কমরেড মাও সে তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী

লাল সংবাদ/ Red News

কর্তৃক অনলাইনে প্রকাশিত ও প্রচারিত ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫

ওয়েবসাইট - https://lalshongbad.wordpress.com

Facebook page– https://www.facebook.com/RedNewz

নোট -

ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে কমরেড মাও সে তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী । কমরেড মাও সে তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী বাংলায় প্রথম প্রকাশ করে কলকাতার নবজাতক প্রকাশনী ১৯৬০ সালে। "লাল সংবাদ/Red News" অনলাইনে এই প্রথম সরাসরি পাঠকদের কাছে মাও সে তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী পৌঁছে দিচ্ছে। পাঠক খুব সহজেই এখানে কমরেড মাও সে তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী ডাউনলোড করতে পারবেন। সকল পাঠক কমরেডদের প্রতি লাল সালাম রইল।

লাল সংবাদ/ Red News

মাও সে তুঙ্ এর নির্বাচিত রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ
১লা মে, ১৯৬০

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬০

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও

সূচীপত্র

প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগ

বিষয়		পৃষ্ঠা
চীনা সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেষণ (মার্চ, ১৯২৬)	...	১৭
হুনানে কৃষক-আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট (মার্চ, ১৯২৭)	...	৩০
কৃষক সমস্যার গুরুত্ব	...	৩০
সংগঠিত হোন !	...	৩১
স্থানীয় উৎপীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোকেরা নিপাত যাক ! কৃষক সমিতির হাতে সকল ক্ষমতা চাই !	...	৩২
'এটা ভয়ঙ্কর !' অথবা 'এটা চমৎকার !'	...	৩৪
তথাকথিত 'বাড়াবাড়ি'র প্রশ্ন	...	৩৫
তথাকথিত 'ইতর লোকের আন্দোলন'	...	৩৭
বিপ্লবের অগ্রবাহিনী	...	৩৮
চোদ্দটি মহান কীর্তি	...	৪৩
১। কৃষক সমিতির মধ্যে কৃষকদের সংগঠিত করা	...	৪৪
২। রাজনৈতিকভাবে ভূস্বামীদেরকে আঘাত করা	...	৪৫
৩। ভূস্বামীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে আঘাত করা	...	৫০
৪। স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের সামন্ততান্ত্রিক শাসন উচ্ছেদ করা—তু এবং তুয়ান ধ্বংস করা	...	৫১
৫। ভূস্বামীদের সশস্ত্র শক্তির উচ্ছেদ এবং কৃষকদের সশস্ত্র শক্তির প্রতিষ্ঠা	...	৫২
৬। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও তার সাকরেদদের রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্ছেদ	...	৫৪
৭। কৌলিক মন্দির···আধিপত্যের উচ্ছেদ	...	৫৬
৮। রাজনৈতিক প্রচারের প্রসার	...	৬০
৯। কৃষকদের নিষেধাজ্ঞা আরোপ	...	৬২
১০। ডাকাতি নির্মূলীকরণ	...	৬৭

বিষয় পৃষ্ঠা

১১। অত্যধিক করের বিলোপসাধন ... ৬৮
১২। শিক্ষার জন্য আন্দোলন ... ৬৯
১৩। সমবায় আন্দোলন ... ৭০
১৪। রাস্তা নির্মাণ ও বাঁধ মেরামত ... ৭১

দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগ

চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিঁকে থাকতে পারে ? ... ৮১
১। দেশের ভেতরকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ... ৮১
২। চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব ও টিঁকে থাকার কারণ ... ৮২
৩। হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে স্বাধীন এলাকা এবং আগস্টের পরাজয় ... ৮৫
৪। হুনান, হুপে এবং কিয়াংসী প্রদেশে হুনান-কিয়াংসী সীমান্তের স্বাধীন এলাকার ভূমিকা ... ৮৮
৫। অর্থনৈতিক সমস্যা ... ৮৮
৬। সামরিক ঘাঁটির সমস্যা ... ৮৯
চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রাম (নভেম্বর ২৫,১৯২৮) ... ৯৪
হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে স্বাধীন এলাকা এবং আগস্টের পরাজয় .. ৯৪
স্বাধীন এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি ... ১০১
সামরিক প্রশ্ন ... ১০২
ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্ন ... ১১১
রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন ... ১১৬
পার্টি-সংগঠনের প্রশ্ন ... ১১৮
বিপ্লবের চরিত্রের প্রশ্ন ... ১২৪
আমাদের স্বাধীন এলাকার স্থান নির্বাচনের প্রশ্ন .. ১২৬
পার্টির ভিতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে (ডিসেম্বর, ১৯২৯) ... ১৩৬
নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে ... ১৩৭
উগ্র-গণতন্ত্র সম্পর্কে ... ১৪০

বিষয় পৃষ্ঠা

সাংগঠনিক শৃঙ্খলা উপেক্ষা করার দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে ... ১৪১
নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদ সম্পর্কে ... ১৪২
আত্মমুখিনতাবাদ সম্পর্কে ... ১৪৪
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সম্পর্কে ... ১৪৫
ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীদের মতাদর্শ সম্পর্কে ... ১৪৭
অন্ধ ক্রিয়াবাদের অবশেষ সম্পর্কে ... ১৪৮
একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে (জানুয়ারী ৫, ১৯৩০) ... ১৫১
অর্থনৈতিক কাজে মনোযোগ দিন (আগস্ট ২০, ১৯৩৩) ... ১৬৭
কীভাবে গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীসমূহের পার্থক্য নির্ণয় করতে হয় (অক্টোবর, ১৯৩৩) ... ১৭৬
১। জমিদার ... ১৭৬
২। ধনী কৃষক ... ১৭৭
৩। মধ্য কৃষক ... ১৭৭
৪। গরীব কৃষক ... ১৭৮
৫। শ্রমিক ... ১৭৮
আমাদের রাজনৈতিক নীতি (জানুয়ারী ২৩, ১৯৩৪) ... ১৮০
জনসাধারণের জীবনযাত্রার যত্ন নিন, কর্মপদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দিন (জানুয়ারী ২৭, ১৯৩৪) ... ১৮৭
জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশল সম্পর্কে (ডিসেম্বর ২৭, ১৯৩৫) ... ১৯৪
বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য ... ১৯৪
জাতীয় যুক্তফ্রন্ট ... ২০৫
গণ-প্রজাতন্ত্র ... ২১০
আন্তর্জাতিক সমর্থন ... ২১৫
চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা (ডিসেম্বর, ১৯৩৬) ... ২৩০
প্রথম অধ্যায়ঃ কীভাবে যুদ্ধের পর্যালোচনা করা যায় ... ২৩০
১। যুদ্ধের নিয়ম বিকাশশীল ... ২৩০
২। যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধের বিলোপসাধন ... ২৩৪
৩। রণনীতি হচ্ছে যুদ্ধের সামগ্রিক নিয়মের পর্যালোচনা ... ২৩৫
৪। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ ... ২৩৯

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের বিপ্লবী যুদ্ধ ... ২৪৫

তৃতীয় অধ্যায়ঃ চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ... ২৪৯

১। বিষয়টির গুরুত্ব ... ২৪৯

২। চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য কি কি? ... ২৫১

৩। এসব বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত আমাদের রণনীতি ও রণকৌশল ... ২৫৪

চতুর্থ অধ্যায়ঃ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান ও এর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ—চীনের গৃহযুদ্ধের প্রধান রূপ ... ২৫৬

পঞ্চম অধ্যায়ঃ রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ... ২৬২

১। সক্রিয় প্রতিরক্ষা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষা ... ২৬২

২। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি ... ২৬৭

৩। রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ ... ২৭০

৪। রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ ... ২৮৭

৫। পাল্টা আক্রমণ শুরু করা ... ২৯০

৬। সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত করা ... ৩০১

৭। চলমান যুদ্ধ ... ৩১০

৮। দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধ ... ৩১৬

৯। নির্মূলীকরণের যুদ্ধ ... ৩২১

চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতি সম্পর্কে বক্তব্য (ডিসেম্বর ২৮, ১৯৩৬) ... ৩৩৫

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্যসমূহ (মে ৩, ১৯৩৭) ... ৩৪৬

চীনের আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহের বিকাশের বর্তমান স্তর ... ৩৪৬

গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ... ৩৫০

নেতৃত্ব দেওয়ায় আমাদের দায়িত্ব ... ৩৫৮

জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের জন্য কোটি কোটি জনগণের সমাবেশ ঘটাও (মে ৭, ১৯৩৭) ... ৩৭৫

শান্তির প্রশ্ন ... ৩৭৫

বিষয় পৃষ্ঠা

গণতন্ত্রের প্রশ্ন ... ৩৭৮
বিপ্লবের ভবিষ্যৎ ... ৩৮১
কর্মীদের প্রশ্ন ... ৩৮২
পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রের প্রশ্ন ... ৩৮৩
সম্মেলনে এবং সমগ্র পার্টিতে ঐক্য ... ৩৮৩
জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের জন্য কোটি কোটি জনগণের সমাবেশ ঘটাও ... ৩৮৪
প্রয়োগ সম্পর্কে ... ৩৮৮
জ্ঞান ও প্রয়োগের মধ্যে, জানা ও করার মধ্যে সম্পর্ক প্রসঙ্গে (জুলাই, ১৯৩৭) ... ৩৮৮
দ্বন্দ্ব সম্পর্কে (আগস্ট, ১৯৩৭) ... ৪০৮
১। দুই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী ... ৪০৮
২। দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ... ৪১৩
৩। দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা ... ৪১৭
৪। প্রধান দ্বন্দ্ব এবং কোন দ্বন্দ্বের প্রধান দিক ... ৪৩০
৫। দ্বন্দ্বের দিকগুলোর অভিন্নতা ও সংগ্রাম ... ৪৩৭
৬। দ্বন্দ্বে বৈরিতার স্থান ... ৪৪৫
৭। উপসংহার ... ৪৪৭

প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগ

॥ চীন প্রসঙ্গে আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ ॥

লি শীন তিয়েন-এর উজ্জ্বল লাল তারা

লি চিয়াও-এর জাগরিত দেশ

ডি. জি. এস্-এর সমাজতন্ত্রের পথে চীনের জয়যাত্রা

নাগার্জুন-এর চীনের জনস্বাস্থ্য ও আকুপাংচার

চীনের একাদশ জাতীয় কংগ্রেসের দলিল

মাও সে-তুঙের কবিতা

অনুবাদক : সুদর্শন রায়চৌধুরী

চীন ভিয়েতনাম বিরোধ প্রসঙ্গে চীন ও ভিয়েতনাম

হো কান চি-র আধুনিক চীন বিপ্লবের ইতিহাস

চীনা সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেষণ

(মার্চ ১৯২৬)

কারা আমাদের শত্রু? কারাই বা আমাদের বন্ধু? এটাই হল বিপ্লবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। চীনের অতীতের সমস্ত বিপ্লবের সংগ্রামগুলো কেন এত অল্প সাফল্য অর্জন করেছে, তার মূল কারণ হচ্ছে, প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য প্রকৃত বন্ধুদের ঐক্যবদ্ধ করতে না পারা। বিপ্লবী পার্টি হচ্ছে জনসাধারণের পথপ্রদর্শক; বিপ্লবী পার্টি যখন তাঁদের ভ্রান্ত পথে চালিত করে, তখন কোন বিপ্লবই সার্থক হতে পারে না। আমাদের বিপ্লবকে আমরা ভ্রান্ত পথে চালিত করব না এবং অবশ্যই সফল হব, এ বিষয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্য প্রকৃত বন্ধুদের ঐক্যবদ্ধ করতে মনোযোগী হতে হবে। প্রকৃত শত্রুদের ও প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিপ্লবের প্রতি তাদের মনোভাবের সাধারণ বিশ্লেষণ অবশ্যই আমাদের করতে হবে।

চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা কি রকম?

জমিদারশ্রেণী ও মুৎসুদ্দিশ্রেণী।[১] অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ আধা-

---

কমরেড মাও সে-তুঙ এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে। সে সময়ে পার্টির ভেতরে যে দু'ধরনের বিচ্যুতি ছিল, তার বিরোধিতা করার জন্যই তিনি এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। তৎকালে পার্টির ভেতরকার প্রথম বিচ্যুতির প্রবক্তা ছিল ছেন তু-সিউ। এরা কেবলমাত্র কুওমিনতাঙের সঙ্গে সহযোগিতা করতেই মনোযোগ দিয়েছিল এবং কৃষকদেরকে ভুলে গিয়েছিল—এটা ছিল দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ। দ্বিতীয় বিচ্যুতির প্রবক্তা ছিল চাং কুও-থাও। এরা কেবলমাত্র শ্রমিক-আন্দোলনের উপরই মনোযোগ দিয়েছিল এবং তারাও ভুলে গিয়েছিল কৃষকদেরকে—এটা ছিল 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ। বিপ্লবের শক্তির অপর্যাপ্ততা সম্বন্ধে উভয় সুবিধাবাদী বিচ্যুতির সমর্থকরাই সচেতন ছিল। কিন্তু উভয়ের কেউই জানত না যে, কোথায় শক্তির সন্ধান করা যায় এবং কোথায় ব্যাপক মিত্রবাহিনী পাওয়া যায়। কমরেড মাও সে-তুঙ দেখিয়েছিলেন যে, কৃষকরাই হচ্ছে চীনের সর্বহারাশ্রেণীর ব্যাপকতম ও সবচেয়ে দৃঢ় মিত্রবাহিনী। এইভাবে তিনি চীন বিপ্লবের সবচেয়ে প্রধান মিত্রবাহিনীর সমস্যার মীমাংসা করেছেন। অধিকন্তু, তিনি আগে থেকে লক্ষ্য করেছিলেন যে, তৎকালীন জাতীয় বুর্জোয়ারা দ্বিধাগ্রস্ত শ্রেণী এবং বিপ্লবের উত্তাল জোয়ারে তা বিভক্ত হয়ে পড়বে, এর দক্ষিণপন্থী অংশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে যাবে। ১৯২৭ সালের ঘটনাবলী থেকেই এটা প্রমাণিত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক চীনে জমিদারশ্রেণী ও মুৎসুদ্দিশ্রেণী পুরোপুরিভাবেই আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের লেজুড় এবং নিজেদের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল। এই শ্রেণীগুলি চীনের সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ এবং সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে এবং চীনের উৎপাদন-শক্তির বিকাশকে বাধা দেয়। তাদের অস্তিত্ব চীনা বিপ্লবের উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ অংগতিহীন। বিশেষ করে, বৃহৎ জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ মুৎসুদ্দিশ্রেণী সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ নেয় এবং তারাই হচ্ছে চরম প্রতিবিপ্লবী চক্র। তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিগণ হল **রাষ্ট্রবাদীগোষ্ঠী**[২] এবং কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীগোষ্ঠী।

মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী। এই শ্রেণী চীনের শহর ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে। মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী বলতে প্রধানতঃ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকেই[৩] বুঝায়। চীনা বিপ্লবের প্রতি তারা দ্বন্দ্বের মনোভাব পোষণ করে। যখন তারা বিদেশী পুঁজির আঘাতে এবং যুদ্ধবাজদের অত্যাচারে যন্ত্রণাবোধ করে, তখনই তারা বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু যখনই স্বদেশে সর্বহারাশ্রেণী সাহসের সঙ্গে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে-বিপ্লবে অংশগ্রহণ করছে এবং বিদেশেও আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণী সক্রিয় সমর্থন দান করছে এবং যখন তারা অনুভব করে যে, তাদের শ্রেণীর পক্ষে বৃহৎ বুর্জোয়া-শ্রেণীর স্তরে উন্নতি হবার আশা বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে, তখনই তারা বিপ্লব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা একটি মাত্র শ্রেণীর—জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনাধীনে রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতী। নিজেকে তাই চি-থাওয়ের[৪] খাঁটি শিষ্য বলে জাহির করত এমন একজন পিকিংয়ের **চেন পাও**[৫] পত্রিকাতে লিখেছিল, 'সাম্রাজ্যবাদকে নিপাত করার জন্য তোমার বাম হাত তোল এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে নিপাত করার জন্য তোমার ডান হাত তোল।' এই দু'টি কথাই এই শ্রেণীর দ্বন্দ্বপূর্ণ ও আশংকাপূর্ণ অবস্থাকে স্পষ্ট করে তোলে। তারা শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদ অনুসারে কুওমিনতাঙের জনকল্যাণের নীতির ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে, তারা রাশিয়ার সঙ্গে কুওমিনতাঙের মৈত্রীর এবং কুওমিনতাঙে কমিউনিস্ট[৬] ও বামপন্থীদের গ্রহণ করার বিরোধিতা করে। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রচেষ্টা অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়াদের শাসনাধীনে রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা একেবারেই অসাধ্য কারণ বর্তমান দুনিয়ার

পরিস্থিতি হল বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী দু'টি বৃহৎ শক্তির চূড়ান্ত সংগ্রামের পরিস্থিতি। এই দু'টি বৃহৎ শক্তি দু'টি বৃহৎ পতাকা উত্তোলন করেছে : একটি হল বিপ্লবের লাল পতাকা—এটাকে তৃতীয় আন্তর্জাতিক উর্ধ্বে তুলে ধরছে, যা সারা দুনিয়ার সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণীগুলোকে তার পতাকার তলে সমবেত হতে আহ্বান জানাচ্ছে ; অপরটি হল প্রতিবিপ্লবের শ্বেত পতাকা—এটাকে জাতিপুঞ্জ উর্ধ্বে তুলে ধরছে, যা বিশ্বের সমস্ত প্রতিবিপ্লবীদেরকে তার পতাকার তলে সমবেত হতে আহ্বান জানাচ্ছে। মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলো অনিবার্যভাবেই দ্রুত বিভক্ত হবে, এক অংশ বামে হেলে বিপ্লবী গোষ্ঠীতে যোগ দেবে এবং অন্য অংশ দক্ষিণে হেলে প্রভিবিপ্লবী গোষ্ঠীতে যোগ দেবে, তাদের 'স্বতন্ত্র' থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই, চীনের মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী যে 'স্বতন্ত্র' বিপ্লবের ধারণা পোষণ করে যাতে তারা প্রধান ভূমিকা নেবে, তা নিছক কল্পনা মাত্র।

পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী। উদাহরণস্বরূপ, মালিক-কৃষক[৭], মালিক-হস্তশিল্পী, নিম্নস্তরের বুদ্ধিজীবী—ছাত্রসমাজ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক, নিম্নস্তরের সরকারী কর্মচারী, ক্ষুদে কেরানি, ক্ষুদে উকিল এবং ক্ষুদে ব্যবসায়ী ইত্যাদি সবাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর লোকসংখ্যা ও তার শ্রেণী-চরিত্রের দিক থেকে এর প্রতি গভীর মনোযোগ উচিত। মালিক-কৃষক ও মালিক-হস্তশিল্পী উভয়েই ক্ষুদে উৎপাদনের অর্থনীতিতে নিযুক্ত। এই পেটি-বুর্জোয়াদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্তর যদিও একই পেটি-বুর্জোয়া অর্থনৈতিক অবস্থায় থাকে, তবুও তারা তিনটি ভিন্ন শাখায় বিভক্ত। প্রথম শাখায় পড়ে তারা যাদের কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ ও খাদ্য আছে, অর্থাৎ যারা শারীরিক অথবা মানসিক শ্রম দ্বারা নিজেদের ভরণপোষণের জন্য প্রতি বছর যতটুকু প্রয়োজন তার অধিক উপার্জন করে। এই ধরনের লোকেরা ধনী হতে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং মার্শাল চাওয়ের[৮] একান্ত অনুগত পূজারী, বিপুল অর্থ সঞ্চয়ের ব্যাপারে মোহ না থাকলেও মাঝারি বুর্জোয়া স্তরে উন্নীত হতে এরা সর্বদাই অত্যন্ত ইচ্ছুক। লোকের নিকট সম্মান পায় এমন ক্ষুদে টাকাওয়ালাকে দেখে প্রায়শঃই তাদের মুখ দিয়ে লালা ঝরে। এই ধরনের লোক ভীরু, তারা সরকারী অফিসারকে ভয় করে এবং বিপ্লবকেও একটু ভয় করে। যেহেতু এদের অর্থনৈতিক অবস্থা মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার অত্যন্ত কাছাকাছি, তাই এরা মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রচারকে খুবই বিশ্বাস করে

এবং বিপ্লবের প্রতি সন্দেহের মনোভাব পোষণ করে। পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে এ অংশ সংখ্যালঘু এবং এরা দক্ষিণপন্থী। দ্বিতীয় শাখা তারা যারা অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে মোটামুটিভাবে নিজেদের ভরণপোষণ করতে পারে। এই শাখার লোক প্রথম শাখার লোকদের থেকে অনেক ভিন্ন। তারাও ধনী হতে চায়, কিন্তু মার্শাল চাও কোনমতেই তাদের ধনী হতে দেয় না। তদুপরি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ, সামন্ত-জমিদার ও বৃহৎ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের দ্বারা উৎপীড়িত ও শোষিত হয়ে তারা অনুভব করে যে, দুনিয়া এখন আর আগের মতো নেই। তারা অনুভব করে যে, কেবলমাত্র পূর্বের মতো সমান পরিশ্রম করলে আজ বেঁচে থাকার মতো উপার্জন করতে পারবে না। কাজের সময় বাড়িয়ে প্রতিদিন খুব ভোরে উঠে দেরীতে ফিরে ও পেশার প্রতি দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়েই কেবল জীবিকা নির্বাহ করা যায়। তাদের মুখে এখন গালাগাল; বিদেশীদের 'বিদেশী শয়তান,' যুদ্ধবাজদের 'দস্যু সর্দার' এবং স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের 'হৃদয়হীন ধনী' বলে গালাগালি করে। সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্পর্কে এরা শুধু সন্দেহ করে যে, এটা সফল হবে কিনা (কারণ বিদেশী ও যুদ্ধবাজদের অতি শক্তিশালী মনে হতো), তারা আন্দোলনে যোগদানের ঝুঁকি নিতে চায় না এবং নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করে, কিন্তু কখনো বিপ্লবের বিরোধিতা করে না। এই শাখায় লোকসংখ্যা খুবই বেশি, পেটি-বুর্জোয়াদের প্রায় অর্ধেক। তৃতীয় শাখায় রয়েছে তারা যাদের জীবনযাত্রার ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটছে। এই শাখার লোক অনেকেই পূর্বে হয়তো কোন অবস্থাপন্ন পরিবারভুক্ত ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থায় উপনীত হচ্ছে যে, শুধু কোনমতে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম এবং তাদের জীবনযাত্রার ক্রমশঃই আরও অবনতি হচ্ছে। প্রতি বছরের শেষে তারা যখন একবার হিসাব-নিকাশ করে, তখন আঁৎকে উঠে বলে, 'হায়! আবার লোকসান!' কারণ এ ধরনের লোকেরা অতীতে সুদিনের মধ্যে জীবনযাপন করেছে, কিন্তু পরে বছর বছর তাদের অবস্থার অবনতি হচ্ছে, তাদের ঋণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীবনও ক্রমশঃ শোচনীয় হচ্ছে, তাই তারা 'ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ভয়ে কেঁপে ওঠে।' এ ধরনের লোক মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে বেশি, কারণ তাদের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এমন একটা বৈপরীত্যের তুলনা রয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলনে এ ধরনের লোক বেশ গুরুত্ব-পূর্ণ, তাদের সংখ্যাও কম নয় এবং এরাই পেটি-বুর্জোয়ার বামপন্থী অংশ।

পেটি-বুর্জোয়ার উপরোক্ত তিনটি শাখাই স্বাভাবিক সময়ে বিপ্লবের প্রতি ভিন্ন মনোভাব পোষণ করে, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ যখন বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার বৃদ্ধি পায়, বিজয়ের আলো চোখে পড়ে তখন শুধু পেটি-বুর্জোয়াদের বামপন্থা নয়, মধ্যপন্থী অংশও বিপ্লবে যোগদান করতে পারে, এমনকি সর্বহারাশ্রেণী ও পেটি-বুর্জোয়াদের বামপন্থীদের বিরাট বৈপ্লবিক স্রোতে ভেসে দক্ষিণপন্থীরাও বিপ্লবের সঙ্গে যেতে বাধ্য হয়। ১৯২৫ সালের ৩০শে মে-র আন্দোলন[৯] এবং বিভিন্ন স্থানের কৃষক-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা প্রমাণিত হয়।

আধা-সর্বহারাশ্রেণী। এখানে আধা-সর্বহারা বলতে পাঁচ রকমের লোক বুঝায়: (১) আধামালিক-কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য[১০], (২) গরীব কৃষক, (৩) ক্ষুদে হস্তশিল্পী, (৪) দোকান-কর্মচারী[১১], এবং (৫) ফেরিওয়ালা। আধামালিক-কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও গরীব কৃষক হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের এক বিরাট সংখ্যক জনসাধারণ। কৃষক সমস্যা প্রধানতঃ তাদেরই সমস্যা। আধামালিক-কৃষক, গরীব কৃষক ও ক্ষুদে হস্তশিল্পীরা যে অর্থনীতিতে নিযুক্ত, তা হচ্ছে আরও ক্ষুদ্রাকারের ক্ষুদে উৎপাদনের অর্থনীতি। আধামালিক-কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও গরীব কৃষক উভয়েই যদিও আধা-সর্বহারাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তবুও অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে তাদেরকে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। আধামালিক-কৃষক—এদের জীবন মালিক-কৃষকদের অপেক্ষা কষ্টকর, কারণ প্রতি বছরই তাদের খাদ্যশস্যের প্রায় অর্ধেক ঘাটতি পড়ে এবং এই ঘাটতি পূরণ জন্য তারা অন্যের থেকে জমি বর্গা নিতে বাধ্য হয়, অথবা নিজেদের শ্রমশক্তি আংশিকভাবে বিক্রি করতে বাধ্য হয়, অথবা ছোটখাট ব্যবসায় চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বসন্তের শেষে এবং গ্রীষ্মের প্রথমে শস্যাদি যখন কাঁচা থাকে এবং পুরানো মজুত শস্যও নিঃশেষ হয়ে যায় তখন তারা অন্যের থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে এবং চড়া দামে শস্য কেনে। তাদের অবস্থা স্বভাবতঃই যারা মালিক-কৃষক—যাদের অপরের সাহায্য নেবার প্রয়োজন নেই—তাদের থেকে কষ্টকর, কিন্তু গরীব কৃষকদের থেকে উৎকৃষ্টতর। কারণ গরীব কৃষকদের নিজস্ব কোন জমি নেই, সারা বছর পরের জমি চাষ করে তারা শুধু অর্ধেক অথবা অর্ধেকেরও কম ফসল পায়; কিন্তু আধামালিক-কৃষক বর্গা-নেওয়া জমি থেকে যদিও অর্ধেক বা অর্ধেকেরও কম ফসল পায়, তবু তাদের নিজস্ব জমির সবটুকু ফসলই তারা

পায়। সুতরাং আধামালিক-কৃষকেরা মালিক-কৃষকদের থেকে অধিক বিপ্লবী, কিন্তু গরীব কৃষকদের থেকে কম বিপ্লবী। গরীব কৃষক হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের বর্গাচাষী এবং জমিদারদের দ্বারা শোষিত। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারে তাদের আবার দু' অংশে ভাগ করা যায়। এক অংশের গরীব কৃষকদের কাছে অপেক্ষাকৃতভাবে পর্যাপ্ত কৃষি-যন্ত্রপাতি ও কিছু মূলধন আছে। এ ধরনের কৃষকেরা তাদের বার্ষিক শ্রমের ফলের অর্ধেকটা পেতে পারে। ঘাটতি পূরণের জন্য তারা পার্শ্ব-ফসল চাষ করে, মাছ বা চিংড়ি ধরে, মুরগী বা শূকর পোষে, অথবা নিজেদের শ্রমশক্তি আংশিকভাবে বিক্রি করে কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করে এবং এইভাবে তারা দুঃখকষ্ট ও অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে বছরটা কাটিয়ে দেবার আশা পোষণ করে। অতএব, তাদের জীবনযাত্রা আধামালিক-কৃষকদের অপেক্ষা কষ্টসাধ্য, কিন্তু অন্য অংশের গরীব কৃষকদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তারা আধামালিক-কৃষকদের থেকে অধিক বিপ্লবী, কিন্তু অন্য অংশের গরীব কৃষকদের থেকে কম বিপ্লবী। অন্য অংশের গরীব কৃষকদের কথা বলতে গেলে, তাদের না আছে যথেষ্ট পরিমাণে কৃষি-যন্ত্রপাতি, না আছে মূলধন; তাদের কাছে পর্যাপ্ত সার নেই, তাদের জমিতে কম ফসল ফলে এবং খাজনা দেবার পর তাদের কাছে প্রায় কিছুই থাকে না, সুতরাং আংশিকভাবে শ্রমশক্তি বিক্রি করার আরও বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অজন্মার বছরে তারা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে করুণভাবে ভিক্ষা চায়, চার-পাঁচ দিন কাটাবার জন্য কয়েক মণ বা কয়েক সের খাদ্যশস্য ধার করে, এইভাবে ষাঁড়ের পিঠের বোঝার মতো তাদের ঋণ স্তূপীকৃত হতে থাকে। কৃষকদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে মন্দ অবস্থার, এবং বিপ্লবী প্রচারকে অতি সহজেই গ্রহণ করে। ক্ষুদে হস্তশিল্পীদেরকে আধা-সর্বহারাশ্রেণী বলা হয়, কারণ তাদের যদিও উৎপাদনের কিছু সহজ উপকরণ আছে, এবং স্বতন্ত্র পেশা রয়েছে, তবুও তারা প্রায়শঃই আংশিকভাবে শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় গ্রামাঞ্চলের গরীব কৃষকদের মতোই। তাদের সংসার খরচের ভারি বোঝা, উপার্জন ও জীবন নির্বাহের ব্যয়ের ব্যবধান এবং প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের জ্বালা ও বেকারত্বের আশংকার দিক থেকে গরীব কৃষকদের সংগে তাদের মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। দোকান-কর্মচারীরা হচ্ছে ভাড়াটে কর্মী, নিজেদের সামান্য বেতন দিয়েই তাদের পরিবারের খরচ চালাতে হয়, যদিও প্রতি বছরই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়,

তবুও তাদের বেতন সাধারণতঃ বেশ কয়েক বছর পর একবার মাত্র বাড়ে। আপনি যদি কখনো তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ করেন, তাহলে তখনি তারা নিজেদের অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনাতে থাকবে। তাদের অবস্থা গরীব কৃষক ও ক্ষুদে হস্তশিল্পীদের থেকে বেশি আলাদা নয়; বিপ্লবী প্রচারকে তারা অতি সহজেই গ্রহণ করে। ফেরিওয়ালারা পণ্যদ্রব্য কাঁধের বাঁকেই বহন করুক কিংবা রাস্তার পাশে ছোট দোকান খুলেই বিক্রয় করুক, তাদের মূলধন কিন্তু অল্প এবং উপার্জিত অর্থও কম, এতে তাদের খাওয়া-পরার খরচ কুলায় না। তাদের অবস্থা গরীব কৃষকদের থেকে বেশি আলাদা নয়। তাই তাদেরও গরীব কৃষকদের মতো বিপ্লবের প্রয়োজন হয়, যা বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করবে।

সর্বহারাশ্রেণী। চীনের আধুনিক শিল্প-সর্বহারার সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ। চীন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ দেশ বলে এদের সংখ্যাও বেশি নয়। এই আনুমানিক বিশ লক্ষ শিল্প-শ্রমিক প্রধানতঃ পাঁচটি শিল্পে নিযুক্ত— রেলওয়ে, খনিজ, নৌ-পরিবহন, বস্ত্রশিল্প এবং জাহাজ তৈরী। তাদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক বিদেশী পুঁজির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ। শিল্প-সর্বহারাশ্রেণী যদিও সংখ্যায় অধিক নয়, তবুও তারা চীনের নতুন উৎপাদন-শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে; আধুনিক চীনের তারাই সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল শ্রেণী এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিচালক শক্তি। বিগত চার বছরের ধর্মঘটী আন্দোলনগুলোতে, যেমন নাবিক-ধর্মঘট[১২], রেলওয়ে ধর্মঘট[১৩], খাইলুয়ান ও চিয়াওচুওয়ের কয়লা খনির ধর্মঘট[১৪], শামিয়েন ধর্মঘট[১৫] এবং ৩০শে মের আন্দোলনের পর সাংহাই ও হংকংয়ের বিরাট ধর্মঘটে[১৬] এরা যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে, তার প্রতি তাকালেই আমরা চীন বিপ্লবে শিল্প-সর্বহারাশ্রেণীর অবস্থানের গুরুত্বটা বুঝতে পারব। কেন তারা এই ভূমিকা দখল করে আছে, তার প্রথম কারণ হচ্ছে তারা কেন্দ্রীভূত। অন্য কোন অংশের লোকই তাদের মতো এত কেন্দ্রীভূত নয়। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নমানের। উৎপাদনের উপকরণ থেকে তারা বঞ্চিত, নিজেদের হাত দু'টি ছাড়া তাদের কিছুই অবশিষ্ট নেই, ধনী হবার কোন আশা তাদের নেই এবং সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ ও বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, সুতরাং তারা লড়াই করতে বিশেষ সক্ষম। শহরের কুলিদের শক্তিও মনোযোগ দেবার যোগ্য। তাদের অধিকাংশই

বন্দরের মুটে-মজুর এবং রিক্সাওয়ালা; মেথর এবং রাস্তার ঝাড়ুদারও তাদের অন্তর্ভুক্ত। নিজেদের হাত দু'টি ছাড়া এদের অন্য কোন সম্বল নেই, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা শিল্প-শ্রমিকদের মতোই, কিন্তু শিল্প-শ্রমিকদের অপেক্ষা এরা কম কেন্দ্রীভূত এবং উৎপাদন ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ। চীনে আধুনিক পুঁজিবাদী কৃষীকার্য এখনো খুব কম। গ্রাম্য সর্বহারাশ্রেণী বলতে বার্ষিক, মাসিক অথবা দৈনিক চুক্তির ক্ষেত-মজুরদেরই বোঝায়। এই ধরনের ক্ষেত-মজুরদের কাছে শুধু যে জমি এবং কৃষি-যন্ত্রপাতিই নেই তা নয়, এমনকি তাদের কোন মূলধনও নেই, তারা শুধু নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করেই বেঁচে থাকতে পারে। তাদের কাজের সময় এত দীর্ঘ, বেতন এত কম, শ্রমের অবস্থা এত শোচনীয় এবং কাজ এত নিরাপত্তাহীন যে, অন্য সকল শ্রমিকদের তুলনায় তাদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের লোকেরাই সবচেয়ে অধিক কষ্টভোগ করছে এবং কৃষক-আন্দোলনে এদের স্থান গরীব কৃষকদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

এ ছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক **ভবঘুরে** সর্বহারা, অর্থাৎ ভূমিহারা কৃষক এবং কাজে নিযুক্তির সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হস্তশিল্প-শ্রমিক। মানব-সমাজে তারা সবচেয়ে দুঃস্থ। দেশের বিভিন্ন স্থানেই তাদের গুপ্ত সংগঠন আছে, যেমন ফুকিয়েন ও কোয়াংতুঙে 'ত্রিগুণাত্মা সমিতি', হুনান, হুপে, কুইচৌ ও সেচুয়ানে 'ভ্রাতৃসংঘ', আনহুই, হোনান ও শানতুঙে 'বৃহৎ তরবারি সংঘ', চিলি[১৭] ও তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশে 'যুক্তিবাদী জীবন সংঘ' এবং সাংহাই ও অন্যান্য স্থানে 'সবুজ সংঘ'[১৮]। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে এগুলো ছিল তাদের পারস্পরিক সহায়ক সংগঠন। এই সমস্ত লোককে কি করে পরিচালিত করা যায় তা চীনের অন্যতম কঠিন সমস্যা। তারা নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করতে খুব সক্ষম, কিন্তু তাদের ধ্বংসাত্মক ঝোঁকও আছে, নির্ভুল নেতৃত্ব দিলে এরা একটি বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজশে লিপ্ত সমস্ত যুদ্ধবাজ, আমলা, মুৎসুদ্দিশ্রেণী, বড় জমিদারশ্রেণী এবং তাদের উপর নির্ভরশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশই হল আমাদের শত্রু। শিল্প-সর্বহারাশ্রেণীই হল আমাদের বিপ্লবের পরিচালক শক্তি। সমস্ত আধা-সর্বহারাশ্রেণী এবং পেটি-বুর্জোয়ারাই আমাদের নিকটতম বন্ধু। দোদুল্যমান মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর দক্ষিণপন্থীরা আমাদের শত্রু এবং বামপন্থীরা আমাদের

মিত্র হতে পারে—কিন্তু আমাদের সর্বদাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে তারা আমাদের কর্মীদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে না পারে।

টীকা

১। মূল অর্থে মুৎসুদ্দি মানে বিদেশী বাণিজ্যিক সংস্থার চীনা ম্যনেজার বা প্রধান কর্মচারী। মুৎসুদ্দিরা ছিল বিদেশী অর্থনৈতিক স্বার্থের বিশ্বস্ত সেবা দাস, এবং এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও বিদেশী পুঁজির সঙ্গে।

২। **রাষ্ট্রবাদ**—এখানে তৎকালীন মুষ্টিমেয় ফ্যাসিবাদী নির্লজ্জ রাজনীতিবিদদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা চীনের রাষ্ট্রবাদী যুব সংঘ গঠন করেছিল, পরে যার নামকরণ করা হয়েছিল চীনা যুব পার্টি। ক্ষমতাসীন বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তারা কমিউনিস্ট পার্টির এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করাটাকে নিজেদের প্রতিবিপ্লবী পেশা করেছিল।

৩। জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য মাও সে-তুঙের **নির্বাচিত রচনাবলীর** ২য় খণ্ডে 'চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি' শীর্ষক প্রবন্ধের ২য় অধ্যায়, ৪র্থ অংশ দ্রষ্টব্য।

৪। তাই চি-থাও যুবাবস্থাতেই কুওমিনতাঙে যোগ দিয়েছিল এবং চিয়াং কাই-শেকের অংশীদার হয়ে স্টক-এক্সচেঞ্জে চোরাবাজারী করত। ১৯২৫ সালে সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর, সে কমিউনিস্টবিরোধী উস্কানির কাজে লিপ্ত হয় এবং ১৯২৭ সালে চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লবী ক্যু'দেতা চালানোর জন্য মতাদর্শগত দিক দিয়ে প্রস্তুতি করেছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবী কাজে সে ছিল চিয়াং কাই-শেকের অনুগত কুকুর। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চিয়াং কাই-শেকের শাসনের ধ্বংসের অনিবার্যতা দেখে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরুপায় হয়ে সে আত্মহত্যা করে।

৫। **ছেন পাও** সেই সময়ে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের শাসনের সমর্থনকারী অন্যতম রাজনৈতিক চক্রের—সংবিধানের গবেষণা সমিতির মুখপত্র ছিল।

৬। ১৯২৩ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন কুওমিনতাঙের পুনর্গঠন করার, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করার এবং কমিউনিস্টদেরকে কুওমিনতাঙে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেন। ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ক্যান্টনে কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেস আহ্বান করেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মৈত্রী ও কৃষক-শ্রমিকদের সমর্থন করা—এই তিনটি মৌলিক নীতি নির্ধারণ করেন। সেই সময়ে কমরেড মাও সে-তুঙ এবং লী তা-চাও, লিন পো-ছু, ছু ছিউ-পাই ও অন্যান্য কমরেড ঐ কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন এবং কুওমিনতাঙকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সেই সময়ে কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য অথবা বিকল্প সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৭। মালিক-কৃষক বলতে কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে মাঝারি কৃষকদের বুঝিয়েছেন।

৮। মার্শাল চাও হচ্ছেন চীনা লোক কাহিনীতে সমাজের দেবতা, তাঁর পুরো নাম চাও কুঙ-মিঙ।

৯। ১৯২৫ সালের ৩০শে মে সাংহাইয়ে ব্রিটিশ পুলিশ কর্তৃক চীনা জনগণের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সারা দেশের জনগণ যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন চালিয়েছিল এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৫ সালের মে মাসে ছিংতাও ও সাংহাইয়ের জাপানী সুতাকলগুলোতে পর পর ধর্মঘট হয়, এই ধর্মঘট ব্যাপক আকারের রূপ নিয়েছিল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের পদলেহী কুকুর—উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজরা এটা দমন করতে আসে। ১৫ই মে সাংহাইয়ের জাপানী সুতাকলের মালিক কু চেং-হুং নামক একজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে এবং ডজনখানেক শ্রমিককে আহত করে। ২৮শে তারিখে ছিংতাওয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ২৮ জন শ্রমিককে হত্যা করে। ৩০শে মে সাংহাইয়ে দু'হাজারেরও অধিক ছাত্র বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বিদেশীদের এলাকাগুলোতে শ্রমিকদের সমর্থনে প্রচার চালায় এবং এইসব এলাকা ফেরৎ আনার জন্য আহ্বান জানায়, এর পরেই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্রিটিশ এলাকার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সম্মুখে দশ হাজারের অধিক লোক জমায়েত হয় এবং উচ্চৈস্বরে 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক!', 'সমগ্র চীনা জনগণ, এক হও!' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ জনতার উপর গুলি চালায়। ফলে বহু ছাত্র হতাহত হয়। এই ঘটনাই ৩০শে মের হত্যাকাণ্ড বলে পরিচিত। এই বিরাট হত্যাকাণ্ডে

সমগ্র দেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়, দেশের সর্বত্রই বিক্ষোভ-মিছিল করা হয় এবং শ্রমিক, ছাত্র ও দোকান-কর্মচারীদের ধর্মঘট ও হরতাল শুরু হয়, যা বিরাটাকারের সম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়।

১০। কমরেড মাও সে-তুঙ 'আধামালিক-কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য' বলতে এখানে দরিদ্র কৃষকদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা অংশতঃ নিজেদের জমিতে চাষ করে এবং অংশতঃ অন্যদের কাছ থেকে বর্গা নেওয়া জমিতে কাজ করে।

১১। পুরানো চীনে দোকান-কর্মচারীরা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিল। এখানে কমরেড মাও সে-তুঙ এদের সংখ্যাগুরু স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া নিম্নস্তরের-দোকান-কর্মচারীর আর একটি অংশ সর্বহারাজীবন যাপন করত।

১২। ১৯২২ সালের প্রারম্ভে হংকংয়ের নাবিকগণ ও ইয়াংসির স্টীমারের নাবিকগণ ধর্মঘট করে। হংকংয়ের নাবিকরা দৃঢ়তার সঙ্গে আট সপ্তাহ ধরে ধর্মঘট চালায়; তীব্র ও রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত হংকংয়ের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, নাবিকদের ইউনিয়নের ওপর থেকে বাধানিষেধ প্রত্যাহার, বন্দী শ্রমিকদের মুক্তি এবং শহীদদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি দাবি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এবং পরে ইয়াংসির স্টীমারের নাবিক ও শ্রমিকরাও ধর্মঘট শুরু করে দেয় এবং দুসপ্তাহ পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাবার পর তারাও বিজয়লাভ করে।

১৩। ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে তা সংগঠনের কাজ চালাতে শুরু করে। ১৯২২-২৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত প্রধান প্রধান রেলওয়েতে ধর্মঘট হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল পিকিং-হানখৌ রেলওয়ের সাধারণ ধর্মঘট, যা ১৯২৩ সালের ৪টা ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রমিকরা সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার স্বাধীনতার জন্য চালিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সমর্থিত উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ উ পেই-ফু ও শিয়াও ইয়াও-নান ৭ই ফেব্রুয়ারী এই ধর্মঘটী শ্রমিকদের নির্মমভাবে হত্যা করে। এটাই ইতিহাসের ৭ই ফেব্রুয়ারীর হত্যাকাণ্ড নামে বিখ্যাত।

১৪। খাইলুয়ান কয়লার খনি হচ্ছে, খাইফিং ও লুয়ানচৌ কয়লা খনি দু'টির সাধারণ নাম। এটা চীনের হোপে প্রদেশে অবস্থিত এবং পরস্পরের সংলগ্ন বিশাল কয়লার খনি। সেই সময়ে সেখানে ৫০ হাজারের অধিক শ্রমিক

কাজ করত। ১৯০০ সালেই হো থোয়ান আন্দোলনের সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা খাইফিং কয়লার খনি কেড়ে নিয়েছিল। পরে চীনা লোকেরা লুয়ানচৌ কয়লার খনি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে, কিছুকাল পরে এই কোম্পানি খাইফিং কয়লা খনির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ফলে খাইলুয়ান কয়লা খনির যুক্ত কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে উভয় খনিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দখল করে নেয়। খাইলুয়ান ধর্মঘট বলতে ১৯২২ সালের অক্টোবরের ধর্মঘটকেই বুঝায়। চিয়াওচুও কয়লার খনি হোনান প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত এবং চীনের প্রসিদ্ধ কয়লার খনি। চিয়াওচুও ধর্মঘট ১৯২৫ সালের পয়লা জুলাই থেকে ৯ই আগস্ট পর্যন্ত চলেছিল।

১৫। সে সময়ে শামিয়েন ছিল ক্যান্টন শহরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা—যারা শামিয়েন শাসন করত—১৯২৪ সালের জুলাই মাসে এক নতুন পুলিশ আইন জারী করে যে, ঐ এলাকা থেকে আসা-যাওয়ার সময় সমস্ত চীনাদের অবশ্যই নিজের ফটোযুক্ত পাশ দেখাতে হবে, কিন্তু বিদেশীরা সেখানে স্বাধীনভাবে আসা-যাওয়া করতে পারত। এই অযৌক্তিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৫ই জুলাই তারিখে শামিয়েনের শ্রমিকরা ধর্মঘট ঘোষণা করে। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা বাধ্য হয়ে ঐ নতুন পুলিশ আইন বাতিল করে।

১৬। সাংহাইয়ের ১৯২৫ সালের ৩০শে মের ঘটনার পর, ১লা জুন তারিখে সাংহাইয়ে এবং ১৯শে জুন হংকংয়ে সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়। সাংহাইয়ে ২ লক্ষের অধিক শ্রমিক এবং হংকংয়ে আড়াই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগদান করে। সমগ্র দেশের জনগণের সমর্থন পেয়ে হংকংয়ের বিরাট ধর্মঘট লাগাতার-ভাবে ১৬ মাস ব্যাপী চলতে থাকে। বিশ্বের শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসে এইটাই দীর্ঘতম ধর্মঘট ছিল।

১৭। চিলি হচ্ছে হোপে প্রদেশের পুরানো নাম।

১৮। 'ত্রিগুণাত্মক সমিতি,' 'ভ্রাতৃসংঘ,' 'বৃহৎ তরবারি সংঘ,' 'যুক্তিবাদী জীবন সংঘ', 'সবুজ সংঘ' প্রভৃতি ছিল জনতার মধ্যে আদিম ধরনের গুপ্ত সংগঠন। এই সংগঠনে প্রধানতঃ রয়েছে দেউলিয়া কৃষক, বেকার হস্তশিল্পী ও ভবঘুরে সর্বহারাগণ। সামন্ততান্ত্রিক চীনে প্রায়শঃই ধর্ম ও কুসংস্কারের সূত্রে এইসব লোক একত্রিত হতো এবং পিতৃপ্রধান ব্যবস্থার সংগঠনরূপে বিভিন্ন নামের সংগঠন গড়ে তুলত, তাদের কারো কারো বা অস্ত্রশস্ত্র ছিল। এই সংগঠনের

মাধ্যমে তারা সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য লাভ করত এবং আমলা ও জমিদার—যারা তাদের অত্যাচার করত—তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে কখনো কখনো তা ব্যবহার করত। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, কৃষক এবং হস্তশিল্পীরা এ ধরনের পশ্চাৎপদ সংগঠন থেকে কোন উপায় খুঁজে পেত না। অধিকন্তু, এই ধরনের পশ্চাৎপদ সংগঠন অতি সহজেই জমিদার ও স্থানীয় উৎপীড়কদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবহৃত হতো, আর এ ছাড়া তাদের অন্ধ-ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির কারণে কোন কোনটা বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হতো। ১৯২৭ সালে চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লবী ক্যু'দেতার সময়ে সে মেহনতী জনগণের ঐক্যকে বিনষ্ট করার ও বিপ্লবকে ধ্বংস করার হাতিয়ার হিসেবে এই ধরনের পশ্চাৎপদ সংগঠনকে ব্যবহার করেছিল। আধুনিক শিল্প সর্বহারাশ্রেণীর শক্তি বিপুলভাবে বেড়ে ওঠার পর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকেরা ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাই এইসব আদিম ও পশ্চাৎপদ সংগঠনের **অস্তিত্বের** আর প্রয়োজন রইল না।

হুনানে কৃষক-আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট

(মার্চ ১৯২৭)

কৃষক সমস্যার গুরুত্ব

হুনানে[১] আমার সাম্প্রতিক সফরকালে আমি সিয়াংথান, সিয়াংসিয়াং, হেংশান, লিলিং এবং ছাংশা—এ পাঁচটি জেলার অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করেছি। ৪ঠা জানুয়ারী থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত—এই ৩২ দিনে গ্রামঞ্চলে এবং জেলা-শহরগুলিতে আমি তথ্যানুসন্ধানী সম্মেলন আহ্বান করেছিলাম।

অভিজ্ঞ কৃষক এবং কৃষক-আন্দোলনে কার্যরত কমরেডগণ এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। আমি মনোযোগের সঙ্গে তাঁদের রিপোর্ট শুনেছি এবং প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছি। হানখৌ ও ছাংশার ভদ্রলোকরা যা বলাবলি করেছে, কৃষক-আন্দোলনের কারণ ও পদ্ধতি সম্পর্কিত অনেক প্রশ্নই ছিল একেবারে ঠিক তার উল্টো। এমন অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় আমি দেখেছি এবং শুনেছি যেগুলি সম্পর্কে এর আগে আমি অবহিত ছিলাম না। আমার বিশ্বাস, কথাটা অন্যান্য অনেক স্থান সম্পর্কেও সত্য। কৃষক-আন্দোলনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বক্তব্য অবশ্যই দ্রুত শোধরাতে হবে। কৃষক-আন্দোলন সম্পর্কে বিপ্লবী

কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে সেই সময় পার্টির ভিতরে ও বাইরে যে খুঁতখুঁতে সমালোচনা চালানো হচ্ছিল তারই জবাবে কমরেড মাও সে-তুঙ এই প্রবন্ধটি লেখেন। ঐ সব সমালোচনার উত্তর দেবার জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ হুনান প্রদেশে ৩২ দিন ধরে ঘটনাবলীর তদন্ত করেন এবং এই রিপোর্ট লেখেন। তখন ছেন তু-সিউয়ের নেতৃত্বে পার্টির ভেতরকার দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা কমরেড মাও সে-তুঙের অভিমত মেনে না নিয়ে তাদের নিজস্ব ভুল ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরে রাখে। তাদের প্রধান ভুল ছিল এই যে, কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতায় ভয় পেয়ে কৃষকদের যে মহান বিপ্লবী সংগ্রাম তখন শুরু হয়ে গিয়েছে বা শুরু হবার পথে ছিল, তাকে সমর্থন জানাতে তারা সাহস করেনি। কুওমিনতাঙের তুষ্টি-বিধান করার জন্য সর্বাপেক্ষা প্রধান মিত্রবাহিনী অর্থাৎ কৃষকদের তারা পরিত্যাগ করতে মনস্থ করে। এইভাবে তারা শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিকে বিচ্ছিন্ন ও সহায়হীন অবস্থায় ফেলে দেয়। কমিউনিস্ট পার্টির এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে কুওমিনতাঙ সমর্থ হয়েছিল, এবং প্রধানতঃ এই কারণে ১৯২৭ সালের গ্রীষ্মকালে সে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে, তার 'পার্টি শুদ্ধি অভিযান' চালাতে এবং জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস করে।

কর্তৃপক্ষ যেসব ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল সেগুলি অবশ্যই দ্রুত পরিবর্তন করতে হবে। কেবলমাত্র এইভাবেই বিপ্লবের ভবিষ্যৎ লাভবান হতে পারে। কারণ কৃষক-আন্দোলনের বর্তমান অভ্যুত্থান একটা অত্যন্ত বিরাট ঘটনা। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চীনের মধ্য, দক্ষিণ এবং উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে কোটি কোটি কৃষক প্রবল ঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যার মতো তীব্র গতি ও প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে জেগে উঠবে। কোন শক্তি, সে যত প্রবলই হোক না কেন, এটাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। যেসব বেড়াজাল তাদের বেঁধে রাখে, সে সব-কিছুকেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তারা মুক্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হবে। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধবাজ, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের তারা কবরে পুঁতে ফেলবে। সমস্ত বিপ্লবী পার্টি ও দল এবং সমস্ত বিপ্লবী কমরেডকেই তাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে—গ্রহণ করা বা বর্জন করা তাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে। তাদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তাদের নেতৃত্ব দান করা? না, তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ভেংচি কেটে তাদের সমালোচনা করা? অথবা তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের বিরোধিতা করা? এ তিনটার একটাকে বেছে নেবার স্বাধীনতা প্রতিটি চীনা লোকেরই আছে। তবে বাস্তব অবস্থা বেছে নেওয়ার কাজটা শীঘ্রই করে ফেলতে আপনাকে বাধ্য করবে।

সংগঠিত হোন!

হুনানের কৃষক-আন্দোলনের বিকাশকে মোটামুটি দু'টি পর্যায়কালে ভাগ করা যায়; প্রদেশের মধ্যে ও দক্ষিণভাগের যেখানে এই আন্দোলন ইতিমধ্যেই অনেকখানি অগ্রগতি লাভ করেছে, সেখানকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাগ করা চলে। বিগত বছরের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়টা ছিল প্রথম পর্যায়কাল, অর্থাৎ সংগঠনের পর্যায়কাল। এই পর্যায়কালে জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত সময়টা ছিল গোপন কর্ম-তৎপতার সময়; জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিপ্লবী বাহিনী যখন চাও হেং-থিকে[২] বিতাড়িত করেছিল, সে সময়টা ছিল প্রকাশ্য কর্ম-তৎপরতার সময়। এই পর্যায়কালে কৃষক সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা তিন-চার লক্ষের বেশি ছিল না। তাদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বাধীন জনসাধারণের সংখ্যা ছিল দশ লাখের সামান্য কিছু বেশি। তখন গ্রামাঞ্চলে কোন সংগ্রাম ছিল না বললেই চলে; এর ফলে অন্যান্য মহলে সমিতিগুলোর

খুব অল্প সমালোচনাই হতো। কৃষক সমিতির সদস্যরা উত্তরে অভিযানকারী সৈন্যবাহিনীর পথপ্রদর্শক, স্কাউট এবং বাহক হিসাবে কাজ করত বলে কোন কোন অফিসার কৃষক সমিতি সম্পর্কে প্রশংসাবাক্যও উচ্চারণ করছিল। বিগত অক্টোবর থেকে এ বছরের জানুয়ারী অবধি ছিল দ্বিতীয় পর্যায়কাল, অর্থাৎ বিপ্লবী কর্ম-তৎপরতার পর্যায়কাল। এই সময়ে কৃষক সমিতির সদস্য সংখ্যা দ্রুত বেড়ে হল কুড়ি লাখ এবং তাদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বাধীন জনসাধারণের সংখ্যা বেড়ে হল এক কোটি। যেহেতু সাধারণতঃ কৃষকরা কৃষক সমিতিতে যোগদানের সময় একটি সমগ্র পরিবারের পক্ষ থেকে মাত্র একজনের নাম লেখায়, সেজন্য কৃষক সমিতির সদস্যের সংখ্যা কুড়ি লাখ বলতে প্রায় এক কোটি জনসাধারণের আনুগত্য বোঝায়। হুনানের প্রায় অর্ধেক কৃষকই এখন সংগঠিত। সিয়াংথান, সিয়াং-সিয়াং, লিউইয়াং, ছাংশা, লিলিং, নিংসিয়াং, পিংকিয়াং, সিয়াংইং, হেংশান, হেংইয়াং, লেইয়াং, ছেনসিয়ান এবং আনহুয়া-এর মতো জেলাগুলোর প্রায় সমস্ত কৃষকেরাই কৃষক সমিতিগুলিতে যোগ দিয়েছে এবং তাদের নেতৃত্বাধীনে এসেছে। তাদের বিপুল সাংগঠনিক শক্তির ফলেই কৃষকেরা কর্মতৎপর হয়েছে এবং এইভাবে চার মাসের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে এক বিরাট বিপ্লব সম্পন্ন করেছে। ইতিহাসে এই বিপ্লবের তুলনা নেই।

স্থানীয় উৎপীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোকেরা নিপাত যাক ! কৃষক সমিতির হাতে সকল ক্ষমতা চাই !

কৃষকদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য স্থানীয় উৎপীড়ক, এবং উচ্ছৃংখল ভূস্বামীরা,- কিন্তু সাথে সাথে তারা বিভিন্ন পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণার ও বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, শহরের দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এবং গ্রামাঞ্চলের প্রচলিত কুপ্রথা ও কুনীতির বিরুদ্ধেও আঘাত হেনেছে। প্রলয়ংকরী ঝড়ো আক্রমণের সামনে যারা মাথা নত করে তারা বেঁচে যায়, আর যারা বাধা দেয় তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে হাজার হাজার বছর ধরে সামন্ত ভূস্বামীরা যে বিশেষ অধিকার ভোগ করে আসছিল তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। ভূস্বামীদের সৃষ্ট মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রতিটি কণা ধূলিসাৎ হচ্ছে। ভূস্বামীদের ক্ষমতা ভেঙ্গে পড়বার সাথে সাথে এখন কৃষক সমিতিগুলি ক্ষমতা প্রয়োগের একমাত্র যন্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং 'কৃষক সমিতির হাতে সকল ক্ষমতা চাই' এই জনপ্রিয় শ্লোগানটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার

ঝগড়াঝাটির মতো ছোটখাট ব্যাপারও সমাধানের জন্য কৃষক সমিতির কাছে পেশ করা হয়। কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে কেউ উপস্থিত না থাকলে কোন কিছুরই মীমাংসা হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, সমিতিই পল্লী অঞ্চলের সমস্ত ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করে—সোজা কথায় 'এরা যা বলে তাই হয়'। যারা সমিতির বাইরে রয়েছে, তারা সমিতি সম্পর্কে শুধু ভাল কথাই বলতে পারে এবং এর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতে পারে না। স্থানীয় উৎপীড়ক এবং উচ্ছৃংখল ভূস্বামীদের কথা বলার সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ মতভেদের কথা বিড়বিড় করে প্রকাশ করতেও সাহস করে না। কৃষক সমিতির শক্তি ও চাপের মুখে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের শীর্ষস্থানীয়রা সাংহাইয়ে পালিয়ে গেছে। দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা হানখৌ, তৃতীয় স্তরেররা ছাংশা এবং চতুর্থ স্তরের লোকেরা গেছে জেলা শহরগুলোতে, আর পঞ্চম স্তরের এবং তারও নীচের চুনোপুঁটিরা গ্রামের কৃষক সমিতিগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

ছোটখাট অসৎ ভদ্রলোকদের কেউ কেউ বলে 'এই রইল দশ ইউয়ান। দয়া করে আমাকে কৃষক সমিতিতে যোগ দিতে দিন।'

কৃষকেরা উত্তর দেয়: 'ছ্যাঃ! কে চায় তোমার নোংরা টাকা!'

অনেক মাঝারি ও ক্ষুদ্র ভূস্বামী এবং ধনী কৃষক, এমনকি অনেক মাঝারি কৃষকও, যারা আগে কৃষক সমিতির বিরোধিতা করেছে, তারা এখন ভর্তি হবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। বিভিন্ন স্থান সফরকালে আমি প্রায়ই এ রকম লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যারা আমার কাছে অনুনয় করে বলেছে: 'প্রাদেশিক রাজধানী থেকে আগত কমিটি-নেতা, আপনি দয়া করে আমার জামিন হোন!'

ছিং রাজবংশের শাসনকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংকলিত পারিবারিক আদমশুমারির জন্য ছিল একটি নিয়মিত তালিকাপুস্তক এবং আর একটি 'অন্য' তালিকাপুস্তক। প্রথমটি ছিল সৎ লোকের জন্য এবং দ্বিতীয়টি ছিল সিঁদেলচোর, দস্যু এবং অনুরূপ অবাঞ্ছিতদের জন্য। কোন কোন জায়গায় কৃষকরা এখন এই পন্থা অবলম্বন করে পূর্বে যারা কৃষক সমিতির বিরোধিতা করেছে, তাদের ভয় দেখায়। তারা বলে, 'এদের নাম অন্য তালিকাপুস্তকে লিখে রাখ!'

অন্য তালিকাপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হবার ভয়ে এই ধরনের লোকেরা কৃষক

সমিতিতে ভর্তি হবার জন্য নানা কৌশলে চেষ্টা করছে। এর উপর তাদের মন এতই নিবদ্ধ যে, সমিতির সভ্য তালিকায় তাদের নাম না লেখানো পর্যন্ত তারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে না। কিন্তু প্রায়ই তাদের কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ফলে তারা সর্বদাই উৎকণ্ঠায় দিন কাটায়। সমিতির দ্বার রুদ্ধ থাকায় তাদের অবস্থা হয়েছে গৃহহীন ভবঘুরের মতো, অথবা গ্রাম্য কথায় যাকে বলে 'ছন্নছাড়া', তার মতো। সংক্ষেপে বলতে গেলে, চার মাস আগেও যাকে একটা 'কৃষক চক্র' বলে তুচ্ছ করা হতো, এখন তাই হয়েছে একটি অতি সম্মানিত প্রতিষ্ঠান। ভদ্রলোকদের ক্ষমতার কাছে আগে যারা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করত, এখন কৃষকদের ক্ষমতার কাছে তারা মাথা নত করে। তাদের পরিচিতি যা-ই হোক, সকলেই স্বীকার করে, বিগত অক্টোবর থেকে পৃথিবী বদলে গেছে।

'এটা ভয়ংকর!' অথবা 'এটা চমৎকার!'

গ্রামে কৃষক বিদ্রোহ সুখস্বপ্নের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। গ্রাম থেকে সংবাদ যখন শহরে পৌঁছাল, তখন সেখানকার ভদ্রলোকদের মধ্যে তৎক্ষণাৎ হৈ চৈ পড়ে গেল। ছাংশায় আসার পরেই আমি সকল স্তরের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি এবং অনেক গালগল্প শুনেছি। সমাজের মধ্য স্তর থেকে শুরু করে কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীরা পর্যন্ত এমন কোন লোক নেই যে সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে একটি বাক্যে পরিণত করে বলেনি, 'এটা ভয়ংকর!' শহরে 'এটা ভয়ংকর!' এই মতাবলম্বীদের অবাধ প্রচারের প্রভাবে অনেক একনিষ্ঠ বিপ্লবী-ব্যক্তিও মানসনয়নে পল্লীর ঘটনাবহুল চিত্র দেখে ভগ্নহৃদয় হয়ে পড়েছে এবং 'ভয়ংকর' এই কথাটা তারা অস্বীকার করতে পারছিল না। এমনকি অতি প্রগতিশীল লোকও বলে, 'ভয়ংকর বটে, কিন্তু বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় এটা অপরিহার্য। সংক্ষেপে বলা যায়, 'ভয়ংকর' শব্দটা কেউই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে পারছিল না। কিন্তু ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বস্তুতঃ ঐতিহাসিক দায়িত্বসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই ব্যাপক কৃষকসাধারণ জেগে উঠেছে এবং পল্লীর গণতান্ত্রিক শক্তি গ্রাম্য সামন্ততান্ত্রিক শক্তির পতন ঘটাবার জন্য জেগে উঠেছে। পিতৃতান্ত্রিক-সামন্তশ্রেণীর স্থানীয় উৎপীড়ক এবং উচ্ছৃংখল ভূস্বামীশ্রেণী হাজার হাজার বছর ধরে স্বৈরাচারী সরকারের বুনিয়াদ তৈরী করে এসেছে, এবং তারা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের ভিত্তি-

স্বরূপ। এইসব সামন্তশক্তিকে উচ্ছেদ করাই হল জাতীয় বিপ্লবের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ডঃ সান ইয়াৎ-সেন চল্লিশ বছর ধরে জাতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করার কাজে একাগ্রভাবে লেগেছিলেন, তিনি এতদিন ধরে যা করতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছিলেন, কৃষকরা মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তা সম্পন্ন করেছে। শুধুমাত্র ৪০ বছরেই নয়—এমনকি আগের হাজার হাজার বছরেও এমন অভূতপূর্ব বিস্ময়কর সাফল্য আর অর্জিত হয়নি। এটা চমৎকার। এটা মোটেই 'ভয়ংকর' নয়। এটা আর যাই হোক 'ভয়ংকর' নয়। 'এটা ভয়ংকর!'—এই তত্ত্ব স্পষ্টতঃই ভূস্বামীদের স্বার্থের খাতিরে কৃষক উত্থানকে আঘাত হানার জন্য সৃষ্ট তত্ত্ব। স্পষ্টতঃই সামন্ততন্ত্রের পুরানো বিধিব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্যে এবং গণতন্ত্রের নতুন শৃংখলার প্রতিষ্ঠাকে বাধাদানের জন্যে এটা ভূস্বামীশ্রেণীর একটি তত্ত্ব এবং এটা স্পষ্টতঃ প্রতিবিপ্লবী তত্ত্বও বটে। কোন বিপ্লবী কমরেডেরই এই বাজে কথা উচ্চারণ করা উচিত নয়। যদি আপনার বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী দৃঢ়বদ্ধ হয় এবং যদি আপনি একবার গ্রামে গিয়ে তার চারিপাশে দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি আগের চেয়ে বেশি আনন্দ বোধ করবেন। এখন অগণিত হাজার হাজার ক্রীতদাস—কৃষকগণ—আঘাত করে ধরাশায়ী করছে তাদের নরখাদক শত্রুদের। কৃষকরা যা করছে তা সম্পূর্ণ ঠিক। তারা যা করছে—তা চমৎকার! 'এটা চমৎকার!' এই তত্ত্ব কৃষকদের ও অন্যান্য সকল বিপ্লবীদের। প্রত্যেকটি বিপ্লবী কমরেডেরই জানা উচিত যে, জাতীয় বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন গ্রামাঞ্চলের বিরাট পরিবর্তন সাধন। ১৯১১ সালের বিপ্লবে এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি, ফলে বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। এখন এই পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে এবং বিপ্লবের সাফল্যের জন্য তা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রত্যেকটি বিপ্লবী কমরেডকেই তা সমর্থন করতে হবে। তা না হলে তাকে প্রতিবিপ্লবের পক্ষে যেতে হবে।

তথাকথিত 'বাড়াবাড়ি'র প্রশ্ন

আরও এক দলের লোক রয়েছে—যারা বলে, 'হ্যাঁ, কৃষক সমিতির প্রয়োজন আছে, কিন্তু তারা বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছে।' এটা মধ্যপন্থীদের অভিমত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি? সত্য বটে, গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা বেশ কিছুটা 'অবাধ্য'। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কৃষক সমিতি ভূস্বামীকে কিছুই বলতে দেয় না এবং তার প্রতিপত্তিও করে দেয় নির্মূল। এইভাবে

আঘাত করে ভূস্বামীকে ধূলিলুণ্ঠিত করে পদতলে রাখা হয়। কৃষকরা ভয় দেখায়—'আমরা তোমার নাম অন্য তালিকাপুস্তকে লিখব!' স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের তারা জরিমানা করে, তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে এবং তাদের পাল্কিগুলো ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে। যে সমস্ত স্থানীয় উৎপীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোক কৃষক সমিতির বিরোধিতা করেছে, জনগণ দল বেঁধে তাদের বাড়ীতে গিয়ে ঢোকে, তাদের শূকর জবাই করে ও শস্য ছিনিয়ে নেয়। এমনকি তারা স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্র-পরিবারের মিসি-সাহেবা ও বিবিদের হাতীর দাঁতের খাটে দুই-এক মিনিট গড়াগড়িও দেয়। সামান্যতম বিরোধিতা করলেই তারা গ্রেপ্তার করে এবং ধৃত ব্যক্তির মাথায় লম্বা গাধার টুপি পরিয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় এবং বলতে থাকে—'কি হে অসৎ ভদ্রসম্প্রদায়, এখন চেন আমরা কারা!' তারা তাদের যা ইচ্ছে তাই করে এবং সব কিছু ওলট-পালট করে দিয়ে পল্লী অঞ্চলে এক ধরনের ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। এটাকেই কোন কোন লোক 'বাড়াবাড়ি, 'ত্রুটি সংশোধন করার জন্য যথাযথ সীমা অতিক্রম করা' অথবা 'বাস্তবিকই অতিরিক্ত' বলে প্রচার করছে। এসব কথাবার্তা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসংগত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাও ভুল। প্রথমতঃ, স্থানীয় উৎপীড়ক, অসৎ ভদ্রসম্প্রদায় এবং উচ্ছৃংখল ভূস্বামীরাই কৃষকদেরকে উপরোল্লিখিত কার্যকলাপ করার জন্য বাধ্য করেছে। যুগ যুগ ধরে তারা নিজেদের ক্ষমতার বলে কৃষকদের উপর প্রভুত্ব করে এসেছে এবং তাদেরকে পদদলিত করেছে। সে জন্যেই কৃষকরা এমন প্রবলভাবে পালটা আঘাত হেনেছে। সবচেয়ে ভয়ানক বিদ্রোহ এবং সবচেয়ে প্রচণ্ড বিশৃংখলা ঘটেছে সেইসব স্থানে যেখানে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রসম্প্রদায় এবং উচ্ছৃংখল ভূস্বামীদের দৌরাত্ম্য ছিল সবচেয়ে জঘন্য। কৃষকরা সূক্ষ্মদর্শী। কে খারাপ আর কে নয়, কে সবচেয়ে মন্দ আর কে অতটা নয়, কার কঠিন শাস্তির প্রয়োজন আর কার লঘু দণ্ডের দরকার—কৃষকরা এ সবের সহজ ও নিখুঁত হিসেব রাখে এবং অপরাধের তুলনায় দণ্ড অধিক হয়েছে এমন ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লব কোন ভোজসভা নয়, বা প্রবন্ধ রচনা বা চিত্রাঙ্কন কিংবা সূচীকর্ম নয়; এটা এত সুমার্জিত, এত ধীর-স্থির ও সুশীল, এত নম্র, দয়ালু, বিনীত, সংযত ও উদার হতে পারে না।[৪] বিপ্লব হচ্ছে বিদ্রোহ—উগ্র বলপ্রয়োগের কাজ, যার দ্বারা এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে উৎখাত করে। গ্রামীণ

বিপ্লব এমন একটি বিপ্লব যার দ্বারা কৃষকশ্রেণী সামন্ত ভূস্বামীশ্রেণীর ক্ষমতা উচ্ছেদ করে। সবচেয়ে প্রচণ্ড শক্তি কাজে না লাগিয়ে কৃষকরা কোনমতেই ভূস্বামীদের হাজার হাজার বছরের গভীর পাকাপোক্ত ক্ষমতার উৎখাত করতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে একটা বিরাট বৈপ্লবিক উত্তাল জোয়ারের প্রয়োজন আছে। কারণ এর মাধ্যমেই কেবল লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলে একটা মহান শক্তিতে সংগঠিত করা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলের বিরাট বৈপ্লবিক উত্তাল জোয়ারের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে যে কৃষক শক্তির উদ্ভব হয়েছে তার ফলেই উপরে উল্লিখিত কার্যকলাপ ঘটেছে—যাকে লোকেরা 'বাড়াবাড়ি' বলে প্রচার করছে। এরকম কার্যকলাপ কৃষক-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়কালে (বিপ্লবী কর্মতৎপরতার পর্যায়কালে) খুবই প্রয়োজন ছিল। এ পর্যায়ে কৃষকদের নিরংকুশ কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা করা দরকার ছিল। দরকার ছিল কৃষক সমিতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ সমালোচনা নিষিদ্ধ করা। দরকার ছিল ভদ্র সম্প্রদায়ের সমস্ত ক্ষমতার উচ্ছেদ করা এবং তাদের আঘাত দিয়ে ধূলিলুণ্ঠিত করে পদতলে দাবিয়ে রখো। এই পর্যায়ে 'অধিক বাড়াবাড়ির' লেবেল-আঁটা সমস্ত কর্মতৎপরতারই একটা বৈপ্লবিক তাৎপর্য রয়েছে। যথার্থভাবে বলতে গেলে, প্রত্যেকটি পল্লী এলাকায় সাময়িকভাবে ত্রাসের সঞ্চার করা দরকার। তা না হলে গ্রামাঞ্চলের প্রতিবিপ্লবীদের কার্যকলাপ দমন করা কিংবা ভদ্র সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বের পতন ঘটানো অসম্ভব হবে। ত্রুটি সংশোধন করার জন্যে যথাযথ সীমা অতিক্রম করতে হবে, অন্যথায় ত্রুটির সংশোধন কখনো হতে পারে না[৫]। আগেই বলা হয়েছে, কৃষকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কেউ কেউ বলে 'এটা ভয়ংকর!' আবার কেউ কেউ বলে তারা 'বাড়াবাড়ি করছে'। আপাতদৃষ্টিতে শেষোক্ত বক্তব্য প্রথমটি থেকে ভিন্ন মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলে এবং বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী ভূস্বামীদের মতবাদেরই তারা প্রতিধ্বনি করে। যেহেতু, এ মতবাদ কৃষক-আন্দোলনের উত্থানকে ব্যাহত করছে, তাই বিপ্লবের ক্ষতিসাধন করছে, অবশ্যই আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে তার বিরোধিতা করব।

তথাকথিত "ইতর লোকের আন্দোলন'

কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীরা বলে, 'কৃষক-আন্দোলন হল ইতর লোকের ও অলস কৃষকদের আন্দোলন।' ছাংশাতে এ অভিমত বেশ চালু। আমি

যখন গ্রামাঞ্চলে ছিলাম, তখন আমি ভদ্রলোকদের বলতে শুনেছি : 'কৃষক সমিতি গঠন করা ঠিকই হয়েছে, কিন্তু এখন যে সমস্ত লোক এগুলো পরিচালনা করছে, তারা কোন কাজের নয়। তাদের বদলে দেওয়া উচিত!' দক্ষিণপন্থীরা যা বলছে, এ অভিমতও সেই একই কথার প্রতিধ্বনি। তাদের উভয়ের মতেই কৃষক-আন্দোলন থাকাটা বাঞ্ছনীয় (আন্দোলনটা যেহেতু ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, তাই কেউ এর বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস করে না), কিন্তু তাদের মতে যারা এই আন্দোলন পরিচালনা করছে, তারা কোন কাজের নয়। বিশেষ করে নিম্নস্তরের কৃষক সমিতির দায়িত্বে অধিষ্ঠিত লোকদের তারা ঘৃণা করে এবং তাদেরকে বলে 'ইতর লোক'। সংক্ষেপে, ভদ্রলোকরা যে সমস্ত লোকদের ঘৃণার চোখে দেখে এসেছে, যাদের পদদলিত করে আবর্জনায় পুঁতে রেখেছিল, যাদের সমাজে কোন স্থান ছিল না এবং যাদের কথা বলারও অধিকার ছিল না, তারাই এখন উদ্ধতভাবে তাদের মাথা উঁচু করেছে। তারা যে শুধু তাদের মাথা উঁচু করেছে তাই নয়, উপরন্তু তারা ক্ষমতাও হস্তগত করেছে। তারা এখন থানা কৃষক সমিতিগুলোর (সবচেয়ে নিম্নস্তরের) পরিচালনার ভার নিয়ে সেগুলিকে প্রচণ্ড ও অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। তারা তাদের কড়াপড়া নোংরা হাতগুলো তুলে ধরে ভদ্রলোকদের উপর আঘাত করছে। অসৎ ভদ্রলোকদের তারা দড়ি দিয়ে বাঁধে, লম্বা গাধার টুপি তাদের মাথায় পরিয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। (সিয়াংথান এবং সিয়াংসিয়াংয়ে এটাকে তারা 'গ্রামের মধ্য দিয়ে ঘোরানো' এবং লিলিংয়ে 'মাঠের ভেতর দিয়ে ঘোরানো' বলে অভিহিত করেছে।) এমন একদিনও যায় না যেদিন তারা এসব ভদ্রলোকদের কানে কিছু কঠোর ও নির্দয় নিন্দাবাদ বর্ষণ না করে। তারা হুকুম জারি করছে ও সবকিছু পরিচালনা করছে। আগে যারা ছিল সবচেয়ে নীচে—তারাই এখন সকলের চেয়ে উঁচুতে অবস্থান করছে। একেই বলে 'উল্টে দেওয়া।'

বিপ্লবের অগ্রবাহিনী

কোন বিষয় বা মানুষ সম্পর্কে দু'টি বিপরীত ধারণা যেখানে রয়েছে, সেখানে দু'টি বিপরীত মতের উদ্ভব ঘটে। 'এটা ভয়ংকর!' ও 'এটা চমৎকার!', 'ইতর লোক' ও 'বিপ্লবের অগ্রবাহিনী'—এগুলো এর যথাযথ উদাহরণ।

আমরা উপরে বলেছি, যে কাজ বহু বছর ধরে অসম্পন্ন রাখা হয়েছিল, কৃষকরা সেই বৈপ্লবিক দায়িত্ব সমাধা করেছে এবং জাতীয় বিপ্লবের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে। কিন্তু এই মহান বৈপ্লবিক কর্তব্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কাজ কি সকল কৃষকের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে? না। তিন রকমের কৃষক আছে—ধনী, মাঝারি ও গরীব। এই তিন রকম কৃষক ভিন্নতর অবস্থার মধ্যে বাস করে, সুতরাং বিপ্লব সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীও পৃথক। প্রথম পর্যায়কালে যা ধনী কৃষকদের মনে নাড়া দিত, তা ছিল চিয়াং-সীতে উত্তরে অভিযানকারী বাহিনীর চরম পরাজয় ঘটেছে, চিয়াং কাই শেক পায়ে জখম হয়ে[৬] বিমানযোগে কুয়াংতোংয়ে[৭] পালিয়ে গেছে এবং উ পেই-ফু[৮] পুনরায় ইয়ুয়ে-চৌ দখল করে নিয়েছে। কৃষক সমিতি নিশ্চয়ই বেশি দিন টিঁকবে না এবং তিন-গণনীতি[৯] কখনো সফল হতে পারে না, কারণ আগে এ সম্বন্ধে তারা কিছুই শোনেনি। থানা কৃষক সমিতির কোন কর্মী (সাধারণতঃ 'ইতর লোক' জাতীয় কেউ) হাতে একটি তালিকাপুস্তক নিয়ে ধনী কৃষকদের গৃহে গিয়ে যখন বলত—'তুমি কি কৃষক সমিতিতে যোগ দেবে?', ধনী কৃষকেরা তখন কিভাবে উত্তর দিত? ব্যবহারে মোটামুটি ভদ্র কেউ বলত—'কৃষক সমিতি? আমি যুগ যুগ ধরে এখানে বাস করছি এবং আমার জমি চাষ করছি। কৈ, এমন জিনিসের নাম তো এর আগে কখনো শুনিনি, কিন্তু তবু তো বেশ ভালভাবে জীবিকা নির্বাহ করছি। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, এসব ছেড়ে দাও।' দুষ্টপ্রকৃতির ধনী কৃষকরা বলত—'কৃষক সমিতি! যত সব বাজে! মাথা কাটার সমিতি! মানুষকে বিপদে ফেল না!' তবুও, অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, কৃষক সমিতি কয়েক মাস হল গড়ে উঠেছে, এমনকি ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও সাহস করেছে। প্রতিবেশী ভদ্রলোকদের মধ্যে যারা তাদের আফিমের নলচে পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেছে, কৃষক সমিতি তাদের বন্দী করে গ্রামের ভেতর দিয়ে তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। অধিকন্তু জেলা-শহরগুলোতে—সিয়াংথানের ইয়ান জুং-ছিউ এবং নিংসিয়াংয়ের ইয়াং চি-জে'র মতো কিছু সংখ্যক বড় ভূস্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে, ব্রিটিশবিরোধী সমাবেশের সময়ে এবং উত্তর অভিযানের মহান বিজয়ানুষ্ঠান উদ্‌যাপনের কালে প্রত্যেকটি থানায় হাজার হাজার কৃষক ছোট-বড় নিশান উড়িয়ে কাঁধে বাঁক ও কোদাল নিয়ে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো বিরাট মিছিল বের করেছে। কেবলমাত্র

তখন থেকেই ধনী কৃষকরা হতবুদ্ধি ও ভীত হতে আরম্ভ করেছে। উত্তর অভিযানের মহান বিজয়ানুষ্ঠানের সময়েই তারা জানতে পেরেছে যে, চিউচিয়াং অধিকার করা হয়েছে, চিয়াং কাই-শেক পায়ে আঘাত পায়নি, আর পরিশেষে উ পেই-ফু পরাজিত হয়েছে। অধিকন্তু তারা দেখল 'লাল ও সবুজ রঙের ইস্তাহারে' 'তিন-গণনীতি জিন্দাবাদ!', কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ!', 'কৃষক জিন্দাবাদ!' প্রভৃতি শ্লোগান স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে। ধনী কৃষক অতিমাত্রায় হতবুদ্ধি ও ভীত হয়ে বলেছে—'কি? কৃষক জিন্দাবাদ! এ লোকগুলোকে এখন কি সম্রাট বলে গণ্য করতে হবে?[১০] এইভাবে কৃষক সমিতি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। সমিতির লোকেরা ধনী কৃষকদের বলে—'আমরা তোমাদের নাম অন্য তালিকপুস্তকে লিখব!' অথবা বলে—'আর এক মাস পরে ভর্তি-ফি মাথাপিছু দশ ইউয়ান লাগবে!' এইসব অবস্থার চাপে পড়েই কেবল ধনী কৃষকরা আস্তে আস্তে সমিতিতে যোগ দিচ্ছে[১১]। ভর্তির জন্যে কেউ কেউ ৫০ সেণ্ট অথবা এক ইউয়ান দিচ্ছে। (নিয়মিত ভর্তির ফি মাত্র ১০০ ছিয়ান।) কেউ কেউ অন্য লোক তাদের অনুকূলে একটু সুপারিশ করার পরই কেবল ভর্তি হতে পারছে। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক গোঁড়া ব্যক্তি রয়েছে, যারা আজও পর্যন্ত সমিতিতে যোগ দেয়নি। ধনী কৃষকরা যখন সমিতিতে যোগ দেয়, তখন তারা সাধরণতঃ পরিবারের ৬০-৭০ বছর বয়সের বৃদ্ধের নাম লেখায়। কারণ তারা সর্বদা 'বাধ্যতামূলক সৈন্যদলে ভর্তি'-র ভয়ে ভীত থাকে। যোগ দেবার পরে সমিতির জন্যে কোন প্রকার কাজ-কর্মে ধনী কৃষকরা আগ্রহ দেখায় না। আগাগোড়াই তারা থাকে নিষ্ক্রিয়।

মাঝারি কৃষকদের অবস্থা কি? তাদের আছে দোদুল্যমান মনোভাব। তারা মনে করে, বিপ্লব তাদের বিশেষ কিছু উপকারে আসবে না। তাদের হাঁড়িতে চাল আছে এবং মাঝরাতে দ্বারে করাঘাত করার মতো কোন পাওনাদার তাদের নেই। জিনিসটি আগে কোনদিন ছিল কিনা, এই দিক থেকে বিচার করে তারাও ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাবতে থাকে—'কৃষক সমিতি কি সত্যই টিঁকে থাকতে পারবে?', 'তিন-গণনীতি কি সফল হতে পারবে?' তাদের সিদ্ধান্ত হল—'বুঝি বা নয়!' তারা মনে করে যে, এর সব কিছু ভগবানের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে এবং ভাবে, 'কৃষক সমিতি? কে জানে ভগবানের এটেই ইচ্ছে কিনা?' প্রথম পর্যায়কালে, সমিতির লোকেরা

তালিকাপুস্তক হাতে করে মাঝারি কৃষকদের কাছে গিয়ে বলত—'আপনি কি দয়া করে কৃষক সমিতিতে যোগ দেবেন?' মাঝারি কৃষক উত্তর দিত—'তাড়াহুড়োর কিছু নেই!' দ্বিতীয় পর্যায়কালে যখন কৃষক সমিতি তার বিপুল ক্ষমতার প্রয়োগ শুরু করেছে, কেবলমাত্র তখনই মাঝারি কৃষকরা ভর্তি হয়েছে। সমিতির ভেতরে তাদের ব্যবহার ধনী কৃষকদের তুলনায় ভাল ছিল, কিন্তু তবু এখনো তারা খুব বেশি উৎসাহী নয়। তারা এখনো অপেক্ষা করে দেখতে চায়। কৃষক সমিতির পক্ষে মাঝারি কৃষকদের ভর্তি করে নেওয়া এবং তাদের মধ্যে আরও অধিক ব্যাখ্যামূলক কাজ করা খুবই প্রয়োজন।

গরীব কৃষকরাই সর্বদা গ্রামাঞ্চলের তীব্র সংগ্রামের প্রধান শক্তি। গোপন ও প্রকাশ্য কর্মতৎপরতার দুটি পর্যায়েই তারা বীরত্বের সঙ্গে লড়ে চলেছে। তারা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রতি সবচেয়ে সহজে সমর্থন জানায়। স্থানীয় উৎপীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোকদের তারাই হচ্ছে মারাত্মক শত্রু এবং বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ না করে তারা তাদের শিবিরের উপরে আক্রমণ করে। তারা ধনী কৃষকদের বলে, 'আমরা অনেক আগেই কৃষক সমিতিতে যোগ দিয়েছি। তোমরা এখনো দ্বিধা করছ কেন?' ধনী কৃষকরা বিদ্রূপের সঙ্গে উত্তর দেয়—'তোমাদের যোগ না দেবার কি আছে? তোমাদের মাথার উপরে না আছে একটা টালি, পায়ের নীচে না আছে এক ফালি জমি!' এটা সত্য যে গরীব কৃষকদের কিছুই হারাবার ভয় নেই। সত্যিই তাদের অনেকেরই 'মাথার উপর না আছে একটা টালি, পায়ের নীচে না আছে এক ফালি জমি।' বাস্তবিকই তাদের সমিতিতে যোগদানের বাধা কি? ছাংশা জেলার তদন্ত অনুসারে গ্রাম অঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ গরীব কৃষক, ২০ ভাগ মাঝারি কৃষক আর ভূস্বামী ও ধনী কৃষক হল শতকরা ১০ ভাগ। শতকরা ৭০ ভাগ গরীব কৃষককে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: একেবারেই নিঃস্ব এবং অল্প নিঃস্ব। একেবারেই নিঃস্ব[১২] হল শতকরা ২০ ভাগ, তারা সম্পূর্ণরূপে সহায়-সম্পদহীন অর্থাৎ তাদের জমিও নেই, অর্থও নেই এবং জীবিকা নির্বাহের কোন উপায়ই তাদের নেই। তারা বাধ্য হয়েছে গৃহত্যাগ করে ভাড়াটিয়া সৈন্য হতে বা মজুর খাটতে কিংবা ভ্রাম্যমান ভিক্ষুক হতে। অল্প সহায়-সম্পদহীন হল বাকী ৫০ ভাগ। তারা অল্প নিঃস্ব[১৩] অর্থাৎ তাদের সামান্য জমি বা সামান্য অর্থ আছে। কিন্তু তারা যা উপার্জন করে, তার চেয়ে ব্যয় বেশি, এবং সারা বছরই তারা কঠোর পরিশ্রম করে ও দুঃখ কষ্টের ভেতর জীবনযাপন করে। এই

ধরনের লোকের মধ্যে আছে হস্তশিল্পী, বর্গাদার কৃষক (ধনী বর্গাদার কৃষকদের বাদ দিয়ে) এবং আধা-স্বত্বাধিকারী কৃষক। গরীব কৃষকদের বিরাট জনসাধারণ—যারা গ্রামাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার সতকরা ৭০ ভাগ, তারাই কৃষক সমিতির মেরুদণ্ড, সামন্ত শক্তির উচ্ছেদসাধনের অগ্রবাহিনী এবং সেই বীরনায়ক যারা বহু বছরের অসম্পাদিত বৈপ্লবিক কাজকে সম্পাদন করেছে। গরীব কৃষকশ্রেণী (অসৎ ভদ্রলোকদের কথায় 'ইতর লোক') ছাড়া গ্রামাঞ্চলে বর্তমান বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের পতন ঘটানো এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব হতো না। গরীব কৃষকরা সবচেয়ে বেশি বিপ্লবী হবার ফলে কৃষক সমিতির নেতৃত্ব লাভ করেছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় পর্যায়েই একেবারেই নিম্নতম কৃষক সমিতির সভাপতি এবং কমিটি-সদস্যদের প্রায় সকলেই ছিল গরীব কৃষক। (হেংশান জেলার থানা সমিতির কমিটি-সদস্যদের মধ্যে একেবারে নিঃস্ব কৃষক ছিল শতকরা ৫০ ভাগ, অল্প নিঃস্ব কৃষক ছিল শতকরা ৪০ ভাগ, এবং দারিদ্র্য প্রপীড়িত বুদ্ধিজীবী ছিল শতকরা ১০ ভাগ।) গরীব কৃষকদের নেতৃত্ব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গরীব কৃষক ব্যতীত বিপ্লব হতে পারে না। তাদের ভূমিকা অস্বীকার করার মানেই হল বিপ্লবকে অস্বীকার করা। তাদের আক্রমণ করার অর্থ বিপ্লবকে আক্রমণ করা। বিপ্লবের সাধারণ গতিমুখ সম্পর্কে তারা কখনই ভুল করেনি। তারা স্থানীয় উৎপীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোকদের মর্যাদা নষ্ট করে দিয়েছে। ছোট-বড় সকল স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের তারা ধুলিলুণ্ঠিত করেছে এবং পদতলে রেখেছে। বিপ্লবী কার্য-কলাপের সময় তাদের অনেক কাজ, যা 'অধিক বাড়াবাড়ি করা' হচ্ছে বলে লেবেল আঁটা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষেই বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন ছিল। হুনানের কিছু কিছু জেলা সরকার, কুওমিনতাঙের জেলা সদরদপ্তর এবং জেলা কৃষক সমিতি ইতিমধ্যেই কতকগুলি ভুল করেছে। এমনকি, কেউ কেউ ভূস্বামীদের অনুরোধে নিম্নস্তরের কৃষক সমিতিগুলোর কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য সৈন্য পর্যন্ত পাঠিয়েছে। হেংশান এবং সিয়াংসিয়াং জেলার জেলে বেশকিছু সংখ্যক থানা কৃষক সমিতির সভাপতি এবং কমিটি-সদস্যকে আটক করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত মারাত্মক ভুল এবং এতে প্রতিক্রিয়াশীলদের স্পর্ধা বাড়িয়ে দেয়। এটা ভুল কিনা তার বিচার করতে হলে, আপনাকে শুধু খেয়াল করতে হবে, যেখানেই কৃষক সমিতির সভাপতি কিংবা কমিটি-সদস্যরা গ্রেপ্তার হয়েছে,

সেখানেই স্থানীয় উচ্ছৃংখল ভূস্বামীরা কি রকম আনন্দিত হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল ভাবপ্রবণতা কেমন বৃদ্ধি পেয়েছে। 'ইতর লোকের আন্দোলন' আর 'অলস কৃষকদের আন্দোলন' বলে যে প্রতিবিপ্লবী কথাবার্তা চলছে, আমাদের অবশ্যই তার বিরোধিতা করতে হবে এবং গরীব কৃষকশ্রেণীর উপর আক্রমণ করার জন্যে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের সাহায্য করার ভুল যাতে না করি, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। যদিও অল্প সংখ্যক গরীব কৃষক নেতার কার্যকলাপে নিঃসন্দেহে ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল তবু তাদের অনেকেই এখন শুধরে উঠেছে। তারা নিজেরাই উদ্যমশীলতার সঙ্গে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ করেছে এবং দস্যুবৃত্তির দমন করছে। কৃষক সমিতি যেখানে শক্তিশালী, জুয়াখেলা সেখানে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে এবং দস্যুবৃত্তি অন্তর্হিত হয়েছে। একথা আক্ষরিকভাবে সত্য যে, কোন কোন স্থানে পথে জিনিস পড়ে থাকলেও কেউ তা তুলে নেয় না এবং রাত্রিকালে দরজায় খিল এঁটে দেয় না। হেংশানের তদন্ত অনুসারে, গরীব কৃষক নেতাদের শতকরা ৮৫ জনই প্রভূত উন্নতিসাধন করেছে এবং নিজেদেরকে কর্মদক্ষ ও কঠোর পরিশ্রমী বলে প্রমাণ করেছে। শতকরা মাত্র ১৫ জনের কিছু বদভ্যাস আছে। বড়জোর এদের 'অস্বাস্থ্যকর সংখ্যালঘু' বলতে পারা যায়। তাদের 'ইতর লোক' বলে নির্বিচারে নিন্দা করার ব্যাপারে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের কথার প্রতিধ্বনি আমরা অবশ্যই করব না। 'অস্বাস্থ্যকর সংখ্যালঘু'র সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র 'কৃষক সমিতির শৃংখলাকে দৃঢ়তর কর' এই শ্লোগানের মাধ্যমে, জনগণের মধ্যে প্রচার চালিয়ে, 'অস্বাস্থ্যকর সংখ্যালঘু'কে শিক্ষিত করে এবং সমিতির শৃংখলাকে দৃঢ়বদ্ধ করেই করা যেতে পারে। যে গ্রেপ্তারে গরীব কৃষকশ্রেণীর মর্যাদার ক্ষতি হয়, এবং স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের ঔদ্ধত্য বাড়ে—এমন গ্রেপ্তারের জন্যে কোন অবস্থাতেই সৈন্যদের নির্বিচারে পাঠানো উচিত নয়। এই বিষয়টির প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

চোদ্দটি মহান কীর্তি

কৃষক সমিতির সমালোচকদের অনেকেই অভিযোগ করে যে, এই সমিতিগুলো বহু খারাপ কাজ করেছে। আমি আগেই বলেছি, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের উপর কৃষকদের আক্রমণ পুরোপুরি এক বিপ্লবী কর্মধারা এবং

সেগুলি কোনভাবেই দূষনীয় নয়। তবু কৃষকরা অনেক কাজ সম্পন্ন করেছে এবং লোকজনের সমালোচনার জবাব দেবার জন্য তাদের যাবতীয় কার্যকলাপকে এক এক করে আমাদের অবশ্যই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে; দেখতে হবে তারা সত্যই কি করেছে। তাদের গত কয়েক মাসের কার্যকলাপকে আমি শ্রেণীবিন্যস্ত করেছি এবং সেগুলির সারসংকলন করেছি। কৃষক সমিতিগুলোর নেতৃত্বে কৃষকরা নিম্নলিখিত চোদ্দটি মহান কীর্তি সম্পন্ন করেছে।

১। কৃষক সমিতির মধ্যে কৃষকদের সংগঠিত করা

এটাই হল কৃষকদের প্রথম মহান কীর্তি। সিয়াংথান, সিয়াংসিয়াং, হেংশানের মতো জেলাতে প্রায় সব কৃষকই সংগঠিত হয়েছে এবং এমন একটা সুদূর কোণও নেই যেখানে তারা তৎপর নয়। এইসব জেলাগুলো প্রথম সারিতে পড়ে। দ্বিতীয় সারিতে পড়ে ঈইয়াং, হুয়ারোং-এর মতো অন্যান্য জেলাগুলো, যেখানে কৃষকদের অধিকাংশই সংগঠিত, অসংগঠিত রয়ে গেছে এক ক্ষুদ্রাংশই। কোন কোন জেলায় যেমন ছেংপু, লিংলিং-এ এক ক্ষুদ্রাংশ সংগঠিত হলেও বেশির ভাগ কৃষক এখনো অসংগঠিত; এই জেলাগুলো তৃতীয় সারিতে পড়ে। ইউয়ান জু-মিংয়র[১৪] শাসনাধীন পশ্চিম হুনানে কৃষক সমিতির প্রচার এখনো পৌঁছায়নি, এখানকার অনেক জেলায় কৃষকরা সম্পূর্ণভাবে অসংগঠিত, এগুলি পড়ে চতুর্থ সারিতে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ছাংশাকে কেন্দ্র করে মধ্য হুনানের জেলাগুলিই সবচেয়ে অগ্রসর, দক্ষিণ হুনানের জেলাগুলি পড়ে দ্বিতীয় স্তরে এবং পশ্চিম হুনানে কৃষকরা কেবল সবে সংগঠিত হতে শুরু করেছে। গত নভেম্বরে সংগৃহীত প্রাদেশিক কৃষক সমিতির হিসাব অনুযায়ী সারা প্রদেশটির ৭৫টি জেলার মধ্যে ৩৭টিতে কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির সদস্যসংখ্যা মোট ১,৩৬৭,৭২৭। এইসব সদস্যের মধ্যে প্রায় ১০ লাখ সংগঠিত হয় গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে যখন সমিতিগুলির শক্তি বৃদ্ধি পায়, অথচ সেপ্টেম্বর অবধি সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র তিন থেকে চার লাখ। তারপর এল ডিসেম্বর ও জানুয়ারী এই দু'টি মাস। এ সময়ে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে কৃষক-আন্দোলন। জানুয়ারীর শেষাবধি সমিতির সদস্যসংখ্যা কম করেও ২০ লক্ষে উঠেছিল। যেহেতু সমিতিতে যোগদান করার সময় প্রত্যেকটি পরিবার সাধারণভাবে মাত্র একজনের নাম লেখায় এবং পরিবারগুলির গড়পড়তা সদস্যসংখ্যা পাঁচ, সেই হিসেবে কৃষক সমিতির অনুগামী সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক কোটি। সমিতি-

গুলির এই বিস্ময়কর ও দ্রুততর প্রসারের ফলেই সমস্ত স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোক এবং দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, আর পৃথিবী এমন সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেছে দেখে জনসাধারণ বিস্মিত হয়ে পড়েছে, এবং গ্রামাঞ্চলে এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে এটাই হল কৃষকদের প্রথম মহান কীর্তি।

২। রাজনৈতিকভাবে ভূস্বামীদেরকে আঘাত করা

কৃষকরা নিজেদের সংগঠন খাড়া করার পর, প্রথম যে কাজ করেছে তা হল ভূস্বামীশ্রেণীর, বিশেষ করে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের রাজনৈতিক মর্যাদা চুরমার করা অর্থাৎ পল্লীসমাজে ভূস্বামীদের কর্তৃত্বকে উৎখাত করা এবং কৃষকদের কর্তৃত্ব গড়ে তোলা। এটা হচ্ছে চরম গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক সংগ্রাম। দ্বিতীয় পর্যায়কালে অর্থাৎ বিপ্লবী কার্যকলাপের পর্যায়ে এটাই হল সংগ্রামের কেন্দ্র। এই সংগ্রামে জয়লাভ করা না গেলে খাজনা ও সুদ কমানো, জমি ও অন্যান্য উৎপাদন-উপকরণগুলি করায়ত্ত করা ইত্যাদি অর্থনৈতিক সংগ্রামে কোনমতেই জয়লাভ করা সম্ভব নয়। হুনানের সিয়াংসিয়াং, হেংশান, সিয়াংথান জেলার মতো অনেকস্থানে অবশ্য একটা এটা সমস্যা নয়, কেননা এসব জায়গায় ভূস্বামীশ্রেণীর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এবং কৃষকদের কর্তৃত্বই সেখানে একমাত্র কর্তৃত্ব। কিন্তু লিলিং-এর মতো জেলায় এখনো এমন কিছু স্থান আছে (যেমন লিলিং-এর পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে), যেখানে আপাতদৃষ্টিতে কৃষকদের কর্তৃত্বের তুলনায় ভূস্বামীদের কর্তৃত্ব দুর্বল বলে মনে হয়, কিন্তু এসব স্থানে রাজনৈতিক সংগ্রাম তীব্র হয়নি বলে বাস্তবে ভূস্বামীদের কর্তৃত্ব গোপনে গোপনে কৃষকদের কর্তৃত্বের বিরোধিতা করছে। এইসব স্থানে কৃষকরা রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করেছে—এমন কথা বলার সময় এখনও আসেনি এবং ভূস্বামীদের কর্তৃত্ব পুরোপুরি চুরমার না হওয়া অবধি আরও জোরের সঙ্গে রাজনৈতিক সংগ্রাম তাদের অবশ্যই চালাতে হবে। সবকিছু ধরলে কৃষকরা ভূস্বামীদেরকে রাজনৈতিকভাবে আঘাত করার ব্যাপারে যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তা নিম্নরূপ :

হিসাব পরীক্ষা করা। স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের হাতে স্থানীয় যে সাধারণ সম্পত্তির টাকা-পয়সা আসতো তা তারা প্রায়ই নিজেদের সুবিধার জন্য খরচ করতে তৎপর হতো এবং হিসাবপত্রও ঠিকমতো রাখা হতো

না। বহু স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোককে উৎখাত করবার উপলক্ষ হিসেবে কৃষকরা এখন হিসাব পরীক্ষা করাটা কাজে লাগাচ্ছে। স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের সঙ্গে আর্থিক হিসাবনিকাশ করার জন্য বহুস্থানে হিসাব পরীক্ষা কমিটি স্থাপন করা হয়েছে। আর এইরকম কোন কমিটি নজরে পড়লেই স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরা শিউরে ওঠে। যেসব জেলায় কৃষক-আন্দোলন সক্রিয়, সেখানে এ ধরনের হিসাব পরীক্ষাটি খুব প্রচলিত। এগুলি টাকাকড়ি উদ্ধার করবার জন্য অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের অপরাধ জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করা, এবং এইভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার আসন থেকে তাদের নীচে ফেলে দেওয়া।

জরিমানা ধার্য করা। কৃষকরা তাদের যেসব অপরাধের জন্য জরিমানা ধার্য করে সেগুলি হল : হিসাব পরীক্ষায় উদ্ঘাটিত অনিয়ম, কৃষকদের বিরুদ্ধে অতীব দৌরাত্ম্য, কৃষক সমিতির পক্ষে ক্ষতিকর বর্তমান কার্যকলাপ, জুয়ার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা না মানা ও আফিমের হুঁকা ত্যাগ করতে অস্বীকার করা। কৃষকরা জরিমানা ধার্য করে এইরকম: এই স্থানীয় উৎপীড়ককে অত টাকা দিতে হবে, অমুক অসৎ ভদ্রলোককে অত দিতে হবে, আর এই অর্থের পরিমাণ দশ থেকে হাজার হাজার ইউয়ান পর্যন্ত ধার্য করা হয়। স্বভাবতঃই কৃষকরা যে ব্যক্তির উপর জরিমানা ধার্য করেছে, সে একেবারেই মুখ দেখাতে পারে না।

চাঁদা আরোপ। দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য, সমবায় কিংবা কৃষক ঋণ-দান সমিতি গঠনের জন্য বা অন্যান্য চাহিদার জন্য বিবেকবর্জিত ধনী ভূস্বামী-দেরকে চাঁদা দিতে বাধ্য করা হয়। চাঁদা আরোপও একরকমের শাস্তি, তবে এই শাস্তি জরিমানার তুলনায় অপেক্ষাকৃত নরম প্রকৃতির। দুর্ভোগ এড়ানোর জন্য ভূস্বামীদের অনেকে স্বেচ্ছায় কৃষক সমিতিগুলিতে চাঁদা দেয়।

ছোটখাট প্রতিবাদ। কথায় বা কাজে যখন কেউ কৃষক সমিতির ক্ষতি করে এবং এই অপরাধ হয় ছোটখাট ধরনের, তখন কৃষকেরা দল বেঁধে দুষ্কৃত-কারীর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয় এবং তার কাছে বিধিমতো প্রতিবাদ জানিয়ে আসে। ফলে, সাধারণতঃ সেই ব্যক্তির কাছ থেকে 'এ কাজ আর করব না' জাতীয় এক প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই প্রতিজ্ঞাপত্রে সে ভবিষ্যতে কাজে বা কথায় কৃষক সমিতির মর্যাদার ক্ষতি না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন। কৃষক সমিতির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য বিরাট জনতার সমাবেশ হয়। তারা অপরাধীর বাড়ীতে গিয়ে তার শূকর জবাই করে আর শস্যাদি নিয়ে খানা বানিয়ে খায়। এই ধরনের বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল। সিয়াংথান জেলায় মাচিয়াহোতে সম্প্রতি এইরকম ঘটনা ঘটেছে। সেখানে পনেরো হাজার কৃষকদের একটি দল ছয় জন অসৎ ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। চারদিন ধরে এ বিক্ষোভ প্রদর্শন চলে, আর এই চারদিনে ১৩০টিরও বেশি শূকর জবাই করে খাওয়া হয়। এই ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর কৃষকরা সাধারণতঃ জরিমানা ধার্য করে।

'লম্বা গাধার টুপি পরিয়ে' গ্রামের মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো। এ ধরনের ঘটনা খুবই সাধারণ। স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের মাথায় একটা লম্বা কাগজের টুপি বসিয়ে দেওয়া হয়, তাতে লেখা থাকে—'অমুক স্থানীয় উৎপীড়ক' বা 'অমুক অসৎ ভদ্রলোক'। তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নেওয়া হয় আর সামনে ও পিছনে বিরাট জনতার মিছিল চলে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কখনো কখনো পিতলের ঘণ্টা বাজানো হয় ও নিশান দোলানো হয়। অন্য সবরকম শাস্তির চেয়ে এই ধরনের শাস্তিতে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকরা বেশি করে ভয়ে কাঁপে। একবার যার মাথায় গাধার টুপি পরানো হয়, তার আর মুখ দেখানোর উপায় থাকে না এবং আর কখনো সে মাথা তুলে চলতে পারে না। সেইজন্য ধনীদের অনেকেই লম্বা টুপি পরার চেয়ে জরিমানা দেওয়াটাকে বেশি পছন্দ করে। কিন্তু কৃষকরা জেদ ধরলে তাদের এটা পরতেই হয়। উদ্ভাবনে পটু এমন এক থানার কৃষক সমিতি একজন অসৎ ভদ্রলোককে ধরে ঘোষণা করল যে সেইদিন তার মাথায় লম্বা গাধার টুপি পরানো হবে। অসৎ ভদ্রলোকটি ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কিন্তু পরে কৃষক সমিতি সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাকে সেইদিন গাধার টুপি পরানো হবে না। তারা এই যুক্তি দেখালো যে, লোকটিকে যদি সেইদিনই টুপি পরানো হয় তাহলে সে তার স্বভাবে কঠিন হয়ে উঠবে এবং তার ভয় ভেঙে যাবে, তাই তাকে বাড়ী ফিরে যেতে দিয়ে আর একদিন গাধার টুপি পরালেই বেশি ভাল হবে। কখন টুপি পরানো হবে সেটা জানতে না পেরে এই অসৎ ভদ্রলোক প্রতিদিন এক উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাতে লাগল, সে আর স্বস্তির সঙ্গে বসে থাকতে বা ঘুমুতে পারত না।

জমিদারদের জেলার জেলে তালাবন্ধ করা। লম্বা গাধার টুপি পরানোর চেয়ে এটা আরও গুরুতর শাস্তি। কোন স্থানীয় উৎপীড়ক বা অসৎ ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জেলার জেলে তাকে প্রেরণ করা হয়। তাকে তালাবন্ধ করে রাখা হয় এবং তাকে বিচার করে শাস্তি দেওয়ার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে বাধ্য করা হয়। বর্তমানে যাদের জেলে তালাবন্ধ করে রাখা হয়, তারা আর আগের লোক নয়। আগে অসৎ ভদ্রলোকেরা কৃষকদের তালাবন্ধ করার জন্য প্রেরণ করতো আর এখন করা হচ্ছে ঠিক তার উল্টো।

নির্বাসন। স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে জঘন্য অপরাধে অপরাধী তাদেরকে নির্বাসন দেওয়ার কোন ইচ্ছা কৃষকদের নেই; তারা বরং সেসব ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে বা হত্যা করতে চায়। এইসব ব্যক্তিরা গ্রেপ্তার হওয়া কিম্বা নিহত হবার ভয়ে পালিয়ে যায়। যেসব জেলায় কৃষক-আন্দোলন বেশ ভালভাবে গড়ে উঠেছে সেসব স্থান থেকে প্রায় সকল প্রধান স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকরা পালিয়ে গেছে—এর অর্থ নির্বাসনই দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়রা শাংহাইয়ে পালিয়ে গেছে, দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা গেছে হানখৌয়ে, তৃতীয় স্তরেরা গেছে ছাংশায় এবং চতুর্থ স্তরের লোকেরা গেছে জেলা শহরগুলোতে। পলাতক স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের মধ্যে যারা শাংহাইয়ে পালিয়েছে, তারাই সবচেয়ে নিরাপদে আছে। হানখৌয়ে যারা পালিয়েছে তাদের কাউকে কাউকে, যেমন হুয়ারোং-এর তিনজন অসৎ ভদ্রলোককে শেষ পর্যন্ত ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। যারা ছাংশাতে পালিয়েছিল তারা তাদেরই জেলা থেকে আগত প্রাদেশিক রাজধানীতে অধ্যয়নরত ছাত্র কর্তৃক যে-কোন সময় ধরা পড়ার বিপদের মধ্যে আছে। আমি নিজে ছাংশাতে দুইজনকে গ্রেপ্তার হতে দেখেছিলাম। জেলার শহরসমূহে যারা আশ্রয় নিয়েছে তারা কেবল চতুর্থ স্তরের লোক এবং বহু চোখ ও কান সমন্বিত কৃষকরা সহজেই তাদের খুঁজে বের করতে পারে। কৃষকরা অবস্থাপন্নদের নির্বাসন দিয়েছে—এই অবস্থার উল্লেখ করে হুনানের প্রাদেশিক সরকারের অর্থদপ্তরের কর্মকর্তারা টাকা ওঠানোর ব্যাপারে তারা যে অসুবিধায় পড়ছে তা ব্যাখ্যা করে। এ থেকে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়, কতখানি ব্যাপকভাবে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের তাদের নিজস্ব গ্রাম্য বাসভূমি থেকে উৎখাত করা হতো।

মৃত্যুদণ্ড। এর প্রয়োগ কেবল খুব বড় স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্র-

লোকদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। আর জনসাধারণের অপরাপর অংশের সঙ্গে মিলে কৃষকরা এই শাস্তি কার্যকরী করে। যেমন, নিংসিয়াংয়ের ইয়াং চি-জে, ইয়ুয়েইয়াংয়ের চৌ চিয়া-কান, হুয়ারোংয়ের ফু তাও-নান ও সুন পো-চুকে সরকারী কর্তৃপক্ষ গুলি করে হত্যা করেছে কৃষক ও জনসাধারণের অন্যান্য অংশের চাপে। আর সিয়াংথাংয়ে, কৃষক ও জনসাধারণের অপরাপর অংশের লোকেরা জেলে তালাবদ্ধ ইয়ান রোং-ছিউকে তাদের হাতে ছেড়ে দিতে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বাধ্য করেছে এবং কৃষকরা নিজেরাই তাকে হত্যা করেছে। কৃষকদের হাতেই নিহত হয়েছিল নিংসিয়াংয়ের লিউ চাও। লিলিংয়ের পেং চি-ফান এবং ঈইয়াংয়ের চৌ থিয়ান-চ্যুয়ে ও ছাও ইয়ুন-এর হত্যা করার ব্যাপারটা 'স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ আদালত'-এর রায় সাপেক্ষে আটকে আছে। এ রকম একজন বড় স্থানীয় উৎপীড়ক বা অসৎ ভদ্রলোকের হত্যাকাণ্ড সমগ্র জেলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে এবং সামন্ততন্ত্রের দুষ্ট অবশেষসমূহকে মুছে ফেলবার ব্যাপারে এই পদক্ষেপ খুবই কার্যকরী। প্রত্যেকটি জেলায় এইরকম বড় বড় স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের অস্তিত্ব আছে। কোন জেলায় আছে কয়েক ডজন, আবার কোন জেলায় অন্ততঃ কয়েকজন। আর প্রত্যেকটি জেলায়ই অন্ততঃপক্ষে সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী কয়েকজনকে হত্যা করাই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন করার কার্যকরী পদ্ধতি। স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরা যখন ক্ষমতার উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত ছিল তখন তারা আক্ষরিক অর্থে কৃষকদের কোতল করত, আর তাতে তাদের চোখের পাতাও কাঁপত না। হো মাই-ছ্যুয়ান দশ বছর ধরে ছিল ছাংশা জেলার সিনথাং টাউনের প্রতিরক্ষাবাহিনীর কর্তা। প্রায় এক হাজার দারিদ্র্য প্রপীড়িত কৃষককে হত্যা করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সে দায়ী। এই কাজকে বাগাড়ম্বর করে সে বর্ণনা করত 'ডাকাত নিধন' বলে। আমার নিজের দেশ সিয়াংথান জেলার ইনথিয়ান টাউনের প্রতিরক্ষাবাহিনার থাং চ্যুন-ইয়ান আর লুও শু-লিন এই দুজন ১৯১৩ সাল থেকে গত ১৪ বছরে পঞ্চাশজনেরও বেশি লোককে খুন করেছে, আর জ্যান্ত কবর দিয়েছে চারজনকে। যে পঞ্চাশজনেরও বেশি লোককে তারা হত্যা করে, তাদের প্রথম দু'জন ছিল একেবারেই নির্দোষ ভিক্ষুক। থাং চ্যুন-ইয়ান বলেছিল: 'এক জোড়া ভিখারী হত্যা করে শুরু করা যাক!' আর এইভাবে দু'টো জীবনকে খতম করে দেওয়া হয়।

আগেকার দিনে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের নিষ্ঠুরতা ছিল এই রকমের। তারা গ্রামাঞ্চলে যে শ্বেত সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তা ছিল এই রকমের। আর আজ যখন কৃষকেরা বিদ্রোহ করে জনকয়েককে মাত্র গুলি করে মেরেছে এবং প্রতিবিপ্লবীদের দমন করবার জন্য খানিকটা মাত্র সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে, তখন একথা বলার কি কোন যুক্তি আছে যে, এমন করা উচিত নয়?

৩। ভূস্বামীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে আঘাত করা

এলাকার বাইরে শস্য পাঠানো, শস্যের দাম জোর করে চড়ানো এবং মজুতদারী ও ফাটকাবাজারীর উপর নিষেধাজ্ঞা। হুনানের কৃষকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামে সাম্প্রতিক মাসের ঘটনাবলীর মধ্যে এটি একটি বিরাট ব্যাপার। গত অক্টোবর মাস থেকে গরীব কৃষকরা ভূস্বামী ও ধনী কৃষকদের শস্য বাইরে যাওয়া প্রতিরোধ করেছে এবং নিষিদ্ধ করে দিয়েছে জোর করে শস্যের দাম চড়ানো ও মজুতদারী ও ফাটকাবাজারী। ফলে, গরীব কৃষকরা তাদের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে সফল করতে পেরেছে। শস্যের বাইরে চালানের উপর এই নিষেধাজ্ঞাটি একেবারেই অলংঘনীয়। শস্যের দাম বেশ পড়ে গেছে আর মজুতদারী ও ফাটকাবাজারী লোপ পেয়েছে।

খাজনা ও জামানত বৃদ্ধির উপর নিষেধাজ্ঞা[১৫] এবং খাজনা ও জামানত কমানোর জন্য প্রচার। গত জুলাই-আগস্ট মাসে কৃষক সমিতিগুলি যখন দুর্বল ছিল, তখন চরমতম শোষণের দীর্ঘপ্রতিষ্ঠ প্রথা অনুসরণ করে ভূস্বামীরা একের পর এক প্রজাদের উপর খাজনা আর জামানত বৃদ্ধি করে নোটিশ জারী করত। কিন্তু, অক্টোবর মাসে যখন কৃষক সমিতিগুলো বেশ শক্তি অর্জন করল এবং যখন সেগুলি একযোগে খাজনা ও জামানত বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়াল তখন এ সম্পর্কে আর একটুও উচ্চবাচ্য করতে ভূস্বামীরা সাহস করেনি। নভেম্বর মাস থেকে পরবর্তীকালে কৃষকরা ভূস্বামীদের ওপরে যখন প্রাধান্য পেতে লাগল, খাজনা ও জামানত হ্রাসের জন্য প্রচার করার ব্যাপারে তারা তখন আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করল। কৃষকরা বলে, এটা খুব দুঃখের ব্যাপার যে গত শরৎকালে খাজনা আদায়কালে কৃষক সমিতিগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না, নাহলে গত শরৎকালেই আমরা খাজনা কমাতে পারতাম। আগামী শরৎকালে যাতে খাজনা হ্রাস হয় তার জন্য কৃষকরা এখন ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে, আর ভূস্বামীরাও জানতে চায় কেমন করে তা কমানো যাবে।

জামানত কমানোর ব্যাপারে হেংশান এবং অন্যান্য জেলায় ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রজাস্বত্ব বাতিল করার ওপর নিষেধাজ্ঞা। গত জুলাই ও আগস্ট মাসে ভূস্বামী কর্তৃক প্রজাস্বত্ব বাতিল ও জমি খারিজ দাখিল করার অনেক ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু অক্টোবরের পরে প্রজাস্বত্ব বাতিল করতে কেউই সাহস করেনি। আজ প্রজাস্বত্ব বাতিল করা বা জমি খারিজ দাখিল করার কথাই ওঠে না। যে সমস্যাটা এখনো দেখা দেয় তা হল ভূস্বামী নিজে যদি জমি চাষ করতে চায়, তাহলে প্রজাস্বত্ব বাতিল করা যাবে কিনা। কোন কোন জায়গায় কৃষকরা এমনকি এটাও ঘটতে দেয় না। আবার কোন কোন স্থানে ভূস্বামী নিজে যদি জমি চাষ করতে চায় তাহলে প্রজাস্বত্ব বাতিল করা যেতে পারে, কিন্তু তখন আবার প্রজা-কৃষকদের মধ্যে বেকার সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যার সমাধান করতে একই রকম কোন পদ্ধতি এখনো স্থিরীকৃত হয়নি।

সুদ কমানো। আনহুয়াতে সাধারণভাবে সুদ কমানো হয়েছে। অন্যান্য জেলা থেকেও সুদ কমানোর খবর এসেছে। কিন্তু যেখানেই কৃষক সমিতিগুলি খুব শক্তিশালী, সেখানেই গ্রাম্য মহাজনী প্রকৃতপ্রস্তাবে লোপ পেয়েছে, কারণ তাদের অর্থ 'সাধারণের সম্পত্তিতে' পরিণত করা হবে এই ভয়ে ভূস্বামীরা ঋণদান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে। বর্তমানে যাকে বলা হয় সুদ কমানো, তা কেবল পুরানো ঋণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওইসব পুরানো ঋণের সুদই যে কেবল কমানো হয় তা নয়, উপরন্তু ঋণদাতাকে আসলটা আদায় করার ব্যাপারে চাপ দিতে প্রকৃতপক্ষে নিষেধ করা হয়। গরীব কৃষকরা বলে, 'আমাকে দোষ দিও না। বছর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি আগামী বছরে তোমার টাকা শোধ করে দেব।'

৪। স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের সামন্ততান্ত্রিক শাসন উচ্ছেদ করা—তু এবং তুয়ান[১৬] ধ্বংস করা

পুরানো তু (মহকুমা) এবং তুয়ানের (থানা) রাজনৈতিক ক্ষমতার সংগঠন, বিশেষ করে 'তু' পর্যায়ের, অর্থাৎ জেলা পর্যায়ের ঠিক নিচের ধাপে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের হাতে। 'তু'র ক্ষমতা বিস্তৃত ছিল দশ থেকে পঞ্চাশ বা ষাট হাজার লোকের

উপর ; তার নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী ছিল—যেমন থানারক্ষী বাহিনী ; তার নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতা ছিল—যেমন প্রতি মু জমির উপর কর[17] ধার্য করার ক্ষমতা, ইত্যাদি ; এবং তার নিজস্ব বিচার ক্ষমতাও ছিল—যেমন ইচ্ছামতো কৃষকদের গ্রেপ্তার করা, জেলে দেওয়া, বিচার করা এবং শাস্তি দান করার ক্ষমতা। যেসব অসৎ ভদ্রলোক এমন ক্ষমতাযন্ত্র পরিচালনা করত তারা প্রকৃত-পক্ষে ছিল গ্রামাঞ্চলের সম্রাট। তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, প্রাদেশিক সামরিক গভর্নর[18] কিম্বা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে কৃষকরা অত মাথা ঘামাত না ; তাদের প্রকৃত 'মনিব' ছিল এইসব গ্রাম্য সম্রাটরা। এই ধরনের মনিব শুধু হুম্ শব্দ করলেই কৃষকরা বুঝত যে তাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে বিদ্রোহের ফলে ভূস্বামীশ্রেণীর কর্তৃত্ব সাধারণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে, আর স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গ্রাম্য শাসনব্যবস্থা স্বভাবতঃই ভেঙে পড়েছে। 'তু' ও 'তুয়ানের' প্রধানরা সকলেই জনসাধারণকে এড়িয়ে চলে এবং নিজেদের মুখ দেখাতে তারা সাহস করে না ; আর স্থানীয় সব ব্যাপার সমাধানের জন্য তারা কৃষক সমিতির কাছে পাঠিয়ে দেয়। লোকজনকে তারা দূরে রাখে এই বলে, 'এটা আমার কাজ নয় !'

কৃষকদের আলাপ-আলোচনায় 'তু' এবং 'তুয়ানের' প্রধানদের কথা উঠলে তারা ক্রুদ্ধভাবে বলে, 'সেই বদমায়েসদের দল ! তারা শেষ হয়ে গেছে !'

তা বটে। যেখানেই বিপ্লবের ঝড় বয়েছে, সেখানেই গ্রাম্য শাসনব্যবস্থার পুরানো যন্ত্রগুলি সম্পর্কে 'শেষ হয়ে গেছে' কথাটা যথার্থ অবস্থা প্রকাশ করে।

৫। ভূস্বামীদের সশস্ত্র শক্তির উচ্ছেদ এবং কৃষকদের সশস্ত্র শক্তির প্রতিষ্ঠা

হুনান প্রদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণাংশের তুলনায় মধ্যাংশের ভূস্বামীদের সশস্ত্র শক্তির পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম। প্রত্যেকটি জেলায় যদি গড়ে ৬০০টি রাইফেল ধরা যায়, তাহলে ৭৫টি জেলায় সর্বমোট রাইফেল সংখ্যা হবে ৪৫,০০০টি। বাস্তবে এই সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। দক্ষিণ ও মধ্যাংশে যেখানে কৃষক-আন্দোলন বেশ ভালভাবে গড়ে উঠেছে, সেখানে কৃষকরা যে প্রচণ্ড গতিতে জেগে উঠেছে, তার ফলে ভূস্বামীশ্রেণী নিজের শক্তি টিঁকিয়ে

রাখতে পারেনি। তাদের সশস্ত্র শক্তিগুলি ব্যাপকহারে কৃষক সমিতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং কৃষকদের পক্ষে চলে গিয়েছে। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নিংসিয়াং, পিংচিয়াং, লিউইয়াং, ছাংশা, লিলিং, সিয়াংথান, সিয়াং-সিয়াং, আনহুয়া, হেংশান, হেংইয়াং প্রমুখ জেলায়। পাওছিংয়ের মতো কোন কোন জেলায় ভূস্বামীদের সশস্ত্র বাহিনীর অল্প অংশ একটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে, কিন্তু তাদের প্রবণতা হল আত্মসমর্পণের দিকে। আর একটা ক্ষুদ্রাংশ কৃষক সমিতিগুলির বিরোধিতা করছে, যেমন, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ইচাং, লিনউ এবং চিয়াহো প্রমুখ জেলার কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু কৃষকরা তাদের আক্রমণ করছে এবং অল্পকালের মধ্যে তাদের উচ্ছেদ করে ফেলবে। প্রতিক্রিয়াশীল ভূস্বামীদের কাছ থেকে এইভাবে যেসব সশস্ত্র শক্তি পাওয়া গিয়েছে, তাদের সবাইকে 'স্থায়ী পারিবারিক মিলি-শিয়ায়'[১৯] পুনর্গঠিত করা হচ্ছে এবং তাদেরকে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসিত সরকারের নতুন ব্যবস্থার অধীনে দিয়ে দেওয়া হয়েছে—যে সরকার কৃষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারক। এইসব পুরানো সশস্ত্র শক্তিকে নিজেদের দলে আনা হল একটা উপায়, যার দ্বারা কৃষকরা তাদের নিজেদের সশস্ত্র শক্তি গড়ে তুলছে। আর একটা নতুন পদ্ধতি হল কৃষক সমিতির বর্শাবাহিনী গড়ে তোলা। বর্শাগুলিতে আছে হুল বসানো দু'দিকে কাটে এমন পাত, যা লম্বা লাঠির মাথায় বসানো থাকে। কেবল সিয়াংসিয়াং জেলায় এই অস্ত্রের সংখ্যা হল এক লাখ। অন্যান্য জেলায়, যথা সিয়াংথান, হেংশান, লিলিং এবং ছাংশার প্রত্যেকটিতে আছে ৭০,০০০-৮০,০০০, বা ৫০,০০০-৬০,০০০ কিম্বা ৩০,০০০-৪০,০০০টি করে। যেসব জেলায় কৃষক-আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তার প্রত্যেকটিতে বর্শাবাহিনী দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইভাবে অস্ত্রসজ্জিত কৃষকরা গঠন করে 'অস্থায়ী পারিবারিক মিলিশিয়া'। বর্শাসজ্জিত এই বিরাট বাহিনী উপরে উল্লিখিত পুরানো সশস্ত্র বাহিনী থেকে আরও বড়। এই বাহিনী একটা নবজাত সশস্ত্র শক্তি, যাকে দেখামাত্র স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরা ভয়ে কাঁপতে থাকে। হুনানের বিপ্লবী কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া উচিত যে, প্রদেশের ৭৫টি জেলার দু'কোটির বেশি কৃষকের মধ্যে যেন এই সশস্ত্র শক্তি সত্যই ব্যাপকভাবে গঠন করা হয়; যেন তরুণ বা পরিণত বয়স্ক প্রত্যেকটি কৃষকের একটা করে বর্শা থাকে, বর্শা একটি মারাত্মক অস্ত্র এমন মনে করে এর উপর যেন কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা না হয়।

বর্শা দেখলেই যার বুক কাঁপে সে সত্যই ভীরু! কেবল স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরা তার ভয়ে ভীত, কিন্তু কোন বিপ্লবীর এতে ভয় পাওয়া উচিত নয়।

৬। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও তার সাকরেদদের রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্ছেদ

কৃষকরা জেগে না উঠলে জেলার সরকার যে পরিচ্ছন্ন হতে পারে না তা কুয়াংতোং প্রদেশের হাইফেংয়ে কিছুকাল আগে প্রমাণিত হয়েছিল। এখন আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি বিশেষ করে হুনানে। যে জেলায় ক্ষমতা স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের করায়ত্ত, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট প্রায় সবাই দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী হবেই, তা সে যেই হোক না কেন। যে জেলায় কৃষকরা জেগে উঠেছে সেখানকার সরকার দুর্নীতিমুক্ত, তার ম্যাজিস্ট্রেট যেই হোক না কেন। আমি যে জেলাগুলো পরিদর্শন করেছি, সেসব জায়গায় ম্যাজিস্ট্রেটকে সকল ব্যাপারে কৃষক সমিতির সঙ্গে আগে আলোচনা করতে হয়। যেসব জেলায় কৃষকদের ক্ষমতা খুব শক্তিশালী, সেসব স্থানে কৃষক সমিতির কথা 'বিস্ময়করভাবে ফলপ্রসূ' হয়েছে। সমিতি যদি স্থানীয় উৎপীড়ক বা অসৎ ভদ্রলোকদের কাউকে সকালে গ্রেপ্তার করতে দাবি জানায় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট দুপুর পর্যন্ত দেরী করতে সাহস করে না। সমিতি যদি গ্রেপ্তারের দাবি জানায় দুপুরবেলা, তাহলে সে বিকেল পর্যন্ত দেরী করতে সাহস করে না। গ্রামে কৃষকদের শক্তি যখন কেবল মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছিল, ম্যাজিস্ট্রেট তখন স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে কৃষকদের বিরোধিতা করেছিল। কৃষকদের শক্তি বাড়তে বাড়তে যখন জমিদারের শক্তির সমকক্ষ হল, ম্যাজিস্ট্রেটরা তখন দু-মুখো আচরণ করার চেষ্টা করত। এটা করতে গিয়ে সে কৃষক সমিতির কোন কোন প্রস্তাব গ্রহণ করত, আবার কতকগুলো বর্জন করত। কৃষক সমিতির কথা 'বিস্ময়করভাবে ফলপ্রসূ' হয়—এই মন্তব্য কেবল সেইসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে কৃষকদের শক্তি ভূস্বামীর শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে দিয়েছে। বর্তমানে সিয়াংসিয়াং, সিয়াংথান, লিলিং, হেংশান প্রমুখ জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই রকম :

(১) ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিপ্লবী গণ-সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে

গঠিত যুক্ত পরিষদ কর্তৃক সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিষদ আহ্বান করে ম্যাজিষ্ট্রেট, এবং তার অফিসে এই সভা বসে। কোন কোন জেলায় একে বলা হয় 'জনসাধারণের সংস্থা ও স্থানীয় সরকারের যুক্ত পরিষদ'। আবার কোথাও একে বলা হয় 'জেলা সংক্রান্ত বিষয়ের পরিষদ'। এইসব সভায় উপস্থিতদের মধ্যে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়াও থাকেন জেলা কৃষক সমিতি, জেলার ট্রেড ইউনিয়ন সমিতি, বণিক সমিতি, নারী সমিতি, স্কুল কর্মচারী সমিতি, ছাত্র সমিতি এবং কুওমিনতাঙের জেলার সদর দপ্তরের[২০] প্রতিনিধিরা। এইসব পরিষদে ম্যাজিষ্ট্রেট গণ-সংস্থাসমূহের মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং অনিবার্যভাবেই তাদের হুকুমে ওঠে-বসে। সেইজন্য হুনানের জেলা সরকারের ঐরূপ গণতান্ত্রিক কমিটির পদ্ধতি অবলম্বন করার ব্যাপারে বড় একটা সমস্যার সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। বর্তমানে জেলা সরকারগুলি রূপে ও মর্মে, উভয় ক্ষেত্রেই বেশ গণতান্ত্রিক। গত দুই কি তিন মাসেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে, অর্থাৎ সমগ্র মফস্বল অঞ্চলে কৃষকরা জেগে উঠবার পর এবং স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের ক্ষমতা উচ্ছেদ করবার পর এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ম্যাজিষ্ট্রেটরা তাদের পুরানো অবলম্বন ধ্বসে পড়তে দেখে তাদের চাকরী রক্ষার খাতিরে অন্য অবলম্বনের তাগিদে জনসাধারণের সংস্থাসমূহের অনুগ্রহ লাভের জন্য তোষামোদ শুরু করেছে। তাই উপরে বর্ণিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

(২) বিচার বিষয়ক সহকারীদের হাতে পরিচালনা করবার মতো মামলাদি বলতে গেলে তেমন কিছুই নেই। হুনানের বিচার প্রণালী হল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট একসাথে বিচার সম্পর্কিত বিষয়ের দায়িত্বেও অধিষ্ঠিত। আর বিচার পরিচালনার জন্য একজন সহকারী তাকে সাহায্য করে। ধনী হবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা পুরোপুরি নির্ভর করত ট্যাক্স ও খাজনা আদায়ের ওপর, সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সৈন্য ও রসদ জোগাড় করার ওপর এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় ন্যায়-অন্যায়ের ধার না ধেরে জোর করে অর্থ আদায় করার ওপর। এই শেষের পদ্ধতিটি ছিল আয়ের সবচেয়ে নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য উপায়। গত কয়েক মাসে, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের পতনের ফলে সব আইন-ব্যবসায়ী ধাপ্পাবাজরা অদৃশ্য হয়েছে। কৃষকদের ছোট-বড় সবরকম সমস্যা এখন বিভিন্ন স্তরের কৃষক সমিতিগুলি মীমাংসা করে। তাই জেলার বিচারের সহকারীদের একেবারেই আর কিছু

করার নেই। সিয়াংসিয়াংয়ের ওইরকম একজন লোক আমাকে বলেছিল: 'যখন কৃষক সমিতি ছিল না, তখন প্রতিদিন গড়ে ষাটটি করে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা জেলা সরকারের কাছে পেশ করা হতো, আর এখন পেশ করা হয় গড়ে প্রতিদিন মাত্র চারটি কি পাঁচটি মামলা।' এইভাবে ম্যাজিস্ট্রেট ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের পকেট ঘটনা-পরম্পরায় বাধ্য হয়ে খালি থাকে।

(৩) **সশস্ত্র রক্ষীদল, পুলিশ এবং সাকরেদরা এখন আশেপাশে ভেড়ে না এবং জোর করে অর্থ আদায় করতে তারা গ্রামে যেতে সাহস করে না।** অতীতে গ্রামের অধিবাসীরা শহুরে লোকদের ভয় করত কিন্তু এখন শহুরে লোকেরাই গ্রামের অধিবাসীদের ভয়ে ভীত। বিশেষ করে পুলিশ, সশস্ত্র রক্ষীদল এবং সাকরেদরা—জেলা সরকারের পোষ্য এইসব পাজি কুকুররা এখন গ্রামে যেতে ভয় করে। যদি তারা যায়ও, তবু তারা আগেকার মতো জোর করে অর্থ আদায় করতে সাহস করে না। কৃষকদের বর্শা নজরে পড়লেই তারা কাঁপতে থাকে।

৭। কৌলিক মন্দির ও কুলবৃদ্ধদের গোষ্ঠীগত আধিপত্য, শহর ও গ্রামের দেবদেবীর ধর্মীয় আধিপত্য এবং স্বামীদের পুরুষসুলভ আধিপত্যের উচ্ছেদ

চীনের পুরুষেরা সাধারণতঃ তিন ধরনের আধিপত্যের ব্যবস্থার দ্বারা শাসিত; সেগুলি হল: (১) রাষ্ট্রব্যবস্থা (রাজনৈতিক কর্তৃত্ব)—এর বিস্তৃতি জাতীয়, প্রাদেশিক এবং জেলা সরকার থেকে থানা সরকার পর্যন্ত; (২) কুলব্যবস্থা (গোষ্ঠীগত কর্তৃত্ব)—এর বিস্তৃতি পূর্বপুরুষদের কেন্দ্রীয় মন্দির এবং তার শাখামন্দির থেকে পরিবারের প্রধান পর্যন্ত; এবং (৩) অতি-প্রাকৃত ব্যবস্থা (ধর্মীয় কর্তৃত্ব)—এর বিস্তৃতি নরকাধিপতি থেকে পাতাল-লোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নগর ও পল্লীর দেবদেবী পর্যন্ত, এবং স্বর্গাধিপতি থেকে স্বর্গলোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের দেবদেবী ও ভূতপ্রেতাত্মা পর্যন্ত। নারীদের পক্ষে উপরোক্ত তিন ধরনের আধিপত্যের দ্বারা শাসিত হওয়া ছাড়াও, তারা পুরুষদের দ্বারা শাসিত (স্বামীর কর্তৃত্বের দ্বারা)। এই চারটি কর্তৃত্ব—রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, গোষ্ঠীগত কর্তৃত্ব, ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও স্বামীর কর্তৃত্ব—সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ ও ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করছে। আর এগুলোই হচ্ছে চারটা মস্ত মোটা দড়ি যা চীনা জনগণকে, বিশেষ করে

কৃষকদের, বেঁধে রেখেছে। গ্রামাঞ্চলে কেমন করে কৃষকেরা ভূস্বামীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব উচ্ছেদ করেছে তা উপরে বলা হয়েছে। ভূস্বামীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হচ্ছে সমস্ত কর্তৃত্বের মেরুদণ্ড। ভূস্বামীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উচ্ছেদ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই গোষ্ঠীগত কর্তৃত্ব, ধর্মীয় ও স্বামীর কর্তৃত্ব সবই টলায়মান হয়ে পড়ে। কৃষক সমিতি যেখানে শক্তিশালী সেখানে কুলবৃদ্ধরা এবং মন্দিরের তহবিলের তত্ত্বাবধায়করা আর কুলবদ্ধ সমাজের নীচের তলার লোকজনদের উৎপীড়ন করতে কিংবা মন্দিরের তহবিল তছরুপ করতে সাহস করে না। কুলবৃদ্ধ ও তহবিলের তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে যারা সবচেয়ে খারাপ, তাদের স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের মতোই উৎখাত করা হয়েছে। বেত্রাঘাত, ডুবিয়ে মারা এবং জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো যেসব নিষ্ঠুর দৈহিক ও প্রাণঘাতী শাস্তি কৌলিক মন্দিরে প্রচলিত ছিল, এখন তা করতে কেউ সাহস করে না। কৌলিক মন্দিরসমূহের ভোজোৎসবে নারী ও গরীব লোকদেরকে যোগদান নিষিদ্ধ করে যে পুরানো আইন প্রচলিত ছিল তাও ভেঙে গিয়েছে। হেংশান জেলার পাইকুও-এর মহিলারা একত্র জড়ো হয়ে মন্দিরে ভীড় করে ঢুকে পড়ে, কোনরকমে লজ্জা না করে আসনে বসে পড়ে, এবং খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে অংশ নেয়। সে সমস্ত সম্ভ্রান্ত কুল মাতব্বরদের আর কোন উপায় থাকে না, তারা বাধ্য হয়ে মহিলাদের যা খুশী করতে দেয়। অন্য এক জায়গায়, যেখানে মন্দিরের ভোজোৎসবে গরীব কৃষকদের বাদ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কিছু সংখ্যক গরীব কৃষক দলবেঁধে ঢুকে পড়ে এবং পূর্ণতৃপ্তিতে খায় ও পান করে। সে সময় স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরা—লম্বা জোব্বা পরিহিত ভদ্রলোকেরা সবাই ভয়ে দৌড় মারে। সর্বত্র যেখানেই কৃষক-আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সেখানেই ধর্মীয় কর্তৃত্ব টলে উঠেছে। অনেক জায়গায় কৃষক সমিতি দেবদেবীর মন্দিরকে তাদের অফিসের কাজের জন্য দখল করে নিয়েছে। সর্বত্র তারা কৃষকদের স্কুল খুলবার কাজে বা সমিতির খরচ নির্বাহের জন্য মন্দিরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে বলে। এটাকে তারা বলে 'কুসংস্কার থেকে সাধারণের আয়'। লিলিং জেলায় কুসংস্কারমূলক কর্মকলাপ নিষিদ্ধ করা এবং মূর্তি ধ্বংস করার ধুম লেগেছে। এই জেলার উত্তরাঞ্চলীয় মহকুমাগুলোতে কৃষকরা মহামারীর দেবতাকে শান্ত করার জন্য প্রজ্বলিত ধূপ-মোমবাতি নিয়ে শোভাযাত্রা করতে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। লুখৌ-এর ফুপোলিংস্থিত তাও-মন্দিরে অনেক মূর্তি ছিল, কিন্তু

কুওমিনতাঙের আঞ্চলিক সদর দপ্তরের জন্য যখন আরও ঘরের দরকার পড়ল, তখন ছোট-বড় সব মূর্তিগুলোকে একসাথে কোণে গাদা করে রাখা হল। কৃষকেরা এতে কোন আপত্তি তোলেনি। তারপর থেকে কোন পরিবারে কারো মৃত্যু হলে দেবদেবীর প্রতি উৎসর্গ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন এবং পবিত্র বাতি প্রদান করার ঘটনা খুবই কম ঘটেছে। কৃষক সমিতির সভাপতি সুন সিয়াও-শান এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বলে স্থানীয় তাওবাদী পুরোহিতরা তাঁকে খুব ঘৃণা করে। উত্তরের তৃতীয় মহকুমায় লোংফেং নানের কৃষকরা এবং প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা কাঠের মূর্তিগুলোকে কেটে সেই কাঠ দিয়ে মাংস রাঁধে। দক্ষিণের অঞ্চলে অবস্থিত তোংফু মন্দিরের তিরিশটিরও বেশি মূর্তিকে ছাত্র ও কৃষকরা মিলে পুড়িয়ে ফেলে। মহামান্য পাও[২১]-এর দুটি মাত্র ছোট মূর্তি একজন বৃদ্ধ কৃষক ছিনিয়ে নিয়ে রক্ষা করে এবং বলে, 'পাপ করো না!' যেসব স্থানে কৃষকদের ক্ষমতা প্রাধান্য লাভ করেছে সেখানে বৃদ্ধ কৃষক এবং স্ত্রীলোকরাই শুধু দেবদেবীতে বিশ্বাস করে, যুবক ও মধ্যবয়স্ক কৃষকরা এখন আর ওসবে বিশ্বাস করে না। যেহেতু সমিতিগুলি যুবক ও মধ্যবয়স্ক কৃষকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে, সেজন্য ধর্মীয় কর্তৃত্বের উচ্ছেদ ও কুসংস্কার বিলুপ্তির কাজ সবত্র চলেছে। স্বামীর কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে, এটা গরীব কৃষকদের মধ্যে সর্বদাই দুর্বলতর, কারণ আর্থিক অবস্থার দরুণ গরীব কৃষক-নারীরা ধনিকশ্রেণীর নারীদের চেয়ে বেশি শ্রম না করে পারে না, তাই পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলার অধিকার, এমনকি সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তাদেরই বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান দেউলিয়া অবস্থার ফলে নারীদের উপর পুরুষদের আধিপত্যের মৌলিক ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ভাঙ্গন ধরেছে। বর্তমান কৃষক-আন্দোলনের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক জায়গায় নারীরা পল্লী-নারী সমিতি সংগঠন করেছেন, নারীদের মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ এসেছে এবং স্বামীর কর্তৃত্ব দিনের পর দিন নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। এক কথায় কৃষকদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক পিতৃপ্রধান মতাদর্শ ও ব্যবস্থা টলে উঠেছে। তবে বর্তমানে কৃষকরা ভূস্বামীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ধ্বংস করতে মনোনিবেশ করেছে। যেখানেই সেটাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়ে গেছে, সেখানেই তারা কুল, দেবদেবী এবং পুরুষের আধিপত্য এই তিনটি ব্যবস্থার উপর তাদের আক্রমণ শুরু করেছে। কিন্তু সেরকম আক্রমণ সবেমাত্র

শুরু হয়েছে, আর কৃষকরা যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থনৈতিক সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ না করছে, ততক্ষণ ঐ তিনটির সবকটিকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা যায় না। সেজন্য আমাদের বর্তমান দায়িত্ব হল রাজনৈতিক সংগ্রামে কৃষকরা যাতে তাদের ব্যাপকতম কর্মপ্রচেষ্টা সংহত করে, সে ব্যাপারে তাদের নেতৃত্ব দেওয়া, যাতে করে ভূস্বামীদের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ হয়ে যায়। অর্থনৈতিক সংগ্রাম শুরু করা উচিত এর অব্যবহিত পরে, যাতে করে গরীব কৃষকদের ভূমি সমস্যা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সমস্যার মৌলিক সমাধান হয়ে যায়। কুলব্যবস্থা, কুসংস্কার এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে অসমতা সম্পর্কে বলা যায় যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে জয়লাভের স্বাভাবিক পরিণতিতেই সেগুলি লোপ পাবে। যদি জোর করে ও অকালে এইসব অবস্থাকে উচ্ছেদ করতে অতিরিক্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরা এই অজুহাতের সুযোগ গ্রহণ করে এইসব প্রতিবিপ্লবী প্রচার চালাবে, যেমন, 'পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃষক সমিতির কোন ভক্তি নেই', 'কৃষক সমিতি দেবদেবীর নিন্দা করে ও ধর্ম বিনষ্ট করে' এবং 'কৃষক সমিতি স্ত্রীদের সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করা সমর্থন করে'। আর এ সবকিছুর উদ্দেশ্যই হল কৃষক-আন্দোলনকে ধ্বংস করা। হুনানের সিয়াংসিয়াং এবং হুপেইয়ের ইয়াংসিনের একটি সাম্প্রতিক ঘটনা একথা প্রমাণ করে। ওই ঘটনা হল এই যে, এখানে মূর্তি ধ্বংস করতে কৃষকরা বিরোধিতা করলে ভূস্বামীরা তার সুযোগ গ্রহণ করেছিল। কৃষকরা এইসব মূর্তি নিজেই তৈরী করেছে এবং সময় এলে তারা নিজের হাতেই ঐসব মূর্তিকে ছুঁড়ে ফেলবে; অকালে তাদের পক্ষ থেকে অন্য কাউকে এ কাজ করবার দরকার নেই। এইসব বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার-নীতি হওয়া উচিত এইরকম—'তীর না ছুঁড়ে ধনুক টেনে ধর, কেবল দিক নির্দেশ কর।'[২২] দেবদেবীর মূর্তি ছুঁড়ে ফেলা, শহীদ কুমারী মন্দির এবং সতী ও চরিত্রবতী বিধবাদের খিলানগুলি টেনে নামানোর কাজ করবে কৃষকরা নিজেরাই, অন্য কারো পক্ষে তাদের হয়ে এ কাজ করা ভুল।

আমি যখন গ্রামাঞ্চলে ছিলাম তখন কৃষকদের মধ্যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমিও প্রচার চালিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম:

'যদি আপনারা আটটি চিত্রাক্ষরে[২৩] বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনারা সৌভাগ্যের আশা করেন। যদি আপনি ভূস্থান বৈশিষ্ট্যের[২৪] শুভাশুভে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের কবরের অবস্থান থেকে

লাভবান হবার আশা করবেন। এ বছর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে স্থানীয় উৎপীড়ক, অসৎ ভদ্রলোক এবং দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী সকলেই একসঙ্গে তাদের আসন থেকে উৎখাত হয়েছে। এটা কি করে সম্ভব যে, মাত্র কয়েক মাস আগে তাদের সকলের ভাগ্য ভাল ছিল এবং তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কবরগুলির সুনির্বাচিত অবস্থানের সুফল ভোগ করেছে, আর হঠাৎ গত কয়েক মাসে তাদের সবাইয়ের ভাগ্য খারাপ হয়ে গেল এবং তাদের পূর্বপুরুষ-দের কবর একই সময় সুফলপ্রদ প্রভাব খাটানো বন্ধ করে দিল? স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকরা আপনাদের কৃষক সমিতির ব্যাপারে এ কথা বলে আসছে যে, 'কি আশ্চর্য! আজ পৃথিবীটা হয়ে দাঁড়িয়েছে কমিটির লোক-দের পৃথিবী। কাণ্ডখানা ভ্যাখো, কমিটির কোন একজন লোকের সঙ্গে মুখোমুখী না হয়ে তুমি প্রস্রাব করতেও যেত পার না!' কথাটি খুবই সত্য। শহর ও গ্রাম, ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতি, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি সকলেরই কার্যকরী কমিটির সভ্য আছে—সত্য বটে পৃথিবীটা কমিটির লোকদের। কিন্তু এ সবগুলি কি আটটি চিত্রাক্ষর এবং পূর্বপুরুষদের কবরের অবস্থানের জন্য হয়েছে? কি অদ্ভুত! গ্রামাঞ্চলের সকল দরিদ্র হতভাগ্যদের আটটি চিত্রাক্ষর হঠাৎ শুভ হয়ে পড়েছে! এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কবরগুলি হঠাৎ লাভজনক প্রভাব প্রয়োগ করতে শুরু করেছে! দেবদেবীর কথা বলছেন? আচ্ছা, সবকিছু দিয়ে তাদের পুজো করুন। কিন্তু আপনাদের যদি কেবল মহামান্য কুয়ান [২৫] এবং করুণার দেবী থাকত আর কৃষক সমিতি না থাকত তাহলে আপনারা কি স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের উচ্ছেদ করতে পারতেন? ঐসব দেব ও দেবীরা বাস্তবিকই করুণার উদ্রেক করে। আপনারা শত শত বছর ধরে তাদের পুজো করে এসেছেন, অথচ তারা আপনাদের উপকারার্থে স্থানীয় উৎপীড়ক বা অসৎ ভদ্রলোকদের একজনকেও উচ্ছেদ করেনি! এখন আপনারা আপনাদের খাজনা কমাতে চান। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই—কিভাবে আপনারা সেটা করবেন? আপনারা কি দেবদেবীর উপর বিশ্বাস করবেন, না কৃষক সমিতির উপর বিশ্বাস করবেন?'

আমার এসব কথা শুনে কৃষকরা হো হো করে হেসে উঠল।

৮। রাজনৈতিক প্রচারের প্রসার

যদি আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দশ হাজার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হতো,

তাহলেও কি তারা মফস্বলের দূরতম অঞ্চলব্যাপী নর-নারী, তরুণ-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে অতটা রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে পারত, যতটা দিয়েছে কৃষক সমিতিগুলি অত অল্প সময়ের মধ্যে? আমার মনে হয় না যে তারা তা করতে পারত। 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!', 'যুদ্ধবাজরা নিপাত যাক!', 'দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা নিপাত যাক!', 'স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোক নিপাত যাক!'—এই রাজনৈতিক শ্লোগানগুলোর পাখা গজিয়েছে; অগুনতি গ্রামের তরুণ, মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের কাছে ওই শ্লোগানগুলি উড়ে গিয়ে পৌঁছেছে; এইগুলি তাদের মনে গেঁথে গেছে, আর পরে মন থেকে ঠাঁই পেয়েছে তাদের ঠোঁটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্রীড়ারত একদল শিশুর প্রতি লক্ষ্য করুন। তাদের কেউ যদি আর একজনের প্রতি রেগে গিয়ে চোখ পাকিয়ে তাকায়, মাটিতে পদাঘাত করে এবং মুষ্টিবদ্ধ হাত নাড়তে থাকে, তাহলে তক্ষুণি আপনি তীক্ষ্ণ স্বরের চিৎকার শুনতে পাবেন, 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!'

সিয়াংথান অঞ্চলে রাখাল বালকদের মধ্যে যখন মারামারি বাধে, তখন তাদের একজন সাজে থাং শেং-চি এবং অপরজন সাজে ইয়ে থাই-সিন[২৬]। যখন একজন হেরে গিয়ে দৌড়ে পালায় এবং আরেকজন তার পিছু ধাওয়া করে, তখন দেখা যায়, যে ধাওয়া করে সে হল থাং শেং-চি, আর যাকে ধাওয়া করা হয় সে হল ইয়ে থাই-সিন। 'সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিপাত যাক!' এই গানটি শহরের প্রায় প্রত্যেকটি বালকবালিকা নিঃসন্দেহে গাইতে পারে এবং এখন গ্রামাঞ্চলেরও অনেক বালকবালিকা এটা গাইতে শিখেছে।

কোন কোন কৃষক ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের ইচ্ছাপত্রের আবৃত্তিও করতে পারে। তারা 'স্বাধীনতা', 'সমতা', 'তিন-গণনীতি' এবং 'অসম চুক্তি' শব্দগুলি ওই ইচ্ছাপত্র থেকে বেছে নিয়ে অনেকটা কাঁচাভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করেছে। ভদ্রগোছের জনৈক ব্যক্তি পথে একজন কৃষকের সামনা-সামনি পড়েছিল। লোকটি তার উন্নাসিকতা বজায় রেখে কৃষকটির জন্য পথ ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে। তখন কৃষকটি সরোষে বলে, 'এই ব্যাটা জুলুমবাজ, তুমি তিন-গণনীতির কথা শোননি?' আগে কৃষকরা যখন ছাংশার সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত শাকসব্জির ক্ষেত থেকে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে শহরে প্রবেশ করত, পুলিশ তখন তাদের হয়রানি করত। এখন তারা একটা অস্ত্র খুঁজে পেয়েছে, সে অস্ত্র হল তিন-গণনীতি।

এখন কোন পুলিশ যখন শাকসজি বেচাকেনায় ব্যস্ত কোন কৃষককে মারে বা গালিগালাজ করে, কৃষকটি তখন তৎক্ষণাৎ তিন-গণনীতির উল্লেখ করে জবাব দেয় এবং তা পুলিশকে চুপ করিয়ে দেয়। সিয়াংথানে একবার যখন মহাকুমা কৃষক সমিতি এবং একটি থানার কৃষক সমিতির মধ্যে একটি বিষয়ে বিরোধ দেখা দিল, তখন থানার কৃষক সমিতির সভাপতি ঘোষণা করল, 'মহকুমা কৃষক সমিতির অসম চুক্তির বিরোধিতা করি আমরা!'

গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র রাজনৈতিক প্রচারের প্রসার সম্পূর্ণরূপে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির একটি কীর্তি। অতি সহজ শ্লোগান, কার্টুন ও বক্তৃতা কৃষকদের মধ্যে এমন একটা ব্যাপক ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে যে মনে হয় যেন তাদের প্রত্যেকে কোন রাজনীতির বিদ্যালয় থেকে পাশ করে এসেছে। গ্রামাঞ্চলে কর্মরত কমরেডদের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃটিশবিরোধী বিক্ষোভ, অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন ও উত্তর-অভিযানের মহান বিজয়োৎসব পালন—এই তিনটি বিরাট গণসমাবেশের সময় রাজনৈতিক প্রচার হয়েছিল খুবই ব্যাপক। এইসব ঘটনার সময়ে যেখানে কৃষক সমিতির অস্তিত্ব ছিল, সেখানেই ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক প্রচার চালানো হয়েছে এবং সমগ্র গ্রামাঞ্চলকে এক প্রচণ্ড প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এর ফল হয়েছে বিরাট। এখন থেকে ঐসব সহজ শ্লোগানের মর্মবাণী ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ করে তুলবার এবং তার অর্থ পরিষ্কার করবার প্রতিটি সুযোগ যত্নসহকারে কাজে লাগানো উচিত।

৯। কৃষকদের নিষেধাজ্ঞা আরোপ

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক সমিতি যখন গ্রামাঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল তখন কৃষকেরা যা পছন্দ করে না, সেইসব জিনিসকে তারা নিষেধ করতে কিম্বা তার উপর বাধানিষেধ আরোপ করতে শুরু করল। বাজী ধরে খেলা, জুয়াখেল এবং আফিমখোরী হল তিনটি জিনিস যা সবচেয়ে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বাজী ধরে খেলা। যেখানে কৃষক সমিতিগুলি ক্ষমতাশালী, সেখানে মাচিয়াং, ডোমিনো এবং তাসখেলা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সিয়াংসিয়াংয়ের চতুর্দশ মহাকুমার কৃষক সমিতি দু'ঝুড়ি মাচিয়াং পুড়িয়ে দিয়েছে।

আপনি যদি গ্রামাঞ্চলে যান, এসব কোন খেলাই কাউকে আর খেলতে দেখবেন না। এই নিষেধাজ্ঞা যেই অমান্য করুক, তাকে কোন প্রশ্রয় না দিয়ে তক্ষুণি শাস্তি দেওয়া হয়।

জুয়াখেলা। আগে যারা পাঁড় জুয়াড়ী ছিল এখন তারা নিজেরাই জুয়াখেলা বন্ধ করছে। যেসব জায়গায় কৃষক সমিতি শক্তিশালী, সেসব জায়গা থেকে আবর্জনা একেবারেই সাফ করে ফেলা হয়েছে।

আফিমখোরী। এর ওপর নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত কঠোর। কৃষক সমিতি যখন আফিমের নলকে জমা দিতে আদেশ করে, কেউ তখন সামান্যতম আপত্তি তুলতেও সাহস করে না। লিলিং জেলায় জনৈক অসৎ ভদ্রলোক তার নলচে জমা দেয়নি বলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গ্রামের মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হয়।

কৃষকদের এই আফিমখোরদের 'নিরস্ত্রীকরণের আন্দোলন' উত্তরে অভিযানকারী বাহিনী কর্তৃক উ পেই-ফু এবং সুন চুয়ান-ফাংয়ের[২৭] সৈন্যবাহিনীকে নিরস্ত্র করার চেয়ে কম প্রভাববিস্তারী নয়। বিপ্লবী বাহিনীর অফিসারদের অনেকেরই পিতা, যেসব বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আফিমের প্রতি নেশাগ্রস্ত ছিল এবং নলচে কখনো হাতছাড়া করত না, 'সম্রাটরা' (অসৎ ভদ্রলোকেরা কৃষকদের ব্যঙ্গ করে এই নামে ডাকে) তাদেরকেও নিরস্ত্র করে ফেলেছে। 'সম্রাটরা' যে কেবল আফিমের চাষ ও আফিম সেবন নিষিদ্ধ করেছে তাই নয়, তার চলাচলও বন্ধ করে দিয়েছে। কুইচৌ থেকে পাওছিং, সিয়াংসিয়াং, ইয়ৌসিয়ান এবং লিলিংদের মধ্য দিয়ে যে আফিম চিয়াংসীতে রপ্তানীকরা হতো তার অনেকখানি মাঝ পথে আটকে দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে সরকারের অর্থ বিভাগের সঙ্গে সংঘাত ঘটেছে। ফলে উত্তরে অভিযানকারী সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের তাগিদে প্রাদেশিক কৃষক সমিতি নিম্ন পর্যায়ের কৃষক সমিতিগুলির প্রতি 'আফিম চলাচলের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে' আদেশ দেয়। কিন্তু এতে কৃষকরা খুবই বিক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়েছে।

এই তিনটি ছাড়াও অনেক জিনিস আছে, যা কৃষকরা নিষিদ্ধ করেছে কিংবা যার উপর বাধানিষেধ আরোপ করেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি:

হুয়াকু (পুষ্প ঢাক)। এটা এক ধরনের অশ্লীল অনুষ্ঠান যা অনেক জায়গায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পাল্কি (সেদান চেয়ার)। অনেক জেলায়, বিশেষ করে সিয়াংসিয়াংয়ে, পাল্কি ভাঙার অনেক ঘটনা ঘটেছে। পাল্কি যারা ব্যবহার করে, তাদেরকে কৃষকরা সবচেয়ে ঘৃণা করে; কৃষকরা পাল্কিগুলি সব সময় ভেঙে ফেলতে প্রস্তুত কিন্তু কৃষক সমিতি তা করতে তাদের নিষেধ করে। সমিতির কর্মকর্তারা কৃষকদের বলে: 'তোমরা যদি পাল্কিগুলি ভেঙে ফেল তাহলে কেবল ধনীদের অর্থ বাঁচবে আর বাহকরা বেকার হয়ে পড়বে। তাতে কি আমাদের নিজের লোকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না?' ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কৃষকরা নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেছে—পাল্কিবাহকদের পারিশ্রমিক বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যেটা ধনীদের শাস্তি দেওয়ার সমতুল।

মদ চোলাই ও চিনি তৈরী। মদ চোলাই ও চিনি তৈরী করতে খাদ্যশস্যের ব্যবহার সব জায়গার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মদ চোলাইকারকরা এবং চিনি শোধনকারীরা নিয়তই অভিযোগ করছে। হেংশান জেলায় ফুতিয়ান-পুতে মদ চোলাই করা নিষিদ্ধ করা হয়নি, কিন্তু সেখানে মদের দাম খুব নীচে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, ফলে মদ্য ব্যবসায়ীরা এই ব্যবসা লাভজনক না দেখে বাধ্য হয়ে এটা বন্ধ করে দেয়।

শুয়োর। পরিবার প্রতি কত সংখ্যক শুয়োর রাখা যাবে, তার সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, কারণ শুয়োররা খাদ্যশস্য খেয়ে ফেলে।

হাস-মুরগী। সিয়াংসিয়াংয়ে হাস-মুরগী পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু মহিলারা এতে আপত্তি করে। হেংশান জেলার ইয়াংথাংয়ের প্রত্যেকটি পরিবার মাত্র তিনটি করে পুষতে পারে, ফুথিয়ানপুতে পারে পাঁচটি করে। অনেক জায়গায় হাস পালন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, কারণ হাস মুরগীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। তারা যে কেবল খাদ্যশস্য খেয়ে ফেলে তাই নয়, উপরন্তু তারা ধানগাছ নষ্ট করে দেয়।

ভোজ। ভূরিভোজ সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। সিয়াংথান জেলার শাওশানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, অতিথিদেরকে মাত্র তিন রকমের জৈব খাদ্য পরিবেশন করা চলবে। ঐ তিন রকম হল মুরগী, মাছ এবং শুয়োরের মাংস। বাঁশের করুল, সামুদ্রিক গাছ-গাছড়া (কেল্প) এবং দক্ষিণ চীনের সেমই পরিবেশন করাও নিষিদ্ধ। হেংশান জেলায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, ভোজোৎসবে আটপ্রস্ত খাদ্য পরিবেশন করা চলবে, তার বেশি নয়।[২৮] লিলিং জেলার পূর্ব-তৃতীয় মহকুমায় মাত্র পাঁচপ্রস্ত পরিবেশন করতে দেওয়া হয়, আর উত্তর-

দ্বিতীয় মহকুমায় করা হয় মাংসের তিনটি প্রস্ত ও শাকসব্জির তিনটি প্রস্ত মাত্র। পশ্চিম-তৃতীয় মহকুমায় বসন্ত উৎসবের ভোজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিয়াংসিয়াং জেলায় সব রকম 'ডিম-পিঠার ভোজ' নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যদিও এটাকে কোনক্রমে ভুরিভোজ বলা যায় না। সিয়াংসিয়াং জেলার দ্বিতীয় মহকুমায় একটি পরিবারে ছেলের বিয়েতে 'ডিম-পিঠার ভোজ' দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হয়েছে দেখে কৃষকরা দল বেঁধে সে বাড়ীতে ঢুকে পড়ে এবং উৎসব পণ্ড করে দেয়। সিয়াংসিয়াং জেলার চিয়ামো টাউনে জনসাধারণ দামী খাবার খাওয়া থেকে বিরত হয়েছে এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অনুষ্ঠানে কেবল ফলই পরিবেশন করে।

বলদ। বলদ কৃষকদের একটি মূল্যবান সম্পদ। 'এ জীবনে বলদ হত্যা করলে পরের জীবনে তুমি বলদ হবে'—কথাটি প্রায় ধর্মীয় অনুশাসন পরিণত হয়েছে। বলদকে কোনক্রমেই হত্যা করা চলবে না। ক্ষমতা অর্জন করার আগে কৃষকরা বলদ হত্যার বিরোধিতা করতে কেবল ধর্মীয় অনুশাসনের দোহাই দিতে পারত। এটাকে নিষিদ্ধ করার কোন উপায় তাদের ছিল না। কৃষক সমিতি গড়ে উঠবার পর তাদের ক্ষমতা এমনকি বলদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং শহরে তারা বলদ হত্যা নিষিদ্ধ করেছে। জেলা শহর সিয়াংথানের ছয়টি কসাইখানার মধ্যে এখন পাঁচটিই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাকীটিতে কেবল রুগ্ন ও কাজের অযোগ্য বলদ জবাই করা হয়। হেংশান জেলার সর্বত্র বলদ হত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। জনৈক কৃষকের একটি বলদের একটি পা ভেঙে গেলে কৃষকটি পূর্বাহ্নে কৃষক সমিতির অনুমতি নিয়েই কেবল তাকে হত্যা করতে সাহস করেছে। চুচৌয়ের বাণিজ্য পরিষদ হঠকারিতা করে একটি বলদ হত্যা করলে কৃষকরা শহরে এসে তার কৈফিয়ৎ তলব করে এবং পরিষদ জরিমানা দেওয়া ছাড়াও ক্ষমা ভিক্ষা করে আতসবাজী ছোড়ে।

বাউণ্ডুলে বা ভবঘুরে। লিলিং জেলায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বসন্ত উৎসবের অভিনন্দন জানিয়ে ঢোল বাজানো, আঞ্চলিক দেবদেবীর গুণকীর্তন করা কিংবা পদ্মগীত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যান্য জেলায় এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে, কিংবা হয়তো আপনা থেকেই এইসব আচার-অনুষ্ঠান লোপ পেয়েছে, কারণ কেউ আর সেগুলি পালন করে না। 'গুণ্ডা ভিক্ষুক' বা 'ভবঘুরে' যারা আগে অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির ছিল, এখন কৃষক সমিতির কাছে নত হওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। সিয়াংথান

জেলার শাওশানে ভবঘুরেরা বৃষ্টি দেবতার মন্দিরকে নিয়মিতভাবে তাদের আস্তানায় পরিণত করেছিল এবং তারা কাউকে ভয় করত না। কিন্তু কৃষক সমিতি গড়ে ওঠার পর তারা চুপচাপ সরে পড়েছে। একই জেলার হুতি থানার কৃষক সমিতি এ রকম তিনটি ভবঘুরেকে পাকড়াও করে এবং ইঁটের ভাঁটির জন্য এঁটেল মাটি বইতে তাদের বাধ্য করে। নববর্ষের আমন্ত্রণ ও উপহারজনিত অপচয়কারী রীতিনীতিকে নিষিদ্ধ করে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে।

এগুলি ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে আরও অনেক ছোটখাট নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, লিলিংয়ে মহামারীর দেবতাকে শান্ত করবার জন্য প্রজ্বলিত ধূপ মোমবাতি নিয়ে শোভাযাত্রা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নৈবেদ্যের জন্য দামী জিনিস ও ফল ক্রয়, প্রেতাত্মার উৎসবে কাগজে পোশাক পোড়ানোর শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান এবং বসন্ত উৎসবে সৌভাগ্য কামনা করে পোষ্টার লাগানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিয়াংসিয়াং জেলার কুসুইতে জল নলচেয় করে ধূমপান করাও নিষিদ্ধ। এই জেলার দ্বিতীয় মহকুমায় আতসবাজী ছোড়া এবং অনুষ্ঠানমূলক বন্দুক ছোড়া নিষিদ্ধ, প্রথমটির জন্য জরিমানা হল ১.২০ ইউয়ান এবং দ্বিতীয়টির জন্য ২.৪০ ইউয়ান। সপ্তম ও বিংশ মহকুমায় মৃত ব্যক্তির জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অষ্টাদশ মহকুমায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার টাকা উপহার দেওয়া নিষিদ্ধ। এই ধরনের সংখ্যাতীত নিষেধাজ্ঞাকে সাধারণভাবে কৃষকদের নিষেধাজ্ঞা ও বাধানিষেধ আরোপ করা বলে অভিহিত করা হয়।

দু'দিক থেকে এসব নিষেধাজ্ঞার বিরাট তাৎপর্য আছে। প্রথমতঃ, এগুলি বাজী ধরে খেলা, জুয়াখেলা এবং আফিম সেবনের মতো খারাপ সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিপ্রকাশ। ভূস্বামীশ্রেণীর বিকৃত রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে এইসব রীতিনীতির সৃষ্টি হয় এবং ঐ শ্রেণীর কর্তৃত্ব যখনই উচ্ছেদ করা হল তখন ঐ রীতিনীতিকেও শেষ করে দেওয়া হল। দ্বিতীয়তঃ, শহরের ব্যবসায়ী কর্তৃক শোষণের বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞাগুলি এক ধরনের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা; যেমন ভোজ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে উপহার দেবার জন্য দামী বস্তু ও ফল ক্রয় ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা এই রকমের। শিল্পজাত দ্রব্য খুবই দামী এবং কৃষিজাত দ্রব্য খুবই শস্তা বলে কৃষকেরা অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে যায় এবং ব্যবসায়ীরা নির্মমভাবে তাদেরকে শোষণ করে;

সেইজন্ম নিজেদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কৃষকদের মিতব্যয়কে উৎসাহ দিতেই হবে। উপরে উল্লিখিত এলাকার বাইরে খাদ্যশস্য চালান দেবার উপর নিষেধাজ্ঞার যুক্তি হল এই যে, গরীব কৃষকদের খাবার জন্ম যথেষ্ট খাদ্য নেই এবং বাজার থেকে তাদের কিনে খেতে হয়, তাই এটা করে খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি রোধ করা হয়। এসবের কারণ হল কৃষকদের দারিদ্র্য এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে বিরোধ। তাদের এই পদক্ষেপ দ্বারা এটা বোঝায় না যে, তারা তথাকথিত প্রাচ্য সংস্কৃতির বিধিনিয়ম[২৯] বাঁচিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে শিল্পজাত দ্রব্য কিংবা শহর ও গ্রামের মধ্যে বাণিজ্য বর্জন করছে। অর্থনৈতিকভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে কৃষকদের অবশ্যই জিনিসপত্র মিলিতভাবে কিনবার জন্ম খরিদ্দারদের সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে হবে। সমিতিগুলি যাতে ঋণদান সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সরকারের পক্ষেও সে ব্যাপারে সাহায্য করা প্রয়োজন। এইসব ব্যবস্থা যদি অবলম্বন করা হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই দাম কম রাখবার উপায় হিসেবে খাদ্যশস্যের বাইরে চালান দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা কৃষকরা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করবে, আর অর্থনৈতিক আত্মরক্ষার জন্ম কোন কোন শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানীর উপর নিষেধজ্ঞাও তখন তাদের জারী করতে হবে না।

১০। ডাকাতি নির্মূলীকরণ

আমার মতে হয়ু আর থাং, ওয়েন এবং উ থেকে শুরু করে ছিং সম্রাট ও প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি অবধি কোন শাসনকর্তাই আজও পর্যন্ত ডাকাতি নির্মূল করার ব্যাপারে অতখানি শক্তি দেখাতে পারেনি, যেমনটা আজ দেখিয়েছে কৃষক সমিতিগুলি। কৃষক সমিতি যেখানে শক্তিশালী, সেখানেই ডাকাতির চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই। আশ্চর্যের বিষয়, অনেক জায়গায় শাকসব্জি চুরি করে এমন ছিঁচকে চোরও লোপ পেয়েছে। কোন কোন জায়গায় এখনও কিছু কিছু ছিঁচকে চোরের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু যেসব জেলা আমি পরিদর্শন করেছি, এমনকি যেসব জায়গায় আগে দস্যুতার খুব প্রাদুর্ভাব ছিল সেসব স্থানেও দস্যুর চিহ্নমাত্র নেই। কারণ হল : প্রথমত:, কৃষক সমিতির সভ্যরা পাহাড় ও উপত্যকার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, আর তারা বর্শা ও লাঠি হাতে নিয়ে শত শত সংখ্যায় জমায়েত হতে পারে এক ডাকে ; তাই দস্যুরা আর কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষক-আন্দোলন গড়ে উঠবার

পর থেকে চালের দাম পড়ে গেছে ; গত বসন্তে এক তান চালের দাম ছিল ছয় ইউয়ান, কিন্তু গত শীতে তা ছিল মাত্র দুই ইউয়ান। ফলে, জনসাধারণের জন্য খাদ্য সমস্যার গুরুত্ব আগের চেয়ে কমে গেছে। তৃতীয়তঃ, গুপ্ত সংগঠনের সভ্যরা[৩০] কৃষক সমিতিতে যোগ দিয়েছে, এখানে তারা প্রকাশ্যে এবং আইন-সম্মতভাবে নিজেদের বীরত্ব জাহির করতে এবং অভাব-অভিযোগের কথা প্রকাশ করতে পারে। ফলে 'পর্বত', 'মন্দির', 'ধর্মশালা' ও 'নদী'র[৩১] মতো গুপ্ত সংগঠনের অস্তিত্বের আর কোন প্রয়োজন নেই। যারা তাদের উৎপীড়ন করত সেইসব স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকের শুয়োর ও ভেড়া জবাই করার এবং তাদের উপর গুরুভার অতিরিক্ত কর এবং জরিমানা আদায় করার মাধ্যমে কৃষকরা নিজেদের ক্রোধ প্রকাশ করার জন্য এখন যথেষ্ট নির্গম পথ খুঁজে পেয়েছে। চতুর্থতঃ, সেনাবাহিনী এখন অধিক সংখ্যায় সৈন্য সংগ্রহ করেছে এবং 'অবাধ্যদের' অনেকে তাতে যোগদান করেছে। এইভাবে কৃষক-আন্দোলন গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতির অভিশাপ বন্ধ হয়ে গেছে। এই বিষয়ে ভদ্রলোক ও সম্পদশালী ব্যক্তিরাও কৃষক সমিতিকে অনুমোদন করে। তাদের মন্তব্য হল, 'কৃষক সমিতির কথা বলছ? তা যাই বল, সত্যি কথা বলতে কি, তাদের সপক্ষেও কিছু বলবার আছে।'

বাজী ধরে খেলা, জুয়াখেলা ও আফিম সেবন নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে এবং ডাকাতি নির্মূলীকরণের ব্যাপারে কৃষক সমিতিগুলি সাধারণ অনুমোদন লাভ করেছে।

১১। অত্যধিক করের বিলোপসাধন

যেহেতু দেশ এখনও ঐক্যবদ্ধ হয়নি এবং সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের কর্তৃত্ব উচ্ছেদ করা যায়নি, সেইজন্য কৃষকদের উপর ধার্য করা সরকারী ট্যাক্স ও করের গুরুভার, বা অন্য কথায় বলা যায় বিপ্লবী সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার দূর করার এখনও কোন উপায় নেই। যাহোক, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকরা যখন গ্রাম্য শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করত তখন কৃষকদের উপর যে অত্যধিক কর—যেমন প্রতি মু জমির উপর অতিরিক্ত কর—ধার্য করা হতো, তা কৃষক-আন্দোলনের অভ্যুত্থান এবং স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেছে কিম্বা অন্ততপক্ষে কমে এসেছে। এটাকেও কৃষক সমিতির কীর্তিসমূহের একটি বলে বিবেচনা করা উচিত।

১২। শিক্ষার জন্য আন্দোলন

চীন দেশে শিক্ষা সব সময় শুধু ভূস্বামীদের একটা অধিকার হয়ে এসেছে এবং কৃষকদের তাতে প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু ভূস্বামীদের সংস্কৃতি কৃষকদেরই সৃষ্টি, কারণ ভূস্বামীদের সংস্কৃতি কৃষকদের ঘাম ও রক্ত দিয়েই তৈরী। চীনদেশে শতকরা নব্বই জন লোকের কোন শিক্ষা নেই, আর এদের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ হল কৃষক। যখন গ্রাম অঞ্চলে ভূস্বামীদের শক্তি উৎখাত করা হল, তখনই শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য কৃষকদের আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। লক্ষ্য করুন, যে কৃষকরা এতকাল স্কুলকে ঘৃণা করে এসেছে, তারা কিন্তু আজ আগ্রহের সঙ্গে নৈশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে চলেছে! কৃষকরা সব সময় 'বিদেশী ধরনের স্কুলকে' অপছন্দ করে এসেছে। আমার ছাত্রাবস্থায় আমি যখন গ্রামে ফিরে গিয়ে দেখলাম যে কৃষকরা 'বিদেশী ধরনের স্কুলের বিরোধী' তখন আমিও 'বিদেশী ধরনের ছাত্র ও শিক্ষকদের' সাধারণ স্রোতের সঙ্গে নিজেকে এক করে ভাবতাম আর ওই শিক্ষার সমর্থনে দাঁড়াতাম, মনে করতাম, কোন-না-কোনভাবে কৃষকরা ভুল করছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন গ্রামাঞ্চলে ছয় মাস বাস করেছিলাম এবং আমি এই সময় ইতিমধ্যেই একজন কমিউনিস্ট হয়েছি এবং মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করেছি শুধু তখনই আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমারই ভুল হচ্ছিল আর কৃষকরাই ছিল সঠিক। গ্রামাঞ্চলের প্রথমিক স্কুলসমূহে যে পাঠ্যবই পড়ান হতো তা লেখা ছিল সম্পূর্ণরূপে শহরের বিষয় নিয়ে এবং তা গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনের পক্ষে যথাযথ ছিল না। তাছাড়া কৃষকদের প্রতি প্রাথমিক স্কুলসমূহের শিক্ষকদের মনোবৃত্তি ছিল খুব খারাপ এবং তারা কৃষকদের পক্ষে সহায়ক হওয়া তো দূরের কথা, তারা হয়ে উঠল কৃষকদের অপছন্দের লোক। সেইজন্য কৃষকরা আধুনিক স্কুলের (যাকে তারা বলত 'বিদেশী স্কুল') চেয়ে পুরানো ধরনের পাঠশালা (যাকে তারা বলত 'চীনা বিদ্যালয়') এবং প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের চেয়ে পুরানো ধরনের পাঠশালার গুরুমশাইদের বেশি পছন্দ করত। এখন কৃষকরা উৎসাহের সঙ্গে নৈশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করছে—এই স্কুলকে তারা বলে কৃষকদের স্কুল। এসবের কোন-কোনটিকে ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে এবং কোন-কোনটিকে সংগঠিত করা হচ্ছে; আর গড়ে প্রতি থানায় একটা করে স্কুল স্থাপিত হয়েছে। এই স্কুলগুলি স্থাপনের ব্যাপারে কৃষকরা খুবই উৎসাহী এবং কেবলমাত্র এগুলিকেই তারা নিজেদের স্কুল বলে মনে করে। নৈশ স্কুলগুলির আয় আসে 'কুসংস্কার

থেকে সাধারণের আয়', কৌলিক মন্দিরের তহবিল এবং অন্যান্য অব্যবহৃত সামাজিক তহবিল ও সম্পত্তি থেকে। জেলার শিক্ষাবোর্ড এই অর্থ সরকারী স্কুল অর্থাৎ কৃষকদের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম 'বিদেশী ধরনের স্কুল' প্রতিষ্ঠার কাজে লাগাতে চেয়েছিল, আর কৃষকরা তাকে কৃসকদের স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে লাগাতে চেয়েছিল। এই বিবাদের পরিণতিতে উভয় পক্ষই অর্থের কিছু কিছু অংশ লাভ করে। কোন কোন স্থানে কৃষকরা সবটাই পেয়েছে। কৃষক-আন্দোলনের বিকাশলাভের ফলে কৃষকদের সাংস্কৃতিক মান দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। সমগ্র প্রদেশের গ্রামগুলিতে হাজার হাজার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে বেশি দিন লাগবে না। যে 'সার্বজনীন শিক্ষা' সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত 'শিক্ষা-বিদরা' চারিদিক মুখরিত করে তুলেছে, যা এখনও পর্যন্ত এটা ফাঁকা বুলি মাত্র রয়ে গেছে, তা থেকে কৃষক-স্কুল প্রতিষ্ঠার ঘটনাটা একেবারেই স্বতন্ত্র।

১৩। সমবায় আন্দোলন

সমবায় সমিতিটা কৃষকদের সত্যিই দরকার, বিশেষতঃ খরিদ্দারদের সমবায়, বাণিজ্যিক সমবায় এবং ঋণদান সমবায়। তারা যখন জিনিস কেনে, তখন ব্যবসায়ীরা তাদের শোষণ করে; তারা যখন তাদের ক্ষেতে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে, ব্যবসায়ীরা তখন তাদের ঠকায়; তারা যখন টাকা বা চাল ধার করে, সুদখোর মহাজনরা তখন নিষ্ঠুরভাবে তাদের লুট করে। এই তিনটি সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে তারা খুবই আগ্রহী। গত শীতে ইয়াংসি উপত্যকায় যুদ্ধ করার সময়ে যখন বাণিজ্যের পথগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং হুনানে লবণের দাম বেড়ে গেল, তখন কৃষকরা তাদের লবণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অনেক সমবায় সমিতি গঠন করেছিল। ভূস্বামীরা যখন টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করে দিল, তখন ঋণদান সংস্থা গঠন করবার জন্য কৃষকরা বহু চেষ্টা করেছিল, কারণ টাকা ধার করা তাদের দরকার ছিল। একটা বড় সমস্যা হল এই সংগঠনের জন্য একটি বিস্তারিত ও যথাযথ নিয়ম-কানুনের অভাব। আপনা-আপনি গজিয়ে ওঠা কৃষকদের এইসব সমবায় সমিতিগুলি প্রায়শই সনবায় কর্মনীতির সঙ্গে খাপ খায় না বলে যেসব কমরেড কৃষকদের মধ্যে কাজ করছেন তাঁরা সব সময় আগ্রহের সঙ্গে 'নিয়মকানুন' সম্পর্কে খোঁজ করেন। যদি উপযুক্তভাবে পরিচালনা করা যায়, তাহলে কৃষক সমিতির বিস্তারলাভের সঙ্গে সঙ্গে সমবায় আন্দোলনও সর্বত্র বিস্তারলাভ করতে পারে।

১৪। রাস্তা নির্মাণ ও বাঁধ মেরামত

এটাও কৃষক সমিতির কীর্তিসমূহের একটি। কৃষক সমিতি গড়ে উঠবার আগে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাগুলোর অবস্থা ছিল শোচনীয়। অর্থ ছাড়া রাস্তা মেরামত করা যায় না, আর ধনীরা এ ব্যাপারে নিজেদের গাঁট থেকে খরচ করতে অনিচ্ছুক ছিল। সেইজন্য রাস্তাগুলি খুব খারাপ অবস্থায় পড়ে ছিল। যদি রাস্তা মেরামতের কোন কাজ করাও হতো তবু তা একটা খয়রাতী কাজ হিসেবে করা হতো, যেসব লোক 'পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় করতে ইচ্ছুক' তাঁদের কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা হতো এবং কিছু সরু, কোনরকমে বাঁধানো পথ তৈরী করা হতো। কৃষক সমিতি গড়ে উঠবার পর রাস্তা কত চওড়া হবে তা নির্দিষ্ট করে দিয়ে আদেশ জারী করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানের যাতায়াতের প্রয়োজনানুযায়ী তা তিন, পাঁচ, সাত বা দশ ফুট চওড়া হতে পারে এবং রাস্তার পাশে বসবাসকারী প্রত্যেকটি ভূস্বামীকে রাস্তাটির অংশবিশেষ তৈরি করে দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। একবার আদেশ দেওয়া হয়ে গেলে তা অমান্য করে এমন সাহস কার আছে? অল্প সময়ের মধ্যে অনেক ভাল রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। এটা কোন খয়রাতী নয় বরং বাধ্যবাধকতার ফল, কিন্তু এই ধরনের খানিকটা বাধ্যবাধকতা মোটেই খারাপ জিনিস নয়। বাঁধ দেওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। নির্মম ভূস্বামীরা সব সময় প্রজাকৃষকদের কাছ থেকে যতটা পারা যায় শুষে নিতে তৎপর থাকত, কিন্তু তারা বাঁধ মেরামতের জন্য সামান্য পরিমাণ অর্থও কখনোই ব্যয় করত না। তারা পুকুর শুকিয়ে যেতে দিত এবং প্রজাকৃষকদের উপবাসে রাখত। একমাত্র খাজনা ছাড়া আর কিছু নিয়েই তারা মাথা ঘামাত না। এখন কৃষক সমিতি হয়েছে, এখন বাঁধ মেরামত করতে ভূস্বামীদের বাধ্য করার জন্য তাদের প্রতি সরাসরি আদেশ জারী করা যায়। যদি কোন জমিদার তা করতে অস্বীকার করে, তাহলে সমিতি তাকে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলে: 'ঠিক আছে! তুমি যদি মেরামত না কর, তাহলে তুমি চাঁদা হিসেবে ধান দেবে, আর তার পরিমাণ হবে প্রতিদিন কাজের জন্য এক তৌ করে।' ভূস্বামীর পক্ষে এটা আরও ক্ষতিকর বলে সে তাড়াতাড়ি মেরামতের কাজটা করে দেয়। ফলে অনেক খারাপ বাঁধ এখন ভাল হয়ে উঠেছে।

ওপরে যে চৌদ্দটি কাজের উল্লেখ করা হল, তার সবগুলিই কৃষক সমিতির

নেতৃত্বে কৃষকরা সম্পন্ন করেছে। মৌখিক প্রেরণা ও বিপ্লবী তাৎপর্যের দিক থেকে এদের কোন্‌টি খারাপ? পাঠকগণ, দয়া করে এগুলি সম্পর্কে আরেক-বার ভেবে দেখবেন। আমার মনে হয়, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরাই সেগুলিকে কেবল খারাপ বলবে। বিস্মিত হতে হয়, নানছাং[32] থেকে খবর এসেছে যে, চিয়াং কাই-শেক, চাং চিং-চিয়াং[33] এবং এই ধরনের অন্যান্য ভদ্রলোকেরা হুনানের কৃষকদের কার্যকলাপকে আদৌ অনুমোদন করে না। হুনানের দক্ষিণপন্থী নেতা লিউ ইয়ুয়ে-চি[34] প্রমুখ ব্যক্তিগণ চিয়াং ও চাংয়ের মতো একই মত পোষণ করে এবং বলে, 'তারা তো একেবারে লাল হয়ে গেছে।' কিন্তু এরকম একটু লাল না হলে জাতীয় বিপ্লব কি করে হবে? রাতদিন 'জনসাধারণকে জাগ্রত করা' সম্পর্কে হৈ চৈ করা এবং জনসাধারণ যখন সত্যই জেগে ওঠে, তখন আতঙ্কে মুমূর্ষ হয়ে ওঠার ব্যাপারটির সঙ্গে মহামান্য শে'র ড্রাগন প্রীতির[35] পার্থক্য কোথায়?

টীকা

১। হুনান প্রদেশ তখন ছিল সমগ্র চীন দেশের কৃষক-আন্দোলনের কেন্দ্র।

২। সে সময় হুনানের শাসনকর্তা ছিল চাও হেং-থি। সে ছিল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের দালাল। ১৯২৬ সালে উত্তরে অভিযানকারী সৈন্য-বাহিনী তাকে উচ্ছেদ করে।

৩। ১৯১১ সালের বিপ্লব ছিং রাজবংশীয় স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটায়। এই বছরের ১০ই অক্টোবর তারিখে, ছিং সরকারের নয়া সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী সংস্থাগুলির প্রেরণায় উছাং শহরে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। এর পরে বিভিন্ন প্রদেশে পরপর বিদ্রোহ ঘটে এবং অতিসত্বরই ভেঙে পড়ে ছিং রাজবংশের শাসন। ১৯১২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে নানকিং শহরে স্থাপিত হয় চীন প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার, আর সান ইয়াৎ-সেন নির্বাচিত হলেন এর অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট। কৃষক, শ্রমিক ও শহরে পেটি-বুর্জোয়াদের সঙ্গে বুর্জোয়াদের মৈত্রীর ভেতর দিয়ে জয়লাভ করে এই বিপ্লব। কিন্তু যে চক্র এই বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল, তারা ছিল আপোষপন্থী, তারা কৃষকদের প্রকৃত হিতসাধন করেনি এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের

চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছিল বলে রাষ্ট্রক্ষমতা এসে পড়ল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ—ইউয়ান শি-খাইয়ের হাতে, আর বিপ্লব হল ব্যর্থ।

৪। এগুলি কনফুসিয়াসের গুণাবলী—তাঁর অন্যতম শিষ্যের বর্ণনা অনুসারে।

৫। প্রাচীন চীনা উক্তিতে বলা হয় 'ত্রুটি সংশোধন করার জন্যে যথাযথ সীমা অতিক্রম করতে হবে।' আগে লোকদের কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে কথাটিকে প্রায়শঃই উল্লেখ করা হতো, প্রতিষ্ঠিত শৃংখলার গণ্ডির মধ্যে হলে সংস্কার সাধন মেনে নেওয়া হতো, কিন্তু যেসব কর্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল পুরানো নিয়ম-শৃংখলাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা, তা নিষিদ্ধ করা হতো। এই সীমারেখার মধ্যেকার কার্যকলাপকে মনে করা হতো 'যথাযথ', কিন্তু পুরানো নিয়ম-শৃংখলাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যা করা হতো, তাকে বলা হতো 'যথাযথ সীমা অতিক্রম'। সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী শিবিরের মধ্যকার সুবিধা-বাদীদের মতবাদ ছিল এটা। কমরেড মাও সে-তুঙ এই ধরনের সংস্কারবাদী মতবাদ খণ্ডন করেছিলেন। আলোচ্য বিষয়ে তিনি যে বলেছেন 'ত্রুটি সংশোধন করার জন্যে যথাযথ সীমা অতিক্রম করতে হবে, অন্যথায় ত্রুটির সংশোধন কখনও হতে পারে না'—তার অর্থ হল শোধনবাদী অর্থাৎ সংস্কারবাদী পদ্ধতি নয়, পুরানো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করতে জনগণের বিপ্লবী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

৬। ১৯২৬ সালের শীতকালে এবং ১৯২৭ সালের বসন্তকালে উত্তরে অভিযানকারী সৈন্যবাহিনী যখন ইয়াংসি নদীর উপত্যকায় প্রবেশ করছিল, চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লবী স্বরূপটি তখনও সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয়নি, এবং কৃষক সাধারণ তখনও মনে করত সে বিপ্লবের পক্ষে। ভূস্বামী ও ধনী কৃষকরা তাকে অপছন্দ করত এবং গুজব রটায় যে উত্তরে অভিযানকারী বাহিনী পরাজিত হয়েছে আর চিয়াং কাই-শেক পায়ে আঘাত পেয়েছে। ১৯২৭ সালের ১২ই এপ্রিল চিয়াং কাই-শেক যখন শাংহাই ও অন্যান্য স্থানে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটাল, শ্রমিকদের হত্যা করল, কৃষকদের দমন করল এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ করল তখনই তার প্রতিবিপ্লবী স্বরূপটা পরিপূর্ণ-রূপে প্রকাশিত হয়। তখন থেকে ভূস্বামীরা ও ধনী কৃষকরা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে তাকে সমর্থন করতে শুরু করে।

৭। প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের (১৯২৪-২৭) সময়কালে কুয়াংতোং ছিল প্রথম বিপ্লবী ঘাঁটি।

৮। উ পেই-ফু ছিল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের সবচেয়ে বিখ্যাতদের মধ্যে একজন। যে ছাও খুন ১৯২৩ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সভ্যদের ঘুষ দেবার কৌশল অবলম্বন করে কুখ্যাত হয়, তার সাথে একযোগে উ পেই-ফু উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের চিলি (হোপেই প্রদেশে) চক্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে ছাও খুনকে নেতা হিসেবে সমর্থন করে এবং এই দুইজনকে সাধারণভাবে 'ছাও-উ' বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯২০ সালে আনহুই চক্রের যুদ্ধবাজ তুয়ান ছী-রুইকে পরাজিত করার পর উ পেই-ফু পিকিংয়ের উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজদের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হয়। সে ছিল ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল। ১৯২৩ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তার নির্দেশে পিকিং-হানখৌ রেলপথ বরাবর ধর্মঘটী শ্রমিকদের হত্যা করা হয়। ১৯২৪ সালে চাং জুও-লিনের সঙ্গে যুদ্ধে (যেটা সাধারণভাবে 'চিলি এবং ফেংথিয়ান চক্রের মধ্যকার যুদ্ধ' বলে খ্যাত) পরাজিত হয় এবং তাকে পিকিং সরকার থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু জাপানী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় সে ১৯২৬ সালে চাং জুও লিনের সঙ্গে তার শক্তি যোগ করে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরে অভিযানকারী বাহিনী ১৯২৬ সালে যখন কুয়াংতোং থেকে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন উ পেই-ফু ছিল প্রথম শত্রু, যাকে উচ্ছেদ করা হয়।

৯। তিন-গণনীতি ছিল জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্রের নীতি এবং গণকল্যাণের নীতির প্রশ্নে চীনদেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংক্রে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের মূলনীতি ও কর্মসূচী। ১৯২৪ সালে কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ঘোষণায় সান ইয়াৎ-সেন তিন-গণনীতিকে পুনরায় ব্যাখ্যা করেন, এই ব্যাখ্যায় তিনি জাতীয়তাবাদকে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী হিসেবে প্রচার করেন এবং শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলনের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপন করেন। পুরানো তিন-গণনীতি এইভাবে নতুন তিন-গণনীতিতে বিকাশলাভ করে, যার মধ্যে ছিল তিনটি মহান নীতি অর্থাৎ রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকের প্রতি সহায়তা। এই নতুন তিন-গণনীতি হয়ে উঠেছিল প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙের মধ্যে সহযোগিতার রাজনৈতিক ভিত্তি। দ্রষ্টব্য—'নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে', 'মাও সে-তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ।

১০। 'দীর্ঘজীবী'-র চীনা প্রতিশব্দ ওয়ানস্যুই অর্থাৎ 'দশ হাজার বছর' —চীন সম্রাটকে অভিভাদন জানাবার প্রচলিত রীতি। বর্তমানে এরই মানে দাঁড়িয়েছে 'সম্রাট'।

১১। ধনী কৃষকদের কৃষক সমিতিতে যোগ দিতে দেওয়া উচিত হয়নি—কথাটি ১৯২৭ সালে কৃষক জনসাধারণ তখনও বুঝতে পারেনি।

১২। কমরেড মাও সে তুঙ এখানে যে 'একেবারেই নিঃস্ব' কৃষকদের কথা বলছেন, তার অর্থ ক্ষেতমজুর (গ্রাম্য সর্বহারা) এবং গ্রাম্য ভবঘুরে সর্বহারা বোঝায়।

১৩। 'অল্প নিঃস্ব' বলতে গ্রাম্য আধা-সর্বহারা বোঝায়।

১৪। ইউয়ান জু-মিং ছিল কুইচৌ প্রদেশের যুদ্ধবাজ। সে তখন হুনানের পশ্চিমাংশ শাসন করতো।

১৫। বর্গা নেওয়ার শর্ত হিসেবে বর্গা কৃষক সাধারণতঃ টাকায় বা জিনিসে জমিদারের কাছে জামিন রাখতো, এবং প্রায়শঃই তার জমির মূল্যের একটা বড় অংশই এতে চলে যেতো। খাজনা দেবার জামিন হিসেবে একে ধরা হলেও আসলে এটা ছিল অতিরিক্ত শোষণের একটা পদ্ধতি।

১৬। হুনানে তু হল মহকুমার সমকক্ষ এবং তুয়ান থানার সমকক্ষ। তু ও তুয়ানের পুরানো আমলের প্রশাসন ছিল ভূস্বামীদের শাসনের হাতিয়ার।

১৭। প্রতি মু জমির উপর কর ধার্য করা হল নিয়মিত করের উপর একটি অতিরিক্ত কর। ভূস্বামী পরিচালিত সরকার নির্মমভাবে এই কর কৃষকদের উপর ধার্য করত।

১৮। উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজদের শাসনামলে প্রদেশের সামরিক প্রধানকে বলা হতো 'সামরিক গভর্ণর'। কিন্তু সে ছিল প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রদেশের এক-নায়ক সর্বেসর্বা, সমগ্র প্রদেশের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তার করায়ত্ত থাকত। সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে যোগসাজস করে তারা স্থানীয় একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সামন্ততান্ত্রিক-সামরিক ব্যবস্থা চালু রাখত।

১৯। 'স্থায়ী পারিবারিক মিলিশিয়া' ছিল গ্রামাঞ্চলে সেই সময় সংগঠিত নানা ধরনের সশস্ত্র বাহিনীর একটি। 'পারিবারিক' কথাটি ব্যবহার করবার কারণ হল, প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের কাউকে না কাউকে এতে যোগ দিতে হতো। ১৯২৭ সালে বিপ্লবের পরাজয়ের পর অনেক স্থানে ভূস্বামীরা এই 'পারিবারিক মিলিশিয়া'র কর্তৃত্বভার দখল করে নেয় এবং সেগুলিকে প্রতি-

বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করে।

২০। সেই সময় উহানে অবস্থিত কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বাধীনে অনেক স্থানের কুওমিনতাঙের জেলা সদর দপ্তর ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতি সহায়তা—এই তিনটি মহান নীতি অনুসরণ করত। এগুলো ছিল কমিউনিস্ট, কুওমিনতাঙের বামপন্থী ও অন্যান্য বিপ্লবীদের বিপ্লবী মৈত্রীজোট।

২১। মহামান্য পাও (পাও চেং) ছিলেন সুং রাজবংশের (৯৬০-১১২৭ খ্রীঃ) রাজধানী খাইফেং-এর অধ্যক্ষ। পুরানো সমাজে সমান্ততান্ত্রিক শাসকশ্রেণীর প্রতারণামূলক প্রচারের ফলে লোকে মনে করত যে, তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ কর্মচারী এবং তিনি যেসব মামলার বিচার করেছিলেন তার প্রত্যেকটিতে সঠিক রায় প্রদান করেছিলেন।

২২। এই বাক্যটি **মেনসিয়াস** শীর্ষক বই থেকে উদ্ধৃত। এর মর্ম হচ্ছে যে, ধনুর্বিদার একজন দক্ষ শিক্ষক অপরকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শুধু নাটকীয় ভঙ্গীতে ধনুক টেনে ধরেন কিন্তু তীর ছোড়েন না। অর্থাৎ কৃষকরা যাতে পূর্ণ রাজনৈতিক চেতনা লাভ করে, এবং যাতে নিজেদের উদ্যোগে, সচেতনভাবে কুসংস্কার ও অন্যান্য খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করবার জন্য অগ্রণী হয় তার জন্য কমিউনিস্টদের উচিত কৃষকদের পরিচালনা করা। কমিউনিস্টরা এ ব্যাপারে তাদের উপর হুকুম করবে না, বা তাদের হয়ে এ কাজ করে দেবে না।

২৩। আটটি চিত্রাক্ষর হল পুরানো চীনদেশে ভাগ্যগণনার একটি পদ্ধতি। এর ভিত্তি ছিল যথাক্রমে কোন ব্যক্তির জন্মের বছর, মাস, দিন এবং ঘণ্টার প্রত্যেকটির জন্য দু'টি করে বৃত্তাকার চিত্রাক্ষর পরীক্ষা।

২৪। ভূস্থান বৈশিষ্ট্য হল পুরানো চীনদেশের একটা কুসংস্কার। এই কুসংস্কার অনুযায়ী বিশ্বাস করা হয় যে, কারো পূর্বপুরুষের কবরের অবস্থান সেই ব্যক্তির ভাগ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ভূস্থান বৈশিষ্ট্য বিশারদরা দাবি করে যে, তারা কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান ও তার পরিপার্শ্ব শুভ কিনা, তা বলে দিতে পারে।

২৫। মহামান্য কুয়ান (কুয়ান ইয়ু, ১৬০-২১৯ খ্রীঃ) 'তিনটি রাজ্যের' যুগের একজন যোদ্ধা। চীনা জনসাধারণ ব্যাপকভাবে তাকে আনুগত্য ও যুদ্ধের দেবতা হিসেবে পূজা করত।

২৬। থাং শেং-চি ছিলেন একজন জেনারেল। সে সময়ে ইনি বিপ্লবের পক্ষে ছিলেন এবং উত্তর অভিযানে যোগ দেন। ইয়ে থাই-সিন ছিলেন জেনারেল। তিনি উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের পক্ষে ছিলেন এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

২৭। সুন ছুয়ান-ফাং ছিল একজন যুদ্ধবাজ। তার শাসন চিয়াংসু, চেচিয়াং, ফুচিয়ান, চিয়াংসী এবং আনহুই এই পাঁচটি প্রদেশে বিস্তৃত ছিল। সাংহাইয়ের শ্রমিকদের অভ্যুত্থানকে রক্তের স্রোতে দমন করবার জন্য সে দায়ী ছিল। চিয়াংসী প্রদেশের নানছাং-চিউচিয়াং অঞ্চলে উত্তরে অভিযানকারী বাহিনী কর্তৃক ১৯২৬ সালের শীতকালে তার প্রধান সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে যায়।

২৮। চীনে পরিবেশনের সময় আলাদাভাবে খাবার না দিয়ে দেওয়া হয় একটা গামলা বা প্লেটে—সবার জন্য।

২৯। 'প্রাচ্য সংস্কৃতির বিধিনিয়ম' ছিল একটি প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ। এতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতা বর্জন করা হতো এবং প্রাচ্যের কৃষি উৎপাদনের পশ্চাৎপদ পদ্ধতি ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিকে সমর্থন করা হতো।

৩০। গুপ্ত সমিতি সম্পর্কে জানবার জন্য এই খণ্ডে প্রকাশিত 'চীনা সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেষণ' প্রবন্ধের ১৮ নং টীকা, পৃঃ ২৮ দ্রষ্টব্য।

৩১। 'পর্বত', 'মন্দির', 'ধর্মশালা', 'নদী' হল নিজেদের উপদলকে চিহ্নিত করবার জন্য আদিম গোপন সমিতি কর্তৃক ব্যবহৃত নাম।

৩২। ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে যখন উত্তরে অভিযানকারী বাহিনী নানছাং দখল করল, তখন চিয়াং কাই-শেক এই সুযোগ গ্রহণ করে সেখানে তার সদর দপ্তর স্থাপন করে। সে তার চারিদিকে কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীদের এবং কিছু সংখ্যক উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজদের রাজনীতিকদের জড়ো করল, আর সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আঁতাত করে উহানের বিরুদ্ধে তার প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র চালায়। উহান তখন ছিল বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল। ঘটনার পরিণামে ১৯২৭ সালে ১২ই এপ্রিলে সে শাংহাইতে তার প্রতিবিপ্লবী ক্যুদেতা ঘটাল, এবং ভয়ংকর গণহত্যা চালাল।

৩৩। চাং চিং-চিয়াং ছিল কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীদের একজন নেতা। সে চিয়াং কাই-শেকের পরামর্শদাতা ছিল।

৩৪। লিউ ইয়ুয়ে-চি ছিল 'বাম সমিতি'র প্রধান। এই সমিতি ছিল হুনানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিস্টবিরোধী সমিতি।

৩৫। ইয়ে শে'র ড্রাগন প্রীতি হচ্ছে সিয়াংয়ের (৭৭-৬ খ্রীঃ পূঃ) সিন স্যু বই থেকে নেওয়া একটি গল্প। এতে বলা হয় যে, লর্ড শে ড্রাগনকে খুব ভালবাসতেন। তিনি তাঁর অস্ত্রাদি, হাতিয়ার এবং সমগ্র প্রাসাদটিকে ড্রাগনের চিত্র ও ভাস্কর্য মূর্তি দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর এই অনুরাগের কথা শুনে একটি প্রকৃত ড্রাগন আকাশ থেকে নেমে এলো। সে জানালা থেকে ইয়ে কোংয়ের বাড়ীর ভেতরে উঁকি মারল আর নিজের লেজটি দরজার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। ইয়ে কোং ড্রাগনকে দেখে ভয়ে দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেলেন। দেখা গেল যে, বাস্তবে ইয়ে কোং ড্রাগনকে ভালবাসতেন না, ভালবাসতেন কেবল ড্রাগনের সদৃশ সবকিছু। এখানে কমরেড মাও সে-তুঙ এই রূপক ব্যবহার করে দেখাতে চেয়েছেন যে চিয়াং কাই-শেক ও তার মতো ব্যক্তিরা যদিও বিপ্লবের কথা বলে, তবু তারা বিপ্লবের ভয়ে ভীত এবং তার বিরোধী।

দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগ

চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিঁকে থাকতে পারে?

(অক্টোবর ৫, ১৯২৮)

১। দেশের ভেতরকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি

কুওমিনতাঙের নতুন যুদ্ধবাজদের বর্তমান শাসনটা আগের মতোই শহরে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর আর গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় জমিদারশ্রেণীর শাসন। এই শাসন বৈদেশিক ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে, আর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নতুন যুদ্ধবাজদের দ্বারা পুরানো যুদ্ধবাজদের বদলিয়েছে এবং শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর উপর অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক উৎপীড়ন আগের চেয়েও অধিক তীব্রতর করে তুলেছে। কোয়াংতুং থেকে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয়েছিল, মাঝপথে তার নেতৃত্ব মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং জমিদারশ্রেণীর কুক্ষিগত হয়েছে এবং তখন থেকেই সেটা প্রতিবিপ্লবের পথে মোড় নিয়েছে। সারা দেশের শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ জনগণ, এমনকি বুর্জোয়াশ্রেণীও[১] আগের মতোই প্রতিবিপ্লবী শাসনাধীনে রয়েছে এবং সামান্যতম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিও অর্জন করেনি।

পিকিং ও থিয়েনচিন দখল করার আগে চাং চো-লিনের[২] বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙের নতুন যুদ্ধবাজদের চারটি চক্র—অর্থাৎ চিয়াং চক্র, কুই চক্র, ফেং চক্র এবং ইয়েন চক্র[৩] একটি সাময়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই শহরগুলি দখল করার পর এই ঐক্য সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গিয়েছিল, এই চার চক্রের ভেতরে তীব্রতর লড়াইয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, আর চিয়াং ও কুই এই দু'টি চক্রের মধ্যে যুদ্ধ-প্রস্তুতি চলছিল। চীন দেশের ভেতরকার যুদ্ধবাজদের বিভিন্ন চক্রের দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামকেই প্রতিফলিত করে। এই জন্যই, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে চীনকে বিভক্ত করার অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধবাজদের বিভিন্ন

এই প্রবন্ধটি হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের জন্য ১৯২৮ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখে কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক লিখিত প্রস্তাবের 'রাজনৈতিক সমস্যা এবং সীমান্ত এলাকার পার্টি-সংগঠনের কর্তব্য' শীর্ষক অংশ।

চক্র কোন অবস্থাতেই আপোষ করতে পারবে না, এবং যে-কোন আপোষেই তারা পৌছাক না কেন, তা হবে কেবলমাত্র সাময়িক। আজকের সাময়িক আপোষই আগামীকালের আরও বিরাটাকারের যুদ্ধকে জন্ম দেবে।

একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব চীনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এই বিপ্লব কেবলমাত্র সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বেই সম্পন্ন হতে পারে। ১৯২৬-২৭ সালের যে বিপ্লব কোয়াংতুং থেকে শুরু হয়ে ইয়াংসি নদীর দিকে বিস্তৃত হয়েছিল, তাতে সর্বহারাশ্রেণী দৃঢ়ভাবে নেতৃত্ব দিতে না পারার ফলে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং জমিদারশ্রেণী এই নেতৃত্বকে কব্জা করে নিয়েছিল, বিপ্লবকে প্রতিবিপ্লবে বদলে দিয়েছিল। এইভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাময়িকভাবে পরাজয় বরণ করেছিল। এই পরাজয়ে চীনা সর্বহারাশ্রেণী ও কৃষকরা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল, চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীও (মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং জমিদার-শ্রেণী নয়) আঘাত পেয়েছিল। কিন্তু, বিগত কয়েক মাসে উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীনের বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শহরগুলিতে শ্রমিকদের সুসংগঠিত ধর্মঘট ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের বিদ্রোহ বিকাশলাভ করেছে। ক্ষুধা ও ঠাণ্ডার কারণে যুদ্ধবাজদের বাহিনীগুলোর সৈন্যদের মধ্যে একটা দারুণ অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াং চিং-ওয়ে এবং ছেন কুঙ-পো চক্রের উস্কানিতে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় ও ইয়াংসি নদীর ধারে বুর্জোয়াশ্রেণী বেশ ব্যাপক সংস্কারবাদী আন্দোলন[৪] বিস্তৃত করছে। এই ধরনের আন্দোলনের বিকাশ একটা নতুন ঘটনা।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশানুসারে চীনা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে—চীনে সাম্রাজ্যবাদের এবং তার হাতিয়ার যুদ্ধবাজদের শাসনকে উৎখাত করা, জাতীয় বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করা, ভূমি-বিপ্লবকে কার্যকরী করা, কৃষকদের উপর জমিদারশ্রেণীর সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে নিশ্চিহ্ন করা। ১৯২৮ সালের মে মাসে চিনান হত্যাকাণ্ডের[৫] পরে এই ধরনের বিপ্লবী আন্দোলন দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।

২। চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব ও টিঁকে থাকার কারণ[৬]

একটি দেশের অভ্যন্তরে শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত অবস্থায় একটি বা কয়েকটি ছোট ছোট এলাকায় লাল রাজনৈতিক

ক্ষমতার দীর্ঘকাল ধরে টিঁকে থাকাটা এমন একটা ব্যাপার, যা দুনিয়ার অন্যান্য দেশে আর কখনো ঘটেনি। এই উদ্ভূত ব্যাপারটার উদ্ভবের বিশেষ কারণ আছে। শুধুমাত্র উপযুক্ত শর্তেই এটা টিঁকে থাকতে ও বিকাশলাভ করতে পারে।

প্রথমতঃ, কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশে বা সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন কোন উপনিবেশে[7] এ ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে না। এটা ঘটতে পারে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ শাসনাধীন ও অর্থনীতিগত ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এবং আধা-ঔপনিবেশিক চীনেই। কারণ, এই ধরনের অদ্ভুত রাজনৈতিক ব্যাপার অবশ্যই আর একটি অদ্ভুত ব্যাপারের সহগামী এবং সেটা হল শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যেকার যুদ্ধ। চীনা প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হবার প্রথম বছর (১৯১২ সাল) থেকেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের এবং দেশের অভ্যন্তরে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর আর জমিদারশ্রেণীর সমর্থিত নতুন এবং পুরানো যুদ্ধবাজদের বিভিন্ন চক্র একে অন্যের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছে। এটাই হল আধা-ঔপনিবেশিক চীনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশেই, এমনকি সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন উপনিবেশেও এ ধরনের ব্যাপার কখনো দেখতে পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ শাসনাধীন চীনের মতো দেশেই এ ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যাপারটা উদ্ভবের দুটি কারণ ছিল, যথা স্থানীয় কৃষি অর্থনীতি (ঐক্যবদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনীতি নয়), এবং দেশকে ভাগ ও শোষণ করার উদ্দেশ্যে প্রভাবাধীন অঞ্চল সৃষ্টি করার সাম্রাজ্যবাদী নীতি। শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল ধরে ভাঙনের ও যুদ্ধের ফলেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যাতে শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা চারদিকে পরিবেষ্টিত অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালিত একটি বা কয়েকটি ছোট ছোট লাল এলাকার উদ্ভব ঘটতে পারে এবং দৃঢ়ভাবে তা টিঁকে থাকতে পারে। হুনান-কিয়াংসী সীমান্তের ঘাঁটি এলাকা হচ্ছে এমন অনেক ছোট ছোট এলাকার অন্যতম। কিছু কিছু কমরেডদের মনে কঠিন বা সংকটজনক সময়ে প্রায়ই এই ধরনের লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার টিঁকে থাকা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে এবং তাঁদের মধ্যে হতাশার মনোবৃত্তি গজিয়ে ওঠে। এর কারণ হল যে, তাঁরা এই লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব ও এর টিঁকে থাকা সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি। আমরা যদি শুধু এই কথাটুকু উপলব্ধি করি যে, চীনে শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার

অভ্যন্তরে ভাঙন ও যুদ্ধ অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে, তাহলে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব, টিঁকে থাকা এবং ক্রমবর্ধমান বিকাশ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবে না।

দ্বিতীয়তঃ, চীনের যেসব অঞ্চলে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রথমে উদ্ভব ঘটে এবং দীর্ঘকাল ধরে টিঁকে থাকতে সক্ষম হয়, তা সেসব অঞ্চলে নয়, যেখানে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েনি, যেমন, সেচুয়ান, কুইচৌ ইয়ুন্নান এবং উত্তর চীনের বিভিন্ন প্রদেশে, বরং এমন সব অঞ্চলে প্রথমে তার উদ্ভব ঘটে এবং দীর্ঘকাল ধরে টিঁকে থাকতে সক্ষম হয়, যেখানে ১৯২৬-২৭ সালে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় শ্রমিক, কৃষক এবং সৈন্যসাধারণ ব্যাপকভাবে জেগে উঠেছিল, যেমন, হুনান, কোয়াংতুং হুপে এবং কিয়াংসী প্রদেশে। এই-সব প্রদেশের বহু স্থানেই ব্যাপক আকারের ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতি গঠিত হয়েছিল। জমিদারশ্রেণীর এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকেরা বহু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়েছিল। তাই, ক্যাণ্টন শহরে জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব ঘটেছিল এবং তিন দিন ধরে তা টিঁকে ছিল, কোয়াংতুং প্রদেশের হ্যাইফেঙ ও লুফেঙে, হুনান প্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে, হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে এবং হুপে প্রদেশের হুয়াং-আন প্রভৃতি স্থানে কৃষকদের ঘাঁটি এলাকা[৮] প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমান লাল-ফৌজের কথা বলতে গেলে, সেটা জাতীয় বিপ্লবী ফৌজ থেকে বিছিন্ন হয়ে এসেছে, যা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ট্রেনিং পেয়েছিল এবং শ্রমিক-কৃষকসাধারণের প্রভাবাধীন ছিল। যাদের দ্বারা লালফৌজের ইউনিট গঠিত হতে পারে, তারা ইয়েন সি-সান, চাং চো-লিনের মতো বাহিনী থেকে কোনমতেই বেরিয়ে আসতে পারে না—যা কোন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ট্রেনিং পায়নি এবং শ্রমিক-কৃষকদের প্রভাব একটুও লাভ করেনি।

তৃতীয়তঃ, ছোট ছোট এলাকায় জনসাধারনের রাজনৈতিক ক্ষমতার দীর্ঘ-কাল ধরে টিঁকে থাকা সম্ভব কি না, তা নির্ভর করে দেশব্যাপী বিপ্লবী পরিস্থিতি বিকশিত হচ্ছে কি না সেই শর্তের উপর। যদি দেশব্যাপী বিপ্লবী পরিস্থিতি বিকশিত হতে থাকে, তাহলে ছোট ছোট লাল এলাকা যে শুধু নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল ধরে টিঁকে থাকবে তাই নয়, পরন্তু, দেশব্যাপী রাজ-নৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে অবশ্যই তা অনেক শক্তির মধ্যে অন্যতম শক্তিতে পরিণত হবে। যদি দেশব্যাপী বিপ্লবী পরিস্থিতি অব্যাহতভাবে

বিকশিত না হয়ে বরং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরে নিশ্চল থাকে, তাহলে ছোট ছোট লাল এলাকার পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে টি঳কে থাকা অসম্ভব হবে। দেশের অভ্যন্তরে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং জমিদারশ্রেণীর ভেতরকার এবং আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণীর ভেতরকার অব্যাহত ভাঙন ও যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে চীনা বিপ্লবী পরিস্থিতিও অব্যাহতভাবে বিকশিত হচ্ছে। সে জন্যই, ছোট ছোট লাল এলাকাগুলো শুধু যে নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল ধরে টি঳কে থাকবে তা নয়, বরং তা অব্যাহতভাবে বিস্তৃত হতে থাকবে এবং ক্রমে ক্রমে দেশব্যাপী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যের দিকে উপনীত হতে থাকবে।

চতুর্থতঃ লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার টি঳কে থাকার একটা অপরিহার্য শর্ত হল যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিসম্পন্ন নিয়মিত লালফৌজের অস্তিত্ব। কেবলমাত্র যদি স্থানীয় লালরক্ষী বাহিনী[৯] থাকে এবং কোন নিয়মিত লালফৌজ না থাকে, তাহলে কেবল জমিদারদের পোষা রক্ষী বাহিনীর সঙ্গেই মোকাবিলা করা সম্ভব, কিন্তু কোন নিয়মিত শ্বেত বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। অতএব শ্রমিক-কৃষকসাধারণের সক্রিয় সমর্থন সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিসম্পন্ন নিয়মিত সৈন্যবাহিনী না থাকলে একটি ঘাঁটি এলাকা সৃষ্টি করা একেবারেই অসম্ভব, আর তার দীর্ঘকাল ধরে টি঳কে থাকা ও ক্রমবর্ধমান বিকাশলাভ করা তো আরও অসম্ভব। তাই, 'শ্রমিক-কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা'র মতাদর্শ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা কমিউনিস্ট পার্টি ও ঘাঁটি এলাকার শ্রমিক-কৃষকসাধারণকে অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

পঞ্চমতঃ, লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার দীর্ঘকালীন অস্তিত্ব এবং বিকাশের জন্য উপরোক্ত শর্তগুলো ছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত থাকা প্রয়োজন, সেটা হল কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনকে শক্তিশালী হতে হবে এবং তার নীতি নির্ভুল হতে হবে।

৩। হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে স্বাধীন এলাকা এবং আগস্টের পরাজয়

যুদ্ধবাজদের মধ্যে ভাঙন ও যুদ্ধ শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার শাসনশক্তিকে দুর্বল করে। অতএব, এই সুযোগ-সুবিধা পেয়েই ছোট ছোট এলাকায় লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু, যুদ্ধবাজদের মধ্যে যুদ্ধ প্রতিদিনই

চলে না। যখনই একটি বা কয়েকটি প্রদেশে শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতা সাময়িকভাবে স্থায়ী হয়, তখনই সেখানকার শাসকশ্রেণীগুলো অপরিহার্যভাবেই জোট বাঁধে এবং এই লাল রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ধ্বংস করার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যে স্থানে রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন করার এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখার সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ করা না হয়, সে স্থানে শত্রুর দ্বারা তার উৎখাত হয়ে যাবার আশংকা থাকে। এই কারণেই, বর্তমান বছরের এপ্রিল মাসের আগে বেশ অনুকূল সময় গড়ে ওঠা বহু লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা, যেমন, ক্যান্টন, হাইফেঙ এবং লুফেঙ, হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকা, দক্ষিণ হুনান, লিলিঙ আর হুয়াংআন প্রভৃতি স্থানের লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা একের পর এক বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। এপ্রিল মাসের পর থেকে হুনান-কিয়াংসী সীমান্তের স্বাধীন এলাকা দক্ষিণ চীনে শাসনশক্তির সাময়িক স্থায়িত্বের কালের সম্মুখীন হয়েছিল, হুনান-কিয়াংসী প্রদেশ দু'টিতে প্রেরিত 'দমন বাহিনী'র সংখ্যা মাঝে মাঝে আট, ন'টি রেজিমেন্ট বা তারও বেশি এমনকি কখনো কখনো ১৮টি রেজিমেন্ট পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চার রেজিমেন্টেরও কম সৈন্যশক্তি নিয়ে আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ চার মাস ধরে সংগ্রাম করেছি। তার ভেতর দিয়েই দিনের পর দিন আমাদের স্বাধীন এলাকা বিস্তৃত করা হয়েছে, ভূমি-বিপ্লবকে গভীরতর করা হয়েছে, জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংগঠনকে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং লালফৌজ ও লালরক্ষী বাহিনীকে প্রসারিত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টি-সংগঠনের (স্থানীয় ও সৈন্যবাহিনীর) নীতির নির্ভুলতা। পার্টির বিশেষ কমিটির ও ফৌজী কমিটির নীতি তখন ছিল নিম্নরূপ:

শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করা, লোসিয়াও পর্বতমালার[১০] মধ্যভাগে রাজনৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টি করা এবং পলায়নবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

স্বাধীন এলাকায় ভূমি-বিপ্লবকে গভীরতর করা।

সৈন্যবাহিনীর পার্টি-সংগঠনের সাহায্যে স্থানীয় পার্টি-সংগঠনের বিকাশকে উন্নত করা এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে স্থানীয় সশস্ত্র শক্তির বিকাশকে উন্নত করা।

স্থবিধাজনক সময়ে আক্রমণরত শত্রুর মোকাবিলা করার জন্ম লাল-ফৌজের ইউনিটগুলোকে কেন্দ্রীভূত করা এবং একটি একটি করে শত্রুর দ্বারা ধ্বংস হওয়াটা এড়ানোর জন্ম সৈন্যবাহিনীর বিভক্তিকরণের বিরোধিতা করা।

স্বাধীন এলাকাকে বিস্তৃত করার জন্ম তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করে এগিয়ে যাবার নীতি গ্রহণ করা এবং বেপরোয়া অগ্রগতির নীতির বিরোধিতা করা।

এই সঠিক রণকৌশলের কারণে ও ভৌগোলিক পরিবেশ আমাদের সংগ্রামের অনুকূল থাকায়, এবং হুনান ও কিয়াংসী প্রদেশের আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকায় আমরা এপ্রিল থেকে জুলাই এই চার মাসে বহু সংগ্রামে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। যদিও শত্রুবাহিনী আমাদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল, তবু তারা এই স্বাধীন এলাকা ধ্বংস করতে পারেনি এবং এই স্বাধীন এলাকার ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতির গতিও রোধ করতে পারেনি, বরং আমাদের এই স্বাধীন এলাকা হুনান ও কিয়াংসীর উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করেই চলেছে। আগস্টের পরাজয়ের একমাত্র কারণ হলো, কিছু সংখ্যক কমরেড এ কথা উপলব্ধি করতে পারেননি যে, সে সময়টা ছিল শাসকশ্রেণীগুলোর সাময়িক স্থায়িত্বের সময় এবং তাঁরা শুধু শাসকশ্রেণীগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ভাঙনের সময়েই প্রযোজ্য রণনীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং বেপরোয়া অগ্রগতির জন্ম আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। ফলতঃ, সীমান্ত এলাকা এবং দক্ষিণ হুনান উভয় স্থানেই আমাদের পরাজয় ঘটেছিল। হুনান প্রাদেশিক কমিটির প্রতিনিধি কমরেড তু সিউ-চিঙ তখনকার অবস্থা না দেখে এবং পার্টির বিশেষ কমিটি, ফৌজী কমিটি ও পার্টির ইউংশিন জেলা-কমিটি যুক্ত বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবকে উপেক্ষা করেই যান্ত্রিকভাবে হুনান প্রাদেশিক কমিটির আদেশ অনুসরণ করেছিলেন এবং লালফৌজের ২৯ নং রেজিমেণ্টের সংগ্রামকে এড়িয়ে বাড়ী ফিরে যেতে চাওয়ার অভিমতই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। এটা সত্যিই একটা মারাত্মক ভুল। সেপ্টেম্বর মাসের পর পার্টির বিশেষ কমিটি ও ফৌজী কমিটি মূল সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল বলেই এই পরাজয় থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি কাটানো গিয়েছিল।

৪। হুনান, হুপে এবং কিয়াংসী প্রদেশে হুনান কিয়াংসী সীমান্তের স্বাধীন এলাকার ভূমিকা

নিঙকাঙকে কেন্দ্র করে হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে গঠিত শ্রমিক-কৃষকদের সশস্ত্র স্বাধীন এলাকার তাৎপর্য সীমান্তের কয়েকটি জেলার মধ্যে নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ নয়। হুনান, হুপে এবং কিয়াংসী প্রদেশগুলোর শ্রমিক-কৃষকদের অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে এই তিনটি প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ার এই ধরনের স্বাধীন এলাকাটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হুনান, হুপে এবং কিয়াংসী এই তিনটি প্রদেশে অভ্যুত্থানের বিকাশসাধনে সীমান্ত এলাকার পার্টি-সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ জরুরী কর্তব্য হচ্ছে এইরূপ: সীমান্ত এলাকার ভূমি-বিপ্লবের এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতার যে প্রভাব রয়েছে, তাকে হুনান ও কিয়াংসীর উত্তর অংশে এবং হুপে পর্যন্ত বিস্তৃত করা; সংগ্রামের ধারায় অবিরামভাবে লালফৌজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং গুণগতভাবে উন্নত করা, যাতে এই তিনটি প্রদেশের আসন্ন সাধারণ অভ্যুত্থানে লালফৌজ তার প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারে; জেলায় জেলায় স্থানীয় সশস্ত্র শক্তি অর্থাৎ লালরক্ষী বাহিনী ও শ্রমিক-কৃষকদের অভ্যুত্থানকারী বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও গুণগতভাবে উন্নত করা, যাতে তারা জমিদারদের দ্বারা লালিত রক্ষী বাহিনীর ও ছোট ছোট সশস্ত্র ইউনিটের বিরুদ্ধে এখন লড়াই করতে পারে এবং ভবিষ্যতে সীমান্ত এলাকার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সুরক্ষিত করতে পারে; লালফৌজের কর্মীদের সাহায্যের উপর স্থানীয় সংস্থা-গুলোর নির্ভরশীলতা ক্রমে ক্রমে হ্রাস করা এবং সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল করা, যাতে সীমান্ত এলাকার কর্মিগণ সীমান্ত এলাকার কাজের ভার গ্রহণ করতে পারেন এবং স্থানীয় সংস্থাগুলো ভবিষ্যতে লালফৌজের জন্য ও সম্প্রসারিত স্বাধীন এলাকার জন্য কর্মী পাঠাতে পারে।

৫। অর্থনৈতিক সমস্যা

শ্বেত শাসনের দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সৈন্য ও জনগণের জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব এবং নগদ টাকার অভাব এক চরমতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বছর থেকে সীমান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাধীন এলাকায় শত্রুদের কঠোর অবরোধের কারণে লবণ, কাপড় ও ঔষধের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চরম অভাব এবং দারুণ মূল্যবৃদ্ধি

সব সময়েই দেখা দিয়েছে। সুতরাং ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়াদের[১১] জীবনযাত্রায় এবং লালফৌজের সৈন্যসাধারণের জীবনযাত্রার অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে, কোন কোন সময়ে এই অশান্তি সত্যসত্যই চরম মাত্রায় উঠেছে। লাল-ফৌজকে একদিকে লড়াই করতে হচ্ছে, অপরদিকে অর্থাদিও সংগ্রহ করতে হচ্ছে। খাদ্যশস্য ছাড়া সৈন্যদের মাথাপিছু দৈনিক যে ৫ সেণ্ট করে খাদ্যভাতা দেওয়া হতো তারও অভাব ঘটছে, তাদের খাদ্য অপুষ্টিকর, অনেকেই অসুস্থ, হাসপাতালে আহত সৈন্যদের অবস্থা আরও শোচনীয়। অবশ্যই সারা দেশব্যাপী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আগে এ রকম দুঃখ-কষ্ট অপরিহার্য, কিন্তু এই দুঃখ-কষ্ট অপেক্ষাকৃতভাবে কাটিয়ে উঠাটা জীবনযাত্রাকে কিছুটা সহজ করাটা, বিশেষ করে লালফৌজের জন্য সরবরাহের ব্যবস্থাকে অপেক্ষাকৃতভাবে উন্নত করাটা আশু প্রয়োজন। সীমান্ত এলাকার পার্টি-সংগঠন যদি অর্থনৈতিক সমস্যার যথাযথ সমাধান করার জন্য উপায় খুঁজে বের করতে না পারে, তাহলে শত্রু-শক্তির অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের অবস্থায় স্বাধীন এলাকাকে বড় বেশি দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। এই অর্থনৈতিক সমস্যার যথাযথ সমাধানের দিকে অবশ্যই প্রত্যেকটি পার্টি-সদস্যকে নজর দিতে হবে।

৬। সামরিক ঘাঁটির সমস্যা

সীমান্ত এলাকার পার্টি-সংগঠনের আরও একটি কর্তব্য হচ্ছে পাঁচটি কুয়ো[১২] ও চিউলুঙের সামরিক ঘাঁটি এলাকাগুলোকে সুসংবদ্ধ করা। ইউংশিন, লিংসিয়েন, নিঙকাঙ এবং সুইজুয়ান জেলার সংযোগস্থলে পাঁচটি কুয়ো পাহাড়ী এলাকা এবং ইউংশিন, নিঙকাঙ, ছালিং ও লিয়েনহুয়া জেলার সংযোগস্থলে চিউলুঙ পাহাড়ী এলাকা উভয়েরই উৎকৃষ্ট সংস্থানিক সুবিধা রয়েছে। এটা কেবলমাত্র বর্তমানে সীমান্ত এলাকার জন্যই নয়, বরং ভবিষ্যতে হুনান, হুপে এবং কিয়াংসী প্রদেশে অভ্যুত্থানের বিকাশ সাধনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি; বিশেষ করে পাঁচটি কুয়ো এলাকা —যেখানে জনগণের সমর্থনও যেমন আছে তেমনি সংস্থানিক বন্ধুরতাও আছে। এই ঘাঁটিগুলোকে সুসংবদ্ধ করার উপায় হচ্ছে: প্রথম, পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলা; দ্বিতীয়, যথেষ্ট খাদ্যশস্য মজুত করা; তৃতীয়, লাল-ফৌজের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল হাসপাতাল স্থাপন করা। এই তিনটি কাজ কার্যকরী করতে সীমান্ত এলাকার পার্টি-সংগঠনকে অবশ্যই প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

টীকা

১। কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন। 'জাপান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতি সম্পর্কে' (ডিসেম্বর, ১৯৩৫) এবং 'চীনা বিপ্লব ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (ডিসেম্বর, ১৯৩৯)—এই দুটি প্রবন্ধের মধ্যে কমরেড মাও সে-তুঙ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার পার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

২। চাং চো-লিন ছিল ফেংথিয়েন চক্রের যুদ্ধবাজদের পাণ্ডা। ১৯২৪ সালে দ্বিতীয় চিলি-ফেংথিয়েনযুদ্ধে উ পেই-ফু পরাজিত হবার পর চাং চো-লিন উত্তর চীনে সবচাইতে শক্তিশালী যুদ্ধবাজে পরিণত হয়েছিল। ১৯২৬ সালে, সে উ পেই-ফুয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে পিকিং অভিমুখে অভিযান করে তা দখল করেছিল। ১৯২৮ সালের জুন মাসে সে পিকিং থেকে রেলযোগে উত্তর-পূবে পশ্চাদপসরণ করছিল, তখন জাপান সাম্রাজ্যবাদী—যারা তাকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করছিল, তাদেরই সংস্থাপিত বোমায় পথের মধ্যে সে নিহত হয়।

৩। 'চিয়াং চক্র' অর্থাৎ 'চিয়াং কাই-শেক চক্র'। 'কুই চক্র' মানে কোয়াংসী প্রদেশের যুদ্ধবাজ লি চোং-জেন ও পাই ছুং-শি চক্র। 'ফেং চক্রের' অর্থ হচ্ছে ফেং ইউ-সিয়াং চক্র। 'ইয়েন চক্র' মানে শানসী যুদ্ধবাজ ইয়েন সি-সান চক্র। যুদ্ধবাজ এই চারটি চক্র একত্রিত হয়ে চাং চো-লিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ১৯২৮ সালের জুন মাসে পিকিং ও থিয়েনচিনকে দখল করেছিল।

৪। ১৯২৮ সালের ৩রা মে, জাপান আক্রমনকারীর চিনান দখল এবং চিয়াং কাই-শেকের প্রকাশ্যভাবে ও নির্লজ্জভাবে জাপানের সঙ্গে আপোষ করার পর জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, যা ১৯২৭ সালের প্রতিবিপ্লবী ক্যু-দেতার সমর্থন করেছিল, তার এক অংশ নিজেদের স্বার্থের জন্য ক্রমে ক্রমে চিয়াং কাই-শেকের শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী দল গঠন করেছিল। ওয়াং চিং-ওয়ে, ছেন কুঙ-পো ও অন্যদের প্রতিবিপ্লবী মতলববাজ চক্র এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিল এবং কুওমিনতাঙের ভেতরে তথাকথিত 'পুনর্গঠন দল' সৃষ্টি হয়েছিল।

৫। ১৯২৮ সালে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে চিয়াং কাই-শেক উত্তরে গিয়ে চাং চো-লিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। ব্রিটিশ-আমেরিকান শক্তিকে উত্তর চীনে বিস্তারলাভে বাধা দানের উদ্দেশ্যে জাপান সাম্রাজ্য-বাদীরা সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে সানতুং প্রদেশের রাজধানী চিনান দখল করে নেয়

এবং থিয়েনচিন-পুখৌ রেললাইন কেটে দেয়। ওরা যে তারিখে জাপান আক্রমণকারী বাহিনী চিনানে অনেক চীনা অধিবাসীকে হত্যা করেছিল। এটা চিনান হত্যাকাণ্ড বলে পরিচিত।

৬। চীনা লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার সাংগঠনিক রূপ, সোভিয়েত রাজনৈতিক ক্ষমতার সাংগঠনিক রূপের অনুরূপ। সোভিয়েত অর্থাৎ প্রতিনিধি-পরিষদ, ১৯০৫ সালে বিপ্লবের কালে রুশ শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক সৃষ্টি এক ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা। মার্কসবাদের তত্ত্ব থেকে লেনিন এবং স্তালিন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের কালে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রই হচ্ছে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের সবচেয়ে উপযোগী রূপ। লেনিন ও স্তালিনের বলশেভিক পার্টির নেতৃত্ব, ১৯১৭ সালের রাশিয়ার অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্বে সর্বপ্রথম এই সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্রকে বাস্তবে রূপ দিল। চীনে ১৯২৭ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর কমরেড মাও সে-তুঙের পরিচালনাধীন চীনা কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানের জনসাধারণের বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটেছে, জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিনিধি-পরিষদের রূপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু, চীনা বিপ্লবের এই পর্যায়ে, এই রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী,, সামন্ততন্ত্রবিরোধী নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি থেকে এটা ভিন্ন।

৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, প্রাচ্যের অনেক ঔপনিবেশিক দেশ, যা পূর্বে বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড সাম্রাজ্যবাদের শাসনাধীন ছিল, তা জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই সকল দেশে ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়ারা এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যক্তিরা বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাপান সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যাপক যুক্তফ্রণ্ট গঠন করেছিল, জাপানবিরোধী ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠোর গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল। এইভাবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে শুরু করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জাপান সাম্রাজ্যবাদকে এই ঔপনি

বেশিক দেশগুলো থেকে বিতাড়িত করা হল। তবু আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের আগেকা'র ঔপনিবেশিক শাসন অব্যাহত রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু উপনিবেশগুলোর জনগণ জাপানবিরোধী যুদ্ধের সময়ে বেশ বলিষ্ঠ সশস্ত্র শক্তি গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা পূর্বেকার মতো জীবনযাপন করতে চাননি। অধিকন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়ন শক্তিশালী হবার কারণে, আমেরিকা ছাড়া সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশ যুদ্ধের মধ্যে পালটে যাবার বা দুর্বল হবার কারণে এবং অবশেষে চীনা বিপ্লবের বিজয়ের ফলে চীনে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টে ফাটল ধরার কারণে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা গভীরভাবে নড়ে উঠেছিল। এইভাবে, প্রায় চীনের মতোই প্রাচ্যের বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের পক্ষে, অন্ততঃ কোন কোন ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের পক্ষে ছোট অথবা বড় বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখা ও গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলোকে ঘেরাও করার বিপ্লবী যুদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে যাওয়া এবং ক্রমে ক্রমে অভিযান চালিয়ে শহরগুলো দখল করা ও এই ঔপনিবেশিক দেশে দেশব্যাপী বিজয় অর্জন করা সম্ভব।

৮। ১৯২৭ সালে, চিয়াং কাই-শেক ও ওয়াং চিং-ওয়ে পর পর বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিরোধিতা করার জন্য বিভিন্ন স্থানের জনগণের প্রথম প্রত্যাঘাতের কথা এখানে বলা হয়েছে। ১৯২৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর, ক্যাণ্টনে, শ্রমিকেরা ও বিপ্লবী সৈনিকেরা একসঙ্গে বিদ্রোহ করলেন, জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন করলেন। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সমর্থিত ও সাহায্য-প্রাপ্ত প্রতিবিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তীব্রভাবে লড়াই করলেন, কিন্তু, শক্তির বৈষম্য খুব বেশি বলে জনগণের এ বিদ্রোহটা ব্যর্থ হল। কোয়াংতুং প্রদেশের পর্বে সমুদ্রতীরবর্তী হাইফেঙ ও লুফেঙের কৃষকেরা ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কমরেড পেঙ পাইয়ের নেতৃত্বে এক শক্তি-শালী আন্দোলন চালাতে আরম্ভ করেছিলেন। ছেন চিওং-মিনের প্রতিবিপ্লবী চক্রের বিরুদ্ধে ক্যাণ্টন থেকে পরিচালিত এই আন্দোলনটা জাতীয় বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীকে দুবার পূর্ব অভিযানের বিজয় অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ১৯২৭ সালের ১২ই এপ্রিল, চিয়াং কাই-শেক বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর, এপ্রিল, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে, সেখানকার কৃষকেরা তিনবার

বিদ্রোহ করেছিলেন এবং হাইফেঙ-লুফেঙ নিকটবর্তী এলাকায় যে বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত টিঁকে ছিল। ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হুনান প্রদেশের পূর্ব অঞ্চলে বিদ্রোহী কৃষকেরা লিউইয়াং, পিংচিয়াং লিলিং এবং চুচৌ সংলগ্ন এলাকাগুলো দখল করেছিলেন। প্রায় একই সময় হুপে প্রদেশের উত্তর-পূর্ব দিকের সিয়াওকান, মাছেঙ এবং হুয়াংআন প্রভৃতি স্থানে হাজার হাজার কৃষক সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিলেন এবং ত্রিশ দিনের অধিক সময় পর্যন্ত তাঁরা হুয়াংআন জেলাশহর দখল করে রেখেছিলেন। দক্ষিণ হুনানে, ১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে ইচাং ছেনচৌ, লেইইয়াং ইউংশিং ও চিসিং জেলার বিদ্রোহী কৃষকেরা যে বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন করেছিলেন, তা তিন মাসেরও বেশি টিঁকে ছিল।

৯। লালরক্ষী বাহিনী—এটা হচ্ছে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার জনসাধারণের সশস্ত্র সংগঠন। এর সদস্যরা উৎপাদনের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হননি।

১০। লোসিয়াও পর্বতমালা হচ্ছে কিয়াংসী ও হুনান প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত বিরাট পর্বতমালা। চিংকাং পাহাড় এই পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

১১। এখানে কমরেড মাও সে-তুঙ 'পেটি-বুর্জোয়া' এই শব্দটির দ্বারা কৃষকদের ছাড়া যেসব লোকদের কথা বুঝিয়েছেন, তারা হচ্ছে হস্তশিল্পী ক্ষুদে ব্যবসায়ী, বিভিন্ন স্বাধীন পেশাদারী এবং পেটি বুর্জোয়াদের থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীরা। চীনে এই ধরনের সামাজিক সম্প্রদায় প্রধানতঃ শহরে-নগরে বাস করে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলেও তাদের সংখ্যা বেশ প্রচুর।

১২। 'পাঁচটি কুয়ো'র অর্থ হচ্ছে চিংকাং পাহাড়ের পাঁচটি গ্রাম—বড় কুয়ো, ছোট কুয়ো, উঁচু কুয়ো, মাঝারি কুয়ো ও নীচু কুয়ো। কিয়াংসী প্রদেশের পশ্চিমে ইউংশিন, নিঙকাঙ, সুইচুয়ান ও হুনান প্রদেশের পূর্বে লিংসিয়েনে এগুলি অবস্থিত।

চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রাম

(নভেম্বর ২৫, ১৯২৮)

হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে স্বাধীন এলাকা এবং আগস্টের পরাজয়

বর্তমান পৃথিবীতে চীনই একমাত্র দেশ, যেখানে শ্বেত শাসনের পরিবেষ্টনীর মধ্যে এক বা একাধিক ছোট ছোট অঞ্চলে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব ঘটেছে। বিশ্লেষণ করে ধরা পড়ছে যে, এই ঘটনার অন্যতম কারণ হচ্ছে চীনের মুৎসুদ্দি ও জমিদারশ্রেণীর মধ্যে অবিরাম খেয়োখেয়ি ও যুদ্ধ। যতদিন এই খেয়োখেয়ি ও যুদ্ধ চলবে, ততদিন শ্রমিক ও কৃষকদের সশস্ত্র স্বাধীন এলাকার অস্তিত্ব ও বিকাশ সম্ভব। তাছাড়া, এর অস্তিত্ব ও বিকাশ নিম্নলিখিত শর্তগুলির ওপর নির্ভর করছে: (১) গভীর গণভিত্তি, (২) দৃঢ় পার্টি-সংগঠন, (৩) রীতিমতো শক্তিশালী লালফৌজ, (৪) সামরিক কার্যকলাপের উপযোগী 'ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা, এবং (৫) জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নৈতিক সম্পদ।

পরিবেষ্টনরত শাসকশ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে স্বাধীন এলাকার রণনীতি হবে পরিবর্তনশীল। শাসকশ্রেণীর সামরিক স্থায়িত্বের সময় এটা হবে এক রকম আবার তাদের খেয়োখেয়ির সময় তা হবে আর এক রকম। শাসকশ্রেণীগুলি যখন বিভক্ত, যেমন, হুনান ও হুপে প্রদেশে[১] লি স্যুং জেন ও তাং শেং চি'র মধ্যে এবং কোয়াংতুং প্রদেশে[২] চ্যাং ফা-কুয়েই এবং লি চি-শেন-এর মধ্যে যুদ্ধের সময়ে, তখন আমাদের রণনীতি তুলনামূলকভাবে দুঃসাহসিক হতে পারে এবং সামরিক অভিযানের মাধ্যমে অধিকৃত অঞ্চলের আয়তন তুলনামূলকভাবে বড় হতে পারে। তবে আমাদের অবশ্যই কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির ভিত্তি সুদৃঢ় করে তুলবার ওপর জোর দিতে হবে, যাতে শ্বেত সন্ত্রাস আঘাত হানলে নির্ভর করার মতো কিছু অঞ্চল আমাদের অধিকারে থাকে। আর যখন শাসকশ্রেণীগুলির রাজত্ব তুলনামূলকভাবে স্থায়ী, যেমন এ বছর এপ্রিল মাসের পরে দক্ষিণের

এই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পেশ করা কমরেড মাও সে-তুঙ-এর একটি রিপোর্ট

প্রদেশগুলিতে হয়েছে, তখন আমাদের রণনীতি অবশ্যই হবে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাবার। এরকম সময়ে সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হবে দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে দেওয়া; আর স্থানীয় কাজের ক্ষেত্রে (জমি-বণ্টন, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, পার্টির সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় সশস্ত্র শক্তির সংগঠন) সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হবে আমাদের কর্মীদের ছড়িয়ে দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে অবহেলা করা। কিছু ছোট ছোট লাল এলাকায় যে পরাজয় ঘটেছে, তার কারণ হচ্ছে, হয় উপযুক্ত বাস্তব অবস্থার অভাব, না হয় কৌশলগত বিষয়ে বিষয়ীগত ত্রুটি। শাসকশ্রেণীগুলির সাময়িক স্থায়িত্ব এবং তাদের খেয়োখেয়ি—এই দুই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করার ব্যাপারে ব্যর্থতাই হচ্ছে কৌশলগত ত্রুটির একমাত্র কারণ। সাময়িক স্থায়িত্বের সময় কিছু কিছু কমরেড আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে দুঃসাহসিক অভিযানের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন, এমনকি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পর্যন্ত তাঁরা শুধুমাত্র লালরক্ষী বাহিনীর ওপর ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। শত্রুরা যে জমিদারদের প্রেরিত সৈন্যদল ছাড়াও নিয়মিত সৈন্য-বাহিনী নিয়ে সংগঠিত আক্রমণ করতে পারে, এ কথাটাই তাঁরা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। স্থানীয় কাজের ক্ষেত্রে তাঁরা কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির ভিত্তি সুদৃঢ় করার কাজে অবহেলা করেছিলেন, এবং আমাদের সামর্থ্যের কথা চিন্তা না করেই ইচ্ছেমতো সম্প্রসারণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কেউ সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির কথা বললে, বা স্থানীয় কাজের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এলাকাগুলির ভিত্তি সুদৃঢ় করে নিজেদের অবস্থানকে দুর্ভেদ্য করে তোলার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে সুসংবদ্ধ করবার কথা বললে তাঁরা তাকে 'রক্ষণশীল' হিসেবে চিহ্নিত করতেন। এদের ভুল ধারণাগুলির জন্যই আগস্ট মাসে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে এবং চতুর্থ লালফৌজের পরাজয় বরণ করতে হয়।

হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের কাজ শুরু হয়েছিল গত অক্টোবর মাসে। শুরুতে জেলাগুলোর পার্টি-সংগঠনগুলি ছিল পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী বলতে চিংকাং পাহাড়ের কাছে য়ুয়ান ওয়েন-সাই এবং ওয়াং সো'র নেতৃত্বে দুটি মাত্র ছোট দল ছিল। প্রতিটি দলের ছিল মাত্র ষাটটি করে ভাঙা রাইফেল। অন্যদিকে, য়ুংসীন, লিয়েনহুয়া, চালিং ও

লিংসীয়েনের কৃষকদের আত্মরক্ষা বাহিনীগুলোর জমিদারশ্রেণী পুরোপুরি নিরস্ত্র করে ফেলেছিল, জনগণের বিপ্লবী উদ্যমও হয়ে পড়েছিল অবদমিত। এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই নিংকাং, য়ুংসীন, চালিং ও সুইজুয়ান জেলাতে পার্টি-কমিটি গঠিত হয়েছে, লিংসীয়েনে গঠিত হয়েছে বিশেষ এক জেলা পার্টি-কমিটি, এবং লিয়েনহুয়াতেও একটি পার্টি-সংগঠন কাজ করতে শুরু করেছে ও ওয়ানান জেলা কমিটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। লিংসীয়েন ছাড়া প্রত্যেক কাউন্টিতেই কয়েকটা করে স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে। নিংকাং, চালিং, সুইজুয়ান ও য়ুনসীনে, বিশেষ করে শেষ দু'টি জেলাতে জমিদারদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি গেরিলা অভ্যুত্থান ঘটেছে। এগুলো জনগণকে জাগিয়ে তুলেছে, এবং বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। সে সময় পর্যন্ত কৃষি-বিপ্লব খুব বেশি এগিয়ে যায়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতার সংগঠনগুলোকে বলা হতো শ্রমিক, কৃষক ও যোদ্ধাদের সরকার। সৈন্যবাহিনীতে সৈন্যদের কমিটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সৈন্যরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে গেলে, তাদের পরিচালনার জন্য গঠিত হতো সংগ্রাম-কমিটি। পার্টির পরিচালক সংস্থা ছিল ফ্রন্ট কমিটি (তার সম্পাদক ছিলেন মাও সে-তুঙ), শরৎকালীন ফসল অভ্যুত্থানের সময় হুনান প্রাদেশিক কমিটি এই কমিটিকে সংগঠিত করেছিল। মার্চের প্রথমদিকে দক্ষিণ হুনান বিশেষ কমিটির অনুরোধে ফ্রন্ট কমিটিকে ভেঙে দিয়ে ডিভিশনাল পার্টি কমিটি হিসেবে (তার সম্পাদক ছিলেন হো তিং-থিং) পুনর্গঠিত করা হল। এটা হল সেনাবাহিনীর পার্টি সংগঠনগুলির ভারপ্রাপ্ত কমিটি, স্থানীয় পার্টি-সংগঠনগুলির ওপর এর কোন কর্তৃত্ব রইল না। এদিকে মাও সে-তুঙের নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে দক্ষিণ হুনানে পাঠানো হল বিশেষ কমিটির অনুরোধে, এবং তার ফলে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে একমাসেরও বেশি শত্রুর অধিকারে চলে গেল। মার্চের শেষে পরাজয় ঘটল দক্ষিণ হুনানে। এপ্রিলে চু তে ও মাও সে-তুঙের নেতৃত্বাধীন বাহিনীগুলি দক্ষিণ হুনানের কৃষক বাহিনীর সঙ্গে একসাথে নিংকাঙে সরে গিয়ে সীমান্ত অঞ্চলে স্বাধীন এলাকা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করল।

এপ্রিলের পর থেকে হুনান কিয়াংসীর স্বাধীন এলাকা সাময়িক স্থায়িত্বসম্পন্ন শাসকশক্তির সম্মুখীন হল। আমাদের 'দমন' করার জন্য হুনান এবং কিয়াংসী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সৈন্যদের অন্তত: আট-নটা বাহিনীকে, কখনও কখনও আঠারোটা পর্যন্ত বাহিনী পাঠাত। কিন্তু

তবুও চার রেজিমেন্টেরও কম সৈন্য নিয়ে আমরা চার মাস ধরে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছি, প্রতিদিন আমাদের স্বাধীন এলাকার অধীন ভূখণ্ডকে সম্প্রসারিত করেছি, কৃষি-বিপ্লব গভীরতর করে তুলেছি এবং জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা, লালফৌজ ও লালরক্ষী বাহিনীকে সম্প্রসারিত করেছি। সীমান্ত অঞ্চলের পার্টি-সংগঠনগুলির (স্থানীয় ও সামরিক) সঠিক নীতির জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। সীমান্ত অঞ্চলের বিশেষ কমিটি (যার সম্পাদক ছিলেন মাও সে-তুঙ) এবং সেনাবাহিনীর পার্টি কমিটির (যার সম্পাদক ছিলেন চেন ই) কর্মনীতিগুলি ছিল নিম্নরূপ:

শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চালানো, লোশিয়াও পর্বতমালার মাঝামাঝি অঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা এবং পলায়নী মনোবৃত্তির বিরোধিতা করা।

স্বাধীন এলাকায় কৃষি-বিপ্লবকে গভীরতর করা।

সেনাবাহিনীর পার্টি সংগঠনগুলির সাহায্যে স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলির বিকাশ ঘটানো এবং নিয়মিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীগুলির বিকাশ ঘটানো।

হুনানের তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী শাসকশক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট থাকা এবং কিয়াংসীর তুলনামূলকভাবে দুর্বল শাসকশক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো।

য়ুংসীনের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা, সেখানকার জনগণের স্বাধীন এলাকা প্রতিষ্ঠা করা এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

অনুকূল সময়ে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করার জন্য লালফৌজের ইউনিট-গুলিকে কেন্দ্রীভূত করা এবং আলাদাভাবে একে একে ধ্বংসপ্রাপ্তিকে এড়াবার জন্য আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করার বিরোধিতা করা।

স্বাধীন এলাকার অধীনস্থ ভূখণ্ডকে সম্প্রসারিত করার জন্য ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে এগিয়ে যাবার নীতি গ্রহণ করা এবং হঠকারিতামূলক অগ্রগতির সাহায্যে সম্প্রসারণের নীতির বিরোধিতা করা।

এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত এই চার মাসে আমরা যে বেশ কয়েকটি সামরিক বিজয় অর্জন করেছি এবং জনগণের স্বাধীন এলাকাকে সম্প্রসারিত করতে পেরেছি, তার মূলে ছিল আমাদের সঠিক রণকৌশল, আমাদের সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল সীমান্ত এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা এবং হুনানে ও কিয়াংসী থেকে

আগত আক্রমণকারী সৈন্যদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের অক্ষমতা। আমাদের তুলনায় কয়েকগুণ শক্তিশালী হয়েও শত্রুরা আমাদের এলাকার সম্প্রসারণকে ঠেকাতে পারেনি, ধ্বংস করা তো দূরের কথা। হুনান ও কিয়াংসীর ওপর আমাদের সরকারের ক্রমবর্ধমান প্রভাব পড়েছে। আগষ্ট মাসের পরাজয়ের একমাত্র কারণ হল এই যে, সেই সময়টা যে শাসকশ্রেণীর সাময়িক স্থায়িত্বের সময়, এটা না বুঝতে পেরে কিছু কমরেড শাসকশ্রেণীর মধ্যে খেয়োখেয়ির সময়ের উপযুক্ত কর্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং দক্ষিণ হুনানে এক দুঃসাহসিক অভিযান চালানোর জন্য আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। তার ফলে সীমান্ত এলাকা ও দক্ষিণ হুনান—দু' জায়গাতেই আমাদের পরাজয় ঘটেছিল। হুনান প্রাদেশিক কমিটির প্রতিনিধি দু সিউ-চিং এবং প্রাদেশিক কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত সীমান্ত অঞ্চলের বিশেষ কমিটির সম্পাদক ইয়াং কাই-মিং বাস্তব পরিস্থিতিটাই বুঝতে পারেননি। মাও সে-তুঙ, ওয়ান সী-সিয়েন এবং অন্যান্য যেসব কমরেড এদের মতের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন, তাঁরা তখন ছিলেন বহুদূরে য়ুংসীনে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এঁরা পার্টির সেনাকমিটি, বিশেষ কমিটি এবং য়ুংসিন কাউন্টি কমিটির যুক্ত সভার প্রস্তাবগুলিকে—যা আবার হুনান প্রাদেশিক কমিটির মতামতের বিরোধী ছিল—অগ্রাহ্য করেন। দক্ষিণ হুনানে অভিযান চালানোর জন্য হুনান প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশকে এঁরা যান্ত্রিকভাবে কার্যকরী করেন এবং লালফৌজের ২৯তম রেজিমেন্টের যুদ্ধ এড়িয়ে ঘরে ফিরবার ইচ্ছাকেই অনুসরণ করলেন। ফলে সীমান্ত অঞ্চল ও দক্ষিণ হুনান—দু'জায়গাতেই পরাজয় ঘটল।

প্রথমে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে উ শাঙের নেতৃত্বে অষ্টম বাহিনী হুনান থেকে নিংকাং আক্রমণ করে, য়ুংসিনে ঢুকে পড়ে, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে (আমাদের সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী একটা রাস্তা থেকে তাদের আক্রমণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের ধরতে পারে না) এবং তারপর আমাদের সমর্থক জনগণের ভয়ে লিয়েনহুয়ার মধ্য দিয়ে তাড়াহুড়া করে চালিং-এ পিছিয়ে যায়। ইতিমধ্যে লিংসিয়েন ও চালিং আক্রমণের জন্য নিংকাং থেকে অগ্রসরমান লালফৌজের প্রধান বাহিনী লিংসিয়েনে পৌছানোর পর নিজেদের পরিকল্পনা পাল্টে ফেলে এবং দক্ষিণ হুনানের দিকে এগোতে থাকে। অন্যদিকে, কিয়াংসী থেকে ওয়াংচুন ও চিন হান-তিঙের নেতৃত্বে তৃতীয় বাহিনীর পাঁচটি রেজিমেন্ট এবং হু ওয়েন-তৌ-এর নেতৃত্বে ষষ্ঠ বাহিনীর ছ'টি রেজিমেন্ট

একসঙ্গে য়ুংসিনে আক্রমণ শুরু করে। তখন য়ুংসিনে আমাদের মাত্র এক রেজিমেণ্ট সৈন্য ছিল। ব্যাপক জনগণের সাহায্যে আত্মগোপন করে থেকে তারা চারদিক থেকে গেরিলা আক্রমণ চালায়, এবং এই এগারো রেজিমেণ্ট শত্রুসৈন্যকে পঁচিশ দিন ধরে য়ুংসিন কাউণ্টি শহরের ত্রিশ লী ব্যাসার্ধের মধ্যে আটকে রাখে। শেষপর্যন্ত শত্রুর তীব্র আক্রমণের মুখে য়ুংসিন আমাদের হাতছাড়া হয়, এবং কিছুদিন পরে লিয়েনহুয়া ও নিংকাংও আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এই সময় কিয়াংসী শত্রুসৈন্যদের মধ্যে হঠাৎ অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। হু ওয়েন-তৌ'র অধীনস্থ ষষ্ঠ বাহিনী তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে চ্যাংশাতে ওয়াং চুনের তৃতীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। কিয়াংসীর বাকী পাঁচটি রেজিমেণ্ট তখন তাড়াতাড়ি য়ুংসিন কাউণ্টি শহরে পিছিয়ে যায়। আমাদের প্রধান বাহিনী দক্ষিণ হুনানে সরে না গেলে, এই শত্রু বাহিনীকে আমরা পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারতাম, আমাদের স্বাধীন সরকারের এলাকাকে প্রসারিত করে কিয়ান, আন্‌ফু ও পিংসিয়াংকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারতাম, এবং একে পিংকিয়াং ও লিউইয়াং-এর সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারতাম। কিন্তু আমাদের প্রধান বাহিনী দূরে থাকায় এবং বাকী রেজিমেণ্টটি অত্যন্ত ক্লান্ত থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, কিছু সৈন্য য়ুয়ান ওয়েন-সাই এবং ওয়াং সো'র নেতৃত্বাধীন ইউনিট দু'টির সহযোগিতায় চিংকাং পাহাড় রক্ষার জন্য থেকে যাবে, এবং বাকী সৈন্যদের নিয়ে আমি এগিয়ে গিয়ে প্রধান বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হব এবং তাদের ফিরিয়ে আনব। ইতিমধ্যে আমাদের প্রধান বাহিনী দক্ষিণ হুনান থেকে কুয়েইতুঙের দিকে পিছিয়ে আসে, এবং আমরা ২৩শে আগস্ট তাদের সঙ্গে মিলিত হই।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে লালফৌজের প্রধান বাহিনীটি লিংসিয়েনে এসে পৌঁছায়। ২৯তম রেজিমেণ্টের অফিসার ও সৈন্যরা তখন রাজনৈতিক দোদুল্যমানতা দেখাচ্ছিল এবং দক্ষিণ হুনানে তাদের ঘরে ফিরবার জন্য উতলা হয়ে ওঠে। তারা নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে। আবার ২৮তম রেজিমেণ্ট দক্ষিণ হুনানে না গিয়ে দক্ষিণ কিয়াংসীতে যাবার পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু কোনমতেই তারা য়ুংসিনে ফিরে যেতে চাইছিল না। তু শিউ-চিং ২৯তম রেজিমেণ্টে ভুল চিন্তাকেই প্রশ্রয় দিল, সামরিক কমিটিও তাদের বুঝিয়ে উঠতে পারল না। ফলে ১৭ই জুলাই প্রধান বাহিনী লিংসিয়েন থেকে চেনচৌ'র দিকে রওনা হল। ২৪শে জুলাই চেনচৌতে ফ্যান শি-শেঙের নেতৃত্বাধীন শত্রুবাহিনীর

সঙ্গে যুদ্ধে প্রথমদিকে সফল্য অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হল এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গেল। এরপর ২৯নং রেজিমেণ্ট নিজেদের খেয়ালখুশি মতো য়িচাঙের পথে গৃহাভিমুখে এগোতে শুরু করল। এর ফল দাঁড়াল এই যে, এই বাহিনীর একটি অংশ লোচাঙে হু ফেং-চ্যাঙের দস্যু-বাহিনীর হাতে ধ্বংস হয়ে গেল, আরেকটি অংশ চেনচৌ-ইচাং অঞ্চলে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং তাদের কোন খবর আর পাওয়া গেল না, শুধু দিনের শেষে শ'খানেকের মতো সৈন্যকে আবার জড়ো করা গেল। তবে আশার কথা এই যে, বাহিনীর প্রধান অংশ ২৮নং রেজিমেণ্টের খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি হল না, ১৮ই আগস্ট তারা কুয়েইতুং দখল করল। ২৩শে আগস্ট এদের সঙ্গে চিংকাং পাহাড়ের সৈন্যরা এসে মিলিত হল, এবং তারপর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, এই সম্মিলিত বাহিনী চুংয়ি ও শাংয়ু'র পথে ফিরে যাবে। চুংয়িতে পৌঁছাবার পর ব্যাটেলিয়ান-কম্যাণ্ডার য়ুয়াং চুং চুয়ান এক কোম্পানি পদাতিক বাহিনী ও এক কোম্পানি গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে দলত্যাগ করে। কোম্পানি দু'টিকে শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল বটে, কিন্তু আমাদের রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার ওয়াং এর-চো এই যুদ্ধে প্রাণ দেন। আমাদের বাহিনী গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবার আগেই হুনান ও কিয়াংসী থেকে আগত শত্রুসৈন্যরা সুযোগ বুঝে ৩০শে আগস্ট চিংকাং পাহাড় আক্রমণ করল। সুবিধাজনক অবস্থান থেকে প্রত্যাক্রমণ চালিয়ে আমাদের এক ব্যাটেলিয়ানেরও কম সৈন্য শত্রুদের ধ্বংস করল এবং ঘাঁটি এলাকাকে রক্ষা করল।

আগস্ট মাসে আমাদের পরাজয়ের কারণগুলি হচ্ছে: (১) দোদুল্যমান ও গৃহ-প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী কিছু অফিসার ও সৈন্য তাদের লড়াইয়ের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, এবং অন্যদিকে দক্ষিণ হুনানে যেতে অনিচ্ছুক সৈন্যদের মধ্যে উৎসাহ কমে আসে; (২) গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে দীর্ঘপথ চলার দরুণ আমাদের সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে; (৩) লিয়েংশিয়েন থেকে কয়েকশো লী দূরে চলে যাওয়ায় সীমান্ত এলাকা থেকে তারা সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; (৪) দক্ষিণ হুনানের জনগণকে তখনও পর্যন্ত জাগিয়ে তুলতে না পারায় আমাদের অভিযান সম্পূর্ণভাবেই একটি হঠকারী সামরিক অভিযানে পর্যবসিত হয়; (৫) শত্রুদের পরিস্থিতি আমাদের অজানা ছিল; এবং (৬) প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অভাব ছিল, অফিসার ও সৈন্যরা অভিযানের উদ্দেশ্য বুঝে উঠতে পারেনি।

স্বাধীন এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি

বর্তমান বছরের এপ্রিল মাস থেকে লাল এলাকাগুলি ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ২৩শে জুন (য়ুংশিন ও নিংকাং সীমান্তে) লুংয়ুয়ানকৌ'র যুদ্ধে আমরা চতুর্থবার কিয়াংসীর শত্রুসৈন্যদের পরাজিত করি, এবং তারপর থেকে সীমান্ত এলাকার বিকাশ চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, এবং নিংকাং, য়ুংশিন ও লিয়েনহুয়া কাউন্টি তিনটি, কিয়ান ও আনফু'র কিছু অংশ, সুইচুয়ানের উত্তরাংশ এবং লিংশিয়েনের দক্ষিণ পূর্ব অংশ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। লাল এলাকাগুলিতে অধিকাংশ জমিই বন্টন করা হয়েছে, এবং বাকী জমিও বন্টন করা হচ্ছে। জেলা ও ছোট শহরগুলির সর্বত্রই রাজনৈতিক ক্ষমতা সংগঠিত করা হয়েছে। নিংকাং, য়ুংশিন, লিয়েনহুয়া ও সুইচুয়ানে কাউন্টি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একটি সীমান্ত এলাকার সরকার গঠিত হয়েছে। গ্রামগুলিতে শ্রমিক ও কৃষকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বাহিনী এবং জেলা ও কাউন্টি স্তরে লালরক্ষী বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। জুলাই মাসে কিয়াংসীর শত্রুবাহিনী এবং আগস্ট মাসে হুনান ও কিয়াংসীর বাহিনী একযোগে চিংকাং পাহাড় আক্রমণ করে। সমস্ত কাউন্টি শহর এবং সীমান্ত এলাকার সমতলভূমি শত্রুদের দখলে চলে যায়। শান্তিরক্ষা বাহিনী ও জমিদারদের ভাড়াটে বাহিনী প্রভৃতি শত্রুদের ফেউরা লাগামছাড়া হয়ে পড়ে, শহর ও গ্রামাঞ্চল জুড়ে শ্বেতসন্ত্রাস বিরাজ করতে থাকে। অধিকাংশ পার্টি ও সরকারী সংগঠন ভেঙে পড়ে। ধনী কৃষকরা ও পার্টির মধ্যেকার সুবিধেবাদীরা বিপুল সংখ্যায় শত্রুদের সঙ্গে যোগ দেয়। ৩০শে আগস্ট চিংকাং পাহাড়ের যুদ্ধের পরেই কেবল হুনানের শত্রুসৈন্যরা লিংসিয়েনে হটে যায়, কিন্তু কিয়াংসীর সৈন্যরা তখনও সমস্ত জেলা শহর এবং অধিকাংশ গ্রাম দখল করে থাকে। তবে শত্রুরা কখনই পার্বত্য এলাকা দখল করতে সক্ষম হননি। এসব এলাকার মধ্যে ছিল নিংকাঙের পশ্চিম ও উত্তরের জেলাগুলি ; য়ুংসিনের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণের যথাক্রমে তিয়েনলুং, শিয়াওসিকিয়াং ও ওয়ানিয়েনশান জেলাগুলি ; লিয়েনহুয়ার শানসি জেলা ; সুইচুয়ানের চিংকাংশান জেলা ; এবং লিয়েংসিয়েনের সিংশিকাং ও তায়ুয়ান জেলা। জুলাই ও আগস্ট মাসে লালফৌজের একটি বাহিনী বিভিন্ন কাউন্টির লালরক্ষীদের সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে ছোট-বড় বহু লড়াই চালায়, এবং মাত্র ত্রিশটি রাইফেল হারিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত পাহাড়ী এলাকায় সরে যায়।

চুংয়ি ও শাংয়ু'র মধ্য দিয়ে আমাদের সৈন্যরা যখন চিংকাং পাহাড়ে ফিরে আসছিল, তখন লিউ শি-য়ি'র অধীনস্থ দক্ষিণ কিয়াংসী শত্রুবাহিনীর ৭নং স্বাধীন ডিভিশন সুইচুয়ান পর্যন্ত আমাদের পিছনে ধাওয়া করে। ১৩ই সেপ্টেম্বর আমরা লিউ শি-য়িকে পরাস্ত করে কয়েকশো রাইফেল দখল করি এবং সুইচুয়ান অধিকার করি। ২৬শে সেপ্টেম্বর আমরা চিংকাং পাহাড়ে ফিরে আসি। ১লা অক্টোবর আমরা নিংকাঙে চৌ হুন-য়ুয়ানের নেতৃত্বাধীন শিউং শি-হুই'র একটি বাহিনীকে পরাজিত করে সমগ্র নিংকাং কাউন্টি পুনরুদ্ধার করি। ইতিমধ্যে কুয়েইতুঙে অবস্থানকারী হুনানের শত্রুসৈন্যদের ২৬ জন ইয়েহ চুং-জু'র নেতৃত্বে আমাদের পক্ষে চলে আসে। পি চান-য়ুনের নেতৃত্বে তাদেরকে একটি বিশেষ বাহিনীতে সংগঠিত করা হয়। ৯ই নভেম্বর আমরা লুংয়ুয়ানকৌ এবং নিংকাঙের কাউন্টি শহরে চৌ'র ব্রিগেডের একটি রেজিমেণ্টকে বিধ্বস্ত করি। পরের দিনই আমরা এগিয়ে গিয়ে য়ুংশিন দখল করি, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার নিংকাঙে সরে আসি। বর্তমানে আমাদের এলাকা দক্ষিণে সুইচুয়ান কাউন্টির চিংকাং পাহাড়ের ঢালু অংশ থেকে উত্তরে লিয়েন-হুয়া কাউন্টির সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র নিংকাং এবং সুইচুয়ান লিংসিয়েন ও য়ুংশিনের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত এই এলাকা উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত অবিভক্ত একটি সরু অঞ্চল গড়ে তুলেছে। তবে লিয়েনহুয়ার শানসি জেলা এবং য়ুংশিনের তিয়েনলুং ও ওয়ানিয়েনশান জেলা এই অবিভক্ত অঞ্চলের সঙ্গে খুব দৃঢ়ভাবে যুক্ত নয়। শত্রুরা এখন সামরিক আক্রমণ ও অর্থনৈতিক অবরোধ চালিয়ে আমাদের ঘাঁটি এলাকাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, আর আমরা তাদের এইসব আক্রমণকে ব্যর্থ করার প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছি।

সামরিক প্রশ্ন

সীমান্ত এলাকার সংগ্রাম হচ্ছে পুরোপুরিভাবে একটি সামরিক ব্যাপার। কাজেই পার্টি ও জনসাধারণ উভয়কেই যুদ্ধের উপযোগী করে তৈরী রাখতে হবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মূল প্রশ্নই হয়ে উঠেছে কীভাবে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, কীভাবে যুদ্ধ করতে হবে। স্বাধীন সরকারকে অবশ্যই সশস্ত্র থাকতে হবে। এই এলাকা যেখানেই অবস্থিত হোক না কেন, সশস্ত্র শক্তি না থাকলে বা যথেষ্ট না হলে, অথবা শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলায় ভুল রণকৌশল অবলম্বন করলে শত্রু সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকা দখল করে নেবে। সংগ্রাম

প্রতিদিনই তীব্র হয়ে উঠছে, এবং সেজন্য আমাদের সমস্যাগুলিও হয়ে উঠছে অতিশয় জটিল ও গুরুতর।

সীমান্ত এলাকার লালফৌজ গড়ে উঠেছে নিম্নলিখিতদের নিয়ে: (১) চাওচৌ ও সোয়াতৌ-এ[৪] ইয়ে তিং ও হো লুঙের অধীনস্থ প্রাক্তন সৈন্য; (২) য়ুংাঙের ভূতপূর্ব জাতীয় সরকারের[৫] রক্ষীবাহিনী; (৩) পিংকিয়াং ও লিউইয়াঙের[৬] কৃষকেরা; (৪) দক্ষিণ হুনানের কৃষক[৭] এবং স্থইকৌশানের শ্রমিক[৮]; (৫) শু কে-শিয়াং, তাং শেং-চি, পাই চুং-শি, চু পেই-তে, উ শাং এবং শিউং শি-হুই'র বাহিনী থেকে বন্দী হওয়া সৈন্য; এবং (৬) সীমান্ত এলাকার কাউন্টিগুলির কৃষক। তবে আগে যারা ইয়ে তিং ও হো লুঙের অধীনে ছিল, সেইসব সৈন্যদের, রক্ষীবাহিনীর ও পিংকিয়াং ও লিউইয়াঙের কৃষকদের মধ্যে এক বছরেরও বেশি সময় যুদ্ধের পর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট আছে। দক্ষিণ হুনানদের কৃষকদের মধ্যেও হতাহতের সংখ্যা খুবই বেশি। এ কারণে প্রথম চার ধরনের সৈন্যরা এখনও পর্যন্ত চতুর্থ লালফৌজের প্রধান শক্তি হলেও, শেষ দু' ধরনের সৈন্যদের সংখ্যা অনেক বেশি। আবার শেষের দুই ধরনের সৈন্যদের মধ্যে কৃষকদের সংখ্যার তুলনায় ধৃত বন্দী সৈন্যদের সংখ্যাও অনেক বেশি। এদের মধ্য থেকে আরও নতুন সৈন্য না পাওয়া গেলে জনবলের গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে। তা সত্ত্বেও রাইফেলের সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সৈন্য সংখ্যা তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। রাইফেল সহজে খোয়া যায় না, কিন্তু সৈন্যরা আহত বা নিহত হয়, অসুস্থ হয়ে পড়ে বা পালিয়ে যায়, ফলে সৈন্য সংখ্যা সহজেই কমে যায়। হুনান প্রাদেশিক কমিটি আনিয়ুয়ান[৯] থেকে শ্রমিকদের এখানে পাঠাবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি, তাঁরা সেই প্রতিশ্রুতি রাখবেন।

শ্রেণী ভিত্তির বিচারে লালফৌজের কিছু অংশ এসেছে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্য থেকে, আর কিছু এসেছে ভবঘুরে সর্বহারাদের মধ্য থেকে। অবশ্য এই শেষ ধরনের সৈন্যদের সংখ্যা বেশি না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তবে তারাও যুদ্ধ করতে পারে, এবং প্রতিদিন যুদ্ধ চলার ফলে হতাহতের সংখ্যাও বাড়ছে, এবং তার ফলে এদের মধ্য থেকে লোক জোগাড় করাও আর সহজসাধ্য থাকছে না। এই পরিস্থিতিতে এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে, রাজনৈতিক শিক্ষার ওপর আরও গুরুত্ব দেওয়া।

লালফৌজের সৈন্যদের অধিকাংশই ভাড়াটে সৈন্যদের মধ্য থেকে এলেও

একবার লালফৌজে ঢুকবার পরেই তাদের চরিত্র পাল্টে যায়। প্রথমতঃ, লালফৌজ ভাড়াটে সৈন্য প্রথা তুলে দিয়েছে, এখানে তারা অনুভব করে যে তারা যুদ্ধ করছে, নিজেদের জন্য, জনগণের জন্য, আর কারও জন্য নয়। এখনও পর্যন্ত লালফৌজে নিয়মিত মাইনে দেবার কোন ব্যবস্থা নেই, তাদের দেওয়া হয় ফসল, রান্নার তেল, নুন, জ্বালানি কাঠ, তরিতরকারি কিনবার জন্য টাকা, এবং সামান্য হাতখরচা। সামান্ত এলাকার বাসিন্দা লালফৌজের অফিসার ও সৈন্যদের সবাইকেই জমি দেওয়া হয়েছে। তবে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যারা এসেছে, তাদের জমি দেওয়াটা বেশ অসুবিধের ব্যাপার।

রাজনৈতিক শিক্ষা পাবার পর লালফৌজের যোদ্ধারা হয়ে উঠেছে শ্রেণী সচেতন, এবং আয়ত্ত করেছে জমি-বণ্টন, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক-কৃষকদেরকে সশস্ত্র করে তোলা প্রভৃতি বিষয়ের মূল শিক্ষাকে। তারা যে যুদ্ধ করছে তাদের নিজেদের জন্য, শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য, এটাও তারা বোঝে। সেজন্যই তারা বিনা অভিযোগে এই তীব্র সংগ্রামের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারে। প্রত্যেক কোম্পানি, ব্যাটেলিয়ন বা রেজিমেণ্টের মধ্যে আছে সৈন্যদের কমিটি, এগুলি সৈন্যদের স্বার্থ দেখে এবং রাজনৈতিক ও জনগণের জন্য কাজ করে।

অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করেছে যে, পার্টি-প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিটি[১০] তুলে দেওয়াটা কোনমতেই ঠিক হবে না। পার্টি শাখাগুলি কোম্পানি স্তরেই সংগঠিত এবং সে কারণে বিশেষতঃ কোম্পানি স্তরে পার্টি-প্রতিনিধি থাকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাকে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে সৈন্যদের কমিটি রাজনৈতিক শিক্ষা চালিয়ে যায় ও গণ-আন্দোলনের কাজ পরিচালনা করে। একই সঙ্গে তাকে পার্টি-শাখার সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করতে হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, কোম্পানির পার্টি-প্রতিনিধি যত দক্ষ, সেই কোম্পানিও তত উন্নত হয়। কোম্পানি কম্যাণ্ডারের পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করা খুবই অসুবিধাজনক। নীচের স্তরের কর্মীদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা বেশি হওয়ায়, প্রায়ই ধৃত শত্রুসৈন্যরা খুব কম সময়ের মধ্যেই প্লেটুন লিডার বা কোম্পানি কম্যাণ্ডার হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাসে ধৃত কেউ কেউ ইতিমধ্যেই ব্যাটেলিয়ান কম্যাণ্ডার হয়ে গেছে। মনে হতে পারে, আমাদের সৈন্যবাহিনীর নাম যেহেতু লালফৌজ, অতএব এতে পার্টি-প্রতিনিধি না থাকলেও চলে। এটা

অত্যন্ত ভুল ধারণা। একসময় দক্ষিণ হুনানে ২৮নং রেজিমেণ্টে এই পদ্ধতি তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকাল আবার এই ব্যবস্থা চালু করতে হয়। আর পার্টি-প্রতিনিধিদের 'পরিচালক' নামে অভিহিত করলে, যাদেরকে ধৃত সৈন্যরা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে, কুওমিনতাঙ বাহিনীর সেই পরিচালকদের সঙ্গে এটা গুলিয়ে যাবে। নাম পাল্টালেই ব্যবস্থার চরিত্র পাল্টায় না। সেজন্যই আমার নাম না পাল্টাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পার্টি-প্রতিনিধিদের হতাহতের সংখ্যা খুবই বেশি। শিক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য আমরা ক্লাসের ব্যবস্থা করেছি বটে, তবে আমরা আশা করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং হুনান ও কিয়াংসীর প্রাদেশিক কমিটি পার্টি-প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার যোগ্য অন্ততঃ ত্রিশজন কমরেডকে এখানে পাঠাবেন।

সাধারণতঃ, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আগে একজন যোদ্ধার ছ' মাস থেকে এক বছর শিক্ষার দরকার হয়। কিন্তু আমাদের সৈন্যরা গতকাল ভর্তি হলেও আজই তাদের যুদ্ধে অংশ নিতে হচ্ছে, যুদ্ধ করতে হচ্ছে কোন শিক্ষা না পেয়েই। যুদ্ধের পদ্ধতি না জানার ফলে তাদের লড়তে হচ্ছে শুধুমাত্র সাহসের ওপর নির্ভর করে। যতদিন পর্যন্ত না শিক্ষা ও বিশ্রামের জন্য সময় পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন একমাত্র যা করতে হবে, তা হচ্ছে সামনাসামনি যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা, এবং এভাবে শিক্ষার জন্য কিছু সময় পাওয়া। বর্তমানে আমরা ১৫০ জন নিম্নপদস্থ অফিসারের একটি বাহিনীর শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি, এবং এই শিক্ষাব্যবস্থাকে আমরা একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। আমরা আশা করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং দুটি প্রাদেশিক কমিটি প্লেটুন লিডার ও কোম্পানি কম্যাণ্ডার থেকে শুরু করে ওপরের স্তরের আরও কিছু অফিসার পাঠাবেন।

হুনান প্রাদেশিক কমিটি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যোদ্ধাদের সুখ-সুবিধের দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য, এবং তারা যাতে সাধারণ শ্রমিক বা কৃষকদের চেয়ে অন্ততঃ কিছুটা ভাল অবস্থায় থাকতে পারে, তার ব্যবস্থা করার জন্য। আসলে কিন্তু তুলনামূলকভাবে যোদ্ধাদের অবস্থাই বেশি খারাপ। ফসল ছাড়া রান্নার তেল, নুন, জ্বালানি কাঠ ও তরিতরকারির জন্য তারা প্রতিদিন মাথাপিছু মাত্র ৫ সেণ্ট করে পেয়ে থাকে। এবং এটা দেওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে। শুধু এইসব খরচ বাবদই প্রতি মাসে দশ হাজার রূপোর ডলারেরও বেশি খরচ হয়। এর সবটাই স্থানীয় উৎপীড়কদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

করে জোগাড় করতে হচ্ছে।[১১] আমাদের পাঁচ হাজার লোকের পুরো সেনাবাহিনীরই এখন শীতের তুলোভরা কোট থাকলেও এখনও বস্ত্রের অভাব রয়ে গেছে। কন্‌কনে শীতের মধ্যেও অনেককেই এখনও শুধু দু-ভাঁজ করা পাতলা সুতির জামা গায়ে দিয়ে কাটাতে হচ্ছে। ঘটনাক্রমে আমরা কষ্টের মধ্যে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত। তাছাড়া, প্রত্যেকেই আমরা দুঃখ-কষ্টকে সমানভাবে ভাগ করে নিই—বাহিনীর কম্যাণ্ডার থেকে পাচক পর্যন্ত প্রত্যেকেই শস্য বাদে ওই ৫ সেণ্ট খাদ্যভাতা দিয়েই জীবন কাটাচ্ছে। হাতখরচা হিসেবেও সবাই একই পরিমাণ ভাতা পাচ্ছে—তা ২০ সেণ্টই হোক বা ৪০ সেণ্টই হোক।[১২] কাজেই কারও বিরুদ্ধেই যোদ্ধাদের কোন অভিযোগ নেই।

প্রতিটি যুদ্ধের পরেই কিছু-না-কিছু লোক আহত হয়। তাছাড়া অপুষ্টির জন্য ও ঠাণ্ডা লেগে এবং অন্যান্য কারণেও বহু অফিসার ও সৈনিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পাহাড়ের ওপর আমাদের হাসপাতালগুলিতে চীনা ও পাশ্চাত্য দুই ধরনের চিকিৎসারই ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু ওষুধ ও ডাক্তারের প্রচণ্ড অভাব। বর্তমানে সেখানে আটশোরও বেশি রোগী আছে, হুনানের প্রাদেশিক কমিটি আমাদের ওষুধ পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনও পর্যন্ত কিছুই এসে পৌঁছায়নি। আমরা এখনও আশা করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও দুই প্রাদেশিক কমিটি আমাদের কিছু আয়োডিন ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ডাক্তার শিগ্‌গিরই পাঠিয়ে দেবেন।

জিনিসপত্রের অভাব এবং প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধ পরিচালনা সত্ত্বেও লালফৌজ যে চালিয়ে যেতে পারছে, তার পেছনে পার্টির ভূমিকা ছাড়াও লালফৌজের মধ্যে গণতন্ত্রের অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অফিসাররা সৈন্যদের পেটায় না; অফিসার এবং সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা হয়; সৈন্যরা স্বাধীনভাবে সভা করতে পারে, নিজেদের মনের কথা খুলে বলতে পারে; ফালতু আদবকায়দাগুলো বাতিল করা হয়েছে; হিসাবপত্র সকলেই পরীক্ষা করতে পারে। সৈন্যরা নিজেরাই মেস চালায়। রান্নার তেল, নুন, জ্বালানি কাঠ ও তরিতরকারির বাবদ বরাদ্দ পাঁচ সেণ্টের মধ্য থেকে সামান্য কিছু হাতখরচা তারা সঞ্চয়ও করতে পারে, যার পরিমাণ মাথাপিছু প্রতিদিন প্রায় ছয় বা সাত তামার পয়সার মতো হবে। একে বলা হয় 'মেস-খরচ থেকে উদ্বৃত্ত'। এইসব কারণে সৈন্যরা খুবই সন্তুষ্ট। বিশেষ করে আমাদের হাতে সম্প্রতি বন্দী হওয়া সৈন্যরাও আমাদের বাহিনী ও কুওমিনতাঙ বাহিনীর মধ্যেকার বিরাট

পার্থক্যটা ধরতে পারে। মনের দিক থেকে তারা নিজেদের মুক্ত মনে করে, যদিও লালফৌজের মধ্যে জীবনধারনের সুযোগ-সুবিধা শ্বেত বাহিনীর সুযোগ-সুবিধার চেয়ে অনেক কম। এই সেদিনও শ্বেত বাহিনীর মধ্যে যে সৈন্যরা এতটুকু সাহস দেখাতে পারত না, আজ লালফৌজে যোগ দিয়ে তারাই অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দিচ্ছে। গণতন্ত্রের এমনিই প্রভাব। লালফৌজ যেন একটি অগ্নিকুণ্ড, তার মধ্যে বন্দী সৈন্যরা এসে পড়া মাত্রই তাদের চরিত্র পাল্টে যায়। চীনে জনগণের পক্ষে যেমন গণতন্ত্রের প্রয়োজন, ঠিক তেমান প্রয়োজন সৈন্যবাহিনীরও। সামন্ততান্ত্রিক ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীকে[১৩] নস্যাৎ করার জন্য আমাদের হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হল সৈন্যবাহিনীর মধ্যকার এই গণতন্ত্র।

এখন পার্টি-সংগঠনের চারিটি স্তর আছে : কোম্পানি শাখা, ব্যাটেলিয়ান কমিটি, রেজিমেণ্ট কমিটি ও সৈন্যবাহিনীর কমিটি। প্রত্যেক কোম্পানিতে একটি শাখা আছে, আর কোম্পানির প্রতিটি স্কোয়াডে একটি করে গ্রুপ আছে। 'পার্টি-শাখাগুলি সংগঠিত হয়েছে কোম্পানির ভিত্তিতে'। এতো প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়েও লালফৌজ যে ভেঙে পড়েনি এটাই তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। দু'বছর আগে আমরা যখন কুওমিনতাঙ বাহিনীতে ছিলাম, তখন সামরিক বাহিনীর মধ্যে আমাদের পার্টির কোন সাংগঠনিক ভিত ছিল না, এমনকি, ইয়ে তিঙের বাহিনীতেও[১৪] প্রত্যেক রেজিমেণ্টে মাত্র একটি করে পার্টি-শাখা ছিল। তার ফলে কোন কঠিন পরীক্ষার সামনে আমরা টিঁকে থাকতে পারিনি। বর্তমানে লালফৌজের মধ্যে পার্টির সদস্য ও অ-সদস্যদের সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে ১ : ৩, বা গড়ে প্রতি চারজনের মধ্যে একজন পার্টি-সদস্য। সম্প্রতি আমরা যুদ্ধ সক্ষম সৈনিকদের মধ্য থেকে আরও বেশি সংখ্যায় পার্টি-সদস্য সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, যাতে এই অনুপাতকে বাড়িয়ে ৫০ : ৫০ করা যায়।[১৫] এখন কোম্পানি শাখাগুলিতে দক্ষ পার্টি-সম্পাদকের অভাব আছে। যেসব সক্রিয় কর্মী বর্তমানে তাদের নিজেদের জায়গায় আর কাজ করতে পারছেন না, তাঁদের মধ্য থেকে কিছু সক্রিয় কর্মী আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেবার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় কমিটিকে অনুরোধ করছি। দক্ষিণ হুনান থেকে যেসব কর্মী এসেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই সামরিক বাহিনীর মধ্যেই পার্টির কাজ করছেন। কিন্তু আগস্ট মাসে দক্ষিণ হুনানে পিছু হটার সময় তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছেন, তাই বর্তমানে অতিরিক্ত লোক আমাদের নেই।

লালরক্ষী বাহিনী ও শ্রমিক-কৃষকের শসস্ত্র অভ্যুত্থানকারী দলগুলিকে নিয়েই গড়ে উঠেছে স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী। এই বাহিনীগুলির অস্ত্র হল বর্শা ও গাদা বন্দুক, তারা সংগঠিত হয়েছে শহরতলী-ভিত্তিতে। প্রত্যেকটি শহরতলীতে একটি করে বাহিনী আছে, শহরতলীর জনসংখ্যার ভিত্তিতে এগুলি আকারে ছোট বা বড় হয়ে থাকে। এদের কাজ প্রতিবিপ্লব দমন করা, শহরতলীতে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে রক্ষা করা, এবং শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের সময় লালফৌজ ও লালরক্ষী বাহিনীদের সাহায্য করা। য়ুংসিনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানকারী দলগুলি প্রথমে গুপ্তবাহিনী হিসাবেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সমগ্র কাউন্টিটি আমাদের দখলে আসার পর তারা আত্মপ্রকাশ করেছে। সীমান্ত এলাকার অন্যান্য কাউন্টিতেও এখন এই সংগঠন সম্প্রসারিত হয়েছে এবং তার নামও অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছে। লালরক্ষীদের প্রধান অস্ত্র পাঁচ-ঘড়া রাইফেল। অবশ্য কিছু কিছু নয়-ঘড়া এবং এক-ঘড়ার রাইফেলও আছে, মোট রাইফেল আছে—নিংকাঙে ১৪০টি, য়ুংসিনে ২২০টি, লিয়েনহুয়াতে ৪৩টি, চালিং-এ ৫০টি, লিংসিয়েনে ৯০টি, সুইচুয়ানে ১৩০টি, এবং ওয়ানানে ১০টি—মোট ৬৮৩টি। লালফৌজই এর অধিকাংশ রাইফেল যোগান দিয়েছে। তবে লালরক্ষীরা নিজেরাও শত্রুর কাছ থেকে কিছু কিছু রাইফেল কেড়ে নিয়েছে। জমিদারদের সৈন্য ও শান্তি সংরক্ষণ বাহিনীর বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ চালিয়ে কাউন্টিগুলিতে অধিকাংশ লালরক্ষীই ক্রমশ: নিজেদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। ২১শে মে'র ঘটনার আগে[১৬] সব কাউন্টিতেই কৃষকদের আত্মরক্ষাবাহিনী ছিল। রাইফেল ছিল য়ুংসিয়েনে ৩০০টি, সালিং-এ ৩০০টি, লিংসিয়েনে ৬০টি, সুইচুয়ানে ৫০টি, য়ুংসিনে ৮০টি, লিয়েনহুয়াতে ৬০টি, নিংকাঙে ৬০টি (য়ুয়ান ওয়েনসাই-এর সৈন্যরা) এবং চিংকাং পাহাড়ে ৬০টি (ওয়াং সো'র বাহিনী)—মোট ৯৭০টি। সেই ঘটনার পর য়ুয়ান ও ওয়াঙের সৈন্যদের রাইফেলগুলি রক্ষা পেয়েছিল, এবং এছাড়া সুইচুয়ানে ৬টি এবং লিয়েনহুয়াতে ১টি রাইফেল রক্ষা পেয়েছিল। বাকি সমস্ত রাইফেলই জমিদাররা কেড়ে নিয়েছিল। সুবিধাবাদী লাইন গ্রহণের জন্যই কৃষকদের আত্মরক্ষাবাহিনী তাদের রাইফেলগুলি রক্ষা করতে পারেনি। এখন কাউন্টিগুলিতে লালরক্ষীদের হাতে খুব কমই রাইফেল আছে, এবং সংখ্যায় তা জমিদারদের রাইফেলের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। লালফৌজের উচিত তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা। নিজেদের যুদ্ধ-ক্ষমতার ক্ষতি না করে, জনগণকে সশস্ত্র করার কাজে লালফৌজকে সবরকম

সাহায্যই দিতে হবে। আমরা এই নিয়ম চালু করেছি যে, লালফৌজের প্রত্যেক ব্যাটেলিয়ানে চারটি করে কোম্পানি থাকবে এবং প্রত্যেক কোম্পানির হাতে ৭৫টি রাইফেল থাকবে। এর সঙ্গে বিশেষ কাজে নিযুক্ত কোম্পানি, মেসিনগান কোম্পানি, ট্রেঞ্চ-মর্টার কোম্পানি, রেজিমেণ্টের সদর দপ্তর ও তিনটি ব্যাটেলিয়ানের হেড কোয়ার্টার—এদের সবার রাইফেলগুলি ধরলে প্রত্যেক রেজিমেণ্টের হাতে ১,০৭৫টি রাইফেল থাকবে। যুদ্ধের সময় দখলীকৃত রাইফেল যথাসম্ভব স্থানীয় বাহিনীগুলিকে সশস্ত্র করার জন্য কাজে লাগাতে হবে। কাউন্টি থেকে যাদের লালফৌজের শিক্ষা-শিবিরে পাঠানো হয়েছে এবং সেখানে যাদের শিক্ষালাভ শেষ হয়েছে, তাদের মধ্য থেকেই লালরক্ষী বাহিনীর কম্যাণ্ডার নিয়োগ করা উচিত। স্থানীয় শক্তিগুলিকে পরিচালনার জন্য লাল-ফৌজ বাইরে থেকে ক্রমশই কমসংখ্যক কম্যাণ্ডার পাঠাবে। চু পেই-তে শান্তি-সংরক্ষণ বাহিনী ও জমিদারদের সৈন্যদের সশস্ত্র করে তুলছে। ওদিকে সীমান্ত এলাকার কাউন্টিগুলিতে জমিদারদের সশস্ত্র বাহিনীর আকার এবং যুদ্ধ-ক্ষমতাও বেশি। এসব কারণেই আমাদের স্থানীয় লাল বাহিনীগুলিকে সম্প্রসারিত করার জরুরী প্রয়োজন রয়েছে। লালফৌজের নীতি হচ্ছে কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং লালরক্ষী বাহিনীর নীতি হচ্ছে ছড়িয়ে পড়া। বর্তমান মুহূর্তে প্রতিক্রিয়ার শাসন যখন সাময়িক স্থায়িত্বলাভ করেছে, তখন শত্রু লাল-ফৌজকে আক্রমণ করার জন্য বিপুল সৈন্য সমাবেশ করতে পারে। এই কারণেই লালফৌজের পক্ষে ছড়িয়ে পড়ার নীতি গ্রহণ করা সুবিধাজনক হবে না। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সৈন্যদলকে ছড়িয়ে দেওয়ার নীতি প্রায় সব সময়েই আমাদের পরাজয় ঘটিয়েছে, আর সৈন্যদলকে কেন্দ্রীভূত করতে পারলে আমাদের থেকে কম সংখ্যক, সমান সংখ্যক, কিংবা সামান্য কিছু বেশি সংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রায়ই আমাদের জয় হয়েছে। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কয়েক সহস্র লী ব্যাপী এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সম্ভবতঃ তাঁরা আমাদের শক্তিকে বাড়িয়ে দেখছেন। লালরক্ষীদের পক্ষে ছড়িয়ে পড়ার নীতিটি সুবিধাজনক, এবং সমস্ত কাউন্টিতেই তারা এখন এই পদ্ধতি অনুসরণ করছে।

শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচারে সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হচ্ছে ধৃত শত্রুসৈন্যদের মুক্তি দেওয়া এবং আহতদের চিকিৎসা করা। যখনই শত্রুবাহিনীর সৈন্য, প্লেটুন লিডার, কোম্পানি বা ব্যাটেলিয়ান কম্যাণ্ডার আমাদের হাতে বন্দী হয়,

আমরা তাদের মধ্যে প্রচার চালাই। তাদের দু'দলে ভাগ করা হয়—একদল যারা থেকে যেতে চায়, এবং অন্য দল যারা ফিরে যেতে চায়। যারা ফিরে যেতে চায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, এবং সেই সঙ্গে তাদের ফিরে যাওয়ার পথ-খরচাও দিয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে 'কমিউনিস্ট দস্যুরা দেখামাত্রই সবাইকে খুন করে'—শত্রুর এই কুৎসা সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। আমাদের এই ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইয়াংচি-শেঙের ৮নং ডিভিসনের **দশ দিনের খবর** নামে পত্রিকাটি মন্তব্য করেছে: 'কি শয়তানি!' লালফৌজের সৈন্যরা বন্দীদের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিকতা দেখায় এবং তাদের জন্য সাদর বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'আমাদের নতুন ভাইদের বিদায় অনুষ্ঠানে' বন্দীরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তৃতা করে। আহত শত্রুদের চিকিৎসা করেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শত্রুদের মধ্যে লি ওয়েন-পিনের মতো ধূর্ত ব্যক্তিরা আমাদের দেখাদেখি যুদ্ধ-বন্দীদের হত্যা করা বন্ধ করেছে এবং আহতদের চিকিৎসা করা শুরু করেছে! তা সত্ত্বেও আমাদের সৈন্যরা পরের যুদ্ধেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, এবং ইতিমধ্যেই দু'বার এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া, প্রয়োজন মতো লিখিত প্রচারও আমরা করি, যেমন প্রাচীরের গায়ে শ্লোগান লেখা। আমরা যেখানেই যাই, সেখানেই শ্লোগান লিখে সব প্রাচীর ভরিয়ে দিই। আমাদের এইসব শ্লোগান লেখার খুবই অভাব আছে। আমরা আশা করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও দুই প্রাদেশিক কমিটি শ্লোগান লেখার জন্য আমাদের এখানে কিছু লোক পাঠাবেন।

সামরিক ঘাঁটি প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, আমাদের প্রথম ঘাঁটি চিংকাং পাহাড়ের অবস্থান নিংকাং, লিং সিয়েন, সুইচুয়ান ও য়ুংসিন—এই চারটি কাউন্টির সংযোগস্থলে। উত্তরে ঢালু অঞ্চলে অবস্থিত নিংকাং কাউন্টির মাওপিং থেকে দক্ষিণে ঢালু অঞ্চলে অবস্থিত সুইচুয়ান কাউন্টির হুয়ানগাও এর দূরত্ব ৯০ লী। পূর্বের ঢালু অঞ্চলে অবস্থিত য়ুংসিন কাউন্টির নাসান থেকে পশ্চিমের ঢালু অঞ্চলে অবস্থিত লিংসিয়েন মহকুমার শুইকৌ-এর দূরত্ব ৮০ লী। এই ৫৫০ লী পরিধির মধ্যে আছে নাসান থেকে শুরু করে লুঙয়ুয়ানকৌ (দুইই য়ুংসিন কাউন্টিতে), সিনচেং, মাওপিং, তালুং (সবগুলি নিংকাং কাউন্টিতে), শিতু, শুইকৌ, সিয়াৎসুন (সবগুলিই লিংসিয়েন কাউন্টিতে), ইংপানসু, তাইচিয়াপু, তাফেন, তুইজেচিয়েন, হুয়ানগাও, য়ুতৌকিয়াং এবং চে-আও (সবগুলি সুইচুয়ান কাউন্টিতে), এবং সেখান থেকে আবার নাসান। এই পর্বতমালায়

রয়েছে ধানের ক্ষেত, এবং বড়ো কুয়ো, ছোট কুয়ো, উঁচু কুয়ো, মাঝের কুয়ো, নীচের কুয়ো, জেপিং, সিয়াচুয়াং, সিংচো, সাওপিং পাইনীছ ও লোফু প্রভৃতি গ্রাম। এসব অঞ্চলে আগে পলাতক সৈনিক ও ডাকাতদের আড্ডা ছিল। কিন্তু এখন এগুলো আমাদের ঘাঁটি এলাকায় পরিণত হয়েছে। এখানকার জনসংখ্যা দু' হাজারেরও কম এবং ধানের উৎপাদন দশ হাজার পিকুলের কম। সুতরাং সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় সমস্ত শস্য আনতে হচ্ছে নিংকাং, য়ুংসিন এবং সুইচুয়ান কাউন্টি থেকে। পাহাড়ী অঞ্চলের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথগুলিই সুরক্ষিত। আমাদের হাসপাতাল, বিছানা ও পোশাক তৈরীর কারখানা, অস্ত্র তৈরীর বিভাগ এবং বাহিনীর পশ্চাদভাগের দপ্তরগুলি এখানেই অবস্থিত। বর্তমানে শস্য প্রভৃতি নিংকাং থেকে পর্বতাঞ্চলে আনা হচ্ছে। যদি আমাদের যথেষ্ট সরবরাহ বজায় থাকে, তবে শত্রু কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে পারবে না। আমাদের দ্বিতীয় ঘাঁটি চিউলুং পাহাড়ের অবস্থান নিংকাং, য়ুংসিন, লিয়েনহুয়া ও সালিং কাউন্টির সংযোগস্থলে। চিংকাং পাহাড়ের ঘাঁটিটির তুলনায় এই ঘাঁটিটি কম গুরুত্বপূর্ণ। চারটি কাউন্টির স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী এটিকে তাদের সবচেয়ে পশ্চাতের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে এবং এই ঘাঁটিটিও সুরক্ষিত। চারিদিকে শ্বেত শাসনের বেড়াজালের মধ্যে অবস্থিত স্বাধীন লাল এলাকার পক্ষে পাহাড়ী অঞ্চলের রণনৈতিক সুবিধাগুলো ব্যবহার করা একান্তই প্রয়োজনীয়।

ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্ন

সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে ভূমি সংক্রান্ত পরিস্থিতি। সাধারণভাবে বলতে গেলে, শতকরা ৬০ ভাগের বেশি জমি ছিল জমিদারদের এবং শতকরা ৪০ ভাগের কম জমি ছিল কৃষকদের হাতে। জমির মালিকানা কিয়াংসী অঞ্চলের সুইচুয়ান কাউন্টিতেই সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীভূত, সেখানে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ জমিই জমিদারদের হাতে। তারপরেই য়ুংসিন মহকুমা, সেখানে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জমি জমিদারদের হাতে। ওয়ানান, নিংকাং ও লিয়েনহুয়াদতে কৃষকমালিকের সংখ্যা এর থেকে বেশি, তবে সমস্ত জমির এক বিরাট অংশের, অর্থাৎ, শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ জমি জমিদারদের কুক্ষিগত আর কৃষকদের হাতে মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ। হুনান অঞ্চলের সালিং ও চিংসীয়েন কাউন্টিতে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জমিই জমিদারদের হাতে।

মধ্যবর্তী শ্রেণীর প্রশ্ন। এই ধরনের ভূমি সংক্রান্ত পরিস্থিতির ফলে সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত ও পুনর্বণ্টন করলে অধিকাংশ লোকেরই সমর্থন পাওয়া যাবে।[১৭] সাধারণভাবে গ্রামবাসীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: বড় ও মাঝারি স্তরের জমিদারশ্রেণী, ক্ষুদে জমিদার ও কৃষকদের নিয়ে গঠিত মধ্যবর্তী শ্রেণী, এবং মাঝারি ও গরীব কৃষকের শ্রেণী। ধনী কৃষকদের স্বার্থ প্রায়ই ছোট জমিদারদের স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাধারণতঃ মোট জমির তুলনায় ধনী কৃষকের জমির পরিমাণ সামান্যই, কিন্তু তার সঙ্গে ছোট জমিদারদের জমি যোগ করলে পরিমাণটি আর সামান্য থাকে না। সম্ভবতঃ অবস্থাটা সমগ্র দেশেই মোটামুটি এই রকম। জমি সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত ও বণ্টন করার ভূমি সংক্রান্ত নীতি সীমান্ত এলাকাগুলিতে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে, লাল এলাকায় বড় ও মাঝারি জমিদারশ্রেণী ও মধ্যবর্তী শ্রেণী—এই উভয়কেই আক্রমণ করা হচ্ছে। এটা নীতি হলেও এই নীতি প্রয়োগের সময় মধ্যবর্তী শ্রেণীর কাছ থেকে আমরা প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছি। বিপ্লবের প্রথমদিকে এই মধ্যবর্তী শ্রেণী গরিব কৃষকশ্রেণীর কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছে বলে মনে হলেও বাস্তবক্ষেত্রে ভূমি-বণ্টনের কাজে বিলম্ব ঘটানোর জন্য তারা নিজেদের চিরকালের সামাজিক পদমর্যাদা ও গোষ্ঠীকর্তৃত্বের সুযোগ নিয়ে গরীব কৃষকদের ভয় দেখিয়ে এসেছে এবং অবদমনের চেষ্টা করে এসেছে। যখন এভাবেও আর বিলম্ব ঘটানো সম্ভব হয় না, তখন তারা নিজেদের কুক্ষিগত জমির সঠিক পরিমাণ গোপন করেছে, অথবা ভাল জমিগুলিকে নিজেদের হাতে রেখে খারাপ জমিগুলি ছেড়ে দিয়েছে। সুদীর্ঘকাল ধরে পদদলিত এবং বিপ্লবের বিজয় সম্পর্কে অনিশ্চিত দরিদ্র কৃষকরা এই সময়টিতে প্রায়ই মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলোর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে এবং কোন দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ভরসা পায়নি। কেবল বিপ্লবের উত্তাল অগ্রগতির সময়েই তারা গ্রামে মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলোর বিরুদ্ধে এই ধরনের দৃঢ় ব্যবস্থা নেয়। যেমন, এক বা একাধিক কাউন্টিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, প্রতিক্রিয়াশীল সেনাবাহিনীর কয়েকটা পরাজয় বরণ এবং লালফৌজের পরাক্রম বার বার প্রদর্শিত হবার সময়ে। ভূমি বণ্টনের কাজে বিলম্ব ঘটার এবং জমির মালিকানা লুকানোর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ঘটেছিল য়ুংসিন মহকুমায়, যেখানে মধ্যবর্তী শ্রেণী সংখ্যায় সব থেকে বেশি। ২৩শে জুন লুংওয়ানকৌতে লালফৌজের যখন বিরাট জয় হল এবং জেলা সরকার ভূমি-বণ্টনের কাজে দেরী করানোর জন্য কিছু লোককে

শান্তি দিল, কেবলমাত্র তখনই এই অঞ্চলে ভূমি-বণ্টনের কাজ প্রকৃতপক্ষে সম্পন্ন হল। প্রতিটি কাউন্টিতে সামন্ততান্ত্রিক পারিবারিক প্রথা চালু থাকায়, এক-একটি গ্রামের বা কয়েকটি গ্রামের সব পরিবার একই গোষ্ঠীর লোক হওয়ায়, এই গোষ্ঠী-মানসিকতা দূর হয়ে গ্রামের লোকদের মধ্যে নিজেদের শ্রেণী-সচেতনতা আসতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে।

শ্বেত-সন্ত্রাসের মধ্যে মধ্যবর্তী শ্রেণীর দল পরিবর্তন। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময়ে মধ্যবর্তী শ্রেণীর ওপর আক্রমণ করা হয়েছিল বলে শ্বেত-সন্ত্রাসের আঘাত শুরু হতেই মধ্যবর্তী শ্রেণী সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষে যোগ দিল। য়ুংসিন ও নিংকাঙে এই ছোট জমিদার ও ধনী কৃষকরাই বিপ্লবী কৃষকদের ঘরে আগুন লাগানোর জন্য প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে-ছিল। প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্দেশে তারাই বেপরোয়াভাবে বিভিন্ন বাড়ীতে আগুন লাগায় ও গ্রেপ্তার করে। লালফৌজ নিংকাং, সিনচেং, কুচেং ও লুংসী অঞ্চলে ফিরে আসার পর কয়েক হাজার কৃষক প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে য়ুংসিনে পালিয়ে গেল, কমিউনিস্টরা তাদের হত্যা করবে, প্রতিক্রিয়ার এই প্রচারে তারা বিভ্রান্ত হয়ে। 'যেসব কৃষক দল ছেড়ে গেছে, তাদের হত্যা করা হবে না', এবং 'যেসব কৃষক দল ছেড়ে গেছে, তাদের সাদরে আহ্বান জানানো হচ্ছে, তারা ফিরে এসে নিজেদের ফসল কেটে ঘরে তুলুক'—আমরা এই প্রচার চালাবার পরেই কেবল তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধীরে ধীরে ফিরে এল।

সমগ্র দেশেই যখন বিপ্লবে ভাঁটা চলেছে, তখন আমাদের অঞ্চলগুলিতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে এই মধ্যবর্তী শ্রেণীকে দৃঢ়ভাবে নিজেদের কব্জার মধ্যে রাখা। এই শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার মূল কারণ হল, বিপ্লব এদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। কিন্তু যখন সমগ্র দেশে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জোয়ার আসে, দরিদ্র কৃষকশ্রেণী তখন ভরসা পায় এবং সাহসী হয়ে ওঠে, আর মধ্যবর্তী শ্রেণী সে সময়ে ভয় পায়, কব্জার বাইরে যেতে তারা সাহস করে না। লী সুং-জেন এবং তাং শেং-চি র মধ্যেকার যুদ্ধ হুনানেও ছড়িয়ে পড়ার সময় সালিং-এর ছোট জমিদাররা কৃষকদের সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করেছিল, এমনকি কেউ কেউ নববর্ষের উপহার হিসেবে শুয়োরের মাংস কৃষকদের ভেট পাঠিয়েছিল (যদিও তার আগেই লালফৌজ সালিং থেকে সুইচুয়ানে ফিরে গেছে)। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পর এ ধরনের ঘটনা আর ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। এখন সমগ্র দেশে প্রতিবিপ্লবের জোয়ার বইছে, তারই প্রচণ্ড আঘাতে জর্জরিত হয়ে শ্বেত-

শাসনের অঞ্চলের মধ্যবর্তী শ্রেণী প্রায় সম্পূর্ণভাবে বড় জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে এবং দরিদ্র কৃষকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। *নিঃসন্দেহে এটি একটি* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।[১৮]

মধ্যবর্তী শ্রেণীর দলত্যাগের কারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চাপ। শ্বেত এলাকা ও বিপ্লবী এলাকা আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধরত দু'টি দেশের মতো। শত্রুর সুদৃঢ় অবরোধ ও পেটি-বুর্জোয়াদের প্রতি আমাদের ভুল ব্যবহার—এই দুইয়ের ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। নুন, বস্ত্র, ওষুধপত্র ইত্যাদি সব প্রয়োজনীয় জিনিস দুষ্প্রাপ্য, তাদের দামও অত্যন্ত বেশি। কৃষিজাত দ্রব্যাদি, যেমন কাঠ, চা, তেল ইত্যাদি বাইরে পাঠানো যাচ্ছে না, ফলে কৃষকদের নগদ টাকা আয়ের পথও বন্ধ হয়ে আছে এবং সমগ্র জনগণই তার ফলে প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে। এই ধরনের কষ্ট স্বীকারে দরিদ্র কৃষকরা অধিকতর সক্ষম, কিন্তু অত কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মধ্যবর্তী শ্রেণী জমিদারশ্রেণীর পক্ষে চলে যাবে। জমিদারশ্রেণীর মধ্যে এবং চীনের যুদ্ধবাজদের মধ্যে বিভেদ ও যুদ্ধ না চলতে থাকলে এবং দেশব্যাপী একটি বিপ্লবী পরিস্থিতি বিকশিত হয়ে না উঠলে ছোট ছোট লাল এলাকাগুলির ওপর প্রচণ্ড অর্থনৈতিক চাপ পড়বে, শেষ পর্যন্ত সেগুলি টিঁকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। কারণ, এই ধরনের অর্থনৈতিক চাপ শুধু মধ্যবর্তী শ্রেণীর পক্ষেই অসহনীয় নয়, একদিন এই চাপ শ্রমিক, দরিদ্র কৃষক ও লালফৌজের সৈন্যদের কাছেও অসহনীয় হয়ে উঠবে। য়ুংসিম ও নিংকাং কাউন্টিতে এমন একটা সময় গেছে, যখন রান্নার নুনও জোটানো যায়নি। আর অন্য জিনিসের কথা দূরে থাক, বস্ত্র ও ওষুধপত্রের সরবরাহও একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নুন আবার পাওয়া যাচ্ছে, যদিও দাম এখনও অত্যন্ত বেশি। বস্ত্র ও ওষুধ এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। কাঠ, চা ও তেল—যেগুলো প্রচুর পরিমাণে নিংকাং, পশ্চিম য়ুংসিন ও উত্তর সুইচুয়ানে উৎপন্ন হয় (সবই বর্তমানে আমাদের এলাকাধীন) —তা বাইরে পাঠানো যাচ্ছে না।[১৯]

ভূমি-বণ্টনের মাপকাঠি। ভূমি বণ্টনের জন্য একটি শহরতলীকে একক হিসেবে ধরা হয়। পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতে যেখানে চাষের জমি কম আছে—যেমন য়ুংসিনের সিয়াওকিয়াং জেলায়, সেখানে কখনও কখনও তিন বা চারটে শহরতলীকে একক হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু এ জাতীয় ঘটনা খুবই কম। নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, তরুণ—সমস্ত অধিবাসীই সমান ভাগ পায়। কেন্দ্রীয় কমিটির

পরিকল্পনানুযায়ী বর্তমানে একটা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ঐ পরিকল্পনাতে শ্রমশক্তিকে মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়েছে। যে শ্রমশক্তি দেয় না সে যে পরিমাণ জমি পায় তার থেকে দ্বিগুণ জমি পায় সে যে শ্রমশক্তি দেয়।[20]

মালিক-কৃষকদের সুবিধে দেওয়ার প্রশ্ন। এই প্রশ্নটির পর্যালোচনা এখনও পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। মালিক-কৃষকদের মধ্যে ধনী চাষীরা অনুরোধ করেছে উৎপাদন-ক্ষমতাকে মাপকাঠি হিসাবে ধরার জন্য, অর্থাৎ যাদের লোকবল ও মূলধন (যথা, চাষের উপকরণ) বেশি আছে তাদের বেশি জমি দেওয়া উচিত। তাদের মতে, সমহারে বণ্টন অথবা শ্রমশক্তি অনুযায়ী বণ্টন তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। তারা আকারে-ইঙ্গিতে এটাও জানিয়েছে যে, তারা আরও বেশি উদ্যোগ নিয়ে রাজী আছে, এবং তাদের মূলধন বিনিয়োগের সঙ্গে তাদের এই উদ্যোগ যুক্ত করলে তারা আরও বেশি ফসল ফলাতে পারবে। আর সবাইকে যে হারে জমি দেওয়া হচ্ছে তাদেরও তাই দেওয়া হবে, তাদের বিশেষ উদ্যোগ ও বাড়তি মূলধনকে (অব্যবহৃত ফেলে রেখে) অবহেলা করা হবে—এটা তারা পছন্দ করছে না। এখনও কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ভূমি-বণ্টন পদ্ধতি অনুসরণ করেই এখানে কাজ চলছে। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তৃত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার পর একটা রিপোর্ট পেশ করা হবে।

ভূমি-কর। নিংকাঙে করের হার হচ্ছে ফসলের শতকরা ২০ ভাগ, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট হারের চেয়ে শতকরা ৫ ভাগ বেশি। কর সংগ্রহের কাজ এখনও চলছে, তাই এখনও কোন পরিবর্তন করা উচিত হবে না, তবে আগামী বছরে করের হার কমানো হবে। আমাদের শাসনাধীন সুইচুয়ান লিংসিয়েন ও য়ুংসিনে এমন কতকগুলো পাহাড়ী অঞ্চল আছে, যেখানে কৃষকরা এতোই দারিদ্র্য-পীড়িত যে তাদের ওপর কোনরকম কর বসানো উচিত হবে না। আমাদের সরকার ও লালরক্ষীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য শ্বেত এলাকার স্থানীয় অত্যাচারীদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে। লালফৌজের রসদ জোগানোর ব্যাপারে চালটা এখনকার মতো আসছে নিংকাঙের ভূমি-কর থেকে, আর নগদ টাকার সবটাই সংগৃহীত হচ্ছে স্থানীয় অত্যাচারীদের বাজেয়াপ্ত ধনসম্পত্তি থেকে। অক্টোবর মাসে সুইচুয়ানে গেরিলা অভিযানের সময়ে আমরা দশ হাজার

য়ুয়ানের কিছু বেশি সংগ্রহ করেছিলাম। তা দিয়ে আমাদের কিছুদিন চলবে। সেটা ব্যয় হয়ে গেলে কি করা যাবে, তা পরে ঠিক করতে হবে।

রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন

কউন্টি, জেলা ও শহরতলী স্তরে সব জায়গাতেই জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু আসলে তা হয়েছে নামেই। অনেক জায়গাতেই শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের কোন পরিষদ নেই। শহরতলী অঞ্চলের জেলার, এমনকি কাউন্টি সরকারগুলির কার্যকরী কমিটিগুলি পর্যন্ত কোন-না-কোন জনসভা থেকে নির্বাচিত হয়েছে কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে অহূত জনসমাবেশে বিভিন্ন প্রশ্ন আলোচিত হতে পারে না, জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও তা খুবই কার্যকরী সাহায্য করতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা, এই ধরনের জনসভাগুলোকে বুদ্ধিজীবীরা বা আত্মস্বার্থসন্ধানী ব্যক্তিরা অতি সহজেই নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে। কোন কোন জায়গায় পরিষদ আছে, কিন্তু তাকে কার্যকরী কমিটি নির্বাচনের প্রয়োজনে একটি অস্থায়ী সংস্থা মাত্র বলে মনে করা হয়। একবার নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরই সব কর্তৃত্ব ঐ কমিটি একচেটিয়াভাবে দখল করে নেয়, তারপর আর পরিষদের কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না। তাই বলে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের পরিষদ যে একেবারেই নেই তা নয়, কিন্তু তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। এই নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচার ও শিক্ষার অভাবই তার কারণ। ইচ্ছামতো নির্দেশ চালানোর সামন্ততান্ত্রিক বদ অভ্যাসটি মানুষের মনে, এমনকি সাধারণ পার্টি-সভ্যদের মনেও এমন দৃঢ়মূল হয়ে আছে যে, এক মুহূর্তে তা দূর করা যাবে না। যখনই কোন সমস্যা দেখা দেয়, তখনই তারা এই সোজা পথটি বেছে নেয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণের ঝামেলা তারা একেবারেই পছন্দ করে না। যখন বিপ্লবী সংগ্রামে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কার্যকারিতা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, জনগণ যখন বুঝতে পারে যে, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা তাদের নিজেদের শক্তিগুলিকে সংহত করার সবশ্রেষ্ঠ উপায় এবং তাদের সংগ্রামের পক্ষে খুবই সহায়ক, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ব্যবহার গণ-সংগঠনগুলিতে ব্যাপক ও কার্যকরীভাবে তখনই কেবল সম্ভব হয়। সর্বস্তরের পরিষদগুলির জন্য (কেন্দ্রীয় কমিটির খসড়াকে ভিত্তি করে) আমরা একটা বিস্তারিত নিয়ম-বিধি রচনা করছি, এবং এর সাহায্যে আমরা ধীরে ধীরে আগের ত্রুটিগুলি শুধরে নিতে

পারি। বর্তমানে লালফৌজের সব স্তরেই সৈনিক প্রতিনিধিদের সম্মেলনগুলিকে স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে, যাতে সৈনিকদের শুধু কমিটিই থাকবে এবং কোন সম্মেলন না থাকার ত্রুটিটি শোধরানো যায়।

বর্তমানে জনসাধারণ 'শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সরকার' বলতে সাধারণত: কার্যকরী কমিটিকেই বোঝেন, কারণ এখনও তাঁরা পরিষদের ক্ষমতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন এবং তাঁরা মনে করেন একমাত্র কার্যকরী কমিটিই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। কোন পরিষদ না থাকায় কার্যকরী কমিটি প্রায় সময়েই জনগণের মতামত উপেক্ষা করে কাজ চালায়। ভূমি বাজেয়াপ্ত করার ও পুনর্বণ্টনের কাজে দোদুল্যমানতা ও আপোষেরমনোভাব, অর্থের অপচয় বা তহবিল তছরুপ, শ্বেত-বাহিনীর সম্মুখীন হলেই পশ্চাদপসরণ কিংবা তাদের বিরুদ্ধে ভগ্নোদ্যমে যুদ্ধে নামা ইত্যাদি দৃষ্টান্ত সব জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া, কমিটির পূর্ণ অধিবেশন খুব কমই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সবকিছু সম্বন্ধেই সিদ্ধান্ত নেয়, বা যা কিছু ঐ কমিটির স্থায়ী কমিটি। জেলা ও শহরতলীর সরকারগুলিতে আবার স্থায়ী কমিটির অধিবেশনও বসে কখনো-সখনো। আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজ পরিচালনা করে শুধুমাত্র সেই চারজন ব্যক্তি যারা অফিসে বসে—যেমন, সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও লালরক্ষী (অথবা অভ্যুত্থানকারী) বাহিনীর নায়ক। সুতরাং, সরকারের কাজকর্মেও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কর্মধারা বিশেষ কার্যকারী হয়ে ওঠেনি।

প্রথম দিকে ছোট জমিদার ও ধনী কৃষকেরা সরকারী কমিটিগুলিতে, বিশেষ করে শহরতলী অঞ্চলের কমিটিগুলির মধ্যে ঢুকবার জন্য খেয়োখেয়ি শুরু করে দিত। লাল ফিতে লাগিয়ে ও উৎসাহের ভান করেনানাফন্দিতেতারা সরকারী কমিটিগুলির মধ্যে ঢুকে পড়ত, সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ নিজেরা করায়ত্ত করে নিত, এবং দরিদ্র কৃষক সদস্যদের কমিটির অকিঞ্চিৎকর ভূমিকায় বসিয়ে দিত। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের মুখোস খুলে দিতে পারলে এবং গরীব কৃষকরা দৃঢ়তা অবলম্বন করলেই কেবল তাদের দূর করে দেওয়া সম্ভব হবে। ব্যাপকভাবে না হলেও এই ধরনের অবস্থা বেশ কিছু জায়গায় বিরাজ করছে।

জনগণের মধ্যে পার্টির বিরাট কর্তৃত্ব ও মর্যাদা আছে, তুলনামূলকভাবে সরকারের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা অনেক কম। কারণ, কাজের সুবিধার জন্য সরকারী সংস্থাগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে পার্টি অনেক বিষয় সোজাসুজি নিজেই পরিচালনা করে। এ ধরনের অনেক উদাহরণ আছে। অনেক জায়গায়

সরকারী সংগঠনগুলিতে নেতৃস্থানীয় পার্টি-সভ্যদের কোন গ্রুপই নেই, বাকী-গুলিতে গ্রুপ থাকলেও সেগুলি ঠিকমতো কাজ করে না। এখন থেকে সরকারকে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজ পার্টিকে অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। একমাত্র প্রচারের কাজ ছাড়া, যে সব কর্মনীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পার্টি সুপারিশ করে, সেগুলোকে সরকারী সংগঠনগুলির মধ্যে দিয়েই কাজে পরিণত করতে হবে। সরাসরি সরকারকে নির্দেশ দেবার যে ভুল পদ্ধতি কুওমিনতাঙরা অনুসরণ করে, সেটা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

পার্টি-সংগঠনের প্রশ্ন

সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। একথা বলা যেতে পারে যে, একুশে মে'র ঘটনার কাছাকাছি সময়ে সীমান্ত এলাকার কাউন্টিগুলির পার্টি-সংগঠন-গুলির কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল সুবিধাবাদীদের হাতে। প্রতিবিপ্লব যখন শুরু হল, তখন কোন দৃঢ় সংগ্রামই প্রায় সংগঠিত হয়নি। গত বছরের অক্টোবর মাসে লালফৌজ (শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী ফৌজের প্রথম বাহিনীর প্রথম ডিভিশনের প্রথম রেজিমেণ্ট) যখন সীমান্ত এলাকার কাউন্টিগুলিতে এসে পৌছাল, তখন সামান্য সংখ্যক আগে থেকে লুকিয়ে থাকা পার্টি-সদস্যই শুধু বেঁচে ছিলেন, পার্টি-সংগঠনগুলিকে শত্রুরা একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিল। গত নভেম্বর মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়ে পার্টিকে পুনঃসংগঠিত করা হয় এবং মে মাসের পরবর্তীকালে বিপুলভাবে পার্টির সম্প্রসারণ ঘটে। কিন্তু তবুও বিগত বারো মাস ধরে সুবিধাবাদের প্রকাশ ব্যাপকভাবেই ধরা পড়েছে। শত্রু এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম চালাবার মনোবলহীন কিছু কিছু সদস্য দূরবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল এবং তাদের এই কাজকে তারা অভিহিত করেছিল 'শত্রুর জন্য ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করা' বলে। অন্যান্য সদস্যরা সক্রিয় থাকলেও পা বাড়িয়েছিল অন্ধ অভ্যুত্থানের পথে। এ দুটিই পেটি-বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রকাশ। দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম ও আন্তঃপার্টি শিক্ষার মধ্যে পোড় খাবার পর এ ধরনের ঘটনা কমে এসেছে। গত বছর লাল ফৌজের মধ্যেও এই পেটি-বুর্জোয়া মতাদর্শ বিদ্যমান ছিল। শত্রু এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে হয় বেপরোয়া যুদ্ধ, না হয় সবাই মিলে পালানোর প্রস্তাব উত্থাপিত হতো। কোন্ ধরনের সামরিক কাজ পরিচালিত হবে, এই বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় প্রায়ই একই লোক এই দু'ধরনের ধারণাই প্রকাশ করে,

বসত। সুদীর্ঘ অন্তঃপার্টি সংগ্রাম ও বাস্তব ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে, যেমন বেপরোয়া যুদ্ধের ফলে ক্ষয়ক্ষতি এবং সবাই মিলে দ্রুত পলায়নের সময়ের বিপর্যয়সমূহের মধ্য দিয়ে, এই সুবিধাবাদী মতাদর্শকে ধীরে ধীরে শুধরে নেওয়া গেছে।

স্থানিক মনোভাব। সীমান্ত এলাকার অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। কোন কোন জায়গা এখনও হাত-মুষলের যুগেই রয়ে গেছে (পাহাড়ী অঞ্চলে সাধারণতঃ ধান ভানার জন্য এখনও কাঠের মুষলই ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং সমতলভূমিতে ব্যবহৃত হয় পাথরের মুষল)। সব জায়গারই সামাজিক সংগঠনের একক হচ্ছে গোষ্ঠী, একই পারিবারিক পদবী নিয়ে তা গড়ে উঠেছে গ্রামের পার্টি-সংগঠন-গুলিতে প্রায়ই দেখা যায় যে, পার্টি-শাখার সভা কার্যতঃ একটি গোষ্ঠী সভায় পর্যবসিত হয়ে দাঁড়াচ্ছে কারণ পার্টি-শাখার সদস্যদের সবারই পদবী এক এবং তারা থাকেও খুবই ঘনিষ্ঠভাবে। এই ধরণের অবস্থায় একটি 'জঙ্গী বলশেভিক পার্টি' তৈরী করা রীতিমতো কঠিন কাজ। এরা অনেকেই বোঝেন না যে, কমিউনিস্টরা এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির বা এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের মধ্যে কোন গভীর বিভেদের রেখা টানে না, কিংবা ভিন্ন ভিন্ন কাউন্টি, জেলা বা শহরাঞ্চলের মধ্যে গভীর বিভেদ রেখা টানা উচিত নয়। কাউন্টি-গুলির পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে, এমনকি একই কাউন্টির বিভিন্ন জেলা ও শহরগুলির পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যেও প্রচণ্ড স্থানিক মনোভাব রয়ে গেছে। এই স্থানিক মনোভাব দূর করার ব্যাপারে যুক্তির প্রয়োগ খুবই সীমিত ফল দিতে পারে। বরং এ ব্যাপারে অনেক বেশি ফল দিয়েছে শ্বেত-নিপীড়ন, যা একেবারেই স্থানিক ব্যাপার নয়। যেমন, দুটি প্রদেশের যখন প্রতিবিপ্লবী 'রক্ত অবদমন' অভিযানের সময় মানুষ সংগ্রামের মধ্যে একে অন্যের সঙ্গে একই সুখ-দুঃখ বরণ করে নিতে বাধ্য হয়, এবং তার ফলে তাদের স্থানিক মনোভাব ধীরে ধীরে ভেঙে যেতে থাকে। এই ধরণের বহু শিক্ষার মধ্য দিয়ে স্থানিক মনোভব কমে আসছে।

স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগত বসবাসকারিদের প্রশ্ন। সীমান্ত এলাকার কাউন্টিগুলির আরও একটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগত বসবাসকারীদের মধ্যেকার বিভেদ। স্থানীয় অধিবাসী এবং যাদের পূর্বপুরুষরা কয়েক শ' বছর আগে উত্তরদিক থেকে এখানে এসেছিল, সেই বহিরাগত বসবাসকারীদের মধ্যে একটা ব্যাপক বিভেদ অনেকদিন ধরেই চলে

আসছে। এদের এই বংশানুক্রমিক রেষারেষি খুবই গভীর এবং প্রায়শঃই প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তার বিস্ফরণ ঘটে। সংখ্যায় কয়েক নিযুত এই-সব বহিরাগত বসবাসকারীরা ফুকিয়েন-কোয়াংতুং সীমান্ত থেকে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত বরাবর দক্ষিণ হুপে পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট অঞ্চলে বাস করে। পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসকারী এই সব বহিরাগতরা সমতলভূমির স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা সব সময়েই নিপীড়িত হয়েছে, এবং তারা কোনদিনই কোন রকম রাজনৈতিক অধিকার পায়নি। এই ভেবে গত দু' বছরের জাতীয় বিপ্লবকে তারা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে যে, এবার তাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার দিন এসেছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা তাদেরকে এখনও আগের মতোই নিপীড়িত হতে হচ্ছে। আমাদের নিজেদের এলাকার মধ্যে নিংকাং, সুইচুয়ান, লিংসীয়েন ও সালিং-এ স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগত বসবাসকারীদের মধ্যেকার এই সমস্যাটি বিরাজ করছে। নিংকাঙেই এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি গুরুতর। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নিংকাঙের স্থানীয় বিপ্লবীরা বহিরাগত বসবাসকারীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্থানীয় জমিদারদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করে এবং ১৯২৬-২৭ সালে সমস্ত কাউন্টির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। গত বছর জুন মাসে চু পেই-তের অধীনস্থ কিয়াংসী সরকার বিপ্লবের বিরুদ্ধে চলে যায়। সেপ্টেম্বর মাসে নিংকাঙের বিরুদ্ধে যে 'দমন' অভিযান শুরু হয়, তাতে জমিদাররা চু পেই-তের সেনাবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে এবং আবার স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগত বসবাসকারীদের বিরোধটিকে জাগিয়ে তোলে। তত্ত্বের দিক থেকে স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যেকার এই বিভেদ শোষিত শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া উচিত নয়, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তো কখনই নয়। তবু তাই ঘটেছে এবং দীর্ঘদিনের অভ্যাস হিসেবে এটা থেকেই যাচ্ছে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সীমান্ত এলাকায় পরাজয়ের পর স্থানীয় জমিদাররা প্রতিক্রিয়ার সৈন্যবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নিংকাঙে ফিরে এসেই এই গুজব ছড়াতে শুরু করল যে, বহিরাগতরা স্থানীয় অধিবাসীদের খুন করতে আসছে। এর ফলে অধিকাংশ স্থানীয় কৃষক অধিবাসীরা আমাদের দল ছেড়ে গিয়ে সাদা ফিতে লাগিয়ে বাড়ীতে আগুন লাগাবার জন্য এবং পাহাড়ে তল্লাসী চালাবার জন্য শ্বেত-সৈন্যবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। আবার অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে লালফৌজ যখন শ্বেত-বাহিনীকে উচ্ছেদ করল, তখন স্থানীয়

কৃষক অধিবাসীরা প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে পালিয়ে গেল এবং বহিরাগত কৃষকরা এসে তাদের সম্পত্তি দখল করে বসল। এই অবস্থা পার্টির মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলে প্রায়ই অর্থহীন বিরোধের সৃষ্টি হতে থাকে। এ বিষয়ে আমরা যে সমাধান দিচ্ছি তা হচ্ছে এই যে, একদিকে যেসব কৃষক দল ছেড়ে গেছে তারা যাতে জমিদারদের প্রভাব কাটিয়ে বিনা উৎকণ্ঠায় ফিরে আসে তার জন্য এই ঘোষণা করতে হবে যে, 'যেসব কৃষক দল ছেড়ে গেছে তাদের খুন করা হবে না' এবং 'যেসব কৃষক দল ছেড়ে গেছে তারা ফিরে এলেই তাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে'; আর অন্যদিকে, আমাদের কাউন্টি সরকারগুলিকে দিয়ে বহিরাগত বসবাসকারী কৃষকরা যেসব সম্পত্তি দখল করেছে, সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ জারী করাতে হবে। এ ছাড়া স্থানীয় কৃষকদের যে উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এই মর্মে এক নোটিশ সরকার-গুলিকে দিয়ে চারদিকে টাঙিয়ে দিতে হবে। পার্টির অভ্যন্তরে এই দুই অংশের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য সুনিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাকে আরও তীব্র করে তুলতে হবে।

আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিদের দলত্যাগ। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় (জুন মাসে) পার্টি-সদস্য সংগ্রহ করা হয়েছিল প্রকাশ্যে ও ঢালাওভাবে। তারই সুযোগে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী বহু ব্যক্তি পার্টির মধ্যে ঢুকে পড়ে। এবং এইভাবে সীমান্ত এলাকায় পার্টির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে খুব তাড়াতাড়ি দশ হাজারেরও ওপরে ওঠে। শাখা ও জেলা কমিটিগুলির নেতারা অধিকাংশই নতুন সদস্য, তাদের জন্য উপযুক্ত আন্তঃপার্টি শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভবই হয়নি। শ্বেত-সন্ত্রাস আঘাত হানবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিরা দল ছেড়ে দেয় এবং আমাদের কমরেডদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিবিপ্লবীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। তার ফলে, শ্বেত এলাকায় অধিকাংশ পার্টি-সংগঠনই ভেঙে পড়ে। সেপ্টেম্বরের পর খুব দৃঢ়ভাবে ঘরের জঞ্জাল সাফ করার কাজ শুরু করে এবং সভ্যপদের জন্য কড়াকড়িভাবে শ্রেণীগত যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করে দেয়। য়ুংসিন ও নিংকাঙের সমস্ত পার্টি সংগঠনকেই বাতিল করে দেওয়া হয় এবং পার্টি-সভ্যদের নতুন তালিকা তৈরী করার কাজ শুরু করা হয়। পার্টি-সভ্যদের সংখ্যা যথেষ্ট কমে গেলেও সংগ্রামী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আগে সমস্ত পার্টি-সংগঠনই ছিল প্রকাশ্য। কিন্তু সেপ্টেম্বরের পর থেকে গোপন পার্টি-সংগঠন তৈরী করা হল, যাতে প্রতিক্রিয়াশীলেরা ফিরে এলেও কাজ চালিয়ে যাবার জন্য

পার্টিকে প্রস্তুত রাখা যায়। সেই সঙ্গে আমরা শ্বেত এলাকার ভেতরে ঢুকে শত্রু শিবিরের মধ্যে কাজ চালাবার জন্য সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছি। কিন্তু নিকটবর্তী শহরগুলিতে এখনও পর্যন্ত পার্টি-সংগঠনের কোন ভিত্তি স্থাপন করা যায়নি। কারণ, প্রথমত:, শহরগুলিতে শত্রু বেশি শক্তিশালী; দ্বিতীয়ত:, আমাদের সৈন্যরা শহরগুলি অধিকার করে থাকার ফলে বুর্জোয়াদের স্বার্থের ওপর খুব বেশি আঘাত করেছিল, এবং তার ফলে, পার্টি-সভ্যদের পক্ষে এখন সেখানে পা রাখাই কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আমরা এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি শুধরে নিচ্ছি এবং শহরগুলিতে পার্টি-সংগঠন তৈরী করার জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এখনও বিশেষ ফললাভ করতে পারা যায়নি।

পার্টির পরিচালক সংস্থাসমূহ। পার্টি-শাখার কার্যকরী কমিটির নতুন নামকরণ হয়েছে শাখা-কমিটি। শাখা-কমিটির ওপরে আছে জেলা কমিটি এবং তার ওপর কাউন্টি কমিটি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জেলা ও কাউন্টির মাঝখানে একটি বিশেষ জেলা কমিটি তৈরী করা হয়েছে, যেমন য়ুংসিনে পেসিয়াং বিশেষ জেলা কমিটি এবং দক্ষিণ-পূর্ব বিশেষ জেলা কমিটি। সীমান্ত এলাকায় নিংকাং, য়ুংসিন, লিয়েনহুয়া, সুইচুয়ান ও লিংসিয়েনে মোট পাঁচটি কাউন্টি কমিটি আছে। চালিং-এও একটা কাউন্টি কমিটি ছিল, কিন্তু সেখানে কাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে গত শীতকালে এবং এবারের বসন্তকালে সংগঠিত অধিকাংশ পার্টি-সংগঠনগুলিই শ্বেত প্রতিক্রিয়াশীলরা ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে গত ছ'মাসে শুধুমাত্র নিংকাং ও য়ুংসিনের নিকটবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতেই কাজ করা গেছে। সেই কারণে চালিং কমিটিকে বিশেষ জেলা কমিটিতে পরিণত করা হয়েছে। য়ুংসিন ও আনজেন-এ কমরেডদের পাঠানো হয়েছিল। সেখানে যেতে হয় চালিং-এর মধ্য দিয়ে। কিন্তু তারা কিছুই করতে না পেরে ফিরে এসেছে। জানুয়ারী মাসে সুইচুয়ানে ওয়ানান কমিটির সঙ্গে আমাদের যুক্ত সভা হবার পর গত ছ'মাস ধরে শ্বেত প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের সঙ্গে আমাদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সেপ্টেম্বরে লালফৌজ যখন এক গেরিলা অভিযানে ওয়ানানে গেল, একমাত্র তখনই আবার আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হই। ওয়ানান থেকে যে আশীজন বিপ্লবী কৃষক আমাদের বাহিনীর লোকদের সঙ্গে চিংকাং পাহাড়ে চলে এসেছিল, তারা ওয়ানান লালরক্ষী বাহিনী হিসেবে সংগঠিত হয়েছে। আনফুতে কোন পার্টি-সংগঠন নেই। য়ুংসিন সীমান্তে

অবস্থিত কীয়ানের কাউন্টি কমিটি আমাদের সঙ্গে মাত্র দু'বার যোগাযোগ স্থাপন করেছিল, আমাদের আর কোনরকম সাহায্য করেনি—ব্যাপারটি কিন্তু খুবই অদ্ভুত। কুয়েইতুং কাউন্টির শাতিয়েন অঞ্চলে মার্চ এবং আগস্ট মাসে দু'বার ভূমি-বণ্টন করা হয়েছিল। সেখানে পার্টি সংগঠনসমূহ গড়ে তোলা হয়েছে দক্ষিণ হুনান বিশেষ কমিটির পরিচালনাধীনে। এর কেন্দ্র লুংসীর অন্তর্গত সিহারতুং-এ অবস্থিত। এই কাউন্টি কমিটিগুলির ওপরে রয়েছে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার বিশেষ কমিটি। ২০শে মে নিংকাঙের মাওপিং-এ সীমান্ত এলাকার প্রথম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কংগ্রেস প্রথম বিশেষ কমিটির সদস্য হিসেবে তেইশজনকে নির্বাচিত করে। কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন মাও সে-তুঙ। জুলাই মাসে হুনান প্রাদেশিক কমিটি ইয়াং কাই-মিংকে পাঠান, এবং তিনি অস্থায়ী কার্যকরী-সম্পাদক হিসেবে কাজ করতে থাকেন। সেপ্টেম্বরে ইয়াং অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর জায়গায় আসেন তান্ চেন-লিন্। আগস্ট মাসে লালফৌজের প্রধান বাহিনী দক্ষিণ হুনানে চলে যাবার পর শ্বেত প্রতিক্রিয়াশীলদের বাহিনী সীমান্ত এলাকার ওপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করে। আমরা তখন য়ুংসীনে একটি জরুরী সভায় মিলিত হই। অক্টোবর মাসে লালফৌজ নিংকাঙে ফিরে এলে মাওপিং-এ সীমান্ত এলাকার দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই অক্টোবর থেকে তিন দিনের অধিবেশন 'রাজনৈতিক সমস্যাবলী এবং সীমান্ত এলাকার পার্টি-সংগঠনের কর্তব্য' শীর্ষক প্রস্তাবসহ কতকগুলি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। কংগ্রেস নিম্নলিখিত উনিশজনকে দ্বিতীয় বিশেষ কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করে—তান্ চেন-লিন্, চু তে, চেন ঈ, লুং চাও-চিং, চু চ্যাং-চিয়ে, লিউ তিয়েন-চিয়েন য়ুয়ান পান-চু, তান জু-সুং, তান পিং, লী চুয়ে-ফেই, সুং ঈ-য়ুয়ে, য়ুয়ান ওয়েন-সাই, ওয়াং সো-সুং, চেন্ চেং-জেন, মাও সে-তুঙ, ওয়ান্ সী-সীয়েন, ওয়াং সো, ইয়াং কাই-মিং এবং হো তিং-ইং। তান চেন-লিনকে (একজন শ্রমিক) সম্পাদক এবং চেন চেং-জেনকে (একজন বুদ্ধিজীবী) সহ সম্পাদক করে পাঁচজনের একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হয়। ১৪ই নভেম্বরে লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস থেকে তেইশজনের একটি সেনাবাহিনীর কমিটি নির্বাচিত হয়। তাদের মধ্যে পাঁচজনকে নিয়ে একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হয় এবং চু তে তার সম্পাদক হন। সীমান্ত এলাকার বিশেষ কমিটি এবং সেনাবাহিনীর কমিটি দুটোই ফ্রণ্ট-কমিটির অধীনে থাকে।

৬ই নভেম্বর ফ্রন্ট-কমিটিকে পুনর্গঠিত করা হয়। নিম্নলিখিত পাঁচজন সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক মনোনীত হন: মাও সে-তুঙ, চু তে, স্থানীয় পার্টির সদরদপ্তরের সম্পাদক (তান চেন-লিন), একজন শ্রমিক কমরেড (সুং চিয়াও-শেং) এবং একজন কৃষক কমরেড (মাও কো-ওয়েন)। মাও সে তুঙ নির্বাচিত হন ফ্রন্ট-কমিটি সম্পাদক। কিছুদিনের জন্য এই কমিটি একটি সম্পাদকীয় দপ্তর, একটি প্রচার বিভাগ, একটি সংগঠন বিভাগ, একটি শ্রমিক-আন্দোলনের কমিশন এবং একটি সামরিক বিষয়ের কমিশন তৈরী করে। স্থানীয় পার্টি-সংগঠনগুলির দায়িত্বে থাকে ফ্রন্ট-কমিটি। মাঝেমাঝেই ফ্রন্ট-কমিটিকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে হয়, এবং সে কারণে বিশেষ কমিটিকে রাখার প্রয়োজন আছে। আমাদের মতে, সর্বহারাশ্রেণীর মতাদর্শগত নেতৃত্বের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্ত এলাকার কাউন্টিগুলির পার্টি-সংগঠসমূহ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই কৃষকদের নিয়েই সংগঠিত হয়েছে। সর্বহারাশ্রেণীর মতাদর্শগত নেতৃত্ব ছাড়া এই সংগঠন-গুলি বিপথে যাবেই। কাউন্টি শহরগুলিতে ও অন্যান্য বড় বড় শহরের শ্রমিক-আন্দোলনের প্রতি আমাদের গভীর দৃষ্টি দিতে হবে, তাছাড়া সরকারী সংগঠনগুলিতে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব আরও বাড়াতে হবে। পার্টির সমস্ত স্তরের পরিচালক সংস্থাগুলিতেও শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষকদের সংখ্যার অনুপাত আরও বাড়াতে হবে।

বিপ্লবের চরিত্রের প্রশ্ন

আমরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চীন সংক্রান্ত প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্যমত পোষণ করি। নিঃসন্দেহে চীন এখনও পর্যন্ত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেই রয়েছে। চীনে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন করার কর্মসূচী বলতে বোঝায়, বহিঃক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার মধ্য দিয়ে পূর্ণ জাতীয় মুক্তি অর্জন করা, এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শহরগুলি থেকে মুৎসুদ্দি শ্রেণীর শক্তি ও প্রভাব মুছে দেওয়া, গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কসমূহ ধ্বংস করার জন্য কৃষি বিপ্লব সম্পূর্ণ করা, এবং যুদ্ধবাজদের সরকারকে উৎখাত করা। এই ধরনের একটি গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার পরই আমরা সমাজ-তন্ত্রে যাওয়ার সত্যিকারের বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করতে পারব। গত বছর বহু জায়গায় আমরা যুদ্ধ চালিয়েছি এবং এখন সমগ্র দেশেই বিপ্লবের জোয়ারে যে ভাঁটা পড়েছে, সে সম্পর্কে আমরা খুবই সচেতন। একদিকে, গোটাকয়েক ছোট

ছোট এলাকায় লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপিত হয়েছে, আর অন্যদিকে সমগ্র দেশে জনগণের সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু পর্যন্ত নেই—শ্রমিক, কৃষক, এমনকি, গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদেরও বাক্-স্বাধীনতা বা সভা-সমাবেশ করবার স্বাধীনতা নেই। আর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধ। লালফৌজ যেখানেই যাক, জনগণ সবজায়গাতেই উৎসাহহীন, তারা কাছে আসে না, এবং কেবল আমাদের প্রচারের পরেই তারা ধীরে ধীরে গিয়ে সংগ্রামে যোগ দেয়। শত্রুসৈন্যের যে-কোন বাহিনীর মুখোমুখিই আমরা হই না কেন, তাদের মধ্যে আর বিদ্রোহ হচ্ছে না, তারা আমাদের পক্ষে চলেও আসছে না, এবং যুদ্ধটা আমাদের করতেই হচ্ছে। এমনকি ২১শে মে'র ঘটনার পর শত্রুদের যে বাহিনী থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক 'বিদ্রোহীদের' আমরা পেয়েছিলাম, সেই ষষ্ঠ বাহিনী সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য। আমাদের বিচ্ছিন্নতা আমরা তীব্রভাবে অনুভব করছি। আমরা আশা করছি, শিগগিরই এই অবস্থার অবসান ঘটবে। কেবল গণতন্ত্রের জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করার মধ্যে দিয়েই—যাতে শহরের পেটি-বুর্জোয়াদেরও সমাবেশ ঘটাতে হবে—আমরা বিপ্লবকে একটা উত্তাল জোয়ারে পরিণত করতে পারব যার ঢেউ সমগ্র দেশেই ছড়িয়ে পড়বে।

এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত আমরা বেশ ভালভাবেই পেটি-বুর্জোয়াদের প্রতি এই নীতি প্রয়োগ করতে পেরেছিলাম। মার্চ মাসে দক্ষিণ হুনানের বিশেষ কমিটির প্রতিনিধি নিংকাঙে এলেন। আমরা নাকি খুবই কম অগ্নিসংযোগ ও খুন করেছি, এবং 'পেটি বুর্জোয়াদের সর্বহারা বানিয়ে তারপর তাদের বিপ্লবে ঠেলে নামানো'-র তথাকথিত নীতিটি কাজে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছি, অর্থাৎ আমরা নাকি দক্ষিণে ঝুঁকে পড়েছি—এইসব বলে তিনি আমাদের তীব্র সমালোচনা করেন। ফ্রন্ট-কমিটির নেতৃত্ব পুনর্গঠিত হল এবং নীতিও বদলে দেওয়া হল। এপ্রিল মাসে আমাদের গোটা বাহিনী সীমান্ত এলাকায় এসে পৌঁছাবার পরও সেখানে খুব বেশি অগ্নিসংযোগ বা খুন করা হল না। কিন্তু শহরগুলির মাঝারি ব্যবসায়ীদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হল এবং গ্রামাঞ্চলের ধনী কৃষক ও ছোট জমিদারদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক টাকা আদায়ের কাজ খুবই কঠোরভাবে চালু করা হল। দক্ষিণ হুনানের বিশেষ কমিটি প্রদত্ত 'সমস্ত কারখানাই শ্রমিকদের' শ্লোগানটি চারিধারে ব্যাপকভাবে

প্রচার করা হল। পেটি-বুর্জোয়াদের ওপর আক্রমণ করার এই উগ্র বামপন্থী নীতিটি পেটি বুর্জোয়াদের অধিকাংশকেই ঠেলে দিল জমিদারদের দিকে। ফলে তারা সাদা ফিতে গায়ে এঁটে আমাদের বিরোধিতা করতে শুরু করল। ধীরে ধীরে এই নীতি আবার পাল্টানো হল এবং তারপর থেকে পরিস্থিতিও অনুকূল হয়ে এল। বিশেষভাবে সুফল পাওয়া গেছে সুইচুয়ানে, কারণ কাউন্টি শহর ও অন্যান্য গঞ্জগুলির ব্যবসায়ীরা আমাদের আর এখন অবিশ্বাসের চোখে দেখছে না, বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ লালফৌজ সম্বন্ধে ভাল কথাই বলছে। সাওলিন-এর হাটে (তিন দিন অন্তর দুপুর হাট বসে) এখন প্রায় কুড়ি হাজার লোক এসে জমা হচ্ছে যা এর আগে কোনদিনই হয়নি। এটা আমাদের নীতির সঠিকতাই প্রমাণ করছে। জমিদাররা জনগণের ওপর এর আগে দুর্বিষহ করের বোঝা ও জবরদস্তিমূলক আদায়ের পদ্ধতি চাপিয়েছিল। সুইচুয়ানের শান্তিরক্ষীদল[২১] হুয়ানগাও থেকে সাওলিন পর্যন্ত ৭০ লী দীর্ঘ পথে পাঁচটি পথ-কর আদায় করত, কোন কৃষি-পণ্যই রেহাই পেত না। ঐ রক্ষীদলকে উৎখাত করে এই পথ-কর আমরা বন্ধ করে দিয়েছি এবং এই কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা কৃষক এবং ছোট ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের সমর্থন লাভ করেছি।

কেন্দ্রীয় কমিটি চাইছেন আমরা এমন একটা রাজনৈতিক কর্মসূচী তৈরী করি, যাতে পেটি-বুর্জোয়াদের স্বার্থগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়; এবং আমাদের পক্ষ থেকে আমরা প্রস্তাব করছি যে, কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রমিকদের স্বার্থ, কৃষি বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তির প্রশ্নগুলিকে বিবেচনা করে সমগ্র গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যই একটি সাধারণ দিকনির্দেশ ও কর্মসূচী প্রণয়ন করুন।

প্রধানত: কৃষি-অর্থনীতির দেশ চীনের বিপ্লবের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামরিক কাজের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের বিকাশ সাধন। আমরা প্রস্তাব করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি যেন সামরিক কাজের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

আমাদের স্বাধীন এলাকার স্থান নির্বাচনের প্রশ্ন

উত্তর কোয়াংতুং থেকে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত বরাবর দক্ষিণ হুপে পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটি সম্পূর্ণভাবে লোসিয়াও পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। এই পর্বত-মালাটি আমরা ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য করেছি। এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে তুলনা করলে

দেখা যায় যে, নিংকাংকে কেন্দ্র করে মধ্যবর্তী অংশটাই আমাদের সশস্ত্র স্বাধীন এলাকার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক। উত্তরাংশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা আক্রমণ বা প্রতিরক্ষা কোন দিক থেকেই আমাদের পক্ষে বিশেষ উপাযাগী নয়, এবং এই অংশটা শত্রুর প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলির খুবই কাছাকাছি। দ্রুতগতিতে চ্যাংসা বা উহান দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা ছাড়া লিউইয়াং, লিলিং, পিংসিয়াং এবং টুংকুতে কোন বড় বাহিনী মোতায়েন করা খুবই বিপজ্জনক হবে। দক্ষিণ অংশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা উত্তরাংশের চেয়ে নিঃসন্দেহে ভাল, কিন্তু সেখানে আমাদের গণভিত্তি মাঝের অংশের মতো অত দৃঢ় নয়। তা ছাড়া মাঝের অংশ থেকে আমরা হুনান ও কিয়াংসীর ওপর যে বিরাট রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারি, ঐ অংশ থেকে তা সম্ভব নয়। ঐ অংশে আমাদের যে-কোন কাজের প্রভাব ঐ দুই প্রদেশের নীচের দিকের নদী-উপত্যকাগুলির ওপর পড়তে পারে। মাঝের অংশে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছে: (১) একটি গণভিত্তি, যা আমরা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে গড়ে তুলেছি; (২) পার্টি-সংগঠনের উপযুক্ত ভিত্তি; (৩) এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সংগঠিত এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে বেশ অভিজ্ঞ স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী—যা একটি দুর্লভ কৃতিত্ব। লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর সঙ্গে এই স্থানীয় বাহিনী মিলিত হলে তাকে ধ্বংস করা যে-কোন শত্রুবাহিনীর পক্ষেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে; (৪) চমৎকার সামরিক ঘাঁটি চিংকাং পাহাড় এবং সমস্ত কাউন্টিতেই আমাদের স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীর চমৎকার ঘাঁটি; এবং (৫) এই স্থান থেকে দুটি প্রদেশের ওপরে এবং তাদের নিম্নাংশের নদী-উপত্যকাগুলির ওপরে প্রভাব বিস্তার করা যায়, দক্ষিণ হুনান বা দক্ষিণ কিয়াংসীর তুলনায় যার রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। তারা যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা শুধু সেই প্রদেশের মধ্যেই অথবা বড়জোর সেই প্রদেশের পশ্চাদ্‌ভূমিতে এবং নদী-উপত্যকাগুলির ওপরের দিকের অংশেই সীমিত। আর মধ্যবর্তী অংশের অসুবিধা হল এই যে, দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীন এলাকা হিসাবে থাকার ফলে এই অংশ বার বার শত্রুদের বিরাট বিরাট 'অবরোধ ও অবদমনের' সম্মুখীন হয়েছে, এবং তার ফলে এই অংশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী, বিশেষতঃ নগদ টাকার অভাব অত্যন্ত অসুবিধেজনক।

এখানকার কাজের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, জুন ও জুলাই মাসের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হুনান প্রাদেশিক কমিটি তিনটি পৃথক পরিকল্পনার কথা

জানিয়েছেন। প্রথমে য়ুয়ান তে-শেং এসে লোসিয়াও পর্বতমালার মধ্যে অংশে রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম করার যে পরিকল্পনা আমাদের ছিল, তা অনুমোদন করলেন। তারপর তু সিউ-চিং এবং ইয়াং কাই-মিং এসে জোর দিয়ে বললেন, সীমান্ত এলাকাকে রক্ষা করার জন্য মাত্র দু'শো রাইফেলধারী সৈন্য ও লালরক্ষী বাহিনীকে রেখে লালফৌজের উচিত 'বিনা দ্বিধায়' দক্ষিণ হুনানের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তাঁদের মতে, এইটাই 'সম্পূর্ণ সঠিক' নীতি। এবার তৃতীয় বার, প্রায় দিন দশেক পর, য়ুয়ান তে-শেং আবার এলেন একটি বার্তা নিয়ে। সেই বর্তায় আমাদের প্রচুর সমালোচনা করা ছাড়াও বিশেষ জোর দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হল—লালফৌজ যেন পূর্ব হুনানের দিকে এক্ষুণি যাত্রা করে। এটিও নাকি 'সম্পূর্ণ সঠিক' নীতি, এবং আমরা যেন 'বিনা দ্বিধায়' এই নীতিকে কার্যকরী করি। এইসব অনমনীয় নির্দেশের ফলে আমরা উভয়-সংকটে পড়ে গেলাম, কারণ নিদেশ না মানার অর্থ অবাধ্যতা, অথচ নির্দেশ পালন করা মানেই সুনিশ্চিত পরাজয়। দ্বিতীয় বার্তাটি আসার পর সেনাবাহিনীর কমিটি, সীমান্ত এলাকার বিশেষ কমিটি এবং পার্টির য়ুংসিন কাউন্টি কমিটির একটি যুক্ত সভা হয় এবং তাঁরা প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশাবলী কার্যকরী না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কারণ তাঁরা দক্ষিণ হুনানে যাত্রা করা বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু তু সিউ-চিং এবং ইয়াং কাই-মিং প্রাদেশিক কমিটির পরিকল্পনাটিকেই আঁকড়ে ধরে বসে থাকেন, এবং ২৯ নং রেজিমেণ্টের গৃহ-প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছার সুযোগ নিয়ে কয়েকদিন পর চেনচৌ কাউন্টি শহর আক্রমণ করার জন্য লালফৌজকে দিয়ে যান। এইভাবে এঁরা সীমান্ত এলাকা ও লালফৌজের পরাজয় ডেকে আনেন। লালফৌজ প্রায় অর্ধেক সৈন্য হারায়, সীমান্ত এলাকার অসংখ্য বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়, এবং বহু লোককে খুন করা হয়। একের পর এক কাউন্টি শত্রুদের দখলে চলে যায় এবং সেইসব অঞ্চলের কিছু কাউন্টি আজ পর্যন্ত পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। হুনান, হুপে ও কিয়াংসী প্রদেশের জমিদার-শাসকদের মধ্যে খেয়োখেয়ি শুরু না হওয়া সত্ত্বেও লালফৌজের প্রধান বাহিনীর পক্ষে পূর্ব হুনানে যুদ্ধযাত্রা করাটা নিঃসন্দেহে ভুল হয়েছিল। জুলাই মাসে আমরা যদি দক্ষিণ হুনানের দিকে না এগোতাম তাহলে সীমান্ত এলাকায় আগস্ট মাসের পরাজয় এড়ানো যেত, এবং কিয়াংসী প্রদেশের চ্যাংশুতে কুওমিনতাঙের ষষ্ঠ বাহিনীর সঙ্গে ওয়াং চুনের কুওমিনতাঙ বাহিনীর যে যুদ্ধ চলছিল, তার সুযোগ নিয়ে য়ুংসিনের শত্রুসৈন্যদের বিধ্বস্ত

করা যেত, কিয়ান ও আনফু দখল করা যেত, আমাদের অগ্রগামী বাহিনী পিং-সিয়াং পৌঁছাতে পারত, এবং লোসিয়াও পর্বতমালার উত্তরাংশে পঞ্চম লাল-ফৌজ বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করাও সম্ভব হতো। যা ঘটে গেছে তা সত্বেও আমাদের সদর দপ্তরের পক্ষে উপযুক্ত কেন্দ্র হতো নিংকাং এবং শুধুমাত্র গেরিলাবাহিনীগুলিকেই পূর্ব হুনানে পাঠানো উচিত ছিল। জমিদারদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি এবং শক্তিশালী শত্রুবাহিনী তখনও হুনান সীমান্তে পিংসিয়াং, চালিং ও য়ুসীয়েন-এ অপেক্ষা করছিল। তখন আমরা আমাদের প্রধান বাহিনীকে উত্তরদিকে সরিয়ে নিলে শত্রুদেরই সুবিধে করে দেওয়া হতো। কেন্দ্রীয় কমিটি দাক্ষিণ বা পূর্ব হুনানের দিকে এগিয়ে যাবার প্রশ্নটিকে আমাদের বিবেচনা করতে বলেছিলেন। কিন্তু এই দুটোই ছিল বিপজ্জনক পথ। পূর্ব হুনান অভিযানের প্রস্তাবটি কার্যকরী হয়নি ঠিকই, কিন্তু দক্ষিণ হুনান অভিযানটি ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা আমাদের সব সময়েই মনে রাখা উচিত।

জমিদারশ্রেণীর শাসন-ব্যবস্থায় এখনও ভাঙন ধরেনি, এবং সীমান্ত এলাকার চারিপাশে শত্রুর যেসব 'দমন' বাহিনী রয়েছে, তাদের সংখ্যা দশ রেজিমেণ্টেরও বেশি। কিন্তু আমরা যদি নগদ টাকা সংগ্রহের উপায় খুঁজে বের করতে পারি (খাদ্য ও বস্ত্রের সমস্যাটা এখন আর বড় সমস্যা নয়), তাহলে সীমান্ত এলাকায় আমাদের কাজকর্মের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে এই শত্রু বাহিনীগুলির সঙ্গে, এমনকি তাদের চেয়েও বড় বাহিনীর সঙ্গে আমরা মোকাবিলা করতে সক্ষম হব। লালফৌজ যদি অন্য কোথাও সরে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে এই সীমান্ত এলাকা বিগত আগস্ট মাসের মতোই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। আমাদের লালরক্ষী বাহিনীর সবটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না ঠিকই, তবে আমাদের পার্টি এবং গণভিত্তির ওপর প্রচণ্ড আঘাত আসবে, এবং তাছাড়া, পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের পা রাখবার মতো জায়গা থাকলেও সমতল-ভূমিতে বিগত আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মতোই আমাদের আত্মগোপন করে থাকতে হবে। আর লালফৌজ যদি অন্য কোথায়ও চলে না যায়, তবে যে ভিত্তি আমাদের আছে তারই ওপর দাঁড়িয়ে আশেপাশের এলাকাগুলিতে আমরা ধীরে ধীরে সম্প্রসারণ ঘটাতে পারব, এবং আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনাও খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যদি আমরা লালফৌজকে আরও সম্প্রসারিত করতে চাই, তবে তার একমাত্র পথ হচ্ছে চিংকাং পাহাড়ের কাছাকাছি যে সব

জায়গায় আমাদের দৃঢ় গণভিত্তি আছে—যেমন নিংকাং, য়ুংসিন, লিংসীয়েন এবং সুইচুয়ান মহকুমায়—সেসব জায়গায় শত্রুকে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে আটকিয়ে রাখা, এবং হুনান ও কিয়াংসী এই দুই প্রদেশের শত্রু সৈন্যদের মধ্যেকার স্বার্থের দ্বন্দ্বকে কাজে লাগানো, সব দিক থেকেই তাদের নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনবোধ জাগিয়ে রাখা,এবং এভাবে তাদের কেন্দ্রীভূত হতে না দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। লালফৌজকে আমার সম্প্রসারিত করতে পারি সঠিক কৌশল গ্রহণ করে, জয়ের সম্ভাবনা ছাড়া যুদ্ধে না নেমে, এবং অস্ত্র দখল করে ও শত্রু সৈন্য বন্দী করে। লালফৌজের প্রধান বাহিনীটি যদি দক্ষিণ হুনানে অভিযানে না যেত, তাহলে এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে সীমান্ত এলাকার জনগণের মধ্যে যে প্রস্তুতিমূলক কাজ হয়েছিল, তার ভিত্তিতে আগস্ট মাসে লালফৌজকে নিশ্চিতভাবেই আরও সম্প্রসারিত করা যেত। এই ভুল সত্ত্বেও লালফৌজ আবার সীমান্ত এলাকায় ফিরে এসেছে। সেখানে ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল, জনগণও বন্ধুভাবাপন্ন, এবং এমনকি এখনও সম্ভাবনা খুব খারাপ নয়। কেবলমাত্র যুদ্ধ পরিচালনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে ও সীমান্ত এলাকার মতো বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধের সাহস দেখাতে পারলেই লালফৌজ নিজের অস্ত্র-শস্ত্র বাড়াতে পারে, শিক্ষা দিয়ে ভাল সৈন্য তৈরি করতে পারে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সীমান্ত এলাকায় লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। হুনান, হুপে, কিয়াংসী এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশেরই জমিদারশ্রেণীর মধ্যে এই ঘটনা তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে হলেও এই ঘটনা স্থিরপ্রতিজ্ঞভাবে চারিপাশের প্রদেশগুলির শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মনে আশা-ভারসা জাগিয়ে তুলছে সৈনিকদের কথা ভাবুন, সীমান্ত এলাকার বিরুদ্ধে 'দস্যু-দমন' অভিযানকে যুদ্ধবাজরা প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এই বলে বিবৃতি দিচ্ছে যে, 'একটা বছর চলে গেল, দস্যু-দমনের প্রচেষ্টায় দশ লক্ষ ডলার খরচ হয়ে গেল' (লু তি-পিং), কিংবা লালফৌজে '২০,০০০ সৈন্য ও ৫,০০০ রাইফেল আছে' (ওয়াং চুন)। এইসব বিবৃতি ওদের সৈন্য ও ভগ্নোদ্যম ছোট অফিসারদের মনোযোগ আমাদের দিকে আকৃষ্ট করছে। শত্রুপক্ষ থেকে অবশ্যই আরও বেশি সংখ্যায় সৈন্য দল ছেড়ে আমাদের বাহিনীতে যোগদান করবে এবং তারা এইভাবে লালফৌজে সৈন্য ভর্তির আর একটি উৎসমুখ খুলে দেবে। তাছাড়া সীমান্ত এলাকায় লাল ঝাণ্ডা যে কখনও নামানো যায়নি, এই ঘটনাই দেখিয়ে দিচ্ছে কমিউনিস্ট-পার্টির শক্তি কী বিরাট এবং শাসনশ্রেণীগুলি কত

দেউলিয়া। সমগ্র দেশব্যাপী এই ঘটনার একটা প্রচণ্ড রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। সুতরাং আমরা মনে করি, এবং আগেও একথা আমরা সব সময়েই মনে করেছি যে, লোসিয়াও পর্বতমালার মধ্য অংশে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তোলা এবং তার সম্প্রসারণ ঘটানোটা একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় ও সঠিক কাজ।

টীকা

১। ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে এই যুদ্ধ হয়েছিল।

২। ১৯২৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এই যুদ্ধ হয়েছিল।

৩। লালফৌজে সৈনিক প্রতিনিধিদের সম্মেলন ও সৈনিকদের কমিটির ব্যবস্থা পরবর্তীকালে বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৯৪৭এ গণমুক্তিফৌজ কর্মীদের নেতৃত্বে সৈনিকদের সম্মেলন ও সৈনিকদের কমিটির পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে।

৪। কমরেড ইয়ে তিং এবং হো লুঙের অধীন এইসব সৈন্যরা ১৯২৭এর ১লা আগস্ট নানচাং অভ্যুত্থান ঘটায়। কোয়াতুং প্রদেশের চাওচৌ ও সোয়াতৌ-এর দিকে এগোবার পথে এরা পরাজিত হয় এবং কমরেড চু তে, লিন পিয়াও ও চেন-ঈ দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি ইউনিট কিয়াংসীর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ হুনানে সরে যায় গেরিলা কার্যকলাপ চালিয়ে যাবার জন্য। ১৯২৮এর এপ্রিলে তারা চিংকাং পাহাড়ে কমরেড মাও সে-তুঙের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়।

৫। ১৯২৭ সালের বিপ্লবী দিনগুলিতে উচাংএ অবস্থিত জাতীয় সরকারের রক্ষী বাহিনীর অধিকাংশ যোদ্ধারা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। ১৯২৭এর জুলাই মাসের শেষের দিকে ওয়াং চিং-ওয়েই এবং তার সাকরেদরা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর নানচাং অভ্যুত্থানে যোগ দেবার জন্য এই বাহিনী উচাং ছেড়ে যাবার পথে যখন শুনল যে, বিপ্লবী সৈন্যরা ইতিমধ্যেই নানচাং ছেড়ে দক্ষিণে যাত্রা করেছে, তখন এই বাহিনী পিংকিয়াং ও লিউইয়াং-এর সশস্ত্র কৃষকবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য নানা ঘুরপথে পশ্চিম কিয়াংসীর অন্তর্গত সিউশুইতে গিয়ে পৌছাল।

৬। ১৯২৭এর বসন্তকালে হুনান প্রদেশের পিংকিয়াং ও লিউইয়াং অঞ্চলে বেশ শক্তিশালী একটি সশস্ত্র কৃষকবাহিনী তৈরী হয়। ২১শে মে তারিখে চ্যাং-

শাতে সু কে-সিয়াং ক্ষমতা দখলের জন্য প্রতিবিপ্লবী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বিপ্লবী জনগণকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে। তখন প্রতিবিপ্লবীদের ওপর প্রত্যাঘাত হানবার জন্য ৩১শে মে তারিখে কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনী চ্যাংশার দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু সুবিধাবাদী চেন তু-সিউ তাদের মাঝপথে আটকে দিয়ে ফিরিয়ে দেয়। এরপর এই বাহিনীর একটি অংশকে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য পুনর্গঠিত করা হয়। ১লা আগস্ট নানচাং অভ্যুত্থান ঘটার পর, এই সশস্ত্র কৃষকেরা, কিয়াংসী প্রদেশের সিউশুই ও টুংকুতে এবং হুনান প্রদেশের পিংকিয়াং ও লিউইয়াং এ উচাং জাতীয় সরকারের আগেকার রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর তারা কিয়াংসী প্রদেশের পিংসিয়াঙের সশস্ত্র কয়লা খনি শ্রমিকদের সঙ্গে মিলে শরৎকালীন ফসল অভ্যুত্থান ঘটায়। কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে এরা চিংকাং পাহাড়ে চলে আসে।

৭। ১৯২৮এর শুরুতে কমরেড চু তের নেতৃত্বে দক্ষিণ হুনানে যখন বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধ চলছিল তখন ইচাং, চেন চৌ, লেইয়াং, য়ুংসিন ও জেসিং তালুকে কৃষকদের সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করা হয়েছিল। এই অঞ্চলগুলিতে ইতিপূর্বেই কৃষক-আন্দোলন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে কমরেড চু তের নেতৃত্বে তারা চিংকাং পাহাড়ে এসে কমরেড মাও সে-তুঙের বাহিনীতে যোগ দেয়।

৮। হুনান প্রদেশের চ্যাংনিং অঞ্চলে সুইকৌসান সীসার খনির জন্য বিখ্যাত। ১৯২২এ সেখানকার খনি শ্রমিকরা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটি ট্রেড ইউনিয়ন তৈরী করে এবং বহু বছর ধরে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। ১৯২৭এর শরৎকালীন ফসল অভ্যুত্থানের পর অনেক খনি শ্রমিক লালফৌজে যোগ দেয়।

৯। কিয়াংসী প্রদেশে পিংসিয়াং তালুকে অবস্থিত আনিয়ুয়ান কয়লা খনিতে ১২,০০০ শ্রমিক কাজ করত, এর মালিক ছিল হান-ইয়ে-পিং লোহা ও ইস্পাত কোম্পানি। কমিউনিস্ট পার্টির হুনান প্রাদেশিক কমিটি প্রেরিত সংগঠক কমরেডরা ১৯২১ সালে ঐখানে পার্টি সংগঠন ও খনি শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ে তোলেন।

১০। ১৯২৯এ লালফৌজে পার্টি-প্রতিনিধিদের নতুন নামকরণ হয় পলিটিক্যাল কমিশার বা রাজনৈতিক প্রতিনিধি। ১৯৩১এ কোম্পানি পলিটিক্যাল কমিশারদের নাম পাল্টে পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর বা রাজনৈতিক নির্দেশক রাখা হয়।

১১। সেনাবাহিনীর আংশিক ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থানীয় অত্যাচারীদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নীতি সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছিল। ঘাঁটি অঞ্চলের সম্প্রসারণ ও সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর সংগ্রহ করে সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করা হতো এবং তার প্রয়োজনও ছিল।

১২। এই সময় থেকে সমান-সমান নগদ টাকা দেওয়ার এই রীতিটি লালফৌজে বহু বছর চালু ছিল। পরে পর্যাদা অনুযায়ী সামান্য কিছু কমবেশি টাকা অফিসার ও সৈন্যদের দেওয়া হতো।

১৩। এখানে কমরেড মাও সে-তুঙ বিপ্লবী সেনাবাহিনীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন। কারণ, লালফৌজের প্রথম যুগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর জোর না দিলে যেসব কৃষকরা নতুন লাল-ফৌজে ভর্তি হতো, বা যেসব শ্বেত বাহিনীর বন্দী সৈন্যরা লালফৌজে যোগ দিত, তাদের মধ্যে বিপ্লবী উৎসাহ সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া যুদ্ধবাজদের প্রতিক্রিয়াশীল সেনাবাহিনীর কর্মধারা (যার প্রভাব আমাদের মধ্যেও মাঝে মাঝে দেখা দিত) দূর করাও সম্ভব হতো না। তবে সেনা-বাহিনীতে গণতন্ত্র সামরিক শৃঙ্খলার সীমা লঙ্ঘন নিশ্চয়ই করবে না। গণতন্ত্র সামরিক শৃঙ্খলাকে শক্তিশালীই করে, দুর্বল করে না। সুতরাং, প্রয়োজনীয় পরিমাণে যেমন গণতন্ত্রের প্রসার ঘটাতে হবে, তেমনি উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর অতি-গণতন্ত্রের দাবি নিশ্চিহ্নভাবে রুখতে হবে। লালফৌজের প্রথম যুগে একটা সময়ে এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে অতি-গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কমরেড মাও সে-তুঙের সংগ্রাম সম্বন্ধে জানার জন্য এই খণ্ডেই মুদ্রিত 'পার্টির ভিতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে' রচনাটি দেখুন।

১৪। ১৯২৬ এ উত্তরাভিযানের সময় কমরেড ইয়ে তিং একটি স্বাধীন রেজিমেণ্ট পরিচালনা করতেন। কমিউনিস্টদের নিয়ে এর কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল এবং এটি একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী হিসেবে খ্যাতিলাভ করে। বিপ্লবী সেনাবাহিনী উচাং দখল করার পর এটিকে সম্প্রসারিত করে ২৪নং ডিভিশনে পরিণত করা হয়, এবং নানচাং অভ্যুত্থানের পর এই ডিভিশনটিকে আবার একাদশ সেনাবাহিনীতে পরিবর্তিত করা হয়।

১৫। লালফৌজের পরবর্তী অভিজ্ঞতা এইটাই প্রমাণ করে যে, পার্টির

বাইরের লোক ও পার্টি-সদস্যের আনুপাতিক হার হওয়া উচিত ২ : ১। সাধারণভাবে এই অনুপাতিক হারটি লালফৌজে এবং পরবর্তী সময়ে গণ-মুক্তিফৌজে মেনে চলা হতো।

১৬। চিয়াং কাই-শেক এবং ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে প্রতিবিপ্লবী কুওমিনতাঙ সেনানায়কেরা চ্যাংশার ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন ও অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনগুলির প্রাদেশিক সদর দপ্তরগুলির ওপর আক্রমণ চালায় এবং কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষকদের দলে দলে গ্রেপ্তার ও হত্যা করে। এই ঘটনা ওয়াং চিং-ওয়েই এর নেতৃত্বাধীন উহান্ চক্র এবং চিয়াং কাই-শেকএর নেতৃত্বাধীন নানকিং চক্র—এই দুই প্রতিবিপ্লবী কুওমিনতাঙ চক্রের প্রকাশ্য সহযোগিতার সূত্রপাতকেই সূচিত করেছিল।

১৭। ১৯২৮এ হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলের ভূমি-সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা হচ্ছে সমস্ত জমি বাজেয়াপ্তকরণ ও পুনর্বণ্টন। পরে কমরেড মাও সে-তুঙ দেখিয়েছেন যে, কৃষি সংগ্রামে অনভিজ্ঞতার দরুণ, জমিদারদের জমির বদলে সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করা ভুল হয়েছিল। ১৯২৯এর এপ্রিলে, কিয়াংসীর সিংকুয়ো তালুকে যে ভূমি-আইন গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতে 'সমস্ত জমি বাজেয়াপ্তকরণ' করার ধারাটি বদলে 'সমস্ত সরকারী জমি ও জমিদারের জমি বাজেয়াপ্তকরণ'-এর ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

১৮। গ্রামাঞ্চলে মধ্যবর্তীশ্রেণীর সমর্থন লাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কমরেড মাও সে-তুঙ তাই এই শ্রেণীর সঙ্গে অতিরিক্ত কঠোর ব্যবহারের ভ্রান্তনীতি শুধরে দেন। বর্তমান প্রবন্ধটি ছাড়াও, এই শ্রেণীর প্রতি যে নীতি প্রায়োগ করা উচিত, সে সম্পর্কে কমরেড মাও সে-তুঙের মতামত লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেসে পেশ করা প্রস্তাবে (নভেম্বর, ১৯২৮) এবং 'বেপরোয়া গৃহদাহ ও হত্যা নিষিদ্ধ করা,' 'ছোটো ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করা' শীর্ষক প্রস্তাবেও দেওয়া আছে। ১৯২৯এর জানুয়ারী মাসে লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর ঘোষণা এবং ১৯২৯এর এপ্রিল মাসে গৃহীত সিংকুয়ো কাউন্টির ভূমি আইন (১৭নং টীকা দ্রষ্টব্য) ইত্যাদির মধ্যেও কমরেড মাও সে-তুঙের মতামত পাওয়া যাবে। চতুর্থ বাহিনীর উপরোক্ত ঘোষণায় বলা হয়েছিল: 'শহরে ব্যবসায়ীরা, যারা ধীরে ধীরে কিছু সম্পত্তি তৈরি করেছে, যতক্ষণ কর্তৃত্ব মেনে চলবে তাদের আয়ে হাত দেওয়া হবে না।'

১৯। বিপ্লবী যুদ্ধের প্রসার, বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলগুলির সম্প্রসারণ ও বিপ্লবী

সরকার কর্তৃক শিল্প ও বাণিজ্য রক্ষার নীতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছিল, এবং পরে অবস্থার পরিবর্তন সত্যিই ঘটেছিল। এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় যে, জাতীয় বুর্জোয়াদের শিল্প ও বাণিজ্যকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা এবং উগ্র বামপন্থী কর্মনীতিগুলির দৃঢ় বিরোধিতা করা হয়েছিল।

২০। ভূমি বণ্টনের জন্য শ্রমশক্তি উপযুক্ত মাপকাঠি নয়। লাল এলাকাগুলিতে মাথাপিছু সমানভাবে নতুন করে ভূমি বণ্টন করা হয়েছিল।

২১। শান্তি বাহিনী ছিল এক ধরনের স্থানীয় প্রতিবিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনী।

পার্টির ভিতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে

(ডিসেম্বর, ১৯২৯)

লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর কমিউনিস্ট পার্টি-সংগঠনে বিভিন্ন ধরনের অ-সর্বহারাসুলভ চিন্তাধারা বিরাজ করছে। পার্টির সঠিক লাইন অনুসরণে এটা খুবই বড় বাধার সৃষ্টি করছে। যদি সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে সংশোধন করা না হয়, তাহলে লালফৌজের চতুর্থ বাহিনী তার কাঁধে ন্যস্ত চীনের মহান বিপ্লবী সংগ্রামের কর্তব্যভার অবশ্যই বহন করতে পারবে না। পার্টির মূল ইউনিট-গুলির বিপুল-সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি কৃষক এবং অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়াদের থেকে উদ্ভূত লোকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। এখানেই নিহিত রয়েছে চতুর্থ বাহিনীর পার্টি-সংগঠনের ভিতরকার বিভিন্ন রকম ভুল চিন্তাধারার উৎস। কিন্তু, এইসব ভুল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থার ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় সংগ্রামের অভাব এবং পার্টি-সদস্যদের সঠিক লাইনে শিক্ষাদানের অভাব—এটাও এর অস্তিত্ব ও বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কেন্দ্রীয় কমিটির সেপ্টেম্বর মাসের

কমরেড মাও সে-তুঙ এই প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর নবম কংগ্রেসের একটি প্রস্তাব হিসাবে। চীনের গণফৌজ গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটি ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। চীনের লালফৌজ (জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় যা অষ্টম রুট বাহিনী এবং নতুন চতুর্থ বাহিনী হিসেবে এবং বর্তমানে গণমুক্তিফৌজ হিসেবে পরিচিত) সংগঠিত হয় ১৯২৭ সালের ১লা আগস্ট নানচাং অভ্যুত্থানের সময় এবং ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তার বয়স দু'বছর পেরিয়ে যায়। এই সময়ের মধ্যে নানা ধরনের ভুল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে লালফৌজের পার্টি-সংগঠন বিরাট শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করে। বর্তমান প্রস্তাবটি তারই সার-সংকলন। পুরোপুরি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর ভিত্তি করে লালফৌজকে গড়ে তুলতে এবং পুরানো ধরনের সেনাবাহিনীর প্রভাব নির্মূল করতে এই প্রস্তাবটি বিশেষভাবে সাহায্য করে। শুধু চতুর্থ বাহিনীতেই নয়, ক্রমান্বয়ে লালফৌজের অন্যান্য শাখাতেও এই প্রস্তাব কার্যকরী করা হয়, এবং এভাবে সমগ্র চীনা লালফৌজটিই সাচ্চা একটি গণফৌজে পরিণত হয়। পার্টির কাজ ও রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে গত ত্রিশ বছরে চীনের সশস্ত্র গণফৌজে প্রচণ্ড বিকাশ ঘটেছে, এবং বর্তমানে এ দুটি কাজকে আলাদা মনে হলেও, এই প্রস্তাবে বিধৃত মূল লাইন এখনও পর্যন্ত অপরিবর্তিতই আছে।

চিঠির মর্মবাণী অনুসারে এই কংগ্রেস চতুর্থ বাহিনীর পার্টি-সংগঠনের বিভিন্ন ধরনের অ-সর্বহারাসুলভ চিন্তাধারার অভিব্যক্তি, তার উৎস ও সংশোধন করার পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছে এবং সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য কমরেডদের কাছে আহ্বান জানিয়েছে।

নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে

লালফৌজের কোন কোন কমরেডের মধ্যে নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ খুবই বিকাশলাভ করেছে। এটা নিজেকে এইভাবে প্রকাশ করে।

(২) এইসব কমরেড সামরিক ব্যাপার ও রাজনীতিকে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে করেন এবং সামরিক ব্যাপার যে রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের অন্যতম যন্ত্র মাত্র, এ কথা তাঁরা অস্বীকার করেন। এমনকি, কেউ কেউ আরও বলেন, 'সামরিক ব্যাপারে ভাল হলে স্বভাবতই রাজনীতিতে ভাল হবে, সামরিক ব্যাপারে ভাল না হলে রাজনীতিতেও ভাল হতে পারে না।' এইভাবে তাঁরা আরও দূরে চলে গেছেন, তাঁদের মতে সামরিক ব্যাপার রাজনীতির উপর নেতৃত্ব করে।

(২) তাঁরা মনে করেন যে, শ্বেত বাহিনীর মতো লালফৌজেরও কর্তব্য হচ্ছে কেবলমাত্র যুদ্ধ করা। তাঁরা এ কথা জানেন না যে, চীনা লালফৌজ হচ্ছে বিপ্লবের রাজনৈতিক কর্তব্য পালনের জন্য একটা সশস্ত্র বাহিনী। বিশেষ করে বর্তমানে, লালফৌজ যে কেবলমাত্র যুদ্ধই করে, তা অবশ্যই নয়। শত্রুর সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য লড়াই করা ছাড়াও জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালানো, জনসাধারণকে সংগঠিত করা, তাঁদের সশস্ত্র করা এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ও পার্টি-সংগঠন স্থাপনের কাজে তাঁদের সাহায্য করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকেও এর কাঁধে তুলে নিতে হবে। নিছক লড়াই করার জন্যই লালফৌজ লড়াই করে না, পরন্তু লড়াই করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালানোর জন্য, জনসাধারণকে সংগঠিত করার জন্য, তাঁদেরকে সশস্ত্র করার জন্য এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে তাঁদের সাহায্য করার জন্য। এইসব উদ্দেশ্য ছাড়া লড়াই হয়ে ওঠে অর্থহীন, আর লালফৌজের অস্তিত্বেরও কোন তাৎপর্য থাকে না।

(৩) তাই, সাংগঠনিক দিক দিয়ে, এইসব কমরেডরা লালফৌজের রাজনৈতিক কার্যনির্বাহক সংস্থাগুলিকে সামরিক কার্যনির্বাহক সংস্থাগুলির

অধীনে স্থান দেন এবং তাঁরা এই শ্লোগান তোলেন যে, 'সৈন্যবাহিনীর সদর দপ্তরকেই বাইরের কার্য পরিচালনার ভার দেওয়া হোক।' এই ধরনের চিন্তাধারা যদি বাড়তে দেওয়া হয়, তাহলে, তা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার বিলই ডেকে আনবে, ডেকে আনবে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে যাবারই বিপদ —এটা হবে সেই যুদ্ধবাজদের পথ অনুসরণ করার মতো, যে পথ কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী অনুসরণ করছে।

(৪) সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা প্রচারকার্যের ক্ষেত্রে প্রচার-টিমের গুরুত্বও উপেক্ষা করেন। জনসাধারণের সংগঠনের প্রশ্নে তাঁরা সৈন্যবাহিনীতে সৈনিক-সমিতি সংগঠিত করার কাজ এবং স্থানীয় শ্রমিক ও কৃষকসাধারণকে সংগঠিত করার কাজ উপেক্ষা করে চলেন। ফলে, প্রচার এবং সাংগঠনিক কাজ সবই বাতিল হয়।

(৫) কোন যুদ্ধে জিতলেই তাঁরা অহংকারী হয়ে ওঠেন, আর যুদ্ধে হারলে হয়ে পড়েন হতাশ।

(৬) স্ববিভাগীয়বাদ—তাঁরা শুধু চতুর্থ বাহিনীর কথাই চিন্তা করেন এবং এ কথা তাঁরা জানেন না যে, স্থানীয় জনসাধারণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করাটা লালফৌজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এটা হচ্ছে ক্ষুদে-দলবাদেরই এক বর্ধিত রূপ।

(৭) কিছু কমরেড চতুর্থ বাহিনীর সংকীর্ণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে মনে করেন যে, এ ছাড়া আর কোন বিপ্লবী শক্তির অস্তিত্ব নেই। তাই, নিজেদের শক্তি বজায় রাখার এবং সংগ্রামকে এড়িয়ে যাবার চিন্তা এঁদের খুবই প্রবল। এটা সুবিধাবাদেরই অবশেষ।

(৮) বিষয়ীগত এবং বিষয়গত অবস্থাকে উপেক্ষা করে কিছু কিছু কমরেড বিপ্লবের তাড়াহুড়ার ব্যাধিতে ভোগেন, জনসাধারণের মধ্যে কঠোরভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাজ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক, মোহাবিষ্ট হয়ে তাঁরা শুধু বড় বড় কাজ করতেই চান। এটা হচ্ছে অন্ধক্রিয়াবাদেরই অবশেষ।[১]

নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণের উৎস হল :

(১) নীচু রাজনৈতিক মান। তার ফলে সৈন্যবাহিনীতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা এবং লালফৌজ ও শ্বেত বাহিনীর মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য উপলব্ধি করতে না পারা।

(২) ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর মনোবৃত্তি। বিগত যুদ্ধগুলোতে ধৃত বহু বন্দী সৈন্য লালফৌজে যোগ দিয়েছে, এই ধরনের ব্যক্তিরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর প্রবল মনোবৃত্তি। তার ফলেই, নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণের ভিত্তি রচিত হয়েছে নিম্নস্তরে।

(৩) উপরোক্ত কারণ দুটি থেকেই উদ্ভূত হয় তৃতীয় কারণ, সেটা হল সামরিক শক্তির উপর অতি-বিশ্বাস এবং জনসাধারণের শক্তির উপর অবিশ্বাস।

(৪) পার্টি সামরিক কাজের প্রতি সক্রিয়ভাবে নজর দেয়নি এবং তা আলোচনা করেনি, কিছু কিছু কমরেডদের নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণের উৎপত্তির সেটাও একটা কারণ।

সংশোধনের পদ্ধতি :

(১) শিক্ষার মাধ্যমে পার্টির ভিতরে রাজনৈতিক মান উন্নত করা, নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণের তাত্ত্বিক উৎস নির্মূল করা এবং লালফৌজ ও শ্বেত বাহিনীর মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যকে স্পষ্ট করা। সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাবাদের ও অন্ধক্রিয়াবাদের অবশেষ নির্মূল করা, চতুর্থ বাহিনীর স্ববিভাগীয়বাদকে ভেঙে দেওয়া।

(২) অফিসার ও সৈনিকদের রাজনৈতিক ট্রেনিং, বিশেষ করে প্রাক্তন যুদ্ধবন্দীদের শিক্ষাদান জোরদার করে তোলা। সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব, লালফৌজে ভর্তির জন্য সংগ্রামে অভিজ্ঞ শ্রমিক-কৃষককে স্থানীয় সরকার কর্তৃক বাছাই করা। এইভাবে, নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণের উৎস সাংগঠনিকভাবে দুর্বল করা, এমকি নিশ্চিহ্ন করা।

(৩) লালফৌজের পার্টি-সংগঠনকে সমালোচনা করার জন্য স্থানীয় পার্টি-সংগঠনকে উদ্বুদ্ধ করা এবং লালফৌজকে সমালোচনা করার জন্য জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলোকে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে লালফৌজের পার্টি-সংগঠন এবং অফিসার ও সৈনিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়।

(৪) সামরিক কাজের প্রতি পার্টিকে সক্রিয়ভাবে নজর দিতে হবে এবং সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। সমস্ত কাজ সৈন্যসাধারণের মাধ্যমে কার্যকরী করার পূর্বে সে সম্পর্কে পার্টিতে আলোচনা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

(৫) লালফৌজের জন্য এমন সব নিয়মকানুন রচনা করা, যার মধ্য দিয়ে তাদের কর্তব্য স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয়, স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয় লালফৌজের

সামরিক কাজের ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কাজের ব্যবস্থার মধ্যেকার সম্পর্ক, লাল-ফৌজ আর জনসাধারণের মধ্যেকার সম্পর্ক; স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয় সৈনিক-সমিতিগুলোর ক্ষমতা আর সামরিক ও রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক।

উগ্র-গণতন্ত্র সম্পর্কে

লালফৌজের চতুর্থ বাহিনী কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ মেনে নেবার পর, উগ্র-গণতন্ত্রের অভিব্যক্তি অনেক কমে গেছে। যেমন, এখন পার্টির সিদ্ধান্ত অপেক্ষাকৃতভাবে কার্যকরী করা হচ্ছে, লালফৌজের ভেতরে তথাকথিত 'নিচুতলা থেকে উপরতলা পর্যন্ত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা' প্রয়োগ করা হোক এবং 'নিম্নতর স্তরে প্রথমে সব বিষয়ে আলোচিত হোক, তারপর উচ্চতর স্তরে-সিদ্ধান্ত গৃহীত হোক' ইত্যাদি ভুল দাবি আর কেউ উত্থাপন করেন না। কিন্তু আসলে, এই ধরনের কমে যাওয়াটা শুধু সাময়িক ও বাহ্যিক অভিব্যক্তি, এর অর্থ এই নয় যে, উগ্র-গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে ইতিমধ্যেই নির্মূল করা হয়েছে। অন্য কথায়, উগ্র-গণতন্ত্রের মূল এখনো বহু কমরেডের মনে গভীরভাবে বাসা বেঁধে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সিদ্ধান্তগুলো কার্যকরী করতে বিভিন্ন ধরনের নিমরাজীমূলক মনোভাবের প্রকাশই এর প্রমাণ।

সংশোধনের পদ্ধতি :

(১) তত্ত্বের ক্ষেত্রে উগ্র-গণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করা। প্রথম, এটা দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, উগ্র-গণতন্ত্রের বিপদ হচ্ছে পার্টি-সংগঠনের ক্ষতি করা, এমনকি তার পুরোপুরি সর্বনাশ করা এবং পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে দুর্বল করা, এমনকি তার পুরোপুরি ধ্বংসসাধন করা, পার্টিকে তার সংগ্রামের দায়িত্ব বহন করতেও অক্ষম করে তোলা, এর ফলে, বিপ্লবের পরাজয়ই ডেকে আনা হয়। দ্বিতীয়, এটা দেখিয়ে দেওয়া উচিত যে, উগ্রগণতন্ত্রের উৎস রয়েছে পেটি-বুর্জোয়াদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উচ্ছৃঙ্খলতায়। এটাকে পার্টির ভেতরে টানলেই, তা রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে উগ্র-গণতান্ত্রিক ভাবধারায় রূপলাভ করে। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী কর্তব্যের সঙ্গে এই ভাবধারা একেবারেই অসংগতিপূর্ণ।

(২) সাংগঠনিক ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীভূত পরিচালনায় গণতান্ত্রিক জীবন সুনিশ্চিত করা। তার লাইন হচ্ছে নিম্নরূপ :

(১) পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থার নির্ভুল পরিচালনার লাইন থাকতে হবে এবং সমস্যা দেখা দিলেই তা সমাধানের উপায় বের করতে হবে যাতে করে নিজেদেরকে নেতৃত্বের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

(২) উচ্চতর সংস্থাকে নিম্নতর সংস্থার অবস্থা ও জনসাধারণের জীবনের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকতে হবে, যাতে করে সঠিক পরিচালনার বাস্তব ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে।

(২) পার্টির সকল স্তরের সংস্থারই বিবেচনাহীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, অবশ্যই তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতে হবে।

(৪) উচ্চতর সংস্থার যেসব সিদ্ধান্ত কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোকে অবশ্যই নিম্নতর সংস্থায় এবং পার্টি-সদস্যসাধারণের কাছে দ্রুত পৌঁছে দিতে হবে। তার পদ্ধতি হচ্ছে সক্রিয় ব্যক্তিদের সভা, অথবা পার্টি-শাখার সভা, এমনকি, কলামের[২] পার্টি-সদস্যদের সভাও (যখন-অবস্থানুসারে সম্ভব) ডাকতে হবে, সে রকম সভায় রিপোর্ট প্রদানের জন্য লোক পাঠাতে হবে।

(৫) পার্টির নিম্নতর সংস্থাগুলোকে ও পার্টি-সদস্যসাধারণকে উচ্চতর সংস্থার নির্দেশাদির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করতে হবে, যাতে করে এর তাৎপর্য তাঁরা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেন এবং তা পালন করার পদ্ধতি স্থির করতে পারেন।

সাংগঠনিক শৃঙ্খলা উপেক্ষা করার দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে

চতুর্থ আর্মির পার্টি-সংগঠনে সংগঠনিক শৃঙ্খলাকে উপেক্ষা করার দৃষ্টিকোণ নিম্নলিখিতভাবে অভিব্যক্ত হয়:

(ক) সংখ্যাগরিষ্ঠকে সংখ্যালঘিষ্ঠের মেনে না নেওয়া। যেমন, যখন সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়, তখন তাঁরা আন্তরিকভাবে পার্টির সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করেন না।

সংশোধনের পদ্ধতি:

(১) সভায় সকল যোগদানকারীকেই তাঁদের অভিমত যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। বিতর্কের প্রশ্নে কোন্‌টা ঠিক,

কোন্‌টা বেঠিক, তা পরিষ্কার করে দিতে হবে, সেখানে কোন আপোষ বা এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছাতে যদি একটি সভায় না পারা যায় তাহলে পরের সভায় আবার তা আলোচনা করতে হবে, অবশ্যই তাতে যদি কাজ ব্যাহত না হয়।

(২) পার্টির অন্যতম শৃঙ্খলা হল সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অধীনতা মেনে চলবে। সংখ্যালঘুর মতামত যদি বাতিল করা হয়, তাহলে সংখ্যাগুরুর গৃহীত সিদ্ধান্তকে তাঁদের অবশ্যই সমর্থন করতে হবে। প্রয়োজন হলে পরবর্তী সভায় তা আলোচনার জন্য পুনরায় পেশ করা যেতে পারে, এ ছাড়া কার্যকলাপে কোনরকম আপত্তিই প্রকাশ করা উচিত নয়।

(থ) সাংগঠনিক শৃঙ্খলার উপেক্ষামূলক সমালোচনা:

(১) পার্টির ভেতরকার সমালোচনা হচ্ছে পার্টির সংগঠনকে সুদৃঢ় করার ও পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে বৃদ্ধি করার একটা হাতিয়ার। কিন্তু লালফৌজের পার্টির ভেতরকার সমালোচনা যে সব সময়েই এই প্রকৃতির হয় তা নয়, কোন কোন সময় তা ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত হয়। তার ফলে, শুধুমাত্র ব্যক্তি-বিশেষেরই নয়, বরং পার্টির সংগঠনেরও সর্বনাশ হয়। এটা হচ্ছে পেটি-বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অভিব্যক্তি। শোধরানোর পদ্ধতি হচ্ছে পার্টি-সদস্যদের বোঝানো যে, সমালোচনার উদ্দেশ্য হল শ্রেণী-সংগ্রামে জয়লাভের জন্য পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে বাড়ানো; আর সমালোচনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

(২) বহু পার্টি-সদস্য তাঁদের সমালোচনা পার্টির ভেতরে করেন না, করেন পার্টির বাইরে। এর কারণ হচ্ছে যে, সাধারণ পার্টি-সদস্যরা পার্টি-সংগঠনের (পার্টির সভা ইত্যাদির) গুরুত্ব এখনও বোঝেননি, তাঁরা মনে করেন যে, সংগঠনের বাইরে বা ভেতরে সমালোচনা করায় কোন পার্থক্য নেই। শোধ-রানোর পদ্ধতি হচ্ছে পার্টি-সদস্যদের শিক্ষা দেওয়া, যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন পার্টি-সংগঠনের গুরুত্ব এবং বুঝতে পারেন যে, পার্টি-কমিটি বা কমরেডদের সমালোচনা পার্টির সভায় করা উচিত।

নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদ সম্পর্কে

লালফৌজে নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদ এক সময়ে অত্যন্ত গুরুতরভাবে বিকাশলাভ করেছিল। যেমন, আহত সৈনিকদের ভাতা দেবার ব্যাপারে

সামান্য আহত ও গুরুতররূপে আহতদের মধ্যে পার্থক্য করার বিরোধিতা করে সকলের জন্য সমান ভাতা দেবার দাবি উত্থাপন করা হতো। যখন অফিসারেরা ঘোড়ায় চড়ে যেত, তখন সেটাকে তাদের কর্তব্য সম্পাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে না দেখে তাকে বরং অসাম্যের নিদর্শন হিসেবে দেখা হতো। সকলের মধ্যে একেবারে সমানভাবে দ্রব্য বণ্টন করার দাবি করা হতো। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি জিনিস বণ্টনে অনিচ্ছা প্রকাশ করা হতো। চাল বহন করার ব্যাপারে দাবি উঠত যে, প্রত্যেককেই সমান ওজনের বোঝা বহন করতে হবে, তা তার বয়স বা শারীরিক সামর্থ্য যাই হোক না কেন। সৈন্যদের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে সমানাধিকার দাবি করা হতো, সদর দপ্তর কিছুটা বড় ঘর নিলে তাকে গালি দেওয়া হতো। সৈন্যদের নিয়মিত কাজ ব্যতীত যে বিভিন্ন কাজকর্ম করতে দেওয়া হয়, সে কাজ নির্দিষ্ট করার ব্যাপারেও সমানধিকার দাবি করা হতো এবং অপরের চেয়ে সামান্য বেশি কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করা হতো। এমনকি, যখন আহত ব্যক্তির সংখ্যা দুই, কিন্তু স্ট্রেচারের সংখ্যা এক, তখন কাউকেই বহন করা যেত না, কারণ, তারা একজনকে নিয়ে যাওয়ার চাইতে দুজনের না যাওয়াটাই পছন্দ করত। এতে প্রমাণিত হয় যে, লালফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে নিরঙ্কুশ সামানাধিকারবাদ এখনো গুরুতররূপে বিরাজমান।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উগ্র-গণতন্ত্রের মতোই, নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদের উৎস হচ্ছে হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র কৃষি-অর্থনীতির ফল। পার্থক্য শুধু এই যে, একটিকে দেখা যায় রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে, অপরটিকে দেখা যায় বৈষয়িক জীবনের ক্ষেত্রে।

সংশোধনের পদ্ধতি: এটা দেখিয়ে দিতে হবে যে, পুঁজিবাদের অবসানের আগে নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদ কেবল কৃষক অন্যান্য ছোট ছোট মালিকদের একটি মোহ মাত্র, এমনকি, সমাজতন্ত্রের কালেও তথাকথিত নিরঙ্কুশ সমানাধিকার নিশ্চয়ই থাকবে না। কারণ, তখনও বৈষয়িক জিনিসগুলোর বণ্টন 'প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ, আর কাজ অনুযায়ী পাওনার' নীতি এবং কাজের প্রয়োজন অনুসারে করতে হবে। লালফৌজের লোকজনদের বৈষয়িক জিনিসগুলোর বণ্টন প্রায় সমানভাবেই হওয়া উচিত—যেমন, অফিসার ও সৈনিকদের সমান বেতন—কারণ, বর্তমান সংগ্রামের অবস্থায় এটা প্রয়োজন। কিন্তু সম্পূর্ণ বিচার-বিবেচনাহীন নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদের

অবশ্যই বিরোধিতা করতে হবে, কারণ, সংগ্রামের জন্য এটার প্রয়োজন নেই, বরং এটা সংগ্রামকে ব্যাহত করে।

আত্মমুখিনতাবাদ সম্পর্কে

আত্মমুখিনতাবাদ কোন কোন পার্টি-সদস্যদের মধ্যে গুরুতরভাবে বিরাজ করছে। এটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণের পক্ষে ও কাজের পরিচালনার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির আত্মমুখীন বিশ্লেষণ এবং কাজের আত্মমুখীন পরিচালনার অনিবার্য ফল, হয় সুবিধাবাদ, না হয় অন্ধক্রিয়াবাদ। পার্টির ভেতরে আত্মমুখী সমালোচনা, ভিত্তিহীন আজেবাজে কথাবার্তা বা পরস্পরের প্রতি সন্দেহ প্রায়ই পার্টির ভেতরে নীতিহীন বিরোধের সৃষ্টি করে এবং পার্টি-সংগঠনের ক্ষতি করে।

পার্টির ভেতরকার সমালোচনার সমস্যা সম্পর্কে আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত তা হচ্ছে এই যে, কোন কোন কমরেড সমালোচনা করার সময় বড় বড় বিষয়ের উপর মনোযোগ না দিয়ে কেবলমাত্র ছোটখাট বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেন। তাঁরা বোঝেন না যে, সমালোচনার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়ে দেওয়া। ব্যক্তিগত ত্রুটির ব্যাপারে, যদি রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুল-ভ্রান্তির সঙ্গে তা জড়িত না হয়, তাহলে ছিদ্রানুসন্ধানের কোন দরকার নেই। অন্যথায়, কমরেডরা হতভম্ব হয়ে পড়বেন। অধিকন্তু, এ ধরনের সমালোচনা যদি একবার শুরু হয়, তাহলে পার্টির ভেতরের মনোযোগ শুধু ছোটখাট ত্রুটির উপরেই কেন্দ্রীভূত হবে এবং প্রত্যেকেই ভীরু ও অতি সাবধানী ভদ্রলোক হয়ে পড়বেন, আর ভুলে যাবেন পার্টির রাজনৈতিক কর্তব্য। এটা খুবই বিপজ্জনক।

সংশোধনের পদ্ধতি: প্রধানতঃ পার্টি-সদস্যদেরকে শিক্ষা দেওয়া, যাতে পার্টি-সদস্যদের চিন্তাধারা ও পার্টির ভেতরকার জীবন রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত হয়। এই উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য আমাদের নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে: (১) আত্মমুখীন বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার বদলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পদ্ধতি দিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও শ্রেণী-শক্তির মূল্যায়ন করতে পার্টি-সদস্যদের শিক্ষা দিতে হবে। (২) সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনুসন্ধান এবং পর্যালোচনার দিকে পার্টি-সদস্যদের মনোযোগী করে তুলতে হবে, যাতে তাঁরা এর ভিত্তিতে সংগ্রামের কৌশল ও

কাজের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারেন। কমরেডদের বুঝতে দিতে হবে যে বাস্তব অবস্থার অনুসন্ধান ছাড়া তাঁরা কল্পনা ও অন্ধক্রিয়ার গভীর গর্তে পতিত হবেন। (৩) পার্টির ভেতরকার সমালোচনায় আত্মমুখিনতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও সমালোচনার নামে ইতরামির বিরুদ্ধে সতর্ক হতে হবে, কথা বলার সময় তথ্যভিত্তিক হতে হবে এবং সমালোচনার রাজনৈতিক দিকের উপর মনোযোগ দিতে হবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সম্পর্কে

লালফৌজের পার্টি-সংগঠনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ঝোঁকের বিভিন্ন অভিব্যক্তি নিম্নরূপ :

(১) প্রতিশোধবাদ। পার্টির ভেতরে কোন সৈনিক কমরেডের দ্বারা সমালোচিত হবার পর, কিছু কিছু লোক পার্টির বাইরে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। প্রহার করা বা গালিগালাজ করা তাঁদের প্রতিশোধ নেবার অন্যতম পথ। পার্টির ভেতরেও তাঁরা প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। 'এই সভায় তুমি আমার বিরুদ্ধে বলেছ, তাই, পরের সভায় এর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি তোমার ছিদ্রানুসন্ধান করবই।' এই ধরনের প্রতিশোধবাদ উদ্ভূত হয় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে। এটা শ্রেণীর স্বার্থকে ও সমগ্র পার্টির স্বার্থকে উপেক্ষা করে। এর লক্ষ্য শত্রুশ্রেণীর বিরুদ্ধে নয়, বরং নিজেদের বাহিনীর মধ্যেকার ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে। এটা ক্ষয়কারী, এতে পার্টি-সংগঠন ও সংগ্রামী শক্তি দুর্বল হয়।

(২) 'ক্ষুদে দলবাদ'। কিছু কিছু কমরেড শুধু তাঁদের নিজস্ব ক্ষুদে দলের স্বার্থের প্রতি মনোযোগ দেন, সামগ্রিক স্বার্থকে উপেক্ষা করেন। ভাসাভাসাভাবে দেখতে গেলে, এটা ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের জন্য নয়, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এর ভিতরেই নিহিত রয়েছে সংকীর্ণতম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। একইভাবে, এটা অত্যন্ত ক্ষতিকারক ও বিকেন্দ্রিক। 'ক্ষুদে দলবাদ' দীর্ঘকাল পর্যন্ত লালফৌজে প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। সমালোচনার ফলে তা এখন কিছুটা ভাল হয়েছে, কিন্তু এর অবশেষ এখনো রয়ে গেছে, এবং এটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আরও চেষ্টা করা দরকার।

(৩) 'ভাড়াটে লোকের' মনোবৃত্তি। কিছু কিছু কমরেড এটা উপলব্ধি করেন না যে, পার্টি ও লালফৌজ উভয়ই হচ্ছে বিপ্লবের কর্তব্য সাধনের

হাতিয়ার, আর তাঁরা নিজেরা হচ্ছেন তার সদস্য। তাঁরা একথা উপলব্ধি করেন না যে, তাঁরা নিজেরাই হচ্ছেন বিপ্লবের স্রষ্টা। তাঁরা মনে করেন যে, কেবলমাত্র তাঁদের নিজ নিজ উপরওয়ালাদের প্রতিই তাঁদের দায়িত্ব আছে, বিপ্লবের প্রতি তাঁদের কোন দায়িত্ব নেই। বিপ্লবের কাজে এই ধরনের নিষ্ক্রিয় ভাড়াটে মনোবৃত্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একটা অভিব্যক্তিও বটে। বিপ্লবের জন্য শর্তহীনভাবে প্রচেষ্টা চালাবার মতো সক্রিয় ব্যক্তি কেন বেশি করে পাওয়া যায় না, এই ধরনের মনোবৃত্তি তার একটা কারণ। এ মতাদর্শ যদি নির্মূল না হয়, তাহলে, সক্রিয় ব্যক্তির সংখ্যা বাড়বে না, বিপ্লবের গুরুভার আগাগোড়াই অল্পসংখ্যক লোকের কাঁধে থেকে যাবে এবং তাতে সংগ্রামের অত্যন্ত ক্ষতি হবে।

(৪) ভোগবাদ। লালফৌজেও বেশ কিছু লোক আছেন যাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ভোগবিলাসের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়। তাঁরা সব সময়েই আশা করেন যে, তাঁদের বাহিনী বড় বড় শহরে যাবেন। তাঁরা যে শহরে কাজ করার জন্য যেতে চান তা নয়, বরং ভোগবিলাসের জন্যই যেতে চান। লাল এলাকা—যেখানে জীবনযাত্রা কঠোর, সেখানে কাজ করতে তাঁরা সবচেয়ে বেশি অনিচ্ছুক।

(৫) নিষ্ক্রিয়তা। কোন কিছু যখন তাঁদের ইচ্ছার সঙ্গে খাপ খায় না, তখন কিছু কিছু কমরেড নিষ্ক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং কাজ বন্ধ করে দেন। এটা ঘটে প্রধানতঃ শিক্ষার অভাবে। আবার কখনো কখনো এটা ঘটে সমস্যার সমাধান করার, কাজ বণ্টন করার অথবা শৃঙ্খলা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালকদের অনুপযুক্ততা থেকে।

(৬) সৈন্যদল ত্যাগ করার মতাদর্শ। সৈন্যদল ত্যাগ করে স্থানীয় কাজে বদলী হয়ে যাবার জন্য আবেদন জানায়, এমন লোকের সংখ্যা লালফৌজে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ যে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত তা নয়, এর কারণ নিহিত রয়েছে অন্যত্র। প্রথমতঃ, লালফৌজের বাস্তব জীবনযাত্রার কষ্ট; দ্বিতীয়তঃ, দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রামজনিত ক্লান্তি; এবং তৃতীয়তঃ, সমস্যার সমাধান করার, কাজ বণ্টন করার, অথবা শৃঙ্খলা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালকদের অনুপযুক্ততা, ইত্যাদি।

সংশোধনের পদ্ধতি হল প্রধানতঃ শিক্ষার কাজকে সুদৃঢ় করা, যাতে মতাদর্শগত ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সংশোধন করা যায়। পরে, উপযুক্ত-

ভাবে সমস্যার সমাধান করা, কাজ বণ্টন করা এবং শৃঙ্খলা পালন করা। এর সঙ্গে সঙ্গে লালফৌজের বৈষয়িক জীবনযাত্রার উন্নতি করার পথ খুঁজে বের করা এবং বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির জন্য বিশ্রাম ও পুনর্বাসনের জন্য প্রতিটি সম্ভাব্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। শিক্ষাদানের সময়ে এ কথা অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সামাজিক উৎস হল পার্টির অভ্যন্তরে পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রতিফলন।

ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীদের মতাদর্শ সম্পর্কে

লালফৌজে ভবঘুরে ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক বেশি, এবং সারা দেশে, বিশেষ করে দক্ষিণের বিভিন্ন প্রদেশে, প্রচুর ভবঘুরে রয়েছে বলেই লালফৌজে ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ গজিয়ে উঠেছে। এই ধরনের মতাদর্শের অভিব্যক্তি নিম্নরূপ: (১) কিছু কিছু লোক ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার ও জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার দুরূহ কাজ করতে এবং তার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে ইচ্ছুক নন, বরং শুধু ভ্রাম্যমাণ গেরিলা কার্যকলাপের পদ্ধতিতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে আগ্রহী। (২) লালফৌজের প্রসারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু লোক স্থানীয় লালরক্ষী বাহিনী ও স্থানীয় লালফৌজ বৃদ্ধি করার ভেতর নিয়মিত লালফৌজকে বাড়িয়ে তোলার লাইন অনুসরণ করেন না, বরং, 'সৈন্য ভাড়া করার ও ঘোড়া কেনার' এবং 'দলত্যাগীদের নিয়োগ করার ও বিদ্রোহীদের নিজেদের বাহিনীতে ভর্তি করার'[৩] লাইন অনুসরণ করেন। (৩) কিছু কিছু লোকের জনসাধারণের সঙ্গে থেকে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাবার ধৈর্য নেই, তাঁরা শুধু বেপরোয়া পান-ভোজের জন্য বড় বড় শহরে যেতে চান। এইসব ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীদের মতাদর্শের অভিব্যক্তি সঠিক কর্তব্য পালনে লালফৌজকে প্রবলভাবে বাধা দিচ্ছে। তাই, ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীদের মতাদর্শ নির্মূল করাটা বাস্তবিকই লালফৌজের পার্টি-সংগঠনের ভিতরকার সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এ কথা বুঝতে হবে, হুয়াং ছাও[৪] অথবা লী ছুয়াং[৫] ধরনের ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদ আজকের অবস্থায় চলতে পারে না।

সংশোধনের পদ্ধতি হল নিম্নরূপ:

(১) শিক্ষাদানের কাজ জোরদার করা, বেঠিক মতাদর্শের সমালোচনা করা এবং ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদকে নির্মূল করা।

(২) ভবঘুরে চেতনা প্রতিহত করার জন্য লালফৌজের মূল অংশের মধ্যে এবং নতুন বন্দী সৈন্যদের মধ্যে শিক্ষাদানের কাজ জোরদার করে তোলা।

(৩) লালফৌজের গঠন পরিবর্তন করার জন্য সংগ্রামের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সক্রিয় শ্রমিক ও কৃষকদের লালফৌজে টেনে আনা।

(৪) ব্যাপক জঙ্গী শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে থেকে লালফৌজের নতুন ইউনিট গড়ে তোল।

অন্ধক্রিয়াবাদের অবশেষ সম্পর্কে

লালফৌজের পার্টি-সংগঠনে এর আগে অন্ধক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো হলেও এখানো পর্যন্ত তা যথেষ্ট হয়নি। ফলে, অন্ধক্রিয়াবাদের মতাদর্শের অবশেষ এখনো লালফৌজে রয়ে গেছে। তাদের অভিব্যক্তিগুলি নিম্নরূপ: (১) আত্মমুখীন ও বাস্তব অবস্থা বিচার-বিবেচনা না করে অন্ধভাবে কাজ করা; (২) শহরে পার্টির কর্মনীতি অপর্যাপ্তভাবে ও অসংলগ্নভাবে কার্যকরী করা; (৩) সামরিক শৃঙ্খলা ঢিলে করা, বিশেষ করে পরাজয়ের মুহূর্তে; (৪) কোন কোন ইউনিট কর্তৃক ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া; এবং (৫) পলাতক সৈন্যদের গুলি করে হত্যা করা এবং দৈহিক শাস্তি দেওয়া—এগুলিও অন্ধ ক্রিয়াবাদেরই চরিত্রবিশিষ্ট। অন্ধক্রিয়াবাদের সামাজিক উৎস হচ্ছে **ভবঘুরে** সর্বহারা মতাদর্শ এবং পেটি-বুর্জোয়া মতাদর্শের সংমিশ্রণ।

সংশোধনের পদ্ধতি হল:

(১) মতাদর্শগতভাবে অন্ধক্রিয়াবাদকে নির্মূল করা।

(২) নিয়মকানুন ও নীতির মাধ্যমে অন্ধক্রিয়ামূলক আচরণের সংশোধন করা।

টীকা

১। ১৯২৭ সালের বিপ্লবে পরাজয়ের পর স্বল্পকালের জন্য কমিউনিস্ট পার্টিতে একটি 'বাম' অন্ধক্রিয়াবাদের ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। চীনা বিপ্লবকে 'স্থায়ী বিপ্লব' এবং চীনের বিপ্লবী পরিস্থিতিকে 'স্থায়ী অভ্যুত্থান' হিসেবে চিহ্নিত করে অন্ধক্রিয়াবাদী কমরেডরা সুশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণকে সংগঠিত করতে অস্বীকার করে, এবং আদেশ দেওয়ার রীতিকে অনুসরণ ও মাত্র অল্প সংখ্যক

পার্টি-সদস্য আর জনগণের একটা ক্ষুদ্র অংশের ওপর আস্থা রেখে সারা দেশে ধারাবাহিক স্থানীয় অভ্যুত্থান ঘটাবার ভ্রান্ত চেষ্টা করে—যার জয়লাভের কোন আশাই ছিল না। ১৯২৭-এর শেষ দিকে এই ধরনের অন্ধক্রিয়াবাদী কার্য-কলাপ ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে, কিন্তু ১৯২৮-এর শুরু থেকে ধীরে ধীরে কমতে থাকে, যদিও কিছু কমরেডের মধ্যে তখনো অন্ধক্রিয়াবাদের প্রতি ভাবাবেগ ছিল।

২। গেরিলা সংগঠনরীতিতে কলাম হল নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর একটি ডিভিশনের মতোই, যার সঙ্গে থাকে একটা পরিপূরক যা নিয়মিত ডিভিশনের পরিপূরক থেকে আরও নমনীয় এবং সাধারণভাবে আরও ছোট।

৩। চীনা ইতিহাসে কিছু বিদ্রোহী তাদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল এই দুটি চীনা প্রবাদে তাই বোঝান হচ্ছে।

৪। তাং রাজবংশের শেষ দিকের কৃষক-বিদ্রোহীদের একজন নেতা হলেন হুয়াং চাও। ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নিজের জেলা সাওচৌ (এখন সান্তুং-এর হোৎসে কাউন্টি) থেকে আরম্ভ করে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষকদের সফল যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে হুয়াং নিজেকে 'স্বর্গ-কাঁপানো সর্বাধিনায়ক' বলে জাহির করে। দশ বছরের মধ্যে তিনি ইয়েলো, ইয়াংৎসে, হুয়াই ও পার্ল নদী-উপত্যকার অধিকাংশ প্রদেশ দখল করেন এবং কোয়াংসী পর্যন্ত অগ্রসর হন। সবশেষে তিনি তুংকুয়ান গিরিপথ অতিক্রম করে চাংগান-এর (বর্তমান শেনসীর সিয়ন) রাজধানী দখল করেন এবং চি-এর সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হন। আভ্যন্তরীণ বিবাদ এবং তাং শক্তির অ-হান উপজাতি মিত্রদের আক্রমণে হুয়াং চাংগান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন, এবং নিজের জেলায় ফিরে গিয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর দশ বছরের যুদ্ধ পরিচালনা চীন দেশের ইতিহাসে কৃষক যুদ্ধসমূহের মধ্যে অন্যতম। রাজবংশীয় ঐতিহাসিকরা বলেন, 'অতিরিক্ত করভার এবং লেভির দ্বারা জর্জরিত সব মানুষই তাঁর পিছনে সমবেত হয়েছিলেন।' কিন্তু যেহেতু তুলনামূলকভাবে সংগঠিত মূল এলাকা সৃষ্টি না করেই মূলতঃ চলমান যুদ্ধনীতি অনুসরণ করেন সেইহেতু তাঁর দলকে বলা হত 'চলমান বিদ্রোহী দল'।

৫। লি চুয়াং, লি জু-চেং দি কিং চুয়াং (দি দারে-অল কিং)-এর সংক্ষিপ্ত নাম। উত্তর শেনসীর মিচি এলাকার একজন অধিবাসী ছিলেন লি চুয়াং। যে কৃষক বিদ্রোহ মিং রাজবংশের পতন ঘটিয়েছিল তিনি তাদের নেতৃত্ব

দিয়েছিলেন। ১৬২৮ সালে উত্তর শেনসীতে বিদ্রোহ প্রথম শুরু হয়। কাও জিং-সিয়াং-এর পরিচালিত শক্তির সঙ্গে যোগদান করেন এবং হোনান ও আনহুইয়ে অভিযান চালিয়ে আবার শেনসীতে ফিরে যান। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে কাও-এর মৃত্যুর পর লি তার উত্তরাধিকারী হন এবং 'কিং ছুয়াং' নাম ধারণ করে শেনসী, জেছুয়ান, হুনান এবং হুপে প্রদেশগুলির ভিতরে ও বাইরে অভিযান চালন। সর্বশেষে তিনি ১৬৪৪ সালে পিকিংয়ের রাজধানী দখল করেন যেখানে শেষ মিং সম্রাট আত্মহত্যা করেন। তিনি জনগণের কাছে প্রধান যে শ্লোগানটি তুলে ধরেন তা হল, 'রাজা ছুয়াংকে সমর্থন করুন, তাহলে শস্যের জন্য কোন কর দিতে হবে না।' তাঁর লোকজনের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আর একটি শ্লোগান দেন: 'কাউকে খুন করা মানে আমার বাবাকে খুন করা; কোন বলাৎকার করা মানে আমার মায়ের ওপর বলাৎকার করা'। এইভাবে তিনি জনসাধারণের সমর্থন লাভ করেন এবং তাঁর আন্দোলন সারা দেশে যে কৃষক বিদ্রোহ চলছিল তার সঙ্গে মূলতঃ এক ধারায় বয়ে চলে। তিনি নিজে যেহেতু তুলনামূলকভাবে কোনও সংগঠিত মূল এলাকা সৃষ্টি না করে কেবল ঘুরেই বেড়িয়েছেন সেহেতু ঘটনাচক্রে মিং রাজ-বংশের একজন দেশদ্রোহী সেনাধ্যক্ষ উ সান কুয়েই ছিং আক্রমণকারীদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করে লি-এর ওপর যুক্তভাবে আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত করে।

একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে

(জানুয়ারী ৫, ১৯৩০)

বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং আনুষংগিক কার্যকলাপের প্রশ্ন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব আমাদের পার্টির ভেতরে কিছু সংখ্যক কমরেডের মধ্যে এখনো রয়েছে। যদিও তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, অপরিহার্যভাবেই বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আসবে, তবু তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে, তা শীঘ্রই আসতে পারে। তাই তাঁরা কিয়াংসী দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন না, শুধুমাত্র ফুকিয়েন, কোয়াংতুং ও কিয়াংসীর ধোকার তিনটি সীমান্ত এলাকায় ভ্রাম্যমাণ গেরিলা কার্যকলাপ চালনার পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। একই সময়ে গেরিলা অঞ্চলে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে তাঁদের কোন গভীর ধারণা নেই এবং সেজন্যই এই ধরনের লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার সুসংবদ্ধতা ও প্রসারের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার দ্রুততর করা সম্পর্কেও কোন গভীর ধারণা তাঁদের নেই। তাঁরা বোধহয় মনে করেন, বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার যখন সুদূরে তখন রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য এই ধরনের কঠোর কাজ করাটা পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছুই নয়। এর পরিবর্তে তাঁরা অপেক্ষাকৃত সহজতর ভ্রাম্যমাণ গেরিলা কার্যকবাপের পদ্ধতিতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে ইচ্ছুক এবং সমগ্র দেশে জনসাধারণকে স্বপক্ষে আনার কাজ সুসম্পন্ন করার পরে অথবা কোন একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সম্পন্ন করার পরে দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান চালাতে চান, লালফৌজের শক্তি সংযোগে তখন যা হয়ে উঠবে দেশজোড়া বিরাট বিপ্লব। সমস্ত অঞ্চলসহ দেশজোড়া জনসাধারণকে প্রথমে নিজেদের পক্ষে টেনে আনা, তারপরে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা—তাঁদের এই তত্ত্ব চীনা বিপ্লবের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিল খায় না। চীন একটা আধা-ঔপনিবেশিক দেশ যা কুক্ষিগত করার জন্য বহু সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে—এটাকে স্পষ্টভাবে বোঝার ব্যর্থতা থেকেই প্রধানত: তাঁদের এই তত্ত্বের উদ্ভব। এটাকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেই, প্রথমত:,

---

এটা কমরেড মাও সে-তুঙের একটি চিঠি। পার্টির মধ্যে সে সময়ে বিরাজমান এক ধরনের হতাশাব্যঞ্জক মনোভাবের বিরুদ্ধে এটি লেখা হয়।

পরিষ্কার হবে যে, সারা দুনিয়ায় কেন কেবলমাত্র চীনেই শাসকশ্রেণীর ভেতরে পারস্পরিক দীর্ঘকালীন জটপাকানো যুদ্ধের অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়, কেন এই জটপাকানো যুদ্ধ দিন দিন তীব্রতর হয়ে উঠছে ও দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে, এবং কেন কখনো কোন ঐক্যবদ্ধ শাসন কায়েম হতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ, পরিষ্কার হবে কৃষক সমস্যার গুরুত্ব, আর সে কারণেই পরিষ্কার হবে কেন পল্লী-অভ্যুত্থান আজকের মতো সমগ্র দেশ জুড়ে প্রসারলাভ করেছে। তৃতীয়তঃ, পরিষ্কার হবে শ্রমিক-কৃষকদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার শ্লোগানের নির্ভুলতা। চতুর্থতঃ, পরিষ্কার হবে সারা দুনিয়ায় কেবলমাত্র চীনেই শাসকশ্রেণীর ভেতরে যে পারস্পরিক দীর্ঘকালীন জটপাকানো যুদ্ধ বিদ্যমান—সেই অদ্ভুত ব্যাপার থেকে উদ্ভূত অন্য একটি অদ্ভুত ব্যাপার, অর্থাৎ লালফৌজ ও গেরিলা বাহিনীর অস্তিত্ব ও বিকাশ এবং সেই সঙ্গে শ্বেত শাসনের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছোট ছোট লাল এলাকার অস্তিত্ব ও বিকাশ (এই ধরনের অদ্ভুত ব্যাপার চীন ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না)। পঞ্চমতঃ, এটাও পরিষ্কার হবে যে, লালফৌজ গেরিলা বাহিনী ও লাল এলাকার প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ হচ্ছে আধা-ঔপনিবেশিক চীনে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক-সংগ্রামের উচ্চতম রূপ, আধা-ঔপনিবেশিক কৃষক-সংগ্রামের বিকাশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এবং নিঃসন্দেহে দেশব্যাপী বিপ্লবী উত্তাল জোয়ারকে দ্রুততর করার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ষষ্ঠতঃ, এটাও পরিষ্কার হবে যে, নিছক ভ্রাম্যমাণ গেরিলা কার্যকলাপের নীতি দেশব্যাপী বিপ্লবী উত্তাল জোয়ারকে দ্রুততর করার কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে পারে না, পক্ষান্তরে চু তে, মাও সে-তুঙ এবং ফ্যাঙ্‌ চি-মিন[১] কর্তৃক গৃহীত নীতি নিঃসন্দেহে সঠিক—অর্থাৎ ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠার, সুপরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার, ভূমি-বিপ্লব গভীরতর করার, থানা লালরক্ষী বাহিনী, মহকুমা লালরক্ষী বাহিনী, পরে জেলা লালরক্ষী বাহিনী, তারপরে স্থানীয় লালফৌজ এবং নিয়মিত লালফৌজ পর্যন্ত গড়ে তোলার পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের সশস্ত্র শক্তিকে সম্প্রসারণ করার, তরঙ্গমালার মতো অগ্রসর হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রসারিত করার ইত্যাদি, ইত্যাদি নীতি। কেবলমাত্র এভাবেই সমগ্র দেশের বিপ্লবী জনসাধারণের আস্থা গড়ে তোলা সম্ভব, সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমন সারা দুনিয়ায় এই আস্থা গড়ে তুলেছে। কেবলমাত্র এভাবেই, প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর জন্য প্রচণ্ড অসুবিধার সৃষ্টি করা, তাদের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে তোলা

ও তাদের আভ্যন্তরীণ ভাঙনকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব। এবং কেবলমাত্র এমনি করেই লালফৌজকে প্রকৃতভাবে গঠন করা যায়, যা ভবিষ্যতের মহান বিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠবে। এক কথায় বলা যায়, কেবলমাত্র এভাবেই বিপ্লবী উত্তাল জোয়ারকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

বিপ্লবের তাড়াহুড়ার ব্যাধিতে পীড়িত কমরেডরা বিপ্লবের আত্মমুখীন শক্তিকে[২] অযথার্থভাবে বড় করে দেখেন আর প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে দেখেন ছোট করে। এ ধরনের মূল্যায়ন প্রধানতঃ আত্মমুখিনতাবাদ থেকেই আসে। পরিণামে এটা নিঃসন্দেহে অন্ধক্রিয়াবাদের পথে যায়। অপরদিকে, যদি বিপ্লবের আত্মমুখীন শক্তিকে ছোট করে দেখা হয় এবং প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে বড় করে দেখা হয়, তাহলে, এটাও হবে এক ধরনের অযথার্থ মূল্যায়ন এবং নিশ্চিতভাবেই অন্য ধরনের কুফল নিয়ে আসবে। তাই, চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করতে গেলে নিম্নলিখিত মৌলিক বিষয়গুলোকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন :

(১) যদিও এখন চীনা বিপ্লবের আত্মমুখীন শক্তি দুর্বল, কিন্তু অন্যদিকে চীনের পশ্চাৎপদ ও ভঙ্গুর সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে দাঁড়ানো প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর সমস্ত সংগঠনও (রাজনৈতিক ক্ষমতা, সশস্ত্র শক্তি, রাজনৈতিক পার্টি ইত্যাদি) দুর্বল। এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, বর্তমান পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর বিপ্লবের আত্মমুখীন শক্তি যদিও বর্তমান চীনা বিপ্লবেরর আত্মমুখীন শক্তির চেয়ে সম্ভবতঃ কিছুটা শক্তিশালী, তবু যেহেতু সেখানকার প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর শক্তি চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর শক্তির চেয়ে আরও অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী, সেহেতু সেখানে এখনই বিপ্লব শুরু হতে পারছে না। বর্তমানে চীনা বিপ্লবের আত্মমুখীন শক্তি যদিও দুর্বল, কিন্তু যেহেতু, প্রতিবিপ্লবের শক্তিও অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সেহেতু, চীনা বিপ্লব নিশ্চিতরূপে পশ্চিম ইউরোপের চেয়ে অধিক দ্রুতগতিতে উত্তাল জোয়ারের দিকে ধাবিত হবে।

(২) ১৯২৭ সালে বিপ্লবের পরাজয়ের পর, বিপ্লবের আত্মমুখীন শক্তি বাস্তবিকই অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। অবশিষ্ট শক্তিগুলো খুবই নগণ্য এবং যেসব কমরেডরা কেবলমাত্র কিছুটা বাহ্য অভিব্যক্তি দেখেই বিচার করেন, তাঁরা স্বভাবতঃই হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু সারমর্ম দেখে বিচার করলে এটা একেবারেই ভিন্ন। এখানে আমরা একটা পুরানো চীনা প্রবাদ প্রয়োগ

করতে পারি—'একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে'। এর অর্থ, বর্তমানে আমাদের শক্তি যদিও অল্প, কিন্তু এটা অতি দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠবে। চীনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই শক্তির বৃদ্ধি শুধু সম্ভবই নয়, এমনকি অবশ্যম্ভাবীও। ৩০শে মে'র আন্দোলন এবং তারপরে যে মহান বিপ্লব ঘটেছে, তা থেকে এটা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যখন আমরা কোন বিষয়কে দেখি, তখন অবশ্যই তার সারমর্মকে দেখতে হবে এবং তার বাহ্য রূপটাকে দেখতে হবে শুধুমাত্র প্রবেশদ্বারের দিশারী হিসেবে, আর প্রবেশদ্বার অতিক্রম করেই সে বিষয়ের সারমর্মকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরতে হবে। এটাই শুধু নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি।

(৩) তেমনি, প্রতিবিপ্লবী শক্তির মূল্যায়নেও আমাদের কোনমতেই কেবলমাত্র তার বাহ্যিক রূপটা দেখলে চলবে না, বরং তার সারমর্ম দেখতে হবে। হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে আমাদের স্বাধীন এলাকার প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে কিছু কিছু কমরেড হুনান প্রাদেশিক কমিটির বেঠিক মূল্যায়নকেই সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করতেন এবং শ্রেণীশত্রুকে তাঁরা কানাকড়িরও মূল্য দিতেন না : হুনানের শাসক লু তি-পিং[৩] সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে হুনান প্রাদেশিক কমিটি সে সময় (১৯২৮ সালের মে থেকে জুন পর্যন্ত) 'ভীষণ নড়বড়ে', 'অত্যন্ত আতংকগ্রস্ত'—এই দুটি বর্ণনাত্মক কথা ব্যবহার করেছিল, আজও তা ঠাট্টার বিষয়। এ ধরনের মূল্যায়নে অনিবার্যভাবেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্ধক্রিয়াবাদের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু ঐ বছরের নভেম্বর থেকে ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চার মাসের মতো সময়ের মধ্যে (চিয়াং কাই-শেক ও কোয়াংসি চক্রের মধ্যে যুদ্ধ[৪] শুরু হবার পূর্বে) যখন শত্রুর তৃতীয় 'মিলিত দমন অভিযান'[৫] চিংকাং পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসছিল, তখন কিছু কিছু কমরেড এই প্রশ্ন তুলেছিলেন 'আর কতকাল আমরা এ লাল পতাকা উড়িয়ে রাখতে পারবো?' আসলে, তখন চীনে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে সংগ্রাম অত্যন্ত নগ্ন পর্যায়ে নেমে এসেছিল এবং চিয়াং কাই-শেক, কোয়াংসি চক্র ও ফেং ইয়ু-সিয়াংয়ের মধ্যে একটি জটপাকানো যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল সেই সময়, যখন প্রতিবিপ্লবী স্রোতে ভাটা পড়তে শুরু হয়েছিল এবং বিপ্লবী স্রোত আবার বাড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু সেই সময়ে শুধু যে লাল-ফৌজ ও স্থানীয় পার্টি-সংগঠনের মধ্যেই হতাশাপূর্ণ চিন্তাধারা বিদ্যমান ছিল তাই নয়, এমনকি কেন্দ্রীয় কমিটিও ঐ বাহ্যিক রূপ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল।

এবং তার মধ্যেও হতাশার সুর ফুটে উঠেছিল। সে সময়ে পার্টিতে যে হতাশাপূর্ণ বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় কমিটির ফেব্রুয়ারীর চিঠিই তার প্রমাণ।

(৪) বাস্তব অবস্থা আজও এমন যে, যেসব কমরেড বর্তমান অবস্থার সারমর্মকে না দেখে কেবল তার বাহ্যিক রূপটাই দেখেন তাঁরা সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে, লালফৌজে কর্মরত আমাদের লোক যখন যুদ্ধে পরাজিত হন বা চারিদিক থেকে বেষ্টিত হন অথবা শক্তিশালী শত্রুর দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হন, তখন প্রায়ই নিজের অজান্তে এই ধরনের সাময়িক, বিশেষ ও সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিকে সার্বিক ও অতিরঞ্জিত করে তোলেন, যেন গোটা চীনের এবং সমগ্র বিশ্বের পরিস্থিতিতে আশার আলো নেই এবং বিপ্লবের জয়ের প্রত্যাশা সুদূরপরাহত। কোন জিনিস পর্যবেক্ষণে তাঁরা শুধু বাহ্যিক রূপকেই আঁকড়ে ধরে থাকেন এবং সারবস্তুকে ঝেড়ে ফেলে দেন, কারণ তাঁরা সাধারণ অবস্থার সারবস্তুর কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেননি। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, চীনে বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার শীঘ্রই আসবে কিনা—যেসব দ্বন্দ্ব বিপ্লবী উত্তাল জোয়ারের উদ্ভব ঘটায় সেই দ্বন্দ্বগুলো প্রকৃতই বিকাশলাভ করছে কিনা, শুধু তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেই এটা স্থির করা যায়। যেহেতু, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশগুলোর মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের নিজেদের দেশের সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বিকাশলাভ করেছে, সেহেতু, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চীনকে কেড়ে নেবার প্রয়োজনীয়তা আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চীনকে কেড়ে নেবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখনই তীব্রতর হয়ে ওঠে তখনই সাম্রাজ্যবাদ ও সমগ্র চীনের দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পরের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব চীনের মাটিতে একই সঙ্গে বিকাশলাভ করে, ফলে চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের বিভিন্ন চক্রের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক জটপাকানো যুদ্ধ, যা দিন দিন সম্প্রসারিত ও তীব্রতর হয় এবং তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের হয় ক্রমবিকাশ। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের বিভিন্ন চক্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের অর্থাৎ যুদ্ধবাজদের জটপাকানো যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আসে আরও বেশি করভার—এইভাবে ব্যাপক করদাতা জনগণ ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব দিন দিন বিকাশলাভ করে। সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের জাতীয় শিল্পের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেবার ফলে চীনের জাতীয় শিল্প সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে সুবিধে আদায় করতে পারে না এবং এটা চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী ও চীনের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার

দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তোলে। চীনা পুঁজিপতিরা মরিয়া হয়ে শ্রমিকদের শোষণ করে বাঁচার পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে, আর শ্রমিকরা তা প্রতিরোধ করছে। সাম্রাজ্যবাদীদের বাণিজ্যিক আক্রমণ, চীনা বণিক-পুঁজিপতির শোষণ, সরকারের মোটা কর ধার্য ইত্যাদি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরও গভীরতর হচ্ছে, অর্থাৎ জমির খাজনা ও অতিরিক্ত সুদের মাধ্যমে শোষণ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বেড়ে উঠছে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের ঘৃণা। বিদেশী মালের চাপ, ব্যাপক শ্রমিক-কৃষকসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার হ্রাস এবং সরকারী করের বৃদ্ধি—এ সব কারণে চীনে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবসায়ী ও স্বাধীন উৎপাদকেরা দিন দিন দেউলিয়ার পথে যাচ্ছে। রসদ এবং আর্থিক টানাটানির অবস্থায়ও প্রতিক্রিয়াশীল সরকার সীমাহীনভাবে তার সৈন্যবাহিনী বাড়িয়ে চলেছে এবং এই কারণে দিনের পর দিন যুদ্ধ বেশি হচ্ছে, ফলে সৈনিকসাধারণ সর্বদাই দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়ে থাকে। রাষ্ট্রের কর-বৃদ্ধি, জমিদার কর্তৃক খাজনা ও সুদ-বৃদ্ধির এবং দিনের পর দিন যুদ্ধের বিপর্যয়ের বিস্তৃতির কারণে দেশের সর্বত্রই দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ ও ডাকাতি এবং ব্যাপক কৃষক ও শহরের গরীবরা জীবন ধারণে নিরুপায় হয়ে পড়ে। স্কুল চালনার জন্য কোন টাকা না থাকায় বহু ছাত্র আশংকা করত যে তারা শিক্ষার সুযোগ হারাবে। যেহেতু উৎপাদন পশ্চাৎপদ, সেহেতু বহু স্নাতকের চাকুরীর আশা নেই। যদি আমরা উপরোল্লিখিত দ্বন্দ্ব সমূহ উপলব্ধি করি, তাহলে আমরা জানতে পারব যে, কি রকম শঙ্কাকুল পরিস্থিতি এবং বিশৃংখল অবস্থার মধ্যে চীন রয়েছে। আরও জানতে পারব যে, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার অনিবার্য এবং তা আসবে অতি শীঘ্রই। সমগ্র চীন শুকনো জ্বালানি কাঠে ভরা, তা শীঘ্রই আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে—এই প্রবাদবাক্যটি চীনের বর্তমান পরিস্থিতি কিভাবে বিকাশলাভ করবে তার একটি উপযুক্ত বর্ণনা। বহু জায়গায় শ্রমিকদের ধর্মঘট, কৃষকদের অভ্যুত্থান, সৈনিকদের বিদ্রোহ ও ছাত্র-ধর্মঘট প্রসারলাভ করছে—কেবলমাত্র এগুলোর দিকে তাকালেই আমরা জানতে পারব যে, 'স্ফুলিঙ্গ' থেকে 'দাবানল সৃষ্টির' সময় নিঃসন্দেহে আর বেশি দূরে নেই।

উপরের কথাগুলোর সারাংশ ১৯২৯ সালের ৫ই এপ্রিল তারিখে ফ্রন্ট-কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটিকে যে চিঠি দিয়েছে তাতে ইতিমধ্যেই বর্ণিত হয়েছে।

ঐ চিটিতে বলা হয়েছে :

কেন্দ্রীয় কমিটির এই চিঠিতে (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯) বাস্তব পরিস্থিতি এবং আমাদের আত্মমুখীন শক্তির মূল্যায়ন অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ছিল। চিংকাং পাহাড়ের বিরুদ্ধে কুওমিননাঙের তিনটি 'দমন অভিযান' ছিল প্রতিবিপ্লবের উচ্চতম স্রোতের অভিব্যক্তি। কিন্তু সে স্রোত সেখানেই থেমে গিয়েছিল এবং তারপর থেকে প্রতিবিপ্লবী স্রোতে ধীরে ধীরে ভাটা পড়ল আর বিপ্লবী স্রোতে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠল। পার্টির সংগ্রামী শক্তি ও সাংগঠনিক শক্তি কেন্দ্রীয় কমিটি যেভাবে বর্ণনা করেছে, যদিও সেই মাত্রায় দুর্বল, তবুও প্রতিবিপ্লবী স্রোত ক্রমশ: কমে যাবার অবস্থায় সেগুলো অবশ্যই দ্রুত পুনরুদ্ধার হবে এবং পার্টির নিষ্ক্রিয়তার মনোভাবও তাড়াতাড়ি দূর হবে। জনসাধারণ অবশ্যই আমাদের পক্ষে আসবেন। কুওমিনতাঙের গণহত্যার নীতি 'মাছকে গভীর জলে তাড়ানো'[৬] এই প্রবাদের মতো কাজ করে এবং সংস্কারবাদও আর জনসাধারণের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। এটা নিশ্চিত যে, কুওমিনতাঙ সম্পর্কে জনসাধারণের ভ্রম শীঘ্রই অপসারিত হবে। আসন্ন পরিস্থিতিতে জনসাধারণকে নিজেদের পক্ষে টেনে আনার ব্যাপারে কোন পার্টিই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে না। পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের[৭] নির্দেশিত রাজনৈতিক লাইন ও সাংগঠনিক লাইন সঠিক, অর্থাৎ বিপ্লবের বর্তমান পর্যায় হচ্ছে গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক নয় এবং পার্টির বর্তমান কর্তব্য হল ('বড় বড় শহরে' শব্দ যোগ করে নিতে হবে)[৮] জনসাধারণকে স্বপক্ষে টেনে আনা, অবিলম্বে অভ্যুত্থান ঘটানো নয়। কিন্তু বিপ্লব দ্রুতগতিতে বিকাশলাভ করবে এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য আমাদের প্রচার ও প্রস্তুতির ব্যাপারে সক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান বিশৃংখলাপূর্ণ পরিস্থিতিতে সক্রিয় সংগ্রামী শ্লোগান ও সক্রিয় মনোভাবের দ্বারাই কেবল আমরা জনসাধারণকে পরিচালিত করতে পারি। কেবলমাত্র এ ধরনের সক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করেই পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।...সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বই হচ্ছে বিপ্লবে বিজয়লাভের একমাত্র চাবিকাঠি। পার্টির সর্বহারা ভিত্তি স্থাপন করা, প্রধান প্রধান শহর ও অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে পার্টির শাখা খোলা বর্তমানে পার্টির

সাংগঠনিক ক্ষেত্রের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু একই সময়, গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের বিকাশসাধন, ছোট ছোট এলাকায় লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা এবং লালফৌজের সৃষ্টি ও প্রসার—বিশেষ করে এগুলোই হচ্ছে শহরের সংগ্রামকে সাহায্য করার এবং বিপ্লবী স্রোতের জোয়ার বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার প্রধান শর্ত। তাই, শহরের সংগ্রামকে পরিত্যাগ করা ভুল হবে। কিন্তু কৃষক শক্তি শ্রমিক শক্তিকে ছাড়িয়ে গিয়ে বিপ্লবের ক্ষতি করবে বলে কৃষক শক্তির বৃদ্ধিকে ভয় করাটাও আমাদের মতে ভুল (অবশ্যই যদি কোন পার্টি-সদস্যদের মধ্যে এরকম মত থেকে থাকে)। কারণ, আধা-ঔপনিবেশিক চীনে বিপ্লব শুধু তখনই ব্যর্থ হয়, যখন কৃষক-সংগ্রাম শ্রমিকদের নেতৃত্ব না পায়, কিন্তু কৃষক-সংগ্রামের বিকাশ যখন শ্রমিকদের শক্তিকে ছাড়িয়ে যায়, তখন বিপ্লব কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

লালফৌজের কার্য কলাপের কৌশলের প্রশ্ন সম্পর্কে এ চিঠিতে নিম্নলিখিত উত্তর ছিল :

লালফৌজকে সংরক্ষণ ও জনসাধারণকে জাগাবার উদ্দেশ্য আমাদের সৈন্যবাহিনীকে খুব ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে এবং সৈন্যবাহিনী থেকে চু তে ও মাও সে-তুঙকে সরিয়ে দিতে কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের নির্দেশ দিয়েছে, যাতে করে প্রধান প্রধান লক্ষ্যবস্তু শত্রুর অগোচরে থাকে। এটা একটা অবাস্তব অভিমত। ১৯২৭-২৮ সালের শীতকালে আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম যে, প্রত্যেকটি কোম্পানি বা ব্যাটেলিয়ন একাকী কাজ করবে, পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে এবং গেরিলা যুদ্ধকৌশলের দ্বারা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করবে, যাতে করে লক্ষ্যবস্তু শত্রুর অগোচরে থাকে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে আমরা বহুবার চেষ্টা করেছি কিন্তু প্রত্যেকবারই ব্যর্থ হয়েছি। তার কারণ হচ্ছে: (১) নিয়মিত লালফৌজের অধিকাংশ সৈন্যই স্থানীয় নন এবং তাঁদের পটভূমি স্থানীয় লালরক্ষী বাহিনীর পটভূমি থেকে আলাদা। (২) বাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে দেবার ফলে নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলার ব্যাপারে অক্ষমতা দেখা দেয়, এতে সহজেই পরাজয় ঘটে। (৩) ইউনিটগুলো শত্রুর আঘাতে একটা একটা করে সহজেই ভেঙে পড়তে পারে। (৪) অবস্থা যত প্রতিকূল আমাদের সৈন্যবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করাবার ও সংগ্রামে

নেতাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবার প্রয়োজনীয়তা তত বেশি, কেবলমাত্র এইভাবেই, আভ্যন্তরীণ ঐক্য গড়ে তুলে আমরা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারি। শুধুমাত্র অনুকূল অবস্থাতেই গেরিলা তৎপরতার জন্য আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করা বিধেয়, আর সেই সময়ে, প্রতিকূল অবস্থার মতো প্রতিমুহূর্তেই নেতাদেরকে বাহিনীর সঙ্গে থাকার দরকার নেই।

উপরোক্ত অংশের ত্রুটি হচ্ছে এই যে, সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখানো হয়েছিল তা সবই নেতিবাচক ধরনের—এটা মোটেই যথেষ্ট নয়। আমাদের সৈন্যবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করার ইতিবাচক যুক্তি হচ্ছে যে, শুধুমাত্র কেন্দ্রীভূত করেই অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শত্রু-ইউনিটগুলিকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হব, শহর-নগর দখল করতে সক্ষম হব। অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শত্রু-ইউনিটগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে শহর-নগর দখল করে নিয়েই কেবল আমরা ব্যাপকভাবে জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলতে পারব এবং সংলগ্ন কয়েকটি জেলা জুড়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারব। কেবলমাত্র এইভাবেই সুদূরপ্রসারী আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারব (যাকে আমরা 'রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা' বলে থাকি) এবং বিপ্লবী উত্তাল জোয়ারকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে বাস্তব ফললাভ করতে পারব। উদাহরণস্বরূপ, গত বছরের আগের বছরে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে এবং গত বছরে পশ্চিম ফুকিয়েনে[৯] যে রাজনৈতিক ক্ষমতা আমরা স্থাপন করেছিলাম, তা সবই হচ্ছে আমাদের সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার নীতির ফল। এটা হচ্ছে একটা সাধারণ মূলনীতি কিন্তু এমন সময় কি নেই যখন আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করতেই হয়? হ্যাঁ, এমন সময়ও আছে। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লেখা ফ্রন্ট-কমিটির চিঠিতে বলা হয়েছে লালফৌজের গেরিলা যুদ্ধকৌশলের কথা—তাতে সৈন্যবাহিনীকে স্বল্প দূরত্বের মধ্যে বিভক্ত করার কথাও রয়েছে:

> গত তিন বছরের সংগ্রাম থেকে যে যুদ্ধকৌশল আমরা অর্জন করেছি, তা অন্য যে-কোন যুদ্ধকৌশল—প্রাচীন বা আধুনিক, চীনা বা বিদেশী যুদ্ধকৌশল থেকে সত্যি সত্যি ভিন্ন। আমাদের যুদ্ধকৌশল দিয়ে জনসাধারণকে সংগ্রামের জন্য দিনের পর দিন ব্যাপকতর আকারে জাগ্রত করা যায় এবং কোন শত্রুই, সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, আমাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। আমাদের যুদ্ধকৌশল হল গেরিলা যুদ্ধকৌশল। এতে মূলত: থাকে:

'জনসাধারণকে জাগাবার জন্য আমাদের সৈন্যশক্তিকে বিভক্ত করা, শত্রুর সাথে মোকাবিলার জন্য আমাদের সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা।'

'শত্রু এগোয়, আমরা পিছোই ; শত্রু শিবির ফেলে, আমরা হয়রান করি ; শত্রু ক্লান্ত হয়, আমরা আক্রমণ করি ; শত্রু পালায়, আমরা পিছনে ধাওয়া করি।'

'দৃঢ় ঘাঁটি এলাকা[১০] বিস্তারের কাজে ঢেউয়ের কায়দায় এগিয়ে যাবার নীতি প্রয়োগ করা ; যখন শক্তিশালী শত্রু তাড়া করবে, তখন বৃত্তাকারে চলার নীতি প্রয়োগ করা।'

'অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে খুব ভাল পদ্ধতিতে ব্যাপকতর জনসাধারণকে জাগ্রত করা।'

এই ধরনের যুদ্ধকৌশল ঠিক জাল ফেলার মতন। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে জাল ফেলতে হয় এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে জাল গুটিয়ে নিতে হয়। আমরা জাল ফেলি জনসাধারণকে আমাদের পক্ষে আনার জন্য এবং গুটিয়ে নিই শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য। বিগত তিন বছর ধরে আমরা এই যুদ্ধ-কৌশলই প্রয়োগ করেছি।

এখনে 'জাল ফেলার' অর্থ হচ্ছে সৈন্যবাহিনীকে স্বল্প দূরত্বের মধ্যে বিভক্ত করা। যেমন, হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার জেলা শহর ইউংসিনকে যখন প্রথমবার দখল করলাম, তখন ইউংসিন জেলার সীমানার মধ্যে আমরা আমাদের ২৯তম ও ৩১তম রেজিমেণ্টকে বিভক্ত করেছিলাম, আবার আমরা যখন তৃতীয়বার ইউংসিন দখল করলাম তখন আর একবার আমরা সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করলাম—২৮তম রেজিমেণ্টকে আনফু জেলার সীমান্তে, ২৯তম রেজিমেণ্টকে লিয়েনহুয়াতে এবং ৩১তম রেজিমেণ্টকে কিয়ান জেলার সীমান্তে পাঠালাম। আবার, গত বছরের এপ্রিল-মে মাসে দক্ষিণ কিয়াংসীর জেলা-গুলোতে, জুলাই মাসে পশ্চিম ফুকিয়েনের জেলাগুলোতে আমরা আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করেছিলাম। সুদূর ব্যবধানের মধ্যে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করে দেওয়া শুধু দুই শর্তেই সম্ভব—অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশ ও অপেক্ষাকৃত সবল নেতৃস্থানীয় সংস্থা। কারণ, আমাদের সৈন্য-বাহিনীকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণকে নিজেদের পক্ষে আনার জন্য, ভূমি-বিপ্লবকে গভীরতর করার জন্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার

জন্য এবং লালফৌজ ও স্থানীয় সশস্ত্র শক্তিকে সম্প্রসারিত করার জন্য নিজেদেরকে আরও বেশি সক্ষম করে তোলা। যদি এই উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে অক্ষম হই অথবা যদি আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করার ফলে পরাজয় ঘটে, লালফৌজের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে—যেমন দু'বছর আগে আগষ্ট মাসে ছেনচৌর উপর আক্রমণ চালাবার জন্য হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করা হয়েছিল—তাহলে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত না করাই ভাল। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, উপরোল্লিখিত শর্ত দুটি মিটলে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করা উচিত। কারণ, তখন বিভক্ত করাটাই কেন্দ্রীভূত করার চেয়ে সুবিধাজনক।

কেন্দ্রীয় কমিটির ফেব্রুয়ারী মাসের চিঠির মর্ম ভাল নয় এবং চতুর্থ বাহিনীর পার্টি-সংগঠনের কিছু সংখ্যক কমরেডের উপরে তা খারাপ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটি এই বলে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারী করেছিল যে, চিয়াং কাই-শেক ও কোয়াংসি চক্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধা অবশ্যম্ভাবী নয়। কিন্তু তার পর থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির মূল্যায়ন ও নির্দেশগুলি মোটামুটিভাবে ঠিকই হয়েছে। অযথার্থ মূল্যায়ন-সম্বলিত বিজ্ঞপ্তিটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি ইতিমধ্যে আর একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করেছে। যদিও লালফৌজের নিকট কেন্দ্রীয় কমিটির ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেরিত চিঠির কোন সংশোধন করা হয়নি, তবু তার পরবর্তী নির্দেশগুলোতে সে রকমের হতাশার সুর আর নেই এবং লালফৌজের কার্যকলাপ সম্পর্কে এর অভিমত এখন আমাদের অভিমতের সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু এ চিঠি কিছু কিছু কমরেডের মধ্যে যে খারাপ প্রভাব বিস্তার করেছে তা এখনো টিঁকে আছে। তাই, আমি মনে করি যে, এ সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন এখনো রয়েছে।

কিয়াংসী প্রদেশকে এক বছরের মধ্যে দখল করে নেবার পরিকল্পনাটাও গত বছরের এপ্রিল মাসে ফ্রন্ট-কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পেশ করেছিল, পরে ইউতুতে একটি সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লেখা চিঠিতে সে সময়ে দেখানো যুক্তিগুলো ছিল নিম্নরূপ :

চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনী ও কোয়াংসি যুদ্ধবাজদের সৈন্যবাহিনী কিউকিয়াঙের নিকটবর্তী অঞ্চলে পরস্পরের নিকটতর হচ্ছে—একটি বিরাট যুদ্ধ আসন্ন। গণ-সংগ্রামের পুনরারম্ভ আর প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের ভেতরকার দ্বন্দ্বের প্রসার এমনি সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে যে, শীঘ্রই বিপ্লবী

উত্তাল জোয়ার আসবে। এই অবস্থায়, আমাদের কাজকর্মের বন্দোবস্ত করতে গেলে, আমরা মনে করি যে, দক্ষিণের প্রদেশগুলির মধ্যে কোয়াংতুং এবং হুনান প্রদেশ দুটিতে মুৎসুদ্দি বর্জোয়া ও জমিদারদের সশস্ত্র শক্তি অতিশয় সবল, অধিকন্তু হুনানে পার্টির অন্ধক্রিয়াবাদী ভুলের জন্যই পার্টি-সংগঠন ও গণভিত্তি দুই-ই বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু ফুকিয়েন, কিয়াংসী এবং চেকিয়াং এই তিনটি প্রদেশে পরিস্থিতি অন্য রকম। প্রথমতঃ, এই তিনটি প্রদেশে শত্রুদের সৈন্যশক্তি সবচেয়ে দুর্বল। চেকিয়াঙে কেবলমাত্র চিয়াং পো-ছেঙের [১১] অধীনে অল্প সংখ্যক প্রাদেশিক রক্ষীবাহিনী রয়েছে। ফুকিয়েনে যদিও শত্রুবাহিনীর পাঁচটি দলের সব মিলিয়ে মোট ১৪টি রেজিমেণ্ট আছে, কিন্তু কুয়ো ফেঙ-মিঙের রেজিমেণ্টকে ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত করা হয়েছে। ছেন কুয়ো-হুই আর লু শিঙ-পাঙের[১২] অধীনে যে দুটি সৈন্যদল রয়েছে তারা সবই দস্যুবাহিনী, তাদের যুদ্ধক্ষমতা অল্প। উপকূলে অবস্থিত দুই ব্রিগেড নৌসৈন্য কখনো যুদ্ধ করেনি এবং তাদের যুদ্ধক্ষমতা নিশ্চয়ই বেশি নয়। একমাত্র চ্যাং চেনই [১৩] তুলনামূলকভাবে যুদ্ধ করতে সক্ষম, কিন্তু ফুকিয়েন প্রাদেশিক কমিটির বিশ্লেষণ অনুসারে, তারও শুধু দুটি রেজিমেণ্ট অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। অধিকন্তু, ফুকিয়েনে এখন পরিপূর্ণ বিশৃংখলা এবং অনৈক্য বিরাজ করেছে। কিয়াংসীতে চু পেই-তে [১৪] ও সিউং সি-হুইয়ের [১৫] অধীনস্থ দুই সৈন্যদলের মোট ১৬টি রেজিমেণ্ট রয়েছে, ফুকিয়েন অথবা চেকিয়াঙের সৈন্যশক্তির চেয়ে এরা বেশি শক্তিশালী, কিন্তু হুনানের সৈন্যশক্তির থেকে অনেক নিকৃষ্টতর। দ্বিতীয়তঃ, এই তিনটি প্রদেশে অন্ধক্রিয়াবাদী ভুল তুলনাগতভাবে কম করা হয়েছে। চেকিয়াঙের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়; কিন্তু হুনানের চেয়ে কিয়াংসী ও ফুকিয়েন প্রদেশ দুটিতে পার্টি-সংগঠন ও গণভিত্তি কিছুটা ভাল। দৃষ্টান্ত হিসাবে কিয়াংসীর কথা ধরা যাক। উত্তর কিয়াংসীতে তেহান, সিউশুই এবং থুঙকুতে আমাদের এখনো বেশ কিছুটা ভিত্তি রয়েছে। পশ্চিম কিয়াংসীতে নিংকাঙ, ইউংশিন, লিয়েনহুয়া ও সুইচুয়ানে পার্টি এবং লালরক্ষী বাহিনীর শক্তি এখনো আছে। দক্ষিণ কিয়াংসীতে আরও বড় আশা রয়েছে। কিয়ান, ইউঙফেং ও সিংকুয়ো প্রভৃতি জেলাগুলিতে লালফৌজের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রেজিমেণ্ট ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হতে চলেছে। ফ্যাঙ চি-মিনের লালফৌজ যে ধ্বংস হয়েছে তা নয়।

এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে চারদিক থেকে নানছাঙকে ঘিরে ধরার অবস্থা। আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে সুপারিশ করছি যে, কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজদের মধ্যে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের সময়ে কিয়াংসী প্রদেশকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ফুকিয়েন ও পশ্চিম চেকিয়াঙ দখল করে নেবার জন্য চিয়াং কাই-শেক ও কোয়াংসী চক্রের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করা উচিত। এই তিনটি প্রদেশে আমাদের উচিত লালফৌজকে বাড়ানো এবং জনসাধারণের স্বাধীন এলাকা প্রতিষ্ঠা করা। এই পরিকল্পনাকে এক বছরের মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

কিয়াংসীকে দখল করার এই প্রস্তাবের মধ্যে ভুল হচ্ছে এক বছরের মেয়াদ ধার্য করা। কিয়াংসীকে দখল করার কথা বলতে গেলে, আমরা শুধু যে কিয়াংসী প্রদেশের নিজস্ব অবস্থার কথা বিবেচনা করছি তা নয়, পরন্তু শীঘ্রই যে দেশব্যাপী বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আসবে সে কথাটাও বিবেচনা করছি। শীঘ্রই বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আসবে—এ বিষয়ে আমরা যদি বিশ্বাস না করতাম, তাহলে এক বছরের মধ্যে আমরা কিয়াংসী দখল করতে পারব, এই সিদ্ধান্তে কোনমতেই উপনীত হতে পারতাম না। ঐ প্রস্তাবের ত্রুটি ছিল এক বছরের একটা মেয়াদ ধার্য করা, যা করা উচিত ছিল না। সুতরাং 'শীঘ্রই বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আসবে' এই বাক্যটির মধ্যে 'শীঘ্রই' শব্দটিতে এমনি করেই দেওয়া হয়েছিল সহিষ্ণুতার গন্ধ। কিয়াংসীর আত্মমুখান ও বাস্তব অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া খুবই প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লেখা চিঠিতে বর্ণিত আত্মমুখীন অবস্থা ছাড়াও, বাস্তব অবস্থার তিনটি কথা এখন পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, কিয়াংসীর অর্থনীতি প্রধানতঃ সামন্ততান্ত্রিক, এখানে ব্যবসায়ী পুঁজিপতিশ্রেণীর শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং অন্য যে-কোন দক্ষিণ প্রদেশের চাইতে এখানকার জমিদারদের সশস্ত্র শক্তি দুর্বল। দ্বিতীয়তঃ, কিয়াংসীর নিজস্ব কোন প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনী নেই, এখানে সচরাচর অন্যান্য প্রদেশের সৈন্যবাহিনী মোতায়েন থাকে। এইসব সৈন্যদের এখানে পাঠানো হয় 'কমিউনিস্টদের দমন করবার জন্য' অথবা 'ডাকাতদের দমন করবার জন্য'। তারা কিন্তু স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে অপরিচিত, প্রদেশের স্থানীয় সৈন্যবাহিনী যেভাবে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ত, তার চেয়ে অনেক কমই তারা এখানে জড়িয়ে পড়ছে; প্রায়শঃই এই ব্যাপারে তারা তত আগ্রহী নয়। তৃতীয়তঃ, কিয়াংসী প্রদেশ সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব থেকে

অপেক্ষাকৃত দূরে, হংকংয়ের নিকটবর্তী ও প্রায় সর্বতোভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন কোয়াংতুঙের মতো নয়। এ তিনটি কথা বুঝলেই আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পল্লী অভ্যুত্থান কেন কিয়াংসীতে বেশি ব্যাপকতর, লালফৌজ ও গেরিলাবাহিনীর সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের থেকে কেনই-বা কিয়াংসীতে বেশি।

'শীঘ্রই বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আসবে'—এই বক্তব্যের মধ্যে 'শীঘ্রই' শব্দটিকে আমরা তাহলে কিভাবে ব্যাখ্যা করব? কমরেডদের মধ্যে অনেকের জন্যই এটা একটা সাধারণ প্রশ্ন। মার্কসবাদীরা গণক নন, ভবিষ্যতের বিকাশ ও পরিবর্তনের সাধারণ গতি কোন্ দিকে তা-ই শুধু তাঁদের বলা উচিত এবং কেবলমাত্র এটাই তাঁরা করতে পারেন, যান্ত্রিকভাবে দিনক্ষণ ধার্য করা তাঁদের উচিত নয় এবং তা করাও অসম্ভব। কিন্তু আমি যখন বলি যে, চীনে শীঘ্রই বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আসবে, তখন আমি কোনমতেই এমন কোন কিছু বলি না, যা কিছু কিছু লোকের ভাষায় 'আসার সম্ভাবনা রয়েছে', যা কাজের পক্ষে তাৎপর্যহীন যা অলীক এবং যা লাভ করা যায় না। এ যেন সমুদ্রের সুদূরে একটি জাহাজের মতো, তীর থেকে যার মাস্তুলের মাথাটা ইতিমধ্যেই দেখা যায়, এ যেন পূর্ব দিগন্তের উদয়োন্মুখ প্রভাত সূর্যের মতো, যার ঝলোমলো রশ্মি দেখা যায় উঁচু পাহাড়ের শিখর থেকে, এ যেন মাতৃগর্ভে অস্থিরভাবে সঞ্চরণরত জন্মোন্মুখ শিশুর মতো।

টীকা

১। কমরেড ফ্যাঙ চি-মিন ছিলেন কিয়াংসী প্রদেশের ই-ইয়াঙের অধিবাসী, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, উত্তর-পূর্ব কিয়াংসীর লাল এলাকার এবং লালফৌজের দশম আর্মির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৪ সালে লালফৌজের জাপানবিরোধী অগ্রগামী বাহিনীকে উত্তরমুখী অভিযানে তিনি পরিচালনা করেছিলেন। প্রতিবিপ্লবী কুওমিনতাঙ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ধরা পড়েন এবং জুলাই মাসে তিনি বীরত্বপূর্ণভাবে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন কিয়াংসীর নানছাঙে।

২। 'বিপ্লবের আত্মমুখীন শক্তি' বলতে কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে বিপ্লবের সংগঠিত শক্তিকে বুঝিয়েছেন।

৩। লু তি-সিং ছিলেন একজন কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজ, ১৯২৮ সালে তিনি হুনান প্রদেশের কুওমিনতাঙ সরকারের গভর্ণর ছিলেন।

৪। চিয়াং কাই-শেক ও কোয়াংসি চক্রের মধ্যে যুদ্ধ, অর্থাৎ নানকিং-এর কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজ চিয়াং কাই-শেক এবং কোয়াংসি প্রদেশের যুদ্ধবাজ লি চোং-জেন ও পাই ছুং-শি'র মধ্যে ১৯২৯ সালের মার্চ-এপ্রিলের যুদ্ধ।

৫। হুনান ও কিয়াংসীর কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজরা লালফৌজের ঘাঁটি এলাকা চিংকাং পার্বত্য অঞ্চলের বিরুদ্ধে তৃতীয়বার যে আক্রমণ চালিয়েছিল, এখানে সেই অভিযানের কথাই বলা হয়েছে। ১৯২৮ সালের শেষের দিক থেকে ১৯২৯ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত এই অভিযান চলেছিল।

৬। এটি মেনসিয়াস থেকে উদ্ধৃতি। যে অত্যাচারী রাজা জনগণকে ভাল শাসক খুঁজতে বাধ্য করে, তাকে সে তুলনা করছিল 'মাছকে গভীর জলে তাড়ানো' উদবিড়ালের সঙ্গে।

৭। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এ কংগ্রেস দেখিয়েছিল যে, ১৯২৭ সালে বিপ্লবের পরাজয়ের পরেও চীনের বিপ্লব প্রকৃতিতে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবই ছিল। আরও দেখিয়েছিল যে, নতুন বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার অনিবার্য, কিন্তু যেহেতু সেই উত্তাল জোয়ার তখন দেখা দেয়নি, সেহেতু, তখনকার বিপ্লবের সাধারণ লাইন ছিল জনসাধারণকে স্বপক্ষে টেনে আনা। ষষ্ঠ কংগ্রেসে ১৯২৭ সালের ছেন তু-সিউ'র দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণ-বাদকে বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৯২৭ সালে বিপ্লবের পরাজয়ের পর, অর্থাৎ ১৯২৭ সালের শেষের দিকে এবং ১৯২৮ সালের প্রথম দিকে পার্টিতে যে 'বামপন্থী' অন্ধক্রিয়াবাদ দেখা দিয়েছিল এই কংগ্রেসে তারও সমালোচনা ও নিন্দা করা হয়।

৮। ব্র্যাকেটের মধ্যের অংশটি গ্রন্থকার নিজেই যোগ করেছেন।

৯। ১৯২৯ সালে চিংকাং পার্বত্য অঞ্চল থেকে লালফৌজ নতুন বিপ্লবী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য পূর্বদিকস্থ ফুকিয়েনে অভিযান চালায় এবং পশ্চিম ফুকিয়েনের লুঙইয়েন, ইউংতিং ও নাংহাঙ জেলায় জনগণের বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে।

১০। দৃঢ় ঘাঁটি এলাকা বলতে শ্রমিক-কৃষকদের লালফৌজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অপেক্ষাকৃত দৃঢ় বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা বোঝায়।

১১। চিয়াঙ পো-ছেঙ সেই সময়ে চেকিয়াং প্রদেশে কুওমিনতাঙ শান্তিরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক ছিল।

১২। ছেন কুয়ো-হুই আর লু শিঙ-পাঙ ছিল ফুকিয়েনের দু'জন কুখ্যাত ডাকাত। এদের বাহিনীকে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল।

১৩। চ্যাং চেন ছিল কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর একজন ডিভিশন-কম্যাণ্ডার।

১৪। কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজ চু পেই-তে তখন কিয়াংসী প্রদেশের কুওমিনতাঙ সরকারের গভর্ণর ছিল।

১৫। সে সময়ে সিউং সি-হুই ছিল কিয়াংসী প্রদেশস্থ কুওমিনতাঙ সৈন্য বাহিনীর একজন ডিভিশন-কম্যাণ্ডার।

অর্থনৈতিক কাজে মনোযোগ দিন

(আগস্ট ২০, ১৯৩৩)

বিপ্লবী যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা আমাদের কাছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি এক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এবং অর্থনৈতিক গঠনকার্যের সমস্ত সাম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য ব্যাপক জনতাকে সমবেত করার কাজকে বিশেষ জরুরী করে তুলেছে। কেন ? কারণ, আমাদের সমস্ত বর্তমান কর্মপ্রচেষ্টাকে এখন পরিচালিত করতে হবে বিপ্লবী যুদ্ধে বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্যে, এবং সর্বপ্রথমে ও সর্বাগ্রে, শত্রুদের পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে[২] ধ্বংস করার সংগ্রামে সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে। এই প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করতে হবে এমন এক বাস্তব অবস্থা গড়ে তোলার দিকে, যা লালফৌজের জন্য খাদ্য-ও অন্যান্য জিনিস সরবরাহের নিশ্চিতি এনে দেবে ; জনগণের জীবনযাত্রাকে উন্নত করে তোলার দিকে, যাতে বিপ্লবী যুদ্ধে তাদের আরও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায় ; জনগণকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংগঠিত ও শিক্ষিত করে তোলার দিকে, যাতে যুদ্ধের জন্য নতুন জনবল গড়ে তোলা যায় ; শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী এবং শ্রমিক ও কৃষকদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে সুসংহত করে তোলার দিকে ; এবং অর্থনীতিকে গড়ে তুলে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে তোলার দিকে। এই সমস্ত উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে হলে এ ধরণের অর্থনৈতিক গঠনকার্য হচ্ছে অবশ্য প্রয়োজনীয়। বিপ্লবের কাজে নিয়োজিত প্রত্যেককেই এ কথাটা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। কোন কোন কমরেডের মতে, এখন অর্থ-নৈতিক গঠনকার্যের জন্য সময় দেওয়া অসম্ভব, কেননা বিপ্লবী যুদ্ধে সবাই ব্যস্ত হয়ে আছে। এজন্য যাঁরা এই গঠন কার্যের পক্ষে কথা বলেন, তাঁদেরকেই এরা 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি'র জন্য অভিযুক্ত করেন। এদের মতে, বিপ্লবী যুদ্ধ চলাকালে অর্থনৈতিক গঠনকার্য চালনো সম্ভব নয়, কেবল চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পর শান্তিপূর্ণ সুস্থির অবস্থাতেই নাকি তা সম্ভব। কমরেডগণ,

---

১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে দক্ষিণ কিয়াংসীর ১৭টি কাউন্টির অর্থনৈতিক গঠনকার্য সম্পর্কিত সম্মেলনে এই বক্তৃতাটি প্রদত্ত হয়েছিল।

এ ধরণের চিন্তা মোটেই ঠিক নয়। এ ধরনের মতাবলম্বীরা এটাই বুঝতে পারছেন না যে, অর্থনীতিকে সুসংগঠিত করে না তুলতে পারলে বিপ্লবী যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ সম্ভব হবে না, এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জনগণ ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। একবার ভেবে দেখুন! শত্রু একটি অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করছে, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসাদাররা ও প্রতিক্রিয়াপন্থীরা আমাদের অর্থনীতি ও বাণিজ্যে ভাঙন ধরাচ্ছে, বাইরের সঙ্গে লাল এলাকার বাণিজ্য গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এই প্রতিবন্ধকগুলো দূর করতে না পারলে বিপ্লবী যুদ্ধ কি গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না? নুনের দাম খুব বেশি এবং অনেক সময়ে তা একেবারে পাওয়াই যায় না। শরৎ ও শীতকালে ধান সস্তা থাকলেও গ্রীষ্ম ও বসন্তে এর দাম খুবই বেড়ে যায়। এ সবই প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনে প্রভাব ফেলে এবং উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। এবং আমাদের মূল নীতি শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর ওপর কি এটা আঘাত হানে না? জীবন নির্বাহের এইসব অসুবিধার জন্য যদি শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ থাকে, তবে লালফৌজের সম্প্রসারণ এবং বিপ্লবী যুদ্ধের গণসমাবেশে কি অসুবিধার সৃষ্টি হবে না? সুতরাং বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্যে কোনরকম অর্থ নৈতিক সংগঠনের কাজ চলবে না—এ চিন্তা একেবারেই ঠিক নয়, যাঁরা এরকম ভাবেন, তাঁদের মতে সব কিছুকেই যুদ্ধ-প্রচেষ্টার তুলনায় অপ্রধান বলে গণ্য করতে হবে। কিন্তু তাঁরা এটাই ধরতে পারছেন না, যে; অর্থনৈতিক সংগঠনকে বরবাদ করে দিলে যুদ্ধ-প্রচেষ্টাই দুর্বল হয়ে পড়বে, অপ্রধান করে রাখা তো পরের কথা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করে এবং লাল এলাকার অর্থনীতিকে গড়ে তুলেই কেবল বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে আমরা প্রয়োজনায় বাস্তব ভিত্তি রচনা করতে পারি এবং তার মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারি, ঠিকভাবে আমাদের সামরিক অভিযানে এগিয়ে যেতে পারি, এবং সক্রর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে কার্যকরী আঘাত হানতে পারি। এইভাবেই সম্পদসম্ভার বৃদ্ধি করে আমরা হাজার হাজার লী ব্যাপী আমাদের সীমান্ত বাইরের দিকে সম্প্রসারণ করতে পারি, যাতে অনুকূলে এলে লালফৌজ নানচাং ও কিউকিয়াং আক্রমণ ও মুক্ত করে সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাতে পারে এবং এইভাবে নিজেরাই নিজেদের খাদ্য সরবরাহের অনেকখানি সুরাহা করে যুদ্ধ বিষয়ে সমস্ত মনোযোগ দিতে পারে। এবং কেবলমাত্র এইভাবেই আমরা জনসাধারণের

জীবন নির্বাহের প্রয়োজনীয় জিনিসের কিছুটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি, যাতে তারা লালফৌজে যোগ দিতে কিংবা অন্যান্য বিপ্লবী কর্তব্যকর্মের আরও বেশি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। এই হচ্ছে যুদ্ধ প্রচেষ্টার অধীনে সবকিছু টেনে নামানোর অর্থ। বিভিন্ন জায়গায় যাঁরা বিপ্লবী কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের অনেকের কাছেই এখনও বিপ্লবী যুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগঠনের তাৎপর্য পরিষ্কার নয় এবং বহু স্থানীয় সরকার অর্থনৈতিক সংগঠনের সমস্যাবলী সম্পর্কে খুব কমই মনোযোগ দিয়ে থাকে। স্থানীয় সরকারগুলির অর্থনৈতিক বিভাগ এখানো খুব সংগঠিত নয় এবং অনেকগুলিরই পরিচালক নেই। কোথাও কোথাও অনুপযুক্ত ব্যক্তি দিয়ে এই পদটি পূরণ করে রাখা হয়েছে মাত্র। সমবায়-সংস্থা তৈরীর ব্যাপারটিও একেবারেই প্রথমিক স্তরে রয়েছে, এবং কোন কোন জায়গায় খাদ্য সরবরাহের নিয়মিত ব্যবস্থা চালু হয়েছে মাত্র। জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে কোন প্রচারই করা হয় না (যদিও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ), এবং এর পেছনে জনগণের উৎসাহ জাগিয়ে তোলা হয়নি। এর কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক সংগঠন বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বোঝার অক্ষমতা। আলোচনার মধ্য দিয়ে, এবং আপনারা কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে যে রিপোর্ট দেবেন তারই মধ্য দিয়ে সরকারী কর্মচারী এবং শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে অর্থনীতিক সংগঠন সম্পর্কে গণ-উৎসাহ সৃষ্টি আপনাদের করতেই হবে। প্রত্যেকের কাছে বিপ্লবী যুদ্ধের অর্থনৈতিক সংগঠনের গুরুত্ব অত্যন্ত পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে নিজেরাই তারা অর্থনৈতিক সংগঠনের বণ্ড বিক্রি বাড়াবার ব্যবস্থা করে, সমবায় আন্দোলনের প্রচারে নেমে পড়ে এবং সব জায়গায় দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য সাধারণ ধর্মগোলা ও শস্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করে। খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যেক কাউন্টিতে একটি ছোট বিভাগ থাকবে এবং তার শাখা থাকবে জেলা এবং বাণিজ্যকেন্দ্রে-গুলিতে। একদিকে, আমাদের লাল এলাকার মধ্যে যেসব অঞ্চলে শস্যের প্রাচুর্য আছে, সেখান থেকে ঘাটতি অঞ্চলে আমরা শস্য পাঠাব, যাতে এক জায়গায় শস্য জমা হয়ে অন্য জায়গায় দুষ্প্রাপ্য না হয়, এবং তার দামও এক জায়গায় খুব চড়া এবং অন্য জায়গায় খুব কম না হয়। অন্যদিকে, পরিকল্পনা অনুযায়ী (অর্থাৎ সীমাহীন পরিমাণে নয়) লাল এলাকার শস্যের বাড়তি অংশ বাইরে পাঠিয়ে তার বদলে শ্বেত এলাকা থেকে আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আনব দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসাদারদের শোষণ এড়িয়ে।

আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করব কৃষি ও হস্তশিল্পের বিকাশসাধন করতে এবং কৃষি উপকরণ ও সারের বৃদ্ধি ঘটাতে, যাতে আগামী বছরের ফলনের বৃদ্ধি ঘটে আরও বিপুলাকারে। আমরা স্থানীয় পণ্য, যেমন ওলফ্রাম, সেগুন, কর্পূর, কাগজ, তামাক, বস্ত্র, শুকনো ছত্রাক, পিপুলনির্যাস আগের মতো উৎপাদন করাব এবং সেগুলো শ্বেত এলাকায় পাইকারীভাবে বিক্রি করব।

বহিরাঞ্চলের সঙ্গে আমাদের ব্যবসার আয়তন অনুসারে প্রেরিত পণ্যের তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে থাকে শস্য। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বদলে প্রতি বছর প্রায় তিরিশ লক্ষ পিকুল ধান পাঠানো হয়, অর্থাৎ গড়ে তিরিশ লক্ষ লোকের জনপ্রতি এক পিকুল ধান। এর কমে হবেই না। কিন্তু এই ব্যবসা কে পরিচালনা করছে? এই ব্যবসার সম্পূর্ণটাই ব্যবসাদারদের হাতে, যারা আমাদের সাংঘাতিকভাবে শোষণ করছে। গত বছর এরা ওয়ানান ও তাইহে কাউন্টিতে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনেছিল প্রতি পিকুল ৫০ সেণ্ট দামে আর কাঞ্চৌতে বিক্রি করেছিল ৪ য়ুয়ানে—অর্থাৎ সাতগুণ মুনাফায়। আর একটি উদাহরণ: প্রতি বছর আমাদের তিরিশ লক্ষ জনসাধারণের প্রয়োজন নব্বই লক্ষ য়ুয়ান দামের নুন এবং ষাট লক্ষ য়ুয়ান দামের কার্পাস বস্ত্র। নুন ও কার্পাসবস্ত্রে এই দেড়কোটি য়ুয়ান দামের ব্যবসা পুরোপুরি ব্যবসায়ীদের কবলে। এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই করিনি এই ব্যবসাদারদের শোষণ সত্যিই সাংঘাতিক। যেমন, এরা মেইসিয়েনে গিয়ে সাত ক্যাটি নুন কেনে এক য়ুয়ান দামে, আর আমাদের এলাকায় এনে ১২ আউন্স নুন বিক্রি করে এক য়ুয়ানে। কী সাংঘাতিক মুনাফা! এই জাতীয় ব্যাপার আমরা আর চলতে দিতে পারি না, এখন থেকে এই ব্যবসা আমরা নিজেরাই পরিচালনা করব। আমাদের বহিরাঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত বাণিজ্য-বিভাগ এ বিষয়ে নিশ্চয়ই বিশেষ প্রচেষ্টা চালাবেন।

আমরা কীভাবে তিরিশ লক্ষ য়ুয়ান মুদ্রামূল্যের অর্থনৈতিক সংগঠনের বণ্ড ব্যবহার করব? আমাদের পরিকল্পনা—এরকম দশ লক্ষ বরাদ্দ থাকবে লালফৌজের যুদ্ধ ব্যয় বাবদ। বাকী কুড়ি লক্ষ মূলধন হিসেবে ঋণ দেওয়া হবে সমবায় সংস্থা, খাদ্যসরবরাহ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এবং বহির্বাণিজ্য বিভাগকে। বাকী টাকার বড় অংশটাই ব্যবহৃত হবে বাহির্বাণিজ্য সম্প্রসারণের খাতে এবং অবশিষ্টটা হবে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, আমাদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য দরে বিক্রির ব্যবস্থাও আমরা করব শ্বেত

এলাকায়, এবং সস্তা দামে নুন ও কার্পাসবস্ত্র কিনব আমাদের জনসাধারণের মধ্যে বণ্টনের জন্য যাতে শত্রুর অবরোধ আমরা ভেঙে দিতে পারি, রুখে দিতে পারি ব্যবসায়ীদের শোষণ। জনগণের অর্থনীতির অবিরাম বিকাশসাধন আমরা করব, তাদের জীবনযাত্রার বহুল উন্নতি ঘটাব এবং সরকারী আয় বৃদ্ধি করাব প্রচুর পরিমাণে, এবং এইভাবে বিপ্লবী যুদ্ধের এবং অর্থ নৈতিক সংগঠনের দৃঢ় বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করব।

বিরাট কাজ এটা, বিরাট এক শ্রেণী-সংগ্রাম। কিন্তু নিজেদেরকে আমাদের প্রশ্ন করে দেখতে হবে প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে কি এই কাজ করা সম্ভব? আমি মনে করি, সম্ভব। লুংইয়েন পর্যন্ত রেলপথ বসানোর কথা আমরা বলছি না, এখনকার মতো কানচৌ পর্যন্ত মোটরপথ তৈরীর কথাও বলছি না। শস্য বিক্রির একচেটিয়া অধিকারের কথা বলছি না, এমন কথাও বলছি না যে দেড় কোটি য়ুয়ান মুদ্রামূল্যের নুন ও বস্ত্রের সমস্ত ব্যবসাটাই ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়ে সরকার পরিচালনা করবে। এটি আমাদের বক্তব্য নয়, বা এরকম চেষ্টাও আমরা করছি না। আমরা আলোচনা করছি এবং চেষ্টা করছি কৃষি ও হস্ত-শিল্প বিকাশের সম্পর্কে, এবং নুন ও বস্ত্রের বদলে শস্য ও ওলফ্রাম বাইরে পাঠানো সম্পর্কে, ২০ লক্ষ য়ুয়ান মূলধন ও তৎসহ জনগণের বিনিয়োজিত অর্থ দিয়ে সাময়িকভাবে শুরু করার বিষয় নিয়ে। এখানে কি এমন কোন বিষয় আছে যা আমাদের শুরু করা উচিত নয়, কিংবা করতে পারি না ও ফল পাওয়া যাবে না? এ কাজ আমরা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছি এবং কিছু সুফলও পেয়েছি। এ বছরের শরৎকালীন শস্যোৎপাদন গত বছরের তুলনায় শতকরা ২০।২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, আমাদের শত করা ২০ ভাগ বৃদ্ধির পরিকল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছে। হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে কৃষিযন্ত্র ও সার উৎপাদনের পরিমাণ আবার আগের মতোই করা গেছে এবং আমরা ওলফ্রাম উৎপাদনও শুরু করেছি। তামাক, কাগজ ও সেগুনের উৎপাদন পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। খাদ্য সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এ বৎসর অনেক কিছু করা হয়েছে। নুন আমদানীর প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। এইসব সাফল্যকে ভিত্তি করেই আমাদের আরও এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা গড়ে উঠেছে। অর্থ নৈতিক গঠনকার্য সম্ভব নয় এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে—এ কথা কি তাহলে স্পষ্টতঃই ভুল নয়?

এটা এখন সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বর্তমান পর্যায়ে অর্থ নৈতিক গঠনকার্য

কেন্দ্রীয় কর্মসূচী বিপ্লবী যুদ্ধকে ঘিরেই গড়ে উঠবে। বর্তমানে আমাদের প্রধান কাজ বিপ্লবী যুদ্ধ। অর্থ নৈতিক সাংগঠনিক পরিকল্পনা তাকে সাহায্য করবে, তাকে কেন্দ্র করে চলবে এবং তার অধীনে থাকবে। আবার, বিপ্লবী যুদ্ধকে উপেক্ষা করে অর্থ নৈতিক সংগঠনকে আমাদের সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু ভাবা কিংবা বিপ্লবী যুদ্ধকে বাদ দিয়ে চলার কথা চিন্তা করা হবে একই রকম ভ্রান্তি। গৃহযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্থ নৈতিক গঠনকার্যকে আমাদের সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু ভাবা সম্ভব নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। গৃহযুদ্ধের মধ্যে শান্তির সময়ের উপযোগী অর্থ নৈতিক গঠনকার্য পরিচালনা, যা বর্তমানের নয় ভবিষ্যতের, নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। বর্তমানের কাজ হচ্ছে সেগুলিই, যেগুলি যুদ্ধের আশু প্রয়োজন মেটাতে পারে। তাদের প্রত্যেকটিই যুদ্ধের প্রয়োজনভিত্তিক, তার একটিও যুদ্ধ থেকে আলাদা শান্তির সময়ের উপযোগী কোন কাজ নয়। যদি কোন কমরেড অর্থ নৈতিক গঠনকার্যকে যুদ্ধ থেকে আলাদা কিছু ভেবে থাকেন তবে তাঁর ভুল অচিরেই শুধরে নেওয়া উচিত।

সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং নেতৃত্বের সঠিক রীতি ছাড়া অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত অভিযান সম্ভব নয়। এই সভায় এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটিও সমাধানের জন্য উপস্থাপিত হয়েছে। কারণ নিজেদের কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই কমরেডদের বহুকিছু করতে হবে। তাঁদের নেতৃত্ব দিতে হবে অগণিত জনসাধারণকে, যারা তাঁদের সঙ্গে কাজে নামবে। বিশেষ করে শহর-নগরে এবং সমবায় সংস্থায়, খাদ্যবিভাগ, বাণিজ্যবিভাগ ও ক্রয় অফিসে যেসব কমরেড কাজ করেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে হাতে-কলমে কাজ করেন, সমবায় সংস্থা গড়ে তোলার কাজে জনগণকে সমাবেশ করান, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিবহনের ব্যবস্থা করেন এবং বহিরাঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসায় পরিচালনা করেন। যদি তাঁদের নেতৃত্বের রীতি ভুল হয়, যদি তাঁরা সঠিক ও কুশলী কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ না করেন তবে সঙ্গে সঙ্গেই কাজ ব্যাহত হবে, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে গণ-সমাবেশ ঘটাতে আমরা অক্ষম হব, এবং আগামী শরৎ ও শীতকালে এবং বসন্ত ও গ্রীষ্মে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ নৈতিক গঠনকার্যের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারব না। এই কারণে আমি নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি কমরেডদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথমতঃ, বিভিন্ন সাংগঠনিক পদ্ধতিতে গণ-সমাবেশ ঘটান। প্রাথমিকভাবে, সভাপতিমণ্ডলীর কমরেডরা, এবং সরকারী অর্থনীতি ও অর্থ বিভাগের

সর্বস্তরের কমরেডরা নিয়মিতভাবে আলোচ্য বিষয় ঠিক করে আলোচনা করবেন, তদারক করবেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন বণ্ড বিক্রী কীভাবে চলছে, সমবায় সংস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ কীভাবে হচ্ছে, খাদ্য সরবরাহ ও তার নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন ও বাণিজ্য বৃদ্ধি কীভাবে হচ্ছে। তারপর, গণসংগঠনসমূহকে, প্রধানত: ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং গরীব কৃষকদের সমিতিগুলিকে, কাজে নামাতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন তাদের সব সভ্যদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে সমাবেশ করাবে। গরীব কৃষকদের সমিতি সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও বণ্ড বিক্রি করার কাজে গণ-সমাবেশ ঘটাবার কাজে একটি শক্তিশালী ভিত্তি। তাদেরকে উদ্দীপনাময় নেতৃত্ব দেওয়া উচিত জেলা ও শহর সরকারের। তাছাড়া, আমাদের গ্রামে ও বাড়ী-বাড়ী ঘুরে অনুষ্ঠিত সভায় অর্থনৈতিক গঠনকার্যের প্রচার চালিয়ে যেতে হবে, ব্যাখ্যা করে অত্যন্ত কার্যকরী ভাষায় বুঝিয়ে বলতে হবে কীভাবে জনগণের জীবনমানের বিকাশ ঘটানো যায় এবং আমাদের সংগ্রামের শক্তি বাড়িয়ে তোলা যায়। জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান জানাব বণ্ড কিনিবার জন্য, সমবায় সংস্থা গড়ে তোলার জন্য, খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, অর্থব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য। তাদেরকে আমরা আহ্বান জানাব এই শ্লোগানের ভিত্তিতে সংগ্রাম করতে এবং তাদের উৎসাহ বাড়িয়ে তুলতে। আমরা যদি উপরিলিখিত পদ্ধতিতে আমাদের বিভিন্ন সাংগঠনিক উপায়ে গণ-সমাবেশ ঘটাতে না পারি, তাদের মধ্যে প্রচার না চালাতে পারি অর্থাৎ যদি সভাপতিমণ্ডলী ও সরকারী অর্থনৈতিক ও অর্থবিভাগের সর্বস্তরের সংস্থাগুলি অত্যন্ত কার্যকরীভাবে অর্থ-নৈতিক গঠনকার্যের বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে, যদি তারা গণসংগঠনসমূহকে উৎসাহের জোয়ারে কাজের মধ্যে নামিয়ে দিতে না পারে ও গণ-প্রচার সভা অনুষ্ঠিত করতে না পারে—তবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণ-সমাবেশ আমরা কিছুতেই করব না। বিপ্লবী কাজে যেমন কোনমতেই আমরা আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব সহ্য করি না, ঠিক সেইরকম অর্থনৈতিক গঠনকার্যেও আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব সহ্য করব না। অমলাতন্ত্রের কুৎসিত রূপকে, কোন কমরেডই যা পছন্দ করেন না, আবর্জনাকূপে নিক্ষেপ করতে হবে। আর এজন্য এমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যা জনসাধারণের মনে সাড়া তোলে, অর্থাৎ যা সব কমরেডই চান এবং যা

সব শ্রমিক ও কৃষকরাই সমর্থন করে। আমলাতন্ত্রের একটি লক্ষণ হল অসাবধানতা বা তাচ্ছিল্যের দরুণ কাজে শৈথিল্য। এই লক্ষণের বিরুদ্ধে আমাদের অত্যন্ত কঠোর সংগ্রাম চালাতেই হবে। আরেকটি লক্ষণ হল হুকুম জারি। হুকুম জারি যারা করে, তারা কিন্তু কাজে শৈথিল্য দেখায় না। তারা যে দৃঢ় কর্মঠ ব্যক্তি, এই ভাব তারা হাবভাবে ফুটিয়ে রাখে। কিন্তু ঘটনাটি হল এই যে, হুকুম জারির ওপর প্রতিষ্ঠিত সমবায় টিঁকতে পারে না। এমনকি কিছু সময়ের জন্য বেশ চালু আছে মনে হলেও তা দৃঢ়বদ্ধ হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের আস্থা তার থেকে যায় হারিয়ে এবং বিকাশও হয়ে পড়ে ব্যাহত। বণ্ড বস্তুটি যে কী এবং তা বিক্রি করার ক্ষমতা কতখানি আছে, তা বিচার না করেই হুকুম জারির পদ্ধতিতে বণ্ড বিক্রি এবং খুশীমত বিক্রি-কোটা বেঁধে দেওয়া শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের বিরক্তি উৎপাদন করবে এবং বিক্রিও ভাল হবে না। হুকুম জারির পদ্ধতি আমরা অবশ্যই অনুসরণ করব না। আমরা চাই জনসাধারণকে বোঝাবার জন্য উৎসাহব্যঞ্জক প্রচার অভিযান। বাস্তবানুগ অবস্থা ও সত্যিকারের গণ অনুভূতির ভিত্তিতে আমরা বিকাশ করব সমবায় সংস্থাসমূহকে, বণ্ড বিক্রির পরিমাণ বাড়াব এবং অর্থ-নৈতিক সমাবেশ ঘটানোর জন্য সমস্ত ধরনের কাজ করব।

তৃতীয়তঃ, অর্থ নৈতিক গঠনকার্যের সম্প্রসারণের কাজে বহু সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন। কয়েক কুড়ি বা কয়েকশ' লোকের কথা নয়, সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ লোককে সংগঠিত করতে হবে, তাদের শিক্ষিত করতে হবে এবং তাদের পাঠাতে হবে অর্থ নৈতিক গঠনকার্যের ফ্রন্টে। তারাই হবে অর্থ নৈতিক ফ্রন্টের নায়ক, আর বিপুল জনগণ হবে সৈন্যসাধারণ। কর্মীর অভাবের জন্য অনেকে হা-পিত্যেশ করে। কমরেড, সত্যিসত্যিই কি কর্মীর অভাব আছে? অগুনতি অসংখ্য কর্মী জনসাধারণের মধ্যে থেকে এগিয়ে এসেছেন, যাঁরা কৃষি-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পোড় খেয়ে এসেছেন, পোড় খেয়েছেন অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও বিপ্লবী যুদ্ধে। কী করে আমরা বলব যে কর্মীর অভাব রয়েছে? এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করলেই দেখবেন যে, আপনার চারিদিকেই রয়েছেন অসংখ্য কর্মী।

চতুর্থতঃ, অর্থ নৈতিক গঠনকার্য আজ যুদ্ধের সাধারণ কর্মসূচী ও অন্যান্য কর্মসূচী থেকে কিছু আলাদা নয়। জমি বিতরণের[২] ওপর প্রখর নজর রাখলেই জমির ওপর সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা সম্পূর্ণ-ভাবেই বিলুপ্ত করে দেওয়া যায়, উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে কৃষকের উৎসাহকে বৃদ্ধি

করা যায় এবং অর্থনৈতিক গঠনকার্যে অতি দ্রুত কৃষকসাধারণকে টেনে আনা যায়। শ্রম-আইনগুলি যদি অত্যন্ত কঠোরভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে শ্রমিকদের জীবন নির্বাহের অবস্থা সুষ্ঠু করা যায় এবং অতি দ্রুত অর্থ নৈতিক গঠনকার্যে তাদের নামানো যায় এবং কৃষকদের ওপর তাদের নেতৃত্ব শক্তিশালী করা যায়। নির্বাচনে যদি সঠিক নেতৃত্ব থাকে, তবে জমি বিতরণের হিসাবসহ চরিত্র উদ্ঘাটনের প্রচার[৩] মারফৎ আমাদের সরকারী সংস্থাসমূহকে আরও শক্তিশালী করা যায়, এবং তখন বিপ্লবী যুদ্ধে এবং অর্থ নৈতিক কর্মকাণ্ড-সহ অন্যান্য কর্তব্যকর্মে তাঁরা আরও উৎসাহী নেতৃত্ব দিতে পারেন। অর্থনৈতিক বিকাশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে জনগণের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্য সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কাজ করা। আর এ কথা না বললেও চলে যে, লালফৌজ সম্প্রসারণের কাজটি আর এক মুহূর্তও ফেলে রাখা যায় না। লালফৌজের বিজয় না হলে অবরোধ যে আরও দৃঢ় হবে, এটা প্রত্যেকেই বোঝে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক বিকাশ এবং জনগণের উন্নততর জীবন লালফৌজের সম্প্রসারণের কাজে নিঃসন্দেহে সাহায্য করবে এবং জনগণকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমরা যদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নতুন অর্থনৈতিক গঠনকার্য-সহ উপরিলিখিত সব কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে পারি এবং তাদের সবাইকে বিপ্লবী যুদ্ধের কাজে লাগিয়ে দিতে পারে, তবে বিপ্লবী যুদ্ধে বিজয় অতি অবশ্যই চলে আসবে আমাদের দিকে।

টীকা

১। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে চিয়াং কাই-শেক পাঁচটি ব্যাপক সামরিক অভিযান চালিয়েছিল জুইচিন ও কিয়াংসীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা লাল এলাকার বিরুদ্ধে। এগুলোকেই বলা হতো 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান। পঞ্চম অভিযানটি ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হলেও তার আগের গ্রীষ্মকাল থেকে চিয়াং কাই-শেক এই অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করেছিল।

২। লাল এলাকায় ভূমি-সংস্কারের পর সঠিকভাবে জমি বণ্টন হয়েছে কিনা পরীক্ষার জন্য একটি অভিযান পরিচালিত হয়।

৩। চরিত্র-উদ্ঘাটন করার অভিযানগুলি ছিল গণতান্ত্রিক সরকারের কর্ম-কর্তাদের বাজে কাজকর্মের স্বরূপ উদ্ঘাটন করবার উদ্দেশ্যে জনগণকে উৎসাহিত করে তুলবার জন্য পরিচালিত গণতান্ত্রিক অভিযান।

কীভাবে গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীসমূহের পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়

(অক্টোবর, ১৯৩৩)

১। জমিদার

জমিদার হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে জমির মালিক, যে নিজে শ্রম করে না বা করলেও খুবই অল্প পরিমাণে করে, এবং যে কৃষকদের শোষণ করে বেঁচে থাকে। জমির খাজনা আদায় করাটাই তার শোষণের প্রধান রূপ। এ ছাড়া সে টাকাও ধার দেয়, শ্রমিক নিয়োগও করে যা শিল্প-বাণিজ্যেও নিযুক্ত থাকে। তবে কৃষকদের কাছ থেকে জমির খাজনা আদায় করাটাই তার শোষণের প্রধান রূপ। বারোয়ারী জমির তত্ত্বাবধান করা এবং বিদ্যালয়ের জমি থেকে খাজনা[১] আদায়টাও জমির খাজনা আদায়ের মাধ্যমে শোষণের পর্যায়েই পড়ে।

একজন দেউলিয়া জমিদারকেও জমিদার হিসাবেই শ্রেণীভুক্ত করা হবে, যদি সে নিজে শ্রম না করে অন্যদের ঠকিয়ে বা লুট করে, অথবা তার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে বেঁচে থাকে, এবং যদি সে গড়পড়তা মধ্য-কৃষকদের থেকে ভাল অবস্থায় থাকে।

যুদ্ধবাজ, আমলা, স্থানীয় উৎপীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোকদের দল হচ্ছে জমিদারশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধি, জমিদারশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত এবং অতি মাত্রায় নির্দয়। ধনী কৃষকদের মধ্যেও ছোটখাট স্থানীয় অত্যাচারীদের এবং ছোটখাট অসৎ ভদ্রলোকদের হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়।

যেসব লোক খাজনা আদায় করা এবং সম্পত্তি দেখাশুনা করার ব্যাপারে জমিদারদের সহায়তা করে, যেসব লোক নিজেদের আয়ের প্রধান পথ হিসেবে জমিদার কর্তৃক কৃষকদের শোষণের উপরই নির্ভরশীল এবং গড়পড়তা মধ্য-কৃষকদের চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকে, তাদের জমিদারদের সমপর্যায়ে ফেলা হবে।

ভূমি-সংস্কারের কাজে যেসব বিচ্যুতি ঘটেছিল সেগুলো সংশোধন করার জন্য এবং ভূমি সমস্যার সঠিক সমাধানের জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে এই দলিলটি লিখেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-অবস্থান নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে দলিলটি সেই সময়কার শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়।

সুদখোর হচ্ছে সেইসব লোক, যারা নিজেদের আয়ের প্রধান পথ হিসেবে নির্ভর করে সুদের মাধ্যমে শোষণ করার উপর এবং গড়পড়তা মধ্য কৃষকের চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকে এবং তাদের জমিদারদের সমপর্যায়ে ফেলা হবে।

২। ধনী কৃষক

ধনী কৃষক জমির মালিক হয়, সেটাই নিয়ম। তবে কোন কোন ধনী কৃষক নিজেদের জমির মাত্র অংশবিশেষের মালিক, বাকী অংশটা খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত নিয়ে থাকে। অন্যদের আবার নিজের বলতে কোন জমিই নেই, সব জমিটুকুই খাজনায় বন্দোবস্ত নেওয়া। সাধারণতঃ ধনী কৃষকের গড়পড়তার তুলনায় বেশি এবং উন্নততর উৎপাদনের যন্ত্রপাতি থাকে, বেশি পরিমাণে কাঁচা টাকার মূলধন থাকে এবং সে নিজে শ্রম করে, তবে নিজের আয়ের অংশ-বিশেষের জন্য, এমনকি আয়ের মোটা অংশটার জন্যও নির্ভর করে থাকে শোষণের উপর। তার শোষণের প্রধান রূপ হচ্ছে শ্রমিক নিয়োগ করা (দীর্ঘ মেয়াদের শ্রমিক)। এ ছাড়াও সে তার জমির অংশবিশেষ ভাড়াও দিয়ে থাকে এবং জমির খাজনার মাধ্যমে শোষণ চালিয়ে থাকে, বা টাকা ধার দেয়, বা শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকে। অধিকাংশ ধনী কৃষক বারোয়ারী জমির তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত থাকে। যে লোক বেশ খানিকটা ভাল জমির মালিক, কিছুটা জমি শ্রমিক নিয়োগ না করে নিজেই চাষবাস করে, কিন্তু জমির খাজনার দ্বারা, ধার দেওয়া টাকার উপর সুদ নিয়ে বা অন্য ধরনে অন্যান্য কৃষকদের উপর শোষণ চালায়, তাকেও ধনী কৃষক হিসেবে গণ্য করা হবে। ধনী কৃষকরা নিয়মিত শোষণ চালায় এবং তাদের মধ্যে অনেকেরই আয়ের অধিকাংশটাই এসে থাকে এইখান থেকে।

৩। মধ্য কৃষক

অনেক মধ্য কৃষকই জমির মালিক। কেউ কেউ জমির মাত্র অংশ-বিশেষের মালিক, বাকী অংশটা খাজনায় বন্দোবস্ত নিয়ে থাকে। অন্যদের নিজের বলতে কোন জমিই নেই, সব জমিটুকুই খাজনার বন্দোবস্ত নেওয়া। সব মধ্য কৃষকেরই বেশ কিছু সংখ্যক চাষের যন্ত্রপাতি থাকে। একজন মধ্য কৃষকের আয়ের সবটাই বা প্রধান অংশটাই আসে তার নিজের শ্রম থেকে। সে অন্যকে শোষণ করে না, সেটাই নিয়ম, এবং অনেক ক্ষেত্রে সেই নিজেই

অন্তদের দ্বারা শোষিত হয়, কেননা, জমির খাজনা বাবদ এবং টাকা ধার নেওয়ার জন্ত সুদ বাবদ অল্প কিছু টাকা লোককে দিতে হয়। তবে সাধারণতঃ সে নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে না। কোন কোন মধ্য কৃষক (স্বচ্ছল মধ্য কৃষকরা) অবশ্য অল্প পরিমাণে শোষণ চালায়, তবে তাদের আয়টা নিয়মিত-ভাবে কিংবা প্রধানতঃ ওখান থেকে আসে না।

৪। গরীব কৃষক

গরীব কৃষকদের মধ্যে কেউ কেউ জমির অংশবিশেষের মালিক এবং তাদের অল্প কিছু এটা-সেটা চাষের যন্ত্রপাতি থাকে। অন্তদের নিজের বলতে কোন জমিই নেই, আছে শুধু অল্প কিছু এটা-সেটা চাষের যন্ত্রপাতি। গরীব কৃষকেরা যে জমিতে কাজ করে, সেটা খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত নেওয়া জমি, সেটাই নিয়ম এবং তারা শোষণের শিকার হয়ে থাকে, কেননা তাদের জমির খাজনা ও টাকা ধার নেওয়ার দরুণ সুদ দিতে হয় এবং কিছু পরিমাণে মজুর হিসেবে খাটতেও হয়।

সাধারণতঃ, একজন মধ্য-কৃষকের পক্ষে নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু গরীব কৃষককে নিজের শ্রমশক্তির কিছুটা অংশ বিক্রয় করতেই হয়। একজন মধ্য-কৃষকের সঙ্গে একজন গরীব কৃষকের পার্থক্য করার ব্যাপারে এটাই হচ্ছে প্রধান মাপকাঠি।

৫। শ্রমিক

শ্রমিকের (কৃষি-শ্রমিকও এর অন্তর্ভুক্ত) নিজের বলতে কোন জমি নেই বা চাষের যন্ত্রপাতি থাকে না, যদিও কেউ কেউ খুব সামান্ত পরিমাণ জমির মালিক এবং তাদের অতি অল্পপরিমাণ চাষের যন্ত্রপাতিও থাকে। শ্রমিকরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে সম্পূর্ণতঃ বা প্রধানতঃ নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে।

টীকা

১। চীনের গ্রামাঞ্চলে সর্বসাধারণের জমি ছিল নানান ধরনের—কোন জমির মালিক ছিল শহর বা জেলার সরকার, কোনটির মালিক গোষ্ঠিবিশেষের

পূর্বপুরুষকৃত মন্দির, কোনটির মালিক বৌদ্ধদের বা তাও-পন্থীদের মন্দির, ক্যাথলিকদের কোন গির্জা বা কোন মসজিদ, বা এমন জমি যার আয়টা দুর্ভিক্ষ ত্রাণ, বা রাস্তাঘাট ও পুল তৈরী ও মেরামত প্রভৃতি জনহিতকর কাজে বা শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা হতো। কার্যক্ষেত্রে এই ধরনের অধিকাংশ জমিই নিয়ন্ত্রণ করত জমিদাররা ও ধনী কৃষকরা, সেগুলির তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে নগণ্য কিছু কৃষকেরই মাত্র কথা বলার অধিকার ছিল।

আমাদের অর্থনৈতিক নীতি

(জানুয়ারী ২৩, ১৯৩৪)

যারা নিজেদের শাসিত অঞ্চলকে চরম-দেউলিয়া অবস্থায় এনে ফেলেছে, সেই কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজরাই কেবল চরম বেহায়ার মতো দিনের পর, দিন এই গুজব রটিয়ে যাচ্ছে যে, লাল এলাকাগুলি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে বসেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা ও কুওমিনতাঙরা উঠে-পড়ে লেগেছে, যাতে লাল এলাকাগুলিকে, সেখানে এগিয়ে চলা অর্থনৈতিক গঠনকার্যকে, এবং সেখানকার মুক্তিপ্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষকদের কল্যাণকে ধ্বংস করা যায়। এই উদ্দেশ্যে তারা 'পরিবেষ্টন ও দমন'-এর সামরিক অভিযানের জন্য শক্তি সংগঠিত তো করছেই, তার ওপর আবার অনুসরণ করে চলেছে অর্থনৈতিক অবরোধের এক হিংস্র নীতি। কিন্তু ব্যাপক জনতা ও লালফৌজকে নেতৃত্ব দিয়ে আমরা যে শুধু একের পর এক শত্রুদের 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে বিধ্বস্ত করেছি তাই নয়, এই হিংস্র অবরোধকেও ব্যর্থ করে দেবার জন্য আমরা সাধ্যমতো অর্থনৈতিক গঠনকার্যের মূল কর্তব্যগুলিও পালন করে চলেছি। এই ক্ষেত্রেও আমরা একের পর এক সাফল্য অর্জন করে চলেছি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের নির্ধারক নীতি হচ্ছে এই যে, আমাদের ক্ষমতানুযায়ী অর্থনৈতিক গঠনকার্যের সমস্ত মূল কর্তব্যগুলি পালন করে যেতে হবে এবং যুদ্ধ-প্রচেষ্টার ওপর সমস্ত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে, এবং একই সঙ্গে সাধ্যমতো জনগণের জীবনযাত্রাকে উন্নত করে তুলতে হবে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে সুসংহত করে তুলতে হবে, কৃষক সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এবং অর্থনীতিতে ব্যক্তি-মালিকানাধীন সেক্টরের ওপর রাষ্ট্রীয় সেক্টরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে—এবং এইভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা তৈরী করতে হবে।

অর্থনৈতিক গঠনকার্যের ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দিতে হবে

কিয়াংসী প্রদেশের জুইচিনে ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে কমরেড মাও সে-তুঙ এই রিপোর্ট পেশ করেন।

যাতে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, বাইরের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যকে সম্প্রসারিত করা যায়, এবং সমবায় সংস্থাগুলিকে বিকশিত করে তোলা যায়।

লাল এলাকায় কৃষিব্যবস্থা স্পষ্টতঃই এগিয়ে চলেছে। দক্ষিণ কিয়াংসী ও পশ্চিম ফুকিয়েনে ১৯৩২-এর তুলনায় ১৯৩৩-এর কৃষি-উৎপাদন ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, আর ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ফুকিয়েন-চেকিয়াং-কিয়াংসী সীমান্তাঞ্চলে। সেচুয়ান-শেনসী সীমান্ত এলাকায় ভাল ফসল হয়েছে। লাল এলাকা প্রতিষ্ঠা হলে প্রথমদিকে দু'-এক বছর প্রায়ই কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়ে থাকে।[১] কিন্তু জমি পুনর্বণ্টন ও মালিকানা নির্ধারণ এবং চাষের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেবার পরে পরেই কৃষকরা অত্যন্ত উদ্দীপনার মধ্যে চাষ শুরু করে, এবং উৎপাদন তখন অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে কৃষি-উৎপাদন কয়েকটি জায়গায় প্রাক বিপ্লব যুগের পরিমাণে পৌঁছে গেছে বা এমনকি ছাড়িয়ে গেছে। অন্যান্য জায়গায় বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় যেসব জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকত, আজ সেগুলোতেই যে শুধু আবার চাষ হচ্ছে তাই নয়, নতুন জমিতেও চাষ হচ্ছে। বহু জায়গায় গ্রামাঞ্চলে শ্রমশক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য পরস্পর-সহায়ক দল ও চাষ করার দল[২] সংগঠিত হয়েছে এবং বলদের অভাব দূর করার জন্য সমবায় সংগঠিত করা হয়েছে। তা ছাড়া, উৎপাদনে মেয়েরা অনেক বেশি সংখ্যায় যোগ দিচ্ছে কুওমিনতাঙ শাসনকালে এসবের কোনটাই হতো না। জমিদারদের হাতে জমি থাকায় কৃষকদের ইচ্ছেও হতো না উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণের, এবং তা করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণ করে, তাদের উৎসাহ দেবার এবং উৎপাদনের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করার পরেই কেবল কৃষকদের মধ্যে কাজের উৎসাহ বিকশিত হয়েছে এবং তার ফলে উৎপাদনে বিরাট সাফল্য অর্জিত হচ্ছে। এটাও বলা দরকার যে, আমাদের বর্তমান অবস্থার অর্থনৈতিক গঠনকার্যের কর্মসূচীতে কৃষিব্যবস্থা মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। এই কৃষির মাধ্যমেই আমরা যেমন আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য সমস্যার সমাধান করে থাকি, তেমনি তুলো, শন, আঁখ, বাঁশ প্রভৃতি দিয়ে আমাদের বস্ত্র, চিনি, কাগজ প্রভৃতি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদিত হয়, এবং কাঁচামালের সমস্যার সমাধানও হয়ে থাকে। বন-সম্পদ সংরক্ষণ ও পশুসংখ্যা বৃদ্ধিও কৃষিব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্ষুদ্রায়তন কৃষি অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত পরি-

কল্পনা গ্রহণ করা এবং এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কৃষকদেরকে সংগঠিত করা সম্ভব ও প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে এবং প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শ্রমশক্তি, চাষের বলদ, জমির সার, বীজ ও জলের সমস্যা সমাধানের কাজে কৃষকদেরকে আমাদের সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের মূল কর্তব্য হবে সংগঠিতভাবে শ্রমশক্তির যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা এবং কৃষিকাজে মেয়েদের যোগ দেওয়ার বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া। শ্রমশক্তি সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনীয় পন্থা হচ্ছে পরস্পর-সাহায্য দল সংগঠিত করা, চাষ করার দল গড়া, এবং অত্যন্ত কর্মমুখর চাষের সময় বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সমস্ত গ্রামের জনগণকে কাজে নামিয়ে দেবার জন্য উৎসাহ দেওয়া। আরেকটি বিরাট সমস্যা এই যে, কৃষকদের একটি বড় অংশেরই (প্রায় ২৫ শতাংশ) চাষের বলদ নেই। চাষের বলদের জন্য আমাদের সমবায় গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে, যেসব কৃষকের বলদ নেই তাদের উৎসাহ দিতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় সর্বসাধারণ্যে ব্যবহারের সমবায়ের 'শেয়ার' কেনে। কৃষিব্যবস্থার যা প্রাণ সেই জল সরবরাহের দিকেও আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। অবশ্য আমরা এখনও যৌথ কিংবা রাষ্ট্রীয় খামারের প্রশ্নটি আনতে পারছি না, তবে কৃষি উন্নয়নে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ছোট ছোট খামার, কৃষি গবেষণা ইস্কুল এবং বিভিন্ন স্থানে কৃষি পণ্যের প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার কাজ বিশেষ জরুরী।

শত্রুর অবরোধ বহিরাঞ্চলে আমাদের পণ্য বিক্রির বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। লাল এলাকায় বহু হস্তশিল্পের পণ্যোৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, বিশেষ করে তামাক ও কাগজের। কিন্তু বহিরাঞ্চলে পণ্য প্রেরণের বাধা দূর করা অসম্ভব নয়। আমাদের নিজেদের অঞ্চলেই সর্বসাধারণের চাহিদার কারণে পণ্যবাজারও সুবিস্তৃত। সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের হস্তশিল্পোৎপাদন ও অন্যান্য কিছু পণোৎপাদনের বিকাশসাধন করাতে হবে, প্রথমতঃ আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য, এবং দ্বিতীয়তঃ, বহিরাঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসার জন্য। আমরা তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করার এবং জনগণের সাহায্যে পণ্যোৎপাদকদের সমবায় সংস্থা গড়ে ওঠার পর থেকে গত দু'বছরে, বিশেষ করে ১৯৩৩এর প্রথমার্ধে বহু হস্তশিল্প ও কিছু কিছু শিল্প-কারখানা আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে তামাক, কাগজ, ওলফ্রাম, কর্পূর, চাষ-যন্ত্র ও জমির সার (যেমন চুন)। তা ছাড়া, বর্তমান অবস্থায়

আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র, ওষুধ এবং চিনির উৎপাদনে অবহেলা করা উচিত নয়। ফুকিয়েন-চেকিয়াং-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে কাগজ তৈরী, বস্ত্র তৈরী, চিনি পরিশোধন প্রভৃতি এমন কতকগুলি শিল্প গড়ে তোলা হয়েছে, যেগুলি আগে ছিল না। সেগুলি ভালভাবেই চলছে। নুনের ঘাটতি পূরণের জন্য জনসাধারণ নাইটার থেকেই নুন তৈরী করা শুরু করেছে। শিল্পকে চালিয়ে যেতে হলে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রয়োজন। হস্তশিল্পগুলি বিক্ষিপ্ত থাকলে বিস্তারিত ও সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা করা অবশ্যই অসম্ভব। কিন্তু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জন্য মোটামুটি বিস্তারিত পরিকল্পনা বিশেষভাবে প্রয়োজন, বিশেষ করে প্রথমে ও সর্বাগ্রে রাষ্ট্রীয় ও সমবায় সংস্থার জন্য। রাষ্ট্রীয় ও সমবায় সংস্থার প্রতিটি লোককে অবশ্যই প্রথম থেকেই কাঁচামাল উৎপাদনের পরিমাণের এবং শত্রু অঞ্চলে ও আমাদের অঞ্চলে তার বিক্রির সম্ভাবনার নিখুঁত ও নির্ভুল হিসেবের দিকে নজর রাখতে হবে।

বর্তমান সময়ে আমাদের কাছে জরুরী কাজ হচ্ছে পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যক্তিগত কারবারীদের বহির্বাণিজ্য সংগঠিত করা এবং কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় পণ্যের দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহণ করা। যেমন নুন এবং বস্ত্রাদির আমদানী, শস্যাদি ও উলফ্রাম রপ্তানী এবং আমাদের এলাকার মধ্যে শস্যের জোগানের সামঞ্জস্য বিধান করা। এই কাজগুলির পরিকল্পনা প্রথমে ফুকিয়েন-চেকিয়াং-কিয়াংসী অঞ্চলে নেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৩৩-এর বসন্ত কালে কেন্দ্রীয় অঞ্চলেও নেওয়া হয়েছে। বহির্বাণিজ্যের পর্যদ এবং অন্যান্য এজেন্সি গঠিত হওয়ার পরে প্রাথমিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

আমাদের অর্থনীতির তিনটি সেক্টর আছে: রাষ্ট্রীয় সংস্থা, সমবায় সংস্থা এবং ব্যক্তিমালিকানার সংস্থা।

বর্তমানে যেগুলি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলি করা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যেই রাষ্ট্রীয় সংস্থা সীমাবদ্ধ আছে। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত শিল্প এবং বাণিজ্যের বিকাশ শুরু হয়েছে এবং এগুলির ভবিষ্যৎও অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ।

ব্যক্তিগত অর্থনীতির সেক্টরগুলির কোন ক্ষতিসাধন আমরা করব না। বস্তুতঃপক্ষে যতদিন পর্যন্ত এগুলি আমাদের সরকার কর্তৃক নির্দেশিত আইন-সীমা লঙ্ঘন না করবে ততদিন পর্যন্ত আমরা এগুলির বিকাশসাধনে প্রেরণা জোগাব। কারণ, বর্তমান স্তরে রাষ্ট্রের ও জনগণের স্বার্থেই ব্যক্তিমালিকানার সংস্থাগুলির বিকাশসাধন একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ। এ কথা বলাই বাহুল্য

যে, বর্তমানে ব্যক্তিমালিকানার সংস্থাগুলিরই বিপুল সংখ্যাধিক্য এবং বেশ কিছুকাল এগুলিই প্রধান স্থান অধিকার করে থাকবে। বর্তমানে লাল এলাকায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-সংস্থাগুলিই ব্যক্তিমালিকানার সংস্থা।

সমবায় সংস্থাগুলিও দ্রুত বাড়ছে। নানাধরনের সমবায় সংস্থার মোট সংখ্যা এখন ১,৪২৩। ১৯৩৩এর সেপ্টেম্বর মাসে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী, কিয়াংসী ও ফুকিয়েনের ১৭টি কাউন্টির এই সমবায়গুলির মোট মূলধন ৩০০,০০০ য়ুয়ানেরও ওপরে। ক্রেতা-সমবায় এবং শস্য-সমবায়গুলোই সংখ্যায় বেশি আর তারপরেই উৎপাদক সমবায়গুলি। ঋণদান সমবায় সমিতি সবেমাত্র কাজ শুরু করেছে। যখন এই সমিতিগুলি এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি সমন্বিত হয়ে দীর্ঘদিন এই কাজের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠবে, তখন আমাদের অর্থনীতিতে সেগুলিই হয়ে উঠবে এক প্রচণ্ড শক্তি, এবং ক্রমশঃই এগুলি প্রধান স্থান অধিকার করবে এবং ব্যক্তিমালিকানার সেক্টরের নেতৃত্বও গ্রহণ করবে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় সংস্থার সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি বিকাশ এবং সমবায় সংস্থার ব্যাপক বিকাশকে অবশ্যই চলতে হবে ব্যক্তিগত মালিকানার সংস্থাগুলির বিকাশের প্রতি উৎসাহ প্রদানের সঙ্গে পাশাপাশিভাবে।

রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং সমবায় সংস্থার বিকাশসাধনের জন্য আমরা জনগণের সমর্থন নিয়ে ৩০ লক্ষ য়ুয়ান মূল্যের অর্থনৈতিক গঠনকার্যের বণ্ড বিলি করেছি। জনগণের শক্তির ওপর এরকম আস্থা স্থাপন করাই হচ্ছে একমাত্র সম্ভাব্য পথ, যে-পথে বর্তমান অর্থনৈতিক গঠনকার্যের জন্য অর্থ সমস্যার সমাধান করা যায়।

আমাদের অর্থনীতির বিকাশসাধন করে রাজস্ব বৃদ্ধি করাই হচ্ছে আমাদের রাজস্ব নীতির একটি মূলনীতি। ফুকিয়েন-চেকিয়াং-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে এর ফলে চমৎকার ফল পাওয়া গেছে, এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলেও তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। আমাদের রাজস্ব ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির কর্তব্য হচ্ছে এই নীতিকে সুসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা। এ প্রসঙ্গে আমাদের সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক নোট প্রচলন যেন মুখ্যতঃ অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনানুসারেই হয় এবং আর্থিক কারণে নোট প্রচলন যেন গৌণ স্থান গ্রহণ করে।

আমাদের সরকারী ব্যয়ের পরিচালিকা নীতি হওয়া উচিত মিতব্যয়িতা। সমস্ত সরকারী কর্মচারীদেরকে একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, দুর্নীতি এবং অপচয় হচ্ছে মারাত্মক অপরাধ। দুর্নীতি এবং অপচয়ের বিরুদ্ধে

আমাদের আন্দোলন বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে, কিন্তু এ বিষয়ে আরও প্রচেষ্টা চালানো দরকার। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্য, বিপ্লবের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং আমাদের অর্থনৈতিক গঠনকার্যের জন্য প্রতিটি পয়সা সঞ্চয় করা—আমাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষার ব্যবস্থার এটাই হওয়া উচিত মূল নীতি। কুওমিনতাঙ যে পদ্ধতিতে রাজস্ব ব্যয় করে, আমাদের ব্যয়ের পদ্ধতি নিশ্চিতভাবেই হতে হবে তার চাইতে ভিন্ন ধরনের।

যে-সময়ে সমগ্র দেশ এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ডুবে আছে, যখন কোটি কোটি লোক ক্ষুধায় এবং শীতে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে, তখন আমাদের এলাকার জনগণের সরকার বিপ্লবী যুদ্ধের স্বার্থে, সমগ্র জাতির স্বার্থে, সমস্ত অসুবিধা উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক গঠনকার্য দৃঢ় পদক্ষেপে চালিয়ে যাচ্ছে। অবস্থাটি খুবই পরিষ্কার,—কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদ ও কুওমিনতাঙকে পরাজিত করেই এবং সুপরিকল্পিত ও সংগঠিত অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে হাত লাগিয়েই আমরা সমগ্র চীনের জনগণকে এই অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের কবল থেকে মুক্ত করতে পারি।

টীকা

১। লাল এলাকা প্রতিষ্ঠিত হবার পর সাধারণতঃ প্রথম দু-এক বছর কৃষি-উৎপাদন কমে যায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, জমির পুনর্বণ্টনের সময়ে জমির মালিকানা তখনও নির্ধারিত হয় না, এবং নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও তখনও পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না। এর ফলে কৃষকরা পুরো মন দিয়ে উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যেতে পারেনি।

২। শ্রমশক্তিকে আরও ভালভাবে সংগঠিত করে উৎপাদন বাড়াবার উদ্দেশ্যে লাল এলাকায় ব্যক্তিগত কৃষির ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছিল পারস্পরিক সহায়ক দল ও চাষের কাজের দল। স্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণ ও পারস্পরিক সুবিধের নীতির ভিত্তিতে সদস্যরা প্রত্যেকে একে একে অন্যের জন্য সমান পরিমাণ কাজ করত; কিংবা একজন যে পরিমাণ কাজ পেত, সে অন্যের জন্য তার সমান পরিমাণ কাজ না করতে পারলে নগদ টাকায় এই ব্যবধান পুষিয়ে দিত। পরস্পরকে সাহায্য করা ছাড়াও এই দলগুলি লালফৌজের সৈন্যদেরকে বিশেষ সুবিধে দিত, এবং যাদের সন্তান মারা গেছে এমন বৃদ্ধদের কাজ

বিনা পারিশ্রমিকে শুধু খাবারের বিনিময়ে করে দিত। পারস্পরিক সাহায্যের এইসব বিধি উৎপাদনে বিশেষ সাহায্য করত এবং যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে কার্যকরী হতো। একারণে এগুলি ব্যাপক জনগনের আন্তরিক সমর্থন পেয়েছিল।

জনসাধারণের জীবনযাত্রার যত্ন নিন
কর্মপদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দিন

(জানুয়ারী ২৭, ১৯৩৪)

কমরেডরা আলোচনার সময়ে গুরুত্ব আরোপ করতে পারেননি এমন দু'টি সমস্যা আছে, আমি তা উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

প্রথম সমস্যা হল জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত সমস্যা।

বর্তমানে আমাদের প্রধান কর্তব্য হল বিপ্লবী যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাপক জনসাধারণকে সমাবেশ করা, এই বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদকে ও কুওমিনতাঙকে নিপাত করা, বিপ্লবকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদকে চীন থেকে বিতাড়িত করা। যিনি এই প্রধান কর্তব্যকে ছোট করে দেখেন তিনি খুব ভাল বিপ্লবী কর্মী হতে পারেন না। আমাদের কমরেডরা যদি এই প্রধান কর্তব্যকে প্রকৃতভাবেই স্পষ্ট করে দেখে থাকেন এবং বুঝে থাকেন যে, যে-কোনভাবেই হোক, বিপ্লবকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতেই হবে, তাহলে ব্যাপক জনসাধারণের প্রত্যক্ষ স্বার্থের সমস্যাকে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার সমস্যাকে লেশমাত্রও অবহেলা করা উচিত নয় এবং কিছুতেই ছোট করে দেখাও উচিত নয়। কারণ, বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের যুদ্ধ, কেবলমাত্র জনসাধারণকে সমাবেশ করে এবং তাঁদের উপর নির্ভর করেই এ যুদ্ধকে চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

যদি আমরা যুদ্ধ চালাবার জন্য কেবলমাত্র জনগণকে সমাবেশ করি এবং তা ছাড়া আর কোন কিছুই না করি, তাহলে আমরা কি শত্রুকে পরাজিত করার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব? অবশ্যই না। যদি আমরা বিজয়লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই আরও অনেক কাজ করতে হবে। ভূমি-সংগ্রামে কৃষকদের পরিচালনা করতে হবে, কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করে দিতে হবে, কৃষকদের শ্রম-উৎসাহ বাড়াতে হবে, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, শ্রমিকদের

এই রচনাটি ১৯৩৪ সালের ২৭শে জানুয়ারী কিয়াংসী প্রদেশের জুইচিনে অনুষ্ঠিত নিখিল চীন শ্রমিক-কৃষক প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসে কমরেড মাও সে-তুঙের প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণের একটি অংশ।

স্বার্থ রক্ষা করতে হবে, সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বাইরের এলাকার সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে হবে, জনসাধারণের যে সমস্যা, অর্থাৎ বস্ত্র, খাদ্য, বাসস্থান, জ্বালানি, চাল, রান্নার তেল, লবণ, রোগ, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং বিবাহের সমস্যা সমাধান করতে হবে। এক কথায়, জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত বাস্তব সমস্যার প্রতিই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। যদি আমরা এইসব সমস্যার প্রতি মনোযোগ দিই, এগুলোর সমাধান করি এবং জনসাধারণের চাহিদা মেটাই, তাহলেই আমরা জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রকৃত সংগঠক হয়ে উঠব, এবং জনসাধারণ সত্যিকারভাবে আমাদের চারিপাশে ঐক্যবদ্ধ হবেন ও আমাদেরকে তাঁদের আন্তরিক সমর্থন দেবেন। কমরেডগণ, আমরা কি সেই সময়ে জনসাধারণকে বিপ্লবী যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারব? পারব, নিশ্চয়ই পারব।

আমাদের কর্মীদের মধ্যে এই ধরনের ব্যাপার দেখা গিয়েছিল যে, তাঁরা শুধু লালফৌজের সম্প্রসারণ, পরিবহন-ইউনিটের সম্প্রসারণ, জমির খাজনা আদায় এবং বণ্ড বিক্রয় সম্বন্ধেই কেবল কথা বলেন, অন্য কাজ সম্পর্কে তাঁরা কিছু বলেন না এবং মনোযোগ দেন না, এমনকি একেবারেই মনোযোগ দেন না। উদাহরণস্বরূপ, এক সময়ে থিংচৌ পৌর-সরকার শুধুমাত্র লালফৌজের সম্প্রসারণ ও পরিবহন-ইউনিটের সমাবেশ সম্পর্কে মনোযোগ দিয়েছে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার সমস্যার ব্যাপারে কোন মনোযোগই দেয়নি। থিংচৌ শহরের জনসাধারণের সমস্যা হল তাঁদের জ্বালানি কাঠ ছিল না, পুঁজিপতিদের মজুতের ফলে তাঁরা লবণ কিনতে পারেননি, জনসাধারণের মধ্যে কারো-কারো বাড়ী-ঘর ছিল না এবং সেখানে চালের অভাব ছিল, আর চালের দামও ছিল চড়া। এগুলোই ছিল থিংচৌ শহরের জনসাধারণের বাস্তব সমস্যা এবং সেগুলো সমাধানের সাহায্যের জন্য তাঁরা খুবই আগ্রহে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু থিংচৌ পৌর-সরকার এসব কোন কিছুই আলোচনা করেনি। তাই, তখন থিংচৌ শহরে শ্রমিক-কৃষকদের প্রতিনিধি-পরিষদ পুনর্নির্বাচনের পর এক শতাধিক প্রতিনিধি পরবর্তী সভায় যোগদানে অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ, প্রথম কয়েকটি সভায় শুধুমাত্র লালফৌজ সম্প্রসারণ ও পরিবহন ইউনিটের সমাবেশ সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছিল এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রতি মোটেই মনোযোগ দেওয়া হয়নি। তার ফলে, পরবর্তী-কালে সভা ডাকাও অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সুতরাং লালফৌজ সম্প্রসারণ

এবং পরিবহন-ইউনিটের সমাবেশ সম্পর্কে, অতি অল্প সাফল্যই অর্জিত হয়েছিল। তা ছিল এক রকমের অবস্থা।

কমরেডগণ, দুটি আদর্শ-থানা সম্পর্কে যে পুস্তিকা আপনাদের দেওয়া হয়েছে আপনারা সম্ভবতঃ তা পড়েছেন। ওখানকার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। কিয়াংসীর ছাংকাং থানায়[১] এবং ফুকিয়েনের ছাইসি থানায়[২] লালফৌজ সম্প্রসারণের সংখ্যা কি বিরাট ছিল! ছাংকাং থানায় শতকরা ৮০ ভাগ যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী লালফৌজে যোগদান করেছিল এবং ছাইসি থানায় জনসাধারণের শতকরা ৮৮ ভাগ লালফৌজে যোগদান করেছিল। বণ্ডের বিক্রিও হয়েছিল প্রচুর, দেড় হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত ছাংকাং থানায় ৪ হাজার ৫ শত য়ুয়ান মূল্যের বণ্ড বিক্রি করা হয়েছে। অন্যান্য কাজেও খুব বেশি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এর কারণ কি? কয়েকটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ছাংকাং থানার একজন গরীব কৃষকের ঘরে যখন একটি অগ্নিকাণ্ডের ফলে দেড়টি কামরা ধ্বংস হয়ে যায়, তখন থানা-সরকার তাঁকে সাহায্যে করার জন্য জনসাধারণের কাছে অর্থদানের আবেদন করেছিল। তিনটি লোক না খেয়ে ছিল, থানা-সরকার এবং পারস্পরিক সাহায্য-কমিটি অবিলম্বে চাল সরবরাহ করে তাঁদের সাহায্য করেছিল। গত গ্রীষ্মে খাদ্য ঘাটতির সময়ে থানা-সরকার জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য দুইশত লী-রও বেশি দূরবর্তী কুংলিও জেলা[৩] থেকে চাল এনেছিল। ছাইসি থানায়ও এই ধরনের কাজ খুব ভালই চলেছিল। এইরকম থানা-সরকারই প্রকৃত আদর্শ থানা-সরকার। থিংচৌ পৌর-সরকারের আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব-পদ্ধতি থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ আলাদা। ছাংকাং থানা ও ছাইসি থানা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং থিংচৌ শহরের নেতাদের মতো আমলাতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা করা উচিত।

আমি আন্তরিকভাবে এই কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব করছি যে, ভূমি ও শ্রম সমস্যা থেকে শুরু করে জ্বালানি, চাল, রান্নার তেল ও লবণের সমস্যা পর্যন্ত জনসাধারণের জীবনের প্রতিটি সমস্যার প্রতি আমাদের গভীর মনোযোগ দিতে হবে। নারীরা লাঙল ও মই চালনা শিখতে চায়, তাদের শেখাবার জন্য আমরা কাকে খুঁজতে পারি? শিশুরা পড়াশোনা করতে চায়, প্রাথমিক স্কুল কি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে? ওখানকার কাঠের পুল খুবই সরু, মানুষ পড়ে যেতে পারে, সেটা কি মেরামত করা উচিত নয়? অনেক মানুষ ফোড়া

এবং অন্যান্য রোগে ভুগছে, এই সম্বন্ধে আমরা কি করতে যাচ্ছি? জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত এ ধরনের সমস্ত সমস্যাকেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ে স্থান দিতে হবে। সেগুলোকে আলোচনা করতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, কার্যকারী করতে এবং তার ফলাফলের উপর পরীক্ষা করতে হবে। ব্যাপক জনসাধারণকে আমাদের বোঝানো উচিত যে, আমরা তাঁদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করি এবং তাঁদের সঙ্গে আমরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই সমস্ত বিষয় থেকে আমাদের উত্থাপিত উচ্চতর কর্তব্যকে অর্থাৎ বিপ্লবী যুদ্ধের কর্তব্যকে যেন তাঁদের বোঝানো হয়, যাতে করে তাঁরা বিপ্লবকে সমর্থন করেন এবং সারা দেশে ছড়িয়ে দেন, আমাদের রাজনৈতিক আবেদনে সাড়া দেন এবং বিপ্লবের জয়লাভের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করেন। ছাংকাং থানার জনসাধারণ বলেন, 'কমিউনিস্ট পার্টি সত্যিই ভাল, আমাদের জন্য তা সব কিছু চিন্তা করছে'। ছাংকাং থানার কর্মিগণই আদর্শ। কী প্রশংসনীয় লোক! তাঁরা ব্যাপক জনসাধারণের আন্তরিক ও অকপট ভালবাসা অর্জন করেছেন। যুদ্ধে যোগদানের জন্য তাঁদের আহ্বান ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থন লাভ করেছে। আমরা কি জনসাধারণের সমর্থন লাভ করতে চাই? আমরা কি চাই যে, জনসাধারণ তাঁদের সমস্ত শক্তি যুদ্ধ-ফ্রন্টে নিযোজিত করুক? যদি তাই হয়, তবে আমাদের অবশ্যই জনসাধারণের সঙ্গে থাকতে হবে, তাঁদের সক্রিয়তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, তাঁদের সুখ-দুঃখের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, তাঁদের স্বার্থের জন্য আন্তরিকভাবে ও অকপটভাবে কাজ করতে হবে এবং তাঁদের উৎপাদন ও দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যা, অর্থাৎ লবণ, চাল, বাসগৃহ, কাপড়, শিশুজন্ম সমস্যার সমাধান করতে হবে, অন্য কথায়, জনসাধারণের সমস্ত সমস্যারই সমাধান করতে হবে। আমরা যদি এইভাবে কাজ করি তাহলে ব্যাপক জনসাধারণ নিশ্চয়ই আমাদের সমর্থন করবেন, এবং বিপ্লবকে তাঁদের জীবন বলে মনে করবেন, বিপ্লবকে তাঁদের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় পতাকা বলে মনে করবেন। কুওমিনতাঙ যদি লাল এলাকা আক্রমণ করতে চেষ্টা করে, তাহলে ব্যাপক জনসাধারণ যে নিজেদের জীবন দিয়ে কুওমিনতাঙের সঙ্গে চূড়ান্তভাবে সংগ্রাম করবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। আমরা কি শত্রুর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে বাস্তবিক ভাবেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিইনি?

কুওমিনতাঙ এখন তাদের দুর্গ-নীতি[৪] অনুসরণ করছে, প্রচণ্ডভাবে তাদের

"'কচ্ছপের খোল' নির্মাণ করে যাচ্ছে। তারা মনে করে সেগুলোই তাদের লৌহপ্রকার। কমরেডগণ, সেগুলো কি প্রকৃতই লৌহপ্রকার? মোটেই না। আপনারা দেখুন, হাজার হাজার বছর ধরে সামন্ত-সম্রাটদের প্রাচীর-পরিখা ও প্রাসাদগুলো কি শক্তিশালী ছিল না? তবুও যখনই জনসাধারণ জেগে উঠেছেন, তখনই সেগুলো একের পর এক ধ্বসে গিয়েছে। রাশিয়ার জার ছিল পৃথিবীর অন্যতম নিষ্ঠুরতম শাসক, তবু যখন সর্বহারাশ্রেণী ও কৃষকদের বিপ্লবের অভ্যুদয় ঘটল, তখন কি এই জারের অস্তিত্ব ছিল? না, কিছুই ছিল না। আর লৌহপ্রাকার? সব ধ্বসে গেছে। কমরেডগণ, সত্যিকারের লৌহ-প্রাকার কি? তা হচ্ছে জনসাধারণ, কোটি কোটি জনসাধারণ, যাঁরা বিপ্লবকে অকৃত্রিমভাবে ও আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। এটাই হচ্ছে প্রকৃত লৌহ-প্রাকার, এটাকে বিনাশ করা যে-কোন শক্তির পক্ষেই অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব। প্রতিবিপ্লবী শক্তি আমাদের বিনাশ করতে পারে না, আমরাই বরং তাকে বিনাশ করব। বিপ্লবী সরকারের চারিপাশে কোটি কোটি জন-সাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং আমাদের বিপ্লবী যুদ্ধকে প্রসারিত করে আমরা সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করতে পারব এবং সমগ্র চীন অধিকার করতে পারব।

দ্বিতীয় সমস্যা হল কর্মপদ্ধতি সম্পর্কিত সমস্যা।

আমরা বিপ্লবী যুদ্ধের পরিচালক ও সংগঠক, আবার জনসাধারণের জীবন-যাত্রার পরিচালক এবং সংগঠকও বটে। বিপ্লবী যুদ্ধকে সংগঠিত করা এবং জন-সাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা আমাদের দুটি মহান কর্তব্য। এখানে, কর্মপদ্ধতি সম্পর্কিত সমস্যা একটা গুরুতর সমস্যা হিসেবে আমাদের সামনে রয়েছে। আমাদের শুধু যে কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে তাই নয়, বরং কর্তব্য সম্পন্ন করার পদ্ধতির সমস্যারও সমাধান করতে হবে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নদী পার হওয়া, কিন্তু সেতু কিংবা নৌকা ছাড়া তা তো পার হওয়া যায় না। সেতু বা নৌকা-সমস্যার সমাধান না হলে নদী পার হওয়ার কথাটা একটা ফাঁকা বুলি মাত্র। পদ্ধতির সমস্যার সমাধান না হলে কর্তব্য সম্পন্ন করার কথাও বাজে কথা মাত্র। যদি লালফৌজের সম্প্রসারণের কাজে নেতৃত্ব দেবার জন্য মনোযোগ দেওয়া না হয় এবং লালফৌজের সম্প্রসারণের কর্মপদ্ধতিতে যত্ন নেওয়া না হয়, তাহলে হাজার বার লালফৌজের সম্প্রসারণের কথা আওড়ালেও তা কখনো সফল হবে না। অন্য কোন কাজে, উদাহরণস্বরূপ, জমি বণ্টন

সম্পর্কে যাচাই করার কাজে, অর্থনীতি গঠনের কাজে, সংস্কৃতি ও শিক্ষার কাজে এবং নতুন এলাকার ও সীমান্ত এলাকার কাজে—এ সকল কাজে যদি আমরা শুধু কর্তব্য নির্ধারণ করি, কিন্তু সেগুলো কার্যকরী করার সময়ে কর্মপদ্ধতিতে মনোযোগ না দিই আমলাতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করি এবং কার্যকরী ও বাস্তব কর্মপদ্ধতি গ্রহণ না করি, হুকুমবাদী পরিত্যাগ না করি এবং ধৈর্যের সঙ্গে বুঝিয়ে বলার কর্মপদ্ধতি গ্রহণ না করি, তাহলে কোন কর্তব্য সম্পন্ন করাই সম্ভব নয়।

সিংকুয়োর কমরেডরা সৃজনশীলভাবে প্রথমশ্রেণীর কাজ সম্পন্ন করেছেন, তাই আদর্শ কর্মী হিসেবে আমাদের প্রশংসার যোগ্য। অনুরূপভাবে উত্তর-পূর্ব কিয়াংসীর কমরেডগণও সৃজনশীলভাবে খুব ভাল কাজ করেছেন। তাঁরাও আদর্শ কর্মী। সিংকুয়োর ও উত্তর-পূর্ব কিয়াংসীর কমরেডগণ জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে বিপ্লবী যুদ্ধের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন এবং বিপ্লবী কর্মপদ্ধতির সমস্যাকে ও বিপ্লবী কাজের কর্তব্যের সমস্যাকে যুগপৎ সমাধান করেছেন। ওখানে তাঁরা মন দিয়ে কাজ করেছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্যার সমাধান করেছেন এবং বিপ্লবের দায়িত্বকে প্রকৃতভাবেই বহন করছেন। তাঁরা বিপ্লবী যুদ্ধের উত্তম সংগঠক ও পরিচালক আবার জনসাধারণের জীবনযাত্রার উত্তম সংগঠক এবং পরিচালকও বটে। অন্যান্য অঞ্চলে, যেমন ফুকিয়েন প্রদেশের সাংহাং, ছাংথিং ও ইউংতিং প্রভৃতি জেলার কোন কোন জায়গায়, দক্ষিণ কিয়াংসীর সিকিয়াং প্রভৃতি স্থানে, হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার ছালিং, ইউংশিন ও কিয়ান প্রভৃতি জেলার কোন কোন জায়গায়, হুনান-হুপে-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার ইয়াংসিন জেলার কোন কোন স্থানে এবং কিয়াংসী প্রদেশের আরও অনেক জেলার মহকুমা ও থানাগুলিতে, আর আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি অধীন জুইচিন জেলার কমরেডগণ সবাই তাঁদের কাজের অগ্রগতি অর্জন করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁরাও আমাদের সকলের প্রশংসার যোগ্য।

আমাদের নেতৃত্বাধীন সমস্ত স্থানেই নিঃসন্দেহে জনসাধারণ থেকে উদ্ভূত অনেক সক্রিয় কর্মী এবং চমৎকার কমরেড-কর্মী রয়েছেন। এইসব কমরেডদের একটি দায়িত্ব হচ্ছে, যেসব স্থানে কাজ দুর্বল সেসব স্থানে সাহায্য করা এবং যে কমরেডগণ এখনো ভালভাবে কাজ করতে নিপুণ হননি তাঁদেরকে সাহায্য করা। আমরা একটি মহান বিপ্লবী যুদ্ধের সম্মুখীন শত্রুর বিরাটাকারের 'পরি-

বেষ্টন ও দমন' অভিযানকে আমাদের ভেঙে দিতে হবে এবং সারা দেশে বিপ্লবকে ছড়িয়ে দিতে হবে। সকল বিপ্লবী কর্মীরই এক মহান দায়িত্ব রয়েছে। এই কংগ্রেসের পর আমাদের কাজের উন্নতির জন্য আমাদের অবশ্যই কার্যকরী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। অগ্রগামী এলাকাকে আরও উন্নত করতে হবে এবং পশ্চাৎপদ এলাকাকে অগ্রগামী এলাকার কাছাকাছি আসতে হবে। ছাংকাংয়ের মতো হাজার হাজার থানা এবং সিংকুয়োর মতো ডজন ডজন জেলার সৃষ্টি করতে হবে। সেগুলোই হবে আমাদের দৃঢ় অবস্থান। এই অবস্থানগুলো দখল করেই আমরা এই অবস্থানগুলো থেকে শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চূর্ণ করার জন্য এগিয়ে যেতে পারব এবং সমগ্র দেশে সাম্রাজ্যবাদী ও কুওমিনতাঙের শাসনকে উচ্ছেদ করতে অগ্রসর হতে পারব।

টীকা

১। ছাংকাং হল কিয়াংসী প্রদেশের সিংকুয়ো জেলার একটি থানা।

২। ছাইসি হল ফুকিয়েন প্রদেশের সাংহাং জেলার একটি থানা।

৩। কুংলিও হল তৎকালীন কিয়াংসী লাল এলাকার একটি জেলা, তার কেন্দ্র হল কিয়ান জেলার দক্ষিণ-পূর্বের তুংকু। লালফৌজের তৃতীয় আর্মির কম্যাণ্ডার কমরেড হুয়াং কুং-লিও ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে এখানে শহীদ হন, তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর নামানুসারেই এই জেলার নামকরণ করা হয়েছে।

৪। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে কিয়াংসীর লুসানে সামরিক সম্মেলনে চিয়াং কাই-শেক পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের নতুন সামরিক কৌশল হিসেবে লাল এলাকার চারিপাশে দুর্গ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এক হিসাবানুযায়ী ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে কিয়াংসী প্রদেশে ২,৯০০ দুর্গ তৈরী করা হয়। পরবর্তীকালে অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার কালে জাপানী আক্রমণকারীরাও চিয়াং কাই-শেকের এই নীতি প্রয়োগ করেছিল। ঐতিহাসিক ধারার মধ্য দিয়ে এটা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কমরেড মাও সে-তুঙের গণযুদ্ধের রণনীতি অনুসারে এই ধরনের প্রতিবিপ্লবী দুর্গ-নীতিকে চূর্ণবিচূর্ণ ও পরাজিত করা সম্পূর্ণ সম্ভব।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশল সম্পর্কে

(ডিসেম্বর ২৭, ১৯৩৫)

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য

কমরেডগণ! বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তিত অবস্থার পটভূমিতে পার্টি আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে।

এই বর্তমান অবস্থাটি কীরকম?

এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীনকে একটি উপনিবেশে পরিণত করবার চেষ্টা করছে।

আমরা সবাই জানি, প্রায় একশো বছর ধরে চীন একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ হয়ে আছে, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এক সঙ্গে তার ওপর আধিপত্য করছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ির ফলে চীন তার আধা-স্বাধীন সত্বা বজায় রাখতে পেরেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে কিছু সময়ের জন্ত চীনের ওপর এককভাবে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছিল। কিন্তু জাপানের কাছে চীনের আত্মসমর্পণের চুক্তি, তখনকার জঘন্য বিশ্বাসঘাতক য়ুয়ান শি-কাই[১] কর্তৃক স্বাক্ষরিত একুশ দফা দাবি[২] জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের সংগ্রাম এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হস্তক্ষেপের ফলে নিঃসন্দেহেই নাকচ হয়ে গিয়েছিল। ১৯২২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বানে

১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তর শেনসীর ওয়াওপাওতে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর এক সভার পর সেখানেই অনুষ্ঠিত পার্টি-কর্মীদের এক সম্মেলনে কমরেড মাও সে-তুঙ এই রিপোর্টটি পেশ করেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভাগুলির অন্যতম এই সভায় এই ভুল ধারণাকে সমালোচনা করা হয়েছিল যে, জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যুদ্ধে চীনের জাতীয় বুর্জোয়ারা শ্রমিক-কৃষকের মিত্র হতে পারে না। এই সভায় জাতীয় যুক্তফ্রন্টের রণকৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাজনৈতিক ব্যুরোর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমরেড মাও সে তুঙ এই সভায় জাপানকে প্রতিরোধ করার শর্তে জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ও গুরুত্ব সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি এই যুক্তফ্রন্টের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজের নেতৃত্বের ভূমিকা পালনের চূড়ান্ত

ওয়াশিংটনে নয়শক্তি সম্মেলনে একটি চুক্তি[৩] স্বাক্ষরিত হয়, যার ফলে চীনদেশ আবার একই সঙ্গে বহু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনস্থ হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনাই[৪] হচ্ছে চীনকে জাপানের উপনিবেশে পরিণত করার বর্তমান স্তরের রাজনীতির শুরু। যেহেতু জাপানী আক্রমণ সাময়িকভাবে চারটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশের[৫] মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাই কিছু কিছু ব্যক্তি মনে করেছিল যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা সম্ভবতঃ আর অগ্রসর হবে না। আজ কিন্তু অবস্থাটা অন্যরকম। চীনের মহাপ্রাচীরের দক্ষিণে অনুপ্রবেশ করবার এবং সমগ্র চীনকে গ্রাস করবার মতলব ইতিমধ্যেই জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা প্রকাশ করেছে। বর্তমানে আধা-ঔপনিবেশিক চীনকে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভাগাভাগি করে ভোগ করছে। জাপান এখন সেই আধা-ঔপনিবেশিক চীনকে একচেটিয়া উপনিবেশে পরিণত করতে চাইছে। সাম্প্রতিক পূর্ব-হুপেইর ঘটনা[৬] এবং কূটনৈতিক শলা-পরামর্শ[৭] ঘটনার গতির ইঙ্গিত যে এই দিকেই, তা দেখিয়ে দিচ্ছে, এবং তার ফলে সমগ্র চীনা জনগণের বেঁচে থাকার প্রশ্নটিই বিপন্ন হয়ে

গুরুত্বের ওপর বিশেষ জোর দেন। তিনি চীন বিপ্লবের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্রের কথা বলেন এবং দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় পার্টি এবং লালফৌজের বিপর্যয়ের মূল কারণ সংকীর্ণ রুদ্ধদ্বার নীতি ও বিপ্লব সম্পর্কে পার্টির মধ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী অতি-দ্রুত কিছু করে ফেলার মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা করেন। একই সময়ে তিনি চেন তু-সিউর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের ফলে ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের ঐতিহাসিক শিক্ষার প্রতি পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং দেখান যে চিয়াং কাই-শেক অবধারিতভাবে বিপ্লবের শক্তিকে হতমান করতে চেষ্টা করবে। চিয়াং কাই-শেকের চক্রান্ত ও অসংখ্য সশস্ত্র আক্রমণ সত্ত্বেও এইভাবেই তিনি নতুন পরিস্থিতিতে পার্টিকে মাথা পরিষ্কার রাখতে এবং বিপ্লবী শক্তিকে ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে কুইচৌ প্রদেশের সুনিতে আহূত কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর এক বর্ধিত সভায় আগেকার পুরানো 'বাম' সুবিধাবাদী নেতৃত্বের পরিবর্তে কমরেড মাও সে-তুঙকে নেতা করে এক নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। যেহেতু লালফৌজের লং মার্চ চলাকালে ঐ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেহেতু একান্ত জরুরী সামরিক সমস্যা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বিপ্লবী সামরিক কমিশন এবং সেক্রেটারিয়েটের সংগঠন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের মধ্যেই ঐ সভার কাজকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। লং মার্চের পরে লালফৌজ যখন উত্তর শেনসীতে পৌঁছায় কেবল তখনই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সম্ভব হয়েছিল রাজনীতিক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যার রণকৌশল প্রসঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই রিপোর্টে কমরেড মাও সে-তুঙ অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে এইসব সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

উঠেছে। এর ফলে চীনের সমস্ত শ্রেণী এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল আজ একটিই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে : কি করা যায়? প্রতিরোধ? আত্মসমর্পণ? কিংবা এই দুইটির মাঝখানে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকা?

চীনের বিভিন্ন শ্রেণী এই প্রশ্নটির উত্তর কিভাবে দিচ্ছে, সেটা এবার দেখা যাক।

শ্রমিক ও কৃষকের সকলেই প্রতিরোধ দাবি করছে। ১৯২৭-২৭ সালের বিপ্লব, ১৯২৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কৃষি-বিপ্লব এবং ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে জাপ-বিরোধী জোয়ার—এসব কিছুই প্রমাণ করছে যে, শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকরা হচ্ছে চীনের বিপ্লবের সবচাইতে দৃঢ় শক্তি।

পেটি-বুর্জোয়ারাও প্রতিরোধের দাবি করছে। যুবছাত্ররা এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়ারা কি ইতিমধ্যেই ব্যাপক জাপ-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করেনি?[৮] চীনা পেটি-বুর্জোয়াদের এই অংশ ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবেও অংশগ্রহণ করেছে। কৃষকদের মতোই এদের অর্থনৈতিক অবস্থাতে এরা ক্ষুদে-উৎপাদক, এবং এদের স্বার্থের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের কোন সামঞ্জস্য নেই। সাম্রাজ্যবাদ এবং চীনা প্রতিবিপ্লবী শক্তি এদের অনেক ক্ষতি করেছে, বহু লোককে বেকার করেছে, সর্বস্বান্ত বা আধা-সর্বস্বান্ত করেছে। বর্তমানে বিদেশী জাতির ক্রীতদাস হওয়ার আসন্ন বিপদের প্রতিরোধ করা ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর নেই।

কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়ারা, মুৎসুদ্দিরা ও জমিদারশ্রেণী এবং কুওমিনতাঙ কিভাবে এই প্রশ্নটির সম্মুখীন হচ্ছে?

স্থানীয় বড় বড় জুলুমবাজেরা এবং অসৎ ভদ্রলোকেরা, বড় বড় যুদ্ধবাজরা ও আমলারা এবং মুৎসুদ্দিরা অনেক দিন আগেই মনস্থির করে ফেলেছে। তারা সব সময়ই এই ধারণা পোষণ করে এসেছে এবং আজও পোষণ করছে যে, যে-কোন ধরনের বিপ্লবই সাম্রাজ্যবাদের চাইতে খারাপ। তারা সবাই মিলে বিশ্বাসঘাতকদের একটি শিবির তৈরী করেছে। বিদেশী জাতির ক্রীতদাস তারা হবে কি হবে না, এ প্রশ্ন আজ আর তাদের কাছে নেই, কারণ তারা সমস্ত জাতীয়তাবোধ হারিয়ে বসেছে এবং তাদের স্বার্থকে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। তাদের পাণ্ডা হচ্ছে চিয়াং কাই-শেক[৯]। এই বিশ্বাসঘাতকদের শিবির চীনা জনগণের ঘোর শত্রু। এই বিশ্বাসঘাতকদের জন্যই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ তাদের আগ্রাসনে এতটা উদ্ধত হতে পেরেছে। এরা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের পোষা কুকুর।

জাতীয় বুর্জোয়ারা একটি জটিল সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শ্রেণীটি ১৯২৪-২৭ সালে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল, কিন্তু বিপ্লবের আগুন দেখে এরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জনগণের শত্রু চিয়াং কাই-শেক চক্রের সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান অবস্থায় এই শ্রেণীর পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। আমরা মনে করি, আছে। কারণ, জাতীয় বুর্জোয়ারা জমিদার বা মুৎসুদ্দিশ্রেণীর মতো নয়, এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। জমিদারশ্রেণীর তুলনায় জাতীয় বুর্জোয়ারা অপেক্ষাকৃত কম সামন্ততান্ত্রিক এবং মুৎসুদ্দিশ্রেণীর মতো মুৎসুদ্দি নয়। বিদেশী মূলধন আর চীনা জমিদারী স্বার্থের সঙ্গে যে অংশ অধিকতর জড়িত, তারাই হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়াদের দক্ষিণপন্থী অংশ, এবং এদের পরিবর্তন হবে কি হবে না, এই মুহূর্তে আমরা তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। বিদেশী মূলধন এবং চীনা জমিদারী স্বার্থের সঙ্গে যে অংশের খুব সামান্যই বন্ধন আছে বা একেবারেই নেই, সমস্যা হচ্ছে তাদের নিয়েই। আমরা বিশ্বাস করি, এই নতুন অবস্থায়, যে অবস্থায় চীনদেশের একটা উপনিবেশে পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা আছে, এই অংশগুলি হয়তো তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতেও পারে। এই পরিবর্তনের মধ্যে দোদুল্যমানতা থাকবে। একদিকে তারা সাম্রাজ্যবাদকে অপছন্দ করে, আর অন্যদিকে তারা ব্যাপক বিপ্লবকেও ভয় করে, এবং তারা এ দু'য়ের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলতে থাকে। এই কারণেই তারা ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং পরিশেষে চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছিল। চিয়াং কাই-শেক যখন ১৯২৭ সালে বিপ্লবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তখন থেকে বর্তমান অবস্থা কোন্ দিক থেকে স্বতন্ত্র? চীন সে-সময়ে ছিল একটি আধা-উপনিবেশ, কিন্তু বর্তমানে সে একটি উপনিবেশে পরিণত হওয়ার পথে। গত নয় বছর ধরে জাতীয় বুর্জোয়ারা তার মিত্র শ্রমিকশ্রেণীকে পরিত্যাগ করেছে এবং জমিদার ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। কিন্তু এতে তারা লাভবান হয়েছে কি? শিল্প এবং বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহের দেউলিয়া বা আধা-দেউলিয়া অবস্থায় পরিণত হওয়া ছাড়া তাদের আর কিছুই লাভ হয়নি। তাই আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় বুর্জোয়াদের মনোভাব পরিবর্তিত হতে পারে। এই পরিবর্তনের পরিধি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে? জাতীয় বুর্জোয়াদের সাধারণ চরিত্র হচ্ছে দোদুল্যমান, কিন্তু সংগ্রামের একটা স্তর পর্যন্ত একটি অংশের (বামপন্থী) বিপ্লবে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে,

আর অন্য অংশটির নিরপেক্ষতার দিকে ইতস্তত: করবার সম্ভাবনা আছে।

সাই তিং-কাই[10] এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বাধীন উনিশ নং রুট বাহিনী কোন্ শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে? জাতীয় বুর্জোয়া, উচ্চ পেটি-বুর্জে এবং ধনী কৃষক ও গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট জমিদারদের স্বার্থ। সাই তিং-কা এবং তার সহযোগীরা কি একবার লালফৌজের বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধ করেনি? হ্যাঁ, করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা লালফৌজের সঙ্গে জাপ-বিরোধী এবং চিয়াং-বিরোধী মৈত্রীচুক্তি করেছে। কিয়াংসীতে তারা লালফৌজকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু পরে শাংহাইতে তারা জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে। আরও পরে তারা ফুকিয়েনে লালফৌজের সঙ্গে এক চুক্তি করে এবং চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে বন্দুক ঘুরিয়ে ধরে। ভবিষ্যতে সাই তিং-কাই এবং তার সহযোগীরা যে-কোন পথ গ্রহণ করলেও, এবং তাদের ফুকিয়েন গণ-সরকার সংগ্রামের জন্য জনগণকে জাগিয়ে তোলার বদলে পুরানো কায়দা আঁকড়ে থাকা সত্ত্বেও এ কথা আমাদের ভেবে দেখতেই হবে যে, যে-বন্দুক লালফৌজের সৈন্যদের বিরুদ্ধে চালানোর জন্য তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, সে-বন্দুক তারা আজ জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও চিয়াং কাই শেকের বিরুদ্ধেই তুলে ধরেছে। এর মধ্য দিয়ে কুওমিনতাঙ শিবিরের ভাঙনই প্রকাশ পেয়েছে। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরবর্তী অবস্থা যদি এই গ্রুপের ভাঙনের কারণ হতে পারে, তবে বর্তমানে অবস্থা কেন কুওমিনতাঙে আরও ভাঙ্গনের সৃষ্টি করবে না? যে সব পার্টি-সদস্য মনে করেন যে, সমগ্র জমিদার এবং বুর্জোয়া শিবিরটি একটি ঐক্যবদ্ধ ও স্থায়ী শিবির এবং কোন অবস্থাতেই তার পরিবর্তন ঘটবে না, তাঁরা ভুল করছেন। তাঁরা যে শুধু বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্বই উপলব্ধি করতে পারছেন না তাই নয়, এমনকি তাঁরা ইতিহাসও ভুলে যাচ্ছেন।

বিগত দিনগুলি সম্বন্ধে আমি আরও কিছু বলছি। ১৯২৬ এবং ১৯২৭ সালে যখন বিপ্লবী সেনাবাহিনী উহানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, উহান দখল করে হোনানে এগিয়ে গিয়েছিল, তখন তাং সেং-চি এবং ফেং ইউ-সিয়াং[11] বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৩৩ সালে ফেং ইউ-সিয়াং কিছু দিনের জন্য চাহার প্রদেশে জাপ-বিরোধী মিত্র বাহিনী গঠনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতাও করেছিল।

আর একটি চমৎকার উদাহরণের কথা বলা যেতে পারে। ছাব্বিশ নং রুট

বাহিনী উনিশ নং রুট বাহিনীর সঙ্গে একযোগে কিয়াংসীতে লালফৌজকে কি আক্রমণ করেনি? তারই কি আবার ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে মাসে নিংতু অভ্যুত্থান[12] ঘটায়নি এবং লালফৌজের অংশ হয়ে যায়নি? নিংতু অভ্যুত্থানের নেতৃবর্গ চাও পো-সেং, তুং চেন-তাং এবং অন্যান্যরা আজ বিপ্লবের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কমরেড হয়ে গেছেন।

উত্তর-পূর্বের তিনটি প্রদেশে মা চান-শানের[13] জাপ-বিরোধী কার্যকলাপ শাসকশ্রেণীর শিবিরে আর একটি ভাঙনের দৃষ্টান্ত।

এ সমস্ত উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় যে, যখন সমগ্র চীনদেশ জাপানী বোমার পাল্লার মধ্যে আসবে এবং যখন সংগ্রাম তার স্বাভাবিক গতিকে ছাড়িয়ে গিয়ে তীব্র বেগে এগিয়ে যাবে, তখন শত্রু-শিবিরে ভাঙন ধরবে।

কমরেডগণ, আসুন, এবার আমার প্রশ্নটির আর-একটি দিক আলোচনা করি।

যেহেতু চীনের জাতীয় বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, তাই নতুন পরিস্থিতি সত্ত্বেও তাদের মনোভাব পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই—এই যুক্তির ভিত্তিতে কি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে অগ্রাহ্য করা ঠিক? আমি মনে করি, ঠিক নয়। যদি দুর্বলতাই তাদের মনোভাব পরিবর্তন না করার কারণ হবে, তবে কেন জাতীয় বুর্জোয়ারা ১৯২৪-২৭ সালে অন্যরকম আচরণ করেছিল? তখন তারা বিপ্লবের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাদের দোদুল্যমানতা প্রকাশ করেনি, তারা বিপ্লবেও যোগ দিয়েছিল। এ কথা কি কেউ বলে যে, দুর্বলতাটা জাতীয় বুর্জোয়াদের একটা নতুন রোগ? এই রোগ নিয়েই কি তারা জন্মগ্রহণ করেনি? এ কথা কি কেউ বলে যে, জাতীয় বুর্জোয়ারা আজকেই দুর্বল হয়েছে, ১৯২৪-২৭ সালে তারা দুর্বল ছিল না? আধা-ঔপনিবেশিক দেশের একটি অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়াদের দুর্বলতা। ঠিক এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদ তাদের চোখ রাঙাতে সাহস করে, এবং আবার ঠিক এই কারণেই এই জাতীয় বুর্জোয়াদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে অপছন্দ করা। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, জাতীয় বুর্জোয়াদের দুর্বলতা আছে বলেই সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে জমিদার এবং মুৎসুদ্দিদের খানিক আপাতঃ সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হয়। এই জন্যই বিপ্লবের শেষ পর্যন্ত তারা যেতে পারে না। তা সত্ত্বেও এ কথা বলা চলে না যে, বর্তমান

অবস্থায় জাতীয় বুর্জোয়া আর জমিদার ও মুৎসুদ্দিশ্রেণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

সুতরাং আমরা জোর দিয়েই এ কথা বলছি যে, যখন জাতীয় সংকট একটা চূড়ান্ত স্তরে পৌছাবে, তখন কুওমিনতাঙ শিবিরে ভাঙন ধরবেই। এ রকম ভাঙন জাতীয় বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতার মধ্য দিয়ে এবং ফেং ইউ-সিয়াং, সাই তিং-কাই ও মা চান-শানের মতো হাল আমলের জাপ-বিরোধী জনপ্রিয় নেতাদের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। এই ভাঙ্গন মূলতঃ প্রতিবিপ্লবের প্রতিকূলে এবং বিপ্লবের অনুকূলে কাজ করছে। চীনের অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ, এবং তারই ফলশ্রুতিতে বিপ্লবেরও অসমান বিকাশ এ ভাঙ্গনের সম্ভাবনাকেই আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

কমরেডগণ, প্রশ্নটির ইতিবাচক দিক সম্বন্ধে এই হচ্ছে বক্তব্য। এখন আমি নেতিবাচক দিকটি আলোচনা করব, অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে কিছু কিছু লোক যে জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত, সেই ব্যাপারটি আলোচনা করব। কেন? কারণ, জনগণের বিপ্লবী স্বার্থের প্রতি আন্তরিক সমর্থক ছাড়াও এই শ্রেণীর মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যাদের সাময়িকভাবে বিপ্লবী বা আধাবিপ্লবী বলে মনে হয়, যারা এভাবে এমন একটা সুনাম অর্জন করেছে যা জনগণকে ধোঁকা দিতে সাহায্য করে, এবং তারা যে প্রকৃত বিপ্লবী নয়, তাদের এ মিথ্যা মোহজাল জনগণ ধরতে পারে না। এর ফলেই মিত্রদের সমালোচনা করবার, ভুয়া বিপ্লবীদের মুখোস খুলে দেবার এবং নেতৃত্ব অর্জন করবার দায়িত্ব কমিউনিস্ট পার্টির ওপর বেশি করে এসে পড়ে। জাতীয় বুর্জোয়ারা যে দোদুল্যমান থাকে এবং বিরাট উত্থান-পতনের সময় যে তারা বিপ্লবে যোগ দিতে পারে, এ সম্ভাবনাকে অস্বীকার করার অর্থ আমাদের পার্টির নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার দায়িত্ব পরিত্যাগ করা, বা অন্ততঃ এই দায়িত্বকে ছোট করে দেখা। কারণ, জাতীয় বুর্জোয়ারা যদি অবিকল জমিদার এবং মুৎসুদ্দিদের মতোই হতো, যদি তারা অবিকল একই রকম নোংরা বিশ্বাসঘাতক হতো, তবে তাদের নেতৃত্বের জন্য প্রতিযোগিতা করবার সমস্যা একেবারেই থাকত না, বা থাকলেও খুব সামান্যই থাকত।

বিরাট উত্থান-পতনের সময় চীনা জমিদার ও বুর্জোয়াদের মনোভাবের সাধারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের আর একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, এবং তা হচ্ছে এই ঘটনাটি যে, জমিদার ও মুৎসুদ্দিদের শিবিরও

ঐক্যবদ্ধ নয়। এর কারণ চীন একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ, এরজন্য বহু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রতিযোগিতা করছে। যখন জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে, তখন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বা বিটেনের তাঁবেদার গোষ্ঠী তাদের প্রভুদের বিভিন্ন নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বা গোপন সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। কুকুরের মতো এই ধরনের খেয়োখেয়ির অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আমরা সেগুলি আলোচনা করব না। আমরা কেবল হু হান-মিনের[১৪] ঘটনাটি উল্লেখ করব। হু হান-মিন ছিলেন একজন কুওমিনতাঙ রাজনীতিবিদ, চিয়াং কাই-শেক একবার তাঁকে বন্দী করেছিল। জাপানকে প্রতিরোধ করা এবং জাতিকে রক্ষা করবার[১৫] যে ছয় দফা কর্মসূচী আমরা রেখেছি, তাতে তিনি স্বাক্ষর দিয়েছেন। কোয়াংতুং এবং কোয়াংসী চক্রের[১৬] যুদ্ধবাজরা, যারা হু হান-মিনকে সমর্থন করে, তারা 'আমাদের হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা' এবং 'জাপানকে প্রতিরোধ কর ও দস্যুদের অবদমন কর'[১৭] এই প্রতারণা-মূলক শ্লোগানের মাধ্যমে চিয়াং কাই-শেকের বিরোধিতা করছে ('প্রথমে দস্যুদের অবদমন, পরে জাপানকে প্রতিরোধ'—চিয়াং কাই-শেকের এই শ্লোগানের বিরুদ্ধে)। এটা কি খুব অদ্ভুত ব্যাপার নয়? না, এটা মোটেই অদ্ভুত ব্যাপার নয়। বরং এ হচ্ছে একটা বড় ও ছোট কুকুরের, খেতে-পাওয়া আর অভুক্ত কুকুরের কামড়া-কামড়ির একটা চমৎকার উদাহরণ। এটা একটা বড় ভাঙন নয়, কিন্তু তাই বলে খুব ছোটও নয়; এটা একই সময়ে একটা বিরক্তিকর এবং বেদনাদায়ক দ্বন্দ্ব। কিন্তু এই লড়াই, এই ভাঙন, এই দ্বন্দ্ব বিপ্লবী জনগণের কাজে লাগতে পারে। শত্রু-শিবিরের এইসব লড়াই, ভাঙন আর দ্বন্দ্বকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে এবং বর্তমানের প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে হবে।

শ্রেণীগুলির সম্পর্কের প্রশ্নটির সার-সংকলন করে আমরা বলতে পারি যে, পরিস্থিতিতে মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে, অর্থাৎ চীনের প্রাচীরের দক্ষিণে জাপ-আক্রমণ চীনের বিভিন্ন শ্রেণী-সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, জাতীয় বিপ্লবের শিবিরকে শক্তিশালী করেছে এবং প্রতিবিপ্লবের শিবিরকে দুর্বল করেছে।

এবার জাতীয় বিপ্লবের শিবিরের অবস্থা পর্যালোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ, লালফৌজ। কমরেডগণ, আপনারা জানেন যে, প্রায় দেড় বছর ধরে চীনা লালফৌজের তিনটি প্রধান বাহিনী তাদের অবস্থানের বিরাট

পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ইয়েন পি-শী[18] ও অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বে ষষ্ঠ সেনাবাহিনী গত বছরের আগস্ট মাস থেকে কমরেড হো লুং-এর[19] অঞ্চলে যাওয়া শুরু করেছে এবং অক্টোবর মাস থেকে আমরাও অন্য জায়গায়[20] যাওয়া শুরু করেছি। এই বছরের মার্চ মাসে সেচুয়ান-শেনসী সীমান্ত অঞ্চলের[21] লালফৌজ স্থান পরিবর্তন শুরু করেছে। লালফৌজের তিনটি বাহিনীই তাদের পুরানো স্থান ছেড়ে এসেছে এবং নতুন অঞ্চলে সরে গিয়েছে। এই স্থান থেকে ব্যাপকভাবে সরে যাওয়ার ফলে পুরানো অঞ্চলগুলি গেরিলা অঞ্চলে পর্যবসিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লালফৌজ উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এইদিক থেকে সামগ্রিকভাবে অবস্থার বিচার করলে দেখা যায় যে, শত্রুপক্ষ সাময়িক এবং আংশিকভাবে জয়লাভ করেছে এবং আমরা সাময়িক ও আংশিকভাবে পরাজিত হয়েছি। এই বক্তব্য কি ঠিক? আমি মনে করি, ঠিক। কারণ, এই বক্তব্যই হচ্ছে ঘটনার প্রকৃত বিবরণ। কিন্তু কিছু কিছু লোক (উদাহরণস্বরূপ, চাং কুও-তাও[22]), বলেন যে, কেন্দ্রীয় লালফৌজ[23] ব্যর্থ হয়েছে। এ কথা কি ঠিক? না। কারণ এটা ঘটনার প্রকৃত বিবরণ নয়। কোন একটি সমস্যার বিচার করতে গিয়ে একজন মার্কসবাদী যেমন সমগ্র জিনিসটির বিচার-বিবেচনা করেন, ঠিক তেমনি অংশের বিচার-বিবেচনা করেন। একটি কুয়োর ব্যাঙ বলেছিল, 'কুয়োর মুখের চাইতে আকাশ মোটেই বড় নয়।' এ কথা ঠিক নয়, কারণ আকাশের আয়তন আর কুয়োর মুখের আয়তন এক নয়। যদি সে বলতো, 'আকাশের একটা অংশের আয়তন কুয়োর মুখের আয়তনের সমান', তবে তার বক্তব্য প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো। আমরা যা বলি তা হচ্ছে, একদিক থেকে লালফৌজ ব্যর্থ হয়েছে (অর্থাৎ মূল ঘাঁটিগুলি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে), কিন্তু অন্যদিক থেকে লালফৌজ জয়ী হয়েছে (অর্থাৎ লং মার্চের পরিকল্পনা কার্যকরী করে)। একদিক থেকে শত্রুপক্ষের জয় হয়েছে (আমাদের আগের ঘাঁটিগুলি দখল করে), কিন্তু অন্যদিক থেকে সে ব্যর্থ হয়েছে (অর্থাৎ তার 'পরিবেষ্টন ও দমন' এবং 'পশ্চাদ্ধাবন ও অবদমন' পরিকল্পনা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে)। এই হচ্ছে একমাত্র সঠিক সূত্রায়ন, কারণ আমরা লং মার্চ সম্পূর্ণ করেছি।

লং মার্চ সম্বন্ধে কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন 'এর গুরুত্ব কি?' আমরা বলি ইতিহাসে লং মার্চই হচ্ছে এ ধরনের প্রথম ঘটনা। এ একটি ইস্তাহার, একটি শক্তিশালী প্রচার, একটা বীজ-বোনার যন্ত্র। যেদিন থেকে পান

কে স্বর্গ আর মর্তকে ভাগ করে দিয়েছে এবং তিনটি সার্বভৌম রাজত্ব ও পাঁচজন সম্রাট[২৪] রাজত্ব করে আসছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাস কি আমাদের লং মার্চের মতো কোন অভিযান দেখেছে? বারোটি মাসের প্রত্যেক দিন আকাশ থেকে আমাদের তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে, এবং শত শত বোমারু বিমান থেকে আমাদের ওপর বোমা বর্ষিত হয়েছে। আর স্থলপথে লক্ষ লক্ষ লোকের সেনাবাহিনী আমাদের পেছনে ধাওয়া করেছে, ঘিরে ফেলেছে, বাধা দিয়েছে, পথে অবরোধ স্থাপন করেছে, এবং আমাদের অগ্রগতির পথে আমরা অগণিত ও অকথ্য বিপদ ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছি। তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের দুটি পা ব্যবহার করে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এগারোটি প্রদেশ এবং বিশ হাজার লীরও বেশি পথ অতিক্রম করে এসেছি। আমরা জানতে চাই, আমাদের লং মার্চের মতো এ রকম অভিযান কি ইতিহাস আর কোনদিন কোনকালে দেখেছে? না, কখনও না। লং মার্চ হচ্ছে একখানা ইস্তাহার। দুনিয়ার কাছে এ ইস্তাহার ঘোষণা করেছে যে, লালফৌজ হচ্ছে এক বীর সেনাবাহিনী, আর সাম্রাজ্যবাদ ও চিয়াং কাই-শেক ও তার মতো পা-চাটা কুকুররা হচ্ছে নপুংসকের দল। আমাদের অবরোধ করা, পিছনে ধাওয়া করা, বাধা দেওয়া এবং ফাটল ধরানোর ব্যাপারে এই লং মার্চ তাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা ঘোষণা করেছে। এগারোটি প্রদেশের প্রায় ২০ কোটি লোকের কাছে এই লং মার্চ প্রচার করেছে যে, লালফৌজের পথই হচ্ছে তাদের মুক্তির একমাত্র পথ। লালফৌজ যে মহান সত্য বহন করছে, এই লং মার্চ ছাড়া এই বিপুল জনতা এত দ্রুত তা জানতে পারত কি? লং মার্চ আবার বীজ-বোনার যন্ত্রও বটে। এগারোটি প্রদেশে এ অসংখ্য বীজ বপন করেছে, যা মাটি-ফুঁড়ে উঠবে, যার পাতা গজাবে, প্রস্ফুটিত হবে ও ফল ধরবে এবং ভবিষ্যতে যার ফসলও তোলা হবে। এক কথায়, আমাদের বিজয়ে ও শত্রুর পরাজয়ে লং মার্চ শেষ হয়েছে। কে লং মার্চকে বিজয়ী করে তুলেছে? কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া এ ধরনের লং মার্চ কল্পনা করাও যেত না। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এর নেতৃত্বে, এর কর্মী এবং সদস্যরা কোন অসুবিধা বা কঠোর পরিশ্রমকেই ভয় করে না। বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্বের ব্যাপারে যারা আমাদের সামর্থ্যের প্রতি সন্দেহ করে, তারা অতি অবশ্যই সুবিধাবাদের গাড্ডায় গিয়ে পড়বে। যে মুহূর্তে লং মার্চ শেষ হয়েছে, তখনই একটি নতুন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। চিহ্‌লোচেনের যুদ্ধে কেন্দ্রীয় লালফৌজ এবং উত্তর-

পশ্চিমের লালফৌজ ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শেনসী-কানসু সীমান্ত অঞ্চলে[২৫] বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-শেকের 'পরিবেষ্টন এবং দমন' অভিযানকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে, এবং এইভাবেই তা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম চীনে বিপ্লবের জাতীয় সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করবার সীদ্ধান্তের ভিত্তি রচনা করেছে।

এই যখন লালফৌজের প্রধান বাহিনীর অবস্থা, তখন দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশ-গুলির গেরিলা যুদ্ধের অবস্থা কি? সেখানে আমাদের গেরিলা বাহিনীগুলির কিছু কিছু বিপর্যয় ঘটেছে, কিন্তু তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। অনেক জায়গায় তারা তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে, বেড়ে উঠেছে, এবং সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে।[২৬]

কুওমিনতাঙ শাসিত অঞ্চলে শ্রমিকদের সংগ্রাম কারখানার চার দেওয়ালের বাইরে চলে আসছে, এবং অর্থনৈতিক সংগ্রাম থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ নিচ্ছে। জাপানীদের এবং বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বর্তমানে তীব্র হয়ে উঠেছে, এবং অবস্থা বিচার করে বলা যায় যে, খুব শিগ্রই এগুলির বিস্ফোরণ ঘটবে।

কৃষকদের সংগ্রাম কখনও বন্ধ হয়নি। বাইরের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে, দেশের আভ্যন্তরীণ অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হয়ে এবং প্রকৃতির বিপর্যয়ের মুখে পড়ে কৃষকরা গেরিলা যুদ্ধ, ব্যাপক অভ্যুত্থান এবং দুর্ভিক্ষজনিত দাঙ্গাহাঙ্গামা ব্যাপক-ভাবে শুরু করে দিয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে এবং পূর্ব-হোপেইতে[২৭] এখন যেসব গেরিলা যুদ্ধ চলছে, তা হচ্ছে জাপসাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রত্যুত্তর।

ছাত্র আন্দোলন ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে বিকাশলাভ করছে, এবং সুনিশ্চিতভাবেই এর বিস্তার ঘটতে থাকবে। কিন্তু কেবলমাত্র তখনই এই আন্দোলনকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, এবং তা বিশ্বাস-ঘাতকদের দ্বারা চাপানো সামরিক আইন এবং পুলিশ, গুপ্তচর, শিক্ষাজগতের বদমায়েস ও ফ্যাসিষ্টদের বিভেদ সৃষ্টি ও ব্যাপক হত্যার বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে অসতে পারবে, যখন ছাত্রদের এই সংগ্রাম শ্রমিক, কৃষক এবং সৈন্যদের সংগ্রামের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে উঠবে।

আমরা আগেই জাতীয় বুর্জোয়াদের, ধনী কৃষকদের এবং ছোট জমিদারদের দোদুল্যমানতা, এবং তাদের জাপ-বিরোধী সংগ্রামের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

সংখ্যালঘু জাতীসমূহ এবং বিশেষ করে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শিকার অন্তর্মঙ্গোলিয়ার জনগণ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। সময় যতই যেতে থাকবে, তাদের সংগ্রাম ততই উত্তর চীনের জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে এবং উত্তর-পশ্চিমের লালফৌজের সামরিক কার্যকলাপের সঙ্গে মিশে যাবে।

এই সব থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিপ্লবী অবস্থা এখন স্থানীয় থেকে সমস্ত দেশব্যাপী সামগ্রিক চরিত্র গ্রহণ করছে এবং ক্রমশঃই অসম ব্যবস্থা থেকে কিছু পরিমাণে সম অবস্থায় এসে পড়েছে। আমরা এক বিরাট পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি। এখন পার্টির কর্তব্য হচ্ছে লালফৌজের কার্যকলাপের সঙ্গে দেশব্যাপী শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়াদের সমস্ত কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন করে একটি বিপ্লবী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন করা।

জাতীয় যুক্তফ্রন্ট

প্রতিবিপ্লব এবং বিপ্লব এই উভয় অবস্থা পর্যালোচনা করার পর পার্টির রণকৌশলগত কর্তব্য নির্ধারণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে।

পার্টির মূল রণকৌশলগত কাজ কি? ব্যাপক জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিপ্লবী অবস্থার যখন পরিবর্তন হয়, তখন বিপ্লবী রণকৌশল এবং নেতৃত্বের কর্মপদ্ধতিরও সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। জাপানী সাম্রাজ্য-বাদীদের এবং তার সহযোগী ও বিশ্বাসঘাতকদের কাজ হচ্ছে চীনকে একটি উপনিবেশে পরিণত করা, আর আমাদের কাজ হচ্ছে পরিপূর্ণ ভূখণ্ডগত সংহতির ভিত্তিতে চীনকে একটি স্বাধীন ও মুক্ত দেশে পরিণত করা।

চীনের স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জন করা হচ্ছে একটি মহান কর্তব্য। এরজন্য আমাদের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হবে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীনের গভীর অভ্যন্তরে তারা থাবা বিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর। এখন পর্যন্ত বড় জমিদার এবং মুৎসুদ্দিশ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী শক্তি জনগণের বিপ্লবী শক্তির চাইতে বেশি শক্তিশালী। জাপ-সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে এক দিনেই উৎখাত করা যাবে না, দীর্ঘকাল ব্যাপী এই কাজে নিযুক্ত থাকবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন হতে পারে না, তাই আমাদের বিরাট শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। চীনে এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্বে, প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহ

আগের চাইতে এখন অনেক দুর্বল এবং বিপ্লবী শক্তিসমূহ আগের চাইতে অনেক শক্তিশালী। এ হিসেব নির্ভুল, এবং এটা এ ব্যাপারটার একটি দিক। একই সময়ে এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, চীন এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্বে প্রতিবিপ্লবী শক্তি সাময়িকভাবে বিপ্লবী শক্তির তুলনায় বেশি শক্তিশালী। অন্য আর একদিক থেকে বিচার করলে এ হিসাবটাও নির্ভুল। চীনের অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ফলে বিপ্লবেরও অসম বিকাশ হয়েছে। যেসব জায়গায় প্রতিবিপ্লবী শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সাধারণতঃ বিপ্লব সেখানেই প্রথম শুরু হয়, তার বৃদ্ধি ঘটে এবং বিজয়লাভ হয়। আর যেসব জায়গায় প্রতিবিপ্লবী শক্তি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, সেখানে বিপ্লব প্রথমে অরম্ভ হয় না বা আরম্ভ হলেও অতি ধীরে ধীরে তার বৃদ্ধি ঘটে। অনেক দিন ধরেই চীনা বিপ্লবের এই অবস্থা চলে আসছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, ভবিষ্যতে একটা পর্যায়ে সাধারণ বিপ্লবী অবস্থা আরও বিকশিত হবে বটে, কিন্তু অসম বিকাশের অবস্থা থেকেই যাবে। এই অসম অবস্থা থেকে সাধারণভাবে সম অবস্থায় রূপান্তর ঘটতে প্রয়োজন সুদীর্ঘ সময়ের, বিরাট প্রচেষ্টার আর পার্টি কর্তৃক নির্ভুল লাইন প্রয়োগের। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির[২৮] নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে তিন বছর লেগেছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, তাতে দেশী ও বিদেশী প্রতিবিপ্লবাদের চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য যে আরও বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এর আগে যে ধরনের ধৈর্যহীনতা দেখানো হয়েছে, তা করলে কখনই চলবে না। উপরন্তু নির্ভুল বিপ্লবী রণকৌশল বের করতে হবে। আমরা যদি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আমাদের আবদ্ধ রাখি তাহলে কোনদিনই আমরা বড় কিছু করতে পারব না। এর অর্থ এই নয় যে, চীনে ধীরে ধীরে কাজ করতে হবে। না, কাজ করতে হবে বলিষ্ঠ সাহসের সঙ্গেই, কেননা জাতীয় পরাধীনতার বিপদ এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের শৈথিল্য প্রকাশ করতে দেবে না। এখন থেকে সুনিশ্চিতভাবেই আগের চাইতে অনেক দ্রুত বিপ্লবের বিকাশ ঘটবে, কারণ চীন এবং সমগ্র দুনিয়া যুদ্ধ ও বিপ্লবের এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে। এসব কারণেই চীনের বিপ্লবী যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। সাম্রাজ্যবাদের শক্তি এবং বিপ্লবের অসম বিকাশই এর কারণ। আমরা বলি, বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে

এমন যে, জাতীয় বিপ্লবের এক নতুন ও বিরাট জোয়ার আসন্ন এবং সেই জোয়ারের মধ্যে চীনও দেশব্যাপী এক নতুন বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। বর্তমান বিপ্লবী পরিস্থিতির এটি একটি বৈশিষ্ট্য। এটি একটি ঘটনা, এবং ঘটনার একটি দিককে এ প্রতিফলিত করছে। কিন্তু আমাদের একথাও বলতে হবে যে, আজও সাম্রাজ্যবাদ এমন একটি শক্তি আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়েই যার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। বিপ্লবী শক্তিসমূহের মধ্যে অসম বিকাশ আমাদের একটি সাংঘাতিক দুর্বলতা, এবং শত্রুকে পরাজিত করতে হলে আমাদের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে: বর্তমান বিপ্লবী পরিস্থিতির এটি হচ্ছে আর একটি বৈশিষ্ট্য। এটিও একটি ঘটনা এবং অন্য একটি দিককে প্রতিফলিত করছে। এই উভয় বৈশিষ্ট্য ও উভয় ঘটনা আমাদের রণকৌশল, শক্তি-সমাবেশ ও শক্তি নিয়োগের পদ্ধতি এবং অবস্থানুযায়ী সংগ্রাম পরিচালনা করার পদ্ধতি পরিবর্তনের শিক্ষা দেয় ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বলে। বর্তমান পরিস্থিতি দাবি করছে যে, আমাদের সাহসের সঙ্গে সমস্ত রুদ্ধদ্বার নীতি পরিত্যাগ করতে হবে, ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে এবং হঠকারিতার বিরুদ্ধে সতর্ক প্রহরা দিতে হবে। সময় যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপক্ক না হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় শক্তি সংগৃহীত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা চূড়ান্ত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ব না।

হঠকারিতার সঙ্গে রুদ্ধদ্বার নীতির সম্পর্ক, অথবা বৃহত্তর পরিসরে ঘটনার বিকাশের সঙ্গে হঠকারিতার সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কিত আলোচনা আমি এখানে করছি না, তা ভবিষ্যতে করা যেতে পারে। এই মুহূর্তে যুক্তফ্রন্টের রণকৌশল এবং রুদ্ধদ্বার নীতির কৌশল যে পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী, তার বিশ্লেষণের মধ্যেই আমি আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব।

প্রথমটির জন্য প্রয়োজন শত্রুকে পরিবেষ্টন ও ধ্বংস করার জন্য এক বিরাট শক্তিকে সংগ্রহ করা

পরেরটির অর্থ হচ্ছে দুর্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে একা একা বেপরোয়া যুদ্ধ করা।

যুক্তফ্রন্টের রণকৌশলের সমর্থকদের মতে, যদি ব্যাপক বিপ্লবী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের সঠিক মূল্যায়ন করতে হয়, তবে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক চীনকে একটি উপনিবেশে পরিণত করবার প্রচেষ্টার ফলে চীনের বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিন্যাসে যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তারও সঠিক মূল্যায়ন অবশ্যই করতে হবে। জাপানী ও চীনা

প্রতিবিপ্লবী শক্তি এবং চীনা বিপ্লবী শক্তির দুর্বল ও সবল দিকগুলির সঠিক মূল্যায়ন ছাড়া আমরা ব্যাপক জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি বুঝতে পারব না, কিংবা রুদ্ধদ্বার নীতি ভাঙার জন্য শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব না, বা আমাদের মূল লক্ষ্য জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং তার পোষা কুকুর চীনা বিশ্বাসঘাতকদের ওপর আঘাত হানবার জন্য বিপ্লবের প্রতি বন্ধুসুলভ মনোভাবসম্পন্ন সেনাবাহিনী এবং কোটি কোটি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার হাতিয়ার হিসেবে যুক্তফ্রন্টকে কাজে লাগাতে পারব না, বা আমাদের সামনের প্রধান লক্ষ্যকে আঘাত হানার জন্য আমাদের রণকৌশলগত এই হাতিয়ারকে আমরা ব্যবহারও করতে পারব না। তার বদলে বিভিন্ন লক্ষ্যে আমরা আঘাত হানতে শুরু করব, এবং আমাদের বুলেট প্রধান শত্রুকে আঘাত না করে আমাদের ছোটখাট শত্রু, এমনকি আমাদের মিত্রকে পর্যন্ত আঘাত করে বসবে। এর অর্থ হবে প্রধান শত্রুকে আলাদা করে ফেলবার ব্যর্থতা এবং গোলাবারুদের অপচয়। এর অর্থ হবে তাকে চারিদিক থেকে পরিবেষ্টন করবার এবং সমস্ত শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যর্থতা। এর অর্থ হবে যারা শত্রু শিবির এবং শত্রু ফ্রণ্টে নেহাৎই বাধ্য হয়ে চলে গিয়েছে, এবং যারা কাল আমাদের শত্রু ছিল এবং যাদের আজ আমাদের বন্ধু হবার সম্ভাবনা আছে, তাদের আমাদের দিকে টেনে আনার ব্যর্থতা। আসলে এর অর্থ হবে শত্রুকে সাহায্য করা, বিপ্লবকে পিছিয়ে দেওয়া, বিচ্ছিন্ন করা ও সঙ্কুচিত করা, এবং বিপ্লবের জোয়ারকে স্তিমিত করা এবং এমনকি, বিপ্লবকে পরাজিত করা।

রুদ্ধদ্বার কৌশলের প্রবক্তারা উপরোক্ত সমস্ত যুক্তিকেই ভুল মনে করেন। বিপ্লবের শক্তিকে বিশুদ্ধ হতে হবে, পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ এবং বিপ্লবের রাস্তাকে হতে হবে সোজা-সরল, পরিপূর্ণভাবে সোজা-সরল। পবিত্র গ্রন্থে আক্ষরিকভাবে যা লেখা আছে, তা ছাড়া আর কোন কিছুই সঠিক নয়। জাতীয় বুর্জোয়ারা সম্পূর্ণভাবে এবং চিরকালের জন্য প্রতিবিপ্লবী। ধনী কৃষককে এক ইঞ্চিও সুবিধা দেওয়া হবে না। প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার লড়াই করতে হবে। কেউ সাই তিং-কাইয়ের সঙ্গে করমর্দন করলে তক্ষুনি তাকে প্রতিবিপ্লবী বলে চিহ্নিত করতে হবে। এমন বিড়াল কি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে যে মাছ ভালবাসে না, এবং এমন যুদ্ধবাজ কি আছে যে প্রতিবিপ্লবী নয়? বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছে তিন দিনের বিপ্লবী, এদের দলে নেওয়াটাই হবে মারাত্মক। সুতরাং এ থেকে এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে,

একমাত্র রুদ্ধদ্বার নীতিই হচ্ছে একটি আলাদিনের প্রদীপ, আর যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে একটি সুবিধাবাদী রণকৌশল।

কমরেডগণ, কোন্‌টি সঠিক? যুক্তফ্রন্ট নীতি, না রুদ্ধদ্বার নীতি? বাস্তবে কোন্‌টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত? নির্দ্বিধায় আমি বলছি—রুদ্ধদ্বার নীতি নয়, যুক্তফ্রন্টই হচ্ছে সঠিক এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত নীতি। তিন বছর বয়সের শিশুদের অনেক চিন্তাভাবনা সঠিক হয়, কিন্তু তাই বলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় আন্তর্জাতিক ব্যাপারের দায়িত্ব দেওয়া যায় না। কারণ তারা তখনও সেগুলি জানে না। মার্কসবাদ-লেলিনবাদ বিপ্লবীদের মধ্যেকার 'শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলার' বিরোধী। এই শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলার পক্ষেই ওকালতি করেছেন রুদ্ধদ্বার নীতির কট্টর প্রবক্তারা। দুনিয়ার আর সমস্ত কাজের মতোই বিপ্লবও সবসময় আঁকাবাঁকা পথেই অগ্রসর হয়, সহজ-সরল পথে নয়। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবী শিবিরের বিন্যাসের পরিবর্তন হয়, ঠিক দুনিয়ার অন্য সব জিনিষেরই মতো। পার্টির ব্যাপক যুক্তফ্রন্টের নতুন রণকৌশল দুটি মূল ঘটনা থেকে উদ্ভূত; জাপ-সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র চীনকে একটি উপনিবেশে পরিণত করবার জন্য বদ্ধপরিকর এবং চীনের বিপ্লবী শক্তিসমূহ সাংঘাতিকভাবে দুর্বল। প্রতিবিপ্লবের শক্তিকে আক্রমণের জন্য আজকের দিনে বিপ্লবী শক্তির যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে কোটি কোটি জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং এক বিরাট শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানো। সহজ সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র এই ধরনের বিপুল শক্তিবাহিনীই পারে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশ্বাসঘাতক ও সহযোগীদের ধ্বংস করতে। তার যুক্তফ্রন্টের রণকৌশলই একমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রণকৌশল। অন্যদিকে, রুদ্ধদ্বার নীতির রণকৌশল হচ্ছে পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের রণকৌশল। রুদ্ধদ্বার নীতি 'মাছকে গভীর জলে তাড়িয়ে নেয় এবং পাখীদের গভীর জঙ্গলে নিয়ে' যায়, এই নীতি কোটি কোটি জনগণের বিশাল বাহিনীকে শত্রুপক্ষের দিকে নিয়ে যাবে এবং তার ফলে সুনিশ্চিতভাবেই এই নীতি শত্রুপক্ষের প্রশংসা অর্জন করবে। বাস্তবে রুদ্ধদ্বার নীতি হচ্ছে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বাসঘাতক, এবং দালালদের বিশ্বস্ত অনুচর। এই নীতির প্রবক্তাদের 'বিশুদ্ধ' এবং 'সোজা' রাস্তার কথা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের দ্বারা ধিকৃত এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রশংসিত হবেই। অবশ্যই আমরা কোন রুদ্ধদ্বার নীতি চাই না। আমরা যা চাই তা হচ্ছে বিপ্লবী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট, যা

জাপ-সাম্রাজ্যবাদী এবং বিশ্বাসঘাতক ও তার সহযোগীদের মৃত্যু ডেকে আনবে।

গণ-প্রজাতন্ত্র[২১]

এতদিন পর্যন্ত আমাদের সরকারের ভিত্তি ছিল শ্রমিক-কৃষক ও শহরের মধ্যবিত্ত, এবং এখন থেকে তাকে অবশ্যই পরিবর্তিত করে এই জাতীয় বিপ্লবে অংশগ্রহণে ইচ্ছুকদেরও এই সরকারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বর্তমানে এরকম একটি সরকারের মূল কাজ হবে চীনকে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ করার বিরোধিতা করা। এই সরকারের ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব থাকবে, যারা কেবলমাত্র জাতীয় বিপ্লব চায় অথচ কৃষি-বিপ্লব চায় না, এমনকি যারা জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের বিরোধিতা করে, কিন্তু ইউরোপীয় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় তাদের বিরোধিতা করতে রাজী নয়, তাদেরও এই সরকারে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং নীতির দিক থেকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে যে মূল সংগ্রাম, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই সরকারের কর্মসূচী তৈরী হওয়া প্রয়োজন এবং সেই অনুযায়ীই আমাদের আগের নীতির সংশোধন করতে হবে।

বর্তমানে বিপ্লবীদের দিকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইস্পাত-দৃঢ় কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজের অস্তিত্ব। এটি একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যদি এ সবের অস্তিত্ব না থাকত, তবে সাংঘাতিক অসুবিধার সৃষ্টি হতো। কেন? কারণ চীনে বিশ্বাসঘাতক ও সাম্রাজ্যবাদের অসংখ্য সহযোগী রয়েছে, তারা বেশ শক্তিশালী ও তারা নিশ্চিতভাবেই যুক্তফ্রন্টকে বানচাল করে দেবার জন্য সর্বপ্রকার পন্থাই গ্রহণ করবে। তারা ভয় দেখিয়ে ও ঘুষ দিয়ে, এবং বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে দহরম-মহরম করে বিরোধের বীজ বপন করবে।

যারা তাদের চাইতে দুর্বল এবং তাদের দল ভেঙে আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক, সামরিকবাহিনীর সাহায্যে তারা তাদের ওপর নির্যাতন চালাবে এবং একটি একটি করে তাদের ধ্বংস করে দেবে। যদি জাপ-বিরোধী সরকার ও সেনাবাহিনীর হাতে কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজের মতো গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার না থাকত তবে এসব এড়িয়ে যাওয়া রীতিমতো কষ্টকর হতো। ১৯২৭ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল এই যে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তখন সুবিধাবাদী লাইনের প্রাধান্য থাকায়

ফলে আমাদের নিজস্ব বাহিনীর (কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক ও কৃষক-আন্দোলন এবং সশস্ত্র বাহিনী) ব্যাপক বিস্তৃতির কোন চেষ্টাই করা হয়নি এবং আমাদের সাময়িক মিত্র কুওমিনতাঙের ওপরই সম্পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখা হয়েছিল। ফলে যখন সাম্রাজ্যবাদ তার পদলেহী জমিদার ও মুৎসুদ্দিশ্রেণীকে হুকুম করল তাদের অসংখ্য প্রতিবন্ধকের জাল ছড়িয়ে দিয়ে প্রথমে চিয়াং কাই-শেক ও পরে ওয়াং চিং-ওয়েইকে দলে টানতে, তখনই বিপ্লবী পরাজয় বরণ করল। সে সময়ে বিপ্লবী যুক্তফ্রন্টের নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবার মতো কোন শক্ত ভিত্তি ছিল না, ছিল না কোন শক্তিশালী সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনী, এবং তাই দ্রুত ও ব্যাপক দলত্যাগ আরম্ভ হতেই কমিউনিস্ট পার্টি এককভাবে সংগ্রাম করতে বাধ্য হল, এবং সাম্রাজ্যবাদী ও চীনা প্রতিবিপ্লবীরা তাদের বিরোধীদের একে একে ধ্বংস করার যে কৌশল গ্রহণ করেছিল, তা ব্যর্থ করতেও অক্ষম হল। এ কথা ঠিক যে, হো লুং এবং ইয়ে তিং-এর অধীনে আমাদের সৈন্যবাহিনী ছিল, কিন্তু তখনও তারা রাজনৈতিকভাবে সুসংবদ্ধ ছিল না এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো গুণও পার্টির ছিল না, তাই শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয়েছিল। আমাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি যে, বিপ্লবী শক্তির একটি ইস্পাতদৃঢ় কেন্দ্র না থাকলে বিপ্লব ব্যর্থ হয়। আজকের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এখন আমাদের একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি ও একটি শক্তিশালী লালফৌজ আছে, তাছাড়াও আছে লালফৌজের ঘাঁটি অঞ্চল। আজ কমিউনিস্ট পার্টি এবং লালফৌজ শুধু জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় যুক্তফ্রন্টের উদ্যোক্তাই নয়, ভবিষ্যতে তারাই হবে জাপ-বিরোধী সরকার ও সেনাবাহিনীর শক্তিশালী প্রধান ভিত্তি, এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও চিয়াং কাই-শেকএর যুক্তফ্রন্ট ভাঙার নীতিকে সার্থকভাবে ব্যর্থ করতে সক্ষম। যাই হোক, আমাদের অতিমাত্রায় সতর্ক থাকতে হবে, কারণ চিয়াং কাই-শেক ও সাম্রাজ্যবাদীরা নিঃসন্দেহে সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে ভয় দেখাবে ও ঘুষের প্রলোভন দেখাবে এবং বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করবে।

স্বভাবতঃই আমরা এ আশা করি না যে, জাপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতীয় যুক্তফ্রন্টের প্রত্যেকটি অংশই কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজের মতো দৃঢ়-সংকল্পের লোক হবে। তাদের কার্যকলাপের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শত্রু-দের প্রভাবে প্রভাবান্বিত কিছু কিছু বদ লোকও যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। এ ধরনের লোকেরা চলে গেলে আমাদের ঘাবড়াবার কোন কারণ

নেই। বদ লোকেরা যেমন শত্রুর প্রভাবে পড়ে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, তেমনি ভাল লোকেরাও আবার আমাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আমাদের সঙ্গেই আসবে। যতদিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজ টিঁকে থাকবে এবং শক্তিশালী হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত জাতীয় যুক্তফ্রন্টও টিঁকে থাকবে এবং শক্তিশালী হতে থাকবে। এই-ই হচ্ছে জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজের নেতৃত্বকারী ভূমিকা। কমিউনিস্টরা আজ আর রাজনৈতিক দিক থেকে শিশু নয়, তারা যেমন নিজেদের পরিচর্যা নিজেরাই করতে পারে, ঠিক তেমনি তারা মিত্রদের সঙ্গে কিভাবে চলতে হবে, তাও পরিচালনা করতে পারে। চিয়াং কাই-শেক ও জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা যেমন বিপ্লবী শক্তির ব্যাপারে চাল চালতে পারে, কমিউনিস্ট পার্টিও ঠিক তেমনি প্রতিবিপ্লবী শক্তির ব্যাপারে চাল চালতে পারে। তারা যেমন আমাদের দল থেকে বদ লোকদের তাদের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে, আমরাও তেমনি তাদের দল থেকে তাদের 'খারাপ লোকদের' (আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে ভাল লোক) আমাদের দিকে টেনে আনতে পারি। আমরা যদি ব্যাপক সংখ্যায় আমাদের দিকে লোক টেনে আনতে পারি, তবে তার ফলে শত্রুর সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং আমরা শক্তিশালী হব। সংক্ষেপে, দুটি মূল শক্তি আজ সংগ্রামে লিপ্ত, এবং এই দুই শক্তির মাঝখানে যেসব শক্তি আছে, অবস্থার গতিতে আজ তাদের একদিকে না একদিকে যোগ দিতেই হবে। চীনকে পরাধীন করবার জাপ-সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং চীনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার চিয়াং কাই-শেকের নীতির ফলে জনগণ অবশ্যই আমাদের দিকে আসবে। তারা হয় সোজাসুজি কমিউনিস্ট পার্টি এবং লালফৌজে যোগ দেবে, কিংবা আমাদের সঙ্গে যুক্তফ্রণ্টে যোগ দেবে। যদি আমরা রুদ্ধদ্বার কৌশল ত্যাগ করি, তবেই এ অবস্থা আসবে।

'শ্রমিক-কৃষকের প্রজাতন্ত্র'-কে কেন 'গণ-প্রজাতন্ত্রে' পরিবর্তিত করা হবে?

আমাদের সরকার কেবল শ্রমিক-কৃষকেরই প্রতিনিধিত্ব করে না, প্রতিনিধিত্ব করে সমগ্র জাতির। আমাদের শ্রমিক-কৃষক-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শ্লোগানের মধ্যেই এই ধারণা নিহিত রয়েছে, কারণ শ্রমিক-কৃষকরাই হচ্ছে দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ। আমাদের পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত দশটি বিষয় সম্বলিত কর্মসূচীতে[৩০] সমগ্র জাতির স্বার্থের কথাই বলা হয়েছে, কেবলমাত্র শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থের কথা বলা হয়নি।

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমাদের স্লোগানের পরিবর্তন প্রয়োজন, একে গণ-প্রজাতন্ত্রে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। কারণ জাপানী আক্রমণ চীনের শ্রেণী-সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন করেছে এবং এখন কেবল পেটি-বুর্জোয়ারাই নয়, এমনকি জাতীয় বুর্জোয়ারাও জাপ-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দেবে।

গণ-প্রজাতন্ত্র অবশ্যই শত্রু শ্রেণীগুলির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে না। আমাদের সরকার বরং সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার জমিদার এই মুৎসুদ্দিশ্রেণীর সরাসরি বিরুদ্ধেই দাঁড়াবে এবং তাদের জনগণের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করবে না। একইভাবে, চিয়াং কাই-শেকের 'চীন প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সরকার' একমাত্র ধনীদেরই প্রতিনিধিত্ব করে, সাধারণ লোকদের প্রতিনিধিত্ব করে না এবং এই সরকার সাধারণ লোককে জাতির একটা অংশ হিসেবেও গণ্য করে না। যেহেতু চীনের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ থেকে ৯০ জনই হচ্ছে শ্রমিক-কৃষক, তাই গণ-প্রজাতন্ত্রের উচিত হবে সর্বাগ্রে এবং সবচাইতে বেশি করে তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা। কিন্তু চীনকে স্বাধীন এবং মুক্ত করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নকে হটিয়ে দেওয়ার পর এবং চীনকে আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক অবস্থা থেকে মুক্ত করবার জন্য জমিদারদের নিপীড়ন উৎখাত করার পর গণ-প্রজাতন্ত্র কেবলমাত্র শ্রমিক-কৃষকেরই স্বার্থ দেখবে না, জনগণের অন্যান্য অংশেরও স্বার্থ দেখবে। শ্রমিক-কৃষক এবং অন্যান্য জনগণের মোট স্বার্থই হচ্ছে সমগ্র চীনা জাতির স্বার্থ। জমিদার এবং মুৎসুদ্দিশ্রেণীও চীন-ভূমিতে বসবাস করে, কিন্তু যেহেতু জাতীয় স্বার্থের দিকে তারা কোন নজর দেয় না; তাই তাদের স্বার্থের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের সংঘাত ঘটে। এই মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র অংশের সঙ্গেই শুধু আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করি, সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হই, এবং তাই আমরা সমগ্র জাতির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবার দাবি রাখি।

অবশ্য শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থের বিরোধ আছে। যদি জাতীয় বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনী শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দেওয়া না হয় এবং সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুর ও বিশ্বাস-ঘাতকদের বিরুদ্ধে তাদের শক্তিকে নিয়োজিত করতে দেওয়া না হয়, তবে আমরা সার্থকভাবে বিপ্লবকে সম্প্রসারিত করতে পারব না। কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়ারা যদি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টে যোগ দেয়, তবে শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে একটা সমস্বার্থ গড়ে উঠবে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া আর অন্য কোন

ব্যক্তি-মালিকানার সম্পত্তি গণ-প্রজাতন্ত্র বাজেয়াপ্ত করবে না, এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থা বাজেয়াপ্ত করা তো দূরের কথা, এইসব সংস্থার বিকাশে এই সরকার উৎসাহ দেবে। যারা সাম্রাজ্যবাদীদের বা চীনা বিশ্বাসঘাতকদের সমর্থন করে না, এরকম প্রত্যেকটি জাতীয় পুঁজিপতিকে আমরা রক্ষা করব। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই স্তরে শ্রম ও পুঁজির সংগ্রামের একটা সীমা আছে। গণ-প্রজাতন্ত্রের শ্রম-আইনগুলি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করবে, কিন্তু তাই বলে জাতীয় বুর্জোয়াদের মুনাফা অর্জনে বা তাদের শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার বিকাশে বাধা দেবে না, কারণ এ ধরনের বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে খারাপ হলেও চীনা জনগণের কাছে ভাল। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তশক্তির বিরোধী সমস্ত স্তরের স্বার্থকেই গণ-প্রজাতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব করবে। গণ-প্রজাতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি হবে প্রথমতঃ শ্রমিক-কৃষক, কিন্তু অন্যান্য যেসব শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তশক্তির বিরোধী, গণ-প্রজাতন্ত্র তাদের স্বার্থেরও প্রতিনিধিত্ব করবে।

কিন্তু এসব শ্রেণীর প্রতিনিধিদের গণ-প্রজাতান্ত্রিক সরকারে যোগ দিতে দেওয়া কি বিপজ্জনক নয়? না। শ্রমিক এবং কৃষকরাই হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের মূল জনগণ। শহরের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী এবং জনগণের অন্যান্য যেসব অংশ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কর্মসূচী সমর্থন করে, গণ-প্রজাতান্ত্রিক সরকার তাদের মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার দেবে, সরকারের মধ্যে কাজ করবার অধিকার দেবে, ভোটের অধিকার দেবে এবং নির্বাচিত হবার অধিকার দেবে। তবে আমরা অবশ্যই মূল জনগণ, শ্রমিক এবং কৃষকের স্বার্থের বিরুদ্ধে তাদের কাজ করতে দেব না। আমাদের কর্মসূচীর মর্মবস্তু হবে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থ রক্ষা। তাদের প্রতিনিধিরাই সরকারে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে, কমিউনিস্ট পার্টি এই সরকারের মধ্যে কাজ করবে ও নেতৃত্ব দেবে এবং তার ফলে এই নিশ্চয়তা অবশ্যই থাকছে যে, অন্যান্য শ্রেণী অংশগ্রহণ করলেও কোন বিপদ আসবে না। এটা খুবই সুস্পষ্ট যে, বর্তমান স্তরে চীনা বিপ্লব এখনও প্রকৃতিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। কেবলমাত্র প্রতিবিপ্লবী ট্রট্স্কিপন্থীরাই[৩১] এইসব আজেবাজে কথা বলে যে, চীনে ইতিমধ্যেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং এখন যে-কোন বিপ্লব সেখানে হবে, তা হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কিন্তু তা শেষ অবধি যেতে পারেনি, ব্যর্থ

হয়েছে। ১৯২৭ সাল থেকে আমরা যে কৃষি-বিপ্লব পরিচালনা করেছি, তাও ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কারণ এ বিপ্লব ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে না, পরিচালিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। আমাদের বিপ্লব সম্বন্ধে এ কথা দীর্ঘকাল পর্যন্ত সত্য হয়ে থাকবে।

মূলতঃ, শ্রমিক, কৃষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়ারাই এখনও বিপ্লবের চালিকাশক্তি, কিন্তু এখন তার মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়াদেরও যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বিপ্লবে পরিবর্তন আসবে আরও পরে। ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবীরূপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হবে। কখন এই রূপান্তর হবে, তা নির্ভর করবে প্রয়োজনীয় অবস্থার উপস্থিতির ওপর এবং তার জন্য হয় তো দীর্ঘদিন লেগে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উদ্ভব না হচ্ছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থা সমগ্র চীনের বিপুল সংখ্যাধিক্যের স্বার্থের প্রতিকূলে না গিয়ে অনুকূলে আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই রূপান্তর নিয়ে মাথা ঘামাব না। এ ব্যাপারে কোনরকম সংশয় রাখা এবং খুব তাড়াতাড়ি এই রূপান্তর আশা করা ভুল হবে। আমাদের কিছু কিছু কমরেডের এরকম ধারণা ছিল যে, যে-মুহূর্তে বড় বড় প্রদেশগুলিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়লাভ করতে শুরু করবে, সেই মুহূর্তেই এই রূপান্তর শুরু হবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে চীন কি ধরনের দেশ, এ কথা তারা বুঝতে পারেন না, এবং রাশিয়ার তুলনায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন করতে হলে চীনের পক্ষে যে আরও বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে, আরও অনেক বেশি সময় ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে, এটাও তাঁরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন এবং এ কারণেই তাঁরা এরকম ভুল ধারণা পোষণ করেন।

আন্তর্জাতিক সমর্থন

পরিশেষে, চীন-বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্ব-বিপ্লবের সম্পর্ক কি, সে বিষয়ে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন।

সাম্রাজ্যবাদ নামক দৈত্যটির আবির্ভাবের পর থেকেই বিশ্বের কার্যকলাপ এত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে, তাকে আর আলাদা করা সম্ভব নয়। আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার মনোবল,

আমাদের নিজস্ব চেষ্টায় হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের দৃঢ় সংকল্প, এবং বিশ্বের জাতি-সমূহের পরিবারে আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার সামর্থ্য আমাদের চীনাদের আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা আন্তর্জাতিক সমর্থন ছাড়াই চলতে পারি ; না, আজকের দিকে প্রতিটি দেশের বা জাতিরই বিপ্লবী সংগ্রামে আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রয়োজন। 'বসন্ত আর শরৎকালের যুগে কোন ন্যায় যুদ্ধ ছিল না'[৩২] বলে একটা প্রাচীন প্রবাদ আছে। আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে এ কথা আরও সত্য, কারণ কেবলমাত্র নিপীড়িত জাতি আর নিপীড়িত শ্রেণীই ন্যায় যুদ্ধ করতে পারে, পৃথিবীর যে-কোন স্থানে নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে জনগণ যে সংগ্রাম করে, তাই হচ্ছে ন্যায় সংগ্রাম। রাশিয়ার ফেব্রুয়ারী আর অক্টোবর বিপ্লব ছিল ন্যায় যুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশগুলির জনগণের বিপ্লব ছিল ন্যায় যুদ্ধ। চীনে আফিং বিরোধী যুদ্ধ,[৩৩] তেইপিং স্বর্গীয় রাজত্বের যুদ্ধ,[৩৪] ই হো তুয়ান যুদ্ধ,[৩৫] ১৯১১ সালের বিপ্লবী যুদ্ধ,[৩৬] ১৯২৬-২৭ সালের উত্তরাভিযান, ১৯২৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধ এবং জাপানের বিরুদ্ধে বর্তমান প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং বিশ্বাস-ঘাতকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কার্যকলাপ—এ সবগুলিই ন্যায় যুদ্ধ। বর্তমানে জাপানের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান জোয়ারের সময় এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়াব্যাপী সংগ্রামের সময় সমগ্র চীনে ও সমগ্র বিশ্বে ন্যায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে। সমস্ত ন্যায় যুদ্ধ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করবে, এবং সমস্ত অন্যায় যুদ্ধকে ন্যায় যুদ্ধে রূপান্তরিত করতে হবে—এই হচ্ছে লেনিনীয় লাইন[৩৭]। জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে সমগ্র বিশ্বের জনগণের, বিশেষ করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের সমর্থন প্রয়োজন, যা তাঁরা অবশ্যই আমাদের দেবেন। কারণ তাঁরা আর আমরা একই আদর্শের বন্ধনে আবদ্ধ। অতীতে চীনের বিপ্লবী শক্তিকে চিয়াং কাই-শেক বিশ্বের বিপ্লবী শক্তিসমূহ থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল এবং এই অর্থে আমরা বিচ্ছিন্ন ছিলাম। বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং এই পরিবর্তন আমাদের অনুকূলেই হয়েছে। এখন থেকে অবস্থা আমাদের অনুকূলেই পরিবর্তিত হতে থাকবে। আমরা আর বিচ্ছিন্ন হব না। এটাই হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জয়ের এবং চীন বিপ্লবের বিজয়ের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত।

টীকা

১। চিং বংশের রাজত্বের শেষ ক'বছরে য়ুয়ান শি-কাই ছিল উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজদের প্রধান পাণ্ডা। ১৯১১ সালের বিপ্লবের ফলে চিং বংশ যখন উৎখাত হয়, তখন সে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ দখল করে এবং উত্তরের যুদ্ধবাজদের প্রথম সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এই সরকার বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ মুৎসুদ্দিদের প্রতিনিধিত্ব করত। সে এ কাজটি করেছিল প্রতিবিপ্লবী সশস্ত্র শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর নির্ভর করে, এবং বিপ্লবের তৎকালীন নেতা বুর্জোয়াদের আপোষকামী চরিত্রের সুযোগ নিয়ে। ১৯১৫ সালে সে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করতে চেয়েছিল এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন পাবার জন্য তাদের একুশ দফা দাবি মেনে নিয়েছিল। এই একুশ দফা দাবির সাহায্যে জাপান চীনে একাধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিল। সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে তার সিংহাসন দখল করার বিরুদ্ধে য়ুনান প্রদেশে এক অভ্যুত্থান ঘটে, এবং সমগ্র দেশে সেই অভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়ে ও সমর্থনলাভ করে। ১৯১৬ সালের জুন মাসে য়ুয়ান শি কাই পিকিং-এ মারা যায়।

২। ১৯১৫ সালের ১৮ই জানুয়ারী জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা য়ুয়ান শি-কাই সরকারের কাছে ২১ দফা দাবি পেশ করে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর দাবি করে ৭ই মে তারা একটা চরমপত্র পাঠায়। এই দাবিগুলি পাঁচ অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম চারটি ছিল: শানতুঙে জার্মানীরা যে অধিকার কায়েম করেছিল, সেই অধিকার এবং ওই প্রদেশে আরও কিছু অধিকার জাপানকে দেওয়া; দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া ও পূর্ব মঙ্গোলিয়ায় জমি লিজ দেওয়ার বা মালিকানা প্রতিষ্ঠার অধিকার, সেখানে বাসস্থান প্রতিষ্ঠার বা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হবার অধিকার, এবং রেলপথ নির্মাণ ও খনির ওপর একচেটিয়া অধিকার জাপানীদের দেওয়া; হান-ইয়ে-পিং লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় চীন-জাপান যৌথ সংস্থা হিসেবে পুনঃসংগঠিত করা; চীনের সমুদ্র উপকূলবর্তী কোন বন্দর বা দ্বীপকে অন্য কোন তৃতীয় শক্তির কাছে হস্তান্তর না করার বা লিজ না দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। পঞ্চম অংশে ছিল এইসব দাবি যে, জাপানকে চীনের রাজনৈতিক, আর্থিক, সামরিক ও পুলিশী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে দিতে হবে এবং হুপে, কিয়াংসী ও কোয়াংতুং প্রদেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রেলপথগুলি তৈরী করতে দিতে হবে। এই পঞ্চম অংশটি ছাড়া

বাকী চারটি অংশই যুয়ান শি-কাই মেনে নিয়েছিল, এবং এই পঞ্চম অংশটি সম্পর্কে 'আরও আলাপ-আলোচনার' আবেদন জানিয়েছিল। ধন্যবাদ যে, চীনা জনগণের সর্বসম্মত বিরোধিতার ফলে জাপান শেষ পর্যন্ত তার দাবিগুলি আদায় করতে পারেনি।

৩। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ওয়াশিংটনে ন'টি শক্তির সম্মেলন আহ্বান করে। চীন, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, পর্তুগাল ও জাপান এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়। এটা ছিল সুদূর প্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে সংঘাত। ১৯২২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে 'মুক্ত দ্বার' বা 'চীনদেশে সকল জাতির সমান সুযোগ' নীতির ভিত্তিতে একটি নয়শক্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করা, যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ চীনের ওপর যৌথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কার্যতঃ জাপানের একক নিয়ন্ত্রণের চক্রান্তকে বানচাল করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের পথকেই এতে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

৪। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর উত্তর-পূর্ব চীনের জাপানী 'কোয়াংতুং বাহিনী' সেনইয়াং দখল করে। 'কোন প্রতিরোধ নয়'—চিয়াং কাই-শেকের এই নির্দেশের ফলে সেনইয়াং এবং উত্তর-পূর্ব চীনের অন্যান্য স্থানের (উত্তর-পূর্ব সেনাবাহিনী) চীনাবাহিনী সানহাইকুয়ানের দক্ষিণে সরে যায়। ফলে জাপানী বাহিনী অতি দ্রুত লিয়াওনিং, কিরিন এবং হেইলুংকিয়াং-এর প্রদেশগুলি দখল করে। জাপানী আক্রমণের এই কার্যকলাপই '১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা' বলে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

৫। তৎকালীন 'চারটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশ' ছিল লিয়াওনিং, কিরিন, হেইলুংকিয়াং এবং জেহোল। এগুলি বর্তমানে হচ্ছে লিয়াওনিং, কিরিন, হেইলুংকিয়াং প্রদেশ, এবং চীনের প্রাচীরের উত্তরে হোপেই প্রদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ ও অন্তর্মঙ্গোলীয়া স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের পূর্বাংশ। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর জাপানী আক্রমণকারীরা লিয়াওনিং, কিরিন এবং হেইলুংকিয়াং দখল করে এবং পরে ১৯৩৩ সালে জেহোল দখল করে।

৬। জাপানীদের প্ররোচনায় পশ্চিম হোপেইর বাইশটি কাউন্টি নিয়ে কুওমিনতাঙ বিশ্বাসঘাতক জিন জু কেং ১৯৩৫ সালের ২৫শে নভেম্বর একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র স্থাপন করে, যার নাম দেওয়া হয় 'পূর্ব-হোপেই কমিউনিস্ট-

বিরোধী স্বায়ত্তশাসিত শাসনব্যবস্থা'। পূর্ব হোপেই ঘটনা নামে এটি পরিচিতি লাভ করে।

৭। চিয়াং কাই-শেক সরকার এবং জাপানী সরকারের মধ্যে যে কূট-নৈতিক কথাবার্তা চলে, সেখানে তথাকথিত 'হিরোটার তিন নীতি' আলোচিত হয়েছিল। অর্থাৎ জাপানী পররাষ্ট্র সচিব হিরোটা চীনের সঙ্গে আলাপের যে তিন নীতি উপস্থাপিত করেছিল, তা ছিল: (১) চীন কর্তৃক সমস্ত জাপ-বিরোধী আন্দোলনের দমন, (২) চীন, জাপান এবং 'মাঞ্চুকুয়ো'-র মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা এবং (৩) চীন এবং জাপান কর্তৃক যৌথভাবে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা। ১৯৩৬ সালের ২১শে জানুয়ারী হিরোটা ডায়েটে বলে যে, চীনা সরকার 'সম্রাট কর্তৃক প্রস্তাবিত তিন নীতি মেনে নিয়েছে'।

৮। ১৯৩৫ সালে চীনে দেশব্যাপী এক জনপ্রিয় দেশপ্রেমিক আন্দোলনের নতুন জোয়ার দেখা দেয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পিকিঙের ছাত্ররা ৯ই ডিসেম্বর এক দেশপ্রেমিক বিক্ষোভ-মিছিল করে। তাঁদের শ্লোগান ছিল 'গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর এবং বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হও' এবং 'জাপ-সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'। জাপ-আক্রমণকারীদের যোগসাজসে কুওমিনতাঙ সরকার দীর্ঘদিন ধরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল, এই আন্দোলন সেই প্রতিবন্ধক ভেঙে বেরিয়ে আসে এবং অতি দ্রুত দেশব্যাপী সমস্ত জনগণের সমর্থন লাভ করে। এইটিই '৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলন' নামে খ্যাত। এর ফলেই সমস্ত দেশের মধ্যেকার বিভিন্ন শ্রেণীগুলির সম্পর্কের মধ্যে নতুন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাবিত জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট হয়ে ওঠে দেশপ্রেমিক জনগণের খোলাখুলি প্রচারের নীতি। চিয়াং কাই-শেক তার বিশ্বাসঘাতক নীতির ফলে ভীষণভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

৯। এই রিপোর্টের সময় চিয়াং কাই-শেক জাপানের নিকট উত্তর-পূর্ব চীনকে বিক্রয় করার পর উত্তর চীনকেও বিক্রয় করছিল এবং সেই সঙ্গে লাল-ফৌজের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং বিশ্বাসঘাতক হিসেবে তার মুখোস খুলে ধরতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হয়, এবং স্বভাবতঃই পার্টির প্রস্তাবিত জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের মধ্যে তাকে ধরা হয়নি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে চীনা জমিদার ও মুৎসুদ্দিশ্রেণীগুলির মধ্যে যে ভাঙনের সম্ভাবনা আছে, এই রিপোর্টে কমরেড

মাও সে-তুঙ তা বলেছেন। উত্তর চীনে জাপানী আক্রমনের ফলে পরবর্তীকালে আপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের ভীষণ সংঘাত শুরু হয়েছিল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই ধারণা পোষণ করত যে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ চিয়াং কাই-শেক চক্র তার প্রভুদের নির্দেশে জাপানের প্রতি তার মনোভাব পরিবর্তন করতে পারে এবং তাই পার্টি জাপানকে প্রতিরোধ করবার জন্য চিয়াং কাই-শেককে বাধ্য করবার নীতি গ্রহণ করেছিল। শানসী থেকে উত্তর শেনসীতে ফিরে এসে ১৯৩৬ সালের মে মাসে লালফৌজ সরাসরি নানকিং-এর কুওমিনতাঙ সরকারের কাছে গৃহযুদ্ধের অবসান এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আবেদন জানায় ঐ বৎসরের আগস্ট মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির কাছে এক চিঠিতে জাপানের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক যুক্তফ্রন্ট এবং উভয় পার্টির প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার আহ্বান জানায়। কিন্তু চিয়াং কাই-শেক এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। জাপানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট-দের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীর অফিসাররা যখন ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সিয়ানে চিয়াং কাই-শেককে বন্দী করেন কেবল তখনই চিয়াং গৃহযুদ্ধের অবসান এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব মেনে নেয়।

১০। সাই তিং-কাই ছিল কুওমিনতাঙের উনিশ নং রুট বাহিনীর ডেপুটি অধিনায়ক এবং এর একটি অংশের অধিনায়ক। এই অংশের অপর দু'জন নেতা ছিল চেন মিং-সু এবং চিয়াং কুয়াং-নাই। এই বাহিনী কিয়াংসী ও লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর সাংহাইতে এই বাহিনীকে বদলী করা হয়। সাংহাই নগরী তখন ছিল সমগ্র দেশের জাপ-বিরোধী জনগণের কেন্দ্র। জাপ-বিরোধী ক্রমবর্ধমান জোয়ার উনিশ নং রুট বাহিনীর ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করছিল। ১৯৩২-এর ২৮শে জানুয়ারীর রাত্রিতে যখন জাপানী যুদ্ধ জাহাজ সাংহাই আক্রমণ করে তখন সাংহাইয়ের সেনাবাহিনী ও জনগণ মিলিতভাবে তার প্রতিরোধ করে, কিন্তু চিয়াং কাই-শেক এবং ওয়েং চি-ওয়েইয়ের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তারা পরাজয় বরণ করে। পরে, চিয়াং-এর হুকুমে উনিশ নং রুট বাহিনীকে আবার লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য ফুকিয়েনে পাঠানো হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর নেতৃবর্গ এ-ধরনের যুদ্ধের অসারতা ক্রমশঃই উপলব্ধি করতে

থাকে। ১৯৩০ সালের নভেম্বরে লি চি-সেন এবং অন্যান্যদের অধীনস্থ কুওমিনতাঙ বাহিনীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে তারা ফুকিয়েনে 'চীন প্রজাতন্ত্রের গণবিপ্লবী সরকার' প্রতিষ্ঠা করে এবং জাপানকে প্রতিরোধ করা ও চিয়াং কাই-শেকের বিরোধিতা করার শর্তে লালফৌজের সঙ্গে এক চুক্তি করে। চিয়াং সেনাবাহিনীর আক্রমণে উনিশ নং রুট বাহিনী ও জনগণের সরকারের পতন ঘটে। তখন থেকে সাই তিং-কাই এবং অন্যান্যরা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সহযোগিতা করার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

১১। ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন উত্তরমুখী অভিযানকারী বিপ্লবী বাহিনী উহানে পৌছায়, তখন ফেং ইয়ু-সিয়াং সুইয়ান প্রদেশে তার অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে উত্তরের যুদ্ধবাজদের চক্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করবার কথা ঘোষণা করে এবং বিপ্লবে যোগদান করে। ১৯২৭ সালের প্রথম দিকে তার সেনাবাহিনী উত্তরমুখী অভিযানকারী বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে হোনান প্রদেশ আক্রমণ করবার জন্য শেনসী থেকে রওনা হয়। যদিও ১৯২৭ সালে চিয়াং কাই-শেক এবং ওয়াং চিং-ওয়েই কর্তৃক বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরে ফেং কমিউনিস্ট বিরোধী আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিল, তা সত্ত্বেও তার এবং চিয়াং কাই-শেক চক্রের মধ্যে সর্বদাই একটা স্বার্থের সংঘাত ছিল। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হওয়ার পরে ফেং প্রতিরোধের পক্ষে ছিল। ১৯৩৩ সালের মে মাসে চ্যাংচিয়াকৌতে জাপ-বিরোধী মিত্রবাহিনী গঠনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সে সহযেগিতা করেছিল। চিয়াং কাই-শেক বাহিনীর এবং জাপানী আক্রমনকারীদের চাপে আগস্ট মাসে তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরবর্তী বছরগুলিতে ফেং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করে।

১২। কিয়াংসীর নিংতুতে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে কুওমিনতাঙের ছাব্বিশ নং রুট বাহিনীর মধ্যে একটি অভ্যুত্থান ঘটে। এই বাহিনীকে চিয়াং কাই-শেক কিয়াংসী প্রদেশের লালফৌজের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য পাঠিয়েছিল। জাপানকে প্রতিরোধ করবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে কমরেড চাও পো-সেং এবং তুং চেং-তাঙের নেতৃত্বে দশ হাজারেরও বেশি অফিসার এবং সেনানী বিদ্রোহ করে এবং লালফৌজে যোগ দেয়।

১৩। মা চাঁ-শান ছিলেন কুওমিনতাঙের উত্তর-পূর্ব বাহিনীর একজন অফিসার। তাঁর সেনাবাহিনী হেইলুংকিয়াঙে অবস্থিত ছিল। ১৮ই

সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর লিয়াওনিং হয়ে হেইলুংকিয়াঙের দিকে যে জাপ-বাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল, মা চাং-শান ও তাঁর বাহিনী তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছিলেন।

১৪। হু হান-মিন ছিলেন একজন নামজাদা কুওমিনতাঙ রাজনীতিবিদ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতার যে নীতি ডঃ সান ইয়াৎ-সেন গ্রহণ করেছিলেন, এই লোকটি ছিলেন তার বিরোধী এবং ১৯২৭ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক সংঘটিত প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের সহযোগী। পরবর্তী সময়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে হু হান-মিন চিয়াং-বিরোধী হয়ে যান এবং চিয়াং তাঁকে বন্দী করে। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর তিনি নানকিং ত্যাগ করে ক্যাণ্টনে চলে যান এবং সেখানে কোয়াংতুং এবং কোয়াংসীর যুদ্ধবাজদের দীর্ঘদিন ধরে প্ররোচনা দেন চিয়াং কাই-শেকের বিরোধিতা করার জন্য।

১৫। জাপানকে প্রতিরোধ করা এবং জাতিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ছয় পয়েণ্টের কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছিলেন যা 'জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য চীনা জনগণের মূল কর্মসূচী' নামে পরিচিত, এবং সুং চিং-লিং (শ্রীযুক্তা সান ইয়াৎ-সেন) এবং অন্যান্যদের স্বাক্ষর-সহ এই কর্মসূচীটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই কর্মসূচীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছিল: (১) সমস্ত স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য সমাবিষ্ট কর; (২) সমগ্র দেশব্যাপী জনগণকে সমাবিষ্ট কর; (৩) সমগ্র জনগণকে সশস্ত্র কর; (৪) যুদ্ধজনিত খরচ-খরচার জন্য জাপানী সাম্রাজ্যবাদের চীনস্থ এবং বিশ্বাসঘাতকদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর; (৫) জাতীয় সশস্ত্র প্রতিরক্ষার জন্য শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য, ছাত্র এবং ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত একটি নিখিল চীন কমিটি স্থাপন কর; এবং (৬) জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধী সমস্ত শক্তির সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা কর ও সহৃদয় নিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।

১৬। এই যুদ্ধবাজরা ছিল কোয়াংতুঙের চেন চি-তাং এবং কোয়াংসীর লিন সাং-জেন ও পাই চুং-সি।

১৭। চিয়াং কাই-শেকের দস্যুদল বিপ্লবী জনগণকে 'দস্যু' বলে অভিহিত করত এবং বিপ্লবী জনগনের বিরুদ্ধে তাদের সশস্ত্র আক্রমণ ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ডকে বলত 'দস্যু' অবদমন'।

১৮। কমরেড ইয়েন পি-শী ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একজন

প্রবীণ সভ্য এবং এই পার্টির অন্যতম প্রথম সংগঠক। ১৯২৭ সালের পঞ্চম কংগ্রেস থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। ১৯৩১-এ অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ বর্ধিত অধিবেশনে তিনি পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ সালে তিনি হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার প্রাদেশিক পার্টি কমিটির সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন এবং একই সঙ্গে লালফৌজের ষষ্ঠ সেনা গ্রুপের রাজনৈতিক কমিশার হিসেবেও কাজ করেন। ষষ্ঠ এবং দ্বিতীয় সেনা গ্রুপ এক হয়ে দ্বিতীয় ফ্রন্ট বাহিনী গঠিত হলে তিনি তার রাজনৈতিক কমিশার নিযুক্ত হন। প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রথম বছরগুলিতে তিনি অষ্টম রুট বাহিনীর সাধারণ রাজনৈতিক বিভাগের পরিচালক ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েটে কাজ করতে শুরু করেন। ১৯৪৫ সালে সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বর্ধিত অধিবেশনে তিনি পুনর্বার পলিটব্যুরো ও সেক্রেটারিয়েটে নির্বাচিত হন। কমরেড ইয়েন পি-শী ১৯৫০ সালের ২৭শে অক্টোবর পিকিঙে মারা যান।

১৯। চীনা শ্রমিক-কৃষকের লালফৌজের ষষ্ঠ সেনা গ্রুপ প্রথমে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে ছিল। এখান থেকে তারা শত্রুদের অবরোধ ভেঙে ১৯৩৪ সালের আগষ্ট মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে অন্য স্থানে চলে যায়। অক্টোবর মাসে পূর্ব কুইচৌয়ে কমরেড হো লুঙের নেতৃত্বে দ্বিতীয় সেনা গ্রুপের সঙ্গে এরা যোগ দেয়, উভয়ে মিলে লালফৌজের দ্বিতীয় ফ্রন্ট সেনা-বাহিনী গঠন করে, এবং হুনান-হুপে-সেচুয়ান-কুইচৌ বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল সৃষ্টি করে।

২০। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে চীনা শ্রমিক এবং কৃষকের লাল-ফৌজের (অর্থাৎ লালফৌজের প্রথম বাহিনী যা কেন্দ্রীয় লালফৌজ নামেও পরিচিত ছিল) প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সেনা গ্রুপ পশ্চিম ফুকিয়েনের চ্যাংতিং এবং নিংহুয়া থেকে ও দক্ষিণ কিয়াংসীর জুইচিন, ইয়ুতু এবং অন্যান্য জায়গা থেকে রণনীতিগতভাবে সরে যেতে আরম্ভ করে। ফুকিয়েন, কিয়াংসী, কোয়াংতুং, হুনান, কোয়াংসী, কুইচৌ, সেচুয়ান, য়ুনান, সিকাং, কানসু এবং শেনসী—এই এগারোটি প্রদেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবার সময় লালফৌজকে প্রায়শঃই বরফাবৃত পাহাড়-পর্বত এবং পথহীন গভীর অরণ্যানী পার হতে হয়েছে। এভাবে শত্রুর অবরোধ, পশ্চাদ্ধাবন, আক্রমণ সবকিছুকেই ব্যর্থ করে দিয়ে অকথ্য কষ্ট এবং বিঘ্ন উপেক্ষা করে লালফৌজ এই অভিযানে ২৫,০০০ লী

পথ অতিক্রম করে এবং অবশেষে বিজয়ী হয়ে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে উত্তর শেনসীর বিপ্লবী ঘাঁটিতে উপনীত হয়।

২১। সেচুয়ান-শেনসী সীমান্ত অঞ্চলের লালফৌজ ছিল চীনা শ্রমিক-কৃষকের লালফৌজের চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনী। ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে সেচুয়ান-শেনসী সীমান্ত অঞ্চলের ঘাঁটি থেকে তা সেচুয়ান সীমান্ত ও সিকাং প্রদেশে সরে যায়। জুন মাসে পশ্চিম সেচুয়ানের মাওকাঙের প্রথম ফ্রন্ট বাহিনী এই বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় এবং একটি বাঁদিকে ও অপরটি দক্ষিণ দিকে এই দুই পথ ধরে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে পাঙ্‌পুনের নিকটবর্তী মাওয়েরাইতে পৌঁছানোর পর চ্যাং কুও-তাও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ উপেক্ষা করে তার সেনাবাহিনাকে বাঁ দিকের পথে দক্ষিণ দিকে পরিচালিত করে এবং এভাবে লালফৌজের মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় ফ্রন্ট বাহিনী শত্রুর অবরোধ-ভেঙে হুনান-হুপে-সেচুয়ান-কুইচৌ সীমান্ত অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৩৬ সালের জুন মাসে হুনান, কুইচৌ এবং য়ুনানের মধ্য দিয়ে সিকাং প্রদেশের কানজেতে উপস্থিত হয়, এবং এখানেই চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনীর সঙ্গে একত্রিত হয়। অক্টোবর মাসে সমগ্র দ্বিতীয় ফ্রন্ট বাহিনী এবং চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনীর একাংশ উত্তর শেনসীতে পৌঁছায় এবং প্রথম ফ্রন্ট সেনাবাহিনীর সঙ্গে একত্রিত হয়।

২২। চ্যাং কুও-তাও চীন বিপ্লবের একজন দলত্যাগী ব্যক্তি। বিপ্লবের বিজয় হবে এই ভরসায় সে তার যুবা বয়সে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। পার্টির মধ্যে সে অসংখ্য ভুল করে, যার পরিসমাপ্তি ঘটে মারাত্মক অপরাধে। বদমায়েশী করে সে ১৯৩৫ সালে লালফৌজের উত্তরমুখী অভিযানের বিরোধিতা করে, লালফৌজকে সেচুয়ান-সিকাং সীমান্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে ওকালতি করে নিজের ধ্বংসকামী ও পরাজয়বাদী মনোভাবের পরিচয় দেয়, পার্টি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে এবং তার নিজস্ব ভুয়া কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে এবং এভাবে পার্টি ও লালফৌজের ঐক্য ভেঙে দেয় ও তার নিজের চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনীর বিরাট ক্ষতিসাধন করে। কমরেড মাও সে-তুঙ এবং কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ধৈর্যসহকারে শিক্ষাদানের ফলে চতুর্থ ফ্রন্টবাহিনী ও তার অসংখ্য কর্মী স্বল্পকালের মধ্যেই কেন্দ্রীয় কমিটির নির্ভুল নেতৃত্বাধীনে চলে আসে এবং পরবর্তী সংগ্রামগুলিতে গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে। চ্যাং

কুও-তাও সংশোধনের অতীত বলে প্রমাণিত হয়, এবং শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল থেকে ১৯৩৮ সালের বসন্তকালে পালিয়ে গিয়ে সে কুওমিনতাঙের গুপ্ত পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করে।

২৩। কেন্দ্রীয় লালফৌজ বা প্রথম ফ্রন্ট বাহিনী বলতে বোঝায় সেই লালফৌজকে, যা প্রত্যক্ষভাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বাধীনে কিয়াংসী-ফুকিয়েন অঞ্চল গড়ে ওঠে।

২৪। চীনা পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী পান কু ছিলেন এই জগতের স্রষ্টা এবং মানবজাতির প্রথম শাসক। তিন সার্বভৌম ও পাঁচ সম্রাট ছিলেন প্রাচীন চীনের পৌরাণিক শাসক।

২৫। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে কুওমিনতাঙ বাহিনী শেনসী-কানসু বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলের বিরুদ্ধে তাদের তৃতীয় 'অবরোধ ও দমন' অভিযান শুরু করে। উত্তর শেনসী লালফৌজের ২৬ নং সেনাবাহিনী পূর্ব রণাঙ্গণে দুটি শত্রু ব্রিগেডকে পরাজিত করে এবং শত্রুদের ইয়েলো নদীর পূর্ব প্রান্তে তাড়িয়ে দেয়। সেপ্টেম্বর মাসে লালফৌজের ২৫ নং সেনাদল, হুপে-হোনান-আনহুই ঘাঁটি অঞ্চলে যারা যুদ্ধ করছিল, দক্ষিণ শেনসী এবং পূর্ব কানসুর মধ্য দিয়ে উত্তর শেনসীতে গিয়ে পৌছায় এবং উত্তর শেনসীর লালফৌজের সঙ্গে একত্রিত হয়ে লালফৌজের ২৫ নং সেনাগ্রুপ তৈরী করে। কানচুয়ান-লাওসান অভিযানে এই সেনাগ্রুপ শত্রুর ১১০ নং ডিভিশনের অধিকাংশ সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে এবং ডিভিশনাল অধিনায়ককে হত্যা করে। পরবর্তী আর একটি যুদ্ধে কানচুয়ান কাউন্টির উলিসচিয়াওয়ে শত্রুর ১০৭ নং ডিভিশনের চারটি ব্যাটেলিয়নকে তারা ধ্বংস করে। শত্রুরা আবার নতুনভাবে আক্রমণ করে এবং তুং ইং-পিন (উত্তর-পূর্ব বাহিনীর একজন কোর কম্যাণ্ডার) ৫টি ডিভিশনের অধিনায়ক হয়। এই বাহিনী দুদিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করে, পূর্বদিকের ডিভিশন লো-চুয়ান এবং ফুসিয়েনের মধ্য দিয়ে উত্তরদিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং পশ্চিমদিকের বাকী চার ডিভিশন হুলু নদীর পথ ধরে কানসুর চিংইয়েং এবং হোসুই-এর মধ্য দিয়ে উত্তর শেনসীতে ফুসিয়েনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় লালফৌজ উত্তর শেনসীতে পৌছায়। পরবর্তী মাসগুলিতে কেন্দ্রীয় লালফৌজ এবং ১৫ নং সেনাগ্রুপ একযোগে শত্রুর ১০৯ নং ডিভিশনকে ফুসিয়েনের দক্ষিণ-পশ্চিমে চিলোচেন নামক জায়গায় একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং পশ্চাদ্ধাবনকালে শত্রুর ১০৬ নং ডিভিশনের একটি

রেজিমেন্টকে হেইসুইজেতে নিশ্চিহ্ন করে। এভাবেই শেনসী-কানসু সীমান্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে শত্রুর তৃতীয় 'অবরোধ ও দমন' অভিযান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

২৬। ১৯৩৪-৩৫ সালে দক্ষিণ চীনের লালফৌজের প্রধান বাহিনী স্থান পরিবর্তন করার সময় গেরিলা কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকটি ইউনিট রেখে আসে। এই গেরিলা ইউনিটগুলিই আটটি প্রদেশে নিম্নলিখিত ১৪টি ঘাঁটি অঞ্চল রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল: দক্ষিণ চেকিয়াং, উত্তর ফুকিয়েন, পূর্ব ফুকিয়েন, দক্ষিণ ফুকিয়েন, পশ্চিম ফুকিয়েন, উত্তর-পূর্ব কিয়াংসী, ফুকিয়েন-কিয়াংসী সীমান্ত, হুনান-হুপে-কিয়াংসী সীমান্ত, হুপে-হুনান-আনহুই সীমান্ত, দক্ষিণ হুনানের তুং পাই পাহাড় এবং কোয়াংতুং সমুদ্র উপকূলে অদূরস্থিত হাইনান দ্বীপ।

২৭। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯৩১ সালে উত্তর-পূর্ব চীন দখল করার পরে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য জনগণকে আহ্বান জানায়। পার্টি জাপ-বিরোধী গেরিলা ইউনিট সংগঠিত করে, উত্তর পূর্ব জনগণের বিপ্লবী বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছে সেই স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটগুলিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। ১৯৩৪ সালে পার্টির নেতৃত্বে এই সমস্ত শক্তিগুলিকে একটিমাত্র উত্তর-পূর্ব জাপ-বিরোধী যুক্ত বাহিনী নামে পুনর্গঠিত করা হয়, এবং এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন বিখ্যাত কমিউনিস্ট ইয়াং চিং-ইউ। উত্তর-পূর্বে এই বাহিনী দীর্ঘকালব্যাপী জাপ-বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ টিঁকিয়ে রেখেছিল। ১৯৩৫ সালের জাপ-বিরোধী কৃষক অভ্যুত্থানকেই এখানে পূর্ব হুপের জাপ-বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ বলা হয়েছে।

২৮। ১৯১৮ থেকে ১৯২০ সালের যুদ্ধে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যপুষ্ট রুশ শ্বেতবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দেয়। এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে।

২৯। প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় জনগণের মুক্তাঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গণ-প্রজাতন্ত্রের যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক নীতি বাস্তবে রূপায়িত করা হয়েছিল, কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে তাই বিশ্লেষণ করেছেন। এই নীতিকে সার্থকভাবে রূপায়িত করার জন্য জাপ-আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে

শত্রু-লাইনের পেছনে পার্টি যুদ্ধ করতে পেরেছিল। জাপানের আত্মসমর্পণের পর তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন সমগ্র চীনে জনগণের মুক্তাঞ্চলের পরিধিও বিস্তৃত হয়ে চলছিল, এবং এভাবেই ঐক্যবদ্ধ চীনা গণ-প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়। এভাবেই কমরেড মাও সে-তুঙের গণ-প্রজাতন্ত্রের আদর্শ দেশব্যাপী বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল।

৩০। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে। এই কংগ্রেসে নিম্নলিখিত দশ পয়েন্টের এক কর্মসূচী গৃহীত হয়: (১) সাম্রাজ্যবাদী শাসন উৎখাত কর; (২) বিদেশী পুঁজিপতিদের কল-কারখানা ও ব্যাঙ্কসমূহ বাজেয়াপ্ত কর, (৩) চীনকে ঐক্যবদ্ধ কর এবং বিভিন্ন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার কর; (৪) কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজদের সরকার উৎখাত কর; (৫) শ্রমিক-কৃষক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠিত কর; (৬) দৈনিক আটঘণ্টা কাজ, মজুরী বৃদ্ধি, বেকার ভাতা এবং সামাজিক বীমার প্রবর্তন কর; (৭) সমস্ত জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে তা বিতরণ কর; (৮) সৈনিকদের জীবন-ধারণের মান উন্নয়ন কর, প্রাক্তন সৈনিকদের জমি ও কাজ দাও; (৯) সমস্ত রকম উঁচুহার বিশিষ্ট ট্যাক্স ও নানাপ্রকারের অতিরিক্ত কর বাতিল কর এবং একটি সুসংবদ্ধ প্রগতিশীল ট্যাক্স-ব্যবস্থা প্রবর্তন কর; এবং (১০) বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হও।

৩১। রুশ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে গোড়ায় একটি লেনিন-বিরোধী চক্র হিসেবে শুরু করে পরবর্তীকালে ট্রটস্কিপন্থী এই গ্রুপটি দস্যুর মতো একটি প্রতিবিপ্লবী গ্রুপে অধঃপতিত হয়। ১৯৩৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্টে কমরেড স্তালিন এই দলত্যাগী গ্রুপটি কোন্ পথে এগিয়েছিল তা ব্যাখ্যা করে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন:

> একথা ঠিক যে, সাত-আট বছর আগে ট্রটস্কিবাদ ছিল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটি রাজনৈতিক ঝোঁক, একটি লেনিনবাদ-বিরোধী ঝোঁক, এবং তাই এটা ছিল মারাত্মক ভ্রান্ত পথ, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা ছিল একটা রাজনৈতিক ঝোঁক।...বর্তমানের ট্রটস্কিবাদ কিন্তু আর শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটি রাজনৈতিক ঝোঁক হিসেবে নেই, বরং কোনরকম মতাদর্শ, কোন ভাবধারা ছাড়াই এটি একটি বিপথে নিয়ে যাওয়ার, সবকিছু তছনছ করে দেওয়ার

দলে পরিণত হয়েছে। এরা গুপ্তচর বিভাগের লোক হিসেবে কাজ করে, গুপ্তচর বৃত্তি গ্রহণ করে, এরা হত্যাকারী এবং শ্রমিকশ্রেণীর ঘৃণিত শত্রুর দল। বিদেশী রাষ্ট্রের গুপ্তচর বিভাগ দ্বারা এরা ক্রীত এবং তাদের স্বার্থে নিয়োজিত।

১৯২৭ সালে চীন বিপ্লবের ব্যর্থতার পর চীনেও ট্রট্স্কিপন্থীদের একটি ক্ষুদ্র দলের আবির্ভাব হয়। দলত্যাগী চেন তু-সিউ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে মিলেমিশে তারা ১৯২৯ সালে একটি প্রতিবিপ্লবী দল তৈরী করে, এবং এরকম প্রতিবিপ্লবী প্রচার চালাতে থাকে যে, কুওমিনতাঙরা ইতিমধ্যেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে ফেলেছে। তারা জনগণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের ও কুওমিনতাঙের ঘৃণিত দালালে পরিণত হয়। চীনা ট্রট্স্কিপন্থীরা নির্লজ্জভাবে কুওমিনতাঙ গুপ্তচর বিভাগে যোগ দেয়। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরে 'জাপ-সম্রাট কর্তৃক চীন দখলে কোন বাধা সৃষ্টি কর না'—দলত্যাগী বদমায়েস ট্রট্স্কিপন্থীদের এই নির্দেশ প্রতিপালনের জন্য তারা জাপানী গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করা শুরু করে, তাদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য নেয় এবং জাপানী আক্রমণের যাতে সুবিধা হয় তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে থাকে।

৩২। এই উদ্ধৃতিটি **মেনসিয়াস** থেকে নেওয়া হয়েছে। যে সময়টি বসন্ত ও শরতের যুগ (খ্রীঃ পূঃ ৭২২-৪৮১) বলে ইতিহাসে খ্যাত হয়েছিল, সে সময়ে চীনের সামন্ত রাজারা ক্ষমতার জন্য একে অন্যের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ করেছিল বলেই মেনসিয়াস এই মন্তব্যটি করেছিলেন।

৩৩। বৃটেনের আফিং ব্যবসায়ে চীনা জনগণের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে বৃটেন তার ব্যবসা রক্ষা করার নামে ১৯৪০-৪২ সালে কোয়াংতুং এবং অন্যান্য সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি আক্রমণ করে। লিন সে-জুর নেতৃত্বে কোয়াংতুং সেনাবাহিনী প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। ক্যান্টনের জনগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'বৃটিশ সৈন্য দমনকারী' নামে একটি গণবাহিনী গড়ে তোলে এবং তারাও আক্রমণকারীদের ওপর নিদারুণ আঘাত হানে।

৩৪। তাইপিং স্বর্গীয় রাজত্বের যুদ্ধ ছিল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কৃষকদের বিপ্লবী যুদ্ধ। চিং বংশের জাতীয় নিপীড়ন ও সামন্ত শাসকদের বিরুদ্ধেই ছিল এই যুদ্ধ। ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসে হুং সিউ-চুয়ান, ইয়াং সিউ-চিং এবং এই বিপ্লবের অন্যান্য নেতৃবর্গ কোয়াংসীর কুইপিং

তালুকের চিনতিয়েন গ্রামে এক অভ্যুত্থান ঘটায় এবং তাইপিং স্বর্গীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। ১৮৫২ সালে এই কৃষক সেনাবাহিনী কোয়াংসী থেকে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে হুনান, হুপে, কিয়াংসী এবং আনহুইয়ের মধ্য দিয়ে অভিযান চালিয়ে ১৮৫৩ সালে ইয়াংসির নিম্নভাগের প্রধান শহর নানকিং দখল করে। এই সৈন্যবাহিনীর একাংশ আরও উত্তরে এগিয়ে যেতে থাকে এবং তিয়েনসিনের কাছাকাছি যায়। কিন্তু অধিকৃত অঞ্চলে তাইপিং বাহিনী সুদৃঢ় ঘাঁটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় এবং নানকিঙে তাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেও সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ অসংখ্য সামরিক ও রাজনৈতিক ভুল করে। তাই তারা প্রতিবিপ্লবী চিং সরকারের এবং বৃটিশ, আমেরিকা ও ফরাসী আক্রমণকারীদের সেনাবাহিনীর যৌথ আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারেনি এবং অবশেষে ১৮৬৪ সালে এরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়।

৩৫। ১৯০০ সালের ই হো তুয়ান যুদ্ধ ছিল উত্তর চীনের কৃষক এবং হস্তশিল্পীদের এক ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। রহস্যময় গুপ্ত সমিতি তৈরী করে এই কৃষক এবং হস্তশিল্পীরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ চালায়। কিন্তু অকথ্য বর্বরতা সহকারে এই আন্দোলনকে দমন করা হয় এবং আটটি সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির যৌথবাহিনী পিকিং এবং তিয়েনসিন দখল করে।

৩৬। ১৯১১ সালের বিপ্লব সম্পর্কে এই খণ্ডের 'হুনানে কৃষক-আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট, ৩নং টীকা, পৃঃ ৭২ দ্রষ্টব্য।

৩৭। দ্রষ্টব্য: ভি. আই. লেনিনের 'সর্বহারা বিপ্লবের যুদ্ধ কর্মসূচী', **সংকলিত রচনাবলী**, রুশ সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫০, খণ্ড ২৩। তাছাড়া 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ', ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৩য় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা

প্রথম অধ্যায়

কীভাবে যুদ্ধের পর্যালোচনা করা যায়

১। যুদ্ধের নিয়ম বিকাশশীল

যুদ্ধের নিয়মগুলি হচ্ছে এমন একটা সমস্যা, যে কেউ যুদ্ধ পরিচালনা করুক, তাকে তা পর্যালোচনা এবং সমাধান করতেই হবে।

বিপ্লবী যুদ্ধের নিয়মগুলি হচ্ছে এমন একটা সমস্যা, যে কেউ বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করুক তাকে তা পর্যালোচনা এবং সমাধান করতেই হবে।

চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের নিয়মগুলি হচ্ছে এমন একটা সমস্যা, যে কেউ চীনা বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করুক, তাকে তা পর্যালোচনা এবং সমাধান করতেই হবে।

আমরা এখন যুদ্ধে লিপ্ত আছি। আমাদের যুদ্ধ হচ্ছে বিপ্লবী যুদ্ধ। আমাদের বিপ্লবী যুদ্ধ চলছে আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীন

দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতার সার-সংকলনের উদ্দেশ্যে কমরেড মাও সে-তুঙ এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন এবং তখন উত্তর শেনসীর লালফৌজ কলেজে বক্তৃতা দেবার সময় একে কাজে লাগিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধটির শুধু পাঁচটি অধ্যায় লেখা হয়েছিল। সীআন ঘটনার জন্য ভীষণ ব্যস্ত থাকায় রণনীতিগত আক্রমণ, রাজনৈতিক কাজকর্ম ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে লিখবার সময় তিনি আর পাননি। এই প্রবন্ধটি হল দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের কালে পার্টির ভেতরে সামরিক সমস্যা নিয়ে একটি বিরাট বিতর্কের ফল। এতে ব্যক্ত হয়েছে সামরিক বিষয়ে একটি লাইনের বিরুদ্ধে অন্য একটি লাইনের অভিমত। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চুনই অধিবেশনে এই দুই লাইনের বিতর্ক সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতে কমরেড মাও সে-তুঙের অভিমতকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং ভুল লাইনের অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি উত্তর শেনসীতে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে, ডিসেম্বর মাসেই কমরেড মাও সে-তুঙ। 'জাপান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতি সম্পর্কে' বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতায় দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের কালে পার্টির রাজনৈতিক লাইনের সমস্যা সুব্যবস্থিতভাবে সমাধান করা হয়। পরের বছরে অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সুব্যবস্থিত ব্যাখ্যা করে এই বইটি লিখেছিলেন।

দেশে। সুতরাং, আমাদের শুধু যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম পর্যালোচনা করলেই চলবে না, বরং বিপ্লবী যুদ্ধের বিশেষ নিয়মও পর্যালোচনা করতে হবে, এমনকি, চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিয়মও পর্যালোচনা করতে হবে।

এটা সুবিদিত যে, যে-কোন কাজই করি না কেন, যদি তার অবস্থা, প্রকৃতি ও অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে তার সম্পর্কাদি না বুঝি, তাহলে সে কাজের নিয়ম বুঝতে পারব না, কেমন করে তা সম্পন্ন করতে হয়, তা বুঝতে পারব না, তাকে ভাল করে সম্পন্ন করতেও পারব না।

শ্রেণী, জাতি, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব যখন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন সে দ্বন্দ্বগুলোর মীমাংসার জন্য সংগ্রামের উচ্চতম রূপই হচ্ছে **যুদ্ধ**—যা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীর উদ্ভব থেকেই আরম্ভ হয়েছে। যদি তার অবস্থা, প্রকৃতি ও অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে তার সম্পর্কাদি না বুঝি, তাহলে যুদ্ধের নিয়ম বুঝতে পারব না, কেমন করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়, তা বুঝতে পারব না এবং যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারব না।

বিপ্লবী যুদ্ধ অর্থাৎ বিপ্লবী শ্রেণীযুদ্ধ ও বিপ্লবী জাতীয় যুদ্ধ, সাধারণ যুদ্ধের অবস্থা এবং প্রকৃতি ছাড়াও এর নিজস্ব বিশেষ অবস্থা ও প্রকৃতি রয়েছে। তাই, যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম ছাড়াও এর কতকগুলো বিশেষ নিয়ম আছে। যদি এই বিশেষ অবস্থা ও প্রকৃতি না বুঝি এবং তার বিশেষ নিয়মগুলো না বুঝি, তাহলে বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারব না এবং তাতে জয়লাভও করতে পারব না।

চীনের বিপ্লবী যুদ্ধ, তা সে গৃহযুদ্ধই হোক কিংবা জাতীয় যুদ্ধই হোক, তা চীনের বিশেষ পরিবেশে চালানো হয় এবং সাধারণ যুদ্ধ ও সাধারণ বিপ্লবী যুদ্ধের তুলনায় তার আবার নিজস্ব বিশেষ অবস্থা ও প্রকৃতি রয়েছে। তাই, যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম ও বিপ্লবী যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম ছাড়াও, তার নিজস্ব কতকগুলো বিশেষ নিয়ম আছে। এগুলো যদি না বুঝি, তাহলে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারব না।

তাই, আমাদের অবশ্যই সাধারণ যুদ্ধের নিয়মগুলোকে পর্যালোচনা করতে হবে, বিপ্লবী যুদ্ধের নিয়মগুলোকেও পর্যালোচনা করতে হবে, এবং পরিশেষে আমাদের চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের নিয়মগুলোকেও পর্যালোচনা করতে হবে।

কিছু লোকের ভ্রান্ত মত রয়েছে, যা আমরা বহু পূর্বেই খণ্ডন করেছি। তাদের মতে, কেবলমাত্র যুদ্ধের সাধারণ নিয়মগুলো পর্যালোচনা করাটাই

যথেষ্ট, অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, শুধু প্রতিক্রিয়াশীল চীনা সরকার বা প্রতিক্রিয়াশীল চীনা সামরিক একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত সামরিক পত্র-পত্রিকা অধ্যয়নই যথেষ্ট। তারা জানে না যে, এইসব পত্র-পত্রিকার শুধুমাত্র যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম মেলে, এবং তাও পুরোপুরি বিদেশ থেকে নকল করা। আমরা যদি তার আকৃতি ও বিষয়বস্তু কিঞ্চিৎ মাত্রও পরিবর্তন না করে হুবহু সেগুলোকে নকল করে প্রয়োগ করি, তাহলে আমরা 'জুতোর উপযোগী করার জন্য পা'টাকেই কেটে ফেলব এবং পরাজিত হব। তাদের যুক্তি হচ্ছে: অতীতে রক্তের বিনিময়ে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়েছে, কেন তাকে কাজে লাগানো হবে না? তারা জানে না যে, এইভাবে অর্জিত পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাকে আমাদের অবশ্যই মর্যাদা দেওয়া উচিত, কিন্তু নিজেদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতাকেও আমাদের মর্যাদা দেওয়া উচিত।

আরও এক ধরনের লোকের মতও ভ্রান্ত, তা আমরা বহু পূর্বেই খণ্ডন করেছি। তাদের মতে, কেবলমাত্র রাশিয়ার বিপ্লবী যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে পর্যালোচনা করলেই যথেষ্ট। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধ যে নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল শুধু সেগুলোকে এবং সোভিয়েত সামরিক সংস্থাগুলো কর্তৃক প্রকাশিত সামরিক পত্র-পত্রিকা অনুসরণই যথেষ্ট। তারা জানে না যে, এইসব নিয়ম ও পত্র-পত্রিকা সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধ ও লালফৌজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রতিফলিত করে। আমরা যদি কোনরকম রদবদল না করে হুবহু নকল করে প্রয়োগ করি, তাহলে একইভাবে আমরা 'জুতোর উপযোগী করার জন্য পা'টাকেই কেটে ফেলব' এবং পরাজিত হব। এদের যুক্তি হচ্ছে: সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ বিপ্লবী যুদ্ধ, আমাদের যুদ্ধটাও যেহেতু বিপ্লবী যুদ্ধ, এবং যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন জয়ী হয়েছে, সেহেতু তার নজির অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প কেমন করে থাকতে পারে? তারা জানে না যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে আমাদের নিশ্চয়ই বিশেষ মর্যাদা দিতে হবে, কারণ এই যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা হচ্ছে সবচেয়ে আধুনিককালের বিপ্লবী যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, আর সে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে। কিন্তু চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকেও অবশ্যই আমাদের অনুরূপভাবে মর্যাদা দিতে হবে, কারণ চীনা বিপ্লব ও চীনা লালফৌজের অবস্থার আরও অনেক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

তৃতীয় আর এক ধরনের লোকের মতও ভ্রান্ত, সেটাও আমরা বহু পূর্বেই

খণ্ডন করেছি। তারা বলে যে, শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞতা হচ্ছে ১৯২৬-২৭ সালের উত্তর অভিযানের[১] অভিজ্ঞতা, আর তা আমাদের শেখা উচিত অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, সামনে এগিয়ে গিয়ে বড় বড় শহর দখল করে নেবার ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই উত্তর অভিযানের অনুকরণ করা উচিত। তারা জানে না যে, উত্তর অভিযানের অভিজ্ঞতাকে শিক্ষা করা আমাদের উচিত হলেও যান্ত্রিকভাবে তাকে নকল করে প্রয়োগ করা উচিত নয়, কারণ আমাদের বর্তমান যুদ্ধের অবস্থার ইতিমধ্যেই পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান অবস্থায় যা কাজে লাগে শুধুমাত্র সেটাই উত্তর অভিযান থেকে আমাদের নেওয়া উচিত, আর বর্তমান অবস্থা অনুসারে আমাদের নিজস্ব কিছু সৃষ্টি করা উচিত।

কাজেই, বিভিন্ন যুদ্ধের পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নিয়ম ঠিক হয় ঐসব যুদ্ধের অবস্থার বিভিন্নতার দ্বারা—তাদের কাল, স্থান ও প্রকৃতির পার্থক্যের দ্বারা। কাল সম্পর্কে বলতে গেলে, যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরিচালনার নিয়ম উভয়ই বিকাশলাভ করে, প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক পর্যায়েরই আপন আপন বৈশিষ্ট্য আছে, আর তাই, প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে যুদ্ধের নিয়মগুলোরও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সেগুলোকে যান্ত্রিকভাবে অন্য পর্যায়ে প্রয়োগ করতে পারা যায় না। যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে বলা যায় যে, বিপ্লবী যুদ্ধ ও প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ উভয়েরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। তাই যুদ্ধের নিয়মগুলোরও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং একের উপরে যা প্রযোজ্য, অপরের উপর তা যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করতে পারা যায় না। স্থান সম্পর্কে দেখতে গেলে, প্রত্যেকটি দেশ বা জাতির, বিশেষ করে, বড় দেশ বা জাতির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য থাকে, তাই প্রত্যেকটি দেশ বা জাতির যুদ্ধের নিয়মগুলোর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং এখানেও একের উপরে যা প্রযোজ্য, তা অপরের উপরে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ের, বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন জাতির যুদ্ধ-পরিচালনার নিয়মগুলোকে পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাদের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের দিকে অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে, এবং যুদ্ধ-সমস্যার প্রতি যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করতে হবে।

এটাই সব নয়। শুরুতে ছোট একটা সৈন্যবাহিনীর পরিচালনায় সমর্থ কোন কম্যাণ্ডার যদি পরে বড় সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হয়ে ওঠেন, তাহলে এটা তাঁর অগ্রগতি ও উন্নতি। একটিমাত্র স্থানে লড়াই চালানো ও

বহু স্থানে লড়াই চালানোর মধ্যেও পার্থক্য আছে। একজন কম্যাণ্ডার প্রথমে কোন একটি পরিচিত স্থানে লড়াই চালনা করতে সক্ষম, পরে অনেকগুলো স্থানে লড়াই চালনা করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন, এটাও তাঁর অগ্রগতি ও উন্নতি। শত্রুদের ও আমাদের উভয় পক্ষের টেকনিক, রণকৌশল ও রণনীতির উন্নতির কারণে একই যুদ্ধের মধ্যেও প্রত্যেক পর্যায়ের অবস্থা ভিন্নতর হয়। যুদ্ধের নিম্নপর্যায়ে পরিচালনা করতে সক্ষম কম্যাণ্ডার যদি যুদ্ধের উচ্চপর্যায়ে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন, তাহলে এটা তাঁর পক্ষে আরও অগ্রগতি ও উন্নতির নিদর্শন। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বাহিনীতে, নির্দিষ্ট স্থানে ও যুদ্ধ-বিকাশের নির্দিষ্ট পর্যায়ে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়ে থেকে যাওয়া মানে তাঁর অগ্রগতি ও উন্নতি হয়নি। এমন কিছু লোক আছে, যারা শুধুমাত্র একটি দক্ষতা বা সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়েই তুষ্ট থাকে। তারা আর অগ্রসর হয় না। কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে ও কালে তারা যদিও বিপ্লবে কোন একটা ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। আমাদের এমন যুদ্ধ-পরিচালকের দরকার যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ইতিহাসের এবং যুদ্ধের বিকাশ অনুযায়ী যুদ্ধ-পরিচালনার সমস্ত নিয়মও বিকাশলাভ করে। কিছুই পরিবর্তনহীন নয়।

৯। যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধের বিলোপসাধন

মানবজাতির মধ্যে পারস্পরিক হত্যার এই দানব যুদ্ধকে মানবসমাজের অগ্রগতি শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করবে এবং অদূর ভবিষ্যতেই তা করবে। কিন্তু তাকে ধ্বংস করার কেবল একটিমাত্র পদ্ধতি আছে এবং তা হচ্ছে যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধের বিরোধিতা করা, বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরোধিতা করা, জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা জাতীয় প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং শ্রেণীর বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা শ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরোধিতা করা। ইতিহাসে শুধুমাত্র দু'ধরনের যুদ্ধ রয়েছে—ন্যায় যুদ্ধ আর অন্যায় যুদ্ধ। আমরা ন্যায় যুদ্ধের সমর্থন করি আর অন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করি। সমস্ত প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে অন্যায় যুদ্ধ, আর সমস্ত বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে ন্যায় যুদ্ধ। আমাদের হাতেই মানবজাতির যুদ্ধ-যুগের অবসান ঘটবে, এবং আমরা যে যুদ্ধ করি সেটা নিঃসন্দেহে সর্বশেষ যুদ্ধেরই অংশ। কিন্তু আমরা যে যুদ্ধের সম্মুখীন হই, নিঃসন্দেহে সেটা বৃহত্তম ও নির্মমতম যুদ্ধের অংশও বটে।

বৃহত্তম ও নির্মমতম অন্যায় প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ এখন আমাদের মাথার উপরে ঝুলছে। আমরা যদি ন্যায় যুদ্ধের পতাকাটি উর্ধ্বে তুলে না ধরি, তাহলে মানবজাতির অধিকাংশই গুরুতরভাবে বিপদগ্রস্ত হবে। মানবজাতির ন্যায় যুদ্ধের পতাকা হচ্ছে তার মুক্তির পতাকা। চীনের ন্যায় যুদ্ধের পতাকা হচ্ছে চীনের মুক্তির পতাকা। মানবজাতির ও চীনা জনগণের অধিকাংশের চালিত যুদ্ধ নিঃসন্দেহে ন্যায় যুদ্ধ—মানবজাতির ও চীনের মুক্তির এক অত্যন্ত মহিমান্বিত ও গৌরবোজ্জ্বল কাজ এবং সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসের নব যুগে পৌছানোর এক সংযোগ-সেতু। মানবসমাজ যখন এমন একটা স্তরে এগিয়ে যাবে যেখানে শ্রেণীর ও রাষ্ট্রের লোপ পাবে, তখন আর কোন যুদ্ধ থাকবে না, প্রতিবিপ্লবী বা বিপ্লবী, অন্যায় বা ন্যায়, কোন যুদ্ধেই থাকবে না। মানবজাতির পক্ষে সেটা হবে চিরস্থায়ী শান্তির যুগ। বিপ্লবী যুদ্ধর নিয়ম সম্পর্কে আমাদের গবেষণার প্রেরণা এসেছে সমস্ত যুদ্ধের অবসান ঘটানোর ইচ্ছা থেকে। এখানেই আমাদের কমিউনিস্টদের সঙ্গে সমস্ত শোষকশ্রেণীর পার্থক্য।

৩। রণনীতি হচ্ছে যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতির নিয়মের পর্যালোচনা

যুদ্ধ থাকলেই তার সামগ্রিক পরিস্থিতি থাকবে। সারা দুনিয়াটাই যুদ্ধের একটি সামগ্রিক পরিস্থিতি হতে পারে, একটা দেশ যুদ্ধের একটি সামগ্রিক পরিস্থিতি হতে পারে, একটা স্বতন্ত্র গেরিলা অঞ্চল বা একটা বৃহৎ স্বতন্ত্র যুদ্ধরত এলাকাওযুদ্ধের একটি সামগ্রিক পরিস্থিতি হতে পারে। যে-কোন যুদ্ধ-পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক ও পর্যায়ের ব্যাপক বিশ্লেষণ করা হলে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতি।

রণনীতি-বিজ্ঞানের কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ-পরিচালনার সেইসব নিয়মগুলো পর্যালোচনা করা, যেগুলি সামগ্রিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। যুদ্ধাভিযান বিজ্ঞানের ও রণকৌশল বিজ্ঞানের[২] কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ-পরিচালনার সেইসব নিয়মগুলোকে পর্যালোচনা করা যেগুলি আংশিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

কেন যুদ্ধাভিযানের এবং রণকৌশলের কম্যাণ্ডারের পক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণে রণনীতিগত নিয়মগুলোকে জানা দরকার? কারণ সমগ্রের উপলব্ধিই অংশের পরিচালনাকে সহজতর করে, কারণ অংশটা সমগ্রের অধীন। শুধুমাত্র রণকৌশলগত বিজয়ের দ্বারাই রণনীতিগত বিজয় নির্ধারিত হয়—এ ধরনের

মত ভুল, কারণ যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের প্রধান ও প্রথম প্রশ্ন যে সামগ্রিক পরিস্থিতির এবং প্রত্যেক পর্যায়ের ভালভাবে বিচার-বিবেচনা, এধরনের অভিমত তা বুঝতে পারে না। সামগ্রিক পরিস্থিতি ও প্রত্যেক পর্যায়ের বিচার-বিবেচনায় গুরুতর ত্রুটি বা ভুল থাকলে সেই যুদ্ধে নিশ্চয়ই হার হবে। 'একটা অসতর্ক চালে গোটা খেলাটাই নষ্ট হয়ে যায়।' এখানে যে চাল সামগ্রিক প্রকৃতি-সম্পন্ন অর্থাৎ সামগ্রিক পরিস্থিতির পক্ষে প্রভাবশালী, তারই কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যে চাল আংশিক প্রকৃতি-সম্পন্ন অর্থাৎ সামগ্রিক পরিস্থিতির পক্ষে প্রভাবশালী নয় তার কথা বলা হয়নি। দাবা খেলায় যেমনি, যুদ্ধেও তেমনি।

কিন্তু অংশ থেকে সমগ্র বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীন নয়, কারণ সমগ্র তার সমস্ত অংশের দ্বারাই গঠিত হয়। কোন কোন সময়ে কোন কোন আংশিক পরিস্থিতি নষ্ট ব্যর্থ হলেও সামগ্রিক পরিস্থিতি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, কারণ এই আংশিক পরিস্থিতিগুলো সামগ্রিক পরিস্থিতির নয়। যুদ্ধের মধ্যে রণকৌশলগত কার্যকলাপে বা যুদ্ধভিযানে কিছু ব্যর্থতা বা বিফলতা প্রায়শঃই যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে কোন অবনতি ঘটায় না, কারণ সেইসব ব্যর্থতা নির্ধারক নয়। কিন্তু যেসব যুদ্ধাভিযানের দ্বারা যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতি গঠিত হয়, সেসব যুদ্ধাভিযানের অধিকাংশ যদি ব্যর্থ হয় অথবা নির্ধারক দু-একটি যুদ্ধভিযান যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে তক্ষুণি যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। এখানে 'সেসব যুদ্ধাভিযানের অধিকাংশ' ও 'দু-একটি যুদ্ধাভিযান' হচ্ছে নির্ধারক। যুদ্ধের ইতিহাসে এমন উদাহরণ রয়েছে, যেখানে একটানা বহু বিজয় অর্জনের পরে একটিমাত্র লড়াইয়ের পরাজয়ই পূর্ববর্তী সেই সমস্ত জয়লাভকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। আবার এমন নজিরও রয়েছে যেখানে বহু পরাজয়ের পরে একটিমাত্র লড়াইয়ে বিজয়ের ফলেই নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এখানে 'একটানা বহু বিজয়' এবং 'বহু পরাজয়' সবই ছিল আংশিক প্রকৃতির, সামগ্রিক পরিস্থিতির পক্ষে নির্ধারক ছিল না। পক্ষান্তরে, 'একটিমাত্র লড়াইয়ের পরাজয়' ও 'একটি-মাত্র লড়াইয়ের বিজয়' সবই হচ্ছে নির্ধারক। এই সবগুলোই সামগ্রিক পরিস্থিতিকে বিচার-বিবেচনা করার গুরুত্ব প্রমাণ করে। যিনি সামগ্রিক পরিস্থিতিকে পরিচালনা করেন তাঁর পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচার-বিবেচনার উপরে নিজের দৃষ্টি রাখা। প্রধানতঃ,

অবস্থা অনুযায়ী সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলো ও সৈন্যসংস্থানগুলোর গঠনের প্রশ্ন, দুটি যুদ্ধাভিযানের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন, যুদ্ধ চালনার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন, আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের ও শত্রুদের সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন বিচার-বিবেচনা করা—এই প্রশ্নগুলো সবচেয়ে কঠিন। এগুলোর দিকে নজর না দিয়ে অপ্রধান সমস্যা নিয়ে মেতে উঠলে বিপর্যয় এড়ানো কঠিন।

সামগ্রিক পরিস্থিতি ও আংশিক পরিস্থিতির মধ্যেকার সম্পর্কের কথা বলতে গেলে, তা শুধু রণনীতি ও যুদ্ধাভিযানের সম্পর্ক সম্বন্ধেই নয়, পরন্তু যুদ্ধাভিযান ও রণকৌশলের মধ্যেকার সম্পর্কের বিষয়েও প্রযোজ্য। একটা ডিভিশনের সামরিক কার্যকলাপাদি এবং তার রেজিমেণ্ট ও ব্যাটেলিয়নের সামরিক কার্যকলাপাদির মধ্যেকার সম্পর্কের মধ্যে, একটা কোম্পানীর কার্যকলাপ এবং তার প্ল্যাটুন ও সেকশনের কার্যকলাপের মধ্যেকার সম্পর্কের মধ্যে এর উদাহরণ দেখা যায়। যে-কোন স্তরের পরিচালককে তাঁর দ্বারা পরিচালিত গোটা পরিস্থিতির পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে নির্ধারক সমস্যার বা কার্যকলাপের উপরে তাঁর নিজের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করতে হবে, অন্য কোন সমস্যা বা কার্যকলাপের উপর নয়।

কোন্‌টা গুরুত্বপূর্ণ বা নির্ধারক, তার নির্ধারণ সাধারণ বা বিমূর্ত অবস্থানুসারে করা চলবে না, বাস্তব অবস্থানুসারে তার নির্ধারণ করতে হবে। যুদ্ধ করার সময়ে সেই মুহূর্তে শত্রুর প্রকৃত অবস্থা, ভোগোলিক পরিবেশ এবং নিজেদের সৈন্যবাহিনীর শক্তির অবস্থানুসারে আক্রমণের গতিমুখ ও লক্ষ্যবিন্দু বাছাই করতে হবে। যেখানে প্রচুর খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ আছে, সেখানে নজর দিতে হবে, যাতে সেন্যরা যেন অতিভোজন না করে। যেখানে খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ অল্প, সেখানে নজর দিতে হবে, যাতে সৈন্যদের ক্ষুধার্ত হয়ে দিন কাটাতে না হয়। শ্বেত এলাকায় একটিমাত্র খবর ফাঁস হবার কারণে পরবর্তী লড়াইয়ে পরাজয় ঘটতে পারে। কিন্তু লাল এলাকায় খবর ফাঁস হওয়া প্রায়শঃই সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার নয়। উচ্চস্তরের কম্যাণ্ডারের পক্ষে কোন কোন যুদ্ধাভিযানে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন, কিন্তু অন্যগুলিতে তার দরকার নেই। একটা সামরিক স্কুলের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে স্কুলের পরিচালক ও শিক্ষক বাছাই করা এবং একটা শিক্ষা নীতি নির্ধারণ করা। একটি জনসভার আয়োজন করতে হলে প্রধানতঃ নজর দিতে

হবে জনসভায় যোগ দেবার জন্ত জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং যথাযোগ্য স্লোগান তোলার দিকে। এমনি ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কথায়, মূলনীতি হচ্ছে সামগ্রিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্রগুলোর প্রতি আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা।

শুধুমাত্র গভীরভাবে চিন্তা করেই যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিচালনার নিয়মগুলো অধ্যয়ন করা যায়। কারণ এই ধরনের জিনিস যা সামগ্রিক পরিস্থিতির চরিত্রবিশিষ্ট, তা চোখে পড়ে না, শুধুমাত্র গভীরভাবে চিন্তা করার ভেতর দিয়েই তা আমরা বুঝতে পারি, গভীরভাবে চিন্তা না করলে তা বুঝতে পারি না। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি অংশের দ্বারা গঠিত হয় বলে অংশের অভিজ্ঞতা, যুদ্ধাভিযান ও রণকৌশলের অভিজ্ঞতা যাদের আছে তেমন ব্যক্তিরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে তাঁরা আরও উচ্চ পর্যায়ের জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন। রণনীতির সমস্যায় নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো অন্তর্ভুক্ত:

শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া।

বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের মধ্যেকার বা যুদ্ধ করার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া।

সামগ্রিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত (নির্ধারক) কোন কোন অংশের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া।

গোটা পরিস্থিতিতে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে সেগুলির প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া।

ফ্রন্ট ও পশ্চাদ্ভাগের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া।

ক্ষয়ক্ষতি ও পূরণের মধ্যেকার, লড়াই করা ও বিশ্রাম করার মধ্যেকার, কেন্দ্রীভূত করা ও ছড়িয়ে দেবার মধ্যেকার, আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার মধ্যেকার, অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণের মধ্যেকার, আড়ালে থাকা ও উন্মুক্ত অবস্থায় থাকার মধ্যেকার, মুখ্য আক্রমণ ও সহায়ক আক্রমণের মধ্যেকার, হানা দেওয়া ও আটকে রাখার মধ্যেকার, কেন্দ্রীভূত পরিচালনা ও বিক্ষিপ্ত পরিচালনার মধ্যেকার, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধের মধ্যেকার, অবস্থানগত যুদ্ধ ও চলমান যুদ্ধের মধ্যেকার, আমাদের নিজেদের বাহিনী ও মিত্রবাহিনীর মধ্যেকার, সৈন্যবাহিনীর ভেতরে এক বাহিনী ও অন্য বাহিনীর মধ্যেকার, উচ্চস্তর ও নিম্নস্তরের মধ্যেকার, কর্মী ও সৈনিকের

মধ্যেকার, প্রবীণ সৈন্য ও নবীন সৈন্যের মধ্যেকার, উচ্চতর ও নিম্নস্তর কর্মীর মধ্যেকার, প্রবীণ কর্মী ও নবীন কর্মীর মধ্যেকার, লাল এলাকা ও শ্বেত এলাকার মধ্যেকার, পুরানো লাল এলাকা ও নতুন লাল এলাকার মধ্যেকার, কেন্দ্র-অঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চলের মধ্যেকার, গরম দিন ও ঠাণ্ডা দিনের মধ্যেকার, জয় ও পরাজয়ের মধ্যেকার, বৃহদাকার বাহিনী ও ক্ষুদ্রাকার বাহিনীর মধ্যেকার, নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ও গেরিলা বাহিনীর মধ্যেকার শত্রুকে ধ্বংস করা ও জনসাধারণকে স্বপক্ষে টেনে আনার মধ্যেকার, লালফৌজকে সম্প্রসারিত করা ও লালফৌজকে সুসংবদ্ধ করার মধ্যেকার, সামরিক কাজ ও রাজনৈতিক কাজের মধ্যেকার, অতীত কর্তব্য ও বর্তমান কর্তব্যের মধ্যেকার, বর্তমান কর্তব্য ও ভবিষ্যৎ কর্তব্যের মধ্যেকার, এক রকমের অবস্থা থেকে উদ্ভূত কর্তব্য ও অন্য রকমের অবস্থা থেকে উদ্ভূত কর্তব্যের মধ্যেকার স্থায়ী যুদ্ধফ্রন্ট ও অস্থায়ী যুদ্ধফ্রণ্টের মধ্যেকার, গৃহযুদ্ধ ও জাতীয় যুদ্ধের মধ্যেকার, একটি ঐতিহাসিক পর্যায় ও অন্য একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ের মধ্যেকার, প্রভৃতি পার্থক্য ও যোগসূত্রের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া।

রণনীতির এইসব সমস্যার কোনটাকেই চোখে দেখা যায় না, তবু আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে এ সবকিছুকেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি, ধরতে পারি, নিপুণভাবে আয়ত্ত করতে পারি। অর্থাৎ যুদ্ধ বা অভিযান চালাবার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে নীতির উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে সেগুলির সমাধান করতে পারি। রণনীতির সমস্যাগুলোর পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জন করা।

৪। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ

আমাদের লালফৌজ গঠনের উদ্দেশ্য কি ? তার দ্বারা শত্রুকে পরাজিত করা। যুদ্ধের নিয়মগুলো আমরা শিখি কেন ? যুদ্ধে সেগুলোকে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে

শেখাটা সহজ ব্যাপার নয়, শিক্ষাকে প্রয়োগ করাটা আরও কঠিন। ক্লাসরুমে বা পুস্তকে রণ-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করার সময়ে অনেক লোককেই বেশ সমঝদার বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত লড়াইয়ে নেমে কেউ জেতে, কেউ-বা হেরে যায়। যুদ্ধের ইতিহাস এবং যুদ্ধে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা— উভয়ই এই বিষয়টাকে প্রমাণ করেছে।

তাহলে সমস্তার মূলটি কোথায়?

বাস্তব জীবনে আমরা 'সদাবিজয়ী সেনাপতি' দাবি করতে পারি না, ইতিহাসে এমন সেনাপতি খুব কম দেখা যায়। আমরা এমন সেনাপতি চাই, যাঁরা সাহসী ও বিচক্ষণ, যুদ্ধে সাধারণতঃ যারা জয়লাভ করে—যাঁদের বিচক্ষণতা ও সাহস দুইই আছে। সাহসী ও বিচক্ষণ হতে গেলে অবশ্যই একটি পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে। শেখার সময়ে এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে হবে এবং প্রয়োগের সময়েও তা করতে হবে।

পদ্ধতিটা কি? সেটা হচ্ছে শত্রু ও আমাদের উভয় পক্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অবস্থার সঙ্গে নিজেদেরকে সুপরিচিত করা, উভয় পক্ষের কার্যকলাপের নিয়ম-গুলো খুঁজে বের করা এবং আমাদের নিজেদের কার্যকলাপে সেই নিয়ম-গুলোকে ব্যবহার করা।

বহু দেশের প্রকাশিত বিভিন্ন সামরিক গ্রন্থাদি 'অবস্থানুসারে নীতির নমনীয় প্রয়োগের' প্রয়োজনীয়তা এবং পরাজয় ঘটলে কি উপায় অবলম্বন করা হবে—এ উভয় দিক নির্দেশ করে। প্রথমটির উল্লেখ তারা করে কম্যাণ্ডারদেরকে সতর্ক করার জন্য যাতে কম্যাণ্ডাররা নীতির যান্ত্রিক প্রয়োগের কারণে বিষয়ীগত ভুল না করে বসে, এবং দ্বিতীয়টিতে বিষয়ীগত ভুল করার পরে, অথবা বিষয়গত অবস্থায় অপ্রত্যাশিত ও দুর্নিবার পরিবর্তন ঘটার পরে কম্যাণ্ডারদের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, তা নির্দেশ করে।

বিষয়ীগত ভুল কেন ঘটে? কারণ, কোন যুদ্ধ বা লড়াইয়ে সৈন্যবাহিনীকে যেভাবে বিন্যস্ত ও পরিচালিত করা হয়, সেটা নির্দিষ্ট স্থান ও কালের অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না, কারণ বিষয়ীগত নির্দেশ প্রকৃত বিষয়গত অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না বা ভিন্ন ভিন্ন হয়, অথবা বলা যায়, বিষয়ীগত ও বিষয়গত অবস্থার মধ্যে-কার দ্বন্দ্বের সমাধান করা হয়নি। মানুষ যাই করুক না কেন, এ ধরনের অবস্থা এড়িয়ে চলা কঠিন। কেউ কেউ অন্যের চেয়ে অধিক সক্ষম বলে প্রমাণ করতে পারেন। কাজকর্মে আমরা যেমন অপেক্ষাকৃত সক্ষমতার দাবি করি, তেমনি সামরিক ক্ষেত্রেও অপেক্ষাকৃত অধিক জয় দাবি করি, অথবা অন্য কথায়, যাতে পরাজয় অপেক্ষাকৃত কম হয় তার দাবি করি। এ ব্যাপারের মূল বিষয় হচ্ছে বিষয়ীগত ও বিষয়গতের মধ্যে যথাযথ সংগতি সাধন।

রণকৌশলগত একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। শত্রুবাহিনীর একটি পার্শ্বভাগ যদি আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেওয়া হয়, আর সে স্থানটি যদি শত্রুর

ঠিক দুর্বল অংশ হয় এবং সে কারণে আক্রমণ সফল হয়, তাহলে বলা যায় যে, বিষয়ীগত ও বিষয়গতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, অর্থাৎ কম্যাণ্ডারের পর্যবেক্ষণ, বিচার ও সংকল্প শত্রুর বাস্তব অবস্থা ও তার বাস্তব বিন্যাসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল। যদি শত্রুবাহিনীর অন্য একটি পার্শ্বভাগ বা কেন্দ্রভাগ আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেওয়া হয় এবং ফলে অপ্রত্যাশিত বাধার মুখে পড়ে আক্রমণ বিফল হয়, তাহলে বলতে হবে, এটা সংগতিপূর্ণ ছিল না। আক্রমণ যদি যথাযথ সময়ে হয়, সংরক্ষিত বাহিনীকে বেশি দেরীতে কিংবা বেশি আগে ব্যবহার না করা হয় এবং লড়াইয়ে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা ও সামরিক কার্যকলাপ যদি আমাদের অনুকূল হয় ও শত্রুর বিপক্ষে যায়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় আগাগোড়া লড়াইয়ে বিষয়ীগত পরিচালনা বিষয়গত অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সংগতিপূর্ণ। যুদ্ধে বা লড়াইয়ে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ ব্যাপার অত্যন্ত বিরল, কারণ যুদ্ধে বা লড়াইয়ে উভয়পক্ষের যুদ্ধরতরা হচ্ছে সশস্ত্র জীবন্ত মানুষের দল এবং পরস্পরে আবার নিজের গোপনীয়তা বজায় রাখছে। এটা নিষ্প্রাণ বস্তু অথবা গতানুগতিক কাজকর্ম থেকে অনেক ভিন্ন। যদি কম্যাণ্ডারের পরিচালনা মোটামুটি অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়, অর্থাৎ পরিচালনার নির্ধারক উপাদানগুলি যদি অবস্থার সঙ্গে 'সংগতিপূর্ণ হয়, তাহলে জয়ের একটা ভিত্তি গড়ে ওঠে।

কম্যাণ্ডারের নির্ভুল বিন্যাস ব্যবস্থা আসে তাঁর নির্ভুল সংকল্প থেকে, তাঁর নির্ভুল সংকল্প আসে তাঁর নির্ভুল বিচার থেকে, তাঁর নির্ভুল বিচার আসে পুংখানুপুংখ ও প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ থেকে এবং বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে সংগৃহীত তথ্যগুলোকে একসূত্রে গেঁথে চিন্তা করা থেকে। কম্যাণ্ডার সমস্ত সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, পর্যবেক্ষণে অর্জিত শত্রুর অবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যগুলোর উপর চিন্তা করেন—বাজে জিনিস ছেড়ে সার জিনিস বেছে, মিথ্যাকে বাদ দিয়ে সত্যকে রেখে, এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে গিয়ে, বাইরে থেকে ভেতরে গিয়ে, তারপর তিনি তাঁর নিজের পক্ষের অবস্থাকে বিবেচনা করেন এবং উভয়পক্ষের তুলনা ও পারস্পরিক সম্পর্কের পর্যালোচনা করেন। এমনি করেই তিনি বিচার-বিবেচনা গড়ে তোলেন, নিজের মনস্থির করেন এবং পরিকল্পনা রচনা করেন। এই হচ্ছে রণনীতিগত পরিকল্পনা, যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনা বা লড়াইয়ের পরিকল্পনা রচনা করার পূর্বে রণবিশারদের পক্ষে অবস্থাকে জানার সামগ্রিক প্রক্রিয়া কিন্তু এমন না করে অসতর্ক রণবিশারদ নিজের মনগড়া ভিত্তির সামরিক

পরিকল্পনা রচনা করে, তাই এ ধরনের পরিকল্পনাগুলো হচ্ছে কাল্পনিক এবং বাস্তবের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। নিছক উৎসাহের উপর নির্ভরশীল বেপরোয়া রণবিশারদ শত্রুর দ্বারা প্রতারিত হতে বাধ্য, শত্রুর বাহ্য আকৃতি বা শত্রুর অবস্থার একতরফা উপলব্ধির দ্বারা প্রলুব্ধ হতে বাধ্য, অধীনস্থ কর্মচারীর দায়িত্ব-জ্ঞানহীন পরামর্শ, যা বাস্তব জ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন পরামর্শের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। আর তাই তার মাথা দেওয়ালে না ঠেকে পারে না। কারণ, সে জানে না অথবা জানতেও চায় না যে, যে-কোন সামরিক পরিকল্পনাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ, শত্রু নিজের অবস্থার এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিস্তারিত বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়।

অবস্থাকে জানার প্রক্রিয়া শুধুমাত্র যে সামরিক পরিকল্পনা রচিত হবার আগেই চলে তা নয়, উপরন্তু তার পরেও চলে। কোন একটি পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে শুরু করার মূহূর্ত থেকে লড়াইয়ের সমাপ্তি পর্যন্ত চলতে থাকে অবস্থাকে জানার আরও একটি প্রক্রিয়া, অর্থাৎ প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া। এই সময়ে, প্রথম প্রক্রিয়ায় রচিত পরিকল্পনাটি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কি না, তা নতুন করে পরীক্ষা করা দরকার। যদি সে পরিকল্পনা অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ না হয়, অথবা পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ না হয়, তাহলে আমাদের অবশ্যই নতুন জ্ঞান অনুসারে নতুন বিচার গড়ে তোলা, নতুন সংকল্প স্থির করা এবং পূর্বে নির্ধারিত পরিকল্পনার পরিবর্তন করা উচিত, যাতে তা নতুন অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আংশিক পরিবর্তন প্রায় প্রতিটি লড়াইয়েই করা হয়, এবং কখনো কখনো তাকে সম্পূর্ণভাবেও বদলাতে হয়। বেপরোয়া ব্যক্তি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে বোঝে না অথবা পরিবর্তন সাধনে অনিচ্ছুক, শুধু অন্ধভাবেই সে কাজ করে থাকে, তাই অনিবার্যভাবেই তার মাথা দেওয়ালে ঠুকবে।

উপরের কথাটি রণনীতিগত কার্যকলাপ, অথবা একটি যুদ্ধাভিযান বা লড়াই সম্পর্কে বলা হয়েছে। অভিজ্ঞ সামরিক ব্যক্তি যদি শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হন, নিজের বাহিনীর (কমাণ্ডারের, যোদ্ধার, অস্ত্রশস্ত্রের, রসদাদি-সরবরাহ, ইত্যাদির এবং তাদের মোট সমষ্টির) প্রকৃতির সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে থাকেন, শত্রুবাহিনীর (অনুরূপভাবে, কম্যাণ্ডারের, যোদ্ধার, অস্ত্রশস্ত্রের, রসদাদি-সরবরাহ, ইত্যাদির এবং তাদের সবকিছুর) প্রকৃতির এবং যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত

অন্যান্য সমস্ত অবস্থার—যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, ভৌগোলিক অবস্থা ও আবহাওয়ার প্রকৃতি ইত্যাদির সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে থাকেন, তাহলে এই ধরনের সামরিক ব্যক্তির যুদ্ধ বা লড়াই পরিচালনার সামর্থ্য অপেক্ষাকৃত বেশি থাকবে এবং তাঁর বিজয় অর্জন করার সম্ভাবনাও অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি থাকবে। এটা হচ্ছে দীর্ঘকালের মধ্যে শত্রুপক্ষের ও নিজেদের পক্ষের অবস্থা জেনে নেবার, কার্যকলাপের নিয়মগুলো খুঁজে বের করার এবং বিষয়ীগত ও বিষয়গতের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সমাধান করার পরিণতি। জানার এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ব্যতীত গোটা যুদ্ধের নিয়মগুলোকে বোঝা ও আয়ত্ত করা কঠিন। সামরিক ব্যাপারে যারা নবীব তারা, অথবা যারা শুধু কাগজে-কলমেই লড়াই করে তারা প্রকৃত নিপুণ উচ্চস্তরের কম্যাণ্ডার হতে পারে না। যুদ্ধের ভেতর দিয়ে যারা শিক্ষালাভ করে, শুধু তারাই এমন কম্যাণ্ডার হতে পারে।

নীতিগত প্রকৃতি-সম্পন্ন সমস্ত সামরিক নিয়ম বা সামরিক তত্ত্ব হচ্ছে আগের দিনের বা আজকের দিনের মানুষের দ্বারা অতীত যুদ্ধের অভিজ্ঞতার সার-সংকলন। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বিগত যুদ্ধের শিক্ষাকে আমাদের অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে শেখা উচিত। এটা একটা ব্যাপার। কিন্তু আর একটা ব্যাপারও আছে, অর্থাৎ এই সমস্ত সিদ্ধান্তকে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করে যা প্রয়োজনীয় তা গ্রহণ করতে হবে, যা অপ্রয়োজনীয় তা বর্জন করতে হবে এবং যা বিশেষভাবে আমাদের নিজস্ব, তা যোগ করতে হবে। পরের ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা না করলে আমরা যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারব না।

বই পড়া অবশ্যই শিক্ষা, কিন্তু প্রয়োগ করাও শিক্ষা, আর এটাই হচ্ছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেখা—এটাই আমাদের প্রধান পদ্ধতি। যার স্কুলে যাবার সুযোগ হয়নি, সেও যুদ্ধ শিখতে পারে, এটাই হচ্ছে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে শেখা। বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের কাজ, এটা প্রায়শঃই প্রথমে শিখে পরে কাজ করা নয়, বরং কাজ করেই শেখা, কাজ করার মানেই শেখা। সাধারণ জনগণ ও সৈন্যের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে, কিন্তু এটা মহাপ্রাচীর নয়, এই ব্যবধানটাকে দ্রুত দূর করা যায়, আর এটা দূর করার পদ্ধতি হচ্ছে বিপ্লব করা ও যুদ্ধ করা। যখন আমরা বলি, শেখা ও প্রয়োগ করা সহজ নয়, তখন এর অর্থ হল সম্পূর্ণরূপে শিখে নেওয়া ও দক্ষতার

সঙ্গে প্রয়োগ করা কঠিন। যখন আমরা বলি সাধারণ জনগণ দ্রুত সৈন্যে পরিবর্তিত হতে পারেন, তখন এর অর্থ হল প্রবেশদ্বার অতিক্রম করা কঠিন নয়। এ দুটি বিষয়কে একত্রে বলতে গিয়ে আমরা একটা পুরানো চীন প্রবাদ-বাক্যের উল্লেখ করতে পারি—'কার্য সাধনে যারা দৃঢ়সংকল্প, তাদের পক্ষে দুনিয়ায় কঠিন বলে কিছুই নেই।' প্রবেশদ্বার অতিক্রম করা কঠিন নয়, নৈপুণ্য অর্জনও সম্ভব, কেবলমাত্র দৃঢ়সংকল্পের প্রয়োজন এবং নিপুণভাবে শিক্ষার প্রয়োজন।

অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের নিয়মের মতোই যুদ্ধের নিয়মগুলোও আমাদের মনে বিষয়মুখী বাস্তবতার (objective reality) প্রতিফলন। আমাদের মনের বাইরের সমস্ত বিষয়ই হচ্ছে বিষয়মুখী বাস্তবতা। অতএব, আমাদের যা শিখতে ও জানতে হবে, তার মধ্যে আছে শত্রুপক্ষের ও আমাদের নিজেদের পক্ষের অবস্থা। এ দুটোকেই পর্যালোচনার বিষয় হিসেবে গণ্য করা উচিত, আর শুধুমাত্র আমাদের মনই (চিন্তাশক্তি) হচ্ছে পর্যালোচনাকে সম্পন্ন করার কর্তা। কোন কোন লোক নিজেদের জানতে পটু, কিন্তু শত্রু সম্পর্কে জানার ব্যাপারে অপটু। আর এক ধরনের লোক রয়েছে, যারা শত্রু সম্পর্কে জানার ব্যাপারে পটু, কিন্তু নিজেদের জানার ব্যাপারে অপটু। তাদের কেউই যুদ্ধের নিয়মগুলো শিক্ষা করার ও প্রয়োগ করার সমস্যার সমাধান করতে পারে না। প্রাচীন চীনের প্রখ্যাত সমরতত্ত্ববিদ সুন উ জু'র[৩] রচিত গ্রন্থের একটা বাক্য আছে—'শত্রুকে জানুন, নিজেকে জানুন, তাহলে একশবার যুদ্ধ করলেও পরাজিত হবেন না'। এতে শিক্ষা করার ও প্রয়োগ করার—এই উভয় পর্যায়ের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বিষয়মুখী বাস্তবতার বিকাশের নিয়মগুলোকে জানার এবং আমরা যে শত্রুর সম্মুখীন হচ্ছি সেই শত্রুকে পরাভূত করার জন্য এইসব নিয়মানুসারে আমাদের নিজেদের কার্যকলাপ নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে। এ প্রবাদবাক্যকে আমাদের হাল্কাভাবে দেখা উচিত নয়।

যুদ্ধ হচ্ছে জাতি, রাষ্ট্র, শ্রেণী বা রাজনৈতিক দলের মধ্যে পারস্পরিক সংগ্রামের উচ্চতম রূপ। আর নিজেদের বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধরত জাতি, রাষ্ট্র, শ্রেণী অথবা রাজনৈতিক দল যুদ্ধের সমস্ত নিয়মই ব্যবহার করে। যুদ্ধের জয়-পরাজয় যে প্রধানতঃ যুদ্ধরত উভয় পক্ষের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারাই নির্ধারিত হয়, এতে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু, শুধুমাত্র এগুলোর দ্বারাই নয়, যুদ্ধরত উভয় পক্ষের বিষয়ীগত পরিচালনার

সামর্থ্যের দ্বারাও এটা নির্ধারিত হয়ে থাকে। বস্তুগত অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত সীমা লংঘন করে কোন রণবিশারদ যুদ্ধে বিজয় অর্জনের আশা করতে পারেন না। কিন্তু এই সীমার মধ্যেই তিনি বিজয়লাভের চেষ্টা করতে পারেন এবং এটা তাঁর অবশ্যই করা প্রয়োজন। রণবিশারদের কার্যমঞ্চ গড়ে ওঠে বিষয়মুখী বস্তুগত অবস্থার ভিত্তিতে, কিন্তু এই মঞ্চের উপর শব্দ, বর্ণ, শক্তি ও আড়ম্বরময় অনেক প্রাণবান নাট্যানুষ্ঠানই তিনি পরিচালনা করতে পারেন। তাই নিশ্চিত বিষয়মুখী বস্তুগত ভিত্তি অর্থাৎ সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থাতে, আমাদের লালফৌজের পরিচালকদের অবশ্যই নিজেদের পরাক্রমকে কাজে লাগিয়ে সমগ্র সৈন্যবাহিনকে পরিচালিত করে জাতীয় ও শ্রেণীশত্রুকে ধ্বংস করে এই খারাপ দুনিয়াকে রূপান্তরিত করতে হবে। এখানে আমাদের বিষয়ীগত পরিচালনার সামর্থকে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং তা অবশ্যই করা উচিত। লালফৌজের কোন কম্যাণ্ডারকেই আমরা গোঁয়ার-গোবিন্দের মতো বেপরোয়া ব্যক্তি হতে দেব না। আমাদের অবশ্যই লালফৌজের প্রত্যেকটি কম্যাণ্ডারকে উৎসাহ দেওয়া উচিত, যাতে তাঁরা সাহসী ও বিচক্ষণ বীর হয়ে ওঠেন। তাঁদের যে শুধু অসীম সাহসই থাকবে তা নয়, পরন্তু সমগ্র যুদ্ধের পরিবর্তন ও বিকাশকে পরিচালনার সমর্থ্যও তাঁদের থাকতে হবে। যুদ্ধের মহাসমুদ্রে সাঁতার কাটতে গিয়ে কম্যাণ্ডারের হাবুডুবু খাওয়া উচিত নয়, বরং দৃঢ়চিত্তে পরিমাপ মতো জল কেটে কেটে ওপরে পৌছানো উচিত। যুদ্ধ পরিচালনার নিয়মগুলো হচ্ছে যুদ্ধের সাগরে সাঁতার কাটার কৌশল।

এটাই হচ্ছে আমাদের পদ্ধতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের বিপ্লবী যুদ্ধ

চীনের বিপ্লবী যুদ্ধ, যা ১৯২৪ সালে শুরু হয়েছিল, তা ইতিমধ্যেই দুটি পর্যায় অতিক্রম করেছে। প্রথম পর্যায়টি ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ও দ্বিতীয় পর্যায়টি ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। এখন থেকে শুরু হবে জাপানবিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের পর্যায়। এই তিনটি পর্যায়ের বিপ্লবী যুদ্ধ সবই চীনের সর্বহারাশ্রেণী এবং তার রাজনৈতিক পার্টি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত। চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্য-

বাদ ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তি। কোন কোন ঐতিহাসিক মুহূর্তে চীনের বুর্জোয়া-শ্রেণী বিপ্লবী যুদ্ধে যদিও-বা অংশগ্রহণ করতে পারে, তবুও নিজেদের স্বার্থপরতার কারণে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাবের কারণে তারা চীনের বিপ্লবী যুদ্ধকে পূর্ণ বিজয়ের পথে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে যেতে অনিচ্ছুক ও অক্ষম। চীনের ব্যাপক কৃষকসাধারণ ও শহরে পেটি-বুর্জোয়া সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী যুদ্ধে যোগদান করতে এবং সে যুদ্ধকে পূর্ণ বিজয় পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক। তাঁরাই হচ্ছেন বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান শক্তি। কিন্তু ক্ষুদে-উৎপাদকে বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টি গণ্ডিবদ্ধ (আবার কিছু সংখ্যক বেকার জনসাধারণের নৈরাজ্যবাদী ভাবধারা আছে), তাই তাঁরা যুদ্ধের নির্ভুল পরিচালক হতে পারেন না। এই কারণে, যে যুগে সর্বহারাশ্রেণী রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে, সে যুগে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বটি অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কাঁধে। এই সময়ে যে-কোন বিপ্লবী যুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের অভাব ঘটলে অথবা সেই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গেলে সে যুদ্ধ অনিবার্যরূপেই ব্যর্থ হবে। কারণ আধা-ঔপনিবেশিক চীন দেশের সমাজের সমস্ত স্তর ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে শুধুমাত্র সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিই হচ্ছে সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, রাজনীতিগতভাবে তারাই হচ্ছে সবশেষে বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সবচেয়ে বেশি সংগঠিত আর দুনিয়ার অগ্রগামী সর্বহারাশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টিগুলির অভিজ্ঞতাকে তারা সবচেয়ে বেশি খোলা মনে গ্রহণ করতে এবং সেই অভিজ্ঞাকে নিজেদের কাজে প্রয়োগ করতে পারে। তাই কেবলমাত্র সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিই কৃষক, শহরে পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্ব নিতে পারে, কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়াদের সঙ্কীর্ণতাকে, বেকার সাধারণের ধ্বংসাত্মক মানসিকতাকে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর দোটানা মনোভাবকে ও শেষ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবার মনোবলের অভাবকেও কাটিয়ে উঠতে পারে (অবশ্য যদি কমিউনিস্ট পার্টির নীতিতে ভুল না হয়), এবং বিপ্লব ও যুদ্ধকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিতে পারে।

মূলতঃ বলতে গেলে, ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবী যুদ্ধ এমন অবস্থার ভেতর দিয়ে চালানো হয়েছিল যে, আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণী এবং চীনা সর্বহারাশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টি রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল চীনা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টির উপরে, এবং তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক

সহযোগিতাও করেছিল। কিন্তু বিপ্লব ও যুদ্ধের সঙ্কট মুহূর্তে, প্রথমতঃ, বড় বড় বুর্জোয়ারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং তা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী বাহিনীর ভেতরকার সুবিধাবাদীরাও স্বেচ্ছায় বিপ্লবের নেতৃত্ব ত্যাগ করেছিল, এবং তার ফলে এই বিপ্লবী যুদ্ধটি ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯২৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধ চলেছে নতুন অবস্থায়। এ যুদ্ধের শত্রু শুধু সাম্রাজ্যবাদই নয়, পরন্তু বৃহৎ বুর্জোয়া ও বৃহৎ জমিদারদের মৈত্রীও। আর জাতীয় বুর্জোয়ারাও বৃহৎ বুর্জোয়াদের লেজুড় হয়ে পড়েছে। এই বিপ্লবী যুদ্ধের নেতৃত্ব করছে। কমিউনিস্ট পার্টি একা এবং বিপ্লবী যুদ্ধে নিরঙ্কুশ নেতৃত্বও সে প্রতিষ্ঠা করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির এই নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব হচ্ছে বিপ্লবী যুদ্ধকে দৃঢ়ভাবে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার সবচেয়ে প্রধান শর্ত। কমিউনিস্ট পার্টির এই ধরনের নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব ছাড়া, এ কথা কল্পনাও করা যায় না যে, বিপ্লবী যুদ্ধ এমন অধ্যবসায়ের সঙ্গে চালানো যায়।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বীরত্বপূর্ণভাবে ও দৃঢ়ভাবে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের নেতৃত্ব করেছে এবং দীর্ঘ পনের বছর ধরে[৪] সারা দেশের জনগণের কাছে প্রমাণ করেছে যে, সে হচ্ছে জনগণের বন্ধু, জনগণের স্বার্থ রক্ষায় জন্য, তাঁদের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সে সব সময়েই বিপ্লবী যুদ্ধের সবচেয়ে অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে আছে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তার নিজের কঠোর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এবং তার কয়েক লাখ শহীদ বীর পার্টি-সদস্যের আর হাজার হাজার বীর কর্মীদের আত্ম-বলিদানের ভেতর দিয়ে গোটা জাতির কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একটা মহান শিক্ষাপ্রদ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিপ্লবী সংগ্রামে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি মহান ঐতিহাসিক সাফল্যই জাতীয় শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবার সংকট মুহূর্তে আজ মৃত্যুর কবল থেকে চীনের উদ্ধারের এবং বেঁচে থাকার শর্তকে জুগিয়েছে। এই শর্ত হচ্ছে এমন এক রাজনৈতিক নেতৃত্বের অস্তিত্ব, যা বিরাট সংখ্যক জনগণের আস্থাভাজন এবং দীর্ঘকালের পরীক্ষার পরে জনগণ যা বাছাই করে নিয়েছেন। আজ অন্য যে-কোন রাজনৈতিক পার্টির কথার চেয়ে কমিউনিস্ট পার্টির কথাই জনগণ সহজে গ্রহণ করেন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির গত পনের বছরের কঠোর সংগ্রাম না থাকলে দেশের সামনে ধ্বংসের যে নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে, তার হাত থেকে দেশকে বাঁচানো অসম্ভব হতো।

ছেন তু-সিউর[৫] দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও লি লি-সানের 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের[৬] ভুল ছাড়', বিপ্লবী যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি আরও দুটি ভুল করেছে। প্রথম ভুলটি ছিল ১৯৩১-৩৪ সালের 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ[৭]। এই ভুলের ফলে ভূমি-বিপ্লবের যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর ক্ষতি হয় এবং তাতে করে আমরা শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে পরাজিত করতে তো পারলামই না, উপরন্তু আমরাই আমাদের ঘাঁটি এলাকা হারালাম আর লালফৌজ দুর্বল হয়ে পড়ল। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে চুনইতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর বর্ধিত অধিবেশনে এ ভুলটি সংশোধন করা হয়েছিল। দ্বিতীয়টী ছিল ১৯৩৫-৩৬ সালের চাং কুও-থাওয়ের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ[৮]। এ ভুলটি এমনই বেড়ে উঠেছিল যে, তা পার্টি ও লালফৌজের শৃংখলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবং লালফৌজের প্রধান শক্তির এক অংশের গুরুতর ক্ষতি করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক নেতৃত্বের ফলে এবং লালফৌজের অন্তর্ভুক্ত পার্টি-সদস্য, কম্যাণ্ডার ও যোদ্ধারা সচেতন থাকার ফলে এই ভুলটিও শেষ পর্যন্ত সংশোধন করে নেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এ সমস্ত ভুলই আমাদের পার্টি, আমাদের বিপ্লব ও যুদ্ধের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলোকে আমরা পরাভূত করেছিলাম এবং তা করতে গিয়ে আমাদের পার্টি ও লালফৌজ নিজেরা পোড় খেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রচণ্ড, গৌরবোজ্জ্বল ও বিজয়াত্মক বিপ্লবী যুদ্ধের নেতৃত্ব করেছে এবং এখনো করছে। এ যুদ্ধ যে শুধু চীনের মুক্তি পতাকা তা-ই নয়, পরন্তু এর আন্তর্জাতিক বিপ্লবী তাৎপর্যও আছে। বিশ্বের বিপ্লবী জনগণের দৃষ্টি আমাদের উপরে নিবদ্ধ। নতুন পর্যায়ে—জাপানবিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের পর্যায়ে চীনা বিপ্লবকে আমরা নেতৃত্ব দিয়ে তার সমাপ্তি অবধি নিয়ে যাব আর প্রাচ্যের ও দুনিয়ার বিপ্লবের উপরে একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করব। বিগত বিপ্লবী যুদ্ধ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আমাদের যে শুধু একটা সঠিক মার্কসবাদী রাজনৈতিক লাইন দরকার তা নয়, উপরন্তু একটা সঠিক মার্কসবাদী সামরিক লাইনও দরকার। পনের বছরের বিপ্লবে ও যুদ্ধে এ ধরনের একটি রাজনৈতিক ও সামরিক লাইন গড়ে তোলা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস যে, আজ থেকে যুদ্ধের নতুন পর্যায়ে এই ধরনের লাইন নতুন অবস্থানুসারে আরও বিকশিত, পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হবে, যাতে করে আমরা জাতীয় শত্রুকে পরাজিত

করার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, সঠিক রাজনৈতিক ও সামরিক লাইন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও শান্তিপূর্ণভাবে জন্ম ও বিকাশলাভ করে না, পরন্তু তা সংগ্রামের ভেতর দিয়ে জন্ম ও বিকাশলাভ করে। একদিকে তাকে 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের সঙ্গে লড়তে হবে, অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের সঙ্গেও লড়তে হবে। এইসব ক্ষতিকর ঝোঁকগুলো বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধের ক্ষতিসাধন করে। এই ঝোঁকগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করলে এবং তাদের নিঃশেষে দূর না করলে সঠিক লাইন স্থাপন করা ও বিপ্লবী যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব। ঠিক এই উদ্দেশ্যেই আমি এই পুস্তিকায় বার বার ভুল মতগুলোর উল্লেখ করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য

১। বিষয়টির গুরুত্ব

চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—এ কথা যাঁরা স্বীকার করেন না, জানেন না বা জানতে চান না, তাঁরা কুওমিনতাঙ বাহিনীর বিরুদ্ধে লাল-ফৌজের যুদ্ধকে সাধারণ যুদ্ধের অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধের সমান বলে মনে করেন। লেনিন ও স্তালিনের দ্বারা পরিচালিত সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতার একটা বিশ্বজোড়া তাৎপর্য রয়েছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সমেত সব কমিউনিস্ট পার্টিই এই অভিজ্ঞতাকে এবং লেনিন ও স্তালিন কর্তৃক কৃত সেই অভিজ্ঞতার তত্ত্বগত সার-সংক্ষেপকে তাঁদের পথপ্রদর্শক হিসেবে গণ্য করে থাকে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের নিজেদের অবস্থায় সেই অভিজ্ঞতাকে আমাদের যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা উচিত। বহু দিক থেকেই চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তা সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধ থেকে পৃথক। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা না করা বা তাকে অস্বীকার করা অবশ্যই ভুল। আমাদের দশ বছরের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে।

আমাদের শত্রুরাও অনুরূপ ভুল করেছিল। তারা মানতো না যে অন্যান্য সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে যেসব রণনীতি ও রণকৌশল ব্যবহার করা হয়, লালফৌজের বিরুদ্ধে লড়তে তার থেকে ভিন্ন রণনীতি ও রণকৌশলের প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের শক্তি-শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভর করে তারা আমাদের

উপেক্ষা করেছিল আর যুদ্ধের পুরানো পদ্ধতিই আঁকড়ে ছিল। এ ছিল ১৯৩৩ সালের শত্রুর চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের সময়ের ও তার আগের অবস্থা। এর ফলে তাদের পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটেছে। কুওমিনতাঙ বাহিনীতে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সেনাপতি লিউ ওয়েই-ইউয়ান এ সমস্যার প্রতি একটা নতুন মত প্রথমে পেশ করেছিল এবং তারপর পেশ করেছিল তাই ইয়ুয়ে। শেষ অবধি চিয়াং কাই-শেক তাদের এই মত গ্রহণ করেছিল। এমনি করেই চিয়াং কাই-শেকের লুশানস্থ অফিসার ট্রেনিং দল[৯] গঠিত হয়েছিল এবং তার পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে ব্যবহৃত প্রতিক্রিয়াশীল নয়া সামরিক নীতি[১০] উদ্ভূত হয়েছিল।

লালফৌজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অবস্থার সঙ্গে সংগতি রাখার জন্য শত্রু যখন তার সামরিক নীতিগুলো বদলে নিল, তখন আমাদের বাহিনীতে এমন এক দল লোক দেখা দিল, যারা 'পুরানো পদ্ধতিতে' ফিরে গেল। সাধারণ অবস্থার পদ্ধতিতে ফিরে যাবার জিদ তারা ধরল, প্রতিটি ক্ষেত্রের বিশেষ অবস্থার অনুধাবন করতে তারা অস্বীকার করল, লালফৌজের রক্তরাঙা লড়াইয়ের ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকে তারা অগ্রাহ্য করল, সাম্রাজ্যবাদ ও কুওমিনতাঙের শক্তিকে এবং কুওমিনতাঙ বাহিনীর শক্তিকে ছোট করে দেখল, আর শত্রুর দ্বারা গৃহীত প্রতিক্রিয়াশীল নয়া নীতির দিকে চোখ বুজে রইল। ফলে, শেনসী-কানসু সীমান্ত এলাকা ছাড়া সমস্ত বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাই আমাদের হারাতে হয়েছিল, লালফৌজের সৈন্যসংখ্যা তিন লাখ থেকে কমে কয়েক অযুতে দাঁড়িয়েছিল, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা তিন লাখ থেকে কয়েক অযুতে নেমে এসেছিল, আর কুওমিনতাঙ শাসিত এলাকায় পার্টি-সংগঠনগুলি প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এক কথায়, একটা নিদারুণ ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। এই দলের লোকজন নিজেদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলত, কিন্তু বাস্তবে তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অ-আ-ক-খও শেখেনি। লেনিন বলেছিলেন যে, মার্কসবাদের একান্ত সারবস্তু এবং মার্কসবাদের জীবন্ত মর্ম হচ্ছে বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ[১১]। ঠিক এ কথাটিই আমাদের এসব কমরেডরা ভুলে গিয়েছিল।

এর থেকে বোঝা যায় যে, চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলোকে না বুঝলে সে যুদ্ধকে পরিচালনা করা বা তাকে বিজয়ের পথে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

২। চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য কি কি ?

তাহলে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য কি কি ?

আমি মনে করি চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমটি হচ্ছে যে, চীন একটি বিরাট আধা-ঔপনিবেশিক দেশ, তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ সমান নয়, ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের ভেতর দিয়ে সে গেছে।

এই বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে দিয়েছে যে, চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বিকাশ ও বিজয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯২৭ সালের শেষের দিক থেকে ১৯২৮ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত অর্থাৎ চীনের গেরিলা যুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পরে, হুনান কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার অর্থাৎ চিংকাং পর্বতের কমরেডদের মধ্যে কেউ কেউ যখন প্রশ্ন তুলেছিল, 'কত দিন লাল পতাকা উর্ধ্বে তুলে রাখতে পারব ?' তখনই আমরা (হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার প্রথম পার্টি-কংগ্রেসে[১২]) সেই সম্ভাবনাটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ, এটা ছিল একটা সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্ন। চীনের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাগুলি ও চীনা লালফৌজের অস্তিত্ব ও বিকাশ হতে পারে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক পা-ও আমরা এগোতে পারতাম না। ১৯২৮ সালের চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে আর একবার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে চীনের বিপ্লবী আন্দোলন একটা সঠিক তাত্ত্বিক ভিত্তি পেয়ে গেছে।

এই প্রশ্নটিকে এখন পৃথক পৃথক করে আলোচনা করা যাক।

চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ সমান নয়—দুর্বল পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও গুরুতর আধা-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি সহ-অবস্থান করছে ; আধুনিক কয়েকটি শিল্প ও বাণিজ্য শহর এবং বিশাল নিশ্চল গ্রামাঞ্চল সহ-অবস্থান করছে ; লক্ষ লক্ষ শিল্পশ্রমিক ও পুরানো ব্যবস্থাধীনে লক্ষ লক্ষ কৃষক ও হস্তশিল্পী সহ-অবস্থান করছে ; কেন্দ্রীয় সরকারকে নিয়ন্ত্রণকারী বড় বড় যুদ্ধবাজ ও বিভিন্ন প্রদেশকে নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষুদে যুদ্ধবাজরা সহ-অবস্থান করছে ; দুই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যবাহিনী—চিয়াং কাই-শেকের অধীনে তথাকথিত কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বিভিন্ন প্রদেশের যুদ্ধবাজদের অধীনে 'পাঁচমিশালী বাহিনী'—সহ-অবস্থান করছে ; কয়েকটি রেললাইন, জাহাজ চলাচলের পথ ও মোটরগাড়ী যাতায়াতের রাস্তা, সর্বত্র একচাকার গাড়ী চলার মতো সরু পথ ও

পায়ে হাঁটা পথ, আর এমন অনেক পথ যার মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়াও মুস্কিল—এ সকল পথও সহ-অবস্থান করছে।

চীন হচ্ছে একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ—সাম্রাজ্যবাদীদের অনৈক্য চীনের শাসনচক্রগুলিকে প্রভাবিত করেছে বলে চীনের শাসকচক্রগুলির মধ্যেও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। কতকগুলি দেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ আর একটিমাত্র দেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত উপনিবেশের মধ্যে পার্থক্য আছে।

চীন হচ্ছে একটি বিরাট দেশ—'পূর্বে যখন অন্ধকার, পশ্চিমে তখন রোদ্দের মেলা; দক্ষিণে যখন আঁধার কালো, উত্তরে তখনও আলো ঝলমল'। অতএব যুদ্ধ চালনার জন্য পরিক্রমণের জায়গার অভাবের কোন চিন্তা নেই।

চীন একটা বিরাট বিপ্লবের ভেতর দিয়ে গেছে—এই বিপ্লবই যুগিয়েছে সেই বীজ যার থেকে জন্মলাভ করেছে লালফৌজ, এই বিপ্লবই সৃষ্টি করেছে লালফৌজের নেতা অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিকে, আর প্রস্তুত করেছে এমন জনসাধারণকে যাঁরা একবার বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তাই আমরা বলি, চীন হচ্ছে একটি বিরাট আধা-ঔপনিবেশিক দেশ, যা একটি বিপ্লব পার হয়ে এসেছে এবং যার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ সমান নয়—এটাই হচ্ছে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য শুধু যে মৌলিকভাবে আমাদের রাজনীতিগত রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করে তা-ই নয়, উপরন্তু আমাদের সামরিক রণনীতি এবং রণকৌশলও মৌলিকভাবে নির্ধারণ করে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—আমাদের শত্রু বৃহৎ ও শক্তিশালী।

লালফৌজের শত্রু কুওমিনতাঙের অবস্থা কেমন? এটা হচ্ছে এমন একটি পার্টি, যে পার্টি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে এবং তাকে কম-বেশি দৃঢ় করেছে। সারা দুনিয়ার প্রধান প্রধান প্রতিবিপ্লবী রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন তারা লাভ করেছে। তারা তাদের সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠিত করছে। ফলে এই সৈন্যবাহিনী চীনের যে-কোন ঐতিহাসিক যুগের সৈন্যবাহিনী থেকে পৃথক হয়ে উঠেছে এবং মোটামুটিভাবে দুনিয়ার আধুনিক রাষ্ট্রগুলির সৈন্যবাহিনীর অনুরূপ হয়ে উঠেছে। অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক দ্রব্য সরবরাহের অবস্থা লালফৌজের তুলনায় এই সৈন্যবাহিনীর অনেক ভাল ও প্রচুর, এবং তাদের সৈন্যসংখ্যা চীনের যে-কোন ঐতিহাসিক যুগের সৈন্যবাহিনীর থেকে বেশি,

দুনিয়ার যে-কোন দেশের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর থেকেও বেশি। কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী ও লালফৌজের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সমগ্র চীনের রাজনীতি, অর্থনীতি, যোগাযোগব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সংযোগস্থল বা প্রাণসূত্র নিয়ন্ত্রণ করে কুওমিনতাঙ; তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশজোড়া।

চীনা লালফৌজ তাই এক বৃহৎ ও শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হয়ে রয়েছে। এটাই হচ্ছে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের ফলে সাধারণ যুদ্ধ বা সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধ কিংবা উত্তর অভিযানের যুদ্ধ থেকে লালফৌজের পরিচালিত যুদ্ধ বহু দিক থেকেই পার্থক্যযুক্ত না হয়ে পারে না।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, লালফৌজ দুর্বল।

প্রথম মহাবিপ্লবের পরাজয়ের পরে চীনা লালফৌজ জন্মলাভ করে। তার শুরু হয়েছিল গেরিলা বাহিনী হিসেবে। যখন এটা ঘটেছিল, তখন কেবল যে চীনে প্রতিক্রিয়াশীল যুগ চলছিল তা নয়, অধিকন্তু বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আপেক্ষিক স্থিতিশীলতার যুগ বিদ্যমান ছিল।

আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছড়িয়ে আছে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন পাহাড়ে বা সুদূরবর্তী অঞ্চলে, আর তা বাইরে থেকে কোনরকমের সাহায্যই পায় না। কুওমিনতাঙ অঞ্চলগুলির তুলনায় বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাগুলির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা পশ্চাৎপদ। বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র পল্লী অঞ্চল আর ছোট ছোট নগর। গোড়াতে এই অঞ্চলগুলি ছিল অত্যন্ত ছোট এবং পরেও খুব বেশি বড় হয়ে উঠেনি। উপরন্তু সেগুলি হচ্ছে সচল কিন্তু স্থায়ী নয়। লালফৌজের কোন প্রকৃত সুদৃঢ় ঘাঁটি এলাকা ছিল না।

সংখ্যাগতভাবে লালফৌজ ছোট, তার অস্ত্রশস্ত্র ও নিকৃষ্ট মানের খাদ্য, বিছানাপত্তর ও পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি জিনিসের সরবরাহ জোগাড় করাও তার পক্ষে খুবই কষ্টকর।

তুলনামূলকভাবে পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যের তীব্র বৈপরীত্য রয়েছে। এই তীব্র বৈপরীত্যের ভিত্তিতে জন্মলাভ করেছে লালফৌজের রণনীতি ও রণকৌশল।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও ভূমি-বিপ্লব।

এই বৈশিষ্ট্যটি হল প্রথম বৈশিষ্ট্যটির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। এই বৈশিষ্ট্যটি

থেকে দুটি দিকের অবস্থা উদ্ভূত হয়েছে। একদিকে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধ যদিও চীনের ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল যুগে চলেছে, তবুও তার বিজয় সম্ভব, কারণ এই বিপ্লবী যুদ্ধটি চলছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং এতে রয়েছে কৃষকের সমর্থন। আর এই সমর্থন লাভ করেছে বলেই আমাদের ঘাঁটি এলাকাগুলি ছোট হলেও রাজনীতিগতভাবে খুবই শক্তিশালী, এবং অতীব বিপুলাকার কুওমিনতাঙ শাসনের বিরুদ্ধে অটলভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে, সামরিক ক্ষেত্রে কুওমিনতাঙের আক্রমণের প্রতি প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করেছে। লালফৌজ ছোট হলেও তার সংগ্রামী শক্তি খুবই প্রবল, কারণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত লালফৌজের সৈন্যরা ভূমি-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন, আর তাঁরা লড়াই করছেন আপন স্বার্থে এবং এই ফৌজের কম্যাণ্ডার ও যোদ্ধারা রাজনীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ।

অপরদিকে, আমাদের সঙ্গে কুওমিনতাঙের একটা তীব্র বৈপরীত্য দেখা যায়। কুওমিনতাঙ ভূমি-বিপ্লবের বিরোধিতা করে, তাই তারা কৃষকদের সমর্থন পায় না। তার সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি হলেও সৈনিকসাধারন ও ক্ষুদে উৎপাদক পরিবার থেকে উদ্ভূত নিম্নপদস্থ বহু অফিসারদের দিয়ে কুওমিনতাঙ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তার জন্য মরণপণ করে লড়াই করাতে পারে না। তার অফিসার ও সৈনিকরা রাজনীতিগতভাবে বিভক্ত, ফলে তার সংগ্রামী শক্তি হ্রাস পেয়েছে।

৩। এসব বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত আমাদের রণনীতি ও রণকৌশল

একটি বিরাট আধা-ঔপনিবেশিক দেশ, যা একটা বিরাট বিপ্লব পার হয়ে গেছে এবং যার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ সমান নয়, একটি বৃহৎ শক্তিশালী শত্রু, একটি ছোট ও দুর্বল লালফৌজ, এবং ভূমি-বিপ্লব—এগুলো হচ্ছে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলো চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের পরিচালনা-লাইন এবং তার বহু রণনীতিগত ও রণকৌশলগত নীতি নির্ধারণ করেছে। প্রথম ও চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এটা নির্ধারণ করেছে যে, চীনা লালফৌজের পক্ষে বৃদ্ধি পাওয়া ও শত্রুকে পরাজিত করা সম্ভব। আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছে যে, চীনা লালফৌজের পক্ষে খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাওয়া ও শত্রুকে অবিলম্বে পরাজিত করা অসম্ভব, অর্থাৎ,

নির্ধারণ করেছে যে, যুদ্ধটা হবে দীর্ঘস্থায়ী, এবং সঠিকভাবে না চালালে যুদ্ধে হার পর্যন্ত হতে পারে।

এই হচ্ছে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের দুটি দিক। এ দুটি দিক যুগপৎ বিদ্যমান, অর্থাৎ অনুকূল অবস্থাও আছে আবার অসুবিধাজনক অবস্থাও আছে। চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের মৌলিক নিয়ম এটাই, আর এর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে অন্য বহু নিয়ম। আমাদের দশ বছরের যুদ্ধের ইতিহাস এ নিয়মের সঠিকতা প্রমাণ করে দিয়েছে। চোখ খোলা থাকা সত্ত্বেও যে লোক এই মৌলিক নিয়মকে দেখতে পায় না, সে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধকে পরিচালনা করতে পারে না এবং লালফৌজকেও বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

এটা স্পষ্ট যে, মূলনীতি সম্পর্কিত নিম্নলিখিত যাবতীয় বিষয়গুলির মীমাংসা আমাদের অবশ্যই সঠিকভাবে করতে হবে:

রণনীতিগত দিকনির্দেশ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা, আক্রমণ করার সময়ে হঠকারিতার বিরোধিতা করা, প্রতিরক্ষা করার সময়ে রক্ষণশীলতার বিরোধিতা করা, আর স্থানান্তরিত হওয়ার সময়ে পলায়নবাদের বিরোধিতা করা।

লালফৌজে গেরিলাবাদের বিরোধিতা করা, কিন্তু সামরিক কার্যকলাপে লালফৌজের গেরিলা চরিত্রকে স্বীকার করা।

যুদ্ধাভিযানের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালনার বিরোধিতা করা এবং রণনীতির ক্ষেত্রে দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধের বিরোধিতা করা, রণনীতির ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধকে স্বীকার করা এবং যুদ্ধাভিযানের ক্ষেত্রে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইকে স্বীকার করা।

স্থায়ী যুদ্ধরেখার ও অবস্থানগত যুদ্ধের বিরোধিতা করা, অস্থায়ী যুদ্ধরেখার ও চলমান যুদ্ধকে স্বীকার করা।

শত্রুকে শুধুই ছত্রভঙ্গ করার লড়াই চালনার বিরোধিতা করা, আর নির্মূলীকরণের লড়াইকে স্বীকার করা।

দুই 'মুষ্টি' দিয়ে একই সময়ে দুই দিকে আঘাত হানার রণনীতির বিরোধিতা করা, আর এক সময়ে এক 'মুষ্টি' দিয়ে এক দিকে আঘাত হানার রণনীতিকে স্বীকার করা।

বিরাটাকারের পশ্চাদ্ভাগ-ব্যবস্থার বিরোধিতা করা, আর ছোট আকারের পশ্চাদ্ভাগ-ব্যবস্থা রাখাটা স্বীকার করা।[১৩]

নিরঙ্কুশ কেন্দ্রীভূত পরিচালনার বিরোধিতা করা, আর অপেক্ষিক কেন্দ্রীভূত পরিচালনাকে স্বীকার করা।

নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ ও ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীপনার[14] বিরোধিতা করা, আর স্বীকার করা যে, লালফৌজ হচ্ছে চীনা বিপ্লবের প্রচারক ও সংগঠক।

দস্যু-বৃত্তিম[15] বিরোধিতা করা, আর কঠোর রাজনৈতিক শৃংখলাকে স্বীকার করা।

যুদ্ধবাজ-রীতির বিরোধিতা করা, আর ফৌজে সীমাবদ্ধ গণতন্ত্রের জীবনকে ও প্রামাণিক সামরিক শৃংখলাকে স্বীকার করা।

ভ্রান্ত সঙ্কীর্ণতাবাদী কর্মীসংক্রান্ত নীতির বিরোধিতা করা, আর নির্ভুল কর্মী-নীতিকে স্বীকার করা।

বিচ্ছিন্নতার নীতির বিরোধিতা করা, আর সমস্ত সম্ভাব্য মিত্রদের স্বপক্ষে টেনে আনার নীতিকে স্বীকার করা।

লালফৌজকে তার পুরানো স্তরে ফেলে রাখার বিরোধিতা করা, আর তাকে একটা নতুন স্তরে বিকশিত করে তোলার চেষ্টা করা।

রণনীতিগত সমস্যা সম্পর্কে আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে চীনের দশ বছরের রক্তক্ষয়ী বিপ্লবী যুদ্ধের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে উপরোল্লিখিত সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যাখ্যা করা।

চতুর্থ অধ্যায়

'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান ও এর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ—চীনের গৃহযুদ্ধের প্রধান রূপ

বিগত দশ বছরে, আমাদের গেরিলা যুদ্ধ শুরু হবার প্রথম দিন থেকেই প্রতিটি স্বাধীন লাল গেরিলাবাহিনী বা লালফৌজকে অথবা প্রতিটি বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাকে প্রায়শঃই শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। লালফৌজকে শত্রু একটা দৈত্য বলে মনে করে, আর যখনই তার দেখা মেলে তখনই তাকে ধরতে চায়। শত্রু সর্বদাই লালফৌজের পিছু ধাওয়া করে চলেছে আর নিয়তই তাকে ঘেরাও করবার জন্য চেষ্টা করছে। যুদ্ধের এই রূপ গত দশ বছরে বদল হয়নি। যদি জাতীয় যুদ্ধ গৃহযুদ্ধের স্থান না নেয়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত না শত্রু দুর্বল হয় আর লালফৌজ শক্তিশালী হয়ে ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত এই রূপের পরিবর্তন ঘটবে না।

লালফৌজের ক্রিয়াকলাপ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে। আমাদের পক্ষে বিজয়ের অর্থ হচ্ছে মুখ্যতঃ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিজয়, অর্থাৎ রণনীতিগত বিজয় ও যুদ্ধাভিযানের বিজয়। প্রতিটি 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে এক-একটা যুদ্ধাভিযান, যা প্রায়ই গঠিত হয় ছোট-বড় কতকগুলি বা এমনকি কয়েক ডজন লড়াইয়ের দ্বারা। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে মূলগতভাবে ভেঙে চুরমার করে দেবার আগে, এমনকি বহু লড়াইয়ে জয়লাভ করলেও, রণনীতিগত বিজয় বা গোটা যুদ্ধাভিযানে জয় হয়েছে এ কথা বলা যায় না। লালফৌজের দশ বছরের যুদ্ধের ইতিহাস হচ্ছে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস।

শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে এবং তার বিরুদ্ধে লালফৌজের সংগ্রামে আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ের এই দুই ধরনের রূপই ব্যবহার করা হয়। এবং অন্য কোন যুদ্ধ—প্রাচীন বা আধুনিক, চীনের বা বিদেশের যুদ্ধ থেকে এর কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু চীনের গৃহযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে লড়াইয়ের এই দুই রূপের পুনরাবৃত্তি। প্রতিটি 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে শত্রু আক্রমণ চালিয়ে লালফৌজের প্রতিরক্ষার বিরোধিতা করে, আর লালফৌজ প্রতিরক্ষার মাধ্যমে শত্রুর আক্রমণের বিরোধিতা করে। এটা হচ্ছে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের প্রথম পর্যায়। তারপরে শত্রু প্রতিরক্ষার মাধ্যমে লালফৌজের আক্রমণের বিরোধিতা করে, আর লালফৌজ আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর প্রতিরক্ষার বিরোধিতা করে। এটা হচ্ছে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়। যে-কোন 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে এই দুটি পর্যায় থাকে, এবং দীর্ঘকাল ধরে এগুলোর পুনরাবৃত্তি হয়।

দীর্ঘকাল ধরে পুনরাবৃত্তি বলতে আমরা যুদ্ধ ও লড়াইয়ের রূপের পুনরাবৃত্তিই বুঝাই। এটা একটা তথ্য, এটাকে যে-কোন লোক প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারে। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান ও এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে যুদ্ধ-রূপেরই পুনরাবৃত্তি। আমাদের প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ, আর শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরক্ষা, এটা প্রথম পর্যায়। আমাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে শত্রুর প্রতিরক্ষা, আর শত্রুর প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে আমাদের আক্রমণ, এটা দ্বিতীয় পর্যায়। এ দুই পর্যায় হচ্ছে প্রত্যেক 'পরিবেষ্টন ও

দমন' অভিযানের মধ্যে লড়াইয়ের রূপের পুনরাবৃত্তি।

যুদ্ধের ও লড়াইয়ের বিষয়বস্তুর কিন্তু নিছক পুনরাবৃত্তি হয় না, বরং প্রত্যেকবারই তা ভিন্ন হয়। এটাও একটা তথ্য এবং যে-কোন লোক তা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারে। এখানে এটা একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, প্রতিবারই 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের আকার হয়ে ওঠে আরও বৃহত্তর, পরিস্থিতিটি হয়ে ওঠে জটিলতর, আর লড়াই হয়ে ওঠে আরও তীব্রতর।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, উত্থান-পতন থাকবে না। কারণ শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের পরে লালফৌজ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল, দক্ষিণের ঘাঁটি এলাকাগুলো সব খোয়া গিয়েছিল, লালফৌজ উত্তর-পশ্চিমে সরে এসেছিল, দক্ষিণে দেশী শত্রুকে সন্ত্রস্ত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তার আর ছিল না। ফলে, 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের আকার ক্ষুদ্রতর হয়েছে, পরিস্থিতি সহজতর হয়েছে এবং লড়াইয়ের তীব্রতা কমেছে।

লালফৌজের পরাজয়ের অর্থ কি? রণনীতিগতভাবে বলতে গেলে, পরাজয় শুধু তখনই বলা যায় যখন 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়, এবং তখনও সেটাকে আংশিক ও সাময়িক পরাজয় মাত্র বলা যায়। কারণ, গৃহযুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের অর্থ হচ্ছে গোটা লালফৌজের ধ্বংস। কিন্তু এটা বাস্তবক্ষেত্রে ঘটেনি। বিস্তীর্ণ ঘাঁটি এলাকা হস্তচ্যুত হওয়া ও লালফৌজের সরে যাওয়াটা সাময়িক ও আংশিক পরাজয়, চিরকালীন ও পূর্ণ পরাজয় নয়, যদিও এই আংশিক পরাজয়ের ফলে পার্টি-সদস্যসংখ্যার, সৈন্যবাহিনীর ও ঘাঁটি এলাকার শতকরা ৯০ ভাগ হারাতে হয়েছিল। এই স্থানান্তরকে আমরা বলি আমাদের প্রতিরক্ষার ধারাবাহিক রূপ, আর আমাদের প্রতি শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনকে বলি তার আক্রমণের ধারাবাহিক রূপ। অর্থাৎ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা প্রতিরক্ষার বদলে আক্রমণ করতে পারিনি, বরং শত্রুদের আক্রমণ আমাদের প্রতিরক্ষাকে ভেঙে দিয়েছিল, যার ফলে আমাদের প্রতিরক্ষা পরিবর্তিত হয়েছে পশ্চাদপসরণে, আর শত্রুর আক্রমণ পরিবর্তিত হয়েছে পশ্চাদ্ধাবনে। কিন্তু লালফৌজ যখন একটা নতুন এলাকায় পৌঁছে গেল, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা যখন কিয়াংসী প্রদেশ ও অন্যান্য স্থান থেকে সরে শেনসী প্রদেশে এলাম, তখন আবার নতুন করে দেখা দিল 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের

পুনরাবৃত্তি। সেই কারণেই আমরা বলি যে, লালফৌজের রণনীতিগত *পশ্চাদপসরণ (দীর্ঘ অভিযান) ছিল তার রণনীতিগত প্রতিরক্ষার ধারাবাহিক* রূপ, শত্রুর রণনীতিগত পশ্চাদ্ধাবনটা ছিল তার রণনীতিগত আক্রমণের ধারাবাহিক রূপ।

প্রাচীন বা আধুনিক, চীনের বা বিদেশের যে-কোন যুদ্ধের মতো চীনের গৃহযুদ্ধেরও লড়াই করার দুটিমাত্র মৌলিক রূপ রয়েছে—আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা। চীনের গৃহযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হল 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান ও এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের দীর্ঘমেয়াদী পুনরাবৃত্তি এবং আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা – লড়াই করবার এই দুটি রূপের দীর্ঘমেয়াদী পুনরাবৃত্তি, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দশ হাজার কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের মহান রণনীতিগত স্থানান্তরের (দীর্ঘ অভিযান বা Long March)[১৬] ঘটনা।

শত্রুর পরাজয়ও একই রকমের। শত্রুর রণনীতিগত পরাজয়ের অর্থ এই যে, তার 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান আমাদের আঘাতে ভেঙে পড়ে, আমাদের প্রতিরক্ষা আক্রমণে পরিণত হয় ও শত্রুর আক্রমণ প্রতিরক্ষায় পরিণত হয় এবং আর একটা 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান শুরু করবার জন্যে তাকে পুনর্বার সৈন্যশক্তি সংগঠিত করে নিতে হয়। আমাদের মতো শত্রুকে তেমন দশ হাজার কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের রণনীতিগত স্থানান্তরের পথ নিতে হয়নি, কারণ সে গোটা দেশেরই শাসক এবং আমাদের থেকে সে অনেক বেশি শক্তিশালী। তবু তার সৈন্যবাহিনীর আংশিক অপসরণ ঘটেছে। কোন কোন ঘাঁটি এলাকায় লালফৌজের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শত্রু নিজের শ্বেত ঘাঁটি থেকে আমাদের পরিবেষ্টন ভেঙে বেরিয়ে শ্বেত এলাকায় অপসরণ করেছে নতুন আক্রমণ সংগঠিত করবার জন্য, এ রকম ঘটনাও ঘটেছিল। গৃহযুদ্ধের মেয়াদ যদি বর্ধিত হয় এবং লালফৌজের বিজয়গুলি যদি অধিকতর ব্যাপক হয়ে ওঠে, তাহলে এ ধরনের ঘটনা আরও বেশি ঘটবে। কিন্তু লালফৌজ যে ফললাভ করতে পারে, শত্রু সেই রকমের ফললাভ করতে পারে না, কারণ জনগণের সমর্থন সে পায় না, আর তার অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে ঐক্য নেই। তারা যদি লালফৌজের দীর্ঘ দূরত্বের স্থানান্তরকে অনুকরণ করে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

১৯৩০ সালে লি লি-সান লাইনের যুগে, কমরেড লি লি-সান চীনের গৃহযুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতিটি বুঝতে পারেননি, আর সেই কারণে তিনি এই

নিয়মটিকে দেখতে পাননি যে, এই যুদ্ধের গতিধারায় দীর্ঘকাল ধরে চলছে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলি ও সেগুলির পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি (সে সময় পর্যন্ত হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকায় তিনটি এবং ফুচিয়ানে দুটি 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান ঘটে গেছে)। তাই দেশব্যাপী বিপ্লবে দ্রুত বিজয়লাভের প্রয়াসে লালফৌজের শৈশবাবস্থাতেই তিনি লালফৌজকে উহান শহর আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন এবং আদেশ দিলেন দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করার। তাই তিনি করে বসলেন 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের ভুল।

একইভাবে, ১৯৩১-৩৪ সালের 'বামপন্থী' সুবিধাবাদীরাও 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলির পুনরাবৃত্তির নিয়মে বিশ্বাস করত না হুপে-হোনান-আনহুই সীমান্ত ঘাঁটি এলাকায় তথাকথিত 'সহায়ক বাহিনী'[১৭] তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। সেখানকার কোন কোন নেতৃস্থানীয় কমরেড মনে করতেন যে, তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের পরাজয়ের পরে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী একটা নিছক সহায়ক বাহিনী হয়ে পড়েছে এবং লালফৌজের উপরে আরও আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে প্রধান বাহিনী হিসেবে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদেরই যুদ্ধে নামতে হবে। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে রচিত রণনীতিই হচ্ছে যে, লালফৌজকে উহান শহর আক্রমণ করতে হবে। এটা কিয়াংসীর কোন কোন কমরেডদের অভিমতের সঙ্গে নীতিগতভাবে মেলে—এইসব কমরেড নানছাংয়ের ওপরে আক্রমণ করবার জন্য লালফৌজকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, আলাদা আলাদা ঘাঁটি এলাকার সংযোগ সাধনের তাঁরা বিরোধিতা করতেন, শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনবার রণকৌশলের তাঁরা বিরোধিতা করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, কোন প্রদেশে বিজয়লাভ করাটা নির্ভর করে প্রদেশের রাজধানী ও প্রধান প্রধান শহরগুলিকে দখল করার উপরে। তাঁরা আরও মনে করতেন যে 'পঞ্চম "পরিবেষ্টন ও দমন" অভিযান-বিরোধী সংগ্রামটি হবে উপনিবেশের পথের সঙ্গে বিপ্লবের পথের নির্ধারক লড়াই' ইত্যাদি ইত্যাদি। হুপে-হোনান-আনহুই সীমান্ত এলাকায় চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান-বিরোধী সংগ্রামে এবং কিয়াংসীর কেন্দ্রীয় এলাকায় পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান-বিরোধী সংগ্রামে অবলম্বিত ভুল লাইনের উৎস ছিল এই বামপন্থী' সুবিধাবাদ। আর এই 'বাম' সুবিধাবাদ শত্রুর গুরুতর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের মুখে লাল-ফৌজকে অক্ষম করে ফেলেছিল এবং চীনা বিপ্লবের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল।

প্রতিরক্ষাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করা লালফৌজের কোনমতেই উচিত নয়—এই অভিমতটিও সম্পূর্ণ ভুল, এবং যে 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলির পুনরাবৃত্তিকে অস্বীকার করে, তার সঙ্গে এই অভিমতটি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে আক্রমণাত্মক—এই কথাটা একদিকে অবশ্য ঠিক। বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধকে এর জন্ম থেকে বৃদ্ধিতে, ছোট থেকে বড় হওয়াতে, রাজনৈতিক ক্ষমতার অনুপস্থিতি থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেওয়াতে, লালফৌজের অনুপস্থিতি থেকে লালফৌজের সৃষ্টিতে, আর বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার অনুপস্থিতি থেকে সেগুলোর সংস্থাপনে অবশ্যই আক্রমণাত্মক থাকতে হবে এবং রক্ষণশীল হতে পারবে না, রক্ষণশীলতাবাদের ঝোঁকগুলোর বিরোধিতা অবশ্যই করতে হবে।

বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে আক্রমণাত্মক, কিন্তু তার প্রতিরক্ষা ও পিছু হটাও রয়েছে—এইভাবে বললেই শুধু সম্পূর্ণ ঠিক হবে। আক্রমণ করবার জন্যই প্রতিরক্ষা করা, এগিয়ে যাবার জন্যই পিছু হটা, সম্মুখ-ফ্রন্টে এগিয়ে যাবার জন্য পার্শ্বভাগে যাওয়া, সোজা পথে যাবার জন্যই বাঁকা পথ ধরা—বহু ব্যাপারের বিকাশলাভের প্রক্রিয়ায় এগুলো অনিবার্য, সামরিক ব্যাপারে তো নিশ্চয়ই এমনি হবে।

উপরোল্লিখিত মন্তব্য দুটির প্রথমটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে, কিন্তু সামরিক ক্ষেত্রে তাকে নিয়ে এলে তা ঠিক হবে না। উপরন্তু রাজনীতি-গতভাবেও এটা মাত্র একটি পরিস্থিতিতেই (বিপ্লব যখন এগিয়ে চলছে) ঠিক, কিন্তু অন্য পরিস্থিতিতে নিয়ে এলে (বিপ্লব যখন পিছু হটতে থাকে : ১৯০৬ সালের রাশিয়ার মতো[১৮] এবং ১৯২৭ সালের চীনের মতো বিপ্লবে যখন সামগ্রিক পিছু হটা ঘটে ; অথবা ১৯১৮-সালের ব্রেষ্ট-লিতভস্ক সন্ধির[১৯] সময়কার রাশিয়ার মতো বিপ্লব যখন আংশিকভাবে পিছু হটে তখন) তা ঠিক হবে না। শুধু দ্বিতীয় মন্তব্যটিই হচ্ছে সম্পূর্ণ নির্ভুল সত্য। ১৯৩১-৩৪ সালের যে 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ যান্ত্রিকভাবে সামরিক প্রতিরক্ষাত্মক পদ্ধতির প্রয়োগের বিরোধিতা করেছিল তা নিছক শিশুসুলভ চিন্তাধারা ছাড়া আর কিছুই নয়।

'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের পুনরাবৃত্তি কবে শেষ হবে? আমার মতে গৃহযুদ্ধের মেয়াদকাল যদি বর্ধিত হয়, তাহলে এই পুনরাবৃত্তি তখনই শেষ হবে যখন আমাদের ও শত্রুর শক্তির তুলনায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে।

লালফৌজ যখন শত্রুর থেকে বেশি শক্তিশালী হবে, তখনই এই পুনরাবৃত্তিটা শেষ হবে। তখন আমরাই শত্রুর বিরুদ্ধে পরিবেষ্টন ও দমন অভিযান চালাব, আর সে তখন এই অভিযানের বিরোধিতা করার চেষ্টা করবে, কিন্তু লালফৌজ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল, সে রকমের প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে শত্রুকে রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থা সুযোগ দেবে না। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তখন 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলির পুনরাবৃত্তি একেবারে শেষ না হলেও মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে।

পঞ্চম অধ্যায়

রণনীতিগত প্রতিরক্ষা

এই শিরোনামায় আমি নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির আলোচনা করতে চাই: (১) সক্রিয় প্রতিরক্ষা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষা; (২) 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি, (৩) রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ; (৪) রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ; (৫) পাল্টা আক্রমণ শুরু করার সমস্যা; (৬) সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত করার সমস্যা; (৭) চলমান যুদ্ধ; (৮) দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধ; এবং (৯) নির্মূলীকরণের যুদ্ধ।

১। সক্রিয় প্রতিরক্ষা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষা

প্রতিরক্ষার বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করছি কেন? ১৯২৪-২৭ সালের চীনের প্রথম জাতীয় যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতার পরে, বিপ্লব খুবই তীব্র ও নিষ্ঠুর শ্রেণী-যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। শত্রু গোটা দেশই শাসন করত আর আমাদের ছিল কেবল কিছু ক্ষুদ্র সশস্ত্র বাহিনী। তাই গোড়া থেকেই শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের কঠোর সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলোকে ভেঙে দেওয়ার সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত রয়েছে আমাদের আক্রমণ। আর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলোকে আমরা ভেঙে দিতে সমর্থ হব কিনা, এর উপরই পুরোপুরি নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যতের বিকাশ। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলোকে ভেঙে দেবার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে প্রায়শঃই আঁকাবাঁকা, এবং যেমন সোজা ও সরাসরি বলে আশা করা যায় তেমন সোজা ও সরাসরি নয়। প্রথম ও গুরুতর

সমস্যা হচ্ছে, কি করে আমাদের শক্তিকে সংরক্ষণ করা যায় এবং শত্রুকে পরাস্ত করবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করা যায়। অতএব, লালফৌজের সামরিক কার্যকলাপে রণনীতিগত প্রতিরক্ষাই হচ্ছে সবচেয়ে জটিল ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

আমাদের গত দশ বছরের যুদ্ধের মধ্যে রণনীতিগত প্রতিরক্ষার সমস্যায় প্রায়শঃই দুটি বিচ্যুতি ঘটতো: একটি ছিল শত্রুকে ছোট করে দেখা, আর অন্যটি ছিল তার ভয়ে সন্ত্রস্ত হওয়া।

শত্রুকে ছোট করে দেখার ফলে বহু গেরিলা বাহিনী পরাজিত হয়েছে এবং লালফৌজ কয়েকবার শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলোকে ভেঙে দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী যখন সবেমাত্র সৃষ্ট হল, তখন সেই বাহিনীর নেতারা শত্রুর ও আমাদের নিজেদের পরিস্থিতির প্রায়ই সঠিকভাবে মূল্য নির্ধারণ করতে পারত না। কোন একটা স্থানে আকস্মিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে নিজেদের জয়লাভ হয়েছিল বলে অথবা শ্বেত বাহিনীতে বিদ্রোহ সংগঠিত করতে সফল হয়েছিল বলে তারা শুধু ক্ষণস্থায়ী অনুকূল পরিস্থিতিটাই দেখতে পেয়েছিল, অথবা যদিও পরিস্থিতি গুরুতর কিন্তু তারা তা দেখতে পায়নি। তাই এইভাবে প্রায়শঃই তারা শত্রুকে ছোট করে দেখত। অপরদিকে, নিজেদের দুর্বলতার (অভিজ্ঞতার অভাব, শক্তির স্বল্পতা) উপলব্ধিও তাদের ছিল না। শত্রু যে শক্তিশালী এবং আমরা যে দুর্বল—এটা ছিল একটা বাস্তব ঘটনা, তবুও কেউ কেউ এ নিয়ে ভাবতে চাইত না, শুধু আক্রমণের বুলিই আওড়াত, কিন্তু প্রতিরক্ষা ও পশ্চাদপসরণের কথা মুখেও আনত না। এইভাবে নিজেদের তারা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মানসিকভাবে নিরস্ত্র করে ফেলে তাদের কার্যকলাপকে ভুল পথে চালিত করেছিল। এই কারণেই বহু গেরিলা বাহিনী পরাজিত হয়।

একই কারণে যেসব ক্ষেত্রে লালফৌজ শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানগুলিকে ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত হল কোয়াংতুং প্রদেশের হাইফেং-লুফেং এলাকায় ১৯২৮ সালে লালফৌজের পরাজয়[২০], আর কুওমিনতাঙ বাহিনী যে নিছক সহায়ক বাহিনী—এই তত্ত্বের ভিত্তিতে সামরিক কার্যকলাপ পরিচালনার ফলে শত্রুর চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে ১৯৩২ সালের হুপে-হোনান-আনহুই সীমান্ত এলাকার লালফৌজের স্বচ্ছন্দভাবে

কার্যকলাপ চালনার ক্ষমতা হারানো।

শত্রুর ভয়ে সন্ত্রস্ত হবার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত বহু আছে।

শত্রুকে যারা ছোট করে দেখত, তাদের বিপরীতে কেউ কেউ আবার শত্রুকে খুব বড় করে দেখত আর নিজেদের শক্তিকে দেখত খুব ছোট করে। সুতরাং তারা অপ্রয়োজনীয় পশ্চাদপসরণের নীতি অবলম্বন করেছিল এবং অনুরূপভাবেই প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মানসিকভাবে নিজেদেরকে নিরস্ত্র করে ফেলেছিল। এর ফলে গেরিলা বাহিনীর পরাজয় ঘটেছিল বা লালফৌজের কোন কোন যুদ্ধাভিযান ব্যর্থ হয়েছিল অথবা ঘাঁটি এলাকা হারাতে হয়েছিল।

ঘাঁটি এলাকা হারানোর সবচেয়ে জলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে কিয়াংসীতে কেন্দ্রীয় ঘাঁটি এলাকা হারাতে হয়েছিল। দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকেই এই ভুলের উৎপত্তি। নেতারা শত্রুকে বাঘের মতো ভয় করেছিল, সর্বত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খাড়া করেছিল, প্রতি পদে প্রতিরোধ যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ চালাতে তারা সাহস করল না, অথচ সেটা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনকই হতো। এমনকি শত্রুবাহিনীকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে এনে ঘেরাও করে নিশ্চিহ্ন করার সাহসও তারা করল না। ফলে গোটা ঘাঁটি এলাকা হাতছাড়া হয়ে গেল আর লালফৌজকে বারো হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পথে দীর্ঘ অভিযান চালাতে হল। তবু এই ধরনের ভুল ঘটার আগে সাধারণতঃ শত্রুকে ছোট করে দেখার 'বাম' ভুল ঘটে থাকত। ১৯৩২ সালে প্রধান প্রধান শহরগুলিকে আক্রমণ করার সামরিক হঠকারিতাটা ছিল পরে শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের মোকাবিলা করার ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষার লাইন অবলম্বনের মূল উৎস।

শত্রুর ভয়ে সন্ত্রস্ত হবার চরমতম দৃষ্টান্ত ছিল পশ্চাদপসরণবাদের 'চাং কুও-থাও লাইন'। হুয়াংহো নদীর পশ্চিমে লালফৌজের চতুর্থ ফ্রণ্ট-আর্মির পশ্চিম রুট বাহিনীর পরাজয়ই[২১] হচ্ছে এই লাইনের চূড়ান্ত দেউলিয়াপনা।

সক্রিয় প্রতিরক্ষার অন্য নাম হচ্ছে আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা বা নির্ধারক লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা। নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষাকে নির্ভেজাল প্রতিরক্ষাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিরক্ষা বা নিছক প্রতিরক্ষা বলা যায়। নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষা হচ্ছে বস্তুতঃ একটা মেকি প্রতিরক্ষা, আর কেবল সক্রিয় প্রতিরক্ষাই হচ্ছে প্রকৃত প্রতিরক্ষা—পাল্টা আক্রমণ ও আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যজনিত

প্রতিরক্ষা যতদূর আমি জানি, প্রাচীন বা আধুনিক যুগে, চীনে বা বিদেশে এমন কোন মূল্যবান সামরিক গ্রন্থ বা এমন কোন অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান রণবিশারদ নেই, যা বা যিনি রণনীতিতে ও রণকৌশলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষার বিরোধিতা করেন না। শুধু নিরেট নির্বোধ বা উন্মাদ ব্যক্তিই নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষাকে মন্ত্রপূত রক্ষাকবচ হিসেবে বক্ষে ধাণ করে থাকে। তবু দুনিয়ায় এমন লোকও আছে, যারা এই ধরণের কাজও করে। এটা হচ্ছে যুদ্ধ চালনার মধ্যে একটা ভুল, এটা সামরিক ব্যাপারে রক্ষণশীলতার অভিব্যক্তি। আমাদের দৃঢ়ভাবে তার বিরোধিতা করা উচিত।

নবীন ও দ্রুত উন্নয়নশীল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর, অর্থাৎ জার্মানী ও জাপানের রণবিশারদরা প্রচণ্ডভাবে রণনীতিগত আক্রমণের সুবিধের পক্ষে ঢাক পেটায়, আর রণনীতিগত প্রতিরক্ষার বিরোধিতা করে। এ ধরনের চিন্তা চীনা বিপ্লবী যুদ্ধের ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপযোগী। জার্মানী ও জাপনী সাম্রাজ্যবাদী রণবিশারদদের মতে, প্রতিরক্ষার একটা গুরুতর দুর্বলতা হচ্ছে—লোকজনের মনোবলকে অনুপ্রাণিত করার বদলে এটা লোকজনের মনোবলকে কাঁপিয়ে দেয়। যেসব দেশে শ্রেণীদ্বন্দ্ব তীব্র এবং যুদ্ধ যেখানে শুধুই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর, এমনকি শুধু প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক গোষ্ঠীরই উপকার সাধন করে, সেইসব দেশের ক্ষেত্রে এটা খাটে। কিন্তু আমাদের অবস্থা ভিন্ন। বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাগুলোকে রক্ষা করার ও চীনকে রক্ষা করার শ্লোগান দিয়ে আমরা জনগণের ব্যাপকতম সংখ্যাধিক্যকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি একমন একপ্রাণ হয়ে যুদ্ধ করার জন্য, কারণ আমরা হচ্ছি উৎপীড়িত ও আক্রমণের শিকার। গৃহযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের লালফৌজও প্রতিরক্ষার পন্থা ব্যবহার করে শত্রুদেরকে পরাজিত করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যখন আক্রমণের জন্য শ্বেত রক্ষীদের সংগঠিত করেছিল, শুধু যে তখনই সোভিয়েতকে রক্ষা করার শ্লোগান দিয়ে তারা যুদ্ধ চালিয়েছিল তাই নয়, এমনকি অক্টোবর অভ্যুত্থানের জন্য যখন প্রস্তুতি চলছিল তখনও সামরিক সমাবেশ করা হয়েছিল রাজধানী রক্ষা করার শ্লোগান দিয়ে। সমস্ত ন্যায় যুদ্ধে প্রতিরক্ষা রাজনীতিগত শত্রুদের ওপরে একটা আচ্ছন্নতাই শুধু সৃষ্টি করে না, অধিকন্তু যুদ্ধে যোগদান করবার জন্য জনসাধারণের পশ্চাৎপদ অংশকেও জাগিয়ে তুলতে পারে।

মার্কস বলেছিলেন, একবার সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হলে আক্রমণে এক

মুহূর্তের জন্যও বিরতি দেওয়া চলবে না[২২]। এর অর্থ হল, শত্রুর অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগে হঠাৎ অভ্যুত্থান করবার পরে জনসাধারণ অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখতে বা পুনরুদ্ধার করতে সুযোগ দেবেন না, এই মুহূর্তটিকে ব্যবহার করেই দেশের ভেতরকার প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশক্তি যখন প্রস্তুতিবিহীন অবস্থায় থাকে তখন তাকে আঘাত করা উচিত। আর যে বিজয় অর্জিত হয়েছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়, শত্রুকে ছোট করে দেখা উচিত নয়, শত্রুর ওপর আক্রমণ চালনায় ঢিলে দেওয়া অথবা এগিয়ে যেতে ইতস্ততঃ করা উচিত নয়, এবং শত্রুকে ধ্বংস করবার সুযোগ ফসকে যেতে দেওয়া উচিত নয়, তাহলে বিপ্লব পরাজিত হবে। এটা ঠিক। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, যখন শত্রুপক্ষ ও আমাদের পক্ষ উভয়েই সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত, এবং শত্রু উৎকৃষ্ট অবস্থায় থেকে আমাদের উপর চাপ দিচ্ছে, তখনও আমাদের বিপ্লবীদের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়। আস্ত বোকাই কেবল এমন ধারণা পোষণ করে।

সামগ্রিকভাবে দেখলে, এ পর্যন্ত আমাদের যুদ্ধটি হল কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে আক্রমণ। কিন্তু সামরিক ক্ষেত্রে এ যুদ্ধ শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দেবার রূপ নিয়েছে।

সামরিকভাবে বলতে গেলে, আমাদের এ যুদ্ধ হচ্ছে পর্যায়ক্রমে প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ। আমাদের পক্ষে আক্রমণ প্রতিরক্ষার আগেই ঘটুক বা পরেই ঘটুক, তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ মূল কথাটা হচ্ছে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দেওয়া। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দেবার আগে পর্যন্ত প্রতিরক্ষা চলতে থাকে আর তার পরেই শুরু হয় আক্রমণ— এটা হচ্ছে একই বিষয়ের দুটি পর্যায়। আর শত্রুর একটা 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে তার অন্য একটা 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে। এই দুটি পর্যায়ের মধ্যে আক্রমণের পর্যায়ের চেয়ে প্রতিরক্ষা পর্যায়ই অধিকতর জটিল ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেমন করে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দেওয়া যায়, তার বহু সমস্যাই এতে জড়িত। এখানকার মৌলিক নীতি হচ্ছে সক্রিয় প্রতিরক্ষাকে স্বীকার করা আর নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষার বিরোধিতা করা।

আমাদের গৃহযুদ্ধের কথা বলতে গেলে, লালফৌজের শক্তি যখন শত্রুর

শক্তিকে ছাড়িয়ে যাবে, সাধারণভাবে রণনীতিগত প্রতিরক্ষার তখন আমাদের দরকার হবে না। তখন আমাদের নীতি হবে কেবল রণনীতিগত আক্রমণ। এই ধরনের পরিবর্তন নির্ভর করবে শত্রুর ও আমাদের শক্তিস্থিতির সামাগ্রক পরিবর্তনের ওপর। সেই সময়ে অবশিষ্ট প্রতিরক্ষা হবে শুধু আংশিক চরিত্রের।

২। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি

শত্রুর একটি পরিকল্পিত 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্তুতি না থাকলে আমরা নিশ্চয়ই একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় গিয়ে পড়তে বাধ্য হব। প্রস্তুত না হয়ে তাড়াহুড়ো করে কোন লড়াইয়ে লেগে গেলে জয়লাভের নিশ্চয়তা থাকবে না। তাই, শত্রু যখন 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছে, তখন আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিহার্য হচ্ছে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি করা। আমাদের বাহিনীর মধ্যে এ ধরনের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে যে আপত্তি উঠেছিল, তা শিশুসুলভ ও হাস্যকর।

এখানে একটা কঠিন সমস্যা আছে, যা নিয়ে সহজেই তর্কবিতর্ক ঘটতে পারে। সেটা হল—আমরা কখন আমাদের আক্রমণ শেষ করব এবং শত্রুর নতুন 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি-পর্যায়ে যাব? যখন আমরা বিজয়-সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ চালাই, আর শত্রু যখন প্রতিরক্ষায় লিপ্ত থাকে, তখন শত্রু তার পরবর্তী 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের জন্য গোপনে গোপনে প্রস্তুতি চালায়, আর তাই আর কখন তার আক্রমণ শুরু হবে আমাদের পক্ষে তা জানা কঠিন। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের প্রস্তুতির কাজ যদি খুবই আগে আগে শুরু করা হয়, তাহলে আমাদের পূর্ববর্তী আক্রমণের থেকে পাওয়া সুবিধা ও লাভ কমে যেতে বাধ্য। আবার তাতে কখনো কখনো লালফৌজ ও জনগণের উপরও কিছু অনিষ্টকর প্রভাব দেখা দিতে পারে। কারণ প্রস্তুতি পর্যায়ের মুখ্য কর্মব্যবস্থা হচ্ছে সামরিক ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণের প্রস্তুতি আর তারজন্য রাজনৈতিক সক্রিয়করণ। কোন কোন সময়ে যদি খুবই আগে প্রস্তুতি শুরু হয় তাহলে শত্রুর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার পরেও

শত্রুর দেখা না পেয়ে আমাদের আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু করতে বাধ্য হতে হবে। কখনো কখনো আবার আমরা যখন নতুন আক্রমণ শুরু করছি, ঠিক সেই সময়ে শত্রু তার আক্রমণ শুরু করে দেবে, ফলে আমরা একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ব। তাই প্রস্তুতি শুরু করবার উপযুক্ত মুহূর্তটি বেছে নেওয়া হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। শত্রুর ও আমাদের নিজেদের অবস্থার দিকে এবং উভয়ের সম্পর্কের দিকে যথাযোগ্য দৃষ্টি রেখে এই মুহূর্তটিকে স্থির করতে হবে। শত্রুর অবস্থা জানাবার জন্য আমাদের তার রাজনৈতিক, সামরিক ও আর্থিক অবস্থা এবং শত্রু এলাকার জনমত সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। এইসব তথ্যের বিশ্লেষণ করার সময়ে আমাদের অবশ্যই শত্রুর গোটা শক্তিকে পর্যাপ্তভাবে বিবেচনা করতে হবে। তার অতীতের পরাজয়ের ব্যাপ্তিকে অতিরঞ্জিত করে দেখা চলবে না, কিন্তু আবার তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, তার আর্থিক অসুবিধা ও অতীতের পরাজয়ের প্রভাব ইত্যাদিকে হিসেবে ধরতে না পারাও আমাদের অবশ্যই চলবে না। আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে, অতীতের জয়ের ব্যাপ্তিকে অতিরঞ্জিত করা চলবে না, এবং আমাদের অতীতের জয়ের প্রভাবকে পর্যাপ্তভাবে বিবেচনা না করাও অবশ্যই চলবে না।

তবুও, প্রস্তুতি শুরু করার উপযুক্ত মুহূর্ত সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে, খুব দেরী করে শুরু করার চেয়ে বরং খুব আগে শুরু করাটাই ভাল। কারণ খুব দেরী করে শুরু করার চাইতে খুব আগে শুরু করাটাই ক্ষতি কম, আর তার সুবিধা হচ্ছে এই যে, আগে থাকতে প্রস্তুত হতে পারলে সম্ভাব্য বিপদকে এড়ানো যায় এবং মৌলিকভাবে আমরা অপরাজেয় অবস্থায় দাঁড়াতে পারি।

প্রস্তুতি পর্যায়ের প্রধান প্রধান সমস্যা হচ্ছে লালফৌজের পশ্চাদপসরণের প্রস্তুতি, রাজনৈতিক সক্রিয়করণ, নতুন সৈন্য ভর্তি করা, আর্থিক ও খাদ্য-প্রস্তুতি এবং রাজনৈতিক শত্রুদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তার সমস্যা ইত্যাদি।

লালফৌজের পশ্চাদপসরণের প্রস্তুতির অর্থ হল, যাতে লালফৌজ নিজের পশ্চাদপসরণের পক্ষে অসুবিধাজনক এমন দিকে চলে না যায়, আক্রমণ করতে অতি বেশি দূর অগ্রসর না হয় এবং খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। শত্রুর বিরাটাকার আক্রমণের পূর্বক্ষণে লালফৌজের প্রধান শক্তিকে অবশ্যই এই সবের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই সময় লালফৌজের প্রধানতঃ নজর দিতে হবে যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টি করার[১৩], সরবরাহাদি সংগ্রহ করার, নিজেদের শক্তি বাড়ানোর

ও নিজেদের সৈন্যদের ট্রেনিং দেবার পরিকল্পনাগুলোর উপার।

রাজনৈতিক সক্রিয়করণ হচ্ছে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। অর্থাৎ লালফৌজের লোকজনকে এবং ঘাঁটি এলাকার জনগণকে আমাদের এটা স্পষ্টভাবে, দৃঢ়ভাবে ও পুরোপুরিভাবে বলে দিতে হবে যে, শত্রুর আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন, আর সে আক্রমণে জনগণের গুরুতর ক্ষতি হবে। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর দুর্বলতা, লালফৌজের অনুকূল অবস্থা জয়লাভে আমাদের অদাম্য সংকল্প এবং আমাদের কাজকর্মের দিকনির্দেশ ইত্যাদি তাদেরকে জানাতে হবে। শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরোধিতা ও ঘাঁটি এলাকাকে রক্ষা করার জন্যে সংগ্রাম করতে লালফৌজ ও সমস্ত জনগণকে আমাদের আহ্বান জানাতে হবে। সামরিক দিক থেকে যা গোপনীয় তা বাদে, রাজনৈতিক সক্রিয়করণ খোলাখুলিভাবে করতে হবে, আর বিপ্লবের স্বার্থকে যারা সমর্থন করতে পারে এমন সবার মধ্যে এই কাজ করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে কর্মীদেরকে বোঝানো।

নতুন সৈন্যদের ভর্তি করতে হবে দুটি বিবেচনার ভিত্তিতে: একদিকে জনগণের রাজনৈতিক চেতনার মান এবং জনসংখ্যার অবস্থা বিবেচনা করতে হবে, অন্যদিকে লালফৌজের সেই সময়কার অবস্থা এবং 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে গোটা যুদ্ধাভিযানে লালফৌজের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতিকেও বিবেচনা করতে হবে।

আর্থিক সমস্যা ও খাদ্য সমস্যা যে প্রত্যাভিযানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একথা বলাই বাহুল্য। শত্রুর অভিযানের মেয়াদকাল যে বর্ধিত হতে পারে তা আমাদের বিবেচনা করা উচিত। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সমগ্র সংগ্রামে মুখ্যতঃ লালফৌজের জন্য এবং তা ছাড়া বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ন্যূনতম পরিমাণের হিসাব ধরা উচিত।

রাজনীতিগত বিরোধীদের সম্পর্কে সতর্ক না হলে চলবে না। কিন্তু তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অত্যধিক শঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আমাদের উচিত নয়। জমিদার, ব্যবসায়ী ও ধনী কৃষকের সঙ্গে ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে হবে, মুখ্যতঃ রাজনীতির দিক থেকে তাদের কাছে ব্যাপারটাকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, তারা যাতে নিরপেক্ষ থাকে

তার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপরে নজর রাখার জন্য জনসাধারণকে সংগঠিত করতে হবে। কেবল অতি অল্পসংখ্যক সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেই গ্রেপ্তারের মতো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কতটুকু বিজয়লাভ করবে তা প্রস্তুতি পর্যায়ের কর্তব্য যে পরিমাণে সুসম্পন্ন হবে, তারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শত্রুকে ছোট করে দেখার কারণে প্রস্তুতিতে শিথিল হওয়া এবং শত্রুর আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে হতভম্ব হওয়া—এ দুটিই হচ্ছে অনিষ্টকর ঝোঁক এবং দৃঢ়ভাবে এর বিরোধিতা করা উচিত। আমাদের প্রয়োজন হল উৎসাহী কিন্তু স্থিরচিত্ত মনোবৃত্তির, ব্যাপক কিন্তু শৃংখলাপূর্ণ কাজের।

৩। রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ

নিকৃষ্ট সৈন্যবাহিনী যখন উৎকৃষ্ট শত্রুবাহিনীর আক্রমণের সম্মুখীন হয় এবং বিবেচনা করে যে, সেই আক্রমণকে দ্রুত চুরমার করা অসম্ভব, তখন সেই সৈন্যবাহিনী নিজের সৈন্যশক্তিকে সংরক্ষিত করে রাখার ও শত্রুকে পরাজিত করবার সুযোগের প্রতীক্ষা করবার জন্য যে সুপরিকল্পিত রণনীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাই হচ্ছে রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ। সামরিক হঠকারীরা কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে এই ধরণের পদক্ষেপের বিরোধিতা করে; 'গেটের বাইরেই শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে'—এই তাদের অভিমত।

আমরা সবাই জানি যে, দুজন মুষ্টিযোদ্ধা যখন লড়ে, তখন সুচতুর মুষ্টিযোদ্ধা প্রায়শঃই গোড়াতে এক কদম পিছু হটে যায় আর নির্বোধ মুষ্টিযোদ্ধাটি প্রচণ্ডভাবে হঠকারীর মতো সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রথম মুহূর্তেই তার যাবতীয় কলাকৌশল প্রয়োগ করে ফেলে, আর শেষে প্রায়ই দেখা যায় যে লোকটি গোড়াতে একটু পিছু হটে গিয়েছিল, তারই আঘাতে নির্বোধ মুষ্টিযোদ্ধাটি ধরাশায়ী হয়েছে।

শুই হু চুয়ান[২৪] নামক উপন্যাসে হুং নামে একজন ড্রিলমাষ্টর ছাই চিনের গৃহে লিন ছুংকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করল, এবং কয়েকবার হুংকার করে ডাকল—'আয় দেখি,' 'আয় দেখি,' 'আয় দেখি'। লিন ছুং পিছিয়ে যেতে লাগল এবং শেষে হুংয়ের দুর্বল দিকটা ধরতে পেরে এক ঘুসিতে তাকে মাটিতে ফেলে দিল।

বসন্ত ও শরতের 'ছুনছিউ' যুগে লু ও ছী রাজ্য[২৫] দুটির মধ্যে যুদ্ধ বাধল। ছী রাজ্যের-সৈন্যবাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়বার আগেই লু-এর রাজা ডিউক চুয়াং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে বাধা দিল ছাও কুই। চুয়াং তখন 'শত্রু যখন ক্লান্ত হয়, আমরা তখন অক্রমন করি'—এই রণকৌশল গ্রহণ করে ছী'র বাহীনীকে পরাজিত করেছিল। চীনের সামরীক ইতিহাসে এটা হচ্ছে দুর্বল সৈন্যবাহিনীর শক্তিশালি সৈন্যবাহিনীকে পারাজিত করার একটা সুবিদিত দৃষ্টান্ত। ইতিহাসবিদ ছিউ মিংয়ের [২৬] বর্ণনা দেখুন:

বসন্তে ছী-বাহিনী আক্রমন করল। রাজা যুদ্ধ করতে চাইলেন। এমন সয়ম ছাও কুই তাঁর দর্শনপ্রার্থী হল। তাঁর প্রতিবেশিগণ বলল, 'এটা হচ্ছে মাংসখাদক অধিকারিদের কাজ, তুমি তাতে নাক গলাচ্ছ কেন?' ছাও উত্তর দিল, 'মাংসখাদিকগণ নির্বোধ, তারা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করতে পারে না।' সে রাজার সঙ্গে দেখা করল এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, যুদ্ধ করতে যেয়ে আপনি কিসের উপর নির্ভর করবেন?' রাজা উত্তরে বললেন, খাদ্য ও পোশাকাদি সকলই স্বীয় উপভোগের জন্য রাখবার সাহস আমার কোনদিনই নেই, পরন্তু সবদাই সকলের সঙ্গে তা আমি ভাগ করে গ্রহণ করে থাকি।' ছাও কুই বলল, 'এমন তুচ্ছ ভিক্ষাদান সকলের কাছে গিয়ে পৌছাতে পারে না। প্রজাগণ আপনার অনুসরণ করবে না।' রাজা বললেন, 'দেবগনকে প্রাপ্যের কম যজ্ঞপশু, মণি বা পট্টবস্ত্র নৈবেদ্য উৎসর্গ করে প্রতাবণা করবার সাহস রাখি না, আমি আস্থা রাখি।' ছাও বলল, 'এই যৎসামান্য ভক্তি কোন স্থান অর্জন করবে না। দেবতারা আপনাকে আশীর্বাদ করবেন না।' রাজা বললেন, ছোট-বড় যাবতীয় অভিযোগ পুংখানুপুংখরূপে বিচার করতে অক্ষম হলেও আমি নিয়তই সত্য নিবেদন করে থাকি।' ছাও কুই বলল, 'এতে জনগণের প্রতি আপনার গভীর অনুরাগকেই প্রমাণ করছে, অতএব আপনি যুদ্ধ করতে পারেন। আপনি যখন যুদ্ধে যাবেন আমি তখন আপনার অনুগমন করতে চাই। রাজা আর ছাও কুই একই রথে চড়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ছাংশাওতে যুদ্ধ বাধল। আক্রমন আরম্ভ করবার জন্য রাজা দুন্দুভি নিনাদ করতে উদ্যত হলে ছাও কুই বলল, 'এখনই নয়।' ছী-বাহিনী তিন বার দুন্দুভি নিনাদ করবার পর ছাও কুই বলল, 'এখন আমারা দুন্দুভি নিনাদ করতে পারি।' ছী-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। রাজা পলায়মান শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন

করতে চাইলেন। আবারও ছাও কুই বলল, 'এখনই নয়।' ছাও রথ থেকে নীচে নেমে শত্রুর রথচক্রের রেখাগুলি পরীক্ষা করে দেখল। তারপর রথের হাতলের উপর আরোহণ করে দূরের পানে তাকিয়ে দেখে বলল, 'এখন আমার পশ্চাদ্ধাবন করতে পারি।' অতএব, ছী বাহিনীর পশ্চাবদ্ধান করা আরম্ভ হল। বিজয় অর্জিত হবার পরে রাজা ছাও কুইকে জিজ্ঞাসা করলেন যে' কেন সে এমন পরামর্শ দিয়েছিল। ছাও উত্তর দিল, 'লড়াই নির্ভর করে সাহসের উপরে। প্রথম দুন্দুভি নিনাদে সাহস সঞ্চারিত হয়, দ্বিতীয় দুন্দুভি নিনাদে তা নিস্তেজ হয়ে পড়ে, আর তৃতীয় দুন্দুভি নিনাদে সাহস সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে পড়ে। শত্রুর সাহস যখন নিঃশেষ হয়ে পড়ল আমাদের সাহস তখন প্রচণ্ড, অতএব, আমরা জয়লাভ করলাম। কিন্তু বড় রাজ্যের সামরিক চাল অনুধাবন করা কঠিন, গুপ্তস্থান থেকে আকস্মিক আক্রমনের আশঙ্কা আমি করেছিলাম। কিন্তু যখন আমি দেখলাম যে, শত্রুর রথচক্রের রেখাগুলি এলোমেলো হয়ে চলে গেছে এবং দূরে তাকিয়ে দেখলাম যে, তাকের পতাকাগুলি ঝুলে পড়েছে, তখনই আমরা পশ্চাদ্ধাবনের পরামর্শ দিয়েছিলাম।'

একটা দুর্বল রাষ্ট্রের একটা শক্তিশালি রাষ্ট্রকে প্রতিরোধ করবার ঘটনা ছিল এটা। বিবরণে বলা হয়েছে যুদ্ধের আগে রাজনৈতিক প্রস্তুতির কথা—জনগণের আস্থা অর্জনের কথা। পাল্টা আক্রমনের পর্যায়ে প্রবেশ করার পক্ষে অনুকুল রণক্ষেত্রে—ছাংশাও-এর কথা। এই বিবরণে বর্ননা করা হয়েছে পাল্টা আক্রমণ শুরু করার পক্ষে অনুকুল সময়ের কথা অর্থাৎ শত্রুর সাহস যে সময়ে নিঃশেষ হয়ে পড়েছে আর আমাদের সাহস পূর্ণ হয়ে উঠেছে—সেই সময়ের কথা। এবিবরণে আরও বলা হয়েছে পশ্চাদ্ধাবন শুরু করার অনুকুল মুহুর্তের কথা, অর্থাৎ যে মুহুর্তে শত্রুর রথচক্রের রেখাগুলি এলোমেলোভাবে চলে গেছে এবং তাদের পতাকাগুলি ঝুলে পড়েছে, সেই মুহুর্তের কথা। উক্ত বিবরণে বর্ণিত লড়াইটি বড় না হলেও তাতেই রণনীতিগত প্রতিরক্ষার মূলনীতিগুলির কথা বলা হয়েছে। এইসব মূলনীতি প্রয়োগ করে যুদ্ধে জয়লাভ করার বহু বাস্তব উদাহরণ রয়েছে চীনের সামরিক ইতিহাসে। চু ও হান-এর মধ্যে ছেংকাওয়ের লড়াই[২৭], সিন ও হানের মধ্যে খুনইয়াংয়ের লড়াই [২৮], ইউয়ান শাও ও ছাল ছাওয়ের মধ্যে কুয়ানতুয়ের লড়াই[২৯], উ ও ওয়েই-এর মধ্যে ছিপি'র লড়াই [৩০], উ এবং শু'র মধ্যে ইলিংয়ের লড়াই[৩১], ছিন ও তোং-

চিনের মধ্যে ফেইশুইয়ের লড়াইয়ের[৩২] মতো বিখ্যাত লড়াইগুলির প্রত্যেকটিতে যুদ্ধরত দুই পক্ষের শক্তি ছিল অসম, দুর্বলতর পক্ষ প্রথমে কিছুটা পিছু হটে গিয়েছিল, আর শত্রু আঘাত হানবার পরেই শুধু সুযোগ নিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত হেনেছিল, তাই তারা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল।

আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯২৭ সালের শরৎকালে। সে সময়ে আমাদের আদৌ কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। নানছাং অভ্যুত্থান[৩৩] ও কুয়াংচৌ অভ্যুত্থান[৩৪] ব্যর্থ হল, আর 'শরৎকালীন ফসল' অভ্যুত্থানের[৩৫] সময়ে লালফৌজও হুনান-হুপে-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকায় কয়েকবার যুদ্ধে পরাজিত হল এবং হুনান-কিয়াংসী সীমান্তস্থ চিংকাং পার্বত্য অঞ্চলে সরে গেল। নানছাং অভ্যুত্থানের পরাজয়ের পরে যেসব সৈন্যবাহিনী অবশিষ্ট ছিল পরবর্তী বছরের এপ্রিল মাসে তারাও দক্ষিণ হুনান হয়ে চিংকাং পর্বতে সরে এল। তবু ১৯২৮ সালের মে মাস থেকেই গেরিলাযুদ্ধের যে মৌলিক নীতিগুলি উদ্ভূত হয়েছিল, সেগুলি ছিল তখনকার অবস্থার উপযোগী এবং প্রকৃতিতে সরল। তা হল ১৬টি চীনা শব্দের সূত্র—'শত্রু এগোয়, আমরা পিছিয়ে যাই। শত্রু শিবির ফেলে, আমরা হয়রান করি। শত্রু ক্লান্ত হয়, আমরা আক্রমণ করি। শত্রু পালায়, আমরা পিছনে ধাওয়া করি।' এই ১৬টি চীনা শব্দের সূত্রের সামরিক মূলনীতিকে লি লি-সান লাইনের পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটি স্বীকার করেছিল। পরে আমাদের সামরিক কার্যকলাপের মূলনীতি আরও বিকাশলাভ করেছে। কিয়াংসী ঘাঁটি এলাকায় প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে 'শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনার' নীতিটিকে উপস্থাপিত করা হল, আর কাজেও লাগানো হল সফলভাবে। শত্রুর তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে যখন ব্যর্থ করা হল, তখন লাল-ফৌজের সামরিক কার্যকলাপের মূলনীতিগুলো সম্পূর্ণভাবে তৈরী হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে সামরিক মূলনীতিগুলোর বিকাশের এক নতুন পর্যায়। এই মূল-নীতিগুলোর বিষয়বস্তুতে প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল আর রূপের দিক থেকেও অনেক পরিবর্তিত হয়েছিল। প্রধানতঃ সেগুলি তাদের অতীতের সরল প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মৌলিক নীতি হিসেবে আগেকার সেই ১৬টি চীনা শব্দের সূত্রই থেকে গেছে। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মৌলিক নীতিগুলো গেঁথে রয়েছে ১৬টি চীনা শব্দের সূত্রে, এ সূত্রের সামিল ছিল দুটি পর্যায়—রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত

আক্রমণ, আর প্রতিরক্ষার সময়ে এ সূত্রের সামিল ছিল রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ ও রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ—এই দুটি পর্যায়ই। পরে যা যোগ করা হয়েছে তা শুধু এই সূত্রের বিকাশ।

'তৃতীয় "পরিবেষ্টন ও দমন" অভিযানকে বিধ্বস্ত করবার পরে একটি অথবা কয়েকটি প্রদেশে সর্বপ্রথমে বিপ্লবের বিজয় অর্জনের জন্য সংগ্রাম' শীর্ষক পার্টির প্রস্তাবের মধ্যে নীতির দিক থেকে মারাত্মক ভুল ছিল। এই প্রস্তাব প্রকাশিত হবার পরে, ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে শুরু করে 'বাম' সুবিধাবাদীরা সঠিক মূলনীতিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাল এবং শেষ পর্যন্ত এই সঠিক মূলনীতিগুলি বাতিল করে দিল, আর সেগুলোর বিপরীতে পুরো আর এক গুচ্ছ তথাকথিত 'নতুন মূলনীতি' অথবা 'নিয়মিত মূলনীতি' প্রবর্তন করল। তখন থেকে আগেকার মূলনীতিগুলোকে আর নিয়মিত বলে ধরা হতো না, পরন্তু সেগুলোকে 'গেরিলাবাদ' আখ্যা দিয়ে অস্বীকার করা হতো। 'গেরিলাবাদ'-বিরোধী আবহাওয়ার প্রাধান্য পুরো তিন বৎসর ধরে বিরাজমান ছিল। এর প্রথম পর্যায়টি ছিল সামরিক হঠকারিতা, দ্বিতীয় পর্যায়ে সেটা হয়ে উঠল সামরিক রক্ষণশীলতা, আর শেষ পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়ে সেটা পরিণত হল পলায়নবাদে। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে কুইচো প্রদেশের চুনই শহরে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর বর্ধিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়েই শুধু এই ভুল লাইনকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হল, আর আগেকার লাইনের নির্ভুলতাকে পুনরায় স্বীকার করে নেওয়া হল। কিন্তু এটাকে অর্জন করার জন্য কতই না মূল্য দিতে হয়েছে।

যেসব কমরেড তীব্রভাবে 'গেরিলাবাদের' বিরোধিতা করেছিল তারা বলেছিল: শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনাটা ভুল, কারণ এমনি করে বহু জায়গা আমাদের ছেড়ে আসতে হল। আগে এইভাবে বিজয় অর্জিত হলেও এখনকার অবস্থা কি অনেক তফাৎ হয়ে যায়নি? অধিকন্তু, জায়গা ছেড়ে না দিয়ে শত্রুকে পরাজিত করাটা কি আরও বেশী ভাল ছিল না? শত্রুকে তার নিজ এলাকায় বা তার ও আমাদের এলাকার সীমান্তে পরাজিত করাটা কি আরও বেশী ভাল ছিল না। আগের নীতিগুলিতে 'নিয়মিত' বলে কিছুই ছিল না, আর সেগুলি ছিল শুধু গেরিলা বাহিনীর দ্বারা ব্যবহৃত পদ্ধতি। এখন আমাদের নিজস্ব রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে এবং আমাদের লালফৌজ একটা নিয়মিত বাহিনী হয়ে উঠেছে। চিয়াং

কাই-শেক ও আমাদের মধ্যে যে যুদ্ধ, তা হচ্ছে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যেকার যুদ্ধ এবং দুটি বিরাট সৈন্যবাহিনীর মধ্যেকার যুদ্ধ। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানো উচিত নয়, আর 'গেরিলাবাদের' সমস্ত কিছুই পুরোপুরিভাবে ত্যাগ করা উচিত। নতুন নীতিগুলো 'পুরোমাত্রায় মার্কসবাদী' এবং পূর্বের নীতিগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল পাহাড়-পর্বতে অবস্থিত গেরিলা বাহিনীগুলোর দ্বারা, এবং পাহাড়-পর্বতে তো আর মার্কসবাদ ছিল না। নতুন নীতিগুলো ছিল পুরানো নীতিগুলোর বিপরীত। সেগুলি হল: 'একজনকে দশজনের বিরুদ্ধে লড়াও, দশ জনকে একশ জনের বিরুদ্ধে লড়াও, নির্ভীকভাবে ও কৃতসংকল্প হয়ে লড়ে যাও, বিজয়কে কাজে লাগিয়ে সরাসরি শত্রুকে ধাওয়া কর', সকল ফ্রণ্টে আঘাত হান', 'প্রধান প্রধান শহরগুলো দখল কর', আর, 'দুই "মুষ্টি" দিয়ে একই সঙ্গে দুদিক থেকে আঘাত হান'। শত্রু যখন আক্রমণ করত তখন তার মোকাবিলার পদ্ধতি ছিল: 'প্রবেশদ্বারের বাইরে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখা', 'প্রথমে আঘাত হেনে প্রাধান্য অর্জন করা', 'আমাদের হাঁড়িকুড়ি ভেঙে খান খান হতে না দেওয়া', 'এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে না দেওয়া,' আর 'সৈন্যশক্তিকে ছয়টি পথে বিভক্ত করে দেওয়া', 'বিপ্লবের পথ ও উপনিবেশের পথের মধ্যে চূড়ান্ত লড়াই', সংক্ষিপ্ত দ্রুত আকস্মিক আঘাত হানা, দুর্গ যুদ্ধ, শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ, 'দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ', আরও ছিল বিরাট পশ্চদ্ভাগব্যবস্থার নীতি ও নিরঙ্কুশ কেন্দ্রীভূত পরিচালনা; আর সর্বশেষে এসবের পরিণতি দাঁড়ায় বৃহদাকারে 'ঘর-বাড়ী গুটিয়ে চলে যাওয়ায়'। এইসব বিষয়গুলোকে যে মেনে নিত না, তাকেই শাস্তি দেওয়া হতো, তাকেই সুবিধাবাদী বলে চিহ্নিত করা হতো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব তত্ত্ব এবং প্রয়োগ নিঃসন্দেহে সবই ভুল। সেগুলো হচ্ছে আত্ম-মুখীবাদ। সেইগুলো ছিল অনুকূল অবস্থায় পেটি-বুর্জোয়াদের বিপ্লবী উন্মাদনা ও অসহিষ্ণুতার প্রকাশ মাত্র। কিন্তু দুর্দশার সময়ে পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুযায়ী সেগুলি পর্যায়ক্রমে বেপরোয়া হঠকারিতায়, রক্ষণশীলতায় ও পলায়নবাদে পরিণত হয়েছিল। সেগুলি ছিল গোঁয়ারগোবিন্দ আর আনাড়ীদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ। সেসবের ধারেকাছে মার্কসবাদের লেশমাত্র গন্ধও ছিল না। সেগুলো ছিল প্রকৃতই মার্কসবাদবিরোধী।

এখানে আমরা শুধু রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এটাকে কিয়াংসীতে বলা হয় 'শত্রুকে প্রলুব্ধ করে এলাকার গভীরে

টেনে আনা', আর সেইস্থানে বলা হয় 'ফ্রন্টকে সঙ্কুচিত করা'। অতীতের কোন সামরিক তাত্ত্বিক বা প্রয়োগকারীই এ কথা অস্বীকার করেননি যে, এটা হচ্ছে সেই কর্মনীতি, যা প্রবলতর সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে দুর্বল বাহিনীকে যুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। একজন বিদেশী রণবিশারদ এ কথা বলেছেন যে, রণনৈতিগতভাবে প্রতিরক্ষাত্মক লড়াই চালনায় শুরুতে প্রতিকূল অবস্থায় নির্ধারক লড়াইকে সাধারণতঃ এড়িয়ে যাওয়া হয় আর অবস্থা অনুকূল হলেই শুধু লড়াই করতে নামা হয়। এটা সম্পূর্ণ ঠিক, এর সঙ্গে যোগ করবার আর আমাদের কিছুই নেই।

রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের লক্ষ্য হচ্ছে, সামরিক শক্তি সংরক্ষিত করে রাখা ও পাল্টা আক্রমণের জন্য তৈরি হওয়া। পশ্চাদপসরণ দরকার, কারণ শক্তিশালী শত্রুর আক্রমণের মুখে এক পাও পশ্চাদপসরণ না করার অর্থ হচ্ছে অনিবার্যভাবেই নিজের সামরিক শক্তির সংরক্ষণকে বিপদাপন্ন করা। যাই-হোক, অতীতে অনেকেই পশ্চাদপসরণের ঘোর বিরোধী ছিল। এটাকে তারা 'নিছক প্রতিরক্ষার সুবিধাবাদী লাইন' বলে মনে করত। আমাদের ইতিহাসে প্রমাণ করেছে যে, তাদের এ বিরোধিতাটা ছিল পুরোপুরি ভুল।

পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি করতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই নিজেদের অনুকূল কিন্তু শত্রুর প্রতিকূল কতকগুলো শর্ত বাছাই করে নিতে হবে অথবা সৃষ্টি করে নিতে হবে, যাতে করে শত্রুর ও আমাদের শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটে, এবং পরে পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে প্রবেশ করা যায়।

আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা অনুসারে বলা যায় যে, পশ্চাদপসরণের পর্যায়ে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত শর্তগুলোর মধ্যে অন্ততঃ দুটিকে নিশ্চিত করে নিলেই শুধু পরিস্থিতিকে আমাদের অনুকূল ও শত্রুর প্রতিকূল বলে মনে করা যায় এবং পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারা যায়। এই শর্তগুলো হচ্ছে ঃ

(১) জনগণ সক্রিয়ভাবে লালফৌজকে সমর্থন করেন।

(২) লড়াই করার জন্য অনুকূল অবস্থান।

(৩) লালফৌজের যাবতীয় প্রধান শক্তি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত।

(৪) শত্রুর দুর্বল স্থান খুঁজে বের করা হয়েছে।

(৫) শত্রুকে পরিশ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত করা হয়েছে।

(৬) ভুল করতে শত্রুকে প্রলুব্ধ করা হয়েছে।

লালফৌজের পক্ষে প্রথম শর্তটি অর্থাৎ জনসমর্থনই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ শর্ত। এর অর্থ হচ্ছে ঘাঁটি এলাকা থাকা। অধিকন্তু এই শর্তটি পূর্ণ হলে, ৪, ৫ এবং ৬ নম্বর শর্তগুলোকে সৃষ্টি বা অর্জন করাও সহজ হয়। তাই যখন শত্রু লালফৌজের উপর বিরাটাকারের আক্রমণ চালায়, তখন লালফৌজ সর্বদাই শ্বেত এলাকা থেকে হটে ঘাঁটি এলাকায় আসে, কারণ শ্বেত বাহিনীর বিরুদ্ধে লালফৌজকে সাহায্য করতে ঘাঁটি এলাকার জনগণই সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। আবার ঘাঁটি এলাকার সীমান্ত অঞ্চল আর কেন্দ্র-অঞ্চলের মধ্যেও পার্থক্য আছে। শত্রুর কাছে খবর গোপন রাখা, পর্যবেক্ষণ, পরিবহণ, লড়াইয়ে যোগদান করা ইত্যাদি ব্যাপারে সীমান্ত অঞ্চলের চাইতে কেন্দ্র-অঞ্চলের জনগণই বেশি ভাল কাজ করতে পারেন। সেজন্য কিয়াংসীতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে এমন সব অঞ্চলকে 'পশ্চাদপসরণের শেষ-স্থান' হিসেবে বাছাই করা হয়েছিল, যেখানে জনসমর্থন—এই প্রথম শর্তটি ছিল সবচেয়ে ভাল বা অপেক্ষাকৃত ভাল। ঘাঁটি এলাকার এই বৈশিষ্ট্য আমাদের লালফৌজের সামরিক কার্যকলাপকে সাধারণ সামরিক কার্যকলাপ থেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র ধরনের করেছিল, আর সেটাই ছিল প্রধান কারণ, যার জন্য পরবর্তীকালে শত্রু যুদ্ধের দুর্গনীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল।

অন্তর্লাইনে লড়াই করার একটা সুবিধাজনক অবস্থা হচ্ছে যে, পশ্চাদ-পসরণকারী সৈন্যবাহিনী নিজের পছন্দমতো অনুকূল অবস্থান বেছে নিতে পারে এবং আক্রমণকারী বাহিনীকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে লড়াই করতে বাধ্য করতে পারে। প্রবলতর বাহিনীকে পরাজিত করবার জন্য দুর্বল বাহিনীকে অনুকূল অবস্থানের শর্তকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে। কিন্তু শুধু এই শর্তটাই যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে অন্যান্য শর্তও থাকা চাই। এসবের প্রথমটি হচ্ছে জনসমর্থন। পরেরটি হচ্ছে এমন একটি শত্রু থাকা চাই, যাকে সহজেই পরাজিত করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, এমন এক শত্রু যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বা ভুল করেছে, অথবা অগ্রসরমান এমন এক শত্রুদল যার যুদ্ধ-ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এই শর্তগুলোর অনুপস্থিতিতে অনুকূল অবস্থান থাকলেও আমাদের তাকে ত্যাগ করে নিজেদের মনোমত শর্তগুলোকে পাবার জন্য অব্যাহতভাবে পিছু হটে চলতেই হবে। শ্বেত এলাকায় যে অনুকূল অবস্থান

নেই, তা বলা যায় না, কিন্তু সেখানে সক্রিয় জনসমর্থনের অনুকূল শর্তটি আমরা পাই না। অন্যান্য শর্তাদি যদি পূরণ হয়ে না থাকে, তাহলে লালফৌজকে নিজের ঘাঁটি এলাকার দিকে পিছু হয়ে আসতেই হবে। শ্বেত এলাকা ও ঘাঁটি এলাকার মধ্যেকার পার্থক্যের মতোই ঘাঁটি এলাকার সীমান্ত-অঞ্চল ও কেন্দ্র-অঞ্চলের মধ্যেকার পার্থক্যও মোটামুটি এইরকম।

স্থানীয় বাহিনী ও শত্রুকে আটকে রাখবার সৈন্যশক্তি ছাড়া সমস্ত হানা দেবার সৈন্যশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত করতে হবে—এটাই নীতি। রণনীতিগত প্রতিরক্ষায় রত শত্রুকে আক্রমণ করার সময়ে লালফৌজ সাধারণতঃ নিজের সৈন্যশক্তিকে ছড়িয়ে দেয়। শত্রু একবার বিরাটাকারের আক্রমণ শুরু করলেই লালফৌজ 'কেন্দ্রাভিমুখে পশ্চাদপসরণ' করে। পশ্চাদপসরণের শেষ-স্থান সাধারণতঃ ঘাঁটি এলাকার মধ্যভাগেই নির্বাচিত হয়ে থাকে। কিন্তু অবস্থা অনুসারে কখনো কখনো আবার পুরোভাগে বা পশ্চাদ্ভাগেও থাকে। এ ধরনের কেন্দ্রাভিমুখে পশ্চাদপসরণে লালফৌজের প্রধান শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত করা যেতে পারে।

প্রবলতর বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত দুর্বল বাহিনীর পক্ষে আর একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে আক্রমণের জন্য শত্রুর দুর্বলতর ইউনিটগুলোকে বেছে নেওয়া। কিন্তু শত্রুর আক্রমণের শুরুতে আমরা সাধারণতঃ জানি না শত্রুর পৃথকভাবে অগ্রসরমান সৈন্যদলগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে শক্তিশালী আর কোনটিই-বা-একটু কম শক্তিশালী, কোন্‌টি সবচেয়ে দুর্বল আবার কোন্‌টি একটু কম দুর্বল। এইসব জানার জন্য পর্যবেক্ষণ করা দরকার। প্রায়ই এতে অনেক সময় লাগে। এটা হচ্ছে আর একটি কারণ যার জন্য রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ প্রয়োজন।

যদি আক্রমণকারী শত্রুর সৈন্যসংখ্যা ও শক্তি দুইই আমাদের চেয়ে অনেক বেশি হয়, তাহলে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তন আমরা শুধু তখনই ঘটাতে পারি, যখন শত্রু আমাদের ঘাঁটি এলাকার গভীরে ঢুকে পড়েছে এবং সেখানে সমস্ত রকমের কষ্ট ভোগ করছে। তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের সময়ে চিয়াং কাই-শেকের কোন এক ব্রিগেডের চীফ অফ স্টাফ যেমন বলেছিল, 'আমাদের মোটা মোটা সৈন্যরা হয়রান হয়ে শুকিয়ে গেছে, আর শুকনো সৈন্যরা ক্লান্তিতে মরে গেছে', অথবা কুওমিনতাঙের 'পরিবেষ্টন ও দমন' বাহিনীর পশ্চিম-রুটের প্রধান সেনাপতি চেন মিং-শু যেমন বলেছিল, 'জাতীয় বাহিনী সর্বত্র আঁধারে

হাতড়ে বেড়ায়, আর লালফৌজ সর্বত্রই প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়ায়'—ঠিক এই রকম অবস্থা তৈরী হলেই আমাদের উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। এইরকম সময়ে শত্রুবাহিনী শক্তিশালী হলেও অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। তার সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাদের মনোবল ভেঙে যায় এবং তার দুর্বল স্থানের অনেকগুলোই প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু দুর্বল হলেও লালফৌজ তার শক্তিকে সঞ্চয় করে রেখেছে আর ক্লান্ত শত্রুর জন্য নিশ্চিন্তে প্রতীক্ষা করছে। এইরকম একটা সময়ে সাধারণতঃ দুই পক্ষের মধ্যে কোন একটা পরিমাণের সমতা অর্জিত হতে পারে, বা শত্রুর চরম উৎকৃষ্টতা আপেক্ষিক উৎকৃষ্টতায় এবং আমাদের চরম নিকৃষ্টতা আপেক্ষিক নিকৃষ্টতায় পরিবর্তিত হতে পারে। এমনও হতে পারে যে, শত্রুবাহিনী আমাদের বাহিনীর থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং আমাদের সৈন্যবাহিনী বরং শত্রুর সৈন্যবাহিনীর চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কিয়াংসীতে তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে লড়বার সময়ে লালফৌজ চরম সীমা পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করেছিল (লালফৌজকে ঘাঁটি এলাকার পশ্চাদ্ভাগে সমাবেশ করা হয়েছিল); এমন না করলে শত্রুকে পরাজিত করা যেত না। কারণ শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' বাহিনী তখন সংখ্যায় লালফৌজের দশ গুণেরও বেশি ছিল। সুন উ জু বলেছিলেন: 'শত্রু যতক্ষণ সতেজ থাকে তাকে এড়িয়ে চল, আর যখন সে ক্লান্ত হয়ে ফিরে যায় তখন তাকে আঘাত কর'। এ কথা বলতে গিয়ে তিনি শত্রুর উৎকৃষ্টতা নষ্ট করবার জন্য তাকে ক্লান্ত ও মন-মরা করে ফেলার কথাই উল্লেখ করেছিলেন।

পশ্চাদপসরণের সর্বশেষ লক্ষ্য হচ্ছে, শত্রুকে ভুল করতে প্ররোচিত করা বা তার ভুলগুলোকে খুঁজে বের করা। এ কথা উপলব্ধি করতেই হবে যে, শত্রুদের যে কোন কম্যাণ্ডার, তা সে যত বিচক্ষণই হোক না কেন, বেশ একটা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কিছু ভুলত্রুটি এড়াতে পারে না, আর তার রেখে যাওয়া সেই ফাঁকগুলোকে কাজে লাগানো আমাদের পক্ষে সব সময়েই সম্ভব। আমরা যেমন কোন কোন সময়ে নিজেরা হিসেবে ভুল করে শত্রুকে সে ফাঁকের সুযোগ নিতে দিই, শত্রুও তেমনি ভুল করতে পারে। উপরন্তু, আমরা কৌশল খাটিয়ে শত্রুকে ভুল প্রলুব্ধ করতে পারি। উদাহরণ হিসেবে, সুন উ জু যেমন 'ভান করবার' কথা বলেছেন, যেমন পূর্বদিকে আক্রমণের ভান করে পশ্চিমদিকে আক্রমণ করা। এইরকম করতে হলে পশ্চাদপসরণের শেষ-স্থান কোন একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে অনমনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। কোন কোন সময়ে

পূর্বনির্ধারিত অঞ্চলে পিছু হটে গিয়েও সুযোগ নেবার মতো ফাঁক দেখা যায় না, তখন আমাদের আরও দূরে পশ্চাদপসরণ করতে হবে শত্রুর মধ্যে 'ফাঁক' দেখা দেবার সুযোগের অপেক্ষা করার জন্য।

পশ্চাদপসরণের দ্বারা আমরা যে অনুকূল অবস্থা পেতে চাই, সেটা উপরে মোটামুটিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, শুধু এই শর্তাদির সবগুলি উপস্থিত থাকলেই কেবল পাল্টা আক্রমণ শুরু করা যাবে। একই সময়ে এদের সবগুলির উপস্থিতি সম্ভব নয়, আর তার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু প্রবলতর শত্রুর বিরুদ্ধে যে দুর্বল বাহিনী অন্তর্লাইনে লড়াই করে, তার পক্ষে শত্রুর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় শর্ত অর্জন করার জন্য মনোযোগ দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে বিপরীত অভিমতগুলি ভুল।

গোটা পরিস্থিতি বিচারের ভিত্তিতেই পশ্চাদপসরণের শেষসীমা নির্ধারণ করতে হবে। আংশিক পরিস্থিতির দৃষ্টিতে কোন স্থানকে আমাদের পাল্টা আক্রমণ শুরু করবার পক্ষে অনুকূল বলে মনে হলেও সামগ্রিক পরিস্থিতির দিক থেকে যদি তা সুবিধাজনক না হয়, তাহলে তেমন স্থানকে পশ্চাদপসরণের শেষ সীমা হিসেবে নিবারণ করাটা সঠিক হবে না। কারণ, পরে কি কি পরিবর্তন ঘটা সম্ভব, তা পাল্টা আক্রমণ শুরু করবার সময়ে অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন, এবং আমাদের পাল্টা আক্রমণ সব সময়েই আংশিক-ভাবে শুরু হয়। কোন কোন সময়ে ঘাঁটি এলাকার সম্মুখভাগে পশ্চাদপসরণের শেষ সীমাকে নির্বাচিত করতে হয়, যেমন করা হয়েছিল কিয়াংসীতে দ্বিতীয় ও চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে এবং শেনসী-কানসু এলাকায় তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে। কোন কোন সময়ে সেটা ঘাঁটি এলাকার মধ্যভাগে হওয়া উচিত, যেমন হয়েছিল কিয়াংসীতে প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে। অন্য সময়ে সেটাকে নির্দিষ্ট করতে হবে ঘাঁটি এলাকার পশ্চাৎ অংশে, যেমন করা হয়েছিল কিয়াংসীতে তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে। এইসবের বেলায়, আংশিক পরিস্থিতিকে সামগ্রিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিয়াংসীতে পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণের সম্বন্ধে কোন বিবেচনাই করেনি, কারণ আংশিক পরিস্থিতি বা সামগ্রিক পরিস্থিতি কোনটার প্রতিই তারা

মনোযোগ দেয়নি, এটা সত্যি সত্যিই ছিল বেপরোয়া ও গোঁয়ারগোবিন্দ আচরণ। পরিস্থিতি অনেকগুলো শর্ত নিয়ে গঠিত হয়। আংশিক ও সামগ্রিক পরিস্থিতির সম্পর্কের কথা বিচার করতে গিয়ে শত্রু ও আমাদের উভয় পক্ষের শর্তগুলো—যা আংশিক ও সামগ্রিক পরিস্থিতিকে সৃষ্টি করে, তা আমাদের পাল্টা আক্রমণ শুরু করার পক্ষে কিছু পরিমাণে অনুকূল কিনা, তার ওপরেই গড়ে তুলতে হবে আমাদের বিচার-বিবেচনার ভিত্তি।

ঘাঁটি এলাকায় পশ্চাদপসরণের শেষ সীমাকে সাধারণভাবে তিন রকমে ভাগ করা যায়, যথা সম্মুখভাগ, মধ্যভাগ ও পশ্চাৎ অংশ। এর অর্থ কি এই যে, আমরা শ্বেত এলাকায় লড়াই করতে একেবারেই অস্বীকার করি? না। কেবলমাত্র শত্রুদের বিরাটাকারের 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের মোকাবিলা করতে হলেই আমরা শ্বেত এলাকায় লড়াই করতে অস্বীকার করি। শত্রুর ও আমাদের শক্তির মধ্যে যখন বিরাট অসমতা থাকে, শুধু তখনই আমাদের সামরিক শক্তিকে সংরক্ষিত করার এবং শত্রুকে পরাভূত করবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করার নীতির ভিত্তিতে ঘাঁটি এলাকায় পিছু হটে যাবার ও শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনবার পক্ষে কথা বলি, কারণ শুধু এইভাবেই কাজ করেই আমরা পাল্টা আক্রমণের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে বা খুঁজে পেতে পারি। পরিস্থিতি যদি এতটা গুরুতর না হয়, অথবা এটা যদি এতই গুরুতর হয় যে, ঘাঁটি এলাকাতেও লাল-ফৌজ পাল্টা আক্রমণ শুরু করতে পারে না, অথবা পাল্টা আক্রমণ যদি অকৃতকার্য হয় এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আরও পিছু হটার দরকার হয়, তাহলে আমাদের মেনে নেওয়া উচিত যে, পশ্চাদপসরণের শেষ সীমাকে শ্বেত এলাকাতেও নির্বাচিত করা সম্ভব। অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে আমাদের এটা স্বীকার করা উচিত, যদিও অতীতে আমাদের এ ধরনের অভিজ্ঞতা ছিল খুবই কম।

শ্বেত এলাকায় পশ্চাদপসরণের শেষ সীমাকেও মোটমুটিভাবে তিনটি ধরনে ভাগ করতে পারা যায়: (১) আমাদের ঘাঁটি এলাকার অগ্রে, (২) ঘাঁটি এলাকার পাশে, (৩) ঘাঁটি এলাকার পিছনে। প্রথম ধরনের শেষ সীমার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

কিয়াংসীতে প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে যদি লালফৌজের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও স্থানীয় পার্টি-সংগঠনের

মধ্যে বিভেদ না ঘটত, অর্থাৎ লি লি-সান লাইন ও A-B গ্রুপ[৩৬] —এই দুটি কঠিন সমস্যা যদি না থাকত, তাহলে এটা কল্পনা করা যায় যে, আমরা কিয়ান, নানফেং ও চাংশু এই তিনটি জায়গার মধ্যেকার ত্রিভুজাকৃতি অঞ্চলে আমাদের সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে পাল্টা আক্রমণ শুরু করতে পারতাম। কারণ তখন কান ও ফু নদী দুটির মধ্যবর্তী এলাকা[৩৭] দিয়ে যে শত্রুবাহিনী এগিয়ে আসছিল, তার সৈন্যশক্তি লালফৌজের তুলনায় খুব বেশি ছিল না (৪০,০০০-এর বিরুদ্ধে ১০০,০০০)। জনসমর্থনের দিক থেকে ওখানকার অবস্থা ঘাঁটি এলাকার চেয়ে খারাপ হলেও যুদ্ধের জন্য অবস্থানটা আমাদের পক্ষে অনুকূল ছিল। উপরন্তু তখন শত্রু পৃথক পৃথক পথে এগিয়ে আসছিল, এমন সুযোগে তাকে একে একে বিধ্বস্ত করা যেত।

দ্বিতীয় ধরনের শেষ সীমার একটা উদাহরণ ধরা যাক :

কিয়াংসীতে তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে শত্রুর আক্রমণ যদি অত বিরাট আকারে না হতো, শত্রুর একটি সৈন্যদল যদি ফুচিয়ান-কিয়াংসী সিমান্তস্থ চিয়াননিং, লিছুয়ান ও থাইনিং থেকে অগ্রসর হতো এবং আমাদের আক্রমণের পক্ষে সেই সৈন্যদলের শক্তি যদি খুব বেশি না হতো, তাহলে এটাও কল্পনা করা যায় যে, লালফৌজ পশ্চিম ফুচিয়ানের শ্বেত এলাকাতে তার সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করতে পারত এবং প্রথমেই সেই শত্রু দলটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলতে পারত, জুইচিন দিয়ে সিংকুও পর্যন্ত হাজার লী তাদের ঘুরে যেতে হতো না।

তৃতীয় ধরনের শেষ সীমার উদাহরণ :

কিয়াংসীতে উপরোক্ত তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে, শত্রুর প্রধান বাহিনী যদি পশ্চিমদিকে না গিয়ে দক্ষিণ দিকে যেত, তাহলে আমরা হয়তো হুইছাং-স্যানউ-আনইয়ুয়ান এলাকায় (শ্বেত এলাকার) সরে যেতে বাধ্য হয়ে শত্রুকে আরও দক্ষিণ দিকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম, তারপরে লালফৌজ আবার দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে আক্রমণ চালিয়ে লাল ঘাঁটি এলাকার অভ্যন্তরে যেতে পারত, আর সেই সময়ে উত্তরদিকে লাল ঘাঁটি এলাকায় অবস্থিত শত্রুসৈন্যের সংখ্যা খুব বেশি হতে পারত না।

কিন্তু উপরোক্ত সবগুলোই হচ্ছে মনগড়া দৃষ্টান্ত—সেগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতার

উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। সেগুলোকে অসাধারণ ব্যাপার হিসেবে গণ্য করতে হবে, সাধারণ নীতি হিসেবে ধরলে চলবে না। শত্রু যখন একটা বিরাট আকারের 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান শুরু করে, তখন আমাদের সাধারণ নীতি হচ্ছে শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনা, ঘাঁটি এলাকার মধ্যে সরে এসে লড়াই করা, কারণ শত্রুর আক্রমণকে বিধ্বস্ত করার এটাই হচ্ছে আমাদের নিশ্চিততম পদ্ধতি।

'প্রবেশদ্বারের বাইরে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখবার' সপক্ষে যারা বলে, তারা রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের বিরোধিতা করে। তাদের যুক্তি এই যে, পশ্চাদপসরণ করার অর্থ আমাদের ভূমি হাতছাড়া করা এবং জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা (তথাকথিত 'আমাদের হাঁড়িকুড়ি ভেঙে খান খান হতে দেওয়া'), আর বাইরে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে তারা যুক্তি দেখাল যে, আমরা এক পা পিছিয়ে গেলে শত্রুর দুর্গগুলোও এক পা এগিয়ে আসবে এবং এইভাবে আমাদের ঘাঁটি এলাকা দিন দিন সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে এবং সেই হৃত ভূমিকে পুনরুদ্ধার করার আমাদের কোন উপায় থাকবে না। তারা বলত যে, শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনাটা অতীতে কার্যকরী হয়ে থাকলেও পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের ক্ষেত্রে শত্রুর দুর্গ-নীতির পরিপ্রেক্ষিতে তা কার্যকরী হবে না। তারা বলত যে, এই অভিযানের মোকাবিলা করবার একমাত্র পথ হল আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে প্রতিরোধ করা আর শত্রুর ওপরে সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত আকস্মিক হামলা করা।

এ ধরনের অভিমতের জবাব দেওয়া সহজ এবং আমাদের ইতিহাস তা ইতিমধ্যেই দিয়েছে। ভূমি হারানোর ব্যাপারে, এটা প্রায়ই ঘটে যে, হারিয়েই কেবল হারানোকে ঠেকাতে পারা যায়, এ হচ্ছে 'নেওয়ার জন্য প্রথমে দেওয়ার' নীতি। যা আমরা হারাই সেটা যদি ভূমি হয় এবং যা আমরা লাভ করি সেটা যদি শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ হয়, এবং আরও আমাদের ভূমির পুনরুদ্ধার ও সম্প্রসারণ হয়, তাহলে সেটা লাভজনক ব্যাপার। বাজারের কেনাকাটায়, ক্রেতা যদি তার কিছু টাকা না 'হারায়' তাহলে সে মাল পেতে পারে না, আবার বিক্রেতা যদি তার কিছু মাল না 'হারায়' তাহলে সে টাকা পেতে পারে না। বিপ্লবী আন্দোলনে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তা হচ্ছে ধ্বংস, আর যা লাভ হয় তা হচ্ছে প্রগতিশীল গঠনকার্য। ঘুমে আর বিশ্রামে

সময়ের লোকসান ঘটে, কিন্তু তাতে আগামীকালের কাজের জন্য কর্মশক্তি অর্জিত হয়। যদিও কোন বোকা এটা না বুঝে ঘুমুতে অস্বীকার করে, তাহলে পরের দিন তার কোন কর্মশক্তি থাকবে না, আর সেটা হচ্ছে লোকসানের ব্যবসা। ঠিক এই কারণেই শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকালে আমাদের হার হয়েছে। কিছু ভূমি ছেড়ে দিতে অনিচ্ছার ফলে সমস্ত ভূমিকেই হারাতে হয়েছিল। শত্রুর সঙ্গে জিদ ধরে সামনাসামনি লড়াই করার ফলে আবিসিনিয়াও তার সমগ্র দেশ হারিয়েছিল—যদিও সেটাই তার পরাজয়ের একমাত্র কারণ ছিল না।

জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রশ্নেও এটা খাটে। সাময়িকভাবে জনগণের এক অংশের ঘরের হাঁড়িকুড়ি ভেঙে খান খান করতে দিতে অস্বীকার করলে সমস্ত জনগণের হাঁড়িকুড়ি ভেঙে খান খান হবে এবং এমন অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকবে। সাময়িক প্রতিকূল রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত হলে তার জন্য ভীষণ মূল্য দিতে হবে অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। অক্টোবর বিপ্লবের পরে, রুশ বলশেভিকরা যদি 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' অভিমত অনুসারে জার্মানীর সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে সই করতে অস্বীকার করত, তাহলে নবজাত সোভিয়েতকে অকালমৃত্যুর বিপদে পড়তে হতো[৩৮]।

এ ধরনের 'বাম' অভিমত যা আপাতঃদৃষ্টিতে বিপ্লবী বলে মনে হয়, তার উৎপত্তি হয়েছে পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী অসহিষ্ণুতা থেকে এবং ক্ষুদে উৎপাদক-কৃষকদের সঙ্কীর্ণ রক্ষণশীলতা থেকে। কোন সমস্যা বিচার করতে গেলে তারা শুধু তার একটা অংশই দেখে, সামগ্রিক পরিস্থিতিটির পরিপূর্ণ ছবিটা দেখতে তারা অক্ষম। আগামীকালের স্বার্থের সঙ্গে আজকের স্বার্থের অথবা সমগ্রের স্বার্থের সঙ্গে অংশের স্বার্থের সংযোগসাধন করতে তারা অনিচ্ছুক। কিন্তু সমস্ত আংশিক ও সাময়িক জিনিসই তারা মরণপণ করে আঁকড়ে ধরে থাকে। সত্যি, বর্তমান বাস্তব অবস্থা অনুসারে দেখতে গেলে, যে আংশিক ও সাময়িক জিনিস বর্তমান গোটা পরিস্থিতির পক্ষে ও গোটা পর্যায়ের পক্ষে অনুকূল, বিশেষ করে যে আংশিক ও সাময়িক জিনিস নির্ধারক তাৎপর্যসম্পন্ন, সে সব সবগুলোকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরে থাকা উচিত। অন্যথায়, আমরা স্বতঃস্ফূর্ততার বা-হাত না দেওয়ার নীতির সমর্থক হয়ে পড়ব। এই কারণেই পশ্চাদপসরণের জন্য অবশ্যই একটা শেষ সীমা থাকা দরকার। কিন্তু,

এ ক্ষেত্রে ক্ষুদে উৎপাদকদের অদূরদর্শিতার উপর কোনোমতেই আমাদের নির্ভর করা উচিত নয়। বলশেভিকদের বিচক্ষণতা আমাদের শিখে নিতে হবে। আমাদের খোলা চোখের দৃষ্টিশক্তিই যথেষ্ট নয়, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য আমাদের অবশ্যই নিতে হবে। মার্কসবাদী পদ্ধতিই হচ্ছে রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারের দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

অবশ্য, রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের অসুবিধা আছে। পশ্চাদপসরণ শুরু করবার উপযুক্ত মুহূর্ত নির্ধারণ করা, পশ্চাদপসরণের শেষ সীমা বাছাই করে নেওয়া, রাজনীতিগতভাবে কর্মীদের ও জনগণকে বুঝিয়ে বলা—এ সবই হচ্ছে কঠিন সমস্যা, যার সমাধান অবশ্যই করতে হবে।

পশ্চাদপসরণ শুরু করবার উপযুক্ত মুহূর্ত নির্ধারণ করার সমস্যাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিয়াংসীতে প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে আমাদের পশ্চাদপসরণটিকে ঠিক যে সময়ে করা হয়েছিল, যদি তখন তা না করা হতো, অর্থাৎ যদি আমরা দেরী করতাম, তাহলে অন্ততঃ আমাদের জয়ের মাত্রাটা কমে যেত। ঠিক সময়ের আগে অথবা পরে পশ্চাদপসরণ ক্ষতিকর। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, খুব আগে পশ্চাদপসরণ করার তুলনায় খুব দেরীতে পশ্চাদপসরণ করার ক্ষতি বেশি। যথাসময়ে পশ্চাদপসরণ করলে উদ্যোগকর্মতা সম্পূর্ণভাবে আমাদের হাতে থাকবে, এটা আমাদের পশ্চাদপসরণের শেষ সীমায় পৌঁছানোর পর আমাদের বাহিনীকে পুনরায় দলবদ্ধ করার ব্যাপারে এবং ক্লান্ত শত্রুর জন্য নিশ্চিন্তে প্রতিক্ষা করে পাল্টা আক্রমণের পথে পা বাড়াবার ব্যাপারে খুবই সহায়ক হয়ে থাকে। কিয়াংসীতে শত্রুর প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চুরমার করার যুদ্ধাভিযানে আমরা আস্থার সঙ্গে ধীরস্থিরভাবে শত্রুর মোকাবিলা করতে পেরেছিলাম। শুধু তৃতীয় যুদ্ধাভিযানের সময়ে এক জায়গায় জড়ো হবার জন্য লালফৌজকে তড়িঘড়ি অনেক পথ ঘুরে ঘুরে যেতে হয়েছিল—ফলে তারা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কারণ দ্বিতীয় যুদ্ধাভিযানে অমন শোচনীয়ভাবে পরাজয় ভোগ করার পরেই এত তাড়াতাড়ি শত্রু যে একটা নতুন আক্রমণ শুরু করবে, তা আমরা আন্দাজ করতে পারিনি (দ্বিতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের লড়াই শেষ করি ১৯৩১ সালের ২৯শে মে, আর চিয়াং কাই-শেক তার তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান শুরু করে ১লা জুলাই তারিখে)। পশ্চাদপসরণ শুরু

করবার উপযুক্ত মুহূর্তটা স্থির করা নির্ভর করে প্রয়োজনীয় তথ্য-সংগ্রহের উপর, এবং শত্রুপক্ষের ও আমাদের পক্ষের সাধারণ পরিস্থিতির বিচার-বিবেচনার উপর। 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্যায় শুরু হওয়ার উপযুক্ত মুহূর্ত নির্ধারণের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বনের কথা আগে বলা হয়েছে, এখানেও ঠিক সেই একইরকম পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের ব্যাপারে, যখন কর্মী ও জনগণের কোন অভিজ্ঞতা থাকে না, এবং সামরিক নেতৃত্বের মর্যাদা যখন এমন উচ্চ স্তরের হয়ে উঠেনি যে সে নেতৃত্ব রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের বিষয় নির্ধারণের কর্তৃত্বকে অল্প কয়েকজনের হাতে এমনকি একজনের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে দিতে পারে এবং সেই একই সময়ে কর্মীদের আস্থাও অর্জন করতে পরে, তখন রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কর্মী ও জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়াটা খুবই কঠিন সমস্যা। কর্মীদের অভিজ্ঞতা ছিল না এবং রণনীতিগত পশ্চাদ-পসরণের উপর তাদের বিশ্বাস ছিল না বলে প্রথম ও চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের শুরুতে এবং পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের সমগ্র প্রক্রিয়ায় এই প্রশ্নে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল! প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে লি লি-সান লাইনের প্রভাব দেখা দিয়েছিল বলে কর্মীদের সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করানোর আগে পর্যন্ত তাদের অভিমত পশ্চাদপ-সরণের পক্ষে ছিল না, বরং আক্রমণ চালানোর পক্ষে ছিল। চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে সামরিক হঠকারিতার প্রভাবে কর্মীরা পশ্চাদপসরণের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে ছিল। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে, কর্মীরা প্রথমে অব্যাহতভাবে সামরিক হঠকারিতাবাদী দৃষ্টিকোণ আঁকড়ে ছিল—যা শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনার বিরোধী ছিল, পরে তা সামরিক রক্ষণশীলতাবাদে পরিণত হল। অন্য একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, চাং কুও-তাও লাইনের অনুসরণকারীরা এটা বিশ্বাস করত না যে, তিব্বতীয় এবং হুই জাতির[39] অঞ্চলে আমাদের ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা অসম্ভব, দেওয়ালে মাথা ঠোকার পরেই কেবল তারা এ কথাটা বিশ্বাস করেছে। কর্মীদের পক্ষে অভিজ্ঞতা একান্ত প্রয়োজনীয়, আর সত্যিই বিফলতাই হচ্ছে সফলতার জননী। কিন্তু অন্য লোকদের অভিজ্ঞতাকেও বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করা দরকার। সব

ব্যাপারেই নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতীক্ষায় থাকা এবং তা অর্জিত হওয়ার আগে নিজের মতামতে একগুঁয়েভাব লেগে থেকে অন্যের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করাটা হচ্ছে নিছক 'সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদ'। এর জন্য যুদ্ধে আমাদের কম ক্ষতি হয়নি।

অভিজ্ঞতা ছিল না বলে রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জনগনের অবিশ্বাস কিয়াংসীতে প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে যত প্রচল ছিল, আর কোনদিনই তত প্রবল ছিল না। সেই সময়ে কিয়ান, সিংকুও ইয়োংফেং জেলার স্থানীয় পার্টি-সংগঠনগুলো ও জনসাধারণ সবাই লালফৌজের পশ্চাদপসরণের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু প্রথম 'পবিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম থেকে অভিজ্ঞতালাভের পর, পরবর্তী কয়েকটি 'পারবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে এ ধরনের কোন সমস্যাই আর দেখা দেয়নি। সকলেই বিশ্বাস করেছে যে আমাদের ঘাঁটি এলাকার ভূমি হারানোটা ও জনগণের দুঃখদুর্দশাটা হচ্ছে সাময়িক ব্যাপার এবং সকলেরই এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দেবার ক্ষমতা লালফৌজের আছে। কিন্তু, জনগণের বিশ্বাস থাকা না থাকাটা কর্মীদের বিশ্বাস থাকা না থাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, আর তাই প্রধান এবং প্রথম কাজ হচ্ছে কর্মীদেরকে বিশ্বস করানো

রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের সমগ্র ভূমিকা হচ্ছে পাল্টা আক্রমণের দিকে আমাদের যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া এবং রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ হচ্ছে রণনীতিগত প্রতিরক্ষার প্রথম পর্যায় মাত্র। পরবর্তী পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে জয়লাভ করা যাবে কিনা, তা-ই হচ্ছে গোটা রণনীতির নির্ধারক চাবিকাঠি।

৪। রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ

চরম উৎকৃষ্টতর শত্রুর আক্রমণকে ব্যর্থ করার জন্য আমরা নির্ভর করি আমাদের রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের পর্যায়ে সৃষ্ট পরিস্থিতির উপরে—যে পরিস্থিতিটি আমাদের পক্ষে অনুকূল, আর শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল, এবং এই পরিস্থিতিটি শত্রুর আক্রমণ শত্রুর পরিস্থিতি থেকে পৃথক। বিভিন্ন শর্তের দ্বারা এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সবই উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু, আমাদের পক্ষে অনুকূল ও শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল এইসব শর্ত ও পরিস্থিতির উপস্থিতির অর্থ এই নয় যে, আমরা ইতিমধ্যেই শত্রুকে পরাজিত করেছি। এ ধরনের শর্ত ও পরিস্থিতি জয়-পরাজয়ের সম্ভাব্যতা যোগায়, কিন্তু জয় বা পরাজয়ের বাস্তবতা তাতে গড়ে ওঠে না, দুটি সৈন্যবাহীর কারুর কাছেই সেগুলি সত্যিকারের জয় বা পরাজয় এখনো এনে দেয়নি। জয়-পরাজয় স্থির করতে দুটি সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একটা নির্ধারক লড়াইয়ের দরকার। কে জয়ী, কে পরাজিত—এ প্রশ্নের সমাধান শুধুমাত্র নির্ধারক লড়াইই করতে পারে। এটাই হচ্ছে রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ের একমাত্র কর্তব্য। পাল্টা আক্রমণ হচ্ছে একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত পর্যায়, এবং প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধের শেষ পর্যায়ও বটে। সক্রিয় প্রতিরক্ষা বলতে মুখ্যতঃ এই নির্ধারক চরিত্র সম্পন্ন রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণেরই উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

শুধু যে রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের পর্যায়েই শর্ত ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা নয়, পরন্তু পাল্টা আক্রমণের পর্যায়েও অব্যাহতভাবে তার সৃষ্টি হতে থাকে। আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে এই সময়ের শর্ত ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে আগের পর্যায়ের মত নয়।

আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে যা একই থাকতে পারে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই ঘটনা যে, পাল্টা আক্রমণের সময়ে শত্রুসৈন্যর ক্লান্তিবৃদ্ধি ও অধিকতর সংখ্যাহ্রাস হচ্ছে আগের পর্যায়ে তাদের ক্লান্তি ও সংখ্যাহ্রাসের ধারাবাহিক রূপ মাত্র।

কিন্তু পুরোপুরি নতুন শর্ত এবং পরিস্থিতিও দেখা দিতে বাধ্য। ধরা যাক, যখন শত্রু যুদ্ধে একবার বা কয়েকবার পরাজয় বরণ করে, তখন আমাদের পক্ষে অনুকূল ও শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল শর্ত শত্রুর ক্লান্তি ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না, পরন্তু শত্রু পরাজয় ভোগ করছে এমন নতুন অবস্থাও দেখা দেবে। পরিস্থিতিতেও নতুন পরিবর্তন ঘটবে। শত্রু যখন বিশৃঙ্খলভাবে তড়িঘড়ি তার সৈন্য বিন্যাস পুনর্গঠিত করে, ভুল চাল দিতে শুরু করে, তখন দুটি সৈন্যবাহিনীর আপেক্ষিক শক্তির বৈষম্য স্বভাবতঃই আর আগের মতো থাকবে না।

কিন্তু শত্রুর বদলে আমরাই যদি একবার বা কয়েকবার পরাজিত হই, তা-হলে শত্রু ও পরিস্থিতি বিপরীত দিকে বদলে যাবে। অর্থাৎ শত্রুর পক্ষে

অবস্থার প্রতিকূলতা কমে যাবে, আর আমাদের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা দেখা দেবে, এমনকি বাড়বেও। এই অবস্থাটাও হবে সম্পূর্ণ নতুন—পুরানো অবস্থার থেকে এটা হবে একেবারে অন্যরকম।

এ দুইয়ের যে-কোন পক্ষের পরাজয়ই প্রত্যক্ষ ও দ্রুতভাবে পরাজিত পক্ষকে একটা নতুন প্রয়াস নিতে বাধ্য করবে—পরাজিত পক্ষ বিপর্যয় এড়াবার এবং নিজের প্রতি প্রতিকূল ও শত্রুর প্রতি অনুকূল নতুন শর্ত ও পরিস্থিতির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করবে এবং প্রতিপক্ষের উপর চাপ দেওয়ার জন্য এমন শর্ত ও পরিস্থিতি নতুন করে সৃষ্টির চেষ্টা করবে, যা নিজের পক্ষে অনুকূল এবং শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল।

আর ঠিক এর বিপরীত হবে বিজয়ী পক্ষের প্রয়াস। সে নিজের জয়টাকে বাড়াবার ও শত্রুর আরও বেশী ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, যাতে করে নিজের পক্ষে অনুকূল শর্ত ও পরিস্থিতি আরও বৃদ্ধি বা বিকাশ লাভ করে, প্রতিপক্ষ যাতে প্রতিকূল অবস্থার হাত থেকে নিজে মুক্ত করতে এবং বিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে না পারে।

এইভাবে, উভয় পক্ষের জন্যই নির্ধারক লড়াইয়ের পর্যায়ের সংগ্রামটি গোটা যুদ্ধের বা গোটা যুদ্ধাভিযানের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তীব্র, সবচেয়ে বেশী জটিল, সবচেয়ে বেশী পরিবর্তনশীল এবং সবচেয়ে বেশী দুরূহ ও কষ্টকট হয়ে থাকে। পরিচালনা করার পক্ষে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন সময়।

পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে অনেক সমস্যা থাকে, আর তাদের মধ্যে মুখ্য হচ্ছে পাল্টা অক্রমণ শুরু করার সমস্যা, সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার সমস্যা চলমান লড়াইয়ের সমস্যা, দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ের সমস্যা ও নির্মূলীকরণের লড়াইয়ের সমস্য ইত্যাদি।

পাল্টা আক্রমণেই হোক বা আক্রমণেই হোক, এইসব সমস্যা সম্পর্কিত নীতিগুলির মৌলিক চরিত্রে কোন পার্থক্যই নেই। এই অর্থে আমরা বলতে পারি যে, পাল্টা আক্রমণ হচ্ছে আক্রমণ।

তবুও পাল্টা আক্রমণ ও আক্রমণ ঠিক এক জিনিস নয়। যখন শত্রু আক্রমণ করে, তখন আমরা পাল্টা আক্রমণের নীতি প্রয়োগ করি। আর যখন শত্রু প্রতিরক্ষা করে, তখন আমরা আক্রমণের নীতি প্রয়োগ করি। এই অর্থে, পাল্টা আক্রমণ ও আক্রমণের মধ্যে কতকগুলো পার্থক্য রয়েছে।

এই কারণে, যদিও রণনীতিগত প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত অধ্যায়ের পাল্টা

আক্রমণের অংশে লড়াই করার অনেক সমস্যারই আলোচনা করা হয় এবং পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্য রণনীতিগত আক্রমণ সম্পর্কিত অধ্যায়ে শুধুমাত্র অন্যান্য সমস্যার আলোচনা করা হবে, তবুও বাস্তব প্রয়োগের সময়ে, পাল্টা আক্রমণ ও আক্রমণের যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে, তাদের কোনটিকেই উপেক্ষা করা আমাদের উচিত হবে না।

৫। পাল্টা আক্রমণ শুরু করা।

পাল্টা আক্রমণ শুরু করার সমস্যা হচ্ছে 'প্রথম লড়াই' বা 'প্রারম্ভিক লড়াইয়ের' সমস্যা।

রণনীতিগত প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কিংবা রণনীতিগত আক্রমণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে, বহু বুর্জোয়া রণবিশারদ প্রথম লড়াইয়ের সময়ে সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়। অতীতে আমরাও গুরুত্বের সঙ্গে এই সমস্যাটাকে পেশ করেছি। কিয়াংসী প্রদেশে শত্রুর পাঁচটি 'পরিবেষ্টন ও দমন, অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আমাদেরকে প্রচুর অভিজ্ঞতা যুগিয়েছে—সেগুলির পর্যালোচনা করলে আমরা অবশ্যই উপকৃত হব।

প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে শত্রু প্রায় এক লাখ সৈন্য নিয়োজিত করেছিল। তারা কিয়ান-চিয়াননিং লাইনে আটটি কলামে বিভক্ত হয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণদিকে লালফৌজের ঘাঁটি এলাকার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। তখন লালফৌজের সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ হাজার কিয়াংসী প্রদেশের নিংতূ জেলার হুয়াংপি আর সিয়াওপু অঞ্চলে তারা সৈন্য সমাবেশ করেছিল।

পরিস্থিতিটা ছিল এই রকম :

(১) 'দমন' বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এক লাখের বেশী ছিল না এবং তাদের কেউই চিয়াং কাই শেকের নিজস্ব সৈন্য ছিল না, আর সামগ্রিক পরিস্থিতিও খুব গুরুতর ছিল না।

(২) শত্রুবাহিনীর লুও লিনের পরিচিত ডিভিশনটি কিয়ান শহর রক্ষা করছিল। সেই ডিভিশনটি অবস্থিত ছিল কান নদীর অপর পারে অর্থাৎ পশ্চিম পারে।

(৩) কুং পিং-ফান, চাং হুই-জান আর থান তাও-ইউয়ানের অধীনে তিনটি শত্রু ডিভিশন এগিয়ে এসে কিয়ানের দক্ষিণ-পূর্বস্থ ও নিংতুর

উত্তরপশ্চিমস্থ ফুতিয়েন-তুংকু-লুংকাং-ইউয়ানখৌ অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। চাং হুই-জানের ডিভিশনের প্রধান বাহিনী ছিল লুংকাংয়ে আর থান তাও-ইউয়ানের ডিভিশনের প্রধান বাহিনী ছিল ইউয়ানখৌতে। A-B গ্রুপের দ্বারা প্রতারিত হয়ে ফুতিয়েন ও তুংকুর অধিবাসীরা এক সময়ে লালফৌজকে বিশ্বাস করত না এবং লালফৌজের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল, তাই ফুতিয়েন আর তুংকুকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করাটা ছিল অসঙ্গত।

(৪) লিউ হো-তিংয়ের পরিচালিত শত্রু ডিভিশনটি ছিল বহু দূরে—ফুকিয়ান প্রদেশের শ্বেত এলাকার চিয়ানিনিংয়ে; সেই বাহিনীটা অবশ্যই যে কিয়াংসী প্রদেশে প্রবেশ করবে তা কিন্তু মনে হয়নি।

(৫) মাও পিং-ওয়েন আর স্যু খে-সিয়াংয়ের পরিচালিত দুইটি শত্রু ডিভিশন কুয়াংছাং ও নিংতুর মধ্যেকার থৌপি-লুওখো-তুংশাও অঞ্চলে ঢুকে পড়েছিল। থৌপি একটা শ্বেত এলাকা, লুওখো ছিল গেরিলা অঞ্চল, তোংশাওতে থাকত A-B গ্রুপ, এখান থেকে শত্রুর কাছে খবর বেরিয়ে যাওয়া খুব সম্ভব ছিল। অধিকন্তু, আমরা যদি প্রথমে এই জায়গায় মাও পিং-ওয়েন ও স্যু খে-সিয়াংকে আক্রমণ করে পশ্চিমদিকে আক্রমণ চালাতাম, তাহলে চাং হুই-জান, থান তাও ইউয়ান আর কুং পিং-ফানের নেতৃত্বাধীন তিনটি শত্রু ডিভিশন একত্রে মিলে যেতে পারত এবং জয়লাভ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠত, সমস্যার শেষ মীমাংসাও আর হতো না।

(৬) চাং হুই-জান ও থান তাও ইউয়ানের পরিচালনাধীন দুটি ডিভিশন হল 'পরিবেষ্টন ও দমন' বাহিনীর প্রধান শক্তি, আর তারা ছিল 'পরিবেষ্টন ও দমন' বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ও কিয়াংসী প্রদেশে গভর্ণর লু তি-পিংয়ের নিজস্ব বাহিনী, আর চাং হুই-জান ছিল যুদ্ধফ্রণ্টের প্রধান কম্যাণ্ডার। এই দুটি ডিভিশনকে ধ্বংস করতে পারলে 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে মূলতঃ চূর্ণবিচূর্ণ করা যেত। এই দুটি ডিভিশনের প্রত্যেকটিতে প্রায় ১৪ হাজার সৈন্য ছিল, চাং হুই-জান তার ডিভিশনকে ভাগ করে দুই জায়গায় রেখেছিল। তাই প্রত্যেকবার একটি ডিভিশন করে আক্রমণ করলে আমরা চরম উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকতাম।

(৭) লুংকাং-ইউয়ানখৌ এলাকায় অবস্থিত ছিল চাং হুই-জান ও থান তাও-ইউয়ানের ডিভিশন দুটির প্রধান শক্তি, আর তা ছিল আমাদের

সৈন্যশক্তি সমাবেশিত হওয়ার জায়গার কাছাকাছি। সেখানে জনসমর্থন ভালই ছিল, তাই আমরা গোপনে গোপনে শত্রুর কাছে এগিয়ে যেতে পারতাম।

(৮) লুংকাংয়ে ভৌগোলিক অবস্থা আমাদের যুদ্ধের অনুকূল ছিল, আর ইউয়ানথৌকে আক্রমণ করা সহজ ছিল না। যদি শত্রু সিয়াওপুতে আমাদের আক্রমণ করত তাহলে আমরা সেখানেও ভাল অবস্থায় পেয়ে যেতাম।

(৯) লুংকাংয়ের দিকে আমরা বৃহত্তম সংখ্যক সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করতে পারতাম। লুংকাংয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে একশ লীর কম দূরত্বের মধ্যে সিংকুও অবস্থিত, সেখানে আমাদের একটা স্বতন্ত্র ডিভিশন ছিল, তার সৈন্যসংখ্যা এক হাজারের উপরে। এই ডিভিশন ঘুরে শত্রুর পিছনে গিয়ে কৌশলী অভিযান চালাতে পারত।

(১০) আমাদের সৈন্যবাহিনী যদি কেন্দ্রভাগকে ভেদ করে শত্রুর ফ্রন্টে ফাটল ধরাতে পারত, তাহলে পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত শত্রুর বাহিনীগুলো ব্যাপক ব্যবধানে দুটি দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত।

উপরোল্লিখিত যুক্তি অনুসারে আমরা স্থির করেছিলাম যে, আমাদের প্রথম লড়াইটি হবে চাং-হুই-জানের প্রধান শক্তির বিরুদ্ধে, এবং দুইটি ব্রিগেডের উপর ও ডিভিশনের সদর দপ্তরের উপরে আমরা সাফল্যের সঙ্গেই আঘাত হেনেছিলাম, ডিভিশনের সেনাপতিসহ ৯ হাজার সৈন্যের সবাইকেই আমরা বন্দী করেছিলাম—একটি সৈন্য বা ঘোড়াকেও পালাতে দিইনি। এই একটিমাত্র জয়েই আতঙ্কিত হয়ে থান তাও-ইউয়ানের ডিভিশন পালাল তুংশাওয়ের অভিমুখে আর স্যু কে-সিয়াংয়ের ডিভিশন পালাল থৌপির দিকে। আমাদের সৈন্যবাহিনী থান তাও-ইউয়ানের ডিভিশনের পিছু ধাওয়া করে তার অর্ধেককেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল। পাঁচ দিনের মধ্যে (১৯৩০ সালের ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৩১ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত) আমরা দুটি লড়াই করেছিলাম আর মার খাওয়ার ভয়ে ফুতিয়েন, তুংকু ও থৌপিতে অবস্থিত শত্রুবাহিনী তাড়াহুড়ো করে পিছু হটে গিয়েছিল বিশৃংখলভাবে। এমনি করেই শেষ হল প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান।

দ্বিতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের সময়ে পরিস্থিতিটা ছিল এই রকম :

(১) 'দমন' বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল দুই লাখ, তাদের প্রধান সেনাপতি ছিল হো ইং-ছিন। তার সদর দপ্তর ছিল নানছাংয়ে।

(২) শত্রুর প্রথম অভিযানের মতোই, এইসব শক্তিবাহিনীর কোনটাই চিয়াং কাই-শেকের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ছিল না। তাদের মধ্যে ছাই থিং-কাইয়ের অধীনস্থ ১৯তম রুট আর্মি, সুন লিয়ান-চোংয়ের নেতৃত্বাধীন ২৬তম রুট আর্মি এবং চু শাও লিয়াংয়ের পরিচালনাধীন অষ্টম রুট আর্মি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী বা বেশ শক্তিশালী, আর অবশিষ্ট অন্যান্য সব বাহিনীগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

(৩) A-B গ্রুপটিকে একেবারে নির্মূল করে ফেলা হয়েছিল আর আমাদের ঘাঁটি এলাকার সমগ্র জনগণই লালফৌজকে সমর্থন করতেন।

(৪) ওয়াং চিন-ইয়ুর নেতৃত্বাধীন পঞ্চম রুট আর্মি উত্তর চীন থেকে সবেমাত্র এসে পৌঁছেছিল আর তারা আমাদের ভয়ে ছিল সন্ত্রস্ত। এই আর্মির বাম পার্শ্বদেশস্থ কুও হুয়া-জোং এবং হাও মেং-লিংয়ের পরিচালনাধীন ডিভিশন দুটির অবস্থাও ছিল প্রায় একই রকম।

(৫) আমাদের সৈন্যবাহিনী যদি প্রথমে ফুতিয়েন আক্রমণ করে পূর্বদিকে লড়াই চালিয়ে যেত, তাহলে আমরা আমাদের ঘাঁটি এলাকাটিকে ফুকিয়ান-কিয়াংসী সীমান্তস্থ চিয়াননিং-লিছুয়ান থাইনিং অঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে পারতাম এবং পরবর্তী 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চূর্ণ করবার ব্যাপারে সাহায্য করবার মতো সরবরাহাদি সংগ্রহ করতে পারতাম। আমরা যদি পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে লড়াই চালিয়ে যেতাম, তাহলে আমরা কানচিয়াং নদীর মুখোমুখী এসে দাঁড়াতাম, ফলে লড়াই শেষ হওয়ার পর প্রসারলাভ করবার মতো জায়গা আমরা পেতাম না। পশ্চিমদিকে লড়াই শেষ করার পরে আমাদের বাহিনী যদি আবার পূর্বদিকে ফিরত, তাহলে আমাদের সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ত, আর সময়ও নষ্ট হতো।

(৬) প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে আমাদের সৈন্যসংখ্যা যত ছিল এবারে আমাদের সৈন্যসংখ্যা তার চেয়ে কিছুটা কম হলেও (৩০ হাজারের বেশি) আমাদের বাহিনী ভালভাবে বিশ্রাম করার ও কর্মশক্তি সঞ্চয় করার জন্য চার মাস সময় পেয়েছিল।

উপরোল্লিখিত যুক্তি অনুসারে আমরা ফুতিয়েন অঞ্চলেও ওয়াং চিন-ইয়ু এবং কুং পিং-ফানের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে (এদের সৈন্যসংখ্যা মোট ১১ রেজিমেণ্ট) প্রথমে লড়াই করার সিদ্ধান্ত করলাম। এই লড়াইয়ে জয়লাভের পরে আমরা পর্যায়ক্রমে কুও হুয়া-জোং, সুন লিয়ান-চুং, চু শাও-লিয়াং আর লিউ হো-তিংকে আক্রমণ করেছিলাম। (১৯৩১ সালের ১৬ই থেকে ৩০শে মে পর্যন্ত) ১৫ দিনে সাতশ লী অতিক্রম করেছিলাম, পাঁচবার লড়াই করেছিলাম এবং ২০ হাজারেরও বেশি রাইফেল অধিকার করে নিয়েছিলাম, আর শত্রুর 'পরিবেষ্টন দমন' অভিযানকে সাফল্যের সঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলাম। ওয়াং চিন-ইয়ুর সঙ্গে লড়বার সময়ে আমরা ছিলাম ছাই থিং-কাই ও কুও হুয়া-জোংয়ের নেতৃত্বাধীন দুই শত্রুবাহিনীর মাঝখানে—কুও হুয়া-জোংয়ের বাহিনী থেকে আমরা ছিলাম ১০ লীর কিছু বেশি দূরে আর ছাই থিং-কাইয়ের বাহিনী থেকে ৪০ লীর কিছু বেশি দূরে। কেউ কেউ বলতে লাগল যে, আমরা 'কাণাগলিতে ঢুকছি'। আমরা কিন্তু তবুও পথ কেটে বেরিয়ে এসেছিলাম। প্রধানতঃ এটা সম্ভব হয়েছিল ঘাঁটি এলাকার সুবিধাজনক অবস্থার জন্য এবং শত্রুবাহিনীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে অনৈক্যের জন্য। কুও হুয়া-জোংয়ের ডিভিশন পরাজিত হয়ে যাবার পর হাও মেং-লিংয়ের ডিভিশন রাতারাতি পালিয়ে ইয়োংফেংয়ে ফিরে গেল আর এমনি করেই বিপর্যয় এড়াল।

তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে পরিস্থিতিটি ছিল এইরকম:

(১) চিয়াং কাই-শেক নিজেই প্রধান সেনাপতি হিসেবে রণক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণ করল। তার নীচে আরও তিনজন সেনাপতি ছিল, প্রত্যেককে এক একটি কলামের—অর্থাৎ বাম, দক্ষিণ ও মধ্য কলামের ভার দেওয়া হল। হো ইং-ছিন মধ্য কলামকে পরিচালনা করল, চিয়াং কাই-শেকের মতো তারও সদর দপ্তর ছিল নানাছাংয়ে। দক্ষীণ কলামের প্রধান ছিল ছেন মিং-শু, তার সদর দপ্তর ছিল কিয়ানে। আর বাম কলামের প্রধান ছিল চু শাও-লিয়াং, তার সদর দপ্তর ছিল নানফেংয়ে।

(২) 'দমন' বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩ লাখ। তাদের মধ্যে প্রধান বাহিনী ছিল চিয়াং কাই-শেকের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী। এই প্রধান বাহিনীতে ছিল পাঁচটি ডিভিশন, যা ছিল ছেন ছেং, লুও চুও-ইং চাও কুয়ান-থাও, ওয়েই লি-হুয়াং আর চিয়াং তিং-ওয়েনের পরিচালনাধীনে।

প্রত্যেকটি ডিভিশন ১টা রেজিমেণ্ট নিয়ে তৈরী—মোট সৈন্যসংখ্যা প্রায় ১ লাখ। এগুলো ছাড়া, চিয়াং কুয়াং-নাই, ছাই তিং-কাই আর হান তে-ছিনের পরিচালনাধীন তিনটি ডিভিশন ছিল। এদের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। তার পরে ছিল সুন লিয়ান-চোংয়ের আর্মি, এর সৈন্য সংখ্যা ২০ হাজার। বাকী অন্যান্য সব বাহিনীর কোনটাই চিয়াং কাই-শেকের নিজস্ব বাহিনী নয় এবং তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

(৩) এই 'দমন' অভিযানে শত্রুর রণনীতি ছিল 'গভীরে সোজা ঢুকে যাওয়া'। দ্বিতীয় পরিবেষ্টনও দমন' অভিযানে তার রণনীতি ছিল 'প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে সুসংবদ্ধ করা'। এর থেকে এইবারের রণনীতি অনেক ভিন্ন। শত্রুর এই রণনীতির লক্ষ্য ছিল লালফৌজকে কান নদীর দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করা।

(৪) দ্বিতীয় অভিযানের সমাপ্তি তৃতীয় অভিযানের আরম্ভের মধ্যে মাত্র এক মাসের বিরতি ছিল। অত্যন্ত কঠোর লড়াইয়ের পরে লালফৌজ না পেল বিশ্রাম, না পেল সৈন্যশক্তি পুনরায় পূরণের সময় (তখন তার সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০ হাজারের মতো)। আর এরা হাজার লী ঘুরে যখন দক্ষিণ কিয়াংসীর ঘাঁটি এলাকার পশ্চিম অংশে সিংকুও নামক স্থানে ফিরে এসে একত্রিত হল, তখন বিভিন্ন পথ দিয়ে শত্রুরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই রকম অবস্থায় আমরা যে পরিকল্পনা প্রথমে স্থির করলাম, তা ছিল সিংকুও থেকে ওয়ানানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ফুতিয়েন শত্রুব্যূহ ভেদ করা, তারপর, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সবেগে ধেয়ে লড়াই চালিয়ে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগের যোগাযোগের লাইন ছিন্ন করে এগিয়ে যাওয়া এবং এইভাবে শত্রুর প্রধান শক্তিকে আমাদের দক্ষিণ কিয়াংসীর ঘাঁটি এলাকার গভীরে অকেজোভাবে প্রবেশ করতে দেওয়াই ছিল আমাদের সামরিক কার্যকলাপের প্রথম পর্যায়। শত্রু যখন উত্তরদিকে ফিরে চলে আসত, সে অবশ্যই থাকত খুবই ক্লান্ত। তখন সেই সুযোগ নিয়ে তাদের দুর্বল অংশগুলির ওপর আমাদের আঘাত হানবার কথা। এটা ছিল আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ। এই পরিকল্পনার মর্ম ছিল শত্রুর প্রধান শক্তিকে এড়িয়ে যাওয়া এবং তাদের দুর্বল অংশে আঘাত হানা। কিন্তু ফুতিয়েনের ওপরে হামলা করবার জন্য এগিয়ে চলবার সময়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী শত্রুর দৃষ্টিতে পড়ে গেল, তার তখন ছেন

ছেং ও লুও চুও-ইংয়ের পরিচালনাধীন দুই ডিভিশন আমাদের দিকে ধাওয়া-করে এল। আমরা তখন পরিকল্পনাটি বদল করতে এবং সিংকুওয়ের পশ্চিমে কাওসিংস্যুতে ফিরতে বাধ্য হলাম। একশয়ের কম বর্গলী বিস্তৃত পারিপার্শ্বসহ কাওসিংস্যু তখন ছিল একমাত্র জায়গা যেখানে আমাদের সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত হতে পারত। সেখানে একত্র হবার পরের দিন আমরা পূর্বদিকে সিংকুও জেলার পূর্ব অঞ্চলের লিয়ানথাং অভিমুখে, ইয়োফেং জেলার দক্ষীণ অঞ্চলের লিয়াংছুন অভিমুখেও নিংতু জেলার উত্তর অঞ্চলের হুয়াংপি অভিমুখে দ্রুত এগিয়ে চলবার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেই রাতেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমরা সরে পড়লাম, সরে পড়লাম চিয়াং তিং-ওয়েনের ডিভিশন আর চিয়াং কুয়াং-নাই, ছাই থিং-খাই ও হান তে-ছিনের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্বর্তী চল্লিশ লী বিস্তৃত ফাঁকা জায়গা দিয়ে বেগে পৌছালাম লিয়ানথাংয়ে। দ্বিতীয় দিনে আমরা শাংকুয়ান ইয়ুন-সিয়াংয়ের সৈন্যবাহিনীর (শাংকুয়ান ইয়ুন-সিয়াং তার নিজের একটি ডিভিশনসহ হাও মেং-লিংয়ের ডিভিশনটিও পরিচালনা করছিল) অগ্রগামী টহলদারী সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলাম। প্রথম লড়াইটি লড়লাম তৃতীয় দিনে শাংকুয়ান-ইয়ুন-সিয়াংয়ের ডিভিশনের সঙ্গে, আর দ্বিতীয় লড়াইটি লড়লাম চতুর্থ দিনে হাও মেং-লিংয়ের ডিভিশনের সঙ্গে। তারপর তিন দিন ধরে চলার পরে পৌছালাম হুয়াংপিতে এবং সেখানে তৃতীয় লড়াই লড়লাম মাও পিং-ওয়েনের ডিভিশনের বিরুদ্ধে। তিনটি লড়াইয়েই আমরা জিতলাম আর দশ হাজারেরও বেশী রাইফেল দখল করে নিলাম। শত্রুর যেসব প্রধান বাহিনী পশ্চিমদিকে এবং দক্ষিণদিকে অগ্রসর হচ্ছিল, এই সময়ে তারা পূর্বদিকে মোড় ফিরল। হুয়াংপির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হিংস্র বেগে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে তারা আমাদের দিকে এগিয়ে এল, এগিয়ে এল একটা বিরাট পরিবেষ্টনীর মধ্যে আমাদেরকে ফেলবার জন্যে, ঘন ঘন সৈন্য সাজিয়ে। চিয়াং কুয়াং-নাই, ছাই তিং-কাই ও হান তে-ছিনের সৈন্যবাহিনী এবং ছেন ছেং ও লুও চুও-ইংয়ের সৈন্যবাহিনীর মধ্যবর্তী বিশ লী ফাঁকা জায়গার বড় বড় পাহাড় আমাদের সৈন্যবাহিনী চুপি চুপি পার হয়ে গেল এবং পূর্বদিক থেকে গিয়ে সিকুও জেলার এলাকায় জড়ো হল। শত্রু যখন টের পেয়ে আবার পশ্চিমদিকে অগ্রসর হতে লাগল, তখন আমাদের সৈন্যদের আধ মাসের মতো বিশ্রাম হয়ে গেছে, আর শত্রু তখন শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ও মনমরা হয়ে এবং লড়াই করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। তাই তারা পিছু হটাই স্থির করল। তাদের পিছু হটার সুযোগ

নিয়ে আমরা চিয়াং কুয়াং-নাই, ছাই তিং-কাই, চিয়াং তিং-ওয়েন আর হান তে-ছিনের সৈন্যবাহিনীগুলিকে আক্রমণ করলাম এবং চিয়াং তিং-ওয়েনের একটি ব্রিগেডকে আর হান তে-ছিনের পুরো ডিভিশনটাকেই নিশ্চিহ্ন করে দিলাম। ছিয়াং কুয়াং-নাই আর ছাই-তিং-কাইয়ের ডিভিশন দুটির বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হল, তাই আমরা তাদের পালিয়ে যেতে দিলাম।

চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের সময়ে পরিস্থিতিটি এইরকম ছিল: শত্রুবাহিনী তিনটি কলামে বিভক্ত হয়ে কুয়াংছাংয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, শত্রুর প্রধান বাহিনী ছিল পূর্বদিকে। যে দুই ডিভিশন নিয়ে তারা পশ্চিম কলাম গড়ে উঠেছিল, সেগুলি আমাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং আমরা যেখানে কেন্দ্রীভূত হয়েছিলাম তারই কাছাকাছি তারা অবস্থান করছিল। সুতরাং আমরা ইহুয়াং কাউন্টির দক্ষিণ অঞ্চলে শত্রুর পশ্চিম কলামকে প্রথম আক্রমণ করার সুযোগ পেলাম এবং এক আঘাতে আমরা লি মিং ও ছেন শি-চৌর পরিচালিত দুটি ডিভিশনকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেললাম। তখন শত্রু তার মধ্যভাগের কলামকে সাহায্য করবার জন্য তার পূর্ব কলাম থেকে দুই ডিভিশন সৈন্য পাঠিয়ে আরও এগিয়ে এল বলে ইহুয়াং কাউন্টির দক্ষিণ অঞ্চলে আমরা আবার একটি ডিভিশনকে নিশ্চিহ্ন করতে সমর্থ হলাম। এই দুটি লড়াইয়ে আমরা দশ হাজারেরও বেশি রাইফেল দখল করে নিয়েছিলাম আর এমনি করে এই 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে মোটামুটিভাবে চুরমার করে দিয়েছিলাম।

পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে শত্রু এক নতুন রণনীতি অর্থাৎ দুর্গনীতি অবলম্বন করে এগুতে লাগল, প্রথমেই তারা লিছুয়ান দখল করল। কিন্তু লিছুয়ানকে পুনরুদ্ধার করবার ও শত্রুকে ঘাঁটি এলাকার বাইরে রুখবার চেষ্টায় আমরা লিছুয়ানের উত্তরে সিয়াওশির ওপরে আক্রমণ করলাম। সিয়াওশি ছিল শত্রুর সুদৃঢ় ঘাঁটি এবং সেটা অবস্থিত ছিল শ্বেত এলাকায়। এ লড়াইয়ে জয়লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে আমরা আবার সিয়াওশির দক্ষিণ-পূর্ব দিকের জিসীছিয়াওয়ের ওপরে আক্রমণ করলাম। এটাও ছিল শত্রুর সুদৃঢ় ঘাঁটি এবং শ্বেত এলাকার অন্তর্গত। সেখানেও আবার আমরা জয়লাভ করতে ব্যর্থ হলাম। তারপর লড়াই বাধাবার চেষ্টায় আমরা শত্রুর প্রধান বাহিনী ও দুর্গগুলোর মাঝ এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করলাম। এইভাবে আমরা এক সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার অবস্থায় এসে পড়লাম। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের

বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ চলেছিল এক বছর ধরে, সেই এক বছরে বিন্দুমাত্র উদ্যোগ-তৎপরতা আমরা দেখাইনি। অবশেষে, কিয়াংসী ঘাঁটি এলাকা থেকে সরে আসিতে আমরা বাধ্য হলাম।

উপরোল্লিখিত প্রথম থেকে পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় পর্যন্ত আমাদের সৈন্যবাহিনীর লড়াই করার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, একটি শক্তিশালী 'দমন' বাহিনীকে চুরমার করতে হলে প্রতিরক্ষারত লালফৌজের পক্ষে পাল্টা আক্রমণের প্রথম লড়াইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র পরিস্থিতির উপর প্রথম লড়াইটির জয়-পরাজয়ের প্রভাব পড়ে অত্যন্ত গভীরভাবে, এমনকি এর প্রভাব শেষ লড়াইটির ওপরেও পড়ে। তাই আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।

প্রথমতঃ, প্রথম লড়াইটিতে অবশ্যই জিততে হবে। শত্রুর পরিস্থিতি, ভৌগোলিক পরিবেশ ও জনসমর্থন সবই যখন আমাদের অনুকূল কিন্তু শত্রুর প্রতিকূল, এবং লড়াইয়ে জেতা সম্পর্কে আমরা যখন একেবারে নিশ্চিত, শুধু তখনই আমরা আঘাত হানব। অন্যথায়, আমাদের বরং পিছু হটা উচিত ও সতর্কতার সঙ্গে সুযোগের প্রতিক্ষা করা উচিত। সুযোগ পাওয়া যাবেই। গোঁয়ারগোবিন্দের মতো আগুপিছু বিবেচনা না করে যুদ্ধে নামা আমাদের উচিত নয়। প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে আমরা প্রথমে থান তাও-ইউয়ানের বাহিনীর ওপরে আঘাত হানতে চেয়েছিলাম, দুবার আমরা অগ্রসরও হয়েছিলাম। কিন্তু দুবারই নিজেদের সংযত করে ফিরে আসতে হয়েছিল। কারণ শত্রুবাহিনী ইউয়ানতৌর উঁচু জায়গার ওপরকার সুবিধাজনক অবস্থান থেকে নড়েনি। কয়েকদিন পরে আমরা চাং হুই-জানের বাহিনীকে খুঁজে বের করলাম। এই বাহিনীর উপর আক্রমণ করা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। দ্বিতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী তুংকু পর্যন্ত এগিয়েছিল। ওয়াং চিন-ইয়ুর সৈন্যবাহিনী তার ফুতিয়েনস্থ সুদৃঢ় ঘাঁটি ছেড়ে বেরুবে, তারই প্রতীক্ষা করার জন্য খবর ফাঁস হয়ে পড়ার ঝুঁকি নিয়েও তাড়াহুড়ো আক্রমণ করার যাবতীয় অসহিষ্ণু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আমরা শত্রুর খুব কাছে পঁচিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। অবশেষে আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল। তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে, যদিও আমাদের চারদিকে বিপর্যয় ফেটে পড়েছিল এবং হাজার

শী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমাদের ফিরে আসতে হয়েছিল, আর শত্রুবাহিনীর পার্শ্বে ও পিছনে ঘুরে গিয়ে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনাটা যদিও শত্রু টের পেয়েছিল, তবুও আমরা ধৈর্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করেছিলাম এবং পরিকল্পনা বদলে নিয়ে শত্রুর মধ্যভাগে ভেদ করার কৌশল গ্রহণ করেছিলাম আর অবশেষে লিয়াংথাংয়ে আমরা প্রথমবার সাফল্যের সঙ্গেই লড়াই করলাম। চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে, যখন নানফেংয়ের উপর আক্রমণ করতে গিয়ে আমরা ব্যর্থ হলাম, তখন দ্বিধাহীনভাবে আমরা পশ্চাদপসরণ করলাম এবং ঘুরে ঘুরে অবশেষে শত্রুর ডান পার্শ্বে গিয়ে পৌঁছে তুংশাও এলাকায় আমাদের সৈন্যবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করে ইহুয়াং কাউন্টির দক্ষিণ অঞ্চলে খুব সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলাম। শুধুমাত্র পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে প্রথম লড়াইয়ের গুরুত্বকে আদৌ বিবেচনা করা হয়নি। একটিমাত্র লিছুয়ান নগরের পতনে আতঙ্কিত হয়ে সেই নগরটিকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টায় আমাদের সৈন্যবাহিনী শত্রুবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য উত্তরদিকে এগিয়ে গেল, স্যুনখৌয়ের অপ্রত্যাশিত সম্মুখ লড়াইয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী জয়লাভ করল (এক ডিভিশন শত্রুসৈন্য নিশ্চিহ্ন করা হল)। কিন্তু এ লড়াইকে প্রথম লড়াই হিসেবে ধরা হল না, আর এই লড়াইয়ের ফলে যেসব পরিবর্তনগুলো ঘটতে বাধ্য ছিল, সেগুলিকে আগে থেকে লক্ষ্য করা হল না, পরন্তু হঠকারীভাবে সিয়াওশি আক্রমণ করা হল, যেখানে জয়ের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এইভাবে আমরা প্রথম চালেই আমাদের উদ্যোগক্ষমতা হারিয়ে ফেললাম' আর বস্তুতঃ সেটা ছিল লড়াইয়ের সবচেয়ে বুদ্ধিহীন ও খারাপ পদ্ধতি।

দ্বিতীয়তঃ, প্রথম লড়াইয়ের পরিকল্পনাকে অবশ্যই হতে হবে গোটা যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনার প্রস্তাবনা ও সুব্যবস্থিত অঙ্গ। গোটা যুদ্ধাভিযানের একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকলে একটা সত্যিকারের ভাল প্রথম লড়াই করা একেবারেই অসম্ভব। অর্থাৎ প্রথম লড়াইয়ে জয়লাভ করলেও সে লড়াই যদি গোটা যুদ্ধাভিযানকে সাহায্য না করে বরং ক্ষতি করে, তাহলে এ ধরনের জয়কে শুধু পরাজয় হিসেবেই ধরতে হবে (যেমন পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে স্যুনখৌ লড়াই)। তাই প্রথম লড়াইয়ের পূর্বে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ লড়াই এবং এমনকি সর্বশেষ লড়াই অবধি আমরা কিভাবে লড়ব সে সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার, আর পরবর্তী লড়াইগুলির প্রত্যেকটিতে আমরা

জিতলে শত্রুর সামগ্রিক পরিস্থিতিতে কি কি পরিবর্তন ঘটবে, হারলে আবার কি কি পরিবর্তন ঘটবে, তা অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করা দরকার। যেমনটি আশা করা যায়, প্রকৃত ফলটা হয়তো ঠিক তেমনটি নাও হতে পারে, এবং বস্তুতঃ নিশ্চয়ই তেমনটি হবে না—তবুও উভয় পক্ষের সামগ্রিক পরিস্থিতি অনুসারে সবকিছুই আমাদেরকে পুংখানুপুংখভাবে ও বাস্তবভাবে ভেবেচিন্তে পরিষ্কার করে নিতে হবে। সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা না থাকলে দাবার ছকে কোন সত্যিকারের ভাল চাল দেওয়া অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ, পরবর্তী রণনীতিগত পর্যায়ে কি ঘটবে, তাও অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে। রণনীতিগত পরিচালক যদি কেবল পাল্টা আক্রমণের প্রতিই মনোযোগ দেয় এবং সে পাল্টা আক্রমণে জয় অথবা ঘটনা-চক্রে পরাজয়ের পরে আমাদের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত সে সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা না করে, তাহলে সে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে। একটা নির্দিষ্ট রণনীতিগত পর্যায়ে, পরবর্তী বহু পর্যায়কে, অথবা অন্ততঃপক্ষে, ঠিক পরবর্তী পর্যায়টিকে রণনীতিগত পরিচালকের অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে। যদিও ভবিষ্যৎ পরিবর্তন পূর্ব থেকেই দেখা কঠিন এবং যতই দূরে তাকানো যায় বিষয়গুলোকে ততই অস্পষ্ট বলে মনে হয়, তবুও একটা মোটামুটি হিসেব করা সম্ভব এবং সুদূর ভবিষ্যতের অবস্থার মূল্যায়ন করাও দরকার। যেমনি রাজনীতিতে তেমনি যুদ্ধে, এগিয়ে চলার সময়ে প্রতি পদক্ষেপে শুধু একটি পদক্ষেপকে দেখার পরিচালনার পদ্ধতি হচ্ছে ক্ষতিকর। প্রতি পদক্ষেপে কি কি বাস্তব পরিবর্তন ঘটছে তা দেখতে হবে, এবং এগুলোর ওপর ভিত্তি করে নিজের রণনীতিগত পরিকল্পনা এবং যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনাকে শুধরে নেওয়া বা পরিপুষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। অন্যথায়, বিপদকে অগ্রাহ্য করে হঠকারিতার সঙ্গে সোজা সামনে ছুটে চলার ভুল করা হবে। তথাপি, গোটা একটি রণনীতিগত পর্যায় বা কতকগুলো রণ-নীতিগত পর্যায় জুড়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা থাকা একান্ত অপরিহার্য। এটা হবে এমন পরিকল্পনা যা সামগ্রিকভাবে ভেবে দেখা হয়েছে। এইভাবে না করলে ইতস্ততঃ করার এবং নিজেকে বাধ্যবাধকতায় বেঁধে ফেলার ভুল করা হবে। এটা বাস্তবে শত্রুর রণনীতিগত অভিপ্রায়ের প্রয়োজনানুরূপ কাজ করবে এবং নিজেকে একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় এনে ফেলবে। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, শত্রুর সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীরও কোন একটা রণনীতিগত

অন্তদৃষ্টি রয়েছে ট্রেনিং দিয়ে আমরা যখন নিজেদেরকে শত্রুর থেকে এক স্তর বেশি উন্নত করে তুলব শুধু তখনই রণনীতিগত জয়লাভ সম্ভব হবে। এমনি করতে না পারাটাই ছিল শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের সময়ে 'বাম' সুবিধাবাদী লাইন ও চাং কুও-তা ও লাইনের রণনীতিগত পরিচালনার ভুল-ভ্রান্তির প্রধান কারণ। এক কথায়, পশ্চাদপসারণের পর্যায়ে অবশ্যই পাল্টা আক্রমণের কথা হিসেব করতে হবে, পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে অবশ্যই আগে থেকেই আক্রমনপর্যায়ের কথা হিসাব করতে হবে এবং আক্রমণপর্যায়ে আবার অবশ্যই পশ্চাদপসরণের কথা হিসেব করতে হবে। এমনি হিসেব না করে শুধুমাত্র বর্তমান মুহূর্তের সুবিধা-অসুবিধার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখাটা হচ্ছে পরাজয়ের পথ।

প্রথম লড়াইটিতে অবশ্যই জিততে হবে, গোটা যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনার দিকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে, এবং পরবর্তী রণনীতিগত পর্যায়টিকেও অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করতে হবে। পাল্টা আক্রমণের শুরুতে, অর্থাৎ প্রথম লড়াইয়ের সময়ে এই তিনটি মূলনীতিকে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

৬। সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত করা

সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত করাটা মনে হয় সহজ, কিন্তু আসলে তা বেশ কঠিন। প্রত্যেকেই জানে যে, সংখ্যাধিক্যের দ্বারা সংখ্যাল্পকে পরাজিত করাই হচ্ছে সবচেয়ে সেরা উপায়, তবুও অনেকেই তেমনটি করতে পারে না; পক্ষান্তরে প্রায়শঃই নিজেদের সৈন্যশক্তিকে ছড়িয়ে দেয়। কারণ এই যে, এ ধরনের পরিচালকদের রণনীতি বুঝবার মতো অত মাথা নেই, আর তারা জটিল পরিবেশের দ্বারা বিভ্রান্ত। আর সেজন্যই তারা এইসব পরিবেশের আয়ত্তাধীনে পড়ে নিজেদের উদ্যোগক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে মোকাবলা করার নীতি অবলম্বন করে।

পরিবেশ যতই জটিল, গুরুতর ও কঠোর হোক না কেন, একজন সামরিক পরিচালকের যা সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন, তা হচ্ছে তার নিজের নেতৃত্বাধীন সৈন্যশক্তিকে স্বাধীনভাবে সংগঠিত করবার ও ব্যবহার করবার সামর্থ্য। অনেক সময়ে শত্রুর দ্বারা বাধ্য হয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়তে হয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাড়াতাড়ি উদ্যোগক্ষমতা ফিরে পাওয়া। এমন করতে না পারলে অবশ্যই পরাজয় ঘটবে।

উদ্যোগক্ষমতা কাল্পনিক কিছু নয়, বরং সেটা হচ্ছে বাস্তব ও বস্তুগত। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যথাসম্ভব বৃহদাকারের ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর সৈন্যবাহিনীকে সংরক্ষিত করা সমাবিষ্ট করা।

প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে যাওয়টা সহজ। আক্রমণাত্মক লড়ায়ের তুলনায় প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ে উদ্যোগক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগের সুযোগ খুব কমই থাকে। তবু প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ের নিষ্ক্রিয় রূপের মধ্যেও সক্রিয় বিষয়বস্তু থাকেতে পারে, এবং যে পর্যায়ে প্রতিরক্ষাত্মক লড়াই রূপের দিক থেকে নিষ্ক্রিয় থাকে, সে পর্যায় থেকে প্রতিরক্ষাত্মক লড়াই এমন একটি পর্যায়ে যেতে পারে, যেখানে তা রূপে ও বিষয়বস্তুতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাহ্য রূপের দিক থেকে দেখলে পুরোপুরি পরিকল্পিত রণনীতিগত পশ্চাদপসরণকে বাধ্যতামূলক বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা করা হয় আমাদের সৈন্যবাহিনীর শক্তি সংরক্ষিত করবার ও শত্রুকে চুরমার করার সুযোগের অপেক্ষা করবার জন্য, এবং শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনবার ও পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি করবার জন্য। অন্যদিকে, পশ্চাদপসরণ অস্বীকার করে তাড়ঘড়ি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে নামাটাকে (যেমন সিয়াওশির লড়াইয়ে) বাহ্য দৃষ্টিতে উদ্যোক্ষমতা লাভের প্রয়াস বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে সেটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয়। রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ শুধু বিষয়-বস্তুতেই সক্রিয়তাপূর্ণ নয়, পরন্তু রূপের দিক থেকেও তা পশ্চাদপসরণ-পর্যায়ের নিষ্ক্রিয় ভঙ্গীটি ত্যাগ করে। শত্রুবাহিনীর কাছে আমাদের পাল্টা আক্রমণের অর্থ হল, শত্রুকে তার উদ্যোগক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য করার এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফেলার জন্য আমাদের বাহিনীর প্রয়াস।

এই লক্ষ্যকে সম্পূর্ণভাবে অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা, সচল লড়াই করা, দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা এরা এবং নির্মূলী-করণের লড়াই করা। আর এগুলোর মধ্যে সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করাটাই হচ্ছে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান শর্ত।

শত্রুর ও আমাদের উভয় পক্ষের পরিস্থিতিকে বদলে দেওয়ার জন্য অমাদের সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা অবশ্য প্রয়োজন। প্রথমতঃ, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণ সম্পর্কিত পরিস্থিতিকে বদল করা। আগে শত্রু অগ্রসর হচ্ছিল এবং আমরা পিছু হটছিলাম। এখন আমরা এই পরিস্থিতিকে আমাদের অগ্রগমনে ও শত্রুর পশ্চাদরসরণে বাদলাতে চাই।

যখন আমরা সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করে একটা লড়াইয়ে জয়লাভ করি, তখন সেই লড়াইয়ে আমাদের উপরোক্ত উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয় এবং সেই জয়লাভটা গোটা যুদ্ধাভিযানের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয়তঃ, সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্য হল আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পরিস্থিতিকে বদলে দেওয়া। প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ে পশ্চাদপসরণের শেষ সীমা পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করাটা মূলতঃ নিষ্ক্রিয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ 'প্রতিরক্ষা'-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। পাল্টা আক্রমণ হচ্ছে সক্রিয় পর্যায়ের অর্থাৎ 'আক্রমণে'-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যদিও গোটা রণনীতিগত প্রতিরক্ষার পর্যায়ের মধ্যে পাল্টা আক্রমণ তার প্রতিরক্ষাত্মক চরিত্র হারায় না, তবু পশ্চাদপসরণের তুলনায় পাল্টা আক্রমণ শুধু রূপেয়ই নয়, বিষয়বস্তুতেও ইতিমধ্যেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। পাল্টা আক্রমণ হচ্ছে রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত আক্রমণের মধ্যবর্তী একটা উত্তরণ-পর্যায় এবং চরিত্রের দিক থেকে এটা হচ্ছে রণনীতিগত আক্রমণের প্রাক্কাল। এই উদ্দেশ্যেই সৈন্যশক্তি কেন্দ্রভূত করা হয়।

তৃতীয়তঃ, সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্য হল অন্তর্লাইন ওবহির্লাইনের পরিস্থিতিটিকে পরিবর্তিত করা। রণনীতিগত অন্তর্লাইনে যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনী অনেক অসুবিধা ভোগ করে, 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের সম্মুখীন লাল-ফৌজের ক্ষেত্রে এটা আরও বিশেষ করে খাটে। কিন্তু যুদ্ধাভিযানে বা লড়াইয়ে আমরা এ অবস্থাকে বদলাতে পারি এবং তা আমাদের অবশ্যই করা উচিত। আমাদের বাহিনীর বিরুদ্ধে শত্রুবাহিনীর একটা বিরাট 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে পরিবর্তিত করে সেটাকে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের বাহিনীর দ্বারা চালিত অনেকগুলো ছোট ছোট ও পৃথক পৃথক 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানে পরিণত করতে হবে। রণনীতিগত ক্ষেত্রে আমাদের বাহিনীর বিরুদ্ধে শত্রুবাহিনীর পৃথক পৃথকভাবে এগিয়ে আঘাত হানার যে অভিযান চালায়, সেটাকে আমাদের এইভাবে পরিবর্তিত করা উচিত, যাতে করে আমাদের বাহিনীর যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক পৃথকভাবে এগিয়ে একত্রে আঘাত হানার অভিযানগুলো চালাতে পারে। রণনীতিগত ক্ষেত্রে আমাদের বাহিনীর তুলনায় শত্রুবাহিনীর উৎকৃষ্টতর অবস্থাকে বদল করতে হবে, যাতে করে যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে শত্রুবাহিনীর তুলনায় আমাদের বাহিনীর অবস্থা উৎকৃষ্টতর হয়ে ওঠে। রণ-

নীতিগত ক্ষেত্রে যে শত্রুবাহিনী প্রবলতর অবস্থায় রয়েছে, যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তাকে দুর্বল অবস্থায় ফেলে দিতে হবে। সেই একই সময়ে আবার আমাদের রণনীতিগত দুর্বল অবস্থাকে যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে আমাদের সবল অবস্থায় পরিবর্তিত করে নিতে হবে। এগুলোকে আমরা বলি অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই, 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের মধ্যে পরিবেষ্টন ও দমন অভিযান, অবরোধের মধ্যে অবরোধ, প্রতিরক্ষার মধ্যে আক্রমণ, নিকৃষ্ট অবস্থার মধ্যে উৎকৃষ্ট অবস্থা, দুর্বলতার মধ্যে সবলতা, অসুবিধার মধ্যে সুবিধা এবং নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে উদ্যোগ। রণনীতিগত প্রতিরক্ষায় জয়লাভ করাটা নির্ভর করে মূলতঃ সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার উপরে।

চীনা লালফৌজের যুদ্ধের ইতিহাসে প্রায়শঃই এই প্রশ্নটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের প্রশ্ন। ১৯৩০ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে কিয়ানের লড়াইয়ে আমাদের সৈন্যশক্তি পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত হওয়ার আগেই অগ্রগমন ও আক্রমণ শুরু হয়েছিল। ঘটনাক্রমে শত্রুবাহিনী (তেং ইংয়ের ডিভিশন) নিজের থেকেই পালিয়ে যায়। আমাদের আক্রমণটা নিজের দিক থেকে মোটেই কার্যকরী ছিল না।

১৯৩২ সাল থেকে শুরু করে শ্লোগান ছিল— সমগ্র ফ্রন্টে আঘাত হানো'। ঘাঁটি এলাকা থেকে পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর—চতুর্দিকে আঘাত হানার জন্য দাবি করা হয়েছিল। এটা শুধু রণনীতিগত প্রতিরক্ষার ভুলই নয়, পরন্তু রণনীতিগত আক্রমনের বেলায়ও ভুল। শত্রুর ও আমাদের সামগ্রিক শক্তির ভারসাম্যে মৌলিক পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত রণনীতি ও রনকৌশল উভয় দিক থেকেই প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ পাশাপাশি চলে, শত্রুকে আটকে রাখার লড়াই ও হানা দেওয়ার লড়াই পাশাপাশি চলে, বাস্তবক্ষেত্রে তথাকথিত 'সমগ্র ফ্রন্টে আঘাত হানা' খুবই কম সময়েই ঘটে। এই শ্লোগান হচ্ছে সামরিক সমতাবাদ, যা সামরিক হঠকারিতার সঙ্গে সঙ্গেই আসে।

সামরিক সমতাবাদীরা ১৯৩৩ সালে 'দুই মুষ্টি দিয়ে আঘাত হানার' মতবাদকে তুলে ধরেছিল এবং দুটি রণনীতিগত লক্ষ্যপথে একই সঙ্গে জয়লাভের আশায় লালফৌজের প্রধান শক্তিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। ফলে, একটি 'মুষ্টি' হয়ে রইল অকেজো, আর অন্য 'মুষ্টি'টি লড়াই করতে করতে খুবই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ল, এবং সেই সময়ের সম্ভাব্য সর্বাধিক জয়লাভও সম্ভব হল না। আমার মতে, যখন আমারা শক্তিশালী শত্রুবাহিনীর

সম্মুখীন হই, তখন আমাদের যত বেশি সৈন্যবাহিনী হোক না কেন, এক সময়ে শুধু একটি প্রধান লক্ষ্যপথেই আমাদের সৈন্যবাহিনীকে নিয়োগ করা উচিত, দুই লক্ষ্যপথে নয়। দুই বা তারও বেশি লক্ষ্যপথে লড়াই চালানোর বিরোধিতা আমি করি না, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সময়ে কেবল একটিমাত্র প্রধান লক্ষ্যপথ থাকা উচিত। গৃহযুদ্ধের রণক্ষেত্রে চীনা লালফৌজ নেমেছিল একটা ছোট ও দুর্বল শক্তি হিসেবে। কিন্তু সে তার শক্তিশালী শত্রুকে বারংবার পরাজিত করেছে—তার এই জয় সমগ্র বিশ্বকে বিস্ময়াভিভূত করেছে। লালফৌজ প্রধানতঃ সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে ব্যবহার করার উপর নির্ভর করেই এই জয়লাভ করেছে। লালফৌজের বিরাট বিরাট জয়ের যে-কোন একটিই এটাকে প্রমাণ করতে পারে। আমরা যখন বলি, 'একজনকে দশজনের বিরুদ্ধে লড়াও, দশজনকে একশজনের বিরুদ্ধে লড়াও' তখন আমরা রণনীতির কথা সমগ্র যুদ্ধের কথা ও শত্রুর ও আমাদের সামগ্রিক শক্তির তুলনার কথাই বলছি। আর এই অর্থে, সেটা হচ্ছে ঠিক তাই, যা আমরা করছি। কিন্তু যুদ্ধাভিযান ও রণকৌশলের দিক থেকে এই কথাটা আমরা বলছি না। সেক্ষেত্রে আমাদের কোনমতেই এইরকম করা উচিত নয়। পাল্টা আক্রমণেই হোক বা আক্রমণেই হোক, আমরা সব সময়েই অনেক বেশি সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করে শত্রুর একটা অংশের ওপরে আঘাত হানি। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে থান তাও-ইউয়ানের বিরুদ্ধে কিয়াংসী প্রদেশের নিংতু কাউন্টির তুংশাও অঞ্চলের লড়াইয়ে, ১৯৩১ সালের আগস্ট মাসে ১৯তম রুটআর্মির বিরুদ্ধে কিয়াংসীর সিংকুও কাউন্টির কাওসিংস্যু অঞ্চলের লড়াইয়ে, ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে ছেন চী তাংয়ের বিরুদ্ধে কুয়াংতোং প্রদেশের নানসিয়ুং জেলার শুইখৌস্যু অঞ্চলের লড়াইয়ে এবং ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে ছেন ছেংয়ের বিরুদ্ধে কিয়াংসীর লিছুয়ান কাউন্টির থুয়ানছুন অঞ্চলের লড়াইয়ে আমাদের যে ক্ষতি ভোগ করতে হয়েছিল, তার কারণ ছিল আমাদের সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা হয়নি। অতীতে সাধারণভাবে শুইখৌস্যুর ও থুয়ানছুনের লড়াইয়ের মতো লড়াইগুলিকে জয় হিসেবে, এমনকি বিরাট জয় হিসেবে ধরা হতো (শুইখৌস্যুর লড়াইয়ে ছেন চী-তাংয়ের পরিচালিত ২০টি রেজিমেন্টকে এবং থুয়ানছুনের লড়াইয়ে ছেন ছেংয়ের পরিচালিত ১২টি রেজিমেন্টকে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে)। কিন্তু এ ধরনের জয়কে আমরা কোনদিনই স্বাগত জানাইনি, এমনকি, এক অর্থে এগুলোকে পরাজয় বলেই ধরতে পারি। আমাদের মতে, এইরকম লড়াইয়ের

তাৎপর্য খুবই কম, কারণ এর ফলে আমাদের কিছুই লাভ হয়নি, অথবা যা লাভ করেছি তা আমাদের ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে বেশি নয়। আমাদের রণনীতি হচ্ছে 'একজনকে দশজনের বিরুদ্ধে লড়াও,' আমাদের রণকৌশল হচ্ছে 'দশজনকে একজনের বিরুদ্ধে লড়াও, আর শত্রুকে পরাজিত করার এটাই হচ্ছে আমাদের অন্যতম মৌলিক নীতি।

সামরিক সমতাবাদ তার চরমে উঠেছিল ১৯৩৪ সালে পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে। তখন এটা মনে হয়েছিল যে, 'সৈন্যবাহিনীকে ছয়টি পথে বিভক্ত করে দিয়ে এবং 'সমগ্র ফ্রন্টে প্রতিরোধ' করে শত্রুকে পরাজিত করা যাবে। কিন্তু ফল হল উল্টো, আমাদের বাহিনীই পরাজিত হল—নিজস্ব ভূমি হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়ই ছিল এসবের কারণ। নিজেদের প্রধান শক্তি এক লক্ষ্যপথেই কেন্দ্রীভূত করে অন্যান্য লক্ষ্যপথে কেবলমাত্র রক্ষীবাহিনী রাখলে স্বভাবতঃই কোন কোন ভূমি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু এই ক্ষতিটা হল সাময়িক ও আংশিক, এই ক্ষতির মূল্যে আমরা যে জায়গায় প্রচণ্ড আঘাত হানি, সেখানেই জয়লাভ করতে পারি। এই প্রচণ্ড আঘাতের লক্ষ্যপথে জয়লাভের ফলেই রক্ষীবাহিনীর এলাকার হৃত ভূমি পুনরুদ্ধার করা যায়। শত্রুর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের প্রত্যেকটিতেই আমাদের কতকগুলো ভূমি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে, শত্রুর তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের সময়ে কিয়াংসী প্রদেশে লালফৌজের ঘাঁটি এলাকাটি প্রায় পুরোপুরিই হাতছাড়া হয়ে যায়, কিন্তু পরিশেষে আমরা শুধু সেইসব হৃত ভূমিই পুনরুদ্ধার করিনি, উপরন্তু আমাদের শাসনাধীন এলাকাও সম্প্রসারিত করেছিলাম।

ঘাঁটি এলাকার জনগণের শক্তিকে উপলব্ধি করতে না পারায় ঘাঁটি এলাকা থেকে লালফৌজকে বহু দূরে পাঠানোর ব্যাপারে অযথা ভয়ের উদ্ভব প্রায়ই ঘটত। যখন কিয়াংসীস্থ লালফৌজ ১৯৩২ সালে ফুকিয়ান প্রদেশের চাংচৌ আক্রমণ করার জন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গিয়েছিল, এবং যখন ১৯৩৩ সালে চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধাভিযানে জয়লাভের পরে লালফৌজ মোড় ঘুরিয়ে ফুকিয়ান আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল, তখন এই ভয় দেখা দিয়েছিল। প্রথম অবস্থায় ভয় হয়েছিল যে, শত্রু আমাদের গোটা ঘাঁটি এলাকা দখল করে নেবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় ভয় ছিল যে, ঘাটি এলাকার একটা অংশ হাতছাড়া হয়ে যাবে। ফলে আমাদের সৈন্য-

বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করার ব্যাপারে আপত্তি উঠেছিল আর ঘাঁটি এলাকাকে রক্ষা করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করে দেবার অভিমত পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু শেষে ভুল প্রমাণিত হয়ে যায়। শত্রুর দৃষ্টিতে, এক-দিকে সে আমাদের ঘাঁটি এলাকার মধ্যে ঢুকতে ভয় পেত, অন্যদিকে যে লালফৌজ লড়াই চালিয়ে শ্বেত এলাকায় ঢোকে, সেই লালফৌজকে সে তার প্রধান বিপদ 'বলে মনে করত। নিয়মিত লালফৌজ যেখানে অবস্থিত, সেখানে শত্রুবাহিনী সব সময়ে দৃষ্টি রাখে এবং খুব কম সময়েই সে তার দৃষ্টি নিয়মিত লালফৌজ থেকে সরিয়ে নিয়ে কেবলমাত্র আমাদের ঘাঁটি এলাকার উপরই নিবদ্ধ করে। লালফৌজ যখন প্রতিরক্ষায় লিপ্ত থাকে, তখনও শত্রুর দৃষ্টি লালফৌজের উপরই কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। আমাদের ঘাঁটি এলাকার আয়তন হ্রাস করার পরিকল্পনা হচ্ছে শত্রুর গোট পরিকল্পনার একটা অংশ। কিন্তু লালফৌজ যদি নিজের প্রধান শক্তি কেন্দ্রীভূত করে শত্রুবাহিনীর একটি কলাম ধ্বংস করে, তাহলে শত্রুবাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী লালফৌজের উপর আরও বেশি মনোযোগ দিতে এবং লালফৌজের বিরুদ্ধে আরও বেশি সৈন্যশক্তি নিয়োগ করতে বাধ্য হবে। তাই আমাদের ঘাঁটি এলাকার আয়তন হ্রাস করার ব্যাপারে শত্রুর পরিকল্পনাকে বানচাল করাও সম্ভব।

'পঞ্চম "পরিবেষ্টন ও দমন" অভিযানে শত্রু যখন দুর্গনীতি অবলম্বন করেছে, তখন সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করে লড়াই করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, আর যা কিছু আমরা করতে পারি, তা হচ্ছে প্রতিরক্ষার জন্য সৈন্যশক্তি বিভক্ত করে দেওয়া এবং সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত আকস্মিক আঘাত হানা—এমন কথা বলাও ভুল। একই সময়ে শত্রুর ৩, ৫, ৮ অথবা ১০ লী ঠেলে এগিয়ে যাবার দুর্গনীতিতে যুদ্ধচালনার পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবেই ছিল প্রতিটি পদক্ষেপে লালফৌজের প্রতি-রোধের ফল। যদি আমাদের সৈন্যবাহিনী অন্তর্লাইনে প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিরোধের রণকৌশলকে পরিত্যাগ করত এবং প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য সময়ে মোড় ফিরিয়ে শত্রুর অন্তর্লাইনের ভেতরে আক্রমণ চালাত, তাহলে পরিস্থিতি নিশ্চয়ই ভিন্নরূপ হতো। সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার নীতিই হচ্ছে দুর্গ-নীতিকে ব্যর্থ করার হাতিয়ার।

আমরা সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার পক্ষে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জনগণের গেরিলাযুদ্ধ ত্যাগ করতে হবে। লি লি-সান লাইনের অভিমত ছিল যে, ক্ষুদ্রাকারের গেরিলাযুদ্ধ ত্যাগ করতে হবে এবং 'প্রত্যেকটি বন্দুক

লালফৌজের হাতে রাখা চাই'। এই অভিমত অনেক আগেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সামগ্রিক বিপ্লবী যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে, জনগণের গেরিলাযুদ্ধ ও প্রধান শক্তি হিসেবে লালফৌজ একজন মানুষের ডান হাত আর বাঁ হাতের মতো। জনগণের গেরিলাযুদ্ধ বাদ দিয়ে যদি কেবলমাত্র প্রধান শক্তি হিসেবে লালফৌজই থাকত, তাহলে আমরা হয়ে পড়তাম এক-বাহুবিশিষ্ট সেনাপতির মতো। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বিশেষ করে সামরিক যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে, ঘাঁটি এলাকায় আমাদের জনগণের অবস্থা হচ্ছে, তাঁরা সশস্ত্র। ঘাঁটি এলাকায় এগোতে শত্রুরা যে ভয় পায়, তার প্রধান কারণ হচ্ছে এটাই।

লড়াই করার গৌণ লক্ষ্যপথে লালফৌজের একটা শাখা নিয়োগ করাও দরকার। মুখ্য লক্ষ্যপথে সমস্ত সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা আমাদের উচিত হবে না। আমরা যে সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার পক্ষে কথা বলি, তা হচ্ছে রণক্ষেত্রে আমাদের চরম বা আপেক্ষিক উৎকৃষ্টতাকে সুনিশ্চিত করার নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য অথবা গুরুত্বপূর্ণ একটা রণক্ষেত্রে লড়াই করার জন্য আমাদের অবশ্যই চরম উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তি থাকতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৩০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম লড়াইয়ে চাং হুইৎজানের ৯ হাজার সৈন্যের সঙ্গে লড়বার জন্য আমাদের ৪০ হাজার সৈন্য কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। দুর্বল শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য, অথবা অত গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন একটা রণক্ষেত্রে লড়াই করার জন্য, একটা আপেক্ষিক উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তিই যথেষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৩১ সালের ২৯শে মে তারিখে দ্বিতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শেষ লড়াইয়ে চিয়াংনিংয়ে লিউ হো-তিংয়ের ডিভিশনের ৭ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য লালফৌজ শুধু ১০ হাজারের কিছু বেশি সৈন্য নিয়োগ করেছিল।

এর অর্থ কিন্তু এও নয় যে, প্রত্যেকবার আমাদের অবশ্যই সংখ্যাগতভাবে উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তি নিয়োগ করতে হবে। কোন কোন অবস্থায়, একটা অপেক্ষিক বা চরম নিকৃষ্ট সৈন্যশক্তি নিয়ে আমরা রণক্ষেত্রে যেতে পারি। অপেক্ষিক নিকৃষ্ট সৈন্যশক্তি নিয়ে লড়াইয়ে যাবার কথা ধরা যাক। কোন একটা এলাকায় আমাদের যখন শুধু একটা ছোট আকারের লালফৌজের বাহিনী রয়েছে (এ নয় যে আমাদের বেশি সৈন্য আছে কিন্তু আমরা তাদের কেন্দ্রীভূত

করিনি) তখন কোন একটা অধিকতর শক্তিশালী শত্রুর আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবার জন্যে জনসমর্থন, ভৌগোলিক পরিবেশ ও আবহাওয়া প্রভৃতি অবস্থা আমাদেরকে খুব বেশি সাহায্য দিলে শত্রুর সম্মুখভাগ ও একটা পার্শ্বদেশকে আটকে রাখার জন্য গেরিলাবাহিনী অথবা লালফৌজের ছোট শাখা নিয়োগ করা এবং শত্রুর অপর পার্শ্বদেশের একটি অংশের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালানোর জন্যে লালফৌজের অন্যান্য সমস্ত সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করাও অবশ্যই প্রয়োজন, এবং এইভাবে জয়লাভ করাও সম্ভব। শত্রুর পার্শ্বদেশের সেই অংশের উপর আমাদের আকস্মিক আক্রমণে একটি নিকৃষ্ট সৈন্যশক্তির বিরুদ্ধে উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তির ব্যবহার করার ও সংখ্যাল্পকে পরাজিত করার জন্য সংখ্যাধিক্যকে ব্যবহার করার নীতি এখনো খাটে। চরম নিকৃষ্ট সৈন্যশক্তি নিয়ে যুদ্ধে যাবার কথা ধরা যাক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন গেরিলাবাহিনী একটা বিরাট শ্বেত বাহিনীর উপর আকস্মিক আক্রমণ চালায়, তখন সে কেবল শ্বেতবাহিনীর একটা ছোট অংশের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত নীতি প্রযোজ্য।

একটিমাত্র রণক্ষেত্রে লড়াই করার জন্যে একটি বিরাট সৈন্যশক্তির কেন্দ্রীভূত করাটা ভৌগোলিক পরিবেশ, পথঘাট, সরবরাহ ও বাসস্থানের সুযোগাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ—এই যুক্তিকে অবস্থানুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে বিচার করতে হবে। লালফৌজ ও শ্বেত বাহিনীকে এইসব সীমাবদ্ধতা কি পরিমাণে প্রভাবিত করতে পারে, তার একটা মাত্রাগত পার্থক্য আছে, কারণ শ্বেত বাহিনী থেকে লালফৌজ অনেক বেশি কষ্ট সহ্য করতে পারে।

সংখ্যাল্পতা নিয়ে সংখ্যাধিক্যকে আমরা পরাজিত করি—সমগ্র চীন দেশের শাসকদের এই কথাই আমরা বলে থাকি। আবার সংখ্যাধিক্য নিয়ে সংখ্যাল্পকে আমরা পরাজিত করি—রণক্ষেত্রে লড়াইরত শত্রুর প্রত্যেকটি পৃথক অংশের প্রতিই আমাদের এই কথা। এই ব্যাপারটা এখন আর গোপনীয় নয়, এবং শত্রু সাধারণতঃ আমাদের রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু শত্রু আমাদের জয়কে ঠেকাতে পারে না এবং তার নিজের ক্ষতিও এড়াতে পারে না, কারণ আমরা কখন, কোথায়, কিভাবে তাকে আক্রমণ করব তা সে জানে না। এই ব্যাপারটা আমরা গোপনে রাখি। লালফৌজ সাধারণতঃ আচমকা আক্রমণ করে থাকে।

৭। চলমান যুদ্ধ

চলমান যুদ্ধ না অবস্থানগত যুদ্ধ? আমাদের উত্তর হচ্ছে চলমান যুদ্ধ। আমাদের সৈন্যশক্তি বিরাট নয়, গোলাবারুদাদির সরবরাহ-ব্যবস্থা নেই এবং প্রত্যেকটি ঘাঁটি এলাকায় লড়াই করার জন্য রয়েছে কেবলমাত্র লালফৌজের একটিই বাহিনী—এরকম অবস্থায় আমাদের কাছে অবস্থানগত লড়াইটা হচ্ছে সাধারণভাবে অকেজো। আমাদের পক্ষে অবস্থানগত লড়াই যে শুধু প্রতিরক্ষায় বেলায়ই সাধারণভাবে অপ্রযোজ্য তা নয়, আক্রমণের বেলায়ও একইভাবে অপ্রযোজ্য।

শত্রু প্রবল এবং লালফৌজ কারিগরী ক্ষেত্রে দুর্বল। তাই লালফৌজের লড়াই চালনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলির একটি হচ্ছে এই যে, তার স্থায়ী যুদ্ধরেখা নেই।

যে গতিমুখে লালফৌজ লড়াই চালায়, সেই গতিমুখ অনুসারেই লালফৌজের যুদ্ধরেখা নির্ধারিত হয়। লড়াই চালনার গতিমুখ স্থায়ী না হওয়ায় লালফৌজের যুদ্ধরেখাও স্থায়ী নয়। কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদিও সাধারণ গতিমুখ বদলায় না, তবুও তার মধ্যে ছোট ছোট গতিমুখগুলো যেকোন মুহূর্তেই পরিবর্তিত হতে পারে। একটা গতিমুখে লড়াই চালাতে গিয়ে বাধা-প্রাপ্ত হলে, অন্য গতিমুখে যেতেই হবে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে, লড়াই চালনায় সাধারণ গতিমুখেও যদি নিজেরা বাধাপ্রাপ্ত হই, তাহলে সেটাও বদলে নিতে হবে।

বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধরেখা স্থায়ী হতে পারে না। সোভিয়েত ইউ-নিয়নেও এমন অবস্থা ঘটেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনী ও আমাদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ-রেখা আমাদের মতো এত বেশি অস্থায়ী ছিল না। কোন যুদ্ধেই একেবারে স্থায়ী যুদ্ধরেখা থাকতে পারে না, যুদ্ধে জয়-পরাজয় ও অগ্রগমন-পশ্চাদপসরণের পরিবর্তনের কারণে যুদ্ধরেখাটা স্থায়ী হতে পারে না। তবে, আপেক্ষিক স্থায়ী যুদ্ধরেখা সাধারণ যুদ্ধে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান পর্যায়ের চীনা লালফৌজের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি কোন সৈন্যবাহিনী যদি তার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে লড়ে, কেবল তখনই ব্যতিক্রম দেখা যায়।

যুদ্ধরেখা স্থায়ী না থাকার ফলে ঘাটি এলাকার ভূখণ্ড স্থায়ী থাকে না। প্রায়শঃই ঘাটি এলাকার আয়তন কখনও কমে কখনও বাড়ে, কখনও সঙ্কুচিত

হয় কখনও প্রসারিত হয়, এবং প্রায়ই একটি ঘাঁটি এলাকার পতন ঘটলে অন্য একটি ঘাঁটি এলাকার উদ্ভব হয়। ঘাঁটি এলাকার ভূখণ্ডের এই প্রবাহমানতা পুরোপুরিভাবেই যুদ্ধের প্রবাহমানতা থেকে উদ্ভূত হয়।

যুদ্ধ ও ঘাঁটি এলাকার ভূখণ্ডের প্রবাহমানতার প্রভাবে ঘাঁটি এলাকায় বিভিন্ন ধরনের গঠনকার্যও প্রবাহমান হয়ে ওঠে। কয়েক বছর মেয়াদবিশিষ্ট গঠন-পরিকল্পনার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। আমাদের পক্ষে পরিকল্পনার ঘন ঘন পরিবর্তন হচ্ছে দৈনন্দিন ব্যাপার।

এই বৈশিষ্ট্যটিকে স্বীকার করে নেওয়া আমাদের পক্ষে লাভজনক। এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমাদের কার্যক্রম স্থির করতে হবে। পশ্চাদপসারণবিহীন শুধু কেবল অগ্রসরমান যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের মোহ থাকা উচিত নয়, আমাদের শাসনাধীন ভূখণ্ডের ও সামরিক পশ্চাদ্ভাগের সাময়িক প্রবহণে অবশ্যই আমাদের ভয় পাওয়া চলবে না, দীর্ঘমেয়াদী নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনার চেষ্টা করাও আমাদের উচিত নয়। আমাদের চিন্তাধারা ও কাজকে অবস্থার উপযোগী করে নিতে হবে। বসে থাকার জন্যে আমাদের তৈরি থাকতে হবে, আবার চলে যাবার জন্যেও তৈরী থাকতে হবে, আর সবসময়েই আমাদের রসদাদি হাতের কাছে অবশ্যই তৈরী রাখতে হবে। আজকের প্রবাহমান জীবনের আমাদের প্রচেষ্টার দ্বারাই শুধু ভবিষ্যৎকালে আমরা অপেক্ষাকৃত অপ্রবাহমানতা অর্জন করতে পারব এবং পরিশেষে পূর্ণ স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারব।

পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে তথাকথিত 'নিয়মিত যুদ্ধের' রণনীতি প্রাধান্যলাভ করেছিল। এই রণনীতির প্রবক্তরা এই প্রবাহমানতাকে অস্বীকার করত এবং তথাকথিত 'গেরিলাবাদের' বিরোধিতা করত। প্রবাহমানতার বিরোধী কমরেডরা এমনভাবে কাজ-কারবার চালাত যেন তারা একটা বিরাট রাষ্ট্রের শাসক, আর ফল হল একটা অস্বাভাবিক ও বিপুল প্রবাহমানতা—২৫,০০০ লীর দীর্ঘ অভিযান।

আমাদের শ্রমিক-কৃষক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হচ্ছে একটি রাষ্ট্র, কিন্তু আজও সেটা পুরাদস্তুর রাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি। আমরা আজও গৃহযুদ্ধের রণনীতিগত প্রতিরক্ষায় পর্যায়েই রয়ে গেছি, আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা আজও পুরাদস্তুর রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে অনেক দূরে, নিজের সংখ্যা ও কারিগরির দিক দিয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী এখনো শত্রুদের চেয়ে অনেক পিছনে পড়ে আছে, আমাদের এলাকার আয়তন এখনো খুব ছোট, আর

আমাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য শত্রু সততই সচেষ্ট এবং আমাদের নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত সে আনন্দিত হবে না এসবের ভিত্তিতে আমাদের নীতি স্থির করতে গিয়ে আমাদের পক্ষে বিচারহীনভাবে গোরিলাবাদের বিরোধিতা করা উচিত হবে না, বরং লালফৌজের গেরিলা চরিত্রকে সততার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে। এই ব্যাপারে লজ্জিত হবার কিছু নেই। এর বিপরীতে গোরিলা চরিত্রেই আমাদের বৈশিষ্ট, আমাদের গুণ এবং শত্রুকে পরাজিত করার জন্য আমাদের হাতিয়ার। গেরিলা চরিত্রকে ত্যাগ করার জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে, কিন্তু আজই আমরা তা করতে পারি না। ভবিষ্যতে গেরিলা চরিত্র নিশ্চয় লজ্জাজনক একটা কিছু হয়ে উঠবে এবং আমাদের তা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে, কিন্তু আজ এটা মূল্যবান এবং এটাতে আমাদের দৃঢ় থাকতে হবে।

'যখন জিততে পারব বুঝি তখন আমরা লড়ি, আর জেতার আশা না থাকলে সরে পড়ি'—আজকের আমাদের চলমান লড়াইয়ের এটাই হচ্ছে সহজ ব্যাখ্যা। দুনিয়ার কোথাও এমন কোন রণবিশারদ নেই, যিনি কেবল লড়াই চালনাকেই স্বীকার করেন, সরে যাওয়াটাকে স্বীকার করেন না। কিন্তু আমরা যত বেশী সরে যাই, তাঁরা তত বেশী সরে যান না। লড়াই করার চেয়ে সাধরণতঃ সরে যাওয়াতে আমরা অধিক সময় ব্যয় করি, আর মাসে যদি গড়ে একটা বড় আকারের লড়াই করতে পারি, তাই যথেষ্ট ভাল। আমাদের 'সরে যাওয়ার' একটি মাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে 'লড়াই করা'। 'লড়াই করা'—এই ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত অমোদের সমস্ত রণনীতি ও যুদ্ধাভিযানের নীতি তবুও কখনো কখনো এমন অবস্থা দেখা যায়, যখন লড়াই করাটা আমাদের পক্ষে অসমীচীন হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ, আমাদের সম্মুখে যদি খুব বেশি শত্রু থাকে তাহলে লড়াই করাটা অসমীচীন। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের সম্মুখে শত্রবাহিনী খুব বেশী বড় না হয়েও যদি আশপাশের শত্রুবাহিনীগুলোর খুব কাছাকাছি হয়, তাহলে তেমন অবস্থায় কখনো কখনো লড়াই করাটাও অসমীচীন। তৃতীয়তঃ, সাধারণতঃ বলতে গেলে, যে শত্রুবাহিনী বিচ্ছিন্ন নয় পরন্তু অত্যন্ত দৃঢ় অবস্থান অধিকার করে আছে, তেমন শত্রুর সঙ্গে লড়াই করাও অসমীচিন। চতুর্থতঃ, যে লড়াইয়েজয়ের সম্ভাবনা নেই এমন লড়াই অব্যাহত রাখাও উচিত নয়। এমন অবস্থায় আমাদের সরে যেতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এইরূপে সরে যাওয়াটা অনুমোদনযোগ্য এবং অবশ্য প্রয়োজনীয়। কারণ প্রথমে

লড়াই করার প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নেবার শর্তেই আমরা স্বীকার করি সরে যাবার প্রয়োজনীয়তাকে। এখানেই নিহিত রয়েছে লালফৌজের চলমান লড়াইয়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

আমাদের যুদ্ধ মূলতঃ চলমান লড়াই, কিন্তু যেখানে প্রয়োজন ও সম্ভব সেখানে অবস্থানগত লড়াইকেও আমরা প্রত্যাখান করি না। আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, রণনীতিগত প্রতিরক্ষার সময়ে আমাদের রক্ষী বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দৃঢ়ভাবে রক্ষা করার জন্যে এবং রণনীতি-গত আক্রমণের সময়ে বিচ্ছিন্ন ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত শত্রুর মোকাবিলার জন্যে অবস্থানগত লড়াইয়ের পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত। এ ধরনের অবস্থানগত লড়াইয়ের মাধ্যমে শত্রুকে পরাজিত করার অভিজ্ঞতা আমাদের কম ছিল না। এইভাবে বহু শহর, দুর্গ ও সুরক্ষিত গ্রাম ভেঙে উন্মুক্ত করেছিলাম আমরা, ভেদ করে দিয়েছিলাম শত্রুর যথেষ্ট সুরক্ষিত রণক্ষেত্রের অবস্থান-গুলিকে। এইক্ষেত্রে পরে আমাদের প্রচেষ্টা বাড়াতে হবে এবং আমাদের এইক্ষেত্রের দুর্বলতাকেও দূর করতে হবে। যে অবস্থানগত আক্রমণ ও অবস্থানগত প্রতিরক্ষা অবস্থার পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং তাতে অনুমোদনীয়, তা আমাদের সম্পূর্ণভাবেই সমর্থন করা উচিত। আজকের দিনে অবস্থানগত লড়াইয়ের সাধারণ ব্যবহার অথবা চলমান লড়াইয়ের সঙ্গে অবস্থানগত লড়াইকে সমান স্থান দেওয়ারই শুধু আমরা বিরোধিতা করি। সেগুলো অনুমোদন করা যায় না।

দশ বছরের গৃহযুদ্ধের মধ্যে লালফৌজের গেরিলা চরিত্রে, স্থায়ী যুদ্ধরেখার অভাবে, ঘাঁটি এলাকা ও তার গঠনকার্যের প্রবহমানতায় কি কোন পরিবর্তন হয়নি? হ্যাঁ, হয়েছে। চিংকাং পর্বতের দিনগুলি থেকে শুরু করে কিয়াংসীতে প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আগে পর্যন্ত কালটি ছিল প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে গেরিলা চরিত্র ও প্রবহমানতা খুব বেশি স্পষ্ট ছিল, লালফৌজ ছিল তার শৈশবাবস্থায় এবং ঘাটি এলাকা তখনও পর্যন্ত গেরিলা অঞ্চলই ছিল। প্রথম থেকে তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পর্যন্ত কালটি ছিল দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে গেরিলা চরিত্র ও প্রবহমানতা অনেক পরিমাণে কমে যায়, লালফৌজের প্রথম ফ্রন্ট-আর্মি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বেশ কয়েক লক্ষ লোকসংখ্যাবিশিষ্ট ঘাটি এলাকা স্থাপিত হয়। তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পর থেকে

শুরু করে পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পর্যন্ত সময়টা ছিল তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে গেরিলা চরিত্র ও প্রবহমানতা আরও কমে গিয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও বিপ্লবী সামরিক কমিশন ইতিপূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল। দীর্ঘ অভিযান ছিল চতুর্থ পর্যায়। ভ্রান্তভাবে ক্ষুদ্রাকারের গেরিলা চরিত্র ও ঘাঁটি এলাকার সামান্য প্রবহমানতাকে অস্বীকার করার ফলে বিরাট গেরিলা চরিত্রের ও বিরাট প্রবহমানতার উদ্ভব ঘটেছিল। এখানে আমরা রয়েছি পঞ্চম পর্যায়ে। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চুরমার করে দেবার ব্যাপারে আমাদের ব্যর্থতার কারণে এবং এই বিরাট প্রবহমানতার কারণে লালফৌজ ও ঘাঁটি এলাকাগুলো অনেক হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে আমরা দৃঢ়ভাবে পা রেখে দাঁড়িয়েছি এবং শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সামান্য ঘাঁটি এলাকাকে সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করেছি। লালফৌজের প্রধান শক্তি তিনটি ফ্রন্ট-আর্মিকে একীভূত পরিচালনার অধীনে আনা হয়েছে—পূর্বে আর কখনও এমনটি হয়নি।

রণনীতির প্রকৃতি বিচার করলে, আমরা এ কথাও বলতে পারি যে, চিংকাং পর্বতের সময় থেকে চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পর্যন্ত কালটা ছিল একটা পর্যায়, পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় ছিল আর একটা পর্যায়; এবং দীর্ঘ অভিযান থেকে অদ্যাবধি কালটি হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে অতীতের সঠিক নীতিকে ভ্রান্তভাবে অস্বীকার করা হয়েছিল। আর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে অবলম্বিত ভুল নীতিকে আজ আমরা সঠিকভাবে অস্বীকার করেছি এবং আগেকার সঠিক নীতিকে পুনঃপ্রবর্তিত করেছি। কিন্তু পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সবকিছুকেই যেমন আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিইনি, তেমনি অতীতের সবকিছুকেই যে আমরা পুনঃপ্রবর্তিত করেছি, তাও নয়। অতীতে যা ভাল ছিল আমরা শুধু তাকে আবার পুনঃপ্রবর্তিত করেছি, পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে ভুল হয়েছিল শুধু তাকেই আমরা পরিত্যাগ করেছি।

গেরিলাবাদের দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে অনিয়মানুবর্তিতা, অর্থাৎ কেন্দ্রীয়করণের অভাব, একত্বের অভাব, কঠোর শৃংখলার অভাব এবং কর্ম পদ্ধতির অতি সরলতা ইত্যাদি। এগুলো এসেছিল লালফৌজের শৈশবাবস্থা

থেকে, এগুলোর কোন কোনটার প্রয়োজন তখন ছিল। কিন্তু লালফৌজ উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অবশ্যই ক্রমে ক্রমে ও সচেতনভাবে সেগুলো দূর করা দরকার, যাতে করে লালফৌজ আরও বেশী কেন্দ্রীভূত, আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ, আরও বেশি সুশৃংখলাপূর্ণ হতে পারে এবং কাজকর্ম আরও বেশি পুংখানুপুংখভাবে করতে পারে, অর্থাৎ যাতে করে লালফৌজ আরও বেশি নিয়মিত চরিত্রসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। সামরিক কার্যকলাপের পরিচালনায় যেসব গেরিলা চরিত্র উচ্চতর পর্যায়ের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে সেগুলিকে ক্রমে ক্রমে ও সচেতনভাবে কমিয়ে ফেলতে হবে। এই ব্যাপারে এগিয়ে অস্বীকার করা এবং পুরানো পর্যায়ে একগুঁয়ের মতো থামাটা হচ্ছে অনুমোদনযোগ্য ও ক্ষতিকর, আর বিরাটাকারের লড়াই চালনার পক্ষে তা হচ্ছে ক্ষতিকর।

গেরিলাবাদের অপর দিকটা হচ্ছে চলমান লড়াইয়ের নীতি, রণনীতিগত ও যুদ্ধাভিযানগত লড়াই চালনার গেরিলা চরিত্র—যা এখনো প্রয়োজনীয়। এই দিকটা হচ্ছে ঘাঁটি এলাকাগুলোর অপরিহার্য প্রবহমানতা, ঘাঁটি এলাকাগুলোতে গঠন পরিকল্পনার নমনীয়তা, এবং লালফৌজের গঠনে অসময়োচিত নিয়মানুবর্তিতার প্রত্যাখ্যান। এই ক্ষেত্রে ইতিহাসের তথ্যকে অস্বীকার করা, যা উপযোগী তাকে বজায় রাখার বিরোধিতা করা, অবিবেচিতভাবে বর্তমান পর্যায়কে ছেড়ে যাওয়া, এবং যা নাগালের বাইরে ও বর্তমান বাস্তবিক্ে তাৎপর্যবিহীন সেই তথাকথিত 'নতুন পর্যায়ে' অন্ধের মতো ছুটে যাওয়াটা অনুরূপভাবে হচ্ছে অনুমোদনযোগ্য ও ক্ষতিকর এবং বর্তমানের লড়াই চালনার পক্ষে তা হচ্ছে অনিষ্টকর।

আমরা এখন লালফৌজের কারিগরী ও সাংগঠনিক বিকাশের একটা নতুন পর্যায়ের পূর্বক্ষণে রয়েছি। এই নতুন পর্যায়ে যাবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। এই ধরনের প্রস্তুতি না করাটা হবে ভুল, আমাদের ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পক্ষেও তা হবে অনিষ্টকর। ভবিষ্যতে, যখন লালফৌজের কারিগরী ও সাংগঠনিক অবস্থা বদলাবে এবং লালফৌজের গঠনকার্য নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করবে, তখন লালফৌজের লড়াই চালনার দিকস্থিতি (operational direcrions) ও যুদ্ধ-রেখা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয়ে উঠবে, অবস্থানগত লড়াই বৃদ্ধি পাবে, যুদ্ধের প্রবাহমানতা, আমাদের ভূখণ্ডের ও গঠনকার্যের প্রবাহমানতা বহুল পরিমাণে কমে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শত্রুর উৎকৃষ্ট শক্তি ও তার

সুদৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত অবস্থান প্রভৃতি যে সমস্ত অসুবিধা বর্তমানে আমাদেরকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাখছে, সেগুলো তখন আর আমাদেরকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাখতে পারবে না।

বর্তমানে আমরা একদিকে 'বাম' সুবিধাবিদের প্রাধান্যকালের ভুল পদ্ধতিগুলোর বিরোধিতা করি, অন্যদিকে লালফৌজের শৈশবাবস্থার অনেকগুলো অনিয়মিত চরিত্র যা বর্তমানের জন্য অপ্রয়োজনীয়, তার পুনঃপ্রবর্তনেরও বিরোধিতা করি। কিন্তু সৈন্যবাহিনী গঠনের এবং রণনীতি ও রণকৌশলের বহু অমূল্য নীতিকে দৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এইগুলোকে অবলম্বন করেই লালফৌজ যুদ্ধে বারংবার জয়লাভ করছে। অতীতের যা কিছু ভাল সেগুলোর সার সংকলন করে সুব্যবস্থিত, আরও বিকশিত ও আরও সমৃদ্ধ সামরিক লাইনে পরিণত করতে হবে, যাতে করে আজ আমরা শত্রুকে পরাজিত করতে পারি এবং ভবিষ্যতে নতুন পর্যায়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারি।

চলমান লড়াই চালানোর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বহু সমস্যা। যথা: পর্যবেক্ষণ, বিচার, সংকল্প লড়াইয়ের জন্য বিন্যাসব্যবস্থা, পরিচালনা, আত্মগোপন, কেন্দ্রীকরণ, অগ্রগমন, প্রসারণ, আক্রমণ, পশ্চাদ্ধাবন, আকস্মিক আক্রমণ, অবস্থানগত আক্রমণ, অবস্থানগত প্রতিরক্ষা, সম্মুখ সংঘর্ষ, পশ্চাদপসরণ, নৈশ লড়াই, বিশেষ ধরনের লড়াই, সবলকে এড়িয়ে দুর্বলকে আক্রমণ, শহর ঘেরাও করে এর সাহায্যে ধেয়ে আসা শত্রুকে ধ্বংস করা, কপট আক্রমণ' বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা, কয়েকটি শত্রুবাহিনীর মধ্যে সামরিক কার্যকলাপ চালানো, শত্রুর একাংশ অতিক্রম করে অন্য অংশের উপরে আক্রমণ চালানো, অবিরাম লড়াই চালানো, পৃষ্ঠদেশহীন লড়াই, ভালভাবে বিশ্রাম করার ও কর্মশক্তি সঞ্চয় করার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলো লালফৌজের যুদ্ধ-ইতিহাসে অনেক বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত করেছে। যুদ্ধাভিযান-বিজ্ঞানে এই সব বৈশিষ্ট্যগুলোর সুশৃংখলভাবে আলোচনা হওয়া উচিত এবং সে-সবের সারসংক্ষেপও থাকা উচিত। সে-সব নিয়ে এখানে আমি আলোচনা করছি না।

৮। দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধ

রণনীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধাভিযান ও লড়াই

হচ্ছে একই বিষয়ের দুইটি দিক। গৃহযুদ্ধে এই দুটি নীতি একই সময়ে সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধেও এগুলি প্রযোজ্য।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি খুবই প্রবল হওয়ার কারণে বিপ্লবী শক্তি বাড়ে শুধু ক্রমে ক্রমে—এটাই যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি নির্ধারণ করে। এই ক্ষেত্রে অধৈর্য হওয়া ক্ষতিকর এবং এখানে 'দ্রুত নিষ্পত্তির' কথা বলা ভুল। আমরা দশ বছর ধরে বিপ্লবী যুদ্ধ চালিয়েছি, অন্যান্য দেশের কাছে এটা বিস্ময়কর হতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে এটা যেন একটা অষ্টপদী রচনার শিরোনামার ব্যাখ্যা এবং প্রাথমিক মন্তব্য[৪০] মাত্র লেখা হয়েছে—রচনাটির অনেক আকর্ষণীয় অংশ এখনো লিখতে বাকী আছে। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থার প্রভাবে ভবিষ্যতের বিকাশ যে আগের চেয়ে অনেক দ্রুততর হতে পারবে—তাতে কোন সন্দেহই নেই। কারণ আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই পরিবর্তন ঘটেছে এবং আরও বৃহত্তর পরিবর্তন ঘটবে। তাই এ কথা বলা যায় যে, মন্থর বিকাশ ও একা লড়াই করার অতীত অবস্থা থেকে আমরা মুক্ত হতে পেরেছি। কিন্তু আগামীকালই সাফল্যলাভের আশা করা উচিৎ হবে না 'প্রাতরাশের পূর্বেই শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার উচ্চাভিলাষ ভাল, কিন্তু তেমনি করবার জন্য বাস্তব পরিকল্পনা করাটা খারাপ। চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো বহু সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় দেশী ও বিদেশী শত্রুর প্রধান অবস্থানগুলোকে ভেঙে ফেলবার মতো যথেষ্ট শক্তি চীনের বিপ্লবী শক্তিগুলো সঞ্চয় না করা পর্যন্ত এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শক্তিগুলোর দ্বারা আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর অধিকাংশকে চূর্ণ না করা ও আটকে না রাখা পর্যন্ত, আমাদের বিপ্লবী যুদ্ধটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হিসেবেই চলতে থাকবে। এই ভিত্তিতে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী লড়াই চালনার রণনীতিগত নীতি নির্ধারণ করাটা হচ্ছে আমাদের রণনীতিগত পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলির একটি।

যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের নীতি ঠিক এর বিপরীত—দীর্ঘস্থায়িত্ব নয়, বরং দ্রুত নিষ্পত্তিই হল নীতি। যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত নিষ্পত্তির চেষ্টা করা প্রয়োজন, প্রাচীনকালে বা আধুনিককালে, চীনদেশে বা বিদেশে এটা একইভাবে সত্য। যুদ্ধের ব্যাপারেও সব সময়ে ও সব দেশে দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি করা হয় এবং দীর্ঘ প্রলম্বিত যুদ্ধকে সর্বদাই ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করা হয়। চীনের যুদ্ধকেই কেবল সর্বাধিক ধৈর্যের সঙ্গে চালাতে হবে, এবং তাকে অবশ্যই

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হিসেবে চালাতে হবে। লি লি-সান লাইনের আমলে কেউ কেউ আমাদের কার্যকলাপকে 'মুষ্টিযুদ্ধের রণকৌশল' বলে বিদ্রুপ করত (মুষ্টিযুদ্ধের রণকৌশল বলতে বুঝায় বারবার লড়াই করার পরই কেবল একটি বড় শহর দখল করার কথা)। তারা এই বলে উপহাস করত যে, আমাদের চুল পেকে সাদা হওয়ার পরেই শুধু বিপ্লবের জয় আমরা দেখতে পাই। এই ধরনের অসহিষ্ণু মনোভাব অনেক আগেই ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের সমালোচনা রণনীতির সম্পর্কে প্রয়োগ না করে যদি যুদ্ধাভিযান ও লড়াই সম্পর্কে প্রয়োগ করা হতো, তাহলে সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল হতো। তার কারণঃ প্রথমতঃ, লালফৌজের অস্ত্রশস্ত্র বিশেষ করে গোলাবারুদের সরবরাহের উৎস নেই ; দ্বিতীয়তঃ, শ্বেতবাহিনীর অনেক সৈন্যদল রয়েছে কিন্তু লালফৌজের আছে শুধু একটা—প্রতিটি 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যে লালফৌজকে দ্রুতভাবে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকতে হয় ; তৃতীয়তঃ, শ্বেতবাহিনী কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে পৃথক পৃথকভাবে অগ্রসর হলেও সেগুলির অধিকাংশই একে অপরের খুবই কাছাকাছি থাকে। আমরা যদি তাদের একটাকে আক্রমণ করে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে না পারি, তাহলে অন্য দলগুলিও সবাই আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এইসব কারণেই আমরা দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই না চালিয়ে পারি না। প্রায়শঃই, আমরা কয়েক ঘন্টার মধ্যে, অথবা এক বা দুই দিনের মধ্যে একটা লড়াই শেষ করে থাকি। 'শহর ঘেরাও করে এর সাহায্যে ধেয়ে আসা শত্রুকে ধ্বংস করার' নীতির উদ্দেশ্য পরিবেষ্টিত শহরের শত্রুকে ধ্বংস করা নয়, বরং তার সাহায্যে ধেয়ে আসা শত্রুকে ধ্বংস করা। শুধু এই নীতিতেই আমরা পরিবেষ্টিত শত্রুর বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালাতে প্রস্তুত, কিন্তু তখনো তার সাহায্যে ধেয়ে আসা শত্রুর বিরুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই চালাব। আমরা যখন রণ-নীতিগত প্রতিরক্ষায় শত্রুকে আটকে রাখবার কার্যকলাপে কোন ঘাঁটিকে দৃঢ়-ভাবে রক্ষা করি, অথবা যখন রণনীতিগত আক্রমণে আমরা বিচ্ছিন্ন ও সাহায্যে থেকে বঞ্চিত শত্রুকে আঘাত হানি, অথবা আমাদের ঘাঁটি এলাকার অভ্যন্তরস্থ শ্বেত ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করি, তখন প্রায়শঃই আমরা যুদ্ধাভিযান বা লড়াইকেও দীর্ঘস্থায়ীভাবে চালিয়ে যাবার নীতি গ্রহণ করি। কিন্তু এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী লড়াই নিয়মিত লালফৌজকে তার দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ে শুধু সাহায্যই করে, বাধা দেয় না।

দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ের ব্যাপারে যে শুধু ইচ্ছা থাকলেই সাফল্যলাভ করা যাবে, তা নয়। এরজন্য আরও অনেকগুলো বাস্তব শর্ত থাকা দরকার। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে—পূর্ণপ্রস্তুতি, উপযুক্ত মুহূর্তটি না হারানো, উৎকৃষ্টতর সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা; ঘেরাও করার ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্শ্বে বা পিছনে এগিয়ে যাওয়ার রণকৌশল, অনুকূল অবস্থান, চলমান শত্রুকে আঘাত হানা, অথবা শত্রু যখন শিবির ফেলার জন্য থেমেছে কিন্তু তার অবস্থান, সংহত হয়নি তখন তাকে আঘাত হানা। এইসব শর্তের সৃষ্টি করা না হলে যুদ্ধাভিযান অথবা লড়াইয়ের দ্রুত নিষ্পত্তি অসম্ভব।

শত্রুর প্রতিটি 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দেওয়াটা হচ্ছে একটা বিরাটাকারের যুদ্ধাভিযান, এতেও দ্রুত নিষ্পত্তির নীতি প্রযোজ্য, দীর্ঘস্থায়িত্বের নীতি নয়। কারণ ঘাঁটি এলাকার জনশক্তি, অধিক শক্তি এবং সামরিক শক্তি প্রভৃতি শর্তগুলো দীর্ঘস্থায়িত্বের অনুমোদন করে না।

কিন্তু দ্রুত নিষ্পত্তির সাধারণ নীতিতে অপ্রয়োজনীয় অসহিষ্ণুতার বিরোধিতা করা অবশ্যই দরকার। এটা সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজন যে, ঘাঁটি এলাকার এই সমস্ত শর্ত ও শত্রুর অবস্থা বিচার-বিবেচনা করে একটা বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার সর্বোচ্চ সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় সংস্থার উচিত শত্রুর তর্জন-গর্জনের ভয়ে ভীত না হওয়া, সহ্য করা সম্ভব এমন কষ্টের ভয়ে নিরুৎসাহ না হওয়া, কয়েকবার ব্যর্থ হয়াতে হতাশ না হওয়া এবং প্রয়োজনীয় ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা। কিয়াংসী প্রদেশে প্রথম 'পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানকে চুরমার করতে প্রথম থেকে শেষ লড়াই পর্যন্ত শুধু এক সপ্তাহ লেগেছিল; দ্বিতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' আভযানকে চুরমার করতে একপক্ষকাল মাত্র লেগেছিল ; তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চুরমার করার জন্য তিন মাস ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছিল ; চতুর্থটিকে লেগেছিল তিন সপ্তাহ; পঞ্চমটিতে গোটা একবছর অতি কষ্টে ও ধৈর্যের সঙ্গে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চুরমার করতে ব্যর্থ হবার পরে আমরা যখন শত্রুর পরিবেষ্টনকে ভেদ করে যেতে বাধ্য হলাম, তখন অপ্রয়োজনীয় তাড়াহুড়ো দিয়েছিল। তখনকার অবস্থা অনুসারে আমারা আরও দু-তিন মাস টিকতে পারতাম, তাতে বিশ্রামের জন্য ও নিজেকে ঠিকঠাক করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে কিছুটা সময়ও দেওয়া যেত। এটা যদি করা হতো এবং পরিবেষ্টনকে ভেদ করার পরে আমাদের নেতৃত্ব যদি একটু বেশি

বিচক্ষণ হতো তাহলে পরিস্থিতিটা অনেক ভিন্ন হতো।

তৎসত্ত্বেও, গোটা যুদ্ধাভিযানের সময়কে যথাসম্ভব উপায়ে হ্রাস করার নীতি যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, তা অপরিবর্তিতই রয়েছে। যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের পরিকল্পনাগুলোর উচিত সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা এবং চলমান লড়াই চালানো প্রভৃতির জন্য প্রচেষ্টা চালানো। এইসবই করা উচিত অন্তর্লাইনে (অর্থাৎ ঘাঁটি এলাকায়) শত্রুর কার্যকারী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য এবং 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে দ্রুত চুরমার করার জন্য। এগুলি ছাড়া, যখন এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, অন্তর্লাইনের 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চুরমার করা অসম্ভব, তখন শত্রুর পরিবেষ্টনকে ভেদ করে যাবার জন্য আমাদের উচিত লালফৌজের প্রধান শক্তিকে নিয়োগ করা এবং আমাদের বহির্লাইনে অর্থাৎ শত্রুর অন্তর্লাইনে সরে এসে সেখানেই শত্রুকে পরাজিত করা। আজ যখন দুর্গনীতি খুবই চালু করে নিয়েছে, তখন প্রায়শঃই উপরোক্ত পদ্ধতিই হবে আমাদের লড়াইয়ের পদ্ধতি। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হবার দু'মাস পরেই ফুকিয়েনের ঘটনাটা[৪১] ঘটল। তখন লাল ফৌজের প্রধান শক্তিগুলোর নিঃসন্দেহে উচিত ছিল চেকিয়াংকে কেন্দ্র করে কিয়াংসু-চেকিয়াং-আনহুই-কিয়াংসী অঞ্চলে জোর করে ঢুকে পড়া, আর হাংচৌ, সুচৌ, নানকিং, উহু, নানছাং ও ফুচৌয়ের* মধ্যবর্তী গোটা এলাকার সর্বত্রই সক্রিয়ভাবে সামরিক তৎপরতা বিস্তৃত করা, আমাদের রণনীতিগত প্রতিরক্ষাকে রণনীতিগত আক্রমণে পরিবর্তিত করা, শত্রুর গুরুত্বপূর্ণ মূল অঞ্চলগুলোকে বিপদাপন্ন করা এবং যে বিশাল এলাকায় দুর্গ নেই, সেখানে শত্রুকে যুদ্ধে লিপ্ত করা। যে শত্রু দক্ষিণ কিয়াংসী পশ্চিম ফুকিয়েনের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল, এই ধরনের উপায়ে আমরা তাকে তার নিজের গুরুত্বপূর্ণ মূল অঞ্চলগুলোকে রক্ষা করবার জন্যে পিছু হঠতে বাধ্য করতে পারতাম, কিয়াংসীর ঘাঁটি এলাকার ওপরে অক্রমণকে চুরমার করে দিতে পারতাম, এবং ফুকিয়েন গণসরকারকে সাহায্য করতে পারতাম— নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারতাম এই উপায়ে। এই পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করা হয়েছিল বলেই শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চুরমার করতে পারা গেল না, আর ফুকিয়েনে গণ-সরকারও ভেঙে পড়তে বাধ্য হল। এক বছর ধরে লড়াইয়ের পরে চেকিয়াংয়ের দিকে এগিয়ে যাবার কোন সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও, আমরা অন্যদিকে রণনীতিগত আক্রমণ চালাতে পারতাম, অর্থাৎ

আমাদের প্রধান বাহিনীগুলোকে হুনান অভিমুখে পরিচালিত করে, মানে হুনানের ভেতর দিয়ে কুইচৌয়ে যাবার বদলে মধ্য হুনানে এগিয়ে যেতে পারতাম, এবং এইভাবে শত্রুকে কিয়াংসী থেকে হুনানে টেনে এনে সেখানে তাকে ধ্বংস করতে পারতাম। কিন্তু এ পরিকল্পনাটাও অগ্রাহ্য করা হল, ফলে শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দেবার শেষ আশাও নির্মূল হল, এবং লং মার্চ ছাড়া আমাদের আর কোন পথই রইল না।

৯। নির্মূলীকরণের যুদ্ধ

আজ চীনা লালফৌজের জন্য 'শক্তিক্ষয়ের প্রতিযোগিতার' ওকালতি করা অসমীচীন। 'মণিরত্নের প্রতিযোগিতা' দুটি ড্রাগন রাজার মধ্যে না চলে ড্রাগন রাজা ও এক ভিখারীর মধ্যে চলছে এটা খুবই হাস্যকর। লালফৌজ তার প্রায় সবকিছু শত্রুর কাছ থেকে পায়, তার পক্ষে নির্মূলীকরণের লড়াই হচ্ছে মৌলিক নীতি। শত্রুর কার্যকরী শক্তিকে নির্মূল করেই শুধু আমরা 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে ভেঙে দিতে ও বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাকে সম্প্রসারিত করতে পারি। শত্রুকে হতাহত করার নীতিটা ব্যবহৃত হয় শত্রুকে নির্মূল করার উপায় হিসেবে, অন্যথায় সেটার কোন অর্থই হয় না। শত্রুকে হতাহত করতে গিয়ে আমরা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হই, আবার শত্রুকে নির্মূল করেই আমরা আমাদের নিজেদের পূরণ করি। এইভাবে আমরা যে শুধু আমাদের সৈন্যবাহিনীর ক্ষতিরই পূরণ করে নিই তা নয় বরং এর মাধ্যমে আমরা আমাদের সৈন্যবাহিনীর শক্তির বৃদ্ধিও করে নিই। প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন শত্রুবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করায় জয়-পরাজয়ের মৌলিক মীমাংসা হয় না। পক্ষান্তরে নির্মূলীকরণের লড়াই যে-কোন শত্রুর উপর তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড চাপ দেয়। একটি লোকের দশটা আঙুল ক্ষতবিক্ষত করাটাও তার একটি আঙুলকে একেবারে কেটে দেওয়ার মতো কার্যকরী নয়, শত্রুর দশটি ডিভিশনকে ছত্রভঙ্গ করাটাও তাদের একটিকে নির্মূল করে ফেলার মতো কার্যকরী নয়।

শত্রুর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের মোকাবিলা করার জন্য আমাদের নীতি ছিল নির্মূলীকরণের লড়াই। প্রত্যেকবারে যেসব শত্রুকে নির্মূল করা হয়েছে, তা শুধু সমগ্র শত্রুবাহিনীর একটি অংশ মাত্র, তবুও এইসব 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চুরমার করা

হয়েছে। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে এর বিপরীত নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, আর এটা বাস্তবে শত্রুকে তার লক্ষ সাধনে সাহায্য করেছিল।

একদিকে নির্মূলীকরণের লড়াই, অপরদিকে উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা এবং ঘেরাও করার ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্শ্বে বা পিছনে এগিয়ে যাওয়ার রণকৌশল গ্রহণ করা—এ দুটোর তাৎপর্য একই। দ্বিতীয়টা না হলে আমরা প্রথমটা পেতে পারি না। জনসমর্থন, অনুকূল অবস্থান, সহজে আঘাত হানা যায় এমন শত্রু এবং আকস্মিকতার সুবিধা প্রভৃতি শর্তাদি সবই হচ্ছে নির্মূলীকরণের লড়াইয়ের পক্ষে অপরিহার্য।

যখন আমাদের সৈন্যবাহিনীর প্রধান শক্তি সমগ্র লড়াইয়ে বা সমগ্র যুদ্ধাভিযানে শত্রুর একটা নির্দিষ্ট অংশের বিরুদ্ধে নির্মূলীকরণের লড়াই চালায় শুধু তখনই শত্রুর অন্য অংশকে ছত্রভঙ্গ করার তাৎপর্য থাকে, এমনকি তাকে পালিয়ে যেতে দেওয়ার তাৎপর্যও থাকে। অন্যথায় সেটা অর্থহীন। এইক্ষেত্রে লাভের দ্বারা ক্ষতি সার্থক হয়েছিল।

আমাদের সামরিক শিল্প স্থাপন করতে গিয়ে নিজেদের আমরা অবশ্যই তার উপর নির্ভরশীল হতে দেব না। আমাদের মৌলিক নীতি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের ও দেশী শত্রুর সামরিক শিল্পের উপর নির্ভর করা। লণ্ডন ও হানইয়াংয়ের অস্ত্রশস্ত্রের কারখানার উপরে আমাদের অধিকার আছে, এবং শত্রুর পরিবহণ বাহিনীর মাধ্যমে এই অস্ত্রাদি আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়। এটা সরল সত্য, এটা ঠাট্টা নয়।

টীকা

১। উত্তর অভিযানের যুদ্ধ হচ্ছে ১৯২৬-২৭ সালে চীনা জনগণের দ্বারা চালিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী মহান বিপ্লবী যুদ্ধ। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে, কুয়াংতোংয়ের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা একীকরণ করার পর, উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজদের শাসন উচ্ছেদ করার জন্য জাতীয় বিপ্লবী বাহিনী কুয়াংতুং থেকে উত্তর অভিযান শুরু করেছিল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্বে ও ব্যাপক শ্রমিক-কৃষকসাধারণের আন্তরিক সমর্থনে ১৯২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ও ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে জাতীয় বিপ্লবী বাহিনী যুদ্ধ

চালিয়ে দ্রুতভাবে ইয়াংসি ও হুয়াংহো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে পৌঁছেছিল এবং অর্ধেক চীন দখল করে নিয়েছিল, এবং এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তির উপরে মোক্ষম আঘাত হেনেছিল। যখন উত্তর অভিযান বিজয়ের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন চিয়াং কাই-শেকের প্রতিনিধিত্বে পরিচালিত কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীরা (যারা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী ও বৃহৎ জমিদারদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে) সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিবিপ্লবী ক্যুদেতা ঘটায়। তা ছাড়া চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ছেন তু-সিউর প্রতিনিধিত্বে পরিচালিত দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা পার্টির নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে কমরেড মাও সে-তুঙের সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী লাইনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এবং আত্মসমর্পণবাদী লাইনকে পালন করে বিপ্লবের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করেছিল, বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব ত্যাগ করেছিল। ফলে এবারকার বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যায়।—অনুবাদক

২। রণনীতির বিজ্ঞান, যুদ্ধাভিযানের বিজ্ঞান ও রণকৌশলের বিজ্ঞান—এসবগুলিই চীনা সামরিক বিজ্ঞানের অংগ। রণনীতির বিজ্ঞান সামগ্রিক যুদ্ধ-পরিস্থিতির নিয়মগুলির পর্যালোচনা করে। যুদ্ধাভিযানের বিজ্ঞান যুদ্ধাভিযানের নির্ধারক নিয়মগুলির পর্যালোচনা করে, এবং যুদ্ধাভিযানে প্রযুক্ত হয়। রণ-কৌশলের বিজ্ঞান খণ্ডযুদ্ধের নির্ধারক নিয়মগুলির পর্যালোচনা করে ও খণ্ডযুদ্ধে প্রযুক্ত হয়।

৩। সুন উ জু অর্থাৎ সুন উ ছিলেন খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের বিখ্যাত চীনা সমরতত্ত্ববিদ। তিনি সুন জু নামে একখানি বই লিখেছিলেন, এই বইয়ে ১৩টি অধ্যায় আছে। এই উদ্ধৃতিটি 'আক্রমণের রণনীতি' নামক তৃতীয় অধ্যায় থেকে গৃহীত।

৪। কমরেড মাও সে-তুঙ যখন ১৯৩৬ সালে এই প্রবন্ধটি লেখেন, তখন ১৯২১ সালের জুলাই মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার পনের বছর পূর্ণ হয়েছে।

৫। ছেন তু-সিউ ছিলেন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। 'সিন ছিন-নিয়ান' (নবযুবক) নামক একটি সাময়িকীর সম্পাদক হিসেবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ছিলেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ৪ঠা মে আন্দোলনে তাঁর খ্যাতি ও পার্টির প্রাথমিক পর্যায়ের অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের সর্বশেষ পর্যায়ে পার্টির ভেতরে ছেন তু-সিউ যে দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তা আত্মসমর্পণবাদী লাইনে রূপ লাভ করেছিল। তখনকার 'আত্মসমর্পণবাদীরা স্বেচ্ছায় কৃষকসাধারণ, শহরে পেটি-বুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়াদের ওপরে নেতৃত্বকে ত্যাগ করেছিল, বিশেষ করে তারা ত্যাগ করেছিল সশস্ত্র বাহিনীর ওপরে নেতৃত্বকে। এমনি করে তারা পরাজয় ঘটিয়েছিল বিপ্লবের' ('বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য' : মাও সে-তুঙ)। ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পরে ছেন তু-সিউ ও মুষ্টিমেয় অন্যান্য আত্মসমর্পণবাদীরা বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন এবং বিলোপবাদী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ট্রটস্কিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন এবং ট্রটস্কিবাদীদের সঙ্গে মিলে একটি পার্টি-বিরোধী উপদল গঠন করেছিলেন। ফলতঃ ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে ছেন তু-সিউ পার্টি থেকে বিতাড়িত হন। ১৯৪২ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

৬। লি লি-সানের 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ বলতে সেই 'বাম' সুবিধাবাদী লাইনকে বোঝায়, যার প্রাধান্য পার্টিতে ১৯৩০ সালের জুন মাস থেকে শুরু করে চার মাস যাবৎ ছিল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তৎকালীন প্রধান নেতা কমরেড লি লি-সান এই লাইনের প্রতিনিধিত্ব করতেন। এটা সাধারণতঃ লি লি-সান লাইন নামে পরিচিত। লি লি-সান লাইনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল : এই লাইন পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের নীতিকে লংঘন করে, বিপ্লবের জন্যে জনসাধারণের শক্তি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে, অস্বীকার করে বিপ্লবের অসমবিকাশকে। গ্রামীণ ঘাঁটি এলাকার সৃষ্টিতে, গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলোকে ঘেরাও করার ব্যাপারে, এবং দেশব্যাপী বিপ্লবের উত্তাল জোয়ারকে এগিয়ে নেবার জন্য এই ঘাঁটি এলাকাগুলোর ব্যবহারে প্রধানতঃ আমাদের মনোযোগ দীর্ঘকাল ধরে নিবদ্ধ রাখতে হবে—কমরেড মাও সে-তুঙের এ চিন্তাধারাকে এই লাইন 'মারাত্মক ভুল' এবং 'কৃষক মনোভাবের স্থানিকতা ও রক্ষণশীলতা' বলে মনে করত। আর এই লাইনটা এই অভিমত পোষণ করত যে, দেশের সব অংশে তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ ঘটানোর জন্যে প্রস্তুতি করতে হবে। এই ভুল লাইনের ভিত্তিতে কমরেড লি লি-সান সারা দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে তখনই সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাবার এক হঠকারী পরিকল্পনা তৈরী করে বসলেন। একই সময়ে এই লাইন আবার বিশ্ব-বিপ্লবের অসম

বিকাশকে মেনে নিতে অস্বীকার করল এই বলে যে, চীনা বিপ্লবের সামগ্রিক বিস্ফোরণ অনিবার্যরূপেই সামগ্রিক বিশ্ব-বিপ্লবের বিস্ফোরণ ঘটাবে, যাকে বাদ দিয়ে চীনা বিপ্লব সফল হতে পারে না। চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্রকে মানতেও অস্বীকার করল এই বলে যে, এক বা একাধিক প্রদেশে বিপ্লবের জয়ের সূচনাই হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরের সূচনা, এবং এইভাবে তিনি কতকগুলো অসময়োচিত 'বাম' হঠকারী নীতি নির্ধারিত করলেন। কমরেড মাও সে-তুঙ এই ভুল লাইনের বিরোধিতা করেন এবং সমগ্র পার্টির ব্যাপক কর্মী ও সদস্যগণও এর সংশোধন দাবি করেন। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনে উল্লিখিত ভুলগুলোকে কমরেড লি লি-সান নিজেই স্বীকার করেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বপদ থেকে সরে দাঁড়ান। দীর্ঘকাল ধরে কমরেড লি লি-সান নিজের ভুল অভিমতগুলো সংশোধন করে নেন, আর তাই পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসে তিনি আবার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

৭। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন এবং এর পরবর্তীকালের কেন্দ্রীয় কমিটি লি লি-সান লাইনের অবসান ঘটাবার জন্য অনেকগুলো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে পার্টির ভেতরে বাস্তব বিপ্লবী সংগ্রামে অনভিজ্ঞ কিছু সংখ্যক কমরেড ছেন শাও-ইয়ু (ওয়াং মিং) ও ছিন পাং-সিয়ান (পো কু)-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলির বিরোধিতা করতে দাঁড়ান। সেই সময়ে প্রকাশিত 'দুই লাইন' অথবা 'চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আরও বেশি বলশেভিকীকরণের জন্য সংগ্রাম' শীর্ষক পুস্তিকায় তাঁরা বিশেষ জোর দিয়ে ঘোষণা করেন যে, পার্টির ভেতরে তখন প্রধান বিপদ 'বাম' সুবিধাবাদ নয়, বরং তথাকথিত 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ'। আর নিজেদের কার্যকলাপের রাজনৈতিক পুঁজি সংগ্রহের জন্য তাঁরা লি লি-সান লাইনকে 'দক্ষিণপন্থী' লাইন বলে 'সমালোচনা' করেন। লি লি-সান লাইন এবং অন্যান্য 'বাম' ভাবধারা ও 'বাম' নীতিগুলোকে নতুন রূপে অব্যাহতভাবে চালু করা, পুনরুদ্ধার করা অথবা পরিপুষ্ট করার একটা নতুন রাজনৈতিক কর্মসূচী তাঁরা পেশ করেন, আর এটাকে তাঁরা দাঁড় করান কমরেড মাও সে-তুঙের সঠিক লাইনের বিরুদ্ধে। 'চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা' শীর্ষক বর্তমান প্রবন্ধটি

কমরেড মাও সে-তুঙ প্রধানত: এই নতুন 'বাম' সুবিধাবাদী লাইনের সামরিক ক্ষেত্রের ভুলভ্রান্তির সমালোচনা করার জন্যই রচনা করেছিলেন। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ বর্ধিত অধিবেশন থেকে শুরু করে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে কুইচৌ প্রদেশের চুনইতে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আহূত পলিটব্যুরোর অধিবেশন পর্যন্ত, পার্টির ভেতরে এই নতুন 'বাম' সুবিধাবাদী লাইনের প্রাধান্য ছিল। আর পলিটব্যুরোর এই অধিবেশনটি এই ভুল লাইনের নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে পরিচালিত নতুন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভুল 'বাম' লাইনের প্রাধান্য দীর্ঘকাল (চার বছর) ধরে পার্টিতে বিরাজ করে, এবং পার্টির ও বিপ্লবের গুরুতর ক্ষতি করে। তার কুফল হয়েছিল নিম্নরূপ: চীনা কমিউনিস্ট পার্টি, চীনা লালফৌজ ও তার ঘাঁটি এলাকার শতকরা ৯০ ভাগেরই ক্ষতি হয়েছিল, বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় কোটি কোটি মানুষ কুওমিনতাঙের নিষ্ঠুর উৎপীড়ন ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিল, আর বিলম্বিত করা হয়েছিল চীনা বিপ্লবের অগ্রগতিকে। যেসব কমরেড এই 'বাম' লাইনের ভুল করেছিলেন, তাঁদের ব্যাপকতম সংখ্যাগুরু অংশ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেদের ভুল বুঝেছিলেন ও সংশোধন করে নিয়েছিলেন, এবং পার্টি ও জনগণের জন্য বহু হিতকর কাজ করেছিলেন। কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে এক অভিন্ন রাজনৈতিক উপলব্ধির ভিত্তিতে অন্যান্য ব্যাপক কমরেড-সাধারণের সঙ্গে এইসব কমরেডরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।

৮। চাং কুও-থাও চীনা বিপ্লবের প্রতি একজন বিশ্বাসঘাতক। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যৌবনে সে চীনা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। পার্টিতে সে বহু ভুল করে আর মারাত্মক অপরাধ করে। তার সবচেয়ে বড় অপরাধ এই যে, সে ১৯৩৫ সালে লালফৌজের উত্তরমুখী অভিযানের বিরোধিতা করে এবং পরাজয়বাদ ও বিলোপবাদের জেদ ধরে লালফৌজের সিছুয়ান-সীথাং সীমান্তস্থ সংখ্যালঘু জাতিগুলির এলাকায় পশ্চাদপসরণের ওকালতি করে। পার্টি ও কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কার্যকলাপে সে প্রকাশ্যভাবে লেগে পড়ে, একটি নিজস্ব মেকী কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপন করে, পার্টি ও লালফৌজের ঐক্য লংঘন করে এবং লালফৌজের চতুর্থ ফ্রন্ট-আর্মির গুরুতর ক্ষতি ঘটায়। কমরেড মাও সে-তুঙের ও কেন্দ্রীয় কমিটির সহিষ্ণু শিক্ষাদানের ফলে, লালফৌজের চতুর্থ ফ্রন্ট-আর্মি ও তার ব্যাপক কর্মী অচিরেই কেন্দ্রীয় কমিটির

সঠিক নেতৃত্বের আওতায় ফিরে এলেন এবং পরবর্তী সংগ্রামগুলিতে গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করেন। চাং কুও-থাও নিজে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসংশোধিতই রইল। ১৯৩৮ সালের বসন্তকালে শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত এলাকা থেকে সে একাই পালিয়ে যায় এবং কুওমিনতাঙের গুপ্তচর-বিভাগে যোগ দেয়।

৯। লুশানস্থ অফিসার ট্রেনিং দল ছিল কমিউনিস্টবিরোধী সামরিক কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য চিয়াং কাই-শেকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে কিয়াংসী প্রদেশের কিউকিয়াং জেলার লুশান পাহাড়ে এই সংগঠন স্থাপিত হয়েছিল। জার্মান, ইতালীয় ও আমেরিকান সামরিক শিক্ষাদাতাদের কাছ থেকে ফ্যাসিস্ট সামরিক ও রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করার জন্য চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের পর্যায়ক্রমে সেখানে পাঠানো হতো।

১০। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের এই নতুন সামরিক নীতিগুলি বলতে প্রধানতঃ চিয়াং কাই-শেক দস্যু-চক্রের 'দুর্গনীতি'কেই বুঝায়। এই নীতি অনুসারে চিয়াং কাই-শেক চক্রের সৈন্যবাহিনী ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়ে দুর্গ নির্মাণ করে প্রতি পদক্ষেপে নিজেদের অবস্থান সুসংবদ্ধ করে নেয়।

১১। ভি. আই. লেনিনের 'কমিউনিজম' নামক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। হাঙ্গেরীয় কমিউনিস্ট বেলা কুনকে সমালোচনা করে এই প্রবন্ধে লেনিন বলেছিলেন যে, বেলা কুন 'এড়িয়ে গেছে মার্কসবাদের একান্ত সারবস্তু এবং মার্কসবাদের জীবন্ত মর্মবস্তু—বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ' ('সংকলিত রচনাবলী', রুশ সংস্করণ, মস্কো ১৯৫০, খণ্ড ৩১, পৃঃ ১৪৩)।

১২। হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার পার্টির প্রথম কংগ্রেস, অর্থাৎ ১৯২৮ সালের ২০শে মে তারিখে নিংকাং জেলার মাওপিংয়ে অনুষ্ঠিত হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস।

১৩। বিরাটাকারের পশ্চাদ্ভাগ-ব্যবস্থাকে বলতে বুঝায় বিরাট ও জগদ্দল আকারের পশ্চাদ্ভাগের কাঠামোকে প্রতিষ্ঠিত করা, যা তখনকার যুদ্ধের অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়নি। ছোট আকারের পশ্চাদ্ভাগ-ব্যবস্থাকে বলতে বুঝায় সহজতর এবং যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত এমন ছোট আকারের পশ্চাদ্ভাগের কাঠামোকে প্রতিষ্ঠিত করা।—অনুবাদক

১৪। ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীপনা সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থের 'পার্টির ভিতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে' প্রবন্ধের ৪ ও ৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫। 'দস্যু-বৃত্তি' বলতে নিয়মানুবর্তিতা, সংগঠন ও স্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যের অভাবজাত লুটপাট বুঝায়।

১৬। এখানে কিয়াংসী থেকে উত্তর শেনসী পর্যন্ত লালফৌজের ২৫ হাজার লীর দীর্ঘ অভিযানের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে চীনা শ্রমিক-কৃষকদের লালফৌজের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম আর্মি-গ্রুপ (অর্থাৎ লালফৌজের প্রথম ফ্রন্ট-আর্মি কেন্দ্রীয় লালফৌজের নামেও পরিচিত ছিল) পশ্চিম ফুকিয়েনের ছাংথিং ও নিংহুয়া এবং দক্ষিণ কিয়াংসীর রুইচিন, ইয়ুতু ও অন্যান্য স্থান থেকে রওনা হলেন আর শুরু করলেন একটা বিরাট রণনীতিগত স্থানান্তর। ফুকিয়েন, কিয়াংসী, কুয়াংতুং, হুনান, কুয়াংসী, কুইচৌ, সিছুয়ান, ইয়ুয়ান, সীখাং, কানসু ও শেনসী প্রদেশের মতো এগারটি প্রদেশের ভেতর দিয়ে তাঁরা এগিয়ে গেলেন চিরতুষারাচ্ছন্ন উচ্চ পর্বতমালা ও নির্জন তৃণভূমি পেরিয়ে, অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করে, বারবার শত্রুর পরিবেষ্টন, পশ্চাদ্ধাবন, অবরোধ ও বাধাকে ব্যর্থ করে এবং ২৫ হাজার লী (সাড়ে বারো হাজার কিলোমিটার) পথ অতিক্রম করে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে বিজয় উল্লাসে এসে পৌছালেন উত্তর শেনসীর বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায়।

১৭। 'সহায়ক বাহিনী' অর্থাৎ প্রধান বাহিনী নয়, এটা কেবলমাত্র সৈন্যবাহিনীর একটা অংশবিশেষ যা এই সৈন্যবাহিনীর পার্শ্বভাগ হিসেবে নিযুক্ত।

১৮। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ার বিদ্রোহ পরভূত হবার পরের যুগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময়ে বিপ্লবী জোয়ার ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছিল। 'সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ', তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৯। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে ব্রেস্টলিটভস্ক শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। তখন শত্রুর শক্তি স্পষ্টতঃই বিপ্লবী শক্তির চেয়ে বেশি প্রবল ছিল এবং নবজাত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না। এই অবস্থায় জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আঘাত এড়াবার জন্য এটা হল সাময়িক পশ্চাদপসরণ। এই চুক্তির সম্পাদন করে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার, তার অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করার ও লালফৌজকে গড়ে তোলার সময় পেয়েছিল। সর্বহারাশ্রেণীকে এই চুক্তি সমর্থন করেছিল কৃষকসাধারণের উপর তার নেতৃত্ব

বজায় রাখার ব্যাপারে, সমর্থন করেছিল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করার ব্যাপারে যার ফলে ১৯১৮-২০ সালে শ্বেত রক্ষীবাহিনী এবং বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান, পোল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশের সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে পরাজিত করা হয়েছিল।

২০। ১৯২৭ সালের ৩০শে অক্টোবর কুয়াংতুং প্রদেশের হাইফেং ও লুফেং জেলার কৃষকেরা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তৃতীয়বার বিদ্রোহ করেছিলেন, আর হাইফেং ও লুফেং এবং এদের নিকটবর্তী এলাকাকে দখল করে নিয়েছিলেন, লালফৌজ গড়ে তুলেছিলেন এবং শ্রমিক কৃষকদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শত্রুকে ছোট করে দেখার ফলে পরবর্তীকালে তারা পরাজিত হন।

২১। ১৯৩৬ সালের শরৎকালে লালফৌজের চতুর্থ ফ্রন্ট-আর্মি ও দ্বিতীয় ফ্রন্ট-আর্মি একসঙ্গে মিলিত হওয়ার পরা সীকাংয়ের উত্তর-পূর্ব অংশ থেকে শুরু করে উত্তরদিকে সরে গিয়েছিল। চাং কুও-থাও তখনও তার পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল, আর তার পশ্চাদপসরণবাদ ও বিলোপবাদকে আঁকড়ে ছিল। ঐ বছরের অক্টোবর মাসে লালফৌজের দ্বিতীয় ফ্রন্ট-আর্মি ও চতুর্থ-ফ্রন্ট-আর্মি যখন কানসুতে এসে পৌছাল, তখন চাং কুও-থাও চতুর্থ ফ্রন্ট-আর্মির অগ্রগামী বাহিনীকে—যার সৈন্যসংখ্যা ছিল ২০ হাজারের উপরে—হুয়াংহো নদী পেরিয়ে পশ্চিমাভিমুখে এগিয়ে ছিংহাইয়ে পৌছানোর জন্য পশ্চিম রুট বাহিনী গঠন করতে নির্দেশ দিল। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসের লড়াইয়ে মার খাবার পরে পশ্চিম রুট বাহিনী মূলতঃ পরাজিত হয়েছিল এবং সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল ১৯৩৭ সালের মাচ মাসে।

২২। প্যারী কমিউন সম্পর্কে এল. কুগেলম্যানকে লিখিত কার্ল মার্কসের চিঠি দ্রষ্টব্য।

২৩। এর অর্থ হল আমাদের সৈন্যবাহিনীকে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে এক-একটা কোম্পানিতে বা এক-একটা প্ল্যাটুনে বিভক্ত করে সর্বত্রই স্থানীয় উৎপীড়কদের উপর আঘাত হানা, ভূমি বণ্টন করা, পার্টির সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার জন্য জনসাধারণকে সাহায্য করা, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা, জনসাধারণের মধ্যে কাজ চালানো এবং সেই স্থানগুলোকে ঘাঁটি এলাকায় পরিণত করা, যাতে করে শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের সুবিধা হয়।—অনুবাদক

২৪। **শুই হু চুয়ান** ('জলাবিলের বীর নায়কগণ') হচ্ছে একখানি বিখ্যাত

চীনা উপন্যাস। কৃষক-যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে এতে। এই উপন্যাসখানিকে শি নাই-আনের রচনা বলে বলা হয়। ইউয়ান রাজবংশের শেষের দিকে এবং মিং রাজবংশের গোড়ার দিকে চতুর্দশ শতকে শি নাই-আন জীবিত ছিলেন। লিন ছুং আর ছাই চিন হচ্ছে এই উপন্যাসের দুইজন বীরনায়ক। আর হুং ছিল ছাই চিনের গৃহের একজন ড্রিলমাষ্টার।

২৫। ছুনছিউ যুগের (খৃষ্টপূর্ব ৭২২-৪৮১) দুটি সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য ছিল লু আর ছী। বর্তমান শানতুং প্রদেশের মধ্যভাগে একটা বিরাট রাজ্য ছিল ছী, আর দক্ষিণভাগে লু অপেক্ষাকৃত ছোট একটা রাজ্য। রাজা চুয়াং কোং লু'তে রাজত্ব করেছিলেন খৃষ্টপূর্ব ৬৯৩ টেকে ৬৬২ অব্দ অবধি।

২৬। জুও ছিউ-মিং ছিলেন 'জুও চুয়ানের' গ্রন্থকার। চৌ রাজবংশের ধ্রুপদী ইতিহাসের ধারাবিবরণী হচ্ছে 'জুও চুয়ান'। বর্তমান প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশটা 'জুও চুয়ান'-এর 'রাজা চুয়াং কোংয়ের দশম বৎসর' শীর্ষক বিভাগে দ্রষ্টব্য।

২৭। প্রাচীন শহর ছেংকাও অবস্থিত ছিল হোনান প্রদেশের বর্তমান ছেংকাও জেলার উত্তর-পশ্চিমে; প্রাচীনকালে প্রভূত সামরিক গুরুত্ব ছিল তার। এটাই ছিল খৃঃ পূঃ ২০৩ অব্দে হানের রাজা লিউ পাং এবং ছুর রাজা সিয়াং ইয়ুর মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ক্ষেত্র। প্রথমে সিয়াং ইয়ু ক্রমশঃ সিংইয়াং ও ছেংকাও দখল করে নেয়। লিউ পাংয়ের সৈন্যরা প্রায় সম্পূর্ণ-ভাবেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। সুবিধাজনক মুহূর্তটি না আসা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে লিউ পাং, সে মুহূর্তটি এল তখনই যখন সিয়াং ইয়ুর সৈন্যরা সিশুই নদীটি পেরুতে গিয়ে নদীর মাঝপথে উপস্থিত হল, আর তখনই সিয়াং ইয়ুর সৈন্যবাহিনীকে চুরমার করে লিউ পাং ছেংকাও পুনর্দখল করল।

২৮। প্রাচীন শহর খুনইয়াং বর্তমান হোনান প্রদেশের ইয়েসিয়ান জেলার ভিতরে। লিউ সিউ (তোং হান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট গুয়াং উতি) এই জায়গাতেই সিন রাজবংশের সম্রাট ওয়াং মাংয়ের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেছিল ২৩ খ্রীষ্টাব্দে। দুই পক্ষের মধ্যে সৈন্যশক্তির দিক থেকে একটা বিরাট অসমতা ছিল। লিউ সিউয়ের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৮-৯ হাজার আর তার বিরুদ্ধে ওয়াং মাংয়ের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪ লাখের বেশি। ওয়াং মাংয়ের সেনাপতি ওয়াং য়ুান ও ওয়াং ই শত্রুর শক্তিকে ছোট করে দেখে। তাদের এই অবহেলার সুযোগ গ্রহণ করে মাত্র ৩ হাজার বাছাই করা সৈন্য নিয়ে লিউ সিউ ওয়াং মাংয়ের প্রধান বাহিনীকে চুরমার করে দিল। এই বিজয়ের সুযোগ

নিয়ে সে শত্রুসৈন্যদের উপর আক্রমণ করে তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।

২৯। হোনান প্রদেশের বর্তমান চোংমৌ জেলার উত্তর-পূবে ছিল কুয়ানতু। ২০০ খ্রীষ্টাব্দে ছাও ছাও এবং ইউয়ান শাওয়ের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে লড়াই হয় এখানে। ইউয়ান শাওয়ের ছিল ১ লাখ সৈন্য, শাওয়ের সৈন্য সংখ্যা ছিল কম আর তার রসদও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ইউয়ান শাওয়ের সৈন্যরা শত্রুকে তাচ্ছিল্য করে, ফলে ইউয়ান শাওয়ের সৈন্যদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে ছাও ছাও তার দ্রুতগামী সৈন্যদের পাঠিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে এবং তাদের রসদ ও অন্যান্য সরবরাহাদি জ্বালিয়ে দেয়। ইউয়ান শাওয়ের সৈন্যরা আতঙ্কে ও বিশৃংখলায় পড়ে। ছাও ছাওয়ের বাহিনী তাদের আক্রমণ করে এবং তাদের প্রধান বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে।

৩০। উ রাজ্যটি শাসিত হতো সুন ছুয়ানের দ্বারা, আর ওয়েই রাজ্যটি শাসিত হতো ছাও ছাওয়ের দ্বারা। ছিপ হচ্ছে ইয়াংসী নদীর দক্ষিণ পারে, হুপেই প্রদেশের চিয়াইয়ু জেলার উত্তর-পূবে। সুন ছুয়ানের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য ২০৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাও ছাও ৫ লাখের বেশি সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে এগুলো। ছাও ছাও অবশ্য ঘোষণা করল যে, তার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৮ লাখ। ছাও ছাওয়ের শত্রু লিউ পেইয়ের সঙ্গে মিলে সুন ছুয়ান ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে বেরুল। ছাও ছাওয়ের সৈন্যবাহিনীতে মড়ক লেগেছে এবং জলযুদ্ধে তারা অনভ্যস্ত—এই কথা জেনে নিয়ে সুন ছুয়ান ও লিউ পেইয়ের বাহিনী ছাও ছাওয়ের নৌবহরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং তার সৈন্যবাহিনীকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে।

৩১। হুপে প্রদেশের ইছাং জেলার পূর্বদিকে ইলিং অবস্থিত। এখানে ২২২ খ্রীষ্টাব্দে উ রাজ্যের সেনাপতি লু স্যুন শু রাজ্যের রাজা লিউ পেইয়ের সৈন্যবাহিনীকে ভীষণভাবে পরাজিত করে। যুদ্ধের গোড়াতে লিউ পেইয়ের সৈন্যবাহিনী পর পর কতকগুলো জয়লাভ করেছিল আর উ রাজ্যের পাঁচ-ছয়শ লী ভেতরে ঢুকে ইলিং পর্যন্ত এসে পৌঁছায়। লু স্যুন ইলিং রক্ষা করে। ৭-৮ মাস সময় ধরে সে যুদ্ধ এড়িয়ে চলে, যতদিন না লিউ পেইয়ের 'সৈন্যরা ক্লান্ত ও মনমরা এবং নিরুপায় হয়ে পড়ে। তারপর, অনুকূল বাতাসের সুযোগ নিয়ে লিউ পেইয়ের সৈন্যদের তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে তার সৈন্যদের ধ্বংস করল লু স্যুন।

৩২। তোংচিন বংশের সেনাপতি সিয়ে স্যুয়ান ৩৮৩ খৃষ্টাব্দে আনহুই

প্রদেশে ফেইশুই নদীর পারে ছিন রাজ্যের রাজা ফু চিয়ানকে পরাজিত করেছিল। ফু চিয়ানের সৈন্যবাহিনীতে ছিল ৬ লাখের ওপর পদাতিক সৈন্য, ২ লাখ ৭০ হাজার অশ্বারোহী, ৩০ হাজারের ওপরে অশ্বারোহী রক্ষী বাহিনী। অপরপক্ষে, তোংচিনের জল ও স্থল সৈন্যের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ৮০ হাজার। ফেইশুই নদীর দুই পারে সারিবদ্ধ হয়ে ব্যূহ রচনা করল দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনী শত্রুবাহিনীর আত্মগর্বের ও অতিবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সিয়ে স্যুফান ফু চিয়ানকে অনুরোধ করল ছিন বাহিনীকে একটু পিছু হটিয়ে নিয়ে সামনে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিতে, যাতে তোংচিন বাহিনী নদী পেরিয়ে গিয়ে সেখানে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তির লড়াই করতে পারে। ফু চিয়ান রাজি হয়ে গেল, কিন্তু তার বাহিনী যখন পিছিয়ে যেতে লাগল তখন আর তাদের থামানো সম্ভব ছিল না। এই সুযোগে তোংচিন বাহিনী নদী পার হয়ে আক্রমণ করে ছিন বাহিনীকে ভীষণভাবে পরাজিত করল।

৩৩। চিয়াং কাই-শেক ও ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের প্রতিবিপ্লবের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে এবং ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবী কার্য অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবার জন্য ১৯২৭ সালের ১লা আগস্ট কিয়াংসী প্রদেশের রাজধানী নানছাংয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বিখ্যাত অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিল। ৩০ হাজারেরও বেশি সৈন্যের সশস্ত্র বাহিনী এই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে। এই অভ্যুত্থানের পরিচালকগণ ছিলেন চৌ এন-লাই, চু তে, হো লোং ও ইয়ে থিং প্রমুখ কমরেড। পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫ই আগস্ট নানছাং থেকে সরে গেল বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনী, কিন্তু কুয়াংতুং প্রদেশের ছাওচৌ ও শানথৌয়ের মুখে পরাজয় ভোগ করতে হল। কমরেড চু তে, চেন ঈ এবং লিন পিয়াওয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ লড়তে লড়তে পথ করে নিয়ে চিংকাং পর্বতে উপস্থিত হল এবং কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বাধীন শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লবী ফৌজের প্রথম আর্মির প্রথম ডিভিশনের সঙ্গে মিলিত হল।

৩৪। ১৯২৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কুয়াংতুং প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বে কুয়াংচৌয়ের শ্রমিক ও সৈনিকরা সম্মিলিতভাবে অভ্যুত্থান করে জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন প্রাপ্ত প্রতিবিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তীব্রভাবে লড়াই করেছিলেন। কিন্তু শক্তির দিক থেকে একটা বিরাট অসমতা ছিল বলে অবশেষে এই গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়।

৩৫। ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার সিউশুই, পিংসিয়াং, পিংকিয়াং এবং লিউইয়াং জেলার জনগণের সশস্ত্র বাহিনী বিখ্যাত 'শরৎকালীন ফসল' অভ্যুত্থানটি ঘটিয়েছিল, এবং গড়ে তুলেছিল শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লবী ফৌজের প্রথম আর্মির প্রথম ডিভিশন। কমরেড মাও সে-তুঙ নেতৃত্ব দিয়ে এই বাহিনীকে চিংকাং পর্বতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হুনান-কিয়াংসী সীমান্তের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা।

৩৬। A-B গ্রুপটি ছিল লাল এলাকায় লুক্কায়িত কুওমিনতাঙ গুপ্তচরদের প্রতিবিপ্লবী সংগঠন। A-B হচ্ছে ইংরাজী ভাষায় Anti-Bolshevik (বলশেভিক-বিরোধী) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।

৩৭। কানচিয়াং নদী কিয়াংসী প্রদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত, ফুশুই নদী কিয়াংসী প্রদেশের পূর্বভাগে অবস্থিত। এখানে এই দুই নদীর মধ্যবর্তী এলাকার কথা বলা হয়েছে।—অনুবাদক

৩৮। ভি. আই. লেনিনের রচিত 'একটি পৃথক ও সম্প্রসারণবাদী শান্তির আশু সম্পাদন সমস্যার ওপর থিসিস', 'অদ্ভুত এবং আজগুবী কথা,' 'একটি গুরুতর শিক্ষা ও গুরুতর দায়িত্ব', 'যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে রিপোর্ট' দ্রষ্টব্য এবং 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ', সপ্তম অধ্যায়, সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩৯। এখানে তিব্বতীয় ও হুই জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হচ্ছে সীখাং এলাকার তিব্বতীয় জাতি এবং কানসু, ছিংহাই ও সিনচিয়াংয়ের হুই জাতি।

৪০। অষ্টপদী রচনা সামন্তযুগীয় চীনের পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতক অবধি—চীনা সামন্ততান্ত্রিক আমলে রাজকীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থা অনুসারে এক ধরনের বিশেষ প্রবন্ধ রচনার রীতি। এই রচনায় শিরোনামার উপস্থাপনা, শিরোনামার ব্যাখ্যা, প্রাথমিক মন্তব্য, মন্তব্যের সূচনা, প্রারম্ভিক পর্ব, মধ্যবর্তী পর্ব, পশ্চাদ্ভাগস্থ পর্ব এবং সমাপ্তিসূচক পর্ব থাকে। 'শিরোনামার উপস্থাপনা' দুটি বাক্য নিয়ে গঠিত, এতে শিরোনামার মুখ্য অর্থ উপস্থাপিত করা হয়। 'শিরোনামার ব্যাখ্যা' তিনটি বা চারটি বাক্য নিয়ে রচিত, এতে শিরোনামার উপস্থাপনের অর্থানুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়। 'প্রাথমিক মন্তব্যে' গোটা রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকে, আর এর থেকেই মন্তব্য শুরু হয়।

'মন্তব্যের সূচনা' হল প্রাথমিক মন্তব্যের পরে মন্তব্যের সূচনা। প্রারম্ভিক পর্ব, মধ্যবর্তী পর্ব, পশ্চাদ্ভাগস্থ পর্ব ও সমাপ্তিসূচক পর্ব—শুধু এই চারটি পরিচ্ছেদই হল আনুষ্ঠানিক মন্তব্য, মধ্যবর্তী পব হল গোটা রচনার কেন্দ্র। এই চারটি পরিচ্ছেদের প্রত্যেকটিই গঠিত হয় পরস্পর বৈশাদৃশ্যপূর্ণ দুটি পর্ব নিয়ে। এইভাবে মোট আটটি পর্ব হয়। তাই এই রচনা আট পর্ববিশিষ্ট রচনা অথবা অষ্টপদী রচনা বলে পরিচিত। বিপ্লবী বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে রূপক হিসেবে এ ধরনের রচনার বিভিন্ন অংশের সংযোগের প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে গোঁড়ামিবাদকে উপমিত ও বিদ্রূপ করার জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ 'অষ্টপদী রচনা' শব্দের প্রয়োগ করে থাকেন।

৪১। ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাবের প্রভাবে এবং ব্যাপক অফিসার ও সৈনিক-দের চাপ দেওয়ার কারণে কুওমিনতাঙের ১৯তম রুট বাহিনীর অধ্যক্ষ চিয়াং কুয়াং-নাই, ছাই থিং-খাই প্রমুখ উপলব্ধি করল যে, লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালালে তাদের কোন লাভ হবে না, তাই কুওমিনতাঙ পার্টির ভেতরকার লি চী-শেন প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলে খোলাখুলিভাবে চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটায়। ফুকিয়েন প্রদেশে তারা 'চীনা প্রজাতন্ত্রের গণ-বিপ্লবী সরকার' স্থাপন করে এবং লালফৌজের সঙ্গে সম্পন্ন করে জাপানবিরোধী ও চিয়াংয়ের বিরুদ্ধে পরামর্শচুক্তি। এটাহচ্ছে তথাকথিত 'ফুকিয়েন ঘটনা'। পরে, চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে ১৯তম রুট বাহিনী ও ফুকিয়েনের গণ-সরকার ব্যর্থ হয়ে যায়।

চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতি সম্পর্কে বক্তব্য

(ডিসেম্বর ২৮, ১৯৩৬)

সিয়ানে চিয়াং কাই-শেক জেনারেল ছ্যাং স্যুয়ে-লিয়াং ও ইয়াং হু-চেং এবং উত্তর-পশ্চিমের জনগণ কর্তৃক উত্থাপিত জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার দাবি মেনে নিয়েছেন, এবং এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত তার সেনাবাহিনীকে শেনসী ও কানস্থ থেকে সরে আসবার নির্দেশ দিয়েছেন। গত এক দশক ধরে[১] চিয়াং যে ভুল নীতি অনুসরণ করছিলেন, এটা হচ্ছে তার পরিবর্তনের সূচনা। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ও চীনা 'পিটুনি' চক্র[২] গৃহযুদ্ধ মঞ্চস্থ করার জন্য, ভাঙন ধরাবার জন্য এবং সিয়ানের ঘটনায় চিয়াঙের মৃত্যু ঘটানোর জন্য যেসব চক্রান্ত চালাচ্ছিল, এ ঘটনা তার ওপর আঘাত হেনেছে। তাদের হতাশা ইতিমধ্যেই বেশ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে। চিয়াং কাই-শেক যে চোখ মেলে তাকাতে শুরু করেছেন, এই ঘটনাকে কুওমিনতাঙ কর্তৃক গত দশ বছর ধরে অনুসৃত ভুল নীতির অবসান ঘটাবার ইচ্ছে বলে ধরা যেতে পারে।

২৬শে ডিসেম্বর চিয়াং কাই-শেক লোইয়াং থেকে তথাকথিত 'চ্যাং স্যুয়ে-লিয়াং ও ইয়াং হু-চেঙের প্রতি ভৎর্সনা' শীর্ষক যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা এত দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ও ভাসাভাসা যে সেটাকে চীনের রাজনৈতিক দলিলসমূহের মধ্যে একটি চমৎকার উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। চিয়াং এই ঘটনা থেকে সত্যিই যদি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে চান এবং কুওমিনতাঙকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে চান, তিনি যদি পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপারে আপোষের এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গৃহযুদ্ধ ও নিপীড়নের দীর্ঘ অনুসৃত ভুল নীতির অবসান ঘটাতে চান—যাতে কুওমিনতাঙ আর জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না, তাহলে শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে তাঁর রচিত ছিল আরেকটু ভাল বিবৃতি রচনা করা—তাঁর অতীত রাজনীতির জন্য অনুতাপ প্রকাশ করা এবং ভবিষ্যতের জন্য নতুন পথ তুলে ধরা। ২৬শে ডিসেম্বরের এই বিবৃতি চীনা জনগণের দাবি মেটাতে পারছে না।

যাই হোক, এই বিবৃতির মধ্যে একটি প্রশংসাযোগ্য অংশ আছে, চিয়াং যেখানে জোর দিয়ে বলছেন, 'প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করতে হবে এবং দৃঢ়-

প্রতিজ্ঞ হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে।' তার অর্থ হল, যদিও তিনি সিয়ানে চ্যাং ও ইয়াংয়ের নির্দেশিত শর্তাবলীতে সই করতে রাজী হননি, তবুও রাষ্ট্র ও দেশের স্বার্থে তিনি সেই ধরনের দাবি গ্রহণে ইচ্ছুক, এবং শর্তে সই না করলেও তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। আমরা দেখব, সামরিক বাহিনী সরিয়ে নেবার পর চিয়াং আস্থার মর্যাদা রক্ষা করেন কি না এবং যেসব শর্ত তিনি মেনে নিয়েছেন তা পালন করেন কিনা। শর্তগুলো হল :

(১) কুওমিনতাঙ ও জাতীয় সরকারকে পুনঃসংগঠিত করা, জাপ-সমর্থকদের বহিষ্কার করে জাপ-বিরোধীদের গ্রহণ করা ;

(২) সাংহাইর দেশপ্রেমিক নেতাদের[৩] ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করা, এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা ও অধিকার মেনে চলার নিশ্চয়তা দেওয়া ;

(৩) 'কমিউনিস্ট অবদমনের' নীতির অবসান এবং লালফৌজের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনা ;

(৪) সমস্ত পার্টি, গ্রুপ, সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে নিয়ে জাতীয় মুক্তি সম্মেলন আহ্বান করা, জাতিকে বাঁচানো এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার নীতি নির্ধারণ করা ;

(৫) জাপ-প্রতিরোধের ব্যাপারে যেসব দেশ আমাদের সমর্থক, তাদের সহযোগিতা পাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ; এবং

(৬) জাতিকে বাঁচানোর জন্য অন্যান্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এই সব শর্ত পূরণের মূল কথা হল দৃঢ় বিশ্বাস ও কিছু সাহস। ভবিষ্যতের কার্য-কলাপ দেখেই আমরা চিয়াংকে বিচার করব।

কিন্তু তাঁর বিবৃতিতে এই মর্মে একটি মন্তব্য আছে যে, সিয়ান ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে 'প্রতিক্রিয়াশীলদের' চাপে। এটা সত্যিই দুঃখজনক যে, 'প্রতিক্রিশাশীল' বলতে তিনি কোন্ ধরনের লোককে বুঝিয়েছেন বিবৃতিতে তিনি তার ব্যাখ্যা দেননি, বা এটাও সুস্পষ্ট নয় যে, চিয়াং-এর অভিধানে 'প্রতিক্রিয়াশীল' কথাটার অর্থ কি। যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে, সিয়ান ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল নিম্নলিখিত শক্তির প্রভাবে :

(১) জেনারেল চ্যাং ও ইয়াংয়ের অধীনস্থ সেনাবাহিনীর মধ্যে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিপ্লবী জনসাধারণের জাপ-বিরোধী ক্রমবর্ধমান ঘৃণার তীব্র প্রকাশ ;

(২) সমগ্র দেশব্যাপী জনগণের মধ্যে জাপ-বিরোধী তীব্র ঘৃণা ;

(৩) কুওমিনতাঙের মধ্যে বামপন্থী শক্তির স্ফুরণ ;

(৪) বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমতারূঢ় গ্রুপের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ ও জাতির মুক্তির দাবি ;

(৫) কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুক্ত মোর্চা গঠনের দাবি ; এবং

(৬) বিশ্বশান্তি মোর্চার বিকাশ।

এসবই অবিসংবাদী ঘটনা। এইসব শক্তিসমূহকেই চিয়াং উল্লেখ করছেন 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে। অন্যেরা যাঁদের বলে বিপ্লবী, চিয়াং তাঁদের অভিহিত করছেন 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে—এই তো যথেষ্ট। সিয়ানে তিনি যখন ঘোষণা করেছেন যে, দৃঢ়ভাবেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, মনে হয়, সিয়ান পরিত্যাগের পর পরই তিনি বিপ্লবী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবেন না। তাঁর নিজের ও তাঁর দলের রাজনৈতিক জীবনই শুধু যে তাঁর এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করছে তাই নয়, আজ তাঁদের মুখোমুখীও দাঁড়িয়েছে ; তাঁদের রাজনৈতিক পথের বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই শক্তি, যার বৃদ্ধি ঘটেছে তাঁদেরই ক্ষতিসাধনের জন্য—সেই 'পিটুনি' চক্র, যারা সিয়ান ঘটনার সময়ে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। সুতরাং আমরা চিয়াংকে উপদেশ দিচ্ছি তিনি যেন তাঁর রাজনৈতিক অভিধানটির সংশোধন করে, 'প্রতিক্রিয়ার' স্থানে 'বিপ্লবী' কথাটা বসান, কারণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কথাগুলোর অর্থ ঠিক হওয়া উচিত।

চিয়াং-এর মনে রাখা উচিত যে, তাঁর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির হস্তক্ষেপে, এবং সিয়ান ঘটনার নেতৃদ্বয় জেনারেল চ্যাং ও ইয়াংয়ের প্রচেষ্টায়। সেই ঘটনার সময় কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদা শান্তিপূর্ণ মীমাংসাই চেয়েছে এবং তার জন্য সব প্রচেষ্টা চালিয়েছে, আর সেটা চালিয়েছে একমাত্র জাতিকে বাঁচাবার প্রয়োজনে। গৃহযুদ্ধ যদি বিস্তৃত হতো, চ্যাং ও ইয়াং যদি তাঁকে বন্দী করে রাখতেন বহুদিনের জন্য, তাহলে সেই ঘটনাটি জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা 'পিটুনী' চক্রেরই সুবিধা করে দিত। এই অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়ভাবে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও ওয়াং চিং-ওয়েই[৪], হো ইং-চিন[৫] ও চীনা 'পিটুনী' চক্রের অন্যান্য সভ্যদের ষড়যন্ত্রকে উদঘাটিত করে দেয় এবং দৃঢ়তার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কথা বলে, যা আবার জেনারেল সুয়ে-লিয়াং

ও ইয়াং হু-চেং ও কুওমিনতাঙের টি. ভি. সুং[৬] প্রভৃতি সভ্যদের মতের সঙ্গে মিলে যায়। সমগ্র দেশব্যাপী জনসাধারণ এটাই চাইছে, কারণ তারা এই তিক্ত গৃহযুদ্ধকে ঘৃণা করে।

সিয়ানের শর্ত গ্রহণের পরই চিয়াং মুক্ত হন। এখন যে প্রশ্নটি সামনে এসেছে, তা হল, চিয়াং সেই শর্তানুযায়ী 'প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে যুদ্ধ পরিচালনা' করবেন কি না, জাতিকে বাঁচানোর জন্য সেইসব শর্ত সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করবেন কি না। জাতি তাঁকে আর দোদুল্যমান অবস্থায় থাকতে দেবে না, দেবে না শর্তপূরণে কোনরকম গাফিলতি দেখাতে। জাপ-প্রতিরোধে যদি তিনি গড়িমসি করেন, বা অঙ্গীকার পূরণে কালহরণ করেন, তাহলে দেশব্যাপী বিপ্লবী জোয়ার তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। চিয়াং ও তাঁর চক্রকে সেই পুরানো প্রবাদটি মনে করিয়ে দিচ্ছি: 'অঙ্গীকার যে রাখে না, তার কি মূল্য আছে?'

কুওমিনতাঙ কর্তৃক প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করার ফলে বিগত দশ বৎসরে যে নোংরা জমে উঠেছে, তা যদি চিয়াং পরিষ্কার করতে পারেন, তিনি যদি বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমঝোতা করার এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গৃহযুদ্ধ ও নিপীড়নের ভুল বিদূরিত করতে, সমস্ত পার্টি ও গ্রুপগুলিকে একত্রীভূত করে এই মুহূর্তে জাপ-বিরোধী মোর্চা গঠন করতে পারেন, এবং জাতিকে রক্ষার জন্য সত্যিসত্যিই সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারেন—তবে কমিউনিস্ট পার্টি নিশ্চয়ই তাঁকে সমর্থন দেবে। সেই ২৫শে আগস্ট তারিখেই কমিউনিস্ট পার্টি তার চিঠিতে কুওমিনতাঙ ও চিয়াংকে সেই সমর্থনের কথা বলেছে।[৭] বিগত পনের বৎসর ধরে সমগ্র দেশের জনগণ জানেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি যে নীতিটি অনুসরণ করে তা হচ্ছে: 'প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালন করতে হবে এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে।' জনগণ নিঃসন্দেহে চীনের অন্য যে-কোন পার্টি বা গ্রুপের তুলনায় কমিউনিস্ট পার্টির কথা ও কাজের ওপরেই বেশি আস্থা রাখেন।

টীকা

১। চীনা লালফৌজ ও জাপ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত চ্যাং স্যুয়ে-লিয়াঙের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙের উত্তর-পূর্ব সেনাবাহিনী ও ইয়াং

হু-চেঙের নেতৃত্বাধীন ১৭ নং রুট বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের প্রস্তাবে সম্মতি জানায় এবং চিয়াং কাই-শেকের কাছে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে যোগ দেবার দাবি জানায়। চিয়াং এ দাবি অগ্রাহ্য করেন, 'কমিউনিস্ট দমনের' সামরিক প্রস্তুতিকে জোরদার করে তোলেন, এবং সিয়ানের জাপ-বিরোধী যুবকদের হত্যা করেন। চ্যাং সুয়ে-লিয়াং ও ইয়াং হু-চেং একসঙ্গে চিয়াং-এর বিরুদ্ধে চলে যান এবং চিয়াংকে গ্রেপ্তার করেন। ১৯৩৬-এর ১২ই ডিসেম্বরের সিয়ান ঘটনা নামে এটি ইতিহাস খ্যাত হয়ে আছে। চিয়াংকে বাধ্য করা হয় কমিনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্যের শর্ত ও জাপ-বিরোধী যুদ্ধের প্রস্তাব মেনে নিতে, এবং তার পরই তাঁকে মুক্ত করা হয় এবং চিয়াং নানকিঙে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন।

২। নানকিঙে অবস্থিত কুওমিনতাঙ সরকারের মধ্যে জাপ-সমর্থকদের চক্র 'পিটুনি' চক্র নামে পরিচিত। তারা সিয়ান ঘটনার সময়ে চিয়াং কাই-শেকের হাত থেকে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল। ওয়াং চিং-ওয়েই ও হো য়িং-চিনের নেতৃত্বে এরা চ্যাং শুয়ে-লিয়াং ও ইয়াং হু-চেঙের বিরুদ্ধে 'পিটুনি' অভিযানের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ঘটনাটির সুযোগ নিয়ে তারা পরিকল্পনানুযায়ী বৃহদাকারের গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে চিয়াঙের ক্ষমতা নিজেদের কব্জায় নিয়ে এসে জাপানী আক্রমণকারীদের সামনে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে দিতে চায়।

৩। ১৯৩৬-এর নভেম্বর মাসে সাংহাই নগরীতে সাতজন জাপ-বিরোধী দেশব্রতী যুবককে চিয়াং কাই-শেক গ্রেপ্তার করেছিল। তাঁদের নাম: শেন চুন-জু, চ্যাং নাই-চি, সৌ তাও-ফেন, লি কুং-পু, শা চিয়েন-লি, শী লিয়াং ও ওয়াং সাও-শী। ১৯৩৭-এর জুলাই পর্যন্ত তাঁরা কারাগারে বন্দী ছিলেন।

৪। কুওমিনতাঙের মধ্যেকার জাপ-সমর্থক চক্রের মধ্যমণি ছিল ওয়াং চিং-ওয়েই। ১৯৩১ এ জাপানীরা উত্তর-পূর্ব চীনে হামলা করার সময় থেকে ওয়াং তাদের গোপন সেবাদাস। ১৯৩৮ এর ডিসেম্বরে চুংকিং পরিত্যাগ করে ওয়াং খোলাখুলি জাপানী হানাদারদের পক্ষে দাঁড়ায় এবং নানকিঙের দালাল সরকারের প্রধান হয়ে বসে।

৫। জাপ-সমর্থক চক্রের আর-একজন হল কুওমিনতাঙ দলভুক্ত যুদ্ধবাজ হো য়িং-চিন। সিয়ান ঘটনার সময়ে সে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে গৃহযুদ্ধ বাঁধাবার জন্য কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীকে দিয়ে লুংহাই রেলপথ ধরে শেনসী আক্রমণের ব্যবস্থা করে। চিয়াংকে হত্যা করে চিয়াঙের স্থলাভিষিক্ত হবার বাসনায় সে

সিয়ান নগরীকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল।

৬। কুওমিনতাঙ দলভুক্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ও মার্কিন স্বার্থের প্রবক্তা টি. ভি. সুং সিয়ান ঘটনাকে ভিত্তি করে শান্তিপূর্ণ সমঝোতার কথা বলেছিল। দূর প্রাচ্যে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে টোক্কর দিয়ে নিজেদের প্রাধান্য রক্ষা করা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে খুবই মুশকিল হচ্ছিল, তাদের স্বার্থসংঘাত হচ্ছিল তীব্রভাবে।

৭। এই চিঠিতে কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের এবং তাদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বিতীয় বর্ধিত অধিবেশনের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট সংগঠিত করা এবং কুওমিনতাঙের সঙ্গে সহযোগিতার কথাও এই চিঠিতে বলা হয়েছিল। চিঠির প্রধান অংশটি হচ্ছে:

'কেন্দ্রীকরণ ও একীকরণ' প্রসঙ্গে আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বিতীয় বর্ধিত অধিবেশন সত্যিসত্যিই কারণ ও ফল সম্বন্ধে গুলিয়ে ফেলেছে। বিশেষ জোর দিয়েই একথা বলতে হবে যে, আপনাদের পার্টি ও পার্টি-পরিচালিত সরকার কর্তৃক অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীলতার, বিশেষ করে, ১৯৩১-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের ঘটনা থেকে জাপ-প্রতিরোধ না করার নীতিরই ফল হচ্ছে গৃহযুদ্ধ ও গত দশ বছরের ঐক্যহীনতা। 'বিদেশী হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পূর্বে আভ্যন্তরীণ শান্তিস্থাপন' ধ্বনির মধ্য দিয়ে আপনাদের পার্টি ও পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সরকার গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, লালফৌজের বিরুদ্ধে বহু সংখ্যক পরিবেষ্টন অভিযান পরিচালনা করছে, এবং সমগ্র দেশব্যাপী দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক গণ-আন্দোলন ও জনসাধারণকে পিষে মারবার সবরকম চেষ্টাই চালিয়ে গেছে। চীনের সব থেকে বড় দুশমন যে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ—এই সত্যটি আপনারা অনুধাবন করতে পারেননি, এবং সেজন্য দেশের উত্তর-পূর্ব ও উত্তরাংশ ছেড়ে দিতেও আপনারা দ্বিধা করেননি, সর্বশক্তি দিয়ে আপনারা চীনের লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং আপনাদের পার্টির অভ্যন্তরে বিভিন্ন চক্রের খেয়োখেয়ি চালিয়েছেন, জাপানের বিরুদ্ধে লালফৌজের যুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন, তার পৃষ্ঠদেশে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন, সর্বদেশব্যাপী জাপ-বিরোধী প্রতিরোধের দাবি আপনারা অগ্রাহ্য করেছেন, এবং দেশবাসীকে তাদের স্বাধীনতা ও অধিকার থেকে বিচ্যুতি করে দিচ্ছেন। সর্বত্র দেশকে ভালবাসার জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আরও শাস্তি

দেওয়া হচ্ছে নির্দোষ ব্যক্তিদের। বিশ্বাসঘাতকতা আজ পুরস্কৃত, বিশ্বাসঘাতকরা তাদের নতুন নতুন উচ্চপদ প্রাপ্তি ও সম্মানের জন্য পরম পুলকিত। 'কেন্দ্রীকরণ ও একীকরণের' নামে এই ভ্রান্ত পথানুসরণের অর্থ হচ্ছে 'গাছের মাথায় উঠে মাছ ধ'রার মতো, এবং তার ফলটি হবে একেবারে বিপরীত। ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা আপনাদের সাবধান করে দিতে চাইছি, আপনারা যদি আপনাদের ভ্রান্ত নীতির মৌলিক পরিবর্তন না করেন, দেশবাসীর বিরুদ্ধে বর্ধিত আপনাদের ঘৃণা যদি জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে না ঘোরান, আপনাদের এই 'স্থিতাবস্থাও' আপনারা রক্ষা করতে পারবেন না, এবং আপনাদের এই কেন্দ্রীকরণ, একীকরণ ও তথাকথিত 'আধুনিক রাষ্ট্র' তৈরীর পরিকল্পনা অলীক স্বপ্নে পরিণত হয়ে যাবে। সমগ্র জাতি চাইছে জাপ-প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্রীকরণ ও একীকরণের মধ্য দিয়ে জাতির রক্ষা ব্যবস্থা, তারা বিদেশীদের প্রতি তোষামোদ আর দেশের লোকদের ওপর অত্যাচারের বিরোধী। দেশবাসী দাবি জানাচ্ছে এমন একটি গণতান্ত্রিক সরকারের, যা সত্যিসত্যিই দেশকে ও জনগণকে রক্ষা করতে পারবে। তারা চাইছে একটি গণতান্ত্রিক সরকার, যা তাদের স্বার্থরক্ষা করতে সক্ষম। এই জাতীয় সরকারের কর্মসূচী প্রধানতঃ হবে: এক, বৈদেশিক হানাদারীর প্রতিরোধ; দুই, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার; এবং তিন, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশসাধন, বা অন্ততঃপক্ষে জনসাধারণের দুরবস্থার অবসান ঘটানো। 'আধুনিক রাষ্ট্র' তৈরীর কথাটির সত্যিসত্যিই যদি কোন অর্থ থাকে, তাহলে এটাই হল একমাত্র সাচ্চা কর্মসূচী, যা বর্তমান যুগে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক চীনের প্রয়োজন পূরণ করছে। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য জনসাধারণ আশা ও দৃঢ়মত নিয়ে এই পথে অগ্রসর হবার জন্য সংগ্রাম করছে। কিন্তু আপনাদের পার্টি এবং আপনাদের পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সরকার এমন নীতি অনুসরণ করছে, যা জনগণের এই আশার চরম বিরোধী এবং আপনারা জনগণের আস্থা কোনমতেই অর্জন করতে পারবেন না। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের লালফৌজ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা করছে: আমরা সমগ্র দেশব্যাপী একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং সার্বিক নির্বাচনের মাধ্যমে একটি লোকসভা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী এবং জাপ-বিরোধী সমগ্র জনগণ ও সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা জাপ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি কংগ্রেস আহ্বান ও সমগ্র দেশের জন্য জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের পক্ষপাতী। আমরা এখানে ঘোষণা করছি: যে

মুহূর্তে সমগ্র চীনব্যাপী একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, লাল এলাকাগুলি সেই সরকারের অংশীভূত হয়ে যাবে, লাল অঞ্চলের প্রতিনিধিরা সর্ব-চীন লোকসভায় উপস্থিত থাকবেন এবং চীনের অন্যান্য অংশে যেমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, লাল অঞ্চলেও তাই অনুসরণ করা হবে। আমরা মনে করি, আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বিতীয় বর্ধিত অধিবেশন জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাসভা তৈরী এবং জাতীয় পরিষদ আহ্বানের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনাদের পার্টি ও পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সরকার তার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, তা জাপানকে রুখবার জন্য কেন্দ্রীকরণ ও একীকরণে সাফল্যলাভ করতে পারবে না, পারবে না জাতিকে রক্ষা করতে। আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বিতীয় বর্ধিত অধিবেশনে গৃহীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাসভা তৈরীর যে বিধিনিয়ম প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, তা আপনাদের পার্টির ও পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সরকারের জনাকয়েক ক্ষমতাশালী পদাধিকারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে এবং এর কর্মপরিধি ও সরকারের উপদেষ্টা হিসেবেই সীমিত। এটি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, এই ধরনের মন্ত্রণাসভা নিরর্থক এবং জনগণের আস্থা সে অর্জন করতে পারে না। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যে জাতীয় পরিষদ আহ্বান করতে চাইছেন, তার সম্বন্ধেও আমাদের এই একই বক্তব্য। আপনাদের সরকার কর্তৃক গৃহীত 'প্রজাতান্ত্রিক চীনের খসড়া শাসনতন্ত্র' এবং 'জাতীয় পরিষদের নির্বাচন-বিষয়ক বিধিনিয়ম ও আইন' অনুসারে এই পরিষদটি হবে আপনাদের পার্টি ও সরকারের জনাকয়েক পদাধিকারী ব্যক্তির কুশলতা প্রদর্শনের মঞ্চ, হবে তাদের কুকর্মের মঞ্চ, হবে একটি অলঙ্কার বিশেষ। এই ধরনের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাসভা ও জাতীয় পরিষদের সঙ্গে আমাদের পার্টি কর্তৃক প্রস্তাবিত নিখিল চীন জাপ-বিরোধী জাতিরক্ষা কংগ্রেস, জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাসভা, চীনের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তার লোকসভার কোন মিলন নেই। আমাদের বক্তব্য হল, জাপ-প্রতিরোধের ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংগঠিত মন্ত্রণাসভায় গ্রহণ করতে হবে সব রাজনৈতিক দল ও গ্রুপের প্রতিনিধিদের, সমস্ত সামরিক বাহিনী ও জীবনের সর্বক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের, এবং জাতিকে রক্ষা ও জাপ-প্রতিরোধের জন্য প্রধান প্রধান নীতি নির্ধারণ ও কর্তৃত্ব থাকবে তার হাতে, এবং এই মন্ত্রণাসভা থেকেই একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। জাতীয়

পরিষদটি অবশ্যই হবে সার্বিক নির্বাচনের ভিত্তিতে তৈরী লোকসভা, হবে চীনা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সর্বকর্তৃত্বের আধার। এই ধরনের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাসভা ও নিখিল চীন লোকসভা দেশব্যাপী জনসাধারণের অনুমোদন, সমর্থন ও গণোদ্যোগ সৃষ্টি করবে এবং জাতি ও দেশকে রক্ষা করার মহান কর্মটিকে দৃঢ় ও অনড় ভিত্তির ওপর স্থাপন করবে। ভাল ভাল কথার ফুলঝুরি ছড়ানো নিরর্থক এবং তাতে গণসমর্থন আসবে না। আপনাদের পার্টি ও পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সরকারের নানা সম্মেলনের ব্যর্থতাই এর প্রমাণ বহন করছে। আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বিতীয় বর্ধিত অধিবেশনের ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'বিপদ ও প্রতিবন্ধকতা আসবেই; কিন্তু জাতির সামনে যে অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা এসেছে, তার মোকাবিলা করার জন্য আমরা আমাদের কর্তব্যকর্ম সম্পূর্ণ করা থেকে বিমুখ হব না।' এবং আরও বলা হয়েছে, 'জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পার্টি অব্যাহত কর্মধারা অনুসরণ করে যাবে, করবে মনে-প্রাণে।' কথাটি ঠিকই চীনের সর্বাধিক অংশের শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার দরুণ আপনাদের বিগত দিনের কৃতকর্মের জন্য আপনাদের পার্টিকেই রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে; যেহেতু কুওমিনতাঙ সরকার হচ্ছে একক পার্টির একনায়কত্ব, এ দায়িত্ব থেকে আপনার পার্টি রেহাই পেতে পারে না। বিশেষ করে, চীনের প্রায় অর্ধেক স্থান হারানোর দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিতে পারবেন না আপনারা, কারণ ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং সমগ্র জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে আপনারা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করছেন, এ তারই ফল।' আমরা এবং সমগ্র জনগণ দেখছি যে, যেহেতু আপনাদের পার্টি অর্ধেক চীন খুইয়েছে, সেহেতু তাকে এই স্থান উদ্ধারের কর্তব্যকর্মে, ব্রতী হওয়ার দায়িত্ব এড়ালে চলবে না, এড়ানো চলবে না চীনের স্বাধীন সত্তাকে পুনরুদ্ধার করার কর্তব্যকর্মটি। এমনকি, এই সময়েই আপনাদের পার্টির মধ্যেও দেখছি যে, বহু বিবেকবান লোক জাতীয় পরাধীনতাজনিত বিভীষিকা ও জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া প্রসঙ্গে সজাগ হয়ে উঠেছেন; একটা নতুন দিকে যাবার কথা তাঁরা ভাবছেন, এবং তাঁদের পার্টি ও জাতির ভাগ্যে যে বিপর্যয় তাঁদের মধ্যের কিছু লোক নিয়ে এসেছেন তাঁদের সম্বন্ধে তাঁরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন। এই নতুন দিক্-পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রতি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সমর্থন আছে এবং কুওমিনতাঙের মধ্যস্থ এইসব

দেশব্রতী ও চিন্তাশীল সভ্যদের উচ্চ চিন্তাকে সাদর সমর্থন জানাচ্ছে, সমর্থন জানাচ্ছে তাঁদের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করার সদিচ্ছাকে, মুখোমুখী এসে দাঁড়ানো জাতিকে রক্ষার জন্য তাঁরা যে সংশোধনের প্রস্তাবাদি এনেছেন তার প্রতি। আমরা জানি যে, প্রতিদিনই আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দপ্তরে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সংবাদপত্র ও শিল্প জগতে, মহিলা, ধর্ম ও চিকিৎসা কেন্দ্রে, পুলিশ ও বিভিন্ন ধরনের গণ-সংগঠনে, এবং বিশেষ করে সেনাবাহিনীর ব্যাপক সৈনিকদের মধ্যে, পুরানো ও নতুন কুওমিনতাঙ সভ্যদের মাঝে, এবং কুওমিনতাঙের নেতৃবর্গের মধ্যেও বিভিন্ন স্তরে জাগ্রত দেশপ্রেমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ঘটনাটি সত্যই উৎসাহোদ্দীপক। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সবসময়ে কুওমিনতাঙের এইসব সভ্যদের প্রতি তাদের সমর্থনের হাত প্রসারিত করে দিচ্ছে, যাতে জাতির সব-থেকে হিংস্র শত্রু জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগঠিত করার জন্য দৃঢ় জাতীয় যুক্ত-মোর্চা গড়ে উঠতে পারে। আমরা আশা করি যে, তাঁরা অতি দ্রুত কুওমিনতাঙের মধ্যে একটি প্রধান শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন এবং সেইসব বদ নির্লজ্জ সভ্যদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন যারা জাতির স্বার্থকে পদদলিত করেছে এবং কার্যতঃ জাপানের সহযোগী ও দালালে পরিণত হয়েছে—যারা ডঃ সান ইয়াৎ-সেন-এর স্মৃতির অবমাননার প্রতীক হিসেবে নিজেদের দাঁড় করিয়েছে—এবং আমরা আশা করি, তাঁরা এইভাবে ডঃ সানের বিপ্লবী তিন-গণনীতির মূল উদ্দেশ্যকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম হবেন, তাঁর রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা এবং শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থ সমর্থনের তিন মহান পন্থার পুনর্ঘোষণা করবেন, এবং 'বিরামহীনভাবে কাজ করবেন' বিপ্লবী তিন-গণনীতি, তিন মহান পন্থা এবং ডঃ সানের বিপ্লবী ইস্তাহার কার্যকরী করতে। আমরা আশা করি যে, সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি, গ্রুপ ও জীবনের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের দেশপ্রেমিক নেতাদের সহ তাঁরা দৃঢ়ভাবে ডঃ সানের বিপ্লবী নীতিকে রূপদান করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করে এগিয়ে আসবেন, চীনকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবার জন্য, জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবার জন্য, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্য, চীনের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের জন্য, চীনের বিপুল জনসাধারণের দুর্দশা লাঘবের জন্য এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তন সহ চীনা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই প্রসঙ্গে কুওমিনতাঙের সমস্ত সভ্যদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছে: আপনারা যদি সত্যসত্যই এ কাজ করেন, আমরা আপনাদের কাজে দৃঢ় সমর্থন জানাব, এবং ১৯২৪-২৭এ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত দৃঢ় বিপ্লবী যুক্তফ্রণ্টের মতো যুক্তফ্রণ্ট গড়তে আমরা প্রস্তুত আছি, কারণ আজকের পরিস্থিতিতে এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ, যার সাহায্যে আমরা জাতিকে পরাধীনতা থেকে বাঁচাতে পারি এবং তার বাঁচবার নিশ্চিতি সৃষ্টি করতে পারি।

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্যসমূহ

(মে ৩, ১৯৩৭)

চীনের আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহের বিকাশের বর্তমান স্তর

এক। বর্তমানে চীন ও জাপানের মধ্যেকার দ্বন্দ্বটিই প্রধান দ্বন্দ্ব হয়ে উঠেছে এবং চীনের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহ গৌণ ও অপ্রধান হয়ে পড়েছে। এর ফলে চীনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, এর বর্তমান পরিস্থিতির বিকাশ এক নতুন স্তরে উপনীত হয়েছে।

দুই। চীন দীর্ঘদিন ধরে দুটি সুতীব্র ও মৌলিক দ্বন্দ্বের জালে জড়িয়ে ছিল—চীন ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, এবং সামন্ততন্ত্র ও ব্যাপক জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। ১৯২৭ সালে বুর্জোয়াশ্রেণী—যাদের প্রতিনিধি ছিল কুওমিনতাঙরা-বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে চীনের জাতীয় স্বার্থকে বিকিয়ে দেয়, এবং এভাবে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে, যেখানে শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে কুওমিনতাঙদের রাষ্ট্রক্ষমতার তীব্র সংঘাত দেখা দেয়, এবং স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দায়িত্ব তখন একমাত্র চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ওপরেই এসে বর্তায়।

তিন। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে, এবং বিশেষ করে ১৯৩৫ সালের উত্তর চীনের ঘটনার[১] পর থেকে এই দ্বন্দ্বসমূহে নিম্নলিখিত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে :

(১) চীন ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার সাধারণ দ্বন্দ্ব চীন ও জাপ-সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট ও সুতীব্র দ্বন্দ্বে রূপ নিয়েছে। জাপান-সাম্রাজ্যবাদ চীনকে সম্পূর্ণ গ্রাস করবার নীতি গ্রহণ করেছে। ফলতঃ চীন ও অন্যান্য কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলি অপ্রধান হয়ে পড়েছে,

---

১৯৩৭ সালের মে মাসে ইয়েনানে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে কমরেড মাও সে-তুঙ এই রিপোর্টটি পেশ করেন।

এবং একই সঙ্গে এইসব শক্তির সঙ্গে জাপানের ফাটল আরও বেড়ে গেছে। ফলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা জনগণের সামনেও বিশ্বের শান্তি ফ্রণ্টের সঙ্গে চীনের জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের সংযোগ সাধনের দায়িত্ব এসে পড়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই চীনা জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু হিসেবে আছে, চীন শুধুমাত্র সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেই ঐক্যবদ্ধ হবে না, উপরন্তু, যেসব সাম্রাজ্যবাদী দেশ বর্তমানে শান্তি রক্ষা করতে ইচ্ছুক এবং নতুন আগ্রাসী যুদ্ধের বিরোধী, তাদের সঙ্গেও যথাসম্ভব ঐক্যবদ্ধ হয়েই যুক্তভাবে জাপ-বিরোধিতা করবে। আমাদের যুক্তফ্রণ্টের লক্ষ্য হতে হবে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং একই সময়ে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধিতা না করা।

(২) চীন ও জাপানের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব চীনের আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং বুর্জোয়াশ্রেণী, এমনকি যুদ্ধবাজদেরও সামনে এনে দিয়েছে অস্তিত্বের প্রশ্ন। তারই ফলে তারা এবং তাদের রাজনৈতিক পার্টিগুলির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্রমশই পরিবর্তন ঘটেছে। এলে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা জনগণের সামনে একটি জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠনের দায়িত্ব এসে পড়েছে। বুর্জোয়াশ্রেণী এবং যারাই মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক তাদের সকলকে নিয়েই আমাদের এই যুক্তফ্রণ্ট হওয়া উচিত, বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে জাতীয় সংহতি এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই কাজ শুধু অবশ্যকরণীয়ই নয়—এই কাজ সম্পন্নও করা যায়।

(৩) চীন এবং জাপানের দ্বন্দ্ব দেশব্যাপী জনগণের (সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়া) এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এবং পার্টির কর্মনীতিরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ক্রমেই বেশি বেশি লোক জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে এগিয়ে আসছে। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর কমিউনিস্ট পার্টি যে নীতি ঘোষণা করেছে তা হল কুওমিনতাঙের যেসব অংশ প্রতিরোধের জন্য আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক, তাদের সঙ্গে তিনটি শর্তে (বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলগুলিতে আক্রমণ বন্ধ করা, জনগণের স্বাধীনতা এবং অধিকার সুনিশ্চিত করা, জনগণকে সশস্ত্র করা) কমিউনিস্ট পার্টি চুক্তিবদ্ধ হতে প্রস্তুত আছে। এই নীতিটিই সমগ্র জাতির জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠার নীতিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই হচ্ছে কারণ যার জন্য আমাদের পার্টি নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করছে : ১৯৩৫ সালের

আগস্ট ঘোষণা[২] এবং ১৯৩৬-এর ডিসেম্বর প্রস্তাব[৩]; মে মাসে[৪] 'চিয়াং কাই-শেক-বিরোধী' শ্লোগান পরিত্যাগ, আগস্ট মাসে কুওমিনতাঙের নিকট চিঠি,[৫] সেপ্টেম্বরে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ওপর প্রস্তাব,[৬] এবং ডিসেম্বরে সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ সমাধানের ওপর জোর দেওয়া, ও ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয়, কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনের প্রতি টেলিগ্রাম।[৭]

(৪) চীন এবং জাপানের দ্বন্দ্বের ফলে চীনা যুদ্ধবাজাদের রাজত্বগুলিতে ও তাদের মধ্যেকার গৃহযুদ্ধগুলির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে, যেগুলো আবার প্রভাবাধীন অঞ্চল বিস্তারের সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং চীনের আধা-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক অবস্থারই ফল। জাপ-সাম্রাজ্যবাদ চীনের উপর তার একচেটিয়া আধিপত্যের পথ সুগম করবার উদ্দেশ্যে এ ধরনের আলাদা আলাদা রাজত্ব এবং গৃহযুদ্ধের ইন্ধন জোগায়। অন্যান্য কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও তাদের নিজস্ব স্বার্থেই সাময়িকভাবে চীনের ঐক্য এবং শান্তি চায়। চীনের কিমউনিস্ট পার্টি ও চীনা জনগণও তাদের স্বার্থের দিক থেকে গৃহযুদ্ধ ও বিভেদের বিরুদ্ধে শান্তি ও ঐক্যের জন্য তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে।

(৫) রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে তুলনামূলক বিচারে, চীন ও জাপানের মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ জাতীয় দ্বন্দ্বটির বিকাশ শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও রাজনৈতিক পার্টিতে পার্টিতে দ্বন্দ্বটিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ে ফেলেছে এবং অপ্রধান করে তুলেছে। কিন্তু এগুলির অস্তিত্ব এখনও আছে, কোনক্রমেই তা হ্রাস পায়নি বা বিলীন হয়ে যায়নি। জাপান ছাড়া অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও চীনের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা জনগণ যে কর্তব্যের সামনে এসে পড়েছে, তা হচ্ছে —আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বগুলি সম্পর্কে উপযুক্ত সামঞ্জস্যবিধান করে বর্তমানে জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যের সাধারণ কার্যাবলীর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। এ কর্তব্যপালন অবশ্যই করতে হবে এবং করা যায়ও। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক শান্তি, ঐক্য, গণতন্ত্র, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং যেসব জাপ-বিরোধী দেশ আছে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাবার নীতি অনুসরণের এই হচ্ছে কারণ।

চার। চীনা বিপ্লবের নতুন যুগের প্রথম স্তর আরম্ভ হয়েছিল ১৯৩৫ সালের ৯ই ডিসেম্বরে, এবং ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কুওমিনতাঙের কেন্দ্রিয়

কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনে তার সমাপ্তি ঘটে। এই স্তরের প্রধান ঘটনাগুলি ছিল ছাত্র, সাংস্কৃতিক এবং পত্রপত্রিকা-মহলে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন; উত্তর-পশ্চিমে লালফৌজের প্রবেশ; জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার এবং সংগঠন, সাংহাই এবং সিংতাওয়ে[৮] জাপ-বিরোধী ধর্মঘট; জাপানের প্রতি বৃটেনের তুলনামূলক কঠোর মনোভাব[৯]; কোয়াংতুং-কোয়াংসী ঘটনা[১০]; সুইচুয়ানের প্রতিরোধ এবং তার সমর্থনে আন্দোলন[১১]; চীন-জাপান আলোচনায় নানকিঙের কিছু পরিমাণে দৃঢ় মনোভাব[১২]; সিয়ান ঘটনা; এবং সর্বশেষে, নানকিঙে কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন[১৩]। এই সমস্ত ঘটনাগুলি চীন ও জাপানের মধ্যের মূল দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকে প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল। এই স্তরে বিপ্লবের মূল কাজ ছিল আভ্যন্তরীণ শান্তির জন্য সংগ্রাম করা এবং আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধ করা, যাতে করে জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। এই পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টি আহ্বান জানিয়েছিল: 'গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর এবং জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হও।' এই আহ্বান প্রধানতঃ কার্যকরী করা হয়েছে এবং তারই ফলে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট প্রকৃতপক্ষে গঠন করবার প্রাথমিক পূর্বশর্ত সৃষ্টি করেছে।

পাঁচ। কুওমিনতাঙের মধ্যে জাপ-সমর্থক চক্র থাকার জন্য এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনে সুনির্দিষ্ট অথবা আগাগোড়া পরিবর্তনের কোন নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি এবং সুনির্দিষ্টভাবে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। যাই হোক, জনগণের চাপে এবং তার নিজের সভ্যদের মধ্যে বিরোধের জন্য কুওমিনতাঙকে বিগত দশ বৎসরের ভ্রান্ত নীতির পরিবর্তন শুরু করতে হয়েছে, অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের নীতি, একনায়কত্ব, এবং জাপানকে প্রতিরোধ না করার নীতি থেকে সরে এসে শান্তি, গণতন্ত্র এবং জাপানকে প্রতিরোধের নীতির দিকে চলে আসতে হয়েছে এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নীতি গ্রহণের কাজ শুরু করতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনেই এই প্রাথমিক পরিবর্তনগুলি পরিলক্ষিত হয়। এখন থেকে কুওমিনতাঙের কাছে পুরোপুরি নীতিপরিবর্তনের দাবি অবশ্যই রাখতে হবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য আমাদের পার্টি এবং জনগণকে জাপ-প্রতিরোধের জন্য ও গণতন্ত্রের জন্য দেশব্যাপী আরও অনেক ব্যাপকভাবে

আন্দোলন করতে হবে, কুওমিনতাঙকে সমালোচনার ব্যাপারে আরও এক ধাপ অগ্রসর হতে হবে এবং একে সক্রিয়তার দিকে ঠেলে দিতে হবে, সর্বক্ষণের জন্য চাপ রাখতে হবে, কুওমিনতাঙের মধ্যে যাঁরা শান্তি, গণতন্ত্র ও জাপ-প্রতিরোধ চান তাঁদের সঙ্গে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, এবং দোদুল্যমান ব্যক্তিদের এগিয়ে যাবার জন্য সাহায্য করতে হবে, যাতে জাপ-সমর্থকদের কুওমিনতাঙ থেকে তাঁরা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন।

ছয়। বর্তমান স্তরটি হচ্ছে নতুন পর্যায়ের দ্বিতীয় স্তর। আগের এবং বর্তমানের—এই উভয় স্তর দুটিই হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সশস্ত্র প্রতিরোধের দিকে এগিয়ে যাওয়ার স্তর। আগের স্তরে যদি প্রধান কাজ হয়ে থাকে শান্তির জন্য সংগ্রাম করা, তবে বর্তমান স্তরের প্রধান কাজ হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করা। এ কথা বোঝা দরকার যে, প্রকৃত এবং সুদৃঢ় জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট যেমন আভ্যন্তরীণ শান্তি ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, তেমনি আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ছাড়াও তা হতে পারে না। সুতরাং বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম হচ্ছে বিপ্লবী কাজের কেন্দ্রীয় যোগসূত্র। আমরা যদি সুস্পষ্টভাবে গণতন্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই এবং এর জন্য সংগ্রামে শৈথিল্য দেখাই, তাহলে আমরা একটি প্রকৃত ও সুদৃঢ় জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনে সমর্থ হব না।

গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম

সাত। জাপ-সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে চীনের প্রাচীরের দক্ষিণে আক্রমণের প্রস্তুতির তোড়জোড় করছে। পাশ্চাত্যে হিটলার এবং মুসোলিনির আগ্রাসী যুদ্ধের প্রস্তুতির তোড়জোড়ের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে জাপান একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ভিত রচনার কাজে প্রাচ্যে তার প্রতি বিন্দু শক্তি নিয়োগ করছে, যাতে করে একটি আঘাতেই চীনকে সে পদানত করতে পারে। এজন্য সে দেশের মধ্যে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত অবস্থা সৃষ্টি করছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে কূটনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করছে, এবং চীনের মধ্যে জাপ-সমর্থক শক্তিকে বাড়িয়ে তুলছে। 'জাপ-চীন সহযোগিতা' এবং কূটনৈতিক ব্যাপারে কিছু কিছু নমনীয়তা, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় তার আগ্রাসী নীতির কলা-কৌশলের প্রয়োজনেই করা হয়েছে। চীন আজ বাঁচবে, কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটি এসে গিয়েছে।

জাপ-প্রতিরোধের প্রস্তুতিকে আমাদের বাড়িয়ে তুলতে হবে এবং দেশকে বাঁচাতে হবে। আমরা সুনিশ্চিতভাবেই প্রস্তুতি-পর্বের বিরোধী নই; কিন্তু আমরা বিরোধী দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতির এবং সামরিক ও অসামরিক অফিসার-রাজত্বের গয়ংগচ্ছ ভাবের, বিরোধী কোন ব্যাপারকেই গুরুত্ব না দেওয়ার—যার ফলে দেশের সর্বনাশ সাধিত হয়ে যাবে। এসব প্রকৃতপক্ষে শত্রুকেই সাহায্য করে এবং অবশ্যই অতি দ্রুত আমাদের এসব দূর করতে হবে।

আট। জাতিকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য, জাতীয় প্রতিরক্ষার রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত প্রস্তুতি প্রয়োজন, প্রয়োজন এর সব কিছুরই এবং এর একটিকেও এক মুহূর্তের জন্যও ফেলে রাখা যায় না। কিন্তু আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের বিজয়কে সুনিশ্চিত করবার চাবিকাঠি হচ্ছে রাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা অর্জন। সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ শান্তি ও ঐক্য। কিন্তু গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে যে শান্তি অর্জিত হয়েছে তাকে সুসংবদ্ধ এবং আভ্যন্তরীণ ঐক্যকে শক্তিশালী করা যাবে না। সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন জনগণের সমাবেশ, কিন্তু স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ছাড়া তাদের সমাবেশ করানোর আর কোন পথই নেই। যদি শান্তি এবং ঐক্য সুসংহত করা না যায়, যদি জনগণকে সমাবিষ্ট করা না যায়, তবে আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের ভাগ্য আবিসিয়ার মতোই হবে। আবিসিনিয়ার পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল এই যে, তার সামন্ত শাসন-ব্যবস্থা দৃঢ়মূল আভ্যন্তরীণ ঐক্য অর্জন করতে পারেনি এবং জনগণের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেনি। চীনে গণতন্ত্র ছাড়া জাপানের বিরুদ্ধে প্রকৃত এবং দৃঢ়মূল জাতীয় যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না এবং তার লক্ষ্যও অর্জিত হবে না।

নয়। চীনকে এক্ষুণি নিম্নলিখিত দুটি ব্যাপারে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন শুরু করতে হবে। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক ব্যবস্থান ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙের এক পার্টির এবং এক শ্রেণীর একনায়কত্বের পরিবর্তন করে সমস্ত পার্টি ও সমস্ত শ্রেণীর সহযোগিতার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে হবে। এই ব্যাপারে, জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ও আহ্বানের অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তন করে পরিষদে গণতান্ত্রিক নির্বাচন করতে হবে, এবং পরিষদের সভার কাজ পরিচালনায় স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে হবে। তারপর প্রয়োজন একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করা ও তা গ্রহণ করা, একটি

প্রকৃত গণতান্ত্রিক লোকসভার অধিবেশন আহ্বান করা এবং একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচিত করা, যে সরকার প্রকৃত গণতান্ত্রিক নীতিসমূহ কার্যকরী করবে। কেবলমাত্র এভাবেই সত্যিকারের আভ্যন্তরীণ শান্তি সংহত হতে পারে, আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধ হতে পারে, আভ্যন্তরীণ ঐক্য শক্তিশালী হতে পারে এবং সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে বিদেশী শত্রুর প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেতে পারে। আমাদের এসব পরিবর্তন সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং, যখন জাপানী আক্রমণ আসবে তখন তাকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করবার জন্য আমাদের অতি দ্রুত সংস্কারের কাজে এগিয়ে যেতে হবে এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সম্পূর্ণভাবে এগুলি শেষ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সমগ্র দেশের জনগণ এবং সমস্ত পার্টির দেশপ্রেমিকগণকে জাতীয় পরিষদ এবং সংবিধানের ব্যাপারে আগেকার অবহেলার ভাব পরিত্যাগ করতে হবে এবং জাতীয় পরিষদ ও একটি সংবিধানের জন্য আন্দোলনে গুরুত্ব দিতে হবে। জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য এ আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতাধিষ্ঠিত পার্টি কুওমিনতাঙকে সুতীব্রভাবে সমালোচনা করতে হবে এবং চাপ সৃষ্টি করে এক-পার্টি ও এক-শ্রেণীর এক-নায়কত্ব ত্যাগ করে জনগণের মতানুযায়ী চলতে বাধ্য করতে হবে। এই বছরের আগামী কয়েক মাস জাতীয় পরিষদ এবং সংবিধানকে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক করে তোলার আশু লক্ষ্য নিয়ে দেশব্যাপী এক ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার জাগিয়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, জনগণের জন্য বাক-স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ করা ও সংগঠন করবার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা ছাড়া শাসন-ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন, প্রতিরোধ যুদ্ধে জনগণকে সমাবিষ্ট করা, মাতৃভূমিকে সফলভাবে প্রতিরক্ষা করা এবং বিজিত অঞ্চগুলি পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব। আগামী কয়েক মাসে দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্ততঃপক্ষে এই নিম্নতম স্বাধীনতাগুলি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত, যার মধ্যে থাকবে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, রাজনৈতিক পার্টিগুলির প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ইত্যাদি। শাসন-ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন এবং জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের কার্যসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একই সঙ্গে এগুলিই আবার প্রকৃত এবং সুদৃঢ় জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের পূর্ব শর্ত।

দশ। আমাদের শত্রুরা—জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, চীনা বিশ্বাসঘাতক, জাপ-সমর্থক লোকেরা এবং ট্রটস্কিপন্থীরা—চীনে শান্তি ও ঐক্য, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা এবং জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধকে বানচাল করবার জন্য তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করছে। অতীতে যখন আমরা অক্লান্তভাবে শান্তি ও ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করছিলাম, তখন তারা গৃহযুদ্ধ এবং অনৈক্যের সর্বপ্রকার ইন্ধন জুগিয়েছে। বর্তমানে এবং অদূর ভবিষ্যতে যখন আমরা অক্লান্তভাবে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি, তখন নিঃসন্দেহে তারা তাদের ধ্বংসমূলক কাজ আবার আরম্ভ করবে। তাদের সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে মাতৃভূমির রক্ষার জন্য আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের কাজকে প্রতিহত করা এবং চীনকে পদানত করবার জন্য তাদের আগ্রাসী পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা। গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রামে এখন থেকে আমরা আমাদের প্রচার, বক্তৃতা এবং সমালোচনা কেবলমাত্র কট্টরপন্থী কুওমিনতাঙ সদস্য ও জনগণের পশ্চাৎপদ অংশের দিকেই নিয়োজিত করব না, উপরন্তু জাপানী সাম্রাজ্য-বাদীদের এবং চীন-আক্রমণের ব্যাপারে তাদের পোষা কুত্তা জাপ-সমর্থক ব্যক্তিবর্গ ও ট্রটস্কিপন্থীদের চক্রান্তের মুখোসও সম্পূর্ণভাবে খুলে দেব এবং সুদৃঢ়ভাবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব।

এগারো। আভ্যন্তরীণ ঐক্য, গণতন্ত্র এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রয়োজনে এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনের প্রতি প্রেরিত এক টেলিগ্রামের মাধ্যমে নিম্নলিখিত চারটি প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়েছে:

(১) শেনসী-কানসু-নিংসিয়া বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলের কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের নাম হবে চীন প্রজাতন্ত্রের বিশেষ অঞ্চলের সরকার, লালফৌজ জাতীয় বিপ্লবী বাহিনীর অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে, এবং তারা যথাক্রমে নানকিঙের কেন্দ্রীয় সরকার এবং এর সামরিক পরিষদের নির্দেশাধীনে আসবে;

(২) বিশেষ অঞ্চলের সরকারের অধীনস্থ স্থানসমূহে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরী করা হবে;

(৩) কুওমিনতাঙকে সশস্ত্র শক্তি দ্বারা উৎখাতের নীতি বন্ধ থাকবে; এবং

(৪) জমিদারের জমি বাজেয়াপ্তকরণ বন্ধ থাকবে।

এই প্রতিশ্রুতিগুলি প্রয়োজনীয় এবং উপযোগীও বটে। কারণ একমাত্র এইভাবেই আমরা দেশের মধ্যে দুটি বিভিন্ন সরকারের মধ্যেকার বিরোধের পরিবর্তন সাধন করতে পারি এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের জন্য ঐক্য অর্জন করতে পারি। এগুলি হবে চীনের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের তুলনামূলক রাজনৈতিক গুরুত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এগুলি হচ্ছে নীতিসম্মত এবং শর্তাধীন সুবিধাদান। সমগ্র জাতির পক্ষে যা প্রয়োজনীয়—শান্তি, গণতন্ত্র এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ—সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই এই সুবিধাদান। তাছাড়া, এই সুবিধাদানেরও কিন্তু সীমা আছে। বিশেষ অঞ্চলে এবং লাল-ফৌজের ওপরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব বজায় রাখা, এবং কুওমিনতাঙের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনার স্বাধীনতা—এগুলি হচ্ছে সীমা, যা পেরিয়ে যাওয়া চলবে না। সুবিধাদানের অর্থ উভয় পার্টিরই সুবিধাদান: কুওমিনতাঙ গৃহযুদ্ধের নীতি, একনায়কত্ব ও বিদেশী শত্রুকে প্রতিরোধ না করার নীতি পরিত্যাগ করবে, এবং কমিউনিস্ট পার্টি দুই সরকারের মধ্যে বৈরিতা চালাবার নীতি পরিত্যাগ করবে। আমরা পরেরটির বিনিময়ে আগেরটি চাই, এবং জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনে আমরা কুওমিনতাঙের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাই। একে কমিউনিস্ট পার্টির আত্মসমর্পণ বলে অভিহিত করা আ কিউবাদ[১৪] বা নোংরা অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

বারো। কমিউনিস্ট পার্টি কি তিন-গণনীতিকে স্বীকার করে? আমাদের উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ, আমরা স্বীকার করি।[১৫] তিন-গণনীতি তার ইতিহাসের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী তিন-গণনীতি জনগণের আস্থা অর্জন করেছিল এবং তা ১৯২৪-২৭ সালের বিজয়ী বিপ্লবের পতাকা হয়েছিল, কারণ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সহযোগিতার ফলেই সুদৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যদিও ১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙ কমিউনিস্ট পার্টির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে (পার্টি থেকে বিতাড়ন[১৬] এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী যুদ্ধ) এবং বিরুদ্ধ নীতি অনুসরণ করে বিপ্লবের পরাজয় ঘটায় এবং দেশকে বিপদগ্রস্ত করে। ফলে, জনগণ তিন-গণনীতির ওপর আস্থা হারায়। যেহেতু এখন জাতীয় সংকট খুবই গভীর এবং কুওমিনতাঙ আর পুরানো কায়দায় শাসন চালাতে পারছে না, সেহেতু সমগ্র দেশের জনগণ এবং

কুওমিনতাঙের মধ্যেকার দেশপ্রেমিকরা দুই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা জরুরী-ভাবে দাবি করছেন। ফলে তিন-গণনীতির সারমর্মকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, এবং জাতীয়তার আদর্শ বা জাতীয় স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রাম, গণতন্ত্রের আদর্শ বা আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা অর্জন, এবং জনগণের জীবনযাত্রার আদর্শ বা জনগণের হিতসাধনের ভিত্তিতে দুই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে চীনা বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে এসব আদর্শ সুদৃঢ়ভাবে বাস্তবে রূপায়িত করবার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেক সদস্যকে একথা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কমিউনিস্টরা কখনো তাদের সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদের আদর্শ পরিত্যাগ করবে না, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েই এই আদর্শে তারা পৌঁছাবে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী আছে। এর সর্বোচ্চ কর্মসূচী হচ্ছে সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ, যা তিন গণনীতি থেকে স্বতন্ত্র। এমনকি, তার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগের কর্মসূচীও চীনের অন্যান্য পার্টির তুলনায় অনেক বেশি নিখুঁত ও সম্পূর্ণ। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী এবং কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক বিঘোষিত তিন গণনীতি মূলতঃ বিরোধী নয়। সুতরাং তিন-গণনীতিকে প্রত্যাখ্যান করা তো দূরের কথা, আমরা একে কার্যকরী করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে প্রস্তুত। উপরন্তু, আমরা এই কর্মসূচী আমাদের সঙ্গে একযোগে রূপায়ণের জন্য কুওমিনতাঙকে আহ্বান জানাচ্ছি, এবং সমগ্র দেশকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি এই কর্মসূচীকে কার্যকরী করবার জন্য। আমরা মনে করি যে, জাতীয় স্বাধীনতা গণতন্ত্র, এবং স্বাধীনতা—এই তিন সুমহান লক্ষ্যের জন্য এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানের জন্য, কমিউনিস্ট পার্টি, কুওমিনতাঙ এবং সমগ্র দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং সংগ্রাম চালাতে হবে।

তেরো। শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের যে স্লোগান আমরা আগে দিয়েছিলাম তা কি ভুল ছিল? না, ভুল ছিল না। বুর্জোয়ারা, বিশেষ করে বৃহৎ বুর্জোয়ারা, বিপ্লব থেকে সরে দাঁড়িয়েছে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত শক্তির রক্ষকে পরিণত হয়েছে, এবং জনগণের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় বিপ্লবের একমাত্র চালিকাশক্তি থাকছে সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক এবং শহরের

পেটি-বুর্জোয়ারা এবং একমাত্র বিপ্লবী পার্টি থাকছে কমিউনিস্ট পার্টি, যার ওপরেই অবশ্যম্ভাবীরূপে বিপ্লব সংগঠনের দায়িত্ব বর্তাচ্ছে। একমাত্র কমিউনিস্ট-পার্টিই বিপ্লবের পতাকা উঁচুতে তুলে রেখেছে, বিপ্লবের ঐতিহ্য রক্ষা করেছে, শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্লোগান উপস্থাপিত করেছে, এবং বহু বছর ধরে কঠোর সংগ্রাম করেছে। এই স্লোগান বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজের বিরোধী ছিল না, বরং আমরা যে সুদৃঢ়ভাবে সে-কাজই সম্পন্ন করেছি, তাই প্রমাণ করেছে। আমাদের প্রকৃত সংগ্রামে আমরা যে নীতি গ্রহণ করেছিলাম তার একটিও এই কর্তব্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ এবং আট ঘণ্টা শ্রম-সময় প্রবর্তন সহ আমাদের অন্যান্য নীতিসমূহ কখনও ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিমালিকানার সীমানার বাইরে যায়নি। সমাজতন্ত্রকে বাস্তবে কার্যকরী করা আমাদের তৎকালীন নীতি ছিল না। নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শরিক কারা কারা হবে? এর শরিক হবে সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক, শহরের পেটি-বুর্জোয়া, বুর্জোয়াশ্রেণী এবং দেশের অন্যান্য ব্যক্তি যারা জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব চায়,—এ হবে জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবে এইসব শ্রেণীর মৈত্রী। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, বুর্জোয়াদের এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তার কারণ, বর্তমান অবস্থায় বুর্জোয়াদের আবার আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার এবং জাপ-প্রতিরোধে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে, এবং তাই সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির তাদের বাদ না দিয়ে স্বাগত জানানোই উচিত হবে এবং যৌথ সংগ্রামে তাদের সঙ্গে মৈত্রী পুনরুজ্জীবিত করে চীনা বিপ্লবকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করাই উচিত হবে। আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘর্ষের অবসান ঘটাবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি জমিদারদের জমি বলপূর্বক বাজেয়াপ্তকরণের কাজটি আর না করতে রাজী আছে এবং ভূমি-সমস্যা সমাধানের জন্য নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গড়বার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংসদীয় এবং অন্যান্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করতে রাজী আছে। প্রথম যে প্রশ্নটির মীমাংসা করতে হবে তা হচ্ছে, চীনের জমির মালিক চীনারা হবে, না জাপানীরা হবে? যেহেতু কৃষকদের ভূমি-সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটি চীনের প্রতিরক্ষার প্রশ্নটির সঙ্গে বিজড়িত, তাই আমাদের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন হবে বলপূর্বক বাজেয়াপ্তকরণের পথ পরিত্যাগ করে উপযুক্ত নতুন পথ গ্রহণ করা। অতীতে শ্রমিক কৃষকের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্লোগানটি খুবই সঠিক ছিল, এবং আজ এ স্লোগান বর্জন করাটাও সঠিক।

চৌদ্দ। শত্রুকে যৌথভাবে প্রতিরোধ করবার প্রয়োজনে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকটি আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সঠিক সমাধান প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নীতি হওয়া উচিত এই যে, এই সমাধান যেন জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে দুর্বল ও সংকুচিত না করে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে শ্রেণীতে শ্রেণীতে, পার্টিতে পার্টিতে এবং রাজনৈতিক গ্রুপে গ্রুপে দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব, কিন্তু যেসব সংগ্রাম ঐক্য এবং জাপ-প্রতিরোধের পক্ষে ক্ষতিকর (গৃহযুদ্ধ, রাজনৈতিক পার্টিগুলির বৈরিতামূলক সংঘর্ষ প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতাবাদ, একদিকে সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন এবং অন্যদিকে প্রতিরোধের পক্ষে ক্ষতিকারক অভ্যুত্থানের নীতি ও বেশি বেশি অর্থনৈতিক দাবি ইত্যাদি), সেগুলির অবসান ঘটানো সম্ভব ও প্রয়োজন। আর যেসব সংগ্রাম ঐক্য এবং জাপ-প্রতিরোধকে সাহায্য করে (সমালোচনার স্বাধীনতার জন্য, রাজনৈতিক পার্টিগুলির স্বাধীনতার জন্য, জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনমান উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য) সেগুলিকে চালিয়ে যাওয়া।

পনেরো। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট এবং সংযুক্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সংগ্রামের সামগ্রিক কর্তব্যের মধ্যে লালফৌজ এবং জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলগুলির কাজ হচ্ছে :

(১) জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যের জন্য লালফৌজকে অবিলম্বে জাতীয় বিপ্লবী বাহিনী হিসেবে পুনঃসংগঠিত করতে হবে এবং সামরিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষার মান বাড়িয়ে একটি আদর্শ সেনাবাহিনী হতে হবে।

(২) আমাদের ঘাঁটি অঞ্চলগুলিকে রাষ্ট্রের অংশ হতে হবে, নতুন অবস্থায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে, শান্তিরক্ষী বাহিনীকে পুনর্গঠিত করতে হবে। বিশ্বাসঘাতক এবং অন্তর্ঘাতীদের বিতাড়িত করতে হবে এবং একে প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রের আদর্শ অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।

(৩) এই অঞ্চলে অতিপ্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক গঠনকার্য চালাতে হবে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে হবে।

(৪) প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

তোলো। চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী কোন কোন ঐতিহাসিক অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ত-বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করলেও, তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতার ফলে অন্য অবস্থায় তারা আবার দোদুল্যমান হয়ে পড়ে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে। চীনা বুর্জোয়াশ্রেণী সম্বন্ধে চীনের ইতিহাস এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং এ হচ্ছে ইতিহাসের সিদ্ধান্ত—সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দায়িত্ব বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে সম্পন্ন করা যায় না, কেবলমাত্র সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বেই তা সম্পন্ন করা যায়। শুধু তাই নয়, গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর অধ্যবসায় এবং শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার পরিপূর্ণ ভূমিকাটি পালন করেই কেবল বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্তর্নিহিত দোদুল্যমানতা এবং শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার অক্ষমতাকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব এবং বিপ্লবের মাঝপথে বিশ্বাসঘাতকতাকে ঠেকানো সম্ভব। সর্বহারাশ্রেণী কি বুর্জোয়াশ্রেণীকে অনুসরণ করবে, না বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বহারাশ্রেণীকে অনুসরণ করবে? নেতৃত্ব দেওয়ার এই দায়িত্বের প্রশ্নটিই হচ্ছে চীন বিপ্লবের চাবিকাঠি, যার ওপরে বিপ্লবের সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে। ১৯২৪-২৭ সালের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, যখন বুর্জোয়ারা সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্বে চলেছিল তখন বিপ্লব কিভাবে এগিয়ে গিয়েছিল, এবং সর্বহারাশ্রেণী কমিউনিস্ট পার্টির ভুলের জন্য[১৭] বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক লেজুড়ে পরিণত হল, তখন কিভাবে বিপ্লব ব্যর্থ হল। ইতিহাসের এই ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি করতে দেওয়া ঠিক হবে না। বর্তমান অবস্থায় সর্বহারাশ্রেণী ও তার পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন করা, শান্তি, গণতন্ত্র এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের লক্ষ্য অর্জন করা এবং মাতৃভূমিকে রক্ষা করা অসম্ভব, এবং অসম্ভব সংযুক্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। আজও কুওমিনতাঙের বুর্জোয়ারা খুবই নিষ্ক্রিয় ও রক্ষণশীল, এবং তার প্রমাণ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে সৃষ্ট জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে মেনে নিতে তাদের দীর্ঘদিন ব্যাপী দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব। এই অবস্থা সর্বহারাশ্রেণী ও তার পার্টির নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। জাপ-প্রতিরোধের প্রধান বাহিনী হিসেবে কাজ করবার এবং দেশকে বাঁচাবার দায়িত্বভার থেকে কমিউনিস্ট পার্টি মুক্ত হতে পারে না—এই বাধ্যবাধকতা তারা অস্বীকার করতে পারে না।

সতেরো। দেশের সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীগুলিকে সর্বহারাশ্রেণী কিভাবে তার পার্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয়? প্রথমতঃ, বিপ্লবের প্রতিটি পর্যায়ের বিকাশ অনুযায়ী ঐতিহাসিক স্তরের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক শ্লোগান উপস্থাপিত করে এবং এইসব রাজনৈতিক শ্লোগানগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা 'একটি জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট' এবং 'একটি সংযুক্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মূল শ্লোগান উপস্থাপিত করেছি। এছাড়াও আমরা 'গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাও', 'গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম কর', 'সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যাও' প্রভৃতি শ্লোগান তুলে ধরেছি ঐক্যবদ্ধ কাজের লক্ষ্য হিসেবে। এরকম সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্নই উঠতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, যখন সমগ্র দেশ তাদের এই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজে নেমে পড়েছে, তখন সর্বহারাশ্রেণীকে, বিশেষ করে তার অগ্রগামী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টিকে তার অসীম উদ্দীপনা এবং আনুগত্যের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবার সংগ্রামে কমিউনিস্টদের হতে হবে সবচাইতে বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সবচাইতে বেশি আত্মত্যাগী, সবচাইতে বেশি সুদৃঢ় এবং প্রতিটি অবস্থার সুযোগ গ্রহণের জন্য সবচাইতে কম কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ব্যাপক জনগণের ওপর আস্থা স্থাপন করে তাদের সমর্থন অর্জন করতে হবে। তৃতীয়তঃ, নির্ধারিত রাজনৈতিক লক্ষ্যকে এক মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ না করে কমিউনিস্ট পাটিকে তার মিত্রদের সঙ্গে উপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং সে মৈত্রীকে বিকশিত এবং সংহত করতে হবে। চতুর্থতঃ, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে, মতাদর্শগত ঐক্য এবং কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। এ সমস্ত কাজ করেই কেবল সমগ্র চীনা জনগণের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে কমিউনিস্ট পার্টি বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে।. এগুলিই আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভিত্তির গ্যারান্টি সৃষ্টি করতে পারে, বিপ্লবের সম্পূর্ণ বিজয়কে সুনিশ্চিত করতে পারে, এবং আমাদের দোদুল্যমানতায় যাতে বিপ্লবের বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, তার নিশ্চিতি অর্জন করতে পারে।

আঠারো। যখন আভ্যন্তরীণ শান্তি অর্জিত হবে এবং আমাদের দুই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সংগ্রামের ধরন, সংগঠন এবং আমাদের কাজকর্মের পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে, কুওমিনতাঙ শাসনের সঙ্গে যে

বৈরিতামূলক সম্পর্ক আমরা অনুসরণ করছিলাম, তার পরিবর্তন সাধন করতে হবে। প্রধানত: এগুলি হবে সামরিক থেকে শান্তিপূর্ণ ধরনে পরিবর্তন, বে-আইনী ধরন থেকে আইনী ধরনে পরিবর্তন। এ সমস্ত পরিবর্তন সাধন করা সহজ হবে না এবং আমাদের নতুন করে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং আমাদের কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা একটি মূল চাবিকাঠি।

উনিশ। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রকৃতি ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহু কমরেড প্রশ্ন করছেন। আমাদের উত্তর হচ্ছে: শ্রেণী-চরিত্রের দিক থেকে এই প্রজাতন্ত্র হবে সমস্ত বিপ্লবীশ্রেণীর মৈত্রী, এবং ভবিষ্যতের দিক থেকে এর সম্ভাবনা থাকবে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার। সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় সশস্ত্র প্রতিরোধের পথে এবং নতুন আন্তর্জাতিক পরিবেশের মধ্যে (সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয় এবং বিশ্ববিপ্লবের নতুন যুগের আরম্ভ) আমাদের এই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুতরাং, যদিও সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে এ তখনও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থাকবে, তা সত্ত্বেও এটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সাধারণ চরিত্র থেকে পৃথক হবে, কারণ, নির্ভুল রাজনৈতিক ভাষায়, একে হতে হবে এমন একটি রাষ্ট্র, যার ভিত্তি হবে সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মৈত্রী। সুতরাং, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা যায়, যদিও এর ধনতান্ত্রিক পথে যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন আছে, ঠিক তেমনি আবার সমাজতান্ত্রিক পথে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে, এবং চীনা সর্বহারাশ্রেণীর পার্টিকে পরের সম্ভাবনাটির জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হবে।

কুড়ি। পার্টির দায়-দায়িত্ব বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য রুদ্ধদ্বার নীতি এবং হঠকারিতার বিরুদ্ধে ও লেজুড়বৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গণ-আন্দোলনে আমাদের পার্টির একটি দীর্ঘদিনের ঝোঁক আছে চূড়ান্ত রুদ্ধদ্বার নীতির দিকে, ঔদ্ধত্যপূর্ণ সংকীর্ণতাবাদের দিকে এবং হঠকারিতার দিকে যাবার। এইসব কুৎসিৎ ঝোঁক পার্টি কর্তৃক জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার এবং জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে জয় করবার প্রতিবন্ধক। আমাদের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্র থেকে এই ঝোঁককে সমূলে উৎপাটিত করা একান্তভাবেই দরকার। আমরা যা বলছি তা হচ্ছে: সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর নির্ভর কর এবং সমগ্র পরিস্থিতিকে বিচার কর। চেন তু-শিউ ধরনের লেজুড়-বৃত্তি—যা হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া সংস্কারবাদেরই প্রতিফলন—

কিছুতেই আর ঘটতে দেওয়া চলবে না। পার্টির শ্রেণী-অবস্থানকে বিচ্যুত করা. তার সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিকে মুছে ফেলা. বুর্জোয়া সংস্কারবাদের স্বার্থে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া—এইসব বিপ্লবকে সুনিশ্চিত পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেবে। আমরা যা বলছি তা হচ্ছে : সুদৃঢ় বিপ্লবী কর্মনীতিগুলিকে কার্যকরী কর এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিপূর্ণ বিজয় অর্জনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাও। যেসব অবস্থিত ঝোঁকের কথা আমরা বললাম সেগুলিকে দূর করবার জন্য সমস্ত পার্টির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তাত্ত্বিক জ্ঞানের মানকে উন্নত করে তোলা একান্তভাবে দরকার, কেননা মার্কসবাদ-লেনিনবাদই হচ্ছে একমাত্র দিক্‌নির্দেশক, যা চীন-বিপ্লবকে বিজয় অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

টীকা

১। ১৯৩৫ সালে যখন জাপানীরা উত্তর চীনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী আক্রমণ চালায় এবং যখন চিয়াং কাই-শেক-এর নেতৃত্বে কুওমিনতাঙ সরকার আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এক অবমাননাজনক অবস্থায় আমাদের টেনে নামিয়ে আনে, তখনই উত্তর চীন ঘটনা ঘটে। ঐ বছরের মে মাসে কুওমিনতাঙ সরকারের কাছে জাপানীরা উত্তরে চীনের শাসন-ব্যবস্থার অধিকার দাবি করে এবং জুন মাসে কুওমিনতাঙ সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধি হো-ইং-চিন উত্তর চীনের হানাদারী জাপ-বাহিনীর অধিনায়ক য়োসিজিরো উমেজুর সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিটি 'হো-উমেজু চুক্তি' নামে খ্যাত হয়। এই চুক্তি অনুসারে চীনকে হোপেই এবং চাহার প্রদেশের ওপর থেকে আর সার্বভৌমত্বের অনেকখানিই ত্যাগ করতে হয়। অক্টোবর মাসে, জাপানী আক্রমণকারীদের প্ররোচনায়, কিছু চীনা বিশ্বাসঘাতক হোপেই প্রদেশের সিয়াংহোতে বিদ্রোহ করে এবং ঐ কাউন্টি শহরটি অধিকার করে। নভেম্বর মাসে জাপ-আক্রমণকারীরা জনাকয়েক চীনা বিশ্বাসঘাতককে দিয়ে উত্তর চীনের পাঁচটি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন চালায় এবং পূর্ব হোপেইতে একটি 'কমিউনিস্ট বিরোধী স্বায়ত্তশাসিত শাসন-ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠা করে। 'উত্তর চীনের জন্য বিশেষ শাসন-ব্যবস্থা'র দাবি নিয়ে জাপানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার্থে কুওমিনতাঙ সরকার একটি 'হোপেই এবং চাহারের

নিমিত্ত রাজনৈতিক পরিষদ' গঠনের জন্য সুং চে-য়ুয়ান এবং অন্যান্যদের মনোনীত করে।

২। ১৯৩৫ সালের ১লা আগস্ট চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই ঘোষণাটি করে। নিম্নলিখিত সারাংশে ঘোষণাটির প্রধান বিষয়গুলি দেওয়া হল:

এই মুহূর্তে যখন আমাদের দেশ ও আমাদের জনগণ ধ্বংসের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়াছে, তখন কমিউনিস্ট পার্টি স্বদেশবাসীদের কাছে আর একবার আবেদন জানাচ্ছে: বিগত দিনে বা বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে স্বার্থের এবং রাজনৈতিক মতাবাদের যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, আমাদের স্বদেশবাসীদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর এবং স্বার্থের যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, বিভিন্ন সেনাবাহিনীর মধ্যে বিগত দিনের বা বর্তমানের যত বিরোধিতায় থাকুক না কেন, আমাদের সকলেরই এই উপলব্ধিতে প্রকৃতই জেগে উঠা প্রয়োজন যে, 'বাড়িতে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হলেও তারা বাইরের আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়', এবং আমাদের প্রথম এবং প্রধানতম কাজ হচ্ছে জাপানকে প্রতিরোধ করে জাতিকে বাঁচানোর পবিত্র কর্তব্যের জন্য সংগ্রামের জাতির সমস্ত শক্তিকে (জনবল, অর্থবল এবং সশস্ত্র-বাহিনী) কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানো। কমিউনিস্ট পার্টি আবার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা করছে: যদি কুওমিনতাঙ সামরিকবাহিনী লালফৌজের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ বন্ধ করে, এবং তাদের কোন ইউনিট যদি জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালায়, তবে লালফৌজ, পুরোনো ঝগড়া বা বর্তমান সংঘর্ষ বা অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্বন্ধে মত-পার্থক্য সব কিছুকে ভুলে গিয়ে এইসব কিছুকে ইউনিটের বিরুদ্ধে তাদের সংঘর্ষমূলক কাজকর্ম এই মুহূর্তে শুধু বন্ধই করবে না, জাতিকে বাঁচানোর জন্য সানন্দে ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে কাজ করবে।

কমিউনিস্ট পার্টি এ ধরনের একটি জাতিয় প্রতিরক্ষা সরকার গঠনের উদ্যোগ নিতে রাজী আছে। এরকম একটি জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার গঠনের জন্য সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি, সমস্ত সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, ছাত্র ইউনিয়ন, চেম্বার অব কমার্স, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, সংবাদ পত্রসেবী সংঘ, শিক্ষক প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যালয়সমূহের কর্মচারীবর্গ, শহরবাসীদের প্রতিষ্ঠান, চি কুং-তাং জাতীয় সশস্ত্র আত্মরক্ষার প্রতিষ্ঠান,

জাপ-বিরোধী সংঘ, জাতীয় মুক্তিসংঘ ইত্যাদি), সব নামী ব্যক্তি, রাজনীতিজ্ঞ, পণ্ডিত, এবং সমস্ত স্থানীয় সামরিক এবং প্রশাসনিক সংগঠন, যারা জাপানকে প্রতিরোধ করতে এবং জাতিকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক, তাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি এখনি আলাপ-আলোচনায় বসতে প্রস্তুত আছে। এই আলাপ-আলোচনা থেকে উদ্ভূত জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার হবে পরাধীনতার হাত থেকে জাতিকে বাঁচাবার জন্য এবং বেঁচে থাকাকে সুনিশ্চিত করবার জন্য নেতৃত্বের একটি অস্থায়ী হাতিয়ার। এর পক্ষে উচিত হবে দেশের সমস্ত লোকের সত্যিকারের প্রতিনিধি নিয়ে (বিভিন্ন অংশের শ্রমিক, সৈন্য, কর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং ছাত্র, সমস্ত পার্টি এবং প্রতিষ্ঠান—যারা জাপানকে প্রতিরোধ করতে এবং দেশকে বাঁচাতে ইচ্ছুক, এবং সমস্ত প্রবাসী চীনাদের ও চীনের মধ্যেকার সমস্ত জাতিসমূহের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে) একটি প্রতিনিধিত্ব-মূলক সংস্থা গঠন করা এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ ও জাতীয় মুক্তি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির আরও সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করা। কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দের এরকম এক সভা আহ্বানের ব্যাপারে সমস্ত শক্তি দিয়ে সাহায্য করবে এবং এর সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরী করিতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে।

'জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক সমস্ত সৈন্যদের নিয়ে একটি জাপ-বিরোধী সংযুক্ত বাহিনী গঠন করতে হবে। জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের নেতৃত্বে এই সেনাবাহীর একটিমাত্র সাধারণ সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই সদর দপ্তর বিভিন্ন জাপ-বিরোধী সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির সৈন্য এবং অফিসারদের দ্বারা নির্বাচিত হবে, না অন্য কোন উপায়ে হবে, সেই প্রশ্নটি সমস্ত অংশের প্রতিনিধি এবং জনগণের ইচ্ছানুসারেই নির্ধারিত হওয়া উচিত। লালফৌজ এরকম সংযুক্ত বাহিনীতে শর্তহীনভাবে সবার প্রথমেই যোগ দেবে এবং জাপানকে প্রতিরোধ ও দেশকে বাঁচাবার জন্য তার কর্তব্য পালন করবে। জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার এবং জাপ-বিরোধী সংযুক্ত সেনাবাহিনী কর্তৃক জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং জাপানকে প্রতিরোধের অসীম দায়িত্ব কার্যকরীভাবে পালনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি তাই সমগ্র জাতির কাছে আবেদন জানাচ্ছে: যাঁদের টাকা আছে তাঁরা টাকা, যাঁদের বন্দুক আছে তারা বন্দুক দিন, যাঁদের খাদ্যশস্য

আছে তাঁরা তা দিন, যাঁদের শ্রমক্ষমতা আছে তাঁরা শ্রমক্ষমতা দিন এবং যাঁদের বিশেষ দক্ষতা আছে তাঁরা সেই বিশেষ দক্ষতা নিয়ে এগিয়ে আসুন, যাতে করে আমাদের সশস্ত্র স্বদেশবাসীকে সমাবিষ্ট করা যায় এবং আধুনিক এবং পুরানো সমস্ত অস্ত্র দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে সশস্ত্র করা যায়।

৩। ডিসেম্বর প্রস্তাব হচ্ছে ১৯৩৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বরে উত্তর শেনসীর ওয়াওপাওতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সভায় গৃহীত 'বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পার্টির কর্তব্য' শীর্ষক প্রস্তাবটি। এই প্রস্তাব বর্তমান আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং চীনের শ্রেণী-সম্পর্কের পরিবর্তন সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ করে পার্টির নীতি রচনা করে। প্রস্তাবটি আংশিকভাবে নিম্নরূপ ঃ

বর্তমান অবস্থা থেকে ধরা পড়েছে যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক চীনকে গ্রাস করবার প্রচেষ্টা সমস্ত দেশ ও সমস্ত বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে। চীনের রাজনৈতিক জীবনে সমস্ত শ্রেণী, স্তর, রাজনৈতিক পার্টি এবং সশস্ত্র বাহিনীর সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটছে। জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট এবং জাতীয় প্রতিবিপ্লবী ফ্রন্ট—এই উভয় ক্ষেত্রেই শক্তির পুনর্বিন্যাস ঘটেছে। সুতরাং পার্টির কৌশলগত লাইন হচ্ছে, প্রধান শত্রু অর্থাৎ জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং চরম বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিপ্লবী শক্তিকে এবং সমস্ত জাতিগুলিকে প্রতিরোধের জন্য জাগিয়ে তোলা, ঐক্যবদ্ধ করা এবং সংগঠিত করা। সমস্ত জনগণ, সমস্ত পার্টি, সমস্ত সশস্ত্র বাহিনী এবং সমস্ত শ্রেণী—যারাই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-শেকের বিরোধী, তাদের উচিত ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং মহান জাতীয় বিপ্লবী-যুদ্ধ শুরু করা, জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের চীন থেকে বিতাড়িত করা, চীনে সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটা কুকুরদের শাসনকে উচ্ছেদ করা, চীনা জাতির পূর্ণ মুক্তি অর্জন করা এবং চীনের স্বাধীনতা এবং চীনা ভূমির সংহতি রক্ষা করা। কেবলমাত্র ব্যাপকতম জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট (উচ্চ এবং নিম্নস্তরের সকল লোককে নিয়ে) গঠন করেই আমরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটা কুকুর চিয়াং কাই-শেককে পরাজিত করতে পারি। এ কথা ঠিক যে, বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও স্তর এবং

বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবে যোগদান করছে। কেউবা করছে তাদের প্রভাব বজায় রাখবার জন্য, কেউবা আন্দোলন যাতে তাদের নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে যেতে না পারে সেজন্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দখল করার জন্য, আবার কেউবা চীনদেশের সত্যিকার পূর্ণ মুক্তি অর্জনের জন্য। উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে বলেই কিছু লোক সংগ্রামের শুরুতে দোদুল্যমানতা দেখাবে বা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, কিছু লোক উদাসীন হয়ে যাবে বা মাঝপথে সংগ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, এবং কিছু লোক দৃঢ়সংকল্প নিয়ে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করবে। তা সত্ত্বেও আমাদের কাজ শুধু সমস্ত সম্ভাব্য মূল শক্তিগুলিকেই ঐক্যবদ্ধ করা নয়, উপরন্তু জাপানকে প্রতিরোধ করবে এরূপ সমস্ত ভবিষ্যতের সম্ভাব্য কার্যকরী শক্তিকেও ঐক্যবদ্ধ করা, যাতে করে দেশব্যাপী সমগ্র জনগণ, যাদের শ্রমক্ষমতা আছে তারা শ্রম-ক্ষমতা দিতে পারে, যাদের অর্থ আছে তারা অর্থ দিতে পারে, যাদের বন্দুক আছে তারা বন্দুক দিতে পারে, যাদের জ্ঞান আছে তারা জ্ঞান ছড়াতে পারে, এবং যাতে কোন স্বদেশপ্রেমিক চীনাই জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের বাইরে না থাকে। এই হচ্ছে ব্যাপকতম সম্ভাব্য জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য পার্টির রণকৌশলের সাধারণ লাইন। কেবলমাত্র এই লাইন অনুসরণ করেই আমরা আমাদের সাধারণ শত্রু জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই শেকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সশস্ত্র জনগণকে সমাবিষ্ট করতে পারি। চীনা সর্বহারাশ্রেণী এবং কৃষকরাই চীনা বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি। পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যেকার ব্যাপক অংশ এবং বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছে জাতীয় বিপ্লবে তাদের সবচাইতে বিশ্বস্ত মিত্র। এবং এদের সুদৃঢ় মৈত্রী হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশ্বাস-ঘাতক ও সহযোগীদের পরাজিত করবার মূল বাহিনী। যখন জাতীয় বুর্জোয়া এবং যুদ্ধবাজদের একটি অংশ নৈতিক সমর্থন দেয়, নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে কিংবা জাপানের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বাসঘাতক ও জাপ-সহযোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে, তখন কৃষি-বিপ্লব ও লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও জাপ-বিরোধী ফ্রন্ট সম্প্রসারণের কাজকে তারা কিন্তু সাহায্যই করে। কারণ, এইভাবেই প্রতিবিপ্লবের সামগ্রিক শক্তি হ্রাস পায় এবং বিপ্লবী

শক্তিসমূহের সামগ্রিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই পার্টির উচিত হবে যথোপযুক্ত উপায় ও পথ গ্রহণ করা, যাতে করে জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের পক্ষে এই শক্তিসমূহকে জয় করা সম্ভব হয়। উপরন্তু, জমিদার ও মুৎসুদ্দিশ্রেণীদের মধ্যেও কোনরকম ঐক্য নেই। যেহেতু বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী চুক্তিগুলির মধ্যে চীনকে নিয়ে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা আছে—তাই বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বাসঘাতক গ্রুপের উৎপত্তি হয়েছে এবং তাদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ আছে। পার্টির উচিত হবে এমন সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের পদ্ধতি অবলম্বন করা, যাতে করে কিছু সময়ের জন্যও সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তিরা সক্রিয়ভাবে জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের বিরোধিতা না করতে পারে। জাপান ছাড়া অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের বেলায়ও এই একই কৌশল অবলম্বন করতে হবে। দেশব্যাপী সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে জনগণের শক্তিকে জাগরিত, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার জন্য জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের মধ্যে পার্টি সুদৃঢ়ভাবে এবং অনমনীয়-ভাবে সমস্ত প্রকারের দোদুল্যমানতা, আপোষ, নতিস্বীকার ও বিশ্বাস-ঘাতী প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। চীনা জনগণের জাপ-বিরোধী আন্দোলনে যারা বিভেদ সৃষ্টি করে, তারা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক অথবা সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী। তাদের বিরুদ্ধে আমরা সবাই মিলে একযোগে কঠোর আঘাত হানব। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বাসঘাতক চক্র এবং সাম্রাজ্যবাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে কথায় এবং কাজে সুদৃঢ় ও সঠিক পথ অনুসরণ করে জাপ-বিরোধী ফ্রন্টে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করা উচিত। কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই জাপ-বিরোধী যুদ্ধে ব্যাপৃত জনগণের মূল স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবিসমূহ (কৃষকদের জমির দাবি, শ্রমিকশ্রেণীর, সেনাদের এবং শহরের দরিদ্র বুদ্ধিজীবীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন) পূরণ করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র তাদের দাবিসমূহ পূরণ করেই আমরা জনগণের ব্যাপক অংশকে জাপ-বিরোধী বাহীনিতে সমাবিষ্ট করতে পারি, এবং কেবলমাত্র এইভাবেই পার্টি জাপ-বিরোধী যুদ্ধে নেতৃত্ব অর্জন করতে পারে।

এই খণ্ডেই প্রকাশিত 'জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশল সম্পর্কে' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪। ১৯৩৬ সালের ৫ই মে লালফৌজ টেলিগ্রাম করে এই দাবী জানায়

যে, নানকিং সরকার গৃহযুদ্ধ অবসান ঘটাক, জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যের জন্ত কমিউনিস্টদের সঙ্গে শান্তি-আলোচনা চালাক। টেলিগ্রামটি ছিল নিম্নরূপ :

নানকিং সরকারের সামরিক পরিষদের নিকট, সমস্ত জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর প্রতি, সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপের প্রতি, সমস্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্রগুলির প্রতি এবং সেইসব স্বদেশবাসীদের প্রতি যাঁরা বিদেশী জাতির অধীনে দাসত্ব বরণে রাজী নন :

পূর্বদিকে অভিযানের পথে ইয়েলো নদী পার হওয়ার পর চীনা লাল-ফৌজের বিপ্লবী সামরিক কমিশন কর্তৃক সংগঠিত চীনা জনগণের লাল-ফৌজের জাপ-বিরোধী অগ্রগামী বাহিনী প্রতিটি জায়গাতেই বিজয়ী হয়েছে, দেশব্যাপী সকলের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু যখন এই বাহিনী টাটুং-পুচৌ রেলপথ দখল করে প্রত্যক্ষভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য পূর্বদিকে হোপেইতে অগ্রসর হবার জন্য উৎসাহ সহকারে প্রস্তুতি চালাচ্ছিল, তখন চিয়াং কাই-শেক দশ ডিভিশনের অধিক সৈন্য শানসীতে পাঠায় ইয়েন সি-সান-এর সঙ্গে সহযোগিতা করে জাপানীদের বিরুদ্ধে আমাদের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার জন্য। চ্যাং সুয়ে-লিয়াং এবং ইয়াং হু-চেঙের অধীনস্ত সেনাবাহিনী এবং উত্তর শেনসীর সেনাবাহিনীকেও চিয়াং শেনসী-কানসু লাল অঞ্চলে অভিযান চালাবার নির্দেশ দিয়েছে, আমাদের জাপ-বিরোধী পশ্চাদ্ভাগকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবার উদ্দেশ্যে। জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্তে জনগণের জাপ-বিরোধী অগ্রগামী বাহিনীর পক্ষে সঠিক কাজ হতো তাদের সমস্ত শক্তি সংহত করা এবং এই পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে সেই চিয়াং-এর বাহিনীকে নির্মূল করা। কিন্তু লালফৌজের বিপ্লবী সামরিক কমিশন অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বর্তমান জাতীয় সংকটের সময় দুই পথের আমৃত্যু যুদ্ধ কেবলমাত্র চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষার শক্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদেরই খুশি করবে—তা সে যুদ্ধে যে পক্ষই বিজয়ী হোক না কেন। অধিকন্তু, চিয়াং কাই-শেক এবং ইয়েন সি-সানএর বাহিনীতে বেশ কিছু সংখক দেশপ্রেমিক অফিসার ও যোদ্ধা আছেন, যারা গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং জাপানকে প্রতিরোধ করবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে ইচ্ছুক। জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লালফৌজের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার জন্য চিয়াং এবং ইয়েন-এর নির্দেশ পালন করা প্রকৃতই তাঁদের বিবেকের

বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সুতরাং শানসীতে অনেকগুলি বিজয় অর্জন সত্বেও লালফৌজের বিপ্লবী সামরিক কমিশন জনগণের জাপ-বিরোধী অগ্রগামী বাহিনীকে ইয়েলো নদীর পশ্চিমে সরিয়ে নিয়েছেন চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষার শক্তিকে রক্ষা করবার জন্য এবং এইভাবে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ নিকটবর্তী করবার জন্য, গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাবার নিমিত্ত ক্রমাগত ঘোষণাকে সুদৃঢ়ভাবে কার্যকরী করবার জন্য, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য এবং চিয়াং কাই-শেক ও তার বাহিনীর দেশপ্রেমিক অফিসার ও সৈন্যদের চূড়ান্ত জাগরণকে ত্বরান্বিত করবার জন্য। নানকিং সরকার, দেশের সমস্ত জল, স্থল, বিমান বাহিনী এবং সমগ্র জাতির নিকট আমাদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়ে আমরা ঘোষণা করছি, যে সমস্ত সশস্ত্র ইউনিট জাপ-বিরোধী লালফৌজকে আক্রমণ করছে, তাদের সঙ্গে এক মাসের মধ্যে আমরা যুদ্ধাবসানের ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত আছি এবং গৃহযুদ্ধের অবসান ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য তাদের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালাতে রাজী আছি। লালফৌজের বিপ্লবী সামরিক কমিশন এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে নানকিং সরকারের ভদ্রলোকেদের এই সৎ পরামর্শ দিচ্ছে যে, যখন আমাদের দেশ এবং জনগণ ধ্বংসের আশঙ্কার মধ্যে আছে তখন বিগত দিনের অপরাধসমূহ স্খালনের জন্য সুদৃঢ় প্রচেষ্টার প্রয়োজন, সমগ্র গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানো প্রয়োজন, ঘরের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ার মনোভাব ত্যাগ করে বাইরের শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে হাত মেলানো দরকার, এবং সর্বপ্রথমেই শেনসী, কানসু এবং শানসীর গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা প্রয়োজন। উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং জাতিকে রক্ষা করার সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। এটা হবে দেশ ও জাতির কাছে এক আশীর্বাদস্বরূপ এবং আপনাদের পক্ষেও মঙ্গলজনক। কিন্তু যদি আপনারা একগুঁয়েমি করে এই যুক্তিগুলি না শোনেন এবং বিশ্বাসঘাতক ও সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হিসেবে থাকতেই পছন্দ করেন, তবে শেষ পর্যন্ত সুনিশ্চিতভাবেই আপনাদের শাসন ভেঙে পড়বে এবং আপনারা সমগ্র জাতি কর্তৃক ঘৃণিত হবেন এবং উৎখাত হয়ে যাবেন। প্রাচীন প্রবচন আছে, 'হাজার হাজার আঙুল দোষী সাব্যস্ত করে দেখিয়ে দিলে বিনা রোগেও একজন লোক মারা যায়', অথবা যেমন আর একটি

প্রবচন আছে, 'যে জল্লাদ অস্ত্র নামিয়ে রাখে, সে তক্ষুণি বুদ্ধদেব বনে যায়'। ভদ্রমহোদয়গণ, এ সমস্ত কথা বলছি আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করবার এবং ভাববার জন্য। লালফৌজের বিপ্লবী সামরিক কমিশন সমস্ত প্রতিষ্ঠান, সমস্ত পার্টি এবং দেশের সমগ্র জনগণ, যারা বিদেশী জাতির ক্রীতদাস হতে চায় না, তাদের সকলকে আহ্বান জানাচ্ছেন আমাদের অস্ত্র সংবরণ এবং শান্তি আলোচনা এবং জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যের প্রস্তাব সমর্থন করবার জন্য, আহ্বান জানাচ্ছেন গৃহযুদ্ধ অবসানকে ত্বরান্বিত করবার জন্য, উভয় পক্ষের যুদ্ধ বন্ধ করবার প্রয়োজন ফ্রন্টে প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য, এবং প্রস্তাবকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী করার ব্যাপারে তদারকী করবার জন্য কমিটি গঠন করবার জন্য।

৫। এই খণ্ডে 'চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতি সম্পর্কে বক্তব্য', ৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৬। 'জনগণের প্রজাতন্ত্র' শ্লোগানটি প্রথমে 'বর্তমান পরিস্থিতি এবং পার্টির কর্তব্য প্রস্তাব'টিতে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সভায় এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং এটি কমরেড মাও সে-তুঙের 'জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশল সম্পর্কে' রচনাতেও আছে। পরবর্তী পরিস্থিতিতে চিয়াং কাই-শেককে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে বাধ্য করার নীতি গ্রহণ করা পার্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেহেতু এই শ্লোগানটি চিয়াং কাই-শেক চক্রের কাছে গ্রহণীয় হতো না, তাই এটিকে পাল্টে ১৯৩৬ সালে কুওমিনতাঙের কাছে পার্টির চিঠিতে 'একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' করা হয়। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শ্লোগানটি পরে 'জাপানকে প্রতিরোধ এবং দেশকে রক্ষা করার আন্দোলন সম্পর্কে এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে প্রস্তাব' এ আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক তা ঐ বৎসরেই সেপ্টেম্বর মাসে গৃহীত হয়। যদিও দুইটি ভিন্ন ধরনের তবুও দুটি শ্লোগানের মর্মবস্তু একই। ১৯৩৬ সালের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেপ্টেম্বর প্রস্তাব থেকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উদ্ধৃত দুটি দেওয়া হল :

কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে 'একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা'র শ্লোগান উপস্থাপিত করা প্রয়োজন, কারণ চীনা ভূমির সংহতি রক্ষা করার জন্য, সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার

জন্য, চীনকে সর্বনাশা ধ্বংসের বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য এবং তার জনগণকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে রক্ষা করবার জন্য এই ইচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এছাড়াও ব্যাপক জনগণের গণতান্ত্রিক দাবির ওপর ভিত্তি করে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার জন্যেও এই শ্লোগানটি সবচাইতে উপযোগী। 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' দ্বারা আমরা সেই গণতন্ত্রকেই বুঝি, যা চীনের একাংশের শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের চাইতে ভৌগোলিকভাবে অনেক ব্যাপক এবং রাজনৈতিকভাবে চীনের প্রধান অংশে কুওমিংতাঙের এক-পার্টি এক-নায়কত্বের চাইতে অনেক বেশি প্রগতিশীল। সুতরাং এটি জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যাপক বিকাশকে এবং পরিপূর্ণ বিজয়কে আরও অনেক ভালভাবে সুনিশ্চিত করবে। অধিকন্তু, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কেবলমাত্র চীনা জনগণের ব্যাপকতম অংশকেই দেশের রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণে এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির বিকাশে সাহায্য করবে না, চীনা সর্বহারাশ্রেণী এবং তার নেতা কমিউনিস্ট পার্টিকেও সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ বিজয়ের সংগ্রামের কাজকর্মের সুযোগ এনে দেবে। সুতরাং, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্য তার সক্রিয় সমর্থন ঘোষণা করছে, এবং আরও ঘোষণা করছে যে, যখন চীনের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং যখন সার্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা হবে, তখন লাল অঞ্চলগুলি প্রজাতন্ত্রের অঙ্গ হিসেবেই পরিগণিত হবে, পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে এবং একই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা লাল অঞ্চলগুলিতেও কার্যকরী করা হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি জোর দিয়ে বলছে যে, আমরা নানকিঙের কুওমিনতাঙ সরকারকে জাপানকে প্রতিরোধ করায় বাধ্য করব এবং চীনা জনগণের সশস্ত্র প্রতিরোধ জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্প্রসারিত করব; সমস্ত রাজনৈতিক পার্টির, সমস্ত অংশের জনগণের এবং সেনাবাহিনীর ব্যাপকতম জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন করব; জাতীয় যুক্তফ্রন্টের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে শক্তিশালী করব; লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও লালফৌজকে আরও অনেক সংহত করব এবং যেসব কথা ও কাজ আমাদের সার্বভৌমত্বের পক্ষে বিশ্বাসঘাতী ও আমাদের দেশের পক্ষে

অপমানজনক এবং জাতীয় ফ্রন্টকে দুর্বল করে, তার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় সংগ্রাম করব। কেবলমাত্র এভাবেই আমরা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পূর্বশর্ত সৃষ্টি করতে পারব। তিক্ত এবং ধৈর্যশীল সংগ্রাম না চালিয়ে, সমগ্র চীনা জাতিকে সমাবিষ্ট না করে, এবং বিপ্লবের এক প্রবল জোয়ার সৃষ্টি না করে আমরা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করে তুলতে পারব না। একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকালীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে জোর দিতে হবে, যেন জাপানকে প্রতিরোধ করবার এবং জাতিকে বাঁচানোর জন্য আমাদের পার্টি কর্তৃক প্রদত্ত কর্মসূচী কার্যকরী করেই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কাজ শুরু করা হয়, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত চীনা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল কর্তব্যগুলি সমাধা না হচ্ছে, ততদিন এইভাবেই চালিয়ে যাওয়া হয়।

৭। এই টেলিগ্রামটি ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাঠানো হয়েছিল। এর পূর্ণ বয়ানটি নিম্নরূপ:

কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনের প্রতি।

ভদ্রমহোদয়গণ,

এ একটি জাতীয় আনন্দের বিষয় যে, সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে। এখন থেকে আভ্যন্তরীণ শান্তি, বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্য এবং সংগতির নীতি কার্যকরী হওয়া সম্ভব হবে। দেশ ও জাতির কাছে এটা একটা আশীর্বাদ। এই মুহূর্তে যখন জাপানী আক্রমণকারীরা সব লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে এবং চীনা জাতির বাঁচার প্রশ্নটি একটি সুতোয় ঝুলছে, তখন আমাদের পার্টি সাগ্রহে আশা করে যে, এই নীতি অনুযায়ী আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ওপর জাতীয় নীতি হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন:

(১) সমস্ত গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাও এবং দেশের সমস্ত শক্তিকে বিদেশী আগ্রাসনের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীভূত কর;

(২) বাক-স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ ও সংগঠন গড়বার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত কর এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও;

(৩) সমস্ত রাজনৈতিক পার্টির, প্রতিটি স্তরের জনগণের এবং সমস্ত সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে আহ্বান কর এবং দেশকে বাঁচানোর সাধারণ প্রচেষ্টায় জাতির সমস্ত গুণাবলীকে কেন্দ্রীভূত কর ;

(৪) জাপানকে প্রতিরোধ করবার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি দ্রুততার সঙ্গে শেষ কর ;

(৫) জনগণের জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন কর।

যদি আপনাদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন এ প্রশ্নগুলির ওপর জাতীয় নীতি হিসাবে সুদৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কৃতকার্য হয়, তবে আমাদের পার্টি বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে :

(১) জাতীয় সরকারকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান দ্বারা উৎখাতের নীতি দেশব্যাপী বন্ধ থাকবে ;

(২) শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক সরকারের নাম পাল্টে চীন প্রজাতন্ত্রের বিশেষ অঞ্চলের সরকার বলে অভিহিত করা হবে, লালফৌজ জাতীয় বিপ্লবী বাহিনীর অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে, এবং তারা যথাক্রমে নানকিং সরকার এবং তার সামরিক পরিষদের নির্দেশাধীনে থাকবে ;

(৩) সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশেষ অঞ্চলের সরকারের অধীনস্থ অঞ্চলগুলিতেও প্রবর্তন করা হবে ; এবং

(৪) জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণের নীতি বন্ধ থাকবে; এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের সংযুক্ত কর্মসূচী সুদৃঢ়ভাবে কার্যকরী করা হবে।

৮। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে সাংহাইতে ছাব্বিশটি জাপানী ও চীনা মালিকানার অধীনস্থ সুতাকলে ৪৫,০০০ শ্রমিকের এক বিরাট ধর্মঘট হয়। ডিসেম্বর মাসে সিংটাওয়ের সমস্ত জাপ-মালিকানার সুতাকলগুলির সমস্ত শ্রমিক সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট করেন। সাংহাই শ্রমিকরা ধর্মঘটে জয়লাভ করেন, এবং নভেম্বর মাস থেকে তাঁদের মজুরী শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং মালিকরা শ্রমিকদের খেয়ালখুশী মতো ছাঁটাই করবে না বা গালাগাল বা মারধোর করবে না, এই শর্ত মেনে নেয়। কিন্তু জাপানী নৌবাহিনী সিংটাওয়ের ধর্মঘটকে অবদমিত করে।

৯। বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের প্রতি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করা শুরু করে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সানহাইকুয়ান দখল ও ১৯৩৩ সালে উত্তর চীনে অনুপ্রবেশের পর, এবং বিশেষ করে ১৯৩৫ সালে হো-উমেজু চুক্তি' স্বাক্ষরের পর (১নং টীকা দ্রষ্টব্য)—যে চুক্তি সরাসরিভাবে উত্তর ও মধ্য চীনে এদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ১৯৩৬ সালে সিয়ান ঘটনার সময়ে বৃটেন চীনে বৃটিশ-স্বার্থহানিকর জাপানী দাবি প্রত্যাখ্যান করবার পরামর্শ দেয়, এবং এমনকি, এই বলে ভয়ও দেখায় যে, যদি চিয়াং কাই-শেক সরকার চীনা জনগণের ওপর তার শাসন চালিয়ে গিয়ে জাপানী আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য 'কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা' দরকার মনে করে, তবে সেটা খুব খারাপ কিছু হবে না।

১০। ১৯৩৬ সালের জুন মাসে কোয়াংসীর যুদ্ধবাজ লি সুং-জেস ও পাই চুং-সি এবং কোয়াংতুঙের যুদ্ধবাজ চেন চি-তাং 'জাপানকে প্রতিরোধ করবার এবং জাতিকে বাঁচাবার' অজুহাতে একযোগে চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতা ঘোষণা করে। আগস্ট মাসে চিয়াং কাই-শেকের উৎকোচ এবং বিভক্ত করে রেখে শাসন করার নীতির ফলে তাদের বিরোধিতা বন্ধ হয়ে যায়।

১১। ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে জাপবাহিনী এবং পুতুল বাহিনী সুইচুয়ান আক্রমণ আরম্ভ করে। নভেম্বর মাসে সেখানকার চীনা বাহিনী প্রতিরোধ আক্রমণ শুরু করে এবং দেশব্যাপী জনগণ তাদের এই যুদ্ধের সমর্থনে এক আন্দোলন শুরু করে।

১২। ১৯৩৫ সালে 'হো-উমেজু চুক্তির' পর জনগণের ক্রমবর্ধমান জাপ-বিরোধী মনোভাবের চাপে এবং জাপানের প্রতি বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীদের কঠোর মনোভাব গ্রহণের ফলে নানকিঙের কুওমিনতাঙ সরকার জাপানের প্রতি দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করে। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কুওমিনতাঙ সরকার জাপানের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সময় নেবার কৌশল গ্রহণ করে, ফলে এই আলোচনায় কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হয় না।

১৩। সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পরে ১৯৩৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির এই সভাটি হয়েছিল

১৪। চীনের মহান লেখক লু সুনের সুবিখ্যাত উপন্যাস 'আ কিউ-এর

সত্য কাহিনী'র নায়ক ছিলেন আ কিউ। বাস্তব জীবনে ব্যর্থতা এবং বিপর্যয়কে নৈতিক বা আত্মিক বিজয় বলে যাঁরা সান্ত্বনা পান, আ কিউ হচ্ছেন তাঁদেরই প্রতিরূপ।

১৫। চীনেব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে কমিউনিস্টরা সান ইয়াৎ-সেনএর কর্মসূচীর মূল বিষয়গুলির সঙ্গে ঐক্যমত হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল।- এর অর্থ এই নয় যে, কমিউনিস্টরা বুর্জোয়া বা পেটি-বুর্জোয়া বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী অথবা ভাবধারা, যার প্রবক্তা ছিলেন সান ইয়াৎ-সেন, তা গ্রহণ করেছিল। চীনা সর্বহারাশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে চীনের কমিউনিস্টদের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী বা মতাদর্শগত ভাবধারা এবং জাতীয় ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সান ইয়াৎ-সেনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

১৬। ১৯২৪ সালে সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক পুনঃসংঠিত হবার পর কুওমিনতাঙ অনেকগুলি শ্রেণীর বিপ্লবী মৈত্রীতে পরিণত হয়, এবং ব্যক্তিগত-ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যেরাও তার সদস্য হন। ১৯২৭ সালের বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর কুওমিনতাঙ সমগ্র দেশ জুড়ে তথাকথিত এক 'পার্টি থেকে বিতাড়ন' অভিযান চালায়, এবং কমিউনিস্ট ও তার নিজের ভেতকার যে সমস্ত বামপন্থীরা ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের তিন মহান নীতিকে প্রকৃতই সমর্থন করতেন, তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করে। তার পর থেকেই কুওমিনতাঙ পরিণত হয় বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টিতে।

১৭। ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সুবিধাবাদী নেতৃত্ব যে অবস্থার সৃষ্টি করে, এখানে তার কথাই বলা হচ্ছে।

জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের জন্য কোটি কোটি জনগণের সমাবেশ ঘটাও

(মে ৭, ১৯৩৭)

কমরেডগণ! 'জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্যসমূহ' শীর্ষক আমি যে রিপোর্ট পেশ করেছি, তার ওপর গত কয়েকদিনের আলোচনায় আপনারা প্রায় সবাই একমত হয়েছেন। কয়েকজন কমরেড অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এই ভিন্ন মতগুলি যেহেতু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমার সমাপ্তিভাষণে অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা আগে আমি সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব।

শান্তির প্রশ্ন

প্রায় দু'বছর ধরে আমাদের পার্টি আভ্যন্তরীণ শান্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনের পর আমরা ঘোষণা করেছিলাম, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 'শান্তির জন্য সংগ্রাম'-এর স্তর এবার শেষ হল, এবং নতুন কর্তব্য হচ্ছে 'শান্তিকে সুসংহত করা'। আমরা এ কথাও বলেছিলাম যে, এই নতুন কর্তব্যটি 'গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম'-এর সঙ্গে সংযুক্ত, অর্থাৎ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শান্তিকে সুসংহত করে তুলতে হবে। কিন্তু কিছু কিছু কমরেডের মতে, আমাদের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁরা হয় বিপরীত মতে উপনীত হবেন, অথবা দুটোর মাঝে দোদুল্যমান থাকবেন। কেননা তাঁদের মতে, 'জাপান পিছু হটছে[১] এবং নানকিং আগের চেয়েও বেশি দোদুল্যমান মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে—এই দুই দেশের মধ্যে দ্বন্দ্বের তীব্রতা হ্রাস পাচ্ছে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে উঠছে।' স্বভাবতঃই, এই মূল্যায়ন অনুসারে, নতুন কোন স্তরের বা কর্তব্যের সৃষ্টি হয়নি, এবং পরিস্থিতিটি আবার আগের স্তরেই ফিরে গেছে, বা এমনকি তার চেয়েও খারাপ হয়ে পড়েছে। আমার মনে হয়, এই অভিমত ঠিক নয়।

১৯৩৭ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে এটি ছিল কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণ

শান্তি এসেছে বলা মানে এই নয় যে, শান্তির সংহতি সাধন হয়েছে। বরং উল্টোটাই, অর্থাৎ শান্তির সংহতি সাধন হয়নি। শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তির সংহতি সাধন—দুটো কিন্তু ভিন্ন জিনিস। কিছু সময়ের জন্যে ইতিহাসের দিক-পরিবর্তন ঘটতে পারে, এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বাসঘাতক দল ও জাপ-সমর্থক চক্রের অবস্থানের জন্য শান্তির বিঘ্নও ঘটতে পারে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে, সিয়ান ঘটনার পর শান্তি এসেছে এবং তা কয়েকটি ঘটনার ফলশ্রুতি (জাপানের মূল হানাদারী নীতি, চীনের আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং তাছাড়া ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের অনুকূল মনোভাব, চীনের জনগণের চাপ, সিয়ান ঘটনার সময়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শান্তি নীতি ও দুটি শাসন-ব্যবস্থার মধ্যের বিরোধ মিটিয়ে নেবার নীতি, বুর্জোয়াদের মধ্যেকার বিভেদ, কুওমিনতাঙের মধ্যেকার বিভেদ প্রভৃতি); শান্তি প্রতিষ্ঠা করা বা তা বিঘ্নিত করা চিয়াং কাই-শেকের একক ক্ষমতা দ্বারা আর সম্ভব নয়। শান্তি বিঘ্নিত করতে হলে তাকে বহু শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে, তাকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও জাপ সমর্থক চক্রের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হতে হবে। নিঃসন্দেহে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও জাপ-সমর্থক চক্রের আপ্রাণ প্রচেষ্টাই হচ্ছে চীনের গৃহযুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করা। এই মূল কারণটির জন্যেই এখানে শান্তি সংহত হচ্ছে না। এই যখন অবস্থা, তখন আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে 'গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর' এবং 'শান্তির জন্য সংগ্রাম কর' এই পুরানো শ্লোগানে ফিরে না গিয়ে আমাদের এক ধাপ এগিয়ে নতুন শ্লোগান দেওয়া উচিত—'গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম কর'। কারণ দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তির সংহতি সাধন ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে আসার এটাই হল একমাত্র পথ। পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত তিনটি শ্লোগান—'শান্তিকে সংহত কর', 'গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম কর', এবং 'সশস্ত্র প্রতিরোধ চালাও'—কেন আমরা দিচ্ছি? উত্তরটি হচ্ছে এই যে, আমরা চাইছি বিপ্লবের চাকাকে ঠেলে এগিয়ে নিতে এবং পরিস্থিতিও আমাদের তাই করতে দিচ্ছে। নতুন পর্যায় ও নতুন কর্তব্যকে যাঁরা অস্বীকার করতে চাইছেন, কুওমিনতাঙের 'পরিবর্তন শুরু হওয়া'-কে যাঁরা অস্বীকার করতে চাইছেন, তাঁরা কিন্তু সেই একই যুক্তিতে বিগত দেড় বৎসর ধরে বিভিন্ন শক্তি কর্তৃক শান্তির জন্য সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত ফলকেই অস্বীকার করছেন, তাঁরা আগে যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে যাবেন, তারা এক ইঞ্চিও এগোতে পারবেন না।

এই কমরেডরা এরকম অযৌক্তিক মূল্যায়ন কেন করছেন? কারণ, বর্তমান পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণে তাঁরা মূল বিষয়টিকে বিশ্লেষণের সূত্র হিসেবে না ধরে কতকগুলি সীমাবদ্ধ ও অস্থায়ী ঘটনাকে (সাটোর কূটনীতি, সুচৌ-এর বিচার,[২] ধর্মঘট দমন, উত্তর-পূর্ব বাহিনীকে[৩] পূর্বদিকে সরিয়ে নেওয়া, জেনারেল ইয়াং হু-চেঙের বিদেশ গমন[৪] প্রভৃতি) সূত্র হিসেবে ধরেন। এর ফলেই এই হতাশার ছবি। আমরা বলছি, কুওমিনতাঙের পরিবর্তন শুরু হয়েছে এবং আমরা আরও বলছি, পুরোপুরি পরিবর্তন হয়নি। আমাদের পক্ষ থেকে এবং জনগণের পক্ষ থেকে নতুন চেষ্টা ছাড়া, আরও বিরাট ও কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়া কুওমিনতাঙের বিগত দশ বছরের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির পরিবর্তন সাধিত হবে এমন কথা কল্পনাও করা যায় না। যাঁরা প্রায়ই অত্যন্ত কঠোরভাবে কুওমিনতাঙকে নিন্দা করেন, সিয়ান ঘটনার সময়ে যাঁরা চিয়াংকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা বলেছিলেন এবং 'টুং কুয়ানের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ করে আমাদের পথ করে নেওয়ার'[৫] কথা বলেছিলেন, সেই বেশ কিছু সংখ্যক নামজাদা 'বামপন্থী' ব্যক্তিবৃন্দ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরেই সুচৌ বিচারের মতো ঘটনা ঘটায় অত্যন্ত অবাক হয়েছেন এবং তাঁরা জানতে চাইছেন 'কেন চিয়াং কাই-শেক এখনো এই ধরনের কাজকর্ম করছেন?' তাঁদের বোঝা উচিত, কমিউনিস্টরা বা চিয়াং কাই-শেক—এঁদের কেউই ভগবান নন বা তাঁরা বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তি নন, তাঁরা একটি পার্টি বা একটি শ্রেণীর সদস্য। কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবকে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু দেশের সমস্ত আবর্জনা এক রাত্রির মধ্যে পরিষ্কার করতে পারে না। চিয়াং কাই-শেক এবং কুওমিনতাঙের পরিবর্তন শুরু হয়েছে মাত্র, কিন্তু বিগত দশ বছর ধরে যেসব আবর্জনা জমা হয়েছে, সুনিশ্চিতভাবেই তা সমগ্র জনগণের পক্ষ থেকে কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়া দ্রুত অপসারিত হতে পারে না। আমরা মনে করি, প্রবণতাটি শান্তি, গণতন্ত্র ও প্রতিরোধের দিকেই আছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পুরানো আবর্জনা—গৃহযুদ্ধ, একনায়কত্ব এবং প্রতিরোধ না করা—কোনরকম কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়াই দূর করা সম্ভব হবে। কেবলমাত্র সুদীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম এবং সুকঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই আমরা পুরানো আবর্জনা ও পুরানো পঙ্কিলতা দূর করতে পারি এবং অবস্থার অবনতি, এমনকি বিপ্লবের বিপর্যয়কেও ঠেকাতে পারি।

'তারা আমাদের ধ্বংস করবার জন্য বদ্ধপরিকর।' কথাটি খুবই সত্য,

তারা সব সময়ই আমাদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে। আমি এই সুযুক্তিপূর্ণ মূল্যায়ণের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, এবং বাস্তবিকপক্ষে এই দিকটির প্রতি নজর না দেওয়ার অর্থ গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে থাকা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তারা যে আমাদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে, তার পদ্ধতিগত কোন পরিবর্তন ঘটেছে কি? আমি মনে করি, পরিবর্তন ঘটেছে। যুদ্ধ এবং নির্বিচার হত্যা থেকে সংস্কার ও প্রতারণা, কঠোর নীতি থেকে নরম নীতি এবং সামরিক নীতি থেকে রাজনৈতিক নীতিতে পরিবর্তিত হয়েছে। কেন এই পরিবর্তন হয়েছে? আমরা যেমন বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি, ঠিক একইভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখীন হয়ে বুর্জোযারা এবং কুওমিনতাঙও সাময়িকভাবে বাধ্য হয়েছে সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে। সমস্যাটির বিচার-বিশ্লেষণের সময় এটিই আমাদের প্রাথমিক সূত্র হওয়া উচিত। ঠিক একই কারণে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফরাসী সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি শত্রুতা ত্যাগ করে মিত্রতা করেছে।[৬] আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপও সামরিক ক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়েছে। আমাদের দিক থেকে ষড়যন্ত্র বা ফন্দী আঁটার প্রয়োজন নেই, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বুর্জোয়া ও কুওমিনতাঙের যে অংশ প্রতিরোধের সপক্ষে, তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমবেত প্রচেষ্টায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করা।

গণতন্ত্রের প্রশ্ন

'গণতন্ত্রের ওপর জোর দেওয়া ভুল, জাপানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া সম্পূর্ণ জোর দিতে হবে। জাপানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া গণতন্ত্রের কোন আন্দোলনই হতে পারে না। অধিকাংশ লোক কেবল জাপানকেই রুখতে চায়, গণতন্ত্র চায় না, এবং আজ যা প্রয়োজন তা হচ্ছে আর একটি ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলন।'[৭]

আমি কয়েকটি প্রশ্ন করব। এর আগের স্তরে (অর্থাৎ ১৯৩৫ এর ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে '৩৭ এর ফেব্রুয়ারী মাসে কুওমিন-তাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন পর্যন্ত) অধিকাংশ লোকই কি শুধু জাপানকে প্রতিরোধ করতেই চেয়েছিল? তারা কি অভ্যন্তরীণ শান্তি চায়নি? তখন কি অভ্যন্তরীণ শান্তির ওপর জোর দেওয়া ভুল হয়েছিল? জাপানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া কি অভ্যন্তরীণ শান্তির

আন্দোলন করা অসম্ভব হয়েছিল? (মুইচুয়ানের প্রতিরোধ সমাপ্তির পরই সিয়ান ঘটনা ঘটে এবং কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন হয়, এবং বর্তমানেও মুইচুয়ান প্রতিরোধ বা ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলনের মতো কিছুরই অস্তিত্ব নেই।) প্রত্যেকেই জানত, জাপানকে প্রতিরোধ করতে হলে আভ্যন্তরীণ শান্তির অবশ্যই প্রয়োজন, আভ্যন্তরীণ শান্তি ছাড়া জাপানকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার এক শর্ত হচ্ছে আভ্যন্তরীণ শান্তি। আগের স্তরের সমস্ত জাপ-বিরোধী কার্যকলাপে—সে প্রত্যক্ষই হোক আর পরোক্ষই হোক—(৯ই ডিসেম্বর আন্দোলন থেকে শুরু করে কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন পর্যন্ত) আভ্যন্তরীণ শান্তির সংগ্রামকে কেন্দ্রীয় কর্তব্য বলে ধরা হয়েছিল এবং তাই ছিল কেন্দ্রবিন্দু, জাপ-বিরোধী আন্দোলনের সবচাইতে দরকারী বিষয়।

একইভাবে আজ, নতুন স্তরে, জাপানকে প্রতিরোধের জন্য গণতন্ত্র হচ্ছে সবচাইতে প্রয়োজনীয় জিনিস, এবং গণতন্ত্রের জন্য কাজ করার অর্থই হচ্ছে জাপানকে প্রতিরোধের জন্য কাজ করা। প্রতিরোধ আর গণতন্ত্র পরস্পর নির্ভরশীল, যেমন পরস্পর নির্ভরশীল প্রতিরোধ আর আভ্যন্তরীণ শান্তি এবং গণতন্ত্র ও আভ্যন্তরীণ শান্তি। গণতন্ত্রই হচ্ছে প্রতিরোধের গ্যারান্টি, আবার প্রতিরোধই পারে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনকে বিকশিত করবার প্রয়োজনীয় অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে।

আমরা আশা করছি, এই নতুন স্তরে জাপানের বিরুদ্ধে বহু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সংগ্রামের সম্ভাবনা দেখা দেবে—বাস্তবিকপক্ষে তা হবেও—এবং এগুলিই প্রতিরোধ-যুদ্ধকে উদ্দীপনা দেবে এবং গণতন্ত্রের আন্দোলনকে বিরাটভাবে সাহায্য করবে। কিন্তু ইতিহাস যে বিপ্লবী দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পণ করেছে, তার মর্মবস্তু ও সারকথা হচ্ছে গণতন্ত্র অর্জন করা। তাহলে গণতন্ত্রের উপর জোর দিতে থাকা কি ভুল? আমি তা মনে করি না।

'জাপান পিছু হটে যাচ্ছে। বৃটেন ও জাপান কার্যত: একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঝুঁকে পড়েছে এবং নানকিং আগের চাইতে অনেক বেশি দোদুল্যমান।' ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এই অহেতুক উৎকণ্ঠার কারণ। যদি জাপানে একটি বিপ্লব হতো এবং সত্যিসত্যিই চীন থেকে সরে যেত, তাহলে সে চীন-বিপ্লবকে সাহায্যই করত এবং আমরা যা

চাই ঠিক তাই হতো, আগ্রাসনের বিশ্বফ্রন্টের ধ্বংসের সূচনা হতো। তাহলে আর কোন উৎকণ্ঠার অবকাশ থাকত 'ক ? কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, এরকম কিছুই ঘটতে যাচ্ছে না। সাটোর কূটনৈতিক চালগুলি, হচ্ছে একটা বড় রকমের যুদ্ধ-প্রস্তুতির প্রস্তাবনা মাত্র, এবং আমরা একটি বড় রকমের যুদ্ধেরই সম্মুখীন হতে যাচ্ছি। বৃটেনের দোদুল্যমানতার নীতি তার কোন কাজেই আসছে না, বরং জাপানের সঙ্গে তার স্বার্থের সংঘর্ষই সুনিশ্চিত করে তুলেছে। যদি নানকিং বেশিদিন টালবাহানা করে, তবে সে সমগ্র জাতির শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, এবং তার নিজস্ব স্বার্থই তাকে আর টালবাহানা করতে দেবে না। একটা সাময়িক পিছু-হটা ইতিহাসের সাধারণ নিয়মকে পাল্টে দিতে পারে না। তাই নতুন স্তরের অস্তিত্বকে বা কর্তব্য হিসেবে গণতন্ত্র অর্জনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করাকে কারও অস্বীকার করা উচিত নয়। উপরন্তু সব সময়েই গণতন্ত্রের শ্লোগানটি যথোপযোগী, কারণ এটি প্রতিটি লোকের কাছেই সুস্পষ্ট যে, চীনা জনগণের অতি সামান্যই গণতন্ত্র আছে, যাকে বিশেষ নেই বললেই হয়। প্রকৃত ঘটনাবলী এও দেখিয়েছে যে, নতুন স্তরের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা এবং গণতন্ত্রের লক্ষ্য কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করার অর্থই হচ্ছে প্রতিরোধের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। ঘটনা এগিয়ে গিয়েছে, আমরা যেন ঘড়ির কাটা ঘুরিয়ে না দিই!

'আমরা জাতীয় পরিষদের ওপর কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছি?' কারণ, এ এমন একটা জিনিস যা জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করতে পারে, কারণ এটাই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কত্ব থেকে গণতন্ত্রে পৌঁছাবার সেতু, কারণ এ হচ্ছে জাতীয় প্রতিরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং একটি আইনসম্মত সংস্থা। অনেক কমরেড যে প্রস্তাব করেছেন, যেমন পূর্ব হোপেই এবং উত্তর চাহার পুনরুদ্ধার করা, চোরা-চালানের[৮] বিরুদ্ধে লড়াই করা, 'অর্থনৈতিক সহযোগিতার'[৯] বিরোধিতা ইত্যাদি, এগুলি অত্যন্ত সঠিক। গণতন্ত্র এবং জাতীয় পরিষদের জন্য লড়াই করার সঙ্গে এগুলির কোনরকম বিরোধিতা তো নেইই, বরং এরা পরস্পরের সম্পূরক। এখনো জাতীয় পরিষদ এবং জনগণের স্বাধীনতাই হচ্ছে আসল কথা।

জাপানের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন লড়াই এবং জীবিকার জন্য জনগণের সংগ্রামকে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে—এ কথা সঠিক এবং কেউই তার বিরোধিতা করতে পারে না। তবুও বর্তমান পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ও মূল ব্যাপার হচ্ছে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা।

বিপ্লবের ভবিষ্যৎ

কিছু কিছু কমরেড এই প্রশ্নটি তুলেছেন এবং আমি তার সংক্ষিপ্ত উত্তরই মাত্র এখানে দিতে পারি।

একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে, প্রবন্ধের প্রথমার্ধ লেখা শেষ হবার পরেই কেবল দ্বিতীয়ার্ধ লেখা সম্ভব। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য দৃঢ়চিত্ত নেতৃত্বই হচ্ছে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের পূর্বশর্ত। আমরা সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই করছি, এবং যাঁরা বিপ্লবী তিন নীতির মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন, তাঁদের সঙ্গে এই বিষয়েই আমাদের পার্থক্য রয়েছে। এই ভবিষ্যৎ মহান লক্ষ্যের দিকেই আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টা পরিচালিত। এই লক্ষ্য যদি আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে অপসারিত হয়, তাহলে আমরা আর কমিউনিস্ট থাকি না। আবার, আমরা যদি আজকের কাজে গাফিলতি করি তাহলেও আমরা আর কমিউনিস্ট থাকি না।

আমরা বিপ্লবের উত্তরণের তত্ত্বের[১০] প্রবক্তা এবং আমরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে চাই। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শ্লোগানের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিকশিত হবে। বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রাধান্য থেকে সর্বহারাশ্রেণীর প্রাধান্যে পরিবর্তন একটা দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই হতে পারে। নেতৃত্বের জন্যে এই সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করে সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক চেতনার স্তরকে এবং সংগঠনকে উন্নীত করবার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির কাজের ওপর।

সর্বহারাশ্রেণীর সবচাইতে দৃঢ়চিত্ত মিত্র হচ্ছে কৃষকেরা এবং তার পরেই শহরের পেটি-বুর্জোয়ারা। একমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণীই নেতৃত্বের জন্য আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর দোদুল্যমানতা এবং তাদের পরিপূর্ণ বৈপ্লবিক নিষ্ঠার অভাবকে জয় করবার জন্য আমাদের আস্থা রাখতে হবে জনগণের শক্তির ওপর এবং আমাদের নীতির অভ্রান্ততার ওপর, অন্যথায় বুর্জোয়াশ্রেণীই নেতৃত্ব দখল করে নেবে।

একটি রক্তপাতহীন উত্তরণই আমাদের বাঞ্ছনীয় এবং তার জন্যেই আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব, কিন্তু কি অবস্থা দাঁড়াবে তা নির্ভর করবে জনগণের শক্তির ওপর।

আমরা বিপ্লবের উত্তরণের তত্ত্বের প্রবক্তা, ট্রট্স্কিপন্থীদের 'স্থায়ী বিপ্লবের'[১১] তত্ত্বের প্রবক্তা নই। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমস্ত প্রয়োজনীয় স্তরগুলি অতিক্রম করবার মধ্য দিয়েই আমরা সমাজতন্ত্রে পৌছাতে চাই। আমরা লেজুড়বৃত্তির বিরোধী, এবং একই সঙ্গে হঠকারিতা এবং অধৈর্যপনারও বিরোধী।

বুর্জোয়াদের বিপ্লবে অংশগ্রহণ স্বল্পস্থায়ী, এই অজুহাতে তাদের বিপ্লবে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করা, এবং বুর্জোয়াদের যে অংশ জাপ-বিরোধী (একটা আধা-ঔপনিবেশিক দেশে) তাদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনকে আত্মসমর্পণ বলে অভিহিত করাটা হচ্ছে ট্রট্স্কিপন্থী ব্যাখ্যা, যার সঙ্গে আমরা একমত নই। বস্তুতপক্ষে আজকের দিনে এরূপ একটি মৈত্রী সমাজতন্ত্রের পথে একটি আবশ্যকীয় সেতু।

কর্মীদের প্রশ্ন

একটি মহান বিপ্লবকে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন একটি মহান পার্টির এবং অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর কর্মীর। যদি বিপ্লবের নেতৃত্বে থাকে একটি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ গ্রুপ, এবং যদি পার্টি-নেতারা এবং কর্মীরা হন সংকীর্ণমনা, অদূরদর্শী এবং অযোগ্য তাহলে ৪৫ কোটি লোকের চীনের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই বিরাট বিপ্লবকে সার্থক করে তোলা অসম্ভব। দীর্ঘদিন ধরেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টি একটি বড় পার্টি, এবং প্রতিক্রিয়ার যুগে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও এখনও এটি একটি বড় পার্টি। এ পার্টির অনেক ভাল ভাল নেতা এবং কর্মী আছে, কিন্তু তবুও তা যথেষ্ট নয়। আমাদের পার্টি-সংগঠনকে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত করতেই হবে এবং অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলকভাবে হাজারে হাজারে কর্মী এবং প্রথম শ্রেণীর নেতাকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাদের অবশ্যই মার্কসবাদ-লেনিনবাদে সুশিক্ষিত, রাজনৈতিকভাবে ধুরদৃষ্টিসম্পন্ন, কাজে উপযুক্ত, আত্মত্যাগে পরিপূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ, নিজে নিজেই সমস্যার মোকাবেলায় সমর্থ, বিপদে ধীর ও স্থির, এবং দেশ, শ্রেণী ও পার্টির কাজে অনুরক্ত ও আসক্ত হতে হবে। সাধারণ সদস্য ও জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার কাজে পার্টি এই ধরনের কর্মী এবং নেতাদের ওপরেই ভরসা করে এবং জনগণের ওপর তাদের সুদৃঢ় নেতৃত্বের ওপর ভরসা করেই পার্টি শত্রুকে পরাজিত করতে পারে। এসব কর্মী এবং নেতাদের অবশ্যই স্বার্থপরতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বীরপনা, হামবড়াভাব,

কুঁড়েমি, নিষ্ক্রিয়তা, এবং সংকীর্ণমনা ঔদ্ধত্য থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং তাদের অবশ্যই নিঃস্বার্থভাবে জাতিয় ও শ্রেণী-নায়ক হতে হবে। আমাদের পার্টির সদস্য, কর্মী এবং নেতাদের কাছে এরকম গুণ ও কাজের পদ্ধতিই পার্টি দাবি করে। যে শত শত প্রথম শ্রেণীর নেতা, লক্ষ লক্ষ সদস্য এবং হাজারে হাজারের কর্মী আমাদের আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁরা আমাদের জন্য এই চেতনাগত উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ সমস্ত গুণ আমাদের অর্জন করা প্রয়োজন। নতুনভাবে যাতে আমরা আমাদের গড়ে তুলতে পারি তার জন্য আমাদের আরও ভালভাবে কাজ করা দরকার এবং আমাদের নিজেদের বৈপ্লবিক মানকে আরও উন্নীত করা দরকার। এটাও কিন্তু যথেষ্ট নয়। পার্টি ও দেশের মধ্য থেকে অনেক নতুন নতুন কর্মী ও নেতা আবিষ্কার করা আমাদের একটা অবশ্যকর্তব্য হিসেবে মনে রাখতে হবে। আমাদের বিপ্লব নির্ভর করে কর্মীদের ওপর। যেমন স্তালিন বলেছেন, 'কর্মীরাই সবকিছু নির্ধারণ করে'।[১২]

পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রের প্রশ্ন

এই লক্ষ্যে পৌছাতে হলে আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র একান্ত প্রয়োজনীয়। পার্টিকে যদি শক্তিশালী করে তুলতে হয়, তবে সমস্ত সদস্যদের মধ্যে উদ্যোগ সঞ্চারের জন্য আমাদের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। গৃহযুদ্ধ ও প্রতিক্রিয়ার যুগে কেন্দ্রিকতাই ছিল বেশি। নতুন যুগে কেন্দ্রিকতাকে ঘনিষ্ঠ-ভাবে গণতন্ত্রের সঙ্গে অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে। আসুন, আমরা গণতন্ত্রের প্রয়োগ করি এবং সমগ্র পার্টির মধ্যে উদ্যোগের সুযোগ করে দিই, এবং এইভাবে বিপুল সংখ্যায় নতুন কর্মীদের শিক্ষিত করে তুলি, সংকীর্ণতা-বাদের অবশেষকে অপসারণ করি এবং সমগ্র পার্টিকে ইস্পাত-দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করি।

সম্মেলনে এবং সমগ্র পার্টিতে ঐক্য

রাজনৈতিক সমস্যাবলীর ওপর এই সম্মেলনে যেসব ভিন্ন মত রাখা হয়েছিল, বিশ্লেষণের পর তাতে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন এবং কয়েকজন কমরেডের নেতৃত্বে পশ্চাদপসরণের যে লাইন গৃহীত হয়েছিল, সেই আগেকার মতপার্থক্যেরও সমাধান হয়েছে[১৩]। এ থেকে প্রমাণিত

হচ্ছে যে, আমাদের পার্টি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ। এই ঐক্য বর্তমান জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি সৃষ্টি করেছে, কারণ কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যের মাধ্যমেই সব কয়টি শ্রেণী ও সমগ্র জাতির ঐক্য সাধিত হতে পারে, শত্রুকে পরাজিত করা যেতে পারে, এবং জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা যেতে পারে।

জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের জন্য কোটি কোটি জনগণের সমাবেশ ঘটাও

জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের পক্ষে কোটি কোটি জনগণকে টেনে আনাটাই হচ্ছে আমাদের নির্ভুল রাজনৈতিক নীতি ও ঘনিষ্ঠ ঐক্যের লক্ষ্য। সর্বহারা, কৃষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়া ·ব্যাপক জনতার মধ্যে আমাদের প্রচার, আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। বুর্জোয়াদের যে অংশ জাপ-বিরোধী, তাদের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্যও আমাদের তরফ থেকে আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। পার্টির নীতিকে জনগণের নীতিতে পরিণত করতে হলে প্রচেষ্টা প্রয়োজন,—দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টা, নিরবচ্ছিন্ন এবং সুতীব্র প্রচেষ্টা, ধৈর্যশীল ও যত্নশীল প্রচেষ্টা। এরকম প্রচেষ্টা ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারব না। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট ও তার সংহতি সাধন, সেজন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করা ও চীনে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং জনগণকে জয় করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা—এ দুটি কাজ একেবারে অবিচ্ছেদ্য। এরকম প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা যদি কোটি কোটি জনগণকে আমাদের নেতৃত্বাধীনে আনতে সমর্থ হই, তবে আমাদের বৈপ্লবিক দায়িত্ব অতি দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে আমরা সুনিশ্চিতভাবেই জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করব এবং পরিপূর্ণ জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি অর্জন করব।

টীকা

১। সিয়ান ঘটনার পর, যে আভ্যন্তরীণ শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তা বানচাল করে দেবার জন্য এবং যে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠছিল তা ভেঙে দেবার জন্য, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষের

সামনে সামরিক আপোষের টোপ ফেলে। তাদের তাঁবেদার অন্তর্মঙ্গোলিয়ার ভূয়া স্বায়ত্তশাসিত সরকারকে দিয়ে নানকিঙের কুওমিনতাঙ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে দুটি বিবৃতি প্রচার করানো হয়—একটি ১৯৩৬এর ডিসেম্বরে, আরেকটি ১৯৩৭এর মার্চে। আর জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাটো নিজে প্রকাশ্যেই চিয়াং কাই-শেকের প্রশংসা করে অসম্ভব ধূর্ততার সঙ্গে ঘোষণা করে যে, জাপান চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করবে, এবং চীনের রাজনৈতিক ঐক্যসাধন ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করবে। তাছাড়া, জাপানী পুঁজিপতি কেন্‌জি কোডামার নেতৃত্বে জাপান একটি তথাকথিত অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণ দলকে চীনে পাঠায়, চীনের 'আধুনিক রাষ্ট্র-সংগঠনকে সম্পূর্ণ' করার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য। এগুলি ছিল আগ্রাসী পরিকল্পনা, এবং এগুলো 'সাটোর কূটনীতি' নামে পরিচিত হয়েছিল। জাপ-সাম্রাজ্যবাদের ছলনায় প্রতারিত লোকেরাই কেবল এগুলোকে 'জাপানের পশ্চাদপসরণ' বলে আখ্যা দিয়েছিল।

২। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে জাপানকে প্রতিরোধ কর এবং দেশকে বাঁচাও আন্দোলনের নেতা শেন চুন-জু এবং আরও ছয় জন নেতার বিচার হয় সুচাও-এর কুওমিনতাঙ হাইকোর্টে। এঁরা ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে সাংহাইতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল 'প্রজাতন্ত্রকে বিপদগ্রস্ত করা'। প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের দেশপ্রেমিক আন্দোলনকে দমন করবার জন্য এই ধরনের অভিযোগ তুরুপের তাস হিসেবে সাধারণভাবে প্রয়োগ করত।

৩। সিয়ান ঘটনার আগে উত্তর-পূর্ব সেনাবাহিনীকে শেনসী এবং কানসু প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমান্ত অঞ্চলে রাখা হয়েছিল এবং উত্তর শেনসীর লালফৌজের সঙ্গে তাদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। ফলে লালফৌজ দ্বারা বিপুলভাবে তারা প্রভাবান্বিত হয়। পরবর্তীকালে এই বাহিনী সিয়ানে এক অভ্যুত্থান ঘটায়। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে এই উত্তর-পূর্ব সেনাবাহীকে হোনান এবং আনহুই প্রদেশে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। লালফৌজের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে এবং এই বাহিনীর মধ্যে অনৈক্যর বীজ বপন করবার উদ্দেশ্যেই কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

৪। জেনারেল ইয়ং হু-চো ছিলেন চীনের উত্তর-পশ্চিমের একজন

সামরিক নেতা। তিনি চ্যাং শুয়ে-লিয়াঙের সঙ্গে একযোগে সিয়ান ঘটনা ঘটান। কাজেই এই ঘটনার প্রধান পরিচালক দু'জনের দুই পদবী দিয়ে 'চ্যাঙ-ইয়াং' কথাটি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। চিয়াং কাই-শেককে মুক্ত করে দেওয়ার পর চ্যাং তার সঙ্গে নানকিঙে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে তক্ষুণি সেখানে আটক রাখা হয়। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে নানকিঙ-প্রতিক্রিয়াশীলেরা ইয়াংকেও তাঁর পদ থেকে অপসারিত করে এবং তাঁকে ছুটি নিয়ে বিদেশে চলে যেতে বাধ্য করে। প্রতিরোধ যুদ্ধ আরম্ভ হলে ইয়াং চীনে ফিরে আসেন এবং তাঁকে কাজে লাগাবার আবেদন জানান। কিন্তু চিয়াং কাই-শেক তাঁকে সারা জীবনের জন্য অন্তরীণ করে রাখে। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণমুক্তি ফৌজ যখন চুংকিং-এর পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন কুওমিনতাঙ দল তাঁকে বন্দীশিবিরের মধ্যে হত্যা করায়।

৫। টুং কুয়ান হচ্ছে শেনসী, হোনান এবং শানসীর সীমান্তের সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ-পথ। সিয়ান ঘটনার সময় কুওমিনতাঙ সেনা-বাহিনী প্রধানতঃ এই প্রবেশদ্বারের পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। পার্টির মধ্যে চেং কুও-তাও'র মতো জনাকয়েক প্রখ্যাত 'বামপন্থী' ব্যক্তি লালফৌজকে 'টুং কুয়ানের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ করে বেরিয়ে যাওয়ার' জন্য প্রস্তাব করে। তার অর্থ হল: কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লালফৌজ আক্রমণ সংগঠিত করুক। সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ সমাধানের যে নীতি কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ করেছিল, এ প্রস্তাব ছিল তার বিরোধী।

৬। অক্টোবর বিপ্লবের পর দীর্ঘকাল ধরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক নীতি অনুসরণ করে এসেছে। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চোদ্দটি শক্তি যে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়েছিল, তাতে ফরাসী সরকার সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং এই আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পরেও তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে একঘরে করে রাখার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করে চলে। ১৯৩৫ সালের মে মাসে ফরাসী জনগণের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তি-নীতির প্রভাবের ফলে এবং জার্মান ফ্যাসিষ্টদের দ্বারা ভয়াবহ বিপদের আশঙ্কার ফলে ফ্রান্স সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের এক চুক্তি করে—যদিও তার প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এ চুক্তি পালন করেনি।

৭। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ১৯৩৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর পিকিঙে

দেশপ্রেমিক ছাত্রদের বিক্ষোভ। এই আন্দোলন গৃহযুদ্ধের অবসান এবং জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের দাবি তোলে এবং দেশব্যাপী সমর্থন লাভ করে।

৮। চীনে জাপানী পণ্যের চোরা-চালান।

৯। চীন-জাপান অর্থনৈতিক সহযোগিতার কথা এখানে বলা হয়েছে।

১০। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার', চতুর্থ খণ্ড; ভি. আই. লেনিনের 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সামাজিক গণতন্ত্রের দুই কৌশল', দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ খণ্ড; 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ', তৃতীয় অধ্যায়, তৃতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১১। জে. ভি. স্তালিন, 'লেনিনবাদের ভিত্তি', ৩য় খণ্ড; 'অক্টোবর বিপ্লব এবং রুশ কমিউনিস্টদের রণকৌশল', দ্বিতীয় খণ্ড; 'লেনিনবাদের প্রশ্ন সম্পর্কে', তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১২। দ্রষ্টব্য: জে. ভি. স্তালিন—'লালফৌজ এ্যাকাডেমির স্নাতকদের প্রতি ক্রেমলিন প্রাসাদে প্রদত্ত বক্তৃতা', মে, ১৯৩৫। এই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন,'...দুনিয়ার সবচেয়ে দামী সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে দামী ও সবচেয়ে নির্ধারক হচ্ছে জনগণ ও কর্মীরা। এটা আমাদের অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে "কর্মীরাই সবকিছু নির্ধারণ করে"।'

১৩। মতানৈক্যটা ছিল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে চ্যাং কুও-তাও'র পশ্চাদপসরণের লাইনের মধ্যে। এই খণ্ডের 'জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশল সম্পর্কে, প্রবন্ধের ২২ নং টীকা দ্রষ্টব্য। 'আগেকার মতপার্থক্যেরও সমাধান হয়েছে'—একথা বলে কমরেড মাও সে-তুঙ লালফৌজের চতুর্থ বাহিনী কর্তৃক কেন্দ্রীয় লালফৌজে যোগ দেবার ঘটনাকে বোঝাচ্ছেন। পরবর্তীকালে চ্যাং কুও-তাও পার্টির প্রতি খোলাখুলি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে এবং একজন প্রতিবিপ্লবীতে অধঃপতিত হয়। এভাবে সে ব্যক্তিগতভাবে একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়, এবং তখন থেকে আর পার্টিলাইনের সঙ্গে তার মতপার্থক্যের কথা ওঠেনি।

প্রয়োগ সম্পর্কে

জ্ঞান ও প্রয়োগের মধ্যে, জানা ও করার মধ্যে সম্পর্ক প্রসঙ্গে

(জুলাই, ১৯৩৭)

মার্কসের আগে বস্তুবাদ মানুষের সামাজিক প্রকৃতি এবং তার ঐতিহাসিক বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞানের সমস্যাকে বিচার করত। এই কারণে ঐ বস্তুবাদ সামাজিক প্রয়োগের ওপর জ্ঞানের নির্ভরশীলতা, অর্থাৎ উৎপাদন ও শ্রেণী-সংগ্রামের ওপর জ্ঞানের নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করতে অক্ষম ছিল।

সর্বোপরি, মার্কসবাদীরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের কার্যকলাপকেই সবচেয়ে মূল বাস্তব কার্যকলাপ বলে এবং তার অন্যান্য সকল কার্যকলাপের নির্ধারক বলে মনে করে। মানুষের জ্ঞান প্রধানতঃ তার বৈষয়িক উৎপাদনের কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে, এবং এই কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই সে ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির ঘটনা, বৈশিষ্ট্য ও নিয়মগুলিকে এবং তার নিজের ও প্রাকৃতির

আমাদের পার্টির মধ্যে কিছু কিছু মতান্ধ কমরেড ছিলেন, যাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ চীনা বিপ্লবের অভিজ্ঞতা বর্জন করেছিলেন। এঁরা এই সত্যকে অস্বীকার করতেন যে 'মার্কসবাদ একটা অন্ধ মতবাদ নয় বরং কাজের পথনির্দেশক'। তাঁরা মার্কসীয় রচনাবলীর এখান-সেখান থেকে খুশীমতো প্রেক্ষাপটহীন টুকরো উদ্ধৃতি সাজিয়ে মানুষকে ধাপ্পা দিতেন। আবার কিছু অভিজ্ঞতাবাদী কমরেডও ছিলেন যাঁরা দীর্ঘকাল যাবৎ নিজেদের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ করে রাখতেন এবং বিপ্লবী প্রয়োগের জন্য তত্ত্বের গুরুত্ব বুঝতেন না বিপ্লবকে সমগ্রভাবে দেখতেন না। এঁরা অধ্যবসায়ের সঙ্গে হলেও অন্ধের মতো কাজ করতেন। এই দুই ধরনের কমরেডদের ভুল চিন্তা, বিশেষ করে মতান্ধের ভুল চিন্তা, ১৯৩১-৩৪ সালের চীনা বিপ্লবের বিপুল ক্ষতিসাধন করে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই মতান্ধদের মার্কসবাদের নামাবলী গায়ে দিয়ে বহু সংখ্যক কমরেডকে বিভ্রান্ত করেন। কমরেড মাও-সে-তুঙ 'প্রয়োগ সম্পর্কে' প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে পার্টিতে মতান্ধতা এবং অভিজ্ঞতাবাদের অধ্যাত্মবাদ ভুলগুলি এবং বিশেষ করে মতান্ধতার ভুলগুলি উদ্ঘাটিত করার জন্য। প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয় 'প্রয়োগ সম্পর্কে', কারণ মতান্ধরা প্রয়োগকে ছোট করে দেখে। আর ঐ মতান্ধতার অধ্যাত্মবাদ খুলে ধরার ওপর এই প্রবন্ধে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধটির বক্তব্যগুলো কমরেড মাও সে তুঙ ইয়েনানে জাপ-বিরোধী সামরিক ও রাজনৈতিক কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতায় উপস্থিত করেছিলেন।

মধ্যেকার সম্পর্ককে বুঝতে সক্ষম হয় এবং এই উৎপাদনী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সে ক্রমশঃ মানুষের সঙ্গে মানুষের নির্দিষ্ট সম্পর্কগুলিকেও বিভিন্ন পরিমাণে বুঝতে সক্ষম হয়। উৎপাদনের কার্যকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই জ্ঞান কিছুতেই অর্জিত হতে পারে না। শ্রেণীহীন সমাজে প্রত্যেক মানুষই সমাজের একজন সদস্য হিসেবে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সাধারণ প্রচেষ্টায় যোগ দেয়, নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কে প্রবেশ করে এবং মানবজাতির বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য উৎপাদন-কর্মে লিপ্ত হয়। আবার সকল রকমের শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর সদস্যরাও বিভিন্নভাবে নির্দিষ্ট উৎপাদক সম্পর্কগুলিতে প্রবেশ করে এবং মানবজাতির বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য উৎপাদন-কর্মে লিপ্ত হয়। এ-ই হচ্ছে মানুষের জ্ঞানবিকাশের মূল উৎস।

মানুষের সামাজিক অনুশীলন উৎপাদন-কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা গ্রহণ করে আরও আনেক রূপ—শ্রেণী-সংগ্রাম, রাজনৈতিক জীবন, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পকলা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ সমাজের বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে। তাই মানুষ, কেবল তার বৈষয়িক জীবনের মধ্যে দিয়েই নয়, তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের (উভয়ই ঘনিষ্ঠভাবে বৈষয়িক জীবনের সঙ্গে জড়িত) মধ্য দিয়েও বিভিন্ন পরিমাণে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারে। এইসব অন্যান্য ধরনের সামাজিক প্রয়োগের মধ্যে বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী-সংগ্রামই মানুষের জ্ঞানের বিকাশের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর সদস্য হিসেবে বাস করে, তাই ব্যতিক্রমহীনভাবে সব রকমের চিন্তাধারার উপরেই শ্রেণীর ছাপ থাকে।

মার্কসবাদীরা মনে করে যে, মানবসমাজে উৎপাদনের কার্যকলাপ নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে ধাপে ধাপে বিকাশলাভ করে। কাজেই প্রকৃতি সম্পর্কেই হোক অথবা সমাজ সম্পর্কেই হোক, মানুষের জ্ঞানও ধাপে ধাপে নিম্নতর থেকে। উচ্চতর স্তরে বিকাশলাভ করে, অর্থাৎ অগভীর জ্ঞান থেকে গভীর জ্ঞানে, একমুখী জ্ঞান থেকে বহুমুখী জ্ঞানে বিকাশলাভ করে। ইতিহাসের একটা অত্যন্ত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মানুষকে সমাজের ইতিহাস সম্পর্কে একতরফা ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। কারণ, একদিকে যেমন শোষকশ্রেণীগুলির পক্ষপাতপুষ্ট মতামত সব সময়েই সামাজিক ইতিহাসকে বিকৃত করত, তেমনি অন্যদিকে ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদন-ব্যবস্থা মানুষের দৃষ্টিকে সীমিত করে রাখত।

উৎপাদনের বিরাট শক্তিগুলির (বৃহৎ শিল্পের) সঙ্গে আধুনিক সর্বহারাশ্রেণী আবির্ভূত হওয়ার পরেই কেবল মানুষ সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে সার্বিক ও ঐতিহাসিক ধারণা লাভ করতে এবং সমাজ স—র্কে নিজের জ্ঞানকে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয় একটি বিজ্ঞানে—মার্কসবাদের বিজ্ঞানে।

মার্কসবাদীরা মনে করে যে, মানুষের সামাজিক প্রয়োগই বহির্জগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের সঠিকতা যাচাই করার একমাত্র মাপকাঠি। আসলে যা ঘটে তা এই যে, মানুষ যখন সামাজিক প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় (বৈষয়িক উৎপাদন, শ্রেণী-সংগ্রাম অথবা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রক্রিয়ার) মধ্যে তার প্রত্যাশিত ফললাভ করে, তখনই কেবল মানুষের জ্ঞানের সঠিকতা প্রমাণিত হয়। যদি কোন মানুষ কাজে সাফল্যলাভ করতে চায় অর্থাৎ প্রত্যাশিত ফল পেতে চায়, তাহলে তার নিজের চিন্তাকে অবশ্যই বিষয়গত বহির্জগতের নিয়মের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তুলতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে সে প্রয়োগে ব্যর্থ হবে। ব্যর্থ হয়েই মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজের চিন্তাকে সংশোধন করে বহির্জগতের নিয়মের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তোলে। তখন মানুষ তার বিফলতাকে সফলতায় পরিবর্তিত করতে পারে। 'বিফলতাই সফলতার জননী' এবং 'ঠেকে শেখা' বলতে এটাই বুঝায়। দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্ব প্রয়োগকে প্রথমে স্থান দেয়। এই তত্ত্ব মনে করে যে, মানুষের জ্ঞানকে তার প্রয়োগ থেকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যেসব ভ্রান্ত মতবাদ প্রয়োগের গুরুত্বকে অস্বীকার করে অথবা জ্ঞানকে প্রয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্ব সেইসব মতবাদের বিরোধী। তাই লেনিন বলেছিলেন, 'প্রয়োগ (তত্ত্বগত) জ্ঞানের চেয়ে অনেক বড়, কারণ তার যে শুধু সর্বজনীনতার গুণই আছে তাই নয়, তাতে আছে আশু বাস্তবতার গুণও।'[১] দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মার্কসবাদী দর্শনের দুটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। একটা হচ্ছে তার শ্রেণী-প্রকৃতি। তা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে যে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সর্বহারাশ্রেণীর সেবায় নিয়োজিত। অপরটা হচ্ছে এর বাস্তব প্রকৃতি। এতে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয় যে, তত্ত্ব প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল, তত্ত্বের ভিত্তিই হচ্ছে প্রয়োগ, আবার তত্ত্ব প্রয়োগের সেবা করে। জ্ঞান বা তত্ত্বের সত্যতা বিষয়ীগত অনুভূতির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় সামাজিক প্রয়োগে তার বাস্তব ফলাফলের দ্বারা। সামাজিক প্রয়োগই সত্যের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে। দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্বে প্রয়োগের দৃষ্টি-

ভঙ্গীই হল প্রথম এবং মূল দৃষ্টিভঙ্গী।[২]

কিন্তু মানুষের জ্ঞান কিভাবে প্রয়োগ থেকে উদ্ভূত হয় এবং আবার প্রয়োগেরই সেবা করে ? আমরা যদি জ্ঞানের বিকাশের প্রক্রিয়ার দিকে তাকাই, তাহলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় মানুষ প্রথমে শুধুমাত্র বিভিন্ন বস্তুর বাহ্য রূপ, তাদের পৃথক পৃথক দিক এবং তাদের পরস্পর-বহিঃসম্পর্কগুলোকেই দেখতে পায়। যেমন, ইয়েনান পরিদর্শনে যাঁরা বাইরে থেকে আসেন তাঁদের কথাই ধরুন। প্রথম দু-এক দিন তাঁরা দেখেন ইয়েনানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর। অনেক লোকের সঙ্গে তাঁদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়; তাঁরা ভোজসভায়, সান্ধ্য অনুষ্ঠানে, জনসভায় যোগ দেন, নানা ধরনের কথাবার্তা শোনেন এবং বিভিন্ন রকমের দলিলপত্র পাঠ করেন। এ সব কিছুই হল বস্তুগুলোর বাহ্য রূপ, তাদের পৃথক পৃথক দিক, তাদের বহিঃসম্পর্ক। এটাকে বলা হয় জ্ঞানের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যায়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূতি ও মনের উপর ছাপ পড়ার পর্যায়। অর্থাৎ ইয়েনানে এই বিশেষ বস্তুগুলো পরিদর্শক-দলের সদস্যদের ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর ক্রিয়া করে, তাঁদের অনুভূতিবোধকে জাগিয়ে তোলে, তাঁদের মস্তিষ্কে নানা ছাপ ফেলে, এবং এইসব ছাপের মধ্যেকার বহিঃসম্পর্কের একটা ভাসাভাসা ছবি এঁকে দেয়। এইটিই হল জ্ঞানের প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে মানুষ তখনও গভীর ধারণা গঠন করতে পারে না, পারে না কোন যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত টানতে।

সামাজিক প্রয়োগ চলার সঙ্গে সঙ্গে, যে বিষয়গুলো মানুষের প্রয়োগের মধ্যে মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ও ছাপগুলোর জন্ম দেয়, সেই বিষয়গুলোর বহুবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তখন মানুষের মস্তিষ্কে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা আকস্মিক পরিবর্তন (অর্থাৎ দ্রুত-অতিক্রমণ) ঘটে এবং ধারণা গঠিত হয়। এই ধারণাগুলো তখন আর বস্তুগুলোর বাহ্য রূপ, তাদের পৃথক পৃথক দিক এবং তাদের বহিঃসম্পর্ক নয়—সেগুলো তখন বস্তুর সারাংশকে, সমগ্রতাকে এবং অন্তঃসম্পর্ককে আয়ত্ত করে। ধারণা এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে শুধুমাত্র পরিমাণগত পার্থক্যই নয়, গুণগত পার্থক্যও রয়েছে। এইভাবে আরও এগিয়ে গিয়ে বিচার ও অনুমানের সাহায্যে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর হয়। 'সানকুও ইয়ান ই'-তে[৩] উল্লিখিত 'ভ্রূ কোঁচকালেই মাথায় বুদ্ধি আসে' বলতে অথবা চলতি কথায় 'ব্যাপারটা ভেবে দেখি' বলতে মানুষ কর্তৃক

মস্তিষ্কের ধারণাগুলোকে বিচার ও অনুমান গঠনে ব্যবহার করার প্রচেষ্টাকেই বোঝায়। এইটি হল জ্ঞানের দ্বিতীয় পর্যায়। যখন পরিদর্শক-দলের সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করার এবং তদুপরি 'ঐগুলো ভেবে দেখা'র কাজটি শেষ করেন, তখনই তাঁরা এই বিচারে এসে পৌছাতে পারেন যে, 'কমিউনিস্ট পার্টির জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নীতি পূর্ণাঙ্গ, আন্তরিক এবং সাচ্চা'। এই বিচারে আসার পর, তাঁরাও যদি দেশকে বাঁচাবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সাচ্চা হন, তবে তাঁরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, 'জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট সাফল্যলাভ করতে পারে।' কোন বস্তুকে জানার সমগ্র প্রক্রিয়ায় ধারণা, বিচার এবং অনুমানের এই পর্যায় হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই পর্যায় হচ্ছে ধারণাত্ম (rational) জ্ঞানের পর্যায়। জানার আসল কাজটি হল ইন্দ্রিয়ানুভূতি মধ্য দিয়ে চিন্তায় পৌছানো, ধাপে ধাপে বাস্তব বস্তুর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিষয়ে, তার নিয়মবিধি সম্পর্কে এবং একটি প্রক্রিয়া ও আরেকটি প্রক্রিয়ার মধ্যেকার অন্তঃসম্পর্কের বিষয়ে উপলব্ধিতে পৌছানো, অর্থাৎ যৌক্তিক জ্ঞানে পৌছানো। আবার বলা যায়, যৌক্তিক জ্ঞানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের তফাৎ এখানেই যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান বস্তুর পৃথক পৃথক দিক, বাহ্য রূপ এবং বহিঃসম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, আর যৌক্তিক জ্ঞান সামনের দিকে একটা বড় ধাপ অগ্রসর হয়ে বস্তুর সমগ্রতা, সারাংশ ও অন্তঃসম্পর্কে গিয়ে পৌছায়, এবং পারিপার্শ্বিক জগতে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে। সুতরাং যৌক্তিক জ্ঞান পারিপার্শ্বিক জগতের বিকাশকে তার সমগ্রতায়, তার সমস্ত দিকগুলির অন্তঃসম্পর্কের মধ্যে আয়ত্ত করতে সক্ষম।

অনুশীলনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং অগভীর থেকে গভীরের দিকে অগ্রসরমান এই জ্ঞান-বিকাশের প্রক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী তত্ত্ব মার্কসবাদের আবির্ভাবের আগে কেউ কখনো উপস্থিত করেনি। মার্কসীয় বস্তুবাদই সর্বপ্রথম এই সমস্যার সঠিক সমাধান করে, বস্তুবাদী ও দ্বান্দ্বিক উভয় দিক থেকেই জ্ঞানের ক্রমগভীর গতিকে দেখিয়ে দেয়, এবং দেখিয়ে দেয় যে, সমাজে মানুষ তার উৎপাদন ও শ্রেণী-সংগ্রামের জটিল ও নিয়মিতভাবে পুনরাবর্তনশীল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে যৌক্তিক জ্ঞানে এগিয়ে যায়। লেনিন বলেছিলেন, 'পদার্থের বিমূর্তকরণ (abstraction), প্রকৃতির নিয়ম-বিধির বিমূর্তকরণ, মূল্য প্রভৃতির বিমূর্তকরণ, সংক্ষেপে, সকল বিজ্ঞানসম্মত (সঠিক, গুরুত্বপূর্ণ, অভ্রান্ত) বিমূর্তকরণ প্রকৃতিকে আরও গভীরভাবে, সঠিকভাবে

এবং পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে।[৪] মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতে, জ্ঞানের প্রক্রিয়ার দুটো পর্যায়ের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। নিম্ন পর্যায়ে জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান হিসেবে, আর উচ্চতর পর্যায়ে তা আত্মপ্রকাশ করে যৌক্তিক জ্ঞান হিসেবে। কিন্তু উভয় পর্যায়ই জ্ঞানলাভের একক প্রক্রিয়ার অংশ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান এবং ধারণাত্মক জ্ঞান গুণগতভাবে পৃথক, কিন্তু পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—প্রয়োগের ভিত্তিতে তারা ঐক্যবদ্ধ। আমাদের প্রয়োগ প্রমাণ করে যে, যা অনুভব করা যায় তা তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, এবং যা হৃদয়ঙ্গম করা হয়েছে কেবল তাই অধিকতর গভীরভাবে অনুভব করা যায়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি শুধুমাত্র বস্তুর বাহ্য রূপের সমস্যাটুকুই সমাধান করে, আর একমাত্র তত্ত্বই পারে সারাংশের সমাধান করতে। এই উভয় সমস্যার সমাধানকে প্রয়োগ থেকে এতটুকুও আলাদা করা যায় না। কেউ কোন বস্তুকে জানতে চাইলে তার সংস্পর্শে আসা, অর্থাৎ সে বস্তুর পরিবেশে বাস করা (প্রয়োগ করা) ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজে পুঁজিবাদী সমাজের নিয়মগুলি আগে থেকে জানা অসম্ভব ছিল, কারণ তখনও পুঁজিবাদের আবির্ভাব ঘটেনি এবং তার আনুষঙ্গিক প্রয়োগও ছিল না। একমাত্র পুঁজিবাদী সমাজবাদী সমাজ থেকেই মার্কসবাদের জন্ম সম্ভব ছিল। অবাধ পুঁজিবাদের যুগে মার্কসের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী যুগের বিশেষ কতকগুলি নিয়মবিধি আগে থাকতে মূর্তভাবে জানা অসম্ভব ছিল, কারণ সাম্রাজ্যবাদ, অর্থাৎ পুঁজিবাদের সর্বশেষ পর্যায় তখনও পর্যন্ত আবির্ভূত হয়নি এবং তার আনুষঙ্গিক প্রয়োগও ছিল না। একমাত্র লেনিন ও স্তালিনই পেরেছিলেন সেই দায়িত্বভার তুলে নিতে। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের মনীষার কথা বাদ দিলেও, তাঁরা যে তাঁদের তত্ত্বগুলি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন তার কারণ প্রধানতঃ ছিল এই যে, তাঁরা স্বয়ং তাঁদের সময়কার শ্রেণী সংগ্রামের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োগে অংশগ্রহণ করে-ছিলেন। এই অবস্থা না থাকলে কোন মনীষার পক্ষেই সাফল্যলাভ করা সম্ভব ছিল না। প্রাচীনকালে যখন প্রযুক্তিবিদ্যা ছিল অনুন্নত, তখন 'পণ্ডিত-ব্যক্তি ঘরে বসেই দুনিয়ার সবকিছু জানতে পারেন'—এই কথা ছিল একেবারেই ফাঁকা বুলি। যদিও উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার বর্তমান যুগে এই কথাটা কাজে পরিণত হতে পারে, তবুও দুনিয়ায় যারা প্রয়োগে নিয়োজিত, তারাই হচ্ছে প্রকৃত নিজস্ব জ্ঞানসম্পন্ন লোক। এইসব লোক তাদের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যখন

'জ্ঞান' লাভ করে আর তাদের সেই জ্ঞান যখন রচনা ও প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে 'পণ্ডিতব্যক্তির' কাছে পৌছায়, 'পণ্ডিতব্যক্তি' একমাত্র তখনই পরোক্ষভাবে 'দুনিয়ার সবকিছু জানতে পারেন'। আপনি যদি কোন একটি বস্তু অথবা একাধিক বস্তু প্রত্যক্ষভাবে জানতে চান, তবে বাস্তবকে পরিবর্তন করার, সেই বস্তু অথবা সেই একাধিক বস্তুগুলি পরিবর্তন করার বাস্তব সংগ্রামে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করতেই হবে, কারণ কেবল এইভাবেই আপনি সেই বস্তু বা সেই একাধিক বস্তুগুলির বাহ্য রূপের সংস্পর্শে আসতে পারেন ; এবং বাস্তবকে পরিবর্তন করার বাস্তব সংগ্রামে ব্যক্তিগত অংশগ্রহনের মাধ্যমেই কেবল আপনি সেই বস্তু অথবা সেই একাধিক বস্তুগুলির সারাংশকে উন্মোচিত করতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। আসলে প্রত্যেক মানুষই জ্ঞানলাভের জন্য এই পথেই চলে, যদিও কিছু লোক ঘটনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে এর বিরুদ্ধে তর্ক করে থাকে। দুনিয়াতে সেই 'সবজান্তা'-ই হচ্ছে সবচেয়ে হাস্যাস্পদ ব্যক্তি, যারা পরের কাছে শোনা কিছু ভাসাভাসা কথা সংগ্রহ করে নিজেকে 'দুনিয়ার পয়লা নম্বরের জ্ঞানী' বলে জাহির করে। এতে শুধু এটাই প্রমাণিত হয় যে, নিজের ক্ষমতা কতখানি সে ধারণাই তার নেই। জ্ঞান হচ্ছে একটা বিজ্ঞানের ব্যাপার। বিন্দুমাত্রও কপটতা কিংবা অহমিকা এই ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য নয়. যা দরকার তা ঠিক এর বিপরীত—অর্থাৎ দরকার সততা ও বিনয়ের মনোভাব। যদি আপনি জ্ঞানার্জন করতে চান তাহলে বাস্তব জগৎকে পরিবর্তন করার প্রয়োগে আপনাকে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। যদি অপনি নাশপাতির স্বাদ জানতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই নাশপাতির পরিবর্তন করতে হবে, নিজের মুখে খেয়ে। যদি আপনি পরমাণুর গঠন ও গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে পরমাণুটির অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য ভৌত ও রাসায়নিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেই হবে যদি আপনি বিপ্লবের তত্ত্ব ও পদ্ধতি জানতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে হবে। সমস্ত প্রকৃত জ্ঞানের উৎসই হচ্ছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কিন্তু একজনের পক্ষে সবকিছুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব নয়। বাস্তবিকপক্ষে, আমাদের জ্ঞানের অধিকাংশই আসে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, যেমন, প্রাচীনকালের ও বিদেশের সকল জ্ঞান। আমাদের পূর্বপুরুষ এবং বিদেশীদের কাছে এই জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়। আমাদের পূর্বপুরুষ ও বিদেশীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সময়ে এই জ্ঞান যদি লেনিনের উল্লিখিত 'বিজ্ঞানসম্মত বিমূর্তকরণ'-এর শর্ত

পূরণ করে এবং বাস্তব বিষয়কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিফলিত করে, তাহলে এই জ্ঞান নির্ভরযোগ্য। অন্যথায় এই জ্ঞান নির্ভরযোগ্য নয়।। সুতরাং একজন মানুষের জ্ঞান কেবল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত: একটি হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আসা, আরেকটি হল পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আসা। অধিকন্তু, যেটা আমার কাছে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা, অন্য কারও কাছে সেটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। অতএব, সমগ্রভাবে বিচার করলে, যে কোন ধরনের জ্ঞানই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অবিচ্ছেদ্য। সকল জ্ঞানই উৎপন্ন হয় মানুষের দৈহিক ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির দ্বারা বাস্তব বহির্জগৎকে অনুভব করার মধ্যে। যে ব্যক্তি এই ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অস্বীকার করে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে, অথবা বাস্তবকে পরিবর্তন করার প্রয়োগে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণকে অস্বীকার করে, সে বস্তুবাদী নয়। এই কারণেই, 'সবজান্তা' ব্যক্তিরা হাস্যাস্পদ। একটি পুরানো চীনা প্রবাদ আছে: 'বাঘের গুহায় না ঢুকে বাঘের বাচ্চা কি ধরা যায়?' কথাটি মানুষের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি সত্য জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রেও। প্রয়োগ ছাড়া জ্ঞান অসম্ভব।

বাস্তবকে পরিবর্তন করার প্রয়োগের ভিত্তিতে উদ্ভূত জ্ঞানের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী গতিকে—জ্ঞানের ক্রমগভীর গতিকে—স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য আরও কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ নীচে দেওয়া হল।

পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বহারাশ্রেণী তার প্রয়োগের প্রথম যুগে অর্থাৎ মেশিনভাঙা ও স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের যুগে কেবল জ্ঞানের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যায়ে ছিল। সেই যুগে সে শুধুমাত্র পুঁজিবাদের বাহ্য রূপের কতকগুলি পৃথক পৃথক দিক ও বহিঃসম্পর্ক জানত। সর্বহারাশ্রেণী তখনও ছিল 'নিজের-মধ্যেই-শ্রেণী'। কিন্তু সর্বহারাশ্রেণী যখন তার প্রয়োগের দ্বিতীয় যুগে, অর্থাৎ সচেতন এবং সংগঠিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের যুগে পৌঁছাল, তখন সর্বহারাশ্রেণীর নিজের প্রয়োগের ফলে, দীর্ঘ সংগ্রামে নিজের অভিজ্ঞতার ফলে, এবং মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এইসব অভিজ্ঞতার সার-সংকলনের মধ্যে মার্কসবাদী তত্ত্বের সৃষ্টি করা ও তার দ্বারা সর্বহারাশ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলার ফলেই সর্বহারাশ্রেণী পুঁজিবাদী সমাজের সারমর্মকে বুঝতে পারল, সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যেকার শোষণের সম্পর্কগুলিকে এবং সর্বহারাশ্রেণীর নিজের ঐতিহাসিক কর্তব্যকে বুঝতে পারল। আর তখনই সর্বহারাশ্রেণী 'নিজের-জন্য-শ্রেণী'-তে পরিণত হল।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে চীনা জনগণের জ্ঞানের ব্যাপারেও ঐ একই কথা। প্রথম পর্যায় ছিল ভাসাভাসা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের পর্যায়, যার প্রতিফলন দেখা যায় থাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের আন্দোলনে[৫] এবং ই হো থুয়ান আন্দোলন[৬] প্রভৃতিতে নির্বিচারে বিদেশী-বিরোধী সংগ্রামগুলির ক্ষেত্রে। কেবল দ্বিতীয় পর্যায়েই চীনা জনগণ ধারণাত্মক জ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছেছিল, সাম্রাজ্যবাদের ভেতরের ও বাইরের বিভিন্ন দ্বন্দ্বগুলিকে দেখেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ যে ব্যাপক চীনা জনগণকে নিপীড়ন ও শোষণ করার জন্য চীনের মুৎসুদ্দি ও সামন্তশ্রেণী-গুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, এই মূল সত্যকে দেখেছিল। ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলনের[৭] কাছাকাছি সময়ে এই জ্ঞানের শুরু হয়েছিল।

এরপর, যুদ্ধের কথা বিচার করা যাক। যারা যুদ্ধ পরিচালনা করে, তাদের যদি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহলে গোড়ার দিকে তারা একটি সুনির্দিষ্ট যুদ্ধ (যেমন আমাদের বিগত দশ বছরের কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধ) পরিচালনা সম্পর্কিত গভীর নিয়মবিধিগুলো উপলব্ধি করতে পারবে না। গোড়ার দিকে তাদের কেবল বেশ কিছু লড়াই করার অভিজ্ঞতা হবে এবং তার চেয়েও যা বেশি, অনেক পরাজয় সইতে হবে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা (জেতা লড়াইগুলির অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে হারা লড়াইগুলির অভিজ্ঞতা) দ্বারাই তারা গোটা যুদ্ধের অন্তর্নিহিত সূত্র অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট যুদ্ধের নিয়মবিধিগুলোকে হৃদয়ঙ্গম করতে, এবং রণনীতি ও রণকৌশল বুঝতে সক্ষম হবে। এর ফলে আস্থার সঙ্গে তারা যুদ্ধ পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। যদি, এ রকম মুহূর্তে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে পরিচালনভার তুলে দেওয়া হয়, তবে তাকেও যুদ্ধের সঠিক নিয়মবিধি হৃদয়ঙ্গম করতে পারার আগে অনেকগুলি পরাজয় সইতে হবে (অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে)।

'আমি নিশ্চিত নই যে, এটা আমি পারব।' যখন একজন কমরেড একটি ন্যস্ত কাজ গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করে, তখন প্রায়শঃই এই মন্তব্য আমরা শুনতে পাই। নিজের সম্পর্কে তার এই অনিশ্চয়তা কেন? কারণ ন্যস্ত কাজটির বিষয়বস্তু ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তার কোন নিয়মিত উপলব্ধি নেই, অথবা ঐ ধরনের কাজের অতি অল্প সংস্পর্শে সে এসেছে বা একেবারেই আসেনি, এবং সেজন্য ঐ কাজের নির্ধারক নিয়মবিধিগুলি তার অনায়ত্ত। কাজটির প্রকৃতি পরিস্থিতির পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণের পর সে নিজের সম্পর্কে বেশ কিছুটা নিশ্চিত হবে এবং কাজটি স্বেচ্ছায় করতে এগোবে। যদি সে ঐ

কাজে কিছুটা সময় ব্যয় করে এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে, যদি সে এমন লোক হয় যে খোলা মন নিয়ে বিষয়ের গভীরে দৃষ্টি প্রসারিত করতে আগ্রহী এবং যদি সে এমন লোক না হয় যে সমস্যাকে বিষয়ীগতভাবে, একতরফাভাবে এবং ভাসাভাসাভাবে বিচার করে, তাহলে কাজটিকে কিভাবে করতে হবে সে বিষয়ে সে নিজেই সিদ্ধান্তে আসতে পারবে এবং কার্যসাধনে তার সাহস বহু গুণ বেড়ে যাবে। যারা বিষয়ীগত, একতরফা এবং ভাসাভাসাভাবে সমস্যাকে দেখে, শুধু তারাই কোন জায়গায় আসামাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা না করে, ব্যাপারটাকে সামগ্রিকভাবে (তার ইতিহাস ও সমগ্র বর্তমান অবস্থাকে) বিবেচনা না করে এবং ব্যাপারের সারাংশকেও (তার প্রকৃতি এবং তার ও অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যেকার অন্তঃসম্পর্ক) উপলব্ধি না করেই আত্মতৃপ্তির সঙ্গে হুকুম জারি করতে থাকে। এ ধরনের লোক হোঁচট ও আছাড় খেতে বাধ্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় বহির্জগতের বিষয়গুলির সঙ্গে যোগাযোগ হল প্রথম ধাপ। এটা ইন্দ্রিয়ানুভূতির পর্যায়ের অন্তর্গত। দ্বিতীয় ধাপটি হল ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ তথ্যগুলিকে সাজিয়ে ও পুনর্গঠন করে সেগুলির সংশ্লেষণ (synthesize) করা। এটা ধারণা, বিচার এবং অনুমান পর্যায়ের অন্তর্গত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যগুলি যখন খুব সমৃদ্ধ (অসংলগ্ন নয়) ও বাস্তবানুগ (ভ্রান্ত নয়) হয়, একমাত্র তখনই সেগুলি সঠিক ধারণা যুক্তি গঠনের ভিত্তি হতে পারে।

এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমটি আগেই বলা হয়েছে, তবুও এখানে আবার বলা উচিত। সেটি হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের উপর ধারণাত্মক জ্ঞানের নির্ভরশীলতা। যিনি একথা মনে করেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে ধারণাত্মক জ্ঞানের উদ্ভব হওয়ার প্রয়োজন নেই, তিনিই একজন ভাববাদী। দর্শনের ইতিহাসে 'যুক্তিবাদী' গোষ্ঠী রয়েছে, যারা কেবল যুক্তির বাস্তবতাকেই স্বীকার করে, অভিজ্ঞতার বাস্তবতাকে স্বীকার করে না। তাদের বিশ্বাস, একমাত্র যুক্তিই নির্ভরযোগ্য আর ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা নির্ভরযোগ্য নয়। এই গোষ্ঠী বিষয়কে উল্টো করে দেখার ভুল করে থাকে। ধারণাত্মক জ্ঞান ঠিক এই কারণেই নির্ভরযোগ্য যে, তার উৎস নিহিত রয়েছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে। অন্যথায় তা হতো উৎসহীন জলধারা বা শিকড়হীন গাছের মতো মনগড়া, আত্মজাত কোন বস্তু, যা নির্ভরযোগ্য নয়। জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়ায় ক্রম অনুযায়ী সর্বপ্রথম আসে ইন্দ্রিয়লব্ধ

অভিজ্ঞতা। আমরা যে জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় সামাজিক প্রয়োগের তাৎপর্যের উপর বিশেষ করে জোর দিই তার কারণ, একমাত্র সামাজিক প্রয়োগই মানুষের জ্ঞানের জন্ম দিতে পারে এবং মানুষকে বাস্তব বহির্জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা অর্জনে চালিত করতে পারে। যে লোক তার চোখ-কান বন্ধ রাখে এবং সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বাস্তব বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তার কাছে জ্ঞান বলে কিছু থাকতে পারে না। অভিজ্ঞতা থেকেই জ্ঞানের সূচনা—এই হল জ্ঞানতত্ত্বের বস্তুবাদ।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল এই যে, জ্ঞানকে গভীরতর করা দরকার, জ্ঞানের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যায়কে ধারণাত্মক পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন—এটাই হল জ্ঞানতত্ত্বের দ্বন্দ্ববাদ[৮]। জ্ঞান নিম্নতর, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যায়ে থেমে থাকতে পারে এবং শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানই নির্ভরযোগ্য, আর ধারণাত্মক জ্ঞান নির্ভরযোগ্য নয়—এইভাবে ভাবলে 'অভিজ্ঞতাবাদের' ঐতিহাসিক ভুলের পুনরাবৃত্তি করা হবে। এই মতবাদের ভুল হল এটা না বোঝা যে, যদিও ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যগুলি বাস্তব বহির্জগতের কতকগুলি সত্যকে প্রতিফলিত করে (আমি এখানে সেই ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদের কথা বলছি না যা অভিজ্ঞতাকে তথাকথিত অন্তর্দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে), কিন্তু সেগুলি নিছক একপেশে ও ভাসাভাসা, সেগুলি বিষয়কে অসম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে এবং বিষয়ের সারাংশকে প্রতিফলিত করে না। সম্পূর্ণভাবে কোন বিষয়কে তার সমগ্রতায় প্রতিফলিত করতে হলে, বিষয়ের সরাংশকে ও তার অন্তর্নিহিত নিয়মগুলিকে প্রতিফলিত করতে হলে প্রয়োজন চিন্তার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির সমৃদ্ধ তথ্যগুলিকে পুনর্গঠন করা—বাজে জিনিস পরিত্যাগ করে সারবস্তু বেছে নেওয়া, মিথ্যাকে বাদ দিয়ে সত্যকে গ্রহণ করা, এক বিষয় থেকে শুরু করে অন্য বিষয়ে যাওয়া, এবং বাইরে থেকে শুরু করে ভেতরে যাওয়া। ধারণা ও তত্ত্বের একটা প্রণালী গঠনের জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে ধারণাত্মক জ্ঞানে একটা দ্রুত-অতিক্রমণ। এই পুনর্গঠিত জ্ঞান অধিকতর ফাঁকা বা অনির্ভরযোগ্য নয়। বরং বিপরীতভাবে, জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় প্রয়োগের ভিত্তিতে যা কিছু বিজ্ঞান-সম্মতভাবে পুনর্গঠিত হয়, তাইই, লেনিনের ভাষায়,—আরও গভীররূপে, আরও সঠিকরূপে এবং আরও পরিপূর্ণরূপে বাস্তব বিষয়গুলিকে প্রতিফলিত করে। এরই বিরুদ্ধে স্থূল 'ব্যবহারিক ব্যক্তিরা' অভিজ্ঞতাকে মর্যাদা দেয়, কিন্তু তত্ত্বকে অবজ্ঞা করে। সেজন্য তারা একটা সমগ্র বাস্তব প্রক্রিয়া সম্বন্ধে

সামগ্রিক ধারণা করতে পারে না, তাদের স্পষ্ট দিক্‌নির্দেশ ও দূরদৃষ্টি নেই, তারা মাঝে-মধ্যে দু-একটা সাফল্যপ্রাপ্তিতে ও সত্যের আংশিক দর্শনেই আত্মতুষ্ট। এ ধরনের লোকেরা যদি বিপ্লব পরিচালনা করে, তবে তারা বিপ্লবকে এক কানাগলিতে পৌঁছে দেবে।

ধারণাত্মক জ্ঞান নির্ভর করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের ওপর, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানকে উন্নীত করতে হয় ধারণাত্মক জ্ঞানে—এটাই হচ্ছে দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্ব। দর্শনশাস্ত্রে 'যুক্তিবাদ' বা 'অভিজ্ঞতাবাদ' কোনটাই জ্ঞানের ঐতিহাসিক বা দ্বান্দ্বিক প্রকৃতিকে বোঝে না। যদিও মতবাদ দুটির প্রত্যেকটির মধ্যেই সত্যের একটি দিক আছে (এখানে আমি বস্তুবাদী যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের কথাই বলছি, ভাববাদী যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের কথা বলছি না), তবুও উভয় মতবাদই সমগ্র বিচারে জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থেকে ধারণাত্মক পর্যায়ে জ্ঞানের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী গতিটা জ্ঞানের একটা ছোটখাট প্রক্রিয়ার (যেমন, কোন একটিমাত্র বস্তু বা কাজ জানার) বেলায় যেমন সত্য, তেমনি জ্ঞানের একটা বৃহৎ প্রক্রিয়ার (যেমন, একটা গোটা সমাজকে বা একটা বিপ্লবকে জানার) বেলায়ও সত্য।

কিন্তু জ্ঞানের গতির এখানেই শেষ নয়। যদি জ্ঞানের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী গতি ধারণাত্মক জ্ঞানে এসে থামত, তাহলে কেবল অর্ধেক সমস্যার সমাধান হতো। এবং মার্কসবাদী দর্শনের দিক থেকে তাতে শুধুমাত্র যে অর্ধাংশটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেই অর্ধাংশটুকুরই সমাধান হতো। মার্কসবাদী দর্শনের মতানুসারে, বাস্তব জগতের বিধিনিয়ম বোঝা এবং এইভাবে তাকে ব্যাখ্যা করতে পারাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়, বরং সমস্যাটা হচ্ছে বাস্তব বিধিনিয়মের জ্ঞানের সাহায্যে জগৎটাকেই পুরোপুরি বদলে দেওয়া। মার্কসবাদী দৃষ্টিতে তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ এবং এর গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে লেনিনের এই বক্তব্যে: 'বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন হতে পারে না।'[৯] কিন্তু মার্কসবাদ তত্ত্বের গুরুত্বের উপর জোর দেয় ঠিক এবং শুধুমাত্র এই কারণেই যে, তত্ত্ব কর্মের পথনির্দেশ করতে পারে। যদি আমাদের একটা নির্ভুল তত্ত্ব থাকে, কিন্তু যদি তা নিয়ে শুধু বক্‌বকই করা হয়, যদি তাকে খোপের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় এবং কাজে লাগানো না হয়, তাহলে সেই তত্ত্বটি যত ভালই হোক না কেন তার কোনো তাৎপর্যই থাকে না। প্রয়োগ থেকে জ্ঞানের শুরু হয়, এবং প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে আবার অবশ্যই প্রয়োগে

ফিরে আসতে হবে। জ্ঞানের সক্রিয় ভূমিকা কেবলমাত্র যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে ধারণাত্মক জ্ঞানে সক্রিয়ভাবে দ্রুত অতিক্রমণের মধ্যে ব্যক্ত হয় তা-ই নয়, বরং আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ধারণাত্মক জ্ঞান থেকে বিপ্লবী প্রয়োগে দ্রুত অতিক্রমণের মধ্যেও তা অভিব্যক্ত হয়। যে জ্ঞান জগতের নিয়মবিধিকে আয়ত্ত করে, তাকে অবশ্যই আবার জগৎকে পরিবর্তন করার প্রয়োগে নিয়োজিত করতে হবে, তাকে নতুন করে কাজে লাগাতে হবে উৎপাদনের প্রয়োগে, বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের প্রয়োগে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োগে। এটা হচ্ছে তত্ত্বের পরীক্ষা ও বিকাশসাধনের প্রক্রিয়া, জ্ঞানের সমগ্র প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিকতা। তত্ত্ব বাস্তব সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা—এই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থেকে ধারণাত্মক পর্যায়ে জ্ঞানের গতির মধ্যে হয়নি এবং হতেও পারে না। সমস্যাটির পুরোপুরি সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে ধারণাত্মক জ্ঞানকে আবার সামাজিক প্রয়োগে চালিত করা, তত্ত্বকে প্রয়োগ করা এবং এতে প্রত্যাশিত উদ্দেশ্য সাধিত হয় কিনা তা দেখা। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বকেই সত্য বলে গণ্য করা হয়। তা কেবল এইজন্যে নয় যে, প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা যখন তত্ত্বগুলো উদ্ভাবন করেছিলেন তখন তত্ত্বগুলোকে সত্য বলে গণ্য করা হতো, বরং এইজন্যেই যে, ঐ তত্ত্বগুলো পরবর্তী বৈজ্ঞানিক প্রয়োগেও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সত্য বলে গণ্য করা হয় কেবল এইজন্যে নয় যে, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এবং স্তালিন যখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঐ মতবাদ উদ্ভাবন করেছিলেন, তখন সেটা সত্য বলে গণ্য করা হতো, বরং এইজন্যেও যে, পরবর্তী বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের প্রয়োগে ঐ মতবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ একটি সার্বজনীন সত্য, কারণ কেউই নিজের প্রয়োগে এর আওতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। মানুষের জ্ঞানের ইতিহাস আমাদের এটাই শেখায় যে, বহু তত্ত্বই অসম্পূর্ণ, এবং কেবল প্রয়োগের পরীক্ষার মধ্য দিয়েই এই অসম্পূর্ণতা দূর করা যায়। বহু তত্ত্বই ভুল এবং প্রয়োগের পরীক্ষার মধ্য দিয়েই সেসব তত্ত্বের ভুলগুলি শোধরানো যায়। সেজন্যই প্রয়োগ হল সত্যের মাপকাঠি, এবং সেজন্যই 'জীবনের ও প্রয়োগের দৃষ্টিকোণই জ্ঞানতত্ত্বের প্রথম ও মৌলিক দৃষ্টিকোণ হওয়া উচিত'।[১০] স্তালিন ঠিকই বলেছেন, 'বিপ্লবী প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত না হলে তত্ত্ব হয়ে পড়ে উদ্দেশ্যহীন, ঠিক যেমন বিপ্লবী তত্ত্বের দ্বারা

তার পথ আলোকিত না হলে প্রয়োগ অন্ধকারে পথ হাতড়ায়।'[১১]

এই পর্যন্ত এসেই কি জ্ঞানের গতিবিধি শেষ হয়ে যায়? আমাদের উত্তর: হ্যাঁ, এবং সেই সঙ্গে না-ও বটে। বিকাশের কোন একটি পর্যায়ে কোন একটি বাস্তব প্রক্রিয়াকে (প্রাকৃতিকই হোক বা সামাজিক হোক) পরিবর্তন করার অনুশীলনে যখন সমাজের মানুষ নিজেদের নিয়োজিত করে, তখন তারা তাদের মস্তিষ্কে বাস্তব প্রক্রিয়ার প্রতিফলন ও তাদের আত্মগত কর্মতৎপরতার সঞ্চালনের ফলে তাদের জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যায় থেকে ধারণাত্মক পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং ঐ বাস্তব প্রক্রিয়ার নিয়ম-বিধির সঙ্গে সাধারণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ চিন্তাধারা, তত্ত্ব, পরিকল্পনা বা কর্মসূচী সৃষ্টি করতে পারে। তারপর তারা ঐ চিন্তাধারা, তত্ত্ব, পরিকল্পনা বা কর্মসূচীগুলোকে ঐ একই বাস্তব প্রক্রিয়ার অনুশীলনে প্রয়োগ করে। এবং যদি তারা প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, অর্থাৎ যদি ঐ একই প্রক্রিয়ার প্রয়োগে তারা ঐ পূর্ব-নিরূপিত চিন্তাধারা, তত্ত্ব, পরিকল্পনা বা কর্মসূচীগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করতে অথবা মোটামুটিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে, তাহলে ঐ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানের গতিবিধি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রকৃতিকে বদলানোর প্রক্রিয়ায় একটি ইঞ্জিনীয়ারিং পরিকল্পনার বাস্তবে রূপায়ণ, একটা বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের সত্য প্রতিপাদন (verification), একটা যন্ত্রের উৎপাদন বা কোন ফসল কাটা; অথবা সমাজকে বদলানোর প্রক্রিয়ায় একটি ধর্মঘটের সাফল্য, একটি যুদ্ধে জয়লাভ বা একটি শিক্ষা পরিকল্পনার রূপায়ণ—এসব কিছুকেই প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রকৃতিকে বদলানোর প্রয়োগেই হোক অথবা সমাজকে বদলানোর প্রয়োগেই হোক, মানুষের পূর্ব-নিরূপিত চিন্তাধারা, তত্ত্ব, পরিকল্পনা বা কর্মসূচী কদাচিৎ কোন পরিবর্তন ছাড়াই বাস্তবে রূপায়িত হয়। এর কারণ, যারা বাস্তবকে পরিবর্তনে নিয়োজিত, তারা সাধারণতঃ বহু রকমের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকে। তারা শুধুমাত্র প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাসংক্রান্ত পরিস্থিতির দ্বারাই সীমাবদ্ধ নয়, উপরন্তু বাস্তব প্রক্রিয়ার বিকাশ এবং তার প্রকাশের মাত্রার দ্বারাও সীমাবদ্ধ (বাস্তব প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক ও তার সারাংশ তখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে পড়েনি)। এই অবস্থায় প্রয়োগের প্রক্রিয়ার অভাবিতপূর্ব পরিস্থিতির আবিষ্কারের ফলে চিন্তাধারা, তত্ত্ব, পরিকল্পনা বা কর্মসূচী প্রায়ই

আংশিকভাবে পাল্টানো হয় এবং কথনো কথনো পুরোপুরিও পাল্টানো হয়। অর্থাৎ এমন ঘটনা ঘটে যে, পূর্ব-নিরূপিত চিন্তাধারা, তত্ত্ব, পরিকল্পনা ও কর্মসূচীগুলি বাস্তবের সঙ্গে আংশিকভাবে বা পুরোপুরিভাবে সঙ্গতিসাধন করতে পারে না, সেগুলি আংশিকভাবে বা পুরোপুরিই ভুল হয়। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বহুবার ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটার পরই কেবল জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভুলগুলি সংশোধিত হয় এবং বাস্তব প্রক্রিয়ার নিয়মবিধিগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য অর্জিত হয়, এবং তার ফলে আত্মগতকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারা যায়, বা অন্য কথায়, প্রয়োগে প্রত্যাশিত ফল অর্জিত হয়। কিন্তু যেভাবেই হোক না কেন, এ ব্যাপার যখন ঘটে, তখন বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে একটা নির্দিষ্ট বাস্তব প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের গতিবিধি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা যায়।

তবে, প্রক্রিয়ার ক্রমাগ্রগতির দিক থেকে বলতে গেলে, মানুষের জ্ঞানের গতি সম্পূর্ণ হয় না। প্রকৃতির ক্ষেত্রেই হোক বা সমাজের ক্ষেত্রেই হোক, প্রত্যেক প্রক্রিয়াই তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের কারণেই এগিয়ে যায় ও বিকাশলাভ করে, এবং মানুষের জ্ঞানের গতি ও সেই সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া ও বিকাশলাভ করা উচিত। সামাজিক গতিসমূহের বেলায়, উপরে যেমন বলা হয়েছে—সাচ্চা বিপ্লবী নেতাদের শুধুমাত্র নিজেদের চিন্তাধারা, তত্ত্ব, পরিকল্পনা বা কর্মসূচীগুলিতে ভুল আবিষ্কৃত হলে সেগুলি সংশোধনে পারদর্শী হলেই চলবে না, উপরন্তু যখন কোন একটি বাস্তব প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই এগিয়ে গেছে এবং বিকাশের এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়ে গেছে—তখন তাদের নিজেদের ও সমস্ত সহকর্মী বিপ্লবীদের আত্মগত জ্ঞানের মধ্যে আনুষঙ্গিক অগ্রগতি ও পরিবর্তন ঘটানোয় অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে। অর্থাৎ তাদের অবশ্যই স্থিরনিশ্চিত হতে হবে, -যাতে প্রস্তাবিত নতুন বিপ্লবী কর্তব্য ও নতুন কাজের কর্মসূচীগুলি পরিস্থিতির নতুন পরিবর্তনগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। বিপ্লবের সময় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে অতি দ্রুত। বিপ্লবীদের জ্ঞানও যদি পরিবর্তিত অবস্থানুযায়ী দ্রুত পরিবর্তিত না হয়, তাহলে তারা বিপ্লবকে বিজয়ের দিকে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না।

অবশ্য, প্রায়ই দেখা যায়, চিন্তা বাস্তবের পেছনে পড়ে আছে। এর কারণ মানুষের জ্ঞান বহু রকম সামাজিক অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। বিপ্লবী বাহিনীর মধ্যে আমরা সেইসব গোঁড়াদের বিরোধী, যাদের চিন্তা পরিবর্তন-

শীল বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে এগিয়ে যেতে না পেরে ঐতিহাসিকভাবে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এইসব লোকেরা এটা দেখতে পায় না যে, দ্বন্দ্বসমূহের সংগ্রাম ইতিমধ্যেই বাস্তব প্রক্রিয়াকে ঠেলে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে, অথচ এদিকে তাদের জ্ঞান পুরানো পর্যায়েই থেমে আছে। সকল গোঁড়াপন্থীর চিন্তাধারার এটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। তাদের চিন্তাধারা সামাজিক প্রয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা সমাজের রথকে পথ দেখিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। তারা শুধু পিছিয়ে পড়ে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে যে, এটা বড্ড জোরে যাচ্ছে। তারা ঐ রথকে পেছনে টেনে রাখতে বা তাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

'বাম' বাগাড়ম্বরেরও আমরা বিরোধী। 'বামপন্থীদের' চিন্তাধারা বাস্তব প্রক্রিয়ার বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়কে ছাড়িয়ে যায়। তাদের কেউ কেউ নিজেদের অলীক কল্পনাকেই সত্য বলে মনে করে। আবার কেউ কেউ যে আদর্শ কেবল ভবিষ্যতেই বাস্তবায়িত করা সম্ভব বর্তমানের মধ্যে সেই আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য গলদঘর্ম হয়। এরা জনগণের অধিকাংশের বর্তমান প্রয়োগ থেকে এবং বর্তমান বাস্তবতা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং কার্য-কলাপে হঠকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ভাববাদ এবং যান্ত্রিক বস্তুবাদ, সুবিধাবাদ এবং হঠকারিতা—এ সবেরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আত্মগত এবং বাস্তবের বিচ্ছেদ, প্রয়োগ ও জ্ঞানের সংযোগ-হীনতা। বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক প্রয়োগ হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞানতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। এই জ্ঞানতত্ত্ব ঐসব ভ্রান্ত মতাদর্শের দৃঢ় বিরোধিতা না করে পারে না। মার্কসবাদীরা মনে করে যে, বিশ্বের অনাপেক্ষিক (aboslute) ও সামগ্রিক বিকাশের প্রক্রিয়াধারায়, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার বিকাশ হচ্ছে আপেক্ষিক, এবং সেজন্যে অনাপেক্ষিক সত্যের অন্তহীন প্রবাহে বিকাশের কোন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের একটা বিশেষ প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান কেবল আপেক্ষিক সত্য মাত্র। অসংখ্য আপেক্ষিক সত্যের মোট যোগফলই অনাপেক্ষিক সত্য[১২]। বাস্তব প্রক্রিয়ার বিকাশ দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে পরিপূর্ণ, মানুষের জ্ঞানের গতিবিধির বিকাশও তাই। বাস্তব জগতের সকল দ্বান্দ্বিক গতি আগে হোক বা পরে হোক মানুষের জ্ঞানে প্রতিফলিত হতে পারে। সামাজিক প্রয়োগে উদ্ভব, বিকাশ এবং বিলয়ের প্রক্রিয়া যেমন অনন্ত, তেমনি মানুষের জ্ঞানেও উদ্ভব, বিকাশ এবং বিলয়ের প্রক্রিয়া অনন্ত। মানুষের প্রয়োগ—যা নির্দিষ্ট চিন্তাধারা, তত্ত্ব, পরিকল্পনা বা

কর্মসূচী অনুযায়ী বস্তুগত বাস্তবতাকে পরিবর্তন করে—যতই অগ্রসর হতে থাকে, বস্তুগত বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানও তদনুযায়ী গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। বস্তুগত বাস্তব জগতে পরিবর্তনের গতিবিধির কখনই যেমন শেষ হয় না, তেমনি প্রয়োগের মাধ্যমে সত্য সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানার্জনেরও কখনই শেষ হয় না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মোটেই সত্যকে নিঃশেষিত করেনি বরং প্রয়োগের ধারায় সত্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পথ বিরামহীনভাবে খুলে দিয়েছে। আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে বিষয়ীগতের ও বিষয়গতের, তত্ত্ব ও প্রয়োগের, জানা ও করার মূর্ত ও ঐতিহাসিক ঐক্য। 'বাম' হোক বা দক্ষিণ হোক—যা মূর্ত ইতিহাস থেকে বিচ্যুত—সে সমস্ত ভ্রান্ত মতাদর্শের আমরা বিরোধী।

সমাজের বিকাশের বর্তমান যুগে দুনিয়াকে সঠিকভাবে জানার এবং পরিবর্তন করার দায়িত্বটি ইতিহাস সর্বহারাশ্রেণী এবং তার পার্টির কাঁধে ন্যস্ত করেছে। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অনুযায়ী নির্ধারিত দুনিয়াকে পরিবর্তন করার প্রয়োগের এই প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই দুনিয়ায় এবং চীনদেশে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে পৌঁছে গেছে। এটা মানব ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। অর্থাৎ দুনিয়া থেকে এবং চীন থেকে অন্ধকারকে সম্পূর্ণ নির্বাসন দেওয়ার এবং দুনিয়াকে একটি অভূতপূর্ব আলোকিত দুনিয়ায় পরিবর্তন করার মুহূর্তে। দুনিয়াকে পরিবর্তন করার জন্য সর্বহারাশ্রেণী ও বিপ্লবী জনগণের সংগ্রামে নিম্ন-লিখিত কর্তব্যগুলির পরিপূরণ অন্তর্ভুক্ত: 'বস্তুগত জগতের পরিবর্তন সাধন এবং সেই সঙ্গে নিজেদের মনোগত জগতের পরিবর্তন সাধন—নিজেদের জ্ঞানার্জন-ক্ষমতার পরিবর্তন সাধন এবং মনোগত ও বস্তুগত জগতের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্ত সাধন। এরকম পরিবর্তন ইতিমধ্যেই পৃথিবীর এক অংশে—সোভিয়েত ইউনিয়নে—এসে গেছে। সেখানে জনগণ পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চীনের ও বাকী দুনিয়ার জনগণ এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে কিংবা চলবে। এবং যে বস্তুগত জগতের পরিবর্তন করতে হবে, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঐ সমস্ত পরিবর্তন-বিরোধীরাও। তাদের নিজেদের পরিবর্তনের জন্য স্বেচ্ছামূলক সচেতন পরিবর্তনের পর্যায়ে প্রবেশ করার আগে বাধ্যতামূলক একটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অবশ্যই যেতে হবে। যেদিন সমগ্র মানবজাতি স্বেচ্ছায় এবং সচেতনভাবে নিজেকে এবং জগৎকে পরিবর্তন করবে, সেদিনই শুরু হবে বিশ্ব-কমিউনিজমের যুগ।

প্রয়োগের মাধ্যমে সত্যকে আবিষ্কার করুন, এবং আবার প্রয়োগের মাধ্যমে

সত্যকে যাচাই এবং বিকশিত করুন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে শুরু করুন এবং তাকে সক্রিয়ভাবে ধারণাত্মক জ্ঞানে উন্নীত করুন। তারপর ধারণাত্মক জ্ঞান থেকে শুরু করুন এবং বিষয়ীগত ও বিষয়গত এই উভয় জগৎকে পরিবর্তন করার জন্য সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী প্রয়োগ পরিচালনা করুন। প্রয়োগ, জ্ঞান, আবার প্রয়োগ এবং আবার জ্ঞান—এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে অন্তহীন চক্রাবর্তে, এবং প্রত্যেকটি চক্রাবর্তের সাথে সাথে প্রয়োগ ও জ্ঞানের অন্তর্বস্তুটি উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হয়। এই হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সমগ্র জ্ঞানতত্ত্ব, এই হল জানা এবং করার ঐক্যের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী তত্ত্ব।

টীকা

১। হেগেলের 'যুক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞান'-এর তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় প্রবন্ধ 'ধারণা' সম্পর্কে লেনিনের নোট থেকে উদ্ধৃত ; ভি. আই. লেনিন, 'হেগেলের "যুক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞান"-এর সংক্ষিপ্ত সার' (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯১৪) দ্রষ্টব্য।

২। কার্ল মার্কস, 'ফয়েরবাক সম্পর্কে থিসিস' (বসন্ত, ১৮৪৫) এবং ভি. আই. লেনিন, 'বস্তুবাদ এবং এমপিরিয়োক্রিটিসিজম' (১৯০৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে), দ্বিতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৩। 'সান কুও ইয়ান ই' চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর লো কুয়ান-চুং কর্তৃক রচিত একটি বিখ্যাত চীনা ঐতিহাসিক উপন্যাস।

৪। হেগেলের 'যুক্তি-শাস্ত্রের বিজ্ঞান'-এর তৃতীয় খণ্ড 'আত্মমুখী যুক্তি বা ধারণার মতবাদ' সম্পর্কে লেনিনের নোট থেকে উদ্ধৃত। ভি. আই. লেনিন, 'হেগেলের "যুক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞান"-এর সংক্ষিপ্ত সার' দ্রষ্টব্য।

৫। থাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের আন্দোলন ছিল ১৯ শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত ছিং রাজবংশের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও জাতীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিপ্লবী যুদ্ধ। ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসে কুয়াংসী প্রদেশের কুইপিং জেলার চিনথিয়ান গ্রামে এই বিপ্লবের নেতা হোং সিউ-ছুয়ান, ইয়াং সিউ-ছিং প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন আর ঘোষণা করেছিলেন 'থাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের' প্রতিষ্ঠা। ১৮৫২ সালে থাইপিং বাহিনী কুয়াংসী প্রদেশ থেকে অভিযান শুরু করে, আর হুনান, হুপে, কিয়াংসী ও আনহুই প্রদেশের ভেতর দিয়ে অভিযান চালিয়ে নানকিং দখল করে ১৮৫৩

সালে। তারপর থাইপিং বাহিনীর একটা অংশ নানকিং থেকে উত্তর অভিমুখে অভিযান চালিয়ে যেতে যেতে থিয়ানচিন শহরের নিকটে পৌঁছেছিল। কিন্তু থাইপিং বাহিনী তার দখলীকৃত স্থানগুলিতে কোন সুদৃঢ় ঘাঁটি এলাকাই স্থাপন করেনি। উপরন্তু, নানকিংয়ে রাজধানী স্থাপন করবার পরে এ বাহিনীর নেতৃস্থানীয় গ্রুপ অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক ভুল করে বসেছিল। সেই সব কারণেই এ বাহিনী অসমর্থ হয়েছিল ছিং সরকারের প্রতিবিপ্লবী বাহিনী এবং বৃটিশ, মার্কিন ও ফরাসী হামলাকারীদের মিলিত আক্রমণের মোকাবিলা করতে। আর শেষ পর্যন্ত ১৮৬৪ সালে এই বাহিনী পরাজিত হল।

৬। ই হো থুয়ান আন্দোলন—১৯০০ সালে উত্তর চীনের কৃষক ও হস্তশিল্পীসাধারণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত একটি বিরাট আন্দোলন। এই আন্দোলনে তাঁরা রহস্যময় পদ্ধতিতে গুপ্ত সমিতি গঠন করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালান। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান, ইতালি ও অস্ট্রিয়া এই আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র শক্তি দিয়ে পিকিং ও থিয়ানচিন দখল করেছিল এবং অবর্ণনীয় বর্বরতার সাথে এই আন্দোলন দমন করেছিল।

৭। ৪ঠা মে'র আন্দোলনটি ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন। এই আন্দোলন ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে শুরু হয়েছিল। সেই বছরের প্রথমার্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীরা, অর্থাৎ বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান, ইতালি ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ, প্যারিসে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিল লুঠের মাল ভাগাভাগি করে নেবার জন্য। আর এই বৈঠকে তারা স্থির করেছিল যে, চীনের শানতুং প্রদেশে আগের দিনে জার্মানী যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করত, সে সবই জাপান পাবে। ৪ঠা মে তারিখে, পিকিংয়ের ছাত্ররা সর্বপ্রথম সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করে দৃঢ়ভাবে এর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। এই আন্দোলনকে দমন করবার চেষ্টায় উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ সরকার ত্রিশ জনেরও বেশি ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। প্রতিবাদে ধর্মঘট করে পিকিংয়ের ছাত্ররা, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররাও এই ধর্মঘটে সাড়া দেয়। ৩রা জুন তারিখে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ সরকার পিকিংয়ে আরও ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু করে, দুই দিনের মধ্যে প্রায় হাজার খানেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। ৩রা জুনের ঘটনা সারা দেশের জনগণের ক্রোধকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ৫ই জুন থেকে শুরু করে শাংহাই ও অন্যান্য অনেক জায়গার

শ্রমিকরা পরপর ধর্মঘট করে, আর ব্যবসায়ীরাও তাদের দোকানপাট বন্ধ রাখে। শুরুতে যা ছিল মুখ্যত: বুদ্ধিজীবীদের স্বদেশপ্রেমী আন্দোলন, তাই অবিলম্বেই হয়ে উঠল দেশব্যাপী স্বদেশপ্রেমী আন্দোলন। তাতে যোগ দিল সর্বহারাশ্রেণী, পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণী। এই স্বদেশপ্রেমী আন্দোলনের প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে ৪ঠা মে'র আগে সূচিত সামন্ততন্ত্রবিরোধী এবং বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের উন্নতিবিধায়ক নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনটি এক ব্যাপক আকারের বলিষ্ঠ বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বিকশিত হয়ে ওঠে। আর এর প্রধান ধারাটি ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচার।

৮। হেগেলের 'যুক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞান'-এর তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় প্রবন্ধ 'ধারণা' সম্পর্কে লেনিনের নোট : 'বুঝতে হলে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বুঝতে, অধ্যয়ন করতে শুরু করতে হবে এবং অভিজ্ঞতা থেকে সার্বজনীনতায় উন্নীত হতে হবে।' 'হেগেলের "যুক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞান"-এর সংক্ষিপ্ত সার' দ্রষ্টব্য।

৯। ভি. আই. লেনিন, 'কী করতে হবে?' (শরৎকাল, ১৯০১-ফেব্রুয়ারী, ১৯০২) প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১০। ভি. আই. লেনিন, 'বস্তুবাদ এবং এমপিরিয়োক্রিটিসিজম', দ্বিতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

১১। জে. ভি. স্তালিন, 'লেনিনবাদের ভিত্তি' (এপ্রিল-মে ১৯২৪), তৃতীয় অংশ 'তত্ত্ব'।

১২। ভি. আই. লেনিন, 'বস্তুবাদ এবং এমপিরিয়োক্রিটিসিজম', দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দ্বন্দ্ব সম্পর্কে

(আগস্ট, ১৯৩৭)

বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্বের নিয়ম, অর্থাৎ বিপরীতের ঐক্যের নিয়ম হল বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের সবচেয়ে মৌলিক নিয়ম। লেনিন বলেছেন: 'প্রকৃত অর্থে দ্বন্দ্ববাদ হচ্ছে বস্তুর একেবারে সারমর্মে (essence) দ্বন্দ্বের পর্যালোচনা।'[১] লেনিন এই নিয়মকে প্রায়ই দ্বন্দ্ববাদের সারবস্তু বলতেন। তিনি এটাকে দ্বন্দ্ববাদের শাঁস বলেও অভিহিত করেছেন।[২] সুতরাং এই নিয়মটি নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে, আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন এবং অনেক দার্শনিক সমস্যার আলোচনা করতে হবে। আমরা যদি এসব সমস্যা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমরা বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদ সম্পর্কে একটা মৌলিক উপলব্ধিতে পৌঁছাব। এই সমস্যাগুলো হচ্ছে: দুই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী, দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা, দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা, প্রধান দ্বন্দ্ব ও একটি দ্বন্দ্বের প্রধান দিক, দ্বন্দ্বের দিকগুলোর অভিন্নতা ও সংগ্রাম, দ্বন্দ্বে বৈরিতার স্থান।

সোভিয়েত দার্শনিক মহলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেবোরিন সম্প্রদায়ের[৩] ভাববাদের যে সমালোচনা করা হয়েছে, তা আমাদের মধ্যে গভীর ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে। দেবোরিনের ভাববাদ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অত্যন্ত বাজে প্রভাব বিস্তার করেছে। এমন কথা বলা যায় না যে, আমাদের পার্টির ভেতরে মতান্ধ চিন্তাধারার সঙ্গে ঐ সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন সম্পর্কে নেই। সুতরাং, দর্শন সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান পর্যালোচনার মূল লক্ষ্য হবে মতান্ধ চিন্তাধারার মূল উচ্ছেদ করা।

১। দুই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী

মানুষের জ্ঞানের ইতিহাসে বিশ্ব-জগতের বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে চিরকালই

দর্শন সম্পর্কে এই রচনাটি কমরেড মাও সে-তুঙ তার 'প্রয়োগ সম্পর্কে' রচনাটির পরে একই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ ঐ যুগে পার্টির অভ্যন্তরে বিদ্যমান মতান্ধতাপ্রসূত চিন্তাধারার মারাত্মক ভুলগুলি শোধরানোর জন্য রচনা করেন। সর্বপ্রথমে ইয়েনানে জাপ-বিরোধী সামরিক ও রাজনৈতিক কলেজে ভাষণরূপে প্রদত্ত এই রচনাটি 'মাও সে-তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী' তে অন্তর্ভুক্ত করবার সময়ে লেখক এটিকে সংশোধন করেন।

দুটি ধারণা চলে এসেছে : আধিবিদ্যক ধারণা এবং দ্বন্দ্ববাদী ধারণা। এ দুটির ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে দুটি পরস্পর-বিরোধী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী। লেনিন বলেছেন :

> বিকাশের (বিবর্তনের) দুটি মূল (অথবা দুটি সম্ভাব্য? অথবা দুটি ঐতিহাসিকভাবে লক্ষণীয়?) ধারণা হচ্ছে : হ্রাস ও বৃদ্ধির মধ্যে পুনরাবৃত্তি হিসেবে বিকাশ : বিপরীতের ঐক্য হিসেবে বিকাশ (পরস্পর ব্যতিরেকী বিপরীতে ঐক্যের বিভাজন এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক)।[৪]

এখানে লেনিন এই দুটি পৃথক বিশ্বদৃষ্টির কথাই উল্লেখ করেছেন।

চীনে অধিবিদ্যার আর এক নাম স্যুয়ান-স্যুয়ে। ইতিহাসের এক সুদীর্ঘকাল জুড়ে চীনে হোক বা ইউরোপে হোক, এই ধরনের চিন্তা, যা ভাববাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, মানবিক চিন্তাধারায় প্রধান স্থান দখল করেছে। ইউরোপে প্রথমদিকে বুর্জোয়াদের বস্তুবাদও ছিল আধিবিদ্যক। ইউরোপের বহু দেশে সামাজিক অর্থনীতি যখন পুঁজিবাদের অত্যুন্নত স্তরে অগ্রসর হয়েছে, উৎপাদনশক্তি, শ্রেণী-সংগ্রাম ও বিজ্ঞান সব কিছুই ইতিহাসে অভূতপূর্ব এক স্তরে বিকশিত হয়েছে এবং শিল্প-সর্বহারাশ্রেণী ঐতিহাসিক বিকাশের বৃহত্তম চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে, কেবল তখনই বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের মার্কসবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর অভ্যুদয় ঘটেছে। এর পরে, প্রকাশ্য এবং নগ্ন প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদ ছাড়াও, বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে স্থূল বিবর্তনবাদের আবির্ভাব ঘটেছে বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের বিরোধিতা করার জন্য।

আধিবিদ্যক বা স্থূল বিবর্তনবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন, নিশ্চল ও একদেশদর্শীভাবে দেখে। এটা বিশ্বের সকল বস্তুকে এবং তাদের রূপকে ও তাদের প্রজাতিকে (species) মনে করে চিরস্থায়ীভাবে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন এবং অপরিবর্তনীয়। পরিবর্তন যা হয় তা কেবল পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি অথবা স্থানের পরিবর্তনে। তাছাড়া, এরকম হ্রাস বা বৃদ্ধি অথবা স্থানের পরিবর্তনের কারন বস্তুর ভেতরে নয়, বাইরে অবস্থিত, অর্থাৎ, এর চালিকাশক্তি রয়েছে বাইরে। আধিবিদ্যকদের মতে, বিশ্বে সকল বিভিন্ন প্রকারের বস্তু এবং তাদের সকল বৈশিষ্ট্য তাদের প্রথম সৃষ্টির কাল থেকে একই অবস্থায় আছে। পরবর্তীকালের যেটুকু পরিবর্তন হয় তা শুধু পরিমাণগত প্রসারণ বা সংকোচন। তাঁরা মনে করেন যে, চিরকাল ধরে একটা বস্তু কেবল একই প্রকারের বস্তু হিসেবে বারংবার নিজের পুনরাবৃত্তি করে যেতে পারে, কিন্তু কোন স্বতন্ত্র বস্তুতে পরিবর্তিত হতে পারে না। আধিবিদ্যকদের মতে ধনতান্ত্রিক

শোষণ, ধনতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ধনতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতাদর্শ এবং অনুরূপ সবকিছুই প্রাচীন দাসসমাজে বা এমনকি আদিম সমাজেও বর্তমান ছিল, এবং এগুলো চিরকাল অপরিবর্তিতভাবেই বিদ্যমান থাকবে। তাঁরা সামাজিক বিকাশের কারণগুলো দেখিয়ে থাকেন ভূগোল ও আবহাওয়ার মতো সমাজের বাহ্যিক উপাদানের ওপর। তাঁরা বস্তুর বাইরে ঐ বস্তুর বিকাশের কারণগুলোকে খুঁজে থাকেন অতি সরলীকৃত পন্থায়, এবং বস্তুর বিকাশ যে তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণেই ঘটে থাকে—এই বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের মতবাদটিকেই তাঁরা অস্বীকার করেন। ফলে, তাঁরা বস্তুর গুণগত বিভিন্নতা, বা এক গুণের অন্য গুণে পরিবর্তনের মতো ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। ইউরোপে এই ধরনের চিন্তা ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে যান্ত্রিক বস্তুবাদ হিসেবে এবং ১৯শ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্থূল বিবর্তনবাদ হিসেবে বিদ্যমান ছিল। চীনেও যে আধিবিদ্যক চিন্তাধারার অস্তিত্ব ছিল, তার প্রমাণ এই উক্তিটি—'স্বর্গের পরিবর্তন নেই, সেইরূপ তাও-ও অপরিবর্তনীয়'[৫]। এই মতবাদ দীর্ঘকাল ধরে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক শাসক-শ্রেণীগুলোর সমর্থন পেয়ে এসেছে। গত একশ বছর ধরে ইউরোপ থেকে যা আমদানি করা হয়েছে সেই যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও স্থূল বিবর্তনবাদ পেয়েছে বুর্জোয়া-শ্রেণীর সমর্থন।

আধিবিদ্যক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীতে, বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী মনে করে যে, কোন বস্তুর বিকাশ বোঝার জন্য আমাদের বস্তুর অভ্যন্তর এবং অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্কগুলো পর্যালোচনা করতে হবে। অন্য কথায়, বস্তুর বিকাশকে তার আভ্যন্তরীণ ও আবশ্যিক নিজস্ব গতিরূপেই দেখতে হবে। আর প্রত্যেক বস্তুই তার গতিধারায় চতুর্দিকের অন্যান্য বস্তুসমূহের সঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং পরস্পরের ওপর ক্রিয়া করে। বস্তুর বিকাশলাভের মৌলিক কারণ বাহ্যিক নয়, আভ্যন্তরীণ, বস্তুর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেই এটা নিহিত। যে-কোন বস্তুর ভেতরে এই ধরনের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, সেটাই বস্তুর গতি ও বিকাশ ঘটায়। বস্তুর ভেতরকার এই ধরনের দ্বন্দ্বই হচ্ছে বস্তুর বিকাশলাভের মৌলিক কারণ। আর অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে কোন একটা বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়া হচ্ছে বস্তুর বিকাশলাভের গৌণ কারণ। এইভাবে, বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদ কার্যকরীভাবে আধিবিদ্যক যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও স্থূল বিবর্তনবাদ কর্তৃক প্রচারিত বাহ্যিক কারণ বা বাহ্যিক চালিকাশক্তি সংক্রান্ত তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান

করে। এটা পরিষ্কার যে, নিছক বাহ্যিক কারণ থেকে শুধুমাত্র যান্ত্রিক গতিই সৃষ্টি হতে পারে, অর্থাৎ আকৃতিগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু কেন যে বস্তুসমূহ হাজারো দিক দিয়ে গুণগতভাবে পৃথক এবং কেনইবা একে অন্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়, বাহ্যিক কারণ তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বাস্তবিক-পক্ষে, এমনকি বহিঃশক্তির তাড়নায় কোন বস্তুর যান্ত্রিক গতিও তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই উৎপন্ন হয়। গাছপালা ও জীবজন্তুর সহজ বৃদ্ধি এবং পরিমাণগত বিকাশও প্রধানতঃ তাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলেই ঘটে। একইভাবে, সমাজের বিকাশ প্রধানতঃ বাহ্যিক কারণে নয়, আভ্যন্তরীণ কারণেই ঘটে। বহু দেশে প্রায়ই একই ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত অবস্থা বিদ্যমান, তথাপি বিকাশের দিক থেকে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য ও অসমতা রয়েছে। অধিকন্তু, একটি দেশের ভুগোল ও জলবায়ু অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও, সেই দেশেই সমাজের বিরাট পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিবর্তিত হয়েছে, এবং বাইরের দুনিয়ার কাছে রুদ্ধদ্বার সামন্ততান্ত্রিক জাপান পরিবর্তিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী জাপানে, অথচ দেশ দুটির ভুগোল ও জলবায়ুর পরিবর্তন হয়নি। দীর্ঘকালব্যাপী সামন্তব্যবস্থার অধীনস্থ চীনে গত একশ বছরে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে, এখন তা স্বাধীন ও মুক্ত এক নতুন চীনের দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে, তবুও চীনের ভুগোল ও জলবায়ুর কোন পরিবর্তন হয়নি। সমগ্র পৃথিবী এবং তার প্রত্যেকটি অংশে ভুগোল ও জলবায়ুরও অবশ্যই পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে, কিন্তু সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করলে সেগুলো অকিঞ্চিৎকর। ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত পরিবর্তন লক্ষ লক্ষ বছরে আত্মপ্রকাশ করে, আর বিপ্লবের সময়ে সামাজিক পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করে কয়েক হাজার, কয়েক শ' বছরে অথবা কয়েক দশকে এবং এমনকি, কয়েক বছরে বা মাসে। বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদ অনুযায়ী, প্রকৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে প্রধানতঃ প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিকাশের ফলে। সমাজের পরিবর্তন ঘটে প্রধানতঃ সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিকাশের ফলে, অর্থাৎ উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদনসম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, শ্রেণীসমূহের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং নূতন ও পুরানোর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের ফলে। এই দ্বন্দ্বগুলোর বিকাশই সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয় এবং নূতন কর্তৃক পুরানো সমাজকে ধ্বংসের প্রেরণা দেয়। বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদ কি বাহ্যিক কারণকে বাতিল করে? মোটেই না। বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের মতে বাহ্যিক কারণ হচ্ছে

পরিবর্তনের শর্ত, আর আভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে পরিবর্তনের ভিত্তি। আভ্যন্তরীণ কারণের মাধ্যমেই বাহ্যিক কারণ সক্রিয় হয়। উপযুক্ত তাপেই মুরগীর ডিম মুরগীর ছানায় পরিবর্তিত হয়, কিন্তু কোন তাপই পাথরকে মুরগীর ছানায় পরিবর্তিত করতে পারে না, কারণ এ দুইয়ের ভিত্তি ভিন্ন। বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে অবিরাম পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলেছে। ধনতন্ত্রের যুগে, এবং বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাত অত্যন্ত বেশি। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুধু রুশ ইতিহাসে নয়, বিশ্বের ইতিহাসেও এক নূতন যুগের সূচনা করেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের উপর এবং সমভাবে ও বিশেষ গভীরভাবে, চীনের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের উপর একটা প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশ্য ঐ পবিবর্তনগুলো চীনসহ ঐ দেশগুলোর বিকাশের আভ্যন্তরীণ নিয়মবিধির মধ্যে দিয়েই কার্যকরী হয়েছে। দুটি সেনাবাহিনীতে যুদ্ধ হলে একটি জয়ী হয় এবং অন্যটি পরাজিত হয়। জয় ও পরাজয় উভয়ই আভ্যন্তরীণ কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। জয়ী যে হল তার কারণ, হয় সে শক্তিশালী, না হয় তার পরিচালনা সুযোগ্য। আব যে পরাজিত হল তার কারণ, হয় সে দুর্বল, না হয় তার পরিচালনা অযোগ্য। আভ্যন্তরীণ কারণের মধ্যে দিয়েই বাহ্যিক কারণ সক্রিয় হয়। ১৯২৭ সালে চীনের বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে সর্বহারাশ্রেণীর পরাজয় ঘটেছিল সে সময়ে চীনা সর্বহারাশ্রেণীর ভেতরে (চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে) বিরাজমাণ সুবিধাবাদের মধ্যে দিয়ে। যখন আমরা এই সুবিধাবাদকে নির্মূল করলাম, চীনা বিপ্লবের অগ্রগতি অবার শুরু হল। পরবর্তীকালে, শত্রুর হাতে চীনা বিপ্লবের পুনরায় গুরুতর বিপর্যয় ঘটেছিল, কারণ আমাদের পার্টির মধ্যে হঠকারিতার উদ্ভব হয়েছিল। যখন আমরা হঠকারিতা নির্মূল করলাম, তখন আমাদের আদর্শ অবার অগ্রসর হল। সুতরাং এটা দেখা যাচ্ছে যে, বিপ্লবকে বিজয়ের দিকে পরিচালনা করতে হলে, একটি রাজনৈতিক পার্টিকে অবশ্যই তার রাজনৈতিক লাইনের নির্ভুলতা ও নিজস্ব সংগঠনের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করতে হবে।

দ্বন্দ্ববাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী চীনে এবং ইউরোপে প্রাচীনকালেই দেখা দেয়। কিন্তু প্রাচীন দ্বন্দ্ববাদের ছিল কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং সাদামাঠা চরিত্র। সেকালে বিরাজমান সামাজিক ও ঐতিহাসিক অবস্থায়, তখন পর্যন্ত প্রাচীন দ্বন্দ্ববাদ

একটা তত্ত্বগত প্রণালী গড়ে তুলতে সক্ষম ছিল না। সেজন্য তা বিশ্বকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি এবং পরে অধিবিদ্যা দ্বারা স্থানচ্যুত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল দ্বন্দ্ববাদে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, কিন্তু তাঁর দ্বন্দ্ববাদ ছিল ভাববাদী। সর্বহারা আন্দোলনের মহান নেতা মার্কস ও এঙ্গেলস যখন মানবিক জ্ঞানের ইতিহাসের যথার্থ কীর্তিগুলির সমন্বয় সাধন করে, বিশেষ করে সমালোচনাত্মক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের যুক্তিপূর্ণ উপাদানগুলো গ্রহণ করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মহান তত্ত্ব গড়ে তুললেন, তখনই মানবিক জ্ঞানের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব মহাবিপ্লব সংগঠিত হল। লেনিন ও স্তালিন এই মহান তত্ত্বকে আরও বিকশিত করেন। চীনে এই তত্ত্ব বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনের চিন্তাজগতে প্রচণ্ড এক পরিবর্তন ঘটে গেল।

এই দ্বন্দ্ববাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী আমাদের প্রধানতঃ শিক্ষা দেয় কেমন করে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের গতিকে পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করতে হবে, এবং সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কেমন করে দ্বন্দ্বগুলির সমাধানের উপায় বের করতে হবে। এ জন্যই বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্বের নিয়মকে মূর্তভাবে বোঝা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২। দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা

ব্যাখ্যার সুবিধার্থে আমি প্রথমে দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতার কথা আলোচনা করব এবং তার পরে দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতার কথায় আসব। দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কারণ মার্কসবাদের মহান স্রষ্টা ও উত্তরসূরীরা—মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী আবিষ্কৃত হবার পর এবং বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদকে মানবিক ইতিহাস ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের নানা দিকের বিশ্লেষণে এবং সমাজ ও প্রকৃতির নানা দিকের পরিবর্তন সাধনে (যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে) প্রয়োগ করে বিপুল সাফল্য অর্জিত হবার পর থেকে দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পক্ষান্তরে, দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা এখনও অনেক কমরেড, বিশেষ করে মতান্ধরা পরিষ্কারভাবে বোঝেন না। তাঁরা বোঝেন না যে, দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতার মধ্যেই দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা নিহিত। তাঁরা এটাও বোঝেন না যে, বিপ্লবী

প্রয়োগের গতিপথ নির্দেশের জন্য আমাদের সামনের মূর্ত বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা পর্যালোচনা করা কত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা পর্যালোচনার উপর জোর দেওয়া এবং তা যথেষ্ট বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। এই কারণে বস্তুর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের নিয়মের বিশ্লেষণে আমরা প্রথম দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা বিশ্লেষণ করব, পরে দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা বিশ্লেষণের উপর বিশেষ জোর দেব এবং পরিশেষে আবার দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতায় ফিরে আসব।

দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা বা অনাপেক্ষিতার দুটো অর্থ আছে। একটি হচ্ছে, সকল বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকে; এবং অপরটি হচ্ছে, প্রত্যেক বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বের গতি বিদ্যমান থাকে।

এঙ্গেলস, বলেছেন: 'গতি নিজেই একটি দ্বন্দ্ব।'[৬] লেনিন বিপরীতের ঐক্যের নিয়মের সংজ্ঞাকে 'প্রকৃতির (মন ও সমাজ সহ) সমস্ত দৃশ্যমান ঘটনা ও প্রক্রিয়ার মধ্যে পরস্পর বিরোধী, পরস্পর ব্যতিরেকী ও বিপরীত প্রবণতার স্বীকৃতি (আবিষ্কার), বলে বর্ণনা করেছেন।[৭] এইসব অভিমত কি সঠিক? হ্যাঁ, সঠিক। সকল বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বী দিকগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সংগ্রাম সকল বস্তুর জীবনকে নির্ধারণ করে এবং সকল বস্তুর বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এমন কিছুই নেই যার মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই। দ্বন্দ্ব ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্বই সম্ভব নয়।

দ্বন্দ্ব হচ্ছে গতির সরল রূপগুলোর (যেমন, যান্ত্রিক গতি) ভিত্তি। গতির জটিল রূপগুলোর ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি প্রযোজ্য।

এঙ্গেলস দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে:

যদি সরল যান্ত্রিক স্থান পরিবর্তনের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে বস্তুর গতির উচ্চতর রূপের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জৈব জীবন ও তার বিকাশের ক্ষেত্রে এটা আরও সত্য।...জীবন হচ্ছে প্রধানতঃ ও নিশ্চিতরূপে এই যে কোন জীবন্ত জিনিস প্রতি মুহূর্তে সে নিজে যা তাই, অথচ আবার অন্য কিছু। অতএব জীবনও একটি দ্বন্দ্ব, যা বস্তুসমূহের ও প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে বিদ্যমান, এবং যা অবিরামভাবে নিজেকে উৎপন্ন ও বিশ্লিষ্ট করে। এবং যে মুহূর্তে দ্বন্দ্ব থেমে যায় সেই মুহূর্তে জীবনও শেষ হয়ে যায় এবং মৃত্যু এগিয়ে আসে। আমরা অনুরূপভাবে দেখেছি যে, চিন্তার ক্ষেত্রেও আমরা দ্বন্দ্বকে এড়াতে পারিনি এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখেছি, যে, একদিকে মানুষের অন্তর্নিহিত

সীমাহীন জ্ঞানার্জন-ক্ষমতা, অন্যদিকে যে মানুষেরা, বাহ্যিক দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ ও সীমিত জ্ঞানের অধিকারী কেবলমাত্র তাদের মধ্যেই এই জ্ঞানার্জন-ক্ষমতার বাস্তব রূপায়ণ—এই দুয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তার সমাধান প্রাপ্ত হয়, অন্ততঃ আমাদের পক্ষে, কার্যতঃ পুরুষানুক্রমিক ধারায় এবং অনন্ত প্রগতিতে

…উচ্চতর গণিতের মূল নীতিগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই দ্বন্দ্ব যে, বিশেষ অবস্থায় সরল ও বক্ররেখা অভিন্ন হয়ে পড়তে পারে।…

এমনকি নিম্নতর গণিতও দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ।[৮]

লেনিনও এইভাবে দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতাকে ব্যাখ্যা করেছেন:

গণিতেঃ + ও —, অন্তরকলন (Differential) ও সমাকলন (Integral)।

বলবিদ্যায়: ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া।

পদার্থবিদ্যায়: ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ।

রসায়নে: পরমাণুগুলির সংযোজন ও বিয়োজন।

সমাজবিজ্ঞানে: শ্রেণী-সংগ্রাম।[৯]

যুদ্ধে, আক্রমণ ও আত্মরক্ষা, অগ্রাভিযান ও পশ্চাদপসরণ এবং বিজয় ও পরাজয় সবই হচ্ছে পরস্পর-বিরোধী ব্যাপার। একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। দুটি দিক একই সঙ্গে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ও নির্ভরশীল এবং এটাই একটি যুদ্ধের সমগ্রতাকে গঠন করে, যুদ্ধের বিকাশকে সামনে ঠেলে দেয় এবং যুদ্ধের সমস্যাগুলোর সমাধান করে।

মানুষের ধারণায় প্রত্যেকটি পার্থক্যকে দেখতে হবে বাস্তব দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হিসেবে। বাস্তব দ্বন্দ্ব আত্মমুখী বিদ্যায় প্রতিফলিত হয় এবং এই প্রক্রিয়া ধারণার দ্বন্দ্বের গতির জন্ম দেয়, চিন্তার বিকাশকে সামনে ঠেলে দেয় এবং অবিরামভাবে মানুষের চিন্তার সমস্যাগুলোর সমাধান করে।

পার্টির ভেতরে বিভিন্ন রকমের চিন্তাধারার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগ্রাম নিরন্তর চলতে থাকে। এ হচ্ছে পার্টির ভেতরে সমাজের শ্রেণীসমূহের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের এবং নূতন ও পুরানোর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। পার্টির ভেতরে যদি কোন দ্বন্দ্ব না থাকত এবং তা সমাধান করার জন্য মতাদর্শগত সংগ্রাম না থাকত, তাহলে পার্টির জীবনই শেষ হয়ে যেত।

সুতরাং এটা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার যে, গতির সরল রূপেই হোক বা গতির জটিল রূপেই হোক, বস্তুগত ব্যাপারেই হোক বা মতাদর্শগত ব্যাপারেই হোক,

দ্বন্দ্ব সর্বজনীনভাবে বিদ্যমান এবং সকল প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান। কিন্তু প্রত্যেক প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক স্তরেও কি দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকে? প্রত্যেকটি বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি দ্বন্দ্বের গতি বিদ্যমান থাকে?

দেবোরিন সম্প্রদায়ের সমালোচনা করে লেখা সোভিয়েত দার্শনিকদের নিবন্ধগুলো থেকে জানা যায়, ঐ সম্প্রদায়ের মতে, শুরুতে নয়, বরং যখন কোন প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত হয়, কেবল তখন দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে। যদি তাই হতো তাহলে ঐ স্তরের পূর্বে প্রক্রিয়াটির বিকাশের কারণ হতো আভ্যন্তরীণ নয়, বাহ্যিক। দেবোরিন এইভাবে অধিবিদ্যার বাহ্যিক কারণের ও যান্ত্রিকতার তত্ত্বে ফিরে গেছেন। মূর্ত সমস্যার বিশ্লেষণে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করে দেবোরিন সম্প্রদায় সোভিয়েত ইউনিয়নে বিরাজমান অবস্থায় কুলাক ও সাধারণ কৃষকদের মধ্যে কেবল পার্থক্যই দেখেন, দ্বন্দ্ব দেখেন না, এবং বুখারিনের সঙ্গে সর্বতোভাবে একমত হয়ে যান[১০]। ফরাসী বিপ্লবের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে, অনুরূপভাবে বিপ্লবের আগে শ্রমিক, কৃষক ও বুর্জোয়াদের নিয়ে গঠিত তৃতীয় এষ্টেটের মধ্যে শুধু পার্থক্যই ছিল, দ্বন্দ্ব ছিল না। দেবোরিন সম্প্রদায়ের এসব মত মার্কসবাদবিরোধী। তাঁরা বোঝেন না যে, প্রত্যেক পার্থক্যের মধ্যেই রয়েছে দ্বন্দ্ব এবং পার্থক্য নিজেই হচ্ছে দ্বন্দ্ব। শ্রমিক ও পুঁজিপতিশ্রেণীর দুটির জন্মের সময় থেকেই শ্রম ও পুঁজির মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে, তবে প্রথমে এই দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠেনি। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নে বিরাজমান সামাজিক অবস্থাতেও শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্যই হচ্ছে দ্বন্দ্ব, যদিও শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্বের মতো এটা শত্রুতামূলকভাবে তীব্র হয়ে উঠবে না বা শ্রেণীদ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করবে না। সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে দৃঢ় মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে এবং সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে অগ্রগতির পথে ক্রমে এই দ্বন্দ্বের সমাধান হয়ে যাবে। এটি দ্বন্দ্বের চরিত্রে পার্থক্যের প্রশ্ন, দ্বন্দ্বের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির প্রশ্ন নয়। দ্বন্দ্ব সর্বজনীন ও অনাপেক্ষিক এবং এটা সকল বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান এবং সকল প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবহমান।

একটি নূতন প্রক্রিয়ায় আবির্ভাব দ্বারা কি বোঝায়? যখন পুরানো ঐক্য ও তার মধ্যেকার বিপরীত উপাদানগুলোর বদলে এক নূতন ঐক্য ও তার নিজস্ব বিপরীত উপাদানগুলো আবির্ভূত হয়, তখন পুরানো প্রক্রিয়ার স্থলে শুরু হয় এক নূতন প্রক্রিয়া। পুরানো প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় এবং নূতন প্রক্রিয়া শুরু

হয়। নূতন প্রক্রিয়ায় নিহিত থাকে নূতন দ্বন্দ্ব এবং এই নূতন প্রক্রিয়া দ্বন্দ্বের বিকাশের নিজস্ব ইতিহাসের সূচনা করে।

লেনিন দেখিয়েছেন যে, সকল বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে দ্বন্দ্বের গতি বিদ্যমান থাকে, সেই সম্বন্ধ মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে এক আদর্শ বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। যে-কোন বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়াকে পর্যালোচনা করতে হলে এই পদ্ধতি অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। লেনিন নিজেও সঠিকভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে গেছেন এবং তাঁর সব রচনায় তা অনুসরণ করেছেন।

> মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে প্রথমে বিশ্লেষণ করেছেন বুর্জোয়া (পণ্য) সমাজের সবচেয়ে সরল, সবচেয়ে সাধারণ, সবচেয়ে মৌলিক, সবচেয়ে সর্বজনীন, সবচেয়ে প্রাত্যহিক সম্পর্কটির, কোটি কোটি বার দেখা দিচ্ছে এমন সম্পর্কটির, অর্থাৎ পণ্য বিনিময়ের। বিশ্লেষণ এই অতি সরল দৃশ্যমান ঘটনাটিতেই (বুর্জোয়া সমাজের এই 'জীবকোষ'-টিতে) আধুনিক সমাজের সকল দ্বন্দ্বকে (বা সকল দ্বন্দ্বের বীজকে) তুলে ধরে। পরবর্তী ব্যাখ্যা আমাদের দেখিয়ে দেয় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সব দ্বন্দ্বের এবং এই সমাজের আলাদা আলাদা অংশের যোগফলের বিকাশ (বৃদ্ধি ও গতি উভয়ই)।

এর পর লেনিন আরও বলেছেন: 'সাধারণভাবে দ্বন্দ্ববাদকে ব্যাখ্যার (বা পর্যালোচনার) পদ্ধতি এরকমই হতে হবে।'[১১]

চীনের কমিউনিস্টদের অবশ্যই এই পদ্ধতি শিখতে হবে। কেবল তাহলেই তাঁরা সঠিকভাবে চীনের বিপ্লবের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করতে এবং বিপ্লবের ভবিষ্যৎ অনুমান করতে সক্ষম হবেন।

৩। দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা

সকল বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব বিদ্যমান এবং প্রত্যেক বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবহমান। এটাই হচ্ছে দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ও অনাপেক্ষিকতা, যা আমরা উপরে আলোচনা করেছি। এখন আমরা দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা ও আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

এই সমস্যাটি কয়েকটি পর্যায়ে পর্যালোচনা করতে হবে।

প্রথমতঃ, পদার্থের গতির প্রত্যেক রূপের মধ্যে দ্বন্দ্বের নিজস্ব বিশিষ্টতা

রয়েছে। পদার্থ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান হচ্ছে পদার্থের গতির রূপগুলো সম্পর্কে জ্ঞান, কারণ গতিশীল পদার্থ ছাড়া বিশ্বে অন্য কিছুই নেই এবং এই গতিকে অবশ্যই কোন রূপ পরিগ্রহ করতে হবে। পদার্থের গতির প্রত্যেকটি রূপ বিচার করার সময়, ঐ রূপের সঙ্গে গতির অন্যান্য রূপের যেসব বিষয়ে মিল রয়েছে, তা লক্ষ্য করতে হবে। কিন্তু বস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে, বস্তুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে হবে, অর্থাৎ ঐ রূপের সঙ্গে গতির অন্যান্য রূপের গুণগত পার্থক্য লক্ষ্য করতে হবে। তা করলেই কেবল আমরা বস্তুসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব। গতির যে-কোন রূপের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে তার নিজস্ব বিশেষ দ্বন্দ্ব। এই বিশেষ দ্বন্দ্বই হচ্ছে সেই বিশেষ সারবস্তু, যা একটা বস্তুকে অপর বস্তু থেকে পৃথক করে। এটা হচ্ছে বিশ্বের বস্তুসমূহের বহু বৈচিত্র্যের আভ্যন্তরীণ কারণ বা ভিত্তি। প্রকৃতিতে গতির অনেক রূপ আছে, যেমন যান্ত্রিক গতি, শব্দ, আলো, তাপ, বিদ্যুৎ, বিয়োজন ও সংযোজন প্রভৃতি। পদার্থের এই সমস্ত গতির রূপহ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু সারবস্তুতে পরস্পর থেকে আলাদা। পদার্থের প্রত্যেক গতির রূপের বিশেষ সারবস্তু নির্ধারিত হয় তার নিজস্ব বিশেষ দ্বন্দ্ব দ্বারা। কেবল প্রকৃতির বেলায় নয়, বরং সমাজসংক্রান্ত ও মতাদর্শ-গত ব্যাপারেও এটা সত্য। প্রতিটি সামাজিক রূপ ও প্র তটি মতদের্শগত রূপের রয়েছে নিজস্ব বিশেষ দ্বন্দ্ব এবং বিশেষ সারবস্তু।

বিজ্ঞানকে পৃথক করা হয় পর্যালোচনার বিভিন্ন বিষয়বস্তুর বিশেষ দ্বন্দ্বগুলোর ভিত্তিতে। এইভাবে কোন বিষয়ের বিশেষ কোন দ্বন্দ্ব বিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট শাখার পর্যালোচনার বিষয়বস্তু। যেমন, গণিতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক রাশি; বল-বিদ্যায় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া; পদার্থবিদ্যায় ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ, রসায়নে বিয়োজন ও সংযোজন; সমাজবিজ্ঞানে উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংগ্রাম; রণবিজ্ঞানে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা; এবং দর্শনে ভাববাদ ও বস্তুবাদ, অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গী ও দ্বন্দ্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি—এ সবই হচ্ছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিচার্য বিষয়। এবং এটা ঠিক এই কারণেই যে, প্রত্যেক শাখারই রয়েছে বিশেষ দ্বন্দ্ব ও বিশেষ সারবস্তু। অবশ্য, দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে বস্তুর গতি বা বিকাশের সর্বজনীন কারণ বা সর্বজনীন ভিত্তি আবিষ্কার করার কোন উপায় আমাদের থাকে না। পক্ষান্তরে, দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা পর্যালোচনা না করলে আমাদের পক্ষে একটি বস্তুর

বিশেষ সারবস্তুকে—যা অন্যান্য বস্তু থেকে তাকে পৃথক করে—নির্ণয় করার কোন উপায় থাকে না, বস্তুর গতি বা বিকাশের বিশেষ কারণ বা বিশেষ ভিত্তি আবিষ্কার করার কোন উপায় থাকে না, উপায় থাকে না একটি বস্তুকে অন্যটি থেকে আলাদা করার বা বিজ্ঞানের বিষয়গুলির সীমানা নির্দেশ করার।

মানুষের জ্ঞানের গতির পর্যায়ক্রম সম্পর্কে বলা যায়, সর্বদাই স্বতন্ত্র ও বিশেষ বস্তুর জ্ঞান থেকে সাধারণভাবে সকল বস্তুর জ্ঞানে একটা ক্রমিক বিকাশ রয়েছে। মানুষ নানা বিভিন্ন বস্তুর বিশেষ সারবস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পরই কেবল সাধারণীকরণের দিকে অগ্রসর হতে এবং বস্তুসমূহের অভিন্ন সারবস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে। এই অভিন্ন সারবস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পর মানুষ এটাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে ব্যবহার করে, যেসব মূর্ত বস্তু এখনও পর্যালোচন করা হয়নি অথবা পুংখানুপুংখরূপে পর্যালোচনা করা হয়নি, সেগুলো পর্যালোচনা করার এবং সেগুলোর বিশেষ সারবস্তু আবিষ্কার করার কাজে অগ্রসর হয়। কেবল এইভাবেই মানুষ ঐ বস্তুসমূহের অভিন্ন সারবস্তু সম্পর্কে নিজের জ্ঞানকে বাড়াতে, সমৃদ্ধ করতে ও বিকশিত করতে পারে এবং এই জ্ঞানের ক্ষয় বা পচন রোধ করতে পারে। জ্ঞানের প্রক্রিয়া এই দুটি: একটি বিশেষ থেকে সাধারণে এবং অন্যটি সাধারণ থেকে বিশেষে। এইভাবে মানবের জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়া সর্বদাই চক্রাকারে আবর্তিত হয় এবং প্রত্যেক চক্র (যতক্ষণ বৈজ্ঞানিক পন্থা কঠোরভাবে অনুসৃত হয়) মানবিক জ্ঞানকে এক ধাপ উঁচুতে এগিয়ে দেয় এবং এইভাবে আরও বেশি গভীর করে তোলে। এ ব্যাপারে আমাদের মতান্ধরা যেখানে ভুল করেন তা হচ্ছে এই যে, একদিকে, তাঁরা বোঝেন না যে, দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতাকে এবং বস্তুসমূহের অভিন্ন সারবস্তুকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পাবার আগে দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতাকে পর্যালোচনা করতে হবে এবং প্রত্যেকটি বস্তুর বিশেষ সারবস্তুকে জানতে হবে। অপরদিকে, তাঁরা বোঝেন না যে, বস্তুর অভিন্ন সারবস্তু বোঝার পর আমাদের আরও অগ্রসর হয়ে, যেসব মূর্ত বস্তু পুংখানুপুংখরূপে পর্যালোচনা করা হয়নি বা সবেমাত্র উদ্ভূত হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করতে হবে। আমাদের মতান্ধরা হাড়ে হাড়ে অলস। তাঁরা ধৈর্যসহকারে মূর্ত বস্তুর পর্যালোচনা করতে নারাজ। তাঁরা সাধারণ সত্যগুলোকে শূন্যতার মধ্য থেকে উদ্ভূত বলে গণ্য করেন এবং সেগুলোকে শুধুমাত্র বিমূর্ত দুর্বোধ্য সূত্রে পরিণত করেন। তার ফলে যে স্বাভাবিক পর্যায়ক্রম দ্বারা সত্যকে মানুষ জানতে পারে, তাকে তারা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এবং উল্টে

দেন। বিশেষ থেকে সাধারণে এবং তারপর সাধারণ থেকে বিশেষে—মানবিক জ্ঞানের এই দুটি প্রক্রিয়ার পারস্পরিক সংযোগও তাঁরা বোঝেন না। মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্ব তাঁরা আদৌ বোঝেন না।

কেবল পদার্থের গতির রূপসমূহের প্রত্যেকটি বড় ব্যবস্থার বিশেষ দ্বন্দ্বকে এবং এর দ্বারা নির্ধারিত সারবস্তুকেই নয়, উপরন্তু পদার্থের গতির প্রত্যেকটি রূপের বিকাশের দীর্ঘ ধারায় প্রত্যেক প্রক্রিয়ার বিশেষ দ্বন্দ্বকে এবং সারবস্তুকেও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। গতির প্রত্যেকটি রূপে বিকাশের প্রত্যেকটি বাস্তব (কাল্পনিক নয়) প্রক্রিয়া গুণগতভাবে পৃথক। আমাদের পর্যালোচনায় এই বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে এবং এখান থেকেই শুরু করতে হবে।

গুণগতভাবে ভিন্ন দ্বন্দ্বগুলোর সমাধান কেবলমাত্র গুণগতভাবে ভিন্ন পদ্ধতির দ্বারাই করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; ব্যাপক জনসাধারণ ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; উপনিবেশসমূহ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব কৃষির যৌথীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের পদ্ধতির দ্বারা সমাধান করা হয়; কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরকার দ্বন্দ্ব সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; সমাজের ও প্রকৃতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব উৎপাদন-শক্তির বিকাশসাধনের দ্বারা মীমাংসা করা হয়। প্রক্রিয়ার পরিবর্তন হয়, পুরানো প্রক্রিয়া ও পুরানো দ্বন্দ্ব বিলীন হয়ে যায়, নূতন প্রক্রিয়া ও নূতন দ্বন্দ্বের আবির্ভাব হয়, এবং দ্বন্দ্বগুলোর মীমাংসার পদ্ধতিও সেই অনুযায়ী ভিন্ন হয়। রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারী বিপ্লব যে দ্বন্দ্বের সমাধান করে এবং অক্টোবর বিপ্লব যে দ্বন্দ্বের সমাধান করে, তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে, পার্থক্য আছে তাদের সমাধানের পদ্ধতির মধ্যেও। ভিন্ন দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে এমন একটা মূলনীতি, যা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের অবশ্যই কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। মতান্ধরা এই মূলনীতি মেনে চলেন না। তাঁরা বোঝেন না যে, বিভিন্ন ধরনের বিপ্লবে অবস্থার পার্থক্য ঘটে, এবং এজন্য এটাও বোঝেন না যে, ভিন্ন দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা দরকার। পক্ষান্তরে, যেটাকে তাঁরা অপরিবর্তনীয় সূত্র বলে ধরে নেন, সেটাকেই ব্যতিক্রমহীনভাবে

অবলম্বন করেন এবং সর্বত্র নির্বিচারে প্রয়োগ করেন। এটা কেবল বিপ্লবের বিপত্তিই ঘটায়, বা যা বেশ সুষ্ঠুভাবেই সমাপ্ত হতে পারত তাতে একটা শোচনীয় তালগোল পাকিয়ে তোলে।

একটা বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বগুলোর সমগ্রতায় ও পারস্পরিক সংযোগে দ্বন্দ্বগুলোর বিশিষ্টতাকে উদ্ঘাটন করার জন্য অর্থাৎ ঐ প্রক্রিয়ার সারবস্তুকে উদ্ঘাটন করার জন্য, ঐ প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বগুলোর সবদিকের বিশিষ্টতাকে উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। অন্যথায় ঐ প্রক্রিয়ার সারবস্তুকে উদ্ঘাটন করা অসম্ভব হবে। তার পর্যালোচনায়ও আমাদের গভীরভাবে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

কোন বড় বস্তু বা বিষয়ের বিকাশের ধারায় বহু দ্বন্দ্ব থাকে। যেমন, চীনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারায় পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। সেখানে চীনের সমাজের সকল নিপীড়িত শ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, ব্যাপক জনসাধারণ এবং সামন্তব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, সর্বহারাশ্রেণী এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, একদিকে কৃষকশ্রেণী ও শহরে পেটি-বুর্জোয়া এবং অন্যদিকে বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বর্তমান রয়েছে। এইসব দ্বন্দ্বের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বিশিষ্টতা থাকার জন্য একইভাবে তাদেরকে মোকাবিলা করা যায় না। তাছাড়া প্রত্যেক দ্বন্দ্বের দুটি দিকের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বিশিষ্টতা থাকে বলে একইভাবে তাদেরকেও মোকাবিলা করা যায় না। আমরা যারা চীনা বিপ্লবে নিয়োজিত রয়েছি, তাদের কেবল দ্বন্দ্বগুলোর সমগ্রতায় অর্থাৎ পারস্পরিক সংযোগে দ্বন্দ্বগুলোর বিশিষ্টতাকে বুঝলেই চলবে না, পরন্তু, প্রত্যেক দ্বন্দ্বের দুটি দিককেই পর্যালোচনা করতে হবে। সমগ্রতাকে বুঝতে হলে এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। যখন আমরা একটা দ্বন্দ্বের প্রত্যেকটি দিককে জানার কথা বলি, তখন আমরা প্রত্যেকটি দিক কোন্ নির্দিষ্ট অবস্থান অধিকার করে, প্রত্যেকটি দিক তার বিপরীতের সঙ্গে পরস্পর নির্ভরশীলতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন্ মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে এবং দিক দুটির পরস্পর নির্ভরশীলতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ভেঙে পড়ার পরে প্রত্যেকটি দিক তার বিপরীতের সঙ্গে সংগ্রামে কোন্ মূর্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে, তা জানার কথাই বলি। এই সমস্ত সমস্যার পর্যালোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেনিন যখন বলেছেন, মার্কসবাদের একান্ত সারবস্তু এবং মার্কসবাদের জীবন্ত মর্মবস্তু হচ্ছে মূর্ত অবস্থা-

সমূহের মূর্ত বিশ্লেষণ[১২]—তখন তিনি ঠিক একথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। আমাদের মতান্ধরা লেনিনের শিক্ষাকে লংঘন করেছেন। তাঁরা কখনও কোন কিছুকে মূর্তভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য মাথা ঘামান না। তাঁদের লেখায় ও বক্তৃতায় তাঁরা সর্বদাই অর্থহীন ও শূন্যগর্ভ একঘেয়ে রচনার কায়দা অবলম্বন করেন, এবং তার ফলে আমাদের পার্টিতে কাজের অত্যন্ত বাজে রীতি সৃষ্টি করেন।

সমস্যার পর্যালোচনার ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই আত্মমুখিতা, একদেশ-দর্শিতা ও ওপর ওপর দেখা পরিত্যাগ করতে হবে। যাকে আত্মমুখিতা বলে, তা হল সমস্যাকে বাস্তবভাবে না দেখা, অর্থাৎ বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে সমস্যাকে না দেখা। আমার 'প্রয়োগ সম্পর্কে' নিবন্ধে এই বিষয়ে আমি ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। একদেশদর্শিতার অর্থ হচ্ছে সমস্যাকে সব দিক থেকে না দেখা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেবল চীনকে বোঝা—জাপানকে নয়, কেবল কমিউনিস্ট পার্টিকে বোঝা—কুওমিনতাঙকে নয়, কেবল সর্বহারাশ্রেণীকে বোঝা—বুর্জোয়াশ্রেণীকে নয়, কেবল কৃষককে বোঝা—জমিদারকে নয়, কেবল অনুকূল অবস্থাগুলোকে বোঝা—প্রতিকূল অবস্থাগুলোকে নয়, কেবল অতীতকে বোঝা—ভবিষ্যৎকে নয়, কেবল অংশকে বোঝা—সমগ্রকে নয়, কেবল ত্রুটিকে বোঝা—সাফল্যকে নয়, কেবল ফরিয়াদীকে বোঝা—আসামীকে নয়, কেবল গোপন বিপ্লবী কাজকে বোঝা—প্রকাশ্য বিপ্লবী কাজকে নয়, ইত্যাদি। এক কথায়, এর অর্থ একটা দ্বন্দ্বের উভয় দিকের বৈশিষ্ট্যগুলোকে না বোঝা। একটা সমস্যাকে একদেশদর্শীভাবে দেখা বলতে আমরা এটাই বোঝাতে চাই। অথবা বলা যায় যে, শুধু অংশবিশেষকে দেখা, সমগ্রকে নয়; শুধু বৃক্ষগুলোকেই দেখা, অরণ্যকে নয়। এইভাবে কোন দ্বন্দ্বের সমাধানের পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, অসম্ভব বিপ্লবী কর্তব্য সম্পন্ন করা, অসম্ভব অর্পিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করা, অসম্ভব পার্টির আভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত সংগ্রামকে সঠিকভাবে বিকশিত করে তোলা। সামরিক বিজ্ঞান প্রসঙ্গে সুন উ জু বলেছিলেন, 'শত্রুকে জানুন, আর নিজেকে জানুন, তাহলে একশ বার যুদ্ধ করলেও পরাজিত হবেন না।'[১৩] তিনি এখানে যুদ্ধরত দুটি পক্ষের উল্লেখ করেছেন। থাং রাজবংশের আমলে ওয়েই চেং[১৪] যখন বলেছিলেন, 'উভয় পক্ষকে শুনলে আপনি জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত হবেন, আর একপক্ষকে বিশ্বাস করলে অজ্ঞানতিমিরে ডুববেন,'—তখন তিনিও একদেশ-দর্শিতার ভুল ধরতে পেরেই একথা বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের কমরেডরা

প্রায়শঃই একতরফাভাবে সমস্যাকে দেখে থাকেন, আর তাই প্রায়ই তাঁরা অপ্রত্যাশিত বাধার মধ্যে পড়েন। **শুই হু চুয়ান** উপন্যাসটিতে সুং চিয়াং তিনবার চু গ্রাম আক্রমণ করেন[১৫]। প্রথম দুবার তিনি পরাজিত হন, কারণ স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল না এবং তিনি ভুল পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। পরে তিনি তাঁর পদ্ধতি পরিবর্তন করেন। প্রথমে তিনি অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করেন এবং রাস্তাগুলোর গোলকধাঁধার সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করে তোলেন, তারপর লি, হু ও চু গ্রামের মৈত্রী ভাঙেন এবং বিদেশী গল্পের ট্রয়ের ঘোড়ার মতো ফন্দি[১৬] করে ওঁৎ পেতে থাকার উদ্দেশ্যে শত্রুশিবিরে ছদ্মবেশে নিজের লোক পাঠান। তৃতীয়বার তিনি যুদ্ধে বিজয়ী হন। **শুই হু চুয়ান** উপন্যাসটিতে বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যার মধ্যে চু গ্রামের উপর তিনবার আক্রমণের উপাখ্যানটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ। লেনিন বলেন :

> '...কোন বস্তুকে সত্যি সত্যি জানার জন্য অবশ্যই তার সব দিক, তার সব সংযোগ ও "মধ্যস্থতাকে" গভীরভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং সেগুলির পর্যালোচনা করতে হবে। কোনদিনই এটাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করব না, কিন্তু সর্বতোমুখী বিচার-বিবেচনার দাবি করতে হবে, কারণ এটা আমাদের ভুল ও আড়ষ্টতা থেকে রক্ষা করবে।'[১৭]

তাঁর কথাগুলো আমাদের স্মরণে রাখা উচিত। ওপর ওপর দেখার অর্থ হল দ্বন্দ্বের সামগ্রিকতা ও দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিকের বৈশিষ্ট্যগুল্যের বিচার না করা, কোন বস্তুর গভীরে গিয়ে পুংখানুপুংখভাবে দ্বন্দ্বর বৈশিষ্ট্যকে পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা, শুধু দূর থেকে দেখা এবং এক নিমেষে দ্বন্দ্বের পরিলেখটি (outline) দেখার পর তক্ষুণি তার মীমাংসার চেষ্টা করা (প্রশ্নের জবাব, বিতর্কের মীমাংসা, কার্য চালনা অথবা যুদ্ধ পরিচালনা)। এইভাবে কাজ করলে বিভ্রাট ঘটতে বাধ্য। যে যে কারণে চীনের মতান্ধ ও অভিজ্ঞতাবাদী কমরেডরা ভুল করেছেন, তা তাঁদের বস্তুকে দেখার আত্মমুখী, একদেশদর্শী ও ভাসাভাসা পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত। একদেশদর্শিতা ও ওপর ওপর দেখাটাও আত্মমুখিতা, কারণ সমস্ত বাস্তব জিনিসই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে পরস্পর সংযুক্ত এবং আভ্যন্তরীণ বিধিনিয়মের দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু এই অবস্থাগুলো যথার্থভাবে প্রতিফলিত করবার দায়িত্ব গ্রহণের বদলে কিছু লোক সেগুলোকে একতরফা ও ভাসাভাসাভাবে দেখেন এবং সেগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগ জানেন না, সেগুলোর আভ্যন্তরীণ বিধিনিয়মও বোঝেন না এবং

সেজন্য এ ধরনের পদ্ধতি হচ্ছে আত্মমুখীবাদী পদ্ধতি।

আমাদের শুধু কোন বস্তুর বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বগুলোর গতিতে তাদের পারস্পরিক সংযোগ ও তাদের প্রত্যেকটি দিকের অবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলোকে লক্ষ্য করলেই চলবে না, উপরন্তু বিকাশের প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলোও আমাদের লক্ষ্য করতে হবে।

কোন বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় মূল দ্বন্দ্ব এবং ঐ দ্বন্দ্ব দ্বারা নির্ণীত প্রক্রিয়ার সারবস্তু প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে না। কিন্তু বস্তুর বিকাশের একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় বিকাশের প্রত্যেক স্তরে অবস্থা সাধারণতঃ পৃথক হয়। কারণ, একটা বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় মূল দ্বন্দ্বের প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়ার সারবস্তু অপরিবর্তিত থেকে গেলেও, ঐ দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় এক স্তর থেকে আরেক স্তরে অতিক্রমণের সাথে মূল দ্বন্দ্বটি ক্রমান্বয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। তা ছাড়া, মূল দ্বন্দ্ব দ্বারা নির্ণীত বা প্রভাবিত বহু সংখ্যক ছোট-বড় দ্বন্দ্বের মধ্যে কতকগুলো তীব্রতর হয়, কতকগুলো অস্থায়ীভাবে বা আংশিকভাবে মীমাংসিত হয় বা চাপা পড়ে যায়, এবং কয়েকটি নূতন দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে। এজন্য প্রক্রিয়া স্তরসমূহ দ্বারা চিহ্নিত। যদি লোকে একটা বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ার স্তর-সমূহের প্রতি মনোযোগ না দেয়, তাহলে তারা তার দ্বন্দ্বগুলোর যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারবে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হল, তখন মূল দ্বন্দ্বে নিয়োজিত শ্রেণী দুটির—যথা সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রকৃতিতে এবং সমাজের ধনতান্ত্রিক সারবস্তুতে কোন পরিবর্তন হল না। যাহোক, এই দুটি শ্রেণীর দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠল, একচেটিয়া পুঁজি ও অ একচেটিয়া পুঁজির দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করল, প্রভু দেশগুলো ও তাদের উপনিবেশগুলোর দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠল, অসম বিকাশের ফলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব বিশেষ তীব্র হয়ে দেখা দিল, এবং এইভাবে ধনতন্ত্রের বিশেষ স্তর—সাম্রাজ্যবাদী স্তরের সৃষ্টি হল। লেনিনবাদকে যে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ, তার কারণ, লেনিন ও স্তালিন সঠিকভাবেই এই দ্বন্দ্বগুলির ব্যাখ্যা করেছেন এবং এই দ্বন্দ্বগুলির মীমাংসার জন্য সঠিকভাবেই সর্বহারা বিপ্লবের তত্ত্ব ও কৌশল প্রণয়ন করেছেন।

১৯১১ সালের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যার শুরু, চীনের সেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করলেও কতকগুলি বিশেষ স্তর চোখে পড়বে।

বিশেষ করে, বুর্জোয়া নেতৃত্বের পর্যায়কালের বিপ্লব এবং সর্বহারা নেতৃত্বের পর্যায়কালের বিপ্লব দুটি বিরাট পার্থক্যবিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্তর। অন্য কথায় সর্বহারা নেতৃত্ব বিপ্লবের চেহারাকে মৌলিকভাবে পাল্টে দিয়েছে, শ্রেণীসম্পর্কের নূতন বিন্যাস ঘটিয়াছে, কৃষি-বিপ্লবে এক বিপুল জোয়ার এনেছে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে সম্পূর্ণতা দান করেছে, এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, ইত্যাদি। বিপ্লব যখন বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন ছিল, তখন এর কিছুই সম্ভব ছিল না। যদিও সামগ্রিকভাবে ঐ প্রক্রিয়ার মূল দ্বন্দ্বের প্রকৃতিতে, অর্থাৎ প্রক্রিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রকৃতিতে (যার বিপরীত হচ্ছে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক প্রকৃতি) কোন পরিবর্তন ঘটেনি, তথাপি বিশ বছরে ঐ প্রক্রিয়া কয়েকটি স্তর অতিক্রম করেছে। এই দীর্ঘ সময়কালে অনেক বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে—১৯১১ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতা ও উত্তরাঞ্চলীয় সমরনায়কদের শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রথম জাতীয় যুক্তফ্রন্টের স্থাপনা ও ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লব, যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গন ও বুর্জোয়াদের প্রতি-বিপ্লবের পক্ষে যোগদান, নূতন সমরনায়কদের যুদ্ধ, ভূমি-বিপ্লবী যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় জাতীয় যুক্তফ্রন্টের স্থাপনা জাপান-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ ইত্যাদি। এই স্তরগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত, যেমন, কতকগুলো দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি (দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভূমি-বিপ্লবী যুদ্ধ ও উত্তর-পূর্বের চারটি প্রদেশের উপর জাপ আক্রমণ[১৮]), কতকগুলো দ্বন্দ্বের আংশিক বা সাময়িক মীমাংসা (দৃষ্টান্তস্বরূপ, উত্তরাঞ্চলীয় সমরনায়কদের ধ্বংসসাধন ও আমাদের দ্বারা জমিদারদের জমির বাজেয়াপ্তকরণ) এবং কতকগুলো দ্বন্দ্বের পুনরায় আবির্ভাব (দৃষ্টান্তস্বরূপ, নূতন সমরনায়কদের মধ্যেকার সংগ্রাম ও দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাগুলো হারানোর পর জমিদারদের দ্বারা জমির পুনর্দখল) ইত্যাদি।

কোন বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ার প্রত্যেক স্তরে দ্বন্দ্বগুলোর বিশিষ্টতাগুলো পর্যালোচনা করতে হলে আমাদের শুধু তাদের সংযোগে তা তাদের সমগ্রতায় দেখলে চলবে না, প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক দ্বন্দ্বের দুটি দিককেই পরীক্ষা করতে হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির কথা ধরুন। একটা দিককে, কুওমিনতাঙকে নেওয়া যাক। প্রথম যুক্তফ্রন্টের পর্যায়কালে কুওমিনতাঙ রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা ও কৃষক-শ্রমিকদের

সাহায্য করা—সান ইয়াৎ-সেনের তিন মহান কর্মনীতি কার্যকর করেছিল[৮]। এজন্য তা ছিল বিপ্লবী ও প্রাণবান এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর একটা মৈত্রী। ১৯২৭ সাল থেকে কুওমিনতাঙ বিপরীত দিকে মুখ ফেরায় এবং জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল জোটে পরিণত হয়। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে সীআন ঘটনার[৯] পর, গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানোর এবং জাপ সাম্রাজ্যবাদকে সম্মিলিতভাবে বাধা দানের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সাথে মৈত্রীর দিকে এর আরেকটা পরিবর্তন শুরু হয়। এইই হল কুওমিনতাঙের এই তিন স্তরের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য, নানা ধরনের কারণ থেকে এই বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্ভূত হয়েছে। এখন অন্যদিকটিকে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কথা, ধরা যাক। প্রথম যুক্তফ্রণ্টের পর্যায়কালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তার শৈশবাবস্থায়। সে ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবকে সাহসিকতার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিল, কিন্তু বিপ্লবের চরিত্র করণীয় কাজ ও পদ্ধতিগুলো বোঝার ব্যাপারে তার অপরিপক্কতা প্রকাশ পেয়েছিল এবং সেই জন্যই ঐ বিপ্লবের শেষের দিকে ছেন তু-সিউবাদের পক্ষে নিজেকে জাহির করা ও বিপ্লবের পরাজয় ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। ১৯২৭ সাল থেকে, সে আবার সাহসিকতার সাথে ভূমি-বিপ্লব যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং বিপ্লবী সেনাবাহিনী ও বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সে হঠকারিতামূলক ভুল করে বসে, যার ফলে সেনাবাহিনীর ও ঘাঁটি এলাকাগুলোর বিপুল ক্ষতি হয়। ১৯৩৫ সাল থেকে পার্টি ঐ ভুল সংশোধন করেছে এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য নূতন যুক্তফ্রণ্টকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। এই মহান সংগ্রাম এখন বিকাশলাভ করছে। বর্তমান স্তরে কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে সেই পার্টি, যা দুটো বিপ্লবের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পার হয়েছে এবং বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এটাই হল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির এই তিন স্তরের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলোও নানাপ্রকার কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। দুই পার্টির এই বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা না করলে আমরা বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে দুই পার্টির বিশেষ আন্তঃসম্পর্কগুলোকে বুঝতে পারব না, যথা একটা যুক্তফ্রণ্টের স্থাপনা, যুক্তফ্রণ্টের ভাঙন এবং আরেকটা যুক্তফ্রণ্টের স্থাপনা। পার্টি দুটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনার জন্য যা আরও মৌলিক তা হচ্ছে পার্টি দুটির শ্রেণীভিত্তি এবং এর ফলে প্রত্যেকটি পার্টি ও অন্যান্য শক্তিগুলোর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়কালে উদ্ভূত দ্বন্দ্বগুলো পরীক্ষা করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে প্রথম মৈত্রীর পর্যায়কালে

কুওমিনতাঙের একদিকে ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, এবং এজন্য কুওমিনতাঙ ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ; অন্যদিকে ছিল দেশের ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে দ্বন্দ্ব—কথায় কুওমিনতাঙ মেহনতী জনগণকে অনেক সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খুবই নগণ্য সুবিধা দিয়াছে বা কিছুই দেয়নি। কমিউনিস্টবিরোধী যুদ্ধ চালানোর পর্যায়কালে, ব্যাপক জনসাধারণের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের সাথে সহযোগিতা করেছিল এবং বিপ্লবে ব্যাপক জনসাধারণ যে সমস্ত সুবিধা অর্জন করেছিল তা নির্মূল করেছিল এবং তার ফলে জনগণের সাথে নিজের দ্বন্দ্ব তীব্র করে তুলেছিল। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের বর্তমান পর্যায়কালে, জাপ-সাম্রাজ্যবাদের সাথে কুওমিনতাঙের দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং সে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে মৈত্রীবদ্ধ হতে চায়, কিন্তু একই সময় কমিউনিস্ট পার্টি ও দেশের জনগণের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম ও তাদের উপর তার অত্যাচার শিথিল করতে চায় না। কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে বলা যায়, সে সর্বদাই, প্রত্যেক পর্যায়কালে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে থেকেছে। কিন্তু জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের বর্তমান পর্যায়কালে, কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনতাঙ ও দেশীয় সামন্তশক্তিগুলোর প্রতি নরম নীতি গ্রহণ করেছে, কারণ কুওমিনতাঙ জাপানকে প্রতিরোধ করার পক্ষে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। উপরোক্ত পরিস্থিতির ফল দাঁড়িয়েছে পার্টি দুটির মধ্যে কখনো মৈত্রী, আবার কখনো সংগ্রাম, এবং এমনকি মৈত্রীর পর্যায়কালগুলোতেও একই সাথে মৈত্রী ও সংগ্রামের জটিল অবস্থা বিদ্যমান থেকেছে। যদি আমরা দ্বন্দ্বের এইসব দিকের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা না করি, তাহলে আমরা প্রত্যেকটি পার্টির সাথে অন্যান্য শক্তিগুলোর সম্পর্কই শুধু নয়, দুটো পার্টির মধ্যেকার সম্পর্কটিও বুঝতে ব্যর্থ হব।

এভাবে এটা দেখা যাচ্ছে যে, যে-কোনো প্রকারের দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা পর্যালোচনায়—পদার্থের গতির প্রত্যেক রূপের দ্বন্দ্ব, বিকাশের প্রত্যেক প্রক্রিয়ায় গতির প্রত্যেক রূপের দ্বন্দ্ব, প্রত্যেক বিকাশের প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বের প্রতিটি দিক, প্রত্যেক বিকাশের স্তরে প্রত্যেক বিকাশের প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্ব এবং প্রত্যেক বিকাশের স্তরে দ্বন্দ্বের প্রতিটি দিক—এই সবগুলো দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা পর্যালোচনায় আমাদের অবশ্যই আত্মগত ও খামখেয়ালী হওয়া চলবে না, বরং সেই বিশিষ্টতাকে মূর্তভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। মূর্ত বিশ্লেষণ ছাড়া কোন

দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে লেনিনের কথা: মূর্ত অবস্থাসমূহের মূর্ত বিশ্লেষণ।

মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম এই ধরনের মূর্ত বিশ্লেষণের চমৎকার এক আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরেন।

যখন মার্কস ও এঙ্গেলস বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্বের নিয়মকে সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পর্যালোচনায় প্রয়োগ করলেন, তখন তাঁরা আবিষ্কার করলেন উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে, শোষণ ও শোষিতশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে এবং ঐ দ্বন্দ্বগুলো থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর (রাজনীতি, মতাদর্শ ইত্যাদি) মধ্যেকার দ্বন্দ্বক, এবং আবিষ্কার করলেন কিভাবে এসব দ্বন্দ্ব বিভিন্ন রকমের শ্রেণীসমাজে বিভিন্ন রকম সমাজবিপ্লবের জন্ম দেয়।

মার্কস ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পর্যালোচনায় এই নিয়মকে প্রয়োগ করে এটা আবিষ্কার করলেন যে, এই সমাজের মূল দ্বন্দ্ব হচ্ছে উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র এবং মালিকানার ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। এককভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎপাদনের সংগঠিত চরিত্র এবং সমগ্রভাবে সমাজে উৎপাদনের অসংগঠিত চরিত্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের মধ্যে ঐ দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে। শ্রেণীসম্পর্কের দিক থেকে এটা আত্মপ্রকাশ করে বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বে।

যেহেতু বস্তুসমূহের বিস্তার অত্যন্ত বিরাট এবং তাদের বিকাশ অনন্ত, সেহেতু যা এক প্রসঙ্গে সর্বজনীন, অন্য প্রসঙ্গে তা-ই বিশেষ। বিপরীতভাবে, যা এক প্রসঙ্গে বিশেষ, তা-ই অন্য প্রসঙ্গে সর্বজনীন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র ও উৎপাদনের উপকরণগুলোর ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব যেখানেই ধনতন্ত্র বিদ্যমান ও বিকাশমান এমন সমস্ত দেশেই সাধারণভাবে রয়েছে, ধনতন্ত্রের পক্ষে এ হচ্ছে দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা। কিন্তু ধনতন্ত্রের এই দ্বন্দ্ব শ্রেণীসমাজের সাধারণ বিকাশের একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তরের ব্যাপার মাত্র, সাধারণ শ্রেণীসমাজে উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের পক্ষে এ হচ্ছে দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা। যাহোক, ধনতান্ত্রিক সমাজের এসব দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে মার্কস সাধারণ শ্রেণীসমাজে উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতার আরও গভীর, আরও পর্যাপ্ত এবং আরও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

যেহেতু বিশেষ সর্বজনীনের সঙ্গে সংযুক্ত এবং যেহেতু দ্বন্দ্বের শুধু বিশিষ্টতা নয়, তার সর্বজনীনতাও সকল বস্তুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত, বিশিষ্টতার মধ্যেই সর্বজনীনতা বিদ্যমান, সেহেতু কোন বস্তুকে পর্যালোচনা করার সময় আমাদের উচিত বিশিষ্টতা ও সর্বজনীনতা উভয়কেই ও তাদের আন্তঃসংযোগকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করা, ঐ বস্তুর ভেতরকার বিশিষ্টতা ও সর্বজনীনতাকে এবং তাদের আন্তঃসংযোগকেও আবিষ্কার করা এবং ঐ বস্তুর সঙ্গে বাইরের নানা বস্তুর আন্তঃ-সংযোগকে আবিষ্কার করা। স্তালিন যখন তাঁর বিখ্যাত রচনা **লেনিনবাদের ভিত্তি**-তে লেনিনবাদের ঐতিহাসিক উৎসগুলো ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি, যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে লেনিনবাদের উৎপত্তি হয়েছে তা বিশ্লেষণ করেন, সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ধনতন্ত্রের যে দ্বন্দ্বগুলো তাদের চরমে পৌঁছেছে সেগুলো বিশ্লেষণ করেন, এবং কিভাবে এই দ্বন্দ্বগুলো সর্বহারা বিপ্লবকে অবিলম্বে করণীয় বিষয়ে পরিণত করছে ও ধনতন্ত্রের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানার জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তা দেখান। উপরন্তু, কেন রাশিয়া লেনিনবাদের সূতিকা-গৃহে পরিণত হল, কেন জারের রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদের সকল দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল এবং কেন রাশিয়ার সর্বহারার পক্ষে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সর্বহারার অগ্রগামী বাহিনী হওয়া সম্ভব হল, তার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করেন। এইভাবে স্তালিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা বিশ্লেষণ করে দেখান, কেন লেনিনবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ, এবং একই সাথে ঐ সাধারণ দ্বন্দ্বের মধ্যে জারতন্ত্রী রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিশিষ্টতা বিশ্লেষণ করে দেখান, কেন রাশিয়া সর্বহারা বিপ্লবের তত্ত্ব ও রণকৌশলের জন্মভূমিতে পরিণত হল এবং কিভাবে এই বিশিষ্টতার মধ্যে দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা নিহিত রয়েছে। দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা ও সর্বজনীনতা এবং তাদের আন্তঃসংযোগকে বোঝার জন্য স্তালিনের বিশ্লেষণ আমাদের একটা অনুকরণীয় আদর্শ প্রদান করেছে।

বস্তুগত প্রতীক ব্যাপার (objective phenomenon) পর্যালোচনায় দ্বন্দ্ববাদ ব্যবহারের প্রশ্নে, মার্কস ও এঙ্গেলস এবং অনুরূপভাবে লেনিন ও স্তালিন সর্বদাই নির্দেশ দিয়েছেন কোনভাবেই আত্মগত ও খামখেয়ালী না হওয়ার জন্য বরং বস্তুগত বাস্তব গতির মূর্ত শর্তগুলো থেকে এসব প্রতীত ব্যাপারের মূর্ত দ্বন্দ্বগুলোকে, প্রত্যেক দ্বয়ের প্রত্যেকটি দিকের মূর্ত অবস্থানকে, এবং দ্বন্দ্বগুলোর মূর্ত আন্তঃসংযোগগুলোকে আবিষ্কার করার জন্য। পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই

মনোভাব আমাদের মতাদর্শের নেই এবং এজন্য তাঁরা কখনও সঠিক কিছুকে পান না। তাঁদের ব্যর্থতা থেকে আমাদের অবশ্যই সাবধান হতে হবে এবং এই মনোভাব—যা পর্যালোচনার জন্য একমাত্র সঠিক মনোভাব—অর্জন করতে শিখতে হবে।

দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ও বিশিষ্টতার মধ্যেকার সম্পর্ক হচ্ছে দ্বন্দ্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যেকার সম্পর্ক। প্রথমটিতে বুঝতে হবে, সকল প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব বিদ্যমান এবং প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবহমান; গতি, বস্তু, প্রক্রিয়া ও চিন্তা—সবই হচ্ছে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করার অর্থ সবকিছুকেই অস্বীকার করা। সকল সময় ও সকল দেশের জন্য এটা সর্বজনীন সত্য, যার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই। এজন্যই দ্বন্দ্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনাপেক্ষিকতা। কিন্তু এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহত, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। যদি সমস্ত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মুছে ফেলা হতো, তাহলে সাধারণ বৈশিষ্ট্য কোথায় থাকত? প্রত্যেকটি দ্বন্দ্ব বিশেষ বলেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়। সকল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য শর্তসাপেক্ষভাবে ও অস্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে, এবং এজন্য তা আপেক্ষিক।

সাধারণ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং অনাপেক্ষিকতা ও আপেক্ষিকতা সম্পর্কে এই সত্য হচ্ছে বস্তুসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্বের সমস্যার কেন্দ্রীভূত সারবস্তু। এটা না বোঝা দ্বন্দ্ববাদকে পরিহার করার সামিল।

৪। প্রধান দ্বন্দ্ব এবং কোন দ্বন্দ্বের প্রধান দিক

দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আরও দুটি বিষয় আছে, যা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, যথা, প্রধান দ্বন্দ্ব এবং কোন দ্বন্দ্বের প্রধান দিক।

একটা জটিল বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় অনেকগুলো দ্বন্দ্ব আছে। এগুলোর মধ্যে একটা স্বভাবতঃই প্রধান দ্বন্দ্ব, যার অস্তিত্ব ও বিকাশ অন্যান্য দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব ও বিকাশকে নির্ধারিত বা প্রভাবিত করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধনতান্ত্রিক সমাজে দ্বন্দ্বরত দুই শক্তি সর্বহারাশ্রেণী এবং বুর্জোয়াশ্রেণী জন্ম দেয় প্রধান দ্বন্দ্বের। অন্যান্য দ্বন্দ্ব, যেমন, সামন্তশ্রেণীর অবশেষ ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, কৃষক পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, সর্বহারা ও কৃষক পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, অ-একচেটিয়া

পুঁজিপতি ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও বুর্জোয়া ফ্যাসিবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশগুলোর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সবই নির্ধারিত বা প্রভাবিত হয় ঐ প্রধান দ্বন্দ্ব দ্বারা।

চীনের মতো আধা-ঔপনিবেশিক দেশে, প্রধান দ্বন্দ্ব এবং অপ্রধান দ্বন্দ্বগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক একটা জটিল ছবি তুলে ধরে। এরকম একটা দেশের বিরুদ্ধে যখন সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণ শুরু করে, কিছুসংখ্যক বিশ্বাসঘাতক ছাড়া ঐ দেশের সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণী সাময়িকভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা জাতীয় যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। এ সময়ে, সাম্রাজ্যবাদ ও ঐ দেশের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হয়, আর দেশের ভেতরে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহ (সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যেকার যে দ্বন্দ্বটি প্রধান দ্বন্দ্বে ছিল, সেটি সহ) সাময়িকভাবে অপ্রধান ও অধীনস্থ স্থানে অবনত হয়। চীনে এই অবস্থা ঘটেছিল ১৮২০ সালের আফিম যুদ্ধে[20], ১৮৯৪ সালের চীন-জাপান যুদ্ধে[21] ও ১৯০০ সালের ই হো থুয়ান যুদ্ধে। বর্তমান চীন-জাপান যুদ্ধেও এই অবস্থাই চলছে।

কিন্তু অন্য পরিস্থিতিতে দ্বন্দ্বগুলো অবস্থান পরিবর্তন করে। যখন সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের বদলে অপেক্ষাকৃত নম্র উপায়ে, অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপায়ে নির্যাতন চালিয়ে যায়, তখন আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলোর শাসকশ্রেণীগুলো সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং উভয়পক্ষ মিলিতভাবে ব্যাপক জনসাধারণকে নির্যাতনের জন্য একটা জোট গড়ে তোলে। এরকম সময়ে, জনগণ প্রায়শঃই সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তশ্রেণীগুলির মৈত্রীর বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করে, আর সাম্রাজ্যবাদ জনগণকে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সাহায্য করার জন্য প্রায়শঃই প্রত্যক্ষ কার্যকলাপের পরিবর্তে পরোক্ষ পন্থাগুলো কাজে লাগায়, এবং এইভাবে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলো বিশেষ তীব্র হয়ে ওঠে। এটাই ঘটেছিল চীনে ১৯১১ সালের বিপ্লবী যুদ্ধে, ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবী যুদ্ধে এবং ১৯২৭ সাল থেকে দশ বছরব্যাপী কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধে। আধা-ঔপনিবেশিক দেশে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীগুলোর ভেতরকার যুদ্ধগুলো, দৃষ্টান্তস্বরূপ, চীনে সমরনায়কদের মধ্যে যুদ্ধগুলোও, এই শ্রেণীভুক্ত।

যখন একটা বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ এতদূর বিকাশলাভ করে যে, সাম্রাজ্যবাদ ও

তার পা-চাটা কুকুর দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের নিজেদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে, তখন সাম্রাজ্যবাদ প্রায়শ:ই তার শাসন বজায় রাখার জন্য অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করে। সাম্রাজ্যবাদ তখন হয় ভেতর থেকে বিপ্লবী ফ্রণ্টকে বিভক্ত করার চেষ্টা করে, অথবা দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করার জন্য সশস্ত্র সৈন্যদল প্রেরণ করে। এরকম সময়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা খোলাখুলিভাবে একসঙ্গে দাঁড়ায় একপ্রান্তে, আর ব্যাপক জনসাধারণ দাঁড়ায় অন্যপ্রান্তে, এবং এইভাবে গড়ে তোলে দ্বন্দ্বটি, যা আবার অন্যান্য দ্বন্দ্বগুলোর বিকাশকে নির্ধারিত বা প্রভাবিত করে। অক্টোবর বিপ্লবের পরে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশগুলো কর্তৃক রুশ প্রতিক্রিয়াশীলদেরকে প্রদত্ত সাহায্য সশস্ত্র হস্তক্ষেপেরই একটা নজীর। ১৯২৭ সালে চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতা বিপ্লবী ফ্রণ্টকে বিভক্ত করার একটা নজীর।

কিন্তু যাই ঘটুক না কেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একটা প্রক্রিয়ার বিকাশের প্রত্যেক স্তরে প্রধান দ্বন্দ্ব মাত্র একটাই, যা পরিচালকের ভূমিকা পালন করে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, কোন প্রক্রিয়াতে যদি অনেকগুলো দ্বন্দ্ব থাকে তাহলে তাদের মধ্যে অবশ্যই একটি হবে প্রধান দ্বন্দ্ব, যা নেতৃস্থানীয় ও নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণ করবে, আর অন্যগুলো দখল করবে গৌণ ও অধঃস্তন স্থান। তাই, দুই বা দুয়ের বেশি দ্বন্দ্ববিশিষ্ট কোন জটিল প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করতে গেলে, আমাদের অবশ্যই সেগুলির মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্বকে খুঁজে বের করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একবার এই প্রধান দ্বন্দ্বকে হৃদয়ঙ্গম করা গেলে সব সমস্যারই সহজে সমাধান করা যায়। ধনতান্ত্রিক সমাজ পর্যালোচনার মাধ্যমে মার্কস আমাদেরকে এই পদ্ধতি শিখিয়েছেন। লেনিন ও স্তালিনও একইভাবে আমাদের এই পদ্ধতি শিখিয়েছেন তাঁদের সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটের পর্যালোচনায় এবং সোভিয়েত অর্থনীতির পর্যালোচনায়। হাজার হাজার পণ্ডিত ও কর্মী এই পদ্ধতি বোঝেন না, এবং তার ফলে ঘন কুয়াশায় দিশেহারা হয়ে তাঁরা সমস্যার মর্মটিই ধরতে পারেন না এবং স্বভাবতই দ্বন্দ্বগুলো সমাধানের পথও খুঁজে পান না।

আগেই বলেছি, কোন একটা প্রক্রিয়ার সমস্ত দ্বন্দ্বকে আমরা সমান গুরুত্ব দিতে পারি না। প্রধান ও গৌণের মধ্যে পার্থক্য করতেই হবে এবং প্রধানটিকে

ধরবার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। কিন্তু যে-কোন নির্দিষ্ট দ্বন্দ্বে, তা সেটা প্রধানই হোক বা গৌণই হোক, দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দিককে কি আমরা সমান বলে মনে করতে পারি? আবার বলছি, না। যে-কোন দ্বন্দ্বে প্রতিদ্বন্দ্বী দিকগুলোর বিকাশ অসমান। কথনো কথনো তাদের মধ্যে ভারসাম্য দেখা যায় বটে, কিন্তু তা সাময়িক আপেক্ষিক মাত্র, অসমতাই মৌলিক। দুটি দ্বন্দ্বমান দিকের মধ্যে একটি দিক অবশ্যই প্রধান, অপরটি গৌণ। যেটি প্রধান দিক, সেটিই দ্বন্দ্বের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বস্তুর প্রকৃতি প্রধানতঃ নির্ধারিত হয় দ্বন্দ্বের প্রধান দিকের দ্বারা, যে দিকটি কর্তৃত্বের স্থান লাভ করেছে।

কিন্তু এই অবস্থাটা অপরিবর্তনীয় নয়, দ্বন্দ্বের প্রধান ও অপ্রধান দিকগুলো একে অন্যতে রূপান্তরিত হয় এবং সেই অনুসারে বস্তুর প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। কোন একটি দ্বন্দ্বের বিকাশের একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় বা একটি নির্দিষ্ট স্তরে 'ক' হয়ত প্রধান দিক এবং 'খ' অপ্রধান দিক। অন্য একটি স্তরে বা অন্য একটি প্রক্রিয়ার আবার ভূমিকাগুলোই হয়তো পাল্টে যায়। এই পরিবর্তন নির্ধারিত হয় একটি বস্তুর বিকাশের পথে দ্বন্দ্বের অন্য দিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রত্যেক দিকের শক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাসের পরিমাণ দ্বারা।

আমরা প্রায়শঃই 'নূতন কর্তৃক পুরাতনের স্থান দখল'-এর কথা বলে থাকি। নূতন কর্তৃক পুরাতনের স্থান দখল বিশ্বের সর্বজনীন ও চিরকালীন অলংঘনীয় নিয়ম। বস্তুর নিজের প্রকৃতি ও বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের দ্রুত-অতিক্রমণের মধ্যে দিয়ে একটা বস্তুর অপর একটা বস্তুতে রূপান্তর—এটাই নূতন কর্তৃক পুরাতনের স্থান দখলের প্রক্রিয়া। প্রত্যেক বস্তুতে নূতন ও পুরাতন দিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, ধারাবাহিকভাবে বহু আঁকাবাঁকা সংগ্রামের জন্ম দেয়। এই সংগ্রামের নূতন দিকটি গৌণ থেকে মুখ্যতে পরিবর্তিত হয় এবং প্রাধান্য লাভ করে আর পুরাতন দিকটি মুখ্য থেকে গৌণে পরিবর্তিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে লয় পেয়ে যায়। এবং যে মুহূর্তে নূতন দিকটি পুরাতন দিকটির উপর প্রাধান্য-লাভ করে, পুরাতন বস্তু গুণগতভাবে নূতন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে দেখতে পাওয়া যায় যে, বস্তুর প্রকৃতি প্রধানতঃ নির্ধারিত হয় দ্বন্দ্বের প্রধান দিকের দ্বারা, যে দিকটি কর্তৃত্বের স্থান লাভ করেছে। যে প্রধান দিকটি কর্তৃত্বের স্থান লাভ করেছে, সেটি যখন রূপান্তরিত হয়, বস্তুর প্রকৃতিও সেই অনুসারে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

পুরানো সামন্ততান্ত্রিক যুগে অধীনস্থ শক্তি হিসাবে ধনতন্ত্রের যে অবস্থান

ছিল, ধনতান্ত্রিক সমাজে তা পরিবর্তিত হয়ে যায় প্রধান্যের শক্তিতে, এবং সমাজের প্রকৃতি সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক থেকে ধনতান্ত্রিকে। নূতন ধনতান্ত্রিক যুগে সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলো তাদের আগেকার প্রাধান্যের অবস্থান থেকে অধীনস্থ অবস্থানে পরিবর্তিত হয়, এবং ক্রমান্বয়ে লুপ্ত হতে থাকে। যেমন, বৃটেন ও ফ্রান্সে এরকম ঘটেছিল। উৎপাদনশক্তির বিকাশের সাথে সাথে, বুর্জোয়াশ্রেণী প্রগতিশীল ভূমিকাযুক্ত এক নূতন শ্রেণী থেকে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাযুক্ত এক পুরানো শ্রেণীতে পরিবর্তিত হয়, এবং সর্বহারাশ্রেণী শেষ পর্যন্ত তাকে উৎখাত করে দেয়। বুর্জোয়াশ্রেণী তখন ব্যক্তিগত উৎপাদনের উপকরণসমূহ থেকে বঞ্চিত ও ক্ষমতাচ্যুত শ্রেণীতে পরিণত হয়, এবং এই শ্রেণীরও ক্রমান্বয়ে বিলুপ্তি ঘটে। সর্বহারাশ্রেণী হচ্ছে একটা নূতন শক্তি, যা বুর্জোয়াশ্রেণীর চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি এবং যা বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনে বুর্জোয়াশ্রেণীরই সাথে যুগপৎ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বহারা-শ্রেণী প্রথমে বুর্জোয়াশ্রেণীর অধীনে থাকলেও ক্রমান্বয়ে শক্তি অর্জন করে একটি স্বাধীন ও ইতিহাসে মুখ্য ভূমিকাবিশিষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং শেষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে পরিণত হয় শাসকশ্রেণীতে। তখন সমাজের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং পুরানো ধনতান্ত্রিক সমাজ নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতিমধ্যে এই পথ গ্রহণ করেছে, অন্যান্য দেশও অবশ্যম্ভাবীরূপেই এই পথ গ্রহণ করবে।

চীনের কথাই ধরা যাক। যে দ্বন্দ্বের ফলে চীন আধা-উপনিবেশ, সেই দ্বন্দ্বে সাম্রাজ্যবাদ প্রধান অবস্থান দখল করে আছে ও চীনা জনগণকে পীড়ন করে চলেছে, আর চীন স্বাধীন দেশ থেকে আধা-উপনিবেশে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু অবশ্যম্ভাবীরূপে এই অবস্থার পরিবর্তন হবে, উভয় পক্ষের মধ্যে সংগ্রামে, চীনা জনগণের যে শক্তি সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা অবশ্যম্ভাবীরূপেই চীনকে আধা-উপনিবেশ থেকে একটা স্বাধীন দেশে পরিবর্তিত করবে, পক্ষান্তরে সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত হবে এবং পুরানো চীন অবশ্যম্ভাবীরূপে নূতন চীনে রূপান্তরিত হবে।

পুরানো চীনের নূতন চীনে রূপান্তরের সঙ্গে জড়িত রয়েছে দেশের অভ্যন্তরে পুরানো সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলো এবং নূতন জনগণের শক্তিগুলোর সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন। পুরানো সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণী উৎখাত হবে, শাসক থেকে তারা শাসিতে পরিণত হবে এবং এই শ্রেণী ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হবে।

সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণ শাসিত থেকে শাসকে পরিণত হবে। ফলে চীনের সমাজের প্রকৃতি পরিবর্তিত হবে এবং পুরানো আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এক নূতন গণতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হবে।

এরকম পারস্পরিক রূপান্তরের দৃষ্টান্ত আমাদের অতীত অভিজ্ঞতায় খুঁজে পাওয়া যায়। চীনকে প্রায় তিনশত বৎসর শাসন করার পর ছিং রাজবংশ ১৯১১ সালের বিপ্লবে উৎখাত হয়েছিল, এবং সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবী তুং মেং হুই (মৈত্রী সমিতি) কিছু সময়ের জন্য বিজয়ী হয়েছিল। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবী যুদ্ধে, দক্ষিণে কমিউনিস্ট-কুওমিনতাঙ মৈত্রীর বিপ্লবী শক্তিগুলো দুর্বল অবস্থা থেকে শক্তিশালী অবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছিল এবং উত্তরাভিযানে বিজয় অর্জন করেছিল, আর একদা সর্বশক্তিমান উত্তরাঞ্চলীয় সমরনায়করা উৎখাত হয়েছিল। ১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর আক্রমণে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের শক্তি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু নিজেদের পার্টির মধ্যে সুবিধাবাদ নির্মূল করার সাথে তারা আবার ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাগুলোতে কৃষকেরা শাসিত থেকে শাসকে রূপান্তরিত হয়েছে, আর জমিদারদের ঘটেছে ঠিক বিপরীত রূপান্তর। বিশ্বে সর্বদাই এ রকম ঘটেছে—নূতন হটিয়ে দিচ্ছে পুরাতনকে, নূতন পুরাতনের স্থান দখল করছে, পুরাতনকে মুছে দিয়ে নূতনের পথ তৈরী হচ্ছে এবং নূতনের উদ্ভব ঘটছে পুরাতনেরই মধ্য থেকে।

বিপ্লবী সংগ্রামে কোন কোন সময়ে অনুকূল অবস্থার তুলনায় প্রতিকূল অবস্থাই বেশি জোরদার হয়ে ওঠে। এই সময়ে প্রতিকূল অবস্থা হচ্ছে দ্বন্দ্বের প্রধান দিক, অনুকূল অবস্থা হচ্ছে গৌণ দিক। কিন্তু বিপ্লবীদের প্রয়াসের মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থাকে ধাপে ধাপে অতিক্রম করা সম্ভব, নতুন অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করাও সম্ভব। এমনি করে প্রতিকূল অবস্থার বদলে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯২৭ সালে চীন বিপ্লবের ব্যর্থতার পর এবং চীনের লালফৌজের দীর্ঘাভিযানের সময় এটাই ঘটেছিল। বর্তমান চীন-জাপান যুদ্ধে, চীন আবার একটা প্রতিকূল অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু আমরা এটা পরিবর্তন করতে পারি এবং চীন ও জাপানের মধ্যেকার অবস্থা মূলগতভাবে, অনুকূল অবস্থা প্রতিকূলে হতে পারে, যদি বিপ্লবীরা ভুল করে। এইভাবে ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের বিজয় পরাজয়ে পরিণত হয়। ১৯২৭ সালের পর দক্ষিণের প্রদেশগুলোতে যে

বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাগুলো গড়ে উঠেছিল সবগুলোই ১৯৩৪ সালের মধ্যে পরাজয় বরণ করে।

আমরা যখন পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানে উত্তরণের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম খাটে। মার্কসবাদ পর্যালোচনার একেবারে শুরুতে, মার্কসবাদী সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা বা সামান্য পরিচয়ের সঙ্গে মার্কসবাদের জ্ঞানের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কিন্তু কঠোর অধ্যয়নের ফলে অজ্ঞতাকে জ্ঞানে, সামান্য পরিচয়কে প্রভূত জ্ঞানে এবং মার্কসবাদ প্রয়োগে অন্ধত্বকে নিপুণতায় রূপান্তরিত করা সম্ভব।

কেউ কেউ মনে করে, কোন কোন দ্বন্দ্বের বেলায় এই নিয়ম খাটে না। যেমন, উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে উৎপাদন-শক্তি হচ্ছে প্রধান দিক, তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে প্রয়োগ হচ্ছে প্রধান দিক, অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর মধ্যেকার দ্বন্দ্বে অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে প্রধান দিক, এবং তাদের পারস্পরিক অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না। এটা যান্ত্রিক বস্তুবাদী ধারণা, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধারণা নয়। এটা ঠিক যে, উৎপাদন-শক্তি, প্রয়োগ ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সাধারণতঃ মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। যে এটা অস্বীকার করে, সে বস্তুবাদী নয়। কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হবে যে, বিশেষ অবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্ক, তত্ত্ব ও উপরিকাঠামোও পর্যায়ক্রমে মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে। যখন উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন ছাড়া উৎপাদন-শক্তির বিকাশলাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। লেনিন যে সময় সম্পর্কে বলেছেন, 'বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন হতে পারে না'[২২], তখন বিপ্লবী তত্ত্বের সৃষ্টি ও প্রচার মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। যখন একটা কাজ (যেটাই হোক না কেন) করা দরকার হয়ে পড়ে, অথচ কোন নির্দেশক পথ, পদ্ধতি পরিকল্পনা বা কর্মনীতি থাকে না, তখন মুখ্য ও নির্ধারক বিষয় হচ্ছে একটা নির্দেশক পথ, পদ্ধতি, পরিকল্পনা বা কর্মনীতি স্থির করা। যখন উপরিকাঠামো (রাজনীতি ও সংস্কৃতি প্রভৃতি) অর্থনৈতিক ভিত্তির বিকাশে বাধা দেয়, তখন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার সাধনই মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকা নেয়। আমরা কি একথা বলে বস্তুবাদের বিরোধিতা করছি? না। কারণ, আমরা স্বীকার করি যে, ইতিহাসের সাধারণ বিকাশে বস্তুই মানসিকতাকে নির্ধারণ করে, সামাজিক সত্তা সামাজিক চেতনাকে নির্ধারণ

করে। • কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা বস্তুর উপর মানসিকতার প্রতিক্রিয়া, সামাজিক সত্তার উপর সামাজিক চেতনার প্রতিক্রিয়া, এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর উপরিকাঠামোর প্রতিক্রিয়াকেও স্বীকার করি—বস্তুতঃ একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। এটা বস্তুবাদকে লংঘন করে না, পক্ষান্তরে যান্ত্রিক বস্তুবাদকে পরিহার করে এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে।

দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা পর্যালোচনায়, যদি না আমরা এই দুই ধরনের অবস্থাকে —একটা প্রক্রিয়ার প্রধান ও অপ্রধান দ্বন্দ্ব এবং একটা দ্বন্দ্বের প্রধান ও অপ্রধান দিককে—পরীক্ষা করি, অর্থাৎ যদি না আমরা এই দুই ধরনের স্বতন্ত্র চরিত্রকে পরীক্ষা করি, তাহলে আমরা বিমূর্ততার মধ্যে ডুবে যাব, দ্বন্দ্বকে মূর্তভাবে বুঝতে পারব না এবং তার ফলে দ্বন্দ্বের সমাধানের সঠিক পদ্ধতি বের করতে পারব না। দ্বন্দ্বের এই দুই রকমের অবস্থার স্বতন্ত্র চরিত্র বা বিশিষ্টতা দ্বন্দ্বের মধ্যেকার শক্তিগুলোর অসমতাই প্রকাশ করে। পৃথিবীতে কোন কিছুই অনাপেক্ষিকভাবে সমান বিকাশলাভ করে না। আমাদের অবশ্যই সম-বিকাশের তত্ত্ব বা ভারসাম্যের তত্ত্বের বিরোধিতা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে, দ্বন্দ্বের এই মূর্ত রূপগুলো এবং বিকাশের প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বের প্রধান ও অপ্রধান দিকগুলোর পরিবর্তনই পুরাতনকে সরিয়ে যে নূতন আসছে, তার শক্তিকে প্রকাশ করে। দ্বন্দ্বগুলোতে অসমতার বিভিন্ন অবস্থার, প্রধান ও অপ্রধান দ্বন্দ্বের এবং দ্বন্দ্বের প্রধান ও অপ্রধান দিকের পর্যালোচনা এমন একটি গুরুত্ব-পূর্ণ পদ্ধতি, যার সাহায্যে বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে তার রণনীতিগত ও রণকৌশলগত কর্মনীতিগুলি নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করতে পারে। সমস্ত কমিউনিস্টকেই এ ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হবে।

৫। দ্বন্দ্বের দিকগুলোর অভিন্নতা ও সংগ্রাম

দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ও বিশিষ্টতা উপলব্ধি করার পর আমাদের অবশ্যই দ্বন্দ্বের দিকগুলোর অভিন্নতা এবং সংগ্রামের সমস্যাটি পর্যালোচনা করতে হবে।

অভিন্নতা, ঐক্য, মিল, আন্তঃঅনুপ্রবেশ (interpenetration), আন্তঃ-অন্তর্ভেদ (interpermeation), পরস্পর-নির্ভরশীলতা (বা অস্তিত্বের জন্য পারস্পরিক নির্ভরতা), আন্তঃসংযোগ বা পরস্পর-সহযোগিতা—এসব ভিন্ন ভিন্ন কথা একই জিনিসকেই বোঝায় এবং নিম্নলিখিত দুটি বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে: প্রথম, একটা বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় একটা দ্বন্দ্বের দুটি

দিকের প্রত্যেকটির নিজস্ব অস্তিত্বের পূর্বশর্ত হিসাবে অপরটিকে প্রয়োজন এবং উভয়দিকই একক সত্তার মধ্যে সহ-অবস্থান করে; দ্বিতীয়, নির্দিষ্ট অবস্থায় দ্বন্দ্বমান দুটি দিকে প্রত্যেকটি নিজেকে তার বিপরীপটিতে রূপান্তরিত করে। এই হচ্ছে অভিন্নতার অর্থ।

লেনিন বলেছেন: 'দ্বন্দ্ববাদ' হচ্ছে সেই শিক্ষা, যা দেখিয়ে দেয় কেমন করে **বিপরীতগুলো** অভিন্ন হতে পারে এবং হয়ে থাকে (কেমন করে পরিণত হয়),—কোন্ অবস্থায় তারা অভিন্ন, নিজেদের একটা থেকে অন্যটাতে রূপান্তরিত করে চলে,—মানুষের ধারণায় কেন এসব বিপরীতগুলোকে মৃত, অনড় বলে গ্রহণ না করে বরং জীবন্ত, সর্তসাপেক্ষ, গতিশীল, নিজেদের একটা থেকে অন্যটায় রূপান্তররত বলে গ্রহণ করতে হবে।'[২৩]

এই অনুচ্ছেদটির অর্থ কি?

প্রত্যেক প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বমান দিকগুলো পরস্পর থেকে আলাদা, পরস্পরের সাথে সংগ্রামরত এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে। বিশ্বের সকল বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় এবং মানুষের চিন্তাধারায় এই দ্বন্দ্বমান দিকগুলো বিদ্যমান থাকে, এর কোন ব্যতিক্রম নেই। একটি সরল প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র একজোড়া বিপরীত দিক থাকে, জটিল প্রক্রিয়ায় থাকে তার বেশি। এবং পর্যায়ক্রমে, বিপরীত জোড়াগুলোও পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত। এইভাবেই বাস্তব বিশ্বের সমস্ত বস্তু ও মানবিক চিন্তাধারা গঠিত হয় এবং এইভাবে তারা গতিশীল হয়।

এমতাবস্থায়, অভিন্নতা বা ঐক্য বলে কিছুই থাকছে না, তাহলে কেমন করে অভিন্নতা বা ঐক্যের কথা বলা যায়?

ঘটনা হচ্ছে এই যে, কোন দ্বন্দ্বমান দিক একাকী থাকতে পারে না। বিপরীত দিকের অস্তিত্ব ছাড়া, প্রত্যেকটি দিক তার অস্তিত্বের শর্তই হারিয়ে বসে। ভেবে দেখুন তো, কোন বস্তুর বা মানুষের মনে কোন ধারণার কোন একটা দ্বন্দ্বমান দিক কি স্বাধীনভাবে থাকতে পারে? জীবন না থাকলে মৃত্যু থাকত না, মৃত্যু না থাকলে থাকত না কোন জীবন। 'উর্ধ্ব' না থাকলে 'নিম্ন' থাকত না, 'নিম্ন' না থাকলে, 'উর্ধ্ব' থাকত না। দুর্ভাগ্য না থাকলে সৌভাগ্য থাকত না, সৌভাগ্য না থাকলে থাকত না দুর্ভাগ্য। সুবিধা না থাকলে অসুবিধা থাকত না, অসুবিধা না থাকলে সুবিধা থাকত না। জমিদার না থাকলে কৃষক-প্রজা থাকত না, কৃষক-প্রজা না থাকলে থাকত না জমিদার। বুর্জোয়াশ্রেণী না থাকলে সর্বহারাশ্রেণী থাকত না, সর্বহারাশ্রেণী না থাকলে

থাকত না কোন বুর্জোয়াশ্রেণী। জাতিসমূহের উপর সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন না থাকলে উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশ থাকত না, উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশ না থাকলে থাকত না জাতিসমূহের উপর সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন। সমস্ত বিপরীতগুলোই এই রকমের কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় একদিকে তারা পরস্পর-বিরোধী, আবার অন্যদিকে তারা পরস্পর-সংযুক্ত, পরস্পর-অন্তর্ভেদ্য, পরস্পর-অনুপ্রবিষ্ট এবং পরস্পর-নির্ভরশীল। এই বৈশিষ্ট্যকেই বলা হয় অভিন্নতা। নির্দিষ্ট অবস্থায় সকল দ্বন্দ্বমান দিকগুলোর থাকে ভিন্নতার বৈশিষ্ট্য, তাই তাদের বলা হয় দ্বন্দ্বমান। কিন্তু তাদের অভিন্নতার বৈশিষ্ট্য থাকে, তাই তারা পরস্পর-সংযুক্ত। লেনিন যখন বলেন যে, দ্বন্দ্ববাদ পর্যালোচনা করে 'কেমন করে **বিপরীতগুলো** হতে পারে···**অভিন্ন**,' তখন তিনি এটাই বুঝিয়েছেন। তাহলে কিভাবে তারা অভিন্ন হতে পারে? কারণ প্রত্যেকটি হচ্ছে অপরটির অস্তিত্বের শর্ত। এটাই হচ্ছে অভিন্নতার প্রথম অর্থ।

কিন্তু দ্বন্দ্বমান দিকগুলোর প্রত্যেকটি অপরটির অস্তিত্বের শর্ত, তাদের মধ্যে রয়েছে অভিন্নতা, এবং ফলস্বরূপ, তারা একক সত্তায় সহ-অবস্থান করতে পারে—এটুকু বলাই কি যথেষ্ট? না, যথেষ্ট নয়। তাদের অস্তিত্বের জন্য পরস্পরের উপর নির্ভরতার সাথেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায় না, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তাদের পারস্পরিক রূপান্তর। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট অবস্থায় একটা বস্তুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বমান দিকগুলোর প্রত্যেকটি নিজেকে তার বিপরীতে রূপান্তরিত করে, নিজের অবস্থানকে বিপরীতের অবস্থানে পরিবর্তিত করে। এটা দ্বন্দ্বের অভিন্নতার দ্বিতীয় অর্থ।

এখানেও অভিন্নতা রয়েছে কেন? দেখুন, শাসিত সর্বহারাশ্রেণী বিপ্লবের মাধ্যমে শাসকে রূপান্তরিত হয়, একদা যারা ছিল কঠোর শাসক সেই বুর্জোয়া-শ্রেণী রূপান্তরিত হয় শাসিতে এবং তার বিপরীতের আদি অবস্থানে নিজের অবস্থানকে পরিবর্তন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ইতিমধ্যে এটা ঘটেছে, এবং ভবিষ্যতে সারা দুনিয়াতেও তাই ঘটবে। যদি নির্দিষ্ট অবস্থায় বিপরীত-গুলির আন্তঃসংযোগ ও অভিন্নতা না থাকত, তাহলে এরকম পরিবর্তন কেমন করে ঘটতে পারত?

আধুনিক চীনের ইতিহাসের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে একটা নির্দিষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল কুওমিনতাঙ। সেই কুওমিনতাঙই ১৯২৭ সালের

পরে তার অন্তর্নিহিত শ্রেণীপ্রকৃতি এবং সাম্রাজ্যবাদের চাটুকারিতার দরুন (এইগুলোই শর্ত) একটা প্রতিবিপ্লবী পার্টিতে পরিণত হল। কিন্তু চীন ও জাপানের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠায় এবং কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রণ্টের নীতি গ্রহণ করায় (এইগুলোই হচ্ছে শর্ত) কুওমিনতাঙ বাধ্য হয়েছে জাপানের প্রতিরোধে সম্মত হতে। দ্বন্দ্বমান বস্তুসমূহ একটি অপরটিতে রূপান্তরিত হয় এবং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে নির্দিষ্ট অভিন্নতা।

আমরা যে কৃষি-বিপ্লব কার্যকরী করেছি, তা ইতিমধ্যেই এমন একটি প্রক্রিয়ায় হয়েছে, যাতে জমির মালিক জমিদারশ্রেণী জমিহারা শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়, আর যারা একদা তাদের জমি হারিয়েছিল সেই কৃষকরা জমি দখল করে রূপান্তরিত হয় ক্ষুদে মালিকে। এই প্রক্রিয়া আবার হবে। নির্দিষ্ট অবস্থায়, থাকা এবং না থাকা, অর্জন করা এবং হারানো পরস্পর-সংযুক্ত, উভয় দিকেরই রয়েছে অভিন্নতা। সমাজতন্ত্রের অধীনে কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানা রূপান্তরিত হয় সমাজতান্ত্রিক কৃষির যৌথ-মালিকানায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে ইতিমধ্যে এটা ঘটেছে, এবং ঘটবে সর্বত্র। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে সাধারণ সম্পত্তিতে পৌঁছানোর জন্য রয়েছে একটা সেতু, যাকে দর্শনশাস্ত্রে বলা হচ্ছে অভিন্নতা, বা পরস্পরে রূপান্তর, বা আন্তঃঅনুপ্রবেশ।

সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব বা জনগণের একনায়কত্বকে সংহত করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ঐ একনায়কত্বের অবসানের জন্য, এবং সকল রাষ্ট্রব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে হয়ে যাবে সেই উচ্চতর স্তরে অগ্রগমনের মতো অবস্থা তৈরী করার জন্য। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশসাধন করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট পার্টি ও সমস্ত পার্টি ব্যবস্থারই বিলপ্তির অবস্থা তৈরী করার জন্য। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটা বিপ্লবী সেনাবাহিনী গঠন করা এবং বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের স্থায়ী বিলুপ্তির অবস্থা তৈরী কবার জন্য। এই বিপরীতগুলো যুগপৎ পরস্পরের পরিপূরক।

সকলেরই জানা আছে, যুদ্ধ ও শান্তি নিজেদেরকে একে অন্যটিতে রূপান্তরিত করে। যুদ্ধ রূপান্তরিত হয় শান্তিতে। যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ রূপান্তরিত হয়েছিল যুদ্ধোত্তর শান্তিতে, এবং এখন চীনের গৃহযুদ্ধ থেমে গিয়ে তার স্থানে এসেছে আভ্যন্তরীণ শান্তি। শান্তি যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। যেমন, ১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা রূপান্তরিত হয়েছিল যুদ্ধে, এবং বিশ্বশান্তির বর্তমান অবস্থা একটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হতে পারে।

কেন এমন হয়? কারণ শ্রেণীসমাজে যুদ্ধ এবং শান্তির মতো দ্বন্দ্বমান বস্তুর নির্দিষ্ট অবস্থায় থাকে অভিন্নতা।

দ্বন্দ্বমান সবকিছুই পরস্পর-সংযুক্ত। নির্দিষ্ট অবস্থায় তারা কেবল একক সত্তায় সহ-অবস্থানই করে না, পরন্তু অপর নির্দিষ্ট অবস্থায় তারা নিজেদের একে অন্যতে রূপান্তরিত করে। এটাই হচ্ছে দ্বন্দ্বের অভিন্নতার পূর্ণ অর্থ। লেনিন যখন আলোচনা করেছেন—'কেমন করে বিপরীতগুলো অভিন্ন হয়ে থাকে (কেমন করে পরিণত হয়),—কোন্ অবস্থায় তারা অভিন্ন, নিজেদের একটা থেকে অন্যটাতে রূপান্তরিত করে চলে', তখন তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন।

কেন 'মানুষের ধারণায় এসব বিপরীতগুলোকে মৃত, অনড় বলে গ্রহণ না করে বরং জীবন্ত, শর্তসাপেক্ষ, গতিশীল, নিজেদের একটা থেকে অন্যটায় রূপান্তররত বলে গ্রহণ করতে হবে?' কারণ বাস্তব বস্তু বা বিষয় ঠিক এই-ভাবেই বিরাজ করে আসল কথা এই যে, বাস্তব জিনিসে দ্বন্দ্বমান দিকগুলোর ঐক্য বা অভিন্নতা মৃত বা অনড় নয়, বরং তা জীবন্ত, শর্তাসাপেক্ষ, গতিশীল, ক্ষণস্থায়ী এবং আপেক্ষিক। নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রত্যেক দ্বন্দ্বমান দিক নিজেকে তার বিপরীতে রূপান্তরিত করে। মানুষের চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হয়ে এটাই হয়ে দাঁড়ায় বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী। কেবল অতীত এবং বর্তমানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীগুলি এবং তাদের সেবাদাস আধি-বিদ্যকেরাই মনে করে যে, বিপরীতগুলো জীবন্ত, শর্তসাপেক্ষ, গতিশীল এবং একে অন্যতে রূপান্তররত নয়, বরং মৃত ও অনড়। ব্যপক জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য ঐ ভ্রান্ত মত (fallacy) তারা সর্বদাই প্রচার করে, এবং এইভাবে তাদের শাসন টিঁকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। কমিউনিস্টদের কর্তব্য হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল ও আধিবিদ্যকদের এই ভ্রান্ত মতকে খুলে ধরা, বস্তুর অন্ত-র্নিহিত দ্বন্দ্ববাদকে প্রচার করা, এবং এইভাবে বস্তুর রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করা এবং বিপ্লবের লক্ষ্যে পৌঁছানো।

নির্দিষ্ট অবস্থায় বিপরীতগুলোর অভিন্নতার কথা বলতে আমরা বাস্তব ও মূর্ত বিপরীতগুলোকে এবং বিপরীতগুলোর একে অন্যতে বাস্তব ও মূর্ত রূপান্তর-কেই বোঝাই। পৌরাণিক কাহিনীতে বহু রূপান্তরের কথা আছে, যেমন **শান হাই চিং** গ্রন্থে সূর্যের সঙ্গে খুয়া ফুর দৌড় প্রতিযোগিতা[24], **হুয়াই নান জু** সংকলনে ঈ কর্তৃক নয়টি সূর্যকে তীর মেরে নামানো[25], **সী ইয়ে. চী** উপন্যাসে বানর-দেবতার বাহাত্তর রকমের রূপ পরিগ্রহণ[26], এবং **লিয়াও চাই চি ই**[27]

নামক গ্রন্থে ভূতদের ও খেঁকশিয়ালদের মানুষের রূপ গ্রহণের বহু কাহিনী। এইসব পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত বিপরীতগুলোর পরস্পরে রূপান্তর মূর্ত দ্বন্দ্বে প্রকাশিত মূর্ত রূপান্তর নয়, এগুলো হচ্ছে বিপরীতগুলোর একে অন্যতে বহু জটিল ও বাস্তব রূপান্তর দ্বারা মানুষের মনে কল্পনায় সাজিয়ে তোলা শিশুসুলভ, অলীক ও মনগড়া রূপান্তর। মার্কস বলেছেন: 'সমস্ত পুরাকাহিনী কল্পনায় এবং কল্পনার মাধ্যমে প্রকৃতির শক্তিগুলোর ওপর প্রভুত্ব ও আধিপত্য করে এবং তাদের রূপায়িত করে। তাই প্রকৃতির শক্তিগুলোর উপর মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।'[২৮] পৌরাণিক কাহিনীতে (এবং ছেলেভুলানো গল্পেও) যে অসংখ্য রূপান্তরের কাহিনী রয়েছে, লোককে তা আনন্দ দেয় এই জন্য যে, সেগুলি প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষের জয়লাভকে কল্পনায় রূপ দেয়। তা ছাড়া শ্রেষ্ঠ পুরাকাহিনীগুলির রয়েছে 'চিরন্তন সৌন্দর্য' (মার্কসের ভাষায়) কিন্তু পুরাকাহিনী মূর্ত দ্বন্দ্বগুলির নির্দিষ্ট অবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়নি এবং এজন্য বাস্তবের বৈজ্ঞানিক প্রতিফলন নয়। অর্থাৎ পুরাকাহিনী বা ছেলেভুলানো গল্পে একটা দ্বন্দ্বরত দিকগুলোর কেবল কাল্পনিক অভিন্নতা রয়েছে, মূর্ত অভিন্নতা নয়। বাস্তব রূপান্তরগুলোর অভিন্নতার বৈজ্ঞানিক প্রতিফলনই হচ্ছে মার্কসবাদী দ্বন্দ্ববাদ।

একটা ডিম মুরগীর ছানায় রূপান্তরিত হতে পারে, কিন্তু একটা পাথর পারে না। কেন? যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে অভিন্নতা রয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ ও পাথরের মধ্যে নেই কেন? কেন মানুষ কেবল মানুষকেই জন্ম দিতে পারে, অন্য কিছুকে নয়? কারণ শুধু এই যে, কেবল নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় অবস্থাতেই বিপরীতগুলোর অভিন্নতা থাকে। এই নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় অবস্থা ছাড়া কোন অভিন্নতা থাকতে পারে না।

কেন রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীর বুর্জোয়া' গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঐ বছরেই অক্টোবরের সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত ছিল? আবার ফ্রান্সে বুর্জোয়া বিপ্লব কেন সামাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত ছিল না, কেন ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউন[২৯] ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল? অন্যদিকে, কেন মঙ্গোলিয়া এবং মধ্য এশিয়ার যাযাবর ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে? কেন চীনের বিপ্লব পাশ্চাত্য দেশগুলোর পুরানো ঐতিহাসিক পথ গ্রহণ ছাড়াই এবং বুর্জোয়া একনায়কত্বের পর্যায় অতিক্রম না করেই ধনতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ পরিহার করতে এবং সরাসরি

সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐ সময়ের মূর্ত অবস্থা। যখন কতকগুলো নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় অবস্থা বিদ্যমান থাকে, তখন বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় কতকগুলো দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে এবং তদুপরি সেগুলোর মধ্যে নিহিত বিপরীতগুলো পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয় এবং পরস্পরে রূপান্তরিত হয়। অন্যথায় কোনকিছুই সম্ভব হয় না।

এটাই অভিন্নতার সমস্যা। তাহলে সংগ্রাম কি? অভিন্নতা ও সংগ্রামের মধ্যে সম্পর্ক কি?

> লেনিন বলেছেন: বিপরীতের ঐক্য (মিল, অভিন্নতা, সমক্রিয়া) হচ্ছে শর্তসাপেক্ষ, সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী এবং আপেক্ষিক। পরস্পরব্যতিরেকী বিপরীতগুলোর সংগ্রাম অনাপেক্ষিক, ঠিক যেমন বিকাশ ও গতি অনাপেক্ষিক।[৩০]

এই অনুচ্ছেদটির অর্থ কি?

সকল প্রক্রিয়ার আছে শুরু ও শেষ, সকল প্রক্রিয়া নিজেদের একে অন্যতে রূপান্তরিত করে। সকল প্রক্রিয়ার স্থায়িত্ব আপেক্ষিক, কিন্তু এক প্রক্রিয়া থেকে অন্য প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের মধ্যে আত্মপ্রকাশকারী পরিবর্তনীয়তা অনাপেক্ষিক।

সকল বস্তুর মধ্যে গতির দুটি অবস্থা আছে—আপেক্ষিক নিশ্চলতা এবং দৃশ্যমান পরিবর্তন। দুটোই বস্তুর মধ্যে নিহিত দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী উপাদানের মধ্যেকার সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত। যখন বস্তুটি গতির প্রথম অবস্থাটিতে থাকে, তখন তার পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটে, গুণগত নয়, কাজেই মনে হয় সে আপাতঃ নিশ্চল অবস্থায় রয়েছে। যখন বস্তুটি গতির দ্বিতীয় অবস্থাটিতে থাকে, তার আগেই প্রথম অবস্থাটির পরিমাণগত পরিবর্তন কোন চরম বিন্দুতে পৌঁছে যায় বস্তুর একক সত্তার বিয়োজন ঘটায় এবং অবিলম্বে একটা গুণগত পরিবর্তন উদ্ভূত হয়। ফলে তার দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে ঐক্য, সংহতি, সংযুক্তি, সামঞ্জস্য, সমতা, অচলাবস্থা, বদ্ধাবস্থা, নিশ্চলতা, সুস্থিতি, ভারসাম্য, জমাট অবস্থা ও আকর্ষণ ইত্যাদি দেখতে পাই। এগুলি সবই হচ্ছে পরিমাণগত পরিবর্তনের অবস্থায় বস্তুসমূহের বাইরের চেহারা। অন্যদিকে, ঐক্যের বিয়োজন অর্থাৎ ঐ সংহতি, সংযুক্তি, সামঞ্জস্য, সমতা, অচলাবস্থা, বদ্ধাবস্থা, নিশ্চলতা, সুস্থিতি, ভারসাম্য জমাট অবস্থা ও আকর্ষণের ধ্বংস এবং প্রত্যেকটির বিপরীতে পরিবর্তন—এ সবই হল

গুনগত পরিবর্তনের অবস্থায়, একটি প্রক্রিয়া থেকে অন্য প্রক্রিয়ায় রূপান্তরকালে বস্তুর বাইরের চেহারা। বস্তু সর্বদাই নিজেদেরকে গতির প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় রূপান্তরিত করে চলেছে, আর উভয় অবস্থাতেই বিপরীতগুলোর সংগ্রাম চলছে, এবং দ্বন্দ্বের মীমাংসা হচ্ছে দ্বিতীয় অবস্থার মধ্যে দিয়ে। এজন্যই আমরা বলি যে, বিপরীতগুলোর ঐক্য হচ্ছে শর্তসাপেক্ষ, অস্থায়ী ও আপেক্ষিক, আর পরস্পর-ব্যতিরেকী বিপরীতগুলোর সংগ্রাম হচ্ছে অনাপেক্ষিক।

উপরে আমরা যখন বলেছিলাম যে, যেহেতু তাদের মধ্যে রয়েছে অভিন্নতা, অতএব দুটি বিপরীত জিনিস একক সত্তায় সহ-অবস্থান করতে পারে এবং নিজেদের পরস্পরে রূপান্তরিত করতে পারে, তখন আমরা শর্তাধীনতার কথাই বলেছিলাম। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট অবস্থায় দুটি দ্বন্দ্বমান জিনিস ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং পরস্পরে রূপান্তরিতও হতে পারে। কিন্তু এসব অবস্থা অনুপস্থিত থাকলে তারা একটা দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত করতে পারে না, তারা সহ-অবস্থান করতে পারে না এবং নিজেদর পরস্পরে রূপান্তরিত করতেও পারে না। বিপরীতগুলোর অভিন্নতা কেবল নির্দিষ্ট অবস্থায় বিদ্যমান থাকে বলেই আমরা বলেছি অভিন্নতা শর্তসাপেক্ষও আপেক্ষিক। এর সঙ্গে আমরা আরও বলি যে, বিপরীতগুলোর মধ্যে সংগ্রাম একটা প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবহমান এবং একটা প্রক্রিয়াকে অপর একটা প্রক্রিয়ার রূপান্তরিত করে, এই সংগ্রাম সর্বব্যাপী, এবং এজন্যই শর্তহীন ও অনাপেক্ষিক।

শর্তসাপেক্ষ ও আপেক্ষিক অভিন্নত এবং শর্তহীন ও অনাপেক্ষিক সংগ্রামের সমন্বয় সকল বস্তুতে বিপরীতগুলোর গতিকে রূপ দেয়।

আমরা চীনারা প্রায়ই বলে থাকি, 'যেসব জিনিস পরস্পর-বিরোধী তারা পরস্পরের পরিপূর্বক।'[৩১] অর্থাৎ পরস্পর-বিরেধী জিনিসের অভিন্নতা রয়েছে। এই উক্তি হচ্ছে দ্বন্দ্ববাদী এবং অধিবিদ্যার বিরোধী। 'পরস্পর-বিরোধী' বলতে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দিকের পারস্পরিক বর্জন বা সংগ্রামকে বোঝায়। 'পরস্পরের পরিপূরক' মানে নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি সংযুক্ত হয় এবং অভিন্নতা অর্জন করে। অধিকন্তু, অভিন্নতার মধ্যেই সংগ্রাম নিহিত এবং সংগ্রাম ছাড়া কোন অভিন্নতা থাকতে পারে না।

অভিন্নতার মধ্যে রয়েছে সংগ্রাম, বিশিষ্টতার মধ্যে রয়েছে সর্বজনীনতা এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে সাধারণ বৈশিষ্ট্য। লেনিনের ভাষায়, '...আপেক্ষিকের মধ্যে রয়েছে অনাপেক্ষিক'[৩২]।

৬। দ্বন্দ্বে বৈরিতার স্থান

বিপরীতগুলোর সংগ্রামের প্রশ্নটির মধ্যে বৈরিতা কি—এই প্রশ্নটিও অন্তর্ভুক্ত। আমাদের জবাব হচ্ছে: বৈরিতা বিপরীতগুলোর সংগ্রামের একটা রূপ, কিন্তু একমাত্র রূপ নয়।

মানব ইতিহাসে শ্রেণী-বৈরিতা থাকে বিপরীতগুলোর সংগ্রামের একটি বিশেষ প্রকাশ রূপে। শোষকশ্রেণী ও শোষিতশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে বিবেচনা করুন। এইসব দ্বন্দ্বমান শ্রেণীগুলি বহুদিন একই সমাজে সহ-অবস্থান করে—সে সমাজ দাসসমাজ, সামন্তসমাজ বা ধনতান্ত্রিক সমাজ যাই হোক না কেন—এবং তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কিন্তু শ্রেণী দুটির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব একটা নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত হওয়ার পরই কেবল প্রকাশ্য বৈরিতার রূপ নেয় এবং বিপ্লবের দিকে বিকাশলাভ করে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শান্তি থেকে যুদ্ধে রূপান্তরে ক্ষেত্রেও একথা খাটে।

বিস্ফোরিত হওয়ার পূর্বে বোমা একটা একক সত্তা, যার মধ্যে বিপরীতগুলো নির্দিষ্ট অবস্থায় সহ-অবস্থান করে। বিস্ফোরণ তখনই ঘটে যখন একটা নূতন অবস্থা, জ্বলন দেখা দেয়। যেসব প্রাকৃতিক ব্যাপার চূড়ান্ত পর্যায়ে পুরানো দ্বন্দ্বের সমাধান এবং নূতন বস্তু সৃষ্টির জন্য প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ নেয়, সেই সবগুলোতেই অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

এ বিষয়টি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদ্বারা আমরা বুঝতে পারি, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধ অপরিহার্য, যুদ্ধকে বাদ দিয়ে সমাজ বিকাশের দ্রুত-অতিক্রমণ সম্পন্ন করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীকে উৎখাত করা অসম্ভব, অর্থাৎ জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করাও অসম্ভব। সমাজবিপ্লব অপ্রয়োজনীয় ও অসম্ভব—প্রতিক্রিয়াশীলদের এই শঠতাপূর্ণ অপপ্রচারের স্বরূপ কমিউনিস্টদেরকে উদ্‌ঘাটন করে দিতেই হবে এবং দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে হবে সমাজবিপ্লবের মার্কসবাদী লেনিনবাদী তত্ত্বকে, যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে যে, সমাজবিপ্লব শুধু একান্ত প্রয়োজনীয়ই নয়, সম্পূর্ণ সম্ভবও বটে এবং এটি এমন একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, যা ইতিমধ্যেই মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়যাত্রার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কিন্তু বিপরীতগুলোর প্রত্যেক নির্দিষ্ট সংগ্রামের পরিস্থিতিকে আমাদের অবশ্যই মূর্তভাবে পর্যালোচনা করতে হবে এবং সবকিছুতেই উপরে আলোচিত

সূত্র যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করা চলবে না। দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম হচ্ছে সর্বব্যাপী ও ধ্রুব। কিন্তু দ্বন্দ্বের মীমাংসার পদ্ধতি, অর্থাৎ সংগ্রামের রূপ দ্বন্দ্বের প্রকৃতির বিভিন্নতার জন্য ভিন্ন রকম হয়। কোন দ্বন্দ্বে রয়েছে প্রকাশ্য বৈরিতা, অন্যগুলোতে তা নেই। বস্তুর নির্দিষ্ট বিকাশানুসারে কোন কোন দ্বন্দ্ব যা শুরুতে ছিল অবৈরী, কিন্তু পরে তা বৈরী দ্বন্দ্বে বিকাশলাভ করে। আবার কোন কোন দ্বন্দ্ব যা শুরুতে ছিল বৈরী, কিন্তু পরে তা অবৈরী দ্বন্দ্ব বিকাশলাভ করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যতদিন শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে ততদিন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার নির্ভুল ও ভুল চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব পার্টির ভেতরে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রতিফলন। গোড়ার দিকে, বা কতকগুলি প্রশ্নে, এই ধরনের দ্বন্দ্ব সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বৈরী রূপে প্রকাশ নাও করতে পারে। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশের সাথে সাথে সেও বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বৈরী হয়ে দাঁড়াতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, লেনিন ও স্তালিনের সঠিক চিন্তাধারা এবং ট্রট্স্কি[৩৩] ও বুখারিন প্রমুখের ভুল চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব গোড়ার দিকে বৈরী রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, কিন্তু পরে ঐ দ্বন্দ্ব বৈরী হয়ে দাঁড়ায়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসেও অনুরূপ ঘটনা আছে। আমাদের পার্টির অনেক কমরেডের সঠিক চিন্তাধারা এবং ছেন তু-সিউ ও চাং কুও-থাও প্রমুখ ব্যক্তিদের ভুল চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব গোড়ার দিকেও বৈরী রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, কিন্তু পরে তা বৈরী হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে আমাদের পার্টির মধ্যে সঠিক ও বেঠিক চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব বৈরী রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, এবং যে কমরেডরা ভুল করেছেন তাঁরা যদি ভুল সংশোধন করতে পারেন, তাহলে ঐ দ্বন্দ্ব বৈরিতায় পরিণত হবে না। এজন্য, পার্টিকে অবশ্যই একদিকে ভুল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করতে হবে, এবং অন্যদিকে কমরেডরা ভুল করেছেন তাঁদের সচেতন হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। এমতাবস্থায়, অতিরিক্ত সংগ্রাম স্পষ্টতঃই ঠিক হবে না। কিন্তু যাঁরা ভুল করেছেন তাঁরা যদি ভুলগুলো আঁকড়ে থাকেন এবং সেগুলো বাড়িয়েই চলেন, তাহলে ঐ দ্বন্দ্বের বৈরিতায় পরিণত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

অর্থনীতির দিক দিয়ে, ধনতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে বুর্জোয়া-শাসনাধীন শহর গ্রামাঞ্চলকে নির্মমভাবে শোষণ করে এবং চীনে কুওমিনতাঙ শাসিত

এলাকায়, যেখানে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা বৃহৎ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনাধীন শহর চরম বর্বতার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলকে শোষণ করে—শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব একটা প্রচণ্ড বৈরী দ্বন্দ্ব। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশে এবং আমাদের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় এই বৈরী দ্বন্দ্ব অবৈরী দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং যখন সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছানো যাবে তখন এই দ্বন্দ্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

লেনিন বলেছেন, 'বৈরিতা ও দ্বন্দ্ব মোটেই এক ও অভিন্ন নয়। সমাজ-তন্ত্রের অধীনে, প্রথমটার বিলুপ্তি ঘটবে, কিন্তু দ্বিতীয়টা থাকবে।'[৩৪] অর্থাৎ বৈরিতা হচ্ছে বিপরীতগুলোর সংগ্রামের একটা রূপ, কিন্তু একমাত্র রূপ নয়। বৈরিতার সূত্রকে সর্বত্র নির্বিচারে প্রয়োগ করা যায় না।

৭। উপসংহার

আমরা এখন সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলতে পারি। বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্বের নিয়ম, অর্থাৎ বিপরীতের মধ্যে ঐক্যের নিয়ম হল প্রকৃতি ও সমাজের মৌলিক নিয়ম, এবং এজন্য তা চিন্তারও মৌলিক নিয়ম। এটা অধিবিদ্যার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী। এটা মানবিক জ্ঞানের ইতিহাসে এক বিরাট বিপ্লবের পরিচায়ক। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুযায়ী বাস্তবতঃ বিরাজমান বস্তুর এবং মনোগত চিন্তার সমস্ত প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, এবং সকল প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবাহমান। এটা হচ্ছে দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ও অনাপেক্ষিকতা। প্রত্যেক দ্বন্দ্বের এবং তার প্রত্যেকটি দিকের রয়েছে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য। এটা হচ্ছে দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা ও আপেক্ষিকতা। নির্দিষ্ট অবস্থায় বিপরীতগুলোর থাকে অভিন্নতা। কাজেই তারা একক সত্তায় সহ-অবস্থান করতে পারে এবং প্রত্যেকে নিজের বিপরীতে পরিণত হতে পারে। এটাই আবার দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা ও আপেক্ষিকতা। কিন্তু বিপরীতগুলোর সংগ্রাম বিরামহীন। যখন বিপরীতগুলো সহ-অবস্থান করছে, বা যখন তারা নিজেদের পরস্পরে রূপান্তরিত করছে, উভয় সময়েই সংগ্রাম চলতে থাকে, এবং যখন তারা নিজেদের পরস্পরে রূপান্তরিত করছে, তখন এটা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটাই, হচ্ছে আবার দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ও অনাপেক্ষিকতা। দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা ও আপেক্ষি-কতা পর্যালোচনায় আমাদের অবশ্যই প্রধান ও অপ্রধান দ্বন্দ্বের মধ্যে এবং একটা দ্বন্দ্বের মুখ্য দিক ও গৌণ দিকের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি মনোযোগ দিকে

হবে। দ্বন্দ্বের সর্বজনীনতা ও দ্বন্দ্বের মধ্যেকার বিপরীতগুলোর সংগ্রাম পর্যালোচনা করার সময় আমাদের অবশ্যই সংগ্রামের বিভিন্ন রূপের মধ্যেকার পার্থক্যের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, অন্যথায় আমরা ভুল করব। যদি, পর্যালোচনার মাধ্যমে, আমরা উপরিবর্ণিত মূল বিষয়গুলোর প্রকৃত উপলব্ধি অর্জন করতে পারি, তাহলে আমরা মতান্ধ চিন্তাধারা ধ্বংস করতে সক্ষম হব, যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূলনীতির পরিপন্থী এবং আমাদের বিপ্লবী আদর্শের পক্ষে ক্ষতিকর। এবং আমাদের অভিজ্ঞ কমরেডরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে নীতিতে বিন্যস্ত করতে পারবেন এবং অভিজ্ঞতাবাদী ভুলের পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে সক্ষম হবেন। এগুলো হচ্ছে দ্বন্দ্বের নিয়ম সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনা থেকে লব্ধ কয়েকটি সহজ সিদ্ধান্ত।

মাও সে তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ
১লা মে, ১৯৬০

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগ (১)

জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের কর্মনীতি, ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য (২৩শে জুলাই, ১৯৩৭) ... ১৭

১। দুটি কর্মনীতি .. ১৭

২। দু'রকম ব্যবস্থা ... ২১

৩। দুটি ভবিষ্যৎ লক্ষ্য . ২৬

৪। সিদ্ধান্ত ... ২৬

প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতির শক্তির সমাবেশের জন্য (২৫শে আগস্ট, ১৯৩৭) . ২৯

উদারতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭) ... ৩৮

কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে আশু কর্তব্যসমূহ (২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭) ৪২

ব্রিটিশ সাংবাদিক জেমস বার্ট্রামের সংগে সাক্ষাৎকার (২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৭) . ৫৫

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রতিরোধ-যুদ্ধ .. ৫৫

যুদ্ধ-পরিস্থিতি ও তার শিক্ষা . ৫৬

প্রতিরোধ-যুদ্ধে অষ্টম রুট বাহিনী ... ৬১

প্রতিরোধ-যুদ্ধের মধ্যে আত্মসমর্পণবাদ . ৬৫

গণতন্ত্র এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধ .. ৬৭

সাংহাই ও তাইয়ুয়ানের পতনের পর জাপ-বিরোধী যুদ্ধের পরিস্থিতি ও কর্তব্যসমূহ (১২ই নভেম্বর, ১৯৩৭) ... ৭১

১। বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে আংশিক প্রতিরোধ-যুদ্ধ থেকে সর্বাত্মক প্রতিরোধ-যুদ্ধে উত্তরণের পরিস্থিতি .. ৭১

২। আত্মসমর্পণবাদের বিরুদ্ধে পার্টির মধ্যে এবং দেশের সর্বত্র সংগ্রাম করতে হবে ... ৭৫

পার্টির মধ্যে শ্রেণী-আত্মসমর্পণবাদের বিরোধিতা কর ... ৭৫

বিষয় পৃষ্ঠা

সামগ্রিকভাবে দেশে আত্মসমর্পণবাদের বিরোধিতা কর ... ৮০

শ্রেণী-আত্মসমর্পণবাদ ও জাতীয় আত্মসমর্পণবাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ... ৮২

শেনসী-কাংসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সরকার এবং অষ্টম রুট বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগস্থ সদর দপ্তরের ঘোষণা (১৫ই মে, ১৯৩৮) ... ৯০

জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যা (মে, ১৯৩৮) ... ৯৪

প্রথম অধ্যায় : গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কেন ? ... ৯৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : যুদ্ধের মৌলিক নীতি হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা ও শত্রুকে ধ্বংস করা ... ৯৬

তৃতীয় অধ্যায় : জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের ছয়টি বিশেষ রণনীতিগত সমস্যা ... ৯৭

চতুর্থ অধ্যায় : উদ্যোগ ও নমনীয়তার সংগে এবং সুপরিকল্পিত-ভাবে প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধে আক্রমণাত্মক লড়াই করা, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা এবং অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই চালানো ... ৯৮

পঞ্চম অধ্যায় : নিয়মিত যুদ্ধের সংগে সমন্বয়সাধন ... ১০৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : ঘাঁটি এলাকা স্থাপন ... ১১২

১। বিভিন্ন ধরনের ঘাঁটি এলাকা ... ১১৪

২। গেরিলা অঞ্চল ও ঘাঁটি এলাকা ... ১১৬

৩। ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের শর্ত ... ১১৯

৪। ঘাঁটি এলাকার সুদৃঢ়ীকরণ ও সম্প্রসারণ ... ১২২

৫। আমাদের ও শত্রুর পারস্পরিক পরিবেষ্টনের রূপ ... ১২৩

সপ্তম অধ্যায় : গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত আক্রমণ ... ১২৫

১। গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ... ১২৫

২। গেরিলাযুদ্ধে রণনীতিগত আক্রমণ ... ১২৯

অষ্টম অধ্যায় : গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকাশ সাধন ... ১৩১

নবম অধ্যায় : পরিচালনার সম্পর্কে ... ১৩৪

বিষয়		পৃষ্ঠা

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে (মে, ১৯৩৮) ... ১৪১

সমস্যার সূত্রপাত ... ১৪১

সমস্যার ভিত্তি ... ১৫২

জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের খণ্ডন ... ১৫৬

আপোষ, না প্রতিরোধ ? দুর্নীতি, না প্রগতি ? ... ১৬১

জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্ব ভুল, দ্রুত বিজয়ের তত্ত্বও ভুল ... ১৬৫

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কেন ? ... ১৬৮

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের তিনটি পর্যায় ... ১৭১

কলের করাতের ধরনের যুদ্ধ ... ১৮৩

চিরস্থায়ী শান্তির জন্য যুদ্ধ করা ... ১৮৭

যুদ্ধে মানুষের কর্মতৎপরতা ... ১৯০

যুদ্ধ ও রাজনীতি ... ১৯২

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য রাজনৈতিক সমাবেশ ... ১৯৪

যুদ্ধের উদ্দেশ্য ... ১৯৬

প্রতিরক্ষার মধ্যে আক্রমণ, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই, অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই ... ১৯৯

উদ্যোগ, নমনীয়তা ও পরিকল্পনা ... ২০৪

চলমান যুদ্ধ, গেরিলাযুদ্ধ, অবস্থানগত যুদ্ধ ... ২১৭

শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ এবং নির্মূলীকরণের যুদ্ধ ... ২২২

শত্রুর ভুলত্রুটির সুযোগ নেওয়ার সম্ভাব্যতা ... ২২৬

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে নির্ধারক লড়াইয়ের প্রশ্ন ... ২২৯

সৈন্যবাহিনী ও জনগণ হচ্ছেন জয়ের ভিত্তি ... ২৩৩

উপসংহার ... ২৩৯

জাতীয় যুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা (অক্টোবর, ১৯৩৮) ... ২৫৩

দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদ ... ২৫৪

জাতীয় যুদ্ধে কমিউনিস্টদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত ... ২৫৫

সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ কর ও তার মধ্যেকার শত্রুর চরদের মোকাবিলা কর ... ২৫৮

কমিউনিস্ট পার্টিকে সম্প্রসারিত কর ও শত্রুর চরদের অনুপ্রবেশ রোধ কর ... ২৫৮

বিষয় | পৃষ্ঠা

যুক্তফ্রন্ট ও পার্টির স্বাতন্ত্র্য দুই-ই বজায় রাখ ... ২৫৯
পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিচার কর, সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা কর, আর আমাদের মিত্রদের সাথে একযোগে কাজ কর ... ২৬০
কর্মসংক্রান্ত নীতি ... ২৬১
পার্টি শৃংখলা ... ২৬৪
পার্টি গণতন্ত্র ... ২৬৫
দুই ফ্রণ্টে সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের পার্টি নিজেকে সংহত করেছে ও শক্তিশালী হয়েছে ... ২৬৬
দুই ফ্রণ্টে বর্তমান সংগ্রাম ... ২৬৯
অধ্যয়ন ... ২৭০
ঐক্য ও বিজয় ... ২৭২
যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে স্বাধীনতা ও উদ্যোগের প্রশ্ন (৫ই নভেম্বর, ১৯৩৮) ... ২৭৫
সাহায্য ও সুবিধে ইতিবাচক হওয়া উচিত, নেতিবাচক নয় ... ২৭৫
জাতীয় ও শ্রেণী-সংগ্রামের অভিন্নতা ... ২৭৭
'সমস্ত কিছুই হবে যুক্তফ্রণ্টের মাধ্যমে'—এ ধারণা ভুল ... ২৭৭
যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা (৬ই নভেম্বর, ১৯৩৮) ... ২৮০
১। চীনের বৈশিষ্ট্য ও বিপ্লবী যুদ্ধ ... ২৮০
২। কুওমিনতাঙের যুদ্ধের ইতিহাস ... ২৮৫
৩। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধের ইতিহাস ... ২৮৭
৪। গৃহযুদ্ধে ও জাতীয় যুদ্ধে পার্টির সামরিক রণনীতির পরিবর্তন ... ২৮৯
৫। জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত ভূমিকা ... ২৯২
৬। সামরিক সমস্যার পর্যালোচনায় মনোযোগ দাও ... ২৯৬
৪ঠা মে'র আন্দোলন (মে, ১৯৩৯) ... ৩০৪
যুব আন্দোলনের দিক্‌নির্দেশ (৪ঠা মে, ১৯৩৯) ... ৩০৭
আত্মসমর্পণবাদী কার্যকলাপের বিরোধিতা করুন (৩০শে জুন, ১৯৩৯) ... ৩১৮
প্রতিক্রিয়াশীলদের শাস্তি দিতেই হবে (১লা আগস্ট ১৯৩৯) ... ৩২৫

বিষয়		পৃষ্ঠা

নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে 'নয়া চীন দৈনিক' পত্রিকার সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) … ৩৩১

কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থা, 'সাও তাং পাও' এবং 'শিন মিন পাও' পত্রিকার তিনজন সাংবাদিকের সংগে সাক্ষাৎকার (১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) … ৩৪০

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মানবজাতির স্বার্থ অভিন্ন (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) … ৩৪৭

'দি কমিউনিস্ট' পত্রিকা প্রকাশের পটভূমি (৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৯) … ৩৫৯

বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টির কর্তব্যসমূহ (১০ই অক্টোবর, ১৯৩৯) … ৩৭৫

বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক সংখ্যায় দলে টেনে আনুন (১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৯) … ৩৭৮

চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (ডিসেম্বর, ১৯৩৯) … ৩৮২

প্রথম অধ্যায় : চীনের সমাজ … ৩৮২

১। চীনা জাতি … ৩৮২

২। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ … ৩৮৪

৩। বর্তমান ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ … ৩৮৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : চীন বিপ্লব … ৩৯৩

১। গত একশ বছরের বিপ্লবী আন্দোলন … ৩৯৩

২। চীন বিপ্লবের লক্ষ্য … ৩৯৪

৩। চীন বিপ্লবের করণীয় কাজ … ৩৯৮

৪। চীন বিপ্লবের চালিকাশক্তি … ৩৯৮

৫। চীন বিপ্লবের চরিত্র … ৪০৭

৬। চীন বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত … ৪১০

৭। চীন বিপ্লবের দ্বিবিধ কাজ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি … ৪১২

চীনা জনগণের বন্ধু স্তালিন (২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯) … ৪২৪

নর্ম্যান বেথুনের স্মরণে (২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯) … ৪২৬

নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে (জানুয়ারি, ১৯৪০) … ৪২৯

১। চীন কোন্ পথে? … ৪২৯

২। আমরা এক নতুন চীন গড়ে তুলতে চাই … ৪৩০

বিষয় পৃষ্ঠা

৩। চীনের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ... ৪৩০
৪। চীনের বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবের অংশ ... ৪৩৩
৫। নয়া গণতন্ত্রের রাজনীতি ... ৪৩৯
৬। নয়া গণতন্ত্রের অর্থনীতি ... ৪৪৬
৭। বুর্জোয়া একনায়কত্বের তত্ত্ব খণ্ডন ... ৪৪৭
৮। 'বামপন্থী' বুলি-কপচানির খণ্ডন ... ৪৫৩
৯। গোঁড়া ব্যক্তিদের যুক্তি খণ্ডন ... ৪৫৬
১০। পুরানো ও নতুন তিন-গণনীতি ... ৪৫৯
১১। নয়া গণতন্ত্রের সংস্কৃতি ... ৪৬৬
১২। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ... ৪৬৮
১৩। চার যুগ ... ৪৭১
১৪। সংস্কৃতির প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি ভুল ধারণা ... ৪৭৭
১৫। জাতীয়, বিজ্ঞানসম্মত ও জনসাধারণের একটি সংস্কৃতি ... ৪৮০
আত্মসমর্পণের বিপদকে জয় কর, এবং ভালর দিকে মোড় ঘোরাবার চেষ্টা কর (২৮শে জানুয়ারি, ১৯৪০) ... ৪৮৭
সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ কর এবং গোঁড়া কমিউনিস্ট-বিরোধীদের প্রতিহত কর (১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০) ... ৪৯১
কুওমিনতাঙের কাছে দশ দফা দাবি (১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০) ... ৪৯৯
'চীনের শ্রমিক' পত্রিকার পরিচয় প্রসঙ্গে (৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০) ... ৫০৭
আমাদের জোর দিতে হবে ঐক্য ও প্রগতির ওপর (১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০) ... ৫০৯
নয়া-গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার (২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০) ... ৫১২
জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকায় রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন সম্পর্কে (৬ই মার্চ, ১৯৪০) ... ৫২৫
জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের রণকৌশলগত সাম্প্রতিক সমস্যাবলী (১১ই মার্চ, ১৯৪০) ... ৫২৯
জাপ-বিরোধী শক্তিগুলোকে অব্যাহতভাবে প্রসারিত করুন এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করুন (৪ঠা মে, ১৯৪০) ... ৫৪২
একেবারে শেষ পর্যন্তই ঐক্য চাই (জুলাই, ১৯৪০) ... ৫৫১

বিষয় পৃষ্ঠা

কর্মনীতি সম্পর্কে (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪০) ... ৫৫৫

দক্ষিণ আনহুই ঘটনা সম্পর্কে নির্দেশ ও বিবৃতি (জানুয়ারি, ১৯৪১)... ৫৬৭

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈপ্লবিক সামরিক কমিশনের নির্দেশ (ইয়েনান, ২০শে জানুয়ারি, ১৯৪১) ... ৫৬৭

সিনহুয়া সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের জনৈক সংবাদদাতার কাছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈপ্লবিক সামরিক কমিশনের জনৈক মুখপাত্রের প্রদত্ত বিবৃতি (২২শে জানুয়ারি, ১৯৪১) ... ৫৬৮

দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান প্রতিহত হওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতি (১৮ই মার্চ, ১৯৪১) ... ৫৭৭

দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান প্রতিরোধ প্রসঙ্গে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ (৮ই মে, ১৯৪১) ... ৫৮২

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগ (১)

জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের কর্মনীতি, ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য

২৩শে জুলাই, ১৯৩৭

১। দুটি কর্মনীতি

লুকৌচিয়াও ঘটনার[১] পরের দিন ৮ই জুলাই তারিখে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতিরোধ-যুদ্ধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে সমগ্র জাতির প্রতি একটা আবেদন প্রকাশ করে। আবেদনটির আংশিক উধৃতি দেওয়া হচ্ছে :

বন্ধু দেশবাসিগণ! পিপিং ও তিয়েনসিন ধ্বংসের মুখে! ধ্বংসের মুখে উত্তর চীন! ধ্বংসের মুখে সমগ্র চীনা জাতি! সমগ্র জাতির প্রতিরোধ-যুদ্ধই হচ্ছে বাঁচার একমাত্র পথ! জাপানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দ্রুত ও দৃঢ় প্রতিরোধ আমরা দাবি করছি, দাবি করছি সমস্ত জরুরী অবস্থার উপযোগী দ্রুত প্রস্তুতি। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সমগ্র জাতিকে এই মুহূর্তে অবশ্যই জাপানী আক্রমণকারীদের সঙ্গে বশ্যতামূলক শান্তিতে বাস করার চিন্তা দূর করতে হবে। বন্ধু দেশবাসিগণ! ফেং চি-আন-এর বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধকে আমাদের অবশ্যই অভিনন্দন ও সমর্থন জানাতে হবে। আমাদের অভিনন্দন ও সমর্থন জানাতে হবে উত্তর চীনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এই ঘোষণাকে যে, তাঁরা আমৃত্যু দেশকে রক্ষা করবেন। আমরা দাবি করছি যে, জেনারেল সুং চে-য়ুয়ান দ্রুত সমগ্র ২৯ নং বাহিনীকে[২] জড়ো করুন এবং লড়াইয়ের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে

সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে সমগ্র চীন দখল করার উদ্দেশ্যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই লুকৌচিয়াও'র ঘটনা সংঘটিত করে। চীনা জনগণ সর্বসম্মতভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দাবি জানায়। ধীরে-সুস্থে জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রকাশ্য ঘোষণা করতে চিয়াং কাই-শেকের দশ দিন লেগে যায়। সারা দেশব্যাপী জনগণের দাবিতে এবং জাপানী আক্রমণের ফলে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের এবং চিয়াং কাই-শেক যাদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি সেই বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থের হানি ঘটার ফলেই চিয়াং এটা করেছিলেন। কিন্তু একই চিয়াং কাই-শেক সরকার জাপানী আক্রমণকারীদের সংগে বৈঠক চালাতে থাকে, এমনকি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সংগে জাপানীদের শান্তিপূর্ণ

পাঠান। নানকিঙের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের দাবি হচ্ছে: ২৯ নং বাহিনীকে কার্যকরী সাহায্য দিন। জনগণের বিভিন্ন দেশপ্রেমিক আন্দোলনের ওপরকার বাধানিষেধ দ্রুত প্রত্যাহার করুন এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধে জনগণের উদ্যোগের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দিন। অবিলম্বে দেশের সমস্ত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীকে সমবেত করুন। অবিলম্বে চীনের মধ্যে ঘাপ্‌টি-মেরে-থাকা সমস্ত বিশ্বাসঘাতক ও জাপানী দালালকে খুঁজে বের করুন এবং এভাবে পশ্চাদ্ভাগ সুসংহত করে তুলুন। দেশের সমগ্র জনগণের কাছে আমরা জাপানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার এই পবিত্র যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের শ্লোগান হচ্ছে: পিপিং, তিয়েনসিন ও উত্তর চীনে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোল! শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেশকে রক্ষা কর! সমগ্র দেশের জনগণ, সরকার ও সশস্ত্রবাহিনী ঐক্যবদ্ধ হোন, গড়ে তুলুন আমাদের দৃঢ় বিশাল প্রাচীরের মতোই জাপানী আক্রমণ-বিরোধী এক জাতীয় যুক্তফ্রন্ট! জাপানী আক্রমণকারীদের নতুন নতুন আক্রমণের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও প্রতিরোধ গড়ে তুলুক! জাপানী হানাদারদের দূর করে দেওয়া হোক চীনের বুক থেকে!

এই হচ্ছে আমাদের কর্মনীতি সম্পর্কিত ঘোষণা।

১৭ই জুলাই তারিখে চিয়াং কাই-শেক লুশানে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু করার কর্মনীতি হিসেবে দেখলে বলা যায়, বহু বছরের মধ্যে

সমঝওতা পর্যন্ত মেনে নেয়। ১৯৩৭ সালের ১৩ই আগস্ট জাপানী হানাদাররা যখন সাংহাই-এর ওপর বিরাট এক আক্রমণ চালায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব চীনে চিয়াং কাই-শেকের শাসন চালানোটাই অসম্ভব করে তোলে, কেবলমাত্র তখনই চিয়াং সশস্ত্র প্রতিরোধের পথে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৯৪৪ সাল পর্যন্তও চিয়াং জাপানের সংগে সন্ধি করার জন্য গোপনে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলাকালে চিয়াং কাই-শেক সমগ্র জনগণকে জড়ো করে সর্বাত্মক জনযুদ্ধ গড়ে তোলার বিরোধিতা করেছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের সক্রিয় বিরোধিতা করে জাপানের বিরুদ্ধে অনুসরণ করেছিলেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতি। 'একবার যুদ্ধ বেধে গেলে, যুবক বা বৃদ্ধ, উত্তরের বা দক্ষিণের প্রতিটি লোককে অবশ্যই জাপানকে রুখবার এবং স্বদেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হবে'—তাঁর নিজেরই এই লুশান বিবৃতির তিনি এভাবে বিরোধিতা করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক আলোচিত দুটি কর্মনীতি, দুটি ব্যবস্থা ও দুটি ভবিষ্যৎ লক্ষ্য প্রতিরোধ-যুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি ও চিয়াং কাই-শেকের দুই লাইনের মধ্যেকার সংগ্রামকেই প্রতিফলিত করছে।

এটাই হচ্ছে পররাষ্ট্র বিষয়ে কুওমিনতাঙদের প্রথম সঠিক বিবৃতি, এবং সে কারণেই এই বিবৃতিটিকে সমগ্র দেশবাসী, এবং সংগে সংগে আমরাও, স্বাগত জানিয়েছি। বিবৃতিটিতে লুকৌচিয়াও ঘটনার মীমাংসার জন্য চারটি শর্তের কথা বলা হয়েছে :

(১) কোন মীমাংসা চীনের সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত সংহতিকে বিঘ্নিত করতে পারবে না; (২) হোপেই ও চাহার প্রদেশের প্রশাসনে কোন-রকম বে-আইনী পরিবর্তন করা চলবে না; (৩) অন্য কারও দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত স্থানীয় অফিসারদের পদচ্যুত বা বদলি করা চলবে না, (৪) ২৯ নং বাহিনী বর্তমানে যেখানে অবস্থান করছে, সেখানেই তাকে আবদ্ধ করে রাখলে চলবে না।

বিবৃতিটির উপসংহারে বলা হয়েছে :

লুকৌচিয়াও ঘটনা সম্পর্কে সরকার একটি কর্মনীতি ও অবস্থান গ্রহণ করেছে, এবং সর্বদাই সে তাতে অবিচল থাকবে। আমরা এ কথা বুঝতে পারি যে, সমগ্র দেশ যখন যুদ্ধে নেমেছে, তখন চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, এবং এর থেকে বেরিয়ে আসার সহজ কোন পন্থা সম্পর্কে সামান্যতম আশাও আমরা পোষণ করি না। একবার যুদ্ধ বেধে গেলে, যুবক বা বৃদ্ধ, উত্তরের বা দক্ষিণের প্রতিটি লোককেই জাপানকে রুখবার এবং স্বদেশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

এটিও একটি কর্মনীতি সম্পর্কিত ঘোষণা।

এখানে আমরা লুকৌচিয়াও ঘটনা সম্পর্কে দুটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘোষণা পাচ্ছি—একটি কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রদত্ত, অন্যটি প্রদত্ত কুওমিনতাঙ কর্তৃক। উভয়েই একটি বিষয়ে একমত : উভয়েই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটি প্রতিরোধ-যুদ্ধের সপক্ষে এবং সমঝওতা ও সুবিধাদানের বিরোধী।

জাপানী আক্রমণ রুখবার জন্য এটি হচ্ছে এক ধরনের কর্মনীতি, একটি সঠিক কর্মনীতি।

কিন্তু আরেকটি ভিন্ন ধরনের কর্মনীতি গ্রহণেরই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক মাস ধরে পিপিং ও তিয়েনসিনে বিশ্বাসঘাতক ও জাপপন্থী লোকেরা খুবই তৎপর হয়ে উঠেছে, তারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে দিয়ে জাপানের দাবিগুলি মেনে নেওয়াতে চাইছে, দৃঢ়সংকল্প সশস্ত্র প্রতিরোধের কর্মনীতিকে বিসর্জন

দিয়ে সমঝওতা ও সুবিধাদানের পক্ষে তারা ওকালতি করছে। এ সবই অত্যন্ত বিপজ্জনক ইংগিত।

সমঝওতা ও সুবিধাদানের কর্মনীতি হচ্ছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধের কর্মনীতির ঠিক উল্টো। খুব তাড়াতাড়ি এই কর্মনীতির পরিবর্তন না হলে পিপিং, তিয়েনসিন ও সমগ্র উত্তর চীন শত্রুদের হাতে চলে যাবে, সমগ্র দেশই এক চরম বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়বে। প্রত্যেককে সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে।

২৯ নং বাহিনীর দেশপ্রেমিক অফিসাররা ও সৈন্যরা, ঐক্যবদ্ধ হোন! সমঝওতা ও সুবিধাদানের বিরোধিতা করুন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যান!

পিপিং, তিয়েনসিন ও উত্তর চীনের দেশপ্রেমিক বন্ধুগণ, ঐক্যবদ্ধ হোন! সমঝওতা ও সুবিধাদানের বিরোধিতা করুন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধকে সমর্থন করুন!

সমস্ত দেশের দেশপ্রেমিক বন্ধুগণ, ঐক্যবদ্ধ হোন! সমঝওতা ও সুবিধাদানের বিরোধিতা করুন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধকে সমর্থন করুন!

মিঃ চিয়াং কাই-শেক এবং কুওমিনতাঙের অন্যান্য দেশপ্রেমিক সদস্যবৃন্দ! আমরা আশা করি যে, আপনারা আপনাদের কর্মনীতিতে অবিচল থাকবেন, আপনাদের শপথ রক্ষা করবেন, সমঝওতা ও সুবিধাদানের বিরোধিতা করবেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যাবেন, এবং এভাবে কাজের মধ্য দিয়ে শত্রুর বর্বরতার জবাব দেবেন!

লালফৌজসহ দেশের সশস্ত্রবাহিনী মিঃ চিয়াং কাই-শেকের ঘোষণাকে সমর্থন জানাক, সমঝওতা ও সুবিধাদানের বিরোধিতা করুক, এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যাক!

আমরা কমিউনিস্টরা সর্বান্তঃকরণে ও বিশ্বস্তভাবে আমাদের নিজেদের ইস্তাহারকে অনুসরণ করার সংগে সংগে মিঃ চিয়াং কাই-শেকের ঘোষণাটির প্রতিও দৃঢ় সমর্থন জানাচ্ছি; কুওমিনতাঙের সদস্যগণ ও অন্যান্য দেশবাসী বন্ধুদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা শরীরের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত দেশকে রক্ষা করতে প্রস্তুত আছি; যে-কোন ইতস্ততঃ ভাব, দোদুল্যমানতা, সমঝওতা বা সুবিধাদানের আমরা বিরোধিতা করছি; দৃঢ়তার সংগে আমরা সশস্ত্র প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাব।

২। দু'রকম ব্যবস্থা

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধের কর্মনীতির লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সামগ্রিক কিছু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

সেগুলি কি কি? প্রধানগুলি হচ্ছে এরকম :

১। **সমগ্র দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সমাবেশ ঘটাও।** স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী, কেন্দ্রীয় বাহিনী, স্থানীয় বাহিনী ও লালফৌজ—সব মিলিয়ে কুড়ি লক্ষেরও বেশি আমাদের স্থায়ী বাহিনীকে জড়ো কর, অবিলম্বে তাদের প্রধান বাহিনীগুলিকে জাতীয় রক্ষাব্যূহ রেখায় পাঠিয়ে দাও, এবং পশ্চাদ্ভাগে কিছু বাহিনীকে শৃংখলা রক্ষার জন্য নিয়োজিত কর। জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বস্ত জেনারেলদের ওপর বিভিন্ন ফ্রন্টের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ কর। রণনীতি নির্ধারণ করার জন্য এবং বিভিন্ন সামরিক অভিযানে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটি জাতীয় প্রতিরক্ষা সম্মেলন আহ্বান কর। সৈন্যবাহিনীর অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে এবং সৈন্য ও জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সৈন্যবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক কাজকে ঢেলে সাজাও। রণনীতিগত দায়িত্বের একটা দিকের দায়িত্ব গেরিলা যুদ্ধের ওপর অর্পণ করার নীতি প্রতিষ্ঠা কর এবং গেরিলা যুদ্ধ ও নিয়মিত যুদ্ধের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন কর। সৈন্যবাহিনী থেকে বিশ্বাসঘাতকদের দূর করে দাও। যথেষ্ট সংখ্যক মজুত সৈন্য সংগ্রহ কর, এবং তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবার মতো উপযুক্ত ট্রেনিং দাও। সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় সম্ভার পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ কর। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধের সাধারণ কর্মনীতির সংগে সংগতি রেখে ওপরের চিন্তাগুলি অনুসারে সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কর। চীনের সৈন্যবাহিনী সংখ্যায় প্রচুর বটে, কিন্তু এই পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী না করা হলে তারা শত্রুদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। আর রাজনৈতিক ও বাস্তব বিষয়গুলির সমন্বয় ঘটাতে পারলে আমাদের সৈন্যবাহিনী হবে পূর্ব এশিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি।

২। **সমগ্র জনগণের সমাবেশ ঘটাও।** দেশপ্রেমিক আন্দোলনগুলির ওপর থেকে সমস্ত রকমের বাধা তুলে নাও, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও, 'প্রজাতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক কাজকর্মের ওপর জরুরী নির্দেশনামা'[৩] এবং 'সংবাদ নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশনামা'[৪] বাতিল কর, বর্তমান দেশপ্রেমিক সংগঠন-গুলিকে আইনী স্বীকৃতি দাও, এইসব সংগঠনকে শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী ও

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিস্তৃত কর, জনগণকে আত্মরক্ষার জন্য এবং সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য সশস্ত্র কর। এক কথায় জনগণকে তাদের দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটাবার জন্য স্বাধীনতা দাও। জনগণ ও সেনাবাহিনী তাদের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর মরণ-আঘাত হানতে পারবে। ব্যাপক জনতার ওপর নির্ভর না করলে জাতীয় যুদ্ধে যে জয়লাভ করা যাবে না, এতে কোন সন্দেহ নেই। আবিসিনিয়ার পতন[৫] থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আন্তরিকভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিরোধ-যুদ্ধ গড়ে তুলতে আগ্রহী কেউই এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করতে পারে না।

৩। **সরকারী কাঠামোর সংস্কার কর**। সরকার যাতে প্রকৃত জনগণের সরকার হয়ে উঠতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যৌথ পরিচালনার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গ্রুপের প্রতিনিধি এবং জননেতাদের সরকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর এবং সরকারের মধ্যে ঘাপ্‌টি-মেরে-থাকা সমস্ত বিশ্বাসঘাতক ও জাপপন্থী ব্যক্তিদের দূর করে দাও। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ একটি বিরাট কাজ, শুধু কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষ সে দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে না। সরকারকে যদি প্রকৃতই জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার হয়ে উঠতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই জনগণের ওপর নির্ভর করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অনুশীলন করতে হবে। একই সঙ্গে তাকে হতে হবে গণতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত ; এ ধরনের সরকারই কেবল শক্তিশালী হতে পারে। জাতীয় পরিষদকে হতে হবে সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিমূলক। তা হবে কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ সংস্থা, রাষ্ট্রের প্রধান কর্মনীতিসমূহের নির্ধারক এবং জাপানকে রুখবার ও দেশকে বাঁচাবার কর্মনীতি ও পরিকল্পনাসমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী।

৪। **জাপান-বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ কর**। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের কোনরকম সুযোগ-সুবিধে দিও না, বরং উল্টোদিকে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর, তাদের ঋণ অস্বীকার কর, তাদের দালালদের গোড়াশুদ্ধ উপড়ে ফেল এবং তাদের গুপ্তচরদের বিতাড়িত কর। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে অবিলম্বে একটি সামরিক ও রাজনৈতিক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন কর এবং তার সংগে ঘনিষ্ঠ ঐক্য গড়ে তোল। সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে সেই দেশ, যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, সবচেয়ে শক্তিশালী এবং জাপানের বিরুদ্ধে চীনকে সাহায্য করতে সবচেয়ে বেশি সক্ষম। জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধের ব্যাপারে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের সমর্থন সংগ্রহ কর, তবে এই

শর্তে যে, এতে আমাদের ভূখণ্ড বা সার্বভৌম অধিকারের কোন ক্ষতি হবে না। জাপানী হানাদারদের বিধ্বস্ত করতে গিয়ে আমাদের প্রধানতঃ নিজেদের শক্তির ওপরেই নির্ভর করতে হবে ; কিন্তু তাই বলে বৈদেশিক সাহায্যকে প্রত্যাখ্যান করারও কোন যুক্তি নেই, এবং একা একা চলার নীতি শত্রুদেরই সুবিধে করে দেবে।

৫। **জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতিমূলক কর্মসূচী ঘোষণা কর এবং অবিলম্বে তাকে কার্যকরী কর।** নিম্নলিখিত ন্যূনতম বিষয়গুলি দিয়ে শুরু করা হোক : অত্যধিক হারে কর ও নানারকম লেভির অবসান ঘটাও, জমির খাজনা কমিয়ে দাও, মহাজনী কারবারকে সীমিত কর, শ্রমিকদের মজুরী বাড়াও, সৈন্য ও নিম্নপদস্থ অফিসারদের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটাও, অফিসের কর্মচারীদের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটাও, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্য দাও। এই ব্যবস্থাগুলি, কেউ কেউ যেরকম বলছে, মোটেই দেশের অর্থনীতিকে সেরকম বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলবে না, বরং এইসব নতুন ব্যবস্থা জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে এবং তার ফলে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে। এইসব ব্যবস্থা জাপানকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে আমাদের অপরিমেয় শক্তি জোগাবে এবং সরকারের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তুলবে।

৬। **জাতীয় প্রতিরক্ষার শিক্ষার প্রচলন কর।** বর্তমান শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাও। যেসব প্রকল্প খুব জরুরী নয় এবং যেসব ব্যবস্থা যুক্তিভিত্তিক নয়, সেগুলিকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। সংবাদপত্র, বই ও পত্রপত্রিকা, ফিল্ম্‌, নাটক, সাহিত্য ও শিল্প—সব কিছুকেই জাতীয় প্রতিরক্ষার স্বার্থে কাজ করতে হবে। বিশ্বাসঘাতকতামূলক প্রচার নিষিদ্ধ করতে হবে।

৭। **জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য আর্থিক ও অর্থনৈতিক কর্মনীতিসমূহ গ্রহণ কর।** আর্থিক কর্মনীতি হবে এই যে যাদের টাকা আছে তাদের টাকা দিতে হবে এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। আর অর্থনৈতিক কর্মনীতি হবে জাপানী পণ্য বয়কট ও স্বদেশী পণ্যের বিকাশের নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত—সব কিছুই জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য। আর্থিক সংকট হচ্ছে ভুল ব্যবস্থা গ্রহণেরই ফলশ্রুতি, জনগণের কল্যাণমূলক এইসব নতুন কর্মনীতি গ্রহণ করলে সুনিশ্চিত-

ভাবেই তার সমাধান করা যায়। এমন কথা বলা নিতান্তই মূর্খতা যে, এত বিশাল ভূখণ্ড ও এত বিপুল জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশ আর্থিক ও অর্থ নৈতিকভাবে নিতান্তই অসহায়।

৮। **আমাদের দৃঢ় ও বিশাল প্রাচীরের মতো জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্য সমগ্র চীনা জনগণ, সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করে তোল।** সশস্ত্র প্রতিরোধের কর্মনীতি এবং উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলির প্রয়োগ নির্ভর করছে এই যুক্তফ্রন্টের ওপর। এবং এর চাবিকাঠি হচ্ছে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। এই দুই পার্টির মধ্যেকার এই সহযোগিতার ওপরে ভিত্তি করে সরকার, সেনাবাহিনী, সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং সমগ্র জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠুক। 'জাতীয় সংকটের মোকাবিলার জন্য শুভেচ্ছা-নির্ভর ঐক্য'-এর শ্লোগানটিকে শুধুমাত্র একটি চমৎকার কথার কথা করে রাখলেই চলবে না, তাকে রূপায়িত করতে হবে ভাল কাজের মধ্য দিয়ে। ঐক্যকে হতে হবে সাচ্চা, প্রতারণা করলে চলবে না। রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ক্ষেত্রে চাই উদার মনের ও ব্যাপকতর দৃঢ়তার পরিচয়। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ব্যস্ততা, হীন প্রতারণা, আমলাতান্ত্রিকতা ও এবং আ কিউবাদ[৬]—এই সব কিছুই হবে অর্থহীন। শত্রুদের বিরুদ্ধে এগুলি কোন কাজেই লাগবে না, আর নিজের দেশের লোকের প্রতি এসবের ব্যবহার হবে নিতান্তই হাস্যকর। সবকিছুতেই প্রধান ও অপ্রধান নীতি আছে, এবং সমস্ত অপ্রধান নীতিই প্রধান নীতির অধীন। আমাদেব স্বদেশবাসীদেরকে অবশ্যই প্রধান নীতিগুলির আলোকে সমস্ত কিছুকে সতর্কভাবে বিচার করে দেখতে হবে, কেননা একমাত্র এভাবেই তাঁরা নিজেদের ধ্যানধারণা ও কাজের ক্ষেত্রে যথাযথ দিক্‌নির্দেশ গড়ে তুলতে পারবেন। আজ যাদের মধ্যে এখনো ঐক্যের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়নি, তাদের রাতের অন্ধকারের নিস্তব্ধতার মধ্যে নিজেদের বিবেককে একবার বিচার করে দেখা উচিত এবং লজ্জিত হওয়া উচিত, এমনকি কেউ তাদেরকে নিন্দা না করলেও।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধের উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলিকে বলা যেতে পারে একটি আট দফা কর্মসূচী।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধের কর্মনীতিকে অবশ্যই এই ব্যবস্থাগুলির সংগে যুক্ত হতে হবে, এবং অন্যথায় বিজয় কখনই অর্জিত হবে না, এবং চীনের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণেরও কখনো অবসান ঘটবে না, বরং জাপানের

আক্রমণে চীনই হয়ে পড়বে অসহায়, এবং আবিসিনিয়ার দশাতেই তাকে পড়তে হবে।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধের কর্মনীতির ব্যাপারে আন্তরিকতা থাকলে এইসব ব্যবস্থাকে অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে। এবং কেউ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধে আন্তরিক কিনা তার পরীক্ষা হবে এতেই যে তিনি এই দফাগুলি গ্রহণ করে তা কার্যকরী করেছেন কিনা তার মাধ্যমে।

অবশ্য সর্বক্ষেত্রে এইসব ব্যবস্থার ঠিক বিপরীত আরেকরকম ব্যবস্থাবলীও হতে পারে।

সেনাবাহিনীকে সামগ্রিক সমাবেশ নয়, বরং তাদের অচল করে রাখা এবং সরিয়ে আনা।

জনগণের স্বাধীনতা নয়, শুধু নিপীড়ন।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার নয়, বরং আমলা মুৎসুদ্দি ও বৃহৎ জমিদারদের এক স্বৈরাচারী সরকার।

জাপানকে রুখবার পররাষ্ট্র নীতি নয়, বরং তাকে তোষামোদ করার পররাষ্ট্র নীতি।

জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতি নয়, বরং ক্রমাগত দোহন, যাতে তারা দুঃখকষ্টের যাঁতাকলে গোঙাতে থাকে এবং জাপানকে রুখবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য শিক্ষা নয়, বরং জাতীয় আত্মসমর্পণের জন্য শিক্ষা।

জাপানকে রুখবার জন্য আর্থিক ও অর্থনৈতিক কর্মনীতি নয়, বরং সেই পুরানো, বা তার চেয়েও খারাপ আর্থিক ও অর্থনৈতিক কর্মনীতি, যা নিজের দেশের বদলে শত্রুদেরকেই সুবিধে করে দেয়।

আমাদের বিরাট প্রাচীরের মতো জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট নয়, বরং তাকে গুঁড়িয়ে ফেলা, বা ঐক্যের গালভরা বুলি আউড়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কোন কিছুই না করা।

বিভিন্ন ব্যবস্থা জন্ম নেয় কর্মনীতি থেকেই। কর্মনীতি যদি হয় প্রতিরোধ না করার, সমস্ত ব্যবস্থাই সেই প্রতিরোধ না করাকে প্রতিফলিত করবে। বিগত ছ'বছর ধরে এই শিক্ষাই আমরা পেয়ে এসেছি। আর কর্মনীতি যদি হয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধের, তবে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাকে আট দফা কর্মসূচীকে —অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে।

৩। দুটি ভবিষ্যৎ লক্ষ্য

ভবিষ্যৎ লক্ষ্যগুলি তাহলে কি কি? সকলেই এ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

প্রথম কর্মনীতি অনুসরণ করলে প্রথম ধরনের ব্যবস্থাবলীকেও মানতে হয়, এবং তখন সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে যে, ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটা হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিতাড়ন ও চীনের মুক্তি অর্জন। এ সম্পর্কে এর পরেও কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি? আমার তা মনে হয় না।

দ্বিতীয় কর্মসূচী অনুসরণ কর এবং দ্বিতীয় ধরনের ব্যবস্থাবলী গ্রহণ কর, এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটা সুনিশ্চিতভাবেই হয়ে পড়বে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের চীন দখল, চীনা জনগণের ক্রীতদাসে ও ভারবাহী পশুতে রূপান্তরণ। এ ব্যাপারে এর পরেও কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে? এ ক্ষেত্রেও আমার তা মনে হয় না।

৪। সিদ্ধান্ত

প্রথম কর্মনীতিটিকে কার্যকরী করা, প্রথম ধরনের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা এবং প্রথম ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালনোটা হচ্ছে একান্তভাবেই আবশ্যিক।

দ্বিতীয় কর্মনীতিটির বিরোধিতা করা, দ্বিতীয় ধরনের ব্যবস্থাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা এবং দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটিকে পরিহার করাটা হচ্ছে একান্তভাবেই আবশ্যিক।

কুওমিনতাঙের সমস্ত দেশপ্রেমিক সদস্যরা এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ হোন এবং দৃঢ়ভাবে প্রথম কর্মনীতিটিকে কার্যকরী করুন, প্রথম ধরনের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করুন এবং প্রথম ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালান; দ্বিতীয় কর্মনীতিটিকে দৃঢ়তার সংগে তাঁরা বিরোধিতা করুন, দ্বিতীয় ধরনের ব্যবস্থাগুলিকে প্রত্যাখান করুন, এবং দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটিকে পরিহার করুন।

সমস্ত দেশপ্রেমিক জনগণ, দেশপ্রেমিক সৈন্যবাহিনী এবং দেশপ্রেমিক পার্টি ও গ্রুপগুলি ঐক্যবদ্ধ হোন এবং দৃঢ়ভাবে প্রথম কর্মনীতিটিকে কার্যকরী করুন, প্রথম ধরনের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করুন এবং প্রথম ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালান; দ্বিতীয় কর্মনীতিটাকে দৃঢ়তার সংগে তাঁরা

বিরোধিতা করুন, দ্বিতীয় ধরনের ব্যবস্থাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করুন, এবং দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটাকে পরিহার করুন।

জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ দীর্ঘজীবী হোক!

চীন জাতির মুক্তি দীর্ঘজীবী হোক!

টীকা

১। ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই জাপানী হানাদার সৈন্যরা পিকিং থেকে মাইল দশেক দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত লুকৌচিয়াও'র চীনা গ্যারিসন আক্রমণ করে। দেশজোড়া জাপান-বিরোধী ব্যাপক আন্দোলনে প্রভাবিত চীনা সৈন্যরা তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই ঘটনাই জাপানের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ-যুদ্ধের সূচনা করে, এবং আট বছর ধরে তা চলতে থাকে।

২। ২৯ নং বাহিনী আসলে ছিল কুওমিনতাঙদের উত্তর-পশ্চিম বাহিনীর অংশ এবং ফেং উ-সিয়াঙের অধীন। এই বাহিনী তখন হোপেই ও চাহার প্রদেশে অবস্থান করছিল। এর কম্যাণ্ডার ছিলেন সুং চে-য়ুয়ান এবং ফেং চি-আন ছিলেন এর অন্যতম ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার।

৩। ১৯৩১ সালের ৩১শে জানুয়ারি দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীদের নিপীড়ন ও হত্যা করার জন্য 'প্রজাতন্ত্রকে বিপদাপন্ন করার' মনগড়া মিথ্যা অভিযোগ তুলে কুওমিনতাঙ 'প্রজাতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক কাজকর্মের ওপর জরুরী নির্দেশনামা' জারী করে। এই নির্দেশনামার দ্বারা চূড়ান্ত বর্বরতার মাধ্যমে নির্যাতন চালানো হয়েছিল।

৪। ১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসে জনতার কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে কুওমিনতাঙ সরকারের জারী করা 'সংবাদ নিয়ন্ত্রণমূলক সাধারণ ব্যবস্থা'রই অপর নাম ছিল 'সংবাদ নিয়ন্ত্রণ নির্দেশনামা'। তাতে বলা হয়েছিল যে, 'সমস্ত সংবাদের অনুলিপি সেন্সরশিপের জন্য জমা দিতে হবে।'

৫। দ্রষ্টব্য: 'জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্যসমূহ' ('মাও সে-তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী', ১ম খণ্ড, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, পৃঃ ৩৪৬)।

৬। চীনের মহান লেখক লু শুনের সুবিখ্যাত উপন্যাস আ কিউ-এর সত্য কাহিনীর নায়ক ছিলেন আ কিউ। বাস্তব জীবনের ব্যর্থতা ও বিজয়কে যাঁরা নৈতিক বা আত্মিক বিজয় বলে সান্ত্বনা পান, আ কিউ হচ্ছেন, তাঁদেরই প্রতিরূপ।

প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতির শক্তির সমাবেশের জন্য

২৫শে আগস্ট, ১৯৩৭

(ক) ৭ই জুলাই তারিখের লুকৌচিয়াও'র ঘটনা চীনের বিরাট প্রাচীরের দক্ষিণে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সর্বাত্মক আক্রমণের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। আর লুকৌচিয়াও'র চীনা সৈন্যবাহিনীর প্রতিরোধ সূত্রপাত ঘটিয়েছে জাপানের বিরুদ্ধে চীনের দেশজোড়া প্রতিরোধ-যুদ্ধের। জাপানীদের ক্রমাগত আক্রমণ, জনগণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লড়াই, জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিরোধের প্রবণতা, একটি জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের কর্মনীতির পক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দীপ্ত প্রচার ও এর দৃঢ় প্রয়োগ, এবং এই কর্মনীতির প্রতি দেশজোড়া সমর্থন—এ সবকিছুই লুকৌচিয়াও'র ঘটনার পর থেকে চীনা কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছে ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে তাদের অনুসৃত প্রতিরোধ না করার কর্মনীতিকে পাল্টে প্রতিরোধের কর্মনীতি গ্রহণ করতে। এর ফলে চীনা বিপ্লব ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলনের[১] পরে উপনীত স্তর ছাড়িয়ে, অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে প্রতিরোধের প্রস্তুতির স্তর থেকে প্রকৃত প্রতিরোধে অবতীর্ণ হবার স্তরে, এগিয়ে গেছে। সিয়ান ঘটনা থেকে এবং কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন থেকে কুওমিনতাঙের কর্মনীতির যে প্রাথমিক পরিবর্তন শুরু হয়েছে, সেগুলি এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার বিষয়ে মিঃ চিয়াং কাই-শেকের ১৭ই জুলাই তারিখের বিবৃতি এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে গৃহীত তাঁর বিভিন্ন ব্যবস্থা—এ সবই অভিনন্দন দাবি করে।, যুদ্ধক্ষেত্রে স্থল ও বিমান বাহিনী বা স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীগুলি সবাই সাহসের সংগে লড়াই করেছে এবং চীনা জাতির বীরত্বপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। জাতীয় বিপ্লবের নামে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র চীনের দেশপ্রেমিক সৈন্যবাহিনীকে এবং অন্যান্য সাথীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে।

এই নিবন্ধটি হচ্ছে চীনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সংগঠনগুলির জন্য ১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসে কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক রচিত প্রচার ও জনমত গঠনের রূপরেখা। উত্তর শেনসির লোচুয়ানে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় এটি অনুমোদিত হয়।

(খ) কিন্তু অন্যদিকে, এমনকি ৭ই জুলাই'র লুকোচিয়াও ঘটনার পরেও কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ সেই ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের পর থেকে অনুসৃত ভ্রান্ত কর্মনীতিই অনুসরণ করে চলেছেন, সমঝওতা করছেন ও সুবিধে দিচ্ছেন,[২] দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর উৎসাহকে অবদমিত করছেন এবং জনগণের মুক্তি-আন্দোলনকে চেপে দিচ্ছেন। এতে কোন সন্দেহই নেই যে, পিপিং ও তিয়েনসিন দখল করার পর জাপানী সাম্রাজ্যবাদ তার ব্যাপক অভিযানের কর্মনীতিকে কার্যকরী করতে এগিয়ে আসবে, তার পূর্ব-পরিকল্পিত যুদ্ধ-পরিকল্পনার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়টিকে রূপায়িত করবে এবং সমগ্র উত্তর চীনে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করবে। এ কাজে তারা নির্ভর করবে নিজেদের হিংস্র সামরিক শক্তির ওপরে, এবং একই সংগে তারা জার্মান ও ইতালীর সাম্রাজ্য-বাদের সমর্থন নেবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দোদুল্যমানতাকে ও ব্যাপক মেহনতী জনগণ থেকে কুওমিনতাঙের বিচ্ছিন্নতাকে কাজে লাগাবে। চাহার ও সাংহাইতে ইতিমধ্যেই যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে। আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে হলে, শক্তিশালী হানাদারদের আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে, উত্তর চীনকে ও সমুদ্র উপকূলকে রক্ষা করতে হলে, এবং পিপিং, তিয়েনসিন ও উত্তর-পূর্ব চীন পুনরুদ্ধার করতে হলে কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ ও সমগ্র জনগণকে অবশ্যই গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে উত্তর-পূর্ব চীন, পিপিং ও তিয়েনসিন হারাবার শিক্ষা, শিক্ষা নিতে হবে ও সাবধানবাণী গ্রহণ করতে হবে আবিসিসিয়ার পতন থেকে, শিক্ষা নিতে হবে বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের অতীত বিজয় থেকে,[৩] শিক্ষা নিতে হবে মাদ্রিদকে রক্ষা করার ব্যাপারে স্পেনের বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে,[৪] এবং দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। কাজেই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে: 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য সমগ্র জাতির শক্তির সমাবেশ ঘটাও', এবং এ কাজে সাফল্য অর্জনের চাবিকাঠি হচ্ছে কুওমিনতাঙের কর্মনীতির সম্পূর্ণ ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো। প্রতিরোধের প্রশ্নে কুওমিনতাঙ কর্তৃক গৃহীত অগ্রবর্তী পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানাতে হবে; এর জন্যই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও সমগ্র দেশের জনগণ বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করছিল এবং আমরা একে স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপক জনগণের সমাবেশ ঘটানো, রাজনৈতিক সংস্কার সাধন প্রভৃতি বিষয়ে কুওমিনতাঙ তার কর্মনীতি পাল্টায়নি। এখনো তা জাপ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে

নেয়নি, সরকারী কাঠামোর মৌলিক কোন পরিবর্তন করেনি, এখনো পর্যন্ত জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতিকল্পে কোন নীতিই গ্রহণ করেনি এবং এখনো পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতার ব্যাপারে কোনরকম আন্তরিকতার পরিচয় দেয়নি। আমাদের জাতির জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে কুওমিনতাঙ যদি এখনো সেই পুরানো খাতেই চলতে চায়, যদি তার নীতির দ্রুত পরিবর্তন না করে, তবে তা প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিপর্যয়ই ডেকে আনবে। কিছু কিছু কুওমিনতাঙ সভ্য বলছেন : 'বিজয় অর্জনের পর রাজনৈতিক সংস্কারের পালা শুরু করা যাবে।' এঁদের ধারণা, শুধু সরকারী উদ্যোগেই জাপ-আক্রমণকারীদের হারিয়ে দেওয়া সম্ভব, কিন্তু এঁরা ভুল করছেন। শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় গোটাকয়েক খণ্ডযুদ্ধে হয়তো বিজয়লাভ সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এভাবে জাপ-হানাদারদের সম্পূর্ণ উৎখাত করা সম্ভব নয়। সমগ্র জাতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধে সামিল হলেই কেবল তা সম্ভব হতে পারে। এই ধরনের যুদ্ধের জন্য দরকার কুওমিনতাঙ কর্তৃক অনুসৃত নীতির আমূল পরিবর্তন এবং জাপ-প্রতিরোধের একটি সর্বাত্মক কর্মসূচীকে কার্যকরী করার জন্য উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত সমগ্র জাতির সমস্ত ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, অর্থাৎ কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতার প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিগতভাবে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন যে বৈপ্লবিক তিন গণ-নীতি ও তিন মহান কৌশল[৫] রচনা করেছিলেন, তারই ভিত্তিতে প্রণীত জাতীয় মুক্তির একটি কর্মসূচী।

(গ) সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কুওমিনতাঙের কাছে, সমগ্র জনসাধারণের কাছে, সমস্ত রাজনৈতিক পার্টিসমূহ, গ্রুপ ও বিভিন্ন জীবিকাশ্রয়ী ব্যক্তিবর্গের কাছে, এবং সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীর কাছে জাপ হানাদারদের সমূলে উৎখাতের জন্য একটি দশ দফা সম্বলিত কর্মসূচী গ্রহণ করার প্রস্তাব করছে। আমাদের পার্টি এই দৃঢ়মত পোষণ করে যে, এই কর্মসূচীটি সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে কার্যকরী করার মধ্য দিয়েই কেবল মাতৃভূমির রক্ষা ও জাপ-হানারদের পরাভূত করা সম্ভব। তা না করলে যাঁরা অযথা কাল হরণ করে এইভাবে পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছেন, দায়িত্ব এসে পড়বে তাদেরই ওপরে। দেশের সর্বনাশ ঘটে যাবার পর আক্ষেপ ও বিলাপে সময়ক্ষেপ করার সময় আর থাকবে না। দশটি দফা হচ্ছে নিম্নরূপ :

১। জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত কর।

জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ কর, জাপানী কর্মচারীদের দূর করে

দাও, জাপ এজেন্টদের গ্রেপ্তার কর, চীন দেশে অবস্থিত জাপ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর, জাপ ঋণ অস্বীকার কর, জাপানের সঙ্গে যেসব চুক্তিপত্র সই হয়েছে তা নাকচ কর এবং জাপানকে প্রদত্ত সব সুবিধে ফিরিয়ে নাও।

উত্তর চীন ও সমুদ্রোপকূল প্রতিরক্ষার জন্য শেষ অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যাও।

পিপিং, তিয়েনসিন ও উত্তর চীন পুনরুদ্ধারের জন্য শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও।

চীন থেকে জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের দূর করে দাও।

সমস্ত ধরনের দোদুল্যমানতা ও মধ্যস্থতার বিরোধিতা কর!

২। সমগ্র জাতির সামরিক শক্তির সমাবেশ ঘটাও।

সমগ্র দেশব্যাপী প্রতিরোধ-যুদ্ধে সমস্ত পদাতিক, নৌ ও বিমানবাহিনীর সমাবেশ ঘটাও।

নিষ্ক্রিয় ও শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক রণনীতির বিরোধিতা কর এবং গ্রহণ কর সক্রিয় স্বাধীন এক রণনীতি।

জাতীয় প্রতিরক্ষামূলক পরিকল্পনা ও রণনীতি বিষয়ে সুষ্ঠু আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী একটি স্থায়ী জাতীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠিত কর।

জনগণকে সশস্ত্র কর এবং প্রধান বাহিনীর অভিযানের সঙ্গে তাল রেখে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের বিকাশ ঘটাও।

সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক কর্মের সংস্কার সাধন কর, যাতে অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে একতা গড়ে ওঠে।

জনগণ ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে ঐক্য গড়ে তোল এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে জঙ্গী মানসিকতার উন্মেষ ঘটাও।

জাপ-বিরোধী উত্তর-পূর্ব যুক্ত সামরিক বাহিনীকে সমর্থন জানাও এবং শত্রুর পশ্চাদ্দেশে ভাঙন ধরাও।

প্রতিরোধ-যুদ্ধে ব্যাপৃত সমস্ত বাহিনীর প্রতি সমান ব্যবহার কর।

দেশের সর্বত্র সামরিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা কর। যুদ্ধে অংশ নেওয়াবার জন্য সমগ্র জাতির সমাবেশ ঘটাও এবং এইভাবে ধীরে ধীরে যুদ্ধের ভাড়াটে পদ্ধতির পরিবর্তে সাধারণ সামরিক কর্তব্য পালন করার মনোভাব গড়ে তোল।

৩। সমগ্র দেশের জনগণের সমাবেশ ঘটাও।

সমগ্র দেশের জনগণকে (বিশ্বাসঘাতকরা ছাড়া) জাপানকে প্রতিরোধ

করার ও জাতিকে রক্ষার জন্য বাক্‌-স্বাধীনতা, পত্রপত্রিকার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা ও সমিতিবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা দাও, শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার দাও।

জনগণের দেশপ্রেমিক আন্দোলনের প্রতিবন্ধক সমস্ত পুরানো আইন ও হুকুমনামার অবসান ঘোষণা কর এবং নতুন বিপ্লবী আইন ও হুকুমনামা জারী কর।

সমস্ত দেশপ্রেমিক বিপ্লবী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও এবং রাজনৈতিক পার্টিগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নাও।

সমগ্র দেশের জনগণের সমাবেশ ঘটাও, তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিক, প্রতিরোধ-যুদ্ধে সামিল হোক। যারা শক্তিমান তারা শক্তি জোগাক, যারা অর্থবান তারা অর্থ দিক, যাদের বন্দুক আছে তারা দিক বন্দুক, যারা জ্ঞানী তারা এগিয়ে আসুক জ্ঞান নিয়ে।

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাধারণ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসনের নীতির ভিত্তিতে মঙ্গোল, হুই ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিদের সমাবেশ ঘটাও।

৪। সরকারী কাঠামোর সংশোধন কর।

জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় পরিষদের আহ্বান কর। সেখানে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হবে, জাপানকে প্রতিরোধ ও জাতিকে রক্ষার কর্মনীতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার একটি সরকার নির্বাচিত হবে।

জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকারকে সমস্ত পার্টি ও গণসংগঠন থেকে বিপ্লবীদের গ্রহণ করতে হবে এবং জাপ সমর্থকদের বিতাড়িত করতে হবে।

জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকারকে কাজকর্মে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রয়োগ ঘটাতে হবে এবং একই সঙ্গে তাকে হতে হবে গণতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত।

জাপানকে প্রতিরোধ করার ও জাতিকে রক্ষার জন্য জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকারকে বিপ্লবী কর্মনীতি অনুসরণ করতে হবে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত কর, দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের তাড়াও, এবং প্রতিষ্ঠিত কর একটি নিষ্কলুষ সরকার।

৫। জাপ-বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ কর।

জাপ-আক্রমণের বিরোধী যেসব দেশ আছে তাদের সঙ্গে পারস্পরিক

সামরিক সাহায্যের জন্য আক্রমণ-বিরোধী মৈত্রী ও জাপ-বিরোধী চুক্তি সম্পাদন কর, অবশ্য এই শর্ত সাপেক্ষে যে, এর ফলে আমাদের দেশের কোন অঞ্চলই আমাদের অধিকারচ্যুত হবে না বা আমাদের সার্বভৌম অধিকারে হস্তক্ষেপ আসবে না।

আন্তর্জাতিক শান্তি জোটের প্রতি সমর্থন জানাও, এবং জার্মান ও ইতালীর আগ্রাসী জোটের বিরোধিতা কর।

জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাপানের ও কোরিয়ার শ্রমিক ও কৃষকজনতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হও।

৬। যুদ্ধকালীন আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলী গ্রহণ কর।

যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক নীতি নির্ধারণ করতে হবে এই নীতির ভিত্তিতে যে, অর্থবানদের অর্থ দিতে হবে এবং বিশ্বাসঘাতকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করতে হবে এমনভাবে যাতে দেশের প্রতিরক্ষামূলক উৎপাদনের পুনর্বিন্যাস দ্রুত বৃদ্ধি হতে পারে, গ্রাম্য অর্থনীতির বিকাশ ঘটতে পারে এবং যুদ্ধকালীন পণ্যোৎপাদনে স্বাবলম্বী হবার নিশ্চিতি মেলে। স্থানীয় পণ্যের উন্নতি কর ও চীনা পণ্যের ব্যবহারে উৎসাহ দাও। জাপানী পণ্য সম্পূর্ণভাবে বর্জনের নির্দেশ দাও। মুনাফাখোর ব্যবসাদারদের শায়েস্তা কর এবং বাজারে ফাটকাবাজী ও বাটপাড়ি দমন কর।

৭। জনগণের জীবিকার উন্নয়ন কর।

শ্রমিক, অফিস কর্মচারী ও শিক্ষক, এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত সৈন্যবাহিনীর লোকদের অবস্থার উন্নয়ন কর।

জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত সৈন্যবাহিনীর লোকদের পরিবারের প্রতি সবিশেষ নজর দাও।

অত্যধিক কর ও বিভিন্ন ধরনের লেভি আদায় রহিত কর।

খাজনা ও সুদের হার হ্রাস কর।

বেকারদের সাহায্য দাও।

শস্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ কর।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য দাও।

৮। জাপ-বিরোধী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলন কর।

বর্তমানের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ও পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন কর এবং জাপ-

প্রতিরোধ ও জাতিরক্ষা বিষয়ে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কর ও নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন কর।

৯। বিশ্বাসঘাতক ও জাপ-সমর্থকদের মূলোৎপাটন কর এবং দেশের পশ্চাদ্ভাগ সুসংবদ্ধ করে তোল।

১০। জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোল।

কুওমিনতাঙ কমিউনিস্ট সমর্থনের ভিত্তিতে প্রতিরোধ-যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপ, জীবনের নানাক্ষেত্রে নিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়ে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোল, প্রকৃত বিশ্বাস নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হও এবং জাতীয় সংকটের মোকাবিলা কর।

(ঘ) শুধুমাত্র সরকারই প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাবে—এই নীতি নিশ্চিতভাবে বাতিল করতে হবে, এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধের নীতিকে কার্যকরী করতে হবে। জনগণের সঙ্গে সরকারকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী ধারার সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে, পূর্বোল্লিখিত দশ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ করতে হবে এবং পূর্ণ বিজয়ের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। নিজের নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের সংগে ও জনগণের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই কর্মসূচীকে দৃঢ়ভাবে কার্যকরী করবে, প্রতিরোধ-যুদ্ধের সামনের সারিতে থাকবে, শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তারা মাতৃভূমিকে রক্ষা করে যাবে। এই সুদৃঢ় নীতির ভিত্তিতেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনতাঙ, অন্যান্য পার্টি ও গ্রুপের পাশে দাঁড়িয়ে এবং তাঁদের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় যুক্তফ্রন্টের বিশাল দৃঢ়কঠিন প্রাচীর গড়ে তুলতে প্রস্তুত, যার মাধ্যমে ঘৃণ্য জাপ-হানাদারদের পরাজিত করে এক নতুন স্বাধীন, সুখী ও মুক্ত চীন গড়ে তোলা যাবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আমাদের অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসঘাতকদের সমঝওতা ও পরাজয়ের তত্ত্বকে বর্জন করতে হবে, জাপ-আক্রমণকারীরা অপরাজেয়—এই ধরনের জাতীয় পরাজয়বাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। চীনে কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, উপরোক্ত দশ দফা কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ হলে জাপ-হানাদারদের নিশ্চিতভাবে পরাজিত করা সম্ভব হবে। আমাদের ৪৫ কোটি দেশবাসী যদি সবাই সচেষ্ট হন, চীনা জাতি তবে নিশ্চিতভাবেই বিজয় অর্জন করবে।

জাপ-সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!

জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ দীর্ঘজীবী হোক !

স্বাধীন, সুখী ও মুক্ত নয়া চীন দীর্ঘজীবী হোক !

টীকা

১। ১৯৩৫ সালে সমগ্র দেশ জুড়ে দেশপ্রেমিক গণ-আন্দোলনের এক নতুন জোয়ার জেগে ওঠে। ৯ই ডিসেম্বর তারিখে পিকিং-এ ছাত্ররা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক দেশপ্রেমিক বিক্ষোভ-মিছিল বের করে ধ্বনি তোলে : 'গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর, বিদেশী আগ্রাসন প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হও', 'জাপ-সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'। জাপানী হানাদারদের সহযোগিতায় কুওমিনতাঙ সরকার দীর্ঘদিন ধরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে আসছিল, এই আন্দোলন তা ভেঙে দেয় এবং দেশজুড়ে দ্রুত গণ-সমর্থন অর্জন করে। এই আন্দোলনই '৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলন' নামে খ্যাত। এর ফলে যে নতুন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তা দেশের বিভিন্ন শ্রেণী-সম্পর্কের প্রতিফলন হিসেবেই ফুটে ওঠে, এবং কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রদত্ত জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের শ্লোগান খোলাখুলিই দেশপ্রেমিক জনগণ সমর্থন করতে থাকে। বিশ্বাসঘাতকের নীতির জন্য চিয়াং কাই-শেকের সরকার অত্যন্ত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে।

২। এই ২য় খণ্ডেরই প্রথম প্রবন্ধের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩। 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ', ইংরেজী সংস্করণ, পৃঃ ৩৪৭-৮১, মস্কো, ১৯৫১ দ্রষ্টব্য।

৪। ১৯৩৬-এর অক্টোবরে শুরু হয়ে মাদ্রিদ-প্রতিরোধ ২৯ মাস ধরে চলে। ১৯৩৬-এ ফ্যাসিস্ত জার্মানি ও ইতালী স্পেনের ফ্যাসিস্ত যুদ্ধবাজ ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করার নামে স্পেনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। 'পপুলার ফ্রন্ট' সরকারের নেতৃত্বে স্পেনের জনগণ বীরত্বের সঙ্গে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এই আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। রাজধানী মাদ্রিদ নগরী রক্ষার যুদ্ধ স্পেনের সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে তীব্রতম যুদ্ধ হয়ে আছে। শত্রুর হাতে মাদ্রিদের পতন ঘটে ১৯৩৯-এর মার্চ মাসে, কারণ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের তথাকথিত 'হস্তক্ষেপ নয়' নামক প্রতারণামূলক নীতির দ্বারা ঐ আক্রমণকেই সাহায্য করে, এবং এই পতনের আরও একটি কারণ হচ্ছে এই যে, 'পপুলার ফ্রন্টের' মধ্যেও মতবিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে।

৫। 'তিন গণ-নীতি'—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও জনকল্যাণ—ছিল ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিঘোষিত নীতি। ১৯২৪-এ তিনি এই নীতির পুনঃ ব্যাখ্যা করে শ্রমিক ও কৃষক-আন্দোলনের প্রতি কার্যকরী সমর্থন জানান এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কথা বলেন। তাঁর এই পুনর্ঘোষিত নীতিকে বলা হয় 'নয়া গণ-নীতি'। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে মৈত্রী, কমিউনিস্টদের সংগে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সমর্থন ও সাহায্য—এই ছিল ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নয়া নীতি। এই নয়া নীতিকে ভিত্তি করেই কুওমিনতাঙ ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ পরিচালিত হয়।

উদারতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

আমরা সক্রিয় মতাদর্শগত সংগ্রামের সপক্ষে, কারণ এটাই হচ্ছে লড়াইয়ের স্বার্থে পার্টির মধ্যে ও বিপ্লবী সংগঠনগুলোর মধ্যে ঐক্যকে সুনিশ্চিত করার হাতিয়ার। প্রত্যেক কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীর এই হাতিয়ার গ্রহণ করা উচিত।

কিন্তু উদারতাবাদ মতাদর্শগত সংগ্রামকে বাতিল করে দেয় এবং নীতি-হীন শান্তির পক্ষ নেয়, এর ফলে ক্ষয়িষ্ণু ও অশিষ্ট মনোভাবের সৃষ্টি হয়, এবং কোন কোন পার্টি ইউনিটে এবং পার্টি ও বিপ্লবী সংগঠনগুলোর কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক অধঃপতন ঘটে।

উদারতাবাদের প্রকাশ বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে।

যখন স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, কোন লোক ভুল পথে যাচ্ছেন, অথচ সে লোক একজন পুরানো পরিচিত লোক, একই জায়গার অধিবাসী, সহপাঠী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রিয়জন, পুরানো সহকর্মী বা পুরানো অধীন লোক বলে তাঁর সঙ্গে নীতিগতভাবে যুক্তিতর্ক না করা, তখন শান্তি ও সখ্য বজায় রাখার জন্য তাকে অবাধে চলতে দেওয়া। অথবা তাঁর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য চূড়ান্তভাবে মীমাংসার চেষ্টা না করে ওপর ওপরভাবে কিছু বলা। ফলে সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষ উভয়েরই ক্ষতি হয়। এটা হচ্ছে এক ধরনের উদারতাবাদ।

নিজের প্রস্তাব সংগঠনের সামনে সক্রিয়ভাবে উত্থাপন না করে আড়ালে দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচনা করা। সামনাসামনি কিছু না বলে পেছনে বাজে গুজব রটনা করা, সভায় কিছু না বলে পরে আজেবাজে কথা বলা। যৌথ জীবনযাত্রার নীতির প্রতি আদৌ কোনরকম মর্যাদা না দেখিয়ে নিজের ঝোঁকে চলা। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ধরনের উদারতাবাদ।

নিজের ব্যক্তিস্বার্থে ঘা না লাগলে সব যেমন চলছে তেমনি চলতে দেওয়া; কোন বিষয়কে স্পষ্টতঃই ভুল জেনেও সে বিষয় সম্পর্কে যথাসম্ভব মুখ বুঁজে থাকা; গা বাঁচানোর জন্য দোষ এড়িয়ে নির্বিবাদে ভালমানুষ সেজে থাকা। এটা হচ্ছে তৃতীয় ধরনের উদারদতাবাদ।

নির্দেশ অমান্য করে ব্যক্তিগত মতামতকে সবার ওপরে স্থান দেওয়া। সংগঠনের কাছ থেকে শুধু বিশেষ সুবিধা দাবি করা কিন্তু সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলা অস্বীকার করা। এটা হচ্ছে চতুর্থ ধরনের উদারতাবাদ।

ঐক্য, অগ্রগতি বা সুষ্ঠভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য ভুল মতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও যুক্তিতর্ক না করা, বরং ব্যক্তিগত আক্রমণ চালানো, ঝগড়া বাধানো, ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ করা বা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করা। এটা হচ্ছে পঞ্চম ধরনের উদারতাবাদ।

বিনা প্রতিবাদে ভুল মতামত শুনে যাওয়া এমনকি প্রতিবিপ্লবী মন্তব্য শুনেও সে সম্বন্ধে কোন রিপোর্ট না করা, বরং যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে নিঃশব্দে সেগুলি হজম করে যাওয়া। এটা হচ্ছে ষষ্ঠ ধরনের উদারতাবাদ।

জনসাধারণের মধ্যে থেকেও তাদের মধ্যে প্রচার বা বিক্ষোভ সৃষ্টি না করা, বক্তৃতা না দেওয়া, তদন্ত ও অনুসন্ধান না করা, তাদের সুখদুঃখে মনোযোগ না দেওয়া, তাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকা এবং নিজে যে একজন কমিউনিস্ট সে-কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে একজন সাধারণ অ-কমিউনিস্ট লোকের মতো আচরণ করা। এটা হচ্ছে সপ্তম ধরনের উদারতাবাদ।

কাউকে জনসাধারণের স্বার্থের ক্ষতি করতে দেখেও মনে মনে বিক্ষুব্ধ না হওয়া, অথবা তাকে বারণ বা নিরস্ত না করা, যুক্তি দিয়ে তাকে না বোঝানো, বরং জেনেশুনেও তাকে সে কাজ করে যেতে দেওয়া। এটা হচ্ছে অষ্টম ধরনের উদারতাবাদ।

কাজকর্মে মনোযোগ না দেওয়া, কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা লক্ষ্য ছাড়াই কাজ করা, তাচ্ছিল্যভরে কাজ করা এবং কোনমতে চালিয়ে যাওয়া—'যতদিন মঠের সন্ন্যাসী থাকব ততদিন ঘণ্টা বাজিয়ে গেলেই চলবে।' এটা হচ্ছে নবম ধরনের উদারতাবাদ।

বিপ্লবের জন্য নিজে বিরাট অবদান রেখেছি বলে মনে করা, প্রবীণ ও অভিজ্ঞ বলে নিজেকে জাহির করা, বড় কাজে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ছোট কাজ করতে না চাওয়া, কাজে অমনোযোগী হওয়া এবং অধ্যয়নে ঢিলে দেওয়া। এটা হচ্ছে দশম ধরনের উদারতাবাদ।

নিজের ভুল জেনেও তা সংশোধনের চেষ্টা না করা, নিজের প্রতি উদারতাবাদ অবলম্বন করা। এটা হচ্ছে একাদশ রকমের উদারতাবাদ।

আরও অনেক ধরনের কথা বলা যায়। কিন্তু এই এগারোটিই হচ্ছে প্রধান।

এই সবগুলিই হচ্ছে উদারতাবাদের অভিব্যক্তি।

বিপ্লবী যৌথ সংগঠনের ভেতরে উদারতাবাদ অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটা হচ্ছে একটা ক্ষয়কারক বস্তু, যা ঐক্য বিঘ্নিত করে, সংহতি নষ্ট করে, কাজে নিষ্ক্রিয়তা আনে এবং বিভেদ সৃষ্টি করে। এটা বিপ্লবী বাহিনীকে সুসংবদ্ধ সংগঠন ও শৃংখলা থেকে সরিয়ে আনে, কর্মনীতিগুলিকে কার্যকরী করা অসম্ভব করে তোলে এবং যে জনগণকে পার্টি পরিচালিত করে তাদের থেকে পার্টি-সংগঠনকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এটা একটা অত্যন্ত জঘন্য ঝোঁক।

উদারতাবাদ জন্ম নেয় পেটি-বুর্জোয়া স্বার্থপরতা থেকে, এটা ব্যক্তিস্বার্থকে প্রথম স্থান দেয় এবং বিপ্লবের স্বার্থকে দেয় দ্বিতীয় স্থান। এর ফলেই জন্ম নেয় মতাদর্শগত, রাজনীতিগত ও সংগঠনগত উদারতাবাদ।

উদারতাবাদীরা মার্কসবাদের নীতিগুলোকে বিমূর্ত মতবাদ হিসেবে দেখেন। মার্কসবাদকে তাঁরা স্বীকার করেন কিন্তু তাকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে বা পুরোপুরি প্রয়োগ করতে প্রস্তুত নন; নিজেদের উদারতাবাদের পরিবর্তে মার্কস-বাদকে স্থান দিতেও রাজী নন। এইসব লোকের মার্কসবাদ আছে, আবার একই সংগে আছে উদারতাবাদ—মুখে তাঁরা মার্কসবাদের কথা বলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন উদারতাবাদ; অন্যদের প্রতি তাঁরা প্রয়োগ করেন মার্কসবাদ, কিন্তু নিজেদের বেলায় উদারতাবাদ। দুই ধরনের জিনিসই তাঁরা হাতে রাখেন, এবং প্রয়োজনমতো সেগুলিকে কাজে লাগান। এই হচ্ছে কিছু কিছু লোকের চিন্তাধারার পদ্ধতি।

উদারতাবাদ হচ্ছে সুবিধাবাদের অন্যতম প্রকাশ এবং মার্কসবাদের সঙ্গে এর মৌলিক বিরোধ রয়েছে। এটা হচ্ছে একটা নেতিবাচক জিনিস এবং বাস্তবক্ষেত্রে এটা শত্রুকেই সাহায্য করে, তাই শত্রুরা চায় আমাদের মধ্যে উদারতাবাদ বিরাজ করুক। এই যখন উদারতাবাদের প্রকৃতি তখন বিপ্লবী বাহিনীতে অবশ্যই একে কোন স্থান দেওয়া উচিত নয়।

মার্কসবাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নেতিবাচক উদারতাবাদকে আমাদের দূর করতে হবে। একজন কমিউনিস্টকে মুক্তমন হতে হবে, হতে হবে একনিষ্ঠ ও সক্রিয়, বিপ্লবের স্বার্থকে নিজের প্রাণের সমার্থক হিসেবে দেখতে হবে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিপ্লবের স্বার্থের অধীন করে রাখতে হবে; তাঁকে

সর্বদা এবং সবক্ষেত্রেই সঠিক নীতিতে দৃঢ় থাকতে হবে এবং সমস্ত ভুল চিন্তা-ধারা ও আচরণের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, যাতে করে পার্টির যৌথ জীবনকে সুসংবদ্ধ এবং পার্টি ও জনসাধারণের মধ্যেকার সংযোগকে সুদৃঢ় করা যায়; ব্যক্তিবিশেষের চাইতে পার্টির ও জনসাধারণের সম্বন্ধে এবং নিজের চেয়ে অপরের সম্বন্ধে তাকে বেশি যত্নশীল হতে হবে। এবং তখনই কেবল তাঁকে একজন কমিউনিস্ট বলে ধরা যেতে পারে।

অনুগত, সৎ, সক্রিয় এবং ন্যায়পরায়ণ সমস্ত কমিউনিস্টকে অবশ্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে উদারতাবাদের যে ঝোঁক রয়েছে তার বিরোধিতা করতে হবে এবং তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে হবে। এইটাই হচ্ছে আমাদের মতাদর্শগত ফ্রণ্টের অন্যতম কর্তব্য।

কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে আশু কর্তব্যসমূহ

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

সেই ১৯৩৩ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একটি ঘোষণাপত্রে বলেছিল যে, লালফৌজের বিরুদ্ধে আক্রমণ বন্ধ করার, জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার নিশ্চিতিদানের এবং জনগণকে সশস্ত্র করে তোলার তিনটি শর্ত সাপেক্ষে সে কুওমিনতাঙের যে-কোন অংশের সংগে জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে রাজী আছে ; এই ঘোষণাটি করা হয়েছিল এই কারণেই যে, ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করাই চীনা জনগণের প্রাথমিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি।

১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং চীনের লালফৌজ জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ যুদ্ধ সংগঠিত করার জন্য একটি জাপ-বিরোধী সম্মিলিত বাহিনী এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার একটি সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ এবং দেশের সমগ্র জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছিল।[১] সে বছরই ডিসেম্বর মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় বুর্জোয়াদের সংগে একটি জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠনের সিদ্ধান্ত[২] গ্রহণ করেছিল। ১৯৩৬ সালের মে মাসে লালফৌজ একটি খোলা তারবার্তায়[৩] নানকিং সরকারের কাছে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার দাবি জানিয়েছিল।, সে বছরই আগস্ট মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির কাছে প্রেরিত একটি চিঠিতে[৪] জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে দুই পার্টির একটি যুক্তফ্রণ্ট গঠনের দাবি জানিয়েছিল। ঐ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি চীনে একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রস্তাব[৫] গ্রহণ করে। এই ঘোষণা, খোলা তারবার্তা, চিঠি ও প্রস্তাবগুলি ছাড়াও আমরা বহুবার কুওমিনতাঙদের প্রেরিত লোকদের সাথে আলোচনা চালাবার জন্য আমাদের প্রতিনিধিদেরকে

পাঠিয়েছি, কিন্তু সে সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ১৯৩৬-এর শেষের দিকে সিয়ান ঘটনার পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এবং কুওমিনতাঙের দায়িত্বশীল অধিনায়কের পক্ষে একটি সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে চুক্তিতে আসা সম্ভব হয়, অর্থাৎ দুই দলের মধ্যেকার গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়। চীনের ইতিহাসে এটি একটি বিরাট ঘটনা এবং দুই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি পূর্বশর্ত হিসেবে এটি কাজ করেছে।

বর্তমান বছরের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত সভার কাছে, অধিবেশনের প্রারম্ভ-মুহূর্তে, একটি তারবার্তা[৬] প্রেরণ করে দুই পার্টির মধ্যে সুনির্দিষ্ট সহযোগিতার ভিত্তি রচনার একটি সুষ্ঠু প্রস্তাব দেয়। ঐ তারবার্তায় আমরা কুওমিনতাঙের কাছে এই বলে দাবি জানাই যে, কুওমিনতাঙ কমিউনিস্ট পার্টিকে নিম্নলিখিত পাঁচটি গ্যারান্টি দিক : গৃহযুদ্ধ বন্ধ, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাসমূহের নিশ্চয়তা, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান, জাপ-প্রতিরোধ বিষয়ে দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ এবং জনগণের জীবিকা উন্নয়নের, ব্যবস্থাবলী। একই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনতাঙকে নিম্নলিখিত চারটি গ্যারান্টি দিয়েছিল : দুটি শাসন-ব্যবস্থার মধ্যেকার শত্রুতার অবসান, লালফৌজের নতুন নামকরণ, বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলীর প্রবর্তন এবং জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ বন্ধ রাখা। একইভাবে এটিও ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ, কারণ এটি ব্যতীত দুই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি ব্যাহত হচ্ছিল এবং যার ফলে জাপ-প্রতিরোধের দ্রুত প্রস্তুতিপর্বে প্রচণ্ড বাধা আসছিল।

তারপর থেকে আলোচনার ক্ষেত্রে দুই পার্টি পরস্পর আরও কাছাকাছি চলে আসে। দুই পার্টির পক্ষে গ্রহণযোগ্য সম্ভাব্য রাজনৈতিক কর্মসূচী, গণ-আন্দোলনের ওপর থেকে বাধানিষেধ প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি ও লালফৌজের নতুন নামকরণ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি আরও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয়। এখনো পর্যন্ত সম্মিলিত কর্মসূচী ঘোষিত হয়নি, গণ-আন্দোলনের ওপর থেকে বাধানিষেধ প্রত্যাহৃত হয়নি, বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে নয়া ব্যবস্থা প্রচলনের প্রস্তাবটিও স্বীকৃতি পায়নি। তবে পিপিং ও তিয়েনসিনের পতনের একমাস পর একটি নির্দেশ এসেছে এই বলে যে, লালফৌজের নতুন

নামকরণ হচ্ছে জাতীয় বিপ্লবী সামরিক বাহিনীর অষ্টম রুট বাহিনী (জাপ-বিরোধী সামরিক নির্দেশনামায় অষ্টাদশ গ্রুপ বাহিনী হিসেবেও উল্লিখিত হয়েছিল)। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণা কুওমিনতাঙকে জানানো হয়েছিল সেই ১৫ই জুলাই তারিখে, এবং ঠিক হয়েছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আইনী অবস্থানের স্বীকৃতি দিয়ে চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতি প্রকাশিত হবে ঘোষণাটির সাথে একই সঙ্গে, কিন্তু (হায়, অনেক দেরীতে) তা অবশেষে জনসাধারণকে জানানোর জন্য কুওমিনতাঙের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান পরিবেশন করল ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে, যখন যুক্তফ্রন্টের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণা ও চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতি দুটি পার্টির মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে জাতিকে বাঁচাবার জন্য দুই পার্টির মধ্যে মহান মৈত্রী গঠনের প্রয়োজনীয় ভিত্তি রচনা করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণা দুই পার্টির মধ্যে শুধুমাত্র মৈত্রীর নীতির কথাই বলেনি, উপরন্তু তা সমস্ত দেশের জনসাধারণের মধ্যেকার মহান মৈত্রীর নীতিকেও প্রতিফলিত করেছে। চিয়াং কাই-শেক তাঁর বিবৃতিতে সমগ্র চীনে কমিউনিস্ট পার্টির আইনী অবস্থানকে যে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং জাতির রক্ষাকল্পে দুই পার্টির মধ্যে মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ যে করেছেন, তা ভাল সন্দেহ নেই; তবে, তিনি কিন্তু তাঁর কুওমিনতাঙ একগুঁয়েমি পরিত্যাগ করেননি, প্রয়োজনীয় আত্মসমালোচনাও করেননি, এবং আমরা তাতে মোটেই খুশি হতে পারি না। যা হোক, দুই পার্টির মধ্যে যুক্তফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। চীনা বিপ্লবের ইতিহাসে এটি এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। এটি চীনা বিপ্লবের ওপর সুদূরবিস্তারী প্রভাব বিস্তার করবে এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ে একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করবে।

সেই ১৯২৪ থেকেই চীনা বিপ্লবে কুওমিনতাঙ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার সম্পর্কটি একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে আসছে। নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে দুই পার্টির সহযোগিতায় ১৯২৪-২৭-এর বিপ্লবটি সংঘটিত হয়েছিল। দু-তিন বছরের মধ্যেই জাতীয় বিপ্লবে বিপুল সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। এর জন্য ডঃ সান ইয়াৎ-সেন চল্লিশটি বছর অতিবাহিত করেছিলেন এবং এটা তিনি অসমাপ্ত রেখে যান; কোয়াংতুঙে বিপ্লবী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা ও উত্তরাভিযানের বিজয়লাভ এই সাফল্যেরই ফলশ্রুতি। দুই পার্টির মধ্যে

যুক্তফ্রণ্টের গঠনই এই সাফল্যের কারণ। কিন্তু যে-মুহূর্তে বিপ্লব বিজয়ের মুখোমুখি এসে উপস্থিত হল, কিছু লোক বিপ্লবের লক্ষ্যকে আর আঁকড়ে ধরে রাখতে পারল না, তারা দুটো পার্টির যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে ভাঙন নিয়ে এল এবং তার ফলে বিপ্লব পর্যবসিত হল পরাজয়ে, আর দেশের দুয়ার খুলে দেওয়া হল বৈদেশিক হানাদারদের সামনে। দুই পার্টির যুক্তফ্রণ্টের ভাঙনের এই হল ফল। এখন দুই পার্টির মধ্যে নবগঠিত যুক্তফ্রণ্ট চীনের বিপ্লবে এক নতুন যুগের উন্মেষ ঘটাতে যাচ্ছে। কিছু কিছু ব্যক্তি এখনো আছে, যারা এই যুক্তফ্রণ্টের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও তার ভবিষ্যৎ সম্যক বুঝে উঠতে পারছে না, তারা মনে করছে যে, ঘটনার চাপে পড়ে এই সংগঠন সাময়িকভাবে তৈরী হয়েছে মাত্র। যাই হোক, এই যুক্তফ্রণ্টের মধ্য দিয়েই ইতিহাসের চাকা চীনের বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সম্পূর্ণ এক নতুন স্তরে। যে তীব্র জাতীয় ও সামাজিক সঙ্কটের মধ্যে চীন বর্তমানে পড়েছে তার থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারবে কিনা, তা নির্ভর করছে কিভাবে এই যুক্তফ্রণ্টের বিকাশলাভ ঘটে তার ওপর। ইতিমধ্যেই যেসব প্রমাণ চোখে পড়ছে, তাতে মনে হয় এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। প্রথমতঃ, যে-মুহূর্তে কমিউনিস্ট পার্টি এই যুক্তফ্রণ্টের নীতিটি ঘোষণা করে, সেই মুহূর্ত থেকেই এটিকে সর্বত্রই জনসাধারণ স্বাগত জানিয়েছে। এটি জনগণের সদিচ্ছারই একটি মূর্ত প্রকাশ। দ্বিতীয়তঃ, সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ সমাধান ও দুই পার্টির মধ্যেকার গৃহযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরেই অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপগুলি, বিভিন্ন জীবিকার ব্যক্তিবর্গ ও দেশের সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা অভূতপূর্ব এক ঐক্য গড়ে তোলেন। অবশ্য এই ঐক্য জাপানকে প্রতিরোধের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না, বিশেষ করে সরকার ও জনগণের মধ্যেকার ঐক্যের সমস্যাটি তখনো পর্যন্ত মূলতঃ অমীমাংসিতই থেকে গিয়েছিল। তৃতীয়তঃ, এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, সমগ্র দেশ জুড়ে প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রতিরোধ-যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় আমরা মোটেই খুশি নই, কারণ যদিও চরিত্রের দিক থেকে এটি জাতীয়, তবু এখনো পর্যন্ত এই যুদ্ধ সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে, জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে এই ধরনের প্রতিরোধ-যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করা যাবে না। যাই হোক, শত শত বছরের মধ্যে চীন এই প্রথম এক বিদেশী হানাদারের বিরুদ্ধে নিশ্চিতভাবে দেশজোড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলছে, যা দেশের অভ্যন্তরে

শান্তি বজায় না থাকলে এবং দুই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা না থাকলে কখনই সম্ভব হতে পারত না। দুই পার্টির যুক্তফ্রণ্ট ভেঙে যাবার সময়ে যখন জাপান বন্দুকের একটি গুলি না ছুঁড়েও চীনের উত্তর-পূর্বের চারটি প্রদেশ দখল করে বসতে পেরেছিল, তখন আজ দুই পার্টির যুক্তফ্রণ্ট পুনঃসংগঠিত হবার সময়ে জাপানের পক্ষে রক্তাক্ত যুদ্ধ ব্যতীত চীনের এক টুকরো জমিও আর দখল করা সম্ভব হবে না। চতুর্থতঃ, চীনের বাইরেও এর একটা প্রতিফলন আছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রদত্ত জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের প্রস্তাব দুনিয়ার শ্রমিক-কৃষক ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সমর্থন পেয়েছে। কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সহযোগিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ, চীনকে আরও সক্রিয় সাহায্য দিতে এগিয়ে আসবে। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে রয়েছে একটি অনাক্রমণ চুক্তি[৭] এবং এখন এই দুই দেশের মধ্যেকার সম্পর্কের আরও উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। এইসব থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে এ কথা বলতে পারি যে, যুক্তফ্রণ্টের বিকাশ চীন দেশকে এক উজ্জ্বল ও মহান ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় এবং এক ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে।

যা হোক, বর্তমানে যে-অবস্থায় আছে সে-অবস্থায় থাকলে যুক্তফ্রণ্ট এই মহান কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হবে। দুই পার্টির মধ্যে এই যুক্তফ্রণ্টের আরও বিকাশ ঘটাতে হবে। কারণ, বর্তমানে তা ব্যাপক জনসমর্থনের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সুসংবদ্ধও নয়।

জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট কি কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? না, একে হতে হবে সমগ্র জাতির যুক্তফ্রণ্ট, দুটি পার্টি যার অংশ মাত্র। এই যুক্তফ্রণ্টকে হতে হবে সমস্ত পার্টি ও গ্রুপ, বিভিন্ন জীবিকার লোক ও সশস্ত্র বাহিনীর যুক্তফ্রণ্ট, সমস্ত দেশপ্রেমিক—শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসাদারদের যুক্তফ্রণ্ট। এখনো পর্যন্ত যুক্তফ্রণ্ট কার্যতঃ সীমাবদ্ধ রয়েছে দুটো পার্টির মধ্যে, এখনো পর্যন্ত শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও শহরের পেটি-বুর্জোয়া এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক দেশপ্রেমিকদের উদ্দীপ্ত করে তোলা সম্ভব হয়নি, তাদের কাজে নামানো হয়নি, সংগঠিত ও সশস্ত্র করা হয়নি। বর্তমানে এটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় অর্জনকে অসম্ভব করে তুলেছে বলেই এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর চীন ও

কিয়াংসু এবং চেকিয়াং প্রদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে যে সংকটময় অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তা আর গোপন করে লাভ নেই, এবং তার প্রয়োজনও নেই; প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এই সমস্যাটির সমাধান করা যায়। সমাধানের একমাত্র পথ হল ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রটিকে কাজে পরিণত করা, 'জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করে তোলা।' মৃত্যুকালে প্রদত্ত ইচ্ছাপত্রে ডঃ সান ঘোষণা করেছিলেন, চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি স্থিরনিশ্চিত যে, কেবলমাত্র এই-ভাবেই বিপ্লবের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে। এই শেষ ইচ্ছাপত্রকে এক-গুয়েমিভাবে কাজে পরিণত না করার কি যুক্তি থাকতে পারে? সমগ্র জাতি যখন বিপদাপন্ন, তখন এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কি যুক্তি থাকতে পারে? এ কথা সবাই জানেন যে, স্বৈরতন্ত্র ও দমননীতি হচ্ছে 'জনগণকে উদ্দীপ্ত করে তোলার' নীতির চরম বিরোধী। শুধুমাত্র সরকারী স্তরে ও সামরিক বাহিনী দিয়ে জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করা কখনো সম্ভব নয়। এই বছরের মে মাসের প্রথম দিকে আমরা কুওমিনতাঙের শাসকগণকে সমস্ত রকম গুরুত্ব সহকারে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলাম যে, যদি জনসাধারণকে প্রতিরোধ করতে উদ্দীপ্ত করে তোলা না হয়, তবে চীনকে আবিসিনিয়ার মতো দুর্ভাগ্য বরণ করতে হবে। এই বিষয়টি সম্পর্কে বারবার শুধুমাত্র চীনের কমিউনিস্ট পার্টিই বলেনি, এ সম্পর্কে সমগ্র দেশের সমস্ত প্রগতিশীলরা এবং, এমনকি, কুওমিনতাঙের বুদ্ধিমান সভ্যারাও বলেছেন। তা সত্ত্বেও স্বৈরাচারী শাসন অপরিবর্তনীয়ই থেকে যাচ্ছে। তার ফলে সরকার জনসাধারণ থেকে, সামরিক বাহিনী জনগণ থেকে, ও সামরিক নেতৃত্ব সাধারণ সৈনিকদের কাছ থেকে বহু দূরে সরে যাচ্ছে। যুক্তফ্রন্ট যদি গণ-উদ্যোগে উদ্দীপ্ত না হয়ে ওঠে, তবে যুক্তফ্রন্টের সংকট কমবে না, বরং উত্তরোত্তর তা নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

উভয় পার্টি কর্তৃক গৃহীত এবং নিয়মানুযায়ী বিঘোষিত এমন কোন রাজ-নৈতিক কর্মসূচী বর্তমানের জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের নেই, যা কুওমিনতাঙের স্বৈরাচারী শাসনবিধির বদলে চালু হতে পারে। বিগত দশ বছর ধরে জনসাধারণ সম্পর্কে কুওমিনতাঙ যে শাসন চালিয়ে যাচ্ছে, এখনো তাই তারা অনুসরণ করছে; তার কোন পরিবর্তনই নেই, বিগত দশ বছর ধরে মোটামুটি সেই একই নীতি অনুসৃত হচ্ছে সরকারী শাসনযন্ত্রে, সামরিক বাহিনীর ব্যবস্থা-বলীতে ও নাগরিকদের সম্পর্কে আর্থিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-পদ্ধতিতে।

কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে এবং সে-পরিবর্তনও বিরাট: তা হল গৃহযুদ্ধের অবসান ও জাপ-বিরোধী ঐক্য। দুই পার্টি গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র দেশব্যাপী জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু করেছে, যা সিয়ান ঘটনার পর চীনা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক বিরাট পরিবর্তন সূচীত করছে। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত কর্মধারার কোন পরিবর্তনই নেই, এবং তার ফলে পরিবর্তন ও অপরিবর্তনের মধ্যে এক অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুরানো কর্মধারা বিদেশের সঙ্গে সমঝওতা স্থাপনের আর দেশের ভেতরে বিপ্লব দমনের সংগেই সঙ্গতিপূর্ণ, কিন্তু জাপ-সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের মোকাবিলার প্রশ্নে তা সব দিক দিয়েই অসঙ্গতিপূর্ণ ও অপ্রতুল। জাপানকে প্রতিরোধ করতে যদি আমরা না চাইতাম, তাহলে ঘটনাটি হতো অন্যরকম, কিন্তু আমরা যখন প্রতিরোধ করতে চাই এবং তা আরম্ভও হয়েছে, এবং তীব্র সংকট যখন আত্মপ্রকাশ করেছে, তখন নতুন পথে পরিবর্তন না ঘটানোর অর্থই সম্ভাব্য প্রচণ্ডতম বিপদ। জাপানকে প্রতিরোধ করতে হলে চাই ব্যাপক ভিত্তিতে গঠিত এক যুক্তফ্রন্ট এবং তাতে যোগ দেওয়ার জন্য সমগ্র জনগণের সমাবেশ ঘটাতে হবে। জাপ-প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন সুসংবদ্ধ একটি যুক্তফ্রন্ট এবং তার জন্য চাই একটি সাধারণ কর্মসূচী। সেই সাধারণ কর্মসূচীটি হবে যুক্তফ্রন্টের কর্মের নিশানা, সেটা রজ্জুর মতো সব সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গকে একসঙ্গে যুক্তফ্রন্টে বেঁধে রাখবে, বেঁধে রাখবে সব রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপগুলিকে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যক্তিবর্গ ও সামরিক বাহিনীসমূহকে। একমাত্র এই পদ্ধতিকেই আমরা দৃঢ় ঐক্যের পদ্ধতি বলতে পারি। জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলেই আমরা পুরানো বিধিনিয়ম প্রচলনের বিরোধিতা করি। আমরা প্রত্যাশায় থাকছি পুরানো বিধিনিয়মের পরিবর্তে নতুন বিধিনিয়ম প্রচলনের, অর্থাৎ আমরা চাইছি সাধারণ একটি কর্মসূচীর ঘোষণা, চাইছি বিপ্লবী বিধিনিয়মের প্রতিষ্ঠা। প্রতিরোধ-যুদ্ধের সংগে আর কোন কিছুই সঙ্গতিপূর্ণ হবে না।

সাধারণ কর্মসূচীটি কি রকম হওয়া উচিত? এটি হওয়া উচিত ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের তিন গণ-নীতি এবং জাপ-প্রতিরোধ ও জাতির রক্ষাকল্পে জাপ-প্রতিরোধের দশ দফা কর্মসূচী[৮] যা এ বছরের ২৪শে আগস্টে কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাব করেছে।

কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতার ঘোষণায় কমিউনিস্ট পার্টি এ কথা বলেছে যে, 'ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের তিন গণ-নীতি আজকের চীনের প্রয়োজন,

এবং সে-কারণেই আমাদের পার্টি তাকে সম্পূর্ণ কার্যকরী করার জন্য প্রস্তুত।' কমিউনিস্ট পার্টি যে তিন গণ-নীতি কার্যকরী করতে চাইছে, এটা কারুর কারুর কাছে অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে ; যেমন, সাংহাইয়ের চু চিঙ-লাই[৭] একটি স্থানীয় পত্রিকায় এই সন্দেহই প্রকাশ করেছেন। এইসব লোকের ধারণা আমাদের কমিউনিজ্‌ম্‌ ও তিন গণ-নীতি অসঙ্গতিপূর্ণ। এটি পুরোপুরি একটি আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিপ্লবের ভবিষ্যৎ বিকাশের স্তরেই কমিউনিজ্‌মের প্রয়োগ হবে ; বর্তমান স্তরে এটি কার্যকরী হতে পারবে এমন মোহ কমিউনিস্ট-দের নেই, বরং ইতিহাসের প্রয়োজনেই তারা জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট ও ঐক্যবদ্ধ গণ-তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাব কমিউনিস্ট পার্টি কেন দিয়েছে তার মূল কথা এখানেই নিহিত রয়েছে। তিন গণ-নীতি প্রসঙ্গে এ কথা মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, দশ বছর আগে কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙ যৌথভাবে প্রথম দুই পার্টির যুক্ত-ফ্রণ্টে এটিকে কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, এবং সমস্ত বিশ্বস্ত কমিউনিস্ট ও সমস্ত বিশ্বস্ত কুওমিনতাঙের সভ্যবৃন্দ বহু গ্রামাঞ্চলে ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত এটি কার্যকরী করতে শুরুও করেছিলেন। কিন্তু এটা দুঃখজনক যে, সেই যুক্তফ্রণ্টটি ১৯২৭এ ভেঙে যায় এবং তার পরবর্তী দশ বছর ধরে কুওমিনতাঙ এই তিন গণ-নীতির প্রয়োগের বিরোধিতা করতে থাকে। কিন্তু কমিউনিস্টদের অনুসৃত এই দশ বছরের কর্মনীতি মূলতঃ ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী তিন গণ-নীতি ও তিন মহান কৌশলকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এমন একটি দিনও যায়নি যখন কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম করেনি, এবং এর অর্থই হচ্ছে জাতীয়তাবাদী নীতির পূর্ণ প্রয়োগ ; শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব গণতন্ত্রের নীতির পূর্ণ প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয় ; কৃষি-বিপ্লব হচ্ছে জনগণের জীবিকা বিষয়ক নীতিটির পূর্ণ প্রয়োগ। তাহলে কেন কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব ও জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করছে? কিছুদিন আগে আমরা এ কথা ব্যাখ্যা করেছি যে এগুলোর মধ্যে কোন ভুল ছিল বলে কমিউনিস্ট পার্টি এসব বন্ধ করে দিচ্ছে—এ কথা ঠিক নয়, তারা এগুলো বন্ধ করছে এই কারণে যে, জাপ-সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র আক্রমণ দেশের অভ্যন্তরে শ্রেণী-সম্পর্কের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে, যার ফলে জাপ-

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত শ্রেণীগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা শুধু প্রয়োজনই হয়ে পড়েনি, তার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের জন্য ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট শুধুমাত্র চীন দেশেই নয়, সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রয়োজন ও সম্ভব। আমরা সে কারণেই চীন দেশে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা চাই। এই কারণেই আমরা শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের বদলে সমস্ত শ্রেণীর মৈত্রীর ভিত্তিতে সংগঠিত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাব দিয়েছি। কৃষি-বিপ্লব—'কৃষকের হাতে জমি দাও' নীতিকেই কার্যকরী করেছে, এবং এই নীতিটি ডঃ সান ইয়াৎ-সেনেরই প্রস্তাবিত। এটিকে আমরা আপাততঃ বন্ধ রাখছি এইজন্য যে, জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যাপকতর সংখ্যায় ঐক্যবদ্ধ জনসমাবেশ ঘটাতে চাই। কিন্তু তার মানে কখনই এই নয় যে, চীনে ভূমি-সমস্যার সমাধান দরকার নেই। আমাদের কৌশল ও তার সময়ের পরিবর্তন সম্বন্ধে আমরা আমাদের বক্তব্য বহুবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি। মার্কসবাদী নীতির ওপর ভিত্তি করে চলে বলেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সবসময়েই কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট যুক্তফ্রন্টে উদ্ভাবিত তিন গণ-নীতির সাধারণ কর্মসূচীর প্রয়োগ ও বিকাশের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, দেশ যখন শক্তিশালী হানাদার দ্বারা আক্রান্ত এবং জাতি যখন সংকটের আবর্তে পড়েছে, পার্টি তখন জাতীয় ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের সময়োপযোগী প্রস্তাব দিয়েছে, এবং এ প্রস্তাবটিই হচ্ছে একমাত্র কর্মনীতি যার সাহায্যে দেশ রক্ষা পেতে পারবে। কমিউনিস্ট পার্টি অব্যাহত প্রয়াসে এটিকে কাযকরী করতে চাইছে। প্রশ্নটি আর এখন এই নয় যে কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবী তিন গণ-নীতিতে আস্থাশীল কিনা, বা তারা এটিকে কার্যকরী করবে কিনা, প্রশ্নটি হচ্ছে কুওমিনতাঙ তা করছে কিনা। বর্তমানে কর্তব্য হচ্ছে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী তিন গণ-নীতির ভাবধারাটিকে সমগ্র দেশব্যাপী পুনরুজ্জীবিত করে তোলা, এবং তারই ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও কৌশল নির্ধারণ করে আন্তরিকতার সংগে—আধা-খেঁচড়াভাবে নয়, সম্পূর্ণ উপলব্ধির সংগে —অনবধানতাবশতঃ নয়, এবং দ্রুত—ধীরেসুস্থে নয়—তাকে কার্যকরী করতে নেমে পড়া। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দিনরাত আন্তরিকভাবে ঠিক এটাই চাইছে। এই কারণেই তারা লুকৌচিয়াও ঘটনার পরেপরেই জাপ-প্রতিরোধ ও জাতিকে রক্ষার জন্য দশ দফা কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছে। এই দশ দফা কর্মসূচীটি মার্কসবাদ ও সাচ্চা বিপ্লবী তিন গণ-নীতির

সংগে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। এটি হচ্ছে প্রারম্ভিক কর্মসূচী, চীনা বিপ্লবের বর্তমান স্তরের কর্মসূচী, যে স্তরটি হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবের স্তর; এই কর্মসূচীটি কার্যকরী করার মধ্য দিয়েই চীনকে রক্ষা করা সম্ভব। এই কর্মসূচীর বিরোধী কাজে যে ব্যাপৃত থাকতে চাইবে, তার ওপরেই নেমে আসবে ইতিহাসের অমোঘ দণ্ড।

কুওমিনতাঙের সম্মতি ছাড়া সমগ্র দেশব্যাপী এই কর্মসূচী রূপায়িত করা সম্ভব নয়, কারণ চীনে কুওমিনতাঙ এখনো সব থেকে বড় পার্টি ও শাসক পার্টি। আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, কুওমিনতাঙের বুদ্ধিমান সভ্যবৃন্দ এই কর্মসূচীটির সঙ্গে একদিন একমত হবেন। কারণ তাঁরা যদি তা না হন, তবে তিন গণ-নীতি শুধু কথার কথাই হয়ে থাকবে, ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী ভাবধারার পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে না, জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিতও করা যাবে না, বিদেশী শক্তির কাছে চীনা জনসাধারণের ক্রীতদাস হওয়া ছাড়া কোন পথ থাকবে না। কুওমিনতাঙের সত্যিকারের বুদ্ধিমান সভ্যবৃন্দ নিশ্চয়ই তা চাইবেন না, এবং আমাদের দেশবাসীরাও কখনই ক্রীতদাসে পরিণত হতে চাইবেন না। তা ছাড়া ২৩শে সেপ্টেম্বরের বিবৃতিতে মিঃ চিয়াং কাই-শেক ঘোষণা করেছেন:

> আমি বিশ্বাস করি যে, যিনিই বিপ্লবের সপক্ষে, তিনিই তার ব্যক্তিগত ঈর্ষা-ঘৃণা ও সংস্কার সব দূরে সরিয়ে রেখে তিন গণ-নীতি কার্যকরী করার কাজে নেমে পড়বেন। জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে আমরা গতস্য শোচনা নাস্তি—এই বাক্য গ্রহণ করে সমস্ত জাতিকে একসঙ্গে নিয়ে পুরোপুরি নতুনভাবে শুরু করব, কঠিন পরিশ্রম সহকারে জীবন ও জাতির রক্ষার প্রয়োজনে একতার জন্য সংগ্রাম করব।

কথাটি খুবই সত্য। বর্তমানের জরুরী কর্তব্য হচ্ছে তিন গণ-নীতিকে কার্যকরী করে তোলার জন্য সচেষ্ট হওয়া, ব্যক্তিগত ও উপদলীয় খেয়োখেয়ি পরিহার করা, পূর্বতন কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন করা, অবিলম্বে তিন গণ-নীতির সঙ্গে সুসংবদ্ধ একটি বিপ্লবী কর্মসূচী কার্যকরী করা এবং সমস্ত জাতিকে নিয়ে পুরোপুরি নতুনভাবে শুরু করা। এ কাজে যত দেরী হবে, ততই সব অনুতাপ নিষ্ফল হয়ে যাবে।

কিন্তু তিন গণ-নীতি ও দশ দফা কর্মসূচী কার্যকরী করার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আছে তা সম্পন্ন করার জন্য যথোপযুক্ত হাতিয়ারের প্রশ্নটি, যা সরকার

ও সামরিক বাহিনীর সংস্কার সাধনের প্রশ্নটির সঙ্গে জড়িত। বর্তমান সরকার হচ্ছে কুওমিনতাঙের একক পার্টি-ভিত্তিক একনায়কত্বের সরকার, জাতীয় গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের সরকার নয়। জাতীয় গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট সরকার ছাড়া তিন গণ-নীতি ও দশ দফা কর্মসূচী কার্যকরী করা সম্ভব নয়। কুওমিন-তাঙের সামরিক বাহিনীর পদ্ধতিও এখনো পর্যন্ত সেই পুরানো পদ্ধতিই রয়েছে, এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে ঐ পুরানো ব্যবস্থায় সংগঠিত বাহিনী দিয়ে হারানো সম্ভব নয়। এখন পদাতিক বাহিনী প্রতিরোধে ব্যাপৃত আছে এবং তাদের সকলের প্রতি আমাদের আছে বিপুল প্রশংসা ও শ্রদ্ধা, বিশেষ করে তাদের প্রতি যারা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করছে। কিন্তু বিগত তিন মাসের প্রতিরোধ-যুদ্ধের শিক্ষা এ কথাই প্রমাণ করছে যে, কুওমিনতাঙের সামরিক বাহিনীর পদ্ধতির পরিবর্তন আশু প্রয়োজন, কারণ তা জাপ-হানাদারদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করার কর্তব্যের পক্ষে এবং সাফল্যের সঙ্গে তিন গণ-নীতির বিপ্লবী কর্মসূচীর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অযোগ্য। সামরিক অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যের একতার নীতি এবং জনসাধারণ ও সামরিক বাহিনীর মধ্যের একতার নীতিই হবে এই পরিবর্তনের ভিত্তি। কুওমিনতাঙের বর্তমান প্রচলিত সামরিক ব্যবস্থা উভয়েরই মূলতঃ বিরোধিতা করে থাকে। তাদের বিশ্বস্ততা ও সাহস সত্বেও এই ব্যবস্থা সামরিক অফিসার ও সৈনিকদের সর্বস্ব পণের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে এবং সেই কারণে এর সংস্কারসাধনে অনতিবিলম্বে উদ্যোগী হওয়া নিশ্চিতভাবেই প্রয়োজন। এ কথার অর্থ এই নয় যে, সামরিক ব্যবস্থার সংস্কারসাধন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ থাক; যুদ্ধ চলাকালীনও এ ব্যবস্থার সংস্কার চলতে পারে। সামরিক বাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক ভাবধারা ও রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে পরি-বর্তন আনাটাই হচ্ছে কেন্দ্রীয় কর্তব্য। এর চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যাবে উত্তরাভিযানের সময় জাতীয় বিপ্লবী সামরিক বাহিনীর পরিবর্তন সাধনের পদ্ধতির মধ্যে, যখন সাধারণভাবে সামরিক বাহিনীর অফিসারবৃন্দ ও সৈনিক-দের মধ্যে এবং জনসাধারণ ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে এই একতা গড়ে উঠেছিল; সেদিনের সেই ভাবধারার পুনরুজ্জীবন সুনিশ্চিতভাবেই প্রয়োজন। স্পেনের যুদ্ধ থেকে চীনের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যেখানে প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও প্রজাতন্ত্রী বাহিনী সংগঠিত হয়েছে। স্পেন থেকে চীনের অবস্থা অনেক ভাল, কিন্তু তার ব্যাপকভিত্তিক ও সুসংগঠিত যুক্তফ্রন্ট নেই,

তার নেই যুক্তফ্রন্ট সরকার যা দিয়ে সম্পূর্ণ বিপ্লবী কর্মসূচী রূপায়িত হতে পারে, তার নেই নতুন পদ্ধতিতে সুসংগঠিত সামরিক বাহিনীও। এইসব ত্রুটি সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। সমগ্র যুদ্ধের বিচারে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত লালফৌজ বর্তমানে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করতে পারে বটে, কিন্তু ব্যাপক জাতীয় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবার মতো ভূমিকা এখনো পর্যন্ত পালন করতে সে সক্ষম হয়নি। তবু এর রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংগঠনিক গুণগুলি সারা দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ বাহিনীগুলির কাছে সাদরে গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সৃষ্টির সময়ে লালফৌজের অবস্থা এমন ছিল না; এর মধ্যেও বহু সংস্কার হয়েছে, প্রধানতঃ এর ভিতর থেকে সামন্ততান্ত্রিক কার্যকলাপ-গুলিকে সমূলে উপড়ে ফেলে দিতে হয়েছে এবং অফিসার ও সৈন্যবাহিনীর লোকদের মধ্যে একতা এবং সামরিক বাহিনী ও জনগণের মধ্যে একতার নীতি প্রয়োগ করার মাধ্যমে এগোতে হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সামরিক বাহিনীগুলো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

শাসক কুওমিনতাঙ পার্টির জাপ-বিরোধী কমরেডরা! আজ আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার হাত থেকে জাতিকে বাঁচানোর মহান দায়িত্বের অংশীদার। আপনারা ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট তৈরী করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। আপনারা জাপানের বিরোধিতা করতে শুরু করেছেন। এটাও খুব ভাল। কিন্তু আমরা আপনাদের পুরানো কায়দায় পরিচালিত অন্যান্য কাজকর্ম পছন্দ করছি না। যুক্তফ্রন্টের বিকাশ ও বিস্তার ঘটাতে হবে সবাই মিলে, জনগণকে তার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। যুক্তফ্রন্টকে সুদৃঢ় করা এবং তার কর্মসূচীকে রূপায়িত করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংস্কারসাধন অত্যন্ত জরুরী। সুনিশ্চিতভাবে নতুন সরকারের প্রয়োজন, এবং কেবলমাত্র তারই সাহায্যেই বিপ্লবী কর্মসূচী কার্যকরী করা যাবে এবং সামরিক বাহিনীর সংস্কার শুরু করা যাবে। আমাদের এই প্রস্তাব সময়োপযোগী। আমাদের পার্টির অনেকেই এখন এটিকে কর্মে রূপায়িত করার উপযোগী মনে করছেন। তাঁর সময়ে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন মনস্থির করে রাজনৈতিক ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংস্কারসাধন করেছিলেন এবং এভাবে ১৯২৪-২৭-এর বিপ্লবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ঐ জাতীয় সংস্কারের দায়দায়িত্ব আজ আবার আপনাদের কাঁধে এসে পড়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, কুওমিনতাঙ

পার্টির কোন সাচ্চা ও দেশপ্রেমিক সত্যই এ কথা কিছুতেই বলতে পারবেন না যে, আমাদের প্রস্তাব সময়োপযোগী নয়। আমরা নিশ্চিত যে, আমাদের প্রস্তাব বাস্তবের দাবি মেটাচ্ছে।

আমাদের দেশের ভাগ্য আজ বিপর্যয়ের মুখে—কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি আরও ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ হোক! আমাদের দেশবাসিগণ যাঁরা গোলাম বনতে চান না, তাঁরা কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট একতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হোন! চীনের বিপ্লবের আশু কর্তব্য হচ্ছে সর্বরকম প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন করে সবরকম অসুবিধা দূর করা। এই কর্তব্যটি পালিত হলে আমরা সুনিশ্চিতভাবেই জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে পরাভূত করতে পারব। যদি আমরা কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই, তবে সুনিশ্চিতভাবেই আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

টীকা

১। 'জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্যসমূহ' প্রবন্ধের ('মাও সে-তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী', ১ম খণ্ড, ইংরেজী সংস্করণ) ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২। প্রস্তাবটির জন্য উপরোক্ত প্রবন্ধেরই ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। খোলা তারবার্তার জন্য ঐ, ৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৪। চিঠির বিষয়বস্তুর জন্য 'চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতি সম্পর্কে বক্তব্য' প্রবন্ধের জন্য (ঐ, ১ম খণ্ড) ৩নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৫। প্রস্তাবটির জন্য 'জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্যসমূহ' প্রবন্ধের (ঐ, ১ম খণ্ড) ৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৬। তারবার্তাটির জন্য ঐ, ৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৭। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনা প্রজাতন্ত্রের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তিটি ১৯৩৭ সালের ২১শে আগস্ট সম্পাদিত হয়।

৮। দশ দফা কর্মসূচীর জন্য বর্তমান খণ্ডেরই 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতির শক্তির সমাবেশের জন্য' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

৯। চু চিং-লাই ছিল ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট পার্টির (প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার, আমলা ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের দ্বারা গঠিত একটি ক্ষুদ্র চক্র) একজন নেতা। পরবর্তীকালে সে বিশ্বাসঘাতক ওয়াং চিং-ওয়েই'র সরকারের একজন সদস্য হয়।

ব্রিটিশ সাংবাদিক জেমস বার্ট্রামের সংগে সাক্ষাৎকার

২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৭

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রতিরোধ-যুদ্ধ

জেমস বার্ট্রাম: চীন-জাপান যুদ্ধ শুরু হবার আগে ও পরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কি কি সুনির্দিষ্ট ঘোষণা করেছে?

মাও সে-তুঙ: যুদ্ধ শুরু হবার আগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বারংবার সমগ্র দেশকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছে যে, জাপানের সংগে যুদ্ধ অনিবার্য, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের 'শান্তিপূর্ণ সমাধানের' সমস্ত কথাবার্তা এবং জাপানী কূটনীতিকদের যাবতীয় মধুর বুলি আসলে তাদের যুদ্ধ-প্রস্তুতিকে ঢেকে রাখার আবরণ মাত্র। আমরা বারংবার গুরুত্ব দিয়ে এ কথা বলেছি যে, যুক্তফ্রন্টকে জোরদার করে না তুলতে পারলে এবং একটি বিপ্লবী কর্মনীতি গৃহীত না হলে বিজয়সূচক জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। এবং এই বিপ্লবী কর্মনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই হচ্ছে এই যে, জাপান-বিরোধী ফ্রন্টে সমগ্র জনগণের সমাবেশ ঘটাতে হলে চীন সরকারকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক সংস্কারসমূহ প্রবর্তন করতে হবে। যারা জাপানের 'শান্তির জন্য প্রতিশ্রুতি'তে বিশ্বাস স্থাপন করে যুদ্ধকে এড়ানো যাবে বলে ভেবেছে, বা যারা ব্যাপক জনগণের সমাবেশ না ঘটিয়েই জাপানী হানাদারদের প্রতিরোধ করার সম্ভাবনায় আস্থা স্থাপন করেছে, আমরা বারংবার তাদের ভুল ধরিয়ে দিয়েছি। যুদ্ধের সূচনা এবং তার গতিধারা—উভয়ই আমাদের বক্তব্যের সঠিকতাকেই প্রমাণ করেছে। লুকৌচিয়াও ঘটনার পরের দিনই কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র জাতির প্রতি প্রচারিত একটি ইস্তাহারে সমস্ত রাজনৈতিক দল, গ্রুপ ও সমস্ত সামাজিক স্তরের মানুষের কাছে জাপানী আগ্রাসনের প্রতিরোধ এবং জাতীয় যুক্তফ্রন্টের সাধারণ স্বার্থে সামিল হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। তার পরে পরেই আমরা জাপানকে প্রতিরোধ ও দেশকে বাঁচাবার জন্য একটি দশ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলাম, এবং তাতে প্রতিরোধ-যুদ্ধে চীন সরকারের যেসব কর্মনীতি গ্রহণ করা উচিত, সেগুলো তুলে ধরেছিলাম। কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা কার্যকরী হবার সংগে সংগে আমরা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ

ঘোষণা প্রচার করি। এ সবকিছুই যুক্তফ্রন্টকে শক্তিশালী করে এবং বিপ্লবী নীতিকে কার্যকরী করে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নীতিতে আমাদের সুদৃঢ় আনুগত্যের প্রমাণ বহন করেছে। বর্তমান পর্যায়ে আমাদের মূল শ্লোগান হচ্ছে : 'সমস্ত জাতি কর্তৃক সর্বাত্মক প্রতিরোধ।'

যুদ্ধ-পরিস্থিতি ও তার শিক্ষা

প্রশ্ন : আপনাদের বিচারে এখন পর্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল কি ?

উত্তর : দুটি প্রধান দিক আছে। একদিকে আমাদের শহরগুলি দখল করে, আমাদের অঞ্চলগুলি অধিকার করে, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন করে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে এবং নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়ে জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা চীনা জনগণকে নিঃসন্দেহে জাতীয় পরাধীনতার এক বিপদের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। অন্যদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ চীনা জনগণ এর ফলে এ বিষয়ে খুবই সচেতন হয়ে উঠেছেন যে, ব্যাপকতর ঐক্য এবং সমগ্র জাতির প্রতিরোধ ছাড়া এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। একই সময়ে, বিশ্বের শান্তিকামী দেশগুলিও জাপানী বিপদকে প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠছে। এখনো পর্যন্ত এই হচ্ছে যুদ্ধের ফল।

প্রশ্ন : জাপানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ? এবং সে-বিষয়ে তারা কতটা সাফল্যলাভ করেছে ?

উত্তর : জাপানের পরিকল্পনা হচ্ছে সর্বপ্রথম উত্তর চীন ও সাংহাই দখল করা, এবং তারপর চীনের অন্যান্য অঞ্চল দখল করা। জাপ-হানাদাররা তাদের পরিকল্পনার কিছুটা কার্যকরী করতে পেরেছে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা হোপেই, চাহার ও সুইয়ুয়ান প্রদেশ তিনটি দখল করে বসেছে, আর এখন শানসীকে বিপদের মুখোমুখি এনে ফেলেছে ; এর কারণ হচ্ছে এই যে, এখনো পর্যন্ত চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধ প্রচেষ্টা সীমিত রাখা হয়েছে শুধু সরকার ও সেনা-বাহিনীর মধ্যে। এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে জনগণ ও সরকার কর্তৃক সম্মিলিত প্রতিরোধ কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা।

প্রশ্ন : আপনার মতে প্রতিরোধ-যুদ্ধে কী চীন কোন বিজয় অর্জন করেছে ? যদি তা থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার থাকে, তবে সেগুলো কি ?

উত্তর : আমি এই প্রশ্নটি নিয়ে আপনার সঙ্গে বেশ খানিকটা বিশদভাবে

আলোচনা করতে চাই। সর্বপ্রথমে, সাফল্য অর্জিত হয়েছে, এবং তা বেশ বড় রকমেরই। নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো থেকেই সেগুলো ধরা পড়বে: (১) সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে জাপানের বিরুদ্ধে বর্তমান প্রতিরোধ-যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয় কোন পরিস্থিতি এর আগে আর দেখা যায়নি। ভৌগোলিক দিক থেকে বিচার করলে, এই যুদ্ধই প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশকে জড়িয়ে ফেলেছে। এ যুদ্ধের চরিত্র হচ্ছে বিপ্লবী। (২) এই যুদ্ধ একটি অনৈক্যে ভরা দেশকে তুলনামূলকভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ দেশে রূপান্তরিত করেছে। এবং এই ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা। (৩) বিশ্বের জনমতের সহানুভূতি রয়েছে এই যুদ্ধের প্রতি। প্রতিরোধ না করার জন্য যারা চীনকে এককালে তাচ্ছিল্য করত, প্রতিরোধ করছে বলে তারাই আজ চীনকে সম্মান জানাচ্ছে। (৪) এই যুদ্ধ জাপানী আগ্রাসীদের বিপুল ক্ষতিসাধন করছে। সংবাদে প্রকাশ, দৈনিক দু' কোটি ইয়েন করে তাদের ব্যয় হচ্ছে এবং তাদের হতাহতের সংখ্যা নিঃসন্দেহে খুবই বেশি, যদিও এ সম্বন্ধে এখনো কোন সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। জাপানী আগ্রাসীরা যদিও উত্তর-পূর্বের চারটি প্রদেশ অনায়াসে এবং প্রায় বিনা পরিশ্রমেই দখল করতে পেরেছিল, কিন্তু এখন আর তারা রক্তাক্ত যুদ্ধ ছাড়া চীনা ভূখণ্ড দখল করতে পারছে না। আগ্রাসীরা চীনের অভ্যন্তরে নিজেদের স্থান করে নিতে পারবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু চীনের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ জাপ-সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসই এনে দেবে। সুতরাং চীন শুধু তাকে রক্ষা করার জন্যই সংগ্রাম করছে না, উপরন্তু বিশ্ব-ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ফ্রন্টে তার মহান কর্তব্য পালনের জন্যও সংগ্রাম করছে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিপ্লবী চরিত্র খুবই সুস্পষ্ট। (৫) আমরা যুদ্ধ থেকে কিছু কিছু শিক্ষা পেয়েছি। তার জন্য দাম হিসেবে আমাদের দিতে হয়েছে জমি ও রক্ত।

যেসব শিক্ষা আমরা পেয়েছি, সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক মাসের যুদ্ধে চীনের অনেকগুলি দুর্বলতা ধরা পড়েছে। সর্বোপরি এগুলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট। যদিও ভৌগোলিকভাবে যুদ্ধ সমগ্র দেশকে জড়িয়ে ফেলেছে, কিন্তু সমগ্র জাতি যুদ্ধ করছে না। অতীতের মতো বর্তমানেও ব্যাপক জনতার যুদ্ধে অংশ নেবার ব্যাপারে সরকার বাধানিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়েছে, কাজেই যুদ্ধ এখনো গণ-চরিত্র গ্রহণ করেনি। যতদিন পর্যন্ত এ যুদ্ধ গণ-চরিত্র না পাবে, ততদিন পর্যন্ত জাপ-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন সম্ভব

হবে না। কিছু কিছু লোক বলে : 'এই যুদ্ধ এর মধ্যেই সর্বাত্মক যুদ্ধে পরিণত হয়ে গেছে।' কিন্তু দেশের ব্যাপক অংশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে—এই অর্থেই কেবল কথাটি সত্য। অংশগ্রহণের বিচারে এটা এখনো আংশিক যুদ্ধ, কারণ কেবলমাত্র সরকার ও সেনাবাহিনীই যুদ্ধ করছে, জনগণ যুদ্ধ করছে না। বিশাল অঞ্চল যে হারাতে হচ্ছে এবং বিগত কয়েক মাসে যে বড় বড় সামরিক পরাজয় ঘটেছে তার প্রধান কারণ বিশেষ করে এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে। সুতরাং যদিও বর্তমানের সশস্ত্র প্রতিরোধের চরিত্র বিপ্লবী, কিন্তু তবুও এর বিপ্লবী চরিত্রটি অসম্পূর্ণ, কারণ এ যুদ্ধ এখনো গণ-চরিত্রের রূপ গ্রহণ করেনি। এক্ষেত্রেও ঐক্যের সমস্যাটি রয়ে গেছে। যদিও, অতীতের তুলনায় রাজনৈতিক পার্টি এবং গ্রুপগুলি আপেক্ষিকভাবে ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই ঐক্য এখনো অনেক পেছনে পড়ে আছে। রাজনৈতিক বন্দীদের অধিকাংশই এখনো ছাড়া পায়নি এবং রাজনৈতিক পার্টিগুলির ওপর থেকে এখনো পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে তুলে নেওয়া হয়নি। এখনো পর্যন্ত সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে, সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে, অফিসার এবং সৈন্যদের মধ্যে সম্পর্ক খুবই খারাপ এবং এ ক্ষেত্রে ঐক্যের বদলে বিচ্ছিন্নতাই দেখা যায়। এটা একটা মৌলিক সমস্যা। যদি এর সমাধান না করা হয় তবে বিজয় অর্জনের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ ছাড়া, আমাদের হতাহতের ও ক্ষয়ক্ষতির একটি বড় কারণ হচ্ছে সামরিক ভুল-ভ্রান্তি। যে সমস্ত যুদ্ধ হয়েছে তার অধিকাংশই হয়েছে নিষ্ক্রিয় যুদ্ধ, অথবা সামরিক ভাষায় বলা যায়, 'বিশুদ্ধ আত্মরক্ষার' যুদ্ধ। এভাবে যুদ্ধ করে আমরা কোনদিনও জয়লাভ করতে পারি না। বিজয় অর্জনের জন্য রাজনৈতিক ও সামরিক এই উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমানে প্রচলিত নীতির মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। এই শিক্ষাগুলিই আমরা পেয়েছি।

প্রশ্ন : তবে, রাজনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে অবশ্যকরণীয় পূর্ব-শর্তগুলি কি কি ?

উত্তর : রাজনৈতিক দিক দিয়ে, প্রথমতঃ, বর্তমান সরকারকে অবশ্যই যুক্তফ্রন্ট সরকারে পরিবর্তিত হতে হবে, যে সরকারে জনগণের প্রতিনিধিরা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারবে। এই সরকারকে একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত সরকার হতে হবে। এই সরকার প্রয়োজনীয় বিপ্লবী কর্মনীতিগুলি কার্যকরী করবে। দ্বিতীয়তঃ, জনগণকে মতামত প্রকাশের, পত্রপত্রিকা প্রকাশের ও সভা-সমিতি করার স্বাধীনতা দিতে হবে এবং জনগণকে শত্রুর

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র গ্রহণের অধিকার দিতে হবে, যাতে করে এই যুদ্ধ গণ-চরিত্র অর্জন করতে পারে। তৃতীয়তঃ, অত্যধিক ট্যাক্স ও বিভিন্ন প্রকার লেভি আদায় বন্ধ করে, খাজনা ও সুদ কমিয়ে, শ্রমিক, নিম্নপদস্থ কর্মচারী এবং সৈন্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে জাপানীদের বিরুদ্ধে যেসব সৈন্যরা যুদ্ধ করছে তাদের পরিবারদের অবস্থার উন্নতিসাধন করে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও যুদ্ধে বিপর্যস্ত বাস্তুহারাদের সাহায্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করে অবশ্যই জনগণের জীবনধারণের মানোন্নয়ন করতে হবে। সরকারী রাজস্ব ব্যয়ের নীতির ভিত্তি হবে অর্থনৈতিক চাপের সমহারে বণ্টননীতি, অর্থাৎ যার টাকা আছে তাকে টাকা দিতে হবে। চতুর্থতঃ, একটি ইতিবাচক বৈদেশিক নীতি থাকতে হবে। পঞ্চমতঃ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে নীতির পরিবর্তন করতে হবে। ষষ্ঠতঃ, বিশ্বাসঘাতকদের কঠোরভাবে দমন করতে হবে। এই সমস্যাটি খুবই গুরুতর হয়ে উঠেছে। বিশ্বাসঘাতকরা মরিয়া হয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা শত্রুদের সাহায্য করছে; পশ্চাদ্দেশে তারা গোলযোগের সৃষ্টি করছে, এবং এদের মধ্যে কিছু লোক আবার জাপ-বিরোধী সেজেছে এবং দেশপ্রেমিকদের বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা করে গেপ্তারও করিয়ে দিচ্ছে। যখন জনগণ সরকারের সঙ্গে স্বাধীনভাবে সহযোগিতা করতে পারবে, একমাত্র তখনই কার্যকরীভাবে বিশ্বাসঘাতকদের দমন করা সম্ভব হবে। সামরিক দিকে সুষ্ঠু সংস্কার প্রয়োজন, এবং এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রণনীতি ও রণকৌশলকে বিশুদ্ধ আত্মরক্ষার নীতি থেকে সক্রিয় আক্রমণের নীতিতে পরিবর্তিত করা; পুরানো ধাঁচের সেনাবাহিনীকে নতুন ধাঁচের সেনাবাহিনীতে ঢেলে সাজানো; জোর করে সৈন্যদলে ভর্তি করানোর পদ্ধতির বদলে জনগণকে যুদ্ধে যাবার জন্য সচেতন করে তুলবার পদ্ধতি গ্রহণ করা; বিভক্ত সামরিক নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধন করে ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব প্রবর্তন করা; সেনাবাহিনীকে যা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, সেই শৃংখলাহীনতার বদলে সচেতন শৃংখলার প্রবর্তন করা, যা সামান্যতম জনস্বার্থবিরোধী কাজও করতে দেবে না; বর্তমান অবস্থায় কেবলমাত্র নিয়মিত বাহিনীই যুদ্ধ করছে—এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে জনগণের দ্বারা ব্যাপক গেরিলাযুদ্ধের বিকাশ ঘটিয়ে নিয়মিত বাহিনীর যুদ্ধের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই রাজনৈতিক ও সামরিক পূর্বশর্তগুলি আমাদের প্রকাশিত দশ দফা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর সবগুলিই ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের তিন গণ-নীতি, তিন

মহান নীতি এবং তার শেষ ইচ্ছাপত্রের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সবগুলি কার্যকরী করেই কেবল যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন : এই কর্মসূচী কার্যকরী করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি কি করছে ?

উত্তর : আমরা অক্লান্তভাবে পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার কাজকে, এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে প্রসারিত ও সুসংহত করে তোলার, সমস্ত শক্তির সমাবেশ ঘটাবার এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে কুওমিনতাঙ ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক পার্টি ও গ্রুপের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে আমাদের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছি। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের পরিসর এখনো পর্যন্ত খুবই সীমাবদ্ধ, তাকে আরও ব্যাপকতর করে তোলা প্রয়োজন, অর্থাৎ ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রে যে 'জনগণকে সচেতন করে তোলার' কথা বলা হয়েছিল, সেটা করা দরকার, এবং একেবারে নীচুস্তর থেকে যুক্তফ্রন্টে যোগদানের জন্য জনগণের সমাবেশ ঘটানো দরকার। যুক্ত-ফ্রন্টকে সুসংহত করে তোলার অর্থ হচ্ছে এমন একটি সাধারণ কর্মসূচীকে কার্যকরী করা, যা কাজের ক্ষেত্রে সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি এবং গ্রুপের কাছে বাধ্যতামূলক হবে। আমরা ডঃ সানের তিন গণ-নীতি, তিন মহান নীতি এবং তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রটি সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং সমস্ত সামাজিক শ্রেণীর যুক্তফ্রন্টের সাধারণ কর্মসূচী হিসেবে মেনে নিতে রাজী আছি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সব কয়টি রাজনৈতিক দল এটা মেনে নেয়নি, সর্বোপরি কুওমিনতাঙ দল, এই সর্বাত্মক কর্মসূচী সম্বন্ধে কোন ঘোষণা প্রকাশ করতে সম্মত হয়নি। ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের জাতীয়তাবাদের নীতি কুওমিনতাঙ কাজে প্রয়োগ করেছে কেবল আংশিকভাবে, যেমন, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর গণতন্ত্রের নীতি বা জনগণের জীবনযাত্রার নীতি মোটেই প্রয়োগ করা হয়নি, এবং তারই ফলে আজকের প্রতিরোধ-যুদ্ধে এই প্রচণ্ড সংকট দেখা দিয়েছে। যুদ্ধের পরিস্থিতি যখন এরকম সংকটজনক হয়ে পড়েছে, তখন কুওমিনতাঙের উচিত পুরোপুরিভাবে জনগণের তিন গণ-নীতিকে কার্যকরী করা, না হলে পরে অনুতাপ করারও আর সময় থাকবে না। কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য হচ্ছে সোচ্চার হয়ে ওঠা এবং নিরলসভাবে ও ধৈর্যসহকারে যুক্তি দিয়ে এ সবকিছু কুওমিনতাঙ এবং সমগ্র জাতির কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝানো, যাতে করে সাচ্চা বিপ্লবী তিন গণ-নীতি, তিন মহান নীতি এবং ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রটি সম্পূর্ণতঃ এবং পুংখানুপুংখভাবে দেশব্যাপী কার্যকরী

করা হয় এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট সম্প্রসারিত ও সুসংহত হয়ে ওঠে।

প্রতিরোধ-যুদ্ধে অষ্টম রুট বাহিনী

প্রশ্ন: আমাকে অষ্টম রুট বাহিনী সম্পর্কে বলুন, বহুলোক এ বিষয়ে আগ্রহী—যেমন এর রণনীতি, রণকৌশল, রাজনৈতিক কাজ এবং অন্যান্য বহু বিষয় সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী।

উত্তর: বস্তুতঃ যখন লালফৌজের নাম পাল্টে নতুন নাম হল অষ্টম রুট বাহিনী এবং যখন এই বাহিনী যুদ্ধে চলে গেল, তখন থেকেই বিপুল সংখ্যক লোক এর কার্যকলাপ সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। আমি এখন আপনাকে একটা সাধারণ ধারণা দেব।

প্রথমে, এর রণক্ষেত্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে। রণনীতিগতভাবে অষ্টম রুট বাহিনী শানসিকে কেন্দ্র করে আছে। আপনি জানেন, এ বাহিনী বহু বিজয় অর্জন করেছে। পিংসিঙ্কুয়ানের খণ্ডযুদ্ধ, চিংপিং, পিংলু এবং নিংগু পুনর্দখল, লেইয়ুয়ান এবং কুয়াংলিং পুনরধিকার, চিঙ্কুয়ান অধিকার, জাপানী সেনা-বাহিনীর তিনটি প্রধান সরবরাহ পথের যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (তাতুং এবং ইয়েনমেঙ্কুয়ান, ওয়েইসিয়েন এবং পিংসিঙ্কুয়ান শৌসিয়েন ও নিংগুর মধ্যে), ইয়েনমেঙ্কুয়ানের দক্ষিণে জাপ-বাহিনীর পশ্চাদ্দেশে আক্রমণ, পিংসিঙ্কুয়ান এবং ইয়েনমেঙ্কুয়ানকে দু'বার করে পুনরধিকার এবং সম্প্রতি আবার চুয়াং ও তাং-সিয়েন অধিকার প্রভৃতি হচ্ছে এর উদাহরণ। শানসিতে জাপ-সেনাবাহিনী অষ্টম রুট বাহিনী এবং অন্যান্য চীনা বাহিনী কর্তৃক রণনীতিগতভাবে পরি-বেষ্টিত হচ্ছে। আমরা সুনিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে, উত্তর চীনে জাপ-বাহিনী প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে। শানসিকে তারা গায়ের জোরে দখল করতে গেলে সুনিশ্চিতভাবেই তারা অভূতপূর্ব অসুবিধার সম্মুখীন হবে।

এরপর রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে। অন্যান্য চীনা বাহিনী যা করেনি আমরা তাই করছি। অর্থাৎ প্রধানতঃ শত্রুর পার্শ্বদেশে এবং পশ্চাদ্দেশে আমরা যুদ্ধ করছি। যুদ্ধের এই পদ্ধতিটি বিশুদ্ধ মুখোমুখি প্রতিরক্ষার পদ্ধতি থেকে অনেক স্বতন্ত্র। আমরা আমাদের বাহিনীর একাংশকে মুখোমুখি যুদ্ধে নিয়োগ করার বিরোধী নই, কারণ তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাহিনীর প্রধান অংশকে অবশ্যই শত্রুর পার্শ্বদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে হবে এবং নিজেদের

হাতে উদ্যোগ রেখে স্বাধীনভাবে শত্রুকে আক্রমণ করতে হলে পরিবেষ্টন ও পার্শ্বদেশ অতিক্রম করার কৌশল গ্রহণ করাটা একান্তভাবেই প্রয়োজন। কারণ সেটাই হচ্ছে একমাত্র পদ্ধতি যা দিয়ে তার শক্তিকে ধ্বংস করা এবং আমাদের শক্তিকে রক্ষা করা যায়। উপরন্তু, আমাদের বাহিনীর কিছু সশস্ত্র শক্তিকে শত্রুর পশ্চাদ্দেশে নিয়োজিত করা বিশেষভাবে কার্যকরী, কারণ তারা শত্রুর সরবরাহ পথ এবং ঘাঁটি তছনছ করে দিতে পারে। এমনকি মুখোমুখি যুদ্ধের বাহিনীকেও প্রধানতঃ 'প্রতি-আক্রমণের' ওপর আস্থা স্থাপন করা উচিত, বিশুদ্ধ প্রতিরক্ষার কৌশলের ওপর নয়। বিগত কয়েক মাসে যেসব সামরিক বিপর্যয় হয়েছে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যুদ্ধের অনুপযোগী পদ্ধতির ব্যবহার, অষ্টম রুট বাহিনী যে পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে তাকে আমরা নিজ হাতে উদ্যোগ বজায় রেখে স্বাধীনভাবে গেরিলা এবং চলমান যুদ্ধের প্রয়োগ বলে থাকি। নীতির দিক থেকে গৃহযুদ্ধের সময়ে অনুসৃত পদ্ধতির সংগে এ পদ্ধতি মূলতঃ অভিন্ন, কিন্তু কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান স্তরে, ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে শত্রুর পশ্চাদ্‌ভাগে এবং পার্শ্বদেশে আচমকা আক্রমণকে সহজতর করার জন্য আমরা আমাদের শক্তিকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করার বদলে বেশি বিভক্ত করে দিই। যেহেতু সামগ্রিকভাবে দেশের সশস্ত্র বাহিনী সংখ্যার দিক থেকে শক্তিশালী, তাই তার কিছু মুখোমুখি প্রতিরক্ষার জন্য, আর কিছু গেরিলা-যুদ্ধের জন্য ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু প্রধান বাহিনীকে সব সময়ই শত্রুর পার্শ্বদেশে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। যুদ্ধের প্রথম মূল কথাই হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা, এবং শত্রুকে ধ্বংস করা, এবং এই উদ্দেশ্যেই আমাদের নিজ হাতে উদ্যোগ রেখে স্বাধীনভাবে গেরিলা এবং চলমান যুদ্ধ পরিচালনা করা প্রয়োজন এবং সর্বপ্রকারের নিষ্ক্রিয় ও অনমনীয় কৌশল বর্জন করা প্রয়োজন। যদি বিপুল সংখ্যক সৈন্য অষ্টম রুট বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলমান যুদ্ধ চালায় এবং গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করে, তবে আমাদের জয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে।

এরপর রাজনৈতিক কাজ সম্পর্কে। অষ্টম রুট বাহিনীর আর একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্যের দিক হচ্ছে এর রাজনৈতিক কাজ, যা তিনটি মূল নীতি দ্বারা পরিচালিত। প্রথমতঃ, অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে ঐক্যের নীতি, যার অর্থ হচ্ছে সেনাবাহিনীর ভেতর থেকে সামন্তযুগীয় অভ্যাস-আচরণগুলো নির্মূল করা, মারধোর এবং গালাগাল নিষিদ্ধ করা, সচেতন শৃংখলা

গড়ে তোলা এবং সুখ-দুঃখ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া—যার ফলে গোটা সেনাবাহিনী ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ, সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে ঐক্যের নীতি, যার অর্থ হচ্ছে এমন শৃংখলা রক্ষা করা, যাতে জনস্বার্থের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করা নিষিদ্ধ, জনগণের মধ্যে প্রচারকার্য চালানো, তাদের সংগঠিত করা ও সশস্ত্র করা, তাদের আর্থিক দুর্গতিকে কমিয়ে দেওয়া, এবং যেসব বিশ্বাসঘাতক ও শত্রুদের সহযোগী সেনাবাহিনী ও জনগণের ক্ষতিসাধন করে, তাদের দমন করা। এসবের ফলে সেনাবাহিনী এবং জনগণ ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সর্বত্রই তাদের স্বাগত জানানো হয়। তৃতীয়তঃ, শত্রুবাহিনীকে তছনছ করে দেওয়া এবং যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ক্ষমাশীল আচরণের নীতি। আমাদের বিজয় আমাদের সামরিক কার্যকলাপের ওপরই নির্ভর করে না, উপরন্তু শত্রুবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার ওপরও নির্ভর করে। যদিও শত্রুবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া এবং যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ক্ষমাশীল আচরণ করার ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য কোন ফল এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, কিন্তু ভবিষ্যতে সুনিশ্চিতভাবেই তা পাওয়া যাবে। উপরন্তু অষ্টম রুট বাহিনী গায়ের জোরে তার শক্তি বৃদ্ধি করে না, বরং তিনটি নীতির দ্বিতীয়টির সঙ্গে সংগতি রেখে জনগণকে সচেতন করে তোলার অধিকতর কার্যকরী পদ্ধতির মধ্য দিয়েই যুদ্ধে স্বেচ্ছাসৈনিক পাঠাতে পারে।

যদিও হোপেই, চাহার, সুইয়ুয়ান এবং শানসির একাংশ আমরা হারিয়েছি, তাই বলে আমরা মোটেও হতাশ হইনি, বরং আমরা দৃঢ়ভাবে সমগ্র বাহিনীকে বন্ধুত্বপূর্ণ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তোলার আহ্বান দিয়েছি এবং সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে শানসি রক্ষা করা ও হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য আহ্বান জানিয়েছি। অষ্টম রুট বাহিনী শানসির প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অন্যান্য চীনা সেনাবাহিনীর কাজের সঙ্গে তার কাজের সমন্বয় করবে। সামগ্রিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে উত্তর চীনের যুদ্ধের ক্ষেত্রে এর ফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে।

প্রশ্ন : অষ্টম রুট বাহিনীর এইসব ভাল ভাল গুণগুলি কি চীনের অন্যান্য সেনাবাহিনী অর্জন করতে পারে? এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

উত্তর : নিশ্চয়ই তারা পারে। ১৯২৪-২৭ সালে কুওমিনতাঙ বাহিনীর মনোভাব সাধারণভাবে আজকের অষ্টম রুট বাহিনীর মনোভাবেরই মতো ছিল। তখন কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙ নতুন ধাঁচের সশস্ত্র বাহিনী

সংগঠিত করার কাজে সহযোগিতা করেছিল এবং মাত্র দুটি রেজিমেন্ট নিয়ে শুরু করে তাদের চারিপাশে অনেক সেনাবাহিনী জড়ো করেছিল এবং চেন চিউং-মিঙকে পরাজিত করে তাদের প্রথম বিজয় অর্জন করেছিল। পরবর্তী-কালে এই বাহিনীগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হয় এবং আরও সৈন্য তাদের প্রভাবাধীনে আসে; তার পরেই কেবল উত্তরের অভিযান শুরু হয়। এই বাহিনীগুলোর মধ্যে একটা তাজা মনোভাব বিরাজ করত, সামগ্রিকভাবে অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে এবং সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে ঐক্য ছিল এবং সেনাবাহিনী বিপ্লবী জঙ্গী মনোভাবে ভরপুর ছিল। পার্টি প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক বিভাগের প্রবর্তন চীনে সর্বপ্রথম গৃহীত হওয়ায় এইসব সশস্ত্র বাহিনীর গোটা চেহারাটাই পাল্‌টে গিয়েছিল। ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত লালফৌজের এই ব্যবস্থাকেই আজকের দিনের অষ্টম রুট বাহিনী উত্তরাধিকার রূপে পেয়েছে এবং তাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবী যুগের সশস্ত্র বাহিনী এই নতুন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বভাবতঃই তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুদ্ধের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল, তারা নিষ্ক্রিয় এবং অনমনীয় পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেনি, উদ্যোগ নিয়ে সোৎসাহে আক্রমণ করার পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল এবং তারই ফলে তারা উত্তরের অভিযানে বিজয়ী হয়েছিল। আজকের দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন সেই ধরনের সেনাবাহিনীর। এরকম লাখ লাখ লোক থাকতেই হবে, এমন কোন কথা নেই; এরকম কয়েক হাজার লোকের কেন্দ্রশক্তি নিয়েই আমরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে পারি। প্রতি-রোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যে সাহসিক আত্মত্যাগ তারা করছে, তার জন্য সারা দেশের সেনাবাহিনীকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যেসব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়ে গেছে, তা থেকে অনেক শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ জাপানী সেনাবাহিনীর মধ্যে যেরকম শৃংখলা আছে, তাতে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আপনাদের ক্ষমাশীল ব্যবহারের নীতি কি অকার্যকরী বলে প্রমাণিত হবে না? যেমন ধরুন, বন্দীদেরকে আপনারা ছেড়ে দেবার পর জাপ-সামরিক অধিনায়কত্ব তাদের হত্যা করতে পারে, এবং সামগ্রিকভাবে জাপ-বাহিনী তখন আপনাদের নীতির অর্থ আর বুঝতেই পারবে না।

উত্তর ঃ তা অসম্ভব। যত বেশি তারা হত্যা করবে, ততই জাপানী সেনাবাহিনীর মধ্যে চীনা সেনাবাহিনীর প্রতি সহানুভূতি জেগে উঠবে। এ

ঘটনা সাধারণ সৈন্যদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যাবে না। আমাদের এই নীতিতে আমরা তাই অবিচল থাকব। উদাহরণস্বরূপ, এমনকি যদি জাপ-সেনাবাহিনী অষ্টম রুট বাহিনীর বিরুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহারের ঘোষিত ইচ্ছাকে কার্যকরীও করে, তবুও আমরা আমাদের নীতির পরিবর্তন করব না। ধৃত জাপানী সৈন্যরা এবং জাপানী অধস্তন অফিসাররা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের প্রতি আমরা ভাল ব্যবহার করে যাব, আমরা তাদের অপমান বা গালাগাল করব না, বরং আমাদের দুই দেশের জনগণের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন—এ কথা বিশ্লেষণ করে তাদের বুঝিয়ে দেব, তারপর তাদের মুক্ত করে দেব। যারা ফিরে যেতে চাইবে না, তারা অষ্টম রুট বাহিনীতে কাজ করতে পারে; যদি জাপ-বিরোধী যুদ্ধক্ষেত্রে কোন আন্তর্জাতিক বাহিনীর উদ্ভব হয় তারা তাতেও যোগদান করতে পারে এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে পারে।

প্রতিরোধ-যুদ্ধের মধ্যে আত্মসমর্পণবাদ

প্রশ্ন: আমি শুনেছি, যুদ্ধ চালিয়ে গেলেও জাপান সাংহাইতে শান্তির গুজব ছড়িয়ে চলেছে। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: তাদের পরিকল্পনার কিছুটা সাফল্যের পরেই তারা তিনটি উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আবার শান্তির বুলি আওড়াতে শুরু করেছে। সেগুলো হচ্ছে: (১) যেসমস্ত জায়গা তারা দখল করেছে, সেগুলোকে ভবিষ্যতের আক্রমণাত্মক কাজে রণনীতিমূলক পা-রাখার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজনে সেইসব অবস্থানকে সুসংহত করা; (২) চীনের জাপ-বিরোধী ফ্রন্টে ভাঙ্গন ধরানো; এবং (৩) চীনের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থনের ফ্রন্টে ভাঙন সৃষ্টি করা। বর্তমান শান্তির গুজবটিকে বলা যেতে পারে ধোঁয়ার প্রথম বোমা। বিপদ হচ্ছে এই যে, চীনে কিছু দোদুল্যমান ব্যক্তি আছে যারা শত্রুর ছলাকলায় বিভ্রান্ত হবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে, এবং বিশ্বাসঘাতকরা ও শত্রুর সহযোগীরা এদের মধ্যেই কৌশলী অভিযান চালাচ্ছে এবং জাপানী আগ্রাসীদের কাছে চীনকে আত্মসমর্পণ করানোর চেষ্টায় সবরকমের গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রশ্ন: এই বিপদ, আপনার মতে, কোথায় নিয়ে যেতে পারে?

উত্তর: এর বিকাশের কেবলমাত্র দুটি দিকই থাকতে পারে: হয় চীনা

জনগণ আত্মসমর্পণবাদকে জয় করবে, অথবা আত্মসমর্পণবাদ জয়ী হবে, এবং যার ফলে জাপ-বিরোধী ফ্রন্ট ভেঙে যাবে এবং চীন এক বিশৃংখলার রাজ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : দুটির মধ্যে কোন্‌টির সম্ভাবনা বেশি ?

উত্তর : সমগ্র চীনা জনগণ চাইছেন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যেতে। শাসকশ্রেণীর একটি অংশ যদি আত্মসমর্পণের পথ গ্রহণ করে, তবে বাকি অংশ, যারা সুদৃঢ় থাকছে তারা নিশ্চয়ই এর বিরোধিতা করবে এবং জনগণের সঙ্গে এক হয়ে প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে। অবশ্য, চীনের জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের পক্ষে এটি হবে একটি খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আত্মসমর্পণবাদ গণ-সমর্থন লাভ করতে পারবে না, বরং জনগণ আত্মসমর্পণ-বাদকে জয় করবেন, যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন এবং বিজয় অর্জন করবেন।

প্রশ্ন : কিন্তু কিভাবে আত্মসমর্পণবাদকে জয় করা যাবে ?

উত্তর : প্রচারের মাধ্যমে, অর্থাৎ আত্মসমর্পণবাদের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করে, এবং কাজের মাধ্যমে, অর্থাৎ আত্মসমর্পণবাদী কার্যকলাপ থামাবার জন্য জনগণকে সংগঠিত করে। জাতীয় পরাজয়ের মনোভাবের বা জাতীয় নৈরাশ্যবাদের মনোভাবের মধ্যেই, অর্থাৎ যেহেতু কয়েকটি যুদ্ধে চীন পরাজিত হয়েছে সুতরাং চীনের আর প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই- এই মনো-ভাবের মধ্যেই আত্মসমর্পণবাদের মূল নিহিত আছে। এই নৈরাশ্যবাদীরা এ কথা উপলব্ধি করতে পারে না যে, পরাজয়ই সাফল্যের জন্ম দেয়, পরাজয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই ভবিষ্যৎ জয়ের ভিত্তি তৈরী হয়। তারা প্রতিরোধ-যুদ্ধে কেবল পরাজয়ই দেখে, কিন্তু সাফল্যগুলি দেখতে পায় না, এবং বিশেষ করে তারা এটা দেখতে পায় না যে আমাদের পরাজয়গুলির মধ্যেই সাফল্যের উপাদান রয়েছে, অথচ শত্রুর জয়ের মধ্যেই তাদের পরাজয়ের উপাদানগুলো আছে। আমরা জনগণকে যুদ্ধের বিজয়ের সম্ভাবনাগুলোকে দেখিয়ে দেব, তাদের এ কথা বুঝতে সাহায্য করব যে, আমাদের পরাজয় আর অসুবিধাগুলো হচ্ছে সাময়িক, সমস্ত বিপর্যয় সত্ত্বেও যত বেশি দিন ধরে আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারব চূড়ান্ত বিজয় ততই আমাদের করায়ত্ত হবে। গণভিত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে আত্মসমর্পণবাদীদের আর কোন ভাঁওতাবাজীর সুযোগই থাকবে না এবং জাপ-বিরোধী ফ্রন্ট তাতে সুসংহতই হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন : কমিউনিস্ট পার্টি তার কর্মসূচীতে 'গণতন্ত্রের' কথা বলেছে। এই 'গণতন্ত্রের' অর্থ কি? 'যুদ্ধকালীন সরকারের' সংগে এটা কি বিরোধমূলক নয়?

উত্তর : একেবারেই না। কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসেই 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের' শ্লোগান দিয়েছিল। রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিকভাবে এই শ্লোগানের অর্থ হচ্ছে : (১) রাষ্ট্র ও সরকারের ক্ষমতা একটিমাত্র শ্রেণীর হাতে থাকবে না, বরং বিশ্বাসঘাতক এবং শত্রু-সহযোগীদের বাদ দিয়ে সমস্ত জাপ-বিরোধী শ্রেণীগুলির মৈত্রীর ভিত্তিতেই তা গঠিত হবে এবং তার মধ্যে শ্রমিক, কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়াদের অন্যান্য অংশও অবশ্যই থাকবে। (২) এই সরকারের সাংগঠনিক রূপ হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, যা একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক এবং কেন্দ্রিকতা—এই দুই আপাতঃ বিপরীতের একটি সুনির্দিষ্ট রূপের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ। (৩) এই সরকার জনগণকে সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেবে, বিশেষ করে সংঘবদ্ধ হওয়ার ও শিক্ষা পাওয়ার স্বাধীনতা এবং আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র হওয়ার স্বাধীনতা। এই তিনটি দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কোনরকমেই যুদ্ধকালীন সরকারের সঙ্গে বিরোধমূলক নয়, বরং রাষ্ট্র ও সরকারের এই রূপটি প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে সহায়কই হবে।

প্রশ্ন : 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা' কি একটি স্ব-বিরোধী কথা নয়?

উত্তর : আমরা কেবল কথাটিই দেখব না, বাস্তবতাকেও আমাদের দেখতে হবে। গণতন্ত্র আর কেন্দ্রিকতার মধ্যে কোন অনতিক্রম্য ব্যবধান নেই, চীনের জন্য এ দুটিই একান্ত প্রয়োজনীয়। একদিকে, আমরা যে সরকার চাই, তাকে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সত্যিকারের প্রতিনিধি হতে হবে। দেশব্যাপী ব্যাপক জনগণের স্বাধীনতা থাকবে এবং এর নীতিকে প্রভাবান্বিত করার সমস্ত সুযোগ জনগণের থাকবে। এই হচ্ছে গণতন্ত্রের অর্থ। অপরদিকে, প্রশাসন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণও প্রয়োজন এবং জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার মাধ্যমে যখন নীতিসংক্রান্ত দাবিসমূহ তাদের নিজস্ব নির্বাচিত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, সরকারকে তখন তা কার্যকরী করতে হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে না যাচ্ছে, ততক্ষণ সাবলীলভাবেই এটা করা সম্ভবপর হবে। এই হচ্ছে কেন্দ্রিকতার অর্থ। কেবলমাত্র গণ-

তান্ত্রিকতা গ্রহণ করেই একটি সরকার প্রকৃত শক্তিশালী হতে পারে এবং জাপ-বিরোধী যুদ্ধে চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারকে এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন : এটা তো যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে, তাই না?

উত্তর : বিগত দিনের কয়েকটি যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য নেই।

প্রশ্ন : কোনওকালে এই ধরনের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা কি ছিল?

উত্তর : হাঁ, যুদ্ধকালীন সরকারের ব্যবস্থাকে সাধারণতঃ যুদ্ধের প্রকৃতি অনুসারে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি রূপ হচ্ছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, আর অন্য রূপটি হচ্ছে চরম কেন্দ্রিকতা। প্রকৃতি অনুসারে ইতিহাসের সব যুদ্ধকেই দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে: ন্যায় যুদ্ধ, আর অন্যায় যুদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, কম-বেশি বিশ বছর আগেকার ইউরোপের মহাযুদ্ধ ছিল অন্যায়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের সরকারগুলি সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে যুদ্ধ করার জন্য জনগণকে বাধ্য করেছে, সে কারণে সেগুলো জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেছে এবং সেই অবস্থায় এক ধরনের সরকারের প্রয়োজন হয়েছে—যেমন ব্রিটেনের লয়েড জর্জ সরকার। লয়েড জর্জ ব্রিটিশ জনগণকে নিপীড়ন করেছে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে যেসব সংগঠন বা সমিতি জনমত ব্যক্ত করেছিল—সেগুলিকে বে-আইনী করে দিয়েছে। যদিও লোকসভা ছিল, সেটি ছিল বিশেষ একটি সাম্রাজ্যবাদী গ্রুপের যন্ত্র হয়ে, যে-লোকসভা যুদ্ধ বাজেটের ওপর শুধুমাত্র রবারষ্ট্যাম্প দিত। যুদ্ধকালে জনগণ ও সরকারের মধ্যে ঐক্যের অনুপস্থিতিই 'চরম কেন্দ্রিকতার সরকারের—শুধুই কেন্দ্রিকতা এবং কোন গণতন্ত্র নয়—এরকম সরকারের উদ্ভব ঘটায়। কিন্তু ঐতিহাসিক-ভাবে বিপ্লবী যুদ্ধও হয়েছে, যেমন ফরাসী দেশে, রাশিয়ায় এবং বর্তমানে স্পেনে। এ সমস্ত যুদ্ধে সরকার গণ-বিরোধিতার ভয় করে না, কারণ জনগণ নিজেই এই ধরনের যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য উৎসুক ও আগ্রহী; জনগণকে ভয় করা দূরে থাক, এই সরকার তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলবারই চেষ্টা করে এবং তাদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য উৎসাহিত করে তোলে, যাতে করে তারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে। কারণ, এই

সরকার জনগণের স্বেচ্ছামূলক সমর্থনের ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে। চীনের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রতি জনগণের পূর্ণ সমর্থন আছে এবং তাদের অংশগ্রহণ ছাড়া এ যুদ্ধে জয়লাভ করা যাবে না; সুতরাং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ১৯২৬-২৭ সালের উত্তরাভিমুখী অভিযানেও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মাধ্যমেই বিজয় অর্জিত হয়েছিল। সুতরাং এসব থেকে দেখা যাচ্ছে, যখন যুদ্ধের লক্ষ্য প্রত্যক্ষভাবে জনগণের স্বার্থকেই প্রতিফলিত করে, তখন সরকার যত গণতান্ত্রিক হবে, ততই কার্যকরীভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। জনগণ যুদ্ধের বিরোধিতা করবে—এই ভয়ের কোন কারণ এরকম সরকারের নেই, বরং যুদ্ধে জনগণ যদি নিষ্ক্রিয় থাকে বা উদাসীন থাকে, তবেই এই সরকারের দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। যুদ্ধের প্রকৃতিই সরকার ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ককে নির্ধারিত করে দেয়—এবং এটাই হচ্ছে ইতিহাসের বিধান।

প্রশ্ন : তাহলে এই ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আপনারা কিভাবে অগ্রসর হতে চাইছেন ?

উত্তর : মূল প্রশ্ন হচ্ছে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সহ-যোগিতার প্রশ্ন।

প্রশ্ন : কেন ?

উত্তর : বিগত পনের বছর পর্যন্ত কুওমিনতাঙ এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার সম্পর্কই চীনের রাজনীতিতে নির্ধারক বিষয় হয়ে আছে। দুই পার্টির সহযোগিতায় ১৯২৪-২৭ সালে প্রথম বিপ্লবের জয় হয়েছে। ১৯২৭ সালে দুই পার্টির মধ্যে ভাঙনের ফলেই বিগত দশ বছরের দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। ভাঙনের জন্য কিন্তু আমরা দায়ী ছিলাম না; আমরা কুওমিনতাঙের নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে বাধ্য হয়েছিলাম এবং আমরা চীনের মুক্তির গৌরবজনক পতাকা উঁচুতে তুলে ধরেই রেখেছি। বর্তমানে তৃতীয় স্তর এসেছে এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে দুই পার্টিকে পূর্ণভাবে সহযোগিতা করতে হবে। আমাদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে অবশেষে একটি সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, উভয়পক্ষকে একটি সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। এবং এরকম কর্মসূচীর একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে সরকারের একটি নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

প্রশ্ন : দুই পার্টির সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কিভাবে নতুন একটা সরকারী ব্যবস্থার প্রবর্তন হতে পারে ?

উত্তর : আমরা সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো এবং সেনাবাহিনাকে পুনর্গঠনের প্রস্তাব করছি। বর্তমান জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য আমরা একটি অস্থায়ী জাতীয় পরিষদ আহ্বানের প্রস্তাব করি। ডঃ সান ইয়াৎ-সেন ১৯২৪ সালে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ঠিক সেরকমভাবে বিভিন্ন জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক পার্টিগুলি থেকে, জাপ-বিরোধী সেনাবাহিনী থেকে এবং জাপ-বিরোধী জনপ্রিয় এবং ব্যবসায়িক সংগঠনগুলি থেকে উপযুক্ত আনুপাতিক হারে পরিষদের প্রতিনিধি ঠিক করা হোক। এই পরিষদই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ সংগঠন হিসেবে কাজ করবে, জাতিকে রক্ষা করার নীতি নির্ধারণ করবে, একটি শাসনতান্ত্রিক কর্মসূচী গ্রহণ করবে এবং একটি সরকার নির্বাচন করবে। আমরা মনে করি, প্রতিরোধ-যুদ্ধ একটি সংকটজনক সন্ধিক্ষণে এসে পৌছেছে এবং কর্তৃত্বসম্পন্ন ও জনগণের ইচ্ছায় প্রতিনিধিত্ব-কারী এরকম একটি জাতীয় পরিষদ অবিলম্বে আহ্বান করেই কেবল চীনের রাজনৈতিক জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে এবং বর্তমান সংকটকে জয় করা সম্ভব হবে। আমরা এই প্রস্তাব সম্পর্কে কুওমিনতাঙের সঙ্গে মত বিনিময় করছি এবং ঐক্যমত হতে পারব বলেই আশা করছি।

প্রশ্ন : জাতীয় সরকার কি ঘোষণা করেনি যে, জাতীয় পরিষদ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর : বাতিল করে ঠিক কাজই করা হয়েছে। যা বাতিল করা হয়েছে তা হচ্ছে সেই জাতীয় পরিষদ, কুওমিনতাঙরা যা আহ্বান করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কুওমিনতাঙের ঘোষণা অনুসারে, এর বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা থাকবে না এবং এর নির্বাচনের পদ্ধতি জনমতের সম্পূর্ণ বিরোধী। সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের সংগে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা এই ধরনের জাতীয় পরিষদের বিরোধিতা করি। আমরা যে অস্থায়ী জাতীয় পরিষদের প্রস্তাব দিয়েছি, তা এই বাতিল হওয়া জাতীয় পরিষদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই ধরনের একটি অস্থায়ী জাতীয় পরিষদের আহ্বান নিঃসন্দেহে দেশব্যাপী এক নতুন উদ্যমের সঞ্চার করবে, সরকারী কাঠামো ও সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয় পূর্ব-শর্ত হিসেবে কাজ করবে, এবং সমগ্র জনগণের সমাবেশ ঘটাতে সাহায্য করবে। এর ওপরেই প্রতিরোধ-যুদ্ধের অনুকূলে অবস্থার দিক্‌পরিবর্তন নির্ভর করছে।

সাংহাই ও তাইয়ুয়ানের পতনের পর জাপ-বিরোধী যুদ্ধের পরিস্থিতি ও কর্তব্যসমূহ

১২ই নভেম্বর, ১৯৩৭

১। বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে আংশিক প্রতিরোধ-যুদ্ধ থেকে সর্বাত্মক প্রতিরোধ-যুদ্ধে উত্তরণের পরিস্থিতি

১। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে-কোন ধরনের প্রতিরোধ-যুদ্ধকেই, এমনকি আংশিক হলেও, আমরা সমর্থন করি। কারণ আংশিক প্রতিরোধ অ-প্রতিরোধ থেকে এক ধাপ অগ্রগতি, অন্ততঃ কিছু পরিমাণে এর চরিত্র বিপ্লবী এবং মাতৃভূমি রক্ষার যুদ্ধ।

২। অবশ্য জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছাড়া শুধুমাত্র সরকারের আংশিক প্রতিরোধ অতি অবশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ কথা আমরা এর আগেই (এ বছর এপ্রিল মাসে ইয়েনানে পার্টি-কর্মীদের সভায়, মে মাসে পার্টির জাতীয় সম্মেলনে এবং আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর একটি প্রস্তাবে[১]) বলেছি। কারণ এই যুদ্ধ সম্পূর্ণ অর্থে জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ নয়, জনযুদ্ধ নয়।

৩। আমরা সমগ্র জনগণের সমাবেশ ঘটে এমন এক যুদ্ধের, সম্পূর্ণ অর্থে জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের, অর্থাৎ সর্বাত্মক প্রতিরোধের সপক্ষে। কেননা, এরকম প্রতিরোধই হচ্ছে জনযুদ্ধ, যা মাতৃভূমি রক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

৪। যদিও কুওমিনতাঙ যার পক্ষে ওকালতি করছে সেই আংশিক প্রতিরোধ-যুদ্ধও জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ এবং অন্ততঃ কিছু পরিমাণে বিপ্লবী চরিত্র-বিশিষ্ট, তবু এর বিপ্লবী চরিত্র মোটেই সম্পূর্ণ নয়।[১] আংশিক প্রতিরোধ সুনিশ্চিতভাবেই যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য, কখনই তা সাফল্যজনকভাবে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে পারে না।

৫। এখানেই নিহিত রয়েছে প্রতিরোধ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান

এই রচনাটি ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে ইয়েনানে পার্টি-কর্মীদের এক সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ প্রদত্ত একটি রিপোর্টের রূপরেখা। পার্টির দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা সঙ্গে সঙ্গেই এর বিরোধিতা করে, এবং ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ বর্ধিত সভার আগে এই দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকে মূলগতভাবে দূর করে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এবং কুওমিনতাঙের বর্তমান অবস্থানের মধ্যেকার নীতিগত পার্থক্য। যদি কমিউনিস্টরা এই নীতিগত পার্থক্য ভুলে যায়, তবে তারা প্রতিরোধ-যুদ্ধকে সঠিকভাবে পথ দেখাতে পারবে না, তারা কুওমিনতাঙের একদেশদর্শিতাকে জয় করতে সক্ষম হবে না, এবং তারা তাদের নীতি ত্যাগের দোষে অধঃপতিত হবে, তাদের পার্টিকে কুওমিনতাঙের পর্যায়ে নামিয়ে আনবে, এবং তা হবে জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের পবিত্র লক্ষ্যের বিরুদ্ধে এবং মাতৃভূমি রক্ষার বিরুদ্ধে অপরাধ।

৬। সম্পূর্ণ অর্থে জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধে—সর্বাত্মক প্রতিরোধ-যুদ্ধে—কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রস্তাবিত জাপানকে প্রতিরোধ ও জাতিকে রক্ষা করার দশ দফা কর্মসূচীকে কার্যকরী করা একান্তভাবেই প্রয়োজন, এবং তার জন্য এমন একটি সরকার ও সেনাবাহিনী দরকার, যে সরকার এবং সেনাবাহিনী এই কর্মসূচীকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করবে।

৭। সাংহাই এবং তাইয়ুয়ানের পতনের পর পরিস্থিতিটি দাঁড়িয়েছে এরকম:

(১) উত্তর চীনে যে নিয়মিত যুদ্ধের প্রধান ভূমিকা কুওমিনতাঙ নিয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং যে গেরিলাযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে, তাই এখন প্রধান হয়ে উঠেছে। কিয়াংসু এবং চেকিয়াং প্রদেশে জাপানী আগ্রাসীরা কুওমিনতাঙের যুদ্ধ-রেখা ভেদ করেছে এবং নানকিং ও ইয়াংসি উপত্যকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ কথা ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কুওমিনতাঙের এই আংশিক প্রতিরোধ বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারে না।

(২) তাদের নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের সরকার এই ইঙ্গিত দিয়েছে যে, তারা চীনকে সাহায্য করবে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের মৌখিক সহানুভূতিই শুধু পাওয়া গেছে এবং কোন-রকম বাস্তব সাহায্য পাওয়া যায়নি।

(৩) জার্মান ও ইতালীর ফ্যাসিস্টরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্যের জন্য সবকিছু করছে।

(৪) কুওমিনতাঙ তাদের এক-পার্টি একনায়কত্বের ও স্বৈরাচারী শাসনের যে-কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে এখনো পর্যন্ত অনিচ্ছুক, এবং এর মধ্য দিয়েই তারা আংশিক প্রতিরোধ করছে।

এই হচ্ছে অবস্থার একটি দিক।

অন্য দিকটি হচ্ছে এরকম :

(১) কমিউনিস্ট পার্টির এবং অষ্টম রুট বাহিনীর রাজনৈতিক প্রভাব দ্রুত দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে এবং দেশব্যাপী তাদের 'জাতির রক্ষাকর্তা' বলে প্রশংসা করা হচ্ছে। সমগ্র দেশকে রক্ষার জন্য, জাপানী আগ্রাসীদের স্তব্ধ করে দেবার জন্য এবং কেন্দ্রীয় সমতল অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিম দিকে তাদের আক্রমণে বাধা সৃষ্টির জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও অষ্টম রুট বাহিনী উত্তর চীনে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যেতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

(২) গণ-আন্দোলন আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে।

(৩) জাতীয় বুর্জোয়ারা বামপন্থীদের দিকে ঝুঁকছে।

(৪) সংস্কারকামী শক্তিগুলি কুওমিনতাঙের মধ্যে জোরদার হচ্ছে।

(৫) জাপানের বিরোধিতা করা ও চীনকে সাহায্য করার আন্দোলন বিশ্বের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

(৬) সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে বাস্তব সাহায্য দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

এই হচ্ছে অবস্থার আর একটি দিক।

৮। সুতরাং, বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে আংশিক প্রতিরোধ থেকে সর্বাত্মক প্রতিরোধে উত্তরণের পরিস্থিতি। আংশিক প্রতিরোধ যেখানে দীর্ঘ দিন টিঁকে থাকতে পারে না, সেখানে সর্বাত্মক প্রতিরোধ এখনো শুরুই হয়নি। একটি থেকে আর একটিতে উত্তরণ, এর মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান, তা বিপদের আশংকায় পূর্ণ।

৯। এই পর্যায়ে চীনের আংশিক প্রতিরোধ নীচের তিনটি দিকের মধ্যে যে-কোন একটি দিকে অগ্রসর হতে পারে :

প্রথমটা, আংশিক প্রতিরোধের অবসান এবং সর্বাত্মক প্রতিরোধ কর্তৃক এর স্থান গ্রহণ। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এটার দাবি করে, কিন্তু এ সম্বন্ধে কুওমিনতাঙ এখনো দ্বিধাগ্রস্ত।

দ্বিতীয়টা হচ্ছে, সশস্ত্র প্রতিরোধের অবসান এবং আত্মসমর্পণ কর্তৃক-এর স্থান গ্রহণ। জাপানী আগ্রাসীরা, শত্রু-সহযোগীরা এবং জাপপন্থী লোকেরা এটাই চায়, কিন্তু চীনা জনগণের অধিকাংশই এর বিরোধিতা করে।

তৃতীয়টি হচ্ছে সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং আত্মসমর্পণের সহাবস্থান। জাপানী আগ্রাসী, তাদের সহযোগী এবং জাপপন্থী লোকদের দ্বারা চীনের জাপ-বিরোধী ফ্রন্টকে ভাঙার চক্রান্তের ফলে এটি হওয়া সম্ভব, দ্বিতীয় পথটি ব্যর্থ হলেই তারা এই পথটি গ্রহণ করবে। তারা এখন এই ধরনেরই কিছু একটা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বস্তুতঃ এই বিপদ খুবই বেশি।

১০। বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করলে দেখা যাচ্ছে, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি আত্মসমর্পণবাদের গুরুত্ব বৃদ্ধির পথে বাঁধার সৃষ্টি করছে এবং এগুলিই এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলি হচ্ছে : চীনকে পদানত করার নীতিতে জাপানের অব্যাহত মনোভাব, যার ফলে যুদ্ধ করা ছাড়া চীনের আর কোন পথ থাকছে না ; কমিউনিস্ট পার্টি ও অষ্টম রুট বাহিনীর অস্তিত্ব ; চীনা জনগণের ইচ্ছা ; কুওমিনতাঙের অধিকাংশ সদস্যদের ইচ্ছা ; কুওমিনতাঙ আত্মসমর্পণ করলে তাদের স্বার্থের হানি হবে বলে ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের উদ্বেগ ; সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব এবং তার চীনকে সাহায্য করার নীতি ; সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপরে চীনা জনগণের গভীর আস্থা (যার অবশ্যই ভিত্তি আছে)। এই সমস্ত ঘটনাবলীকে উপযুক্তভাবে এবং পারস্পরিক সমন্বয়সাধন করে প্রয়োগ করতে পারলে শুধুমাত্র আত্মসর্পণবাদ এবং ভাঙনকেই যে জয় করা যাবে তা নয়, এমনকি আংশিক প্রতিরোধকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার পথের বাধাগুলোও দূর হয়ে যাবে।

১১। সুতরাং আংশিক প্রতিরোধ থেকে সর্বাত্মক প্রতিরোধে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনার জন্য চেষ্টা করাটাই হচ্ছে সমস্ত চীনা কমিউনিস্টদের, কুওমিনতাঙের সমস্ত প্রগতিশীল সদস্যদের এবং সমগ্র চীনা জনগণের আশু সাধারণ কর্তব্য।

১২। চীনের জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ বর্তমানে এক প্রচণ্ড সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এই সংকট দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, অথবা খুব তাড়াতাড়িই হয়তো এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসা যেতে পারে। আভ্যন্তরীণভাবে, নির্ধারক বিষয়গুলি হচ্ছে কমিউনিস্ট-কুওমিনতাঙ সহযোগিতা, এবং এই সহযোগিতার ভিত্তিতে এবং শ্রমিক-কৃষকজনগণের শক্তির ভিত্তিতে কুওমিনতাঙের নীতির পরিবর্তন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নির্ধারক বিষয়টি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য।

১৩। কুওমিনতাঙের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক সংস্কার প্রয়োজন এবং

সম্ভব।[২] তার প্রধান কারণ হচ্ছে জাপানী চাপ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির যুক্তফ্রন্ট নীতি, চীনা জনগণের ইচ্ছা, এবং কুওমিনতাঙের মধ্যে নতুন শক্তির বিকাশ। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সরকার ও সেনাবাহিনীর সংস্কারের ভিত্তি হিসেবে কুওমিনতাঙের সংস্কারের জন্য কাজ করা। নিঃসন্দেহে এই সংস্কার-সাধন কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সম্মতির ওপরেই নির্ভরশীল, আমরা শুধু পরামর্শই দিতে পারি।

১৪। সরকারের সংস্কারসাধন প্রয়োজন। আমরা একটি অস্থায়ী জাতীয় পরিষদ আহ্বানের প্রস্তাব দিয়েছি, যেটা এইভাবে প্রয়োজনীয় এবং সম্ভব। নিঃসন্দেহে এই সংস্কারও কুওমিনতাঙের সম্মতির ওপরেই নির্ভরশীল।

১৫। সেনাবাহিনীর সংস্কারের কাজের অর্থ হচ্ছে নতুন সেনাবাহিনী গঠন এবং পুরানো সেনাবাহিনীগুলির সংস্কারসাধন করা। যদি নতুন রাজনৈতিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত আড়াই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ লোক নিয়ে আগামী ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলা যায়, তবে জাপ-বিরোধী যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে শুরু করবে। এ ধরনের সেনাবাহিনী সমস্ত পুরানো সেনাবাহিনীগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং তাদেরকে এরই চারিপাশে জড়ো করবে। এর ফলেই সৃষ্টি হবে প্রতিরোধ-যুদ্ধে রণনীতিগত প্রতি-আক্রমণের দিক্ পরিবর্তনের সামরিক ভিত্তি। এই সংস্কারের জন্যও কুওমিনতাঙের সম্মতির প্রয়োজন। এই সংস্কার চলাকালীন পরিস্থিতিতে অষ্টম রুট বাহিনীর কাজ হবে এক দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করা। এবং অষ্টম রুট বাহিনীকেও সম্প্রসারিত করতে হবে।

২। আত্মসমর্পণবাদের বিরুদ্ধে পার্টির মধ্যে এবং দেশের সর্বত্র সংগ্রাম করতে হবে

পার্টির মধ্যে শ্রেণী-আত্মসমর্পণবাদের বিরোধিতা কর

১৬। ১৯২৭ সালে চেন তু-শিউ'র আত্মসমর্পণবাদের ফলে বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল। আমাদের পার্টির কোন সদস্যেরই এই রক্তে লেখা ঐতিহাসিক শিক্ষাকে কখনো ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।

১৭। পার্টির জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের লাইন সম্পর্কে লুকৌচিয়াও ঘটনার আগে পর্যন্ত পার্টির মধ্যে প্রধান বিপদ ছিল 'বাম' সুবিধাবাদ, অর্থাৎ, রুদ্ধদ্বারনীতি, এবং তার প্রধান কারণ ছিল এই যে, কুওমিনতাঙ

তখনো পর্যন্ত জাপানকে প্রতিরোধ করা শুরু করেনি।

১৮। লুকৌচিয়াও ঘটনার পর থেকে পার্টির মধ্যে 'বাম' রুদ্ধদ্বারনীতি আর প্রধান বিপদ নয়, বরং এখন তা হচ্ছে দক্ষিণ সুবিধাবাদ, অর্থাৎ আত্ম-সমর্পণবাদ, এবং তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, কুওমিনতাঙ প্রতিরোধ করা শুরু করেছে।

১৯। ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসে ইয়েনানে পার্টি-কর্মীদের সভায়, তারপর মে মাসে পার্টির জাতীয় সম্মেলনে, এবং বিশেষ করে আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সভায় (লোচুয়ান সভায়) আমরা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উপস্থাপিত করেছিলাম: যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সর্বহারাশ্রেণী কি বুর্জোয়াদের পরিচালিত করবে, না বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বহারাদের পরিচালিত করবে? কুওমিন-তাঙকে কি কমিউনিস্ট পার্টির দিকে টেনে আনা হবে, না কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনতাঙের দিকে ঝুঁকবে? বর্তমান পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্তব্যের দিক থেকে এই প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে: জাপানকে প্রতিরোধের জন্য এবং দেশকে বাঁচানোর জন্য কুওমিনতাঙকে কি কমিউনিস্ট পার্টি যার পক্ষে কথা বলছে সেই দশ দফা কর্মসূচীর পর্যায়ে, সর্বাত্মক প্রতিরোধের পর্যায়ে উন্নীত করা হবে? না কমিউনিস্ট পার্টি জমিদার ও বুর্জোয়াশ্রেণীর কুওমিনতাঙ একনায়কত্বের পর্যায়ে, আংশিক প্রতিরোধের পর্যায়ে অধঃপতিত হবে?

২০। কেন আমরা এই প্রশ্নটিকে এমন সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করছি? তার উত্তর হচ্ছে:

একদিকে, আমরা দেখছি চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে আপোষের প্রবণতা আছে; কুওমিনতাঙের বৈষয়িক শক্তির প্রাধান্য; কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনের সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণাসমূহ, যে-সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি কুৎসা ছড়িয়েছে ও অপমান করেছে এবং 'শ্রেণী-সংগ্রামের অবসান' ঘটাবার জন্য হৈ-চৈ করেছে, 'কমিউনিস্ট পার্টির আত্মসমর্পণে' কুওমিনতাঙের আগ্রহ এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের ব্যাপক প্রচার; কমিউনিস্ট পার্টিকে তার অধীনে রাখার জন্য চিয়াং কাই-শেকের প্রচেষ্টা; লালফৌজের ও জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি অঞ্চলের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ও দুর্বল করার কুওমিনতাঙী নীতি; জুলাই মাসে কুওমিনতাঙের লুশান প্রশিক্ষণ পাঠক্রম[৩] চলাকালীন 'প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিকে পাঁচ ভাগের দু'ভাগে কমিয়ে আনার' ষড়যন্ত্র;

কমিউনিস্ট কর্মীদেরকে খ্যাতি ও টাকা-পয়সা, মদ ও মেয়েমানুষ দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কুওমিনতাঙের প্রচেষ্টা; জনা কয়েক পেটি-বুর্জোয়া প্রগতিবাদীর (চ্যাঙ নাই-চি[৩] যার প্রতিনিধি) রাজনৈতিক আত্মসমর্পণ; ইত্যাদি।

অন্যদিকে, আমাদের কমিউনিস্টদের মধ্যে তাত্ত্বিক জ্ঞানের অসমতা; উত্তরাভিমুখী অভিযানের সময় দুই পার্টির সহযোগিতার ফলে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের বহু পার্টি-সদস্য বঞ্চিত থাকার ঘটনা; আমাদের পার্টি-সদস্যদের এক বিরাট সংখ্যকই পেটি-বুর্জোয়া বংশোদ্ভূত হবার ঘটনা. কিছু কিছু পার্টি-সদস্যদের তিক্ত সংগ্রামের কঠিন জীবন চালিয়ে যাবার প্রতি বীতরাগ; যুক্তফ্রন্টের মধ্যে কুওমিনতাঙের সঙ্গে নীতিহীন সামঞ্জস্য বিধানের ঝোঁক; অষ্টম রুট বাহিনীর মধ্যে নতুন এক ধরনের যুদ্ধবাজ মনোভাবের ঝোঁকের উদ্ভব; কুওমিনতাঙ সরকারে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণে সমস্যার উদ্ভব; জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি অঞ্চলগুলিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত সামঞ্জস্য বিধানের ঝোঁকের উদ্ভব. ইত্যাদি।

আমরা অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে এই প্রশ্ন উপস্থাপিত করব যে, কে নেতৃত্ব দেবে এবং পূর্বোক্ত সংকটময় পরিস্থিতির কারণে আমরা অবশ্যই কঠোরভাবে আত্ম-সমর্পণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

২১। বেশ কয়েক মাস ধরে, বিশেষ করে প্রতিরোধ-যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সমস্ত পর্যায়ের পার্টি-সংগঠনগুলি প্রকৃত বা সম্ভাব্য আত্মসমর্পণবাদী ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, এ সবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেছে এবং সুফল অর্জন করেছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি কমিউনিস্টদের সরকারে অংশগ্রহণের সমস্যা সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তাব[৫] প্রচার করেছে।

অষ্টম রুট বাহিনীর মধ্যে নতুন যুদ্ধবাজ ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে দেওয়া হয়েছে। লালফৌজের নতুন নামকরণের পর কিছু ব্যক্তির মধ্যে এই ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য প্রকাশ করতে তারা অনিচ্ছুক, ব্যক্তিগত বীরত্ববাদ তাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কুওমিনতাঙের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে (যেমন, অফিসার হিসেবে) তারা গর্ববোধ করছে এবং এরকম আরও অনেক কিছু। নতুন ধরনের যুদ্ধবাজ

মনোভাবের প্রতি ঝোঁকের উৎস (কমিউনিস্ট পার্টিকে কুওমিনতাঙের পর্যায়ে নামিয়ে আনা) এবং ফলাফল (জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা। আর পুরানো ধরনের যুদ্ধবাজ মনোভাবের প্রতি ঝোঁক ও ফলাফল একই রকমের, জনগণকে প্রহার ও গালাগাল করা এবং শৃংখলা প্রভৃতি না মানার মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ ঘটছে। এই ঝোঁক কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট যুক্তফ্রন্টের যুগে আত্ম-প্রকাশ করেছে, এবং সেই কারণেই এগুলি খুবই মারাত্মক এবং এর প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হবে ও দৃঢ়ভাবে এর বিরোধিতা করতে হবে। কুওমিনতাঙের হস্তক্ষেপের ফলে রাজনৈতিক কমিশারের ব্যবস্থা বিলোপ করে দেওয়া হয়েছিল এবং একই কারণে রাজনৈতিক বিভাগের নতুন নামকরণ করা হয়েছিল 'রাজনৈতিক শিক্ষার দপ্তর'। বর্তমানে এই ত্রুটিকেই আবার পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। আমরা 'আমাদের নিজেদের হাতে উদ্যোগ রেখে পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধীন গেরিলাযুদ্ধের' নীতি গ্রহণ করেছি, শক্ত হাতে তা চালিয়ে যাচ্ছি এবং এইভাবেই মূলতঃ যুদ্ধে এবং অন্যান্য কাজে অষ্টম রুট বাহিনীর সাফল্যকে সুনিশ্চিত করে তুলেছি। কুওমিনতাঙের সদস্যদের অষ্টম রুট বাহিনীর ইউনিটগুলিতে কর্মী পাঠাবার যে দাবী কুওমিনতাঙ রেখেছিল, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি এবং এইভাবে অষ্টম রুট বাহিনীর ওপর কমিউনিস্ট পার্টির নিরঙ্কুশ নেতৃত্বের নীতিতে অবিচল রয়েছি। একইভাবে আমরা বিপ্লবী জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলগুলিতে 'যুক্তফ্রন্টের মধ্যে স্বাধীনতা এবং উদ্যোগের' নীতির প্রবর্তন করেছি। আমরা 'পার্লামেণ্টবাদের'[৬] (অবশ্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্লামেণ্টবাদ নয়, তা চীনের পার্টিতে নেই) দিকে আমাদের ঝোঁককে শুধরে নিয়েছি; আমরা ডাকাত, শত্রুর গুপ্তচর এবং অন্তর্ঘাতীদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাচ্ছি।

সিয়ানে কুওমিনতাঙের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে নীতি-বিগর্হিত সমঝওতার ঝোঁক আমাদের মধ্যে উঠেছিল আমরা তা শুধরে নিয়েছি এবং নতুন করে গণ-সংগ্রাম গড়ে তুলেছি।

পূর্ব কানসুতেও আমরা মোটামুটিভাবে সিয়ানের মতোই কাজ করেছি।

সাংহাইতে আমরা চ্যাঙ নাই-চি'র 'সংগ্রামের কম আহ্বান, কিন্তু বেশি বেশি পরামর্শ দেওয়ার' লাইনের সমালোচনা করেছি এবং জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের কাজের সঙ্গে আমাদের অতিরিক্ত সামঞ্জস্য গড়ে তোলার যে ঝোঁক দেখা দিচ্ছিল, তার সংশোধন করেছি।

দক্ষিণের গেরিলা অঞ্চলগুলি হচ্ছে দশ বছর ধরে কুওমিনতাঙের সঙ্গে আমাদের রক্তাক্ত যুদ্ধের ফলে অর্জিত বিজয়ের একটি অংশ ; দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশগুলি হচ্ছে আমাদের জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতিগত শক্ত ঘাঁটি ; এই অঞ্চলগুলি থেকেই কুওমিনতাঙ আমাদের বাহিনীগুলিকে, এমনকি সিয়ান ঘটনার পরেও, তার 'পরিবেষ্টন ও দমন'-এর মাধ্যমে শেষ করে দিতে চেয়েছিল, এবং এমনকি লুকৌচিয়াও ঘটনার পরেও 'বাঘকে পাহাড় থেকে লোভ দেখিয়ে সরিয়ে আনার' নতুন পদ্ধতিকে দুর্বল করে দেবার চেষ্টা করেছিল। এইসব অঞ্চলগুলিতে আমরা বিশেষ করে দৃষ্টি দিয়েছি : (১) অবস্থা বিবেচনা না করে আমাদের বাহিনীগুলিকে কেন্দ্রীভূত করার বিরুদ্ধে সতর্কতা নেবার ব্যাপারে (যা আমাদের শক্ত ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করার জন্য কুওমিনতাঙের প্রত্যাশাকেই পূর্ণ করবে), (২) কুওমিনতাঙের নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে, এবং (৩) আর একটি হো-মিং ঘটনা ঘটার[৭] আশংকার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার (অর্থাৎ কুওমিনতাঙ কর্তৃক পরিবেষ্টিত এবং নিরস্ত্র হওয়ার বিপদ) ব্যাপারে।

লিবারেশন উইকলির[৮] প্রতি আমাদের যুক্তিসঙ্গত ও গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।

২২। সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার জন্য এবং আংশিক প্রতিরোধকে সর্বাত্মক প্রতিরোধে পরিবর্তিত করার জন্য জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের প্রতি অবিচল থাকা এবং এই ফ্রণ্টকে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। কুওমিনতাঙ কমিউনিস্ট যুক্তফ্রণ্টে বিভেদ সৃষ্টিকারী কোন মনোভাবকেই সহ্য করা হবে না। আমাদের এখনো 'বাম' রুদ্ধদ্বারনীতির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু একই সময়ে আমরা যুক্তফ্রণ্টের যাবতীয় কাজে স্বাধীনতা ও উদ্যোগ গ্রহণের নীতির প্রতি একান্ত অবিচল থাকব। কুওমিনতাঙ এবং অন্যান্য পার্টিগুলির সঙ্গে আমাদের যুক্তফ্রণ্ট একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীকে কাজে রূপায়িত করার ভিত্তিতে গঠিত। এই ভিত্তি ছাড়া কোন যুক্তফ্রণ্টই হতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে সহযোগিতা হবে নীতি-বিগর্হিত এবং আত্মসমর্পণবাদেরই প্রকাশ। সুতরাং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুদ্ধকে বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চাবিকাঠি হচ্ছে 'যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে স্বাধীনতা ও উদ্যোগের' নীতিকে ব্যাখ্যা করা, একে প্রয়োগ করা এবং ঊর্ধ্বে তুলে ধরা।

২৩। এ সবকিছুর পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য কি? এক হিসেবে, যেসব জায়গা আমরা ইতিমধ্যেই দখল করেছি সেগুলি আমাদের দখলে রাখা, কারণ এই জায়গাগুলি হচ্ছে আমাদের রণনীতিগত পা-রাখার জায়গা, যেখান থেকে আমরা চলতে শুরু করব; আর এগুলো হারানোর অর্থ হচ্ছে সবকিছুই হারানো। কিন্তু আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ইতিমধ্যেই আমরা যেসব জায়গা জয় করেছি তার বিস্তৃতি ঘটানো এবং 'জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের জন্য এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার জন্য লক্ষ লক্ষ জনগণকে দলে টানার' ইতিবাচক উদ্দেশ্যটিকে কার্যকরী করা। আমাদের স্থান দখলে রাখা এবং তার বিস্তৃতি ঘটানো -এই দুটোই অবিচ্ছিন্ন। বিগত কয়েক মাসে পেটি-বুর্জোয়াদের বহু বামপন্থী সদস্য আমাদের প্রস্তাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, কুওমিনতাঙ শিবিরে নতুন শক্তির বিকাশ ঘটেছে, শানসীতে গণ-সংগ্রাম গড়ে উঠেছে, এবং বহু জায়গায় আমাদের পার্টির সংগঠন বিস্তারলাভ করেছে।

২৪। কিন্তু এ কথা আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে, সাধারণভাবে বলতে গেলে, সমস্ত দেশে আমাদের পার্টির সাংগঠনিক শক্তি এখনো খুবই সামান্য। সামগ্রিকভাবে দেশে ব্যাপক জনগণের শক্তিও অত্যন্ত কম, কারণ সমগ্র দেশের জনগণের শক্তির মূল অংশ শ্রমিক-কৃষক এখনো পযন্ত সংগঠিত নয়। এসবের জন্য দায়ী একদিকে কুওমিনতাঙের দমন ও নিপীড়নের নীতি এবং অন্যদিকে আমাদের কাজের অপ্রতুলতা, বা এমনকি এর সম্পূর্ণ অভাবও। বর্তমান জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধে এটিই হচ্ছে আমাদের পার্টির মৌলিক দুর্বলতা। আমরা এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করা যাবে না। এই লক্ষ্যের দিকে তাকিয়েই আমরা 'যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে স্বাধীনতা ও উদ্যোগের নীতি' প্রয়োগ করব এবং আত্মসমর্পণবাদ অথবা অতিরিক্ত সামঞ্জস্য সাধনের সমস্ত রকমের ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

সামগ্রিকভাবে দেশে আত্মসমর্পণবাদের বিরোধিতা কর

২৫। উপরের অংশে শ্রেণী-আত্মসমর্পণবাদ সম্পর্কে বলা হল। এই ঝোঁকগুলি সর্বহারাশ্রেণীকে বুর্জোয়া সংস্কারবাদ এবং শেষপর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে না যাওয়ার বুর্জোয়াসুলভ মনোভাবের সঙ্গে বোঝাপড়ার দিকে নিয়ে যাবে। যদি আমরা এটা কাটিয়ে উঠতে না পারি, তবে আমরা জাপ-বিরোধী জাতীয়

বিপ্লবী যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না, আংশিক প্রতিরোধকে সর্বাত্মক প্রতিরোধে পরিণত করতে পারব না, এবং মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে পারব না।

কিন্তু আর একধরনের আত্মসমর্পণবাদ—জাতীয় আত্মসমর্পণবাদ—আছে, যে আত্মসমর্পণবাদ চীনকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সঙ্গে বোঝাপড়ার দিকে নিয়ে যাবে, চীনকে জাপানের উপনিবেশে পরিণত করবে, এবং চীনা জনগণকে ঔপনিবেশিক ক্রীতদাসে পরিণত করবে। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে বর্তমানে এই ঝোঁক দেখা দিয়েছে।

২৬। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের বামপন্থীরা হচ্ছেন কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণ, যার মধ্যে আছেন শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়ারা। আমাদের কাজ হচ্ছে এই অংশটিকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। এই কর্তব্য পালন করাটাই হবে কুওমিনতাঙের, সরকারের এবং সেনাবাহিনীর সংস্কারসাধনের জন্য, একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য, আংশিক প্রতিরোধকে সর্বাত্মক প্রতিরোধে পরিণত করার জন্য এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদসাধনের জন্য একটি মৌলিক পূর্বশর্ত।

২৭। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের মধ্যবর্তী অংশ গঠিত হয়েছে জাতীয় বুর্জোয়া এবং পেটি-বুর্জোয়াদের উচ্চস্তরকে নিয়ে। সাংহাই-এর প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলি যাদের মুখপত্র, তারা এখন বামদিকে ঝুঁকেছে,[৯] আবার ফু সিং সমিতির কিছু সদস্য দোদুল্যমান হতে শুরু করেছে এবং সি. সি. চক্রের কিছু কিছু সদস্যও দোদুল্যমানতা দেখাচ্ছে।[১০] যেসব সেনাবাহিনী জাপানকে প্রতিরোধ করছে, তারা কঠোর শিক্ষালাভ করেছে, কেউ কেউ সংস্কার প্রবর্তন শুরু করে দিয়েছে, কেউ-বা তার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের কাজ হচ্ছে মধ্যবর্তী অংশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং তার অবস্থান পরিবর্তনে সাহায্য করা।

২৮। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের দক্ষিণপন্থী অংশ হচ্ছে বড় বড় জমিদার এবং বৃহৎ বুর্জোয়ারা, এবং এরাই হচ্ছে জাতীয় আত্মসমর্পণবাদের মূল স্নায়ুকেন্দ্র। এইসব লোকের আত্মসমর্পণবাদের দিকে ঝুঁকে পড়াটা অবধারিত, কারণ তারা যুদ্ধে তাদের ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং জনগণ জেগে উঠবে—এই দুটোকেই ভয় করে। তাদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যেই শত্রুর সহযোগিতা করছে, অনেকেই ইতিমধ্যে জাপপন্থী হয়ে গেছে বা হওয়ার জন্য

প্রস্তুত হচ্ছে, অনেকে দোদুল্যমান হয়ে পড়েছে, এবং কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তি, বিশেষ অবস্থার জন্য, দৃঢ় জাপ-বিরোধী হয়ে আছে। কিছু লোক বাধ্য হয়ে খুব অল্প সময়ের জন্য একান্ত অনিচ্ছায় জাতীয় যুক্তফ্রন্টে যোগ দিয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এদের এ থেকে ভেঙে চলে যাবার খুব একটা দেরী নেই। বস্তুতঃ বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা ঠিক এই মুহূর্তেই জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভাঙনের চক্রান্ত করছে। 'কমিউনিস্টরা অভ্যুত্থান করানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে', 'অষ্টম রুট বাহিনী পিছু হঠছে' ইত্যাদি নানারকম গালগল্প ও গুজব তারা তৈরী করছে এবং সুনিশ্চিত-ভাবেই প্রতিদিন এগুলি বহুগুণে বেড়েই চলবে। আমাদের কাজ হচ্ছে সুদৃঢ়-ভাবে জাতীয় আত্মসমর্পণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, এবং এই সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বামপন্থী অংশকে সুসংহত ও সম্প্রসারিত করা এবং এই মধ্যবর্তী অংশকে এগিয়ে যেতে ও তাদের অবস্থানের পরিবর্তনে সাহায্য করা।

শ্রেণী-আত্মসমর্পণবাদ ও জাতীয় আত্মসমর্পণবাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

২৯। জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধে শ্রেণী-আত্মসমর্পণবাদ হচ্ছে আসলে জাতীয় আত্মসমর্পণবাদের সংরক্ষিত শক্তি। এ হচ্ছে এমন একটা জঘন্য ঝোঁক, যা দক্ষিণপন্থী শিবিরকে সমর্থন জোগায় এবং যুদ্ধে পরাজয়কে ডেকে আনে। কমিউনিস্ট পার্টি এবং সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, এবং জাতীয় আত্মসমর্পণ-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শক্তিশালী করার জন্য, চীনা জাতির মুক্তি অর্জনের জন্য এবং শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির জন্য এই সংগ্রামকে আমাদের সকল রকম কাজের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে যেতে হবে।

টীকা

১। ১৯৩৭ সালের ২৫শে আগস্ট তারিখে উত্তর শেনসির লোচুয়ানে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সভায় গৃহীত 'বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদের কর্তব্য' শীর্ষক প্রস্তাবের কথা এখানে বলা হচ্ছে। প্রস্তাবটির পূর্ণ বয়ান এরকম :

(১) জাপানী আগ্রাসীদের লুকৌচিয়াওতে সামরিক উস্কানি এবং তাদের দ্বারা পিপিং ও তিয়েনসিন অধিকার হচ্ছে চীনা প্রাচীরের দক্ষিণে চীনের ওপর বিরাট আক্রমণ আরম্ভের সূচনা। তারা ইতিমধ্যেই যুদ্ধের জন্য জাতীয় সমাবেশ শুরু করে দিয়েছে। 'পরিস্থিতি জটিল করার কোন ইচ্ছা নেই' বলে তাদের প্রচার আরও আক্রমণের জন্য ধূম্রজাল সৃষ্টি মাত্র।

(২) জাপানী আগ্রাসীদের আক্রমণের এবং চীনা জনগণের বিক্ষোভের চাপে নানকিং সরকার যুদ্ধ করার জন্য মনস্থির করতে শুরু করেছেন, প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা এবং কোন কোন স্থানে প্রকৃত প্রতিরোধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। চীন এবং জাপানের মধ্যে সামগ্রিক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ৭ই জুলাই তারিখে সংঘটিত লুকৌচিয়াও ঘটনা চীনের জাতীয় প্রতিরোধ-যুদ্ধের সূচনা করেছে।

(৩) সুতরাং চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রকৃত প্রতিরোধের এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছে, প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতির স্তরের অবসান হয়েছে। বর্তমান স্তরে কেন্দ্রীয় কর্তব্য হচ্ছে জাতির সমস্ত শক্তিকে প্রতিরোধ-যুদ্ধে জয়ের জন্য সমাবিষ্ট করা। কুওমিনতাঙের অনিচ্ছার জন্য এবং জনগণকে যথেষ্ট সমাবিষ্ট না করার দরুণ আগের স্তরে যে গণতন্ত্রের বিজয়ের কাজটি সম্পন্ন করা হয়নি, প্রতিরোধ-যুদ্ধের জয়ের মধ্য দিয়ে সে-কাজকে অতি অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে।

(৪) এই নতুন স্তরে জাপানকে প্রতিরোধ করতে হবে কিনা এ বিষয়টি নিয়ে কুওমিনতাঙ এবং অন্যান্য জাপ-বিরোধী গ্রুপগুলির সঙ্গে আমাদের এখন আর কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু কিভাবে বিজয়লাভ করতে হবে তা নিয়ে পার্থক্য ও মতবিরোধ আছে।

(৫) যে প্রতিরোধ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে তাকে সমগ্র জাতির সামগ্রিক প্রতিরোধে পরিণত করার মধ্যেই এখন নিহিত রয়েছে বিজয়ের চাবিকাঠি। কেবলমাত্র সর্বাত্মক প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা যেতে পারে। আমাদের পার্টি-প্রস্তাবিত জাপানকে প্রতিরোধ ও জাতিকে বাঁচাবার যে দশ দফা সম্বলিত কর্মসূচীটি বর্তমানে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাই সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের পথ নির্দিষ্ট করছে।

(৬) প্রতিরোধের বর্তমান স্তরে প্রচণ্ড বিপদের আশংকা রয়েছে। এই বিপদের প্রধান কারণ হচ্ছে কুওমিনতাঙ এখনো পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য সমগ্র জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে ইচ্ছুক নয়। এর পরিবর্তে তারা মনে করে যে, যুদ্ধ হচ্ছে কেবলমাত্র সরকারেরই ব্যাপার, এবং প্রতিটি পর্যায়ে যুদ্ধে জনগণের অংশগ্রহণকে তারা ভয় করে ও তার পথে বাধা সৃষ্টি করে, সরকার ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়, জাপ-প্রতিরোধে এবং জাতিকে বাঁচানোর জন্য জনগণকে গণ-তান্ত্রিক অধিকার দিতে অস্বীকার করে, সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের সম্পূর্ণ সংস্কারসাধনে অস্বীকার করে এবং সরকারকে সমগ্র জাতির প্রতিরক্ষা-সরকারে পর্যবসিত করতে অস্বীকার করে। এই ধরনের প্রতিরোধ হয়তো আংশিকভাবে জয়লাভ করতে পারে, কিন্তু কখনই তা চূড়ান্ত জয়লাভ করতে পারে না। তা বরং মারাত্মক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।

(৭) প্রতিরোধ-যুদ্ধে প্রচণ্ড দুর্বলতা থাকার জন্য অনেক বিপর্যয়, পশ্চাদ-পসরণ, আভ্যন্তরীণ ভাঙন, বিশ্বাসঘাতকতা, সাময়িক এবং আংশিক আপোষ এবং অন্যান্য বিপর্যয় হতে পারে। সুতরাং এ কথা বোঝা উচিত যে, এই যুদ্ধ একটি কঠোর এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হবে। কিন্তু এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে যে, আমাদের পার্টি এবং সমগ্র জনগণের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে প্রতিরোধ শুরু হয়েছে তা সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে চূর্ণ করে দিয়ে বিকাশলাভ করবে ও এগিয়ে যেতে থাকবে। সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকেই আমাদের জয় করতে হবে এবং বিজয়লাভের জন্য আমাদের পার্টি প্রস্তাবিত দশ দফা কর্মসূচীকে রূপায়িত করার জন্য আমরা দৃঢ় সংগ্রাম চালিয়ে যাব। এই কর্মসূচীর বিরোধী সমস্ত ভুল নীতিগুলির আমরা দৃঢ়তা সহকারে বিরোধিতা করব এবং এর ফলে উদ্ভূত জাতীয় পরাজয়বাদ এবং নৈরাশ্য-বাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

(৮) জনগণের এবং পার্টি-নেতৃত্বের অধীন সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে একত্র হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যবৃন্দ সংগ্রামের পুরোভাগে এসে সক্রিয়ভাবে দাঁড়াবেন, জাতির প্রতিরোধের মূলকেন্দ্র হয়ে উঠবেন এবং জাপ-বিরোধী গণ-আন্দোলন বিকাশের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যও কাজে শিথিল হবেন না বা জনগণের মধ্যে প্রচার করতে, তাদের সংগঠিত করতে ও সশস্ত্র করতে কোন সুযোগই হারাবেন না। যদি জনগণ

লাখে লাখে সত্যসত্যই জাতীয় যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হন, তবেই প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয়লাভ সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে।

২। প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে কুওমিনতাঙ এবং চিয়াং কাই-শেক জনগণের চাপে বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তনের অনেক বক্তৃতা দেন, কিন্তু অতি দ্রুত সেসব প্রতিজ্ঞা একটার পর একটা ভঙ্গ করেন। সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কুওমিনতাঙ যদি সংস্কারগুলি প্রবর্তন করত, তাহলে জাতির মধ্যে যে সম্ভাবনার সৃষ্টি হতো, তা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠেনি। মাও সে-তুঙ পরবর্তী সময়ে 'কোয়ালিশন সরকার প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে বলেছেন:

> কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য গণতন্ত্রীসহ সমগ্র জনগণ একান্তভাবে আশা করেছিল যে, যে সময়ে সমস্ত জাতি একটা সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়েছে এবং যখন জনগণ উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর, তখন কুওমিনতাঙ সরকার এই সুযোগ গ্রহণ করে গণতান্ত্রিক সংস্কারসমূহ প্রবর্তন করবে এবং ডঃ সান ইয়াৎ-সেন-এর বিপ্লবী তিন গণ-নীতিকে কার্যকরী করবে, কিন্তু তাদের আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে (মাও সে-তুঙের 'নির্বাচিত রচনাবলী', ৩য় খণ্ড, ইং সং)।

৩। চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক কিয়াংসি প্রদেশের লুসানে 'লুসান প্রশিক্ষণ শিক্ষাসূচী' স্থাপিত হয়। প্রশাসনে প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্র গঠন করার জন্য কুওমিনতাঙ পার্টি এবং সরকারের উচ্চ ও মধ্য পদস্থ অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্যই এটি করা হয়।

৪। চ্যাঙ নাই-চি ঐ সময় 'সংগ্রামের কম আহ্বান এবং বেশি পরামর্শ প্রদান'-এর পক্ষে ওকালতি করছিলেন। যখন কুওমিনতাঙ নিপীড়নের নীতি অনুসরণ করছিল, তখন তার কাছে কেবলমাত্র 'পরামর্শ' পাঠানো ছিল একেবারেই অর্থহীন। কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য সরাসরি জনগণকে আহ্বান জানানোই উচিত ছিল। অন্যথায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠতো বা কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধও অসম্ভব হতো। চ্যাঙ নাই-চি এই ব্যাপারে ভুল করেছিলেন এবং ক্রমশঃ তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন।

৫। 'কমিউনিস্ট পার্টির সরকারে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির খসড়া প্রস্তাবটি' প্রসঙ্গে এখানে বলা হয়েছে।

১৯৩৭-এর ২৫শে সেপ্টেম্বরে প্রস্তাবটি রচিত হয়েছিল। পূর্ণ বয়ানটি নিম্নরূপ :

(১) জাপ-বিরোধী যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতিতে সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্বমূলক একটি যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠনের জরুরী প্রয়োজন রয়েছে, কারণ কেবলমাত্র এরকম একটি সরকারই জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ সুচারুরূপে পরিচালনা করতে পারে এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে পারে। কমিউনিস্ট পার্টি এরকম সরকারে অংশগ্রহণে প্রস্তুত অর্থাৎ সরাসরি ও আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণে এবং এর মধ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালনে প্রস্তুত। কিন্তু এরকম একটি সরকার এখনো গড়ে ওঠেনি। আজ যে সরকার আছে তা এখনো কুওমিনতাঙের এক-পার্টি একনায়কত্বের সরকার।

(২) চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তখনই সরকারে অংশগ্রহণ করতে পারে, যখন সেই সরকার কুওমিনতাঙের এক-পার্টি একনায়কত্ব থেকে সমগ্র জাতির যুক্তফ্রণ্ট সরকারে পরিণত হবে, অর্থাৎ যখন বর্তমান কুওমিনতাঙ সরকার (ক) আমাদের পার্টি-প্রস্তাবিত জাপ-প্রতিরোধ ও জাতিকে রক্ষার দশ দফা কর্মসূচীর মূল বিষয়গুলি গ্রহণ করবে এবং তদনুযায়ী প্রশাসনিক কর্মসূচী প্রণয়ন করবে; (খ) কাজের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দেখাতে শুরু করবে ও সুনির্দিষ্ট ফল অর্জন করবে; এবং (গ) কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনগুলির আইনানুগ অস্তিত্বকে মেনে নেবে এবং জনগণকে সমাবিষ্ট, সংগঠিত ও শিক্ষিত করে তোলার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেবে।

(৩) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যগণ সাধারণভাবে কোন স্থানীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় সরকারের প্রশাসন-যন্ত্রের সংশ্লিষ্ট কোন কাউন্সিল বা কমিটিতে অংশগ্রহণ করবেন না। কারণ এরকম অংশগ্রহণ করলে কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ বিশেষ পার্থক্যের দিকগুলির বিলুপ্তি ঘটবে, কুওমিনতাঙের একনায়কত্বকে টিকিয়ে রাখা হবে এবং সাহায্যের চাইতে বরং ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রচেষ্টাকেই তা ব্যাহত করবে।

(৪) তবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যগণ কোন কোন বিশেষ অঞ্চলের—

যেমন যুদ্ধাঞ্চলের—আঞ্চলিক সরকারে অংশগ্রহণ করতে পারে, যেখানে পুরানো কর্তৃপক্ষ আগের মতো শাসন করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে দেখে মোটামুটিভাবে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি কার্যকরী করতে ইচ্ছুক, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে পারে এবং যেখানে বর্তমান জরুরী পরিস্থিতির জন্য জনগণ এবং সরকার এই উভয়ের মতেই কমিউনিস্ট-দের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। জাপ-অধিকৃত অঞ্চলে এ কথা আরও বেশি প্রযোজ্য, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টিকেই জাপ-বিরোধী সরকার গঠনে খোলাখুলিভাবে এগিয়ে আসা উচিত হবে।

(৫) কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারে যোগ দেবার আগে পর্যন্ত সদস্যদের নীতিগতভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাসমূহে, যেমন নিখিল-চীন জাতীয় পরিষদে, একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান এবং জাতিকে বাঁচানোর নীতি আলোচনার উদ্দেশ্যে যোগ দেওয়া চলবে। সুতরাং এইসব পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে চেষ্টা করতে হবে, এগুলিকে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের বক্তব্যস্থল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে এবং এইভাবে জনগণকে সমাবিষ্ট করে পার্টির পতাকাতলে জড়ো করতে হবে ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

(৬) একটি সুনির্দিষ্ট সাধারণ কর্মসূচী এবং নিরঙ্কুশ সমতার নীতি সমেত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বা তার স্থানীয় শাখাসমূহ কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সঙ্গে, বা তার স্থানীয় সদর দপ্তরের সঙ্গে, বিভিন্ন যুক্ত কমিটি (যেমন, জাতীয় বিপ্লবী লীগ, গণ-আন্দোলনের জন্য কমিটি, যুদ্ধাঞ্চলে সমাবেশের জন্য কমিটি ইত্যাদি) গঠনে যুক্তফ্রন্ট সংগঠন করতে পারে এবং এসব যুক্ত কাজের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির কুওমিনতাঙের সঙ্গে সহযোগিতা অর্জন করা উচিত হবে।

(৭) জাতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনীর অংশ হিসেবে লালফৌজের নতুন নামকরণের পর এবং লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার যন্ত্রগুলিকে বিশেষ অঞ্চলের সরকারে পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে যে আইনানুগ অধিকার তারা অর্জন করেছে, তার শক্তিতেই তাদের প্রতিনিধিরা সমস্ত সামরিক এবং গণ-সংগঠনে যোগদান করতে পারে, যার ফলে জাপানকে প্রতিরোধ এবং জাতিকে বাঁচানোর কাজ আরও এগিয়ে যাবে।

(৮) যেসব স্থানে প্রথমে লালফৌজ এবং গেরিলা ইউনিট ছিল, সেসব স্থানে নিরঙ্কুশ স্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি-নেতৃত্ব রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন, এবং এই নীতিগত ব্যাপারে কমিউনিস্টরা অবশ্যই এতটুকুও দোদুল্যমানতা দেখাবেন না।

৬। এখানে 'পার্লামেন্টবাদ' বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হল: কিছু পার্টি কমরেড বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবস্থার, জনগণের প্রতিনিধির সম্মেলনের ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন।

৭। জাপ-বিরোধী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে হো মিং ঘটনাটি ঘটে। ১৯৩৪-এর অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় লালফৌজ যখন উত্তরদিকে সরে যায় তখন লালফৌজের গেরিলাবাহিনী পশ্চাদ্দেশে থেকে যায় এবং প্রচণ্ড অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে আটটি দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশের কিয়াংসি, ফুকিয়েন, কোয়াংতুং, হুনান, হুপে, হোনান, চেকিয়াং এবং আনহুই প্রভৃতি চোদ্দটি অঞ্চলে গেরিলা-যুদ্ধ চালিয়ে যায়। জাপ-বিরোধী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশানুযায়ী এই ইউনিটগুলি গৃহযুদ্ধের অবসানের জন্য কুওমিনতাঙের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালায় এবং ইউনিটগুলিকে একটি বাহিনীতে (নয়া চতুর্থ সেনাবাহিনী, যারা পরবর্তীকালে ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ ও উত্তর তীরে জাপানীদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেছিল) সংগঠিত করে, এবং জাপানকে প্রতিরোধের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। কিন্তু চিয়াং কাই-শেক এই আলাপ-আলোচনার সুযোগ নিয়ে এই গেরিলা ইউনিটগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার এক চক্রান্ত করে। হো মিং ছিলেন ফুকিয়েন-কোয়াংতুং সীমান্ত অঞ্চলের একটি গেরিলা ইউনিটের নেতা, এবং এই অঞ্চলটি ছিল চোদ্দটি গেরিলা অঞ্চলের একটি। হো চিয়াং কাই-শেকের চক্রান্ত সম্বন্ধে সাবধান ছিলেন না এবং ফলে তাঁর অধীনস্থ এক হাজারেরও বেশি গেরিলা একস্থানে সমাবিষ্ট হওয়ার পর কুওমিনতাঙ বাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং তাদের নিরস্ত্র করা হয়।

৮। ইয়েনান-এ ১৯৩৭-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 'লিবারেশন উইকলি' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র। ১৯৪১-এ এই পত্রিকাটির পরিবর্তে 'লিবারেশন ডেইলী' দৈনিক প্রকাশিত হয়।

৯। এরা ছিল জাতীয় বুর্জোয়াদের সেই অংশ, সাংহাইয়ের 'শেন পাও' জাতীয় পত্রিকা যাদের মতামত ব্যক্ত করার মাধ্যম হয়েছিল।

১০। ফু সিং সোসাইটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটি চক্র—কুওমিনতাঙের মধ্যে এই ফ্যাসিস্ট সংগঠন দুটি যথাক্রমে চিয়াং কাই-শেক এবং চেন লি-ফুর নেতৃত্বে পরিচালিত হতো। তারা বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের শাসন-ব্যবস্থার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত। কিন্তু বহু পেটি-বুর্জোয়া তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল বা যোগদানের জন্য তাদের প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। প্রধানতঃ কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীর নিম্ন ও মধ্য পদস্থ অফিসার যারা ফু সিং সোসাইটিতে ছিল, তাদের সম্বন্ধেই এখানে বলা হয়েছে, এবং কেন্দ্রীয় চক্রের যেসব সদস্যবৃন্দ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল না তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

শেনসী-কাংসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সরকার এবং অষ্টম রুট বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগস্থ সদর দপ্তরের ঘোষণা

১৫ই মে, ১৯৩৮

এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে : লুকৌচিয়াও ঘটনার পর থেকে আমাদের সমস্ত স্বদেশপ্রেমিক দেশবাসিগণ দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অফিসার ও সৈন্যরা রক্ত ঝরাচ্ছেন, জীবন বিসর্জন দিচ্ছেন। সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গ্রুপগুলি সৎ বিশ্বাস নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। দেশ রক্ষার কাজে জনগণের সমস্ত অংশের লোকেরা হাতে হাত লাগিয়েছেন। এটা চীনা জাতির এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিক্‌নির্দেশ করছে এবং জাপানের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের দৃঢ় নিশ্চিতি তুলে ধরছে। আমাদের সমস্ত দেশবাসীকে অবশ্যই এই অগ্রগতির পথ ধরেই এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের শেনসী-কাংসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের[1] জনগণ ও সেনাবাহিনী সরকারের নেতৃত্ব অনুসরণ করেছেন এবং জাতীয় মুক্তির স্বার্থে সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা যা করেছেন তা সবই ন্যায়সংগত ও সম্মানজনক। কঠোর দুঃখকষ্টের মধ্যেও তাঁরা নিরলসভাবে ও বিনা প্রতিবাদে সংগ্রাম করেছেন। দেশব্যাপী সমস্ত জনগণ একবাক্যে তাঁদের প্রশংসা করেছেন। সীমান্ত অঞ্চলের সরকার এবং পশ্চাদ্ভাগের সামরিক সদর-দপ্তর ঘোষণা করেছেন, তাঁরা সমগ্র অঞ্চলের জনগণকে শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন। কর্তব্যে কাউকে অবহেলা করতে দেওয়া হবে না এবং জাতীয় মুক্তির উদ্দেশ্যকে ক্ষতি-সাধন করার মতো কোন কিছুও কাউকে করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু

শেনসী-কাংসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সরকার এবং অষ্টম রুট বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগস্থ সদর দপ্তরের জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ এই ঘোষণাটি লিখেছিলেন চিয়াং কাই-শেক চক্রের বিভেদমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে। কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুদিন পরেই চিয়াং কাই-শেক চক্র কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে বিভেদের চক্রান্ত শুরু করে। শেনসী-কাংসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে ভাঙন ধরানোটা ছিল এই চক্রান্তেরই একটি অংশ। বিপ্লবের স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা দরকার বলে কমরেড মাও সে-তুঙ মত প্রকাশ করেছিলেন। এই ঘোষণা জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের মধ্যে চিয়াং চক্রের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছু পার্টি-সদস্যের সুবিধাবাদী অবস্থানকে আঘাত হেনেছিল।

সীমান্ত অঞ্চলে সাম্প্রতিক তদন্তে এ কথা ধরা পড়েছে যে জনস্বার্থের প্রতি অবহেলা দেখিয়ে কিছু লোক যেসব ঘর-বাড়ি ও জমি-জমা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল তা ফিরিয়ে দেবার জন্য বিভিন্নভাবে কৃষকদের ওপর জবরদস্তি করছে, পুরানো বাতিল ঋণ[২] শোধ দেওয়ার জন্য দেনাদারদের বাধ্য করা হচ্ছে, যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে তার পরিবর্তন সাধন করার জন্য জনগণের ওপর বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে, বা সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং গণসংগঠনগুলি ভেঙে ফেলার জন্য জনগণকে বাধ্য করা হচ্ছে। এদের মধ্যে কিছু কিছু লোক গুপ্তচর হিসেবে কাজ করছে, ডাকাতদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে, আমাদের সৈন্যদেরকে বিদ্রোহ করার জন্য উত্তেজিত করছে, আমাদের অঞ্চলে জরিপ করছে ও মানচিত্র তৈরী করছে, গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করছে অথবা সীমান্ত অঞ্চলের সরকারের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবেই প্রচার করছে। স্পষ্টতঃই এ সমস্ত কার্যকলাপ জাপ-প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ঐক্যের মূল নীতির বিরোধী, সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের ইচ্ছার বিরোধী, এবং এসব করা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ বাদ-বিসম্বাদ উস্‌কিয়ে দেওয়ার জন্য, যুক্তফ্রন্টকে ভাঙার জন্য, জনগণের স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য, সীমান্ত অঞ্চলের সরকারের মর্যাদাহানি করার জন্য এবং জাপানের বিরুদ্ধে লোক সংগ্রহে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। এর কারণ হচ্ছে মুষ্টিমেয় গোঁড়া লোক জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে জঘন্য আচার-আচরণ করছে। এমনকি কিছু লোক জাপানী আগ্রাসীদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে এবং তাদের চক্রান্তমূলক কার্যকলাপকে গোপন রাখার জন্য বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করছে। বেশ কয়েকমাস ধরে জেলাগুলি থেকে প্রতিদিন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ক্রমাগত অসংখ্য রিপোর্ট আসছে, এবং এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। জাপ-বিরোধী শক্তিগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য, জাপানের বিরুদ্ধে পশ্চাদ্ভাগকে সংহত করার জন্য এবং জনগণের স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্য পশ্চাদ্ভাগস্থ সামরিক সদর দপ্তর এবং সরকার এইসব কার্যকলাপকে বে-আইনী ঘোষণা করা অপরিহার্য বলে মনে করে। তদনুযায়ী আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছি :

(১) জনগণ ইতিমধ্যেই যেসব অধিকার অর্জন করেছেন, তা রক্ষা করার জন্য সরকার এবং পশ্চাদ্ভাগের সামরিক সদর দপ্তর আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে সীমান্ত অঞ্চলের সরকারের অধীনস্থ ঘর-বাড়ি বা জমিজমা

বিতরণের বা ঋণ বাতিলের ব্যাপারে যা করা হয়েছে, তার কোনওরকম বে-আইনী পরিবর্তন সাধনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করছে।

(২) সরকার এবং পশ্চাদ্ভাগস্থ সামরিক সদর দপ্তর যেসব সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং গণ-সংগঠন আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠার সময় বর্তমান ছিল এবং বর্তমানে যুক্তফ্রণ্টের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে যেসব সংগঠন সম্প্রসারিত হয়েছে, সরকার এবং পশ্চাদ্ভাগস্থ সামরিক সদর দপ্তর সেগুলির উন্নতিসাধন করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত চক্রান্ত এবং নাশকতামূলক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেবে।

(৩) সরকার এবং পশ্চাদ্ভাগস্থ সামরিক সদর দপ্তর সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং জাতীয় পুনর্গঠন সুদৃঢ়ভাবে চালিয়ে যাবে এবং জাপানের প্রতিরোধে ও জাতীয় শক্তির লক্ষ্য সাধনে সানন্দে যে-কোন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ ও তাকে শক্তিশালী করবে। আমরা প্রতিটি স্থান থেকে জনগণের আন্তরিক সাহায্য আহ্বান করছি। কিন্তু প্রবঞ্চকদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্য ও বিশ্বাসঘাতক-দের দূরে রাখার জন্য যে-কোন কাজে যে-কোন লোকের সরকার এবং পশ্চাদ্ভাগস্থ সামরিক সদর দপ্তরের অনুমতি ছাড়া এবং তাদের লিখিত অনুমোদনপত্র ছাড়া সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ এবং অবস্থানের ওপর আমরা নিষেধাজ্ঞা জারী করছি।

(৪) সশস্ত্র প্রতিরোধের এই উত্তেজনাময় সময়ে সীমান্ত অঞ্চলের সীমানার মধ্যে যারা নাশকতার চেষ্টা করবে, অন্তর্ঘাতী কাজে লিপ্ত থেকে বিদ্রোহের উত্তেজনা সৃষ্টি করবে এবং সামরিক গুপ্ত তথ্য ফাঁস করবে, তাদের খবরাখবর সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার অধিকার জনগণের সঠিক ও সঙ্গতভাবেই থাকছে।

সীমান্ত অঞ্চলের সশস্ত্র বাহিনীর সমস্ত লোক ও সমস্ত নাগরিককেই এই চারটি বিঘোষিত নির্দেশ মেনে চলতে হবে এবং এর কোনরকম লঙ্ঘন বরদাস্ত করা হবে না। এখন থেকে যদি কোন বে-আইনী ব্যক্তি নাশকতামূলক কাজ করতে দুঃসাহসী হয়, তবে সীমান্ত অঞ্চলের সরকার ও পশ্চাদ্ভাগস্থ সামরিক সদর দপ্তর এই নির্দেশের প্রতিটি ধারা কার্যকরী করবে এবং এই নির্দেশ না জানার কোন অজুহাতই গ্রাহ্য হবে না।

আইনের সমস্ত শক্তি দিয়েই এই ঘোষণা প্রচার করা হচ্ছে।

টীকা

১। শেনসী-কাংসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল ছিল বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা, ১৯৩১ সালের পর বিপ্লবী গেরিলাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে উত্তর শেনসীতে ক্রমান্বয়ে এটি গড়ে ওঠে। লং মার্চের পর কেন্দ্রীয় লালফৌজ উত্তর শেনসীতে এসে উপস্থিত হয়, তখন এই অঞ্চল হয়ে দাঁড়ায় বিপ্লবের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি এলাকা এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অবস্থান-কেন্দ্র। ১৯৩৭ সালে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবার পরেই এর নাম হয় শেনসী-কাংসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল। এই তিনটি প্রদেশের সাধারণ সীমান্তের তেইশটি কাউন্টি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২। ১৯৩৬ সালের মধ্যে সীমান্ত অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গাতেই জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে তা বিলি করে দেবার এবং কৃষকদের পুরানো ঋণ বাতিল করার নীতি কার্যকরী হয়ে যায়। ১৯৩৬ সালের পর ব্যাপক এক জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলবার স্বার্থে সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই নীতিকে খাজনা ও সুদ কমাবার নীতিতে পরিবর্তিত করে। একই সংগে সে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের অর্জিত ফলকে দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করে।

জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যা

মে, ১৯৩৮

প্রথম অধ্যায়

গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কেন ?

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে নিয়মিত যুদ্ধই মুখ্য আর গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে অনুপূরক। এই বিষয়টির আমরা ইতিমধ্যেই সঠিকভাবে মীমাংসা করেছি। তাই এখন শুধু গেরিলাযুদ্ধের রণকৌশলগত সমস্যাগুলিই রয়ে গেছে। কেন তবে আর আমরা রণনীতিগত প্রশ্ন তুলছি ?

চীন যদি একটা ছোট দেশ হতো আর গেরিলাযুদ্ধের ভূমিকা যদি শুধুই অল্প দূরত্বের মধ্যে নিয়মিত বাহিনীর যুদ্ধাভিযানে প্রত্যক্ষ সাহায্য দেওয়া হতো তাহলে অবশ্য শুধু রণকৌশলগত সমস্যাই থাকত, কোন রণনীতিগত সমস্যা থাকত না। পক্ষান্তরে, চীনও যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো শক্তিশালী দেশ হতো, আক্রমণকারী শত্রুকে তাড়াতাড়ি বিতাড়িত করা যেত অথবা তাড়াতে কিছু সময় লাগলেও যদি তার অধিকৃত এলাকা বিস্তীর্ণ না হতো, তাহলেও গেরিলাযুদ্ধ যুদ্ধাভিযানে শুধুই সহযোগিতার ভূমিকা গ্রহণ করত, তখন স্বভাবতঃই শুধু রণকৌশলগত সমস্যাই জড়িত থাকত, কোন রণনীতিগত সমস্যা থাকত না।

চীনের ক্ষেত্রে গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত সমস্যা এই অবস্থায় উদ্ভূত হয় : চীন ছোটও নয়, আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের মতোও নয়, সে হচ্ছে একটা বড় অথচ দুর্বল দেশ। এই বড় অথচ দুর্বল দেশটি আক্রান্ত হয়েছে একটি

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের গোড়ার দিকে পার্টির ভেতরের ও বাইরের বহু লোক গেরিলাযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিগত ভূমিকাকে খর্ব করে দেখে শুধুমাত্র নিয়মিত যুদ্ধের, বিশেষ করে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর সামরিক কার্যকলাপের ওপরেই তাদের আশা-ভরসা নিবদ্ধ রেখেছিল। কমরেড মাও সে-তুঙ এই দৃষ্টিকোণকে খণ্ডন করেছিলেন এবং এই প্রবন্ধটি রচনা করে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের বিকাশসাধনের সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে, ১৯৩৭ সালে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হবার সময়ে যে অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল কেবল চল্লিশ হাজারের সামান্যমাত্র বেশি, ১৯৪৫ সালে জাপান যখন

ছোট অথচ শক্তিশালী দেশের দ্বারা, কিন্তু এই বড় অথচ দুর্বল দেশটি এখনো রয়েছে উন্নয়নের যুগে, এটাই সমস্ত সমস্যার উৎস। ঠিক এই অবস্থায় বিরাট অঞ্চল শত্রুর দখলে চলে যায় এবং যুদ্ধও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে। শত্রু আমাদের এই বিরাট দেশের সুবিশাল এলাকা দখল করেছে, কিন্তু তাদের দেশ ছোট, যথেষ্ট সৈন্যশক্তি তার নেই, আর অধিকৃত এলাকায় তাকে বহু জায়গায় ফাঁক রেখে দিতে হয়েছে; তাই আমাদের জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধ মুখ্যতঃ অন্তর্লাইনে নিয়মিত বাহিনীর যুদ্ধাভিযানে সহযোগিতার লড়াই নয়, বরং বহির্লাইনে স্বতন্ত্রভাবে লড়াই করা; উপরন্তু চীন হচ্ছে প্রগতিশীল, অর্থাৎ তার রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী আর ব্যাপক জনসাধারণ; তাই আমাদের জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধ মোটেই ছোট আকারের নয়, বরং তা হচ্ছে বিরাটাকারের; তাই রণনীতিগত প্রতিরক্ষা রণনীতিগত আক্রমণ প্রভৃতির মতো গোটা এক গুচ্ছের সমস্যা দেখা দেয়। যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি ও আনুষঙ্গিক নির্মমতার কারণে গেরিলাযুদ্ধ বহু অসাধারণ কাজ না করে পারে না। তাই ঘাঁটি এলাকার সমস্যা, গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকশিত করে তোলা প্রভৃতি সমস্যার উদ্ভব হয়। সুতরাং জাপানের বিরুদ্ধে চীনের গেরিলাযুদ্ধ রণকৌশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা হয়ে পড়ে রণনীতির সমস্যা, এবং প্রয়োজন হয়ে পড়ে রণনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে গেরিলাযুদ্ধের সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করা। যে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত, তা হচ্ছে যুদ্ধের সমগ্র ইতিহাসে এ ধরনের ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধ একেবারেই নতুন। এ বিষয়টি এই ঘটনার সংগে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত যে, আমরা এখন বিংশ শতাব্দীর ৩০ ও ৪০-এর দশকে প্রবেশ করেছি, আর আমাদের রয়েছে একটি কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজ। এখানেই নিহিত রয়েছে সমস্যার প্রাণকেন্দ্র। ইউয়ান কর্তৃক সুং বংশের ধ্বংসসাধন, ছিং কর্তৃক মিং বংশের ধ্বংসসাধন, ইংরেজদের উত্তর আমেরিকা ও ভারত দখল,

আত্মসমর্পণ করে তখন তা বৃদ্ধি পেয়ে দশ লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী হয়ে ওঠে এবং স্থাপন করে বহু বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে তারা গ্রহণ করে মহান ভূমিকা; আর সেই কারণেই চিয়াং কাই-শেক জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে সাহস করল না, সাহস করল না দেশজুড়ে গৃহযুদ্ধ বাধাতে। ১৯৪৬ সালে চিয়াং কাই-শেক যখন দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ শুরু করে, তখন তার আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী নিয়ে গড়ে ওঠা গণমুক্তি ফৌজ যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

লাতিন দেশসমূহের মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকার প্রভৃতির মতো জয়ের সাধের স্বপ্ন সম্ভবতঃ এখনো দেখে চলেছে আমাদের শত্রুপক্ষ। কিন্তু আজকের চীনদেশে এ ধরনের স্বপ্নের কোন বাস্তব মূল্যই আর নেই; কারণ বর্তমানের চীনদেশে এমন কতকগুলি উপকরণ রয়েছে যা উপরোক্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তে ছিল না। আর সেগুলির একটি হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধ যা একেবারে একটা নতুন ব্যাপার। আমাদের শত্রু যদি এ ঘটনাকে উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে নিশ্চয়ই দুর্ভোগ ভুগতে হবে।

গোটা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধ এখনো পর্যন্ত শুধু অনুপূরক স্থান পেলেও এইসব কারণে তাকে যাচাই করে দেখতে হবে রণনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে।

তাহলে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের সাধারণ রণনীতিগত নীতিগুলি কেন জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে না?

জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যাটি আসলে গোটা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রণনীতির সমস্যার সংগে নিবিড়ভাবে জড়িত এবং এ দুটির অনেক কিছুই অভিন্ন। কিন্তু গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে নিয়মিত যুদ্ধের থেকে ভিন্ন ধরনের, আর তার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তাই গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যায় বহু বিশেষ ধরনের উপাদান রয়েছে; জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের সাধারণ রণনীতিগত নীতিকে কিছুই অদলবদল না করে আপন বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত গেরিলাযুদ্ধের ক্ষেত্রে কোনমতেই প্রয়োগ করতে পারা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুদ্ধের মৌলিক নীতি হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা ও শত্রুকে ধ্বংস করা

গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যা নির্দিষ্টভাবে বলার আগে যুদ্ধের মৌলিক সমস্যা সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলা দরকার।

সমস্ত সামরিক কার্যকলাপের পরিচালিকা-নীতিই এসেছে একটি মৌলিক নীতি থেকে, অর্থাৎ: যথাসম্ভব নিজের শক্তি সংরক্ষণ করা এবং শত্রুর শক্তি ধ্বংস করা। বিপ্লবী যুদ্ধে এই নীতিটি মৌলিক রাজনৈতিক নীতির সংগে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের মূল রাজনৈতিক নীতি অর্থাৎ তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে

জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে তাড়িয়ে দেওয়া, এবং এক স্বাধীন, মুক্ত ও সুখী নতুন চীন গড়ে তোলা। সামরিক ব্যাপারে এর অর্থ হচ্ছে সশস্ত্র শক্তির দ্বারা মাতৃভূমিকে রক্ষা করা, আর জাপানী আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৈন্যবাহিনীর কার্যকলাপ যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালায় এক-দিকে নিজের শক্তি সংরক্ষণ করতে এবং অন্যদিকে শত্রুর শক্তি ধ্বংস করতে। যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগে উৎসাহ দেওয়াটা তাহলে কেমন করে ব্যাখ্যা করা যায়? প্রত্যেকটি যুদ্ধেরই মূল্য দিতে হয়, কখনো কখনো অত্যন্ত বেশি মূল্য দিতে হয়, 'নিজেকে রক্ষা করার' সংগে এর কি কোন দ্বন্দ্ব নেই? বস্তুতঃ আদৌ কোন দ্বন্দ্ব নেই, আরও সঠিকভাবে বলা যায় যে, তারা হচ্ছে একই সঙ্গে পরস্পরের বিপরীত ও পরিপূরক। কারণ এই ধরনের আত্মত্যাগ কেবলমাত্র শত্রুকে ধ্বংস করার জন্যই যে প্রয়োজন তা নয়, বরং নিজেকে রক্ষা করার জন্যও তার দরকার—সামগ্রিক ও চিরকালীন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আংশিক ও সাময়িক 'অসংরক্ষণ' (আত্মত্যাগ বা মূল্যদান)। এই মৌলিক নীতি থেকেই উদ্ভূত হয় সমগ্র সামরিক কার্যকলাপের পরিচালিকা-নীতিগুলো—গুলি ছোঁড়ার নীতি (নিজেকে রক্ষা করার জন্য আড়ালে থাকা এবং শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য নিপুণভাবে গুলিচালনা করা) থেকে শুরু করে রণনীতিগত নীতি পর্যন্ত সবই এই মৌলিক নীতির ধারণার সংগে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সমস্ত প্রযুক্তিগত, রণকৌশলগত, যুদ্ধাভিযানগত ও রণনীতিগত নীতিই হচ্ছে এই মৌলিক নীতি কার্যকরী করার শর্ত। নিজেকে রক্ষা করার ও শত্রুকে ধ্বংস করার নীতি হচ্ছে সমস্ত সামরিক নীতির ভিত্তি।

তৃতীয় অধ্যায়

জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের ছয়টি বিশেষ রণনীতিগত সমস্যা

এখন বিচার-বিবেচনা করে দেখা যাক, নিজেকে রক্ষা করা ও শত্রুকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের সামরিক কার্যকলাপে কোন্ কর্মপন্থা অথবা নীতি আমাদের গ্রহণ করা উচিত। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে (এবং অন্যান্য সমস্ত বিপ্লবী যুদ্ধে) গেরিলা বাহিনী সাধারণতঃ শূন্য থেকে গড়ে ওঠে এবং ক্ষুদ্র থেকে প্রসারিত হয়ে বিরাট বাহিনীতে পরিণত হয়, তাই তাদের নিজেকে রক্ষা করা ছাড়া নিজেকে বিস্তৃতও

করতে হয়। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, নিজেকে রক্ষা বা বিস্তৃত করা ও শত্রুকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য কোন্ কর্মপন্থা অথবা নীতি গ্রহণ করা উচিত?

সাধারণভাবে বলা যায়, মুখ্য কর্মপন্থাগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ: (১) উদ্যোগ ও নমনীয়তার সংগে এবং সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধে আক্রমণাত্মক লড়াই করা, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা এবং অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই চালানো, (২) নিয়মিত যুদ্ধের সংগে সমন্বয়সাধন; (৩) ঘাঁটি এলাকা স্থাপন; (৪) রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত আক্রমণ; (৫) গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকাশসাধন; এবং (৬) পরিচালনার সংগে সঠিক সম্পর্ক। এই ছয়টি ধারা হচ্ছে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের সামগ্রিক রণনীতিগত কর্মসূচী, আর নিজেকে রক্ষা করা ও বিস্তৃত করার, শত্রুকে ধ্বংস ও বিতাড়িত করার, নিয়মিত যুদ্ধের সংগে সমন্বয়-সাধন করার এবং চূড়ান্ত বিজয়লাভ করার জন্য এগুলোই হচ্ছে প্রয়োজনীয় পন্থা।

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্যোগ ও নমনীয়তার সংগে এবং সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধে আক্রমণাত্মক লড়াই করা, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা এবং অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই চালানো

এখানে বিষয়টিকে আবার চারটি অংশে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে: (১) প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের মধ্যেকার, দীর্ঘস্থায়িত্ব ও দ্রুত নিষ্পত্তির মধ্যেকার এবং অন্তর্লাইন ও বহির্লাইনের মধ্যেকার সম্পর্ক; (২) সমস্ত কার্য-কলাপে উদ্যোগক্ষমতা আয়ত্ত করা; (৩) সৈন্যশক্তির নমনীয় ব্যবহার; এবং (৪) সমস্ত কার্যকলাপের পরিকল্পনা।

এবারে প্রথমটি ধরা যাক।

যেহেতু জাপান শক্তিশালী দেশ এবং সে-ই আক্রমণ চালাচ্ছে, আর চীন হচ্ছে দুর্বল দেশ এবং সে প্রতিরক্ষা করছে, তাই এটা নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে যে, সামগ্রিকভাবে আমাদের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হচ্ছে রণ-নীতিগত প্রতিরক্ষাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। যুদ্ধলাইনের বিষয়ে বলতে গেলে

বলা যায়, শত্রুরা বহির্লাইনে লড়াই চালাচ্ছে আর আমরা অন্তর্লাইনে লড়াই চালাচ্ছি। পরিস্থিতির এটা একটা দিক। কিন্তু আর একটা দিকও আছে—সেটি হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত। শত্রুবাহিনী যদিও শক্তিশালী (অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যদের কোন কোন গুণে ও কোন কোন উপকরণে), কিন্তু সংখ্যায় তারা কম; আর আমাদের বাহিনী যদিও দুর্বল (অনুরূপভাবে শুধু অস্ত্রশস্ত্র ও আমাদের সৈন্যদের কোন কোন গুণে ও কোন কোন উপকরণে), কিন্তু সংখ্যায় অত্যন্ত বিরাট। তাছাড়া শত্রু হচ্ছে একটা বিদেশী জাতি যারা আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে, আর আমরা স্বদেশের মাটির বুকে বিদেশী জাতির সেই আক্রমণকে প্রতিরোধ করছি; এ থেকে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে নিম্নলিখিত রণনীতি: রণনীতিগত প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধাভিযান ও লড়াই করা, রণনীতিগত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধাভিযান ও লড়াই করা এবং রণনীতিগত অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের যুদ্ধাভিযান ও লড়াই করা সম্ভব এবং তা দরকারও। গোটা প্রতিরোধ-যুদ্ধে এই রকমের রণনীতিই গ্রহণ করতে হবে। নিয়মিত যুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধ—উভয় ক্ষেত্রেই এটা খাটে। গেরিলাযুদ্ধ শুধু এই রণনীতি কার্যকরী করার মাত্রায় ও রূপেই ভিন্ন। গেরিলাযুদ্ধে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ সাধারণতঃ আকস্মিক আক্রমণের রূপ নিয়ে থাকে। যদিও নিয়মিত যুদ্ধের ক্ষেত্রেও আকস্মিক আক্রমণ চালানো উচিত আর তা চালানোও সম্ভব, তবুও আকস্মিকতার মাত্রাটি এ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম। গেরিলাযুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি আর যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে শত্রুকে পরিবেষ্টিত করার জন্য আমাদের বহির্লাইনের ঘেরটি খুবই ছোট। এ সবেই দেখা যায় নিয়মিত যুদ্ধের সঙ্গে গেরিলাযুদ্ধের পার্থক্য।

তাই এটা দেখা যাচ্ছে যে, লড়াই চালনায় গেরিলা বাহিনীগুলিকে যথাসম্ভব বেশি করে সৈন্যশক্তি সমাবেশ করতে হয়, গোপনে ও দ্রুতগতিতে কাজ করতে হয়; শত্রুর ওপর আকস্মিক আক্রমণ করতে এবং লড়াইয়ের দ্রুত সমাপ্তি ঘটাতে হয়, আর নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষা করা, গড়িমসি করা এবং লড়াইয়ের আগে সৈন্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়াটাকে তাদের অবশ্যই কঠোরভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। অবশ্য, গেরিলাযুদ্ধে শুধু যে রণনীতিগত প্রতিরক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকে তা নয়, পরন্তু তাতে রণকৌশলগত প্রতিরক্ষাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। লড়াইয়ের সময়ে শত্রুকে আটকে রাখার ও বাহিরী-চৌকী

সামরিক ক্রিয়াদি, শত্রুর শক্তি নষ্ট করার ও শত্রুকে হয়রান করে দেবার উদ্দেশ্যে সংকীর্ণ পথে, দুর্গম স্থানে, নদনদীতে অথবা গ্রামে প্রতিরোধের বিন্যাস-ব্যবস্থা এবং পশ্চাদপসরণের সময়ে ফৌজকে নিরাপদ করার ভারপ্রাপ্ত বাহিনীর কার্যকরণ ইত্যাদি—এ সবই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের রণকৌশলগত প্রতিরক্ষার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু গেরিলাযুদ্ধের মৌলিক কর্মপন্থাকে অবশ্যই আক্রমণাত্মক হতে হবে, আর চরিত্রের দিক থেকে গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে নিয়মিত যুদ্ধের তুলনায় অনেক বেশি আক্রমণাত্মক। উপরন্তু এই ধরনের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপকে অবশ্যই আকস্মিক আক্রমণের রূপ নিতে হবে, আবার আমাদের শক্তিকে সাড়ম্বরে দেখিয়ে নিজেদের সবকিছু প্রকাশ করে দেওয়াটা নিয়মিত যুদ্ধের থেকে গেরিলাযুদ্ধে আরও বেশি অনুচিত। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে গেরিলা লড়াই কয়েকদিন পর্যন্ত চালু রাখা যেতে পারে, যেমন বিচ্ছিন্ন ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত কোন একটি ক্ষুদ্র শত্রুবাহিনীর ওপরে আক্রমণ কয়েকদিন চালু রাখতে পারা যায়। কিন্তু গেরিলাযুদ্ধে লড়াইয়ের দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা সাধারণভাবে নিয়মিত যুদ্ধের তুলনায় আরও বেশি; শত্রু যে শক্তিশালী এবং আমরা দুর্বল —এ ঘটনা থেকেই তা নির্ধারিত হয়। নিজের বিক্ষিপ্ত চরিত্রের কারণেই গেরিলাযুদ্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে আর শত্রুর মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা, তাকে আটকে রাখা, ক্ষতিসাধন করা এবং জনসাধারণের মধ্যে কাজ চালানোর মতো বহু কাজে ও কর্তব্যে এর নীতি হচ্ছে সৈন্যশক্তিকে ছড়িয়ে রাখা, কিন্তু যখন কোন গেরিলাবাহিনী অথবা কোন গেরিলা সৈন্যসংস্থান শত্রুকে ধ্বংস করতে লেগে থাকে এবং বিশেষ করে তারা যখন শত্রুর আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে কঠোরভাবে চেষ্টা করছে, তখন তাদের প্রধান সৈন্যশক্তিকে অবশ্যই কেন্দ্রীভূত করতে হবে। 'বিরাট শক্তি কেন্দ্রীভূত করে শত্রুর একটা ক্ষুদ্র অংশের ওপরে আঘাত হানা'—এটা আজও গেরিলাযুদ্ধের রণক্ষেত্রে লড়াই চালনার অন্যতম নীতি হয়ে রয়েছে।

তাই এটাও দেখা যাচ্ছে যে, আমরা যদি জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে সামগ্রিকভাবে ধরি, তাহলে শুধু নিয়মিত ও গেরিলা এই উভয়বিধ যুদ্ধের আক্রমণাত্মক যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ক্রমপুঞ্জিত ফলাফলের মাধ্যমে অর্থাৎ আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের বহু বিজয়লাভের মাধ্যমেই আমরা আমাদের রণনীতিগত প্রতিরক্ষার লক্ষ্য অর্জন করতে পারি এবং চূড়ান্তভাবে জাপানী

সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে পারি। শুধু দ্রুত নিষ্পত্তির বহু যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ক্রমপুঞ্জিত ফলাফলের মাধ্যমে অর্থাৎ আক্রমণাত্মক যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের দ্রুত নিষ্পত্তির কারণে বহু বিজয় অর্জন করার মাধ্যমেই আমরা আমাদের রণনীতিগত দীর্ঘস্থায়িত্বের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি; এর অর্থ, একদিকে প্রতিরোধ করার শক্তিসামর্থ্য আমাদের বাড়িয়ে নেবার জন্য সময় পাওয়া এবং একই সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তনকে ও শত্রুর আভ্যন্তরীণ ভাঙনকে ত্বরান্বিত করা ও তার প্রতীক্ষা করা, যাতে আমরা রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ শুরু করতে এবং চীন থেকে জাপানী আক্রমণকারী-দের বিতাড়িত করতে সমর্থ হই। আমাদের অবশ্যই প্রতিটি লড়াইয়ে উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং রণনীতিগত প্রতিরক্ষার পর্যায়েই হোক কিংবা রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়েই হোক, যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই চালাতে হবে, শত্রুকে ঘিরে ধরে ধ্বংস করতে হবে, তাকে পুরোপুরি ঘিরে ধরতে না পারলেও তার এক অংশকে ঘিরে ধরতে হবে, ঘেরা শত্রুকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে না পারলেও তার এক অংশকে ধ্বংস করতে হবে এবং ঘেরা শত্রুবাহিনীর বহু সংখ্যক সৈন্যকে বন্দী করতে না পারলেও তাদেরকে বিরাট সংখ্যায় হতাহত করতে হবে। এ ধরনের বহু নির্মূলীকরণের লড়াইয়ের ক্রমপুঞ্জিত ফলাফলের ভেতর দিয়েই শুধু আমরা শত্রুর ও আমাদের পারস্পরিক অবস্থাকে বদলে দিতে পারি—শত্রুর রণনীতিগত পরিবেষ্টনকে অর্থাৎ তার বহির্লাইনের লড়াই চালনার নীতিকে সম্পূর্ণভাবে চুরমার করে দিতে পারি, আর অবশেষে আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের সংগে ও জাপানী জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের সংগে সমন্বয়সাধন করে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের চারিদিক থেকে ঘিরে ধরতে পারি এবং একবারেই তাদের ধ্বংস করতে পারি। এইসব ফল অর্জন করতে হয় মুখ্যতঃ নিয়মিত যুদ্ধের মাধ্যমে, গেরিলাযুদ্ধ তাতে শুধু গৌণ অবদানই যোগায়। যাই হোক, উভয়ের ক্ষেত্রেই যা সাধারণ, তা হচ্ছে একটা বিরাট জয়লাভের জন্য অনেকগুলি ছোট ছোট জয়কে জড়ো করা। এখানেই নিহিত রয়েছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিগত ভূমিকা।

এখন গেরিলাযুদ্ধে উদ্যোগ, নমনীয়তা ও পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

গেরিলাযুদ্ধে উদ্যোগের অর্থ কি?

যে-কোন যুদ্ধে যুদ্ধরত উভয় পক্ষই রণক্ষেত্রে, রণভূমিতে, যুদ্ধ-অঞ্চলে এমনকি সমগ্র যুদ্ধে উদ্যোগ নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে, কারণ সৈন্য-বাহিনীর পক্ষে উদ্যোগের অর্থ হচ্ছে কার্যকলাপের স্বাধীনতা। উদ্যোগ হারিয়ে ফেললে সৈন্যবাহিনী নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়তে বাধ্য হয়, কার্যকলাপের স্বাধীনতা তার আর থাকে না এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস বা পরাজয়ের বিপদের মুখে সে পড়ে। স্বভাবতঃই, রণনীতিগত প্রতিরক্ষায় ও অন্তর্লাইনের লড়াই চালনায় উদ্যোগ হাতে নেওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন আর বহির্লাইনে আক্রমণাত্মক লড়াই চালনায় সেটা অর্জন করা সহজতর। কিন্তু, জাপানী সাম্রাজ্যবাদের দুটি মৌলিক দুর্বলতা রয়েছে—যথা, তার সৈন্যশক্তি অপ্রচুর, আর অন্য দেশের মাটিতে সে লড়াই করছে। উপরন্তু, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীনের শক্তিকে কম করে ধরেছে আর জাপানী যুদ্ধবাজদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে পরিচালনায় বহু ভুলত্রুটির উদ্ভব ঘটেছে, যথা শক্তিবৃদ্ধির জন্য নতুন সৈন্যবাহিনী অল্প অল্প করে আনা, রণনীতিগত সমন্বয় বিধানের অভাব, কোন কোন সময়ে আক্রমণের মুখ্য দিক্-নির্দেশের অভাব, কোন কোন লড়াই চালনার সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থতা এবং পরিবেষ্টিত সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে বিফলতা, ইত্যাদি। এইসব ভুলত্রুটিগুলিকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের তৃতীয় দুর্বলতা হিসেবে ধরতে পারা যায়। তাই আক্রমণাত্মক হওয়ার ও বহির্লাইনে লড়াই চালাবার সুবিধা সত্ত্বেও জাপানী যুদ্ধবাজরা ক্রমে ক্রমে উদ্যোগক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে; হারিয়ে ফেলছে তাদের সৈন্যশক্তির অপ্রাচুর্যের (তাদের দেশ ছোট, জনসংখ্যা অল্প, সম্পদসম্ভার অপ্রতুল, সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতির) কারণে, তারা যে অন্য দেশের মাটিতে যুদ্ধ করছে (তাদের যুদ্ধ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ও নৃশংস বর্বর যুদ্ধ) এই ঘটনার কারণে এবং পরিচালনায় তাদের বোকামির কারণে। বর্তমানে যুদ্ধটি শেষ করতে জাপান ইচ্ছুক নয়, সমর্থও নয়; তাছাড়া তার রণ-নীতিগত আক্রমণ এখনো শেষ হয়ে যায়নি, কিন্তু সাধারণ গতিধারায় যেমন দেখা যায়—তার আক্রমণ একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটা হচ্ছে তার তিনটি দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। জাপান গোটা চীনকে গ্রাস করতে পারে না। জাপান একদিন অবশ্যই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফেলবে, আর তার লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। পক্ষান্তরে, যুদ্ধের শুরুতে চীন বেশ একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল; কিন্তু অভিজ্ঞতা লাভ করে এখন সে নয়া নীতি—চলমান যুদ্ধের নীতি, অর্থাৎ যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে আক্রমণাত্মক

কার্যকলাপ, দ্রুত নিষ্পত্তির ও বহির্লাইনের লড়াই চালাবার নীতি গ্রহণ করেছে, আর গ্রহণ করেছে গেরিলাযুদ্ধকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করার নীতি, তাই দিনে দিনে উদ্যোগের অবস্থা গড়ে উঠছে।

উদ্যোগের প্রশ্ন কিন্তু গেরিলাযুদ্ধের ক্ষেত্রে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে গেরিলাবাহিনী অত্যন্ত কঠিন পরিবেশে সামরিক কার্যকলাপ চালায়—পশ্চাদ্ভাগবিহীন অবস্থায় যুদ্ধ করা, নিজেদের দুর্বল শক্তি নিয়ে শত্রুর শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করা, অভিজ্ঞতার অভাব (গেরিলা-বাহিনী যখন নতুন তৈরী করা হয়) এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া প্রভৃতি। তৎসত্ত্বেও গেরিলাযুদ্ধে নিজের উদ্যোগ গড়ে তোলা সম্ভব, আর তার মুখ্য শর্ত হচ্ছে উপরে উল্লিখিত শত্রুর তিনটি দুর্বলতাকে কাজে লাগানো। শত্রুর সৈন্য-শক্তির অপ্রাচুর্যের সুযোগ নিয়ে (সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে), গেরিলাবাহিনীগুলি বিরাট বিরাট এলাকাগুলিকে তাদের সামরিক কার্যকলাপের ক্ষেত্র হিসেবে সাহসের সংগে ব্যবহার করতে পারে; শত্রু যে বিদেশী আক্রমণকারী, সে যে চরমতম বর্বর নীতি অনুসরণ করছে, এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে গেরিলা বাহিনীগুলি অকুতোভয়ে কোটি কোটি জনগণের সমর্থন-লাভ করতে পারে; শত্রুর পরিচালনার বোকামির সুযোগ নিয়ে গেরিলা বাহিনীগুলি সাহসের সংগে তাদের নিজেদের বুদ্ধিমত্তাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে। নিয়মিত বাহিনীর পক্ষে শত্রুর এই সমস্ত দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করা ও তাকে পরাজিত করার জন্য এই সুযোগকে কাজে লাগানো অবশ্য কর্তব্য, গেরিলাবাহিনীর পক্ষে এইরকম করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গেরিলাবাহিনীর নিজের দুর্বলতাকে সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে কমিয়ে আনতে পারা যায়। উপরন্তু, কোন কোন সময়ে এই দুর্বলতাগুলিই আবার উদ্যোগলাভের অনুকূল শর্ত হয়ে ওঠে। যেমন ধরা যাক: গেরিলাবাহিনীগুলি ছোট; ঠিক সেই কারণেই তারা শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে রহস্যজনকভাবে আবির্ভূত ও অদৃশ্য হতে পারে, শত্রু তাদের কিছুই করতে পারে না। তারা কার্যকলাপে এত বেশি স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে, যা বিরাটাকার নিয়মিত বাহিনী কখনো করতে পারে না।

কয়েকদিক থেকে শত্রু যখন সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণ চালায়, তখন গেরিলাবাহিনীর পক্ষে উদ্যোগ হাতে রাখা কঠিন আর উদ্যোগ হারিয়ে ফেলা খুবই সহজ। এ অবস্থায় সঠিকভাবে তার মূল্যায়ন ও বিন্যাসব্যবস্থা না করা

হলে গেরিলাবাহিনীর সহজেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, আর তার ফলে শত্রুর সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে তা ব্যর্থ হয়। শত্রু যখন প্রতিরক্ষাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আর আমরা যখন আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ চালাই, তখনো এটা ঘটতে পারে। তাই উদ্যোগ উদ্ভূত হয় পরিস্থিতির (আমাদের নিজেদের ও শত্রুর) সঠিক মূল্যায়ন থেকে এবং সঠিক সামরিক ও রাজনৈতিক বিন্যাসব্যবস্থা থেকে। বাস্তব অবস্থার সংগে সংগতিবিহীন এক হতাশাপূর্ণ মূল্যায়ন এবং তার থেকে উদ্ভূত নিষ্ক্রিয় বিন্যাসব্যবস্থার ফলে আমরা নিঃসন্দেহে উদ্যোগ হারিয়ে ফেলব আর নিজেদেরকে একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নিক্ষেপ করব। পক্ষান্তরে, বাস্তব অবস্থার সংগে সংগতিবিহীন অতি-আশাবাদী মূল্যায়ন ও তার থেকে উদ্ভূত দুঃসাহসিক (অপ্রয়োজনীয় দুঃসাহসিকতা) বিন্যাসব্যবস্থাও উদ্যোগের হানি ঘটাবে এবং আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত হতাশাবাদীদের অনুরূপ অবস্থায় নিয়ে যাবে। উদ্যোগ কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তির কোন সহজাত গুণ নয়, পরন্তু সেটা হচ্ছে এমন একটা কিছু, যা বুদ্ধিমান নেতা বাস্তব অবস্থার সংস্কারমুক্ত পর্যালোচনা ও সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে এবং সঠিক সামরিক ও রাজনৈতিক বিন্যাস-ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। সুতরাং, উদ্যোগ হচ্ছে এমন একটা জিনিস যাকে সচেতন প্রয়াসের দ্বারা লাভ করতে হয়, এটা তৈরী মাল হিসেবে হাতে পাওয়া যায় না।

কোন ভুল মূল্যায়ন ও বিন্যাসব্যবস্থার কারণে অথবা শত্রুর অত্যন্ত প্রবল চাপের ফলে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়তে বাধ্য হলে গেরিলাবাহিনীর অবশ্য কর্তব্য হবে সেই অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য কঠোর চেষ্টা চালানো। কেমন করে তা করা যাবে, সেটা নির্ভর করে অবস্থার ওপরে। বহু ক্ষেত্রে দরকার 'সরে যাওয়া'। সরে যাওয়ার সামর্থ্য হচ্ছে গেরিলাবাহিনীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নিষ্ক্রিয় অবস্থা থেকে বেরোবার ও উদ্যোগকে পুনরায় অর্জন করার মুখ্য পদ্ধতি হচ্ছে সরে যাওয়া। কিন্তু এটাই একমাত্র পদ্ধতি নয়। শত্রু যখন পুরোদমে ক্ষমতাশালী আর আমরা যখন চরম অসুবিধায়, প্রায়শঃই ঠিক সেই সময়টাই হচ্ছে এমন একটি মুহূর্ত, যখন অবস্থাটা ঘুরতে শুরু করে শত্রুর প্রতিকূলে এবং আমাদের অনুকূলে। 'আর একটু বেশি সময় ধরে সহ্য করার' প্রয়াসে প্রায়শঃই একটা অনুকূল পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটে ও উদ্যোগ পুনরায় অর্জিত হয়।

এবারে নমনীয়তার সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। '

নমনীয়তা হচ্ছে উদ্যোগের একটি মূর্ত অভিব্যক্তি। নিয়মিত যুদ্ধের তুলনায় গেরিলাযুদ্ধেই সৈন্যশক্তির নমনীয় ব্যবহার অধিকতর আবশ্যক।

গেরিলাযুদ্ধের পরিচালককে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, শত্রু ও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান পরিস্থিতিটিকে পরিবর্তন করার ও উদ্যোগক্ষমতা লাভ কবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে সৈন্যশক্তির নমনীয় ব্যবহার। গেরিলা-যুদ্ধের প্রকৃতিই এমন যে, সৈন্যশক্তিকে অবশ্যই হাতের কর্তব্যভার অনুসারে এবং শত্রুর অবস্থা, ভৌগোলিক পরিবেশ ও স্থানীয় অধিবাসীদের মনোভাব প্রভৃতি অবস্থা অনুসাবে নমনীয়ভাবে ব্যবহাব করতে হবে; তাব মুখ্য পদ্ধতি হচ্ছে সৈন্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ব্যবহাব করা, সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত কবে ব্যবহার করা এবং সৈন্যশক্তিব অবস্থান পরিবর্তন করা। গেরিলাবাহিনীগুলির ব্যবহারের ব্যাপারে, গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকের অবস্থাটা হচ্ছে জালক্ষেপণকারী মৎস্য-জীবীর মতো, জালটাকে তার খুব ছড়িয়ে ফেলতে হবে আর দৃঢ়ভাবে চেপে গুটিয়ে আনতে হবে। জাল ছড়িয়ে ফেলবার সময়ে জলেব গভীরতা, স্রোতের গতি এবং কোন বাধাবিপত্তি রয়েছে কিনা, এ সবকিছুই মৎস্যজীবীকে অবশ্যই ভাল করে দেখে নিতে হবে; অনুরূপভাবেই, গেবিলাবাহিনীগুলিকে বিক্ষিপ্ত করে ব্যবহাব করার সময়ে গেরিলাযুদ্ধের পরিচালককেও সযত্নে অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে, পরিস্থিতির অজ্ঞানতা ও ভুল কার্যকলাপেব কারণে যেন ক্ষতি ভোগ কবতে না হয়। জালটিকে দৃঢ়ভাবে চেপে গুটিয়ে আনার জন্য মৎস্যজীবী যেমন জালের দড়িটাকে শক্ত হাতে অবশ্যই ধরে বাখে, তেমনি গেরিলাযুদ্ধের পরিচালককেও তার সমস্ত বাহিনীগুলির সঙ্গে যোগাযোগ অবশ্যই বজায় রাখতে হবে এবং এবং তার মুখ্য শক্তির পর্যাপ্ত পরিমাণ অংশকে সব সময়েই নিজের হাতের কাছে তৈরী রাখতে হবে। মাছ ধরার ব্যাপারে যেমন ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করা দরকার, ঠিক তেমনি গেরিলাবাহিনীর পক্ষেও ঘন ঘন অবস্থান পরিবর্তন করা দরকার। সৈন্যশক্তি বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়া, সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা এবং সৈন্যশক্তির অবস্থান পরিবর্তন করা গেরিলাযুদ্ধে নমনীয়ভাবে সৈন্যশক্তির ব্যবহারের তিনটি পদ্ধতি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, গেরিলাবাহিনীর সৈন্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে, ছড়িয়ে দেওয়াকে, অর্থাৎ 'সমগ্রকে অংশে অংশে ভেঙে দেওয়াকে'—মুখ্যতঃ নিম্নলিখিত এই কয়েকটি ধরনের অবস্থায় কাজে লাগানো হয়: (১) শত্রু

আত্মরক্ষামূলক কার্যকলাপে রত থাকে এবং আমাদের সৈন্যশক্তিকে জড়ো করে লড়াই করার সুযোগ সামগ্রিকভাবে থাকে না বলে আমরা যখন ব্যাপক ফ্রণ্টে শত্রুকে বিপদগ্রস্ত করতে চাই, তখন ; (২) যে এলাকায় শত্রুর সৈন্যশক্তি দুর্বল সেখানে আমরা যখন ব্যাপকভাবে তাকে হয়রান ও ক্ষতিসাধন করতে চাই, তখন ; (৩) শত্রুর সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণকে আমরা যখন ভাঙতে পারি না এবং নিজেদের আমরা যখন অপেক্ষাকৃত কম প্রকট করে সরে পড়তে চেষ্টা করি, তখন ; (৪) ভৌগলিক পরিবেশ বা রসদাদি সরবরাহের দ্বারা আমরা যখন সীমাবদ্ধ, অথবা (৫) একটা ব্যাপক এলাকা জুড়ে আমরা যখন জনসাধারণের মধ্যে কাজ চালাই। কিন্তু পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, সৈন্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেবার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত : (১) একেবারে সমানভাবে যেন সৈন্যশক্তিকে আমরা কোনদিনই বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে না দিই, পরন্তু কৌশলী অভিযানের জন্য সুবিধাজনক এলাকায় সৈন্যশক্তির একটা অপেক্ষাকৃত বিরাট অংশকে আমাদের রেখে দেওয়া উচিত, যাতে করে সম্ভাব্য জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করা যায় এবং ছড়িয়ে দেওয়ার ভেতরে যে কর্তব্যটি সম্পাদিত করা হচ্ছে, তার একটা ভারকেন্দ্র থাকে, আর (২) বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়া প্রত্যেকটি বাহিনীর জন্য সুস্পষ্ট কর্তব্যভার, কার্যকলাপের ক্ষেত্র, কার্যকলাপের মেয়াদ, একত্র মিলবার স্থান ও যোগাযোগের পদ্ধতি প্রভৃতি আমাদের ধার্য করে দেওয়া উচিত।

সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে ব্যবহার করার পদ্ধতিটি অর্থাৎ 'অংশগুলিকে সমগ্রে সম্মিলিত করার' পদ্ধতিটি শত্রু যখন আক্রমণ চালায় তখন তাকে ধ্বংস করার জন্য প্রায়শঃ প্রয়োগ করা হয় ; কখনো কখনো একে প্রয়োগ করা হয় শত্রু যখন আত্মরক্ষামূলক কার্যকলাপে রত তখন তার কিছু কিছু অ-চলমান সৈন্যদলকে ধ্বংস করার জন্য। সৈন্যশক্তির কেন্দ্রীভূতকরণ বলতে চরম কেন্দ্রীভূতকরণ বোঝায় না, পরন্তু বোঝায় একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকে ব্যবহারের জন্য মুখ্য সৈন্যশক্তি জড়ো করা, এবং শত্রুকে আটকে রাখার, তাকে হয়রান ও তার ক্ষতিসাধন করার অথবা জনসাধারণের মধ্যে কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে অন্যান্য দিকে ব্যবহার করার জন্য সৈন্যশক্তির অংশ বিশেষ রাখা বা পাঠিয়ে দেওয়া।

পরিস্থিতি অনুযায়ী নমনীয়ভাবে সৈন্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে

দেওয়া বা তাকে কেন্দ্রীভূত করা গেরিলাযুদ্ধের প্রধান পদ্ধতি হলেও আমাদের সৈন্যশক্তিকে কেমন করে নমনীয়ভাবে সরিয়ে নেওয়া (অবস্থান পরিবর্তন করা) যায়, তাও আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। যখন শত্রু বুঝবে যে গেরিলাবাহিনী সাংঘাতিকভাবে তাকে বিপদগ্রস্ত করছে, তখনই সে গেরিলাদের দমন করার জন্য সৈন্য পাঠাবে অথবা আক্রমণ করবে। অতএব গেরিলা-বাহিনীগুলিকে পরিস্থিতির বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে। লড়াই করা সম্ভব হলে যেখানে তারা আছে সেখানেই তাদের লড়াই করা উচিত; আর সম্ভব না হলে অন্যত্র সরে যেতে তাদের দেরী করা উচিত নয়। কখনো কখনো শত্রু সৈন্যবাহিনীগুলোকে একে একে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে গেরিলা-বাহিনীগুলো এক জায়গায় শত্রুকে ধ্বংস করে অবিলম্বে অন্য জায়গায় শত্রুকে শেষ করে ফেলবার জন্য সরে যেতে পারে; এমনও হয় যে, কোন বিশেষ স্থানে অবস্থা যুদ্ধের অনুকূল না হলে অবিলম্বে সেখানকার শত্রুদলকে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র শত্রুর সংগে লড়াই করতে তাদের যেতে হতে পারে। কোন বিশেষ স্থানে শত্রুবাহিনীর প্রবলতার দরুন পরিস্থিতি বিশেষ গুরুতর হয়ে উঠলে গেরিলাবাহিনীর গড়িমসি করে সেখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়, পরন্তু বিদ্যুৎগতিতে তাদের অন্যত্রে সরে পড়া উচিত। সাধারণতঃ সৈন্য-শক্তিকে গোপনে ও ত্বরিৎগতিতে স্থানান্তরিত করতে হয়। শত্রুকে ফাঁকি দেবার, তাকে ফাঁদে ফেলবার ও বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে তাদের সর্বদা কলা-কৌশল ব্যবহার করা উচিত, ধরা যাক, পুবের দিকে আক্রমণের ভান করে পশ্চিম দিকে আক্রমণ চালানো, এই মুহূর্তে দক্ষিণে আবার পর মুহূর্তেই উত্তরে এসে হাজির হওয়া, আঘাত হেনেই সরে পড়া ও রাতে কার্যকলাপ চালানো, প্রভৃতি।

সৈন্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়ার, কেন্দ্রীভূত করার এবং স্থানান্তরিত করার নমনীয়তা হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধে উদ্যোগের মূর্ত অভিব্যক্তি; অপরপক্ষে, অনমনীয়তা ও গতিহীনতা অবশ্যই আমাদেরকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফেলবে ও অপ্রয়োজনীয় লোকসান ঘটাবে। কিন্তু কোন নেতা বিচক্ষণ কিনা, তা নমনীয়ভাবে সৈন্যশক্তির ব্যবহার করার গুরুত্ব বোঝার মধ্যেই শুধু নিহিত নয়, বরং বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে যথাসময়ে সৈন্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়ার, কেন্দ্রীভূত করার ও স্থানান্তরিত করার নিপুণতার মধ্যেও তা নিহিত। পরিবর্তন আন্দাজ করার ও ঝোপ বুঝে কোপ মারার উপযুক্ত

সময় নির্বাচনের এই বিচক্ষণতা সহজে অর্জন করা যায় না ; খোলা মনে যারা পর্যালোচনা করে এবং অধ্যবসায়ীভাবে অনুসন্ধান ও চিন্তা করে, শুধু তারাই তা অর্জন করতে পারে। নমনীয়তা যাতে হঠকারী কার্যকলাপে পরিণত না হয়, তার জন্য সাবধানে পরিস্থিতির বিচার-বিবেচনা অপরিহার্য।

পরিশেষে, পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রশ্নটির আলোচনায় আসা যাক। পরিকল্পনা ছাড়া গেরিলাযুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব। গেরিলাযুদ্ধ এলোমেলোভাবে চালানো যেতে পারে—এই ধারণার অর্থ হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধ নিয়ে খেলা করা অথবা গেরিলাযুদ্ধ সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ দেওয়া। কোন গোটা গেরিলা এলাকার কার্যকলাপ, অথবা একটি গেরিলাবাহিনী বা গেরিলা সৈন্যসংস্থানের কার্যকলাপ আরম্ভ করার আগে যথাসম্ভব পুংখানুপুংখ পরিকল্পনা অবশ্যই করে নিতে হবে, এটাই হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপের আগাম প্রস্তুতি। অবস্থাকে উপলব্ধি করা, কর্তব্য স্থির করা, সৈন্যশক্তির বিন্যাস ব্যবস্থা করা, সামরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া, রসদাদির সরবরাহের ব্যবস্থা করা, সাজসরঞ্জাম-গুলিকে সাজিয়ে রাখা, জনসাধারণের সাহায্যের যথোপযুক্ত ব্যবহার করা প্রভৃতি—এ সবই হচ্ছে গেরিলা নেতাদের কাজের অঙ্গ, এইসব কাজকে তাঁদের অবশ্যই যত্ন সহকারে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে, কার্যকরীভাবে এগুলিকে সম্পাদন করতে হবে এবং কিভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে তা পরখ করে দেখতে হবে। অন্যথায় কোন উদ্যোগ, নমনীয়তা ও আক্রমণই সম্ভব হবে না। এটা ঠিক যে নিয়মিত যুদ্ধে যে উচ্চ মানের পরিকল্পনার অবকাশ থাকে, গেরিলাযুদ্ধের অবস্থায় তা থাকে না, এবং গেরিলাযুদ্ধে উচ্চ মানের পুংখানুপুংখ পরিকল্পনা করার চেষ্টা করা হলে সেটা ভুল হবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা অনুসারে যতটা সম্ভব পুংখানুপুংখভাবে পরিকল্পনা করা দরকার, কারণ এটা বোঝা উচিত যে, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করাটা তামাশা নয়।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলিতে গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত নীতির প্রথম সমস্যা—উদ্যোগের সংগে, নমনীয় ও সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে আক্রমণাত্মক লড়াই করা, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা এবং অন্তর্লাইনে যুদ্ধ চালনার মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই চালিয়ে যাবার নীতিটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিতে এটাই হচ্ছে মুল সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান হলেই সামরিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে গেরিলাযুদ্ধের জয়লাভের গুরুত্বপূর্ণ গ্যারান্টি পাওয়া যায়।

এখানে বহু বিষয়ের আলোচনা করা হলেও সেগুলির সবই ঘুরপাক খাচ্ছে যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে আক্রমণ চালানোকে কেন্দ্র করে। আক্রমণে বিজয়লাভ করার পরেই শুধু উদ্যোগকে চূড়ান্তভাবে করায়ত্ত করতে পারা যায়। সব আক্রমণাত্মক লড়াইকে আমাদের নিজেদের উদ্যোগে সংগঠিত করতে হবে, বাধ্যবাধকতার চাপে পড়ে আক্রমণ শুরু করা অবশ্যই চলবে না। আক্রমণাত্মক লড়াই চালনার প্রয়াসকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় সৈন্যশক্তি ব্যবহারের নমনীয়তা, আর পরিকল্পনাও অনুরূপভাবে দরকার মুখ্যতঃ আক্রমণের জয়লাভকে সুনিশ্চিত করার জন্য। রণকৌশলগত প্রতিরক্ষা যদি আক্রমণ চালাবার কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য না করে, তবে তা অর্থহীন। দ্রুত নিষ্পত্তি বলতে একটা আক্রমণের গতিমাত্রা বোঝায়, আর বহির্লাইন বলতে বোঝায় আক্রমণের কর্মপরিধি এলাকা। শত্রুকে ধ্বংস করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আক্রমণ এবং সেটাই হচ্ছে আবার নিজেকে রক্ষা করারও মুখ্য উপায়। নিছক প্রতিরক্ষা ও পশ্চাদপসরণ কিন্তু নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে শুধুমাত্র একটি সাময়িক ও আংশিক ভূমিকাই গ্রহণ করতে পারে, শত্রুকে ধ্বংস করার কাজে তা একেবারেই অকেজো।

উপরোক্ত নীতি নিয়মিত যুদ্ধে ও গেরিলাযুদ্ধে—উভয়ক্ষেত্রেই মূলতঃ একরকম, শুধুমাত্র অভিব্যক্তির রীতিতেই কিছুটা পার্থক্য ঘটে। কিন্তু গেরিলাযুদ্ধের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজন। অভিব্যক্তির রীতিতে এই পার্থক্য থাকার জন্যই নিয়মিত যুদ্ধের লড়াই চালনার পদ্ধতিগুলির থেকে গেরিলাযুদ্ধের লড়াই চালনার পদ্ধতিগুলি ভিন্ন হয়; আর দুই রীতির এই পার্থক্যকে গুলিয়ে ফেললে গেরিলাযুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব হয়ে উঠবে।

পঞ্চম অধ্যায়

নিয়মিত যুদ্ধের সংগে সমন্বয়সাধন

গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির দ্বিতীয় সমস্যাটি হচ্ছে নিয়মিত যুদ্ধের সংগে তার সমন্বয়সাধন। এটা হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের বাস্তব কার্যকলাপের প্রকৃতি অনুসারে লড়াই চালানোর ব্যাপারে গেরিলাযুদ্ধের ও নিয়মিত যুদ্ধের মধ্যেকার সম্পর্কটাকে ব্যাখ্যা করার বিষয়। শত্রুকে কার্যকরীভাবে পরাজিত করার কাজে এই সম্পর্কের উপলব্ধিটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিয়মিত যুদ্ধের সংগে গেরিলাযুদ্ধের সমন্বয় তিন রকমের : রণনীতির যুদ্ধাভিযানের ও লড়াইয়ের সমন্বয়।

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, গেরিলাযুদ্ধে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে শত্রুকে পঙ্গু করার, তাকে আটকে রাখার ও তার সরবরাহ পথ নষ্ট করে দেবার ভূমিকা পালন করছে এবং সারা দেশের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে মানসিকভাবে অনুপ্রাণিত করছে,—এবং এ সবই হচ্ছে রণনীতিগতভাবে নিয়মিত যুদ্ধের সংগে গেরিলাযুদ্ধের সমন্বয়সাধন। তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশের গেরিলাযুদ্ধের কথাই ধরা যাক। অবশ্য, দেশব্যাপী জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হবার আগে, সেখানে সমন্বয়ের প্রশ্নটিই ওঠেনি, কিন্তু এই যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে এ ধরনের সমন্বয়ের তাৎপর্যটা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। সেখানকার গেরিলারা শত্রুর যে সৈনিকটিকে নিহত করে, তাদের ওপরে যে গুলিটি ব্যয় করতে তারা শত্রুকে বাধ্য করে, এবং তারা শত্রুর যে সৈনিকটিকে মহাপ্রাচীরের দক্ষিণে অগ্রসর হতে বাধা দেয়, প্রতিরোধ-যুদ্ধের গোটা শক্তিতে সেগুলির প্রত্যেকটিকে অবদান হিসেবে ধরা যেতে পারে। উপরন্তু, এটাও স্পষ্ট যে, মানসিক দিক থেকে সেগুলি গোটা শত্রুবাহিনী ও সমগ্র জাপানের ওপর হতাশাকারী প্রভাব ফেলছে এবং আমাদের গোটা সৈন্যবাহিনী ও জনগণের ওপর ফেলছে উৎসাহজনক প্রভাব। পিপিং-সুইয়ুয়ান, পিপিং-হানখৌ, তিয়েনসিন-পুখৌ, তাতুং পুচৌ, চেংতিং-তাইয়ুয়ান, আর শাংহাই-হাংচৌ রেলপথের দুই পাশে চালিত গেরিলাযুদ্ধ যে রণনীতিগত সমন্বয়ের ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা আরও স্পষ্ট। বর্তমানে শত্রু যখন রণনীতিগত আক্রমণ করছে, তখনই নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সংগে সমন্বয়সাধন করে গেরিলাবাহিনী যে শুধু রণনীতিগত প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকাই গ্রহণ করছে তাই নয়; শত্রু যখন রণনীতিগত আক্রমণ শেষ করে তার অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে সুরক্ষিত করার কাজে লিপ্ত হবে, তখন নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সংগে শুধুমাত্র সমন্বয়সাধন করে শত্রুর রক্ষাত্মক কার্যকলাপে সে যে বাধা দেবে তাই নয়; উপরন্তু যখন নিয়মিত সৈন্যবাহিনী রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ শুরু করবে, তখন নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সংগে সমন্বয়সাধন করে শত্রুকে তাড়িয়ে দেবে এবং সমস্ত হৃত ভূমিকে পুনরুদ্ধার করবে গেরিলাবাহিনী। রণনীতিগত সমন্বয়সাধনে গেরিলাযুদ্ধের মহান ভূমিকাটিকে উপেক্ষা করা অবশ্যই চলবে না। গেরিলাবাহিনীর এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর পরিচালকদের এই ভূমিকাটিকে অবশ্যই স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে।

এ ছাড়া, গেরিলাযুদ্ধ যুদ্ধাভিযানে নিয়মিত যুদ্ধকর্মের সংগে সমন্বয়সাধনের ভূমিকাও গ্রহণ করে। উদাহরণ, ইয়ানমেনকুয়ানের উত্তর ও দক্ষিণে গেরিলাবাহিনী তাতুং-পুচৌ রেলপথটিকে এবং পিংসিংকুয়ান ও ইয়াংকাংখৌ-এর দুই মোটরগামী পথটিকে ধ্বংস করে তাইয়ুয়ানের উত্তরস্থ সিনখৌ যুদ্ধাভিযানে সমন্বয়সাধনের যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা খুবই উল্লেখযোগ্য। আর একটি উদাহরণ, শত্রুর দ্বারা ফেংলিংতু দখলের পর গোটা শানসী প্রদেশের এধার থেকে ওধার অবধি ব্যাপকভাবে চালিত গেরিলাযুদ্ধ (যা প্রধানতঃ নিয়মিত সৈন্যবাহিনী চালাচ্ছে) শেনসী প্রদেশে হোয়াংহো নদীর পশ্চিমের ও হোনান প্রদেশে হোয়াংহো নদীর দক্ষিণের প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের সংগে যে যুদ্ধাভিযানগত সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করেছে তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। আবার শত্রু যখন দক্ষিণ শানতুং আক্রমণ করেছিল, তখন গোটা উত্তর চীনের পাঁচটি প্রদেশে চালিত গেরিলাযুদ্ধ আমাদের সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণ শানতুংয়ের যুদ্ধাভিযানের সংগে সমন্বয়সাধনে বিরাট অবদান জুগিয়েছিল। এ ধরনের কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগস্থ সমস্ত গেরিলা ঘাঁটি এলাকার পরিচালকদেরকে অথবা সাময়িকভাবে সেখানে প্রেরিত গেরিলা সৈন্যসংস্থানের পরিচালকদেরকে অবশ্যই নিজেদের সৈন্যশক্তিকে ভালভাবে বিন্যাস করতে হবে, সময় ও স্থানীয় অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে শত্রুকে পঙ্গু করে ফেলার, তাকে আটকে রাখার, তার সরবরাহ পথ নষ্ট করে দেবার এবং অন্তর্লাইনে বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে রত আমাদের সৈন্যবাহিনীকে মানসিক দিক থেকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে এবং এইভাবে যুদ্ধাভিযানে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব বহন করার জন্য শত্রুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে দুর্বল স্থানে সক্রিয়ভাবে কার্যকলাপ চালাতে হবে। নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সংগে যুদ্ধাভিযানে সমন্বয়সাধন করার দিকে মনোযোগ না দিয়ে প্রত্যেকটি গেরিলা এলাকা অথবা প্রত্যেকটি গেরিলাবাহিনী যদি শুধু নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী চলে, তাহলে, যদিও সাধারণ রণনীতিগত সামরিক কার্যকলাপে তারা সমন্বয়সাধনের কিছু ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকবে, তবুও যুদ্ধাভিযানে সমন্বয়সাধন না করার কারণে, তাদের এই রণনীতিগত সমন্বয়সাধনের তাৎপর্য কমে যাবে। এই বিষয়ে গেরিলাযুদ্ধের সমস্ত পরিচালকদের গভীরভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে পৌঁছাবার জন্য ব্যাপকভাবে বেতার যোগাযোগ স্থাপন করা

সমস্ত অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর গেরিলাবাহিনী ও গেরিলা সৈন্যসংস্থানের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে লড়াইয়ের সমন্বয়সাধন, অর্থাৎ রণক্ষেত্রে লড়াই করার সমন্বয়-সাধনই হচ্ছে অন্তর্লাইনে রণক্ষেত্রের নিকটবর্তী সমস্ত গেরিলাবাহিনীর কর্তব্য। অবশ্য এটা শুধু নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর কাছাকাছি গেরিলাবাহিনী অথবা নিয়মিত সৈন্যবাহিনী থেকে সাময়িকভাবে প্রেরিত গেরিলাবাহিনীর বেলায়ই খাটে। এইরকম অবস্থা গেরিলাবাহিনীকে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর পরিচালকদের নির্দেশানুসারে তার ওপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। সাধারণতঃ এ কাজ হচ্ছে শত্রুবাহিনীর কোন অংশকে আটকে রাখা, শত্রুর সরবরাহ পথ নষ্ট করে দেওয়া, শত্রুর অবস্থার পর্যবেক্ষণ করা এবং পথপ্রদর্শক হওয়া, ইত্যাদি। নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর পরিচালকদের নির্দেশ না থাকলেও, গেরিলাবাহিনীকে নিজের উদ্যোগে এইসব কাজ করা উচিত। হাত গুটিয়ে বসে থাকার, নড়াচড়া ও লড়াই না করার অথবা লড়াই না করে নড়াচড়া করার মনোভাব গেরিলাবাহিনীর পক্ষে সম্পূর্ণ অসহনীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঘাঁটি এলাকা স্থাপন

জাপ বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে ঘাঁটি এলাকা স্থাপন সম্পর্কিত সমস্যা, যে সমস্যার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বটা যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্র ও নির্মমতা থেকে আসে। কারণ আমাদের হৃত ভূখণ্ডের পুনরুদ্ধারটা শুধুমাত্র তখনই সম্ভব হবে, যখন দেশজোড়া রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ শুরু হবে; ততদিনে শত্রুর ফ্রন্ট চীনের মধ্যভাগের গভীর অবধি বিস্তৃত হয়ে পড়বে এবং দেশকে দুইভাগে বিভক্ত করে ফেলবে, আর আমাদের মাতৃভূমির একটা ছোট ভাগ, এমনকি হয়তো-বা তার বড় ভাগটাই, শত্রুর কবলে পড়ে তার পশ্চাদ্ভাগে পরিণত হবে। শত্রু-কবলিত এই বিরাট এলাকার সর্বত্রই আমাদের ছড়িয়ে দিতে হবে গেরিলাযুদ্ধ, শত্রুর পশ্চাদ্ভাগকে তার ফ্রন্টে পরিণত করতে হবে, আর তার দখলীকৃত গোটা ভূখণ্ডে অবিরামভাবে যুদ্ধ করতে বাধ্য করতে হবে তাকে। যতদিন অবধি আমাদের রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ শুরু না হয় এবং যতদিন অবধি আমাদের হৃত ভূখণ্ডের পুনরুদ্ধার না হয়,

ততদিন পর্যন্ত শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অটলভাবে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া দরকার; কতদিন অবধি চালিয়ে যাওয়া দরকার যদিও তা সঠিক করে নির্ধারণ করা অসম্ভব, কিন্তু, নিঃসন্দেহে সেজন্য বেশ দীর্ঘ সময় লাগবে। এই কারণেই যুদ্ধটা হবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। একই সময়ে অধিকৃত এলাকায় নিজের স্বার্থকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে শত্রু অবশ্যই গেরিলাযুদ্ধের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামকে দিন দিন তীব্রতর করবে, বিশেষ করে তার রণনীতিগত আক্রমণ বন্ধ করার পরে, অবশ্যই গেরিলাবাহিনীকে নিষ্ঠুরভাবে দমন-পীড়ন শুরু করবে। এইভাবে দীর্ঘস্থায়িত্বের সাথে নির্মমভাবে যোগ হওয়ায় শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে ঘাঁটি এলাকা ব্যতিরেকে গেরিলাযুদ্ধকে জীইয়ে রাখাটা অসম্ভব।

তাহলে, গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকাগুলো কি? এগুলো হচ্ছে রণনীতি-গত ঘাঁটি, যার ওপর নির্ভর করেই গেরিলাবাহিনী নিজেদের রণনীতিগত কর্তব্য পালন করে এবং নিজেদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করার, শত্রুকে ধ্বংস করার ও হটিয়ে দেবার লক্ষ্য অর্জন করে। এরকম রণনীতিগত ঘাঁটি না থাকলে আমাদের সকল রণনীতিগত কর্তব্য পালন করার এবং যুদ্ধের লক্ষ্য হাসিল করার জন্য নির্ভর করার মতো কিছুই থাকবে না। পশ্চাদ্ভাগবিহীন লড়াই হচ্ছে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে গেরিলাযুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্য।, কারণ গেরিলাবাহিনী দেশের সাধারণ পশ্চাদ্ভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন। তবু, ঘাঁটি এলাকা বাদ দিয়ে গেরিলাযুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরে টিঁকে থাকতে এবং বিকাশলাভ করতে পারে না। বস্তুতঃ ঘাঁটি এলাকাগুলোই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের পশ্চাদ্ভাগ।

ইতিহাসে 'ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহী ধরনের বহু কৃষক-যুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সেগুলির কোনটাই সফল হয়নি। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি-বিদ্যার বর্তমান যুগে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীর পদ্ধতি ব্যবহার করে বিজয়-লাভ করার প্রচেষ্টাটা এখন একেবারেই অমূলক কল্পনা। 'তবু, আজকের নিঃস্ব কৃষকদের মধ্যে এই ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীর ভাবটা এখনো রয়ে গেছে, আর তাদের এই ভাবটা গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকদের মস্তিষ্কে দানা বেঁধে ওঠে যে, ঘাঁটি এলাকার না আছে কোন দরকার, না আছে তার কোন গুরুত্ব। তাই, গেরিলা-যুদ্ধের পরিচালকদের মস্তিষ্ক থেকে এই ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীর ভাবকে দূর করে দেওয়াটা হচ্ছে ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের নীতি নির্ধারণ করার পূর্বশর্ত। ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা উচিত কিনা এবং তাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা উচিত কিনা—এই সমস্যাটা, অন্য কথায়, ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের মতাদর্শ এবং ভ্রাম্যমাণ

বিদ্রোহীর মতাদর্শের মধ্যেকার সংগ্রামের সমস্যাটা যে-কোন গেরিলাযুদ্ধেই উঠে থাকে, এবং কিছুটা পরিমাণে আমাদের জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই, ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদের ধারণার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম হবে একটি অনিবার্য প্রক্রিয়া। ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদকে পুরোপুরি-ভাবে পরাভূত করা হলে এবং ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার নীতিকে চালু করা ও কাজে প্রয়োগ করা হলেই কেবল দীর্ঘকাল ধরে গেরিলাযুদ্ধ বজায় রাখার পক্ষে অনুকূল অবস্থা দেখা দেয়।

ঘাঁটি এলাকার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার পর ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের সময়ে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি অবশ্যই উপলব্ধি করা ও সমাধান করা উচিত। এই সমস্যাগুলি হচ্ছে: বিভিন্ন ধরনের ঘাঁটি এলাকা, গেরিলা অঞ্চল ও ঘাঁটি এলাকা, ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের শর্ত, ঘাঁটি এলাকার সুদৃঢ়ীকরণ ও সম্প্রসারণ এবং আমাদের ও শত্রুর দ্বারা ব্যবহৃত কয়েক প্রকারের পরিবেষ্টন।

১। বিভিন্ন ধরনের ঘাঁটি এলাকা

জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকাগুলি প্রধানতঃ তিন ধরনের: পার্বত্য অঞ্চলের ঘাঁটি এলাকা, সমতলভূমির ঘাঁটি এলাকা ও নদী-হ্রদ মোহনা অঞ্চলের ঘাঁটি এলাকা।

পার্বত্য অঞ্চলে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার সুবিধাটি সুস্পষ্ট, ছাংপাই[১], উতাই[২], তাইহাং[৩], তাইশান[৪], ইয়ানশান[৫], মাওশান[৬] পর্বতে যেসব ঘাঁটি এলাকা স্থাপিত হয়েছে বা হচ্ছে অথবা হবে, তার সবগুলিই এই ধরনের। এইসব ঘাঁটি এলাকা হচ্ছে এমন স্থান, যেখানে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে যাওয়া সবচেয়ে বেশি সম্ভব, সেগুলি হচ্ছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ। শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলে গেরিলাযুদ্ধকে আমাদের পরিপুষ্ট করে তুলতেই হবে এবং ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করতেই হবে।

অবশ্য, পর্বতের তুলনায় সমতলভূমি কিছুটা কম উপযোগী, কিন্তু সমতল-ভূমিতেও গেরিলাযুদ্ধের বিকাশসাধন করা বা কোন ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা কোনরকমেই অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ, হোপেই সমতলভূমিতে এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম শানতুংয়ের সমতলভূমিতে ব্যাপকবিস্তৃত গেরিলাযুদ্ধ এ কথাই

প্রমাণ করে যে, সমতলভূমিতেও গেরিলাযুদ্ধের বিকাশসাধন করা সম্ভব। সমতলভূমি এলাকাগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে এখনো কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কিন্তু এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাময়িক ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা সম্ভব, আর বলা যায় যে, ছোট ছোট বাহিনীর অথবা মরশুমী চরিত্রের ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা সম্ভব। কারণ একদিকে সমস্ত ভূখণ্ডে সৈন্যশক্তি বন্টনের জন্য শত্রুর হাতে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্যশক্তি নেই, আর সে এক তুলনাবিহীন বর্বরতার নীতি চালিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে চীনের রয়েছে সুবিশাল ভূখণ্ড ও বিরাট সংখ্যক জনগণ যাঁরা জাপানকে রুখেছেন, এইসব অবস্থাই সমতলভূমিতে গেরিলাযুদ্ধকে বিকশিত করার ও সাময়িক ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার অনুকূল বাস্তবমুখী শর্ত যুগিয়েছে। অধিকন্তু, যদি যথার্থ সামরিক পরিচালনা করা হয়, তাহলে অবশ্য বলা উচিত যে, ছোট ছোট বাহিনীর অস্থায়ী কিন্তু দীর্ঘকালীন ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা সম্ভব[৭]। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, শত্রু যখন তার রণনীতিগত আক্রমণ শেষ করে নিজের অধিকৃত অঞ্চলকে সুরক্ষিত করার পর্যায়ে প্রবেশ করে, তখন সে যে গেরিলাযুদ্ধের সমস্ত ঘাঁটি এলাকার ওপর বর্বর আক্রমণ শুরু করবেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর সে আক্রমণের সবচেয়ে প্রথম ধাক্কাটা স্বভাবতঃই এসে পড়বে সমতলভূমির গেরিলা ঘাঁটি এলাকাগুলির ওপরে। তখন সমতল-ভূমিতে কার্যকলাপে রত বড় বড় গেরিলা সৈন্যসংস্থান সেখানে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে না এবং পরিস্থিতি অনুসারে ধীরে ধীরে পার্বত্য অঞ্চলে সরে যেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, হোপেই সমতলভূমি থেকে উতাই ও তাইহাং পাহাড়ে সরে যাওয়া এবং শানতুং সমতলভূমি থেকে তাইশান পাহাড়ে ও শানতুং উপদ্বীপে সরে যাওয়া। কিন্তু, জাতীয় যুদ্ধের অবস্থায় বহু ছোট ছোট গেরিলাবাহিনী বজায় রাখা, সুবিস্তীর্ণ সমতলভূমির বিভিন্ন জেলাগুলিতে সেগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং লড়াইয়ের একটা পরিবর্তনশীল পদ্ধতি গ্রহণ করা, অর্থাৎ ঘাঁটি এলাকাগুলিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করার লড়াইয়ের পদ্ধতি গ্রহণ করাটা যে অসম্ভব তা বলা যায় না। গ্রীষ্মকালে উঁচু শস্যচারার 'সবুজ যবনিকা' এবং শীতকালে জমে যাওয়া নদীর সুযোগ নিয়ে মরশুমী চরিত্রের গেরিলাযুদ্ধ চালানো নিশ্চয়ই সম্ভব। বর্তমানে শত্রুর পক্ষে গেরিলাদের ওপর আক্রমণ করার মতো বাড়তি শক্তি নেই এবং ভবিষ্যতেও তার পক্ষে এর জন্য যথেষ্ট শক্তি থাকবে না, এই অবস্থায় বর্তমানে

সমতলভূমিতে গেরিলাযুদ্ধকে ব্যাপকভাবে পরিপুষ্ট করার ও সাময়িক ঘাঁটি-এলাকা স্থাপন করার নীতি এবং ভবিষ্যতের জন্য ছোট ছোট বাহিনীর গেরিলাযুদ্ধকে, কমপক্ষে মরশুমী চরিত্রের গেরিলাযুদ্ধকে অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার এবং অস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের নীতি নির্ধারণ করাটা একান্ত প্রয়োজন।

নদী-হ্রদ-মোহনা অঞ্চলে গেরিলাযুদ্ধকে পরিপুষ্ট করার এবং ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার সম্ভাবনা বাস্তবতঃ সমতলভূমির চেয়ে বেশি, যদিও পার্বত্য অঞ্চলের তুলনায় তা কিছুটা কম। ইতিহাসে তথাকথিত 'সামুদ্রিক বোম্বেটে' 'জল-দস্যুরা' অসংখ্য নাটকীয় যুদ্ধ চালিয়েছিল, চীনা লালফৌজের যুগে হোংহু হ্রদের এলাকায় গেরিলাযুদ্ধ কয়েক বছর ধরে টিঁকে ছিল। এসবই প্রমাণ করে যে, নদী-হ্রদ-মোহনা অঞ্চলে গেরিলাযুদ্ধ গড়ে তোলা ও ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা সম্ভব। কিন্তু এইদিকে বিভিন্ন জাপ-বিরোধী পার্টি ও দল এবং জাপ-বিরোধী জনগণ এখনো যথেষ্ট দৃষ্টি দেয়নি। যদিও এই ধরনের অঞ্চলে গেরিলাযুদ্ধ গড়ে তোলার জন্য বিষয়ীগত অবস্থা এখনো পাকা হয়নি, তবুও নিঃসন্দেহে আমাদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া এবং কাজ শুরু করা উচিত। দেশ-ব্যাপী গেরিলাযুদ্ধের বিকাশসাধনের একটা দিক হিসেবে ইয়াংসি নদীর উত্তরের হোংজে হ্রদ অঞ্চলে, ইয়াংসি নদীর দক্ষিণের তাইহু হ্রদ অঞ্চলে, এবং নদী বরাবর ও সমুদ্রোপকূলে শত্রু-অধিকৃত সমস্ত নদী-মোহনা-খাড়ি অঞ্চলে ভালভাবে গেরিলাযুদ্ধ সংঘটিত করা এবং এই নদী-হ্রদ-মোহনা অঞ্চলে ও তার কাছাকাছি দীর্ঘস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা উচিত। যদি তা না করা হয় তবে নিঃসন্দেহে জলপথে পরিবহনের সুবিধা শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হবে; জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রণনীতিগত পরিকল্পনায় এটা একটা ফাঁক, এই ফাঁককে যথাসময়ে ভরে নেওয়া উচিত।

২। গেরিলা অঞ্চল ও ঘাঁটি এলাকা

শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে চালিত গেরিলাযুদ্ধের পক্ষে গেরিলা অঞ্চল ও ঘাঁটি এলাকার মধ্যে তফাৎ আছে। যেসব এলাকার চারিদিকে শত্রুর দখল রয়েছে কিন্তু যার মধ্যভাগ শত্রুর অধিকৃত নয়, অথবা শত্রুর দ্বারা দখল করা হয়েছিল কিন্তু ইতিমধ্যেই পুনরুদ্ধার করা হয়েছে—যেমন, উতাই পার্বত্য এলাকার (অর্থাৎ শানসী-চাহার-হোপেই সীমান্ত এলাকার) কোন কোন জেলা

এবং তাইহাং ও তাইশান পাহাড়ী এলাকার কোন কোন জায়গা—সেইসব এলাকা হচ্ছে তৈরী ঘাঁটি এলাকা, গেরিলাবাহিনীর পক্ষে এগুলোর, ওপর নির্ভর করে গেরিলাযুদ্ধ প্রসারিত করা খুবই সুবিধাজনক। কিন্তু এইসব ঘাঁটি এলাকার অন্যান্য জায়গার অবস্থাটা ভিন্ন, যেমন উতাই পার্বত্য এলাকার পূর্ব ও উত্তরভাগে—অর্থাৎ পশ্চিম হোপেই ও দক্ষিণ চাহারেব কোন কোন অংশে এবং পাওতিংয়ের পূর্বস্থ ও ছ্যাংচৌ'র পশ্চিমস্থ অনেক জায়গায়; গেরিলাযুদ্ধেব গোড়ার দিকে গেরিলারা এই জায়গাগুলিকে পুরোপুরি অধিকার কবে নিতে সক্ষম হয়নি, তখন তারা শুধু সেখানে ঘন ঘন গেবিলা-হানাই দিতে পেরেছিল। গেরিলাবাহিনী যখন আসে তখন এই জায়গাগুলি থাকে গেরিলা-বাহিনীর দখলে, আব তাবা সরে গেলেই জাপানেব পুতুল সরকারের অধীনে পড়ে। এই ধরনেব এলাকা এখনো গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকা হয়ে ওঠেনি, ববং এগুলি হচ্ছে এমন স্থান যাকে বলতে পাবা যায় গেবিলা অঞ্চল। এই রকমের গেবিলা অঞ্চল যখন গেরিলাযুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাবে, অর্থাৎ বিরাট সংখ্যক শত্রুসৈন্যকে যখন সেখানে নিশ্চিহ্ন বা পরাজিত করা হবে, পুতুল সরকারকে যখন ধ্বংস কবা হবে, জনসাধারণের সক্রিয়তাকে যখন জাগিয়ে তোলা হবে, জাপ-বিরোধী গণ-সংগঠনগুলি যখন গড়ে উঠবে, জনসাধারণের স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী যখন বিকশিত হয়ে উঠবে এই জাপ-বিরোধী শাসনব্যবস্থাকে যখন সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা হবে, তখন এইরকমের গেরিলা অঞ্চলগুলি ঘাঁটি এলাকায় রূপান্তরিত হবে। এই ঘাঁটি এলাকাগুলোকে আমাদেব পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ঘাঁটি এলাকার সঙ্গে জুড়ে দেওয়াটাকেই আমরা ঘাঁটি এলাকার প্রসার বলছি।

কোন কোন জায়গায়, গেরিলাযুদ্ধের কার্যকলাপেব গোটা অঞ্চলই শুরুতে গেরিলা অঞ্চল ছিল। এর উদাহরণ হল হোপেইর গেরিলাযুদ্ধ। সেখানে দীর্ঘকাল ধরে পুতুল শাসনব্যবস্থা চলে আসছে, স্থানীয় বিদ্রোহী জনসাধারণের সশস্ত্র বাহিনী ও উতাই পর্বত থেকে প্রেরিত গেবিলা শাখাবাহিনীব কার্যকলাপের শুরুতে তারা এই অঞ্চলে কেবলমাত্র কতকগুলো ভাল জায়গা বেছে নিয়ে নিজেদের সাময়িক পশ্চাদ্ভাগ হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছিল; সেটাকে সাময়িক ঘাঁটি এলাকা বলা যায়। যখন এই এলাকার শত্রুকে ধ্বংস করা হবে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার কাজ প্রসারিত হবে, শুধু তখনই এই এলাকাটা গেরিলা অঞ্চল থেকে রূপান্তরিত হয়ে একটা অপেক্ষাকৃত

দৃঢ়স্থায়ী ঘাঁটি এলাকায় পরিণত হবে।

সুতরাং দেখা যায় যে, গেরিলা অঞ্চলকে ঘাঁটি এলাকায় পরিণত করাটা হচ্ছে একটি কষ্টসাধ্য সৃজনশীল প্রক্রিয়া। গেরিলা অঞ্চলটা ঘাঁটি এলাকায় পরিণত হল কিনা তা এই অঞ্চলে কি পরিমাণে শত্রুকে ধ্বংস করা হয় এবং জনসাধারণকে কি মাত্রায় উদ্বুদ্ধ করা হয়, তার ওপরে নির্ভর করে নির্ধারণ করা যায়।

বহু অঞ্চলই দীর্ঘকাল পর্যন্ত গেরিলা অঞ্চল হিসেবে থেকে যাবে। এইসব অঞ্চলকে নিজের কর্তৃত্বে রাখার জন্য শত্রু সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে, কিন্তু সেখানে কোন দৃঢ়স্থায়ী পুতুল সরকার স্থাপন করতে সে সক্ষম হবে না, আমরাও সর্বশক্তি দিয়ে গেরিলাযুদ্ধ প্রসারিত করার চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা সেখানে জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপনের লক্ষ্য অর্জন করতে পারব না। শত্রুর দখল করা রেলপথ বরাবর ও বড় বড় শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং সমতলভূমির কোন কোন এলাকায় এ ধরনের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়।

শত্রুর প্রবল সৈন্যশক্তির দ্বারা সংরক্ষিত বড় বড় শহর রেলস্টেশন ও কোন কোন সমতলভূমির এলাকাগুলির ক্ষেত্রে গেরিলাযুদ্ধটা শুধু তাদের নিকটবর্তী-জায়গা পর্যন্তই ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাদের ভেতর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না, সেখানে পুতুল সরকারের অপেক্ষাকৃত দৃঢ়স্থায়ী শাসনব্যবস্থা থাকে। এটা হচ্ছে আবার আর এক ধরনের অবস্থা।

আমাদের নেতৃত্বের ভুলে অথবা শত্রুর প্রচণ্ড চাপে ওপরে বর্ণিত অবস্থা তার বিপরীতে পরিবর্তিত হতেও পারে, অর্থাৎ আমাদের ঘাঁটি এলাকা একটা গেরিলা অঞ্চলে পরিণত হতে পারে, গেরিলা অঞ্চল শত্রুর অপেক্ষাকৃত দৃঢ়স্থায়ী দখলীকৃত এলাকায় রূপান্তরিত হতে পারে। এ ধরনের অবস্থা দেখা দেওয়া সম্ভব এবং তার জন্য গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকদের বিশেষভাবে সজাগ থাকতে হবে।

তাই, গেরিলাযুদ্ধ ও শত্রুর সংগে আমাদের সংগ্রামের ফলে, শত্রু-অধিকৃত গোটা অঞ্চলে নিম্নলিখিত তিন ধরনের জায়গায় ভাগ করা যায়: প্রথম, আমাদের গেরিলাবাহিনী ও আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার কর্তৃত্বাধীন জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকা; দ্বিতীয়, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তার পুতুল সরকারের অধিকৃত এলাকা; আর তৃতীয়টা হচ্ছে মধ্যবর্তী এলাকা যাকে দখলে

নেবার জন্ত দু'পক্ষের মধ্যে সংগ্রাম চলছে, অর্থাৎ গেরিলা অঞ্চল। গেরিলা-যুদ্ধের পরিচালকদের কর্তব্য হচ্ছে প্রথম ও তৃতীয় ধরনের এলাকাকে যত বেশি সম্ভব বিস্তৃত করা, এবং দ্বিতীয় ধরনের এলাকাকে যথাসম্ভব সংকুচিত করা। এটাই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত কর্তব্য।

৩। ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের শর্ত

ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার মৌলিক শর্ত হচ্ছে—একটি জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী থাকা চাই এবং তার দ্বারা শত্রুকে পরাজিত করা ও জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলা চাই। সুতরাং, ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের সর্বপ্রথম সমস্যা হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার সমস্যা। গেরিলাযুদ্ধের নেতাদের অবশ্যই সর্বশক্তি দিয়ে এক বা একাধিক গেরিলাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে, আর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সেগুলিকে বিকশিত করে ক্রমে ক্রমে গেরিলা সৈন্যসংস্থানে পরিণত করতে হবে এবং কালক্রমে তাদেরকে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে ও নিয়মিত সৈন্য-সংস্থানে বিকশিত করে তুলতে হবে। ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার জন্ত মূল চাবিকাঠি হল একটা সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলা, সশস্ত্র বাহিনী যদি না থাকে অথবা সেটা যদি দুর্বল হয়, তাহলে কিছুই করতে পারা যাবে না। এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত।

ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের দ্বিতীয় অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে জনসাধারণের সহ-যোগিতায় সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা শত্রুকে পরাজিত করা। শত্রুর নিয়ন্ত্রণাধীন সব জায়গাই হচ্ছে শত্রুর ঘাঁটি এলাকা, গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকা নয়, এবং স্বভাবতঃই শত্রুকে পরাজিত না করে তার ঘাঁটি এলাকাকে আমাদের গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকায় রূপান্তরিত করা অসম্ভব। গেরিলাযুদ্ধের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায়, শত্রুর আক্রমণকে যদি প্রতিহত করা না হয় এবং শত্রুকে যদি পরাজিত করা না হয় তাহলে আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন জায়গা-গুলিও শত্রুর নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাবে, ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের জন্ত কোন সম্ভাবনাই আর থাকবে না।

ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের তৃতীয় অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনীর শক্তিসহ সমস্ত শক্তিসামর্থ্য প্রয়োগ করে জাপ-বিরোধী গণ-সংগ্রাম গড়ে তোলা। এই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে জনগণকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করে তুলতে হবে, অর্থাৎ আত্মরক্ষাবাহিনী ও গেরিলাবাহিনী সংগঠিত করতে

হবে। আবার এই সংগ্রামের ভেতর দিয়েই বিভিন্ন গণ-সংগঠনকে গড়ে তুলতে হবে; শ্রমিক, কৃষক, যুব, নারী, কিশোর, ব্যবসায়ী ও স্বাধীন পেশাদারী মানুষ—সবাইকে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার ও সংগ্রামী মনোভাবের উন্নতির মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জাপ-বিরোধী সংগঠনে সংগঠিত করতে হবে আর এইসব সংগঠনকে অবশ্যই ধাপে ধাপে প্রসারিত ও উন্নত করে তুলতে হবে। জনসাধারণের সংগঠন না থাকলে তারা নিজেদের জাপ-বিরোধী শক্তিকে কার্যকরী করতে পারে না। এই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে আমাদের অবশ্যই প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন দেশদ্রোহীদের শক্তিকে নির্মূল করে ফেলতে হবে; এটা শুধু জনসাধারণের শক্তির ওপরে নির্ভর করেই সম্পন্ন করতে পারা যায়। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে এ ধরনের সংগ্রামের ভেতর দিয়েই স্থানীয় জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার অথবা তাকে সুদৃঢ় করার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা। যেখানে পূর্বের চীনা শাসনব্যবস্থা শত্রুর দ্বারা বিধ্বস্ত হয়নি, সেখানে ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থনের ভিত্তিতে আমাদের অবশ্যই সেই শাসনব্যবস্থাটাকে পুনর্গঠিত ও সুদৃঢ় করে তুলতে হবে; আর যেখানে সেটা শত্রুর দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছে সেখানে আমাদের উচিত ব্যাপক জনসাধারণের প্রচেষ্টায় সেটাকে আবার গড়ে তোলা। সেটা হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নীতিকে কার্যকরী করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা, আর এই সংস্থাকে অবশ্যই আমাদের একমাত্র শত্রু—জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুর অর্থাৎ দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য জনগণের সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা উচিত।

জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা, শত্রুকে পরাজিত করা ও জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা—এই তিনটি মৌলিক শর্তের ক্রমপরিপূরণের ভেতর দিয়েই শুধু সমস্ত গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকা সত্যিকারভাবে স্থাপন করতে পারা যায়।

এগুলো ছাড়া আমাদের অবশ্যই ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক শর্তেরও উল্লেখ করতে হবে। ইতিপূর্বে 'বিভিন্ন ধরনের ঘাঁটি এলাকা' নামক পরিচ্ছেদে আমরা ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে তিনটি ভিন্ন ধরনের অবস্থা উল্লেখ করেছিলাম; এখানে শুধুমাত্র একটি প্রধান চাহিদার কথা বলা হবে, আর সে চাহিদা হচ্ছে যে, এলাকাটিকে সুবিস্তীর্ণ হতে হবে। চারিদিকে অথবা

তিন দিক থেকে শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত জায়গায় পার্বত্য অঞ্চলই দীর্ঘস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের পক্ষে সবচেয়ে ভাল জায়গা, কিন্তু প্রধান বিষয় হচ্ছে যে, গেরিলাবাহিনীর কৌশলী অভিযান চালাবার জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকা দরকার অর্থাৎ এলাকাটিকে হতে হবে সুবিস্তীর্ণ। এই শর্ত, অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ এলাকা পেলে গেরিলাযুদ্ধকে সমতল অঞ্চলেও প্রসারিত করতে ও তাকে টিঁকিয়ে রাখতে পারা যায়, নদী-হ্রদ-মোহনা অঞ্চলের তো কথাই নেই। চীন দেশের সুবিশালতা ও শত্রুর সৈন্যশক্তির অপর্যাপ্ততা ইতিমধ্যেই মোটামুটিভাবে চীনের গেরিলযুদ্ধকে এই শর্তটি জুগিয়েছে। গেরিলাযুদ্ধ চালানোর সম্ভাবনার দিক থেকে এইটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, কারণ বেলজিয়ামের মতো ছোট দেশে এই শর্ত নেই, তাই সেখানে গেরিলা-যুদ্ধের সম্ভাবনাও খুবই কম, এমনকি মোটেই থাকে না।[৮] কিন্তু চীনদেশে এই শর্ত লাভ করবার জন্য কোন চেষ্টারই দরকার হয় না, আবার এটা কোন অমীমাংসিত সমস্যাও নয়, এই শর্তটি প্রকৃতির দান হিসেবেই এখন শুধু মানুষের ব্যবহারের অপেক্ষাতেই রয়েছে।

প্রাকৃতিক চরিত্রের দিক থেকে দেখতে গেলে অর্থ নৈতিক শর্তের চরিত্র ভৌগোলিক শর্তটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ আমরা এখন মরুভূমির ভেতরে ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের কথা আলোচনা করছি না, সেখানে কোন শত্রু নেই। আমরা শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে ঘাঁটি এলাকা স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা করছি। শত্রু যেসব জায়গায় ঢুকে পড়তে পারে তার প্রত্যেকটিতেই নিশ্চয় বহু আগে থেকেই চীনা বাসিন্দারা বসবাস করে আসছে, আর জীবিকার অর্থ নৈতিক ভিত্তিও অনেক পূর্ব থেকেই রয়েছে, তাই ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের ব্যাপারে সেখানে অর্থ নৈতিক শর্তাদি বাছাই করার প্রশ্ন আদৌ ওঠে না। যেখানেই চীনা বাসিন্দা ও শত্রুসৈন্যদের দেখতে পাওয়া যায়, তা অর্থ নৈতিক অবস্থা যাই হোক না কেন, সেখানে সর্বত্রই গেরিলাযুদ্ধকে প্রসারিত করবার জন্য এবং স্থায়ী বা অস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টি নিয়ে এই প্রশ্ন বিচার করলে ব্যাপারটা হয় অন্যরকম: এদিক থেকে যে সমস্যা দেখা দেবে, তা হচ্ছে অর্থ-নৈতিক নীতির সমস্যা, এটা ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকার অর্থ নৈতিক নীতি অবশ্যই জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের মূল নীতিকে অনুসরণ করে চলবে, অর্থাৎ আর্থিক বোঝাটিকে যুক্তি-

সংগতভাবে বণ্টন করে দিতে হবে এবং বাণিজ্যকে রক্ষা করতে হবে। কি রাজনৈতিক ক্ষমতার স্থানীয় সংস্থাগুলি, কি গেরিলাবাহিনী, কারুরই এই মূল নীতিকে লংঘন করা উচিত নয়, অন্যথায় ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার ও গেরিলাযুদ্ধকে টিঁকিয়ে রাখার ব্যাপারে প্রতিকূল প্রভাব পড়বে। আর্থিক বোঝার যুক্তিসংগত বণ্টনের অর্থ হল 'যাদের টাকা আছে তারা টাকা দান করবে', আর গেরিলাবাহিনীর জন্য কৃষকদেরও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে হবে। বাণিজ্যের সংরক্ষণ বলতে বোঝায় যে, গেরিলা-বাহিনীগুলিকে খুবই নিয়ম-শৃংখলানিষ্ঠ হতে হবে, আর প্রমাণিত দেশদ্রোহী-দের দোকানগুলি ছাড়া কোন ব্যবসায়ীর দোকান বাজেয়াপ্ত করাকে কঠোর-ভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। এটা সহজ ব্যাপার নয়, কিন্তু এই নীতি নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাকে অবশ্যই পালন করতে হবে।

৪। ঘাঁটি এলাকার সুদৃঢ়ীকরণ ও সম্প্রসারণ

চীনে আক্রমণকারী শত্রুদেরকে কয়েকটি ঘাঁটিতে অর্থাৎ বড় বড় শহরে ও প্রধান যোগাযোগ পথ বরাবর এলাকায় আবদ্ধ করে রাখার উদ্দেশ্যে গেরিলাদের অবশ্যই নিজেদের ঘাঁটি এলাকাগুলি থেকে গেরিলাযুদ্ধকে চারিদিকে যথাসম্ভব প্রসারিত করতে হবে, আর শত্রুর প্রত্যেকটা ঘাঁটির একেবারে নিকটে গিয়ে তার ওপরে চাপ দিতে হবে, এইভাবে শত্রুর অস্তিত্বকেই বিপদসংকুল করে তুলতে হবে, তার সৈন্যদের মনোবলকে ভেঙে নড়বড়ে করে দিতে হবে, এর সংগে সংগেই গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকা সম্প্রসারিত করা হবে, এটা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অবশ্যই গেরিলাযুদ্ধে রক্ষণশীলতা-বাদের বিরোধিতা করতে হবে। তা আরামপ্রিয়তা থেকেই উদ্ভূত হোক কিংবা শত্রুর শক্তিকে খুব বড় করে দেখার ফলেই আসুক, উভয় অবস্থায়ই রক্ষণশীলতাবাদ জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে লোকসান টেনে আনবে; এটা গেরিলাযুদ্ধের পক্ষে এবং মূল ঘাঁটি এলাকাগুলির পক্ষেও ক্ষতিকর। অন্যদিকে ঘাঁটি এলাকা সুদৃঢ় করার কাজটিকে ভোলা উচিত নয়। এই ব্যাপারে মুখ্য কাজ হবে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করা আর গেরিলাবাহিনী ও স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীকে ট্রেনিং দেওয়া। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য এবং ঘাঁটি এলাকাকে আরও প্রসারিত করার জন্য এ ধরনের সুদৃঢ়ীকরণের দরকার সুদৃঢ়ীকরণের অভাবে সোৎসাহ সম্প্রসারণ অসম্ভব। গেরিলাযুদ্ধে আমরা যদি·

সুদৃঢ়ীকরণের কাজটিকে ভুলে গিয়ে শুধুই সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি দিই, তাহলে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে আমরা অসমর্থ হব; আর ফলে শুধু যে সম্প্রসারণের সম্ভাবনাই হারাব তা-ই নয়, পরন্তু ঘাঁটি এলাকাগুলির মূল অস্তিত্বটাকেও বিপদাপন্ন করে ফেলব। সঠিক নীতি হচ্ছে সুদৃঢ়ীকরণের সংগে সংগে সম্প্রসারণ করা। এটা হচ্ছে এমন ভাল পদ্ধতি, যার ফলে যখন আমাদের আক্রমণের ইচ্ছা থাকে তখন তা করতে পারি, আর যখন আমাদের আত্মরক্ষার প্রয়োজন তখন তাও করতে পারি। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে, প্রত্যেকটি গেরিলা-বাহিনীর ক্ষেত্রে ঘাঁটি এলাকাকে সুদৃঢ় করার ও সম্প্রসারিত করার সমস্যাটি অবিরতই ওঠে। অবশ্য অবস্থা অনুযায়ী এ সমস্যার বাস্তব সমাধান করা উচিত। এক সময়ে সম্প্রসারণের ওপরে জোর দিতে হয়, অর্থাৎ গেরিলা অঞ্চলকে সম্প্রসারিত করার ও গেরিলাবাহিনী বাড়ানোর কাজের ওপরে জোর দিতে হয়। আবার অন্য এক সময়ে সুদৃঢ়ীকরণের ওপরে জোর দিতে হয়, অর্থাৎ জোর দিতে হয় জনসাধারণকে সংগঠিত করার ও সশস্ত্র বাহিনীকে ট্রেনিং দেওয়ার কাজের ওপরে। যেহেতু প্রকৃতিতে সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ়ীকরণ ভিন্ন সামরিক বিন্যাসব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতিও তদনুসারে ভিন্ন হবে, তাই অবস্থা অনুসারেই এক একটার ওপর এক এক সময়ে গুরুত্ব আরোপ করার দরকার হয়, শুধু তাহলেই এ সমস্যার একটা কার্যকরী সমাধান সম্ভব।

৫। আমাদের ও শত্রুর পারস্পরিক পরিবেষ্টনের রূপ

সামগ্রিকভাবে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে বিচার করলে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে, রণনীতিগতভাবে আমরা শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত, কারণ শত্রু রণনীতিগত আক্রমণ চালাচ্ছে আর লড়াই চালাচ্ছে বহির্লাইনে এবং আমরা রয়েছি রণনীতিগত প্রতিরক্ষায় ও লড়াই চালাচ্ছি অন্তর্লাইনে। শত্রুর দ্বারা আমাদেরকে পরিবেষ্টিত করার এটা হচ্ছে প্রথম রূপ। কারণ বহির্লাইন থেকে বিভিন্ন পথ ধরে আমাদের দিকে অগ্রসরমান শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সংখ্যাগত বিপুলতর সৈন্যশক্তি ব্যবহার করে আমরা যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত আক্রমণ করার এবং বহির্লাইনের লড়াই চালানোর নীতি প্রয়োগ করি, তাই বিভিন্ন পথ দিয়ে অগ্রসরমান শত্রুর প্রত্যেকটি অংশ আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। আমাদের দ্বারা শত্রুকে পরিবেষ্টনের এটা হচ্ছে প্রথম রূপ। শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকাগুলির কথা আমরা যদি

বিবেচনা করি—প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন ঘাঁটি এলাকাকে পৃথক পৃথক করে ধরলে সেগুলি উতাই পার্বত্য অঞ্চলের মতো চারিদিক থেকে শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত অথবা উত্তর-পশ্চিম শানসী এলাকার মতো তিনদিক থেকে শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত। শত্রুর পরিবেষ্টনের এটা হচ্ছে দ্বিতীয় রূপ। কিন্তু, যদি সবগুলি ঘাটি এলাকাকে একসংগে ধরা হয় এবং যদি নিয়মিত বাহিনীর যুক্তফ্রণ্টের সংগে গেরিলাযুদ্ধের সমস্ত ঘাঁটি এলাকাকে একসংগে মিলিয়ে তার সম্পর্কাদি বিচার করা হয়, তাহলে দেখা যায় যে, আমরাও বহুল পরিমাণে শত্রুকে পরিবেষ্টিত করেছি। যেমন, শানসী প্রদেশে তাতুং-পুচৌ রেলপথটিকে তিনদিক দিয়ে (পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বদেশ ও দক্ষিণ প্রান্ত) এবং তাইয়ুয়ান শহরটিকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরেছি আমরা, হোপেই ও শানতুং প্রভৃতি প্রদেশে এরকম পরিবেষ্টনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এটি হচ্ছে শত্রুকে ঘিরে ধরার আমাদের দ্বিতীয় রূপ। তাই দেখা যাচ্ছে যে, শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টনের দুটি রূপ এবং আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টনেরও দুটি রূপ এ যেন **ওয়েইছী** দাবা খেলার[১] মতো। শত্রু ও আমাদের দুই পক্ষের চালিত যুদ্ধাভিযান ও লড়াইগুলি যেন ওয়েইছী দাবা খেলায় পরস্পরের 'ঘুঁটিগুলি দখল করে নেবার' মতো, আর শত্রু কর্তৃক সুরক্ষিত ঘাঁটি স্থাপন ও আমাদের দ্বারা গেরিলা ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা যেন ওয়েইছী দাবা খেলায় 'ফাঁকা ঘর স্থাপন করার' মতো। 'ফাঁকা ঘর স্থাপন করার' ব্যাপারেই শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে গেরিলাযুদ্ধের ঘাটি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিগত ভূমিকাটি প্রকাশ পায়। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের এই সমস্যাটিকে আমরা তুলে ধরেছি এ-কারণেই যে, একদিকে গোটা রাষ্ট্রের সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং অন্যদিকে বিভিন্ন এলাকার গেরিলা-যুদ্ধের পরিচালকরা উভয়েই যেন শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে গেরিলাযুদ্ধের বিকাশ-সাধন করাকে ও সমস্ত সম্ভবপর স্থানে ঘাটি এলাকা স্থাপন করাকে নিজেদের আলোচ্য বিষয়ে স্থান দেন এবং এই সমস্যাকে রণনীতিগত কর্তব্য হিসেবে সম্পাদন করেন। আমরা যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনকে একটা রণনীতিগত ইউনিট, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সম্ভাব্য দেশ—প্রত্যেককে একটি রণনীতিগত ইউনিট করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি জাপ-বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমরা তখন শত্রুর চাইতে আর একটা বেশি পরিবেষ্টনের পদ্ধতি হাতে পাব, এবং এইভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বহির্লাইনের লড়াই চালিয়ে ফ্যাসিবাদী জাপানের বিরুদ্ধে পরিবেষ্টনী

আক্রমণ চালিয়ে যেতে পারব। অবশ্য, বর্তমানে এর কার্যকরী তাৎপর্য না থাকলেও এ ধরনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অসম্ভব নয়।

সপ্তম অধ্যায়

গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত আক্রমণ

গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির চতুর্থ সমস্যা হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত আক্রমণের সমস্যা। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা যে আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের নীতির কথা উল্লেখ করেছি, জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধে যখন আমরা প্রতিরক্ষাত্মক অবস্থায় রত এবং যখন আমরা আক্রমণাত্মক অবস্থায় রত, তখন বাস্তবে কিভাবে সেই আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের নীতি কার্যকরী করা যায়, এটা তারই সমস্যা।

দেশজোড়া রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত আক্রমণের (সঠিক করে বলতে গেলে বলা উচিত রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের) মধ্যে গেরিলা-যুদ্ধের প্রতিটি ঘাঁটি এলাকার ভেতরে ও তার চারিদিকে ছোট ছোট আকারের রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত আক্রমণ ঘটতে থাকে। রণনীতিগত প্রতিরক্ষা বলতে আমরা বোঝাই সেই সময়কার রণনীতিগত পরিস্থিতি ও রণনীতিগত নীতিকে, যখন শত্রু আক্রমণাত্মক অবস্থায় রত আর আমরা প্রতিরক্ষাত্মক অবস্থায় লিপ্ত; রণনীতিগত আক্রমণ বলতে আমরা বোঝাই সেই সময়কার রণনীতিগত পরিস্থিতি ও রণনীতিগত নীতিকে, যখন শত্রু প্রতিরক্ষায় রত আর আমরা আক্রমণে লিপ্ত।

১। গেরিলাযুদ্ধে রণনীতিগত প্রতিরক্ষা

গেরিলাযুদ্ধ বেধে উঠবার এবং সেটা যথেষ্ট মাত্রায় বিকশিত হয়ে উঠবার পর শত্রু অবশ্যম্ভাবিরূপেই গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকাগুলিকে আক্রমণ করবে, আক্রমণ করবে বিশেষ করে সেই সময়ে যখন গোটা দেশটির বিরুদ্ধে তার রণ-নীতিগত আক্রমণ বন্ধ করে সে তার দখল-করা এলাকাগুলিকে সংরক্ষিত করার নীতি গ্রহণ করে। এ ধরনের আক্রমণের অবশ্যম্ভাবিতাকে বোঝা একান্ত দরকার, কারণ অন্যথায় গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকরা একেবারেই প্রস্তুতিহীন অবস্থায় ধরা পড়ে যাবে আর শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পড়ে তারা নিঃসন্দেহে

আতংকগ্রস্ত ও হতভম্ব হয়ে পড়বে এবং তাদের বাহিনী শত্রুর দ্বারা পরাজিত হবে।

গেরিলাদের ও তাদের ঘাঁটি এলাকাগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার উদ্দেশ্যে শত্রু প্রায়শঃই সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণের পদ্ধতি অবলম্বন করতে থাকবে; যেমন, উতাই পার্বত্য অঞ্চলে ইতিমধ্যে যে চার-পাঁচটি তথাকথিত 'শাস্তিমূলক অভিযান' হয়েছে, তার প্রত্যেকটাতেই শত্রুরা একই সময়ে তিন, চার, এমনকি ছয় বা সাতটি দিক থেকে সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয়েছিল। গেরিলাযুদ্ধ প্রসারিত হয়ে উঠবার মাত্রাটা যত বাড়বে, তার ঘাঁটি এলাকার অবস্থান যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে, এবং শত্রুর রণনীতিগত ঘাঁটির ও মুখ্য যোগাযোগপথের পক্ষে বিপদের আশংকাটা যত বেশি বাড়বে, গেরিলাবাহিনী ও তার ঘাঁটি এলাকার ওপর শত্রুর আক্রমণও ততই তীব্রতর ও হিংস্রতর হবে। তাই কোন গেরিলা এলাকার ওপরে শত্রুর আক্রমণ যত বেশি হিংস্রতর ও তীব্রতর হয়, তাতে প্রমাণিত হয় যে, সেখানকার গেরিলাযুদ্ধের সফলতা ততই বেশি আর নিয়মিত যুদ্ধের সংগে গেরিলাযুদ্ধের সমন্বয়সাধনও ততই বেশি কার্যকরী হয়েছে।

যখন শত্রু কয়েকটি পথ দিয়ে সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণ চালাতে থাকে, তখন গেরিলাযুদ্ধের নীতি হচ্ছে সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করে শত্রুর সেই আক্রমণটাকে চুরমার করে দেওয়া। যদি শত্রু কয়েকটি পথ দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে, কিন্তু প্রতিটি পথে শুধুমাত্র একটি বড় অথবা ছোট বাহিনী থাকে, তার যদি কোন অনুগমনকারী বাহিনী না থাকে এবং অগ্রগমনের পথে সে সৈন্যশক্তি মোতায়েন করতে অসমর্থ হয়, দুর্গাদি গড়ে তুলতে ও মোটরগাড়ী চলার উপযোগী রাস্তা তৈরী করতে না পারে, তাহলে শত্রুর এই ধরনের সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণকে সহজেই চুরমার করতে পারা যায়। এই সময়ে, শত্রু আক্রমণে রত, সে বহির্লাইনে লড়াই চালাতে থাকে; আমরা তখন প্রতিরক্ষায় রত এবং অন্তর্লাইনে লড়াই চালাতে থাকি। আমাদের সৈন্য বিন্যাস-ব্যবস্থার ব্যাপারে আমাদের উচিত শত্রুর কয়েকটি কলামকে আটকে রাখার জন্য আমাদের গৌণ সৈন্যশক্তিকে ব্যবহার করা, আর শত্রুর একটি কলামের মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রধান সৈন্যশক্তিকে ব্যবহার করা, এই ব্যাপারে যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের আকস্মিক আক্রমণের পদ্ধতি (মুখ্যতঃ ওৎ পেতে থেকে আক্রমণ করার পদ্ধতি) গ্রহণ

করা, শত্রুবাহিনী যখন চলমান তখন তার ওপরে আঘাত হানা। শত্রু শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও, তার ওপরে বারংবার আকস্মিক আক্রমণ করার ফলে সে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং প্রায়শঃই যাবপথে পশ্চাদপসরণ করবে; তখন গেরিলা-বাহিনীগুলি পশ্চাদ্ধাবনের সময়ে অব্যাহতভাবে শত্রুর ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাকে আরও বেশি দুর্বল করে ফেলতে পারবে। আক্রমণ থামাবার বা পশ্চাদপসরণ শুরু করার আগে শত্রু সাধারণতঃ আমাদের ঘাঁটি এলাকার ভেতরকার জেলা-শহরগুলি অথবা অন্যান্য শহরগুলি দখল করে নিয়ে থাকে। আমাদের উচিত এইসব জেলা-শহরগুলি অথবা অন্যান্য শহরগুলিকে ঘিরে ধরা, তার খাদ্য সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কেটে দেওয়া, এবং যখন সে আর টিকতে না পেরে পিছু হটতে শুরু করে, তখন আমাদের উচিত সেই সুযোগ নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে আক্রমণ করা। শত্রুর একটি কলামকে পরাজিত করার পরে অন্য একটি শত্রু-কলামকে চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্য আমাদের সৈন্যশক্তি সরিয়ে নেওয়া উচিত, আর এইভাবে শত্রুর সৈন্যবাহিনীগুলিকে একে একে চুরমার করেই শত্রুর সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া উচিত।

উতাই পার্বত্য অঞ্চলের মতো একটি বিরাট ঘাঁটি এলাকায় গড়ে ওঠে একটি 'সামরিক অঞ্চল', যা চারটি বা পাঁচটি কিংবা তারও বেশি সংখ্যক 'সামরিক উপ-অঞ্চলে' বিভক্ত থাকে আর প্রত্যেকটি সামরিক উপ-অঞ্চলের নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী থাকে যা স্বাধীনভাবে লড়াই চালাতে পারে। উপরে বর্ণিত রণপদ্ধতিগুলিকে ব্যবহার করে এই সশস্ত্র বাহিনীগুলি প্রায়শঃই একই সময়ে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শত্রুর আক্রমণগুলিকে চুরমার করে দিয়েছে।

শত্রুর সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালনার পরিকল্পনায় সাধারণভাবে আমরা আমাদের প্রধান সৈন্যশক্তিকে অন্তর্লাইনে মোতায়েন করে রাখি। কিন্তু হাতে যখন প্রচুর সৈন্যশক্তি থাকে তখন শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বানচাল করার ও শত্রুর সাহায্যকারী অতিরিক্ত বাহিনীগুলিকে আটকে রাখার জন্য আমাদের গৌণ শক্তিগুলিকে (যেমন, জেলা বা মহকুমার গেরিলাবাহিনী, এমনকি প্রধান শক্তি থেকে পৃথক করে নেওয়া তার একাংশকে) বহির্লাইনে সামরিক কার্যকলাপে ব্যবহার করা উচিত। শত্রু যদি আমাদের ঘাঁটি এলাকায় ঢুকে দীর্ঘকাল ধরে বসে থাকে, তাহলে আমাদের উপরে বর্ণিত রণপদ্ধতিটিকে পাল্টে নিয়ে প্রয়োগ করতে

পারি, অর্থাৎ শত্রুকে আবদ্ধ রাখার জন্য আমাদের বাহিনীর একাংশকে ঘাঁটি এলাকার ভেতরে রেখে শত্রু যে অঞ্চল থেকে এসেছে সেই অঞ্চলটিকে আক্রমণ করার কাজে আমাদের প্রধান শক্তিকে নিয়োগ করতে পারি, আর সেখানে সক্রিয়ভাবে আমাদের কর্মতৎপরতা চালাতে পারি। এইভাবে আমরা দীর্ঘকাল ধরে বসে থাকা সেই শত্রুকে সরে এসে আমাদের প্রধান শক্তিকে আক্রমণ করতে প্রলুব্ধ করতে পারি; এ হচ্ছে 'ওয়েই রাজ্যকে অবরোধ করে চাও রাজ্যকে বাঁচানোর' [২০] পদ্ধতি।

সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে স্থানীয় জনগণের জাপ-বিরোধী আত্মরক্ষাবাহিনী ও সমস্ত গণ-সংগঠনগুলির উচিত যুদ্ধে যোগদানের জন্য সামগ্রিকভাবে সমাবিষ্ট হওয়া আর সর্বপ্রকারে ও সর্ব উপায়ে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করা ও শত্রুর বিরোধিতা করা। শত্রুর বিরোধিতা করার ব্যাপারে, স্থানীয় সামরিক আইন জারি করা এবং যতটা সম্ভব 'আমাদের প্রতিরক্ষার কাজ জোরদার করা ও ক্ষেতগুলিকে পরিষ্কার করা'—এ দুটিই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটির উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশদ্রোহীদের দমন করা ও শত্রুকে খবরাখবর পেতে না দেওয়া, আর পরবর্তীটির লক্ষ্য হচ্ছে লড়াই চালাতে সাহায্য করা (আমাদের প্রতিরক্ষার কাজ জোরদার করা) ও শত্রুকে খাদ্যশস্য পেতে না দেওয়া (ক্ষেতগুলিকে পরিষ্কার করা)। এখানে 'ক্ষেতগুলিকে পরিষ্কার করার' অর্থ হচ্ছে ফসল পাকা মাত্রই তাড়াতাড়ি কেটে নেওয়া।

শত্রু যখন পিছু হটে প্রায়শঃই সে তখন দখলীকৃত শহরগুলোর বাড়ীঘর আর তার পালাবার পথের ধারের গ্রামগুলিকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। এ-সবের উদ্দেশ্য হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকাগুলির ক্ষতিসাধন করা। কিন্তু এটা করতে গিয়ে নিজেকে সে তার পরবর্তী আক্রমণের সময়ে থাকার বাড়ীঘর ও খাদ্যশস্য থেকে বঞ্চিত করে ফেলে যার ফলে নিজেরই ক্ষতি হয়। একটি বিষয়ের দুটি পরস্পরবিরোধী দিক বলতে যা বোঝায় এটি হচ্ছে তারই এক মূর্ত দৃষ্টান্ত।

শত্রুর প্রচণ্ড সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে বারবার সামরিক কার্যকলাপের পরও সেই আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করাটা অসম্ভব বলে প্রমাণিত হওয়ার আগে গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকের পক্ষে তাঁর নিজের ঘাঁটি এলাকা পরিত্যাগ করে অন্য ঘাঁটি এলাকায় সরে যাবার প্রচেষ্টা করা উচিত হবে না। এই অবস্থায়, হতাশাব্যঞ্জক মনোভাবের উদ্ভবকে ঠেকানোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া

উচিত। যদি পরিচালকেরা কোন নীতিগত ভুল না করে থাকে, তবে সাধারণভাবে পার্বত্য অঞ্চলে শত্রুর সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে আর ঘাঁটি এলাকাকে অধ্যবসায় সহকারে বজায় রাখতে পারা যায়। শুধুমাত্র সমতলভূমির অঞ্চলে, প্রচণ্ড সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণের মুখোমুখি হলে, বাস্তব অবস্থার আলোকে নিম্নলিখিত সমস্যার বিবেচনা করা উচিত: উক্ত অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত কার্যকলাপ চালাবার জন্য অনেকগুলি ছোট ছোট গেরিলা-বাহিনীকে রেখে বড় গেরিলা সৈন্যসংস্থানগুলিকে সাময়িকভাবে পার্বত্য অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, যাতে শত্রুর প্রধান বাহিনী অন্যত্র সরে গেলে তারা আবার ফিরে এসে সমতলভূমিতে তাদের কার্যকলাপ আবার শুরু করতে পারে।

চীনদেশের বিরাট আয়তন ও শত্রুর সৈন্যশক্তি অপর্যাপ্ত—এই দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থার কারণে, সাধারণভাবে বলতে গেলে গৃহযুদ্ধের সময়ে কুওমিনতাঙ যে দুর্গ-নীতি প্রয়োগ করেছিল, সেই নীতিকে জাপানীরা অবলম্বন করতে পারে না। কিন্তু, তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানাদির পক্ষে যেসব গেরিলা ঘাঁটি এলাকা বিশেষ বিপদের কারণ সৃষ্টি করে, সেগুলির বিরুদ্ধে তারা এই দুর্গ-নীতিটি নির্দিষ্ট পরিমাণে কাজে লাগাতে পারে এমন সম্ভাবনাকে আমাদের হিসেবে ধরা উচিত। তবুও এ ধরনের অবস্থাতেও ঐসব এলাকায় অধ্যবসায় সহকারে গেরিলাযুদ্ধকে চালিয়ে যাবার জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে। গৃহযুদ্ধের সময়েও আমরা গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যেতে পেরেছিলাম—এই অভিজ্ঞতা অনুসারে জাতীয় যুদ্ধে তেমন গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যেতে আমরা আরও বেশি সক্ষম, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সৈন্যশক্তির তুলনায়, আমাদের কোন কোন ঘাঁটি এলাকার বিরুদ্ধে শত্রু তার গুণগতভাবে ও পরিমাণগতভাবে প্রভূত উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তিকে নিয়োগ করতে পারলেও শত্রুর ও আমাদের মধ্যেকার জাতীয় দ্বন্দ্বটির মীমাংসার উপায় নেই, আর শত্রুর পরিচালনার দুর্বলতাগুলিও অপরিহার্য। জনসাধারণের ভেতরে গভীর কাজকর্ম আমাদের লড়াই চালনার নমনীয় পদ্ধতির ওপরেই আমাদের বিজয় প্রতিষ্ঠিত।

২। গেরিলাযুদ্ধে রণনীতিগত আক্রমণ

শত্রুর একটি আক্রমণকে আমরা চূর্ণবিচূর্ণ করার পর এবং শত্রু আর একটি নতুন আক্রমণ শুরু করার আগে শত্রু রত থাকে রণনীতিগত প্রতিরক্ষায়, আর আমরা রত থাকি রণনীতিগত আক্রমণে।

এ সময়ে, যে শক্রবাহিনীকে পরাজিত করার ব্যাপারে আমরা সুনিশ্চিত নই এবং যা নিজের প্রতিরক্ষাত্মক অবস্থানে সুরক্ষিত হয়ে বসেছে, তাকে আক্রমণ করা আমাদের লড়াইয়ের নীতি নয়; পরন্তু আমাদের নীতি হচ্ছে নির্দিষ্ট এলাকায় শত্রুর যেসব ছোট ছোট সৈন্যদল ও চীনা দেশদ্রোহীদের সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবিলা করতে আমাদের গেরিলাবাহিনী সক্ষম, সে সবগুলিকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা ও বিতাড়িত করা, আমাদের অধিকৃত এলাকাকে সম্প্রসারিত করা, জাপ-বিরোধী সংগ্রামের জন্য জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলা, আমাদের সৈন্যবাহিনীকে আবার পূর্ণ করে নেওয়া ও তাদের ট্রেনিং দেওয়া এবং নতুন গেরিলাবাহিনী সংগঠিত করা। এইসব কর্তব্যগুলি বেশ কিছুটা সুসম্পন্ন করার পরেও যদি শত্রু প্রতিরক্ষায় রত থাকে তাহলে আমরা আমাদের নতুন করে দখল করা এলাকাগুলিকে আরও বেশি সম্প্রসারিত করে নিতে পারি, আর যেখানে শত্রুর শক্তি দুর্বল সেইসব শহর ও যোগাযোগ লাইনগুলোকে আক্রমণ করে অবস্থা অনুসারে দীর্ঘকাল ধরে বা সাময়িকভাবে তা দখল করে রাখতে হবে। এসবই হচ্ছে রণনীতিগত আক্রমণের কর্তব্য আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুর প্রতিরক্ষায় রত থাকার সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের নিজেদের সামরিক শক্তি ও জনসাধারণের শক্তিকে কার্যকরীভাবে বিকশিত করা, শত্রুর শক্তিকে কার্যকরীভাবে হ্রাস করা এবং প্রস্তুতি চালানো, যাতে করে শত্রু যখন আবার আমাদের ওপর আক্রমণ করবে, তখন আমরা তাকে সুপরিকল্পিতভাবে ও প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারি।

আমাদের বাহিনীর বিশ্রাম ও ট্রেনিং একান্ত দরকার; আর তা করার সবচেয়ে ভাল সুযোগ হচ্ছে সেই সময়টা, যখন শত্রু প্রতিরক্ষাত্মক কার্যকলাপ নিয়ে ব্যস্ত। এর অর্থ যে অন্য সবকিছু থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখে কেবলমাত্র বিশ্রাম করা ও ট্রেনিং দেওয়া তা নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে আমাদের অধিকৃত এলাকাগুলিকে সম্প্রসারিত করার, শত্রুর ছোট ছোট সৈন্যদলগুলিকে ধ্বংস করার ও জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলার কাজ চালানোর সংগে সংগে বিশ্রাম ও ট্রেনিংয়ের জন্য সময় খুঁজে বের করা। সাধারণতঃ এই সময়ে খাদ্য ও বিছানাপত্র-পোশাকপরিচ্ছদ জোগাড় করা ইত্যাদির কঠিন সমস্যার সমাধানেরও প্রয়াস করা হয়।

আবার এ হচ্ছে সেই সময়, যখন ব্যাপকমাত্রায় শত্রুর যোগাযোগ পথ-

গুলিকে ধ্বংস করা, তার পরিবহণব্যবস্থাকে ব্যাহত করা, এবং আমাদের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধাভিযানে প্রত্যক্ষ সাহায্য দেওয়া হয়।

এই সময়েই গোটা গেরিলা ঘাঁটি এলাকা, গেরিলা অঞ্চল ও গেরিলাবাহিনী উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আর শত্রুর দ্বারা বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত এলাকাগুলি ক্রমে ক্রমে সুশৃংখল অবস্থায় ফিরে আসে ও পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। শত্রুদখলীকৃত এলাকায় জনসাধারণও আনন্দে মেতে ওঠেন, আর গেরিলাদের যশঃকীর্তনে চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, শত্রুর ও তার পদলেহী কুকুর চীনা দেশদ্রোহীদের ভেতরে একদিকে বাড়তে থাকে উদ্বেগ-আতংক ও বিভেদ, অন্যদিকে তেমনি বাড়তে থাকে গেরিলাবাহিনী ও ঘাঁটি এলাকার প্রতি তাদের ঘৃণা, আর গেরিলাযুদ্ধের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতিও হয়ে ওঠে তীব্রতর। সুতরাং, রণনীতিগত আক্রমণ চালানোর সময়ে গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকদের উল্লাসে আত্মহারা হয়ে শত্রুকে তুচ্ছ করে দেখা উচিত নয়, আর আমাদের আভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং ঘাঁটি এলাকাকে ও নিজেদের সৈন্যবাহিনীকে সুদৃঢ় করার কাজ ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এই সময়ে, শত্রুর কার্যকলাপকে অবশ্যই নৈপুণ্যের সংগে লক্ষ্য করতে হবে, আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুরা আবার আক্রমণের চেষ্টা করছে কিনা তার ইঙ্গিত-আভাস লক্ষ্য করতে হবে, যাতে করে শত্রুর আক্রমণ শুরু হওয়া মাত্রই যথাযথভাবে আমাদের রণনীতিগত আক্রমণ শেষ করে রণনীতিগত প্রতিরক্ষার পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারি এবং সেই প্রতিরক্ষার মধ্য দিয়ে শত্রুর আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারি।

অষ্টম অধ্যায়

গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকাশসাধন

জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির পঞ্চম সমস্যাটি হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকাশসাধন। এ বিকাশসাধন প্রয়োজন ও সম্ভব, কারণ যুদ্ধটি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী ও নির্মম। চীন যদি দ্রুতগতিতে জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করে নিজের হারানো জমি পুনরুদ্ধার করে নিতে পারত, এবং যুদ্ধটি যদি দীর্ঘস্থায়ী ও নির্মম না হতো, তাহলে গেরিলাযুদ্ধের চলমান যুদ্ধে বিকাশসাধনের দরকার হতো না। কিন্তু অবস্থাটা সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের, এ যুদ্ধটি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী আর নির্মম, তাই চলমান যুদ্ধে বিকাশলাভ করেই কেবল

গেরিলাযুদ্ধ নিজেকে এ ধরনের যুদ্ধের সংগে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। যুদ্ধটি দীর্ঘস্থায়ী ও নির্মম বলেই গেরিলাবাহিনী প্রয়োজনীয় অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে পোড় খেয়ে ক্রমে ক্রমে নিজেদেরকে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে পরিবর্তিত করতে পারে, এই ক্রমপরিবর্তনের ভেতর দিয়ে তাদের লড়াই চালনার পদ্ধতিটিও ক্রমশঃ নিয়মাবদ্ধ হয়ে ওঠে আর গেরিলাযুদ্ধটা চলমান যুদ্ধে পরিণত হয়। গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকদের অবশ্যই এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতাকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে হবে, শুধু তাহলেই তারা গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকাশসাধনের নীতিতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকতে এবং এই নীতিকে সুপরিকল্পিতভাবে পালন করতে পারে।

এখন বহু জায়গাতেই, যেমন উতাই পার্বত্য অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে, নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর দ্বারা প্রেরিত শক্তিশালী শাখাবাহিনীই গেরিলাযুদ্ধের বিকাশসাধন করছে। সেখানকার লড়াই সাধারণতঃ গেরিলা ধরনের হলেও শুরু থেকেই তাতে চলমান যুদ্ধের উপাদানও ছিল। যুদ্ধ যতদিন ধরে চলবে ততই এই উপাদানও দিন দিনই বেড়ে চলবে। এটাই হচ্ছে আজকের জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব, এটা শুধু যে গেরিলাযুদ্ধকে দ্রুতভাবে প্রসারিত করে তা নয়, উপরন্তু তাকে দ্রুতভাবে উন্নত করে তোলে, সুতরাং তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশের গেরিলাযুদ্ধের তুলনায় এখানে গেরিলাযুদ্ধ চালাবার পক্ষে অবস্থা অনেক বেশি উন্নত।

গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এমন গেরিলাবাহিনীগুলিকে চলমান যুদ্ধের চালনাকারী নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে রূপান্তরের জন্য দুটি শর্তের প্রয়োজন— সংখ্যাগত বৃদ্ধি ও গুণগত উন্নতি। সংখ্যাগত বৃদ্ধির ব্যাপারে, জনগণকে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সমাবেশ করা ছাড়াও, ছোট ছোট বাহিনীগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে নেবার পদ্ধতিও অবলম্বন করা যায়; গুণগত উন্নতি নির্ভর করে যুদ্ধে যোদ্ধাদের পোড় খাইয়ে দৃঢ় করার ও অস্ত্রশস্ত্রের গুণের উন্নতিসাধনের ওপরে।

ছোট ছোট বাহিনীগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে নেবার ব্যাপারে, একদিকে স্থানীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে, যা শুধু স্থানীয় স্বার্থের ওপরেই মনোযোগ দেয় এবং ফলে কেন্দ্রীয়করণ ব্যাহত হয়; আর অন্যদিকে সতর্ক থাকতে হবে বিশুদ্ধ সামরিক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেও, যা স্থানীয় স্বার্থের ওপরে দৃষ্টি দেয় না।

স্থানীয় গেরিলাবাহিনী ও স্থানীয় সরকারের ভেতরে স্থানীয়তাবাদের অস্তিত্ব রয়েছে; তারা প্রায়শঃই শুধু স্থানীয় স্বার্থেরই যত্ন নেয়, সামগ্রিক স্বার্থকে ভুলে যায়; অথবা তারা আলাদা আলাদা কার্যকলাপ চালাতে পছন্দ করে, সমষ্টিগত কাজকর্মে অভ্যস্ত নয়। প্রধান গেরিলাবাহিনীর অথবা গেরিলা সৈন্যসংস্থানের পরিচালকদের অবশ্যই এই অবস্থাকে বিবেচনা করতে হবে এবং ক্রমে ক্রমে ও আংশিকভাবে কেন্দ্রীভূত করার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে অব্যাহতভাবে গেরিলাযুদ্ধ প্রসারিত করার জন্য স্থানীয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তি থাকে, পরিচালকদের অবশ্যই সর্বপ্রথমে ছোট ছোট বাহিনীগুলিকে যুক্ত কার্যকলাপে লাগিয়ে দেওয়া আব তারপরে সেগুলির সাংগঠনিক কাঠামোকে না ভেঙে ও কর্মীদের অদলবদল না করে সেগুলিকে নিজেদের বাহিনীর সংগে মিলিয়ে এক করে নেওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে সেই ছোট বাহিনীগুলি বড দলের সংগে সহজে মিলে যেতে পারে।

স্থানীয়তাবাদের উল্টোদিকে, বিশুদ্ধ সামরিক মনোবৃত্তি হচ্ছে প্রধান বাহিনীগুলির সেইসব পরিচালকদের ভুল দৃষ্টিকোণ, যারা কেবল নিজেদের বাহিনীগুলিকে বাড়িয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর আর স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে সাহায্য করতে অবহেলা করে। এ কথা তারা জানে না যে, গেরিলাযুদ্ধের চলমান যুদ্ধে বিকাশসাধনের অর্থ গেরিলাযুদ্ধকে বর্জন করা নয়, বরং তার অর্থ হচ্ছে ব্যাপকবিস্তৃত গেরিলাযুদ্ধের মধ্যে ক্রমে ক্রমে এমন একটি প্রধান শক্তির সৃষ্টি করা যা চলমান যুদ্ধ চালাতে সক্ষম, এবং এই প্রধান শক্তির আশেপাশে এমন বহুসংখ্যক গেরিলাবাহিনী অবশ্যই থাকবে যেগুলি ব্যাপক গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এই বহুসংখ্যক গেরিলাবাহিনী হচ্ছে প্রধান শক্তির প্রবল সহায়ক বাহিনী, এগুলি আবার প্রধান শক্তির অব্যাহত সম্প্রসারণের অফুরন্ত উৎস। তাই, কোন প্রধান বাহিনীর পরিচালক যদি বিশুদ্ধ সামরিক মনোবৃত্তির ফলে স্থানীয় জনসাধারণ ও স্থানীয় সরকারের স্বার্থের ওপরে দৃষ্টি না দেওয়ার ভুল করে বসেন, তাহলে এই ভুলটিকে অবশ্যই শুধরে নিতে হবে, সংশোধন করে নিতে হবে প্রধান শক্তির সম্প্রসারণ ও স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি—এ দুটিই যাতে যথাযোগ্য স্থান পেতে পারে তার জন্য।

গেরিলাবাহিনীর গুণকে উন্নত করার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হচ্ছে রাজনীতি, সংগঠন, সাজসরঞ্জাম, সামরিক প্রয়োগকৌশল, রণকৌশল ও শৃংখলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন করা, আর ক্রমে ক্রমে নিজেদেরকে নিয়মিত সৈন্য

বাহিনীর আকারে গড়ে তোলা এবং গেরিলা রীতি পরিহার করা। গেরিলা-বাহিনীগুলিকে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর স্তরে উন্নীত করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কম্যাণ্ডার ও যোদ্ধাদের উভয়কেই উপলব্ধি করানো, ঐ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়া এবং রাজনৈতিক কাজকর্মের মাধ্যমে ঐ লক্ষ্যের অর্জনকে সুনিশ্চিত করাটা হচ্ছে রাজনীতিগতভাবে একান্ত আবশ্যক। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক হল ক্রমে ক্রমে নিয়মিত সৈন্যসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মসংস্থা গড়ে তোলা, সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের প্রস্তুত করা, সামরিক ও রাজনৈতিক কর্ম-পদ্ধতিকে গ্রহণ করা এবং নিয়মিত সরবরাহ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করা। সাজসরঞ্জামের ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্রের গুণকে উন্নত করা ও আরও বিভিন্ন রকমের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা এবং প্রয়োজনীয় যোগাযোগব্যবস্থা সম্পর্কিত সরঞ্জামের সরবরাহ বৃদ্ধি করা। সামরিক প্রয়োগ-কৌশল ও রণকৌশলের ক্ষেত্রে, গেরিলাবাহিনীকে নিয়মিত সৈন্যসংস্থানের প্রয়োজনীয় স্তরে উন্নীত করা দরকার। শৃংখলার ক্ষেত্রে, এমন স্তরে উন্নীত হওয়া দরকার যাতে করে সর্বত্রই একই মানদণ্ড মেনে চলা হয়, প্রতিটি আদেশ দৃঢ়ভাবে পালন করা হয় ব্যতিক্রমহীনভাবে, এবং সমস্ত রকমের ঢিলেঢালা ভাব নির্মূল হয়। এইসব কর্তব্যগুলি সম্পাদনের জন্য দরকার একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রয়াস-প্রক্রিয়া, রাতারাতি তা করতে পারা যায় না; কিন্তু সেইদিকে আমাদের অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। শুধুমাত্র এইভাবেই গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকায় প্রধান সৈন্যসংস্থান গড়ে উঠতে পারে এবং উদ্ভূত হয়ে উঠতে পারে চলমান যুদ্ধ, যা শত্রুর ওপরে আঘাত হানার ব্যাপারে আরও বেশি কার্যকর। যেখানে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী থেকে প্রেরিত শাখাবাহিনী অথবা কর্মীরা থাকে, সেখানে অপেক্ষাকৃত সহজভাবেই এই ধরনের লক্ষ্যটা অর্জন করতে পারা যায়। অতএব গেরিলাবাহিনীকে নিয়মিত বাহিনীর দিকে বিকাশলাভ করতে সাহায্য করার দায়িত্ব সব নিয়মিত সৈন্যবাহিনীরই রয়েছে।

নবম অধ্যায়

পরিচালনার সম্পর্ক

জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির শেষ সমস্যাটি হচ্ছে পরিচালনার

সম্পর্কের সমস্যা। এই সমস্যার সঠিক সমাধানই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের অবাধ বিকাশের অন্যতম শর্ত।

যেহেতু গেরিলাবাহিনী হচ্ছে নিম্নস্তরের সশস্ত্র সংগঠন, আর তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে কার্যকলাপ চালানো, তাই গেরিলাযুদ্ধের পরিচালনার পদ্ধতিটি নিয়মিত যুদ্ধের পরিচালনার পদ্ধতির মতো উচ্চমাত্রার কেন্দ্রীয়করণের অনুমতি দেয় না। নিয়মিত যুদ্ধের পরিচালিত পদ্ধতিতে যদি গেরিলাযুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করা হয়, তাহলে গেরিলাযুদ্ধের উচ্চমাত্রার নমনীয়তা অপরিহার্যভাবেই গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়বে, আর গেরিলাযুদ্ধের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। উচ্চমাত্রার কেন্দ্রীভূত পরিচালনা হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের উচ্চমাত্রার নমনীয়তাব সবাসরি বিপবীত এবং তাই এক্ষেত্রে তা অবশ্যই প্রয়োগ করা উচিত নয় এবং করতে পারাও যায় না।

তবু এর অর্থ এই নয় যে, কোন কেন্দ্রীভূত পরিচালনা ছাড়াই গেরিলাযুদ্ধ সাফল্যজনকভাবে বিকাশলাভ কবতে পারে। একই সময়ে যখন ব্যাপক নিয়মিত যুদ্ধ ও ব্যাপক গেরিলাযুদ্ধ চলে তখন উভয়ের যথাযোগ্যভাবে সমন্বিত কাযকলাপ চালানো দরকার, তাই এখানে এই দুইয়ের সমন্বিত কার্যকলাপের জন্য একটি পরিচালনার প্রয়োজন, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সেনাপতিমণ্ডলী ও যুদ্ধাঞ্চলগুলির সেনাপতিদের দ্বারা রণনীতিগত সামরিক কার্যকলাপের একীভূত পরিচালনার প্রয়োজন। একটা গেরিলা অঞ্চলে বা গেরিলা ঘাঁটি এলাকায় বহু গেরিলাবাহিনী থাকে, যাদের মধ্যে প্রধান শক্তি হিসেবে সাধারণতঃ একটা বা কয়েকটা গেরিলা সৈন্যসংস্থান থাকে (কখনো কখনো নিয়মিত সৈন্যসংস্থানও থাকে), আর সহায়ক শক্তি হিসেবে ছোট-বড় অনেকগুলি গেরিলাবাহিনী থাকে, তা ছাড়া উৎপাদনের কাজ থেকে অবিচ্ছিন্ন এমন ব্যাপক জনগণের সশস্ত্র শক্তিও থাকে—তখন সেখানকার শত্রুরাও সাধারণতঃ নিজেদেরকে একটা একীভূত ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলে একসংগে গেরিলাযুদ্ধের মোকাবিলা করে। সেইজন্য, এই ধরনের গেরিলা অঞ্চলে বা ঘাটি এলাকায় একটা একীভূত পরিচালনা অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত পরিচালনার সমস্যা দেখা দেয়।

তাই, চরম কেন্দ্রীয়করণ ও নিরঙ্কুশ বিকেন্দ্রীকরণ—উভয়েরই বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধের পরিচালনার নীতি হওয়া উচিত রণনীতিগত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত পরিচালনা আর যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে বিকেন্দ্রীভূত পরিচালনা।

রণনীতিগত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত পরিচালনার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র কর্তৃক সমগ্র গেরিলাযুদ্ধের পরিকল্পনাকরণ, প্রতিটি যুদ্ধাঞ্চলে নিয়মিত যুদ্ধের সংগে গেরিলাযুদ্ধের সমন্বয়সাধন এবং প্রত্যেকটি গেরিলা অঞ্চলে বা ঘাঁটি এলাকায় সেখানকার সমস্ত জাপ-বিরোধী সশস্ত্র শক্তির জন্য একীভূত পরিচালনা। এসব ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য, একত্ব ও কেন্দ্রীয়করণের অভাব ক্ষতিকর, আর সামঞ্জস্য একত্ব ও কেন্দ্রীয়করণকে অর্জন করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে। সাধারণ ব্যাপারে, অর্থাৎ রণনীতির চরিত্রবিশিষ্ট ব্যাপারে নিম্নতর স্তরগুলিকে অবশ্যই উচ্চতর স্তরের কাছে রিপোর্ট করতে হবে এবং উচ্চতর স্তরগুলির নির্দেশ মেনে চলতে হবে, যাতে করে মিলিত কার্যকলাপের সফলতা সুনিশ্চিত করা যায়। তবু এখানেই কেন্দ্রীয়করণকে থামতে হয়, এই সীমা অতিক্রম করা, নিম্নতর স্তরগুলির বিশিষ্ট ব্যাপারে—ধরা যাক যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের জন্য বিশিষ্ট সৈন্যবিন্যাসব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে, হস্তক্ষেপ করা অনুরূপভাবেই ক্ষতিকর হবে। কারণ এইসব বিশিষ্ট ব্যাপারকে অবশ্যই সাধন করতে হবে বিশিষ্ট অবস্থা অনুসারে, যা এক সময় থেকে অন্য সময়ে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলে যায়, আর এইসব বিশিষ্ট অবস্থা অতি দূরবর্তী উচ্চতর স্তরেব সংস্থার জ্ঞানের একেবারে বাইরে। এটাই হচ্ছে যুদ্ধাভিযানে ও লডাইয়ে বিকেন্দ্রীভূত পবিচালনার নীতি। এই নীতিটা সাধারণভাবে নিয়মিত যুদ্ধের লডাই চালনায়ও খাটে, বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন পর্যাপ্ত নয় তখন তো খাটেই। এক কথায়, এটা হচ্ছে একটা একীভূত রণনীতিগত পরিচালনার অধীন ও স্বতন্ত্র গেরিলাযুদ্ধ।

গেরিলা ঘাঁটি এলাকায়, যেখানে একটি সামরিক অঞ্চল গড়ে তোলা হয়, যা কতকগুলি সামরিক উপ-অঞ্চলে বিভক্ত, প্রতিটি সানরিক উপ-অঞ্চল কয়েকটি জেলায় বিভক্ত, আর প্রতিটি জেলা আবার কতকগুলি মহকুমায় বিভক্ত, সেখানে নিম্নরূপের অধীনতার ব্যবস্থা চালু হয়: মহকুমা সরকার জেলা সরকারের অধীন, জেলা সরকার সামরিক উপ-অঞ্চলের সদর দপ্তরের অধীন, সামরিক উপ-অঞ্চলের সদর দপ্তর সামরিক অঞ্চলের সদর দপ্তরের অধীন, আর প্রত্যেকটি সশস্ত্র বাহিনীকে অবশ্যই তার চরিত্র অনুসারে এইগুলির একটার-না-একটার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বের অধীনে থাকতেই হয়। উপরে উল্লিখিত মূল নীতি অনুসারে এই সবগুলির মধ্যেকার পরিচালনার সম্পর্ক নিম্নরূপ: সাধারণ নীতির বিষয়গুলি উচ্চতর স্তরে কেন্দ্রীভূত হয়; আর বাস্তব

অবস্থা অনুসারে বাস্তব কার্যকলাপ সম্পাদিত হয়, নিম্নতর স্তরগুলির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কার্য চালনার অধিকার থাকে। কোন উচ্চতর স্তরের নিম্নতর স্তরে গৃহীত কোন বাস্তব কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু মতামত থাকলে, উচ্চতর স্তর তার অভিমতকে 'নির্দেশ' হিসেবে পেশ করতে পারে এবং তাই করা উচিত, কিন্তু সে অভিমতকে অবশ্যই অপরিবর্তনীয় 'আদেশ' হিসেবে জারী করা উচিত নয়। এলাকা যত বিস্তীর্ণ হবে, পরিস্থিতি যত জটিল হবে, আর উচ্চতর স্তর ও নিম্নতর স্তরের মধ্যে দূরত্বটা যত বেশি হবে, ততই আরও বেশি প্রয়োজন হবে এই ধরনের বাস্তব কার্যকলাপে নিম্নতর স্তরগুলিকে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকার দেওয়া, এবং এই কার্যকলাপকে আরও বেশি স্থানীয় চরিত্র দেওয়া, তাকে স্থানীয় অবস্থার প্রয়োজনের সংগে আরও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে খাপ খাওয়ানো, যাতে করে নিম্নতর স্তরগুলির ও স্থানীয় কর্মীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সামর্থ্য পরিপুষ্ট করে তুলতে, জটিল পরিবেশের মোকাবিলা করতে এবং জয়যুক্তভাবে গেরিলাযুদ্ধকে প্রসারিত করতে পারা যায়। কেন্দ্রীভূত কার্যকলাপে রত কোন বাহিনী বা সৈন্যসংস্থার আভ্যন্তরীণ পরিচালনা সম্পর্কে কেন্দ্রীভূত পরিচালনার নীতি প্রয়োগ করা উচিত, কারণ এখানে অবস্থাটা পরিষ্কার, কিন্তু এই বাহিনী বা সৈন্যসংস্থা যদি একবার বিক্ষিপ্ত কার্যকলাপ শুরু করে দেয়, তখন সাধারণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয়করণের ও বিশিষ্ট ব্যাপারে বিকেন্দ্রীকরণ নীতিটি প্রয়োগ করা উচিত, কারণ উচ্চতর নেতৃত্বের কাছে তখন বিশিষ্ট অবস্থাটি পরিষ্কার হতে পারে না।

যা কেন্দ্রীভূত করা উচিত, তা কেন্দ্রীভূত না করার অর্থ হচ্ছে উচ্চতর স্তরগুলি কর্তৃক কর্তব্যে অবহেলা, এবং নিম্নতর স্তরগুলি কর্তৃক স্বেচ্ছাচারীভাবে কর্তৃত্ব করা। এটাকে যে-কোন উচ্চতর ও নিম্নতর স্তরগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সামরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহ্য করতে পারা যায় না। যেখানে বিকেন্দ্রীকরণ করা উচিত, সেখানে যদি তা করা না হয়, তাহলে তার অর্থ হয় উচ্চতর স্তরগুলির দ্বারা ক্ষমতাকে একচেটিয়া করে নেওয়া আর নিম্নতর স্তরগুলির উদ্যোগের অভাব। এটাকেও যে-কোন উচ্চতর ও নিম্নতর স্তরগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে গেরিলাযুদ্ধের পরিচালনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায় না। উপরে যেসব নীতি বর্ণনা করা হল, শুধু সেগুলিই হচ্ছে পরিচালনার সম্পর্কের সমস্যার সঠিক সমাধানের কর্মপন্থা।

টীকা

১। ছাংপাই পর্বত হচ্ছে চীনের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত একটি পর্বতমালা। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ঘটনার পর ছাংপাই পার্বত্য অঞ্চলটি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত জাপ-বিরোধী গেরিলা ঘাঁটি এলাকায় পরিণত হয়েছিল।

২। উতাই পর্বত হচ্ছে শানসী, চাহার ও হোপেই প্রদেশ তিনটির সীমান্তে অবস্থিত পর্বতমালা। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত অষ্টম রুট বাহিনী উতাই পার্বত্য অঞ্চলকে কেন্দ্র করে শানসী-চাহার-হোপেই জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে শুরু করে।

৩। তাইহাং পর্বত হচ্ছে শানসী, হোপেই ও হোনান প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত একটি পর্বতমালা। ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে অষ্টম রুট বাহিনী তাইহাং পার্বত্য অঞ্চলকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ-পূর্ব শানসী জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে শুরু করে।

৪। তাইশান পর্বত শানতুং প্রদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত, এটা হচ্ছে তাই-ই পর্বতমালার অন্যতম প্রধান শৃঙ্গ। ১৯৩৭ সালের শীতকালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত গেরিলাবাহিনী তাই-ই পার্বত্য অঞ্চলকে কেন্দ্র করে মধ্য শানতুং ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে শুরু করে।

৫। ইয়ানশান পর্বত হচ্ছে হোপেই ও রেহো প্রদেশের সীমান্তের পর্বতমালা। ১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মকালে ইয়ানশান পার্বত্য অঞ্চলকে কেন্দ্র করে অষ্টম রুট বাহিনী পূর্ব হোপেই জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাক গড়ে তুলতে শুরু করে।

৬। মাওশান পর্বত দক্ষিণ কিয়াংসুতে অবস্থিত। ১৯৩৮ সালের জুন মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত নতুন চতুর্থ বাহিনী মাওশান পার্বত্য অঞ্চলকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ কিয়াংসু জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে শুরু করে।

৭। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিকাশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছিল যে, সমতলভূমি অঞ্চলেও দীর্ঘস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা সম্ভব, এবং বহু জায়গায় এইরূপ ঘাঁটি এলাকা স্থায়ী ঘাঁটি এলাকায় পরিণত হতেও পারে। অঞ্চলের সুবিশালতা, সেখানকার বিরাট জনসংখ্যা, কমিউনিস্ট পার্টির নীতির

সক্রিয়তা, জনসাধারণের ব্যাপক সমাবেশকরণ ও শত্রুর সৈন্যশক্তির স্বল্পতা ইত্যাদি ইত্যাদি—এটাকে সম্ভব করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে কমরেড মাও সে-তুঙ বিশেষ বিশেষ নির্দেশগুলিতে এই কথাটিকে আরও স্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন।

৮। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকায় জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন বৃদ্ধি পেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। অনেক দেশে জনগণ তাঁদের নিজস্ব বিপ্লবী ও প্রগতিশীল শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলের তমসাচ্ছন্ন শাসনের উচ্ছেদ ঘটাবার জন্য লাগাতর সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন। এদ্বারা প্রতীয়মান যে নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে—যখন সমাজতান্ত্রিক শিবির, ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জনগণের বিপ্লবী শক্তিসমূহ এবং সারা দুনিয়ায় গণতন্ত্র ও প্রগতির জন্য কঠোর প্রচেষ্টারত জনগণের শক্তিসমূহ যখন সামনের দিকে বিরাট বিরাট পদক্ষেপ ফেলছে, যখন বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আরও দুর্বল হচ্ছে, এবং যখন সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক শাসন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে—এমন অবস্থায় আজ যে সমস্ত দেশ গেরিলা যুদ্ধকৌশল অনুসরণ করছে তা জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের তখন যে ধরনের গেরিলাযুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল সেরকম হবে না। অন্য কথায়, গেরিলাযুদ্ধ সফলভাবে সেইসব দেশেই পরিচালনা করা যেতে পারে যে দেশের ভূখণ্ড বিরাটাকার নয়, যেমন কিউবা, আলজেরিয়া, লাওস ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম।

৯। **ওয়েইছী** দাবা হচ্ছে চীনের একটা অত্যন্ত প্রাচীন ধরনের খেলা। এ খেলায় ছকের ওপরে পরস্পরের ঘুঁটিগুলিকে ঘিরে ধরার চেষ্টা করে দুজন খেলুড়ে। কোন খেলুড়ের কোন একটা বা কতকগুলি ঘুঁটি প্রতিপক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত ঘুঁটিগুলির মধ্যে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণে ফাঁকা ঘর থাকে তাহলে ঘুঁটিগুলি তখনো 'জ্যান্ত' বলে ধরা হয়।

১০। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫৩ সালে চাও রাজ্যের রাজধানী হানতানকে অবরোধ করেছিল ওয়েই রাজ্য। ছী রাজ্যের রাজা তার দুই সেনাপতি—থিয়ান চী আর সুন পিনকে সৈন্য নিয়ে চাও-এর সাহায্যের জন্য যেতে আদেশ দিল। সুন পিন মনে করল যে, ওয়েই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সৈন্যবাহিনী চাও রাজ্যের ভেতরে ঢুকে পড়েছে আর তাদের নিজেদের রাজ্যে শুধু সামান্য সৈন্যশক্তি রেখেছে। অতএব, সুন পিন ওয়েই রাজ্যকে আক্রমণ করল, আর নিজেদের দেশকে রক্ষা

করার জন্য ওয়েই বাহিনী তখন চাও রাজ্য থেকে সরে এল। ওয়েই বাহিনীর নিদারুণ শ্রান্তির সুযোগ নিয়ে ছী সৈন্যবাহিনী কুইলিংয়ের (আজকের শানতুং প্রদেশের হোজে জেলার উত্তর-পূর্ব) লড়াইয়ে তাদেরকে ভীষণভাবে পরাজিত করল। এইভাবে হানতানের অবরোধ উত্তোলিত হল। সেই থেকে চীনা রণবিশারদরা অনুরূপ রণপদ্ধতিকে 'ওয়েই রাজ্যকে অবরোধ করে চাও রাজ্যকে বাঁচানো' বলে বর্ণনা করতে থাকে।

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে

মে, ১৯৩৮

সমস্যার সূত্রপাত

(১) জাপ-বিরোধী মহান প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম বার্ষিকী—৭ই জুলাই ঘনিয়ে আসছে। প্রায় এক বছর হল গোটা জাতির শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবোধ-যুদ্ধে অটল থেকে এবং দৃঢ়তার সংগে যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করে শত্রুর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাচ্যের ইতিহাসে এই যুদ্ধের কোন পূর্ব-নজির নেই, পৃথিবীব ইতিহাসেও এ যুদ্ধ এক মহান যুদ্ধ হিসেবে স্থান লাভ কববে। সারা দুনিয়াব জনগণ মনোযোগের সংগে এই যুদ্ধের গতিধারা লক্ষ্য করছেন। যুদ্ধের দুর্দশায় জর্জরিত ও আপন জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংগ্রামবত প্রতিটি চীনা প্রতিদিনই যুদ্ধে জয়লাভেব জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কবছেন। কিন্তু আসলে যুদ্ধেব গতি কি হবে? আমরা কি জিততে পাবব? শীঘ্রই কি আমবা জিততে পাবব? অনেকেই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কথা বলছেন, কিন্তু এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে কেন? দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কিভাবে চালাতে হয়? অনেকেই চূড়ান্ত বিজয়ের কথা বলছেন, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয়ই-বা কেন আমাদেব হবে? চূড়ান্ত বিজয় কিভাবে অর্জন করা যায়?—এইসব প্রশ্নের উওর যে প্রত্যেকেই খুঁজে পেয়েছেন, তা নয়। এমনকি আজও অধিকাংশ লোকই তা পাননি। সুতরাং জাতীয় পবাধীনতার তত্ত্বের পরাজয়বাদী প্রবক্তারা আগ বাড়িয়ে জনসাধারণকে বলছে, চীন পদানত হবে এবং চূড়ান্ত বিজয় চীনের হবে না। পক্ষান্তরে, কিছু সংখ্যক ধৈর্যহীন বন্ধু এগিয়ে এসে জনসাধাবণকে বলছে যে, চীন অচিবেই বিজয় অর্জন করবে, এর জন্য কোনরকমের বিরাট প্রয়াসের দরকার নেই। এইসব অভিমত কি সঠিক? আগাগোড়াই আমরা বলে আসছি, এগুলি ঠিক নয়। যাই হোক, আমরা যা বলে আসছি, অধিকাংশ লোকই এখনো তা উপলব্ধি করেননি। এটা কিছুটা এই কারণে যে, আমরা যথেষ্ট প্রচার ও ব্যাখ্যামূলক কাজ করিনি, আর কিছুটা এই কারণে যে, বাস্তব ঘটনাদির বিকাশ

১৯৩৮ সালের ২৬শে মে থেকে ৩রা জুন অবধি ইয়েনানে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পর্যালোচনা-সমিতিতে কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতামালা প্রদান করেছিলেন।

এখনো ততটা হয়নি যে তাদের সহজাত প্রকৃতির স্বরূপ প্রকাশ পাবে এবং স্পষ্টভাবে তার চেহারা মানুষের চোখে ধরা পড়বে। তাই জনসাধারণ তার সামগ্রিক গতি ও পরিণতিকে দূরদর্শিতার সংগে দেখার অবস্থায় ছিলেন না এবং সেই কারণে তাঁরা নিজেদের সামগ্রিক কর্মনীতি ও কৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার অবস্থায়ও ছিলেন না। এখন অবস্থা ভাল হয়েছে। দশ মাসের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা জাতীয় পরাধীনতার সম্পূর্ণ অমূলক তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দেবার পক্ষে এবং দ্রুত বিজয়ের তত্ত্ব থেকে আমাদের ধৈর্যহীন বন্ধুদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই সারসংকলনগত বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করছে। তারা বিশেষভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ব্যাখ্যা চাইছে। তা চাওয়ার কারণ, একদিকে তার বিরুদ্ধে রয়েছে জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্ব ও দ্রুত বিজয়ের তত্ত্ব, এবং অন্যদিকে রয়েছে এই যুদ্ধ সম্পর্কে ভাসাভাসা উপলব্ধি। 'লুকৌছিয়াও ঘটনা[১] থেকে শুরু করে আমাদের চল্লিশ কোটি মানুষ একসাথে প্রয়াস চালিয়ে আসছে, এবং চূড়ান্ত বিজয় চীনেরই হবে।'—এই সূত্রটি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এটা একটা সঠিক সূত্র, কিন্তু বাস্তব সারমর্ম দিয়ে তাকে পূর্ণতা দান করা দরকার। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও যুক্তফ্রন্ট টিঁকে থাকতে পারে বহু উপাদানের কারণে। সে উপাদানগুলো হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে শুরু করে কুওমিনতাঙ পর্যন্ত দেশের সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি, শ্রমিক ও কৃষক থেকে শুরু করে

পর্যন্ত সারা দেশের জনগণ এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনী থেকে শুরু করে গেরিলা বাহিনী পর্যন্ত দেশের যাবতীয় সশস্ত্র সৈন্যশক্তি, আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এগুলির ব্যাপ্তি—সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে শুরু করে সকল দেশের ন্যায়পরায়ণ জনগণ পর্যন্ত; শত্রু শিবিরের ক্ষেত্রেও এগুলির প্রসার হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে আছে জাপানে যাঁরা যুদ্ধের বিরোধিতা করে তাদের থেকে শুরু করে ফ্রন্টে যেসব জাপানী সৈন্য যুদ্ধের বিরোধিতা করে তারা পর্যন্ত। এক কথায়, এইসব শক্তির সবাই কম বা বেশি মাত্রায় অবদান জুগিয়েছে আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধে। বিবেকসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের উচিত তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। আমরা কমিউনিস্টরা জাপ-বিরোধী অন্যান্য পার্টি ও দলের সংগে এবং সমগ্র জনগণের সংগে মিলে একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছি—সে উদ্দেশ্য হচ্ছে সুদৃঢ় প্রচেষ্টায় সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে হিংস্র জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করা। এ বছরের পয়লা জুলাই তারিখে চীনা

কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার ১৭তম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হবে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে আরও ভালভাবে এবং আরও ব্যাপকভাবে নিজের শক্তি প্রয়োগ করতে প্রতিটি কমিউনিস্টকে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধকে গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করা। তাই আমার এই আলোচনাগুলো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর্যালোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রাসঙ্গিক যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কেই আমি বলার চেষ্টা করব, কিন্তু সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারব না, কারণ একটি বক্তৃতামালাতেই প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে পুরোপুরিভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

(২) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের দশ মাসের সমগ্র অভিজ্ঞতা চীনের অনিবার্য পরাধীনতার তত্ত্ব ও চীনের দ্রুত বিজয়ের তত্ত্ব যে ভুল—সেকথাই প্রমাণ করে। প্রথমোক্ত তত্ত্বটি আপোষ করার ঝোঁক সৃষ্টি করে আর শেষোক্তটি শত্রুর শক্তিকে কম করে দেখার ঝোঁক সৃষ্টি করে। সমস্যা সম্পর্কে এই উভয় বিচার পদ্ধতিই হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক ও একতরফা, কিংবা এক কথায় অবৈজ্ঞানিক।

(৩) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের আগে জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের বিষয়ে অনেক কথা শোনা যেত। কেউ কেউ বলত: 'অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে শত্রুর চেয়ে চীন নিকৃষ্ট, আর যুদ্ধ করলেই সে হারতে বাধ্য।' অন্যেরা বলত, 'চীন যদি সশস্ত্র প্রতিরোধে অগ্রসর হয়, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে আর একটি আবিসিনিয়ায় পরিণত হবে।' প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্ব সম্পর্কে খোলাখুলি কথাবার্তা শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু সে সম্পর্কে গোপনে কথা চলছেই, আর তা চলছে ব্যাপক মাত্রায়ই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপোষের আবহাওয়া মাঝে মাঝেই ঘনীভূত হয়ে ওঠে, আর আপোষের প্রবক্তারা যুক্তি দেখায়: যুদ্ধ অব্যাহত রাখলে অনিবার্যভাবেই পদানত হব'[২]। হুনান থেকে একজন ছাত্র চিঠিতে লিখেছে:

> গ্রামে সব কিছুতেই কষ্ট অনুভব করি। আমি একা প্রচার করতে গিয়ে যখন যেখানে লোকদের পাই, তখনই সেখানে তাদের সংগে আমাকে কথা বলতে হয়। যেসব লোকের সংগে আমি কথা বলেছি, তারা কিন্তু অজ্ঞ বা নির্বোধ নয়। কি ঘটছে তার কিছুটা উপলব্ধি তাদের সবারই আছে। আমার বক্তব্য সম্পর্কেও তারা খুবই কৌতূহলী। কিন্তু যখন আমার নিজের আত্মীয়স্বজনের সংগে দেখা হয়, তখন সবসময়ই তারা

বলে : 'চীন জিততে পারে না, সে পদানত হবেই'। এটা খুবই বিরক্তিকর লাগে। সৌভাগ্যক্রমে তারা তাদের মতামতকে চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়ায় না। না হলে তো অবস্থাটি সত্যসত্যই খারাপ হতো। তারা যা বলত, কৃষকরা স্বভাবতঃই তা বেশি বিশ্বাস করত।

এ ধরনের চীনের অনিবার্য পরাধীনতার মতবাদীরাই আপোষকামী ঝোঁকের সামাজিক বুনিয়াদ গড়ে তোলে। চীনে সর্বত্রই এ ধরনের লোককে দেখতে পাওয়া যায়, আর তাই জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের মধ্যে যে-কোন সময়ে আপোষের সমস্যাটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং এ সমস্যাটি সম্ভবতঃ যুদ্ধের শেষ পর্যায় পর্যন্তই থাকবে। এখন স্যুচৌ-এর পতন ঘটেছে আর উহান বিপদাপন্ন। তাই আমি মনে করি এ ধরনের জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বকে তীব্রভাবে খণ্ডন করাটা অলাভজনক হবে না।

(৪) প্রতিরোধ যুদ্ধের এই দশ মাসের মধ্যে তাড়াহুড়ো-ব্যাধিসূচক সব রকমের মতামতও দেখা দিয়েছে। যেমন, প্রতিরোধ-যুদ্ধের গোড়াতে অনেকেই অমূলকভাবে আশাবাদী ছিল। তারা জাপানের শক্তিকে কম করে ধরেছিল, এমনকি মনে করেছিল যে জাপানীরা শানসীর কাছাকাছিও আসতে পারবে না। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত ভূমিকাটিকে কেউ কেউ অবহেলা করেছিল, 'সামগ্রিক বিচারে চলমান যুদ্ধ প্রধান আর গেরিলাযুদ্ধ সহায়ক, আংশিক বিচারে গেরিলাযুদ্ধ প্রধান, চলমান যুদ্ধ সহায়ক'—এই বক্তব্যটিকে তারা সন্দেহ করেছিল। 'গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে মৌলিক, কিন্তু অনুকূল অবস্থায় চলমান যুদ্ধের সুযোগ নষ্ট করো না'—অষ্টম রুট বাহিনীর এই রণনীতিকে তারা সমর্থন করে না। এই রণনীতিকে তারা মনে করত 'যান্ত্রিক' বিচারদৃষ্টি[৩] বলে। শাংহাইয়ের লড়াইয়ের সময়ে কেউ কেউ বলত : 'আমরা যদি তিন মাস পর্যন্ত যুদ্ধ চালাতে পারি, তাহলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে বাধ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্যই সৈন্য পাঠাবে, আর যুদ্ধও শেষ হয়ে যাবে।' প্রতিরোধ-যুদ্ধের ভবিষ্যতের জন্য তারা তাদের আশাকে মুখ্যতঃ নিবদ্ধ করে রেখেছিল বৈদেশিক সাহায্যের ওপরে।[৪] তাই-এরচুয়াং বিজয়ের[৫] পর কেউ কেউ এ অভিমত পোষণ করত যে, স্যুচৌ-এর যুদ্ধাভিযানকে 'আধা-নির্ধারক লড়াই' হিসেবে লড়তে হবে, এবং বলত যে, আগেকার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের নীতিটি বদলে দিতে হবে। 'এই লড়াইটি হচ্ছে শত্রুর সর্বশেষ মরণ-কামড়', 'আমরা যদি জিতি তাহলে জাপানী যুদ্ধবাজদের

আত্মবিশ্বাস ও মনোবল ভেঙে পড়বে, আর তখন তারা শুধু নিজেদের শেষ বিচারের দিনের জন্যই প্রতীক্ষা করতে পারবে।'[৬] এইরকমের কথা তারা বলত। পিংসিংকুয়ান-এর বিজয়[৭] কারও কারও মাথা ঘুরিয়ে দিল; তাই এরচুয়াং-এর বিজয় আরও অনেকের মাথা ঘুরিয়ে দিল। সুতরাং শত্রু উহান আক্রমণ করবে কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিল। অনেকে ভাবে 'সম্ভবতঃ না', আবার অন্যান্য অনেকে ভাবে 'নিশ্চয়ই না।' এই ধরনের সন্দেহ যাবতীয় প্রধান প্রধান সমস্যাকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে। যেমন: আমাদের জাপ-বিরোধী শক্তি কি যথেষ্ট? এর উত্তর হাঁ-সূচক হতে পারে, কারণ শত্রুর আক্রমণ রোধ করার জন্য আমাদের বর্তমান শক্তিই যথেষ্ট, তাহলে আর শক্তি বাড়ানোটা কিসের জন্য? অথবা যেমন: জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টটিকে সুদৃঢ় করার ও সম্প্রসারিত করার স্লোগানটি কি এখনো সঠিক? এর জবাব না-সূচক হতে পারে, কারণ যুক্তফ্রন্ট তার বর্তমান অবস্থাতেই শত্রুকে হটিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী, সুতরাং আর তাকে সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করা কেন? অথবা যেমন: কূটনীতিতে ও আন্তর্জাতিক প্রচারে আমাদের প্রচেষ্টাকে কি জোরদার করতে হবে? এখানেও জবাবটি না-সূচক হতে পারে। অথবা যেমন: সৈন্যব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করা, গণ-আন্দোলন পরিপুষ্ট করে তোলা, জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য শিক্ষা চালু করা, দেশদ্রোহী ও ট্রট্স্কিপন্থীদের দমন করা, সামরিক শিল্পের বিকাশ-ঘটানো এবং জনগণের জীবিকার উন্নতিসাধন—এইসব কাজ আমাদের গুরুত্বসহকারে করা উচিত কিনা? অথবা যেমন: উহান, কুয়াংচৌ ও উত্তর-পশ্চিমের প্রতিরক্ষা এবং শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে গেরিলাযুদ্ধের প্রচণ্ড পুরিপুষ্টির স্লোগানগুলি কি এখনো সঠিক? উত্তরগুলো সবই না-সূচক হতে পারে। এমন লোকও আছে যারা যুদ্ধপরিস্থিতিতে বিন্দুমাত্র অনুকূল ঝোঁক দেখা দেওয়ার মুহূর্তেই কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরকার সংঘর্ষকে তীব্রতর করে তুলতে তৈরী এবং এইভাবে তারা বহির্দেশীয় থেকে অন্তর্দেশীয় ব্যাপারে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। অপেক্ষাকৃত কোন বড় লড়াইয়ে যখনই জয় হয়, অথবা শত্রুর আক্রমণ যখনই সাময়িককালের জন্য থেমে যায়, তখনই প্রায়শঃ এটা ঘটে। উপরোল্লিখিত এই সবগুলিকেই আমরা রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রের অদূরদর্শিতা বলি। এইসব কথা শুনতে গেলে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে এগুলো একেবারেই অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন কথা মাত্র। জাপ-বিরোধী

প্রতিরোধ-যুদ্ধকে বিজয়ের সংগে চালিয়ে যাবার জন্য এইসব অন্তঃসারশূন্য কথাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করাটা নিশ্চয়ই উপকারে আসবে।

(৫) এখন প্রশ্ন হচ্ছে: চীন কি পদানত হবে? এর উত্তর হচ্ছে: হবে না, চূড়ান্ত বিজয় চীনেরই হবে। চীন কি সত্বরই বিজয় অর্জন করতে পারে? জবাব হচ্ছে: না, চীন সত্বর বিজয় অর্জন করতে পারে না, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ।

(৬). এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে মুখ্য যুক্তিগুলিকে আমরা দুই বছর আগেই সাধারণভাবে দেখিয়েছিলাম। ১৯৩৩ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে—সীআন ঘটনার[৮] পাঁচ মাস আগে এবং লুকৌচিয়াও ঘটনার বার মাস আগে মার্কিন সাংবাদিক মিঃ এডগার স্নো'র সংগে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে চীন-জাপান যুদ্ধের পরিস্থিতির একটা সাধারণ মূল্যায়ন আমি করেছিলাম এবং জয়লাভের জন্য বিভিন্ন নীতির উল্লেখও আমি করেছিলাম। পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি উধৃতি তুলে দিচ্ছি:

প্রশ্ন: চীন কোন্ অবস্থায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে পরাভূত ও ধ্বংস করতে পারে?

উত্তর: তিনটি শর্তের প্রয়োজন: প্রথম, চীনে একটি জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়, জাপ-বিরোধী একটি আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলা; তৃতীয়, জাপানী জনগণের ও জাপানী উপনিবেশগুলিতে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্ভব। চীনা জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে, এই তিনটি শর্তের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চীনা জনগণের বিরাট ঐক্য।

প্রশ্ন: এই যুদ্ধ কতদিন চলবে বলে আপনি মনে করেন।

উত্তর: সেটা নির্ভর করে চীনের জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের শক্তির ওপরে এবং চীন ও জাপান—দুই দেশের অন্যান্য বহু নির্ণায়ক উপাদানের ওপর। অর্থাৎ চীনের নিজস্ব শক্তি হচ্ছে মুখ্য বস্তু, তাছাড়াও, চীনের প্রতি আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং জাপানের বিপ্লবের দ্বারা প্রদত্ত সাহায্যও গুরুত্বপূর্ণ। চীনের জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট যদি প্রবলভাবে বিকাশলাভ করে আর কার্যকরীরূপে তাকে যদি অনুভূমিকভাবে ও উল্লম্বভাবে সংগঠিত করা হয়, যারা জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে তাদের নিজস্ব বিপদের কারণ বলে উপলব্ধি করে সেই সরকারগুলি ও সেইসব দেশের জনগণ যদি চীনকে

প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়, এবং জাপানে যদি সম্ভব বিপ্লব ঘটে, তাহলে যুদ্ধটি তাড়াতাড়ি শেষ হবে, আর চীনও তাড়াতাড়ি বিজয় অর্জন করবে। এইসব শর্তগুলি যদি দ্রুতগতিতে বাস্তবে পরিণত না হয়, তাহলে যুদ্ধ বিলম্বিত হবে। কিন্তু পরিণতি হবে একই—জাপান নিশ্চিতভাবেই পরাজিত হবে আর চীন নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হবে। শুধু আত্মত্যাগই হবে বৃহত্তর, আর অত্যন্ত কষ্টকর একটা সময়ের ভেতর দিয়ে যেতে হবে আমাদের।

প্রশ্ন: রাজনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিতে এই যুদ্ধের বিকাশের গতিধারা সম্পর্কে আপনার মত কি?

উত্তর: জাপানের মহাদেশীয় নীতি ইতিমধ্যেই স্থিরীকৃত হয়ে গেছে। যারা মনে করে, জাপানের সংগে আপোষ করে চীনের ভূখণ্ডের ও সার্বভৌম অধিকারের আরও খানিকটা জাপানের হাতে তুলে দিয়ে জাপানী আক্রমণকে রুখতে পারবে, তারা কেবল নিছক উদ্ভট কল্পনারই প্রশ্রয় দিচ্ছে। আমরা নিশ্চিত জানি যে, নিম্ন ইয়াংসি উপত্যকা ও আমাদের দক্ষিণের বন্দরগুলি ইতিমধ্যেই জাপান সাম্রাজ্যবাদের মহাদেশীয় কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উপরন্তু, জাপান চায় ফিলিপাইন, শ্যাম, ভিয়েতনাম, মালয় উপদ্বীপ ও ওলন্দাজাধিকৃত পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নিতে, যাতে করে অন্যান্য দেশ থেকে চীনকে বিচ্ছিন্ন করা যায় এবং দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করা যায়। এই হচ্ছে জাপানের সামুদ্রিক নীতি। এমন সময়ে চীন সন্দেহাতীতভাবে একটা অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় এসে পড়বে। কিন্তু চীনা জনগণের অধিকাংশই বিশ্বাস করে যে, এ ধরনের অসুবিধাকে কাটিয়ে ওঠা যাবে, শুধু বড় বড় বাণিজ্যিক বন্দর শহরের ধনীরাই হচ্ছে পরাজয়বাদী, কারণ তারা তাদের বিষয়সম্পত্তি হারানোর ভয়ে ভীত। অনেকেই মনে করে যে, একবার চীনের উপকূলসীমা জাপান কর্তৃক অবরুদ্ধ হলে চীনের পক্ষে অব্যাহতভাবে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হবে। এটা বাজে কথা। একে খণ্ডন করার জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে লালফৌজের যুদ্ধের ইতিহাসটি তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গৃহযুদ্ধে লালফৌজের অবস্থাটি যা ছিল, তার থেকে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধযুদ্ধে চীনের অবস্থা অনেক বেশি ভাল। চীন একটা বিরাট দেশ, দশ থেকে বিশ কোটি নরনারী অধ্যুষিত চীনের একটা

অঞ্চল জাপান দখল করে নিতে সমর্থ হলেও আমরা কিন্তু তখনো পরাজিত হওয়া থেকে অনেক দূরেই থেকে যাব। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রভূত শক্তি তখনো আমাদের থাকবে, আর জাপানকে সমগ্র যুদ্ধে অবিরত নিজের পশ্চাদ্ভাগে আত্মরক্ষাত্মক লড়াই চালাতে হবে। চীনের অর্থব্যবস্থার বিভিন্নতা ও অসমতা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে বরং সুবিধাজনক। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবশিষ্টাংশ থেকে নিউইয়র্ককে বিচ্ছিন্ন করলে যতটা ক্ষতি হবে, শাংহাইকে চীনের অবশিষ্টাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে নিশ্চয়ই চীনের ততটা গুরুতর ক্ষতি হবে না। চীনের সামুদ্রিক উপকূলসীমাকে জাপান অবরোধ করে রাখলেও তার পক্ষে চীনের উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম অঞ্চলকে অবরোধ করা অসম্ভব। তাই, আবার বলছি, সমস্যাটির মর্মকেন্দ্র হচ্ছে সমগ্র চীনা জনগণের ঐক্য ও একটি দেশজোড়া জাপ-বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তোলা। বহুদিন থেকেই আমরা তা বলে আসছি।

প্রশ্ন : যুদ্ধটি যদি দীর্ঘকাল ধরে চলে এবং জাপান যদি সম্পূর্ণভাবে পরাভূত না হয়, তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি কি জাপানের সংগে একটা শান্তি আলোচনা করতে রাজী হবে, এবং চীনের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে জাপানের শাসন স্বীকার করে নেবে?

উত্তর : না। গোটা দেশের জনগণের মতো চীনা কমিউনিস্ট পার্টিও চীনের মাটির এক ইঞ্চি জমিও জাপানকে দখল করে রাখতে দেবে না।

প্রশ্ন : আপনার মতে এই মুক্তিযুদ্ধে অনুসরণীয় মুখ্য রণনীতি কি হওয়া উচিত?

উত্তর : আমাদের রণনীতি হওয়া উচিত একটা অত্যন্ত সম্প্রসারিত ও পরিবর্তনশীল যুক্তফ্রণ্টে লড়াই চালাবার জন্য আমাদের প্রধান শক্তিকে নিয়োগ করা। বিজয় অর্জনের জন্য চীনা সৈন্যবাহিনীর অবশ্যই বিস্তৃত রণক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রার চলমান যুদ্ধ চালাতে হবে, দ্রুত অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণ, দ্রুত সমাবিষ্ট ও বিক্ষিপ্তকরণ করতে হবে। এটা হচ্ছে বিরাটাকারের চলমান যুদ্ধ, এবং অবস্থানগত যুদ্ধ নয়; অবস্থানগত যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে প্রতিরক্ষাত্মক অবস্থা, গভীর পরিখা, উঁচু উঁচু দুর্গ ও প্রতিরক্ষাত্মক অবস্থানস্থিতির ধারাবাহিক সারির ওপরে নির্ভরশীল। এতে কিন্তু যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থানগুলোকে ছেড়ে দেওয়া বোঝায় না

এইসব জায়গায় যদি সুবিধে হয়, তাহলে অবশ্যই অবস্থানগত যুদ্ধ চালাতে হবে। কিন্তু গোটা পরিস্থিতিকে বদলাবার জন্য যে রণনীতি অবশ্যই প্রয়োজন, তা হচ্ছে চলমান যুদ্ধের নীতি। অবস্থানগত যুদ্ধও দরকার, কিন্তু সেটি সহায়ক এবং গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে রণক্ষেত্রটি এত বিস্তৃত যে, আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি কার্যকরীভাবে চলমান যুদ্ধ চালানো সম্ভব। আমাদের বাহিনীর প্রচণ্ড প্রাণশক্তিসম্পন্ন কার্যকলাপের মুখে জাপানী বাহিনী সতর্ক হতে বাধ্য। তার যুদ্ধযন্ত্রটি হচ্ছে গুরুভার ও মন্থরগতি আর তার কার্যক্ষমতা হচ্ছে সীমিত। আমরা যদি আমাদের সৈন্যশক্তিকে একটা সঙ্কীর্ণ রণক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করে এবং শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে শত্রুকে প্রতিরোধ করি, তাহলে আমাদের বাহিনী ভৌগোলিক অবস্থার ও অর্থনৈতিক সংগঠনের সুবিধাদির সুযোগ খোয়াবে এবং আবিসিনিয়া যে ভুল করেছিল আমরাও সেই ভুল করে বসব। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে কোনরকমের বিরাটাকারের নির্ধারক লড়াই আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে এবং প্রথমে চলমান লড়াইকে কাজে লাগিয়ে শত্রু-সৈন্যদের মনোবল ও যুদ্ধক্ষমতাকে ক্রমে ক্রমে ভেঙে দিতে হবে।

চলমান যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা ছাড়াও কৃষকদের মধ্যে বহুসংখ্যক গেরিলা ইউনিট সংগঠিত করতে হবে। এটা জানা উচিত যে, গোটা দেশের কৃষকদের থেকে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাবার জন্য যে অন্তর্নিহিত শক্তিকে সমাবেশ করা যায়, তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশের জাপ-বিরোধী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীগুলি হচ্ছে শুধু তার ছোট একটা অংশেরই প্রকাশ মাত্র। চীনা কৃষকদের প্রভূত অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। উপযুক্তভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত হলে তারা জাপানী বাহিনীকে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই উদ্ব্যস্ত করে রাখতে পারে এবং হয়রান ও বিপর্যস্ত করে দিয়ে মরার সামিল করতে পারে। এ কথাটি স্মরণ রাখতে হবে যে, যুদ্ধটি লড়া হবে চীনদেশের বুকে, অর্থাৎ জাপানী বাহিনী শত্রুভাবাপন্ন চীনা জনগণের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত হতে বাধ্য; সে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধসামগ্রী বাইরে থেকে আনতে এবং সেগুলিকে নিজে পাহারা দিয়ে রক্ষা করতে বাধ্য হবে; তার যোগাযোগ পথকে রক্ষা করার জন্য তাকে প্রবল সৈন্যশক্তি অবশ্যই নিয়োগ করতে হবে এবং আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিয়তই সতর্কভাবে পাহারা দিতে

হবে ; তাছাড়া, মাঞ্চুরিয়ায় ও জাপানের অভ্যন্তরেও বিরাট সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করতে হবে।

যুদ্ধের গতিপথে চীন বহুসংখ্যক জাপানী সৈন্যকে বন্দী করতে এবং বহুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করে নিজেকে অস্ত্রসজ্জিত করে নিতে পারবে ; একই সময়ে চীন আবার বৈদেশিক সাহায্যও লাভ করবে, যাতে করে ধীরে ধীরে চীনের সৈন্যবাহিনীর সাজসরঞ্জাম উন্নত হয়ে উঠবে। তাই, যুদ্ধের শেষের পর্যায়ে চীন অবস্থানগত যুদ্ধ চালাতে সমর্থ হবে এবং সমর্থ হবে জাপানের অধিকৃত এলাকাগুলির ওপর অবস্থানগত আক্রমণ চালাতে। এইভাবে চীনের দীর্ঘ প্রতিরোধ-যুদ্ধের চাপে জাপানের অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, এবং অসংখ্য লড়াইয়ের কষ্টভোগের ফলে চুরমার হয়ে যাবে জাপানী সৈন্যদের মনোবল। আর চীনের ক্ষেত্রে, তার প্রতিরোধ-যুদ্ধের অন্তর্নিহিত শক্তি দিন দিন প্রস্ফুটিত ও বর্ধিত হয়ে উঠবে আর বিরাট সংখ্যক বিপ্লবী জনসাধারণ নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে অবিরামভাবে যুক্তফ্রন্টে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এইসব উপাদানকে অপরাপর উপাদানের সংগে সংযুক্ত করে আমরা জাপানের অধিকৃত অঞ্চলের দুর্গ ও ঘাঁটিগুলির ওপর চূড়ান্ত ও মারাত্মক আঘাত হানতে এবং চীনের মাটি থেকে আগ্রাসী জাপানী সৈন্যবাহিনীকে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হব। (এডগার স্নো : 'উত্তর-পশ্চিম চীনের রূপরেখা')

দশ মাসের প্রতিরোধ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে উপরোল্লিখিত অভিমত-গুলি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সেগুলি সঠিক বলে প্রমাণিত হবে।

(৭) ১৯৩৭ সালের ২৫শে আগস্ট তারিখে—লুকৌচিয়াও ঘটনার পরে দুই মাস পূর্ণ হবার আগেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার 'বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টির কর্তব্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে' স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছিল :

লুকৌচিয়াওয়ে জাপানী আক্রমণকারীদের সামরিক প্ররোচনা ও তাদের পিপিং ও তিয়েনসিন দখল করে নেওয়াটা হচ্ছে চীনের মূল অংশের ওপরে তাদের ব্যাপক আক্রমণের সূচনা মাত্র। যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই জাপানী আক্রমণকারীরা তাদের জাতীয় শক্তিসমাবেশ করতে শুরু করেছে।

তাদের তথাকথিত 'পরিস্থিতিকে আরও গুরুতর করে তোলার কোন ইচ্ছা নেই'—এই প্রচারটি হচ্ছে তাদের আক্রমণকে আড়াল করে রাখার নিছক ধূম্রজাল।

৭ই জুলাইয়ে লুকৌচিয়াওয়ের প্রতিরোধ হচ্ছে চীনের দেশব্যাপী প্রতিরোধ-যুদ্ধের সূত্রপাত মাত্র।

চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তখন থেকে সূত্রপাত হয়েছে একটা নতুন পর্যায়ের—প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালানোর পর্যায়ের। প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির পর্যায়টি শেষ হয়ে গেছে। এই নতুন পর্যায়ের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করা।

প্রতিবোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে ইতিমধ্যেই সূচিত প্রতিরোধ-যুদ্ধকে গোটা জাতির সামগ্রিক প্রতিরোধ-যুদ্ধে পরিণত করা। শুধুমাত্র এই ধরনের গোটা জাতির সামগ্রিক প্রতিরোধ যুদ্ধের মাধ্যমেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হতে পারে।

প্রতিরোধ-যুদ্ধের বর্তমান গুরুতর দুর্বলতাসমূহ ভবিষ্যতে প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় বহু বিপত্তি, পশ্চাদপসরণ, আভ্যন্তরীণ, বিভক্তি ও বিশ্বাস-ঘাতকতা, সাময়িক ও আংশিক আপোষাদি এবং এই ধরনের অন্যান্য প্রতি-কুল অবস্থা ঘটাতে পারে। তাই এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, যুদ্ধটি হবে কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইতিমধ্যেই সূচিত প্রতিবোধ-যুদ্ধ আমাদের পার্টি ও সারা দেশের জনগণের প্রয়াস-প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে যাবতীয় বাধাবিপত্তিকে দূর করে দেবে আর অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাবে ও বিকাশলাভ করবে।

প্রতিরোধ-যুদ্ধের দশ মাসের অভিজ্ঞতার আলোকে উপরোল্লিখিত অভিমত-গুলিও সঠিক প্রমাণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা সঠিক বলে প্রমাণিত হবে।

(৮) যুদ্ধের প্রশ্নে ভাববাদী ও যান্ত্রিক প্রবণতা হচ্ছে যাবতীয় ভ্রমাত্মক অভিমতের জ্ঞানতত্ত্বগত উৎস। সমস্যার প্রতি বিচার-দৃষ্টির ব্যাপারে এ ধরনের প্রবণতাযুক্ত লোকদের পদ্ধতি হচ্ছে আত্মমুখী ও একতরফা। হয় তারা এক-বারেই অমূলক ও নিছক আত্মমুখী কথাবার্তায় মেতে ওঠে, আর না হয়, সমস্যার কোন একটা দিক অথবা একটা সময়ের অভিব্যক্তির ওপরে ভিত্তি করে তাকে অনুরূপ মনের রং লাগিয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে একটা গোটা সমস্যায় অতিরঞ্জিত

করে তোলে। কিন্তু মানুষের ভ্রমাত্মক অভিমতগুলো দুইভাগে বিভক্ত হতে পারে: এক ধরনের অভিমত হচ্ছে মৌলিক এবং পারম্পর্যশীল—এগুলো শোধরানো কঠিন; অন্য ধরনের অভিমত হচ্ছে আকস্মিক ও সাময়িক, এগুলো শোধরানো সহজ। যেহেতু দুই-ই ভুল, তাই উভয়কেই শুধরে নেওয়া দরকার। সুতরাং যুদ্ধের প্রশ্নে ভাববাদী ও যান্ত্রিক প্রবণতাগুলোর বিরোধিতা করে এবং যুদ্ধের পর্যালোচনা করার সময়ে একটা বাস্তব ও সর্বতোমুখী বিচারদৃষ্টি গ্রহণ করেই শুধু আমরা যুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত টানতে পারি।

সমস্যার ভিত্তি

(৯) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কেন? আর চূড়ান্ত বিজয় কেনই-বা চীনের হবে? এইসব উক্তির ভিত্তি কি?

চীন-জাপানের যুদ্ধটি যে-কোন প্রকারের একটি যুদ্ধ মাত্র নয়, এটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর ৩০-এর দশকে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীন আর সাম্রাজ্যবাদী জাপানের মধ্যে জীবন-মরণের যুদ্ধ। গোটা সমস্যার ভিত্তি নিহিত রয়েছে এইখানেই। এই যুদ্ধের দুটি পক্ষের বহু বৈসাদৃশ্যসূচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সেগুলির আলোচনা নীচে করা হবে।

(১০) **জাপানী পক্ষ।** প্রথমতঃ, জাপান হচ্ছে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ। সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তিতে প্রাচ্যে তার স্থান প্রথমে এবং দুনিয়ার পাঁচ বা ছয়টি প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে জাপান হচ্ছে অন্যতম। এটা হচ্ছে জাপানের আগ্রাসী যুদ্ধের বুনিয়াদী শর্ত। যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা ও চীনের পক্ষে দ্রুত জয়লাভের অসম্ভাব্যতা উদ্ভূত হয় জাপানের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা থেকে এবং তার বিরাট সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তি থেকে। যাই হোক, দ্বিতীয়তঃ, জাপানের সামাজিক অর্থব্যবস্থার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রটি থেকে উদ্ভূত হয় তার যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র—তার এ যুদ্ধ অধঃপতনমুখী ও বর্বরোচিত। বিংশ শতাব্দীর ৩০-এর দশকের জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় দ্বন্দ্বগুলি তাকে যে শুধু তুলনাহীন মাত্রার দুঃসাহসিক যুদ্ধ শুরু করতে বাধ্য করেছে তাই নয়, পরন্তু চরম পতনের মুখে তাকে ঠেলে দিয়েছে। সামাজিক বিকাশের দিক থেকে বলতে গেলে, জাপান এখন আর বর্ধিষ্ণু দেশ নয়; জাপানের শাসকশ্রেণী যা চায় সেই সমৃদ্ধির পথে এ যুদ্ধ জাপানকে নিয়ে যাবে

না, বরং তাকে নিয়ে যাবে ঠিক তার বিপরীত পথে—জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সর্বনাশের পথে। জাপানের যুদ্ধের অধঃপতনমুখী চরিত্র বলতে আমরা যা বোঝাই তা হচ্ছে এই। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ। এর এই বৈশিষ্ট্যের সংগে যুদ্ধের অধঃপতনমুখী চরিত্রটি মিলে জাপানের যুদ্ধের বিশেষ বর্বরতার উদ্ভব ঘটায়। আর এ সবের ফলে চরমমাত্রায় জাপানের অভ্যন্তরে শ্রেণী-বিরোধ, জাপানী ও চীনা জাতির মধ্যে বৈরিতা এবং জাপান ও দুনিয়ার অপরাপর অধিকাংশ দেশের মধ্যে বৈরিতা জেগে উঠবে। জাপানের যুদ্ধের অধঃপতনমুখী ও বর্বরোচিত চরিত্রই হবে তার অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের মুখ্য কারণ। এ-টুকুতেই শেষ নয়। তৃতীয়তঃ, জাপানের যুদ্ধ যদিও চালিত হচ্ছে তার বিরাট সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তির ভিত্তিতে, তবুও সেই একই সময়ে সেটি আবার চালিত হচ্ছে তার সহজাত দুর্বলতার ভিত্তিতেও। যদিও জাপানের সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তি বিরাট, তবুও এ শক্তি পরিমাণগতভাবে অপর্যাপ্ত। জাপান হচ্ছে তুলনামূলকভাবে একটি ছোট দেশ। জনবলে এবং সামরিক, আর্থিক ও বস্তুগত শক্তিতে হীন বলেই সে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সহ্য করতে পারে না। জাপানের শাসকরা যুদ্ধের মাধ্যমে এই অসুবিধাটির সমাধান করতে চাইছে, কিন্তু অনুরূপভাবেই তারা যা চাইছে তারও উল্টোটিই তারা পাবে। অর্থাৎ এই অসুবিধা মেটাবার জন্য তারা যুদ্ধ বাধিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধের ফলে তাদের অসুবিধা আরও গুরুতর হয়ে উঠবে, এমনকি আগে জাপানের যা ছিল তাও ফুরিয়ে যাবে। চতুর্থতঃ, এবং শেষতঃ, দুনিয়ার ফ্যাসিবাদী দেশগুলির কাছ থেকে জাপান যে আন্তর্জাতিক সাহায্যলাভ করতে পারে, কিন্তু একই সময়ে জাপান আন্তর্জাতিক বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করতে বাধ্য, সেটি তার পাওয়া আন্তর্জাতিক সাহায্যের থেকে অনেক বেশি গুরুতর। এই ধরনের বিরোধী শক্তি ক্রমশঃ বাড়বে এবং অবশেষে তা যে শুধু ফ্যাসিবাদী দেশগুলোর সাহায্যকে অতিক্রম করে যাবে তা-ই নয়, পরন্তু খোদ জাপানের ওপরও চাপ দেবে। এই হচ্ছে বিধি যে, অন্যায় কাজ সামান্যই সমর্থনলাভ করে এবং এই ফলশ্রুতি উদ্ভূত হয় জাপানের যুদ্ধের নিজস্ব প্রকৃতি থেকেই। সংক্ষেপে বলা যায়, জাপানের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তার যুদ্ধ চালাবার বিরাট সামর্থ্যে আর তার দুর্বলতা রয়েছে তার যুদ্ধের অধঃপতনমুখী ও বর্বরোচিত চরিত্রে, তার জনবল ও বস্তুগত সম্পদভাণ্ডারের অপ্রতুলতায় এবং তার নগণ্য আন্তর্জাতিক সাহায্যে। এ সবই হচ্ছে জাপানী পক্ষের বৈশিষ্ট্য।

(১১) **চীনা পক্ষ।** প্রথমতঃ, আমাদের দেশ হচ্ছে একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ। আফিম যুদ্ধ[৯], তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের যুদ্ধ[১০], ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলন[১১], ১৯১১ সালের বিপ্লব[১২] এবং উত্তর অভিযান[১৩]—এ সবই ছিল আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে চীনকে মুক্ত করার জন্য বিপ্লবী বা সংস্কার আন্দোলন, কিন্তু এ সবগুলিকেই গুরুতর বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাই চীন এখনো রয়েছে একটি আধা-ঔপনিশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ। আমরা এখনো দুর্বল দেশ এবং সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তিতে শত্রুর থেকে দুর্বল। যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা ও চীনের পক্ষে দ্রুত জয়লাভের অসম্ভাব্যতার ভিত্তি এখানেও দেখতে পাওয়া যায়। তবুও, দ্বিতীয়তঃ, আজ চীনের মুক্তি-আন্দোলন তার বিগত একশ বছরের ক্রমঃবর্ধমান পরিপুষ্টির ফলে ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী যে-কোন ঐতিহাসিক পর্যায়ের থেকে ভিন্ন। অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় বিরোধী শক্তিগুলি এই মুক্তি-আন্দোলনে গুরুতর বিপত্তির সৃষ্টি করে থাকলেও, সেই একই সময়ে সেগুলি আবার চীনা জনগণকে পোড় খাইয়ে বজ্রকঠোর করে তুলেছে। আজ চীন সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে জাপানের মতো ততটা শক্তিশালী না হলেও তার ইতিহাসের যে-কোন সময়ের তুলনায় চীনে এখন অধিকতর প্রগতিশীল উপাদান রয়েছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নেতৃত্বাধীন সৈন্যবাহিনী হচ্ছে এইসব প্রগতিশীল উপাদানের প্রতিনিধি। এই প্রগতির ভিত্তিতেই চীনের বর্তমান মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ পতনোন্মুখ—তার ঠিক বিপরীতে চীন হচ্ছে ভোরের সূর্যের মতো একটি উদীয়মান দেশ। চীনের যুদ্ধ হচ্ছে প্রগতিশীল আর এই ধরনের প্রগতিশীলতার কারণ থেকেই উদ্ভূত হয় তার যুদ্ধের ন্যায়সঙ্গত চরিত্র। এটা ন্যায়যুদ্ধ বলেই তা চীনের সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, শত্রুদেশের জনগণের মধ্যে সহানুভূতি জাগাতে পারে এবং দুনিয়ার অধিকাংশ দেশের সমর্থনলাভ করতে পারে। তৃতীয়তঃ, আবার জাপানের বিপরীতে চীন হচ্ছে একটা অত্যন্ত বিরাট দেশ, সুবিশাল তার ভূখণ্ড, সমৃদ্ধ তার সম্পদসম্ভার, বিরাট তার জনসংখ্যা এবং প্রচুর তার সৈন্য, তাই একটি দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চীন সইতে পারে। চতুর্থতঃ এবং শেষতঃ, চীনের যুদ্ধের প্রগতিশীল ও ন্যায়সঙ্গত চরিত্রের কারণে সে পেয়েছে একটা

ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থন। এটাও জাপানের তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ যেহেতু জাপান অন্যায় কাজ করছে, তাই সামান্য সমর্থনই সে লাভ করছে। সংক্ষেপে বলা যায়, চীনের অসুবিধা রয়েছে তার সামরিক দুর্বলতায়, আর তার সুবিধা রয়েছে তার যুদ্ধের প্রগতিশীল ও ন্যায়সঙ্গত চরিত্রে, তার বিরাট ভৌগোলিক আয়তনে ও তার প্রভূত আন্তর্জাতিক সমর্থনে। এইগুলিই হচ্ছে চীনের বৈশিষ্ট্য।

(১২) এইভাবে দেখতে পারা যায় যে, জাপানের বিরাট সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তি রয়েছে, কিন্তু তার যুদ্ধটি হচ্ছে অধঃপতনমুখী ও বর্বরোচিত, তার জনবল ও বস্তুগত সম্পদসম্ভার অপ্রচুর এবং আন্তর্জাতিকভাবে সে এক প্রতিকূল অবস্থায় অবস্থিত। পক্ষান্তরে, চীনের সামরিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও এখন সে প্রগতির যুগে রয়েছে, তার যুদ্ধ হচ্ছে প্রগতিশীল ও ন্যায়সঙ্গত; আবার সে হচ্ছে একটা বিরাট দেশ—এটা হচ্ছে এমন একটা উপকরণ, যা তাকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সমর্থ করে, অধিকন্তু অধিকাংশ দেশ কর্তৃক সে সমর্থিত হবে।—উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে চীন-জাপান যুদ্ধের মৌলিক ও পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্য। এইসব বৈশিষ্ট্যই নির্ধারণ করেছে ও করছে উভয় পক্ষের রাজনৈতিক নীতি এবং সামরিক রণনীতি ও রণকৌশল, নির্ধারণ করেছে ও করছে যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্র এবং তার পরিণতি, যথা, চূড়ান্ত বিজয় চীনেরই হবে, জাপানের নয়। এ যুদ্ধ হচ্ছে এইসব বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা। যুদ্ধের গতিপথে সেগুলি বদলাবে আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী, আর এর থেকে আসবে অন্যান্য সবকিছু। এইসব বৈশিষ্ট্য বাস্তবভাবে বিদ্যমান, লোকজনকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে সেগুলিকে উদ্ভাবন করা হয়নি; এগুলি হচ্ছে যুদ্ধের যাবতীয় মৌলিক উপাদান, এবং এগুলি অপূর্ণ অংশ নয়; উভয় পক্ষের যাবতীয় বড় ও ছোট সমস্যাগুলির মধ্যে এবং যুদ্ধের সর্ব পর্যায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এগুলি, আর এগুলি মোটেই অবজ্ঞার বস্তু নয়। যদি কেউ চীন-জাপান যুদ্ধের পর্যালোচনা করতে গিয়ে এ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভুলে যায়, তাহলে সে নিশ্চয়ই ভুল করবে; এবং তার কোন কোন অভিমত কিছু সময়ের জন্য কোন মানুষের বিশ্বাস অর্জন করলেও এবং সেগুলিকে সঠিক মনে হলেও, যুদ্ধের গতিধারা সেগুলিকে নিশ্চিন্তভাবে ভুল বলে প্রমাণ করবে। এইসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই এখন আমরা যাবতীয় আলোচ্য সমস্যার ব্যাখ্যা শুরু করব।

(১৩) জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীদের চোখে শত্রুর প্রবলতার ও আমাদের দুর্বলতার তুলনামূলক বৈপরীত্য ছাড়া আর কিছুই পড়ে না। আগে তারা বলত, 'প্রতিরোধ করলে অনিবার্যভাবেই পদানত হব', আর এখন আবার বলছে, 'যুদ্ধ অব্যাহত রাখলে অনিবার্যভাবেই পদানত হব।' শক্তিশালী হলেও জাপান ছোট, আর দুর্বল হলেও চীন বিরাট—আমরা শুধু এ কথা বলেই তাদের বিশ্বাস করাতে পারব না। ছোট কিন্তু শক্তিশালী দেশ একটি বিরাট অথচ দুর্বল দেশকে পরাভূত করতে পারে, উপরন্তু একটি অনগ্রসর দেশ একটি অগ্রসর দেশকে পরাজিত করতে পারে—এটি প্রমাণ করার জন্য তারা ইউয়ান কর্তৃক সুং বংশের ধ্বংসসাধন, এবং ছিং কর্তৃক মিং বংশের ধ্বংস-সাধনের মতো ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিতে পারে। আমরা যদি বলি যে, এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল বহুদিন আগে, এগুলি বর্তমানের বিষয়টি প্রমাণ করতে পারে না, তাহলে তারা একটি ছোট অথচ শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ যে একটা বিরাট অথচ দুর্বল ও অনগ্রসর দেশকে পরাভূত করতে পারে, তা প্রমাণ করার জন্য ব্রিটেন কর্তৃক ভারতবর্ষকে পদানত করার নজিরটি দেখাতে পারে। সুতরাং, আমাদের অবশ্যই অন্যান্য যুক্তিও প্রদর্শন করতে হবে, তাহলেই কেবল আমরা সমস্ত জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীদের চুপ করিয়ে দিতে ও তাদের বিশ্বাস করাতে পারব এবং এখনো যারা বিভ্রান্ত বা অস্থিরসংকল্প আছে তাদের প্রত্যয় জন্মাবার আর প্রতিরোধ-যুদ্ধে তাদের আস্থাকে জোরদার করার জন্য প্রচারের কাজে লিপ্ত সমস্ত লোকজনকে পর্যাপ্ত যুক্তি যোগাতে পারব।

(১৪) তাহলে কি যুক্তি আমাদের খাড়া করা উচিত? যুগের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য মূর্তভাবে প্রতিভাত হয়েছে জাপানের অধঃপতনমুখিতা ও সমর্থনের স্বল্পতার মধ্যে আর চীনের প্রগতি ও সমর্থনপ্রাচুর্যের মধ্য দিয়ে।

(১৫) আমাদের যুদ্ধ যে-কোন ধরনের একটি যুদ্ধ মাত্র নয়। এটি বিংশ শতাব্দীর ৩০-এর দশকে চীন ও জাপানের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ। আমাদের শত্রু সম্পর্কে বলতে গেলে, প্রথমে সে হচ্ছে মরণোন্মুখ সাম্রাজ্যবাদ। সে ইতিমধ্যেই তার অধঃপতনমুখী যুগের কবলিত। ব্রিটেন কর্তৃক ভারতবর্ষকে পদানতকরণের সময়েও পুঁজিবাদ ছিল প্রগতির যুগে। সেই সময়ের ব্রিটেনের

যে অবস্থা ছিল, জাপান যে এখন শুধু তার থেকেই ভিন্ন রকমের অবস্থায় আছে তা-ই নয়, পরন্তু বিশ বছর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সে নিজে যে রকম অবস্থায় ছিল, তার থেকেও আজ তার অবস্থা ভিন্ন। বর্তমান যুদ্ধটি শুরু হয়েছিল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের, সর্বোপরি ফ্যাসিবাদী দেশগুলির সার্বজনীন ধ্বংসের প্রাক্কালে, ঠিক এই কারণেই শত্রু বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসেবে এই হঠকারী যুদ্ধ বাধিয়েছে। তাই, এই যুদ্ধের ফলে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, সে চীন নয়—বরং সে হবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের শাসকচক্র, এটা হচ্ছে অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। উপরন্তু, জাপান এমন একটা সময়ে এ যুদ্ধ বাধিয়েছে, যখন দুনিয়ার বহু দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে অথবা পড়ার মুখে, যখন বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে তারা সবাই লড়ছে বা লড়াই করার জন্য তৈরী হচ্ছে, আর চীনের স্বার্থ দুনিয়ার অধিকাংশ দেশ ও জনগণের স্বার্থের সংগে গ্রথিত হয়ে গেছে। দুনিয়ার অধিকাংশ দেশ ও জনগণের মধ্যে জাপান যে বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করেছে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে যে বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করবে, তার মূল কারণ এটাই।

(১৬) চীনের ব্যাপার কি? অন্য যে-কোন ঐতিহাসিক যুগের চীনের সংগে আজকের চীনের তুলনা চলে না। আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ—এটা হচ্ছে চীনের বৈশিষ্ট্য, তাই তাকে দুর্বল দেশ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু সেই একই সময়ে ঐতিহাসিকভাবে চীন এখন তার প্রগতির যুগে, আর এটাই হচ্ছে তার জাপানকে হারিয়ে দিতে সক্ষম হবার মুখ্য কারণ। আমরা যখন বলি যে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হচ্ছে প্রগতিশীল, তখন আমরা সাধারণ বা সার্বজনীন অর্থে প্রগতিকে বোঝাই না, এবং যে অর্থে ইতালীর বিরুদ্ধে আবিসিনিয়ার যুদ্ধ কিংবা তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের যুদ্ধ অথবা সিনহাই বিপ্লব প্রগতিশীল ছিল, সেই অর্থেও প্রগতিকে আমরা বোঝাই না, চীন আজ যে অর্থে প্রগতিশীল, সেই অর্থেই প্রগতিকে আমরা বোঝাই। কোন্ দিক থেকে আজকের চীন প্রগতিশীল? সে প্রগতিশীল, কারণ আজ সে আর পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক দেশ নয়, ইতিমধ্যেই চীনে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়েছে, উদ্ভব হয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর ও সর্বহারাশ্রেণীর, এবং এখানে রয়েছেন ব্যাপক জনগণ যাঁরা ইতিমধ্যেই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন বা উঠছেন, আমাদের একটি কমিউনিস্ট পার্টি আছে, আমাদের আছে একটি রাজনৈতিকভাবে প্রগতিশীল ফৌজ অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন চীনা

লালফৌজ, আছে বহু দশকের বিপ্লবের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হবার পরবর্তী সতের বছরের অভিজ্ঞতা। এইসব অভিজ্ঞতাই চীনা জনগণকে ও চীনের রাজনৈতিক পার্টিগুলিকে শিক্ষা দান করেছে আর এগুলিই আজ গড়ে তুলেছে জাপ-বিরোধী ঐক্যের বুনিয়াদ। যদি এ কথা বলা হয় যে, রাশিয়ায় ১৯০৫ সালের অভিজ্ঞতাকে বাদ দিলে ১৯১৭ সালের জয়লাভ অসম্ভব হতো, তাহলে আমরাও বলতে পারি যে, বিগত সতের বছরের অভিজ্ঞতাকে বাদ দিলে আমাদের এই জাপ-বিরোধী যুদ্ধটি জেতাও অসম্ভব হবে। এটাই হচ্ছে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে চীন এ যুদ্ধে নিঃসঙ্গ নয়, আর এই ঘটনাটিও ইতিহাসে নজিরবিহীন। অতীতে চীনের যুদ্ধগুলোই হোক অথবা ভারতবর্ষের যুদ্ধগুলোই হোক, সবই লড়া হয়েছিল বিচ্ছিন্নভাবে। দুনিয়াজোড়া যে অভূতপূর্ব ব্যাপক ও গভীর গণ-আন্দোলন জেগে উঠেছে অথবা উঠছে এবং চীনকে সাহায্য করছে, তা আমরা শুধু বর্তমানেই দেখতে পাই। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবও আন্তর্জাতিক সমর্থনলাভ করেছিল এবং তার ফলে রুশ শ্রমিক ও কৃষকরা জয়লাভ করেছিল। কিন্তু আজ আমরা যে সমর্থনলাভ করছি, সেই সমর্থন তার মতো মাত্রায় ব্যাপক ও প্রকৃতিতে গভীর নয়। আজকের বিশ্বে গণ আন্দোলন ব্যাপকতায় ও গভীরতায় অভূতপূর্বভাবে বিকশিত হয়ে উঠছে। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব আজকের দিনের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন নিশ্চয়ই চরম উৎসাহের সংগে চীনকে সাহায্য করবে; বিশ বছর আগে এ ধরনের কিছুই ছিল না। এই সবই চীনের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য সৃষ্টি করেছে বা করছে অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহের। যদিও বিরাট পরিমাণের প্রত্যক্ষ সাহায্যের এখনো অভাব এবং সেটা শুধু ভবিষ্যতেই আসবে, তবুও চীন বিরাট দেশ বলেই সে তার যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সমর্থ হবে, আর সমর্থ হবে প্রগতিশীল ও আন্তর্জাতিক সাহায্যকে ত্বরান্বিত করতে এবং তার প্রতীক্ষা করতে।

(১৭) তদুপরি জাপান হচ্ছে একটা ছোট দেশ, ভূ-আয়তন তার ছোট, সম্পদসম্ভার তার স্বল্প, জনসংখ্যা তার কম, আর সৈন্যসংখ্যা তার সীমিত কিন্তু চীন হচ্ছে বিরাট এক দেশ, ভূ-আয়তন তার সুবিশাল, সম্পদসম্ভারে সে সমৃদ্ধ জনসংখ্যা তার বিরাট, আর সৈন্যও তার প্রচুর। তাই প্রবলতা

ও দুর্বলতার বৈসাদৃশ্য ছাড়াও, একটি ছোট দেশ, অধঃপতনমুখিতা ও নগণ্য সমর্থন—বনাম একটি বিরাট দেশ, প্রগতি ও প্রচুর সমর্থনের বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। চীন যে কোনদিনই পদানত হবে না—এটাই হচ্ছে তার ভিত্তি। যদিও প্রবলতা ও দুর্বলতার বৈসাদৃশ্য থেকে স্থির হয়েছে যে, কিছুদিনের জন্য ও কিছুটা পরিমাণে জাপান চীনে যথেচ্ছাচার করতে পারে, চীনকে অনিবার্যভাবেই দুর্গম পথে এগুতে হবে, আর জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধ নয়; তবুও ছোট দেশ, অধঃপতনমুখিতা ও নগণ্য সমর্থন—বনাম বিরাট দেশ, প্রগতি ও প্রচুর সমর্থনের এই বৈসাদৃশ্য থেকেই আবার স্থির হয়েছে যে, জাপান চীনে চিরকাল ধরে যথেচ্ছাচার করে যেতে পারবে না এবং চরম পরাজয় তাকে অবশ্যই ভোগ করতেই হবে, পক্ষান্তরে চীন কোনমতেই পদানত হবে না, পরন্তু চূড়ান্ত বিজয় সে অর্জন করবেই।

(১৮) আবিসিনিয়া পদানত হয়েছিল কেন? প্রথমতঃ, সে যে শুধু দুর্বল দেশই ছিল তাই নয়, পরন্তু সে ছোটও ছিল। দ্বিতীয়তঃ, সে চীনের মতো অতটা প্রগতিশীল ছিল না, সে ছিল প্রাচীন দেশ—ক্রীতদাস ব্যবস্থা থেকে সে তখন ভূমিদাস ব্যবস্থায় উন্নীত হচ্ছিল। সে দেশে না ছিল পুঁজিবাদ, না ছিল বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টির তো কথাই ওঠে না। চীনা বাহিনীর মতো তার কোন সৈন্যবাহিনীও ছিল না, অষ্টম রুট বাহিনীর মতো বাহিনী তো অনেক দূরের কথা। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সমর্থনের প্রতীক্ষা করার সামর্থ্য তার ছিল না এবং নিঃসঙ্গভাবে তাকে লড়তে হয়েছিল। চতুর্থতঃ, এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, ইতালীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের পরিচালনায় ভুল ছিল। তাই আবিসিনিয়া পদানত হয়েছিল। কিন্তু, এখনো আবিসিনিয়ায় বেশ ব্যাপক গেরিলাযুদ্ধ চলছে এবং যদি হাবসীরা অটলভাবে এই যুদ্ধ চালিয়ে যান, তাহলে পরবর্তীকালের বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তনে তাঁরা তাঁদের মাতৃ-ভূমিকে পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হবেন।

(১৯) 'প্রতিরোধ করলে অনিবার্যভাবেই পদানত হব' এবং 'যুদ্ধ অব্যাহত রাখলে অনিবার্যভাবেই পদানত হব'—এই বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীরা যদি আধুনিক চীনের মুক্তি-আন্দোলনের ব্যর্থতার ইতিহাসের নজির দেখায়, তাহলে সে ক্ষেত্রেও পুনরায় আমাদের জবাব হচ্ছে: 'যুগটা ভিন্ন'। চীনের নিজস্ব অবস্থা, জাপানের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশ—সবই আগের চেয়ে ভিন্ন। জাপান

এখন আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, আর চীন এখনো অপরিবর্তিত আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায় রয়েছে, এবং এখনো খুব দুর্বল। এটা খুবই গুরুতর অবস্থা। জাপান এখনো তার দেশের জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং চীনের ওপর আক্রমণ করার জন্য আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বগুলোকে অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগাতে পারে, এ সবই হচ্ছে বাস্তব ঘটনা। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় এই পরিস্থিতি বিপরীত দিকে মোড় ফিরতে বাধ্য। এখনো এটা ঘটেনি, কিন্তু ভবিষ্যতে এটা অবশ্যই ঘটবে। কিন্তু জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীরা এই বিষয়টিকে অবহেলা করেছে। আর চীনের ক্ষেত্রে? চীনে ইতিমধ্যেই নতুন মানুষ, নতুন রাজনৈতিক পার্টি, নতুন সৈন্যবাহিনী এবং নতুন নীতি—জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নীতি—গড়ে উঠেছে, দশাধিক বছর আগে যা ছিল আজ পরিস্থিতিটি তার থেকে অনেক ভিন্নতর হয়েছে, শুধু তা-ই নয়, অধিকন্তু এগুলির অবশ্যম্ভাবীরূপে আরও বেশি অগ্রগতি ঘটবে। চীনের ইতিহাসে মুক্তি-আন্দোলনগুলি বারংবার বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিল, এবং তার ফলে বর্তমানের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য চীন অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়নি।—এটি হচ্ছে অত্যন্ত বেদনাকর ঐতিহাসিক শিক্ষা—আজ থেকে আর আমাদের নিজেদের কোন বিপ্লবী শক্তিকে নষ্ট করা চলবে না। বর্তমান অবস্থাতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করলে আমরা নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যেতে পারব এবং আমাদের প্রতিরোধের শক্তিকেও বাড়িয়ে নিতে পারব। মহান জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টই হচ্ছে এইসব প্রয়াসের মুখ্য দিক। আন্তর্জাতিক সমর্থনের ব্যাপারে বলা যায়, প্রভূত ও প্রত্যক্ষ সাহায্য এখনো নজরে না পড়লেও, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আগের থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন হয়ে উঠেছে এবং এখন প্রভূত ও প্রত্যক্ষ সাহায্যের শর্ত তৈরী হতে চলছে। আধুনিক চীনের মুক্তি-আন্দোলনের অসংখ্য ব্যর্থতার বাস্তব এবং অন্তর্নিহিত কারণ ছিল, কিন্তু আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। যদিও আজ আমাদের অনেক বাধা-বিপত্তি রয়েছে যা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে দুঃসাধ্য করে তুলেছে—যেমন শত্রুর প্রবলতা ও আমাদের দুর্বলতা, শত্রুর অসুবিধা সবেমাত্র শুরু হয়েছে, আমাদের প্রগতি আদৌ যথেষ্ট নয়, ইত্যাদি—তবুও শত্রুকে পরাভূত করার জন্য বহু অনুকূল শর্তও আছে। আমাদের শুধু দরকার আত্মগত প্রয়াস-প্রচেষ্টাকে সেগুলির সংগে জুড়ে নেওয়া, তাহলেই আমরা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জয়লাভ

করতে সমর্থ হব। এই ধরনের অনুকূল শর্তাদি আমাদের ইতিহাসে আগে আর কোনদিনই ছিল না। আর ঠিক সেই কারণেই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধটি অতীতের মুক্তি-আন্দোলনের মতো ব্যর্থতায় শেষ হবে না।

আপোষ, না প্রতিরোধ?
দুর্নীতি, না প্রগতি?

(২০) ওপরে এটা সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, জাতীয় পরাধীনতার তত্বটি হচ্ছে অমূলক। কিন্তু এমন অনেক লোক আছে, যারা জাতীয় পরাধীনতার মতবাদী নয়, তারা সৎ স্বদেশপ্রেমিক। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা কিন্তু তবুও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। দুটি বিষয় তাদের উদ্বিগ্ন করছে—জাপানের সংগে আপোষের ভয়, আর রাজনৈতিক প্রগতির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সংশয়। এই দুটি উদ্বেগজনক প্রশ্ন লোকজনের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে এবং তাদের সমাধানেব ভিত্তি এখনো পাওয়া যায়নি। এই দুটি প্রশ্ন সম্পর্কে একবার পর্যালোচনা কবে দেখা যাক।

(২১) আগে যেমন বলা হয়েছে, আপোষের প্রশ্নটির একটি নিজস্ব সামাজিক উৎস আছে, এবং যতদিন পর্যন্ত এই উৎস থাকবে ততদিন আপোষের প্রশ্নটিও উঠতে বাধ্য। কিন্তু আপোষ সফল হবে না। এই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য আবারও আমাদের দরকার শুধু জাপান, চীন ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করা। প্রথমতঃ, জাপানকে দেখা যাক। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের একেবারে শুরুতে আমরা অনুমান করেছিলাম যে, এমন একটা সময় আসবে যখন আপোষের অনুকূল একটা আবহাওয়া দেখা দেবে, অর্থাৎ উত্তর চীন, কিয়াংসু ও চেকিয়াং প্রদেশগুলো দখল করে নেবার পরে জাপান সম্ভবতঃ চীনকে আত্মসমর্পণ করাবাব জন্য কোন ফন্দি আঁটবে। সত্য বটে, ফন্দি সে এঁটেছিল; কিন্তু সংকটজনক সময়টি তাড়াতাড়ি কেটে গিয়েছিল, এবং তার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, শত্রু সর্বত্রই একটা বর্বর নীতি অনুসরণ করছিল এবং প্রকাশ্যভাবে লুণ্ঠন চালাচ্ছিল। চীন আত্মসমর্পণ করলে প্রতিটি :চীনা স্বদেশহীন ক্রীতদাস হয়ে পডত। শত্রুর এই লুণ্ঠনাত্মক নীতির অর্থাৎ চীনকে পদানত করার নীতির দুটি দিক আছে: বৈষয়িক এবং মানসিক। এগুলোর উভয়টিই ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল চীনা লোকের ওপরে প্রয়োগ করা হয়; শুধু যে নিচু স্তরের লোকজনের ওপরে প্রয়োগ করা হয় তাই

নয়, এমনকি উঁচু স্তরের লোকজনের ওপরেও তা প্রয়োগ করা হয়—অবশ্য শেষোক্তদের সংগে কিছুটা ভদ্রভাবে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তফাৎ শুধু মাত্রার, নীতির নয়। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশে শত্রু যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল সেই পুরানো ব্যবস্থাই এখন আবার সে চীনের অভ্যন্তর-ভাগে কাজে লাগাচ্ছে। বৈষয়িকভাবে, সাধারণ মানুষের খাদ্য ও বস্ত্র সে কেড়ে নিচ্ছে, এইভাবে ব্যাপক জনসাধারণকে সে ক্ষুধায় ও শীতে কাঁদাচ্ছে, উৎপাদনের হাতিয়ার সে লুঠ করছে, এইভাবে ধ্বংস করছে ও গোলাম বানাচ্ছে চীনের জাতীয় শিল্পকে। মানসিক দিক থেকে সে কাজ করে চলেছে চীনা জনগণের জাতীয় সচেতনতাকে ধ্বংস করার জন্য। 'উদীয়মান সূর্য' মার্কা পতাকাতলে প্রত্যেক চীনাই বাধ্য হচ্ছে সহজবশ্য প্রজা হতে ও ভারবাহী জানোয়ার বনতে—চীনা জাতীয় ভাবধারার অণুমাত্র রেশও দেখানো তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই বর্বর নীতিকে চীনের অভ্যন্তরে গভীর পর্যন্ত শত্রু নিয়ে যাবে। তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে জাপান যুদ্ধ থামাতে অনিচ্ছুক। ১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিখের জাপানী ক্যাবিনেটের বিবৃতিটিতে ঘোষিত নীতিটি[১৪] এখনো একগুঁয়েভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এবং তা না চালিয়ে পারে না, আর এতে চীনা জনগণের সর্বস্তরকে রাগিয়ে তুলেছে। জাপানের যুদ্ধের অধঃপতনমুখী ও বর্বর চরিত্রের জন্য এই রাগের সৃষ্টি হয়েছে। 'দুর্যোগের হাত থেকে রেহাই নেই', আর তাই জাপানের বিরুদ্ধে চরম বৈরিতা দানা বেঁধে উঠেছে। এই অনুমান করা যায় যে, ভবিষ্যতে কোন সময় শত্রু আবার চীনকে আত্মসমর্পণ করাবার ফন্দি আঁটকে এবং কোন কোন জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীরা আবার আঁটসাঁট বেঁধে বেরিয়ে আসবে, আর খুব সম্ভব কোন কোন বৈদেশিক উপাদানের (ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে ব্রিটেনের উচ্চতর স্তরের মধ্যে এ ধরনের লোককে দেখতে পাওয়া যায়) সংগে ষড়যন্ত্রের অংশীদার হিসেবে যোগসাজস করবে। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের অবশ্যম্ভাবী গতিধারা আত্মসমর্পণ করতে দেবে না। জাপানের যুদ্ধের একগুঁয়ে ও বিশেষ ধরনের বর্বর চরিত্র প্রশ্নের এই একটি দিককে স্থির করে দিয়েছে।

(২২) দ্বিতীয়তঃ, চীনের কথাই ধরা যাক। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার চীনের তিনটি উপাদান আছে। প্রথম হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি, যা হল জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার জন্য

জনগণকে পরিচালনা করার নির্ভরযোগ্য শক্তি। তার পরে আসছে কুওমিনতাঙ। ব্রিটেন ও আমেরিকার ওপরে নির্ভরশীল সে। তাই ব্রিটেন ও আমেরিকা না বললে কুওমিনতাঙ জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। সর্বশেষে হচ্ছে অন্যান্য পার্টি ও দলগুলো, এদের অধিকাংশই আপোষের বিরোধী এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধের সমর্থক। এই তিনের ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে-কেউ আপোষ করবে, সে দেশদ্রোহীর পর্যায়ভুক্ত হবে এবং তাকে শাস্তি দেবার অধিকার প্রত্যেকেরই থাকবে। যারা দেশদ্রোহীর পর্যায়ভুক্ত হতে চায় না, তাদের সকলেরই ঐক্যবদ্ধ জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে শেষ অবধি চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই, সুতরাং আপোষ কদাচিত সাফল্যলাভ করতে পারে।

(২৩) তৃতীয়তঃ, এবারে আন্তর্জাতিক দিকটি দেখা যাক। জাপানের মিত্রশক্তিগুলি এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের উচ্চস্তরের কিছু কিছু লোক ছাড়া গোটা দুনিয়া চীনের দ্বারা প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে, চীন কর্তৃক আপোষ করার বিপক্ষে। এই উপাদান চীনের আশাকে বলীয়ান করে তোলে। আজ গোটা দেশের জনগণ এই আশা পোষণ করে যে, আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ চীনকে ক্রমবর্ধমান সাহায্য দেবে। এই আশা মিথ্যা নয়। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব চীনকে তার প্রতিরোধ-যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করবে। অভূতপূর্বভাবে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বদাই চীনের সুখ-দুঃখের অংশভাগী হয়েছে। যারা কেবল মুনাফা চায়, সেই সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের উচ্চস্তরের লোকদের থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পূর্ণ বিপরীত, সোভিয়েত ইউনিয়ন সকল দুর্বল ও ক্ষুদ্র জাতিকে এবং যাবতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের প্রতি সাহায্যদানকে তার নিজের কর্তব্য বলে মনে করে। চীন যে নিঃসঙ্গভাবে লড়ছে না—এর ভিত্তিটি শুধু সাধারণভাবে গোটা আন্তর্জাতিক সাহায্যেই নয়, পরন্তু তার ভিত্তি রয়েছে বিশেষ করে সোভিয়েতের সাহায্যে ও সমর্থনে। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেকার নিবিড় ভৌগলিক সান্নিধ্য জাপানের সঙ্কটকে বাড়িয়ে তোলে আর চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। জাপানের সংগে চীনের ভৌগোলিক সান্নিধ্য প্রতিরোধ-যুদ্ধে চীনের বাধাবিপত্তিকে বাড়িয়ে দেয়। পক্ষান্তরে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে ভৌগলিক সান্নিধ্য হচ্ছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে একটি অনুকূল শর্ত।

(২৪) তাই এই সিদ্ধান্ত টানা যায় যে, আপোষের বিপদ আছে কিন্তু তাকে অতিক্রম করা যায়। কারণ শত্রু তার নীতিকে কিছুটা পরিমাণে সংশোধিত করতে পারলেও তাকে মৌলিকভাবে বদলে নিতে পারে না। চীনে আপোষের সামাজিক উৎস রয়েছে, কিন্তু আপোষ-বিরোধীরাই হচ্ছে সংখ্যাগুরু। আন্তর্জাতিকভাবে কিছু কিছু শক্তি আপোষের পক্ষে, কিন্তু প্রধান শক্তিগুলি প্রতিরোধ চালানোর পক্ষে। এই তিনটি উপাদানের সংযোজনে আপোষের বিপদকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়ে ওঠে, এবং সম্ভব হয়ে ওঠে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া।

(২৫) এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া যাক। দেশের রাজনৈতিক প্রগতি প্রতিরোধ-যুদ্ধকে অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। রাজনৈতিক প্রগতি যতই বেশি হয়, ততই অটল প্রয়াস আমরা চালাতে পারি প্রতিরোধ-যুদ্ধে, আবার যতই বেশি অটল প্রয়াস আমরা প্রতিরোধ-যুদ্ধে চালাই ততই বেড়ে ওঠে রাজনৈতিক প্রগতি। কিন্তু মৌলিকভাবে সেটি নির্ভর করে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ওপরে। কুওমিনতাঙ শাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অস্বাস্থ্যকর অভিব্যক্তি অত্যন্ত গুরুতর হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে এইসব অবাঞ্ছনীয় উপাদানগুলি পুঞ্জীভূত হওয়ার ফলে ব্যাপক স্বদেশপ্রেমিকদের মধ্যে গুরুতর উদ্বেগ ও হয়রানির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রতিরোধ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, অতীতে বহু বছরে যতটা প্রগতি চীনা জনগণ করেছিল, গত দশ মাসেই ততটা এগিয়েছে, তাই হতাশার কোন কারণ নেই। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত দুর্নীতি জাপানকে রুখবার জন্য জনগণের শক্তি বৃদ্ধির গতিবেগকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করছে, আমাদের জয়লাভের পরিধিকে কমিয়ে দিচ্ছে এবং যুদ্ধে আমাদের ক্ষতিসাধন করছে। কিন্তু তবুও চীনে, জাপানে এবং সারা দুনিয়ায় সামগ্রিক পরিস্থিতিটি আজ এমন যে, চীনা জনগণ প্রগতি না করেই পারেন না। প্রগতিকে ব্যাহত করার উপাদান—দুর্নীতির অস্তিত্বের কারণে এই প্রগতি মন্থর হয়। প্রগতি ও প্রগতির মন্থরগতি হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতির দুটি বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনের সংগে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তাই স্বদেশপ্রেমিকদের কাছে এটি হচ্ছে গভীর উদ্বেগের কারণ। কিন্তু আমরা এখন রয়েছি একটি বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্যে, আর বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে একটা বিষ-প্রতিষেধক, এ যে শুধু শত্রুদের বিষ নাশ করে তাই নয়, বরং

আমাদের নিজেদেরও ক্লেদ থেকে মুক্ত করে। প্রতিটি ন্যায় বিপ্লবী যুদ্ধই হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন এবং বহু বস্তুকে তা রূপান্তরিত করতে পারে অথবা তাদের রূপান্তরের পথ উন্মুক্ত করে দিতে পারে। চীন-জাপান যুদ্ধ চীন-জাপান উভয় দেশকেই রূপান্তরিত করবে; প্রতিরোধ-যুদ্ধে এবং যুক্তফ্রন্টে চীন যদি অধ্যবসায়ের সংগে অবিচল থাকে, তাহলে পুরানো জাপান নিশ্চয়ই এক নতুন জাপানে এবং পুরানো চীন এক নতুন চীনে পরিণত হবে, আর চীন-জাপান উভয় দেশের লোক এবং সবকিছুই এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ও এই যুদ্ধের পরে রূপান্তরিত হবে। প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও আমাদের দেশের গঠনকার্যকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বলে ধরাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত। জাপানও রূপান্তরিত হতে পারে বলার অর্থ এই যে, জাপানের শাসকদের এই আগ্রাসী যুদ্ধ তাদের পরাজয়ের মধ্যে শেষ হবে এবং তা জাপানী জনগণের বিপ্লব ঘটাতে পারে। জাপানী জনগণের বিপ্লবের বিজয়দিনটি হবে সেই দিন, যেদিন জাপান রূপান্তরিত হবে। চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের সংগে এ সবই নিবিড়ভাবে সংযুক্ত, আর এমন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আমাদর হিসেবে ধরা উচিত।

জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্ব ভুল, দ্রুত বিজয়ের তত্ত্বও ভুল

(২৬) জাপান হচ্ছে শক্তিশালী অথচ ছোট দেশ, সে অধঃপতনমুখী এবং তার সমর্থন স্বল্প; আর চীন হচ্ছে দুর্বল অথচ বড় দেশ, সে প্রগতিশীল এবং ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থনের অধিকারী—শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার এইসব পরস্পরবিরোধী মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর ইতিমধ্যেই আমরা তুলনা ও পর্যালোচনা করেছি, জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের খণ্ডন করেছি এবং আপোষ কেন অসম্ভব, এবং রাজনৈতিক প্রগতিই-বা কেন সম্ভব—এইসব প্রশ্নের উত্তর আমরা দিয়েছি। জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীরা প্রবলতা ও দুর্বলতার দ্বন্দ্বের ওপরে জোর দেয় এবং তাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সমগ্র সমস্যা সমাধানের যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করে, আর এইভাবে অবহেলা করে অন্যান্য দ্বন্দ্বগুলোকে। তারা কেবল শক্তির বৈসাদৃশ্যের কথা বলে, এবং এটা তাদের একতরফা দৃষ্টি প্রমাণ করে; আবার তারা যে বস্তুর এই একটা দিককেই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সমগ্রে অতিরঞ্জিত করে, এটা তাদের আত্মগত মনোভাবকে প্রমাণ করে। তাই সামগ্রিক দিক থেকে দেখতে গেলে তাদের দাঁড়াবার কোন ভিত্তি নেই এবং

তারা হচ্ছে ভুল। যারা জাতীয় পরাধীনতার মতবাদী নয় এবং মজ্জাগত হতাশাবাদীও নয়, অথচ কোন একটা মুহূর্তে এবং কোন একটা আংশিক ব্যাপারে আমাদের ও শত্রুর শক্তির অসমতার দ্বারা কিংবা দেশের দুর্নীতির দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার কারণে শুধু সাময়িকভাবে হতাশাভরা মানসিক অবস্থায় পড়েছে, তাদেরও আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে যে তাদের বিচারদৃষ্টির উদ্ভবও একদেশদর্শিতা ও আত্মগত মনোভাবের ঝোঁক থেকে। কিন্তু তাদের সংশোধন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, একবার তাদের সতর্ক করে দেওয়া হলেই তারা বুঝতে পারবে, কারণ তারা হচ্ছে স্বদেশপ্রেমিক আর তাদের ভুলটি হচ্ছে নিছক সাময়িক।

(২৭) দ্রুত বিজয়ের মতবাদীরাও অনুরূপভাবেই ভুল। হয় তারা অন্যান্য দ্বন্দ্বগুলোকেই শুধু মনে রেখে প্রবলতা ও দুর্বলতার দ্বন্দ্বকে পুরোপুরি ভুলে যায়, অথবা চীনের উৎকৃষ্টতাকে এমনভাবে অতিরঞ্জিত করে তোলে যে, তাতে আর বাস্তবতার লেশও থাকে না এবং তাকে চেনাও যায় না , কিংবা প্রবাদে যেমন আছে, 'চোখের সামনে গাছের পাতা, ঢেকে রাখে পাহাড় তাইয়ের মাথা'— তেমনিই তারা কোন একটা কালের ও স্থানের শক্তির অনুপাতকেই গোটা পরিস্থিতি হিসেবে গ্রহণ করে এবং ধৃষ্টভাবে মনে করে যে, তারা নির্ভুল। এক কথায়, শত্রু যে শক্তিশালী আর আমরা যে দুর্বল এই বাস্তব কথাটি স্বীকার করার সাহস তাদের নেই। প্রায়শঃই তারা এই বিষয়টি অস্বীকার করে এবং ফলে সত্যের একটি দিককে তারা অস্বীকার করে বসে। আবার আমাদের উৎকৃষ্টতার সীমাবদ্ধতাকেও স্বীকার করার সাহস তাদের নেই, আর এইভাবেই তারা সত্যের আর একটি দিককেও অস্বীকার করে। ফল হয় এই যে, তারা ছোট বা বড় ভুল করে বসে, এই ক্ষেত্রেও সেই আত্মগত মনোভাব ও একদেশ-দর্শিতাই আবার অমঙ্গল ঘটাচ্ছে। এ সব বন্ধুদের মন ভাল এবং তারা স্বদেশপ্রেমিকও বটে। কিন্তু এই 'ভদ্রলোকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সত্যই অতি-উচ্চ, হলেও তাদের বিচারগুলো ভুল, সেই ভুল বিচার অনুসারে কাজ করলে নিশ্চয়ই দেওয়ালে মাথা ঠেকে যাবে। কারণ বাস্তবের সংগে মূল্যায়নের সঙ্গতি না থাকলে কার্যকারণ তার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না ; আর তৎসত্ত্বেও কাজ করার অর্থ হবে ফৌজের পরাজয় ও স্বদেশের পরাধীনতা, পরাজয়বাদীদের বেলায় যে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, এতে করেও সেই একই ফল হবে। তাই এই দ্রুত বিজয়ের তত্ত্বটিও কোন কাজে আসবে না।

(২৮) আমরা কি জাতীয় পরাধীনতার বিপদাশঙ্কাকে অস্বীকার করি? না, আমরা তা করি না। আমি মানি যে, চীনের সামনে দুটি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে—মুক্তি অথবা পরাধীনতা, আর এ দুটির মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলছে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মুক্তি অর্জন করা এবং পরাধীনতাকে প্রতিহত করা। মুক্তি অর্জনের শর্ত হচ্ছে চীনের প্রগতি, যা হচ্ছে মৌলিক, আর তদুপরি শত্রুর বাধাবিপত্তি ও অসুবিধা এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য। জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীদের সংগে আমাদের মতপার্থক্য আছে। বাস্তবনিষ্ঠভাবে ও সর্বাঙ্গীণভাবে আমরা জাতীয় পরাধীনতা ও মুক্তি—এই উভয় সম্ভাবনার অস্তিত্বকেই স্বীকার করি এবং এ বিষয়ে জোর দিই যে, মুক্তির সম্ভাবনা বেশি এবং মুক্তি অর্জনের শর্তাদি আমরাই দেখিয়ে দিই, আর সেই শর্তাদিকে সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা প্রয়াস চালাই। পক্ষান্তরে জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীরা আত্মগতভাবে ও একতরফাভাবে শুধু একটিমাত্র সম্ভাবনাকেই, অর্থাৎ শুধু পরাধীনতার সম্ভাবনাকেই, স্বীকার করে, মুক্তির সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে, আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, মুক্তির জন্য তারা প্রয়োজনীয় শর্তাদি দেখিয়ে দেবে না এবং সেগুলিকে সুনিশ্চিত করার জন্য তারা চেষ্টা করবে না। আমরা আপোষের ঝোঁকগুলোকে ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যাপারগুলোকেও স্বীকার করি, কিন্তু আমরা আবার অপরাপর ঝোঁকগুলোকে ও ব্যাপারগুলোকেও দেখতে পাই এবং আমরা দেখিয়ে দিই যে, অপরাপর ঝোঁকগুলো ও ব্যাপারগুলো ক্রমে ক্রমে আপোষের ঝোঁকগুলো ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যাপারগুলোর ওপর প্রাধান্যলাভ করবে এবং এই দুয়ের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলছে; উপরন্তু, হিতকর ঝোঁকগুলো ও ব্যাপারগুলোর জয়লাভের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় শর্তাদি দেখিয়ে দিই, চেষ্টা করি আপোষের ঝোঁককে অতিক্রম করতে এবং দুর্নীতিপরায়ণ ব্যাপারগুলোকে বদলে দিতে। সুতরাং, আমরা ঠিক হতাশাবাদীদের বিপরীতে, আমরা আদৌ মনমরা নই।

(২৯) আমরা যে দ্রুত বিজয় পছন্দ করি না তাও কিন্তু নয়; প্রত্যেকেই 'শয়তানকে' রাতারাতি তাড়ানোর পক্ষেই আছে। কিন্তু আমরা বলতে চাই যে, সুনির্দিষ্ট শর্তাদির অভাবে দ্রুত বিজয় হচ্ছে এমন একটা কিছু, যা বিরাজ করছে শুধু মনোরাজ্যে এবং যার বাস্তবে কোন অস্তিত্বই নেই—তা হচ্ছে নিছক একটা কল্পনা এবং ভ্রান্ত মতবাদ। তাই, শত্রু ও আমাদের যাবতীয় অবস্থার বাস্তবগত ও সর্বাঙ্গীণ মূল্যায়ন করে আমরা দেখিয়ে দিই, চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের

একমাত্র পথ হচ্ছে রণনীতিগত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, এবং দ্রুত বিজয়ের নিছক অমূলক তত্ত্বকে তাই আমরা নাকচ করে দিই। আমরা এই অভিমত পোষণ করি যে, চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য অপরিহার্য যাবতীয় শর্তাদিকে সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের অবশ্যই চেষ্টা চালাতে হবে এবং যত বেশি পূর্ণতার সংগে ও দ্রুতগতিতে এই শর্তাদি প্রস্তুত হবে, বিজয় সম্পর্কে আমরা তত বেশি সুনিশ্চিত হব, এবং তত বেশি তাড়াতাড়ি আমরা সে বিজয় অর্জন করব। আমরা মনে করি যে, শুধুমাত্র এইভাবেই যুদ্ধের গতিপথটিকে সংক্ষিপ্ত করতে পারা যায়, এবং আমরা অগ্রাহ্য করি দ্রুত বিজয়ের তত্ত্বকে, যা হচ্ছে শুধু শূন্যগর্ভ কথা ও শস্তায় বাজিমাৎ করার চেষ্টা।

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কেন?

(৩০) দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সমস্যাকে এখন একবার পর্যালোচনা করে দেখা যাক। 'দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কেন?' এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরে পৌছাতে পারা যায় কেবলমাত্র শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার সমস্ত মৌলিক বৈপরীত্যগুলির ওপর ভিত্তি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা যদি শুধু এইটুকু বলি যে, শত্রু হচ্ছে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র আর আমরা হচ্ছি একটা দুর্বল আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ, তাহলে জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের খাদে পড়ার বিপদ আমাদের থাকে। কারণ, কেবলমাত্র শক্তিশালীর বিরুদ্ধে দুর্বলের যুদ্ধ ঘটলেই কোন যুদ্ধ তত্ত্বের দিক থেকে কিংবা বাস্তবে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে না। আবার নিছক ছোটর বিরুদ্ধে বড়র, অথবা নিছক অধঃপতনমুখীর বিরুদ্ধে প্রগতিশীলের, নগণ্য সমর্থনের বিরুদ্ধে প্রচুর সমর্থনের যুদ্ধ বাধলেও অনুরূপভাবে কোন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে না। বড় কর্তৃক ছোটকে দখল করে নেওয়া অথবা ছোট কর্তৃক বড়কে দখল করে নেওয়া তো গতানুগতিক ঘটনা। প্রগতিশীল দেশ যদি শক্তিশালী না হয়, তাহলে তারা প্রায়ই বিরাট অথচ অধঃপতনমুখী দেশ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আর এ কথা যা কিছু প্রগতিশীল অথচ শক্তিশালী নয় তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রচুর বা নগণ্য সমর্থন হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সহায়ক উপাদান। এর ভূমিকা কতটুকু হবে তা নির্ভর করে উভয়পক্ষের মৌলিক উপাদানের ওপরে। সুতরাং আমরা যখন বলি, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হচ্ছে একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, তখন আমাদের সিদ্ধান্তটি উভয়পক্ষের সমস্ত উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকেই উদ্ভূত হয়।

শত্রু শক্তিশালী আর আমরা দুর্বল—আমাদের দেশের পদানত হওয়ার বিপদ রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে শত্রুর দুর্বলতা রয়েছে আর আমাদের আছে শ্রেষ্ঠতা। আমাদের প্রচেষ্টা শত্রুর শ্রেষ্ঠতাকে কমাতে পারে এবং তার দুর্বলতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। পক্ষান্তরে, নিজেদের প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠতাকে বাড়িয়ে নিতে এবং দুর্বলতাকে দূর করতে পারি। তাই আমরা চূড়ান্ত জয়লাভ করতে এবং জাতীয় পরাধীনতাকে প্রতিহত করতে পারি। আর পরিশেষে শত্রু পরাজিত হবে এবং তার গোটা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসকে এড়িয়ে যেতে পারবে না।

(৩১) শত্রুর শুধু একটিমাত্র ব্যাপারে শ্রেষ্ঠতা আছে, কিন্তু দুর্বলতা তার অন্য সকল ব্যাপারে; আবার আমাদের দুর্বলতা হচ্ছে শুধুমাত্র একটি ব্যাপারে, কিন্তু অন্যান্য সকল ব্যাপারে আমাদের রয়েছে শ্রেষ্ঠতা। তবু কেন এতে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, বরং বর্তমানে শত্রুর জন্য একটা উৎকৃষ্ট অবস্থিতি আর আমাদের জন্য একটা নিকৃষ্ট অবস্থিতি সৃষ্ট রয়েছে? খুবই স্পষ্ট যে, এরকম বাহ্যিক দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্নের বিবেচনা করা উচিত নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, শত্রু ও আমাদের মধ্যে শক্তির বৈষম্য এখনো খুব বেশি; শত্রুর দুর্বলতাগুলি এখনো এমন যথেষ্ট মাত্রায় বিকশিত হয়ে ওঠেনি এবং বর্তমানে সেগুলি বিকশিত হয়ে উঠতেও পারে না, যাতে করে তার প্রবলতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে; আবার আমাদের শ্রেষ্ঠতাও এমন যথেষ্ট মাত্রায় বিকশিত হয়ে ওঠেনি এবং বর্তমানে সেগুলি বিকশিত হয়ে উঠতেও পারে না, যাতে করে আমাদের দুর্বলতার ক্ষতিটি পূরণ করে দিতে পারে। সুতরাং ভারসাম্য এখনো হতে পারে না, হতে পারে শুধু ভারসাম্যহীনতা।

(৩২) যদিও প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও যুদ্ধফ্রন্ট রক্ষা করে আমাদের প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার ফলে—শত্রু শক্তিশালী আর আমরা দুর্বল, শত্রু উৎকৃষ্ট অবস্থিতিতে আর আমরা নিকৃষ্ট অবস্থিতিতে—এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, তবুও এখনো পর্যন্ত কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। তাই যুদ্ধের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে শত্রু নির্দিষ্ট মাত্রায় জয়লাভ করতে পারবে আর আমরা নির্দিষ্ট মাত্রায় পরাজয় বরণ করব। কিন্তু শত্রুর জয়গুলি ও আমাদের পরাজয়-গুলি শুধু এই নির্দিষ্ট পর্যায়ে ও নির্দিষ্ট মাত্রায় সীমাবদ্ধ এবং সেগুলিকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না—শত্রু সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে পারবে না আর আমরা সম্পূর্ণ-ভাবে পরাজিত হব না।—এর কারণ কি? কারণ এই যে, প্রথমতঃ, একেবারে

শুরু থেকেই শত্রুর প্রবলতা ও আমাদের দুর্বলতা ছিল আপেক্ষিক এবং সেগুলি নিরঙ্কুশ ছিল না; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও যুক্তফ্রন্ট অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় শত্রুর প্রবলতা ও আমাদের দুর্বলতা আরও বেশি আপেক্ষিক হয়ে উঠবে। প্রারম্ভিক পরিস্থিতির কথা ধরা যাক, শত্রু শক্তিশালী হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রতিকূল উপাদানগুলি তার সেই শক্তিকে হ্রাস করেছে; কিন্তু তবুও তার উৎকৃষ্ট অবস্থিতিকে বানচাল করার জন্য যথেষ্ট মাত্রায় শক্তিহ্রাস তখনো করেনি; আমরা দুর্বল হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রের অনুকূল উপাদানগুলি আমাদের দুর্বলতার ক্ষতিটি পূরণ করেছে। কিন্তু তবুও আমাদের নিকৃষ্ট অবস্থাকে বদলে দেবার মতো যথেষ্ট মাত্রায় তা ঘটেনি। তাই ফলতঃ, শত্রু হচ্ছে আপেক্ষিকভাবে শক্তিশালী আর আমরা আপেক্ষিকভাবে দুর্বল; শত্রু রয়েছে তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট অবস্থায়, আর আমরা রয়েছি তুলনামূলকভাবে নিকৃষ্ট অবস্থায়। উভয়পক্ষে প্রবলতা ও দুর্বলতা, উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা কোন-দিনই নিরঙ্কুশ ছিল না। আর তাছাড়া যুদ্ধের সময়ে আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও যুক্তফ্রন্ট অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টার ফলে শত্রুর ও আমাদের মধ্যে আগেকার প্রবলতা ও দুর্বলতা, উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার পরিস্থিতির আরও পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং শত্রুর জয়গুলি ও আমাদের পরাজয়গুলি শুধু নির্দিষ্ট পর্যায়ে ও নির্দিষ্ট মাত্রায় সীমাবদ্ধ, আর তাই যুদ্ধটি হয়ে ওঠে দীর্ঘস্থায়ী।

(৩৩) কিন্তু পরিস্থিতি অব্যাহতভাবে বদলে যাচ্ছে। যুদ্ধের মধ্যে আমরা যদি সঠিক সামরিক ও রাজনৈতিক রণকৌশল নিয়োগ করি, কোন নীতিগত ভুল না করি এবং সর্বাধিক প্রয়াস চালাই, তাহলে যুদ্ধটি প্রলম্বিত হওয়ার সংগে সংগে শত্রুর প্রতিকূল উপাদানগুলি ও আমাদের অনুকূল উপাদানগুলি উভয়ই বেড়ে উঠবে, আর অনিবার্যভাবেই শত্রুর ও আমাদের প্রবলতা ও দুর্বলতার আগেকার মাত্রাটা পরিবর্তিত হতে থাকবে, উভয়পক্ষের উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার পরিস্থিতিতেও পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। একটা নতুন ও নির্দিষ্ট পর্যায় এলে প্রবলতা ও দুর্বলতার মাত্রায় এবং উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটবে, আর তার ফলে শত্রু পরাজিত হবে, আমরা হব জয়ী।

(৩৪) শত্রু এখনো কোনমতে তার প্রবলতার সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধ এখনো তাকে মৌলিকভাবে দুর্বল করে দেয়নি। তার জনশক্তির ও সম্পদসম্ভারের অপ্রতুলতা এখনো তার আক্রমণকে রোধ করতে পারে না; পক্ষান্তরে তার জনশক্তি ও সম্পদসম্ভার তার

আক্রমণকে নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পারে। শত্রুর নিজ দেশের শ্রেণীবিরোধ এবং চীনা জাতির প্রতিরোধ—এই উভয়কেই তীব্রতর করে তুলতে পারে এমন উপাদানগুলি, অর্থাৎ শত্রুর যুদ্ধের অধঃপতনমুখী ও বর্বর প্রকৃতি, এখনো এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেনি, যা তার আক্রমণকে মৌলিকভাবে ব্যাহত করতে পারে। শত্রুর আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার উপাদান এখনো রয়েছে পরিবর্তন ও বিকাশের পর্যায়ে, এবং শত্রু এখনো সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি। আমাদেরকে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছে এমন অনেক দেশের অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের কারবারী পুঁজিপতিরা এখনো মুনাফার লোভে জাপানকে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করে চলছে[১৫], এবং সেইসব দেশগুলির সরকার[১৬] এখনো সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে একযোগে বাস্তব উপায়ে জাপানকে শাস্তিবিধান করতে অনিচ্ছুক। এ সবই নির্ধারিত করে দিচ্ছে যে, আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধ তাড়াতাড়ি জয়লাভ করতে পারবে না, সেটি হবে একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চীনের যেসব দুর্বলতা প্রকাশ পায়, দশ মাসের প্রতিরোধ-যুদ্ধে তার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শত্রুর আক্রমণকে ব্যাহত করার ও আমাদের পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য যতটা প্রয়োজন, তার থেকে আমরা এখনো বহু দূরে। উপরন্তু, পরিমাণের দিক থেকে আমাদের কিছু ক্ষতি ভোগ করতে হয়েছে। চীনের যাবতীয় অনুকূল উপাদানগুলি যদিও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে, তবুও সেগুলি যাতে শত্রুর আক্রমণকে রুখবার ও আমাদের পাল্টা আক্রমণ প্রস্তুত করার পক্ষে যথেষ্ট মাত্রায় পৌঁছাতে পারে, তার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রবল চেষ্টা চালাতে হবে। দেশের ভেতর থেকে দুর্নীতি দূরীকরণ ও প্রগতি ত্বরান্বিতকরণ কিংবা বিদেশে জাপানের সমর্থক শক্তিগুলির দূরীকরণ ও জাপ-বিরোধী শক্তিগুলির সম্প্রসারণ এখনো ঘটেনি। এইসব আবার নির্ধারণ করে দিচ্ছে যে, আমাদের যুদ্ধটি তাড়াতাড়ি জয়লাভ করতে পারবে না, এবং সেটি কেবলমাত্র একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধই হতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের তিনটি পর্যায়

(৩৫) যেহেতু চীন-জাপান যুদ্ধটি হচ্ছে একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং চূড়ান্ত বিজয় হবে চীনের, তাই এই যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে,

এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধটি তিনটি পর্যায়ের ভেতর দিয়ে যাবে। প্রথম পর্যায়টি হবে শত্রুর রণনীতিগত আক্রমণ ও আমাদের রণনীতিগত প্রতিরক্ষার সময়কাল। দ্বিতীয় পর্যায় হবে শত্রুর রণনীতিগত-সংরক্ষণের ও আমাদের পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতির সময়কাল। তৃতীয় পর্যায় হবে আমাদের রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের ও শত্রুর রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের সময়কাল। তিনটি পর্যায়ে বাস্তব পরিস্থিতি কি হবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব, কিন্তু বর্তমান অবস্থার আলোকে যুদ্ধের কয়েকটি প্রধান ঝোঁকের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করা যেতে পারে। বাস্তব ঘটনার গতিপ্রবাহ হবে অত্যন্ত ঘটনাবহুল এবং আঁকা-বাঁকা ও পরিবর্তনশীল, আর চীন-জাপান যুদ্ধের 'ঠিকুজী' তৈরী করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, তবুও যুদ্ধের রণনীতিগত পরিচালনার জন্য দরকার হচ্ছে যুদ্ধের ঝোঁকগুলির একটা খসড়া রূপরেখা তৈরী করা। তাই, যদিও পরবর্তী ঘটনাদির সংগে আমাদের খসড়া রূপরেখাটি সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না এবং সেই পরবর্তী ঘটনাদির দ্বারাই তা শুধরে নেওয়া যাবে, তবুও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের দৃঢ় ও অর্থপূর্ণ রণনীতিগত পরিচালনাব জন্যই খসডা রূপরেখাটি তৈরী করা এখনই প্রয়োজন।

(৩৬) প্রথম পর্যায়টি এখনো শেষ হয়নি। শত্রুর দুরভিসন্ধি হচ্ছে ক্যান্টন, উহান ও লানচৌ দখল করা এবং এই তিনটি বিন্দুর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যটি সাধনেব জন্য শত্রুকে অন্ততঃপক্ষে ৫০ ডিভিসন—প্রায় ১৫ লক্ষ সৈন্য ব্যবহার করতে হবে, দেড থেকে দুই বছর সময় ব্যয় করতে হবে এবং এক হাজার কোটিরও বেশি ইয়েন খরচ করতে হবে। এত গভীরে ঢুকতে গিয়ে সে প্রচণ্ড বাধাবিপত্তি ও অসুবিধাদির সম্মুখীন হবে এবং তার ফল হবে এমন সর্বনাশা, যা কল্পনার অতীত। ক্যান্টন-হানকৌ রেলপথ ও সীআন-লানচৌ মোটর যাতায়াতের সডককে সম্পূর্ণভাবে দখল করে নেবার অপচেষ্টা করতে গিয়ে শত্রুকে অত্যন্ত বিপজ্জনক যুদ্ধ লডতে হবে এবং তাতেও তার দুরভিসন্ধি পুরোপুরি সাধিত না হতে পারে। কিন্তু আমাদের যুদ্ধচালনার পরিকল্পনা করতে গিয়ে এই অনুমানের ওপরে ভিত্তি করতে হবে যে, শত্রু এই তিনটি বিন্দু, এমনকি এই তিনটি বিন্দু ছাড়াও আরও কোন কোন অঞ্চল দখল করে নিতে পারে এবং সেগুলির মধ্যে সংযোগও সাধন করতে পারে, আর আমাদের উচিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য বিন্যাসব্যবস্থা করা যাতে করে শত্রু তা করলেও আমরা তার সংগে এঁটে উঠতে সমর্থ হই। এই পর্যায়ে যুদ্ধের যে

রূপটি আমরা গ্রহণ করব তা হচ্ছে মুখ্যতঃ চলমান যুদ্ধ, আর গেরিলাযুদ্ধ ও অবস্থানগত যুদ্ধ হবে তার সম্পূরক। কুওমিনতাঙ সামরিক কর্তৃপক্ষের আত্মগত ভুলের কারণে এই পর্যায়ের প্রথমদিকে অবস্থানগত যুদ্ধকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তবুও গোটা পর্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি হচ্ছে সম্পূরক। এই পর্যায়ে চীন ইতিমধ্যেই একটি ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলেছে এবং অভূতপূর্ব ঐক্য অর্জন করেছে। চীনকে আত্মসমর্পণ করতে প্রলুব্ধ করার জন্য শত্রু ঘৃণ্য ও নির্লজ্জ উপায় অবলম্বন করেছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে, আর এইভাবে বেশি প্রয়াস না করেই তার দ্রুত নিষ্পত্তির পরিকল্পনাকে হাসিল করার এবং গোটা চীনদেশকে দখল করে নেবার অপচেষ্টা করেছে ও করবে। তৎসত্ত্বেও এযাবৎকাল সে ব্যর্থ হয়েছে, ভবিষ্যতেও তার পক্ষে সাফল্যলাভ করা কঠিন। এই পর্যায়ে প্রভূত পরিমাণ লোকসান সত্ত্বেও চীন যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে, আর সেইটিই হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তার জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রধান ভিত্তি। এই পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই চীনকে ভাল রকম সাহায্য দিয়েছে। আর শত্রুর পক্ষে, ইতিমধ্যেই সৈন্যের মনোবল ভেঙে পড়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, এই পর্যায়ের গোড়ার দিকে যেমন ছিল তার তুলনায় এর মধ্যভাগে শত্রুর স্থলবাহিনীর আক্রমণের গতিবেগ কম এবং শেষের দিকে এ গতিবেগ আরও কমে যাবে। তার আর্থিক ব্যবস্থায় ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিঃশেষণের লক্ষণাদি দেখা দিতে শুরু করছে, তার জনসাধারণ ও সৈন্যদের মধ্যে রণক্লান্তি দেখা দিতে শুরু করছে, যুদ্ধের পরিচালক চক্রের ভেতরে 'যুদ্ধ-হতাশা' প্রকাশ পেতে আরম্ভ করছে এবং যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্য বাড়ছে।

(৩৭) দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা যেতে পারে রণনীতিগত ভারসাম্যের পর্যায়। শত্রুর সৈন্যশক্তির অপর্যাপ্ততা ও আমাদের দৃঢ় প্রতিরোধের কারণে প্রথম পর্যায়ের শেষাংশে শত্রু নির্দিষ্ট সীমায় তার রণনীতিগত আক্রমণের শেষ গন্তব্যস্থলগুলি স্থির করে নিতে বাধ্য হবে, আর এই শেষ গন্তব্যস্থলগুলিতে পৌঁছে তার রণনীতিগত আক্রমণ থামিয়ে দেবে এবং অধিকৃত এলাকাগুলিকে সংরক্ষিত করার পর্যায়ে প্রবেশ করবে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে শত্রু তার অধিকৃত এলাকাগুলিকে সংরক্ষিত করার চেষ্টা করবে, তাঁবেদার সরকার স্থাপনের কপট পদ্ধতির মাধ্যমে এই অঞ্চলগুলিকে নিজস্ব করে নেবার প্রয়াস চালাবে, আর চীনের জনগণকে প্রচণ্ডভাবে লুণ্ঠন করবে। কিন্তু সে দৃঢ় গেরিলাযুদ্ধের

সম্মুখীন হয়ে পড়বে। প্রথম পর্যায়ে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে সৈন্যশক্তি খুবই কম, এই সুযোগ নিয়ে আমাদের গেরিলাযুদ্ধ ব্যাপক মাত্রায় বিকাশলাভ করবে এবং বহু ঘাঁটি এলাকা স্থাপিত হবে, এটা মূলতঃ শত্রুর অধিকৃত এলাকাগুলির সংরক্ষণকে বিপদাপন্ন করে তুলবে। তাই দ্বিতীয় পর্যায়েও ব্যাপক যুদ্ধ হবে। এই পর্যায়ে আমাদের যুদ্ধের রূপটি হবে মুখ্যতঃ গেরিলাযুদ্ধ, আর সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে চলমান যুদ্ধ। চীন তখনো বিরাট নিয়মিত সৈন্যবাহিনী রাখতে পারবে, কিন্তু অবিলম্বে রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ শুরু করা তার পক্ষে কঠিন হবে, কারণ, একদিকে শত্রু তার অধিকৃত বড় বড় শহরগুলিতে ও যোগাযোগের প্রধান প্রধান পথে রণনীতিগতভাবে প্রতিরক্ষাত্মক অবস্থিতি গ্রহণ করবে এবং অন্যদিকে চীন তখনো প্রকৌশলগতভাবে যথোপযুক্তরকমে সুসজ্জিত হয়ে উঠবে না। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যরা ছাড়া আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিপুল সংখ্যায় সরিয়ে দেওয়া হবে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে, সেখানে তারা অপেক্ষাকৃত ছড়িয়ে পড়া বিন্যাসব্যবস্থায় থাকবে; আর সেখানকার যেসব এলাকা শত্রুর অধিকারে নয়, সেইসব এলাকায় নিজেদের ভিত্তি স্থাপন করে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সশস্ত্রবাহিনীর সংগে সহযোগিতা করে তারা শত্রু-অধিকৃত এলাকার বিরুদ্ধে ব্যাপক ও প্রচণ্ড গেরিলাযুদ্ধ চালাবে, এবং শত্রুকে যথাসম্ভব চলন্ত অবস্থায় লিপ্ত করিয়ে তাকে চলমান লড়াইয়ে ধ্বংস করবে—শানসী প্রদেশে এখন যেমন করা হচ্ছে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধটি হবে নির্মম, আর বহু এলাকাই গুরুতর বিনাশের কবলে পড়বে। কিন্তু গেরিলাযুদ্ধ জয়যুক্ত হতে পারবে, আর গেরিলাযুদ্ধ সুপরিচালিত হলে শত্রু তার অধিকৃত এলাকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাত্র নিজের অধিকারে রাখতে পারবে, বাকি দুই-তৃতীয়াংশ থাকবে আমাদের হাতে। এটা হবে শত্রুর বিরাট পরাজয় আর চীনের পক্ষে এক বিরাট জয়। গোটা শত্রু-অধিকৃত এলাকা তখন তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে: প্রথমতঃ, শত্রুর ঘাঁটি এলাকা; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকা; এবং তৃতীয়তঃ, উভয়পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতাভুক্ত গেরিলা অঞ্চল। আমাদের ও শত্রুর ভেতরকার শক্তিসাম্যে পরিবর্তনের মাত্রার ওপরে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের ওপরে নির্ভর করবে এই পর্যায়ের স্থিতিকাল। সাধারণভাবে বলা যায়, এই পর্যায়টা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হবে, তার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এই পর্যায়ের কষ্টসাধ্য পথকে অটলভাবে অতিক্রম করতে হবে।

চীনের পক্ষে এটা হবে খুবই কষ্টকর সময় ; দুটি গুরুতর সমস্যা হবে অর্থনৈতিক অসুবিধাদি ও দেশদ্রোহীদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ। চীনের যুক্তফ্রন্টকে ভাঙবার জন্য শত্রুরা সবরকম চেষ্টা করবে, আর সমস্ত শত্রু-অধিকৃত এলাকায় দেশদ্রোহীদের সংগঠনগুলি একত্রিত হয়ে তথাকথিত 'একীভূত সরকার' গড়ে তুলবে। বড় বড় শহরগুলির পতনের ফলে এবং যুদ্ধের দুর্ভোগাদির কারণে আমাদের ভেতরকার দোদুল্যচিত্ত ব্যক্তিরা আপোষের জন্য চেঁচাবে আর হতাশাপূর্ণ মনোভাব গুরুতর আকারে বেড়ে উঠবে। তখন আমাদের কর্তব্য হবে একপ্রাণ হয়ে অপ্রতিহত অধ্যবসায় নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য গোটা দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা, যুক্তফ্রন্টকে সম্প্রসারিত ও সুসংবদ্ধ করা, যাবতীয় নৈরাশ্য ও আপোষের ভাবধারাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা, কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রেরণা দেওয়া ও নতুন যুদ্ধকালীন নীতি প্রয়োগ করা, এবং এমনি করেই অটলভাবে এই পর্যায়ের কষ্টসাধ্য পথ অতিক্রম করা। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে, স্থিরসংকল্প হয়ে একটি সংযুক্ত সরকারকে বজায় রাখার জন্য গোটা দেশকে আমাদের আহ্বান জানাতে হবে, ভাঙনের বিরোধিতা করতে হবে, সুপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধের পদ্ধতির উন্নতিসাধন করতে হবে, সৈন্য-বাহিনীকে পুনর্গঠন করতে হবে, সমগ্র জনগণকে সমাবেশ করতে হবে এবং পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। এই পর্যায়ে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জাপানের পক্ষে আরও বেশি প্রতিকূল হয়ে পড়বে; যদিও নিজেকে 'সিদ্ধ ঘটনার' সংগে খাপ খাইয়ে নেবার সেই চেম্বারলেন ধরনের 'বাস্তববাদের' কথাও উঠতে পারে, কিন্তু তবুও প্রধান আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি চীনকে আরও বেশি সাহায্য দেবার জন্য উন্মুখ হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সাইবেরিয়ার প্রতি জাপানের আক্রমণাশঙ্কা আগের চেয়ে আরও বেশি দেখা দেবে, এমনকি নতুন যুদ্ধও বেধে যেতে পারে। জাপানের ক্ষেত্রে, তার কয়েক ডজন ডিভিসন সৈন্য চীনের অথৈ জলে পড়ে যাবে। সুবিস্তৃত গেরিলা-যুদ্ধ ও জনগণের জাপান-বিরোধী আন্দোলন এই বিরাট জাপানী বাহিনীকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে দেবে, একদিকে প্রভূত পরিমাণে তার ক্ষতিসাধন করবে এবং অন্যদিকে তার স্বদেশে ফেরার জন্য কাতরতা, রণক্লান্তি ও এমনকি যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাবকে আরও বাড়িয়ে দেবে, এমনি করে এই বাহিনীর মনোবলকে ভেঙে দেবে। যদিও এ কথা বলা ভুল হবে যে চীনের লুণ্ঠনে জাপান আদৌ কোন ফলই পাবে না, তবুও পুঁজির স্বল্পতার ফলে ও গেরিলাযুদ্ধের

দ্বারা হয়রান হয়ে জাপান সম্ভবতঃ দ্রুত ও ভালরকম কোন ফললাভ করতে পারবে না। এই দ্বিতীয় পর্যায়টি হবে গোটা যুদ্ধের উত্তরণপর্যায় এবং সবচেয়ে কঠিন সময়, কিন্তু এটা হবে গোটা যুদ্ধের মোড় ঘুরবার সন্ধিক্ষণ। চীন স্বাধীন দেশ হয়ে উঠবে কি একটা উপনিবেশে পর্যবসিত হবে, তা প্রথম পর্যায়ে বড় বড় শহরগুলিকে নিজ অধিকারে ধরে রাখা বা খোয়ানোর দ্বারা নির্ধারিত হবে না, পরন্তু সেটি নির্ধারিত হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে গোটা জাতি কিভাবে সচেষ্ট হয় তার মাত্রার দ্বারা। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে, যুক্তফ্রন্টে এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে আমরা যদি অটল থাকি, তাহলে চীন এই দ্বিতীয় পর্যায়ে দুর্বলতাকে প্রবলতায় বদলে নেবার ক্ষমতা অর্জন করবে। চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের ত্রি-অঙ্ক নাটিকার এটি হবে দ্বিতীয় অঙ্ক। আর এই নাটিকার সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব হয়ে উঠবে একটি সবচেয়ে চমৎকার শেষ অঙ্কের অভিনয়।

(৩৭) তৃতীয় পর্যায়টি হবে আমাদের হৃত অঞ্চলগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য পাল্টা আক্রমণের পর্যায়। পূর্ববর্তী পর্যায়ে চীন নিজেই যে শক্তি গড়ে তুলেছে এবং এই তৃতীয় পর্যায়েও যে শক্তি বেড়ে চলতে থাকবে, মুখ্যতঃ তার ওপরেই নির্ভর করবে এই হৃত অঞ্চলগুলির পুনরুদ্ধার। কিন্তু শুধু চীনের একার নিজস্ব শক্তিটিই যথেষ্ট হবে না। আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের সমর্থনের ওপরে ও জাপানের ভেতরে যে পরিবর্তনাদি ঘটবে তার ওপরেও আমাদের নির্ভর করতে হবে, অন্যথায় আমরা জয়লাভ করতে পারব না। আন্তর্জাতিক প্রচার ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে চীনের কাজ এতে বেড়ে যাবে। এই পর্যায়ে, আমাদের যুদ্ধ তখন আর রণনীতিগত প্রতিরক্ষাত্মক হয়ে থাকবে না, পরন্তু সে তখন পরিণত হবে রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণে, নিজেকে সে তখন প্রকাশ করবে রণনীতিগত আক্রমণে; আর সে যুদ্ধ তখন আর রণনীতিগত অন্তর্লাইনে লড়া হবে না, বরং সে যুদ্ধ তখন ক্রমে ক্রমে সরে যাবে রণনীতিগত বহির্লাইনে। যুদ্ধ করতে করতে যখন আমরা ইয়ালু নদীর তীরে পৌঁছাব, শুধু তখনই এই যুদ্ধ শেষ হয়েছে বলে মনে করতে পারা যাবে। তৃতীয় পর্যায়টিই হবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের শেষ পর্যায়। আমরা যখন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলি, তখন আমরা এই পর্যায়ের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার পথটি পেরিয়ে যাবার কথাই বোঝাই। আমাদের চালিত যুদ্ধের প্রধান রূপটি এই পর্যায়েও হবে চলমান যুদ্ধ, কিন্তু অবস্থানগত যুদ্ধের গুরুত্ব বাড়বে।

যদি বলি যে, তৎকালীন পরিবেশের কারণে প্রথম পর্যায়ে অবস্থানগত প্রতি-রক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে পারা যায় না, তবে পরিবেশের পরিবর্তন ও কর্তব্যের প্রয়োজনের কারণে তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থানগত আক্রমণ বেশ গুরুত্ব-পূর্ণ হয়ে উঠবে। তৃতীয় পর্যায়েও চলমান যুদ্ধ ও অবস্থানগত যুদ্ধের পরিপূরক ভূমিকা নিয়ে গেরিলাযুদ্ধ রণনীতিগতভাবে সহযোগিতামূলক ভূমিকা গ্রহণ করবে, এটা দ্বিতীয় পর্যায় থেকে ভিন্ন।

(৩৯) কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে, যুদ্ধটি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী আর তাই প্রকৃতিতে নির্মম। গোটা চীনকে গিলে ফেলতে শত্রু সমর্থ হবে না, কিন্তু বেশ দীর্ঘদিনের জন্য বহুস্থান সে নিজের দখলে রাখতে পারবে। চীন তাড়াতাড়ি জাপানীদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে না, কিন্তু চীনের বৃহত্তর অংশ চীনের হাতেই থাকবে। পরিশেষে শত্রু হারবে আর আমরা জিতব, কিন্তু সে জয়লাভ করতে আমাদের একটি দুর্গম পথ পেরিয়ে আসতে হবে।

(৪০) এই দীর্ঘ ও নির্মম যুদ্ধের ভেতর দিয়ে চীনা জনগণ পোড় খেয়ে ইস্পাত-কঠিন হয়ে উঠবেন। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক পার্টিগুলিও অগ্নিতে পোড় খাবে এবং পরীক্ষিত হয়ে উঠবে। যুক্তফ্রন্টকে অবশ্যই টিঁকিয়ে রাখতে হবে; যুক্তফ্রন্টকে দৃঢ়ভাবে টিঁকিয়ে রাখলেই কেবল আমরা অটলভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারি; আবার যুক্তফ্রন্টকে দৃঢ়ভাবে টিঁকিয়ে রাখা ও যুদ্ধকে অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার ভেতর দিয়েই শুধু আমরা চূড়ান্ত বিজয়লাভ করতে পারি। শুধুমাত্র এইভাবেই সমস্ত বাধাবিপত্তি ও অসুবিধাকে দূর করতে পারা যায়। যুদ্ধের দুর্গম পথ পেরিয়ে আমরা এসে পৌছাব বিজয়ের রাজপথে। এই হচ্ছে যুদ্ধের স্বাভাবিক যুক্তি।

(৪১) তিন পর্যায়ে শত্রু ও আমাদের শক্তির অনুপাতে পরিবর্তন নিম্নলিখিত পথে চলবে: প্রথম পর্যায়ে শত্রু উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকবে আর আমরা নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকব। আমাদের নিকৃষ্টতার ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পূর্বমুহূর্ত থেকে শুরু করে এই পর্যায়ের শেষ পর্যন্ত দুটি ভিন্ন ধরনের পরিবর্তনকে হিসেবে ধরতে হবে। প্রথম ধারণাটি হচ্ছে খারাপের দিকে পরিবর্তন। প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি, অর্থাৎ ভূমিসীমা, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক শক্তি, সামরিক শক্তি ও সাংস্কৃতিক সংস্থায় হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে চীনের প্রারম্ভিক নিকৃষ্টতার অবস্থা আরও গুরুতর হয়ে উঠবে। প্রথম পর্যায়ের শেষদিকে, এই হ্রাসপ্রাপ্তিটি সম্ভবতঃ বেশ

প্রচুর হবে, প্রচুর হবে বিশেষ করে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে। জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্ব ও আপোষের মতবাদের ভিত্তি হিসেবে এই বিষয়টি কোন কোন লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্তন অর্থাৎ ভালর দিকে পরিবর্তনকেও অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে। এই পরিবর্তনে আছে যুদ্ধে লব্ধ অভিজ্ঞতা, সৈন্যবাহিনীর প্রগতি, রাজনৈতিক প্রগতি, জনগণের সমাবেশ, নতুন পথে সংস্কৃতির বিকাশ, গেরিলাযুদ্ধের উদ্ভব, আন্তর্জাতিক সাহায্যের বৃদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম পর্যায়ে খারাপের দিকে যা থাকে তা হচ্ছে পুরানো পরিমাণ ও গুণ, আর তার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে মুখ্যতঃ পরিমাণগত। ভালর দিকে যা থাকে তা হচ্ছে নতুন পরিমাণ ও গুণ, আর তার বহিঃপ্রকাশটি হচ্ছে মুখ্যতঃ গুণগত। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ও চূড়ান্ত জয়লাভ করার আমাদের সামর্থ্যের ভিত্তি যোগায় এই দ্বিতীয় ধরনের পরিবর্তন।

(৪২) প্রথম পর্যায়ে, শত্রুর পক্ষে দুই ধরনের পরিবর্তন ঘটে। প্রথম ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে মন্দাভিমুখী পরিবর্তন, যা প্রতিফলিত হয় কয়েক লক্ষ হতাহতের মধ্য দিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ক্ষয়ক্ষতিতে, সৈন্যদের মনোবলের অবনতিতে, স্বদেশে গণ-বিক্ষোভে, বাণিজ্য সংকোচনে, এক হাজার কোটির বেশি ইয়েনের খরচে, বিশ্বজনমত কর্তৃক নিন্দিত হওয়াতে, ইত্যাদিতে। এই প্রকারের পরিবর্তনও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ও চূড়ান্ত জয়লাভ করার জন্য আমাদের সামর্থ্যের ভিত্তি যোগায়। কিন্তু অনুরূপভাবে আমরা অবশ্যই শত্রুপক্ষের দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্তনটিকেও হিসেবে ধরব। এ পরিবর্তন হচ্ছে ভালর দিকে পরিবর্তন। অর্থাৎ ভূমিসীমায়, জনসংখ্যায় ও সম্পদসম্ভারে তার সম্প্রসারণ। এটাও হচ্ছে আমাদের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির ও দ্রুত বিজয়ের অসম্ভাব্যতার ভিত্তি। কিন্তু এই একই সময়ে কিছু কিছু লোক এইটিকেই তাদের জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের ও আপোষের মতবাদের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করবে। যাই হোক, শত্রুপক্ষের ভালর দিকে এই পরিবর্তনটির সাময়িক ও আংশিক প্রকৃতিটিকে আমাদের অবশ্যই হিসেবে ধরতে হবে। আমাদের শত্রু হচ্ছে ধ্বংসের মুখে ধেয়ে চলা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র, আর তাদের দ্বারা চীনের জমি দখল সাময়িক। চীনে গেরিলাযুদ্ধের বলিষ্ঠ ক্রমবৃদ্ধি তার দখলীকৃত অঞ্চলকে বাস্তবতঃ সঙ্কীর্ণ এলাকায় সীমিত করে রাখবে। উপরন্তু, জাপান কর্তৃক চীনা ভূখণ্ড দখল করে নেওয়াটা আবার জাপান ও অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে এবং দ্বন্দ্বকে তীব্রতর,

করেছে। তাছাড়া, তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশের অভিজ্ঞতায় এটা দেখা গেছে যে, বেশ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে জাপান সাধারণতঃ শুধু মূলধন খরচ করবে, কিন্তু সেই সময়ে মুনাফা লাভ করতে পারবে না। এ সবই আবার জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্ব ও আপোষের মতবাদকে খণ্ডন করার জন্য এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ও চূড়ান্ত বিজয়ের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি ভিত্তি আমাদের হাতে তুলে দেয়।

(৪৩) দ্বিতীয় পর্যায়ে উভয় পক্ষের উপরোক্ত পরিবর্তনগুলি বিকশিত হতে থাকবে। পরিস্থিতি সম্পর্কে সবিস্তারে ভবিষ্যৎবাণী করা না গেলেও মোটামুটি-ভাবে বলা যায় জাপান চলতে থাকবে নিম্নমুখী ধারায় চীন চলতে থাকবে ঊর্ধ্বমুখী ধারায়।[১৭] যেমন, চীনের গেরিলাযুদ্ধে জাপানের সামরিক ও আর্থিক শক্তি ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, জাপানে জনগণের অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে, তার সৈন্যদের মনোবলের আরও অবনতি ঘটবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে জাপান আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আর চীনের বেলায়: রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং জনগণের সমাবেশে চীন আরও বেশি অগ্রগতিলাভ করবে; গেরিলাযুদ্ধ আরও বেশি বিকশিত হয়ে উঠবে; দেশের অভ্যন্তরভাগে ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যাপক কৃষির ভিত্তিতে কিছু মাত্রায় নতুন অর্থনৈতিক উন্নতি দেখা দেবে, আন্তর্জাতিক সমর্থন ক্রমে ক্রমে বাড়বে, এবং এখন যা আছে গোটা পরিস্থিতিটা তার থেকে অনেক ভিন্ন ধরনের হবে। এই দ্বিতীয় পর্যায়টি বেশ লম্বা সময় ধরে চলতে পারে, আর সেই সময়ে শত্রু ও আমাদের শক্তির অনুপাতে একটা বিরাট বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটবে—চীন ক্রমে ক্রমে উঠছে আর জাপান ক্রমে ক্রমে পড়ছে। চীন তার নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবে, কিন্তু জাপান তার উৎকৃষ্ট অবস্থাটি খোয়াবে। প্রথমে দুটি দেশ যথা-যথভাবে সমকক্ষ হয়ে উঠবে, আর তারপরে তাদের আগেকার আপেক্ষিক অবস্থা উল্টে যাবে। তারপরে, চীন মোটামুটিভাবে রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করে পাল্টা আক্রমণের ও শত্রু বিতাড়নের পর্যায়ে প্রবেশ করবে। এটি বারংবার বলা দরকার যে, নিকৃষ্টতা থেকে উৎকৃষ্টতায় পরিবর্তনে এবং পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতিকে পূর্ণাঙ্গকরণে লাগবে তিনটি জিনিস, যেমন, চীনের নিজস্ব শক্তির বৃদ্ধি, জাপানের অসুবিধাদির বৃদ্ধি এবং চীনের আন্তর্জাতিক সমর্থনের বৃদ্ধি। এইসব শক্তির সংযুক্তিই চীনের উৎকৃষ্টতার সৃষ্টি করবে এবং পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে।

(৪৪) চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের অসমতার দরুন তৃতীয় পর্যায়ে রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ তার প্রথমদিকে সারা দেশে একটা একভাবানুসারী ও সমান ছবি উপস্থাপিত করবে না, পরন্তু চরিত্রে তা হবে আঞ্চলিক—এখানে উঠছে, আবার ওখানে পড়ছে। এই পর্যায়ে চীনের যুক্তফ্রন্টকে ভাঙবার জন্য শত্রু তার নানারকম বিভেদকারী কৌশল প্রয়োগের প্রয়াসে ঢিলে দেবে না; তাই, চীনের আভ্যন্তরীণ ঐক্য বজায় রাখার কাজটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং এটি আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে যে, রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ যেন আভ্যন্তরীণ মতবিরোধের দরুন মাঝপথে ভেঙে না পড়ে। এই সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিটি চীনের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হয়ে উঠবে। আর চীনের কর্তব্য হবে এই ধরনের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিটির সুযোগ গ্রহণ করে পূর্ণ মুক্তি অর্জন এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করা, আবার একই সময়ে এর অর্থ হবে বিশ্বের ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনকে সাহায্য করা।

(৪৫) নিকৃষ্টতা থেকে সমতায় এবং তারপরে সমতা থেকে উৎকৃষ্টতায় চলবে চীন, আর জাপান চলবে উৎকৃষ্টতা থেকে সমতায় এবং তারপরে সমতা থেকে নিকৃষ্টতায়। চীন চলবে প্রতিরক্ষা থেকে ভারসাম্যাবস্থায় এবং তারপরে পাল্টা আক্রমণে, আর জাপান চলবে আক্রমণ থেকে সংরক্ষিতকরণে এবং তারপরে পশ্চাদপসরণে—এইরকমই হবে চীন-জাপান যুদ্ধের প্রক্রিয়া ও চীন জাপান যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী গতিধারা।

(৪৬) তাই প্রশ্ন ও সিদ্ধান্তগুলি হবে নিম্নরূপ: চীন কি পদানত হবে? উত্তর হচ্ছে: না, চীন পদানত হবে না, পরন্তু সে চূড়ান্ত বিজয়লাভ করবে। চীন কি তাড়াতাড়ি জিততে পারবে? উত্তর হচ্ছে: না, চীন তাড়াতাড়ি জিততে পারবে না, যুদ্ধটি অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হবে। এই সিদ্ধান্তগুলি কি ঠিক? আমি মনে করি এগুলি ঠিক।

(৪৭) এইসব কথা শুনে জাতীয় পরাধীনতার ও আপোষের মতবাদীরা আবার ছুটে এসে বলবে: নিকৃষ্টতা থেকে সমতায় আসতে চীনের দরকার জাপানের সমান সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি; আর সমতা থেকে উৎকৃষ্টতায় আসতে তার দরকার হবে জাপানের থেকে বৃহত্তর সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি; কিন্তু এটা অসম্ভব, তাই উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি ঠিক নয়।

(৪৮) এটা সেই তথাকথিত মতবাদ যে, 'অস্ত্রই সবকিছু নির্ধারণ

করে'[১৮], যুদ্ধের প্রশ্নের প্রতি এটা হচ্ছে একটা যান্ত্রিক বিচারদৃষ্টি; একটি আত্মগত ও একতরফা অভিমত। আমাদের অভিমত এই মতের বিপরীত। আমরা শুধুই অস্ত্র দেখি না, উপরন্তু জনশক্তিকেও দেখি। অস্ত্র হচ্ছে যুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু নির্ধারক উপাদান নয়, নির্ধারক উপাদান হচ্ছে মানুষ, বস্তু নয়। শক্তির তুলনা শুধু সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির তুলনাই নয়, বরং জনশক্তি ও নৈতিক শক্তির তুলনা। সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি অপরিহার্যরূপেই মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয়। চীনাদের, জাপানীদের ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের জনগণের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ যদি জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে দাঁড়ায় তাহলে জবরদস্তির মাধ্যমে জাপানের অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি কেমন করে উৎকৃষ্ট হিসেবে গণ্য হতে পারে? তা যদি উৎকৃষ্ট না হয়, তবে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী চীন কি উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠে না? কোনই সন্দেহ নেই যে, চীন যদি দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং যুক্তফ্রন্টে অটল থাকে, তাহলে তার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে উঠতে পারবে। আর আমাদের শত্রুর বেলায়, দীর্ঘ যুদ্ধের দ্বারা এবং অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় দ্বন্দ্বের দ্বারা সে দুর্বল হয়ে পড়বে, ফলে তার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি তখন বিপরীত মুখে পাল্টে যেতে বাধ্য। এই অবস্থায়, চীনের উৎকৃষ্ট হয়ে উঠতে না পারার কি কোন কারণ আছে? আর শুধু এই-ই সব নয়। আপাততঃ আমরা অন্যান্য দেশের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে বিরাট পরিমাণে ও প্রকাশ্যে আমাদের শক্তি হিসেবে ধরতে না পারলেও, ভবিষ্যতেও কি পারব না? জাপানের শত্রু যদি শুধুই চীন না হয়, ভবিষ্যতে যদি এক বা একাধিক অন্য দেশ তাদের বেশ প্রচুর সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা প্রকাশ্যে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষাত্মক কার্যকলাপ কিংবা আক্রমণ চালায় এবং প্রকাশ্যে আমাদের সাহায্য করে, তাহলে আমাদের উৎকৃষ্টতা কি আরও বৃহত্তর হবে না? জাপান হচ্ছে ছোট দেশ, তার যুদ্ধ হচ্ছে অধঃপতনমুখী ও বর্বর, এবং আন্তর্জাতিকভাবে সে ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে; চীন হচ্ছে বিরাট দেশ, তার যুদ্ধ হচ্ছে প্রগতিশীল ও ন্যায়সঙ্গত, এবং আন্তর্জাতিকভাবে সে অধিক থেকে অধিকতর সমর্থনলাভ করবে। এইসব উপাদানের দীর্ঘমেয়াদী পরিপুষ্টির ফলে শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার আপেক্ষিক অবস্থাটি নিশ্চিতভাবে পাল্টে না যাবার কোন কারণ আছে কি?

(৪৯) দ্রুত বিজয়ের মতবাদীরা কিন্তু বোঝে না যে, যুদ্ধ হচ্ছে একটি শক্তির প্রতিযোগিতা। তারা উপলব্ধি করে না যে, যুদ্ধরত উভয় পক্ষের শক্তির অনুপাতে নির্দিষ্ট মাত্রার পরিবর্তন ঘটার আগে রণনীতিগতভাবে নির্ধারক লড়াই করতে ও যথার্থ সময়ের আগে মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হতে চেষ্টা করার কোন ভিত্তি নেই। তাদের অভিমতকে কাজে প্রয়োগ করতে হলে আমাদের মাথাগুলি অনিবার্যভাবেই ইটের দেওয়ালে ধাক্কা খাবে। অথবা, তারা শুধু মজা করার জন্যই নিছক বক্‌বক্‌ করছে, তাদের অভিমতটিকে প্রয়োগ করতে প্রকৃতপক্ষে তারা প্রস্তুত নয়। পরিশেষে শ্রীমান বাস্তব মশায় এসে এইসব বাচালদের মাথায় এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবে, তাদের নিছক বাক্যবাগীশ স্বরূপটি ফাঁস করে দেবে—এই বাক্যবাগীশরা শস্তায় কিস্তি মাৎ করতে চায়, কষ্ট ছাড়া কেষ্ট পেতে চায়। এ ধরনের অসার কচকচানি আগেও ছিল, আবার এখনো দেখছি, তবে এখন খুব বেশি নয়। কিন্তু যুদ্ধ যখন বিকশিত হয়ে ভারসাম্যের ও পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে প্রবেশ করবে, তখন এ কচকচানি বেড়ে উঠতে পারে। কিন্তু একই সময়ে, যদি প্রথম পর্যায়ে চীনের ক্ষয়ক্ষতি বেশ গুরুতর হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়টি যদি অত্যন্ত দীর্ঘ হয়, তাহলে জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্ব ও আপোষের মতবাদ তখন আরও বেশি সোচ্চার হয়ে উঠবে। সুতরাং আমাদের অগ্নিবর্ষণ মুখ্যতঃ জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের ও আপোষের মতবাদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করতে হবে, আর গৌণ অগ্নিবর্ষণের দ্বারা অসার কচকচানির দ্রুত বিজয়ের তত্ত্বের বিরোধিতা করতে হবে।

(৫০) যুদ্ধ যে দীর্ঘস্থায়ী হবে এটা নিশ্চিত, কিন্তু কেউই আগে থেকে বলতে পারে না যে, ঠিক কত মাস ও কত বছর এ যুদ্ধ চলবে। কারণ এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে শত্রু ও আমাদের শক্তির অনুপাতে পরিবর্তনের মাত্রার ওপরে। যারা যুদ্ধের মেয়াদকে সংক্ষিপ্ত করতে চায়, আমাদের নিজেদের শক্তি বাড়াবার জন্য ও শত্রুর শক্তি হ্রাস করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, একমাত্র পথ হচ্ছে যুদ্ধে বেশি বেশি বিজয় অর্জন করার জন্য এবং শত্রু-বাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য কঠোর চেষ্টা করা; শত্রু-অধিকৃত এলাকাকে ন্যূনতমে কমিয়ে আনার জন্য গেরিলাযুদ্ধ বিকশিত করে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা; যুক্তফ্রন্টকে সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করার জন্য এবং গোটা দেশের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা; নতুন সৈন্যবাহিনী গড়ে

তোলা ও নতুন যুদ্ধশিল্প বিকশিত করে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা ; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো ; শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও জনগণের অন্যান্য অংশকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালানো ; শত্রুবাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা ও তাদের সৈন্যদেরকে স্বপক্ষে টানার জন্য চেষ্টা করা ; বৈদেশিক সমর্থন ও সাহায্যলাভের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচার চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা, এবং জাপানী জনগণের ও অন্যান্য নিপীড়িত জাতির সমর্থনলাভের জন্য চেষ্টা করা। এইসব করেই শুধু আমরা যুদ্ধের মেয়াদকে কমাতে পারি। কোন ঐন্দ্রজালিক সোজা পথ নেই।

কলের করাতের ধরনের যুদ্ধ

(৫১) নিশ্চয়তার সংগে আমরা বলতে পারি, মানবজাতির যুদ্ধ-ইতিহাসে একটি গৌরবময় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পৃষ্ঠা লিখবে এই দীর্ঘস্থায়ী জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ। এই যুদ্ধের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরস্পর সংবদ্ধ 'কলের করাত' প্যাটার্ন—একদিকে জাপানের বর্বরতা ও তার সৈন্যশক্তির স্বল্পতা এবং অন্যদিকে চীনের প্রগতিশীলতা ও তার ভূমিসীমার বিশালতা—এইসব পরস্পরবিরোধী উপাদান থেকে উদ্ভূত হচ্ছে এই প্যাটার্ন। কলের করাত প্যাটার্নের যুদ্ধ ইতিহাসেও ঘটেছিল। অক্টোবর বিপ্লবের পরে রাশিয়ার তিন বছরের গৃহযুদ্ধে এ ধরনের অবস্থা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু চীনে কলের করাত প্যাটার্নের যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার বিশেষ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক চরিত্র, এইক্ষেত্রে তা ইতিহাসের যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে দেবে। এই কলের করাত প্যাটার্নটি নিজেকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করে।

(৫২) **অন্তর্লাইন ও বহির্লাইন।** সামগ্রিকভাবে ধরলে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধটি লড়া হচ্ছে অন্তর্লাইনে। কিন্তু প্রধান সৈন্যবাহিনী ও গেরিলাবাহিনীগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের দিক থেকে প্রধান সৈন্যবাহিনী থাকে অন্তর্লাইনে আর গেরিলাবাহিনীগুলি থাকে বহির্লাইনে। এইভাবে এরা শত্রুকে ঘিরে সাঁড়াশির মতো একটি আশ্চর্য দৃশ্য উপস্থাপিত করে। বিভিন্ন গেরিলা অঞ্চলগুলির মধ্যেকার সম্পর্কেও এই একই কথা বলতে পারা যায়। তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, প্রতিটি গেরিলা অঞ্চল হচ্ছে অন্তর্লাইনে এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলি হচ্ছে বহির্লাইনে। তারা সবাই মিলে

বহু ব্যূহমুখ গড়ে তোলে আর সেগুলি শত্রুকে সাঁড়াশির মধ্যে ধরে রাখে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে, রণনীতিগতভাবে অন্তর্লাইনে লড়াইরত নিয়মিত বাহিনী পশ্চাদপসরণ করছে; কিন্তু রণনীতিগতভাবে বহির্লাইনে লড়াইরত গেরিলা-বাহিনীগুলি ব্যাপকভাবে শত্রুর পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় বিরাট পদক্ষেপে এগিয়ে চলবে, দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও বেশি প্রচণ্ডভাবে তারা এগুবে, আর এইভাবে দেখা দেবে পশ্চাদপসরণ ও অগ্রগমনের উভয়েরই এক আশ্চর্য ছবি।

(৫৩) **পশ্চাদ্বর্তী এলাকা থাকা ও না-থাকা।** প্রধান সৈন্যবাহিনী দেশের মূল পশ্চাদ্বর্তী এলাকার ওপর নির্ভর করে যুদ্ধরেখাকে শত্রু-অধিকৃত এলাকার সবচেয়ে অগ্রভাগের সীমা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে দেয়। আব দেশের মূল পশ্চাদ্বর্তী এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেরিলাবাহিনীগুলি যুদ্ধরেখাকে শত্রুর পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় সম্প্রসারিত কবে দেয়। কিন্তু প্রত্যেকটি গেরিলা অঞ্চলে গেরিলাবাহিনীর নিজস্ব একটা ছোট পশ্চাদ্বর্তী এলাকা থাকে, এবং এব ওপর নির্ভর করেই গেরিলাবাহিনী অস্থায়ী যুদ্ধরেখা গড়ে তোলে। নিজ নিজ এলাকার শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে স্বল্পমেয়াদী সামরিক কার্যকলাপ চালাবাব জন্য প্রতিটি গেরিলা অঞ্চল কর্তৃক প্রেরিত গেরিলাবাহিনীগুলির ব্যাপাব হচ্ছে স্বতন্ত্র। তাদের না থাকে কোন পশ্চাদ্বর্তী এলাকা, না থাকে যুদ্ধবেখা। নতুন যুগে যেখানেই সুবিশাল ভূমিসীমা, প্রগতিশীল জনগণ, অগ্রসব রাজনৈতিক পার্টি ও সৈন্যবাহিনী দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে বিপ্লব যুদ্ধের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'পশ্চাদ্ভূমিহীন লড়াই চালানো।' এতে ভয়েব কিছুই নেই, বরং লাভের অনেক কিছু আছে। এ সম্পর্কে সন্দেহ বাখা উচিত নয়, ববং এটাকে চালু করার জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত।

(৫৪) **পরিবেষ্টন ও প্রতি-পরিবেষ্টন।** যুদ্ধকে সামগ্রিকভাবে ধরলে কোন সন্দেহই থাকে না যে, রণনীতিগতভাবে আমরা শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত, কারণ শত্রু রণনীতিগত আক্রমণ চালাচ্ছে এবং বহির্লাইনে সামবিক কার্যকলাপ চালাচ্ছে, আর আমরা রণনীতিগত প্রতিরক্ষায় লিপ্ত এবং অন্তর্লাইনে সামরিক কার্যকলাপ চালাচ্ছি। এটি হচ্ছে শত্রু দ্বারা আমাদেরকে পরিবেষ্টন কবার প্রথম রূপ।. বিভিন্ন পথ ধরে আমাদের ওপবে আক্রমণে অগ্রসরমান এক বা অধিক শত্রুকলামকে আমরাও আমাদের দিক থেকে পরিবেষ্টন করতে পারি, কারণ রণনীতিগতভাবে বহির্লাইন থেকে বিভিন্ন পথ ধরে অগ্রসরমান এইসব শত্রু-কলামগুলির বিরুদ্ধে সংখ্যাগতভাবে উৎকৃষ্ট সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করে যুদ্ধা-

ভিযান ও লড়াইয়ের ব্যাপারে বহির্লাইন থেকে সামরিক কার্যকলাপ চালাবার নীতি আমরা কাজে লাগাই। শত্রুকে প্রতি-পরিবেষ্টন করার এই হচ্ছে আমাদের প্রথম রূপ। তারপর, পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকা-গুলির কথা আমরা যদি বিবেচনা করি—প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন ঘাঁটি এলাকাকে পৃথক পৃথক করে ধরলে সেগুলি উতাই পার্বত্য অঞ্চলের মতো চারিদিক থেকে শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত, অথবা উত্তর-পশ্চিম শানসী এলাকার মতো তিনদিক থেকে শত্রুর দ্বারা: পরিবেষ্টিত। শত্রুর পরিবেষ্টনের এটা হচ্ছে দ্বিতীয় রূপ। কিন্তু, যদি সবগুলি গেরিলা ঘাঁটি এলাকাকে একত্রে ধরা হয় এবং যদি নিয়মিত বাহিনীর অবস্থানক্ষেত্রের সংগে সমস্ত গেরিলা ঘাঁটি এলাকাকে একসংগে মিলিয়ে বিচার হয়, তাহলে দেখা যায়, আমরাও আমাদের দিক থেকে শত্রুর বেশ অনেকগুলি বাহিনীকে পরিবেষ্টন করে থাকি। যেমন, শানসী প্রদেশে আমরা তাতুং-পুচৌ রেলপথটিকে (পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বদেশ ও দক্ষিণ প্রান্ত) তিন দিক দিয়ে এবং তাইয়ুয়ান শহরটিকে চার দিক দিয়ে ঘিরে ধরেছি; আবার হোপেই ও শানতুং প্রদেশে এইরকম পরিবেষ্টনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এটি হচ্ছে আমাদের শত্রুকে প্রতি-পরিবেষ্টনের দ্বিতীয় রূপ। এইভাবে শত্রুর দ্বারা পবিবেষ্টনের দুটি রূপ আর আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টনেব দুটি রূপ আছে, এ যেন ওয়েইছী দাবা খেলার মতো। শত্রু ও আমাদের দুই পক্ষের চালিত যুদ্ধাভিযান ও লড়াইগুলি যেন ওয়েইছী দাবা খেলায় পরস্পরের 'ঘুঁটিগুলি দখল করে নেবার' মতো, আর শত্রু কর্তৃক সুরক্ষিত ঘাঁটি স্থাপন (যেমন তাইয়ুয়ান শহর) ও আমাদের গেরিলা ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা (যেমন উতাই পার্বত্য অঞ্চল) যেন ওয়েইছী দাবা খেলায় 'ফাঁকা ঘব স্থাপন' করার মতো। যদি দুনিয়াকেই ওয়েইছী দাবা খেলার ক্ষেত্র হিসেবে ধরা হয় তাহলে আমাদের ও শত্রুর মধ্যে পরিবেষ্টনের আরও একটি তৃতীয় রূপ দেখা দেবে, যথা আগ্রাসী ফ্রন্ট ও শান্তিফ্রন্টের মধ্যেকার পরস্পর সম্পর্ক। শত্রু তার আগ্রাসী ফ্রন্ট দিয়ে চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও চেকোস্লো-ভাকিয়া প্রভৃতি দেশগুলোকে পরিবেষ্টন করে, আব আমরা আমাদের শান্তিফ্রন্ট দিয়ে প্রতি-পরিবেষ্টন করি জার্মানি, জাপান ও ইতালীকে। কিন্তু বুদ্ধের হাতের মতো আমাদের পরিবেষ্টনও বিশ্বের এপাশে-ওপাশে অবস্থানরত পঞ্চ-ভূত পর্বত হয়ে উঠবে আর আধুনিক সুন উ-খোংরা—ফ্যাসিবাদী আক্রমণ-কারীরা, পরিশেষে তার তলায় চাপা পড়ে যাবে আর কোনদিনই তার তলা

থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।[১৯] সুতরাং, আমরা যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনকে একটি রণনীতিগত ইউনিট হিসেবে নিয়ে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সম্ভাব্য দেশগুলোর প্রত্যেককে একটি রণনীতিগত ইউনিট হিসেবে নিয়ে এবং আরেকটি রণনীতিগত ইউনিট হিসেবে জাপানের গণ-আন্দোলনকে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি জাপ-বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তুলতে পারি, এবং এইভাবে যদি আমরা এমন একটি বিরাট জাল রচনা করতে পারি, যার থেকে নিষ্কৃতির কোন পথ আর ফ্যাসিবাদী সুন উ-খোংরা পেতে পাবে না, তাহলে সেটাই হবে শত্রুর বিনাশের দিন। বস্তুতঃ, যেদিন এই বিরাট জালটি মোটামুটি রচিত হবে, নিঃসন্দেহে সেইদিনটি হবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ উৎখাতের দিন। এটা মোটেই ঠাট্টা নয়, বরং এই-ই হচ্ছে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী গতিধারা।

(৫৫) **বড় এলাকা ও ছোট এলাকা।** এ সম্ভাবনা আছে যে, চীনের মূল ভূখণ্ডের বৃহত্তর অংশ শত্রু দখল করে নেবে, এবং শুধু ক্ষুদ্রতর অংশটি অক্ষত থাকবে। এটা হচ্ছে পরিস্থিতির এক দিক। কিন্তু তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশ ছাড়া, শত্রু-অধিকৃত এই বৃহত্তর অংশের মধ্যে আসলে শত্রু শুধু বড় বড় শহর, প্রধান যোগাযোগ পথ ও কোন কোন সমতল এলাকা অধিকার করে রাখতে পারে। গুরুত্বের দিক থেকে এগুলি সবই প্রথমশ্রেণীর হলেও, আয়তনে ও জনসংখ্যায় এগুলি সম্ভবতঃ শুধু শত্রু-অধিকৃত এলাকার ক্ষুদ্রতর অংশ; আর শত্রু-অধিকৃত এলাকার বৃহত্তর অংশটি হবে গেরিলা এলাকা, যা সর্বত্রই প্রসারিত হবে। এটি হচ্ছে পরিস্থিতির অপর একটি দিক। চীনের মূল ভূখণ্ডকে ছাড়িয়ে গিয়ে আমরা যদি মঙ্গোলিয়া, সিনকিয়াং, সিংহাই ও তিব্বতকে হিসেবে ধরি, তাহলে অনধিকৃত এলাকাই হবে চীনা ভূখণ্ডের বৃহত্তর অংশ আর তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশকে হিসেবে ধরলেও শত্রু-অধিকৃত এলাকা হবে ক্ষুদ্রতর অংশ। পরিস্থিতির এও হচ্ছে আর একটি দিক। অক্ষত এলাকাটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, এবং তার বিকাশসাধনের জন্য আমাদের প্রভূত প্রচেষ্টা চালাতে হবে; শুধু যে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই তার বিকাশসাধন করতে হবে তাই নয়, উপরন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তার বিকাশসাধন করতে হবে এবং সেটিও হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। শত্রু আমাদের আগেকার সংস্কৃতি-কেন্দ্রগুলিকে সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকায় পরিণত করেছে, এবং আমাদের উচিত আগেকার সংস্কৃতিগতভাবে পশ্চাৎপদ এলাকা-

গুলিকে সংস্কৃতি-কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা। সেই একই সময়ে শত্রু পশ্চাদ্ভাগে ব্যাপক গেরিলা এলাকার বিকাশসাধনের কাজটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিভিন্ন দিক দিয়ে তার বিকাশসাধন করতে হবে তার সাংস্কৃতিক কার্যের বিকাশসাধনও করতে হবে। এক কথায় বলা যায় যে, চীনা ভূখণ্ডের বিরাট বিরাট অংশগুলি অর্থাৎ গ্রামীণ এলাকা প্রগতিশীল ও উজ্জ্বল অঞ্চলে রূপান্তরিত হবে, আর ছোট ছোট অংশগুলি অর্থাৎ শত্রু-অধিকৃত এলাকাগুলি, বিশেষ করে বড় বড় শহর, সাময়িকভাবে হয়ে পড়বে পশ্চাৎপদ ও অন্ধকারময় অঞ্চল।

(৫৬) কাজেই এটা দেখা যাচ্ছে যে, দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক-বিস্তৃত জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হচ্ছে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক-ভাবে একটি কলের করাতের প্যাটার্নের যুদ্ধ। যুদ্ধের ইতিহাসে এটি হচ্ছে একটি আশ্চর্য দৃশ্য, চীনা জাতির এক শৌর্যদৃপ্ত কীর্তিকলাপ এবং বিশ্ব-আলোড়নকারী মহান কার্য। এ যুদ্ধ যে শুধু চীন আর জাপানকেই প্রভাবান্বিত করবে, শুধু যে এই দুই দেশকেই এগিয়ে চলার জন্য বলিষ্ঠভাবে অনুপ্রাণিত করবে তা-ই নয় উপরন্তু গোটা দুনিয়াকেও, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো উৎপীড়িত দেশগুলিকেও এগিয়ে চলতে অনুপ্রাণিত করবে। প্রতিটি চীনা লোকের উচিত সচেতনভাবে কলের করাত প্যাটার্নের এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া, এটাই হচ্ছে নিজেকে মুক্ত করার জন্য চীনা জাতির যুদ্ধের রূপরীতি, এটাই হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর ৩০-এর ও ৪০-এর দশকের যুগে একটি বিরাট আধা-ঔপনিবেশিক দেশের দ্বারা চালিত মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ রূপরীতি।

চিরস্থায়ী শান্তির জন্য যুদ্ধ করা

(৫৭) চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতিটি চীনের ও গোটা দুনিয়ার চিরস্থায়ী শান্তি অর্জনের সংগ্রামের সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। কোন ঐতিহাসিক কালেই যুদ্ধ আজকের মতো চিরস্থায়ী শান্তির এত নিকটবর্তী হয়নি। শ্রেণীসমূহের আবির্ভাবের ফলে কয়েক হাজার বছর ধরে মানবজাতির জীবনটি যুদ্ধে ভরপুর হয়ে রয়েছে, কতই না যুদ্ধ লড়েছে প্রতিটি জাতি; যুদ্ধ ঘটেছে একটি জাতির ভেতরে কিংবা বিভিন্ন জাতির মধ্যে। পুঁজিবাদী সমাজের সাম্রাজ্যবাদী যুগে যুদ্ধগুলি চালানো হয় বিশেষ ধরনের ব্যাপক মাত্রায় ও একটা বিশেষ নির্মমতার সংগে। বিশ বছর আগের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধটি ছিল ইতিহাসে অভূতপূর্ব, কিন্তু সেটিই

শেষ যুদ্ধ নয়। যে যুদ্ধ এখন শুরু হয়েছে, শুধু সেই শেষ যুদ্ধ হবার কাছাকাছি আসে, অর্থাৎ মানবজাতির চিরস্থায়ী শান্তির কাছাকাছি আসে। এ পর্যন্ত বিশ্ব জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। দেখুন: ইতালী ও জাপান, আবিসিনিয়া আর স্পেন, তারপর চীন। যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলির জনসংখ্যা প্রায় ৬০ কোটির অঙ্কে উঠেছে, অর্থাৎ সারা দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বর্তমান যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে তার চিরস্থায়ী শান্তির সংগে তার নৈকট্য। এ যুদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন কেন? আবিসিনিয়ার সংগে যুদ্ধ করার পরে ইতালী স্পেনের সংগে যুদ্ধ করল, আর এই যুদ্ধে যোগ দিল জার্মানি। তারপরে জাপান আক্রমণ করল চীনকে। তারপরে কাদের পালা? নিঃসন্দেহে বলা যায়, হিটলার বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সংগে যুদ্ধ করবে। 'ফ্যাসিবাদই হচ্ছে যুদ্ধ'[২০]—এ কথাটি পুরোপুরি সত্য। বর্তমান যুদ্ধ একটি বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ায় যুদ্ধের বিরতি থাকবে না; মানবজাতি যুদ্ধের বিপর্যয়কে এড়াতে পারবে না। তাহলে আমরা কেন বলছি যে, বর্তমান যুদ্ধ চিরস্থায়ী শান্তির কাছাকাছি? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিশ্ব-পুঁজিবাদের যে সাধারণ সঙ্কট শুরু হয়েছিল তারই বিকাশের ভিত্তিতে ঘটেছে বর্তমান এ যুদ্ধটি। এই সাধারণ সঙ্কটই পুঁজিবাদী দেশগুলিকে একটি নতুন যুদ্ধের মুখে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, আর সর্বপ্রথম, ফ্যাসিবাদী দেশগুলিকে নতুন দুঃসাহসিক যুদ্ধের পথে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা আগে থেকেই বলতে পারি যে, এ যুদ্ধের ফলে পুঁজিবাদ পরিত্রাণ পাবে না, পরন্তু সে ধ্বংসের মুখে যাবে। বিশ বছর আগের যুদ্ধের তুলনায় এ যুদ্ধটি হবে আরও বিরাট ও আরও বেশি নির্মম; সকল জাতিকেই অনিবার্যভাবে এ যুদ্ধে টেনে নামানো হবে, দীর্ঘদিন ধরে চলবে এ যুদ্ধ, আর মানবজাতি প্রভূত দুঃখদুর্দশা ভোগ করবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব ও সারা দুনিয়ার জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার উন্নতির ফলে এই যুদ্ধ থেকে নিঃসন্দেহে উদ্ভূত হবে মহান বিপ্লবী যুদ্ধসমূহ···উদ্ভূত হবে যাবতীয় প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য, আর এইভাবে সেগুলি বর্তমান যুদ্ধকে চিরস্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য সংগ্রামের চরিত্র দেবে। পরে যদি আর একটি যুদ্ধের যুগও আসে, তাহলেও চিরস্থায়ী বিশ্বশান্তি আর বেশি দূরে নয়। মানবজাতি একবার যদি পুঁজিবাদকে বিলোপ করে দেয়, তাহলে সে চিরস্থায়ী শান্তির যুগে পৌঁছে যাবে এবং তখন যুদ্ধের আর কোন দরকারই থাকবে না। কি সৈন্যবাহিনী, কি যুদ্ধজাহাজ, কি সামরিক বিমানপোত,

কি বিষাক্ত গ্যাস—এ সবের কিছুরই তখন আর কোন দরকার হবে না। তারপর থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত মানবজাতি আর কোনদিনই যুদ্ধ দেখতে পাবে না। ইতিমধ্যে যে বিপ্লবী যুদ্ধগুলি শুরু হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে চিরস্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য চালিত যুদ্ধের অংশ। চীন ও জাপানের মিলিত জনসংখ্যা হচ্ছে ৫০ কোটির ওপরে। চিরস্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য চালিত এই যুদ্ধে চীন-জাপান যুদ্ধটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করবে, আর এর থেকেই আসবে চীনা জাতির মুক্তি। ভবিষ্যতের মুক্ত নয়া চীন হবে ভবিষ্যতের মুক্ত নয়া দুনিয়ার থেকে অবিচ্ছেদ্য। তাই আমাদের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধটি চিরস্থায়ী শান্তি অর্জনের যুদ্ধের চরিত্র বহন করে।

(৫৮) ইতিহাসে যুদ্ধ দুরকম : একটা ন্যায় যুদ্ধ, আর একটা অন্যায় যুদ্ধ। যেসব যুদ্ধ প্রগতিশীল সেসবই ন্যায় যুদ্ধ, আর যেসব যুদ্ধ প্রগতিকে বাধা দেয় সেসবই হচ্ছে অন্যায় যুদ্ধ। যেসব অন্যায় যুদ্ধ, প্রগতিকে ব্যাহত করে, আমরা কমিউনিস্টরা সে সবেরই বিরোধিতা করি, কিন্তু প্রগতিশীল ন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করি না। আমরা কমিউনিস্টরা ন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা তো করিই না, বরং সেসব যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। অন্যায় যুদ্ধ, ধরা যাক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দুপক্ষই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরে এ যুদ্ধে লড়ল, তাই সারা দুনিয়ার কমিউনিস্টরা দৃঢ়ভাবে এই যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। বিরোধিতা করার পদ্ধতি হচ্ছে যুদ্ধ বেধে যাবার আগেই তাকে বাধাদানের যথাসাধ্য চেষ্টা করা ; যুদ্ধ বেধে যাবার পর যথাসম্ভব যুদ্ধ দিয়ে যুদ্ধের বিরোধিতা করা, ন্যায় যুদ্ধ দিয়ে অন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করা। জাপানের যুদ্ধ হচ্ছে অন্যায় যুদ্ধ, তা প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। আর জাপানী জনগণ সমেত সারা দুনিয়ার জনগণের উচিত এ যুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং তাঁরা তার বিরোধিতা করছেনও। আমাদের দেশে জনগণ ও সরকার, কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙ—সবাই ন্যায়ের পতাকা তুলে ধরে আক্রমণবিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ চালাচ্ছে। আমাদের যুদ্ধ পবিত্র ও ন্যায়সঙ্গত, এ যুদ্ধ প্রগতিশীল আর তার লক্ষ্য হচ্ছে শান্তি। লক্ষ্য যে শুধু-একটিমাত্র দেশেরই শান্তি তা নয়, সারা দুনিয়ার শান্তি, শুধুমাত্র সাময়িক শান্তি নয়, চিরস্থায়ী শান্তি। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের অবশ্যই জীবন-মরণ সংগ্রাম করতে হবে, যে-কোন আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে এবং লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই থামা চলবে না। সে লক্ষ্য অর্জনের

জন্য আত্মত্যাগ যত বড়ই হোক না কেন, যত দীর্ঘ সময়ই লাগুক না কেন, চিরস্থায়ী শান্তি ও চিরস্থায়ী ঔজ্জ্বল্যের নতুন এক দুনিয়া ইতিমধ্যেই আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে প্রসারিত রয়েছে। এই যুদ্ধ চালানায় আমাদের আস্থা স্থাপিত রয়েছে চিরস্থায়ী শান্তি ও চিরস্থায়ী ঔজ্জ্বল্যের নয়া চীন ও নয়া দুনিয়া অর্জনের ওপরে। ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ চায় যুদ্ধকে অনন্তকাল পর্যন্ত জীইয়ে রাখতে, আর আমরা চাই অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানবজাতির বিরাট সংখ্যাগুরু অংশকে পরম প্রয়াস চালাতে হবে। চীনের ৪৫ কোটি মানুষ দুনিয়ার জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। আমরা যদি একযোগে প্রচেষ্টা চালিয়ে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করি এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের এক নয়া চীন সৃষ্টি করি, তাহলে আমরা নিঃসন্দেহেই বিশ্বের চিরস্থায়ী শান্তির জন্য সংগ্রামে অত্যন্ত বিরাট অবদান যোগাব। এটা কোন অলীক আশা নয়, সমগ্র বিশ্বের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের গতি ইতিমধ্যেই এদিকে এগিয়ে চলেছে; এবং মানবজাতির সংখ্যাগুরু অংশ চেষ্টা করলে এই লক্ষ্য নিশ্চয়ই কয়েক দশকের মধ্যেই অর্জিত হবে।

যুদ্ধে মানুষের কর্মতৎপরতা

(৫৯) এ পর্যন্ত আমরা এটাই ব্যাখ্যা করেছি যে, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কেন এবং কেন চূড়ান্ত বিজয় চীনের হবে, আমরা মুখ্যতঃ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কি এবং কি নয় তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা কি করতে হবে এবং কি করা উচিত নয়—এই প্রশ্ন নিয়ে পর্যালোচনা করব। কি করে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাতে হয় এবং কেমন করেই-বা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা যায়? এইসব প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়েছে নীচে। এর জন্য আমরা যথাক্রমে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির আলোচনা করব: যুদ্ধে মানুষের কর্মতৎপরতা, যুদ্ধ ও রাজনীতি, প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য রাজনৈতিক সক্রিয়করণ, যুদ্ধের উদ্দেশ্য, প্রতিরক্ষার মধ্যে আক্রমণ, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই, অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই, উদ্যোগ, নমনীয়তা, পরিকল্পনা, চলমান যুদ্ধ, গেরিলাযুদ্ধ, অবস্থানগত যুদ্ধ, নির্মূলীকরণের যুদ্ধ, শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ, শত্রুর ভুলত্রুটির সুযোগ নেওয়ার সম্ভাব্যতা, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে নির্ধারক লড়াইয়ের প্রশ্ন, এবং জয়ের ভিত্তি হচ্ছে সৈন্যবাহিনী ও জনগণ। এখন মানুষের কর্মতৎপরতার সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক।

৬০) আমরা যখন বলি যে, আমরা সমস্যা সম্পর্কে আত্মমুখী বিচারদৃষ্টি রাখার বিরোধিতা করি, তখন আমরা এটাই বোঝাই যে, আমাদের অবশ্যই কোন কোন লোকের এমন ভাবনাচিন্তার বিরোধিতা করতে হবে যা বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং তার সংগে খাপ খায় না, যা হচ্ছে অলীক কল্পনা এবং মিথ্যা-যুক্তি; আর সেগুলি অনুসারে কাজ করলে ব্যর্থতা অনিবার্য। কিন্তু যা কিছু করবার, তা তো মানুষের দ্বারাই করতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও চূড়ান্ত বিজয় মানুষের চেষ্টা ছাড়া সংঘটিত হবে না। এ ধরনের কাজকে সুসম্পন্ন করতে হলে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা বাস্তব ঘটনা থেকে ধারণা, যুক্তি ও অভিমত আহরণ করে, এবং পরিকল্পনা, কর্মপন্থা, নীতি, রণনীতি ও রণকৌশল উপস্থাপিত করে। ধারণা প্রভৃতি হচ্ছে আত্মগত জিনিস, কিন্তু কার্যকরণ বা কার্যকলাপ হচ্ছে আত্মগত জিনিসের বাস্তবে রূপায়ণ। এগুলি সবই হচ্ছে মানুষের বিশিষ্ট কর্মতৎপরতা। এ ধরনের কর্মতৎপরতাকে আমরা 'মানুষের সচেতন কর্মতৎপরতা' বলে থাকি। আর এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা অন্য সমস্ত কিছু থেকে মানুষকে পৃথক করে দেয়। বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তার সংগে সংগতিপূর্ণ সমস্ত ধারণাই হচ্ছে সঠিক ধারণা, আর সঠিক ধারণার ওপরে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত কার্যকরণ বা কার্যকলাপই হচ্ছে সঠিক কার্যকলাপ। এই ধরনের ধারণাকে ও কার্যকলাপকে এবং এই ধরনের সচেতন কর্মতৎপরতাকে আমাদের অবশ্যই বিকশিত করে তুলতে হবে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধটি চালানো হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে তাড়িয়ে দেবার জন্য এবং পুরানো চীনকে একটা নতুন চীনে রূপান্তরিত করার জন্য। এই লক্ষ্যটি যাতে অর্জিত হয়, তার জন্য অবশ্যই সমগ্র চীনের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তাঁদের সচেতন কর্মতৎপরতাকে অবশ্যই পুরোপুরিভাবে বিকশিত করতে হবে। আমরা যদি শুধু বসে থাকি, কোন কাজ না করি, তাহলে শুধু স্বদেশের পতনই হবে তার ফলশ্রুতি, তাতে না হবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, না আসবে চূড়ান্ত বিজয়।

(৬১) সচেতন কর্মতৎপরতা হচ্ছে মানবজাতির বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধে এই বৈশিষ্ট্যকে মানুষ প্রচণ্ডভাবে প্রদর্শন করে থাকে। এটা সত্য যে, উভয় পক্ষের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থার দ্বারা, যুদ্ধের চরিত্রের দ্বারা এবং আন্তর্জাতিক সমর্থনের দ্বারা নির্ধারিত হয় যুদ্ধের জয় অথবা পরাজয়; কিন্তু শুধুমাত্র এ সবের দ্বারাই তা নির্ধারিত হয় না। এ সবগুলি

শুধু জয় বা পরাজয়ের সম্ভাব্যতা সৃষ্টি করে, কিন্তু জয় বা পরাজয়ের প্রশ্নটির চূড়ান্ত মীমাংসা তারা নিজেরা করে না। জয় বা পরাজয়ের নিষ্পত্তিকরণে আত্মগত প্রচেষ্টাকেও অবশ্যই যোগ করে নিতে হবে। এটা হচ্ছে যুদ্ধের পরিচালনা ও যুদ্ধ-চালনা, অর্থাৎ যুদ্ধে মানুষের সচেতন কর্মতৎপরতা।

(৬২) যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁরা বাস্তব অবস্থার দ্বারা অনুমোদিত সীমা লংঘন করে যুদ্ধে জয়লাভের আশা করতে পারেন না, কিন্তু বাস্তব অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে উদ্যোগের সংগে যুদ্ধে জয়লাভের চেষ্টা করতে পারেন, এবং তা অবশ্যই করতে হবে। যুদ্ধ পরিচালকদের ক্রিয়ামঞ্চকে অবশ্যই বাস্তব অবস্থার সম্ভাবনার ওপরে গড়ে উঠতে হবে, কিন্তু তাঁরা এই মঞ্চের ওপর শব্দ, বর্ণ, শক্তি ও আড়ম্বরময় অনেক নাট্যানুষ্ঠানই পরিচালনা করতে পারেন। নির্দিষ্ট বাস্তবমুখী বস্তুগত ভিত্তির ওপরে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পরিচালকদের উচিত তাঁদের পরাক্রমকে কাজে লাগানো, সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে পরিচালিত করে জাতীয় শত্রুকে ধ্বংস করা, আমাদের এই আক্রান্ত ও নিপীড়িত সমাজ ও দেশের পরিস্থিতিকে বদলে দেওয়া এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের এক নয়া চীন সৃষ্টি করা। এখানেই আমাদের আত্মগত পরিচালনার সামর্থ্য কাজে লাগে এবং অবশ্যই তাকে কাজে লাগাতে হবে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের কোন কম্যাণ্ডারকেই নিজেকে বাস্তব অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে গোঁয়ারগোবিন্দের মতো বেপরোয়া ব্যক্তি হতে আমরা অনুমতি দেব না; কিন্তু আমাদের অবশ্যই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রত্যেকটি কম্যাণ্ডারকে উৎসাহ দেওয়া উচিত, যাতে তাঁরা সাহসী ও বিচক্ষণ সেনাপতি হয়ে ওঠেন। তাঁদের যে শুধু শত্রুকে দাবিয়ে রাখার সাহসই থাকবে তাই নয়, পরন্তু সমগ্র যুদ্ধের পরিবর্তন ও বিকাশকে পরিচালনার সামর্থ্যও তাঁদের থাকতে হবে। যুদ্ধের মহাসমুদ্রে সাঁতার কাটতে গিয়ে কম্যাণ্ডারের অবশ্যই হাবুডুবু খাওয়া চলবে না, বরং দৃঢ়চিত্তে সুবিবেচিত টানে টানে ওপারে পৌঁছানো উচিত। যুদ্ধ পরিচালনার নিয়ম হিসেবে রণনীতি ও রণকৌশলই হচ্ছে যুদ্ধের মহাসাগরে সাঁতরানোর কলাকৌশল।

যুদ্ধ ও রাজনীতি

(৬৩) 'যুদ্ধ হচ্ছে রাজনীতির ধারাবাহিক রূপ'। এই অর্থে যুদ্ধই হচ্ছে রাজনীতি এবং যুদ্ধ নিজেই রাজনৈতিক প্রকৃতির কার্যকলাপ। প্রাচীনকাল

থেকে শুরু করে এমন একটা যুদ্ধও ঘটেনি, যার কোন রাজনৈতিক প্রকৃতি ছিল না। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধটি হচ্ছে গোটা জাতির বিপ্লবী যুদ্ধ আর তার বিজয় হচ্ছে যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে অর্থাৎ জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা ও সাম্যের এক নয়া চীন গড়ে তোলা থেকে অবিচ্ছেদ্য, প্রতিরোধ-যুদ্ধে ও যুক্তফ্রন্টে অটলভাবে প্রচেষ্টা চালানোর সাধারণ নীতি থেকে অবিচ্ছেদ্য, গোটা দেশের জনগণের সমাবেশ থেকে, অফিসার ও সৈনিকদের ঐক্য, সৈন্যবাহিনী ও জনগণের ঐক্য এবং শত্রু-বাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি রাজনৈতিক নীতি থেকে অবিচ্ছেদ্য, আর অবিচ্ছেদ্য যুক্তফ্রন্ট নীতির কার্যকরী প্রয়োগ থেকে, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সমাবেশ থেকে এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন ও জাপানের ভেতরকার জনগণের সমর্থন-লাভের প্রচেষ্টা থেকে। এক কথায়, ক্ষণকালের জন্যও যুদ্ধকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারা যায় না। জাপ-বিরোধী সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে যদি রাজনীতিকে তুচ্ছ করে দেখার ঝোঁক থাকে, রাজনীতি থেকে যুদ্ধকে বিচ্ছিন্ন করে যুদ্ধের ধারণাটি চরম হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা থাকে, তাহলে এটা ভুল বলে মনে করা উচিত এবং শুধরে নেওয়া উচিত।

(৬৪) কিন্তু যুদ্ধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে, এবং এই অর্থে যুদ্ধ সাধারণ রাজনীতির সমান নয়। 'যুদ্ধ হচ্ছে অন্য…উপায়ে রাজনীতির ধারাবাহিক রূপ'।[২২] রাজনীতি যখন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিকাশলাভ করে এবং আগের মতো আর এগুতে পারে না, তখন যুদ্ধ বাধে রাজনৈতিক পথের বাধাকে ঝেঁটিয়ে দূর করার জন্য। ধরা যাক, চীনের আধা-স্বাধীন অবস্থা ছিল জাপানী সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক বিকাশের পথের বাধা, তাই জাপান সেই বাধাকে ঝেঁটিয়ে দূর করার জন্য এই আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু করেছে। আর চীনের ব্যাপারটা কি? চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অনেকদিন থেকেই বাধা হয়ে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়ন; তাই এ বাধাটাকে ঝেঁটিয়ে দূর করার প্রয়াসে অনেকবার মুক্তিযুদ্ধ চালানো হয়েছে। চীনকে উৎপীড়ন করে চীনা বিপ্লবের গতিপথকে সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করার জন্য জাপান এখন যুদ্ধকে ব্যবহার করছে, তাই এই বাধাকে ঝেঁটিয়ে দূর করার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে চীন বাধ্য হয়েছে এই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাতে। বাধা যখন দূর হয় এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য যখন অর্জিত হয়, তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বাধা পুরোপুরি দূর না হলে যুদ্ধ অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যেতেই হবে, যাতে

পুরোপুরি লক্ষ্য অর্জিত হয়। যেমন, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের কাজ সম্পন্ন হবার আগেই যদি কেউ আপোষের চেষ্টা করে, তাহলে ব্যর্থ হতে সে বাধ্য, কারণ কোন-না-কোন কারণে একটা আপোষ-রফা হলেও যুদ্ধ আবার বেধে উঠবেই, ব্যাপক জনসাধারণ বশ্যতা স্বীকার করবেন তো না-ই, পরন্তু তাঁদের যুদ্ধের রাজনৈতিক লক্ষ্য পুরোপুরিভাবে অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। অতএব, এ কথা বলা যেতে পারে যে, রাজনীতি হচ্ছে রক্তপাতহীন যুদ্ধ আর যুদ্ধ হচ্ছে রক্তপাতময় রাজনীতি।

(৬৫) যুদ্ধের বিশেষ বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত হয় যুদ্ধের একটা বিশেষ সংগঠনব্যবস্থা, একটা বিশেষ পদ্ধতিমালা ও এক বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়া। এই সংগঠন হচ্ছে সৈন্যবাহিনী ও তার সংগে জড়িত সব কিছু। এ পদ্ধতি হচ্ছে যুদ্ধ-পরিচালনার রণনীতি ও রণকৌশল। আর এই প্রক্রিয়া হচ্ছে সামাজিক কার্যকলাপের এক বিশেষ রূপরীতি যার মধ্যে যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনী-গুলি নিজেদের পক্ষে অনুকূল ও শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োগ করে একে অপরকে আক্রমণ করে অথবা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরক্ষা করে। তাই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা। যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের সবাইকে অবশ্যই প্রথাগত অভ্যাস থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিতে হবে আর যুদ্ধের ব্যাপারে নিজেদের অভ্যস্ত করে নিতে হবে, এবং শুধু এইভাবেই তারা যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে।

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য রাজনৈতিক সমাবেশ

(৬৬) এত মহান একটা জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ ব্যাপক ও সুগভীর রাজনৈতিক সমাবেশ ছাড়া জিততে পারা যায় না। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের আগে জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য কোন রাজনৈতিক সমাবেশ ছিল না, এটি ছিল চীনের বিরাট একটা ত্রুটি; এইভাবে চীন ইতিমধ্যেই শত্রুর কাছে একটা চালে হেরে গেছে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হবার পরেও রাজনৈতিক সমাবেশ ব্যাপক হওয়া থেকে বহু দূরে ছিল, সুগভীর হওয়া তো আরও দূরের কথা। জনসাধারণের বিরাটতম অংশ শত্রুর কামানের গোলার আগুন আর তার বিমানবাহিনীর বর্ষিত বোমা থেকেই যুদ্ধের খবর পেয়েছিল। সেটাও এক রকমের সমাবেশ, কিন্তু আমাদের হয়ে

সেটি করেছিল শত্রু, আমরা নিজেরা সেটি করিনি। কামানের গোলার দুমদাম শব্দের নাগালের বাইরে দূরান্তবর্তী অঞ্চলের লোকজন এখনো আগের মতোই অচঞ্চলভাবে দিন কাটাচ্ছে। এ পরিস্থিতিকে অবশ্যই পরিবর্তিত করতে হবে, অন্যথায় এই জীবন-মরণ যুদ্ধে আমরা জিততে পারব না। শত্রুর কাছে আর কোনদিনই যেন কোন চালে আমরা অবশ্যই না হারি, বরং এর ঠিক বিপরীতে, শত্রুকে পরাজিত করবার জন্য যেন আমরা অবশ্যই এই চালের—রাজনৈতিক সমাবেশের পূর্ণ ব্যবহার করি। এ চালটির গুরুত্ব অত্যন্ত বিরাট, বস্তুতঃই এটির গুরুত্ব হচ্ছে প্রথমশ্রেণীর, আর শত্রুর তুলনায় অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে আমাদের নিকৃষ্টতা হচ্ছে গৌণ। সারা দেশের সাধারণ মানুষের সমাবেশ সাধিত হলে শত্রুকে ডুবিয়ে মারার মতো একটি বিরাট সমুদ্রের সৃষ্টি হবে, আমাদের অস্ত্রশস্ত্রাদির নিকৃষ্টতার ক্ষতিটা পূরণ করার শর্তের সৃষ্টি হবে এবং যুদ্ধের সমস্ত অসুবিধাকে দূর করবার পূর্বশর্তের সৃষ্টি হবে। জয়-লাভের জন্য আমাদের অবশ্যই অটলভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, এবং অটলভাবে যুক্তফ্রন্ট ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এ সবই হচ্ছে সাধারণ মানুষের সমাবেশ থেকে অবিচ্ছেদ্য। বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করেও রাজনৈতিক সমাবেশকে অবহেলা করা হচ্ছে, এটা—'উত্তর অভিমুখে রথ চালিয়ে দক্ষিণ দিকে যেতে' চাওয়ার মতো, এর ফল অনিবার্যভাবেই হবে বিজয় থেকে বঞ্চিত হওয়া।

(৬৭) রাজনৈতিক সমাবেশ বলতে কি বোঝায়? প্রথমতঃ, এতে বোঝায় যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে বলা। প্রত্যেকটি সৈন্য ও বেসামরিক নাগরিককে এটা স্পষ্টভাবে বোঝানো দরকার যে যুদ্ধটি অবশ্যই কেন লড়তে হবে এবং সে যুদ্ধের সংগে তাঁদের কি সম্পর্ক। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে 'জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা ও সাম্যের এক নয়া চীন গড়ে তোলা', এই উদ্দেশ্যকে আমাদের অবশ্যই সমস্ত সৈন্য ও জনগণের কাছে বলে দিতে হবে, শুধু এই-ভাবেই একটা জাপ-বিরোধী জোয়ার সৃষ্টি করতে পারা যাবে এবং যুদ্ধে নিজেদের সবকিছু দিয়ে দেবার জন্য কোটি কোটি মানুষকে একমন-একপ্রাণরূপে ঐক্যবদ্ধ করতে পারা যাবে। দ্বিতীয়তঃ, তাদের কাছে শুধু উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, সে উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি ও নীতিগুলিও ব্যাখ্যা করে দিতে হবে, অর্থাৎ একটা রাজনৈতিক কর্মসূচী

অবশ্যই থাকতে হবে। ইতিমধ্যেই আমাদের জাপানকে প্রতিরোধ করে দেশকে বাঁচানোর দশ দফা কর্মসূচী রয়েছে, আর প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও দেশগঠনের কর্মসূচীও রয়েছে। সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যে এই দুটি কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং কাজে পরিণত করার জন্য সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে সক্রিয় করে তোলা আমাদের উচিত। একটা সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচী ছাড়া জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধটিকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার জন্য গোটা সৈন্যবাহিনী ও সমগ্র জনগণকে সক্রিয় করে তোলা অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, আমাদের কেমন করে তাদেরকে সক্রিয় করা উচিত? মৌখিকভাবে প্রচার করে, ইস্তাহার ও বিজ্ঞাপন দিয়ে, খবরের কাগজ ও বই-পুস্তকের মাধ্যমে, নাটক ও চলচ্চিত্রের ভেতর দিয়ে, স্কুলের মাধ্যমে, গণ-সংগঠন ও আমাদের কর্মীদের মারফতে। কুওমিনতাঙের শাসিত এলাকায় এ পর্যন্ত যা করা হয়েছে তা হচ্ছে সমুদ্রে শিশিরবিন্দু মাত্র, উপরন্তু তাও হয়েছে জনগণের রুচি-বিরুদ্ধ পদ্ধতিতে এবং জনগণের অনুপযোগী ভাবরসে। একে অবশ্য আমূলভাবে পরিবর্তন করতে হবে। চতুর্থতঃ, একবার সমাবেশই যথেষ্ট নয়। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য রাজনৈতিক সমাবেশকে অবশ্যই হতে হবে নিরবচ্ছিন্ন। জনগণের কাছে রাজনৈতিক কর্মসূচীকে আউড়ে যাওয়া আমাদের কাজ নয়, কারণ এ ধরনের বুলিতে কেউই কান দেবে না। যুদ্ধের জন্য রাজনৈতিক সমাবেশকে আমাদের অবশ্যই যুদ্ধের বিকাশের সংগে আর সৈন্যদের তথা জনসাধারণের জীবনের সংগে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে, আর এইভাবে তাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন করে তুলতে হবে। এ হচ্ছে একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যুদ্ধে আমাদের জয় মুখ্যতঃ এরই ওপরে নির্ভর করে।

যুদ্ধের উদ্দেশ্য

(৬৮) এখানে আমরা যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করছি না। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে 'জাপানী-সাম্রাজ্যবাদকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা ও সাম্যের এক নয়া চীন গড়ে তোলা' বলে ওপরে সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে। এখানে আমরা আলোচনা করছি মানবজাতির 'রক্তপাতময় রাজনীতি' হিসেবে যুদ্ধের, দুই সৈন্যবাহিনী কর্তৃক পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড হিসেবে যুদ্ধের মৌলিক উদ্দেশ্যটা কি। যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'নিজেকে রক্ষা করা ও শত্রুকে ধ্বংস করা' (শত্রুকে ধ্বংস করার অর্থ

শত্রুকে নিরস্ত্র করা, অর্থাৎ 'প্রতিরোধ-শক্তি থেকে শত্রুকে বঞ্চিত করা, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তার দেহটা ধ্বংস করা নয়)। প্রাচীন যুদ্ধে ব্যবহৃত হতো বর্শা আর ঢাল: বর্শা আক্রমণ করার জন্য, শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য; আর ঢাল প্রতিরক্ষার জন্য, নিজেকে রক্ষা করার জন্য। আজকের সব অস্ত্রও এই দুটিরই পরিবর্ধিত রূপ। বোমারু বিমান, মেশিনগান, দূরপাল্লার কামান এবং বিষাক্ত গ্যাস হচ্ছে বর্শার উন্নত রূপ; বিমান-আক্রমণবিরোধী আশ্রয়স্থল, লৌহ শিরস্ত্রাণ, কংক্রিট নির্মিত দুর্গাদি ও গ্যাসনিরোধক মুখোস হচ্ছে ঢালের উন্নত রূপ। ট্যাংক হচ্ছে বর্শা ও ঢালের সংযোজনে একটা নতুন হাতিয়ার। আক্রমণ হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করার প্রধান উপায়, কিন্তু প্রতিরক্ষাকেও বাদ দেওয়া যায় না। আক্রমণের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করা, কিন্তু সেই সংগে নিজেকে রক্ষা করাও, কারণ শত্রু ধ্বংস না হলে আপনি নিজেই ধ্বংস হবেন। প্রতিরক্ষার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা, কিন্তু একই সময়ে আবার প্রতিরক্ষা হচ্ছে আক্রমণের সাহায্যকারী উপায় অথবা আক্রমণ-পর্যায়ে প্রবেশের প্রস্তুতির উপায়। পশ্চাদপসরণ হচ্ছে প্রতিরক্ষার অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিরক্ষার ধারাবাহিক রূপ; কিন্তু পশ্চাদ্ধাবন হচ্ছে আক্রমণের ধারাবাহিক রূপ। এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে যুদ্ধের মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করা আর গৌণ লক্ষ্য নিজেকে রক্ষা করা, কারণ কেবলমাত্র বিপুল পরিমাণে শত্রুকে ধ্বংস করেই নিজেকে কার্যকরীভাবে রক্ষা করা যায়। অতএব, শত্রুকে ধ্বংস করার মুখ্য উপায় হিসেবে আক্রমণই হচ্ছে প্রধান, আর শত্রুকে ধ্বংস করার সাহায্যকারী উপায় হিসেবে এবং নিজেকে রক্ষা করার অন্যতম উপায় হিসেবে প্রতিরক্ষা হচ্ছে অপ্রধান। বাস্তব যুদ্ধে প্রতিরক্ষা যদিও অনেক সময়ে প্রধান, তৎসত্ত্বেও বাকি সময়ে আক্রমণই প্রধান, তবু যুদ্ধকে সামগ্রিকভাবে ধরলে আক্রমণটাই হচ্ছে প্রধান।

(৬৯) যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগে উৎসাহ দেওয়াটা কেমন করে ব্যাখ্যা করা যায়? 'নিজেকে রক্ষা করা' ও এর মধ্যে কি দ্বন্দ্ব নেই? না, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, তারা হচ্ছে পরস্পরের বিপরীত আবার পরিপূরকও। যুদ্ধ হচ্ছে রক্তপাতময় রাজনীতি, যুদ্ধের জন্য মূল্য দিতে হয়, কখনো কখনো অত্যন্ত বেশি মূল্য দিতে হয়। সামগ্রিক ও চিরকালীন সংরক্ষণের জন্য দিতে হয় আংশিক ও সাময়িক আত্মত্যাগ (অসংরক্ষণ)। ঠিক এই কারণে আমরা বলি যে, মূলতঃ শত্রুবিনাশের একটি উপায় হিসেবে আক্রমণের মধ্যে একই সময়ে

একটা আত্মসংরক্ষণের ভূমিকাও আছে। এই কারণেই আবার প্রতিরক্ষার সংগে সংগে আক্রমণও করতে হয় এবং শুধু নিছক প্রতিরক্ষা করা চলবে না।

(৭০) নিজেকে রক্ষা করা ও শত্রুকে ধ্বংস করা—যুদ্ধের এই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যুদ্ধের সারমর্ম এবং যাবতীয় যুদ্ধ-ক্রিয়ার ভিত্তি এই সারমর্মটি প্রযুক্তিগত কার্যকলাপ থেকে শুরু করে রণনীতিগত কার্যকলাপ পর্যন্ত যাবতীয় যুদ্ধ-ক্রিয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধের মূল নীতি, আর কোন প্রযুক্তিগত, রণকৌশলগত, যুদ্ধাভিযানগত ও রণনীতিগত ধারণা বা নীতিসূত্র কিছুতেই তার থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। গুলি ছোঁড়ার নীতিতে 'আড়ালে থাকা এবং অগ্নিবর্ষণের শক্তিকে পুরোপুরি ব্যবহার করার' অর্থ কি? প্রথমটির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা, আর দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করা। ভূ-প্রকৃতি ও স্থানিক বস্তুগুলির ব্যবহার করা, উৎক্ষেপে অগ্রসরণ, এবং বিক্ষিপ্ত সেনাবিন্যাসে ছড়িয়ে পড়ার মতো নানারকম কৌশলের উদ্ভব ঘটায় প্রথমটি। দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করে অন্যান্য বিভিন্ন কৌশলের, যেমন গুলিবর্ষণের ক্ষেত্রকে মুক্ত ও পরিষ্কার করা এবং অগ্নিবর্ষণের জাল সংগঠন করা। রণকৌশলগত সামরিক কার্যকলাপে ব্যবহৃত হানাদার বাহিনী, সংবরণী বাহিনী ও অতিরিক্ত মজুতবাহিনীর মধ্যে, প্রথমটি হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য, দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করার জন্য, আর তৃতীয়টি হচ্ছে পরিস্থিতি অনুযায়ী উল্লিখিত দুই উদ্দেশ্যের একটির জন্য—এই বাহিনীটি হয় হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করবে অথবা পশ্চাদ্ধাবনকারী বাহিনী হিসেবে কাজ করবে, অর্থাৎ শত্রুকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে, আর না হয় নিজেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে, অর্থাৎ সংবরণী বাহিনীটিকে সাহায্য করবে অথবা একটি আচ্ছাদক বাহিনী হিসেবে কাজ করবে। এইভাবে কোন প্রযুক্তিগত, রণকৌশলগত, যুদ্ধাভিযানগত ও রণনীতিগত নীতি অথবা কার্যকলাপ কিছুতেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে না, আর এই উদ্দেশ্যটি যুদ্ধের সবটাকে পরিব্যাপ্ত করে রাখে, যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে।

(৭১) চীন-জাপান দুদেশের মধ্যেকার বিভিন্ন ধরনের পরস্পরবিরোধী মৌলিক উপাদান বিবেচনা না করে যুদ্ধ পরিচালনা করা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিভিন্ন স্তরের পরিচালকদের অবশ্যই চলবে না, আবার এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করাও চলবে না। দুদেশের মধ্যেকার এইসব পরস্পরবিরোধী মৌলিক উপাদানগুলি যুদ্ধ-ক্রিয়ার

আত্মপ্রকাশ করে এবং এগুলি রূপান্তরিত হয় নিজেকে রক্ষা করার ও শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য পারস্পরিক সংগ্রামে। আমাদের যুদ্ধে আমরা অবশ্যই প্রতিটি লড়াইয়ে ছোট বা বড় জয়লাভ করার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করি এবং প্রতিটি লড়াইয়ে শত্রুর একটা অংশকে নিরস্ত্র করার এবং তার সৈন্য, ঘোড়া ও সাজ-সরঞ্জামের একটা ভাগ বিনষ্ট করার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করি। আংশিকভাবে শত্রুকে ধ্বংস করার এইসব ফলকে সঞ্চয় করতে করতে আমরা এগুলিকে বিরাট রণনীতিগত বিজয়ে পরিণত করতে পারি এবং এইভাবেই আমরা চুড়ান্তরূপে আমাদের দেশ থেকে শত্রুকে তাড়িয়ে দেওয়া, মাতৃভূমিকে রক্ষা করা ও এক নয়া চীন গড়ে তোলার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উপনীত হব।

প্রতিরক্ষার মধ্যে আক্রমণ, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই, অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই

(৭২) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিশেষ রণনীতিগত কর্মপন্থাটিকে এখন পর্যালোচনা করে দেখা যাক। আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে, জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের রণনীতিগত কর্মপন্থা হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের রণনীতি, এবং প্রকৃতপক্ষে এটাই ঠিক কথা। কিন্তু এটা সাধারণ কর্মপন্থা, কোন বিশেষ কর্মপন্থা নয়। বাস্তবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কিভাবে চালানো উচিত? এই প্রশ্নটির আলোচনা এখন আমরা করব। আমাদের উত্তর হচ্ছে নিম্নরূপ: যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণের ও অধিকৃত এলাকা-গুলিকে সংরক্ষিত করার পর্যায়ে আমাদের উচিত রণনীতিগত প্রতিরক্ষার মধ্যে যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত আক্রমণ, রণনীতিগত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত দ্রুত নিষ্পত্তির সামরিক কার্যকলাপ, রণনীতিগত অন্তর্লাইনের মধ্যে যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত বহির্লাইনের সামরিক কার্য-কলাপ চালানো। তৃতীয় পর্যায়ে আমাদের উচিত রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ চালানো।

(৭৩) জাপান হচ্ছে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ, আর আমরা হচ্ছি দুর্বল আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ, তাই জাপান রণনীতি-গত আক্রমণের নীতি গ্রহণ করেছে আর আমরা রত হয়েছি রণনীতিগত প্রতিরক্ষায়। দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধের রণনীতিকে অবলম্বন করার চেষ্টা করছে

জাপান ; আমাদের উচিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের রণনীতিকে যথোচিতভাবে অবলম্বন করা। জল ও স্থল উভয় দিক থেকে চীনকে ঘিরে ধরার ও অবরুদ্ধ করার জন্য জাপান বেশ উঁচুমানের যুদ্ধক্ষমতাসম্পন্ন কয়েক ডজন ডিভিসন স্থলবাহিনী (বর্তমানে ডিভিসনের সংখ্যা ত্রিশ) ও নৌবাহিনীর একটা অংশকে ব্যবহার করছে আর চীনের ওপর বোমাবর্ষণ করার জন্য ব্যবহার করছে তার বিমান-বাহিনীকে। বর্তমানে জাপানের স্থলবাহিনী ইতিমধ্যে পাওতৌ থেকে শুরু করে হাংচৌ পর্যন্ত বিস্তৃত একটা দীর্ঘ ফ্রন্টলাইন স্থাপন করেছে, আর ফুকিয়ান ও কুয়াংতুংয়ে পৌঁছে গেছে তার নৌবাহিনী, এমনি করেই সে বিরাট আকারে বহির্লাইনের সামরিক কার্যকলাপ গড়ে তুলেছে। পক্ষান্তরে, আমরা রয়েছি অন্তর্লাইনে সামরিক কার্যকলাপ চালানোর অবস্থায়। এ সবই সৃষ্ট হয়েছে এমন একটা বৈশিষ্ট্যের ফলে, অর্থাৎ শত্রু শক্তিশালী আর আমরা দুর্বল—এই বৈশিষ্ট্যের ফলে। এটা হচ্ছে পরিস্থিতির একটা দিক।

(৭৪) কিন্তু অন্য একটা দিকে অবস্থাটা ঠিক বিপরীত। জাপান শক্তিশালী হলেও তার যথেষ্ট সৈন্য নেই। চীন দুর্বল হলেও তার আছে একটা সুবিশাল ভূখণ্ড, বিরাট জনসংখ্যা ও প্রচুর সৈন্য। এর থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি ঘটে। প্রথমতঃ, একটা বিরাট দেশের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীকে নিয়োগ করে শত্রু দখল করে নিতে পারে কেবলমাত্র কয়েকটি বড় বড় শহর, প্রধান প্রধান যোগাযোগ পথ ও সমতল ভূমির কিছুটা অংশ। তাই তার দখলাধীন ভূখণ্ডে এমন ব্যাপক এলাকাগুলি থাকে, যেগুলিকে শত্রু অধিকার করতে অক্ষম। আর এটাই আমাদেরকে ব্যাপক এলাকায় গেরিলাযুদ্ধ চালাবার সুযোগ যোগায়। গোটা চীন দেশে, শত্রু যদি ক্যান্টন-উহান-লানচৌয়ের সংযোগকারী লাইনকে এবং তার নিকটবর্তী এলাকাগুলিকেও দখল করে নিতে পারে, তাহলেও তার বাইরের অঞ্চলগুলি দখল করা শত্রুর পক্ষে কঠিন হবে। এটাই চীনকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাবার ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার জন্য একটা মূল পৃষ্ঠদেশ ও প্রধান ঘাঁটি এলাকা যোগায়। দ্বিতীয়তঃ, বিরাটাকার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে তার ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে লিপ্ত করে দিয়ে শত্রু আমাদের বিরাট বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন পথ ধরে শত্রু আমাদের ওপরে আক্রমণ চালায়, রণনীতিগতভাবে শত্রু বহির্লাইনে আর আমরা অন্তর্লাইনে, রণনীতিগতভাবে শত্রু আক্রমণে রত আর আমরা প্রতিরক্ষায় রত। এসব কিছু থেকে মনে হয়, আমরা যেন অত্যন্ত অসুবিধাজনক

অবস্থায় আছি। তবুও আমাদের সুবিশাল ভূখণ্ড ও প্রচুর সৈন্য—এই দুটি সুবিধার ব্যবহার আমরা করতে পারি, জায়গাগুলিকে একগুঁয়েভাবে রক্ষা করার অবস্থানগত যুদ্ধের বদলে নমনীয় চলমান যুদ্ধ চালাতে পারি, শত্রুর এক ডিভিশনের বিরুদ্ধে আমাদের কয়েক ডিভিশন, শত্রুর দশ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে আমাদের কয়েক অযুত সৈন্য, শত্রুর একটি কলামের বিরুদ্ধে আমাদের কয়েকটি কলাম নিয়োগ করে রণক্ষেত্রের বহির্লাইন থেকে আকস্মিকভাবে শত্রুর একটি কলামকে ঘিরে ধরে আক্রমণ করতে পারি। সুতরাং, রণনীতিগতভাবে বহির্লাইনে অবস্থিত ও আক্রমণে লিপ্ত শত্রু যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগতভাবে অন্তর্লাইনে সামরিক কার্যকলাপ চালাতে ও প্রতিরক্ষায় লিপ্ত হতে বাধ্য হবে। আর রণনীতিগতভাবে অন্তর্লাইনে অবস্থিত ও প্রতিরক্ষায় রত আমাদের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগতভাবে বহির্লাইনে সামরিক কার্যকলাপ চালাবে ও আক্রমণে লিপ্ত হবে। শত্রুর একটি কলামের অথবা শত্রুর অন্য যে-কোন কলামের মোকাবিলা করার এটাই হচ্ছে প্রণালী। উপরে বর্ণিত উভয় পরিণতিই উদ্ভূত হয় এই বৈশিষ্ট্য থেকে যে, শত্রু ক্ষুদ্র আর আমরা বিরাট। আবার, ক্ষুদ্র হলেও শত্রুবাহিনী শক্তিশালী (অস্ত্রশস্ত্রে ও সৈন্যপ্রশিক্ষণের মানে) আর আমাদের সৈন্যবাহিনী বিরাট হলেও দুর্বল (অস্ত্রশস্ত্রে ও সৈন্যপ্রশিক্ষণের মানে, কিন্তু সংগ্রামী মনোবলের অর্থে নয়), আর তাই যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত সামরিক কার্যকলাপে আমাদের শুধুই যে ক্ষুদ্র বাহিনীর বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা এবং বহির্লাইন থেকে অন্তর্লাইনে অবস্থিত শত্রুকে আঘাত করা উচিত তাই নয়, উপরন্তু আমাদের দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ের নীতিও অবলম্বন করা উচিত। দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই কার্যকরী করার জন্য, সাধারণতঃ স্থায়ীভাবে অবস্থিত শত্রুকে আক্রমণ করা আমাদের উচিত নয়, বরং চলমান অবস্থায় রত শত্রুকে আক্রমণ করা উচিত। যে পথটি ধরে নিশ্চয়ই শত্রু চলবে, সেই পথ বরাবর আগে থেকেই বিরাট সৈন্যবাহিনীকে গোপনে সমাবেশ করে রাখা আমাদের উচিত, যখন শত্রু চলতে থাকে, তখন কি ঘটছে সেটা সে বুঝবার আগেই আমাদের উচিত আকস্মিকভাবে এগিয়ে গিয়ে তাকে ঘিরে ধরা ও আক্রমণ করা, আর এইভাবে তাড়াতাড়ি লড়াইটি শেষ করা। ভাল করে আমরা যদি লড়াই করি তাহলে আমরা হয়তো শত্রুর গোটা বাহিনীকে অথবা তার বৃহত্তর কিংবা কিছু অংশকে ধ্বংস করতে পারি। এমনকি ভাল করে

লড়াই না করলেও আমরা গুরুতরভাবে শত্রুসৈন্যদের হতাহত করতে পারি। আমাদের একটি লড়াইয়ের এবং অন্যান্য সমস্ত লড়াইয়ের সম্পর্কেই এটা খাটে। বেশি বেশি জয়ের কথা নাই-বা বললাম, পিংসিংকুয়ান অথবা তাইএরচুয়াংয়ের জয়ের মতো অপেক্ষাকৃত বড় ধরনের জয় আমরা যদি মাসে একটাও অর্জন করতে পারি, তাহলে তা শত্রুবাহিনীর মনোবল প্রচণ্ডভাবে ভেঙে দেবে, আমাদের সৈন্যবাহিনীর সংগ্রামী মনোবলকে উদ্দীপ্ত করে তুলবে এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন ডেকে আনবে। এইভাবে আমাদের রণনীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধটি রণক্ষেত্রের সামরিক কার্যকলাপের দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়। আর বহু যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে পরাজিত হবার পরে শত্রুর রণনীতিগত দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধটিই বদলে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে বাধ্য।

(৭৫) এক কথায়, ওপরে বর্ণিত যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত সামরিক কার্যকলাপের নীতিটি হচ্ছে 'বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই'। এটা হচ্ছে আমাদের রণনীতিগত নীতির—'অন্তর্লাইনে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধের' বিপরীত, তবুও এই রণনীতিগত নীতিকে কাজে পরিণত করার জন্য এটা হচ্ছে অপরিহার্য নীতি। আমরা যদি যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ব্যাপারেও 'অন্তর্লাইনে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধের নীতিকে ব্যবহার করতাম, যেমনটি করা হয়েছিল জাপ বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রথমদিকে, তাহলে সেটা শত্রু ক্ষুদ্র ও আমরা বিরাট এবং শত্রু শক্তিশালী ও আমরা দুর্বল—এই দুটি অবস্থার একেবারেই অনুপযোগী হতো, এইভাবে আমরা কোনদিনই আমাদের রণনীতিগত উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারতাম না এবং সামগ্রিকভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সমর্থ হতাম না, বরং আমরা শত্রুর দ্বারা পরাজিত হতাম। এই কারণেই আমরা সর্বদাই গোটা দেশে কতকগুলি বিরাট বিরাট স্থলবাহিনী সংগঠিত করে নেওয়ার পক্ষে অভিমত পেশ করে আসছি, এইসব স্থলবাহিনী-গুলির প্রত্যেকটির সৈন্যসংখ্যা শত্রুর সংশ্লিষ্ট এক একটি স্থলবাহিনীর থেকে দুই, তিন বা চার গুণ হওয়া চাই, আর উপরে বর্ণিত নীতি অনুসারে তারা শত্রুর সংগে ব্যাপক রণক্ষেত্রে লড়াই করবে। 'বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই'-এর নীতিকে শুধু নিয়মিত যুদ্ধে নয়, উপরন্তু গেরিলাযুদ্ধেও প্রয়োগ করা যায় এবং অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। এটা যে শুধু যুদ্ধের কোন একটা পর্যায়েই প্রয়োগ করা যায় তা কিন্তু নয়, উপরন্তু যুদ্ধের গোটা গতিধারাতেই এটা প্রযোজ্য। রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে প্রযুক্তিগত-

ভাবে আমরা বেশি ভালভাবে সজ্জিত হব এবং শত্রু প্রবল আর আমরা দুর্বল এই অবস্থাও একেবারেই থাকবে না, তখনো আমরা যদি বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়োগ করে বহির্লাইন থেকে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই চালাই, তাহলে আরও বেশি কার্যকরভাবে বিরাট পরিমাণে আমরা বন্দী করতে ও শত্রুর মালপত্র দখল করে নিতে সক্ষম হব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শত্রুর একটি যন্ত্রীকৃত ডিভিশনের বিরুদ্ধে আমরা যদি দুই, তিন বা চারটি যন্ত্রীকৃত ডিভিসন নিয়োগ করি, তাহলে সেই শত্রু-ডিভিসনটিকে ধ্বংস করার ব্যাপারে আমরা আরও বেশি নিশ্চিত হতে পারব। এটা তো সাধারণ বুদ্ধির কথা যে, কয়েকজন পালোয়ান একজন পালোয়ানকে সহজেই পরাজিত করে দিতে পারে।

(৭৬) রণক্ষেত্রে লড়বার সময়ে আমরা যদি দৃঢ়ভাবে 'বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের' নীতি অবলম্বন করি, তাহলে আমরা যে শুধু রণক্ষেত্রে শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার প্রবলতা ও দুর্বলতা এবং উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার পরিস্থিতিই বদলে দেব তা নয়, উপরন্তু ক্রমে ক্রমে গোটা পরিস্থিতিকেও বদলে দেব। রণক্ষেত্রে আমরা লিপ্ত হব আক্রমণের আর শত্রু লিপ্ত হবে প্রতিরক্ষায়; বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আমরা বহির্লাইনে লড়াই করব, আর অন্তর্লাইনে অবস্থিত থাকবে আমাদের শত্রু, যার সৈন্যসংখ্যা আমাদের চেয়ে কম; আমরা দ্রুত নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা করব, আর যত চেষ্টাই করুক না কেন, সহায়ক অতিরিক্ত বাহিনীর প্রত্যাশায় লড়াইটিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে শত্রু সমর্থ হবে না; এইসব কারণে শত্রুর অবস্থাটি প্রবলতা থেকে দুর্বলতায়, উৎকৃষ্টতা থেকে নিকৃষ্টতায় বদলে যাবে; আর আমাদের সৈন্য-বাহিনীর অবস্থাটি ঠিক এর বিপরীত—দুর্বলতা প্রবলতায় আর নিকৃষ্টতা উৎকৃষ্টতায় রূপান্তরিত হবে। এই ধরনের অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করার পরে আমাদের ও শত্রুর মধ্যেকার গোটা পরিস্থিতিটা বদলে যাবে। অর্থাৎ, রণক্ষেত্রের সামরিক কার্যকলাপে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের দ্বারা অর্জিত অনেকগুলি বিজয় পুঞ্জীভূত হওয়ার ফলে আমরা ক্রমে ক্রমে নিজেদের শক্তিশালী আর শত্রুকে দুর্বল করে তুলব, আর এর প্রভাবে অনিবার্যভাবেই প্রবলতা ও দুর্বলতার এবং উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার গোটা পরিস্থিতিটির পরিবর্তন ঘটবে। তখন আমাদের পক্ষের অপরাপর উপাদানের সংগে মিলিত হয়ে এবং শত্রুপক্ষের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলির ও অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সংগে মিলে এই পরিবর্তনগুলি শত্রু ও আমাদের

মধ্যেকার গোটা পরিস্থিতিটিকে বদলে প্রথমে তাকে সমতার পরিস্থিতিতে এবং পরে আমাদের উৎকৃষ্টতা ও শত্রুর নিকৃষ্টতার পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত করবে। পাল্টা আক্রমণ শুরু করে শত্রুকে আমাদের দেশ থেকে দূর করে দেবার সেইটাই হবে আমাদের সময়।

(১৭) যুদ্ধ হচ্ছে শক্তির প্রতিযোগিতা, কিন্তু যুদ্ধের গতিপথে শক্তির পূর্ব অবস্থাটি বদলে যায়। এ ক্ষেত্রে নিশ্চায়ক উপাদান হচ্ছে আত্মগত প্রচেষ্টা —অধিকতর বিজয় অর্জন করা ও কম ভুল করা। বস্তুগত উপাদানগুলো এ ধরনের পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা যোগায়, কিন্তু এই সম্ভাব্যতাকে বাস্তবতায় রূপান্তরিত করার জন্য সঠিক নীতি ও আত্মগত প্রচেষ্টা দরকার। তখন আত্মগত উপাদানই নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

উদ্যোগ, নমনীয়তা ও পরিকল্পনা

(১৮) উপরে বর্ণিত যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে 'আক্রমণ', 'বহির্লাইন' বলতে আক্রমণের পরিধি, আর 'দ্রুত নিষ্পত্তি' বলতে একটি আক্রমণ কতক্ষণ ধরে চলবে তা বোঝায়। তাই তাকে 'বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই' বলে অভিহিত করা হয়। এটা হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাবার সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি, অর্থাৎ চলমান যুদ্ধের নীতি। কিন্তু উদ্যোগ, নমনীয়তা ও পরিকল্পনা ছাড়া এই নীতিকে কার্যকরী করা সম্ভব হয় না। এখন এই তিনটি বিষয়ের পর্যালোচনা করা যাক।

(১৯) আমরা ইতিপূর্বে মানুষের সচেতন কর্মতৎপরতার কথা আলোচনা করেছি। তাহলে আবার কেন উদ্যোগের কথা বলছি? সচেতন কর্মতৎপরতা বলতে আমরা সচেতন কার্যকলাপ ও প্রচেষ্টাকে বোঝাই—এটা এমন একটা বৈশিষ্ট্য, যা অন্য সমস্ত কিছু থেকে মানুষকে পৃথক করে দেয়। মানুষের এই বৈশিষ্ট্যটি যুদ্ধের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠভাবে প্রকাশলাভ করে। এসব কথাই আগে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উদ্যোগ বলতে কোন একটা সৈন্য-বাহিনীর কার্যকলাপের স্বাধীনতাকে বোঝানো হয়েছে, স্বাধীনতাকে হারিয়ে বাধ্য হয়ে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়া থেকে এটা পৃথক। কার্যকলাপের স্বাধীনতাই হচ্ছে সৈন্যবাহিনীর প্রাণ। সেটি খোয়া গেলে সৈন্যবাহিনী পরাজয় বা বিনাশের কাছাকাছি এসে পড়ে। কোন সৈনিকের নিরস্ত্র হওয়াটা হচ্ছে এই সৈনিকের

কার্যকরণের স্বাধীনতা হারিয়ে বাধ্য হয়ে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ার জন্য। কোন সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। এই কারণে যুদ্ধে উভয় পক্ষই উদ্যোগলাভ করার ও নিষ্ক্রিয়তাকে পরিহার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এ কথা বলা যায় যে, আমাদের দাখিলকৃত বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের নীতি ও তাকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তা ও পরিকল্পনা—সবই হচ্ছে উদ্যোগ-ক্ষমতালাভের জন্য প্রচেষ্টা, যাতে করে শত্রুকে নিষ্ক্রিয় অবস্থার মধ্যে ফেলে নিজেদের রক্ষা করার ও শত্রুকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যটি অর্জন করা যায়। কিন্তু উদ্যোগ অথবা নিষ্ক্রিয়তা যুদ্ধ চালানোর শক্তির উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অতএব সেটা আবার যুদ্ধের আত্মগত পরিচালনার সঠিকতা অথবা বেঠিকতা থেকেও বিচ্ছিন্ন নয়। তা ছাড়া শত্রুর ভুল ধারণা ও তার অসতর্কতার সুযোগ গ্রহণ করে উদ্যোগলাভ করার এবং শত্রুকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফেলার প্রশ্নও রয়েছে। এইসব নীচে বিশ্লেষণ করা হবে।

(৮০) উদ্যোগ হচ্ছে যুদ্ধ চালানোর শক্তির উৎকৃষ্টতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য; আবার নিষ্ক্রিয়তা হচ্ছে যুদ্ধ চালানোর শক্তির নিকৃষ্টতার সংগে অবিচ্ছেদ্য। এই ধরনের উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতা হচ্ছে উদ্যোগ বা নিষ্ক্রিয়তার বাস্তব ভিত্তি। এটা স্বাভাবিক যে, রণনীতিগত আক্রমণের ভেতর দিয়েই রণনীতিগত উদ্যোগকে অপেক্ষাকৃত ভাল করে আয়ত্ত করতে ও বিকশিত করতে পারা যায়, কিন্তু সর্বদা ও সর্বত্রই উদ্যোগ বজায় রাখা—অর্থাৎ নিরঙ্কুশ উদ্যোগক্ষমতা বজায় রাখা শুধু তখনই সম্ভব, যখন নিরঙ্কুশ নিকৃষ্টতার বিরুদ্ধে নিরঙ্কুশ উৎকৃষ্টতা প্রতি-যোগিতা করে। একজন বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান পুরুষ যখন গুরুতরভাবে রোগগ্রস্ত কোন লোকের সংগে কুস্তি লড়ে, তখন নিরঙ্কুশ উদ্যোগক্ষমতা সেই পুরুষের হাতে। জাপান যদি অনেক অনতিক্রম্য দ্বন্দ্বে জর্জরিত না হতো, উদাহরণস্বরূপ, যদি সে এই মুহূর্তে কয়েক মিলিয়ন বা এক কোটি সৈন্যের একটা বিরাট বাহিনী নিয়োগ করতে পারত, তার আর্থিক সম্পত্তি এখন যা তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হতো, যদি তার নিজ দেশের জনগণ বা বিদেশ থেকে কোন বিরোধিতা সে না পেত, আর চীনা জনগণের প্রাণপণ প্রতিরোধ উদ্রেককারী বর্বর নীতি যদি সে অনুসরণ না করত, তাহলে সে নিরঙ্কুশ উৎকৃষ্টতা বজায় রাখতে পারত এবং সর্বদা ও সর্বত্রই নিরঙ্কুশ উদ্যোগক্ষমতা পেত। কিন্তু ইতিহাসে এই ধরনের নিরঙ্কুশ উৎকৃষ্টতা যুদ্ধের বা যুদ্ধাভিযানের শেষদিকে দেখতে পাওয়া যায়, যুদ্ধে

বা যুদ্ধাভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে কমই দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে, আঁতাতভুক্ত দেশগুলি নিরঙ্কুশভাবে নিকৃষ্ট ছিল। ফলে জার্মানি গেল হেরে আর বিজয়ী হল আঁতাতভুক্ত দেশগুলি। এটা হচ্ছে যুদ্ধের শেষদিকে নিরঙ্কুশ উৎকৃষ্টতা ও নিরঙ্কুশ নিকৃষ্টতার দৃষ্টান্ত। আবার, তাইএরচুয়াং-এ চীনাদের বিজয়লাভের প্রাক্কালে, কষ্টকর লড়াইয়ের পরে তখন সেখানকার বিচ্ছিন্ন জাপানী বাহিনী নিরঙ্কুশ নিকৃষ্টতায় পর্যবসিত হয়েছিল। আর পক্ষান্তরে আমাদের সৈন্যবাহিনী নিরঙ্কুশ উৎকৃষ্টতা অর্জন করেছিল, ফলে শত্রু পরাভূত হয়েছিল আর আমরা বিজয়লাভ করেছিলাম। এটা হচ্ছে যুদ্ধাভিযানের শেষের দিকে নিরঙ্কুশ উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার একটা উদাহরণ। কোন কোন যুদ্ধ বা যুদ্ধাভিযান আবার আপেক্ষিক উৎকৃষ্টতার বা ভারসাম্যের পরিস্থিতিতেও শেষ হতে পারে। তখন যুদ্ধে একটা আপোষ হয় আর যুদ্ধাভিযানে একটা অচলাবস্থা দেখা দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরঙ্কুশ উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে দেয়। এ সবই খাটে যুদ্ধ বা যুদ্ধাভিযানের শেষের দিকে, শুরুতে নয়। চীন-জাপান যুদ্ধের শেষ পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলতে পারা যায় যে, জাপান নিরঙ্কুশভাবে নিকৃষ্ট হয়ে পরাভূত হবে আর নিরঙ্কুশভাবে উৎকৃষ্ট হয়ে চীন জয়লাভ করবে; কিন্তু বর্তমানে কোন পক্ষেরই উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতা চরম নয়, বরং আপেক্ষিক। জাপানের রয়েছে প্রবল সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তি ও রাজনৈতিক সাংগঠনিক শক্তি—তার এই সুবিধাজনক উপাদান থাকায় সে আমাদের দুর্বল সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তির চাইতে উৎকৃষ্ট অবস্থায় আছে। এর ফলে জাপানের উদ্যোগক্ষমতার বুনিয়াদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরিমাণগতভাবে তার সামরিক ও অন্যান্য শক্তি বিরাট নয়, এবং তার অন্যান্য অনেক অসুবিধা আছে বলে তার উৎকৃষ্টতা তার নিজস্ব দ্বন্দ্বের দ্বারা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। চীনের ওপরে আক্রমণ করতে গিয়ে তাকে আমাদের সুবিশাল দেশ, বিরাট জনসংখ্যা, বিপুলসংখ্যক সৈন্য এবং দৃঢ় জাতীয় প্রতিরোধের মোকাবিলা করতে হয়েছে, ফলে তার উৎকৃষ্টতাটি আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই জাপানের সাধারণ অবস্থাটি পরিণত হয়েছে আপেক্ষিক উৎকৃষ্টতায়, আর উদ্যোগক্ষমতা বিকশিত করার ও বজায় রাখার সামর্থ্যটিও সীমিত হয়ে অনুরূপভাবেই আপেক্ষিক হয়ে পড়েছে। নিজের নিকৃষ্ট শক্তির কারণে রণনীতিগতভাবে চীন যদিও নির্দিষ্ট মাত্রার নিষ্ক্রিয় অবস্থায়

অবস্থিত, তবুও ভূখণ্ড, জনসংখ্যা ও সৈন্যসংখ্যায় এবং শত্রুর প্রতি তার জনগণ ও সৈন্যবাহিনীর ঘৃণায় ও সংগ্রামী মনোবলে সে হচ্ছে উৎকৃষ্ট। অন্যান্য সুবিধাজনক উপাদানের সংগে মিলে এই উৎকৃষ্টতা তার সামরিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য শক্তির নিকৃষ্টতার মাত্রাকে কমিয়ে দেয় আর রণনীতিগত নিকৃষ্টতাকে আপেক্ষিকে পরিণত করে। এর ফলে চীনের নিষ্ক্রিয়তার মাত্রাটিও কমে যায়, এবং এই নিষ্ক্রিয় অবস্থাটা শুধুই রণনীতিগত ক্ষেত্রের আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয়তা। যাই হোক, যে-কোন নিষ্ক্রিয়তাই ক্ষতিকর এবং তাকে দূর করে দেবার জন্য যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সামরিক ক্ষেত্রের পদ্ধতি হচ্ছে দৃঢভাবে বহি-র্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই চালানো এবং শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে গেরিলাযুদ্ধ শুরু করা, আর যুদ্ধাভিযানগত চলমান লড়াই ও গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে বহু ক্ষেত্রে আংশিকভাবে শত্রুকে দাবিয়ে রাখার উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগ-ক্ষমতা অর্জন করা। এরূপ বহু যুদ্ধাভিযানগত আংশিক উৎকৃষ্টতা ও আংশিক উদ্যোগক্ষমতার ভেতর দিয়ে আমরা ক্রমে ক্রমে রণনীতিগত উৎকৃষ্টতা ও রণনীতিগত উদ্যোগক্ষমতা সৃষ্টি করে নিজেদেরকে রণনীতিগত নিকৃষ্টতা ও নিষ্ক্রিয়তার অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারি। এটাই হচ্ছে উদ্যোগ ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেকার, উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক

(৮২) এর থেকে আমরা উদ্যোগ বা নিষ্ক্রিয়তা ও যুদ্ধের আত্মগত পরি-চালনার মধ্যেকার সম্পর্কটাও বুঝতে পারি। আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আমাদের আপেক্ষিক রণনীতিগত নিকৃষ্টতা ও নিষ্ক্রিয়তার এই অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব, তার পদ্ধতি হচ্ছে আমাদের আপন প্রয়াসে বহু আংশিক উৎকৃষ্টতা ও আংশিক উদ্যোগ সৃষ্টি করা, শত্রুকে বহু আংশিক উৎকৃষ্টতা ও আংশিক উদ্যোগের অবস্থা থেকে বঞ্চিত করে তাকে নিকৃষ্টতার ও নিষ্ক্রিয়তার অতলে নিক্ষেপ করা। এ আংশিক সাফল্যগুলি একত্রিত করলেই সেগুলো হবে আমাদের রণনীতিগত উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগ এবং শত্রুর রণনীতিগত নিকৃষ্টতা ও নিষ্ক্রিয়তা। এ ধরনের পরিবর্তনটি নির্ভর করে সঠিক আত্মগত পরিচালনার ওপরে। কেন? কারণ আমরা যখন উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগ চাই, শত্রুও তাই চায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে যুদ্ধ হচ্ছে সামরিক শক্তি ও আর্থিক শক্তি প্রভৃতি বস্তুগত অবস্থার ভিত্তিতে উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগলাভের সংগ্রামে উভয় সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ডারদের মধ্যেকার আত্মগত সামর্থ্যের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়েই উদ্ভূত হয় জয় ও

পরাজয়, বাস্তব বস্তুগত অবস্থার বৈষম্যকে বাদ দিলে বিজয়ের কারণ অপরিহার্য: তা্বেই হবে সঠিক আত্মগত পরিচালনা, আর পরাজয়ের কারণ হবে ভুল আত্মগত পরিচালনা। আমরা স্বীকার করি যে, অন্য যে-কোন সামাজিক ব্যাপারের চেয়ে যুদ্ধের ব্যাপারটিকে উপলব্ধি করা বেশি কঠিন এবং তার নিশ্চয়তা আরও কম। অন্য কথায় এটা হচ্ছে অধিকতর মাত্রায় একটা 'সম্ভাব্যতার' বিষয়। তবুও যুদ্ধ কোনমতেই অতিপ্রাকৃত নয়, বরং তা হচ্ছে অবশ্যম্ভাবিতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি পার্থিব প্রক্রিয়া। সেই কারণে সুন উ জির নীতি—'শত্রুকে জানুন, নিজেকে জানুন, তাহলে একশবার যুদ্ধ করলেও পরাজিত হবেন না'[২২]—এখনো বৈজ্ঞানিক সত্য হয়ে রয়েছে। শত্রু সম্পর্কে ও আমাদের নিজেদের সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে আসে ভুল, অধিকন্তু যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য বহু ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের পূর্ণ জ্ঞানলাভকে অসম্ভব করে তোলে, তাই দেখা দেয় যুদ্ধের পরিস্থিতি ও কাযকলাপ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আর সেকারণেই ঘটে ভুল ও পরাজয়। কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতি ও কাযকলাপ যাই হোক না কেন, তাদের সাধারণ অবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি জানতে পারা যায়। প্রথমে সবরকমের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং পরে কম্যাণ্ডারের বুদ্ধিমান অনুমিতি ও বিচার-বিবেচনার ভেতর দিয়ে ভুল কমানো ও সাধারণভাবে সঠিক পরিচালনা সম্ভব। 'সাধারণভাবে সঠিক পরিচালনাকে' অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে আমরা বেশি লড়াই জিততে পারি, আর পারি আমাদের নিকৃষ্টতাকে উৎকৃষ্টতায় এবং নিষ্ক্রিয়তাকে উদ্যোগে রূপান্তরিত করে নিতে। এটাই হচ্ছে যুদ্ধের নির্ভুল বা ভুল আত্মগত পরিচালনার সংগে উদ্যোগ বা নিষ্ক্রিয়তার সম্পর্ক।

(৮২) যখন আমরা ইতিহাসে বড় বড় পরাক্রান্ত সৈন্যবাহিনীগুলির স্বীকৃত পরাজয় ও ছোট ছোট দুর্বল সৈন্যবাহিনীগুলির অর্জিত বিজয়গুলির নজিরের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন এই বিচারতত্ত্বটি আরও যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় যে, ভুল আত্মগত পরিচালনা উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগকে নিকৃষ্টতায় ও নিষ্ক্রিয়তায় বদলে দিতে পারে, আর নির্ভুল আত্মগত পরিচালনা এগুলির বিপরীত পরিবর্তন ঘটাতে পারে। চীনের ও বিদেশের ইতিহাসে এ ধরনের বহু নজির আছে। চীনের উদাহরণ হচ্ছে চিন ও চু-এর মধ্যে ছেংপু-এর লড়াই[২৩], চু ও হান-এর মধ্যে ছেংকাওয়ের লড়াই[২৪], হান সিন কর্তৃক চাও বাহিনীকে পরাস্ত করার লড়াই[২৫], সিন ও হানের মধ্যে খুনইয়াংয়ের লড়াই[২৬], ইউয়ান শাও ও ছাও

ছাগুয়ের মধ্যে কুয়ানতুয়ের লড়াই [২৭], উ ও ওয়েই-এর মধ্যে ছিপি'র লড়াই [২৮], উ এবং উ'র মধ্যে ইলিংয়ের লড়াই [২৯], ছিন ও তোংচিনের মধ্যে ফেইশুইয়ের লড়াই [৩০] প্রভৃতি। বিদেশে এই ধরনের উদাহরণ দেখা যায় নেপোলিয়নের দ্বারা চালিত অধিকাংশ যুদ্ধাভিযানগুলিতে [৩১] এবং অক্টোবর বিপ্লবের পরে, সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধে। এসব দৃষ্টান্তে ছোট বাহিনী বড় বাহিনীকে এবং নিকৃষ্ট বাহিনী উৎকৃষ্ট বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে, দুর্বল সৈন্যবাহিনী প্রথমে শত্রুর আংশিক নিকৃষ্টতা ও নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে নিজের আংশিক উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগকে যুদ্ধে নিয়োগ করে শত্রুর ওপরে আক্রমণ চালিয়ে বিজয় অর্জন করেছিল, তার পরে শত্রুর অবশিষ্ট অংশগুলির ওপরে আক্রমণ চালিয়ে একে একে তাদের ধ্বংস করেছিল। এইভাবে দুর্বল সৈন্য-বাহিনী সামগ্রিক পরিস্থিতিতে উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগ অর্জন করেছিল। আর শত্রুর বেলায় ঘটনাটি হল বিপরীত। শুরুতে শত্রু ছিল উৎকৃষ্ট ও উদ্যোগী অবস্থায়, সে তার আত্মগত ভুল ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে তার অত্যন্ত ভাল বা অপেক্ষাকৃত ভাল বা উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগী অবস্থাকে পুরোপুরি খুইয়ে বসল এবং হয়ে পড়ল পরাজিত সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি বা রাজ্যবিহীন এক রাজা। এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে, যুদ্ধ চালানোর শক্তির উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতা উদ্যোগ বা নিষ্ক্রিয়তাকে নির্ধারণ করার বাস্তব ভিত্তি হলেও, সেটি কিন্তু উদ্যোগ বা নিষ্ক্রিয়তার বাস্তব বিষয় নয়, শুধু সংগ্রামের ভেতর দিয়ে আত্মগত সামর্থ্যের প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়েই বাস্তব উদ্যোগ বা নিষ্ক্রিয়তা উদ্ভূত হতে পারে। সংগ্রামে নির্ভুল আত্মগত পরিচালনা নিকৃষ্টতাকে উৎকৃষ্টতায় আর নিষ্ক্রিয়তাকে উদ্যোগে রূপান্তরিত করতে পারে, আর ভুল পরিচালনা করতে পারে তার বিপরীত। কোন শাসনকারী রাজবংশই যে বিপ্লবী বাহিনীকে পরাভূত করতে পারে না, এটা প্রমাণ করে যে, নিছক কোন ব্যাপারের উৎকৃষ্টতা উদ্যোগকে সুনিশ্চিত করে না, চূড়ান্ত বিজয়কে সুনিশ্চিত করা তো আরও দূরের কথা। বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী আত্মগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শর্ত সুনিশ্চিত করে উৎকৃষ্ট ও উদ্যোগী পক্ষের হাত থেকে নিকৃষ্ট ও নিষ্ক্রিয় পক্ষ উদ্যোগ ও জয়কে ছিনিয়ে নিতে পারে।

(৮৩) ভুল ধারণায় ও অসতর্কতায় উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগ খোয়া যেতে পারে। তাই, সুপরিকল্পিতভাবে শত্রুর মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা আর তার ওপরে অতর্কিত আক্রমণ চালানো হচ্ছে উৎকৃষ্টতা অর্জনের ও উদ্যোগ ছিনিয়ে

নেবার পদ্ধতি, এবং গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিও বটে। ভুল ধারণা কি কি? ভুল ধারণার একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'পাকোং পর্বতের প্রতিটি ঝোপ ও গাছকে শত্রুসৈন্য বলে মনে করা'।[৩২] আর 'পূর্বদিকে আক্রমণের ভান করে পশ্চিমদিকে আক্রমণ করা' হচ্ছে শত্রুদের মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টি করার একটি পদ্ধতি। খবর ফাঁস হয়ে পড়া বন্ধ করার মতো যথেষ্ট জনসমর্থন যখন থাকে, তখন বিভিন্ন ছল ও কৌশল প্রয়োগ করে প্রায়শঃই শত্রুকে কার্যকরীভাবে ভুল বিচার ও ভুল কার্যকারণের কঠিন অবস্থায় নিক্ষেপ করা সম্ভব, যার ফলে শত্রু তার উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগ থেকে বঞ্চিত হয়। 'যুদ্ধে কোন ছলচাতুরীই উপেক্ষণীয় নয়'—এই প্রবাদটি ঠিক এই কথাই বোঝায়। 'অসতর্কতার' অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে অপ্রস্তুত থাকা। প্রস্তুতিবিহীন উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রকৃত উৎকৃষ্ট অবস্থা নয় এবং এতে কোন উদ্যোগও থাকতে পারে না। এ বিষয়টা বুঝতে পারলে, নিকৃষ্ট অথচ প্রস্তুত সৈন্য-বাহিনী প্রায়ই অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা উৎকৃষ্ট শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করতে পারে। আমরা যে বলি, চলমান অবস্থায় রত শত্রুকে আক্রমণ করা সহজ, তার কারণ এই যে, সে তখন অসতর্ক অর্থাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকে। এই দুটি বিষয়—শত্রুর মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা ও তার ওপরে অতর্কিত আক্রমণ চালানোর অর্থ হচ্ছে শত্রুর কাঁধে যুদ্ধের অনিশ্চয়তাকে পাচার করে দেওয়া আর আমাদের নিজেদের জন্য যথাসম্ভব নিশ্চয়তাকে সুনিশ্চিত করা, আর এইভাবে উৎকৃষ্টতা, উদ্যোগ এবং বিজয় অর্জন করা। এইসব অর্জনের পূর্বশর্ত হচ্ছে জনগণের অনবদ্য সংগঠন। সুতরাং, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সমস্ত শত্রুবিরোধী জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে ও তাঁদের সবাইকে অস্ত্র-সজ্জিত করে শত্রুর ওপরে ব্যাপকভাবে আকস্মিক আক্রমণ চালানো এবং সংগে সংগে খবর ফাঁস হয়ে পড়া বন্ধ করা ও সৈন্যবাহিনীকে আড়ালে লুকিয়ে রাখা, যার ফলে শত্রু জানতে পারবে না যে, আমাদের সৈন্যবাহিনী কোথায় এবং কখন তাকে আক্রমণ করবে, এবং সৃষ্ট হবে শত্রুর ভুল ধারণা ও অসতর্কতার বাস্তব ভিত্তি। অতীতে কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধের যুগে চীনা লালফৌজ তার দুর্বল ও ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে সর্বদাই যে জিততে সমর্থ হতো তার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে সংগঠিত ও অস্ত্রসজ্জিত জনসাধারণের সমর্থন। যুক্তির দিক থেকে, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের থেকে অনেক বেশি ব্যাপক জন-সমর্থন লাভ করা উচিত জাতীয় যুদ্ধের; কিন্তু অতীতের ভুলের[৩৩] ফলে জন-সাধারণ এখন একটা অসংগঠিত অবস্থায় রয়েছে, জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের

কাজে তাড়াতাড়ি তাদের নামাতে পারা যায় না, পরন্তু কখনো কখনো এমনও হয় যে, শত্রুই তাদের কাজে লাগায়। শুধুমাত্র, দৃঢ়তার সংগে ব্যাপকভাবে সমগ্র জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেই যুদ্ধের যাবতীয় চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে অফুরন্ত সম্পদ সরবরাহ করতে পারা যায়। অধিকন্তু, এটি শত্রুকে ভুল ধারণায় নিক্ষেপ করে ও অতর্কিত আক্রমণ করে তাকে পরাজিত করার আমাদের এই রণকৌশলকে কার্যকরী করার ব্যাপারেও বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করবে। আমরা সুং-এর রাজা সিয়াং নই এবং তার গর্দভতুল্য নীতি-শাস্ত্রও[৩৪] আমরা চাই না। বিজয়লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের অবশ্যই যতটা সম্ভব শত্রুদের চোখ আর কানকে বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে করে তারা অন্ধ ও বধিরে পরিণত হয়, আর যথাসম্ভব তাদের কম্যাণ্ডারদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদেরকে পাগলে পরিণত করতে হবে। উপরে বর্ণিত দৃষ্টান্তগুলি থেকে বোঝা যায় যে, যুদ্ধের আত্মগত পরিচালনার সংগে কিভাবে উদ্যোগ বা নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কিত। জাপানকে পরাভূত করার জন্য এ ধরনের আত্মগত পরিচালনা অপরিহার্য।

(৮৪) আমাদের অতীত ও বর্তমান আত্মগত ভুলভ্রান্তিগুলির সুযোগ নিয়ে এবং নিজের প্রবল সামরিক শক্তির কারণে জাপান তার আক্রমণের পর্যায়ে মোটামুটিভাবে উদ্যোগী অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু তার নিজের বহু অসুবিধাজনক উপাদানের কারণে এবং যুদ্ধেও কিছু আত্মগত ভুলভ্রান্তি করার কারণে (এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হবে) আর আমাদের বহু সুবিধাজনক উপাদান থাকার কারণে তার এই উদ্যোগ আংশিক-ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে। তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে তাইএরচুয়াংয়ে শত্রুর পরাজয় ও শানসীতে তার সঙ্কটাবস্থা থেকে। শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে আমাদের গেরিলাযুদ্ধের ব্যাপক বিকাশ সেখানকার শত্রুর রক্ষীবাহিনীকে একেবারে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় এনে ফেলেছে। যদিও রণনীতিগতভাবে এখনো সে আক্রমণে রত আর উদ্যোগ এখনো তার হাতে, তবুও যখন তার রণ-নীতিগত আক্রমণ থেমে যাবে তখনই শেষ হয়ে যাবে তার উদ্যোগ। শত্রু কেন যে উদ্যোগ বজায় রাখতে পারবে না তার প্রথম কারণ হচ্ছে, সৈন্য-সংখ্যার স্বল্পতার দরুণ অনির্দিষ্টকাল শত্রুর পক্ষে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। কেন যে তাকে একটা নির্দিষ্ট সীমায় আক্রমণ বন্ধ করতে হবে এবং কেন যে সে উদ্যোগ বজায় রাখতে পারবে না, তার দ্বিতীয়

কারণটি হচ্ছে, আমাদের যুদ্ধাভিযানগত আক্রমণাত্মক লড়াই ও শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে আমাদের গেরিলাযুদ্ধ এবং অপরাপর উপাদান। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে তৃতীয় কারণ। এইভাবে এটা দেখা যায় যে, শত্রুর উদ্যোগ হচ্ছে সীমিত আর এই উদ্যোগকে চূর্ণবিচূর্ণ করা যায়। চীন যদি সামরিক কার্যকলাপে তার প্রধান বাহিনীগুলির দ্বারা যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের নীতি চালু রাখতে পারে, শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে প্রচণ্ডভাবে গেরিলাযুদ্ধকে বিকশিত করে তুলতে পারে এবং রাজনীতিগতভাবে ব্যাপক মাত্রায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে, তাহলে আমরা ধীরে ধীরে রণনীতিগত উদ্যোগী অবস্থিতি গড়ে তুলতে পারি।

(৮৫) এখন নমনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। নমনীয়তাটা কি? এটা হচ্ছে সামরিক কার্যকলাপে উদ্যোগের বাস্তব রূপায়ণ। এটা হচ্ছে সৈন্য-শক্তির নমনীয় প্রয়োগ। সৈন্যশক্তির নমনীয় প্রয়োগ হচ্ছে যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্রীয় কর্তব্য, আর এ কাজটি ভালভাবে সম্পাদন করা সবচেয়ে কঠিনও বটে। সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে সংগঠিত ও শিক্ষিত করার কাজ প্রভৃতি ছাড়াও যুদ্ধে আমাদের কাজ হচ্ছে লড়াইয়ে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা, আর এ সবকিছুই করা হয় যুদ্ধে জয়লাভের জন্য। সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করা প্রভৃতি কাজ অবশ্য কঠিন। কিন্তু তার থেকেও বেশি কঠিন হচ্ছে সৈন্যবাহিনীকে নিয়োগ করা, বিশেষ করে তখন যখন দুর্বলটি প্রবলটির সংগে লড়ছে। এ কাজ করার জন্য দরকার অত্যন্ত উচ্চ মানের আত্মগত সামর্থ্য, দরকার যুদ্ধের বিশিষ্ট বিশৃংখলা, অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তাকে দূর করা আর তাতে শৃংখলা, স্পষ্টতা ও নিশ্চয়তা খুঁজে বের করা। শুধুমাত্র এইভাবেই পরিচালনায় নমনীয়তাকে কায়েম করতে পারা যায়।

(৮৬) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রণক্ষেত্রে লড়াই করার মৌলিক নীতি হচ্ছে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই। এ নীতিকে কার্যকরী করার জন্য রয়েছে বিভিন্ন রণকৌশল বা পদ্ধতি, যেমন সৈন্যশক্তিকে ছড়িয়ে দেওয়া ও কেন্দ্রীভূত করা, পৃথক পৃথকভাবে অগ্রসর হওয়া ও একাভিমুখী আক্রমণ করা, আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা, হানা দেওয়া ও শত্রুকে আটকে রাখা, ঘেরাও করা ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্শ্বে বা পিছনে এগিয়ে যাওয়া, অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণ। এ রণকৌশলগুলিকে বোঝা সহজ, কিন্তু নমনীয়ভাবে সেগুলিকে

কাজে প্রয়োগ করা ও রদবদল সহজ নয়। এ ক্ষেত্রে রয়েছে তিনটি সমস্যামূলক যোগসূত্র—সময়, স্থান ও সৈন্যবাহিনী। সময়, স্থান ও সৈন্যবাহিনী ভালভাবে বাছাই করা না হলে কোন বিজয় অর্জন করতে পারা যায় না। যেমন, চলন্ত অবস্থায় রত শত্রুকে আক্রমণ করতে গিয়ে আমরা যদি অতি তাড়াতাড়ি আঘাত হেনে বসি, তাহলে নিজেদের আমরা প্রকাশ করে ফেলব আর শত্রুকে তৈরী হবার সুযোগ দিয়ে দেব, আবার আমরা যদি খুব দেরি করে আঘাত হানি, তাহলে শত্রু ততক্ষণে ছাউনী গেড়ে তার বাহিনীগুলিকে সন্নিবেশ করে ফেলতে পারে, তাতে আমাদের কঠিন সমস্যার মোকাবিলা করতে হতে পারে। এটাই হচ্ছে সময়ের প্রশ্ন। আমরা যদি আমাদের আক্রমণস্থল শত্রুর বামপার্শ্বদেশে বাছাই করে নিই আর সেটা ঠিক শত্রুর দুর্বলস্থান হয়, তাহলে জয়লাভটি সহজ হবে। কিন্তু আমরা যদি তার দক্ষিণ পার্শ্বদেশে আক্রমণস্থল বাছাই করে একটা ত্রুটি করে বসি তাহলে কিছুই সাধিত হবে না। এটা হচ্ছে স্থানের প্রশ্ন। আমাদের সৈন্যবাহিনীর একটি নির্দিষ্ট ইউনিটকে যদি একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়, তাহলে জয়লাভ সহজ হতে পারে। কিন্তু সেই একই কাজের জন্য অন্য আর একটি ইউনিটকে নিয়োগ করা হলে ফললাভ করা কঠিন হতেও পারে। এটা হচ্ছে সৈন্যবাহিনীর প্রশ্ন। আমাদের যে শুধু রণকৌশলগুলি প্রয়োগই করতে হবে ,তাই নয়, বরং সেগুলির রদবদলও করতে হবে। আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষায় অথবা প্রতিরক্ষা থেকে আক্রমণে, অগ্রগমন থেকে পশ্চাদপসরণে অথবা পশ্চাদপসরণ থেকে অগ্রগমনে, সংবরণী বাহিনী থেকে হানাদার বাহিনীতে অথবা হানাদার বাহিনী থেকে সংবরণী বাহিনীতে পরিবর্তন সাধন করা এবং ঘেরাও করা ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্শ্বে বা পিছনে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদির পারস্পরিক পরিবর্তন সাধন করা, আর উভয় পক্ষের বাহিনীগুলির অবস্থা ও ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে এ ধরনের পরিবর্তন সাধন করা হচ্ছে নমনীয় পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এটা লড়াইয়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি যুদ্ধাভিযানগত ও রণনীতিগত পরিচালনার ক্ষেত্রেও সত্য।

(৮৭) প্রাচীনরা বলেন : 'রণকৌশল প্রয়োগের নৈপুণ্য নির্ভর করে বুদ্ধির ওপরে'। এই 'নৈপুণ্যকে' আমরা বলি নমনীয়তা, এটা হচ্ছে বুদ্ধিমান কম্যাণ্ডারদের অবদান। নমনীয়তা বলতে কিন্তু হঠকারিতা বোঝায় না। হঠকারিতাকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে। নমনীয়তা হচ্ছে বাস্তব অবস্থার

ভিত্তিতে 'সময় বিচার করার ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার পরে' (এখানে 'পরিস্থিতি' বলতে শত্রুর পরিস্থিতি, আমাদের পরিস্থিতি ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি প্রভৃতি বোঝানো হচ্ছে) বুদ্ধিমান কম্যাণ্ডারদের সময়োচিত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সামর্থ্য, অর্থাৎ 'রণকৌশল প্রয়োগের নৈপুণ্য'। এই রণকৌশল প্রয়োগের নৈপুণ্যের ভিত্তিতে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে আমরা অপেক্ষাকৃত বেশি বিজয়লাভ করতে পারি, শত্রুর উৎকৃষ্টতাকে আর আমাদের নিকৃষ্টতাকে বদলে দিতে পারি, শত্রুর ওপরে উদ্যোগক্ষমতা লাভ করতে পারি, শত্রুকে দাবিয়ে নিয়ে ধ্বংস করতে পারি যাতে করে চূড়ান্ত বিজয় হবে আমাদেরই।

(৮৮) পরিকল্পনার প্রশ্নটি এবারে আলোচনা করা যাক। যুদ্ধের বিশিষ্ট অনিশ্চয়তার কারণে অপরাপর কার্যের তুলনায় সুপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ চালানো অনেক বেশি কঠিন। তবুও, 'প্রস্তুতিসম্পন্নতা সাফল্য সুনিশ্চিত করে, আর অপ্রস্তুতিসম্পন্নতা বিফলতা সৃষ্টি করে', পূর্ব থেকে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছাড়া যুদ্ধে কোন বিজয় অর্জন করা অসম্ভব। যুদ্ধে কোনরকমের নিরঙ্কুশ নিশ্চয়তা নেই, তবুও যুদ্ধে নির্দিষ্ট মাত্রার আপেক্ষিক নিশ্চয়তাও যে নেই, তাও নয়। আমাদের নিজেদের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমবা তুলনামূলকভাবে নিশ্চিত। শত্রুর পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত অনিশ্চিত, কিন্তু এখানেও আমাদেব অনুসন্ধান করার জন্য রয়েছে পূর্বলক্ষণ, অনুসরণ কবার জন্য রয়েছে বহস্য সমাধানের সূত্র, আর বিবেচনা করার জন্য রয়েছে ঘটনাক্রম। এসব নিয়ে গড়ে ওঠে নির্দিষ্ট মাত্রার আপেক্ষিক নিশ্চয়তা, যা যুদ্ধের পরিকল্পনার জন্য একটা বাস্তব ভিত্তি যোগায়। আধুনিক কারিগরীর উন্নতি (টেলিগ্রাফী, বেতার, বিমান, মোটর-গাড়ী, রেলপথ, জাহাজ প্রভৃতি) আবার যুদ্ধের পরিকল্পনার সম্ভাব্যতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু, যুদ্ধে শুধু অত্যন্ত সীমিত ও অল্পকালস্থায়ী নিশ্চয়তা থাকে বলে যুদ্ধের পূর্ণাংগ ও অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনা খুবই কঠিন, যুদ্ধের গতির (প্রবাহ বা পরিবর্তন) সংগে সংগে এ ধরনেব পরিকল্পনার পরিবর্তন হয়ে থাকে আর যুদ্ধের পরিধি অনুসারে এই পরিবর্তনেব মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। রণকৌশলগত পরিকল্পনাগুলি, যেমন ছোট ছোট সৈন্যসংস্থান ও ইউনিটগুলির আক্রমণ বা প্রতিরক্ষার পরিকল্পনাগুলি প্রায়ই দিনে কয়েকবার বদলে নিতে হয়। যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনা অর্থাৎ বিরাট বিরাট সৈন্যসংস্থান কর্তৃক কার্যকারণের পরিকল্পনা সাধারণতঃ যুদ্ধাভিযানের পরিসমাপ্তি অবধি বলবৎ থাকতে পারে।

কিন্তু যুদ্ধাভিযানের গতিপথে সে পরিকল্পনাকে প্রায়ই অংশতঃ বদলে নেওয়া হয়, আর কোন কোন সময়ে এমনকি পুরোপুরি বদলেও নেওয়া হয়। রণনীতিগত পরিকল্পনা যুদ্ধরত উভয় পক্ষের সামগ্রিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে রচিত, আর সেটি আরও বেশি স্থায়ী, কিন্তু তাও শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট রণনীতিগত পর্যায়েই প্রযোজ্য, যুদ্ধ যখনই একটা নতুন পর্যায়ে এগিয়ে চলে তখনই সেই রণনীতিগত পরিকল্পনাকে বদলে নিতে হয়। পরিধি ও পরিবেশ অনুযায়ী রণকৌশলগত, যুদ্ধাভিযানগত ও রণনীতিগত পরিকল্পনা তৈরী করা ও বদলে নেওয়া হচ্ছে যুদ্ধ পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি। এটা হচ্ছে যুদ্ধে নমনীয়তার বাস্তব অভিব্যক্তি, অন্য কথায়, এটা হচ্ছে বাস্তবে রণকৌশল প্রয়োগের নৈপুণ্যও বটে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে সর্বস্তরের কম্যাণ্ডারদের এর প্রতি নজর দিতে হবে।

(৮৭) যুদ্ধের প্রবহমানতার কারণে কেউ কেউ যুদ্ধের পরিকল্পনা বা নীতির আপেক্ষিক স্থায়িত্বকে একেবারেই অস্বীকার করে। তারা এ ধরনের পরিকল্পনা বা নীতিকে 'যান্ত্রিক' বলে বর্ণনা করে। এই অভিমত ভুল। পূর্ববর্তী অংশে আমরা পুরোপুরি স্বীকার করে নিয়েছি যে যুদ্ধের পরিস্থিতিটি কেবল আপেক্ষিকভাবে নিশ্চিত আর যুদ্ধ দ্রুতগতিতে প্রবাহিত (চলন্ত বা পরিবর্তিত) হওয়ার কারণে যুদ্ধের পরিকল্পনা বা নীতিও শুধুই আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী হতে পারে, এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন ও যুদ্ধের প্রবহমানতার সংগে সংগতি রেখে যথাসময়ে সেগুলিকে বদলাতে বা শুধরাতে হবে, নইলে আমরা যান্ত্রিক হয়ে পড়তাম। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী যুদ্ধের পরিকল্পনা বা নীতিকে অস্বীকার করা অবশ্যই চলবে না, এটাকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে সবকিছুকেই অস্বীকার করা—খাস যুদ্ধকে তথা খোদ অস্বীকারকারীকেও অস্বীকার করা। যুদ্ধের পরিস্থিতি ও কার্যকলাপ উভয়ই আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী, তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত যুদ্ধের পরিকল্পনা বা নীতিগুলিকেও আমাদের অবশ্যই আপেক্ষিক স্থায়িত্ব দিতে হবে। যেমন, একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে উত্তর চীনে যুদ্ধের পরিস্থিতি আর অষ্টম রুট বাহিনীর বিক্ষিপ্ত সামরিক কার্যকলাপের স্থায়ী চরিত্র থাকে বলে এই পর্যায়ে অষ্টম রুট বাহিনীর 'গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে মৌলিক, কিন্তু অনুকূল অবস্থায় চলমান যুদ্ধের সুযোগ ছাড়িও না'—এই রণনীতিগত সামরিক কার্যকলাপের নীতির আপেক্ষিক স্থায়িত্বকে স্বীকার করে নেওয়া একেবারেই অপরিহার্য। উপরে উল্লিখিত

রণনীতিগত নীতির কার্যকরী মেয়াদকাল থেকে যুদ্ধাভিযানগত নীতির কার্যকরী মেয়াদকালটি হ্রস্বতর, আর রণকৌশলগত নীতির মেয়াদকালটি আরও বেশি সংক্ষিপ্ততর। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ে তাদের প্রত্যেকটিই স্থায়ী। যে-কেউ এ কথা অস্বীকার করে, যুদ্ধ পরিচালনার কোন পথই সে খুঁজে পাবে না, আর যুদ্ধের ব্যাপারে সে হয়ে পড়বে স্থির অভিমতহীন অপেক্ষবাদী, তার কাছে এটাও হয় না, ওটাও হয় না, অথবা, এটাও হয়, ওটাও হয়। এ কথা কেউই অস্বীকার করে না যে, এমনকি একটা নির্দিষ্ট মেয়াদকালের জন্য কার্যকরী নীতিও পরিবর্তনশীল থাকে, অন্যথায় একটি নীতিকে বাতিল করা এবং অন্য একটি নীতিকে গ্রহণ করা অসম্ভব। কিন্তু এ ধরনের পরিবর্তনশীলতা সীমিত, অর্থাৎ এই নীতিকে কার্যকরী করার নানা ধরনের সামরিক কার্যকলাপের চৌহদ্দির মধ্যে পরিবর্তন, কিন্তু এই নীতির মৌলিক প্রকৃতির পরিবর্তন নয়, অন্য কথায়, এটা পরিমাণগত পরিবর্তন, কিন্তু গুণগত নয়। একটা নির্দিষ্ট মেয়াদকালে এ ধরনের মৌলিক প্রকৃতি কোনমতেই পরিবর্তনশীল নয়। কোন একটা নির্দিষ্ট মেয়াদকালে আপেক্ষিক স্থায়িত্বের কথা বলতে এটাই আমরা বোঝাই। গোটা যুদ্ধের নিরঙ্কুশ প্রবহমান মহানদীর প্রতিটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে রয়েছে আপেক্ষিক স্থায়িত্ব—যুদ্ধের পরিকল্পনা বা নীতির মৌলিক প্রকৃতি সম্পর্কে এই হচ্ছে আমাদের অভিমত।

(২০) রণনীতিগতভাবে অন্তর্লাইনে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধ এবং যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগতভাবে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই সম্পর্কে এবং উদ্যোগ, নমনীয়তা ও পরিকল্পনা সম্পর্কেও আলোচনা করার পর, এখন আমরা সংক্ষেপে তার সারমর্ম বর্ণনা করতে পারি। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের অবশ্যই একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে। যুদ্ধের পরিকল্পনা অর্থাৎ রণনীতি ও রণকৌশলের বাস্তব প্রয়োগকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে, যাতে তাকে যুদ্ধের পরিস্থিতির উপযোগী করে নিতে পারা যায়। আমাদের সর্বত্রই নিকৃষ্টতাকে উৎকৃষ্টতায় ও নিষ্ক্রিয়তাকে উদ্যোগে রূপান্তরিত করার জন্য চেষ্টা করতে হবে, যাতে করে শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার পরিস্থিতি বদলানো যায়। আর এ সবই অভিব্যক্ত হয় যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগতভাবে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে, এবং একই সময়ে রণনীতিগতভাবে অন্তর্লাইনে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধেও তা অভিব্যক্ত হয়।

(২১) যে যুদ্ধের বিষয়বস্তু হচ্ছে রণনীতিগতভাবে অন্তর্লাইনে চালিত, দীর্ঘস্থায়ী ও প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধের মধ্যেকার যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগতভাবে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই, তা রূপের দিক থেকে নিজেকে প্রকাশ করে চলমান যুদ্ধে। চলমান যুদ্ধ হচ্ছে সেই যুদ্ধরূপ, যাতে নিয়মিত সৈন্যসংস্থান দীর্ঘ যুদ্ধরেখা ও বিরাট যুদ্ধাঞ্চল জুড়ে যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগতভাবে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই চালায়। একই সময়ে, এ ধরনের আক্রমণাত্মক লড়াইকে সহজসাধ্য করার জন্য প্রয়োজনবোধে চালিত 'চলন্ত প্রতিরক্ষণও' তাতে সামিল থাকে। এতে আরও সামিল থাকে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করার অবস্থানগত আক্রমণ ও অবস্থানগত প্রতিরক্ষা। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিয়মিত সৈন্যসংস্থানের উপস্থিতি, যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে সৈন্যশক্তির উৎকৃষ্টতা এবং আক্রমণাত্মক ও প্রবহমান চরিত্র।

(২২) চীনের ভূখণ্ড বিরাট, তার সৈন্যসংখ্যা বিপুল, কিন্তু তার সৈন্য-বাহিনীর কারিগরী ও প্রশিক্ষণ অনুন্নত। পক্ষান্তরে, শত্রুর সৈন্যরা সংখ্যায় অপ্রতুল কিন্তু তাদের কারিগরী ও প্রশিক্ষণ বেশ উন্নত। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে সামরিক কার্যকলাপের প্রধান রূপরীতি হিসেবে আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে আক্রমণাত্মক চলমান যুদ্ধকে, আর তার পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে অপরাপর রূপরীতিকে এবং এইভাবে গঠিত হবে গোটা চলমান যুদ্ধ। 'শুধুই পশ্চাদপসরণ, কখনোই নয় অগ্রসরণ'—এই পলায়নবাদের বিরোধিতা আমরা অবশ্যই করি। আবার সেই একই সময়ে আমরা 'শুধুই অগ্রসরণ, কখনোই নয় পশ্চাদপসরণ'-এরও বিরোধিতা করি, কারণ এটি হচ্ছে বেপরোয়া হঠকারিতা।

(২৩) চলমান যুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার প্রবহমানতা। প্রচণ্ড গতিতে অগ্রসরণের ও পশ্চাদপসরণের অনুমতিই যে শুধু স্থলবাহিনীকে এই প্রবহমানতা দান করে তাই নয়, উপরন্তু তার কাছে তা দাবিও করে। যাই হোক, হান ফু-চ্যু ধরনের পলায়নবাদের[৩৫] সংগে এর কোনই মিল নেই। যুদ্ধের মৌলিক দাবি হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করা, আর অন্য দাবি হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা। নিজেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করা, আর শত্রুকে ধ্বংস করাই হচ্ছে আবার নিজেকে রক্ষা করার সর্বাধিক কার্যকরী উপায়। তাই, চলমান যুদ্ধ কোনমতেই হান ফু-চ্যুর মতো লোকজনের পলায়নের

অছিলা হয়ে ওঠে না ; শুধু পিছনের দিকে চলা, কখনোই সামনের দিকে নয়— এমন কথা চলমান যুদ্ধ কোনমতেই বোঝাতে পারে না। ঐ ধরনের 'চলা' চলমান যুদ্ধের মৌলিক আক্রমণাত্মক চরিত্রটিকেই নস্যাৎ করে দেয়। চীন সুবিশাল হওয়া সত্বেও এ ধরনের 'চলার' ফলে সে জীবনপথের বাইরে 'চলে' যাবে।

(৯৪) যাই হোক, আব একটি অভিমতও ভুল—অর্থাৎ 'শুধু অগ্রসরণ, কখনোই নয় পশ্চাদপসরণ'—এটা বেপরোয়া হঠকারিতা। আমরা যে চলমান যুদ্ধের সুপারিশ করি, তার বিষয়বস্তু হচ্ছে যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগতভাবে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই, আর তাতে সামিল থাকে অবস্থানগত যুদ্ধ যা সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে, এবং আরও সামিল থাকে 'চলন্ত প্রতিরক্ষা' ও পশ্চাদপসরণ। এ সবগুলি ছাড়া চলমান যুদ্ধকে পুরোপুরিভাবে চালানো যেতে পারে না। বেপরোয়া হঠকারিতা হচ্ছে সামরিক অদূরদর্শিতা। প্রায়শঃই তার উদ্ভব ঘটে জমি খোয়ানোর ভয় থেকে। বেপরোয়া হঠকারীরা জানে না যে, চলমান যুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রবহমানতা, এই প্রবহমানতা স্থলবাহিনীকে যে শুধু প্রচণ্ড গতিতে অগ্রসরণের ও পশ্চাদপসরণের অনুমতিই দেয় তাই নয়, উপরন্তু তাব কাছে এমন দাবিও করে। সক্রিয়তার দিকে, শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল কিন্তু আমাদের পক্ষে অনুকূল কোন একটি লড়াইয়ে শত্রুকে টেনে নামাবার উদ্দেশ্যে সচরাচর এটাই দরকার যে, শত্রুকে থাকতে হবে চলন্ত অবস্থায়, আর আমাদেব থাকতে হবে অনেক অনুকূল শর্ত, যেমন : অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ, পরাজয়সাধ্য শত্রু, খবর ফাঁস হয়ে পড়া বন্ধ করতে পারে এমন স্থানীয় লোকজন, শত্রুর ক্লান্তি ও অসতর্কতা ইত্যাদি। এর জন্য দরকার হচ্ছে শত্রুর অগ্রসরণ আর আমাদের এলাকার অংশবিশেষ সাময়িকভাবে খোয়া গেলে আমাদের বিচলিত না হওয়া। কারণ আমাদের জমির আংশিক ও সাময়িক খোয়ানো হচ্ছে সম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ীভাবে জমির সংরক্ষণ ও হৃত জমির পুনরুদ্ধারের মূল্য। নিষ্ক্রিয়তার দিকে, যখন আমরা বাধ্য হয়ে সৈন্যশক্তির সংরক্ষণকে মৌলিকভাবে বিপদাপন্ন করে তোলার মতো অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ি, তখন আমাদের উচিত দ্বিধা না করে পশ্চাদপসরণ করা, যাতে করে সৈন্যশক্তিকে সংরক্ষণ করা যায় ও নতুন সুযোগ গ্রহণ করে শত্রুকে আবার আঘাত হানা যায়। বেপরোয়া হঠকারীরা এই নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ, অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে ও নিশ্চিতরূপেই প্রতিকূল হলেও

তারা একটা শহর বা একখণ্ড জমির জন্য লড়ে। ফলে, তারা যে শুধু শহরটি বা জমিটি হারায় তাই নয়, পরন্তু তাদের সৈন্যশক্তিকেও সংরক্ষিত করতেও তারা ব্যর্থ হয়। সর্বদাই আমরা 'শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনার' নীতির সপক্ষে আছি, তার কারণ এই যে, শক্তিশালী সৈন্য-বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য রণনীতিগতভাবে প্রতিরক্ষায় রত একটা দুর্বল সৈন্যবাহিনীর পক্ষে এটি হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকরী সামরিক নীতি।

(১৫) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধেঃ সামরিক কার্যকলাপের রূপরীতির মধ্যে চলমান লড়াইয়ের স্থান প্রথম, আর গেরিলা লড়াইয়ের স্থান দ্বিতীয়। আমরা যখন বলি যে গোটা যুদ্ধে চলমান লড়াই প্রধান আর গেরিলা লড়াই সহায়ক, তখন আমরা এটাই বোঝাই যে, যুদ্ধের পরিণতি মুখ্যতঃ নির্ভর করে নিয়মিত লড়াইয়ের ওপরে, বিশেষ করে তার চলমান রূপরীতির ওপরে, এবং যুদ্ধের পরিণতি নির্ধারণের প্রধান দায়িত্বকে গেরিলা লড়াই বহন করতে পারে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে গেরিলা লড়াইয়ের রণনীতিগত ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গোটা প্রতিরোধ-যুদ্ধে গেরিলা লড়াইয়ের রণনীতিগত ভূমিকাটি হচ্ছে শুধুই চলমান লড়াইয়ের ভূমিকার পরে। কারণ গেরিলা লড়াইয়ের সহায়তা ছাড়া শত্রুকে আমরা পরাভূত করতে পারি না। এ কথা বলতে গিয়ে গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকশিত করে তোলার রণনীতিগত কর্তব্যকেও আমরা মনে রাখি। এই দীর্ঘ ও নিষ্ঠুর যুদ্ধের মধ্যে গেরিলা লড়াই একই স্তরে থাকবে না, পরন্তু উচ্চতর স্তরে উঠে তা চলমান লড়াইয়ে বিকাশলাভ করবে। তাই গেরিলা লড়াইয়ের রণনীতিগত ভূমিকা হচ্ছে দ্বিবিধ—নিয়মিত লড়াইকে সাহায্য করা, আর নিজেকেও নিয়মিত লড়াইয়ে রূপান্তরিত করা। চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে গেরিলা লড়াইয়ের অভূতপূর্ব ব্যাপ্তি ও অভূতপূর্ব দীর্ঘস্থায়িত্বকে বিবেচনায় ধরলে তার রণনীতিগত ভূমিকাকে উপেক্ষা করা আরও অনুচিত। সেই কারণে চীনে গেরিলাযুদ্ধের যে শুধুই রণকৌশলগত সমস্যাটি আছে তাই নয়, পরন্তু তার নিজস্ব বিশেষ রণনীতিগত সমস্যাও আছে। 'জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যা' নামক প্রবন্ধে আগেই আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। উপরে যেমন বলা হয়েছে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের তিনটি রণনীতিগত পর্যায়ে সামরিক কার্যকলাপের রূপরীতি হচ্ছে নিম্নরূপ: প্রথম পর্যায়ে চলমান যুদ্ধ হচ্ছে প্রধান, আর গেরিলাযুদ্ধ ও অবস্থান-

গত যুদ্ধ হচ্ছে সহায়ক। দ্বিতীয় পর্যায়ে গেরিলাযুদ্ধ প্রথম স্থানে এগিয়ে আসবে আর চলমান যুদ্ধ ও অবস্থানগত যুদ্ধ সহায়ক হবে। তৃতীয় পর্যায়ে চলমান যুদ্ধ আবার প্রধান রূপরীতি হয়ে উঠবে আর অবস্থানগত যুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধ হবে সহায়ক। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের চলমান যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে আগেকার নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর দ্বারা চালানো হবে না, বরং তার একটা অংশ, সম্ভবতঃ বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এমন সৈন্যবাহিনী চালাবে যারা আগে ছিল গেরিলা-বাহিনী, কিন্তু তখন গেরিলাযুদ্ধ থেকে চলমান যুদ্ধের স্তরে উন্নীত হয়েছে। এ তিনটি পর্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের মধ্যে গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে নিশ্চিতভাবেই অপরিহার্য। আমাদের গেরিলাযুদ্ধ মানবজাতির যুদ্ধের ইতিহাসে একটা অভূতপূর্ব মহান নাটক প্রযোজনা করবে। এই কারণে, গোটা শত্রু-অধিকৃত এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে অস্ত্রসজ্জিত করা আর তাঁদের সংগে সমন্বয়সাধন করে গেরিলাযুদ্ধ চালানোর জন্য চীনের কয়েক মিলিয়ন নিয়মিত সৈন্যদের ভেতর থেকে অন্ততঃ কয়েক লক্ষকে বাছাই করা একেবারেই অপরিহার্য। এইভাবে বাছাই করা সৈন্যবাহিনীর উচিত এই পবিত্র কর্তব্যভারকে সচেতন-ভাবে কাঁধে তুলে নেওয়া। এটা তাদের ভাবা উচিত নয় যে বড় লড়াই লড়বার সুযোগ তাদের কম হবে এবং কিছু সময়ের জন্য তারা জাতীয় বীর হিসেবে দেখা দিতে পারবে না বলে তাদের পদমর্যাদা কমে গেছে। এ ধরনের ভাবটা ভুল। নিয়মিত যুদ্ধের মতো দ্রুত ফল এবং বিপুল খ্যাতি গেরিলাযুদ্ধে মেলে না, কিন্তু 'দীর্ঘ যাত্রার মাধ্যমেই ঘোড়ার শক্তির পরখ হয়, আর দীর্ঘ কর্মসাধনে মানুষের অন্তঃকরণের পরীক্ষা হয়'; আর এই দীর্ঘ ও নির্মম যুদ্ধের গতিপথে গেরিলাযুদ্ধ তার প্রচণ্ড শক্তি দেখাবে। এটা মোটেই সাধারণ কর্মভার নয়। অধিকন্তু, এই ধরনের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী বিক্ষিপ্ত হবে গেরিলাযুদ্ধ চালাতে পারে, আর সমাবেশিত হলে আবার চলমান যুদ্ধও চালাতে পারে। অষ্টম রুট বাহিনী এমনই করে আসছে। অষ্টম রুট বাহিনীর নীতি হচ্ছে: 'গেরিলা-যুদ্ধ হচ্ছে মৌলিক, কিন্তু অনুকূল অবস্থায় চলমান যুদ্ধের সুযোগ হারিও না'। এ নীতি সর্বাংশে ঠিক, এর বিরোধী সব অভিমত ভুল।

(৯৬) চীনের বর্তমান প্রযুক্তিগত স্তরে প্রতিরক্ষাত্মক ও আক্রমণাত্মক অবস্থানগত যুদ্ধ সাধারণতঃ কার্যকরী করা অসম্ভব। আর এখান থেকেই আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। উপরন্তু, আমাদের দুর্গসংরক্ষিত অবস্থান-

গুলিকে পাশ কাটিয়ে চলার জন্য শত্রু আবার আমাদের দেশের সুবিশালতাকে কাজে লাগাচ্ছে। তাই অবস্থানগত যুদ্ধ আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে হতে পারে না, প্রধান পদ্ধতি হওয়া তো আরও দূরের কথা। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে চলমান যুদ্ধের পরিধির মধ্যে আংশিক অবস্থানগত যুদ্ধকে যুদ্ধাভিযানে সহায়ক ভূমিকায় নিয়োগ করা সম্ভব এবং একান্ত আবশ্যক। প্রতি পদে প্রতিরোধ করে শত্রুর সৈন্যশক্তি লাঘব করার এবং অতিরিক্ত সময় পাওয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত আধা-অবস্থানগত 'চলন্ত প্রতিরক্ষণ' হচ্ছে চলমান যুদ্ধের একটা আরও বেশি অপরিহার্য অঙ্গ। চীনকে অবশ্যই নিজের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের যোগান বৃদ্ধি করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যাতে করে রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে অবস্থানগত আক্রমণের কর্তব্যটি সে পুরোপুরি সম্পাদন করতে পারে। রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে অবস্থানগত যুদ্ধ নিঃসন্দেহে বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করবে। কারণ শত্রু তখন তার অবস্থানগুলিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, আর চলমান যুদ্ধের সংগে সমন্বয়সাধনের জন্য প্রচণ্ড অবস্থানগত আক্রমণ শুরু না করে আমরা আমাদের হৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হব না। তৎসত্ত্বেও তৃতীয় পর্যায়ে চলমান যুদ্ধকেই যুদ্ধের মৌলিক রূপরীতি হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আমাদের অবশ্যই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম ইউরোপে যে ধরনের অবস্থানগত যুদ্ধ লড়া হয়েছিল, তেমন অবস্থানগত যুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল ও মানুষের সক্রিয় ভূমিকা বহুলাংশে বাতিল হয়। এটা স্বাভাবিক যে, যুদ্ধকে টেনে 'পরিখার বাইরে' আনতে হবে, কারণ যুদ্ধ লড়া হচ্ছে চীনের সুবিশাল বুকের ওপরে, আর আমাদের পক্ষ কারিগরীর দিক থেকে আরও বেশ কিছুকাল অনুন্নত থাকবে। তৃতীয় পর্যায়ে, চীনের কারিগরী অবস্থার উন্নতি হলেও, সেদিক দিয়ে চীন যে নিশ্চিতরূপেই তার শত্রুকে ছাড়িয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়। আর তাই, উচ্চ মাত্রায় চলমান যুদ্ধ চালাবার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালাতে বাধ্য হব। আর তা না হলে চীন চূড়ান্ত বিজয়লাভ করতে পারবে না। তাই, গোটা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে অবস্থানগত যুদ্ধকে চীন মৌলিক রূপ হিসেবে গ্রহণ করবে না। মৌলিক আর গুরুত্বপূর্ণ রূপ চলমান যুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধই থাকবে। যুদ্ধের এই দুটি রূপরীতির মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল ও মানুষের সক্রিয় ভূমিকাকে কার্যকরী করার পূর্ণ সুযোগ পাওয়া যাবে, আমাদের দুর্ভাগ্যের জঠর থেকে এ এক সৌভাগ্যের অভ্যুদয়।

(৯৭) আগেই আমরা বলেছি, যুদ্ধের সারমর্ম বা উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা ও শত্রুকে ধ্বংস করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধের তিনটি রূপ রয়েছে—চলমান যুদ্ধ, অবস্থানগত যুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধ। আর কার্যকারিতার মাত্রায় তাদের পার্থক্য রয়েছে, এ দিক থেকে যুদ্ধকে সাধারণতঃ শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধে ও নির্মূলীকরণের যুদ্ধে বিভক্ত করা যায়।

(৯৮) সর্বপ্রথমে আমরা বলতে পারি যে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হচ্ছে শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ, আবার নির্মূলীকরণের যুদ্ধও বটে। কেন? কারণ শত্রু এখনো তার প্রবলতাকে কাজে লাগাচ্ছে, এবং রণনীতিগত উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগকে বজায় রাখছে। আর তাই, যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত নির্মূলীকরণের যুদ্ধ ছাড়া আমরা কার্যকরীভাবে এবং দ্রুতগতিতে শত্রুর প্রবলতাকে কমাতে এবং তার উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগকে ভাঙতে পারি না। এখনো আমাদের দুর্বলতা রয়েছে, রণনীতিগত নিকৃষ্টতা ও নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে এখনো আমরা মুক্ত হইনি, তাই যুদ্ধাভিযানগত ও লডাইগত নির্মূলীকবণের যুদ্ধ না করলে আমরা সময় পেতে পারি না, আমাদের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতিবিধান করতে পারি না এবং আমাদের প্রতিকূল অবস্থাটিও বদলে নিতে পারি না। তাই যুদ্ধাভিযানগত নির্মূলীকরণের যুদ্ধ হচ্ছে রণনীতিগত শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধের উদ্দেশ্যসাধনের পথ। এই অর্থে নির্মূলীকরণের যুদ্ধ হচ্ছে শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ। মুখ্যতঃ নির্মূলীকরণের মাধ্যমে শত্রুর শক্তিক্ষয়করণের পদ্ধতি ব্যবহার করেই চীন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাতে পারে।

(৯৯) কিন্তু শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধাভিযানের দ্বারাও রণনীতিগত শক্তিক্ষয়করণের লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, চলমান যুদ্ধ নির্মূলীকরণের কাজ করে, শক্তিক্ষয়করণের কাজ করে অবস্থানগত যুদ্ধ আর গেরিলাযুদ্ধ এ উভয় কাজই একসঙ্গে করে। এইভাবে যুদ্ধের তিনটি রণরীতিই পরস্পরের থেকে পৃথক। এই অর্থে নির্মূলীকরণের যুদ্ধ হচ্ছে শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধের থেকে ভিন্ন। শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধাভিযানগুলি হচ্ছে সহায়ক, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পক্ষে প্রয়োজন।

(১০০) তত্ত্বের ও প্রয়োজনের দিক থেকে বলতে গেলে, শত্রুর শক্তিকে প্রচুরভাবে ক্ষয় করার রণনীতিগত লক্ষ্য অর্জন করার জন্য প্রতিরক্ষাত্মক পর্যায়ে চীনের উচিত চলমান যুদ্ধের মুখ্য ও গেরিলাযুদ্ধের আংশিক

নির্মূলীকরণের প্রকৃতিকে ব্যবহার করা এবং অবস্থানগত যুদ্ধের (যা সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে), মুখ্য ও গেরিলাযুদ্ধের আংশিক শক্তিক্ষয়করণের প্রকৃতিকে ব্যবহার করা। তারসাম্যের পর্যায়ে শত্রুর সৈন্যশক্তির আরও বিরাট পরিমাণ ক্ষয়করণের উদ্দেশ্যে আমাদের উচিত গেরিলা ও চলমান যুদ্ধের নির্মূলীকরণের ও শক্তিক্ষয়করণের প্রকৃতিকে অবিচলভাবে ব্যবহার করা। এ সবেরই লক্ষ্য হচ্ছে যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করা, ধীরে ধীরে শত্রু ও আমাদের শক্তির অনুপাতকে বদলে দেওয়া, আর আমাদের পাল্টা আক্রমণের জন্য শর্ত তৈরী করা। শেষ পর্যন্ত শত্রুকে যাতে বিতাড়িত করা যায়, তার জন্য রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের সময়ে আমাদের উচিত হবে নির্মূলীকরণের মাধ্যমে শত্রুর শক্তিক্ষয়করণের পদ্ধতিকে অব্যাহতভাবে প্রয়োগ করা।

(১০১) কিন্তু বস্তুতঃ, বিগত দশ মাসে আমাদের অভিজ্ঞতা হল যে, চলমান যুদ্ধাভিযানগুলির অনেকগুলি, এমনকি অধিকাংশগুলিই শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধাভিযানে পরিণত হয়েছিল; আর কোন কোন এলাকায় গেরিলাযুদ্ধের সঠিক নির্মূলীকরণের ভূমিকাটি যথাযথভাবে সম্পাদিত করা হয়নি। এ অবস্থার ভাল দিকটি হচ্ছে এই যে, অন্ততঃপক্ষে আমরা শত্রুর শক্তিকে ক্ষয় করেছিলাম, আর তা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও আমাদের চূড়ান্ত বিজয়—উভয়ের জন্যই তাৎপর্যপূর্ণ, তাই বৃথাই আমাদের নিজেদের রক্ত ঢালিনি। কিন্তু ত্রুটি হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ শত্রুর শক্তিকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষয় করিনি; আর দ্বিতীয়তঃ, বেশ গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি আমরা এড়াতে অসমর্থ হয়েছিলাম এবং যুদ্ধে শত্রুর দ্রব্য-সামগ্রী আমরা কম দখল করেছিলাম। এই পরিস্থিতির বাস্তব কারণটিকে, অর্থাৎ প্রযুক্তিগত সাজসরঞ্জামে এবং সৈন্যদের প্রশিক্ষণে আমাদের ও শত্রুর মধ্যেকার অসমতাকে আমাদের স্বীকার করে নেওয়া উচিত হলেও, যাই ঘটুক না কেন, তত্ত্বগতভাবে এবং বাস্তবিকপক্ষে এটা জোর দিয়ে বলা দরকার যে, যখনই পরিবেশ অনুকূল হয়, তখনই আমাদের প্রধান সৈন্যবাহিনীর উচিত সক্রিয়ভাবে নির্মূলীকরণের যুদ্ধ চালানো। অন্তর্ঘাত ও হয়রানি করার মতো অনেক নির্দিষ্ট কাজ করতে গিয়ে গেরিলাবাহিনীগুলিকে বিশুদ্ধ শক্তিক্ষয়ী লড়াই চালাতে হলেও, পরিবেশ যখনই অনুকূল হয় তখনই নির্মূলীকরণের যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের সুপারিশ করা ও সক্রিয়ভাবে সম্পাদন করা দরকার, যাতে করে প্রভূত পরিমাণে শত্রুর ক্ষতিসাধন করা যায়, আর আমাদের নিজেদের শক্তিকে প্রভূত পরিমাণে পূরণ করে নেওয়া যায়।

(১০২) বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে, যেগুলিকে আমরা 'বহির্লাইন', 'দ্রুত নিষ্পত্তি' এবং 'আক্রমণাত্মক' বলি, আর চলমান যুদ্ধে যেটাকে আমরা 'চলমান' বলি—সে সবগুলিই লড়াইয়ের রূপের দিক থেকে মুখ্যতঃ অভিব্যক্ত হয় ঘেরাও করার ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্শ্ব বা পিছনে এগিয়ে যাওয়ার রণকৌশলের প্রয়োগে। তাই প্রয়োজন উৎকৃষ্ট সৈন্য-শক্তি কেন্দ্রীভূত করা। সুতরাং সৈন্যশক্তির কেন্দ্রীভূতকরণ আর ঘেরাও করার ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্শ্ব বা পিছনে এগিয়ে যাওয়ার রণকৌশলের প্রয়োগ হচ্ছে চলমান যুদ্ধ চালাবার অর্থাৎ বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত। এ সবের লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুকে নির্মূল করা।

(১০৩) জাপানী সৈন্যবাহিনীর শক্তি শুধু যে তার অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে তাই নয়, পরন্তু সে শক্তি নিহিত রয়েছে তার অফিসার ও সৈন্যদের প্রশিক্ষণেও—তার সংগঠনের মাত্রায়, অতীতে পরাজিত না হওয়া থেকে উদ্ভূত তার আত্মবিশ্বাসে, জাপানী সম্রাটের ও দেবতার ওপরে তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসে, তার দাম্ভিকতা ও আত্মমর্যাদায়, চীনা জনগণ সম্পর্কে তার অবহেলায় এবং এ ধরনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে। এ সবই আসে জাপানী যুদ্ধবাজদের দ্বারা কৃত বহু বছরের সমরবাদী শিক্ষা থেকে আর আসে জাপানের জাতীয় ঐতিহ্য থেকে। জাপানী সৈন্যদের প্রচুর সংখ্যককে হতাহত করা সত্ত্বেও আমরা কেন যে অত্যন্ত কম সংখ্যককেই বন্দী করতে পেরেছিলাম, তার মুখ্য কারণ হচ্ছে এইটি। অতীতে অনেকেই এটা উপেক্ষা করেছে। শত্রুর এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধ্বংস করার জন্য দরকার একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার। সর্বপ্রথমে আমাদের দরকার এসব বৈশিষ্ট্যের ওপরে মনোযোগ দেওয়া এবং তারপরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক প্রচার ও জাপানী জনগণের আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে এই বিষয় নিয়ে ধৈর্যশীলভাবে ও সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাওয়া; আর সামরিক ক্ষেত্রে নির্মূলীকরণের লড়াইও হচ্ছে অন্যতম পদ্ধতি। শত্রুর এইসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের ভিত্তি পেতে পারে হতাশাবাদীরা, আবার নির্মূলীকরণের লড়াইয়ের বিরোধিতার ভিত্তি পেতে পারে নিষ্ক্রিয় মনোভাবাপন্ন রণবিশারদরা। কিন্তু এর বিপরীতে, আমরা এইমত পোষণ করি যে, জাপানী সৈন্যবাহিনীর এইসব শ্রেষ্ঠ উপাদানকে ধ্বংস করতে পারা যায় এবং তাদের ধ্বংস ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সেগুলিকে

করার প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে জাপানী সৈন্যদেরকে স্বপক্ষে টেনে নেওয়া। তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত করা থেকে আমাদের বরং উচিত তাদের এই আত্মমর্যাদাকে বোঝা আর সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং যুদ্ধবন্দীদের প্রতি উদার ব্যবহারের দ্বারা জাপানী শাসকদের জনবিরোধী আগ্রাসী নীতির চরিত্রটি বুঝতে জাপানী সৈন্যদেরকে শিক্ষা দেওয়া। অন্যদিকে জাপানী সৈন্যদের সামনে আমাদের প্রদর্শন করা উচিত চীনা সৈন্যবাহিনীর ও চীনা জনগণের অদম্য মনোবল এবং বীরোচিত ও অনমনীয় সংগ্রামী শক্তি। এটাই হচ্ছে নির্মূলীকরণের লড়াইয়ের মাধ্যমে শত্রুদের ওপরে প্রচণ্ড আঘাত হানা। সামরিক কার্যকলাপের গত দশ মাসের আমাদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, শত্রুর সৈন্যশক্তিকে নির্মূল করা সম্ভব—পিংসিংকুয়ান আর তাই-এরচুয়াংয়ের যুদ্ধাভিযানগুলি হচ্ছে এর স্পষ্ট প্রমাণ। জাপানী সৈন্যবাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়তে শুরু করেছে, তার সৈন্যরা যুদ্ধের উদ্দেশ্য বোঝে না, চীনা সৈন্যবাহিনী ও চীনা জনগণের দ্বারা তারা পরিবেষ্টিত, প্রবলবেগে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস চীনা সৈন্যদের তুলনায় তারা অনেক কম দেখায়, ইত্যাদি—এসবই হচ্ছে আমাদের পক্ষে নির্মূলীকরণের লড়াই চালানোর অনুকূল বাস্তব শর্ত, আর সেগুলি আবার যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠার সংগে সংগে দিনের পর দিন বিকশিত হয়ে উঠবে। নির্মূলীকরণের লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে শত্রুবাহিনীর বিহ্বলকর ঔদ্ধত্যকে ধ্বংস করার দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের নির্মূলীকরণের লড়াই হচ্ছে যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করার এবং জাপানী সৈন্যদের ও জাপানী জনগণের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করার শর্তগুলির অন্যতম। বিড়াল বিড়ালের সংগেই বন্ধুত্ব করে, দুনিয়ার কোথাও বিড়াল ইঁদুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না।

(১০৪) অপরপক্ষে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বর্তমানে প্রযুক্তিগত সাজসরঞ্জামে ও সৈন্যদের প্রশিক্ষণে শত্রুর থেকে আমরা নিকৃষ্ট। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে লড়াইটা যখন সমতল ভূমিতে ঘটে, তখন শত্রু-বাহিনীর গোটাটিকে অথবা তার বৃহত্তর অংশকে বন্দী করার মতো চরম মাত্রার নির্মূলীকরণ কঠিন। এই ব্যাপারে দ্রুত বিজয়ের মতবাদীদের অতিরিক্ত দাবিগুলি ভুল। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে সঠিক দাবি এটাই হওয়া উচিত যে, যথাসম্ভব নির্মূলীকরণের যুদ্ধ চালাতে হবে। অনুকূল অবস্থায় প্রতিটি লড়াইয়ে আমাদের উচিত উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা, আর

ঘেরাও করার ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্শ্ব বা পিছনে এগিয়ে যাওয়ার রণকৌশল কাজে লাগানো—শত্রুর যাবতীয় সৈন্যশক্তিকে ঘেরাও করতে না পারলেও তার একটা অংশকে ঘেরাও করতে হবে, পরিবেষ্টিত সৈন্যশক্তির সবটাকে না পারলেও তার একটা অংশকে বন্দী করতে হবে, আর পরিবেষ্টিত সৈন্যশক্তির এক অংশকে বন্দী করতে না পারলেও সেই অংশকে বহুল পরিমাণে হতাহত করতে হবে। নির্মূলীকরণের লড়াইয়ের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের করতে হবে শক্তিক্ষয়ী লড়াই। নির্মূলীকরণের লড়াইয়ে আমাদের উচিত সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার নীতি কাজে লাগানো, আর শক্তিক্ষয়ী লড়াইয়ে আমাদের উচিত সৈন্যশক্তিকে ছড়িয়ে দেওয়ার নীতি কাজে লাগানো। যুদ্ধাভিযানে পরিচালনার সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদের উচিত প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত পরিচালনার নীতি, আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকৃত পরিচালনার নীতি প্রয়োগ করা। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রণক্ষেত্রে এইসবই হচ্ছে সামরিক কার্যকলাপের মৌলিক নীতিমালা।

শত্রুর ভুলত্রুটির সুযোগ নেওয়ার সম্ভাব্যতা

(১০৫) শত্রুকে পরাজিত করার সম্ভাব্যতার ভিত্তি রয়েছে শত্রুর পরিচালনার ক্ষেত্রেও। কোন ভুল করেনি এমন সেনাপতি ইতিহাসে কোনদিনই ছিল না। আমরা নিজেরা যেমন ভুল করা এড়াতে পারি না, শত্রুও ঠিক তেমনই ভুল করে। তাই শত্রুর ভুলত্রুটির সুযোগ নেওয়ার সম্ভাব্যতা থেকে যায়। রণনীতি ও যুদ্ধাভিযানের দিক থেকে বলতে গেলে, আগ্রাসী যুদ্ধের দশ মাসে শত্রু ইতিমধ্যেই অনেক ভুল করে বসেছে। এর মধ্যে পাঁচটা ভুল গুরুতর।

প্রথমতঃ, সৈন্যশক্তি অল্প অল্প করে আনা। এর কারণ চীন সম্পর্কে শত্রুর উপেক্ষা আর তার নিজের সৈন্যস্বল্পতাও বটে। শত্রু সর্বদাই আমাদের ছোট মনে করে। স্বল্প আয়াসে চারটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশকে ছিনিয়ে আত্মসাৎ করে নেবার পরে সে পূর্ব হোপেই ও উত্তর চাহার দখল করে। এসবকে শত্রুর রণনীতিগত পর্যবেক্ষণ হিসেবে গণ্য করা যায়। এর মাধ্যমে শত্রু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, চীনা জাতি হচ্ছে একটা আলগা বালির স্তূপ। তাই, একটামাত্র আঘাতেই চীন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে ভেবে শত্রু তথাকথিত 'দ্রুত নিষ্পত্তির' একটা

পরিকল্পনা রচনা করেছিল, আর অত্যন্ত কম সৈন্যশক্তি নিয়ে চেষ্টা করেছিল আমরা যাতে ভয়ে ইতস্ততঃ ছুটে পালাই। বিগত দশ মাসে চীন যে প্রচণ্ড ঐক্য ও বিপুল প্রতিরোধ শক্তি দেখিয়েছে, তা সে ভাবেনি। সে ভুলে গিয়েছিল যে, চীন ইতিপূর্বে প্রগতির যুগে এসে গেছে; এবং তার রয়েছে একটি অগ্রণী পার্টি, একটি অগ্রণী সৈন্যবাহিনী ও অগ্রণী জনগণ। বাধাবিপত্তির মুখে পড়ে সে তখন তার সৈন্যশক্তিকে একটু একটু করে বাড়াল —সৈন্যসংখ্যা দশাধিক ডিভিসন থেকে বাড়িয়ে ত্রিশ ডিভিসনে তুলল। যদি সে আরও এগুতে চায় তাহলে সৈন্যসংখ্যা তার আরও বাড়াতে হবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে শত্রুতার কারণে এবং তার নিজের জনবল ও অর্থবলের স্বল্পতার কারণে যে বৃহত্তম সংখ্যক সৈন্য সে চীনে নিয়োগ করতে পারে এবং তার অগ্রগমনের যে দূরতম বিন্দু অবধি সে যেতে পারে, তার একটা অনিবার্য সীমারেখা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, আক্রমণের মুখ্য গতিমুখের অভাব। তাইএরচুয়াং যুদ্ধাভিযানের আগে শত্রু তার সৈন্যশক্তিকে মোটামুটি সমান সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল মধ্য চীন ও উত্তর চীনের মধ্যে, আর দুই এলাকার অভ্যন্তরেও আবার সমানভাবে সৈন্যশক্তি ভাগ করে দিয়েছিল। যেমন, উত্তর চীনে তার সৈন্যশক্তিকে সে তিয়েনসিন-পুখৌ, পিপিং-হানখৌ আর তাতুং-পুচৌ —এই তিনটি রেলপথের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছিল। এই পথ-গুলির প্রত্যেকটির সৈন্য কিছু হতাহত হয়েছে, আর অধিকৃত এলাকায় সে কিছু রক্ষী সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছে। এ সবের ফলে আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্যশক্তি তার থাকল না। তাইএরচুয়াংয়ের পরাজয়ে শত্রু শিক্ষালাভ করে তার মুখ্য সৈন্যশক্তিকে স্যুচৌয়ের অভিমুখে সমাবেশ করেছে আর এইভাবে এই ভুলটিকে সাময়িকভাবে শুধরে নিয়েছে।

তৃতীয়তঃ, রণনীতিগত সমন্বয়সাধনের অভাব। মধ্য চীনে ও উত্তর চীনে শত্রুবাহিনীর গ্রুপ দুটির প্রত্যেকটির ভেতরে মোটামুটিভাবে সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু এই দুটির মধ্যে সমন্বয়ের খুবই অভাব। তিয়েনসিন-পুখৌ রেলপথের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত শত্রুবাহিনী যখন পিয়াওপাংপু আক্রমণ করছিল, তখন উত্তর অংশে অবস্থিত শত্রুবাহিনী নিষ্ক্রিয় ছিল; আবার উত্তর অংশে অবস্থিত শত্রুবাহিনী যখন তাইএরচুয়াং আক্রমণ করছিল, তখন দক্ষিণ অংশে অবস্থিত শত্রুবাহিনী নিষ্ক্রিয় ছিল। উত্তর

ক্ষেত্রেই শত্রু দুর্দশায় পড়ার পরে, জাপানের স্থলবাহিনীর মন্ত্রী পরিদর্শন-সফরে এসে পৌঁছেছিল, আর নেতৃত্বভার গ্রহণের জন্য ছুটে এসেছিল চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ। এর ফলে কোনরকমে সাময়িকভাবে সমন্বয়সাধন হয়েছে। জাপানের জমিদার, বুর্জোয়াশ্রেণী এবং যুদ্ধবাজদের ভেতরে বেশ গুরুতর দ্বন্দ্ব রয়েছে, এ ধরনের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ বাড়ছে, আর সামরিক সমন্বয়ের অভাব সেই দ্বন্দ্বেরই বাস্তব অভিব্যক্তিগুলির অন্যতম।

চতুর্থতঃ, রণনীতিগত সুবিধাসুযোগকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে ব্যর্থতা। নানকিং আর তাইয়ুয়ান দখল করে নেবার পরে শত্রুর বিরতিতে এই ব্যর্থতা সুস্পষ্টভাবে প্রকট হয়েছিল। এটা ঘটেছিল মুখ্যতঃ তার সৈন্যশক্তির স্বল্পতা ও রণনীতিগত পশ্চাদ্ধাবনকারী সৈন্যবাহিনীর অভাবের কারণে।

পঞ্চমতঃ, বিরাট সংখ্যক পরিবেষ্টন অথচ স্বল্প সংখ্যক নির্মূলীকরণ। তাইএরচুয়াং যুদ্ধাভিযানের আগে, শাংহাই, নানকিং, ছ্যাংচৌ, পাওতিং, নানখৌ, সিনখৌ আর লিনফেনের যুদ্ধাভিযানগুলিতে বহু চীনা বাহিনীকে পরাজিত করা হয়েছিল, কিন্তু বন্দী করা হয়েছিল সামান্যই। এটা শত্রুর পরিচালনার মূর্খতারই প্রমাণ।

এই পাঁচটি ভুল—সৈন্যশক্তি অল্প অল্প করে আনা, আক্রমণের মুখ্য গতিমুখের অভাব, রণনীতিগত সমন্বয়সাধনের অভাব, সুবিধাসুযোগকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে ব্যর্থতা এবং বিরাট সংখ্যক পরিবেষ্টন অথচ স্বল্প সংখ্যক নির্মূলীকরণ—ছিল তাইএরচুয়াং যুদ্ধাভিযানের আগে জাপানী পরিচালনার অযোগ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ। তাইএরচুয়াং যুদ্ধাভিযানের পর শত্রু কিছুটা উন্নতিসাধন করেছে, কিন্তু তবুও তার সৈন্যসংখ্যার স্বল্পতা, তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য কারণের দরুন ভুলের পুনরাবৃত্তি সে এড়াতে পারে না। উপরন্তু, এক জায়গায় যদিও সে কিছু লাভ করে, অন্য জায়গায় সে আবার কিছু খুইয়ে বসে। যেমন, উত্তর চীনে অবস্থিত তার সৈন্যশক্তিকে সে যখন স্যুচৌয়ে সমাবেশ করেছিল, তখন উত্তর চীনের অধিকৃত এলাকায় সে একটা বিরাট ফাঁক রেখেছিল, আর তাই গেরিলাযুদ্ধকে বিকশিত করে তোলার পূর্ণ সুযোগ আমাদের দিয়েছিল। এইসব ভুলত্রুটিগুলি কিন্তু শত্রুর নিজেরই সৃষ্টি, আমাদের দ্বারা প্ররোচিত নয়। আমাদের দিক থেকে, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে শত্রুকে দিয়ে ভুলত্রুটি করাতে পারি, অর্থাৎ সুসংগঠিত জনসাধারণের সহায়তায়

বুদ্ধিমত্তার ও কার্যকরী চালের মাধ্যমে শত্রুর মধ্যে ভ্রান্ত অনুভবের সৃষ্টি করতে পারি, আর কৌশলে তাকে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী চলতে বাধ্য করতে পারি, যেমন, 'পূর্বদিকে আক্রমণের ভান করে পশ্চিমদিকে আক্রমণ করার' মতো পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করতে পারি। এর সম্ভাবনার কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ওপরের এ সবকিছু এটাই প্রমাণ করে যে, শত্রুর পরিচালনার মধ্যেও আমরা আমাদের বিজয়ের কিছু ভিত্তি পেতে পারি। অবশ্য, রণনীতিগত পরিকল্পনার জন্য তাকে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে ধরা আমাদের উচিত হবে না, বরং—শত্রু স্বল্প সংখ্যক ভুলত্রুটি করবে—এই অনুমানের ওপরে আমাদের পরিকল্পনাকে স্থাপন করাই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য পথ। তাছাড়া, আমরা যেমন শত্রুর ভুলত্রুটির সুযোগ নিয়ে তা আমাদের কাজে লাগাতে পারি, শত্রুও তেমনি আমাদের ভুলত্রুটির সুযোগ নিয়ে তা তাদের কাজে লাগাতে পারে। তাই শত্রুকে এমন সুযোগ যথাসম্ভব কম দেওয়াই হচ্ছে আমাদের পরিচালনার কর্তব্য। তবু বস্তুতঃ, শত্রুর পরিচালনায় ভুল হয়েছিল, এবং ভবিষ্যতে আবারও ভুল ঘটবে, আর আমাদের প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে তাকে তেমন করতে আমরা বাধ্যও করতে পারি। এইসব ভুলত্রুটির সুযোগ আমরা নিতে পারি। সেগুলিকে কাজে লাগাবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা করা হচ্ছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের সেনাপতিদের কাজ। যাই হোক, শত্রুর রণনীতিগত ও যুদ্ধাভিযানগত পরিচালনার অনেকটাই অযোগ্য হলেও, তার লড়াই পরিচালনায় অর্থাৎ তার ইউনিট ও ক্ষুদ্রাকার সৈন্যসংস্থানের রণকৌশলে বেশ কিছু চমৎকার বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। এ ক্ষেত্রে তার কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে নির্ধারক লড়াইয়ের প্রশ্ন

(১০৬) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে নির্ধারক লড়াইয়ের প্রশ্নটিকে তিন দিক থেকে বিচার করে দেখতে হবে: যে যুদ্ধাভিযানে বা লড়াইয়ে জয় সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত, তেমন প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের উচিত দৃঢ়ভাবে নির্ধারক লড়াই চালানো, যে যুদ্ধাভিযানে বা লড়াইয়ে জয় সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই, তেমন প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের উচিত নির্ধারক লড়াইকে এড়ানো; আর যে রণনীতিগত নির্ধারক লড়াইয়ে গোটা জাতির ভাগ্য বাজি রাখা হয় এমন লড়াইকে আমাদের নিশ্চয়ই এড়ানো উচিত। অন্যান্য

অনেক যুদ্ধের থেকে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পার্থক্য প্রকাশ পায় নির্ধারক লড়াইয়ের এই প্রশ্নেও। যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন শত্রু শক্তিশালী আর আমরা দুর্বল, তখন শত্রু চায় যাতে আমরা আমাদের মুখ্য সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে তাদের সংগে নির্ধারক লড়াই লড়ি। আর আমরা যা চাই তা ঠিক এর বিপরীত, আমাদের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ বাছাই করে, উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করে আর জয় সম্পর্কে যখন আমরা নিশ্চিত, শুধু তখনই নির্ধারক যুদ্ধাভিযান বা লড়াই চালাতে আমরা চাই। যেমন, পিংসিংকুয়ান, তাইএরচুয়াং আর অন্যান্য অনেক জায়গার লড়াইয়ে করেছিলাম; প্রতিকূল পরিবেশে আমরা যখন জয় সম্পর্কে নিশ্চিত নই, তখন আমরা চাই নির্ধারক লড়াইকে এড়াতে, যেমন চাংতে ও অন্যান্য জায়গার যুদ্ধাভিযানে এ নীতিই আমরা গ্রহণ করেছিলাম। আর রণনীতিগতভাবে যে নির্ধারক লড়াইয়ে গোটা জাতির ভাগ্যকে বাজি রাখা হয়, তেমন লড়াই আমরা অবশ্যই লড়ব না। যেমন সাম্প্রতিক স্যুচৌ থেকে পশ্চাদপসরণ। এইভাবে শত্রুর 'দ্রুত নিষ্পত্তির' পরিকল্পনাকে বানচাল করা হল, আর তখন আমাদের সংগে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ না লড়ে সে আর পারে না। ভূ-আয়তন যার ছোট, তেমন দেশে এ ধরনের নীতি অকাযকর, আবার রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ দেশেও এগুলি কার্যকরী করা কঠিন। এগুলি চীনে কার্যকর, কারণ চীন হচ্ছে বিরাট দেশ আর এখন সে রয়েছে তার প্রগতির যুগে। যদি রণনীতিগতভাবে নির্ধারক লড়াই এড়িয়ে যেতে পারি, তাহলে আমরা নিজের শক্তি সংরক্ষণ করতে পারব—'সবুজ পাহাড় যত দিন আছে, জ্বালানি কাঠের চিন্তা নেই'। আমাদের কতকগুলি এলাকা খোয়া গেলেও কৌশলী অভিযানের জন্য তখনো আমাদের প্রচুর বিস্তৃত এলাকা থাকবে। আর এইভাবেই আমরা সমর্থ হব দেশের আভ্যন্তরীণ প্রগতি ও আন্তর্জাতিক সাহায্যের বৃদ্ধি এবং শত্রুর আভ্যন্তরীণ সংহতির ভাঙনকে ত্বরান্বিত করতে, এবং তার জন্য প্রতীক্ষা করতে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের পক্ষে সেটাই হচ্ছে সেরা নীতি। দ্রুত বিজয়ের ধৈর্যহীন মতবাদীরা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কঠোর দুর্দশা সইতে অক্ষম আর শীঘ্র জয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষী। পরিস্থিতিটি যে মুহূর্তে একটু অনুকূল মোড় নেয়, তখনই তারা রণনীতিগতভাবে নির্ধারক লড়াইয়ের জন্য চেঁচায়। তারা যা চায় তাই করা হলে গোটা যুদ্ধের অভাবনীয় ক্ষতি-সাধন করা হবে, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, আর শত্রুর মরণ-ফাঁদে

আমরা পড়ে যাব। সত্যিই সেটা হবে সবচেয়ে খারাপ নীতি। নির্ধারক লড়াই যদি আমরা এড়াতে চাই, তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের ভূখণ্ড ছাড়তে হবে। ভূখণ্ড ছাড়াটা যখন একেবারে অপরিহার্য হয়ে ওঠে তখন (এবং একমাত্র তখনই) আমাদের দ্বিধাহীনভাবে ভূখণ্ড ছাড়তে হবে। এমন সময়ে সামান্যতম ইতস্ততঃ করাও আমাদের উচিত নয়; কারণ এটা হচ্ছে সময় পাওয়ার জন্য জমি দেওয়ার সঠিক নীতি। ইতিহাসে নির্ধারক লড়াই এড়াবার জন্য রাশিয়া সাহসের সংগে পশ্চাদপসরণ করেছিল এবং এভাবে যুগ-ত্রাস নেপোলিয়নকে পরাভূত করেছিল[৩৬]। আজ চীনেরও তেমন করা উচিত।

(১০৭) 'অ-প্রতিরোধী' হিসেবে নিন্দিত হবার ভয়ে আমরা কি ভীত নই? না, আমরা ভীত নই। আদৌ যুদ্ধ না করা, শত্রুর সংগে আপোষ করা—সেটাই হচ্ছে অপ্রতিরোধবাদ। তাকে যে শুধু নিন্দা করা উচিত তাই নয়, পরন্তু তাকে কোনমতেই বরদাস্ত করা চলবে না? আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাই; কিন্তু শত্রুর মরণ-ফাঁদটিকে এড়াবার উদ্দেশ্যে, আমাদের বাহিনীর মুখ্য শক্তিকে শত্রুর একটিমাত্র আঘাতে শেষ হয়ে যেতে না দেওয়ার জন্য, এবং এইভাবে যাতে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে কঠিন না হয়ে ওঠে সেজন্য—সংক্ষেপে বলতে গেলে, জাতীয় পরাধীনতাকে এড়াবার জন্য রণনীতিগত নির্ধারক লড়াই এড়ানো একেবারেই অপরিহার্য। এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে যুদ্ধের ব্যাপারে অদূরদর্শী হওয়া, আর এমন করার ফল হবে অবশ্যই নিজেকে জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীদের দলে নিয়ে যাওয়া। 'শুধু অগ্রসরণ, কখনই নয় পশ্চাদপসরণের' বেপরোয়া হঠকারিতার সমালোচনা আমরা করেছিলাম, কারণ, এ ধরনের বেপরোয়া হঠকারিতা যদি রেওয়াজ হয়ে উঠত, তাহলে সেটা আমাদের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াকে অসম্ভব করে তুলত এবং শেষে আমাদের জাতীয় পরাধীনতার বিপদের মুখে ফেলে দিত।

(১০৮) অনুকূল পরিবেশে আমরা নির্ধারক লড়াইয়ের পক্ষে, তা সে লড়াইয়েই হোক, কিংবা বড় বা ছোট যুদ্ধাভিযানেই হোক। এ ব্যাপারে আমরা কোনমতেই নিষ্ক্রিয়তাকে বরদাস্ত করব না। শুধুমাত্র এই ধরনের নির্ধারক লড়াইয়ের মাধ্যমেই আমরা অর্জন করতে পারি শত্রুর সৈন্যশক্তির নির্মূলীকরণের অথবা শক্তিক্ষয়করণের লক্ষ্য, আর জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে প্রতিটি সৈন্যকে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে এ ধরনের লড়াই চালাতে হবে। 'এই

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রভূত পরিমাণ আংশিক আত্মত্যাগ প্রয়োজন। যারা কাপুরুষ আর যারা জাপানের ভয়ে জর্জরিত, তাদের মনোভাব হচ্ছে যে-কোন-রকমের আত্মত্যাগ এড়ানো। অবশ্য দৃঢ়ভাবে এ মনোভাবের বিরোধিতা করতে হবে। লি ফু-ইং, হান ফু-চ্যু ও অন্যান্য পলায়নবাদীদের মৃত্যুদণ্ড ন্যায়সঙ্গত ছিল। সঠিক সামরিক কার্যকলাপের পরিকল্পনায় ভিত্তিতে যুদ্ধে শৌর্যদৃপ্ত আত্মত্যাগ এবং বীরত্বপূর্ণ অগ্রসরণের মনোবৃত্তি ও কার্যকলাপকে উৎসাহ দান হচ্ছে একান্ত অপরিহার্য আর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের চালনা ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের সংগে অবিচ্ছেদ্য। আমরা 'শুধু পশ্চাদপসরণ, কখনই নয় অগ্র-সরণের' পলায়নবাদের কঠোর নিন্দা করেছি আর শৃংখলানিষ্ঠার প্রবর্তনকে সমর্থন করেছি, কারণ সঠিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে বীরত্বপূর্ণ নির্ধারক লড়াইয়ের ভেতর দিয়েই শুধু আমরা পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাভূত করতে পারি; পক্ষান্তরে পলায়নবাদীরা জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বে প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন যোগায়।

(১০৯) প্রথমে বীরত্বপূর্ণভাবে লড়া এবং পরে ভূখণ্ড ছেড়ে আসা কি পরস্পরবিরোধী নয়? আমাদের বীর যোদ্ধাদের কি তাতে বৃথাই নিজেদের রক্তপাত করা হবে না? প্রশ্নগুলিকে উপস্থাপিত করার পদ্ধতি এটি আদৌ নয়। খাওয়া আর তারপরেই মলত্যাগ করা, এটা কি বৃথাই খাওয়া নয়? ঘুমানো আর তারপরেই জেগে ওঠা, এটা কি বৃথাই ঘুমোনো নয়? প্রশ্নগুলিকে কি এভাবে উপস্থাপিত করা যায়? আমি তো মনে করি, তা যায় না। অনবরত খেয়ে চলা, সর্বদা ঘুমিয়ে থাকা, বীরত্বপূর্ণভাবে লড়তে লড়তে না থেমে ইয়ালু নদী অবধি সারাটি পথ আসা, এসবই হচ্ছে আত্মমুখী আর আনুষ্ঠানিকতাবাদী কল্পনা, জীবনের বাস্তবতা নয়। প্রত্যেকেই যেমন জানে, সময় পাবার জন্য এবং পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নেবার জন্য রক্ত ঢেলে লড়াই করেও কিছু ভূখণ্ড আমাদের ছেড়ে দিতে হয়েছে, তবুও আমরা সময় পেয়েছি, শত্রুর সৈন্যশক্তির নির্মূলীকরণের ও শক্তিক্ষয়করণের লক্ষ্য অর্জন করেছি, যুদ্ধ চালনার অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করেছি, অসচেতন জনগণকে আমরা জাগিয়ে তুলেছি, আর আমাদের আন্তর্জাতিক মর্যাদাকে বাড়িয়েছি। আমাদের রক্ত ঢালা কি বৃথাই গেছে? নিশ্চয় নয়। জমি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল আমাদের সামরিক শক্তিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, এবং জমি রক্ষা করার জন্যও বটে; কারণ প্রতিকূল অবস্থায় যদি জমির কিছু অংশ আমরা ছেড়ে না দিই, পরন্তু জয়লাভের ন্যূনতম নিশ্চয়তা ছাড়াই আমরা যদি অন্ধভাবে

নির্ধারক লড়াই লড়ি, তাহলে আমরা আমাদের সামরিক শক্তি খোয়ানোর পর আমাদের যাবতীয় জমিই অবশ্যম্ভাবীরূপে খুইয়ে বসব; হৃত জমি পুনরুদ্ধারের কথা তো বলারই নয়। ব্যবসা চালানোর জন্য পুঁজিপতির অবশ্যই পুঁজি থাকতে হবে, সে যদি তার সবটা পুঁজিই খুইয়ে বসে তাহলে সে আর তখন পুঁজিপতি থাকবে না। এমনকি বাজি ধরার জন্য জুয়াড়ীরও অবশ্যই টাকা থাকতে হয়, তার সবটা টাকাই যদি সে একটিমাত্র দানে ধরে বসে এবং ভাগ্য যদি তার বিরূপ হয়, তাহলে সে আর জুয়া খেলতে পারে না। ঘটনাপ্রবাহ আঁকাবাঁকা ও আবর্তন-বিবর্তনমূলক, আর ঘটনাপ্রবাহ সোজা সরল পথরেখা ধরে চলে না। যুদ্ধও কোন ব্যতিক্রম নয়। শুধু আনুষ্ঠানিকতাবাদীরাই এই সত্যকে উপলব্ধি করতে অসমর্থ।

(১১০) আমি মনে করি, রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে নির্ধারক লড়াইয়ের ব্যাপারেও এই একই কথা খাটবে। তখন শত্রু এসে পড়বে নিকৃষ্ট অবস্থিতিতে আর আমরা পৌঁছে যাব উৎকৃষ্ট অবস্থিতিতে। তা সত্ত্বেও 'সুবিধাজনক নির্ধারক লড়াইগুলি লড়ার আর অসুবিধাজনক নির্ধারক লড়াইগুলিকে এড়ানোর' নীতি তখনো খাটবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ইয়ালু নদীর তীরে লড়তে লড়তে পৌঁছাই, ততক্ষণ পর্যন্ত এই নীতি খাটবে। এইভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের উদ্যোগ বজায় রাখতে সক্ষম হব। শত্রুর 'চ্যালেঞ্জ' আর অন্য লোকজনের 'বিদ্রূপমূলক প্ররোচনাকে' আমাদের উত্তেজনাহীনভাবে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া উচিত, সেগুলিকে উপেক্ষা করা উচিত। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে যেসব সেনাপতি এ ধরনের দৃঢ়তা দেখায়, শুধু তাদেরই সাহসী ও বিজ্ঞ বলে মনে করা যেতে পারে। 'ছুঁলেই লাফিয়ে ওঠে' যারা, এটি তাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আমরা কম-বেশি রণনীতিগতভাবে নিষ্ক্রিয় অবস্থানে থাকি, কিন্তু প্রতিটি যুদ্ধাভিযানে আমাদের উদ্যোগ থাকা উচিত, আর পরবর্তী সমস্ত পর্যায়ে উদ্যোগ অবশ্যই থাকা উচিত আমাদের হাতে। আমরা হচ্ছি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও চূড়ান্ত বিজয়ের পক্ষে। যে জুয়াড়ী একটিমাত্র দানেই তার সবকিছু বাজি ধরে বসে তেমন জুয়াড়ী আমরা নই।

সৈন্যবাহিনী ও জনগণ হচ্ছেন জয়ের ভিত্তি

(১১১) বিপ্লবী চীনের ওপর জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কোনরকমেই তার

আক্রমণে ও দমনে শিথিলতা দেখাবে না। তার সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতির দ্বারা এটি নির্ধারিত। চীন যদি প্রতিরোধ না করত, তাহলে জাপান একটা গুলি না ছুঁড়েই সহজেই গোটা চীনকে কব্জা করে নিত, চারটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশ হচ্ছে তারই উদাহরণ। চীন যদি প্রতিরোধ করে, তাহলে জাপান এই প্রতিরোধকে দমন করার চেষ্টা করবে, চীনের প্রতিরোধশক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে যতদিন সে ব্যর্থ না হবে ততদিন চেষ্টা করবে, এটা একটা অনিবার্য বিধি। জাপানী জমিদার ও বুর্জোয়াশ্রেণী অত্যন্ত দুরাকাঙ্ক্ষী। দক্ষিণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওপর, আর উত্তরে সাইবেরিয়ার ওপর আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে তারা মধ্য-ভাগে ভেদ করার নীতি গ্রহণ করে প্রথমে চীনের ওপর আক্রমণ করেছে। যারা মনে করে যে, উত্তর চীন, কিয়াংসু ও চেকিয়াং প্রদেশ দখল করে নিয়েই জাপান তুষ্ট হয়ে থেমে যাবে, তারা এটা উপলব্ধি করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয় যে, সাম্রাজ্যবাদী জাপান একটা নতুন পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে এবং ধ্বংসের মুখে থেয়ে চলেছে, আর অতীতের জাপান থেকে সে হচ্ছে ভিন্ন রকমের। আমরা যখন বলি যে, জাপানের সৈন্য নিয়োগের ও অগ্রসর হওয়ার দুয়েরই একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, তখন আমরা এটাই বোঝাই যে, জাপান তার প্রাপ্তিসাধ্য শক্তির ভিত্তিতে শুধু নির্দিষ্ট পরিমাণের সৈন্যশক্তিকে চীনের বিরুদ্ধে পাঠাতে পারে, আর তার শক্তিসামর্থ্যে যতটা কুলোয় ঠিক ততদূরই তারা চীনের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে, কারণ জাপানকে অন্যান্য দিকেও আক্রমণ চালাতে এবং অন্যান্য শত্রুর থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে হয়, সেই একই সময়ে চীন প্রমাণ দিয়েছে তার প্রগতির আর তার বজ্রকঠোর প্রতিরোধের শক্তিসামর্থ্যের, এবং কেউই এটা কল্পনা করতে পারে না যে, শুধু জাপানই তীব্র আক্রমণ চালাতে থাকবে, আর এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য চীনের প্রয়োজনীয় শক্তি থাকবে না। গোটা চীনকে জাপান দখল করতে পারবে না, কিন্তু যে অঞ্চলগুলিতে সে পৌঁছাতে পারবে, সেইসব অঞ্চলে চীনের প্রতিরোধকে দমন করার জন্য সে কোন চেষ্টাই বাদ দেবে না, আর দেশী ও বিদেশী ঘটনাপরম্পরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে ঠেলে তার কবরের মুখে না নিয়ে যাওয়া অবধি জাপান তার দমনকে থামাবে না। জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাত্র দুটি সম্ভাব্য পথ রয়েছে: হয় তার গোটা শাসকশ্রেণীর পতন তাড়াতাড়ি ঘটবে, রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে চলে যাবে এবং এইভাবে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে, কিন্তু বর্তমানে সেটা অসম্ভব; আর না হয় তার জমিদার

ও বুর্জোয়াশ্রেণী অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠবে এবং তাদের পতনের দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালু রাখবে, যেটি হচ্ছে ঠিক সেই পথ যে পথে জাপান এখন চলছে। এগুলি ছাড়া আর কোন তৃতীয় পথ নেই। যারা আশা করে যে, জাপানী বুর্জোয়াশ্রেণীর ভেতরকার উদারপন্থীরা এগিয়ে এসে যুদ্ধটিকে থামাবে, তারা শুধু কল্পনাই করছে। জাপানের বুর্জোয়াশ্রেণীর উদারপন্থীরা ইতিমধ্যেই জমিদার ও ধনকুবেরদের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছে, এটা হচ্ছে বহু বছর ধরে জাপানী রাজনীতির বাস্তবতা। চীনের বিরুদ্ধে জাপান আক্রমণ শুরু করার পর, প্রতিরোধ-যুদ্ধের মাধ্যমে চীন যদি জাপানের ওপর মারাত্মক আঘাত না দেয় এবং জাপানের হাতে যথেষ্ট শক্তি বজায় থাকে, তাহলে সে অবশ্যই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে বা সাইবেরিয়াকে অথবা এমনকি উভয়কেই আক্রমণ করবে। একবার ইউরোপে যুদ্ধ বেধে গেলে সে তাই করবে। তাদের খুশিমাফিক পূর্ব-হিসেবে জাপানের শাসকরা আড়ম্বরভরা মাত্রায় তার হিসেব করে রেখেছে। অবশ্যই এটা সম্ভব যে: সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবলতার কারণে এবং চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে জাপান নিজে গুরুতর পরিমাণে দুর্বল হওয়ার কারণে সাইবেরিয়া আক্রমণ করার গোড়ার পরিকল্পনাটি হয়ত জাপান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে, আর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি জাপান একটা মৌলিকভাবে প্রতিরক্ষাত্মক মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু এমন পরিস্থিতি ঘটলেও, চীনের বিরুদ্ধে তার আক্রমণে ঢিলে দেওয়া তো দূরের কথা, বরং সেই আক্রমণকে জাপান আরও তীব্র করে তুলবে, কারণ তখন তার সামনে একটিমাত্র পথই থাকবে, আর সেটি হবে দুর্বলকে গ্রাস করা। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ, যুক্তফ্রন্ট ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার চীনের কর্তব্যটি তখন হয়ে ওঠে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আর আমাদের প্রচেষ্টাকে সামান্যতম মাত্রায়ও শিথিল না করাটাই হয়ে ওঠে আরও বেশি অপরিহার্য।

(১১২) এই পরিবেশে জাপানের বিরুদ্ধে চীনের বিজয়ের মুখ্য শর্ত হচ্ছে দেশজোড়া ঐক্য আর সর্বক্ষেত্রে অতীতের থেকে দশ বা একশ গুণের বেশি মাত্রার প্রগতি। চীন ইতিমধ্যেই প্রগতির যুগে পৌঁছেছে এবং মহান ঐক্য অর্জন করেছে, কিন্তু এখনো এই প্রগতি ও ঐক্য মোটেই যথেষ্ট নয়। জাপান যে এতটা বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছে, সেটা শুধু তার শক্তির জোরেই নয়, পরন্তু তা হচ্ছে চীনের দুর্বলতার কারণেও বটে। এই দুর্বলতা পুরোপুরিই

হচ্ছে বিগত একশ বছরের, বিশেষ করে বিগত দশ বছরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভুলগুলোর পুঞ্জীভূত পরিণতি। আর ফলে চীনের প্রগতি তার বর্তমান চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে এবং ব্যাপকভাবে প্রচেষ্টা না চালালে এমন শক্তিশালী শত্রুকে এখন পরাজিত করা অসম্ভব। এমন অনেক কাজ আছে যেগুলি করার জন্য আমাদের নিজেদেব সচেষ্ট হতে হবে, এখানে আমি শুধু দুটি মৌলিক দিক নিয়ে আলোচনা করব—সৈন্যবাহিনীর প্রগতি ও জনগণের প্রগতি।

(১১৩) সৈন্যবাহিনীর আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তিগত সাজসরঞ্জামেব উন্নয়ন ছাড়া আমাদের সামরিক ব্যবস্থার সংস্কারসাধন কবা অসম্ভব। এইসব ছাড়া আমরা শত্রুকে ইয়ালু নদীর পরপারে তাড়িয়ে দিতে পারি না। সৈন্য-বিনিয়োগে আমাদেব দরকাব প্রগতিশীল ও নমনীয় বণনীতি এবং রণকৌশল। এ ছাড়া আমবা বিজয়লাভ কবতে পাবি না। তবুও, সৈন্যবাহিনীব ভিত্তি হচ্ছে সৈনিক, প্রগতিশীল বাজনৈতিক প্রেরণাব দ্বাবা সৈন্যবাহিনীকে অনুপ্রাণিত না করলে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক কাজ না চালালে, অফিসার ও সৈনিকদেব মধ্যে সত্যিকাবেব ঐক্য অর্জন কবা অসম্ভব হবে, অসম্ভব হবে জাপ-বিরোধী প্রতিবোধ-যুদ্ধের অনুকূলে অফিসাব ও সৈনিকদের উৎসাহকে সর্বাধিক মাত্রায় উদ্দীপিত করা, সমস্ত প্রযুক্তি ও বণকৌশল যথাযথভাবে কাজে লাগানাব জন্য শ্রেষ্ঠতম ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কবা। আমবা যখন বলি যে, প্রযুক্তি-গত উৎকৃষ্টতা সত্ত্বেও পরিশেষে জাপান পবাজিত হবে, তখন আমরা এটাই বোঝাই যে, নির্মূলীকবণ ও শক্তিক্ষয়করণেব ভেতর দিযে যেসব আঘাত আমরা হানি, সেগুলি ছাড়াও শত্রুবাহিনীর মনোবল পবিশেষে আমাদের আঘাতে নডবড়ে হয়ে পডবেই, এবং শত্রুবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রও অবিশ্বস্ত লোকদের হাতে রয়েছে। আমবা ঠিক তার বিপরীত, আমাদেব অফিসার ও সৈনিকরা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধেব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ব্যাপাবে একমত। এতেই রয়েছে যাবতীয় জাপ-বিরোধী বাহিনীর মধ্যেকাব রাজনৈতিক কাজ চালাবাব ভিত্তি। একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় গণতন্ত্র সৈন্যবাহিনীতে কার্যকরী করতে হবে, প্রধানতঃ সামন্ততান্ত্রিক মারধোর, গালাগালের ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়া এবং অফিসার ও সৈনিকদের একসঙ্গে সুখ-দুঃখের ভাগ নেওয়া। এমনি করলেই অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে ঐক্য অর্জিত হবে, সৈন্যবাহিনীর সংগ্রামী শক্তি প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যাবে এবং দীর্ঘ ও নির্মম যুদ্ধে আমরা যে

টিকতে পারব, তাতে কোন সন্দেহ থাকবে না।

(১১৪) যুদ্ধের মহান শক্তির গভীরতম উৎস নিহিত রয়েছে জনসাধারণের মধ্যে। জাপান যে আমাদের লাঞ্ছিত করতে সাহস পায়, তার প্রধান কারণ হল চীনা জনসাধারণের অসংগঠিত অবস্থা। এই ত্রুটি দূর করলেই আগুনের আবেষ্টনীতে ঢুকে পড়া একটা বুনো ষাঁড়ের মতো জাপানী আক্রমণকারীরা আমাদের কোটি কোটি জাগ্রত জনগণের সম্মুখীন হবে, আমাদের কণ্ঠস্বরের নিছক আওয়াজই তার মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করবে এবং এই বুনো ষাঁড়টা অবশ্যই পুড়ে মরবে। আমাদের সৈন্যবাহিনীর জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে নতুন সৈন্য ভর্তি করতে হবে। জোর করে ধরে সৈন্য হিসেবে ভর্তি করা ও ক্রয় করে সৈন্য হিসেবে ভর্তি করার[৩৭] যে অদ্ভুত পদ্ধতিগুলি এখন নীচের দিকে প্রয়োগ করা হচ্ছে, অবিলম্বে সেটাকে অবশ্যই নিষিদ্ধ করতে হবে, আর সেগুলিকে ব্যাপক-বিস্তৃত ও প্রবল উদ্যমভরা রাজনৈতিক প্রচারের দ্বারা বদলে দিতে হবে, এই-ভাবে লাখ লাখ লোককে সৈন্যদলে ভর্তি করে নেওয়া সহজ হবে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য টাকা তোলার ব্যাপারে প্রচণ্ড অসুবিধা রয়েছে, কিন্তু জনসাধারণকে একবার সক্রিয় করা হলে আর্থিক ব্যাপারেও আর সমস্যা থাকবে না। চীনের মতো সুবিশাল ও জনবহুল একটা দেশের টাকার অভাব হবে কেন? সৈন্যবাহিনীকে অবশ্যই জনসাধারণের সংগে এক হয়ে মিশে যেতে হবে, যাতে করে জনসাধারণ সৈন্যবাহিনীকে তাঁদের নিজেদের সৈন্যবাহিনী বলে মনে করেন। এই ধরনের সৈন্যবাহিনী পৃথিবীতে হবে অপরাজেয়, আর জাপানের মতো একটা সাম্রাজ্যবাদী দেশকে পরাজিত করার জন্য যতটুকু শক্তি প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশিই হবে এই বাহিনীর শক্তি।

(১১৫) অনেকে মনে করেন যে, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যেকার এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক অসন্তোষজনক হবার কারণ হচ্ছে পদ্ধতিগত ভুল; আমি সব সময়েই তাঁদের বলি যে, এটা হচ্ছে মৌলিক মনোভাবের (অথবা মৌলিক উদ্দেশ্যের) প্রশ্ন, এই মনোভাব হচ্ছে সৈনিক ও জনগণকে সম্মান করা। এই মনোভাব থেকে বিভিন্ন নীতি, পদ্ধতি ও রূপের উদ্ভব ঘটে। যদি এই মনোভাব থেকে দূরে সরে যাই, তাহলে নীতি, পদ্ধতি ও রূপ নিশ্চয়ই ভুল হবে, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যেকার এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক অবশ্যই অসন্তোষজনক হবে। সৈন্যবাহিনীর রাজ-নৈতিক কাজের তিনটি প্রধান নীতি হচ্ছে: প্রথম, অফিসার ও সৈনিকদের

ঐক্য; দ্বিতীয়, সৈন্যবাহিনী ও জনগণের ঐক্য; তৃতীয়, শত্রুবাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা। এই নীতিগুলোকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করার জন্য সৈনিকদের সম্মান করার, জনগণকে সম্মান করার এবং শত্রুবাহিনীর যেসব যুদ্ধবন্দীরা একবার অস্ত্র ত্যাগ করেছে, তাদের মানবিক মর্যাদাকে সম্মান করার মৌলিক মনোভাব থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে। যাঁরা এটাকে মৌলিক মনোভাবের প্রশ্ন বলে মনে করেন না, বরং যান্ত্রিক প্রশ্ন বলে মনে করেন, তাঁরা বাস্তবিকই ভুল ভাবছেন, তাঁদের মতামতকে সংশোধন করা দরকার।

(১১৬) বর্তমান মুহূর্তে যখন উহান ও অন্যান্য জায়গাগুলির প্রতিরক্ষা জরুরী কর্তব্য হয়ে উঠেছে, তখন যুদ্ধের সমর্থনের জন্য গোটা সৈন্যবাহিনীর ও গোটা জনগণের সক্রিয়তাকে পূর্ণমাত্রায় উদ্দীপিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কোন সন্দেহ নেই যে, উহান ও অন্যান্য স্থানগুলোর প্রতিরক্ষার কর্তব্যকে অবশ্যই ঐকান্তিকভাবে উপস্থাপিত করতে এবং সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু সেগুলিকে দখলে রাখা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি কিনা, সেটা আমাদের আত্মগত অভিলাষের ওপরে নির্ভর করে না, পরন্তু সেটা নির্ভর করে বাস্তব শর্তাদির ওপরে। আর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব শর্তগুলির একটি হচ্ছে সংগ্রামের জন্য গোটা সৈন্যবাহিনীর ও গোটা জনগণের রাজনৈতিক সমাবেশ। যাবতীয় প্রয়োজনীয় শর্তগুলিকে সুনিশ্চিত করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা না করা হলে, এমনকি এইসব শর্তের একটিমাত্র অনুপস্থিত থাকলেও, নানকিং ও অন্যান্য স্থানগুলির পতনের মতো বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটতে বাধ্য। মাদ্রিদে[৩৮] যেসব শর্তাদি ছিল সেইরকম শর্তাদি যেখানে উপস্থিত থাকবে, সেখানেই চীনের মাদ্রিদের সৃষ্টি হবে। এ পর্যন্ত চীনের কোন মাদ্রিদ ছিল না, এখন থেকে কয়েকটি মাদ্রিদ সৃষ্টির জন্য আমাদের প্রয়াস চালানো উচিত। কিন্তু এ সবকিছু নির্ভর করে শর্তাদির ওপরে, আর শর্তগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক শর্ত হচ্ছে গোটা সৈন্যবাহিনী ও জনগণের ব্যাপক রাজনৈতিক সমাবেশ।

(১১৭) আমাদের সকল কাজে সাধারণ নীতি হিসেবে আমাদের অবশ্যই জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টটি অটলভাবে চালিয়ে যেতে হবে। কারণ শুধুমাত্র এই নীতির সাহায্যেই আমরা প্রতিরোধ যুদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ দৃঢ়রূপে চালিয়ে যেতে পারি; অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যেকার এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কে ব্যাপক-বিস্তৃত ও প্রগাঢ় উন্নতি ঘটাতে পারি;

আর এখনো আমাদের দখলে যেসব এলাকা রয়েছে, সেগুলির প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ লড়ছে গোটা সৈন্যবাহিনীর ও গোটা জনগণের . সক্রিয়তাকে পূর্ণমাত্রায় উদ্দীপিত করতে পারি, এবং এইভাবে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারি।

(১১৮) সৈন্যবাহিনী ও জনগণের রাজনৈতিক সমাবেশের এই প্রশ্নটি হচ্ছে সত্যসত্যই সর্বচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের রাজনৈতিক সমাবেশ ছাড়া যে বিজয়লাভ অসম্ভব, ঠিক সেই কারণেই আমরা পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েও বারবার এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি। অবশ্য, বিজয়ের জন্য অন্যান্য অনেক শর্তাদিও অপরিহার্য, কিন্তু রাজনৈতিক সমাবেশ হচ্ছে বিজয়ের জন্য সবচেয়ে মৌলিক শর্ত। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে গোটা সৈন্য-বাহিনী ও গোটা জনগণের যুক্তফ্রন্ট, তা নিশ্চয়ই নিছক কয়েকটি পার্টির ও দলের সদর দপ্তরের বা সদস্যদের যুক্তফ্রন্ট নয়, আমাদের জাপ বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট স্থাপনের মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে সে ফ্রন্টে অংশগ্রহণের জন্য গোটা বাহিনী ও গোটা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

উপসংহার

(১১৯) আমাদের উপসংহার কি? আমাদের উপসংহার হচ্ছে:

'চীন কোন অবস্থায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে পরাভূত ও ধ্বংস করতে পারে বলে আমরা মনে করি? তিনটি শর্তের প্রয়োজন: প্রথম, চীনে একটি জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয়, জাপ-বিরোধী একটি আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা, তৃতীয়, জাপানী জনগণের ও জাপানী উপনিবেশগুলিতে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্ভব। চীনা জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে, এই তিনটি শর্তের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চীনা জনগণের ঐক্য।'

'এই যুদ্ধ কতদিন চলবে?—সেটা নির্ভর করে চীনের জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের শক্তির ওপর এবং চীন ও জাপান—দুই দেশের অন্যান্য বহু নির্ধারক উপাদানের ওপর।'

'এইসব শর্ত যদি দ্রুতগতিতে বাস্তবে পরিণত না হয়, তাহলে যুদ্ধ বিলম্বিত হবে। কিন্তু পরিণতি হবে একই—জাপান নিশ্চিতভাবেই পরাজিত হবে, আর চীন নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হবে। শুধু আত্মত্যাগই হবে

দুরূহতর, আর অত্যন্ত কষ্টকর একটা সময়ের ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হবে।'

'আমাদের রণনীতি হওয়া উচিত একটা অত্যন্ত সম্প্রসারিত ও পরিবর্তনশীল যুদ্ধফ্রন্টে লড়াই চালাবার জন্য আমাদের প্রধান শক্তিকে নিয়োগ করা। বিজয় অর্জনের জন্য চীনা সৈন্যবাহিনীর অবশ্যই বিস্তৃত রণক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রার চলমান যুদ্ধ চালাতে হবে।'

'চলমান যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা ছাড়াও কৃষকদের মধ্যে বহুসংখ্যক গেরিলা ইউনিট সংগঠিত করতে হবে।'

'যুদ্ধের গতিপথে ধীরে ধীরে চীনের সৈন্যবাহিনীর সাজসরঞ্জাম উন্নত হয়ে উঠবে। তাই, যুদ্ধের শেষের পর্যায়ে চীন অবস্থানগত যুদ্ধ চালাতে সমর্থ হবে এবং সমর্থ হবে জাপানের অধিকৃত এলাকাগুলির ওপর অবস্থানগত আক্রমণ চালাতে। এইভাবে চীনের দীর্ঘ প্রতিরোধ-যুদ্ধের চাপে জাপানের অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, এবং অসংখ্য লড়াইয়ের কষ্টভোগের ফলে চুরমার হয়ে যাবে জাপানী সৈন্যদের মনোবল। আর চীনের ক্ষেত্রে, তার প্রতিরোধ-যুদ্ধের অন্তর্নিহিত শক্তি দিন দিন প্রস্ফুটিত ও বর্ধিত হয়ে উঠবে, আর বিরাট সংখ্যক বিপ্লবী জনসাধারণ নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে অবিরামভাবে যুদ্ধফ্রন্টে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এইসব উপাদানকে অপরাপর উপাদানের সংগে যুক্ত করে আমরা জাপানের অধিকৃত অঞ্চলের দুর্গ ও ঘাঁটিগুলির ওপর চূড়ান্ত ও মারাত্মক আঘাত হানতে এবং চীনের মাটি থেকে আগ্রাসী জাপানী সৈন্যবাহিনীকে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হব।' (১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে এডগার স্নো-র সংগে সাক্ষাৎকার থেকে।)

'চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তখন থেকে সূত্রপাত হয়েছে একটা নতুন পর্যায়ের। এই নতুন পর্যায়ের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করা।'

'প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে ইতিমধ্যেই সূচিত প্রতিরোধ-যুদ্ধকে গোটা জাতির সামগ্রিক প্রতিরোধ-যুদ্ধের মাধ্যমেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হতে পারে।'

'প্রতিরোধ-যুদ্ধ বর্তমান দুর্বলতাসমূহ ভবিষ্যতে প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রক্রিয়ায়

বহু বিপত্তি, পশ্চাদপসরণ, আভ্যন্তরীণ বিভক্তি ও বিশ্বাসঘাতকতা, সাময়িক ও আংশিক আপোষাদি এবং এই ধরনের অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা ঘটাতে পারে। তাই এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, যুদ্ধটি হবে কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, ইতিমধ্যেই সূচিত প্রতিরোধ-যুদ্ধ আমাদের পার্টি ও সারা দেশের জনগণের প্রয়াস-প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে যাবতীয় বাধাবিপত্তিকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দেবে এবং অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাবে ও বিকাশলাভ করবে।' (১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত 'বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টির কর্তব্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত'।)

এইসবই হচ্ছে আমাদের উপসংহার। জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীদের চোখে শত্রু হচ্ছে অতিমানব আর আমরা চীনারা হচ্ছি অপদার্থ, এবং দ্রুত বিজয়ের মতবাদীদের চোখে আমরা নিজেরা হচ্ছি অতিমানব আর শত্রু হচ্ছে অপদার্থ। এসবই ভুল। তাদের বিপরীত মত আমরা পোষণ করি—জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, আর চূড়ান্ত বিজয় হবে চীনের। এই হচ্ছে আমাদের উপসংহার।

(১২০) আমার বক্তৃতামালার এখানেই শেষ। মহান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ বিবর্ধিত হয়ে উঠছে। পূর্ণ বিজয় অর্জন করার জন্য অভিজ্ঞতার সারসংকলনের আশা অনেকেই করছে। আমি যা আলোচনা করছি, তা হচ্ছে শুধু গত দশ মাসের সাধারণ অভিজ্ঞতা, আর এটা এক ধরনের সারসংকলনের প্রয়োজন হয়তো মেটাতে পারে। এইসব সমস্যা সকলের মনোযোগ ও ব্যাপক আলোচনার দাবি করে, এখানে আমি যা বলেছি তা হচ্ছে শুধুমাত্র একটি রূপরেখা। আশা করি যে, আপনারা সেটা পর্যালোচনা ও আলোচনা করবেন এবং সংশোধন ও পরিবর্ধন করবেন।

টীকা

১। লুকৌছিয়াও পিকিং শহর থেকে দশাধিক কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই তারিখে জাপানী আক্রমণ-কারী বাহিনী এখানে চীনা সৈন্যবাহিনীর ওপরে আক্রমণ চালিয়েছিল। দেশ-ব্যাপী জনগণের জাপ-বিরোধী উত্তাল তরঙ্গে এখানকার চীনা বাহিনী প্রতিরোধ

চালিয়েছিল। চীনা জনগণের ৮ বছর ব্যাপী বীরত্বপূর্ণ জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ তখন থেকে শুরু হয়।

২। জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বটি ছিল কুওমিনতাঙের অভিমত। জাপানকে প্রতিরোধ করতে কুওমিনতাঙ ছিল অনিচ্ছুক, আর পরে জাপানের বিরুদ্ধে তারা লড়েছিল নিছক বাধ্য হয়ে। লুকৌছিয়াও ঘটনার পরে চিয়াং কাই-শেক চক্র জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে যোগদান করেছিল অনিচ্ছাভরে আর ওয়াং চিন-ওয়েই চক্র জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। ওয়াং চিন-ওয়েই চক্র জাপানের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং বস্তুতঃ পরে তা আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু জাতীয় পরাধীনতার ভাবধারাটি যে শুধু কুওমিনতাঙের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল তাই নয়, পরন্তু সমাজের মধ্যস্তরের কোন কোন অংশকে এবং এমনকি মেহনতী জনগণের ভেতরকার কোন কোন পশ্চাদ্পদ লোকজনকেও এক সময় তা প্রভাবিত করেছিল। দুর্নীতিপরায়ণ ও অক্ষম কুওমিনতাঙ সরকার জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে একের পর এক পরাজয় বরণ করল আর জাপানী বাহিনী বিনা বাধায় যুদ্ধের প্রথম বছরেই উহানের নিকটবর্তী অঞ্চলে এসে পৌছাল, এতে কিছু কিছু পশ্চাদ্পদ লোকজন অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ল।

৩। এই অভিমতগুলি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দেখা দিয়েছিল। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে পার্টির কিছু কিছু সদস্যের ভেতরে শত্রুকে ছোট করে দেখার একটা ঝোঁক ছিল। এইসব পার্টি-সদস্য এই অভিমত পোষণ করত যে, একটিমাত্র আঘাতেই জাপানকে পরাজিত করতে পারা যাবে। তাদের এই অভিমতের যুক্তি এই নয় যে, তারা আমাদের নিজস্ব শক্তিকে খুব শক্তিশালী বলে মনে করত, বরং তারা জানত যে, কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক পরিচালিত সৈন্যবাহিনী ও সংগঠিত গণশক্তি তখনো ছোটই ছিল; কারণটা হচ্ছে এই যে, কুওমিনতাঙ জাপানকে প্রতিরোধ করতে শুরু করেছিল। তাদের মতে, কুওমিনতাঙ ছিল খুবই শক্তিশালী, আর কমিউনিস্ট পার্টির সংগে সহযোগিতা করে সে জাপানের বিরুদ্ধে বিশেষ ফলপ্রসূ আঘাত হানতে পারত। এই ভ্রমাত্মক মূল্যায়ন তারা করেছিল, কারণ তারা শুধু কুওমিনতাঙের সাময়িকভাবে জাপানকে প্রতিরোধ করার দিকটা দেখেছিল, কিন্তু অন্য দিকটিকে—কুওমিনতাঙ যে প্রতিক্রিয়াশীল আর দুর্নীতিপরায়ণ—সেই দিকটিকে তারা ভুলে গিয়েছিল।

৪। এটা ছিল চিয়াং কাই-শেক প্রমুখ ব্যক্তিদের অভিমত। জাপানকে প্রতিরোধ করতে বাধ্য হয়ে চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ তাদের আশা স্থাপন করেছিল একমাত্র ক্রুত বৈদেশিক সাহায্যের ওপরে, তাদের নিজেদের শক্তির ওপরে তাদের কোন আস্থা ছিল না, জনগণের শক্তির ওপরে আস্থা রাখা তো দূরের কথা।

৫। তাইএরচুয়াং হচ্ছে দক্ষিণ শানতুংয়ের একটি শহর। জাপানী আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে তাইএরচুয়াং অঞ্চলে চীনা সৈন্যবাহিনী একটি লড়াই লড়েছিল। জাপানের ৭০-৮০ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে চার লাখ সৈন্য নিয়োগ করে চীনা সৈন্যবাহিনী জয়লাভ করেছিল।

৬। তৎকালীন কুওমিনতাঙের রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রুপের মুখপাত্র তা কুং পাও-এর এক সম্পাদকীয়তে এই অভিমতটি প্রকাশ করা হয়েছিল। সৌভাগ্যের আশায় মেতে এই চক্র আশা করেছিল যে, তাইএরচুয়াংয়ের মতো আর কয়েকটা বিজয় জাপানের অগ্রসরণকে থামিয়ে দেবে, তখন আর একটা দীর্ঘ-স্থায়ী যুদ্ধের জন্য জনগণের শক্তিকে সমাবেশ করার কোন দরকার হবে না। তাদের মতে, এ ধরনের সমাবেশ এই চক্রের নিজ শ্রেণীর নিরাপত্তাকে বিপদাপন্ন করে তুলতে পারে। এই সৌভাগ্যের আশা সে-সময়ে গোটা কুওমিনতাঙকে পরিব্যাপ্ত করেছিল।

৭। ১৯৩৭ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন অষ্টম রুট বাহিনীর ১১৫ নং ডিভিসন কমরেড লিন পিয়াওয়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় শানসী প্রদেশের পিংসিংকুয়ান অঞ্চলে একটি নির্মূলী-করণের লড়াই চালিয়েছিল। দেশব্যাপী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হবার পর এটাই ছিল প্রথম নির্মূলীকরণের লড়াই। এই লড়াইয়ে জাপানের দুর্ধর্ষ বাহিনীর ইতাগাকি ডিভিসনের তিন হাজারের বেশি সৈন্যকে ধ্বংস করা হয়েছিল। এই বিজয়টি দেশ-বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধে নিশ্চিত জয়লাভ করার জন্য সারা দেশের সৈন্যবাহিনী ও জনগণের বিশ্বাসকে প্রভূতভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। এই বিজয়টি চীনা জনগণের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে।

৮। চীনা লালফৌজের ও জনগণের জাপান-বিরোধী আন্দোলনের প্রভাবে চ্যাং স্যুয়ে-লিয়াংয়ের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙের উত্তর-পূর্ব বাহিনী এবং ইয়াং হু-ছেংয়ের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙের সপ্তদশ রুট বাহিনী চীনা কমিউনিস্ট

পার্টির প্রস্তাবিত জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নীতিটি মেনে নিয়েছিল আর জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য চিয়াং কাই-শেকের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির সংগে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দাবি করেছিল। চিয়াং কাই-শেক যে শুধু এটাকে অগ্রাহ্য করল তাই নয়, উপরন্তু আরও স্বেচ্ছাচারী হয়ে 'কমিউনিস্টদের দমনের' জন্য তার সামরিক প্রস্তুতি জোরদার করে তুলল এবং সীআন শহরে জাপান-বিরোধী যুবকদের হত্যা করতে লাগল। এই অবস্থায় চ্যাং স্যুয়ে-লিয়াং ও ইয়াং হু-চেং সম্মিলিতভাবে কার্যকলাপ চালিয়ে চিয়াং কাই-শেককে গ্রেপ্তার করলেন। এটা ছিল ১৯৩৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখের ঘটনা, যা সীআন ঘটনা নামে সুপরিচিত। তখন জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সংগে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শর্তকে মেনে নিতে চিয়াং কাই-শেক বাধ্য হল কাজেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হল এবং সে নানকিংয়ে ফিরে গেল।

৯। অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে কয়েক দশক ধরে ব্রিটেন ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণ আফিম চীনে রপ্তানি করত। এই বাণিজ্য চীনা জনগণকে শুধু গুরুতরভাবে অবসাদগ্রস্তই করেনি, উপরন্তু বিপুল পরিমাণে চীনের রৌপ্যও লুণ্ঠন করেছিল। চীন এই আফিমবাণিজ্যের বিরোধিতা করেছিল। ১৮৪০ সালে বাণিজ্যকে সুরক্ষিত করার অজুহাতে ব্রিটেন চীনের ওপরে এক সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। লিন জে-স্যুর নেতৃত্বে চীনা সৈন্য-বাহিনী সে আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ করল, আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে কুয়াংচৌ-এর জনগণ 'ব্রিটিশদেরকে দমন করার বাহিনী' সংগঠিত করেছিল যা আগ্রাসী ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। কিন্তু ১৮৪২ সালে দুর্নীতিপরায়ণ ছিং সরকার আগ্রাসী ব্রিটিশদের সংগে 'নানকিং চুক্তি' স্বাক্ষর করল। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, ব্রিটেনকে হংকং হস্তান্তর এবং শাংহাই, ফুচৌ, অ্যাময়, নিংপো আর ক্যান্টনকে ব্রিটেনের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা হল, আর স্থির হল যে, চীনে আমদানী করা ব্রিটিশ পণ্যের ওপরে ধার্য শুল্কের হার চীন ও ব্রিটেন মিলিতভাবে নির্ধারণ করবে।

১০। তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের যুদ্ধ ছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত ছিং রাজবংশের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও জাতীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিপ্লবী যুদ্ধ। ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসে কুয়াংসী প্রদেশের কুইপিং জেলার চিনথিয়ান গ্রামে এই বিপ্লবের নেতা হোং সিউ-ছ্যুয়ান, ইয়াং সিউ-ছিং

প্রমুখ বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন আর ঘোষণা করেছিলেন 'তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের' প্রতিষ্ঠা। ১৮৫২ সালে তাইপিং বাহিনী কুয়াংসী প্রদেশ থেকে অভিযান শুরু করে, আর হুনান, হুপেই, কিয়াংসী ও আনহুই প্রদেশের ভেতর দিয়ে অভিযান চালিয়ে নানকিং দখল করে ১৮৫৩ সালে। তারপরে তাইপিং বাহিনীর একটা অংশ নানকিং থেকে উত্তর অভিমুখে অভিযান চালিয়ে যেতে যেতে থিয়ানচিন শহরের নিকটে পৌঁছেছিল। কিন্তু তাইপিং বাহিনী তার দখলীকৃত স্থানগুলিতে কোন সুদৃঢ় ঘাঁটি এলাকাই স্থাপন করেনি। উপরন্তু, নানকিংয়ে রাজধানী স্থাপন করার পরে এই বাহিনীর নেতৃস্থানীয় গ্রুপ অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক ভুল করে বসে। সেইসব কারণেই এই বাহিনী অসমর্থ হয়েছিল ছিং সরকারের প্রতিবিপ্লবী বাহিনী এবং ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী হামলাকারীদের মিলিত আক্রমণের মোকাবিলা করতে। আর শেষ পর্যন্ত ১৮৬৪ সালে পরাজিত হল।

১১। এখানে ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। উদারপন্থী বুর্জোয়া ও আলোকপ্রাপ্ত জমিদারদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছিল এই আন্দোলন। খাং ইয়ৌ ওয়েই, লিয়াং ছী-ছাও ও থান সি-থুং প্রমুখ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। এ আন্দোলন যুবসম্রাট কুয়াং স্যু-এর আনুকূল্য ও সমর্থনলাভ করেছিল। কিন্তু এর কোন গণভিত্তি ছিল না। সে সময়ে ইউয়ান শি-কাইয়ের অধীনে নিজস্ব সশস্ত্র শক্তি ছিল, সে বিশ্বাসঘাতকতা করে গোঁড়া রক্ষণশীলদের নেত্রী বিধবা সম্রাজ্ঞী জু সীর কাছে সংস্কারকদের গুপ্ত পরিকল্পনাকে ফাঁস করে দিয়েছিল, অতএব বিধবা সম্রাজ্ঞী জু সী আবাব ক্ষমতা জোর করে দখল করে নিল, যুবসম্রাট কুয়াং স্যুকে বন্দী করল আর থান সি-থুং ও অন্যান্য পাঁচজনের শিরশ্ছেদ করাল। এইভাবে এ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল শোচনীয় পরাজয়ে।

১২। সিনহাই বিপ্লব—১৯১১ সালের বিপ্লব ছিং রাজবংশীয় স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটায়। এই বছরের ১০ই অক্টোবর তারিখে, ছিং-সরকারের নয়া সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী সংস্থাগুলির প্রেরণায় উছাং শহরে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। এর পরে বিভিন্ন প্রদেশে পর পর বিদ্রোহ ঘটে এবং অতি সত্বরই ছিং রাজবংশের শাসন ভেঙে পড়ে। ১৯১২ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে নানকিং শহরে স্থাপিত হল চীন প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার, আর সান ইয়াৎ-সেন নির্বাচিত হলেন এর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট।

কৃষক, শ্রমিক ও শহরে পেটি-বুর্জোয়াদের সংগে বুর্জোয়াদের মৈত্রীর ভেতর দিয়ে জয়লাভ করল এই বিপ্লব। কিন্তু যে চক্র এই বিপ্লবের নেতৃত্ব করেছিল তারা ছিল আপোষপন্থী, আর তারা কৃষকদের প্রকৃত হিতসাধন করেনি এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের চাপে আপোষ করেছিল বলে রাষ্ট্রক্ষমতা এসে পড়ল উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজ ইউয়ান শি-কাইয়ের হাতে, আর বিপ্লব হল ব্যর্থ।

১৩। উত্তর অভিযান হল বিপ্লবী সৈন্যদের দ্বারা ১৯২৬ সালের মে-জুলাই মাসে কুয়াংতুং থেকে উত্তরদিকে উত্তরের যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত শাস্তিমূলক যুদ্ধ। উত্তরাভিযানী সৈন্যরা, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং পার্টির প্রভাবে (তখন সৈন্যবাহিনীতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রধানতঃ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হতো), ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকদের আন্তরিক সমর্থনলাভ করেছিল। ১৯২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে ইয়াংসি ও পীত নদী সংলগ্ন অধিকাংশ প্রদেশ দখলীকৃত হয়েছিল এবং উত্তরের যুদ্ধবাজদের পরাজিত করেছিল। বিপ্লবী সেনাবাহিনীর মধ্যে চিয়াং কাই শেক-এর নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে এই বিপ্লবী যুদ্ধ ব্যর্থ হয়।

১৪। ১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিখের বিবৃতিতে জাপানী মন্ত্রিসভা এই নীতি ঘোষণা করেছিল যে, জাপান শক্তি প্রয়োগ করে চীনকে পদানত করবে। একই সময়ে সে আবার ধমক দিয়ে ও চাটু কথায় ভুলিয়ে কুওমিনতাঙ সরকারকে আত্মসমর্পণ করাবার চেষ্টা করছিল এই ঘোষণা করে যে, কুওমিনতাঙ সরকার যদি তার 'প্রতিরোধ-যুদ্ধের পরিকল্পনাকে চালিয়ে যায়' তাহলে জাপান সরকার চীনে একটা নতুন পুতুল সরকার স্থাপন ও পোষণ করবে এবং আর কখনো আলাপ-আলোচনায় কুওমিনতাঙকে 'অপরপক্ষ' হিসেবে স্বীকার করবে না।

১৫। এখানে মুখ্যতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬। এখানে 'সেইসব দেশগুলির সরকার' বলতে সাম্রাজ্যবাদী দেশ ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের সরকারগুলির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের ভারসাম্যের পর্যায়ে চীন ঊর্ধ্বমুখী ধারায় চলবে—কমরেড মাও সে-তুঙের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি চীনা কমিউনিস্ট-

পার্টির নেতৃত্বাধীন মুক্ত অঞ্চলে পুরোপুরিই বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু কুও-মিনতাঙ শাসিত অঞ্চলে উর্ধ্বগতির বদলে বরং অবনতি ঘটেছে, কারণ চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন শাসকচক্র জাপানকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ছিল আর কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের বিরোধিতা করার কাজে ছিল সক্রিয়। এতে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে প্রতিরোধের অগ্নি জ্বলে ওঠে আর তাঁদের রাজনৈতিক চেতনা উদ্দীপ্ত হয়।

১৮। 'অস্ত্রই সবকিছু নির্ধারণ করে'—এই মতবাদ অনুসারে চীন যুদ্ধে পরাজিত হতে বাধ্য ছিল, কারণ অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে চীন ছিল জাপানের তুলনায় নিকৃষ্ট অবস্থায়। চিয়াং কাই-শেক সমেত কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়া-শীলদের সকল সর্দারদের মনেই এই অভিমতটি চালু ছিল।

১৯। বুদ্ধ ছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক শাক্যমুনি। সুন উ-খোং হচ্ছে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চীনা পৌরাণিক উপন্যাস 'সী ইউ চী' ('পশ্চিমে তীর্থযাত্রা')-এর বীরনায়ক। এই পৌরাণিক উপন্যাসে বলা হয় যে, সুন উ-খোং ছিল একটা বানর। একটা ডিগবাজি দিয়ে সে এক লাখ আট হাজার লী পথ অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু তবুও একবার বুদ্ধের করতলে পড়লে তার থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে না, তা সে যত ডিগবাজিই দিক না কেন। করতলকে উল্টে দিয়ে বুদ্ধ তাঁর আঙুলগুলিকে পাঁচশিখরযুক্ত পঞ্চভূত পর্বতে রূপান্তরিত করেছিলেন আর তার তলায় চাপা দিয়েছিলেন সুন উ-খোংকে।

২০। ১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে কমরেড ডিমিট্রিভ তাঁর প্রদত্ত 'ফ্যাসিবাদী আক্রমণ ও কমিউ-নিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্তব্য' শীর্ষক রিপোর্টে বলেছিলেন: 'ফ্যাসিবাদ হচ্ছে অসংযত জাতিদম্ভী আর লুণ্ঠনাত্মক যুদ্ধ'। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে কম-রেড ডিমিট্রিভ আবার 'ফ্যাসিবাদ হচ্ছে যুদ্ধ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

২১। ভি. আই. লেনিন, 'সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ'-এর প্রথম অধ্যায় এবং 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন'-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২২। 'সুন জি' নামক গ্রন্থের 'আক্রমণের রণনীতি' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৩। ছেংপু পিংইউয়ান প্রদেশের পুলিয়ান জেলায় [বর্তমান হোনান

প্রদেশে—অনুবাদক] অবস্থিত। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৩২ সালে এখানে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল চিন রাজ্য ও চু রাজ্যের মধ্যে। লড়াইয়ের গোড়ার দিকে চু রাজ্যের বাহিনী প্রাধান্যলাভ করেছিল। ৯০ লী পশ্চাদপসরণ করার পরে চিন রাজ্যের সৈন্যবাহিনী চু বাহিনীর দুর্বল স্থান অর্থাৎ চু বাহিনীর দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বদেশ বেছে নিয়ে মোক্ষম আঘাত দিল, ফলে চু বাহিনী সাংঘাতিকভাবে পরাজিত হল।

২৪। হোনান প্রদেশের বর্তমান ছেংকাও কাউন্টির উত্তর-পশ্চিমের প্রাচীন ছেংকাও শহর প্রভূত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এটা ছিল খ্রীঃ পূঃ ২০৩ সালে হানের রাজা লিউ প্যাং এবং চু-এর রাজা সিয়াং উ-র মধ্যে লড়াইয়ের স্থান। প্রথমদিকে সিয়াং উ সিংইয়াং ও ছেংকাও দখল করে এবং লিউ প্যাঙের বাহিনীকে প্রায় ধ্বংস করে দেয়। লিউ প্যাং সুযোগের অপেক্ষায় থেকে যখন সিয়াং উ'র বাহিনী সেথুই নদী পার হবার সময় মাঝ নদীতে এসেছে তখন তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করে এবং ছেংকাও পুনর্দখল করে।

২৫। খ্রীষ্টপূর্ব ২০৪ সালে চাও সিয়ের বিরুদ্ধে হান সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি হান সিন সৈন্য পরিচালনা করে প্রচণ্ডভাবে লড়াই চালিয়েছিল চিংসিং নামক স্থানে। কথিত আছে যে, চাও সিয়ের সৈন্যবাহিনীতে দুই লাখ সৈন্য ছিল। আর সেটা ছিল হান বাহিনীর থেকে কয়েক গুণ বেশি। নদীর দিকে পিঠ করে সৈন্যসারিকে সম্প্রসারিত করে এক শৌর্যপূর্ণ যুদ্ধে তাদের চালনা করেছিল হান সিন। আর সেই একই সময়ে শত্রুর দুর্বলভাবে রক্ষিত পৃষ্ঠদেশে আক্রমণ চালিয়ে সেটাকে দখল করে নেবার জন্য সে সৈন্যদল পাঠিয়েছিল, এর ফলে চাও সিয়ের বাহিনী সম্মুখ ও পিছন উভয় দিকেই শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ল, এবং শেষে একেবারে পযুদস্ত হয়েছিল।

২৬। হোনান প্রদেশের বর্তমান ইয়েসিন কাউন্টির উত্তরের প্রাচীন শহর খুনইয়াং ছিল পূর্ব হান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা লিউ সিউ যেখানে ২৩ খ্রীষ্টাব্দে সিন রাজবংশের সম্রাট ওয়াং ম্যাং-এর বাহিনীকে পরাজিত করেছিল সেই স্থানটি। সংখ্যার দিক থেকে দু পক্ষের মধ্যে বিরাট বৈসাদৃশ্য ছিল—লিউ সিউ-এর লোকসংখ্যা ছিল ৮-৯ হাজার, সেখানে ওয়াং ম্যাঙের ছিল ৪ লক্ষ। কিন্তু ওয়াং ম্যাঙের সেনাধ্যক্ষ ওয়াং সুন এবং ওয়াং ই'র শত্রুশক্তি সম্পর্কে অবহেলাভরে অবমূল্যায়নের সুযোগ নিয়ে লিউ সিউ মাত্র তিন হাজার পোড় খাওয়া সৈন্য নিয়ে ওয়াং ম্যাঙের মূল শক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের

ধ্বংস করে দেয়। শত্রুসৈন্যের বাকি অংশকে চূর্ণবিচূর্ণ করে সে এই বিজয়কে বাস্তবায়িত করে।

২৭। হোনান প্রদেশের বর্তমান চুংমৌ কাউন্টির উত্তর-পূর্ব ছিল কুয়ানতু এবং এটা ছিল ২০০ খ্রীষ্টাব্দে ইউয়ান শাও এবং ছাও ছাওয়ের সৈন্যদের মধ্যে লড়াইয়ের স্থান। ইউয়ান শাওয়ের সৈন্য ছিল একলক্ষ, কিন্তু ছাও ছাওয়ের ছিল খুবই কম সৈন্য এবং রসদ সরবরাহ ব্যবস্থাও ছিল অপ্রতুল। ইউয়ান শাওয়ের সৈন্যবাহিনীর তরফ থেকে সতর্কতার অভাব এবং শত্রু-সৈন্যের অবমূল্যায়নের সুযোগ নিয়ে ছাও তার লঘুপদ সৈন্যদের ইউয়ান শাওয়ের সৈন্যদের ওপর হঠাৎ আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করে এবং তাঁদের সরবরাহ ব্যবস্থায় আগুন ধরিয়ে দেয়। ইউয়ান শাওয়ের সৈন্যরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং তার মূল শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়।

২৮। সুন ছুয়ান শাসন করত উ রাজ্য, আর ছাও ছাও শাসন করত ওয়েই রাজ্য। ছিপি হল ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ তীরে হুপে প্রদেশের অন্তর্গত ছিয়াউ-এর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। ২০৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাও ছাও ৫ লক্ষের ওপর এক সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করে, যাকে সে ৮ লক্ষ বলে ঘোষণা করেছিল, সুন ছুয়ান-এর ওপর আক্রমণ হানার জন্য। সুন ছুয়ান ছাও ছাওয়ের শত্রু লিউ পেই-এর সংগে যুক্ত হয়ে ৩০ হাজার সৈন্য সমাবেশ করে। ছাও ছাওয়ের সৈন্যবাহিনী প্লেগ ও মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং তারা নৌযুদ্ধ চালাতে অক্ষম এটা জানতে পেরে সুন ছুয়ান ও লিউ পেই'র মিলিত সৈন্য-বাহিনী ছাও ছাওয়ের যুদ্ধজাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং তার সেনা-বাহিনীকে চূর্ণ করে ফেলে।

২৯। হুপে প্রদেশের বর্তমান ইছাং-এর পূর্বদিকে ইলিং হল সেই স্থান যেখানে উ রাজ্যের সেনাধ্যক্ষ লু সুন ২২২ খ্রীষ্টাব্দে শু'র শাসক লিউ পেই-এর বাহিনীকে পরাস্ত করে। লিউ পেই পরপর কতকগুলি লড়াইয়ে প্রথমদিকে জয়লাভ করে এবং উ'র ভূখণ্ডের প্রায় ৫।৬ শত লী পর্যন্ত অর্থাৎ ইলিং-এর কাছাকাছি ঢুকে পড়ে। লু সুন, যে ইলিংকে রক্ষা করছিল, সাত মাসের ওপর লড়াই এড়িয়ে চলছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না লু পেই 'তার বুদ্ধির শেষ সীমা পর্যন্ত এসেছে এবং তার সৈন্যরা ক্লান্ত ও হতাশ' হয়ে পড়েছে। সে তখন অনুকূল বাতাসের সুযোগ নিয়ে তাঁবুগুলিতে আগুন লাগিয়ে লু পেই'র সেনা-বাহিনীকে ধ্বংস করেছিল।

৩০। আনহুই প্রদেশের ফেইশুই নদীর ধারে ৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে চিন রাজ্যের শাসক ফু ছিয়েনকে পূর্ব সিন রাজবংশের সেনাধ্যক্ষ সিয়ে শুয়ান পরাজিত করে। ফু ছিয়েনের ৬ লক্ষের ওপর পদাতিক সৈন্য, ২ লক্ষ ৭০ হাজার ঘোড়সওয়ার এবং ৩০ হাজারের ওপর রক্ষীবাহিনী ছিল; কিন্তু পূর্ব সিনের স্থল ও নৌবাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৮০ হাজার। সৈন্যবাহিনী যখন ফেইশুই নদীর অপর তীরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল তখন সিয়ে শুয়ান শত্রুসৈন্যের অতিরিক্ত আস্থা এবং প্রতারণার সুযোগ নিয়ে ফু ছিয়েনকে তার সৈন্য ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করল যাতে করে পূর্ব সিন বাহিনী নদী পার হতে এবং লড়াই করে তাদের বিতাড়িত করতে পারে। ফু ছিয়েন রাজী হল, কিন্তু সৈন্য প্রত্যাহারের আদেশ দিলে তার সৈন্যরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল, আর তাদের থামানো গেল না। সুযোগ গ্রহণ করে পূর্ব সিন বাহিনী নদী পার হয়ে আক্রমণ শুরু করে শত্রুদের পরাস্ত করল।

৩১। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ফ্রান্সের নেপোলিয়ন ব্রিটেন, প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য বহু দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। বহু যুদ্ধে নেপোলিয়নের বাহিনীর সৈন্য-সংখ্যা তাব শত্রুর তুলনায় কম ছিল, তবুও নেপোলিয়নবাহিনী সেইসব যুদ্ধেই জয়লাভ করেছিল।

৩২। ৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ছিন রাজ্যের শাসক ফু চিয়ান তোংচিন বাহিনীর শক্তিকে খাট মনে করে তাদের আক্রমণ করে। আনহুই প্রদেশের শৌইয়াং অঞ্চলের লুওচিয়ানে ছিন সৈন্যবাহিনীর অগ্রগামী ইউনিটগুলিকে পরাজিত করে তোংচিন বাহিনী জল ও স্থল উভয় পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। শৌইয়াংয়ের নগরপ্রাকারে উঠে ফু চিয়ান তোংচিন সৈন্যবাহিনীর নিখুঁত সমাবেশরেখা দেখতে পেল এবং পাকোংশান পর্বত-শিখরের প্রতিটি ঝোপঝাড় ও গাছকে শত্রুসৈন্য বলে ভুল করে শত্রুর আপাতঃদৃশ্যমান শক্তিতে ঘাবড়ে গেল।

৩৩। এখানে এই ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যে, চিয়াং কাই-শেক আর ওয়াং চিং-ওয়েই ১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম জাতীয় গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে জনগণের বিরুদ্ধে একটা দশ বছরের যুদ্ধ শুরু করে দিল, আর এইভাবে চীনের জনগণের পক্ষে ব্যাপক-ভাবে সংগঠিত হয়ে ওঠাকে অসম্ভব করে তুলল। অতীতের এই ভুলের জন্য

চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের অবশ্যই দায়ী করতে হবে।

৩৪। সুং-এর রাজা সিয়াং ছিল খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে চুনছিউ যুগে সুং রাজ্যের রাজা। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৩৮ সালে সুং রাজ্য পরাক্রমশালী চু রাজ্যের সংগে যুদ্ধ করেছিল। চু বাহিনী যখন নদী পার হচ্ছিল, সুং বাহিনী তার আগেই যুদ্ধব্যূহাকারে সম্প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। সুং বাহিনীর একজন অফিসার মনে করল যে, চু বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সুং বাহিনীর চেয়ে বেশি। অতএব সেই অফিসার চু বাহিনীর নদী-উত্তরণ সমাপ্ত হবার আগেই চু বাহিনীর ওপর আক্রমণ করার প্রস্তাব করল। কিন্তু সুং-এর রাজা সিয়াং কোং বলল, 'না, যখন কেউ অসুবিধায় আছে এমন সময়ে তাকে আক্রমণ করা ভদ্রমহোদয়গণের পক্ষে উচিত নয়। নদী পার হবার পরে চু বাহিনী যুদ্ধব্যূহাকারে সম্প্রসারিত হবার আগে সুং রাজ্যের অফিসার আবারও প্রস্তাব করল অবিলম্বে আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু সুং-এর রাজা সিয়াং-কোং আবারও বলল, 'না, যে সৈন্যবাহিনী যুদ্ধব্যূহাকারে সম্প্রসারিত হয়ে উঠেনি, তাকে আক্রমণ করা ভদ্রমহোদয়গণের পক্ষে উচিত নয়'। চু বাহিনী পুরোপুরি তৈরী হলেই শুধু সুং-এর রাজা সিয়াং-কোং আক্রমণের আদেশ দিল। ফলে সুং বাহিনী বিপর্যয়কর পরাজয় ভোগ করল আর সিয়াং-কোং নিজেও আহত হল।

৩৫। কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজ হান ফু-চ্যু বহু বছর ধরে শানতুং প্রদেশ শাসন করত। ১৯৩৭ সালে আগ্রাসী জাপানী সৈন্যবাহিনী পেইপিং ও থিয়ানচিন দখল করে নেবার পরে থিয়ানচিন-পুখৌ রেলপথ বরাবর যখন দক্ষিণ অভিমুখে শানতুং আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল, তখন একটা লড়াইও না লড়ে হান ফু-চ্যু শানতুং থেকে পালিয়ে হোনান প্রদেশে চলে গিয়েছিল।

৩৬। ১৮১২ সালে নেপোলিয়ন ৫ লাখ সৈন্য বিশিষ্ট একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাশিয়ার ওপর আক্রমণ করল। রুশ সৈন্যবাহিনী মস্কো শহর পরিত্যাগ করল এবং তাকে পুড়িয়ে বিনষ্ট করল, এমনি করে নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীকে এমন একটা নিরুপায় অবস্থায় নিক্ষেপ করল যে, তারা ক্ষুধা, শীত ও কষ্টে নিমজ্জিত হয়ে পড়ল, পশ্চাড়াগের সংগে তাদের যোগাযোগ ব্যাহত হল এবং তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল। অতএব নেপোলিয়ন বাধ্য হয়ে সৈন্যবাহিনী নিয়ে পশ্চাদপসরণ করল। এই সুযোগ নিয়ে রুশ সৈন্যবাহিনী পাল্টা

আক্রমণ চালাল, ফলে নেপোলিয়ন বাহিনীর মাত্র বিশ হাজারের কিছু বেশি সৈন্য পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

৩৭। কুওমিনতাঙ তার সৈন্যবাহিনীকে সম্প্রসারিত করেছিল নিম্ন পদ্ধতিতে: সামরিক ব্যক্তি ও পুলিশ পাঠিয়ে সর্বত্র লোকজনকে ধরে জোর করে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করত। সামরিক ব্যক্তি ও পুলিশ এসব লোকজনকে ধরে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাদের প্রতি কয়েদীর মতো আচরণ করত। যাদের টাকা ছিল তারা কুওমিনতাঙ অফিসারদেরকে ঘুষ দিয়ে নিজের পরিবর্তে অন্য মানুষ ক্রয় করে ভর্তি করাত।

৩৮। ১৯৩৬ সালে জার্মান ও ইতালীয় ফ্যাসিবাদীরা স্পেনের ফ্যাসিবাদী যুদ্ধবাজ ফ্রাঙ্কোর মাধ্যমে স্পেনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু করল। গণফ্রন্ট-সরকারের নেতৃত্বে স্পেনের জনগণ গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য আগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাল। গোটা যুদ্ধে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ রক্ষা কবার লড়াইটা ছিল সবচেয়ে তীব্র, যা ১৯৩৬ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছিল এবং মোট দুই বছর পাঁচ মাস ধরে টিঁকে ছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশ তথাকথিত 'হস্তক্ষেপ না করার' মেকী নীতির দ্বারা আক্রমণকারীদেরকে সাহায্য করেছিল এবং স্পেনের গণফ্রন্টের ভেতরে ভাঙন ধরেছিল বলে ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে মাদ্রিদের পতন ঘটল।

জাতীয় যুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

অক্টোবর, ১৯৩৮

কমরেডগণ, আমাদের সামনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করা এবং একটি নতুন চীন গড়ে তোলাই যে আমাদের পক্ষে জরুরী তাই নয়, বরং এইসব লক্ষ্যে উপনীত হতেও আমরা নিশ্চিতভাবেই সক্ষম। যাই হোক, বর্তমান এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে কঠিন একটি পথ আমাদের সামনে রয়েছে। একটি নতুন চীন গড়ে তোলার সংগ্রামে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনগণকে অবশ্যই একটি পরিকল্পিত উপায়ে জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, এবং আর একটা সুদীর্ঘ যুদ্ধের মাধ্যমেই কেবল তাদেরকে তারা পরাজিত করতে পারবে। যুদ্ধের সাথে জড়িত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে অনেক কিছু বলেছি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার আমরা সারসংকলন করেছি এবং বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন করেছি, সমগ্র জাতির সামনে উপস্থিত জরুরী কর্তব্য আমরা ব্যাখ্যা করেছি ও একটি দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের সাহায্যে জাপানের বিরুদ্ধে একটি সুদীর্ঘ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কারণ এবং তা চালিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছি, এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিরও আমরা বিশ্লেষণ করেছি। তাহলে কি কি সমস্যা বাকী থাকছে? কমরেডগণ, আরও একটি সমস্যা রয়েছে, অর্থাৎ জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কোন্ ভূমিকা পালন করবে, এই যুদ্ধকে পরাজয়ের দিকে পরিচালিত না করে বিজয়ের দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম হওয়ার জন্যে কমিউনিস্টরা কিভাবে তাঁদের নিজেদের ভূমিকা হৃদয়ঙ্গম

পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কমরেড মাও সে তুঙ এই রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। অধিবেশনে কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বাধীন পলিটব্যুরোর লাইন অনুমোদিত হয় এবং অধিবেশনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কিত প্রশ্নে আলোচনা করে তিনি জাপ বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ পরিচালনা করার কাজে পার্টি সুমহান ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে এবং সচেতনভাবে কাঁধে তুলে নিতে সকল কমরেডকে সাহায্য করেন। এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টে অবিচল থাকার লাইন স্থির করে দেয়, এবং একই সাথে দেখিয়ে দেয় যে, যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে ঐক্যের সাথে সাথে সংগ্রামও থাকবে আর 'সবকিছুই

করবেন, নিজেদের শক্তিশালী করবেন এবং নিজেদের সারিকে সংঘবদ্ধ করবেন।

দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদ

একজন কমিউনিস্ট যিনি হচ্ছেন একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী, একই সময়ে তিনি কি আবার দেশপ্রেমিকও হতে পারেন? আমরা মনে করি, তিনি শুধু হতেই পারেন না, তাঁর তা হওয়া উচিত। ঐতিহাসিক অবস্থার দ্বারাই দেশপ্রেমের নির্দিষ্ট অন্তর্বস্তু নির্ধারিত হয়। জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারেরও 'দেশপ্রেম' আছে, আবার আমাদেরও দেশপ্রেম আছে। কমিউনিস্টদের, অবশ্যই জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারেব 'দেশপ্রেমেব' দৃঢ় বিরোধিতা করতে হবে। তাঁদের দেশের দ্বারা চালিত যুদ্ধ সম্পর্কে বলতে গেলে, জাপান ও জার্মানির কমিউনিস্টরা হচ্ছেন পরাজয়বাদী। প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারের পরাজয় ঘটানোটাই হচ্ছে জাপানী ও জার্মান জনগণের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল, আর এই পরাজয় যতই সম্পূর্ণ হয়, ততই ভাল। জাপানী ও জার্মান কমিউনিস্টদের ঠিক এটাই কবতে হবে এবং এটাই তাঁরা করছেন। কারণ, জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারের দ্বারা চালিত যুদ্ধ শুধু বিশ্ব জনগণেরই ক্ষতি করছে না, বরং তাদের নিজেদেব দেশের জনগণেরও ক্ষতি করছে। চীনেব ব্যাপাব হচ্ছে ভিন্ন, কাবণ সে হচ্ছে আক্রমণের শিকার। চীনা কমিউনিস্টদের তাই আন্তর্জাতিকতাবাদের

যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে'—এই প্রস্তাবনা চীনের বাস্তব অবস্থার উপযোগী নয়। এভাবে যুক্তফ্রন্টের ব্যাপারে খাপ খাইয়ে নেবার মতবাদের ভুলকে সমালোচনা করা হয়: 'যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে স্বাতন্ত্র্য ও উদ্যোগ গ্রহণের প্রশ্ন' নামক রচনা, যা ছিল ঐ একই অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণের অংশ, তাতে কমরেড মাও সে-তুঙ এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। জাপানের বিরুদ্ধে জনগণের সশস্ত্র সংগঠিত করার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করাই সমগ্র পার্টির পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ—দৃঢ়তার সাথে এটা ঘোষণা করে অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়: যুদ্ধাঞ্চল ও শত্রুর পশ্চাদ্ভূমি হবে পার্টির প্রধান কাজের ক্ষেত্র। যেসব ব্যক্তি কুওমিনতাঙ বাহিনীর ওপর তাদের জয়ের আশা নিবদ্ধ করেছিল এবং যারা প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ শাসনের অধীনে বৈধ সংগ্রামের ওপরই জনগণের ভাগ্য ন্যস্ত করত, তাদের ভুল চিন্তাধারাকেও অধিবেশন নাকচ করে দেয়। 'যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা' নামক রচনা, যা ছিল ঐ অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণেরই একটি অংশ, তাতে কমরেড মাও সে-তুঙ এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

সাথে অবশ্যই দেশপ্রেমকে সংযুক্ত করতে হবে। আমরা হচ্ছি একই সময়ে আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং দেশপ্রেমিকও বটে, আর আমাদের শ্লোগান-হচ্ছে, 'মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর'। আমাদের পক্ষে পরাজয়বাদ হল অপরাধ এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয়লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ, মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করেই কেবলমাত্র আমরা আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে পারি এবং জাতীয় মুক্তি অর্জন করতে পারি। আর কেবলমাত্র জাতীয় মুক্তি অর্জন করেই সর্বহারাশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী জনগণের পক্ষে নিজেদের মুক্তি অর্জন সম্ভব হবে। চীনের বিজয় আর আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজয় অন্যান্য দেশের জনগণকে সাহায্য করবে। তাই জাতীয় মুক্তির যুদ্ধসমূহে দেশপ্রেম হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদের বাস্তব প্রয়োগ। এই কারণে কমিউনিস্টরা অবশ্যই তাঁদের উদ্যোগের সর্বাধিক ব্যবহার করবেন, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে বীরত্বের সাথে ও দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে যাবেন এবং জাপানী আক্রমণকারীদের ওপর তাঁদের বন্দুকের নিশানা ঠিক করবেন। এই কারণেই, ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার ঠিক পরপরই আমাদের পার্টি জাতীয় প্রতিরক্ষা-যুদ্ধের দ্বারা জাপানী আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার ঘোষণা জারী করে, পরবর্তী সময়ে জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় যুক্তফ্রন্টের প্রস্তাব উথাপন করে, জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনীর অংশ হিসেবে লালফৌজকে পুনর্গঠিত করার এবং রণাঙ্গনে যাত্রা করার নির্দেশ দেয়, আর যুদ্ধের সম্মুখসারিতে নিজেদের স্থান গ্রহণের জন্যে এবং নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য পার্টি-সদস্যদের নির্দেশ দেয়। এগুলো হচ্ছে চমৎকার দেশপ্রেমমূলক কার্যক্রম এবং, আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরুদ্ধে যাওয়া তো দূরের কথা, চীনে এগুলোই হচ্ছে তার বাস্তব প্রয়োগ। আমরা ভুল করেছি কিম্বা আন্তর্জাতিকতাবাদকে পরিত্যাগ করেছি ইত্যাদি ধরনের বাজে কথা তারাই বলতে পারে, যারা রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত কিংবা যাদের রয়েছে দুরভিসন্ধি।

জাতীয় যুদ্ধে কমিউনিস্টদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত

উপরোল্লিখিত কারণে জাতীয় যুদ্ধে কমিউনিস্টদের প্রচণ্ড উদ্যোগ দেখানো

উচিত, আর তা বাস্তবতঃই দেখানো উচিত, অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের দৃষ্টান্তমূলক অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। আমাদের যুদ্ধ হল প্রতিকূল অবস্থার অধীনে চালিত একটি যুদ্ধ। ব্যাপক জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনা-বোধ, জাতীয় আত্মসম্মানবোধ এবং জাতীয় আত্মবিশ্বাস পর্যাপ্ত পরিমাণে বিকাশলাভ করেনি, জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অসংগঠিত, চীনের সামরিক শক্তি দুর্বল, অর্থনীতি পশ্চাদ্‌পদ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক, দুর্নীতি ও হতাশাবাদ বিরাজ করছে, এবং যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে ঐক্য ও সংহতির অভাব রয়ে গেছে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রয়েছে এগুলোই। সুতরাং, এইসব অনভিপ্রেত বিষয়ের যাতে সমাপ্তি ঘটে, তার জন্য সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার মহান দায়িত্ব কমিউনিস্টদের সচেতনভাবে কাঁধে তুলে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের দৃষ্টান্তমূলক অগ্রণী ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর কমিউনিস্টদের বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করার, শৃংখলা মেনে চলার, রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে যাওয়ার এবং আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতির উন্মেষ ঘটানোর কাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। বন্ধুভাবাপন্ন দল ও বাহিনীগুলোর সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধে বলতে গেলে, জাপানকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টদের ঐক্যের জন্য দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, যুক্ত-ফ্রন্টের কর্মসূচী ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে এবং প্রতিরোধের কর্তব্য সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, কথায় তাদের হতে হবে বিশ্বস্ত আর কাজে হতে হবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ঔদ্ধত্য থেকে হতে হবে মুক্ত আর বন্ধুভাবাপন্ন দল ও বাহিনীগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনায় ও সহযোগিতা প্রদর্শনে হতে হবে আন্তরিক, এবং যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে অন্তঃপার্টি সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের হতে হবে আদর্শ দৃষ্টান্ত। সরকারী কাজে নিযুক্ত প্রত্যেক কমিউনিস্টকেই চূড়ান্ত সততার, চাকুরীতে নিযুক্তিদানের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি থেকে মুক্ত থাকার এবং স্বল্প পারিশ্রমিকের বদলে কঠোর কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। জনগণের মধ্যে কাজ করছেন-এমন প্রত্যেক কমিউনিস্টকেই জনগণের বন্ধু হতে হবে, তাঁদের বস্ নয়; অক্লান্ত শিক্ষক হতে হবে, আমলাতান্ত্রিক রাজনীতিক নয়। কখনো, কোন অবস্থাতেই একজন কমিউনিস্ট তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দেবেন না, বরং সেগুলোকে জাতির এবং জনসাধারণের স্বার্থের অধীনস্থ রাখবেন। এই কারণে, স্বার্থপরতা, শিথিলতা, দুর্নীতি, খ্যাতির আকাঙ্খা প্রভৃতি হচ্ছে সবচেয়ে ঘৃণার বিষয়; অন্যদিকে নিঃস্বার্থপরতা, নিজের সকল শক্তি নিয়ে

কাজ করা, জনগণের কর্তব্যে সর্বান্তকরণে আত্মনিয়োগ, আর নীরবে কঠিন কাজ করার মনোভাব শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হবে। পার্টির বাইরেকার সকল প্রগতিশীলদের সাথে সমতালে কাজ করা এবং অনভিপ্রেত সবকিছুকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা চালানো কমিউনিস্টদের উচিত। এটা অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, কমিউনিস্টরা জাতির একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, পার্টির বাইরে বিপুলসংখ্যক প্রগতিশীল ও সক্রিয় কর্মী রয়েছেন যাঁদের সাথে আমাদের অবশ্যই কাজ করতে হবে। এটা চিন্তা করা নেহাতই ভুল যে, আমরাই কেবলমাত্র ভাল, আর অন্যরা মোটেই ভাল নয়। রাজনৈতিকভাবে পশ্চাদ্‌পদ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলতে গেলে কমিউনিস্টরা তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন না কিম্বা উপেক্ষা করবেন না, বরং তাদেরকে বন্ধুর মতো দেখবেন, তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হবেন, তাদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাবেন এবং সামনে এগিয়ে যেতে তাদের উৎসাহিত করবেন। যেসব ব্যক্তি তাদের কাজে ভুল করেছেন, তারা যদি সংশোধনের অতীত না হন, তাহলে পরিবর্তিত হওয়া ও নতুনভাবে কাজ শুরু করায় তাদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি কমিউনিস্টদের বুঝিয়ে বলার দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করা উচিত, সরিয়ে রাখার নয়। বাস্তবনিষ্ঠ এবং দূরদর্শী হওয়ার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। কারণ একমাত্র বাস্তবনিষ্ঠ হয়েই তাঁরা পূর্ব-নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন, আর অগ্রগতির ক্ষেত্রে দূরদর্শিতাই তাদেরকে আপেক্ষিক অবস্থান হতে বিচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। কমিউনিস্টদেরকে তাই অধ্যয়নেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। সব সময়েই তাঁদেরকে জনগণের কাছ থেকে শিখতে হবে, সব সময়েই জনগণকে শেখাতে হবে। জনগণের কাছ থেকে, প্রকৃত অবস্থা থেকে এবং বন্ধুভাবাপন্ন দল ও বাহিনীর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েই কেবলমাত্র আমরা কাজের ক্ষেত্রে বাস্তবনিষ্ঠ হতে পারি এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দূরদর্শী হতে পারি। একটি সুদীর্ঘ যুদ্ধে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, বন্ধুভাবাপন্ন দল ও বাহিনীর মধ্যেকার এবং জনগণের মধ্যেকার সকল অগ্রণী ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে কমিউনিস্টরা যদি তাঁদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ সীমায় দৃষ্টান্তমূলক অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন তাহলে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করা, শত্রুকে পরাজিত করা এবং একটি নতুন চীন গড়ে তোলার সংগ্রামে সমগ্র জাতির প্রাণবন্ত শক্তির সমাবেশ ঘটানো যাবে।

সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ কর ও তার মধ্যেকার শত্রুর চরদের মোকাবিলা কর

বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ওঠা, শত্রুকে পরাজিত করা এবং একটি নতুন চীন গড়ে তোলার জন্যে একটিমাত্র নীতিই আছে, আর তা হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে সুসংহত ও প্রসারিত করা এবং সমগ্র জাতির প্রাণবন্ত শক্তিকে সমাবেশ করা। কিন্তু আমাদের জাতীয় যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে শত্রুর গুপ্তচররা আগে থেকেই বিভেদমূলক ভূমিকা পালন করে চলেছে, যেমন, দেশদ্রোহী, ট্রট্স্কিপন্থী এবং জাপানপন্থী লোকেরা। কমিউনিস্টরা সব সময়ই তাদের সম্পর্কে সতর্ক নজর রাখবে, তাদের অপরাধমূলক কার্যকলাপকে তথ্যপ্রমাণ সহকারে উদ্‌ঘাটিত করবে আর যাতে তাদের দ্বারা সহজে প্রতারিত না হন তার জন্য জনগণকে হুঁশিয়ার করে দেবেন। শত্রুর এসব চরদের প্রতি কমিউনিস্টরা তাঁদের রাজনৈতিক সতর্কতাকে অবশ্যই সুতীক্ষ্ণ করবেন। তাঁদেরকে এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, জাতীয় যুক্তফ্রন্টেই সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের কাজ এবং শত্রুর গুপ্তচরদের মুখোস উন্মোচন ও তাদের নিশ্চিহ্নকরণের কাজ অবিচ্ছেদ্য। শুধু একদিকেই নজর দেওয়া এবং অন্যদিকে ভুলে যাওয়া সামগ্রিকভাবেই ভুল হবে।

কমিউনিস্ট পার্টিকে সম্প্রসারিত কর ও শত্রুর চরদের অনুপ্রবেশ রোধ কর

বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ওঠা, শত্রুকে পরাজিত করা এবং একটি নতুন চীন গড়ে তোলার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে অবশ্যই তার সংগঠনের সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে এবং শ্রমিক, কৃষক ও যুবকর্মীদের মধ্যে যারা বিপ্লবের প্রতি সত্যিকারভাবে অনুগত, যারা পার্টির নীতির প্রতি আস্থাশীল, তার কর্মনীতি সমর্থন করে এবং তার শৃংখলা মেনে চলতে ও কঠোর কাজ করতে প্রস্তুত, তাদের জন্যে পার্টির দরজা খুলে দিয়ে পার্টিকে একটি বিরাট গণ-পার্টিতে পরিণত করতে হবে। দরজা বন্ধ রাখার কোন প্রবণতাই এক্ষেত্রে সহ্য করা উচিত নয়। কিন্তু এই একই সাথে, শত্রুর গুপ্তচরদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সজাগ-সতর্কতার ক্ষেত্রে কোন শিথিলতাই থাকতে পারে না। জাপানী সাম্রাজ্যবাদী গুপ্ত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আমাদের পার্টির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্যে এবং সক্রিয় কর্মীর ছদ্মবেশে আমাদের সারিতে ছদ্মবেশী দেশদ্রোহী,

ট্রট্স্কিপন্থী, জাপ-সমর্থক ব্যক্তি, অধঃপতিত ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী লোকদের গোপনে অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়ার জন্যে বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব লোকের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্কতা এবং কঠোর সাবধানতা একটি মুহূর্তের জন্যেও যেন আমরা শিথিল না করি। সাহসের সাথে পার্টিকে সম্প্রসারিত করার প্রতিষ্ঠিত কর্মনীতি যেখানে আমাদের রয়েছে, সেখানে শত্রুর গুপ্তচরদের ভয়ে দরজা বন্ধ করা আমাদের অবশ্যই উচিত নয়। কিন্তু একদিকে সাহসের সাথে যখন আমরা আমাদের সভ্যসংখ্যা বাড়াব, তখন অন্যদিকে শত্রুর চর ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী যেসব ব্যক্তি পার্টিতে ঢুকে পড়ার জন্যে এই সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্কতা অবশ্যই শিথিল করা চলবে না। আমরা যদি কেবলমাত্র একদিকের প্রতিই নজর দিই এবং অন্যদিককে ভুলে যাই তাহলে আমাদের ভুলই হবে। একমাত্র সঠিক কর্মনীতি হল: 'সাহসের সাথে পার্টিকে সম্প্রসারিত কর, কিন্তু অনভিপ্রেত একটি লোককেও ঢুকতে দিও না।'

যুক্তফ্রন্ট ও পার্টির স্বাতন্ত্র্য দুই-ই বজায় রাখ

দৃঢ়ভাবে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট বজায় রেখেই কেবলমাত্র বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ওঠা যাবে, শত্রুকে পরাজিত করা যাবে এবং একটি নতুন চীন গড়ে তোলা যাবে। এর মধ্যে কোন সন্দেহই নেই। একই সময়ে, যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ প্রত্যেকটি পার্টি ও গ্রুপকে তার আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই রক্ষা করতে হবে, এটা কুওমিনতাঙ, কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা অন্য যে-কোনও পার্টি বা গ্রুপের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্তঃপার্টি সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সকল পার্টি ও গ্রুপের সম্মিলন এবং প্রত্যেকটির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এই দুটোই 'তিন গণ-নীতির' অন্তর্ভুক্ত 'গণতন্ত্রের নীতি' দ্বারা স্বীকৃত। কেবল ঐক্যের কথাই বলা এবং স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করার অর্থ হল গণতন্ত্রের নীতিকে পরিত্যাগ করা, আর এতে কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা অন্য যে-কোন পার্টি একমত হতে পারে না। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে আপেক্ষিক, চূড়ান্ত নয়, আর এটাকে চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করলে তা শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যের সাধারণ কর্মনীতিকেই দুর্বল করবে। কিন্তু এই আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যকে অবশ্যই অস্বীকার করা উচিত নয়, আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে প্রত্যেক পার্টিরই

থাকবে তার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য, অর্থাৎ আপেক্ষিক স্বাধীনতা। তাছাড়া, এই আপেক্ষিক স্বাধীনতা যদি অস্বীকার করা হয় কিংবা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যের সাধারণ কর্মনীতি দুর্বল হয়ে পড়বে। কমিউনিস্ট পার্টি এবং বন্ধুভাবাপন্ন পার্টিগুলোর সকল সদস্যদের এটা স্পষ্টভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।

শ্রেণী-সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই কথা একইভাবে সত্য। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত নীতি যে, প্রতিরোধ-যুদ্ধের ক্ষেত্রে সবকিছুকেই প্রতিরোধের স্বার্থের অধীনস্থ করতে হবে। সুতরাং, শ্রেণী-সংগ্রামের স্বার্থ প্রতিরোধ-যুদ্ধের স্বার্থের অধীনস্থ হবে, অবশ্যই তার বিরোধী হবে না। কিন্তু শ্রেণী এবং শ্রেণী-সংগ্রাম বাস্তব ঘটনা, আর যেসব লোক শ্রেণী-সংগ্রামের বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার করে তারা ভ্রান্ত। যে তত্ত্ব এই বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার করার প্রয়াস পায়, তা একেবারেই ভ্রান্ত। আমরা শ্রেণী-সংগ্রামকে অস্বীকার করি না, আমরা তার সমন্বয়সাধন করি। পারস্পরিক সাহায্য এবং পারস্পরিক সুবিধাদানের যে কর্মনীতির পক্ষে আমরা কথা বলি, তা শুধু পার্টি-সম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং তা শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জাপ-বিরোধী ঐক্য দাবি করে শ্রেণী-সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত সমন্বয়সাধনের কর্মনীতি, এমন এক কর্মনীতি যা শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ-সংরক্ষণ করবে না, বরং ধনী লোকের স্বার্থও বিবেচনা করে, এবং এইভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে সংহতির দাবি পূরণ করে। কেবল একদিকের প্রতি নজর দিয়ে অন্যদিককে অবহেলা করা প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিচার কর, সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা কর, আর আমাদের মিত্রদের সাথে একযোগে কাজ কর

শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণকে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা পরিস্থিতিকে অবশ্যই সামগ্রিকভাবে বিচার করবে, জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করবে এবং তাদের মিত্রদের সাথে একযোগে কাজ করবে। অংশের প্রয়োজনকে সমগ্রের প্রয়োজনের অধীনস্থ করার

নীতিকে কমিউনিস্টদের আয়ত্ত করতে হবে। যদি কোন পরিকল্পনা একটি আংশিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রেই প্রয়োগযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়, সামগ্রিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য না হয়, তাহলে অংশকে অবশ্যই সমগ্রের পথ ছেড়ে দিতে হবে। বিপরীত দিক দিয়ে, যদি পরিকল্পনাটি অংশের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য না হয়, বরং সামগ্রিক পরিস্থিতির আলোকে প্রযোগযোগ্য হয়, তাহলে এবারও অংশকে সমগ্রের পথ ছেড়ে দিতে হবে। পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করা বলতে ঠিক এটাই বোঝায়। কমিউনিস্টরা কখনোই জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করবে না, অথবা কেবলমাত্র কিছুসংখ্যক প্রগতিশীল বাহিনীকে একটি বিচ্ছিন্ন ও হঠকারী অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে জনগণকে উপেক্ষা করবে না, বরং প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ ও ব্যাপক জনতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তুলবে। জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করা বলতে ঠিক এটাই বোঝায়। আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক গণতান্ত্রিক পার্টি বা ব্যক্তি যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই কমিউনিস্টদের পক্ষে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি হবে তাদের সাথে বিস্তৃতভাবে সব বিষয় আলাপ-আলোচনা করা এবং তাদের সাথে একযোগে কাজ করা। স্বেচ্ছাচারমূলক সিদ্ধান্ত ও প্রভুত্বমূলক কার্যাবলীর প্রশ্রয় দেওয়া এবং আমাদের মিত্রদের উপেক্ষা করাটা অনুচিত। ভাল কমিউনিস্ট হচ্ছে সেই যে পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিচার-বিবেচনা করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করায় এবং মিত্রদের সাথে কাজ করায় উপযুক্ত। এ ব্যাপারে আমাদের মারাত্মক দোষ-ত্রুটি ছিল, আর এখনো এই বিষয়টির ওপর আমাদের নজর দিতে হবে।

কর্মীসংক্রান্ত নীতি

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে এমন একটা পার্টি, যা সংখ্যার দিক দিয়ে বেশ কয়েক কোটি লোকেরই এক জাতির মধ্যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিচালনা করছে। আর রাজনৈতিক সংহতির সাথে কর্মক্ষমতার সংযোগ সাধনকারী বিপুলসংখ্যক নেতৃস্থানীয় কর্মী ছাড়া পার্টির পক্ষে তার এই ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পন্ন করা অসম্ভব। বিগত সতের বছরে আমাদের পার্টি বেশ ভাল সংখ্যক যোগ্য নেতাকে সুশিক্ষিত করে তুলেছে, যার ফলে সামরিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পার্টিগত এবং গণ-কার্যকলাপের ক্ষেত্রে আমাদের একটা কর্মী-

কাঠামো গড়ে উঠেছে; এই সাফল্যের সকল গৌরবই পার্টির এবং জাতির প্রাপ্য। কিন্তু বর্তমানের এই কর্মী-কাঠামো আমাদের সংগ্রামের বিরাট সৌধকে সমর্থন করার পক্ষে এখনো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, ব্যাপক হারে যোগ্য লোক সুশিক্ষিত করে তোলার এখনো প্রয়োজন রয়েছে। চীনা জনগণের মহান সংগ্রামে বহু সক্রিয় কর্মী এগিয়ে এসেছেন, এবং তাঁদের আগমন এখনো অব্যাহত রয়েছে। তাঁদেরকে সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করে তোলা এবং তাঁদের ভালভাবে যত্ন নেওয়া ও উপযুক্ত কাজে লাগানোর দায়িত্ব আমাদের রয়েছে। রাজনৈতিক লাইন একবার নির্ধারিত হয়ে গেলে কর্মীরাই হচ্ছেন নির্ধারক উপাদান। সুতরাং আমাদের সংগ্রামী কর্মসূচী হচ্ছে নতুন কর্মীদের বিরাট সংখ্যককে পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষিত করা।

পার্টি-কর্মীদের সাথে সাথে পার্টি-বহির্ভূত কর্মীদের প্রতিও আমাদের সম্পর্ককে সম্প্রসারিত করতে হবে। পার্টির বাইরে অনেক যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁদেরকে উপেক্ষা করা অবশ্যই উচিত নয়। প্রত্যেক কমিউনিস্টের কর্তব্য হল ঔদ্ধত্য ও একাকীত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করা, পার্টি বহির্ভূত কর্মীদের সাথে মিলে কাজ করতে নিপুণ হওয়া, তাদের আন্তরিক সাহায্য দেওয়া, তাদের প্রতি ঐকান্তিক কমরেডসুলভ মনোভাব গ্রহণ করা এবং জাপানকে প্রতিরোধ করা ও দেশকে পুনর্গঠন করার মহান কাজে তাদের উদ্যোগকে নিয়োজিত করা।

কর্মীদের কিভাবে বিচার করতে হবে, তা আমাদের অবশ্যই জানা দরকার। কোন কর্মীর জীবনের একটা স্বল্প সময় কিংবা একটা স্বতন্ত্র ঘটনার মধ্যেই আমাদের বিচার-বিবেচনা অবশ্যই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়, বরং তার জীবন ও কার্যকলাপকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা উচিত। এটাই হচ্ছে কর্মীদের বিচার করার প্রধান পদ্ধতি।

কর্মীদের কিভাবে ভালভাবে কাজে লাগানো যায় তা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, নেতৃত্বের সাথে জড়িত রয়েছে দুটো প্রধান দায়িত্ব: কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, আর কর্মীদের ভালভাবে কাজে লাগানো। পরিকল্পনা খাড়া করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, আর আদেশ ও নির্দেশ প্রদান করা, এসব বিষয়ই 'কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করার' আওতায় পড়ে; কর্ম-পরিকল্পনাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলে কাডারদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং কাজে নেমে পড়ায় উৎসাহিত করতে হবে; এটা 'কর্মীদের'

ভালভাবে কাজে লাগানোর' আওতায় পড়ে। কর্মীদের কাজে লাগানোর ব্যাপারে আমাদের জাতির সমগ্র ইতিহাস জুড়ে দুটো তীব্র বিপরীতমুখী লাইন দেখা যায়, একটা হল 'যোগ্যতা অনুসারে লোক নিয়োগ', আর অন্যটা হল 'স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে লোক নিয়োগ'। প্রথমটি হল সদুপায় আর দ্বিতীয়টি হল অসদুপায়। কর্মী-নীতির ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির যে মানদণ্ড প্রয়োগ করা উচিত তা হল কোন কর্মী-পার্টি-লাইন কার্যকরী করার ব্যাপারে দৃঢ় কিনা, সে পার্টির শৃংখলা মানে কিনা, জনতার সাথে তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে কিনা, স্বাধীনভাবে নিজের দায়িত্ব খুঁজে নেবার ক্ষমতা তার আছে কিনা, আর সে সক্রিয়, পরিশ্রমী ও নিঃস্বার্থ কিনা। 'যোগ্যতা অনুসারে লোক নিয়োগ' বলতে এটাই বোঝায়। চ্যাং কুও-তাও'য়ের কর্মী নীতি ছিল তার ঠিক বিপরীত। 'স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করার' লাইন অনুসরণ করে, একটি ক্ষুদ্র চক্র গঠন করার উদ্দেশ্যে নিজের চারিদিকে সে তার প্রিয়পাত্রদের জড়ো করে, আর শেষ পর্যন্ত পার্টির প্রতি নিজেকে সে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করে এবং শিবির ত্যাগ করে। এটা আমাদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এই ঘটনা এবং অনুরূপ ঐতিহাসিক শিক্ষাবলী থেকে সতর্কতা গ্রহণ করে, কেন্দ্রীয় কমিটি ও সকল স্তরের নেতাদেরকে কর্মী-নীতির ক্ষেত্রে সৎ ও নিরপেক্ষ পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং অসৎ ও পক্ষপাতমূলক পদ্ধতি বাতিল করার বিষয়টিকে প্রধান দায়িত্ব বলেই গ্রহণ করতে হবে, আর এভাবে পার্টির ঐক্যকে মজবুত করতে হবে।

কর্মীদের কিভাবে ভাল করে যত্ন নিতে হয় তা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। যত্ন নেওয়ার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি আছে :

প্রথমতঃ, তাদের পথনির্দেশ করা। এর অর্থ, স্বাধীনভাবে তাদের কাজ করতে দেওয়া, যাতে সাহসের সাথে তারা দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে আর একই সময়ে, তাদের সময়োচিত নির্দেশ দেওয়া, যাতে পার্টির রাজনৈতিক লাইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা নিজেদের উদ্যোগের পূর্ণ ব্যবহার করতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, তাদের মান উন্নত করা। এর অর্থ, অধ্যয়নের সুযোগ দিয়ে তাদের শিক্ষাদান করা, যাতে নিজেদের তত্ত্বগত উপলব্ধি ও নিজেদের কর্মক্ষমতা তারা বাড়াতে পারে।

তৃতীয়তঃ, তাদের কাজকর্ম পরীক্ষা করে দেখা, আর তাদের অভিজ্ঞতার

সারসংকলন করতে, তাদের সাফল্যকে সামনে এগিয়ে নিতে এবং তাদের ভুলগুলোকে শুধরে নিতে তাদেরকে সাহায্য করা। পরীক্ষা না করে কাজের দায়িত্ব দেওয়া এবং শুধু মারাত্মক ভুল করলেই কেবল নজর দেওয়া —এটা কর্মীদের যত্ন নেওয়ার পদ্ধতি নয়।

চতুর্থতঃ, সাধারণভাবে, যেসব কর্মী ভুল করেছে তাদের প্রতি বুঝিয়ে বলার পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, আর তাদের ভুলগুলো শুধরাতে সাহায্য করতে হবে। গুরুতর ভুল করা সত্ত্বেও যারা নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে, কেবলমাত্র তাদের বেলায় সংগ্রামের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা অপরিহার্য। কোন লোককে লঘুভাবে 'সুবিধাবাদী' আখ্যা দেওয়া কিম্বা তার বিরুদ্ধে লঘুভাবে 'সংগ্রাম চালানোর' পদ্ধতি অবলম্বন করা ঠিক নয়।

পঞ্চমতঃ, তাদের অসুবিধার সময় তাদের সাহায্য করা। অসুস্থতা, আর্থিক অনটন বা সাংসারিক কিংবা অন্য কোন বিপত্তির ফলে কর্মীরা যখন অসুবিধায় পড়ে, তখন আমাদের নিশ্চিতভাবেই যতটা সম্ভব যত্ন নিতে হবে।

এগুলোই হচ্ছে কর্মীদের যত্ন নেওয়ার পদ্ধতি।

পার্টি শৃংখলা

চ্যাং কুও-তাও'য়ের মারাত্মক শৃংখলা ভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির শৃংখলাকে আমাদের আবার দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরতে হবে, যা হল :

(১) ব্যক্তি সংগঠনের অধীন,

(২) সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অধীন,

(৩) নিম্নতর স্তর উচ্চতর স্তরের অধীন, এবং

(৪) সমগ্র পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির অধীন।

যে কেউ-ই শৃংখলার এই বিধিগুলো লংঘন করে, সে-ই পার্টি-ঐক্যকে বিনষ্ট করে। অভিজ্ঞতা প্রমাণিত করেছে যে, কিছু কিছু লোক পার্টি-শৃংখলা কি তা না জেনেই শৃংখলা ভঙ্গ করে, আবার অন্যদিকে চ্যাং কুও তাও'য়ের মতো কিছু কিছু লোক জেনেশুনেই তা ভঙ্গ করে এবং নিজেদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বহু পার্টি-সদস্যদের এই অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করে। তাই, পার্টি-সদস্যদের পার্টি-শৃংখলায় শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন, যাতে পার্টির

সাধারণ কর্মীরা নিজেরাই যে কেবল শৃংখলা মেনে চলবে তা নয়, বরং নেতারাও যাতে তা মেনে চলেন, সেজন্য তাঁদের ওপর তদারকী প্রয়োগ করবেন, আর এইভাবেই চ্যাং কুও-তাওয়ের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে। সঠিক পথে অন্তঃপার্টি সম্পর্কের বিকাশসাধনকে যদি আমরা নিশ্চিত করতে চাই, তাহলে শৃংখলার উপরোক্ত চারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধি ছাড়াও বেশ সুবিস্তৃত একপ্রস্থ পার্টি নিয়মবিধি আমাদের প্রণয়ন করতে হবে, যা সকল স্তরের নেতৃত্বদানকারী সংস্থাসমূহের কাজকর্মকে সুসমঞ্জস করার কাজে সহায়তা করবে।

পার্টি গণতন্ত্র

বর্তমানের মহান সংগ্রামে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দাবি করে যে, পার্টির সমস্ত নেতৃত্বদানকারী সংস্থা এবং সমস্ত পার্টি-সদস্য ও কর্মীদের উচিত তাদের উদ্যোগের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটানো, আর কেবলমাত্র এটাই বিজয়কে সুনিশ্চিত করতে পারে। নেতৃত্বদানকারী সংস্থা, কর্মী ও পার্টির সাধারণ কর্মীদের সৃজনশীলভাবে কাজ করার ক্ষমতায়, দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের প্রস্তুতিতে, তাদের কাজকর্মে তাদের দ্বারা প্রদর্শিত উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্ততায়, প্রশ্ন উত্থাপন, মত প্রকাশ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনায় তাদের সাহস ও সক্ষমতায়, নেতৃত্ব-দানকারী সংস্থা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীদের ওপর আরোপিত কমরেডসুলভ তদারকির ক্ষেত্রেই এই উদ্যোগকে বাস্তবতঃ প্রদর্শন করতে হবে, অন্যথায় এই 'উদ্যোগ' একটি শূন্যগর্ভ বিষয়ে পরিণত হবে। কিন্তু এই ধরনের উদ্যোগের অনুশীলন পার্টি-জীবনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বিস্তৃতির ওপর নির্ভর করে। পার্টি-জীবনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র যদি না থাকে তাহলে এর স্ফুরণ ঘটানো সম্ভব নয়। কেবলমাত্র একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশেই বিপুলসংখ্যক যোগ্য লোককে সামনে টেনে আনা যায়। আমাদের হচ্ছে এমন এক দেশ, যেখানে ক্ষুদে উৎপাদন এবং পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিরাজমান, আর সামগ্রিকভাবে ধরলে দেশে এখনো কোন গণতান্ত্রিক জীবনধারা নেই, ফলতঃ, আমাদের পার্টিতে এই ধরনের অবস্থার প্রতিফলন ঘটছে পার্টি-জীবনের ক্ষেত্রে অপ্রতুল গণতন্ত্রের মাধ্যমে। এই অবস্থা সমগ্র পার্টিকে তার পরিপূর্ণ উদ্যোগ অনুশীলনে বাধা দিচ্ছে। অনুরূপভাবে যুক্তফ্রন্ট ও গণ-আন্দোলনে এটা অপ্রতুল গণতন্ত্রের জন্ম দিচ্ছে। এইসব কারণে পার্টির ভেতরে গণতন্ত্র সম্পর্কে শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে যেতে

হবে, যাতে পার্টি-সদস্যরা গণতান্ত্রিক জীবনের অর্থ কি, গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার মধ্যেকার সম্পর্ক বলতে কি বোঝায়, আর গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কোন্ পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে তা অনুধাবন করতে পারেন। শুধুমাত্র এই উপায়েই আমরা প্রকৃতভাবে পার্টির ভেতরে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ ঘটাতে পারি এবং একই সময়ে উগ্র গণতন্ত্র ও শৃংখলা ধ্বংসকারী অবাধ স্বাধীনতার নীতিকে এড়াতে পারি।

আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যেকার পার্টি-সংগঠনসমূহের মধ্যেও প্রয়োজনীয় পরিমাণ গণতন্ত্রের প্রসার ঘটানো দরকার যাতে পার্টি-সদস্যদের উদ্যোগ জাগ্রত হয় এবং সৈন্যদের প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য স্থানীয় পার্টি-সংগঠন-সমূহে যে পরিমাণ গণতন্ত্র থাকে, সেনাবাহিনীর মধ্যেকার পার্টি-সংগঠনসমূহে সে পরিমাণ গণতন্ত্র থাকতে পারে না। সেনাবাহিনী ও স্থানীয় সংস্থাসমূহ—এই উভয়টিতেই অন্তঃপার্টি গণতন্ত্র চালু রাখার উদ্দেশ্য হল শৃংখলা জোরদার করা এবং প্রতিরোধক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা, সেগুলোকে দুর্বল করা নয়।

পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণকে পার্টির সুসংবদ্ধকরণ ও বিকাশের পথে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবেই দেখতে হবে, দেখতে হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হিসেবে, যা পার্টিকে মহান সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় হতে, তার কর্তব্য সাধনের উপযোগী হতে, নতুন শক্তি সৃষ্টি করতে ও যুদ্ধের বাধাবিপত্তিসমূহ দূর করায় সক্ষম করে তোলে।

দুটি ফ্রন্টে সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের পার্টি নিজেকে সংহত করেছে ও শক্তিশালী হয়েছে

সাধারণভাবে বলতে গেলে আমাদের পার্টি বিগত সতের বছর ধরে দুটি ফ্রন্টে পার্টির আভ্যন্তরীণ ভুল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে—অর্থাৎ, দক্ষিণপন্থী সুবিধা-বাদের বিরুদ্ধে ও 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শগত হাতিয়ার ব্যবহার করতে শিখেছে।

ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পূর্বে[২] আমাদের পার্টি চেন তু-শিউ'র দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও কমরেড লি লি-সানের 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এই দুটি অন্তঃপার্টি সংগ্রামে অর্জিত বিজয়ের দরুণ পার্টির বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর আরও দুটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন অন্তঃপার্টি সংগ্রাম চালানো হয়, সেটা হল

সুনাই বৈঠকে পরিচালিত সংগ্রাম এবং চ্যাং কুও-তাও'য়ের বহিষ্কার সম্পর্কিত সংগ্রাম।

সুনাই বৈঠক 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী চরিত্রের মারাত্মক ভুলসমূহ—শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে নীতিগত যেসব ভুল করা হয়েছিল সেগুলোকে—সংশোধন করেছে এবং পার্টি ও লাল-ফৌজকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, এই বৈঠক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং লাল-ফৌজের মূল শক্তিসমূহকে 'লং মার্চের' বিজয়মণ্ডিত সমাপনে, জাপানকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী অবস্থানে এগিয়ে যেতে এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নতুন কর্মনীতি বাস্তবায়নে সক্ষম করে তুলেছে। চ্যাং কুও-তাও'য়ের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদকে মোকাবিলা করার মাধ্যমে পার্সী ও ইয়েনান বৈঠক (চ্যাং কুও-তাও'য়ের লাইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয় পার্সী বৈঠকে[৩] আর শেষ হয় ইয়েনান বৈঠকে[৪]) লাল শক্তিসমূহের সবগুলোকে একত্রে সম্মিলিত করতে এবং জাপানের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য সমগ্র পার্টির ঐক্যকে জোরদার করতে সক্ষম হয়েছে, বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের আমলেই এই দু'রকমের সুবিধাবাদী ভুল দেখা দিয়েছিল, আর তাদের বৈশিষ্ট্য হল এগুলো ছিল যুদ্ধ সম্পর্কিত ভ্রান্তি।

এই দুটি অন্তঃপার্টি সংগ্রাম থেকে লব্ধ শিক্ষাগুলো কি কি? সেগুলো হচ্ছে:

(১) 'বামপন্থী' ধৈর্যহীনতার প্রবণতা, যা বিষয়গত ও বস্তুগত উভয় উপাদানকে উপেক্ষা করে, তা বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক, আর সেই সূত্রে যে-কোন বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষেই ক্ষতিকারক—এই প্রবণতাই ছিল মারাত্মক নীতিগত ভ্রান্তিসমূহের মধ্যেকার একটি, যা শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে চালিত সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছিল, আর যা চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিয়েছিল।

(২) চ্যাং কুও-তাও'য়ের সুবিধাবাদ অবশ্য ছিল বিপ্লবী যুদ্ধের ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ এবং পশ্চাদপসরণবাদী লাইন, যুদ্ধরাজ নীতি পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপের একটা সংমিশ্রিত রূপ ছিল এটা। শুধুমাত্র এই নিদর্শনের সুবিধাবাদকে অতিক্রম করেই লালফৌজের চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির বিপুল সংখ্যক কর্মী ও পার্টি-সদস্য, যাঁরা অপরিহার্যরূপে চমৎকার গুণাবলী দ্বারা ভূষিত এবং যাঁদের রয়েছে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য, তাঁরা চ্যাং কুও-

তাও'য়ের ফাঁদ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক লাইনে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

(৩) কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের দশ বছরকালীন মহান সাংগঠনিক কাজে, অর্থাৎ সেনাবাহিনী গঠন, সরকারী কাজকর্ম, জনগণের মধ্যেকার কাজকর্ম ও পার্টি গঠনের কাজে অত্যাশ্চর্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। রণাঙ্গনের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের প্রতি এরকম সাংগঠনিক কাজের দ্বারা প্রদত্ত সমর্থন না থাকলে চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে তিক্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। তবুও এই আমলের শেষদিকে কর্মী ও সংগঠন সম্পর্কিত পার্টির কর্মনীতিতে মারাত্মক নীতিগত ভুলভ্রান্তি করা হয়েছিল, সংকীর্ণতাবাদী প্রবণতা, দৈহিক শাস্তি প্রদান ও মাত্রাতিরিক্ত আদর্শগত সংগ্রামের কর্মনীতির মধ্যেই এসব ভ্রান্তি নিজেদের প্রকাশ ঘটিয়েছিল। পূর্বতন লি লি-সান লাইনের নিদর্শনগুলো দূর করার কাজে আমাদের অকৃতকার্যতা আর ঐ নির্দিষ্ট সময়ে নীতিগত ব্যাপারে কৃত রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি— এই উভয় কারণেই তা ঘটেছিল। স্থনাই বৈঠকে এসব ভুলভ্রান্তিও সংশোধন করা হয়, আর এভাবে পার্টি একটি সঠিক কর্মী-নীতি ও সঠিক সাংগঠনিক নীতিমালা নির্ধারণের পথে এগুতে সক্ষম হয়। চ্যাং কুও-তাও'য়ের সাংগঠনিক লাইন সম্পর্কে বলতে গেলে, এই লাইন সকল পার্টি-নীতি লংঘন করেছিল, পার্টি শৃংখলা ভঙ্গ করেছিল এবং পার্টির বিরোধিতা, কেন্দ্রীয় কমিটির বিরোধিতা ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিরোধিতার পর্যায় পর্যন্ত উপদলীয় কার্যকলাপ চালিয়েছিল। চ্যাং কুও-তাও'য়ের অপরাধমূলক ও ভ্রান্ত লাইনকে পরাজিত করার জন্য এবং তার পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি যথাসম্ভব সবকিছুই করেছিল, আর স্বয়ং চ্যাং কুও-তাও'কেও বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু চ্যাং কুও-তাও যখন গোঁয়ারের মতো নিজের ভুলগুলো সংশোধন করতে অস্বীকার করল এবং দুমুখো নীতির আশ্রয় গ্রহণ করল, আর পরবর্তীকালে এমনকি পার্টির প্রতিও যখন বিশ্বাসঘাতকতা করল ও কুওমিনতাঙের কোলে নিজেকে সমর্পণ করল, তখন পার্টিকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এবং তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করতে হয়। এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা শুধু যে সকল পার্টি-সদস্যদেরই সমর্থন পেয়েছিল তাই নয়, উপরন্তু জাতীয় মুক্তির আদর্শের প্রতি অনুগত সকল জনগণেরও সমর্থনলাভ করেছিল। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকও এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে এবং চ্যাং কুও-তাওকে

শিবিরত্যাগী ও বিশ্বাসঘাতক বলে নিন্দা করে।

এই সমস্ত শিক্ষা ও এই সমস্ত সাফল্য সমগ্র পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার, পার্টির আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সংহতিকে জোরদার করার, আর সাফল্যের সাথে প্রতিরোধ-যুদ্ধ পরিচালনার পূর্বশর্তসমূহ আমাদের যুগিয়েছে। দুই ফ্রন্টে সংগ্রামের মাধ্যমেই আমাদের পার্টি নিজেকে সংহত করেছে ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

দুই ফ্রন্টে বর্তমান সংগ্রাম

এখন থেকে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে দক্ষিণপন্থী হতাশাবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যদিও 'বামপন্থী' ধৈর্যহীনতার দিকে নজর রাখারও আবশ্যকতা রয়েছে। আমরা যদি অন্যান্য বিভিন্ন জাপ-বিরোধী পার্টি ও গ্রুপের সহযোগিতালাভ করতে চাই, কমিউনিস্ট পার্টিকে সম্প্রসারিত করতে চাই এবং গণ-আন্দোলনকে ব্যাপকতর করতে চাই, তাহলে যুক্তফ্রন্ট, পার্টি ও গণ-সংগঠনের প্রশ্নে রুদ্ধদ্বারের 'বামপন্থী' প্রবণতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। একই সময়ে, শর্তহীন চরিত্রের সহযোগিতা ও সম্প্রসারণ-অভিমুখী দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী প্রবণতাকে মোকাবিলা করার কাজেও আমাদের অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, তা না হলে সহযোগিতা ও সম্প্রসারণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সেগুলো আত্মসমর্পণকারী সহযোগিতা ও নীতিহীন সম্প্রসারণে পর্যবসিত হবে।

দুই ফ্রন্টের মতাদর্শগত সংগ্রামকে অবশ্যই প্রতিটি ক্ষেত্রের বাস্তব অবস্থার উপযোগী হতে হবে, আর কোন সমস্যার প্রতি আত্মগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা কিংবা লোকের গায়ে অযথা 'লেবেল সেঁটে' দেওয়ার পুরানো বদ-অভ্যাস অব্যাহত রাখা কখনোই চলবে না।

বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের বেলায়, দুমুখো আচরণের বিরোধিতার প্রতি অবশ্যই আমাদের তীক্ষ্ণ নজর দিতে হবে। চ্যাং কুও-তাও'য়ের জীবনের গতি প্রমাণ করছে এই ধরনের আচরণের মারাত্মক বিপদ হল এই যে, এটা উপদলীয় কার্যকলাপের জন্ম দিতে পারে। প্রকাশ্যে সম্মতি প্রদান আর পেছনে বিরুদ্ধাচরণ, মুখে 'হ্যাঁ' আর অন্তরে 'না', লোকের সামনে চমৎকার কথাবার্তা বলা আর পেছনে কূট চক্রান্ত করা—এ সবই দুমুখো আচরণের বিভিন্ন রূপ। এ ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে কর্মী ও পার্টি-সদস্যদের সতর্কতাকে তীক্ষ্ণ করেই

কেবল পার্টি-শৃংখলাকে আমরা শক্তিশালী করতে পারি।

অধ্যয়ন

সাধারণভাবে বলতে গেলে, কমিউনিস্ট পার্টির যেসব সভ্য লেখাপড়া জানেন তাঁদের সকলকেই মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের তত্ত্বাবলী অধ্যয়ন করতে হবে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস এবং চলতি আন্দোলন ও প্রবণতাসমূহ সম্পর্কে অধ্যয়ন চালাতে হবে, তদুপরি, কম লেখাপড়া জানেন এমন সব পার্টি-সভ্যকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারেও সহায়তা করতে হবে। বিশেষতঃ কর্মীদের এসব বিষয় যত্নের সাথে অধ্যয়ন করা উচিত, আর কেন্দ্রীয় কমিটি ও উচ্চস্তরের কর্মীদের এগুলোর প্রতি আরও অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। বিপ্লবী তত্ত্বের অধিকারী না হলে ও ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে এবং বাস্তব আন্দোলন সম্পর্কে সুগভীর উপলব্ধি না থাকলে কোন রাজনৈতিক পার্টিই সম্ভবতঃ একটি মহান বৈপ্লবিক আন্দোলনকে বিজয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে না।

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের তত্ত্ব সার্বজনীনভাবেই প্রয়োগযোগ্য। অন্ধ মতবাদ হিসেবে নয়, বরং কর্মের পথনির্দেশক হিসেবেই এটাকে দেখা উচিত। নিছক কতকগুলো পদ বা শব্দসমষ্টি শেখার ব্যাপার নয়, বরং এটা অধ্যয়ন করার অর্থ হল বিপ্লবের বিজ্ঞান হিসেবেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে শেখা। বাস্তব জীবন সম্পর্কে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের সুবিস্তৃত অধ্যয়ন ও তাঁদের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা যেসব সাধারণ সূত্র নিরূপণ করেছিলেন, সেগুলো নিছক হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারই শুধু এটা নয়, বরং তা হচ্ছে সমস্যার পর্যবেক্ষণ ও সমাধানে তাঁদের অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিকেও অধ্যয়ন করা। অতীতের তুলনায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর আমাদের পার্টির দখল এখন অনেক বেশি কিন্তু এখনো তা যথেষ্ট ব্যাপক ও গভীর নয়। আমাদের কর্তব্য হল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের এক মহান জাতির এক সুমহান ও নজিরবিহীন সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করা। সেইজন্য, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অধ্যয়নকে ছড়িয়ে দেওয়া ও গভীরতর করার কাজটি আমাদের সামনে একটি বিরাট সমস্যা হিসেবে উপস্থিত হয়েছে, যার আশু সমাধান প্রয়োজন এবং যা কেবলমাত্র কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় কমিটির এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর, সমগ্র পার্টিতে অধ্যয়ন নিয়ে

একটা প্রতিযোগিতা আমি দেখতে চাই। এতে দেখা যাবে কে প্রকৃতই কিছু শিখছেন, আর কে বেশি শিখেছেন ও ভালভাবে শিখেছেন। নেতৃত্বের প্রধান দায়িত্ব মাথায় তুলে নেওয়া সম্পর্কে বলতে গেলে, দু-একশ কমরেড থাকেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর যাঁদের টুক্‌রো-টুক্‌রো নয় সুসম্বন্ধ দখল রয়েছে, ফাঁকা নয় প্রকৃত দখল রয়েছে, তাহলে আমাদের পার্টির লড়াকু শক্তি বহুগুণ বেড়ে যাবে এবং জাপানকে পরাজিত করার কর্তব্য আরও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

আমাদের আরেকটি কর্তব্য হচ্ছে আমাদের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে অধ্যয়ন করা এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার সারসংকলন করার জন্য মার্কসীয় পদ্ধতি ব্যবহার করা। আমাদের কয়েক হাজার বছরের জাতীয় ইতিহাস রয়েছে এবং তার রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও অপরিমেয় সম্পদ-ভাণ্ডার। কিন্তু এসব ব্যাপারে আমরা নিছক পাঠশালারই শিক্ষার্থী। অতীত চীনের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে সমকালীন চীন; ইতিহাস অন্বেষণের ব্যাপারে আমরা হচ্ছি মার্কসবাদী আর সেজন্যে আমাদের ইতিহাসকে আমরা কেটে-ছেঁটে বাদ দিতে পারি না। কনফুসিয়াস থেকে শুরু করে সান ইয়াৎ-সেন পর্যন্ত ইতিহাসের সারসংকলন করা আমাদের উচিত, এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই মহামূল্য সম্পদকে গ্রহণ করা উচিত। আজকের মহান আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্য এই কাজটি গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদী হওয়ার কারণেই কমিউনিস্টরা হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদী, কিন্তু মার্কসবাদকে কেবলমাত্র তখনই আমরা প্রয়োগে নিয়ে যেতে পারি, যখন তাকে আমাদের দেশের সুনির্দিষ্ট অবস্থার সাথে সমন্বিত করা হবে এবং যখন তা একটি নির্দিষ্ট জাতীয় রূপ লাভ করবে। সকল দেশের বাস্তব বৈপ্লবিক অনুশীলনের সাথে তার সমন্বয়সাধনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান শক্তি। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে, চীনের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে প্রয়োগ করাটা একটা শিক্ষণীয় বিষয়। যেহেতু চীনা কমিউনিস্টরা হচ্ছেন মহান চীনা জাতিরই একটি অংশ, তাঁদের রক্তমাংসের বন্ধনে আবদ্ধ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেইহেতু চীনের বৈশিষ্ট্যসমূহকে বাদ দিয়ে মার্কসবাদ সম্পর্কে যে-কোনরূপ কথাবার্তা বলাই হবে নিছক বিমূর্ত মার্কসবাদ, অন্তঃসারশূন্য মার্কসবাদ। কাজেই, চীনদেশে বাস্তবভাবে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করা, যাতে তার প্রত্যেকটি প্রকাশ সন্দেহাতীত রূপেই চীনা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়, অর্থাৎ চীনের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের

আলোকে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করাটা হচ্ছে এমন একটা জরুরী সমস্যা যা সমগ্র পার্টিকেই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং সমাধান করতে হবে। বিদেশী ছাঁচে-ঢালা মানসিকতার অবশ্যই বিলোপ ঘটাতে হবে, ফাঁকা, বিমূর্ত সুরের বাজনা অবশ্যই কমাতে হবে, আর গোঁড়ামিবাদকে অবশ্যই কবর দিতে হবে; আর তার বদলে সতেজ, প্রাণবন্ত চীনা রীতি-পদ্ধতি ও মানসিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যা চীনের সাধারণ মানুষ পছন্দ করেন। আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রাথমিক বিষয়-বস্তু সম্পর্কে যাদের কোনরকম ধারণাই নেই, তাদেরই কাজ হচ্ছে জাতীয় রূপ থেকে আন্তর্জাতিকতাবাদী মর্মবস্তুকে বিচ্ছিন্ন করা। বিপরীতপক্ষে, এই উভয়কেই আমাদের ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করতে হবে। এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মারাত্মক ভুলত্রুটি রয়েছে, যা সচেতনভাবে কাটিয়ে ওঠা উচিত।

বর্তমান আন্দোলনেব বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? এব নিয়মবিধিই-বা কি কি? এই আন্দোলন কিভাবে পবিচালিত করতে হবে? এসবই হচ্ছে বাস্তব প্রশ্ন। এখনো পর্যন্ত আমরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে, কিংবা চীন সম্পর্কে সবকিছু বুঝে উঠতে পারিনি। আন্দোলনেব বিকাশ ঘটছে, নতুন নতুন জিনিস এখনো পুরোপুরি মূর্ত হয়ে ওঠেনি, আর সীমাহীন ধারায় তাদের আবির্ভাব অব্যাহত রয়েছে। এই আন্দোলনকে তাব সামগ্রিকতার দিক থেকে এবং তার বিকাশেব দিক থেকে অধ্যয়ন করাব বিরাট কর্তব্য আমাদের নিরন্তর মনোযোগ দাবি করছে। যেসব লোক এইসব সমস্যাবলী গুরুত্ব সহকারে ও যত্ন সহকারে অধ্যয়ন কবতে অস্বীকার করে, তারা কিছুতেই মার্কসবাদী হতে পারে না।

আত্মপ্রসাদ হচ্ছে অধ্যয়নের শত্রু। যে পর্যন্ত আত্মপ্রসাদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করা না যাবে, সে পর্যন্ত আমরা প্রকৃতই কিছু শিখতে পারব না। নিজেদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে 'শিক্ষা গ্রহণে অতৃপ্ত থাকা' এবং অন্যদের প্রতি 'শিক্ষাদানে অক্লান্ত হওয়া'।

ঐক্য ও বিজয়

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ ঐক্য হচ্ছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ বিজয় অর্জনের জন্য এবং এক নতুন চীন গড়ে তোলার জন্য সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার মৌলিক পূর্বশর্ত। সতের বছরের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি আভ্যন্তরীণ ঐক্যবিধানের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে

শিক্ষালাভ করেছে এবং বর্তমানে আমাদের পার্টি আগের তুলনায় অনেক বেশি পরিপক্ক। কাজেই, প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য এবং এক নতুন চীন গড়ে তোলার সংগ্রামে সমগ্র জনগণের জন্য একটি শক্তিশালী মূলকেন্দ্র গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম। কমরেডগণ, যতদিন আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব, ততদিন আমরা নিশ্চিতই এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।

টীকা

১. স্তালিন ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে সি. পি এস ইউ (বি)-র সপ্তদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে বলেছিলেন, 'সঠিক রাজনৈতিক লাইন নির্ধারিত হয়ে গেলে, সাংগঠনিক কাজই সবকিছুকে নির্ধারণ করে, এমনকি রাজনৈতিক লাইনের ভবিষ্যৎ এবং তার সাফল্য বা ব্যর্থতাকে পর্যন্ত।' ('লেনিনবাদের সমস্যাবলী' দ্রষ্টব্য, ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫৪, পৃঃ ৬৪৪।) তিনি 'কর্মকর্তার যথাযথ নির্বাচন' সম্পর্কেও বলেছিলেন। ১৯৩৫ সালের মে মাসে তিনি লালফৌজ একাডেমীগুলির স্নাতকদের কাছে প্রদত্ত বক্তৃতায় নিম্নোক্ত শ্লোগানটি তুলেছিলেন এবং তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন: 'কর্মীরাই সব কিছু নির্ধারণ করে।' (ঐ, পৃঃ ৬৬১-৬২।) ১৯৩৯ সালে মার্চ মাসে সি পি এস ইউ (বি)-র অষ্টাদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে তিনি বলেন, 'কোন সঠিক লাইন উদ্ভূত ও বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়ে যাবার পর পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পার্টি-কর্মীরাই নির্ধারক শক্তিতে পরিণত হন।

২. এখানে ১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর জরুরী সভার সময় থেকে ১৯৩৭ সালের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন পর্যন্ত সময়ের কথা বলা হচ্ছে।

৩। উত্তর-পশ্চিম জেচুয়ান ও দক্ষিণ পূর্ব কানসুর সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অবস্থিত সুংপান কাউন্টি-শহরের উত্তর-পশ্চিমের পাসী নামক স্থানে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো পাসী সভা আহ্বান করেছিল ১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে। তখন চ্যাং কুও-তাও একদল লালফৌজ নিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বেরিয়ে যায় এবং তার আদেশ অমান্য করে, এবং তার ক্ষতিসাধন করার

অপচেষ্টা চালায়। এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটি বিপজ্জনক অঞ্চল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং যেসব লালফৌজ পার্টির অনুগত তাদের নিয়ে উত্তর শেনসীর দিকে অগ্রসর হয়। আর চ্যাং কুও-তাও তার দ্বারা প্রতারিত লালফৌজকে নিয়ে থিয়ান ছুয়ান, লুশান, বড় ও ছোট চিনছুয়ান এবং আপা প্রভৃতি দক্ষিণ-দিকের অঞ্চলে অগ্রসর হয়। সেখানে সে একটা ভুয়া কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে এবং খোলাখুলিভাবে পার্টির বিপক্ষে চলে যায়।

৪। ইয়েনান সম্মেলন হল ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে ইয়েনানে অনুষ্ঠিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর বর্ধিত সম্মেলন। এই সম্মেলনের আগেই চ্যাং কুও-তাও'য়ের পরিচালিত ফৌজের ব্যাপক কর্মী ও সৈন্যরা চ্যাং কুও-তাও'য়ের প্রতারণা বুঝতে পেরে শেনসী-কানসু সীমান্ত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়ে যায়। কিন্তু পথিমধ্যে তাদের এক অংশ নেতৃত্বের ভুল নির্দেশে পশ্চিমদিকের কানচৌ, লিয়াংচৌ, সুচৌ-এর দিকে অগ্রসর হয়। তাদের অধিকাংশই শত্রুর আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, অবশিষ্ট সৈন্যরা সিনকিয়াঙের দিকে পালিয়ে যায় এবং পরে শেনসী-কানসু সীমান্ত অঞ্চলে এসে পৌঁছায়। লালফৌজের অন্য এক অংশ অনেক আগেই শেনসী-কানসু সীমান্ত এলাকায় এসে কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালিত লালফৌজের সাথে সম্মিলিত হয়। চ্যাং কুও-তাও নিজেও উত্তর শেনসীতে আসে এবং ইয়েনান সম্মেলনে যোগদান করে। এই সম্মেলনে ব্যাপকভাবে এবং চূড়ান্তভাবে তার সুবিধাবাদ ও পার্টি-বিরোধিতাকে নিন্দা করা হয়। চ্যাং কুও-তাও পার্টির সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার ভান করে, কিন্তু আসলে সে পার্টির প্রতি তখন চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল।

যুক্তফ্রন্টের মধ্যে স্বাধীনতা ও উদ্যোগের প্রশ্ন

৫ই নভেম্বর, ১৯৩৮

সাহায্য ও সুবিধে ইতিবাচক হওয়া উচিত, নেতিবাচক নয়

যুক্তফ্রন্টের ভেতরকার সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গ্রুপগুলিকে দীর্ঘকালীন সহযোগিতার স্বার্থে অবশ্যই পারস্পরিক সাহায্য করতে হবে ও পারস্পরিক সুবিধে দিতে হবে, এবং এইসব সাহায্য ও সুবিধে হওয়া উচিত ইতিবাচক, নেতিবাচক নয়। আমরা অবশ্যই আমাদের পার্টি ও সৈন্যবাহিনীকে সুসংবদ্ধ ও সম্প্রসারিত করে তুলব, এবং একই সংগে আমাদের উচিত হবে বন্ধুত্বমূলক পার্টি ও সৈন্যবাহিনীগুলিকে সুসংবদ্ধ ও সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে সাহায্য করা। জনগণ চান, সরকার তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবিগুলিকে পূরণ করুক, এবং একই সঙ্গে তাঁরা সরকারকে প্রতিরোধ-যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে সমস্ত সম্ভাব্য সাহায্য দিয়ে থাকেন। কারখানার শ্রমিকরা মালিকদের কাছে আরও ভাল অবস্থা দাবি করেন, এবং একই সংগে তাঁরা প্রতিরোধের স্বার্থে কঠোর পরিশ্রম করেন, বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যের স্বার্থে জমিদারদেরও হবে খাজনা ও সুদ কমিয়ে দেওয়া, এবং একই সঙ্গে কৃষকদের

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কমরেড মাও সে-তুঙের প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণেরই একটি অংশ হচ্ছে বর্তমান নিবন্ধটি। সে সময়ে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে স্বাধীনতা ও উদ্যোগের প্রশ্নটি ছিল জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এবং এ ব্যাপারে কমরেড মাও সে-তুঙ ও কমরেড চেন শাও-য়ুর মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। সারমর্মের বিচারে প্রশ্নটি ছিল যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সর্বহারা নেতৃত্বের প্রশ্ন। কমরেড মাও সে-তুঙ তাঁর ডিসেম্বর, ১৯৪৭-এ প্রদত্ত রিপোর্টে ('বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য') এই মতপার্থক্যের সংক্ষিপ্ত সারসংকলন করে বলেছিলেন :

> প্রতিরোধ-যুদ্ধের সময় আমাদের পার্টি আত্মসমর্পণবাদীদের মতো অনুরূপ ধারণাকে (এখানে প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময়কার চেন তু-শিউ'র আত্মসমর্পণবাদের কথা বলা হচ্ছে) প্রত্যাখ্যান করেছিল—অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করেছিল কুওমিনতাঙের জন-বিরোধী নীতির প্রতি সুবিধেদান, জনগণের চেয়ে কুওমিনতাঙের ওপর বেশি আস্থা স্থাপন, গণ-আন্দোলন জাগিয়ে তোলায় ও তার পূর্ণ বিকাশের ব্যাপারে সাহসের অভাব, জাপ-অধিকৃত এলাকায়

উচিত হবে খাজনা ও সুদ দেওয়া। পারস্পরিক সাহায্যের এইসব নীতি ও কর্মনীতিগুলি হচ্ছে ইতিবাচক; নেতিবাচক বা একপেশে নয়। পারস্পরিক সুবিধে দেওয়া সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রত্যেক পক্ষেরই অন্যকে হেয় করার থেকে এবং অন্যের পার্টি, সরকার ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে গোপন পার্টি-শাখা গড়ে তোলার থেকে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া উচিৎ। যেমন আমরা কুওমিনতাঙের মধ্যে এবং তার সরকার বা বাহিনীর মধ্যে কোন গোপন পার্টি-শাখা গড়ে তুলছি না, এবং এভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধের স্বার্থে তাদের মনে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করছি না। 'কিছু জিনিস করার জন্য অন্য কিছু জিনিস করা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হও'[১]—এই প্রবাদবাক্যটি এ ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য। লালফৌজের পুনর্গঠন ছাড়া, লাল এলাকার প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কর্মনীতি বর্জন ছাড়া জাতীয় প্রতিরোধ-যুদ্ধ কিছুতেই সম্ভব হতে পারত না। ঐগুলো ছেড়ে দিয়েই কেবল আমরা শেষেরটা অর্জন করতে পেরেছি, নেতিবাচক ব্যবস্থাই ইতিবাচক ফলাফলের জন্ম দিয়েছে। 'সামনে বিরাট লাফ দেবার জন্য পেছনে সরে যাওয়া'[২]—এটাই হচ্ছে লেনিনবাদ। সুবিধে দেওয়াকেই পুরোপুরি নেতিবাচক কিছু হিসেবে দেখাটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী। বস্তুতঃ পুরোপুরি নেতিবাচক সুবিধে দেবার দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে—দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সহযোগিতার তত্ত্বের[৩] ফল হয়েছিল সমগ্র শ্রেণী ও সমগ্র বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। চীনে চেন তু-শিউ, চ্যাং কুও-তাও দুজনেই ছিল আত্ম-

মুক্তাঞ্চল ও গণফৌজকে সম্প্রসারিত করার' ব্যাপারে সাহসের অভাব, কুওমিনতাঙের হাতে প্রতিরোধ-যুদ্ধের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া প্রভৃতি ধ্যান-ধারণাকে। আমাদের পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিবিরোধী এইসব ব্যাখ্যা ও অধঃপতিত ধারণার বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালিয়েছিল, 'প্রগতিশীল শক্তির বিকাশ ঘটানোর, মধ্যবর্তী শক্তিগুলিকে দলে টানার এবং রক্ষণশীল শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার' লাইনকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেছিল এবং দৃঢ়ভাবে মুক্তাঞ্চল ও গণ-মুক্তিফৌজকে সম্প্রসারিত করেছিল। জাপ-আক্রমণের সময় জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির সামর্থ্যকেই তা শুধু বাড়িয়ে দেয়নি, উপরন্তু জাপানের আত্মসমর্পণের পর চিয়াং কাই-শেক যখন প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ শুরু করেছিল, তখন তা সহজে ও বিনা ক্ষতিতে চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবী জনযুদ্ধের পথে সরে যাবার এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট বিজয় অর্জনের ব্যাপারেও পার্টির সামর্থ্যকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। সমস্ত কমরেডদেরকে অবশ্যই ইতিহাসের এইসব শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে মনে রাখতে হবে।

সমর্পণবাদী ; এবং সর্বতোভাবেই আত্মসমর্পণবাদের বিরোধিতা করতে হবে। আমরা যখন মিত্র বা শত্রুদের সংগে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুবিধে দিই, পেছনে সরে আসি, আত্মরক্ষার দিকে মন দিই এবং অগ্রগতিকে ব্যাহত করি, তখন সর্বদাই এ সবকিছুকে আমাদের দেখা উচিত সমগ্র বৈপ্লবিক কর্মনীতির একটা অংশ হিসেবে, সাধারণ বিপ্লবী লাইনের এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র হিসেবে, আঁকাবাঁকা পথের একটা মোড় হিসেবে।' এক কথায়, সেগুলিই হচ্ছে ইতিবাচক।

জাতীয় ও শ্রেণী-সংগ্রামের অভিন্নতা

দীর্ঘকালীন সহযোগিতার মাধ্যমে একটি দীর্ঘ যুদ্ধকে দীর্ঘ দিন ধরে অব্যাহত রাখতে হবে—অর্থাৎ অন্য কথায়, শ্রেণী-সংগ্রামকে জাপান-বিরোধী বর্তমান জাতীয় সংগ্রামের অধীন করতে হবে—এবং এই হচ্ছে যুক্তফ্রণ্টের মৌলিক নীতি। এই নীতি সাপেক্ষে, যুক্তফ্রণ্টের ভেতরকার পার্টি ও শ্রেণীগুলির স্বাধীন চরিত্র এবং তাদের স্বাধীনতা ও উদ্যোগ বজায় রাখতে হবে, সহযোগিতা ও ঐক্যের কাছে তাদের আবশ্যিক অধিকারগুলিকে বিসর্জন দিলে চলবে না, বরং তার বিপরীতে সেগুলিকে কিছু সীমার মধ্যে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে হবে। একমাত্র এভাবেই সহযোগিতা গড়ে তোলা যায়, বস্তুতঃ একমাত্র এভাবেই শুধু সহযোগিতা থাকতে পারে। তা না হলে সহযোগিতা পরিণত হয়ে যাবে সংমিশ্রণে, এবং যুক্তফ্রন্ট সুনিশ্চিতভাবেই বরবাদ হয়ে যাবে। জাতীয় চরিত্র-বিশিষ্ট কোন সংগ্রামে শ্রেণী-সংগ্রামই জাতীয় সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে, এবং তা এই দুইয়ের অভিন্নতাকেই নির্দেশ করে। একদিকে, ঐতিহাসিক একটি পর্যায় জুড়ে বিভিন্ন শ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবিগুলিকে এমন হতে হবে যাতে তা সহযোগিতাকে বিঘ্নিত না করে, অন্যদিকে, (জাপানকে রুখবার প্রয়োজনে) জাতীয় সংগ্রামের দাবিগুলিই হবে সমস্ত শ্রেণী-সংগ্রামের প্রস্থানবিন্দু। কাজেই যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে রয়েছে ঐক্য ও স্বাধীনতার মধ্যে অভিন্নতা এবং জাতীয় সংগ্রাম ও শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে অভিন্নতা।

'সমস্ত কিছুই হবে যুক্তফ্রণ্টের মাধ্যমে'—এ ধারণা ভুল

কুওমিনতাঙ হচ্ছে ক্ষমতাসীন দল এবং এখনো পর্যন্ত সে যুক্তফ্রন্টকে কোন সাংগঠনিক রূপ গ্রহণ করতে দেয়নি। কমরেড লিউ শাও-চি সঠিকভাবেই

বলেছেন যে, 'সবকিছুই মাধ্যমে' বলতে যদি বোঝায় চিয়াং কাই-শেক ও ইয়েন শি-শানের মাধ্যমে, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে একতরফাভাবে আত্মসমর্পণ, এবং মোটেই তার অর্থ 'যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে' হবে না। শত্রুর অবস্থানরেখার পেছনে 'সবকিছুই মাধ্যমে' একেবারেই অসম্ভব, কেননা সেখানে আমাদের কাজ করতে হবে স্বাধীনভাবে এবং নিজেদের হাতে উদ্যোগ বজায় রেখে, এবং একই সংগে কুওমিনতাঙের সংগে সাধিত চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে (উদাহরণস্বরূপ, সশস্ত্র প্রতিরোধ ও জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচী)। কিংবা কুওমিনতাঙ কি করতে পারে সেটা আন্দাজ করে নিয়ে আমরা আগে কাজ করে পরেও রিপোর্ট করতে পারি। যেমন, প্রশাসনিক কমিশনার নিয়োগ এবং শানতুং প্রদেশে সৈন্য পাঠাবার কাজগুলি যদি 'যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে' করতে হতো, তবে কখনই এ কাজগুলো করা সম্ভব হতো না। বলা হচ্ছে যে, ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি নাকি একবার এই স্লোগান দিয়েছিল। কিন্তু সেটা সম্ভবতঃ এই কারণে যে, ফ্রান্সে তার আগে থেকেই সম্মিলিত স্বীকৃত কর্মসূচী অনুসারে বিভিন্ন পার্টিগুলির একটি যুক্ত কমিটি কাজ করছিল এবং সোশ্যালিষ্ট পার্টি এই সম্মিলিত স্বীকৃত কর্মসূচী অনুসারে কাজ করতে রাজী না হয়ে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করতে চাইছিল, এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে এই স্লোগান দিতে হয়েছিল সোশ্যালিষ্ট পার্টিকে নিবৃত্ত করার জন্যই, নিজের পায়ে শিকল বাঁধবার জন্য নিশ্চয়ই সে এই স্লোগান তোলেনি। কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে, কুওমিনতাঙ সমস্ত রাজনৈতিক পার্টিকে সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত করে সবার ওপর নিজের নির্দেশ চাপিয়ে দিতে চাইছে। এই স্লোগানের অর্থ যদি এই হয় যে, কুওমিনতাঙ যা করবে, সে সবকিছুই আমাদের মাধ্যমে করতে হবে, তবে সেটা হবে একই সংগে হাস্যকর ও অসম্ভব। আমাদের যদি কোন কিছু করতে গেলেই আগে থেকে কুওমিনতাঙের অনুমতি চাইতে হয়, এবং কুওমিনতাঙ যদি অনুমতি না দেয়, তবে তখন কী হবে? যেহেতু কুওমিনতাঙের কর্মনীতিই হল আমাদের বিকাশকে সীমিত করে রাখা, সেহেতু আমাদের পক্ষে এই স্লোগান তোলার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না, কেননা তা আমাদের হাত-পা বেঁধে ফেলবে। বর্তমানে এমন কিছু ব্যাপার আছে, যেজন্য আমাদের আগে থেকে কুওমিনতাঙের সম্মতি নিতে হবে—যেমন, আমাদের সৈন্যবাহিনীর তিনটি ডিভিসনকে তিনটি আর্মি কোরে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে। এটা হচ্ছে আগে রিপোর্ট করে পরে কাজ করা। আবার

এমন কিছু জিনিসও আছে, যা পুরোপুরি করা হয়ে যাবার পরে কুওমিনতাঙকে জানালেই চলবে—যেমন, আমাদের সৈন্যবাহিনীকে ২ লক্ষ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা। এটা হচ্ছে আগে কাজ করে পরে রিপোর্ট করা। আবার সীমান্ত অঞ্চলের পর্ষদের অধিবেশন আহ্বান করার মতো এমন কিছু ব্যাপারও আছে, যা এখন কুওমিনতাঙকে না জানিয়েই আমরা করে ফেলব, কারণ আমরা জানি, কুওমিনতাঙ এতে রাজী হবে না। আবার অন্যকিছু ব্যাপারও থেকে যাচ্ছে, যা এক্ষুণি আমরা করব না, রিপোর্টও দেব না, কারণ তা সমগ্র পরিস্থিতিকেই বিপন্ন করে তুলতে পারে। সংক্ষেপে, আমরা যেমন যুক্তফ্রন্টে ভাঙন আনব না, ঠিক তেমনি নিজেদের হাত-পা বেঁধে ফেলার অবস্থাও তৈরী করব না। কাজেই, 'সবকিছুই যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে'—এই শ্লোগান আমরা তুলতে পারি না। আর 'সবকিছুই যুক্তফ্রন্টের সামনে পেশ করতে হবে'—এই শ্লোগানের অর্থ যদি হয় 'সবকিছুই পেশ করতে হবে' চিয়াং কাই-শেক ও ইয়েন শি-শানের কাছে, তাহলে সেই শ্লোগানও ভুল। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আমাদের নীতি হচ্ছে স্বাধীনতা ও উদ্যোগের নীতি, একই সংগে ঐক্য ও স্বাধীনতার নীতি।

টীকা

১। এটি 'মেনসিয়াস' থেকে একটি উদ্ধৃতি।

২ ভি. আই. লেনিন: 'হেগেলের "দর্শনের ইতিহাস সম্পর্কিত বক্তৃতামালা" গ্রন্থের সারমর্ম', 'সংকলিত রচনাবলী', রুশ সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫৮, খণ্ড ৩৮, পৃঃ ২৭৫।

৩। 'পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সহযোগিতার তত্ত্বটি হচ্ছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের একটি প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব। এই তত্ত্ব পুঁজিবাদী দেশে এই সহযোগিতার পক্ষে ওকালতি করে এবং বুর্জোয়া শাসনের বিপ্লবী উৎখাত ও সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে।

যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা

৬ই নভেম্বর, ১৯৩৮

১। চীনের বৈশিষ্ট্য ও বিপ্লবী যুদ্ধ

বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে সশস্ত্র শক্তির দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, যুদ্ধের দ্বারা সমস্যার সমাধান। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই বিপ্লবী নীতি সর্বত্রই প্রযোজ্য, তা চীনদেশেই হোক আর বিদেশেই হোক।

কিন্তু নীতি এক হলেও সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি ভিন্ন পরিবেশে একে ভিন্নভাবেই প্রয়োগ করে। যেসব পুঁজিবাদী দেশ ফ্যাসিবাদী নীতি অনুসরণ করে না ও যুদ্ধাবস্থায় নেই, তারা দেশের ভেতরে বুর্জোয়া গণতন্ত্র চালু রাখে, সেখানে সামন্ততন্ত্র থাকে না। আর বাইরে তারা অন্যান্য জাতির দ্বারা অত্যাচারিত হয় না, বরং নিজেরাই অন্যান্য জাতির ওপর নির্যাতন চালায়। এইসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই, পুঁজিবাদী দেশগুলোর সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির কর্তব্য হল দীর্ঘকাল আইনী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের শিক্ষিত করা, শক্তি সঞ্চয় করা আর এরই মাধ্যমে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এইসব দেশে দীর্ঘকাল ধরে আইনী সংগ্রাম চালানো, পার্লামেন্টকে মত প্রকাশের একটি মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধর্মঘট, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তৈরী ও শ্রমিকদের শিক্ষাদান করাই হল সমস্যা। সেখানকার সংগঠনের রূপ হচ্ছে আইনী আর সংগ্রামের রূপ হচ্ছে রক্তপাতহীন (অ-সামরিক)। যুদ্ধের প্রশ্নে, পুঁজিবাদী দেশগুলোর কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নিজ নিজ দেশের দ্বারা পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করে; এ ধরনের যুদ্ধ যদি বেধে যায়, তবে নিজ নিজ দেশের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের

এই প্রবন্ধটি হল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কমরেড মাও সে-তুঙের প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণের একটি অংশ। 'জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যা' ও 'দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে' শীর্ষক গ্রন্থ দুটিতে ইতিমধ্যেই কমরেড মাও সে-তুঙ জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে পার্টির নেতৃস্থানীয় ভূমিকার প্রশ্নটির সমাধান করেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ভুল করেছে এমন কমরেডরা যুক্তফ্রন্টে পার্টির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করে। তাই তারা যুদ্ধ ও রণনীতি সম্পর্কে পার্টির নীতিতেও সন্দেহ প্রকাশ করে এবং তার বিরোধিতা করে। পার্টির ভেতরকার এই দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদকে দূর করার জন্য, চীনের বিপ্লবে

পরাজয় ঘটানোই হচ্ছে এইসব পার্টির নীতি। যে যুদ্ধ তারা লড়তে চায় সেটা শুধু গৃহযুদ্ধ, যার জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে।[1] কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না বুর্জোয়াশ্রেণী সত্যসত্যই অসহায় হয়ে পড়ছে, সর্বহারাশ্রেণীর বেশির ভাগ যতক্ষণ না সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হচ্ছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষকসাধারণ সর্বহারাশ্রেণীকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে এগিয়ে না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ শুরু করা উচিত নয়। এবং যখনই অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ শুরু করার সময় আসে, তখন প্রথমে শহরগুলোকে দখল করে, তারপর গ্রামাঞ্চলে অভিযান চলে—এর বিপরীতটা নয়। পুঁজিবাদী দেশগুলোর কমিউনিস্ট পার্টি এই সবকিছুই করেছিল এবং রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব একে সঠিক বলে প্রমাণিত করেছে।

চীনের অবস্থা স্বতন্ত্র। চীনের বৈশিষ্ট্য হল, সে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ নয়, বরং একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ; আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তার কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই, বরং সে সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারে জর্জরিত, আর বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার জাতীয় স্বাধীনতা নেই, বরং সে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিষ্পেষিত। সুতরাং পার্লামেণ্টকে ব্যবহার করার মতো কোন পার্লামেণ্টই আমাদের নেই এবং ধর্মঘটের জন্য শ্রমিকদের সংগঠিত করারও কোন আইনসঙ্গত অধিকারও আমাদের নেই। মূলতঃ, এখানে কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ শুরু করার আগে দীর্ঘকাল আইনী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়া নয়, প্রথমে শহরগুলি দখল ও পরে গ্রামাঞ্চলগুলোকে অধিকার করে নেওয়া নয়—বরং এর বিপরীতটাই।

যখন সাম্রাজ্যবাদের কোন সশস্ত্র আক্রমণ আমাদের দেশের ওপর পরিচালিত হচ্ছে না, তখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধবাজদের (সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী কুকুরদের) বিরুদ্ধে ১৯২৪-

[1] যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এ কথা সমগ্র পার্টিকে আরও পরিষ্কারভাবে বোঝানোর উদ্দেশ্যে এবং রণোযোগের সংগে এই কাজ করতে গোটা পার্টিকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে, কমরেড মাও সে-তুঙ পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাংগ অধিবেশনে চীনের রাজনৈতিক সংগ্রামের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বের সাথে আবার এ প্রশ্নটি ব্যাখ্যা করেন, এবং সংগে সংগে পার্টির সামরিক কাজকর্মের বিকাশসাধন ও রণনীতিগত কর্মপন্থার বিশেষ পরিবর্তনগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন। এর ফলশ্রুতিতে পার্টি-নেতৃত্বের চিন্তাধারার ও সমগ্র পার্টির কাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৭ সালে কুয়াংতুং প্রদেশের যুদ্ধ[২] এবং উত্তর অভিযানের যুদ্ধের মতো যুদ্ধ চালানো উচিত, নতুবা কৃষক ও শহরের পেটি-বুর্জোয়াদের সংগে মিলিত হয়ে ১৯২৭-৩৬ সালের কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধের মতো জমিদারশ্রেণী ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের (এরাও সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী কুকুর) বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ চালানো উচিত। যখন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়, তখন পার্টিকে স্বদেশে বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরোধী সকল শ্রেণী ও স্তরের সাথে মিলিত হয়ে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ চালানো উচিত, বর্তমানের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে যেমন করা হচ্ছে।

এ সবই পুঁজিবাদী দেশগুলির সংগে চীনের পার্থক্য দেখিয়ে দিচ্ছে। চীনে সংগ্রামের প্রধান রূপ হচ্ছে যুদ্ধ, আর সংগঠনের প্রধান রূপ হচ্ছে সৈন্যবাহিনী। গণ-সংগঠন ও গণ-সংগ্রামের মতো অন্যান্য সমস্তও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত অপরিহার্য, কোন অবস্থাতেই এদের উপেক্ষা করা উচিত নয়. কিন্তু এগুলো সবই যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধ বেধে ওঠার আগে সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রামই হচ্ছে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য, যেমন ১৯১৯ সালের ৪ঠা মের আন্দোলন[৩] থেকে ১৯২৫ সালের ৩০শে মের আন্দোলন[৪] পর্যন্ত সময়কালে ঘটেছিল। যুদ্ধ বাধার পর এই সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রাম প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করে, উদাহরণস্বরূপ, উত্তর অভিযানের যুদ্ধের সময়ে, বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্বর্তী এলাকাগুলিতে সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রামই প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করেছিল, এবং উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজদের শাসনাধীন এলাকাগুলিতে সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রাম পরোক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করেছিল। আবার কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধেও লাল এলাকার ভেতরকার সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করেছিল এবং লাল এলাকার বাইরের সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রাম পরোক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করেছিল। একইভাবে, যেমন বর্তমানকালে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে জাপ-বিরোধী সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্বর্তী এলাকার এবং শত্রুর অধিকৃত অঞ্চলের সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রামও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করছে।

'চীনে সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে। এটা চীনা বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও সুবিধে।'[৫] কমরেড স্তালিনের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক, এবং এটা উত্তর অভিযানের যুদ্ধে, কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধে কিংবা বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে—সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এগুলো সব যুদ্ধ হচ্ছে বিপ্লবী যুদ্ধ...

এসব যুদ্ধই প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে চালিত, এবং এতে অংশ নিয়েছেন প্রধানতঃ বিপ্লবী জনগণ; এদের মধ্যে তফাৎ যেটুকু তা হল গৃহযুদ্ধের সংগে জাতীয় যুদ্ধের তফাৎ এবং কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে চালিত যুদ্ধের সাথে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্মিলিত শক্তিতে চালিত যুদ্ধের যেটুকু তফাৎ সেটুকু। অবশ্য, এই পার্থক্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে শক্তি যুদ্ধ চালনা করে তা কখনো ব্যাপক হয়, কখনো-বা সংকীর্ণ হয় (শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রী অথবা শ্রমিক, কৃষক ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মৈত্রী), এবং বোঝা যায় যুদ্ধে যারা আমাদের বিপক্ষ তারা স্বদেশী অথবা বিদেশী (যুদ্ধটি দেশী শত্রু অথবা বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে, আর যদি দেশী শত্রুর বিরুদ্ধে হয়, তাহলে যুদ্ধটি উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে অথবা কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে). এসব পার্থক্য থেকে আরও বোঝা যায় যে, চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বিষয়বস্তু তার ইতিহাসের গতিপথের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন রকম। 'অথচ এসব যুদ্ধই হচ্ছে সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের যুদ্ধ, এগুলি সবই হচ্ছে বিপ্লবী যুদ্ধ আর এই সবই চীনা বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধেকে দেখিয়ে দেয়। বিপ্লবী যুদ্ধ 'চীনা বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও সুবিধে'—এই বক্তব্য চীনের অবস্থার সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই। চীনের সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির প্রধান কর্তব্য হচ্ছে—জন্মের প্রায় প্রথম দিন থেকেই পার্টিকে যে কর্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে—জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি অর্জনের জন্য যথাসম্ভব বেশি মিত্রবাহিনীর সংগে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করা এবং অবস্থা অনুসারে দেশের অথবা দেশের বাইরের সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। চীনে সশস্ত্র সংগ্রাম বাদ দিলে সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির দাঁড়াবার স্থান থাকবে না, এবং কোন বিপ্লবী কর্তব্যই তখন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।

আমাদের পার্টি গঠনের পর প্রথম পাঁচ বা ছয় বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৬ সালের উত্তর অভিযানের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সময় পর্যন্ত, এই বিষয়টিকে পার্টি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেনি। চীনে সশস্ত্র সংগ্রামের অসীম গুরুত্বের কথা পার্টি তখন বোঝেনি, মনোযোগ দিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করেনি, সামরিক রণনীতি ও রণকৌশলের পর্যালোচনার ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করেনি। উত্তর অভিযানের সময়ে সৈন্যবাহিনীকে সপক্ষে টেনে নেবার কাজে পার্টি অবহেলা করেছে, এবং গণ-আন্দোলনের ওপর একপেশে জোর দিয়েছে। এর ফলে যখনই কুওমিনতাঙ

প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠল, তখনই সমস্ত গণ-আন্দোলন ভেঙে পড়ল। ১৯২৭ সালের পর, দীর্ঘকাল পর্যন্ত অনেক কমরেডই শহরের মধ্যে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি এবং শ্বেত এলাকায় কাজকর্ম চালানোকে পার্টির কেন্দ্রীয় কর্তব্য হিসেবে মনে করতেন। ১৯৩১ সালে শত্রুর তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় অর্জনের পর কিছু কিছু কমরেড এই প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন করেন। কিন্তু গোটা পার্টির তখনো এই প্রশ্ন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি, তখনো কোন কোন কমরেড আমরা এখন যেভাবে ভাবি সেইভাবে ভাবতেন না।

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি যে সশস্ত্র শক্তি ছাড়া চীনের সমস্যার সমাধান হতে পাবে না। এ কথাটি উপলব্ধি করতে পারলে ভবিষ্যতে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে সাফল্যজনকভাবে চালাবার ব্যাপারে আমাদের সুবিধা হবে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে সমগ্র জনগণই যে সশস্ত্র প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, এই বাস্তব ঘটনা গোটা পার্টিকে আরও ভালভাবে এই প্রশ্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শিক্ষা দেবে যে, প্রতিটি পার্টি-সদস্যকেই যে-কোন মুহূর্তে অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধফ্রন্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অধিকন্তু, আমাদের বর্তমান অধিবেশন স্থির করেছে যে, পার্টির প্রধান কর্মক্ষেত্র হবে যুদ্ধাঞ্চলে ও শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে, আর এইভাবে অধিবেশন একটি সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করেছে। কোন কোন পার্টি-সদস্য পার্টির সাংগঠনিক কাজ ও গণ-আন্দোলনের কাজ করতে ইচ্ছুক হলেও যুদ্ধের পর্যালোচনা করতে ও যুদ্ধে অংশ নিতে অনিচ্ছুক, কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যুদ্ধফ্রন্টে যাবার জন্য ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করাব ব্যাপারে মনোযোগী হয়নি—এসব অভিব্যক্তি ও এ ধরনের অন্যান্য অভিব্যক্তিকে শুধরাবার জন্য এই নীতি এক চমৎকার ঔষধ। চীনের বেশির ভাগ অঞ্চলেই পার্টির সাংগঠনিক কাজ ও গণ-আন্দোলনের কাজ প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের সংগে জড়িত, একাকী ও বিচ্ছিন্নভাবে পার্টির কোন কাজ বা গণ-আন্দোলন হয় না এবং হতেও পারে না। এমনকি যুদ্ধাঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে দূরবর্তী পশ্চাৎ এলাকায় (যেমন, ইয়ুনান, কুইচৌ, জেছুয়ান) ও শত্রুর নিয়ন্ত্রণাধীন কোন কোন এলাকায়ও (যেমন পিপিং, তিয়েনসিন, নানকিং ও শাংহাই) পার্টির সাংগঠনিক কাজ ও গণ-আন্দোলন যুদ্ধের সংগে সহযোগিতা করে, সেগুলি শুধু যুদ্ধফ্রন্টের চাহিদাকে পূরণ করার ব্যাপারে নিয়োজিত হতে পারে এবং শুধু তাই করা উচিত। এক কথায়,

গোটা পার্টিকেই যুদ্ধের দিকে গভীরভাবে মনোযোগী হতে হবে, সামরিক বিষয় শিখতে হবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

২। কুওমিনতাঙের যুদ্ধের ইতিহাস

কুওমিনতাঙের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং যুদ্ধের প্রতি তারা কিরকম মনোযোগ দেয়, তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আমাদের পক্ষে দরকার হবে।

সান ইয়াৎ-সেন প্রথম যখন একটি ছোট বিপ্লবী দল গঠন করেন তখন থেকেই ছিং রাজবংশের বিরুদ্ধে কয়েকবার সশস্ত্র অভ্যুত্থান[৬] ঘটান। তুং মেং হুইয়ের (চীনা বিপ্লবী লীগ) আমলটা আরও বেশি সশস্ত্র অভ্যুত্থানে[৭] ভর্তি ছিল, এবং অবশেষে ১৯১১ সালের বিপ্লবে সশস্ত্র শক্তির মাধ্যমে ছিং রাজবংশের পতন ঘটে। এরপর চীনা বিপ্লবী পার্টির আমলে, ইউয়ান শি-কাইয়ের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান[৮] চলেছিল। তারপর দক্ষিণ অভিমুখে নৌবাহিনীর অভিযান[৯], কুইলিন থেকে উত্তর অভিযান[১০] এবং হুয়াংপু সামরিক একাডেমী[১১] স্থাপন—এই সবই হচ্ছে সান ইয়াৎ-সেনের সামরিক কার্যকলাপ।

সান ইয়াৎ-সেনের পরে আসে চিয়াং কাই-শেক, তার আমলেই কুওমিনতাঙের সামরিক ক্ষমতার উৎকর্ষ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। সৈন্যবাহিনীকে সে নিজের জীবনের মতোই কদর করে এবং উত্তর অভিযান, গৃহযুদ্ধ ও জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ—এই তিনটি পর্যায়ের অভিজ্ঞতা তার আছে। গত দশ বছর ধরে চিয়াং কাই-শেক বিপ্লবের বিরোধিতা করেছে। প্রতিবিপ্লবী কাজকর্মের জন্য সে একটি বিশাল 'কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী' তৈরী করেছে। সৈন্যবাহিনী যার ক্ষমতা তার এবং যুদ্ধই সবকিছুর সমাধান করে—এই মৌলিক নীতিকে সে দৃঢ়ভাবেই আঁকড়ে ধরে রেখেছে। এ ব্যাপারে তার কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে সান ইয়াৎ-সেন ও চিয়াং কাই-শেক উভয়েই আমাদের শিক্ষক।

১৯১১ সালের বিপ্লবের পর থেকে সমস্ত যুদ্ধবাজরা সৈন্যবাহিনীকে নিজের প্রাণের মতোই কদর করেছে, এবং তারা সবাই 'সৈন্যবাহিনী যার, ক্ষমতা তার' এই নীতিকে গুরুত্ব সহকারে দেখেছে।

তান-ইয়ান-কাই[১২] ছিল একজন চালাকচতুর আমলা, হুনান প্রদেশে তার জীবনধারা ছিল উত্থানে-পতনে বিচিত্র, কিন্তু সে কখনো নিছক বেসামরিক

গভর্নর হতে চায়নি, বরং সে সামরিক গভর্নর ও বেসামরিক গভর্নর এই উভয় পদাধিকারীই হবার চেষ্টা করেছিল। এরপর যখন সে প্রথমে কুয়াংচুংয়ে ও পরে উহানে জাতীয় সরকারের সভাপতি হল, তখনো সে যুগপৎ দ্বিতীয় বাহিনীর কম্যাণ্ডার ছিল। চীনে এ ধরনের অনেক যুদ্ধবাজ আছে, তারা সবাই চীনের এই বৈশিষ্ট্যটিকে বোঝে।

চীনে আবার এমন পার্টিও ছিল যারা সৈন্যবাহিনী রাখতে চাইত না, তাদের মধ্যে প্রধানটি ছিল প্রগ্রেসিভ পার্টি[১৩], কিন্তু এই পার্টিও বুঝেছিল যে, কোন যুদ্ধবাজের ওপর নির্ভর করলেই কেবল তারা সরকারী পদ লাভ করতে পারে। ইউয়ান শি-কাই[১৪], তুয়ান ছী-রুই[১৫] ও চিয়াং কাই-শেক ছিল তাদের পৃষ্ঠপোষক (চিয়াং কাই-শেকের ওপর যারা নির্ভর করেছিল তারা ছিল প্রগ্রেসিভ পার্টির এক অংশ নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রুপ[১৬])।

যাদের ইতিহাস বেশিদিনের নয়, এমন কতকগুলো ছোটখাট রাজনৈতিক পার্টি, যেমন যুব পার্টি[১৭] প্রভৃতি, এদের সৈন্যবাহিনী নেই, তাই তারা কিছুই করে উঠতে পারেনি।

অন্যান্য দেশে বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রত্যেকটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে সৈন্যবাহিনী রাখার কোন দরকার নেই। কিন্তু চীনে ব্যাপারটা অন্য রকমের, দেশটির সামন্ততান্ত্রিক ভাগাভাগির কারণে, এখানে যেসব জমিদার বা বুর্জোয়া গোষ্ঠী ও পার্টির হাতে বন্দুক আছে ক্ষমতা তাদেরই হাতে, আর যাদের বন্দুক বেশি, ক্ষমতাও তাদের বেশি। এই অবস্থায় সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির উচিত সুস্পষ্টভাবে সমস্যার মর্ম উপলব্ধি করা।

কমিউনিস্টরা ব্যক্তিগত সামরিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করেন না (এবং কোনমতেই তা করা চলবে না, কেউ যেন আবার চাং-তাও'য়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে), কিন্তু পার্টির জন্য সামরিক ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ও জনগণের জন্য সামরিক ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁদের চেষ্টা করা উচিত। বর্তমানে জাতীয় প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলছে, জাতির জন্য সামরিক ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করতেই হবে। সামরিক ক্ষমতার প্রশ্নে শিশুসুলভ ব্যাধি থাকলে নিশ্চয় কোন কিছুই অর্জন করতে পারা যায় না। মেহনতী জনগণ, যাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর দ্বারা প্রবঞ্চিত ও ভীতসন্ত্রস্ত, তাঁদের পক্ষে নিজেদের হাতে বন্দুক তুলে নেবার গুরুত্বটা উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার ও তার বিরুদ্ধে গোটা জাতির

অভিজ্ঞতা-পুষ্ট মেহনতী জনগণকে যুদ্ধের বধ্যকে ঠেলে দিয়েছে, আর কমিউনিস্টদের অবশ্যই এই যুদ্ধের সবচেয়ে সচেতন নেতা হওয়া উচিত। প্রতিটি কমিউনিস্টকে অবশ্যই এ সত্য বুঝতে হবে: 'বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে'। আমাদের নীতি হচ্ছে—পার্টি বন্দুককে পরিচালনা করে, বন্দুককে কোনমতেই পার্টির ওপর পরিচালনা করতে দেওয়া হবে না। তবু, বন্দুক থাকলে আমরা সত্যিই পার্টি সৃষ্টি করতে পারি, উত্তর চীনে অষ্টম রুট বাহিনী যেমন শক্তিশালী পার্টি-সংগঠন গড়ে তুলেছে। আমরা আরও সৃষ্টি করতে পারি কর্মী; স্কুল, সংস্কৃতি ও গণ-আন্দোলন। ইয়েনানের সবকিছুই সৃষ্ট বন্দুকের জোরে। বন্দুকের নল থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি। রাষ্ট্র সম্পর্কিত মার্কসবাদী মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে, সৈন্যবাহিনী হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রধান উপাদান। যিনি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চান এবং এটাকে বজায় রাখতে চান, তাঁর অবশ্যই একটা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী থাকতে হবে। কেউ কেউ আমাদেরকে 'যুদ্ধের সর্বশক্তিমত্তা তত্ত্বের' প্রবক্তা বলে বিদ্রূপ করে। হাঁ, আমরা বিপ্লবী যুদ্ধের সর্বশক্তিমত্তা তত্ত্বের প্রবক্তাই বটে। এটা খারাপ নয়, ভালই, এটা মার্কসীয়। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বন্দুকই সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি করেছে। আমরা একটা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি করব। সাম্রাজ্যবাদের যুগে শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে: শুধুমাত্র বন্দুকের শক্তিতেই শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণ সশস্ত্র বুর্জোয়াশ্রেণী ও জমিদারদের পরাজিত করতে পারে, এই অর্থে আমরা বলতে পারি যে, শুধুমাত্র বন্দুক দিয়েই সমগ্র দুনিয়ার রূপান্তর ঘটানো সম্ভব। যুদ্ধ বিলোপ করার আমরা সমর্থক, আমরা যুদ্ধ চাই না, কিন্তু কেবলমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই যুদ্ধ বিলোপ করা যায় এবং বন্দুক থেকে মুক্তি পাবার জন্য বন্দুক ধারণ করা অবশ্য প্রয়োজন।

৩। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধের ইতিহাস

যদিও ১৯২১ সাল (যখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) থেকে ১৯২৪ সাল (যখন কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল) পর্যন্ত—এই তিন-চার বছর ধরে আমাদের পার্টি প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতির এবং সৈন্যবাহিনী সংগঠনের গুরুত্ব বুঝতে পারেনি, ১৯২৪-২৭ সালে, এমনকি তারও পরে কিছুকাল পর্যন্ত এর গুরুত্ব সম্পর্কে পার্টির যথেষ্ট উপলব্ধি ছিল না, কিন্তু ১৯২৪ সালে যখন পার্টি হুয়াংপু সামরিক একাডেমীর

কাজে অংশগ্রহণ করল, সেই সময় থেকে পার্টি এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করল এবং সামরিক ব্যাপারের গুরুত্বটি বুঝতে শুরু করল। কুয়াংতুং প্রদেশের যুদ্ধে ও উত্তর অভিযানে কুওমিনতাঙকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে পার্টি সৈন্য-বাহিনীর এক অংশকে[১৮] নিজেদের প্রভাবে নিয়ে এল। বিপ্লবের ব্যর্থতায় তিক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে পার্টি নানছাং অভ্যুত্থান[১৯], 'শরৎকালীন ফসল' অভ্যুত্থান[২০], ক্যান্টন অভ্যুত্থান গড়ে তোলে, এবং এইভাবে তা একটি নতুন পর্যায়ে— লালফৌজকে প্রতিষ্ঠিত করার পর্যায়ে, প্রবেশ করে। এ পর্যায় ছিল আমাদের পার্টির পুরোপুরিভাবে সৈন্যবাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়। যদি এই পর্যায়ের লালফৌজ ও তার দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধ না হতো, অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি যদি চেন তু-সিউয়ের বিলোপবাদী নীতি গ্রহণ করত, তাহলে বর্তমানের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ এবং একে দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে যাওয়ার কথাটি কল্পনাও করা যেত না।

১৯২৭ সালের ৭ই আগস্টের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরী অধিবেশন রাজনৈতিক ক্ষেত্রের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, ফলে পার্টি অনেকখানি সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসের ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণাংগ অধিবেশনে শুধু নামেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রের 'বাম'পন্থী সুবিধাবাদের বিরোধিতা করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে আবার নতুন করে 'বাম'পন্থী সুবিধাবাদের ভুল করা হয়েছিল। এই দুটি সভার বিষয়বস্তু ও তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য ছিল, কিন্তু এদের কোনটাই যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যাগুলি নিয়ে গুরুত্বের সংগে আলোচনা করেনি। এতে এটাই ধরা পড়ে যে, পার্টির কাজকর্মের ভারকেন্দ্রটা তখনো যুদ্ধের ওপর রাখা হয়নি। ১৯৩৩ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি লাল এলাকায় সরে আসার পরে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু যুদ্ধের সমস্যা (এবং অন্যান্য সমস্ত প্রধান সমস্যাগুলো) সম্পর্কে আবার নীতিগত ভুল করা হল, আর তার ফলে বিপ্লবী যুদ্ধের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হয়। অপরদিকে, ১৯৩৫ সালের সুনাই বৈঠকে[২১] সংগ্রামটি মুখ্যত ছিল যুদ্ধের ব্যাপারে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে, এবং যুদ্ধের সমস্যাটিকে সেখানে প্রথম স্থান দেওয়া হল, যুদ্ধাবস্থারই প্রতিফলন ছিল এটা। আজকে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসে বলতে পারি যে, গত ১৭ বছরের সংগ্রামে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি যে শুধুই একটি দৃঢ় মার্কসবাদী রাজনৈতিক লাইন গড়ে তুলেছে তাই নয়, উপরন্তু গড়ে তুলেছে একটি দৃঢ়

মার্কসবাদী সামরিক লাইন। শুধু রাজনৈতিক সমস্যারই নয়, উপরন্তু যুদ্ধের সমস্যার সমাধানেও মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে আমরা সমর্থ হয়েছি; পার্টি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্ষম এমন বিরাট সংখ্যক কর্মীকেন্দ্রই যে আমরা শুধু শিক্ষিত করে তুলেছি তাই নয়, উপরন্তু সৈন্যবাহিনীর পরিচালনায় সিদ্ধহস্ত এমন বিপুল সংখ্যক কর্মীকেন্দ্রও আমরা শিক্ষিত করে তুলেছি। এটা হচ্ছে অসংখ্য শহীদের রক্তে রঞ্জিত বিপ্লবের ফল। এটা শুধু যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা জনগণের গৌরব তাই নয়, এই গৌরব সারা দুনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ও বিশ্বের জনগণেরও। দুনিয়ায় এখনো পর্যন্ত মাত্র তিনটি সৈন্যবাহিনী সর্বহারাশ্রেণীর ও জনগণের অধিকারে, এই তিনটি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত সৈন্যবাহিনী। অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির এখনো সামরিক অভিজ্ঞতা নেই, তাই আমাদের সৈন্যবাহিনী ও আমাদের সামরিক অভিজ্ঞতা হচ্ছে অত্যন্ত মূল্যবান।

বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে বিজয়ের সংগে চালিয়ে যাবার জন্য অষ্টম রুট বাহিনী, নতুন চতুর্থ বাহিনী এবং আমাদের পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত সমস্ত গেরিলাবাহিনীকে সম্প্রসারিত ও সুসংবদ্ধ করা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই নীতি অনুযায়ী পার্টির উচিত সবচেয়ে ভাল এবং পর্যাপ্ত পরিমাণের পার্টি-সদস্য ও কর্মীদের যুদ্ধফ্রন্টে পাঠানো। সবকিছুকেই যুদ্ধফ্রন্টে জয়লাভের কাজে লাগানো উচিত, আর সাংগঠনিক কর্তব্যকে অবশ্যই হতে হবে রাজনৈতিক কর্তব্যের অধীন।

৪। গৃহযুদ্ধে ও জাতীয় যুদ্ধে পার্টির সামরিক রণনীতির পরিবর্তন

আমাদের পার্টির সামরিক রণনীতির পরিবর্তনের প্রশ্ন পর্যালোচনার যোগ্য। ব্যাপারটাকে গৃহযুদ্ধ ও জাতীয় যুদ্ধ—এই দুই প্রক্রিয়ায় ভাগ করে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা যাক।

গৃহযুদ্ধের প্রক্রিয়াকে মোটামুটি রণনীতিগত দুটি সময়কালে ভাগ করে নিতে পারা যায়। প্রথম সময়কালে গেরিলাযুদ্ধই ছিল প্রধান, আর দ্বিতীয় সময়কালে প্রধান ছিল নিয়মিত যুদ্ধ। কিন্তু এই নিয়মিত যুদ্ধ ছিল চীনা ধরনের—এর নিয়মিত চরিত্র অভিব্যক্ত ছিল শুধুই সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করে

চলমান যুদ্ধ চালানোর ব্যাপারে এবং পরিচালনার ও সংগঠনের কিছুটা পরিমাণে কেন্দ্রীভূতকরণে ও পরিকল্পনাকরণে; অন্যান্য ব্যাপারে এ যুদ্ধটি গেরিলা চরিত্র বজায় রেখেছিল, এটা ছিল নিম্ন মানের, এবং বিদেশী সৈন্যবাহিনীগুলির সামরিক কার্যকলাপের সংগে এ যুদ্ধটি তুলনার যোগ্য ছিল না, এমনকি কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর সামরিক কার্যকলাপ থেকেও কিছুটা ভিন্ন। তাই, এক অর্থে, এই ধরনের নিয়মিত যুদ্ধ ছিল উচ্চতর মানে উন্নীত গেরিলাযুদ্ধ।

আমাদের পার্টির সামরিক কর্তব্যের দিক থেকে বলতে গেলে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রক্রিয়াকেও মোটামুটি দুটি রণনীতিগত সময়কালে বিভক্ত করতে পারা যায়। প্রথম সময়কালে (যার অন্তর্ভুক্ত দুটি পর্যায়—রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত ভারসাম্যাবস্থা) গেরিলাযুদ্ধই হচ্ছে প্রধান, দ্বিতীয় সময়কালে (রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়) নিয়মিত যুদ্ধই হবে প্রধান। কিন্তু, বিষয়বস্তুর দিক থেকে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম সময়-কালের গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে গৃহযুদ্ধের প্রথম সময়কালের গেরিলাযুদ্ধ থেকে অনেক ভিন্ন, কারণ এখন নিয়মিত (কিছুটা পরিমাণে নিয়মিত) অষ্টম রুট বাহিনী বিক্ষিপ্তভাবে গেরিলা কর্তব্যগুলিকে পালন করছে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের দ্বিতীয় সময়কালের নিয়মিত যুদ্ধও গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় সময়-কালের নিয়মিত যুদ্ধ থেকে ভিন্ন হবে, কারণ এটা আমরা ধরে নিতে পারি যে, নতুন ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হওয়ার পর সৈন্যবাহিনী ও তার সামরিক কার্যকলাপের বিরাট পরিবর্তন ঘটবে। আমাদের সৈন্যবাহিনী তখন কেন্দ্রী-ভূতকরণ ও সংগঠনের উচ্চমান অর্জন করবে এবং তার সামরিক কার্যকলাপ নিয়মিত উচ্চমান অর্জন করবে, তার গেরিলা চরিত্র অনেকটা হ্রাস পাবে, এখন যেটি রয়েছে নিম্নমানে তখন সেটি উন্নীত হবে উচ্চমানে, আর চীনা ধরনের নিয়মিত যুদ্ধ তখন পরিবর্তিত হবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো নিয়মিত যুদ্ধে। এটা হবে রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে আমাদের কাজ।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই, যে, গৃহযুদ্ধ ও জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ—এই দুটি প্রক্রিয়ায় এবং তাদের চারটি রণনীতিগত সময়কালে রয়েছে রণনীতির তিনটি পরিবর্তন। প্রথমটি ছিল গৃহযুদ্ধের সময়ে গেরিলাযুদ্ধ থেকে নিয়মিত যুদ্ধে পরিবর্তন। দ্বিতীয়টি ছিল গৃহযুদ্ধকালের নিয়মিত যুদ্ধ থেকে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকালে গেরিলাযুদ্ধে পরিবর্তন। আর

"তৃতীয়টি হবে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের সময়ে গেরিলাযুদ্ধ থেকে নিয়মিত যুদ্ধে পরিবর্তন।

এই তিনটি পরিবর্তনের প্রথমটি ভীষণ অসুবিধার মুখে পড়েছিল। এতে দুদিকের কর্তব্য ছিল। একদিকে, গেরিলা চরিত্রকে আঁকড়ে ধরে থাকা আর নিয়মিত চরিত্রের দিকে পরিবর্তিত হতে অনিচ্ছুক দক্ষিণপন্থী স্থানীয়তাবাদ ও গেরিলাবাদের বিরোধিতা করতে হয়েছিল। এ ঝোঁকটি জন্মেছিল, কারণ কর্মীরা শত্রুর পরিস্থিতির ও নিজেদের কর্তব্যগুলিকে হেয়জ্ঞান করেছিল। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় লাল অঞ্চলের কথা বলতে গেলে, সেখানে অনেক কষ্ট স্বীকার করে শিক্ষা দেওয়ার পরেই শুধু এ ঝোঁকটিকে ক্রমশঃ শুধরে নেওয়া গিয়েছিল। আর অন্যদিকে, নিয়মিতকরণের ওপরে অত্যধিক জোর দেওয়ার 'বাম'পন্থী অতিকেন্দ্রীয়করণ ও হঠকারিতাবাদেরও বিরোধিতা করতে হয়েছিল। এ ঝোঁকের উদ্ভব ঘটেছিল এই কারণে যে, আমাদের কোন কোন নেতৃস্থানীয় কর্মী শত্রুকে বেশি মাত্রায় শক্তিশালী বলে মনে করেছিল, কর্তব্যগুলিকে অত্যন্ত চড়া করে ধার্য করেছিল, আর বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত না করে বিদেশী অভিজ্ঞতাকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করেছিল। দীর্ঘ তিন বছর ধরে (সুনাই বৈঠকের আগে) এই ঝোঁকটি কেন্দ্রীয় লাল অঞ্চলের ওপরে প্রভূত আত্মত্যাগ চাপিয়ে দিল, আর রক্তের বিনিময়ে শিক্ষালাভ করার পরেই শুধু এ ঝোঁকটিকে শুধরে নেওয়া গিয়েছিল। এই শুধরে নেওয়াটাই ছিল সুনাই বৈঠকের সাফল্য।

রণনীতির দ্বিতীয় পরিবর্তনটি ঘটেছিল ১৯৩৭ সালের শরৎকালে (লুকৌছিয়াও ঘটনার পরে), দুটি ভিন্নতর যুদ্ধের সন্ধিক্ষণে। এই সময়ে, আমাদের শত্রু হচ্ছে নতুন অর্থাৎ জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, আমাদের মিত্রবাহিনী হচ্ছে আমাদের প্রাক্তন শত্রু—কুওমিনতাঙ (তারা এখনো আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন), আর যুদ্ধক্ষেত্র হচ্ছে সুবিশাল উত্তর চীন (সাময়িকভাবে সেটি হল আমাদের সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্র, কিন্তু অচিরেই সেটি শত্রুর দীর্ঘস্থায়ী পশ্চাদ্ভাগে পরিণত হবে)। আমাদের রণনীতির পরিবর্তন হচ্ছে এই বিশেষ পরিস্থিতিতে সাধিত একটি অত্যন্ত গুরুতর পরিবর্তন। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের অতীত দিনের নিয়মিত বাহিনীকে গেরিলাবাহিনীতে (এখানে বিক্ষিপ্তভাবে প্রয়োগ করার অর্থে বলছি, কিন্তু সাংগঠনিক সুসবদ্ধতা বা শৃংখলানিষ্ঠার অর্থে নয়) রূপান্তরিত করে নিতে হয়েছিল, আর অতীতের

চলমান যুদ্ধকে গেরিলাযুদ্ধে রূপান্তরিত করে নিতে হয়েছিল; শুধু এমনি করেই শত্রুর পরিস্থিতির সংগে ও আমাদের কর্তব্যের সংগে খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে এই ধরনের পরিবর্তনটি ছিল একটি পিছু হটার পরিবর্তন, তাই এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবীরূপেই অত্যন্ত কঠিন। এ সময়ে, শত্রুকে খাটো করে দেখা এবং জাপানকে ভয় করা, দুটোই ঘটতে পারে এবং বাস্তবে এ দুটোই ঘটেছিল কুওমিনতাঙের মধ্যে। কুওমিনতাঙ যখন গৃহযুদ্ধের রণক্ষেত্র থেকে জাতীয় যুদ্ধের রণক্ষেত্রে নামতে শুরু করল, তখন সে বহু অনাবশ্যক ক্ষতি ভোগ করেছিল। এর প্রধান কারণ ছিল শত্রুকে খাটো করে দেখা, তাছাড়া জাপানকে ভয় করাও (হান ফু-চ্যু আর লিউ চি হচ্ছে[২] তার দৃষ্টান্ত) হচ্ছে এর কারণ। অন্যদিকে আমরা এই পরিবর্তনটি বেশ সহজেই করতে পেরেছি, আমরা ক্ষতি ও পরাজয় ভোগ করিনি, বরং বিরাট বিরাট জয়লাভ করেছি। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যদিও কেন্দ্রীয় কমিটি ও সামরিক কর্মীদের একাংশের মধ্যে গুরুতর তর্কবিতর্ক হয়েছিল, তবুও আমাদের ব্যাপক কর্মিগণ যথাসময়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন আর নমনীয়তার সংগে পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। গোটা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধকে অধ্যবসায় সহকারে চালিয়ে যাওয়া, তাকে প্রসারিত করা ও জেতার জন্য তথা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভবিষ্যতের জন্য এই পরিবর্তনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। চীনের জাতীয় মুক্তির ভাগ্য নির্ধারণে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কথা যদি ভাবি, তাহলে আমরা এর গুরুত্বটি বুঝতে পারব। অসাধারণ ব্যাপকতা ও দীর্ঘস্থায়িত্বের দিক থেকে বলতে গেলে, চীনের জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধটি শুধু যে প্রাচ্যে নজিরবিহীন তা-ই নয়, উপরন্তু, সম্ভবতঃ গোটা মানবজাতির ইতিহাসেও এর তুলনা নেই।

তৃতীয় পরিবর্তনটি হচ্ছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের সময়ে গেরিলাযুদ্ধ থেকে নিয়মিত যুদ্ধে রূপান্তর, এবং এটাই হবে যুদ্ধবিকাশের ভবিষ্যতের ব্যাপার। সে সময়ে হয়ত নতুন অবস্থা ও নতুন অসুবিধার সৃষ্টি হবে, সে সম্পর্কে এখন না বললেও চলে।

৫। জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত ভূমিকা

সামগ্রিকভাবে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে নিয়মিত যুদ্ধই হচ্ছে প্রধান

আর গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে সহায়ক, কারণ শুধুমাত্র নিয়মিত যুদ্ধই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি স্থির করতে পারে। গোটা দেশের কথা বলতে গেলে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের গোটা প্রক্রিয়ায় যে তিনটি রণনীতিগত পর্যায় (প্রতিরক্ষা, ভারসাম্যাবস্থা ও পাল্টা আক্রমণ) রয়েছে, তার মধ্যে প্রথম ও শেষটিতে নিয়মিত যুদ্ধই হচ্ছে প্রধান আর গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে সহায়ক। মধ্যবর্তী পর্যায়ে গেরিলাযুদ্ধ হবে প্রধান আব নিয়মিত যুদ্ধ হবে সহায়ক, কারণ শত্রু তার অধিকৃত এলাকাগুলিকে আঁকড়ে ধরে রাখবে আর আমরা পাল্টা আক্রমণেব জন্য প্রস্তুতি চালালেও তখনো পাল্টা আক্রমণ চালাতে সক্ষম হয়ে উঠব না। যদিও এই পর্যায়টি হয়ত সবচেয়ে দীর্ঘ হবে, কিন্তু এটি হচ্ছে গোটা যুদ্ধের তিনটি পর্যায়ের মাত্র একটি। তাই, যুদ্ধকে সমগ্রভাবে ধরলে, নিয়মিত যুদ্ধই হচ্ছে প্রধান আর গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে সহায়ক। যদি এ অবস্থাকে উপলব্ধি না কবি, নিয়মিত যুদ্ধ যে যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধাবণেব চাবিকাঠি—এটা না বুঝি, এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার কাজে আব নিয়মিত যুদ্ধের পর্যালোচনা ও পরিচালনার কাজে দৃষ্টি না দিই, তাহলে আমরা জাপানকে পরাজিত করতে পারব না। এটা হচ্ছে সমস্যাব একটা দিক।

তবু, গোটা যুদ্ধের মধ্যে গেবিলাযুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিগত ভূমিকা রয়েছে। গেরিলাযুদ্ধ না করে এবং গেবিলাবাহিনী ও গেরিলাফৌজ গঠনের কাজ উপেক্ষা করলে, এবং গেরিলাযুদ্ধেব পর্যালোচনা ও পরিচালনার কাজ উপেক্ষা করলে আমবা অনুরূপভাবেই জাপানকে পবাজিত করতে অসমর্থ হব। কারণ চীনেব বৃহত্তর অংশ শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে পরিণত হবে, আমরা যদি সর্বাধিক ব্যাপক ও সবচেয়ে দৃঢ় গেরিলাযুদ্ধ না চালাই এবং এইভাবে শত্রুকে নিজের পশ্চাদ্ভাগ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে তার অধিকৃত অঞ্চলে অটলভাবে বসতে সুযোগ দিই, তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের প্রধান সৈন্যবাহিনীর গুরুতর ক্ষতি হতে বাধ্য। শত্রুর আক্রমণ নিশ্চয়ই আরও হিংস্রতর হবে, ভারসাম্যাবস্থা সৃষ্টি করা কঠিন হয়ে উঠবে, আর জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটাই হয়ত-বা বিপদাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। ঘটনাগুলি যদি তেমন নাও ঘটে তাহলেও দেখা দেবে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা, যেমন, আমাদের পাল্টা আক্রমণের জন্য শক্তির প্রস্তুতি যথেষ্ট হবে না, পাল্টা আক্রমণের সময়ে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগের দিক থেকে আমরা সাহায্য পাব না, এবং শত্রুর

ক্ষয়ক্ষতি পূরণের সম্ভাবনাও থাকবে, ইত্যাদি। এ ধরনের অবস্থা ঘটলে এবং ব্যাপক ও দৃঢ় গেরিলাযুদ্ধকে যথাসময়ে বিকশিত করে সেই অবস্থাকে আয়ত্তে না আনা গেলে, অমুরূপভাবেই জাপানকে পরাজিত করা অসম্ভব হবে। অতএব, গোটা যুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ একটি সহায়ক স্থানের অধিকারী হলেও, আসলে তার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিগত স্থান রয়েছে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালানোর ব্যাপারে গেরিলাযুদ্ধকে অবহেলা করাটা হবে নিঃসন্দেহে একটা গুরুতর ভুল। এটা হচ্ছে সমস্যার আর একটা দিক।

দেশ বড় হলেই গেরিলাযুদ্ধ সম্ভব। তাই প্রাচীনকালেও গেরিলাযুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হলেই গেরিলা-যুদ্ধকে অটলভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারা যায়। এই কারণেই প্রাচীনকালে গেরিলাযুদ্ধ সাধারণতঃ ব্যর্থ হয়েছে, আর শুধুমাত্র আধুনিককালের বড় বড় দেশে, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি বিদ্যমান, সেখানে গেরিলাযুদ্ধ জয়যুক্ত হতে পারে, যেমন হয়েছে গৃহযুদ্ধের সময়কার সোভিয়েত ইউনিয়নের ও চীনেব মতো দেশে। বর্তমানকালের শর্তগুলি ও সাধারণ শর্তগুলিব দিক থেকে বলতে গেলে, যুদ্ধ চালনার ব্যাপারে জাপ-বিবোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এমন একটা শ্রমবিভাজন হচ্ছে অপবিহার্য ও উপযোগী, যে শ্রমবিভাজনে কুওমিনতাঙ যুদ্ধক্ষেত্রেব নিয়মিত যুদ্ধ চালাবার ভার গ্রহণ করে আর কমিউনিস্ট পার্টি শত্রুব পশ্চাদ্ভাগের গেরিলাযুদ্ধ চালাবার ভার নেয়। এটা হচ্ছে পারস্পরিক প্রয়োজন, পারস্পরিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের ব্যাপার।

এ থেকেই বোঝা যায়, আমাদের পার্টির সামরিক রণনীতিকে গৃহযুদ্ধের শেষের সময়কালের নিয়মিত যুদ্ধ থেকে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম সময়কালের গেরিলাযুদ্ধে বদলে নেওয়া কত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। নিম্ন-লিখিত ১৮ দফায় এই পরিবর্তনের সুবিধে বর্ণনা করা হল:

(১) শত্রুবাহিনীর অধিকৃত এলাকাগুলির হ্রাসকরণ;

(২) আমাদের সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটি এলাকাগুলির সম্প্রসারণ;

(৩) প্রতিরক্ষার পর্যায়ে, শত্রুকে টেনে ধরে যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক কার্য-কলাপের সংগে সহযোগিতা করা;

(৪) ভারসাম্যের পর্যায়ে, শত্রুর পশ্চাদ্ভাগস্থ আমাদের ঘাঁটি এলাকাগুলি

সুদৃঢ়ভাবে অধিকার করে রাখা, যাতে যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সুসংবদ্ধকরণ ও ট্রেনিংয়ের সুবিধে হয়,

(৫) পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে, যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক কার্যকলাপের সঙ্গে সহযোগিতা করে হৃত এলাকা পুনরুদ্ধার করা,

(৬) দ্রুততম ও সর্বাধিক কার্যকরভাবে আমাদের সৈন্যবাহিনীর সম্প্রসারণ,

(৭) কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপকতম সম্প্রসারণ, যাতে প্রতিটি গ্রামে পার্টি-শাখা গঠন করা যায়,

(৮) গণ-আন্দোলনগুলির ব্যাপকতম সম্প্রসারণ, যাতে করে শত্রুর ঘাঁটিতে অবস্থিত যারা তাদের বাদ দিয়ে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগস্থ সমস্ত জনগণকে সংগঠিত করতে পারা যায়,

(৯) জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলির সর্বাধিক ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা,

(১০) জাপ-বিরোধী সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক কাজকর্মের ব্যাপকতম প্রসার,

(১১) জনগণের জীবনযাত্রার ব্যাপকতর উন্নতিবিধান,

(১২) শত্রুসৈন্যবাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার জন্য সর্বাধিক সুবিধের

...

(১৩) সবচেয়ে ব্যাপক ও স্থায়ীভাবে গোটা দেশের জনগণের মনোভাবের ওপরে প্রভাব বিস্তার এবং গোটা দেশের সৈন্যদের সংগ্রামী মনোবল ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত করা,

(১৪) বন্ধুভাবাপন্ন সৈন্যবাহিনী ও পার্টিগুলিকে প্রগতির জন্য ব্যাপকতর প্রেরণা দেওয়া,

(১৫) শত্রু শক্তিশালী আর আমরা দুর্বল এমন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার উপযোগী হওয়া, যাতে আমরা কম ক্ষতি ভোগ করি এবং বেশি জয়লাভ করি।

(১৬) শত্রু ছোট আর আমরা বড়—এই অবস্থার উপযোগী হওয়া, যাতে শত্রু বেশি ক্ষতি ভোগ করে এবং কম জয়লাভ করে,

(১৭) সবচেয়ে দ্রুত ও সবচেয়ে কার্যকরীভাবে বিরাট সংখ্যক নেতৃস্থানীয় কর্মী গড়ে তোলা,

(১৮) রসদাদি সরবরাহের সমস্যা সমাধানের সর্বাধিক সুবিধার সৃষ্টি করা।

এ কথা সন্দেহাতীত যে, দীর্ঘকালীন সংগ্রামে গেরিলাবাহিনী ও গেরিলা-যুদ্ধকে নিজের পূর্বাবস্থায় নিশ্চল হয়ে থাকা উচিত নয়, তাকে বরং উচ্চতর পর্যায়ে বিকশিত হয়ে উঠতে হবে, আর ক্রমে ক্রমে নিয়মিত বাহিনীতে ও নিয়মিত যুদ্ধে রূপান্তরিত হতে হবে। গেরিলাযুদ্ধের ভেতর দিয়ে আমরা শক্তি সঞ্চয় করে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে চূর্ণবিচূর্ণ করার কাজে নিজেদেরকে অন্যতম নির্ধারক উপাদানে পরিণত করব।

৬। সামরিক সমস্যার পর্যালোচনায় মনোযোগ দাও

শত্রুভাবাপন্ন দুটি সৈন্যবাহিনীর মধ্যেকার যাবতীয় সমস্যার সমাধান নির্ভর করে যুদ্ধের ওপরে, আর চীনের অস্তিত্ব বা বিলুপ্তি নির্ভর করে যুদ্ধে তার জয়-পরাজয়ের ওপর। তাই সামরিক তত্ত্ব, রণনীতি ও রণকৌশল এবং সৈন্য-বাহিনীর রাজনৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনায় আর এক মুহূর্তও দেরী করলে চলবে না। রণকৌশল সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনা পর্যাপ্ত না হলেও, সামরিক কাজকর্মে নিয়োজিত আমাদের কমরেডরা গত দশ বছরে বহু সাফল্য অর্জন করেছেন এবং চীনের পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন অনেক কিছুর উদ্ভব ঘটিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে ত্রুটি হচ্ছে এই যে সে সবকিছুর সারসংকলন করা হয়নি। এখনো মাত্র খুব অল্পসংখ্যক লোকই রণনীতির সমস্যা ও যুদ্ধের তাত্ত্বিক সমস্যার পর্যালোচনা করছেন। রাজনৈতিক কাজ-কর্মের পর্যালোচনায় প্রথমশ্রেণীর সাফল্য পাওয়া গেছে, এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যসমৃদ্ধিতে এবং উদ্ভাবনের সংখ্যায় ও গুণে সারা দুনিয়ায় সোভিয়েত ইউ-নিয়নের পরেই আমাদের স্থান, কিন্তু ত্রুটি হচ্ছে এই যে, সেগুলির সমন্বয়সাধন ও সুব্যবস্থিতকরণ পর্যাপ্ত নয়। গোটা পার্টি ও গোটা দেশের প্রয়োজনে, সামরিক জ্ঞানকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করা হচ্ছে জরুরী কর্তব্য। এইসব বিষয়ের দিকে এখন থেকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে, আর যুদ্ধ ও রণনীতির তত্ত্ব হচ্ছে সবকিছুর মূল। সামরিক তত্ত্বের পর্যালোচনায় আগ্রহকে উদ্দীপ্ত করা ও সামরিক সমস্যা পর্যালোচনার দিকে দৃষ্টি দিতে গোটা পার্টিকে উদ্বুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজনীয় বলেই আমি মনে করি।

টীকা

১। ভি. আই. লেনিন—'যুদ্ধ এবং রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি, "আর. এস. ডি. এল. পি-এর বিদেশস্থ শাখাগুলির সম্মেলন', 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে নিজের সরকারের পরাজয় সম্পর্কে', 'রাশিয়ার পরাজয় ও বিপ্লবী সংকট' দ্রষ্টব্য। লেনিনের এই প্রবন্ধগুলি ১৯১৪-১৫ সালে তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত। এগুলি ছাড়া, 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ'-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ 'যুদ্ধ, শান্তি ও বিপ্লবের প্রশ্নে বলশেভিক পার্টির তত্ত্ব ও রণকৌশল' দ্রষ্টব্য।

২। কমিউনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষকদের সংগে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন ১৯২৪ সালে মুৎসুদ্দি ও জমিদারদের সশস্ত্র বাহিনী—'সদাগর বাহিনীকে' পরাজিত করেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে যোগসাজসে এরা সেই সময়ে কুয়াংচৌতে প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপে নিয়োজিত ছিল। কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতার ভিত্তিতে স্থাপিত বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে কুয়াংচৌ থেকে রওনা হয়ে পূর্বমুখী অভিযানে লড়ে, এবং কৃষকদের সাহায্যে ও সমর্থনে পরাজিত করে যুদ্ধবাজ ছেন চিয়োং-মিংয়ের সৈন্যবাহিনীকে। তারপরে কুয়াংচৌতে ফিরে এসে ধ্বংস করে ইয়ুনান ও কুয়াংসীর যুদ্ধবাজদের, যারা কুয়াংচৌতে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। সেই বছরের শরৎকালে এই বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী দ্বিতীয় পূর্বমুখী অভিযান চালায় আর ছেন চিয়োং-মিংয়ের সৈন্যবাহিনীকে চূড়ান্ত-ভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এইসব যুদ্ধাভিযানের পুরোভাগে বীরত্বের সংগে লড়াই করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট যুব লীগের সদস্যরা। এই যুদ্ধাভিযানগুলিই কুয়াংতুং প্রদেশের ঐক্যসাধন ঘটিয়ে উত্তর অভিযানের ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছিল।

৩। ৪ঠা মের আন্দোলনটি ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন যা ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে শুরু হয়েছিল। সেই বছরের প্রথমার্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীরা, অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান, ইতালী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি প্যারিসে এক বৈঠকে মিলেছিল লুটের মাল ভাগাভাগি করে নেবার জন্য, আর এই বৈঠকে তারা স্থির করেছিল যে, চীনের শানতুং প্রদেশে আগের দিনে জার্মানি যেসব সুযোগ-সুবিধে ভোগ করত, সে সবই জাপান পাবে। ৪ঠা মে তারিখে,

পিকিংয়ের ছাত্ররা সর্বপ্রথম সমাবেশ ও বিক্ষোভ-মিছিল আয়োজন করে দৃঢ়ভাবে এর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিল। এই আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টায় উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ সরকার ত্রিশ জনেরও বেশি ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছিল। প্রতিবাদে ধর্মঘট করেছিল পিকিংয়ের ছাত্ররা, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররাও এই ধর্মঘটে সাড়া দিয়েছিল। ৩রা জুন তারিখে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ সরকার পিকিংয়ে আরও ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু করল, দুই দিনের মধ্যে প্রায় হাজারখানেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করল। ৩রা জুনের ঘটনা সারা দেশের জনগণের ক্রোধকে আরও উদ্দীপ্ত করে তুলল। ৫ই জুন থেকে শুরু করে শাংহাই ও অন্যান্য অনেক জায়গার শ্রমিকরা পরপর ধর্মঘট করল, আর ব্যবসায়ীরাও তাঁদের দোকানপাট বন্ধ রাখল। শুরুতে যা ছিল মুখ্যতঃ বুদ্ধিজীবীদের স্বদেশপ্রেমী আন্দোলন, সেটি অবিলম্বে হয়ে উঠল দেশব্যাপী স্বদেশপ্রেমী আন্দোলন। তাতে যোগ দিল সর্বহারাশ্রেণী, পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণী। এই স্বদেশপ্রেমী আন্দোলনেব প্রসারলাভের সংগে সংগে ৪ঠা মেব আগে আরম্ভ করা যা সাংস্কৃতিক আন্দোলনটি, যা শুরু হয়েছিল সামন্ততন্ত্র-বিবোধী আর বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রেব উন্নতিবিধায়ক এক আন্দোলন হিসেবে, তা এক ব্যাপক আকারের বলিষ্ঠ বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বিকশিত হয়ে উঠল। আর এর প্রধান প্রবাহটি ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচার।

৪। ১৯২৫ সালের ৩০শে মে শাংহাইয়ে ব্রিটিশ পুলিস কর্তৃক চীনা জনগণকে হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সারা দেশের জনগণ যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন চালিয়েছিল, এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৫ সালের মে মাসে ছিংতাও ও শাংহাইয়ের জাপানী সূতাকল-গুলোতে পরপর ধর্মঘট হয়, এই ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের পদলেহী কুকুর—উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজরা এটা দমন করতে আসে। ১৫ই মে শাংহাইয়ের জাপানী সূতাকলের মালিক কু চেং-হোং নামক একজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে এবং দশ জনেরও বেশি শ্রমিক আহত হয়। ২৮শে মে তারিখে ছিংতাওয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার আট জন শ্রমিককে হত্যা করে। ৩০শে মে শাংহাইয়ে দু হাজারেরও বেশি ছাত্র বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বিদেশীদের এলাকাগুলোতে শ্রমিকদের সমর্থনে প্রচার চালায় এবং এইসব এলাকা ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান জানায়, এর পরেই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্রিটিশ এলাকার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সম্মুখে দশ হাজারেরও

অধিক লোক জমায়েত হয় এবং বজ্রনির্ঘোষে 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!', 'সমগ্র চীনা জনগণ, এক হও!' ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ জনতার ওপর গুলি চালায়, ফলে বহু ছাত্র হতাহত হয়, এই ঘটনাই '৩০শে মের হত্যাকাণ্ড' বলে পরিচিত। এই বিরাট হত্যাকাণ্ডে সমগ্র দেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, দেশের সর্বত্রই বিক্ষোভ-মিছিল ও হরতাল এবং ছাত্র, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট শুরু হয়, যা বিরাটাকারের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়।

৫। জে. ভি. স্তালিন, 'চীনে বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ' থেকে উদ্ধৃত।

৬। ১৮৯৪ সালে সান ইয়াৎ-সেন হনলুলুতে একটি ছোট বিপ্লবী দল গঠন করেছিলেন। তার নাম ছিল 'সিং চোং হুই' (চীনের পুনর্জীবন সমিতি)। ১৮৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধে ছিং রাজবংশীয় সরকারের পরাজয়ের পরে, জনগণের ভেতরের 'হুইতাং' নামক গুপ্ত সংগঠনগুলির সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে সান ইয়াৎ-সেন ছিং সরকারের বিরুদ্ধে কুয়াংতুং প্রদেশে দুবার সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন, একটি ১৮৯৫ সালে কুয়াংচৌতে, আর অন্যটি ১৯০০ সালে হুইচৌয়ে।

৭। ১৯০৫ সালে সিং চোং হুই অন্য দুটি ছিং-বিরোধী সংগঠন—হুয়াং সিং হুই (চীনা পুনর্জীবন সমিতি) আর কুয়াং ফু হুই (পুনরুদ্ধার সমিতি)-এর সংগে একত্রিত হয়েছিল এবং ফলে গঠিত হয়েছিল তুং মেং হুই অর্থাৎ 'মৈত্রী সমিতি' (বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া এবং কিছু সংখ্যক ছিং সরকার-বিরোধী জমিদার ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের যুক্তফ্রন্ট সংগঠন)। এই সমিতি বুর্জোয়া বিপ্লবের কার্যক্রম উপস্থাপন করেছিল। 'মাঞ্চুদের বিতাড়ন, চীন পুনরুদ্ধার, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জমির মালিকানার সমতাবিধান'-এর সুপারিশ করা হয়েছিল এই কার্যক্রমে। তুং মেং হুই-এর কালে, 'হুইতাঙ' ও ছিং সরকারের নয়া সৈন্যবাহিনীর এক অংশের সংগে মৈত্রী গড়ে তুলে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন ছিং সরকারের বিরুদ্ধে অনেকবার সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। এই অভ্যুত্থানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯০৬ সালের পিংসিয়াং (কিয়াংসী প্রদেশে), লিউইয়াং ও লিলিংয়ের (হুনান প্রদেশে) বিদ্রোহ, ১৯০৭ সালের ছাওচৌ-হুয়াংকাংয়ের (কুয়াংতুং প্রদেশে) বিদ্রোহ, ছিনচৌয়ের (কুয়াংতুং প্রদেশে) বিদ্রোহ, চেন্নানকুয়ানের [অর্থাৎ বর্তমানের ইয়ৌইকুয়ান—অনুবাদক] (কুয়াংসী প্রদেশে) বিদ্রোহ, ১৯০৮ সালের ইয়ুনান প্রদেশের হোকৌয়ের বিদ্রোহ আর ১৯১১ সালের কুয়াংচৌ বিদ্রোহ ও উছাং অভ্যুত্থান।

৮। ১৯১২ সালে 'তুং মেং হুই' পুনর্গঠিত হয়ে কুওমিনতাঙে পরিণত হল এবং তৎকালীন উত্তরাঞ্চলের শি-কাইয়ের শাসনের সংগে আপোষ করল। ১৯১১ সালের সিনহাই বিপ্লবের দ কিয়াংসী, আনহুই ও কুয়াংতুং প্রদেশে যে উক্তির উদ্ভব ঘটেছিল, সেগুলিকে দাবিয়ে রাখার জন্য ইউয়ান শি-কাইয়ের সৈন্যবাহিনী ১৯১৩ সালে দক্ষিণ অভিমুখে অভিযান চালায়। ডঃ সান ইয়াৎ-সেন সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুললেন কিন্তু অচিরেই সে প্রতিরোধ ভেঙে গেল। কুওমিনতাঙের আপোষনীতির ভুল বুঝতে পেরে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন ১৯১৪ সালে জাপানের টোকিও শহরে 'চোং হুয়া কে মিং তাঙ' (চীনা বিপ্লবী পার্টি) নামে একটি পার্টি গঠন করলেন, সে সময়কার কুওমিনতাঙের সংগে তাঁর পার্টির পার্থক্য দেখিয়ে দেবার জন্য। বস্তুতঃ এই নতুন পার্টিটি ছিল ইউয়ান শি-কাইয়ের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া অংশবিশেষ ও বুর্জোয়াদের একটি অংশের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মৈত্রীসংস্থা। এই মৈত্রীসংস্থার ওপর নির্ভর করে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন ১৯১৪ সালে শাংহাইয়ে একটা ছোট আকারের বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে ইউয়ান শি-কাই নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করলে ইউয়ান শি-কাইয়ের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাই এ এবং অন্যান্যরা তার বিরুদ্ধে ইয়ুনান থেকে যুদ্ধ শুরু করল। আর ইউয়ান শি-কাইয়ের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিরোধিতা গড়ে তোলবার ব্যাপারেও ডঃ সান ইয়াৎ-সেন ছিলেন সক্রিয় প্রচারক ও সংগঠক।

৯। ১৯১৭ সালে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন তাঁর প্রভাবাধীন নৌবাহিনীকে পরিচালিত করে শাংহাই থেকে কুয়াংচৌয়ে গিয়েছিলেন। কুয়াংতুং প্রদেশকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমী যুদ্ধবাজদের সংগে মিলিত হয়ে তিনি তুয়ান ছী-রুইবিরোধী একটি সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিমী যুদ্ধবাজরা সে সময়ে ছিল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ তুয়ান ছী-রুইয়ের বিরোধী।

১০। ১৯২১ সালে, কুইলিন শহরে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন উত্তর অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর অধীনস্থ ছেন চিয়োং-মিং উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের সংগে যোগসাজস করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এই কারণে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের চেষ্টা সফল হয়নি।

১১। ১৯২৪ সালে, সান ইয়াৎ-সেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত

ইউনিয়নের সহযোগিতা পেয়ে কুওমিনতাঙের পুনঃসংগঠনের পর কুয়াংচৌয়ের নিকটবর্তী হুয়াংপুতে একটি সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এটাই হুয়াংপু সামরিক একাডেমী নামে খ্যাত। চিয়াং কাই-শেকের ১৯২৭ সালের প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের আগে এ ছিল কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির যুক্ত সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়। কমরেড চৌ এন-লাই, ইয়ে চিয়ান-ইং, ইয়ুন তাই-ইং, সিয়াও ছু-ন্যু ও অন্যান্য বহু কমরেড বিভিন্ন সময়ে এই বিদ্যালয়ে নানা রকমের দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়েছিলেন। আর এই বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রও ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির বা কমিউনিস্ট যুব লীগের সদস্য। তাঁরা এই বিদ্যালয়ের বিপ্লবী অন্তঃসার হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন।

১২। তান ইয়ান-কাই ছিল হুনানের অধিবাসী। সে ছিল একজন 'হানলিন', অর্থাৎ ছিং রাজবংশের অধীনস্থ সর্বোচ্চ সরকারী বিদ্বৎ সংস্থার সদস্য। গোড়াতে সে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের সপক্ষে ওকালতি করত। আর পরে স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য ১৯১১ সালের বিপ্লবে (সিনহাই বিপ্লবে) অংশ-গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে কুওমিনতাঙ শিবিরে তার যোগদানটা ছিল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের সংগে হুনানের স্থানীয় জমিদারদের বিরোধের প্রতিফলন।

১৩। প্রগ্রেসিভ পার্টি (চিনপুতাঙ) হল চীনা প্রজাতন্ত্রের শুরুর বছর-গুলিতে ইউয়ান শি-কাইয়ের কৃপাশ্রয়ে লিয়াং ছী-ছাও প্রমুখদের দ্বারা সংগঠিত একটি পার্টি।

১৪। ছিং রাজবংশের শেষ বছরগুলিতে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের সর্দার ছিল ইউয়ান শি-কাই। ১৯১১ সালের বিপ্লবে ছিং রাজবংশের পতনের পর, প্রতিবিপ্লবী সশস্ত্র শক্তির ওপরে ও সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যের ওপরে নির্ভর করে এবং তৎকালীন বিপ্লব পরিচালনাকারী বুর্জোয়াশ্রেণীর আপোষমূলক চরিত্রের সুযোগ নিয়ে ইউয়ান শি-কাই প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের পদটি কুক্ষিগত করে নিয়েছিল, আর উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের প্রথম সরকার গঠন করেছিল। এ সরকার প্রতিনিধিত্ব করত বড় বড় জমিদার ও বড় বড় মুৎসুদ্দিশ্রেণীর। ১৯১৫ সালে সে নিজেকে সম্রাট হিসেবে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনলাভের জন্য জাপানের একুশ দফা দাবি মেনে নিয়েছিল। এই একুশ দফা দাবির সাহায্যে জাপান গোটা চীনের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন করতে চেয়েছিল। সে বছরের ডিসেম্বর মাসে ইউয়ান শি-কাইয়ের সম্রাট

হওয়ার ঘোষণার বিরুদ্ধে ইয়ুনান প্রদেশে একটি বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল এবং অবিলম্বেই সারা দেশ এই বিদ্রোহে সাড়া দিল। ইউয়ান শি-কাই মারা যায় পিকিংয়ে ১৯১৬ সালের জুন মাসে।

১৫। তুয়ান ছী-রুই ছিল ইউয়ান শি-কাইয়ের একজন প্রবীণ অধীনস্থ ব্যক্তি এবং উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের আনহুই চক্রের সর্দার। ইউয়ান শি-কাইয়ের মৃত্যুর পরে সে একাধিকবার পিকিং সরকারের ক্ষমতা হাতে নিয়েছিল।

১৬। রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রুপটি ছিল ১৯১৬ সালে প্রগ্রেসিভ পার্টির (চিন-পুতাঙের) এক অংশ ও কুওমিনতাঙের এক অংশ নিয়ে গঠিত অত্যন্ত দক্ষিণ-পন্থী একটি রাজনৈতিক গ্রুপ। সরকারী পদ লাভের জন্য এই গ্রুপ কখনো দক্ষিণাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের, আবার কখনো বা উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের সাথে জোট বাঁধে। ১৯২৬-২৭ সালের উত্তর অভিযানের সময়ে এই গ্রুপের একাংশ যেমন হুয়াং ফু, চাং ছুন ও ইয়াং ইয়োং-তাইয়ের মতো জাপান-অনুরাগী সদস্যরা চিয়াং কাই-শেকের সংগে যোগসাজস করতে শুরু করেছিল, আর নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চিয়াং কাই-শেককে সাহায্য করেছিল।

১৭। যুব পার্টি অর্থাৎ তথাকথিত 'রাষ্ট্রবাদী' গ্রুপের চীনা যুব পার্টি—এটা হচ্ছে মুষ্টিমেয় ফ্যাসিবাদী নির্লজ্জ রাজনীতিবিদদের সংগঠন। কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করে ক্ষমতাসীন বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য লাভ করাটাকে তারা নিজেদের প্রতিবিপ্লবী পেশা করে নিয়েছিল।

১৮। এখানে মুখ্যতঃ উত্তর অভিযানের যুদ্ধকালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য জেনারেল ইয়ে থিংয়ের নেতৃত্বাধীন স্বতন্ত্র রেজিমেন্টেরই উল্লেখ করা হয়েছে। এই রেজিমেন্ট ছিল উত্তর অভিযানে বিখ্যাত সংগ্রামী বাহিনী, বিপ্লবী সৈন্য-বাহিনী কর্তৃক উছাং দখলের পরে এই রেজিমেন্টটি ২৪তম ডিভিসনে সম্প্রসারিত হয় এবং নানছাং অভ্যুত্থানের পর ১১তম বাহিনীতে সম্প্রসারিত হয়।

১৯। কিয়াংসী প্রদেশের রাজধানী নানছাং হল ১৯২৭ সালের ১লা আগস্টের বিখ্যাত অভ্যুত্থানের স্থান। চিয়াং কাই-শেক এবং ওয়াং ছিং-ওয়েই-এর প্রতিবিপ্লবকে দমন ও ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবকে চালিয়ে নেবার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই অভ্যুত্থানকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। কমরেড চৌ এন-

শাই, চু ডে, হো লুং এবং ইয়ে তিঙের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজারেরও বেশি সৈন্য এই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে। পরিকল্পনামাফিক অভ্যুত্থানকারী বাহিনী ৫ই আগস্ট নানছাং থেকে প্রত্যাহৃত হয়, কিন্তু কুয়াংতুং প্রদেশের ছাওচৌ ও সোয়াতৌ-এর দিকে অগ্রসরকালে পরাজয় বরণ করে। কমরেড চু তে, চেন ই এবং লিন পিয়াও-এর বাহিনীর একটা অংশ পরবর্তীকালে লড়াই করে ছিংকাং পর্বতমালা পর্যন্ত পথ করে নেয় এবং কমরেড মাও সে-তুঙের পরিচালনাধীন প্রথম শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী বাহিনীর প্রথম ডিভিসনের সাথে যোগ দেয়।

২০। বিখ্যাত শরৎকালীন ফসল অভ্যুত্থান ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে সিউশুই, পিংকিয়াং, পিংকিয়াং কবং লিউয়াং শহরেব জনগণের সশস্ত্র অংশ দ্বারা হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে সংঘটিত হয়। এদের নিয়েই প্রথম শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী বাহিনীর প্রথম ডিভিসন গঠিত হয়। এই বাহিনীকে কমরেড মাও সে-তুঙ ছিংকাং পর্বতমালা পর্যন্ত পরিচালনা করে সেখানে একটা বিপ্লবী ভিত প্রতিষ্ঠা করেন।

২১। এই অধিবেশন ছিল ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে কুইচৌ প্রদেশের সুনাই শহরে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা আয়োজিত পলিটব্যুরোর বর্ধিত অধিবেশন। এই অধিবেশন সর্বশক্তি কেন্দ্রীভূত করে তখনকার নির্ধারক তাৎপর্যসম্পন্ন সামরিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রের ভুলগুলোকে শোধরায়, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে সুবিধাবাদী লাইনের প্রাধান্যের বিলোপসাধন করে এবং প্রধান নেতা হিসেবে কমরেড মাও সে-তুঙের দ্বারা পরিচালিত পার্টিব কেন্দ্রীয় কমিটির নতুন নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। এটা হচ্ছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন।

২২। হান ফু-চ্যু প্রথমে ছিল শানতুং প্রদেশস্থ একজন কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজ। লিউ চি ছিল চিয়াং কাই-শেকের নিজস্ব চক্রের যুদ্ধবাজ। প্রথমে সে হোনান প্রদেশে ছিল, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ বেধে ওঠার পর হোপেই প্রদেশের পাওতিং অঞ্চলের প্রতিরক্ষাব দায়িত্ব ছিল তার ওপরে। যখন জাপানী হামলাকারীরা আক্রমণ করল, তখন তারা উভয়েই বাধা না দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

৪ঠা মে'র আন্দোলন

মে ১৯৩৯

বিশ বছর আগে সংঘটিত ৪ঠা মে'র আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি নতুন স্তর চিহ্নিত করে দিয়েছে। ৪ঠা মে'র আন্দোলন থেকে সাংস্কৃতিক সংস্কারের আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল, যেটা ছিল এই বিপ্লবেরই অন্যতম অভিব্যক্তি। সে সময়ে নতুন সামাজিক শক্তিগুলির উন্মেষ ও বিকাশের সংগে সংগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে একটি শক্তিশালী শিবিরের আবির্ভাব ঘটে। এই শিবিরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল শ্রমিকশ্রেণী, ব্যাপক ছাত্র ও নতুন জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের সমসাময়িককালে শত-সহস্র ছাত্র সাহসের সংগে অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করে। এদিক থেকে ৪ঠা মে'র আন্দোলন ১৯১১ সালের বিপ্লবের চেয়েও একধাপ এগিয়ে গিয়েছিল।

চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রারম্ভিক গঠনকাল থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, এর বিকাশধারার কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে তা পেরিয়ে এসেছে: আফিং যুদ্ধ, তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের যুদ্ধ, ১৮৯৪ সালের চীন-জাপান যুদ্ধ[১], ১৮৯৮-র সংস্কার আন্দোলন[২], ঈ হো তুয়ান আন্দোলন[৩], ১৯১১ সালের বিপ্লব, ৪ঠা মে'র আন্দোলন, উত্তরাভিমুখী অভিযান, এবং কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধ। বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধও এরই আরেকটি পর্যায়, এবং এটি হচ্ছে সবচেয়ে বিরাট, সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও সবচেয়ে গতিশীল পর্যায়। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তবাদের শক্তি মূলগত উৎখাত এবং একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে। আফিং যুদ্ধ থেকে শুরু করে বিপ্লবের বিকাশধারার প্রত্যেকটি স্তরেই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে এই যে, সেগুলি কমিউনিস্ট পার্টির জন্মের আগে না পরে

কমরেড মাও সে-তুঙের এই রচনাটি লেখা হয়েছিল ইয়েনানের সংবাদপত্রগুলির জন্য ৪ঠা মে'র আন্দোলনের বিংশতি বার্ষিকী উপলক্ষে।

সংঘটিত হয়েছে তাই। যাই হোক, সামগ্রিকভাবে, সবগুলি গুরুই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র বহন করছে। এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যই হচ্ছে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থার প্রবর্তন যা চীনের ইতিহাসে অভূতপূর্ব অর্থাৎ এমন একটি গণতান্ত্রিক-সামাজিক ব্যবস্থা যার পূর্বসূরী হল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ (বিগত সহস্র বছরের আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ) এবং যার উত্তরাধিকারী হল সমাজতান্ত্রিক সমাজ। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, কেন প্রথমে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজ এবং তারপর সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্ম কমিউনিস্টরা চেষ্টা করবেন, তবে তার উত্তরে আমাদের বক্তব্য হল: আমরা ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী ধারা অনুসরণ করছি মাত্র।

চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব তার সম্পূর্ণতার জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক শক্তি-সমূহের ওপর নির্ভরশীল। এই সামাজিক শক্তিসমূহ হল শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, বুদ্ধিজীবী এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার প্রগতিশীল অংশ, অর্থাৎ—শ্রমিক-শ্রেণী ও কৃষকদের মৌলিক বিপ্লবী শক্তি হিসেবে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবের নেতৃত্বকারী শ্রেণী হিসেবে নিয়ে বিপ্লবী শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী এবং ব্যবসায়ীরা। আজ এইসব মৌলিক বিপ্লবী শক্তিগুলি ছাড়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আজ বিপ্লবের প্রধান শত্রু হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ও চীনা বিশ্বাসঘাতকরা, এবং বিপ্লবের মৌলিক নীতি হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নীতি, যে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সমাবেশ ঘটেছে জাপ-আক্রমণবিরোধী শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী এবং ব্যবসায়ীদের। প্রতিরোধ-যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়লাভ তখনই ঘটবে, যখন এই যুক্তফ্রন্ট দৃঢ়ভাবে সংগঠিত ও বিকশিত হবে।

চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীরাই সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়েছিল। ১৯১১ সালের বিপ্লব এবং ৪ঠা মে'র আন্দোলনে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এটা দেখা গিয়েছে, এবং ৪ঠা মে'র আন্দোলনের দিনগুলিতে বুদ্ধিজীবীরা ১৯১১ সালের বিপ্লবের সময়ের তুলনায় সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি, তাদের রাজনৈতিক চেতনাও ছিল অনেক বেশি উন্নত। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে কিছুই করতে সক্ষম হবে না। শেষ বিচারে, বিপ্লবী ও অবিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকার পার্থক্য-রেখা হচ্ছে এটাই যে, তারা শ্রমিক-কৃষকদের সংগে একাত্ম হতে চাইছে কি

চাইছে না, এবং প্রকৃতই তারা চেষ্টা করছে কিনা। পরিশেষে, এটাই, এবং শুধুমাত্র এটাই, ভিন্ন গণ-নীতি বা মার্কসবাদে বিশ্বাস করার ঘোষণা নয়, এদের থেকে অন্যদের পার্থক্য নির্ণয় করে। সত্যকারের বিপ্লবী হচ্ছে সে-ই, যে নিজেকে শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হতে ইচ্ছুক, এবং সত্যসত্যই যে তা করছে।

৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর বিশ বছর এবং জাপ-বিরোধী যুদ্ধ শুরু হবার পর দু'বছর পার হয়ে গেল। যুবকদের এবং দেশের সমগ্র সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলির গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রতি বিরাট দায়িত্ব আছে। আমি আশা করি, তাঁরা চীনা বিপ্লবের চরিত্র ও তার পরিচালিকাশক্তিগুলি অনুধাবন করতে পারবেন, তাঁদের কাজ দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের সেবা করবেন, তাদের মধ্যে যাবেন, এবং তাদের মধ্যে প্রচারক ও সংগঠকের কাজ করবেন, জাপানের বিরুদ্ধে সমগ্র জনতা সামিল হলে বিজয় আমাদের হবেই। সমগ্র দেশের যুবকবৃন্দ, উদ্যোগী হয়ে উঠুন!

টীকা

১। কোরিয়া ও চীনকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ করে। বহু চীনা সাধারণ সৈন্য ও কিছু কিছু দেশব্রতী সেনাপতি বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেন কিন্তু প্রতিরোধ-যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যাপারে চিং সরকারের দুর্নীতির দরুণ চীন পরাজিত হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চিং সরকার জাপানের সঙ্গে অত্যন্ত অপমানকর ঘৃণ্য শিমনশেকি চুক্তি করতে বাধ্য হয়।

২। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে এই খণ্ডে প্রকাশিত 'দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে' নামক প্রবন্ধের ১১নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের 'ঈ হো তুয়ান আন্দোলন' ছিল উত্তর চীনের কৃষক ও হস্তশিল্পীদের এক ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সশস্ত্র স্বতঃস্ফূর্ত লড়াই। ধর্ম ও অন্যান্য সূত্রে যোগাযোগ করে গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে তারা ব্যাপক যুদ্ধ চালায়। কিন্তু অত্যন্ত হিংস্র বর্বরতার সঙ্গে এই আন্দোলনকে অবদমিত করা হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, জাপান, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালী ও অস্ট্রিয়া—এই আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সৈন্যবাহিনী পিকিং ও তিয়েনসিন দখল করে।

যুব আন্দোলনের দিক্‌নির্দেশ

৪ঠা মে, ১৯৩৯

৪ঠা মে'র আন্দোলনের আজ বিংশতিতম বার্ষিকী। এই স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য ইয়েনানের সমস্ত যুবক এখানে সমবেত হয়েছেন। অতএব, আমি চীনের যুব আন্দোলনের দিক্‌নির্দেশ সম্পর্কে কয়েকটি সমস্যার ওপর এই উপলক্ষে কিছু বলব। [১]

প্রথমতঃ, ৪ঠা মেকে এখন চীনের যুব-দিবস[২] বলে স্থির করা হয়েছে, এবং এটা খুবই যথার্থ হয়েছে। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর ২০ বছর গত হয়েছে, তবু এ-বছরই মাত্র দিবসটিকে জাতীয় যুব-দিবস হিসেবে স্থির করা হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কারণ এটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব শীঘ্রই এক সন্ধিক্ষণে উপনীত হবে। কয়েক দশক ধরে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব বার বার ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু এখন এই অবস্থা অবশ্যই পরিবর্তিত হবে—এবং এ পরিবর্তন হবে বিজয়ের দিকে, আর একটি পরাজয়ের দিকে নয়। চীনা বিপ্লব এখন সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—জয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অতীতের বারংবার ব্যর্থতা আর সংঘটিত হতে পারে না এবং কোনমতেই তা হতে দেওয়া উচিত হবে না, বরং তাকে জয়ের দিকেই পরিচালিত করতে হবে। কিন্তু এই পরিবর্তন কি ইতিমধ্যেই ঘটেছে? না, তা এখনো ঘটেনি, আমরা এখনো জয়লাভ করিনি। কিন্তু জয়লাভ করা সম্ভব। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমরা পরাজয় থেকে বিজয়ের সন্ধিক্ষণে পৌঁছাবার চেষ্টা করছি। ৪ঠা মে'র আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল, সে সরকার হচ্ছে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার সরকার, সে সরকার সাম্রাজ্যবাদের সংগে যোগসাজস করে জাতীয় স্বার্থকে বিকিয়ে দিয়েছিল এবং জনসাধারণের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল। এরকম একটি সরকারের বিরোধিতা

এই প্রবন্ধটি হচ্ছে ৪ঠা মে'র আন্দোলনের বিংশতিতম বার্ষিকী উপলক্ষে ইয়েনানের যুবকদের আয়োজিত এক সভায় কমরেড মাও সে-তুঙের প্রদত্ত ভাষণ। এই ভাষণে কমরেড মাও সে-তুঙের চীনা বিপ্লবের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মতবাদের বিকশিত রূপ প্রকাশ পাচ্ছে।

করার কি প্রয়োজন ছিল না? যদি তা না থাকে, তাহলে ৪ঠা মে'র আন্দোলন ছিল একটা নিছক ভ্রান্তি। এটা খুবই স্পষ্ট যে, এরকম সরকারের অবশ্যই বিরোধিতা করতে হবে, পতন ঘটাতে হবে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক সরকারের। একটু ভেবে দেখুন, ৪ঠা মে'র আন্দোলনের বহু পূর্বেই ডঃ সান ইয়াৎ-সেন তৎকালীন সরকার-বিরোধী বিদ্রোহী ছিলেন। তিনি ছিং রাজবংশীয় সরকারের বিরোধিতা করেছিলেন এবং তার পতন ঘটিয়েছিলেন। তিনি কি ঠিক করেন নি?—আমার মতে তিনি সম্পূর্ণ ঠিকই করেছিলেন। কারণ যে সরকারের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন, সে সরকার সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করেনি, বরং তার সংগে যোগসাজস করেছিল, এবং তা বিপ্লবী সরকার ছিল না, বরং বিপ্লবকে দাবিয়েই রেখেছিল। ৪ঠা মে'র আন্দোলন জাতীয় বিশ্বাসঘাতক সরকারের বিরোধিতা করেছিল, তাই ৪ঠা মে'র আন্দোলন ছিল বিপ্লবী আন্দোলন। ৪ঠা মে'র আন্দোলনকে সমস্ত চীনা যুবকের এই আলোকেই দেখা উচিত। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে আজ যখন সমগ্র দেশের জনগণ রুখে দাঁড়িয়েছেন, তখন অতীতের বিপ্লবের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে আমরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি;—আর কোন বিশ্বাসঘাতককেই আমরা বরদাস্ত করব না এবং বিপ্লবকে পুনরায় ব্যর্থ হতে দেব না। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া চীনের সমগ্র যুব-সম্প্রদায়ই জেগে উঠেছেন এবং নিশ্চিত জয়লাভের জন্যে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন, এটা ৪ঠা মেকে যুব-দিবস হিসেবে নির্দিষ্ট করার মধ্যেই প্রতিফলিত হচ্ছে। আমরা বিজয়ের পথ বেয়ে অগ্রসর হচ্ছি এবং দেশের সমস্ত জনসাধারণ যদি একত্রে প্রচেষ্টা চালান, তাহলে চীনা বিপ্লব অবশ্যই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের ভেতর দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ, চীনা বিপ্লব কিসের বিরুদ্ধে পরিচালিত? বিপ্লবের লক্ষ্যবস্তু কি? সকলেই জানেন, একটি লক্ষ্য হল সাম্রাজ্যবাদ, অপরটি সামন্তবাদ। বর্তমানে বিপ্লবের লক্ষ্যবস্তু কি? একটি হল জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, এবং অন্যটি চীনা আপোষকামী। বিপ্লব সম্পাদন করার জন্য অবশ্যই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং চীনা দেশদ্রোহীদের পতন ঘটাতে হবে। বিপ্লবের স্রষ্টা কারা? এর প্রধান শক্তি কি? চীনের সাধারণ মানুষ। বিপ্লবের পরিচালিকাশক্তি হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণী, কৃষকসাধারণ এবং অন্যান্য শ্রেণীর সেই সমস্ত সদস্য যারা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক। এগুলোই হল সাম্রাজ্য-

দ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শক্তি। কিন্তু এসবের মধ্যে বিপ্লবের মূল শক্তি ও মেরুদণ্ড কারা? তাঁরা হচ্ছেন শ্রমিক এবং কৃষক, যাঁরা দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ। চীনা বিপ্লবের প্রকৃতি কি? কি ধরনের বিপ্লব আজ আমরা সম্পাদন করছি? আজ আমরা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন করছি, এবং এর আওতার বাইরে যায় এমন কিছুই আমরা করছি না সাধারণভাবে বুর্জোয়াদের ব্যক্তিগত মালিকানা-ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা বর্তমানে আমাদের উচিত নয়, আমাদের যা ধ্বংস করা উচিত তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলতে আমরা এটাই বোঝাই। কিন্তু এর সমাপ্তি ইতিমধ্যেই বুর্জোয়াদের সামর্থ্যের বাইরে চলে গেছে এবং সর্বহারাশ্রেণী ও ব্যাপক জনগণের প্রচেষ্টার ওপরই তা নির্ভরশীল। এ বিপ্লবের উদ্দেশ্য কি? এর উদ্দেশ্য হল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের পতন ঘটানো এবং জনগণের একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। এই ধরনের জনগণের গণতান্ত্রিক 'প্রজাতন্ত্রের অর্থ হল বিপ্লবী তিন-গণনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র। এটা বর্তমানের আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে ভিন্ন হবে এবং ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকেও ভিন্ন হবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের কোন স্থান নেই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাদের অস্তিত্বকে টিঁকে থাকতে দিতে হবে। চীনে কি পুঁজিপতিদের জন্য সর্বদাই স্থান থাকবে? না ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই থাকবে না? কেবলমাত্র চীনের বেলায়ই নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীর জন্যেই এটা সত্য। ভবিষ্যতে কোন দেশেই—সে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানি অথবা ইতালী যে দেশেই হোক না কেন, পুঁজিপতিদের কোন স্থানই থাকবে না। চীনেও এর ব্যতিক্রম হবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নই এমন একটি দেশ, যে দেশে ইতিপূর্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে সমগ্র বিশ্ব এর দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করবে। চীন ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সমাজতন্ত্রে বিকাশলাভ করবে; এ বিধানকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করা আমাদের কাজ নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করা, চীনের বর্তমান আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার পরিবর্তন করা ও জনগণের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কাজ। সমগ্র দেশের যুবকদের এর জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

৷ তৃতীয়তঃ, চীনা বিপ্লবে অতীতের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা ক ? এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যা আমাদের যুবকদের উপলব্ধি করতে হবে। সূক্ষ্ম বিচারে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ডঃ সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক সূচিত হয়েছে এবং ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসছে। চীনের বিরুদ্ধে বিদেশী পুঁজিবাদী আক্রমণ সম্পর্কে বলা যায়, এটা প্রায় ১০০ বছর ধরে চলছে। বিগত ১০০ বছর ধরে চীনের সংগ্রাম—প্রথমে ব্রিটিশ আক্রমণের বিরুদ্ধে আফিং যুদ্ধ, তারপরে তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের যুদ্ধ, তারপর ১৮৯৪ সালের চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলন, ঈ হো তুয়ান আন্দোলন, ১৯১১ সালের বিপ্লব, ৪ঠা মে'র আন্দোলন, উত্তর অভিযান এবং লালফৌজ কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধ—যদিও এ-সমস্ত সংগ্রাম একে অপর থেকে পৃথক, তবুও তাদের অভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শত্রুদের প্রতিরোধ করা অথবা প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তন করা। কিন্তু কেবলমাত্র ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের সময় থেকেই একটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট রূপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরু হয়েছে। বিগত ৫০ বছরে ডঃ সান ইয়াৎ সেন কর্তৃক সূচিত বিপ্লবে সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই ই ছিল। আপনারা দেখুন, ১৯১১ সালের বিপ্লব সম্রাটকে তাড়িয়ে দিয়েছে,—এটা কি একটা সাফল্য নয় ? তবুও এই অর্থে এটা ব্যর্থ যে, ১৯১১ সালের বিপ্লব সম্রাটকে তাড়িয়ে দিলেও চীন আগের মতোই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের অত্যাচারের কবলে থেকে যায় আর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লবী কর্তব্য অসম্পন্ন থেকে যায়। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের লক্ষ্য কি ছিল ? এরও লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে উৎখাত করা, কিন্তু এটাও বিফল হয়েছিল। চীন আগের মতো সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের শাসনাধীনেই থেকে যায়। উত্তর অভিযানের বিপ্লবও তাই। এই বিপ্লব সফলতাও অর্জন করেছে, আবার ব্যর্থও হয়েছে। কুওমিনতাঙ যে সময় থেকে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে যায়[২], তখন থেকেই চীন আবার সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের প্রভুত্বের অধীনে পতিত হয়। লালফৌজ কর্তৃক দশ বছর যুদ্ধ চালনা তারই অনিবার্য ফল। কিন্তু এ দশ বছরের সংগ্রামও কেবলমাত্র চীনের অংশবিশেষে বিপ্লবী কর্তব্য সম্পাদন করেছে, সমগ্র দেশের নয়। আমরা যদি বিগত কয়েক দশকের বিপ্লবের সারসংকলন করি, তাহলে আমরা বলতে পারি যে, তা অস্থায়ী এবং আংশিক বিজয়লাভ করেছিল, কিন্তু স্থায়ী ও দেশব্যাপী বিজয়লাভ করেনি। ডঃ সান ইয়াৎ-সেন যেমন

বলেছিলেন, ঠিক তেমনি 'বিপ্লব এখনো সাফল্যমণ্ডিত হয়নি, কমরেডদের অবশ্যই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।' এখন প্রশ্ন হল: কয়েকদশক ধরে সংগ্রামের পরেও কেন এখনো চীনা বিপ্লব তাঁর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছায়নি? কারণগুলো কি? আমি মনে করি, তার দুটি কারণ রয়েছে—প্রথমতঃ, শত্রুর শক্তি ছিল খুবই প্রবল; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের নিজস্ব শক্তি ছিল খুবই দুর্বল। যেহেতু একপক্ষ সবল এবং অপরপক্ষ দুর্বল ছিল, তাই বিপ্লব সফল হয়নি। শত্রুর শক্তি খুবই প্রবল—এ কথা বলে আমরা এটাই বোঝাই যে, সাম্রাজ্যবাদ (যা প্রধান) ও সামন্তবাদের শক্তি খুবই প্রবল ছিল। আমদের নিজস্ব শক্তি খুবই দুর্বল ছিল—এ কথা বলে আমরা এই অর্থ করি যে, সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের শক্তি দুর্বল ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্বলতা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থতা প্রধানতঃ এই কারণে যে, শ্রমিক-কৃষক—মেহনতী জনসাধারণ, যাঁরা দেশের শতকরা ৯০ জন, তাঁরা এখনো সমাবিষ্ট হননি। যদি বিগত কয়েক দশকের বিপ্লবের সারসংকলন করি, তাহলে আমরা বলতে পারি যে, দেশব্যাপী জনসাধারণকে পুরোপুরিভাবে সমাবিষ্ট করা হয়নি এবং প্রতি-ক্রিয়াশীলরা সর্বদাই এরকম সমাবেশের বিরোধিতা এবং ক্ষতিসাধন করেছে। সমগ্র দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন শ্রমিক ও কৃষকসাধারণকে সমাবিষ্ট ও সংগঠিত করেই কেবল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের উচ্ছেদ করা সম্ভব। ডঃ সান ইয়াৎ-সেন তাঁর শেষ ঘোষণাপত্রে বলেছেন:

> চীনের জন্যে স্বাধীনতা এবং সমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ৪০ বছর ধরে আমি নিজেকে জাতীয় বিপ্লবের কাজে নিয়োজিত রেখেছি। এই ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা আমাকে গভীরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনসাধারণকে জাগাতে হবে এবং পৃথিবীর সেই সব জাতির সংগে সাধারণ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যারা আমাদেরকে সমকক্ষ বলে গণ্য করে।

আজ দশ বছরেরও বেশি হয়েছে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন মারা গেছেন, যদি এ বছরগুলোকে আমরা সেই ৪০ বছরের সংগে যোগ দিই তাহলে মোট ৫০ বছরেরও বেশি হয়। এই বছরগুলোতে বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা কি? মূলতঃ এটা হল 'জনসাধারণের জাগরণ'। আপনাদের এই পাঠ ভাল করে অধ্যয়ন করা উচিত এবং সমগ্র দেশের যুবকদেরও তাই করা উচিত। তাঁদের

অবশ্যই জানতে হবে যে, যাঁরা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন কেবলমাত্র সেই ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণকে সমাবিষ্ট করেই আমরা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে পরাজিত করতে পারি। যদি না আমরা সমগ্র দেশের ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণকে সমাবিষ্ট করি তাহলে জাপানকে পরাজিত করা এবং এক নয়া চীন গড়ে তোলা অসম্ভব হবে।

চতুর্থতঃ, যুব আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করা যাক। ২০ বছর আগে আজকের এই দিনে ৪ঠা মে'র আন্দোলন নামে খ্যাত মহান্ ঐতিহাসিক ঘটনা চীনেই সংঘটিত হয়েছিল। ছাত্ররা এতে অংশ নিয়েছিলেন। এটা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের সময় থেকে চীনের যুবকরা কি ভূমিকা গ্রহণ করে আসছেন? একভাবে তাঁরা অগ্রবাহিনীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এই কথা গোঁড়া লোকেরা ছাড়া সমগ্র দেশের জনগণই স্বীকার করেন। অগ্রবাহিনীর ভূমিকার অর্থ কি? এর অর্থ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা, অর্থাৎ বিপ্লবী দলের পুরোভাগে দাঁড়ানো। চীনা জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্তবাদ-বিরোধী দলগুলোর মধ্যে দেশের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের ও ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত একটি বাহিনী রয়েছে। এটি একটি বৃহৎ আকারের বাহিনী, এবং যাঁরা প্রাণত্যাগ করেছেন তাঁদের সংখ্যা বাদ দিলেও বর্তমানে এদের সংখ্যা কয়েক মিলিয়ন। কয়েক মিলিয়নের এই বাহিনী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে অন্যতম ফ্রন্টের বাহিনী এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীও বটে। কিন্তু শুধু এই বাহিনীই যথেষ্ট নয়। শুধুমাত্র এর ওপর নির্ভর করেই আমরা শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করতে পারব না। কারণ এটা প্রধান বাহিনী নয়। তাহলে, প্রধান বাহিনী কারা? ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণ। চীনের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের এবং ছাত্রদের অবশ্যই শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের মধ্যে যেতে হবে এবং সমগ্র দেশের জনসংখ্যার যারা শতকরা ৯০ ভাগ সেই শ্রমিক ও কৃষকসাধারণকে সমাবিষ্ট ও সংগঠিত করতে হবে। শ্রমিক ও কৃষকদের এই প্রধান বাহিনী ব্যতীত কেবলমাত্র তরুণ বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রদের বাহিনীর ওপর নির্ভর করেই আমরা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ করতে পারব না। অতএব, দেশব্যাপী তরুণ বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের অবশ্যই ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের সংগে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং তাঁদের সংগে একাত্ম হতে হবে। কেবলমাত্র তাহলেই একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করা যেতে

পারে। কোটি কোটি লোকের একটি বাহিনী! কেবলমাত্র এই বিশাল বাহিনীর দ্বারাই শত্রুর দৃঢ় ঘাঁটিগুলো দখল করা যেতে পারে এবং সর্বশেষ দুর্গগুলো বিধ্বস্ত করা যেতে পারে। অতীতের যুব আন্দোলনকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে তার একটি ভুল প্রবণতা দেখিয়ে দেওয়া উচিত। বিগত কয়েক দশকের যুব আন্দোলনে যুবকদের একাংশ শ্রমিক ও কৃষক-সাধারণের সংগে ঐক্যবদ্ধ হতে অনিচ্ছুক ছিল এবং তারা শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। এটা ছিল যুব আন্দোলনের জোয়ারে একটি প্রতিকূল স্রোত। তারা সমগ্র দেশের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ নিয়ে গঠিত ব্যাপক শ্রমিক-কৃষকসাধারণের সংগে ঐক্যবদ্ধ হতে অস্বীকার করেছে এবং মূলতঃ তাঁদের বিরোধিতা করেছে; বস্তুতঃ, তারা বুদ্ধিমানের কাজ করেনি। এটা কি একটা ভাল প্রবণতা? আমি মনে করি, না; কারণ শ্রমিক ও কৃষকদের বিরোধিতা করে তারা প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবেরই বিরোধিতা করছে। সেজন্যেই আমি বলি যে, যুব আন্দোলনের মধ্যে এটা একটা প্রতিকূল স্রোত। ঐরকম যুব আন্দোলন কোন ভাল ফলই আনতে পারে না। কিছুদিন পূর্বে আমি একটি ছোট নিবন্ধ রচনা করেছিলাম, যার মধ্যে আমি লিখেছিলাম:

> বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ও অবিপ্লবী বুদ্ধিজীবী বা প্রতিবিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চূড়ান্ত প্রভেদরেখা হল এই যে, তারা শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের সংগে এক হতে ইচ্ছুক কিনা এবং প্রকৃতই তা করে কিনা, তা দেখা।

এখানে আমি একটি মানদণ্ড উপস্থাপিত করেছি, এবং এটিকেই আমি একমাত্র মানদণ্ড বলে মনে করি। একজন যুবক বিপ্লবী কিনা, তা বিচার করতে কি রকম মানদণ্ড প্রয়োগ করা উচিত? কেমন করে পার্থক্য করা যায়? কেবল একটিমাত্র মানদণ্ড আছে, তা হচ্ছে সে নিজেকে ব্যাপক শ্রমিক-কৃষকসাধারণের সংগে মিশিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক কিনা, এবং বাস্তবে তা করছে কিনা। যদি সে এমন করতে ইচ্ছুক থাকে এবং বাস্তবে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগে মিশে যায়, তাহলে সে একজন বিপ্লবী; অন্যথায়, সে অবিপ্লবী অথবা প্রতিবিপ্লবী। যদি আজ সে নিজেকে শ্রমিক-কৃষকসাধারণের সংগে মিশিয়ে ফেলে, তাহলে আজই সে বিপ্লবী; কিন্তু আগামীকাল যদি সে তাঁদের সংগে না মেশে অথবা উল্টো-দিকে সাধারণ জনগণকে অত্যাচার করে, তাহলে সে হবে অবিপ্লবী বা প্রতি-বিপ্লবী। কিছু কিছু যুবক তিন-গণনীতিতে অথবা মার্কসবাদে তাঁদের বিশ্বাসের

কথা পঞ্চমুখে বলে থাকেন। কিন্তু এর দ্বারা কোন কিছু প্রমাণ হয় না। আপনারা দেখুন, হিটলারও কি এ কথা বলত না যে, সে 'সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী'? ২০ বছর পূর্বে এমনকি মুসোলিনীও একজন 'সমাজতন্ত্রী' ছিল। তাদের 'সমাজতন্ত্র' আসলে কি ছিল? ফ্যাসিবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়! চেন তু-সিউ কি একদা মার্কসবাদে 'বিশ্বাস' করত না? পরে সে কি করেছিল? সে প্রতিবিপ্লবের পক্ষে চলে গিয়েছিল। চ্যাং কুও-তাও'ও কি মার্কসবাদে 'বিশ্বাস' করত না? সে এখন কোথায়? সে পালিয়ে গেছে এবং নিমজ্জিত হয়েছে। কিছু লোক নিজেদের 'তিন-গণনীতির অনুসরণকারী' বলে এবং এই নীতির প্রবীণ সমর্থক বলেও অভিহিত করে; কিন্তু তারা কি করেছে? আসলে তাদের জাতীয়তাবাদের নীতির অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদের সংগে যোগসাজস করা; তাদের গণতন্ত্রের নীতির অর্থ সাধারণ জনগণকে অত্যাচার করা এবং তাদের জনকল্যাণের নীতির অর্থ যতবেশি সম্ভব সাধারণ জনগণের রক্ত শোষণ করা। তারা হল সেই ধরনের লোক, যারা মুখে তিন-গণনীতির ভক্ত, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাকে অস্বীকার করে সুতরাং, আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে বিচার করে দেখি, তিন গণনীতির সে আসল অনুসরণকারী না নকল অনুসরণকারী, সে প্রকৃত মার্কসবাদী না মেকী মার্কসবাদী, তখন আমাদের শুধু খুঁজে দেখা দরকার, ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের সংগে তার সম্পর্ক কি রকমের। এবং এটা বিচার করলেই তার সম্পর্কে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে উঠবে। পার্থক্য করার জন্য এটাই একমাত্র মানদণ্ড, এ ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি আশা করি, সারা দেশের যুবকগণ এই কথা মনে রাখবেন যে, তাঁরা যেন কোনমতেই অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রতিকূল স্রোতের মধ্যে পড়ে না যান, তাঁরা যেন শ্রমিক ও কৃষকদের তাঁদের বন্ধু বলে পরিষ্কারভাবে বোঝেন এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হন।

পঞ্চমতঃ, বর্তমানের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চীনা বিপ্লবের একটি নতুন পর্যায় এবং একটি সবচেয়ে উদ্দীপ্ত ও সবচেয়ে প্রাণবন্ত নতুন পর্যায়। এই পর্যায়ে যুব সম্প্রদায় গুরুতর দায়িত্ব বহন করেন। কয়েক দশক ধরে আমাদের বিপ্লবী আন্দোলন কঠোর সংগ্রামের বিবিধ পর্যায়ের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু বর্তমানের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের মতো এটা কোনদিনই এত ব্যাপক ছিল না। যখন আমরা মনে করি যে, বর্তমানের চীনা বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য অতীতের বিপ্লব থেকে ভিন্ন এবং তা ব্যর্থতা থেকেই বিজয়ের দিকে ধাবিত

হবে, তখন আমরা এটাই বোঝাই যে চীনের ব্যাপক জনগণ অগ্রগতি লাভ করেছেন। যুবকদের অগ্রগতি তার একটি স্পষ্ট প্রমাণ। অতএব, এবারকার জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ নিশ্চয়ই সফল হবে, অবশ্যই হবে। সকলেই জানে যে, এই যুদ্ধের মৌলিক নীতি হল জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট— যার উদ্দেশ্য হল জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা আপোষকামীদের পতন ঘটানো, পুরানো চীনকে নয়া চীনে রূপান্তরিত করা এবং সমগ্র জাতিকে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে মুক্ত করা। বর্তমানে চীনের যুব-আন্দোলনে ঐক্যের অভাব একটা সাংঘাতিক ত্রুটি। আপনাদের একতার জন্য অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালানো উচিত, কারণ একতাই বল। আপনারা অবশ্যই ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন, যাতে করে সমস্ত দেশের যুবকগণ বর্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে, ঐক্য স্থাপন করতে এবং জাপানকে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করতে পারেন।

ষষ্ঠতঃ, এবং সবশেষে, আমি বলতে চাই ইয়েনানের যুব আন্দোলন সম্পর্কে। দেশব্যাপী যুব আন্দোলনের এটাই হল আদর্শ। ইয়েনানের যুব আন্দোলনের দিক্‌নির্দেশই হচ্ছে সমগ্র দেশের যুব আন্দোলনের দিক্‌নির্দেশ। কেন? কারণ এটাই ছিল নির্ভুল। আপনারা দেখুন, ইয়েনানের যুবকগণ শুধু যে তাঁদের একতার কাজই করেছেন তা নয়, উপরন্তু ভালভাবেই করেছেন। ইয়েনানের যুবকগণ সংহতি এবং ঐক্য অর্জন করেছেন। ইয়েনানের তরুণ বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র, তরুণ শ্রমিক ও কৃষক সকলেই ঐক্যবদ্ধ। দেশের সমস্ত স্থান থেকেই, এমন কি সুদূর প্রবাসী চীনা সমাজ থেকেও বিপুল সংখ্যক বিপ্লবী যুবক অধ্যয়ন করতে ইয়েনানে এসেছেন। আজ এই সভায় যোগদানের জন্য আপনাদের অনেকেই হাজার মাইল দূর থেকে এসেছেন। আপনার ডাকনাম চ্যাং বা লি যা-ই হোক না কেন, আপনি পুরুষ বা মহিলা, শ্রমিক বা কৃষক যা-ই হোন না কেন, আপনারা সকলেই এক মতের। সমগ্র দেশের জন্য এটা কি একটা আদর্শরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত নয়? ইয়েনানের যুবকগণ তাঁদের নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়াও তাঁদের নিজেদেরকে শ্রমিক ও কৃষক-সাধারণের সংগে এক করে ফেলেছেন এবং এটাই আপনাদেরকে আরও বেশি করে সমগ্র দেশের জন্য আদর্শ করে তুলেছে। ইয়েনানের যুবকগণ কি করছেন? তাঁরা বিপ্লবের তত্ত্ব শিক্ষা করছেন এবং জাপানকে প্রতিরোধ ও দেশকে রক্ষা করার নীতি ও পন্থা অধ্যয়ন করছেন। তাঁরা উৎপাদনের জন্য আন্দোলন

চালাচ্ছেন এবং হাজার হাজার মু পতিত জমি আবাদ করেছেন। পতিত জমি আবাদ কিংবা জমি চাষের মতো কাজ কনফুসিয়াসও কখনোই করেননি। তিনি যখন বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন, তখন তাঁর ছাত্রও কম ছিল না। "৭০ জন গুণবান ব্যক্তি এবং তিন সহস্র শিষ্য' কতই-না জাঁকজমকপূর্ণ বিদ্যালয়! কিন্তু ইয়েনানের ছাত্রসংখ্যার তুলনায় তাঁর ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই অল্প। অধিকন্তু তারা উৎপাদন আন্দোলন অপছন্দ করত। যখন একজন ছাত্র তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, কিভাবে জমিতে লাঙ্গল চালাতে হয়, কনফুসিয়াস উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি জানি না, সে বিষয়ে আমি একজন কৃষকের মতো দক্ষ নই।' তার পরই কনফুসিয়াসকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তরিতরকারী কিভাবে উৎপাদন করা হয়, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি জানি না, একজন মালীর মতো সে বিষয়ে আমি দক্ষ নই।' প্রাচীনকালে চীনের যুবকেরা যারা কোন ঋষির অধীনে অধ্যয়ন করত, তারা না শিখত কোন বিপ্লবী তত্ত্ব, না অংশগ্রহণ করত শ্রমে। আজকাল সমগ্র দেশের বিশাল অঞ্চলের বিদ্যালয়-সমূহে বিপ্লবী তত্ত্বের শিক্ষা কম দেওয়া হয়, আর উৎপাদন আন্দোলনের তো কোন বিষয়ই নেই। শুধুমাত্র ইয়েনানের যুবকেরা এবং শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকাগুলোর যুবকেরা মূলতঃ ভিন্ন, জাপানকে প্রতিরোধ করতে.এবং দেশকে রক্ষা করতে তাঁরা প্রকৃতই অগ্রবাহিনী। কারণ, তাঁদের রাজনৈতিক দিক্‌নির্দেশ ও কর্মপদ্ধতি নির্ভুল। সে-কারণেই আমি বলি যে, ইয়েনানের যুব আন্দোলন সমগ্র দেশের যুব আন্দোলনের জন্য আদর্শস্বরূপ।

আমাদের আজকের সভা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা সবই বলেছি। আমি আশা করি, আপনারা বিগত পঞ্চাশ বছরের চীনা বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন করবেন, এর ভাল দিককে বিকশিত করবেন ও এর ভুল দিককে বর্জন করবেন, এর ফলশ্রুতিতে সমগ্র দেশের জনগণের সংগে সমগ্র দেশের যুবকেরা একত্রিত হবেন এবং বিপ্লব ব্যর্থতা থেকে বিজয়ের দিকে মোড় নেবে। যেদিন সমগ্র দেশের যুবকগণ ও সমগ্র দেশের জনগণ উদ্বুদ্ধ হবেন, সংগঠিত হবেন এবং ঐক্যবদ্ধ হবেন সে-দিনই জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটবে। প্রত্যেক যুবককে অবশ্যই এই দায়িত্ব বহন করতে হবে। প্রত্যেক যুবককে অবশ্যই পূর্বের থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে এবং সমগ্র দেশের যুবকদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, সমগ্র দেশের জনগণকে সংগঠিত করার জন্য, জাপানী

সাম্রাজ্যবাদকে উল্টে দেবার জন্য এবং পুরানো চীনকে নয়া চীনে রূপান্তরিত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। আপনাদের সকলের কাছে এটাই আমি প্রত্যাশা করি।

টীকা

১। সর্বপ্রথমে শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের যুব-সংগঠনের দ্বারা ৪ঠা মেকে চীনা যুব-দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে সময়ে ব্যাপক যুবসাধারণের দেশপ্রেমী উত্তাল জোয়ারের চাপে কুওমিনতাঙও বাধ্য হয়ে এটা স্বীকার করেছিল। কিন্তু পাছে যুবকরা বিপ্লবী হয়ে ওঠে এই ভয়ে কুওমিনতাঙ এই সিদ্ধান্তটিকে খুব বিপজ্জনক বলে মনে করল, তাই পরে তার পরিবর্তে ২৯শে মার্চ তারিখকে (১৯১১ সালের ক্যাণ্টনের অভ্যুত্থানে শহীদ ও পরে ক্যাণ্টনের উপকণ্ঠে হুয়াংহুয়াকাং নামক স্থানে সমাধিস্থ বিপ্লবী শহীদদের স্মৃতি দিবস) যুব-দিবস হিসেবে স্থির করল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় ৪ঠা মে যুব-দিবস পালন অব্যাহত থাকে। আর চীন গণ-প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর কেন্দ্রীয় গণ-সরকারের প্রশাসন পরিষদ ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ৪ঠা মেকে চীনা যুব-দিবস হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে।

২। এখানে ১৯২৭ সালের চিয়াং কাই-শেকের দ্বারা শাংহাই ও নানকিংয়ে আর ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের দ্বারা উহানে সংঘটিত প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের কথা বলা হয়েছে।

৩। জমির পরিমাপের একক (চীনে প্রচলিত)। এক মু—প্রায় দশ কাঠা।

আত্মসমর্পণবাদী কার্যকলাপের বিরোধিতা করুন

৩০শে জুন, ১৯৩৯

চীনা জাতি জাপানী আক্রমণের সম্মুখীন হবার পর থেকেই, যুদ্ধ করা হবে কি হবে না এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা থেকে ১৯৩৭-এর ৭ই জুলাই তারিখের লুকৌচিয়াও ঘটনার সময় পর্যন্ত এই প্রশ্নটি গুরুতর বিতর্ক জাগিয়ে তুলেছিল। অবশেষে সমস্ত দেশপ্রেমিক দল ও গ্রুপ এবং সমস্ত দেশপ্রেমিক জনসাধারণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে: 'বাঁচতে হলে যুদ্ধ করতে হবে আর যুদ্ধ না করলে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে।' আর সমস্ত আত্মসমর্পণবাদীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে: 'যুদ্ধ করলেই ধ্বংস হয়ে যেতে হবে, বাঁচতে হলে যুদ্ধ করা চলবে না।' তখনকার মতো লুকৌচিয়াও'র প্রতিরোধের কামান গর্জন বিতর্কের সমাধান করে দিয়েছিল। সেটা এ কথাই ঘোষণা করে দিয়েছিল যে, প্রথম সিদ্ধান্তটাই ছিল সঠিক, আর দ্বিতীয়টা ছিল ভুল। কিন্তু কেন প্রশ্নটির সমাধান সাময়িক হয়েছিল সব সময়ের জন্য নয়? কারণ জাপ-সাম্রাজ্যবাদ আত্মসমর্পণের পথে চীনকে ঠেলে দেবার কর্মনীতি গ্রহণ করতেই আন্তর্জাতিক আত্মসমর্পণবাদীরা[১] একটা আপোষের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল, এবং আমাদের জাপ বিরোধী ফ্রন্টের মধ্যেকার কিছু লোকও দোদুল্যমানতা দেখাতে শুরু করল। এখন এই প্রশ্নটিই আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, এবং একটু ভিন্ন ভাষায় প্রশ্নটি তোলা হচ্ছে: 'যুদ্ধ, না শান্তি'—এই প্রশ্ন হিসেবে। ফলতঃ, চীনে যাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান ও যারা শান্তি চায়, তাদের মধ্যে একটা মতান্তর দেখা দিয়েছে। তাদের পারস্পরিক অবস্থান কিন্তু একই থেকে গেছে। যাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান, তাঁদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে: 'যুদ্ধই হচ্ছে বাঁচার পথ, শান্তি মানেই ধ্বংস।' আর শান্তিগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত হচ্ছে: 'শান্তিই হচ্ছে বাঁচার পথ, যুদ্ধ মানেই ধ্বংস।' প্রথম দলে আছেন সমস্ত দেশপ্রেমিক দল ও ব্যক্তি, এবং তাঁরাই দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। আর পরের দলে, অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারীদের দলে আছে জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের মধ্যেকার অল্প-সংখ্যক সংখ্যালঘিষ্ঠ দোদুল্যমানেরা। ফলে, শান্তিকামীদের মিথ্যা প্রচারের

আশ্রয় নিতে হচ্ছে, এবং বিশেষ করে কমিউনিস্ট-বিরোধী অপপ্রচার শুরু করতে হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এরা মনগড়া মিথ্যা সংবাদ, মিথ্যা রিপোর্ট মিথ্যা দলিল ও মিথ্যা প্রস্তাব বিতরণ করতে শুরু করেছে, যেমন: 'কমিউনিস্ট পার্টি বিভেদমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত', 'অষ্টম রুট ও নয়া চতুর্থ বাহিনী নির্দেশ অমান্য করে যুদ্ধ না করে ঘুরে বেড়াচ্ছে', শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তৈরী হয়েছে, এবং সীমানা প্রসারিত করে তা এগিয়ে চলেছে', 'কমিউনিস্ট পার্টি ষড়যন্ত্র করছে সরকারকে উৎখাত করার জন্য', এবং এমনকি 'সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছে।' এ সবকিছুর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সত্য ঘটনাসমূহকে আড়াল করে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করে এরা শান্তির পথ প্রশস্ত করতে চাইছে, অর্থাৎ চাইছে আত্মসমর্পণ করতে। এই শান্তিগ্রুপটি, আত্মসমর্পণকারীদের এই উপদলটি এইসব কাজ করছে একারণেই যে, যুক্তফ্রন্টের উদ্যোক্তা ও উদগাতা কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ না করলে তারা কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতায় ভাঙন ধরাতে পারছে না, জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টে বিভেদ আনতে পারছে না, এবং জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করাতে পারছে না। দ্বিতীয়তঃ, এই গ্রুপটির আশা যে, জাপ সাম্রাজ্যবাদ কিছু সুবিধে দেবে। তারা বিশ্বাস করে যে, জাপান খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং সে তার মূল কৌশলের পরিবর্তন করে মধ্য, দক্ষিণ ও এমনকি, উত্তর চীন থেকেও নিজেই সরে আসবে, এবং সেই কারণে চীন আর বিশেষ যুদ্ধ না চালিয়েও বিজয় অর্জন করতে পারবে। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক চাপের ওপর তারা আস্থা স্থাপন করেছে। এই শান্তিগ্রুপের বহু লোক আশা করছে যে, জাপান যাতে কিছু সুবিধে দেবার কথা ঘোষণা করে এবং শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি হয় তার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলি শুধুমাত্র জাপানের ওপরেই চাপ দেবে না, উপরন্তু চীন সরকারের ওপরেও চাপ দেবে, যাতে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়াসী গ্রুপটিকে বলতে পারে: 'দেখ! বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আমাদের শান্তির পথই গ্রহণ করতে হবে!' এবং 'একটা আন্তর্জাতিক প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলন[২] চীনাদের পক্ষে সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। এটা অবশ্যই আর-একটা মিউনিক[৩] হবে না, হবে চীনের নবীন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠার পদক্ষেপ!' এই হচ্ছে শান্তিপ্রয়াসী গ্রুপটির, অর্থাৎ চীনা আত্মসমর্পণকারীদের বক্তব্য, রণকৌশল ও পরিকল্পনা। এই নাটকটি ওয়াং চিং-ওয়েই নিজেই যে শুধু মঞ্চস্থ করছে তা নয়, সব থেকে আশঙ্কার কথা হচ্ছে

এই যে, জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের আড়ালে থেকে তার মতন অনেকেই ওয়াঙের সংগে সহযোগিতা করেছে, একই মঞ্চে বা বৈতসঙ্গীতে[4] কণ্ঠ মেলাচ্ছে, তাদের কেউ কেউ নামছে সাদা রং গায়ে-মুখে মেখে দুর্জনের ভূমিকায়, আর কেউ কেউ নামছে লাল রং মেখে বীরের ভূমিকায়।

আমরা কমিউনিস্টরা খোলাখুলিই ঘোষণা করছি যে, আমরা সবসময়েই যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী, এবং যারা শান্তির প্রয়াসী আমরা তাদের ঘোরতর বিরোধী। আমাদের একটিমাত্র বাসনাই আছে এবং তা হচ্ছে এই যে, অন্য সমস্ত দেশপ্রেমিক পার্টি ও ব্যক্তিদের সংগে আমাদের ঐক্যকে শক্তিশালী করে তোলা, জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে আরও শক্তিশালী করে তোলা, কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতাটিকে আরও দৃঢ় করে তোলা, তিন গণ-নীতি কার্যকরী করা, শেষপর্যন্ত প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, ইয়ালু নদী পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে গিয়ে আমাদের সমস্ত অধিকৃত অঞ্চলকে[5] পুনরুদ্ধার করা। প্রকাশ্য ও ছদ্মবেশী সমস্ত ওয়াং চিং-ওয়েইদেরই আমরা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নিন্দা করছি—যারা কমিউনিস্ট-বিরোধী আবহাওয়া সৃষ্টি করছে, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে 'সংঘর্ষ'[6] বাঁধাচ্ছে, এমন কি এই দুই পার্টির মধ্যে আবার একটা গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেবার পযন্ত চেষ্টা করছে। এদের উদ্দেশ্যে আমরা বলছি: তোমাদের বিভেদ সৃষ্টির পরিকল্পনা মূলতঃ আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং তোমাদের এই বিভেদ সৃষ্টির ও আত্মসমর্পণের কৌশলটি যে তোমাদের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি স্বার্থের প্রয়োজনে সমস্ত জাতির স্বার্থকে বিক্রি করে দেবার সাধারণ পরিকল্পনা, তা অত্যন্ত নগ্নভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে। জনসাধারণ অন্ধ নয়, তোমাদের এই ষড়যন্ত্র তারা ধরে ফেলবে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনটি প্রাচ্যের মিউনিক হবে না বলে তোমরা যে বক্তব্য ছেড়েছ, তা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। তথাকথিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনটি যে প্রাচ্যের মিউনিক হতে যাচ্ছে, এবং তা যে চীনদেশকে আর একটা চেকোস্লোভাকিয়ায় পরিণত করার প্রস্তুতি-পর্ব মাত্র সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। জাপ-সাম্রাজ্যবাদ যে আবার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে এবং তারা সুবিধে ঘোষণা করতে পারে—এই ভিত্তিহীন দাবিরও দৃঢ় বিরোধিতা আমরা করছি। সমগ্র চীনকে পরাধীন করার মূল পরিকল্পনার কোন পরিবর্তন জাপ-সাম্রাজ্যবাদ কখনই করবে না। উহাদের পতনের পর জাপানের মধু-মাখা কথাবার্তা—যেমন,

'আলাপ-আলোচনার সময় জাতীয় সরকারকে বিরোধী দল হিসেবে গ্রহণ না করার'[৭] পূর্বনীতিটি এখন পরিত্যক্ত হবে এবং তার পরিবর্তে তাকে স্বীকার করে নেওয়া হবে, কিংবা কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তে মধ্য ও দক্ষিণ চীন থেকে জাপান তার সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেবে—এসব হচ্ছে বঁড়শিতে মাছ ধরার একটা ধূর্ত টোপ মাত্র, সে-টোপটি যে গিলবে তাকে ভালভাবে ভোজ্য দ্রব্যে পরিণত হওয়ার জন্য তৈরী হয়ে থাকতে হবে। আত্মসমর্পণের আন্তর্জাতিক প্রবক্তারা একই ধূর্ত কায়দায় চীনকে আত্মসমর্পণের গাড্ডায় ঠেলে দেবার চেষ্টা করছে। চীনে জাপানী আক্রমণ তারা সমর্থন করেছে, 'পাহাড়ের চূড়ায় বসে বাঘের লড়াই দেখতে দেখতে' তারা সুযোগের অন্বেষণ করছে, যাতে তথাকথিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনের নামে একটা কিছু মঞ্চস্থ করে অন্যের কাঁধে ভর করে নিজেদের কোলে মাছ টানা যায়। এইজাতীয় ষড়যন্ত্রের ওপর যারাই আস্থা স্থাপন করবে, তারাই একইভাবে প্রতারিত হবে।

এককালে প্রশ্নটি ছিল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হবে কি হবে না, এখন প্রশ্নটি হয়ে দাঁড়িয়েছে যুদ্ধ চালানো হবে, না শান্তি স্থাপন করা হবে। তবে প্রশ্নটি কিন্তু মূলতঃ সেই একই থেকে গেছে, এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্ন হিসেবেই থেকে গেছে। বিগত ছ' মাস ধরে জাপান যখন তার আত্মসমর্পণের দাবির কাছে মাথা নোয়ানোর জন্য চাপ দিচ্ছে, যখন চলেছে আত্মসমর্পণের আন্তর্জাতিক প্রবক্তাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি, এবং সর্বোপরি, আমাদের জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের ভেতরকার কিছু কিছু ব্যক্তি যখন খুব দোদুল্যমান হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে শান্তি ও যুদ্ধের প্রশ্নটিকে নিয়ে চিৎকার উঠেছে তীব্রভাবে এবং এসবের ফলে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আত্মসমর্পণের বিষয়টি প্রধান বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিদের পক্ষে প্রথম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রস্তুতি হিসেবে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, অর্থাৎ কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা ভেঙে দেওয়ার এবং জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের ঐক্য ভেঙে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সব দেশপ্রেমিক পার্টিগুলো ও ব্যক্তিদের অত্যন্ত সজাগ লক্ষ্য রাখতে হবে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিত্বের কার্যকলাপের ওপর, তাঁদের নিশ্চিত-ভাবে বুঝতে হবে বর্তমান পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি, যেমন আত্মসমর্পণ হচ্ছে প্রধান বিপদ এবং আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি-পর্বের ধাপ হিসেবেই কমিউনিজমের বিরোধিতা শুরু হয়েছে, এবং এই আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে ও

ঐক্য ভাঙার বিরুদ্ধে তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। বিগত দু'বছর ধরে সমগ্র জাতিকে যে বিপুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছে সেই জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন গোষ্ঠীকেই আমাদের এই যুদ্ধে ক্ষতি বা বিশ্বাসঘাতকতা করার কোন সুযোগই দেওয়া চলবে না। সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টে কোন গোষ্ঠীকেই কিছুতেই কখনো বিভেদ বা ভাঙন আনতে দেওয়া চলবে না।

লড়াই চালিয়ে যান, ঐক্য রক্ষায় সচেষ্ট থাকুন, তাহলেই চীন রক্ষা পাবে।

শান্তি স্থাপন করলে বা ভাঙনে সচেষ্ট থাকলে চীন ধ্বংস হয়ে যাবে।

এর কোন্‌টা আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন, কোন্‌টাই-বা গ্রহণ করবেন? আমাদের দেশবাসীকে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

আমরা কমিউনিস্টরা, নিশ্চিতভাবেই যুদ্ধ চালিয়ে যাব, ঐক্য রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকব।

সমস্ত দেশপ্রেমিক পার্টিগুলো ও সমস্ত দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গ যুদ্ধ করে যাবেন, তাঁরা ঐক্য রক্ষায় সচেষ্ট থাকবেন।

এমনকি আত্মসমর্পণ ও বিভেদের জন্য সচেষ্ট আত্মসমর্পণকারীরা যদি কিছুদিনের জন্য প্রাধান্যও পায়, তবুও তাদের মুখোস কিছুকালের মধ্যেই খুলে যাবে, এবং তারা জনগণ কর্তৃক শাস্তি পাবেই। চীনা জাতির ঐতিহাসিক কর্তব্যই হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে মুক্তি অর্জন করা। আত্মসমর্পণকারীরা চাইছে ঠিক এর বিপরীতটি। তারা যতই সুবিধা পাক না কেন, কেউ তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না মনে করে যত উল্লাসই তাদের মধ্যে দেখা যাক না কেন, সমগ্র জনসাধারণের শাস্তি থেকে তাদের রেহাই নেই।

আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে ও বিভেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান—সমস্ত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপের এবং আমাদের দেশপ্রেমিক স্বদেশবাসীদের এটাই হচ্ছে এই মুহূর্তের আশু কর্তব্য।

সমস্ত দেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হোন! ঐক্য ও প্রতিরোধে অবিচল থাকুন। আত্মসমর্পণের ও বিভেদ সৃষ্টির সমস্তরকম ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান!

টীকা

১। 'আন্তর্জাতিক আত্মসমর্পণকারীরা' হচ্ছে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, যারা চীনদেশকে বলি দিয়ে জাপানের সঙ্গে সমঝওতায় আসার ষড়যন্ত্র করছিল।

২। পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনটিকে অভিহিত করা হচ্ছিল দূর প্রাচ্যের মিউনিক বলে, কারণ চীনদেশকে বিকিয়ে দিয়ে জাপানের সঙ্গে সমঝওতায় আসার জন্য এই সমঝওতার পক্ষপাতী চীনের একদল রাজনীতিজ্ঞ ব্রিটিশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে মিলে চেষ্টা করছিল। এই সম্মেলন প্রাচ্যের মিউনিকে পরিণত হবে না—এই আজগুবি যুক্তি চিয়াং কাই-শেকও সমর্থন করেছিল। তার এই যুক্তি কমরেড মাও সে-তুঙ এই প্রবন্ধে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন।

৩। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্মান ও ইতালীর সরকারের প্রধানগণ জার্মানির মিউনিক নগরে এক আলোচনায় বসে 'মিউনিক চুক্তি' নামে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার মধ্য দিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স চেকোস্লোভাকিয়া দেশটিকে জার্মানির কব্জায় ছেড়ে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর জার্মান আক্রমণ ঘটানোর পরিকল্পনা করে। ১৯৩৮-১৯৩৯-এ ঠিক একই পদ্ধতিতে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চীনদেশটিকে বলি দিয়ে জাপানের সঙ্গে একটা সমঝওতায় পৌছাবার চেষ্টা করে। ১৯৩৯-এর জুনে মাও সে-তুঙ যখন এই প্রবন্ধটি রচনা করেন, তখন জাপান ও ব্রিটেনের মধ্যে এই ষড়যন্ত্রের জন্য আরও একবার আলোচনা-সভা বসেছিল। এই ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনাটির নামকরণ হয়েছিল 'প্রাচ্যের মিউনিক' কারণ এর চেহারাটি ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালীর মধ্যে যে মিউনিক ষড়যন্ত্র হয়েছিল ঠিক তারই মতন।

৪। নামভূমিকায় অবতরণ করেছিল চিয়াং কাই-শেক ও ওয়াং চিং-ওয়েই। প্রকাশ্য আত্মসমর্পণকারীদের পাণ্ডার ভূমিকায় ছিল ওয়াং চিং-ওয়েই আর চিয়াং ছিল জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের মধ্যে লুকায়িতদের নেতা।

৫। ১৯৩৯-এর জানুয়ারি মাসে কুওমিনতাঙ পার্টির পঞ্চম কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে চিয়াং কাই-শেক প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে যে, 'শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ-যুদ্ধটি চালিয়ে নিয়ে যাও'—এই রণধ্বনির 'শেষ পর্যন্ত' বলতে 'লুকৌচিয়াও ঘটনার পূর্বের স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনা' বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ এ ব্যাখ্যাটির অর্থ এমনই হল যে, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব

চীনের বিপুল এলাকা জাপ-অধিকারে ছেড়ে রাখার স্বীকৃতি দেওয়া হল। সুতরাং, চিয়াঙের আত্মসমর্পণের কর্মনীতির মোকাবিলা করার জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ বিশেষ জোর দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন যে, 'শেষ পর্যন্ত' কথাটির অর্থ হল 'ইয়ালু নদী পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে গিয়ে আমাদের সমস্ত হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা'।

৬। 'সংঘর্ষ' কথাটি দিয়ে তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙের সমস্ত-রকম রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিক্রিয়াশীল কাজকর্ম বোঝানো হতো, যার সাহায্যে তারা জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেওয়া এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিরোধিতা করছিল—যেমন হত্যাকাণ্ড ও অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনীর ওপর বৃহদাকারে আক্রমণ চালানো।

৭। ১৯৩৭-এর ১৩ই ডিসেম্বরে জাপ-হানাদাররা নানকিং অধিকার করার পর জাপ-সরকার ১৯৩৮-এর ১৬ই জানুয়ারিতে এক বিবৃতি দিয়ে বলে যে, জাপান কোনরকম 'চুক্তি-আলোচনায় জাতীয় সরকারকে বিরোধী দল হিসেবে গ্রহণ করবে না এবং এক নয়া সরকারের প্রতিষ্ঠা সে আশা করে।' ১৯৩৮-এর অক্টোবরে ক্যান্টন ও উহান জাপ-অধিকারে যাওয়ার পর জাপ-সরকার চিয়াঙের দোদুল্যমানতার সুযোগ গ্রহণ করে তার কর্মনীতির পরিবর্তন করে। ৩রা নভেম্বর জাপ-সরকার আর একটা বিবৃতি দিয়ে বলে, যার অংশবিশেষ হচ্ছে: 'জাতীয় সরকার সম্বন্ধে বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যদি ঐ সরকার তার এতদিন পর্যন্ত অনুসৃত ভ্রান্ত কর্মনীতির পরিবর্তন সাধন করে তার মধ্যে নতুন লোক নিয়ে পুনর্বাসনের কাজ শুরু করে, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে, তবে জাপ সম্রাট তার সঙ্গে আলোচনা করতে গররাজী হবে না।'

প্রতিক্রিয়াশীলদের শাস্তি দিতেই হবে

১লা আগস্ট, ১৯৩৯

আজ ১লা আগস্ট আমরা এখানে সমবেত হয়েছি একটি স্মরণ-সভায়। কেন আমরা এই স্মরণ-সভা উদ্‌যাপন করছি? কারণ প্রতিক্রিয়াশীলরা আমাদের বিপ্লবী কমরেডদের খুন করেছে, খুন করেছে জাপান-বিরোধী যোদ্ধাদের। এ সময়ে খুন করা উচিত কাদের? চীন বিশ্বাসঘাতক ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদী-দের। গত দু'বছর ধরে চীন জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সংগে যুদ্ধ করছে, কিন্তু এব ফলাফল এখনো নির্ধারিত হয়নি। বিশ্বাসঘাতকরা এখনো খুবই তৎপর রয়েছে, তাদের মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যকই খুন হয়েছে। কিন্তু তবুও আমাদের বিপ্লবী কমরেডরা—যাঁরা সকলেই যুদ্ধ করছিলেন জাপানের বিরুদ্ধে—খুন হয়েছেন। কারা তাঁদের খুন করেছে? সৈন্যরা খুন করেছে। কেন সৈন্যরা জাপান-বিরোধী যোদ্ধাদেরকেই খুন করল? তারা নির্দেশ পালন করেছে, বিশেষ কিছু ব্যক্তি তাদেরকে খুন করার এই নির্দেশ দিয়েছে। কারা তাদেরকে খুন করার এই নির্দেশ দিয়েছে? প্রতিক্রিয়াশীলরা।[১] কমরেডগণ! জাপ-বিরোধী যোদ্ধাদের খুন করার ইচ্ছেটা কাদের পক্ষে হওয়া স্বাভাবিক? প্রথমতঃ, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে, এবং তারপর ওয়াং চিং-ওয়েই'র মতো চীনা দালাল ও বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের স্থান তো জাপানী আক্রমণকারী ও তাদের চীনা দালালদের দ্বারা অধিকৃত সাংহাই, পিপিং, তিয়েনসিন বা নানকিঙের মতো জায়গায় হয়নি, এটা হয়েছে পিংকিয়াঙে, প্রতিরোধ-যুদ্ধের পশ্চাভাগে, এবং খুন হয়েছেন কমরেড তু চেং-কুন ও কমরেড লো জু-মিঙের মতো নয়া চতুর্থ বাহিনীর পিংকিয়াং গণ-সংযোগ কার্যালয়ের দায়িত্বশীল কমরেডরা। স্পষ্টতঃই এই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদী ও ওয়াং চিং-ওয়েই'র নির্দেশাধীন একঝাড় চীনা প্রতি-ক্রিয়াশীলদের দ্বারা। আত্মসমর্পণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব এইসব প্রতিক্রিয়াশীলরা গোপনে গোপনে জাপানী ও ওয়াং চিং-ওয়েই'র নির্দেশ কার্যকরী করেছে এবং

পিংকিয়াঙের শহীদের স্মরণে ইয়েনানের জনগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত একটি সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ এই ভাষণটি দিয়েছিলেন।

প্রথমেই তারা যাঁদের খুন করেছে, তাঁরাই হচ্ছেন জাপানীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে দৃঢ়পণ যোদ্ধা। ঘটনাটিকে মোটেই তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেবার কারণ নেই, এর বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই সোচ্চার হয়ে উঠতে হবে, একে নিন্দা করতেই হবে।

সমগ্র জাতি এখন জাপানের প্রতিরোধ করছে এবং প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সমস্ত জনগণের এক মহান ঐক্য গড়ে তুলেছে। কিন্তু এই মহান ঐক্যের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও আত্মসমর্পণকারীরাও আছে। এরা কি করছে? এরা জাপ-বিরোধী যোদ্ধাদের হত্যা করছে, এবং অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করছে, এবং জাপ-হানাদার ও চীনা দালালদের সংগে যোগসাজসে আত্মসমর্পণের পথ প্রশস্ত করছে।

জাপ-বিরোধী কমরেডদের এই গুরুত্বপূর্ণ খুনের ঘটনার বিরুদ্ধে কেউ কি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? ১২ই জুন বেলা ৩ টায় এই খুন করা হয়েছে, আজ ১লা আগস্ট, এই সময়ের মধ্যে কি আমরা কাউকে দেখেছি, যে এগিয়ে এসে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? না। কে সেটা করবে? দেশের আইন অনুযায়ী আইনের প্রশাসকদেরই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল। এই ঘটনা শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে ঘটলে আমাদের হাইকোর্ট অনেকদিন আগেই ব্যবস্থা গ্রহণ করত। পিংকিয়াং হত্যাকাণ্ডের পর দুমাস কেটে গেছে, আইন এবং তার প্রশাসকরা এখনো পর্যন্ত কিছুই করেনি। কি তার কারণ? কারণটি হচ্ছে এই যে, চীন ঐক্যবদ্ধ নয়।[২]

চীনকে ঐক্যবদ্ধ করতেই হবে; একতা ছাড়া বিজয়লাভ হতে পারে না। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকেই জাপানকে রুখবে, সবাই ঐক্যবদ্ধ হবে ও প্রগতির জন্য চেষ্টা করবে, এবং যথাযোগ্য পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। কাদের পুরস্কৃত করা হবে? যারা জাপানকে প্রতিরোধ করে, যারা ঐক্যকে উঁচুতে তুলে ধরে, যারা প্রগতিশীল, তাদের। আর শাস্তি কারা পাবে? শত্রুর দালাল ও প্রতিক্রিয়াশীলরা, যারা প্রতিরোধের, ঐক্যের ও প্রগতির অন্তরায় সৃষ্টি করে। আমাদের দেশ কি এখন ঐক্যবদ্ধ? না, তা নয়। পিংকিয়াং ঘটনাই তার প্রমাণ। যে একতা থাকা উচিত ছিল তা যে নেই, এই ঘটনাই তা দেখিয়ে দেয়। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই সমগ্র দেশের ঐক্য চেয়ে আসছি। প্রথমতঃ, প্রতিরোধ-যুদ্ধের ভিত্তিতে ঐক্য। কিন্তু এখন তু চেং-কুন, লো জু-মিং এবং অন্যান্য যেসব কমরেড জাপানকে

প্রতিরোধ করেছিলেন, তাঁরা পুরস্কৃত হবার বদলে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন, আর যেসব বদমায়েশরা প্রতিরোধের বিরোধিতা করে আসছিল, যারা আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, তারা কোন শাস্তিই পায়নি, এটাকে একতা বলে না। এইসব বদমায়েস ও আত্মসমর্পণকামীদের বিরোধিতা আমরা নিশ্চয়ই করব, খুনেদের গ্রেপ্তার করব। দ্বিতীয়তঃ, একতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। যারা একতার পক্ষে তাঁদের পুরস্কৃত হওয়া উচিত এবং যারা এর ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা করেছে তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত, কিন্তু তু চেং-কুন, লো জু-মিং প্রভৃতি কমরেডরা এই ঐক্য উঁচুতে তুলে ধরার জন্যই শাস্তি পেয়েছেন, নৃশংসভাবে তাঁদের হত্যা করা হয়েছে, আর যেসব শয়তান এই ঐক্য বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে তারা বেশ বহালতবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একে মোটেই ঐক্যবদ্ধ হওয়া বলে না। তৃতীয়তঃ, প্রগতির ভিত্তিতে একতা। সমগ্র দেশকে এগিয়ে যেতে হবে, অনগ্রসরদের দ্রুত এগিয়ে গিয়ে অগ্রগামীদের ধরার চেষ্টা করতে হবে, অগ্রগামী যারা তারা অনগ্রসরদের সংগে তাল রাখার জন্য থেমে থাকলে হবে না। পিংকিয়াঙের খুনীরা প্রগতিশীলদের খুন করেছে। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে হাজার হাজার কমিউনিস্ট ও দেশপ্রেমিকদের খুন করা হয়েছে, পিংকিয়াঙের হত্যাকাণ্ড তার একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ মাত্র। এ যদি চলতে দেওয়া হয়, চীনের পক্ষে তা হবে চরম ক্ষতিকর; যাঁরাই জাপানের প্রতিরোধ করেছেন তাঁরাই খুন হবেন। এই খুনের অর্থটা কী? এর সোজা অর্থ হল এই যে, জাপ-সাম্রাজ্যবাদী ও ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের হুকুমে চীনা প্রতিক্রিয়াশীলরা আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, এবং সেই কারণে জাপ-বিরোধী যোদ্ধাদের, কমিউনিস্ট ও দেশপ্রেমিকদের খুন করতে শুরু করেছে। এটা যদি বন্ধ না হয়, এই প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে চীনের ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং এই হত্যাকাণ্ডের সংগে সমগ্র দেশের সম্পর্ক জড়িত, এর গুরুত্ব অসীম, এবং আমরা জাতীয় সরকারের কাছে দাবি করছি যে, এই প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে চরম শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

কমরেডদের আরও খেয়ালে রাখতে হবে যে, জাপ-সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রতি তার বিভেদমূলক কার্যকলাপ জোরদার করেছে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ জাপানকে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে আরও তৎপর হয়েছে,[৩] এবং চীনের বিশ্বাসঘাতকরা, গোপন ও প্রকাশ্য ওয়াং চিং-ওয়েইরা আরও বেশী সচেষ্ট হয়ে

উঠেছে প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালাবার জন্য, ঐক্যকে বিঘ্নিত করার জন্য, এবং ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেবার জন্য। এরা চাইছে আমাদের দেশের বৃহদাংশ ছেড়ে দিতে, এরা চাইছে আভ্যন্তরীণ বিভেদ ঘটিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু করতে। এখন এরা 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিসমূহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ বিধি'[৪] নামক গোপন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে কার্যকরী করতে শুরু করেছে। এরা হচ্ছে চরম প্রতিক্রিয়াশীল, এরা জাপ-সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যকারী, এরা প্রতিরোধ, একতা ও প্রগতির বিধ্বংসী শক্তি। এই 'বিদেশী-ভাবাপন্ন পার্টি' কারা? জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা, ওয়াং চিং-ওয়েই ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকরা। জাপ-প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক পার্টিকে কিভাবে 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টি' বলা যায়? তবুও কিন্তু আত্মসমর্পণ-কারী, প্রতিক্রিয়াশীল ও গোঁড়াপন্থীরা যথেচ্ছভাবে জাপ-বিরোধী কর্মীদের মধ্যে কোন্দল ও বিরোধ ঘটানোর কাজ করে যাচ্ছে। এই ধরনের কাজ কি সঠিক, না ভুল? এ ধরনের কাজ অত্যন্ত ভুল! (**সমস্বরে হর্ষধ্বনি।**) নিয়ন্ত্রণের কথা বলতে গেলে, কোন্ ধরনের লোকদের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত? করা উচিত জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের, ওয়াং চিং-ওয়েই, প্রতিক্রিয়াশীল ও আত্মসমর্পণকারীদের। (**সমস্বরে হর্ষধ্বনি।**) জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সবচেয়ে বিপ্লবী ও সবচেয়ে প্রগতিশীল কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ কেন? এ কাজ চূড়ান্তভাবেই ভুল। আমরা ইয়েনানের লোকেরা এর দৃঢ় বিরোধিতা ও তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছি। (**সমস্বরে হর্ষধ্বনি।**) আমরা 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিসমূহের কাযাবলী নিয়ন্ত্রণ বিধি' নামক বিধিটির বিরোধিতা করছি, কারণ এই ধরনের সমস্ত ব্যবস্থা ঐক্য ভাঙার সমস্ত দুষ্কর্মের মূলে আছে। আমরা আজ যে এই জনসভায় জমায়েত হয়েছি, তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিরোধ, একতা ও প্রগতি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঐ 'বিদেশী পার্টিসমূহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ বিধিটি' অবশ্যই বাতিল করতে হবে, আত্মসমর্পণকারী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে এবং সমস্ত বিপ্লবী কমরেডদের, সমস্ত কমরেড ও জাপ-প্রতিরোধে ব্যাপৃত জনগণকে নিশ্চয়ই রক্ষা করতে হবে। (**প্রবল হর্ষধ্বনি ও শ্লোগান।**)

টীকা

১। চিয়াং কাই-শেক ও তার সাঙ্গপাঙ্গরাই হচ্ছে এই প্রতিক্রিয়াশীলবৃন্দ। ১৯৩৯ সালের ১২ই জুন চিয়াং কাই-শেকের গোপন নির্দেশে কুওমিনতাঙের ২৭ নম্বর গ্রুপ বাহিনী হুনান প্রদেশের পিংকিয়াঙে নয়া চতুর্থ বাহিনীর গণ-সংযোগ দপ্তর অবরোধ করার জন্য সৈন্য পাঠায় এবং ঠাণ্ডা মাথায় নয়া চতুর্থ বাহিনীর ষ্টাফ অফিসার কমরেড তু চেং-কুন, অষ্টম রুট বাহিনীর মেজর ও অ্যাডজুট্যান্ট কমরেড লো জু-মিং এবং আরও চারজন কমরেডকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড শুধু জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকাতেই নয়, এমনকি কুওমিনতাঙ অঞ্চলে সৎব্যক্তিদের মধ্যেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ সঞ্চার করে।

২। কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলরা 'ঐক্যবদ্ধ হবার' আওয়াজ তুলে তাদের কমিউনিস্ট পরিচালিত জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী ও ঘাঁটি অঞ্চল ভেঙে দেবার ঘৃণ্য চক্রান্ত কার্যকরী করেছিল, এবং তার মোকাবিলা করার জন্যই কমরেড মাও সে-তুঙ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। জাপানের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর 'ঐক্যবদ্ধ হবার' শ্লোগানটিকেই প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগিয়ে কুওমিনতাঙরা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলে যে, তারা নাকি সব সময়েই আলাদা থাকতে চায়, তারা নাকি ঐক্যে বিঘ্ন ঘটিয়ে প্রতিরোধের কাজকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসের পর থেকে, কুওমিনতাঙের পঞ্চম কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির পঞ্চম বর্ধিত অধিবেশনে চিয়াং কর্তৃক প্রস্তাবিত 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিসমূহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ বিধি' গৃহীত হবার পর থেকে এই প্রতিক্রিয়াশীল হট্টগোল আরও বাড়তে থাকে। কমরেড মাও সে-তুঙ প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙের হাত থেকে 'ঐক্যবদ্ধ হও' এই শ্লোগানটি ছিনিয়ে নিয়ে এটিকে জাতি ও জনগণের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙের বিভেদপন্থী কার্যাবলীর একটি বিপ্লবী রণধ্বনিতে রূপান্তরিত করেন।

৩। ১৯৩৮-এর অক্টোবরে উহানের পতনের পর জাপানের প্রধান কর্মনীতিই হয় রাজনৈতিক উপায়ে কুওমিনতাঙকে আত্মসমর্পণে প্রলুব্ধ করা। ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদও বারবার চিয়াংকে শান্তি স্থাপনের জন্য মধ্যস্থতা করতে উপদেশ দিয়েছে, এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন এই ইঙ্গিতও দেন যে, 'দূর প্রাচ্য পুনর্গঠনের' পরিকল্পনায় সে যোগ দেবে। জাপ-আক্রমণকারীরা ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ১৯৩৯-এ তাদের

ষড়যন্ত্রের জাল আরও বিস্তার করে। ঐ বছরের এপ্রিল মাসেই চীনে অবস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ক্লাক-কের চিয়াং ও জাপ-আক্রমণকারীদের মধ্যে শান্তি-আলোচনার সূত্রপাত করে দেওয়ার জন্য মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করে। জুলাই মাসে জাপান ও ব্রিটেনের মধ্যে এক চুক্তি হয়, এবং তাতে চীনদেশে জাপান যে 'বাস্তব পরিস্থিতি' সৃষ্টি করেছে ব্রিটিশ সরকার তার স্বীকৃতি দিতে রাজী হয়।

৪। 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিসমূহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ বিধি'—অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশটি দেয়। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য সমস্তরকম প্রগতিশীল চিন্তাধারা, বক্তৃতা ও কার্যাবলীর ওপর প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়, যার ফলে সমস্ত রকমের জাপ-বিরোধী গণ-সংগঠনের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। তারা আরও নির্দেশ দেয় যে, যেসব জায়গায় 'কমিউনিস্টরা অত্যন্ত প্রবল' বলে কুওমিনতাঙ মনে করে, সেখানে 'যৌথ দায়িত্ব ও শাস্তির আইনটি' প্রযুক্ত হবে, এবং সাধারণভাবে 'সংবাদ সংগ্রহের জাল', অর্থাৎ প্রতিবিপ্লবী গোয়েন্দা বিভাগের জাল 'পাও-চিয়া' শাসন-সংস্থার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। 'পাও' ও 'চিয়া' তখন ছিল কুওমিনতাঙের ফ্যাসিষ্ট শাসনের বুনিয়াদী প্রশাসনিক একক। দশটি পরিবার নিয়ে হতো একটি 'চিয়া', এবং দশটি 'চিয়া' নিয়ে একটি 'পাও'।

নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে 'নয়া চীন দৈনিক' পত্রিকার সাংবাদিকের সংগে সাক্ষাৎকার

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

সাংবাদিক : সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানির মধ্যে সম্পাদিত অনাক্রমণ চুক্তির[১] তাৎপর্য কী?

মাও সে-তুঙ : সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিটি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক শক্তি এবং সোভিয়েত সরকার কর্তৃক অবিচলভাবে অনুসৃত শান্তি নীতিরই ফলশ্রুতি। চেম্বারলিন-দালাদিয়েরের নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়াশীল আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ারা একটা সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার যে চক্রান্ত চালাচ্ছিল, এই চুক্তি তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে, কমিউনিস্ট-বিরোধী জার্মানি-ইতালী-জাপান গোষ্ঠীর দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের চারিদিকে গড়ে তোলা পরিবেষ্টনীকে ভেঙে দিয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের মধ্যে শান্তিকে জোরদার করে তুলেছে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের অগ্রগতিকে রক্ষা করছে। প্রাচ্যে এই চুক্তি জাপানকে আঘাত হেনে চীনকে সাহায্য করেছে; চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধের শক্তিগুলিকে শক্তিশালী করে তুলে আত্মসমর্পণ-বাদীদের আঘাত হেনেছে। এবং এ সবকিছুই সমগ্র দুনিয়ায় জনগণকে স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জনের ব্যাপারে সাহায্য করেছে। এই হচ্ছে সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির সম্পূর্ণ রাজনৈতিক তাৎপর্য।

প্রশ্ন : কিছু লোক এখনো এ কথা বুঝতে পারছে না যে, সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিটা হচ্ছে ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েত আলোচনার ব্যর্থতারই ফলশ্রুতি; তারা বরং এই সোভিয়েত-জার্মান চুক্তিকেই এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী বলে ভাবছে। ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েত আলোচনা কেন ব্যর্থ হল, সে সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি?

উত্তর : ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের আন্তরিকতার অভাবের জন্যই সম্পূর্ণতঃ এই আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল

আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া, এবং প্রাথমিকভাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বুর্জোয়ারা ফ্যাসিষ্ট জার্মানি, ইতালী ও জাপানের আগ্রাসনের প্রতি 'হস্তক্ষেপ না করার' প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করে চলেছে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আগ্রাসী যুদ্ধগুলোকে উপেক্ষা করে চলা, এবং তার মধ্য দিয়ে নিজেদের সুবিধে অর্জন করা। সেই কারণেই আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি প্রকৃত ফ্রন্ট সৃষ্টির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচেষ্টা বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে; দূরে দাঁড়িয়ে তারা 'হস্তক্ষেপ না করার' অবস্থান গ্রহণ করে জার্মান, ইতালীর ও জাপ-আক্রমণ উপেক্ষা করছে। যুদ্ধমান পক্ষগুলো যখন লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন এগিয়ে এসে হস্তক্ষেপ করাটাই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। এই প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতি অনুসরণ করে তারা জাপানের কাছে অর্ধেক চীন ছেড়ে দিয়েছে, সমস্ত আবিসিনিয়া, স্পেন, অস্ট্রিয়া ও চেকো-শ্লোভাকিয়াকে ছেড়ে দিয়েছে ইতালী ও জার্মানির হাতে।[২] তারপর তারা চাইছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বলি দিতে। এই ষড়যন্ত্রটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে সাম্প্রতিক ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েতের আলোচনার মধ্য দিয়ে। ১৫ই এপ্রিল থেকে ২৩শে আগস্ট- চার মাস ধরে এই আলোচনা চলে এবং এই আলোচনা-পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু গোড়া থেকে শেষদিন পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্স সমতা ও পারস্পরিক আবশ্যিকতার নীতি প্রত্যাখ্যান করে এসেছে, তারা দাবি করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করুক, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ছোট বাল্টিক দেশগুলোর ক্ষেত্রে সেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে তারা রাজী হল না। এভাবে জার্মানিকে আক্রমণ চালানোর সুযোগ করে দেবার জন্য ফাঁক রেখে দেওয়া হল, কিন্তু আক্রমণকারীকে রোখার জন্য পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর চলাচলের পথ করে দেওয়ার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা হল; আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার এই হল কারণ। ইতিমধ্যে জার্মানি এই বলে ইংগিত দিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তার কার্যকলাপ সে বন্ধ রাখবে, তথাকথিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে চুক্তিটি[৩] তারা পরিত্যাগ করবে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানা অলঙ্ঘ্য বলে স্বীকৃতি দেবে; সুতরাং সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হল। 'হস্তক্ষেপ না করার' যে নীতিটি আন্তর্জাতিক, এবং প্রধানতঃ ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করছিল, তা হল 'পাহাড়ের চূড়ায় বসে বাঘের

লড়াই দেখার' নীতি, অন্যের স্বার্থহানি করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতি। চেম্বারলিন মন্ত্রী হয়ে বসার পর থেকে এই কর্মনীতির সূত্রপাত, গতবছরের সেপ্টেম্বরে মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে এটি চরমাবস্থায় গিয়ে পৌঁছায়, এবং পরিশেষে এর অবসান ঘটে সাম্প্রতিক ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েত আলোচনায়। এখন থেকে পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যাবে ইঙ্গ-ফরাসী ও জার্মান-ইতালীয়—এই দুটি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের দিকে। ১৯৩৮-এর অক্টোবরে আমাদের পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ বর্ধিত অধিবেশনে আমি বলেছিলাম 'চেম্বারলিন-অনুসৃত কর্মনীতির নিশ্চিত পরিণতি হচ্ছে "নিজের পায়ে ফেলার জন্যই পাথর তোলা"।' পরের ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্য নিয়ে চেম্বারলিন শুরু করেছিল, কিন্তু তার পরিসমাপ্তি ঘটল নিজের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। এটা হচ্ছে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতির পরিচালিকা নিয়মেরই বিকাশের ফল।

প্রশ্ন: বর্তমান পরিস্থিতির বিকাশ কিভাবে ঘটবে বলে আপনি ভাবছেন?

উত্তর: আন্তর্জাতিক অবস্থা ইতিমধ্যেই এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কিছুদিন ব্যাপী যে একমুখী পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, অর্থাৎ 'হস্তক্ষেপ না করার' দরুণ উদ্ভূত যে পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর একটা গ্রুপ আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছিল আর অন্য গ্রুপ তখন চুপচাপ বসে লক্ষ্য করছিল, সে পরিস্থিতি সুনিশ্চিতভাবেই বিশেষ করে ইউরোপে এক সর্বগ্রাসী যুদ্ধের পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।

ইউরোপে জার্মান-ইতালীয় ও ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী দুই ব্লকের মধ্যে ঔপনিবেশিক জনগণের ওপর আধিপত্য করা নিয়ে বৃহদাকারের এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে। এই যুদ্ধে বিবদমান উভয়পক্ষই জনগণকে ধোঁকা দিয়ে তাদের সমর্থন পাবার জন্য তাদের নিজ নিজ অবস্থানকে সঠিক এবং বিপরীতপক্ষের অবস্থানকে বেঠিক বলে ঘোষণা করে তারস্বরে প্রচার চালিয়ে যাবে। বাস্তবে এটা হচ্ছে একটা ভাঁওতা। দুপক্ষেরই উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদী, দুপক্ষই উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার ও প্রভাবাধীন অঞ্চল স্থাপনের জন্য লড়ছে, উভয়েই আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে তারা লড়াই করছে পোল্যাণ্ড, বলকান দেশসমূহ এবং

ভূমধ্যসাগরের উপকূল নিয়ে। এ যুদ্ধ কোনক্রমেই ন্যায় যুদ্ধ নয়। ন্যায় যুদ্ধ কখনো আগ্রাসী যুদ্ধ হয় না, তা হয় মুক্তিযুদ্ধ। কমিউনিস্টরা কখনই কোন অবস্থাতেই আগ্রাসী যুদ্ধ সমর্থন করবে না। তারা মুক্তির জন্ত অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে আগ্রাসী নয় এমন প্রত্যেকটি যুদ্ধই সমর্থন করবে, তারা থাকবে সংগ্রামের সামনের সারিতে। চেম্বারলিন ও দালাদিয়েরের ভীতি প্রদর্শন ও উৎকোচ প্রদানের সামনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংগে সংশ্লিষ্ট সামাজিক-গণতান্ত্রিক পার্টিগুলো বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কালে যেমন হয়েছিল, ঠিক তেমনি একটা অংশ—ওপরের স্তরের প্রতিক্রিয়াশীল অংশটি—সেই জঘন্য পুরানো পথটিই অনুসরণ করে চলেছে, তারা নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সমর্থন জানাতে প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু আরেকটি অংশ কমিউনিস্টদের সংগে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে গণফ্রন্ট তৈরী করবে। চেম্বারলিন ও দালাদিয়েব জার্মানি ও ইতালীর পদচিহ্ন ধরে এগিয়ে চলেছে, প্রতিনিয়ত তারা আরও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে, যুদ্ধকালীন সমাবেশের সুযোগ গ্রহণ করে তারা তাদের দেশের রাষ্ট্র-কাঠামোটাকে ফ্যাসিষ্ট কাঠামোয় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, অর্থনীতির সামরিকীকরণ ঘটাচ্ছে। সংক্ষেপে, সাম্রাজ্যবাদী দুটি শিবিরই যুদ্ধপ্রস্তুতি চালাচ্ছে তীব্র গতিতে, লক্ষ লক্ষ লোক গণহত্যার আশংকার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এ সবকিছুই জনগণের মধ্যে নিশ্চিত-ভাবে প্রতিরোধ-আন্দোলন জাগিয়ে তুলবে। জার্মানি কি ইতালী, ব্রিটেন কি ফ্রান্স, ইউরোপের বা বিশ্বের সর্বত্রই, জনগণ যদি সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের কামানের খোরাক হতে না চান, তাহলে তাঁদের জেগে উঠতে হবে, সমস্তরকম সম্ভাব্য উপায়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করতে হবে।

এই দুটি বৃহৎ ব্লক ছাড়াও ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার আরও একটি ব্লক আছে, যাদের নেতৃত্বে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এবং এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশ। নিজেদের স্বার্থেই এই গ্রুপের দেশগুলো এখনই যুদ্ধে নামবে না। নিরপেক্ষতার নামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সাময়িক-ভাবে এই দুই বিবদমান পক্ষের কোনদিকেই যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকবে, যাতে করে ভবিষ্যতে সে মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার নেতৃত্বলাভের জন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়ারা যে এখনো গণতন্ত্রের কাঠামোটি এবং তাদের দেশের শান্তিকালীন অর্থনীতি এখন পরিত্যাগ করেনি, তা বিশ্বশান্তি আন্দোলনের অনুকূলেই কাজ করছে।

সোভিয়েত-জার্মান চুক্তির আঘাতটি চরমভাবে পড়েছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের ওপরে, এবং তারা বৃহত্তর বিপদের ঝুঁকি-সম্বলিত এক ভবিষ্যতের মুখোমুখি গিয়ে পড়েছে। জাপানের অভ্যন্তরে তার পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে দুই উপদলের মধ্যে লড়াই চলছে। জাপ-সমন্বয়বাদীরা জার্মানি ও ইতালীর সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করে চীনের ওপর তাদের পরিপূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে, তারা চাইছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আক্রমণ করে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এ অঞ্চল থেকে উৎখাত করতে ; অন্যদিকে বুর্জোয়াদের আর একটা অংশ চীনের ওপর লুণ্ঠনে প্রধান জোর দেবার জন্য ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সকে সুবিধে দিতে চাইছে। বর্তমান মুহূর্তে ব্রিটেনের সঙ্গে একটা সমঝওতা করার দিকের ঝোঁকটাই বেশ শক্তিশালী। ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়াশীলরা আর্থিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যসহ চীনকে যুক্তভাবে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেবে, এবং তার বদলে তারা চাইবে যাতে জাপান প্রাচ্যখণ্ডে ব্রিটিশ স্বার্থের প্রহরী হিসেবে কাজ করে, চীনা জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে অবদমিত করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে আটকে রাখে। সুতরাং, যাই হোক না কেন, চীনদেশ জয় করার জাপানী মূল উদ্দেশ্যের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। চীনে জাপানীরা সামনাসামনি বড় আকারের সামরিক অভিযান চালাবে—এমন সম্ভাবনা হয়তো ততটা নেই, তবে 'চীনাদের অবদমিত করার জন্য চীনাদের ব্যবহার করার'[৪] এবং চীনের ওপর অর্থনৈতিক লুণ্ঠন পরিচালনার জন্য 'যুদ্ধের সাহায্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার'[৫] রাজনৈতিক আক্রমণ সে বাড়িয়ে তুলবে, এবং একই সঙ্গে অধিকৃত অঞ্চলকে 'ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করার' অভিযান[৬] চালিয়ে যাবে। তাছাড়া, চীন যাতে আত্মসমর্পণ করে, ব্রিটেনের মধ্যস্থতায় তার চেষ্টাও সে করবে। সুযোগ বুঝে সে পূর্বাঞ্চলের মিউনিক প্রস্তাব দিয়ে বসবে এবং তুলনামূলকভাবে বড় টোপ ফেলে চেষ্টা করবে চীনকে প্রলোভিত করতে বা ভয় দেখাতে, যাতে সে আত্মসমর্পণের চুক্তি করে এবং তার চীনকে দখলে রাখার উদ্দেশ্য সফল হয়। জাপানী শাসকশ্রেণী তার মন্ত্রিসভার মধ্যে যে পরিবর্তনই করুক না কেন, যতদিন না জাপানী জনগণ বিপ্লবী অভ্যুত্থানে জেগে উঠছেন, ততদিন পর্যন্ত এই জাপানী সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য অপরিবর্তিতই থাকবে।

এই ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বাইরেও রয়ে গেছে এক আলোর দুনিয়া, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি সোভিয়েতকে সুযোগ

দিয়েছে শান্তি-আন্দোলনে আরও সাহায্য করতে, জাপ-প্রতিরোধে চীনকে আরও সাহায্য দিতে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এই হচ্ছে আমার মূল্যায়ন।

প্রশ্ন : এই পরিস্থিতিতে চীনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কি?

উত্তর : দুটি সম্ভাবনা আছে। একটি হচ্ছে প্রতিরোধ, ঐক্য ও প্রগতির ব্যাপারে অধ্যবসায়—যার অর্থ হচ্ছে জাতীয় পুনর্জাগরণ। অন্যটি হচ্ছে সমঝওতা, বিভক্ত হওয়া ও পশ্চাদপসরণ—যার অর্থ হচ্ছে জাতীয় আত্মসমর্পণ।

নতুন আন্তর্জাতিক অবস্থায় জাপান যত বেশি ক্রমবর্ধমান অসুবিধার মধ্যে পড়তে থাকবে এবং চীন দৃঢ়ভাবে সমঝওতা করতে অস্বীকার করবে, ততই আমাদের পক্ষে রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের স্তরটির পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং রণনীতিগত অচলাবস্থার সূত্রপাত হবে। পরবর্তী স্তরটি হবে প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুতিপর্বের।

যাই হোক, যুদ্ধের ফ্রণ্টে অচলাবস্থার অর্থই হচ্ছে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অচলাবস্থার বিপরীত; ফ্রণ্ট লাইন ধরে অচলাবস্থার সূত্রপাত হওয়ার সংগে সংগে শত্রুর পশ্চাতের লাইন ধরে সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠবে। ফলে, প্রধানত: উহান পতনের পর অধিকৃত অঞ্চলে শত্রু যে ব্যাপকভাবে 'ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করার' অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে—বিশেষভাবে উত্তর চীনে—তা শুধু তারা চালিয়েই যাবে না, এখন থেকে তারা তা আরও তীব্রতর করবে। তারও ওপর, যেহেতু শত্রুর প্রধান কর্মনীতিই এখন 'চীনাদের অবদমনের জন্য চীনাদের ব্যবহার' করার রাজনৈতিক আক্রমণ পরিচালনা এবং 'যুদ্ধ দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার' অর্থনৈতিক আক্রমণ পরিচালনা, এবং যেহেতু ব্রিটিশের প্রাচ্য নীতির লক্ষ্যও হচ্ছে দূর প্রাচ্যের মিউনিক তৈরী করা, সেহেতু চীনদেশের বৃহদাঞ্চল বিসর্জন দেওয়ার বিপদ এবং আভ্যন্তরীণ বিভেদের আশঙ্কা প্রভূতভাবে বৃদ্ধি পাবে। শত্রুর তুলনায় চীন এখনো যথেষ্ট দুর্বল, এবং সমগ্র দেশ যদি কঠিন সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ না হয়, তবে প্রতি-আক্রমণে যে শক্তির প্রয়োজন, তা গড়ে তুলতে সে সক্ষম হবে না।

সুতরাং, এখনো আমাদের দেশের পক্ষে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ পরিচালনায় অধ্যবসায়ী হওয়া, এবং সেখানে কোনরকম শৈথিল্যই চলবে না।

এ সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই যে, চীনের পক্ষে বর্তমান সুযোগ কোনক্রমেই হারানো চলবে না, কোন ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে চলবে না, অত্যন্ত দৃঢ় রাজনৈতিক অবস্থান তাকে গ্রহণ করতেই হবে।

অন্য কথায়: প্রথমতঃ, জাপ-প্রতিরোধের নীতিতে দৃঢ়প্রত্যয়ে অবিচল থাকা, এবং যে-কোন রকমের সমঝওতার বিরোধিতা করা। প্রত্যক্ষ বা ছদ্মবেশী ওয়াং চিং-ওয়েইদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প আঘাত হানতেই হবে। তোষামোদের মিষ্টি বুলি, তা সে জাপানের কাছ থেকেই আসুক বা ব্রিটেনের কাছ থেকেই আসুক, চীন তা অবশ্যই দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে, এবং প্রাচ্যের মিউনিকে সে কখনই যোগ দেবে না।

দ্বিতীয়তঃ, জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের নীতিতে দৃঢ়প্রত্যয়ে অবিচল থাকা এবং বিচ্ছেদের দিকে যে-কোন পদক্ষেপেরই বিরোধিতা করা। প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে এইসব পদক্ষেপের দিকে, তা সেগুলো জাপ-সাম্রাজ্যবাদ, অন্য কোন বিদেশী বা দেশের মধ্যেকার পরাজয়কামীদের যাদের কাছ থেকেই আসুক না কেন। প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে ক্ষতিকর সমস্তরকম আভ্যন্তরীণ বিরোধ দৃঢ়হস্তে রোধ করতেই হবে।

তৃতীয়তঃ, প্রগতির অবস্থানের প্রতি দৃঢ়প্রত্যয়ে অবিচল থাকতে হবে এবং বিরোধিতা করতে হবে যে-কোন পশ্চাদপসরণের। সামরিক, রাজনৈতিক, আর্থিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, বা পার্টি বিষয়ে, কিংবা সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ে বা গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে-কোন তত্ত্ব, সংস্থা বা ব্যবস্থা যদি যুদ্ধের পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তবে তা পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধের স্বার্থে তার পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

এইসব কাজ যদি করা হয়, তবে চীন তার প্রতি-আক্রমণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শক্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

এখন থেকে 'প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুতিকেই' সমগ্র দেশের মুখ্য কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

আজ, একদিকে যেমন ফ্রন্ট-লাইন ধরে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আন্তরিকভাবে রক্ষা করে যেতে হবে এবং শত্রু-লাইনের পেছনকার সংগ্রামকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে যেতে হবে, ঠিক তেমনি অন্যদিকে রাজনৈতিক, সামরিক ও অন্যান্য সংস্কারসাধনও করতে হবে এবং প্রচণ্ড শক্তি গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে উপযুক্ত মুহূর্ত এলেই আমাদের হৃত ভূখণ্ডগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য

দেশের সমগ্র শক্তি নিয়ে ব্যাপক এক প্রতি-আক্রমণে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

টীকা

১। ১৯৩৯ সালের ২৩শে আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানির মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২। ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের 'হস্তক্ষেপ না করার' নীতির সাহায্য ও মদৎ পেয়ে ফ্যাসিষ্ট জার্মানি ও ইতালী একের পর এক আগ্রাসন চালিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে থাকে। ১৯৩৫-এর অক্টোবরে ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে এবং ১৯৩৬-এর মে মাসের মধ্যেই সমগ্র দেশ দখল করে নেয়। ১৯৩৬-এর জুলাই মাসে জার্মানি ও ইতালী স্পেনে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে এবং 'পপুলার ফ্রন্ট' সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট ফ্র্যাংকোর বিদ্রোহকে সমর্থন করে। জার্মান ও ইতালীর হানাদার বাহিনী এবং ফ্র্যাংকোর প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ চালাবার পর ১৯৩৯-এর মার্চ মাসে পপুলার ফ্রন্ট সরকার পরাজয় বরণ করে। ১৯৩৮-এর মার্চে জার্মান বাহিনী অষ্ট্রিয়া দখল করে এবং অক্টোবর মাসে চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল দখল করে।

৩। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে জাপান ও জার্মানির মধ্যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-বিরোধী চুক্তি সম্পাদিত হয়, এবং ১৯৩৭-এর নভেম্বরে ইতালী এই চুক্তিতে যোগ দেয়।

৪। 'চীনাদের অবদমিত করার জন্য চীনাদের ব্যবহার করা' ছিল জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের চীন আক্রমণের এক শয়তানি হাতিয়ার। দেশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য তারা তাদের দালাল হিসেবে কাজ করার জন্য কিছু চীনাকে জোগাড় করে। যুদ্ধ শুরু হবার পর তারা ওয়াং চিং ওয়েই'র নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙের জাপপন্থী চক্রটিকে তো বটেই, এমনকি চিয়াং কাই-শেক চক্রকে কাজে লাগিয়েছিল। এটা তারা করেছিল জাপ-প্রতিরোধে সবচেয়ে দৃঢ় কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করার জন্য। ১৯৩৯ সালে তারা চিয়াঙের বাহিনীর ওপর আক্রমণ বন্ধ করে দিয়ে তার কমিউনিস্ট-বিরোধী কার্যকলাপে রাজনৈতিক মদৎ দিতে শুরু করে।

৫। 'যুদ্ধের সাহায্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া' হচ্ছে জাপানের আগ্রাসী যুদ্ধের

ব্যয়ভার বহন করার জন্ত তার অধিকৃত চীনা ভূখণ্ডে নির্মম লুণ্ঠন চালাবার জাপানী কর্মনীতি।

৬। 'ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করা' অভিযানগুলি ছিল জাপানীদের ত্রিবিধ হিংস্র ও বর্বর কর্মনীতির—সব কিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দাও, খুন কর, লুট কর—জাপানী সংজ্ঞা।

কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থা, 'সাও তাং পাও' এবং 'শিন মিন পাও' পত্রিকার তিনজন সাংবাদিকের সংগে সাক্ষাৎকার[1]

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

সাংবাদিক: কয়েকটি বিষয়ে আপনার মতামত জানাতে পারি কি? আজকের **নয়া চীন সংবাদ**-এ আপনার ১লা সেপ্টেম্বরের বিবৃতি আমরা পড়েছি। আমাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর তাতে পাওয়া গেলেও, অন্য কিছু প্রশ্ন সম্পর্কে আপনার বিশদ বক্তব্য জানতে চাই। আমাদের লিখিত প্রশ্নগুলি তিন ভাগে বিভক্ত, সেগুলির প্রত্যেকটি সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে পারলে আমরা খুবই খুশি হব।

মাও সে-তুঙ: আপনাদের তালিকা অনুসারেই আমি বলছি।

আপনারা জানতে চেয়েছেন, প্রতিরোধ-যুদ্ধে কোন অচলাবস্থা এসেছে কিনা। আমার মনে হয়, এক অর্থে তা এসেছে—এই অর্থে যে, নতুন এক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছে, চীন যখন সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে, জাপান তখন আরও বেশি বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এ থেকে এই সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, শত্রু এখনো বেশ বড় রকমের একটি আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করতে পারে; যেমন, সে পাখোই, চ্যাংশা, বা এমনকি সিয়ানও আক্রমণ করতে পারে। আমরা যখন বলি যে, শত্রুর রণনীতিগত আক্রমণ এবং আমাদের রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ এক অর্থে মোটামুটি শেষ হয়ে এসেছে, তখন আমরা আরও আক্রমণ বা পশ্চাদপসরণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিই না। এই নতুন স্তরের বিশেষ কর্তব্য হবে প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা, এবং এর মধ্যেই সব কিছু এসে যাচ্ছে। অর্থাৎ অচলাবস্থার স্তরে ভবিষ্যতের প্রতি-আক্রমণের প্রয়োজনে চীনের যে শক্তির দরকার তা সুসংগঠিত করে তুলতে হবে। প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুতির অর্থ মোটেই এই মুহূর্তে আক্রমণ চালানো নয়, কারণ পরিস্থিতি পরিপক্ক না হলে তা করা যায় না। আমরা প্রতি-আক্রমণের নীতির কথা বলছি, রণকৌশলের নয়। রণ-কৌশলগত প্রতি-আক্রমণ, যেমন ধরুন দক্ষিণ-পূর্ব শানসি অঞ্চলে শত্রুর

'নির্মূলীকরণের' বিরুদ্ধে আমাদের প্রত্যাঘাত শুধু যে সম্ভব তাই নয়, তা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। কিন্তু সর্বাত্মক রণনীতিগত প্রতি-আক্রমণের সময় এখনো আসেনি, এবং আমরা এখন রয়েছি তার দ্রুত প্রস্তুতিপর্বের স্তরে। এই পর্যায়েও আমাদের শত্রুর কিছু সম্ভাব্য আক্রমণাত্মক অভিযান রুখতে হবে।

এই নতুন পর্যায়ের কর্তব্যগুলির তালিকা যদি করা যায় তবে তা হবে শত্রুর পশ্চাতে আমাদের গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, তার 'নির্মূলীকরণের' অভিযান ভেঙে দেওয়া, এবং তার অর্থনৈতিক আক্রমণ বিধ্বস্ত করে দেওয়া; ফ্রন্টে আমাদের কাজ হবে সামরিক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা শক্তিশালী করে তোলা এবং শত্রুর যে-কোন আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রচেষ্টা প্রতিহত করা; সুবিস্তৃত পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে আমাদের প্রধান কাজ হবে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য দৃঢ়ভাবে কাজ করা। প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুতি বিষয়ে এইসবই হবে সুনির্দিষ্ট কাজ।

আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংস্কারসাধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কারণ বর্তমানে শত্রু প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্যোগ নিচ্ছে, সুতরাং আমাদের বিশেষ কর্তব্য হবে রাজনৈতিক প্রতিরোধ শক্তিশালী করা। অর্থাৎ, যত দ্রুত সম্ভব আমাদের গণতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করে ফেলতে হবে, কারণ কেবলমাত্র এই পথেই আমরা আমাদের রাজনৈতিক প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে পারব, পারব সামরিক শক্তি গড়ে তুলতে, প্রতিরোধ যুদ্ধে চীনকে প্রধানতঃ আত্মপ্রচেষ্টার ওপরেই নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে। আমরা আত্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে নবজন্মের পক্ষে, এবং নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই পুনরুজ্জীবনের মর্মকথাই হচ্ছে গণতন্ত্র।

প্রশ্ন: আপনি এইমাত্র বললেন যে, প্রতিরোধ-যুদ্ধে আত্মপ্রচেষ্টার ভিত্তিতে বিজয় অর্জনের জন্য গণতন্ত্র অবশ্য প্রয়োজনীয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থা কিভাবে চালু করা সম্ভব হবে?

উত্তর: ডঃ সান ইয়াৎ-সেন প্রথমে সামরিক শাসন, রাজনৈতিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং শাসনতান্ত্রিক সরকারের তিনটি পর্যায়ের কথা ভেবেছিলেন।[২] মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে প্রদত্ত তাঁর 'উত্তরে যাওয়ার মুহূর্তে আমার বিবৃতি'তে তিনি কিন্তু আর তিন পর্যায়ের কথা বলেননি, তার বদলে বলেছিলেন, একটা জাতীয় পরিষদ এই মুহূর্তে আহ্বান করা হোক। এটাই স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বহুদিন আগেই ডঃ সান নিজেই পরিস্থিতির পরিবর্তনের

সংগে সংগে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। আজকের সংকটময় পরিস্থিতিতে যখন প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলেছে, তখন জাতীয় পরাজয়ের বিপর্যয় এড়াবার জন্য এবং শত্রুকে দূরীভূত করার জন্য অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের আহ্বান এবং গণতান্ত্রিক সরকারের প্রচলন অত্যাবশ্যকীয়। অবশ্য এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। কারও কারও অভিমত হচ্ছে যে, সাধারণ লোক অজ্ঞ, সুতরাং গণতান্ত্রিক সরকারের প্রচলন সম্ভব নয়। এরা ভুল করছে। যুদ্ধের মধ্যে সাধারণ লোকের প্রভূত উন্নতি হয়েছে, এবং সঠিক নীতি ও নেতৃত্ব পেলে গণতান্ত্রিক সরকার নিশ্চিতভাবেই প্রচলিত হতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, উত্তর চীনে এর প্রচলন হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি জেলা ও শহরে, 'পাও' ও 'চিয়ার' প্রধানরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। এমনকি কোন কোন 'কাউন্টির ম্যাজিস্ট্রেটরাও এই পদ্ধতিতেই নিযুক্ত হয়েছে, এবং নির্বাচিত হয়েছেন প্রগতিবাদী ব্যক্তিরা ও সম্ভাবনাসম্পন্ন যুবকেরা। বিষয়টিকে জনগণের আলোচনার জন্য ছেড়ে দেওয়াটাই উচিত হবে।

আপনাদের তালিকার দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রশ্নাবলীতে আপনারা 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিগুলোর দমন সম্বন্ধে' অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলে যে সংঘর্ষ চলছে তার সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে আপনাদের দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক। বর্তমানে কিছু কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে বটে, তবে মূলতঃ পরিস্থিতিটা কিন্তু অপরিবর্তিতই থেকে গেছে।

প্রশ্ন : এ বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টি কি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার অবস্থানটি স্পষ্টভাবে রেখেছে?

উত্তর : আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি।

প্রশ্ন : কিভাবে?

উত্তর : আমাদের পার্টির প্রতিনিধি চৌ এন-লাই গত জুলাই মাসে জেনারালিসিমো চিয়াং কাই-শেককে চিঠি লিখেছেন। তারপর ১লা আগস্ট ইয়েনানের বিভিন্ন জীবিকাশ্রয়ী ব্যক্তিরা মিলে জেনারালিসিমোকে এবং নানকিং সরকারের কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিগুলোর দমন সম্বন্ধে' এই নির্দেশটা প্রত্যাহার করে নেবার জন্য দাবি জানান, যে নির্দেশটা সংগোপনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যেটা বিভিন্ন অঞ্চলে যে 'সংঘর্ষ' চলেছে তার মূলে কাজ করছে।

প্রশ্ন : কেন্দ্রীয় সরকার কি কোন জবাব পাঠিয়েছে?

উত্তর : না। তবে শোনা যাচ্ছে যে কুওমিনতাঙের কিছু কিছু ব্যক্তি এইসব ব্যবস্থার বিরোধী। সবাই জানেন যে, যে-সামরিক বাহিনী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে সে-বাহিনী বন্ধু-বাহিনী, 'বিদেশী ভাবাপন্ন' বাহিনী নয়। একইভাবে, যে-কোন পার্টি জাপানের বিরুদ্ধে সাধারণ সমস্বার্থে লড়ছে সে-পার্টি বন্ধু-পার্টি, 'বিদেশী ভাবাপন্ন' পার্টি নয়। প্রতিরোধ-যুদ্ধে-বহু পার্টি ও গ্রুপ যোগ দিয়েছে, তাদের শক্তির তারতম্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা সবাই সাধারণ সমস্বার্থেই লড়ছে; নিশ্চয়ই তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হবে এবং কোনমতেই একে অপরকে 'দমন' করবে না। বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টি কাকে বলে? জাপানের পোষা কুকুর ওয়াং চিং-ওয়েইর নেতৃত্বাধীন দলই হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকদের দল, কারণ জাপ-বিরোধী পার্টিগুলোর সমস্বার্থসম্বলিত কোন রাজনীতিই তার নেই, এইধরনের পার্টিগুলোকেই দমন করা দরকার। কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে রয়েছে সমস্বার্থভিত্তিক রাজনীতি, যেমন জাপ-হানাদারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। সুতরাং আমাদের সামনে সমস্যাটি হচ্ছে জাপান ও ওয়াং চিং ওয়েইর বিরুদ্ধে বিরোধিতা ও প্রতিরোধ সংগঠিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের সমস্যা, কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করা বা তার প্রতিরোধ নয়। সঠিক স্লোগান উদ্ভাবনের এটাই হচ্ছে একমাত্র ভিত্তি। ওয়াং চিং-ওয়েইর তিনটি স্লোগান হচ্ছে 'চিয়াং কাই-শেকের বিরোধিতা কর', 'কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা কর', এবং 'জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর'। ওয়াং চিং-ওয়েই হচ্ছে কুওমিনতাঙের শত্রু, কমিউনিস্ট পার্টির শত্রু এবং সমগ্র জনগণের শত্রু। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনতাঙের শত্রু নয়। কাজেই পরস্পরের বিরোধিতা বা 'দমন' নয়, বরং এদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, পরস্পরের সাহায্যে আসতে হবে। আমাদের দিকের স্লোগান হবে ওয়াং চিং-ওয়েইর স্লোগানের থেকে আলাদা, ঠিক বিপরীত, তার স্লোগানের সঙ্গে এগুলিকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। সে যদি বলে: 'চিয়াং কাই শেকের বিরোধিতা কর', তাহলে প্রত্যেকেরই চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন জানানো উচিত, যদি সে বলে: 'কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা কর', তবে প্রত্যেকেরই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত; এবং যদি সে বলে: 'জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর' তবে প্রত্যেকেরই জাপ-প্রতিরোধে নামা উচিত। শত্রু যা-কিছুরই বিরোধিতা করবে আমাদের তাকেই সমর্থন করতে হবে, সে যা সমর্থন করবে আমাদের তারই বিরোধিতা করতে

হবে। আজকাল বিভিন্ন লেখায় অনেকেই এই উদ্ধৃতিটি দিচ্ছে: 'বন্ধুদের মনে দুঃখ দিও না, শত্রুদের খুশি কর না।' পূর্বাঞ্চলের হান বংশের সিউ সিউয়ের অধীনস্থ সেনাধ্যক্ষ চু ফু য়ুয়াঙের নগরপাল পেং চুংকে একটা চিঠিতে এ কথাটি লিখেছিলেন। চিঠিতে আছে 'যাই তুমি কর না কেন, তোমায় নিশ্চিত হতে হবে যে, তুমি তোমার বন্ধুদের মনে দুঃখ দিচ্ছ না এবং শত্রুকে খুশি করছ না।' চু ফু'র কথাগুলো একটা বিশেষ রাজনৈতিক নীতির কথা তুলে ধরেছে, যা আমরা কখনই ভুলতে পারি না।

আপনাদের প্রশ্নাবলীতে আপনারা আরও জিজ্ঞেস করেছেন 'সংঘর্ষ' হিসেবে অভিহিত বিষয় সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি'র দৃষ্টিভঙ্গি কি। আপনাদের খোলাখুলিভাবেই বলছি, জাপ-বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের আমরা বিরোধী, এর দ্বারা আমাদের শক্তির ক্ষয় হয়। কিন্তু কেউ যদি আমাদের বিরুদ্ধে হিংস্রতা চালিয়েই যেতে চায়, আমাদের দমন করতে বদ্ধপরিকর হয়, তবে কমিউনিস্ট পার্টিকে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতেই হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে: আমাদের আক্রমণ না করলে আমরা আক্রমণ করব না, আমরা যদি আক্রান্ত হই তাহলে আমরা নিশ্চয়ই প্রতি-আক্রমণ করব। আমাদের অবস্থান হচ্ছে পুরোপুরি আত্মরক্ষামূলক; নীতির বাইরে কোন কমিউনিস্টই যাবে না।

প্রশ্ন: উত্তর চীনের সংঘর্ষ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর: চ্যাং য়িন-য়ু ও ছিন চি-জুং এরা দুজন হচ্ছে সংঘর্ষ বাধাবার ব্যাপারে ওস্তাদ। হোপেইতে চ্যাং য়িন য়ু আর শানতুঙে ছিন চি-জুং সোজাসুজি সব নিয়মকানুন—তা মানবীয়ই হোক বা স্বর্গীয়ই হোক—পদদলিত করছে, বিশ্বাসঘাতকদের থেকে তাদের পার্থক্য করা কঠিন। শত্রুদের বিরুদ্ধে তারা খুব কমই লড়াই করে, তাদের যত লড়াই অষ্টম রুট বাহিনীর বিরুদ্ধে। আমরা বহু সন্দেহাতীত প্রমাণ জেনারালিসিমো চিয়াংয়ের কাছে পাঠিয়েছি, যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, অষ্টম রুট বাহিনীর ওপর আক্রমণ সম্বন্ধে তার অধঃস্তনদের প্রতি চ্যাং য়িন-য়ু'র নির্দেশাবলী।

প্রশ্ন: নয়া চতুর্থ বাহিনীর সঙ্গে কি কোন সংঘর্ষ হয়েছে?

উত্তর: হাঁ, হয়েছে বৈকি। পিংকিয়াঙের হত্যাকাণ্ড সমস্ত জাতিকেই হতভম্ব করে দিয়েছে।

প্রশ্ন: কেউ কেউ বলছে যে, যুক্তফ্রন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ঐক্যবদ্ধতার

প্রয়োজনে সীমান্ত অঞ্চলের সরকার ভেঙে দেওয়াই উচিত। এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর: সর্বত্রই বিভিন্ন ধরনের আজেবাজে কথা বলা হয়ে থাকে, সীমান্ত অঞ্চলের সরকার ভেঙে দেওয়া সম্বন্ধে কথাটিও ঐ ধরনেরই একটি দৃষ্টান্ত। শেনসি কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল হচ্ছে একটি জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি অঞ্চল এবং সমগ্র দেশের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে সব থেকে প্রগতিশীল অঞ্চল। একে ভেঙে দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? তা ছাড়া, জেনারালিসিমো চিয়াং বহুদিন হল এই সীমান্ত অঞ্চলকে মেনে নিয়েছেন এবং জাতীয় সরকারের কার্যকরী সংস্থা য়ুয়ানও সরকারীভাবে প্রজাতন্ত্রের ২৬তম বছরের (১৯৩৭) শীতকালে তা মেনে নিয়েছে। চীনকে নিশ্চিতভাবেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, কিন্তু তার ভিত্তি হল প্রতিরোধ, একতা ও প্রগতি। এর বিপরীত ভিত্তিতে যদি একতার দাবি হয়, তবে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিভিন্ন ব্যাখ্যা যখন আছে, তখন কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙে ভাঙন ধরার কি কোন সম্ভাবনা আছে?

উত্তর: শুধু সম্ভাবনার কথাই যদি বলা হয়, তবে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির, বিশেষ করে সমগ্র দেশের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে ঐক্য ও ভাঙন—দুয়েরই সম্ভাবনার কথা বলা যায়। আমাদের কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলতে পারি, আমরা বহুদিন ধরেই বলে আসছি যে, সহযোগিতাই কর্মনীতি, আমরা শুধু দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতার কথাই বলছি না, সেজন্য আমরা দৃঢ়ভাবে কাজও করছি। শুনেছি, কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম বর্ধিত অধিবেশনে জেনারালিসিমো চিয়াং কাই-শেক ঘোষণা করেছেন, আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান শক্তি-প্রয়োগের দ্বারা হওয়া উচিত নয়। শক্তিমান শত্রুর মুখোমুখি হয়ে এবং অতীতের শিক্ষা মনে রেখে চললে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি উভয়কেই বিভেদের পথ পরিত্যাগ করে দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতার পথ অনুসরণ করতেই হবে। বিভেদের আশঙ্কা পরিহার করতে হলে দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতার রাজনৈতিক নিশ্চয়তা চাই, যেমন প্রতিরোধযুদ্ধে অবিচলতা এবং গণতান্ত্রিক সরকারের সূচনা চাই। এর দ্বারাই একতা রক্ষা করা সম্ভব হবে, বিভেদ পরিহার করা যাবে, উভয় পার্টির ও সমগ্র জাতির সাধারণ প্রচেষ্টার ওপর এটা নির্ভর করছে, এবং এটা করতেই হবে। 'প্রতিরোধে অধ্যবসায়ী হও, আত্মসমর্পণের বিরোধিতা কর', 'একতার জন্য

লড়াই কর, বিভেদের বিরোধিতা কর', 'প্রগতির পথে অবিচল থাক, পশ্চাদ্‌-গামিতার বিরোধিতা কর'—এই তিনটি হচ্ছে আমাদের পার্টির তিনটি মহান রাজনৈতিক শ্লোগান, যা এ বছরের ৭ই জুলাই তারিখে আমরা দিয়েছি। আমাদের মতে এই পথ অনুসরণ করেই চীন পরাজয় থেকে রক্ষা পেতে পারে, পারে শত্রুকে দূর করে দিতে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

টীকা

১। এই কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থাটি ছিল কুওমিনতাঙের সরকারী সংবাদ সংস্থা। 'সাও তাং পাও' ছিল কুওমিনতাঙ সরকারের সামরিক বিভাগের পত্রিকা। আর 'শিন মিন পাও' ছিল জাতীয় বুর্জোয়াদের অন্যতম পত্রিকা।

২। ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের 'জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচী' দ্রষ্টব্য। চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল চক্র অনেকদিন ধরেই তাদের নির্মম প্রতিবিপ্লবী একনায়কত্বের পক্ষে যুক্তি খাড়া করার জন্য একে ডঃ সানের পরিকল্পিত 'সামরিক শাসন' বা 'রাজনৈতিক রক্ষণাবেক্ষণ' বলে সাফাই গাইবার চেষ্টা করত।

৩। ডঃ সান ইয়াৎ-সেন এই বিবৃতিটি দিয়েছিলেন ১৯২৪ সালের ১০ই নভেম্বর, ফেং উ-সিয়াঙের আমন্ত্রণে ক্যান্টন থেকে পিকিং যাবার দুদিন আগে। এই বিবৃতিতে ডাঃ সান্ সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের বিরোধিতা আবার ঘোষণা করে দেশের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য একটি জাতীয় পরিষদ আহ্বান করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এবং তাঁর এই বিবৃতি সারা দেশের সমর্থনলাভ করেছিল। ফেং উ-সিয়াং প্রথমে চিহ্‌লি যুদ্ধবাজদের চক্রের লোক হলেও, ১৯২৪ সালে দ্বিতীয়বার তাদের সংগে ফেংতিয়ান যুদ্ধবাজদের চক্রের যখন যুদ্ধ বাধে, তখন তিনি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে তাঁর সৈন্যদের পিকিঙে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, এবং তার ফলে চিহ্‌লি যুদ্ধবাজদের আসল নেতা উ পেই-ফুর পতন ঘটে। এরপরই তিনি ডঃ সানকে পিকিঙে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

সংগে সংগে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। আজকের সংকটময় পরিস্থিতিতে যখন প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলেছে, তখন জাতীয় পরাজয়ের বিপর্যয় এড়াবার জন্য এবং শত্রুকে দূরীভূত করার জন্য অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের আহ্বান এবং গণতান্ত্রিক সরকারের প্রচলন অত্যাবশ্যকীয়। অবশ্য এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। কারও কারও অভিমত হচ্ছে যে, সাধারণ লোক অজ্ঞ, সুতরাং গণতান্ত্রিক সরকারের প্রচলন সম্ভব নয়। এরা ভুল করছে। যুদ্ধের মধ্যে সাধারণ লোকের প্রভূত উন্নতি হয়েছে, এবং সঠিক নীতি ও নেতৃত্ব পেলে গণতান্ত্রিক সরকার নিশ্চিতভাবেই প্রচলিত হতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, উত্তর চীনে এর প্রচলন হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি জেলা ও শহরে, 'পাও' ও 'চিয়ার' প্রধানরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। এমনকি কোন কোন 'কাউন্টির ম্যাজিস্ট্রেটরাও এই পদ্ধতিতেই নিযুক্ত হয়েছে, এবং নির্বাচিত হয়েছেন প্রগতিবাদী ব্যক্তিরা ও সম্ভাবনাসম্পন্ন যুবকেরা। বিষয়টিকে জনগণের আলোচনার জন্য ছেড়ে দেওয়াটাই উচিত হবে।

আপনাদের তালিকার দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রশ্নাবলীতে আপনারা 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিগুলোর দমন সম্বন্ধে' অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলে যে সংঘর্ষ চলছে তার সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে আপনাদের দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক। বর্তমানে কিছু কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে বটে, তবে মূলতঃ পরিস্থিতিটা কিন্তু অপরিবর্তিতই থেকে গেছে।

প্রশ্ন: এ বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টি কি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার অবস্থানটি স্পষ্টভাবে রেখেছে?

উত্তর: আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি।

প্রশ্ন: কিভাবে?

উত্তর: আমাদের পার্টির প্রতিনিধি চৌ এন-লাই গত জুলাই মাসে জেনারালিসিমো চিয়াং কাই-শেককে চিঠি লিখেছেন। তারপর ১লা আগস্ট ইয়েনানের বিভিন্ন জীবিকাশ্রয়ী ব্যক্তিরা মিলে জেনারালিসিমোকে এবং নানকিং সরকারের কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিগুলোর দমন সম্বন্ধে' এই নির্দেশটা প্রত্যাহার করে নেবার জন্য দাবি জানান, যে নির্দেশটা সংগোপনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যেটা বিভিন্ন অঞ্চলে যে 'সংঘর্ষ' চলেছে তার মূলে কাজ করছে।

প্রশ্ন: কেন্দ্রীয় সরকার কি কোন জবাব পাঠিয়েছে?

উত্তর : না। তবে শোনা যাচ্ছে যে কুওমিনতাঙের কিছু কিছু ব্যক্তি এইসব ব্যবস্থার বিরোধী। সবাই জানেন যে, যে-সামরিক বাহিনী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে সে-বাহিনী বন্ধু-বাহিনী, 'বিদেশী ভাবাপন্ন' বাহিনী নয়। একইভাবে, যে-কোন পার্টি জাপানের বিরুদ্ধে সাধারণ সমস্বার্থে লড়ছে সে-পার্টি বন্ধু-পার্টি, 'বিদেশী ভাবাপন্ন' পার্টি নয়। প্রতিরোধ-যুদ্ধে-বহু পার্টি ও গ্রুপ যোগ দিয়েছে, তাদের শক্তির তারতম্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা সবাই সাধারণ সমস্বার্থেই লড়ছে; নিশ্চয়ই তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হবে এবং কোনমতেই একে অপরকে 'দমন' করবে না। বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টি কাকে বলে? জাপানের পোষা কুকুর ওয়াং চিং-ওয়েইর নেতৃত্বাধীন দলই হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকদের দল, কারণ জাপ-বিরোধী পার্টিগুলোর সমস্বার্থসম্বলিত কোন রাজনীতিই তার নেই, এইধরনের পার্টিগুলোকেই দমন করা দরকার। কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে রয়েছে সমস্বার্থভিত্তিক রাজনীতি, যেমন জাপ-হানাদারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। সুতরাং আমাদের সামনে সমস্যাটি হচ্ছে জাপান ও ওয়াং চিং ওয়েইর বিরুদ্ধে বিরোধিতা ও প্রতিরোধ সংগঠিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের সমস্যা, কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করা বা তার প্রতিরোধ নয়। সঠিক শ্লোগান উদ্ভাবনের এটাই হচ্ছে একমাত্র ভিত্তি। ওয়াং চিং-ওয়েইর তিনটি শ্লোগান হচ্ছে 'চিয়াং কাই-শেকের বিরোধিতা কর', 'কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা কর', এবং 'জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর'। ওয়াং চিং-ওয়েই হচ্ছে কুওমিনতাঙের শত্রু, কমিউনিস্ট পার্টির শত্রু এবং সমগ্র জনগণের শত্রু। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনতাঙের শত্রু নয়। কাজেই পরস্পরের বিরোধিতা বা 'দমন' নয়, বরং এদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, পরস্পরের সাহায্যে আসতে হবে। আমাদের দিকের শ্লোগান হবে ওয়াং চিং-ওয়েইর শ্লোগানের থেকে আলাদা, ঠিক বিপরীত, তার শ্লোগানের সঙ্গে এগুলিকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। সে যদি বলে: 'চিয়াং কাই শেকের বিরোধিতা কর', তাহলে প্রত্যেকেরই চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন জানানো উচিত, যদি সে বলে: 'কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা কর', তবে প্রত্যেকেরই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত; এবং যদি সে বলে: 'জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর' তবে প্রত্যেকেরই জাপ-প্রতিরোধে যাওয়া উচিত। শত্রু যা-কিছুরই বিরোধিতা করবে আমাদের তাকেই সমর্থন করতে হবে, সে যা সমর্থন করবে আমাদের তারই বিরোধিতা করতে

হবে। আজকাল বিভিন্ন লেখায় অনেকেই এই উদ্ধৃতিটি দিচ্ছে: 'বন্ধুদের মনে দুঃখ দিও না, শত্রুদের খুশি কর না।' পূর্বাঞ্চলের হান বংশের লিউ সিউয়ের অধীনস্থ সেনাধ্যক্ষ চু ফু য়ুয়াঙের নগরপাল পেং চুংকে একটা চিঠিতে এ কথাটি লিখেছিলেন। চিঠিতে আছে 'যাই তুমি কর না কেন, তোমায় নিশ্চিত হতে হবে যে, তুমি তোমার বন্ধুদের মনে দুঃখ দিচ্ছ না এবং শত্রুকে খুশি করছ না।' চু ফু'র কথাগুলো একটা বিশেষ রাজনৈতিক নীতির কথা তুলে ধরেছে, যা আমরা কখনই ভুলতে পারি না।

আপনাদের প্রশ্নাবলীতে আপনারা আরও জিজ্ঞেস করেছেন 'সংঘর্ষ' হিসেবে অভিহিত বিষয় সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি'র দৃষ্টিভঙ্গি কি। আপনাদের খোলাখুলিভাবেই বলছি, জাপ-বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের আমরা বিরোধী, এর দ্বারা আমাদের শক্তির ক্ষয় হয়। কিন্তু কেউ যদি আমাদের বিরুদ্ধে হিংস্রতা চালিয়েই যেতে চায়, আমাদের দমন করতে বদ্ধপরিকর হয়, তবে কমিউনিস্ট পার্টিকে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতেই হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে: আমাদের আক্রমণ না করলে আমরা আক্রমণ করব না, আমরা যদি আক্রান্ত হই তাহলে আমরা নিশ্চয়ই প্রতি-আক্রমণ করব। আমাদের অবস্থান হচ্ছে পুরোপুরি আত্মরক্ষামূলক; নীতির বাইরে কোন কমিউনিস্টই যাবে না।

প্রশ্ন: উত্তর চীনের সংঘর্ষ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর: চ্যাং য়িন-য়ু ও ছিন চি-জুং এরা দুজন হচ্ছে সংঘর্ষ বাধাবার ব্যাপারে ওস্তাদ। হোপেইতে চ্যাং য়িন যু আর শানতুঙে ছিন চি-জুং সোজাসুজি সব নিয়মকানুন—তা মানবীয়ই হোক বা স্বর্গীয়ই হোক—পদদলিত করছে, বিশ্বাসঘাতকদের থেকে তাদের পার্থক্য করা কঠিন। শত্রুদের বিরুদ্ধে তারা খুব কমই লড়াই করে, তাদের যত লড়াই অষ্টম রুট বাহিনীর বিরুদ্ধে। আমরা বহু সন্দেহাতীত প্রমাণ জেনারালিসিমো চিয়াংয়ের কাছে পাঠিয়েছি, যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, অষ্টম রুট বাহিনীর ওপর আক্রমণ সম্বন্ধে তার অধঃস্তনদের প্রতি চ্যাং য়িন-য়ু'র নির্দেশাবলী।

প্রশ্ন: নয়া চতুর্থ বাহিনীর সঙ্গে কি কোন সংঘর্ষ হয়েছে?

উত্তর: হাঁ, হয়েছে বৈকি। পিংকিয়াঙের হত্যাকাণ্ড সমস্ত জাতিকেই হতভম্ব করে দিয়েছে।

প্রশ্ন: কেউ কেউ বলছে যে, যুক্তফ্রন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ঐক্যবদ্ধতার

প্রয়োজনে সীমান্ত অঞ্চলের সরকার ভেঙে দেওয়াই উচিত। এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি ?

উত্তর : সর্বত্রই বিভিন্ন ধরনের আজেবাজে কথা বলা হয়ে থাকে, সীমান্ত অঞ্চলের সরকার ভেঙে দেওয়া সম্বন্ধে কথাটিও ঐ ধরনেরই একটি দৃষ্টান্ত। শেনসি কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল হচ্ছে একটি জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি অঞ্চল এবং সমগ্র দেশের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে সব থেকে প্রগতিশীল অঞ্চল। একে ভেঙে দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ? তা ছাড়া, জেনারালিসিমো চিয়াং বহুদিন হল এই সীমান্ত অঞ্চলকে মেনে নিয়েছেন এবং জাতীয় সরকারের কার্যকরী সংস্থা য়ুয়ানও সরকারীভাবে প্রজাতন্ত্রের ২৬তম বছরের (১৯৩৭) শীতকালে তা মেনে নিয়েছে। চীনকে নিশ্চিতভাবেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, কিন্তু তার ভিত্তি হল প্রতিরোধ, একতা ও প্রগতি। এর বিপরীত ভিত্তিতে যদি একতার দাবি হয়, তবে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিভিন্ন ব্যাখ্যা যখন আছে, তখন কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙে ভাঙন ধরার কি কোন সম্ভাবনা আছে ?

উত্তর : শুধু সম্ভাবনার কথাই যদি বলা হয়, তবে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির, বিশেষ করে সমগ্র দেশের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে ঐক্য ও ভাঙন—দুয়েরই সম্ভাবনার কথা বলা যায়। আমাদের কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলতে পারি, আমরা বহুদিন ধরেই বলে আসছি যে, সহযোগিতাই কর্মনীতি, আমরা শুধু দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতার কথাই বলছি না, সেজন্য আমরা দৃঢ়ভাবে কাজও করছি। শুনেছি, কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম বর্ধিত অধিবেশনে জেনারালিসিমো চিয়াং কাই-শেক ঘোষণা করেছেন, আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান শক্তি-যোগের দ্বারা হওয়া উচিত নয়। শক্তিমান শত্রুর মুখোমুখি হয়ে এবং অতীতের শিক্ষা মনে রেখে চললে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি উভয়কেই বিভেদের পথ পরিত্যাগ করে দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতার পথ অনুসরণ করতেই হবে। বিভেদের আশঙ্কা পরিহার করতে হলে দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতার রাজনৈতিক নিশ্চয়তা চাই, যেমন প্রতিরোধযুদ্ধে অবিচলতা এবং গণতান্ত্রিক সরকারের সূচনা চাই। এর দ্বারাই একতা রক্ষা করা সম্ভব হবে, বিভেদ পরিহার করা যাবে, উভয় পার্টির ও সমগ্র জাতির সাধারণ প্রচেষ্টার ওপর এটা নির্ভর করছে, এবং এটা করতেই হবে। 'প্রতিরোধে অধ্যবসায়ী হও, আত্মসমর্পণের বিরোধিতা কর', 'একতার জন্য

লড়াই কর, বিভেদের বিরোধিতা কর', 'প্রগতির পথে অবিচল থাক, পশ্চাদ্‌গামিতার বিরোধিতা কর'—এই তিনটি হচ্ছে আমাদের পার্টির তিনটি মহান রাজনৈতিক শ্লোগান, যা এ বছরের ৭ই জুলাই তারিখে আমরা দিয়েছি। আমাদের মতে এই পথ অনুসরণ করেই চীন পরাজয় থেকে রক্ষা পেতে পারে, পারে শত্রুকে দূর করে দিতে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

টীকা

১। এই কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থাটি ছিল কুওমিনতাঙের সরকারী সংবাদ সংস্থা। 'সাও তাং পাও' ছিল কুওমিনতাঙ সরকারের সামরিক বিভাগের পত্রিকা। আর 'শিন মিন পাও' ছিল জাতীয় বুর্জোয়াদের অন্যতম পত্রিকা।

২। ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের 'জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচী' দ্রষ্টব্য। চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল চক্র অনেকদিন ধরেই তাদের নির্মম প্রতিবিপ্লবী একনায়কত্বের পক্ষে যুক্তি খাড়া করার জন্য একে ডঃ সানের পরিকল্পিত 'সামরিক শাসন' বা 'রাজনৈতিক রক্ষণাবেক্ষণ' বলে সাফাই গাইবার চেষ্টা করত।

৩। ডঃ সান ইয়াৎ-সেন এই বিবৃতিটি দিয়েছিলেন ১৯২৪ সালের ১০ই নভেম্বর, ফেং উ-সিয়াঙের আমন্ত্রণে ক্যান্টন থেকে পিকিং যাবার দুদিন আগে। এই বিবৃতিতে ডাঃ সান্ সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের বিরোধিতা আবার ঘোষণা করে দেশের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য একটি জাতীয় পরিষদ আহ্বান করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এবং তাঁর এই বিবৃতি সারা দেশের সমর্থনলাভ করেছিল। ফেং উ-সিয়াং প্রথমে চিহ্‌লি যুদ্ধবাজদের চক্রের লোক হলেও, ১৯২৪ সালে দ্বিতীয়বার তাদের সংগে ফেংতিয়ান যুদ্ধবাজদের চক্রের যখন যুদ্ধ বাধে, তখন তিনি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে তাঁর সৈন্যদের পিকিঙে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, এবং তাঁর ফলে চিহ্‌লি যুদ্ধবাজদের আসল নেতা উ পেই-ফুর পতন ঘটে। এরপরই তিনি ডঃ সানকে পিকিঙে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মানবজাতির স্বার্থ অভিন্ন

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাইশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময় এগিয়ে আসায় চীন-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতি আমাকে একটা লেখা দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমার নিজস্ব ধারণা অনুসারে আমি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে কিছু বলতে চাই। কেননা, বর্তমানে চীনের জনগণ সেগুলো নিয়েই আলোচনা করছেন এবং মনে হচ্ছে, কোন সিদ্ধান্তে এখনো পর্যন্ত পৌছানো যায়নি। যারা ইউরোপের যুদ্ধ ও চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক নিয়ে ভাবছেন, এই সুযোগে তাঁদের বিবেচনার জন্য আমরা মতামত তুলে ধরাটা সম্ভবতঃ সুবিধেজনকই হবে।

কেউ কেউ বলছেন, দুনিয়ায় শান্তি বজায় থাকুক, এটা সোভিয়েত ইউনিয়ন চায় না, কারণ একটা বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গেলেই সেটা তার পক্ষে সুবিধেজনক হবে, আর বর্তমান যুদ্ধটাও বাধিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নই—ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি না করে জার্মানির সংগে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে। আমার মতে, এ ধারণা ভুল। দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক-ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে আসছে, সেটা হচ্ছে শান্তির নীতি, এবং এ নীতি গড়ে উঠেছে তার স্বার্থের সংগে মানবজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। তার নিজের সমাজ-তান্ত্রিক গঠনকাযের প্রয়োজনেই সোভিয়েত ইউনিয়ন সব সময়েই শান্তি চেয়ে এসেছে, সব সময়েই তার দরকার হয়েছে অন্যান্য দেশের সংগে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ককে জোরদার করার এবং একটি সোভিয়েত-বিরোধী যুদ্ধ ঠেকাবার। দুনিয়া জুড়ে-শান্তি রক্ষার স্বার্থেই তার আরও দরকার হয়ে পড়েছে ফ্যাসিষ্ট দেশগুলির আক্রমণ প্রতিহত করার, তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলির যুদ্ধ-বাজি সীমিত করে রাখার, এবং একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সূত্রপাতকে যতদিন সম্ভব বিলম্বিত করে দেবার। দীর্ঘদিন ধরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব শান্তির জন্য প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। যেমন, সে লীগ অব নেশানস-এ[১] যোগ দিয়েছে, ফ্রান্স ও চেকোস্লোভাকিয়ার সংগে পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি[২] সম্পাদন

করেছে, এবং আপ্রাণ চেষ্টা করেছে যাতে ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশ, যারা শান্তি-রক্ষায় সচেষ্ট হতে পারে, তাদের সংগে নিরাপত্তা-চুক্তি সম্পাদনের জন্য। জার্মানি ও ইতালী যখন যুক্তভাবে স্পেনের ওপর আক্রমণ করল এবং যখন ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স লোক-দেখানো 'হস্তক্ষেপ না করার' নীতি গ্রহণ করে আসলে আক্রমণ না দেখার ভান করে চলতে লাগল, একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই তখন সেই 'হস্তক্ষেপ না করার' নীতির তীব্র বিরোধিতা করে জার্মানি ও ইতালীর আক্রমণের বিরুদ্ধে স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক শক্তিসমূহের প্রতিরোধ-সংগ্রামে সাহায্য প্রেরণ করেছিল। জাপান যখন চীনের ওপর আক্রমণ করল, এবং যখন সেই একই তিন-শক্তি একই ধরনের 'হস্তক্ষেপ না করার' নীতি গ্রহণ করে চলতে থাকল, সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন শুধুমাত্র চীনের সংগে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনই করেনি, সে চীনকে তার প্রতিরোধ-সংগ্রামে কার্যকরী সাহায্যও প্রেরণ করেছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স যখন হিটলারের আক্রমণ না দেখার ভান করে অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে বিসর্জন দিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন তার সর্বক্ষমতা দিয়ে মিউনিক কর্মনীতির প্রকৃত কুৎসিৎ লক্ষ্য উদ্ঘাটন করে দিতে থাকে এবং সেই সংগে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছে কিভাবে আক্রমণ রোধ করা সম্ভব হবে সে সম্বন্ধে প্রস্তাব দেয়। এ বছর বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে পোল্যাণ্ড যখন বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, এবং এখান থেকেই বিশ্বযুদ্ধ লাগার আশংকা দেখা দিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন চেম্বারলিন ও দালাদিয়েরের আন্তরিকতায় সম্পূর্ণ অভাবের কথা জানা সত্ত্বেও চার মাস ধরে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সংগে আলোচনা চালিয়ে গেল, যাতে একটা পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হয় এবং যুদ্ধ ঠেকানো যায়। কিন্তু ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অনুসৃত কর্মনীতিই হচ্ছে যুদ্ধ যে হতে যাচ্ছে তা না দেখার ভান করা, যুদ্ধে প্ররোচনা জোগানো, যুদ্ধের বিস্তারসাধন করা এবং এইভাবে বিশ্বের শান্তি ব্যাহত হয়, যার ফলে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায়। তারা সোভিয়েতের সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল করে দিতে থাকে। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের সরকারগুলির যুদ্ধ রোধার সত্যিকারের কোন ইচ্ছাই নেই; বরং তাদের প্রচেষ্টাই হচ্ছে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া। সমতা ও পরস্পর নির্ভরতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তিকে কার্যকরী করার সোভিয়েত প্রস্তাব তারা মেনে না নেওয়ায় এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা যুদ্ধ চায়, শান্তি চায় না। সবাই জানেন যে, আজকের দুনিয়ায় সোভিয়েতকে প্রত্যাখান

করার অর্থই হচ্ছে শান্তি প্রত্যাখান করা। এমনকি ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের সেই বিশেষ প্রতিনিধি লয়েড জর্জের মতো লোকও এ কথা জানেন।* - এইরকম পরিস্থিতিতে জার্মানি যখন তার সোভিয়েত-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার, 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে চুক্তি' পরিত্যাগ করার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানা অলঙ্ঘনীয় বলে স্বীকৃতি দেবার প্রস্তাব দিল, তখনই কেবল সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হল। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের পবিকল্পনাই ছিল জার্মানিকে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করানো, যাতে তারা 'পাহাড়ের চূড়ায় বসে বাঘের খেলা দেখতে পাবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানির পরস্পবেব শক্তিক্ষয় হয়ে যাবার পর মঞ্চে নেমে এসে সবকিছু দখলে নিতে পারে। সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি এই চক্রান্তকে চুরমার করে দিয়েছে। এই ষড়যন্ত্রটির দিকে এবং ইঙ্গ-ফবাসী সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ না দেখার ভান, প্ররোচনা দেবার এবং প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার পরিকল্পনার দিকে না তাকিয়ে আমাদের দেশের কিছু কিছু লোক এইসব চক্রান্তের মিষ্টি বুলিতে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। এই ধূর্ত রাজনীতিজ্ঞরা স্পেনের ওপর আক্রমণ, চীনের ওপর আক্রমণ, কিংবা অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর আক্রমণ বন্ধ করার ব্যাপাবে একটুও আগ্রহ দেখায়নি, বরং তারা আক্রমণগুলোকে না দেখার ভান কবেছে, যুদ্ধের প্ররোচনা দিয়েছে, এবং বঁড়শী ও চার দুজনের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে দুটোকেই ধরার সুযোগের প্রতীক্ষা করার সেই চিরাচরিত জেলের খেলাটাই খেলে গেছে। তাবা বুলি দিয়েছে যে, 'হস্তক্ষেপ না করাটাই' নাকি তাদেব নীতি ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা যেকাজটা করেছে তা হল 'পাহাড়ের চূড়ায় বসে বাঘের খেলা দেখা'। পৃথিবীব সর্বত্র বেশ কিছু লোক চেম্বারলিন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের মধুমাখা কথা শুনে বিভ্রান্ত হয়েছে, তাদের হাসির আবরণে ঢাকা খুনীর উদ্দেশ্যটি তারা দেখতে পায়নি, তারা বুঝতে পারেনি যে, এই সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছে তখনই, যখন চেম্বারলিন ও দালাদিয়ের সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা প্রমাণ করে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ ও মানবজাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বার্থ অভিন্ন। এই হচ্ছে প্রথম প্রশ্নটি, যার কথা আমি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম।

কিছু কিছু লোক বলছে, এখন যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বোধহয় কোন একটা পক্ষ অবলম্বন করবে—অর্থাৎ সোভিয়েতের লালফৌজ জার্মান সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টে যোগ দেবে। এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলেই আমি মনে করি। ইঙ্গ-ফরাসী বা জার্মান যে-কোন পক্ষের বিচারেই হোক না কেন, যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সে-যুদ্ধ অন্যায়ের যুদ্ধ, লুণ্ঠনের যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহকে এবং জনগণকে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে এবং উভয় আক্রমণকারীদের চরিত্রই উদ্ঘাটিত করে দিতে হবে, কারণ এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুধু ক্ষয়ক্ষতিই বহন করে নিয়ে আসে, বিশ্বের জনগণের জন্য কোনরকম সুবিধে তা নিয়ে আসে না। সামাজিক-গণতন্ত্রী পার্টিগুলোর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমর্থন ও সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার কাজকেও স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ, যে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতাসীন, এবং সেই কারণে যুদ্ধ বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি তার আছে: (১) কোন অন্যায়, লুণ্ঠনকারী এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগ দেওয়ার বিষয়টিকে সে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং সব আক্রমণকারীদের সম্বন্ধেই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। সুতরাং সোভিয়েত লালফৌজ কখনো নীতি পরিত্যাগ করে দুটি সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের কোন পক্ষের সঙ্গেই হাত মেলাবে না। (২) সোভিয়েত ইউনিয়ন কার্যকরীভাবে লুণ্ঠনবিরোধী মুক্তি যুদ্ধের সমর্থন করবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তের বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের জনগণের উত্তরাভিযানের যুদ্ধে এবং গত বছর জার্মানি ও ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে স্পেনের জনগণকে সাহায্য দিয়েছে, বিগত দুবছর হল জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে চীনা জনগণকে সাহায্য দিচ্ছে, বিগত কয়েক মাস হল সাহায্য দিচ্ছে মঙ্গোলিয়ার জনগণকে জাপানের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধে; এবং নিশ্চিতভাবেই সে ভবিষ্যতে কোন দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সে-দেশের জনগণকে সাহায্য দেবে, নিশ্চিতভাবেই সে সাহায্য দেবে শান্তিরক্ষার পক্ষে পরিচালিত যে-কোন যুদ্ধে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিগত ২২ বছরের ইতিহাসই তার প্রমাণ বহন করছে এবং ভবিষ্যতেও তার আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে। সোভিয়েত-জার্মান বাণিজ্যচুক্তি অনুসারে জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েতের ব্যবসাকে কেউ কেউ মনে করছে যুদ্ধে জার্মানির দিকে সোভিয়েতের পদক্ষেপ। এই দৃষ্টিভঙ্গিটিও ভ্রান্ত, কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যকে যুদ্ধের সংগে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যকে কোনমতেই যুদ্ধে সাহায্য বা সাহায্য প্রদানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্পেন-যুদ্ধের সময়েও সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানি এবং ইতালীর সঙ্গে বাণিজ্য করেছে এবং সে-সময়ে কেউই কোথাও এ কথা বলেনি যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানি ও ইতালীকে তাদের স্পেনের ওপর আক্রমণে সাহায্য করেছে, বরং জনগণ বলেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যে স্পেনকে প্রতিরোধ-যুদ্ধে সাহায্য করেছে, তার কারণ ছিল এই যে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকৃতপক্ষেই স্পেনকে সাহায্য করেছে। আবার ধরুন, বর্তমান চীন-জাপান যুদ্ধের সময়েও জাপানের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্য রয়েছে, কিন্তু কেউই কোথায়ও এ কথা বলছে না যে চীনের ওপর হানাদারীতে জাপানকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন সাহায্য করছে, বরং জনসাধারণ বলছেন যে, হানদারীর প্রতিরোধে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে সাহায্য করছে, এবং তার কারণটি হল এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকৃতপক্ষে চীনকেই সাহায্য করছে। বর্তমানে যুদ্ধে লিপ্ত দুই পক্ষেরই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ব্যবসা রয়েছে, কিন্তু একে দুই পক্ষের কাউকেই সাহায্য হিসেবে ভাবা যাবে না, যুদ্ধে সাহায্য দেওয়ার কথা তো ওঠেই না। যদি যুদ্ধের চরিত্র বদলায়, যদি কোন একটি বা কয়েকটি দেশে কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটে এবং তা সোভিয়েতের ও বিশ্বজনগণের পক্ষে সুযোগ সৃষ্টি করে, তখনই কেবল সোভিয়েতের পক্ষে তাতে সাহায্য করার বা যোগদানের প্রশ্ন উঠতেপারে, অন্যথায় তা সম্ভব নয়। কম-বেশি সুবিধের চুক্তিতে সোভিয়েত দুই পক্ষের সঙ্গে যে বাণিজ্য করছে, সে-সম্বন্ধে বলা যায় সুবিধের পার্থক্যটি নির্ভরশীল সোভিয়েতের প্রতি বন্ধুত্ব বা শত্রুতার ওপর, এবং তা নির্ভর করছে আক্রমণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। কিন্তু কোন বিশেষ দেশ বা কয়েকটি দেশ যদি সোভিয়েত-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেও, তবুও সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক বন্ধ করে দেবে না—যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখবে, বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করবে এবং যুদ্ধ ঘোষণা না করবে। ২৩শে আগস্টের আগে পর্যন্ত জার্মানি যেমন করেছিল। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এ কথা বুঝতে হবে যে, এই ধরনের বাণিজ্য-সম্পর্ক সাহায্য বোঝায় না, যুদ্ধে যোগদান তো নয়ই। এই হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্নটি, যা আমি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম।

পোল্যাণ্ডে সোভিয়েত ফৌজের প্রবেশে চীনদেশের অনেকে বিহ্বল হয়ে

পড়েছে।[8] পোল্যাণ্ডের প্রশ্নটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে, বিচার করতে হবে জার্মানির দিক থেকে, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দিক থেকে, পোল্যাণ্ডের সরকারের দিক থেকে, পোল-জনগণের দিক থেকে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে। পোল জনগণকে লুণ্ঠনের জন্য এবং ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টের একটা পার্শ্বদেশ ভেঙে দেবার জন্য জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছে। কিন্তু চরিত্রগতভাবে জার্মানির যুদ্ধও সাম্রাজ্যবাদী এবং তা শুধু স্বীকার করে নেওয়া নয়, তার বিরোধিতাও করতে হবে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দিক থেকে, তারা পোল্যাণ্ডকে তাদের লগ্নী পুঁজির মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করেছে, লুণ্ঠনের জন্য, নতুন বিশ্ববিভাগে জার্মান-সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের সামনে বলি হিসেবে তুলে ধরে তাকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টের এক পার্শ্বদেশ হিসেবে খাড়া করে দিয়েছে। সুতরাং তাদেব যুদ্ধ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, তাদের তথাকথিত সাহায্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পোল্যাণ্ডেব ওপব জার্মান আধিপত্যের পথ তৈরী করে দিয়ে তাকে তুষ্ট করা, এবং এই যুদ্ধেরও বিরোধিতা করতে হবে, তাব স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। পোল সরকারের দিক বিচাব কবে বলা যায়, এটা একটা ফ্যাসিষ্ট সরকার, পোল জমিদার ও বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার, যে সরকার শ্রমিক ও কৃষকদের চবম হিংস্রতার সংগে শোষণ করে এবং পোল গণতন্ত্রীদের ওপর চরম অত্যাচার করে। তা ছাড়া এই সরকারটি হচ্ছে বৃহত্তর পোল্যাণ্ডের উগ্র জাতি-দাম্ভিকতার সরকার, যাবা অত্যন্ত জিঘাংসাব সংগে পোল নয় এমন সমস্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিসমূহের ওপর নির্যাতন চালায়—যেমন উক্রেনীয়, বিয়েলোরুশীয়, ইহুদী, জার্মান, লিথুয়ানীয় ও অন্যান্যদের ওপর, যাদের মোট সংখ্যা হবে এক কোটিরও ওপর। এই সরকার নিজেই সাম্রাজ্যবাদী। এই প্রতিক্রিয়াশীল পোল সরকার ইচ্ছে করেই ব্রিটিশ ও ফরাসী লগ্নী পুঁজির যুদ্ধে কামানের খোরাক হিসেবে ব্যবহারের জন্য পোল জনগণকে পাঠাচ্ছে, ইচ্ছে করেই আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির প্রতিক্রিয়াশীল ফ্রণ্টের একটা অংশ হিসেবে কাজ করছে। বিগত বিশ বছর ধরে পোল সরকার নিরন্তব সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করেছে এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নেব সঙ্গে আলোচনাকালে সে একগুঁয়েভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছে। তা ছাড়াও, এ সরকার সম্পূর্ণভাবে অযোগ্য সরকার, যার ১৫ লক্ষ সামরিক বাহিনী থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রথম আঘাতেই মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যেই, সমগ্র দেশটাকে সে ধ্বংসের

মধ্যে এনে ফেলেছে, সমস্ত পোল জনগণকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পায়ের নীচে ঠেলে দিয়েছে। এইসব হচ্ছে পোল সরকারের অন্যায় কার্যকলাপের দীর্ঘ তালিকা, এবং এর জন্য কোনরকম সহানুভূতি দেখানোটাও নিতান্তই সময়ের অপচয়। পোল জনগণকে আসলে বলি দেওয়া হয়েছে; জার্মান ফ্যাসিস্টদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের রুখে দাঁড়াতে হবে, উঠে দাঁড়াতে হবে তাদের নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার ও বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং স্বতন্ত্র, স্বাধীন গণতান্ত্রিক পোল সরকার গঠন করতে হবে। নিঃসন্দেহ আমাদের সহানুভূতি রয়েছে পোল জনগণের প্রতি। সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে বিচারে দেখা যাচ্ছে যে, তার কাজ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত হয়েছে। দু'টা সমস্যার মুখোমুখি তাকে হতে হয়েছিল। প্রথম সমস্যাটি ছিল: জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পায়ের তলায় সমগ্র পোল্যাণ্ডকে ছেড়ে দেওয়া হবে, না পূর্ব পোল্যাণ্ডের সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিসমূহকে তাদের মুক্তি অর্জনে সাহায্য করবে। দ্বিতীয় পথটিই সে গ্রহণ করল। বিয়েলোরুশীয় ও উক্রেনীদের বাসস্থান এই বিরাট অঞ্চল সেই ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দেই জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তির মাধ্যমে সদ্যজাত সোভিয়েত সরকারের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, এবং তারপর এই অঞ্চলটিকে খুশিমত ভার্সাই চুক্তি অনুসারে প্রতিক্রিয়াশীল পোল সরকারের আধিপত্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন যা করেছে তা হল তার হৃত অঞ্চল পুনরধিকার মাত্র, অত্যাচারিত বিয়েলোরুশী ও উক্রেনীদের মুক্ত করে এনে জার্মান অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছে। গত কয়েকদিনের সংবাদে দেখা যাচ্ছে, সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি-গুলো কী প্রভূত সম্বর্ধনাসহ স্বাগত জানাচ্ছে লালফৌজকে, তারা মুক্তিদাতাদের খাদ্য ও পানীয় দিচ্ছে; পশ্চিমাঞ্চল থেকে গিয়ে যে-অঞ্চল জার্মান সৈন্যবাহিনী অধিকার করে বসেছে, কিংবা পশ্চিম জার্মানির অংশ থেকে যে-অঞ্চল ফরাসী সামরিক বাহিনী অধিকার করেছে এ ধরনের কোন রিপোর্টই সেখান থেকে পাওয়া যাবে না। স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ হচ্ছে লুণ্ঠনহীন মুক্তিযুদ্ধ, যে-যুদ্ধ দুর্বল ও ছোট ছোট জাতিগুলোকে সাহায্য করছে তাদের জনগণের মুক্তি অর্জনে। অন্যদিকে জার্মানি, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যে-যুদ্ধ চালাচ্ছে, তা অন্যায় যুদ্ধ, লুণ্ঠন ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, অন্যান্য জাতি ও জনগণের ওপর অত্যাচার চালানোর যুদ্ধ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে দ্বিতীয় সমস্যাটি হল চেম্বারলিনের অনুসৃত সোভিয়েত-বিরোধী পুরানো প্রচেষ্টা।

চেম্বারলিনের কর্মনীতি হল প্রথমতঃ পশ্চিমদিক থেকে চাপ সৃষ্টির জন্য জার্মানির ওপর বিরাট অবরোধ তৈরী করা ; দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করে ইতালী, জাপান ও উত্তর ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোকে টেনে নিয়ে এসে জার্মানিকে আলাদা করে ফেলা ; এবং তৃতীয়তঃ, জার্মানিকে ঘুষ দেওয়া, পোল্যাণ্ড, এমনকি হাঙ্গেরী ও রুমানিয়াকেও তার অধিকারে ছেড়ে দেওয়া। সংক্ষেপে, চেম্বারলিনের সমস্ত প্রচেষ্টাই হল জার্মানি যাতে সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিটি পরিত্যাগ করে, এবং যাতে তার বন্দুকের মুখ সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঘুরিয়ে ধরে, তারজন্য সর্বপ্রকারের ভীতি প্রদর্শন ও ঘুষ দেওয়া। এই ষড়যন্ত্রটি কিছুদিন হল চলেছে এবং আরও কিছুদিন ধরে চলবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নিজস্ব অঞ্চল পুনরধিকার ও সেখানকার দুর্বল ও সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিসমূহের মুক্তি অর্জনে সাহায্য করার জন্য পূর্ব পোল্যাণ্ডে শক্তিমান সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর প্রবেশ প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পূর্বদিকে জার্মান হানাদারীর পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং চেম্বারলিনের ষড়যন্ত্রের মূলে আঘাত হেনেছে। গত কয়েকদিনের সংবাদ বিচার করে দেখা যাচ্ছে যে, সোভিয়েতের এই কর্মনীতি অত্যন্ত সাফল্যলাভ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ এবং পোল কুশাসন-ব্যবস্থায় অত্যাচারিত জনগণসহ মানবজাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন, এ হচ্ছে তারই এক বাস্তব দৃষ্টান্ত। এই হচ্ছে তৃতীয় প্রশ্ন যা আমি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম।

সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে সমগ্র পরিস্থিতিটিই জাপানের ওপর এক চরম আঘাত হয়ে পড়েছে, আর চীনের কাছে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিপুলভাবে সহায়ক। জাপানকে যাঁরা প্রতিরোধ করছেন তাঁদের অবস্থানই এতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, আর যারা আত্মসমর্পণকারী তাদের অবস্থা দুর্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চুক্তিকে চীনা জনগণ সঠিকভাবেই স্বাগত জানিয়েছে। যাই হোক, নোমনহান সন্ধিচুক্তি[৫] স্বাক্ষরের সংগে সংগে ব্রিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সংস্থাগুলি অত্যন্ত তৎপর হয়ে এই কাহিনীটি ছড়িয়ে দিচ্ছে যে, অবিলম্বে একটি সোভিয়েত-জাপান অনাক্রমণ চুক্তি হতে যাচ্ছে, এবং এই সংবাদের দরুণ কিছু কিছু চীনার মধ্যে এই ভাবনা শুরু হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে আর সাহায্য দিতে সক্ষম হবে না। তাঁরা যে ভ্রান্ত এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। নোমনহান চুক্তি হচ্ছে ঠিক আগের চ্যাংকুফেং চুক্তির[৬] মতোই ; অর্থাৎ জাপ-সমরবাদীরা

পরাজয় মেনে নিয়ে বাধ্য হচ্ছে সোভিয়েত-মঙ্গোলিয়ার অলংঘনীয় সীমান্তের স্বীকৃতি দিতে। সাহায্য প্রদান হ্রাস তো দূরের কথা, এই সন্ধিচুক্তি সোভিয়েতকে চীনের প্রতি আরও বেশি করে সাহায্য প্রদানের সুযোগ দেবে। জাপ-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তির যে কথা উঠেছে, তার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বহুদিন ধরেই এ প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু জাপান তা সংগে সংগেই প্রত্যাখ্যান করে আসছে। এখন অবশ্য জাপ-শাসক-শ্রেণীর মধ্যে একটা অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঐ ধরনের এক চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন তাতে রাজী হবে কিনা তা নির্ভর করছে এই মূল নীতিটি বিচারের ওপর যে, চুক্তিটি সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ এবং সমগ্র মানবজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থরক্ষা করবে কিনা। বিশেষ করে এটা নির্ভর করছে এই বিষয়টির ওপর যে, চুক্তিটি চীনের মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে কিনা। এ বছরের ১০ই মার্চ অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে স্তালিন প্রদত্ত রিপোর্ট এবং ৩০শে মার্চ সোভিয়েতের সর্বোচ্চ পরিষদে মলোটভের ভাষণ বিচার করে আমার মনে হয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মূল নীতির কোন পরিবর্তন করবে না। ঐ ধরনের কোন চুক্তি যদি সম্পাদিত হয়ও, তবুও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিশ্চয়ই চীনকে তার সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতাই স্বীকার করবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ চীনের জাতীয় মুক্তির স্বার্থের সংগে সবসময়েই সমার্থক এবং কখনই তা বিরোধী হবে না। এ বিষয়ে আমার মনে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ নেই। যেসব লোক সোভিয়েত বিরোধিতায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তারাই নোমনহান সন্ধিচুক্তি ব্যবহার ও জাপ-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি সম্বন্ধে গুজব ছড়িয়ে দিয়ে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো দুই মহান দেশের মধ্যে গোলমাল পাকিয়ে ও অশুভ মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা করে সুবিধা করে নেবার প্রচেষ্টায় আছে। এ কাজটিই ব্রিটিশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফরাসী ষড়যন্ত্র-কারীরা করছে এবং করছে চীনা আত্মসমর্পণকারীরা। এটা খুবই বিপদাশঙ্কার বিষয়, এবং এই জঘন্য ফন্দিটা সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটন করে দিতেই হবে। সন্দেহ নেই যে, চীনের পররাষ্ট্রনীতিকে হতে হবে জাপ-আক্রমণের প্রতিরোধের নীতি। এ নীতির অর্থ হচ্ছে প্রাথমিকভাবে আমাদের হতে হবে নিজস্ব প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল এবং বহিঃসাহায্যের কোন সম্ভাবনাকেই প্রত্যাখ্যান না করা। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এখন আরম্ভ হয়েছে, তিনটি সূত্র থেকে প্রধানতঃ বিদেশী

সাহায্য আসছে: (১) সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে, (২) গণতান্ত্রিক দেশসমূহের জনগণের কাছ থেকে, এবং (৩) উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের অত্যাচারিত জাতিগুলির কাছ থেকে। এই হচ্ছে আমাদের নির্ভরযোগ্য সাহায্যের উৎস। এ ছাড়া যে-কোন বৈদেশিক সাহায্যই আসুক না কেন, তাকে গ্রহণ করতে হবে অতিরিক্ত বা সাময়িক সাহায্য হিসেবেই। চীনকে অবশ্যই এই ধরনের অতিরিক্ত বা সাময়িক বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু তার ওপর নির্ভর করলে চলবে না, সে-সাহায্যকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করাও চলবে না। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুদ্ধমান পক্ষ সম্বন্ধে চীনকে দৃঢ় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে এবং কোন পক্ষেই তাকে যোগ দেওয়া চলবে না। ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষে চীনের যোগ দেওয়া উচিত বলে যে কথা বলা হচ্ছে তা হচ্ছে আত্মসমর্পণবাদীদের যুক্তি, যা প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, চীনা জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির পক্ষেও তা ক্ষতিকর, এবং একে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এই হচ্ছে চতুর্থ প্রশ্ন যা আমি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম।

আমাদের দেশের জনসাধারণ এই চারটি বিষয় নিয়েই ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করছেন। আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সম্পর্ক নিয়ে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সম্পর্ক প্রভৃতি নিয়ে এই যে আলাপ-আলোচনা তাঁরা করছেন তা খুব ভাল, কারণ তাঁদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে জাপ-আক্রমণকে পরাভূত করে বিজয় অর্জন করা। এইসব সমস্যাবলী সম্বন্ধে আমি এখানে কিছু মূল নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করলাম, এবং আমি আশা করি, পাঠকবৃন্দ এ সম্বন্ধে তাঁদের মন্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকবেন না।

টীকা

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বহু কষাকষি ও পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সাময়িক জোড়াতালির মাধ্যমে দুনিয়াকে নতুন করে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার উদ্দেশ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই 'লীগ অব নেশানস' গড়ে তোলে। ১৯৩১ সালে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল দখল করে নেয়, এবং আরও অব্যাহতভাবে তার আগ্রাসন চালিয়ে যাবার

উদ্দেশ্যে ১৯৩৩ সালে সে লীগ অব নেশানস ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সেই বছরই জার্মান ফ্যাসিষ্টরাও ক্ষমতায় আসে, এবং পরবর্তীকালে তারাও তাদের আগ্রাসী যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার জন্ম লীগ অব নেশানস ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ১৯৩৪ সালে, একটি ফ্যাসিষ্ট আগ্রাসী যুদ্ধের আশংকা যখন বেড়েই চলেছে, এমন সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন লীগ অব নেশানস-এ যোগ দেয়, এবং এভাবে, দুনিয়াকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার জন্ম গঠিত এই সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাটির বিশ্বশান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত একটি সংস্থায় রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯৩৫ সালে আবিসিনিয়ায় আক্রমণ করার পরে ইতালীও লীগ অব নেশানস থেকে বেরিয়ে আসে।

২। ১৯৩৫-এ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের মধ্যে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের দুটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

৩। ব্রিটিশ বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ লয়েড জর্জ ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। তিনি ১৯৩৮-এর নভেম্বরে পার্লামেন্টে বলেন যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালী চুক্তিবদ্ধ হলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন চুক্তিতে যোগ না দিলে শান্তি কখনই আসবে না।

৪। ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বরে জার্মানরা পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে এবং বেশির ভাগ অঞ্চলই অধিকার করে নেয়। ১৭ই তারিখে পোল্যাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার দেশের বাইরে পালিয়ে যায়। সেইদিনই সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব পোল্যাণ্ডে তার বাহিনী প্রেরণ করে তার পূর্বহৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে, অত্যাচারিত ইউক্রেনী ও বিয়েলোরুশীয় জনগণকে মুক্ত করে এবং জার্মান ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর পূর্বপ্রান্তের অভিযান বন্ধ করে দেয়।

৫। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে নোমনহান সন্ধিচুক্তি মস্কোয় স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৩৯-এর মে মাসে জাপানী ও পুতুল 'মাঞ্চুকুয়ো' বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের ওপর আক্রমণ করে মঙ্গোলিয়া ও তথাকথিত 'মাঞ্চুকুয়োর' সীমান্তে অবস্থিত নোমনহানে, এবং সেই যুদ্ধে সোভিয়েত ও মঙ্গোলিয়ার বাহিনী হানাদারদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে দেয়। জাপানীরা তখন শান্তি প্রার্থনা করে। সন্ধিচুক্তিতে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ বন্ধ করা হয় এবং মঙ্গোলিয়া গণতন্ত্র ও 'মাঞ্চুকুয়োর' সীমানায় যেখানে সংঘর্ষ হয়েছিল সেখানে

সীমানা নির্ধারণ করার জন্য দুপক্ষ থেকে দুজন দুজন করে চারজনের একটা 'কমিশন' তৈরী করা হয়।

৬। ১৯৩৮-এর ১১ই আগস্ট তারিখে মস্কোতে 'চ্যাংকুফেং চুক্তি' সম্পাদিত হয়। ১৯৩৮-এর জুলাইয়ের শেষদিকে ও আগস্টের প্রথমদিকে জাপান, চীন, কোরিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানায় অবস্থিত চ্যাংকুফেং জেলায় সোভিয়েত বাহিনীকে নানাধরনের উস্কানি দিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সমুচিত জবাবও পায়। জাপানীরা শান্তি প্রার্থনা করে। সন্ধিচুক্তিতে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয় এবং সোভিয়েত পক্ষ থেকে দুজন ও জাপানী-'মাঞ্চুকুয়ো' থেকে দুজন নিয়ে চারজনের এক 'কমিশন' তৈরী করা হয় সীমানা বিষয়ে অনুসন্ধান করে ব্যাপারটার পূর্ণ সমাধান করে ফেলার জন্য।

'দি কমিউনিস্ট' পত্রিকা প্রকাশের পটভূমি

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৯

কেন্দ্রীয় কমিটি দীর্ঘদিন ধরে একটি আভ্যন্তরীণ পার্টি-পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করে আসছিল। অবশেষে এখন এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হল। এরকম একটি পত্রিকা দরকার একটি বলশেভিক ধরনের চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য, যে-পার্টি ব্যাপ্তির দিক দিয়ে হবে জাতীয় এবং ব্যাপক গণ-চরিত্রের অধিকারী; মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে যে-পার্টি হবে পুরোপুরি সুসংবদ্ধ। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে সুস্পষ্ট, যে পরিস্থিতির রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য-সমূহ: একদিকে, জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে আত্মসমর্পণ, ভাঙন ও পিছু হঠার বিপদ নিয়তই বেড়ে চলেছে, আবার অন্যদিকে, আমাদের পার্টি তার সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বেরিয়ে এসেছে এবং একটি বৃহত্তর জাতীয় পার্টিতে পরিণত হয়েছে। পার্টির কর্তব্য হচ্ছে আত্মসমর্পণ, ভাঙন ও পিছু হঠার বিপদকে কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে জনগণকে সমবেত করা এবং সকল সম্ভাব্য ঘটনাবলীর জন্য তাঁদেরকে প্রস্তুত করে রাখা, যাতে সেরকম কোন ঘটনা আদৌ ঘটে গেলে পার্টি এবং বিপ্লবকে কোন অপ্রত্যাশিত ক্ষতি ভোগ করতে না হয়। এরকম সময়ে একটি আভ্যন্তরীণ পার্টি-পত্রিকা বাস্তবিকই অত্যন্ত জরুরী।

এই আভ্যন্তরীণ পার্টি-পত্রিকার নাম দেওয়া হয়েছে দি কমিউনিস্ট। এর উদ্দেশ্য কি? এতে কি কি বিষয় থাকবে? অন্যান্য পার্টি-প্রকাশনা থেকে এটা কোন্ কোন্ দিক দিয়ে ভিন্ন?

এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি বলশেভিক ধরনের চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করা, যা ব্যাপ্তির দিক দিয়ে হবে জাতীয়, যার থাকবে ব্যাপক গণ-চরিত্র, আর মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে যা হবে পুরোপুরি সুসংবদ্ধ। চীনা বিপ্লবের বিজয় অর্জনের জন্যে এ ধরনের একটি পার্টি গড়ে তোলাই হচ্ছে জরুরী, আর এরজন্য মোটামুটিভাবে বিষয়গত ও বাস্তব শর্তসমূহ বিদ্যমান রয়েছে; বাস্তবিকই এই মহান দায়িত্বপূর্ণ কাজ এখন অগ্রগতির পথেই এগিয়ে চলেছে। এই মহান কর্তব্য সম্পন্ন করায়

কাজে সহায়তা করার জন্য একটি স্বতন্ত্র পার্টি-সাময়িকী প্রয়োজনীয়, কেননা সাধারণ পার্টি-প্রকাশনার পক্ষে এই কর্তব্য সম্পন্ন করা হল সামর্থ্যের বাইরে, আর সেজন্যেই এখন দি কমিউনিস্ট পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে।

নির্দিষ্ট পরিমাণে আমাদের পার্টি আগে থেকেই ব্যাপ্তির দিক দিয়ে জাতীয় এবং ব্যাপক গণ-চরিত্রের অধিকারী। আর তার নেতৃত্বের কেন্দ্র, তার সভ্যদের একটি অংশ এবং সাধারণ লাইন ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সম্পর্কে বলতে গেলে আগে থেকেই এটা হল মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে সুসংহত একটি বলশেভিক ধরনের পার্টি।

তাহলে আমরা নতুন একটা কর্তব্য সামনে রাখছি কেন?

এর কারণ হচ্ছে আমাদের এখন বহুসংখ্যক নতুন পার্টি-শাখা রয়েছে, এসব শাখায় রয়েছে বিপুলসংখ্যক নতুন সদস্য, কিন্তু এখনো এগুলোকে ব্যাপক গণ-চরিত্রের অধিকারী, কিংবা মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে সুসংহত, অথবা বলশেভিক ধরনে গঠিত বলে গণ্য করা যায় না। একই সময়ে, পুরানো পার্টি-সভ্যদের রাজনৈতিক মান উন্নত করা এবং পুরানো শাখাগুলোর বলশেভিকীকরণের কাজে আরও অগ্রগতি সাধন করা ও তাদেরকে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে সুসংহত করার সমস্যাও রয়েছে। বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের আমলে যে অবস্থা ছিল, তা থেকে বর্তমানে পার্টি যে অবস্থায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছে এবং যেসব দায়িত্ব তার কাঁধে ন্যস্ত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন; অবস্থা এখন আরও বেশি জটিল এবং দায়িত্ব আরও বেশি কঠিন।

বর্তমান আমল হচ্ছে জাতীয় যুক্তফ্রন্টের আমল, আমরা বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছি। এই আমল হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের আমল, আমাদের পার্টির সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে রণাঙ্গনে, বন্ধুভাবাপন্ন বাহিনীগুলোর সাথে সমন্বয়সাধন করে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে এক নির্মম যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এই আমল হচ্ছে এমন একটি আমল, যখন আমাদের পার্টি একটি বৃহত্তর জাতীয় পার্টিতে পরিণত হয়েছে, আর সেজন্য আগে পার্টি যেরকম ছিল বর্তমানে তা আর সেরকম নেই। যদি এইসব উপাদানকে আমরা একসাথে বিবেচনা না করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারব না কীরকম গৌরবময় ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য আমরা সম্পন্ন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি—যে কর্তব্য হল 'একটি বলশেভিক ধরনের চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা, এমন

এক পার্টি যা হবে ব্যাপ্তির দিক দিয়ে জাতীয় এবং ব্যাপক গণ-চরিত্রের অধিকারী এবং মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে যে পার্টি হবে পুরোপুরি সুসংবদ্ধ।'

এই জাতীয় একটা পার্টিই আমরা গড়ে তুলতে চাই, কিন্তু এই কাজে আমরা কিভাবে অগ্রসর হব? আমাদের পার্টি এবং তার আঠারো বছরের সংগ্রামের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা না করে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না।

১৯২১ সালে আমাদের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের পর আজ পুরো আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছে। এই আঠারো বছরে আমাদের পার্টি বহুসংখ্যক বড় বড় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসেছে। আর এইসব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টির সদস্যবৃন্দ, তার কর্মী এবং সংগঠনগুলোর সবগুলোই নিজেদের পোড় খাইয়ে তুলেছে। বিপ্লবের ক্ষেত্রে গৌরবময় বিজয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পরাজয়—এই উভয় অভিজ্ঞতাই তাদের রয়েছে। পার্টি বুর্জোয়াদের সাথে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করেছিল, আর এই যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাওয়ার পর, বৃহৎ বুর্জোয়া ও তার মিত্রদের সাথে তিক্ত সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছিল। বিগত তিন বছর ধরে বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে পার্টি আবার একটি জাতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে প্রবেশ করেছে। চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে এ জাতীয় জটিল সম্পর্কের মধ্য দিয়েই চীনা বিপ্লব ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তার বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এটা হচ্ছে এক বিশেষ ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য, এমন এক বৈশিষ্ট্য যা ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশসমূহের বিপ্লবেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং কোন পুঁজিবাদী দেশের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে যা দেখা যায় না। অধিকন্তু, যেহেতু চীন হচ্ছে একটি আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্তবাদী দেশ, যেহেতু তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ হচ্ছে অসম, যেহেতু তার অর্থনীতি হচ্ছে প্রধানতঃ আধা-সামন্তবাদী আর যেহেতু তার ভূখণ্ড হচ্ছে সুবিশাল, সেইজন্য এর থেকে যা দেখা যাচ্ছে তা হল এই যে, বর্তমান পর্যায়ে চীনা বিপ্লবের চরিত্র হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, তার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ, আর তার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণী; কৃষকজনসাধারণ ও শহরে পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী কোন কোন সময় অংশগ্রহণ করছে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে অংশগ্রহণ করছে; এর থেকে আরও দেখা যাচ্ছে

যে চীনা বিপ্লবের ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রামই হল সংগ্রামের প্রধান রূপ। বাস্তবিকই, আমাদের পার্টির ইতিহাসকে সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস বলেই আখ্যায়িত করা যায়। কমরেড স্তালিন বলেছেন: 'চীনদেশে সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। চীনা বিপ্লবের এটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ সুবিধা'[১]। এ কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য। আধা-ঔপনিবেশিক চীনের নিজস্ব এই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য পুঁজিবাদী দেশসমূহের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের দ্বারা পরিচালিত বিপ্লবের ইতিহাসে দেখা যায় না, অথবা দেখা গেলেও ঠিক একইভাবে দেখা যায় না। অতএব, চীনা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দুটো মৌলিক নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: (১) সর্বহারাশ্রেণী হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে একটি বিপ্লবী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করছে, অথবা তাকে ভেঙে ফেলতে বাধ্য হয়েছে; আর (২) বিপ্লবের প্রধান রূপ হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম। এখানে কৃষকজনসাধারণ ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে পার্টির সম্পর্ককে যে মূল নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা চিহ্নিত করছি না, প্রথমতঃ, তা এই কারণে যে, সমগ্র দুনিয়াব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ যেসব সম্পর্কগত প্রশ্নের মোকাবিলা করছে, নীতিগত দিক থেকে এইসব সম্পর্কসমূহও হচ্ছে ঠিক ঐ একই রূপের; আর দ্বিতীয়তঃ, তা এই কারণে যে অন্তর্বস্তুর দিক থেকে, চীনের সশস্ত্র সংগ্রাম হচ্ছে কৃষক-যুদ্ধ এবং কৃষকজনসাধারণের সাথে পার্টির সম্পর্ক ও কৃষক-যুদ্ধের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হল যথার্থভাবে একই জিনিস।

এই দুটো মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দরুণ, প্রকৃতপক্ষে ঠিক ঠিক এগুলোর দরুণই, আমাদের পার্টির বলশেভিকীকরণ একটা বিশেষ অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। পার্টির ব্যর্থতা বা সাফল্য, তার পশ্চাদপসরণ কিংবা অগ্রগমন, তার সঙ্কোচন কিংবা প্রসারণ, তার বিকাশ ও সুসংবদ্ধকরণ অবশ্যম্ভাবীরূপেই বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে তার সম্পর্ক এবং সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে তার সম্পর্কের সাথে সংযুক্ত। বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার প্রশ্নে, অথবা যখন তা ভেঙে ফেলতে বাধ্য হয়েছে তখন তা ভেঙে ফেলার প্রশ্নে পার্টি যখনই একটি সঠিক রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করেছে, তখনই তার বিকাশ, সুসংবদ্ধকরণ ও বলশেভিকীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি একটা পদক্ষেপ এগিয়ে গেছে; কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে তার সম্পর্কের বিষয়ে পার্টি যখনই বেঠিক লাইন গ্রহণ করেছে, তখনই আমাদের পার্টি একটা পদক্ষেপ পিছিয়ে গেছে। অনুরূপভাবে, বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নকে আমাদের পার্টি যখনই সঠিকভাবে পরিচালনা

করেছে, তখনই সে তার বিকাশ, সুসংবদ্ধকরণ ও বলশেভিকীকরণের কাজে একটা পদক্ষেপ এগিয়ে গেছে ; কিন্তু যখনই সে প্রশ্নটিকে বেঠিকভাবে পরিচালনা করেছে, তখনই সে একটা পদক্ষেপ পিছিয়ে গেছে। অতএব, আঠারো বছর ধরেই, পার্টি-গঠন ও পার্টির বলশেভিকীকরণের কাজটি তার রাজনৈতিক লাইনের সাথে, যুক্তফ্রন্ট ও সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কিত প্রশ্নের সঠিক বা বেঠিক পরিচালনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। আমাদের পার্টির আঠারো বছরের ইতিহাস এই সিদ্ধান্তকে স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করছে। অথবা বিপরীত দিক দিয়ে বলা যায়, পার্টির বলশেভিকীকরণ যত বেশি হবে, ততই সঠিকভাবে সে তার রাজনৈতিক লাইন নির্ধারণ করতে পারে এবং ততই যুক্তফ্রন্ট ও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবে। আমাদের পার্টির আঠারো বছরের ইতিহাস এই সিদ্ধান্তকেও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে।

সুতরাং চীনা বিপ্লবের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির জন্য তিনটি মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট, সশস্ত্র সংগ্রাম এবং পার্টি গঠন। এই তিনটি প্রশ্ন এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলিকে আয়ত্ত করার অর্থ হল সমগ্র চীনা বিপ্লবকে নির্ভুল নেতৃত্ব দেওয়ার সমতুল্য। আমাদের পার্টির আঠারো বছরের প্রচুর পরিমাণ অভিজ্ঞতার সাহায্যে—আমাদের ব্যর্থতা ও সাফল্য, পশ্চাদপসরণ ও অগ্রগমন, সঙ্কোচন ও প্রসারণের সমৃদ্ধ এবং সুগভীর অভিজ্ঞতার সাহায্যে—এই তিনটি প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা এখন সঠিক সিদ্ধান্ত টানতে সক্ষম হয়েছি। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যুক্তফ্রন্ট, সশস্ত্র সংগ্রাম ও পার্টি-গঠনের প্রশ্নকে আমরা এখন সঠিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে সক্ষম। এর আরও অর্থ হচ্ছে এই যে, আমাদের আঠারো বছরের অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দিয়েছে যে, চীনা বিপ্লবের ক্ষেত্রে শত্রুকে পরাজিত করার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির তিনটি 'যাদু অস্ত্র', তিনটি প্রধান যাদু অস্ত্র হচ্ছে : যুক্তফ্রন্ট, সশস্ত্র সংগ্রাম এবং পার্টি-গঠন। এটা হচ্ছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা বিপ্লবের এক বিরাট সাফল্য।

এখানে তিনটি যাদু অস্ত্রের প্রত্যেকটি সম্পর্কে, তিনটি প্রশ্নের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

বিগত আঠারো বছর ধরে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অবস্থাধীনে কিংবা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রেণীগুলোর সাথে চীনা সর্বহারাশ্রেণীর যুক্তফ্রন্ট বিকাশলাভ করেছে : ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত প্রথম মহান বিপ্লব, ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধ,

আর বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ। তিনটি পর্যায়ের ইতিহাস নিম্নলিখিত নিয়মবিধিকে সুনিশ্চিত করেছে :

(১) যেহেতু চীনদেশকে যেসব নিপীড়ন ভোগ করতে হচ্ছে, তার মধ্যে বৈদেশিক নিপীড়নই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নিপীড়ন, সেজন্য সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ত যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে আয়োজিত সংগ্রামে চীনা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী নির্দিষ্ট সময়ে অংশগ্রহণ করবে এবং তা নির্দিষ্ট পরিমাণেই করবে। সুতরাং, এরকম সময়ে, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে সর্বহারাশ্রেণীর যুক্তফ্রন্ট গঠন করা উচিত এবং যতটুকু সম্ভব তা বজায় রাখা উচিত। (২) অন্যান্য ঐতিহাসিক অবস্থায়, তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে চীনা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এদিক-ওদিক দুলতে থাকবে এবং শিবির পরিত্যাগ করবে। সুতরাং, চীনের বিপ্লবী যুক্তফ্রন্টের গঠন সব সময় অপরিবর্তনীয় থাকবে না, বরং তা পরিবর্তিত হতে বাধ্য। কোন কোন সময় জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এতে অংশগ্রহণ করতে পারে, অন্যান্য সময় সে তা নাও করতে পারে। (৩) চীনা বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী—চরিত্রের দিক থেকে যারা হল মুৎসুদ্দি—তারা হচ্ছে এমন একটি শ্রেণী, যারা সরাসরি সাম্রাজ্যবাদের সেবা করে এবং তার দ্বারা লালিত-পালিত হয়। এই কারণে মুৎসুদ্দি চীনা বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী সব সময়ই বিপ্লবের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু, এই বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা সমর্থিত, তার ফলে এই সমস্ত শক্তিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব যখন তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং বিপ্লবের বর্শাফলক যখন একটি নির্দিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধেই প্রধানতঃ পরিচালিত হয়, তখন অন্যান্য শক্তির ওপর নির্ভরশীল বৃহৎ-বুর্জোয়া গ্রুপসমূহ ঐ নির্দিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যোগদান করতে পারে। এরকম সময়ে, বিপ্লবের পক্ষে সুবিধাজনক হলে শত্রুকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে এবং নিজের মজুতবাহিনী বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে, এইসব গ্রুপগুলোর সাথে চীনা সর্বহারাশ্রেণী যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে পারে, আর যে পর্যন্ত সম্ভব তা বজায় রাখাই উচিত হবে। (৪) সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণীর পাশাপাশি মুৎসুদ্দি বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী যখন যুক্তফ্রন্টে যোগদান করে, এমনকি তখনো তারা সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীলই থেকে যায়। সর্বহারাশ্রেণী ও সর্বহারার

পার্টির যে কোন আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অগ্রগতিকে তারা একগুঁয়েমির সাথে বিরোধিতা করে, তাদের ওপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করার চেষ্টা করে এবং বিভেদাত্মক কৌশল, যেমন প্রতারণা, অন্যায় কাজে প্ররোচনা দান, 'অবক্ষয় ঘটানো' এবং তাদের বিরুদ্ধে বর্বর আক্রমণের কৌশল ব্যবহার করে . এছাড়া, শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ এবং যুক্তফ্রন্টকে ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যই তারা এই সবকিছু করে থাকে। (৫) কৃষকসমাজ হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর দৃঢ় মিত্র। (৬) শহরে পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী হচ্ছে নির্ভরযোগ্য মিত্র।

প্রথম মহান বিপ্লব ও কৃষি-বিপ্লবের আমলেই এইসব নিয়মবিধির যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল, আর বর্তমান প্রতিরোধ-যুদ্ধেও আবার তা প্রমাণিত হচ্ছে। সুতরাং, বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে (বিশেষ করে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে) যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে হলে সর্বহারাশ্রেণীর পার্টিকে অবশ্যই দুই ফ্রন্টে কঠোর ও সুদৃঢ় সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। একদিকে, নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে বুর্জোয়াশ্রেণী যে বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগ দিতে পারে, সেই সম্ভাবনাকে অবহেলা করার ভুলকে মোকাবিলা করা আবশ্যক। চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীকে পুঁজিবাদী দেশসমূহের বুর্জোয়াশ্রেণীর মতো একই রূপের বলে গণ্য করা, আর তার ফলশ্রুতি হিসেবে বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার এবং যতদূর সম্ভব তা বজায় রাখার কর্মনীতিকে অবহেলা করাটা হচ্ছে 'বামপন্থী' রুদ্ধদ্বার নীতির ভুল। অন্যদিকে, বুর্জোয়াশ্রেণীর কর্মসূচী, কর্মনীতি, মতাদর্শ, অনুশীলন, ইত্যাদির সাথে সর্বহারাশ্রেণীর কর্মসূচী, কর্মনীতি, মতাদর্শ, অনুশীলন, ইত্যাদিকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করা এবং তাদের মধ্যেকার নীতিগত পার্থক্যকে অবহেলা করার ভুলকেও মোকাবিলা করা আবশ্যক। এখানে এই সত্যকে অবহেলা করার মধ্যেই এই ভুল নিহিত রয়েছে যে বুর্জোয়াশ্রেণী (বিশেষ করে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী) কেবল পেটি-বুর্জোয়া ও কৃষকসমাজের ওপরেই যে প্রভাব বিস্তার করে তাই নয়, বরং সর্বাহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার, তাদেরকে বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টির একটি লেজুড়ে পরিণত করার, আর বিপ্লবের ফসল যাতে বুর্জোয়াশ্রেণী নিজে ও তার রাজনৈতিক পার্টিই এককভাবে আহরণ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করার প্রবল প্রচেষ্টায় সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রভাবান্বিত করার

উদ্দেশ্যে তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়; এই সত্যকেও অবহেলা করার মধ্যে এই ভুল নিহিত রয়েছে যে, যখনই তার নিজস্ব সংকীর্ণ স্বার্থের সাথে কিংবা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টির স্বার্থের সাথে বিপ্লবের সংঘাত ঘটে, তখনই বুর্জোয়াশ্রেণী (আর বিশেষ করে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী) বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে। এ সমস্ত বিষয়কে অবহেলা করার অর্থ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ। চেন তু-শিউর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তা বুর্জোয়াশ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থ ও তার রাজনৈতিক পার্টির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার দিকেই সর্বহারাশ্রেণীকে পরিচালিত করেছিল, আর প্রথম মহান বিপ্লবের ব্যর্থতার বিষয়গত কারণ ছিল এটাই। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বৈত চরিত্র আমাদের রাজনৈতিক লাইন ও আমাদের পার্টি-গঠনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে, আর এই দ্বৈত চরিত্র উপলব্ধি করতে না পারলে আমরা আমাদের রাজনৈতিক লাইন বা পার্টি-গঠনের সমস্যা আয়ত্ত করতে পারব না। বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে ঐক্য ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম —এই উভয় ধরনের কর্মনীতি হচ্ছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক লাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রকৃতপক্ষে, পার্টি-গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই হল বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে তার ঐক্য ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টির বিকাশসাধন ও উপযুক্ত মাত্রায় তাকে পরীক্ষিত করে তোলা। এখানে ঐক্য বলতে বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে যুক্তফ্রন্টের কথাকেই বোঝানো হচ্ছে। আর সংগ্রাম বলতে 'শান্তিপূর্ণ' ও 'রক্তপাতহীন' সংগ্রাম, মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সংগ্রামকেই বোঝানো হচ্ছে—বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে আমরা ঐক্যবদ্ধ হলে সে সংগ্রাম চলতেই থাকে, আর তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হলে তা সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। কোন কোন সময় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে—আমাদের পার্টি যদি এটা না বোঝে, তাহলে সে সামনে এগোতে পারবে না এবং বিপ্লবও বিকাশলাভ করবে না; বুর্জোয়া-শ্রেণীর সাথে যখন সে ঐক্যবদ্ধ হবে, তখন তাদের বিরুদ্ধে পার্টিকে অবশ্যই কঠোর ও অবিচল 'শান্তিপূর্ণ' সংগ্রাম চালাতে হবে—আমাদের পার্টি যদি এটা না বোঝে, তাহলে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং বিপ্লব ব্যর্থ হবে; আর বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে যখন সে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে যদি কঠোর ও অবিচল সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু না করে তাহলে আমাদের পার্টি একইভাবে চূর্ণবিচূর্ণ

হয়ে যাবে এবং বিপ্লবও একইভাবে ব্যর্থ হবে। বিগত আঠারো বছরের ঘটনা-বলী দ্বারা এসব কিছুর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র সংগ্রাম সর্বহারা নেতৃত্বেই কৃষক-যুদ্ধের রূপলাভ করেছে। এই সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসও তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথমটি হচ্ছে সেই পর্যায়, যে পর্যায়ে আমরা উত্তর অভিযানে অংশ নিয়েছিলাম। আমাদের পার্টি ইতিমধ্যেই সশস্ত্র সংগ্রামের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করেছিল, কিন্তু তা করলেও তাকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারেনি—পার্টি এটা বুঝতে পারেনি যে, চীনা বিপ্লবে সশস্ত্র সংগ্রামই হচ্ছে সংগ্রামের প্রধান রূপ। দ্বিতীয় পর্যায় ছিল কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধকাল। ঐ সময় নাগাদ আমাদের পার্টি তার নিজস্ব স্বাধীন সশস্ত্র বাহিনী আগেই গড়ে তুলেছিল, স্বাধীনভাবে লড়াই চালানোর কলাকৌশল রপ্ত করে ফেলেছিল, আর জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা করেছিল। সংগ্রামের অন্যান্য প্রয়োজনীয় রূপের সাথে সংগ্রামের প্রধান রূপ সশস্ত্র সংগ্রামের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমন্বয়সাধন অর্জন করতে, অর্থাৎ জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম, কৃষক-জনগণের সংগ্রাম (যা ছিল মূল বিষয়), যুব-সম্প্রদায়, নারী-সম্প্রদায় ও জনগণের অন্যান্য সমস্ত অংশের সংগ্রাম, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম, অর্থনৈতিক, গুপ্তচর-বিরোধী ও মতাদর্শগত ফ্রন্টের সংগ্রাম এবং অন্যান্য সমস্ত ধরনের সংগ্রামের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামকে সমন্বিত করতে আমাদের পার্টি আগে থেকেই সক্ষম হয়ে উঠেছিল। আর এই সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে কৃষকজনগণের কৃষি-বিপ্লব। তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে প্রতিরোধ-যুদ্ধের বর্তমান পর্যায়। প্রথম পর্যায়ের সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞতাকে, আর সংগ্রামের অন্যান্য সকল ধরনের প্রয়োজনীয় রূপের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামের সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতাকে যথোপযুক্ত ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে আমরা এই পর্যায়ে সক্ষম হয়ে উঠেছি। সাধারণভাবে, বর্তমান সময়ে সশস্ত্র সংগ্রামের অর্থ হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধ।[৫] গেরিলাযুদ্ধ কাকে বলে? একটি পশ্চাদ্‌পদ দেশে, একটি সুবিশাল আধা-ঔপনিবেশিক দেশে সশস্ত্র শত্রুকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের নিজস্ব ঘাঁটি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘ সময় ধরে জনগণের সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করার কাজে এটা হচ্ছে সংগ্রামের একটি অপরিহার্য রূপ, আর সেই কারণেই সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। এতদিন

পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক লাইন এবং আমাদের পার্টি-গঠনের কাজ—এই উভয়ই সংগ্রামের এই রূপের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে, গেরিলাযুদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে আমাদের রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে, এবং তার ফলস্বরূপ, আমাদের পার্টি-গঠন সম্পর্কে একটা ভাল ধারণা লাভ করা অসম্ভব। সশস্ত্র সংগ্রাম হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক লাইনের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে হবে তা আমাদের পার্টি আঠারো বছর ধরে ধীরে ধীরে শিখেছে এবং তাতে অবিচল থেকেছে। আমরা শিখতে পেরেছি যে, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া চীনদেশে সর্বহারা-শ্রেণী, জনগণ বা কমিউনিস্ট পার্টির দাঁড়াবার কোন স্থানই নেই, আর বিপ্লবে বিজয় অর্জনও অসম্ভব। এই বছরগুলোতে আমাদের পার্টির বিকাশ, সংঘবদ্ধতা আর বলশেভিকীকরণ বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছে; সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির আজ যেরকম আছে নিশ্চিতভাবেই তা সেরকম হতে পারত না। সমগ্র পার্টির কমরেডরা যেন এই অভিজ্ঞতাকে কখনো না ভোলেন, যে অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করেছি রক্তের বিনিময়ে।

অনুরূপভাবে, পার্টি-গঠন, তার বিকাশ, সংঘবদ্ধতা আর বলশেভিকী-করণের ক্ষেত্রেও তিনটি সুনির্দিষ্ট পর্যায় ছিল।

প্রথম পর্যায় ছিল পার্টির শৈশবাবস্থা। এই পর্যায়ের প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী স্তরে পার্টির লাইন ছিল সঠিক, আর পার্টির সাধারণ সারি ও কর্মীবাহিনী উভয়েরই বৈপ্লবিক উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল অত্যধিক মাত্রায় উচ্চস্তরের; সেজন্যই প্রথম মহান বিপ্লবে বিজয়গুলি অর্জন করা গিয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, আমাদের পার্টি তখনো ছিল একটি শিশু-পার্টি, তিনটি মূল সমস্যা—যুক্তফ্রন্ট, সশস্ত্র সংগ্রাম ও পার্টি-গঠন সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার অভাব ছিল, চীনের ইতিহাস ও চীনের সমাজ সম্পর্কে কিংবা চীনা বিপ্লবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও নিয়মবিধি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান তার ছিল না, আর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও চীনা বিপ্লবের অনুশীলনের মধ্যেকার ঐক্য সম্পর্কে তার ব্যাপক উপলব্ধির অভাব ছিল। সেই কারণে এই পর্যায়ের সর্বশেষ স্তরে, কিংবা এই পর্যায়ের সংকটময় সন্ধিক্ষণে, পার্টির নেতৃত্বদানকারী সংস্থাগুলোতে যাঁরা প্রভুত্ব বিস্তারী অবস্থান দখল করে বসেছিলেন তাঁরা বিপ্লবের বিজয়সমূহ সুসংহত করার ব্যাপারে পার্টিকে নেতৃত্ব প্রদানে ব্যর্থ হন, আর তার ফলস্বরূপ, তাঁরা বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা প্রতারিত হন এবং

বিপ্লবের পরাজয় ডেকে আনেন। এই পর্যায়ে পার্টি-সংগঠন প্রসারলাভ করেছিল কিন্তু সেগুলো সুসংবদ্ধ ছিল না, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে পার্টি-সভ্য ও কর্মীদের দৃঢ়সংকল্প ও স্থিরচিত্ত হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করতেও এগুলো ব্যর্থ হয়। প্রচুর পরিমাণে নতুন সভ্য ছিল, কিন্তু তাদেরকে প্রয়োজনীয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা দেওয়া হয়নি। কাজের ক্ষেত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতাও অর্জিত হয়েছিল, কিন্তু যথাযথভাবে তার সারসংকলন করা হয়নি। পার্টিতে বহু আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, কিন্তু তাদেরকে বেছে বের করা হয়নি। শত্রু ও মিত্র উভয়েরই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের একটি গোলকধাঁধার মধ্যে পার্টি পড়েছিল, কিন্তু সজাগ-সতর্কতার ক্ষেত্রে তার ছিল অভাব। পার্টির অভ্যন্তরে বিপুল সংখ্যায় সক্রিয় কর্মীরা সামনে এগিয়ে আসছিলেন, কিন্তু সঠিক সময়ে তাঁদেরকে পার্টির প্রধান ভিত্তিতে রূপান্তরিত করা হয়নি। পার্টির নির্দেশাধীনে পার্টির কিছু কিছু বিপ্লবী সশস্ত্র ইউনিট ছিল, কিন্তু তাদের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সে ছিল অক্ষম। এই সবকিছুরই কারণ ছিল অনভিজ্ঞতা, বৈপ্লবিক উপলব্ধি সম্পর্কে অপ্রচুর গভীরতা, আর চীনা বিপ্লবের অনুশীলনের সাথে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সমন্বয়সাধন করার ক্ষেত্রে অনুপযুক্ততা। পার্টি-গঠনের প্রথম পর্যায় ছিল এইরকম।

দ্বিতীয় পর্যায় ছিল কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার দরুণ, চীনের ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে এবং চীনা বিপ্লবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও নিয়মবিধি সম্পর্কে উত্তম উপলব্ধি থাকার দরুণ, আর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ওপর কর্মীদের ভাল দখল থাকার দরুণ এবং সে তত্ত্বকে চীনা বিপ্লবের অনুশীলনের সাথে সমন্বিত করার ক্ষেত্রে তাদের অধিকতর সক্ষমতা থাকার দরুণ আমাদের পার্টির দশ বছর ধরে একটা সফল কৃষি-বিপ্লবের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও বুর্জোয়াশ্রেণী বিশ্বাসঘাতকেই পরিণত হল, তথাপি আমাদের পার্টি কৃষকসমাজের ওপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করতে সক্ষম হয়। পার্টি-সংগঠন যে শুধুমাত্র নতুনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল তাই নয়, বরং তা সুসংহতও হচ্ছিল। দিনের পর দিন শত্রু আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পার্টি অন্তর্ঘাতকদের তাড়িয়ে দিয়েছে। পার্টির অভ্যন্তরে পুনরায় বিপুল-সংখ্যক কর্মী সামনে এগিয়ে আসে, এবং এ সময় তারা পার্টির প্রধান

ভিত্তিতে পরিণত হয়। জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার পথিকৃৎ হিসেবে পার্টি পথপ্রদর্শন করে এবং এভাবে সরকার পরিচালনার কলাকৌশল সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে।. পার্টি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে, এবং এভাবে যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। এগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ও সাফল্য। তৎসত্ত্বেও, এসব মহান সংগ্রামগুলোর গতিপথে আমাদের কিছু কিছু কমরেড সুবিধাবাদের পংকে নিমজ্জিত হন, অথবা একবারের জন্য হলেও তাতে নিমজ্জিত হন, আর আগের মতোই তার কারণ ছিল এই যে তাঁরা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বিনয়ের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করেননি, চীনের ইতিহাস ও সমাজ এবং চীনা বিপ্লবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও নিয়মবিধি সম্পর্কে তাঁরা একটা উপলব্ধি অর্জন করতে পারেননি, আর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও চীনা বিপ্লবের অনুশীলনের মধ্যেকার ঐক্য সম্পর্কেও তাঁদের কোন উপলব্ধি ছিল না। এই কারণে এই পর্যায়ের সমগ্র অধ্যায় জুড়ে পার্টির নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত কিছু কিছু ব্যক্তি নির্ভুল রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক লাইনের প্রতি অনুগত থাকতে ব্যর্থ হন। কোন সময় কমরেড লি লি-সানের 'বাম' সুবিধাবাদী লাইন, আর অন্য কোন সময় শ্বেত অঞ্চলে বিপ্লবী যুদ্ধ ও কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত 'বাম' সুবিধাবাদ পার্টি ও বিপ্লবের ক্ষতিসাধন করে। সুনাই বৈঠকের (১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে কুয়াইচৌর সুনাইতে পলিটব্যুরোর বৈঠক) আগে পর্যন্ত পার্টি নিশ্চিতভাবেই বলশেভিকীকরণের পথে পা বাড়াতে পারেনি এবং চ্যাং কুও-তাওয়ের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে তার পর্যায়ক্রমিক বিজয় ও জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করতে পারেনি। পার্টির বিকাশের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়।

তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের পর্যায়। বর্তমানে তিন বছর ধরে আমরা এই পর্যায়ের মধ্যে রয়েছি আর সংগ্রামের এই বছরগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী দুটো বিপ্লবী পর্যায়ে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে, সাংগঠনিক শক্তি ও সশস্ত্র বাহিনীর শক্তিকে, সারা দেশের জনগণের মধ্যে উচ্চ রাজনৈতিক মর্যাদাকে, আর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও চীনা বিপ্লবের অনুশীলনে মধ্যেকার ঐক্য সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের পার্টি শুধুমাত্র জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টই প্রতিষ্ঠা করেনি, বরং জাপানের বিরুদ্ধে মহান প্রতিরোধ-যুদ্ধও

পরিচালনা করে আসছে। সাংগঠনিকভাবে পার্টি তার সংকীর্ণ সীমার বাইরে বেরিয়ে এসেছে এবং একটি বৃহত্তর জাতীয় পার্টিতে পরিণত হয়েছে। তার সশস্ত্র বাহিনী আবার গড়ে উঠেছে এবং জাপানী আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অধিকতর শক্তিশালী হচ্ছে। সমগ্র জনগণের মধ্যে তার প্রভাব ক্রমেই ব্যাপকতর হচ্ছে। এই সবগুলোই হচ্ছে বিরাট বিরাট সাফল্য। তথাপি, এখনো পর্যন্ত আমাদের নতুন পার্টি-সভ্যদের অনেককেই শিক্ষিত করে তোলা যায়নি, নতুন সংগঠন-সমূহের অনেকগুলিকেই এখনো সংহত করে তোলা যায়নি, আর নতুন ও পুরানো পার্টি সভ্য এবং নতুন ও পুরানো পার্টি-সংগঠনগুলোর মধ্যে এখনো বিরাট পার্থক্য থেকে গেছে। নতুন পার্টি-সভ্য ও কর্মীদের অনেকেরই এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা নেই। চীনদেশের ইতিহাস ও সমাজ কিংবা চীনা বিপ্লবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও নিয়মবিধি সম্পর্কে এখনো তারা অল্পই জানে কিংবা মোটেই জানে না। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব কিংবা চীনা বিপ্লবের অনুশীলনের মধ্যেকার ঐক্য সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ব্যাপকতা অর্জনের চেয়ে অনেক দূরেই রয়েছে। 'সাহসের সাথে পার্টিকে বিস্তৃত কর, কিন্তু অবাঞ্ছিত একটি লোককেও ভেতরে ঢুকতে দেবে না'—এই স্লোগানের প্রতি যদিও কেন্দ্রীয় কমিটি জোর দিয়েছিল, তথাপি পার্টির সংগঠনসমূহের বিস্তারসাধনের সময় বেশ কিছু-সংখ্যক আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি এবং শত্রুর গুপ্তচর সাফল্যজনকভাবে ভেতরে অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়। যদিও যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়েছিল এবং বর্তমানে তিন বছর ধরে তা বজায় রাখা হয়েছে, তথাপি বুর্জোয়াশ্রেণী বিশেষ করে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী, বিরামহীনভাবে আমাদের পার্টিকে ধ্বংস করে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে—বৃহৎ বুর্জোয়া আত্মসমর্পণকারীরা এবং গোঁড়াপন্থীরা সমগ্র দেশ জুড়ে গুরুতর সংঘর্ষ উসকে দিয়ে আসছে, আর কমিউনিস্ট-বিরোধী চিৎকার তো অবিরাম লেগেই আছে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য, যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেবার জন্য এবং চীনদেশকে পেছনে টেনে রাখার জন্য পথ প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বৃহৎ বুর্জোয়া আত্মসমর্পণকামী ও গোঁড়াপন্থীরা এই সবকিছুকেই ব্যবহার করছে। মতাদর্শগত দিক দিয়ে, বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী কমিউনিস্ট আদর্শের ক্রমাবয় ক্ষয়সাধনের অপচেষ্টা চালাচ্ছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক

দিক দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি, সীমান্ত অঞ্চল ও পার্টির সশস্ত্র বাহিনীকে বিলুপ্ত করে দেবার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই সমস্ত অবস্থায় সন্দেহাতীতভাবেই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আত্মসমর্পণ, ভাঙন ও পিছু হঠার বিপদকে কাটিয়ে ওঠা, যতদূর সম্ভব জাতীয় যুক্তফ্রন্ট ও কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতাকে বজায় রাখা, জাপানের বিরুদ্ধে অব্যাহত প্রতিরোধ এবং অব্যাহত ঐক্য ও প্রগতির জন্য কাজ করা, আর একই সাথে সকল সম্ভাব্য ঘটনাবলীর জন্য প্রস্তুত হওয়া, যাতে ঘটনাক্রমে এরকম কিছু ঘটে গেলে পার্টি ও বিপ্লবকে অপ্রত্যাশিত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে না হয়। এই অভিপ্রায়ে, অতি অবশ্যই পার্টি-সংগঠন ও তার সশস্ত্র বাহিনীকে আমাদের মজবুত করতে হবে, এবং আত্মসমর্পণ, ভাঙন ও পিছু হঠার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় সংগ্রামের জন্য জনগণকে সমবেত করতে হবে। এই কর্তব্য সম্পন্ন করার কাজটি নির্ভর করছে সমগ্র পার্টির প্রচেষ্টার ওপর, সকল স্থানের ও স্তরের সমস্ত পার্টি-সভ্য, কর্মী ও সংগঠনগুলোর কঠোর ও বিরামহীন সংগ্রামের ওপর। আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, আঠারো বছরের অভিজ্ঞতাকে সাথে নিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তার অভিজ্ঞ পুরানো সভ্য ও কর্মী এবং তার উৎসাহী ও তারুণ্যেভরা নতুন সভ্য ও কর্মীদের যৌথ প্রচেষ্টায়, তার সুপরীক্ষিত বলশেভিকীকৃত কেন্দ্রীয় কমিটি ও তার স্থানীয় সংগঠনসমূহের যৌথ প্রচেষ্টায়, এবং তার শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী ও প্রগতিশীল জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় এই সব লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

আমাদের পার্টির আঠারো বছরকালের ইতিহাসের প্রধান প্রধান অভিজ্ঞতা ও প্রধান প্রধান সমস্যাকে আমরা এখানে তুলে ধরলাম।

আমাদের আঠারো বছরের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, শত্রুকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে দুটো প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট ও সশস্ত্র সংগ্রাম। যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ারই যুক্তফ্রন্ট। আর শত্রুর অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালানো ও তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্য দুটো হাতিয়ারকে, যুক্তফ্রন্ট ও সশস্ত্র সংগ্রামকে, একত্রে সংযুক্ত করার কাজে পার্টি হচ্ছে বীর যোদ্ধা।

আমাদের পার্টি আজ আমরা কিভাবে গড়ে তুলব? 'একটি বলশেভিক ধরনের চীনা কমিউনিস্ট পার্টি, ব্যাপ্তির দিক দিয়ে জাতীয় এবং ব্যাপক গণ-

চরিত্রের অধিকারী একটা পার্টি, মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে পুরোপুরি সুসংবদ্ধ একটা পার্টি" আমরা কিভাবে গড়ে তুলতে পারি? পার্টির ইতিহাস অধ্যয়ন করে, অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট ও সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে ঐক্য ও সংগ্রাম এই উভয় সমস্যার সাথে, এবং অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ বাহিনী কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে আয়োজিত গেরিলাযুদ্ধ অনমনীয়তা এবং জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সাথে সংযুক্ত করে পার্টি-গঠনের কাজকে অধ্যয়ন করেই এর উত্তর পাওয়া যাবে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও চীনা বিপ্লবের অনুশীলনের মধ্যেকার ঐক্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাদের আঠারো বছরের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের বর্তমান নতুন অভিজ্ঞতার সারসংকলন করা, আর পার্টি যাতে ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে ওঠে এবং অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তিকে এড়িয়ে যেতে পারে তার জন্য এই অভিজ্ঞতাকে সমগ্র পার্টিতে ছড়িয়ে দেওয়া—এই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য।

টীকা

১। জে. ভি স্তালিন: 'চীনে বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ', 'রচনাবলী বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৫৮, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪১।

২। চীনের বিপ্লবে সাধারণভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের অর্থই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধ —এ কথা বলতে গিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ থেকে শুরু করে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথমদিক পর্যন্ত চীনের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার সারসংকলন করেছেন। দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সুদীর্ঘকাল ধরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক পরিচালিত সমস্ত সশস্ত্র সংগ্রামই গেরিলাযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ঐ আমলের শেষের দিকে লালফৌজের শক্তি বৃদ্ধি পাবার দরুণ গেরিলাযুদ্ধ রূপান্তরিত হয় গেরিলা চরিত্রবিশিষ্ট চলমান যুদ্ধে—কমরেড মাও সে-তুঙের সংজ্ঞা অনুসারে, যা ছিল উচ্চতর পর্যায়ের গেরিলাযুদ্ধ। কিন্তু ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে আবার গেরিলাযুদ্ধের রূপই ফিরে আসে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথমদিকে, যেসব কমরেড দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের ভুল করেছিলেন, তাঁরা পার্টি নেতৃত্বাধীন গেরিলাযুদ্ধকে ছোট করে দেখেছিলেন এবং কুওমিনতাঙ বাহিনীর যুদ্ধাভিযানের

ওপরেই আস্থা স্থাপন করেছিলেন। কমরেড মাও সে-তুঙ তাঁর 'জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধে রণনীতির সমস্যা', 'দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে' ও 'যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যাবলী' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁদের অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করেন, এবং বর্তমান প্রবন্ধে তিনি গেরিলাযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহকারী চীনা বিপ্লবের দীর্ঘকালব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলির সারসংকলন করেছেন। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে, এবং আরও সুনির্দিষ্ট-ভাবে বলতে গেলে, তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের (১৯৪৫-১৯৪৯) সময়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন গেরিলাযুদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামের মূল রূপ হিসেবে নিয়মিত যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। এটা ছিল বিপ্লবী শক্তির অধিকতর বিকাশ ও শত্রুর পরিস্থিতির পরিবর্তনেরই ফলশ্রুতি। তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এর আরও বিকাশ পরিলক্ষিত হয়েছিল। তখন যুদ্ধাভিযান চালানো হতো বিশালাকার যূথবদ্ধ বাহিনী দ্বারা, এবং তারা ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত শত্রু-অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিল।

বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টির কর্তব্যসমূহ

১০ই অক্টোবর, ১৯৩৯

১। নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধার পাবার আশায় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। জার্মানদের বা ইঙ্গ-ফরাসীদের—যে-কোন দিক থেকে দেখলেই এই যুদ্ধ হচ্ছে অন্যায় যুদ্ধ, লুণ্ঠনমূলক ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। দুনিয়ার সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে অবশ্যই এই যুদ্ধের দৃঢ় বিরোধিতা করতে হবে, এবং একে সমর্থন করে সোস্থাল ডিমোক্র্যাটি পার্টিগুলি সর্বহারাশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার যে জঘন্য অপরাধ করেছে, তারও বিরোধিতা করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আগের মতোই তার শান্তির নীতিতে অটল রয়েছে, বিবদমান দুই পক্ষের প্রতি দৃঢ় নিরপেক্ষতার নীতি বজায় রেখে চলেছে, এবং পোল্যাণ্ডে তার সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়ে জার্মান আগ্রাসী বাহিনীর পূর্বাভি-মুখী অভিযান বন্ধ করে দিয়েছে, পূর্ব ইউরোপে শান্তি জোরদার করেছে, এবং পোল শাসকদের নিপীড়নের হাত থেকে ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়ার ভ্রাতৃপ্রতিম জাতিগুলিকে রক্ষা করেছে। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলির সম্ভাব্য আক্রমণকে ঠেকাবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন তার প্রতিবেশী দেশগুলির সংগে বেশ কয়েকটি চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং বিশ্বশান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২। এই নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নীতি হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের হঠকারী অভিযানের বিস্তৃতির প্রস্তুতি হিসেবে চীনা প্রশ্নের সমাধানের জন্য চীনের ওপর তার আক্রমণকে তীব্র করে তোলা। চীনা প্রশ্নের সমাধানের জন্য সে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, সেটা হল এইরকম:

(ক) সমগ্র চীনদেশকে পরাধীনতার নাগপাশে বন্ধনের প্রস্তুতি হিসেবে অধিকৃত অঞ্চলে তার নীতি হবে তার বন্ধনটিকে আরও দৃঢ় করা। এটি

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে কমরেড মাও সে-তুঙ এই সিদ্ধান্তটির খসড়া প্রণয়ন করেন।

করতে গিয়ে তাকে জাপ-বিরোধী গেরিলা ঘাঁটি অঞ্চলে 'ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করার' কাজ শুরু করতে হবে, অর্থনৈতিক সম্পদ শোষণ করতে হবে, পুতুল-সরকারের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এবং জনগণের জাতীয়তাবোধের মধ্যে ভাঙন ধরাতে হবে।

(খ) চীনের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে তার নীতি হবে প্রধানতঃ রাজনৈতিক অভিযান চালানো, সংগে সংগে চলবে তার সামরিক অভিযান। রাজনৈতিক অভিযানের অর্থ ব্যাপক সামরিক আক্রমণের ওপর জোর দেওয়া নয়, জোর দেওয়া জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ধরাবার ওপর, কুওমিনতাঙ কমিউনিস্ট সহযোগিতায় ভাঙন ধরাবার এবং কুওমিনতাঙ সরকারকে আত্মসমর্পণে প্রলুব্ধ করানোর ওপর।

উহানের মতো তারা বর্তমানে বৃহৎ রণনীতিগত অভিযানে সম্ভবতঃ নামবে না, কারণ বিগত ছবছরে চীনের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের সামনে সে মার খেয়েছে এবং তার সশস্ত্র শক্তি ও অর্থনৈতিক সম্ভারের অভাবও হয়েছে। এই অর্থে প্রতিরোধ-যুদ্ধ মূলতঃ রণনীতিগত অচলাবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এবং এই রণনীতিগত অচলাবস্থা হচ্ছে আমাদের প্রতি-আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তুতির পর্যায়। কিন্তু প্রথমতঃ, আমরা যখন বলি যে মূলতঃ, একটা অচলাবস্থা উপস্থিত হয়েছে, তখন তা দ্বারা আমরা এ কথা বোঝাতে চাই না যে শত্রুর আক্রমণাভিযানের আর সম্ভাবনা নেই; চ্যাংশা আক্রান্ত হয়েছে এবং পরে অন্যান্য স্থানেও আক্রমণ হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রন্টে যতই অচলাবস্থার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, ততই শত্রু গেরিলা ঘাঁটি অঞ্চলে 'ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করার' অভিযান তীব্রতর করবে। তৃতীয়তঃ, যে-অঞ্চল শত্রু দখল করেছে সেখানে যদি চীন ভাঙন ধরাতে না পারে, যদি শত্রুকে সেই দখল তীব্রতর করার ও শোষণ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে আমরা সাফল্য অর্জন করতে দিই, যদি চীন শত্রুর রাজনৈতিক অভিযান প্রতিহত করতে না পারে, এবং প্রতিরোধ, একতা ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হয়, ও এভাবে প্রতি-আক্রমণাভিযানে অস্ত্র শক্তি সঞ্চয় করতে ব্যর্থ হয়, কিংবা কুওমিনতাঙ সরকার যদি নিজের খুশিমত আত্মসমর্পণ করে তাহলে শত্রু বিরাট আক্রমণ শুরু করতে পারে। অর্থাৎ, যে অচলাবস্থার সূত্রপাত হয়েছে তা শত্রু বা আত্মসমর্পণকারীরা এখনো ভেঙে দিতে পারে।

৩। আত্মসমর্পণের বিপদ, জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভাঙনের বিপদ

ও পশ্চাদপসরণের বিপদ এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিপদ হিসেবে রয়ে গেছে; এবং বৃহৎ জমিদার ও বুর্জোয়াদের বর্তমানের কমিউনিস্ট-বিরোধিতা ও পশ্চাদপসরণের কার্যকলাপ তাদের আত্মসমর্পণের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবেই চলেছে। প্রতি-আক্রমণের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে হলে এখনো আমাদের কর্তব্য হবে সমস্ত চীনা দেশপ্রেমিকদের সহযোগিতায় ৭ই জুলাই তারিখের পার্টি ইস্তাহারে প্রদত্ত তিনটি মহান রাজনৈতিক শ্লোগানের ভিত্তিতে জনগণকে সমাবিষ্ট করে কার্যকরীভাবে সেগুলি প্রয়োগ করা। এই তিনটি শ্লোগান হচ্ছে 'প্রতিরোধে অবিচল থাক ও আত্মসমর্পণের বিরোধিতা কর', 'একতায় অবিচল থাক ও বিভেদের বিরোধিতা কর', এবং 'অগ্রগমনে অবিচল থাক ও পশ্চাদপসরণের বিরোধিতা কর'। এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে সুনিশ্চিতভাবেই শত্রুর পেছনে গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে, শত্রুর 'ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করার' অভিযানকে পর্যুদস্ত করে দিতে হবে, শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে হবে, এবং জনগণ জাপ-প্রতিরোধযুদ্ধ পরিচালনা করে যাচ্ছেন, তাঁদের সুবিধার্থে প্রগতিমূলক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। ফ্রন্টে সামরিক প্রতিরক্ষা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে এবং শত্রুর আক্রমণাভিযানকে পর্যুদস্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে অবিলম্বে প্রকৃত রাজনৈতিক সংস্কার চালু করতে হবে, কুওমিনতাঙের এক-পার্টি একনায়কত্বের অবসান ঘটাতে হবে, জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় পরিষদের আহ্বান করতে হবে, তার হাতে প্রকৃত ক্ষমতা দিতে হবে, একটি সংবিধান রচনা ও গ্রহণ করতে হবে এবং সাংবিধানিক সরকারকে কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যে-কোনরকম দোদুল্যমানতা বা দীর্ঘসূত্রতা, বা এই কর্মনীতির বিরোধী সব কিছুই প্রচণ্ড ভুল হবে। একই সময়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের পার্টির সর্বস্তরের নেতৃসংস্থা এবং সমস্ত পার্টি-সভ্যকে আরও সতর্ক প্রহরা বজায় রাখতে হবে, এবং চীনা বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকর যে-কোন জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকার ও পার্টি ও জনগণের অপ্রত্যাশিত ক্ষতি ঠেকাবার উদ্দেশ্যে পার্টি, সশস্ত্র বাহিনী ও পার্টির নেতৃত্বাধীন সমস্ত সংস্থার মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সংহতি অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক সংখ্যায় দলে টেনে আনুন[১]

১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৯

১। দীর্ঘ ও নির্মম জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে এবং নতুন চীন গড়ে তোলার মহান সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টিকে অবশ্যই বুদ্ধিজীবীদের দলে টেনে আনার কাজে সুদক্ষ হতে হবে। কারণ, একমাত্র এইভাবেই তা প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য বিরাট শক্তি সমাবেশ করতে পারবে, লক্ষ লক্ষ কৃষককে সংঘবদ্ধ করতে পারবে, বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, এবং বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট প্রসারিত করতে পারবে। বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ ছাড়া বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে না।

২। গত তিন বছর ধরে আমাদের পার্টি ও সৈন্যবাহিনী বুদ্ধিজীবীদের দলে টেনে আনার বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়েছে; বহু বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী পার্টি, সেনাবাহিনী, সরকারের বিভিন্ন শাখাসমূহ সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং গণ-আন্দোলনে সামিল হয়েছেন, এবং এভাবে যুক্তফ্রন্টের প্রসার ঘটেছে। এটা একটা বিরাট সাফল্য। কিন্তু আমাদের বাহিনীর বহু কর্মী এখনো পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন। তাঁরা এখনো তাঁদের কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখেন, এমনকি তাঁদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রবণতা দেখান, বা তাঁদের দূরে রাখতে চান। আমাদের বহু প্রশিক্ষণ-সংস্থা এখনো তরুণ ছাত্রদের ব্যাপক সংখ্যায় ভর্তি করতে ইতস্তত করে। আমাদের বহু স্থানীয় পার্টি-শাখা এখনো পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের যোগদানের বিরোধী। এসবের কারণ হচ্ছে বিপ্লবী স্বার্থে বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্ব বুঝবার ব্যর্থতা, ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বুদ্ধিজীবীদের সংগে পুঁজিবাদী দেশগুলির বুদ্ধিজীবীদের পার্থক্য বুঝবার ব্যর্থতা; এবং যে বুদ্ধিজীবীরা জমিদার ও বুর্জোয়াদের সেবা করে তাদের সংগে যে বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের সেবা করেন —তাদের পার্থক্য বুঝবার ব্যর্থতা; একই সংগে এটা হচ্ছে সেই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝবার ব্যর্থতা যখন বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টিগুলি বুদ্ধিজীবীদের দলে

[১] চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে কমরেড মাও সে-তুঙ এই সিদ্ধান্তটির খসড়া প্রণয়ন করেন।

চীনার জন্ত আমাদের সংগে আপ্রাণ প্রতিযোগিতায় নেমেছে, এবং যখন জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে চীনা বুদ্ধিজীবীদের কিনে নিতে বা তাদের মনকে কলুষিত করতে চাইছে। বিশেষতঃ, এর কারণ হচ্ছে : আমাদের পার্টি এবং আমাদের সেনাবাহিনী যে ইতিমধ্যেই একদল সুপরীক্ষিত কর্মীদের মূল বাহিনীর বিকাশ ঘটাতে পেরেছে এবং তার সাহায্যে বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্ব দেবার সামর্থ্য অর্জন করেছে—এই অনুকূল বিষয়টি বুঝবার ব্যর্থতা।

৩। সেই কারণে এখন থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে :

(ক) যুদ্ধাঞ্চলের বিভিন্ন পার্টি-সংগঠন এবং পার্টির নেতৃত্বাধীন সমস্ত সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির উচিত আমাদের সেনাবাহিনী, প্রশিক্ষণ-সংস্থা এবং সরকারের শাখাসমূহে ব্যাপক সংখ্যায় বুদ্ধিজীবীদের টেনে আনা। যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী জাপানের সাথে লড়াই করতে চান, এবং যাঁরা মোটামুটি-ভাবে বিশ্বস্ত, কঠিন শ্রম করতে রাজী এবং কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত, তাঁদের সবাইকে টেনে আনার জন্ত বিভিন্ন উপায় ও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তাঁদেরকে আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে, হবে এবং সাহায্য করতে হবে, যাতে তাঁরা যুদ্ধে এবং কাজে পাকাপোক্ত হতে পারেন এবং সেনা-বাহিনী, সরকার ও জনগণের সেবা করতে পারেন। যাঁদের পার্টি সদস্যপদের যোগ্যতা রয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের গুণাগুণ পৃথকভাবে বিচার করে তাঁদেরকে আমরা পার্টিতে প্রবেশের সুযোগ দেব। যাঁদের সে যোগ্যতা নেই বা যাঁরা পার্টিতে যোগ দিতে ইচ্ছুক নন, তাঁদের সংগে আমরা ভাল কার্যকরী সম্পর্ক বজায় রাখব এবং আমাদের সংগে তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে পথ দেখাব।

(খ) ব্যাপক সংখ্যায় বুদ্ধিজীবীদের টেনে আনার নীতিকে প্রয়োগ করতে গিয়ে শত্রু এবং বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টিগুলি কর্তৃক প্রেরিত লোকজনের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য অবিশ্বস্ত লোক-জনদের দূরে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে আমাদের অতি অবশ্যই বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। এদের দূরে সরিয়ে দেবার ব্যাপারে আমাদের খুবই দৃঢ় হতে হবে। যারা ইতিমধ্যেই পার্টি, সেনাবাহিনী বা সরকারী দপ্তরসমূহে ঢুকে পড়েছে, সন্দেহাতীত প্রমাণের ভিত্তিতে তাদেরকে দৃঢ়তার সংগে, কিন্তু বাছাই করে, বের করে দিতে হবে। কিন্তু সেজন্য আমরা যুক্তি-

সংগতভাবে বিশ্বস্ত বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে অতি অবশ্যই কোন সন্দেহ পোষণ করব না, নির্দোষ লোকদের সম্পর্কে প্রতিবিপ্লবীদের দ্বারা আনীত মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে অতি অবশ্যই সতর্ক প্রহরা বজায় রাখব।

(গ) যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বস্ত ও প্রয়োজনীয়, তাঁদেরকে আমাদের যথাযোগ্য কাজ দিতে হবে। সংগ্রামের সুদীর্ঘ পথে তাঁরা যাতে ক্রমে ক্রমে তাঁদের দুর্বলতা কাটাতে পারেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বিপ্লবীকরণ ঘটাতে পারেন, জনগণের সংগে একাত্ম হতে পারেন, এবং পুরানো পার্টি-সদস্য ও কর্মীদের সংগে পার্টির শ্রমিক ও কৃষক-সদস্যদের সাথে মিশে যেতে পারেন, সেজন্য তাঁদেরকে আমরা আন্তরিকভাবে রাজনৈতিক শিক্ষা দেব এবং পথ দেখাব।

(ঘ) আমাদের কাজে বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ যে প্রয়োজনীয় সে-কথা তাঁদের অংশগ্রহণের বিরোধী সমস্ত কর্মীদের, বিশেষ করে আমাদের সেনাবাহিনীর মূল অংশের সংগে যুক্ত কিছু কর্মীদের ভালভাবে বোঝাতে হবে। একই শ্রমিক ও কৃষক-কর্মীদের কঠোর অধ্যয়ন করার জন্য এবং সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন করার জন্য আমাদের উৎসাহ দিতে হবে, এবং এই উদ্দেশ্যে কার্যকরী প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এভাবে শ্রমিক ও কৃষককর্মীরা একই সংগে বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠবেন, এবং বুদ্ধিজীবীরা একই সংগে শ্রমিক ও কৃষকে পরিণত হবেন।

(ঙ) ওপরে উল্লিখিত নীতিগুলি মূলগতভাবে কুওমিনতাঙ অঞ্চলসমূহে এবং জাপান কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলসমূহেও প্রযোজ্য হবে। এর ব্যতিক্রম হবে এই যে, বুদ্ধিজীবীদের পার্টিতে প্রবেশাধিকার দেবার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্যের ওপর আরও বেশি দৃষ্টি দিতে হবে, যাতে ঐসব অঞ্চলে আরও দৃঢ় পার্টি-সংগঠন গড়ে তোলা যায়। পার্টি-বহির্ভূত যে বিরাটসংখ্যক বুদ্ধিজীবী আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাঁদের সংগে আমাদের যথাযোগ্য সংযোগ রাখতে হবে, এবং তাঁদের সংগঠিত করতে হবে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এবং গণতন্ত্রের জন্য মহান সংগ্রামে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এবং যুক্তফ্রন্টের কাজে।

৪। আমাদের পার্টির সমস্ত কমরেডদের এ কথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সঠিক নীতি নির্ধারণ বিপ্লবের বিজয় অর্জনের একটি গুরুত্ব পূর্ণ পূর্বশর্ত। কৃষি-বিপ্লবের সময়ে বিভিন্ন জায়গায় পার্টি-সংগঠন ও সেনা-

বাহিনীর ইউনিটগুলি বুদ্ধিজীবীদের প্রতি যে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল, তার পুনরাবৃত্তি হলে চলবে না। বর্তমানে বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য ছাড়া সর্বহারারা নিজেদের বুদ্ধিজীবীদের জন্ম দিতে পারে না। কেন্দ্রীয় কমিটি আশা করে যে, সমস্ত স্তরের পার্টি-কমিটিসমূহ এবং সমস্ত পার্টি-কমরেডরা এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেবেন।

টীকা

১। 'বুদ্ধিজীবী' বলতে বোঝানো হচ্ছে তাঁদের সবাইকে, যাঁরা মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের বা আরও বেশি শিক্ষালাভ করেছেন, এবং যাঁরা এরকম স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রেরা, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা, পেশাদার শিক্ষাজীবীরা, ইঞ্জিনিয়ার এবং যন্ত্রবিদেরা। এদের মধ্যে আবার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রদের অবস্থান।

চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি[1]

ডিসেম্বর, ১৯৩৯

প্রথম অধ্যায়

চীনের সমাজ

১। চীনা জাতি

চীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশগুলির মধ্যে একটি। এ দেশের ভৌগোলিক আয়তন সমগ্র ইউরোপের প্রায় সমান। আমাদের এই বিরাট দেশের উর্বর বিরাট বিরাট এলাকা আমাদের খাদ্য ও বস্ত্রের জোগান দেয়; দেশের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ জুড়ে আছে ছোট-বড় পর্বতমালা, যেখানে বিস্তীর্ণ অরণ্য ও সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়; বহু নদী ও হ্রদ আছে, যার ফলে জলপথে যাতায়াত ও সেচ ব্যবস্থার সুবিধা হয়েছে; আর আছে এক দীর্ঘ তটরেখা, যা আমাদের সমুদ্রের পর-পারের জাতিগুলির সাথে যোগাযোগের সুবিধা করে দিয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই বিরাট ভূখণ্ডে পরিশ্রম করেছেন, জীবনধারণ করেছেন ও জনসংখ্যার দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছেন।

চীনের উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমের সীমান্ত সোভিয়েত সমাজ-তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ইউনিয়নের সংগে সংলগ্ন; উত্তরে মঙ্গোলিয়া গণ-প্রজাতন্ত্র; দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিমে আফগানিস্তান, ভারত, ভুটান ও নেপাল; দক্ষিণে বার্মা ও ভিয়েতনাম; পূর্বে কোরিয়া অবস্থিত; তাছাড়া পূর্বদিকে জাপান এবং ফিলিপাইনও চীনের নিকটবর্তী প্রতিবেশী। চীনদেশের এই ভৌগোলিক অবস্থান চীনের জনসাধারণের বিপ্লবের পক্ষে সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই সৃষ্টি করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকটবর্তী হওয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দূরবর্তী হওয়া এবং আমাদের চতুর্দিকে বহু ঔপনিবেশিক অথবা আধা-ঔপনিবেশিক দেশ থাকা একটি সুবিধাজনক

---

[1] ১৯৩৯ সালের শীতকালে ইয়েনানে কমরেড মাও সে-তুঙ ও অন্য কয়েকজন কমরেড মিলিত ভাবে 'চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি' নামে একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। 'চীনের সমাজ' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়টির খসড়া করেন অন্য কমরেডরা, খসড়াটি কমরেড মাও সে তুঙ সংশোধন করে দেন। 'চীন বিপ্লব' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়টি কমরেড মাও সে তুঙ নিজে লেখেন।

ব্যাপার। আর জাপানী সাম্রাজ্যবাদ তার ভৌগোলিক নৈকট্যের সুবিধা নিয়ে সবসময় চীনা জাতিগুলির অস্তিত্ব এবং চীনা জনগণের বিপ্লবের পক্ষে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে—এটা হচ্ছে অসুবিধাজনক দিক।

বর্তমান চীনের জনসংখ্যা প্রায় ৪৫ কোটি, অর্থাৎ সারা দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। এই জনসংখ্যার দশ ভাগের নয় ভাগেরও বেশি 'হান' জাতীয়। এ ছাড়া বহু সংখ্যালঘু জাতিসত্তা আছে—যেমন মঙ্গোল, হুই, তিব্বতী, উইগুর, মিয়াও, ঈ, চুয়াং, চুংচিয়া ও কোরিয়ান প্রভৃতি। এদের সকলেরই দীর্ঘকালের ইতিহাস আছে—যদিও সাংস্কৃতিক বিকাশের দিক থেকে এরা বিভিন্ন স্তরে। মোটকথা, চীন হচ্ছে বহু জাতিসত্তা নিয়ে গঠিত জনবহুল একটি দেশ।

দুনিয়ার অন্যান্য বহু জাতির বিকাশধারার মতো চীনা জাতি (এখানে আমরা প্রধানতঃ হানদের কথা বলছি) হাজার হাজার বছর ধরে শ্রেণীহীন আদিম কমিউন জীবন যাপন করে এসেছে। আজ থেকে প্রায় হাজার চারেক বছর আগে এই আদিম কমিউনগুলো ভেঙে পড়ে এবং শ্রেণীসমাজের আবির্ভাব ঘটতে থাকে, যা প্রথমে দাস সমাজের ও পরে সামন্ত সমাজের রূপ গ্রহণ করে। চীনা জাতির সভ্যতার ইতিহাসে চীনের কৃষি ও হস্তশিল্প উন্নতমানের জন্য বিখ্যাত ছিল। বহু মহান চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, রাজনীতিবিদ, রণবিশারদ, সাহিত্যিক ও শিল্পী চীনের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর চীনের রয়েছে এক সমৃদ্ধ চিরায়ত সংস্কৃতিভাণ্ডার। বহু যুগ আগে চীনদেশে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল।[১] কাগজ তৈরীর কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে আজ থেকে ১৮০০ বছর আগে[২] চীনদেশেই। ব্লকে ছাপা আবিষ্কৃত হয়েছে ১৩০০ বছর আগে[৩] এবং ৮০০ বছর আগে পরিবর্তনযোগ্য টাইপ আবিষ্কৃত হয়[৪]। ইউরোপীয়দের আগেই চীনারা বারুদের ব্যবহার জানত।[৫] অতএব, চীনের সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির অন্যতম, এবং চীনের প্রায় ৪০০০ বছরের লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়।

পার্টি গঠন' নিয়ে তৃতীয় অধ্যায় লেখার কথা ছিল, কিন্তু যে কমরেডরা লিখছিলেন তাঁরা তা শেষ করতে পারেননি। অধ্যায় দুটি, বিশেষ করে দ্বিতীয় অধ্যায়টি, চীনের কমিউনিস্ট, পার্টি ও চীনা জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কমরেড মাও সে-তুঙ নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেন, পরে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে লিখিত তাঁর 'নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে' গ্রন্থে তিনি তা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

চীনা জাতি শুধু অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতার জন্য নয়, তীব্র স্বাধীনতা-প্রিয়তা এবং সমৃদ্ধ বিপ্লবী ঐতিহ্যের জন্যও বিশ্ববিখ্যাত। উদাহরণস্বরূপ, হান জাতির ইতিহাসে দেখা যায় যে, চীনা জনগণ কখনো স্বৈরাচারী শাসন মুখ বুজে সহ্য করেনি, বরং ঐ শাসন উৎখাত ও পরিবর্তনের জন্য সর্বদাই সুনিশ্চিত-ভাবে বিপ্লবী পন্থা গ্রহণ করেছে। হান জাতির কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে জমিদার ও অভিজাতদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে শত শত ছোট-বড় কৃষক-বিদ্রোহ ঘটেছে এবং এই ধরনের কৃষক-বিদ্রোহের ফলেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক বংশ থেকে আর এক বংশে রাজত্বের পরিবর্তন ঘটেছে। চীনের সমস্ত জাতি বিদেশী জাতির অত্যাচার প্রতিরোধ করেছে এবং ঐ অত্যাচার দূর করতে বিনা ব্যতিক্রমে প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করেছে। সমানাধিকারের ভিত্তিতে এরা ঐক্যের পক্ষে, কিন্তু এক জাতির দ্বারা অন্য জাতির ওপরে অত্যাচারের এরা বিরোধী। লিখিত ইতিহাসের বিগত কয়েক হাজার বছরে চীনা জাতি বহু জাতীয় নায়ক ও বিপ্লবী নেতার জন্ম দিয়েছে। এইভাবে দেখা যায় যে, চীনা জাতির এক গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবী ঐতিহ্য এবং এক চমৎকার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার রয়েছে।

২। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ

যদিও চীন একটি মহান জাতি এবং যদিও চীন বিরাট লোকসংখ্যা, দীর্ঘ ইতিহাস, সমৃদ্ধ বিপ্লবী ঐতিহ্য এবং অত্যুজ্জ্বল উত্তরাধিকার অধ্যুষিত এক সুবিশাল দেশ, তবুও দাস ব্যবস্থা থেকে সামন্ত ব্যবস্থায় উত্তরণের পর থেকে তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ দীর্ঘকাল ধরে মন্থর হয়ে পড়েছিল। চৌ ও চিন বংশের রাজত্বকাল থেকে শুরু করে এই সামন্ত ব্যবস্থা প্রায় ৩০০০ বছর ধরে টিঁকে ছিল।

চীনের সামন্তযুগের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল এই :

(১) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাভাবিক অর্থনীতিরই ছিল প্রাধান্য। শুধু কৃষি-জাত দ্রব্যই নয়, নিজেদের প্রয়োজনের অধিকাংশ হস্ত শিল্পজাত দ্রব্যও কৃষকেরা উৎপাদন করত। জমিদারেরা ও অভিজাতেরা কৃষকদের কাছ থেকে জমির খাজনা হিসেবে যা নিয়ে নিত, তাও ছিল প্রধানতঃ ব্যক্তিগত উপভোগের জন্য, বিনিময়ের জন্য নয়। যদিও কালক্রমে বিনিময় প্রথা বিকাশলাভ করেছিল,

তবুও সমগ্র অর্থনীতিতে এটা নির্ধারক ভূমিকা পালন করেনি।

(২) জমিদার, অভিজাত ও সম্রাটকে নিয়ে গঠিত সামন্ত শাসকশ্রেণীই ছিল অধিকাংশ জমির মালিক, আর কৃষকদের জমি ছিল সামান্য অথবা মোটেই ছিল না। কৃষকেরা নিজেদের কৃষিযন্ত্রপাতি দ্বারা জমিদার, অভিজাত ও রাজ-পরিবারের জমি চাষ করত এবং তাদের উপভোগের জন্য কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের শতকরা ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, এমনকি ৮০ ভাগ অথবা তারও বেশি দিয়ে দিতে হতো। ফলে কৃষকেরা বাস্তবতঃ তখনো ছিল ভূমিদাস।

(৩) জমিদার, অভিজাত ও রাজপরিবার কৃষকদের কাছ থেকে আদায়ীকৃত খাজনা দ্বারা শুধু জীবনযাপনই করত না, উপরন্তু একগাদা সরকারী কর্মচারীদের জন্য এবং প্রধানতঃ কৃষকদের দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী পোষার জন্য এই জমিদারী রাষ্ট্র কৃষকদের কাছ থেকে সেলামী, ট্যাক্স ও বেগার-খাটুনি আদায় করত।

(৪) এই সমস্ত শোষণ ব্যবস্থা রক্ষা করার হাতিয়ার ছিল সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী রাষ্ট্র। চিন বংশের রাজত্বের পূর্বযুগে এই সামন্ত রাষ্ট্র ছিল বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রধান প্রধান রাজ্যে বিভক্ত, প্রথম চিন সম্রাট চীনদেশকে ঐক্যবদ্ধ করার পর এই সামন্ত রাষ্ট্র স্বৈরতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত রূপ পরিগ্রহ করল, যদিও কিছু পরিমাণ সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা তখনো বজায় রইল। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্রাটই ছিলেন সর্বেসর্বা এবং তিনি দেশের সমগ্র অঞ্চলে সেনাবাহিনীর, আইন-আদালতের, খাজাঞ্চীখানার এবং শস্যাগারগুলোর কর্মচারী নিয়োগ করতেন, এবং সামন্ততান্ত্রিক শাসনের প্রধান স্তম্ভ হিসেবে জমিদার বাবুদের ওপর নির্ভর করতেন।

এই ধরনের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক শোষণ ও সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক জুলুমের অধীনে চীনদেশের কৃষকেরা যুগ যুগ ধরে দারিদ্র্য এবং দুঃখকষ্টে ক্রীতদাসের মতো জীবন কাটিয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বন্ধনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে তাদের কিছুই ছিল না। তাদের প্রহার করার ও গালাগাল দেওয়ার, এমনকি খুশিমত খুন করার অধিকার পর্যন্ত জমিদারদের ছিল, তাদের আদৌ কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। চীনা সমাজ যে কয়েক হাজার বছর ধরে একই সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরে দাঁড়িয়েছিল, নির্মম জমিদারী শোষণ ও জুলুমের ফলে কৃষকদের চরম দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতাই ছিল তার মূল কারণ।

সামন্ত সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল কৃষকশ্রেণী ও জমিদারশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব।

কৃষক ও হস্তশিল্পীরাই ছিল এই সমাজের সম্পদ ও সংস্কৃতি সৃষ্টিকারী মূল শ্রেণী।

কৃষকদের ওপর জমিদারশ্রেণীর নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক উৎপীড়নই জমিদারশ্রেণীর শাসনের বিরুদ্ধে বারংবার বিদ্রোহ করতে কৃষকদের বাধ্য করেছিল। ছোট-বড় শত শত বিদ্রোহ ঘটেছে, এর সবগুলিই ছিল কৃষকদের প্রতিরোধ-আন্দোলন অথবা কৃষকদের বিপ্লবী যুদ্ধ—চিন বংশের রাজত্বকালে চেন শেং, উ কুয়াং, সিয়াং ইয়ু ও লিউ পাংয়ের বিদ্রোহ[৬] থেকে শুরু করে হান বংশের রাজত্বকালে সিনশি, পিংলিন, লাল ভুরু, ব্রোঞ্জের ঘোড়া[৭] ও হলদে পাগড়ীর[৮] বিদ্রোহ, সুই বংশের রাজত্বকালে লি মি ও তৌ চিয়ান-তে'র বিদ্রোহ[৯], তাং বংশের রাজত্বকালে ওয়াং সিয়ান-চি ও হুয়াং চাও-এর বিদ্রোহ[১০], সুং বংশের রাজত্বকালে সুং চিয়াং ও ফাং লা'র বিদ্রোহ[১১], ইউয়ান বংশের রাজত্বকালে চু ইউয়ান-চাংয়ের বিদ্রোহ[১২], মিং বংশের রাজত্বকালে লি জু-চেংয়ের বিদ্রোহ[১৩] এবং চিং বংশের রাজত্বকালে তাই পিং স্বর্গীয় রাজ্যের বিপ্লব[১৪] পর্যন্ত। চীনের ইতিহাসে এইসব কৃষক-বিদ্রোহ ও কৃষক-যুদ্ধ যে রকম ব্যাপকতালাভ করেছিল, অন্য কোথাও তা চোখে পড়ে না। চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কেবলমাত্র এই ধরনের কৃষকদের শ্রেণী-সংগ্রাম, কৃষক-বিদ্রোহ এবং কৃষক-যুদ্ধই ছিল ঐতিহাসিক বিকাশের প্রকৃত চালিকা-শক্তি। কারণ প্রত্যেকটি অপেক্ষাকৃত বিরাট কৃষক-বিদ্রোহ ও কৃষক-যুদ্ধ তৎকালীন সামন্ত শাসনের ওপর আঘাত হেনেছিল, ফলে সেগুলো সামাজিক উৎপাদন শক্তিসমূহের বিকাশকে কমবেশি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু ঐ সময়ে নতুন উৎপাদন শক্তি, নতুন উৎপাদন সম্পর্ক, নতুন শ্রেণী-শক্তি বা কোন অগ্রগামী রাজনৈতিক পার্টির অস্তিত্ব ছিল না, সেইহেতু ঐসব কৃষক-বিদ্রোহ ও কৃষক-যুদ্ধে আজকের দিনের মতো সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির মতো সঠিক নেতৃত্ব ছিল না, ফলে প্রতিটি কৃষক-বিপ্লবই ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রতিবারই হয় বিপ্লবের মধ্যে কিংবা বিপ্লবের পরে জমিদাররা ও অভিজাতরা রাজবংশের পরিবর্তনের যন্ত্র হিসেবে সেইসব বিপ্লবকে ব্যবহার করেছে। সুতরাং, প্রতিটি বিরাট কৃষক-বিপ্লবী সংগ্রামের পরই কিছু না কিছু সামাজিক অগ্রগতি ঘটে থাকলেও, সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও সামন্ততান্ত্রিক

রাজনৈতিক ব্যবস্থা মূলতঃ অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

মাত্র গত একশ বছরের মধ্যেই একটি নতুন ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে।

৩। বর্তমান ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ

উপরে দেখা গেল যে, চীনের সমাজ তিন হাজার বছর ধরে সামন্ততান্ত্রিক ছিল। তাহলে এখনো কি ঐ সমাজ সম্পূর্ণরূপে সামন্ততান্ত্রিক? না, চীনের পরিবর্তন ঘটেছে। ১৮৪০ সালের আফিং যুদ্ধের[১৫] পর চীন ক্রমান্বয়ে একটি আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা অর্থাৎ জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা যখন চীনের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করেছে, তখন থেকে চীন আবার একটা ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পরিণত হয়। আমরা এখন এই পরিবর্তনের গতিপথ আলোচনা করব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে, চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ প্রায় তিন হাজার বছর স্থায়ী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিদেশী পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশের ফলে চীনা সমাজে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে যায়।

চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পণ্য-অর্থনীতির বিকাশের ফলে তার ভেতরে পুঁজিবাদের বীজ এসে গিয়েছিল। সুতরাং, বিদেশী পুজিবাদের প্রভাব ছাড়াও এমনিতেই চীন ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী সমাজে পরিণত হতো। বিদেশী পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। বিদেশী পুঁজিবাদ চীনের সামাজিক অর্থনীতির বিচ্ছিন্নতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একদিনে তা চীনের স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাভাবিক অর্থনীতির বুনিয়াদকে ধ্বংস করল এবং শহরে ও কৃষকদের গৃহে উভয়স্থানেই হস্তশিল্পকে ধ্বংস করল, অন্যদিকে চীনের শহরে ও গ্রামাঞ্চলে পণ্য-অর্থনীতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে তুলল।

এইসব ঘটনা শুধু চীনের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে ভেঙে ফেলার ব্যাপারেই ভূমিকা পালন করেনি, উপরন্তু চীন দেশে পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশের পক্ষেও কতকগুলো বাস্তব অবস্থা এবং সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। কারণ স্বাভাবিক অর্থনীতির ধ্বংস পুঁজিবাদের জন্য পণ্যের বাজার সৃষ্টি করেছিল এবং কৃষক ও হস্তশিল্পীদের দেউলিয়াত্ব পুঁজিবাদকে শ্রমশক্তির বাজারও দিয়েছিল।

বস্তুতঃ, বিদেশী পুঁজিবাদের প্রেরণায় এবং সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় কতকগুলি ফাটল দেখা দেওয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে, অর্থাৎ আজ থেকে ষাট বছর আগেই কিছু ব্যবসায়ী, জমিদার ও আমলা আধুনিক শিল্পে অর্থ লগ্নী করতে শুরু করল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বর্তমান শতাব্দী শুরু হবার মুখে, প্রায় ৪০ বছর আগে চীনের জাতীয় পুঁজিবাদ অগ্রগতির প্রথম পদক্ষেপ ফেলে। তারপর প্রায় বিশ বছর আগে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত ছিল এবং অস্থায়ীভাবে চীনের ওপর তাদের জুলুমের মাত্রা লাঘব করেছিল বলে চীনের জাতীয় শিল্প, প্রধানতঃ বয়নশিল্প ও ময়দাকল, আরও বিস্তৃতিলাভ করেছে।

চীনের জাতীয় পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস একই সময়ে চীনের বুর্জোয়া ও সর্বহারাশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসও বটে। ব্যবসায়ী, জমিদার ও আমলাদের একাংশ যেমন ছিল চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীর পূর্বগামী, তেমনি কৃষক ও হস্তশিল্পীদের একাংশ ছিল চীনা সর্বহারাশ্রেণীর পূর্বগামী। চীনা বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণী স্বতন্ত্র সামাজিক শ্রেণী হিসেবে নবজাত, চীনের ইতিহাসে আগে কখনো এদের অস্তিত্ব ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভ থেকে এরা নতুন সামাজিক শ্রেণীরূপে বেরিয়ে এসেছে, এরা পুরানো (সামন্ততান্ত্রিক) সমাজের দুই যমজ সন্তান, একই সংগে পরস্পর-সংযুক্ত এবং পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু চীনের সর্বহারাশ্রেণী চীনের জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথেই শুধু উদ্ভব ও বিকাশলাভ করেনি, পরন্তু চীনদেশে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে চালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সাথেও বিকাশলাভ করেছিল। সুতরাং চীনা সর্বহারাশ্রেণীর এক বিরাট অংশ চীনা বুর্জোয়াদের চেয়ে বয়সে ও অভিজ্ঞতায় অধিকতর প্রবীণ, তাই এ শ্রেণীর সামাজিক শক্তি ও সামাজিক ভিত্তি আরও বৃহৎ ও আরও ব্যাপক।

কিন্তু চীনে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশের পর থেকে যে পরিবর্তন ঘটেছে, পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশ তার একটি দিক মাত্র। আরেকটি দিকও রয়েছে, যা প্রথম দিকটির সংগে থাকলেও তার বাধাস্বরূপ। এই দিকটি হচ্ছে, চীনের পুঁজিবাদের বিকাশ রোধের উদ্দেশ্যে চীনের সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির সংগে সাম্রাজ্যবাদের আঁতাত।

চীনের ওপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আক্রমণের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সামন্ত-

তান্ত্রিক চীনকে পুঁজিবাদী চীনে পরিণত করা ছিল না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল ঠিক এর বিপরীত—চীনকে নিজেদের আধা-উপনিবেশ ও উপনিবেশে পরিণত করা।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনের ওপর সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অত্যাচারের সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছে ও করে যাচ্ছে, যার ফলে চীন ক্রমান্বয়ে একটি আধা-উপনিবেশ এবং উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। ঐ পদ্ধতিগুলি হল এরকম:

(১) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনের বিরুদ্ধে বহু আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন কর্তৃক আফিং যুদ্ধ, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-ফ্রান্স মিত্রশক্তিগুলির যুদ্ধ[১৬], ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন ফরাসী যুদ্ধ[১৭], ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধ[১৮] এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আটটি মিত্র-শক্তির আক্রমণ[১৯]। যুদ্ধের মাধ্যমে চীনকে পরাজিত করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি চীনের পার্শ্ববর্তী দেশ, যেগুলি পূর্বে চীনের রক্ষাধীন ছিল, সেগুলিই শুধু দখল করেনি, চীনের নিজস্ব ভূভাগেরও অংশবিশেষ জবরদখল করেছে বা 'ইজারা নিয়েছে'। উদাহরণস্বরূপ, জাপান তাইওয়ান ও পেংহু দ্বীপপুঞ্জ দখল করেছে এবং লুশুন বন্দর 'ইজারা নিয়েছিল'। ব্রিটেন হংকং কেড়ে নিয়েছে এবং ফ্রান্স কুয়াংচো উপসাগর 'ইজারা নিয়েছিল'। রাজ্যদখল ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ বিপুল অর্থ আদায় করেছিল। এইভাবে তারা চীনের এই বিরাট সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যে গুরুতর আঘাত হেনেছিল।

(২) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনকে অসংখ্য অসম চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছে, এর সাহায্যে তারা চীনে স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী মোতায়েন করার ও দূতাবাসের ক্ষমতার এক্তিয়ার খাটানোর অধিকার অর্জন করল[২০] এবং সমগ্র চীনকে কতকগুলি সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রভাবাধীন এলাকায় ভাগ করে নিল[২১]।

(৩) এই অসম চুক্তিগুলির মারফত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনের সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক বন্দরের নিয়ন্ত্রণলাভ করল এবং এইসব বন্দরের অনেকগুলিতে তারা নিজেদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকাগুলি চিহ্নিত করে নিল[২২]। তারা চীনের শুল্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার (সমুদ্রপথ, স্থলপথ, দেশের আভ্যন্তরীণ জলপথ ও বিমান-

পথ) নিয়ন্ত্রণলাভ করল। 'এইভাবে তারা তাদের পণ্যসামগ্রী চীনদেশে বিপুল পরিমাণে বিক্রি করতে, চীনকে তাদের শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজারে পরিণত করতে এবং সাথে সাথে চীনের কৃষিকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনের অধীনে আনতে সমর্থ হয়েছে।

(৪) চীনের কাঁচামাল এবং সস্তা শ্রম যাতে সেখানেই কাজে লাগানো যায়, সেজন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি হাল্কা ও ভারী শিল্প উভয়ক্ষেত্রেই বহু প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছে, এইভাবে তারা চীনের জাতীয় শিল্পের ওপর প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করছে ও চীনের উৎপাদন শক্তিগুলির বিকাশে বাধা দিচ্ছে।

(৫) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীন সরকারকে ঋণ দিয়ে এবং ব্যাঙ্ক স্থাপন করে চীনের ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক ব্যবস্থায় একচেটিয়া অধিকার কায়েম করেছে। এইভাবে তারা যে শুধু পণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চীনের জাতীয় পুঁজিবাদকেই কোণঠাসা করে দিয়েছে তাই নয়, উপরন্তু চীনের ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক ব্যবস্থাকেও কব্জা করে নিয়েছে।

(৬) বাণিজ্যিক বন্দরগুলি থেকে শুরু করে দেশের সুদূর পশ্চাদ্ভূমি পর্যন্ত সারা চীনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি একটি মুৎসুদ্দি ও কারবারী-সুদখোর শোষণের জাল বিস্তার করেছে এবং নিজেদের সেবাদাসরূপে এমন একটি মুৎসুদ্দি ও কারবারী-সুদখোরশ্রেণী তৈরী করেছে, যাতে চীনের কৃষকসমাজ ও জনগণের অন্যান্য অংশকে শোষণের পথ সুগম হয়।

(৭) মুৎসুদ্দিশ্রেণী ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনের সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণীকেও চীনদেশে তাদের শাসনের প্রধান স্তম্ভরূপে দাঁড় করিয়েছে। তারা 'জনসাধারণের অধিকাংশের বিরুদ্ধে প্রথমে আগের সমাজব্যবস্থার শাসক-শ্রেণীর সাথে অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক জমিদার, ব্যবসায়ী ও কারবারী-সুদখোর বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে আঁতাত করে। সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের আগের যুগের শোষণের ঐ সমস্ত রূপকে (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে) বজায় রাখতে এবং চিরস্থায়ী করতে চেষ্টা করে—যেগুলি তার প্রতিক্রিয়াশীল মিত্রদের অস্তিত্বের ভিত্তিরূপে কাজ করে।'[২৩] 'সাম্রাজ্যবাদ তার সমস্ত আর্থিক ও সামরিক শক্তিসহ চীনদেশে এমন একটি শক্তি, যা চীনের সামন্ততান্ত্রিক অবশিষ্টাংশকে ও তার সমগ্র আমলাতান্ত্রিক-সমরতান্ত্রিক উপরি-কাঠামোকে সমর্থন করে, উৎসাহিত করে, লালনপালন করে ও রক্ষা করে।'[২৪]

(৮) চীনের সমরনায়কদের পরস্পরের মধ্যে লড়াইয়ে ব্যাপৃত রাখার জন্য এবং চীনা জনগণকে দমন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রতিক্রিয়াশীল চীন সরকারকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও একগাদা সামরিক উপদেষ্টা দেয়।

(৯) তাছাড়া, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনা জনসাধারণের মনকে বিষাক্ত করার প্রচেষ্টা কখনো শিথিল করেনি। এটা হচ্ছে তাদের সাংস্কৃতিক আক্রমণের নীতি। মিশনারী কার্যকলাপ, হাসপাতাল এবং স্কুল প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র প্রকাশ এবং চীনা ছাত্রদের বিদেশে পড়াশুনায় উৎসাহ দানের মাধ্যমে ঐ নীতি কার্যকরী করা হয়। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুম তামিল করবে এমন সব বুদ্ধিজীবী তৈরী করা এবং চীনের ব্যাপক জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া।

(১০) ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপক আক্রমণ আধা-ঔপনিবেশিক চীনের এক বিরাট অংশকে জাপানী উপনিবেশে পরিণত করেছে।

এই সমস্ত তথ্যই সাম্রাজ্যবাদের চীনদেশ আক্রমণের পরে যে নতুন পরিবর্তন ঘটেছে তার অন্যদিক, অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক চীনের আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক চীনে রূপান্তরের এক রক্তাক্ত চিত্র প্রকাশ করে দিচ্ছে।

তাহলে এটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি একদিকে চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিচ্ছিন্নতা এবং পুঁজিবাদী উপাদানের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে, এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত করেছে। অন্যদিকে চীনদেশে তাদের নির্মম শাসন চালিয়ে একটি স্বাধীন দেশকে তারা আধা-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক দেশে পরিণত করেছে।

এই দুটি দিক একসাথে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, চীনের ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি আছে:

(১) সামন্তযুগের স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাভাবিক অর্থনীতির বুনিয়াদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার ভিত্তি অর্থাৎ জমিদারশ্রেণী কর্তৃক কৃষকদের শোষণ শুধু অটুটই থাকেনি, বরং মুৎসুদ্দি ও সুদখোর পুঁজির শোষণের

সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তা স্পষ্টতঃই চীনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ওপর আধিপত্য করছে।

(২) জাতীয় পুঁজিবাদ কিছুটা পরিমাণে বিকাশলাভ করেছে এবং চীনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু চীনের সামাজিক অর্থনীতিতে সে প্রধান রূপ হয়ে উঠতে পারেনি, বরং তার শক্তি খুবই দুর্বল এবং এর অধিকাংশ অল্প-বিস্তর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী সামন্তবাদের সাথে সংযুক্ত।

(৩) সম্রাটদের ও অভিজাতদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন উচ্ছেদ হয়ে গেছে, কিন্তু তার জায়গায় প্রথমে জমিদারশ্রেণীর সমরনায়ক-আমলাদের শাসন এবং পরে জমিদারশ্রেণীর ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্বের উদ্ভব হয়েছে। অধিকৃত এলাকায় রয়েছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের শাসন।

(৪) সাম্রাজ্যবাদ চীনের আর্থিক ও অর্থনৈতিক শিরা-উপশিরাগুলিকে শুধু নিয়ন্ত্রণই করে না, অধিকন্তু তার রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। অধিকৃত এলাকায় সমস্ত কিছুই জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে।

(৫) চীন বহু সাম্রাজ্যবাদী দেশের সম্পূর্ণ বা আংশিক আধিপত্যের মধ্যে গিয়ে এসেছে, বস্তুতঃ, দীর্ঘকাল ধরে চীন অনৈক্যের অবস্থায় রয়েছে এবং ভৌগোলিক আয়তন বিরাট বলে চীনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ অত্যন্ত অসম।

(৬) সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের দ্বৈত পীড়নের ফলে এবং বিশেষ করে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপক আক্রমণের ফলে ব্যাপক চীনা জনগণের, বিশেষ করে কৃষকরা, ক্রমান্বয়ে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে, এমনকি বিরাট সংখ্যায় নিঃস্ব কাঙালের পর্যায়ে পৌঁছেছে। তারা অনাহারে ও শীতের যন্ত্রণায় কাল কাটায়, এবং তাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার নেই। চীনা জনগণ দারিদ্র্য ও স্বাধীনতার অভাবের তুলনা অন্যত্র খুব কমই পাওয়া যায়।

এইগুলি হচ্ছে চীনের ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য।

এই পরিস্থিতি প্রধানতঃ নির্ধারিত হয়েছে জাপানী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দ্বারা, এ হচ্ছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী সামন্তবাদের আঁতাতের ফল।

সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা জাতির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং সামন্তবাদের ও বিপুল

জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব হচ্ছে আধুনিক চীনা সমাজের মূল দ্বন্দ্ব। অবশ্য অন্ত দ্বন্দ্বও রয়েছে, যেমন বুর্জোয়া ও সর্বহারাশ্রেণীর দ্বন্দ্ব এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীগুলির নিজেদের ভেতরকার দ্বন্দ্ব। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা জাতির মধ্যেকার দ্বন্দ্বই এসবগুলির মধ্যে প্রধান। এই দ্বন্দ্বগুলির সংগ্রাম ও এদের তীব্রতা বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াবে বিপ্লবী আন্দোলনের অবিরাম অগ্রগতি। এই সমস্ত মৌলিক দ্বন্দ্বগুলির ভিত্তিতেই আধুনিক ও সমকালীন চীনের মহান বিপ্লব আবির্ভূত হয়েছে ও বিকশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চীন বিপ্লব

১। গত একশ বছরের বিপ্লবী আন্দোলন

চীনের সামন্তবাদের সঙ্গে আঁতাত করে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক চীনকে একটি আধা-উপনিবেশে ও উপনিবেশে রূপান্তরিত করার ইতিহাস একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের সংগ্রামের ইতিহাসও বটে। আফিং যুদ্ধ, তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের বিপ্লব, চীন-ফরাসী যুদ্ধ, চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলন[২৫], ই হো তুয়ান আন্দোলন[২৬], ১৯১১-র বিপ্লব[২৭], ৪ঠা মে আন্দোলন, ৩০শে মে'র আন্দোলন[২৮], উত্তর অভিযান[২৯] ও কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধ থেকে বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ পর্যন্ত—সমস্তই সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের কাছে চীনা জনগণ যে নতিস্বীকার করতে চান না, তারই অদম্য মনোবলের পরিচায়ক।

গত একশ বছর ধরে চীনা জনগণের অবিচল ও আপোষহীন বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্যই সাম্রাজ্যবাদ আজ পর্যন্ত চীনকে পদানত করতে সক্ষম হয়নি, এবং কখনো হবেও না।

এখন যদিও জাপ-সাম্রাজ্যবাদ তার সর্বশক্তি দিয়ে চীনের ওপর সর্বাত্মক অভিযান চালাচ্ছে এবং যদিও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ওয়াং চিং-ওয়েইদের মতো চীনের বহু বড় বড় বুর্জোয়া ও জমিদার ইতিমধ্যেই শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে বা করার জন্য তৈরী হচ্ছে, তথাপি বীর চীনা জনগণ নিশ্চয়ই সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে চীন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত চীনা জনগণের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম থামবে না।

১৮৪০ সালের আফিং যুদ্ধ থেকে ধরলে চীনা জনগণের জাতীয় বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসই পুরো একশ বছরের; ১৯১১ সালের সিনহাই বিপ্লব থেকে ধরলে ত্রিশ বছরের ইতিহাস রয়েছে। এই বিপ্লবের পুরো গতিপথ অতিক্রম করা এখনো বাকি রয়েছে, তার করণীয় কাজগুলিও উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সাথে সমাধা হয়নি, অতএব চীনা জনগণকে এবং সর্বোপরি চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বহন করতে হবে।

তাহলে, এই বিপ্লবের আক্রমণের লক্ষ্য কি কি? এর করণীয় কাজগুলিই বা কি? এর চালিকাশক্তিগুলি কি কি? এর চরিত্র কি? আর এর পরিপ্রেক্ষিতই-বা কি? আমরা এখন এইসব আলোচনা করব।

২। চীন বিপ্লবের লক্ষ্য

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের বিশ্লেষণ থেকে আমরা জেনেছি যে, বর্তমান চীনা সমাজ একটি ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। চীনা সমাজের স্বরূপ বুঝতে পারলেই আমাদের পক্ষে চীন বিপ্লবের লক্ষ্য, করণীয় কাজগুলি, চালিকাশক্তি, চরিত্র, পরিপ্রেক্ষিত ও ভবিষ্যৎ উত্তরণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হবে। সুতরাং চীনা সমাজের স্বরূপ অর্থাৎ চীনের অবস্থাকে স্পষ্টভাবে বোঝাই হচ্ছে চীন বিপ্লবের সমস্ত সমস্যাকে স্পষ্টভাবে বোঝার মূল ভিত্তি।

যেহেতু বর্তমান যুগের চীনা সমাজের চরিত্র ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক, সুতরাং চীন বিপ্লবের এ স্তরে প্রধান প্রধান লক্ষ্য কি, অথবা শত্রু কারা?

সেগুলি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের বুর্জোয়াশ্রেণী এবং আমাদের দেশের জমিদারশ্রেণী। কারণ বর্তমান স্তরের চীনা সমাজে এ দুটি শ্রেণীই হচ্ছে চীনা সমাজের অগ্রগতির প্রধান পীড়নকারী ও প্রধান অন্তরায়। এরা পরস্পরের সঙ্গে আঁতাত করে চীনা জনগণকে উৎপীড়ন চালাচ্ছে, আর সাম্রাজ্যবাদের জাতীয় পীড়নই সবচাইতে তীব্র, তাই সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে চীনা জনগণের প্রধানতম ও হিংস্রতম শত্রু।

চীনের ওপর জাপানের সশস্ত্র আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে চীন বিপ্লবের প্রধান শত্রু হয়েছে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও তার সঙ্গে আঁতাতকারী সকল দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলরা, যারা প্রকাশ্যে আত্মসমর্পণ করেছে অথবা

করার জন্ত তৈরী হচ্ছে—তারা সবাই।

চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী জুলুমের একটি শিকারও বটে। এই শ্রেণী একদা ১৯১১-র বিপ্লবের মতো বিপ্লবী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে বা তার পরিচালনায় একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে; উত্তর অভিযান ও বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের মতো বিপ্লবী সংগ্রামেও অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল এই বুর্জোয়াশ্রেণীর ওপরের স্তর, অর্থাৎ কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যে অংশের প্রতিনিধিত্ব করে সেই অংশ, সাম্রাজ্যবাদের সাথে আঁতাত করে ও জমিদারশ্রেণীর সাথে প্রতিক্রিয়াশীল মৈত্রীজোট গঠন করে, যে-বন্ধুরা তাদের সাহায্য করেছিল তাদের প্রতি, অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি, সর্বহারাশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া অংশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, চীন বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং তার পরাজয় ঘটিয়েছিল। সুতরাং, তখন বিপ্লবী জনগণ ও বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি (কমিউনিস্ট পার্টি) এই বুর্জোয়াদেরকে বিপ্লবের অন্যতম লক্ষ্য রূপে গ্রহণ না করে পারেনি। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে বৃহৎ জমিদারশ্রেণীর ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর একাংশ, যাদের প্রতিনিধি হল ওয়াং চিং-ওয়েই, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং দেশদ্রোহীতে পরিণত হয়েছে। কাজেই জাপ-বিরোধী জনসাধারণ এসব বৃহৎ বুর্জোয়াদের, যারা জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদেরকে বিপ্লবের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য রূপে গ্রহণ না করে পারেনি।

তাহলে স্পষ্টতঃই দেখা যচ্ছে, চীন বিপ্লবের শত্রুরা অত্যন্ত শক্তিশালী। তাদের মধ্যে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ ও শক্তিশালী সামন্তশক্তি ছাড়াও সময় সময় থাকে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলরা, যারা জনগণের বিরোধিতা করার জন্ত সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে আঁতাত করে। সুতরাং চীনের বিপ্লবী জনসাধারণের শত্রুদের শক্তিকে ছোট করে দেখা ঠিক নয়।

এহেন শত্রুদের মুখে দাঁড়িয়ে চীন বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী ও নির্মম না হয়ে পারে না। আমাদের শত্রুরা অত্যন্ত শক্তিশালী বলে অবশেষে তাদের বিপর্যস্ত করতে হলে দীর্ঘকাল ব্যতীত বিপ্লবী শক্তিগুলিকে এই কাজের সমর্থ করে তোলা ও গড়ে তোলা অসম্ভব। শত্রু চীন বিপ্লবকে অত্যন্ত নির্মমভাবে দমন করে বলে বিপ্লবী শক্তিগুলি নিজেদের ইস্পাত-দৃঢ় করে তুলতে এবং কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে লেগে থাকতে বাধ্য, তা না হলে নিজেদের অবস্থান

দখল করতে তারা ব্যর্থ হবে। সুতরাং এটা ভাবা ভুল হবে যে, চীনা বিপ্লবী শক্তিগুলিকে চোখের পলকে গড়ে তোলা যায় অথবা চীনের বিপ্লবী সংগ্রাম রাতারাতি জয়যুক্ত হতে পারে।

এহেন শত্রুদের মুখে চীন বিপ্লবের প্রধান পন্থা, চীন বিপ্লবের প্রধান রূপ অবশ্যই হবে সশস্ত্র সংগ্রাম, শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম নয়। কারণ আমাদের শত্রুরা চীনা জনগণের পক্ষে শান্তিপূর্ণ কার্যকলাপ চালানো অসম্ভব করে দিয়েছে এবং সমস্ত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে। স্তালিন বলেছেন: 'চীনদেশে সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, এটা চীন বিপ্লবের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির ও সুবিধাগুলির অন্যতম।'[৩০] এই সূত্র সম্পূর্ণ সঠিক। অতএব, সশস্ত্র সংগ্রাম, বিপ্লবী যুদ্ধ, ও সেনাবাহিনীর কাজকে ছোট করে দেখা ভুল হবে।

এহেন শত্রুদের মুখে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার প্রশ্নও ওঠে। যেহেতু চীনের প্রধান শহরগুলো দীর্ঘকাল যাবৎ শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ ও তার চীনা প্রতিক্রিয়াশীল মিত্র বাহিনীর দখলে আছে, সেইহেতু যদি বিপ্লবী বাহিনী সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের সাথে আপোষ করতে না চায়, বরং দৃঢ়ভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে চায়, যদি তারা নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করতে ও নিজেদের শক্তিকে পোড় খাইয়ে মজবুত করতে চায়, এবং নিজেদের শক্তি যখন যথেষ্ট নয় তখন যদি শক্তিশালী শত্রুর সাথে জয় পরাজয়ের চূড়ান্ত লড়াই এড়াতে চায়, তাহলে অনগ্রসর গ্রামাঞ্চলগুলোকে অবশ্যই অগ্রসর সুদৃঢ় ঘাঁটি এলাকায় পরিণত করতে হবে, সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিরাট বিপ্লবী দুর্গে পরিণত করতে হবে, যাতে করে তারা সেই হিংস্র শত্রুদের—যারা গ্রামীণ এলাকাগুলোকে আক্রমণের জন্য শহরগুলোকে ব্যবহার করছে, তাদের বিরোধিতা করতে পারে, আর এইভাবেই দীর্ঘকালীন লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে ধাপে ধাপে অর্জন করতে হবে বিপ্লবের পূর্ণ বিজয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, যেহেতু চীনের অর্থনৈতিক বিকাশ অসম (তার অর্থনীতি ঐক্যবদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনীতি নয়), তার ভূখণ্ড বিস্তৃত (যার ফলে বিপ্লবী শক্তিগুলির চলাফেরা করার জায়গা আছে), চীনা প্রতিবিপ্লবী শিবির অনৈক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ এবং চীন বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষকদের সংগ্রাম সর্বহারা-শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত হয়, সেহেতু একদিকে চীন বিপ্লবের বিজয় প্রথমে গ্রামাঞ্চলে অর্জন করা সম্ভব; অপরদিকে,

এইসব অবস্থাই বিপ্লবকে অসম করে তোলে এবং সম্পূর্ণ বিপ্লবের কাজকে দীর্ঘস্থায়ী ও কষ্টকর করে তোলে। তাহলে স্পষ্টতঃই, এ ধরনের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাগুলিতে চালিত দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী সংগ্রাম হবে প্রধানতঃ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালিত কৃষকদের গেরিলাযুদ্ধ। সুতরাং গ্রামাঞ্চলকে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকারূপে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করা, কৃষকদের মধ্যে পরিশ্রম সহকারে কাজ করাকে তুচ্ছ করা এবং গেরিলাযুদ্ধ উপেক্ষা করা ভুল হবে।

অবশ্য সশস্ত্র সংগ্রামের ওপরে জোর দেওয়ার অর্থ সংগ্রামের অন্যান্য রূপগুলিকে বিসর্জন করা নয়। বরং অন্যান্য ধরনের সংগ্রামের সাথে সমন্বয় না ঘটালে সশস্ত্র সংগ্রাম সফল হতে পারে না। গ্রাম্য ঘাঁটি এলাকাগুলিতে কাজের ওপর জোর দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, শহরগুলিতে ও যে বিশাল গ্রাম্য এলাকা এখনো শত্রুর শাসনাধীনে রয়েছে সেখানে আমাদের কাজ বর্জন করে দিতে হবে। বরং শহরগুলিতে ও অন্যান্য গ্রাম্য এলাকায় যদি কাজ না করা যায়, তাহলে আমাদের নিজেদের গ্রাম্য ঘাঁটি এলাকাগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং বিপ্লবের পরাজয় ঘটবে। এছাড়া বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুর প্রধান ঘাঁটি হিসেবে শহরগুলিকে দখল করা আর শহরগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে কাজ ছাড়া এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব হবে।

এটাও সুস্পষ্ট যে, জনসাধারণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শত্রুর প্রধান হাতিয়ার অর্থাৎ তার সৈন্যবাহিনীর ধ্বংস ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে ও শহরে কোথাও বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে না। সুতরাং, যুদ্ধে শত্রুবাহিনীকে ধ্বংস করা ছাড়া তাদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে ওঠে।

এটাও সুস্পষ্ট যে, দীর্ঘকাল ধরে শত্রু-অধিকৃত প্রতিক্রিয়াশীল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন শহরগুলিতে ও গ্রামাঞ্চলে প্রচার ও সাংগঠনিক কাজে কমিউনিস্ট পার্টিকে কিছুতেই অধীর ও হঠকারী হলে চলবে না, বরং পার্টির নিম্নোক্ত নীতি অবলম্বন করা উচিত: পার্টির নিশ্চয়ই সুনির্বাচিত কর্মী থাকবে, যারা আত্মগোপন করে কাজ করবে, শক্তি সঞ্চয় করবে এবং সেখানে সুযোগের প্রতীক্ষা করবে। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণকে পরিচালিত করতে গিয়ে পার্টিকে যে কৌশল অবলম্বন করতে হবে তা হচ্ছে: সমস্ত প্রকাশ্য ও বৈধ আইন, হুকুম ও সামাজিক রীতিনীতির অনুমোদিত আওতার মধ্যে কাজকর্ম চালিয়ে ন্যায্য, সুবিধাজনক ও সুসংযত নীতিকে ভিত্তি করে এক-পা এক-পা

করে ধীরে ধীরে ও সুনিশ্চিতভাবে অগ্রসর হওয়া : শূন্যগর্ভ চিৎকার ও বেপরোয়া পদ্ধতিতে সাফল্য আনা অসম্ভব।

৩। চীন বিপ্লবের করণীয় কাজ

এই স্তরে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণী যখন চীন বিপ্লবের প্রধান শত্রু, তখন চীন বিপ্লবের বর্তমান করণীয় কাজ কি ?

নিঃসন্দেহে প্রধান করণীয় কাজ হচ্ছে এই দুই শত্রুর উপর আঘাত হানা, অর্থাৎ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পীড়নকে উচ্ছেদ করে জাতীয় বিপ্লব সমাধা করা এবং দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণীর পীড়নকে উচ্ছেদ করে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা, আর সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে জাতীয়বিপ্লব সমাধা করা।

চীন বিপ্লবের এই বিরাট কাজ দুটি পরস্পর সম্পর্কিত। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উচ্ছেদ না হলে, সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণীর শাসনের অবসান ঘটানো অসম্ভব, কারণ সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে ঐ শ্রেণীর প্রধান অবলম্বন। বিপরীতক্রমে, সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণীকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামে যদি কৃষকদের সহায়তা করা না হয়, তাহলে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উচ্ছেদ করার জন্য শক্তিশালী বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলা অসম্ভব হবে, কারণ চীনদেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রধান সামাজিক ভিত্তি হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক জমিদার-শ্রেণী এবং কৃষকশ্রেণী হচ্ছে চীন বিপ্লবের প্রধান শক্তি। সুতরাং এই দুটি মৌলিক কাজ—জাতীয় বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব একই সময়ে পৃথক ও ঐক্যবদ্ধ।

যেহেতু চীনের জাতীয় বিপ্লবের আশু প্রধান কর্তব্য হচ্ছে জাপ-সাম্রাজ্য-বাদী আক্রমণকারীদের প্রতিহত করা, এবং যেহেতু যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে গণতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্যই সমাধা করতে হবে, সুতরাং বিপ্লবী কাজ দুটি ইতিপূর্বেই সংযুক্ত হয়ে গেছে। জাতীয় বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিপ্লবের দুটি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন স্তর রূপে মনে করা ভুল হবে।

৪। চীন বিপ্লবের চালিকাশক্তি

পূর্বোল্লিখিত বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞা অনুসারে চীনের সমাজের চরিত্র, চীন বিপ্লবের বর্তমান লক্ষ্যগুলি এবং চীন বিপ্লবের করণীয় কাজগুলি কি, তা

-জানা গেল। তাহলে চীন বিপ্লবের চালিকাশক্তি কি?

যেহেতু চীনের সমাজ ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক, যেহেতু চীন বিপ্লবের আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে প্রধানতঃ চীনে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও দেশীয় সামন্তবাদ এবং যেহেতু চীন বিপ্লবের করণীয় কাজ হচ্ছে এই দুই জুলুমবাজকে উচ্ছেদ করা, সেইহেতু চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী শক্তি হতে সমর্থ? এটা হচ্ছে বর্তমান স্তরে চীন বিপ্লবের চালিকাশক্তির প্রশ্ন। চীন বিপ্লবের মূল রণকৌশলের সমস্যার সঠিক সমাধানের জন্য এ প্রশ্নটিকে সঠিকভাবে বোঝা অপরিহার্য।

বর্তমান যুগে চীনা সমাজে কি কি শ্রেণী আছে? জমিদারশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণী; জমিদারশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর উপরিস্তরই হচ্ছে চীনা সমাজের শাসকশ্রেণী। আর আছে সর্বহারাশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণী ছাড়া বিভিন্ন ধরনের পেটি-বুর্জোয়া, চীনদেশের সুবিস্তীর্ণ এলাকায় এই তিনটি শ্রেণী এখনো পরাধীন শ্রেণী।

চীন বিপ্লবের প্রতি এসব শ্রেণীর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হয়। এভাবে চীনের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্রই বিপ্লবের লক্ষ্য ও করণীয় কাজগুলি নির্ধারণ করার সংগে সংগে বিপ্লবের চালিকাশক্তিও নির্ধারণ করে দেয়।

চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর এখন বিশ্লেষণ করা যাক।

(ক) **জমিদারশ্রেণী:** জমিদারশ্রেণী হচ্ছে চীনদেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রধান সামাজিক ভিত্তি; এই শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে কৃষকদের শোষণও পীড়ন করে, চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চীনা সমাজের বিকাশে পথ রুদ্ধ করে এবং আদৌ কোন প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে না।

অতএব, শ্রেণী হিসেবে জমিদারশ্রেণী বিপ্লবের আক্রমণের লক্ষ্য, বিপ্লবের কোন চালিকাশক্তি নয়।

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে বৃহৎ জমিদারদের এক অংশ বৃহৎ বুর্জোয়াদের এক অংশের (আত্মসমর্পণপন্থী) সংগে একযোগে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং দেশদ্রোহীতে পরিণত হয়েছে; বৃহৎ জমিদারদের আরেক অংশ বৃহৎ বুর্জোয়াদের আরেকটি অংশের (গোঁড়াপন্থী) সংগে

একযোগে ক্রমেই বেশি করে দোদুল্যমানতা দেখাচ্ছে, যদিও এখনো তারা জাপ-বিরোধী শিবিরেই রয়েছে। কিন্তু আলোকপ্রাপ্ত ভদ্রলোকদের বেশ কিছু সংখ্যক, যারা ধ্যবারি ও ছোট জমিদারের স্তর থেকে আসে এবং যাদের কিছুটা পুঁজিবাদের চরিত্র আছে, প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছে এবং জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এদের সাথে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হাওয়া উচিত।

(খ) **বুর্জোয়াশ্রেণী:** মুৎসুদ্দি বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়া-শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য আছে।

মুৎসুদ্দি বৃহৎ বুর্জোয়া এমন একটি শ্রেণী, যারা সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী দেশ-গুলির পুঁজিপতিদের জন্ত কাজ করে এবং তাদের দ্বারা প্রতিপালিত হয়; গ্রামাঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির সংগে তারা অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তাই চীন বিপ্লবের ইতিহাসে এ শ্রেণী কখনো চালিকাশক্তি হয়নি বরং সে হয়েছে চীন বিপ্লবের একটি লক্ষ্যস্থল।

তবু মুৎসুদ্দি বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রতি অনুগত, ফলে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে এবং বিপ্লব প্রধানতঃ একটি বিশেষ সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিরুদ্ধে চালিত হয়, তখন অন্ত সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির স্বার্থবাহী মুৎসুদ্দি-শ্রেণী অংশগুলির পক্ষে কিছুটা পরিমাণে ও কিছু সময়ের জন্ত তখনকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রণ্টে যোগদান করা সম্ভব হয়। কিন্তু তাদের প্রভুরা যে মুহূর্তে চীন বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সেই মুহূর্তে তারাও বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে জাপ-সমর্থক বৃহৎ বুর্জোয়ারা (আত্ম-সমর্পণপন্থীরা) আত্মসমর্পণ করেছে, বা করার জন্ত তৈরী হচ্ছে। ইউরোপের সমর্থক ও মার্কিন-সমর্থক বৃহৎ বুর্জোয়ারা (গোঁড়াপন্থী) যদিও এখনো পর্যন্ত জাপ বিরোধী শিবিরে আছে, তবু ক্রমান্বয়েই তারা অধিকতর দোদুল্যমান হচ্ছে এবং একই সময়ে জাপানকে প্রতিরোধ ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করার দ্বিমুখী খেলা খেলছে। বৃহৎ বুর্জোয়া আত্মসমর্পণপন্থীদের সম্পর্কে আমাদের নীতি হচ্ছে তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করা ও তাদের দৃঢ়ভাবে উৎখাত করা। আর বৃহৎ বুর্জোয়া গোঁড়াপন্থীদের প্রতি আমাদের নীতি হবে বিপ্লবী দ্বৈত নীতি; অর্থাৎ একদিকে আমরা তাদের সংগে ঐক্যবদ্ধ হব, কারণ তারা এখনো জাপ-বিরোধী, জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সংগে তাদের দ্বন্দ্বগুলিকে আমরা কাজে লাগব; অন্তদিকে আমরা দৃঢ়ভাবে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করব, কারণ তারা প্রতিরোধ ও ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কমিউনিস্ট-বিরোধী ও জনগণ-বিরোধী দমননীতি অনুসরণ করে চলেছে; এবং এ ধরনের সংগ্রাম না করলে প্রতিরোধ ও ঐক্য দুইই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী হচ্ছে দ্বৈত চরিত্রবিশিষ্ট একটি শ্রেণী।

একদিকে এরা সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক অত্যাচারিত এবং সামন্তবাদ দ্বারা শৃংখলিত, কাজেই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ উভয়ের সাথেই তাদের দ্বন্দ্ব আছে। এদিক থেকে এরা বিপ্লবী শক্তিগুলির অন্যতম। চীন বিপ্লবের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং আমলা ও সমরনায়কদের সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এরাও একদা কিছু পরিমাণে উৎসাহ দেখিয়েছে।

কিন্তু অন্যদিকে যেহেতু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এরা দুর্বল এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের সংগে এদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক এখনো সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়নি, সেহেতু সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধিতা করার পূর্ণ সাহস এদের নেই। জনসাধারণের বিপ্লবী শক্তিগুলো যখন শক্তিশালী হয়, তখন এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জাতীয় বুর্জোয়াদের এই দ্বৈত চরিত্রের ফলে কোন নির্দিষ্ট সময়ে ও কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণে এরা সাম্রাজ্যবাদ এবং বিপ্লবী শক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারে। আবার অন্য সময়ে তারা মুৎসুদ্দি বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুগামী হতে পারে ও প্রতিবিপ্লবে তাদের সহচর হতে পারে, সে বিপদও রয়েছে।

চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী প্রধানতঃ মাঝারি বুর্জোয়া; প্রকৃতপক্ষে এরা কখনো রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়নি, এবং ক্ষমতাসীন বৃহৎ জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল নীতির দ্বারা এরা বাধাপ্রাপ্তই হয়েছে, যদিও ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত (১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার আগে) বিপ্লবের বিরোধিতা করার ব্যাপারে এরা বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুসরণ করেছিল। বর্তমান যুদ্ধে বৃহৎ জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর আত্মসমর্পণকারীদের সাথেই শুধু এদের পার্থক্য নেই, অধিকন্তু বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর গোঁড়াপন্থীদের সাথেও এদের পার্থক্য আছে; এখনো পর্যন্ত এরা আমাদের মোটামুটি ভাল মিত্র। সুতরাং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি বিচক্ষণ পন্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

(গ) কৃষক ছাড়া পেটি-বুর্জোয়াদের অন্যান্য অংশ : কৃষক ছাড়া যে

পেটি বুর্জোয়ারা, তার মধ্যে রয়েছে প্রচুর সংখ্যক বুদ্ধিজীবী, ছোট ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পী এবং স্বাধীন পেশাদারেরা।

এইসব পেটি-বুর্জোয়াদের অবস্থান কিছু পরিমাণে মাঝারি কৃষকদের মতো। তারা সকলেই সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর নিপীড়ন ভোগ করে; ক্রমান্বয়ে তারা দেউলিয়া ও নিঃস্ব হবার দিকে চলেছে।

অতএব, পেটি-বুর্জোয়াদের এইসব অংশ বিপ্লবের অন্যতম চালিকাশক্তি এবং সর্বহারাশ্রেণীর নির্ভরযোগ্য মিত্র। শুধু সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বেই তারা তাদের মুক্তি অর্জন করতে পারে।

এখন আমরা কৃষক বাদে পেটি-বুর্জোয়াদের বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণ করব।

প্রথমতঃ, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-যুব। এরা কোন আলাদা শ্রেণী বা স্তর নয়। কিন্তু পারিবারিক উৎপত্তি, জীবনযাত্রার অবস্থা এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে বর্তমান চীনে এদের অধিকাংশই পেটি-বুর্জোয়া স্তরের আওতায় পড়ে। গত কয়েক দশকে চীনে একটি বিরাট বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-যুব সম্প্রদায় আবির্ভূত হয়েছে। এদের মধ্যে যে অংশটি সাম্রাজ্যবাদীদের ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের পক্ষে কাজ করে এবং জনগণের বিরোধিতা করে তারা ছাড়া অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা অত্যাচারিত, এবং বেকারত্বের ভয়ে অথবা লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার আশংকায় কাল কাটায়। অতএব, তাদের বেশ প্রবণতা রয়েছে বিপ্লবী হওয়ার দিকে। এদের কমবেশি বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আছে, তীব্র রাজনৈতিক বোধ আছে এবং চীন বিপ্লবের বর্তমান স্তরে এরা সচরাচর অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করে ও জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ-সেতু হিসেবে কাজ করে। এর জলন্ত প্রমাণ, ১৯১১ সালের বিপ্লবের আগে বিদেশস্থ চীনা ছাত্রদের আন্দোলন, ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র আন্দোলন, ১৯২৫ সালের ৩০শে মে'র আন্দোলন, ১৯৩৫ সালের ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলন। বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত গরিব বিরাট সংখ্যক বুদ্ধিজীবী শ্রমিকদের ও কৃষকদের সঙ্গে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে ও তার সমর্থন করতে পারে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাদর্শ চীনে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবিষ্ট ও গৃহীত হয় সর্বপ্রথম বুদ্ধিজীবী ও তরুণ ছাত্রদের মধ্যেই। বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ ছাড়া বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সাফল্যের সাথে সংগঠিত করা এবং বিপ্লবী কাজ সাফল্যের সাথে চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামে কার্যক্ষেত্রে

ঝাঁপিয়ে না পড়া পর্যন্ত, অথবা জনসাধারণের স্বার্থের সেবা করতে এবং তাঁদের সঙ্গে মিশে যেতে দৃঢ়সংকল্প না হওয়া পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীরা প্রায়শঃই আত্মমুখী-বাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হবার প্রবণতা দেখায়; তখন তাদের চিন্তাধারা প্রায়ই বাস্তববিমুখ হয়ে থাকে এবং তাদের কার্যকলাপও হয়ে থাকে দ্বিধাগ্রস্ত। তাই চীনের ব্যাপক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী যদিও অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করতে পারে এবং জনসাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতে পারে, তবুও এইসব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সবাই শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী থাকবে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিপ্লবের জরুরী মুহূর্তে বিপ্লবী বাহিনী থেকে সরে পড়তে পারে এবং নিষ্ক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করতে পারে; আবার কিছু সংখ্যক লোক বিপ্লবের শত্রুতে পরিণত হতে পারে। কেবলমাত্র দীর্ঘকালীন গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বুদ্ধিজীবীরা এই ত্রুটি খাপন করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ। এরা ছোট দোকান চালায়, এরা সাধারণতঃ কোন সহকারীই নিযুক্ত করে না বা কেবল অল্প কয়েকজন সহকারী নিযুক্ত করে। সাম্রাজ্যবাদ, বৃহৎ বুর্জোয়া ও সুদখোরদের শোষণের ফলে এরা দেউলিয়া হওয়ার আশংকায় দিন কাটায়।

তৃতীয়তঃ, হস্তশিল্পীরা। এদের সংখ্যা প্রচুর। এদের নিজেদের উৎপাদনের উপকরণ আছে। এরা কোন মজুর ভাড়া করে না; বা কেবলমাত্র এক-একজন শিক্ষানবীশ অথবা সাহায্যকারী রাখে। এদের অবস্থান মাঝামাঝি কৃষকের মতো।

চতুর্থতঃ, স্বাধীন পেশাদাররা। এদের মধ্যে রয়েছে ডাক্তারসহ বিভিন্ন পেশার লোক। এরা অন্যদের শোষণ করে না, করলেও খুব কম মাত্রায়। এদের অবস্থান হস্তশিল্পীদের মতো।

পেটি-বুর্জোয়া স্তরের এই অংশগুলি নিয়ে জনসমষ্টির এক বিরাট অংশ গঠিত, এরা সাধারণতঃ বিপ্লবে যোগ দিতে পারে কিংবা বিপ্লব সমর্থন করতে পারে, এবং এরা বিপ্লবের সাচ্চা মিত্র। কাজেই আমরা অবশ্যই এদের স্বপক্ষে টেনে আনব এবং এদের স্বার্থ আমরা রক্ষা করব। এদের দুর্বলতা হচ্ছে, এদের মধ্যে কেউ কেউ সহজেই বুর্জোয়াদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব এদের মধ্যে মনোযোগের সঙ্গে আমাদের বিপ্লবী প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ চালাতে হবে।

(ঘ) কৃষকশ্রেণীঃ চীনের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৮০

তাগই কৃষক, এবং বর্তমানে তারা চীনের জাতীয় অর্থনীতির প্রধান শক্তি।

কৃষকশ্রেণীর মধ্যে এক তীব্র স্তরবিভাগের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রথমতঃ, ধনী কৃষক। এরা গ্রাম্য জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫ ভাগ (জমিদারসহ প্রায় শতকরা ১০ ভাগ) এবং এরাই হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের বুর্জোয়া-শ্রেণী। চীনের অধিকাংশ ধনী কৃষক নিজেদের জমির একাংশ ভাড়া দেয়, সুদখোরী কারবার করে এবং ক্ষেতমজুরদের নির্মমভাবে শোষণ করে, তাই এরা আধা-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রবিশিষ্ট। কিন্তু সাধারণতঃ এরা নিজেরা পরিশ্রম করে এবং সেদিক থেকে কৃষকশ্রেণীরই অংশ। ধনী কৃষকদের উৎপাদনের রূপ কিছু নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত প্রয়োজনে লাগবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, কৃষকসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে এরা কিছু পরিমাণে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষি-বিপ্লবের সংগ্রামে এরা নিরপেক্ষও থাকতে পারে। সুতরাং ধনী কৃষক ও জমিদারদের অভিন্ন শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করা আমাদের উচিত হবে না, এবং ধনী কৃষকদের উৎখাতের নীতি অকালে গ্রহণ করাও উচিত হবে না।

দ্বিতীয়তঃ, মাঝারি কৃষক। এরা চীনের গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২০ ভাগ। এরা সচরাচর অন্যদের শোষণ করে না, অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংনির্ভর (ফসল ভাল হলে এদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকতে পারে এবং মাঝে মাঝে এরা কিছু মজুর ভাড়া খাটায় অথবা অল্পস্বল্প টাকা সুদে ধার দেয়)। এরা সাম্রাজ্যবাদ, জমিদারশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা শোষিত হয়। এদের কোন রাজনৈতিক অধিকার থাকে না। এদের অনেকেরই যথেষ্ট জমি নেই, কেবলমাত্র কিছু সংখ্যকের (অবস্থাপন্ন মাঝারি কৃষকদের) সামান্য উদ্বৃত্ত জমি আছে। মাঝারি কৃষকরা যে শুধু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবে ও কৃষি-বিপ্লবে যোগ দিতে পারে তাই নয়, এরা সমাজতন্ত্রও গ্রহণ করতে পারে। অতএব, সমস্ত মাঝারি কৃষকই সর্বহারাশ্রেণীর নির্ভরযোগ্য মিত্র হতে পারে এবং হতে পারে বিপ্লবের চালিকাশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মাঝারি কৃষকদের ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাব হচ্ছে বিপ্লবের জয় অথবা পরাজয় নির্ধারণের অন্যতম উপাদান এবং কৃষি-বিপ্লবের পরে যখন এরা গ্রাম্য জনসাধারণের অধিকাংশে পরিণত হয়, তখন এটা বিশেষভাবে সত্য।

তৃতীয়তঃ, গরিব কৃষক। চীনের গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুর মিলে গ্রাম্য জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ। এরা হচ্ছে ব্যাপক কৃষকসাধারণ, যাদের জমি

নেই বা যথেষ্ট জমি নেই। এরা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের আধা-সর্বহারাশ্রেণী, চীন বিপ্লবের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি, সর্বহারাশ্রেণী, স্বাভাবিক ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিত্র এবং চীন বিপ্লবী বাহিনীর প্রধান শক্তি। শুধু সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বেই গরিব ও মাঝারি কৃষকরা নিজেদের মুক্তি অর্জন করতে পারে; কেবলমাত্র গরিব ও মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রী গঠন করেই তবে সর্বহারাশ্রেণী বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার নেতৃত্ব দিতে পারে, অন্যথায় এর কোনটিই সম্ভব নয়। 'কৃষক' শব্দটিতে প্রধানতঃ গরিব ও মাঝারি কৃষকদেরই বোঝানো হয়েছে।

(৬) **সর্বহারাশ্রেণী:** চীনের সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে আধুনিক শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ, শহরের ছোটখাট শিল্পে ও হস্তশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক এবং দোকানের কর্মচারীর মোট সংখ্যা প্রায় ১২০ লক্ষ, তা ছাড়া রয়েছে বিরাট সংখ্যক গ্রাম্য সর্বহারা (ক্ষেতমজুর) এবং শহরের ও গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য সম্পত্তিহীন মানুষ।

অর্থনীতির সবচেয়ে উন্নত রূপের সঙ্গে সংযোগ, সবল সংগঠন ও শৃঙ্খলাবোধ এবং ব্যক্তিগত উৎপাদন-উপকরণের অভাব—সব দেশের সর্বহারাশ্রেণীর এই মৌলিক গুণগুলি চীনা সর্বহারাশ্রেণীরও রয়েছে, কিন্তু তা ছাড়াও চীনা সর্বহারাশ্রেণীর অন্যান্য অনেক বিশেষ গুণ রয়েছে।

সেগুলি কি কি?

প্রথমতঃ, চীনের সর্বহারা ত্রিবিধ অত্যাচারের সম্মুখীন (সাম্রাজ্যবাদী, বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক) এবং তীব্রতা ও নিষ্ঠুরতার দিক থেকে এই ধরনের অত্যাচার পৃথিবীর সকল দেশে বিরল বলে এরা অন্যান্য যে-কোন শ্রেণীর চেয়ে বিপ্লবী সংগ্রামে বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে সবচেয়ে বদ্ধপরিকর। যেহেতু ঔপনিবেশিক, আধাঔপনিবেশিক চীনে ইউরোপের মতো সমাজ-সংস্কারবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই, সেইহেতু অল্পসংখ্যক দালাল বাদে সমগ্র সর্বহারাশ্রেণীই সর্বাধিক বিপ্লবী।

দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লবী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের মুহূর্ত থেকেই চীনের সর্বহারাশ্রেণী তার নিজস্ব বিপ্লবী পার্টি—চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে চীনা সমাজের সবচেয়ে চেতনাসম্পন্ন শ্রেণী হয়ে ওঠে।

তৃতীয়তঃ, উৎপত্তির দিক থেকে চীনের সর্বহারাদের অধিকাংশই দেউলিয়া কৃষক দ্বারা গঠিত বলে কৃষকসাধারণের সঙ্গে তার স্বাভাবিক বন্ধন রয়েছে, ফলে তার পক্ষে কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রীস্থাপনে সুবিধে হয়েছে।

তাই, কতকগুলি অপরিহার্য দুর্বলতা, যেমন সংখ্যালঘিষ্ঠতা (কৃষকদের তুলনায়), অল্প বয়স (পুঁজিবাদী দেশগুলির সর্বহারাদের তুলনায়) ও শিক্ষার নিচু মান (বুর্জোয়াদের তুলনায়) সত্ত্বেও চীনের সর্বহারাশ্রেণী চীন বিপ্লবের সবচেয়ে মূল চালিকাশক্তি। সর্বহারাশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত না হলে চীন বিপ্লব অবশ্যই জয়যুক্ত হতে পারে না। অতীতের একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ১৯১১ সালের সিনহাই বিপ্লব অকালে মৃত সন্তান প্রসব করেছে, কারণ সর্বহারা-শ্রেণী সচেতনভাবে ঐ বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেনি এবং কমিউনিস্ট পার্টির তখন অস্তিত্ব ছিল না। আরও সম্প্রতিকালে, ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লব কিছুদিনের জন্ত বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল, তার কারণ তখন সর্বহারাশ্রেণী সচেতন-ভাবেই এতে যোগ দিয়েছিল ও নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং কমিউনিস্ট পার্টির ইতি-মধ্যেই জন্ম হয়েছে। কিন্তু পরে আবার বৃহৎ বুর্জোয়ারা সর্বহারার সাথে প্রতিষ্ঠিত মৈত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ও সাধারণ বিপ্লবী কর্মসূচী পরিত্যাগ করেছিল এবং একই সময় তৎকালীন চীনের সর্বহারাশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টি যথেষ্ট বিপ্লবী অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি, ফলে এই বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। আজকের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের কথাই ধরা যাক, যেহেতু জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব দিচ্ছে, সেইহেতু গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে, মহান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু করা সম্ভব হয়েছে ও দৃঢ়ভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

চীনের সর্বহারাশ্রেণীকে অবশ্যই এ কথা বুঝতে হবে যে, শ্রেণী হিসেবে যদিও তার সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক চেতনা ও সাংগঠনিক বোধ রয়েছে, তথাপি সে নিজের শক্তিতে একাকী জয়লাভ করতে পারে না। বিজয়ী হতে হলে তাকে বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে পারে এমন সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট সংগঠিত করতে হবে। চীনা সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে কৃষকশ্রেণীই শ্রমিকশ্রেণীর সুদৃঢ় মিত্রবাহিনী, শহরে পেটি-বুর্জোয়া ও নির্ভরযোগ্য মিত্রবাহিনী, এবং কোন কোন সময়ে ও কিছু পরিমাণে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী একটি মিত্রবাহিনী হতে পারে। এটি হচ্ছে আধুনিক চীন বিপ্লবের ইতিহাসের প্রমাণিত মৌলিক নিয়মগুলির একটি।

(চ) ভবঘুরে: উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশরূপে চীনের অবস্থা বিরাট সংখ্যক গ্রাম্য ও শহরে বেকার সৃষ্টি করেছে। জীবনধারণের উপযুক্ত উপায় থেকে বঞ্চিত হয়ে এদেরই অনেককে বাধ্য হয়ে বে-আইনী পথ গ্রহণ

করতে হয়েছে; সেইজন্যই এত দস্যু, গুণ্ডা, ভিখারী, বেশ্যা ও নানা কুসংস্কারজীবী দেখা যায়। এই সামাজিক স্তর হচ্ছে অস্থায়ী; এদের একাংশকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সহজেই কিনে নিতে পারে, বাকিরা বিপ্লবে যোগ দিতে পারে। এদের মধ্যে গঠনমূলক গুণাবলীর অভাব এবং গঠনের থেকে ধ্বংস করার দিকেই এদের প্রবণতা বেশি। বিপ্লবে যোগদানের পর তারা বিপ্লবী বাহিনীতে ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহী ও নৈরাজ্যবাদী মতাদর্শের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, এদের চরিত্র কিভাবে সংশোধন করতে হবে তা আমাদের জানা উচিত এবং এদের ধ্বংসমূলক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

উপরে আমরা চীন বিপ্লবের চালিকাশক্তির বিশ্লেষণ করলাম।

৫। চীন বিপ্লবের চরিত্র

আমরা এখন চীনা সমাজের প্রকৃতি অর্থাৎ চীনের বিশেষ অবস্থা বুঝতে পেরেছি, চীনের সমস্ত বিপ্লবী সমস্যা সমাধানের জন্য এই জ্ঞান হল মূল ভিত্তি। চীন বিপ্লবের লক্ষ্য, করণীয় কাজ ও চালিকাশক্তি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও পরিষ্কার হয়েছে। এগুলি হচ্ছে চীনা সমাজের বিশেষ প্রকৃতি অর্থাৎ চীনের বিশেষ অবস্থা থেকে উদ্ভূত চীন বিপ্লবের বর্তমান স্তরের মৌলিক সমস্যা। এগুলো বুঝবার পর বর্তমান স্তরে চীন বিপ্লবের অন্য একটি মৌলিক বিষয়, অর্থাৎ চীন বিপ্লবের চরিত্র আমরা এখন বুঝতে চেষ্টা করব।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান স্তরে চীন বিপ্লবের চরিত্র কি? এটা কি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, না সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব? স্পষ্টতঃই শেষেরটি নয়, প্রথমটি।

যেহেতু চীনা সমাজ ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক, যেহেতু চীন বিপ্লবের প্রধান শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ, যেহেতু চীন বিপ্লবের করণীয় কাজ হচ্ছে এই দুই প্রধান শত্রুকে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত করা, যে বিপ্লবে বুর্জোয়াশ্রেণী সময় সময় অংশগ্রহণ করে, বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বিপ্লবের শত্রু হয়ে দাঁড়ালেও এই বিপ্লবের গতি সাধারণভাবে পুঁজিবাদের ও পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে চালিত নয়, চালিত সাম্রাজ্যবাদের ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে এবং যেহেতু এর সবগুলিই সত্য—সেইহেতু বর্তমান স্তরে চীন বিপ্লবের চরিত্র সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক নয়, বরং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক।[৩১]

কিন্তু আজকের চীনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর পুরানো সাধারণ ধরনের নয়—তা এখন অচল হয়ে গেছে, বরং এ এক নতুন বিশেষ ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই ধরনের বিপ্লব এখন চীনে ও সকল ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বিকাশলাভ করে চলেছে, আমরা একে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে অভিহিত করি। এ ধরনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্ব সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই অংশ, কারণ এ বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের দৃঢ় বিরোধী। রাজনৈতিক দিক থেকে এ বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের ওপরে কয়েকটি বিপ্লবীশ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্ব স্থাপন করতে চায় এবং চীনের সমাজকে বুর্জোয়া একনায়কত্বাধীন সমাজে রূপান্তরের বিরোধিতা করে। অর্থনৈতিক দিক থেকে তা সাম্রাজ্যবাদীদের এবং দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বড় বড় পুঁজি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করে এবং জমিদারদের জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে; একই সময় তা সাধারণ ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান রক্ষা করে এবং ধনী কৃষকদের অর্থনীতিকে উৎখাত করে না। এইভাবে এই নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব একদিকে পুঁজিবাদের জন্য রাস্তা সাফ করে এবং অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের জন্য পূর্বাবস্থার সৃষ্টি করে। চীন বিপ্লবের বর্তমান স্তর হচ্ছে ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিলুপ্তি ও একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠার অন্তর্বর্তীকালীন স্তর অর্থাৎ একটি নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পর এবং চীনে এর সূত্রপাত হয় ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলনে। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লব। কেবলমাত্র এই বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই চীনা সমাজ সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে পারে, এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই।

ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির সঙ্গে এই ধরনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরাট পার্থক্য রয়েছে, এই বিপ্লবের পরিণতি বুর্জোয়া একনায়কত্ব নয়, বরং সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্তফ্রন্টের একনায়কত্ব। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন প্রতিটি ঘাঁটি এলাকায় প্রতিষ্ঠিত জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা হল জাপ বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক

ক্ষমতা, এটা বুর্জোয়া অথবা সর্বহারা কোন এক শ্রেণীর একনায়কত্ব নয়, বরং সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্ব। পার্টি-আনুগত্য নির্বিশেষে যারা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধের ও গণতন্ত্রের পক্ষপাতী, তারা সকলেই এই ক্ষমতায় অংশগ্রহণের অধিকারী।

এই ধরনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকেও পৃথক। এই বিপ্লব কেবলমাত্র চীনে সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের শাসন উৎখাত করে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দিতে সমর্থ পুঁজিবাদের কোন অংশকে ধ্বংস করে না।

১৯২৪ সালে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক সংঘোষিত তিন গণ-নীতিতে যে বিপ্লবের কথা আলোচিত হয়েছে, এই ধরনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব মূলতঃ সেই বিপ্লবের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ। ঐ বছরেই 'চীনের কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারে' ডঃ সান ইয়াৎ-সেন বলেছিলেন:

> আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাধারণতঃ বুর্জোয়া-শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার ও নিছক সাধারণ লোকদের ওপর অত্যাচারের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কুওমিনতাঙ-এর গণতন্ত্রের নীতির অর্থ এমন এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা সমস্ত সাধারণ লোকের হাতে থাকে, মুষ্টিমেয় লোকের একচেটিয়া অধিকারে নয়।

তিনি আরও বলেছিলেন:

> মালিকানা চীনদেশীয়ই হোক অথবা বিদেশীয়ই হোক—যে প্রতিষ্ঠানগুলি একচেটিয়া চরিত্রের অথবা ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার পক্ষে অত্যন্ত বড়—যেমন ব্যাঙ্ক, রেলপথ, বিমানপথের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ—সেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও শাসিত হবে, যাতে ব্যক্তিগত পুঁজি জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য না করতে পারে; এই হচ্ছে পুঁজি নিয়ন্ত্রণের মৌলিক নীতি।

আবার তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক মূলনীতি সম্পর্কে বলে গেছেন: 'জনসাধারণকে জাগাতে হবে এবং পৃথিবীর সেইসব জাতির সংগে সাধারণ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যারা আমাদেরকে সমকক্ষ বলে গণ্য করে।' এইভাবে পুরানো আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থানুযায়ী উদ্ভূত পুরানো গণতান্ত্রিক তিন গণ-নীতিকে নতুন আন্তর্জাতিক

ও আভ্যন্তরিক অবস্থানুযায়ী নয়া গণতান্ত্রিক তিন গণ-নীতিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তার ১৯৩৭ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর ইস্তাহারে যখন ঘোষণা করেছিল যে, 'চীনের বর্তমানে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে তিন গণ-নীতি, আর আমাদের পার্টি তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত', তখন শেষোক্ত তিন গণ-নীতির কথাই বলেছিল, অন্য কোন তিন গণ-নীতি নয়। এই তিন গণ-নীতির মধ্যে রয়েছে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের তিন মহান নীতি, অর্থাৎ রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক-শ্রমিকদের সাহায্য। নতুন আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থায় এই তিন মহান নীতি থেকে বিচ্যুত অন্য কোন তিন গণ-নীতি বিপ্লবী হতে পারে না (সাম্যবাদ ও তিন গণ-নীতির গণতান্ত্রিক বিপ্লবী মূল রাজনৈতিক কর্মসূচীতে মতৈক্য থাকলেও, অন্য কোন ব্যাপারেই তাদের মতৈক্য নেই, এ সম্পর্কে এখানে আমরা আলোচনা করছি না)।

এইভাবে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সংগ্রামের জন্য শক্তিসমাবেশে (অর্থাৎ, যুক্তফ্রন্ট) বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সংগঠনে যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন, সর্বহারাশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী ও অন্যান্য পেটি বুর্জোয়াদের ভূমিকাকে উপেক্ষা করা যায় না। যদি কেউ এই শ্রেণীগুলিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, তাহলে নিশ্চয়ই সে চীনা জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত সমস্যা অথবা চীনের কোন সমস্যাই সমাধান করতে সমর্থ হবে না। বর্তমান স্তরে চীন বিপ্লব যে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠনের চেষ্টা করবে, এতে অবশ্যই শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়ারা সকলেই নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করবে ও নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করবে। অন্য কথায়, এটি হবে অবশ্যই শ্রমিক, কৃষক ও শহরে পেটি-বুর্জোয়া এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী অন্যান্য সকলেরই বিপ্লবী মৈত্রীর ভিত্তিতে গঠিত একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এই ধরনের প্রজাতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে পরিণত করা কেবলমাত্র সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বেই সম্ভব।

৬। চীন বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত

বর্তমান স্তরে চীনা সমাজের চরিত্র এবং চীন বিপ্লবের লক্ষ্য, করণীয় কাজ, চালিকাশক্তি ও চরিত্র—এইসব মৌলিক সমস্যা পরিষ্কারভাবে আলোচিত হওয়ার পর চীন বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত অর্থাৎ চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যেকার সম্পর্ক অথবা চীন বিপ্লবের বর্তমান

ও ভবিষ্যৎ স্তরের সম্পর্কও সহজে বোঝা যায়।

যেহেতু বর্তমান স্তরে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর সাধারণ পুরানো ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, তা এক নতুন বিশেষ ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব—নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব; যেহেতু এই বিপ্লব ঘটছে বিংশ শতাব্দীর ৩০-৪০-এর দশকের নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের উত্থান ও পুঁজিবাদের পতনের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এবং এটা ঘটছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগে ও বিপ্লবের যুগে, সেইহেতু চীন বিপ্লবের চূড়ান্ত পরিপ্রেক্ষিত পুঁজিবাদ নয়, বরং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ। এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমান স্তরে যেহেতু চীন বিপ্লবের উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকের ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে রূপান্তরিত করা, অর্থাৎ নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা করা, সেইজন্য বিপ্লব জয়ী হওয়ার পর পুঁজিবাদের বিকাশপথের বাধাগুলি দূরীভূত হয়ে যাওয়ায় চীনা সমাজের মধ্যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বেশ পরিমাণে বিকাশলাভ করবে, এটা সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ও আদৌ আশ্চর্যের বিষয় নয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ চীনে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল হবে বেশ পরিমাণে পুঁজিবাদী বিকাশ। কিন্তু এটা চীন বিপ্লবের ফলাফলের একটি দিক মাত্র, সম্পূর্ণ চিত্র নয়। চীন বিপ্লবের সম্পূর্ণ চিত্র হচ্ছে, একদিকে পুঁজিবাদী উপাদানের অগ্রগতি দেখা যাবে অন্যদিকে দেখা যাবে সমাজতান্ত্রিক উপাদানের অগ্রগতি। এই সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলি কি কি? সমগ্র দেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান আপেক্ষিক গুরুত্ব, সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব-ক্ষমতা যা কৃষকেরা, বুদ্ধিজীবীরা ও শহরে পেটি-বুর্জোয়ারা ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে বা স্বীকার করার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনীতি ও মেহনতী জনসাধারণের সমবায় মালিকানাধীন অর্থনীতি; এ সমস্তই সমাজতান্ত্রিক উপাদান। আবার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে এটাও সম্ভব যে, চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদী ভবিষ্যৎ এড়িয়ে যেতে এবং সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ অর্জন করতে পারে।

৭। চীন বিপ্লবের দ্বিবিধ কাজ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি

এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে যা বলা হল তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে চীন বিপ্লবের হবে দ্বিবিধ কাজ, অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব (নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব) ও সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বর্তমান স্তর ও ভবিষ্যৎ স্তরের বিপ্লব—এই দ্বিবিধ কাজ। এই দ্বিবিধ বিপ্লবী কাজের নেতৃত্বভার ন্যস্ত হয়েছে চীনের সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কাঁধে, যার নেতৃত্ব ছাড়া কোন বিপ্লব সফল হতে পারে না।

চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে (নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে) সম্পন্ন করা এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্তের সৃষ্টি হলে এই বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করা—এই হচ্ছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মহান, গৌরবময় ও সামগ্রিক বিপ্লবী কাজ। প্রত্যেকটি পার্টি-সদস্যকে এই কাজ সম্পাদন করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই মাঝপথে পিছু-পা হলে চলবে না। কিছু সংখ্যক অপরিণত পার্টি-সদস্য মনে করেন যে, বর্তমান স্তরের গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ করলেই আমাদের কাজ শেষ হবে এবং ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করা আমাদের কাজ নয়; অথবা বর্তমান বিপ্লব বা কৃষি-বিপ্লবই আসলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এটা গুরুত্বের সাথে বলা প্রয়োজন যে, এইসব ধারণা ভুল। প্রত্যেকটি পার্টি-সদস্যের এ কথা জানা দরকার যে, সামগ্রিক বিচারে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত চীনের বিপ্লবী আন্দোলনটার মধ্যে দুটি পর্যায় অন্তর্ভুক্ত—একটি গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও অপরটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব; এ হল দুটি ভিন্ন প্রকৃতির বিপ্লবী প্রক্রিয়া, প্রথম বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে শেষ করেই কেবল দ্বিতীয়টিকে সম্পন্ন করা সম্ভব। গণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতি। সকল কমিউনিস্টদেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো। কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যেকার পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কাররূপে বুঝলেই চীন বিপ্লবে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হবে।

গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—চীনের এই দুটি মহান বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিয়ে পূর্ণ পরিণতিতে নিয়ে যেতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য

কোন রাজনৈতিক পার্টি (বুর্জোয়া অথবা পেটি-বুর্জোয়া পার্টি) সমর্থ হবে না। জন্মের দিন থেকেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই দ্বিবিধ কাজ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে এবং এটা সম্পাদন করার জন্য ১৮ বছর ধরে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে।

এটি এমন একটি কাজ যা একই সময়ে অতি গৌরবময় এবং খুবই কষ্টকর। একটি বলশেভিক চরিত্রসম্পন্ন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া—যে পার্টি সমগ্র জাতির মধ্যে বিস্তৃত, যে পার্টি ব্যাপক গণ-চরিত্রসম্পন্ন এবং যে পার্টি মতাদর্শ, রাজনীতি ও সংগঠনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে সংহত—এ কাজ সমাধা করা অসম্ভব। সুতরাং এই ধরনের একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করা প্রত্যেক পার্টি-সদস্যেরই কর্তব্য।

টীকা

১। পরম্পরাগত জনশ্রুতি অনুসারে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার চীনে বহুকাল পূর্বেই হয়েছিল। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ল্যু পু-ওয়েই তাঁর 'দেওয়ালপঞ্জীতে' চুম্বক পাথরের আকর্ষণ শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, চুম্বক পাথর যে লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে, এই কথ তখন চীনাদের জানা ছিল। খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ওয়াং ছোং তাঁর 'লুন হেং' পুস্তকে মন্তব্য করেছেন যে, চুম্বক পাথর দক্ষিণের দিক নির্দেশ করে, এতে বোঝা যায় যে তখন চৌম্বক মেরুপ্রবণতা সম্পর্কে তাদের জানা ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, চু ইয়ু কর্তৃক লিখিত 'ক্যান্টন সম্পর্কে আলোচনা' ও স্যু চিং কর্তৃক লিখিত 'স্যুয়ান হো যুগে কোরিয়ায় প্রেরিত রাষ্ট্রদূতের ভ্রমণ বৃত্তান্ত' গ্রন্থে দেখা যায় যে জহাজে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ব্যবহৃত হতো, এতে বোঝা যায় তখন দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের ব্যবহার সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল।

২। পূর্ব হান বংশের (খ্রীঃ ২৫-২২০) সাই লুন নামক একজন খোজা গাছের ছাল, শন, ছেঁড়া ন্যাকড়া ও ছেঁড়া মাছ ধরা জাল দিয়ে প্রথম কাগজ তৈরী করেন। খ্রীঃ ১০৫ সালে অর্থাৎ সম্রাট হো তির রাজত্বের শেষ বছরে সাই লুন তাঁর আবিষ্কার সম্রাটকে উপহার দেন। তখন থেকে গাছের আঁশ থেকে কাগজ তৈরীর পদ্ধতি সারা চীনে ছড়িয়ে পড়ে, তাকে বলা হয় 'খোজা সাই কাগজ'।

৩। চুই বংশের রাজত্বকালে, খ্রী: ৯০০ অব্দের কাছাকাছি ব্লকে ছাপা আবিষ্কৃত হয়।

৪। খ্রী: ১০৪১-১০৪৮ সময়কালে পরিবর্তনযোগ্য টাইপ আবিষ্কার করেন পি শেং।

৫। কিংবদন্তী অনুসারে চীনে বারুদ আবিষ্কৃত হয় নবম শতাব্দীতে এবং একাদশ শতাব্দীতে কামান দাগার জন্য বারুদ ব্যবহৃত হয়।

৬। চেন শেং, উ কুয়াং সিয়াং ইয়ু ও লিউ পাং ছিলেন চিন বংশের রাজত্বকালে প্রথম বিরাট কৃষক বিদ্রোহের নেতা। খ্রী: পূ: ২০৯ সালে চিন বংশের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে চেন শেং ও উ কুয়াং রক্ষীসেনাবাহিনীর ৯০০ লোকদের নেতৃত্ব দিয়ে সীমান্ত ঘাঁটিতে যাওয়ার পথে, ছীশিয়ান জেলায় (বর্তমান আনহুই প্রদেশের সুশিয়ান জেলা) বিদ্রোহ করেছিলেন, সংগে সংগে এতে সারা দেশ সাড়া দিয়েছিল। সিয়াং ইয়ু ও তাঁর কাকা সিয়াং লিয়াং উশিয়ান জেলায় (আজকের কিয়াংসু প্রদেশের উশিয়ান জেলা) এবং লিউ পাং পেইশিয়ান জেলায় (আজকের শানতুং প্রদেশের পেইশিয়ান জেলা) এ বিদ্রোহের সমর্থনে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটান। সিয়াং বাহিনী চিন সেনাবাহিনীর প্রধান শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে এবং লিউ বাহিনী সর্বপ্রথমে কুয়ান চোং অঞ্চল ও চিন বংশের রাজধানী দখল করে। এরপর লিউ পাং ও সিয়াং ইয়ুর মধ্যে যুদ্ধ হয়, এতে সিয়াং পরাজিত হয়ে মারা গেলেন এবং লিউ পাং চিন সম্রাটের পরিবর্তে সম্রাট হয়ে হান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

৭। পশ্চিম হান বংশের রাজত্বকালের শেষ কয়েক বছরে সর্বত্রই কৃষকদের অসন্তোষ ও বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ ঘটে। খ্রী: ৮ সালে হান বংশের পতন ঘটিয়ে ওয়াং মাং সম্রাট হলেন। তিনি কৃষকদের অসন্তোষ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টায় কতকগুলি সংস্কার প্রচলন করেন। তখন দেশের দক্ষিণে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ছিল, সিনশি-এর (আজকের হুপেই প্রদেশের চিংশানশিয়ান জেলা) লোক ওয়াং কুয়াং ও ওয়াং ফেংকে ক্ষুধার্ত জনতা তাঁদের নেতা করে বিদ্রোহ করেন; কৃষকদের এই বাহিনী 'সিনশি সৈন্যবাহিনী' নামে আখ্যায়িত হয়ে লড়তে লড়তে নানা ইয়াংয়ে পৌছে। পিংলিন-এর (আজকের হুপেই প্রদেশের সুইশিয়ান জেলার উত্তর-পূর্ব) চেন মু সহস্রাধিক জনতাকে নেতৃত্ব দিয়ে বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল, তারা 'পিংলিন সৈন্যবাহিনী' নামে খ্যাত। 'লাল ভুরু' ও 'তামার ঘোড়া' সবই ওয়াং মাং যুগের কৃষকদের বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর নাম।

'ব্রোঞ্জের ঘোড়া' বিদ্রোহ ঘটে মধ্য হোপেইয়ে; 'লাল ভুরু' বিদ্রোহ ঘটে মধ্য শানতুং প্রদেশে। 'লাল ভুরু' বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ফান চোং, বিদ্রোহীরা সবাই তাদের ভ্রু লাল রঙে রাঙিয়ে রাখতো বলে লোকে তাদের 'লাল ভুরু' এই আখ্যা দিয়েছিল। 'লাল ভুরু' ছিল তৎকালীন কৃষকদের সবচেয়ে বড় বিদ্রোহী বাহিনী।

৮। খ্রীঃ ১৮৪ সালে পূর্ব হান বংশের আমলে চ্যাং চিয়াও কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়ে বিদ্রোহ করেন, এর সৈন্যরা সবাই হলদে পাগড়ী পরত বলে লোকে তাদের এই নামে ডাকত।

৯। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে, স্থই বংশের শেষাশেষি কৃষকরা একটার পর একটা বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল, লি মি ও তৌ চিয়ান-তে ছিলেন তৎকালীন বিদ্রোহের নেতা। লি মি হোনান প্রদেশে এবং তৌ চিয়ান-তে হোপেই প্রদেশে ছিলেন, তাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহী বাহিনী তখন শক্তির দিক থেকে খুবই বিরাট ছিল।

১০। ওয়াং শিয়ান-চি ও হুয়াং চাও ছিলেন তাং রাজবংশের শেষের দিকে কৃষক বিদ্রোহের নেতা। খ্রীঃ ৮৭৪ সালে ওয়াং শিয়ান-চি শানতুং প্রদেশে বিদ্রোহ সংগঠিত করেন, পরের বছর হুয়াং চাও তার সমর্থনে লোকদের সমাবেশ করে বিদ্রোহ ঘটালেন। খ্রীঃ ৮৭৮ সালে ওয়াং নিহত হলেন। হুয়াং চাও ওয়াংয়ের অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে নিজেকে 'স্বর্গ বিজয়ী সেনাপতি' বলে আখ্যায়িত করেন। হুয়াং চাও তাঁর বিদ্রোহী বাহিনীকে পরিচালনা করে দুবার শানতুং থেকে বের হয়ে চলমান লড়াই করেছেন। প্রথমবার শানতুং থেকে হোনানে, তারপর আনহুই ও হুপেই পৌঁছে, ওখান থেকে শানতুংয়ে ফিরে আসেন। দ্বিতীয়বার শানতুং থেকে হোনানে, তারপর কিয়াংসীতে পৌঁছে, চেকিয়াংয়ের পূর্বাঞ্চলের মধ্য দিয়ে ফুকিয়ান ও কুয়াংতুংয়ে পৌঁছে, তারপর কুয়াংসী হয়ে হুনানের মধ্য দিয়ে হুপেইয়ে পৌঁছে যান; আবার হুপেই থেকে পূর্বের দিকে গিয়ে আনহুই ও চেকিয়াংয়ে পৌঁছান, তারপর হোয়াংহো নদী পার হয়ে হোনানে প্রবেশ করে লুওইয়াং শহর দখল করেন। তারপর তুংকুয়ানকে অধিকার করে চাংআন শহর হাতে নিয়ে ছিলেন। হুয়াং চাও সেখানে চি নামক রাষ্ট্র গড়ে তুলে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। পরে আভ্যন্তরীণ বিভক্তির ফলে (সেনাপতি চু ওয়েনের তাং বংশের কাছে আত্মসমর্পণ) এবং শাতু উপজাতির সর্দার লি খেইয়োংয়ের

পরিচালনাধীন সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের ফলে হুয়াং চাও চাংআন শহর পরিত্যাগ করে আবার হোনানে যান, সেখান থেকে শানতুংয়ে ফিরে আসেন। অবশেষে তিনি পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করেন। তিনি যে দশ বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, তার ফলেই তিনশ বছর ধরে জনগণের ওপর শাসনের পরে থাং রাজবংশের উচ্ছেদ হয়েছে। এটা হচ্ছে চীনের ইতিহাসে বিখ্যাত কৃষক যুদ্ধের মধ্যে অন্যতম।

১১। সুং চিয়াং ও ফাং লা ছিলেন খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুং রাজত্বকালে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহের দুজন নামজাদা নেতা। সুং চিয়াং সক্রিয় ছিলেন পিংয়ুয়ান, শানতুং, হোপেই, হোনান ও কিয়াংসু প্রদেশের সীমান্ত এলাকায়। আর ফাং লা সক্রিয় ছিলেন চেকিয়াং ও আনহুই প্রদেশে।

১২। খ্রীঃ ১৩৫১ সালে ইউয়ান বংশের রাজত্বকালে সর্বত্রই জেগেছে গণ-অভ্যুত্থান। আনহুই প্রদেশের ফেংইয়াংয়ের লোক চু ইউয়ান-চাং যোগ দিলেন কুও জু-সিংয়ের পরিচালনাধীন বিদ্রোহী বাহিনীতে। কুও-এর মৃত্যুর পরে তিনি ঐ বাহিনীর সেনানায়ক হন, শেষ পর্যন্ত তিনি মঙ্গোল বংশকে উৎখাত করেন এবং মিং বংশের প্রতিষ্ঠা করে প্রথম সম্রাট হন।

১৩। লি জু-চেং ছিলেন মিং রাজবংশের শেষের দিকে কৃষক-বিদ্রোহের নেতা। তিনি ছিলেন শেনসী প্রদেশের মিচির অধিবাসী। খ্রীঃ ১৬২৮ সালে শেনসীর উত্তরাঞ্চলে দেখা দিয়েছে কৃষক-বিদ্রোহের উত্তাল তরঙ্গ। লি জু-চেং যোগ দিলেন কাও ইং-সিয়াংয়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী বাহিনীতে, সে বাহিনী শেনসী থেকে হোনান তারপর আনহুইয়ে পৌঁছে, ওখান থেকে শেনসীতে ফিরে এল। ১৬৩৬ সালে কাও ইং-সিয়াং মারা গেলেন, তাঁর স্থানে লিকে 'নির্ভীক রাজা' বলে অভিষিক্ত করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর প্রচলিত প্রধান স্লোগান হল, 'নির্ভীক রাজাকে স্বাগত জানালে শস্যের খাজনা আদায় করা হবে না'। তাঁর বাহিনীর মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখতে আরেকটি স্লোগান ছিল, 'কাউকে হত্যা করার অর্থ আমার পিতাকে হত্যা করা, কাউকে ধর্ষণের মানে আমার মাকে ধর্ষণ করা।' এইভাবে অনেকেই তাঁকে সমর্থন করে, আর আন্দোলন তৎকালীন কৃষক-বিদ্রোহের প্রধান স্রোতে পরিণত হয়। কিন্তু তিনি কোন সময়ই অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা করেননি, কেবলমাত্র ইতস্তত ঘুরে বেড়ান। তিনি 'নির্ভীক রাজা'

হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার পর নিজের সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করে সেন্সুয়ানে প্রবেশ করেন, ওখান থেকে শেনসীর দক্ষিণ-অংশে ফিরে আবার হুপেইয়ের মধ্য দিয়ে হোনানে পৌঁছান, আবার হুপেইয়ে ফিরে সিয়াংইয়াং দখল করেন, তারপর আবার হোনানের মধ্য দিয়ে শেনসীর ওপর আক্রমণ করে সিআন শহর দখল করেন; ১৬৪৪ সালে শানসীর মধ্য দিয়ে আক্রমণ করে পিকিং অধিকার করেন। এর অল্প সময়ের পর মিং বংশের সেনাপতি উ সান-কুই ছিং বাহিনীর সাথে আঁতাত করে যুক্তভাবে তাঁকে পরাজিত করেছিল।

১৪। তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের বিপ্লব ছিল ১৯ শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত চিং রাজবংশের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও জাতীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিপ্লবী যুদ্ধ। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসে কুয়াংসী প্রদেশের কুইপিং জেলার চিনথিয়ান গ্রামে এই বিপ্লবের নেতা হোং সিউ-ছুয়ান, ইয়াং সিউ-চিং প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন আর ঘোষণা করেছিলেন 'তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের' প্রতিষ্ঠা। ১৮৫২ সালে তাইপিং বাহিনী কুয়াংসী প্রদেশ থেকে অভিযান শুরু করল, আর হুনান, হুপেই, কিয়াংসী ও আনহুই প্রদেশের ভেতর দিয়ে অভিযান চালিয়ে নানকিং দখল করল ১৮৫৩ সালে। তারপরে তাইপিং বাহিনীর একটা অংশ নানকিং থেকে উত্তর অভিমুখে অভিযান চালিয়ে যেতে যেতে তিয়েনসিন শহরের নিকটে পৌঁছেছিল। কিন্তু তাইপিং বাহিনী তার দখলীকৃত স্থানগুলিতে কোন সুদৃঢ় ঘাঁটি এলাকাই স্থাপন করেনি। উপরন্তু, নানকিংয়ে রাজধানী স্থাপন করার পরে এ বাহিনীর নেতৃস্থানীয় গ্রুপ অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক ভুল করে বসেছিল। সেইসব কারণেই এ বাহিনী চিং সরকারের প্রতিবিপ্লবী বাহিনী এবং ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী হামলাকারীদের মিলিত আক্রমণের মোকাবিলা করতে অসমর্থ হয়েছিল। আর শেষ পর্যন্ত ১৮৬৪ সালে এই বাহিনী পরাজিত হল।

১৫। অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে কয়েক দশক ধরে ব্রিটেন ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণ আফিং চীনে রপ্তানি করত। এই আফিং বাণিজ্য চীনা জনগণকে শুধু গুরুতরভাবে নেশাগ্রস্তই করেনি, উপরন্তু বিপুল পরিমাণে চীনের রৌপ্যও লুণ্ঠন করেছিল। চীন এই আফিং বাণিজ্যের বিরোধিতা করেছিল। ১৮৪০ সালে বাণিজ্যকে সুরক্ষিত করার অজুহাতে ব্রিটেন চীনের ওপরে এক সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। লিন জ-স্যুর নেতৃত্বে চীনা সৈন্য-

বাহিনী সে আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ করে, আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে কুয়াংচৌ-এর জনগণ 'ব্রিটিশদেরকে দমন করার বাহিনী' সংগঠিত করে, যা আগ্রাসী ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। কিন্তু ১৮৪২ সালে দুর্নীতিপরায়ণ চিং সরকার আগ্রাসী ব্রিটিশদের সংগে 'নানকিং চুক্তি' স্বাক্ষর করল। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, ব্রিটেনকে হংকং হস্তান্তর এবং শাংহাই, ফুচৌ, সিয়ামেন, নিংপো আর কুয়াংচৌকে ব্রিটেনের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা হল, আর স্থির হল যে, চীনে আমদানি করা ব্রিটিশ পণ্যের ওপরে ধার্য শুল্কের হার চীন ও ব্রিটেন মিলিতভাবে নির্ধারণ করবে।

১৬। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুক্তভাবে চীনের ওপর আক্রমণ চালায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জারের রাশিয়া পাশ থেকে তাদের সাহায্য করে। ঐ সময় চিং সরকার তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের কৃষক-বিদ্রোহ দমন করতে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করছিল এবং বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন করছিল। ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রবাহিনী পর পর কুয়াংচৌ, তিয়েনসিন ও পিকিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিকে দখল করে নিয়েছিল। তারা পিকিংয়ের ইউয়ান মিং ইউয়ান প্রাসাদ লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করেছিল এবং চিং সরকারকে 'তিয়েনসিন চুক্তি' ও 'পিকিং চুক্তি' স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল। এই চুক্তিগুলির প্রধান শর্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তিয়েনসিন, নিউচুয়াং, তেংচৌ, তাইওয়ান, হাংচৌ, ছাওচৌ, নানকিং, চেনকিয়াং, চিউকিয়াং ও হানখৌ প্রভৃতি জায়গা বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে উন্মুক্ত করা, বিদেশীদের ভ্রমণ ও মিশনারী কার্যকর্মের বিশেষ অধিকার থাকা এবং চীনের অভ্যন্তরভাগে চোরা-চালানের বিশেষ অধিকার থাকা। তখন থেকে বিদেশী আক্রমণকারী শক্তিগুলি চীনের সমস্ত উপকূলবর্তী প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ল এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করল।

১৭। ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৫ সালে ফরাসী আক্রমণকারীরা ভিয়েতনাম, কুয়াংসী, ফুকিয়ান, তাইওয়ান ও চেকিয়াং প্রভৃতি জায়গায় সশস্ত্র আক্রমণ করেছিল। ফেং জু-চাই ও লিউ ইয়োং-ফু-র নেতৃত্বে পরিচালিত চীনা সেনাবাহিনী সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিল এবং পর পর বিজয় অর্জন করেছিল। যুদ্ধ জয়লাভ সত্ত্বেও দুর্নীতিপরায়ণ চিং সরকার অপমানজনক 'তিয়েনসিন চুক্তি' স্বাক্ষর করল।

১৮। ১৮৯৪ সালে চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে জাপান কর্তৃক কোরিয়ার ওপর আক্রমণ করার এবং চীনের স্থলবাহিনী ও নৌ-বাহিনীর ওপর উস্কানি দেওয়ার জন্য। এই যুদ্ধে চীনের সৈন্যবাহিনী বীরত্বের সাথে লড়াই করেছে, কিন্তু চিং সরকারের দুর্নীতি ও দৃঢ় প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যর্থতার ফলে চীন পরাজিত হয়। ফলে চিং সরকার জাপানের সাথে অপমানকর সিমোনোসেকি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

১৯। ১৯০০ সালে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান, ইতালী ও অস্ট্রিয়া এই আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ চীনা জনগণের হামলা-বিরোধী ইহোচুয়ান আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার জন্য যুক্ত বাহিনী পাঠিয়ে চীনকে আক্রমণ করে। চীনের জনগণ বীরত্বের সঙ্গে এর প্রতিরোধ করেন। এই আটটি মিত্রশক্তি তাকু অধিকার করে তিয়েনসিন ও পিকিং দখল করে। ১৯০১ সালে চিং সরকার আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তির প্রধান শর্তগুলির মধ্যে চীন ঐ সমস্ত দেশকে ৪৫ কোটি টায়েল রৌপ্যের বিরাট পরিমাণ অর্থ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দানের এবং এইসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পিকিংয়ে ও পিকিং থেকে তিয়েনসিন আর শানহাইকুয়ান পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীকে মোতায়েন করার বিশেষ অধিকারের ব্যবস্থা ছিল।

২০। দূতাবাসের ক্ষমতার এক্তিয়ার—১৮৪৩ সালে চীন-ব্রিটিশের দ্বারা স্বাক্ষরিত হুমেন চুক্তি ও ১৮৪৪ সালে চীন-মার্কিনের দ্বারা স্বাক্ষরিত ওয়াংসিয়া চুক্তি থেকে শুরু করে পুরানো চীন সরকারগুলির ওপর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া অসম চুক্তিগুলিতে ব্যবস্থিত বিশেষ অধিকারের অন্যতম। এই অধিকারের অর্থ হচ্ছে, এই অধিকারের ভোগী কোন দেশের কোন নাগরিক চীনে যদি কোন ফৌজদারী অথবা দেওয়ানী কোন মামলার আসামী হয় তাহলে চীনা আদালত তার বিচার করতে পারবে না, তার বিচার করবে তার নিজ দেশের কন্সাল।

২১। উনিশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনের ওপর আক্রমণ চালিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি চীনে তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাবান্বিত এলাকাগুলিকে নিজ নিজ প্রভাবাধীন এলাকা বলে চিহ্নিত করে নেয়। যেমন, ইয়াংসী উপত্যকার নিম্ন ও মধ্যবর্তী প্রদেশগুলি ব্রিটিশ প্রভাবাধীন এলাকারূপে চিহ্নিত হয়, ইয়ুনান এবং কুয়াংতুং ও কুয়াংসী প্রদেশ ফরাসী প্রভাবাধীন এলাকা, শানতুং প্রদেশ জার্মান প্রভাবাধীন এলাকা, ফুকিয়ান হয় জাপানের এবং

উত্তর-পূর্ব তিনটি প্রদেশ (আজকের লিয়াওতুং, লিয়াওসী, চীলিন, হেইলোং-কিয়াং ও সোংকিয়াং পাঁচটি প্রদেশ) প্রথমে জারের রাশিয়ার প্রভাবাধীন এলাকা নির্দিষ্ট হয়েছিল। ১৯০৫ সালে জাপান-রুশ যুদ্ধের পর থেকে উত্তর-পূর্ব তিনটি প্রদেশের দক্ষিণ অংশ জাপানের প্রভাবাধীন এলাকায় পরিণত হল।

২২। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি চিং সরকারকে নদী ও সমুদ্রের উপকূলবর্তী কোন কোন এলাকাকে বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য করার পর, ঐসব এলাকার মধ্যে, যা তারা মনে করে নিজেদের দখল করার উপযোগী, সেইসব অঞ্চলকে তাদের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকা বলে ঘোষণা করেছে। ঐ এলাকাগুলিতে চীনের প্রশাসন ও চীনের আইন থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র অন্য একটি শাসনব্যবস্থা অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়। ঐ এলাকাগুলির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের সামন্ততান্ত্রিক মৎসুদ্দিশ্রেণীর শাসনের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চালাত। ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সালের বিপ্লবের সময় চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী জনসাধারণ ঐসব এলাকা তুলে দেওয়ার আন্দোলন শুরু করেন এবং ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসে হানখো ও চিউকিয়াংস্থিত ব্রিটিশের 'বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকা' পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক বিপ্লবের বিশ্বাসঘাতকতার পরে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি চীনের বিভিন্ন স্থানে তাদের 'বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকা' অব্যাহতভাবে বজায় রেখে চলেছিল।

২৩। ষষ্ঠ কমিনটার্ন (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক) কংগ্রেসে গৃহীত 'ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কিত থিসিস' দ্রষ্টব্য।

২৪। জে. ভি. স্তালিন: ২৪শে মে, ১৯২৭ সালে কমিনটার্নের কার্যকরী কমিটির অষ্টম পূর্ণাংগ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ 'চীন বিপ্লব ও কমিনটার্নের কর্তব্য'।

২৫। এখানে ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। উদারপন্থী বুর্জোয়া ও আলোকপ্রাপ্ত জমিদারদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছিল এই আন্দোলন। খাং ইয়ৌ-ওয়েই, লিয়াং চী-চাও ও থান সি-থোং প্রমুখ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। এ আন্দোলন যুবসম্রাট কুয়াং স্যু-এর আনুকূল্য ও সমর্থনলাভ করেছিল। কিন্তু এর কোন

গণভিত্তি ছিল না। সে সময়ে ইউয়ান শি-খাইদের অধীনে নিজস্ব সশস্ত্র শক্তি ছিল। সে বিশ্বাসঘাতকতা করে গোঁড়া রক্ষণশীলদের নেত্রী বিধবা সম্রাজ্ঞী ৎসি শীর কাছে সংস্কারকদের গুপ্ত পরিকল্পনাকে ফাঁস করে দিয়েছিল; ফলে বিধবা সম্রাজ্ঞী আবার ক্ষমতা জোর করে দখল করে নিল, যুবসম্রাট কুয়াং সুকে বন্দী করল, আর থান সি-থোং ও অন্যান্য পাঁচজনের শিরশ্ছেদ করল। এইভাবে এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল শোচনীয় পরাজয়ে।

২৬। ই হো তুয়ান আন্দোলন—১৯০০ সালে উত্তর চীনের কৃষক ও হস্তশিল্পী-সাধারণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত একটি বিরাট আন্দোলন। এই আন্দোলনে তাঁরা রহস্যময় পদ্ধতিতে গুপ্ত সমিতি গঠন করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালান। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান, ইতালী ও অস্ট্রিয়া এই আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ যৌথভাবে সশস্ত্র শক্তি দিয়ে পিকিং ও তিয়েনসিন দখল করেছিল এবং অবর্ণনীয় বর্বরতার সাথে এই আন্দোলন দমন করেছিল।

২৭। সিনহাই বিপ্লব—১৯১১ সালের বিপ্লব চিং রাজবংশীয় স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটায়। এই বছরের ১০ই অক্টোবর তারিখে, চিং সরকারের নয়া সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী সংস্থাগুলির প্রেরণায় উচাং শহরে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। এর পরে বিভিন্ন প্রদেশে পর পর বিদ্রোহ ঘটে এবং অনতিবিলম্বেই ভেঙে পড়ে চিং রাজবংশের শাসন। ১৯১২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে নানকিং শহরে স্থাপিত হল চীন প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার, আর সান ইয়াৎ-সেন নির্বাচিত হলেন এর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট। কৃষক, শ্রমিক ও শহরে পেটি-বুর্জোয়াদের সংগে বুর্জোয়াদের মৈত্রীর ভেতর দিয়ে জয়লাভ করল এই বিপ্লব। কিন্তু যে চক্র এই বিপ্লবের নেতৃত্ব করেছিল তারা ছিল আপোষপন্থী, আর তারা কৃষকদের প্রকৃত হিতসাধন করেনি এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের চাপে আপোষ করেছিল বলে রাষ্ট্রক্ষমতা এসে পড়ল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ—ইউয়ান শি-কাইয়ের হাতে, আর বিপ্লব হল ব্যর্থ।

২৮। ১৯২৫ সালের ৩০শে মে শাংহাইয়ে ব্রিটিশ পুলিশ কর্তৃক চীনা জনগণকে হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সারা দেশের জনগণ যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন চালিয়েছিল, এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৫ সালের মে মাসে চিংতাও ও শাংহাইয়ের জাপানী সুতাকলগুলোতে পরপর ধর্মঘট হয়, এই ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল; জাপানী

সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের পদলেহী কুকুর—উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজরা এটা দমন করতে আসে। ১৫ই মে শাংহাইয়ের জাপানী সুতাকলের মালিক কু চেং-হোং নামক একজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে এবং দশ জনেরও বেশি শ্রমিক আহত হয়। ২৮শে মে তারিখে ছিংতাওয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার আট জন শ্রমিককে হত্যা করে। ৩০শে মে শাংহাইয়ে দু'হাজারেরও বেশি ছাত্র বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বিদেশীদের এলাকাগুলোতে শ্রমিকদের সমর্থনে প্রচার চালায় এবং এইসব এলাকা ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান জানায়। এর পরেই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্রিটিশ এলাকার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সম্মুখে দশ হাজারেরও অধিক লোক জমায়েত হয় এবং বজ্রনির্ঘোষে 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!', 'সমগ্র চীনা জনগণ, এক হও!' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা পুলিশ জনতার ওপর গুলি চালায়, ফলে বহু ছাত্র হতাহত হয় এই ঘটনাই '৩০শে মে'র হত্যাকাণ্ড' বলে পরিচিত। এই বিরাট হত্যাকাণ্ডে সমগ্র দেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, দেশের সর্বত্রই বিক্ষোভ-মিছিল ও হরতাল এবং ছাত্র, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট শুরু হয় যা বিরাটাকারের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়।

২৯। উত্তর অভিযানের যুদ্ধ হচ্ছে ১৯২৬—১৯২৭ সালে চীনা জনগণের দ্বারা চালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী মহান বিপ্লবী যুদ্ধ। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে, কুয়াংতুংয়ের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা একীকরণ করার পর, উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজদের শাসন উচ্ছেদ করার জন্য জাতীয় বিপ্লবী বাহিনী কুয়াংতুং থেকে উত্তর অভিযান শুরু করে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্বে ও ব্যাপক শ্রমিক-কৃষকসাধারণের আন্তরিক সমর্থনে ১৯২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ও ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে জাতীয় বিপ্লবী বাহিনী যুদ্ধ চালিয়ে দ্রুতভাবে ইয়াংসী নদীর অববাহিকা ও হোয়াংহো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে পৌঁছেছিল এবং অর্ধেক চীন দখল করে নিয়েছিল। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তির ওপরে মোক্ষম আঘাত হেনেছিল। যখন উত্তর অভিযান বিজয়ের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন চিয়াং কাই-শেকের প্রতিনিধিত্বে পরিচালিত কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীরা (যারা বৃহৎ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী, বড় বড় জমিদারদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে) সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটায়; তাছাড়া চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে চেন তু-শিউর প্রতিনিধিত্বে পরিচালিত দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা পার্টির

নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে কমরেড মাও সে-তুঙের সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী লাইনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর আত্মসমর্পণবাদী লাইন অবলম্বন করে বিপ্লবের নেতৃত্বক্ষমতা পরিত্যাগ করেছিল, বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্বক্ষমতা ত্যাগ করেছিল, ফলে এবারকার বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যায়।

৩০। জে. ভি. স্তালিন: 'চীন বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ'।

৩১। ভি. আই. লেনিন: '১৯০৫-১৯০৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কৃষিসংক্রান্ত কর্মসূচী'। 'সংকলিত রচনাবলী', ১৩শ খণ্ড, ইংরেজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৬২, পৃঃ ২১৯-৪২৯।

২০শে ডিসেম্বর, '১৯৩৯

২১শে ডিসেম্বর তারিখে কমরেড স্তালিন ষাট বছরে পা দিচ্ছেন। আমরা নিশ্চিত যে, সমগ্র দুনিয়ার বিপ্লবী জনগণ যাঁরা এ কথা জানেন, তাঁদের সবার হৃদয়েই তাঁর জন্মদিন উষ্ণ ও আবেগময় অভিনন্দন জাগিয়ে তুলবে।

স্তালিনকে অভিনন্দন জানানো কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপারমাত্র নয়; স্তালিনকে অভিনন্দন জানানো মানেই হচ্ছে তাঁকে ও তাঁর আদর্শকে সমর্থন জানানো, সমাজতন্ত্রের বিজয়কে এবং মানবজাতির অগ্রগতির যে পথ তিনি নির্দেশ করছেন তাকে সমর্থন করা, এর অর্থ হচ্ছে এক প্রিয় বন্ধুকে, সমর্থন করা। কারণ, মানবজাতির বৃহত্তর অংশই আজ কষ্টভোগ করছেন, এবং কেবলমাত্র স্তালিন কর্তৃক নির্দেশিত পথে অগ্রসর হয়ে এবং তাঁর সাহায্যেই মানবসমাজ সেই দুঃখভোগের অবসান ঘটাতে পারে।

আমাদের ইতিহাসের তিক্ততম কষ্টভোগের যুগে বাস করে আমরা চীনের লোকেরা সবচেয়ে জরুরীভাবে অন্যের কাছ থেকে সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করছি। কাব্য সংকলন গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'বন্ধুর সাড়া পাবার আশায় পাখি করে গান।' এতে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির যথার্থ বর্ণনাই পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু আমাদের বন্ধু কারা?

চীনা জনগণের এমন কিছু তথাকথিত স্ব-ঘোষিত বন্ধু আছে, যাদেরকে কিছু কিছু চীনা ভাবনাচিন্তা না করেই বন্ধু বলে গ্রহণ করে। কিন্তু এসব বন্ধুদেরকে শুধু তাং রাজত্বের সময়কার প্রধানমন্ত্রী লি লিন-ফুর[1] সংগেই তুলনা করা যেতে পারে, যার 'মুখে ছিল মধু, কিন্তু মনে ছিল খুন'। বস্তুতঃ, এইসব 'বন্ধুদের' সত্যসত্যই 'মুখে আছে মধু, কিন্তু মনে আছে খুন'। এরা কারা? এরা হচ্ছে চীনের প্রতি সহানুভূতির ঘোষণায় মুখর সাম্রাজ্যবাদীরা।

কিন্তু আর এক ধরনের বন্ধুও আছেন যাঁদের রয়েছে আমাদের প্রতি সত্যিকারের সহানুভূতি, যাঁরা আমাদেরকে দেখেন ভাইয়ের মতো। তাঁরা কারা? তাঁরা হচ্ছেন সোভিয়েত জনগণ ও স্তালিন।

কোন দেশই চীনের ওপর তাঁদের বিশেষ অধিকারগুলো পরিত্যাগ করেনি, একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই এটা করেছে।

সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীরাই আমাদের প্রথম মহান বিপ্লবের সময় বিরোধিতা করেছে, একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই আমাদের সাহায্য করছে।

কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের সরকারই জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হবার পর আমাদেরকে সত্যিকারের সাহায্য দেয়নি, একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই বিমান ও সাজসরঞ্জাম দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছে।

বিষয়টি কি যথেষ্ট স্পষ্ট নয়?

কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রের দেশ, তার নেতৃবৃন্দ ও জনগণ, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদগণ, রাষ্ট্রনেতা ও শ্রমিকেরাই চীন জাতি ও চীনা জনগণের মুক্তির স্বার্থে সত্যিকারের সাহায্য দিতে পারেন, এবং তাঁদের সাহায্য ছাড়া আমাদের আদর্শ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারে না।

স্তালিন হচ্ছেন চীনা জনগণের মুক্তির প্রকৃত বন্ধু। মতবিরোধ ঘটাবার কোন প্রচেষ্টা, কোন মিথ্যা কথা বা কুৎসা প্রচারই স্তালিন সম্পর্কে চীনা জনগণের সর্বান্তঃকরণ ভালবাসা ও শ্রদ্ধাকে বা সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত বন্ধুত্বকে প্রভাবিত করতে পারবে না।

টীকা

১। লি লিন-ফু (অষ্টম শতাব্দী) ছিল তাং বংশের সম্রাট শুয়ান ৎসুং-এর প্রধানমন্ত্রী। যারাই সামর্থ্যে বা খ্যাতিতে তাকে ছাড়িয়ে যেত বা সম্রাটের ভাল নজরে পড়ত, সে বন্ধুত্বের ভান করে তাদের ধ্বংস করার চক্রান্ত করত। এই কারণেই সে তার সমসাময়িকদের কাছে পরিচিত ছিল এমন একজন লোক হিসেবে, যার 'মুখে ছিল মধু, কিন্তু মনে ছিল খুন'।

নর্ম্যান বেথুনের স্মরণে

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯

কমরেড নর্ম্যান বেথুন[১] কানাডা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তাঁর পঞ্চাশ বছরের বেশি বয়সে জাপান-বিরোধী যুদ্ধে চীনকে সাহায্য করার জন্য কানাডা ও আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রেরিত হয়ে তিনি হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে চীনে আসতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। গত বসন্তে তিনি উপস্থিত হন ইয়েনানে, পরে কাজ করতে যান উতাই পর্বত্য অঞ্চলে, এবং সেখানে কাজে নিয়োজিত থাকাকালে দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি শহীদ হন। বিদেশী হয়েও তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে চীনা জনগণের মুক্তির কাজকে নিজের কাজ বলে মনে করতেন, এটা কী ধরনের ভাবমানস? এটা হচ্ছে কমিউনিজমের ভাবমানস। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেক সদস্যকেই এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। লেনিনবাদের মতে: ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকশ্রেণীর উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের জনগণের মুক্তি-সংগ্রামকে সমর্থন করা উচিত, আবার উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের শ্রমিকশ্রেণীরও ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করা উচিত; শুধুমাত্র তাহলেই বিশ্ববিপ্লব জয়ী হতে পারে।[২] কমরেড বেথুন এই লেনিনবাদী নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন। আমাদের চীনা কমিউনিস্টদেরও অবশ্যই এই নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করা উচিত। সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত; জাপান, ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানি, ইতালী ও অন্যান্য সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। শুধু এভাবেই সাম্রাজ্যবাদকে নিপাত করা যাবে, আমাদের জাতি ও জনগণ এবং বিশ্বের সমস্ত জাতি ও জনগণের মুক্তি অর্জন করা যাবে। এই হচ্ছে আমাদের আন্তর্জাতিকতাবাদ—সেই আন্তর্জাতিকতাবাদ, যা দিয়ে আমরা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সংকীর্ণ দেশ-প্রেমের বিরোধিতা করি।

কমরেড বেথুন নিজের প্রতি লেশমাত্রও মনোযোগ না দিয়ে অপরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর এই ভাবমানস এখানেই অভিব্যক্ত হয়

যে, তিনি কাজের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল ছিলেন এবং কমরেড ও জনগণের সংগে অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার করতেন। প্রত্যেক কমিউনিস্টেরই তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের কাজে দায়িত্বজ্ঞানহীন, তারা ভারী কাজকে ভয় করে, হাল্কাটা গ্রহণ করে, ভারী ভারগুলো অন্যদের কাঁধে ঠেলে দেয়, নিজেরা হাল্কাটা বহন করে। যদি তাদের সামনে কোন কাজ এসে পড়ে, তাহলে প্রথমে তারা নিজেদের কথা ভাবে, তার পরে অন্যদের। সামান্য একটা কাজ করলেই তারা আত্ম-অহমিকায় মেতে ওঠে, নিজেদের সম্পর্কে বড়াই করতে তারা ভালবাসে, তারা এই ভয় করে যে, তাদের কাজ সম্পর্কে হয়তো অপরে জানতে পারবে না। তারা কমরেড ও জনগণের সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করে না, বরং নিরুত্তাপ, যত্নহীন ও নির্দয় ব্যবহার করে। আসলে, এই ধরনের লোক কমিউনিস্ট নয়, অন্ততঃপক্ষে তাদের প্রকৃত কমিউনিস্ট বলে ধরা যায় না। ফ্রন্ট থেকে আগতদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি বেথুনের কথা বলার সময় তাঁর প্রশংসা করেন না এবং তাঁর ভাবমানসের দ্বারা মুগ্ধ হননি। শানসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত এলাকার যেসব সৈন্য ও জনসাধারণের চিকিৎসা ডাঃ বেথুন নিজ হাতে করেছিলেন এবং যাঁরা বেথুনের কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁরা মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারেননি। প্রত্যেক কমিউনিস্টকে অবশ্যই কমরেড বেথুনের কাছ থেকে এই ধরনের প্রকৃত কমিউনিস্টের ভাবমানস শেখা উচিত।

কমরেড বেথুন একজন ডাক্তার ছিলেন, চিকিৎসা করাই ছিল তাঁর পেশা। তিনি প্রতিনিয়তই নিজের দক্ষতার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করতেন; সমগ্র অষ্টম রুট বাহিনীর মেডিক্যাল সার্ভিসে তাঁর চিকিৎসার দক্ষতা অত্যন্ত উচ্চমানের ছিল। যারা ভিন্নতর কিছু দেখলেই নিজের কাজের পরিবর্তন চায় এবং যারা টেকনিক্যাল কাজকে অর্থহীন কাজ অথবা ভবিষ্যৎহীন কাজ বলে অবজ্ঞা করে, তাদের জন্যও এটা একটা চমৎকার শিক্ষা।

কমরেড বেথুনের সংগে আমার শুধুমাত্র একবার দেখা হয়েছিল। তারপর তিনি আমাকে অনেক পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু, ব্যস্ত থাকায় আমি শুধু একটিমাত্র পত্রের উত্তর দিয়েছি, তাও তিনি পেয়েছেন কিনা জানি না। তাঁর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এখন আমরা সবাই তাঁকে স্মরণ করছি; এতেই প্রমাণিত হয় যে, তাঁর ভাবমানস প্রত্যেককে কত গভীরভাবে অভিভূত করেছে। আমাদের সবারই তাঁর সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবমানস থেকে শিক্ষা গ্রহণ

করা উচিত। এই ভাবমানস গ্রহণ করলে সকলেই জনগণের পক্ষে খুবই হিতকর হবেন। একজন মানুষের যোগ্যতা বেশি অথবা কম হতে পারে, কিন্তু এই ভাবমানস থাকলেই তিনি হতে পারেন মহাপ্রাণ লোক, প্রকৃত লোক, নৈতিক-চরিত্রসম্পন্ন লোক, নীচ রুচি থেকে মুক্ত লোক ও জনগণের জন্য হিতকর লোক।

টীকা

১। প্রখ্যাত সার্জন নর্ম্যান বেথুন ১৯৩৬ সালে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের প্রতিরোধ-যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য ১৯:৮ সালে একটি মেডিক্যাল টিমের নেতা হিসেবে ইয়েনানে আসেন। গভীর আন্তর্জাতিকতা-বোধ ও কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দুবছর ধরে মুক্তাঞ্চলে সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে সেবার কাজ চালান। আহত সৈনিকদের অস্ত্রোপচার করার সময়ে রক্তে বিষক্রিয়ার ফলে ১৯৩৬ সালে ১২ই নভেম্বর তিনি হোপেই প্রদেশের ত্যাং-সিয়েনে প্রাণত্যাগ করেন।

২। জে. ভি. স্তালিন: 'লেনিনবাদের ভিত্তি', লেনিনবাদের সমস্যা।

জানুয়ারি, ১৯৬০

১। চীন কোন্ পথে?

প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে দেশব্যাপী একটা প্রাণবন্ত আবহাওয়া দেখা দিয়েছিল। এই মনোভাব দেখা দিয়েছিল যে, আমাদের জাতি শেষ পর্যন্ত অচল অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ খুঁজে পেয়েছে। লোকে আর সংশয়ে ভুরু কুঁচকে থাকত না। কিন্তু সম্প্রতি আপোষ করার ও কমিউনিজম-বিরোধিতার কলরবে আবার আকাশ-বাতাস ভরে ফেলেছে এবং জনসাধারণকে আবার একবার বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সাংস্কৃতিক কর্মী ও তরুণ ছাত্রেরা সর্বাপেক্ষা অনুভূতিপ্রবণ বলে তারাই সর্বপ্রথমে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। 'কি করা যায়?' 'চীন কোন্ পথে?' প্রভৃতি প্রশ্ন আবার উত্থাপিত হচ্ছে। এই জন্যই 'চীনা সংস্কৃতি'[১] নামক সাময়িক পত্রিকার প্রকাশনার সুযোগ চীনের রাজনীতি ও চীনের সংস্কৃতিক ধারা সম্পর্কে কয়েকটা কথা বললে হয়ত কিছু উপকার হতে পারে। সাংস্কৃতিক সমস্যার ব্যাপারে আমি অনভিজ্ঞ, এ সম্পর্কে আমি অধ্যয়ন করার আশা রাখি এবং সবেমাত্র সে কাজ আমি শুরু করেছি। এটা ভাল ব্যাপার যে এই বিষয় নিয়ে ইয়েনানের অনেক কমরেড ইতিপূর্বেই বহু বিশদ ও বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখেছেন। আমরা এই সাদামাঠা কথাগুলি নাট্যানুষ্ঠানের আগে ঘণ্টা বাজানোর যে উদ্দেশ্য সেইরকম উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। আমাদের মন্তব্য সমূহ জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের অগ্রগামী কর্মীদের জন্য কিছু কিছু সত্যের সন্ধান দিতে পারে এবং তাঁরা যাতে তাঁদের মূল্যবান অবদানসমূহ নিয়ে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ হন সে ব্যাপারে এগুলি কিছু প্রেরণা যোগাতে পারে। আমরা আশা করি, তাঁরা আলোচনায় অংশ নেবেন এবং এমন নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে, যা আমাদের জাতির প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারবে। 'বাস্তব তথ্যাবলী থেকে সত্যের সন্ধান করাই' হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত মনোভাব; 'আমি সবসময়েই নির্ভুল,' 'আমি তোমাদের বলছি' প্রভৃতির মতো অহঙ্কারী মনোভাব নিয়ে সমস্যার সমাধান কোনদিনই করা যায় না। আমাদের জাতি

গভীর বিপদে নিমজ্জিত। কেবলমাত্র বিজ্ঞানসম্মত ও দায়িত্বশীল মনোভাবই আমাদের জাতিকে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে পারে। সত্য একটিমাত্রই আছে এবং কেউ তার সন্ধান পেয়েছে কিনা এই প্রশ্নের মীমাংসা আত্মমুখীন অহংকার ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বাস্তবমুখী অনুশীলনের ওপর। লক্ষ কোটি জনগণের বিপ্লবী অনুশীলনই সত্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। আমি মনে করি, এই দৃষ্টিভঙ্গিকে চীনা সংস্কৃতি প্রকাশ করার মনোভাব হিসেবে গণ্য করা যায়।

২। আমরা এক নতুন চীন গড়ে তুলতে চাই

আজ বহু বছর ধরে আমরা কমিউনিস্টরা চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের জন্য লড়াই করে আসছি, এবং সংগে সংগে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্যও আমরা লড়ছি। আর আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে চীনা জাতির জন্য এক নতুন সমাজ ও নতুন দেশ গড়ে তোলা—যেখানে এক নতুন রাজনৈতিক ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়া এক নতুন সংস্কৃতিও থাকবে। এর অর্থ এই যে, আমরা শুধু যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিপীড়িত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষিত চীনকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধশালী চীনে রূপান্তরিত করতে চাই তাই নয়, আমরা আরও চাই পুরানো সংস্কৃতির প্রভাবে অজ্ঞ ও অনগ্রসর চীনকে নতুন সংস্কৃতির প্রভাবাধীন এক সভ্য ও অগ্রসর চীনে পরিণত করতে। সংক্ষেপে, আমরা এক নতুন চীন গড়ে তুলতে চাই। চীনা জাতির নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলাই আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাজের লক্ষ্য।

৩। চীনের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য

আমরা এক নতুন সংস্কৃতি গড়তে চাই। কিন্তু সেই সংস্কৃতির রূপ কি হবে?

কোন নির্দিষ্ট সংস্কৃতি (মতাদর্শগত রূপ হিসেবে) নির্দিষ্ট সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রতিফলন। সেই সংস্কৃতি আবার সেই নির্দিষ্ট সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতির ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে এবং সেগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে; আর অর্থনীতি হচ্ছে ভিত্তি, এবং

রাজনীতি হচ্ছে অর্থনীতিরই ঘনীভূত প্রকাশ[২]। সংস্কৃতির সংগে রাজনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্ক এবং রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে এটাই আমাদের মূল দৃষ্টিকোণ। অতএব, নির্দিষ্ট রূপের রাজনীতি ও অর্থনীতিই প্রথমে নির্দিষ্ট রূপের সংস্কৃতিকে নির্ধারণ করে; এবং শুধু তারপরেই সেই নির্দিষ্ট রূপের সংস্কৃতি আবার নির্দিষ্ট রূপের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে ও এগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মার্কস বলেছেন: 'মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে না, বরং বিপরীতপক্ষে, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে।'[৩] তিনি আরও বলেছেন, 'দার্শনিকেরা নানা ভাবে বিশ্বকে শুধু ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল সমস্যা হচ্ছে বিশ্বের পরিবর্তন সাধন করা।'[৪] মানব ইতিহাসে এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলিই সর্বপ্রথম চেতনা ও অস্তিত্বের মধ্যেকার সম্পর্কের সমস্যার সঠিক সমাধান করে, এবং এগুলিই হচ্ছে বাস্তবের প্রতিফলন হিসেবে জ্ঞানের গতিশীল বিপ্লবী তত্ত্বের মৌলিক ধারণা। পরবর্তীকালে লেনিন এই তত্ত্বকে আরও গভীরভাবে বিকশিত করেছেন। চীনের সাংস্কৃতিক সমস্যার আলোচনায় এই মূল ধারণাগুলিকে আমাদের একান্তভাবে মনে রাখতে হবে।

কাজেই এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, চীনা জাতির পুরাতন সংস্কৃতির মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াশীল অংশকে আমরা বর্জন করতে চাই সেটা চীনা জাতির পুরানো রাজনীতি ও পুরানো অর্থনীতি থেকে অবিচ্ছেদ্য; আর চীনা জাতির যে নতুন সংস্কৃতি আমরা গড়ে তুলতে চাই সেটাও আমাদের নতুন রাজনীতি, নতুন অর্থনীতি থেকে অবিচ্ছেদ্য। চীনা জাতির পুরানো রাজনীতি ও পুরানো অর্থনীতি হচ্ছে চীনা জাতির পুরানো সংস্কৃতির ভিত্তি; আর চীনা জাতির নতুন রাজনীতি ও নতুন অর্থনীতি হচ্ছে চীনা জাতির নতুন সংস্কৃতির ভিত্তি।

চীনা জাতির পুরানো রাজনীতি এবং পুরানো অর্থনীতি কি? এবং তার পুরানো সংস্কৃতিই বা কি?

চৌ ও চিন রাজবংশের আমল থেকেই চীনা সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। তার রাজনীতি ও অর্থনীতির চরিত্রও ছিল সামন্ততান্ত্রিক। ঐ রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রতিফলন হিসেবে প্রধান সংস্কৃতিও ছিল সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি।

চীনদেশের ওপর বিদেশী পুঁজিবাদের আক্রমণ এবং চীনের সমাজে ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী উপাদানের জন্ম ও বিকাশের পরিণতিতে চীনের সমাজ ক্রমান্বয়ে একটি ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক

সমাজে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান চীনে জাপানীদের অধিকৃত এলাকায় সমাজ ঔপনিবেশিক; কুওমিনতাঙ শাসিত এলাকায় সেটা মূলতঃ আধা-ঔপনিবেশিক; এবং উভয় অঞ্চলের সমাজে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থারই প্রাধান্য রয়েছে। এটাই হল বর্তমান চীনের সমাজের চরিত্র, এটাই হল চীনদেশের বর্তমান অবস্থা। এই সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতি হচ্ছে প্রধানতঃ ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক; আর তাদের প্রতিফলন হিসেবে প্রধান সংস্কৃতিও হচ্ছে ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা সামন্ততান্ত্রিক।

মূলতঃ এই প্রধান রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাই হল আমাদের বিপ্লবের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। এ ধরনের ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক পুরানো রাজনীতি, পুরানো অর্থনীতি এবং সেগুলির সেবায় নিয়োজিত পুরানো সংস্কৃতিকে আমরা নির্মূল করতে চাই; প্রতিষ্ঠা করতে চাই সেগুলির ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ চীনা জাতির এক নতুন রাজনীতি, নতুন অর্থনীতি ও এক নতুন সংস্কৃতি।

তাহলে, চীনা জাতির নতুন রাজনীতি ও নতুন অর্থনীতি কি? এবং চীনা জাতির নতুন সংস্কৃতিই-বা কি?

চীন বিপ্লবের ঐতিহাসিক ধারাকে দুটি পর্বে ভাগ করতে হবে; প্রথমে গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তারপরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই দুটি বিপ্লবী প্রক্রিয়ার চরিত্র ভিন্ন। এখানে উল্লিখিত গণতন্ত্র পুরানো রকমের গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়,— এটা পুরানো গণতন্ত্র নয়, বরং এটা নতুন ধরনের গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত—এটা হচ্ছে নয়া গণতন্ত্র।

সুতরাং, এ কথা জোর দিয়েই বলা চলে যে, চীনা জাতির নতুন রাজনীতি নয়া গণতন্ত্রের রাজনীতি; তার নতুন অর্থনীতি নয়া গণতন্ত্রের অর্থনীতি এবং নতুন সংস্কৃতি নয়া গণতন্ত্রের সংস্কৃতি।

এই হল বর্তমান চীন বিপ্লবের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। চীনে বিপ্লবী কাজে নিযুক্ত যে-কোন রাজনৈতিক পার্টি, গ্রুপ বা ব্যক্তি যদি এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে না পারে, তাহলে তারা বিপ্লব পরিচালনা করতে পারবে না, পারবে না বিপ্লবকে জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। বরং তারা জনসাধারণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হবে এবং শেষ পর্যন্ত নিঃসঙ্গ হতাশার মধ্যে তাদের নিমজ্জিত হতে হবে।

৪। চীনের বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবের অংশ

চীনের বিপ্লবের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই বিপ্লব দুটি পর্বে বিভক্ত, গণতন্ত্রের পর্ব ও সমাজতন্ত্রের পর্ব। প্রথম পর্বের এই গণতন্ত্র এখন আর সাধারণ ধরণের গণতন্ত্র নয়, এ এক চীনা কায়দার, এক বিশেষ ও নতুন ধরনের গণতন্ত্র—নয়া গণতন্ত্র। তাহলে কি করে এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য দেখা দিল? বিগত একশ বছর ধরেই কি তা বিদ্যমান ছিল, না সম্প্রতিই শুধু তার উদ্ভব ঘটেছে?

চীনের ও দুনিয়ার ঐতিহাসিক বিকাশকে মোটামুটিভাবে বিচার করে দেখলেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আফিং যুদ্ধের অব্যবহিত পরের যুগে এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ছিল না, বরং আরও পরে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ ও রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পরেই শুধু এই বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখন দেখা যাক কি করে এই বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হল।

এটা খুবই স্পষ্ট যে, চীনের বর্তমান সমাজের চরিত্র যেহেতু ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক, তাই চীনের বিপ্লবকে অবশ্যই দুই পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বের কাজ হল সমাজের এই ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক রূপকে একটা স্বাধীন, গণতান্ত্রিক সমাজে পরিবর্তিত করা; দ্বিতীয় পর্বের কাজ হল বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এখন যে কাজ আমরা করছি, তা চীন বিপ্লবের প্রথম পর্বের কাজ।

এই প্রথম পর্বের প্রস্তুতির পর্যায় শুরু হয়েছে ১৮৪০ সালের আফিং যুদ্ধের সময় থেকে। অর্থাৎ, যখন চীনের সমাজ তার সামন্ততান্ত্রিক রূপ বদলে আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে, সেই সময় থেকে। তারপর ঘটে এক এক করে তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের আন্দোলন, চীন ফরাসী যুদ্ধ, চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলন, ১৯১১ সালের বিপ্লব, ৪ঠা মে'র আন্দোলন, উত্তর অভিযান, কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধ ও বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ—এসবগুলি সংঘটিত হতে পুরো এক শতাব্দী লেগেছে। একটা নির্দিষ্ট অর্থে বিচার করলে এই সমস্ত আন্দোলনই চীন বিপ্লবের প্রথম পর্বের কাজ সম্পাদনের প্রয়াস। চীনের জনগণ এইসব বিভিন্ন আন্দোলনের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বিপ্লবের প্রথম পর্বের কাজ সম্পাদনের প্রয়াস চালিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী শক্তির বিরোধিতা করেছেন, স্বাধীন

গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং প্রথম পর্বের বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। আরও পূর্ণ অর্থে ১৯১১ সালের বিপ্লব এই বিপ্লবের শুরু। সামাজিক চরিত্রের দিক থেকে এই বিপ্লব হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। এ বিপ্লব আজও সম্পন্ন হয়নি, তা সম্পন্ন করতে আরও বিরাট প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কারণ এ বিপ্লবের শত্রুরা এখনো দারুণ শক্তিশালী। 'বিপ্লব এখনো সাফল্যমণ্ডিত হয়নি, কমরেডদের অবশ্যই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে' ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের এই উক্তি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকেই বোঝায়।

কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার এবং ১৯১৭ সালের রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যের ফলে দুনিয়ার ছয় ভাগের একভাগে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হবার পর চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে একটা পরিবর্তন ঘটে।

এর আগে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল পুরানো ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের অন্তর্ভুক্ত এবং পুরানো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিশ্ব-বিপ্লবেরই একটি অংশ।

ঐ সময় থেকে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্রের রূপান্তর ঘটেছে, তা নতুন ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আওতায় চলে এসেছে। বিপ্লবী ফ্রন্ট গঠনের দিক থেকে দেখলে তা তখন থেকে সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেন এমন হল? কারণ প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ ও প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—অক্টোবর বিপ্লব—দুনিয়ার ইতিহাসের গোটা ধারায় পরিবর্তন এনেছে এবং দুনিয়ার ইতিহাসে নতুন এক যুগের সূচনা করেছে।

এই যুগে পৃথিবীর এক অংশে (অংশটি সারা দুনিয়ার ছয় ভাগের একভাগ) বিশ্ব পুঁজিবাদী ফ্রন্ট চূর্ণ হয়েছে, আর বাকি সব জায়গাতেই তার ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্নগুলো পূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে; এই যুগে পুঁজিবাদী দুনিয়ার বাকি অংশকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ক্রমেই বেশি বেশি করে উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশগুলোর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে; এই যুগে গঠিত হয়েছে এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে যে, সমস্ত উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের মুক্তি-আন্দোলনের সমর্থনের জন্য সে সংগ্রাম করতে চায়; এই যুগে পুঁজিবাদী দেশগুলোর সর্বহারাশ্রেণী সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিগুলোর প্রভাব থেকে দিনের পর দিন মুক্ত হচ্ছে এবং উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলোর মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছে—এমন একটি যুগে সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণী ও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যে-কোন ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লবই আর পুরানো ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের আওতায় পড়ে না, পড়ে নতুন ধরনের বিপ্লবের আওতায়। এ বিপ্লব এখন আর পুরানো বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদী বিশ্ববিপ্লবের অংশ নয়; এ বিপ্লব এখন নতুন এক বিশ্ববিপ্লবের অংশ, অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের বিপ্লবী উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশসমূহকে আর বিশ্ব পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবী ফ্রন্টের মিত্র হিসেবে দেখা চলবে না, এগুলি বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ফ্রন্টের মিত্রে পরিণত হয়েছে।

যদিও সামাজিক চরিত্রের বিচারে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের এই বিপ্লবের প্রথম পর্যায় বা প্রথম পর্ব এখনো মূলতঃ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকই রয়েছে এবং তার বাস্তব দাবি যদিও হচ্ছে পুঁজিবাদের বিকাশের পথ পরিষ্কার করা, তবু এই বিপ্লব আর সেই পুরানো ধরনের বিপ্লব নয়—যা বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হতো এবং যার লক্ষ্য ছিল এক পুঁজিবাদী সমাজ ও বুর্জোয়া একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলা। বরং এই বিপ্লব এক নতুন ধরনের বিপ্লব, যা সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত এবং যার লক্ষ্য বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে এক নয়া-গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্ত এক-নায়কত্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং এই বিপ্লবই আবার সমাজতন্ত্রের বিকাশের জন্য আরও বিস্তৃত পথ পরিষ্কার করবে। অগ্রগতির পথে তার শত্রুদের অবস্থার পরিবর্তন এবং তার মিত্রদের পরিবর্তনের কারণে এই বিপ্লবকে আবার কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে। কিন্তু তার মূল চরিত্রের কোনও পরিবর্তন হবে না।

এই ধরনের বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের একেবারে মূলে আঘাত করে, তাই সাম্রাজ্যবাদ একে সহ্য করে না, বরং এর বিরোধিতা করে। কিন্তু অন্যদিকে সমাজতন্ত্র একে সহ্য করে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণী একে সাহায্য করে।

তাই, এই ধরনের বিপ্লব অনিবার্যভাবে সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-বিপ্লবের অংশে পরিণত হয়।

'চীনের বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবের অংশ'—১৯২৪-১৯২৭ সালে চীনের প্রথম মহাবিপ্লবের সময়কালেই এই নির্ভুল বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল। পেশ করেছিলেন চীনা কমিউনিস্টরা, এবং তখনকার দিনের সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী সংগ্রামে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই একে সমর্থন জানিয়েছিলেন। শুধু এই তত্ত্বের অর্থটা তখনো খুব বেশি স্পষ্ট করে তোলা হয়নি, তাই লোকের মনে প্রশ্নটি সম্পর্কে কেবলমাত্র একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল।

এই 'বিশ্ববিপ্লব' আর পুরানো বিশ্ববিপ্লব নয়, পুরানো বুর্জোয়া বিশ্ববিপ্লব বহু দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে; এ বিপ্লব নতুন বিশ্ববিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লব। ঠিক এইভাবেই এই ধরনের 'অংশ' বলতে পুরানো বুর্জোয়া বিপ্লবের অংশ বোঝায় না, বোঝায় নতুন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ। এ এক বিরাট পরিবর্তন। পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় পরিবর্তন এর আগে আর হয়নি।

স্তালিনের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই চীনের কমিউনিস্টরা এই নির্ভুল বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে লেখা একটি প্রবন্ধে ১৯১৮ সালেই স্তালিন বলেছিলেন:

অক্টোবর বিপ্লবের দুনিয়াব্যাপী মহান তাৎপর্য প্রকাশ পাচ্ছে প্রধানতঃ এই তথ্যগুলোর মধ্যে:

(১) এই বিপ্লব জাতীয় সমস্যার পরিধিকে বিস্তৃত করে দিয়েছে—তাকে ইউরোপে জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আংশিক সমস্যা থেকে রূপান্তরিত করেছে সাম্রাজ্যবাদের কবল হতে নিপীড়িত জাতিসমূহ, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলোর মুক্তির সাধারণ সমস্যায়;

(২) এটা তাদের এই মুক্তির বিপুল সম্ভাবনাকে ও সেইদিকে অগ্রসর হবার পথ খুলে দিয়েছে; এইভাবে এটা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিগুলোর মুক্তির কাজকে অনেকটা সহজতর করেছে এবং তাদেরকে টেনে এনেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের সাধারণ ধারায়;

(৩) **এইভাবে এটা সমাজতান্ত্রিক পাশ্চাত্য ও দাসত্বশৃংখলে আবদ্ধ প্রাচ্যের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছে** এবং রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সর্বহারাশ্রেণী থেকে শুরু করে প্রাচ্যের অত্যাচারিত

জাতিগুলি পর্যন্ত সর্বত্র বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক নতুন বিপ্লবী ফ্রন্ট সৃষ্টি করেছে।[৫]

এই প্রবন্ধ রচনার পর থেকে স্তালিন বারবার নিম্নোক্ত তত্ত্বকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন যে, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের বিপ্লব পুরানো প্রকারের বিপ্লব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশে পরিণত হয়েছে। তখনকার দিনের যুগে ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদীদের সংগে বিতর্ক প্রসঙ্গে লেখা ১৯২৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে স্তালিন এই তত্ত্বের সবচেয়ে স্পষ্ট ও যথার্থ ব্যাখ্যা দেন। এই প্রবন্ধটি চ্যাং চোং-শির দ্বারা অনূদিত **জাতীয় সমস্যা প্রসঙ্গে স্তালিন** নামক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত; প্রবন্ধটির নাম 'জাতীয় সমস্যা প্রসঙ্গে আর একবার'। এই প্রবন্ধটিতে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি রয়েছে :

> ১৯১২ সালের শেষের দিকে লেখা স্তালিনের **মার্কসবাদ ও জাতি-সমস্যা** নামক পুস্তিকার একটি অংশের কথা সেমিচ উল্লেখ করেছেন : সেখানে লেখা আছে : 'উদীয়মান পুঁজিবাদের অবস্থায় জাতীয় সংগ্রাম বুর্জোয়াশ্রেণীগুলোর নিজেদের মধ্যেকার সংগ্রাম।' এই নজির দেখিয়ে সেমিচ, স্পষ্টতঃ, এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, বর্তমান ঐতিহাসিক অবস্থায় জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যার যে সূত্র তিনি খাড়া করেছেন তা নির্ভুল। কিন্তু স্তালিনের পুস্তিকাখানি লেখা হয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগে; তখনো জাতীয় সমস্যা মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপী তাৎপর্যসম্পন্ন সমস্যা ছিল না, তখন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে মার্কসবাদীদের মূল দাবী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ হিসেবেই বিবেচিত হতো—সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের অংশ হিসেবে নয়। তারপর আন্তর্জাতিক পারিস্থিতির একটা মৌলিক পারিবর্তন ঘটে গেছে, একদিকে যুদ্ধ ও অন্যদিকে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব জাতীয় সমস্যাকে বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ থেকে সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশে রূপান্তরিত করেছে। এটা লক্ষ্য করতে না পারা হাস্যকর। ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে লেখা 'আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনার সারসংকলন' নামক প্রবন্ধেই লেনিন বলেছেন, জাতীয় সমস্যার মূল বিষয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আর সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ নয়, তা এখন সাধারণ সর্বহারা, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই অংশে পরিণত হয়েছে। জাতীয়

সমস্যা সম্পর্কে লেনিন ও রুশ কমিউনিজ্‌মের অন্যান্য প্রতিনিধিদের পরবর্তী রচনাগুলোর উল্লেখমাত্রও আমি করছি না। এতসবের পরে, বর্তমানে যখন নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ফলে আমরা এক নতুন যুগে—সর্বহারা বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছি, তখন সেমিচ আবার রাশিয়ার বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের আমলে লেখা স্তালিনের পুস্তিকার অংশবিশেষের যে উল্লেখ করেছেন, তার কী তাৎপর্য থাকতে পারে? এর শুধু এইটুকু তাৎপর্য থাকতে পারে যে, সেমিচ যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে তিনি স্থান, কাল, ও জীবন্ত ঐতিহাসিক অবস্থার কথা মনে রাখেননি। এর দ্বারা তিনি দ্বন্দ্ববাদের সবচেয়ে মৌলিক দাবিই অগ্রাহ্য করে বসেছেন। তিনি এটা বিবেচনা করেননি যে, একটি ঐতিহাসিক অবস্থায় যা সত্য, অন্য ঐতিহাসিক অবস্থায় তা ভুলও হতে পারে।[৬]

এ থেকে জানা যায়, যে, দু'ধরনের বিশ্ববিপ্লব আছে। প্রথম ধরনের বিশ্ববিপ্লব হচ্ছে বুর্জোয়া অথবা পুঁজিবাদী পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের বিশ্ববিপ্লবের যুগ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। ১৯১৪ সালে যখন প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ বেধে উঠল, আরও বিশেষ করে ১৯১৭ সালে যখন রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব সংঘটিত হল, তখনই ওই যুগের সমাপ্তি ঘটেছে। তখন থেকেই শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ধরনের বিশ্ববিপ্লব—সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লব। এই বিপ্লবের প্রধান শক্তি হচ্ছে পুঁজিবাদী দেশগুলোর সর্বহারাশ্রেণী; আর মিত্র হচ্ছে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের নিপীড়িত জাতিগুলি। নিপীড়িত জাতির যে-কোন শ্রেণী, পার্টি, বা ব্যক্তি বিপ্লবে যোগদান করুক না কেন এ ব্যাপারে তারা নিজেরা সচেতন হোক বা না হোক কিংবা বুঝুক বা না বুঝুক, যতদিন তারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী থাকবে ততদিন তাদের বিপ্লব সর্বহারা সমাজ-তান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের অংশ হবে, আর তারা নিজেরাও ঐ বিশ্ববিপ্লবের মিত্র হবে।

চীন বিপ্লবের তাৎপর্য আজ ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে। এখন এমন এক সময় এসে পড়েছে, যখন পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটগুলো দুনিয়াকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাপে ধাপে টেনে নিয়ে চলেছে; যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজ্‌মের দিকে উত্তরণের যুগে এসে পৌঁছেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা ও পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়ার ওপর আঘাত হানার জন্য সারা দুনিয়ার সর্বহারাশ্রেণী ও নিপীড়িত

জাতিগুলিকে পরিচালিত ও সাহায্য করার শক্তি অর্জন করেছে; যখন বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের সর্বহারাশ্রেণী পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে; এবং যখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনা সর্বহারাশ্রেণী, কৃষকসাধারণ, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়ারা একটা মহান স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আজ এমন একটি যুগে বাস করে আমরা কি উপলব্ধি করব না যে, চীনের বিপ্লবের বিশ্বতাৎপর্য আরও বিরাট হয়েছে? আমি মনে করি, আমাদের তাই করা উচিত। চীনের বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে।

সামাজিক চরিত্রের বিচারে চীনের বিপ্লবের এই প্রথম পর্যায় (এই পর্যায় আবার বহু উপ-পর্যায়ে বিভক্ত) একটা নতুন ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, এখনো সেটা সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। তবে বহু আগেই এই বিপ্লব সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের অংশে পরিণত হয়েছে; অধিকন্তু, আজ তা ওই বিশ্ববিপ্লবের এক মহান অংশে এবং এক মহান মিত্রে পরিণত হয়েছে। এই বিপ্লবের প্রথম পর্ব বা পর্যায় নিশ্চয়ই চীনা বুর্জোয়া একনায়কত্বের অধীনে পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা নয়—তা হতেও পারে না; এর ফলে হবে চীনা সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত চীনের সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্বের অধীনে নয়া-গণতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা। তারপর বিপ্লবকে অগ্রসর করিয়ে নেওয়া হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে, যে পর্যায়ে চীনে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এই হচ্ছে বর্তমান চীনের বিপ্লবের সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য, এই কুড়ি বছরের (৪ঠা মে'র আন্দোলন থেকে শুরু করে) নতুন বিপ্লবী ধারা। এই হচ্ছে তার জীবন্ত বাস্তব মর্মবস্তু।

৫। নয়া গণতন্ত্রের রাজনীতি

চীনের বিপ্লবের নতুন ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হল এই বিপ্লব দুটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে বিভক্ত; প্রথম পর্যায়টি হল নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু চীনের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে এই নতুন বৈশিষ্ট্যের বাস্তব অভিব্যক্তি কিভাবে ঘটে? এটা আমরা এখন ব্যাখ্যা করব।

১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র আন্দোলনের (১৯১৪ সালের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের ও ১৯১৭ সালের রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পরে তা ঘটেছিল)

আগে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক পরিচালকের ভূমিকা পালন করেছিল চীনের পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণী (তাদের বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে) তখনো পর্যন্ত চীনের সর্বহারাশ্রেণী সচেতন ও স্বাধীন শ্রেণীশক্তি হিসেবে রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়নি; তারা শুধু পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুগামী হিসেবে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল। যেমন, ১৯১১ সালের বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণীরও ছিল এইরকম অবস্থা।

মে চৌঠার আন্দোলনের পর, যদিও চীনা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী অব্যাহত ভাবেই বিপ্লবে যোগদান করতে থাকে, তবু তখন বুর্জোয়াশ্রেণী আর চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক পরিচালক ছিল না, পরিচালক ছিল চীনা সর্বহারাশ্রেণী। নিজেদের বিকাশের ফলে ও রুশ বিপ্লবের প্রভাবে চীনের সর্বহারা শ্রেণী তখন দ্রুত সচেতন ও স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক'—এই শ্লোগান এবং চীনের গোটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পূর্ণ কর্মসূচিটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টিই উপস্থাপিত করে; আর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একাই কৃষি-বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী হল একটি ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী, এবং তারা সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা অত্যাচারিত। সুতরাং, সাম্রাজ্যবাদী যুগেও তারা নির্দিষ্ট সময়কালে ও নির্দিষ্ট মাত্রায় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও স্বদেশের আমলাতান্ত্রিক যুদ্ধবাজ সরকারের বিরোধিতা করার বিপ্লবী চরিত্র বজায় রাখতে পারে (যুদ্ধবাজ সরকারের প্রতি তাদের বিরুদ্ধতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৯১১ সালের বিপ্লব এবং উত্তর অভিযানের সময়কালে), এবং যাদের তারা বিরোধিতা করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে তারা সর্বহারাশ্রেণী ও পেটি বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে। চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী এবং পুরাতন রুশ সাম্রাজ্যের বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে এখানেই তফাৎ। যেহেতু পুরাতন রুশ সাম্রাজ্য ছিল একটা সামরিক সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশ—যে অন্য দেশের ওপর আগ্রাসী আক্রমণ চালাত—সেইজন্য রুশ বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে কোন বিপ্লবী চরিত্রই ছিল না। সেখানকার সর্বহারাশ্রেণীর কর্তব্য ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরোধিতা করা, তার সংগে হাত মেলানো নয়। কিন্তু চীন একটি ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশ, এবং সে হচ্ছে আগ্রাসী আক্রমণের শিকার, তাই নির্দিষ্ট সময়কালে ও নির্দিষ্ট

মাত্রায় চীনা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর একটা বিপ্লবী চরিত্র আছে। এখানে সর্বহারাশ্রেণীর কর্তব্য হল জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর এই বিপ্লবী চরিত্রকে অবহেলা না করে সাম্রাজ্যবাদ ও আমলাতান্ত্রিক যুদ্ধবাজ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সংগে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

এদিকে আবার ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়া হবার কারণে চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল, এইজন্য এদের চরিত্রে আর একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—বিপ্লবের শত্রুর সংগে আপোষ করার প্রবণতা। চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবে অংশগ্রহণের সময়েও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় না এবং জমির খাজনা গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলকে শোষণ করার সংগে তারা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকে; তাই সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য তাদের নেই, সামন্তবাদী শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য তাদের আরও নেই, এ তো আরও দূরের কথা। অতএব, চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দুটি মৌলিক সমস্যার সমাধান করা বা দুটি মৌলিক কর্তব্য সম্পন্ন করা চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে সম্ভব নয়। চীনের বৃহৎ বুর্জোয়াদের—যাদের প্রতিনিধিত্ব করে কুওমিনতাঙ—সম্পর্কে বলতে গেলে, তারা ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়কালে সাম্রাজ্যবাদীদের কোলে মাথা গুঁজেছে, এবং সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলোর সঙ্গে জোট বেঁধে বিপ্লবী জনগণের বিরোধিতা করেছে। ১৯২৭ সালে ও তার পরবর্তীকালের একটি নির্দিষ্ট সময়ে চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীও প্রতিবিপ্লবের পক্ষ নিয়েছে। বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে বৃহৎ বুর্জোয়াদের একটা অংশ—ওয়াং চিং-ওয়েই যার প্রতিনিধি—শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর বেইমানির এক নতুন পরিচয় দিয়েছে। চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে অতীতের ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোর, বিশেষতঃ ফ্রান্সের বুর্জোয়াশ্রেণীর এ হল আর একটা পার্থক্য। ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে, বিশেষতঃ ফ্রান্সে বুর্জোয়াশ্রেণী যখন তার বিপ্লবী যুগে ছিল, তখন সেখানকার বুর্জোয়া বিপ্লব তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণাঙ্গ ছিল, কিন্তু চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে সেই পরিমাণের সম্পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব করার ক্ষমতা নেই।

একদিকে বিপ্লবে যোগদান করার সম্ভাবনা, অন্যদিকে বিপ্লবের শত্রুর সঙ্গে আপোষ করার মনোভাব—চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর চরিত্রের এই হল দ্বৈত চরিত্র—

'তার মুখ উত্তর দিকেই ফেরানো'। এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাসে দেখা যায়, সেখানকার বুর্জোয়াদের এইরকম দ্বৈত চরিত্র ছিল। যখন তারা শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হয়, তখন শ্রমিক ও কৃষকদের সাথে হাত মিলিয়ে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়; আবার শ্রমিক ও কৃষকেরা যখন জেগে ওঠে তখন তারা শত্রুর সাথে হাত মিলিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের বিরোধিতা করে। বিশ্বের সকল দেশের বুর্জোয়াদের পক্ষে এই হল সাধারণ নিয়ম। তবে চীনের বুর্জোয়াদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য একটু বেশি পরিমাণে দেখা যায়।

চীনে এটা স্পষ্ট যে, যে-কেউ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী শক্তিগুলিকে উৎখাত করতে জনগণকে নেতৃত্ব দিতে পারবে—সে-ই জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারবে, কারণ জনগণের মারাত্মক শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী শক্তি, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ। আজ যে-কেউ জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করতে এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তন করতে জনগণকে নেতৃত্ব দিতে পারবে সে-ই হবে জনগণের ত্রাণকর্তা। ইতিহাস এটা প্রমাণ করেছে যে, এই দায়িত্ব সম্পন্ন করতে চীনা বুর্জোয়াশ্রেণী অক্ষম, এই দায়িত্ব সর্বহারাদের কাঁধেই এসে পড়তে বাধ্য।

অতএব পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, চীনের সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক, বুদ্ধিজীবি ও অন্যান্য পেটি বুর্জোয়ারাই হচ্ছে মূল শক্তি যা দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। এই শ্রেণীগুলোর কোন কোনটি ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে, বাকিরা জাগছে; চীনা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ও সরকারী কাঠামোর এরা অনিবার্যভাবেই মৌলিক অংশ হয়ে উঠবে, আর সর্বহারাশ্রেণী হবে নেতৃত্বের শক্তি। যে চীনা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আজ আমরা গঠন করতে চাই, তা সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে সকল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী জনগণের যুক্ত একনায়কত্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রই কেবল হতে পারে। এটাই হবে নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, খাঁটি বিপ্লবী তিনটি মহান কর্মনীতি-সহ নতুন তিন গণ-নীতির প্রজাতন্ত্র।

এই ধরণের নয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র একদিকে যেমনি প্রাচীন ইউরোপ আমেরিকার বুর্জোয়া একনায়কত্বাধীন পুঁজিবাদী প্রজাতন্ত্র থেকে স্বতন্ত্র, তাই সেগুলি হচ্ছে প্রাচীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং ইতিমধ্যেই তা সেকেলে হয়ে গেছে। অন্যদিকে তেমনি তা সোভিয়েত ধরনের সর্বহারা একনায়কত্বাধীন

সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থেকেও স্বতন্ত্র, যে প্রজাতন্ত্র ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিকশিত হয়ে উঠেছে, এবং যা সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হবে। সমস্ত শিল্পোন্নত দেশের রাষ্ট্রীয় ও সরকারী কাঠামোর এটাই নিঃসন্দেহে হবে সর্বপ্রধান রূপ। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়কালে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লবের জন্য এই ধরনের প্রজাতন্ত্র উপযুক্ত নয়। তাই একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়কালে সমস্ত ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লবে তৃতীয় ধরনের রাষ্ট্ররূপই কেবল গ্রহণ করা যায়, আর সেই রাষ্ট্ররূপই হল নয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এটা এক নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়কালের রাষ্ট্ররূপ, তাই এটা হচ্ছে অন্তর্বর্তী রূপ; কিন্তু এটা অপরিহার্য রূপ, এটাকে বাদ দেওয়া যায় না।

অতএব, দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতার শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে দুনিয়ার বিবিধ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মূলতঃ এই তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে—(১) বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বাধীন প্রজাতন্ত্র, (২) সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বাধীন প্রজাতন্ত্র, এবং (৩) কয়েকটি বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্বাধীন প্রজাতন্ত্র।

প্রথমগুলি হচ্ছে পুরানো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আজ, দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বেধে ওঠার পর, বহু পুঁজিবাদী দেশে গণতন্ত্রের চিহ্ন আর নেই, সেগুলি বুর্জোয়াশ্রেণীর রক্তাক্ত সামরিক একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে বা পরিণত হচ্ছে। জমিদার ও বুর্জোয়াদের যুক্ত একনায়কত্বাধীন কতকগুলো দেশকেও এই রকমের রাষ্ট্র হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে।

দ্বিতীয় ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে এইরকম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার অবস্থা পরিপক্ব হয়ে উঠছে; ভবিষ্যতের এক নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে এই হবে দুনিয়ার প্রধান রাষ্ট্ররূপ।

তৃতীয়টি হচ্ছে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলোর বিপ্লবের অন্তর্বর্তী রাষ্ট্ররূপ। এইসব বিপ্লবের প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকবে, কিন্তু তা হবে মৌলিক অভিন্নতার মধ্যে গৌণ পার্থক্য মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির বিপ্লব হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলির রাষ্ট্রীয় ও সরকারী কাঠামো অবশ্যই মূলতঃ একইরকমের হবে, অর্থাৎ তা হবে কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্বাধীন নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আজকের চীনে এই নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপ হল জাপ-

বিরোধী যুক্তফ্রন্টের রূপ। এটা জাপান-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী; এটা আবার কয়েকটি বিপ্লবী শ্রেণীর মৈত্রীবন্ধন এবং একটি যুক্তফ্রন্টও বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চীনে আজ দীর্ঘদিন ধরে প্রতিরোধের লড়াই চলা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকাগুলি ছাড়া দেশের অধিকাংশে গণতন্ত্রীকরণের কাজ মূলতঃ এখনো পর্যন্ত আরম্ভই হয়নি। এই মূল দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশের অভ্যন্তরে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। যদি এই নীতির পরিবর্তন করা না হয়, তাহলে আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ গুরুতরভাবে বিপন্ন হবে।

আমরা এখানে যে সমস্যার আলোচনা করছি, সেটা 'রাষ্ট্রব্যবস্থার' সমস্যা। চিং রাজবংশের শাসনকালের শেষভাগ থেকে শুরু করে কয়েক দশক ধরে এই সমস্যা নিয়ে বিবাদ বিসংবাদ চলে আসছে, কিন্তু এখনো এর সমাধান হয়নি। আসলে প্রশ্নটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর কোন্‌টি কোন অবস্থানে থাকবে—তা নির্ণয় করা ছাড়া আর কিছুই নয়। বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বদাই এই শ্রেণীগত অবস্থানের সত্যকে গোপন রেখে 'জাতীয়' কথাটি ব্যবহার করে তাদেরই এক-শ্রেণীর একনায়কত্বকে বাস্তবায়িত করতে চায়। এইভাবে গোপন রাখায় বিপ্লবী জনগণের কোন উপকার হয় না, তাই একে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করতে হবে। 'জাতীয়' কথাটি অবশ্য ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু প্রতিবিপ্লবী ও দেশদ্রোহীদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। যে ধরনের রাষ্ট্র আজ আমরা চাই তা হচ্ছে প্রতিবিপ্লবী ও দেশদ্রোহীদের ওপর সমস্ত বিপ্লবীশ্রেণীর একনায়কত্ব।

> আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাধারণতঃ বুর্জোয়া-শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার ও নিছক সাধারণ লোকদের ওপর অত্যাচারের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কুওমিনতাঙের গণতন্ত্রের নীতির অর্থ হচ্ছে এমন এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা সমস্ত সাধারণ লোকের হাতে থাকে, মুষ্টিমেয় লোকের একচেটিয়া অধিকারে নয়।

এটা হল কুওমিনতাঙের সংগে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতার যুগে ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত ইস্তাহার থেকে উদ্ধৃত মহান বিবৃতি। ষোল বছর ধরে কুওমিনতাঙ নিজেই নিজের এই বিবৃতি লংঘন করে চলেছে, ফলে আজকের এই গভীর জাতীয় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এটা হল কুওমিনতাঙের একটা সাংঘাতিক ভুল; আমরা আশা করি, জাপ-

বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে কুওমিনতাঙ এই ভুল সংশোধন করবে।

এবার 'সরকারের ব্যবস্থার' প্রশ্ন। এটা হচ্ছে কীভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা সংগঠিত হবে, অর্থাৎ শত্রুর বিরোধিতা করার ও আত্মরক্ষার জন্য এক বা অন্য সামাজিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতার যন্ত্রটিকে কোন্‌রূপে বিন্যস্ত করবে, তার প্রশ্ন। এমন কোন রাষ্ট্র হতে পারে না যা রাজনৈতিক ক্ষমতার এক যথোপযুক্ত রূপের সংস্থা হিসেবে প্রতিফলিত হয় না। চীনে এখন আমরা জনগণের কংগ্রেস সমন্বিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারি। এই কংগ্রেস থাকবে জাতীয় গন-কংগ্রেস থেকে নিয়ে নীচির দিকে প্রদেশ, জেলা, মহকুমা ও থানার গণ-কংগ্রেস পর্যন্ত সর্বস্তরে; প্রত্যেক স্তরে সেগুলি নিজেদের সরকারী সংস্থাসমূহ নির্বাচন করবে। কিন্তু নরনারী নির্বিশেষে, ধর্মবিশ্বাস, সম্পত্তির পরিমাণ ও শিক্ষাগত মান প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রকৃত সার্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কেবল এমন ব্যবস্থাই হবে রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন বিপ্লবী শ্রেণীর যথাযথ অবস্থানের, জনগণের সত্যিকার মত প্রকাশের, বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনার এবং নয়া-গণতন্ত্রের মানসিকতার পক্ষে উপযুক্ত। এই ব্যবস্থাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ব্যবস্থা। শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারই সমস্ত বিপ্লবী জনগণের অভিমতকে পূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে পারে এবং বিপ্লবের শত্রুর বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে সংগ্রাম করতে পারে। মুষ্টিমেয় লোকের একচেটিয়া অধিকারে নয়'—এই মনোভাব সরকারের মধ্যে ও সৈন্যবাহিনীতে থাকতেই হবে; খাঁটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া এই লক্ষ্যে পৌছানো যাবে না এবং সরকারের শাসনপ্রণালী ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে না।

রাষ্ট্রব্যবস্থা হল সকল বিপ্লবী শ্রেণীগুলির মিলিত একনায়কত্ব এবং সরকারের শাসনপ্রণালী হল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। এই হল নয়া-গণতন্ত্রের রাজনীতি, নয়া-গণতন্ত্রের প্রজাতন্ত্র, জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রজাতন্ত্র, তিনটি মহান কর্মনীতিসহ নয়া তিন গণ-নীতির প্রজাতন্ত্র, নামে ও কাজে সত্যিকার চীনা প্রজাতন্ত্র। বর্তমানে আমাদের দেশ কেবলমাত্র নামেই চীনা প্রজাতন্ত্র, কাজে নয়; নামের সংগে সঙ্গতি রেখে বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করাই আমাদের বর্তমান কাজের লক্ষ্য।

এই হচ্ছে সেই আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সম্পর্ক, যা এক বিপ্লবী চীনে—

পানী আক্রমণের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট চীনে—প্রতিষ্ঠা করা উচিত এবং অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্র গঠনের কাজের এই হল একমাত্র নির্ভুল দিক্‌নির্দেশ।

৬। নয়া গণতন্ত্রের অর্থনীতি

যদি এমন একটা প্রজাতন্ত্র চীনদেশে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তাকে নয়া-গণতান্ত্রিক হতেই হবে।

এই প্রজাতন্ত্রে বড় বড় ব্যাঙ্ক, বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের মালিকানাধীনে থাকবে।

> 'মালিকানা চীনদেশীয়ই হোক অথবা বিদেশীয়ই হোক—যে প্রতিষ্ঠানগুলি একচেটিয়া চরিত্রের অথবা ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার পক্ষে অত্যন্ত বড়—যেমন ব্যাঙ্ক, রেলপথ, বিমানপথের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ—সেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও শাসিত হবে, যাতে ব্যক্তিগত পুঁজি জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য না করতে পারে; এই হচ্ছে পুঁজি নিয়ন্ত্রণের মৌলিক নীতি।

এটাও হল কুওমিনতাঙের সংগে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতার যুগে কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত ইস্তাহার থেকে উধৃত মহান বিবৃতি। এটাই হল নয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনের নির্ভুল কর্মনীতি। সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত নয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন হবে। এবং এটাই হবে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পরিচালিকাশক্তি। কিন্তু এই প্রজাতন্ত্র অন্যান্য ধরনের পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে না, এবং যে পুঁজিবাদী উৎপাদন 'জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য' করতে পারে না—তার বিকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করবে না, কারণ চীনের অর্থনীতি এখনো অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ স্তরে রয়েছে।

জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে তা ভূমিহীন কৃষক ও অল্প জমির মালিক কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেবার, ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শ্লোগান 'কৃষকের হাতে জমি দাও'—কার্যকরী করার, গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বিলুপ্ত করার এবং জমিকে কৃষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য এই প্রজাতন্ত্র কতকগুলো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গ্রামাঞ্চলে ধনী

কৃষকের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যেমন আছে তেমনই চলতে দেওয়া হবে। এটাই হল 'ভূমিস্বত্ব সমীকরণের' নীতি। এই নীতির সঠিক শ্লোগান হচ্ছে 'কৃষকের হাতে জমি দাও।' এই পর্যায়ে সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা স্থাপন করা হবে না, কিন্তু 'কৃষকের হাতে জমি দাও'—এই নীতির ভিত্তিতে বিকশিত নানাধরনের সমবায়-অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক উপাদানও থাকবে।

'পুঁজি নিয়ন্ত্রণ' এবং 'ভূমিস্বত্ব সমীকরণের' পথ ধরে চীনের অর্থনীতিকে চলতে হবে এবং কোনমতেই তাকে 'মুষ্টিমেয় লোকেরা একচেটিয়া অধিকারে' থাকতে দেওয়া হবে না; আমরা কিছুতেই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ও জমিদারদের 'জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য করতে' দিতে পারি না; আমরা কোনমতেই ইউরোপ-আমেরিকার পদ্ধতিতে পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে দেব না, কিংবা উল্টোদিকে পুরাতন আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজকেও টিঁকে থাকতে দেব না। এই ধারার বিরুদ্ধে কাজ করার সাহস যদি কারও থাকে, তবে সে কখনো কৃতকার্য হতে পারবে না, এবং নিজেই সে-দেওয়ালে মাথা ঠুকে বসবে।

বিপ্লবী চীনে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত চীনে, এই আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত এবং নিশ্চিতরূপেই তা গড়ে তোলা হবে।

এটাই হল নয়া গণতন্ত্রের অর্থনীতি।

আর নয়া গণতন্ত্রের রাজনীতি হচ্ছে এই নয়া-গণতান্ত্রিক অর্থনীতিরই কেন্দ্রীভূত অভিব্যক্তি।

৭। বুর্জোয়া একনায়কত্বের তত্ত্ব খণ্ডন

নয়া-গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও অর্থনীতি সমন্বিত এই ধরনের প্রজাতন্ত্র চীনের জনগণের শতকরা নব্বই জনেরও বেশি ব্যক্তির সমর্থনলাভ করবে। এর বিকল্প কোন পথ নেই।

আমরা কি বুর্জোয়া-একনায়কত্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজ গঠনের পথে যেতে পারি? এ পথ যে ইউরোপ ও আমেরিকার বুর্জোয়াদের পুরানো পথ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অথবা আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি কোনটাই চীনকে এ পথ অবলম্বন করতে দিচ্ছে না।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচার করলে দেখা যায়, এ পথ কানাগলির

পথ। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল কথা এই যে, এখন পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রাম চলছে, পুঁজিবাদ পতনের দিকে চলছে আর সমাজতন্ত্র উন্নতিসাধন ও বিকাশলাভ করছে। চীনদেশে বুর্জোয়া একনায়কত্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠাকে প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ সহ্য করবে না। চীনের ওপর সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ এবং চীনের স্বাধীনতা ও চীনের পুঁজিবাদী বিকাশের প্রতি তার বিরোধিতার ইতিহাসই হল চীনের আধুনিক ইতিহাস। চীনে একের পর এক বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে, কারণ সাম্রাজ্যবাদ তাদের টুঁটি টিপে মেরেছে। সেইজন্য অসংখ্য বিপ্লবী শহীদ তাঁদের উদ্দেশ্য অপূর্ণ রয়ে গেল এই আক্ষেপ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এমন শক্তিশালী জাপানী সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণ চালিয়ে চীনের ভেতরে ঢুকেছে, সে চীনকে তার উপনিবেশে পরিণত করতে চায়; জাপানীরা আজ চীনে তাদের নিজস্ব পুঁজিবাদকে বিকশিত করে তুলছে, কিন্তু চীনের নিজের পুঁজিবাদ বিকাশলাভ করছে না; চীনে এখন জাপানী বুর্জোয়াশ্রেণী তার একনায়কত্ব চালু করছে, চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্ব নয়। এ কথা খুবই সত্য যে, বর্তমান যুগ সাম্রাজ্যবাদের মরণপণ সংগ্রামের যুগ এবং সাম্রাজ্যবাদ শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। 'সাম্রাজ্যবাদ হল মুমূর্ষু পুঁজিবাদ'।[৭] কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ মরণোন্মুখ বলেই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সে উপনিবেশগুলির ওপর আরও বেশি করে নির্ভরশীল হচ্ছে, এবং নিশ্চয়ই সে কোন উপনিবেশ অথবা আধা-উপনিবেশকেই তাদের নিজেদের বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে দেবে না। যেহেতু জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এক গুরুতর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত হয়েছে, যেহেতু সে মুমূর্ষু অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, সেইহেতু সে নিশ্চয়ই চীনকে আক্রমণ করার এবং এই দেশকে তাঁর উপনিবেশে পরিণত করার অপচেষ্টা করবে; আর এইভাবে সে চীনে বুর্জোয়া-একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ও চীনের নিজস্ব জাতীয় পুঁজিবাদ বিকাশের পথ বন্ধ করে দেবে।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রও চীনকে ঐ পথে যেতে দেবে না। পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই আমাদের শত্রু। চীন যদি স্বাধীনতালাভ করতে চায়, তবে সে কোনমতেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণীর সাহায্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য থেকে আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারি না; জাপান এবং ব্রিটেন,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালীর সর্বহারাশ্রেণী তাদের নিজ নিজ দেশে পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করে তার মাধ্যমে আমাদেরকে যে সাহায্য করে থাকে, তা থেকে আমরা আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না। যদিও এ কথা আমরা বলতে পারি না যে, জাপান এবং ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালী—এইসব দেশে অথবা এগুলির দু-একটিতে বিপ্লব জয়যুক্ত হবার পরেই কেবল চীনে বিপ্লব জয়যুক্ত হবে, তবু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আমরা ঐ সমস্ত দেশের সর্বহারাশ্রেণীর অতিরিক্ত সহযোগিতা ছাড়া জয়লাভ করতে পারব না। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য সম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পক্ষে এই সাহায্য এক অপরিহার্য বিষয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলে বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য। ১৯২৭ সালের পরবর্তীকালের সোভিয়েত-বিরোধী আন্দোলনের[৮] শিক্ষা থেকে এ কথা কি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি? বর্তমান দুনিয়া অগ্রসর হচ্ছে বিপ্লব ও যুদ্ধের এক নবযুগের মধ্য দিয়ে, অগ্রসর হচ্ছে পুঁজিবাদের নিশ্চিত মৃত্যু ও সমাজতন্ত্রের নিশ্চিত সমৃদ্ধি-লাভের যুগের মধ্য দিয়ে। এমতাবস্থায় চীনদেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বিজয়ের পর বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারা যাবে, এমন আশা করা কি একেবারে স্বপ্ন দেখার সামিল নয়?

যদিও বিশেষ অবস্থায় (যে অবস্থা ছিল তুরস্কের, যেখানে বুর্জোয়াশ্রেণী গ্রীক আক্রমণ প্রতিহত করে দিয়েছিল, অথচ যেখানে সর্বহারাশ্রেণীর শক্তি ছিল খুব দুর্বল) একটা পেটি-কামালবাদী বুর্জোয়া-একনায়কত্বাধীন তুরস্কের[৯] জন্ম হয়েছিল প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ ও অক্টোবর বিপ্লবের পর, তাহলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক গঠন সম্পন্ন হওয়ার পরে দ্বিতীয় আর এক তুরস্কের জন্ম অসম্ভব, ৭৫ কোটি লোকসংখ্যা-বিশিষ্ট 'তুরস্ক' সৃষ্টি করা তো আরও অসম্ভব। চীনের বিশেষ অবস্থার জন্য (অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর ঢিলেঢালাভাব, আপোষপ্রবণতা এবং সর্বহারা-শ্রেণীর শক্তি ও তার বৈপ্লবিক সম্পূর্ণাঙ্গতা), তুরস্কের সেই সহজ সফলতার মতো ব্যাপার এদেশে কখনো ঘটেনি। ১৯২৭ সালে চীনের প্রথম মহাবিপ্লব ব্যর্থ হবার পর চীনের বুর্জোয়ারা কি তারস্বরে কামালবাদের গান গায়নি? কিন্তু কোথায় চীনের কামাল? এবং চীনের বুর্জোয়া-একনায়কত্ব ও পুঁজিবাদী

সমাজই-বা কোথায়? এই প্রসঙ্গে এটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কামালের তুরস্ককেও শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল, আর এইভাবে তুরস্ক ক্রমান্বয়ে একটি আধা-উপনিবেশে পরিণত হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল দুনিয়ার অংশে পরিণত হয়েছে। আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের যে-কোন 'বীর যোদ্ধাকে' হয় সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টে দাঁড়িয়ে নিজেকে বিশ্ব-প্রতিবিপ্লবী শক্তির অংশে পরিণত করতে হবে, না হয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টে দাঁড়িয়ে নিজেকে বিশ্ববিপ্লবী শক্তির অংশে পরিণত করতে হবে। এ দুয়ের একটিকে বেছে নিতেই হবে। তৃতীয় কোন পথ নেই।

আভ্যন্তরীণ পরিবেশ থেকে চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর এতদিনে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল। সর্বহারাশ্রেণী এবং কৃষক ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়ার মিলিত শক্তির বলে ১৯২৭ সালের বিপ্লব জয়যুক্ত হবার মুহূর্তেই বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী এইসব জনসাধারণকে পদাঘাতে সরিয়ে দিয়ে বিপ্লবের ফল নিজে আত্মসাৎ করেছে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তির সংগে প্রতিবিপ্লবী জোটে মিলিত হয়েছে, এবং দশ বছর ধরে সর্বশক্তি দিয়ে চালিয়েছে 'কমিউনিস্ট-বিরোধী দমন অভিযান'। কিন্তু তার ফল কি হয়েছে? আজ যখন এক প্রবল শত্রু আমাদের দেশের গভীরে প্রবেশ করেছে, আর দু'বছর ধরে আমরা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে আসছি, তখন কি তোমরা ইউরোপ ও আমেরিকার বুর্জোয়াদের সেই পুরানো অচল কর্মসূচী নকল করতে ইচ্ছুক? অতীতের 'দশ বছরের কমিউনিস্ট-বিরোধী দমন অভিযানের' ফলে কোন বুর্জোয়া-একনায়কত্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজ জন্মলাভ করেনি, এ ব্যাপারে তোমরা কি আর একবার চেষ্টা করে দেখতে চাও? এ কথা ঠিক যে, 'দশ বছরের কমিউনিস্ট-বিরোধী দমন অভিযানের' ফলে জন্ম নিয়েছে একটি 'একদলীয় একনায়কত্ব', কিন্তু এটা হল আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক একনায়কত্ব। 'কমিউনিস্ট-বিরোধী দমন অভিযানের' প্রথম চার বছরের (১৯২৭ থেকে ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) পরেই 'গায়ের জোরে জন্ম' নিয়েছে একটি 'মাঞ্চুকুও'; আরও ছয় বছর এরকম 'দমন অভিযানের' ফলে ১৯৩৭ সালে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের বিরাট প্রাচীরের দক্ষিণ অংশে ঢুকে পড়ে। আজ যদি কেউ আরও দশ বছর ধরে এই ধরনের 'দমন অভিযান' চালাতে চায়, তবে এই 'কমিউনিস্ট-বিরোধী

ধমন অভিযান' হবে পুরানো অভিযান থেকে আলাদা এক নতুন ধরনের অভিযান। কিন্তু এই নতুন ধরনের 'কমিউনিস্ট-বিরোধী দমন অভিযানের' কার্যভার সাহসভরে গ্রহণ করেছে এমন দ্রুতগামী ব্যক্তি কি ইতিমধ্যেই দেখা দেয়নি? হাঁ, দিয়েছে। এই ব্যক্তি হল ওয়াং চিং-ওয়েই; সে ইতিমধ্যেই একজন খ্যাতনামা নতুন ধরনের কমিউনিস্ট-বিরোধী ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। কেউ যদি ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের উপদলে যোগ দিতে চায়, তবে সে তা করতে পারে; কিন্তু এর পরেও যদি সে বুর্জোয়া-একনায়কত্ব, পুঁজিবাদী সমাজ, কামালবাদ, আধুনিক রাষ্ট্র, একদলীয় একনায়কত্ব, 'একটি মতবাদ' ইত্যাদি সম্পর্কে কপট বুলি আ·ড়ায়, তবে সেটা কি আগের চেয়েও বেশি লজ্জাজনক হবে না? কেউ যদি ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের উপদলে যোগ না দিয়ে 'জাপ-বিরোধী' শিবিরে যোগ দিতে চায়, কিন্তু অন্যদিকে সে যদি আবার জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিজয়ের পর জাপ-বিরোধী জনগণকে এক পদাঘাতে সরিয়ে দিয়ে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিজয়লব্ধ ফলটি আত্মসাৎ করতে এবং 'চিরস্থায়ী একদলীয় একনায়কত্ব' কায়েম করতে চায়, তবে সেটা কি নিতান্তই দিবাস্বপ্ন হবে না? 'জাপানকে প্রতিরোধ কর!' 'জাপানকে প্রতিরোধ কর!' কিন্তু আসলে প্রতিরোধ করছে কে? শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়াদের ছাড়া তোমরা এক পা-ও এগোতে পারবে না। স্পর্ধাভরে যারা এঁদের পদাঘাত করবে, তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা কি একটা সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার নয়? বুর্জোয়াশ্রেণীর গোঁড়া ব্যক্তিরা (আমি গোঁড়া ব্যক্তিদের কথাই কেবল বলছি) মনে হয় এই কুড়ি বছরে কিছুই শিক্ষালাভ করেনি। শুনতে পাচ্ছেন না, তারা এখনো চেঁচিয়ে মরছে, 'কমিউনিজমকে গণ্ডিবদ্ধ কর,' 'কমিউনিজমকে ক্ষয় কর', 'কমিউনিজমের বিরোধিতা কর'? দেখতে পাচ্ছেন না, তাদের 'অন্যান্য দলের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধকরণের বিধিব্যবস্থা, ঘোষণার পর আবার এসেছে 'অন্যান্য দলের সমস্যার মোকাবিলার বিধিব্যবস্থা', এবং তারও পরে এসেছে 'অন্যান্য দলের সমস্যার মোকাবিলা করার নির্দেশাবলী'? হায় রে! যদি এই 'সীমবদ্ধকরণ' ও 'মোকাবিলা' না থেমে চলতেই থাকে, তবে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎকে তারা কোথায় নিয়ে যাবে? নিজেদের ভবিষ্যৎ তারা কিভাবে প্রস্তুত করতে যাচ্ছে? এইসব ভদ্র মহোদয়গণের কাছে আমাদের একান্ত আন্তরিক উপদেশ—তোমরা চোখ খোল, চীনের দিকে ও দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখ, দেখ দেশে-বিদেশে এখন আসল পরিস্থিতিটা কী; দোহাই

তোমাদের, বারবার একই ভুল কর না। যদি এই ভুল চলতেই থাকে তবে জাতির ভবিষ্যৎ তো বিপদগ্রস্ত হবেই, তাছাড়া আমি মনে করি, তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎও ভাল হবে না। এ কথা সুনিশ্চিত, সন্দেহাতীত ও সত্য। চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর গোঁড়া ব্যক্তিরা যদি এখনো সচেতন না হয়, তবে তাদের ভবিষ্যৎ মোটেই শুভ হবে না, তারা নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে আনবে। এই জন্যই আমাদের আশা, চীনের জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট অটলভাবে বেঁচে থাকবে, এবং কোন একটি চক্রের একচেটিয়া কারবারের মধ্য দিয়ে নয়, বরং সকলের সহযোগিতার মধ্য দিয়েই জাপ-বিরোধী সংগ্রামকে বিজয় পর্যন্ত চালিয়ে নেওয়া যাবে। এটাই, শুধু এটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি; আর বাকি সবই খারাপ নীতি। এই হল তোমাদের প্রতি আমাদের—কমিউনিস্টদের—আন্তরিক হিতোপদেশ। আগে থেকে সতর্ক করে দিইনি বলে আমাদের যেন দোষ দিও না।

'যদি খাদ্য থাকে তবে সবাই মিলে তা ভাগ করে নিক'—এটা হল চীনদেশের একটি পুরানো কথা। এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা। যেহেতু আমরা সবাই আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নিচ্ছি, সেইজন্য আমাদের খাদ্য, আমাদের কাজ বা আমাদের বইপুস্তক আমরা সবাই ভাগ করে নেব; এটাই ন্যায়সঙ্গত হবে। 'আমি এবং কেবলমাত্র আমিই সবকিছু হস্তগত করব' আর 'কেউই আমার অনিষ্ট করতে পারবে না,—এইসব মনোভাব সামন্তপ্রভুদের পুরানো চাল মাত্র, বিংশ শতাব্দীর ৪০-এর দশকে এইসব একেবারেই অচল।

যারা বিপ্লবী তাদের কাউকেই আমরা কমিউনিস্টরা কখনোই দূরে সরিয়ে দিই না। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক এমন সমস্ত শ্রেণী, স্তর, রাজনৈতিক পার্টি, রাজনৈতিক সংগঠন ও ব্যক্তির সংগে আমরা যুক্তফ্রন্টে লেগে থাকব, দীর্ঘ সময়ের জন্য তাদের সংগে সহযোগিতা করে চলব। কিন্তু আমরা কাউকেই আমরা কমিউনিস্ট পার্টিকে দূরে সরিয়ে দিতে দেবে না এবং যুক্তফ্রন্টে ফাটল ধরাতে দেব না। চীনকে অবশ্যই জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতেই হবে এবং অবশ্যই ঐক্য ও প্রগতির পথে এগিয়ে চলতেই হবে। যারা আত্মসমর্পণ করতে চাইছে, যারা ভাঙন ধরাতে বা পিছু হটতে চাইছে, তাদের আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না।

৮। 'বামপন্থী' বুলি-কপচানির খণ্ডন

বুর্জোয়া-একনায়কত্বের পুঁজিবাদী পথ গ্রহণ করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সর্বহারা-একনায়কত্বের সমাজতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করা কি সম্ভব ?

না, তাও অসম্ভব।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, বর্তমান বিপ্লব হল প্রথম ধাপ মাত্র, ভবিষ্যতে তা দ্বিতীয় ধাপে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের ধাপে বিকশিত হবে। চীন সমাজতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করলেই শুধু প্রকৃত সুখ লাভ করবে। কিন্তু এখনো সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের সময় আসেনি। চীনে বিপ্লবের বর্তমান কর্তব্য হল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধিতা করা। এ কর্তব্য সম্পন্ন হবার আগে সমাজতন্ত্রের কথা বলা বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছু নয়। চীনের বিপ্লবকে দুই ধাপে ভাগ করতেই হবে, প্রথম ধাপ নয়া-গণতন্ত্রের, দ্বিতীয় ধাপ সমাজতন্ত্রের। তাছাড়া প্রথম ধাপ সম্পূর্ণ হতে বেশ দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে. এটা কোনমতেই রাতারাতি ঘটে যাবার ব্যাপার নয়। আমরা কল্পনাবিলাসী নই, এবং আমাদের যে বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা আমরা এড়াতে পারি না।

কোন কোন কুচক্রী প্রচারক ইচ্ছাকৃতভাবেই এই দুই ভিন্ন ধরনের বিপ্লবী পর্যায়কে একসাথে গুলিয়ে ফেলে তথাকথিত 'একটিমাত্র বিপ্লবের তত্ত্বের' পক্ষে ওকালতি করে। এভাবে এরা এটা প্রমাণ করতে চায় যে, তিন-গণনীতি সমস্ত বিপ্লবের পক্ষেই প্রযোজ্য, কাজেই কমিউনিজমের অস্তিত্বের কোন যৌক্তিকতা নেই। এই 'তত্ত্বের' সাহায্যে এরা প্রাণপণে কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করে, এবং অষ্টম রুট বাহিনী, নতুন চতুর্থ বাহিনী ও শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের বিরোধিতা করে। এদের উদ্দেশ্য সমস্ত বিপ্লবকে সমূলে খতম করা, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার বিরোধিতা করা। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার বিরোধিতা করা এবং জাপানী আক্রমণকারীদের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য জনমত প্রস্তুত করা। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা সুপরিকল্পিত-ভাবেই এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কারণ উহান শহর দখলের পরে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে পেরেছে যে, শুধুমাত্র সামরিক শক্তির দ্বারা চীনকে পদানত করতে তারা সমর্থ হবে না; তাই তারা রাজনৈতিক আক্রমণ ও অর্থনৈতিক প্রলোভনের কৌশল অবলম্বন করেছে। তাদের এই রাজনৈতিক আক্রমণের উদ্দেশ্য হল জাপ-বিরোধী শিবিরের ভেতরকার দোদুল্যমান

ব্যক্তিদের প্রলুব্ধ করা, যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ধরানো এবং কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতাকে বানচাল করার চেষ্টা করা। তাদের অর্থনৈতিক প্রলোভন হল তথাকথিত যৌথ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। মধ্য ও দক্ষিণ চীনে জাপানী আক্রমণকারীরা ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠানে চীনা পুঁজিপতিদেরকে পুঁজির শতকরা ৫১ ভাগ বিনিয়োগ করতে দেয়, বাকি ৪৯ ভাগ জাপানীরা বিনিয়োগ করে; উত্তর চীনে জাপানী আক্রমণকারীরা চীনা পুঁজিপতিদেরকে পুঁজির শতকরা ৪৯ ভাগ বিনিয়োগ করতে দেয়, বাকি ৫১ ভাগ জাপানীরা বিনিয়োগ করে। তাছাড়া জাপানী আক্রমণকারীরা চীনা পুঁজিপতিদেরকে তাদের পূর্ব-বিনিয়োজিত পুঁজি ফিরিয়ে দেবার এবং ঐগুলোকে পুঁজির শেয়ার হিসেবে গণ্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। কাজেই, কোন কোন বিবেকহীন পুঁজিপতি মুনাফার লোভে নৈতিক নিয়মবিধি ভুলে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য উসখুস করছে। ওয়াং চিং-ওয়েই পুঁজিপতিদের যে অংশটির প্রতিনিধিত্ব করে, তারা ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণ করেছে। পুঁজিপতিদের আর এক অংশ এখন জাপ-বিরোধী শিবিরে লুকিয়ে আছে, তারাও ঐ দিকে পা বাড়াতে ইচ্ছুক। কিন্তু চোরের মতো তারা ভয়ে ভয়ে ভাবছে যে, কমিউনিস্টরা তাদের পথরোধ করে দাঁড়াবেন; তাদের কাছে এর চেয়েও ভয়ানক ব্যাপার এই যে, জনসাধারণ তাদেরকে চীনা দেশদ্রোহী বলে অভিহিত করবেন। তাই তারা একত্রিত হয়ে সলাপরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, সাংস্কৃতিক ও সাংবাদিক মহলগুলোতে আগে থাকতেই তারা কিছু প্রস্তুতির কাজ করে রাখবে। এই কর্মনীতি স্থির করার পর সংগে সংগেই সময় নষ্ট না করে তারা কাজে লেগে গেছে: কিছু 'অধিবিদ্যাবাগীশ শয়তানকে'[10] ভাড়া করা হয়েছে; তাছাড়া কিছু ট্রটস্কিপন্থীকেও কাজে লাগানো হয়েছে। এইসব লোক তাদের কলমকে বল্লমের মতো ঘোরায়, সেটাকে তারা সকল দিকে চালিত করে এবং পাগলা-গারদের হট্টগোল সৃষ্টি করে। এমনি করে তারা অনেক কুযুক্তি উপস্থাপিত করেছে; যেমন 'একটিমাত্র বিপ্লবের তত্ত্ব'; যেমন, চীনদেশের পরিস্থিতিতে কমিউনিজম খাপ খায় না; যেমন, চীনে কমিউনিস্ট পার্টি থাকার কোন দরকার নেই; যেমন, অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের ক্ষতি করেছে এবং যুদ্ধ না করে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে; যেমন, শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সরকার হল সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতাবাদী; যেমন, কমিউনিস্ট পার্টি অবাধ্য,

বিভেদসৃষ্টিকারী, ষড়যন্ত্রকারী এবং গণ্ডগোল সৃষ্টিকারী। এই সবকিছুর উদ্দেশ্য হল যারা চারিদিকে কী হচ্ছে তা বোঝে না তাদের চোখে ধুলো দেওয়া, যাতে সুযোগ উপস্থিত হলেই পুঁজিপতিরা শতকরা ৪৯ অথবা ৫১ ভাগ শেয়ার ভোগ করার এবং শত্রুর কাছে সমগ্র জাতির স্বার্থ বিকিয়ে দেবার উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারে। এর অর্থ হল 'কড়িকাঠ ও থাম চুরি করে তার জায়গায় পচা কাঠ বসানো'—অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করার আগে মতাদর্শগত প্রস্তুতি ও জনমতের প্রস্তুতি। এইসব ভদ্রমহোদয়গণ আপাতঃদৃষ্ট ঐকান্তিকতার সহিত 'একটিমাত্র বিপ্লবের তত্ত্বের' ওকালতি করছে এবং কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করছে, কিন্তু আসলে তাদের মতলব ঐ শতকরা ৪৯ ভাগ অথবা ৫১ ভাগ শেয়ারের সুযোগ লাভ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আহা! তারা কতোই না মাথা খাটিয়েছে! 'একটিমাত্র বিপ্লবের তত্ত্ব' হল সোজাসুজি আদৌ কোন বিপ্লব না করার তত্ত্ব। এটাই হল বিষয়টির মর্মকথা।

কিন্তু এমন কিছু লোকও আছে, যাদের আপাতঃদৃষ্টিতে কোন খারাপ উদ্দেশ্য না থাকলেও তারা 'একটিমাত্র বিপ্লবের তত্ত্বে' মুগ্ধ হয়ে রয়েছে এবং তথাকথিত 'একটিমাত্র আঘাতেই রাজনৈতিক বিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লব উভয়কেই সমাপ্ত করার' নিছক আত্মগত ধ্যানধারণায় বিভোর হয়ে রয়েছে; তারা বোঝে না যে, বিপ্লব বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত এবং আমাদের পক্ষে শুধু এক বিপ্লব থেকে আর এক বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়াই সম্ভব, 'একটিমাত্র আঘাতেই উভয়কেই সমাপ্ত করা' অসম্ভব। তাদের ঐ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিপ্লবের বিভিন্ন ধাপগুলো গুলিয়ে ফেলে এবং বর্তমান কর্তব্য সাধনের কর্ম-প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে: তাই এটাও অত্যন্ত ক্ষতিকর। দুটি বৈপ্লবিক পর্যায়ের মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির জন্য পূর্বশর্ত প্রস্তুত করে, একটি পর্যায়ের ঠিক পেছনেই দ্বিতীয় পর্যায়টি আসবে এবং দুয়ের মধ্যে কোন বুর্জোয়া-একনায়কত্বের পর্যায় থাকতে পারে না—এই বক্তব্যই সঠিক; এটা হল বিপ্লবের বিকাশ সম্বন্ধে মার্কসবাদী তত্ত্বসম্মত। অন্যদিকে যদি বলা হয়: গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নিজস্ব কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য নেই এবং নিজের কোন নির্দিষ্ট যুগ নেই, আর যে কর্তব্য শুধু অন্য যুগে সমাপ্ত হতে পারে—যেমন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য—সেই রকম কর্তব্যকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্যেরই অন্তর্ভুক্ত করে সমাপ্ত করা যায়—তবে এটা হল তাদের 'একটিমাত্র আঘাতেই উভয়কেই সমাপ্ত করার তত্ত্ব; এটা কল্পনাবিলাস মাত্র। প্রকৃত বিপ্লবীরা এই মতবাদ বর্জন করেছে।

৯। গোঁড়া ব্যক্তিদের যুক্তি খণ্ডন

বুর্জোয়া গোঁড়া ব্যক্তিরা এগিয়ে এসে বলে: 'বেশ, তোমরা কমিউনিস্টরা যেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা পরবর্তী পর্যায়ের জন্য স্থগিত রেখেছ এবং ঘোষণা করেছ "চীনের বর্তমানে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে তিন-গণনীতি, আর আমাদের পার্টি তা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত"[১১], কাজেই তোমরা তোমাদের কমিউনিজম আপাততঃ শিকেয় তুলে রাখ।' 'এক মতবাদ' তত্ত্বের রূপে এই যুক্তির অবতারণা করে সম্প্রতি তারা পাগলের মতো চিৎকার শুরু করেছে। এই চিৎকার হল প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া স্বৈরতন্ত্রের প্রতি গোঁড়া ব্যক্তিদের সমর্থন। আমরা অবশ্য ভদ্রতার খাতিরে এটাকে কাণ্ডজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব বলে অভিহিত করতে পারি।

কমিউনিজম হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর মতাদর্শের একটা পূর্ণাংগ ব্যবস্থা এবং একই সময়ে তা একটা নতুন সমাজব্যবস্থাও বটে। অন্য যে-কোন মতাদর্শগত ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা থেকে এটা ভিন্ন; মানব ইতিহাসে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সম্পূর্ণাংগ, প্রগতিশীল, বিপ্লবী ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা। সামন্ততন্ত্রের মতাদর্শগত ব্যবস্থা এ সমাজব্যবস্থা ইতিহাসের যাদুঘরের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদের মতাদর্শগত ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থাও পৃথিবীর এক অংশে (সোভিয়েত ইউনিয়নে) যাদুঘরে স্থান নিয়েছে; অন্যান্য দেশেও এর অবস্থা হয়ে উঠেছে 'পশ্চিম পাহাড়ের ওপারে অস্তগামী সূর্যের মতো, দ্রুত নিমজ্জমান মুমূর্ষু ব্যক্তির মতো', এবং শীঘ্রই যাদুঘরে এর স্থান হবে। কেবলমাত্র কমিউনিস্ট মতাদর্শের ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থাই যৌবন ও প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ; তা হিমানী-সম্প্রপাতের মতো প্রচণ্ডবেগে ও প্রচণ্ড বজ্রের শক্তিতে সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলছে। চীনদেশে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম প্রবর্তন করার ফলে জনগণের জন্য নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে এবং চীন বিপ্লবের রূপও বদলে গেছে। কমিউনিজমের পথনির্দেশ ছাড়া চীনা গণতান্ত্রিক বিপ্লব নিশ্চয়ই সফল হতে পারে না, বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায় তো আরও দূরের কথা। এইজন্যই চীনের বুর্জোয়া গোঁড়া ব্যক্তিরা এত হৈ-চৈ করে কমিউনিজমকে 'শিকেয় তুলে রাখার' দাবি জানাচ্ছে। আসলে, কমিউনিজমকে 'শিকেয় তুলে রাখা' চলবে না, কারণ একবার যদি তা শিকেয় ওঠে, তবে চীন ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াবে। সারা পৃথিবী আজ তার মুক্তির জন্য কমিউনিজমের ওপর নির্ভর করছে; চীনে তার কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না।

প্রত্যেকেই জানে, সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির একটি বর্তমানের ও একটি ভবিষ্যতের কর্মসূচী ও বা একটি ন্যূনতম কর্মসূচী ও একটি ব্যাপকতম কর্মসূচী আছে। বর্তমানে নয়া গণতন্ত্র, ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্র—এই দুটি এক সমগ্র অবয়বের অঙ্গ; সমগ্রভাবে কমিউনিস্ট মতাদর্শগত ব্যবস্থার দ্বারা এরা পরিচালিত। কমিউনিস্ট পার্টির ন্যূনতম কর্মসূচীর সাথে তিন-গণনীতির রাজনৈতিক নীতি যখন মূলতঃ মিলে যাচ্ছে, তখন কমিউনিজমকে 'শিকেয় তুলে রাখার' জন্য চিৎকার করাটা কি চরম উদ্ভট ব্যাপার নয়? কমিউনিস্টদের দিক থেকে, যেহেতু তিন-গণনীতির রাজনৈতিক নীতির সংগে কমিউনিস্ট পার্টির ন্যূনতম কর্মসূচীর মূলতঃ মিল আছে, সেইহেতুই 'তিন-গণনীতি হল জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ভিত্তি'—এ কথা স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব, এবং এও আমাদের পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব যে, 'চীনের বর্তমানে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে তিন-গণনীতি, আর আমাদের পার্টি তা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত'; তা না হলে ঐ ধরনের সম্ভাবনার কথা উঠত না। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে এই হচ্ছে কমিউনিজম ও তিন-গণনীতির মধ্যেকার যুক্তফ্রন্ট। এই ধরনের যুক্তফ্রন্টের কথা বলতে গিয়েই ডঃ সান ইয়াৎ-সেন বলেছিলেন, 'কমিউনিজম তিন-গণনীতির ভাল বন্ধু'।[১২] কমিউনিজমকে অস্বীকার করার অর্থ কার্যতঃ যুক্তফ্রন্টকেই অস্বীকার করা। গোঁড়া ব্যক্তিরা তাদের একদলের মতবাদ কার্যে পরিণত করতে এবং যুক্তফ্রন্টকে অস্বীকার করতে চায় বলেই তারা কমিউনিজমকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে ওই উদ্ভট যুক্তিগুলো আবিষ্কার করেছে।

'এক মতবাদের' তত্ত্বও ধোপে টেঁকে না। যতদিন বিভিন্ন শ্রেণী থাকবে, ততদিন যতগুলো শ্রেণী ততগুলো মতবাদও থাকবে; এমনকি একই শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন উপদলেরও নিজ নিজ মতবাদ থাকতে পারে। বর্তমানে সামন্ত-শ্রেণীর সামন্তবাদ, বুর্জোয়াশ্রেণীর পুঁজিবাদ, বৌদ্ধদের বৌদ্ধমতবাদ, খ্রীষ্টানদের খ্রীষ্টীয় মতবাদ, কৃষকদের বহু-দেবতাবাদ আছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কিছু কিছু লোক কামালবাদ, ফ্যাসীবাদ, প্রাণবাদ[১৩], 'শ্রম অনুযায়ী বণ্টনের মতবাদ'[১৪] প্রভৃতি প্রচার করছে। সর্বহারাশ্রেণীর কেন তবে কমিউনিজম-এর মতবাদ থাকতে পারবে না? আর যখন অসংখ্য মতবাদের অস্তিত্ব আছে, তখন শুধু কমিউনিজমকে দেখেই হৈ-চৈ করে তাকে 'শিকেয় তুলে রাখার' দাবি তোলা কেন? সোজা কথা, কমিউনিজমকে 'শিকেয় তুলে

রাখা' চলবে না; বরং আসুন আমরা এক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই। এই প্রতিযোগিতায় যদি কমিউনিজম পরাজিত হয়, তাহলে সেই পরাজয়কে আমরা কমিউনিস্টরা ভদ্রলোকের মতো স্বীকার করে নেব। তা যদি না হয়, তাহলে বরং তোমরাই তোমাদের গণতন্ত্রবিরোধী 'এক মতবাদের' তত্ত্বটিকে যথাসম্ভব চটপট 'শিকেয় তুলে রাখ'।

যাতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে এবং যাতে গোঁড়া ব্যক্তিদের চোখ খুলতে পারে, তাই তিন-গণনীতির সংগে কমিউনিজমের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

তিন-গণনীতির সঙ্গে কমিউনিজমের তুলনা করলে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি দেখা যায়।

প্রথমতঃ, সাদৃশ্যের কথাই ধরা যাক। চীনদেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে উভয় মতবাদের মূল রাজনৈতিক কর্মসূচীতে মিল আছে। ১৯২৪ সালে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক নতুন করে ব্যাখ্যা করা তিন-গণনীতির অন্তর্ভুক্ত বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্রের নীতি এবং গণকল্যাণের নীতি—এই তিনটি রাজনৈতিক নীতি চীনদেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে কমিউনিস্টদের গৃহীত রাজনৈতিক কর্মসূচীর সংগে মূলতঃ অভিন্ন। এই সাদৃশ্যের ফলে এবং তিন-গণনীতিকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলেই দুটি মতবাদের এবং দুটী পার্টির যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। এই দিকটি উপেক্ষা করা ভুল।

দ্বিতীয়তঃ, বৈসাদৃশ্যের কথা আলোচনা করা যাক। (১) গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে দুটি কর্মসূচীর মধ্যে আংশিক পার্থক্য বিদ্যমান। কমিউনিস্টদের পূর্ণাংগ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জনগণের অধিকারের সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন, দৈনিক ৮ ঘণ্টা কার্যকাল এবং পূর্ণাংগ কৃষি-বিপ্লব; অথচ ঐগুলি তিন-গণনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি ঐগুলিকে তিন-গণনীতির অন্তর্ভুক্ত করা না হয় এবং কার্যে পরিণত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা না হয়, তাহলে বলতে হবে, এই দুটি গণতান্ত্রিক কর্মসূচী মূলতঃ এক হলেও সম্পূর্ণ এক নয়। (২) আর একটি পার্থক্য হচ্ছে এই যে, একটার ভেতরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায় আছে, অপরটার মধ্যে তা নেই। কমিউনিজমে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায় ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা পর্যায় রয়েছে; অতএব ন্যূনতম কর্মসূচী ছাড়াও তার একটা ব্যাপকতম কর্মসূচী—সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কর্মসূচী রয়েছে। তিন-গণনীতির মধ্যে কেবল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের

পর্যায়ের কথাই আছে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ের কথা নেই ; তাই এর ভেতর ন্যূনতম কর্মসূচীই কেবল আছে, ব্যাপকতম কর্মসূচী নেই, অর্থাৎ এর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কর্মসূচী নেই। (৩) বিশ্বদৃষ্টি সম্পর্কে পার্থক্য। কমিউনিস্ট বিশ্বদৃষ্টি হচ্ছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ; তিন-গণনীতির বিশ্বদৃষ্টি হচ্ছে গণকল্যাণের মাপকাঠিতে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করা ; আসলে এটা হচ্ছে দ্বৈতবাদ বা ভাববাদ। দুটি বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পর-বিরোধী। (৪) বিপ্লবী সম্পূর্ণাঙ্গতা সম্পর্কে পার্থক্য। কমিউনিস্টদের তত্ত্ব ও অনুশীলন অভিন্ন অর্থাৎ তাদের বিপ্লবী সম্পূর্ণাঙ্গতা আছে। অপরপক্ষে তিন-গণনীতির অনুসারীদের মধ্যে যারা বিপ্লব এবং সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত তারা ছাড়া অন্যদের তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে সঙ্গতি নেই, তাদের কথা এবং কাজ পরস্পর-বিরোধী, অর্থাৎ তাদের বিপ্লবী সম্পূর্ণাঙ্গতার অভাব আছে। উপরোল্লিখিত সবগুলি হচ্ছে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য। এ পার্থক্যগুলিই তিন-গণনীতির অনুসারীদের থেকে কমিউনিস্টদেরকে আলাদা করেছে। এ পার্থক্যগুলো উপেক্ষা করে শুধু তাদের ঐক্যটুকুই দেখা এবং বিরোধটুকু না দেখা নিঃসন্দেহে নিতান্তই ভুল।

এটুকু বুঝলে আমরা বুঝতে পারি, বুর্জোয়া গোঁড়া ব্যক্তিরা কেন কমিউনিজমকে 'শিকেয় তুলে রাখার' দাবি জানাচ্ছে। এ দাবির অর্থ কী? এর অর্থ যদি বুর্জোয়াদের স্বৈরতন্ত্র না হয়, তবে বুঝতে হবে এর আদৌ কোন অর্থ নেই।

১০। পুরানো ও নতুন তিন-গণনীতি

ঐতিহাসিক পরিবর্তন সম্বন্ধে বুর্জোয়া গোঁড়া ব্যক্তিদের কোন ধারণাই নেই। এ ব্যাপারে তাদের জ্ঞান প্রায় শূন্যের কোঠায়। তারা না জানে তিন-গণনীতি এবং কমিউনিজমের মধ্যেকার পার্থক্য, না জানে পুরানো ও নতুন তিন-গণনীতির মধ্যেকার পার্থক্য।

আমরা কমিউনিস্টরা স্বীকার করি যে, 'তিন-গণনীতি হল জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের রাজনৈতিক ভিত্তি'; আমারা স্বীকার করি যে, 'চীনের বর্তমানে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে তিন-গণনীতি, আর আমাদের পার্টি তা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত'; আমরা স্বীকার করি যে, কমিউনিজমের ন্যূনতম কর্মসূচী ও তিন-গণনীতির রাজনৈতিক নীতি

মূলতঃ এক। কিন্তু আমরা কমিউনিস্টরা যাকে স্বীকার করি সে কোন্ তিন-গণনীতি? সেটা অন্য ধরনের কোন তিন-গণনীতি নয়, বরং তা হল সেই তিন-গণনীতি, যাকে 'কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারে' ডঃ সান ইয়াৎ-সেন পুনরায় ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমি আশা করি যে, গোঁড়া ভদ্রলোকরা তাঁদের 'কমিউনিজমকে গণ্ডিবদ্ধ করা', 'কমিউনিজমকে ক্ষয় করা' ও 'কমিউনিজমের বিরোধিতা করার' যে কাজে আনন্দের সংগে ডুবে আছেন, তার মধ্য থেকে কিছুটা সময় ব্যয় করে এই ইস্তাহারটি একবার পড়ে দেখবেন। ইস্তাহারে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন বলেছেন, 'এই হচ্ছে কুওমিনতাঙের তিন-গণনীতির আসল ব্যাখ্যা'। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, শুধু এটাই হচ্ছে আসল তিন-গণনীতি, অন্যসব তিন-গণনীতি ভুয়া। আর 'কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারে' তিন-গণনীতির ঐ ব্যাখ্যাই হচ্ছে একমাত্র 'আসল ব্যাখ্যা', অন্য সব ব্যাখ্যাই হচ্ছে ভুয়া। বোধহয় এটা কমিউনিস্টদের রটানো একটা গুজব নয়, কারণ কুওমিনতাঙের বহু সভ্য ও আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেই এই ঘোষণা গৃহীত হতে দেখেছিলাম।

ওই ইস্তাহার তিন-গণনীতির ইতিহাসকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। এর আগে তিন-গণনীতি ছিল পুরানো ধরনের অন্তর্গত তিন-গণনীতি, আধা-ঔপনিবেশিক দেশের পুরাতন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তিন-গণনীতি, পুরানো গণতন্ত্রের তিন-গণনীতি, পুরানো তিন-গণনীতি।

তারপর তিন-গণনীতি হল নতুন ধরনের অন্তর্গত তিন-গণনীতি, আধা-ঔপনিবেশিক দেশের নয়া বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তিন-গণনীতি, নয়া গণতন্ত্রের তিন-গণনীতি, নতুন তিন-গণনীতি। শুধু এই ধরনের তিন-গণনীতিই হচ্ছে নতুন যুগের বিপ্লবী তিন-গণনীতি।

নতুন যুগের এই বিপ্লবী তিন-গণনীতি, এই নতুন তিন গণনীতি বা প্রকৃত তিন-গণনীতি হচ্ছে সেই তিন-গণনীতি, যার মধ্যে রয়েছে রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সাহায্য করার তিনটি মহান কর্মনীতি। এই তিনটি মহান কর্মনীতি না থাকলে, অথবা এর কোন একটি না থাকলে, এই নতুন যুগে সেই তিন-গণনীতি হবে ভুয়া অথবা অসম্পূর্ণ।

প্রথমতঃ, বিপ্লবী তিন-গণনীতি, নতুন তিন-গণনীতি, বা প্রকৃত তিন-গণনীতির মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর নীতি। কারণ

বর্তমান অবস্থায় এটা সুস্পষ্ট যে, রাশিয়ার সঙ্গে অথবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীর নীতি বাদ দিলে তার অর্থ হবে অপরিহার্যরূপেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মৈত্রীর নীতি গ্রহণ করা, অপরিহার্যরূপেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। ১৯২৭ সালের পরে ঠিক এই অবস্থাটাই কি আপনারা দেখেননি? সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সংগ্রাম যখনই তীব্রতর হয়ে উঠবে, তখনই চীনকে তাদের যে-কোন এক পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে। ঘটনাবলীর মোড় অনিবার্যভাবে সেই দিকেই নিয়েছে। কোন এক পক্ষের সমর্থনে চলে যাওয়াটা পরিহার করা কি সম্ভব? না—সম্ভব নয়; সেটা একটা মরীচিকা। গোটা পৃথিবীর প্রতিটি দেশকেই এই দুই ফ্রন্টের একটি না একটির অন্তর্ভুক্ত হতেই হবে, এবং 'নিরপেক্ষতা' শুধু একটা ভাওতাবাজী শব্দে পর্যবসিত হবে। বিশেষ করে, চীন আজ এমন এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংগে সংগ্রামে লিপ্ত, যা চীনদেশের গভীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য ছাড়া চীনের চূড়ান্ত জয়লাভ কল্পনাও করা যায় না। সাম্রাজ্যবাদের সংগে মৈত্রীর খাতিরে যদি রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীকে বিসর্জন দেওয়া হয়, তাহলে তিন-গণনীতি থেকে 'বিপ্লবী' কথাটিকে বাদ দিতে হবে, তখন তা হয়ে পড়বে প্রতিক্রিয়াশীল। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে 'নিরপেক্ষ' তিন-গণনীতি বলে কিছু নেই, আছে কেবল বিপ্লবী তিন-গণনীতি অথবা প্রতিবিপ্লবী তিন-গণনীতি। এয়াং চিং-ওয়েই একসময় বলেছিল 'উভয় দিক থেকে আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর'[১৫], তেমনটা করা এবং এই সংগ্রামের উপযোগী এক তিন-গণনীতি গ্রহণ করা কি খুব সাহসের কাজ হয় না? কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বয়ং আবিষ্কারক ওয়াং চিং-ওয়েইও ইতিমধ্যেই ঐ তিন-গণনীতি পরিত্যাগ করে (অথবা 'শিকেয় তুলে রেখে') সাম্রাজ্যবাদের সংগে মৈত্রীর তিন-গণনীতি গ্রহণ করেছে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান, তাহলে যে ওয়াং চিং-ওয়েই নিজে প্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদের সংগে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তার বিপরীতে গিয়ে আমরা যখন পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের একটি গ্রুপের সংগে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পূর্বদিকে অভিযান আর আক্রমণ চালিয়ে যাব, তখন সেটা কি একটা অভিনব খাঁটি বৈপ্লবিক কাজ হবে না? কিন্তু তোমরা চাও বা না চাও, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিজমের বিরোধিতা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; যদি

তোমরা তাদের সংগে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হও, তাহলে তারা তোমাদেরকে উত্তরদিকে অভিযান ও আক্রমণ চালাতে বলবে, এবং এইভাবে তোমাদের বিপ্লব শেষ পর্যন্ত বিফল হবে। এইসব থেকে এটাই বেরিয়ে আসছে যে, বিপ্লবী, নতুন বা প্রকৃত তিন-গণনীতির মধ্যে রাশিয়ার সাথে মৈত্রীর নীতি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে ; তার মধ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সংগে মৈত্রীর নীতি কোনমতেই থাকতে পারবে না।

দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লবী, নতুন বা প্রকৃত তিন-গণনীতির মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতার নীতিকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যদি তুমি কমিউনিস্ট পার্টির সংগে সহযোগিতা না কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি তার বিরোধিতা করবে। কমিউনিজম-বিরোধিতাই হল জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের নীতি ; তুমি যদি কমিউনিজমের বিরোধিতা করতে চাও, ঠিক আছে, তাহলে তারা তোমাকে আমন্ত্রণ জানাবে তাদের কমিউনিস্ট-বিরোধী জোটে যোগদান করতে। কিন্তু তা কি দেশদ্রোহিতার সন্দেহ সৃষ্টি করবে না? তুমি হয়ত বলবে, 'আমি তো জাপানকে অনুসরণ করছি না, করছি অন্য কোন দেশকে'। এটাও একটা হাস্যকর কথা। তুমি যাকেই অনুসরণ কর না কেন, যতক্ষণ তুমি কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী, ততক্ষণ তুমি দেশদ্রোহী, কারণ তখন তুমি আর জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে পার না। তুমি হয়ত বলবে, 'আমি স্বাধীনভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করছি।' এ হল স্বপ্ন দেখা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ওপর নির্ভর না করে এত বড় প্রতি-বিপ্লবী কাজ করা উপনিবেশের বা আধা-উপনিবেশের 'বীরদের' পক্ষে কি করে সম্ভব? দুনিয়ার প্রায় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমাবেশ করে দশটা বছর ধরে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই চালানো হয়েছিল ; ফল হয়েছে ব্যর্থতা। আজ তুমি হঠাৎ কেমন করে 'স্বাধীনভাবে' তার বিরুদ্ধে লড়তে সমর্থ হবে? শোনা যায় সীমান্ত এলাকার বাইরে কেউ কেউ এমন কথা বলে বেড়ায় : 'কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করা ভাল কাজ, কিন্তু তোমরা কখনই তাতে সাফল্য অর্জন করতে পারবে না।' এই কথা যদি কেবলমাত্র জনশ্রুতি না হয়, তাহলে তার অর্ধেক অংশই শুধু ভুল। কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতার মধ্যে 'ভাল' কি থাকতে পারে? কিন্তু কথাটার অপর অর্ধেকটা ঠিক, কারণ সত্যি কথা বলতে গেলে 'কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করে' 'তোমরা কখনই সাফল্য অর্জন করতে পারবে না'। তার মূল কারণ কমিউনিস্টদের মধ্যে নিহিত নেই,

আছে জনসাধারণের মধ্যে, যে জনসাধারণ কমিউনিস্ট পার্টিকে পছন্দ করে, তার 'বিরোধিতা' করাটা তারা পছন্দ করে না। এক জাতীয় শত্রু যখন দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছে তখন যদি তুমি কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই কর, তাহলে জনগণ তোমার চামড়া খুলে নেবে ; তোমাকে তারা দয়া দেখাবে না। এটা নিশ্চিত। যে-ই কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করতে উদ্‌গ্রীব, তাকে অবশ্যই ধূলিসাৎ হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তুমি যদি নিজেকে ধুলোয় পরিণত করার জন্য উন্মত্ত না হও, তাহলে এই বিরোধিতা তোমার পক্ষে বন্ধ করাই ভাল, সকল কমিউনিস্ট-বিরোধী 'বীরদের' প্রতি এই হচ্ছে আমাদের আন্তরিক উপদেশ। এ থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আজকের তিন-গণনীতিকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করতেই হবে, অন্যথায় তিন-গণনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এটা হল তিন-গণনীতির জীবনমরণের সমস্যা। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করলে তা বাঁচবে, বিরোধিতা করলে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কে এ কথাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পারে ?

তৃতীয়তঃ, বিপ্লবী, নতুন বা প্রকৃত তিন-গণনীতিতে কৃষক এবং শ্রমিকদের সাহায্য করার নীতি অবশ্যই থাকতে হবে। এই নীতি ত্যাগ করা, অকপটভাবে এবং সর্বান্তঃকরণে কৃষক ও শ্রমিককে সাহায্য করার নীতি বর্জন করা অথবা ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রের অন্তর্ভুক্ত 'জনসাধারণকে জাগাবার' নির্দেশটি পালন না করার অর্থই হল বিপ্লবের পরাজয়ের এবং নিজেরও পরাজয়ের পথ প্রস্তুত করা। স্তালিন বলেছেন যে, 'জাতীয় সমস্যা আসলে হল কৃষক সমস্যা।'[১৬] অর্থাৎ চীনের বিপ্লব আসলে একটি কৃষক-বিপ্লব, আর বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ আসলে কৃষকদেরই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ। নয়া গণতন্ত্রের রাজনীতি আসলে হচ্ছে কৃষককে ক্ষমতাদান করা। নতুন এবং প্রকৃত তিন গণনীতি আসলে কৃষকের বিপ্লবী নীতি। গণ-সংস্কৃতির অর্থ আসলে কৃষকদের সংস্কৃতির স্তর উন্নত করা। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ আসলে কৃষকদেরই যুদ্ধ। এখন 'পাহাড়ে যাওয়ার নীতি'[১৭] অনুসরণ করার সময়, পাহাড়ের ওপরে আমরা সভা করি, কাজ করি, ক্লাশে যোগদান করি, সংবাদপত্র প্রকাশ করি, বই লিখি, নাট্যানুষ্ঠান করি—সমস্তই করি আসলে কৃষকের জন্যই। আর অবশেষে যা দিয়ে আমরা জাপানকে রুখি, যা দিয়ে আমরা প্রাণধারণ করি—সবই আসলে কৃষকদের দেওয়া। আমরা এখানে 'আসলে' বলতে 'মূলতঃ' বোঝাচ্ছি, এতে জনসাধারণের অন্যান্য

অংশকে উপেক্ষা করা হচ্ছে না। স্তালিন নিজে এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রও এ কথা জানে যে, চীনের লোকসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগই কৃষক। সুতরাং কৃষক সমস্যাই চীন বিপ্লবের মূলগত সমস্যা এবং কৃষকদের শক্তিই চীন বিপ্লবের প্রধান শক্তি। চীনের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে কৃষকদের পরেই দ্বিতীয় স্থান শ্রমিকদের। চীনে আছে কয়েক নিযুত শিল্প-শ্রমিক, আর আছে কয়েক কোটি হস্তশিল্প-শ্রমিক ও কৃষি-শ্রমিক। বিভিন্ন ধরনের শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ছাড়া চীন বাঁচতে পারে না, কারণ অর্থনীতির শিল্প বিভাগে এরাই উৎপাদনকারী। আধুনিক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না, কারণ এরাই হচ্ছে চীন বিপ্লবের নেতা এবং সবচেয়ে বিপ্লবী। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী, নতুন বা প্রকৃত তিন-গণনীতিতে অবশ্যই কৃষক এবং শ্রমিকদের সাহায্য করার নীতি থাকতে হবে। যদি এমন কোন তিন-গণনীতি থাকে যার মধ্যে এই নীতি নেই, যা অকপটভাবে ও সর্বান্তঃকরণে কৃষক এবং শ্রমিকদের সাহায্য করতে চায় না এবং জনসাধারণকে জাগাবার' কাজ করতে চায় না,—তবে সেই তিন-গণনীতির ধ্বংস অনিবার্য।

কাজেই এটা স্পষ্ট যে, যে তিন-গণনীতে রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সাহায্য করা—এই তিনটি মহান কর্মনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন, তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। তিন-গণনীতির সকল বিবেকসম্পন্ন অনুগামীকে এ কথা গভীরভাবে ভেবে দেখতেই হবে।

তিনটি মহান কর্মনীতি সমন্বিত এই তিন-গণনীতি, অন্য কথায়, বিপ্লবী, নতুন এবং প্রকৃত তিন-গণনীতি হল নয়া গণতন্ত্রের তিন-গণনীতি, এটা পুরানো তিন-গণনীতির বিকাশের ফল; ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের এ এক মহান অবদান, এবং চীন বিপ্লব যে যুগে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের অংশ বলে গণ্য হয়েছে সেই যুগই একে জন্ম দিয়েছে। একমাত্র এই ধরনের তিন-গণনীতিকেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টি 'আজকের চীনের প্রয়োজন' বলে স্বীকার করে, এবং 'তা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত' এই কথা ঘোষণা করেছে। শুধু এই ধরনের তিন-গণনীতিই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ের জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচীর সংগে, অর্থাৎ তার ন্যূনতম কর্মসূচীর সংগে, মূলগতভাবে খাপ খায়।

পুরানো তিন-গণনীতি ছিল চীন বিপ্লবের পুরানো যুগের সৃষ্টি। তখন

রাশিয়া ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং স্বাভাবিকভাবেই রাশিয়ার সাথে মৈত্রীর নীতি গ্রহণ করার কথা উঠত না। চীনে তখনো কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না এবং স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করার কথাও উঠত না। তাছাড়া শ্রমিক ও কৃষক-আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব তখনো সম্পূর্ণভাবে প্রকট হয়ে উঠেনি, তাই লোকেরা ঐ আন্দোলনকে বিবেচনার বিষয় বলেই মনে করত না; এবং স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিক ও কৃষকদের সাথে মৈত্রীর নীতি গ্রহণের কথা উঠত না। অতএব, ১৯২৪ সালে কুওমিনতাঙের পুনর্গঠনের আগে যে তিন-গণনীতি, তা ছিল পুরানো ধরনের তিন-গণনীতি; তা আজ অচল হয়ে গেছে। যদি তাকে নতুন তিন-গণনীতিতে বিকশিত করা না যায়, তবে কুওমিনতাঙ আর অগ্রসর হতে পারবে না। বিচক্ষণ ডঃ সান ইয়াৎ-সেন তা বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যলাভ করেছিলেন এবং তিন-গণনীতির এমনভাবে পুনর্ব্যাখ্যা করেছিলেন, যাতে করে তার নতুন আরোপিত বৈশিষ্ট্য সময়ের সংগে খাপ খায়। এর ফলে তিন-গণনীতি এবং কমিউনিজমের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট স্থাপিত হয়েছিল, এই প্রথম কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা স্থাপিত হয়েছিল সমগ্র দেশের জনগণের সহানুভূতি অর্জিত হয়েছিল এবং ১৯২৪-১৯২৭ সালের বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল।

পুরানো তিন-গণনীতি পুরানো যুগে বিপ্লবী ছিল এবং ঐ যুগের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলো তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু নতুন যুগে যখন নতুন তিন-গণনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন যদি আবার সেই পুরানো মতবাদ পেশ করা হয়, অথবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরও যদি রাশিয়ার সাথে মৈত্রীর বিরোধিতা করা হয়, অথবা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার পরও যদি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতার বিরোধিতা করা হয়, অথবা শ্রমিক-কৃষকদের জাগরণ এবং তাদের রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শিত হওয়ার পরও যদি কৃষক-শ্রমিকদের সাহায্য করার নীতির বিরোধিতা করা হয়, তা হল প্রতিক্রিয়াশীল, এবং তাতে যুগ সম্পর্কে অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। ১৯২৭ সালের পরবর্তীকালের প্রতিক্রিয়ার যুগটা ছিল এই ধরনের অজ্ঞতারই পরিণতি। প্রবাদ আছে—'যারা যুগের লক্ষণ অনুধাবন করতে পারে তাঁরাই মহান ব্যক্তি।' আশা করি তিন-গণনীতির অনুগামীরা আজ এ কথাটি স্মরণে রাখবেন।

তিন-গণনীতি যদি পুরানো ধরনের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে কমিউনিস্টদের ন্যূনতম কর্মসূচীর সংগে যৌলিক বিষয়ে তার কোন মিল থাকত না, কারণ তখন সেগুলি অতীতের অন্তর্ভুক্ত হতো এবং অচল হয়ে পড়ত। এখন যদি কোন তিন-গণনীতি থাকে, যা রাশিয়ার বিরোধী, কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী, কৃষক-শ্রমিকের বিরোধী, তবে তা প্রতিক্রিয়াশীল; কমিউনিস্টদের ন্যূনতম কর্মসূচীর সংগে তার মিল তো নেই-ই, উপরন্তু তা হল কমিউনিজমের শত্রু; তাই সে-সম্পর্কে বলার কিছুই নেই। এ কথাটাও তিন-গণনীতির অনুগামীদের গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা উচিত।

যাই হোক, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধিতার কাজ মূলগতভাবে সম্পন্ন হওয়ার আগে যাদের বিবেক আছে তারা কেউই নতুন তিন-গণনীতিকে পরিত্যাগ করবে না। কেবল ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের মতো লোকগুলোই তা পরিত্যাগ করে। রাশিয়া-বিরোধী, কমিউনিস্ট পার্টি-বিরোধী, কৃষক-শ্রমিক-বিরোধী ভুয়া তিন-গণনীতিকে তারা যত উৎসাহ নিয়েই চালাতে থাকুক না কেন, যাদের বিবেক বা ন্যায়বুদ্ধি আছে তারাই ডঃ সান ইয়াৎ সেনের প্রকৃত তিন-গণনীতিকে সমর্থন করতে থাকবে। প্রকৃত তিন গণনীতির বহু অনুগামী ১৯২৭ সালের প্রতিক্রিয়ার পরও চীন বিপ্লবের সাফল্যের জন্য অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়ে ছিলেন। আজ যখন এক জাতীয় শত্রু দেশের অভ্যন্তরে গভীরভাবে ঢুকে পড়ছে, তখন এই সত্যিকার অনুগামীরা সংখ্যা বেড়ে নিশ্চয়ই লক্ষ লক্ষ হবে। তিন-গণনীতির অনুগামীদের সাথে আমরা কমিউনিস্টরা অবিচলিতভাবে দীর্ঘকাল ধরে সহযোগিতা করব। দেশদ্রোহী ও একেবারেই অনুশোচনাবিহীন গোঁড়া কমিউনিস্ট-বিরোধী ব্যক্তিদের পরিত্যাগ করব, কিন্তু কোন বন্ধুকেই আমরা কোনমতেই পরিত্যাগ করব না।

১১। নয়া গণতন্ত্রের সংস্কৃতি

ওপরে আমরা নতুন যুগে চীনা রাজনীতির ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ও নয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রশ্ন ব্যাখ্যা করেছি। এখন আমরা সংস্কৃতিক প্রশ্নে যেতে পারি।

একটা নির্দিষ্ট সংস্কৃতি হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতির ভাবাদর্শগত প্রতিফলন। চীনে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি রয়েছে, তা হচ্ছে চীনের রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শাসন বা আংশিক শাসনের

প্রতিফলন। সাম্রাজ্যবাদীরা চীনে প্রত্যক্ষভাবে তাদের দ্বারা পরিচালিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মারফৎ এ ধরনের সংস্কৃতি প্রচার করে; তা ছাড়া কিছু কিছু নির্লজ্জ চীনা লোকও এই সংস্কৃতি প্রচার করে। দাসসুলভ মতাদর্শসম্পন্ন সমস্ত সংস্কৃতিই এই শ্রেণীতে পড়ে। চীনে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিও আছে; দেশের আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতি ও অর্থনীতি এই সংস্কৃতির মধ্যে প্রতিফলিত। যারা কনফুসিয়াসের পুজো, শাস্ত্রচর্চা, পুরানো নীতিবিদ্যা ও পুরানো ভাবধারার সপক্ষে ওকালতি করে এবং নতুন সংস্কৃতি ও নতুন ভাবধারার বিরোধিতা করে—তারাই এই ধরনের সংস্কৃতির প্রতিনিধি। সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি হল অন্তরঙ্গ দুই ভাই; চীনের নতুন সংস্কৃতির বিরোধিতা করার জন্য তারা একটি প্রতিক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক মৈত্রীজোট স্থাপন করেছে। এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী শ্রেণীর সেবায় নিয়োজিত, সুতরাং তাকে উচ্ছেদ করতেই হবে। তার উচ্ছেদ করা না হলে কোন রকমের নয়া সংস্কৃতি গড়ে তোলা যাবে না। ধ্বংস ছাড়া গঠন হয় না, না আটকালে প্রবাহ হয় না, এবং স্থিতি ছাড়া গতির অস্তিত্ব নেই; এ দুয়ের লড়াই জীবন-মরণের লড়াই।

নতুন সংস্কৃতি হচ্ছে নতুন রাজনীতি ও নতুন অর্থনীতির ভাবাদর্শগত প্রতিফলন। নতুন রাজনীতি ও নতুন অর্থনীতির সেবা করাই এর কাজ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে, চীনে পুঁজিবাদী অর্থনীতির উদ্ভবের পর ক্রমে ক্রমে চীনা সমাজের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। তা আর সম্পূর্ণরূপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ নয়; তা পরিণত হয়েছে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, যদিও সে সমাজে এখনো সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিরই প্রাধান্য। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সংগে তুলনা করলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি এক নতুন অর্থনীতি। এই পুঁজিবাদী নতুন অর্থনীতির সংগে আবির্ভূত হয়েছে ও বেড়ে উঠেছে নতুন রাজনৈতিক শক্তি—বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া ও সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তি। নতুন সংস্কৃতি এই নতুন অর্থনৈতিক ও নতুন রাজনৈতিক শক্তিরই মতাদর্শগত প্রতিফলন; এদের সেবা করাই নতুন সংস্কৃতির কাজ। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ছাড়া, বুর্জোয়াশ্রেণী, পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীর অস্তিত্ব ছাড়া, এই শ্রেণীগুলোর রাজনৈতিক শক্তি ছাড়া, তথাকথিত নতুন মতাদর্শ বা নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারত না।

এই সমস্ত নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শক্তিই চীনের

বিপ্লবী শক্তি, এগুলি পুরানো রাজনীতি,পুরানো অর্থনীতি ও পুরানো সংস্কৃতির বিরোধী। ঐসব পুরানো জিনিসের দুটি অংশ, একটি চীনের নিজস্ব আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি এবং অপরটি সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ; এই দুয়ের মৈত্রীজোটের মধ্যে শেষোক্তটিরই প্রাধান্য। এগুলো সবই খারাপ জিনিস। এদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে হবে। চীনের সমাজে পুরানো ও নতুনের যে সংগ্রাম, তা হল জনসাধারণের (বিভিন্ন বিপ্লবী শ্রেণীর) নতুন শক্তি সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ত শ্রেণীগুলোর পুরানো শক্তির মধ্যেকার সংগ্রাম। এটা বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের মধ্যেকার সংগ্রাম। আফিং যুদ্ধের সময় থেকে হিসেব করলে পুরোপুরি একশ বছর ধরে এ সংগ্রাম চলে আসছে ; আর ১৯১১ সালের বিপ্লবের সময় থেকে হিসেব করলেও প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এই সংগ্রাম চলছে।

তবে আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বিপ্লবকেও নতুন ও পুরানো এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এবং এক ঐতিহাসিক যুগে যা নতুন অন্য আর এক যুগে তা পুরানো হয়ে পড়ে। চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একশ বছরকে দুটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে—প্রথম আশি বছর একটি পর্যায়, বাকি বিশ বছর দ্বিতীয় পর্যায়। প্রত্যেক পর্যায়েরই নিজস্ব মৌলিক ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য আছে : প্রথম আশি বছরের চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল পুরানো ধরনের অন্তর্ভুক্ত, এবং আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে শেষের বিশ বছরে ঐ বিপ্লব নতুন ধরনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। পুরানো গণতন্ত্র—প্রথম আশি বছরের বৈশিষ্ট্য। নয়া গণতন্ত্র—শেষের বিশ বছরের বৈশিষ্ট্য। রাজনীতির মতো সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য সত্য।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পার্থক্য কিভাবে আত্মপ্রকাশ করে? এখন তা আমরা ব্যাখ্যা করব।

১২। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য

চীনের সাংস্কৃতিক বা মতাদর্শগত ফ্রন্টে ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পূর্ববর্তী কাল এবং তার পরবর্তী কাল হল দুটি পৃথক পৃথক ঐতিহাসিক যুগ।

৪ঠা মে'র আন্দোলনের আগে চীনের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সংগ্রাম ছিল

বুর্জোয়াশ্রেণীর নতুন সংস্কৃতি ও সামন্তশ্রেণীর পুরানো সংস্কৃতির মধ্যেকার সংগ্রাম। আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী ও রাজকীয় পরীক্ষা-প্রণালীর মধ্যে[১৮], নতুন শিক্ষা ও পুরানো শিক্ষার মধ্যে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চীনা শিক্ষার মধ্যে যে সংঘাত—সেসব ওই একই প্রকৃতির। তখনকার দিনের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী বা নতুন শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষা মূলতঃ মনোনিবেশ করেছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিদের প্রয়োজন অনুসারে গঠিত প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও বুর্জোয়াশ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানের প্রতি (এখানে আমরা 'মূলতঃ' বলছি, কারণ তখনো এসবের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণে চীনা সামন্তবাদের বিষ অবশিষ্ট ছিল)। সেই আমলে এই নতুন শিক্ষার ভাবধারা চীনা সামন্ত ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং পুরানো আমলের চীনা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থসাধন করেছিল। কিন্তু চীনা বুর্জোয়াদের দুর্বলতার দরুণ এবং বিশ্ব ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী যুগে পৌঁছে যাবার দরুণ কয়েক দফা সংগ্রামের পরেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দাস-সুলভ মতাদর্শের সংগে চীনের সামন্তবাদের 'প্রাচীন যুগে ফিরে চল'—এই ভাবধারার প্রতিক্রিয়াশীল মৈত্রীজোট ঐ বুর্জোয়া মতাদর্শকে দ্রুত পরাভূত করে ফেলল, এই প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শগত জোটের সামান্য পাল্টা-আক্রমণের সামনেই এই তথাকথিত নতুন শিক্ষা পতাকা ও ঢাক গুটিয়ে রণে ভঙ্গ দিল এবং পশ্চাদপসরণ শুরু করল; এতে করে তার মর্মবস্তু গেল উড়ে, শুধু পড়ে রইল তার কঙ্কাল। সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুরানো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি পচে গেছে ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এর পরাজয় অনিবার্য।

৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর অবস্থা অন্যরকম দাঁড়িয়েছে। এই আন্দোলনের পরে চীনে সম্পূর্ণ এক নতুন সাংস্কৃতিক শক্তির উদ্ভব হয়েছে। তা হল চীনা কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত কমিউনিজমের সাংস্কৃতিক ভাবধারা অর্থাৎ কমিউনিস্ট বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক বিপ্লবের তত্ত্ব। ৪ঠা মে'র আন্দোলন ঘটে ১৯১৯ সালে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম ও চীনের শ্রমিক-আন্দোলনের সত্যিকার সূচনা হয় ১৯২১ সালে। এ সবগুলোই ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পরে, অর্থাৎ এমন এক সময়ে যখন দুনিয়ার জাতীয় সমস্যা ও ঔপনিবেশিক বিপ্লবী আন্দোলনসমূহের পুরানো রূপ বদলাতে শুরু করেছে। এতে চীন বিপ্লব ও বিশ্ববিপ্লবের মধ্যেকার যোগাযোগ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চীনের নতুন রাজনৈতিক শক্তি অর্থাৎ চীনা

সর্বহারাশ্রেণী ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তখন চীনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে, এবং এর ফলে এই নতুন সাংস্কৃতিক শক্তি-তার নতুন বেশে ও নতুন অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে, সম্ভাব্য সকল মিত্রের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং নিজের শক্তিকে ব্যূহাকারে বিন্যস্ত করে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী সংস্কৃতির ওপর বীরোচিত আক্রমণ চালায়। সকল ক্ষেত্রে—দর্শনে, অর্থবিজ্ঞানে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, সামরিক বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, সাহিত্যে অথবা শিল্পে (নাটকে, সিনেমায়, সঙ্গীতে, ভাস্কর্যে অথবা চিত্রাঙ্কনে (অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্য-শিল্পের সমস্ত ক্ষেত্রেই এই নতুন শক্তি প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছে। এই বিশ বছরে এই নতুন সাংস্কৃতিক শক্তির সঙ্গীন যতদূর গিয়েছে ততদূর পর্যন্ত কী ভাবধারা, কী রূপের ক্ষেত্রে (যেমন, লিখিত ভাষা ইত্যাদিতে) একটা বিরাট বিপ্লব ঘটে গেছে। তার শক্তি এত বিরাট, তার গতি এত প্রচণ্ড যে, যেখানেই সে যায় সেখানেই সে জয়যুক্ত হয়। একে কেন্দ্র করে যে সমাবেশ ঘটেছে তা এত ব্যাপক যে, চীনের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। লু স্যুন ছিলেন এই নতুন সাংস্কৃতিক শক্তির মহত্তম ও নির্ভীকতম পতাকাবাহক। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তিনি ছিলেন প্রধান সেনাপতি। তিনি শুধু একজন মহান সাহিত্যিকই ছিলেন না, তিনি একজন মহান চিন্তাবিদ'ও মহান বিপ্লবীও ছিলেন। লু স্যুন ছিলেন পাথরের মতো দৃঢ়, সকল রকমের মোসাহেবি ও আজ্ঞাবহবর্তিতা থেকে মুক্ত। তাঁর এই চরিত্রবৈশিষ্ট্য ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের এক অমূল্য সম্পদ। সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে, সমগ্র জাতির বিরাট সংখ্যাধিক্যের প্রতিনিধি হিসেবে লু স্যুন শত্রুর দুর্গ বিদীর্ণ করে তার ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছিলেন; এতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে নির্ভুল, সবচেয়ে নির্ভীক, সবচেয়ে দৃঢ়, সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ, সবচেয়ে উৎসাহী জাতীয় বীর, আমাদের ইতিহাসে এমন বীরের কোন তুলনা নেই। লু স্যুনের পথ চীনা জাতির নতুন সংস্কৃতির পথ।

৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর চীনের নতুন সংস্কৃতি ছিল পুরানো গণতান্ত্রিক চরিত্রের সংস্কৃতি, তা ছিল বিশ্ববুর্জোয়াশ্রেণীর পুঁজিবাদী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অংশ। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর চীনের নতুন সংস্কৃতি নয়া-গণতান্ত্রিক চরিত্রের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে, এবং এই সংস্কৃতি এখন বিশ্বসর্বহারাশ্রেণীর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অংশ।

৪ঠা মে'র আন্দোলনের আগে চীনের নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন, চীনের

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিত বুর্জোয়াশ্রেণী; তখনো বুর্জোয়াশ্রেণী নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করত। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর বুর্জোয়াশ্রেণীর সংস্কৃতি ও মতাদর্শ তার রাজনীতির চেয়েও বেশি পিছিয়ে পড়ল; এই সংস্কৃতি ও মতাদর্শ কোনমতেই আর নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে না। এই সংস্কৃতি ও মতাদর্শ বড়জোর শুধু বিপ্লবী যুগে নির্দিষ্ট পরিমাণে মৈত্রীজোটের সভ্য হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এই জোটের নেতৃত্ব অবশ্যই থাকবে সর্বহারাশ্রেণীর সংস্কৃতি ও মতাদর্শের হাতে। এ সত্যকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না।

জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী সংস্কৃতিই হল নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি; এই সংস্কৃতি আজ জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি পরিচালিত হতে পারে একমাত্র সর্বহারাশ্রেণীর সংস্কৃতি ও মতাদর্শ অর্থাৎ কমিউনিজমের মতাদর্শের দ্বারা; অন্য কোন শ্রেণীর সংস্কৃতি ও মতাদর্শের দ্বারা এই সংস্কৃতি পরিচালিত হতে পারে না। এক কথায়, নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি হল সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্তবাদ-বিরোধী সংস্কৃতি।

১৩। চার যুগ

সাংস্কৃতিক বিপ্লব হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবেরই ভাবাদর্শগত প্রতিফলন, এবং তাদের সেবায় নিয়োজিত। চীনদেশে রাজনৈতিক বিপ্লবে যেমন যুক্তফ্রন্ট আছে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবেও তেমনি একটি যুক্তফ্রন্ট বিদ্যমান।

বিগত বিশ বছরের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যুক্তফ্রন্টের ইতিহাস ৪টি যুগে বিভক্ত। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত এই দুই বছর হল প্রথম যুগ; ১৯২১ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত এই ছয় বছর হল দ্বিতীয় যুগ; ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত এই দশ বছর হল তৃতীয় যুগ; এবং ১৯৩৭ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এই তিন বছর হল চতুর্থ যুগ।

প্রথম যুগ ছিল ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র আন্দোলন থেকে ১৯২১ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত। ৪ঠা মে'র আন্দোলন ছিল এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৪ঠা মে'র আন্দোলন ছিল যেমন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, তেমনি তা ছিল সামন্তবাদ-বিরোধী আন্দোলন। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের লক্ষণীয় ঐতিহাসিক তাৎপর্য হচ্ছে এইখানেই যে, তার এমন এক বৈশিষ্ট্য ছিল যা ১৯১১ সালের

বিপ্লবের ছিল না, অর্থাৎ এ আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে এবং আপোষহীনভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের এই বৈশিষ্ট্য থাকার কারণ এই যে, চীনের পুঁজিবাদী অর্থনীতি তখন তার বিকাশের পথে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং তখনকার চীনের বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা নিজের চোখের সামনে দেখেছে রাশিয়া, জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী—এই তিনটি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশের ভাঙন, আর দুটি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশ—ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শক্তিহ্রাস, রাশিয়ায় সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং জার্মানি, হাঙ্গেরী ও ইতালী—এই তিনটি দেশের বুকে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের আলোড়ন। এই সমস্ত ঘটনা তাদের মনে চীনা জাতির মুক্তির নতুন আশা জাগিয়েছিল। ৪ঠা মে'র আন্দোলন ঘটেছিল সেই সময়ের বিশ্ববিপ্লবের আহ্বানে, রুশ বিপ্লবের আহ্বানে, লেনিনের আহ্বানে। ৪ঠা মে'র আন্দোলন ছিল সেদিনের সর্বহারাশ্রেণীর বিশ্ববিপ্লবের অংশ। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের সময়ে যদিও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না, তথাপি এমন বহু বুদ্ধিজীবী ছিলেন যাঁরা রুশ বিপ্লবকে সমর্থন করেছিলেন এবং প্রাথমিক কমিউনিস্ট ভাবধারার সাথে পরিচিত ছিলেন। ৪ঠা মে'র আন্দোলন তার সূচনাতে ছিল কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী, বিপ্লবী পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী (এঁরা ছিলেন তৎকালীন আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী অংশ)—এই তিনটি অংশের যুক্তফ্রন্টের বিপ্লবী আন্দোলন। এর ত্রুটি ছিল এই যে, এটা কেবল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, শ্রমিক ও কৃষকরা এতে যোগ দেয়নি। কিন্তু যখনই এই আন্দোলন বিকশিত হয়ে ৩রা জুনের আন্দোলনে[১১] পরিণত হল, তখন কেবল বুদ্ধিজীবীরা নয়, ব্যাপক সর্বহারাশ্রেণী, পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণীও এতে যোগ দিল এবং ঐ আন্দোলন দেশব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনে পরিণত হল। ৪ঠা মে'র আন্দোলন যে সংস্কৃতিক বিপ্লব চালিয়েছিল, তা ছিল সামন্তবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আপোষহীন আন্দোলন। চীনের ইতিহাসের শুরু থেকে এত মহান এবং সম্পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতিক বিপ্লব আর কখনো ঘটেনি। এই আন্দোলন সেই সময়ে 'পুরানো নীতিবোধের বিরোধিতা করে নতুন নীতিবোধকে এগিয়ে নাও!' এবং 'পুরানো সাহিত্যের বিরোধিতা করে নতুন এক সাহিত্যকে সামনে নিয়ে এস!'—সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই দুটি মহান পতাকা বহন করে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল। শ্রমিক ও কৃষক-সাধারণের মধ্যে তখনো এই সংস্কৃতিক আন্দোলন ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত

করা সম্ভব হয়নি। এ আন্দোলন 'সাধারণ মানুষের জন্য সাহিত্য'—এই স্লোগান তুলেছিল, কিন্তু 'সাধারণ মানুষ' বলতে তখন প্রকৃতপক্ষে শহুরে পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদেরই বোঝাত, অর্থাৎ তা শহরবাসী বুদ্ধিজীবীদেরই বোঝাত। চিন্তাধারা ও কর্মীসৃষ্টির দিক দিয়ে ৪ঠা মে'র আন্দোলন ১৯২১ সালের চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিপর্ব সমাধা করেছিল এবং ৩০শে মে'র আন্দোলন ও উত্তর অভিযানের পথও প্রশস্ত করেছিল। তৎকালীন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা ছিল ৪ঠা মে'র আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী অংশ, দ্বিতীয় যুগে তাদের অধিকাংশই শত্রুর সংগে আপোষ করেছিল এবং প্রতিক্রিয়ার পক্ষে চলে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, ৩০শে মে'র আন্দোলন এবং উত্তর অভিযান। এই যুগে ৪ঠা মে'র আন্দোলনকালের তিন শ্রেণীর যুক্তফ্রন্টকে অব্যাহত রাখা হয় এবং আরও বিকশিত করা হয়, কৃষকদেরকে এই ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় এই সমস্ত শ্রেণীর যুক্তফ্রন্ট, অর্থাৎ এই সর্বপ্রথম কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা স্থাপিত হয়। ডঃ সান ইয়াৎ-সেন মহৎ ছিলেন শুধু ১৯১১ সালের মহান বিপ্লবের (যদিও এটা ছিল পুরানো যুগের গণতান্ত্রিক বিপ্লব) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলেই নয়, উপরন্তু তিনি 'দুনিয়ার গতিধারার সাথে খাপ খাইয়ে এবং জনগণের দাবি মেনে নিয়ে' রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সাহায্য করা—এই তিনটি মহান বিপ্লবী কর্মনীতি উপস্থিত করেছিলেন, তিন-গণনীতি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং এইভাবে তিনটি মহান কর্মনীতি সমন্বিত নয়া তিন-গণনীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর আগে শিক্ষামহল, বিদগ্ধসমাজ ও যুবসমাজের সাথে তিন-গণনীতির বিশেষ কোন সম্পর্কই ছিল না, কারণ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা অথবা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অথবা সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের বিরোধিতার স্লোগান এতে তোলা হয়নি। এর আগে এটা ছিল পুরানো তিন-গণনীতি, লোকে এটাকে মনে করত সরকারী ক্ষমতা দখল করতে অর্থাৎ সরকারী পদ লাভ করতে উদ্‌গ্রীব কতকগুলো লোকের সাময়িক স্বার্থসিদ্ধির পতাকা মাত্র, নির্ভেজাল রাজনৈতিক কারসাজির পতাকা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পরে তিনটি মহান কর্মনীতি সমন্বিত নয়া তিন-গণনীতির আবির্ভাব ঘটেছে। কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সহযোগিতা ও দুই পার্টির

বিপ্লবী সভ্যদের প্রচেষ্টার ফলে এই নয়া তিন-গণনীতি সমগ্র চীনে, শিক্ষামহল ও বিদগ্ধসমাজের একাংশের মধ্যে এবং ব্যাপক যুব ছাত্রদের মধ্যে বিস্তারলাভ করেছে। এটা ঘটেছে সম্পূর্ণ এই কারণেই যে, আগের তিন-গণনীতি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী তিনটি মহান কর্মনীতি সমন্বিত নয়া-গণতান্ত্রিক তিন-গণনীতিতে বিকশিত হয়েছে; এই বিকাশ না ঘটলে তিন-গণনীতির চিন্তাধারার প্রসারলাভ অসম্ভব হতো।

এই যুগে এই ধরনের বিপ্লবী তিন-গণনীতি কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির এবং সকল বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়; যেহেতু 'কমিউনিজম তিন-গণনীতির ভাল বন্ধু' সেজন্য দুটি মতবাদকে একটি যুক্তফ্রন্টে সংহত করা হল। শ্রেণীর বিচারে এ ছিল সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক-সমাজ, শহরে পেটি-বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর যুক্তফ্রন্ট। তখন কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'উইকলি গাইড' শাংহাই থেকে প্রকাশিত কুওমিনতাঙের দৈনিক পত্রিকা 'রিপাবলিকান ডেইলী নিউজ' এবং বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত অন্যান্য সংবাদপত্রগুলো মারফৎ দুটি পার্টি যুক্তভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার আদর্শ প্রচার করে, কনফুসিয়াসের পুজো ও শাস্ত্রচর্চা-ভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষার বিরোধিতা করে, এবং সামন্ততান্ত্রিক সেকেলে কায়দার দুষ্ট পুরানো সাহিত্য ও সাধু ভাষার বিরোধিতা করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী বিষয় নিয়ে লিখিত নতুন সাহিত্য ও চলিত ভাষা চালু করার সপক্ষে প্রচার চালায়। কোয়াংতুং যুদ্ধ ও উত্তর অভিযানের সময়ে চীনের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী মতাদর্শের প্রবর্তন হয় এবং এভাবে চীনা সৈন্যবাহিনীর রূপান্তর সাধন করা হয়। সেই সময় লক্ষ-কোটি কৃষকসাধারণের মধ্যে 'দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী নিপাত যাক' এবং 'স্থানীয় উৎপীড়ক ও বদ ভদ্রলোকরা নিপাত যাক'—এই শ্লোগান তোলা হয়েছিল এবং বিরাট বিপ্লবী কৃষক-সংগ্রাম গড়ে তোলা হয়েছিল। এইসব কারণে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় উত্তর অভিযান জয়যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু বৃহৎ বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় আসার সংগে সংগে এই বিপ্লবের অবসান ঘটাল এবং এইভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হল।

তৃতীয় যুগ হল ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত এক নতুন বিপ্লবী যুগ। কারণ পূর্ববর্তী যুগের শেষের দিকে বিপ্লবী শিবিরে একটা পরিবর্তন ঘটে। চীনের বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ ও সমান্তবাদী শক্তির প্রতিবিপ্লবী শিবিরে যোগ

েন্স, আর জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর কবলে চলে যায়; আগে বিপ্লবী শিবিরে চারিটি অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন রইল কেবল তিনটি—সর্বহারা-শ্রেণী, কৃষকসমাজ ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া (বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা এর অন্তর্ভুক্ত); তাই চীনের বিপ্লবকে এক নতুন যুগে পা দিতে হল, এই বিপ্লবে এখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এককভাবে জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিল। এই যুগে একদিকে চলেছে প্রতিবিপ্লবী 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান এবং অন্যদিকে গভীরতা পেয়েছে বিপ্লব। এই যুগে প্রতিবিপ্লবী 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান দুই ধরনের ছিল—সামরিক ও সাংস্কৃতিক। আর বিপ্লবের গভীরতাপ্রাপ্তিও ছিল দুই ধরনের—গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের গভীরতাপ্রাপ্তি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের গভীরতাপ্রাপ্তি। ঐ দুধরনের প্রতিবিপ্লবী 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় সমগ্র চীনের তথা সমগ্র দুনিয়ার প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহকে সমবেত করা হয়েছিল, পুরো দশটি বছর ধরে এই অভিযান চলেছিল এবং তুলনাবিহীন নির্মমতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। এতে কয়েক লক্ষ কমিউনিস্ট ও তরুণ ছাত্রকে হত্যা করা হয়, কয়েক নিযুত শ্রমিক ও কৃষকজনতার ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়। এই সবকিছুর জন্য যারা দায়ী তারা হয়ত মনে করেছিল যে, কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টিকে নিঃসন্দেহেই 'চিরকালের মতো পর্যুদস্ত ও নির্মূল করা' যাবে। কিন্তু ফল হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত। দুটি 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। সামরিক অভিযানের ফল দাঁড়িয়েছিল জাপানীদের প্রতিরোধের জন্য লালফৌজের উত্তরাভিমুখী অভিযান; আর সাংস্কৃতিক অভিযানের ফলে ঘটল ১৯৩৫ সালের বিপ্লবী যুবকদের ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলন। আর উভয় অভিযানের সাধারণ ফল দাঁড়িয়েছিল সমগ্র দেশব্যাপী জনগণের জাগরণ। এই তিনটিই হল ইতিবাচক ফললাভ। এসবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল এই যে, কুওমিনতাঙ-শাসিত এলাকাগুলিতে সমস্ত সাংস্কৃতিক সংস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা একেবারে অসহায় হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কুওমিনতাঙের সাংস্কৃতিক 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। এমনটা ঘটল কেন? এটা কি দীর্ঘ সময়ব্যাপী গভীর চিন্তার বিষয় নয়? আর এই 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের মধ্যেই কমিউনিজমে বিশ্বাসী লু স্যুন চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মহামানব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

প্রতিবিপ্লবী 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের নেতিবাচক ফল হল এই

এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। এটিই হল প্রধান কারণ, যেজন্য এখনো পর্যন্ত সমগ্র দেশের জনগণ ঐ দশ বছরের কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানকে তীব্রভাবে ঘৃণা করে।

এই যুগের সংগ্রামে বিপ্লবী শিবির দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেছে জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী নয়া গণতন্ত্র এবং নয়া তিন-গণ-নীতিকে; আর প্রতিবিপ্লবী শিবির অনুসরণ করেছে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা পরিচালিত জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর মিলিত স্বৈরতন্ত্রকে। এই স্বৈরতন্ত্র রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সান ইয়াৎ-সেনের তিনটি মহান কর্মনীতিকে খোতন করেছে, তাঁর নয়া তিন-গণনীতিকে খোতন করেছে এবং এভাবে চীনা জাতির জীবনে গুরুতর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে।

চতুর্থ যুগ হচ্ছে বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগ। আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করে এই যুগ চীন বিপ্লবের সেই চারটি শ্রেণীর যুক্তফ্রণ্ট আবার গঠিত হয়েছে, কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের পরিধি এবার আরও প্রসারিত হয়েছে। কারণ এই যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ওপরের শ্রেণীর অনেক শাসক, মধ্যশ্রেণীর জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ও পেটি-বুর্জোয়া এবং নিম্নশ্রেণীর সমগ্র সর্বহারারা। এইভাবে সমগ্র দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর এই মৈত্রীজোটের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করেছে। এ যুগের প্রথম পর্যায় ছিল উহান শহরের পতনের পূর্ব পর্যন্ত। এই পর্যায়ে সমগ্র দেশে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা স্ফূর্তি ও উদ্দীপনা ছিল, রাজনৈতিক দিক দিয়ে গণতন্ত্রীকরণের দিকে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও শক্তি-সমাবেশ ঘটেছিল অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে। উহানের পতনের পর এল দ্বিতীয় পর্যায়। ঐ সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল; বৃহৎ বুর্জোয়াদের একটা অংশ শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং অপর একটা অংশ প্রতিরোধ-যুদ্ধের আশু সমাপ্তি চাইল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই অবস্থা প্রতিফলিত হল ইয়ে চিং[20], চ্যাং চুন-মাই প্রমুখ লোকদের প্রতিক্রিয়াশীল কর্মতৎপরতায় এবং বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের মধ্যে।

এই সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে প্রতিরোধ, ঐক্য ও প্রগতির বিরোধী সমস্ত মতাদর্শের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালাতে হবে। এইসব প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শকে যদি ধ্বংস করা না হয়, তাহলে প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের জয়লাভের কোন আশা থাকবে না। এই সংগ্রামের ভবিষ্যৎ কি? সমগ্র দেশের জনগণের মনে

এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায়, প্রতিরোধ-যুদ্ধের পথে যত বাধাই থাকুক না কেন, চীনের জনগণ জয়লাভ করবেই। চীনের ইতিহাসের সমগ্র গতিপথে, ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পরের বিশ বছরে যে প্রগতি সাধিত হয়েছে তা আগেকার আশি বছরের প্রগতিকেই যে শুধু ছাড়িয়ে গেছে তাই নয়, এমনকি তা অতীতের হাজার হাজার বছরের অগ্রগতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। আগামী বিশ বছরে চীনের আরও কতটা অগ্রগতি হবে, তা কি আমরা কল্পনা করতে পারি না? দেশী, বিদেশী সমস্ত করাল শক্তির বন্নাহীন হিংস্রতা আমাদের জাতীয় জীবনে এনেছে বিপর্যয়; কিন্তু এই হিংস্রতাই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এইসব করাল শক্তির এখনো কিছু ক্ষমতা বর্তমান থাকলেও ইতিমধ্যেই তাদের মরণ-যন্ত্রণা শুরু হয়েছে এবং জনসাধারণ ক্রমান্বয়ে জয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এ কথা শুধু চীন সম্পর্কে নয়, সমগ্র প্রাচ্য সম্পর্কে এবং সমগ্র পৃথিবী সম্পর্কেই সত্য।

১৪। সংস্কৃতির প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি ভুল ধারণা

কঠিন এবং তিক্ত সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য থেকেই নতুন সবকিছু বেরিয়ে আসে। এটা নয়া সংস্কৃতি সম্পর্কেও সত্য। এই নয়া সংস্কৃতি বিগত বিশ বছরে তিনবার বাঁক পরিবর্তন করে আঁকাবাঁকা পথে অগ্রসর হয়েছে, এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভালমন্দ সমস্তরকমের বস্তুই পরীক্ষিত ও যাচাই হয়েছে।

বুর্জোয়া গোঁড়া ব্যক্তিরা যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নে তেমনি সংস্কৃতির প্রশ্নেও সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। তারা চীনের নতুন যুগের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য জানে না, তারা মানে না জনসাধারণের নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে। তারা শুরু করে বুর্জোয়া স্বৈরতন্ত্রকে স্বীকার করে নিয়ে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই স্বৈরতন্ত্র পরিণত হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সংস্কৃতিক স্বৈরতন্ত্রে। তথাকথিত ইউরোপীয়-মার্কিনপন্থী সাংস্কৃতিক পণ্ডিতদের[২১] একটা অংশ (আমি একটা অংশের কথাই বলছি) কার্যতঃ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কুওমিনতাঙ সরকারের 'কমিউনিস্ট দমন' অভিযানকে সমর্থন করেছিল এবং মনে হয় বর্তমানে তারা 'কমিউনিজমকে গণ্ডিবদ্ধ করা' ও 'কমিউনিজমকে ক্ষয় করার' কর্মনীতি সমর্থন করছে। তারা শ্রমিক ও কৃষককে রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিতে চায় না। বুর্জোয়া গোঁড়া ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিক স্বৈরতন্ত্রের এই পথ কানাগলির

পথ ; রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নে যেমন সাংস্কৃতিক সৈরতন্ত্রের ক্ষেত্রেও তেমনি —এর সাফল্যের জন্য যে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পূর্বশর্তের প্রয়োজন তা নেই। সুতরাং, এই সাংস্কৃতিক স্বৈরতন্ত্রকেও 'শিকেয় তুলে রাখাই' ভাল।

জাতীয় সংস্কৃতির কর্মপন্থা সম্পর্কে বলতে গেলে, কমিউনিস্ট মতাদর্শ পথ-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করছে ; আর আমাদের উচিত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমাজবাদ ও কমিউনিজম প্রচার করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো এবং কৃষক ও অন্যান্য জনসাধারণকে যথাযথভাবে ও ধাপে ধাপে সমাজবাদে শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি সামগ্রিকভাবে এখনো সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি নয়।

নয়া গণতন্ত্রের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সবই সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন বলে সেই সবকিছুর মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক উপাদান আছে ; এটা সাধারণ উপাদান নয়, বরং নির্ধারক উপাদান। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এখনো সমাজতান্ত্রিক নয়, বরং নয়া-গণতান্ত্রিক। কারণ বর্তমান পর্যায়ে বিপ্লবের মূল কর্তব্য প্রধানতঃ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ; এটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, এবং এখনো এটা পুঁজিবাদের উচ্ছেদকারী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে গেলে, বর্তমানে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি সামগ্রিকভাবেই সমাজতান্ত্রিক অথবা তা-ই হওয়াই উচিত, এমন মনে করলে ভুল হবে। এ ধারণার অর্থ কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রচারকে আশু কর্মসূচীর বাস্তব প্রয়োগ হিসাবে গ্রহণ করা। এর অর্থ সমস্যার অনুসন্ধান, গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণ, কাজকর্ম পরিচালনা ও কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতির প্রয়োগকে চীন বিপ্লবের গণতান্ত্রিক পর্যায়ের সামগ্রিক জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় সংস্কৃতির কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করা। সমাজতান্ত্রিক উপাদান সমন্বিত জাতীয় সংস্কৃতিতে অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রতিফলিত হবে। আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক উপাদান আছে, তাই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিতেও সমাজতান্ত্রিক উপাদান প্রতিফলিত হয় ; কিন্তু গোটা সমাজের কথা বলতে গেলে, আমাদের এখনো সামগ্রিক সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি ও অর্থনীতি গড়ে ওঠেনি ; তাই আমাদের এখনো সামগ্রিক সমাজতান্ত্রিক জাতীয় সংস্কৃতি থাকতে পারে না। যেহেতু চীনের বর্তমান বিপ্লব বিশ্ব সর্বহারা-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ,

সেইহেতু বর্তমানকালে চীনের নতুন সাংস্কৃতিও বিশ্ব সর্বহারা-সমাজতান্ত্রিক নয়া সংস্কৃতিরই অংশ ও তার মহান মিত্র; যদিও এই অংশটির মধ্যে নিহিত রয়েছে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তবু সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি বিশ্ব সর্বহারা-সমাজতান্ত্রিক নতুন সংস্কৃতির ধারার এক পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি হিসেবে যুক্ত হয় না, যুক্ত হয় ব্যাপক জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি হিসেবে। বর্তমান চীনের বিপ্লবকে যেমন চীনের সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি বর্তমান চীনের নয়া সংস্কৃতিকেও চীনের সর্বহারা-শ্রেণীর সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, অর্থাৎ কমিউনিস্ট মতাদর্শের নেতৃত্ব থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে এই নেতৃত্বের কাজ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদবিরোধী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে চালিয়ে যাবার কাজে জনসাধারণকে নেতৃত্বদান করা। তাই বর্তমানে সামগ্রিকভাবে চীনের নয়া জাতীয় সংস্কৃতির বিষয়বস্তু এখনো নয়া-গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক নয়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এখন কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রচার আমাদের বাড়াতে হবে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়নে আমাদের আরও বেশি করে শক্তি নিয়োগ করতে হবে; তা না হলে চীনের বিপ্লবকে আমরা যে শুধু ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না তাই নয়, বর্তমান গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে জয়লাভের পথে পরিচালিত করতেও আমরা পারব না। কিন্তু কমিউনিস্ট মতাদর্শের ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার প্রচারকে আমাদের নয়া-গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর বাস্তব প্রয়োগ থেকে পৃথক করতে হবে; সমস্যার অনুসন্ধান, গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণ, কাজকর্ম পরিচালনা ও কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কমিউনিস্ট তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে আমাদের সামগ্রিক জাতীয় সংস্কৃতির নয়া-গণতান্ত্রিক কর্মপন্থা থেকে পৃথক করতে হবে। নিঃসন্দেহে এই দুটিকে মিশিয়ে ফেলা যথার্থ নয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বর্তমান পর্যায়ে চীনের নতুন জাতীয় সংস্কৃতির বিষয়-বস্তু বুর্জোয়াশ্রেণীর সাংস্কৃতিক স্বৈরতন্ত্রও নয়, কিংবা বিশুদ্ধ ধরনের সর্বহারা-শ্রেণীর সমাজতন্ত্রও নয়; তা হচ্ছে সর্বহারা-সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মতাদর্শের নেতৃত্বে জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী নয়া গণতন্ত্র।

১৫। জাতীয়, বিজ্ঞানসম্মত ও জনসাধারণের একটি সংস্কৃতি

নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি হল জাতীয়। এই সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়নের বিরোধিতা করে এবং চীনা জাতির মর্যাদা ও স্বাধীনতার দাবি জানায়। এটা আমাদের জাতিরই সংস্কৃতি, আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্যই এতে থাকবে। এই সংস্কৃতি অন্যান্য সমস্ত জাতির সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত, তাদের সাথে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও বিকাশের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের সাথে একসংগে গড়ে তোলে দুনিয়ার নতুন সংস্কৃতি। কিন্তু এ সংস্কৃতি অন্য কোন জাতির সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির সাথে কিছুতেই যুক্ত হতে পারে না, কারণ আমাদের এ সংস্কৃতি বিপ্লবী জাতীয় সংস্কৃতি। নিজস্ব সংস্কৃতির পুষ্টিসাধনের জন্য প্রচুর পরিমাণে বিদেশী প্রগতিশীল সংস্কৃতি গ্রহণ করা চীনের উচিত। এক্ষেত্রে অতীতে যা করা হয়েছে এ মোটেই যথেষ্ট নয়। যা আজ আমাদের কাজে লাগে তা-ই আমাদের গ্রহণ করা উচিত ; শুধু বর্তমানকালের সমাজতান্ত্রিক ও নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি থেকে নয়, বিদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি-গুলো থেকেও, যেমন বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের জ্ঞানালোকপ্রাপ্তির যুগের সংস্কৃতি থেকেও আমাদের গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু খাদ্য সম্পর্কে আমরা যে পদ্ধতি গ্রহণ করি, এইসব বিদেশী সামগ্রী সম্পর্কেও সেই একই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ খাদ্য আমরা চিবানোর জন্য মুখে দিই, হজমের জন্য পাকস্থলী ও অন্ত্রে পাঠাই, তার সাথে লালা, পাচক রস ও অন্ত্রের অন্যান্য রস মিশ্রিত হয়, এমনি করে খাদ্যকে সারবস্তু ও বর্জনীয় অংশে ভাগ করে দিই, তারপর পুষ্টির জন্যে সারবস্তু গ্রহণ করি ও বর্জনীয় অংশ পরিত্যাগ করি। শুধু এইভাবেই আমাদের স্বাস্থ্যের উপকার হবে ; কোন কিছুকেই সবশুদ্ধ গলাধঃকরণ করা অথবা কোন বিচার-বিবেচনা বা সমালোচনা না করে গ্রহণ করা কোনমতেই চলবে না। 'সর্বতোভাবে পশ্চিমীকরণের'[২২] ধারণা ভুল। যান্ত্রিকভাবে বিদেশী জিনিস গ্রহণ করে অতীতে চীনকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। অনুরূপ-ভাবে, চীনদেশে মার্কসবাদ প্রয়োগের ব্যাপারেও চীনা কমিউনিস্টদের অবশ্যই মার্কসবাদের সার্বজনীন সত্যকে চীন বিপ্লবের বাস্তব অনুশীলনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে ও যথাযথভাবে খাপ খাইয়ে নিতে হবে ; অর্থাৎ মার্কসবাদের সার্বজনীন সত্যকে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সংগে সমন্বিত করতে ও নির্দিষ্ট জাতীয় রূপদান করতে হবে। শুধু এইভাবেই তা কাজে লাগবে ; আত্মগতভাবে ও ফর্মুলার

মতো যান্ত্রিকভাবে তাকে প্রয়োগ করা আমাদের কোনমতেই উচিত নয়। ফর্মুলাবাদী মার্কসবাদীরা শুধু মার্কসবাদ ও চীন বিপ্লব নিয়ে ছেলেখেলা করেছে; চীনের বিপ্লবীদের সারিতে তাদের স্থান নেই। চীনের সংস্কৃতির নিজস্ব রূপ থাকা উচিত, এবং সে রূপ হবে জাতীয়। জাতীয় রূপ ও নয়া-গণতান্ত্রিক বিষয়বস্তু—এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের নতুন সংস্কৃতি। .

এই নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিজ্ঞান সম্মত। এটা একদিকে যেমন সমস্ত সামন্তবাদী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার বিরোধী, অপর দিকে তেমনি এটা বাস্তব ঘটনা থেকে সত্যের সন্ধান, বাস্তব সত্য এবং তত্ত্ব ও অনুশীলনের ঐক্যের সমর্থনে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে চীনা সর্বহারাশ্রেণীর বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা চীনের যেসব বুর্জোয়া বস্তুবাদী ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী এখনো প্রগতিশীল, তাঁদের সাথে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী' সামন্তবাদ-বিরোধী ও কুসংস্কার-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে পারে; কিন্তু কোন মতেই সে কোন প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদের সংগে যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে পারে না। কমিউনিস্টরা কোন ভাববাদী এমনকি ধর্মানুসারী ব্যক্তির সংগেও রাজনৈতিক কর্মকলাপে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই তাদের ভাববাদ অথবা ধর্মীয় তত্ত্বের সমর্থন করতে পারেন না। সুদীর্ঘকাল স্থায়ী চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে এক উজ্জ্বল প্রাচীন সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল। সেই প্রাচীন সংস্কৃতির বিকাশের ধারাটির বিশ্লেষণ করা, তার সামন্তবাদী আবর্জনা-গুলো ঝেড়ে ফেলে দেওয়া, তার গণতান্ত্রিক সারবস্তুটুকু গ্রহণ করা জাতীয় নয়া সংস্কৃতির বিকাশ ও জাতীয় আত্মবিশ্বাসের বৃদ্ধির পক্ষে এক অবশ্যকীয় শর্ত; কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিচার-বিশ্লেষণ না করে সমস্ত কিছু চোখ বুজে গ্রহণ করা কোনমতেই উচিত হবে না। প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ গণ-সংস্কৃতি থেকে, অর্থাৎ সংস্কৃতির যে অংশগুলোর প্রকৃতি কমবেশি গণতান্ত্রিক বা বিপ্লবী সেগুলো থেকে প্রাচীন সামন্ত শাসকশ্রেণীর সমস্ত পচা জিনিসকে পৃথক করতে হবে। চীনের বর্তমান নতুন রাজনীতি ও নতুন অর্থনীতি যেমন প্রাচীনকালের পুরানো রাজনীতি ও পুরানো অর্থনীতি থেকে বিকাশলাভ করেছে, তেমনি চীনের বর্তমানকালের নতুন সংস্কৃতিও প্রাচীনকালের পুরানো সংস্কৃতি থেকে বিকাশলাভ করেছে। অতএব আমাদের অবশ্যই নিজেদের ইতিহাসকে শ্রদ্ধা করতে হবে: ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সূত্র ছিন্ন করা কোনমতেই উচিত হবে না। কিন্তু এখানে ইতিহাসকে শ্রদ্ধা করার অর্থ হল ইতিহাসকে একটি

বিজ্ঞান হিসেবে তার যথাযোগ্য স্থান দেওয়া এবং ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বিকাশকে শ্রদ্ধা করা; তার দ্বারা বর্তমানকে উপেক্ষা করে প্রাচীনের প্রশংসা অথবা কোন বিষাক্ত সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের গুণগান করা বোঝায় না। জনসাধারণ এবং তরুণ ছাত্রদেরকে অবশ্যই প্রধানতঃ সামনের দিকে তাকাতে শেখাতে হবে, পেছনের দিকে নয়।

এই নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি জনসাধারণের সংস্কৃতি এবং সেজন্য তা গণতান্ত্রিক। এই সংস্কৃতিকে সমগ্র জাতির জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জনেরও বেশি যে মেহনতী শ্রমিক-কৃষকসাধারণ, তাঁদের সেবায় নিয়োজিত হওয়া উচিত, এবং তাকে ক্রমান্বয়ে তাঁদের একেবারে নিজস্ব সংস্কৃতিতে পরিণত হতে হবে। বিপ্লবী কর্মীদের শিক্ষাদানের জন্য যে জ্ঞানের দরকার এবং বিপ্লবী জনসাধারণকে শিক্ষাদানের জন্য যে জ্ঞানের দরকার—এই দুই জ্ঞানের মধ্যে যেমন মাত্রাগত পার্থক্য নিরূপণ প্রয়োজন, তেমনি তাদের পারস্পরিক সংযোগ-সাধনও প্রয়োজন; সংস্কৃতির মানের উন্নতিসাধনের সংগে তার ব্যাপক জনপ্রিয়-করণের পার্থক্য নিরূপণ এবং সংযোগসাধনও প্রয়োজন। বিপ্লবী সংস্কৃতি ব্যাপক জনসাধারণের হাতে শক্তিশালী বিপ্লবী হাতিয়ার। বিপ্লব শুরু হবার আগে বিপ্লবী সংস্কৃতি মতাদর্শের দিক থেকে বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে বিপ্লবের সময়ে এই বিপ্লবী সংস্কৃতি সাধারণ বিপ্লবী ফ্রন্টের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্য প্রয়োজনীয় ফ্রন্ট। বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মীরা হচ্ছেন এই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে বিভিন্ন স্তরের সেনাধ্যক্ষ। 'বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন সম্ভব নয়'[২৩]—এ থেকে দেখা যায় বাস্তব বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলন কত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও বাস্তব আন্দোলন উভয়ই জনসাধারণেরই আন্দোলন। কাজেই, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ সমস্ত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বাহিনী থাকা উচিত। ব্যাপক জনসাধারণই এক সাংস্কৃতিক বাহিনী। যে বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মী জনগণের ঘনিষ্ঠ নয়, সে একজন সেনাবিহীন সেনাপতির মতো, যার অস্ত্রবল কখনো শত্রুকে ধরাশায়ী করতে পারে না। ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত পূরণ করে নিয়ে চীনা ভাষার লিপির সংস্কার করতে হবে, আমাদের ভাষাকে জনসাধারণের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে; বুঝতে হবে, জনসাধারণই বিপ্লবী সংস্কৃতির অফুরন্ত উৎস।

জাতীয়, বিজ্ঞানসম্মত ও জনসাধারণের সংস্কৃতি হচ্ছে ব্যাপক জনসাধারণের

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং চীনা জাতির নতুন সংস্কৃতি।

নয়া-গণতান্ত্রিক রাজনীতি, নয়া-গণতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সমন্বয়সাধনই নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র; এটা নামেও বাস্তবে যথার্থ চীন প্রজাতন্ত্র। এটা সেই নয়া চীন, যার প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য।

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখুন, নয়া চীন দেখা যাচ্ছে। আসুন, আমরা সকলে তাকে অভিনন্দন জানাই!

দিগন্তের ওপারে দেখা যাচ্ছে নয়া চীনের মাস্তুল। আসুন, আমরা তাকে হর্ষধ্বনি করে স্বাগত জানাই!

আপনার দুহাত উঁচুতে তুলে ধরুন। নয়া চীন আমাদেরই!

টীকা

১। 'চীনা সংস্কৃতি' হল একটি সাময়িক পত্রিকা; ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে ইয়েনান থেকে প্রকাশিত হয়। 'নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঐ পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায়।

২। দ্রষ্টব্য: ভি. আই. লেনিন, 'ট্রেড ইউনিয়ন, বর্তমান পরিস্থিতি এবং ট্রট্স্কি ও বুখারিনের ভুল সম্পর্কে আরও একবার', 'নির্বাচিত রচনাবলী', ইংরাজী সংস্করণ, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৩, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪।

৩। কার্ল মার্কস: '"রাজনৈতিক অর্থবিজ্ঞানের সমালোচনার" ভূমিকা', 'মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত রচনাবলী', ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫৮, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩।

৪। কার্ল মার্কস: 'ফয়েরবাখ সম্পর্কে থিসিস', ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ ৪০৫।

৫। স্তালিন: 'অক্টোবর বিপ্লব ও জাতিসমস্যা', 'রচনাবলী', ৭ম খণ্ড, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৪৪, পৃঃ ১৫১-৫৫।

৬। জে. ভি. স্তালিন: 'আবার জাতিগত প্রশ্ন', 'রচনাবলী', ৪র্থ খণ্ড, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৪৫, ২০২-২১০।

৭। ভি. আই. লেনিন: 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়', 'নির্বাচিত রচনাবলী', ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫০, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ৫৬৬।

৮। বিপ্লবের প্রতি চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতার পর কুওমিনতাঙ সরকার যে অনেকগুলো সোভিয়েত-বিরোধী কাজ করে তার কথাই এখানে বলা হয়েছে। ১৯২৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর কুওমিনতাঙ কুয়াংচৌ শহরের সোভিয়েত ভাইস কন্সালকে হত্যা করে, পরের দিনই নানকিং এ কুওমিনতাঙ সরকার রুশ দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার নির্দেশ জারী করে, বিভিন্ন প্রদেশস্থ সোভিয়েত কন্সালদের ওপর থেকে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয় এবং চীনের বিভিন্ন প্রদেশস্থ সমস্ত সোভিয়েত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম দেয়। সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানিতে ১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে চিয়াং কাই-শেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে উত্তর-পূর্ব চীনে প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ চালায় এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের সৃষ্টি করে।

৯। কামাল ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের তুরস্কের বণিক-বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের তাঁবেদার দেশ গ্রীস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় তুরস্কের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়; ১৯২২ সালে সোভিয়েত সাহায্য পেয়ে তুরস্কের জনগণ গ্রীক বাহিনীকে পরাজিত করে। ১৯২৩ সালে কামাল তুরস্কের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। স্তালিন বলেছিলেন:

> কামালবাদী বিপ্লব হচ্ছে জাতীয় বণিক-বুর্জোয়াদের উপরিস্তরের বিপ্লব। এই বিপ্লব ঘটেছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামের মধ্যে। কিন্তু তার পরবর্তীকালের বিকাশের ধারা অপরিহার্যরূপে কৃষক ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে চলে যায়, এবং কৃষি-বিপ্লবের সম্ভাবনারই পথরোধ করে দাঁড়ায়। 'সান ইয়াৎ-সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগে আলোচনা', 'রচনাবলী', ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫৪, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৬১, দ্রষ্টব্য।

১০। 'অধিবিদ্যাবাগীশ শয়তান' বলতে কমরেড মাও সে-তুঙ চ্যাং চুন-মাই প্রমুখদের কথা উল্লেখ করেছেন। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর চ্যাং চুন-মাই প্রকাশ্যে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে, তারপরে তথাকথিত 'মানসিক সংস্কৃতির' 'আধিবিদ্যক মতবাদ' প্রচার করে; সেই সময়ে তাকে 'অধিবিদ্যাবাগীশ শয়তান' বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে চিয়াং কাই-শেকের উস্কানিতে চ্যাং চুন-মাই 'মিঃ মাও সে-তুঙের নিকট খোলা চিঠি' প্রকাশ করে এতে অষ্টম রুট বাহিনী, নতুন চতুর্থ বাহিনী ও শেনসী-কানসু-

লিংশিয়া সীমান্ত অঞ্চলের বিলোপসাধন করার জন্য উন্মত্তভাবে প্রচার চালায়। এমনি করেই সে জাপানী আক্রমণকারী ও চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন করে।

১১। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রকাশিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণাপত্র দ্রষ্টব্য।

১২। ১৯২৪ সালে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের 'গণ-কল্যাণের নীতি সম্পর্কে বক্তৃতামালার' দ্বিতীয় পাঠ দ্রষ্টব্য।

১৩। চিয়াং কাই-শেক চক্রের গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সর্দার ছেন লি-ফুর ভাড়া করা কয়েকজন প্রতিক্রিয়াশীল লেখক 'প্রাণবাদ' নামক একটা বই লিখেছিল। এই বইয়ে বহু আজগুবী কথা বলা হয়েছিল; এতে কুওমিন-তাঙের ফ্যাসিবাদকে তারস্বরে প্রচার করা হয়। বইটা ছেন লি-ফুর নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৪। 'শ্রম অনুযায়ী বণ্টনের মতবাদ'—এই স্লোগানটি নির্লজ্জভাবে উপ-স্থাপিত করেছিল শানসী প্রদেশের বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ মুৎসুদ্দিদের প্রতিনিধি যুদ্ধবাজ ইয়ান সী-শান।

১৫। ১৯২৭ সালে ওয়াং চিং-ওয়েই বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর একটি প্রবন্ধ লিখেছিল। প্রবন্ধটির শিরোনামা ছিল 'উভয় দিক হতে আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম'।

১৬। ১৯২৫ সালের ৩০শে মার্চ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটির যুগোস্লাভ কমিশনে স্তালিন 'যুগোস্লাভিয়ার জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে' একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। এই ভাষণে তিনি বলেছিলেন:

> ··কৃষকরা হচ্ছে জাতীয় আন্দোলনের মূল সেনাবাহিনী। কৃষকদের এই সেনাবাহিনী ছাড়া শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনের কোন অস্তিত্ব নেই, থাকতেও পারে না।···জাতীয় সমস্যা আসলে একটি কৃষক সমস্যা ('রচনাবলী', ৭ম খণ্ড, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৫৫ দ্রষ্টব্য)।

১৭। কমরেড মাও সে-তুঙ গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় কমিউনিস্ট পার্টির ভেতর কিছু সংখ্যক গোঁড়ামিবাদীরা এটাকে 'পাহাড়ে যাওয়ার নীতি' বলে বিদ্রূপ করে। কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে গোঁড়ামিবাদীদের এই বিদ্রূপাত্মক ভাষা ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন।

১৮। 'আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী' ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদী দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থা। 'রাজকীয় পরীক্ষাপ্রণালী' ছিল সমাজতান্ত্রিক চীনের পুরানো পরীক্ষাব্যবস্থা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনের জাগ্রত বুদ্ধিজীবীরা রাজকীয় পরীক্ষাপ্রণালী বিলোপ করার ও আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব পেশ করেন।

১৯। ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র দেশপ্রেমমূলক আন্দোলন জুন মাসের গোড়ায় এক নতুন স্তরে প্রবেশ করে। ১৯১৯ সালের ৩রা জুন তারিখে সৈন্যবাহিনী এবং পুলিশের দমনমূলক কার্যকলাপকে প্রতিরোধ করার জন্য পিকিং-এর ছাত্রগা গণসমাবেশ করে ভাষণ দেয়। ছাত্ররা যে ধর্মঘট শুরু করে তা ক্রমান্বয়ে শাংহাই, নানকিং, তিয়েনসিন, হাংচৌ, উহান, কিউকিয়াং, আর শানতুং, আনহুই প্রদেশের শ্রমিক ও বণিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ৪ঠা মে'র আন্দোলন তখন থেকে ব্যাপক জনসাধারণের আন্দোলনে পরিণত হয় যাতে সর্বহারাশ্রেণী, শহরে পেটি-বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সকলেই অংশগ্রহণ করে।

২০। ইয়ে চিং ছিল একজন কমিউনিস্ট দলত্যাগী। সে কুওমিনতাঙ গোয়েন্দাবাহিনীর একজন ভাড়াটে গুপ্তচরে পরিণত হয়েছিল।

২১। ইউরোপীয় মার্কিনপন্থী সাংস্কৃতিক পণ্ডিত বলতে বোঝায় সেইসব লোককে, যাদের প্রতিনিধি ছিল প্রতিবিপ্লবী হু শি।

২২। 'সর্বতোভাবে পশ্চিমীকরণ' ছিল কিছু বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের অভিমত। তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সেকেলে পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সংস্কৃতির নির্বিচার প্রশংসা করত। তারা চীনের সবকিছুতেই ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদী দেশগুলির নকল করার পক্ষে ওকালতি করত। এটাকেই তারা 'সর্বতোভাবে পশ্চিমী জিনিস গ্রহণ' বা 'সর্বতোভাবে পশ্চিমীকরণ' নামে অভিহিত করত।

২৩। ভি. আই. লেনিন: 'কী করতে হবে?', 'সংকলিত রচনাবলী', ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪১, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৯।

আত্মসমর্পণের বিপদকে জয় কর, এবং ভালর দিকে মোড় ঘোরাবার চেষ্টা কর

২৮শে জানুয়ারি, ১৯৪০

বর্তমান ঘটনাবলী কেন্দ্রীয় কমিটির বিশ্লেষণের সঠিকতাকেই প্রমাণ করছে। বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের অনুসৃত আত্মসমর্পণের লাইন সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক, শহরের পেটি-বুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়াদের অনুসৃত সশস্ত্র প্রতিরোধের লাইনের তীব্র বিরোধী, এবং এই দুইয়ের মধ্যে সংগ্রাম চলছে। বর্তমানে দুটি লাইনই বিরাজ করছে, এবং ভবিষ্যতে এ দুটির মধ্যে একটিই বিজয়ী হবে। এ প্রসংগে আমাদের সমস্ত পার্টি-কমরেডদের এ কথা উপলব্ধি করতে হবে যে, বিভিন্ন জায়গায় আত্মসমর্পণ, কমিউনিজম-বিরোধিতা ও পশ্চাদপসরণের যেসব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখাটা ঠিক হবে না। এগুলির গুরুত্বকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, দৃঢ়ভাবে এগুলির বিরুদ্ধে লড়তে হবে, এবং এগুলির ফলশ্রুতিতে বিহ্বল হয়ে পড়লে চলবে না। দৃঢ়ভাবে এসব ঘটনার মোকাবিলা করার মানসিকতা বা সঠিক কর্মনীতি যদি আমাদের না থাকে, গোঁড়াপন্থী কুওমিনতাঙদের যদি আমরা তাদের 'কমিউনিস্ট পার্টির সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে সীমাবদ্ধকরণের' কাজ চালিয়ে যেতে দিই, এবং প্রতিনিয়ত যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাবার আশংকায় ভীত হয়ে থাকি, তবে প্রতিরোধ-যুদ্ধই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সারা দেশে আত্মসমর্পণ ও কমিউনিজম বিরোধিতা ছড়িয়ে পড়বে, এবং সত্যিসত্যিই যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাবার বিপদ দেখা দেবে। কিন্তু এটাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আমাদের সংগ্রামে অব্যাহত প্রতিরোধ, ঐক্য ও প্রগতির অনুকূল বাস্তব শর্তাবলী দেশে ও বিদেশে এখনো বিরাজ করছে। যেমন, চীনের প্রতি জাপানের কর্মনীতি এখনো আগের মতোই কঠোর রয়েছে। একদিকে জাপান ও অন্যদিকে ব্রিটেন, মার্কিন ও ফ্রান্সের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের তীব্রতা কিছু কমে গেলেও তাদের মধ্যে প্রকৃত সমঝওতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ইউরোপের যুদ্ধের ফলে প্রাচ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অবস্থান কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সক্রিয়ভাবে চীনকে সাহায্য করছে। এসবের

এই রচনাটি কমরেড মাও সে তুঙ লিখেছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে পার্টির ভেতরকার একটি নির্দেশ হিসেবে।

ফলে জাপানের পক্ষে দূর প্রাচ্যে একটা মিউনিক সম্মেলন তৈরী করাটা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। এই হচ্ছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়, যা কুওমিনতাঙের পক্ষে আত্মসমর্পণ করা বা সমঝওতায় যাওয়া, কিন্তু সমগ্র দেশব্যাপী কমিউনিস্ট-বিরোধী যুদ্ধে নামা দুষ্কর করে দিয়েছে। দেশের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনী আত্মসমর্পণের কর্মনীতির দৃঢ় বিরোধিতা করছে, প্রতিরোধ ও ঐক্যের কর্মনীতিকে তুলে ধরে রাখছে; মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহও আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে; এবং আত্মসমর্পণবাদীরা ও গোঁড়া-পন্থীরা ক্ষমতাশীল হলেও কুওমিনতাঙের মধ্যে তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ। এইসব হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরের বাস্তব বিষয়সমূহ যা কুওমিনতাঙের পক্ষে আত্মসমর্পণ করা বা সমঝওতায় যাওয়া, কিংবা সমগ্র দেশব্যাপী কমিউনিস্ট-বিরোধী যুদ্ধে নামা দুষ্কর করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের পার্টির কর্তব্য হচ্ছে দুটি। একদিকে যেমন তাকে দৃঢ়-সংকল্প হয়ে আত্মসমর্পণবাদী ও গোঁড়াপন্থীদের সামরিক ও রাজনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযানগুলোর বিরোধিতা করতে হবে, অপরদিকে তেমনি তাকে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে বিকাশ ঘটাতে হবে রাজনৈতিক পার্টিসমূহ, সরকারী বিভাগসমূহ, সামরিক বাহিনী, অসামরিক নাগরিক ও বুদ্ধিজীবীদের যুক্তফ্রন্টকে; কুওমিনতাঙের সংখ্যাগরিষ্ঠদেরকে, জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মধ্যপন্থী শ্রেণীসমূহকে ও সামরিক বাহিনীর মধ্যেকার সমর্থকদের নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য তাকে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে, গণ-সংগ্রামকে আরও গভীরতর করে তুলতে হবে, নিজেদের পক্ষে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আসতে হবে, জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলগুলিকে সুসংগঠিত করে তুলতে হবে, জাপ-বিরোধী সামরিক বাহিনী ও জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির কাঠামোগুলোকে বিস্তৃত করে তুলতে হবে। আমরা যদি যুগপৎ এই দুটি কর্তব্য সম্পাদন করি, তাহলে আমরা বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের আত্মসমর্পণের বিপদকে পরাভূত করতে ও পরিস্থিতিকে উন্নতির দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারব। সুতরাং পার্টির বর্তমান সাধারণ কর্মনীতিই হচ্ছে উন্নতির দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো এবং সেই একই সংগে যে-কোন আকস্মিক ঘটনার (এখনো পর্যন্ত যা আছে সীমিত ও স্থানিক পর্যায়ে) মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকা।

ওয়াং চিং-ওয়েই এখন যখন তার বিশ্বাসঘাতকতার চুক্তির[১] কথা ঘোষণা করেছে এবং চিয়াং কাই-শেক জাতির প্রতি তাঁর বাণী প্রকাশ করেছেন, তখন

এতে কোন সন্দেহ নেই যে শান্তির পক্ষের আন্দোলনে অন্তরায় সৃষ্টি হবে এবং প্রতিরোধের পক্ষের শক্তিসমূহের বৃদ্ধি ঘটবে; অপরপক্ষে কমিউনিস্ট পার্টিকে সীমিত করে রাখার জন্য সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা' চলতে থাকবে, আরও অনেক স্থানীয় ঘটনাবলী সৃষ্টি করা হবে, এবং কুওমিনতাঙ আমাদের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য তথাকথিত 'বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে একতার' ওপর জোর দেবে। কেননা, প্রতিরোধের ও প্রগতির সমর্থক শক্তিসমূহ আত্মসমর্পণ-কামী ও পশ্চাদপসরণের শক্তিকে ভাসিয়ে দেবার মতো শক্তি এক্ষুণি তৈরী করে ফেলতে পারছে না। আমাদের কর্মনীতি হচ্ছে দেশের যেখানেই কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন আছে, সেখানেই ওয়াং চিং-ওয়েই'র বিশ্বাস-ঘাতকতার চুক্তির বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযান তীব্রতর করে তোলা। তাঁর বাণীতে চিয়াং কাই-শেক বলেছেন যে, তিনি প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন, কিন্তু জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি জোর দেননি, প্রতিরোধ ও প্রগতি রক্ষা সম্বন্ধেও তিনি কিছু উল্লেখ করেননি, যা বাদ দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করাই অসম্ভব। সুতরাং ওয়াং চিং-ওয়েই'র বিরুদ্ধে অভিযানে আমাদের জোর দিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বলতে হবে: (১) ওয়াং চিং-ওয়েই'র বিশ্বাসঘাতকতার চুক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, প্রতিরোধ যুদ্ধ শেষ ধাপ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার জাতীয় কর্মনীতিকে সমর্থন কর; (২) বিশ্বাসঘাতক ওয়াং চিং-ওয়েই ও তার পুতুল কেন্দ্রীয় সরকারকে উৎখাত কর, সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ কর; (৩) ওয়াং চিং-ওয়েই'র কমিউনিস্ট-বিরোধিতাকে ধূলিসাৎ করে দাও, কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতার প্রতি সমর্থন জানাও, (৪) ওয়াং চিং-ওয়েই মার্কা গোপন বিশ্বাসঘাতকরা নিপাত যাক, জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টে ভাঙন ধরাবার জন্য যার চক্রান্তই হচ্ছে কমিউনিজমের বিরোধিতা করা; (৫) জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী কর, আভ্যন্তরীণ 'সংঘর্ষ' দূর কর; (৬) রাজনৈতিক সংস্কার চালু কর; সাংবিধানিক শাসন-ব্যবস্থাদির জন্য আন্দোলন কর, গণতন্ত্র কায়েম কর; (৭) রাজনৈতিক পার্টিগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নাও, জাপ-বিরোধী পার্টি ও গ্রুপের মর্যাদার আইনগত স্বীকৃতি দাও; (৮) জাপানী ও বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য জনগণের বক্তব্য রাখার ও সমাবেশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দাও; (৯) জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চল সংহত করে গড়ে তোল, ওয়াং চিং-ওয়েই মার্কা বিশ্বাস-ঘাতকদের ভাঙন ধরানোর ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা কর; (১০) যুদ্ধে যারা

প্রকৃতই ভালভাবে লড়ছে সেই সেনাদের প্রতি সমর্থন জানাও, ফ্রন্টে যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ পাঠাও; এবং (১১) প্রতিরোধের সমর্থনে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি কর, প্রগতিবাদী যুবকদের রক্ষা কর, এবং শত্রুর সংগে সহযোগিতামূলক সমস্ত প্রচার নিষিদ্ধ কর। উপরিলিখিত স্লোগানগুলো বহু বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত। বহু সংখ্যক প্রবন্ধাবলী, ইস্তাহার, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি প্রকাশ করতে হবে, বক্তৃতা দিতে হবে, সেই সংগে স্থানীয় পরিস্থিতি বুঝে তার সংগে প্রয়োজনীয় স্লোগান যোগ করতে হবে।

ইয়েনানে ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে ওয়াং চিং-ওয়েই'র বিশ্বাসঘাতকতার চুক্তিকে নিন্দা করার জন্য একটি গণসমাবেশ হতে যাচ্ছে। শত্রুর সংগে সহযোগিতার বিরুদ্ধে, 'সংঘর্ষের' বিরুদ্ধে সমস্ত রকমের ব্যক্তিদের নিয়ে, কুওমিনতাঙের জাপ-বিরোধী সভ্যদের নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমদিকে কিংবা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে এই ধরনের গণ-সমাবেশ আমরা সংগঠিত করব, যাতে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশব্যাপী এক বিরাট গণজাগরণ সৃষ্টি হয়।

টীকা

১। ওয়াং চিং-ওয়েই ১৯৩৯ সালের শেষদিকে জাপানী আক্রমণকারীদের সংগে গোপনে 'চীন-জাপান সম্পর্ক পুনঃসংশোধনের কর্মসূচী' নামে একটি বিশ্বাসঘাতকতামূলক চুক্তি সম্পাদন করে। তার প্রধান ধারাগুলো ছিল: (১) উত্তর-পূর্ব চীন জাপানকে ছেড়ে দিতে হবে এবং 'মঙ্গোলিয়া অঞ্চল' (সে সময়ে যা ছিল সুইয়ুয়ান, চাহার ও উত্তর শানসী নিয়ে গঠিত), উত্তর চীন, ইয়াংসি উপত্যকার নিম্ন-অববাহিকা অঞ্চল ও দক্ষিণ চীনের দ্বীপগুলিকে 'চীন-জাপান সহযোগিতার এলাকা' নামে চিহ্নিত করা হবে, অর্থাৎ সেগুলি স্থায়ীভাবে জাপানী বাহিনীর অধিকারে থাকবে। (২) কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকার পর্যন্ত তাঁবেদারদের শাসন জাপানী উপদেষ্টা ও আমলাদের পর্যবেক্ষণে থাকবে। (৩) পুতুল সরকারের সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ জাপানী সামরিক প্রশিক্ষকদের কাছে ট্রেনিং পাবে এবং জাপান তাদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করবে। (৪) পুতুল সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক কর্মনীতি, তার শিল্পগত ও কৃষি-সংগঠন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা জাপানের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, এবং চীনের প্রাকৃতিক সম্পদ জাপান ইচ্ছামত শোষণ করতে পারবে। (৫) জাপ-বিরোধী সমস্ত কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হবে।

সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ কর এবং গোঁড়া কমিউনিস্ট-বিরোধীদের প্রতিহত কর

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

আমরা, ইয়েনানের সমস্ত স্তরের লোকেরা, আজ এখানে কেন সমবেত হয়েছি? আমরা এখানে এসেছি বিশ্বাসঘাতক ওয়াং চিং-ওয়েইকে নিন্দা করার জন্য, এসেছি সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, এবং গোঁড়া কমিউনিস্ট বিরোধীদের প্রতিহত করার জন্য।

বারবার আমরা কমিউনিস্টরা দেখিয়েছি যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদের কর্মনীতিই হচ্ছে চীনকে পদানত করা। জাপানের মন্ত্রিসভায় যত রদবদলই হোক না কেন, চীনকে পদানত করা ও তাকে একটি উপনিবেশে পরিণত করা সম্পর্কে তার মূল কর্মনীতিতে কোন পরিবর্তন আসবে না। চীনের বৃহৎ বুর্জোয়াদের জাপপন্থী অংশের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ওয়াং চিং-ওয়েই এইসব ঘটনায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং চীনকে জাপানের কাছে বিকিয়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতামূলক একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। তদুপরি সে জাপ-বিরোধী সরকার ও সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি দালাল সরকার ও সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে চাইছে। সম্প্রতি সে চিয়াং কাই-শেকের তেমন বিরোধিতা করছে না, এবং বলা হচ্ছে, সে নাকি 'চিয়াং-এর সংগে মোর্চা' গড়ার দিকে এগোচ্ছে। জাপান ও ওয়াং চিং-ওয়েই—দুজনেরই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিউনিজমের বিরোধিতা করা। তারা এটা বুঝেছে যে, কমিউনিস্ট পার্টিই হচ্ছে জাপানকে রুখবার ব্যাপারে সবচেয়ে দৃঢ়-সংকল্প এবং কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতার অর্থই হচ্ছে প্রতিরোধের শক্তিবৃদ্ধি, এবং সে কারণেই তারা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে এই সহযোগিতায় ভাঙন ধরাতে, বা আরও বেশি চেষ্টা করছে তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে। সেইজন্যই তারা কুওমিনতাঙদের মধ্যেকার গোঁড়াপন্থীদের দিয়ে সর্বত্র গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলছে। হুনানে পিংকিয়াং হত্যাকাণ্ড[1] সংঘটিত হয়েছে;

ইয়েনানে ওয়াং চিং-ওয়েইর প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন করার জন্য সংগঠিত একটি জনসভায় কমরেড মাও সে-তুঙ এই ভাষণটি প্রদান করেন।

'হোনানে চুয়েশান হত্যাকাণ্ড[২]; শানসীতে পুরানো সৈন্যরা নতুন সৈন্যদের আক্রমণ করেছে[৩]; হোপেইতে চাং ইন-যু অষ্টম রুট বাহিনীকে আক্রমণ করেছে[৪]; শানতুঙে চিন-জুং গেরিলাদের আক্রমণ করেছে[৫], পূর্ব হুপেতে চেং জু হুয়াই পাঁচশ থেকে ছ'শ কমিউনিস্টকে খুন করেছে[৬], এবং শেনসি-কানসু-নিংশিয়া সীমান্ত অঞ্চলে গোঁড়াপন্থীরা ভেতর থেকে একটা গুপ্তচর চক্র গড়ে তোলার এবং বাইরে থেকে 'অবরোধ' সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে এবং সশস্ত্র হামলা করার প্রস্তুতি গড়ে তুলছে[৭]। অধিকন্তু, তারা এক বিরাটসংখ্যক প্রগতিশীল তরুণদের গ্রেপ্তার করে তাদের বন্দীশিবিরে আটকে রেখেছে,[৮] এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে বিলুপ্ত করার জন্য, শেনসি-কানসু-নিংশিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে ভেঙে দেবার জন্য এবং অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনীকে ভেঙে ফেলার জন্য তারা সেই আধিবিদ্যক দার্শনিকপ্রবর চ্যাং চুন-মাইকে ভাড়া করেছে; এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে গালাগালি দিয়ে প্রবন্ধ লেখার জন্য তারা ট্রটস্কিপন্থী ইয়ে চিং ও অন্যান্য দালালদের নিয়োগ করেছে। এ সবকিছুর একটাই উদ্দেশ্য— জাপ-বিরোধী প্রতিরোধে ভাঙন ধরানো এবং চীনা জনগণকে ঔপনিবেশিক ক্রীতদাসে পরিণত করা।[৯]

এইভাবে ওয়াং চিং-ওয়েই চক্র ও কুওমিনতাঙের কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়া কুচক্রীরা একসংগে যোগসাজসে কাজ করছে—কেউ সেটা করছে ভেতর থেকে, কেউ করছে বাইরে থেকে এবং তারা একটা বিশৃংখলার সৃষ্টি করেছে।

এইরকম ঘটনায় বেশ কিছু ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন এবং ভাবছেন, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এখন শেষ হয়ে গেছে। কুওমিনতাঙের সদস্যরা সবাই বদমাস এবং তাদের বিরোধিতা করাই সমীচীন। আমাদের এটা অবশ্যই বলতে হবে যে, তাঁদের এই বিক্ষোভ খুবই সঙ্গত, কারণ এইরকম অবস্থায় কেউ কি বিক্ষুব্ধ না হয়ে পারে? কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এখনো শেষ হয়নি এবং কুওমিনতাঙের সকলেই বদমাস নয়। কুওমিনতাঙের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতি বিভিন্নরকম নীতি গ্রহণ করতে হবে। যেসব বিবেকহীন বদমাসরা অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনীকে পেছন থেকে ছুরি মারার, পিংকিয়াং ও চুয়েশানে বিপর্যয় ঘটানোর, সীমান্ত অঞ্চলকে ভেঙে ফেলার এবং প্রগতিশীল সৈন্যবাহিনী, সংগঠন ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের ওপর হামলা চালানোর ঔদ্ধত্য রাখে তাদের কোনক্রমেই সহ্য করা হবে না,—বরং তাদের পাল্টা মার দিতে হবে; তাদের প্রতি সহানুভূতির কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ তারা

এমন ধরনের বিবেকহীন যে, আমাদের জাতীয় শত্রু আমাদের দেশের অভ্যন্তরে অনেক গভীরে ঢুকে পড়ার পরেও তারা দলাদলির সৃষ্টি করছে, বিপর্যয় ঘটাচ্ছে, ভাঙন ধরাচ্ছে। তাদের চিন্তাভাবনা যাই হোক না কেন, তারা কার্যতঃ জাপান ও ওয়াং চিং-ওয়েইকে সাহায্য করছে এবং তাদের কিছু লোক গোড়া থেকেই মুখোস-পরা বেইমান. তাদের শাস্তি দিকে ব্যর্থ হলে ভুল করা হবে; সেটা হবে শত্রুর দোসর ও দেশদ্রোহীদের উৎসাহ দেওয়া, সেটা হবে জাতীয় প্রতিরোধ ও মাতৃভূমির প্রতি অনুগত না থাকা, সেটা হবে যুক্তফ্রন্ট ভাঙার জন্য বদমাসদের আহ্বান করা। সেটা হবে আমাদের পার্টির নীতি ভঙ্গ করা। যাই হোক, আপোষপন্থী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়া কুচক্রীদের আঘাত করার একমাত্র উদ্দেশ্যই হবে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া এবং জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করা। সুতরাং কুওমিনতাঙের সেইসব সদস্যদের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা থাকবে যাঁরা আপোষপন্থী বা কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থী নন, বরং প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রতি যাঁরা অনুগত; আমাদের উচিত হবে তাঁদের সংগে ঐক্য গড়ে তোলা, তাঁদের শ্রদ্ধা করা এবং তাঁদের সংগে দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতা করার ইচ্ছা রাখা, যাতে আমাদের দেশের শৃংখলা বজায় থাকে। যে এর বিপরীত কিছু করবে, সে পার্টির নীতির বিরুদ্ধেই কাজ করবে।

আমাদের পার্টির নীতির দুটি দিক আছে: একদিকে সমস্ত প্রগতিশীল ও জাপ-প্রতিরোধে বিশ্বস্ত লোকজনকে ঐক্যবদ্ধ করা, এবং অপরদিকে আত্ম-সমর্পণকারী ও কমিউনিস্ট বিরোধী গোঁড়াপন্থীদের—যারা হল হৃদয়হীন বদমাস —তাদের বিরোধিতা করা। আমাদের নীতির উভয়দিকের উদ্দেশ্য হল একটি —আরও ভালর দিকে মোড় ফেরানো এবং জাপানকে পরাস্ত করা। কমিউনিস্ট পার্টি ও সারাদেশের জনগণের কাজ হল প্রতিরোধকামী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা, আপোষপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি-গুলিকে প্রতিহত করা এবং বর্তমানের খারাপ অবস্থাকে ঠেকানো ও পরি-স্থিতিকে আরও ভাল করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এটা হল আমাদের মূল নীতি। আমরা আশাবাদী, আমরা কখনো নৈরাশ্যবাদী হব না বা মুষড়ে পড়ব না। আমরা আপোষপন্থী বা কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থীদের কোন হামলাকেই ভয় পাই না। আমরা তাদের অবশ্যই ধ্বংস করব—নিশ্চয়ই এটা আমাদের করতে হবে। চীন নিশ্চয়ই জাতীয় মুক্তি অর্জন করবে; চীন

কখনো ধ্বংস হবে না চীন অবশ্যই উন্নতিলাভ করবে, তার বর্তমান অবনতি নিছক একটি সাময়িক ঘটনা মাত্র।

আমাদের আজকের সভায় আমরা সারাদেশের জনগণের কাছে এটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চাই যে প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে গোটা জাতির ঐক্য ও উন্নতি একান্তই প্রয়োজন। কিছু লোক শুধুমাত্র প্রতিরোধের ওপরে জোর দিয়ে থাকেন এবং ঐক্য ও উন্নতির ওপর মোটেই গুরুত্ব দিতে চান না, বা তার উল্লেখ পর্যন্ত করেন না। এটা ভুল। সাচ্চা ও দৃঢ় ঐক্য ছাড়া, দ্রুত ও দৃঢ় উন্নতি ছাড়া কিভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালানো যেতে পারে? কুওমিনতাঙের মধ্যেকার কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থীরা ঐক্যের উপর জোর দেয়, কিন্তু তাদের তথাকথিত ঐক্য সাচ্চা নয়, লোক-দেখানো; তা যুক্তিসম্মত ঐক্য নয়, তা হল যুক্তিহীন ঐক্য; সে-ঐক্যে সারবস্তু নেই, আছে শুধু ভঙ্গী। তারা ঐক্যের জন্য গলাবাজী করে, অথচ তারা আসলে কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনী এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে বরবাদ করে দিতে চায়; এবং সেটা এই অজুহাতে যে, এগুলির অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিন চীনকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না। তারা সবকিছুই কুওমিনতাঙের হাতে তুলে দিতে চায়, তারা তাদের একদলীয় একনায়কত্বকে শুধু যে বজায় রাখতে চায় তাই নয়, তারা সেটাকে আরও বাড়াতে চায়। এই সবই যদি ঘটতে থাকে, তাহলে কোন্ ধরনের ঐক্য গড়ে উঠতে পারে? সত্য কথা বলতে কি, যদি কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনী এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল এগিয়ে না আসত এবং গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য জাপ-প্রতিরোধের প্রয়োজনে ঐক্য গড়ার জন্য আন্তরিকভাবে যুক্তফ্রন্ট গড়ার, অথবা সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার উদ্যোগ না নিত, তাহলে জাপানকে প্রতিরোধ করার কোন সম্ভাবনাই থাকত না। এবং যদি আজ কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট বাহিনী, নয়া চতুর্থ বাহিনী, শেনসি কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল এবং জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকাগুলি না এগিয়ে আসত এবং আন্তরিকভাবে জাপানকে প্রতিরোধ না করত, যদি আত্ম-সমর্পণের, ভাঙনের ও পিছিয়ে যাওয়ার বিপজ্জনক ঝোঁকগুলিকে না ঠেকাত, তাহলে পরিস্থিতি একটা ভয়াবহ অবস্থায় গিয়ে পড়ত। অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনীর কয়েকশ হাজার ফৌজ জাপানী সৈন্যদের চল্লিশটি ডিভি-সনের মধ্যে সতেরোটি ডিভিসনের সংগে লড়াই বাধিয়ে শত্রুসৈন্যের পাঁচ

ভাগের দুই ভাগকে আটকে রেখেছে[10] এই ফৌজগুলিকে ভেঙে দেওয়া হবে কেন? খেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত এলাকা দেশের সবচেয়ে প্রগতিশীল এলাকা, এটা হল গণতান্ত্রিক জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকা। এখানে প্রথমতঃ, কোন দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী নেই; দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় কোন দুর্বৃত্ত ও মন্দ অভিজাতরা নেই; তৃতীয়তঃ, কোন জুয়াখেলা নেই; চতুর্থতঃ; কোন বেশ্যা নেই; পঞ্চমতঃ, কোন উপপত্নী নেই; ষষ্ঠতঃ, কোন ভিক্ষুক নেই; সপ্তমতঃ, কোন সংকীর্ণ আত্মসর্বস্ব গোষ্ঠী নেই; অষ্টমতঃ, কুঁড়েমি ও ঢিলেমির আবহাওয়া নেই; নবমতঃ, কোনো পেশাদার বিভেদকামী নেই; এবং দশমতঃ, কোন যুদ্ধবাজ মুনাফাখোর নেই। তাহলে সীমান্ত অঞ্চলকে বিলুপ্ত করা হবে কেন? কেবলমাত্র একবারে নির্লজ্জ লোকেরাই এরকম লজ্জাকর প্রস্তাব দিতে পারে। এইসব গোঁড়াপন্থীরা কোন্ অধিকারে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে? না, কমরেড! যেটা প্রয়োজন তা হল সীমান্ত অঞ্চলকে বিলুপ্ত করা নয়, বরং গোটা দেশকে ওই রাস্তায় নিয়ে যাওয়া, অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনীকে ভেঙে ফেলা নয়, বরং গোটা দেশকে সেইদিকে নিয়ে যাওয়া, কমিউনিস্ট পার্টিকে উঠিয়ে দেওয়া নয় বরং সমস্ত দেশকে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা, অগ্রণী জনগণকে পেছিয়ে থাকা জনগণের ঠেলে দেওয়া নয়, বরং পেছিয়ে থাকা স্তরের জনগণকে প্রথম স্তরের জনগণের স্তরে পৌঁছে দেওয়া। আমরা কমিউনিস্টরা ঐক্য গড়ার সবচেয়ে দৃঢ় প্রবক্তা, আমরাই যুক্তফ্রন্ট গড়েছি এবং তাকে বজায় রেখেছি, আমরাই ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্লোগান তুলেছি। আর কারা এইসব আওয়াজ তুলতে পারত? আর কারা এগুলিকে কাজে পরিণত করতে পারত? আর কারা মাসিক মাত্র পাঁচ ইউয়ান ভাতায় সন্তুষ্ট থাকত?[11] আর কারা এরকম একটি সুষ্ঠু ও সৎ সরকার গড়তে পারত? ঐক্যের বুলি কপচানি ঢের হয়েছে। আত্মসমর্পণকামীদের ঐক্যের এরকম ধারণা রয়েছে, তারা আমাদের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের আত্মসমর্পণের রাস্তায় নিয়ে যেতে চায়; কমিউনিস্ট বিরোধী গোঁড়াপন্থীরা তাদের ঐক্যের ধারণা অনুযায়ী আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে ভাঙনের ও অবনতির দিকে নিয়ে যেতে চায়। আমরা কি কখনো তাদের এইসব ধারণাকে গ্রহণ করতে পারি? যে ঐক্য প্রতিরোধ সংহতি ও প্রগতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না, তাকে কি সাচ্চা অথবা যুক্তিযুক্ত অথবা আসল ঐক্য বলা যায়? কি আজগুবি স্বপ্ন! ঐক্য প্রসঙ্গে আমাদের

যা ধারণা সেটা বলার জন্যই আমরা আজ এখানে মিলিত হয়েছি। ঐক্য সম্পর্কে আমাদের ধ্যানধারণার সংগে চীনের সমস্ত জনগণের, বিবেকবান প্রতিটি নরনারীর ধ্যানধারণার মিল রয়েছে। প্রতিরোধ, মিলন ও প্রগতির ভিত্তিতে এটা গড়ে উঠেছে। প্রগতির মধ্য দিয়েই আমরা ঐক্যে আসতে পারি; ঐক্যের মধ্য দিয়েই আমরা জাপানকে রুখতে পারি; এবং প্রগতি, ঐক্য ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই সারাদেশ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। ঐক্য প্রসঙ্গে এই হচ্ছে আমাদের ধ্যানধারণা—যা হচ্ছে খাঁটি, বিচারবুদ্ধিসম্মত ও আসল ঐক্য। মেকী, যুক্তিহীন ও বাহ্যিক ঐক্যের ধ্যানধারণা দেশকে পরাধীনতার পথে নিয়ে যায়। চূড়ান্তরকম বিবেকহীন লোকেরাই ঐক্য প্রসঙ্গে এইরকম ধারণা পোষণ করে থাকে। এইসব লোকেরা কুওমিনতাঙের নেতৃত্বে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনী এবং জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকাগুলিকে ধ্বংস করতে এবং সমস্ত জাপ-বিরোধী স্থানীয় শক্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। এটা হল একটা চক্রান্ত, ঐক্যের নামে স্বৈরাচারী শাসনকে চিরস্থায়ী করার, ভেঁড়ার মাথায় লেবেল এঁটে কুকুরের মাংস বিক্রি করার মতো ঐক্যের নামে একদলীয় একনায়কত্ব চালানোর একটা অপচেষ্টা; যারা সমস্তরকম লজ্জার মাথা খেয়েছে, এটা হল সেইসব মেনীমুখো হামবড়াদের চক্রান্ত। সংক্ষেপে, আমরা তাদের এইসব কাণ্ডজ্ঞে বাঘদের বেলুন চুপসে দেবার জন্যই এখানে মিলিত হয়েছি। আসুন, আমরা অক্লান্তভাবে এইসব কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থীদের প্রতিহত করি।

টীকা

১। পিংকিয়াং হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এই খণ্ডে প্রকাশিত 'প্রতিক্রিয়াশীলদের শাস্তি দিতে হবে' শীর্ষক প্রবন্ধের ১নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২। ১৯৩৯-এর ১১ই নভেম্বর তারিখে চুয়েশান হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়, কুওমিনতাঙের ১৮০০ সাদা পোশাকের গোয়েন্দা পুলিস ও সৈন্য হোনান প্রদেশের চুয়েশান পরগণার চুকৌ শহরে অবস্থিত নয়া চতুর্থ বাহিনীর যোগাযোগ দপ্তরের ওপর হামলা করে। ২০০ লোক খুন হয়, জাপ-বিরোধী যুদ্ধে আহত নয়া চতুর্থ বাহিনীর অফিসার এবং সৈন্যরা ও তাদের পরিবারবর্গও খুন হয়।

৩। পুরানো সৈন্যবাহিনী বলতে বোঝাচ্ছে শানশীর যুদ্ধবাজ ভূস্বামী ইয়েন শি-শানের বাহিনী; নতুন বাহিনী হচ্ছে জাপ-বিরোধী জীবনপণ করে যুদ্ধ করা সৈনিকরা জাপ-বিরোধী গণফৌজ, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে-বাহিনী গড়ে উঠেছে। ১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে চিয়াং ও ইয়েন শি-শান ছয় কোর সৈন্য পশ্চিম শানশীতে আক্রমণ পরিচালনার জন্য জমায়েত করে, কিন্তু পরাজিত হয়। সেইসময়ে ইয়েনের বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব শানশীর ইয়াংছেং-ছিনচেঙে অবস্থিত জাপ বিরোধী সরকারী সংস্থাসমূহ ও গণ-সংগঠনগুলোর ওপর আক্রমণ চালায় এবং বহু কমিউনিস্ট ও প্রগতিপন্থীকে খুন করে।

৪। হোপেইতে কুওমিনতাঙী গুণ্ডাদের শান্তিরক্ষা বাহিনীর অধিনায়ক চ্যাঙ ইন-য়ু ১৯৩৯-এর জুন মাসে হঠাৎ অষ্টম রুট বাহিনীর হোপেইর শেন-সিয়েনে অবস্থিত দপ্তরের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ৪০০র বেশি কর্মী ও সৈন্যকে খুন করে।

৫। ১৯৩৯-এর এপ্রিলে কুওমিনতাঙী গভর্নর শেন হুং-লিয়ের নির্দেশে চিন চি-হুঙের গুণ্ডাবাহিনী পেশোনে অবস্থিত অষ্টম রুট বাহিনীর শানতুং কলামের তৃতীয় গেরিলা বাহিনীর ওপর হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে অফিসারসহ প্রায় ৪০০ জনকে খুন করে।

৬। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে পূর্ব হুপেইর কুওমিনতাঙের সামরিক অফিসার চেঙ জু-হুয়াই'র নেতৃত্বে নয়া চতুর্থ বাহিনীর যোগাযোগ দপ্তরের ওপর আক্রমণ পরিচালিত হয় এবং ৫।৬শ কমিউনিস্ট নিধন হয়।

৭। ১৯৩৯-এর শীতকাল থেকে ১৯৪০-এর বসন্তকাল পর্যন্ত কুওমিনতাঙী বাহিনী শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের পরগণা শহর চুনহুয়া, সুনাই, চেংনিং, নিঙচিয়েন ও চেনয়ুয়ান দখল করে রাখে।

৮। জার্মান ও ইতালীয় ফ্যাসিস্টদের অনুকরণে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়া-পন্থীরা উত্তর-পশ্চিমের লানচৌ ও সিয়ান থেকে দক্ষিণ-পূর্বে কানচৌ ও শাংরাও পর্যন্ত অঞ্চলে বহুস্থানে বন্দীশিবির স্থাপন করে। বহুসংখ্যক কমিউনিস্ট, দেশব্রতী জনগণ ও প্রগতিশীল যুবকবৃন্দ এইসব বন্দীশিবিরে আবদ্ধ থাকতেন।

৯। ১৯৩৮ এর অক্টোবরে উহানের পতনের পর কুওমিনতাঙ তার কমিউনিস্ট বিরোধিতা আরও তীব্রতর করে। ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারিতে চিয়াং গোপনভাবে 'কমিউনিস্ট সমস্যাবলী মোকাবিলা করার ব্যবস্থাসমূহ' ও 'জাপ-

অধিকৃত অঞ্চলে কমিউনিস্ট কার্যবলী থেকে রক্ষার ব্যবস্থাবলী' নামক ছুটি নির্দেশনামা প্রেরণ করে এবং কুওমিনতাঙ অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে দলন তীব্রতর করে ও তার সামরিক ব হিনী মধ্য ও উত্তর চীনে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর আক্রমণ করতে থাকে। এই তীব্র আক্রমণ তীব্রতম হয়ে ওঠে ১৯৩৯-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪০-এর মার্চের মধ্যবর্তী সময়ে।

১০। অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনী পরবর্তীকালে আরও বেশি সংখ্যায় জাপ-বাহিনীর মোকাবিলা করে। ১৯৪৩ এর মধ্যে মোট জাপ-হানাদার বাহিনীর শতকরা ৬৪ ভাগ ও পুতুল বাহিনীর শতকরা ৯৫ ভাগকে মোকাবিলা করতে থাকে।

১১। কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন জাপ-বিরোধী সমস্ত সশস্ত্র বাহিনী ও জাপ-বিরোধী সরকারের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মাসিক ব্যয় বাবদ দেওয়া হতো মাত্র ৫ ইউয়ান করে মুদ্রা।

কুওমিনতাঙের কাছে দশ দফা দাবি

১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

ওয়াং চিং-ওয়েই'র বিরুদ্ধে ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে ইয়েনানে অনুষ্ঠিত এই জনসভা যথার্থ ক্রোধের সংগে সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াং চিং-ওয়েই'র বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসমর্পণকে নিন্দা করার এবং শেষ পর্যন্ত জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। বর্তমান সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং প্রতিরোধ যুদ্ধের বিজয়কে সুনিশ্চিত করে তোলার জন্য এবং দেশকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে দশটি প্রধান বিষয় তুলে ধরছি, এবং আশা করছি যে, জাতীয় সরকার, সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপ, প্রতিরোধ যুদ্ধে সংগ্রামরত সমস্ত অফিসার ও যোদ্ধা, এবং আমাদের সমস্ত স্বদেশবাসী এগুলিকে গ্রহণ ও কার্যকরী করবেন।

১। সমগ্র জাতি ওয়াং চিং-ওয়েইদের নিন্দা করুক। এখন বিশ্বাসঘাতক ওয়াং চিং-ওয়েই যখন তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে জোট বেঁধেছে, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, শত্রুর সংগে গাঁটছড়া বেঁধেছে এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক চুক্তি সম্পাদন করেছে, যাদের পেছনে কেউটেয়ের ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তখন সমগ্র দেশবাসীই তার মৃত্যু দাবি করছে। কিন্তু এভাবে শুধু প্রকাশ্য ওয়াং চিং-ওয়েইদেরকেই শায়েস্তা করা যাবে, গোপন ওয়াংরা এতে রেহাই পেয়ে যাবে। এই শোয়েক্তরা ধূর্ততার সংগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি দখল করে গা ঢাকা দিয়ে আছে, লুকিয়ে চুরিয়ে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঢুকে পড়ছে। বস্তুতঃ দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা ওয়াং চিং-ওয়েইরই দলের লোক, আর সমস্ত বিভেদকামীরা হচ্ছে তার ভাড়াটে লোক। সারা দেশ জুড়ে, শহরে ও গ্রামে এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল, সরকারী সংস্থা, সৈন্যবাহিনী, বেসামরিক সংস্থা, সংবাদপত্র ও শিক্ষায়তনসহ যেখানেই সবাই সমবেত হয়, তার ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত ওয়াং চিং-ওয়েইদের নিন্দা করার অভিযান যদি না চালানো হয়, তবে ওয়াং চিং-ওয়েই

ওয়াং চিং-ওয়েইকে নিন্দা করার জন্য ইয়েনানে অনুষ্ঠিত জনসভার পক্ষে কমরেড মাও সে-তুঙ এই খোলা তারবার্তাটি রচনা করেন।

চক্রকে দূর করা যাবে না, বরং তারা তাদের অবাধ কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারবে এবং বাইরে থেকে শত্রুকে দরজা খুলে দিয়ে ও ভেতর থেকে অন্তর্ঘাত-মূলক কাজ চালিয়ে প্রভূত ক্ষতিসাধন করবে। সরকারের উচিত হচ্ছে ওয়াং চিং-ওয়েইদের ধিক্কার দেওয়ার জন্য সমস্ত জনগণকে আহ্বান জানিয়ে নির্দেশ জারী করা। যেখানেই এই নির্দেশ পালিত না হবে, সেখানেই কর্মচারীদের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হবে। ওয়াং চিং-ওয়েই'র দলবলকে অবশ্যই শায়েস্তা করতে হবে। এটা হচ্ছে প্রথম দফা; একে মেনে নেওয়ার জন্য ও তদনুযায়ী কাজ করার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি।

২। ঐক্যকে জোরদার কর। আজকাল কিছু লোক ঐক্যের কথা না বলে একীকরণের কথা বলতে শুরু করেছে। এর অর্থ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টিকে ধ্বংস করা, অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনীকে বরবাদ করা, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে বিলুপ্ত করা। এবং প্রতিটি জায়গার জাপ-বিরোধী শক্তিকে বিনষ্ট করা। এই ধরনের বক্তব্য কিন্তু একটা বিষয়কে চেপে যাচ্ছে এবং তা হচ্ছে এই যে, কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট ও নয়া চতুর্থ বাহিনী এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলটিই আজ গোটা চীন জুড়ে সাচ্চা একীকরণের সবচেয়ে দৃঢ় প্রবক্তা। এরাই কি সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রস্তাব করেনি? এরাই কি তারা নয়, যারা জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে, ঐক্যবদ্ধ চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাব রেখেছে এবং এই দুয়ের জন্য প্রকৃতই কঠোর পরিশ্রম করেছে? জাতিকে রক্ষার, শত্রুসৈন্যের সতেরটি ডিভিসনকে প্রতিরোধের, কেন্দ্রীয় সমতলভূমি ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অবরোধের উত্তর চীন ও ইয়াংসীর নিম্না-ঞ্চলের দক্ষিণ দিকের এলাকাগুলির প্রতিরক্ষার এবং তিন-গণনীতি, গণতন্ত্র প্রতিরোধ ও জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচী দৃঢ়তার সংগে রূপায়ণের পুরোভাগে যারা রয়েছে, তারা কি এরাই নয়? তথাপি যে মুহূর্তে ওয়াং চিং-ওয়েই খোলাখুলি কমিউনিস্টদের বিরোধিতায় নামল এবং জাপানীদের সংগে ভিড়ে পড়ল, অমনি চ্যাং চুন-মাই ও ইয়ে চিঙের মতো ধড়িবাজরা তালে তাল মিলিয়ে অভিসন্ধিমূলক প্রবন্ধ লিখতে লাগল এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী ও গোঁড়া কূটক্রীদের দলবল 'সংঘর্ষ' বাধিয়ে তাদের সংগে যোগ দিল। ইতিমধ্যে একীকরণের নামে স্বৈরাচারী শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐক্যের নীতিকে বাতিল করা হয়েছে, বিভেদের তীক্ষ্ণ ফলা ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই

পুতুল চাও কৌশলটি আবার প্রতিটি লোকেরই জানা।[১] কমিউনিস্ট পার্টি পাইন রুট ও মরা চতুর্থ বাহিনী এবং মৌলবাদ সকল চক্রান্তের প্রধান কৌশলী একীকরণের বিপক্ষে ও সাচ্চা একীকরণের সপক্ষে, যুক্তিসঙ্গত একীকরণের সপক্ষে ও অযৌক্তিক একীকরণের বিপক্ষে, সাংগঠনিক একীকরণের পক্ষে এবং অভিসন্ধি একীকরণের বিপক্ষে। তারা একীকরণের কথা বলে প্রতিরোধের জন্য—আত্মসমর্পণের জন্য নয়, ঐক্যের জন্য—বিচ্ছেদের জন্য নয়, এগিয়ে যাবার জন্য—পেছিয়ে যাওয়ার জন্য নয়। প্রতিরোধ, ঐক্য ও প্রগতি—এই তিনটির ওপর ভিত্তি করেই কেবল সাচ্চা, যুক্তিসঙ্গত ও প্রকৃত একীকরণ হতে পারে। অন্য কোন ভিত্তির ওপর একীকরণ করতে গেলে, তারজন্য যে ছলচাতুরীই করা হোক না কেন, সেটা হবে উত্তরে 'গাড়ি চালিয়ে দক্ষিণে যাওয়ার' মতো। এরকম ব্যাপারে আমরা সায় দিতে রাজী নই। সমস্ত জাপানী-বিরোধী শক্তিকে একই নজরে দেখতে হবে, কারোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো বা কারোর প্রতি বিরূপ হওয়া চলবে না। তাদের সকলকেই বিশ্বাস করতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে, সমর্থন করতে হবে এবং পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে। জনগণের সংগে আচার-আচরণে ভণ্ডামি নয়—চাই আন্তরিকতা সংকীর্ণতা নয়—চাই মনের ঔদার্য। সত্যিই যদি এইভাবে কাজ করা যায় তাহলে অসদুদ্দেশ্যপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া সকলেই ঐক্যবদ্ধ হবে এবং জাতীয় একীকরণের পথে চলবে। একীকরণের ভিত্তি হবে ঐক্য এবং ঐক্যের নিজের ভিত্তি হবে প্রগতি, একমাত্র প্রগতিই ঐক্য আনতে পারে আর কেবলমাত্র ঐক্যই আনতে পারে একীকরণ। এটা হচ্ছে একটা অপরিবর্তনীয় সত্য। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দফা যেটা গ্রহণ করার ও কাজে পরিণত করার জন্য আমরা আপনাদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

৩। সাংবিধানিক সরকারকে কার্যকরী কর। দীর্ঘদিন ধরে 'রাজনৈতিক মাতব্বরী' কোন কিছুই দেয়নি। 'কোন জিনিসকে খুব বেশি করে ধাক্কা দিলে সে তার বিপরীত দিকে ঘুরে যায়', আর তাই সাংবিধানিক সরকার আজকের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোন বাক্-স্বাধীনতা নেই, রাজনৈতিক দলগুলির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়নি এবং প্রত্যেক জায়গাতেই সাংবিধানিক ব্যবস্থাদি লংঘিত হচ্ছে। এই পথেই যদি সংবিধান রচনা করা হয় তাহলে তা হবে নেহাৎই একটা কাগজে ব্যাপার। একদলীয় একনায়কত্বের চেয়ে এই ধরনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা আলাদা কিছু হবে না।

এখন যেহেতু গুরুতর এক জাতীয় সংকট চলছে, জাপানীরা ও ওয়াং চিং-ওয়েইরা বাইরে থেকে আমাদের বিব্রত করছে এবং বিশ্বাসঘাতকরা ভেতর থেকে আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরাচ্ছে, সেহেতু যদি নীতির পরিবর্তন না ঘটে তাহলে জাতি ও জনগণ হিসেবে আমাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়বে। সরকার যে আন্তরিকভাবে সাংবিধানিক ব্যবস্থাদি কার্যকরী করতে চায়, সেটা প্রমাণের জন্য তাকে রাজনৈতিক দলগুলির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। জনগণের ও জাতির ভাগ্য নতুনভাবে নির্ধারণের জন্য এর চেয়ে জরুরী কাজ আর কিছু নেই। এটা হচ্ছে তৃতীয় দফা, যা গ্রহণ ও কার্যকরী করার জন্য আমরা আপনাদের কাছে আহ্বান রাখছি।

৪। 'সংঘর্ষ' বন্ধ করা। গত বছর মার্চ মাসে 'বিদেশী দলগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা' চালু হওয়ার পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে 'নিয়ন্ত্রণ করা', 'দূষিত করে ফেলা' ও 'প্রতিহত করার' গর্জন সারা দেশ জুড়ে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে, একটার পর একটা বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটেছে, যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছে। এসবও যেন যথেষ্ট নয়, তাই গত বছর অক্টোবরে 'বিদেশী পার্টির সমস্যা মোকাবিলার ব্যবস্থা' নামে অতিরিক্ত ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এরও পরে উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য চীনে রয়েছে 'বিদেশী পার্টির সমস্যা মোকাবিলার নির্দেশ'। জনগণ ন্যায্যভাবেই বলছেন, কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে 'রাজনৈতিক বিধিনিষেধ'-এর পর 'সামরিক বিধিনিষেধ' চালু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কমিউনিজমের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার অর্থ হল কমিউনিজমের বিরোধিতা করা। চীনকে পদানত করার জন্য জাপানীরা এবং ওয়াং চিং-ওয়েই কমিউনিজম-বিরোধিতার ধূর্ত ও ক্ষতিকারক পরিকল্পনা নিয়েছে। এই কারণেই জনগণ সন্দিগ্ধ ও বেদনাহত এবং এ সম্বন্ধে পরস্পর আলোচনা করছে, তাদের আশংকা হচ্ছে, এক যুগ আগের মর্মান্তিক বিয়োগান্তক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে। ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে। হুনানে পিংকিয়াং বিপর্যয় ঘটেছে, হোনানে ঘটেছে চুয়েশান বিপর্যয়, হোপেইতে অষ্টম রুট বাহিনীর ওপর চ্যাং য়িন-উ আক্রমণ চালিয়েছে, শানতুঙে গেরিলাদের ওপর চিন চি-জুং হামলা করেছে, পূর্ব হুপেতে চেং জু-হুয়াই পাঁচ-ছয়শ কমিউনিস্টকে নির্মমভাবে খুন করেছে, পূর্ব কানসুতে অষ্টম রুট বাহিনীর শিবিরস্থিত সৈন্যের ওপর ব্যাপক আকারে হামলা করা হয়েছে, এবং আরও সম্প্রতি শানসিতে

বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটেছে, সেখানে পুরানো বাহিনী নতুন বাহিনীকে আক্রমণ করেছে এবং যেসব জায়গা অষ্টম রুট বাহিনীর দখলে ছিল সেগুলিকে. আক্রমণ করেছে। এই ধরনের ঘটনা যদি এই মুহূর্তে নিষিদ্ধ করা না হয়, তাহলে দু পক্ষই ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং তাহলে জাপানকে পরাজিত করার কোন আশাই কি আর থাকবে? প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রয়োজনে ঐক্যের স্বার্থে সরকারকে এই বিপর্যয়গুলির জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তির আদেশ দিতে হবে এবং গোটা জাতির কাছে এ কথা ঘোষণা করতে হবে যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর ঘটতে দেওয়া হবে না। এটি হল চতুর্থ দফা; এটি গ্রহণ করার জন্য ও রূপায়িত করার জন্য আপনাদের কাছে আমার আহ্বান জানাচ্ছি।

৫। যুবকদের রক্ষা কর। সিয়ান-এর কাছে ইতিমধ্যেই বন্দীশিবির খোলা হয়েছে, এবং জনগণ এ কথা শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন যে, সেখানে উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য চীন থেকে সাতশরও বেশি প্রগতিশীল যুবককে আটকে রেখে দেওয়া হয়েছে, তাদের ওপর মানসিক ও দৈহিক নিপীড়ন চালানো হচ্ছে ও কয়েদীর মতো আচরণ করা হচ্ছে। কোন্ অপরাধে তারা এ ধরনের নির্মমতার শিকার হচ্ছে? যুবকরা হচ্ছে জাতির প্রাণ এবং বিশেষ করে প্রগতিশীল যুবকরা প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। প্রত্যেকের বিশ্বাসের স্বাধীনতা থাকা উচিত, অস্ত্রের ঝনঝনানি দিয়ে আদর্শকে কখনো দাবিয়ে দেওয়া যায় না। দশ বছর ধরে যে 'সাংস্কৃতিক অবদমন' চালানো হয়েছে, সেটা প্রত্যেকেই জানে; কেউ আবার কেন তা ঘটাতে চাইবে? যুবকদের রক্ষার উদ্দেশ্যে সিয়ান-এর নিকটবর্তী বন্দীশিবির উচ্ছেদের জন্য ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যুবকদের ওপর বীভৎস হামলা নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারের উচিত সারাদেশ জুড়ে আদেশ জারী করা। এটি হল পঞ্চম দফা; এটি গ্রহণ ও কার্যকরী করার জন্য আপনাদের কাছে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

৬। ফ্রন্টকে সমর্থন কর। যুদ্ধের সম্মুখসারিতে যেসব সৈন্য লড়াই করছে এবং যাদের কাজের রেকর্ড চমৎকার, যেমন অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনী এবং অন্যান্য কয়েকটি ইউনিটের—তারা অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার পাচ্ছে; তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ যৎসামান্য, খাওয়া-দাওয়া অযত্ন, তারা দরকার মতো গুলিবারুদ ওষুধপত্র পর্যন্ত পাচ্ছে না। অথচ, তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার জন্য বিবেকহীন বিশ্বাসঘাতকদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তাদের

বিরুদ্ধে কান-বালাপালা-করে-দেওয়া অসংখ্য কুৎসা ছড়ানো হচ্ছে। ক্ষতিত্বের কোন পুরস্কার নেই, কৃতিত্বপূর্ণ কাজকর্মের কোন উল্লেখ নেই, থাকছে শুধু মিথ্যা অভিযোগ ও বিদ্বেষপূর্ণ ষড়যন্ত্রের নির্লজ্জ স্পর্ধা। এইসব উদ্ভট অবস্থার ফলে অফিসার ও কর্মীদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে আর শত্রুরা হাততালি দিচ্ছে, কোনরকমেই কিছুতেই এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। সৈন্যদের মনোবল জাগানোর জন্য এবং যুদ্ধের সাহায্যের জন্য সরকারকে সম্মুখভাগের সৈন্যদের ও যাদের কাজের রেকর্ড ভাল তাদের যথাযথ দায়িত্ব উপযুক্তভাবে বহন করতে হবে, এবং সেই সংগে তাদের বিরুদ্ধে যেসব বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কুৎসা ও অভিযোগ করা হচ্ছে তা নিষিদ্ধ করতে হবে। এটি হল ষষ্ঠ দফা; এটি গ্রহণ করার জন্য ও তদনুযায়ী কাজ করার জন্য আমরা আপনাদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

৭। গোয়েন্দা বিভাগকে নিষিদ্ধ কর। গোয়েন্দা বিভাগের বে-আইনী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য জনগণ একে তাং রাজবংশের চৌ সিং ও লাই জুন-চেন[2] এবং মিং রাজবংশের ওয়েই চুং-সিয়েন ও লিউ চিন-এর[3] সংগে তুলনা করছে। শত্রুকে বাদ দিয়ে তারা দেশের লোকের ওপর চড়াও হচ্ছে, অসংখ্য মানুষকে খুন করছে, ক্রমাগত ঘুষ নিয়েও তাদের আকাঙ্ক্ষা মিটছে না; প্রকৃতপক্ষে গোয়েন্দা বিভাগটি গুজবপ্রিয় লোকজনদের সদর দপ্তর আর দেশদ্রোহিতা ও বদমায়েসির কারখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব জায়গাতেই সাধারণ মানুষ এই উন্মত্ত ঘাতকদের দেখলে ভয়ে আঁতকে ওঠে ও পালিয়ে যায়। নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য সরকারকে এই মুহূর্তে গোয়েন্দা বিভাগের এইসব কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করতে হবে, একে যাতে সম্পূর্ণরূপে শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যায় তার জন্য এর কার্যাবলী নির্দিষ্ট করে দিয়ে একে পুনর্গঠিত করতে হবে, এবং তার ফলে জনগণের আস্থা আসবে, এবং রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে শক্তিশালী। এটি হল সপ্তম দফা, যা গ্রহণ ও কার্যকরী করার জন্য আমরা আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি।

৮। দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের বরখাস্ত কর। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে জাতীয় সংকটের সুযোগে অফিসারদের দ্বারা দশ কোটি ইউয়ান তছরুপ করা ও আট অথবা নটি করে উপপত্নী রাখার ঘটনা ঘটেছে। বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যবাহিনীতে নাম তালিকাভুক্ত করার ব্যাপারে সরকারী কাজ, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, দুর্ভিক্ষত্রাণ ও যুদ্ধযান ব্যাপারে—সব কিছুতেই

দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসাররা টাকা কামানোর সুযোগ করে নিয়েছে। যেখানে এইরকম একদঙ্গল নেকড়ে হিংস্রভাবে ছোটাছুটি করে, সেখানে যে দেশে গণ্ডগোল দেখা দেবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। জনসাধারণ অসন্তোষ ও ক্রোধে ফুঁসছেন, কিন্তু এইসব অফিসারদের নিষ্ঠুরতা উদ্ঘাটন করতে কেউই সাহসী হচ্ছেন না। দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের দূর করে দেওয়ার জন্য এই মুহূর্তে কঠোর ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। এটি হল অষ্টম দফা; এটি গ্রহণ ও কার্যকরী করার জন্য আমরা আপনাদের কাছে আহ্ব'ন জানাচ্ছি।

৯। ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের ইচ্ছাপত্রকে কাজে প্রয়োগ কর। ইচ্ছাপত্রে বলা হয়েছে:

চল্লিশ বছর ধরে আমি চীনের স্বাধীনতা ও সাম্যের উদ্দেশ্যে নিজেকে জাতীয় বিপ্লবের কাজে উৎসর্গ করেছি এই চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি দৃঢ়ভাবে এ কথা বুঝেছি যে এই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে জনগণকে জাগিয়ে তুলতেই হবে।...

এটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য এবং আমরা চীনের ৪৫ কোটি জনগণ এর সংগে পরিচিত। কিন্তু এই ইচ্ছাপত্রটি যত না কার্যকরী হচ্ছে, উচ্চারিত হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি। যারা এর পবিত্রতা নষ্ট করছে তারা পুরস্কৃত হচ্ছে, আর যাঁরা একে মর্যাদা দিচ্ছেন তাঁরা শাস্তি পাচ্ছেন। এর চেয়ে অযৌক্তিক ব্যাপার আর কি হতে পারে? সরকারকে নির্দেশ জারী করতে হবে, যারা ইচ্ছাপত্রটিকে অমান্য করবে এবং জনগণকে জাগিয়ে তোলার পরিবর্তে তাদের পদদলিত করবে, তাদের শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ তারা ডঃ সান ইয়াৎ সেনের স্মৃতিকে কলঙ্কিত করছে। এটি হচ্ছে নবম দফা; এটি গ্রহণ ও কার্যকরী করার জন্য আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি।

১০। তিন-গণনীতিকে কাজে রূপায়িত কর। তিন গণনীতি হল কুওমিনতাঙের মঞ্চ। অথচ অনেক ব্যক্তিই কমিউনিজমের বিরোধিতাকে তাদের প্রথম কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, যৌথ প্রচেষ্টাকে বর্জন করেছে এবং যখনই জনগণ জাপানকে প্রতিরোধের জন্য উঠে দাঁড়াচ্ছেন তখনই তাদের সমস্ত রকম সম্ভাব্য উপায়ে দমন করা হচ্ছে এবং পিছন দিকে টেনে রাখা হচ্ছে, যেটা জাতীয়তাবাদের নীতিকে বর্জনেরই নামান্তর। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা এদের কাছে অবহেলিত; এটা জনগণের জীবিকার নীতিকে বর্জনেরই সমান।

এ ধরনের লোকেরা তিন-গণনীতিকে শুধু মুখেই মানে, এবং যাঁরা এটিকে কাজে প্রয়োগের জন্য আন্তরিকতার সংগে চেষ্টা করেন এরা হয় তাঁদের ব্যস্তবাগীশ বলে ঠাট্টা করে, আর নয় তো তাঁদের কঠোর শাস্তি দেয়। এইভাবে সবরকম উদ্ভট গালিগালাজ দেওয়া হচ্ছে এবং সরকারের মানমর্যাদা ধুলোয় মিশে যাবার উপক্রম হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে জনগণের তিন-গণনীতি দৃঢ়ভাবে কার্যকরী করার জন্য এক্ষুণি দ্বিধাহীন নির্দেশ জারী করতে হবে। যারা এই আদেশ লংঘন করবে তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে, আর যাঁরা আদেশ মানবেন তাঁদের উৎসাহিত করতে হবে। একমাত্র এই পথেই তিন-গণনীতি শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হতে পারে এবং যুদ্ধে জয়লাভের ভিত্তি তৈরী হতে পারে। এটি হচ্ছে দশম দফা, যা আমরা আপনাদের গ্রহণ করতে আবেদন করছি।

জাতিকে বাঁচানো এবং যুদ্ধে জয়লাভের জন্য এই দশটি প্রস্তাব হল একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এখন শত্রু যখন চীনের বিরুদ্ধে তার আক্রমণ তীব্র করে তুলছে আর ওয়াং চিং-ওয়েই উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তখন আমরা যে বিষয়গুলিকে গুরুতর বলে মনে করছি, সে-বিষয়ে চুপচাপ থাকতে পারি না। এই প্রস্তাবগুলিকে আপনারা গ্রহণ ও কার্যকরী করুন, এবং তা করলেই প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও জাতীয় মুক্তির কাজে নিশ্চয়তা আসবে। অত্যন্ত জরুরী ভেবেই আমাদের মতামত রাখলাম এবং আপনাদের সুচিন্তিত অভিমতের অপেক্ষায় রইলাম।

টীকা

১। সুমা চাও ছিল ওয়েই রাজ্যের একজন প্রধানমন্ত্রী (২২০-২৬৫ খ্রীঃ)। সে গোপনে সিংহাসনে বসবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত। সম্রাট একবার মন্তব্য করে: 'রাস্তার প্রতিটি লোকই সুমা চাওর আকাঙ্ক্ষার কথা জানে।'

২। চৌ সিং ও লাই ছুন-চেন ছিল তাং আমলের কুখ্যাত দুই নিষ্ঠুর গোয়েন্দা অধিকর্তা। সর্বত্র এরা গোয়েন্দাদের একটা জাল বিস্তৃত করেছিল। তারা কোন লোককে পছন্দ না হলেই গ্রেপ্তার করে নানাভাবে অকথ্য অত্যাচার করত।

৩। লিউ চিন ও ওয়েই চুং-শিয়েন ছিল মিং আমলের দুই খোজা। প্রথমজন সম্রাট উ সুঙের (ষোড়শ শতাব্দী) এবং দ্বিতীয়জন সম্রাট শি সুঙের (সপ্তদশ শতাব্দী) বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। তারা বিরোধী লোকজনকে অত্যাচার ও খুন করার জন্য বিরাট এক গোয়েন্দা বাহিনীকে কাজে লাগাত।

'চীনের শ্রমিক' পত্রিকার পরিচয় প্রসঙ্গে

৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

চীনের শ্রমিক' পত্রিকার প্রকাশ একটা প্রয়োজন মেটাল। নিজের রাজনৈতিক পার্টি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, কর্তৃক পরিচালিত হয়ে চীনের শ্রমিকশ্রেণী গত কুড়ি বছর ধরে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করে এসেছেন, জনগণের মধ্যেকার রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে সজাগ অংশে পরিণত হয়েছেন, এবং হয়ে উঠেছেন চীন বিপ্লবের নেতা। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে কৃষকজনসাধারণ এবং সকল বিপ্লবী জনগণকে সমবেত করে তা সংগ্রাম করছে নয়া-গণতান্ত্রিক চীন প্রতিষ্ঠার জন্য ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করার জন্য, এবং তার অবদান এক্ষেত্রে অসাধারণ। কিন্তু চীনের বিপ্লব আজ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়নি এবং খোদ শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই বিরাট প্রয়াসের প্রয়োজন রয়ে গেছে, প্রয়োজন রয়ে গেছে কৃষকজনগণ, পেটি-বুর্জোয়াদের অন্যান্য অংশ, বুদ্ধিজীবীবৃন্দ ও সমগ্র বিপ্লবী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার। এটা একটা সুবিপুল রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব। এ কাজ সুসম্পাদনের দায়িত্ব এসে পড়েছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, প্রগতিশীল কর্মীবৃন্দ এবং সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর ওপর। শ্রমিকশ্রেণী এবং সামগ্রিকভাবে জনগণের চূড়ান্ত মুক্তি সাধিত হবে একমাত্র সমাজতন্ত্রের অধীনতায়, যে চূড়ান্ত লক্ষ্যসাধনের জন্য চীনের শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের স্তরে আমাদের প্রবেশ করার আগে আমাদের যেতে হবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্তবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের মধ্য দিয়ে। সুতরাং চীনের শ্রমিকশ্রেণীর আশু কর্তব্য হল নিজ শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যকে জোরদার করে তোলা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধিতা করার জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং নতুন এক চীনের জন্য, নয়া-গণতন্ত্রের চীনের জন্য সংগ্রাম করা। ঠিক এই দায়িত্বটি সামনে রেখেই চীনের শ্রমিক প্রকাশিত হচ্ছে।

সহজ কথায় বলতে গেলে চীনের শ্রমিক শ্রমিকদের কাছে বহুবিধ সমস্যার ব্যাপারে কেমন করে ও কেন-র প্রশ্নের ব্যাখ্যা করবে, প্রতিরোধ-যুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের বাস্তব অবস্থার কথা জানাবে এবং নব অভিজ্ঞতার

আত্মসংক্ষেপ করে এভাবে তার কর্তব্য সম্পাদনের প্রচেষ্টা করবে।

চীনের শ্রমিককে হয়ে উঠতে হবে শ্রমিকদের শিক্ষিত করার একটি বিদ্যালয় এবং তাদের মধ্যেকার কর্মীদের সুশিক্ষিত করে তোলার একটি বিদ্যালয়, আর পত্রিকার পাঠকেরাই হবেন তার ছাত্রবৃন্দ। শ্রমিকদের মধ্য থেকে বহু কর্মীবাহিনীকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে, এমন সব কর্মী যাঁরা ওয়াকিবহাল এবং সৎ, যাঁরা শূন্যগর্ভ খ্যাতির প্রত্যাশী নন এবং সততার সংগে কাজ করতে প্রস্তুত। এ ধরনের বিপুলসংখ্যক কর্মী ব্যতীত শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে মুক্তি অর্জন করা অসম্ভব।

শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যকে স্বাগত জানাবে এবং কখনোই তা প্রত্যাখ্যান করবে না। কারণ তাদের সাহায্য ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী নিজে সামনে এগিয়ে যেতে পারে না বা বিপ্লবকে সফল করে তুলতে পারে না।

আমি আশা করি, পত্রিকাটি সুসম্পাদিত হবে এবং তাতে প্রচুর পরিমাণ প্রাণবন্ত লেখা প্রকাশিত হবে, কাঠখোট্টা ও নীরস যে প্রবন্ধাদি একঘেঁয়ে, নির্জীব ও অবোধ্য, সেগুলো তা সযত্নে পরিহার করবে।

প্রকাশিত হবার পর সাময়িকপত্রটিকে বিচার-বিবেচনা করে ভালভাবে চালাতে হবে। এটা একাধারে পাঠক ও পরিচালকবৃন্দ উভয়েরই দায়িত্ব। পাঠকদের পক্ষে নিজেদের পরামর্শ পাঠানো, সংক্ষিপ্ত চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ লিখে তাঁরা কী পছন্দ বা অপছন্দ করেন তা জানিয়ে দেওয়া খুবই দরকারী, কারণ একমাত্র এভাবেই সাময়িকপত্রটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে।

এই কটি কথা দিয়েই আমার প্রত্যাশা ব্যক্ত করলাম। তা-ই চীনের শ্রমিক-এর পরিচিতি জ্ঞাপক বক্তব্য হোক।

টীকা

১। চীনের শ্রমিক (দি চাইনীজ ওয়ার্কার) ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইয়েনানে প্রতিষ্ঠিত একটি মাসিক পত্রিকা। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ট্রেড ইউনিয়ন কমিশনের উদ্যোগে তা প্রকাশিত হয়।

আমাদের জোর দিতে হবে ঐক্য ও প্রগতির ওপর

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

প্রতিরোধ, ঐক্য ও প্রগতি—এই তিনটি মূল নীতি প্রতিরোধ যুদ্ধের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে বিগত ৭ই জুলাই কমিউনিস্ট পার্টি উপস্থিত করেছিল। এই তিনটি একত্রে মিলে একটি সামগ্রিক সত্তা, তার মধ্যেকার যে-কোন একটিকে বরাদ্দ করে দেওয়া চলে না। যদি ঐক্য এবং প্রগতিকে বাদ দিয়ে প্রতিরোধের ওপরই একমাত্র জোর দেওয়া হয় তাহলে ঐ 'প্রতিরোধ' নির্ভরযোগ্য হবে না বা দীর্ঘস্থায়ীও হবে না। ঐক্য এবং প্রগতির একটি কর্মসূচী ব্যতীত প্রতিরোধ আগে বা পরে আত্মসমর্পণে পর্যবসিত হবে অথবা পরাজয়ে পরিসমাপ্ত হবে। আমরা কমিউনিস্টরা মনে করি, এই তিনটিকে সুসংহত করা চাই। প্রতিরোধ-যুদ্ধের স্বার্থে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রয়োজন, প্রয়োজন ওয়াং চিং-ওয়েইর জাপানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতামূলক চুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, প্রয়োজন তার ক্রীড়নক সরকারের বিরুদ্ধে এবং জাপান-বিরোধী মহলগুলোতে লুকিয়ে থাকা বিশ্বাসঘাতক ও আত্মসমর্পণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। ঐক্যের স্বার্থে প্রয়োজন হচ্ছে বিভেদমূলক কার্যকলাপ ও আভ্যন্তরীণ 'সংঘর্ষের' বিরোধিতা করা, অষ্টম রুট ও নয়া চতুর্থ বাহিনীকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাতের বিরোধিতা করা এবং অপরাপর প্রগতিশীল জাপ-বিরোধী গোষ্ঠীসমূহের পেছন থেকে ছুরিকাঘাতের বিরোধিতা করা, শত্রুর পশ্চাদ্‌বর্তী জাপ-বিরোধী এলাকাসমূহে এবং যে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল অষ্টম রুট বাহিনীর পশ্চাদ্‌বর্তী অঞ্চল সেখানে বিভেদমূলক কার্যকলাপের বিরোধিতা করা, এবং কমিউনিস্ট পার্টির বৈধ অস্তিত্বের অস্বীকৃতির ও 'বিদেশী পার্টিসমূহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য দলিল-দস্তাবেজের ছড়াছড়ির বিরোধিতা করা প্রয়োজন। প্রগতির স্বার্থে প্রয়োজন হচ্ছে পশ্চাদ্‌গমনের ও জনগণের তিনটি মূল নীতিকে শিকেয় তুলে রাখার এবং

কমরেড মাও সে-তুঙ এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ইয়েনানের নিউ চায়না নিউজ-এর প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে।

জনগণের প্রতিরোধের ও জাতীয় পুনর্গঠনের কার্যসূচীকে শিকেয় তুলে রাখার বিরোধিতা করা, ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রে 'জনগণকে জাগিয়ে তোলার' যে নির্দেশ রয়েছে তা কার্যকরী করার অস্বীকৃতির বিরোধিতা করা। প্রগতিশীল তরুণদের বন্দীশিবিরগুলিতে কয়েদ করে রাখার বিরোধিতা করা, প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম দিনগুলিতে বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের যে সামান্য স্বাধীনতাটুকু বজায় ছিল তা কেড়ে নেওয়ার বিরোধিতা করা, সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য আন্দোলনকে মুষ্টিমেয় কিছু আমলার ব্যক্তিগত ব্যাপার করে তোলার অভিসন্ধির বিরোধিতা করা, নতুন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণের বিরোধিতা করা, আত্মত্যাগব্রতী সংঘের বিরুদ্ধে নিপীড়ন এবং শানসিতে প্রগতি-শীলদের হত্যাকাণ্ডের বিরোধিতা করা[১], তিন-গণনীতি বিষয়ক যুব লীগের লোকেরা সিয়েনইয়াং-যুলিন রাজপথ এবং লুংহাই রেলপথ থেকে জনসাধারণকে যেভাবে গুম করছে[২] তাদের সেইসব কার্যকলাপের বিরোধিতা করা, নটি করে উপপত্নী রাখার মতো লজ্জাজনক পদ্ধতির এবং জাতীয় সংকটের সুযোগে দশকোটি ইউয়ান মূল্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার বিরোধিতা করা, দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্তাদের, আঞ্চলিক স্বৈরাচারীদের ও বদ অভিজাতগোষ্ঠীর বল্গাহীন নিষ্ঠুরতার বিরোধিতা করা। এ সবের বিরোধিতা করা ছাড়া এবং ঐক্য ও প্রগতি ছাড়া 'প্রতিরোধ' হয়ে দাঁড়াবে নিছক কিছু ফাঁকা বুলি এবং বিজয় পরিণত হবে একটি মিথ্যা প্রত্যাশায়। দ্বিতীয় বছরে নিউ চায়না নিউজ-এর রাজনৈতিক গতিধারা কী হবে? ঐক্য ও প্রগতির ওপর জোর দেওয়া এবং যে সমস্ত কদর্য প্রথাপদ্ধতি যুদ্ধের পক্ষে হানিকর সেগুলোর বিরোধিতা করাই হবে সেই গতিধারা, যাতে করে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের লক্ষ্যে আমাদের অধিকতর বিজয় অর্জন করা সম্ভবপর হবে।

১। 'দি লীগ অব সেলফ স্যাক্রিফাইস ফর ন্যাশনাল স্যালভেশন' ছিল শানসির একটি জাপ-বিরোধী গণ-সংগঠন; ১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সংগে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে তা গড়ে ওঠে। ওখানকার জাপ-বিরোধী যুদ্ধে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে শানসির কুওমিনতাঙ সামন্ত শাসক ইয়েন শী-সান খোলাখুলিভাবে এ প্রদেশের

পশ্চিম অঞ্চলে লীগকে দমন করতে শুরু করে এবং নৃশংসভাবে বহুসংখ্যক কমিউনিস্ট, লীগের কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের হত্যা করে।

২। ১৯৩৯ সালে কুওমিনতাঙ সিয়েনইয়াং-যুলিন রাজপথ এবং লুংহাই (কানসু-হাইচৌ) রেলপথ বরাবর থ্রি পিপলস্ প্রিন্সিপলস ইয়ুথ লীগের 'হোস্টেলের' ছদ্ম আবরণের আড়ালে একটি অবরোধ গড়ে তোলে। এইসব হোস্টেলে গোয়েন্দা সংস্থার যে লোকেরা থাকত তারা কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীর সংগে একযোগে কাজ করত এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে যে প্রগতিশীল তরুণ ও বুদ্ধিজীবীরা যেতেন বা ওখান থেকে আসতেন তাঁদের গ্রেপ্তার করতে এবং বন্দীশিবিরগুলিতে কয়েদ করে রাখত। হয় তাঁদের ওখানেই নির্মমভাবে হত্যা করা হতো, আর নয়তো তাঁদের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে বাধ্য করা হতো।

নয়া-গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

ইয়েনানের সকল অংশের জনগণের প্রতিনিধিরা আজ এখানে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা সহায়ক সমিতির উদ্বোধনী সভায় মিলিত হয়েছেন এবং সকলেই এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার আমাদের এই সভার উদ্দেশ্য কী? জনগণের ইচ্ছার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তিতে সহায়তা করা, জাপানকে পরাজিত করা এবং নতুন চীন গড়ে তোলাকে সহায়তা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

জাপানের বিরুদ্ধে সে সশস্ত্র প্রতিরোধকে আমরা সবাই সমর্থন করি তা ইতিমধ্যেই কার্যকরী করা হচ্ছে এবং এখন একমাত্র প্রশ্ন হল অবিচলভাবে তাতে লেগে থাকা। কিন্তু এছাড়া অন্য একটি বিষয়ও রয়েছে, যেমন গণতন্ত্র, তা কিন্তু কার্যকরী করা হচ্ছে না। এই দুটোই আজ চীনের পক্ষে সুবিপুল গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঠিক, চীনে বহু জিনিসেরই অভাব রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র। এর যে-কোন একটি না থাকলে চীনের কাজকর্ম ভালভাবে চলবে না। কিন্তু যেমন দুটো জিনিসের অভাব রয়েছে তেমনি দুটো জিনিসের বড়ই বাহুল্য রয়েছে। সেগুলো কী? সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও সামন্তবাদী শোষণ। এই দুটো জিনিসের বাহুল্যের জন্য চীন হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ। জাতির প্রধান দাবি আজ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র, আর তাই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে

সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা সহায়ক সংক্রান্ত ইয়েনানস্থ সমিতির কাছে কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতা করেন। ঐ সময়ে পার্টির অনেক কমরেড চিয়াং কাই-শেকের প্রতারণাপূর্ণ প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে চিন্তা করছিলেন, হয়তো সত্যিসত্যিই বুঝি কুওমিনতাঙ সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে চিয়াং কাই-শেকের প্রতারণার মুখোস খুলে দেন, 'সাংবিধানিক সরকার' সংক্রান্ত প্রচারের হাতিয়ারটি তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেন এবং তাকে জনগণকে জাগিয়ে তুলে চিয়াং কাই-শেকের কাছ থেকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবি করার একটি হাতিয়ারে পরিণত করেন। তারপরই চিয়াং কাই-শেক তড়িঘড়ি তার মুখের বোলাটি গুটিয়ে নেয়, এবং জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলার গোটা সময়টিতে সে তার এই তথাকথিত সাংবিধানিক সরকারের প্রচার আর চালাতে আর সাহস করেনি।

ধ্বংস করতেই হবে। এদের ধ্বংস সাধন করতে হবে দৃঢ়হস্তে, পরিপূর্ণভাবে এবং বিন্দুমাত্র করুণা প্রদর্শন না করে। কেউ কেউ বলেন—ধ্বংস নয়, একমাত্র পুনর্গঠনই আমাদের প্রয়োজন। ভাল কথা, আমরা তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই: ওয়াং চিং-ওয়েইকে ধ্বংস করা চাই কিনা? জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা চাই কিনা? সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা চাই কিনা? এইসব অভুত জিনিসগুলোকে ধ্বংস না করলে নিশ্চিতভাবে পুনর্গঠনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এদের ধ্বংস করেই শুধু চীনকে রক্ষা করা যাবে এবং পুনর্গঠন শুরু করা যাবে, অন্যথায় তা হবে অলস স্বপ্নবিলাস মাত্র। একমাত্র পুরাতনকে, পচা-গলা জিনিসকে ধ্বংস করেই আমরা গড়ে তুলতে পারব নবীন ও খাঁটি জিনিসকে। স্বাধীনতার সংগে গণতন্ত্রের সংযোগ ঘটালেই আপনি পাবেন গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রতিরোধকে অথবা প্রতিরোধের স্বার্থে নিয়োজিত গণতন্ত্রকে। গণতন্ত্র ছাড়া প্রতিরোধ ব্যর্থ হবে। গণতন্ত্র ছাড়া প্রতিরোধ চালিয়েই যাওয়া সম্ভব হবে না। আট বা দশ বছর প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হলেও গণতন্ত্রের সাহায্যে জয় সুনিশ্চিতভাবেই আমাদের হবে।

সাংবিধানিক সরকার কাকে বলা হবে? তা হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার। প্রবীণ কমরেড উ[১] এইমাত্র যা বলেছেন, আমি তার সাথে একমত। কিন্তু কী ধরনের গণতন্ত্রের আজ আমাদের প্রয়োজন? আমাদের প্রয়োজন নয়া, গণতান্ত্রিক সরকার, নয়া গণতন্ত্রের সাংবিধানিক সরকার। ইউরোপীয় আমেরিকান ধাঁচের পুরানো, অচল বুর্জোয়া একনায়কত্বের তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার আমরা চাই না, কিংবা এখন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সোভিয়েত ধাঁচের গণতন্ত্রও আমরা চাই না।

অন্যান্য দেশে পুরানো ধাঁচের যে গণতন্ত্র প্রচলিত, তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে। আমরা কোন অবস্থাতেই এরকম প্রতিক্রিয়াশীল জিনিস গ্রহণ করব না। চীনের, প্রতিক্রিয়াশীল একগুঁয়েরা যে ধরনের সাংবিধানিক সরকারের কথা বলে বেড়ায়, তা হচ্ছে বিদেশের পুরানো ধাঁচের বুর্জোয়া গণতন্ত্র। কিন্তু যদিও তারা এ কথা বলে বেড়ায়, আসলে এটাও তারা চায় না; এ ধরনের কথা বলছে তারা জনগণকে ধোঁকা দেবার জন্য। আসলে তারা যা চায় তা হল একদলীয় ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ব। অপরদিকে চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এ ধরনের সাংবিধানিক সরকার চায় এবং চায় চীনে একটি বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে, কিন্তু এতে তারা কখনোই সফলকাম

হবে না। কারণ চীনের জনগণ এ ধরনের একটা সরকার চায় না এবং বুর্জোয়া-শ্রেণীর এক-শ্রেণিক একনায়কত্বকে তাঁরা স্বাগত জানাবেন না। চীনের কাজ-কর্মের ব্যবস্থাপনা চীনের জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই নির্ধারণ করবে এবং শুধু বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণকে পুরোপুরি বাতিল করে দিতে হবে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সম্পর্কে কী বলা যায়? নিশ্চয়ই জিনিসটি খুব ভাল আর কালক্রমে সারা দুনিয়াব্যাপী তা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আজ এ ধরনের গণতন্ত্র চীনে এখনো প্রচলন সম্ভব নয়, আর তাই এখনকার মতো এটাকে বাদ দিয়েই আমাদের চলতে হবে। কিছু কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পরই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। আমরা যে ধরনের গণতান্ত্রিক সরকার চাই, তা পুরানো ধাঁচের গণতন্ত্র নয় অথবা সমাজতান্ত্রিক ধরনের গণতন্ত্রও নয়, তা হচ্ছে চীনের বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী নয়া-গণতন্ত্র। সাংবিধানিক যে সরকার কায়েম হবে তা হবে নয়া-গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার।

নয়া-গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকারটি কী? দেশদ্রোহী প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে এ হচ্ছে কয়েকটি বৈপ্লবিক শ্রেণীর যৌথ একনায়কত্ব। কোন এক ব্যক্তি একবার বলেছিলেন, 'যদি খাবার থাকে তাহলে সবাই তা ভাগ করে খাক।' আমার মনে হয়, নয়া-গণতন্ত্র বোঝাতে এ কথা প্রযোজ্য। যা খাবার আছে তা যেমন সবাই ভাগ করে খাবে, তেমনি একক একটি দল, গোষ্ঠী বা শ্রেণী ক্ষমতা একচেটিয়া করতে পারবে না। কুওমিনতাঙ-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ঘোষণাপত্রে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন এই ধারণাটি ভালভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন:

বিভিন্ন আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে যে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে তা সাধারণতঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর একচেটিয়া করতলগত এবং তা সাধারণ মানুষকে নিপীড়নের নিছক একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে কুওমিনতাঙ-এর গণতন্ত্রের মূল নীতি হল এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেখানে সমগ্র সাধারণ মানুষই তার অংশীদার এবং মুষ্টিমেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার তা নয়।

কমরেডগণ, সাংবিধানিক সরকার সম্পর্কে অধ্যয়নকালে আমরা নানা বইপত্র পড়ব, কিন্তু সবার আগে আমাদের এই ঘোষণাপত্রটি পড়া উচিত ও এই অনুচ্ছেদটি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া উচিত। 'সমগ্র সাধারণ মানুষই

তার অংশীদার এবং মুষ্টিমেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার তা নয়'—সরা-গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার বলতে আমরা যা বোঝাতে চাই, দেশদ্রোহী ও প্রতি-ক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে কয়েকটি বৈপ্লবিক শ্রেণীর যৌথ গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব বলে যা বোঝাতে চাই—এই হচ্ছে তার সারকথা। এই ধরনের সাংবিধানিক সরকারই আজ আমাদের চাই এবং জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের সাংবিধানিক সরকারের রূপটি হওয়া চাই ঠিক এইরকম।

আমাদের আজকের সভার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রেরণা ও আগ্রহ সৃষ্টি করা। এ নিয়ে 'আগ্রহ' সৃষ্টি করতে হচ্ছে কেন? সবাই যদি এগিয়ে চলতে থাকে, তবে কাউকে এগিয়ে চলার জন্য প্রেরণা দেওয়ার দরকার পড়ে না। এই সভা অনুষ্ঠানের ঝামেলা আমরা পোহাতে গেলাম কেন। কারণ কিছু লোক এগিয়ে চলার বদলে শুয়ে পড়তে চাইছে, এগিয়ে চলতে অস্বীকার করছে। তারা যে শুধু এগিয়ে চলতে অস্বীকার করছে তাই নয়, তারা আসলে চাইছে পিছিয়ে যেতে। আপনারা তাদের বলছেন এগিয়ে যেতে, কিন্তু তারা মরে গেলেও এগোবে না; এই লোকেরাই একগুঁয়ে। তারা এমন একরোখা যে, এই সভা করে তাদের 'প্রেরণা' দিতে হচ্ছে। এই 'প্রেরণা দেওয়া' কথাটা এল কোথা থেকে? কে প্রথম এই প্রসঙ্গে কথাটা প্রয়োগ করেছিলেন? আমরা নই, করেছিলেন মহান ও সম্মানিত ডঃ সান ইয়াৎ-সেন, তিনি বলেছিলেন: 'জাতীয় বিপ্লবের লক্ষ্যসাধনে চল্লিশ বছর ধরে আমি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি।...' তাঁর ইচ্ছাপত্রটি পড়ে দেখুন, তাহলেই দেখতে পাবেন এই কথাগুলো: 'অতি সম্প্রতি আমি জাতীয় মহাসভার সম্মেলন আহ্বানের জন্য সুপারিশ করেছি...এবং স্বল্পতম সম্ভব সময়ের মধ্যে তা আহ্বানের জন্য বিশেষভাবে তৎপর হতে বলেছি। এটা হল আপনাদের কাছে আমার আন্তরিক আবেদন।' কমরেডগণ, এটা একটা সাধারণ 'আবেদন' নয়, আন্তরিক আবেদন'। 'আন্তরিক আবেদন' তো নিছক একটা সাধারণ আবেদনমাত্র নয়, তাই তাকে কি হাল্কাভাবে অবহেলা করা চলে? আবার 'স্বল্পতম সম্ভব সময়ের মধ্যে'; প্রথমে, দীর্ঘতম সময় নয়, দ্বিতীয়, তুলনামূলক দীর্ঘ সময় নয় এবং তৃতীয়, নিছক স্বল্প সময় নয় বরং একেবারে স্বল্পতম সম্ভব সময়ের মধ্যে। আমরা যদি স্বল্পতম সম্ভব সময়ের মধ্যে জাতীয় মহাসভাকে বাস্তবায়িত করতে চাই, তাহলে 'প্রেরণা' আমাদের দিতেই হবে। পনের বছর হল ডঃ সান ইয়াৎ-সেন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন

কিন্তু যে জাতীয় মহাসভার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন তা আজও ডাকা হয়নি। রাজনৈতিক মাতব্বরি ফলিয়ে অথবা কালক্ষেপ করে কিছু লোক নির্বোধের মতো সময় কাটিয়ে দিয়েছে, 'যথাসম্ভব সত্বর সময়কে' দীর্ঘতম সময় করে তুলেছে, অথচ এরাই আবার প্রতিনিয়ত ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের নাম জপে চলেছে। ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের ছায়ামূর্তি তাঁর এই অযোগ্য অনুগামীদের কী তিরস্কারই না করছেন! এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে 'প্রেরণা' না জোগালে এগিয়ে চলা সম্ভব হবে না 'প্রেরণা' দেওয়া প্রয়োজন, কারণ অনেকে পিছিয়ে চলেছে, আবার অনেকের এখনো নিদ্রাভঙ্গই হয়নি।

কিছু লোক যখন এগোচ্ছে না, তখন তাদের প্রেরণা আমাদের দিতেই হবে। অন্যদের প্রেরণা দিতে হবে, কারণ তাঁরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন। তারই জন্য সভা ডেকে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রেরণা সঞ্চার করতে হচ্ছে। তরুণেরা এ ধরনের সভা করেছেন, মহিলারাও এ ধরনের সভা করেছেন, শ্রমিকেরা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী সংস্থা আর সেনাদলের বাহিনীগুলোও সভা-সমিতি করেছেন। এসব খুব সাড়া জাগিয়েছে এবং তা খুবই ভাল হয়েছে। আর এখন এই একই উদ্দেশ্যে আমরা এই সাধারণ সভা করছি, যাতে আমরা সবাই সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা দ্রুত কার্যকরী করার কাজে লেগে যেতে পারি এবং ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শিক্ষাবলী আশু কার্যকর করতে লেগে যেতে পারি।

কেউ কেউ বলছেন: 'আপনারা রয়েছেন ইয়েনানে, আর ঐ লোকেরা রয়েছেন নানা জায়গায় ছড়িয়ে। আপনারা তাঁদের প্রেরণা দিতে চাইছেন, কিন্তু ওঁরা যদি কোন সাড়া না দেন তবে এর কী দরকার?' হাঁ, দরকার খানিকটা আছে বৈকি। কারণ, অবস্থা এগোচ্ছে এবং নজর তাদের দিতে হবেই। আমরা যদি আরও বেশি সভা-সমিতি করি, বেশি বেশি করে প্রবন্ধাদি লিখি, বেশি করে বক্তৃতা করি এবং বেশি করে তারবার্তা পাঠাই, তাহলে নজর না দিয়ে ওঁরা পারবেন না। আমার মতে, সাংবিধানিক সরকার প্রবর্তনের জন্য আমাদের এত বেশি সভা-সমিতি করার দুটি উদ্দেশ্য আছে। একটি হচ্ছে সমস্যাটি নিয়ে অধ্যয়ন করা এবং অন্যটি হচ্ছে জনসাধারণকে ঠেলে এগিয়ে দেওয়া। অধ্যয়ন করার আমাদের কী দরকার? কারণটা হচ্ছে, যখন, তারা এগোতে চাইছে না আর আপনারা তাদের এগিয়ে যেতে বলছেন, তখন ওরা জিজ্ঞেস করবে—কেন আপনারা তাদের ঠেলছেন, আপনাদের তখন জবাব

মহড়ার দরকার হবে। তা করতে হলে সাংবিধানিক সরকার সম্পর্কে সকল বিষয়ে আমাদের গুরুতর অধ্যয়ন থাকা দরকার। আমাদের একজন কমরেড ঠিক এই কথাটিই খানিকটা সবিস্তারে বলছিলেন। সকল বিদ্যায়তন, সরকারী সংস্থা ও সামরিক ইউনিট এবং জনগণের সকল অংশকেই আমাদের সামনেকার সাংবিধানিক সরকার সম্পর্কিত সমস্যাটির অধ্যয়ন করা দরকার।

একবার অধ্যয়ন করে নিলে আমরা জনগণকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলতে পারব। ঠেলে নিয়ে যাওয়া মানে তাদের এগিয়ে যেতে প্রেরণা দেওয়া, আর আমরা যতই সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে চলব, সমস্ত ব্যাপারটাও ক্রমশ সামনে এগিয়ে চলবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতোধারাগুলো মিলিত হয়ে পরিণত হবে এক বিরাট নদীতে, যা সমস্ত পচাগলা ও নোংরাকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেবে, আর এভাবেই দেখা দেবে নয়া-গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার। এ ধরনের আন্দোলনের প্রভাব হবে খুবই বিরাট। ইয়েনানে আমরা যা করছি তা গোটা দেশকেই প্রভাবিত করতে বাধ্য।

কমরেডগণ, আপনারা কি মনে করেন যে, একবার সভা করে টেলিগ্রাম পাঠালেই একগুঁয়েরা হাল ছেড়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে শুরু করে দেবে, আমাদের আদেশ মাথা পেতে মেনে নেবে? না, এত সহজে সুবোধ বনে যাওয়ার লোক তারা নয়। তাদের অনেকেই একগুঁয়েদের শিক্ষায়তন থেকে বিশেষ শিক্ষালাভ করে স্নাতক হয়ে এসেছে। তারা যেহেতু আজ একগুঁয়ে, আগামীকাল বা এমনকি তার পরের দিনও তারা একগুঁয়েই থেকে যাবে। একগুঁয়ে বলতে কী বোঝায়? 'অনমনীয়' ও আজ, কাল এমনকি তার পরেও প্রগতির বিরুদ্ধে 'অনড়' হয়ে থাকাটাই একগুঁয়েমি। এরকম লোকদেরই আমরা বলি একগুঁয়ে। এদেরকে আমাদের কথা শোনানো সহজ কর্ম নয়।

ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়নে সাংবিধানিক সরকার বলতে আমরা যা জানি, তাতে রয়েছে বেশ কিছু মৌলিক আইন কানুন অর্থাৎ একটি সংবিধান, যা সাধারণভাবে বিঘোষিত হয়েছে একটা সফল বিপ্লবের সমাপ্তির পর গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি হিসেবে। কিন্তু চীনের ব্যাপারটা ভিন্ন। চীনে বিপ্লব এখনো সীমান্ত অঞ্চলের কিছু কিছু এলাকা ছাড়া সফল হয়নি, গণতান্ত্রিক সরকার এখনো একটি বাস্তব সত্য নয়। বাস্তব সত্য হচ্ছে চীনে এখনো চলছে আধা-উপনিবেশ ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শাসন এবং যদি একটি উত্তম সংবিধান জারী করা হয়, তাহলেও তা অনিবার্যভাবে সামন্ত

শক্তিসমূহের প্রতিবন্ধকতায় সমূহীন হবে এবং একগুঁয়েরা তাকে বাধা দেবে, যাতে করে নির্বিঘ্নে তা কার্যকরী করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাই সাংবিধানিক সরকারের জন্য বর্তমান আন্দোলনকে এমন একটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হতে হবে যা আজও অর্জিত হয়নি; তাই ইতিমধ্যে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত একটি গণতন্ত্রকে নিছক স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপার এটা নয়। তার অর্থ হচ্ছে একটা বিরাট সংগ্রাম এবং নিশ্চয়ই তা হালকা বা সহজসাধ্য একটা ব্যাপার নয়।

যারা বরাবর সাংবিধানিক সরকারের বিরোধিতা করে এসেছে, তারাও এ ব্যাপারটা মুখে মেনে নিচ্ছে। কেন? কারণ তারা জনসাধারণের চাপের মধ্যে রয়েছে, জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইচ্ছুক জনসাধারণের চাপে পড়ে ওরা খানিকটা নরম হয়ে পড়েছে। এমনকি গলা সপ্তমে চড়িয়ে ওরা চিৎকার করে বলছে, 'আমরা সব সময়ই সাংবিধানিক সরকারের পক্ষে রয়েছি!'[২] আর এ নিয়ে ওরা প্রচণ্ড হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছে। আজ বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা 'সাংবিধানিক সরকার' কথাগুলো শুনে আসছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার নামমাত্র চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি না। এই লোকেরা মুখে এক কথা বলে কাজে করে অন্যটি, বলা চলে এরা হচ্ছে সাংবিধানিক সরকারের ব্যাপারে দুমুখো কারবারী। তাদের 'সব সময় পক্ষে রয়েছি' ইত্যাদি কথাবার্তা প্রকৃতপক্ষে ওদের দুমুখো কারবারের উদাহরণ। আজকের এই একগুঁয়েরা ঠিক ঐ ধরনেই দুমুখো কারবারী। তাদের সাংবিধানিক সরকার একটি প্রতারণামাত্র। অদূর ভবিষ্যতে একটি সংবিধান আপনারা পেয়েও যেতে পারেন এবং একজন রাষ্ট্রপতিও জুটে যেতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্র আর স্বাধীনতা আপনাদের ওরা যে কখন দেবে তা বিধাতাই জানেন। চীন তো ইতিমধ্যেই একটি সংবিধান পেয়ে গিয়েছিল। সাও কুন কি একটি সংবিধান ঘোষণা করে দেননি?[৩] কিন্তু গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা কি কোথাও পাওয়া গিয়েছিল? আর রাষ্ট্রপতি —বেশ কয়েকজন তো পাওয়া গিয়েছিল। প্রথমে ছিলেন সান ইয়াৎ-সেন—ভাল লোক, কিন্তু তাঁকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলেন ইউয়ান শী-কাই। দ্বিতীয় ছিলেন ইউয়ান শী-কাই, তৃতীয় ছিলেন লী ইউয়ান-হাং[৪], চতুর্থ ছিলেন ফেং কুও-চাং[৫], এবং পঞ্চম ছিলেন সু শী-চাং[৬]—যথার্থই বহুসংখ্যক রাষ্ট্রপতির মেলা, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী চেয়ে ওঁরা কিছুমাত্র ভিন্ন ছিলেন কি? সংবিধান আর রাষ্ট্রপতিবর্গ উভয়ই ছিল মেকী। বর্তমানে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে যে তথাকথিত সাংবিধানিক ও গণ-

তান্ত্রিক সরকার রয়েছে সেগুলো আসলে নরখাদক সরকার। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বহুদেশে যেখানে সাধারণতন্ত্রের তকমা লটকানো রয়েছে সেখানেও সেই একই কথা খাটে, কারণ কার্যতঃ ওখানে গণতন্ত্রের লেশমাত্র চিহ্নও নেই। অনুরূপভাবে চীনের বর্তমান একগুঁয়েদেরও একই অবস্থা। সাংবিধানিক সরকার সম্পর্কে ওদের কথাবার্তা আসলে হচ্ছে 'ভেড়ার মাথা ঝুলিয়ে রেখে কুকুরের মাংস বিক্রি করা।' তারা সামনে ঝুলিয়ে রাখছে সাংবিধানিক সরকারের ভেড়ার মাথাটা, কিন্তু আসলে বিক্রি করছে একদলীয় একনায়কত্বের কুকুরের মাংস। আমি তাদের অহেতুক আক্রমণ করছি না; আমার কথাগুলো তথ্যের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত, কারণ সাংবিধানিক সরকার সম্বন্ধে ওদের হাজারো বুলি সত্ত্বেও জনসাধারণকে সামান্যতম স্বাধীনতা দিতেও ওরা রাজী নয়।

কমরেডগণ, প্রকৃত সাংবিধানিক সরকার সহজলভ্য নয়, কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শুধু তা পাওয়া যাবে। সুতরাং, আপনারা এটা আশা করে বসে থাকবেন না যে, সভা-সমিতি করে, তারবার্তা পাঠিয়ে বা প্রবন্ধাদি লিখে ফেললেই তা তৎক্ষণাৎ এসে, হাজির হয়ে যাবে।' অথবা, আপনারা এই প্রত্যাশা করে বসবেন না যে, জনগণের রাজনৈতিক পরিষদে[৭] একটি প্রস্তাব পাশ করে নিলে, জাতীয় সরকার একটি হুকুমনামা জারী করে দিলে বা ১২ই নভেম্বর জাতীয় মহাসভার[৮] অধিবেশন বসলেই, বা একটি সংবিধান ঘোষণা করে দিলেই, বা এমনকি একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে নিলেই সবকিছু চমৎকার হয়ে যাবে এবং এই দুনিয়ার সবকিছুই ঠিকঠাক হয়ে যাবে। তা এক অসম্ভব ব্যাপার, কাজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন না। সাধারণ মানুষও যাতে বিভ্রান্ত হয়ে না পড়েন, তার জন্য তাঁদের কাছে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলার দরকার আছে। ব্যাপারটা মোটেই এত সোজা নয়।

তাহলে লক্ষ্যটি মাঠে মারা গেছে ভেবে কি আমরা বিলাপ করতে শুরু করে দেব? ব্যাপারটা যখন এতই কঠিন, তাহলে তো আর কোন আশা করাই চলে না। কিন্তু বিষয়টা তাও নয়। এখনো পর্যন্ত সাংবিধানিক সরকারের আশা রয়েছে, বেশ বড় রকমের আশাই রয়েছে এবং নিশ্চিতভাবেই চীন একটি নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। কেন? একগুঁয়েদের গোলমাল সৃষ্টির ফলে বাধাবিপত্তিগুলো দেখা দিয়েছে, কিন্তু ওরা চিরকাল একগুঁয়ে হয়ে থাকতে পারবে না এবং তারই জন্য আমাদের এখনো বড়রকমের প্রত্যাশা রয়েছে। এই দুনিয়ায় একগুঁয়েরা আজ পর্যন্ত একগুঁয়ে হয়ে থাকলেও,

আগামীকাল বা তার পরের দিন পর্যন্ত একগুঁয়ে হয়ে থাকলেও, তারা চিরকাল একগুঁয়ে হয়ে থাকতে পারবে না, শেষ পর্যন্ত বদলাতে তাদের হবেই। উদাহরণস্বরূপ, ওয়াং চিং-ওয়েই খুবই দীর্ঘকাল ধরে একগুঁয়ে হয়ে ছিল, কিন্তু জাপ-বিরোধী জনগণের মধ্যে থেকে একগুঁয়ে হয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং জাপানীদের দলে তাকে ভীড়ে পড়তেই হয়েছে। অন্য একটি উদাহরণ হিসেবে চ্যাঙ কুও তাওয়ের কথাই ধরুন; সে দীর্ঘকাল একগুঁয়ে হয়ে ছিল, কিন্তু আমরা কয়েকটি সভা-সমিতি করার পর এবং বারবার তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর পর তাকেও পালিয়ে যেতে হয়েছে। আসলে, একগুঁয়েরা যত অনমনীয়ই হোক, আমৃত্যু অনমনীয় হয়ে থাকার মতো অনমনীয় তারা নয়, এবং শেষ পর্যন্ত বদলাতে তাদের হয়—বদলাতে হয় নিতান্ত জঘন্য ও ঘৃণ্য একগাদা কুকুরের বিষ্ঠাতে। কারও কারও পরিবর্তন হয় ভালর দিকে এবং সেটাও হয় তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আমাদের একটানা সংগ্রামের ফল হিসেবে—তারা তাদের ভুল দেখতে পায় এবং ভাল হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে, একগুঁয়েদেরও শেষ পর্যন্ত বদলাতে হয়। সব সময়ই তাদের অনেক অভিসন্ধি থাকে, অন্যদের ঘাড় ভেঙে কায়দা ওঠাবার মতলব থাকে, থাকে, দুমুখো কারবারের নানা ফন্দিফিকির ইত্যাদি অনেক কিছু। কিন্তু তারা যা চায়, পায় সবসময় তার উল্টোটি। তারা অবধারিতভাবেই অপরের ক্ষতি করে কাজ শুরু করে, কিন্তু শেষ হয় তাদের নিজেদের সর্বনাশের মধ্য দিয়ে। আমরা একবার বলেছিলাম যে, চেম্বারলিন 'পাথরটি তুলেছে শুধু তার নিজের পায়ের ওপরেই তা ফেলবার জন্য,' এবং আমাদের সেই কথা এখন সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে সোভিয়েত জনসাধারণের পায়ের আঙুলগুলো থেঁতলে দেওয়ার জন্য চেম্বারলিন হিটলারকে প্রস্তরখণ্ড হিসেবে ব্যবহারের জন্য জিদ ধরেছিল, কিন্তু গতবছর সেপ্টেম্বরের সেই দিনটিতে একদিকে জার্মানি আর অন্যদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল, তার হাতের প্রস্তরখণ্ডটি তার নিজের পায়ের আঙুলগুলোকেই থেঁতলে দিয়েছে। আজও তাকে সেই যন্ত্রণায় কাতরাতে হচ্ছে। চীনেও এ ধরনের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইউয়ান শী-কাই সাধারণ মানুষের পায়ের আঙুলগুলো থেঁতলে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পরিণামে তাকেই যন্ত্রণা ভুগতে হল, সম্রাট সেজে বসার ঠিক কয়েকমাস পরেই তার মৃত্যু হল।[১] তুয়ান চি-রুই, স্যু শী-চ্যাং, সাও কুন, উ পেই-ফু এবং আরও এরকম জনগণকে অনেকে দমন করতে চেয়েছিল

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনগণই তাদের উচ্ছেদ করে দিয়েছিল। যে-কেউই 'অন্যের ক্ষতি করে নিজের ফায়দা ওঠাতে চাইবে, কখনই তার মঙ্গল হবে না'।

আমার মতে আজকের কমিউনিস্ট-বিরোধী একগুঁয়েরা যদি সামনে এগিয়ে না চলে, তবে তাদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। ঐক্য সংস্থাপনের ঢক্কানিনাদের ছলচাতুরীর আড়ালে তারা প্রগতিশীল শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল, প্রগতিশীল অষ্টম রুট বাহিনী, নয়া চতুর্থ বাহিনী, প্রগতিশীল কমিউনিস্ট পার্টি ও গণ-সংগঠনসমূহকে ধ্বংস করে দেবার পরিকল্পনা করেছে। এ ধরনের অজস্র মতলব তাদের রয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এসবের পরিণামে একগুঁয়েগণ কর্তৃক প্রগতিশীলদের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধিত হবে না, বরং প্রগতির হাতে একগুঁয়েপনারই সম্পূর্ণ বিনাশ সাধিত হবে। তাই, যদি সমূহ বিনাশ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হয়, একগুঁয়েদের তাহলে সামনে এগিয়ে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই আমরা সব সময় ওদের পরামর্শ দিয়ে এসেছি অষ্টম রুট বাহিনী, কমিউনিস্ট পার্টি ও সীমান্ত অঞ্চলকে আক্রমণ না করার জন্য। যদি অবশ্য তারা এটা করতে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে, তাহলে তাদের উচিত হবে এ ধরনের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা: 'নিজেদের ধ্বংসসাধনের ব্যাপারে কৃতসংকল্প হয়ে এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রসারের প্রচুর সুযোগ করে করে দেওয়ার জন্য, আমরা একগুঁয়েরা কমিউনিস্ট পার্টি ও সীমান্ত অঞ্চলকে আক্রমণ করার সমূহ দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম।' 'কমিউনিস্টদের দমন করার' প্রচুর অভিজ্ঞতাই তো একগুঁয়েদের হয়েছে এবং এবার আরেক দফা নতুন অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করতে চাইলে তারা স্বচ্ছন্দে তা করতে পারে। ভাল করে খানাপিনার পর এবং টেনে ঘুম দেওয়ার পর তাদের যদি খানিকটা 'দমন করার' বাসনা হয়ে থাকে—সেটার ভার তাদের হাতেই রইল। অবশ্য উপরে উল্লিখিত প্রস্তাবটি তাহলে কার্যকরী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাদের থাকতে হবে কেননা তা অপরিবর্তনীয়। গত দশ বছরের 'কমিউনিস্টদের দমনের' পরিণাম অনিবার্যভাবে ঐ প্রস্তাব অনুযায়ীই ঘটে এসেছে। পরবর্তী অন্য কোন 'দমনের' পরিণাম তার সঙ্গে সংগতি রেখেই ঘটবে। সুতরাং ওদের প্রতি আমার উপদেশ হল—'দমন করার' পথে যেও না। সমগ্র জাতি আজ যা চাইছে তা 'কমিউনিস্টদের দমন' নয়, জাতি আজ চাইছে প্রতিরোধ, ঐক্য ও প্রগতি। সুতরাং যে-কেউ 'কমিউনিস্টদের দমন' করতে চেষ্টা করবে, ব্যর্থ সে হবেই।

সংক্ষেপে বলা যায়, পশ্চাদ্‌গমনের পরিণতি দাঁড়ায় এই অপপ্রয়াসের প্রেরণাদাতাদের বাঞ্ছিত ফলাফলের ঠিক বিপরীত। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম আধুনিক অথবা প্রাচীনকালের চীনে নেই কিংবা অন্য কোথায়ও নেই।

আজকের সাংবিধানিক সরকার সম্পর্কে ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। একগুঁয়েরা যদি বিরোধিতা চালিয়ে যেতেই থাকে, তবে তারা যা চাইছে, ফলাফল নিশ্চিতভাবে তাদের বিপরীতটিই হবে। সাংবিধানিক সরকারের জন্য আন্দোলন একগুঁয়েদের নির্ধারিত পথ ধরে কখনো চলবে না, চলবে তাদের ইচ্ছার বিপরীত পথ ধরে, অনিবার্যভাবেই তা জনগণের নির্ধারিত পথ ধরে এগিয়ে যাবে। এটা সুনিশ্চিত, কেননা সমগ্র দেশের জনগণই তা দাবি করছে এবং চীনে ঐতিহাসিক বিকাশের গতিধারাও তাই দাবি করছে, দাবি করছে সমগ্র বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহের গতিধারা। কে পারবে একে রোধ করতে? ইতিহাসের চাকাকে পিছিয়ে দেওয়া যাবে না। অবশ্য যে কাজ আমরা শুরু করেছি, তার জন্য সময় লাগবে এবং রাতারাতি হয়ে যাওয়ার ব্যাপার তা নয়। তারজন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে, দায়সারাভাবে তা করা যাবে না। এরজন্য প্রয়োজন হবে ব্যাপক জনসাধারণের সমাবেশের এবং এ কাজ করার জন্য একজোড়া হাতই যথেষ্ট নয়। আমরা যে আজ এখানে এই সভা করছি, এটা খুবই ভাল কাজ হয়েছে। এই সভার পর আমরা প্রবন্ধাদি লিখব এবং তারবার্তা পাঠাব; উত্তাই এবং তাইহাং পার্বত্য অঞ্চলেও আমরা এ ধরনের সভা করব, উত্তর চীনে, মধ্য চীনে সারা দেশ জুড়ে আমরা সভা করব। এভাবে যদি আমরা কাজ করে যেতে থাকি, এবং বেশ কয়েক বছর ধরে যদি তা আমরা চালিয়ে যাই, তাহলে তাই হবে সঠিক কাজ। খুব ভালভাবেই কাজটি আমাদের করা চাই, আমাদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা জয় করে আনতে হবে, আমাদের কায়েম করতে হবে নয়া-গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার। যদি তা আমরা করতে না পারি এবং একগুঁয়েরা যদি তাদের পথে চলতে পারে, তবে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। এই পথ ধরেই জাতীয় অধীনতাকে পরিহার করার জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে। তার জন্য প্রত্যেককেই তার যথাশক্তি করতে হবে। আর তা যদি আমরা করি, তাহলে আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার বিরাট আশা আছে। আমাদের আরও বোঝা চাই যে, একগুঁয়েরা শেষ বিচারে সংখ্যালঘু মাত্র, অন্যদিকে

একগুঁয়ে নয়, জনগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাঁরা এগিয়ে যেতে সমর্থ। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে, সংখ্যাগরিষ্ঠের এই অবস্থানের সংগে যদি আমাদের প্রয়াস এসে যুক্ত হয়, তাহলে সে আশা উজ্জ্বলতরই হবে। তাই জন্য আমি বলেছি, কাজটি কঠিন হলেও সাফল্যের আশা উজ্জ্বল।

টীকা

১। প্রবীণ কমরেড উ হলেন কমরেড উ ইউ-চ্যাং। তিনি ছিলেন ইয়েনানের সাংবিধানিক সরকার প্রসারের জন্য গঠিত সমিতির সভাপতি।

২। এখানে 'ওরা' বলতে বোঝাচ্ছে কুওমিনতাঙ-এর চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে।

৩। ১৯২৩ সালে উত্তরাঞ্চলের বড় সশস্ত্র সামন্ত প্রভুদের অন্যতম সাও কুন ৫৯০ জন পার্লামেন্টের সদস্যদের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার করে রৌপ্য ডলার ঘুষ খাইয়ে নিজে সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হয়ে বসে। তারপর নিজেই সে একটি সংবিধান জারী করে দেয় যাকে বলা হয় 'সাও কুন সংবিধান' বা 'ঘুষখোরদের সংবিধান'।

৪। লী ইউয়ান হাং প্রথমে ছিল চিং বংশে সশস্ত্র বাহিনীর একটি ব্রিগেডের কম্যাণ্ডার। ১৯১১ সালের উচাং-এর অভ্যুত্থানকালে তার অফিসার ও সৈনিকেরা তাকে বিপ্লবের পক্ষে থাকতে বাধ্য করে এবং তাকে হুপে প্রদেশের গভর্নর বানিয়ে দেয়। পরে সে উপ-রাষ্ট্রপতি ও তারপরে উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র সামন্ত প্রভুদের গোষ্ঠীটির রাজত্বকালে সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হয়।

৫। ফেং কুয়ো-চাং ছিল ইউয়ান শী-কাই-এর একজন তাঁবেদার। ইউয়ানের মৃত্যুর পর উত্তরাঞ্চলে সশস্ত্র সামন্ত প্রভুদের চক্রের চিহ্‌লি (হোপেই) গোষ্ঠীর সে নেতা হয়। ১৯১৭ কালে লী ইউয়ান-হাংকে হটিয়ে দিয়ে সে নিজেই রাষ্ট্রপতি হয়ে বসে।

৬। সু শী-চাং ছিল উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র সামন্ত প্রভুদের চাকুরীতে নিযুক্ত একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি। তুয়ান চি-জুই নিয়ন্ত্রিত পার্লামেন্ট কর্তৃক ১৯১৮ সালে সে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়।

৭। জাপ-বিরোধী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কুওমিনতাঙ সরকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠা করেছিল উপদেষ্টা সংস্থা হিসেবে 'জনগণের রাজনৈতিক-

পরিষদটি'। সদস্যদের সকলেই ছিলেন কুওমিনতাঙ সরকার কর্তৃক 'আমন্ত্রিত'। জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধিরাও নাম কে-ওয়াস্তে তার মধ্যে ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতে কুওমিনতাঙ-এরই ছিল নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। কুওমিনতাঙ সরকারের অনুসৃত নীতি ও কাজকর্মকে প্রভাবিত করার কোন ক্ষমতা এর ছিল না। চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ যত বেশি বেশি করে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে লাগল, ততই কুওমিনতাঙ ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই পরিষদে সংখ্যায় বেড়ে যেতে লাগল, অন্যদিকে গণতন্ত্রীদের সংখ্যা কমে যেতে লাগল এবং তাদের বাক-স্বাধীনতা নিদারুণভাবে সংকুচিত করে দেওয়া হল ও শেষ পর্যন্ত পরিষদ বেশি বেশি করে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়ারই নিছক একটি হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল। ১৯৪১ সালে দক্ষিণ আনহুইয়ের ঘটনার পর পরিষদের কমিউনিস্ট সদস্যগণ কুওমিনতাঙ এর প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবহারের প্রতিবাদে বেশ কয়েকবার পরিষদের সভা বয়কট করেন।

৮। কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দলের এবং গোষ্ঠীসমূহের গণতন্ত্রীদের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে জনগণের রাজনৈতিক পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে একটি সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার ও জাতীয় মহাসভা আহ্বানের জন্য কুওমিনতাঙ সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩৯ সালে নভেম্বরে কুওমিনতাঙ এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৪০ সালের ১২ই নভেম্বর জাতীয় মহাসভার অধিবেশন আহ্বান করা হবে। জনগণকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য অনেক ঢাকঢোল পেটানো হলেও এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি।

৯। ইউয়ান শী-কাই, ১৯১৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে দেয়, কিন্তু ১৯১৬ সালের ২২শে মার্চই সে গদী ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

জাপ বিরোধী ঘাঁটি এলাকায় রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন সম্পর্কে*

৬ই মার্চ, ১৯৪০

১। এটা হচ্ছে এমন একটা সময়, যখন কুওমিনতাঙ-এর কমিউনিস্ট-বিরোধী একগুঁয়েরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে উত্তর ও মধ্য চীনে এবং অন্যান্য স্থানে আমাদের জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা প্রতিষ্ঠাকে প্রতিহত করছে, অথচ আমাদের দিক থেকে তা স্থাপন করা আমাদের চাই-ই, আর জাপ-বিরোধী প্রধান প্রধান মুক্ত অঞ্চলগুলিতে ইতিমধ্যে আমরা তা স্থাপন করতে পেরেছি। কমিউনিস্ট-বিরোধী একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে এই প্রশ্ন নিয়ে উত্তর, মধ্য ও উত্তর-পূর্ব চীনে আমাদের সংগ্রাম সমগ্র দেশব্যাপী যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করতে পারে এবং গোটা জাতি মনোযোগের সাথে তা অনুধাবন করে চলেছেন। সুতরাং এই প্রশ্নটিকে সতর্কতার সংগে পরিচালনা করা চাই।

২। জাপ-বিরোধী যুদ্ধকালে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা আমরা গড়ে তুলছি প্রকৃতির দিক থেকে তা যুক্তফ্রন্টের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। যাঁরাই প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রকে সমর্থন করেন এই রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁদের সকলের; দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে কয়েকটি বৈপ্লবিক শ্রেণীর এ হচ্ছে যুক্ত গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। জমিদারশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী একনায়কত্ব এবং কৃষি-বিপ্লবের অধ্যায়ের শ্রমিক-কৃষকদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের থেকে তা ভিন্ন। এই রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট উপলব্ধি এবং তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে নিষ্ঠা সহকারে প্রয়াস চালানো দেশব্যাপী গণতন্ত্রের প্রসারে বিরাটভাবে সহায়তা করবে। 'বাম' অথবা দক্ষিণপন্থী যে-কোন বিচ্যুতি সমগ্র জাতির ক্ষেত্রে খুবই খারাপ ধারণা সৃষ্টি করবে।

৩। হোপেই প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশন আহ্বান এবং হোপেই প্রশাসনিক পরিষদের যে নির্বাচনের প্রস্তুতি সবেমাত্র শুরু হয়েছে, তা অসাধারণ

* এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি কমরেড মাও সেতুঙ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে রচনা করেছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হবে। উত্তর-পশ্চিম শানসিতে, শানতুং-এ, হুয়াই নদীর উত্তরের এলাকাসমূহে, হুইতে এবং হুচিয়েন জেলাসমূহে এবং পূর্ব কানসুতে রাজনৈতিক ক্ষমতার নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠা সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। যুক্তফ্রন্টের নীতি অনুযায়ীই আমাদের অগ্রসর হতে হবে এবং দক্ষিণপন্থী বা 'বামপন্থী' যে-কোন প্রবণতা পরিহার করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য করতে হবে। এই মুহূর্তে মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গকে জয় করে পক্ষে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অবহেলার 'বামপন্থী' প্রবণতাই হচ্ছে অধিকতর গুরুতর বিপদ।

৪। রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা প্রসঙ্গে যুক্তফ্রন্টের মূল নীতি অনুসারে আসন বন্টনের ভাগ হওয়া উচিত এক-তৃতীয়াংশ কমিউনিস্টদের, এক-তৃতীয়াংশ পার্টি-বহির্ভূত বামপন্থী প্রগতিশীলদের, এবং এক-তৃতীয়াংশ অন্তর্বর্তী সেইসব অংশের যাঁরা বাম বা দক্ষিণপন্থী কিছুই নন।

৫। আমাদের এই নিশ্চয়তা বিধান করা চাই, যাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহে কমিউনিস্টগণ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং সেইহেতু যে পার্টি-সদস্যরা এক-তৃতীয়াংশ আসন গ্রহণ করবেন তাঁদের খুবই উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন হওয়া চাই। অধিকতর বৃহত্তর প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত এতে করেই পার্টির নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করার পক্ষে তা যথেষ্ট হবে। সকাল থেকে রাত্রি অবধি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করা বা উদ্ধতভাবে আনুগত্য দাবি করার স্লোগানই নেতৃত্ব নয়, বরং নেতৃত্ব হচ্ছে পার্টির সঠিক নীতিসমূহ এবং আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে আমরা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করি সেগুলির সদ্ব্যবহার করে পার্টি-বহির্ভূত জনগণকে এমনভাবে দৃঢ় বিশ্বাসী ও শিক্ষিত করে তোলা, যাতে তাঁরা স্বেচ্ছামূলকভাবেই আমাদের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করতে পারেন।

৬। পার্টি-বহির্ভূত প্রগতিশীলদের এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ করতে হবে এই কারণে যে, তাঁরা পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যাপক জনসমষ্টির সংগে যুক্ত রয়েছেন। ওঁদের পক্ষে নিয়ে আসার দিক থেকে এটি তাই বিরাট গুরুত্বপূর্ণ।

৭। অন্তর্বর্তী অংশসমূহকে এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ করার ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গকে সপক্ষে নিয়ে আসা। এই অংশসমূহকে জয় করে সপক্ষে নিয়ে আসা একগুঁয়েদের বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বর্তমানে এই অংশসমূহের শক্তিকে হিসেবে ধরার ক্ষেত্রে ভুল করা আমাদের চলবে না, এবং এদের সংগে

সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুবিবেচনার পরিচয় আমাদের দিতে হবে।

৮। অ-কমিউনিস্টদের প্রতি মনোভাব আমাদের হবে সহযোগিতামূলক, পার্টিগত অবস্থান তাঁদের যাই হোক এবং যে ধরনেরই হোক, যতক্ষণ তাঁরা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সম্মত থাকবেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সংগে সহযোগিতায় রাজী থাকবেন ততক্ষণ এই হবে আমাদের মনোভাব।

৯। ওপরে আসন বরাদ্দ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা পার্টির ঐকান্তিক নীতিরই অভিব্যক্তি এবং কোনমতেই এ ব্যাপারে আমাদের দায়সারা মনোভাব গ্রহণ করা চলবে না। এই নীতিকে কার্যকরী করতে হলে রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা কর্মরত পার্টি-সদস্যদের আমাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে অ-কমিউনিস্টদের সংগে সহযোগিতার ব্যাপারে তাদের যে অস্বস্তি দেখা যায় এবং অনাগ্রহজনিত সংকীর্ণতার যে প্রকাশ দেখা যায় তা দূর করার জন্য, এবং তাদের উৎসাহিত করে তুলতে হবে গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত কার্যধারার অনুসরণে, অর্থাৎ কোন কাজ করার আগে পার্টি-বহির্ভূতদের সংগে আলাপ-আলোচনা করা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি আদায় করার ব্যাপারে। একই সংগে আমাদের সাধ্যমতো সর্বপ্রকারে পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তিদের উৎসাহিত করতে হবে, যাতে তাঁরা বিভিন্ন সমস্যার ওপর তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন এবং তাঁদের পরামর্শের প্রতি আমাদের মনোযোগ প্রদান করতেই হবে। আমাদের কোন সময়ই এটা ভাবা চলবে না যে, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা যেহেতু আমাদের করায়ত্ত রয়েছে, অতএব আমরা নিঃশর্তে আমাদের সিদ্ধান্ত ওদের মেনে নিতে বাধ্য করাতে পারি এবং এভাবে আমাদের অভিমত তারা যাতে খুশিমনে ও সর্বান্তঃকরণে কার্যকরী করতে পারে তার জন্য পার্টি-বহির্ভূত লোকদের জয় করে সপক্ষে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা বুঝি না করলেও চলে।

১০। ওপরে যে সংখ্যাগত হিসেব আসন বরাদ্দ করা সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে তা যান্ত্রিকভাবে পূরণ করার-মতো অনড় কোন ভাগ বাঁটোয়ারা নয়। এটা হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবে মোটামুটিরকমের একটা অনুপাত, যা প্রতিটি অঞ্চলকে তাদের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তদনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নতম স্তরে এই অনুপাতের কিছু অদলবদল করা যেতে পারে, যাতে করে জমিদার ও বড় অভিজাতদের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাদিতে সংগোপনে ঢুকে পড়া প্রতিহত করা সম্ভব হয়। যেসব জায়গায় ও ধরনের সংস্থাসমূহ বেশ কিছুকাল ধরে চালু রয়েছে—যেমন, শানসি-চাহার-হোপেই সিমান্ত অঞ্চলে, মধ্য হোপেই অঞ্চলে

ভাইহাং পার্বত্য অঞ্চলে এবং দক্ষিণ হোপেই অঞ্চলে, সেখানে এই মূল নীতির নিরিখে নীতিটির পুনর্বিচার করা উচিত। যখন নতুন একটি রাজনৈতিক শক্তির সংস্থা স্থাপিত হবে, তখনই এই মূল নীতিটি কার্যকরী করা চাই।

১১। আঠারো বছর বয়স হয়েছে এবং যিনি প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রের পক্ষপাতী এমন প্রতিটি চীনাই ভোটদানের অধিকারী, শ্রেণী, জাতিসত্তা, স্ত্রী-পুরুষ, ধর্ম, পার্টিগত অবস্থান ও শিক্ষাগত মান নির্বিশেষে তাঁরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকারী—এই হবে যুক্তফ্রন্টের ভোটাধিকার সম্পর্কিত নীতি। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহ হওয়া চাই জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত। তাদের সাংগঠনিক রূপ হওয়া চাই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১২। যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহের সমস্ত মুখ্য নীতিবিষয়ক ব্যবস্থার মৌলিক সূচনাবিন্দু হওয়া চাই জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, জাপানকে প্রতিরোধে নিযুক্ত জনগণের আরক্ষা, জাপ-বিরোধী সমস্ত সামাজিক স্তরের স্বার্থের উপযুক্ত বিন্যাস, শ্রমিক ও কৃষকদের জীবিকার মানোন্নয়ন এবং দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন।

১৩। রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহে যে পার্টি-বহির্ভূত লোকজনেরা কাজ করবেন তাঁদের কমিউনিস্টদের মতো জীবনযাপন, কথাবার্তা বলা ও কাজকর্ম করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই, অন্যথায় তাঁরা অসন্তুষ্ট হতে পারেন বা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন।

১৪। কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক ব্যুরোসমূহ, সমস্ত আঞ্চলিক পার্টি কমিটি এবং সেনাবাহিনীর সকল ইউনিটের প্রধানদের এই মর্মে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা যেন পার্টি-সদস্যদের কাছে এই নির্দেশটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহে আমাদের কাজকর্ম পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করা যেন সুনিশ্চিত হয়।

জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের রণকৌশলে সাম্প্রতিক সমস্যাবলী

১১ই মার্চ, ১৯৪০

১। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি হচ্ছে নিম্নরূপ:

(ক) চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধ জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে গুরুতর আঘাত হেনেছে এবং বৃহৎ আকারের সামরিক আর কোন আক্রমণ পরিচালনার ব্যাপারে তা ইতিমধ্যেই অসমর্থ হয়ে পড়েছে, এবং ফলে শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার শক্তির অবস্থানগত সম্পর্ক একটি রণনৈতিক অচলাবস্থার স্তরে উপনীত হয়েছে। শত্রু কিন্তু এখনো চীনকে পদানত করার তার মূল লক্ষ্য দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রয়েছে এবং এই লক্ষ্য সাধনের জন্য জাপ বিরোধী যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ধরানো, পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলসমূহে তাদের 'ঘিরে ধরে নিশ্চিহ্ন করার' অভিযান তীব্রতর করা এবং তাদের অর্থনৈতিক আগ্রাসন জোরদার করা ইত্যাদি পন্থার মাধ্যমে তারা তা অনুসরণ করে চলেছে।

(খ) ইউরোপে যুদ্ধের পরিণামে প্রাচ্যে তাদের অবস্থানসমূহ যে দুর্বল হয়ে পড়ছে, এটা ব্রিটেন ও ফ্রান্স দেখতে পাচ্ছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'পাহাড়ের চূড়ায় বসে থেকে বাঘেদের পারস্পরিক লড়াই' দেখার নীতিই চালিয়ে যাচ্ছে, ফলে প্রাচ্যদেশের একটি মিউনিক সম্মেলনের[১] কথা এই মুহূর্তে ওঠেই না।

(গ) বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে, সোভিয়েত ইউনিয়ন নতুন নতুন সাফল্যলাভ করেছে এবং চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধে সক্রিয় সমর্থনের নীতিটি সোভিয়েত ইউনিয়ন অব্যাহত রেখেছে।

(ঘ) জাপ-সমর্থক বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী জাপানের কাছে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করে এখন ক্রীড়নকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত। ইউরোপীয়-দের সমর্থক এবং আমেরিকানদের সমর্থক বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী জাপানকে প্রতিরোধ করে চলতে পারে, কিন্তু এদের আপোষে উপনীত হওয়ার

---

* ইয়েনানে পার্টির প্রবীণ কর্মীদের একটি রিপোর্টের কাঠামো হিসেবে কমরেড মাও সে-তুঙ এই রূপরেখাটি লিখেছিলেন।

প্রবণতা গুরুতরই রয়ে গেছে। ওরা একটি দুমুখো নীতি অবলম্বন করছে। জাপানের সংগে মোকাবিলায় বিভিন্ন অ-কুওমিনতাঙ শক্তিসমূহের সংগে তারা যেমন একদিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে চাইছে, তেমনি তাদের এবং বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে তারা দমন করতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের এক-গুঁয়েদের অংশটি এদের নিয়েই গঠিত।

(ঙ) মাঝারি বুর্জোয়া ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবৃন্দ এবং আঞ্চলিক-ভাবে প্রভাবশালী চক্রগুলো-সহ অন্তর্গত শক্তিগুলো প্রগতিশীল ও একগুঁয়েদের মধ্যে প্রায়ই মাঝামাঝি একটা অবস্থান গ্রহণ করছে— একদিকে বৃহৎ জমিদারবর্গ ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রধান প্রধান শাসক-মহলগুলোর সংগে তাদের দ্বন্দ্ব এবং অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকজনগণের সংগে তাদের দ্বন্দ্বর জন্য। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের মাঝারি অংশটি এদের নিয়ে গঠিত।

(চ) সম্প্রতি কমিউনিস্টদের পরিচালিত শ্রমিক, কৃষক ও শহরের পেটি-বুর্জোয়াগণ অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন এবং মুখ্যতঃ এমন সব ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন, যেখানে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা দেশব্যাপী শ্রমিক, কৃষক ও শহরের পেটি বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে তাদের প্রভাব খুবই বিরাট এবং মাঝারি শক্তিগুলোর মধ্যেও তাদের প্রভাব যথেষ্ট। যুদ্ধক্ষেত্রে কুওমিনতাঙগণ প্রায় যে পরিমাণ জাপানী সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়ছে সেই সমপরিমাণ জাপানী সৈন্যের বিরুদ্ধেই কমিউনিস্টগণ লড়াই করে চলেছেন। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের প্রগতিশীল অংশটি এদের নিয়ে গঠিত।

এই হচ্ছে চীনের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে অবস্থার অবনতি ঘটা প্রতিহত করার সম্ভাবনা এখনো রয়েছে, সম্ভাবনা রয়েছে তাকে ভালর দিকে নিয়ে যাওয়ার। ১লা ফেব্রুয়ারিতে গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবসমূহ পুরোপুরিই সঠিক।

২। প্রতিরোধ-যুদ্ধে জয়লাভের মৌলিক শর্ত হচ্ছে জাপ-বিরোধী যুক্ত-ফ্রণ্টের প্রসার ও সংহতিসাধন। এই লক্ষ্যসাধনের জন্য যে রণকৌশলের প্রয়োজন, তা হল প্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিকাশসাধন, মাঝারি শক্তিগুলোকে স্বপক্ষে নিয়ে আসা এবং একগুঁয়ে শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা

করা; এগুলো হচ্ছে তিনটি অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র এবং জাপ-বিরোধী সমস্ত শক্তিসমূহের ঐক্যসাধনের জন্য যে পথ গ্রহণ করতে হবে তা হল সংগ্রামের পথ। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের অধ্যায়ে সংগ্রাম হচ্ছে ঐক্যবিধানের পথ আর ঐক্য হচ্ছে সংগ্রামের লক্ষ্য। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যদি ঐক্যের সন্ধান করা হয় তবেই তা বেঁচে থাকবে; যদি নতি স্বীকারের মধ্য দিয়ে ঐক্যের সন্ধান করা হয় তবে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। পার্টি কমরেডগণ এই সত্য ক্রমেই উপলব্ধি করছেন। কিন্তু এখনো অনেকে রয়েছেন, যাঁরা তা উপলব্ধি করতে পারেননি। কেউ কেউ ভাবছেন সংগ্রামের ফলে যুক্তফ্রন্টে ভাঙন দেখা দেবে, আবার কেউ কেউ ভাবছেন সংগ্রাম বেপরোয়াভাবে চালানো যায়; তাছাড়া অন্যরা মাঝারি শক্তিগুলো সম্পর্কে ভুল রণকৌশল গ্রহণ করে থাকেন বা একগুঁয়েদের সম্পর্কে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এই সবগুলোই শুধরাতে হবে।

৩। প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে বিকশিত করে তোলার অর্থ হচ্ছে শ্রমিক-শ্রেণী, কৃষকজনগণ এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়ার শক্তিগুলোকে গড়ে তোলা, সাহসিকতার সংগে অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীকে প্রসারিত করে চলা, ব্যাপক আকারে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকাসমূহ প্রতিষ্ঠা করা, সারা দেশব্যাপী কমিউনিস্ট সংগঠনসমূহ গড়ে তোলা, শ্রমিক, কৃষক, যুবক, নারী ও কিশোরদের জাতীয় গণ-আন্দোলন বিকশিত করে তোলা, দেশের সকল জায়গায় বুদ্ধিজীবীবৃন্দকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসা এবং গণ-তন্ত্রের সপক্ষে সংগ্রাম হিসেবে জনগণের মধ্যে সাংবিধানিক সরকারের আন্দোলন প্রসারিত করে দেওয়া। প্রগতিশীল শক্তিসমূহের একটানা প্রসারই হচ্ছে একমাত্র পথ যাতে করে অবস্থার অবনতি প্রতিহত করা যাবে, আত্মসমর্পণ ও ভাঙন প্রতিরোধ করা যাবে এবং প্রতিরোধের যুদ্ধের বিজয়ের দৃঢ় ও দুর্জয় ভিত্তি গড়ে তোলা যাবে। কিন্তু প্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিজয় একটি গুরুতর সংগ্রামের প্রক্রিয়া, যা শুধু নির্মমভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীগণ এবং দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করলেই চলবে না, চালাতে হবে একগুঁয়েদেরও বিরুদ্ধে। কারণ একগুঁয়েরা প্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিকাশের বিরুদ্ধাচারী, অন্যদিকে মাঝারি অংশটি এ ব্যাপারে সংশয়গ্রস্ত। একগুঁয়ে-দের বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত সংগ্রাম না চালালে এবং, তারচেয়েও বড় কথা, উল্লেখযোগ্য বাস্তব ফললাভ করতে না পারলে আমাদের পক্ষে তাদের চাপ ঠেকানো বা মাঝারি-অংশের সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হবে না। সুতরাং

প্রগতিশীল শক্তিসমূহের প্রসারের কোন পথ থাকবে না।

৪। মাঝারি শক্তিগুলোকে জয় করার অর্থ হচ্ছে মাঝারি বুর্জোয়া, আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গ এবং আঞ্চলিকভাবে প্রভাবশালী চক্রগুলোকে জয় করা। এদের মধ্যে সুস্পষ্ট তিনটি স্তর রয়েছে। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এরা সবাই মাঝারি শক্তিগুলোর মধ্যে পড়ছে। মাঝারি বুর্জোয়ারা হচ্ছে মুৎসুদ্দিশ্রেণী অর্থাৎ বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে স্বতন্ত্র জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। যদি শ্রমিকদের সংগে এদের শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বাতন্ত্র্যকে এরা মেনে নেয় না, তবু এরা জাপানকে প্রতিরোধ করতে চায় এবং তারা আরও চায় রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের করায়ত্ত করতে, কারণ অধিকৃত এলাকায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদীগণ কর্তৃক এরা উৎপীড়িত হচ্ছে এবং কুওমিনতাঙ-অধিকৃত অঞ্চলে বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াগণ কর্তৃক এরা দমিত হয়ে রয়েছে। জাপানকে প্রতিরোধের প্রশ্নে এরা সংযুক্ত প্রতিরোধের পক্ষপাতী, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে এরা নিয়মতান্ত্রিক সরকারের জন্য আন্দোলনের পক্ষপাতী এবং নিজেদের লক্ষ্যসাধনের জন্য এরা প্রগতিশীল ও একগুঁয়েদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এই স্তরকে জয় করে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসতেই হবে। তার পর আসে আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবৃন্দের কথা—এরা হচ্ছে জমিদারশ্রেণীর বামপন্থী অংশ অর্থাৎ বুর্জোয়া চেহারাসম্পন্ন অংশ, যাদের রাজনৈতিক মনোভাব মোটামুটি মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর মতোই। যদিও কৃষকদের সংগে এদের শ্রেণী-দ্বন্দ্ব রয়েছে, তবু বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের সংগেও এদের দ্বন্দ্ব রয়েছে। এরা একগুঁয়েদের সমর্থন করে না এবং তারও আমাদের ও একগুঁয়েদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে নিজেদের আপন রাজনৈতিক লক্ষ্যসাধনের জন্য কাজে লাগাতে চায়। কোনমতেই এই অংশকে আমাদের অবহেলা করা চলবে না এবং আমাদের নীতি হবে আমাদের পক্ষে এদের নিয়ে আসা। এলাকাগতভাবে প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলো সম্পর্কে বলা যায়, এদের মধ্যে দুধরনের লোক আছে—এমন একদল লোক আছে যারা তাদের নিজেদের বিশেষ বিশেষ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে, আর তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সৈনিকেরা যারা এভাবে নির্দিষ্ট কোন এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে না। প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সংগে যদিও এদের দ্বন্দ্ব রয়েছে কিন্তু যেভাবে এদের স্বার্থের হানি করে আত্মস্বার্থের নীতি অনুসরণ করছে তার জন্য কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় সরকারের সংগেও এদের দ্বন্দ্ব রয়েছে। এরাও নিজেদের রাজনৈতিক

লক্ষ্যসাধনের জন্য, আমাদের একগুঁয়েদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করতে চায়। আকস্মিকভাবে প্রভাবশালী এই গোষ্ঠীগুলোর অধিকাংশ নেতারা বৃহৎ জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের থেকে আগত, আর তাই যুদ্ধকালে বিশেষ বিশেষ সময়ে এদের প্রগতিশীল বলে মনে হলেও, খুব জলদিই ওরা আবার প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে; এসব সত্ত্বেও যেহেতু কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সংগে এদের দ্বন্দ্ব রয়েছে সেইহেতু একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে যদি আমরা সঠিক নীতি অনুসরণ করতে পারি, তবে এদের নিরপেক্ষ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ওপরে যে তিন ধরনের মাঝারি শক্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এদের প্রতি আমাদের নীতি হবে এদের আমাদের সপক্ষে নিয়ে আসা। কিন্তু কৃষকদের ও শহরের পেটি-বুর্জোয়াদের আমাদের পক্ষে নিয়ে আসার নীতির ও এদেরকে পক্ষে নিয়ে আসার নীতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, আর তাছাড়া মাঝারি শক্তিগুলোর প্রতিটি মহলের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে বিভিন্নতা রয়েছে। কৃষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়াদের জয় করে পক্ষে আনতে হবে মূল মিত্র হিসেবে, মাঝারি শক্তিগুলোকে পক্ষে নিয়ে আসতে হবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মিত্র হিসেবে। মাঝারি শক্তিগুলোর মধ্যে মাঝারি বুর্জোয়া ও আলোক-প্রাপ্ত অভিজাতবর্গের লোকেরা জাপানের বিরুদ্ধে ও জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সাধারণ সংগ্রামের ব্যাপারেও আমাদের সংগে যোগ দিতে পারে, কিন্তু কৃষি-বিপ্লবকে এরা ভয় করে। একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এদের কেউ কেউ সীমাবদ্ধ মাত্রায় যোগ দিতে পারে, অন্যরা সহৃদয় নিরপেক্ষতা সহকারে বা হয়তো উদাসীন নিরপেক্ষতা সহকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখতে পারে। কিন্তু যুদ্ধে আমাদের সংগে যোগ দেওয়া ছাড়া একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে এই আকস্মিকভাবে প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলো বড়জোর সাময়িক একটি নিরপেক্ষতার মনোভাব অনুসরণ করবে। কিন্তু যেহেতু তারা নিজেরা বৃহৎ জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের থেকে আগত তাই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের সংগে যোগদানে তারা অনিচ্ছুক। মাঝারি শক্তিগুলোর মধ্যে দোদুল্যমানতার প্রকাশ হয়েছে এবং ভাঙন তাদের মধ্যে দেখা দিতে বাধ্য, আর এই দোদুল্যমানতার মনোভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে আমাদের উচিত হবে এদের উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তোলা ও সমালোচনা করা।

জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের অধ্যায়ে মাঝারি শক্তিগুলোকে জয় করে পক্ষে

নিয়ে আসা আমাদের দিক থেকে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, কিন্তু বেশ কিছু শর্তাধীনেই শুধু তা সম্পাদন করা যেতে পারে। সেই শর্তগুলো হচ্ছে : (১) আমাদের যথেষ্ট শক্তি থাকা চাই ; (২) তাদের স্বার্থের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকা চাই ; এবং (৩) একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের দৃঢ়চিত্ত হওয়া চাই এবং আমাদের ক্রমাগত বিজয়ের পথে এগিয়ে যাওয়া চাই। এই শর্তগুলো যদি পূর্ণ করা না হয় তবে মাঝারি শক্তিগুলো দোদুল্যমানতা প্রদর্শন করবে, এমনকি আমাদের বিরুদ্ধে একগুঁয়েদের আক্রমণকালে ওরা ওদের মিত্র হয়েও দাঁড়াতে পারে কারণ একগুঁয়েরাও আমাদের নিঃসঙ্গ করার জন্য মাঝারি শক্তিগুলোকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে যেতে যথাসাধ্য করছে। চীনে মাঝারি শক্তিগুলোর প্রচুর প্রভাব রয়েছে এবং একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে ওরা মাঝে মাঝে চূড়ান্ত নির্ধারক হয়ে উঠতে পারে ; তাই এদের সংগে ব্যবহারের সময় আমাদের খুবই সুবিবেচনা সহকারে চলা চাই।

৫। বর্তমানে একগুঁয়ে শক্তিগুলো হচ্ছে বৃহৎ জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী। এই মুহূর্তে এরা জাপানের কাছে আত্মসমর্পণকারী একটি গোষ্ঠী এবং জাপানকে প্রতিরোধে আগ্রহী এরকম অন্য একটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ; এই শ্রেণীগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার যে অংশ জাপানকে প্রতিরোধে আগ্রহী, তারা যে অংশ জাপানের কাছে ইতিমধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে তার থেকে ভিন্ন হয়ে পড়েছে। এরা দুমুখো একটা নীতি অনুসরণ করে। এরা এখনো জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যের পক্ষপাতী কিন্তু সংগে সংগে এরা তাদের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি হিসেবে প্রগতিশীলদের দমন করার চরম প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করে। এরা এখনো যেহেতু জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যের পক্ষপাতী, তাই আমরা জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টে এদের রাখার জন্য চেষ্টা করতে ও ফ্রন্টে ওদের রেখে দিতে পারি ; আর যত বেশি সময় তা করতে পারব ততই মঙ্গল। এই অংশকে সপক্ষে রাখার ও এদের সংগে সহযোগিতা করার নীতিকে অবহেলা করা কিংবা তারা ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণ করে ফেলেছে বা এরা কমিউনিস্ট-বিরোধী যুদ্ধ শুরু করে দেওয়ার মুহূর্তে এসে গেছে—এ কথা মনে করা ভুল হবে। কিন্তু একই সংগে এদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কৌশল আমাদের গ্রহণ করতে হবে, তার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে মতাদর্শগত রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে, কারণ সারা দেশব্যাপী

এরা অনুসরণ করে চলেছে প্রগতিশীলদের দমন করার প্রতিক্রিয়াশীল একটি নীতি, কারণ বিপ্লবী জনগণের তিনটি মূল নীতির মাধ্যমে কর্মসূচী কার্যকরী করার পরিবর্তে, তা কার্যকরী পথে আমাদের সচেষ্টাকে গোঁড়ামির মতো ওরা বিরোধিতা করে চলে এবং উপরন্তু ওরা আমাদের যে সীমা বেঁধে দিয়েছে তা ছাড়িয়ে যেতে যাতে আমরা না পারি তার জন্য ওরা প্রচণ্ড চেষ্টা করেছে, অর্থাৎ ওরা যেভাবে নিজেরা একটা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় আমাদেরও সেখানে আটকে রাখতে তারা চেষ্টা করছে এবং তারচেয়েও বড় কথা, তারা চেষ্টা করছে আমাদের গিলে ফেলতে, আর তা না পারলেই আমাদের বিরুদ্ধে ওরা চালাচ্ছে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সামরিক চাপ। একগুঁয়েদের দুমুখো নীতির মোকাবিলায় এই হচ্ছে আমাদের বৈপ্লবিক দ্বৈত নীতি এবং এই হচ্ছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঐক্যের সন্ধানে আমাদের নীতি। মতাদর্শগত ক্ষেত্রে যদি আমরা সঠিক বৈপ্লবিক তত্ত্ব উপস্থিত করতে পারি। এবং ওদের প্রতিবিপ্লবী তত্ত্বকে কঠোর আঘাত হানতে পারি, যদি আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সময়োপযোগী রণকৌশল গ্রহণ করতে পারি এবং ওদের কমিউনিস্ট-বিরোধী ও প্রগতি-বিরোধী নীতিসমূহকে কঠোর আঘাত হানতে পারি, এবং সামরিক ক্ষেত্রে যদি আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারি এবং ওদের আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হানতে পারি —তাহলে ওদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির কার্যকারিতার ক্ষেত্রকে আমরা সংকুচিত করে রাখতে সমর্থ হব এবং প্রগতিশীল শক্তিসমূহের মর্যাদা স্বীকার করে নিতে ওদের বাধ্য করতে পারব ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের প্রসার সাধনে, মাঝারি শক্তিগুলোকে পক্ষে নিয়ে আসার ব্যাপারে এবং একগুঁয়েদের বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে আমরা সমর্থ হব। তাছাড়া, একগুঁয়েদের মধ্যে যারা এখনো জাপানকে প্রতিরোধের ব্যাপারে আগ্রহী, জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টে এদের অংশগ্রহণকে আমরা আরও অধিককাল স্থায়ী করতে পারব এবং এর আগে ব্যাপক আকারে যে গৃহযুদ্ধ দেখা দিয়েছিল তা পরিহার করতে আমরা সমর্থ হব। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের অধ্যায়ে একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র প্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে ওদের আক্রমণকে প্রতিহত করে প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে রক্ষা করা এবং তাদের বিকাশকে সহায়তা করাই নয়; বরং জাপানের বিরুদ্ধে একগুঁয়েদের প্রতিরোধকে দীর্ঘায়িত করা এবং ব্যাপক আকারে গৃহযুদ্ধ পরিহার করার জন্য ওদের সংগে আমাদের

সহযোগিতা অব্যাহত রাখাও বটে। সংগ্রাম ছাড়া এই প্রগতিশীল শক্তিগুলো একগুঁয়ে শক্তিদের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যুক্তফ্রন্টের অবসান ঘটবে, শত্রুর কাছে একগুঁয়েদের আত্মসমর্পণের থেকে বিরত করার আর কিছু থাকবে না এবং গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার পথ হিসেবে, অবস্থার ক্ষেত্রে একটা সহায়ক পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য এবং ব্যাপক আকারে গৃহযুদ্ধ পরিহার করার ব্যাপারে অপরিহার্য। আমাদের সমগ্র অভিজ্ঞতা এই সত্যকেই সপ্রমাণ করেছে।

অবশ্য জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের অধ্যায়ে একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে কয়েকটি মূল নীতি আমাদের মেনে চলতেই হবে। প্রথম হচ্ছে, আত্মরক্ষার নীতি। আক্রান্ত না হলে আমরা আক্রমণ করব না, যদি আমরা আক্রান্ত হই তবে নিশ্চয়ই পাল্টা আক্রমণ আমরা করব। তার অর্থ হচ্ছে, প্ররোচনা ছাড়া অন্যদের আমরা কখনই আক্রমণ করব না কিন্তু আক্রান্ত হলে আঘাতটির বদলা নিতে ব্যর্থ হলে চলবে না। এই হচ্ছে আমাদের সংগ্রামের আত্মরক্ষামূলক প্রকৃতি। একগুঁয়েদের সামরিক আক্রমণকে দৃঢ়ভাবে, সম্পূর্ণরূপে, সামগ্রিকভাবে ও পুরোপুরিভাবে চুরমার করে দিতেই হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, বিজয়ের নীতি। বিজয়ের ব্যাপারে সুনিশ্চিত না হলে আমরা লড়াই করতে যাব না; পরিকল্পনা, প্রস্তাব ও সাফল্যের নিশ্চয়তা ছাড়া আমরা লড়াই করতে যাব না। একগুঁয়েদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে কাজে লাগাতে আমাদের জানতে হবে এবং একই সময়ে তাদের বহুজনের সংগে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লে আমাদের চলবে না বরং তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধেই আমাদের প্রথম আঘাত হানতে হবে। এখানেই নিহিত রয়েছে আমাদের সংগ্রামের সীমাবদ্ধ প্রকৃতিটি। তৃতীয় হচ্ছে, সন্ধির নীতি। একগুঁয়েদের একটি আক্রমণ প্রতিহত করার পর আমাদের জানা চাই কোথায় আমরা থাকব এবং আমাদের ওপর অন্য একটি আক্রমণ পরিচালিত হওয়ার আগে একটা বিশেষ লড়াইকে সমাপ্ত করতে হবে। এই অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য একটা সন্ধি করা চাই। তারপর আমাদের একগুঁয়েদের সংগে ঐক্য স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং যদি ওরা সম্মত থাকে তবে তাদের সংগে শান্তিস্থাপনের চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অবিরাম দিনের পর দিন লড়াই করা চলবে না বা সাফল্যে আত্মহারা হলে চলবে না। এখানে নিহিত রয়েছে

প্রতিটি সংগ্রামের সামরিক প্রকৃতিটি। একগুঁয়েরা যখন একটি নতুন আক্রমণ চালাবে একমাত্র তখনই একটি নতুন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা প্রতিহত করব। অল্প কথায় বলতে গেলে, লড়াইয়ের তিনটি মূল নীতি হচ্ছে 'ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে', 'আমাদের দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে' এবং 'সংযত-ভাবে' লড়াই করা। ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, আমাদের দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে এবং সংযতভাবে এই ধরনের সংগ্রাম চালিয়ে আমরা প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে বিকশিত করে তুলতে, মাঝারি শক্তি-গুলোকে পক্ষে নিয়ে আসতে এবং একগুঁয়ে শক্তিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারব। এভাবেই আমাদের ওপর আক্রমণ চালাবার, শত্রুর সংগে আপোষরফা করার অথবা ব্যাপক আকারে গৃহযুদ্ধ বাধাবার আগে একগুঁয়েদের আমরা একাধিকবার ভেবে দেখতে বাধ্য করতে পারব। এমনি করেই পরিস্থিতিতে একটি সহায়ক পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভবপর হবে।

৬। কুওমিনতাঙ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত একটি পার্টি, তারমধ্যে রয়েছে। একগুঁয়েরা, মাঝারি ব্যক্তিরা এবং প্রগতিশীলেরা; সামগ্রিকভাবে ধরলে, একে একগুঁয়েদের সংগে সমার্থক বলে গণ্য করা চলে না। কিছু কিছু লোক মনে করেন কুওমিনতাঙ সম্পূর্ণভাবে একগুঁয়েদের নিয়েই গঠিত, কারণ তার কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি 'বিদেশী পার্টিসমূহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাবলীর' মতো প্রতিবিপ্লবী সংঘাত সৃষ্টিকারী হুকুমনামা ঘোষণা করেছে এবং তার সমস্ত শক্তি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে প্রতিবিপ্লবী, সংঘাত সৃষ্টিকারী মনোভাব গোটাদেশের মতাদর্শগত, রাজনীতিগত, ও সামরিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি করার জন্য। কিন্তু এটা একটা ভ্রান্ত মনোভাব। কুওমিনতাঙ-এর মধ্যে একগুঁয়েরা এখনো তার নীতিসমূহ চাপিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থানে রয়েছে, কিন্তু সংখ্যাগত দিক থেকে ওরা সংখ্যালঘু; অন্যদিকে সদস্যদের (যদিও সদস্যরা অনেকে শুধু নামেই সদস্য) অধিকাংশই ধরাবাঁধাভাবে একগুঁয়ে নয়। এই বিষয়টি খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেই কুওমিনতাঙ-এর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে আমরা সদ্ব্যবহার করতে পারব, বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভিন্নতার ভিত্তিতে একটি নীতি অনুসরণ করতে এবং মাঝারি ও প্রগতিশীল অংশের সংগে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য চূড়ান্তটুকু করতে পারব।

৭। জাপ-বিরোধী মুক্তাঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নে আমাদের এটা সুনিশ্চিত করা চাই যে, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ক্ষমতাটি জাপ-বিরোধী জাতীয়

যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতা হবে। কুওমিনতাঙ এলাকাসমূহে এখনো এ ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যাঁরা প্রতিরোধ ও গণতন্ত্র এই উভয়কেই সমর্থন করেন অর্থাৎ দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে কতিপয় বৈপ্লবিক শ্রেণীর যৌথ গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে সমর্থন করেন, এটা হবে তাঁদের সকলেরই রাজনৈতিক ক্ষমতা। এটা জমিদারশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বের চেয়ে স্বতন্ত্র এবং তা শ্রমিক-কৃষকদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের থেকেও কড়াকড়িভাবে দেখলে অনেকটা বিভিন্ন। রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থার পদগুলো বরাদ্দ করা চাই নিম্নরূপভাবে: এক-তৃতীয়াংশ বরাদ্দ হবে শ্রমিকশ্রেণী ও গরিব কৃষকজনগণের প্রতিনিধিত্বকারী কমিউনিস্টদের জন্য; এক-তৃতীয়াংশ বরাদ্দ হবে পেটি-বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্বকারী বামপন্থী প্রগতিশীলদের জন্য এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ বরাদ্দ হবে মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবৃন্দের প্রতিনিধিত্বকারী মাঝারি ও অন্যান্য শক্তিগুলোর জন্য। একমাত্র দেশদ্রোহী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী শক্তিগুলোই রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহে অংশগ্রহণের অনুপযুক্ত বলে গণ্য হবে। আসন বরাদ্দ সম্পর্কিত এই সাধারণ নিয়মটি প্রয়োজনীয় কারণ অন্যথায় যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার নীতিটি অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে না। আসন বরাদ্দ সম্পর্কিত এই ব্যবস্থা আমাদের পার্টির ঐকান্তিক নীতিরই প্রকাশ এবং সুবিবেচনার সংগে তাকে কার্যকরী করা চাই; এখানে কোন দায়সারা ভাব থাকা চলবে না। এটা হচ্ছে একটা ব্যাপক নিয়ম, বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী তা প্রয়োগ করতে হবে এবং যান্ত্রিকভাবে সেটা পূরণ করে গেলেই হবে না। একেবারে নিম্নতর স্তরে অনুপাতটিকে খানিকটা রদবদল করে নেওয়া চলতে পারে, জমিদারগণ ও বড় অভিজাতবৃন্দের প্রাধান্যকে প্রতিহত করার জন্য কিন্তু এই নীতির মৌল মনোভাবটিকে লংঘন করা চলবে না। ঐসব সংস্থার অ-কমিউনিস্টগণের পার্টিগত যোগাযোগ আছে কিনা বা থাকলে তাদের পার্টিগত যোগাযোগগুলো কী, তা নিয়ে দুর্ভাবনার আমাদের প্রয়োজন নেই। যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধীন এলাকাসমূহে কুওমিনতাঙ বা অন্য যে-কোন পার্টি হোক, সকল রাজনৈতিক পার্টিকেই, যতক্ষণ তারা সহযোগিতা করবে এবং কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করবে না ততক্ষণ, তাদের আইনসম্মত রাজনৈতিক মর্যাদা দিতে হবে। ভোটাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে নীতি হল প্রত্যেকটি চীনার যখনই আঠারো বছর বয়স হবে এবং যিনিই প্রতিরোধ ও

গণতন্ত্রের পক্ষপাতী—শ্রেণী, জাতিসত্তা, পার্টিগত যোগাযোগ, নারী-পুরুষ, ধর্ম ও শিক্ষাগত মান নির্বিশেষে তাদের সকলেরই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার থাকবে। যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহকে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে এবং তার পরে জাতীয় সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য তা পেশ করতে হবে। তাদের সংগঠনের রূপের ভিত্তি হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহের দ্বারা গৃহীত সকল প্রধান ব্যবস্থাবলীর মূল সূচনাবিন্দু হবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, সুপ্রমাণিত দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরোধিতা, জাপানকে যারা প্রতিরোধ করেছেন তাঁদের রক্ষা করা, জাপ-বিরোধী সকল সামাজিক স্তরের স্বার্থের মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্য বিধান করা এবং শ্রমিক ও কৃষকদের জীবিকার মান উন্নত করা। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা সমগ্র দেশে বিরাট প্রভাব সঞ্চার করবে এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্তরে যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার তা একটি আদর্শ হয়ে উঠবে। সুতরাং এই নীতিটিকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং সমগ্র পার্টি কমরেডগণ কর্তৃক দৃঢ়চিত্তভাবে তা কার্যকরী করতে হবে।

৮। প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে বিকশিত করে তোলা, মাঝারি শক্তিগুলোকে জয় করে পক্ষে নিয়ে আসা এবং একগুঁয়েদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমাদের সংগ্রামে আমাদের দিক থেকে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে অবজ্ঞা করা চলবে না, কারণ একগুঁয়েরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে এদের সপক্ষে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সুতরাং সমস্ত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সপক্ষে নিয়ে আসার এবং তাদের পার্টির প্রভাবে নিয়ে আসার নীতিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যতঃ একটি অপরিহার্য নীতি।

৯। আমাদের প্রচারাভিযানে নিম্নলিখিত কর্মসূচীর ওপর আমাদের জোর দিতে হবে।

(ক) জাপানের বিরুদ্ধে যুক্ত প্রতিরোধের জন্য জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের ঘোষণাবাণীকে কার্যকরী করা;

(খ) জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করে এবং পরিপূর্ণ জাতীয় মুক্তি ও চীনের আভ্যন্তরীণ সকল জাতিসত্তার সমতার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে জাতীয়তাবাদের মূল নীতিকে কার্যকরী করা;

(গ) জাপানকে প্রতিরোধের জন্য এবং জাতিকে রক্ষা করার জন্য জনগণকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা প্রদান করে, সমস্ত স্তরে সরকারকে নির্বাচন করার সুযোগ দিয়ে এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্রের মূল নীতিকে কার্যকরী করা;

(ঘ) অতিরিক্ত করের বোঝা ও বিভিন্ন ধরনের লেভি বাতিল করে দিয়ে, জমির খাজনা ও সুদ কমিয়ে দিয়ে, আট ঘন্টা কাজের দিন সুনিশ্চিত করে, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশসাধন করে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার মূল নীতিকে কার্যকরী করা; এবং

(ঙ) 'তরুণ অথবা প্রবীণ, উত্তর অথবা দক্ষিণের প্রতিটি ব্যক্তিকেই জাপানকে প্রতিরোধ করার এবং দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে'—চিয়াং কাই-শেকের এই ঘোষণাকে কার্যকরী করা।

কুওমিনতাঙ-এর নিজের প্রকাশিত কর্মসূচীতেই এইসব কয়টি বিষয় রয়েছে, যা আবার কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্টদের যুক্ত কর্মসূচীও বটে। কিন্তু কুওমিনতাঙ জাপানকে প্রতিরোধ করা ছাড়া এই কর্মসূচীর আর কোন অংশই কার্যকরী করেনি; একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোই তা কার্যকরী করতে সক্ষম। এটি যথেষ্ট সরল একটি কর্মসূচী এবং ব্যাপকভাবে সকলেরই তা জানা আছে, তবু অনেক কমিউনিস্ট তাকে জনগণকে সমবেত করার এবং একগুঁয়েদের বিচ্ছিন্ন করার কাজে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হন। এখন থেকে এই কর্মসূচীর পাঁচটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হবে এবং জনসাধারণের কাছে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি, ইস্তাহার, প্রচারপত্র, নিবন্ধ, বক্তৃতা, বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। কুওমিনতাঙ এলাকাসমূহে এটি এখনো একটি প্রচারমূলক কর্মসূচী, কিন্তু অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী যেসব অঞ্চলে উপনীত হতে পেরেছে সেখানে এই কর্মসূচী ইতিমধ্যেই কার্যকরী হচ্ছে। এই কর্মসূচী অনুসারে কাজ করে আমরা আইনানুগভাবেই চলছি এবং একগুঁয়েরা যখন তা কার্যকরী করায় বিরোধিতা করছে তখন তারাই আইন-বহির্ভূত কাজ করছে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে কুওমিনতাঙ-এর এই কর্মসূচী মূলতঃ আমাদের কর্মসূচীরই অনুরূপ, কিন্তু কুওমিনতাঙ এর মতাদর্শ সম্পূর্ণতঃ কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শের থেকে পৃথক। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই সাধারণ কর্মসূচীকেই

আমাদের বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমরা কুওমিন-তাঙ-এর মতাদর্শকে অনুসরণ করব না।

টীকা

১। 'প্রাচ্যদেশের মিউনিক' প্রসঙ্গে রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডের 'আত্ম-সমর্পণবাদী কার্যকলাপের বিরোধিতা করুন' নামক রচনাটির ৩নং টীকা দেখুন।

জাপ-বিরোধী শক্তিগুলোকে অব্যাহতভাবে প্রসারিত করুন এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করুন

৪ঠা মে, ১৯৪০

১। শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্বর্তী সকল অঞ্চলসমূহে এবং যুদ্ধের এলাকাসমূহে বিশেষত্বের ওপর জোর না দিয়ে জোর দেওয়া চাই অভিন্নতার ওপর; এবং সেটা না করা ভুল হবে। প্রত্যেক অঞ্চলেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের সকলের অভিন্নতা হচ্ছে এখানেই যে, তারা সবাই শত্রুর মুখোমুখী এবং সকলেই প্রতিরোধ-যুদ্ধে লিপ্ত; উত্তরে, মধ্যাঞ্চলে বা দক্ষিণ চীনে, ইয়াংসি নদীর উত্তর অথবা দক্ষিণ অঞ্চলে হোক, সমতলে হোক, পর্বতে বা লেক অঞ্চলে হোক এবং যুক্তরত বাহিনী অষ্টম রুট বাহিনী, নয়া চতুর্থ বাহিনী বা দক্ষিণ চীন গেরিলা বাহিনী[১] হোক—তারা সকলেই প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত। এ থেকে বোঝা যায়, সব অবস্থাতেই আমাদের সম্প্রসারণ করা চাই এবং তা করতেই হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি বারবার এই সম্প্রসারণের নীতিটি আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছে। সম্প্রসারণ বলতে বোঝায় শত্রু-অধিকৃত সকল অঞ্চলেই ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং কুওমিনতাঙ-এর আরোপিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ থাকা চলবে না, কুওমিনতাঙ এর অনুমোদিত সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে, তাদের কাছ থেকে সরকারী অনুমোদনের আশা করে বসে থাকলে চলবে না অথবা উচ্চতর কর্তাদের কাছ থেকে পাওয়া আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না, বরং তার

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ এই নির্দেশটি রচনা করেছিলেন এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় ব্যুরোকে উদ্দেশ করে তা লিখিত হয়েছিল। ঐ নির্দেশটি লেখার সময় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় ব্যুরোর সম্পাদক কমরেড সিয়াং ইং দক্ষিণপন্থী মনোভাব পোষণ করতেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন অনুসরণের ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা প্রদর্শন করেছিলেন। জনগণকে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে পুরোপুরি উদ্বুদ্ধ করতে তিনি সাহস পাননি এবং ঘাঁটি এলাকা প্রসারের ব্যাপারে জাপানী অধিকৃত এলাকাসমূহে গণফৌজ প্রসারিত করার ব্যাপারেও সাহস পাননি। তিনি কুওমিনতাঙ-এর প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের সম্ভাবনার গুরুত্ব যথেষ্টভাবে উপলব্ধি করেননি আর তাই এই আক্রমণের জন্য মানসিকভাবে ও

পরিবর্তে অবাধে সশস্ত্র বাহিনীকে প্রসারিত করে যেতে হবে, এবং স্বাধীনভাবে দ্বিধাহীন চিত্তে ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করে যেতে হবে, স্বাধীনভাবে ঐসব অঞ্চলের জনসাধারণকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহ গড়ে তুলতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিয়াংসু প্রদেশে কমিউনিস্ট-বিরোধী ব্যক্তিবর্গ যেমন হ্য চু-তুং, লেং সিন এবং হান তে-চিন[২] প্রভৃতির মৌখিক আক্রমণ, বাধা-নিষেধ ও নিপীড়ন সত্ত্বেও আমাদের কর্তব্য হবে পশ্চিমে নানকিং থেকে পূর্বে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত, দক্ষিণে হাংচৌ থেকে উত্তরে স্যুচৌ পর্যন্ত যত বেশি সংখ্যক জেলায় সম্ভব আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, যত দ্রুত সম্ভব তা প্রতিষ্ঠা করা, একটানা ও ধারাবাহিকভাবে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া; আমাদের কর্তব্য হবে স্বাধীনভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে প্রসারিত করা, রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা স্থাপন করা, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য কর ধার্য ও আদায় করার জন্য খাদ্য সংগ্রহের দপ্তর স্থাপন করা এবং কৃষির উন্নতির জন্য, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য অর্থনৈতিক সংস্থা স্থাপন করা, বিপুল সংখ্যক কর্মীবাহিনীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষায়তন স্থাপন করা। কেন্দ্রীয় কমিটি ইতিমধ্যেই আপনাদের নির্দেশ দিয়েছে জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনীকে বৃদ্ধি করে এক লক্ষে পরিণত করতে এবং সম-সংখ্যক রাইফেল সংগ্রহ করতে, কিয়াংসুর শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে ও চেকিয়াং প্রদেশে এই বছর শেষ হওয়ার আগেই দ্রুত রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে। আপনারা কী বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? আগে সুযোগ হারিয়েছেন এবং আবার এই বছরও যদি সুযোগ হারান, অবস্থা তাহলে আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

২। ঠিক এমন একটা সময়ে যখন কমিউনিস্ট-বিরোধী একগুঁয়েরা তাদের

সাংগঠনিকভাবে তিনি অপ্রস্তুত ছিলেন। নির্দেশটি যখন দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় ব্যুরোতে পৌঁছায় কমরেড চেন ই দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় ব্যুরোর সদস্য ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর কম্যাণ্ডার হিসেবে তৎক্ষণাৎ তা কার্যকরী করেন, কিন্তু কমরেড সিয়াং ইং তা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেননি, কাজেই চিয়াং কাই-শেক যখন দক্ষিণ আনহুই ঘটনাটি ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে ঘটান তিনি তখন দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় ছিলেন, ফলে ঐ ঘটনায় আমাদের নয় হাজার সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং কমরেড সিয়াং ইং নিজেও নিহত হন।

কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করার, সীমাবদ্ধ করে রাখার এবং লড়াই করে শেষ করার নীতিতে একগুঁয়ের মতো অবিচল থেকে চাপ দেয় কাছে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত, তখন আমাদের ঐক্যের ওপর নয়, জোর দেওয়া চাই সংগ্রামের ওপর। সেটা করা হবে গুরুতর ভুল। সুতরাং তত্ত্বগত, রাজনৈতিক অথবা সামরিক ক্ষেত্রে একটি নীতিগত বিষয় হিসেবেই আমাদের কর্তব্য হবে কমিউনিস্ট-বিরোধী একগুঁয়েদের যে মৌখিক আক্রমণ, প্রচারাভিযান, আদেশ ও আইনকানুন কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করার, সীমাবদ্ধ করে রাখার ও বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে রচিত—দৃঢ়ভাবে তার সবগুলির প্রতিরোধ করা এবং এ সবের প্রতি দৃঢ় সংগ্রামই হবে আমাদের মনোভাব। এই সংগ্রাম চালাতে হবে ন্যায্য ভিত্তির নীতির ওপর দাঁড়িয়ে, আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক অবস্থান থেকে এবং সংযমের সংগে, অর্থাৎ আত্মরক্ষা, বিজয় ও সন্ধির নীতির ওপর দাঁড়িয়ে—যার অর্থ হচ্ছে প্রতিটি বাস্তব সংগ্রামই হবে আত্মরক্ষামূলক, সীমাবদ্ধ ও সাময়িক প্রকৃতির। সমানে সমান বদলার ব্যবস্থাই আমাদের নিতে হবে এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী একগুঁয়েদের সকল প্রতিক্রিয়াশীল মৌখিক আক্রমণ, প্রচারাভিযান, আদেশ ও আইন-কানুনগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম আমাদের চালাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ওরা যখন আমাদের কাছে দাবি জানিয়ে ছিল আমাদের চতুর্থ ও পঞ্চম সৈন্যদলকে দক্ষিণে সরিয়ে নিতে হবে,[৩] আমরা তখন জোর দিয়ে পাল্টা দাবি জানালাম যে তা করা একান্তই অসম্ভব। যখন ওরা দাবি জানাল যে, ইয়ে ফেই এবং চাং য়ুন-ই'র অধীন ইউনিটগুলিকে দক্ষিণে সরিয়ে নিতে হবে[৪], আমরা তার পাল্টা হিসেবে অনুমতি চাইলাম এই ইউনিটগুলির একটি অংশকে উত্তরের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য; তারা যখন আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল যে, আমরা তাদের বাধ্যতামূলক সৈন্য-সংগ্রহের পরিকল্পনায় ক্ষতিসাধন করছি, আমরা তাদের আমাদের নয়া চতুর্থ বাহিনীর সৈন্য সংগ্রহের এলাকা প্রসারিত করে দেবার জন্য বললাম; তারা যখন বলল যে, আমরা ভুল প্রচারকার্য চালাচ্ছি, আমরা তাদের সকল প্রকার কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারকার্য বন্ধ করতে বললাম এবং 'সংঘর্ষ' সৃষ্টির সকল হুকুমনামা ও আদেশ খারিজ করে দিতে বললাম; আর তারা যখন আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাবে, আমাদের তখন পাল্টা আক্রমণ করে তাদের একেবারে চুরমার করে দিতে হবে। সমানে সমানে বদলা নেওয়ার আমাদের এই নীতির ব্যাপারে আমরা ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি। আর যখন আমরা

ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি, তখন শুধু আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিই যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা নয়, বরং আমাদের সৈন্যদলের প্রতিটি ইউনিটেরই উচিত হবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। চাং যুন-ই লিন সিন-সিয়েনের বিরুদ্ধে যা করেছিলেন এবং লী সিয়েন-নিয়েন লী হুং-জেনের* বিরুদ্ধে যা করেছিলেন—সে দুটিই হচ্ছে নিম্নতর স্তর থেকে ওপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জ্ঞাপনের চমৎকার উদাহরণ। একগুঁয়েদের প্রতি এ ধরনের শক্ত মনোভাব এবং ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে এবং সংযতভাবে লড়াই করাই হচ্ছে আমাদের দমন করার ব্যাপারে একগুঁয়েদের খানিকটা ভয় পাইয়ে দেওয়ার, কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করার, সীমাবদ্ধ করে রাখার ও লড়াই করে শেষ করে দেওয়ার কার্যকলাপের পরিধি সংকুচিত করার, আমাদের আইনসঙ্গত মর্যাদা স্বীকার করে নিতে তাদের বাধ্য করার এবং একটা ভাঙন সৃষ্টি করার আগে তাদের একাধিকবার চিন্তা করতে বাধ্য করার একমাত্র পথ। সুতরাং আত্মসমর্পণের বিপদ পরিহার করার, পরিস্থিতিতে উন্নততর পরিবর্তন নিয়ে আসার এবং কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা জোরদার করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ হচ্ছে সংগ্রাম। আমাদের পার্টি ও সেনাবাহিনীর মধ্যেও একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে অবিচল এই সংগ্রাম পরিচালনাই হচ্ছে একমাত্র পথ যা আমাদের সংগ্রামী মনোভাবকে উন্নততর করবে, আমাদের সাহসিকতার পরিপূর্ণ উন্মোচন ঘটাবে, আমাদের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করবে, আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং আমাদের সেনাবাহিনী ও পার্টিকে সুসংহত করে তুলবে। অন্তর্বর্তী অংশসমূহের ক্ষেত্রে ও একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রামই হচ্ছে একমাত্র পথ, যাতে করে দোদুল্যমানদের জয় করে পক্ষে নিয়ে আসা যাবে, সহানুভূতিশীলদের সহায়তা করা যাবে—অন্য আর কোন পথ নেই। একই-ভাবে, সংগ্রামই হচ্ছে একমাত্র নীতি যার সাহায্যে সমগ্র পার্টি ও সমগ্র সেনাবাহিনীর মানসিক দিক থেকে দেশব্যাপী সম্ভাব্য জরুরী অবস্থার মোকাবিলার জন্য সজাগ থাকাটা সুনিশ্চিত হবে এবং তাদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে তারা প্রস্তুত থাকবে। অন্যথা হলে ১৯২৭ সালের ভুলেরই[৬] পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

৩। বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়নকালে আমাদের এটা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে আত্মসমর্পণের বিপদ যেমন নিদারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে

তেমনি তা পরিহার করাও সম্ভব। বর্তমান সামরিক সংঘর্ষগুলি এখনো আঞ্চলিকভাবে সীমাবদ্ধ এবং তা দেশজোড়া রূপ গ্রহণ করেনি। এটা হচ্ছে আমাদের বিরোধীদের রণনীতিগত দিক থেকে পরখ করে দেখার ব্যাপার, এখনো তা 'কমিউনিস্টদের দমনের' ব্যাপক আকারের রূপ নেয়নি। এগুলি হচ্ছে আত্মসমর্পণের প্রস্তুতির পথে পদক্ষেপ, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা আত্ম-সমর্পণের ঠিক পূর্ববর্তী ধাপ নয়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে অবিচলিতভাবে ও পূর্ণোদ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশিত ত্রিবিধ নীতি কার্যকরী করে চলা। সেটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক নীতি অর্থাৎ এই ত্রিবিধ নীতি হচ্ছে আত্মসমর্পণের বিপদ পরিহার করার জন্য এবং পরিস্থিতিতে একটি উন্নততর পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে বিকশিত করে তোলা, মাঝারি শক্তিগুলিকে জয় করে পক্ষে নিয়ে আসা এবং একগুঁয়েদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। পরিস্থিতির মূল্যায়নকালে এবং আমাদের কর্তব্য নিরূপণকালে যে-কোন 'বামপন্থী' ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি দেখিয়ে না দেওয়া এবং তা না শুধরানো হবে মারাত্মক।

৪। চতুর্থ ও পঞ্চম সেনাদল হান তে-চিন ও লী স্ন-জেনের আক্রমণের বিরুদ্ধে আনহুই-এর পূর্বাঞ্চলে যে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়েছিল, হুপের মধ্যাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে একগুঁয়েদের আক্রমণের বিরুদ্ধে লী সিয়েন-নিয়েনের বাহিনী যে লড়াই করেছিল, হুয়াই নদীর উত্তরাঞ্চলে পেং স্নয়ে-ফেঙের বাহিনী যে দৃঢ়পণ লড়াই চালিয়েছিল, ইয়ে ফেইয়ের সৈন্যরা ইয়াংসি নদীর উত্তরাঞ্চলে যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং হুয়াই নদীর উত্তরাঞ্চলের এলাকা-সমূহে ও আনহুই এবং উত্তর কিয়াংসুর অঞ্চলগুলিতে অষ্টম রুট বাহিনীর যে বিশ হাজারেরও বেশি সৈন্য দক্ষিণদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল[৭]—এইগুলো যে একান্ত প্রয়োজনীয় যুদ্ধবিগ্রহ ছিল তাই নয়, সেগুলো খুবই সঠিক কাজ হয়েছিল এবং দক্ষিণ আনহুই ও দক্ষিণ কিয়াংসু অঞ্চলে আপনাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার আগে একাধিকবার কু চু-তুংকে ভেবে দেখতে বাধ্য করার জন্যও তা ছিল অপরিহার্য। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, যত বেশি বিজয় আমরা অর্জন করব এবং ইয়াংসি নদীর উত্তরাঞ্চলে যত বেশি আমরা নিজেদের প্রসারিত করতে পারব, তত বেশি ইয়াংসি নদীর দক্ষিণাঞ্চলে কু চু-তুং বেপরোয়া কাজকর্ম চালাতে ভয় পাবে এবং দক্ষিণ আনহুই কিয়াংসুর দক্ষিণাঞ্চলে আপনাদের ভূমিকা পালন করা সহজতর হবে। একইভাবে, অষ্টম রুট বাহিনী, নয়া চতুর্থ বাহিনী ও দক্ষিণ চীনের গেরিলাবাহিনী যত

বেশি চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে সম্প্রসারিত হবে, কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশে তত বেশি করে বৃদ্ধিলাভ করবে; আত্মসমর্পণ প্রতিহত করার সম্ভাবনা তত বেশি বেড়ে যাবে এবং পরিস্থিতিতে একটি উন্নততর পরিবর্তন নিয়ে আসা তত বেশি সম্ভব হবে এবং দেশের সমস্ত অংশে আমাদের পার্টির পক্ষে নিজের ভূমিকা পালন করা সহজতর হবে। বিপরীত একটি মূল্যায়ন করা কিংবা আমাদের শক্তিগুলি যত বেশি সম্প্রসারিত হবে একগুঁয়েদের আত্মসমর্পণের প্রবণতা তত বেড়ে যাবে, তাদের যত বেশি আমরা সুযোগ দেব তত বেশি তারা জাপানকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যাবে, কিংবা গোটা দেশটি ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে এবং কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা আর সম্ভব নয়—এই বিশ্বাস থেকে বিপরীত একটি রণকৌশল গ্রহণ করা ভুল হবে।

৫। প্রতিরোধ-যুদ্ধে সমগ্র দেশের ক্ষেত্রেই আমাদের নীতি হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট। শত্রুর অধিকৃত এলাকার পশ্চাদ্‌ভাগে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা এই নীতির অঙ্গ। রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কিত প্রশ্নে আপনাদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলি দৃঢ়তার সংগেই কার্যকরী করতে হবে।

৬। কুওমিনতাঙ অঞ্চলে আমাদের নীতি যুদ্ধের অঞ্চলসমূহের ও শত্রুর পশ্চাদ্‌বর্তী অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি থেকে স্বতন্ত্র হবে। কুওমিনতাঙ অঞ্চলে আমাদের নীতি হবে: দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সুনির্বাচিত কর্মীবৃন্দ আত্মগোপন করে কাজকর্ম করে যাবেন, শক্তিসঞ্চয় করবেন ও সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করবেন, বেপরোয়া মনোভাব পরিহার করবেন এবং আত্মপ্রকাশ করবেন না। ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে ও সংযতভাবে সংগ্রাম করার নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের রণকৌশল হবে দৃঢ় ও সুনিশ্চিত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, এবং কুওমিনতাঙ-এর যেসব আইনকানুনের ও আদেশনামার সদ্ব্যবহার করে কাজকর্ম করলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং যেসবের পেছনে সামাজিক রীতিনীতির সমর্থন রয়েছে তার সবগুলির সদ্ব্যবহার করে আমাদের শক্তিকে জোরদার করে তোলা। আমাদের একজন পার্টি-সদস্যকে যদি কুওমিনতাঙ দলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়, তবে তাই করা হোক। আমাদের সদস্যরা পাও চিয়াজ্ঞয়ুহে[৮] ঢুকে পড়বেন এবং শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামরিক যত

সংগঠন আছে তাদের সবগুলিতে ঢুকে পড়বেন ; ব্যাপকভাবে তাদের যুক্ত-ফ্রন্টের কাজকর্ম চালাতে হবে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সৈন্যদল ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের সৈন্যদের[৯] বাহিনীর লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে। কুওমিনতাঙ শাসিত সকল এলাকাতেই পার্টির মূল নীতি অনুরূপভাবে হবে প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে (পার্টি-সংগঠন ও গণ-সংগঠনসমূহকে) বিকশিত করে তোলা, মাঝারি শক্তিগুলোকে জয় করে নিজের পক্ষে নিয়ে আসা (মোট সাত প্রকারের মাঝারি শক্তি রয়েছে, তারা হচ্ছে—জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গ, বিভিন্ন ধরনের সৈন্যরা, কুওমিনতাঙ-এর মাঝারি অংশ, কেন্দ্রীয় সৈন্যদলের মাঝারি অংশ, পেটি-বুর্জোয়াদের ওপরতলার অংশ, ক্ষুদে পার্টি ও গ্রুপগুলো) এবং একগুঁয়েদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যাতে করে আত্মসমর্পণের বিপদ পরিহার করা যায় এবং পরিস্থিতিতে একটা সহায়ক পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব হয়। একই সঙ্গে আঞ্চলিক বা দেশজোড়া ভিত্তিতে জরুরী অবস্থায় মোকাবিলার জন্য আমাদেব পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে। কুওমিনতাঙ এলাকায় আমাদের পার্টি-সংগঠনগুলিকে কঠোরভাবে গোপন রাখতে হবে। দক্ষিণ-পূর্ব ব্যুরোতে[১০] এবং সমস্ত প্রাদেশিক, বিশেষ, বিভাগীয় ও জেলা কমিটিতে সমস্ত সদস্যদেব (পার্টির সম্পাদকগণ থেকে পাচকগণ পর্যন্ত) সকলকেই এক এক করে সুকঠোরভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, এবং যার সম্বন্ধে সামান্যতম সন্দেহ রয়েছে মনে হবে তাকে কোনমতেই নেতৃস্থানীয় সংস্থাসমূহে থাকতে দেওয়া চলবে না। কর্মীদের রক্ষা করার জন্য গভীর সতর্কতা পালন করতে হবে, এবং প্রকাশ্য বা আধা-প্রকাশ্য দায়িত্বে থেকে কাজ করার সূত্রে যখনই কারও কুওমিনতাঙদের হাতে গ্রেপ্তার বা খুন হওয়ার বিপদ দেখা দেবে, তখনই হয় তাকে অন্য এলাকায় পাঠিয়ে দিতে হবে, আত্মগোপন করতে বলা হবে আর নয়তো সেনাবাহিনীতে পাঠিয়ে দিতে হবে। জাপানী অধিকৃত এলাকায় (যেমন, সাংহাই, নানকিং, উহু অথবা উশি অথবা অন্যকোন ছোট বা বড় মহানগরীতে বা গ্রামাঞ্চলে) আমাদের নীতি মূলতঃ কুওমিনতাঙ এলাকার মতোই একই প্রকারের হবে।

৭। কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সাম্প্রতিক সভায় বর্তমান রণ-কৌশলগত নির্দেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব ব্যুরোর ও সামরিক উপ-সমিতির কমরেডদের অনুরোধ করা হচ্ছে, এ নিয়ে যেন তাঁরা আলোচনা করেন, পার্টি-সংগঠনের ও সেনাবাহিনীর সকল কর্মীকে তা যেন

জানিয়ে দেওয়া হল এবং দৃঢ়ভাবে তা কার্যকরী করা হয়।

৮। কমরেড সিয়াং ইংকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তিনি এই নির্দেশ দক্ষিণ আনহুই অঞ্চলে জানিয়ে দেবেন এবং কমরেড চেন ই তা দক্ষিণ কিয়াংসু অঞ্চলে জানিয়ে দেবেন। এই টেলিগ্রাম পাওয়ার একমাসের মধ্যে আলোচনা ও জানানোর কাজটি শেষ করা চাই। কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন অনুসারে সমগ্র অঞ্চলে পার্টি ও সেনাবাহিনীর কাজকর্মের ব্যবস্থাপনার সর্বময় ভার কমরেড সিয়াং ইংয়ের ওপর ন্যস্ত রয়েছে এবং ফলাফল সম্পর্কে রিপোর্ট তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।

টীকা

১। 'দক্ষিণ চীন গেরিলাবাহিনী' এই নামটি ছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ চীনের জাপ-বিরোধী অনেকগুলো গেরিলা ইউনিটের সাধারণ নাম।

২। কু চু-তুং, লেং সিন এবং হান তে-চিন ছিল কিয়াংসু, চেকিয়াং, দক্ষিণ আনহুই, কিয়াংসি ও অন্যান্য স্থানে অবস্থিত কুওমিনতাঙ বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল সেনাপতিবৃন্দ।

৩। নতুন চতুর্থ বাহিনীর চতুর্থ ও পঞ্চম সেনাদল ঐ সময়ে কিয়াংসু-আনহুই প্রাদেশিক সীমান্তে হুয়াই নদীর উপত্যকায় একটি জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার কাজে ব্যাপৃত ছিল।

৪। নতুন চতুর্থ বাহিনীর ইউনিটসমূহ ইয়ে ফেট এবং চাং য়ুন-ই-এর পরিচালনাধীনে ঐ সময়ে কিয়াংসুর মধ্যাঞ্চল ও পূর্ব আনহুই অঞ্চলে ইয়াংসি নদীর উত্তরে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা করছিল এবং জাপ-বিরোধী ঘাঁটি গড়ে তুলছিল।

৫। ১৯৪০ সালের মার্চ ও এপ্রিলে আনহুই-এর কুওমিনতাঙ প্রাদেশিক শাসনকর্তা লি পিন-সিয়েন এবং পঞ্চম যুদ্ধ এলাকার কুওমিনতাঙ সেনাপতি লী সুং-জেন (এই দুজনই ছিল কোয়াংসির সশস্ত্র সামন্ত জমিদার গোষ্ঠীভুক্ত লোক) আনহুই-হুপে সীমান্ত অঞ্চলে নতুন চতুর্থ বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণাভিযান পরিচালনা করেছিল। ইয়াংসি নদীর উত্তর অঞ্চলের নতুন চতুর্থ বাহিনীর অধিনায়ক কমরেড চাং য়ুন-ই এবং হুপে-হোনান অভিযাত্রী

সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কমরেড লী সিয়েন-নিয়েন তার জোর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং আক্রমণকে প্রতিহত করে দিয়েছিলেন।

৬। ১৯২৭ সালের ভুল বলতে চেন তু-সিউর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের কথাই বলা হচ্ছে।

৭। ১৯৪০ সালের জানুয়ারিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি অষ্টম রুট বাহিনীর ২০,০০০ সৈন্যকে উত্তর চীন থেকে হুয়াই নদীর উত্তরাঞ্চলের, পূর্ব আনহুই অঞ্চলের ও উত্তর কিয়াংসু অঞ্চলের নতুন চতুর্থ বাহিনীর জাপ-বিরোধী যুদ্ধবিগ্রহে যোগদানের জন্য প্রেরণ করেছিল।

৮। **পাও চিয়া** হচ্ছে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যার সাহায্যে ওরা সর্বনিম্ন স্তরে তাদের ফ্যাসিষ্ট শাসন কার্যকরী করত।

৯। চিয়াং কাই-শেক চক্র তাদের নিজেদের সশস্ত্র বাহিনীকে বলত 'কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী' এবং অন্যান্য চক্রের অন্তর্ভুক্ত সৈন্যদের বলত 'বিভিন্ন ধরনের সৈন্যদল'। শেষোক্তদের বিরুদ্ধে তার বৈষম্যমূলক আচরণ করত এবং তাদের কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর সমান স্তরের বলে গণ্য করত না।

১০। ১৯৩৮-৪১ সালের অধ্যায়টিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব ব্যুরো কিয়াংসু, চেকিয়াং, আনহুই, কিয়াংসি, হুপে এবং হুনান প্রদেশ দক্ষিণ-পূর্ব চীনের কাজকর্ম পরিচালনা করত।

একেবারে শেষ পর্যন্তই ঐক্য চাই

জুলাই ১৯৪০

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার তৃতীয় বার্ষিকী এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির উনবিংশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী কয়টি দিনের ব্যবধানেই একসংগে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। প্রতিরোধ-বার্ষিকী উদ্‌যাপন করার সময় আমরা কমিউনিস্টরা আরও একান্তভাবে আমাদের দায়িত্বের কথা উপলব্ধি করছি। চীনা জাতির মুক্তির জন্য সংগ্রামের দায়িত্ব আজ ন্যস্ত হয়েছে সকল জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী এবং সমগ্র জনগণের ওপর, কিন্তু আমরা মনে করি অনেক বেশি গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে কমিউনিস্ট হিসেবে আমাদের ওপর। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বর্তমান পরিস্থিতির ওপর একটি বিবৃতি দিয়েছে, যার মূল কথাই হচ্ছে একেবারে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ ও ঐক্যের জন্য আহ্বান। আমরা আশা করি এই বিবৃতি বন্ধু পার্টি ও সেনাবাহিনীসমূহের এবং সমগ্র জাতির সম্মতিলাভে সমর্থ হবে এবং কমিউনিস্টগণ বিশেষভাবে আন্তরিকতাসহকারে নির্ধারিত লাইন অনুসারে তা কার্যকরী করে চলবেন।

সকল কমিউনিস্টকেই এ কথা বুঝতে হবে যে, একমাত্র একেবারে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই শুধু শেষ পর্যন্ত ঐক্য রক্ষা করা যাবে, এবং তার বিপরীতটিও সত্য। সুতরাং প্রতিরোধ ও ঐক্য এই উভয় ক্ষেত্রেই কমিউনিস্টদের আদর্শ স্থাপন করতে হবে। আমাদের বিরোধিতা পুরোপুরি শত্রুর বিরুদ্ধেই পরিচালিত, পরিচালিত তা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আত্মসমর্পণকামী ও কমিউনিস্ট-বিরোধীদের বিরুদ্ধেও। অন্য সকলের সংগেই আমরা ঐকান্তিকতা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে চাই। প্রতিটি স্থানেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আত্মসমর্পণকামী ও কমিউনিস্ট-বিরোধীগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ মাত্র; একটি আঞ্চলিক সরকারে অনুসন্ধান করে আমি দেখেছিলাম, তার ১,৩০০ জন কর্মীর মধ্যে নিছক ৪০ বা ৫০ জন, অর্থাৎ শতকরা চার ভাগেরও কম, একেবারে সুচিহ্নিত কমিউনিস্ট-বিরোধী, অন্যদিকে বাকি সবাই ঐক্য এবং প্রতিরোধের পক্ষপাতী। অবশ্যই আমরা এই আত্মসমর্পণকামী কমিউনিস্ট-বিরোধীদের সহ্য করতে পারি না, কারণ তার অর্থ দাঁড়াবে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকে ধ্বংস করে দেবার

ও ঐক্যকে বিনষ্ট করার সুযোগ দেওয়া। আমরা দৃঢ়ভাবে আত্মসমর্পণকারীদের বিরোধিতা করব এবং আত্মরক্ষার্থে দৃঢ়ভাবে কমিউনিস্ট-বিরোধীদের আক্রমণকে প্রতিহত করব। এটা করতে না পারাটা হবে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ, এবং তা ঐক্য ও প্রতিরোধে বিঘ্ন ঘটাবে। অবশ্য আমাদের নীতি হবে যাঁরা একান্তভাবে আত্মসমর্পণ ও কমিউনিস্ট-বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে যাননি তাঁদের সকলের সংগেই ঐক্য স্থাপন করা। কারণ অনেকে রয়েছেন, যাঁরা দুদিকেই তাকিয়ে দেখছেন, অনেকে বাধ্য হয়ে কাজ করছেন, আবার অনেকে সাময়িকভাবে ভ্রান্ত পথে চলেছেন, অব্যাহত ঐক্য ও প্রতিরোধের জন্য এই সমস্ত জনসাধারণকেই আমাদের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে। এটা না করতে পারাটা হবে 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ এবং এর ফলেও ঐক্য ও প্রতিরোধের ক্ষতি সাধিত হবে। সকল কমিউনিস্টকেই এটি উপলব্ধি করতে হবে, জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার পর তাকে রক্ষা আমাদেরই করতে হবে। এই মুহূর্তে যখন জাতীয় সংকট গভীরতর হচ্ছে এবং বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হতে যাচ্ছে, তখন চীনা জাতিকে রক্ষা করার খুবই বিরাট এই দায়িত্বভার আমাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত আমাদের করতেই হবে এবং স্বাধীন, মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হিসেবে চীনকে আমাদের গড়ে তুলতেই হবে এবং তা করার জন্য সম্ভাব্য বিপুলতম পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত জনগণকে ঐক্যবদ্ধও আমাদের করতে হবে। নীতি বিবর্জিত যুক্তফ্রন্টে কমিউনিস্টদের যোগ দেওয়া চলবে না এবং তারই জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার, সীমাবদ্ধ করে রাখার, অবরোধ করার ও দমন করার এ ধরনের সকল চক্রান্তের বিরোধিতা করতে হবে এবং পার্টির মধ্যেকার দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদেরও বিরোধিতা করতে হবে। কিন্তু একই সংগে কমিউনিস্টদেরকে পার্টির যুক্তফ্রন্টের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলেও চলবে না, এবং তাই প্রতিরোধের নীতির ভিত্তিতে যারাই জাপানকে এখনো প্রতিরোধ করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলের সংগেই তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হবেন এবং পার্টির মধ্যেকার 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের অবশ্যই তাঁরা বিরোধিতা করবেন।

তাই রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসঙ্গে আমরা যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থার পক্ষপাতী; কমিউনিস্ট পার্টির বা অন্য যে-কোন পার্টিরই হোক, একদলীয় একনায়কত্বের আমরা পক্ষপাতী নই, বরং আমরা সমস্ত রাজ-

বিভিন্ন দল ও গ্রুপ, জীবনের সকল স্তরের জনসাধারণ ও সকল সশস্ত্র বাহিনীর, অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতারই আমরা পক্ষপাতী, পক্ষপাতী আমরা এদের সকলের সংযুক্ত একনায়কত্বের। শত্রুকে এবং জীড়নকদের শাসনকে ধ্বংস করার পর শত্রুর কবলিত এলাকার পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে যখনই আমরা জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা গড়ে তুলব, তখনই আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের 'তিনটি এক-তৃতীয়াংশের' পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যাতে করে কমিউনিস্টগণ সকল সরকারী ও জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থার শুধুমাত্র এক-তৃতীয়াংশ আসন গ্রহণ করবে এবং বাকি দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাবেন সেইসব জনসাধারণ যাঁরা প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রের পক্ষপাতী, তা তাঁরা অন্যান্য পার্টির ও গ্রুপের সদস্য হোন বা না-ই হোন। যদি কেউ আত্মসমর্পণের পক্ষপাতী না হন এবং যদি তিনি কমিউনিস্ট-বিরোধী না হন, তাহলেই তিনি সরকারের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রতিটি রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপেরই অস্তিত্বের অধিকার থাকবে এবং যতক্ষণ তাঁরা আত্মসমর্পণের পক্ষপাতী হবেন না এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী হবেন না, ততক্ষণ তাঁরা জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতার অধীনে তাঁদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারবেন।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রশ্নে আমাদের পার্টির বিবৃতিতে এ কথা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, কোন 'মিত্র বাহিনীতে আমাদের পার্টি-সংগঠন প্রসারিত না করার' সিদ্ধান্ত আমরা মান্য করে চলব। আঞ্চলিক যে পার্টি-সংগঠনগুলো এই সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে মান্য করেনি, তারা অবিলম্বে ব্যাপারটি শুধরে নেবে। যেসব সশস্ত্র ইউনিট অষ্টম রুট বাহিনী অথবা নতুন চতুর্থ বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু করবে না, তাদের সকলের প্রতিই আমাদের বন্ধুত্বের মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। এমনকি যেসব সৈন্যদল 'সংঘর্ষ' বাধিয়েছিল, তারা যখনই তা বন্ধ করে দেবে, তখনই তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। সশস্ত্র বাহিনীর প্রসঙ্গে এই হচ্ছে আমাদের যুক্তফ্রন্টের নীতি।

অন্যান্য বিষয়ে, তা আর্থিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অথবা শিক্ষাগত কিংবা গুপ্তচর-বিরোধী বিষয় যাই হোক না কেন, প্রতিরোধের স্বার্থে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গতিসাধন করে যুক্তফ্রন্টের নীতিই আমাদের অনুসরণ করতে হবে এবং দক্ষিণ ও 'বামপন্থী' এই উভয়বিধ সুবিধাবাদেরই বিরোধিতা করতে হবে।

আন্তর্জাতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে পরিণত হয়েছে এবং তা থেকে যে চূড়ান্ত গুরুতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা অনিবার্যভাবে বহু দেশে বিপ্লবের আকারে ফেটে পড়বে। আমরা যুদ্ধ ও বিপ্লবের এক নতুন যুগে রয়েছি। যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের তাণ্ডবে জড়িয়ে পড়েনি, তা বিশ্বের সকল নিপীড়িত জনগণ ও নিপীড়িত জাতির সমর্থক। এই অবস্থাগুলো চীনের প্রতিরোধ যুদ্ধের পক্ষে সহায়ক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণের বিপদ আগের যে-কোন সময়ের চেয়ে বেশি গুরুতর, কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণকে তীব্রতর করে তুলছে। আর এর ফলে দোদুল্যমান শক্তিগুলোর কেউ কেউ সুনিশ্চিতভাবেই আত্মসমর্পণের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠবে। যুদ্ধের চতুর্থ বছরটি সবচেয়ে কঠিন একটি বছর হবে। আমাদের কাজ হবে সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা, আত্মসমর্পণকামীদের বিরোধিতা করা, সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করা এবং দেশজোড়া প্রতিরোধে অবিচলিত থাকা। সকল কমিউনিস্টকেই মিত্র মনোভাবাপন্ন দলগুলি ও সেনাবাহিনীসমূহের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে হবে। আমরা স্থির বিশ্বাস রাখি যে, আমাদের পার্টির সকল সদস্যের, বন্ধু দল ও সেনাবাহিনী এবং সমগ্র জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে আমরা আত্মসমর্পণকে প্রতিহত করতে, বাধাবিঘ্নকে জয় করতে, জাপানী আক্রমণকারীদের বিদায় করে দিতে এবং আমাদের হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে সফল হব। আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রকৃতপক্ষে খুবই উজ্জ্বল।

কর্মনীতি সম্পর্কে

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪০

কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণের বর্তমান তীব্রতা বৃদ্ধির মুখে আমাদের গৃহীত কর্মনীতি প্রচণ্ড নির্ধারক গুরুত্বসম্পন্ন। কিন্তু অনেক কর্মীই এটা উপলব্ধি করতে পারছেন না যে, পার্টির বর্তমান কর্মনীতি কৃষি-বিপ্লবের সময়কার কর্মনীতির থেকে আলাদা। এ কথা মনে রাখতে হবে যে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের সমগ্র পর্যায় জুড়ে পার্টি কোন অবস্থাতেই তার যুক্তফ্রন্টের কর্মনীতি পাল্টাবে না, এবং কৃষি-বিপ্লবের সময়কার দশ বছরে গৃহীত বহু কর্মনীতিকেই আজ আর প্রয়োগ করা চলবে না। বিশেষতঃ, কৃষি-বিপ্লবের শেষ দিককার বহু উগ্র-বাম কর্মনীতি শুধু আজকেই পুরোপুরি অচল নয়, এমনকি তখনো সেগুলি ভুল ছিল। চীন বিপ্লব যে একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, এবং সেটা যে দীর্ঘস্থায়ী—এই দুটি মৌলিক বিষয় বুঝবার ব্যর্থতা থেকেই ওই ভুল কর্মনীতিগুলি উদ্ভূত হয়েছিল। যেমন, এই তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছিল যে, কুওমিনতাঙের পঞ্চম 'অবরোধ ও দমন' অভিযান এবং আমাদের প্রত্যাভিযানই ছিল প্রতিবিপ্লব ও বিপ্লবের মধ্যেকার নির্ধারক যুদ্ধ; পুঁজিপতিশ্রেণীকে (শ্রম ও ট্যাক্স-সম্পর্কিত উগ্র-বাম কর্মনীতি) এবং ধনী কৃষকদেরকে (নিকৃষ্ট জমি বরাদ্দ করে) অর্থনৈতিকভাবে উৎখাত; জমিদারদের শারীরিক উৎখাত (কোন জমিই তাদের জন্য বরাদ্দ না করে), বুদ্ধিজীবীদের ওপর আক্রমণ; প্রতিবিপ্লবীদের দমন করার ব্যাপারে 'বামপন্থী' বিচ্যুতি; রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলির ওপর কমিউনিস্টদের একচেটিয়া আধিপত্য, গণ-শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে কমিউনিজমের ওপর প্রাধান্য দেওয়া; উগ্র-বাম সামরিক কর্মনীতি (বড় বড় শহরের ওপর আক্রমণএবং গেরিলাযুদ্ধের ভূমিকার অস্বীকৃতি); শ্বেত এলাকার কাজে পুৎসীয় (putschist); শৃংখলা রক্ষার নামে কমরেডদের ওপর আক্রমণ[১]—এইসব উগ্র-বাম কর্মনীতি হচ্ছে 'বামপন্থী' সুবিধাবাদেরই অভিব্যক্তি, যা প্রথম মহান বিপ্লবের যুগের শেষের দিকের চেন

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে কমরেড মাও সে-তুঙ পার্টির আভ্যন্তরীণ এই নির্দেশটি রচনা করেন।

চু-সিউর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের ঠিক বিপরীত। প্রথম মহান বিপ্লবের যুগের শেষের দিকের কর্মনীতি ছিল শুধু মৈত্রী, কোন লড়াই নয়, এবং কৃষি-বিপ্লবের শেষের দিকের কর্মনীতি ছিল শুধু লড়াই, কোন মৈত্রী নয় (কেবলমাত্র কৃষকদের মধ্যে একেবারে নীচের স্তরে ছাড়া)—এ দুটিই হল উগ্র কর্মনীতির জলন্ত উদাহরণ। এই উভয় উগ্র কর্মনীতিই পার্টি ও বিপ্লবের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল।

আমাদের বর্তমান জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের কর্মনীতি যেমন শুধু মৈত্রী ও কোন লড়াই নয়—এমন নয়, তেমনি শুধু লড়াই, কোন মৈত্রী নয়—এমনও নয়, এটা হচ্ছে লড়াই ও মৈত্রী দুটোরই সংমিশ্রণ। সুনির্দিষ্ট অর্থে এ হল:

(১) সমগ্র জনসাধারণ যাঁরাই প্রতিরোধের পক্ষে (অর্থাৎ, সমস্ত জাপ-বিরোধী শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী এবং ব্যবসায়ীরা) তাঁদের সবাইকে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

(২) যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আমাদের কর্মনীতি হবে স্বাধীন ও নিজস্ব উদ্যোগের কর্মনীতি, অর্থাৎ ঐক্য ও স্বাধীনতা উভয়ই চাই।

(৩) সামরিক রণনীতি বিষয়ে আমাদের কর্মনীতি হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ রণ-নীতির কাঠামোর মধ্যে আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে ও স্বাধীনভাবে গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা, গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে মূল ভিত্তি, কিন্তু অনুকূল পরিস্থিতিতে চলমান যুদ্ধ পরিচালনার কোন সুযোগই হারালে চলবে না।

(৪) কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের কর্মনীতি হচ্ছে দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করা, বেশির ভাগ লোককে দলে টেনে নেওয়া, স্বল্পসংখ্যকের বিরোধিতা করা, একে একে শত্রুকে ধ্বংস করা এবং সঠিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে লড়াই চালানো, লড়াই চালানো আমাদের সুযোগ-সুবিধা অনুসারে এবং সংযমের সংগে।

(৫) শত্রু-অধিকৃত এবং কুওমিনতাঙ-শাসিত অঞ্চলে আমাদের কর্মনীতি হচ্ছে একদিকে যুক্তফ্রন্টের যতটা সম্ভব ব্যাপ্তি ঘটানো, অন্যদিকে গোপনভাবে কাজ করার জন্য সুনির্বাচিত কমরেডদের ঠিক করা। লড়াই ও সংগঠনের রূপ কি হবে সে সম্বন্ধে আমাদের কর্মনীতি হচ্ছে এই যে, বহুদিন ধরে আমাদের সুনির্বাচিত কমরেডরা গোপনভাবে কাজ করবেন, শক্তি সঞ্চয় করবেন এবং সুযোগের অপেক্ষা করবেন।

(৬) আমাদের দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণী-বিন্যাস সম্পর্কে আমাদের মূল কর্মনীতি হচ্ছে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিকাশসাধন করা, মধ্যবর্তী স্তরের শক্তিগুলোকে জয় করে আনা এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থী শক্তিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

(৭) কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থীদের সম্বন্ধে আমাদের কর্মনীতি হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দ্বৈত বিপ্লবী কর্মনীতি—যতক্ষণ পর্যন্ত তারা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পক্ষে থাকছে ততক্ষণ তাদের সংগে আমাদের ঐক্য বজায় রাখা, এবং যখনই তারা কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করবে, তখনই তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। তাছাড়া, জাপ-প্রতিরোধের ব্যাপারেও এই গোঁড়াপন্থীদের দ্বৈত চরিত্র বর্তমান, এবং যতক্ষণ তারা প্রতিরোধের পক্ষে থাকছে, আমাদের কর্মনীতি ততক্ষণ হবে তাদের সংগে ঐক্য গড়ার, এবং যখনই তারা দোদুল্যমানতা প্রকাশ করেছে (যেমন, জাপ-হানাদারদের সংগে মিলে ওয়াং চিং-ওয়েই ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের বিরোধিতায় অনিচ্ছা প্রকাশ করছে) তখনই আমাদের কর্মনীতি হবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতার ব্যাপারেও যেহেতু তাদের দ্বৈত চরিত্র আছে, আমাদের কর্মনীতিরও সেইহেতু থাকবে দ্বৈত চরিত্র; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ভাঙন ধরাতে চাইবে না, আমাদের কর্মনীতিও থাকবে তাদের সংগে ঐক্যবদ্ধ থাকার, কিন্তু যখনই তারা স্বেচ্ছাচারীর মতো আমাদের পার্টির ওপর ও জনগণের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাবে, আমাদের কর্মনীতিও হবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এই দ্বৈত চরিত্রের ব্যক্তিদের সংগে বিশ্বাসঘাতক ও জাপপন্থী ব্যক্তিদের আমরা আলাদা করে দেখি।

(৮) এমনকি বিশ্বাসঘাতক ও জাপপন্থীদের মধ্যেও দ্বৈত চরিত্রের ব্যক্তিবর্গ আছে, যাদের প্রতি একইভাবে আমাদের বিপ্লবী দ্বৈত কর্মনীতি প্রয়োগ করা উচিত। তারা যতটা জাপপন্থী, আমাদের ততটাই তাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। কিন্তু তাদের যতটা দোদুল্যমানতা থাকবে, আমাদেরও কর্মনীতি ততটাই হবে তাদেরকে আমাদের দিকে টেনে আনা, তাদের জয় করা। এই ধরনের ব্যক্তিদের আমরা ওয়াং চি-ওয়েই, ওয়াং ই-তাং[২] এবং শি ইউ-সানের[৩] মতো পুরোপুরি বিশ্বাসঘাতকদের থেকে পৃথক করে দেখি।

(৯) প্রতিরোধের বিরোধী জাপপন্থী বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের থেকে প্রতিরোধের সমর্থক ব্রিটিশপন্থী ও মার্কিনপন্থী বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের পৃথক করে দেখতেই হবে ; অনুরূপভাবে প্রতিরোধের সমর্থক কিন্তু দোদুল্যচিত্ত, একতার অভিলাষী কিন্তু কমিউনিস্ট-বিরোধী বৃহৎ জমিদার এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের জাতীয় বুর্জোয়া, মাঝারি ও ছোট জমিদারগোষ্ঠী ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গের থেকে আলাদা করে দেখতেই হবে, যাদের দ্বৈত চরিত্র খুব পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। এইসব পার্থক্যের ওপরে ভিত্তি করেই আমরা আমাদের কর্মনীতি তৈরী করে থাকি। উপরে বর্ণিত শ্রেণী-সম্পর্কের পৃথকীকরণ থেকেই এই বিভিন্ন ধরনের গ্রহণযোগ্য কর্মনীতি নির্ণীত হয়ে থাকে।

(১০) একই পদ্ধতিতে সাম্রাজ্যবাদের বিচার আমরা করে থাকি। কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত ধরনের সাম্রাজ্যবাদেরই বিরোধী, কিন্তু আমরা চীনের ওপর এখন আক্রমণ চালাচ্ছে এমন জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে সেইসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো থেকে আলাদা করে দেখি যারা এখন আক্রমণ চালাচ্ছে না, পৃথক করি জাপানের বিরোধী ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের সাকরেদ জার্মান ও ইতালীর সাম্রাজ্যবাদ থেকে যারা 'মাঞ্চুকুও'কে স্বীকার করে নিয়েছে, পৃথক করি বিগতদিনে দূর প্রাচ্যে মিউনিক কর্মনীতি অনুসরণ করে চীনের জাপ-প্রতিরোধ অবদমন করতে ইচ্ছুক সেদিনের ব্রিটেন ও মার্কিনকে সাম্প্রতিক ব্রিটেন ও মার্কিন থেকে যারা তৎকালীন অনুসৃত কর্মনীতি পরিত্যাগ করে বর্তমানে চীনের প্রতিরোধের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আমাদের কৌশল এক এবং একই নীতি থেকে উদ্ভূত, এবং তা হল : দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ কর, বহুকে নিজের দিকে টেনে নাও, স্বল্পসংখ্যকের বিরোধিতা কর এবং শত্রুকে এক এক করে ধ্বংস কর। আমাদের পররাষ্ট্র নীতি কুওমিনতাঙের নীতি থেকে পৃথক। কুওমিনতাঙ বলে থাকে যে, 'শত্রু মাত্র একটাই, আর সবাই বন্ধু'; জাপান ছাড়া সব দেশকেই সে সমপর্যায়ে বিচার করে, কিন্তু আসলে কুওমিনতাঙ হল ব্রিটিশপন্থী, মার্কিনপন্থী। কিন্তু আমাদের কয়েকটি পার্থক্য করতেই হবে, প্রথমতঃ, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য; দ্বিতীয়তঃ একদিকে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যদিকে জার্মান ও ইতালীর মধ্যে পার্থক্য ; তৃতীয়তঃ, ব্রিটেন ও মার্কিনের জনগণ ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের মধ্যে পার্থক্য ; এবং চতুর্থতঃ, ব্রিটেন ও মার্কিনের দূর প্রাচ্যের মিউনিক তৈরী করার সময়ের কর্মনীতি ও তাদের বর্তমান অনুসৃত কর্মনীতির

মধ্যে পার্থক্য। এইসব পার্থক্যের ওপর আমাদের কর্মনীতি আমরা তৈরী করি। কুওমিনতাঙের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে তুলনা করলে আমাদের মূল লাইন দাঁড়াচ্ছে এরকম: আত্মনির্ভরতার নীতির ওপর দাঁড়িয়ে ও স্বাধীনভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করে সমস্তরকম বৈদেশিক সাহায্যকে ব্যবহার করা, এবং এই নীতিটি পরিত্যাগ করে কুওমিনতাঙের মতো বৈদেশিক সাহায্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে গিয়ে একবার এই সাম্রাজ্যবাদী ব্লক, আরেকবার অন্যটির ওপর নির্ভর করা নয়।

আমাদের বহু পার্টি-কর্মীর মধ্যে রণকৌশলের বিষয়ে এবং তৎপ্রসূত 'বাম' ও দক্ষিণ দোদুল্যচিত্ততার যেসব উল্টো ধারণা বিদ্যমান তার মূল দূরীভূত করার জন্য আমাদের পার্টির অতীত ও বর্তমানের কর্মনীতির পরিবর্তন ও বিকাশসাধনের বিষয়টি সর্বদিক দিয়ে ও সুসমন্বিতভাবে যাতে তারা বুঝতে পারে, সেজন্য তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। উগ্র-বাম দৃষ্টিভঙ্গি গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে এবং এখনো পর্যন্ত পার্টির মধ্যে এটাই হচ্ছে প্রধান বিপদ। কুওমিন-তাঙ অঞ্চলে বহুদিনব্যাপী সুনির্বাচিত কমরেডদের দ্বারা গোপনভাবে কাজ করা, শক্তি সঞ্চয় করা এবং সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকার পার্টি কর্মনীতিটি বহু সভ্যই গুরুত্বপূর্ণভাবে কার্যকরী করতে পারছেন না, কারণ তাঁরা কুওমিন-তাঙের কমিউনিস্ট-বিরোধী কর্মনীতির গুরুত্ব সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারছেন না। একই সময়ে, এমন অনেক কমরেড আছেন, যাঁরা যুক্তফ্রন্টের বিস্তার-সাধনের কর্মনীতিটিও কার্যকরী করতে পারছেন না, কারণ তাঁদের সবকিছুর বিচার-বিবেচনা অতিসারল্য দুষ্ট, সমগ্র কুওমিনতাঙই তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক, এবং সেই কারণে কি যে করণীয় তা আর তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। একই ধরনের অবস্থা জাপ-অধিকৃত অঞ্চলেও বিরাজ করছে।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলে এবং জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে যে দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি এক সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে বিস্তৃত ছিল, বর্তমানে মূলগতভাবে তা পরাভূত হয়েছে, ঐ মত যাঁরা পোষণ করতেন, তাঁরা সংগ্রাম বিবর্জিত মৈত্রীর ওপর জোর দিতেন, জাপ-প্রতিরোধে কুওমিনতাঙের ভূমিকাকে অতিরিক্ত বড় করে দেখতেন, এবং সেই কারণে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার নীতিগত পার্থক্যটি তাঁদের চোখে মুছে যেতো, যুক্তফ্রন্টের মধ্যে স্বাধীনতা ও উদ্যোগের কর্মনীতিটি তাঁরা প্রত্যাখ্যান করতেন, বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের এবং কুওমিনতাঙের দাবি মেনে নিয়ে সমঝওতা

করতেন, অত্যন্ত সাহসিকতার সংগে জাপ-বিরোধী বিপ্লবী শক্তির বিস্তৃতিসাধন না করে এবং কুওমিনতাঙের কমিউনিস্ট-বিরোধী ও কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি প্রতিহত করার কর্মনীতির বিরুদ্ধে না রুখে দাঁড়িয়ে তাঁরা নিজেদের হাত-পা নিজেরাই বেঁধে রাখতেন। ১৯৩৯-এর শীতকাল থেকে বহুস্থানে কিন্তু একটা উগ্র-বাম ঝোঁক মাথা তুলছে, এবং এটি উদ্ভূত হয়েছে কুওমিনতাঙ-এর কমিউনিস্ট-বিরোধী 'সংঘর্ষের' এবং এর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে আমাদের লড়াইয়ের ফলস্বরূপ। এই ঝোঁকটা কিছুটা দূর করা গিয়েছে বটে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি, এবং এখনো বহুস্থানে সুনির্দিষ্ট কর্মনীতির মধ্যে এটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুতরাং এখনই আমাদের বিচার-বিবেচনা করে সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি নির্ণয় করা প্রয়োজন।

যেহেতু কেন্দ্রীয় কমিটি ইতিমধ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি সংক্রান্ত নির্দেশ প্রেরণ করেছেন, এখানে এখন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা। 'তিনটি এক-তৃতীয়াংশের পদ্ধতিটি', যে পদ্ধতি অনুসারে রাজনৈতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান মাত্র এক-তৃতীয়াংশ, এবং সেখানে অ-কমিউনিস্টদেরও টেনে আনা হয়েছে, তা দৃঢ়ভাবে কার্যকরী করতেই হবে। উত্তর কিয়াংসুর মতো অঞ্চলে, যেখানে আমরা সবেমাত্র জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির সংস্থা-সমূহ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি, সে সকল স্থানে কমিউনিস্টদের সংখ্যানুপাত এমনকি এক-তৃতীয়াংশেরও কম হতে পারে। পেটি-বুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়া, এবং আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গ, যাঁরা কমিউনিস্ট বিরোধিতায় কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করছেন না, তাঁদের সরকার ও গণপ্রতিনিধি-সংস্থাসমূহের কাজে টেনে নিতে হবে, এবং যেসব কুওমিনতাঙের সদস্য কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী নন, তাঁদেরও টেনে নিতে হবে। এমনকি দক্ষিণপন্থীদেরও আমরা গণপ্রতিনিধি-সংস্থাসমূহে যোগ দিতে দেব। কোনভাবেই আমাদের পার্টি সবকিছুর ওপর একাধিপত্য করবে না। কমিউনিস্ট পার্টির এক-পার্টি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বৃহৎ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও বৃহৎ জমিদারশ্রেণীর একনায়কত্ব আমরা ধ্বংস করে দিচ্ছি না।

শ্রম নীতি। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর পূর্ণোদ্যম যদি জাগ্রত করতে হয়, তবে তাঁদের জীবিকার উন্নতিসাধন নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু আমাদের উগ্র-বাম ঝোঁক থেকে নিবৃত্ত থাকতেই হবে; অতিরিক্ত মজুরী

যেমন বৃদ্ধি করা চলবে না, কাজের ঘণ্টাও তেমনি খুব কমানো চলবে না। বর্তমান অবস্থায় চীনে ৮ ঘণ্টা কাজের সময়সূচী সর্বত্র প্রয়োগ করা চলবে না এবং কোন কোন উৎপাদন-শিল্পে ১০ ঘণ্টা কাজের সময়সূচী চালু থাকতে দিতে হবে। অন্যান্য উৎপাদন শিল্পে অবস্থা অনুযায়ী শ্রমদিবস ঠিক করতে হবে। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদিত হলে শ্রমিকরা শ্রম-শৃংখলা মেনে চলবেন এবং ধনতন্ত্রকে কিছুটা মুনাফা অর্জন করতে দিতেই হবে। তা না হলে কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাবে, যার ফলে যুদ্ধ পরিচালনায়ও সাহায্য হবে না, শ্রমিকরাও সুবিধে পাবেন না। বিশেষ করে, গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকদের জীবিকার স্তর ও মজুরী অতি উচ্চস্তরে তোলা উচিত হবে না, তাহলে কৃষকদের নিকট থেকে অভিযোগ উঠবে, শ্রমিকদের মধ্যে বেকারী সৃষ্টি হবে, এবং উৎপাদনের অবনতি ঘটবে।

ভূমি নীতি। পার্টি-সভ্য ও কৃষকদের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে যে, এটা পরিপূর্ণ কৃষি-বিপ্লবের সময় নয়, এবং কৃষি-বিপ্লবের সময় যেসব ব্যবস্থাবলী গৃহীত হয়েছিল, আজকে তার প্রয়োগ চলতে পারে না। একদিকে আমাদের বর্তমান কর্মনীতি হবে জমিদাররা যাতে খাজনা ও সুদ হ্রাস করায় চুক্তি করে তার ব্যবস্থা করা, কারণ তাহলে কৃষকদের বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে জাপ-প্রতিরোধের উদ্যোগ বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু এই হ্রাসের মাত্রা খুব বেশি করা চলবে না। সাধারণভাবে, খাজনা হ্রাস হতে পারে শতকরা ২৫ ভাগ, এবং জনগণ যদি আরও হ্রাস চান, তবে বর্গাদার কৃষক শস্যের ৬০ থেকে ৭০ ভাগ রাখতে পারেন, তবে তার বেশি কিছু নয়। ঋণের ওপর সুদের হার এমনভাবে হ্রাস করা উচিত হবে না, যাতে বাকির কারবার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে, আমাদের নীতি এমন চুক্তি সম্পাদনের পক্ষে হবে, যাতে কৃষকরা খাজনা ও সুদ দিয়ে দেন এবং জমিদাররা জমির ও অন্যান্য সম্পত্তির ওপর তাদের অধিকারসত্ব নিয়ে বাস করতে পারে। সুদের হারও এত হ্রাস করা হবে না যাতে কৃষকদের পক্ষে ঋণ পাওয়া অসম্ভব হয়, এবং পুরানো হিসেবের এমন বন্দোবস্ত করা হবে না যাতে কৃষকরা তাদের বন্ধকী জমি বিনা পয়সায় পেয়ে যায়।

কর নীতি। কর ধার্য আয়ের ওপর নির্ভরশীল হবে। যারা খুব দরিদ্র তারাই শুধু করের দায় থেকে মুক্ত থাকবে, আর সবাইকে রাষ্ট্রের হাতে কর দিতে হবে, যার অর্থ জন করভার বহন করতে হবে শ্রমিক ও কৃষক সহ শতকরা

৮০ তাদেরও ওপর জনগণকে শুধু অধিকার ও পুলিশকর্তারাই তা সম্পূর্ণভাবে বহন করবে না। জনসাধারণকে গ্রেপ্তার করে তাদের ওপর জরিমানা বসিয়ে তা আদায় করে সামরিক বাহিনীর ব্যয়ভার মেটানোর পদ্ধতি একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তৈরী না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত করের ব্যাপারে চলিত কুওমিনতাঙের কর পদ্ধতির প্রয়োজনীয় রদবদল করে আমরা তা চালু রাখতে পারি।

গোয়েন্দা-বিরোধী নীতি। প্রমাণিত বিশ্বাসঘাতক ও কমিউনিস্ট-বিরোধীদের অত্যন্ত দৃঢ় হাতে আমরা দমন করব, তা না করলে জাপ-বিরোধী বিপ্লবী শক্তিসমূহকে আমরা রক্ষা করতে সক্ষম হব না। কিন্তু তাই বলে প্রচুর হত্যাকাণ্ড নিশ্চিতই চলবে না, এবং কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা চলবে না। দোদুল্যচিত্ত ব্যক্তিদের এবং অনিচ্ছুক অনুসরণকারীদের নরমভাবে বিচার করতে হবে। অপরাধীদের বিচারে প্রাণদণ্ড একেবারেই রহিত করতে হবে; সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপরই জোর দিতে হবে, স্বীকারোক্তি হলেই তা বিশ্বাস করে নেওয়া চলবে না। জাপানীদের হাত থেকে বা কমিউনিস্ট-বিরোধী পুতুল সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে ধৃত সৈনিকদের ছেড়ে দেওয়াই হচ্ছে আমাদের নীতি। তবে যারা জনগণের প্রতি তিক্ত ঘৃণা পোষণ করে কেবল তাদের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য হবে না, এবং তারা মৃত্যুদণ্ডই পাবে, তবে অবশ্যই সেই মৃত্যুদণ্ড উচ্চ কর্তৃত্ব কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে। যেসব বন্দীরা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু আসলে যারা কমবেশি বিপ্লবের দিকেরই ব্যক্তি, তাদের বেশি বেশি সংখ্যায় জয় করে টেনে নিতে হবে আমাদের সামরিক বাহিনীতে কাজ করার জন্য। অবশিষ্টদের সব মুক্ত করে দিতে হবে, এবং তাদের যদি আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে দেখা যায় এবং তারা যদি আবার বন্দী হয় তবে তাদের আবার ছেড়ে দেওয়া হবে। কোন-রকম অপমান আমরা তাঁদের করব না, তাদের ব্যবহারের জিনিসপত্রও নিয়ে নেব না কিংবা তাদের কাছ থেকে কোনরকম দোষস্খালনের বিবৃতিও দাবি করব না, বরং কোনরকম পার্থক্য না করেই তাদের প্রতি বিশ্বস্ত ও দয়ার্দ্রচিত্তে ব্যবহার করব। যত প্রতিক্রিয়াশীলই তারা হোক না কেন, এই হবে তাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার। প্রতিক্রিয়ার মূল অংশকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার পক্ষে এই হচ্ছে সব থেকে কার্যকরী পদ্ধতি। যারা দলত্যাগী, তাদের মধ্যে যারা অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী, তাদের ছাড়া

আর যারা রইল, তারা যদি তাঁদের কমিউনিস্ট-বিরোধী অপকর্ম করা বন্ধ করে দেয়, তাদের নতুন ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ আমরা নিশ্চয়ই করে দেব ; এবং তারা যদি ফিরে আসে, বিপ্লবে যোগ দিতে চায়, তাদেরও গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু পার্টির মধ্যে তাদের প্রবেশ করা নিশ্চয়ই চলবে না। জাপানী গোয়েন্দা ও চীনা বিশ্বাসঘাতকদের সংগে কুওমিনতাঙের সাধারণ গোয়েন্দাদের গুলিয়ে ফেললে চলবে না ; দুটোকে পৃথক করে দেখতে হবে এবং যথোপযুক্ত-ভাবে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা গ্রেপ্তার করতে পারে—এই ব্যবস্থা চালু থাকার দরুণ যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে আছে তা বন্ধ করা দরকার। যুদ্ধের প্রয়োজনে বিপ্লবী শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে যে সামরিক বাহিনীর মধ্যে যারা যুদ্ধে লিপ্ত তারা ব্যতীত সবরকম গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেওয়া হবে শুধুমাত্র সরকারী বিচার বিভাগ বা জননিরাপত্তা সংস্থাসমূহের ওপর।

জনগণের অধিকার। এ কথাটি পরিষ্কার করে ঘোষণা করতেই হবে যে, প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিরোধী নয় এমন সব জমিদার ও পুঁজিপতিদের শ্রমিক ও কৃষকদের মতো সেই একই ব্যক্তি-স্বাধিকার ও সম্পত্তির অধিকার, সেই একই ভোট প্রদানের অধিকার, বাক্-স্বাধীনতা, সভা ও জমায়েতের অধিকার এবং রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ধর্মমত অনুসরণ করার অধিকার থাকবে। একমাত্র আভ্যন্তরীণ ধ্বংসকার্যে লিপ্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে এবং যারা ঘাঁটি এলাকায় দাঙ্গা সংগঠিত করে তাদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্যই করবে, অন্যান্য সবাইকে রক্ষা করবে এবং তাদের ওপর কোনরকম আঘাত করবে না।

অর্থনৈতিক নীতি। অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে আমরা শিল্প ও কৃষির বিকাশ ঘটাব এবং পণ্যবিনিময়ের ব্যবস্থা করব। আমাদের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে যদি পুঁজিপতিরা, শিল্পসংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার জন্য আমরা তাদের উৎসাহিত করব। ব্যক্তি-মালিকানার শিল্পসংস্থাকে উৎসাহিত করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় শিল্পসংস্থাকে অর্থনৈতিক একটি বিভাগ বলেই বিচার করতে হবে। এ সবের উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্বনির্ভরশীলতা অর্জন করা। কোন প্রয়োজনীয় শিল্পসংস্থারই যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের মূল প্রয়োজনের সংগে মিলিয়ে আমাদের শুল্ক ও টাকাকড়ি বিষয়ক কর্মনীতি নির্ধারণ করতে হবে, এবং তা তার বিরুদ্ধগামী হবে না। বহুদিন ধরে যে ঘাঁটি এলাকাসমূহের অস্তিত্ব বজায় আছে, তার

মূল কারণই হচ্ছে এই যে, ভুল ও কোনমতে ঠেকা দেওয়া সংগঠন নয়—তার পরিবর্তে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও হিসেবী অর্থনৈতিক সংগঠন পরিচালনা করা হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক নীতি। যুদ্ধ পরিচালনা ও প্রসারতার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও নৈপুণ্যের বিকাশ এবং জনগণের মধ্যে জাতীয় গর্ববোধ ফুটিয়ে তোলার জন্যই এই কর্মনীতিগুলির গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বুর্জোয়া উদারবাদী শিক্ষাবিদগণ, পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকরা, বিদ্বান ব্যক্তিবৃন্দ ও শিল্পকর্মে নিযুক্ত নিপুণ ব্যক্তিদের আমাদের ঘাঁটি এলাকায় আসতে এবং স্কুল, সংবাদপত্র ও অন্যান্য বিষয় পরিচালনায় তাঁদের সহযোগিতা নিতে হবে। আমাদের স্কুলে সেইসব বুদ্ধিজীবীদের ও ছাত্রদেরই আমরা গ্রহণ করব যাঁরা জাপ-বিরোধিতায় উৎসাহ দেখাচ্ছেন; তাঁদের আমরা স্বল্পকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষিত করে তুলব, তাঁদের নিযুক্ত করব সামরিক বাহিনী, সরকারী সংস্থা বা গণ-সংগঠনের কাজে; সাহসের সংগে আমরা তাঁদের টেনে নেব, তাঁদের কাজ দেব, তাঁদের উন্নত করে তুলব। প্রতিক্রিয়াশীলদের অনু-প্রবেশের ভয়ে আমাদের অতি-সাবধানী বা ভীত হলে চলবে না। সন্দেহ নেই যে এদের কিছু কিছু ঢুকে পড়বেই, তা আটকানোও যাবে না, কিন্তু একটা সময় আসবেই, যখন কাজ ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এগুলোকে অবশ্যই দূরীভূত করা যাবে। প্রত্যেকটি ঘাঁটি এলাকাতেই ছাপাখানা বসাতে হবে, পুস্তক-পুস্তিকা ও সংবাদপত্র প্রকাশ করতে হবে এবং বিতরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা সংগঠিত করতে হবে। সম্ভবমত প্রত্যেক ঘাঁটি অঞ্চলেই কর্মীদের শিক্ষার জন্য বড় বড় স্কুল প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এবং এগুলো সংখ্যায় ও আয়তনে যত বড় হয় ততই ভাল।

সামরিক নীতি। অষ্টম রুট ও নয়া চতুর্থ সামরিক বাহিনীর সর্বাধিক প্রসারতা আমাদের ঘটাতে হবে, কারণ এরাই হচ্ছে চীনা জনগণের জাতীয় প্রতিরোধ-যুদ্ধ পরিচালনা ও এগিয়ে যাবার ব্যাপারে সব থেকে নির্ভরশীল সশস্ত্র বাহিনী। আমরা আক্রান্ত না হলে কুওমিনতাঙের সামরিক বাহিনীর ওপর চড়াও হয়ে কখনই আক্রমণ করব না—আমাদের এই নীতি আমরা অনুসরণ করে চলব এবং তাদের সংগে বন্ধুত্ব বজায় রাখার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করব। আমাদের সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার জন্য আমাদের প্রতি যেসব অফিসারদের সমর্থন আছে তাঁদের অষ্টম ও নয়া চতুর্থ বাহিনীতে টেনে

নেওয়ার জন্ত সবরকম চেষ্টাই আমরা করব, তা তাঁরা কুওমিনতাঙ বা পার্টি-বহির্ভূত—যাই হোক না কেন। আমাদের সামরিক বাহিনীর মধ্যে যেখানে কমিউনিস্টরা সংখ্যাধিক্যের দরুণ আধিপত্য করতে সক্ষম, সেখানে বখন পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্ত কিছু করতেই হবে। অবশ্যই 'তিনটি এক-তৃতীয়াংশের পদ্ধতি' আমাদের প্রধান বাহিনীর মধ্যে চালু করা উচিত হবে না, কিন্তু যতক্ষণ পার্টির হাতে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব থাকছে (এটি কিন্তু চূড়ান্ত ও অলঙ্ঘনীয়ভাবেই প্রয়োজন), সামরিক বাহিনী ও তার প্রযুক্তিবিষয়ক বিভাগসমূহ গড়ে তোলার জন্ত বহু সংখ্যক সমর্থকদের টেনে নিতে গিয়ে আমাদের সন্ত্রস্ত হওয়ার কোন কারণই নেই। এখন যখন আমাদের পার্টির ও সামরিক বাহিনীর আদর্শগত ও সাংগঠনিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন বহু সংখ্যক সমর্থকদের টেনে নেওয়ার কোনরকম বিপদের ভয় তো নেইই (অবশ্যই অন্তর্ঘাতীদের বাদ দিয়ে), বরং তা আমাদের অবশ্যকরণীয় কাজই হবে, কারণ তা না করলে সমস্ত দেশের সমর্থন আমরা পাব না, বিপ্লবী শক্তির প্রসারতা ঘটাতে সক্ষম হব না।

যুক্তফ্রন্টের জন্ত এবং তদনুসারে নির্দিষ্ট কর্মনীতিগুলি তৈরী করে নেওয়ার প্রয়োজনে সমস্ত রণকৌশলগত নীতিগুলিকে সমগ্র পার্টিকেই দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। যে সময়ে জাপ-হানাদাররা চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ সংহত করছে, যখন বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়ারা তাদের উদ্ধত কর্মনীতি অনুসরণ করছে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালিত করছে, তখন ওপরে বর্ণিত রণকৌশলগত নীতিসমূহ এবং সুনির্দিষ্ট কর্মনীতিগুলিই হচ্ছে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার, যুক্তফ্রন্টের ব্যাপ্তি ঘটানোর, সমস্ত জনগণের সহানুভূতি অর্জনের এবং পরিস্থিতিকে ভালর দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার একমাত্র পথ। যাই হোক, ভুল শোধরানোর জন্ত আমাদের ধাপে ধাপে এগোতেই হবে এবং তড়বড় করে অতি দ্রুত কিছু করে ফেলার বাসনায় আমরা এমন কিছুই করে বসব না, যাতে আমাদের কর্মীদের মধ্যে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়, জনগণের মধ্যে সন্দেহ জাগে, জমিদাররা প্রতি-আক্রমণ করতে পারে বা অন্তান্ত অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে।

টীকা

১। এখানে যে কর্মনীতির কথা বলা হয়েছে তার জন্য মাও সে-তুঙের 'নির্বাচিত রচনাবলী'র 'আমাদের পার্টির ইতিহাসে কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্তের পরিশিষ্ট,' ইংরেজী সংস্করণ, পিকিং ১৯৬৫, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৬-২১৩ দ্রষ্টব্য।

২। ওয়াং য়ি-তাং ছিল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের আমলের এক বড় আমলা এবং জাপপন্থী বিশ্বাসঘাতক। ১৯৩৭ সালে উত্তর চীনের ঘটনার পর চিয়াং কাই-শেক তাকে অবসর জীবন থেকে ফিরিয়ে এনে কুওমিনতাঙ সরকারে কাজ দেয়। ১৯৩৮ সালে সে উত্তর চীনে একজন জাপানী দালাল হিসেবে কাজ করে এবং ভুয়া উত্তর চীন রাজনৈতিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হয়।

৩। শি য়ু-সান ছিল একজন কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজ প্রভু। প্রায়শঃই সে এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষে চলে যেত। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হবার পর সে কুওমিনতাঙের দশম আর্মি গ্রুপের প্রধান সেনাধ্যক্ষ ছিল, দক্ষিণ হোপেইতে জাপানীদের সংগে সহযোগিতা করেছিল এবং অষ্টম রুট বাহিনীকে আক্রমণ, জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতার গণতান্ত্রিক সংস্থাসমূহকে ধ্বংস এবং কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীলদের খুন করা ছাড়া আর কোন কাজই করেনি।

দক্ষিণ আনহুই ঘটনা সম্পর্কে নির্দেশ ও বিবৃতি

জানুয়ারী ১৯৪১

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈপ্লবিক সামরিক কমিশনের নির্দেশ

ইয়েনান, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪১

জাতীয় বৈপ্লবিক সেনাবাহিনীর নতুন চতুর্থ বাহিনী প্রতিরোধ-যুদ্ধে তার বিশিষ্ট কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে দেশে ও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে। শত্রুর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করে সেনানায়ক ইয়ে তিং চমকপ্রদ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি তা যখন নির্দেশ অনুসারে উত্তরদিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন ঐ সেনাবাহিনীটি জাপানের অনুগামী গোষ্ঠী কর্তৃক বিশ্বাসহন্তার মতো আক্রান্ত হয়েছে এবং সেনানায়ক ইয়ে যুদ্ধে আহত ও অবসন্ন হয়ে কারাগারে প্রেরিত হয়েছেন। সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ চাং য়ুন-ঈ-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তারবার্তার মাধ্যমে দক্ষিণ আনহুই ঘটনার সমগ্র গতিধারা সম্পর্কে জানতে পেরে কমিশন তীব্র ক্রোধ এবং আমাদের কমরেডদের ব্যাপারে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে। প্রতিরোধ-যুদ্ধের ক্ষতিসাধনের জন্য জাপানের অনুগামী গোষ্ঠীর বিরাট অপরাধের, জনগণের সশস্ত্র বাহিনীকে আক্রমণের ও গৃহযুদ্ধ শুরু করার মোকাবিলায় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা ছাড়াও কমিশন এতদ্বারা চেন ঈকে জাতীয় বৈপ্লবিক সেনাবাহিনীর নতুন চতুর্থ বাহিনীর অস্থায়ী অধিনায়ক হিসেবে, চাং য়ুন ঈকে সহ অধিনায়ক হিসেবে, লিউ শাও-চিকে পলিটিক্যাল কমিশনার হিসেবে, লাই চুয়ান-চুকে চীফ অব স্টাফ এবং তেং জু-হুইকে রাজনৈতিক বিভাগের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করছে। অস্থায়ী অধিনায়ক চেন ঈ এবং তাঁর সহযোগীদের এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা যেন সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য প্রয়াসী হন, সেনাবাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং জনগণের সংগে সুসম্পর্ক সুনিশ্চিত করে জনগণের তিনটি মূল নীতিকে কার্যকরী করতে প্রয়াসী হন, ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রের প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে এবং আমাদের জনগণ ও আমাদের দেশের প্রতিরক্ষার সংগ্রামে জাপ-বিরোধী

জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে সংহত ও সম্প্রসারিত করতে প্রয়াসী হন, এবং প্রয়াসী হন প্রতিরোধ যুদ্ধকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে ও জাপান অনুগামী গোষ্ঠীর আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার ব্যাপারে।

সিনহুয়া সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের জনৈক সংবাদদাতার কাছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈপ্লবিক সামরিক কমিশনের জনৈক মুখপাত্রের প্রদত্ত বিবৃতি

২২শে জানুয়ারী, ১৯৪১

দক্ষিণ আনহুই-এর সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট-বিরোধী ঘটনাটি দীর্ঘকাল ধরে দানা বেঁধে উঠছিল। বর্তমান ঘটনাবলী দেশজোড়া জরুরী পরিস্থিতির বহিঃপ্রকাশের একটি পর্যায় মাত্র। জার্মানি ও ইতালীর সংগে তাদের ত্রিশক্তির মৈত্রীবন্ধন[১] গড়ে তোলার সময় থেকেই জাপানী আক্রমণকারীরা চীন-জাপান যুদ্ধের দ্রুত সমাধান করার উদ্দেশ্যে চীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য তাদের আয়োজিত প্রয়াসকে চারগুণ বৃদ্ধি করেছেন। তাদের মতলব হচ্ছে জাপ-বিরোধী আন্দোলন দমন করার জন্য চীনাদেরই কাজে লাগানো এবং এভাবে পশ্চাৎদিককে সংহত করে দক্ষিণমুখী অভিযান চালানো, যাতে করে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে হিটলারের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তারা স্বচ্ছন্দে দক্ষিণমুখী অভিযান শুরু করে দিতে পারে। জাপান অনুরাগী চক্রটির বহুসংখ্যক পাণ্ডা দীর্ঘকাল ধরে নিজেরা কুওমিনতাঙ-এর পার্টি, সরকার ও সেনাবাহিনীর সংগঠনে জাঁকিয়ে বসে আছে এবং দিনরাত প্রচার-অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। গতবছরের শেষ দিকেই ওদের চক্রান্তের প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত হয়। দক্ষিণ আনহুই অঞ্চলে নতুন চতুর্থ বাহিনীর ইউনিটগুলির ওপর আক্রমণ এবং ১৭ই জানুয়ারির প্রতিক্রিয়াশীল হুকুমনামাটি[২] হচ্ছে এই চক্রান্তেরই প্রথম প্রকাশ্য অভিব্যক্তি মাত্র। মারাত্মক রকমের ঘটনাবলী এখন একের পর এক অনুষ্ঠিত হতে থাকবে। জাপানী আক্রমণকারী ও জাপানের অনুগামী চক্রটির এই চক্রান্তের বিস্তারিত অধ্যাগুলি কী কী? সেগুলি হচ্ছে:

(১) জনমতকে জাগিয়ে তোলার জন্য হো ইং-চিন ও পাই চুং-সি কর্তৃক স্বাক্ষরিত চু তে, পেং তে-হুয়াই, ইয়ে তিংকে প্রেরিত ১৯শে অক্টোবর ও ৮ই ডিসেম্বরের তারবার্তা দুটি[৩] প্রকাশ করা।

(২) সামরিক শৃংখলা ও সামরিক আদেশনামা যাচাই করার প্রশ্ন সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় একটি প্রচার-অভিযান পুনরায় শুরু করার প্রস্তুতি হিসেবে শুরু করে দেওয়া।

(৩) দক্ষিণ আনহুই অঞ্চলে নতুন চতুর্থ বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

(৪) নতুন চতুর্থ বাহিনী 'বিদ্রোহ করেছে'—এ কথা ঘোষণা করে দেওয়া এবং তার সরকারী মর্যাদা খারিজ করে দেওয়া।

এই চারটি পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে।

(৫) মধ্য চীনের বিভিন্ন সেনাবাহিনীর 'কমিউনিস্ট' দলনের অভিযানের সেনানায়ক হিসেবে তাং এন-পো, লি পিন-সিয়েন, ওয়াং চুং-লিয়েন এবং হান তে-চিনকে নিযুক্ত করা, লি সুং-জেনকে এ ব্যাপারে সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করার লক্ষ্য হচ্ছে পেং সুয়ে-ফেং, চাং য়ুন-ই ও লী সিয়েন-নিয়েনের অধীনস্থ নতুন চতুর্থ বাহিনীর ইউনিটগুলিকে আক্রমণ করা, এবং যদি তা করে ফেলা যায় তাহলে অষ্টম রুট বাহিনী এবং নতুন চতুর্থ বাহিনীর যে ইউনিটগুলি শানতুং ও উত্তর কিয়াংসুতে রয়েছে, জাপানী সেনাবাহিনীর সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগক্রমে তাদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন আক্রমণ শুরু করা।

এই ব্যবস্থাই এখন গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৬) একটা অজুহাত বের করে অষ্টম রুট বাহিনী 'বিদ্রোহ করেছে'—এ কথা ঘোষণা করে দেওয়া, তার সরকারী মর্যাদা খারিজ করে দেওয়া এবং চু তে ও পেং তে-হুয়াইকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া।

এই প্রচেষ্টার প্রস্তুতিই এখন চলছে।

(৭) অষ্টম রুট বাহিনীর যোগাযোগ স্থাপনকারী যে দপ্তরগুলো চুংকিং, সিয়ান ও কুইলিনে রয়েছে, সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া এবং চৌ এন-লাই, ইয়ে চিয়েন ইং, তুং পি-উ এবং তেং ইং-চাওকে গ্রেপ্তার করা।

এই প্রয়াস কুইলিনের যোগাযোগ দপ্তর বন্ধকরার মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেছে।

(৮) দৈনিক নয়া চীন পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া।

(৯) শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করা এবং ইয়েনান দখল করা।

(১০) জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পক্ষপাতী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা এবং চুংকিং ও প্রদেশগুলিতে জাপ-বিরোধী আন্দোলনকে দমন করা।

(১১) সমস্ত প্রদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া এবং কমিউনিস্টদের পাইকারীভাবে গ্রেপ্তার করা।

(১২) জাপানী সৈন্যরা চলে গেলে মধ্য ও দক্ষিণ চীনের 'হৃত অঞ্চলসমূহ কুওমিনতাঙ সরকার কর্তৃক 'পুনরুদ্ধারের' কথা ঘোষণা করা এবং সংগে সংগে তথাকথিত 'সম্মানজনক শান্তি সংস্থাপনের' চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করা।

(১৩) মধ্য ও দক্ষিণ চীন থেকে তার সৈন্যদের উত্তর চীনে সহায়ক বাহিনী হিসেবে সরিয়ে এনে জাপান অষ্টম রুট বাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রকমের হিংস্র আক্রমণ চালাবে এবং সমগ্র অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য কুওমিনতাঙ বাহিনী সহযোগিতা করবে।

(১৪) কুওমিনতাঙ সকল ফ্রণ্টেই গতবছরের যুদ্ধবিরতি ব্যবস্থা অব্যাহত রাখবে, যাতে তাকে সাধারণভাবে সন্ধিস্থাপন ও শান্তি আলোচনায় পরিণত করা যায়, অন্যদিকে অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর বিরুদ্ধে অবিরাম আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া।

(১) কুওমিনতাঙ সরকার জাপানের সংগে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করবে এবং ত্রিশক্তির মৈত্রীবন্ধনে যোগদান করবে।

এইসব প্রয়াসের জন্য সক্রিয় প্রস্তুতিই এখন চালানো হচ্ছে।

সাধারণভাবে এই হচ্ছে জাপান এবং জাপানের অনুগামী চক্রটির বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ চক্রান্তের রূপরেখা। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৩৯ সালের ৭ই জুলাই-এর ইস্তাহারে দেখিয়ে দিয়েছিল: 'বর্তমান পরিস্থিতিতে আত্মসমর্পণ সবচেয়ে গুরুতর রকমের বিপদ হয়ে রয়েছে এবং কমিউনিস্ট-বিরোধিতা হচ্ছে আত্মসমর্পণের পথে প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ।' ১৯৪০ সালের ৭ই জুলাই-এর ইস্তাহারে পার্টি বলেছিল: 'আত্মসমর্পণের বিপদ এত গুরুতর এর আগে কোন সময়ই ছিল না এবং যুদ্ধের সামনে বাধাবিপত্তি আজকের মতো এত বেশি এর আগে আর কোন সময়ই ছিল না।' চু তে, পেং তে-হুয়াই, ইয়ে তিং এবং সিয়াং ইং গতবছরের ৯ই নভেম্বর তাঁদের প্রেরিত তারবার্তায় আরও বেশি বাস্তবভাবে তা তুলে ধরেছিলেন:

কিছু লোক আত্মসমর্পণের পথ উন্মুক্ত করে তোলার প্রয়াস হিসেবে দেশের মধ্যে একটি নতুন কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণের আয়োজন করছে।...'কমিউনিস্টদের দমনের' ক্ষেত্রে চীন-জাপান সহযোগিতা বজে

যাকে তারা অভিহিত করে, তার সাহায্যে প্রতিরোধ-যুদ্ধের অবসান ঘটাতেই তারা চায়। প্রতিরোধ-যুদ্ধের জায়গায় তারা আনতে চাইছে গৃহযুদ্ধকে, স্বাধীনতার স্থলে আত্মসমর্পণ, ঐক্যের জায়গায় বিভেদকে এবং আলোর পরিবর্তে অন্ধকারকে। ঘৃণ্য তাদের কার্যকলাপ আর জঘন্য তাদের অভিসন্ধি। লোকে একজন আরেকজনকে এই খবর বলছে আর আতংকিত হয়ে উঠছে। সত্যিই, আজকের মতো এমন জটিল অবস্থা এর আগে কোন সময় দেখা যায়নি।

তাই দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনা আর চুংকিং সামরিক পরিষদের ১৭ই জানুয়ারির হুকুমনামা অনেকগুলি ঘটনাধারার সূত্রপাত মাত্র। বিশেষ করে ১৭ই জানুয়ারির হুকুমনামা গুরুতর রাজনৈতিক ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। সর্বাত্মক নিন্দার ঝুঁকি নিয়েও এই প্রতিবিপ্লবী আদেশনামা যারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে সাহস করেছে, এই তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে যে তারা পুরোপুরি ভাঙনের জন্য এবং সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়েই এটা করেছে। কারণ তাদের সূত্রধারক এই প্রভুদের বাদ দিয়ে চীনের বৃহৎ জমিদারবর্গ এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের ভুঁড়িদার শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক প্রতিনিধিবর্গ এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতো না, সমগ্র বিশ্বকে সচকিত করে দেওয়ার মতো এরকম একটা অভিযানের তো কথাই ওঠে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে যারা এরকম আদেশনামা জারী করেছে, তাদের মানসিক পরিবর্তন নিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন বলেই মনে হচ্ছে এবং সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে জরুরী কার্যকলাপ ও বিদেশ থেকে কঠিন রকমের কূটনৈতিক চাপ ছাড়া এটা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং, সমগ্র জাতির এখনকার জরুরী কর্তব্য হচ্ছে সর্বোচ্চ সতর্কতার সংগে ঘটনার গতিধারা লক্ষ্য করা এবং প্রতিক্রিয়াশীলেরা মারাত্মক যেসব পরিণতির সৃষ্টি করতে পারে তার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে রাখা; সামান্যতম অবহেলার অবকাশও এখন নেই। চীনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলা যায়, ব্যাপারটি খুবই পরিষ্কার। জাপানী আক্রমণকারী ও জাপানের অনুগামী চক্র যদি তাদের চক্রান্তে সফল হয়, আমরা চীনের কমিউনিস্টগণ ও চীনা জনগণ অনির্দিষ্টকাল কোনমতেই তাদের এই স্বৈরাচার চালিয়ে যেতে দেব না। আমরা যে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর এবং পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শুধু তাই নয়, এটা সুসম্পন্ন করতে পারা সম্পর্কেও আমরা সুনিশ্চিত। পরিস্থিতি যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হোক, পথ যতই

কণ্টকাকীর্ণ হোক এবং এ পথে চলার জন্য যা কিছু মূল্যই দিতে হোক (দক্ষিণ আনহুই অঞ্চলে নতুন চতুর্থ বাহিনীর ইউনিটগুলোর বিনাশ সেই মূল্যেরই একটা অংশ)—জাপানী আক্রমণকারী এবং জাপানের অনুগামী চক্রটির ধ্বংস অবধারিত। কারণগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ :

(১) ১৯২৭ সালের মতো চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে সহজে প্রতারিত ও ধ্বংস করা আর সম্ভব নয়। আজ তা একটি প্রধান দল হয়ে উঠেছে এবং দৃঢ়ভাবে নিজের পায়ে ভর দিয়ে তা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

(২) (কুওমিনতাঙ সহ) অন্যান্য পার্টি ও গ্রুপের যে বহু সংখ্যক সদস্য জাতীয় পরাধীনতার দুর্বিপাকের কথা ভেবে আশংকিত, তারা সুনিশ্চিতভাবেই আত্মসমর্পণ করতে চাইবেন না এবং গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। সাময়িকভাবে এদের কেউ কেউ প্রতারিত হলেও যথাসময়ে তাঁরা সজ্ঞানে ফিরে আসবেন।

(৩) সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রেও তা সত্য। তাঁদের অধিকাংশই বাধ্য হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করছেন।

(৪) চীনের জনগণের সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ঔপনিবেশিক ক্রীতদাসে পরিণত হতে চান না।

(৫) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ একটি বিরাট পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এই মুহূর্তে দম্ভ তাদের যত বেশিই হোক, সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল পরগাছারা শীঘ্রই দেখতে পাবে যে, তাদের কর্তারা তত নির্ভরযোগ্য নয়। একের পর এক মহীরুহ যখন ভূপাতিত হতে থাকবে এবং বাঁদরের যখন প্রাণভয়ে চারিদিকে ছুটে পালাবে, তখন গোটা অবস্থারই পরিবর্তন ঘটবে।

(৬) বহু দেশে বিপ্লবের ফেটে পড়া এখন শুধু সময়ের ব্যাপার এবং এটা সুনিশ্চিত যে, ঐসব বিপ্লব ও চীনের বিপ্লব একে অপরকে তাদের সম্মিলিত সংগ্রামের বিজয়সাধনে সহায়তা করবে।

(৭) সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের সবচেয়ে বলশালী শক্তি এবং চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তা সাহায্য করে যাবেই।

এইসব কারণে আমরা বিশ্বাস করি যে, যারা আগুন নিয়ে খেলা করছে তাদের গর্বিত হয়ে ওঠার কোন হেতু নেই। আমরা তাদের আন্তরিক এই সতর্কবাণীটি জানিয়ে দিতে চাই : একটু সতর্ক হয়ে চলাই ভাল। আগুন খেলা করার বস্তু নয়। নিজেদের চামড়ার দিকে একটু নজর রাখ। যদি শান্ত হয়ে চল, বিষয়টা নিয়ে একটু ভেবে দেখ, তাহলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি

অবিলম্বে এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবে :

(১) তোমরা খাদের একেবারে সীমান্তে এসে পড়েছ, এখনই থেমে যাও আর প্ররোচনা বন্ধ কর।

(২) ১৭ই জানুয়ারির প্রতিক্রিয়াশীল হুকুমনামা খারিজ কর এবং প্রকাশ্যে এ কথা কবুল কর যে, ঐটি পুরোপুরি ভুল হয়েছিল।

(৩) হো য়িং-চিন, কু চু-তুং আর শাংকুয়ান য়ুন-সিয়াং—দক্ষিণ আনহুই ঘটনার এই প্রধান অপরাধীদের শাস্তিপ্রদান কর।

(৪) ইয়ে তিংকে মুক্তি দাও এবং নতুন চতুর্থ বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে তাঁকে পুনর্নিয়োগ কর।

(৫) দক্ষিণ আনহুইতে নতুন চতুর্থ বাহিনীর যেসব সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র করায়ত্ত করেছ, তা ফিরিয়ে দাও।

(৬) দক্ষিণ আনহুইতে নতুন চতুর্থ বাহিনীর যেসব অফিসার ও সৈন্য আহত হয়েছেন তাঁদের ক্ষতিপূরণ দাও এবং যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের পরিবারবর্গকেও ক্ষতিপূরণ দাও।

(৭) 'কমিউনিস্ট দমনের' জন্য মধ্য চীনে যে সৈন্য পাঠিয়েছ তা প্রত্যাহার কর।

(৮) উত্তর-পশ্চিমের অবরোধ[৪] তুলে নাও।

(৯) সমস্ত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও।

(১০) একদলীয় একনায়কত্বের অবসান ঘটাও এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তন কর।

(১১) তিনটি মৌলিক গণনীতি কার্যকরী কর এবং ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রটি কার্যকরী কর।

(১২) জাপানের অনুগত চক্রটির পাণ্ডাদের গ্রেপ্তার কর এবং দেশের আইনানুসারে তাদের বিচারের ব্যবস্থা কর।

এই বারো দফা কার্যসূচী যদি বাস্তবে কার্যকরী করা হয়, তবে অবশ্যই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এবং আমরা কমিউনিস্টরা ও সমগ্র জনগণ ব্যাপারটাকে নিশ্চয়ই চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাব না। অন্যথায় 'আমার ভয় হচ্ছে, চি সুনের বিপদ চুয়ান য়ুর কাছ থেকে আসবে না, দেখা দেবে নিজের ঘর থেকেই',[৫] অন্য কথায় বলা যায়, প্রতিক্রিয়াশীলেরা একটি প্রস্তরখণ্ড তুলছে তা শুধু তাদের নিজেদের পায়ের ওপরেই ফেলবার জন্য এবং আমরা

সাহায্য করতে চাইলেও কিছু করে উঠতে পারব না। সহযোগিতাকে আমরা খুবই দাম দিয়ে থাকি, কিন্তু তারেরও তো একটু মহৎ চাই। খোলাখুলি বলা যায়, আমাদের দিক থেকে সুবিধে দেওয়ার একটা সীমা আছে; আমাদের দিক থেকে সুবিধে দেওয়ার অধ্যায় শেষ হয়েছে। ওরা প্রথম আঘাত হেনেছে, এবং মারাত্মক আঘাতই হেনেছে। যদি তাদের নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কোন ভাবনাচিন্তা থেকে থাকে, তবে নিজেদের থেকেই এগিয়ে এসে এই আঘাতচিহ্নকে তাদের সযত্নে দূর করা উচিত কাজ হবে।'কয়েকটি ভেড়া খোয়া গেলেও বেড়াটা মেরামত করে পুরো দলটিকে রক্ষা করার সময় এখনো কেটে যায়নি।' তাদের পক্ষে এটা জীবন-মরণের প্রশ্ন এবং এই সর্বশেষ উপদেশটি তাদের দেওয়া আমরা নিজেদের একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। ঔদ্ধত্য যদি তাদের এখনো না ঘুচে থাকে এবং বাজে কাজ তারা যদি চালিয়ে যেতেই থাকে, সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়া চীনা জনগণ ওদের আস্তাকুঁড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন, আর তখন অনুশোচনার অবকাশও থাকবে না। নতুন চতুর্থ বাহিনীর প্রতি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক কমিশন ২০শে জানুয়ারি একটি নির্দেশ ঘোষণা করে চেন ঈকে অস্থায়ী সেনানায়ক, চাং য়ুন-ইকে উপ-সেনানায়ক, লিউ শাও-চিকে পলিটিক্যাল কমিশার, লাই চুয়ান-চুকে চীফ অব স্টাফ এবং তেং জু-হুইকে রাজনৈতিক বিভাগের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করেছে। মধ্য চীনে ও দক্ষিণ কিয়াংসুতে নব্বই হাজারের অধিক অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে জাপানী আক্রমণকারী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী সৈন্যদলের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে থাকলেও নতুন চতুর্থ বাহিনী নিশ্চয়ই সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও সংগ্রাম চালিয়ে যাবে এবং জাতির সেবায় ঐকান্তিকভাবে কাজ করে যাবে। আমি খোলাখুলি এ কথা জানিয়ে দিতে চাই—ভ্রাতৃপ্রতিম অষ্টম রুট বাহিনীর ইউনিটগুলি এই সময় চুপচাপ বসে থাকবে না, সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পড়ে তাদের মার খেতে দেখবে না এবং নিশ্চিতভাবেই প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। চুংকিং-এর সামরিক পরিষদের মুখপাত্রের বিবৃতি সম্পর্কে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে, এটি স্ব-বিরোধিতাপূর্ণ। চুংকিং-এর সামরিক পরিষদ একদিকে তাদের আদেশনামায় বলছেন—নতুন চতুর্থ বাহিনী নাকি 'বিদ্রোহ করেছে', কিন্তু মুখপাত্রটি বলছেন তাঁদের লক্ষ্য ছিল নানকিং-সাংহাই-হাংচাও ত্রিভুজে অগ্রসর হয়ে ওখানে একটি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা। এখন ধরে নিচ্ছি, তিনি ঠিকই বলছেন।

কিন্তু নানকিং-সাংহাই-হাংচাও ত্রিভুজে অগ্রসর হওয়াকে কি 'বিদ্রোহ করা' বলে গণ্য করা চলে ? চুংকিং-এর মুখপাত্রগুলি এই মূর্খটির চিন্তাশক্তি একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি নিশ্চয়ই। ঐ অঞ্চলে নতুন চতুর্থ বাহিনী কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যাচ্ছিল ? এটা কি জাপানের অধিকৃত একটা এলাকা নয় ? তাহলে নতুন চতুর্থ বাহিনীকে ঐ অঞ্চলে যেতে আপনারা বাধা দিলেন কেন এবং যখন তারা দক্ষিণ আনহুই অঞ্চলেই রয়ে গেছে, তখন তাদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হল কেন ? হাঁ, তা তো করতেই হবে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ভৃত্যদের তো তাই করতে হবে। তারই জন্য সাত ডিভিসন সৈন্য জড়ো করে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান তারা চালিয়েছে, তারই জন্য ১৭ই জানুয়ারির আদেশনামা জারী করেছে এবং তারই জন্য ইয়ে তিং-এর বিচারের আয়োজন তারা করছে। যাই হোক, আমি এখনো বলছি, চুংকিং-এর মুখপাত্রটি একটি গবেট, কারণ চাপে পড়ার আগেই সে ঝুলি থেকে বিড়ালটি বের করে দিয়েছে এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনা সমগ্র জনগণের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে।

টীকা

১। 'ত্রিশক্তির মৈত্রীবন্ধন' বলতে জার্মানি, ইতালী ও জাপানের মধ্যে ১৯৪০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর বার্লিনে স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিকে বোঝাচ্ছে।

২। জাতীয় সরকারের সামরিক পরিষদের পক্ষ থেকে চিয়াং কাই-শেক নতুন চতুর্থ বাহিনীকে ভেঙে দেবার জন্য ১৭ই জানুয়ারির প্রতিক্রিয়াশীল হুকুমনামাটি জারী করেছিল।

৩। এই দুটি কুখ্যাত টেলিগ্রাম ১৯৪০ সালের শেষের দিকে দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে চিয়াং কাই-শেক প্রেরণ করেছিল এবং ঐগুলিতে স্বাক্ষর করেছিল কুওমিনতাঙ সরকারের সামরিক পরিষদের জেনারেল স্টাফের প্রধান ও উপ-প্রধান হিসেবে হো ইং-চিন এবং পাই চুং-সি। ১৯শে অক্টোবরের টেলিগ্রামে, যে অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর সৈন্যরা শত্রুর অধিকৃত অঞ্চলসমূহে সংগ্রাম করছিল, তাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক-কুৎসা রটানো হয়েছিল এবং ঔদ্ধত্যভরে একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তাদের জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ইউনিটগুলিকে ইয়েলো নদীর দক্ষিণ থেকে উত্তরে সরিয়ে নেওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। সশস্ত্র প্রতিরোধের

স্বার্থে কমরেড চু তে, পেং তে-হুয়াই, ইয়ে তিং এবং সিয়াং ইং ৯ই নভেম্বর একটি যৌথ উত্তর পাঠিয়ে উত্তরে দক্ষিণ আনহুইতে সৈন্যদের সরিয়ে নিতে সম্মতি জানান কিন্তু সংগে সংগে কুৎসা প্রচারকে খণ্ডন করেন। হো ইং-চিন এবং পাই চুং-সি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ৮ই ডিসেম্বরের টেলিগ্রাম ছিল ৯ই নভেম্বরের টেলিগ্রামের প্রত্যুত্তর এবং তাতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জনমতকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য আরেকটি প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

৪। শেননি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে ঘিরে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা উত্তর-পশ্চিমে অবরোধ গড়ে তুলেছিল। ১৯৩৯ সাল থেকে স্থানীয় লোকদের কাজে লাগিয়ে তারা পাঁচটি সারি দিয়ে অবরোধগৃহ তৈরী করে, পাথরের দেওয়াল ও পরিখা খনন করায়। এই লাইন পশ্চিমে নিংসিয়া থেকে শুরু করে চিংশুই নদী ধরে দক্ষিণে চলে গিয়েছিল এবং পূর্বে ইয়েলো নদীতে এসে শেষ হয়েছিল। দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার প্রাক্কালে সীমান্ত অঞ্চলটি ঘিরে কুওমিনতাঙ সৈন্যদের সংখ্যা বাড়িয়ে দু লক্ষ করা হয়।

৫। 'কনফুসিয়াসের বাণীর' ষোড়শ খণ্ডের প্রথম অধ্যায় থেকে উধৃতিটি নেওয়া হয়েছে। লু রাজ্যের মন্ত্রী চি সুন যখন ক্ষুদ্র একটি প্রতিবেশী রাজ্য চুয়াঁউ আক্রমণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন কনফুসিয়াস এই মন্তব্যটি করেছিলেন।

দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান প্রতিহত হওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতি

১৮ই মার্চ, ১৯৪১

১। দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী যে অভিযানের[১] সূত্রপাত হয়েছিল হো ইং-চিন এবং পাই চুং-সির (গতবছরের ১৯শে অক্টোবর তারিখের) টেলিগ্রামের মধ্য দিয়ে, তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছিল দক্ষিণ আনহুই অঞ্চলের ঘটনার এবং চিয়াং কাই-শেকের ১৭ই জানুয়ারির আদেশনামার মধ্য দিয়ে। তাছাড়া প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে তার কার্যকলাপ ছিল ৬ই মার্চের কমিউনিস্ট-বিরোধী বক্তৃতা এবং জনগণের রাজনৈতিক পরিষদের[২] কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রস্তাব। এখন থেকে পরিস্থিতিতে সাময়িক কিছু সহজভাব দেখা যেতে পারে। পৃথিবীর দুটি প্রধান সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী যখন একটি চূড়ান্ত নির্ধারক সংগ্রামের মুখে, চীনের বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর যে অংশটি ব্রিটিশ এবং মার্কিনদের অনুগামী, আর যারা এখনো পর্যন্ত জাপানী আক্রমণকারীদের বিরোধী তারা কুওমিনতাঙ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার বর্তমান তিক্ত সম্পর্ককে সাময়িকভাবে খানিকটা সহজ করে আনার প্রয়াসকে বাঞ্ছিত বলে মনে করছে। তাছাড়া কুওমিনতাঙও এই সম্পর্ককে গত পাঁচ মাস ধরে তা যে উচ্চগ্রামে রয়েছে সেখানে রেখে দিতে পারে না, এবং তার কারণ হচ্ছে কুওমিনতাঙের আভ্যন্তরীণ অবস্থা (কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, কেন্দ্রীয় কমিটির চক্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রুপের মধ্যে, কেন্দ্রীয় কমিটির চক্র ও ফু সিং সোসাইটির মধ্যে[৩] এবং গুঁয়ে ও মাঝামাঝি শক্তিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং তাছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির চক্রের অভ্যন্তরে এবং ফু সিং সোসাইটির অভ্যন্তরেও দ্বন্দ্ব রয়েছে), দেশের পরিস্থিতি (জনসাধারণের ব্যাপক অংশ কুওমিনতাঙের স্বৈরাচারের বিরোধী এবং এক কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল) এবং আমাদের পার্টির নিজস্ব নীতি (প্রতিবাদ-আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া) ইত্যাদির জন্য তা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ লিখেছিলেন।

তাই উত্তেজনার অবস্থাকে খানিকটা সাময়িকভাবে সহজ করে আনাটা চিয়াং কাই শেকের প্রয়োজন।

২। সাম্প্রতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কুওমিনতাঙের মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে এবং কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর উভয় পার্টির তুলনামূলক শক্তির ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এটি তার একটি মূল চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সবকিছু মিলে চিয়াং কাই-শেককে তার নিজের অবস্থান ও মনোভাব পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছে। জাতীয় প্রতিরক্ষার ওপর জোর দিয়ে এবং পার্টিগত রাজনীতি অচল হয়ে পড়ছে এ কথা প্রচার করে, শ্রেণী ও পার্টিগত দিক থেকে তিনি পক্ষপাতহীন এই ভান করে তিনি যে নিজেকে দেশের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে অবস্থিত একজন 'জাতীয় নেতা' হিসেবে হাজির করছেন, তার লক্ষ্য হচ্ছে বৃহৎ জমিদারশ্রেণী, বৃহৎ বুর্জোয়া-শ্রেণী ও কুওমিনতাঙের শাসনকে রক্ষা করা। যদি তা শুধুই একটি আবরণ মাত্র হয় এবং নীতির ক্ষেত্রে প্রকৃত কোন পরিবর্তন না বোঝায়, তবে তাঁর এই প্রয়াস নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ প্রমাণিত হবে।

৩। বর্তমান কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের শুরুতে আমাদের পার্টি যে আপোষ ও সুবিধাদানের নীতি গ্রহণ করেছিল, সাধারণ স্বার্থের কথা বিবেচনা করে (গত বছরের ৯ই নভেম্বরের টেলিগ্রামে যা প্রকাশ পেয়েছে) তার ফলে জনগণের সহানুভূতি লাভ করা গেছে এবং দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার পর আমরা যখন প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণ শুরু করলাম (দুই দফায় আমাদের বারোটি দাবি[৬], জনগণের রাজনৈতিক পরিষদে আমাদের অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি এবং দেশব্যাপী প্রতিবাদ-অভিযানে যার প্রকাশ পাওয়া গেছে) তাতে করে সমগ্র জনগণের সমর্থন আমরা নতুন করে লাভ করেছি। আমাদের এই নীতি, ন্যায্য ভিত্তি ও সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়িয়ে সংযতভাবে সংগ্রাম পরিচালনার আমাদের এই নীতি সর্বশেষ কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান প্রতিহত করার জন্য সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় ছিল এবং ইতিমধ্যেই তার সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে। কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার প্রধান প্রধান বিরোধীয় বিষয়ের যুক্তিসংগত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ আনহুই-এর যে ঘটনাটি কুওমিন-তাঙের মধ্যেকার জাপানের অনুগামী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী চক্রই বাধিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে এবং তাদের সর্বপ্রকারের রাজনৈতিক ও সামরিক দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জ্ঞাপনের অভিযানে শিথিলতার ভাব দেখানো

আমাদের চলবে না, এবং প্রথম বারোটি দাবির জন্য আমাদের প্রচার-অভিযানকে তীব্র করে তুলতেই হবে।

৪। কুওমিনতাঙ আমাদের পার্টি ও অন্যান্য প্রগতিশীলদের নিপীড়ন করার নীতিতে অথবা তাদের শাসনাধীন এলাকাসমূহে কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার-অভিযানে শিথিলতা প্রদর্শন করবে না, সুতরাং আমাদের পার্টিকে তার সতর্কতাকে তীব্রতর করে তুলতেই হবে। হুয়াই নদীর উত্তরাঞ্চলে, পূর্ব আনহুই এবং মধ্য হুপে অঞ্চলে তারা তাদের আক্রমণ চালিয়েই যাবে এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে তা প্রতিহত করতে দ্বিধা করলে চলবে না। সমস্ত ঘাঁটি অঞ্চলকেই কঠোরভাবে গতবছরের ২৫শে ডিসেম্বরের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশাবলীকে[৫] কার্যকরী করতে হবে, রণকৌশল সম্পর্কে পার্টির আভ্যন্তরীণ শিক্ষাকে তীব্রতর করে চলতে হবে এবং অতিবামপন্থী অভিমতগুলিকে সংশোধন করতে হবে, যাতে করে আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকাগুলোকে অব্যাহত রাখতে পারি। অবশ্যই সমস্ত ঘাঁটি এলাকাসহ সমগ্র দেশব্যাপী কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার চূড়ান্ত ভাঙন হয় ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে আর নয়তো অনতিবিলম্বেই ঘটতে যাচ্ছে—এই ভ্রান্ত মূল্যায়ন এবং তা থেকে অন্য বহুবিধ যে ভ্রান্ত অভিমত দেখা দেয়, সেই সবগুলিকেই খারিজ করে দিতে হবে।

টীকা

১। দ্বিতীয় কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযান সম্পর্কে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য 'কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির এবং জনগণের রাজনৈতিক পরিষদের অধিবেশন সম্পর্কে মন্তব্য' দেখুন। (মাও সে-তুঙ: 'নির্বাচিত রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড।)

২। ১৯৪১ সালের ৬ই মার্চ চিয়াং কাই-শেক জনগণের রাজনৈতিক পরিষদে একটি কমিউনিস্ট বিরোধী বক্তৃতা দেন। 'সমস্ত সামরিক ও রাজনৈতিক পরিচালনার কাজ ঐক্যবদ্ধ' হওয়া আবশ্যক—তাঁর এই পুরানো বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে তিনি ঘোষণা করেন যে, শত্রুর পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত সকল জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্থা বাতিল করে দিতে হবে এবং তাঁর 'আদেশ ও পরিকল্পনা' অনুসারে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন

জনগণের সশস্ত্র বাহিনীকে 'সুনির্দিষ্ট এলাকায় কেন্দ্রীভূত' রাখতে হবে। একই সঙ্গে যে জনগণের রাজনৈতিক পরিষদ কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদেরই প্রভাবাধীন ছিল তা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে চিয়াং কাই-শেকের কমিউনিস্ট-বিরোধী ও জন-বিরোধী কার্যকলাপকে অনুমোদন করে এবং দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার প্রতিবাদে কমিউনিস্ট সদস্যগণ জনগণের রাজনৈতিক পরিষদের সভায় অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করার জন্য তাঁদের প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে।

৩। 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রুপ' সম্পর্কে জানার জন্য বর্তমান খণ্ডের 'যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা' নামক রচনার ১৬ নং টীকা দেখুন। 'কেন্দ্রীয় কমিটির চক্র' এবং ফুসিং সোসাইটি' সম্পর্কে জানার জন্যও বর্তমান খণ্ডের 'সাংহাই ও তাইয়ুয়ানের পতনের পর জাপ-বিরোধী যুদ্ধের পরিস্থিতি ও কর্তব্যসমূহ' নামক রচনার ১০ নং টীকা দেখুন।

৪। ১৯৪১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি জনগণের রাজনৈতিক পরিষদের অধিবেশনে কমিউনিস্ট সদস্যগণ প্রথম দফায় যে 'বারোটি দাবি' উত্থাপন করেন, সেগুলি 'দক্ষিণ আনহুই ঘটনা সম্পর্কে নির্দেশ ও বিবৃতি'তে যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে তারই অনুরূপ। দ্বিতীয় দফার দাবিগুলি জনগণের রাজনৈতিক পরিষদের কমিউনিস্ট সদস্যগণ পরিষদের অধিবেশনে তাদের যোগদানের শর্ত হিসেবে ১৯৪১ সালের ২রা মার্চ চিয়াং কাই-শেকের কাছে পেশ করেন। সেগুলি হচ্ছে:

(১) অবিলম্বে সারা দেশব্যাপী কমিউনিস্ট-বিরোধী সামরিক আক্রমণ বন্ধ কর।

(২) চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টি এবং গ্রুপের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে রাজনৈতিক নিপীড়ন চলছে তা বন্ধ কর, তাদের আইনসঙ্গত মর্যাদা স্বীকার করে নাও এবং সিয়ান, চুংকিং, কুইয়াং ও অন্যান্য স্থানে ধৃত তাদের সকল সদস্যদের মুক্তি দাও।

(৩) বিভিন্ন স্থানে যেসব বইয়ের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নাও, ডাকঘরসমূহে জাপ-বিরোধী পুস্তকাদি ও পত্র-পত্রিকা আটক করার আদেশটি খারিজ করে দাও।

(৪) **দৈনিক নতুন চীন** পত্রিকার ওপর আরোপিত সকল নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহার কর।

(৫) শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের বৈধ অস্তিত্ব স্বীকার করে নাও।

(৬) শত্রুর পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলোকে স্বীকৃতি দাও।

(৭) চীনের মধ্য, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সেনাদল ভাগাভাগি করার সময় স্থিতাবস্থা বজায় রাখ।

(৮) কমিউনিস্ট-পরিচালিত সশস্ত্র বাহিনীকে অষ্টাদশ গ্রুপ সেনাবাহিনী ছাড়া অন্য গ্রুপ সেনাবাহিনী গঠন করতে দাও, যাতে করে মোট ছ'টি সেনাবাহিনী তৈরী হয়.

(৯) দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনাকালে যে সমস্ত কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের সকলকে মুক্তি দাও এবং হতাহতদের পরিবারকে সাহায্য-দানের জন্য অর্থবরাদ্দ কর।

(১০) দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনাকালে ধৃত সকল অফিসার ও সৈনিকদের মুক্তি দাও এবং তাদের কাছ থেকে ধৃত সকল অস্ত্রশস্ত্র ফিরিয়ে দাও।

(১১) সমস্ত দল ও গ্রুপের প্রত্যেকটি থেকে এক-একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি যুক্ত কমিটি গঠন কর এবং কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের যথাক্রমে তার সভাপতি ও সহ-সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত কর।

(১২) জনগণের রাজনৈতিক পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীতে কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত কর।

৫। ২৫শে ডিসেম্বরের নির্দেশাবলী বর্তমান খণ্ডের 'কর্মনীতি সম্পর্কে' নামক রচনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান প্রতিরোধ প্রসঙ্গে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

৮ই মে, ১৯৪১

১৯৪১ সালের ১৮ই মার্চের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশাবলীতে বলা হয়েছে—দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান শেষ হয়েছে। তারপর থেকে যা যা ঘটেছে তা হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ নতুন আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে এগিয়ে চলেছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে উপাদান হিসেবে যা যুক্ত হয়েছে তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রসার, আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের মধ্যে নিরপেক্ষতার চুক্তি[১] সম্পাদন, দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের পরাজয় এবং তারই পরিণতি হিসেবে কুওমিনতাঙ-এর রাজনৈতিক মর্যাদা হ্রাস ও কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদা বৃদ্ধি, আর তারপর রয়েছে চীনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে নতুন আক্রমণ-অভিযানের জন্য জাপানের সর্বশেষ প্রস্তুতি। সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের পার্টির বীরত্বপূর্ণ ও বিজয়ী সংগ্রামকে অনুশীলন করা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে প্রতিরোধ-যুদ্ধে অধ্যবসায় নিয়ে দেশব্যাপী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর আত্মসমর্পণ ও কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রতিকূল স্রোতকে কার্যকরভাবে বিধ্বস্ত করে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলার উদ্দেশ্যে একান্ত অপরিহার্য।

১। চীনের দুটো প্রধান দ্বন্দ্বের মধ্যে চীন ও জাপানের মধ্যেকার জাতীয় দ্বন্দ্ব এখনো মুখ্য দ্বন্দ্ব এবং চীনে আভ্যন্তরীণ শ্রেণী দ্বন্দ্ব এখনো অপ্রধান হয়েই রয়েছে। একটি জাতীয় শত্রু আমাদের দেশের অনেক গভীরে ঢুকে পড়েছে—এই বাস্তব সত্য চূড়ান্ত নির্ধারক হয়ে রয়েছে। চীন ও জাপানের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্ব যতদিন তীব্র হয়ে থাকবে, তার মাঝে সমগ্র বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী দেশদ্রোহী হয়ে আত্মসমর্পণ করে বসলেও, তারা আর

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি রচনা করেছিলেন।

কোনকালেই ১৯২৭ সালের পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে বা ঐ বছরের ১২ই এপ্রিলের[২] ও ২১ শে মে'র[৩] ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারবে না। প্রথম কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযানকে[৪] কিছু কমরেড ২১শে মে'র ঘটনার অন্য একটি রূপ বলে মনে করেছিলেন এবং দ্বিতীয় অভিযানকে ১২ই এপ্রিল ও ২১শে মে'র ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি বলে মনে করেছিলেন; কিন্তু বাস্তব তথ্য প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ঐ মূল্যায়ন ভুল। এই কমরেডদের ভুল হচ্ছে এখানেই যে, তাঁরা জাতিগত দ্বন্দ্বই যে মুখ্য দ্বন্দ্ব তা ভুলে গেছেন।

২। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সমর্থক ও মার্কিন সমর্থক যে বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী কুওমিনতাঙ সরকারকে পরিচালনা করে, সেই শ্রেণীগুলোর দ্বৈত চরিত্র রয়ে গেছে। একদিকে, তারা জাপানের বিরোধী, আবার অন্য-দিকে তারা কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টি যে ব্যাপক জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে তারও বিরোধী আর তাদের জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং তাদের কমিউনিস্ট বিরোধিতা দুটোরই দ্বৈত চরিত্র রয়েছে। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রসঙ্গে দেখা যাচ্ছে, যদিও তারা জাপানের বিরোধী, তবু তারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ চালাচ্ছে না বা সক্রিয়ভাবে ওয়াং চিং-ওয়েই ও অন্যান্য দেশদ্রোহীদের বিরোধিতা করছে না, এবং এমনকি মাঝে মাঝে জাপানের শান্তি-দূতদের সংগে মহরম-মহরম পর্যন্ত করছে। তাদের কমিউনিস্ট-বিরোধিতা প্রসঙ্গে দেখা যায়, তারা কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী তো বটেই, এমনকি, দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার মতো ঘটনা পর্যন্ত তারা সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, ১৭ই জানুয়ারির হুকুমনামা পর্যন্ত জারী করছে, কিন্তু সংগে সংগে তারা চূড়ান্ত ভাঙন নিয়ে আসতে চাইছে না, এবং এখনো তাদের নরম-গরম নীতিটিই চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযানে এই বাস্তব সত্য আবার নতুন করে সুপ্রমাণিত হয়েছে। চীনের রাজনীতি অত্যন্ত জটিল এবং তা অনুধাবনের জন্য আমাদের কমরেডদের গভীরতম মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু ব্রিটিশ-অনুগামী ও মার্কিন-অনুগামী বৃহৎ জমিদারবর্গ ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী এখনো জাপানকে প্রতিরোধ করছে, আমাদের পার্টির সংগে মোকাবিলার ক্ষেত্রে নরম-গরম নীতি প্রয়োগ করছে, আমাদের পার্টির নীতিও তাই হবে—'ওরা আমাদের প্রতি যা করবে, আমরাও ওদের প্রতি ঠিক তা-ই করব'[৫], গরমকে গরম দিয়েই মোকাবিলা করব, নরমকে মোকাবিলা করব নরম দিয়ে। এই হচ্ছে বৈপ্লবিক দ্বৈত নীতি।

যতদিন পর্যন্ত বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী পুরোপুরি দেশদ্রোহী হয়ে না যাচ্ছে, ততদিন আমাদের এই নীতিও আমরা পাল্টাব না।

৩। কুওমিনতাঙ-এর কমিউনিস্ট-বিরোধী নীতির মোকাবিলা করতে হলে দরকার হবে ব্যাপক ধরনের পুরো একগুচ্ছ রণকৌশল এবং সেক্ষেত্রে ঔদাসীন্য ও অবহেলার কোন ঠাঁই-ই নেই। বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়া-শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের বৈপ্লবিক শক্তিগুলোর প্রতি ওদের শত্রুতা নিষ্ঠুরতার প্রকাশ শুধু দশ বছরের কমিউনিস্ট-বিরোধী যুদ্ধে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেনি, বরং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালেও দুটো কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের মধ্যে দিয়ে এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানকালে দ্বিতীয় আনহুই ঘটনার মধ্যে দিয়ে ও পুরোপুরি অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। যদি জনগণের বৈপ্লবিক বাহিনীকে চিয়াং কাই-শেকের হাতে নিশ্চিহ্ন না হতে হয় এবং নিজেদের অস্তিত্ব তাকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিতে হয়, তবে ইটের বদলে পাটকেল নিক্ষেপের সংগ্রাম তার প্রতি-বিপ্লবী নীতির বিরুদ্ধে চালাতেই হবে। কমরেড সিয়াং ইং-এর সুবিধাবাদের পরিণতিস্বরূপ যে পরাজয় সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানকালে বরণ করতে হয়েছে, তা সমগ্র পার্টির কাছে একটি গুরুতর সতর্কবাণী বলে গণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সংগ্রাম চালাতে হবে ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, আমাদের সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়িয়ে এবং সংযতভাবে; এই তিনটির একটিও যদি না থাকে তাহলে পশ্চাদপসরণ আমাদের অবধারিত।

৪। কুওমিনতাঙ-এর একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৃহৎ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের জাতীয় বুর্জোয়াদের থেকে পৃথক করে দেখতে হবে, কারণ ওদের মুৎসুদ্দি চরিত্র অতি অল্প অথবা নেই বললেই চলে। সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ জমিদারবর্গকে আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গ এবং সাধারণ জমিদারদের থেকে পৃথক করে দেখতে হবে। মাঝারি অংশগুলিকে সপক্ষে নিয়ে আসার এবং 'তিনটি এক-তৃতীয়াংশ পদ্ধতির' ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার পার্টির প্রয়াসের এইটিই হচ্ছে তত্ত্বগত ভিত্তি এবং গতবছরের মার্চ মাস থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি বারবার তা জোরের সংগে বলে এসেছে। সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানকালে তার সত্যতা নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে। ৭ই নভেম্বরের টেলিগ্রামে[৬] অভিব্যক্ত যে অবস্থান আমরা দক্ষিণ আনহুই ঘটনার আগে গ্রহণ করেছিলাম, তা পুরোপুরি প্রয়োজনীয়

ছিল এই ঘটনার পরে প্রতি-আক্রমণের পরিবর্তিত অবস্থানে আমাদের চলে যাওয়ার জন্য; অন্যথায় আমরা মাঝারি অংশসমূহকে সপক্ষে নিয়ে আসতে পারতাম না। কারণ বারবার যদি তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে তাদের শিক্ষা না হতো, তাহলে মাঝারি অংশসমূহ আমাদের পার্টি কেন কুওমিনতাঙ-এর একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করছে তা উপলব্ধি করতে পারত না, সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই যে শুধু ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং সংগ্রাম পরিত্যাগ করলে কোন ঐক্যই যে হতে পারে না—এটা উপলব্ধ করতে পারত না। যদিও আঞ্চলিকভাবে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীগুলো বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত, তবু সাধারণভাবে ওদের মাঝারি অংশ হিসেবে গণ্য করা উচিত ও সেভাবেই ওদের প্রতি আচরণ করা উচিত, কেননা ওদের সংগে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণকারী বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্ব রয়েছে। ফেংইয়েন শী-সান প্রথম কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানকালে সবচেয়ে সক্রিয় ছিলেন, দ্বিতীয় অভিযানকালে তিনিই মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করেন এবং যে কোয়াংসি চক্র প্রথম অভিযানকালে মাঝারি অবস্থান গ্রহণ করেছিল, দ্বিতীয় অভিযানে তারা কমিউনিস্ট-বিরোধী পক্ষাবলম্বন করে—এসব সত্ত্বেও এদের সংগে চিয়াং কাই-শেক চক্রের দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং দুটোকে অভিন্ন করে দেখলে চলবে না। আঞ্চলিক ক্ষমতাশালী গ্রুপগুলো সম্পর্কে কথাটা বেশি করে প্রযোজ্য। আমাদের বহু কমরেডই কিন্তু বিভিন্ন জমিদার ও বুর্জোয়াগোষ্ঠীকে একাকার করে ধরে বসে থাকেন, যেন গোটা জমিদার ও বুর্জোয়াশ্রেণীই দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার পর দেশদ্রোহী বনে গেছে; এটা চীনের জটিল রাজনীতির একটি অতি-সরলীকরণ মাত্র। এই অভিমতই যদি আমরা গ্রহণ করে বসতাম এবং সকল জমিদার ও বুর্জোয়াদেরই কুওমিনতাঙ একগুঁয়েদের সংগে একাকার করে ফেলতাম, তাহলে আমরা নিজেদেরকেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলতাম। এ কথা বোঝা দরকার যে, চীনের সমাজটি মাঝামাঝি স্তরে বিরাট এবং দুটি প্রান্তভাগেই ক্ষুদ্রকায়[৭], এবং কমিউনিস্ট পার্টি যদি মাঝারি শ্রেণীগুলিকে জয় করে নিজের পক্ষে নিয়ে তা আসতে পারে ও তাদের নিজ নিজ পরিস্থিতি অনুসারে তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ করে না দেয়, তবে তার পক্ষে চীনের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

৫। কিছু কমরেড যেহেতু চীন ও জাপানের মধ্যেকার দ্বন্দ্বই যে মুখ্য দ্বন্দ্ব

এই বিষয়ে দোদুল্যমানতা প্রদর্শন করেছেন, তাই দেখা গেছে চীনের শ্রেণী-সম্পর্কের মূল্যায়নে তাঁরা ভুল করেছেন এবং মাঝে মাঝেই তাঁরা পার্টির নীতির ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা প্রদর্শন করেছেন। দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনা ১২ই এপ্রিল অথবা ২১শে মে'র ঘটনারই অনুরূপ—এই মূল্যায়ন থেকে অগ্রসর হয়ে এই কমরেডরা এ কথা ভাবছেন বলেই মনে হচ্ছে যে, গতবছরের ২৫শে ডিসেম্বরের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশাবলী আর প্রযোজ্য নয়, বা অন্ততঃ পুরোপুরি প্রযোজ্য তো নয়ই। তাঁরা বিশ্বাস করেন, যে ধরনের রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রের সমর্থনকারী সকলেই অন্তর্ভুক্ত থাকবে সেরকম রাষ্ট্রশক্তির আর কোন প্রয়োজন নেই, বরং প্রয়োজন হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক ও শহরের পেটি-বুর্জোয়াদের একটি তথাকথিত রাষ্ট্রশক্তি, অবং আমাদের আর প্রতিরোধ-যুদ্ধের অধ্যায়ের যুক্তফ্রন্টের নীতির কোন প্রয়োজনই নেই, বরং প্রয়োজন হচ্ছে দশ বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধের সময়কার কৃষি-বিপ্লবের নীতির। এইসব কমরেডদের মনে পার্টির সঠিক নীতি অন্ততঃ সাময়িকভাবে হলেও নিতান্ত আবছা হয়ে পড়েছে।

৬। ঐসব কমরেডদের আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যখন কুওমিনতাঙ-এর সংগে সম্ভাব্য ভাঙনের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছিল, অর্থাৎ সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির সম্ভাব্যতার কথা বলেছিল, তখন তাঁরা অন্যান্য সম্ভাবনার কথা ভুলে গেলেন। তাঁরা এটা বুঝতে পারলেন না যে, সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত হওয়া একান্ত অপরিহার্য হলেও, তার অর্থ সহায়ক সম্ভাবনাকে অবহেলা করা বোঝায় না; বরং উল্টোদিকে ঐ ধরনের প্রস্তুতিই হচ্ছে সহায়ক সম্ভাব্যতা সৃষ্টির ও সেগুলিকে বাস্তব করে তোলার যথাযথ একটি শর্তই বটে। এই ক্ষেত্রে, আমরা কুওমিনতাঙ কর্তৃক ভাঙন সৃষ্টির বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলাম আর তাই কুওমিনতাঙ হাল্‌কাভাবে একটি ভাঙন নিয়ে আসতে সাহসই পায়নি।

৭। তাছাড়া আরও অনেক কমরেড রয়েছেন যাঁরা জাতীয় সংগ্রাম ও শ্রেণী-সংগ্রামের ঐক্যকেই উপলব্ধি করতে পারেন না এবং যুক্তফ্রন্টের নীতির ও শ্রেণীনীতির ঐক্যও উপলব্ধি করতে পারেন না, এবং তারই পরিণতি হিসেবে যুক্তফ্রন্টের শিক্ষা ও শ্রেণীশিক্ষার মধ্যেকার ঐক্যকে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন না। তাঁরা মনে করেন, দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার পর যুক্তফ্রন্টের শিক্ষার চেয়ে শ্রেণী-শিক্ষার ওপরই সবিশেষ জোর দেওয়া দরকার।

এখনো তাঁরা এটি উপলব্ধি করতে পারেন না যে, জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সমগ্র অধ্যায় জুড়েই পার্টির একটি সুসংহত একক নীতি রয়েছে—জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নীতি (একটি দ্বৈত নীতি) রয়েছে যা দুটো দিকের মধ্যে, ঐক্য ও সংগ্রামের মধ্যে, সংহতিবিধান করছে—যে নীতি জাপানের প্রতিরোধে লিপ্ত উচ্চ ও মধ্য সকল স্তরের ক্ষেত্রে, তা তারা বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী বা মাঝামাঝি শ্রেণীসমূহ যাই হোক না কেন সকলের ক্ষেত্রেই, প্রযোজ্য। এমনকি এই দ্বৈত নীতিকে ক্রীড়নক সৈন্য, দেশদ্রোহী ও জাপানের অনুগামী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে হবে, শুধুমাত্র যারা নিতান্তই কোন অনু-শোচনার ধার ধারে না তাদেরকেই শুধু আমাদের কঠোর হস্তে ধ্বংস করে দিতে হবে। আমাদের পার্টি নিজের সদস্যদের মধ্যে এবং সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে যে শিক্ষা দিয়ে থাকে তা একইভাবে এই দুটো দিককেই সামনে রাখে, অর্থাৎ তা শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকজনগণ ও পেটি-বুর্জোয়াদের অন্যান্য অংশকে কী করে বিভিন্নভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর ও জমিদারশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাপানকে প্রতিরোধ করতে হবে তা শিক্ষা দেয়, এবং একই সংগে কী করে তাদের আপোষরফা, দোদুল্যমানতা ও কমিউনিস্ট-বিরোধিতার বিভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন পরিমাণে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে তার শিক্ষা দেয়। যুক্তফ্রন্টের নীতি হচ্ছে শ্রেণী-নীতি এবং এই দুটো অবিচ্ছেদ্য; এ ব্যাপারে যারা অস্পষ্ট, তারা আরও অনেক সমস্যার ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট থেকে যাবে।

৮। অন্যান্য কমরেডরা শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের এবং উত্তর ও মধ্য চীনের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকার সমাজ-চরিত্র যে ইতিমধ্যেই নয়া-গণতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে, তা বোঝেন না। একটা অঞ্চল চরিত্রের দিক থেকে নয়া-গণতান্ত্রিক কিনা তা বিচার করার প্রধান মানদণ্ড হচ্ছে, জনসাধারণের ব্যাপক অংশ ওখানকার রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করেন কিনা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাটি কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত কিনা। সুতরাং যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতা কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীনে থাকাটাই হচ্ছে নয়া-গণতান্ত্রিক সমাজের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। কিছু লোক মনে করেন যে, দশ বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধের সময়ের মতো সম্পাদিত হলেই শুধু মনে করা চলে যে নয়া-গণতন্ত্র কায়েম হয়েছে, কিন্তু ওঁরা ভুল করছেন। বর্তমানে ঘাঁটি এলাকায় যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে যাবাই প্রতিরোধ ও

গণতন্ত্রের পক্ষপাতী এমন সকল জনগণের যুক্তফ্রন্টেরই রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তার অর্থনীতি হচ্ছে এমন যা থেকে আধা-ঔপনিবেশিকতা ও আধা-সামন্ততান্ত্রিকতা মূলতঃ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে এবং তার সংস্কৃতি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী ব্যাপক জনগণের সংস্কৃতি। সুতরাং রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিগতভাবে যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন জাপ-বিরোধী যেসব ঘাঁটি এলাকায় খাজনা ও সুদের হারটুকুই শুধু কমানো কার্যকরী হয়েছে এবং যে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে আমূল ভূমি-সংস্কার সম্পাদিত হয়ে গেছে—চরিত্রের দিক থেকে এই দুটিই নয়া-গণতান্ত্রিক। যখন জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকার দৃষ্টান্ত সমগ্র দেশময় ছড়িয়ে যাবে, তখন সমগ্র চীনই নয়া-গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হয়ে উঠবে।

টীকা

১। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের মধ্যে ১৯৪১ সালের ১৩ই এপ্রিল সম্পাদিত নিরপেক্ষতার চুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব সীমান্তে শান্তি সুনিশ্চিত করে এবং এভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মান-ইতালীয় ও জাপানীদের যৌথ আক্রমণের চক্রান্তকে ধ্বংস করে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতির তা এক বিরাট বিজয় সূচিত করে।

২। ১২ই এপ্রিলের ঘটনা হচ্ছে ১৯২৭ সালের ১২ই এপ্রিল চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক বলপূর্বক সাংহাই-এর প্রতিবিপ্লবী ক্ষমতা দখলের ঘটনা, যাতে বিপুল সংখ্যক কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়।

৩। চিয়াং কাই-শেক ও ওয়াং চিং-ওয়েইর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে হুনানের সু কে-সিয়াং ও হো চিয়েন সহ কুওমিনতাঙ-এর প্রতিবিপ্লবী সেনাপতিবৃন্দ ১৯২৭ সালের ২১শে মে চ্যাংসায় অবস্থিত ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা ও অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনের প্রাদেশিক সদর দপ্তরে আক্রমণের নির্দেশ দেয়। কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষকদের গ্রেপ্তার করে পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কুওমিনতাঙ-এর দুটি প্রতিবিপ্লবী চক্রের—ওয়াং চিং-ওয়েইর নেতৃত্বাধীন উহান চক্র ও চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন নানকিং চক্রের প্রকাশ্য মিতালী শুরু হয়।

৪। '১৯৩৯ সালের শীতকালে ও ১৯৪০ সালের বসন্তকালে জাপ-বিরোধী যুদ্ধ চলাকালে চিয়াং কাই-শেক প্রথম কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান শুরু করে।

৫। 'কনফুসিয়াস ডক্‌ট্রিন অব দি মীন' নামক গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ওপর সুং বংশের রাজত্বকালের দার্শনিক চু সির (১১৩০-১২০০ খ্রীঃ) টীকা থেকে এই উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে।

৬। ১৯৪০ সালের ৯ই নভেম্বরের টেলিগ্রামটি চু তে ও পেং তে-হুয়াই (অষ্টম রুট বাহিনীর) অষ্টাদশ গ্রুপ সেনাদলের প্রধান ও সহকারী প্রধান সেনাপতি হিসেবে এবং ইয়ে তিং ও সিয়াং ইং নতুন চতুর্থ বাহিনীর প্রধান ও সহকারী সেনাপতি হিসেবে ১৯৪০ সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখে কুওমিনতাঙ সেনাপতিদ্বয় হো ইং-চিন ও পাই চুং-সি কর্তৃক প্রেরিত টেলিগ্রামের জবাব হিসেবে প্রেরণ করেন। কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ ও জাপানের কাছে আত্মসমর্পণের চক্রান্তকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে নতুন চতুর্থ বাহিনী ও অষ্টম রুট বাহিনীকে ইয়েলো নদীর দক্ষিণ থেকে উত্তরে সরে যাওয়ার জন্য হো ইং-চিন ও পাই চুং-সি'র উদ্ভট প্রস্তাবের তাঁরা নিন্দা করেন। কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে আপোষ ও আপোষের মনোভাব হিসেবে তাঁরা তাঁদের সেনাদলকে ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ থেকে উত্তরে সরিয়ে নিতে সম্মত হন এবং তারই সংগে সংগে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার প্রধান প্রধান বিতর্কিত বিষয়গুলির সুমীমাংসার দাবি জানান। এই টেলিগ্রামটি মাঝামাঝি অংশগুলির সহানুভূতি অর্জন করে এবং চিয়াং কাই-শেককে বিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করে।

৭। চীনের সমাজ সম্পর্কে কমরেড মাও সে-তুঙের মন্তব্যের অর্থ হচ্ছে, চীনের যে শিল্প-শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব করছিল তারা প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর মতোই চীনের জনগণের নিছক একটি সংখ্যালঘু অংশ।

মাও সে তুঙ্ এর নির্বাচিত রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ
১লা মে, ১৯৬০

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগ (২)

বিষয়		পৃষ্ঠা
'গ্রামাঞ্চলীয় তথ্যানুসন্ধান'-এর ভূমিকা ও পরিশিষ্ট		
(মার্চ ও এপ্রিল, ১৯৪১)	...	১৭
ভূমিকা (১৭ই মার্চ, ১৯৪১)	...	১৭
পরিশিষ্ট (১৯শে এপ্রিল, ১৯৪১)	...	২০
আমাদের শিক্ষার সংস্কার সাধন (মে, ১৯৪১)	...	২৪
দূর প্রাচ্যের মিউনিক-এর চক্রান্তের মুখোস খুলে দিন		
(২৫শে মে, ১৯৪১)	...	৩৫
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রন্ট প্রসঙ্গে		
(২৩শে জুন, ১৯৪১)	...	৩৭
শেনসি কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের প্রতিনিধি পরিষদে		
প্রদত্ত বক্তৃতা (২২শে নভেম্বর, ১৯৪১)	...	৩৮
পার্টির কাজের ধারা সংশোধন করুন		
(১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২)	...	৪৩
ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরোধিতা করুন		
(৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২)	...	৬৭
সাহিত্য ও শিল্প প্রসঙ্গে ইয়েনানের আলোচনা-সভায়		
প্রদত্ত ভাষণ (মে, ১৯৪২)	...	৯০
ভূমিকা (২রা মে, ১৯৪২)	...	৯০
উপসংহার (২৩শে মে, ১৯৪২)	...	৯৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মনীতি (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২)	...	১৩০
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিক-পরিবর্তনকারী মুহূর্ত (১২ই অক্টোবর, ১৯৪২)	...	১৩৫
অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে (৬ই নভেম্বর, ১৯৪২)	...	১৪২
জাপ-বিরোধী যুদ্ধে অর্থ নৈতিক ও আর্থিক সমস্যাবলী (ডিসেম্বর, ১৯৪২)	...	১৪৩
নেতৃত্ব প্রদানের পদ্ধতি প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন (১লা জুন, ১৯৪৩)	...	১৫১
কুওমিনতাঙ-এর কাছে কয়েকটি সুস্পষ্ট প্রশ্ন (১২ই জুলাই, ১৯৪৩)	...	১৫৯
ঘাঁটি অঞ্চলসমূহে খাজনা হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং 'সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে সাহায্য করার' অভিযানকে প্রসারিত করুন (১লা অক্টোবর, ১৯৪৩)	...	১৬৮
কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের এবং জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের দুটি অধিবেশন সম্পর্কে মন্তব্য (৫ই অক্টোবর, ১৯৪৩)	...	১৭৪
সংগঠিত হোন ! (২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৩)	...	১৯৪
আমাদের অধ্যয়ন এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতি (১২ই এপ্রিল, ১৯৪৪)	...	২০৭
'পরিশিষ্ট' : আমাদের পার্টির ইতিহাসের কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কিত প্রস্তাব	...	২২৭
জনগণের সেবা করুন (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)	...	২৯৩
ডুই-দশ উৎসব উপলক্ষে চিয়াং কাই-শেকের বক্তৃতা প্রসঙ্গে (১১ই অক্টোবর, ১৯৪৪)	...	২৯৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
সাংস্কৃতিক কাজকর্মে যুক্তফ্রন্ট (৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৪)	...	৩০২
অর্থনৈতিক কাজকর্ম করা আমাদের শিখতে হবে (১০ই জানুয়ারি, ১৯৪৫)	...	৩০৫
গেরিলা অঞ্চলগুলিতেও উৎপাদন করা সম্ভব (৩১শে জানুয়ারি, ১৯৪৫)	...	৩১৫
চীনের দুটি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ (২৩শে এপ্রিল, ১৯৪৫)	...	৩২০
কোয়ালিশন সরকার প্রসঙ্গে (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)	...	৩২৪
১। চীনের জনগণের মৌলিক দাবিসমূহ	...	৩২৪
২। আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি	...	৩২৫
৩। জাপ-বিরোধী যুদ্ধে দুটি লাইন	...	৩২৮
চীনের সমস্যাবলীর মূল চাবিকাঠি	...	৩২৮
ইতিহাস অনুসরণ করে একটি আঁকাবাঁকা গতিপথ	...	৩৩০
গণযুদ্ধ	...	৩৩৪
দুটি যুক্তফ্রন্ট	...	৩৩৯
চীনের মুক্ত অঞ্চল	...	৩৪২
কুওমিনতাঙ এলাকা	...	৩৪৩
বিপরীতচিত্র	...	৩৪৬
কারা 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করছে আর রাষ্ট্রকে বিপন্ন করে তুলছে ?'	...	৩৪৮
'সরকারী ও সামরিক আদেশের প্রতি অবাধ্যতা'	...	৩৪৯
গৃহযুদ্ধের বিপদ	...	৩৫০
আলাপ-আলোচনা	...	৩৫১
দুটি সম্ভাবনা	...	৩৫১

বিষয়		পৃষ্ঠা
৪। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মনীতি	...	৩৫৩
আমাদের সাধারণ কর্মসূচী	...	৩৫৪
আমাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী	...	৩৬২
১। জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দাও, মাঝপথে কোন আপোষরফা করতে দিও না	...	৩৬৭
২। কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কতন্ত্রের অবসান কর এবং গণতান্ত্রিক একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা কর	...	৩৬৯
৩। জনগণের জন্য স্বাধীনতা	...	৩৭২
৪। জনগণের ঐক্য	...	৩৭৪
৫। গণফৌজ	...	৩৭৬
৬। ভূমি সমস্যা	...	৩৭৮
৭। শিল্পের সমস্যা	...	৩৮৫
৮। সংস্কৃতি, শিক্ষা ও বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা	...	৩৮৮
৯। সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের সমস্যা	...	৩৮৯
১০। বৈদেশিক নীতির সমস্যা	...	৩৯০
কুওমিনতাঙ অঞ্চলের কর্তব্য	...	৩৯৩
জাপানীদের অধিকৃত অঞ্চলের কর্তব্য	...	৩৯৫
মুক্ত অঞ্চলের কর্তব্য	...	৩৯৭
৫। সমগ্র পার্টি ঐক্যবদ্ধ হোক এবং তার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সংগ্রাম করুক !	...	৪০০

বিষয় পৃষ্ঠা

যে বোকা বুড়োটি পাহাড় সরিয়েছিল (১২ই জুন, ১৯৪৫) ... ৪১১
নিজের প্রয়োজন মিটানোর জন্য সৈন্যবাহিনী কর্তৃক উৎপাদন করা সম্পর্কে এবং শুদ্ধিকরণের জন্য ও উৎপাদনের জন্য মহান আন্দোলনসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে (২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৫) ... ৪১৫
হার্লি-চিয়াং দ্বৈত সঙ্গীতের চরম ব্যর্থতা (১০ই জুলাই, ১৯৪৫) ... ৪২২
হার্লি-নীতির বিপদ সম্পর্কে (১২ই জুলাই, ১৯৪৫) ... ৪২৭
কমরেড উইলিয়াম জেড. ফস্টারের কাছে প্রেরিত তারবার্তা (২৯শে জুলাই, ১৯৪৫) ... ৪২৯
জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে শেষবারের লড়াই (৯ই আগস্ট, ১৯৪৫) ... ৪৩১

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগ (২)

'গ্রামাঞ্চলীয় তথ্যানুসন্ধান'-এর ভূমিকা ও পরিশিষ্ট

মার্চ ও এপ্রিল, ১৯৪১

ভূমিকা

১৭ই মার্চ, ১৯৪১

দশ বৎসর ব্যাপী গৃহযুদ্ধের সময়ের নীতির মতো পার্টির বর্তমানের গ্রামাঞ্চল সম্পর্কিত নীতিটি কৃষি-বিপ্লবের নীতি নয়, তা হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের গ্রামাঞ্চল সম্পর্কিত নীতি। সমগ্র পার্টিকে কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৪০ সালের ৭ই জুলাই এবং ২৫শে ডিসেম্বরের নির্দেশাবলীকে[১] এবং আগামী সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশাবলীকে কার্যকর করতে হবে। কমরেডরা যাতে সমস্যাগুলি অধ্যয়নের একটি পদ্ধতি খুঁজে পেতে পারেন সে ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য বর্তমান লেখাগুলি প্রকাশ করা হচ্ছে। আমাদের অনেক কমরেড এখনো অপরিচ্ছন্ন ও উদাসীন কর্মধারা অনুসরণ করেন, বিষয়-গুলিকে তাঁরা পুরোপুরি বুঝতে চেষ্টা করেন না, এমনকি নীচের তলার পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞই থেকে যান অথচ কাজটি পরিচালনার দায়িত্বভার ওঁদের ওপরই অর্পিত হয়ে রয়েছে। এটা চূড়ান্ত বিপজ্জনক একটা পরিস্থিতি। চীনের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের প্রকৃত পরিস্থিতির যথার্থ বাস্তব জ্ঞান ব্যতীত সত্যিকারের ভাল নেতৃত্বদান সম্ভব নয়।

পরিস্থিতিকে জানার একমাত্র পথ হল সামাজিক অবস্থার অনুসন্ধান করা, যথার্থ বাস্তব জীবনে প্রতিটি সামাজিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। কারণ কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব যাঁদের হাতে থাকবে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের জানার মৌলিক পদ্ধতি হচ্ছে কয়েকটি শহর বা গ্রামের ব্যাপারে পরিকল্পনা অনুসারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, মার্কসবাদের মৌল দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ শ্রেণী-বিশ্লেষণের পদ্ধতি কাজে লাগানো এবং বেশ কয়েকটি আনুপূর্বিক অনুসন্ধানের কাজ চালানো। একমাত্র তাতে করেই চীনের সামাজিক সমস্যাবলীর একেবারে অত্যন্ত প্রাথমিক একটা জ্ঞান আমরা অর্জন করতে পারি।

তা করতে হলে, সবার আগে, আপনাদের চোখ নামাতে হতো নীচের

দিকে, মাথা উপরে তুলে আকাশের দিকে তাকালে চলবে না। যদি কেউ নীচের দিকে চোখ নামাতে আগ্রহী না হন এবং এ ব্যাপারে যদি তিনি একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হন তবে তাঁর সারা জীবনেও তিনি চীনের অবস্থাকে যথার্থভাবে বুঝে উঠতে পারবেন না।

দ্বিতীয়তঃ, তথ্য নিরূপণের জন্য সভা করুন। শুধু এদিকে ওদিকে চোখ বুলালেই বা গালগল্প শুনে মশগুল থাকলেই সর্বব্যাপ্ত জ্ঞান জন্মে যায় না। তথ্য নিরূপণের জন্য সভা-সমিতি করে আমি হুনান প্রদেশে এবং চিংকাঙশান সম্পর্কে যেসব তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলাম তা খোয়া গেছে। যে বিষয়বস্তু এখানে ছাপা হয়েছে তা প্রধানতঃ 'সিংকুয়ো সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান', 'চ্যাঙকাঙ শহরাঞ্চল সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান' এবং 'সাইসি শহরাঞ্চল সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান'কে ভিত্তি করে রচিত। তথ্য নিরূপণের জন্য সভা-সমিতি করা হচ্ছে সবচেয়ে সরল, সবচেয়ে বাস্তব এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি যা কাজে লাগিয়ে আমি প্রচুর লাভবান হয়েছি। যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে তা অধিকতর ভাল একটি বিদ্যালয়। যাঁরা এসব সভায় যোগ দেবেন তাঁদের হওয়া চাই মাঝারি ও নিম্নতর স্তরের যথার্থ অভিজ্ঞ কর্মী অথবা সাধারণ মানুষ। হুনান প্রদেশের পাঁচটি জেলা আর চিংকাঙশান-এর দুটি জেলার যে তথ্যানুসন্ধান আমি করেছিলাম সেক্ষেত্রে আমি মাঝারি স্তরের দায়িত্বশীল কর্মীদের কাছে গিয়েছিলাম ; সুনউ তথ্যানুসন্ধানকালে মাঝারি ও নিম্নতর স্তরের কর্মীদের, একজন **সিউতসাই**[২]-এর (ক্ষুদে রাজকর্মচারীর), বণিকসভার একজন দেউলিয়া প্রাক্তন সভাপতির এবং জেলার রাজস্ব আদায়ের একদা ভারপ্রাপ্ত কর্মচ্যুত একজন কেরানীর কাছে গিয়েছিলাম। এই সব কজন লোকই আমাকে এমন প্রচুর তথ্য জুগিয়েছিলেন যার কথা আমি এর আগে কোনকালে শুনিইনি। হুনান-এর হেঙশান জেলায় তথ্যানুসন্ধানকালে আমার একজন ক্ষুদে কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হয় যার কাছ থেকে আমি সর্বপ্রথম চীনের জেলখানাগুলির একান্ত ন্যক্কারজনক অবস্থার একটি পুরো চিত্র পাই। সিংকুয়ো জেলা এবং চ্যাংকাঙ ও সাইসি শহরাঞ্চলে আমার অনুসন্ধানকালে যেসব কমরেড শহর পর্যায়ে কাজকর্ম করছিলেন তাঁদের এবং সাধারণ কৃষকদের নিকট গিয়েছিলাম। এইসব কর্মীরা, এই কৃষকেরা, এই ক্ষুদে রাজকর্মচারী, ঐ জেলার, বণিক আর রাজস্ব বিভাগের কেরানী এরা সকলেই ছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং তাঁদের ছাত্র হিসেবে আমাকে তাঁদের প্রতি

শ্রদ্ধাবান ও শ্রমশীল হতে হয়েছিল এবং তাঁদের প্রতি কমরেড সুলভ মনোভাব গ্রহণ করতে হয়েছিল। অন্যথায় তাঁরা আমার দিকে মনোযোগই দিতেন না আর তাঁরা যা জানেন তা আমাকে বলতেন না বা যদি বলতেনও তবু তাঁরা যা জানেন তার সবটুকু আমাকে বলতেন না। তথ্য নিরূপণের জন্য আয়োজিত সভা তেমন বড় হওয়ার দরকার নেই; তিন থেকে পাঁচ বা সাত বা আটজন লোক হলেই যথেষ্ট। প্রচুর সময় দেওয়া চাই এবং অনুসন্ধানের একটা রূপরেখা তৈরী করে নেওয়া চাই। তদুপরি, আপনাকে নিজের থেকে ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করতে হবে, নোট নিতে হবে, সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। সুতরাং উদ্যম না থাকলে, চোখ নীচের দিকে নামাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হলে এবং জ্ঞানের জন্য আকুলতা না থাকলে, সবজান্তার কুৎসিত অঙ্গরাখাটি ঝেড়ে ফেলে একেবারে অনুগত ছাত্র হতে না পারলে কেউ সুনিশ্চিতভাবেই অনুসন্ধান করতে আর ভালভাবে তা করে উঠতে পারবেন না। এ কথাটি বোঝা চাই যে জনসাধারণই হচ্ছেন আসল বীর, অন্যদিকে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই একান্ত ছেলেমানুষ, নিতান্তই অজ্ঞ এবং এই উপলব্ধি না থাকলে একেবারে অত্যন্ত প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করাও অসম্ভব।

আমি পুনরাবৃত্তি করে বলতে চাই, এই প্রাসঙ্গিক তথ্যসংকলন প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্নতর স্তরে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা খুঁজে বের করার একটি পদ্ধতির আভাস দেওয়া। নির্দিষ্ট কিছু বিষয় কমরেডদের মুখস্থ করানো এবং তা থেকে কিছু সিদ্ধান্ত টানার জন্য এটা করা হচ্ছে না। সাধারণ-ভাবে বলতে গেলে, শৈশবাবস্থায় রয়েছে চীনের যে বুর্জোয়াশ্রেণী তার পক্ষে ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানের বুর্জোয়াশ্রেণী যা করেছে তুলনামূলকভাবে পূর্ণাঙ্গ আকারে বা নিতান্তপক্ষে সমাজ পরিস্থিতির একেবারে প্রাথমিক বৈষয়িক ক্ষেত্রেও সেই আয়োজন করে দিতে তারা পারেনি এবং কোনকালে পারবেও না। সুতরাং নিজেদের থেকে আমাদের তা সংগ্রহ করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বাস্তব কাজকর্মে যে মানুষেরা লিপ্ত থাকবেন তাঁদের সবসময়ই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে এবং এটা এমন একটা বিষয় যে ব্যাপারে কোন দেশের কোন কমিউনিস্ট পার্টিই অন্যের ওপর ভরসা করে বসে থাকতে পারে না। সুতরাং, বাস্তব কাজকর্মে যাঁরা লিপ্ত আছেন তাঁদের নীচতলার পরিস্থিতি নিয়ে অনুসন্ধান চালাতেই হবে। এই অনুসন্ধান বিশেষ করে প্রয়োজন যাঁরা শুধু তত্ত্ব জানেন কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিকে জানেন না

তাঁদের পক্ষে ; অন্যথায় তাঁরা তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের মিলন সাধন করতে পারবেন না। 'অনুসন্ধান না করলে কথা বলার অধিকারও থাকবে না' জোর দিয়ে বলা আমার এই কথাকে নিয়ে যদিও 'সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদ' বলে হাসিঠাট্টা করা হয়েছে, আজ অবধি এ কথা বলার জন্য আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই। যা আরও বড় কথা, আমি এখনো জোর দিয়েই বলছি, অনুসন্ধান না করলে কথা বলার কোন অধিকার না থাকাই সমীচীন। এমন অনেক লোকজন রয়েছেন যাঁরা 'সরকারী গাড়ী থেকে মাটিতে পদার্পণ করেই' এন্তার হৈ-চৈ শুরু করে দেন, মতামতের বন্যা বইয়ে দেন, এটির সমালোচনা করেন, ঐটির মুণ্ডপাত করেন ; কিন্তু এঁদের দশ জনের মধ্যে দশজনই কার্যতঃ দেখা যায় কার্যক্ষেত্রে একেবারে ব্যর্থ হয়ে পড়েন। সুগভীর অনুসন্ধানের ভিত্তিতে যেসব অভিমত প্রদান করা ও সমালোচনা করা হয় না সেগুলি অর্থহীন বাক্যজাল ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যেসব 'রাজকীয় দূতেরা' এদিকে ছুটেছেন, ওদিকে ছুটেছেন, সর্বত্র হুটোপুটি করে ফিরেছেন তাঁদের কবলে পড়ে আমাদের পার্টিকে অসংখ্যবার ভুগতে হয়েছে। স্তালিন যথার্থভাবেই বলেছেন 'বৈপ্লবিক প্রয়োগের সঙ্গে সংযুক্ত না হলে তত্ত্ব হয়ে পড়ে উদ্দেশ্যহীন।'[৩] একমাত্র সেই 'নেহাৎ বাস্তব কাজের লোকটি' যিনি অন্ধকারে পথ হাতড়ে ফিরছেন এবং যার কোন লক্ষ্য বা দূরদৃষ্টিই নেই তাকে ছাড়া, অন্য কাউকেই 'সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদী' বলে ছাপ মেরে দেওয়া চলে না।

আজও আমি একান্তভাবেই চীন এবং বিশ্ব ঘটনাপ্রবাহের সুগভীর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। চীনের এবং বিশ্ব ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে আমার নিজের জ্ঞানের স্বল্পতার সঙ্গেই তা বিজড়িত এবং তা থেকে এটা আদৌ বোঝাচ্ছে না যে আমিই সবকিছু জেনে বসে আছি আর অন্যরা নিতান্তই অজ্ঞ। আমি একজন ছাত্র হয়েই থেকে যেতে চাই, পার্টির অন্যসব কমরেডদের সঙ্গে মিলিতভাবে জনগণের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেই যেতে চাই।

পরিশিষ্ট

১৯শে এপ্রিল, ১৯৪১

দশ বৎসর ব্যাপী গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগের পক্ষে সবচেয়ে ভাল ও সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক একটি অভিজ্ঞতা। জনসাধারণের সঙ্গে আমরা নিজেদের কিভাবে সংযুক্ত করব

আর কিভাবে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত করব সেদিক থেকেই প্রাসঙ্গিক-তার কথা বলছি, রণকৌশলগত পথের দিক থেকে নয়। পার্টির বর্তমান রণকৌশলগত পথ নীতির দিক থেকে অতীতের পথের চেয়ে পৃথক। পূর্বে পার্টির রণকৌশলগত পথ ছিল জমিদার ও প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের বিরোধিতা করা; এখন পথটি হচ্ছে জাপানকে প্রতিরোধ করার বিরুদ্ধে যারা নয় এমন সকল জমিদার ও বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত লোকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এমনকি দশ বৎসর ব্যাপী গৃহযুদ্ধের শেষের দিকটাতেও যে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও রাজনৈতিক দল আমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালাচ্ছিল একদিকে এদের প্রতি এবং অন্যদিকে আমাদের শাসনাধীন পুঁজিবাদী চরিত্রসম্পন্ন সকল সামাজিক স্তরের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন নীতি গ্রহণ না করা ভুল হয়েছিল; প্রতি-ক্রিয়াশীল সরকার ও রাজনৈতিক পার্টির মধ্যেকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতি বিভিন্ন নীতি গ্রহণ না করাটাও ভুল ছিল। ঐ সময়ে কৃষকজনগণ এবং শহরে পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর নীচের স্তর ছাড়া সমাজের প্রতিটি অংশের বিরুদ্ধেই 'শুধু সংগ্রামের' নীতি অনুসরণ করা হচ্ছিল; নিঃসন্দেহে এই নীতিটি ছিল ভ্রান্ত। কৃষিনীতির ক্ষেত্রে দশ বৎসরব্যাপী গৃহযুদ্ধের প্রথম ও মাঝামাঝি সময়ে যে সঠিক নীতি[৪] গ্রহণ করে জমিদারগণকে কৃষকদের মতো একইভাবে জমি বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে করে তারাও চাষবাস করে বাঁচতে পারে এবং বাস্তুচ্যুত হয়ে বা পাহাড়ে-জঙ্গলে গিয়ে দস্যু বনে না যায় ও জনশৃংখলায় বিঘ্ন না ঘটায় সেই সঠিক নীতিটি বাতিল করে দেওয়াও ভুল ছিল। পার্টির এখনকার নীতি অবশ্যই ভিন্নরকমের হবে; তা 'শুধু সংগ্রাম, ও কোন মৈত্রী নয়' হবে না কিংবা 'শুধু মৈত্রী, কোন সংগ্রাম নয়' (১৯২৭-এর চেন তু শিউবাদের মতোও) তা হবে না। বরং তা হবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী সকল সামাজিক স্তরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের অথচ তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ারই নীতি; অবশ্য এই সংগ্রামের রূপ তাদের শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণের ও কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনগণের প্রতি বিরোধিতায় দোদুল্যমান অথবা প্রতিক্রিয়াশীল দিকের মাত্রার অভিব্যক্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হবে। বর্তমান নীতি হচ্ছে 'মৈত্রী' ও সংগ্রামের' ও সুসমন্বয়সাধনের একটি দ্বৈত নীতি। শ্রমিকনীতির ক্ষেত্রে দ্বৈত নীতিটি হচ্ছে—যথোপযুক্তভাবে শ্রমিকদের জীবিকার উন্নতি বিধান করা। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গত বিকাশের

ক্ষতিসাধন করা নয়। কৃষিনীতির ক্ষেত্রে দ্বৈত নীতিটি হচ্ছে জমিদারদের দিক থেকে খাজনা ও সুদ হ্রাস করতে হবে আর কৃষকদের দিক থেকে ধরে নেওয়া হবে যে এই হ্রাসপ্রাপ্ত খাজনা ও সুদ তারা মিটিয়ে দেবে। রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে দ্বৈত নীতিটি হচ্ছে জাপ-বিরোধী সকল জমিদার ও পুঁজিবাদীগণকে শ্রমিক ও কৃষকদের মতো একই রকম দৈহিক নিরাপত্তার অধিকার দেওয়া এবং একই রকম রাজনৈতিক ও সম্পত্তি বিষয়ক অধিকার ভোগ করতে দেওয়া এবং একই সঙ্গে তাদের দিক থেকে সম্ভাব্য প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সতর্কতা বজায় রাখা। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও সমবায়ী অর্থনীতির বিকাশসাধন করা হবে কিন্তু গ্রামাঞ্চলের ঘাঁটি অঞ্চলে মূল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি আজ রাষ্ট্রীয় নয় ব্যক্তিগত উদ্যোগেরই আওতাধীন এবং আমাদের অর্থনীতির একচেটিয়া নয় এমন পুঁজিবাদকে বিকাশের সুযোগ দিতে হবে ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাকে ব্যবহার করতে হবে। আজকের দিনে চীনের পক্ষে এই হচ্ছে সবচেয়ে বিপ্লবী নীতি এবং তার বিরোধিতা করা বা তা কার্যকর করাকে বিঘ্নিত করা নিঃসন্দেহে ভুল হবে। পার্টির সদস্যদের কমিউনিস্টসুলভ বিশুদ্ধতা নিষ্ঠা সহকারে ও দৃঢ়ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সমাজের অর্থনীতির পুঁজিবাদী ক্ষেত্রের হিতকর ভূমিকাকে রক্ষা করা ও যথাযথভাবে তাকে বিকশিত হতে দেওয়া জাপানকে প্রতিরোধের যুগে ও গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র গড়ে তোলার যুগে আমাদের পক্ষে এই দুইটিই অপরিহার্য কর্তব্যকর্ম। এই যুগে কিছু কিছু কমিউনিস্ট বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে এবং পার্টির সদস্যদের মধ্যে পুঁজিবাদী ধ্যানধারণাও দেখা দিতে পারে, এইসব অবক্ষয়ী ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের করতেই হবে; কিন্তু পার্টির অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ভুলভাবে সমাজের অর্থনীতির ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত করা এবং অর্থনীতির পুঁজিবাদী ক্ষেত্রের বিরোধিতা করা আমাদের উচিত হবে না। এই দুইয়ের মধ্যে একটা পরিষ্কার ভেদরেখা আমাদের টানতে হবে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একটি জটিল পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করছে এবং প্রতিটি পার্টি-সদস্যকে ও বিশেষ করে প্রতিটি কর্মীকেই নিজেকে মার্কসীয় রণকৌশল উপলব্ধি করেছেন এমন এক-একজন সৈনিক হিসেবে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে। সমস্যাসমূহের প্রতি একটি একপেশে ও অতি সরলীকৃত মনোভাব কোন সময়ই বিপ্লবকে বিজয়ী করে তুলতে পারবে না।

টীকা

১। ১৯৪০ সালের ৭ই জুলাই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশটি হল 'বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টির নীতি সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত।' কেন্দ্রীয় কমিটির ২৫শে ডিসেম্বরের নির্দেশ **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলীর** দ্বিতীয় খণ্ডে 'কর্মনীতি সম্পর্কে' শীর্ষক প্রবন্ধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২। একজন **সিউত্সাই** হলেন রাজকীয় পরীক্ষাসমূহের সর্বনিম্ন উপাধিধারী ব্যক্তি।

৩। জে. ভি. স্তালিন: 'লেনিনবাদের ভিত্তি', **লেনিনবাদের সমস্যা**, ইংরাজী সংস্করণ, বিদেশীভাষা প্রকাশন সংস্থা, মস্কো, ১৯৪৫, পৃঃ ৩১।

৪। দশ বৎসর ব্যাপী গৃহযুদ্ধের প্রথম অধ্যায় ১৯২৭ সালের শেষদিক থেকে ১৯২৮ সালের শেষদিক পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সাধারণভাবে চিংকাঙশান অধ্যায় বলে তা পরিচিত; মাঝামাঝি অধ্যায় ১৯২৯ সালের প্রথমদিক থেকে ১৯৩১ সালের শরৎকাল পর্যন্ত বিস্তৃত, কেন্দ্রীয় লাল ঘাঁটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা থেকে তৃতীয় 'অবরোধ ও দমনমূলক' অভিযানের বিরুদ্ধে বিজয়ী পরিসমাপ্তি পর্যন্ত বিস্তৃত; এবং তৃতীয় অধ্যায় ১৯৩১ সালের শেষদিক থেকে ১৯৩৪ সালের শেষদিক পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ তা ঐ অভিযানের বিজয়ী পরিসমাপ্তি থেকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক কিউচাও প্রদেশের সুনাইতে পলিটিক্যাল ব্যুরোর বর্ধিত অধিবেশন পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৩৫ সালের সুনাই অধিবেশন পার্টিতে যে 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী লাইন ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কর্তৃত্ব করে আসছিল তার সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয় এবং পার্টিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। **পরিশিষ্ট:** 'আমাদের পার্টির ইতিহাসের কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে' প্রবন্ধটি এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত আছে।

আমাদের শিক্ষার সংস্কারসাধন

মে, ১৯৪১

সমগ্র পার্টির মধ্যে শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও ব্যবস্থার সংস্কারসাধনের আমি প্রস্তাব করছি। কারণগুলি নিম্নরূপ :

(১)

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিশ বছর হচ্ছে এমন বিশটি বছর যখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্য চীন বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে অধিক থেকে অধিকতরভাবে সুসমন্বিত হয়ে উঠেছে। পার্টির শৈশব অবস্থায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং চীন বিপ্লব সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি যে কত সামান্য ও ভাসাভাসা ছিল সে-কথা স্মরণ করলে আমরা দেখতে পাব এখন তা কত গভীরতর ও সমৃদ্ধতর হয়েছে। একশ বছর ধরে বিপর্যয়ে দীর্ণ-বিদীর্ণ চীনা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ও তাঁদের জীবন দান করে গেছেন, একজনের মৃত্যু বরণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন এসে তাঁর স্থান পূরণ করেছেন, দেশ ও জনগণের মুক্তির যথার্থ পথের সন্ধান তাঁরা করে গেছেন। তা আমাদের কণ্ঠে গান ও চোখের জল সৃষ্টি করেছে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এবং রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পরেই শুধু আমরা সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ সত্য, আমাদের জাতির মুক্তিসাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে খুঁজে পেলাম এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টিই এই হাতিয়ারের প্রচলন করেছে, তার প্রচার করেছে ও তাকে প্রয়োগ করার সংগঠক হয়ে উঠেছে। চীন বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে যখন তার সম্মিলন সাধিত হল

ইয়েনানে কর্মীদের সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ এই রিপোর্টটি উপস্থিত করেন। এই রিপোর্ট এবং 'পার্টির কাজের ধারা সংশোধন করুন' এবং 'ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনারীতির বিরোধিতা করুন' এই দুটি প্রবন্ধ শুদ্ধিকরণ আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখিত কমরেড মাও সে-তুঙ-এর মৌলিক রচনা। এই সব রচনায় তিনি ভাবাদর্শগত স্তরে পার্টি-লাইন নিয়ে পার্টির মধ্যেকার অতীতের পার্থক্যগুলির সারসংক্ষেপ করেছেন এবং পার্টির মধ্যে প্রচলিত যে পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও কর্মধারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে নিজেদের চালিয়ে দিচ্ছিল ও মুখ্যতঃ যা আত্মগত ও সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক হিসেবে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল ও যার প্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছিল ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনাধারা, তার বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের

তখনই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্য চীন বিপ্লবকে সম্পূর্ণ নতুন এক রূপ দান করেছে। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের শুরু থেকেই আমাদের পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এই যুদ্ধের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে তার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে, চীন এবং বর্তমান দুনিয়ার বিচারের ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে এবং চীনের ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও কাজ শুরু করেছে। এই সবকটি খুবই শুভ লক্ষণ

(২)

কিন্তু ত্রুটিবিচ্যুতি এবং বেশ বড় রকমের ত্রুটিবিচ্যুতিই এসব ক্ষেত্রে আমাদের রয়ে গেছে। এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সংশোধন না করলে আমি মনে করি আমাদের কাজকর্মে এবং চীন বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের সমন্বয়সাধনের আমাদের মহান লক্ষ্য অর্জনের পথে আমরা এক কদমও এগিয়ে যেতে পারব না।

প্রথমে বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনার কথাই ধরা যাক। বর্তমান আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমরা খানিকটা সাফল্য অর্জন করেছি কিন্তু আমাদের মতো বিরাট একটা পার্টির পক্ষে যে তথ্যাদি আমরা সংগ্রহ করেছি তা বিছিন্ন খণ্ড খণ্ড এবং রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক যেদিক সম্পর্কেই হোক না কেন এই বিষয়গুলির প্রতিটি দিক থেকেই আমাদের গবেষণার কাজ অবিন্যস্ত হয়ে রয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, গত বিশ বছরে এই দিকগুলি সম্পর্কে বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও অধ্যয়নের ব্যাপারে ধারাবাহিক ও সুগভীর কাজ আমরা করিনি এবং বাস্তব পরিস্থিতির অনুসন্ধানের ও অধ্যয়নের পরিবেশের অভাব আমাদের রয়ে গেছে। 'চোখ-বাঁধা একজন মানুষের চড়ুই পাখি ধরার মতো'

ভাবাদর্শ গত মূল নীতি অনুসারে সমগ্র পার্টি জুড়ে কাজের ধারা সংশোধনের জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তাঁর এই আহ্বান অতিক্রান্ত পার্টির ভিতরে ও বাইরে প্রলেতারীয় ও পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শের মধ্যে বিরাট এক বিতর্কের সৃষ্টি করে। পার্টির ভিতরে ও বাইরে তা প্রলেতারীয় ভাবাদর্শের অবস্থাকে সুসংহত করে তুলে, ভাবাদর্শগত দিক থেকে ব্যাপক কর্মীদের একটি বিরাট অগ্রসর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে এবং পার্টিকে অভূতপূর্ব ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে তা সমর্থ করে তোলে।

অথবা 'একজন অন্ধের হাতড়ে হাতড়ে মাছ ধরার মতো' আচরণ করা গোঁয়ারের মতো ও অসতর্ক হয়ে কাজ করা, বাগাড়ম্বরকে প্রশ্রয় দেওয়া, আধ খিমচি জ্ঞান নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকা—এই হচ্ছে আমাদের পার্টির অনেক কমরেডদের মধ্যে এখনো বর্তমান অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজের সেই ধারা যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার অধ্যয়ন করা প্রয়োজন এবং আত্মগত খেয়ালখুশি থেকে নয় বাস্তব পরিস্থিতির পর্যালোচনা থেকেই অগ্রসর হাওয়া প্রয়োজন ; কিন্তু আমাদের অনেক কমরেড এই সত্যকে সোজাসুজি লংঘন করেই কাজ করে থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাস অধ্যয়নের ব্যাপারে আসা যাক। যদিও অল্প কয়েকজন পার্টিসভ্য ও দরদীই এই কাজ শুরু করেছেন, সংগঠিতভাবে এ কাজটিকে গ্রহণ করা হয়নি। অনেক পার্টি-সদস্যের কাছেই গত একশ বছরের বা প্রাচীনকালের চীনের ইতিহাস যেন গভীর তমসাচ্ছন্নই রয়ে গেছে। অনেক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পণ্ডিত রয়েছেন যাঁরা প্রাচীন গ্রীসের থেকে উদাহরণ না দিয়ে মুখই খুলতে পারেন না অথচ খুবই দুঃখের ব্যাপার তারা তাঁদের নিজেদের পূর্বপুরুষদের বেমালুম ভুলে বসে রয়েছেন। আধুনিক পরিস্থিতি বা অতীতের ইতিহাস কোনটির ক্ষেত্রেই গুরুতর অধ্যয়নের বাতাবরণ দেখা যায় না।

তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা বা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের অধ্যয়নের কথাই ধরা যাক। অনেক কমরেডকেই দেখা যায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে অধ্যয়ন তাঁরা করেছেন তা বৈপ্লবিক প্রয়োগের প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য নয়, শুধু অধ্যয়নের জন্যই সে অধ্যয়ন তাঁরা করছেন। ফলে অধ্যয়ন যদিও তাঁরা করেন, তাকে হজম করতে তাঁরা পারেন না। একপেশেভাবে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন স্তালিন থেকে বিভিন্ন উধৃতিই তাঁরা শুধু হাজির করেন কিন্তু মার্কস, এঙ্গেলস লেনিন ও স্তালিনের অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতিকে চীনের বর্তমান পরিস্থিতি ও তার ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বা চীন বিপ্লবের সমস্যার বাস্তব বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করতে পারেন না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি এ ধরনের মনোভাব বিশেষ করে মাঝারি ও উচ্চতর স্তরের কর্মীদের পক্ষে প্রচুর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এইমাত্র সাম্প্রতিক পরিস্থিতির অধ্যয়নের ব্যাপারে অবহেলা, ইতিহাস অধ্যায়নের ব্যাপারে অবহেলা এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগের ব্যাপারে অবহেলার যে তিনটি দিকের উল্লেখ আমি করলাম এই সবকটি মিলে অত্যন্ত নিকৃষ্ট একটি কাজের ধারার সৃষ্টি করেছে। এইটির প্রশ্রয়ের ফলে আমাদের অনেক কমরেডের ক্ষতি হয়েছে।

আমাদের মধ্যেকার অনেক কমরেডই এই কাজের ধারার ফলে ভ্রান্ত পথে গেছেন। দেশের, প্রদেশের, বিভাগের বা জেলার ভেতরের ও বাইরেকার বাস্তব পরিস্থিতির ধারাবাহিক ও আনুপূর্বিক অনুসন্ধান পরিচালনায় অনিচ্ছা-হেতু তাঁরা তাঁদের অত্যল্প জ্ঞানের ভিত্তিতেই হুকুম জারি করে চলেন এবং ভাবখানা হচ্ছে যেহেতু 'আমার কাছে এটাই ঠিক মনে হচ্ছে, এতএব এটা তা-ই হবে।' আত্মগত এই কাজের ধারা কি এখনো বহুসংখ্যক কমরেডের মধ্যে চালু থেকে যায়নি ?

এমন কিছু লোকও রয়েছেন আমাদের নিজেদের ইতিহাসের কিছুই জানেন না বা অতি অল্প জানেন বলে লজ্জিত বোধ করার পরিবর্তে তাঁরা গর্বই বোধ করে থাকেন। যা সবচেয়ে বিশেষ করে তাৎপর্যপূর্ণ তা হচ্ছে অতি অল্প সংখ্যক লোকই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস জানেন এবং আফিম যুদ্ধ থেকে চীনের একশ বছরের ইতিহাস যথাযথভাবে জানেন। গত একশ বছরের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গুরুতর রকমের অধ্যয়নের কাজ কেউ শুরু করেছেন বলে মনে হয় না। তাঁদের নিজেদের দেশ সম্পর্কে অজ্ঞ এইসব লোকেরা শুধু প্রাচীন গ্রীস ও অন্যান্য বিদেশের গল্পকাহিনীই শোনাতে পারেন কিন্তু এক্ষেত্রেও এঁদের জ্ঞানের নিতান্ত করুণ অবস্থা, দৌড় শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রাচীন বিদেশী কিছু বই থেকে ইতস্ততঃ কুড়ানো কিছু বিষয়।

গত কয়েক দশক ধরে বিদেশ থেকে প্রত্যাগত বহু ছাত্রের মধ্যেই এই রোগটি দেখা গেছে। ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপান থেকে দেশে ফিরে তাঁরা শুধু বিদেশী জিনিস নিয়ে তোতাপাখির মতো কচকচানি করতে পারেন। তাঁরা গ্রামোফোন হয়ে দাঁড়ান এবং নিজেদের উপলব্ধির ও নতুন কিছু তৈরী করার তাঁদের দায়িত্বের কথা তাঁরা ভুলে যান। এই ব্যাধিটি কমিউনিস্ট পার্টিকেও আক্রমণ করেছে।

যদিও আমরা মার্কসবাদ অধ্যয়ন করছি তবু যে পদ্ধতিতে আমাদের

লোকজনেরা তা অধ্যয়ন করছেন সেটা মার্কসবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তার অর্থ হচ্ছে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে ঐক্য সাধনের যে মৌলিক নীতিটির কথা একান্তভাবে আমাদের বলে গেছেন, তাকেই তাঁরা অমান্য করছেন। এই নীতিটিকে লংঘন করার পর তাঁরা তাঁদের নিজস্ব বিপরীত নীতি, তত্ত্ব ও কর্মের মধ্যেকার বিচ্ছেদের নীতিটি আবিষ্কার করেছেন। শিক্ষা-কেন্দ্রসমূহে ও কর্মরত কর্মীবাহিনীর শিক্ষাদানের ব্যাপারে দর্শনের শিক্ষকেরা তাঁদের ছাত্রদের চীন বিপ্লবের যুক্তিবিজ্ঞানের অধ্যয়নের পথে পরিচালনা করেন না; অর্থনীতির শিক্ষকেরা তাঁদের ছাত্রদের চীনের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়নের পথে পরিচালনা করেন না; রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষকেরা তাঁদের ছাত্রদের চীন বিপ্লবের রণকৌশলের অধ্যয়নের পথে পরিচালনা করেন না; সামরিক বিজ্ঞানের শিক্ষকেরা তাঁদের ছাত্রদের চীনের বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রণনীতি ও রণকৌশলের অধ্যয়নের পথে পরিচালনা করেন না;—এই হচ্ছে অবস্থা। ফলে ভুলগুলি ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং লোক-জনের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। ইয়েনানে তিনি যা শিখলেন, ফুসিয়েনে[১] তাই তিনি প্রয়োগ করতে পারছেন না। অর্থনীতির অধ্যাপকেরা সীমান্ত অঞ্চলের মুদ্রাব্যবস্থা ও কুওমিনতাঙ মুদ্রাব্যবস্থার[২] মধ্যেকার সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিতে পারেন না, স্বভাবতঃই তাঁদের ছাত্ররাও ব্যাখ্যা করতে পারেন না। ফলে অনেক ছাত্রের মধ্যে বিকৃত একটা মানসিকতা গড়ে উঠেছে; চীনের সমস্যাদির প্রতি আগ্রহ প্রদর্শনের পরিবর্তে এবং পার্টির নির্দেশাবলীকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করার পরিবর্তে তাঁদের শিক্ষকদের কাছ থেকে তথাকথিত সনাতন ও শাশ্বত যে শাস্ত্রবাক্য তাঁরা মুখস্থ করেছেন তা নিয়েই তাঁরা পড়ে থাকেন।

অবশ্য এইমাত্র আমি যা বললাম, তা আমাদের পার্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; একটা সাধারণভাবে প্রযোজ্য ব্যাপার হিসেবে তার কথা আমি বলিনি। কিন্তু এ ধরনের লোক রয়েছে; তদুপরি তাদের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যারা যথেষ্ট ক্ষতিই সাধন করে থাকে। এই বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখলে চলবে না।

(৩)

এই বিষয়টিকে আরও খানিকটা ব্যাখ্যা করার জন্য আমি দুটো বিপরীত মনোভাবের মধ্যে তুলনা করতে চাই।

প্রথমে, বিষয়ীবাদী আত্মগত মনোভাবের বিবরণটির কথাই বলি।

এই মনোভাবসম্পন্ন একজন ব্যক্তি তাঁর পারিপার্শ্বিকের ধারাবাহিক ও আনুপূর্বিক অধ্যয়ন করেন না, বরং নেহাৎ আত্মগত উৎসাহ নিয়েই কাজকর্ম করেন এবং আজকের চীনের চেহারা সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট চিত্রই পেয়ে থাকেন। এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তিনি ইতিহাসকে খণ্ডছিন্ন করে ফেলেন, শুধু প্রাচীন গ্রীসকেই জানেন, জানেন না চীনকে এবং গতকালের বা গতপরশু দিনের চীন সম্পর্কে তিনি অন্ধকারেই থেকে যান। এই মনোভাব থেকে একজন ব্যক্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদী তত্ত্ব নিয়ে বাস্তবতা-বিচ্ছিন্নভাবে ও উদ্দেশ্যহীনভাবে অধ্যায়ন করে থাকেন। চীন বিপ্লবের তত্ত্বগত ও রণকৌশলগত সমস্যাদির সমাধানের জন্য একটা অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির অনুসন্ধানে তিনি মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের রচনা অধ্যয়ন করেন না, তিনি শুধু তত্ত্বের জন্যই তত্ত্বের অধ্যয়ন করে থাকেন। তিনি কোন লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে তীর ছোঁড়েন না, শুধু আন্দাজে তীর ছুঁড়ে চলেন। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন বাস্তব পরিস্থিতি থেকে অগ্রসর হওয়ার জন্য এবং তা থেকে নিয়মগুলি নির্ধারণ করে আমাদের পথের নির্দেশ হিসেবে সেগুলিকে ব্যবহার করার জন্য। এই উদ্দেশ্যে মার্কস যেমন বলেছেন তদনুযায়ী আমাদের কর্তব্য হচ্ছে বিস্তারিত বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা এবং সেগুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করা।[৩] আমাদের অনেক লোকজন এ কাজ করেন না, করেন ঠিক বিপরীতটি। তাঁদের অনেকেই গবেষণার কাজকর্ম করছেন। কিন্তু আজকের বা বিগতদিনের চীনকে নিয়ে অধ্যয়নে তাঁদের কোন আগ্রহ নেই এবং বাস্তবতা বর্জিত শূন্যগর্ভ 'তত্ত্ব' নিয়ে অধ্যয়নেই তাঁদের যা কিছু আগ্রহ। অন্য অনেকে বাস্তব কাজকর্ম করেন কিন্তু তাঁরাও বাস্তব পরিস্থিতির অধ্যয়নের প্রতি কোনই মনোনিবেশ করেন না, প্রায়ই নেহাৎ উৎসাহের ওপর নির্ভর করে তাঁরা চলেন এবং কর্মনীতির পরিবর্তে তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্বারাই পরিচালিত হন। এই উভয় ধরনের লোকেরাই যথার্থ বাস্তবতাকে অবহেলা করে আত্মগত বিষয়ের ওপর নির্ভর করেই চলেন। বক্তৃতা করার সময় ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদির লম্বা একটি ফিরিস্তি দিয়ে ১, ২, ৩, ৪ করে বহু বিষয়ের অবতারণা তাঁরা করেন এবং প্রবন্ধ রচনা করার সময় এন্তার গুরুগম্ভীর বাক্যজাল তাঁরা বিস্তার করে থাকেন। বাস্তব তথ্য থেকে সত্যকে খুঁজে বের করার কোন ইচ্ছে তাঁদের নেই, শুধু নিজেদের

জ্ঞানের বহর দেখিয়ে বাহবা কুড়ানোই তাঁদের উদ্দেশ্য। ফলে তা হয়ে দাঁড়ায় সারবস্তুহীন চমকের ব্যাপার, দৃঢ়তাহীন ভঙ্গুরতায় ভরা। তাঁরা সব সময়ই সঠিক, এই দুনিয়ার একেবারে এক নম্বর নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এই ভাব দেখিয়ে 'রাজকীয় দূতের' মতো সর্বত্র তাঁরা ছোটাছুটি করেন। আমাদের মধ্যেকার কিছু কমরেডের এই হচ্ছে কাজের ধারা। এই ধরনের কাজের ধারা অনুসরণ করা নিজের ক্ষতি করারই সামিল এবং কাজের ধারা অন্যকে শেখানো মানে অন্যদের ক্ষতিসাধন করা এবং বিপ্লবের পরিচালনার ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার অর্থ হল বিপ্লবেরই ক্ষতিসাধন করা। এক কথায়, এই আত্মগত কর্মপদ্ধতি বিজ্ঞানের ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী এবং তা কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী, জনগণ ও জাতির তা এক বিরাট শত্রু, পার্টির চেতনার মধ্যেকার গলদেরই তা অভিব্যক্তি। বিরাট এক শত্রু আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে এবং তাকে উৎখাত আমাদের করে দিতেই হবে। আত্মগত মনোভাবের উচ্ছেদ-সাধন করলেই মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের সত্যের বিজয় সম্ভব হবে, পার্টি-চেতনাকে জোরদার করা যাবে এবং বিপ্লব বিজয়ী হয়ে উঠবে। আমরা জোর দিয়েই বলছি, বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অনুপস্থিতি অর্থাৎ তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের মাসর্কবাদী-লেনিনবাদী মনোভাবের অনুপস্থিতির অর্থ হচ্ছে পার্টিগত চেতনা হয় অনুপস্থিত আর নয়তো নিতান্তই অল্প।

একটি কবিতায় এই ধরনের লোকদের নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। তা হচ্ছে :

দেয়ালের গায় জন্ম যে আগাছার—
সরু-মূল আর মাথা-মোটা তার,
শিকড়ে মাটিতে যোগ খুঁজে মেলা ভার।
পাহাড়ী বাঁশের সুচামুখ আহা,
পুরু চামড়ায় ঢাকা তার সারা দেহ,
ভেতরে তবু তা শূন্যগর্ভ, ফাঁপা।

['নবজাতক' সংস্করণের অনুবাদকৃত ভাবানুবাদ।]

বৈজ্ঞানিক মনোভাব বর্জিত যেসব লোক মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের রচনা থেকে শুধু উধৃতি দিতেই জানেন এবং যথার্থ বিদ্যাবুদ্ধি ছাড়াই যাঁরা কেতাবি জাঁকজমক দেখান এটা কি তাঁদের চমৎকার বর্ণনা নয়?

যদি কেউ নিজেকে যথার্থতঃই এই ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত করতে চান, তাহলে তাঁকে এই কবিতাংশটি মুখস্থ করে নিতে বলব এবং আরও খানিকটা সাহস দেখাতে পারলে ঐটি কাগজে লিখে তার ঘরে এঁটে রাখতে বলব। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ একটি বিজ্ঞান, আর বিজ্ঞান মানেই হচ্ছে সৎ ও দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান; চালাকির কোন স্থান এখানে নেই। আমাদের তাই সৎ হওয়া চাই।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মনোভাব।

এই মনোভাব থেকে একজন ব্যক্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে পারিপার্শ্বিক বাস্তব অবস্থার ধারাবাহিক ও আনুপূর্বিক তথ্যানুসন্ধান ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কাজে লাগান। তিনি শুধু উচ্ছ্বাস থেকে কাজ করেন না বরং স্তালিন যা বলেছেন—বৈপ্লবিক ব্যাপকতার সঙ্গে বাস্তবতার মিলনসাধন করেন।[৪] এই মনোভাব থেকে ইতিহাসকে তিনি খণ্ডছিন্ন করে দেখেন না। শুধু প্রাচীন গ্রীসকে জানলেই তাঁর চলে না, তাঁর পক্ষে চীনকেও জানতে হয়; শুধুমাত্র বিদেশের বিপ্লবের ইতিহাস নয়, চীনের বিপ্লবের ইতিহাসও তাঁকে জানতে হয়; শুধু আজকের চীনকে নয়, বিগত দিনের এবং তারও আগেকার দিনের চীনকেও তাঁর জানতে হয়। এই মনোভাব থেকে একটি উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব অধ্যয়ন করেন অর্থাৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে চীন বিপ্লবের যথার্থ আন্দোলনের সঙ্গে সুসমন্বিত করে তোলেন এবং এই তত্ত্ব থেকে একটি অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি খুঁজে বের করে তা দিয়ে চীন বিপ্লবের তত্ত্বগত ও রণকৌশলগত সমস্যাগুলির সমাধান করতে প্রয়াসী হন। এই মনোভাব হচ্ছে স্থিরলক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করা। 'লক্ষ্য' হচ্ছে চীন বিপ্লব এবং 'তীর' হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। আমরা চীনের কমিউনিস্টরা এই তীরের খোঁজ করছিলাম কারণ চীন বিপ্লবের ও প্রাচ্যের বিপ্লবের লক্ষ্যেই আমরা তীর নিক্ষেপ করতে চাই। এই মনোভাব গ্রহণের অর্থ হচ্ছে বাস্তব তথ্য থেকে সত্যকে খুঁজে বের করা। 'বাস্তব তথ্য' হচ্ছে বাস্তবে বিরাজমান সকল বিষয়বস্তু, 'সত্য' হচ্ছে তাদের মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক অর্থাৎ যে নিয়মগুলির দ্বারা তা পরিচালিত হয় সেগুলি এবং 'খুঁজে বের করা' বলতে অধ্যয়নকে বোঝায়। দেশ, প্রদেশ, বিভাগ বা জেলার ভেতরের ও বাইরের প্রকৃত বাস্তব পরিস্থিতি থেকে অগ্রসর হয়ে সেগুলির মধ্য থেকে মনগড়া নয় একেবারে অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি খুঁজে বের করে সেগুলির

দ্বারা আমাদের কাজকর্মকে পরিচালনা করা উচিত অর্থাৎ আমাদের উচিত চারিদিকের ঘটনাবলীর আভ্যন্তরীণ সম্পর্ককে খুঁজে বের করা। আর তা করতে গেলে আমাদের আত্মগত কল্পনাবিলাসের, সাময়িক উচ্ছ্বাসের ও প্রাণহীন পুঁথিপত্রের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, নির্ভর করতে হবে জীবন্ত বাস্তবের ওপর; আনুপূর্বিক সমস্ত বিষয় আমাদের সংগ্রহ করতে হবে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাধারণ মূল নীতির দ্বারা আমাদের পরিচালিত হতে হবে এবং তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত টানতে হবে। এই সিদ্ধান্তগুলি ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি ক্রমানুসারে সাজানো বিষয় মাত্র নয় বা গালভরা কথায় বাণীবদ্ধ রূপমাত্র নয়, তা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসমূহ। এই মনোভাব হচ্ছে বাস্তব তথ্য থেকে সত্য খুঁজে বের করে আনা, জ্ঞানের বহর দেখিয়ে বাহবা কুড়ানোর ব্যাপার তা নয়। পার্টিগত চেতনা, তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্যসাধনের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কাজের ধারারই তা অভিব্যক্তি। কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেক সদস্যেরই একান্ত করে এই মনোভাবটি থাকা দরকার। যিনি এই মনোভাব গ্রহণ করবেন তিনি 'মাথা-মোটা, সরু-মূল, শিঁকড়ে-মাটিতে যোগহীন' হবেন না বা 'সূচী-মুখ, পুরু-চামড়া, শূন্যগর্ভ ফাঁপা'ও হবেন না।

(৪)

উপরে বর্ণিত অভিমতগুলি অনুসারে আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রাখছি:

(১) আমাদের চারিদিকের পরিস্থিতির ধারাবাহিক ও আনুপূর্বিক অধ্যয়নের কাজটিকে সমগ্র পার্টির সামনেই আমাদের তুলে ধরতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব ও পদ্ধতির ভিত্তিতে আমাদের শত্রুদের, আমাদের বন্ধুদের এবং আমাদের অর্থনৈতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক ও পার্টিগত কার্যকলাপের বিস্তারিত অনুসন্ধান ও অগ্রগতির পর্যালোচনা আমাদের করতে হবে এবং যথোপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। এই উদ্দেশ্যে এইসব বাস্তব বিষয়ের অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের ব্যাপারে আমাদের কমরেডদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। আমাদের কমরেডদের এ কথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থাসমূহের দ্বিবিধ মৌলিক কর্তব্য হচ্ছে পরিস্থিতিকে জানা এবং কর্মনীতিকে আয়ত্ত করা; প্রথমটির অর্থ হচ্ছে—পৃথিবীকে জানা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ হচ্ছে পৃথিবীকে

বদলে দেওয়া। আমাদের কমরেডদের এ কথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে তথ্যানুসন্ধান না করলে, কথা বলারই অধিকার থাকে না এবং গুরুগম্ভীর কথায় খেলা ও ১, ২ ৩, ৪ করে ক্রমানুসারে বিষয়গুলি সাজিয়ে দেওয়াটাই কোন কাজের কথা নয়। উদাহরণস্বরূপ প্রচারকার্যের কথাই ধরা যাক। আমরা যদি আমাদের শত্রুদের, আমাদের মিত্রদের ও আমাদের নিজেদের প্রচারকার্যের ব্যাপারে পরিস্থিতিটা না জানি তবে আমরা প্রচারকার্যের কর্মনীতি সম্পর্কে সঠিক একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারব না। যে-কোন দপ্তরের কাজের ক্ষেত্রেই প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে পরিস্থিতিকে জানা এবং একমাত্র তখনই ভালভাবে কাজটি করা যেতে পারে। পার্টির কাজের ধারার পরিবর্তন সাধনের মৌল যোগসূত্রই হচ্ছে তথ্যানুসন্ধানের ও অধ্যয়নের পরিকল্পনাসমূহকে সমগ্র পার্টিতে কার্যকর করে তোলা।

(২) গত একশ বছরের চীনের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের কাজ হবে সুযোগ্য ব্যক্তিদের সমবেত করা এবং সহযোগিতা ও উপযুক্ত কাজকর্ম ভাগ করার মধ্য দিয়ে বর্তমানের অসংগঠিত অবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেওয়া। প্রথমেই প্রয়োজন হচ্ছে অর্থনৈতিক ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস, সামরিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্লেষণমূলক রচনা প্রণয়ন করা এবং একমাত্র তখনই সামগ্রিক রচনাবলী উপস্থিত করা সম্ভবপর হবে

(৩) কর্মরত বা কর্মীদের শিক্ষাকেন্দ্রে সমবেত কর্মীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে চীন বিপ্লবের বাস্তব সমস্যাবলীর অধ্যয়নের ব্যাপারেই এই শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করার একটি কর্মনীতি হাজির করতে হবে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল নীতিকে পরিচালনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, অনড় বিষয় হিসেবে ও বিচ্ছিন্নভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়নের পদ্ধতিকে খারিজ করে দিতে হবে। তাছাড়া, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়নকালে **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, (সংক্ষিপ্ত পাঠ)** কে আমাদের প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বিগত একশ বছরের বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের এটা সর্বোত্তম সুসমন্বিত রূপ ও সংক্ষিপ্তসার, তত্ত্ব এবং প্রয়োগের সমন্বয়ের প্রকৃষ্ট একটি উদাহরণ এবং এযাবৎকালের মধ্যে তা সমগ্র বিশ্বের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ। লেনিন ও স্তালিন সোভিয়েত বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে কিভাবে সু-সমন্বিত করেছেন ও কিভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকশিত করে তুলেছেন,

তা যখন আমরা দেখি, তখন চীনে আমাদের কিভাবে কাজ করতে হবে তাও আমরা জানতে পারি।

ঘোরা পথে আমরা অনেক ঘুরেছি। কিন্তু ভুল অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক পথের পূর্বগামী। আমি এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত যে চীন বিপ্লব ও বিশ্ববিপ্লবের এমন একান্তভাবে জীবন্ত ও বৈচিত্রে সমৃদ্ধ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অধ্যয়নের ধারার রূপান্তর নিশ্চয়ই সুফল দান করবে।

টীকা

১। ফুসিয়েন জেলা ইয়েনানের প্রায় সত্তর কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

২। সীমান্ত অঞ্চলের মুদ্রাব্যবস্থা শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সরকারী ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচারিত মুদ্রা নিয়ে গড়ে উঠেছিল। কুওমিনতাঙ মুদ্রাব্যবস্থা ১৯৩৫ সাল থেকে ব্রিটিশ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তাপুষ্ট চারটি বৃহৎ কুওমিনতাঙ আমলাতান্ত্রিক-পুঁজিপতিদের ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচারিত কাগজে মুদ্রা। কমরেড মাও সে-তুঙ এই দুই মুদ্রার মধ্যে বিনিময়ের হারের ক্ষেত্রে যে উঠতি-পড়তি হচ্ছিল তার কথাই এখানে বলছেন।

৩। দ্রষ্টব্য: কার্ল মার্কস **ক্যাপিটাল** -এর 'দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধে' লিখেছিলেন—'পরবর্তীটিকে (অনুসন্ধানের এই পদ্ধতিকে) আনুপুর্বিক সকল তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, তার বিকাশের বিভিন্ন রূপকে বিশ্লেষণ করতে হবে, তাদের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত যোগসূত্রকে খুঁজে বের করতে হবে। এই কাজ সমাপ্ত হলে পরেই, যথার্থ আন্দোলনকে যথাযথভাবে বর্ণনা করা যাবে।' (**ক্যাপিটাল**, ইংরাজী সংস্করণ, বিদেশীভাষা প্রকাশনা সংস্থা, মস্কো, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৯)।

৪। জে. ভি. স্তালিন: লেনিনবাদের ভিত্তি, **লেনিনবাদের সমস্যা**, রুশ সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫২, পৃঃ ৮০ দ্রষ্টব্য।

দূর প্রাচ্যের মিউনিক-এর চক্রান্তের মুখোস খুলে দিন

২৫শে মে, ১৯৪১

১। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চীনের স্বার্থের পরিপন্থী একটি আপোষ-রফা এবং সাম্যবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর বিরুদ্ধে প্রাচ্যের মিউনিক সৃষ্টি করা—এরকম একটি চক্রান্তই জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং কাই-শেক করছে। এই চক্রান্তের মুখোস আমাদের খুলে দিতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের করতেই হবে।

২। চিয়াং কাই-শেককে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার লক্ষ্য নিয়ে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সর্বশেষ সামরিক আক্রমণের যে পর্যায়টি চালিয়েছিল তা শেষ করার পর এখন তাকে আত্মসমর্পনে প্ররোচিত করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু হতে বাধ্য। লাঠি আর মিষ্ঠ কথা পর্যায়ক্রমে বা একই সঙ্গে ব্যবহার করার শত্রুর সেই পুরাতন নীতিরই তা পুনরভিনয় মাত্র।

৩। সামরিক অভিযান পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে জাপান এই গুজব রটনার অভিযান এই মর্মে শুরু করেছে যে 'অষ্টম রুট সেনাবাহিনী কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংগ্রাম করতে চায় না,' অষ্টম রুট সেনাবাহিনী প্রত্যেকটি সুযোগ গ্রহণ করে নিজের এলাকা প্রসারিত করে চলেছে,' 'তা একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী গড়ে তুলছে,' এবং 'তা অন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করছে'—ইত্যাদি, ইত্যাদি। কুওমিনতাঙ ও কমিউ-নিস্ট পার্টির মধ্যে বিরোধ জাগিয়ে তোলার জন্য এটি জাপানীদের একটি চতুর চক্রান্ত এবং এভাবে চিয়াং কাই-শেককে আত্মসমর্পণে প্ররোচিত করার কাজটিকে তারা সহজতর করে তুলতে চায়। কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থা ও কুওমিনতাঙ পত্রপত্রিকাদি এই গুজবকে নকল করছে ও চারিদিকে ছড়াচ্ছে, জাপানের কমিউনিস্ট-বিরোধী এই প্রচারণায় সুর মিলাতে তাদের বিবেকে বাঁধছে বলে মনে হয় না এবং তাদের মতলবটি খুবই সন্দেহজনক। এটির মুখোসও আমাদের খুলে দিতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে।

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে লিখেছিলেন।

৪। নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে যদিও 'বিদ্রোহে লিপ্ত' বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং যদিও অষ্টম রুট সেনাবাহিনী কুওমিনতাঙ-এর কাছ থেকে একটি বুলেট বা একটি পয়সাও পায়নি, তারা কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরাম দেয়নি। তদুপরি অষ্টম রুট সেনাবাহিনী দক্ষিণ শানসিতে বর্তমান অভিযানকালে[১] সংগ্রামরত কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি সাধনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এবং বিগত দুই সপ্তাহ ধরে তা উত্তর চীনের সকল রণক্ষেত্রে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে—আর এই মুহূর্তেই সেখানে তীব্র যুদ্ধবিগ্রহ চলছে। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণ ইতিমধ্যেই জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রধান ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এইসব কুৎসা প্রচারের লক্ষ্যই হচ্ছে প্রতিরোধ-যুদ্ধকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং আত্মসমর্পণের পথকে উন্মুক্ত করে দেওয়া। অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর সামরিক সাফল্যকে আমাদের প্রসারিত করে যেতে হবে এবং সকল পরাজয়বাদী ও আত্মসমর্পণবাদীদের বিরোধিতা করে যেতেই হবে।

টীকা

১। দক্ষিণ শানসি অভিযান বলতে চুংতিয়াও পর্বতের অভিযানকে বোঝানো হচ্ছে। ১৯৪১ সালের মে মাসে ৫০,০০০ জাপানী সৈন্য দক্ষিণ শানসির পীত নদীর উত্তরাঞ্চলের চুংতিয়াও পার্বত্য অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করে। সর্বমোট সাতটি কুওমিনতাঙ সেনাদলকে ঐ অঞ্চলে সমবেত করা হয় এবং উত্তর পূর্ব দিকে কাওপিং অঞ্চলেও অন্য চারটি বাহিনী মোতায়েন করা হয়—ফলে মোট সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৫০,০০০। পীত নদীর উত্তর অঞ্চলের কুওমিনতাঙ সৈন্যদের প্রধান কাজই যেহেতু ছিল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, তারা জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কোন সময়ে প্রস্তুতিই হয়নি এবং জাপানী আক্রমণকারীরা হামলা করলেও তারা অধিকাংশ যুদ্ধই পরিহার করার চেষ্টা করত। সুতরাং এই অভিযানে শত্রুর বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙ সৈন্যগণকে সাহায্য করার জন্য অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর জোরদার প্রয়াস সত্ত্বেও, কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়, তিন সপ্তাহে পঞ্চাশ হাজারের বেশি সৈন্য নিহত হয় এবং বাকীরা পীত নদীর দক্ষিণতীরে পালিয়ে যায়।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রন্ট প্রসঙ্গে

২৩ শে জুন, ১৯৪১

২২শে জুন জার্মানির ফ্যাসিষ্ট শাসকেরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে। এটা শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিশ্বাসহন্তা অপরাধজনক আগ্রাসন নয়, তা সকল জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির বিরুদ্ধেই আক্রমণ। ফ্যাসিষ্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরোধের পবিত্র যুদ্ধ শুধু তার নিজেকে রক্ষার জন্যই পরিচালিত হচ্ছে না, তা ফ্যাসিষ্ট দাসত্বের বিরুদ্ধে মুক্তির জন্য সংগ্রামরত সকল জাতিকে রক্ষার জন্যই পরিচালিত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী সকল কমিউনিস্টেরই এখন কর্তব্য হচ্ছে সকল দেশের জনগণকে সমবেত ও সংগঠিত করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করার জন্য, চীনকে রক্ষা করার জন্য এবং সকল জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তিকে রক্ষা করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা। বর্তমান যুগে ফ্যাসিষ্ট দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রেই সকল প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সমগ্র দেশব্যাপী করণীয় কর্তব্য হচ্ছে নিম্নরূপ:

(১) জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে অব্যাহতভাবে রক্ষা করা, কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতাকে অব্যাহতভাবে রক্ষা করা, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের চীন থেকে দূর করে দেওয়া এবং এসবের মধ্যে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সহায়তা করা।

(২) বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার প্রতিক্রিয়াশীলদের সকল সোভিয়েত-বিরোধী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করা।

(৩) বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে—ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে যারাই জার্মানি, ইতালী ও জাপানের ফ্যাসিষ্ট শাসকদের বিরোধী সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁদের সকলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে লিখেছিলেন।

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের প্রতিনিধি পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতা

২২শে নভেম্বর, ১৯৪১

পরিষদের সদস্যগণ! কমরেডগণ! সীমান্ত অঞ্চলের প্রতিনিধিদের পরিষদের আজ যে উদ্বোধন হল তা বিরাট এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পরিষদের একটিমাত্রই লক্ষ্য, তা হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা এবং নয়া গণতন্ত্রের চীন গড়ে তোলা বা একই কথা, জনগণের বিপ্লবী তিন গণ-নীতির চীন গড়ে তোলা। আজকের দিনের চীনে অন্য কোন লক্ষ্যই থাকতে পারে না। কারণ আমাদের প্রধান শত্রুরা দেশীয় নয়, তারা হচ্ছে জাপানী, জার্মান ও ইতালীয় ফ্যাসিষ্টগণ এই মুহূর্তে সোভিয়েত লালফৌজ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করছে এবং আমাদের দিক থেকে আমরাও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছি। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ্ চীনকে পদানত করার জন্য তার আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার জন্য দেশের সমগ্র জাপ-বিরোধী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করছে, সমস্ত জাপ-বিরোধী পার্টি, শ্রেণী ও জাতিসত্তাসমূহের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তুলছে; দেশদ্রোহীরা ছাড়া এই সাধারণ সংগ্রামে প্রত্যেককেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এটা কমিউনিস্ট পার্টির অবিচল নীতি। চার বছরের অধিককাল ধরে চীনের জনগণ নির্ভীকতার সঙ্গে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি এবং সকল শ্রেণী, পার্টি ও জাতিসত্তার সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সেই যুদ্ধ চালানো হচ্ছে। যুদ্ধে জয়লাভ করা এখনো সম্ভব হয়নি, যুদ্ধে জয়লাভ কতে হলে আমাদের আরও সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে এবং বিপ্লবী তিন-নীতিকে বাস্তবে কার্যকর করাকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

বিপ্লবী তিন গণ-নীতিকে আমাদের বাস্তবে কার্যকর করতে হবে কেন? কারণ বর্তমান সময় পর্যন্ত ডাঃ সান ইয়াৎ সেন-এর তিন গণ-নীতিকে চীনের সকল অংশে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি। সমাজতন্ত্রকে এখনই কার্যকর করার দাবি আমরা করছি না কেন? অবশ্যই সমাজতন্ত্র একটি উন্নততর ব্যবস্থা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে তা দীর্ঘকাল ধরে

কার্যকর রয়েছে, কিন্তু চীনে এখন পর্যন্ত তার বাস্তব পরিস্থিতির অভাব রয়েছে। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে বিপ্লবী তিন গণ-নীতিই কার্যকর করা হয়েছে। আমাদের বাস্তব সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে তার বেশি আমরা অগ্রসর হইনি। এই নীতিগুলি সম্পর্কে বলা যায়, আজ জাতীয়তাবাদের মূলনীতির অর্থ হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদসাধন এবং গণতন্ত্র ও জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতিবিধানের মূলনীতিগুলির অর্থ হচ্ছে কোন একটি গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ না করে জাপানের বিরোধী সকল জনগণের স্বার্থে কাজ করে যাওয়া। সারা দেশব্যাপী জনগণের দৈহিক নিরাপত্তার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি সংরক্ষণের স্বাধীনতা থাকা চাই। সমগ্র দেশব্যাপী জনগণের তাদের নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ থাকা চাই, তাদের পরবার মতো কাপড়, খাবার, কাজের এবং শিক্ষালাভের সুযোগ থাকা চাই; সংক্ষেপে বলা যায়, কিছু না কিছু ব্যবস্থা সকলের জন্যই থাকা চাই। চীনের সমাজটি মাঝামাঝি স্তরে বিরাট এবং দুটি প্রান্তভাগেই ক্ষুদ্রকায় অর্থাৎ একপ্রান্তে শ্রমিকশ্রেণী এবং অপরপ্রান্তে জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী, এদের প্রতিটিই সংখ্যাগত দিক থেকে অল্প; অন্যদিকে কৃষক, শহরে পেটি-বুর্জোয়া এবং অন্যান্য মাঝারি শ্রেণীসমূহকে নিয়ে গঠিত জনগণ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। চীনের কার্যব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে এইসব শ্রেণীর স্বার্থকে হিসেবের মধ্যে না ধরে, এই সকল শ্রেণীর লোকজনদের জন্য কিছু না কিছু সুরাহার ব্যবস্থা না করে এবং এদের অভিমতকে ভাষা দেবার অধিকার অর্জন না করে নীতি নির্ধারণ করলে কোন পার্টির পক্ষেই তা করা সম্ভব হবে না। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যেসব নীতি হাজির করেছে তা জাপানের বিরোধী সকল জনগণকেই ঐক্যবদ্ধ করতে চায় এবং এ ধরনের প্রতিটি শ্রেণীর, বিশেষ করে কৃষকজনগণের এবং শহরে পেটি-বুর্জোয়া ও অন্যান্য মাঝারি শ্রেণীসমূহের, স্বার্থকেই তা হিসেবের মধ্যে ধরে অগ্রসর হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির নীতিসমূহ জনগণের সকল অংশকেই তাদের অভিমত প্রকাশের সুযোগ দিয়েছে এবং তারা যাতে কাজকর্ম করতে পারে, খেতে-পরতে পারে, তার নিশ্চয়তা দান করেছে বলেই এই নীতিগুলির মধ্যে যথার্থ বিপ্লবী তিন গণ-নীতি রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কৃষি সম্পর্কের ক্ষেত্রে একদিকে আমরা খাজনা ও সুদ হ্রাস করছি যাতে কৃষকেরা খেয়েপরে বাঁচতে পারে, অন্যদিকে এই

হ্রাসপ্রাপ্ত খাজনা ও সুদ যাতে কৃষকেরা মিটিয়ে দেয় তার ব্যবস্থাও আমরা রেখেছি যাতে জমিদাররাও বাঁচতে পারে। শ্রম ও পুঁজির সম্পর্কের ক্ষেত্রে একদিকে আমরা শ্রমিকদের সাহায্য করছি যাতে কাজকর্ম করে খেয়েপরে তাঁরা বাঁচতে পারেন, অন্যদিকে আমরা শিল্পের বিকাশের এমন একটা নীতি অনুসরণ করছি যাতে করে পুঁজিপতিরাও কিছু মুনাফা করতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সাধারণ প্রয়াসে সমগ্র দেশের জনগণকেই যাতে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। একেই আমরা বলেছি নয়া গণতন্ত্রের নীতি। আজকের দিনের চীনের পরিস্থিতির সঙ্গে যা যথার্থভাবেই খাপ খায় এইটি হচ্ছে ঠিক সেরকম একটি নীতি এবং আমরা আশা করি যে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে বা শত্রুর পশ্চাদ্বর্তী জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলেই তার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ থাকবে না, সমগ্র দেশব্যাপী তা প্রসারিত হবে।

আমরা সাফল্যের সঙ্গেই এই নীতি অনুসরণ করে আসছি এবং সমগ্র চীনের জনগণের অনুমোদন এতে আমরা লাভ করেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু কিছু ভুলত্রুটিও রয়েছে। কিন্তু কিছু কমিউনিস্ট এখনো রয়েছেন যাঁরা গণতান্ত্রিক-ভাবে পার্টি-বহির্ভূত লোকজনদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে জানেন না এবং আলাদা হয়ে চলার, 'রুদ্ধদ্বার' অথবা সংকীর্ণতাবাদী কাজের ধারা অনুসরণ করেন। তাঁরা এখনো এই মূলনীতিটিই উপলব্ধি করতে পারেন না যে জাপানের বিরোধী পার্টি-বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে সহযোগিতা করতে কমিউনিস্টরা কর্তব্যবদ্ধ এবং তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখার কোন অধিকারই তাঁদের নেই। এই মূলনীতির অর্থ হচ্ছে,—আমাদের মনোযোগ সহকারে জনসাধারণের অভিমত শুনতে হবে, তাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া চলবে না। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্মসূচীতে একটি ধারা রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে পার্টি-বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে কমিউনিস্টদের গণতান্ত্রিকভাবে সহযোগিতা করে চলতে হবে, খেয়ালখুশি মাফিক কাজ করা চলবে না অথচ সবকিছু তাঁদের নিজেদের হাতে গুটিয়ে রাখলে চলবে না। পার্টির নীতি বুঝতে এখনো যেসব কমরেডরা পারেননি ঠিক তাঁদের লক্ষ্য করেই ঐটি বলা হয়েছে। পার্টির বহির্ভূত জনগণের অভিমত কমিউনিস্টদের মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে এবং তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করতে দিতে হবে। তাঁরা

যা বলছেন তা সঠিক হলে, তাকে আমাদের স্বাগত জানাতে হবে, তাঁদের বক্তব্যের ভাল দিকগুলি থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে; আর যদি তা ভুল হয়, তাঁরা যা বলতে চান তা পুরোপুরি তাঁদের বলতে দিতে হবে এবং তারপর ধৈর্যসহকারে তাঁদের কাছে বিষয় গুলি ব্যাখ্যা করতে হবে। একজন কমিউনিস্ট কোন সময়ই সবজান্তা বা প্রভুত্বপ্রয়াসী হবেন না বা এ কথা ভাববেন না যে তিনি সব বিষয়েই ওস্তাদ আর অন্যরা কোনক্ষেত্রেই বিন্দুমাত্র কাজের নয়; নিজের ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখলে তাঁর চলবে না বা গলাবাজী করা, হামবড়া ভাব দেখানো কিংবা খবরদারি করে বেড়ানো তাঁর চলবে না। গোঁড়া যে প্রতিক্রিয়াবাদীরা জাপানী আক্রমণকারীদের সঙ্গে ও দেশদ্রোহীদের সঙ্গে জোট পাকিয়েছে এবং প্রতিরোধ ও ঐক্যের ক্ষতিসাধন করছে এবং যাদের যথার্থতঃই কথা বলার কোন অধিকারই নেই তাদের ছাড়া প্রতিটি ব্যক্তিরই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে এবং যদি তাঁরা যা বলছেন তা ভুলও হয়—তাতেও কিছু যায় আসে না। রাষ্ট্রের কার্যব্যবস্থা গোটা জাতির জনগণের ব্যাপার, তা একক কোন একটি পার্টি বা গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। সুতরাং, পার্টি-বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে গণতান্ত্রিকভাবে সহযোগিতা করা কমিউনিস্টদের কর্তব্য এবং তাঁদের বাদ দিয়ে দেওয়ার ও সবকিছু একচেটে করে নেওয়ার কোন অধিকারই তাঁদের নেই। কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে একটি রাজনৈতিক পার্টি যা জাতি ও জনগণের স্বার্থে কাজ করে এবং নিজের একান্ত নিজস্ব কোন লক্ষ্যসাধনের প্রশ্নই তার নেই। জনগণই পার্টিকে দেখাশোনা করবেন এবং পার্টিকে কোন সময়ই তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া চলবে না। পার্টির সদস্যদের থাকতে হবে জনগণের মধ্যে ও জনগণের সঙ্গে এবং নিজেদের তাঁদের উর্ধ্বে স্থাপন করলে চলবে না। পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও কমরেডগণ, পার্টি-বহির্ভূত জনগণ সম্পর্কে গণতান্ত্রিক সহযোগিতার কমিউনিস্ট পার্টির এই নীতি অবিচল ও অপরিবর্তনীয়। যতদিন নানা পার্টি থাকবে, ততদিন পার্টিতে যতো লোক যোগ দেবেন তাঁরা সংখ্যালঘু থেকে যাবেন এবং তাঁদের তুলনায় সব সময়ই বাইরে থেকে-যাওয়া লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবেন; তাই আমাদের পার্টি-সদস্যদের সব সময়ই পার্টি-বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে হবে এবং এই পরিষদের কাজকর্মের মধ্য দিয়েই এখন তাঁদের এই কাজ শুরু করে দিতে হবে। আমাদের এই নীতি নিয়ে চললে আমি বিশ্বাস করি পরিষদের কমিউনিস্ট সদস্যগণ এখানে অত্যন্ত ভাল

শিক্ষাই লাভ করবেন এবং তাদের 'রুদ্ধদ্বার নীতিকে' ও সংকীর্ণতাবাদকে দূর করতে পারবেন। আমরা সবজান্তাদের একটি ক্ষুদ্র উপদল মাত্র নই এবং নিজেদের দ্বার কিভাবে খুলে দিতে হয় ও পার্টি-বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে কিভাবে সহযোগিতা করতে হয় আর কিভাবে অন্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হয় তা আমাদের শিখতে হবে। মনে হয়, এত সব বলার পরও এখনো পর্যন্ত এমন কিছু কমিউনিস্ট থাকতে পারেন যাঁরা বলবেন, 'অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করা এতই যদি প্রয়োজন হয় তবে আমাকে ছেড়ে দিন।' কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে আমাদের ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই সুনিশ্চিত-ভাবে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লাইনটি কার্যকর করতে সমর্থ হবেন। একই সঙ্গে আমি পার্টি-বহির্ভূত কমরেডদের আমরা কী চাই তা উপলব্ধি করার জন্য বলতে চাই' তাঁদের এ কথা বুঝতে বলব যে কমিউনিস্ট পার্টি নিজের একান্ত আপন সার্থসিদ্ধির জন্য ব্যাপৃত কোন একটি ক্ষুদ্র উপদল বা গোষ্ঠীমাত্র নয়। না, তা সে নয়! কমিউনিস্ট পার্টি ঐকান্তিকভাবে ও সততার সঙ্গেই রাষ্ট্রের কার্যব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করতে চায়। কিন্তু অনেক অক্ষমতা এখনো আমাদের রয়ে গেছে। এগুলি স্বীকার করতে আমরা ভয় পাই না এবং তা দূর করে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। পার্টির মধ্যেকার শিক্ষাকে জোরদার করে তুলে এবং পার্টি-বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে গণতান্ত্রিকভাবে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আমরা তা করে উঠতে পারব। আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি ও অক্ষমতাকে এভাবে অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে আমরা ভেতর ও বাইরের দুদিক থেকেই তাদের দূর করে দিতে পারব।

পরিষদের সদস্যবৃন্দ! আপনারা অনেক কষ্ট স্বীকার করে এই সভার জন্য এখানে এসেছেন এবং আপনাদের মতো বিশিষ্টদের এই সমাবেশকে অভিনন্দন জানাতে পেরে আমি খুব সুখী এবং আমি আপনাদের এই সমাবেশের সাফল্য কামনা করছি।

পার্টির কাজের ধারা সংশোধন করুন

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২*

আজ থেকে পার্টি-স্কুলের উদ্বোধন হল এবং আমি তার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

আমাদের পার্টির কাজের ধারার সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

বিপ্লবী পার্টির প্রয়োজন কী? বিপ্লবী পার্টির দরকার আছে কারণ এই পৃথিবীতে এমন শত্রুরা রয়েছে যারা জনসাধারণকে নিপীড়ন করে এবং জনগণ শত্রুর সেই নিপীড়নের অবসান করতে চান। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের যুগে ঠিক কমিউনিস্ট পার্টির মতো বিপ্লবী একটি পার্টিরই প্রয়োজন। এ রকম একটা পার্টি না থাকলে জনগণের পক্ষে শত্রুর নিপীড়নের উচ্ছেদসাধন করা একেবারেই অসম্ভব। আমরা কমিউনিস্ট, শত্রুকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে আমরা জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিতে চাই এবং তাই আমরা আমাদের সদস্যবৃন্দকে সুশৃংখল রাখতে চাই, আমরা কদম মিলিয়ে এগিয়ে চলতে চাই, আমাদের সৈনিকদের হওয়া চাই একেবারে বাছাই করা সৈনিক এবং তাদের অস্ত্রপাতিগুলি হওয়া চাই একেবারে সেরা অস্ত্রপাতি। এই শর্তগুলি পূর্ণ করতে না পারলে শত্রুর উচ্ছেদসাধন করা যাবে না।

আমাদের পার্টির সামনে এখন কী কী সমস্যা রয়েছে? পার্টির সাধারণ-লাইন সঠিক এবং কোন সমস্যাই নেই আর পার্টির কাজের ভাল ফলই পাওয়া গেছে। পার্টির বহু লক্ষ সদস্য রয়েছেন এবং তাঁরা শত্রুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠিন ও তিক্ত সংগ্রামে জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। এটা সকলের কাছেই পরিষ্কার এবং এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

তা সত্ত্বেও পার্টির সামনে এখনো কোন সমস্যা রয়েছে, না কোন সমস্যাই নেই? আমি বলছি সমস্যা রয়েছে এবং একটা বিশেষ অর্থে, সমস্যা বেশ গুরুতর রকমের।

সমস্যাটা তাহলে কী? আমাদের কিছু কমরেডের মনে এমন কিছু-

*চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পার্টি ইস্কুল উদ্বোধনকালে কমরেড মাও সে তুঙ বক্তৃতাটি করেছিলেন।

ভাবনা রয়েছে যাকে যথেষ্ট সঠিক বা যথেষ্ট সংগত বলা চলে না—এটা একটা বাস্তব ঘটনা।

অন্য কথায় বলা যায়, আমাদের অধ্যয়নের ধারায় এখনো কিছু ভুলত্রুটি রয়ে গেছে, পার্টির আভ্যন্তরীণ ও ব্যহ্যিক সম্পর্কের ধারার মধ্যে এবং আমাদের লেখার ধারার মধ্যে বেশ কিছু ভুলত্রুটি রয়ে গেছে। অধ্যয়নের ধারায় কিছু কিছু ভুলত্রুটি বলতে আমরা আত্মগত চিন্তাধারার ব্যাধির কথাই বোঝাচ্ছি। পার্টির সম্পর্কের ধারায় আমাদের কিছু কিছু ভুলত্রুটি বলতে আমরা সংকীর্ণতা-বাদের ব্যাধিকে বোঝাচ্ছি। লেখার ধারায় কিছু কিছু ভুলত্রুটি বলতে আমরা ছকে বাঁধা লেখার ব্যাধিকে বোঝাচ্ছি।[১] এই সবকটিই ভুল, এই সবকটিই দূষিত হাওয়া, কিন্তু এগুলি শীতের দিনে উত্তর থেকে সারা আকাশ জুড়ে বয়ে আসা হাওয়া নয়। আত্মগত চিন্তা, সংকীর্ণতাবাদ বা ছকে বাঁধা পার্টিগত লেখা এখন আর প্রধান ধারা নয় বরং তা অনেকটা উল্টোমুখী দমকা হাওয়ার মতো, অনেকটা বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য নির্মিত সুড়ঙ্গগুলি থেকে বেরিয়ে আসা দুর্গন্ধ দূষিত হাওয়ার মতো। (**হাস্যরোল**।) তবু এখনো যে পার্টিতে এরকম হাওয়া বইছে তা খুবই খারাপ কথা। যেসব ছিদ্র দিয়ে এরকম হাওয়া বের হচ্ছে তা আমাদের একেবারে রুদ্ধ করে দিতে হবে। এইসব ছিদ্রগুলিকে রুদ্ধ করে দেবার কাজ আমাদের সমগ্র পার্টিকেই গ্রহণ করতে হবে এবং পার্টি-স্কুলকেও তা করতে হবে। আত্মগত চিন্তা, সংকীর্ণতাবাদ আর ছকে বাঁধা পার্টিগত লেখার এই যে তিনটি দূষিত হাওয়া তার ঐতিহাসিক উৎস রয়েছে। যদিও এখন আর সমগ্র পার্টিতে তারা চূড়ান্ত প্রভাবশালী নয়, তারা তবু অবিরাম গণ্ডগোল বাধাচ্ছে এবং আমাদের আঘাত হানছে। সুতরাং, এদের প্রতিরোধ করা প্রয়োজন এবং বিশদ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

অধ্যয়নের ধারা সংশোধন করার জন্য বিষয়ীবাদী আত্মগত চিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন, পার্টির সম্পর্কের ধারা সংশোধন করার জন্য সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন এবং লেখার ধারা সংশোধন করার জন্য ছকে বাঁধা পার্টি-গত লেখার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন—এই হচ্ছে আমাদের সামনের কাজ।

শত্রুকে উৎখাত করার কাজ সুসম্পাদন করার জন্য পার্টির অভ্যন্তরের এই ধারাগুলির সংশোধন করার কাজটি আমাদের সুসম্পাদন করা চাই। অধ্যয়নের এই ধারা ও লেখার এই ধারা পার্টির কাজের ধারাও বটে। যখন

পার্টির কাজের ধারাকে পুরোপুরি সঠিক করে তোলা যাবে, তখন সারা দেশের জনগণই আমাদের উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন। পার্টির বাইরে যাঁরা এই একই রকম খারাপ ধারা অনুসরণ করেন তাঁরা যদি ভাল এবং সৎ হন, তবে তাঁরাও আমাদের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নেবেন এবং তাঁদের ভুল সংশোধন করে নেবেন, আর এভাবে সমগ্র জাতির ওপর তার প্রভাব পড়বে। আমাদের কমিউনিস্ট সদস্যগণ যতক্ষণ সুবিন্যস্ত হয়ে থাকবেন এবং কদম মিলিয়ে এগিয়ে যাবেন, যতক্ষণ আমাদের সৈন্যরা হবেন একেবারে বাছাই করা এবং আমাদের অস্ত্রপাতিগুলি হবে একেবারে সেরা অস্ত্রপাতি ততক্ষণ শত্রুকে উচ্ছেদ করে দেওয়া যাবেই, তা সে যত শক্তিমান শত্রুই হোক না কেন।

এবার আত্মগত চিন্তা সম্পর্কে আমি বলতে চাই।

আত্মগত চিন্তা অধ্যয়নের একটি ত্রুটিপূর্ণ ধারা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তা বিরোধী এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তা অসঙ্গতপূর্ণ। আমরা চাই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অধ্যয়নের ধারা। যাকে আমরা অধ্যয়নের ধারা বলছি তার কথা শুধু বিদ্যালয়সমূহের অধ্যয়নের ধারা সম্পর্কে নয়, সমগ্র পার্টির অধ্যয়নের ধারা সম্পর্কেই বলছি। আমাদের নেতৃস্থানীয় সংস্থাসমূহের কমরেডদের এবং পার্টি-সদস্যদের চিন্তা-পদ্ধতির প্রশ্ন হচ্ছে এইটি, এইটি হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আমাদের মনোভাবের প্রশ্ন, সকল পার্টি কমরেডদের তাদের কাজের প্রতি মনোভাবের প্রশ্ন। স্বভাবতঃই, এটি অসাধারণ এবং বলা যায় বাস্তবিকপক্ষে প্রাথমিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি প্রশ্ন।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা যাক, আমাদের পার্টির তত্ত্বগত মান উঁচু না নীচু? সম্প্রতি অনেক বেশি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রচনা অনূদিত হয়েছে এবং অনেক বেশি লোক সেগুলি পড়ছেন। এটা খুবই ভাল জিনিস। সুতরাং এর জন্যই কি আমরা বলতে পারি যে আমাদের পার্টির তত্ত্বগত মান অনেকখানি উঁচু হয়েছে? এ কথা সত্য, মানটা পূর্বের তুলনায় এখন খানিকটা উচ্চতর হয়েছে। কিন্তু আমাদের তত্ত্বগত ক্ষেত্রটি চীনের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সমৃদ্ধ বিষয়বস্তুর তুলনায় অনেকখানি সঙ্গতিহীন হয়ে রয়েছে এবং এই দুয়ের তুলনায় তত্ত্বগত দিকটি অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে দেখা যাচ্ছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমাদের তত্ত্ব এখনো পর্যন্ত আমাদের বৈপ্লবিক প্রয়োগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না, নেতৃত্বদানের প্রশ্ন তো দূরের কথা। অথচ তাইতো হওয়া উচিত। আমরা আমাদের সমৃদ্ধ ও বিচিত্র প্রয়োগকে উপযুক্ত

তত্ত্বগত পর্যায়ে উন্নীত করতে পারিনি। বৈপ্লবিক প্রয়োগের সকল সমস্যা-গুলিকে, এমনকি তার মধ্যেকার গুরুত্বপূর্ণগুলিকেও—আমরা এখনো পর্যন্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে উঠতে পারিনি এবং সেগুলিকে তত্ত্বগত পর্যায়ে উন্নীত করে তুলতে পারিনি। একবার ভেবে দেখুন তো, আমাদের কজন চীনের অর্থনীতি, রাজনীতি, সামরিক ব্যাপার বা সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বলবার মতো কটি তত্ত্ব প্রণয়ন করেছি যে তত্ত্বগুলিকে নেহাৎ মোটা দাগের ও ভাসাভাসা বলে গণ্য না করে আমরা বৈজ্ঞানিক ও পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচনা করতে পারি? বিশেষ করে বলছি অর্থনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্র সম্পর্কে: আফিম-যুদ্ধের পর থেকে একশ বছর ধরে চীনে পুঁজিবাদ বিকাশলাভ করে এসেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত চীনের অর্থনৈতিক বিকাশের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক একটিমাত্র তাত্ত্বিক রচনাও উপস্থিত করা যায়নি। উদাহরণ হিসেবে আমরা কি এটা বলতে পারি যে চীনের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী অধ্যয়নের ব্যাপারে তত্ত্বগত মান ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উচ্চ হয়ে উঠেছে? এটা কি আমরা বলতে পারি যে নাম করার মতো উপযুক্ত অর্থনৈতিক তত্ত্ববিদেরা আমাদের পার্টিতে রয়েছেন? নিশ্চয়ই পারি না। অনেক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বই আমরা পড়েছি, কিন্তু আমরা কি দাবি করতে পারি যে আমরা তত্ত্ববিদদের পেয়েছি? পারি না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে প্রয়োগের ভিত্তিতে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের সৃষ্ট তত্ত্ব, তাঁদের সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহে তাঁরা উপনীত হয়েছেন ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক বাস্তবতা থেকে। আমরা যদি শুধু তাঁদের রচনাবলীই পড়ি কিন্তু চীনের ইতিহাস ও বিপ্লবের বাস্তবতাকে যদি তাঁদের তত্ত্বের আলোকে অধ্যয়ন করতে অগ্রসর না হই অথবা আমরা যদি তত্ত্বের ভিত্তিতে সযত্নে চীনের বিপ্লবের প্রয়োগকে গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়াস না পাই, তাহলে নিজেদের মার্কসবাদী তত্ত্ববিদ বলে অথবা গালভরা নাম না দেওয়াই আমাদের পক্ষে উচিত হবে। যদি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে আমরা চীনের সমস্যাবলীর প্রতি চোখ বুঁজে থাকি এবং মার্কসবাদী রচনাসমূহ থেকে শুধু বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্ত ও মূলসূত্র মুখস্থ করতে পারি তবে তত্ত্বগত ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য যথার্থতঃই নিতান্ত নগন্য বলে বিবেচিত হবে। একজন লোক যদি শেষ পর্যন্ত শুধু মার্কসবাদী অর্থ-নীতি বা দর্শন মুখস্থই করতে পারেন, প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু করে দশম অধ্যায়ের থেকে মনের আনন্দে উদ্ধৃতি দিতে পারেন, কিন্তু তাকে প্রয়োগ

করতে একেবারেই অসমর্থ হন—তবে তাঁকে মার্কসবাদী তত্ত্ববিদ বলে গণ্য করা যায় কি? না, যায় না। আমরা কী ধরণের তত্ত্ববিদ চাই? আমরা তেমন তত্ত্ববিদই চাই যিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি, ও পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইতিহাস ও বিপ্লবের গতিপথে যে বাস্তব সমস্যাগুলি দেখা দেবে তাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন, আর চীনের অর্থনীতিগত, রাজনীতিগত, সামরিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সমস্যাগুলির তত্ত্বগত বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন। এ ধরনের একজন তত্ত্ববিদ হতে গেলে একজন লোককে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অবস্থানের, দৃষ্টিভঙ্গির ও পদ্ধতির মর্মবস্তুর যথার্থ অধিকারসম্পন্ন হতে হবে এবং উপনিবেশের বিপ্লব ও চীন বিপ্লব প্রসঙ্গে লেনিন ও স্তালিনের তত্ত্বগুলিকে যথার্থভাবে অধিগত করতে হবে এবং তাকে চীনের বাস্তব সমস্যাবলীর সুগভীর ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রয়োগের ব্যাপারে সমর্থ হতে হবে। এবং এই সমস্যাবলীর বিকাশের নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করতে হবে। ঠিক এ ধরনের তত্ত্ববিদদেরই আমাদের যথার্থ প্রয়োজন।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সম্প্রতি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমাদের কমরেডদের কছে আহ্বান জানিয়েছেন—কিভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদী অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিকে চীনের ইতিহাস, চীনের অর্থনীতি, রাজনীতি, সামরিক ব্যাপার ও সাংস্কৃতির গুরুতর অধ্যয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তা শিক্ষা করতে এবং প্রতিটি সমস্যাকে আনুপূর্বিক তথ্যের ভিত্তিতে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করতে এবং তা থেকে তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত টানতে। এই দায়িত্বই আমাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে।

আমাদের পার্টি-স্কুলের কমরেডরা মার্কসবাদী তত্ত্বকে প্রাণহীন শাস্ত্রবাক্য বলে যেন মনে না করেন। মার্কসবাদী তত্ত্বকে আয়ত্ত করা ও তাকে প্রয়োগ করা প্রয়োজন, তাকে আয়ত্ত করতে হবে একমাত্র প্রয়োগের উদ্দেশ্য নিয়েই। আপনি যদি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি-দুটি বাস্তব সমস্যার বিশদ ব্যাখ্যাকালে প্রয়োগ করতে পারেন তবে আপনাকে খানিকটা সাফল্যের কৃতিত্ব ও গৌরব দেওয়া যায়। যত বেশি সমস্যার বিশদ বিশ্লেষণ আপনি করবেন, যত বেশি পূর্ণাঙ্গভাবে এবং গভীরভাবে আপনি তা করবেন, আপনারা সাফল্য ততই বেশি হবে। আমাদের পার্টি-স্কুলকেও নিয়ম নির্ধারণ করতে হবে যাতে করে ছাত্ররা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়নের পর

চানের সমস্তার প্রতি তাঁরা কিভাবে তাকাচ্ছেন, সমস্তাগুলিকে তাঁরা পরিষ্কার-ভাবে দেখতে পারছেন কিনা এবং আদৌ তাঁরা তা দেখতে পাচ্ছেন কিনা সেই অনুযায়ী তাঁদের ভালমন্দ এইরকম স্তরভাগের ব্যবস্থা করা যায়।

তারপর আলোচনা করা যাক 'বুদ্ধিজীবীদের' প্রশ্ন সম্পর্কে। চীন যেহেতু একটি আধা-উপনিবেশ, আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ এবং তার সংস্কৃতি যেহেতু যথেষ্ট বিকশিত নয়, তার জন্য বুদ্ধিজীবীদের বিশেষভাবেই মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। এই বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্নে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দুবছরের অধিককাল হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে[২] যে বুদ্ধিজীবীদের বিপুল অংশকে, তাঁরা যতখানি বিপ্লবী ও জাপানকে প্রতিরোধে অংশগ্রহণে যতখানি ইচ্ছুক সেই অনুযায়ী তাঁদের সপক্ষে নিয়ে আসতে হবে, তাঁদের সবাইকে স্বাগত জানাতে হবে। বুদ্ধিজীবীদের সম্মান প্রদর্শন আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ সঠিক কাজ হবে কারণ বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের ছাড়া বিপ্লবের বিজয় সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে অনেক বুদ্ধিজীবী রয়েছেন যাঁরা নিজেদের খুবই পণ্ডিত বলে মনে করেন এবং পাণ্ডিত্যের ভাবসাব দেখান; কিন্তু তাঁরা এ কথা বোঝেন না যে এ ধরনের ভাবসাব খুবই খারাপ ও হানিকর এবং তাঁদের নিজেদের অগ্রগতিই এতে করে ব্যাহত হয়। তাঁদের এই সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া কর্তব্য যে তথাকথিত অনেক বুদ্ধিজীবীই প্রকৃতপ্রস্তাবে, তুলনামূলক বিচারে বলতে গেলে, নিতান্ত অজ্ঞ এবং অনেকক্ষেত্রে শ্রমিক ও কৃষকেরা তাদের চেয়ে বেশিই জানেন। এ কথা শুনে কেউ কেউ বলবেন,! 'একি আপনি যে ব্যাপারটাকে একেবারে উল্টে দিচ্ছেন, আর বাজে কথা বলছেন।' (**হাস্যরোল**।) কিন্তু কমরেডগণ, উত্তেজিত হবেন না; আমি যা বলছি, তাতে খানিকটা সত্য আছে বৈকি।

জ্ঞান কি? শ্রেণী-সমাজের উদ্ভবের পর থেকে পৃথিবীতে মাত্র দুই ধরনের জ্ঞান রয়েছে, উৎপাদনের জন্য সংগ্রামের জ্ঞান এবং শ্রেণী-সংগ্রামের জ্ঞান। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে এই দুধরনের জ্ঞানের নির্যাসস্বরূপ এবং দর্শন হচ্ছে প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞানের সামান্যা-করণ ও সারসংক্ষেপন। অন্য কোন ধরনের জ্ঞান আছে কি? না, নেই। এখন সমাজের বাস্তব কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন এমন স্কুলে শিক্ষা-লাভ করে এসেছে সে রকম কিছু ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করা যাক। তাদের ক্ষেত্রে আমরা কী দেখছি? এ ধরনের একটি প্রাথমিক স্কুল থেকে একই রকমের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত গিয়ে গ্রাজুয়েট হয়ে যখন একজন লোক বেরিয়ে

আসেন, তাঁকে তখন বেশ খানিকটা জ্ঞানের অধিকারী বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু তাঁর যা আছে তা নিছক পুঁথিগত বিদ্যামাত্র; তিনি এখনো কোন বাস্তব কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করেননি অথবা যা শিখেছেন জীবনের কোন ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করেননি। এরকম একজন ব্যক্তিকে কি যথার্থ বিকশিত বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য করা চলে? আমার তো মনে হয় তা গণ্য করা যায় না, কারণ তাঁর জ্ঞান তখনো অসম্পূর্ণ। আপেক্ষিক বিচারে সম্পূর্ণ জ্ঞান তাহলে কোন্‌টি? আপেক্ষিকভাবে সকল সম্পূর্ণ জ্ঞানই দুটো স্তরে বিকাশলাভ করে; প্রথম স্তরটা হচ্ছে প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রথমটিরই উচ্চতর স্তরের বিকশিত রূপ। ছাত্রদের পুঁথিগত জ্ঞান তাহলে কোন্ ধরনের জ্ঞান? যদি ধরেও নেওয়া হয় যে তাদের সকল জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, তা কিন্তু তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান নয়, বরং তা হচ্ছে পূর্বসূরীদের কাজ থেকে উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম ও শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার যে সারসংক্ষেপ সন্নিবদ্ধ তত্ত্ব হিসেবে তাদের কাছে এসেছে সেইটুকু মাত্র। এটা একান্তভাবে প্রয়োজন যে ছাত্ররা এ ধরনের জ্ঞান যথেষ্ট আয়ত্ত করবে ঠিকই কিন্তু এটাও বুঝতে হবে যে একটা অর্থে তাদের ক্ষেত্রে এই জ্ঞান একপেশে, তা হচ্ছে এমন একটা বিষয় যা অন্যরা প্রয়োগ করেছে কিন্তু তারা নিজেরা এখনো তা প্রয়োগ করেনি। সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই জ্ঞানকে জীবনে ও বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষ হতে হবে। সুতরাং, যাঁদের শুধু পুঁথিগত বিদ্যা রয়েছে কিন্তু যাঁরা এখনো বাস্তবতার সংস্পর্শে আসেননি এবং যাঁদের অতি অল্প বাস্তব অভিজ্ঞতাই রয়েছে তাঁদের আমি এই পরামর্শই দিচ্ছি যে, তাঁরা তাঁদের নিজেদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত হোন এবং আরও একটু বিনয়-নম্র হোন।

যাঁদের শুধু পুঁথিগত বিদ্যা আছে তাঁদের কিভাবে যথার্থ অর্থই বুদ্ধিজীবীতে পরিণত করা যায়? তার একমাত্র পথ হচ্ছে তাঁদের বাস্তব কাজকর্মে অংশ-গ্রহণ করতে দেওয়া ও বাস্তব কর্মক্ষেত্রের কর্মী করে তোলা, যাঁরা তত্ত্বগত কাজকর্মে লিপ্ত আছেন তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সমস্যাসমূহের অধ্যয়নে নিযুক্ত করা। এভাবে আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব।

আমি যা বললাম তাতে অনেকেই সম্ভবতঃ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন। তাঁরা বলবেন, 'আপনার ব্যাখ্যা অনুসারে এমনকি মার্কসকেও তো বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য করা যাবে না।' আমি বলছি, তাঁদের কথা ঠিক নয়। মার্কস বাস্তব

বৈপ্লবিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বৈপ্লবিক তত্ত্বও সৃষ্টি করেছিলেন। পুঁজিবাদের সরলতম উপাদান থেকে শুরু করে তিনি পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর সুগভীর অধ্যয়ন করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন পণ্যাদি দেখেছেন ও ব্যবহার করেছেন এবং তা তাঁদের এত কাছের জিনিস ছিল যে তাকে তাঁরা লক্ষ্যই করেননি। একমাত্র মার্কসই পণ্যকে বৈজ্ঞানিকভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাদের প্রকৃত বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি বিপুল গবেষণা পরিচালনা করেন এবং সর্বত্র বিরাজমান সেই বাস্তবতা থেকে যথার্থ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতি, ইতিহাস ও প্রলেতারীয় বিপ্লবকে অধ্যয়ন করেছেন এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন। এভাবে মার্কস মানুষের জ্ঞানের চরম উৎকর্ষের প্রতিভূস্থানীয় সবচেয়ে পরিপূর্ণ বিকশিত একজন বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠেছিলেন। যাদের শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা রয়েছে তাদের থেকে তিনি ছিলেন মূলতঃ ভিন্ন রকমের। বাস্তব সংগ্রামের সূত্র ধরে মার্কস আনুপূর্বিক তথ্যানুসন্ধান ও অধ্যয়ন করেছিলেন, সাধারণ সূত্র নিরূপণ করেছিলেন এবং তারপর তাঁর সিদ্ধান্তগুলিকে বাস্তব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচাই করেছিলেন —একেই আমরা বলেছি তত্ত্বগত কার্যকলাপ। কিভাবে এ ধরনের কাজ করতে হয় তা শিখেছেন এমন বিরাট সংখ্যক কমরেডের প্রয়োজন আমাদের পার্টির রয়েছে। আমাদের পার্টিতে এমন বহু কমরেড রয়েছেন যাঁরা এধরনের তত্ত্বগত গবেষণার কাজ করতে শিখতে পারেন; তাঁদের অধিকাংশই বুদ্ধিমান ও প্রতি—প্রতিসম্পন্ন এবং তাঁদের আমাদের মর্যাদা দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু তাঁদের সঠিক নীতি অনুসরণ করা চাই এবং অতীতের ভুলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি করা তাঁদের চলবে না। গোঁড়ামি তাঁদের বর্জন করতে হবে এবং পুস্তকের তৈরী-করা বাক্যজালের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখা তাঁদের চলবে না।

এই পৃথিবীতে একটি ধরনেরই যথার্থ তত্ত্ব রয়েছে, সেই তত্ত্বকে প্রকৃত বাস্তবতা থেকে আহরণ করা এবং তারপর বাস্তব অবস্থায় তা যাচাই করে নেওয়া হয়; আমরা যে অর্থে বলেছি সেই হিসেবে আর কিছুকেই তত্ত্বের নাম দেওয়া চলে না। স্তালিন বলেছেন, বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে সংযুক্ত না হলে তত্ত্ব লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ে।[৩] লক্ষ্যহীন তত্ত্ব মূল্যহীন ও ভ্রান্ত এবং তাকে বাতিল করে দিতেই হবে। আমরা আমাদের নিন্দাসূচক অঙ্গুলি প্রদর্শন তাদের বিরুদ্ধেই করব যারা লক্ষ্যহীন তত্ত্বকথা নিয়ে মশগুল। যথার্থ বাস্তবতা

থেকে উদ্ভূত আর পরীক্ষিত বলেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সবচেয়ে সঠিক, সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক এবং সবচেয়ে বিপ্লবী সত্য। কিন্তু যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করেন তাঁদের অনেকেই তাকে একটি প্রাণহীন শাস্ত্রবাক্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন, ফলে তত্ত্বের বিকাশ ব্যাহত হয় এবং এতে করে নিজেদের ও অন্যান্য কমরেডদেরই তাঁরা ক্ষতিসাধন করেন।

অন্যদিকে আমাদের যেসব কমরেড বাস্তব কাজকর্মে নিযুক্ত রয়েছেন তাঁরা যদি তাঁদের অভিজ্ঞতার অপব্যবহার করেন তবে তাঁদেরকেও দুর্ভোগ ভুগতে হবে। সত্যি কথা, এই ব্যক্তিদের অনেকেরই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে যা খুবই মূল্যবান কিন্তু যদি তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আত্মতুষ্ট হয়ে বসে থাকেন তবে তা হবে অতীব বিপজ্জনক। তাঁদের এ কথা উপলব্ধি করা চাই যে তাঁদের জ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতালব্ধ এবং খণ্ডিত, আর তাঁদের জ্ঞানের বুদ্ধিগ্রাহ্যতা ও পূর্ণাঙ্গতার অভাব রয়েছে; অন্য কথায়, তাঁদের তত্ত্বের অভাব রয়েছে এবং তাঁদের জ্ঞানও তুলনামূলকভাবে অসম্পূর্ণ। আপেক্ষিকভাবে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ব্যতীত ভালভাবে বিপ্লবী কাজ করা অসম্ভব।

তাহলে, দুই ধরনের অসম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, একটি হচ্ছে তৈরী-করা যে জ্ঞান আমরা পুস্তকে পাচ্ছি এবং অন্যটি হচ্ছে সেই জ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা অভিজ্ঞতালব্ধ ও খণ্ডিত। কিন্তু দুটোই একদেশদর্শী। এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হলেই এমন জ্ঞান লাভ করা যাবে যা হবে সঠিক এবং আপেক্ষিকভাবে পূর্ণাঙ্গ।

তত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকজনগণের থেকে আগত আমাদের কর্মীদের প্রথমেই কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষালাভ করা চাই। তা না হলে তাঁরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব শিখতে পারবেন না। প্রাথমিক শিক্ষালাভ করার পর যে-কোন সময় তাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করতে পারবেন। আমার বাল্যকালে কোন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিদ্যালয়ে যাইনি এবং যা শিখেছিলাম তা হচ্ছে এই ধরনের: 'গুরু বললেন—"শিক্ষা গ্রহণ করা আর যা শিক্ষালাভ করা গেল তার নিয়ত পর্যালোচনা কত প্রীতিপ্রদ ব্যাপার।"'[৪] যদিও পঠনীয় বিষয়বস্তু ছিল অত্যন্ত সেকেলে, তবু তাতে করে আমার প্রচুর মঙ্গল হয়েছিল কারণ তা থেকে আমি পড়তে শিখেছিলাম। এখন আমরা আর কনফুসীয় ধ্রুপদী রচনাবলী পাঠ করি না, পড়ি আধুনিক চীনা ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল এবং প্রাথমিক প্রকৃতি-বিজ্ঞান, একবার যা শিখে নিলে সর্বত্রই তা

কাজে লাগে। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এখন অত্যন্ত জোর দিয়েই এটা চায় যে আমাদের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকজনগণ থেকে আগত কর্মীরা অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষালাভ করবেন কারণ তাহলে তখন তাঁরা রাজনীতি, সমর-বিজ্ঞান বা অর্থনীতির মতো যে-কোন শাখাতেই অধ্যয়ন শুরু করতে পারবেন। অন্যথায় তাঁদের সকল সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা সত্বেও তাঁরা তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে সমর্থ হবেন না।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে আত্মগত চিন্তাধারাকে দূর করতে হলে এই দুই ধরনের লোকদের প্রত্যেকের জন্যই এই ব্যবস্থা আমাদের করে দেওয়া চাই যাতে করে যেদিক থেকেই তাঁদের অসম্পূর্ণতা রয়েছে তা তাঁরা দূর করে দিতে পারেন এবং অন্য ধরনের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন যাঁদের পুঁথিগত বিদ্যা রয়েছে তাঁদের প্রয়োগের দিকে বিকশিত হয়ে উঠতে হবে; একমাত্র এই পথ ধরেই তাঁরা পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে তুষ্ট হয়ে থাকা থেকে বিরত হতে এবং মতান্ধতাজনিত ভুল পরিহার করতে পারবেন। যাঁরা কাজকর্মে অভিজ্ঞ তাঁদের তত্ত্ব অধ্যয়ন শুরু করতে হবে, গুরুত্ব সহকারে পড়াশোনা করতে হবে; একমাত্র তাহলেই তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সুশৃংখল ও সুসমন্বিত করতে পারবেন, তাকে তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারবেন, একমাত্র তখনই তাঁরা তাঁদের খণ্ডিত আংশিক অভিজ্ঞতাকে বিশ্বজনীন সত্য বলে ভুল করবেন না এবং অভিজ্ঞতাবাদজাত ভুলভ্রান্তি করবেন না। মতান্ধতার গোঁড়ামি আর অভিজ্ঞতাবাদ এই দুটোই একই ধরনের আত্মগত চিন্তাজাত বিষয়ীবাদ। যদিও এদের প্রতেক্যটির উদ্ভব ঘটছে বিপরীত উৎসবিন্দু থেকে।

সুতরাং আমাদের পার্টিতে দুধরনে আত্মগত চিন্তাধারা রয়েছে—মতান্ধতা ও অভিজ্ঞতাবাদ। এদের প্রতিটিই শুধু অংশকে দেখে থাকে, সমগ্রকে দেখে না। যদি ঐ ব্যক্তিবর্গ সতর্কতা অবলম্বন না করেন, এই একদেশদর্শিতা যে একটি ত্রুটি তা যদি তাঁরা উপলব্ধি না করেন এবং যদি তা দূর করার জন্য প্রয়াস না পান, তবে তাঁরা বিপথগামী হতে পারেন।

কিন্তু এই দুই ধরনের আত্মগত চিন্তাধারার মধ্যে আমাদের পার্টিতে এখনো পর্যন্ত মতান্ধতাই প্রবলতর বিপদ হয়ে রয়েছে। কারণ মতান্ধরা সহজেই একটি মার্কসবাদী মুখোস এঁটে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকজনসাধারণ থেকে আগত যে কর্মীরা অনায়াসে এদের মতলবটি ধরে ফেলতে পারেন না তাঁদের

বাক্যজাল ছাড়িয়ে বিভ্রান্ত, বন্দী ও অনুগামী করে ফেলতে পারে; তারা একই ভাবে সরলমতি যুবকদের বিভ্রান্ত ও বন্দী করে ফেলতেও পারে। যদি আমরা মতান্ধতাকে জয় করতে পারি তবে পুঁথিগত বিদ্যাসম্পন্ন কর্মীরা যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের সঙ্গে অবিলম্বে মিলিত হবেন এবং বাস্তব বিষয়ের অধ্যয়ন শুরু করবেন। এভাবে তত্ত্বকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সুসমন্বিত করেছেন এমন বহু ভাল কর্মী এবং বেশ কিছু যথার্থ তত্ত্ববিদের দেখা পাওয়া যাবে। যদি আমরা আত্মগত চিন্তাধারাকে জয় করতে পারি তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন কমরেডরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করার ক্ষেত্রে এবং এভাবে অভিজ্ঞতাবাদী ভুলভ্রান্তি পরিহার করার ক্ষেত্রে সাহায্য করার মতো ভাল শিক্ষকদের পেয়ে যাবেন।

'তত্ত্ববিদ' ও 'বুদ্ধিজীবী' সম্পর্কে বিভ্রান্ত ধারণা ছাড়াও অনেক কমরেডের মধ্যে 'তত্ত্ব ও প্রয়োগের সংযোগ স্থাপন' সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে—যদিও এই কথাটি হরদম তারা মুখে মুখে প্রতিদিন বলে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা সবসময় 'সংযোগ সাধনের' কথা বলেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা 'বিচ্ছেদ সাধন'ই করেন কারণ সংযোগ সাধনের কোন চেষ্টাই তাঁরা করেন না। চীন বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে কিভাবে সংযুক্ত করা যাবে? একটা সাধারণ কথার মধ্য দিয়েই বলা চলে 'সঠিক' লক্ষ্যস্থলে তীর ছুঁড়ে।' যেমন তীর যাচ্ছে সঠিক লক্ষ্যের দিকে তেমনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রযোজ্য হচ্ছে চীন বিপ্লবের ক্ষেত্রে। কিছু কিছু কমরেড কিন্তু 'লক্ষ্যহীনভাবে তীর ছুঁড়ে চলেছেন,' বেমালুম তীর ছুঁড়েছেন এবং এধরনের লোকেরা বিপ্লবেরই ক্ষতিসাধন করতে পারেন। অন্যরা শুধু মমতাভরে তীরে হাত বোলাচ্ছেন আর, বলছেন, 'বাঃ, কী সুন্দর তীর! কী চমৎকার তীর!' কিন্তু কোন সময়ই তীর ছুঁড়ছেন না। এই লোকেরা দুর্লভ দ্রব্যের সেইসব সমঝদারের মতো, বিপ্লবের ব্যাপারে কার্যতঃ এদের কিছুই করণীয় নেই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তীরকে চীন বিপ্লবের সঠিক লক্ষ্যে নিক্ষেপ করার কাজে লাগাতে হবে। এ কথা পরিষ্কার না হলে, আমাদের পার্টির তত্ত্বগত মানের কোন সময়ই উন্নতি সাধিত হবে না এবং চীন বিপ্লব কোন সময়ই বিজয়ী হবে না।

আমাদের কমরেডদের এ কথা বুঝতে হবে যে আমরা লোক দেখানোর জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করি না, বা এতে কোন জাদু আছে বলেও

তা করি না, তা অধ্যয়ন করি শুধু এই কারণে যে তা এমন একটি বিজ্ঞান যা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী লক্ষ্যকে বিজয়ের পথে নিয়ে যাবে। এখনো এমন কিছু লোক রয়েছেন যাঁরা মনে করেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রচনা থেকে এলো-পাথাড়ি কিছু উধৃতি রীতিমতো মুস্কিল-আসানস্বরূপ এবং একবার আয়ত্ত করে নিলেই সকল প্রকার ব্যাধির সহজ নিরাময়ের ব্যবস্থা তাতে হয়ে যাবে। এই লোকেরা বালসুলভ অজ্ঞতাই প্রদর্শন করে, এদের সচেতন করে তুলতে হবে। ঠিক এ ধরনের অজ্ঞ লোকেরাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে একটি ধর্মীয় বিধান বলে মনে করে। তাদেরকে আমরা সোজাসুজি বলে দেব, 'তোমাদের এই শাস্ত্রবাক্য একেবারেই মূল্যহীন।'[১] মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন বার বার বলেছেন আমাদের তত্ত্ব কোন শাস্ত্রবাক্য নয়, তা হচ্ছে বাস্তব কর্মপথের নির্দেশ। কিন্তু ঐ লোকেরা এই বিবৃতিটিই ভুলে থাকতে পছন্দ করে অথচ এই বিবৃতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, এবং বলা যায়, একেবারে চরম গুরুত্বপূর্ণ। চীনের কমিউনিস্টরা একমাত্র তখনই তত্ত্বকে প্রয়োগের সঙ্গে সংযুক্ত করছেন বলা যাবে যখন তাঁরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিকে এবং চীন বিপ্লব সম্পর্কে লেনিন ও স্তালিনের শিক্ষাবলীকে ভালভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন এবং তদুপরি যখন তাঁরা চীনের ইতিহাস ও বিপ্লবের বাস্তবতাকে নিয়ে গভীর গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনের প্রয়োজন মেটাবার মতো সৃজনশীল তত্ত্বগত কাজ তাঁরা করবেন তখনই শুধু বলা যাবে যে তাঁরা তত্ত্ব ও প্রয়োগের সংযুক্তি সাধন করেছেন। বাস্তবে তা না করে শুধু তত্ত্ব ও প্রয়োগের সংযোগ সাধনের কথা বলা কোনই কাজের নয়, তা যদি শত বছর ধরেও তা বলে যাওয়া হয় তবু তাতে কিছু কাজ হবে না। সমস্যার প্রতি বিষয়ীবাদীদের একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতার জন্য গোঁড়া বিষয়ীবাদ এবং একদেশদর্শীতাকেই আমাদের চুরমার করে ফেলতে হবে।

বিষয়ীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সমগ্র পার্টি জুড়ে অধ্যয়নের ধারা সংশোধন প্রসঙ্গে আজ এইটুকু বললাম।

এখন আমি সংকীর্ণতাবাদের প্রশ্ন সম্পর্কে বলব।

বিশ বছর ধরে পোড় খাওয়ার পর আমাদের পার্টি আর এখন সংকীর্ণতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত নয়। কিন্তু সংকীর্ণতাবাদের অবশেষ এখনো পর্যন্ত পার্টির আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সম্পর্কের উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়। আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতাবাদী মনোভাব থেকে পার্টির মধ্যেকার কমরেডদের প্রতি

বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয় এবং এতে করে পার্টির আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি ব্যাহত হয়। অন্যদিকে বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতাবাদী মনোভাব থেকে পার্টির বাইরের লোকজনের প্রতি বিচ্ছিন্নতার মনোভাব দেখা দেয় এবং সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার পার্টির কাজ তাতে ব্যাহত হয়। এই দুটো দিক থেকে এই আপদের মূলোৎপাটন করলেই পার্টি বাধাহীনভাবে পার্টির সকল কমরেডের মধ্যে ও দেশের সমগ্র জনগণের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের মহান লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

অন্তঃপার্টি সংকীর্ণতাবাদের অবশেষ কী কী? মূলতঃ সেগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ :

প্রথম, 'স্বাতন্ত্র্যের' ঘোষণা। কিছু কমরেড সমগ্রের নয় শুধু অংশের স্বার্থই দেখে থাকেন; তাঁরা সবসময়ই অযথা জোর দেন কাজের সেই অংশের ওপর যার জন্য তাঁরা নিজেরা দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সবসময়ই সমগ্রের স্বার্থকে তাঁদের নিজেদের আংশিক স্বার্থের নীচে স্থান দিতে চান। তাঁরা পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ব্যবস্থাকে বুঝাতে চান না; তাঁরা এ কথা উপলব্ধি করতে চান না যে কমিউনিস্ট পার্টির শুধু গণতন্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে তা নয়, কেন্দ্রিকতার আরও বেশি প্রয়োজন রয়েছে। তাঁরা ভুলে যান গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার যে ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগরিষ্ঠের, নিম্নতর স্তরকে উচ্চতর স্তরের, অংশকে সমগ্রের এবং সমগ্র সদস্যবৃন্দকে কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্যকে মান্য করতে হয়। চ্যাঙ কুয়ো-তাও[৫] পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির থেকে নিজের 'স্বাতন্ত্র্যের' দাবি করেছিলেন এবং এই 'দাবির' পরিণামে দেখা গেল তিনি পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও একজন কুওমিনতাঙ গুপ্তচরে পরিণত হয়ে পড়েছেন। অবশ্য যে সংকীর্ণতাবাদের কথা এখন আমরা আলোচনা করছি তা যদিও এই চরম গুরুতর পর্যায়ের নয় তবু তার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন এবং সকল প্রকার অনৈক্যের অভিব্যক্তিকে আমাদের সম্পূর্ণভাবে দূর করে দেওয়া দরকার। সমগ্রের স্বার্থকে বিচার করে দেখার ব্যাপারে কমরেডদের উৎসাহিত করা আমাদের কর্তব্য। প্রতিটি পার্টি-সদস্য, প্রতিটি শাখা, প্রতিটি বিবৃতি ও প্রতিটি কাজকে সমগ্র পার্টির স্বার্থ সামনে রেখে চলা চাই বা করা চাই; এই নীতি লংঘন করা একান্তভাবেই অননুমোদনীয়।

এ ধরনের 'স্বাতন্ত্র্যের' যারা দাবি করে করে তারা 'সবার আগে আমি' এই নীতি নিয়েই সাধারণতঃ চলে থাকেন এবং সাধারণভাবে দেখা যায় ব্যক্তি

ও পার্টির মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নে তারা ভুল পথে চলছে। যদিও কথায় তারা পার্টির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে কিন্তু প্রয়োগের বেলায় তারা প্রথমে নিজেকে এবং তারপরে পার্টিকে স্থান দেয়। কমরেড লিউ শাও-চি কিছু কিছু লোক সম্পর্কে একবার বলেছিলেন যে তাদের হাত অসাধারণ লম্বা এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে তারা খুবই তৎপর, কিন্তু অন্যদের ও সমগ্র পার্টির স্বার্থের ব্যাপারে তারা অতি অল্পই মনোযোগ দিয়ে থাকে। 'আমারটা তো আমার আছেই, তোমারটাও কিছু আমার।' (উচ্চ হাস্যরোল।) এই লোকেরা কী চায়? তারা চায় খ্যাতি ও মর্যাদা আর একেবারে পাদপ্রদীপের সামনে স্থান পেতে। যখনই তাদের কোন একটি কাজকর্মের শাখার ভার দেওয়া হল, অমনি তারা তাদের 'স্বাতন্ত্র্য' জাহির করে বসবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে কিছু লোক জোটাবে, অন্যদের ঠেলে দূরে সরিয়ে দেবে আর আত্মম্ভরিতা শুরু করবে, কমরেডদের মধ্যে চাটুকারবৃত্তি ও ফোঁপর দালালির মনোভাব সৃষ্টি করবে এবং এভাবে বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টি-গুলির অমার্জিত কাজের ধারা কমিউনিস্ট পার্টিতে আমদানি করবে। তাদের এই অসততাই এদের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমি মনে করি, সততা নিয়েই আমাদের কাজ করা উচিত কারণ সৎ মনোভাব না থাকলে এই পৃথিবীতে কাজের কাজ কিছু করা একান্ত অসম্ভব। সৎলোক কারা? মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন হলেন সৎ, বিজ্ঞানীরা সৎ। অসৎ লোক কারা? ট্রট্স্কি, বুখারিন, চেন তু-শিউ আর চ্যাঙ কুয়ো-তাওরা হচ্ছে চূড়ান্ত অসৎ লোক; এবং ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ থেকে যারা 'স্বাতন্ত্র্যের' ঘোষণা করে তারাও অসৎ। সমস্ত ধূর্ত লোক, কাজের প্রতি যাদের বৈজ্ঞানিক মনোভাব নেই অথচ যারা নিজেদের বিরাট করিৎকর্মা ও চালাকচতুর বলে মনে করে কিন্তু কার্যতঃ যারা নিতান্ত গবেট—এদেরও শেষ পর্যন্ত ভাল হয় না। আমাদের পার্টি-স্কুলের ছাত্রদের এই সমস্যার প্রতি মনোযোগ দিতেই হবে। আমাদের গড়ে তুলতে হবে কেন্দ্রীভূত, ঐক্যবদ্ধ একটি পার্টি এবং নীতিবিবর্জিত উপদলীয় কোন্দলকে ঝেঁটিয়ে একেবারে নিঃশেষে দূর করে দিতে হবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে একই সাধারণ লক্ষ্যের জন্য সংগ্রামে কদমে কদম মিলিয়ে সমগ্র পার্টিকে নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

বহিরাঞ্চল থেকে আগত এবং অঞ্চলের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে এবং

সংকীর্ণতাবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। বহিরাঞ্চল থেকে আগত ও আঞ্চলিক কর্মীদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক মনোযোগ দেওয়া চাই কারণ বহু জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী ঐখানে আসার পর এবং অঞ্চলের অনেক কাজকর্ম শুরুই হয়েছে বহিরাঞ্চলের কর্মীদের আসার পর। আমাদের কমরেডদের বুঝতে হবে যে এই পরিস্থিতিতে আমাদের ঘাঁটি অঞ্চলসমূহকে সুসংহত করা এবং আমাদের পার্টির পক্ষে ঐখানে দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন এই দুধরনের কর্মীরা এক হয়ে দাঁড়াবেন এবং যখন অঞ্চল থেকে বিরাট সংখ্যক কর্মীরা এগিয়ে আসবেন এবং দায়িত্বভার বুঝে নেবেন তখনই। অন্যথায় তা করা অসম্ভব হবে। বাইরের ও অঞ্চলের কমরেডদের নিজেদের সবল ও দুর্বল দিক রয়েছে, আর যদি কোন অগ্রগতি সাধন করতে হয় তাহলে তাদের দুর্বল দিকগুলি দূর করতে হবে অন্যদের সবল দিকগুলি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে। বহিরাঞ্চলের কর্মীরা সাধারণতঃ আঞ্চলিক অবস্থার সঙ্গে পরিচয় ও জনসাধারণের সংযোগের দিক থেকে সমান পর্যায়ের নন। উদাহরণ হিসেবে আমার কথাই ধরুন। যদিও আমি উত্তর শেনসিতে পাঁচ-ছয় বছর রয়েছি তবু আঞ্চলিক অবস্থার সঙ্গে পরিচয় ও এখানকার জনগণের সঙ্গে সংযোগের দিক থেকে আমি আঞ্চলিক কমরেডদের চেয়ে পেছনে রয়েছি। আমাদের যেসব কমরেডরা শানসি, হোপেই, শানতুং বা অন্যান্য প্রদেশের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে যাচ্ছেন তাঁদের এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। তদুপরি, একটি ঘাঁটি অঞ্চলেই যেহেতু কিছু কিছু জেলা অন্য জেলাগুলির তুলনায় আগে থেকেই উন্নত হয়ে উঠেছে তাই দেখা যাবে একটি জেলার আঞ্চলিক কর্মী এবং অন্য জেলা থেকে আগত কর্মীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অপেক্ষাকৃত অগ্রসর জেলা থেকে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জেলাতে যে কর্মীরা আসেন তাঁরাও ঐ অঞ্চলের ক্ষেত্রে বহিরাঞ্চল থেকে আগত কর্মীই বটে এবং তাঁদেরকেও আঞ্চলিক কর্মীবৃন্দকে গড়ে তুলতে এবং তাদের সহায়তা করতে গভীর মনোযোগ দিতে হবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেসব জায়গায় বহিরাঞ্চলীয় কর্মীরা দায়িত্বে রয়েছেন সেখানে যদি অঞ্চলের কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ভাল না হয়ে থাকে তাঁদেরকেই প্রধান দায়িত্বভার বহন করতে হবে এবং মুখ্য কমরেডদেরই অধিকতর দায়িত্বভার বহন করতে হবে। কিছু কিছু জায়গায় এই সমস্যার প্রতি এখনো পর্যন্ত যে মনোযোগ দেওয়া হয়ে

থাকে তা একেবারেই যথেষ্ট নয়। কিছু কিছু লোক আঞ্চলিক কর্মীদের হেয় জ্ঞান করে থাকেন এবং তাদের ঠাট্টাবিদ্রূপ করেন, বলেন, 'এখানকার লোকগুলি কী জানে বলুন তো? নড়তে-চড়তে ন'মাস!' এ ধরনের লোকেরা আঞ্চলিক কর্মীদের গুরুত্ব বুঝতেই পারেন না, তাঁরা ওদের সবল দিকগুলি জানেন না বা নিজেদের দুর্বল দিকগুলিও দেখতে পান না এবং ভুল ও সংকীর্ণতাবাদী একটি মনোভাবই গ্রহণ করেন। বহিরাঞ্চলীয় সকল কর্মীকেই আঞ্চলিক কর্মীদের যত্ন নিতে হবে এবং সব সময় তাদের সহায়তা করতে হবে এবং কোন সময়ই তাদের ঠাট্টাবিদ্রূপ করা বা আক্রমণ করা চলবে না। অবশ্য আঞ্চলিক কর্মীদের নিজেদের থেকেই বহিরাঞ্চলীয় কর্মীদের সবল দিক থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে এবং অনুপযুক্ত, সংকীর্ণ সকল মনোভাব দূর করে তাঁরা এবং বহিরাঞ্চলীয় কর্মীরা যাতে এক হয়ে উঠতে পারেন, যাতে তাঁদের মধ্যে 'ওরা' ও 'আমরা' ইত্যাদি পার্থক্য না থাকে তা দেখতে হবে এবং এভাবে সংকীর্ণতাবাদী মনোভাবকে দূর করে দিতে হবে।

এই একই কথা সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত কর্মী ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে কর্মরত অন্যান্য কর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাদের পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং সংকীর্ণতাবাদী মনোভাবের বিরোধিতা তাদের করতেই হবে। সামরিক বাহিনীর কর্মীদের আঞ্চলিক কর্মীদের সাহায্য করতেই হবে এবং আঞ্চলিক কর্মীদের সামরিক বাহিনীর কর্মীদের সাহায্য করা চাই। যদি তাদের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয় তবে একে অন্যের সুবিধা মেনে নিয়ে আত্মসমালোচনা করতে হবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে যেসব জায়গায় সেনাবাহিনীর কর্মীরা প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বের অবস্থানে রয়েছেন, আঞ্চলিক কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল না থাকলে সেখানে তাঁদেরকেই প্রধান দায়িত্বভার বহন করতে হবে। যখন সেনাবাহিনীর কর্মীরা পদের নিজস্ব দায়িত্বভার বুঝে নিতে পারবেন, এবং আঞ্চলিক কর্মীদের প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে বিনয়ী হবেন তখন এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হবে যাতে করে আমাদের যুদ্ধ প্রয়াস এবং ঘাঁটি অঞ্চলে আমাদের নির্মাণকার্য স্বচ্ছন্দভাবে এগিয়ে যেতে পারবে।

সেনাদলের বিভিন্ন বাহিনী, বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য। স্বার্থপর বিভাগীয় মনোভাবের বিরোধিতা আমাদের করতে হবে কারণ এতে করে অন্যের স্বার্থের কথা না ভেবে

শুধু নিজের বাহিনীর স্বার্থের কথাই ভাবা হয়। অন্যদের অসুবিধার প্রতি যারা উদাসীন, অনুরোধ পেয়েও যারা অন্য বাহিনীতে কর্মীদের প্রেরণ করতে অস্বীকার করে বা শুধু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কর্মীদেরই প্রেরণ করে, 'প্রতিবেশীর জমিটাকে শুধু নিজের জমির বাড়তি জল বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করতে চায়' এবং অন্যান্য দপ্তরের অঞ্চলেরও লোকজনদের প্রতি সামান্যতম বিবেচনাও দেখায় না—এরকম লোকেরা হল স্বার্থপর বিভাগীয় মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি যাদের সঙ্গে সাম্যবাদের মনোভাবের বিন্দুমাত্র কোন সংশ্রবই নেই। সমগ্রের প্রতি বিবেচনাবোধের অভাব এবং অন্যান্য বিভাগের, অঞ্চলের ও লোকজনদের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য হচ্ছে একজন স্বার্থপর বিভাগীয় মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তির লক্ষণ। এ ধরনের লোকজনকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা আমাদের তীব্রতর করে তুলতে হবে এবং তাদের এ কথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে স্বার্থপর বিভাগসর্বস্ব মনোভাব হচ্ছে এমন একটি সংকীর্ণতাবাদী মনোভাব যাকে বেড়ে উঠতে দিলে তা খুবই বিপজ্জনক হয়ে পড়বে।

অন্য একটি সমস্যা হচ্ছে পুরাতন ও নতুন কর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্ক। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের পার্টি বিপুলভাবে বেড়ে উঠেছে এবং বিরাট সংখ্যক নতুন কর্মী এসেছেন। তা খুবই ভাল জিনিস। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর অষ্টাদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর রিপোর্টে কমরেড স্তালিন বলেছিলেন, '…কোন সময়ই যথেষ্ট সংখ্যক পুরাতন কর্মী পাওয়া যায় না, প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যায় তাঁরা অনেক কম এবং তাঁদের অনেকেই ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মেই অংশতঃ অকর্মণ্য হয়ে পড়েছেন।' এখানে তিনি কর্মীদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিলেন এবং শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম নিয়েই কথা বলছিলেন না। আমাদের পার্টিতে যদি বিপুল সংখ্যক নতুন কর্মীবৃন্দ না থাকেন যাঁরা পুরাতন কর্মীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে চলেছেন, তবে আমাদের লক্ষ্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে। সুতরাং, সকল পুরাতন কর্মীকেই পরম উৎসাহ-ভরে নতুন কর্মীদের স্বাগত জানাতে হবে এবং তাঁদের প্রতি ঘনিষ্ঠতম প্রীতির মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে। এটা ঠিক, নতুন কর্মীদের কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে। বিপ্লবে বেশিদিন তাঁরা আসেননি, অভিজ্ঞতা তাঁদের কম এবং অপরিহার্যভাবেই অনেকে প্রাচীন সমাজের অসুস্থ ভাবাদর্শের রেশ, পেটি-বুর্জোয়া ব্যক্তিদের ভাবাদর্শের রেশ তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন

কিন্তু এ ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি ধীরে ধীরে দূর করে দেওয়া যাবে শিক্ষা ও বিপ্লবের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। নতুন কর্মীদের সবলতার দিকগুলি স্তালিনের বক্তব্য অনুসারে হচ্ছে এই যে নতুন কিছুর প্রতি তাঁরা খুবই অনুভূতিশীল, সুতরাং তাঁরা খুবই উৎসাহী ও উচ্চমাত্রায় কর্মচঞ্চল—ঠিক যে গুণগুলির অভাব আমাদের কিছু কিছু পুরাতন কর্মীদের মধ্যে চোখে পড়ে।[৬] নতুন ও পুরাতন কর্মীদের একে অন্যকে শ্রদ্ধা করতে হবে পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, অন্যদের সবল দিকগুলি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি দূর করতে হবে যাতে করে সাধারণ লক্ষ্যসাধনে তাঁরা এক হয়ে দাঁড়াতে পারেন এবং সংকীর্ণতাবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেসব জায়গায় পুরাতন কর্মীরা প্রধানতঃ দায়িত্বে রয়েছেন সেখানে যদি নতুন কর্মীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভাল না হয়ে থাকে তবে সেখানে তাঁদেরকেই মুখ্য দায়িত্বভার বহন করতে হবে।

উপরের এই সমস্ত বিষয়—অংশের সঙ্গে সমগ্রের সম্পর্ক, ব্যক্তি ও পার্টির সম্পর্ক, বহিরাঞ্চলীয় ও আঞ্চলিক কর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্ক, সামরিক বাহিনীর কর্মী ও অঞ্চলে কর্মরত অন্যান্য কর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্ক, সেনাদলের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যেকার সম্পর্ক, একটি অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের সম্পর্ক, একটি বিভাগের সঙ্গে অন্য বিভাগের সম্পর্ক এবং পুরাতন ও নতুন কর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্ক—এইগুলি পার্টির আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক। এই সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্যবাদের মনোভাবের অগ্রগতি সাধন এবং সংকীর্ণতাবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন যাতে করে আমাদের পার্টির কর্মীবৃন্দ সুশৃংখল হয়ে থাকতে পারেন, কদমে কদম মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন এবং ভালভাবে লড়াই করতে পারেন। পার্টির কাজের ধারা সংশোধন করার মধ্য দিয়ে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটিকে সম্পূর্ণভাবে আমাদের সমাধান করতে হবে। সংকীর্ণতাবাদ হচ্ছে সাংগঠনিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মগত চিন্তাধারার প্রকাশ। আমরা যদি আত্মগত চিন্তাধারার কবল থেকে অব্যাহতি চাই এবং বাস্তব তথ্য থেকে সত্যকে খুঁজে নেবার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মনোভাবের প্রসার সাধন করতে চাই, তবে পার্টির মধ্যে থেকে সংকীর্ণতাবাদের অবশেষকে আমাদের ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে হবে এবং পার্টির স্বার্থ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের উর্ধ্বে এই নীতি থেকে অগ্রসর হতে হবে যাতে করে পার্টিতে

পরিপূর্ণ ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হতে পা।

পার্টির বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্র থেকেও, আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ক্ষেত্রের মতোই, সংকীর্ণতাবাদের অবশেষকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তার কারণ হচ্ছে এই: শত্রুকে আমরা শুধুমাত্র দেশব্যাপী সমগ্র পার্টিতে আমাদের কমরেডদের ঐক্যবদ্ধ করেই পরাস্ত করতে পারব না। বিশ বছর ধরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র দেশের জনগনকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে বিরাট ও দুরূহ কর্তব্য করে এসেছে এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকে এই কাজের ক্ষেত্রে অতীতের তুলনায় অনেক বিরাট সাফল্যই অর্জিত হয়েছে। এ থেকে কিন্তু এটা বোঝায় না যে আমাদের সকল কমরেডই ইতিমধ্যে জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিক কাজের ধারা অনুসরণ করেছেন এবং তাঁরা সংকীর্ণতাবাদী মনোভাব থেকে মুক্ত। না, তা নয়। কার্যতঃ কিছু কিছু কমরেডের মধ্যে সংকীর্ণতাবাদী মনোভাব এখনো রয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ গুরুতর আকারেই তা রয়ে গেছে। আমাদের অনেক কমরেডই পার্টি-বহির্ভূত লোকজনদের প্রতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে খবরদারির মনোভাব দেখিয়ে থাকেন, তাদের হেয় জ্ঞান করেন, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন বা তাদের সম্মান প্রদর্শন করতে বা তাদের সবল দিকগুলির প্রশংসা করতে অস্বীকার করেন। এটা অবশ্যই একটা সংকীর্ণতাবাদী মনোভাব। কটি মার্কসবাদী বই-পুস্তক পড়ে ঐ কমরেডরা বিনয়-নম্র হওয়ার পরিবর্তে আরও উদ্ধত হয়ে ওঠেন এবং অনিবার্যভাবে অন্যদের কোন কাজের নয় বলে বাতিল করে দেন কিন্তু এ কথা বোঝেন না যে প্রকৃতপক্ষে তাঁদের নিজেদের জ্ঞান একেবারেই আধাসিদ্ধ মাত্র। আমাদের কমরেডদের এই সত্যটি বুঝতে হবে যে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা সব সময়ই পার্টি-বহির্ভূত জনগণের তুলনায় সংখ্যালঘু মাত্র। যদি ধরেও নেন প্রতি একশ জনে একজন কমিউনিস্ট রয়েছেন, তাহলেও চীনের ৪৫ কোটি লোকের মধ্যে কমিউনিস্ট হবেন ৪৫ লক্ষ্য। আমাদের সদস্যসংখ্যা যদি এই বিপুল পর্যায়ে পৌঁছায় তবু কমিউনিস্টরা হবেন জনসংখ্যার শতকরা একভাগ মাত্র, অন্যদিকে শতকরা ৯৯ জন থেকে যাবে পার্টি-বহির্ভূত মানুষ। তাহলে, পার্টি-বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে সহযোগিতা না করার আমাদের কী কারণ থাকতে পারে? যাঁরাই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান বা করতে পারেন তাঁদের ক্ষেত্রে আমাদের শুধু সহযোগিতার কর্তব্যই রয়েছে, তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখার

কোন অধিকারই আমাদের নেই। কিন্তু কিছু কিছু পার্টি-সদস্য এটা বুঝতে পারেন না এবং যাঁরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান তাঁদের হেয় জ্ঞান করেন বা দূরে সরিয়ে রাখেন। এটা করার কোনই যুক্তি নেই। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন এক্ষেত্রে আমাদের সপক্ষে কোন যুক্তি দিয়ে গেছেন কি? না, তাঁরা তা দেননি। বরং উল্টো, তাঁরা সব সময়ই একান্তভাবে আমাদের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধন গড়ে তুলতে এবং কোনকালেই তাদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন না হতে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তবে কি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের এরকম কোন যুক্তি দেখিয়েছেন? না, দেখাননি। তার সকল প্রস্তাবের মধ্যে এমন একটিও পাবেন না যেখানে নিজেদেরকে জনসাধারণ থেকে পৃথক করে রাখতে বলা হয়েছে ও এভাবে বিচ্ছিন্ন করতে বলা হয়েছে। বরং ঠিক উল্টো, কেন্দ্রীয় কমিটি সব সময়ই আমাদের জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধন গড়ে তুলতে এবং তাদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন না করতে বলেছে। সুতরাং যে কাজ আমাদেরকে জন—সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার আদৌ কোন যুক্তি নেই এবং আমাদের কিছু কমরেড নিজেরা যে মনগড়া সংকীর্ণতাবাদী চিন্তাধারা গড়ে তুলেছেন এটি হচ্ছে তারই ক্ষতিকর কুফল। আমাদের কিছু কমরেডের মধ্যে সংকীর্ণতা-বাদ খুবই গুরুতরভাবে বর্তমান রয়েছে এবং পার্টি-লাইন কার্যকর করার পথে তা এখনো বাধা সৃষ্টি করছে, তাই এই সমস্যাই মোকাবিলার জন্য পার্টির মধ্য ব্যাপক শিক্ষার প্রচলন আমাদের করতে হবে। সবার উপরে আমাদের কর্মীদের যথার্থভাবে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে এই সমস্যা কত গুরুতর এবং পার্টি-বহির্ভূত কর্মী এবং পার্টি-বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে আমাদের পার্টির সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ না হলে শত্রুকে উচ্ছেদ করা ও বিপ্লবের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্পূর্ণতঃই কতখানি অসম্ভব।

সকল সংকীর্ণতাবাদী ভাবধারা আত্মগত চিন্তার প্রকাশ এবং বিপ্লবের যথার্থ প্রয়োজনের দিক থেকে তা অসঙ্গতিপূর্ণ; সুতরাং সংকীর্ণতাবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এবং আত্মগত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে একই সঙ্গে চালাতে হবে।

ছকে বাঁধা পার্টিগত লেখার প্রশ্ন নিয়ে কথা বলার সময় আজ নেই। আমি অন্য একটি সভায় তা নিয়ে আলোচনা করব। ছকে বাঁধা পার্টিগত লেখা আবর্জনা সৃষ্টির একটা মাধ্যম, আত্মগত চিন্তা ও সংকীর্ণতাবাদের অভিব্যক্তির

একটি রূপ। জনগণের তা ক্ষতিসাধন করে ও বিপ্লবের তা ক্ষতিসাধন করে এবং সম্পূর্ণভাবেই তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া চাই।

আত্মগত চিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আমাদের বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্ববাদের প্রচার করতে হবে। কিন্তু আমাদের পার্টিতে অনেক কমরেড রয়েছেন যাঁরা বস্তুবাদ বা দ্বন্দ্ববাদের প্রচারের ওপর কোনই গুরুত্ব দেন না। অনেকে আত্মগত চিন্তাধারার প্রচারণাকে বরদাস্ত করেন এবং প্রশান্তবদনেই তাকে গ্রহণ করেন। তাঁরা ভাবেন তাঁরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু বস্তুবাদ প্রচারের কোন প্রয়াসই তাঁরা করেন না এবং যখন তাঁরা কোন আত্মগত বিষয়ীবাদী রচনাদি পড়েন বা শোনেন তখন তা নিয়ে কোন চিন্তা পর্যন্ত করেন না বা কোন মতামতও দেন না। এটা একজন কমিউনিস্টের মনোভাব হতে পারে না। এতে করে আমাদের অনেক কমরেডের মন আত্মগত বিষয়ীবাদী চিন্তাধারায় বিষে জর্জর হয়ে পড়ে এবং তাঁদের অনুভূতিশীলতাই ভোঁতা হয়ে পড়ে। সুতরাং, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে পার্টির মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির অভিযান গড়ে তোলা যাতে করে কমরেডদের আত্মগত চিন্তাধারা ও গোঁড়ামির তমসার আবরণ থেকে মুক্ত করা যায় এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের আত্মগত ভাববাদী চিন্তাধারা, সংকীর্ণতাবাদ ও ছকে বাঁধা পার্টিগত লেখা বয়কট করার জন্য আহ্বান জানানো। এই অশুভ শক্তিগুলি জাপানী পণ্যের মতো কারণ একমাত্র শত্রুরাই চায় যে আমরা তার পরিপোষণ করি এবং ঐগুলি নিয়ে নিজেরা মশগুল হয়ে থাকি। তাই ঐগুলি বয়কট করার আহ্বানই আমাদের জানাতে হবে ঠিক যেমন জাপানী পণ্য বয়কট করার জন্য আমরা আহ্বান জানিয়েছিলাম।[৭] আত্মগত ভাববাদী চিন্তা, সংকীর্ণতাবাদ আর ছকে বাঁধা পার্টিগত লেখা হিসাবে যে জিনিষ দেখা যাবে তাকেই আমাদের বয়কট করা চাই, তাদের বেচাকেনা দুরূহ করে তোলা চাই এবং পার্টির নীচু তত্ত্বগত মানের সুযোগ নিয়ে এইসব জিনিসের কারবারীদের বাণিজ্য চালাতে আমরা দেব না। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের কমরেডদের ঘ্রাণশক্তিকে ভাল করে বাড়িয়ে তোলা চাই। প্রতিটি জিনিসকেই তাদের শুঁকে দেখতে হবে এবং তার মধ্য দিয়ে ভাল ও মন্দ বাছাই করতে হবে আর তারপরই কোন্‌টাকে স্বাগত জানাব আর কোন্‌টাকে বয়কট করব সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সব জিনিসেরই আনুপূর্বিক অনুসন্ধান কমিউনিস্টদের সব সময়ই করতে হবে, জিনিসগুলি কী এবং কোথাকার

জিনিস তা খুঁজতে হবে, কমিউনিস্টদের নিজেদের মাথা খাটাতে হবে ও সতর্কভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে জিনিসটি বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যথার্থ উত্তম ভিত্তির উপর তা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে কিনা। কোন ক্ষেত্রেই তাঁদের অন্ধভাবে অনুকরণ করা চলবে না এবং দাসত্বের মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

সর্বশেষে, আত্মগত চিন্তাধারা, সংকীর্ণতাবাদ ও ছকে বাঁধা পার্টিগত লেখার বিরোধিতা করার সময় আমাদের দুটি উদ্দেশ্য মনে রাখতে হবে: প্রথম, 'অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর যাতে করে ভবিষ্যতের ভুল পরিহার করতে পার' এবং দ্বিতীয়, 'রোগ দূর কর, কিন্তু রোগীকে রক্ষা কর।' অতীতের ভুলগুলিকে নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটিত করে দিতে হবে তাতে কার অনুভূতিতে কোথায় কতখানি লাগল তা নিয়ে ভাবলে চলবে না। অতীতের যা খারাপ একটি বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে তার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা প্রয়োজন যাতে করে ভবিষ্যতে কাজ অনেক সতর্কতার সঙ্গে করা যায় এবং অনেক ভালভাবে করা যায়। 'অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর যাতে করে ভবিষ্যতের ভুল পরিহার করতে পার' কথাটির এই হচ্ছে অর্থ। ভুলভ্রান্তিগুলির উদ্‌ঘাটনকালে এবং ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির সমালোচনাকালে আমাদের লক্ষ্য হবে রোগ নিরাময়কালে একজন ডাক্তারের লক্ষ্যের মতো; ডাক্তারের একমাত্র লক্ষ্য থাকে রোগীকে বাঁচানো, রোগীকে মেরে ফেলা নয়। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বেঁচে যান যখন সার্জন তাঁর অ্যাপেনডিক্সটি অপারেশন করে কেটে বাদ দিয়ে দেন। একজন ব্যক্তি যদি চিকিৎসার ভয়ে রোগ গোপন করার মতো ভুল করেন বা অবিরাম ভুল করে চলতেই থাকেন তবে রোগ বাড়তে বাড়তে নিরাময়ের অযোগ্য হয়ে উঠবে, কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তিটি সততার সঙ্গে ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করতে চান, তাঁর চালচলন সংশোধন করেন, তবে তাঁকে আমাদের স্বাগতই জানানো উচিত এবং তার ব্যাধিটি দূর করে দেওয়াই উচিত যাতে করে তিনি একজন ভাল কমরেড হয়ে উঠতে পারেন। যদি আমরা নেহাৎ হেলাভরে এগিয়ে যাই এবং তাকে আঘাত হানি তবে কোনকালেই এক্ষেত্রে সফল আমরা হতে পারব না। মতাদর্শগত বা রাজনৈতিক একটি ব্যাধির চিকিৎসা করার সময় আমাদের কোনমতেই রূঢ় এবং অবিবেচক হওয়া চলবে না; এবং রোগ দূর কর, কিন্তু রোগীকে রক্ষা কর'—এই মনোভাবই আমাদের

গ্রহণ করা উচিত। এইটিই হচ্ছে একমাত্র সঠিক ও কার্যকর পদ্ধতি।

পার্টি-স্কুলের উদ্বোধনকে উপলক্ষ্য করে আমি বিস্তারিতভাবে বললাম এবং আমি আশা করি কমরেডরা আমার কথাগুলি ভেবে দেখবেন। (উচ্চকিত হর্ষধ্বনি।)

টীকা

১। চীনের সামন্তবাদী রাজবংশগুলির রাজত্বকালে পঞ্চদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রাজকর্মচারী বাছাইকালে রাজকীয় পরীক্ষা ব্যবস্থাধীনে ছকে বাঁধা লেখা 'অষ্টপদী রচনা' ছিল বিশেষভাবে নির্দেশিত এক ধরনের রচনারীতি। তাতে ছিল কথার খেলা, বিষয়বস্তুবিহীন এই কথার আঙ্গিকের ওপরই শুধু দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত। অবয়বের দিক থেকে রচনার আটটি অংশ থাকত—উপস্থাপনা, সম্প্রসারণ, প্রাথমিক বিশ্লেষণ, প্রারম্ভিক যুক্তি, অন্তর্নিহিত অনুচ্ছেদ, মধ্যস্থ অনুচ্ছেদ, পশ্চাদ্বর্তী অনুচ্ছেদ এবং উপসংহারমূলক অনুচ্ছেদ, এবং পঞ্চম থেকে অষ্টম অংশের প্রতিটির দুটি করে 'পদ' থাকত অর্থাৎ দুটি বিপরীতার্থক অনুচ্ছেদ থাকত—তা থেকেই নাম হল 'অষ্টপদী রচনা'। 'অষ্টপদী রচনা' এই কথাটি কালক্রমে চীনে একটি প্রচলিত বাগ্বিধি হয়ে দাঁড়ায় যা দিয়ে ছকে বাঁধা আঙ্গিকসর্বস্বতা ও অসারতাকেই বোঝানো হতো। সুতরাং 'ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা' কথাটি বিপ্লবীদের মধ্যেকার কিছু কিছু লোকের সেইসব রচনাকে বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হতো যারা এন্তার বিপ্লবী বুলি কপচাতেন এবং এলোপাথাড়ি কথাবার্তাগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করতেন যাতে তথ্যের বিশ্লেষণ বলে কিছুই থাকত না। 'অষ্টপদী রচনার' মতোই এদের লেখা ছিল ফাঁকা কথার স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

২। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত এই সিদ্ধান্ত ছিল বুদ্ধিজীবীদের দলে টেনে আনার বিষয়ে; 'বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক সংখ্যায় দলে টেনে আনুন'—এই শিরোনাম দিয়ে মাও সে-তুঙ-এর রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে তা প্রকাশিত হয়। ('নবয়ুগ' তক' সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮ দেখুন।)

৩। জে. ভি. স্তালিন: 'লেনিনবাদের ভিত্তি', **লেনিনবাদের সমস্যা**, ইংরাজী সংস্করণ, বিদেশীভাষা প্রকাশনা সংস্থা, মস্কো' ১৯৫৪, পৃঃ ৩১ দ্রষ্টব্য।

৪। কনফুসিয়াস ও তার শিষ্যদের কথোপকথনের বিবরণমূলক গ্রন্থ **কনফুসিয়াস উপদেশাবলীর** এইটি হচ্ছে প্রথম বাক্যটি।

৫। চ্যাং কুয়ো-তাও চীন বিপ্লবের একজন দলত্যাগী। প্রথম জীবনে বিপ্লবের ফাটকা খেলতে নেমে সে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। পার্টিতে সে এমন বহু ভুল করে যাতে করে গুরুতর অপরাধজনক ব্যাপার ঘটে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত হচ্ছে ১৯৩৫ সালে লালফৌজের উত্তরমুখী অভিযানে তার বিরোধিতা এবং পরাজয়ের মনোবৃত্তি ও আত্মবিলুপ্তির পরিণতি হিসাবে সেচুয়ান-সিকাং সীমান্তের সংখ্যালঘু জাতিসত্তা অধ্যুষিত অঞ্চলে লালফৌজকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার ওকালতি, তাছাড়া, পার্টি ও কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতকতার কাজকর্ম চালায়, নিজের ভুয়া একটি কেন্দ্রীয় কমিটি সে স্থাপন করে, পার্টি ও লালফৌজের ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং লালফৌজের চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনীর বিরাট ক্ষতিসাধন করে। কমরেড মাও সে-তুঙ ও কেন্দ্রীয় কমিটির ধৈর্যশীল শিক্ষামূলক অভিযানের ফলে চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনী এবং বিপুল সংখ্যক সৈন্য অতিশীঘ্র পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক নেতৃত্বাধীনে ফিরে আসে এবং পরবর্তী সংগ্রামসমূহে গৌরবময় ভূমিকা পালন করে। চ্যাং কুয়ো-তাও সংশোধনের অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় এবং ১৯৩৮ সালের বসন্ত কালে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল থেকে সে পালিয়ে যায় এবং কুওমিনতাঙ গোয়েন্দা পুলিশ দলে যোগ দেয়।

৬। জে. ভি. স্তালিন: 'কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকলাপ সম্পর্কে সি. পি. এস. ইউ (বি)র অষ্টাদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট'; **লেনিনবাদের সমস্যা**, ইংরাজী সংস্করণ, এফ. এল. পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৪, পৃঃ ৭৮৪-৮৬।

৭। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে জাপানী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের জনগণ বারেবারে জাপানী পণ্য বয়কট করাকে সংগ্রামের একটি পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করেছেন—যেমন, ১৯১৯ সালে দেশপ্রেমিক ৪ঠা মে আন্দোলনকালে; ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় পরবর্তীকালে এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময়ে।

ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরোধিতা করুন

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২

কমরেড কাই-ফেঙ এইমাত্র আজকের সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। বিষয়ীবাদ ও সংকীর্ণতাবাদ যে সর্ববিধ উপায়ে ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনাকে (বা পার্টিগত 'অষ্টপদী রচনা'কে)[১] তাদের প্রচারের হাতিয়ারে ও প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগায় আমি এখন তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমরা বিষয়ীবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি কিন্তু যদি আমরা ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনানীতির কবল থেকে একই সঙ্গে মুক্ত হতে না পারি তবে তাদের লুকিয়ে থাকার ক্ষেত্র থেকেই যাবে। আমরা যদি তাকেও চুরমার করে দিতে পারি তবে বিষয়ীবাদ ও সংকীর্ণতাবাদকেও আমরা 'দমন করে রাখতে' পারব এবং এই দানব দুটিকেই তাদের স্বরূপে দেখিয়ে দিতে পারব আর 'রাস্তা দিয়ে ইঁদুরগুলি ছুটে বেড়ানোর সময় সকলেই যেমন চিৎকার করে বলতে থাকে: ওদের শেষ করে দাও! ওদের শেষ করে দাও!' সেরকম অতি সহজেই তাদের তখন আমরা নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারব।

কোন একজন লোক যদি শুধু তার নিজের পড়ার জন্য ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা লেখেন। তাতে তেমন কিছু যায় আসে না। কিন্তু তিনি তারপর লেখাটা যখন আরেকজনকে পড়তে দেন তখন পাঠকদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেল এবং বেশ খানিকটা ক্ষতি সাধিত হয়ে গেল। তিনি যদি তা ছড়িয়ে দেন, কপি করে বিলিয়ে দেন, খবরের কাগজে ছাপান বা বই আকারে প্রকাশ করেন তবে সমস্যাটা সত্যিই বড় হয়ে দেখা দেয় কারণ তা এভাবে বহু লোককেই প্রভাবিত করতে পারে এবং ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা যারা লেখে তাঁরা সব সময়ই বহু সংখ্যক পাঠকের খোঁজে থাকেন। সুতরাং এটির মুখোশ খুলে ধরা ও তাকে ধ্বংস করে দেওয়া অবশ্য করণীয় কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

তাছাড়া ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা হচ্ছে এক ধরনের 'বিদেশী ছক', অনেক আগেই লু স্যুন তাকে আক্রমণ করেছিলেন।[২] এটিকে আমরা পার্টিগত 'অষ্টপদী রচনা' বলছি কেন? তার কারণ হচ্ছে বিদেশী আমেজ থাকলেও

ইয়েনানে কর্মীদের একটি সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতাটি করেন।

এতে স্বদেশী মাটির গন্ধও খানিকটা থাকে। মনে হয় এটাকেও এক ধরনের সৃজনশীল রচনা বলে গণ্য করা যেতে পারে! আমাদের লোকেরা সৃজনশীল কিছু রচনা করেননি এটা কে বলবে? এই তো একটি! (উচ্চ হাস্যরোল।)

আমাদের পার্টিতে বিশেষ করে কৃষি-বিপ্লবের সময়ে ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, মাঝে মাঝে তার প্রচুর প্রাদুর্ভাবই দেখা গেছে।

ঐতিহাসিকভাবে দেখলে, ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা হচ্ছে ৪ঠা মে আন্দোলনের একটি প্রতিক্রিয়া।

৪ঠা মে আন্দোলনকালে আধুনিক-মনা ব্যক্তিরা ধ্রুপদী চীনা ভাষা ব্যবহারের বিরোধিতা করেন এবং চীনা কথ্য ভাষা ব্যবহারের কথা বলেন, ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্রবাক্যের বিরোধিতা করেন এবং বিজ্ঞান ও গণতন্ত্র প্রবর্তনের কথা বলেন—এইগুলি সবই সঠিক কাজ হয়েছিল। আন্দোলন তখন ছিল উদ্দাম ও প্রাণবন্ত, প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক। ঐ সময়ে শাসকশ্রেণীগুলি ছাত্রদের মধ্যে কনফুসীয় শিক্ষার প্রচার করত এবং কনফুসিয়াসের মতবাদের আনুপূর্বিক সকল বিধানকেই ধর্মীয় শাস্ত্রবাক্যজ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন করতে জনগণকে বাধ্য করত, সকল লেখকেরাই ধ্রুপদী ভাষায় লিখতেন। এককথায় শাসকশ্রেণী-সমূহ ও তাদের স্তাবকগণ কর্তৃক যা লিখিত হতো ও যা শিক্ষা দেওয়া হতো বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত উভয় দিক থেকেই তা ছিল ছকে বাঁধা রচনা ও শাস্ত্র-বাক্যের সমগোত্রীয়। ঐটি ছিল প্রাচীন ছক ও প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য। ৪ঠা মে আন্দোলনের সুবিপুল সাফল্যটি ছিল এই যে তা প্রকাশ্যে প্রাচীন ছকের ও প্রাচীন শাস্ত্রবাক্যের কদর্যতাকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল এবং ঐগুলির বিরুদ্ধে জনগণকে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছিল। ঐ আন্দোলনের অন্য একটি মহান ও প্রাসঙ্গিক সাফল্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম, কিন্তু প্রাচীন ছক ও প্রাচীন শাস্ত্রবাক্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ৪ঠা মে আন্দোলনের একটি অন্যতম মহান সাফল্য হয়েই রয়েছে। তারপরে অবশ্য বিদেশী ছকে বাঁধা রচনা ও বিদেশী শাস্ত্রবাক্য আসরে এল। মার্কস-বাদের বিপরীতগামী আমাদের পার্টির মধ্যেকার কিছু লোকও বিদেশী ছক ও শাস্ত্রবাক্যকে বিষয়ীবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ও ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা হিসেবে বিকশিত করে তুললেন। ঐগুলি হল নতুন ছক ও নতুন শাস্ত্রবাক্য। এইগুলি বহু কমরেডের মনে এমন গভীরভাবে দানা বেঁধেছে যে আজও ওদের ভাবমানসকে

নতুন করে গড়ে তোলা অত্যন্ত দুরূহ একটি কর্তব্য হয়েই রয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ৪ঠা মে অধ্যায়ের প্রাণবন্ত, উদ্দাম, প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক যে আন্দোলন প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ছকে বাঁধা রচনা ও শাস্ত্রবাক্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল তাকেই কিছু লোক ঠিক তার বিপরীত বস্তুতে পরিণত করলেন, সৃষ্টি করলেন নতুন ছকে বাঁধা রচনা ও শাস্ত্রবাক্য। ঐ পরবর্তীগুলি না রইল প্রাণবন্ত ও উদ্দাম, হয়ে দাঁড়াল মৃত আর আড়ষ্ট, প্রগতিমুখী রইল না, হল পশ্চাৎমুখী, বৈপ্লবিক হল না, হল বিপ্লবের পথে প্রতিবন্ধক। তাই বলা যায়, বিদেশী ছকে বাঁধা রচনা বা ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা হচ্ছে ৪ঠা মে আন্দোলনের মূল প্রকৃতির একটি প্রতিক্রিয়া। ৪ঠা মে আন্দোলনের কিন্তু নিজেরই দুর্বলতা ছিল। বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরই মার্কসবাদের বিচারশীলতার মনোভাব ছিল না এবং পদ্ধতি হিসেবে তাঁরা যা ব্যবহার করেছিলেন তা সাধারণভাবে ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীরই পদ্ধতি অর্থাৎ আঙ্গিকসর্বস্ব পদ্ধতি। প্রাচীন ছক ও প্রাচীন শাস্ত্রবাক্যের বিরোধিতা করে এবং বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের সপক্ষে কথা বলে তাঁরা ঠিক কাজই করেছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন বাস্তব পরিস্থিতি, ইতিহাসের এবং বিদেশী বিষয়াদির বিচারের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিচারশীল মনোভাবের তাঁদের অভাব ছিল আর তাই যাকে তাঁরা খারাপ বলে মনে করেছেন তাকে চূড়ান্তভাবে ও সম্পূর্ণভাবেই খারাপ বলে মনে করেছেন এবং যাকে ভাল বলেছেন তাকে চূড়ান্তভাবে ও সম্পূর্ণভাবেই ভাল বলে মনে করেছেন। সমস্যাসমূহের প্রতি এই আনুষ্ঠানিকতার মনোভাব আন্দোলনের পরবর্তী গতিধারাকে প্রভাবিত করেছিল। বিকাশের পথে ৪ঠা মে আন্দোলন দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি অংশ তার বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে মার্কসবাদের ভিত্তিতে নবরূপ দান করে; কমিউনিস্টগণ ও কিছু দল-বহির্ভূত মার্কসবাদীরা ঠিক এইটিই করেছিলেন। অন্য অংশটি বুর্জোয়াশ্রেণীর পথ ধরলেন; এটার বিকাশ ঘটল দক্ষিণমুখী আনুষ্ঠানিকতাবাদে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও অবস্থা আশানুরূপ ছিল না; ওখানেও কিছু সদস্যের বিচ্যুতি দেখা দিল এবং মার্কসবাদের ওপর সুদৃঢ় অধিকার না থাকার ফলে আনুষ্ঠানিকতাবাদের, যেমন বিষয়ীবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ও ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার ভুল ঘটল। এটার বিকাশ ঘটল 'বাম' অনুসারী আনুষ্ঠানিকতাবাদে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনারীতি

কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় বরং একদিকে তা ছিল ৪ঠা মে আন্দোলনের ইতিবাচক শক্তিগুলির একটি প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার এবং অন্যদিকে তা হচ্ছে নেতিবাচক শক্তিগুলির একটি উত্তরাধিকার, ধারানুসরণ বা বিকাশ। এই বিষয়টি বোঝা আমাদের পক্ষে খুবই প্রয়োজন। ৪ঠা মে আন্দোলনকালে প্রাচীন ছক ও প্রাচীন শাস্ত্রবাক্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যেমন বৈপ্লবিক ও প্রয়োজনীয় ছিল, তেমনি নতুন ছকে বাঁধা রচনা নতুন শাস্ত্রবাক্যানুগামিতাকে মার্কসবাদের সহায়তা নিয়ে সমালোচনা করাও ছিল বৈপ্লবিক ও প্রয়োজনীয়। প্রাচীন ছকের ও প্রাচীন শাস্ত্রানুগামিতার বিরুদ্ধে ৪ঠা মে আন্দোলনকালে যদি সংগ্রাম না হতো তাহলে চীনের জনগণের মন ঐগুলির দাসত্ব থেকে মুক্তি পেত না এবং চীনের স্বাধীনতা ও মুক্তির কোন আশাই থাকত না। ৪ঠা মের আন্দোলনের সময়ে কাজটি সবেমাত্র শুরু হয়েছিল—সমগ্র জনগণ যাতে করে প্রাচীন ছক ও শাস্ত্রবাক্যানুগামিতার প্রাধান্যের কবল থেকে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে সমর্থ হতে পারেন তার জন্য বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনের পথে বিপুল পরিমাণ কাজ ও খুবই বিরাট প্রয়াসের এখনো প্রয়োজন রয়েছে। আমরা আজ যদি নতুন ছকে বাঁধা রচনারীতি ও নতুন গোঁড়ামির বিরোধিতা না করি, তবে চীনের জনগণের মন অন্য এক ধরনের আনুষ্ঠানিকতাবাদের শিকলে বাঁধা পড়ে থাকবে। আমরা যদি ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনারীতির বিষ ও গোঁড়ামীর যে ভুলভ্রান্তিগুলি পার্টি কমরেডদের একটি অংশের (অবশ্যই, মাত্র একটি অংশের) মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তার কবল থেকে যদি আমরা মুক্ত হতে না পারি তবে একটি শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত বৈপ্লবিক মনোভাব জাগিয়ে তোলা, মার্কসবাদের প্রতি ভ্রান্ত মনোভাব গ্রহণের বদ অভ্যাসটি দূর করা এবং যথার্থ মার্কসবাদের প্রসার ও বিকাশসাধন করা যাবে না। তদুপরি, সমগ্র জনগণের মধ্যে প্রাচীন ছকে বাঁধা রচনা ও শাস্ত্র-বাক্যের প্রভাবের বিরুদ্ধে এবং বিদেশী ছকে বাঁধা রচনা ও শাস্ত্রবাক্যের যে প্রভাব বহু লোকের মধ্যে রয়েছে তার বিরুদ্ধে উদ্যমী সংগ্রাম পরিচালনা করা অসম্ভব এবং এই প্রভাবগুলিকে চুরমার করে দেওয়া ও ঝেঁটিয়ে দূর করে দেওয়ার লক্ষ্যে উপনীত হওয়াও অসম্ভব।

বিষয়ীবাদ, সঙ্কীর্ণতাবাদ ও ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা—এই তিনটিই মার্কসবাদ-বিরোধী এবং এইগুলি শ্রমিকশ্রেণীর নয়, শোষকশ্রেণীসমূহেরই স্বার্থসাধন করে। আমাদের পার্টিতে পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শেরই তা প্রকাশ।

চীনে বিপুল সংখ্যক পেটি-বুর্জোয়ারা রয়েছে এবং আমাদের পার্টি এই বিপুল শ্রেণী কর্তৃক চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। আমাদের পার্টি-সদস্যদের এক বিরাট অংশ এসেছেন এই শ্রেণী থেকে এবং যখন তাঁরা পার্টিতে যোগদান করেন তখন অনিবার্যভাবেই তাঁরা তাঁদের খাটো বা দীর্ঘ, পেটি-বুর্জোয়া লেজুড়টি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। দমিত ও রূপান্তরিত না হলে পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবীদের উন্মত্ত আবেগ এবং একদেশদর্শিতা সহজেই বিষয়ীবাদ ও সঙ্কীর্ণতাবাদের জন্ম দিতে পারে—এবং বিদেশী ছকে বাঁধা রচনা বা ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা হচ্ছে তারই প্রকাশের একটি মাধ্যম।

এই বিষয়গুলিকে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া বা ঝেঁটিয়ে দূর করে দেওয়া সহজ কর্ম নয়। যথাযথভাবেই তা করতে হবে অর্থাৎ সেটা করতে হবে লোক-জনদের সঙ্গে যুক্তি প্রদর্শনের কষ্টকর পথ ধরে। আমরা যদি আন্তরিকভাবে ও যথাযথভাবে যুক্তি প্রদর্শন করি তবেই তা কার্যকর হবে। এই যুক্তি প্রদর্শনের প্রক্রিয়ায় প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে এই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জোরে নাড়া দিয়ে চিৎকার করে ওদেরকে বলা 'আপনারা অসুস্থ !' এবং এভাবে একটা ঘা দিয়ে তাদের রীতিমতো ঘাম ধরিয়ে দেওয়া আর তারপর খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের চিকিৎসা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া।

এখন ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনাকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক ব্যাধিগুলি কোথায় নিহিত রয়েছে। বিষের প্রতিষেধক হিসেবে বিষ ব্যবহার করে ছকে বাঁধা অষ্টাঙ্গিক রচনার ভঙ্গীটি অনুকরণ করে আমরা নিম্নোক্ত 'অষ্টপদী' বক্তব্যটি উপস্থিত করতে পারি যাকে আটটি প্রধান অভিযোগলিপি বলা চলে।

ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ হচ্ছে এই যে তা অন্তহীনভাবে পাতার পর পাতা ফাঁকা বাক্যজাল দিয়ে ভরে তোলে। আমাদের কিছু কমরেড অন্তঃসারশূন্য লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লিখতে খুবই ভালবাসেন অনেকটা 'নোংরা স্ত্রীলোকের পা-ঢাকা পট্টির মতো যেমন লম্বা তেমনি দুর্গন্ধে ভরা'। তাঁরা এমন লম্বা আর এমন শূন্যগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেন কেন ? তার একটি মাত্র ব্যাখ্যাই রয়েছে ; তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন যেন জনসাধারণ তা পড়তে না পারেন। যেহেতু রচনাগুলি বেজায় লম্বা আর ফাঁপা, জনসাধারণ তা দেখেই মাথায় হাত দিয়ে বসেন। ঐগুলি তাঁরা পড়বেন এটা আশা করা যায় ? নিতান্ত সরলমতি লোকদের চমক দেওয়া ছাড়া এইসব লেখা একেবারেই বাজে এবং ওদের মধ্যে এতে করে খারাপ প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে এবং বদ

অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। গত বছর ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক যুদ্ধ আরম্ভ করেছে এবং তা সত্ত্বেও জুলাইয়ের তিন তারিখ স্তালিনের বক্তৃতা লম্বায় আমাদের **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়ের বেশি ছিল না। যদি আমাদের কোন ভদ্রলোক ঐ বক্তৃতাটি লিখতেন, তাহলে হালটা একবার শুধু আন্দাজ করে দেখুন! কম করেও কয়েক লক্ষ কথা তার জন্য প্রয়োজন হতো। আমরা যুদ্ধের মাঝখানে রয়েছি, কী করে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আর সারবান প্রবন্ধ লিখতে হয় তা আমাদের শেখা দরকার। অবশ্য ইয়েনানে এখনো যুদ্ধ শুরু হয়নি, কিন্তু আমাদের সৈন্যরা রণক্ষেত্রে প্রতিদিন যুদ্ধ করছেন আর পশ্চাদ্ভাগে মানুষেরা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। রচনাগুলি যদি অনেক লম্বা লম্বা হয়, তাহলে সেগুলি কারা পড়বেন? রণক্ষেত্রের কিছু কিছু কমরেডও লম্বা লম্বা রিপোর্ট লিখতে ভালবাসেন। কষ্ট করে তাঁরা সেগুলি লেখেন এবং পড়ার জন্য আমাদের কাছে এখানে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেগুলি পড়বে এমন সাধ্য কার? যদি লম্বা আর ফাঁকা রচনা কোন কাজেরই না হয়, তবে কি সংক্ষিপ্ত আর ফাঁকাগুলি মন্দের ভাল? না, সেগুলিও ভাল নয়। সকল ফাঁকা কথাকেই আমাদের নিষেধ করে দিতে হবে। কিন্তু প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে লম্বা আর দুর্গন্ধে ভরা নোংরা স্ত্রীলোকদের পা-পট্টিগুলিকে আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করা। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন, **ক্যাপিট্যাল** কি লম্বা নয়? তাকে কী করব?'

উত্তরটা খুবই সোজা, এখনই পড়তে লেগে যান। একটা প্রবাদ আছে 'যেমন খাড়াই পাহাড় তেমনি চড়া গান গাইতে হয়,' অন্য একটিতে আছে, 'খাবার বুঝে খিদে, দেহ বুঝে পোশাক।' যাই আমরা করি না কেন প্রকৃত পরিস্থিতি অনুযায়ী তা হওয়া চাই, প্রবন্ধ লেখা বা বক্তৃতা করার বেলাতেও সেই একই কথা। আমরা বিরোধিতা করছি লম্বা জট পাকানো আর শূন্যগর্ভ ছকে বাঁধা লেখার, ভাল হতে গেলে প্রতিটি জিনিসকে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হতে হবে সেকথা আমরা বলছি না। ঠিকই যুদ্ধের সময় আমাদের ছোট ছোট রচনা দরকার কিন্তু তারচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সারবস্তু আছে এমন রচনাই আমাদের চাই। অন্তঃসারশূন্য রচনার পক্ষে বলার মতো একেবারেই কিছু নেই এবং তা ঘোরতর আপত্তিজনক। বক্তৃতার বেলাতেও সেই একই কথা; সকল ফাঁকা আর লম্বা কথার জাল বোনা বক্তৃতার সমাপ্তি আমাদের ঘটাতেই হবে।

ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ হচ্ছে লোকজনদের

ভয় দেখানোর জন্য তা একটা জাঁক দেখায়। কিছু কিছু ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা শুধু লম্বা আর ফাঁকাই নয়, তা লোকজনদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে নানা ভাবভঙ্গীতে ভরা; এতে একেবারে মারাত্মক রকমের বিষ রয়েছে। লম্বা জট পাকানো আর ফাঁকা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে অপরিপক্কতা দায়ী হতে পারে, কিন্তু লোকজনদের ভয় দেখানো ভাবভঙ্গী দেখানো তো নিছক অপরিপক্কতা নয়, তা একেবারে সরাসারি প্রতারণায় ভরা। এই ধরনের লোকদের সমালোচনা করেই লু স্যুন একবার বলেছিলেন, 'অপমানকর উক্তি ছুঁড়ে মারা আর ভয়ভীতি প্রদর্শন করা নিশ্চয়ই যুদ্ধ করা নয়।'[৩] যা বৈজ্ঞানিক তা কোন সময়ই সমালোচনাকে ভয় করে না, কারণ বিজ্ঞান হচ্ছে সত্য, তার খণ্ডিত হওয়ার কোন ভয়ই তার নেই। কিন্তু যারা পার্টিগত ছকের আকারে বিষয়ীবাদী, সঙ্কীর্ণতাবাদী প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদি লেখে তাদের খণ্ডিত হওয়ার ভয় থাকে, তারা নিতান্ত কাপুরুষ আর তাই অন্যদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য ভাবভঙ্গীর ওপর তারা নির্ভর করে এবং ভাবে এতে করে তারা লোকজনের মুখ বন্ধ করে দিতে পারবে এবং 'বাজীমাৎ' করে দিতে পারবে। এসব ভাবভঙ্গীতে সত্যের কোন প্রকাশ থাকে না, তা সত্যের প্রতিবন্ধক হয়েই দাঁড়ায়। সত্য লোকজনদের ভড়ং দেখিয়ে ভয় ধরায় না বরং নিজের কথা বলে যায় আর সততা ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করে যায়। অনেক কমরেডের রচনায় ও বক্তৃতায় দুটো কথার ব্যবহার দেখা যায়, একটি হচ্ছে 'নির্মম সংগ্রাম' আর অন্যটি হচ্ছে 'নিষ্ঠুর আঘাত'। শত্রুর বিরুদ্ধে বা শত্রু ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে এইসব ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু আমাদের নিজেদের কমরেডদের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করা অন্যায়। প্রায়ই এটা দেখা যায় যে শত্রু ও শত্রুর ভাবাদর্শ পার্টিতে অনুপ্রবেশ করে, **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ**-এর উপসংহারে চতুর্থ বিষয় হিসেবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'এই শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের নিঃসন্দেহে নির্মম সংগ্রাম চালাতে হয় ও নিষ্ঠুর আঘাত হানতে হয়, কারণ ঐ বদমায়েশরা ঠিক এই ব্যবস্থাগুলিই পার্টির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে; আমরা যদি তাদের প্রতি সহনশীল হই, আমরা তাহলে ঠিক তাদের ফাঁদেই পড়ে যাব। কিন্তু এই একই ব্যবস্থাগুলির যেসব কমরেডরা মাঝেমধ্যে শুধু ভুলভ্রান্তি করে বসেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা চলে না; তাঁদের ক্ষেত্রে

আমাদের প্রয়োগ করতে হবে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পদ্ধতি, যে পদ্ধতিটির কথা **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ** এর উপসংহারের পঞ্চম বিষয় হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে। যেসব কমরেড মাঝেমধ্যে ভুলভ্রান্তি করে বসেন তাঁদের বিরুদ্ধে আগে যে কমরেডরা চিৎকার করে 'নির্মম সংগ্রাম' পরিচালনার এবং 'নিষ্ঠুর আঘাত, হানার কথা বলেছিলেন সেটা তাঁরা যার জন্য করেছিলেন তার একটি কারণ হচ্ছে এই যে, যাদের নিয়ে তাঁরা কারবার করছেন সেই ব্যক্তিদের কোন বিচারই তাঁরা করতে পারেননি এবং তার অন্য কারণ হচ্ছে তাঁরা এই ভাবভঙ্গী দেখাচ্ছেন শুধু অন্যদের ভয় দেখাবার জন্য। এটা ভাল পদ্ধতি নয়, তা যার সম্বন্ধেই তাঁরা তা ব্যবহার করুন না কেন। শত্রুর বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শনের এই কৌশলও সম্পূর্ণতাই অকেজো এবং আমাদের কমরেডদের ক্ষেত্রে এতে শুধু ক্ষতিই সাধিত হতে পারে। এই কৌশলটি শোষকশ্রেণীসমূহ ও লুম্পেন-প্রলেতারিয়েতরাই তাদের অভ্যাসবশে ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু প্রলেতারিয়েতের এর কোন প্রয়োজন নেই। প্রলেতারিয়েতের কাছে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ আর সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হচ্ছে গুরুতর ও জঙ্গী বৈজ্ঞানিক মনোভাব। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সত্যের জোরেই কমিউনিস্ট পার্টি বেঁচে থাকে, বাস্তব তথ্য থেকে সত্যকে খুঁজে বের করে তার জোরে, বিজ্ঞানের জোরেই তা বেঁচে থাকে, লোকজনকে ভয় দেখিয়ে তা বেঁচে থাকে না। বলার দরকার হয় না, নিজের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের প্রত্যাশা থেকে ভড়ং দেখানোটা আরও অনেক ঘৃণ্য ব্যাপার। সংক্ষেপে বলা যায়, সংগঠন যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও নির্দেশ দেয় এবং কমরেডরা যখন প্রবন্ধ লেখেন, বক্তৃতা করেন তখন ব্যতিক্রমহীনভাবে তাঁদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সত্যের ওপরই নির্ভর করতে হবে এবং একটি যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তা করতে হবে। বিপ্লবের বিজয় অর্জনের এইটিই হচ্ছে একমাত্র ভিত্তি ; আর কিছুতেই কোন কাজ হবে না।

ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ হচ্ছে এই যে তা পাঠক বা শ্রোতাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে। কয়েক বছর আগে ইয়েনানের দেয়ালে একটি শ্লোগান দেখা গেল যাতে লেখা আছে 'শ্রমিক ও কৃষকেরা, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন এবং বিজয়লাভের জন্য প্রয়াসী হোন!' এই শ্লোগানের ভাবটি আদৌ খারাপ নয়। কিন্তু কুং জেন অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষকে বোঝাবার জন্য যে ধরনের হরফ

ব্যবহার করা হয়েছে তা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। যে কমরেড ঐটি লিখেছেন, সন্দেহ নেই তিনি প্রাচীন পণ্ডিতদের শিষ্য, কিন্তু এটা হতবুদ্ধিকর মনে হচ্ছে, তিনি ইয়েনান শহরের দেয়ালের মতো একটা জায়গায়, প্রতিরোধ-যুদ্ধ যখন চলছে এমন একটা সময়ে কেন এ ধরনের হরফে লিখতে গেলেন। মনে হচ্ছে তিনি এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে আছেন যে সাধারণ মানুষ যেন তা পড়তে না পারেন, অন্যথায় এর কোন ব্যাখ্যা মেলে না। যে কমিউনিস্টরা যথার্থভাবেই প্রচারকর্ম করতে চান তাঁদেরকে তাঁদের পাঠক ও শ্রোতাদের কথা ভাবতে হবে এবং যাঁরা তাঁদের প্রবন্ধ ও শ্লোগান পড়বেন এবং তাঁদের বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনা শুনবেন তাঁদের কথা মনে রাখবেন। অন্যথায় কার্যতঃ যা দাঁড়াবে তা হচ্ছে এই যে মনে হবে তিনি যেন প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন কেউ তাঁর লেখা পড়বে না বা তাঁর কথা শুনবে না। অনেক লোক প্রায়ই এটা ধরে নেন যে তাঁরা যা লেখেন ও বলেন তা সকলেই অতি সহজে বুঝতে পারেন, আসলে ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তা নয়। তাঁরা যদি ছকে বাঁধা পার্টিগত ভঙ্গীতে লেখেন বা কথা বলেন তবে লোকজনেরা তা বুঝবে কী করে? 'গরুর কাছে বীণা বাজিয়ে কী লাভ'! এই কথাটির মধ্যে শ্রোতাদের প্রতি একটি খোঁচা রয়েছে। তার জায়গায় যদি শ্রোতাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবটি বসিয়ে দিই তবে খোঁচাটি বাদকের বিরুদ্ধেই ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে। তাঁর শ্রোতার কথা না ভেবে তিনিই-বা কেন বাজিয়ে যাবেন? তার চেয়েও খারাপ কথা হচ্ছে তিনি কাকের মতো কর্কশ স্বরে পার্টিগত ছকে বাঁধা রব তুলছেন অথচ তিনিই জনসাধারণকে দোষ দিচ্ছেন। একটা তীর ছোঁড়ার সময় লক্ষ্যবস্তুর প্রতিই একজনের দৃষ্টি থাকা চাই; বীণা বাজাবার সময় শ্রোতাদের কথা বীণাবাদকের বিবেচনা করা চাই; তাহলে কেমন করে প্রবন্ধ লেখার সময় বা বক্তৃতা করার সময় পাঠক বা শ্রোতাদের কথা হিসেবে না ধরে পারেন? ধরুন, আমি একজন ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই, তিনি যে কেউই হোন না কেন, যদি আমরা একে অন্যকে ভাল করে অন্তর দিয়ে না বুঝতে পারি, একজন আরেকজনের মনের কথা না জানি, তবে কি আমরা একে অন্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠতে পারব? আমাদের প্রচারকার্যে রত কর্মীদের তথ্যানুসন্ধান না করে, অধ্যয়ন না করে এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচার না করে খালি বকবক করলে কোনই ফল হবে না।

ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরুদ্ধে চতুর্থ অভিযোগ হচ্ছে তার ব্যবহৃত

নীরস ভাষা **পীয়েসান**-এর কথাই মনে করিয়ে দেয়। আমাদের ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা সাংহাইয়ে 'ক্ষুদে **পীয়েসান**' নামক যে জীবগুলি দেখা যায় তাদের মতোই শুষ্ক রসকসহীন এবং কদাকার। একটি প্রবন্ধে বা বক্তৃতায় যদি বিদ্যালয় কক্ষে ব্যবহৃত সুরে কয়টি শব্দই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উচ্চারিত হতে থাকে আর তাতে যদি একবিন্দু প্রাণ বা প্রেরণা না থাকে, তবে কি তা **পীয়েসান**-এর মতো কর্কশ-কণ্ঠ ও কিম্ভূত কুৎসিত-দর্শন হয়ে দাঁড়াবে না? সাত বছরে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়ে, কৈশোরে মাধ্যমিক স্কুলে পড়ে, কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে যদি কেউ বেরিয়ে আসে কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনই যোগাযোগ না থাকে এবং এতে করে তার ভাষা যদি দুর্বল ও একঘেয়ে হয়ে পড়ে তারজন্য তাকে কেউ দোষ দেবে না। কিন্তু আমরা বিপ্লবীরা কাজ করছি জনসাধারণের জন্য, আমরা যদি জনসাধারণের ভাষা না জানি তবে আমরা ভালভাবে কাজই করতে পারব না। আমাদের বহু কমরেড যাঁরা বর্তমানে প্রচারকার্যে লিপ্ত রয়েছেন তাঁরা ভাষা নিয়ে কোন অধ্যয়নই করেন না। তাঁদের প্রচার তাই খুবই নীরস হয়ে পড়ে এবং অতি অল্প লোকেই তাঁদের লেখা প্রবন্ধ পড়েন বা তাঁদের বক্তৃতা শোনেন। ভাষা নিয়ে অধ্যয়ন করার দরকারটা কী এবং তার চেয়েও বড় কথা তা নিয়ে এত পণ্ডশ্রমই-বা কেন? কারণ হচ্ছে ভাষার ওপর দখল অর্জন করা সহজ ব্যাপার নয় এবং তার জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন! প্রথমে, জনগণের কাছ থেকে আমাদের ভাষা শিখতে হবে। জনগণের শব্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ, প্রাণবন্ত, সুস্পষ্ট ও প্রকৃত জীবনের অভিব্যক্তিসূচক। যেহেতু আমাদের অনেকেই ভাষার ওপর দখল অর্জন করিনি তাই আমাদের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলিতে প্রাণবন্ত, সুস্পষ্ট ও কার্যকর অভিব্যক্তি অতি অল্পই থাকে এবং তাকে সুস্থ সবল একজন লোকের মতো দেখায় না, দেখায় বিশুষ্ক **পীয়েসান**—এর মতো, নিছক এক ঝুড়ি হাঁড়গোড়ের মতো। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী ভাষাসমূহ থেকে আমাদের যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করতে হবে। যান্ত্রিকভাবে বিদেশী শব্দ আমদানী করলেই চলবে না বা নির্বিচারে সেগুলি ব্যবহার করলেই চলবে না, যা হিতকর তাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং যা আমাদের প্রয়োজন মেটাবে তাই আমাদের নিতে হবে। আমাদের প্রচলিত শব্দ-ভাণ্ডারে ইতিমধ্যেই বহু বিদেশী শব্দ গৃহিত হয়ে গেছে কারণ প্রাচীন চীনা শব্দভাণ্ডার ছিল অপ্রচুর। উদাহরণস্বরূপ, আজ আমরা **কান্‌পু** (অর্থাৎ

কর্মীদের) একটি সভা করছি এবং কান্‌পু এই শব্দটি বিদেশী একটি শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। বিদেশ থেকে বহু নতুন জিনিসই আমরা গ্রহণ করে যাব, শুধু প্রগতিশীল ধারণা নয় বরং নতুন শব্দও আমরা গ্রহণ করব। তৃতীয়তঃ, চীনের চিরায়ত ভাষায় যা কিছু জীবন্ত রয়েছে তা থেকেও আমাদের গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু ধ্রুপদী চীনা ভাষা আমরা যথেষ্ট গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিনি তার জন্য আমরা এখনো তার মধ্যেকার প্রচুর জীবন্ত যা রয়েছে তার পরিপূর্ণ ও যথার্থ ব্যবহার করিনি। অবশ্যই একথা ঠিক যে আমরা অপ্রচলিত বাগ্‌ধারা ও পরোক্ষ ইঙ্গিতময় ভাষা ব্যবহারের ঘোর বিরোধী—এটা একেবারে চূড়ান্ত কথা। কিন্তু যা ভাল এবং যা আমাদের পক্ষে এখনো হিতকর তাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। যারা ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনাধারায় একান্তভাবেই ব্যাধিগ্রস্ত তারা জনসাধারণের ভাষায়, বিদেশী ভাষায় অথবা ধ্রুপদী চীনা ভাষায় যা কিছু হিতকর তা নিয়ে অধ্যয়নের প্রয়াস চালায় না, ফলে তাদের শুষ্ক ও নীরস প্রচারকার্যকে জনগণ পছন্দ করেন না এবং তাদের মতো অকেজো ও অদক্ষ প্রচারকর্মীদের আমাদেরও কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রচারকর্মী কারা? শুধু শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক ও শিল্পীরাই তাঁদের মধ্যে নেই, আমাদের সকল কর্মীই তাদের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ হিসাবে, সামরিক হাই কম্যাণ্ডারদের কথাই ধরুন। তাঁরা যদিও কোন প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে যান না তবু তাঁদের সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, লোকজনদের নিয়ে কাজকর্ম করতে হয়। এটা প্রচারকার্য ছাড়া আর কী? যখন একজন লোক অন্যের সঙ্গে কথা বলেন তখন তিনি তো প্রচারকার্যই করেন। তিনি যদি বোবা না হন তবে সব সময়েই তাঁর কিছু বলার মতো কথা থাকবে। সুতরাং, আমাদের সকল কমরেডকেই ভাষা নিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে।

ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরুদ্ধে পঞ্চম অভিযোগ হচ্ছে এই যে তা বিষয়-গুলিকে জটিল সব শিরোনাম দিয়ে এমনভাবে সাজায় যেন ঐ লোকেরা একটি চীনা ঔষধালয় খুলতে যাচ্ছে। যে কোন চীনা ঔষধালয়ে গিয়ে দেখুন, দেখবেন অনেক খোপ আর অসংখ্য দেরাজের প্রতিটিতে নানা ওষুধের নাম লেখা রয়েছে—টংক্যাল, ফক্সগ্লাভ, রুবার্ব, সল্টপিটার···হাঁ, যা যেমনটি থাকা দরকার তাই রয়েছে। আমাদেই কমরেডরাও ঐ পদ্ধতিই বেছে নিয়েছেন। তাঁদের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাতে, তাঁদের বই ও রিপোর্টে প্রথমে তাঁরা ব্যবহার করেন

বড় হাতের চীনা সংখ্যাগুলি, দ্বিতীয়তঃ, ব্যবহার করেন ছোট হাতের চীনা সংখ্যাগুলি, তারপর তৃতীয় পর্যায়ে চীনের দশটি স্বর্গীয় রচনায় ব্যবহৃত হরফগুলি তাঁরা ব্যবহার করেন, তারপর চতুর্থ পর্যায়ে পৃথিবীর বারোটি শাখার ব্যবহৃত হরফগুলি ব্যবহার করেন, তারপর ইংরাজী বড়হাতের অক্ষর, ছোটহাতের অক্ষর, তারপর আরবী সংখ্যাগুলি ইত্যাদি, কী নয় তাই বলুন! কপাল ভাল, আমাদের পূর্বপুরুষেরা ও বিদেশীয়রা আমাদের জন্য এতসব প্রতীক সৃষ্টি করে গিয়েছেন যার জন্য অতি অল্প আয়াসেই একটি চীনা ফার্মেসী খুলে দেওয়া যাচ্ছে! এন্তার বাগ্‌বিন্যাস ও এইসব প্রতীকে পরিকীর্ণ একটি প্রবন্ধ যদি সমস্যাবলীর উত্থাপন, বিশ্লেষণ ও সমাধানের চেষ্টা না করে, কোন কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে একটা অবস্থান গ্রহণ না করে অন্তঃসার-শূন্য হয়েই থেকে যায় তবে তা একটা চীনা ফার্মেসী ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি এ কথা বলছি না, পূর্বোক্ত ঐ প্রতীকগুলি ব্যবহার করা চলবে না, কিন্তু সমস্যার প্রতি এই মনোভঙ্গীটি ভ্রান্ত। চীনের ফার্মেসী থেকে ধার করা এই পদ্ধতিটিকে আমাদের অনেক কমরেডই খুব পছন্দ করেন, তা প্রকৃত-পক্ষে অত্যন্ত স্থূল, শিশুসুলভ ও বাক্যবাগীশতারই প্রকাশ। আনুষ্ঠানিক-বাদী এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিষয়গুলিকে তাদের বাহ্যিক আদল অনুসারেই শ্রেণীভুক্ত করা হয়, তাদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের দিক থেকে তা করা হয় না। একগুচ্ছ ধারণাকে তাদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক অনুসারে না বিচার করে যদি একটি প্রবন্ধে, বক্তৃতায় বা রিপোর্টে ঠেসে দেওয়া হয় শুধুমাত্র তাদের বাহ্যিক আদল অনুসারে, তবে তা হচ্ছে শুধু ধারণা নিয়ে খেলা করারই সামিল। তার দেখাদেখি অন্যরাও এই একই খেলা শুরু করে দিতে পারে যার ফল দাঁড়াবে এই যে তারা কেউ আর সমস্যাগুলি নিয়ে মাথা খাটাবে না, বিষয়-গুলির অন্তরে প্রবেশ করবে না, শুধু বিষয়গুলিকে ক-খ-গ-ঘ ইত্যাদি ক্রমানু-সারে সাজিয়েই পরিতৃপ্ত হয়ে বসে থাকবে। সমস্যা বলব কাকে? সমস্যা হচ্ছে একটি জিনিসের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব। যখন একটি দ্বন্দ্ব সমাধানহীন হয়ে থাকে তখন বলা হয় একটা সমস্যা রয়েছে। যেহেতু সমস্যা রয়েছে আপনাকে হয় সমস্যার এই পক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে, এবং সমস্যাটি উত্থাপন করতে হবে। সমস্যাটি উত্থাপন করার জন্য আপনাকে প্রথমেই একটি প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান করতে হবে, এবং আপনার সামনেকার সমস্যা বা দ্বন্দ্বটির দুটো মৌলিক দিককেই অনুশীলন করে দেখতে হবে, তারপরই আপনি দ্বন্দ্বটির প্রকৃতি উপলব্ধি করতে

পারবেন। সমস্যা নিরূপণের এই হচ্ছে ধারা। প্রাথমিক অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করলে সমস্যাটি নিরূপণ করা যায়, সমস্যাটি উত্থাপন করা যায়, তখনো কিন্তু আপনি তা সমাধান করতে পারেননি। সমস্যার সমাধান করতে হলে ধারাবাহিক ও আনুপূর্বিক অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। এটি হচ্ছে বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া। সমস্যা উত্থাপনের জন্যও বিশ্লেষণের প্রয়োজন। অন্যথায় বিশৃংখল ও বিক্ষিপ্ত একগাদা বিষয়ের ভীড়ের মধ্যে আপনি আন্দাজই করে উঠতে পারবেন না সমস্যা বা দ্বন্দ্বটি কোথায়। কিন্তু এখানে বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া বলতে আমরা ধারাবাহিক ও আনুপূর্বিক বিশ্লেষণের একটি প্রক্রিয়াকেই বোঝাচ্ছি। প্রায়ই দেখা যায় সমস্যাটি যদিও উত্থাপন করা হয়েছে তবুও তার সমাধান করা যাচ্ছে না কারণ বিষয়গুলির আভ্যন্তরীণ সম্পর্কগুলি তখনো উদ্‌ঘাটিত করা হয়নি, ধারাবাহিক ও আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ তখনো করা হয়নি ; ফলে সমস্যাটির গতিপথ আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই না, সংশ্লেষণ করতে পারি না এবং তাই সমস্যাটির ভালভাবে সমাধানও করতে পারি না। একটি প্রবন্ধ বা বক্তৃতা গুরুত্বপূর্ণ ও পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্য রচিত হয়ে থাকলে, তাতে একটি বিশেষ সমস্যা উত্থাপিত হওয়া উচিত, তারপর তার বিশ্লেষণ থাকা চাই এবং তারপর সমস্যাটির প্রকৃতি নির্দেশ করে তাতে একটি সংশ্লেষণ থাকা চাই এবং সমস্যাটির সমাধানের একটি পদ্ধতিও হাজির করা চাই ; এই সমগ্র প্রক্রিয়াতে আনুষ্ঠানিকতাবাদী পদ্ধতি নিরর্থক। যেহেতু শিশুসুলভ, স্থূল, বাকসর্বস্ব ও অলস মানসিকতাজাত আনুষ্ঠানিকতাবাদী পদ্ধতি আমাদের পার্টিতে প্রচলিত রয়েছে, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দেওয়া ; একমাত্র তাহলেই প্রত্যেকের পক্ষে সমস্যার পর্যবেক্ষণ, উত্থাপন, বিশ্লেষণ ও সমাধানের মার্কসবাদী পদ্ধতি ব্যবহার করতে শেখা সম্ভব হবে ; একমাত্র তাহলেই আমরা ভালভাবে আমাদের কাজ করতে পারব এবং একমাত্র তাহলেই আমাদের বিপ্লবী লক্ষ্যের বিজয় অর্জন করা সম্ভব হবে।

ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরুদ্ধে ষষ্ঠ অভিযোগ হচ্ছে এই যে তা দায়িত্ব-জ্ঞানহীন এবং যেখানেই আত্মপ্রকাশ করেছে সেখানেই তা জনগণের পক্ষে হানিকর হয়েছে। উপরে যেসব ত্রুটির কথা বলা হয়েছে আংশিকভাবে তার কারণ অপরিপক্কতা এবং আংশিকভাবে তার কারণ দায়িত্বজ্ঞানের অভাব। মুখ ধোয়ার উদাহরণটি নেওয়া যাক বিষয়টি বোঝাবার জন্য। আমরা সবাই প্রতিদিন মুখ ধুই, অনেকে একাধিকবার মুখ ধুয়ে থাকি আর তারপর আয়নাতে

নিজেদের তাকিয়ে দেখি সব ঠিকঠাক আছে কিনা একেবারে 'অনুসন্ধান আর অধ্যয়নের' পথ ধরে (**উচ্চ হাস্যরোল**), কারণ আমাদের ভয় থাকে সব একেবারে ঠিক নাও থাকতে পারে। দেখুন তো কী বিরাট দায়িত্ববোধ! আমরা যদি একই দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রবন্ধ লিখি বা বক্তৃতা করি, তাহলে কাজটা খারাপ হয় না। যা লোকসমক্ষে হাজির করার যোগ্য নয়, তা হাজির করতে যাবেন না। সব সময় মনে রাখবেন এতে অন্যদের ভাবনা ও কাজকর্ম প্রভাবিত হতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি একদিন বা দুদিন তার মুখ না ধোন তবে তা অবশ্যই একটি খারাপ কাজ কিংবা মুখ ধোয়ার পর যদি দু-এক জায়গায় ময়লা লেগে থাকে তাও খুব একটা প্রীতিকর জিনিস হবে না, কিন্তু এতে গুরুতর বিপদাশঙ্কা নেই। প্রবন্ধ লেখা বা বক্তৃতা করার ব্যাপারে কিন্তু বিষয়টি আলাদা, তা করা মুখ্যতঃ অন্যদের প্রভাবিত করার জন্যই। তা সত্ত্বেও আমাদের কমরেডরা হাল্কা চালে এই কাজটি করে চলেন; তার অর্থ দাঁড়ায় তুচ্ছ জিনিসকে গুরুতর ব্যাপারের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে দেওয়া। আগেভাগে অধ্যয়ন বা প্রস্তুতি না করেই অনেকে প্রবন্ধ লেখেন বা বক্তৃতা করেন এবং একটি প্রবন্ধ লেখার পর মুখ ধোয়ার পর তাঁরা যেভাবে আয়নায় নিজের মুখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেন সেভাবে প্রবন্ধটি তাঁরা বার কয়েক পড়ে দেখারও ঝামেলা পোহাতে চান না এবং যেমন খুশি করে তা প্রকাশের জন্য প্রেরণ করে দেন। ফল প্রায় ক্ষেত্রেই দাঁড়ায় 'কলম থেকে বেরিয়ে এল কথা হাজার খানেক, ভাবে ভাষায় ফারাক যে হায়, মাইল হাজার কয়েক।' এই লেখকদের প্রতিভা দীপ্ত বলে বোধ হলেও, এরা আসলে কিন্তু জনগণের ক্ষতিই সাধন করেন। এই বদ অভ্যাস, দায়িত্ববোধের এই অভাব অবশ্যই শোধরানো দরকার।

ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরুদ্ধে সপ্তম অভিযোগ হচ্ছে এই যে তা গোটা পার্টিকে বিষাক্ত করে তোলে এবং বিপ্লবের ক্ষতিসাধন করে। অষ্টম অভিযোগ হচ্ছে এই যে তার প্রচার দেশকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ও জনগণের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে। এই দুটি অভিযোগ স্বতঃপ্রতীয়মান এবং এগুলির ব্যাখ্যার কোন দরকার পড়ে না। অন্য ভাষায় বলা যায়, ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার যদি রূপান্তর সাধন করা না হয় আর যদি তা অবাধে চলতে পারে, তবে তার পরিণাম খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে। বিষয়ীবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিষ ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনায় লুকিয়ে রয়েছে এবং যদি এই বিষ ছড়াতে থাকে তবে তা পার্টি ও দেশের বিপদই ডেকে আনবে।

উপরে বর্ণিত আট দফা ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই আহ্বান।

প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে পার্টিগত ছকে বাঁধা রচনা শুধু যে বৈপ্লবিক প্রেরণায় প্রকাশের পক্ষে অনুপযুক্ত তাই নয়, তা তাকে স্তব্ধই করে দেয়। বৈপ্লবিক প্রেরণাকে বিকশিত করে তোলার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনাকে খারিজ করে দেওয়া এবং তার পরিবর্তে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত, সতেজ ও শক্তিশালী রচনাধারা গ্রহণ করা। দীর্ঘকাল ধরে এই রচনাধারা চলে আসছে কিন্তু তাকে এখনো সমৃদ্ধ করে তোলা ও ব্যাপকভাবে আমাদের মধ্যে তার প্রচার হওয়া প্রয়োজন। যখন আমরা বিদেশী ছকে বাঁধা রচনা ও ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনাকে শেষ করে দেব তখনই আমরা আমাদের নতুন রচনাধারাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারব, ব্যাপকভাবে তার প্রচার করতে পারব এবং এভাবে পার্টির বৈপ্লবিক লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

শুধু প্রবন্ধ রচনা বা বক্তৃতার বেলাতেই পার্টিগত ছকটি সীমাবদ্ধ নয়, সভার কার্য পরিচালনাতেও তা চোখে পড়ে। '(১) উদ্বোধনী বক্তৃতা ; (২) রিপোর্ট উত্থাপন ; (৩) রিপোর্টের ওপর আলোচনা ; (৪) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ; (৫) সমাপ্তি ঘোষণা।' এই কঠোর অনুষ্ঠানসূচী যদি ছোট-বড় সকল সভাতে, সর্বত্র এবং সব সময় অনুসরণ করা হয় তবে তাও এক ধরনের পার্টিগত ছকের ব্যাপার নয় কি? আবার সভায় যখন 'রিপোর্ট' পেশ করা হয়, তা সাধারণতঃ এই রকম দাঁড়ায়: '(১) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ; (২) আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ; (৩) সীমান্ত অঞ্চলের পরিস্থিতি ; এবং (৪) আমাদের বিভাগীয় পরিস্থিতি।' সভাগুলি সাধারণভাবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে, যাঁদের কিছু বলার নেই তাঁরাও বলতে ওঠেন, যেন তাঁদের বলতে দেওয়া না হলে রক্ষে রাখবেন না এই ভাব। এক কথায়, বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি চরম ঔদাসীন্য এবং প্রাচীন অভ্যাস ও অনড় প্রথার প্রতি জড়বৎ গতানুগতিকতাই এর মধ্যে দেখা যায়। এসব কি আমাদের শোধরাতে হবে না?

বর্তমানে অনেকে একটি জাতীয়, বৈজ্ঞানিক এবং গণ-ধারায় রূপান্তরের আহ্বান জানাচ্ছেন খুবই ভাল কথা। কিন্তু 'রূপান্তর' মানে হচ্ছে আনুপূর্বিক পরিবর্তন, আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত, ভেতরে-বাইরে পরিবর্তন সাধন। তবু যেসব লোকেরা বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সাধন করেননি তাঁরাই আবার রূপান্তরের

কথা বলছেন। আমি ঐ কমরেডদের পরামর্শ দিচ্ছি 'রূপান্তর' নিয়ে আনার আগে তাঁরা যৎসামান্য একটু পরিবর্তনই প্রথমে নিয়ে আসুন, অন্যথায় গোঁড়ামি ও পার্টিগত ছকে বাঁধা রচনার জালেই তাঁরা জড়িয়ে থাকবেন। এটাকে বর্ণনা করা চলে বিরাট আশা কিন্তু নগণ্য ক্ষমতা, বিরাট উচ্চাশা কিন্তু সামান্য প্রতিভার করুণ উদাহরণ হিসেবে এবং এতে করে কাজের কাজ হবে না কিছুই। তাই সরল বিশ্বাসে যখন কেউ বলবেন 'গণ-ধারায় রূপান্তরের' কথা কিন্তু নিজে থেকে যাবেন তাঁর ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর চৌহদ্দির সীমাবদ্ধ হয়ে, তাঁরই বরং সতর্ক হওয়ার দরকার আছে; কারণ একদিন হয়তো তিনি দেখতে পাবেন জনগণ তাঁকে পথের মধ্যে ঘিরে ধরেছেন আর জিজ্ঞেস করছেন, 'রূপান্তরের কদ্দূর হল মশাই? দয়া আমাদের একটু দেখান না?', তখন সত্যিই কিন্তু তাঁকে খুব বিপাকে পড়তে হবে। তিনি যদি খালি কথার কথা হিসেবে না বলে সত্যি সত্যিই ঐকান্তিকতার সঙ্গে গণ-ধারায় রূপান্তরিত হতে চান, তবে তাঁকে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেতে হবে, তাঁদের কাজ থেকে শিখতে হবে, তা না হলে তার 'রূপান্তর' আকাশকুসুম হয়েই থাকবে। কিছু কিছু লোক আছেন যাঁরা গণ-ধারায় রূপান্তরের ব্যাপারে প্রচুর হৈ-হল্লা করেন কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাষায় তিনটি বাক্যও উচ্চারণ করতে পারেন না। এ থেকে বোঝা যায় তাঁরা প্রকৃতপক্ষে জনগণের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে চান না। তাঁদের মন এখনো তাঁদের নিজেদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর খোপের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

এই সভাতে **প্রচারকার্য সম্পর্কিত একটি নির্দেশ** শীর্ষক চারটি প্রবন্ধ সম্বলিত একটি পুস্তিকার কপি বিতরণ করা হয়েছে। আমি আমাদের কমরেডদের তা বারে বারে পড়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।

প্রথম প্রবন্ধটি **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ** থেকে সংকলিত কিছু কিছু অংশ নিয়ে তৈরী করা এবং তাতে লেনিন কিভাবে প্রচারকার্য চালাতেন তা নিয়ে বলা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এতে লেনিন কিভাবে ইস্তাহার লিখতেন তা বর্ণনা করা হয়েছে:

> লেনিনের পরিচালনাধীনে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ-এর শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামী সংঘ ছিল রাশিয়ার প্রথম সংস্থা যা **সমাজতন্ত্রকে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে** শুরু করেছিল। কোন কারখানায় যখন ধর্মঘট শুরু হতো তখন ঐ সংগ্রামী সংঘটি তার অন্তর্ভুক্ত

সদস্যদের মাধ্যমে কারখানাগুলির অবস্থা সম্পর্কে খুবই ভালভাবে ওয়াকিবহাল থাকত, অবিলম্বে তারা ইস্তাহার ও সমাজতান্ত্রিক বক্তব্য এনে হাজির করত। মালিকেরা শ্রমিকদের যে নিপীড়ন করছে এই ইস্তাহারসমূহে তার স্বরূপ তুলে ধরা হতো, তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমিকদের কিভাবে সংগ্রাম করা উচিত তা ব্যাখ্যা করা হতো এবং শ্রমিকদের দাবিগুলি হাজির করা হতো। ঐ ইস্তাহারগুলিতে পুঁজি-বাদের দুষ্টক্ষত সম্পর্কে, শ্রমিকদের দারিদ্র্য সম্পর্কে, ১২ ঘণ্টা থেকে ১৪ ঘণ্টা ব্যাপী তাদের অসহ্য কঠোর শ্রমদিবস সম্পর্কে এবং তাদের চরম অধিকারহীনতা সম্পর্কে সরল সত্য কথা লেখা থাকত। ঐগুলিতে যথোপযুক্ত রাজনৈতিক দাবিও পেশ করা হতো।

'ভালভাবে ওয়াকিবহাল' এবং 'সরল সত্য কথা লেখা থাকত' এই কথাগুলি লক্ষ্য করুন! আবার শুনুন:

> শ্রমিক বাবুশকিন-এর সঙ্গে একযোগে ১৮৯৪ সালের শেষের দিকে এ ধরনের প্রচার অভিযানমূলক প্রথম ইস্তাহারটি লেনিন রচনা করেন এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গের সেমিয়ানিকভ কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি একটি আবেদন রচনা করেন।

একটি ইস্তাহার লিখতে হলে আপনাকে যেসব কমরেড অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিবহাল তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। এ ধরনের অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের ভিত্তিতেই লেনিন লিখতেন ও কাজ করতেন।

> প্রতিটি ইস্তাহারই শ্রমিকদের মনোবলকে দৃঢ়তর করতে বিরাটভাবে সাহায্য করত। তাঁরা দেখতে পেতেন সমাজতন্ত্রীরা তাঁদের সহায়তা করছেন ও তাঁদের সপক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন।[৪]

আমরা কি লেনিনের সঙ্গে একমত? তাই যদি হয়, তাহলে লেনিনের মনোভাব নিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে। তার অর্থ হচ্ছে, লেনিন যেমনটি করেছিলেন, আমাদেরও তাই করতে হবে এবং শুধু ফাঁকা কথা দিয়ে পাতার পর পাতা ভরাট করলে চলবে না বা পাঠকদের প্রতি খেয়াল না করে বেমালুম বাক্যবাণ ছুঁড়লেই চলবে না বা আড়ম্বরী হলে বা গুরুগম্ভীর বাক্যজাল ব্যবহার করলে চলবে না।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর সপ্তম বিশ্ব কংগ্রেসে ডিমিট্রভ-

এর বিবৃতিসমূহের অংশবিশেষের একটি সংকলন। ডিমিট্রভ কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন :

> জনসাধারণের কাছ থেকে আমাদের কথা বলা শিখতে হবে, কেতাবী ঢং-এর ভাষায় নয়, জনসাধারণের হয়ে তাদের লক্ষ্য নিয়ে সংগ্রামরত মানুষের ভাষাতেই আমাদের কথা বলতে হবে; যে ভাষার প্রতিটি শব্দ আর প্রতিটি ভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনের একান্ত চিন্তা আর অনুভূতিই ফুটে উঠবে।[৫]

আবার দেখুন :

> **…জনগণের বোধগম্য ভাষায় কথা বলতে না শিখলে জনগণ আমাদের সিদ্ধান্তগুলি আয়ত্ত করতে পারবে না।**
>
> সহজ সরলভাবে, ঠিক ঠিকভাবে জনসাধারণের পরিচিত আর বোধগম্য ভাবের মাধ্যমে কী করে কথা বলতে হয় তা আমরা জানি না। আমাদের মুখস্থ করা শুষ্ক সূত্রবাঁধা কথাগুলি বাদ দিয়ে চলতে আমরা এখনো পারি না। আসলে যদি আপনি আমাদের ইস্তাহার, খবরের কাগজ, প্রস্তাব ও রচনাদিতে চোখ বুলান তাহলে দেখতে পাবেন তা প্রায়ই এমন একটা ভাষায় ও ভঙ্গিতে লেখা যে সাধারণ শ্রমিকদের কথা ছেড়েই দিন, আমাদের পার্টির কর্মীদের পক্ষেই তা বোঝা শক্ত।[৬]

আচ্ছা? ডিমিট্রভ ঠিক আমাদের দুর্বল জায়গায়ই খোঁচা দিয়েছেন দেখছি। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা চীনের মতো বিদেশেও তাহলে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন এটা একটা সাধারণ ব্যাধি। (**হাস্যরোল।**) যাই হোক, কমরেড ডিমিট্রভ-এর নির্দেশ অনুসারে দ্রুত আমাদের নিজের ব্যাধিটি দূর করা দরকার।

> আমাদের প্রত্যেককেই এটিকে একটি নিয়ম, বলশেভিক নিয়ম, একটি প্রাথমিক নিয়ম করে তুলতে হবে :
>
> **যখন লিখবেন বা কথা বলবেন তখন সব সময় সাধারণ শ্রমিকদের কথা মনে রাখবেন, আপনার কথা তাঁদের বোঝা চাই এবং আপনাকে অনুসরণ করার জন্য তাঁদের প্রস্তুতি থাকা চাই! আপনার মনে রাখতে হবে কাদের জন্য আপনি লিখছেন, কাদের কাছে আপনি কথা বলছেন।**[৭]

'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক আমাদের জন্য এই নির্দেশ রেখেছে, এই নির্দেশ আমাদের পালন করতেই হবে। এই আমাদের কাছে একটি নিয়ম হয়ে দাঁড়াক!

লু সুন-এর সম্পূর্ণ রচনাবলী থেকে নির্বাচিত তৃতীয় প্রবন্ধটি জি 'বীপার'[৮] পত্রিকার কাছে লেখা ঐ জবাবে লু সুন কী করে লিখতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। লু সুন কী বলেছেন? সব মিলিয়ে তিনি লেখার আটটি নিয়ম হাজির করেছেন, তার কয়েকটি আমি আমার মন্তব্যসহ এখানে রাখছি।

প্রথম নিয়ম: 'সকল প্রকার বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখুন; আরও বেশি করে পর্যবেক্ষণ করুন, যদি আপনার পর্যবেক্ষণ খুব অল্প হয়ে থাকে, তাহলে লিখবেন না।'

'সকল প্রকার বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখুন'—এই বলে তিনি বোঝাতে চাই-ছেন যে এক-আধটি জিনিসের প্রতি নজর দিলেই চলবে না। তিনি বলছেন 'আরও বেশি করে পর্যবেক্ষণ করুন'—শুধু একটু-আধটু তাকিয়ে নিলেই চলবে তা বলছেন না। আমরা কী করি? আমরা কি ঠিক তার বিপরীতটাই করি না এবং শুধু খানিকটা চোখ বুলিয়ে নিয়েই লিখতে বসে যাই না?

দ্বিতীয় নিয়ম: 'যখন আপনার বলার মতো কিছু নেই তখন অনর্থক জোর করে নিজে কিছু লিখতে যাবেন না।'

আমরা কী করি? এটা পরিষ্কার যে মাথায় কিছুই নেই অথচ আমরা কি তা সত্ত্বেও জোর করে গাদা গাদা লিখে যাই, না? অনুসন্ধান বা অধ্যয়ন না করে শুধু কালিকলম নিয়ে 'অনর্থক জোর করে নিজেদের লিখে যাওয়া' একান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ।

চতুর্থ নিয়ম: কিছু লেখার পর অন্ততঃ দুবার তা আগাগোড়া পড়ুন এবং অপ্রয়োজনীয় কথা, বাক্য ও অনুচ্ছেদগুলি বিন্দুমাত্র কোন দয়ামায়া না করে বাদ দিতে আপনার যথাসাধ্য করুন। বরং উপন্যাসোপম একটি লেখাকে রেখাচিত্রের মাপে সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে আসুন, কিন্তু কোন সময়ই একটা রেখাচিত্রকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে একটি উপন্যাসের মতো বিশাল-আয়তন করে তুলবেন না।'

কনফুসিয়াস-এর উপদেশ হচ্ছে 'দুবার ভেবে দেখুন',[৯] আর হান যু বলেছেন,

'চিন্তাটা মাথায় ঢোকাতে পারলেই কাজটি হয়ে যায়'[১০] এ হচ্ছে প্রাচীন-কালের কথা। বর্তমানে বিষয়গুলি খুবই জটিল হয়ে উঠেছে এবং মাঝে মাঝে দেখা যায় তিন, এমনকি, চারবার চিন্তা করাটাও যথেষ্ট নয়। লু স্থন বলেছেন 'অন্ততঃ দুবার তা আগাগোড়া পড়ুন।' আর বেশি করে হলে? তিনি কিছু বলেননি, কিন্তু আমি মনে করি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধ হলে দশবারের বেশি পড়ে দেখলে কোনই ক্ষতি নেই এবং প্রকাশিত হওয়ার আগে সুবিবেচনার সঙ্গে তাকে পরিমার্জনা করুন। প্রবন্ধাবলী হচ্ছে বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি-ফলন আর যে বাস্তব পরিস্থিতিটা জট পাকানো আর জটিল এবং তা নিয়ে ভাল করে ভাবতে হলে তার আগে বারেবারে তাকে অধ্যায়ন করা চাই। এ ব্যাপারেই আলগা ভাব থাকা হল লেখার নিতান্ত প্রাথমিক প্রয়োজন সম্পর্কেই অজ্ঞ থেকে যাওয়া।

ষষ্ঠ নিয়ম: 'শুধু আপনি ছাড়া আর কেউ যা বুঝবে না এমন বিশেষণ বা অন্যবিধ শব্দ চয়ন করবেন না।'

'কেউই যা বোঝে না' এমন এন্তার শব্দ আমরা 'চয়ন' করেছি। মাঝে মাঝে এক-একটা বাক্যাংশে চল্লিশ বা পঞ্চাশটি শব্দ রয়েছে আর তা ঠাসা এমন সব 'বিশেষণ বা অন্যবিধ শব্দ দিয়ে যা আপনি ছাড়া কেউই বুঝবে না।' লু স্থনকে অনুসরণ করার কথা ঢাক পিটিয়ে বলতে যাঁরা অনেকেই অক্লান্ত, দেখা যায় ঠিক তাঁরাই ওঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকেন!

সর্বশেষ বিষয়টি সংকলিত হয়েছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত কী করে প্রচারকার্যের জাতীয় একটি ধারা বিকশিত করা যায় সেই সম্পর্কিত রিপোর্ট থেকে। ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত ঐ অধিবেশনে আমরা বলেছিলাম 'চীনের সুনির্দিষ্ট বাস্তব বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্ছিন্নভাবে মার্কসবাদ, সম্পর্কে কোন কথা বলা হচ্ছে নিছক অবাস্তব মার্কসবাদ, হাওয়াই মার্কসবাদ।' অর্থাৎ মার্কসবাদ নিয়ে সব ফাঁকা কথাবার্তারই আমাদের বিরোধিতা করতে হবে এবং চীনে যে কমিউনিস্টরা রয়েছেন চীন বিপ্লবের বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়েই মার্কসবাদ তাঁদের অধ্যয়ন করতে হবে।

ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছিল:

বিদেশী ছকের অবসান ঘটাতে হবে; ফাঁকা, অবাস্তব সুরের

আলাপনের বহর কমাতে হবে আর গোঁড়ামিকে শেষ করে দিতে হবে; তার পরিবর্তে নিয়ে আসতে হবে সতেজ জীবন্ত চীনা ধারা আর অনু-প্রেরণা যা চীনের জনগণের কাছে প্রিয়। আন্তর্জাতিক বিষয়বস্তুকে জাতীয় আঙ্গিক থেকে পৃথক করা সেইসব লোকেরই অভ্যাস যারা আন্ত-র্জাতিকতা সম্পর্কে একান্ত প্রাথমিক মামুলী জিনিসই বোঝে না। বরং উল্টো, আমাদের এই দুয়ের মধ্যে নিবিড় যোগ স্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে এখনো গুরুতর ভুলভ্রান্তি আমাদের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে রয়ে গেছে এবং সচেতনভাবেই তাকে দূর করে দিতে হবে।

ঐ রিপোর্টে বিদেশী ছকের অবসান দাবি করা হয়েছিল, তবু কিছু কমরেড এখনো তারই শ্রীবৃদ্ধি সাধনে লিপ্ত রয়েছেন। ফাঁকা অবাস্তব সুরের আলাপনের বহর কমানোর দাবি করা হয়েছিল, তবু কিছু কমরেড একগুঁয়ের মতো বেশি বেশি করে তা গেয়েই চলেছেন। দাবি জানানো হয়েছিল, গোঁড়ামিকে শেষ করে দিতে হবে, তবু কিছু কমরেড তাকে বিছানা থেকে নেমে চরে বেড়াতে বলেছেন। এক কথায়, অনেকেই ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত রিপোর্টকে এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিয়েছেন, মনে হচ্ছে, যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁরা তার বিরোধিতা করছেন।

কেন্দ্রীয় কমিটি এখন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা, গোঁড়ামি ও ঐ ধরনের বিষয়গুলি চিরতরের মতো আমাদের খারিজ করে দিতে হবে এবং তারই জন্য আমি এসেছি এবং বেশ বিস্তারিতভাবেই এ ব্যাপারে বলেছি। আমি আশা করি আমি যা বলেছি কমরেডরা তা ভেবে দেখবেন ও তাকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবেন এবং প্রতিটি কমরেডই তাঁর নিজের বিশেষ ক্ষেত্রেও এটিকে বিশ্লেষণ করে দেখবেন। প্রত্যেককেই নিজেকে সতর্কভাবে বিচার করে দেখতে হবে, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ও চারিপাশের কমরেডদের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে হবে এবং জানতে হবে তিনি যা বুঝেছেন তাতে করে যথার্থভাবেই তিনি তাঁর দোষত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত হয়ে উঠতে পেরেছেন কিনা।

টীকা

১। ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা প্রসঙ্গে বর্তমান খণ্ডে 'পার্টির কাজের ধারা সংশোধন করুন' প্রবন্ধের এক নম্বর টীকাটি দেখুন, পৃঃ ৬৫।

২। নতুন বা পুরাতন ছকে বাঁধা রচনারীতির বিরোধিতা লু স্থন-এর সকল রচনারই মূল ধারা। বিদেশী ছকটির প্রচলন করেন ৪ঠা মে আন্দোলনের পরে কিছু কিছু হাল্কা মেজাজের বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা এবং তাদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে বিপ্লবী সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে দীর্ঘকাল তা অব্যাহত ছিল। বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে লু স্থন তাঁদের মধ্যেকার এই বিদেশী ছকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং ঐগুলিকে নিম্নলিখিত ভাষায় ধিক্কার জানান:

নতুন বা পুরাতন ছকে বাঁধা রচনাকে একেবারে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে হবে।...উদাহরণ হিসেবে, একজন যদি শুধু 'অপমানজনক উক্তিই ছুঁড়ে মারতে জানেন', 'ভয়ভীতি দেখাতেই জানেন' বা শুধু গর্দান নিতেই জানেন' বা শুধু প্রাচীন সূত্র নকল করে এলোপাথাড়ি যে-কোন ব্যাপারেই তা ছুঁড়ে দিতে জানেন, জানেন না কি করে সুনির্দিষ্টভাবে ও বাস্তবক্ষেত্রে বিজ্ঞান থেকে আহরিত ঐ সূত্রগুলিকে ব্যবহার করে প্রতিদিন যে নতুন নতুন বাস্তব সত্য ও ব্যাপার দেখা দিচ্ছে তাকে বিশ্লেষণ করতে তবে তাও তো এক ধরনের ছকই। ('চু শিউ-শিয়ার চিঠির জবাব', 'গিভিং দি শো এ্যাওয়ে' নামক রচনার পরিশিষ্টে সংযোজিত।)

৩। 'অপমানজনক উক্তি ছুঁড়ে মারা আর ভয়ভীতি প্রদর্শন করা নিশ্চয়ই যুদ্ধ করা নয়' এটি ছিল ১৯৩২ সালে লেখা লু স্থন-এর একটি প্রবন্ধের শিরোনাম এবং **মিক্সড ডায়লেক্ট** নামক সংকলনের তা অন্তর্ভুক্ত। (লু স্থন, **সম্পূর্ণ রচনাবলী**, চীনা সংস্করণ ১৯৫৭, পঞ্চম খণ্ড।)

৪। **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ**, ইংরেজী সংস্করণ বিদেশীভাষা প্রকাশন সংস্থা, মস্কো, ১৯৫, পৃঃ ৩৬-৩৭।

৫। জর্জি ডিমিট্রভ, 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য', **নির্বাচিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতা**, ইংরাজী সংস্করণ, লরেন্স এ্যাণ্ড উইসার্ট, লণ্ডন, ১৯৫১, পৃঃ ১১৬-১৭।

৬। ঐ, পৃঃ ১৩২-৩৩।

৭। ঐ পৃঃ ১৩৫।

৮। **দি ডীপার** (The Dipper) হচ্ছে ১৯৩১-৩২ সালে চীনের বামপন্থী লেখক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত একটি মাসিকপত্র। '**দি ডীপার**-এর উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে' লেখাটি **দুটি হৃদয়** (Two Hearts) নামক রচনা সংকলনের

অন্তর্ভুক্ত। (লু স্যুন, **সম্পূর্ণ রচনাবলী**, চীনা সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড।)

৯। **কনফুসীয় উপদেশাবলী** (Confucian Analects), পঞ্চম খণ্ড, 'কুংয়ে চ্যাঙ।'

১০। হান য়ু (৭৬৮-৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন তাঙ বংশের রাজত্বকালের একজন বিখ্যাত চীনা লেখক। তাঁর প্রবন্ধ 'পণ্ডিতের মার্জনা ভিক্ষা' (The Scholar's Apologia)তে তিনি লিখেছিলেন, 'চিন্তাটি মাথায় ঢোকাতে পারলেই কাজটি হয়ে যায়, আর চিন্তা মাথায় না ঢুকলে কাজটি পণ্ড হয়ে যায়।'

সাহিত্য ও শিল্প প্রসঙ্গে ইয়েনানের আলোচনা-সভায় প্রদত্ত ভাষণ

মে, ১৯৪২

ভূমিকা

২রা মে ১৯৪২

কমরেডগণ! আজকের আলোচনা-সভায় আপনারা আমন্ত্রিত হয়েছেন নিজেদের ধ্যানধারণার আদান-প্রদান করার জন্য এবং সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রের কাজ এবং সাধারণভাবে বিপ্লবী কাজকর্মের মধ্যেকার সম্পর্ক বিচার-বিবেচনা করার জন্য। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, বৈপ্লবিক সাহিত্য ও শিল্প যাতে বিকাশের ক্ষেত্রে সঠিক পথ গ্রহণ করতে পারে এবং আমাদের জাতীয় শত্রুকে উচ্ছেদ করার ও জাতীয় মুক্তির কর্তব্য সম্পাদনের কাজকে সহজ করে তোলার ব্যাপারে এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক কাজকর্মের অধিকতর ভালভাবে সাহায্য প্রদান করতে পারে।

চীনের জনগণের মুক্তির জন্য আমাদের সংগ্রামে রয়েছে বিভিন্ন ফ্রন্ট, তার মধ্যে রয়েছে কলমের ফ্রন্ট এবং বন্দুকের ফ্রন্ট, সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট ও সামরিক ফ্রন্ট। শত্রুকে পরাজিত করার জন্য আমাদের প্রথমতঃ নির্ভর করতে হয় বন্দুকধারী সেনাবাহিনীর ওপর। কিন্তু শুধু এই বাহিনীই যথেষ্ট নয়; আমাদের অবশ্যই চাই একটি সাংস্কৃতিক বাহিনী, আমাদের নিজেদের লোকদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং শত্রুকে পরাজিত করার জন্য তা একান্ত অপরিহার্য। ৪ঠা মে আন্দোলনের সময় থেকে চীনে এই ধরনের একটি বাহিনী গড়ে উঠেছে এবং তা চীন বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে; সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের সহায়তাকারী চীনের সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মুৎসুদ্দি সংস্কৃতির আধিপত্যের এলাকাকে ক্রমে ক্রমে কমিয়ে এনেছে এবং তাদের প্রভাবকে দুর্বলতর করেছে। নতুন সংস্কৃতির বিরোধিতা করার সময় চীনের প্রতিক্রিয়াশীলেরা এখন শুধু 'গুণের বিরুদ্ধে পরিমাণের বহর দেখাতে পারে।' অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রতিক্রিয়াশীলদের টাকা আছে, তাই যদিও তারা ভাল কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, তবু পুরোদমে চেষ্টা করে তারা ঝুড়ি ঝুড়ি পরিমাণ লেখা হাজির

করতে পারে। ৪ঠা মে আন্দোলন থেকে শুরু করে সাহিত্য ও শিল্প আমাদের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর অঙ্গে পরিণত হয়েছে। দশ বছরের গৃহযুদ্ধকালে বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্প-আন্দোলনের বিরাট প্রসার ঘটেছে। এ আন্দোলন ও বিপ্লবী যুদ্ধ উভয়েরই গতি ছিল একই সাধারণ লক্ষ্যের দিকে, কিন্তু এই ভ্রাতৃত্বমূলক দুটি বাহিনীকে তাদের বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে একত্রে সংযুক্ত করা যায়নি কারণ প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাদের একটিকে অন্যটির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এটা খুবই ভাল কথা যে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকে বেশি বেশি করে বিপ্লবী সাহিত্যিক ও শিল্পীরা ইয়েনানে ও আমাদের অন্যান্য জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকায় আসছেন। কিন্তু তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকায় এসেছেন বলেই তাঁরা ইতিমধ্যে এখানকার জন-সাধারণের সঙ্গে নিজেদের পুরোপুরি একাত্ম করে তুলতে পেরেছেন। যদি আমাদের বৈপ্লবিক কাজকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তবে এই দুটিকে পুরোপুরি অভিন্ন করে তুলতেই হবে। সাহিত্য ও শিল্প যাতে সমগ্র বিপ্লবী যন্ত্রের উপযুক্ত অংশ হিসেবে ভালভাবে খাপ খেয়ে যেতে পারে, যাতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও শিক্ষিত করে তোলার ও শত্রুকে আক্রমণ করে খতম করার ব্যাপারে তা শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে এবং একমন-একপ্রাণ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তা জনগণকে সাহায্য করতে পারে ঠিক ঠিকভাবে তা সুনিশ্চিত করাই আজকের আমাদের এই সভার উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে আমাদের কী কী সমস্যার সমাধান করতে হবে? আমাদের মনে হয় সমস্যাগুলি হচ্ছে লেখক ও শিল্পীদের শ্রেণীগত অবস্থান, তাঁদের মনোভাব, তাঁদের পাঠক-দর্শক, তাঁদের কাজ ও তাঁদের অধ্যয়নের সমস্যা।

শ্রেণীগত অবস্থানের সমস্যা। শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের অবস্থানই হচ্ছে আমাদের অবস্থান। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের কাছে এর অর্থ হচ্ছে পার্টির অবস্থান, পার্টির আদর্শ ও পার্টির নীতি রক্ষা করে চলা। আমাদের সাহিত্য ও শিল্পীকর্মীদের মধ্যে এমন কি কেউ আছেন যাঁরা এখনো ভুল করছেন এবং এই সমস্যার উপলব্ধি যাঁদের কাছে স্বচ্ছ নয়? আমি মনে করি, আছেন। আমাদের বহু কমরেডই সঠিক অবস্থান থেকে বারে বারে সরে গেছেন।

মনোভাবের সমস্যা। কোন ব্যক্তির অবস্থান থেকে কোন্ জিনিষের প্রতি তার কী মনোভাব হবে তা নির্ধারিত হয়। উদাহরণ হিসেবে, কাউকে তারিফ

করব, না, তার মুখোস খুলে দেব? এটি হচ্ছে মনোভাবের প্রশ্ন। কোন্ মনোভাবটি চাই? আমি বলব— চাই দুটিই। প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাপারটা কাকে নিয়ে? তিন ধরনের লোক রয়েছে, শত্রুরা রয়েছে, যুক্তফ্রন্টের আমাদের মিত্ররা রয়েছেন এবং আমাদের নিজস্ব লোকজনেরা রয়েছেন; এই শেষোক্তরা হলেন জনসাধারণ ও তাঁদের অগ্রবাহিনী। এই তিনটির প্রতিটির প্রতি আমাদের ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। শত্রুদের অর্থাৎ জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও জনগণের অন্য সকল শত্রুদের বেলায় বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের কাজ হচ্ছে তাদের কপটতা ও নৃশংসতার স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়া এবং সাথে সাথে তাদের অনিবার্য পরাজয়ের কথা দেখিয়ে দেওয়া যাতে করে তা জাপ-বিরোধী সেনাবাহিনী ও জনগণকে দৃঢ়তা সহকারে একমন-একপ্রাণ হয়ে যুদ্ধ করে ওদের উচ্ছেদসাধনে উৎসাহিত করবে। যুক্তফ্রন্টে আমাদের বিভিন্ন মিত্রদের বেলায় আমাদের মনোভাব হবে যুগপৎ মৈত্রী ও সমালোচনার, আবার সেক্ষেত্রে থাকবে বিভিন্ন ধরনের মৈত্রী ও বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা। জাপানের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আমরা তাদের সমর্থন করব ও তাদের যে-কোন সাফল্যকে আমরা প্রশংসা করব। কিন্তু প্রতিরোধ-যুদ্ধে যদি তারা সক্রিয় না থাকে তবে তাদের আমরা সমালোচনা করব। যদি কেউ কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের বিরোধিতা করে এবং প্রতিক্রিয়ার পথ ধরে অধঃপতিত হতে থাকে, আমরা দৃঢ়ভাবে তাদের বিরোধিতা করব। ব্যাপক জনসাধারণের বেলায়, তাদের শ্রম ও তাদের সংগ্রাম, তাদের সেনাবাহিনী ও তাদের পার্টিকে নিশ্চয়ই আমরা প্রশংসা করব। জনগণেরও ভুলত্রুটি রয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর অনেকের মধ্যে পেটি-বুর্জোয়া ধ্যানধারণা রয়ে গেছে, অন্যদিকে কৃষক ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে পশ্চাৎপদ ধ্যানধারণা রয়েছে; এই বোঝাগুলি তাদের সংগ্রামের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। ধৈর্যসহকারে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে তাদের কাঁধের এই বোঝাগুলি ঝেড়ে ফেলে দিতে এবং তাদের নিজস্ব ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে তাদের সাহায্য করতে হবে যাতে করে তারা জোর কদমে এগিয়ে যেতে পারে। সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তারা নিজেদের নতুন ছাঁচে গড়ে তুলেছে বা তুলছে এবং আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকে এই প্রক্রিয়াটিকেই রূপায়িত করে তুলতে হবে। যতক্ষণ তারা তাদের ভুলভ্রান্তিকে নাছোড়বান্দা হয়ে আকড়ে থাকছে না, ততক্ষণ আমাদের দিক থেকে তাদের নেতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরা উচিত হবে না

এবং তার ফল হিসেবে তাদের ভুলভ্রান্তি নিয়ে তাদের বিদ্রূপ করা বা তার চেয়েও খারাপ, তাদের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করা উচিত হবে না। আমাদের লেখায় তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে, প্রগতিসাধন করতে, একমন-একপ্রাণ হয়ে সামনে এগিয়ে যেতে, যা কিছু পিছিয়ে-পড়া তা ঝেড়ে ফেলে দিতে, যা কিছু বৈপ্লবিক তাকে বিকশিত করে তুলতে তাদের সাহায্য করা চাই এবং নিশ্চিতভাবেই তার বিপরীত করা তার উচিত নয়।

পাঠক ও দর্শকদের সমস্যা অর্থাৎ কাদের জন্য আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্ম রচিত হবে? শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল ও উত্তর এবং মধ্য চীনের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে এই সমস্যা কুওমিনতাঙ অঞ্চলের সমস্যার চেয়ে এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধের আগের সাংহাই থেকে তা আরও ভিন্ন রকমের। সাংহাই যুগে, বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্পের পাঠক ও দর্শক ছিলেন প্রধানতঃ ছাত্রদের, অফিস কর্মচারী ও দোকান-কর্মচারীদের একাংশ। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কুওমিনতাঙ এলাকায় আমাদের দর্শক পাঠকদের এই পরিধি আরও খানিকটা বেড়েছে কিন্তু এখনো তা মূলতঃ একই ধরনের লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে কারণ ওখানকার সরকার শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্পের সংস্রবে আসতে বাধা দিচ্ছে। আমাদের ঘাঁটি অঞ্চলসমূহে কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে সাহিত্য ও শিল্পকর্মের পাঠক ও দর্শক হচ্ছেন শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও বিপ্লবী কর্মীবৃন্দ। ঘাঁটি অঞ্চলে ছাত্ররাও রয়েছে কিন্তু পুরানো ধরনের ছাত্রদের থেকে এরা ভিন্ন রকমের; তারা হয় আগেকার না হয় ভবিষ্যতের কর্মীবৃন্দ। সকল ধরনের কর্মীরা, সেনাবাহিনীর সৈনিকেরা, কল-কারখানার শ্রমিকেরা ও গ্রামের কৃষকেরা সকলেই অক্ষরজ্ঞান লাভের পর বই ও খবরের কাগজ পড়তে চান, যাঁদের অক্ষরজ্ঞান নেই তাঁরা নাটক ও অপেরা দেখতে চান, ছবি ও চিত্রকলা দেখতে চান, গান গাইতে চান ও সঙ্গীত শুনতে চান; এঁরাই হলেন আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মের পাঠক, দর্শক ও শ্রোতার দল। শুধু কর্মীদের কথাই ধরা যাক। মনে করবেন না যে তাঁরা সামান্য কয়েকজন মাত্র; তাঁদের সংখ্যা কুওমিনতাঙ এলাকায় প্রকাশিত যে-কোন বইয়ের পাঠক সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। ওখানে সাধারণতঃ একটি বই ছাপা হয় ২০০০ কপি মাত্র; আর যদি তার তিনটি সংস্করণও প্রকাশিত হয় তবু সব মিলিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ৬০০০ কপি; কিন্তু ঘাঁটি এলাকাতে শুধু ইয়েনানেই দশ হাজারেরও বেশি লোক বই পড়েন। তাছাড়া তাঁদের অনেকেই আবার দীর্ঘ

দিনের পোড়-খাওয়া বিপ্লবী, দেশের নানা প্রান্ত থেকে তাঁরা এসেছেন এবং নানা জায়গায় কাজ করতে চলে যাবেন, সুতরাং তাঁদের ভেতর শিক্ষামূলক কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মীরা খুবই ভাল কাজ করতে পারেন।

যেহেতু আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মের পাঠক, দর্শক ও শ্রোতারা হচ্ছেন শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও তাঁদের মধ্যেকার কর্মীরা, সমস্যাটা তাই দাঁড়াচ্ছে তাঁদের ভাল করে বোঝার ও জানার। তাঁদের ভাল করে বুঝতে হলে ও জানতে হলে, বিভিন্ন ধরণের লোকেদের এবং পার্টি ও সরকারী সংগঠনের, গ্রামের ও কলকারখানার এবং অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর মধ্যে—কার বিভিন্ন বিষয়কে ভাল করে বুঝতে ও জানতে হলে আমাদের প্রচুর কাজ করতে হবে। আমাদের লেখক ও শিল্পীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? আমি বলব এই জানা ও বোঝার ব্যাপারে তাঁরা পিছিয়ে রয়েছেন, 'যে বীরের বীরত্ব দেখাবার জায়গা নেই' তাঁরা সেরকম রয়েছেন। জ্ঞানের অভাব বলতে কী বোঝাচ্ছে? বোঝাচ্ছে জনগণকে ভালভাবে না জানা। লেখক ও শিল্পীরা যাদের নিয়ে লেখেন বা যাদের জন্য লেখেন, তাদের সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান তাঁদের নেই; আসলে তাঁরা ওদের আদৌ চেনেনেই না। তাঁরা শ্রমিক, কৃষক বা সৈনিকদের ভাল করে জানেন না এবং কর্মীদেরও ভাল করে জানেন না। বোঝার অভাব বলতে কি বোঝায়? ভাষা না বোঝা অর্থাৎ জনগণের সমৃদ্ধি, প্রাণবন্ত ভাষার সঙ্গেই পরিচয়ের অভাব। যেহেতু বহু লেখক ও শিল্পী জনগণের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ জীবন কাটান, স্বভাবতই জন-গণের ভাষার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় নেই। সুতরাং তাঁদের লেখার ভাষা যে শুধু নীরসই হয়ে পড়ে তাই নয়, তা প্রায়ই তাঁদের নিজেদের চয়ন করা অর্থহীন এমন সব কথা দিয়ে ভরা থাকে যা সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষারীতির বিপরীত। অনেক কমরেড 'একটি গণধারার' কথা বলতে ভালবাসেন। কিন্তু এতে করে ঠিক ঠিক কী বোঝায়? তা এটাই বোঝায় যে আমাদের লেখক ও বিপ্লবীদের ভাবনাচিন্তা ও অনুভূতিকে ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের ভাবনাচিন্তা ও অনুভূতির সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে দিতে হবে। এই মিলন সাধন করতে হলে তাঁদের সততার সঙ্গে জনসাধারণের ভাষা শিখতে হবে। জনসাধারণের ভাষাই যদি আপনি অনেকখানি বুঝে উঠতে না পারেন তবে সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির কথা আপনি কি করে বলবেন? 'বীরত্ব প্রদর্শনের স্থান-

হীন একজন বীর' বলতে আমরা এই কথাই বোঝাতে চাইছি যে বিরাট বিরাট সত্যের যে সঞ্চয় আপনি করেছেন জনগণ তা গ্রহণ করছে না। জনগণের সামনে যত বেশি করেই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ বলে নিজেকে জাহির করুন না কেন বা 'বীর' হিসেবে জাহির করুন না কেন, আপনি যত বেশি করে এইসব মাল জনগণের কাছে ফেরি করবেন তত কম তারা তা গ্রহণ করবে। আপনি যদি চান জনগণ আপনাকে বুঝুক, যদি আপনি জনগণের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যেতে চান তাহলে একটি দীর্ঘ এমনকি কষ্টসাধ্য পোড় খাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের মন স্থির করে ফেলতে হবে। আমার নিজের অনুভূতিগুলি কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। একজন ছাত্র হিসেবে জীবন শুরু করেছিলাম এবং স্কুলে ছাত্রদের চালচলনই রপ্ত করেছিলাম। সামান্য কায়িক শ্রম করাকে যেমন আমার যে সহপাঠি ছাত্ররা কোন কিছুই বয়ে নিয়ে যেতে পারত না সেই ছাত্রদের উপস্থিতিতে নিজের মালপত্রটুকু কাঁধে বা হাতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়াকে আমি তখন অমর্যাদাকর বলে মনে করতাম। ঐ সময়ে আমি মনে করতাম বুদ্ধিজীবিরাই হচ্ছেন এই পৃথিবীর একমাত্র পরিচ্ছন্ন লোক, আর তাঁদের তুলনায় শ্রমিক ও কৃষক অপরিচ্ছন্ন, নোংরা। তাঁরা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এই বিশ্বাস থেকে অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের পোশাক পরতে আমার মনে লাগত না কিন্তু একজন শ্রমিক বা কৃষক নোংরা এই বিশ্বাস থেকে আমি তার পোশাক পরতে পারতাম না। তারপর যখন একজন বিপ্লবী হয়ে উঠলাম এবং শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী সেনাবাহিনীর সৈনিকদের সঙ্গে বসবাস করলাম, ধীরে ধীরে তাঁদের আমি ভাল করে চিনলাম এবং তাঁরাও আমাকে ভাল করে চিনলেন তখন এবং একমাত্র তখনই বুর্জোয়া শিক্ষালয়ে আমার মধ্যে যে বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল তার মৌলিক পরিবর্তন আমি সাধন করেছি। আমি এ কথা অনুভব করলাম যে শ্রমিক ও কৃষকদের তুলনায় নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেননি এমন বুদ্ধিজীবীরা মোটেই পরিচ্ছন্ন নন এবং শেষ বিচারে শ্রমিক ও কৃষকেরাই হচ্ছে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন লোক, আর যদিও তাদের হাত কাদামাখা, পায়ে লেগে রয়েছে গোবর তবু তারা বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন। অনুভূতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন বলতে, একটি শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে পরিবর্তন বলতে এইটিই বোঝায়। যদি বুদ্ধিজীবীদের থেকে আগত আমাদের লেখক ও শিল্পীরা চান যে তাঁদের রচনা জনগণ ভালভাবে

গ্রহণ করুক তবে তাঁদের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে ও তাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজাতে হবে। এইরকম একটা পরিবর্তন ও গড়াপেটা ছাড়া আর কিছুই তাঁরা ভালভাবে করতে পারবেন না ও বেখাপ্পা হয়েই থাকবেন।

সর্বশেষ সমস্যা হচ্ছে অধ্যয়নের সমস্যা; যা বলতে আমি বোঝাচ্ছি মার্কস—বাদ-লেনিনবাদ ও সমাজ সম্বন্ধে অধ্যয়ন। যিনি নিজেকে একজন বিপ্লবী লেখক বলে মনে করেন, বিশেষ করে যে লেখকেরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য তাঁদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জ্ঞান থাকা চাই। এখন কিন্তু মার্কসবাদের মৌলিক ধারণা সম্পর্কেই কিছু কিছু কমরেডের অভাব রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মার্কসীয় একটি মৌলিক বক্তব্য হচ্ছে এই যে সত্তা চেতনাকে নির্ধারণ করে অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের বাস্তব পরিস্থিতিই আমাদের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতিকে নিধারণ করছে। কিন্তু আমাদের কিছু কমরেড বিষয়টিকে একেবারে উল্টো করে ফেলেন এবং এই ধারণা পোষণ করেন যে সবকিছুরই শুরু হওয়া চাই 'প্রেম' থেকে। এখন প্রেম সম্বন্ধে বলতে গেলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তো শুধু শ্রেণীগত প্রেমই থাকতে পারে; কিন্তু ঐ কমরেডরা শ্রেণীর উর্ধ্বে অবস্থিত প্রেমের, বিশুদ্ধ প্রেমেরই অন্বেষণ করছেন এবং একইভাবে তাঁরা বিশুদ্ধ স্বাধীনতা, বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ মানব প্রকৃতি ইত্যাদি ইত্যাদির অন্বেষণ করে চলেছেন। এ থেকে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক একান্ত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে রয়েছেন। তাঁদের এই প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে এবং বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করতে হবে। লেখক ও শিল্পীরা সাহিত্য ও শিল্পকর্মের সৃষ্টিগুলি অধ্যয়ন করবেন ঠিকই কিন্তু সকল বিপ্লবীকেই, লেখক ও শিল্পীরাও তা থেকে বাদ পড়ছেন না, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতেই হবে। লেখক ও শিল্পীদের সমাজকে অধ্যয়ন করতে হবে অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে অধ্যয়ন করতে হবে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নিজ নিজ অবস্থা, তাদের গড়ন ও তাদের মানসিকতাকেও অধ্যয়ন করতে হবে। এই সবকিছুকে যখন আমরা পরিষ্কারভাবে আয়ত্ত করতে পারব শুধু তখনই আমরা এমন সাহিত্য পাব যা বিষয়বস্তুতে হবে সমৃদ্ধ ও যাতে সঠিক পথের ছবি ফুটে উঠবে।

আজ আমি শুধু ভূমিকা হিসেবে সমস্যাগুলি তুলে ধরলাম; আমি আশা

করি এগুলি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে আপনারা সকলেই আপনাদের অভিমত প্রকাশ করবেন।

উপসংহার

২৩ মে, ১৯৪২

কমরেডগণ! এই মাসে আমাদের আলোচনা-সভায় তিনটি অধিবেশন হয়েছে। সত্যের সন্ধানে আমরা যে উৎসাহপূর্ণ বিতর্ক চালিয়েছি তাতে পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত বহু কমরেড তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন, সমস্যাগুলিকে সামনে তুলে ধরেছেন এবং সেগুলিকে অনেক সুনির্দিষ্ট করে তুলেছেন। আমার বিশ্বাস, এতে করে আমাদের সমগ্র সাহিত্য ও শিল্প-আন্দোলন খুবই উপকৃত হবে।

কোন সমস্যা আলোচনাকালে আমাদের শুরু করতে হয় বাস্তব অবস্থা থেকে, কোন সংজ্ঞা থেকে নয়। প্রথমেই যদি আমরা পাঠ্যপুস্তক থেকে সাহিত্য ও শিল্পের সংজ্ঞা খুঁজে বের করি আর তারপর সেগুলিকে বর্তমান সাহিত্য ও শিল্পগত আন্দোলনের পথনির্দেশক মূলনীতি নির্ধারণের জন্য ও আজ যে বিভিন্ন অভিমত ও বিতর্ক দেখা দিয়েছে সেগুলির বিচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি তবে আমরা একটি ভুল পদ্ধতিই গ্রহণ করব। আমরা মার্কসবাদী এবং মার্কসবাদ শিক্ষা দেয় যে কোন সমস্যার বিচার করতে হলে বিমূর্ত কোন সংজ্ঞা থেকে নয়, আমাদের শুরু করতে হবে বাস্তব সত্য থেকে এবং এই বাস্তব সত্যের বিশ্লেষণের মধ্য থেকেই আমাদের পথনির্দেশক মূলনীতি, আমাদের কর্মনীতি ও কার্যসাধনের বিভিন্ন ব্যবস্থাদি খুঁজে বের করতে হবে। সাহিত্য ও শিল্পকর্ম সম্পর্কিত আমাদের বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রেও আমাদের একইভাবে চলতে হবে।

আজকের বাস্তব সত্যগুলি কী কী? আজকের বাস্তব সত্য হচ্ছে: চীন পাঁচ বছর ধরে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে আসছে; বিশ্বব্যাপী চলছে ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধ; প্রতিরোধ-যুদ্ধে চীনের বড় বড় জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর দোদুল্যমানতা এবং জনগণের বিরুদ্ধে তাদের উদ্ধত দমননীতি; ৪ঠা মে আন্দোলনের সময় থেকে বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্পের আন্দোলন—গত ২৩ বছর ধরে বিপ্লবের ক্ষেত্রে তার বিরাট অবদান এবং তার বহুবিধ ভুলত্রুটি; অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকা এবং এইসব সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ও এই ঘাঁটি এলাকা-

সমূহের শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক সাহিত্যিক ও শিল্পীর যোগদান ঘাঁটি অঞ্চলসমূহের ও কুওমিনতাঙ এলাকার বাস্তব পরিবেশ ও কাজকর্মের ব্যাপারে এই উভয় দিক থেকেই লেখক ও শিল্পীদের মধ্যেকার বিভিন্নতা; এবং ইয়েনান ও অন্যান্য জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে সাহিত্য ও শিল্পের সমস্যা প্রসঙ্গে উদ্ভূত বিতর্কিত বিষয়সমূহ। এইগুলি হচ্ছে প্রকৃত, অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য যার উপর ভিত্তি করেই আমাদের সমস্যাগুলির বিচার করতে হবে।

তাহলে সমস্যাটির মূল কথা কী? আমার মতে, মূলগতভাবে তা হচ্ছে জনগণের জন্য কাজ করার সমস্যা এবং কেমন করে জনগণের জন্য কাজ করব সেই সমস্যা। এই দুটি সমস্যার সমাধান না হলে অথবা যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক সেইভাবে না হলে, আমাদের লেখক ও শিল্পীরা তাঁদের পরিবেশ ও কাজে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারবেন না এবং ভেতর ও বাইরের একটানা অজস্র অসুবিধারই সম্মুখীন হবেন। আমার সমাপ্তিসূচক মন্তব্যগুলি এই দুটি সমস্যাকে কেন্দ্র করেই আমি রাখব এবং প্রাসঙ্গিক কিছু সমস্যার ব্যাপারেও আমি দু-চার কথা বলব।

(১)

প্রথম সমস্যা হচ্ছে: কাদের জন্য সাহিত্য ও শিল্প?

মার্কসবাদীরা, বিশেষ করে লেনিন, এই সমস্যার সমাধান বহু আগেই করেই গেছেন। বহু পূর্বে ১৯০৫ সালেই লেনিন অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে আমাদের সাহিত্য ও শিল্প 'সেবা করবে ···লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষকে।'[১] জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে সাহিত্য ও শিল্পকর্মে নিযুক্ত কমরেডদের কাছে মনে হতে পারে এই সমস্যার তো ইতিমধ্যেই সমাধান হয়ে গেছে এবং এ নিয়ে আর আলোচনার কোন দরকারই নেই। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। অনেক কমরেডই পরিষ্কার কোন সমাধান খুঁজে পাননি। ফলে তাঁদের অনুভূতি, তাঁদের রচনা, তাঁদের কাজকর্ম এবং সাহিত্য ও শিল্পের পথপ্রদর্শক মূলনীতির ব্যাপারে তাঁদের ধ্যানধারণায় অনিবার্যভাবে জনগণের ও তাঁদের বাস্তব সংগ্রামের প্রয়োজনের সঙ্গে কমবেশি অমিল থেকেই গেছে। অবশ্য, অসংখ্য সংস্কৃতিকর্মী, লেখক, শিল্পী ও অন্যান্য যেসব সাহিত্য ও শিল্প-কর্মী কমিউনিস্ট পার্টি এবং অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর সঙ্গে একযোগে মিলিতভাবে মুক্তির জন্য বিরাট সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন, তার মধ্যে

খুব কম সংখ্যকই ব্যক্তিগত উন্নতির আশায় কাজ করছেন এবং এঁরা সাময়িক ভাবেই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যেকার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠরাই সাধারণ লক্ষ্যসাধণের জন্য উৎসাহভরে কাজ করে চলেছেন। এইসব কমরেড-দের ওপর নির্ভর করে, আমরা আমাদের সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত, চারুকলার ক্ষেত্রে আমরা বিরাট অগ্রগতি লাভে সমর্থ হয়েছি। এইসব লেখক ও শিল্পীদের অনেকেই তাঁদের কাজকর্ম শুরু করেছেন প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থে ক; অন্যরা অনেকে যুদ্ধের আগেই বেশ কিছু বিপ্লবী রচনা লিখেছেন অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন এবং ব্যাপক জনসাধারণকে তাঁদের কার্যকলাপ ও রচনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করেছেন। তাহলে একথা কেন বলছি যে এই কমরেডদের 'মধ্যেও' এমন কেউ কেউ রয়েছেন যাঁরা কাদের জন্য সাহিত্য ও শিল্প এই সমস্যার একটি পরিষ্কার সমাধানে উপনীত হতে পারেন নি? এ কথা কি ভাবা যায় যে এখনো এমন কেউ কেউ রয়েছেন যাঁরা মনে করেন বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্প জনগণের জন্য নয়, শোষক ও অত্যাচারীদের জন্য?

বটেই তো, এমন সাহিত্য ও শিল্প রয়েছে যা হচ্ছে শোষক ও অত্যাচারী-দের জন্য। জমিদারশ্রেণীর জন্য যে সাহিত্য ও শিল্প তা হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্য ও শিল্প। চীনের সামন্ততান্ত্রিক শাসনকালে ঐটিই ছিল শাসকশ্রেণীর সাহিত্য ও শিল্প। আজ পর্যন্ত ঐ সাহিত্য ও শিল্পের চীনে যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্য যে সাহিত্য ও শিল্প তা হচ্ছে বুর্জোয়া সাহিত্য ও শিল্প। লু স্থন যাঁর সমালোচনা করেছিলেন সেই লিয়াং শি-চিউর[২] মতো লোকেরা শ্রেণী-নিরপেক্ষ সাহিত্য ও শিল্পের কথা বলে থাকেন কিন্তু কার্যতঃ তাঁরা বুর্জোয়া শিল্প ও সাহিত্যেরই পক্ষাবলম্বন করেন এবং প্রলেতারীয় সাহিত্য ও শিল্পের বিরোধিতা করেন। তাছাড়া এমন শিল্প ও সাহিত্য রয়েছে যা সাম্রাজ্যবাদীদের সেবা করে—যেমন চৌ সো-জেন, চ্যাঙ জু-পিং[৩] ও তাদের মতো অন্যান্যদের রচনা হচ্ছে তার উদাহরণ যাকে আমরা বলি বিশ্বাসঘাতকদের শিল্প ও সাহিত্য। আমাদের কাছে সাহিত্য ও শিল্প হচ্ছে জনগণের জন্য, ওপরে বর্ণিত কোন গোষ্ঠীর জন্য নয়। আমরা বলেছি যে চীনের নতুন সংস্কৃতি বর্তমান স্তরে হচ্ছে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন ব্যাপক জনগণের সংস্কৃতি। আজ যা কিছু যথার্থভাবে জনসাধারণের তাকে অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন হতে হবে। যা বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন তা কোনমতেই জনগণের জন্য হতে পারে না। স্বভাবতঃই

একই কথা খাটে নতুন সংস্কৃতির অংশ নতুন সাহিত্য ও শিল্পের বেলাতেও। চীনের ও বিদেশের অতীত যুগগুলি থেকে সাহিত্য ও শিল্পের যে সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার ও চমৎকার ঐতিহ্যগুলি বয়ে চলে আসছে তাকে আমরা গ্রহণ করব কিন্তু তার লক্ষ্য হওয়া চাই কিন্তু ব্যাপক জনগণের সেবা করা। অতীতের সাহিত্য ও শিল্পগত আঙ্গিকের ব্যবহার করতে আমরা নারাজ নই কিন্তু আমাদের হাতে পড়ে এইসব পুরানো আঙ্গিকগুলি নতুন বিষয়বস্তুতে নবরূপে ও নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে এবং জনগণের সেবায় বৈপ্লবিক উপাদান হয়ে দাঁড়াবে।

ব্যাপক জনগণ তাহলে কারা? জনগণের ব্যাপকতম অংশ আমাদের সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা নব্বই ভাগ শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের নিয়ে গঠিত। সুতরাং আমাদের সাহিত্য ও শিল্প সবার আগে হচ্ছে বিপ্লবের নেতৃত্ব করছে যে শ্রেণী সেই শ্রমিকশ্রেণীর জন্য। দ্বিতীয়তঃ, তা হচ্ছে বিপ্লবে আমাদের সবচেয়ে দৃঢ় মিত্র ও সংখ্যায় বিপুল সেই কৃষকদের জন্য। তৃতীয়তঃ, তা হচ্ছে সমস্ত শ্রমিক ও কৃষককের জন্য অর্থাৎ বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান বাহিনী অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং জনগণের অপরাপর সশস্ত্র বাহিনীগুলির জন্য। চতুর্থতঃ, তা হচ্ছে শহুরে পেটি-বুর্জোয়া শ্রমজীবী জনগণ ও পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের জন্য কারণ এরা উভয়েই বিপ্লবে আমাদের মিত্র এবং আমাদের সঙ্গে এদের দীর্ঘস্থায়ী সহযোগীতা গড়ে তোলা সম্ভব। এই চার ধরনের লোকই হচ্ছে চীনা জাতীর ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ, ব্যাপকতম জনগণ।

উল্লিখিত এই চার ধরনের জনগণের জন্যই আমাদের সাহিত্য ও শিল্প। তাদের সেবা করার জন্য আমাদের পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর নয় শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করতে হবে। আজ যে লেখকেরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে রয়েছেন তাঁরা যথার্থভাবে বিপ্লবী শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সেবাকরতে পারবেন না! তাঁদের উৎসাহ নিবদ্ধ রয়েছে মূলতঃ অল্পসংখ্যক পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ওপর। এটিই হচ্ছে মূল কারণ যার জন্য আমাদের কিছু কমরেড সঠিকভাবে 'কাদের জন্য?' এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। এ কথা বলে আমি কোন তত্ত্বের কথা বলছি না। তত্ত্বে বা কথায় আমাদের মধ্যে কেউই ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না। আমি

বাস্তবে, কার্যক্ষেত্রে যা ঘটে তাই বলছি। বাস্তবে, কার্যক্ষেত্রে তাঁরা কি পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি? আমি মনে করি, করেন। অনেক কমরেড বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সঙ্গে যোগদান করে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠার, জনসাধারণের বাস্তব সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার, জনগণকে রূপায়িত ও শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শনের পরিবর্তে, কমরেড এই বুদ্ধিজীবীদের চরিত্রচিত্রণে ও তাদের দোষত্রুটির পক্ষে ওকালতি করতে বা সাফাই গাইতে ও এই পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের অধ্যয়ন ও তাদের মানসিকতার বিশ্লেষণেই তাঁদের অধিক মনোযোগ দিয়ে থাকেন। পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে নিজেরা এসেছেন এবং নিজেরা বুদ্ধিজীবী বলেই অনেক কমরেড শুধু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বন্ধু খুঁজে বেড়ান এবং তাঁদের অধ্যয়ন ও চরিত্রচিত্রণেই ব্যাপৃত থাকেন। এই অধ্যয়ন ও চরিত্রচিত্রণ সঠিক হতো যদি তাঁরা প্রলেতারীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা করতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেন না বা সেটা তাঁরা পুরোপুরিভাবে করেন না। তাঁরা পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন ও এমন সব রচনা হাজির করেন যা পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীরই নিজস্ব অভিব্যক্তি এবং বহু সংখ্যক সাহিত্য ও শিল্পগত রচনায়ই এটা দেখা যায়। প্রায়ই দেখা যায় যে, পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীদের প্রতি এঁদের রয়েছে আন্তরিক সহানুভূতি যা এদের ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ বা এমনকি প্রশংসা জ্ঞাপন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। অন্যদিকে এই কমরেডরা শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সংশ্রবে অতি অল্পই আসেন, তাদের বোঝেন না বা তাদের অধ্যয়ন করেন না, তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু খুঁজে পান না এবং ভালভাবে তাদের চিত্রও আঁকতে পারেন না; যখন এঁরা তাদের ছবি আঁকেন তখন পোশাক-আশাক তাঁদের শ্রমিকের মতো হলেও মুখটি হয়ে ওঠে পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মতো। কিছু কিছু দিক থেকে তাঁরা শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের এবং তাদের মধ্য থেকে উদ্ভূত কর্মীদের পছন্দ করেন, কিন্তু কিছু কিছু সময়ে দেখা যায় ওদের তাঁরা তেমন পছন্দ করেন না বা এমন কিছু কিছু দিক আছে যেদিক থেকে ওদের তাঁরা পছন্দ করেন না: যেমন, তাদের অনুভূতি, অথবা তাদের চাল-চলন বা তাদের নব-উন্মেষিত সাহিত্য ও শিল্প (তাদের দেওয়াল পত্রিকা, প্রাচীরচিত্র, লোকসংগীত, লোককথা ইত্যাদি) ওঁদের পছন্দ নয়। কোন কোন সময়ে এই জিনিসগুলি অবশ্য ওঁদের ভাল লাগে কিন্তু তাও অনেকটা

নতুনত্বেই খোঁজে, ওগুলি দিয়ে নিজেদের রচনার অঙ্গশোভা বাড়াবার জন্য বা তাঁদের অনগ্রসরতার প্রতীক হিসেবে কাজে লাগাবার জন্য। অন্য সময়ে ওঁরা খোলাখুলিই এই জিনিসগুলিকে হেয় জ্ঞান করেন এবং পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের এমনকি বুর্জোয়াশ্রেণীর জিনিসগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন। এই কমরেডদের পা দুখানি আঁটকে আছে পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বা আরও খানিকটা সুন্দর করে বললে বলতে হয় এখনো এঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলের সিংহাসনে সমাসীন হয়ে রয়েছে পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা। তাই তাঁরা 'কাদের জন্য ?' এই সমস্যার সমাধান এখনো করেননি বা পরিষ্কারভাবে তার সমাধান করে উঠতে পারেননি। এটা শুধু যাঁরা ইয়েনানে নতুন এসেছেন তাঁদের বেলাতেই প্রযোজ্য নয়; এমনকি যেসব কমরেড রণক্ষেত্রে ছিলেন, ঘাঁটি এলাকায় ও অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর মধ্যে থেকে বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করে আসছেন তাঁদের অনেকেও এই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান করতে পারেননি। এ সমস্যার পুরোপুরি সমাধানের জন্য দীর্ঘ সময়ের, অন্ততঃ আট বা দশ বছরের, দরকার। কিন্তু যত দীর্ঘ সময়ই লাগুক না কেন তার সমাধান আমাদের করতেই হবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে ও পুরোপুরিভাবেই তার সমাধান করতে হবে। আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মীদের এই কর্তব্য সম্পাদান করতেই হবে এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন নিয়ে আসতেই হবে; তাঁদেরকে ধীরে ধীরে পা দুটিকে টেনে এনে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মধ্যে, শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে রাখতে হবে, একেবারে তাঁদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, নিবিড় বাস্তব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং মার্কসবাদ ও সমাজকে অধ্যয়নের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তা করতে হবে। শুধুমাত্র এই পথেই আমরা এমন একটি সাহিত্য ও শিল্প পাব যা সত্যসত্যিই শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের এবং যথার্থভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর সাহিত্য ও শিল্প হবে।

'কার জন্য ?' এই প্রশ্নটি একটি মৌলিক প্রশ্ন; একটি নীতিগত প্রশ্ন। অতীতে কিছু কিছু কমরেডদের মধ্যে যে বিতর্ক ও বিভিন্নতা, বিরোধিতা ও অনৈক্য দেখা দিয়েছিল তা ঐ মৌলিক নীতিগত প্রশ্ন প্রসঙ্গে নয় বরং তা দেখা দিয়েছিল গৌণ বা এমন কিছু প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যারা সঙ্গে নীতিগত কোন প্রশ্নের সম্পর্ক ছিল না। নীতিগত এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে কিন্তু বিরোধীর দুই পক্ষের মধ্যে বিভিন্নতা প্রায় কিছুই নেই এবং তাঁদের মধ্যে প্রায় পরিপূর্ণ একমত লক্ষিত হয়, কতক পরিমাণে দুটো পক্ষই শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের

হেয় দৃষ্টিতে দেখে থাকেন এবং নিজেদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। আমি 'কতক পরিমাণে' বলেছি কারণ সাধারণভাবে বলতে গেলে ঐ কমরেডরা শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের হেয় দৃষ্টিতে দেখেন না বা নিজেদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন না, বা কুওমিনতাঙ ঠিক যেভাবে তা করে থাকে তা করেন না। তা সত্ত্বেও প্রবণতাটি রয়েছে। এই মৌলিক সমস্যার সমাধান না হলে, অন্যান্য সমস্যার সমাধান সহজ হবে না। উদাহরণ হিসেবে সাহিত্য ও শিল্প মহলগুলিতে সংকীর্ণতাবাদের কথাই ধরুন। এটিও একটি নীতিগত প্রশ্ন, কিন্তু সকীর্ণতাবাদকে তখনই শুধু নির্মূল করা যাবে যখন 'শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য!' 'অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সৈন্যবাহিনীর জন্য!' এবং 'জনগণের মধ্যে চলুন!' ইত্যাদি শ্লোগানগুলিকে তুলে ধরা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে তা কাজে প্রয়োগ করা যাবে। অন্যথায় সংকীর্ণতাবাদের সমস্যা কোন সময়ই সমাধান করা যাবে না। লু স্যুন একবার বলেছিলেন :

> একটা যুক্তফ্রন্টের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন একটি অভিন্ন লক্ষ্যের।… আমাদের ফ্রন্ট যে ঐক্যবদ্ধ নয় এই বাস্তব সত্য দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হইনি এবং কিছু লোক রয়েছেন যাঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্টির জন্য বা বস্তুতঃ শুধু নিজেদের জন্যই কাজ করছেন। আমরা সকলেই যদি শ্রমিক ও কৃষকজনসাধারণের সেবা করার লক্ষ্য গ্রহণ করি, তবে অবশ্যই আমাদের ফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধ হবে।[৪]

তখনকার সাংহাইতে এই সমস্যা ছিল; আজ চুংকিং-এও এই সমস্যা রয়েছে। ঐসব জায়গায় এই সমস্যাকে পুরোপুরি সমাধান করার সম্ভাবনা খুবই কম কারণ শাসকেরা বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের দমনপীড়ন করে এবং তাঁদের শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মধ্যে যাওয়ার স্বাধীনতাও নেই। কিন্তু আমাদের এখানে অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্রিয় হওয়ার জন্য উৎসাহই দিয়ে থাকি, জনসাধারণের মধ্যে যাওয়ার জন্য এবং যথার্থ একটি বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির জন্য তাঁদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে থাকি। সুতরাং আমাদের এখানে সমস্যাটি সমাধানের কাছাকাছি আসছে। কিন্তু সমাধানের কাছাকাছি আসা আর পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন সমাধান হয়ে যাওয়া তো এক কথা নয়। আমরা যেভাবে বলে আসছি সেভাবে মার্কসবাদ ও সমাজকে অধ্যয়ন

করতে হবে পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন সমাধানে ঠিক ঠিকভাবে উপনীত হওয়ার জন্য। মার্কসবাদ বলতে আমরা বোঝাচ্ছি সেই জীবন্ত মার্কসবাদকে যা জনসাধারণের জীবনে ও সংগ্রামে পালন করে একটি কার্যকর ভূমিকা, শুধু শব্দবদ্ধ মার্কসবাদ তা নয়। মুখের কথা থেকে মার্কসবাদকে বাস্তব জীবনে রূপান্তরিত করলে দেখা যাবে, সংকীর্ণতাবাদের আর স্থান থাকবে না। শুধু সংকীর্ণতাবাদের সমস্যারই যে সমাধান হবে তাই নয়, অন্য বহু সমস্যারও তাতে করে সমাধান হয়ে যাবে।

(২)

কাকে সেবা করতে হবে এই সমস্যার নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ার পর আমরা আসছি পরবর্তী সমস্যায়, কিভাবে সেবা করতে হবে। আমাদের কিছু কিছু কমরেডদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়: আমরা কি মান উন্নয়নের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করব, না জনপ্রিয়করণের প্রচেষ্টা করব?

অতীতে কিছু কিছু কমরেড কিছুটা বা বেশ গুরুতরভাবেই জনপ্রিয়করণকে ছোট করে দেখেছেন ও অবহেলা করেছেন এবং অযথা জোর দিয়েছেন মান উন্নয়নের ওপর। মান উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া উচিত কিন্তু একতরফাভাবে, বিশেষভাবে, অতিরিক্ত রকমে তা করা ভুল হবে। 'কাদের জন্য?' এই সমস্যার যে পরিষ্কার সমাধানের অভাবের কথা আমি এর আগে উল্লেখ করেছি—সেটি এই প্রসঙ্গেও দেখা যাচ্ছে। 'কাদের জন্য?' এই সমস্যার ব্যাপারে ঐ কমরেডরা পরিষ্কার ধারণার অধিকারী নন বলেই 'মান উন্নয়নের' ও 'জনপ্রিয়করণের' যে কথা তাঁরা বলেন সে সম্পর্কে কোন যথার্থ মানদণ্ড তাঁদের নেই এবং স্বভাবতঃই এই দুয়ের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নিরূপণ করতে তাঁরা বেশি করে ব্যর্থ হয়েছেন। যেহেতু আমাদের শিল্প ও সাহিত্য মূলতঃ শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের জন্য 'জনপ্রিয়করণ' বলতে বোঝায় শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মধ্যে জনপ্রিয় হওয়া এবং 'মান উন্নয়ন' বলতে বোঝায় তাঁদের বর্তমান স্তরের উন্নতিসাধন করা। তাঁদের মধ্যে কোন্ জিনিস আমরা জনপ্রিয় করে তুলব? সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণীর যা প্রয়োজন এবং তারা যা সহজেই বরণ করে নেবে তা-ই কি আমরা জনপ্রিয় করব? বুর্জোয়াশ্রেণীর যা প্রয়োজন এবং তারা যা সহজেই বরণ করে নেবে তা-ই কি আমরা জনপ্রিয় করব? পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের যা প্রয়োজন এবং সহজেই তারা যা বরণ করে নেবে

তা-ই কি আমরা জনপ্রিয় করব? না, এর কোনটা দিয়েই হবে না। শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের নিজেদের যা প্রয়োজন এবং তাঁরা সহজেই যা বরণ করে নেবেন শুধু তাকেই আমরা জনপ্রিয় করব। তারই জন্য শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের শিক্ষিত করে তোলার আগে তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণের কাজটি করতে হবে। মান উন্নয়নের ব্যাপারে এটা আরও বেশি সত্য। একটা ভিত্তি চাই যার ওপর ভিত্তি করে উন্নয়ন করা যাবে। উদাহরণ হিসেবে এক বালতি জলের কথাই ধরুন; মাটি থেকে না হলে কোথা থেকে তাকে উঁচুতে তুলবেন? হাওয়ার মাঝখান থেকে? কোন্ ভিত্তি থেকে তাহলে শিল্প ও সাহিত্যকে উঁচুতে তুলতে হবে? সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীগুলির ভিত্তি থেকে? বুর্জোয়াশ্রেণীর ভিত্তি থেকে? পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ভিত্তি থেকে? না, তার কোনটা থেকেই নয়; উন্নয়ন করতে হবে একমাত্র শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক-সাধারণের ভিত্তি থেকে। এ থেকে এটাও বোঝাচ্ছে না যে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সামন্তশ্রেণীগুলির, বুর্জোয়াশ্রেণীর বা পেটি বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবীদের 'উচ্চতায়' তুলতে হবে; এর অর্থ হচ্ছে সাহিত্য ও শিল্পের স্তরকে এগিয়ে যেতে হবে শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকেরা নিজেরা যে পথে এগোচ্ছেন, যে পথ ধরে শ্রমিক-শ্রেণী এগিয়ে চলেছেন সেই পথ ধরে। এখানেও আবার শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণের কর্তব্যটি এসে পড়ছে। একমাত্র শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের থেকে শুরু করলেই আমরা জনপ্রিয়করণ ও মান উন্নয়নের একটি সঠিক উপলব্ধি লাভ করতে পারি এবং এ দুয়ের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক খুঁজে পেতে পারি।

শেষ বিচারে, সকল সাহিত্য ও শিল্পের উৎসটি কি? মতাদর্শের প্রকাশ হিসেবে সাহিত্য ও শিল্প কর্ম হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত একটা বিশেষ সমাজজীবনের চিত্র। বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্প হচ্ছে বিপ্লবী লেখক ও শিল্পী-দের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত জনগণের জীবনের চিত্র। জনগণের জীবন সবসময়ই সাহিত্য ও শিল্পের কাঁচামালের, একেবারে সহজাত স্বাভাবিক আকারের নীরেট কাঁচামালের খনি, কিন্তু একান্ত জীবন্ত, সমৃদ্ধ আর মৌলিক বিষয়বস্তুতে ভরা; এর কাছে তুলনামূলকভাবে সকল সাহিত্য আর শিল্পকেই বিবর্ণ বলে মনে হয়; তা হচ্ছে সাহিত্য ও শিল্পের অফুরন্ত এক উৎসস্বরূপ, তাদের একমাত্র উৎস। তা একমাত্র উৎস, কেননা তার অন্য কোন উৎসই থাকতে পারে না। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন, বই পুস্তকে, প্রাচীনকালের ও বিদেশের

সাহিত্য ও শিল্পে কি অন্য একটি উৎস পাওয়া যায় না? আসলে, অতীতের সাহিত্য ও শিল্পকর্ম উৎস নয় বরং একটি স্রোতোধারা; তাঁদের সময়ে ও তাঁদের চারিপাশের জনগণের জীবনে যে সাহিত্য ও শিল্পগত কাঁচামাল পেয়েছিলেন তা দিয়েই আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেগুলি সৃষ্টি করে গেছেন। আমাদের সাহিত্য ও শিল্পগত উত্তরাধিকারে যা কিছু চমৎকার তাকে আমরা গ্রহণ করব, তার মধ্যে যা হিতকর তাকে বিচার-বিবেচনা করে আমরা নিজের করে নেব এবং সেগুলিকে আমাদের সময়ে ও আমাদের চারিদিকে জনগণের জীবনে যে সাহিত্য ও শিল্পগত কাঁচামাল পাচ্ছি তা থেকে রচনা সৃষ্টিকালে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করব। ঐরকম উদাহরণ আমাদের সামনে থাকা না থাকার পার্থক্য রয়েছে, সে পার্থক্য হচ্ছে অমার্জিতের ও মার্জিতের মধ্যেকার, শ্রীহীনতা ও শ্রীমণ্ডিত হওয়ার মধ্যেকার নীচু ও উঁচু স্তরের এবং মন্থরতা ও দ্রুততার মধ্যেকার পার্থক্য। সুতরাং, আমরা কোনমতেই প্রাচীনদের ও বিদেশীয়দের উত্তরাধিকারকে খারিজ করে দিতে বা তাঁদের কাজ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারি না, যদিও তা সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়াশ্রেণীসমূহেরই সৃষ্টি। উত্তরাধিকার গ্রহণ করা এবং সেগুলিকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা কোনমতেই আমাদের নিজস্ব সৃজনশীল রচনার স্থান দখল করতে পারে না; কোন কিছু দিয়েই তা করা সম্ভব নয়। প্রাচীনদের বা বিদেশীয়দের কাছ থেকে বিনা বিচারে হুবহু গ্রহণ করা বা নকল করা সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বন্ধ্যা ও ক্ষতিকর অন্ধতা। চীনের বিপ্লবী লেখকেরা ও শিল্পীরা, প্রতিশ্রুতিবান লেখক ও শিল্পীরা অবশ্যই জনগণের মধ্যে যাবেন, দীর্ঘকাল ধরে দ্বিধাহীনচিত্তে ও সর্বান্তঃকরণে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকসাধারণের মধ্যে যেতে হবে, যেতে হবে তাদের সংগ্রামের উত্তপ্ত মুহূর্তগুলিতে, যেতে হবে একমাত্র উৎসে, সবচেয়ে ব্যাপক ও সবচেয়ে সমৃদ্ধ উৎসে নানা ধরনের সকল মানুষ, সকল শ্রেণী, সকল জনগণ, তাদের জীবন ও সংগ্রামের সকল রূপকে, সাহিত্য ও শিল্পের এই সকল কাঁচামালকেই পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ ও অধ্যয়ন করতে হবে। একমাত্র তখনই তাঁরা সৃষ্টিকর্মে অগ্রসর হতে পারেন। অন্যথায় রচনা করার মতো তাঁরা কিছু পাবেন না আর তাঁরা এক-একজন নকল সাহিত্যিক বা শিল্পী হয়ে উঠবেন, যা না হওয়ার জন্যই লু সুন তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রে তাঁর পুত্রকে একান্তভাবে সাবধান করে দিয়েছিলেন।[৫]

যদিও মানুষের সমাজজীবনই সাহিত্য ও শিল্পের একমাত্র উৎস এবং বিষয়-

বৈচিত্র্যে অনেক বেশি জীবন্ত ও অনেক বেশি সমৃদ্ধ তবু জনগণ কিন্তু প্রতিদিনের জীবন নিয়ে তৃপ্ত নয় তাই তারা সাহিত্য ও শিল্পও চায়। কেন চায়? চায় এই কারণে যে যদিও দুইটিই সুন্দর তবু সাহিত্য ও শিল্পে যে জীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে তা উচ্চতর পর্যায়ে অধিকতর আবেগসম্পন্ন, ঘনীভূত, বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ, আদর্শের নিকটতর বলে তা প্রাত্যহিক জীবনের তুলনায় অনেক বেশি সার্বজনীন হয়ে ওঠে বা হয়ে ওঠা তার উচিত। বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্পকে বাস্তব জীবন থেকে বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে এবং ইতিহাসকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে জনগণকে সাহায্য করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে, একদিকে রয়েছে ক্ষুধার জ্বালা, অবহেলা, ও অত্যাচার আর অন্যদিকে রয়েছে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ ও নিপীড়ন। এই বাস্তব সত্য সর্বত্র রয়েছে আর মানুষের কাছে তা প্রতিদিনের সাধারণ ঘটনা বলেই মনে হয়। সেই প্রতিদিনের ঘটনাকে নিয়ে লেখক ও শিল্পীরা তার মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন তার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংগ্রামকে এবং এমন রচনা সৃষ্টি করেন যা জনগণকে জাগিয়ে দেয়, তাদের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে তোলে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের পরিবেশকেই পরিবর্তন করে দিতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এ রকম সাহিত্য ও শিল্প ছাড়া এই কাজ সুসম্পন্ন করা যাবে না বা ততখানি কার্যকরভাবে ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা যাবে না।

সাহিত্য ও শিল্পকর্মের জনপ্রিয়করণ ও মান উন্নয়নের অর্থ কী? এই দুটির মধ্যে সম্পর্ক কী? জনপ্রিয় রচনাগুলি সহজ, সরল এবং স্বাভাবিকভাবেই তা আজকের দিনের ব্যাপক জনগণের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য বলে বোধ হয়। উচ্চতর মানের রচনাগুলি অনেক বেশি সুচারুভাবে সম্পাদিত বলে তা রচনা করা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য এবং সাধারণতঃ তত সহজে ও দ্রুত তা আজকের ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে না। শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সামনের সমস্যাটি হচ্ছে: তারা এখন শত্রুর বিরুদ্ধে তীব্র ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত এবং দীর্ঘকালের বুর্জোয়াশ্রেণীসমূহের শাসনের পরিণতি হিসেবে তারা নিরক্ষর ও শিক্ষা-বঞ্চিত হয়ে রয়েছে, তাই তারা একান্ত আগ্রহভরে এমন জ্ঞানের আলো, শিক্ষা ও সাহিত্য এবং শিল্পগত রচনা চাইছে যা তাদের জরুরী প্রয়োজন মেটাবে এবং যা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সহজ হবে যাতে করে তাদের সংগ্রামের প্রেরণা বাড়বে ও বিজয় সম্পর্কে আস্থা বাড়বে এবং একমন-একপ্রাণ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম ও ঐক্য জোরদার হয়ে উঠবে। তাদের

সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে 'বরফের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অগ্নি-উদ্দীপক জ্বালানির', 'বুটিদার রেশমি চাদরের শোভাবর্ধনের জন্য আরও ফুলের বাহারের' নয়। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে জনপ্রিয়করণটাই অনেক বেশি জরুরী প্রয়োজন। জনপ্রিয়করণকে ছোট করে দেখা বা অবহেলা করা ভুল হবে।

কিন্তু জনপ্রিয়করণ ও মান উন্নয়নের মধ্যে কোন বাঁধাধরা সীমারেখা টেনে দেওয়া যায় না। উচ্চতর মানের কিছু রচনাকে ঠিক এখনই যে শুধু জনপ্রিয় করে তোলা যায় তাই নয়, ব্যাপক জনগণের সাংস্কৃতিক মান অবিরাম উন্নত হয়ে উঠছে। জনপ্রিয়করণ যদি চিরকাল একই স্তরে পড়ে থাকে, একই জিনিস যদি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে পরিবেশন করা হতে থাকে, সেই 'ছোট রাখাল ছেলে'[৬] এবং সেই একই 'মানুষ, হাত, মুখ, ছুরি, গরু, ছাগলই' হাজির করা হতে থাকে তবে শিক্ষাদাতা আর ছাত্ররা একপক্ষ ছয় আর অন্যপক্ষ আধ ডজন হয়েই থেকে যাবেন না কি? এ ধরনের জনপ্রিয়করণের কোন মানে হয়? জনগণ জনপ্রিয়করণ দাবি করে এবং তারপর চায় উন্নততর মান। তারা মাসে মাসে বছরে বছরে উন্নয়নের প্রত্যাশা করে। এখানে জনপ্রিয়করণ হচ্ছে জনগণের জন্য জনপ্রিয়করণ আর মান উন্নয়ন জনগণের জন্যই মান উন্নয়ন। আর এই মান উন্নয়ন তো হাওয়ার মাঝখান থেকে হতে পারে না বা দ্বারবদ্ধ করে পেছন ফিরে হতে পারে না, উন্নয়ন হতে পারে প্রকৃত জনপ্রিয়করণকে ভিত্তি করেই। তা জনপ্রিয়করণকে দিয়েই নিরূপিত হয় এবং একই সঙ্গে জনপ্রিয়করণকে পথপ্রদর্শন করে। সামগ্রিকভাবে চীনে বিপ্লবের ও বিপ্লবী সংস্কৃতির বিকাশের স্তর অসমান এবং তাদের প্রসার ঘটছে ক্রমে ক্রমে। যখন একক্ষেত্রে জনপ্রিয়করণ দেখা যাচ্ছে এবং তারপর এই জনপ্রিয়করণকে ভিত্তি করে মান উন্নয়নের কাজ চলছে দেখা যাচ্ছে, তখন অন্যান্য জায়গায় হয়তো দেখা যাবে জনপ্রিয়করণই শুরু হয়নি। সুতরাং এক অঞ্চলে জনপ্রিয়করণকে উচ্চতর মানে নিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতাকে অন্যান্য অঞ্চলে কাজে লাগানো যেতে পারে এবং জনপ্রিয়করণের পথনির্দেশের ও মান উন্নয়নের কাজে তাকে সেখানে কাজে লাগানো যায় এবং এতে করে আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার অনেক ঝামেলার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়। আন্তর্জাতিকভাবে বৈদেশিক ভাল অভিজ্ঞতাগুলিকে বিশেষতঃ সোভিয়েতের অভিজ্ঞতাকে আমাদের পথ চলার নির্দেশক হিসেবেও গ্রহণ করা যায়। সুতরাং আমাদের দিক থেকে মান উন্নয়নের ভিত্তি হচ্ছে জনপ্রিয়করণ এবং মান উন্নয়নই জন-

প্রিয়করণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। ঠিক এই কারণেই মান উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক হওয়া দূরে থাক, জনপ্রিয়করণের যে কাজের কথা আমরা বলছি তাই আমাদের মান উন্নয়নের কাজের ভিত্তি হতে পারে, যে মান উন্নয়নের কাজ আজ সীমাবদ্ধভাবে করছি তার ভিত্তি হতে পারে এবং ভবিষ্যতের অনেক বেশি ব্যাপক আকারে আমাদের মান উন্নয়নের কাজের আবশ্যকীয় শর্তগুলিও তা প্রস্তুত করে দিতে পারে।

সরাসরি ব্যাপক জনগণের এ ধরণের মান. উন্নয়নের যেভাবে প্রয়োজন মেটানো হয়, তেমনি তাদের প্রয়োজন মেটানোর আরও একটি পরোক্ষ পথ রয়েছে, তা হচ্ছে আমাদের কর্মীদের প্রয়োজনীয় মান উন্নয়নের পথটি। কর্মী-বাহিনী হচ্ছেন জনগণের অগ্রসর বাহিনী এবং সাধারণভাবে তাঁরা বেশি লেখা-পড়া করেছেন, তাঁদের জন্য উন্নততর মানের সাহিত্য ও শিল্প একান্তভাবেই প্রয়োজন। এটা অবহেলা করা ভুল হবে। কর্মীবাহিনীর জন্য যা করা হয় তা পুরোপুরি জনগণের জন্যই কারণ একমাত্র কর্মীদের মাধ্যমেই আমরা জনগণকে শিক্ষিত ও পরিচালিত করতে পারব। এই লক্ষ্যের বিরুদ্ধে গেলে অর্থাৎ কর্মীবাহিনীকে আমরা যা দিই তা দিয়ে যদি তাঁরা জনগণকে শিক্ষিত ও পরিচালিত করতে না পারেন, তবে মান উন্নয়নের জন্য আমাদের কাজ অন্ধকারে গুলি ছোঁড়ার মতো হয়ে দাঁড়াবে ও ব্যাপক জনগণকে সেবা করার মূলনীতি থেকেই আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়ব।

মোট কথা: বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের সৃষ্টিশীল শ্রমের মধ্য দিয়ে জনগণের জীবনের থেকে পাওয়া কাঁচামাল সাহিত্য ও শিল্পে পরিণত হয়ে মতাদর্শগতরূপ লাভ করে জনগণের সেবায় নিয়োজিত হয়। প্রাথমিক সাহিত্য ও শিল্পের ভিত্তিতে বিকশিত আরও অগ্রসর সাহিত্য ও শিল্পকেও এর মধ্যে ধরা হয়েছে এবং যা গড়ে উঠেছে জনগণের সেইসব অংশের প্রয়োজনে যাদের মান উন্নত হয়ে উঠেছে অথবা আরও সরাসরি বললে, তার প্রয়োজন জনগণের মধ্যেকার কর্মীদের জন্য। বিপরীত দিকে এর মধ্যে প্রাথমিক সাহিত্য ও শিল্পকেও ধরা হয়েছে যা অধিকতর অগ্রসর সাহিত্য ও শিল্পের দ্বারা পরিচালিত এবং বর্তমানে বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের দিক থেকে যা প্রাথমিক প্রয়োজন। অধিকতর অগ্রসর হোক বা প্রাথমিকই হোক আমাদের সকল সাহিত্য ও শিল্পই জনগণের জন্য এবং সর্বপ্রথমেই তার প্রয়োজন শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের জন্য, ঐগুলি সৃষ্ট হয়েছে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের জন্য এবং তাদের ব্যবহারের জন্যই।

মান উন্নয়ন ও জনপ্রিয়করণের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্ন মীমাংসার সাথে সাথে বিশেষজ্ঞ ও জনপ্রিয় যাঁরা করবেন তাঁদের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নেরও মীমাংসা করা যায়। আমাদের বিশেষজ্ঞরা শুধু কর্মীদের জন্যই নন, তাঁরা জনগণের জন্যও বটে এবং মুখ্যতঃ তাঁরা জনগণের জন্যই বটে। আমাদের সাহিত্য সম্পর্কে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা জনগণের দেওয়াল পত্রিকাগুলির প্রতি নজর দেবেন, সেনাবাহিনীতে ও গ্রামে গ্রামে যে রিপোর্টগুলি লিখিত হবে তার প্রতি নজর দেবেন। নাটক সম্পর্কে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা সেনাবাহিনী ও গ্রামগুলির ছোট ছোট নাটকের দলগুলির প্রতি নজর দেবেন। সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা জনগণের গীত গানগুলির প্রতি নজর দেবেন। আমাদের চারুকলা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞরা জনগণের চারুকলার প্রতি নজর দেবেন। এই সকল কমরেডকেই জনগণের মধ্যে যাঁরা সাহিত্য ও শিল্পকে জনপ্রিয় করার কাজে লিপ্ত রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হবে। একদিকে তাঁদের জনপ্রিয়করণের কাজে সাহায্য দিতে হবে ও পরিচালনা করতে হবে এবং অন্যদিকে তাঁদের এইসব কমরেড-দের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে এবং তাঁদের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে নিজেদেরকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। যাতে করে তাঁদের বিশেষজ্ঞতা 'গজদন্ত মিনার'-এর মতো জনগণ ও বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বিষয়বস্তু-বিবর্জিত ও প্রাণহীন হয়ে না পড়ে। বিশেষজ্ঞদের আমাদের সম্মান করা উচিত কারণ তাঁরা আমাদের লক্ষ্যের দিক থেকে মূল্যবান। কিন্তু তাঁদের আমাদের বলে দিতে হবে যে কোন বিপ্লবী লেখক ও শিল্পী যদি জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ না রাখেন, তাদের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতিকে রূপ না দেন এবং তাদের অনুগত মুখপাত্র হিসেবে সেবা না করেন তবে তাঁরা সার্থক কিছুই রচনা করতে পারবেন না। একমাত্র জনগণের পক্ষে কথা বলেই তিনি জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে পারতেন এবং তাদের ছাত্র হওয়ার মধ্য দিয়েই তাঁরা তাদের শিক্ষক হয়ে উঠতে পারবেন। যদি তিনি নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন, 'নীচের তলার' প্রতি একজন অভিজাতের মতো হাবভাব দেখাতে থাকেন তবে তিনি যত প্রতিভাবানই হোন না কেন, জনগণের কোন প্রয়োজনেই তিনি লাগবেন না এবং তাঁর রচনারও কোনো ভবিষ্যৎ থাকবে না।

আমাদের মনোভাব কি উপাযোগিতাবাদী? বস্তুবাদীরা উপযোগিতাবাদ হলেই সাধারণভাবে তার বিরোধিতা করেন না, তাঁরা সামন্ত, বুর্জোয়া ও পেটি-

বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির উপযোগিতাবাদেরই বিরোধিতা করেন ; তাঁরা বিরোধিতা করেন সেই কপটাচারীদের যারা মুখে উপযোগিতাবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলেও কার্যতঃ সবচেয়ে স্বার্থপর ও সংকীর্ণ উপযোগিতাবাদকেই বরণ করে নেন। পৃথিবীতে কোন 'মতবাদই' নেই যা উপযোগিতাবাদী ভাবনার উর্ধ্বে ; শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উপযোগিতাবাদ একটা না একটা শ্রেণীর উপযোগিতাবাদই হতে পারে। আমরা হচ্ছি প্রলেতারীয় উপযোগিতাবাদী এবং জনগণের শতকরা নব্বই জনের অধিক সংখ্যক ব্যাপকতম জনগণের বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্বার্থের ঐক্য থেকেই আমরা যাত্রা শুরু করি ; তাই আমরা হচ্ছি বিপ্লবী উপযোগিতাবাদী, আমাদের লক্ষ্য রয়েছে ব্যাপকতম ও সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের প্রতি, শুধু আংশিক ও আশু বিষয় নিয়ে মগ্ন সংকীর্ণ উপযোগিতাবাদী আমরা নই। যেমন ধরুন, আপনারা জনগণকে তাদের উপযোগিতাবাদের জন্য গালাগাল করেন অথচ আপনি আপনার নিজের প্রয়োজন অথবা কোন সংকীর্ণ গোষ্ঠীর প্রয়োজনে বাজারে এমন একটি রচনা চালু করে দেন এবং জনগণের মধ্যে প্রচার করেন যা শুধু সামান্য কিছু লোকেরই মনোরঞ্জন করে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর বলে মনে হয়, তবে আপনি যে শুধু জনগণকে অপমানই করবেন তাই নয়, আপনি আপনার অজ্ঞতাও প্রকাশ করবেন। একটি জিনিসকে তখনই শুধু ভাল বলা চলে যখন তা ব্যাপক জনগণের পক্ষে প্রকৃতই হিতকর হয়। আপনার রচনাটি 'বসন্তের তুষার'-এর মতো ভাল হতে পারে কিন্তু তা সাময়িকভাবে যদি মুষ্টিমেয় কিছু লোকেরই প্রয়োজন মেটায় এবং জনসাধারণ যদি 'গ্রাম্য গরিবের গানই'[৮] গেয়ে চলতে থাকে তবে তাদের মান উন্নয়নের চেষ্টা না করে শুধু তাদের গালাগাল দিয়ে আপনারা কিছুই করতে পারবেন না। তাই এখন আমাদের সামনে সমস্যা হচ্ছে 'বসন্তের তুষার' ও 'গ্রাম্য গরিবের গান'-এর মধ্যে, উচ্চতর মান ও জনপ্রিয়করণের মধ্যে একটা মিলন সাধন করা। এ ধরনের মিলন ছাড়া কোন একজন বিশেষজ্ঞের সর্বোচ্চ শিল্পকলাও সংকীর্ণতম অর্থে উপযোগিতাবাদী না হয়ে পারবে না ; আপনি ঐ শিল্পকে 'বিশুদ্ধ ও উঁচুদরের' বলে অভিহিত করতে পারেন কিন্তু তাতে শুধু আপনার নাম জাহির করাই হতে পারে, জনগণ তা গ্রহণ করবে না।

মৌলিক নীতিগত সমস্যাগুলির সমাধান করে ফেলার পর অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সেবা করার ও কিভাবে তাদের সেবা করা হবে সেসব সমস্যার সমাধান করে ফেলার পর অন্য যেসব সমস্যা থাকছে, যেমন জীবনের

উজ্জ্বল না অন্ধকার দিক নিয়ে লিখব এবং ঐক্যের সমস্যার সমাধান ইত্যাদি সহজেই হয়ে যাবে। এই মৌলিক নীতির ব্যাপারে প্রত্যেকেই যদি একমত হন তাহলে সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের এবং সাহিত্য ও শিল্পগত কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত আমাদের সকল কর্মী, সকল স্কুল, প্রকাশনা সংস্থা ও সংগঠনগুলিকে এই নীতির প্রতি অনুগত থেকে কাজ করতে হবে। এই নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়া ভুল হবে এবং এই নীতির বিপরীত কোন কিছু থাকলে তাকে উপযুক্ত ভাবে শুধরে নিতে হবে।

(৩)

যেহেতু আমাদের শিল্প হল ব্যাপক জনগণের জন্য, তাই আমরা পার্টির আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের সমস্যাগুলি নিয়ে, যেমন পার্টির সামগ্রিক কাজের সঙ্গে পার্টির সাহিত্য ও শিল্প-বিষয়ক কাজের সম্পর্ক নিয়ে এবং তার সাথে সাথে পার্টির বাইরে যারা আছে, যেমন এই ক্ষেত্রে পার্টি-বহির্ভূত যেমন লোক রয়েছে তাদের সঙ্গে পার্টির সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের কাজের সম্পর্কের অর্থাৎ সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে যুক্তফ্রণ্টের সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি।

প্রথম সমস্যাটি নিয়ে বিবেচনা করা যাক। আজকের পৃথিবীতে সকল সংস্কৃতি, সকল সাহিত্য ও সকল শিল্পই বিশেষ শ্রেণীর সম্পত্তি এবং বিশেষ রাজনৈতিক লাইন প্রচার করাই তার কাজ। শিল্পের জন্য শিল্প, শ্রেণী-স্বার্থের ঊর্ধ্বে অবস্থিত বা রাজনীতির সাথে সম্পর্কহীন ও স্বাধীন শিল্প বলে আসলে কিছুই নেই। প্রলেতারীয় সাহিত্য ও শিল্প হচ্ছে সমগ্র প্রলেতারীয় বিপ্লবী লক্ষ্যেরই একটি অংশ; লেনিনের ভাষায় তা হচ্ছে সমগ্র বিপ্লবী যন্ত্রেরই দাঁত ও চাকা।[১] সুতরাং পার্টির সমগ্র কাজকর্মের মধ্যে কোন একটি বিশেষ বিপ্লবী যুগে পার্টি কর্তৃক নিরূপিত বৈপ্লবিক কাজকর্মের আওতার মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে পার্টির কাজের একটি সুনির্দিষ্ট ও সুনিরূপিত অবস্থান রয়েছে। এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করলে তা সুনিশ্চিতভাবেই দ্বৈতবাদ ও বহুত্ববাদে নিয়ে যাবে এবং মূলতঃ তা ট্রট্স্কির মতো দাঁড়াবে 'রাজনীতি মার্কসবাদী, শিল্প বুর্জোয়া' এই অবস্থানে। সাহিত্য ও শিল্পের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান আমরা সমর্থন করি না, কিন্তু তাদের গুরুত্বকে খাটো করে দেখাও আমরা সমর্থন করি না। সাহিত্য ও শিল্প রাজনীতির অধীন কিন্তু তারা তাদের দিক থেকে রাজনীতির ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্প

সামগ্রিক বৈপ্লবিক লক্ষ্যেরই একটি অংশ, তারই দাঁত ও চাকা এবং যদিও অন্যান্য কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশের তুলনায় তারা কম গুরুত্বপূর্ণ ও কম জরুরী এবং গৌণ একটা অবস্থানের অধিকারী হলেও তা সমগ্র যন্ত্রের অপরিহার্য দাঁত ও চাকা এবং সমগ্র বিপ্লবী লক্ষ্যেরই তা অপরিহার্য অঙ্গ। ব্যাপকতম ও একেবারে সাধারণ অর্থে সাহিত্য ও শিল্প বলতে যা বোঝায় তা যদি আমাদের না থাকত, তাহলে আমরা বিপ্লবী আন্দোলন চালিয়ে যেতে ও বিজয় অর্জন করতে পারতাম না। এটা বুঝতে না পারা ভুল হবে। তাছাড়া যখন আমরা বলি যে সাহিত্য ও শিল্প হচ্ছে রাজনীতির অধীন, আমরা তখন শ্রেণীর রাজনীতি, জনগণের রাজনীতিকেই বোঝাই, তথাকথিত মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের রাজনীতিকে বোঝাই না। বিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী যাই হোক না কেন, রাজনীতি হচ্ছে শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর সংগ্রাম, তা মুষ্টিমেয় কজন ব্যক্তির কার্যকলাপ নয়। মতাদর্শ ও শিল্পগত ক্ষেত্রের সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামের অধীন থাকতে হয় এই জন্য যে একমাত্র রাজনীতির মধ্য দিয়েই শ্রেণী ও জনগণের প্রয়োজন কেন্দ্রীভূত আকারে প্রকাশ পায়। বিপ্লবী রাষ্ট্রনীতিবিদগণ অর্থাৎ সেই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ যাঁরা বিপ্লবী রাজনীতির বিজ্ঞান ও প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন তাঁরা সোজা কথায় হচ্ছেন সেটি লক্ষ্য কোটি রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের অর্থাৎ জনসাধারণের নেতা। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে এই বিপুল সংখ্যক রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের অভিমত সংগ্রহ করা, সেগুলিকে বাছাই করা এবং সেগুলিকে পরিচ্ছন্ন আকারে জনসাধারণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এবং জনসাধারণই তখন সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করবে। সুতরাং তাঁরা সেই অভিজাত 'রাষ্ট্রনীতিজ্ঞবৃন্দ' নন যাঁরা দ্বার বন্ধ ঘরে বসে কাজ করেন আর ভাবেন দুনিয়ার তাবৎ জ্ঞানের তাঁরাই একমাত্র একচেটিয়া অধিকারী। এখানেই হচ্ছে নীতিগত দিক থেকে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রনীতি ও ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া' রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের মধ্যেকার পার্থক্য। ঠিক এই কারণেই আমাদের সাহিত্য ও শিল্পগত রচনার রাজনৈতিক চরিত্র ও তাদের সত্যনিষ্ঠ চরিত্রের মধ্যে পুরোপুরি ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। এটা বুঝতে না পারা এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি ও রাজনীতিজ্ঞদের হেয় প্রতিপন্ন করা ভুল হবে।

আসুন, এবার সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে বিবেচনা করা যাক। যেহেতু সাহিত্য ও শিল্প রাজনীতির অধীন এবং যেহেতু আজকের চীনের রাজনীতির মূল সমস্যা হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে

প্রতিরোধ, আমাদের পার্টির লেখক ও শিল্পীদের সর্বপ্রথম জাপানকে প্রতিরোধের এই প্রশ্নে সমস্ত পার্টি-বহির্ভূত লেখক ও শিল্পীদের সঙ্গে (পার্টির সমর্থক ও পেটি-বুর্জোয়া লেখক ও শিল্পীদের থেকে শুরু করে বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর সমস্ত লেখক ও শিল্পী যাঁরাই জাপানকে প্রতিরোধ করার পক্ষপাতী তাঁদের সঙ্গে) ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্রের প্রশ্নে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ ব্যাপারে জাপ-বিরোধী লেখক ও শিল্পীদের একটা অংশ আমাদের সঙ্গে একমত নন, তাই অপরিহার্যভাবেই ঐক্যের পরিধি-এখানে কিছু পরিমাণে সীমাবদ্ধই হবে। তৃতীয়তঃ, সাহিত্য ও শিল্প জগতের নিজস্ব বিশেষ সমস্যার ব্যাপারে, সাহিত্য ও শিল্পের পদ্ধতি ও রচনারীতির প্রশ্নে তাঁদের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে; এখানেও যেহেতু আমরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের পক্ষপাতী অথচ কিছু লোক এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে একমত নন, তাই এক্ষেত্রেও আমাদের ঐক্যের পরিধি আরও সংকুচিত হবে। এই বিষয়ে একদিকে যেমন ঐক্য থাকছে, অন্যদিকে তেমনি থাকছে সংগ্রাম ও সমালোচনা। বিষয়গুলি একাধারে তাই পৃথক এবং পারস্পারিক সম্পর্কযুক্তও বটে যার ফলে যেসব বিষয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হচ্ছে, যেমন জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রশ্নে, সেখানেও একই সময়ে সংগ্রাম ও সমালোচনার অবকাশ থেকে যাচ্ছে। একটি যুক্তফ্রন্ট 'শুধুই ঐক্য এবং কোন সংগ্রাম নয়' আর 'শুধুই সংগ্রাম এবং কোন ঐক্যই নয়' এই দুটোই হচ্ছে অতীতে কিছু কমরেডদের অনুসৃত ভুল নীতি—একটি হচ্ছে দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণবাদ ও লেজুড়বৃত্তি এবং অন্যটি হচ্ছে 'বামপন্থী' বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সংকীর্ণতাবাদ। এটি শিল্প ও সাহিত্য এবং রাজনীতি এই উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে সত্য।

চীনের সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের যুক্তফ্রন্টের শক্তিগুলির মধ্যে পেটি-বুর্জোয়া লেখক ও শিল্পীরা হচ্ছেন একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। যদিও তাঁদের চিন্তাভাবনা ও রচনার মধ্যে বহু ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে তবু তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে তাঁরা বিপ্লবেরই অনুকূলে এবং শ্রমজীবি জনগণের নিকটবর্তী। সুতরাং আমাদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি যাতে তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেন তার জন্য তাঁদের সাহায্য করা এবং শ্রমজীবী জনগণের সেবায় নিয়োজিত যুক্তফ্রন্টে তাঁদের নিয়ে আসা।

সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে সংগ্রামের প্রধানতম একটি পদ্ধতি হচ্ছে সাহিত্য ও শিল্প-সমালোচনা। কমরেডগণ সঠিকভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে তার বিকাশসাধন করা উচিত এবং এক্ষেত্রে আমাদের অতীতের কাজকর্ম যথেষ্ট নয়। সাহিত্য ও শিল্প-সমালোচনা একটি জটিল প্রশ্ন, তার জন্য বিশেষ ধরনের প্রচুর অধ্যয়নের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমি শুধু সমালোচনার মানদণ্ডের মূল সমস্যা সম্পর্কেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। কিছু কমরেড যে কটি বিশেষ সমস্যা উত্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে এবং কয়েকটি ভুল ধারণা সম্পর্কে সংক্ষেপে আমার মন্তব্য রাখব।

সাহিত্য ও শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে বিচারের দুটি মানদণ্ড রয়েছে—একটি রাজনৈতিক মানদণ্ড, অন্যটি হচ্ছে শিল্পগত মানদণ্ড। রাজনৈতিক মানদণ্ড অনুসারে যা কিছু ঐক্যের এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সহায়ক, যা জনগণকে একজন-একপ্রাণ হয়ে উঠতে উৎসাহিত করে, পিছিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করে এবং প্রগতির সহায়তা করে তাকেই ভাল বলব; অন্যদিকে যা কিছুই ঐক্যের পক্ষে ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পক্ষে হানিকর, যা জনগণের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধের সৃষ্টি করে, প্রগতির বিরোধিতা করে এবং জনগণকে পিছনে টেনে রাখে তা-ই খারাপ। কি করে আমরা ভাল ও মন্দ বিচার করব—উদ্দেশ্য (ব্যক্তির মনোগত ইচ্ছা) বা তার পরিণতি (সামাজিক ফল) দিয়ে? ভাববাদীরা মনোগত উদ্দেশ্যের ওপর জোর দেন এবং পরিণতিকে অবহেলা করেন, অন্যদিকে যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা পরিণতির ওপর জোর দেন এবং মনোগত উদ্দেশ্যকে অবহেলা করেন। এই দুয়ের থেকেই স্বতন্ত্রভাবে আমরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীরা মনোগত উদ্দেশ্য ও পরিণতি এই দুয়ের মধ্যে ঐক্যের ওপর জোর দিয়ে থাকি। জনগণকে সেবার মনোগত উদ্দেশ্য তাদের সম্মতি আদায়ের পরিণতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত; এ দুয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা প্রয়োজন। একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে বা কোন ব্যক্তিকে সেবা করা ভাল নয়, আবার জনগণের সম্মতি অর্জনের ও তাদের হিতসাধনের দিকে না তাকিয়ে জনগণের সেবায় মনোগত উদ্দেশ্যে কিছু করাও ভাল নয়। একজন লেখক বা শিল্পীর মনোগত অভিপ্রায় বিচার করার সময় অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্যটি সঠিক ও সৎ কিনা তা বিচার করার সময় আমরা তাঁর ঘোষণার ওপর নির্ভর করি না, সমাজে জনসাধারণের ওপর

তাঁর কাজের (প্রধানতঃ তাঁর রচনার) পরিণাম দিয়েই আমরা তা বিচার করি। মনোগত অভিপ্রায়ের বা উদ্দেশ্যের বিচারের মানদণ্ড হচ্ছে সমাজিক ব্যবহার ও পরিণাম। সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনায় আমরা কোন সংকীর্ণতা-বাদ চাই না, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যাপারে সাধারণ নীতিগত ঐক্য থাকলে আমরা সাহিত্য ও শিল্পগত রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক মনোভাব সহ্য করব। কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের সমালোচনায় আমরা নীতির প্রতি দৃঢ় থাকব এবং যেসব সাহিত্য ও শিল্পগত রচনা জাতি, বিজ্ঞান, জনসাধারণ ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী অভিমত প্রকাশ করবে সেগুলির আমরা কঠোর সমালোচনা করব এবং কোনমতেই তা মেনে নেব না কারণ এই তথাকথিত সাহিত্য ও শিল্পগত রচনা এমন এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও তা এমন এক পরিণতি সৃষ্টি করে যা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শিল্পগত মানদণ্ড অনুসারে উচ্চতর শিল্পগুণবিশিষ্ট সকল রচনাই ভাল বা তুলনামূলকভাবে ভাল. অন্যদিকে নিম্নতর শিল্পগুণ সম্পন্ন রচনাগুলি খারাপ বা তুলনামূলকভাবে খারাপ। এখানেও অবশ্য সমাজিক পরিণামকে হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে। এমন লেখক ও শিল্পী কমই আছেন যিনি তাঁর নিজের রচনাকে সুন্দর বলে মনে করেন না এবং আমাদের সমালোচনা বিভিন্ন ধরনের শিল্পগত রচনার মধ্যে স্বাধীন প্রতিযোগিতা অনুমোদন করা উচিত। কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্বের বিজ্ঞানের মানদণ্ড অনুসারে এই রচনাবলীকে সমালোচনা করাও একান্ত প্রয়োজনীয় যাতে করে নিম্নতর মানের শিল্পকে ধীরে ধীরে উন্নততর মানে সমুন্নত করা সম্ভব হয় এবং যে শিল্প ব্যাপক জনগণের সংগ্রামের চাহিদা পূরণ করে না তাকে এমনভাবে রূপান্তরিত করা যাতে তা সেই চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়ে ওঠে।

একটি হল রাজনৈতিক মানদণ্ড, আরেকটি হচ্ছে শিল্পগত মানদণ্ড; এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কী? রাজনীতিকে শিল্পের সমার্থক করা চলে না এবং একটি সাধারণ বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে শিল্পগত সৃষ্টি ও সমালোচনার পদ্ধতির সমার্থক করে তোলা চলে না। আমরা যেমন বিমূর্ত ও একান্ত অপরিবর্তনীয় একটি রাজনৈতিক মানদণ্ড বলে কিছু আছে মনে করি না, তেমনি বিমূর্ত ও একান্ত অপরিবর্তনীয় একটি শিল্পগত মানদণ্ড আছে বলেও মানি না; শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রতিটি শ্রেণীরই নিজস্ব রাজনৈতিক ও শিল্পগত মানদণ্ড রয়েছে। কিন্তু শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে সকল শ্রেণীই অপরিহার্যভাবে রাজনৈতিক মানদণ্ডকে

সর্বাগ্রে স্থান দেয় আর তারপর স্থান দেয় শিল্পগত মানদণ্ডকে। বুর্জোয়াশ্রেণী সবসময়ই প্রলেতারীয় সাহিত্য ও শিল্পের শিল্পগত যত উৎকর্ষই থাক না কেন তাকে দূরে সরিয়ে রাখে। শ্রমিকশ্রেণীকে একইভাবে অতীত যুগের সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে বাছাই করতে হবে এবং ঐতিহাসিকভাবে তাদের কোন প্রগতিশীল তাৎপর্য আছে কিনা এবং জনসাধারণের প্রতি তাদের মনোভাব বিচার করার পরই তাদের প্রতি নিজেদের মনোভাব নির্ধারণ করবে। কিছু কিছু রচনা যা রাজনৈতিকভাবে সরাসরি প্রতিক্রিয়াশীল তাদের কিছু শিল্পগত উৎকর্ষ থাকতে পারে। বিষয়বস্তুতে বেশি বেশি প্রতিক্রিয়াশীল অথচ শিল্পগত উৎকর্ষের দিক থেকে উন্নততর—এমন রচনা জনগণের পক্ষে অধিকতর বিষময় এবং সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা তত বেশি করে প্রয়োজন। সকল শোষকশ্রেণীর অবক্ষয়ের যুগের সাহিত্য ও শিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়বস্তু ও তাদের শিল্পগত আঙ্গিকের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। আমরা চাই রাজনীতি ও শিল্পের মধ্যে ঐক্য, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মধ্যে ঐক্য, বৈপ্লবিক রাজনৈতিক বিষয়বস্তু এবং সর্বোচ্চ সম্ভব নিখুঁত শিল্পগত আঙ্গিকের মধ্যেকার ঐক্য। যেসব শিল্পগত রচনায় শিল্পগুণের অভাব রয়েছে তা রাজনৈতিকভাবে যত প্রগতিশীলই হোক না কেন তা হয়ে পড়ে শক্তিহীন। সুতরাং ভুল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শিল্প সৃষ্টির প্রবণতার আমরা যেমন বিরোধিতা করি, তেমনি 'পোস্টার ও শ্লোগানের কায়দায়' শিল্পসৃষ্টির প্রবণতা তা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তাতে শিল্পগত শক্তির অভাব থাকলে আমরা তার বিরোধিতা করি। সাহিত্য ও শিল্পসংক্রান্ত প্রশ্নে আমাদের দুই ফ্রণ্টেই সংগ্রাম চালাতে হবে।

বহু কমরেডের চিন্তাভাবনায় এই দুটো ঝোঁকই দেখা যায়। অনেক কমরেড শিল্পগত কলাকৌশলের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন, তাই শিল্পগত মানের উন্নয়নের ব্যাপারে মনোযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। কিন্তু আমি দেখছি রাজনৈতিক দিকটিই এখন অধিকতর সমস্যা। কিছু কমরেডের প্রাথমিক রাজনৈতিক জ্ঞানেরই অভাব রয়েছে এবং তার ফলে নানারকমের ভ্রান্ত ধারণা এসে দেখা দিচ্ছে। ইয়েনানের কয়েকটি উদাহরণ আমি তুলে ধরছি।

'মানব-প্রকৃতি বিষয়ক তত্ত্ব।' মানব-প্রকৃতি বলে কিছু আছে কি?

নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা হচ্ছে একটি মূর্ত মানব-প্রকৃতি, বিমূর্ত মানব-প্রকৃতি বলে কিছু নেই। শ্রেণীসমাজে শ্রেণীচরিত্রসম্পন্ন মানব-প্রকৃতিই শুধু রয়েছে। শ্রেণীর ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোন মানব-প্রকৃতি নেই। আমরা শ্রমিকশ্রেণীর ও ব্যাপক জনগণের মানব-প্রকৃতিই তুলে ধরি, অন্যদিকে জমিদার ও বুর্জোয়াশ্রেণী-গুলি তাদের নিজস্ব শ্রেণীগুলির মানব-প্রকৃতিকেই তুলে ধরে, শুধু তারা এ কথা কবুল করে না এই যা এবং তাকেই তারা একমাত্র সম্ভাব্য মানব-প্রকৃতি বলে জাহির করে। কিছু কিছু পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী যে মানব-প্রকৃতি হাজির করে তাও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের বিরোধী ; তারা যাকে মানব-প্রকৃতি বলে অভিহিত করে তা আসলে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তাই তাদের কাছে প্রলেতারীয় মানব-প্রকৃতি তাদের কথিত মানব-প্রকৃতির পরিপন্থী। 'মানব-প্রকৃতি বিষয়ক যে তত্ত্বকে' ইয়েনানের কিছু লোক তাদের সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক তথাকথিত তত্ত্ব হিসেবে ঠিক এভাবেই হাজির করে, তা সম্পূর্ণভাবেই ভুল।

'সাহিত্য ও শিল্পের মূল উৎসই হচ্ছে প্রেম, মানবপ্রেম।' প্রেম তো অবশ্যই একটা উৎস হতে পারে কিন্তু তারচেয়ে বেশি কিছু রয়েছে। একটা ধারণা হিসেবে প্রেম বা ভালবাসা হচ্ছে বাস্তব ব্যবহারেরই প্রকাশ। মূলগতভাবে আমরা ধারণা থেকে শুরু করি না, শুরু করি বাস্তব ব্যবহার থেকে। আমাদের যে লেখক ও শিল্পীরা বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে এসেছেন তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীকে ভালবাসেন কারণ সমাজ তাঁদের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করেছে যে তাঁরা শ্রমিকশ্রেণী একই সাধারণ ভাগ্যের অংশীদার। আমরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করি কারণ জাপানী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের নিপীড়ন করে। কার্যকারণহীন প্রেম বা ঘৃণা বলে এই পৃথিবীতে একান্ত-ভাবেই কিছু নেই। তথাকথিত মানবপ্রেম সম্পর্কে বলা যায় মানব সমাজ যেদিন থেকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে সেদিন থেকে ঐ ধরনের সর্বব্যাপ্ত প্রেম বলে কিছুই নেই। অতীতের সকল শাসকশ্রেণীগুলিই ঐটির প্রচারের অনুরাগী এবং অনুরূপভাবে বহু তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসী ও জ্ঞানীরা মানবপ্রেমের প্রচার করেছেন কিন্তু নিজেরা কেউই জীবনে কোনদিন সত্যিসত্যি তা আচরণ করেননি কারণ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে তা করা অসম্ভব। সমগ্র পৃথিবীতে শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তির পরই যথার্থ মানবপ্রেম সম্ভব। শ্রেণীসমূহ সমাজকে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছে ;

শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তির পরই সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেম দেখা দেবে, কিন্তু এখন নয়। আমরা শত্রুকে ভালবাসতে পারি না, আমরা সামাজিক অন্যায়কে ভালবাসতে পারি না, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সেগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া। এ তো সাধারণ বুদ্ধির কথা ; এটা কি করে হতে পারে যে আমাদের কিছু লেখক ও শিল্পীরা এখনো তা বুঝতে পারেন না ?

'সাহিত্য ও শিল্পকর্মে সর্বদাই উজ্জ্বল ও অন্ধকার দিকের ওপর আধা-আধি-ভাবে সমান জোর দেওয়া হয়।' এই বক্তব্যের মধ্যে তালগোল পাকানো ধারণা রয়েছে। সাহিত্য ও শিল্প সবসময় তা করেছে এটা সত্য নয়। বহু পেটি-বুর্জোয়া লেখক কোনদিনই উজ্জ্বল দিকটা আবিষ্কার করতে পারেননি। তাঁরা তাঁদের রচনাতে শুধু অন্ধকার দিককেই উদ্ঘাটিত করেন এবং তাঁদের সাহিত্য 'স্বরূপ প্রকাশের সাহিত্য' বলেই পরিচিত। তাঁদের কিছু রচনা শুধু নৈরাশ্যই প্রচার করে এবং এই পৃথিবী সম্পর্কে ক্লান্তি প্রচারে তা বিশেষ পটু। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের যুগের সোভিয়েত সাহিত্য প্রধানতঃ উজ্জ্বল দিককেই চিত্রিত করে। তা কাজকর্মের ভুলভ্রান্তির বর্ণনাও করে এবং নেতিবাচক চরিত্রও অঙ্কিত করে, কিন্তু সমগ্র চিত্রের উজ্জ্বলতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য শুধু বিপরীত দিক হিসেবে ব্যবহারের জন্যই তা করা হয় এবং তা কোন-ক্রমেই তথাকথিত আধা-আধি ভিত্তিতে নয়। অবক্ষয়ের যুগের বুর্জোয়া লেখক ও শিল্পরা বিপ্লবী জনগণকে নিছক জনতা হিসেবে এবং নিজেদের সাধুসন্ত হিসেবে চিত্রিত করেন এবং এভাবে উজ্জ্বলতা ও অন্ধকারকে একেবারে উল্টে দিয়েছেন। একমাত্র যথার্থ বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীরাই কাকে উচ্চে তুলে ধরতে হবে, না তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হবে এই সমস্যার সঠিক সমাধান করতে পারেন। যেসব অন্ধকারের শক্তি ব্যাপক জনগণের ক্ষতিসাধন করে তাদের মুখোস খুলে দিতে হবে এবং ব্যাপক জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকেই উচ্চে তুলে ধরতে হবে ; এই হচ্ছে বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের মৌলিক কর্তব্য।

'সবসময়েই সাহিত্য ও শিল্পের কাজ হচ্ছে স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেওয়া।' আগেরটির মতো এই বক্তব্যও দেখা দিয়েছে ইতিহাসবিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে। আমরা দেখিয়েছি সাহিত্য ও শিল্প কোনকালেই একমাত্র স্বরূপ উদ্ঘাটনের কাজ করেনি। বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের কাছে জনগণ কোন সময়ই স্বরূপ প্রকাশের বিষয় হতে পারে না, হতে পারে শুধু আক্রমণকারীরা, শোষকেরা, নির্যাতনকারীরা এবং জনগণের ওপর তারা যে কুপ্রভাব সৃষ্টি করে

শুধু সেইগুলি। জনগণের নিজেরও ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে যেগুলিকে জনগণের নিজেদের মধ্যেই সমালোচনা আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে দূর করে দিতে হবে এবং এ ধরনের আলোচনা ও আত্মসমালোচনা সাহিত্য ও শিল্পের পক্ষেও অন্যতম একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কিন্তু কোনমতেই ও তাকে 'জনগণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেওয়া' বলা চলে না। জনগণের দিক থেকে প্রশ্নটা হচ্ছে, মূলতঃ শিক্ষা ও মান উন্নয়নের। একমাত্র প্রতিবিপ্লবীরাই জনগণকে 'জাতবোকা' এবং বিপ্লবী জনগণকে 'অত্যাচারী জনতা' হিসেবে চিত্রিত করে।

'এখনো এটা বিদ্রূপাত্মক রচনার সময় এবং লু স্যুন-এর রচনারীতির এখনো প্রয়োজন রয়েছে।' অন্ধকার শক্তিগুলির রাজত্বে বাস করে এবং বাক-স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়ে লু স্যুন প্রবন্ধ আকারে জ্বলন্ত বিদ্রূপ ও হাড়-কাঁপানো ব্যঙ্গোক্তির ব্যবহার করে তাঁর সংগ্রাম চালিয়েছিলেন; এবং তিনি ঠিক কাজই করেছিলেন। আমরাও ফ্যাসিষ্টদের, চীনা প্রতিক্রিয়াশীলদের ও জনগণের পক্ষে ক্ষতিকর সবকিছুকেই তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করে তুলব কিন্তু শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে ও শত্রুর পশ্চাদ্‌ভাগের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলসমূহে যেখানে বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণ-তান্ত্রিক অধিকার রয়েছে এবং প্রতিবিপ্লবীদের তা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে সেখানে প্রবন্ধ রচনারীতি নিছক লু স্যুন-এর মতো হওয়া উচিত নয়। এখানে আমরা আমাদের বক্তব্য উচ্চকণ্ঠে হাজির করতে পারি এবং রেখে-ঢেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথা বলার যেখানে কোনই প্রয়োজন নেই তখন জনগণের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয় এমনভাবে লেখার কোনই প্রয়োজন থাকে না। তাঁর 'ব্যঙ্গ রচনার যুগেও' লু স্যুন কোনমতেই বিপ্লবী জনগণ ও বিপ্লবী পার্টিকে উপহাস বা আক্রমণ করেননি এবং এই নিবন্ধগুলি শত্রুর প্রতি লক্ষ্য করে লিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাভঙ্গীর চেয়ে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন ছিল। জনসাধারণের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা দরকার এ কথা আমরা এর আগেই বলেছি, কিন্তু এটা করার সময় আমাদের যথার্থভাবে জনগণের পক্ষই অবলম্বন করতে হবে এবং জনগণকে রক্ষা করার ও শিক্ষিত করে তোলার একান্ত আন্তরিক আগ্রহ থেকেই কথা বলতে হবে। কমরেডদের প্রতি শত্রুর মতো আচরণ করার অর্থ হল শত্রুর পক্ষ নেওয়া। আমরা কি তাহলে ব্যঙ্গ করা বন্ধ করে দেব? না, তা দেব না। ব্যঙ্গ সবসময়ই প্রয়োজন। কিন্তু ব্যঙ্গ রয়েছে নানাধরনের, প্রতিটিতে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাবের প্রকাশ ঘটে; ব্যঙ্গ রয়েছে আমাদের শত্রুর

বিরুদ্ধে প্রয়োগের মতো, ব্যঙ্গ আছে আমাদের মিত্রদের প্রতি ব্যবহারের মতো এবং ব্যঙ্গ আছে আমাদের নিজেদের লোকজনদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের মতো। সাধারণভাবে ব্যঙ্গের আমরা বিরোধী নই। আমরা ব্যঙ্গের অপব্যবহারই শুধু বন্ধ করে দিতে চাই।

'প্রশংসা করতে হবে বা জয়গান গাইতে হবে এমন কোন কথা নেই, যাঁদের রচনা উজ্জ্বলতার দিকটিই তুলে ধরে তাই যে অতি অবশ্য মহৎ রচনা হবে এমন কোন কথা নেই এবং যাঁদের রচনা অন্ধকার দিকটি তুলে ধরে তাই যে অতি অবশ্য তুচ্ছ হবে এমনও কোন কথা নেই।' আপনি যদি একজন বুর্জোয়া লেখক বা শিল্পী হন, আপনি তো আর শ্রমিকশ্রেণীর জয়গান গাইতে যাবেন না, গাইবেন বুর্জোয়াশ্রেণীর জয়গান; আবার আপনি যদি শ্রমিকশ্রেণীর লেখক বা শিল্পী হন, আপনি তো আর বুর্জোয়াশ্রেণীর জয়গান গাইতে যাবেন না, গাইবেন শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের জয়গান: হয় এইটি হবে, না হয় হবে অন্যটি। বুর্জোয়াশ্রেণীর জয়গানকারীদের রচনা হলেই তা অতি অবশ্য মহৎ হবে এমন কোন কথা নেই, আবার যাঁরা দেখাতে চান বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্ধকার দিকটি তাদের রচনাই যে অতি অবশ্য তুচ্ছ বিবেচিত হবে এমনও কোন কথা নেই। শ্রমিকশ্রেণীর জয়গান কারীদের রচনা অতি অবশ্য মহৎ নাও হতে পারে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর তথাকথিত 'অন্ধকার দিকের' বর্ণনাকারীদের রচনা তুচ্ছ বলে গণ্য হতে বাধ্য—সাহিত্য ও শিল্পের দিক থেকে এগুলি কি ইতিহাসের বাস্তব সত্য নয়? মানব ইতিহাসের স্রষ্টা জনগণের জয়গান আমরা করব না কেন? কেন আমরা শ্রমিকশ্রেণী, কমিউনিস্ট পার্টি, নয়া গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জয়গান করব না? এক ধরনের লোক আছেন যাঁদের জনগণের লক্ষ্যের ব্যাপারে কোন উৎসাহ নেই এবং তাঁরা শ্রমিকশ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনীর সংগ্রাম ও বিজয়কে এক পাশে দাঁড়িয়ে থেকে শীতল দৃষ্টিতে উদাসভাবে শুধু দেখেই যান; যাতে তাঁদের উৎসাহ এবং যাদের জয়গান করতে তাঁরা অক্লান্ত তাঁরা হলেন নিজেরা এবং সম্ভবতঃ তাঁদের ক্ষুদ্র গণ্ডির কয়েকজন লোকেরা। অবশ্যই এই ধরনের পেটি-বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিপ্লবী জনগণের কার্যকলাপ ও গুণাবলীর জয়গান গাইতে বা সংগ্রামে তাঁদের সাহস ও জয় সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাসকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে অনিচ্ছুক। এই ধরনের লোকেরা বিপ্লবীদের মধ্যেকার ঘুন পোকার মতো; এবং বিপ্লবী জনগণের জন্য এই 'গায়কদের' কোনই প্রয়োজন নেই।

'এটা কোন অবস্থানের প্রশ্ন নয়; আমার শ্রেণীগত অবস্থানটি ঠিকই আছে, আমার উদ্দেশ্য ভাল এবং ঠিকভাবেই সব বুঝতে পারছি, কিন্তু নিজেকে ভালভাবে প্রকাশ করতে পারছি না, তাই ফলটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।' আমি ইতিমধ্যেই উদ্দেশ্য ও পরিণাম সম্পর্কে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী অভিমতের ব্যাপারে বলেছি। আমি এখন জিজ্ঞেস করতে চাই, পরিণামের প্রশ্নটা কি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন নয়? যে লোক শুধুমাত্র নিজের অভিপ্রায় দিয়েই পরিচালিত এবং তার কাজ কী পরিণতি সৃষ্টি করছে তার খোঁজই করে না, সে হচ্ছে সেই ডাক্তারের মতো যিনি শুধু ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লিখেই খালাস কিন্তু কজন রোগী মারা গেল তার কোন খোঁজ নেওয়ারই দরকার মনে করেন না; অথবা ধরুন একটা রাজনৈতিক পার্টির কথা যা শুধু ফরমান জারী করেই সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু তা কার্যকর হল কিনা তার খোঁজ নেওয়ারই দরকার বোধ করে না, সে হচ্ছে তারই মতো। জিজ্ঞেস করা যেতে পারে—এটা কি একটা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি? উদ্দেশ্য কি এক্ষেত্রে ভাল বলা চলে? অবশ্য আগে থেকে পরিণামের কথা ভেবে নিলেও ভুলভ্রান্তি হতে পারে, কিন্তু বাস্তব ঘটনা থেকে যখন দেখা গেল পরিণাম খারাপ হচ্ছে তখনো যদি কেউ সেই একই পুরানো পথ আঁকড়ে পড়ে থাকে তবে কি তার উদ্দেশ্যকে ভাল বলা চলে? একটি পার্টি বা একজন ডাক্তারকে বিচার করার সময় আমাদের তাকাতে হবে তাদের বাস্তব কাজকর্মের দিকে, তাদের কাজের পরিণতির দিকে। একজন লেখকের বিচারের বেলাতেও সেই একই কথা। যে ব্যক্তিটি যথার্থই সৎ অভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত তিনি তাঁর কাজের পরিণতিকে অবশ্যই বিচার করে দেখবেন, অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করবেন এবং অনুসৃত পদ্ধতি পর্যালোচনা করে দেখবেন অথবা সৃজনশীল রচনার ব্যাপারে প্রকাশভঙ্গিকে পর্যালোচনা করে দেখবেন। যে ব্যক্তিটি যথার্থই সৎ অভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত তাঁকে তাঁর কাজকর্মের ভুলত্রুটির ও বিচ্যুতির চূড়ান্ত প্রাণখোলা সমালোচনা করতে হবে এবং এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে শুধরে নিতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। ঠিক এই কারণেই কমিউনিস্টগণ আত্মসমালোচনার পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকেন। এটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক পথ। একমাত্র এ ধরনের গুরুতর ও দায়িত্বশীল বাস্তব প্রয়োগের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কোন্‌টি সঠিক অবস্থান তা ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে এবং ক্রমে ক্রমে সেটিকে ভালভাবে আয়ত্ত করা যাবে। বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেউ যদি এই পথে অগ্রসর না হয়, আর যদি সেই সহজ আত্মপ্রসাদে মশগুল হয়ে শুধু বলতে থাকে

যে সে 'সবকিছু ঠিকই বুঝেছ' তাহলে বুঝতে হবে আসলে সে কিছুই বুঝতে পারেনি।

'আমাদের মার্কসবাদ অধ্যয়নের জন্য আহ্বান জানানোর অর্থ হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী সৃজনশীল পদ্ধতির ভুলগুলিরই পুনরাবৃত্তি করা আর এতে করে আমাদের সৃজনশীল মেজাজেরই ক্ষতিসাধন করা হবে।' মার্কসবাদ অধ্যয়নের অর্থ হচ্ছে জগতের, সমাজের ও সাহিত্য এবং শিল্পের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করা; এর অর্থ আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মের ব্যাপারে দার্শনিক বক্তৃতামালা রচনা করা নয়। সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে বাস্তবতাকে সরিয়ে দিয়ে মার্কসবাদ তার স্থান পূরণ করে নেয় না যদিও তা এই ব্যাপারেও নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রাখে, ঠিক যেমন পদার্থবিদ্যার পারমাণবিক ও ইলেকট্রনিক তত্ত্বগুলির স্থান দখল না করেও তা এ ব্যাপারে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রাখে। ফাঁকা, শুকনো বিচারশূন্য গোঁড়া সূত্রগুলি সত্যিসত্যিই সৃজনশীল মেজাজকে ধ্বংস করে দেয়; শুধু তাই নয়; তা সবার আগে মার্কসবাদকেই ধ্বংস করে দেয়। বিচারশূন্য গোঁড়া 'মার্কসবাদ' মার্কসবাদ নয়, তা মার্কসবাদ বিরোধী। তাহলে মার্কসবাদ সৃজনশীল মেজাজকে ধ্বংস করে দেয় না কি? হাঁ, করে। তা নিশ্চিতভাবেই সামন্তবাদী, বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া, উদারনীতিবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী, নৈরাজ্যবাদী, শিল্পের জন্য শিল্পবাদী, অভিজাত, অবক্ষয়ী ও নৈরাশ্যবাদী এবং অন্যান্য যেসব 'সৃজনশীল' মেজাজ ব্যাপক জনসাধারণ ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধাচারী সেগুলিকে ধ্বংস করে দেয়। প্রলেতারীয় লেখক ও শিল্পীদের দিক থেকে বলা যায়, এই ধরণের 'সৃজনশীল' মেজাজকে ধ্বংস করাই কি উচিত হবে না? আমি মনে করি, সেগুলি ধ্বংস করাই উচিত, একেবারে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়াই উচিত এবং এগুলিকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়েই নতুন কিছু রচিত হতে পারবে।

(৫)

এখানে যে সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল, তা ইয়েনানের আমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীমহলে বর্তমান রয়েছে। তা থেকে কী দেখা যায়? তা থেকে দেখা যায় যে আমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মহলগুলিতে কাজকর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারা এখনো গুরুতর আকারে বর্তমান রয়েছে এবং আমাদের

কমরেডদের মধ্যে এখনো ভাববাদ, বিচারশূন্য গোঁড়ামি, ফাঁকা কল্পনাবিলাস ফাঁকা কথা, বাস্তব কাজকর্মের প্রতি বিরাগ এবং জনগণ থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি অনেক ত্রুটি রয়েছে এবং এই সবগুলির বিরুদ্ধেই কার্যকর ও গুরুতর শুদ্ধিকরণ অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন।

এমন বহু কমরেড রয়েছেন যাঁরা শ্রমিকশ্রেণী ও পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার পার্থক্য সম্পর্কে যথেষ্ট পরিষ্কার নন। এমন বহু কমরেড আছেন যাঁরা শুধু সাংগঠনিকভাবেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছেন কিন্তু তাঁরা পুরোপুরি ভাবে পার্টিতে যোগ দেননি, এবং মতাদর্শগত দিক থেকে তাঁরা পার্টিতে আদৌ যোগ দেননি। মতাদর্শগত দিক থেকে যাঁরা এখনো পার্টিতে যোগই দেননি তাঁরা তাঁদের মাথায় করে শোষকশ্রেণীসমূহের বহু আবর্জনা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ বা সাম্যবাদ বা পার্টি যে কি বস্তু সে সম্পর্কে আদৌ কোন ধারণাই তাঁদের নেই। 'শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ?' তাঁদের মতে 'সেই একই পুরাতন জিনিস মাত্র। তাঁরা জানেনই না যে এই জিনিসটা আয়ত্ত করা সহজ কর্ম নয়। তাদের কেউ কেউ সারা জীবনে সাম্যবাদের সামান্যতম ছিটেফোঁটাও অর্জন করবেন না এবং শেষ পর্যন্ত পার্টি ছেড়ে দেওয়াই হবে তাদের একমাত্র পরিণতি। সুতরাং, যদিও আমাদের পার্টি ও আমাদের নিজস্ব বাহিনীর অধিকাংশই সৎ এবং পরিচ্ছন্ন, তবু যদি আমরা অধিকতর কার্যকরভাবে বিপ্লবী আন্দোলনকে বিকশিত করে তুলতে চাই এবং তাকে দ্রুততর বিজয়ের পথে নিয়ে যেতে চাই তবে সর্বপ্রকার গুরুত্ব সহকারে মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক দুই দিক থেকেই ব্যাপারগুলিকে সঠিকভাবে সমাধান করতে হবে। ব্যাপারগুলিকে সাংগঠনিকভাবে যথাযথ করে তুলতে হলে প্রথমেই আদর্শগত দিক থেকে তা করা দরকার হবে, অ-শ্রমিকশ্রেণীসুলভ মতাদর্শের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের দিক থেকে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। ইয়েনানের সাহিত্যিক ও শিল্পী-দের মহলগুলিতে ইতিমধ্যেই একটা আদর্শগত সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে এবং তার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি। পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে আগত বুদ্ধিজীবীরা সবসময়ই সাহিত্য ও শিল্পগত মাধ্যম সহ যত রকমভাবে সম্ভব সকলভাবেই একগুঁয়ের মতো চেষ্টা করেন নিজেদের কথা হাজির করার জন্য ও তাঁদের মতামতগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাঁরা চান পার্টি ও গোটা দুনিয়াটাকেই তাঁদের নিজেদের আদলে গড়ে তুলতে। এরকম একটা

পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এইসব 'কমরেডদের' বেশ করে ঝাঁকুনি দিয়ে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া যে, 'এতে কোনই সুবিধে হবে না! শ্রমিক-শ্রেণী আপনাদের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না; আপনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থ হবে বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছেই আত্মসমর্পণ করা এবং পার্টি ও দেশের সমূহ সর্বনাশকেই ডেকে নিয়ে আসার ঝুঁকি নেওয়া।' কার কাছে তাহলে আমরা আত্মসমর্পণ করব? আমরা পার্টি ও দুনিয়াটাকে গড়ে তুলতে পারি একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর আদল অনুসারে। আমরা আশা করি, সাহিত্য ও শিল্প মহলের আমাদের কমরেডরা এই মহান বিতর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং সক্রিয়ভাবে এই সংগ্রামে যোগদান করবেন যাতে করে প্রতিটি কমরেড ত্রুটিমুক্ত হয়ে উঠতে পারেন এবং আমাদের সমগ্র বাহিনী যথার্থ ঐক্যবদ্ধ এবং আদর্শগত ও সংগঠনগত দিক থেকে সুসংহত হয়ে উঠতে পারে।

তাঁদের চিন্তার বিভ্রান্তির জন্য আমাদের অনেক কমরেড আমাদের বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল ও কুওমিনতাঙ অঞ্চলের মধ্যেকার পার্থক্যের মধ্যে একটি যথার্থ সীমারেখা টানতে তেমন সক্ষম নন, ফলে বহু ভুল তাঁরা করে বসেন। অনেক কমরেড সাংহাইয়ের চিলেকোঠাগুলি থেকে এখানে এসেছেন এবং ঐ চিলে-কোঠা থেকে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় চলে আসার মধ্য দিয়ে তাঁর শুধু একটা জায়গা থেকে আরেকটি জায়গাতেই যে এলেন তাই নয়, তাঁরা এর মধ্য দিয়ে একটা ঐতিহাসিক যুগ থেকে চলে এলেন আরেকটা ঐতিহাসিক যুগে। একটা সমাজ হচ্ছে আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক, বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ-বুর্জোয়াদের শাসনাধীন সমাজ, আর অন্য সমাজ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বা-ধীন বিপ্লবী নয়া গণতান্ত্রিক সমাজ। বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে আসার অর্থ হচ্ছে এমন একটি যুগে প্রবেশ করা চীনের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে যা অভূতপূর্ব, এমন একটা যুগ যেখানে ব্যাপক জনগণই রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী। এখানে আমাদের চারিদিকের লোকজন এবং আমাদের প্রচারের দর্শক, পাঠক ও শ্রোতারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতীতের যুগটির ইতি ঘটেছে, তা আর ফিরে আসবে না। সুতরাং, আমাদের কোন দ্বিধা না রেখে এই নতুন জনগণের সঙ্গে নিজেদের এক করে তুলতে হবে। আমি আগেই বলেছি এই নতুন জনগণের সঙ্গে বসবাস করতে গিয়ে কিছু কমরেডের এখনো 'জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাব রয়েছে' এবং যদি তাঁরা 'নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শনের ক্ষেত্র-

'বিহীন বীরপুরুষ' হয়েই থেকে যান, তবে তাঁদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হবে; শুধু যখন তাঁরা গ্রামে যাবেন তখনই নয়, ঠিক এই ইয়েনানেই তাঁদের অনেক অসুবিধায় পড়তে হবে। কিছু কিছু কমরেড ভাবতে পারেন, 'বেশ তো, তাহলে আমি "বিশাল পশ্চাদ্বর্তী এলাকার"[১০] পাঠকদের জন্যই বরং লিখে চলি; এই কাজটা আমার ভালই জানা এবং তার একটা "জাতীয় তাৎপর্যও" রয়েছে।' এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বিশাল পশ্চাদ্বর্তী এলাকাটিও পরিবর্তিত হচ্ছে। ঐখানকার পাঠকেরা প্রত্যাশা করেন বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার লেখকেরা তাঁদের নতুন মানুষ ও নতুন দুনিয়া সম্পর্কে বলবেন—সেই একই পুরানো কাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁদের ক্লান্ত করে তুলবেন না। সুতরাং, যত বেশি করে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার জনগণের জন্য রচনা রচিত হবে, তার জাতীয় তাৎপর্য ততই বেশি হবে। ফাদায়েভ-এর **বিরাট পতন** (The Debacle)[১১] বইখানিতে ছোট একটি গেরিলা দলের কথাই বলা হয়েছে এবং পুরানো দুনিয়ার পাঠকদের মনোরঞ্জনের বিষয় বিতরণের কোন বাসনাই তার ছিল না; তবু এই বইখানি বিশ্বব্যাপী প্রভাব সঞ্চার করেছে। অন্ততঃ চীনে তার প্রভাব খুবই বিপুল এ কথা আপনারা জানেন। চীন সামনে এগিয়ে চলেছে, পেছনে পিছিয়ে সে যাচ্ছে না, এবং কোন পশ্চাৎপদ, প্রগতিবিমুখ অঞ্চল নয়, বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলই চীনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এটাই হচ্ছে মূল কথা যা সবচেয়ে আগে শুদ্ধিকরণ আন্দোলনে আমাদের কমরেডদের বোঝা চাই।

যেহেতু নতুন যুগের সাথে ব্যাপক জনগণের একাত্মতা সাধন অপরিহার্য তাই ব্যক্তির সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের সমস্যাটি পুরোপুরি সমাধান হওয়া প্রয়োজন। লু স্যুন-এর এই কবিতাংশটি আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্যক:

হেলাভরে আমি উপেক্ষা করি হাজার অঙ্গুলি নির্দেশের,
নতমস্তকে বলদের মতো সেবা করে যাই শিশুদের।[১২]

'নির্দেশের হাজার অঙ্গুলি' বলতে আমাদের শত্রুদের বোঝানো হচ্ছে এবং তারা যত হিংস্রই হোক না কেন, কোনমতেই আমরা তাদের কাছে মাথা নত করব না। 'শিশুরা' এখানে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের প্রতীক। সকল কমিউনিস্ট, সকল বিপ্লবী ও সকল সাহিত্য ও শিল্পকর্মীকেই লু স্যুন-এর দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, এবং শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের কাছে

'বলদের' মতো হতে হবে, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আপ্রাণ তাঁদের জন্য কাজ করে যেতে হবে। যেসব বুদ্ধিজীবী জনগণের সঙ্গে একাত্মা হয়ে উঠতে চান, জনগণের সেবা যাঁরা করতে চান, তাঁদের এমন এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে যাতে তাঁরা এবং জনগণ একে অপরকে ভাল করে জানতে পারেন। এই প্রক্রিয়া বহু যন্ত্রণা ও নানা সংঘাতে ভরে উঠতে পারে বা একান্তভাবেই ভরে উঠবে, কিন্তু যদি আপনি সংকল্পে অবিচলিত হন তবে এই প্রয়োজন পূরণ করতে আপনি সমর্থ হবেন।

আজ আমি আমাদের সাহিত্য ও শিল্প-আন্দোলনের মৌলিক গতিধারা নির্ধারণের কয়েকটি সমস্যা নিয়েই শুধু আলোচনা করেছি, সুনির্দিষ্ট আরও যেসব প্রশ্ন বাকী রয়ে গেল তা নিয়ে আরও অনুশীলন প্রয়োজন। আমার স্থিরবিশ্বাস আছে যে এখানে সমবেত কমরেডরা নির্দেশিত পথ ধরে এগিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ। আমি বিশ্বাস করি, শুদ্ধিকরণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, দীর্ঘকাল ব্যাপী অধ্যয়ন ও পরবর্তী কাজকর্মের মধ্য দিয়ে আপনারা নিজেদের মধ্যে এবং আপনাদের রচনাসমূহের ক্ষেত্রে রূপান্তর নিয়ে আসবেন এবং এমন অনেক চমৎকার রচনা সৃষ্টি করবেন যা ব্যাপক জনগণের উষ্ণ সম্বর্ধনায় ধন্য হবে, বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় ও সমগ্র চীনে সাহিত্য ও শিল্প-আন্দোলনকে আপনারা নিশ্চয়ই গৌরবময় নতুন এক পর্যায়ে উন্নীত করতে পারবেন।

টীকা

১। ভি. আই লেনিন: 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' দেখুন; ঐ লেখায় লেনিন প্রলেতারীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেন:

এ হবে একটি স্বাধীন সাহিত্য, কেননা লোভ বা আত্মোন্নতি নয়, বরং সমাজতন্ত্রের ধারণা ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি নিত্যনতুন শক্তি-সমূহকে এই বাহিনীতে টেনে নিয়ে আসবে। এ হবে একটি স্বাধীন সাহিত্য কেননা তা কোন পরিতৃপ্তা বীরাঙ্গণার বা 'উপরতলার দশ হাজার' বিরক্ত, তৈল সিক্ত অধঃপতিত ভুঁড়িদারদের সেবা করবে না, সেবা করবে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষকে—দেশের ফুলগুলিকে, দেশের শক্তি ও তার ভবিষ্যৎকে। এটা হবে একটা স্বাধীন সাহিত্য যা মানবসমাজের বিপ্লবী

চিন্তাধারাকে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতা ও জীবন্ত কার্যকলাপের দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুলবে (বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অর্থাৎ আদিমকাল থেকে উদ্ভাবিত সমাজতন্ত্রের নানাবিধ কাল্পনিক রূপগুলিকে বিকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণতাদানের) অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান অভিজ্ঞতার (অর্থাৎ শ্রমিক কমরেডের বর্তমান সংগ্রামের অভিজ্ঞতার) মধ্যে চিরস্থায়ী পারস্পরিক প্রভাব সঞ্চারের ব্যবস্থা করবে। (লেনিন: **সংকলিত রচনাবলী**, ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৬২, দশম খণ্ড, পৃঃ ৪৮-৪৯।)

২। লিয়াং শি-চিউ হচ্ছেন প্রতিবিপ্লবী ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট পার্টির একজন সদস্য; দীর্ঘকাল সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াশীল আমেরিকান বুর্জোয়া ধ্যানধারণার তিনি প্রচার করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিপ্লবের বিরোধিতা করেন এবং বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্পকে নিন্দা করতেন।

৩। চৌ সো-জেন ও চাঙ জু-পিং ১৯৩৭ সালে সাংহাই ও পিকিং জাপানীদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার পর জাপানী আক্রমণকারীদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছিল।

৪। লু সুন: 'বামপন্থী লেখকসংঘ সম্পর্কে আমার ধারণা', **দুটি হৃদয়, সম্পূর্ণ রচনাবলী**, চীনা সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড।

৫। **আধা-স্বাধীন একটা অঞ্চলের কোন একটি চিলেকোঠায় বসে লিখিত প্রবন্ধাবলীর শেষ সংকলন**, চীনা সংস্করণ ৬ষ্ঠ খণ্ডের 'সং-যোজনীর' অন্তর্ভুক্ত 'মৃত্যু' নামক লু সুন-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৬। 'ছোট রাখালছেলে' একটি জনপ্রিয় চীনা লোকনাট্য যাতে প্রয়োজন হয় মাত্র দুজন পাত্রপাত্রীর; একটি রাখালছেলে ও একটি গ্রাম্য বালিকার; ওরা গানে গানে প্রশ্ন ও উত্তরের আকারে অভিনয় করে থাকে। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম দিকে নতুন কথা ও বিষয়বস্তু ব্যবহার করে এই নাট্য-রীতিকে জাপ-বিরোধী প্রচারণার কাজে লাগানো হয় এবং দর্শকসাধারণের মধ্যে তা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

৭। এই ছয়টি শব্দ লেখার জন্য ব্যবহৃত চীনা হরফগুলি খুবই সহজে লেখা যায়, শুধু কটি রেখা টানলেই চলে এবং প্রাচীনকালের প্রথম পাঠের বইয়ে এইগুলিই সাধারণভাবে সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হতো।

৮। 'বসন্তের তুষারপাত' ও 'গ্রাম্য গরিবের গান' খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের চু রাজত্বের সময় এই গানগুলি গাওয়া হতো। প্রথম গানটির সুর দ্বিতীয়টির

তুলনায় উচ্চস্তরের। রাজকুমার চাও মিং-এর **গল্প ও পত্র সংগ্রহের** বইয়ে 'রাজা চু-এর প্রতি সুং য়ুর জবাব'—গল্পটি যেভাবে কথিত হয়েছে তা হল এই যে চু রাজ্যের রাজধানীতে যখন কেউ 'বসন্তের তুষারপাত' গানটি গাইত তখন মাত্র কয়েক ডজন লোক যোগ দিত কিন্তু গ্রাম্য গরিবের গান গাওয়ার সময় হাজার হাজার মানুষ যোগ দিত।

৯। ভি. আই. লেনিনের 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' দেখুন: 'সাহিত্যকে নিশ্চয়ই শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ স্বার্থের একটি **অংশ** হতে হবে। তাকে হতে হবে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিকভাবে সচেতন অগ্রবাহিনীর দ্বারা পরিচালিত এক অখণ্ড মহান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক যন্ত্রের "খাঁজ এবং স্ক্রু"।' (লেনিন: **সংকলিত রচনাবলী**, ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫২, দশম খণ্ড, পৃঃ ৪৫।)

১০। প্রতিরোধ-যুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম চীনের কুওমিনতাঙ নিয়ন্ত্রণাধীন যে বিশাল অঞ্চল আক্রমণকারীরা দখল করে নেয়নি তাকে বলা হতো বিশাল পশ্চাদ্‌ভূমি এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন শত্রুর যুদ্ধরেখার পশ্চাদ্‌বর্তী জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলকে পৃথক করে বলা হতো 'ক্ষুদে পশ্চাদ্‌ভূমি'।

১১। **বিরাট পতন** (The Debacle) বিখ্যাত সোভিয়েত লেখক আলেকজাণ্ডার ফাদায়েভ-এর লিখিত একটি উপন্যাস। লু স্যুন এই উপন্যাসটি চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। এই উপন্যাসে শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত একটি সশস্ত্র বাহিনী সাইবেরিয়ায় সোভিয়েত গৃহযুদ্ধের সময় কিভাবে প্রতিবিপ্লবী দস্যুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল তার বর্ণনা করা হয়েছে।

১২। এই কবিতাংশটি লু স্যুন-এর 'নিজেকে বিদ্রূপ করে' নামক লেখা থেকে নেওয়া; **সংগ্রহের বাইরে সংগ্রহ**-তে তা রয়েছে। **সংকলিত রচনাবলী**, চীনা সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মনীতি

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক 'উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতর প্রশাসন'[১] এই কর্মনীতিটি উপস্থাপনের সময় থেকে বহু জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলেই পার্টি সংগঠনগুলি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুসারে তা কাজে প্রয়োগ করছে অথবা তা কাজে প্রয়োগ করার পরিকল্পনা করছে। শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান সীমান্ত অঞ্চলে নেতৃস্থানীয় কমরেডরা এই কাজ যথার্থভাবেই হাতে নিয়েছেন এবং 'উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতার প্রশাসন'—এর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। কয়েকটি ঘাঁটি অঞ্চলে কিন্তু কমরেডরা তত বেশি গুরুত্ব সহকারে এ কাজের চেষ্টা করছেন না তার কারণ হচ্ছে এই কর্মনীতির গুরুত্বের উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাঁদের অসম্পূর্ণতা রয়েছে। তাঁরা এখনো বুঝতে পারছেন না যে এটা কিভাবে বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টির অন্যান্য কর্মনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত বা এটা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মনীতি তা-ই বুঝতে পারেননি। **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকাতে এর আগেও কয়েকবার এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এবং এখন আমরা তা নিয়ে আরও ব্যাখ্যা হাজির করতে চাই।

পার্টির সকল কর্মনীতির লক্ষ্য হচ্ছে জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করা। পঞ্চম বছরের পর থেকে প্রতিরোধ-যুদ্ধ কার্যতঃ বিজয়ের সংগ্রামের চূড়ান্ত স্তরে প্রবেশ করেছে। এই স্তরে অবস্থাটি যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের অবস্থার চেয়ে পৃথক এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বছরের অবস্থার চেয়েও পৃথক। যুদ্ধের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বছরের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, একদিকে বিজয় নিকটবর্তী হচ্ছে, অন্যদিকে সামনে দেখা দিচ্ছে অত্যন্ত সুকঠিন বাধাবিপত্তি; অন্য কথায় বলা যায়, আমার 'উষালগ্নের পূর্বেকার অন্ধকারে' রয়েছি। ফ্যাসি-বিরোধী সকল দেশেই বর্তমান স্তরে এই অবস্থা বিরাজ করছে, বিরাজ করছে সমগ্র চীনেও, শুধু অষ্টম রুট সেনাবাহিনী এবং নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর ঘাঁটি

ইয়েনানের **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকার এই সম্পাদকীয়টি কমরেড মাও সে-তুঙ লিখেছিলেন।

অঞ্চলের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়, যদিও এখানে তা বিশেষভাবেই প্রকট। দুবছরের মধ্যেই আমরা জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে চেষ্টা করছি। এগুলি হবে চূড়ান্ত বাধাবিঘ্নে ভরা দুটি বছর, যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের চেয়ে বহুল পরিমাণে তা হবে স্বতন্ত্র রকমের। এই বিশেষ কথাটি বিপ্লবী পার্টি ও বিপ্লবী সেনাবাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আগে থেকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এটি করতে যদি তাঁরা ব্যর্থ হন, তবে ঘটনার তালে তালেই শুধু তাঁরা দোল খাবেন, যত চেষ্টাই তাঁরা করুন না কেন জয়লাভে তাঁরা সমর্থ হবেন না এবং বিপ্লবের লক্ষ্যকে পর্যন্ত তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত করে বসতে পারেন। যদিও শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্‌বর্তী জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে অবস্থা ইতিমধ্যেই আগের চেয়ে কয়েকগুণ কঠিন হয়ে উঠেছে, তবু তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। যদি আমাদের সঠিক নীতি না থাকে, তাহলে চরম কঠিন অবস্থা আমাদের একেবারে অভিভূত করে ফেলবে! সাধারণভাবে লোকেরা অতীত ও বর্তমানের অবস্থা দেখে বিচার করতে করতে এই ভুল চিন্তা করে বসেন যে ভবিষ্যৎ অনেকটা ঠিক একই রকমের হবে। তাঁরা এটা আগে থেকে আঁচ করতে পারছেন না যে জলমগ্ন পাথরের সঙ্গে জাহাজের ধাক্কা লাগতে পারে বা বুঝতে চাইছেন না যে তার ভেতর দিয়ে জাহাজকে নিরাপদে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। প্রতিরোধ-যুদ্ধের জাহাজের পথে কী সেই জলমগ্ন পাথরগুলি? সেগুলি হচ্ছে যুদ্ধের চূড়ান্ত স্তরে চূড়ান্ত গুরুতর রকমের বৈষয়িক অসুবিধাগুলি। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তা দেখিয়ে দিয়েছে এবং সেগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে ও তা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী থাকতে আহ্বান জানিয়েছে। আমাদের অনেক কমরেড ইতিমধ্যেই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিন্তু অনেকে তা করতে পারেননি এবং এইটিই হচ্ছে প্রথম প্রতিবন্ধক যা আমাদের দূর করা দরকার। প্রতিরোধ-যুদ্ধে ঐক্যের প্রয়োজন রয়েছে এবং ঐক্য হলেই সমস্যা থাকবে। এই সমস্যাগুলি হচ্ছে রাজনৈতিক; অতীতেও তা ঘটেছে এবং আবার ভবিষ্যতেও তা ঘটতে পারে। পাঁচ বছর ধরে আমাদের পার্টি সেগুলি ক্রমে ক্রমে, প্রচুর প্রচেষ্টা করে অতিক্রম করে এসেছে; আমাদের আহ্বান হচ্ছে ঐক্যকে শক্তিশালী করার এবং আমরা তা জানিয়েই যাব। কিন্তু অন্য ধরনের অসুবিধাও রয়েছে, সে অসুবিধা হচ্ছে বৈষয়িক। সেগুলি ক্রমেই বেশি বেশি করে বেড়ে যেতে থাকবে। আজ পর্যন্ত কিছু কমরেড সহজভাবেই একে নিচ্ছেন এবং অবস্থাটি সম্পর্কে সচেতন তাঁরা

নন, সুতরাং তাঁদেরকে আমাদের সতর্ক করে দিতে হচ্ছে। সমস্ত জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে সকল কমরেডকেই এটা বুঝতে হবে যে এখন থেকে বৈষয়িক অসুবিধাগুলি ক্রমেই অধিকতর গুরুতর আকার ধারণ করতে বাধ্য, সেগুলিকে অতিক্রম আমাদের করতে হবেই এবং তা করার একটি প্রধান উপায় হচ্ছে 'উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতর প্রশাসন।'

বৈষয়িক অসুবিধাগুলি অতিক্রম করার জন্য উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতর প্রশাসন সংক্রান্ত কর্মনীতিটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? এটা পরিষ্কার যে বর্তমানের এবং আরও বেশি করে ভবিষ্যতের ঘাঁটি অঞ্চলসমূহের যুদ্ধ-পরিস্থিতি আমাদের অতীত ধ্যানধারণাকে আঁকড়ে পড়ে থাকতে আমাদের দেবে না। আমাদের বিশাল যুদ্ধ পরিচালন যন্ত্রটি আগেকার অবস্থার উপযোগী। তখন তা অনুমোদনযোগ্য ও যথা প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা স্বতন্ত্র, ঘাঁটি অঞ্চলগুলি হ্রাস পেয়েছে এবং কিছুকাল ধরে তা হ্রাস পেতেই থাকবে এবং আমরা আর আগের মতো যুদ্ধ-পরিচালন যন্ত্রটিকে বজায় রাখতে পারব না। এরই মাঝে একটি দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে যুদ্ধ পরিচালনার যন্ত্র ও যুদ্ধ-পরিস্থিতির মধ্যে এবং তার সমাধান আমাদের করতে হবে। শত্রুর লক্ষ্য হচ্ছে এই দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তোলা, তারই জন্য তার কর্মনীতি হচ্ছে 'সব কিছু জ্বালিয়ে দাও, সবাইকে হত্যা কর, সব কিছু লুট কর।' আমরা যদি আমাদের বিশাল কাঠামোটিকে বজায় রাখি, আমরা সোজা তার সেই ফাঁদে জড়িয়ে পড়ব। আমরা যদি তা হ্রাস করি এবং উন্নততর সৈন্য ও সরলতর প্রশাসনের পথ ধরি তবে আমাদের যুদ্ধ পরিচালনার কাঠামোটি আকারে হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও তা শক্তিশালী হয়েই থাকবে। দ্বন্দ্বের সমাধান, 'অল্প জলে বড় মাছ থাকার, এই দ্বন্দ্বটির সমাধান করে, যুদ্ধ-পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ-পরিচালন যন্ত্রের সঙ্গতি বিধান করে, আমরা কিন্তু আরও শক্তিশালীই হয়ে উঠব এবং শত্রু কর্তৃক পরাজিত হওয়া দূরে থাক, আমরাই শেষ পর্যন্ত তাকে পরাজিত করে দেব। তারই জন্য আমরা বলছি যে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত 'উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতর প্রশাসন' সংক্রান্ত কর্মনীতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মনীতি।

কিন্তু মানুষের মন বাস্তব পরিস্থিতি আর অভ্যাসের শিকলে অনেক সময়ই বাঁধা হয়ে পড়ে যা থেকে বিপ্লবীরাও সবসময় নিস্তার পান না। আমরা নিজেরা এই বিশাল কাঠামোটি সৃষ্টি করেছি, তখন ভাবিইনি যে একদিন আমাদেরকেই তাকে কাটছাট করে দিতে, তাকে হ্রাসপ্রাপ্ত করতে হবে; কিন্তু এখন তা করার

সেই সময়টিই যখন এসেছে, আমাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে অনিচ্ছা এবং তা করা খুবই কঠিন বোধ হচ্ছে। শত্রু তার বিশাল যুদ্ধ-কাঠামোর সকল শক্তি নিয়ে আমাদের ওপর চাপ দিচ্ছে আর আমাদের বাহিনীকে কিনা কমিয়ে দিতে থাকব? তা কমিয়ে দিলে, আমরা দেখতে পাব আমাদের শক্তি শত্রুকে মোকাবিলা করার তুলনায় অনেক কম। এ ধরনের সংশয়গুলি হচ্ছে পরিস্থিতির আর অভ্যাসের শিকলে বাঁধা হয়ে পড়ার যথার্থ পরিণাম। আবহাওয়া যখন বদলায়, তখন সাজপোশাক পাল্টাতে হয়। বসন্ত শেষ হয়ে যখন গ্রীষ্ম আসে, গ্রীষ্ম থেকে শরৎ, শরৎ থেকে শীত, শীত থেকে বসন্ত—আমাদের পোশাক বদলাতেই হয়। কিন্তু অভ্যাসের বশে লোকেরা মাঝে মাঝে যথাসময়ে তা করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ঘাঁটি এলাকাসমূহে ইতিমধ্যেই আমাদের দরকার হয়েছে শীতের পোশাক পরিত্যাগ করার এবং গরমের দিনের পোশাক পরার যাতে করে হাল্কা গায়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমাদের গায়ে এখনো রয়ে গেছে ভারী পোশাকের বোঝা আর তা আমাদের টেনে রেখেছে বলে আমরা লড়াইয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছি। শত্রুর এই বিশাল সমরযন্ত্রের মোকাবিলা কেমন করে করব এই প্রশ্নের জবাবে আমরা **বানর রাজা কী করে লোহার পাখাধারিণী রাজকন্যাকে জব্দ করেছিল** সেই উদাহরণ থেকে শিক্ষা-গ্রহণ করতে পারি। রাজকন্যাটি ছিল আসলে একটি ভয়ানক মায়াবিনী রাক্ষসী, নিজেকে ক্ষুদ্র একটি পোকায় পরিণত করে বানর রাজা সোজা ঢুকে পড়ল রাজকুমারীর পাকস্থলীতে এবং তাকে চরম জব্দ করে ছাড়ল।[২] লিউ সুং-য়ুয়ান-এর **'কিউচাও-এর গর্দভটির'**[৩] বর্ণনাতেও মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কিউচাও-এ একটি বিরাট গর্দভ আনা হয়েছিল এবং তার বিরাট দেহটি দেখে একটি ক্ষুদ্র বাঘ তো প্রথমে ভয়ই পেয়ে গেল। কিন্তু পরে এই বাঘটিই বিরাট গর্দভকে মেরে ফেলেছিল। আমাদের অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী হল সেই বানর রাজা বা ক্ষুদ্র সেই বাঘটি। জাপানী রাক্ষস বা গর্দভের মোকাবিলা করতে তারা সম্পূর্ণ সমর্থ। আজ খানিকটা রদবদল করা আমাদের দিক থেকে একান্ত অপরিহার্য এবং আমাদের নিজেদের ক্ষুদ্রতর ও দৃঢ়তর করে তুলতে হবেই, তাহলেই আমরা অপরাজেয় হয়ে থাকব।

টীকা

১। 'উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতর প্রশাসন' এই কথাটি এখন খুবই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এবং তা শুধু সামরিক ব্যাপারেই আর সীমাবদ্ধ নয়। এটা সংগঠনগত দিক থেকে পরিবর্তন বোঝাতে ও কর্মরত সদস্যসংখ্যা হ্রাস করার অর্থ বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়, প্রশাসনের ও কার্যপদ্ধতির সরলীকরণ সাধনের ব্যাপারেও কথাটি ব্যবহৃত হয়।

২। কিভাবে সান উ-কুং (বানর রাজা) নিজেকে একটি ক্ষুদ্র পোকায় পরিণত করে লোহার পাখাধারিণী রাজকন্যাকে পরাজিত করেছিল এই গল্প জানতে হলে চীনা উপন্যাস **সি য়ু চি (পশ্চিমে তীর্থযাত্রা)**-র ৫৯ তম অধ্যায় দেখুন।

৩। লিউ স্থং-য়ুয়ান (৭৭৭-৮১৯ খ্রীঃ) হচ্ছেন তাঙ রাজবংশের সময়কার একজন বিখ্যাত চীনা লেখক। তাঁর **তিনটি উপাখ্যান**-এর একটি হচ্ছে 'কিউ-চাও-এর গর্দভটি'। কাহিনীটি হচ্ছে এই : একটি বাঘ প্রথমে গর্দভটিকে দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু বাঘটি যখন আবিষ্কার করল যে গর্দভটি শুধু চিৎকার করতে ও পা ছুঁড়তেই জানে, তখন ঐ বাঘটি গর্দভটিকে আক্রমণ করে ও হত্যা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিক-পরিবর্তনকারী মুহূর্ত

১২ই অক্টোবর, ১৯৪২

স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধকে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সংবাদপত্র ভের্দুঁ-র যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছে এবং 'লাল ভের্দুঁ' এখন বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। এই তুলনাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ভের্দুঁর যুদ্ধের চেয়ে প্রকৃতির দিক থেকে ভিন্ন রকমের। কিন্তু এই দুটির মধ্যে মিল হচ্ছে এই যে এখন যেমন, তখনো, তেমনই, জার্মান আক্রমণ অভিযান দেখে বহু মানুষ এই ভুল ধারণা করেছিলেন যে জার্মানির পক্ষে তখনো যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করা সম্ভব। ১৯১৬ সালে জার্মান সেনাবাহিনী ভের্দুঁর ফরাসী দুর্গের ওপর বেশ কয়েকটি আক্রমণ অভিযান চালায়, ১৯১৮ সালের শীতকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার দুবছর আগের ঘটনা এটি। ভের্দুঁতে প্রধান সেনাপতি ছিলেন জার্মান যুবরাজ স্বয়ং এবং এই যুদ্ধে জার্মান সেনাবাহিনীর বাছাই করা সেরা সৈন্যদের নিয়োগ করা হয়েছিল। যুদ্ধটি ছিল নির্ধারক গুরুত্বসম্পন্ন। জার্মানদের হিংস্র আক্রমণগুলি ব্যর্থ হবার পর, সমগ্র জার্মান-অষ্ট্রিয়ান-তুর্কী-বুলগেরীয় জোটের আর কোন ভবিষ্যৎ ছিল না এবং তার পর থেকে তার অসুবিধাগুলি বেড়ে যেতে শুরু করে, অনুগামীরা তাদের পরিত্যাগ করতে শুরু করে, তার ভাঙন শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের চরম পরাজয় ঘটে। কিন্তু ঐ সময়ে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী জোট এই পরিস্থিতি তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেনি, তারা এই বিশ্বাসই করছিল যে জার্মান বাহিনী তখনো খুবই শক্তিশালী এবং তারা তাদের আসন্ন বিজয় সম্পর্কে সচেতন ছিল না। ঐতিহাসিকভাবে বলতে গেলে, বিলুপ্তির উপান্তে এসে সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিই অপরিহার্যভাবে বিপ্লবী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে মরীয়া হয়ে শেষ চরম সংগ্রাম শুরু করে দেয় এবং কিছু কিছু বিপ্লবীও কিছু সময়ের জন্য এই বাহ্যিক শক্তির প্রকাশ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন এবং শত্রুর অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কথা বুঝতে না পেরে এই মূল সত্যটিই তাঁরা ধরতে পারেন না যে শত্রু নিশ্চিহ্ন

কমরেড মাও সে-তুঙ ইয়েনান-এর **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকার জন্য এই সম্পাদকীয়টি লিখেছিলেন।

হওয়ার সন্নিকটবর্তী হচ্ছে এবং তাঁরই বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলেছেন। ফ্যাসিবাদের শক্তিগুলির উত্থান এবং বেশ ক'বছর ধরে যে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ তারা চালাচ্ছে তা ঠিক এই মরীয়া হয়ে পরিচালিত শেষ সংগ্রামেরই প্রকাশ। বর্তমান এই যুদ্ধে স্তালিনগ্রাদের ওপর আক্রমণই ছিল ফ্যাসিবাদের শেষ মরীয়া আক্রমণের প্রকাশ। ইতিহাসের দিক-পরিবর্তনসূচক এই মুহূর্তেও দুনিয়ার ফ্যাসি বিরোধী ফ্রন্টের বহু লোক ফ্যাসিবাদের হিংস্র চেহারা দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং তার মূল সত্যটিই ধরতে পারেননি, ব্যর্থ হয়েছেন। আটচল্লিশটি দিন ধরে ওখানে চলে আসছে অভূতপূর্ব তীব্র তিক্ত এক সংগ্রাম, মানুষের ইতিহাসে যার কোন তুলনা মেলে না—২৩শে আগস্ট যখন গোটা জার্মান সৈন্য বাহিনী ডন নদীর বাঁকটি অতিক্রম করে স্তালিনগ্রাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করে সেইদিন থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর যখন কিছু কিছু জার্মান বাহিনী নগরটির উত্তর-পশ্চিম শিল্পাঞ্চলের জেলাটির মধ্যে ঢুকে পড়ল তখন এবং ৯ই অক্টোবর যখন সোভিয়েত তথ্য দপ্তর ঘোষণা করল যে লালফৌজ ঐ জেলাতে জার্মান অবরোধ্যগহকে ভেদ করে ফেলেছে ঐ দিনটি পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলেছে। শেষ পর্যন্ত, সোভিয়েত বাহিনীই এই যুদ্ধে জয়লাভ করে। এই আটচল্লিশ দিন ধরে ঐ নগরী থেকে প্রতিটি পশ্চাদপসরণ অথবা বিজয়ের সংবাদ অসংখ্য কোটি কোটি মানুষের হৃদয়কে তোলপাড় করেছে, কখনো হয়তো আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন করে তুলেছে আবার কখনো আনন্দে উদ্বেল করে তুলেছে। এই যুদ্ধ শুধু সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধের বা শুধু ফ্যাসি-বিরোধী বিশ্বযুদ্ধের দিক পরিবর্তনসূচক মুহূর্তই নয়, তা সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসেরই দিক-পরিবর্তন-কারী মুহূর্ত। এই আটচল্লিশটি দিন ধরে, বিশ্বের জনগণ গত অক্টোবরে মস্কোর দিকে যে উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়েছিলেন তার চেয়েও বেশি উদ্বেগ নিয়ে স্তালিন-গ্রাদের দিকে তাঁরা তাকিয়েছিলেন।

পশ্চিমী ফ্রন্টে জয়লাভের পূর্ব পর্যন্ত হিটলার অনেকটা সাবধান ছিল। যখন সে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে, যখন নরওয়ে আক্রমণ করে, হল্যাণ্ড, বেল-জিয়াম ও ফ্রান্স আক্রমণ করে, যখন বলকান আক্রমণ করে তখন সে এক সময়ে একই লক্ষ্যে নিজের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে রাখে, তার মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করতে সাহস করেননি: পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়লাভের পর সাফল্যে তার মাথা ঘুরে গেল এবং তিন মাসের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করে ফেলার সে চেষ্টা করে। এই বিশাল ও শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক দেশের

বিরুদ্ধে উত্তরে মুরমান্স্ক থেকে দক্ষিণ ক্রিমিয়া পর্যন্ত সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে আক্রমণ শুরু করে এবং এভাবে তার বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলে। গত অক্টোবরে তার মস্কো অভিযানের ব্যর্থতা সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটায় এবং হিটলারের প্রথম যুদ্ধ-পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। লালফৌজ গত বছর জার্মান আক্রমণকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল এবং শীতকালে সকল রণাঙ্গনেই তা পাল্টা আক্রমণ শুরু করল; তা হচ্ছে সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়; হিটলারের পশ্চাদপসরণের এবং রক্ষণাত্মক যুদ্ধের পর্যায়ের শুরু হল। এই সময়ে তার প্রধান সেনাপতি ব্রাউচিৎশকে বরখাস্ত করে দিয়ে ও নিজে সর্বময় সেনাপতিত্ব গ্রহণ করে হিটলার সিদ্ধান্ত নিল যে সর্বাত্মক আক্রমণ অভিযানের পরিকল্পনা সে পরিত্যাগ করবে এবং ইউরোপের সকল বাহিনীকে ঝেড়েমুছে এনে জড়ো করল চূড়ান্ত অভিযানের জন্য। শুধু দক্ষিণ রণাঙ্গনেই তাকে কেন্দ্রীভূত করে সে ভাবল এতে করে সোভিয়েত ইউনিয়নের একেবারে মূলে আঘাত হানা যাবে। যেহেতু প্রকৃতির দিক থেকে তা ছিল চূড়ান্ত অভিযান, তার ওপর ফ্যাসিজমের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল। হিটলার তার সম্ভাব্য সকল শক্তিকে এনে কেন্দ্রীভূত করল, এমনকি উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গন থেকেও তার বিমান ও ট্যাঙ্কবহরের একটা অংশকে এনে এখানে জড়ো করল। এই বছরের যে মাসে কের্চ ও সেবাস্তপোলের ওপর জার্মান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের তৃতীয় পর্যায় শুরু হল পনের লক্ষ সৈন্যের এই বিশাল বাহিনী এবং তার বিমান ও ট্যাঙ্ক বহরের সাহায্যপুষ্ট হয়ে অভূতপূর্ব প্রচণ্ড বিক্রমে হিটলার স্তালিনগ্রাদ ও ককেশাসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করল। প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে সে এই দুটি লক্ষ্য হাসিল করার প্রচেষ্টা করেছিল ভল্গা জলপথকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া ও বাকু দখল করার জন্য। তারপর উত্তরে অভিযান চালিয়ে মস্কোর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া এবং দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ভেদ করে যাওয়া; আর একই সঙ্গে সে জাপানি ফ্যাসিস্টদের নির্দেশ দিল স্তালিনগ্রাদের পতনের পর সাইবেরিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে তাদের সৈন্যবাহিনীকে মাঞ্চুরিয়াতে সমবেত করার জন্য। হিটলার এই নির্বোধ প্রত্যাশা করেছিল যে সে সোভিয়েত ইউনিয়নকে এমন দুর্বল করে ফেলতে পারবে যে তার পক্ষে সোভিয়েত রণক্ষেত্র থেকে মূল জার্মান বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে পশ্চিম রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য এবং নিকট প্রাচ্যের সম্পদ কব্জা করে নেওয়ার ও জাপানীদের সঙ্গে

বিজয় সাধনের জন্য। একই সঙ্গে এর ফলে জাপানী সৈন্যরা উত্তরাঞ্চল থেকে মুক্ত হয়ে, পেছনের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে পশ্চিমে যাবে চীনের বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণে ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে। ঠিক এইভাবেই হিটলার ফ্যাসিষ্ট শিবিরের বিজয়ের হিসেব-নিকেশ করেছিল। কিন্তু এই পর্যায়ে অবস্থাটি কী রকম দাঁড়াল? হিটলার সোভিয়েতের এমন রণকৌশলের মুখে পড়ল যে তার ভবিষ্যতের দফারফা হয়ে গেল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এমন নীতি গ্রহণ করল যাতে করে শত্রুকে লোভ দেখিয়ে অনেকখানি গভীর পর্যন্ত এগিয়ে আসতে দিল এবং তারপর দৃঢ় প্রতিরোধ শুরু করল। পাঁচ মাসের যুদ্ধে জার্মান সৈন্যবাহিনী ককেশাসের তৈলক্ষেত্রে ঢুকতে বা স্তালিনগ্রাদ দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে; যার ফলে হিটলারকে তার সৈন্যদলকে উচ্চ পর্বতের পাদদেশে এবং দুর্ভেদ্য একটি নগরীর বাইরে থামিয়ে রাখতে হল,.এগোতে পারছে না, পেছোতেও পারছে না এরকম একটা অবস্থায় পড়ে অপরিমেয় ক্ষতি তাকে স্বীকার করতে হল এবং রীতিমত একটি গাড্ডায় সে পড়ে গেল। এর মাঝে অক্টোবর এসে গেছে, শীত আসছে; শীঘ্রই যুদ্ধের তৃতীয় পর্যায় শেষ হবে এবং শুরু হবে চতুর্থ পর্যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামরিক পরিকল্পনার একটিও সফল হয়নি। গত বছরের গ্রীষ্মকালের তার ব্যর্থতার কথা মনে রাখলে দেখা যায় ঐ সময়ে তার শক্তিগুলি বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাই হিটলার এবার দক্ষিণ রণাঙ্গনে তার শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছিল। কিন্তু এবারও পূর্বদিকে ভল্‌গা জলপথ বিচ্ছিন্ন করা ও দক্ষিণে ককেশাস এক ঝটকায় দখল করার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য—নিজের বাহিনীকে সে বিভক্ত করে ফেলল। এটা সে বুঝে উঠতে পারেনি যে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের মতো শক্তি তার নেই এবং তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার—'বহনের দণ্ডটির দুই প্রান্তই মজবুত না হলে বোঝাগুলি পিছলে পড়ে যাবে।' সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যত সে যুদ্ধ করছে ততই তার শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্তালিনের প্রতিভাদীপ্ত সমরাভিযান পরিচালনার ফলে উদ্যোগ পুরোপুরি এসে গেছে তাঁদের হাতে এবং সর্বত্র হিটলারকে ধ্বংসের দিকে তা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এই শীতের থেকে শুরু করে যুদ্ধের যে চতুর্থ পর্যায় শুরু হয়েছে তা হিটলারের আসন্ন পতনেরই সাক্ষ্য হয়ে থাকবে।

যুদ্ধের প্রথম ও তৃতীয় পর্যায়ে হিটলারের অবস্থার তুলনা করলে আমরা দেখতে পাব যে সে তার চূড়ান্ত পরাজয়ের দোরগোড়ায় এসে উপনীত হয়েছে।

লালফৌজ স্তালিনগ্রাদ ও ককেশাস এই উভয় জায়গাতেই জার্মান আক্রমণ কার্যতঃ স্তব্ধ করে দিয়েছে; স্তালিনগ্রাদ ও ককেশাসে তার আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর হিটলার এখন অবসন্ন হওয়ার সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে। এই বছরের ডিসেম্বর থেকে যে এই পুরো শীতকাল জুড়ে সে যে বাহিনী জড়ো করেছিল তা সবই নিঃশেষে কাজে লাগানো হয়ে গেছে। এক মাসের কম সময়ের মধ্যে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে শীত পড়ে যাবে এবং হিটলারকে দ্রুত রক্ষণাত্মক অবস্থায় পিছিয়ে যেতে হবে। ডন নদীর সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চল তার পক্ষে সবচেয়ে দুর্বল এলাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং লালফৌজ ওখানে প্রতি-আক্রমণ শুরু করে দেবে। আসন্ন পরাজয়ের ভয়ে চালিত হয়ে হিটলার এই শীতে তার সৈন্যবাহিনীকে আরেকবার পুনর্গঠিত করবে। পূর্ব ও পশ্চিম এই উভয় রনাঙ্গনের বিপদের মোকাবিলা করার জন্য সে হয়তো তার বাহিনীর অবশেষটুকু জড়ো করে অস্ত্র-সজ্জিত করবে এবং কয়েকটি নতুন ডিভিশন তৈরী করবে এবং তাছাড়া ইতালী রুমানিয়া ও হাঙ্গেরীর মতো তার ফ্যাসিষ্ট অংশীদারদের কাছেও সাহায্য চাইবে ও তাদের কাছ থেকে আরও কিছু কামানের খাদ্য সংগ্রহের জন্য তৎপর হবে। কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গনে শীতকালীন অভিযানের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি তাকে পোয়াতে হবে ও পশ্চিম রণাঙ্গনে দ্বিতীয় ফ্রন্ট-এর মোকাবিলা করার জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে; অন্যদিকে হিটলারের দফারফা হয়ে যাচ্ছে দেখে ইতালী, রুমানিয়া ও হাঙ্গেরী হতাশ হয়ে পড়বে এবং তার থেকে বেশি বেশি করে দূরে সরে যাবে। এক কথায়, ৯ই অক্টোবরের পর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার একমাত্র একটি পথই হিটলারের সামনে খোলা থাকছে।

এই আটচল্লিশটি দিন ধরে স্তালিনগ্রাদে লালফৌজের প্রতিরোধের সঙ্গে গত বছরের মস্কোর প্রতিরোধের কিছু মিল রয়েছে। অর্থাৎ বলা যায়, হিটলারের এই বছরের পরিকল্পনা ঠিক গত বছরের তার পরিকল্পনার মতোই একেবারে ভণ্ডুল হয়ে গেছে। কিন্তু পার্থক্যটা হচ্ছে এই দিক থেকে যে সোভিয়েত জনগণ মস্কোর প্রতিরক্ষার ধারা অনুসরণ করে চালিয়েছিলেন শীতকালীন একটি আক্রমণ অভিযান কিন্তু তাঁদের জার্মান বাহিনীর এই বছরের গ্রীষ্মকালীন আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য অপেক্ষা বাকী ছিল, অংশতঃ তার কারণ হচ্ছে এই যে জার্মানি ও তার ইউরোপীয় সাঙ্গপাঙ্গদের তখনো পর্যন্ত কিছু শক্তি রয়ে গিয়েছিল এবং ব্রিটেন ও আমেরিকার দিক থেকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে দেরী করাটাও ছিল তার আংশিক কারণ। কিন্তু স্তালিনগ্রাদের

প্রতিরক্ষার যুদ্ধের পর গত বছরের অবস্থার চেয়ে এখন অবস্থা দাঁড়াবে সম্পূর্ণ পৃথক। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যাপক আকারে শীতকালীন দ্বিতীয় প্রতি-আক্রমণ শুরু করবে, ব্রিটেন ও আমেরিকার পক্ষে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ব্যাপারে আর দেরী করা সম্ভব হবে না (যদিও সঠিক দিনক্ষণ আগে থেকেই বলে দেওয়া যাচ্ছে না), এবং ইউরোপের জনগণও প্রতিরোধের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে জার্মানি ও তার অপকর্মের সঙ্গীদের আর সেই শক্তি নেই যে তারা ব্যাপক আকারে বড় রকমের আক্রমণ চালাবে এবং তার সমগ্র সমরনতির ধাঁরাকেই রক্ষণাত্মক ধাঁচে দাঁড় করানো ছাড়া হিটলারের আর অন্য গতি থাকবে না। আর হিটলার যখনই একবার এই রক্ষণাত্মক সমরনীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে তখনই ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত ভবিষ্যৎ প্রায় নিধারিত হয়ে যাবে। জন্মের সময় থেকেই হিটলারের রাষ্ট্রের মতো একটি ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র তার সামরিক ও রাজনৈতিক জীবনকে আক্রমণমুখী করে দাঁড় করিয়ে রাখে এবং একবার এই আক্রমণমুখীনতা স্তব্ধ হয়ে পড়লে তার প্রাণপ্রবাহই স্তব্ধ হয়ে যাবে। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ ফ্যাসিবাদের আক্রমণমুখীনতাকেই শুব্ধ করে দেবে এবং তাই তা চূড়ান্ত নিধারক একটি যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। সমগ্র বিশ্বযুদ্ধের পক্ষেই তা চূড়ান্ত নির্ধারক হয়ে দাঁড়াবে।

তিনটি শক্তিমান শত্রু হিটলারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, এবং জার্মান-কবলিত অঞ্চলসমূহের জনগণ। পূর্ব রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আছে লালফৌজ প্রস্তর-কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে এবং সমগ্র দ্বিতীয় শীতকাল জুড়ে আর তার পরেও অব্যাহত গতিতে চলবে তার প্রতি-আক্রমণের অভিযান। এই বাহিনীই সমগ্র যুদ্ধের পরিণাম নিরূপণ করে দেবে, নির্ধারণ করবে মানবজাতির ভবিষ্যৎকে। যদিও ব্রিটেন ও আমেরিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার ও বিলম্ব করার তাদের নীতিই চালিয়ে যাচ্ছে তবু মৃত ব্যাঘ্রকে হেনস্তা করার সময়টি যখন আসবে তখন পশ্চিম রণাঙ্গনে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় রণাঙ্গন অবশ্যই খোলা হবে। তারপর রয়েছে হিটলার-বিরোধী আভ্যন্তরীণ যুদ্ধক্ষেত্রটি—জার্মান, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য অংশে জনগণের ব্যাপক অভ্যুত্থান মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে; সোভিয়েত ইউনিয়ন যে মুহূর্তে সর্বাত্মক প্রতি-আক্রমণ শুরু করবে এবং দ্বিতীয় ফ্রণ্টের কামানগুলির গর্জন শুরু হবে তখন তারা এই তৃতীয় ফ্রণ্টের রণভেরী বাজিয়ে দেবে। এভাবে

হিটলারের বিরুদ্ধে তিনটি ফ্রন্টের আক্রমণের ধারা একযোগে এসে মিলিত হবে—স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের সূত্র ধরে এই বিরাট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটিই শুরু হয়েছে।

নেপোলিয়নের রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটেছিল ওয়াটারলুর রণ-ক্ষেত্রে, কিন্তু তার পরাজয়ের নির্ধারক দিক-পরিবর্তনের মুহূর্তটি রচিত হয়েছিল মস্কোতে তার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। হিটলার আজ নেপোলিয়নের সেই একই পথের যাত্রী এবং স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধই সেই চরম পরিণতিটি রচনা করে দিয়েছে।

এই ঘটনাগুলি দূর প্রাচ্যের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করবে। আগামী বছরটি জাপানী ফ্যাসিবাদের জন্যও কোন সুসংবাদ বহন করে আনছে না। সময় যত যাবে ততই তার শিরঃপীড়াও বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এভাবেই ঘনিয়ে আসবে কবরে যাওয়ার তার অন্তিম মুহূর্তটি।

বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে যাঁরা হতাশাবাদী মনোভাব পোষণ করেন, তাঁদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করাই উচিত।

অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে

৬ই নভেম্বর, ১৯৪২

বর্তমান বছরে বিরাট আশা নিয়ে আমরা অক্টোবর বিপ্লবের বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন করছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই বার্ষিকীটি শুধু সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধের দিক-পরিবর্তন ঘটাবে তাই নয়, তা ফ্যাসিবাদী জোটের বিরুদ্ধে বিশ্বের ফ্যাসি-বিরোধী জোটের বিজয়েরও মোড় ঘুরিয়ে দেবে।

এর আগে পরাজয় বরণ না করেই হিটলার আক্রমণ অভিযান চালিয়ে যেতে পেরেছিল কারণ ফ্যাসিষ্ট জার্মানি ও ইউরোপের তার সাঙ্গপাঙ্গদের প্রতিরোধে লালফৌজ ছিল একা। এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অধিকতর বলশালী হয়ে উঠেছে এবং হিটলারের দ্বিতীয় গ্রীষ্মকালীন আক্রমণ অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। এরপর থেকে বিশ্বের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জোটের কর্তব্য হবে ফ্যাসিষ্ট জোটের বিরুদ্ধে অক্রমণ পরিচালনা করা এবং ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পরাজয় সাধন করা।

স্তালিনগ্রাদে লালফৌজের যোদ্ধারা এমন বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন যা মানবজাতির ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করবে। তাঁরা অক্টোবর বিপ্লবেরই সন্তান। অক্টোবর বিপ্লবের পতাকা অপরাজেয় এবং ফ্যাসিবাদের সমস্ত শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেই।

লালফৌজের এই বিজয় উৎসব পালনের সময় আমরা চীনের জনগণ আমাদের বিজয় উৎসবই পালন করছি। জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধ পাঁচ বছরের অধিককাল ধরে চলে আসছে এবং সামনে যদিও এখনো পর্যন্ত নানা বাধাবিঘ্ন রয়েছে তবু ইতিমধ্যেই বিজয়ের উষাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। জাপানী ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে বিজয় যে শুধু সুনিশ্চিত তাই নয়, তা আর বেশি দূরেও নয়।

চীনের জনগণের কর্তব্য হচ্ছে জাপানী ফ্যাসিষ্টদের পরাজিত করার ব্যাপারে সকল প্রয়াসকে কেন্দ্রীভূত করে তোলা।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধে অর্থনৈতিক ও আর্থিক সমস্যাবলী

ডিসেম্বর, ১৯৪২

অর্থনীতির বিকাশসাধন ও সরবরাহ সুনিশ্চিত করাই হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক ও আর্থিক কাজকর্ম পরিচালনার সাধারণ নীতি। কিন্তু আমাদের অনেক কমরেড একপেশেভাবে আর্থিক রাজস্ব সংগ্রহের ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির গুরুত্বটি উপলব্ধি করেন না। নিছক রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার জন্য যত জোর চেষ্টাই করুন না কেন সমস্যার তাঁরা কোন সমাধানই খুঁজে পান না। তার কারণ হচ্ছে অচল ও রক্ষণশীল ধারণাই তাঁদের মনে নানা গণ্ডগোল পাকাচ্ছে। তাঁরা এটা জানেন না যে ভাল বা মন্দ আর্থিক নীতি অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে ঠিকই, কিন্তু অর্থনীতিই আর্থিক ব্যাপারকে নির্ধারণ করে। দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি অর্থনীতি ছাড়া আর্থিক অসুবিধাগুলির সমাধান অসম্ভব এবং একটি বিকাশশীল অর্থনীতি ছাড়া আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করা অসম্ভব। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের আর্থিক সমস্যা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের ও

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের প্রবীণ কর্মীদের একটি সম্মেলনে কমরেড মাও সে-তুঙ যে রিপোর্ট দেন **অর্থনৈতিক ও আর্থিক সমস্যাবলী**-র প্রথম অধ্যায় হিসেবে এই প্রবন্ধটির তখন শিরোনাম ছিল 'আমাদের অতীত কাজকর্মের একটি মৌলিক সংক্ষিপ্তসার'। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে মুক্ত অঞ্চলসমূহে ১৯৪১ ও ১৯৪২ সাল ছিল সবচেয়ে কঠিন বছর। জাপানী আক্রমণকারীদের বর্বর আক্রমণ ও কুওমিনতাঙ-এর অবরোধ ও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করার ফলে মুক্ত অঞ্চলসমূহে বিরাট আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই বাধাবিপত্তিগুলিকে দূর করার জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ দেখিয়ে দিলেন যে কৃষির ও উৎপাদনের অন্যান্য শাখার বিকাশসাধনের জন্য পার্টির পক্ষ থেকে জনগণকে নেতৃত্বদানে প্রয়াসী হওয়া প্রয়োজন। তিনি মুক্ত অঞ্চলের সরকার ও অন্যান্য সংগঠন, বিদ্যালয় ও সেনাবাহিনীকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য যথাসম্ভব উৎপাদন করতে আহ্বান জানান। কমরেড মাও সে-তুঙ-এর **অর্থনৈতিক ও আর্থিক সমস্যাবলী** ও তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ 'খাজনা হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ঘাঁটি অঞ্চলে "সরকারকে সমর্থন ও জনগণকে সাহায্য করুন"—এই অভিযানগুলিকে প্রসারিত করুন' ও সংগঠিত হোন!' ইত্যাদি মুক্ত অঞ্চলে উৎপাদন অভিযান পরিচালনার

বেসামরিক জনগণের জীবিকা নির্বাহের ও তাদের কর্মক্ষম রাখার জন্য আর্থিক ভাণ্ডারের সুরাহা করা অর্থাৎ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থভাণ্ডারের সরবরাহের সমস্যার সমাধান করা। এই অর্থভাণ্ডার অংশতঃ সংগৃহীত হয় জনসাধারণের প্রদত্ত করের মধ্য দিয়ে এবং অংশত তা সংগৃহীত হয় লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও বেসামরিক ব্যক্তিদের নিজেদের পরিচালিত উৎপাদনের মধ্য দিয়ে। অর্থ-নীতির ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ও সমবেত মালিকানাধীন দুটো ক্ষেত্রেরই যদি আমরা বিকাশসাধন না করি তবে আমরা আমাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকেই শুধু অবধারিত করে তুলব। একবারে কঠোর-কঠিন বাস্তব ও কার্যকর অর্থনৈতিক বিকাশ ছাড়াই আর্থিক অসুবিধাগুলিকে দূর করা যাবে। অর্থনৈতিক বিকাশকে অবহেলা করা এবং অর্থের উৎসগুলিকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার পরিবর্তে অপরিহার্য ব্যয় হ্রাস করে আর্থিক অসুবিধাগুলির সমাধানের প্রত্যাশা করা হচ্ছে এমন একটি রক্ষণশীল ধারণা যা দিয়ে কোন সমস্যারই সমাধান করা যাবে না।

গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আমরা এসেছি। কুওমিনতাঙ যখন তার দুটি কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান চালিয়ে সংঘর্ষ বাঁধিয়েছিল সেই ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালেই ছিল আমাদের সবচেয়ে বেশি বাধাবিঘ্ন-সংকুল সময়। একটা সময় গেছে যখন জামা-কাপড়ের, পোষাক পরিচ্ছদের, রান্নার তেলের, কাগজের, তরিতরকারীর, আমাদের সৈনিকদের জুতোর এবং আমাদের অসামরিক লোকজনদের শীতের -বিছানাপত্রের ভীষণ অভাব গেছে আমাদের। কুওমিনতাঙ আমাদের প্রাপ্য অর্থ না দিয়ে এবং অর্থনৈতিক

ক্ষেত্রে পার্টির মৌলিক কর্মসূচী হয়ে দাঁড়ায়। কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের ব্যাপারেই নিজেদের আবদ্ধ রাখা এবং অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের ভ্রান্ত ধারণাকে এবং জনগণকে সমবেত করা ও উৎপাদন বিকাশে ও বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে তাঁদের সাহায্য না করে শুধু জনগণের কাছে দাবি জানানোর ভ্রান্ত কাজের ধারাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন এবং 'অর্থনীতির বিকাশসাধনের ও সরবরাহ সুনিশ্চিত করার পার্টির সঠিক নীতি উপস্থিত করেন। এই কর্মনীতির ফল হিসেবে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে ও শত্রুর লাইনের পশ্চাতে অবস্থিত মুক্ত অঞ্চলে যে উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযান শুরু হয় তাতে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়। তা যে শুধু যুদ্ধের সবচেয়ে কঠিন সময়টিকে সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করতে মুক্ত অঞ্চলের জনগণ ও সশস্ত্রবাহিনীকে সমর্থ করে তোলে তাই নয়, পরবর্তী বছরগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে পার্টিকে তা অভিজ্ঞতার একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার এনে দেয়।

অবরোধ সৃষ্টি করে আমাদের দম বন্ধ করে দিতে চেয়েছে; আমাদের অবস্থা সত্যিই খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা আমরা কাটিয়ে উঠেছি। সীমান্ত অঞ্চলের লোকজনেরা আমাদের শুধু খাদ্যশস্য জুগিয়েছেন তাই নয়, আমরাও দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের হাতে আমাদের অর্থনীতির যৌথ মালিকানাধীন অংশটি গড়ে তুলেছি। সরকার সীমান্ত অঞ্চলের প্রয়োজন মেটাতে বহু শিল্প গড়ে তুলেছে, সৈন্যবাহিনী উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক অভিযানে ও কৃষির সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করেছে, শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করে তাদের নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে ও বিদ্যালয়সমূহে নিজেদের চাহিদা মেটাবার মতো একই ধরনের অর্থ নৈতিক কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেছে। আত্মনির্ভর এই যে অর্থনীতিটি সৈন্যবাহিনী, বিভিন্ন সংগঠন এবং বিদ্যালয়সমূহ গড়ে তুলেছে সেটা আজকের দিনের বিশেষ পরিস্থিতির একটা বিশেষ ব্যবস্থা। অন্য ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এটা অযৌক্তিক ও অর্থহীন বলে মনে হতো কিন্তু বর্তমানে তা সম্পূর্ণ যুক্তি-সঙ্গত ও আবশ্যকীয়। এই পথেই আমরা আমাদের বাধাবিঘ্নগুলিকে দূর করে এসেছি। তর্কাতীত এই ঐতিহাসিক সত্য কি এ কথাই প্রমাণ করেনি যে একমাত্র অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্য দিয়েই সরবরাহ ও জোগান অব্যাহত রাখা ও সুনিশ্চিত করা সম্ভব? এখনো অনেক অসুবিধা আমাদের সামনে রয়েছে কিন্তু আমাদের অর্থনীতির যৌথ মালিকানাধীন ক্ষেত্রটির ভিত্তি আমরা ইতিমধ্যেই স্থাপন করে ফেলেছি। আরও এক বছরে, ১৯৪৩ সাল শেষ হওয়ার আগেই এই ভিত্তিটিকে আমরা আরও দৃঢ়তর করে তুলব।

অর্থনীতির বিকাশই হচ্ছে সঠিক পথ কিন্তু বেপরোয়া, বিচার-বিবেচনা হীন বা দুর্বল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রসারণই বিকাশ নয়। বর্তমানের বাস্তব পরিস্থিতির কথা খেয়াল না করে কিছু কিছু কমরেড বিকাশের ব্যাপারে বিস্তর ফাঁকা হৈ-চৈ করছেন; উদাহরণ হিসেবে, তাঁরা ভারী শিল্প গড়ে তোলার দাবি করছেন এবং লবণ উৎপাদনের ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের জন্য বিরাট বিরাট শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা তাঁরা হাজির করছেন—এই সবগুলিই অবাস্তব এবং গ্রহণ করার অযোগ্য। পার্টির লাইনই হচ্ছে বিকাশের সঠিক লাইন; তা একদিকে অচল ও রক্ষণশীল ধ্যানধারণার বিরোধিতা করে এবং অন্যদিকে বিরাট চোখ-ধাঁধানো ও অবাস্তব পরিকল্পনারও তা বিরোধিতা করে। আর্থিক ও অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে এ হচ্ছে পার্টির দুই ফ্রন্টের সংগ্রাম।

আমাদের অর্থনীতির যৌথ মালিকানাধীন ক্ষেত্রের বিকাশের ব্যবস্থা আমরা করব কিন্তু জনগণের কাজ থেকে সাহায্যলাভের গুরুত্বকে ভুলে যাওয়া চলবে না। জনগণের কাছ থেকে আমরা ১৯৪০ সালে ৯০ হাজার তান, ১৯৪১ সালে দু' লক্ষ তান এবং ১৯৪২ সালে ১ লক্ষ ৬০ হাজার তান খাদ্যশস্য পেয়েছি।[১] এতে করে আমাদের সৈন্যবাহিনী ও অসামরিক লোকজনের খাদ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করা গেছে। ১৯৪১ সালের শেষ পর্যন্ত আমাদের যৌথ মালিকানাধীন ক্ষেত্রের কৃষির খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল নিতান্তই নগণ্য এবং জনগণের ওপরই খাদ্যের জন্য আমরা নির্ভর করেছিলাম। আমরা সেনাবাহিনীকে আরও শস্য উৎপাদন করার জন্য আহ্বান জানাব কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত জনগণের ওপরই মুখ্যতঃ আমাদের এখানে নির্ভর করতে হবে। যদিও শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাদ্ভাগে রয়েছে, প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি তাকে পোহাতে হয়নি এবং তার লোকসংখ্যা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাত্র, এত বিরাট এলাকার পক্ষে এটা খুবই অল্প লোকসংখ্যা এবং এত বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্যের জোগান দেওয়া সহজ কাজ নয়। তাছাড়া জনসাধারণ আমাদের লবণ সরবাহ করেন বা লবণ সরবরাহের জন্য লেভি দিয়ে থাকেন এবং ১৯৪১ সালে তাঁরা পঞ্চাশ লক্ষ য়ুয়ান মূল্যের সরকারী সার্টিফিকেট ক্রয় করেছেন; এই সব মিলিয়ে বোঝাটা মোটেই কম নয়। প্রতিরোধ যুদ্ধ ও জাতীয় পুনর্গঠনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য জনগণকে এই বোঝা বহন করতে হয় এবং তার প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁরা ভালভাবেই বোঝেন। সরকার যখন খুবই বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন তখন জনগণকে অধিকতর বোঝা বহন করতে বলা প্রয়োজন হয় এবং তাঁরাও এ কথা বোঝেন। কিন্তু একদিকে জনগণের কাছ থেকে আমরা যেমন নেব তেমনি একই সঙ্গে তাঁদের অর্থনীতিকে জোরদার ও সম্প্রসারিত করতে সাহায্যও আমাদের করতে হবে। অর্থাৎ কৃষি, পশুপালন, হস্তশিল্প, লবণ তৈরী ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশের ব্যাপারে জনগণকে সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার যাতে করে একদিকে তাঁরা যেমন দেবেন তেমনি পাবেনও। তারচেয়েও বেশি করা চাই, তাঁরা যা দেবেন তারচেয়ে বেশি তাঁদের পেতে হবে; একমাত্র তাহলেই জাপানের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ আমরা চালিয়ে যেতে পারব।

যুদ্ধের প্রয়োজনের কথা খেয়াল না করে কিছু কমরেড জোর দিয়ে বলেই চলেছেন যে সরকারের উচিত 'জনহিতৈষণার' নীতি গ্রহণ করা। এটা ভুল

হবে। কারণ, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই যদি আমরা জয়লাভ করতে না পারি তাহলে জনগণের কাছে এই 'জনহিতৈষণার' কোনই মূল্য থাকবে না এবং তা জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদেরই শুধু সহায়তা করবে। অন্যদিকে, জনগণকে সাময়িকভাবে যদিও বেশ ভারী একটা বোঝাই বহন করতে হচ্ছে, সরকার ও সৈন্যবাহিনীর সামনে যেসব বাধাবিপত্তি দেখা দিয়েছে সেগুলি যখন অতিক্রম করা যাবে, প্রতিরোধ-যুদ্ধকে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে এবং শত্রুকে পরাজিত করে দেওয়া যাবে—তখন অবস্থা অনেক ভাল হয়ে উঠবে, এবং এখানেই বিপ্লবী সরকারের প্রকৃত জনহিতৈষণার লক্ষ্য নিহিত রয়েছে।

অন্য একটি ভুল হচ্ছে 'মাছ ধরার জন্য পুকুরের জল সেঁচে ফেলে দেওয়া'—অর্থাৎ তাঁদের দুঃখকষ্টের কথা না ভেবে শুধু সরকার ও সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজনের কথা ভেবে জনগণের কাছে অন্তহীন দাবি জানিয়ে যাওয়া। এটা হচ্ছে কুওমিনতাঙসুলভ চিন্তাধারা, আমরা তা কোন সময়ই গ্রহণ করব না। যদিও সাময়িকভাবে আমরা জনগণের বোঝাকে বাড়িয়েছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আমাদের অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রটি গড়ে তোলার কাজ শুরু করে দিয়েছি। ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে সৈন্যবাহিনী, সরকার এবং অন্যান্য সংগঠন এবং বিদ্যালয়সমূহ তাদের নিজেদের চেষ্টাতেই তাদের প্রয়োজনের অনেকখানি মিটিয়ে নিতে পেরেছে। চীনের ইতিহাসে এ এক নজীরবিহীন বিস্ময়কর সাফল্য এবং এটা আমাদের অপরাজেয়তার বাস্তব ভিত্তিই গড়ে তুলেছে। আমাদের আত্মনির্ভরতার এই অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যত বাড়বে তত বেশী করে আমরা জনগণের ওপর থেকে করের বোঝা লাঘব করতে সক্ষম হব। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের প্রথম পর্যায়ে আমার তাঁদের কাছ থেকে খুব কমই নিয়েছি; এই সময় আমরা প্রচুর পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হই। ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সালের দ্বিতীয় পর্যায়টিতে জনসাধারণের ওপরে বোঝাটি বেড়েছে। তৃতীয় পর্যায় শুরু হবে ১৯৪৩ থেকে। আগামী দুবছরের অর্থাৎ ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে যদি আমাদের অর্থনীতির যৌথ ক্ষেত্রটি বেড়েই চলতে থাকে এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সমস্ত বা অন্ততঃ অধিকাংশ সৈন্যবাহিনী কৃষিকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারেন, তাহলে ১৯৪৪ সাল শেষ হওয়ার আগেই জনসাধারণের ওপরকার বোঝা আমরা আবার লাঘব করে দিতে পারব এবং তাঁরা আবার শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হবেন। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

একদেশদর্শী অভিমতগুলিকে আমাদের বাতিল করে দিতে হবে এবং 'অর্থনীতির বিকাশসাধন করুন ও জোগান সুনিশ্চিত করুন'—আমাদের পার্টির এই সঠিক স্লোগানকে সামনে তুলে ধরতে হবে। সামগ্রিক ও একক ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদের স্লোগান হল: 'সামগ্রিক ও একক এই দুটির প্রতিই নজর দিন' এবং 'সশস্ত্রবাহিনী ও অসামরিক জনসাধারণ এই দুয়ের প্রতিই নজর দিন'। আমরা শুধু এ ধরনের স্লোগানগুলিকেই সঠিক বলে মনে করি। আমাদের অর্থনীতির যৌথ ও ব্যক্তিগত এই উভয় মালিকানাধীন ক্ষেত্রকেই বাস্তব বুদ্ধিসম্মত ও কার্যকরভাবে সম্প্রসারিত করার মধ্য দিয়েই শুধু আমরা আমাদের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোকে সুনিশ্চিত করতে পারি। এমনকি কঠিন সময়েও করভারের সীমার প্রতি আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই যাতে তা জনগণকে আঘাত না করে বসে। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে এই বোঝা লাঘব করে দিয়ে জনগণকে শক্তি সঞ্চয় করতে দিতে হবে।

কুওমিনতাঙ গোঁড়াপন্থীরা সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের নির্মাণকার্যকে একটা অর্থহীন উদ্ভট পরিকল্পনা বলে মনে করে এবং এখানকার প্রতিকূলতাগুলিকে অনতিক্রম্য বলে মনে করে: যে-কোনদিন সীমান্ত অঞ্চলের পতন ঘটবে এই দুরাশাই ওরা পোষণ করে। ঐ লোকগুলোর সঙ্গে বাক্যব্যয় করা নিরর্থক; আমাদের 'পতন' ওরা কোনদিনই দেখতে পাবে না এবং আমরা নিঃসংশয়ে অগ্রগতি লাভ করব ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠব। ওরা জানে না যে কমিউনিস্ট পার্টির ও সীমান্ত অঞ্চলের বিপ্লবী সরকারের নেতৃত্বাধীনে জনগণ সব সময়ই পার্টি ও সরকারকে তাদের সমর্থন জানিয়ে যাবে এবং পার্টি ও সরকার সব সময়ই অর্থনৈতিক ও আর্থিক সমস্যাগুলির সমাধানের পথ খুঁজে পাবে। আসলে আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের সাম্প্রতিক নানা সমস্যা অতিক্রম করে ফেলেছি এবং অচিরেই অন্যগুলিও দূর করতে পারব। এরচেয়ে অনেকগুণে বড় বাধা-বিঘ্নকে অতীতে আমরা মোকাবিলা করেছি ও তাদের সবগুলিই অতিক্রম করে এসেছি। প্রতিদিন তীব্র যুদ্ধবিগ্রহ চলছে, উত্তর ও মধ্য চীনে আমাদের ঘাঁটি অঞ্চলসমূহ এখন শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী কঠিন সমস্যার সম্মুখীন কিন্তু এর মাঝে সাড়ে পাঁচ বছর আমরা তা রক্ষা করে আসছি এবং বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত নিশ্চতভাবেই আমরা তা করতে পারব। আমাদের দিক থেকে হতাশার কোন ভিত্তিই নেই; আমরা যে-কোন বাধাবিপত্তিকেই জয় করে নেব।

শেনসি-কানস্থ-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের প্রবীণ কর্মীদের এই সম্মেলনের পর আমরা 'উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতর প্রশাসনের'[২] নীতিটি কার্যকর করব। কঠোরভাবে তাকে কার্যকর করতে হবে, পুরোপুরি ও সকল ক্ষেত্রে তাকে কার্যকর করতে হবে, দোষ ছাড়ানোভাবে, ভাসাভাসাভাবে ও আংশিকভাবে তাকে কার্যকর করলে চলবে না। তাকে কার্যকর করার সময় আমাদের যে লক্ষ্য সামনে রাখতে হবে সেগুলি হচ্ছে—সরলীকরণ, ঐক্যসাধন, দক্ষতা অর্জন, মিতব্যয়িতা ও আমলাতান্ত্রিকতার বিরোধিতা। এই পাঁচটি লক্ষ্য আমাদের অর্থনৈতিক ও আর্থিক কাজকর্মের ওপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সঞ্চার করবে। সরলীকরণের ফলে উৎপাদনমুখী নয় এমন বাজে খরচ হ্রাস পাবে এবং উৎপাদন থেকে আয় বৃদ্ধি পাবে; এর ফলে আমাদের অর্থভাণ্ডারের ওপরই যে শুধু প্রত্যক্ষ ও সুস্থ প্রভাব সৃষ্টি হবে তাই নয়, তা জনগণের বোঝাকে লাঘব করবে ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের হিতসাধন করবে। আমাদের অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থা থেকে অনৈক্য, স্বতন্ত্রভাবে একলা চলা, সংহতির অভাব ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রবণতাকে দূর করে দিতে হবে এবং এমন একটি কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা হবে সুসংহত এবং নির্দেশের প্রতি সজাগ, আর যা আমাদের কর্মনীতি ও কর্মধারার পূর্ণ প্রয়োগকে সম্ভব করে তুলবে। এ ধরনের সুসংহত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পাবে। আমাদের সকল সংগঠন এবং বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও আর্থিক কাজকর্মে যাঁরা লিপ্ত রয়েছেন তাঁদের সকলকেই মিতব্যয়িতার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। মিতব্যয়িতা অনুসরণ করলে আমরা অপ্রয়োজনীয় ও বাজে বহু খরচ অনেক পরিমাণে কমিয়ে আনতে পারব যা সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ য়ুয়ান হয়ে দাঁড়াবে। সব-শেষে, অর্থনৈতিক ও আর্থিক কাজকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিরা আমলাতান্ত্রিক ধরণ-ধারণের যে অবশেষগুলি এখনো রয়েছে তার মধ্যে দুর্নীতি ও উৎকোচ গ্রহণ, অতিরিক্ত সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা, অর্থহীন 'রীতিসিদ্ধ' কাজকর্ম ও দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদি খুবই গুরুতর। আমরা যদি পার্টি, সরকার ও সেনাবাহিনীতে এই পাঁচটি লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জন করতে পারি তাহলে 'উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতর প্রশাসন' সম্পর্কিত আমাদের কর্মনীতি তার লক্ষ্যে উপনীত হবে, আমাদের বাধাবিপত্তিগুলি আমরা নিশ্চয়ই দূর করতে পারব এবং আমাদের আসন্ন 'পতন' বিষয়ক বাচাল উপহাসকে একেবারে স্তব্ধ করে দিতে পারব।

টীকা

১। এই সংখ্যাতত্ত্বগুলি হচ্ছে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কৃষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত মোট কৃষি করের (সরকারী শস্যকরের) হিসেব।

২। 'উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতর প্রশাসন' বিষয়ে জানার জন্য 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মনীতি' দেখুন; বর্তমান খণ্ড, পৃঃ ১৩০-৩৪।

নেতৃত্ব প্রদানের পদ্ধতি প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন

১লা জুন, ১৯৪৩

১। যে-কোন কাজই করি না কেন আমাদের কমিউনিস্টদের সে ক্ষেত্রে দুটো পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। একটি হচ্ছে সাধারণের সঙ্গে বিশেষের সংযোগসাধন এবং অন্যটি হচ্ছে জনগণের সঙ্গে নেতৃত্বের সংযোগসাধন।

২। যে-কোন কাজের বেলাতেই যদি সাধারণ ও ব্যাপক একটি আহ্বান না জানানো হয় তবে ব্যাপক জনগণকে কর্মক্ষেত্রে সমবেত করা যাবে না। কিন্তু নেতৃত্বের অবস্থানে আসীন ব্যক্তিবর্গ যদি নিজেদের একটি সাধারণ আহ্বানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন—যদি তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে কোন-না-কোন সংগঠনের একেবারে গভীরে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট আহ্বান অনুযায়ী বাস্তব কাজে লিপ্ত না হন, কোন একটা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে না পারেন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করেন এবং অভিজ্ঞতাকে অন্যান্য বাহিনীগুলির পরিচালনার ব্যাপারে কাজে না লাগান তবে ঐ সাধারণ আহ্বানটির সঠিকতা যাচাই করার অথবা তাকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে সমৃদ্ধ করার কোন উপায়ই থাকবে না এবং তার ফলে কার্যতঃ কিছুই লাভ করা যাবে না। উদাহরণ হিসেবে, ১৯৪২ সালের শুদ্ধিকরণ অভিযানে যেখানেই সাধারণ আহ্বানের সঙ্গে বিশেষকে সংযুক্ত করা হয়েছে ও সুনির্দিষ্ট পরিচালনাকে কাজে ব্যবহার করার পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হয়েছে সেখানেই সাফল্য অর্জিত হয়েছে কিন্তু যেখানে এই পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হয়নি সেখানে কোন সাফল্যই অর্জন করা যায়নি। ১৯৪৩ সালের শুদ্ধিকরণ অভিযানে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যেকটি ব্যুরো ও সাব-ব্যুরো ও প্রতিটি অঞ্চল এবং নগর পার্টি কমিটিকে একটি সাধারণ আহ্বান জানানো (সারা বছরের জন্য একটি শুদ্ধিকরণের পরিকল্পনা রচনা করা) ছাড়াও নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে হবে, এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। খোদ ঐ সংগঠন এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের অন্যান্য সংগঠন, বিদ্যালয় অথবা সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি থেকে (বেশি সংখ্যককে নয়), দুটি বা তিনটি

নেতৃত্ব প্রদানের পদ্ধতি প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ লিখেছিলেন।

ইউনিটকে বাছাই করুন। ঐ ইউনিটগুলিকে গভীরভাবে যাচাই করুন, তাদের মধ্যে শুদ্ধিকরণ অভিযানের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান সংগ্রহ করুন, ঐ ইউনিটগুলির অন্তর্ভুক্ত লোকজনদের মধ্য থেকে কয়েকজন (বেশি নয় কিন্তু) প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির রাজনৈতিক পূর্ব-ইতিহাস, মতাদর্শগত বৈশিষ্ট্য, অধ্যয়নে উৎসাহ এবং সবল ও দুর্বল দিকগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করুন। তদুপরি, ঐ সব ইউনিটগুলির সামনে যে সব বাস্তব সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছে সেইগুলির যথার্থ সমাধানের ভার যাঁদের ওপর রয়েছে তাঁদের ব্যক্তিগত-ভাবে পথ চলার নির্দেশ প্রদান করুন। প্রতিটি সংগঠন, বিদ্যালয় ও সেনাদলের ইউনিটের নেতাদের এইভাবেই চলতে হবে এবং যেহেতু এদের প্রতিটিরই অধীনস্থ ইউনিট রয়েছে তাই তাদেরও এইভাবেই চলতে হবে। তাছাড়া, এই পদ্ধতির সাহায্যে নেতারা নেতৃত্ব প্রদান ও শিক্ষাগ্রহণের মধ্যে সংযোগসাধন করতে পারেন। নেতৃত্বের পদে আসীন কেউ যদি বিশেষ কিছু অধীনস্থ ইউ-নিটের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ কিছু ব্যক্তির ও ঘটনার থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করেন তবে সকল ইউনিটকে সাধারণ পরিচালন সম্পর্কিত নির্দেশ দানের যোগ্যতা তাঁর থাকবে না। সর্বত্র এই পদ্ধতির প্রচলন করতে হবে যাতে করে সকল স্তরের নেতৃত্বকারী কর্মীরাই তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে শিখতে পারেন।

৩। ১৯৪২ সালের শুদ্ধিকরণ অভিযানের অভিজ্ঞতাও এ কথা প্রমাণ করেছে যে শুদ্ধিকরণের সাফল্যের জন্য ঐ আন্দোলনের সূত্র ধরে প্রতিটি ইউনিটেই একটি নেতৃস্থানীয় গ্রুপ অল্প কয়েকজন সক্রিয় কর্মীকে নিয়ে এবং ঐসব ইউনিটের প্রধানগণকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা এবং এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ব্যাপক জনগণের সঙ্গে ঐসব নেতৃস্থানীয় গ্রুপের নিবিড় যোগসূত্র গড়ে তোলা অপরিহার্য। নেতৃস্থানীয় গ্রুপটি যতই সক্রিয় হোক না কেন, যদি ব্যাপক জনগণের কার্যকলাপের সঙ্গে তা সংযুক্ত না হয় তবে তা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের নিষ্ফল প্রয়াস হয়েই থেকে যাবে। অন্যদিকে, জনগণ নিজেরাই যদি শুধু সক্রিয় থাকে এবং যদি তাদের কার্যকলাপকে উপযুক্তভাবে সংগঠিত করার জন্য এইরকম নেতৃস্থানীয় একটি গ্রুপ না থাকে, তবে ঐ কার্যকলাপকে দীর্ঘকাল চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, সঠিক পথে পরিচালনা করা যাবে না বা উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সাধারণভাবে কোন একটি জায়গায় জনসাধারণ তিনটি অংশকে নিয়ে গঠিত,—তুলনামূলকভাবে সক্রিয়

অংশ, মাঝারি অংশ এবং তুলনামূলকভাবে পশ্চাদ্‌পদ অংশ। সুতরাং এই সামান্য সংখ্যক সক্রিয় ব্যক্তিদের নেতৃত্বের চারিপাশে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে সুদক্ষ হতে হবে এবং এদের ওপর নির্ভর করেই মাঝারি অংশের মানকে উন্নত করতে হবে ও পশ্চাদ্‌পদ অংশকে সপক্ষে নিয়ে আনতে হবে। যথার্থভাবে ঐক্যবদ্ধ ও জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত একটি নেতৃস্থানীয় গ্রুপ গণ-সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে পারে, জনগণের সংগ্রাম থেকে তা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। একটা বিরাট সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় গ্রুপের গড়ন প্রাথমিক, মাঝামাঝি ও চূড়ান্ত পর্যায়ে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে না বা থাকতে পারে না; সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় যেসব সক্রিয় কর্মীরা এগিয়ে আসেন তাঁদের উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে যাতে নেতৃস্থানীয় গ্রুপের সাবেক যে সদস্যরা তুলনামূলকভাবে নিকৃষ্ট বা যাদের অধঃপতন ঘটেছে তাদের স্থানে ওঁদের বসানো যায়। বিভিন্ন স্থানে ও বহু সংগঠনে কাজকর্ম যে, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না তার অন্যতম একটি মূল কারণ হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত ও নিয়ত সুস্থভাবে সুরক্ষিত নেতৃস্থানীয় একটি গ্রুপের অভাব। একশ জন লোকের একটি বিদ্যালয়কে প্রকৃত বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী গঠিত (নেহাৎ যান্ত্রিকভাবে একত্র জড়ো করা নয় এমন) কয়েক-জন লোকের দশ বা বারোজনের একটি নেতৃস্থানীয় গ্রুপ না থাকলে নিশ্চয়ই তাকে ভালভাবে পরিচালনা করা যাবে না; এবং এই গ্রুপটি অবশ্যই গঠিত হওয়া চাই শিক্ষক, অন্যান্য কর্মচারী এবং ছাত্রদের মধ্য থেকে সবচেয়ে সক্রিয় সৎ ও তৎপর ব্যক্তিদের নিয়ে। ছোট হোক, বড় হোক, প্রতিটি সংগঠন, বিদ্যালয়, সেনাবাহিনীর ইউনিট, কারখানা বা গ্রাম যাই হোক—পার্টির বলশেভিকীকরণ সম্পর্কিত স্তালিনের বারোটি শর্তের মধ্যে নবম শর্তটিকে অর্থাৎ নেতৃত্বের একটি কেন্দ্র গঠন করার শর্তটিকে[১] আমাদের কার্যকর করতেই হবে! এই নেতৃত্বদানকারী গ্রুপটির মাপকাঠি হবে কর্মীদের সম্পর্কিত নীতির আলোচনাকালে ডিমিট্রভ যে চারটি মাপকাঠির নির্দেশ দান করে গেছেন সেইগুলি—লক্ষ্যের প্রতি একান্ত আনুগত্য, জনগণের সঙ্গে সংযোগ, স্বাধীনভাবে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের সক্ষমতা ও শৃংখলাপরায়ণতা।[২] কেন্দ্রীয় কর্তব্যগুলি সম্পাদনের ব্যাপারেই হোক—যুদ্ধ, উৎপাদন ও শিক্ষা (শুদ্ধিকরণ সহ সকল শিক্ষা) অথবা কাজকর্ম যাচাই করাই হোক বা কর্মীদের পূর্ব-ইতিহাস পরীক্ষা করাই হোক এবং অন্য যে-কোন কাজই হোক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই

নেতৃত্বপ্রদানকারী গ্রুপের জনগণের সঙ্গে যুক্ত থাকার পদ্ধতিটিকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ আহ্বানকে বিশেষ নির্দেশের সঙ্গে যুক্ত করার পদ্ধতিটিকে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪। আমাদের পার্টির সকল বাস্তব কাজকর্মে সকল সঠিক নেতৃত্বই আবশ্যিকভাবে হচ্ছে 'জনগণের কাছ থেকে পাওয়া এবং জনগণকেই ফিরিয়ে দেওয়া'। এর অর্থ হচ্ছে: 'জনগণের কাছ থেকে ধারণাগুলি (বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন ধারণাগুলি) গ্রহণ করা এবং সেগুলির সারসংকলন করা (অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে সেগুলির সারসংকলন করে সেই ধারণাগুলিকে প্রণালীবদ্ধ করা), তারপর সেগুলি নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়া ও সেগুলি তাদের মধ্যে প্রচার ও ব্যাখ্যা করা যাতে জনগণ ঐ ধারণাগুলিকে তাদের নিজস্ব ধারণা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে সেগুলিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে এবং বাস্তব কাজকর্মে সেগুলিকে রূপায়িত করে তুলতে পারে ও ঐসব কাজের মধ্য দিয়ে ঐ ধারণাগুলির সত্যতা যাচাই করে নিতে পারে। তারপর আবার সেগুলিকে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যাতে জনগণ সেগুলিকে অবিচলভাবে প্রয়োগ করে বাস্তবে সেগুলিকে কার্যকর করে তুলতে পারে। এইভাবে বারে বারে অন্তহীন ধারার মধ্য দিয়ে এই ধারণাগুলি প্রতিবারে আরও সঠিক, আরও প্রাণবন্ত ও আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। এই হচ্ছে মার্কসবাদী জ্ঞানের তত্ত্ব।

৫। একটি সংগঠনে বা একটি সংগ্রামে নেতৃত্বপ্রদানকারী গ্রুপ ও জনগণের মধ্যেকার সঠিক সম্বন্ধের প্রত্যয়, নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সঠিক ধ্যানধারণা একমাত্র 'জনগণের কাছ থেকে এনে জনগণকে ফিরিয়ে দেওয়ার' মাধ্যমেই হতে পারে এই প্রত্যয় এবং নেতৃত্বের ধ্যানধারণাগুলি বাস্তবে প্রয়োগের সময় সাধারণ আহ্বানকে নির্দিষ্ট নির্দেশের সঙ্গে সম্মিলিত করতে হবে এই প্রত্যয়—এই প্রত্যয়গুলিকে বর্তমান শুদ্ধিকরণ অভিযানকালে সর্বত্র প্রচার করতে হবে যাতে করে এইসব প্রশ্নে আমাদের কর্মীদের মধ্যে যেসব ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেগুলিকে শুধরে নেওয়া যায়। আমাদের বহু কমরেড সক্রিয় কর্মীদের একত্র করে নেতৃত্ব প্রদানকারী একটি মূলকেন্দ্র গড়ে তোলার গুরুত্ব বোঝেন না বা তা গড়ে তোলার ব্যাপারে দক্ষ নন এবং নেতৃত্ব প্রদানকারী মূলকেন্দ্রকে জনগণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করার গুরুত্ব তাঁরা বোঝেন না বা যুক্ত করার ব্যাপারে তাঁরা দক্ষ নন, তাই তাঁদের নেতৃত্ব আমলাতান্ত্রিক ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

অনেক কমরেড গণ-সংগ্রামগুলির অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ করার গুরুত্ব বোঝেন না বা তা বোঝার ব্যাপারে দক্ষ নন বরং তাঁরা নিজেদের খুবই বুদ্ধিমান বলে মনে করেন এবং নিজেদের মনোগত ধ্যানধারণাগুলি প্রচারেই মগ্ন থাকেন, ফলে তাঁদের ধ্যানধারণাগুলি শূন্যগর্ভ ও অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। বহু কমরেড কোন কাজের ব্যাপারে একটি সাধারণ আহ্বান জানিয়েই তৃপ্ত হয়ে বসে থাকেন এবং এই সাধারণ আহ্বানের সূত্র ধরে অবিলম্বে নির্দিষ্ট ও বাস্তব নির্দেশ প্রদানের গুরুত্ব বোঝেন না বা এ ব্যাপারে দক্ষ নন ফলে তাঁদের আহ্বান তাঁদের মুখেই থেকে যায়, কাগজপত্রেই থেকে যায় অথবা সম্মেলনকক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাঁদের নেতৃত্ব আমলাতান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান শুদ্ধিকরণ অভিযানে আমাদের এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে হবে এবং নেতৃত্বকে জনগণের সঙ্গে, আমাদের অধ্যয়নে সাধারণকে বিশেষের সঙ্গে, কাজকর্ম যাচাই করার ব্যাপারে এবং কর্মীদের পূর্ব-ইতিহাস পরীক্ষা করার ব্যাপারে এই পদ্ধতিগুলিকে ব্যবহার করতে শিখতে হবে এবং ভবিষ্যতের সকল কাজকর্মের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিকে আমাদের প্রয়োগ করতে হবে।

৬। জনসাধারণের ধ্যানধারণাগুলি গ্রহণ করুন ও ঐগুলির সারসংকলন করুন, তারপর জনগণের কাছে যান, ঐ ধারণাগুলিকে অবিচলভাবে প্রয়োগ করুন এবং সেগুলিকে রূপায়িত করে তুলুন যাতে করে নেতৃত্ব প্রদানের সঠিক ধারণা গড়ে তোলা যায়—এই হচ্ছে নেতৃত্ব প্রদানের মৌলিক পদ্ধতি। ধ্যানধারণাগুলির সারসংকলন এবং সেগুলিকে অবিচলভাবে প্রয়োগ করার প্রক্রিয়ার সময় সাধারণ আহ্বানকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশের সঙ্গে যুক্ত করার পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং তা মৌলিক পদ্ধতিরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কয়েকটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্য থেকে সাধারণ ধারণা (সাধারণ আহ্বান) প্রণয়ন করুন এবং সেগুলিকে বহু বিভিন্ন ইউনিটে প্রয়োগ করে যাচাই করুন (শুধু নিজে তা করলেই চলবে না, অন্যদেরও তা করতে বলুন); তারপর নতুন ধারণার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন (সারসংক্ষেপ করুন) এবং সাধারণভাবে জনগণকে পরিচালনার জন্য নতুন নির্দেশ প্রণয়ন করুন। বর্তমান শুদ্ধিকরণ আন্দোলনে এবং অন্য সব কাজের ক্ষেত্রেও কমরেডদের এটি অনুসরণ করা উচিত। এটি যত বেশি দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করা যাবে ততই উন্নততর নেতৃত্ব দেখা দেবে।

৭। অধীনস্থ ইউনিটগুলিকে যখন কোন কাজের নির্দেশ দেওয়া হবে

(সে কাজ বিপ্লবী যুদ্ধ হোক, উৎপাদন বা শিক্ষা সম্পর্কে হোক, শুদ্ধিকরণ আন্দোলন, কাজকর্ম যাচাই করা বা কর্মীদের পূর্ব-ইতিহাস পরীক্ষা করাই হোক, প্রচারকার্য, সাংগঠনিক কাজকর্ম বা গুপ্তচরবৃত্তি-বিরোধী কাজ বা অন্য যাই হোক) তখন উচ্চতর সংগঠন ও তার বিভিন্ন দপ্তরকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নতর সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নেতার মাধ্যমে যাবেন যাতে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারেন; এ ভাবে শ্রমবিভাজন ও ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব এই দুটিকেই কার্যকর করা যাবে। উচ্চতর স্তরের কোন দপ্তর শুধু নিজের নিম্নতর দপ্তরের কাছে গেলেই চলবে না (যেমন উদাহরণ হিসেবে, সাংগঠনিক ব্যাপারে, প্রচারকার্যে বা গুপ্তচরবৃত্তি-বিরোধী ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট একটি নিম্নতর দপ্তর), শুধু তার সংশ্লিষ্ট নিম্নতর দপ্তরে গেলেই চলবে না, নিম্নতর সংগঠনের সর্বময় দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে (যেমন সম্পাদক, সভাপতি, পরিচালক বা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে) অন্ধকারে রেখে দেওয়া বা দায়িত্ব না দেওয়াও চলবে না। সর্বময় দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই দুজনকেই ওয়াকিবহাল রাখতে হবে ও দায়িত্ব দিতে হবে। এই কেন্দ্রীভূত পদ্ধতি, শ্রমবিভাজনের সঙ্গে কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের সংযোগসাধন সর্বময় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে বিরাট সংখ্যক কর্মীদের একটি বিশেষ কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয়তো একটা গোটা সংগঠনের লোকজনদের সমবেত করাকে সম্ভবপর করে তুলবে এবং এভাবে বিশেষ বিশেষ দপ্তরে কর্মীদের অভাবকে কাটিয়ে ওঠা যাবে এবং হাতে যে কাজটি নেওয়া হয়েছে তা সম্পাদনের ব্যাপারে বহু সংখ্যক ব্যক্তিকেই সক্রিয় কর্মীতে পরিণত করা যাবে। এটাও নেতৃত্বকে জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত করার একটি পথ। উদাহরণ হিসেবে কর্মীদের পূর্ব-ইতিহাস পরীক্ষা করার ব্যাপারটাই ধরুন। যদি কাজটা বিচ্ছিন্নভাবে করা হয়, যদি ঐ কাজের ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত সামন্তসংখ্যক লোকই তা করেন তবে তা নিশ্চয়ই ভালভাবে করা যাবে না। কিন্তু তা যদি কোন সংগঠন বা বিদ্যালয়ের প্রধানের মাধ্যমে করা হয় যিনি অনেককে বা প্রয়োজন হলে তাঁর সকল কর্মীবৃন্দকেই বা বহু অথবা সকল ছাত্রকেই এই কাজে লাগাতে পারবেন, অন্যদিকে উচ্চতর স্তরের সাংগঠনিক দপ্তরের নেতৃত্বে সমাসীন সদস্যরা একই সঙ্গে সঠিক নির্দেশ দিতে পারবেন, নেতৃত্বকে জনগণের সঙ্গে যুক্ত করার নীতিটি প্রয়োগ করতে পারবেন তখন দেখা যাবে কর্মীদের পূর্ব-ইতিহাস পরীক্ষা করে দেখার কাজটি নিঃসন্দেহে সন্তোষজনকভাবে সম্পাদন করা গেছে।

৮। কোন জায়গায় একই সময়ে অনেকগুলি কেন্দ্রীয় কর্তব্য থাকতে পারে না। একটা সময়ে একটাই মাত্র কেন্দ্রীয় কর্তব্য থাকতে পারে, তার সঙ্গে পরিপূরক দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের গুরুত্বসম্পন্ন অন্যান্য কাজও থাকতে পারে। তাই সর্বময় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার অঞ্চলের সংগ্রামের ইতিহাস ও পরিস্থিতিকে হিসেবের মধ্যে নিতে হবে এবং উপযুক্ত ক্রম অনুসারে বিভিন্ন কর্তব্য নির্ধারণ করে দিতে হবে; তাঁর নিজের কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত না করে উচ্চতর সংগঠন থেকে প্রতিটি নির্দেশ যেমন যেমন আসবে তাকে কার্যকর করলেই চলবে না কারণ এতে করে তা একগাদা 'কেন্দ্রীয় কর্তব্য' হয়ে দেখা দেবে এবং বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলার একটি পরিস্থিতিই দেখা দেবে। অন্যদিকে, তুলনামূলকভাবে তাদের ওপর অর্পিত কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ না করে বা তার মধ্যে কোন্ কাজটি কেন্দ্রীয় কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে তা বলে না দিয়ে কোন উচ্চতর সংগঠন একই সঙ্গে অনেকগুলি কর্তব্য নিম্নতর সংগঠনকে করতে বললে তা নিম্নতর সংগঠনগুলির নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণের সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে এবং তার ফলে সুনির্দিষ্ট কোন ফললাভ করা সম্ভব হবে না। সমগ্র পরিস্থিতিকে হিসেবের মধ্যে ধরে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও প্রতিটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে, প্রতিটি অধ্যায়ের কাজের ধারাবাহিকতা ও কেন্দ্রীয় মূল কর্তব্য সঠিকভাবে নিরূপণ করে দৃঢ়তা সহকারে অবিচলিতভাবে সিদ্ধান্ত কার্যকর করে সুনির্দিষ্ট ফললাভকে সুনিশ্চিত করা নেতৃত্ব প্রদানের কলাকৌশলের একটি অঙ্গ। নেতৃত্বপ্রদানের পদ্ধতির এটিও একটি সমস্যা এবং জনগণের সঙ্গে নেতৃত্বের এবং সাধারণের সঙ্গে বিশেষের মিলনসাধনের নীতিগুলি প্রয়োগকালে তা সমাধানের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

৯। এখানে নেতৃত্ব প্রদানের পদ্ধতির খুঁটিনাটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি; এটা আশা করা হচ্ছে যে সমস্ত অঞ্চলের কমরেডরাই এ ব্যাপারে ভালভাবে চিন্তাভাবনা করবেন এবং এখানে উপস্থাপিত নীতিগুলির ভিত্তিতে তাঁদের আপন সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাবেন। সংগ্রাম যত বেশি কঠোর হবে তত বেশি করে কমিউনিস্টগণকে তাঁদের নেতৃত্বকে বিপুল জনগণের দাবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে তুলতে হবে এবং সাধারণ আহ্বানকে বিশেষ নির্দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে দিতে হবে যাতে করে বিষয়ীবাদী আত্মগত চিন্তা ও নেতৃত্বের আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ চুরমার করে দেওয়া সম্ভব

হয়। আমাদের পার্টির সকল নেতৃস্থানীয় কমরেডকে সব সময়ই বিষয়ীবাদী আত্মগত চিন্তা ও নেতৃত্বের আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক; মার্কসবাদী নেতৃত্বের পদ্ধতিকে এনে হাজির করতে হবে এবং পরবর্তীটিকে কাজে লাগিয়ে পূর্ববর্তীটিকে দূর করে দিতে হবে। বিষয়ীবাদীরা ও আমলাতান্ত্রিকেরা নেতৃত্বকে জনগণের সঙ্গে এবং সাধারণকে বিশেষের সঙ্গে যুক্ত করার নীতিগুলি উপলব্ধি করতে পারেন না; তাঁরা পার্টির কাজ নিদারুণভাবে প্রতিহত করেন। বিষয়ীবাদী ও আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্য ব্যাপক ও গভীরভাবে এই দুইদিক থেকেই নেতৃত্বের বৈজ্ঞানিক, মার্কসবাদী পদ্ধতিগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য।

টীকা

১। জে ভি. স্তালিন: 'জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির সাফল্যের সম্ভাবনা এবং বলশেভিকীকরণের প্রশ্ন', **রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৫৫ পৃঃ ৪৬ দেখুন।

২। জর্জি ডিমিট্রভ: 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর 'ঐক্য' **নির্বাচিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী**, ইংরাজী সংস্করণ লরেন্স এ্যাণ্ড উইসার্ট, লণ্ডন, ১৯৫১, পৃঃ ১৩৮-৩৯ দেখুন।

কুওমিনতাঙ-এর কাছে কয়েকটি সুস্পষ্ট প্রশ্ন

১২ই জুলাই, ১৯৪৩

গত ক'মাস ধরে চীনের জাপ-বিরোধী শিবিরের মধ্যে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও পীড়াদায়ক একটি ব্যাপার দেখা যাচ্ছে, তা হচ্ছে, বহু কুওমিনতাঙ পরিচালিত পার্টি, সরকার ও সৈনিকদের সংগঠন প্রতিরোধ-যুদ্ধের ক্ষতিসাধন করা ও ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য একটি অভিযান শুরু করে দিয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসেবে তা দেখা দিলেও আসলে তা সমগ্র চীনা জাতি ও জনগণের বিরুদ্ধেই পরিচালিত।

প্রথমে কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীগুলির কথা ভেবে দেখুন। সারা দেশের কুওমিনতাঙ পরিচালিত সেনাদলের মধ্য থেকে মূলবাহিনীর তিন তিনটি গ্রুপ সেনাবাহিনীকে উত্তর-পশ্চিমে রাখা হয়েছে—৩৪, ৩৭, এবং ৩৮ নম্বর গ্রুপ সেনাবাহিনীর সব কটিকেই অষ্টম যুদ্ধ এলাকার সহকারী প্রধান সেনাপতি হু সুং-নানএর পরিচালনাধীনে রাখা হয়েছে। তার মধ্য থেকে দুটিকে ব্যবহার করা হয়েছে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল অবরোধ করার জন্য এবং শুধু একটিকে পীত নদী বরাবর—য়িচুয়ান থেকে তুঙকুয়ান পর্যন্ত জাপানী আক্রমণ-কারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত রাখা হয়েছে। আজ চার বছরের অধিককাল ধরে এই অবস্থাটি চলছে এবং যতদিন সামরিক সংঘর্ষ দেখা দেয়নি ততদিন জনগণ এটাকে গা-সহা করেই নিয়েছিল। কিন্তু গত কিছুদিনে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটে গেছে। নদী বরাবর প্রথম, ষোড়শ এবং নবতিতম যে সৈনিকের বাহিনীগুলি প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছে—তার মধ্য থেকে দুটিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে—প্রথম আর্মি কোরকে পিন্‌চাও ও চুনহুয়া অঞ্চলে এবং নবতিতম কোরকে লোচুয়ান অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে এবং এই দুটি কোরই সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণের জন্য জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে অথচ জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে নদীতীরবর্তী প্রতিরক্ষার বৃহত্তর অংশই অরক্ষিত হয়ে পড়ে রয়েছে।

ইয়েনানের **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকার জন্য এই সম্পাদকীয়টি কমরেড মাও সে-তুঙ লিখেছিলেন।

এ দেখে অনিবার্যভাবে জনসাধারণ জিজ্ঞেস করছেন : এইসব কুওমিনতাঙ লোকজন ও জাপানীদের মধ্যেকার আসল সম্পর্কটি কী ?

দিনের পর দিন কুওমিনতাঙ-এর বহু লোক এই নির্লজ্জ প্রচার চালাচ্ছে-যে কমিউনিস্ট পার্টি 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করছে' ও 'ঐক্য বিনষ্ট করছে'। নদীর প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত মূলবাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেওয়াকে কী প্রতিরোধ-যুদ্ধ জোরদার করা বলা চলে ? সীমান্ত অঞ্চলে হামলা করাকে বলা যায় কী ঐক্য জোরদার করা ?

আমরা কুওমিনতাঙকে জিজ্ঞেস করতে চাই, এসব কারা করছে : জাপানীরা যখন এগিয়ে আসছে আপনারাই তো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সরে পড়ছেন। আপনাদের পেছনে যদি জাপানীরা এগিয়ে আসতে শুরু করে, তখন কী হবে ?

অন্য তীর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাপানীরা যখন সব দেখছে তখন নদীর প্রতিরক্ষার বিরাট অংশ পরিত্যাগ করে আপনাদের চলে আসার অর্থ কী ? আপনাদের ক্রমশঃ অপসৃয়মান পৃষ্ঠদেশ ফিল্ডগ্লাস দিয়ে দর্শন করে পরম পুলকিত হওয়া ছাড়া তারা আর কী করতে পারে ? আপনাদের পৃষ্ঠদেশ দর্শনের জন্য জাপানীদের এমন পুলকের কারণটা কী ? এবং নদীর প্রতিরক্ষাকে প্রত্যাহার করার এবং বিরাট অঞ্চল অরক্ষিত রেখে চলে আসার পর আপনাদেরই বা এমন পরম নিশ্চিত বোধ করার কারণ কী ?

ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটা সমাজে মানুষজন রাতে ঘুমোতে যাবার আগে দরজার খিল দেন। সকলেই জানেন এটা একটা অনর্থক খেয়াল নয়, এটা হচ্ছে চোরদের বিরুদ্ধে সতর্কতার ব্যবস্থা। এখন এই যে আপনারা সদর দরজা হা করে খোলা রেখে এলেন, চোররা আসবে এই ভয় আপনারা করেন না ? আর সদর দরজা এভাবে খোলা থাকলেও চোররা যদি না আসে, তবে তারই-বা কারণটা কী ?

আপনাদের মতে, চীনে কমিউনিস্টরাই 'প্রতিরোধ যুদ্ধের ক্ষতিসাধন করছে' আর আপনারাই পরম নিষ্ঠাভরে 'জাতিকে মাথায় করে রেখেছেন'। আচ্ছা, এই যে এখন আপনারা শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে আসছেন তখন কাকে আপনারা 'মাথায় করে রাখছেন ?'

আপনাদের মতে, এই কমিউনিস্টরাই 'ঐক্যকে বিনষ্ট করছে' এবং আপনারা পরম নিষ্ঠাভরে 'সর্বান্তঃকরণে ঐক্য রক্ষা করে চলেছেন'। আচ্ছা, এই যে

আপনারা (শুধু একটি আর্মি কোর বাদে) তিনটি গ্রুপ সেনাবাহিনীর বিশাল বহরকে সঙ্গীন উঁচিয়ে এবং ভারী গোলাগুলিসহ সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের বিরুদ্ধে পাঠালেন, এটাকে কি 'সর্বান্তঃকরণে ঐক্য রক্ষা' বলে গণ্য করা চলে ?

অথবা, আপনাদের আরেকটি জোর দাবিকেই ধরা যাক—আপনারা বলছেন আপনারা 'ঐক্যের' ব্যাপারে তত আগ্রহী নন, আপনারা চান 'ঐক্যবদ্ধ সংহতি' —তাই আপনারা চান সীমান্ত অঞ্চলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে, 'সামন্তসুলভ বিচ্ছিন্নতাকে' নিশ্চিহ্ন করে দিতে ও প্রতিটি কমিউনিস্টকেই শেষ করে দিতে। খুবই ভাল কথা ! কিন্তু এটা কি করে হয় যে জাপানীরা আপনাদের সহ চীনা জাতিটাকেই এমন 'ঐক্যবদ্ধ' করে দেবে যে তার অস্তিত্বের আর কোন চিহ্নই থাকবে না এ বিষয়ে তো আপনারা আদৌ ভীত নন ?

মনে করুন আপনারা এক ঝটকায় সীমন্ত অঞ্চলকে বিজয়গর্বে 'ঐক্যবদ্ধ' করে ছাড়লেন এবং কমিউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করে দিলেন, তখন কোন্ 'ঘুম-পাড়ানি দাওয়াই' দিয়ে বা কোন্ 'জাদু' দিয়ে জাপানীদের স্তব্ধ করে রাখবেন যাতে ওদের 'ঐক্যবদ্ধ' করার কবল থেকে জাতি এবং আপনাদের উভয়েই অব্যাহতি পাবেন ? কুওমিনতাঙ-এর প্রিয় ভদ্রমহোদয়বর্গ, আপনাদের ঐ ঘুমপাড়ানি দাওয়াই বা গোপন জাদুমন্ত্রটির একটু হদিস আমাদের দিন না কেন ?

কিন্তু জাপানীদের মোকাবিলা করার মতো কোন ঘুমপাড়ানি দাওয়াই বা জাদুমন্ত্র যদি কিছু আপনাদের না থাকে, যদি আপনারা ওদের সঙ্গে গোপন কোন সমঝওতায় না এসে থাকেন তবে আপনাদের খোলাখুলি ও আনুষ্ঠানিক-ভাবে আমরা বলে দিতে চাই : সীমান্ত অঞ্চলকে আপনারা আক্রমণ করবেন না, ওটা করা উচিত কাজ হবে না। 'একে অন্যে যখন লড়াই চলবে তখন আসল শত্রুরই সুবিধা হবে', 'একজন যখন আরেকজনকে কাঠি দেবে, তখন আসল শত্রুই মজা লুটতে আসবে'—পৌরাণিক উপকথায় এমন অনেক শিক্ষণীয় নজীর রয়েছে। আপনাদের পক্ষে উচিত কাজ হবে আমাদের সঙ্গে এক হয়ে জাপানী অধিকৃত অঞ্চলকে 'ঐক্যবদ্ধ' করা ও দস্যুদের বিতাড়িত করে দেওয়া। সীমান্ত অঞ্চলের এই জায়গাটুকুকে 'ঐক্যবদ্ধ' করার জন্য আপনাদের উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততার কারণটা কী ? আমাদের এই সুন্দর দেশের বিরাট অঞ্চল আজ শত্রুর কবলিত, এ ব্যাপারে আপনাদের কোন উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততা দেখছি না, বরং উল্টে সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণের ব্যাপারে আপনারা উদগ্রীব

এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে ধ্বংস করার ব্যাপারেই আপনারা ব্যস্ত। কী দুঃখের কথা! কী লজ্জার কথা!

তারপর কুওমিনতাঙ পার্টির কথাই ধরুন। কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য কুওমিনতাঙ গুপ্তচরদের বহুশত বাহিনী গড়ে তুলেছে আর তাতে এনে জড়ো করছে যত রাজ্যের বদমায়েশদের। উদাহরণ হিসেবে, ১৯৪৩ সালের ৬ই জুলাই চীন সাধারণতন্ত্রের ৩২তম বর্ষের এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধের ষষ্ঠ বার্ষিকীর প্রাক্কালে কুওমিনতাঙ সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সি এই মর্মে একটি সংবাদ প্রচার করে যে শেনসি প্রদেশের সিয়ানে কয়েকটি 'সাংস্কৃতিক সংগঠন' একটি সভা করেছে এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে 'ভেঙে' দেওয়া হোক এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা-বাদী সীমান্ত অঞ্চলের সরকারকে গুটিয়ে ফেলা হোক' এই মর্মে মাও সে-তুঙ-এর কাছে একটি তারবার্তা প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাঠকের কাছে এটাকে একটা 'সংবাদ' বলে মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তা সেই একই পুরাতন কাহিনী।

দেখা যাচ্ছে, গোটা ব্যাপারটা হচ্ছে সেই কয়েকশ গুপ্ত গোয়েন্দাচক্রের একটিরই কীর্তি। সদর দপ্তরের (অর্থাৎ 'জাতীয় সরকারের মিলিটারী কাউন্সিলের অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান ব্যুরো' এবং 'কুওমিনতাঙ এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর) আদেশ অনুসারে এই বাহিনীটি ট্রটস্কিপন্থী ও বিশ্বাসঘাতক যে চ্যাং তি-ফেই এখন সিয়ান-এর বন্দী শিবিরের পরিচালক হিসেবে কাজ করছে এবং **প্রতিরোধ ও সংস্কৃতি** নামক কুওমিনতাঙ-এর অর্থে পরিচালিত বিশ্বাসঘাতক সাময়িকপত্রে তার কমিউনিস্ট-বিরোধী লেখার জন্য কুখ্যাত, তার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছে; ১২ই জুন তারিখে অর্থাৎ সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সি কর্তৃক সংবাদটি প্রচার করার পঁচিশ দিন আগে এই লোকটি গোটা নয়জন লোককে দশ মিনিটের এক সভায় জড়ো করে এবং এই তথাকথিত তারবার্তার বয়ানটিকে 'অনুমোদন' করিয়ে নেয়।

আজ পর্যন্ত ইয়েনানে এই তারবার্তা এসে পৌছায়নি কিন্তু তার বিষয়বস্তু তো খুবই পরিষ্কার। আমাদের যা জানানো হচ্ছে, তাতে বলা হয়েছে যেহেতু তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দেওয়া হয়েছে তাই কমিউনিস্ট পার্টিকেও একই-ভাবে 'ভেঙে দেওয়া' হোক, 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হতমান হয়ে পড়েছে' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই হচ্ছে মোদ্দা কথাটি। এ ধরনে কথাই কুওমিনতাঙ বলে বেড়াচ্ছে! এ ধরনের কুওমিনতাঙ জীবদের মুখ থেকে যা-তা কিছু বের হতে পারে এটা আমরা সব সময়ই জানি (আর রতনই তো রতনকে চেনে!) এবং ঠিকভাবেই তারা এখন এই বদ বায়ু ছেড়েছে!

চীনে এখন বহু রাজনৈতিক দল রয়েছে—এমনকি কুওমিনতাঙই দুটি রয়েছে। একটি হচ্ছে ওয়াং চিং-ওয়েই-মার্কা নানকিং-এ অবস্থিত কুওমিনতাঙ, আর অন্যত্র রয়েছে সেই একই নীল আকাশের পটভূমিতে শ্বেতবর্ণ সূর্য খচিত পতাকা, তথাকথিত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এবং গোপন গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনীর একটি দঙ্গল। আর তাছাড়া জাপানের অধিকৃত এলাকায় রয়েছে তাদের সৃষ্ট ফ্যাসিষ্ট পার্টিগুলি।

কুওমিনতাঙ-এর হে প্রিয় ভদ্রমহোদয়বৃন্দ! তৃতীয় আন্তর্জাতিকের 'বিলুপ্তির' পর আপনারা যে এমন সাংঘাতিক ব্যস্ত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে 'বিলুপ্ত করে দেওয়ার' ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছেন, কিন্তু কৈ, আপনারা তো ঐ বিশ্বাসঘাতকদের কটি পার্টির বা জাপানের উদ্যোগে তৈরী ঐ পার্টিগুলোর বিলুপ্তির ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উচ্চবাচ্যও করছেন না? আপনারা যখন চ্যাং তি-ফেইকে তারবার্তাটির খসড়া তৈরী করতে নির্দেশ দিলেন, কৈ তখন তো কমিউনিস্ট পার্টির বিলুপ্তি দাবি করা ছাড়া আপনারা ঘুণাক্ষরেও ঐ বিশ্বাস-ঘাতক পার্টিগুলি বা জাপানের উদ্যোগে তৈরী পার্টিগুলোর বিলুপ্তি দাবি করলেন না?

এটা কি সম্ভব যে আপনারা মনে করেন একটি কমিউনিস্ট পার্টিই বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে? সারা চীনে কমিউনিস্ট পার্টি তো একটিই রয়েছে, অন্যদিকে দু-দুটি কুওমিনতাঙ পার্টি রয়েছে। তাহলে কোন্ পার্টিটি একটি থাকলেই এতো বেশি হয়ে যাচ্ছে?

হে কুওমিনতাঙ ভদ্রমহোদয়বৃন্দ! আপনারা কি কোন সময় নিম্নলিখিত বিষয়টি একটুও ভেবে দেখেছেন? আপনাদের ছাড়াও কোন জাপানীরা এবং ওয়াং চিং-ওয়েই এই উভয়ই কমিউনিস্ট পার্টিকে উৎখাত করে দেওয়ার জন্য এমন উন্মত্ত প্রয়াস চালাচ্ছে, বলে বেড়াচ্ছে একটা কমিউনিস্ট পার্টিই বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেই হবে? অথচ কী করে তারা এটা মনে করতে পারছে যে কুওমিনতাঙ বড় বেশি হয়ে যায়নি, এবং যতটি কুওমিনতাঙই হোক তা কোনদিনই বেশি হয়ে যাবে না এবং সব

জায়গাতেই তারা ওয়াং চিং-ওয়েই-মার্কা কুওমিনতাঙকে সাজিয়ে রাখছে ও লালনপালন করছে ?

হে কুওমিনতাঙ ভদ্রমহোদয়বৃন্দ ! এটা বলতে আমাদের কোন দ্বিধা নেই যে কুওমিনতাঙ-এর এবং তিন গণ-নীতির প্রতি জাপান ও ওয়াং চিং-ওয়েই-এর বিশেষ একটা প্রীতি রয়েছে কেননা তারা মনে করে এই দুটিকেই তারা ভালভাবে কাজে লাগাতে পারবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে একটা সময়েই শুধু কুওমিনতাঙ-এর প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ও বিশ্বাসঘাতকদের কোন প্রীতি ছিল না এবং ভীষণ তিক্ততা নিয়ে তারা তাকে ঘৃণা করত এবং তাকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার জন্য তারা তাদের সাধ্যমতো চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে, এটা ছিল ১৯২৪-২৭ সালে যখন ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন তাকে পুনর্গঠিত করে কমিউনিস্টদের তার সদস্যপদভুক্ত করেছিলেন এবং তা যখন কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্টদের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে পরিণত হয়ে উঠেছিল একটি জাতীয় মৈত্রীতে। একমাত্র একটা সময়েই শুধু সাম্রাজ্যবাদী ও বিশ্বাসঘাতকেরা তিন গণ-নীতি সম্পর্কে কোন প্রীতির ভাব পোষণ করত না এবং ভীষণ তিক্ততা নিয়ে ঐ নীতিগুলিকে ঘৃণা করত এবং ঐগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে সেটাও ছিল সেই একই সময়ে যখন ঐ মূলনীতিগুলিকে রূপান্তরিত করে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন সেগুলিকে বিপ্লবী তিন গণ-নীতি হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন এবং কুওমিনতাঙ-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারে তাকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। ঐ সময়টির কথা ছেড়ে দিলে কুওমিনতাঙ যা করেছে তা হচ্ছে কমিউনিস্টদের বিতাড়িত করা এবং তিন গণ-নীতি থেকে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের প্রদত্ত বিপ্লবী মর্মবস্তুকে ঝেড়ে দূর করে দেওয়া এবং এই দুটিই তাই এখন তাবৎ সাম্রাজ্যবাদী ও বিশ্বাসঘাতকদের প্রীতিলাভে ধন্য হয়েছে আর ঠিক একই কারণে তা জাপানী ফ্যাসিষ্টগণ ও ওয়াং চিং-ওয়েই-এর প্রীতিলাভ করেছে এবং ওরা আজ এইগুলিকে মহামূল্য সম্পদজ্ঞানে সাজিয়ে রাখছে এবং লালনপালন করছে। ওয়াং চিং-ওয়েই-মার্কা কুওমিনতাঙ-এর পতাকার ওপরের বাঁদিকে খানিকটা হলুদ অংশ রাখা হয়েছিল অন্য কুওমিনতাঙ-এর থেকে তাদের পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু এখন ঐটুকুও সরিয়ে ফেলা হয়েছে নয়নাভিরাম করে তোলার জন্য এবং এখন দুটিই দেখতে একেবারে পুরোপুরি এক হয়ে উঠেছে। কী প্রচণ্ড প্রীতির বাহার !

ওয়াং চিং-ওয়েই-মার্কা কুওমিনতাঙ পদার্থগুলি জাপানের অধিকৃত এলাকা-সমূহে ও তার পশ্চাদ্বর্তী সেই বিরাট অঞ্চলে ভুরিভুরি রয়েছে। শত্রুর পঞ্চম বাহিনীরূপে গোপনে তারা কেউ কেউ ছদ্মবেশ ধরে রয়েছে। অন্যরা প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের দানাপানির জন্য কুওমিনতাঙ-এর ওপরই ভরসা করে রয়েছে বা পুলিশের চর হিসেবে কাজকেই তারা তাদের জীবিকা করেছে কিন্তু জাপানের প্রতিরোধের জন্য কিছুই করছে না, শুধু কমিউনিস্ট বিরোধিতার ব্যাপারে নিজেদের রপ্ত করে তুলছে। যদিও ওয়াং চিং-ওয়েই-এর মার্কাটি ওদের গায়ে সাঁটা নেই তবু ঐ লোকগুলি আসলে ওরই আপনজন। এরাও শত্রুরই পঞ্চমবাহিনী, শুধু এদের ছদ্মবেশটা খানিকটা অন্য রকমের, তাদের স্বরূপটা ঢেকে রাখার জন্য এবং জনগণকে বোকা বানাবার জন্য।

সমস্ত ব্যাপারটা এখন নিতান্ত পরিষ্কার। যখন আপনারা চ্যাং তি-ফেইকে কমিউনিস্ট পার্টিকে 'ভেঙে দেওয়ার' দাবি জানিয়ে তারবার্তার খসড়া বয়ানটি রচনা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন কোন পরিস্থিতির কারণেই যে জাপানের উদ্যোগে তৈরী করা ও বিশ্বাসঘাতক পার্টিগুলিকে ভেঙে দেওয়ার দাবি জানাতে পারলেন না তার কারণ হচ্ছে আদর্শগত, নীতি ও সংগঠনগত দিক থেকে ওদের সঙ্গে আপনাদের অনেক মিল রয়েছে, আপনাদের সাধারণ মতাদর্শের মৌলিক দিকই হচ্ছে কমিউনিজম-বিরোধিতা ও জনগণ-বিরোধিতা।

আপনাদের কুওমিনতাঙ-এর লোকজনদের, আমরা আরও একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। এটাই কি সত্য কথা যে চীনে তথা সারা দুনিয়ায় একমাত্র 'ভুতমান, মতবাদটি হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং আর সবগুলিই হচ্ছে পরম বরণীয় বস্তু? ওয়াং চিং-ওয়েই-মার্কা যে তিন গণ-নীতির কথা আমরা বলেছি তাকে ছেড়ে দিয়ে হিটলারের, মুসোলিনীর ও হিদেকি তোজোর ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্যটি কী? চ্যাং তি-ফেই-এর ট্রট্স্কিবাদ সম্পর্কে আপনাদের কী বক্তব্য? চীনের নানা ধরনের প্রতিবিপ্লবী গোপন গোয়েন্দা চক্রের মতবাদ সম্পর্কেই-বা আপনাদের বক্তব্য কী?

কুওমিনতাও-এর হে প্রিয় ভদ্রমহোদয়বৃন্দ! আপনারা যখন চ্যাং তি-ফেইকে তারবার্তাটির খসড়া প্রণয়নের নির্দেশ দিলেন তখন এই যেসব তথাকথিত মতবাদগুলি প্লেগ বা ছারপোকা বা কুকুরের বিষ্ঠার মতোই খাসা চীজ তাদের ব্যাপারে আপনারা তো একটি কথা বা একটি বিধানও

দিলেন না? এটাই কি তাহলে সম্ভবপর যে আপনাদের দৃষ্টিতে প্রতিবিপ্লবী এই সকল আবর্জনারাশিই ত্রুটিমুক্ত ও নিখুঁত এবং একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদই সম্পূর্ণতঃ হতমান?

খোলাখুলি বলে দেওয়াই ভাল যে আমাদের গভীর সন্দেহ হচ্ছে আপনারা জাপানীদের সৃষ্ট ও বিশ্বাসঘাতক ঐ দলগুলির সঙ্গে যোগসাজসেই কাজ করছেন এবং তারই জন্য আপনারা ও তারা 'একই নাকে নিঃশ্বাস ফেলছেন' এবং তারই জন্য আপনাদের ও ঐ বিশ্বাসঘাতকদের এমন চমৎকার মিল, এবং কার্যতঃ আপনাদের কথায় ও কাজে এমন হুবহু অভিন্নতা ও এমন সুন্দর ঐকতান। জাপানীরা ও বিশ্বাসঘাতকেরা নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হোক—এটা দাবি করেছিল এবং আপনারা তাকে ভেঙে দেওয়ার আদেশ দিলেন; তারা চায় কমিউনিস্ট পার্টিকে ভেঙে দেওয়া হোক এবং আপনারাও তা-ই চান; তারা চায় সীমান্ত অঞ্চল তুলে নেওয়া হোক এবং আপনারাও তা-ই চান; তারা চায় না যে আপনারা পীত নদী বরাবর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বজায় রাখুন এবং আপনারাও তাই ঐ প্রতিরক্ষাকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন; তারা সীমান্ত অঞ্চলকে আক্রমণ করছে (গত ছয় বছর ধরে শত্রুসৈন্যরা নদীর তীর জুড়ে সুইতে, মিচি, চিয়াশিয়েন, উপাও ও চিংচিয়েন জেলার ওপর অঞ্চল থেকে অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর নদী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করে অবিরাম গোলাবর্ষণ করে চলেছে) এবং আপনারাও তা-ই করতে চাইছেন, তারা কমিউনিস্ট-বিরোধী, আপনারাও তাই, তারা প্রাণপণে কমিউনিজমের ও উদারনৈতিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে, আপনারাও তা-ই করছেন; যখনই তারা একজন কমিউনিস্টকে পাকড়াও করে তারা তাকে বাধ্য করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে উল্টোপাল্টা বলতে, আপনারাও তাই করেন; তারা প্রতিবিপ্লবী চরদের গোপনে বিভেদ সৃষ্টির কুমতলব নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়তে পাঠায়, আপনারাও তাই করেন। এটা কি করে হয় যে আপনারা ও তারা হুবহু ঠিক একই রকমের এবং এমন চমৎকার অভিন্ন? আপনারা এবং শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকেরা যেহেতু হুবহু ঠিক একই রকমের, বহুদিক থেকে কথায় ও কাজে এমন একান্ত অভিন্ন, তাই আপনারা যে ওদের সঙ্গে হরিহর আত্মা হয়ে কাজ করছেন এবং তাদের সঙ্গে গোপন একটা সমঝওতায় উপনীত হয়েছেন—জনসাধারণ কি

এই সন্দেহ পোষণ না করে পারেন ?

এখানে আমরা কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের কাছে এই আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি : নদীর প্রতিরক্ষার মূলবাহিনীগুলিকে প্রত্যাহার করে নিয়ে সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণের প্রস্তুতি করা এবং গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অনুমোদনের একান্ত অযোগ্য। ৬ই জুলাই আপনাদের সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সির তরফ থেকে ঐক্যের পক্ষে হানিকর ও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে অপমানজনক সংবাদ প্রকাশ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অনুমোদনের একান্ত অযোগ্য। এই দুটি ভুল পর্বতপ্রমাণ অপরাধ, শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকদের সম্পাদিত অপরাধের সঙ্গে তা সম্পূর্ণ অভিন্ন। এগুলি আপনাদের শুধরে নিতে হবেই।

কুওমিনতাঙ-এর ডাইরেক্টার-জেনারেল মিঃ চিয়াং কাই-শেকের কাছে আমরা এই আনুষ্ঠানিক দাবি জানাচ্ছি : হু সুং-নান-এর সৈন্যবাহিনীকে নদীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ফিরে আসতে নির্দেশ দিন, সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সিকে পথে নিয়ে আসুন এবং বিশ্বাসঘাতক চ্যাং তি-ফেইকে শাস্তি দান করুন।

কুওমিনতাঙ-এর দেশপ্রেমিক যে সদস্যবৃন্দ নদীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করাকে সমর্থন করেন না এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে ভেঙে দেওয়ার দাবি অনুমোদন করেন না তাঁদের প্রতি আমরা আবেদন জানাচ্ছি : গৃহযুদ্ধের সংকট পরিহার করার জন্য এখনই আপনারা তৎপর হোন। জাতিকে রক্ষা করার জন্য আমরা শেষ পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছি।

আমরা বিশ্বাস করি, এই দাবিগুলি একান্তই ন্যায়সঙ্গত।

ঘাঁটি অঞ্চলসমূহে খাজনা হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং 'সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে সাহায্য করার' অভিযানকে প্রসারিত করুন

১লা অক্টোবর, ১৯৪৩

১। শরৎকালীন ফসল কাটার সময় এসে গেছে, ঘাঁটি এলাকাসমূহের নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলি সর্বস্তরের পার্টি ও সরকারী সংগঠনগুলিকে খাজনা হ্রাস করার আমাদের নীতির প্রয়োগকে তদারক করতে বলুন। যেখানে যেখানে তা ঐকান্তিকতা সহকারে কার্যকর করা হয়নি এই বছর ব্যতিক্রমহীনভাবে সর্বত্র খাজনা হ্রাস করতে হবে। যেখানে যেখানে এই কাজটি আনুপূর্বিকভাবে করা হয়নি, এই বছর আনুপূর্বিকভাবে তা করা চাই। কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষিনীতি অনুসারে ও আঞ্চলিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পার্টি কমিটিগুলিকে অবিলম্বে নির্দেশ প্রদান করতে হবে এবং প্রথমেই কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করে ভাল দৃষ্টান্তগুলি তাদের সংগ্রহ করতে হবে এবং এভাবে অন্যান্য স্থানের কাজকে দ্রুততর করে তুলতে হবে। একই সঙ্গে পত্রিকাগুলিতে খাজনা হ্রাসের ব্যাপারে এবং ভাল দৃষ্টান্তগুলি সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করতে হবে। খাজনা হ্রাসের ব্যাপারটি যেহেতু কৃষকদেরই, একটি গণ-সংগ্রাম পার্টির নির্দেশ ও সরকারী আদেশগুলির মাধ্যমে জনগণের প্রতি হিতসাধনের প্রয়াস দেখানোর পরিবর্তে এই সংগ্রামকে পরিচালনা করা ও সাহায্য করাই লক্ষ্য হওয়া চাই। নিজেদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা অর্জনের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ না করে খাজনা হ্রাসকে হিতসাধনের প্রদর্শনী হিসেবে দেখা ভুল হবে এবং স্থায়ী কোন সুফল তাতে পাওয়া যাবে না। কৃষক সংগঠনগুলি গড়ে তুলতে হবে বা খাজনা হ্রাসের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেগুলিকে পুনর্গঠিত করে তুলতে হবে। সরকারের লক্ষ্য হবে নিশ্চয়তা সহকারে খাজনা হ্রাসের আদেশ কার্যকর করা এবং জমিদার ও চাষী প্রজাদের নানা স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। এখন যেহেতু ঘাঁটি এলাকাগুলির আয়তন হ্রাস পেয়েছে তাই গত ছয় বছরের

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি চীনের কামউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন।

যে কোন সময়ের চেয়ে পার্টির দিক থেকে জনসাধারণকে ধৈর্যশীলভাবে, সততার সঙ্গে ও আনুপূর্বিকভাবে কাজের মধ্য দিয়ে ও তাদের সুখদুঃখ সমভাবে ভাগ করে সপক্ষে নিয়ে আসা অনেক বেশি জরুরী কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শরৎকালে কর্মনীতিকে কতখানি এযাবৎ কার্যকর করা গেছে তা যদি আমরা যাচাই করে দেখি ও খাজনা হ্রাসের কর্তব্যকে আনুপূর্বিকভাবে সম্পাদন করতে পারি তাহলে আমার কৃষকজনগণের উদ্যোগকে বিকশিত করে তুলতে পারব এবং আগামী বছরে শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলতে ও উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযানে উৎসাহ যোগাতে আমরা সমর্থ হব।

২। শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্বর্তী ঘাঁটি অঞ্চলে অধিকাংশ কমরেডই কিভাবে পার্টি ও সরকারী সংগঠনের জন্য, সেনাবাহিনীর জন্য ও ব্যাপকভাবে উৎপাদনের কাজ চালাবার জন্য লোক সংগ্রহ করতে হয় তা জানেন না (এসবের মধ্যে নরনারী, যুবক-বৃদ্ধ, সৈনিক ও অসামরিক ব্যক্তিদের নিয়োগ এবং রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমূহে লোক নিয়োগের কথাও ধরা হয়েছে)। বর্তমান শরৎ ও শীতকালে প্রতিটি ঘাঁটি অঞ্চলে পার্টি কমিটি, সরকার ও সেনাবাহিনীকে আগামী বছর একটি বিরাট অঞ্চলভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযান, যৌথ ও ব্যক্তিগত খামার, শিল্প, হস্তশিল্প, যানবাহন, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে কৃষির ওপর প্রধান জোর দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযান শুরু করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই অভিযান চালাতে হবে বাধাবিপত্তিগুলিকে নিজেদের চেষ্টায় দূর করার মনোভাব নিয়ে (শেনসি-কানসু- নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল ছাড়া 'যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য ও কাপড়ের ব্যবস্থা চাই' এই শ্লোগান অন্যত্র তোলা হবে না)। প্রতিটি পরিবারকে ভিত্তি করে পরিকল্পনা রচনা করতে হবে ও শ্রমের ব্যাপারে পারস্পরিক সাহায্যের আয়োজন করতে হবে (এই পারস্পরিক সাহায্যদানকারী ব্যবস্থা উত্তর শেনসিতে শ্রম-বিনিময় দল বলে পরিচিত এবং অতীতের কিয়াংসির লাল অঞ্চলসমূহে একসময়ে তা পরিচিত ছিল চাষ করার দল অথবা পারস্পরিক-সাহার্য্যের কার্যকরী দল হিসেবে), শ্রমবীরদের পুরস্কৃত করতে হবে, উৎপাদন বৃদ্ধির আদর্শকে প্রশংসাযোগ্য অনুকরণীয় করে তুলতে হবে এবং জনগণের সেবায় নিযুক্ত সমবায়গুলির অগ্রগতি সাধন করতে হবে। আর্থিক এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অঞ্চল ও জেলা স্তরে পার্টি ও সরকারি ব্যক্তিদের তাঁদের দশ ভাগের নয় ভাগ শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদের

সাহায্য করার কাজে এবং শুধু দশ ভাগের এক ভাগ শক্তি কাজে লাগাতে হবে কর সংগ্রহের ব্যাপার। প্রথম কর্তব্যে যদি সকল শক্তি নিয়োজিত হয়, তবে দ্বিতীয়টি অনেক সহজ হয়ে যাবে। বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সমস্ত সংগঠন, বিদ্যালয় ও সেনাবাহিনীর সকল ইউনিটকে একান্তভাবে চেষ্টা করে যেতে হবে তরিতরকারি উৎপাদন, শূকর পালন, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, কাঠকয়লা তৈরী, হস্তশিল্প প্রসার এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় শস্যের অন্তত: একটি অংশ উৎপাদন করার কাজে। সকল ইউনিটে যৌথ উৎপাদনের প্রসার ছাড়াও ছোট বা বড় প্রতিটি ইউনিট, (সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়া) প্রতিটি ব্যক্তিকে উৎসাহিত করতে হবে কোন-না কোন অবসর সময়ের কৃষি বা হস্তশিল্পের কাজ করতে (কিন্তু ব্যবসায়িক কাজে নয়), এই কাজ থেকে প্রাপ্ত অর্থ তিনি নিজের জন্যই রাখতে পারবেন। তরিতরকারি উৎপাদন, শূকর পালন ও পাচকদের অধিকতর ভাল খাদ্য প্রস্তুতের ব্যাপারে সাত থেকে দশ দিনের শিক্ষাক্রমের প্রচলন করতে হবে। সকল পার্টি, সরকার ও সেনা সংগঠনে মিতব্যয়িতার ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে, অপব্যয় রোধ করতে হবে এবং দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। সকল স্তরে পার্টি, সরকার ও সৈনিক সংগঠনের এবং বিদ্যালয়সমূহের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা জনগণকে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকলপ্রকার দক্ষতা অর্জনে তৎপর হবেন। উৎপাদনের ব্যাপার যদি কেউ সতর্কতার সঙ্গে অধ্যয়ন্ না করেন তবে তাঁকে একজন ভাল নেতা বলে গণ্য করা চলে না। উৎপাদনের ব্যাপারে যদি কোন সৈনিক বা অসামরিক ব্যক্তি দায়িত্বশীল মনোভাবসম্পন্ন না হয়, যে শুধু খেতেই ভালবাসে কিন্তু কাজ করতে চায় না তাকে একজন ভাল সৈনিক বা ভাল নাগরিক বলে গণ্য করা চলে না গ্রামের যে পার্টি-সদস্যদের উৎপাদনের কাজ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়নি, তাঁদের বুঝতে হবে জনগণের মধ্যে একজন আদর্শ কর্মী হতে হলে তাঁদের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে ভালভাবে কাজ করতে হবে। উৎপাদন অভিযানে রক্ষণশীল বা নিছক আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে শুধু রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা কিন্তু অর্থনৈতিক বিকাশকে অবহেলা করা ভুল হবে। মুষ্টিমেয় একদল সরকারী কর্মচারী শস্য ও কর সংগ্রহ, তহবিল ও খাদ্য সংগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে এবং পার্টি, সরকার ও সেনাবাহিনীর সাধারণ সদস্যদের এবং জনগণের বিপুল শ্রমশক্তিকে একটি

ব্যাপক গণ-উৎপাদন অভিযান সংগঠনের কাজে লাগাতে অবহেলা করলে ভুল করা হবে। জনসাধারণের কাছ থেকে (কুওমিনতাঙ-এর মতো) শুধু শস্য ও অর্থ দাবি করা অথচ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে তাদের সাহায্য করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ না করা ভুল হবে। মাত্র কয়েকটি অর্থনৈতিক দপ্তর ক্ষুদ্র সংখ্যক লোক নিয়ে উৎপাদনের জন্য কাজে লিপ্ত রইলেন অথচ উৎপাদনের জন্য ব্যাপক গণ-অভিযান শুরু করার কাজকে অবহেলা করলেন—এটি ভুল হবে। গ্রামাঞ্চলে নিজেদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য কমিউনিস্টদের পক্ষে পারিবারিক উৎপাদনকার্যে লিপ্ত হওয়া অমর্যাদাকর বা স্বার্থপরতার কাজ হবে এ কথা মনে করা বা সরকারী সংগঠন ও বিদ্যালয়ে নিযুক্ত কমিউ-নিস্টদের পক্ষে অবসরকালীন সময় ব্যক্তিগত উৎপাদনের কাজে লাগিয়ে তাদের নিজেদের জীবিকার অবস্থার উন্নতিসাধনের প্রয়াস অমর্যাদাকর বা স্বার্থপরতার কাজ হবে এ কথা মনে করা ভুল হবে কারণ ঐসব কাজই বিপ্লবী লক্ষ্যের স্বার্থের পক্ষে সহায়ক। ঘাঁটি অঞ্চলের জনগণকে শুধু তীব্র-তিক্ত সংগ্রামের পথে দুঃখকষ্ট সহ্য করার আহ্বান জানানো অথচ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে ও তাদের বৈষয়িক পরিস্থিতির উন্নতিবিধানের ব্যাপারে প্রচেষ্টা করতে তাদের উৎসাহিত না করা ভুল হবে। সমবায়গুলিকে নিছক মুষ্টিমেয় কিছু সংশ্লিষ্ট কর্মীর হিতসাধনের জন্য অর্থ রোজগারের প্রতিষ্ঠানমাত্র বা সরকার পরিচালিত বিক্রয়কেন্দ্র হিসেবে মনে করা এবং ঐগুলিকে জন-সাধারণ কর্তৃক জনসাধারণের স্বার্থে পরিচালিত অর্থনৈতিক সংগঠন হিসেবে না দেখা ভুল হবে। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে কাজের ক্ষেত্রে অনুকরণযোগ্য আদর্শ স্থাপনের যে পদ্ধতি (যেমন, শ্রমের ব্যাপারে পার-স্পরিক সাহায্য, পৌনঃপৌনিক চাষ, ঘন ঘন আগাছা বাছাই এবং প্রচুর সারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি) কিছু কিছু কৃষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমবীরেরা কার্য-ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন তার প্রবর্তন এই অজুহাতে না করা যে কিছু কিছু ঘাঁটি এলাকায় এই পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা যাবে না—এই যুক্তিটি দেখানো ভুল হবে। উৎপাদন অভিযানের ব্যাপারে অর্থনৈতিক বিকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত আঞ্চলিক দপ্তরের প্রধানদের হাতে এবং সামরিক সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত প্রধানদের বা সরকার ও অন্যান্য সংস্থার প্রশাসনিক প্রধানদের হাতে সব ছেড়ে দেওয়া এবং নেতৃস্থানীয় কর্মীরা যাতে নিজেরা দায়িত্ব নিতে পারেন, ব্যক্তিগতভাবে কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন, জনগণের সঙ্গে

নেতৃস্থানীয় গ্রুপগুলি যাতে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করতে পারেন, সাধারণ আহ্বানকে বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন, অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের আয়োজন করতে পারেন, যা জরুরী প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ তার প্রতি প্রাধান্য দিতে পারেন, নরনারী, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে, এমনকি অলস বাউণ্ডুলেগণসহ প্রতিটি ব্যক্তিকে উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারেন এবং কর্মীদের সুশিক্ষিত এবং জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে পারেন তার ব্যবস্থা না করা ভুল হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমশক্তিকে সংগঠিত করাই হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধির মূল সমস্যা। প্রতিটি ঘাঁটি অঞ্চলে, বর্তমানের এই যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও পার্টি, সরকারী অফিসসমূহের এবং সেনাবাহিনীর হাজার হাজার নরনারীরা ও লক্ষ লক্ষ জনগণের শ্রমশক্তিকে উৎপাদনের কাজে লাগানো (অর্থাৎ স্বেচ্ছামূলক শ্রমের ভিত্তিতে যে সমস্ত মানুষ আংশিক বা পুরো সময় শ্রম করতে সমর্থ এমন প্রতিটি মানুষকে পরিবারভিত্তিক পরিকল্পনার পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রম-বিনিময় টীম, যানবাহনের টীম, পারস্পরিক সাহায্যকারী কার্যকরী শ্রমকারীদের গ্রুপ বা সমবায় গড়ে তোলা এবং সমমূল্যের বিনিময়ের নীতি অনুসরণ করে) তাদের শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব এবং একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। শ্রমশক্তিকে সংগঠিত করার সবকটি মূলনীতি ও পদ্ধতিকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের পুরোপুরি আয়ত্ত করতে হবে। সমস্ত ঘাঁটি অঞ্চলে এই বছর খাজনা হ্রাস সর্বত্র এবং পুরোপুরি কার্যকর করা হলে আগামী বছরের উৎপাদনকে তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির প্রেরণা জোগাবে। এবং আগামী বছর পার্টি ও সরকার, সৈনিক ও অসামরিক নরনারী ও যুবক-বৃদ্ধ সকলে মিলে যে বিরাট উৎপাদন অভিযান গড়ে তুলবেন, শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে প্রস্তুতির যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলবেন তা জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে যোগান অব্যাহত রাখার বৈষয়িক ভিত্তিই গড়ে তুলবে। অন্যথায় আমরা অত্যন্ত গুরুতর বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হব।

৩। আগামী বছরের জাপ-বিরোধী সংগ্রামে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযানে পার্টি, সরকার ও সেনাবাহিনীকে ব্যাপক জনগণের সঙ্গে এক করে তোলার জন্য প্রতিটি ঘাঁটি অঞ্চলেই পার্টি কমিটি ও নেতৃস্থানীয় সৈনিক ও সরকারী সংস্থাসমূহকে একটি ব্যাপক আকারের গণ-অভিযান আগামী চান্দ্র

বছরের প্রথম মাসে শুরু করতে হবে 'সরকারের সমর্থন ও জনগণকে সহায়তা-দানের জন্য' 'সেনাবাহিনীকে সমর্থন ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকদের পরিবার-পরিজনকে বেশি করে সুবিধাদানের জন্য'। সৈন্যবাহিনী-সমূহকে প্রকাশ্যে নতুন করে 'সরকারকে সমর্থন ও জনগণকে সহায়তাদানের' প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে, আত্মসমালোচনার জন্য সভা করতে হবে, আঞ্চলিক মানুষদের সঙ্গে বৈঠকসভায় মিলিত হতে হবে (যেসব সভার আঞ্চলিক পার্টি ও সরকারী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানাতে হবে) এবং জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী ও ক্ষতিকর অতীতের যে-কোন কাজকর্মের জন্য মার্জনা চাইতে হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আঞ্চলিক পার্টির নেতৃত্বাধীনে সরকার ও গণ সংগঠনসমূহ এবং তাদের পক্ষাবলম্বনকারী জনগণকে প্রকাশ্যে সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করার প্রতিজ্ঞা নতুন করে গ্রহণ করতে হবে এবং জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সৈনিকদের পরিবারকে অধিকতর ভালভাবে সুবিধা দেওয়া হবে, এবং সৈন্যবাহিনীর প্রতিটি ইউনিটকেই অভিনন্দন জ্ঞাপনের ও উপহার দানের আন্তরিক একটি অভিযান শুরু করতে হবে। এই অভিযানসমূহের মধ্য দিয়ে, সেনাবাহিনী তার নিজের দিক থেকে এবং পার্টি ও সরকার তাদের নিজেদের দিক থেকে ১৯৪৩ সালের তাদের সকল ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে এবং ১৯৪৪ সালে সেগুলিকে দৃঢ়তা সহকারে সংশোধন করতে হবে। এখন থেকে, এ ধরনের অভিযান প্রতিটি চান্দ্র বছরের প্রথম মাসে সর্বত্র চালাতে হবে এবং এইসব অভিযানের সময়ে 'সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে সহায়তা করার' এবং সেনাবাহিনীকে সমর্থন করার ও জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সৈনিকদের পরিবারগুলিকে সাধারণের চেয়ে অতিরিক্ত সুবিধাদানের' প্রতিজ্ঞা বারবার পাঠ করতে হবে, এবং ঘাঁটি অঞ্চলসমূহের পার্টি, সরকারী কর্মচারীবৃন্দ বা অসামরিক জনগণের প্রতি সৈন্যবাহিনীর যে- কোন প্রকার উদ্ধত আচরণের ব্যাপারে বা সৈন্যবাহিনীর প্রতি পার্টি, সরকারী কর্মচারীবৃন্দ বা অসামরিক লোকজনের কোনপ্রকার অনুকূল মনোভাবের অভাবের ব্যাপারে জনগণের সামনে প্রকাশ্যে বারেবারে আত্মসমালোচনা করতে হবে (অন্য পক্ষকে নয়, প্রতিটি পক্ষই নিজেদের সমালোচনা করবেন) যাতে করে এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তিকে পুরোপুরি শুধরে নেওয়া সম্ভব হয়।

কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের এবং জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের দুটি অধিবেশন সম্পর্কে মন্তব্য

৫ই অক্টোবর, ১৯৪৩

৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয়ে গেল এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর কুওমিনতাঙ সরকার তৃতীয় জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান করল। এই দুটি সভার সব দলিলপত্রই হাতে এসেছে, তাই এখন এ সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু মন্তব্য করা চলে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এক বিরাট পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে এবং এই প্রত্যাসন্ন পরিবর্তন সম্পর্কে সব মহলই অবহিত হয়ে উঠেছেন। ইউরোপীয় অক্ষশক্তিগুলি এটা টের পেয়েছে এবং হিটলারও শেষরক্ষার চরম নীতি গ্রহণ করছে। মোটামুটি বলা চলে, সোভিয়েত ইউনিয়নই এই পরিবর্তন নিয়ে এল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অবস্থার সদ্ব্যবহার করছে—লালফৌজ ইতিমধ্যেই নীপার নদী পর্যন্ত পথের সব বাধাকে দুর্বার গতিতে অতিক্রম করে লড়াই করে এগিয়ে গেছে, এবং আরেকটি শীতকালীন আক্রমণ অভিযান তাকে সোভিয়েতের নতুন সীমান্তে না হলেও, পুরাতন সীমান্তে পৌঁছিয়ে দেবে। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রও এই পরিবর্তনের সদ্ব্যবহার করছে, রুজভেল্ট ও চার্চিল হিটলারের পতনের প্রথম লক্ষণের অপেক্ষায় রয়েছেন যাতে তখনই ফ্রান্সে ঢুকে পড়তে পারেন। সংক্ষেপে জার্মান ফ্যাসিষ্ট সমরযন্ত্রটি শীঘ্রই খণ্ডছিন্ন হয়ে আলগা হয়ে পড়বে, ইউরোপে ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের সমস্যা চূড়ান্ত সমাধানের পূর্বমুহূর্তে উপনীত হয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নই হচ্ছে ফ্যাসিবাদকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার প্রধান শক্তি। বিশ্বের ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুটি যেহেতু ইউরোপে রয়েছে এক বার যখন সেখানে সমস্যাটির নিষ্পত্তি হয়ে যাবে তখনই দুটি বিরাট বিশ্ব-শিবিরের, ফ্যাসিষ্ট ও ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী শিবিরের

কমরেড মাও-ভুঙ ইয়েনানের **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকার জন্য এই সম্পাদকীয়টি রচনা করেছিলেন।

ভাগ্য ও চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারিত হয়ে যাবে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের কোণঠাসা অবস্থাটি বুঝতে পারছে এবং নীতিটিও হচ্ছে শেষরক্ষার চরম সংগ্রামের জন্য যথাসাধ্য সকল শক্তিকে সমবেত করা। চীনে তারা চেষ্টা করবে কমিউনিস্টদের 'নিশ্চিহ্ন করে দিতে' আর কুওমিনতাঙকে আত্ম-সমর্পণের লোভ দেখাতে।

কুওমিনতাঙও পরিবর্তনটি আঁচ করতে পেরেছে। এই অবস্থার মুখোমুখি হয়ে তার আনন্দ আর ভয় দুটোই হচ্ছে। আনন্দ হচ্ছে এ কথা অনুমান করে যে ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হলে, ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র তার হয়ে স্বাধীনভাবে জাপানের বিরুদ্ধে লড়বে এবং তারা বিনা আয়াসে নানকিং এ ফিরে যেতে পারবে। ভয় হচ্ছে এই ভেবে যে তিনটি ফ্যাসিষ্ট শক্তির এই সমূহ পতনের সঙ্গে সঙ্গে সারা দুনিয়ায় মুক্তির এক অভূতপূর্ব যুগ দেখা দেবে এবং কুওমিন-তাঙএর মুৎসুদ্দি-সামন্ত ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ব স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিশাল সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত হয়ে পড়বে, তার ভয় হচ্ছে 'এক দল, এক নীতি ও এক নেতা'-মার্কা নিজস্ব ফ্যাসিবাদটিও সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাবে।

প্রথমদিকে কুওমিনতাঙ ভেবেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এককভাবে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুক আর জাপানীদের তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণে উত্তেজিত করবে যাতে করে সমাজতন্ত্রের দেশটি ধ্বংস হয়ে যাবে বা ভীষণভাবে মার খেয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে; তারা এই আশাও করেছিল যে ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র তাদের সমস্ত শক্তিকে প্রাচ্যে নিয়ে আসবে ও প্রথমে জাপানকে চুরমার করে ফেলবে এবং ইউরোপে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ফ্রণ্ট নিয়ে দুর্ভাবনা না ভেবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এই আসল মতলব থেকেই কুওমিনতাঙ প্রথমে 'ইউরোপের আগে এশিয়া' এবং তারপর 'ইউরোপ ও এশিয়ার প্রতি সমান নজর দেওয়া' সংক্রান্ত রণনীতি নিয়ে এমন হৈ-চৈ শুরু করেছিল। বর্তমান বছরের আগস্ট মাসে কুইবেক সম্মেলন শেষ হওয়ার সময়ে, কুওমিনতাঙ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টি. ভি. সুংকে রুজভেল্ট ও চার্চিল ডেকে পাঠালেন এবং তার সঙ্গে সামান্য কিছু কথাবার্তা বললেন; তারপরই কুওমিনতাঙ চিৎকার জুড়ে দিল 'রুজভেল্ট ও চার্চিল প্রাচ্যের দিকে মুখ ফেরাচ্ছেন', "এশিয়ার আগে ইউরোপ" এই পরিকল্পনাটি পরিবর্তিত হচ্ছে' এবং 'কুইবেক সম্মেলন ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও

চীন এই তিনটি বিরাট শক্তির সম্মেলন'—ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং পরমানন্দে আত্মপ্রচারের জয়ঢাক তারা পিটাতে শুরু করেছে। কিন্তু ঐটিই ছিল কুওমিনতাঙ-এর আনন্দ প্রকাশের অন্তিম মুহূর্তটি। তারপর থেকেই মনোভাবে কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে; 'ইউরোপের আগে এশিয়া' ও 'ইউরোপ ও এশিয়ার প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়া' ইত্যাদিকে ইতিহাসের যাদুঘরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং কুওমিনতাঙ সম্ভবতঃ নতুন মতলব ভাজছে। মনে হয়, এই নতুন মতলবগুলির প্রাথমিক রূপায়ণই কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এবং কুওমিনতাঙ নিয়ন্ত্রিত জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের দ্বিতীয় অধিবেশনের বিবেচ্য বিষয়।

কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এই কুৎসামূলক অভিযোগ করেছে যে তা নাকি 'প্রতিরোধ-যুদ্ধের ক্ষতিসাধন করছে এবং রাষ্ট্রকে বিপন্ন করে তুলছে,' আবার একই সঙ্গে তা এই ঘোষণাও করেছে যে কুওমিনতাঙ 'রাজনৈতিক সমাধানে' এবং 'নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রস্তুতির পক্ষপাতী।' কুওমিনতাঙ-এর সংখ্যা-গরিষ্ঠের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত তৃতীয় জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের দ্বিতীয় অধিবেশনেও কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে মোটামুটি একই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তদুপরি, কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন চিয়াং কাই-শেককে কুওমিনতাঙ সরকারের সভাপতি 'নির্বাচিত' করেছে যাতে করে তাদের একনায়কতন্ত্রী শাসনের যন্ত্রটিকে জোরদার করে তোলা যায়।

একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর কুওমিনতাঙ এখন কী করার পরিকল্পনা করতে পারে? এক্ষেত্রে শুধু তিনটি সম্ভাবনাই রয়েছে:

(১) জাপানী সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা;

(২) পুরানো পথ ধরে চলা; এবং

(৩) রাজনৈতিক লাইনে পরিবর্তন নিয়ে আসা।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের 'কমিউনিস্টদের আঘাত হানার এবং কুওমিন-তাঙকে খাতির করার' উদ্দেশ্যটি চরিতার্থ করার জন্য কুওমিনতাঙ-এর আভ্যন্তরীণ পরাজয়বাদী ও আত্মসমর্পণপন্থীরা সব সময়ই আত্মসমর্পণের পক্ষে ওকালতি করে এসেছে। তারা সব সময় কমিউনিস্ট-বিরোধী গৃহযুদ্ধ অবিচলিতভাবে বাধিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়ে এসেছে এবং তারা এ কথা জানে যে একবার যদি গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া যায় তবে জাপানের বিরুদ্ধে

প্রতিরোধ অসম্ভব হয়ে উঠবে এবং একমাত্র আত্মসমর্পণের পথই খোলা থাকবে। কুওমিনতাঙ চার লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ সৈন্য উত্তর-পশ্চিম চীনে সমবেত করছে এবং গোপনে গোপনে অন্যান্য ফ্রন্ট থেকে আরও অধিকতর সৈন্যকে ওখানে সরিয়ে আনছে। শোনা যাচ্ছে, সেনাপতিরা খুবই খোশমেজাজে রয়েছে এবং বলে বেড়াচ্ছে, ইয়েনান দখল করে নেওয়া কোন সমস্যাই নয়।' একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যে বক্তৃতায় চিয়াং-কাই শেক কমিউনিস্ট সমস্যাকে 'একটি রাজনৈতিক সমস্যা' হিসেবে বর্ণনা করে 'রাজনৈতিকভাবেই তার সমাধান হওয়া উচিত' এই মর্মে বক্তৃতা করেছেন এবং রাজনৈতিক পর্ষদের অধিবেশনেও অনুরূপ মর্মে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে তার পর থেকেই তারা এভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করছে। কুওমিনতাঙ এর-কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের গত বছরের দশম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনেও অনুরূপ প্রস্তাবই নেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রস্তাবের কালি শুকোতে না শুকোতেই সেনাপতিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সীমান্ত অঞ্চলসমূহ নিশ্চিহ্ন করার জন্য সামরিক পরিকল্পনা রচনা করতে ; বর্তমান বছরের জুন ও জুলাই মাসে সীমান্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে তড়িৎ আক্রমণ চালাবার জন্য সৈন্যসজ্জা করা হল এবং দেশ-বিদেশে জনমত তার বিরুদ্ধে ছিল বলেই এই দুরভিসন্ধিটি পরিত্যক্ত হল। এখন আবার একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রস্তাবসমূহ কাগজেপত্রে লিখিত হতে না হতেই সেনাপতিদের বাগাড়ম্বর ও সৈন্য মোতায়েনের রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে। 'ইয়েনান দখল করা কোন সমস্যাই নয়'—এ কথার অর্থ কী ? এর অর্থ হচ্ছে জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। 'ইয়েনান দখল করার' পক্ষপাতী সকল কুওমিনতাঙ সদস্যরাই অবশ্য সচেতন ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আত্মসমর্পণ পন্থী নন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবতে পারেন 'কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়লেও আমরা জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কিন্তু চালিয়েই যাব।' ওহাম-পোয়া চক্রের[১] বহু অফিসারই সম্ভবতঃ এ কথা ভাবছেন। ঐসব ভদ্রলোকের কাছে আমরা কমিনিস্টরা নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি রাখতে চাই। দশ বছরের গৃহযুদ্ধের শিক্ষা কি আপনারা ভুলে গেছেন ? আবার যদি একটা গৃহযুদ্ধ বাধে তাহলে আত্মসমর্পণের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞরা কি আপনাদের জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দেবে ? জাপানীরা এবং ওয়াং চিং-ওয়েই কি জাপানের বিরুদ্ধে আপনাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দেবে ? আপনারা কি যথার্থই এমন শক্তিশালী যে একদিকে একটা গৃহযুদ্ধ চালিয়েও আপনারা একই সঙ্গে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধেও

যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবেন ? আপনারা বলছেন, আপনাদের ত্রিশ লক্ষ সৈন্য রয়েছে, কিন্তু আপনাদের সৈন্যদলের মনোবল এতই দুর্বল যে সাধারণ মানুষ তাদের তুলনা করেছে একটি বহনদণ্ডের একটি প্রান্তে বাহিত দুই ঝুড়ি ডিমের সঙ্গে—একবার সংঘাত বাধলেই সব শেষ হয়ে যাবে। চুংতিয়াও পর্বতে তাই-হাং পর্বতে, চেকিয়াং এবং কিয়াংসিতে, পশ্চিম হুপে এবং তাপাইয়ে পরিচালিত আপনাদের সব অভিযানেই এটা ঘটেছে : এই পরিণতির সোজা কারণ হচ্ছে 'কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সক্রিয়তার' এবং 'জাপানের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার' আপনাদের আত্মঘাতী নীতিটি। একটি জাতীয় শত্রু আমাদের দেশের গভীরে প্রবেশ করেছে এবং যত বেশি সক্রিয়ভাবে আপনারা কমিউ-নিস্টদের বিরুদ্ধে লড়বেন এবং যত বেশি করে জাপানীদের প্রতিরোধের ব্যাপারে আপনারা নিষ্ক্রিয় থাকবেন, আপনাদের সৈন্যবাহিনীর মনোবল ততই বেশি করে ভেঙে পড়বে। যদি বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপনাদের এমন অসহায় হাল হয়, তাহলে কি আপনারা আশা করেন যে হঠাৎ করে আপনাদের সৈন্যরা কমিউনিস্ট ও জনগণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে একেবারে জবরদস্ত হয়ে উঠবে ? তার কোন সম্ভাবনাই নেই। গৃহযুদ্ধ একবার যখন শুরু করবেন, তখন তার প্রতি আপনাদের অখণ্ড মনোযোগ দিতে হবে এবং 'একই সঙ্গে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার' সকল চিন্তাই অনিবার্যভাবে আপনাদের জলাঞ্জলি দিতে হবে ; শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবেন জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আপনারা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের একটি চুক্তিতে স্বাক্ষরদান করতে অনিবার্যভাবে বাধ্য হচ্ছেন এবং আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোন পথই আপনাদের সামনে খোলা নেই। কুওমিনতাঙ এর মধ্যে আপনারা যাঁরা প্রকৃতপক্ষেই আত্মসমর্পণ করতে চান না, যদি আপনারা গৃহযুদ্ধে উস্কানি দেন এবং তা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন তবে দেখতে পাবেন আপনারা অনিবার্যভাবে আত্মসমর্পণে এসে শেষ করেছেন। যদি আপনারা আত্মসমর্পণবাদী চক্রের ছলাকলার শিকার হয়ে পড়েন এবং একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের ও জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের প্রস্তাবাবলীকে জনমত সংগ্রহের এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী গৃহযুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন তবে নিশ্চিন্তভাবেই এটা ঘটবে। যদি আপনারা প্রথমে আত্মসমর্পণ করতে নাও চান অথচ যদি আপনারা আত্মসমর্পণবাদী চক্রের ছলাকলার শিকার হয়ে পড়েন এবং ভুল পথ গ্রহণ করেন তবে আপনারা আত্মসমর্পণবাদী

চক্রটির পদাঙ্ক অনুসরণ করে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই শেষ করবেন। একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পরে এই হচ্ছে প্রথম সম্ভাব্য যে পথ কুওমিনতাঙ গ্রহণ করতে পারে এবং এটা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে ওঠার চূড়ান্ত গুরুতর রকমের বিপদ রয়েছে। আত্মসমর্পণপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে 'রাজনৈতিক সমাধান' ও 'নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রস্তুতি' নিয়ে কথা বলা হচ্ছে গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিকে অর্থাৎ আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুতিকে গোপন রাখার সবচেয়ে ভাল পথ। সকল কমিউনিস্ট, কুওমিনতাঙ-এর সকল দেশপ্রেমিক সদস্য, সকল জাপ-বিরোধী পার্টি এবং আমাদের সমস্ত দেশবাসী যাঁরাই জাপানের বিরোধী তাঁদের সকলকেই এই চূড়ান্ত গুরুতর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং কোনমতেই এইসব ছলাকলায় বিভ্রান্ত হলে চলবে না। এটা বোঝা চাই যে কুওমিনতাঙ-এর একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর এখনকার এই সময়ের মতো গৃহযুদ্ধের বিপদ আর কোন সময়েই এত বেশি ছিল না।

এইসব প্রস্তাব অন্য আরেকটি দিকে অবস্থাকে নিয়ে যেতে পারে, তা হচ্ছে 'খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক, আর গৃহযুদ্ধ কিছুকাল পরেই শুরু করা যেতে পারে।' আত্মসমর্পণবাদী চক্রের প্রস্তাবিত পথের চেয়ে এটা খানিকটা ভিন্ন ধরনের এবং এই পথ সেইসব লোকেরাই নিতে চাইবেন যাঁরা এখনো জাপানের বিরুদ্ধে লোকদেখানো একটা প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে চান, কিন্তু কমিউনিস্ট-বিরোধিতা ও তাঁদের একনায়কতন্ত্রী শাসন আদৌ বর্জন করতে চান না। তাঁরা এই পথে যেতে চাইবেন, কেননা তারা দেখছেন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন অনিবার্য এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার; গৃহযুদ্ধের অর্থ হবে আত্মসমর্পণ এবং সমগ্র দেশের জনগণই গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধের পক্ষপাতী; কুওমিনতাঙ গুরুতর সংকটের আবর্তে পড়েছে, সাধারণ মানুষের থেকে নিজেকে তা দূরে সরিয়ে নিয়েছে, জনগণের সমর্থন হারিয়ে ফেলেছে এবং অতীতের যে-কোন সময়ের চেয়ে বেশি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে; তাঁরা আরও দেখছেন, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এরা সবাই চীন সরকার কর্তৃক গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার বিরোধী। এই সবকিছু মিলে গৃহযুদ্ধ বাধানোর পরিকল্পনাকে স্থগিত রাখতে তাঁদের বাধ্য করবে এবং কিছু সময় ধরে 'রাজনৈতিক সমাধান' ও 'নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রস্তুতির' ফাঁকা কথার কারবার চালাতে তাঁদের বাধ্য করবে। এইসব লোকেরা প্রতারণা ও বাধা সৃষ্টির ব্যাপারে একেবারে ওস্তাদ। তাঁরা স্বপ্নেও 'ইয়েনান

দখল করার' ও কমিউনিস্ট পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করার' বাসনাটি ভুলতে পারেন না। ৮ এই বিষয়ে আত্মসমর্পণপন্থী চক্রটির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তা সত্ত্বেও তাঁরা জাপানের বিরুদ্ধে লোকদেখানো প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে চায়, কুওমিনতাঙ তার আন্তর্জাতিক মর্যাদা খুইয়ে বসুক তা তাঁরা চান না এবং আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী জনমতের নিন্দাকে মাঝে মাঝে তাঁরা খুবই ভয় করেন; তাই তাঁরা 'রাজনৈতিক সমাধান' ও 'নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রস্তুতির' ধূম্রজালের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চান এবং অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক পরিস্থিতি অপেক্ষায় থাকতে চান। একটা 'রাজনৈতিক সমাধান' বা 'নিয়মতান্ত্রিক সরকারের কোন ঐকান্তিক বাসনাই তাঁদের নেই, অন্ততঃ এই মুহূর্তে যে নেই সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। গত বছর কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদের দশম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কাছাকাছি সময়ে কমরেড লিন পিয়াওকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মিঃ চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলার জন্য চুংকিং-এ পাঠিয়েছিলেন। তিনি চুং কিং-এ দশটি মাস অপেক্ষা করলেন, কিন্তু মিঃ চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ তাঁর সঙ্গে একটি বাস্তব বিষয় নিয়ে আলোচনার ইচ্ছাও প্রকাশ করেনি। বর্তমান বছরের মার্চ মাসে চিয়াং কাই-শেক তাঁর বই **চীনের ভবিষ্যৎ** প্রকাশ করে তাতে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ও উদারনৈতিক ধ্যানধারণার ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতার কথা সজোরে বলেছেন, দশ বছরের গৃহযুদ্ধের দায় কমিউনিস্ট পার্টির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন, কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে 'নতুন ধরনের যুদ্ধবাজ' ও 'নতুন ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে কুৎসা করেছেন এবং বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন দু'বছরের মধ্যেই তিনি কউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বেন। এই বছরের ২৮শে জুন, মিঃ চিয়াং কাই-শেক চৌ এন-লাই, লিন পিয়াও এবং অন্যান্য কমরেডদের ইয়েনানে ফিরে আসতে অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু একই সময়ে তিনি পীত নদীর তীরবর্তী তার প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সীমান্ত অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন এবং সারাদেশের আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষকে তিনি আদেশ দিয়েছেন তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিলুপ্তির সুযোগ গ্রহণ করে তথাকথিত গণ-সংগঠনের নামে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিলুপ্তি দাবি করার জন্য। এই পরিস্থিতিতে আমরা কমিউনিস্টরা কুওমিনতাঙ ও সমগ্র জাতির কাছে গৃহযুদ্ধ পরিহার করার আহ্বান জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং প্রতি-

রোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করা ও রাষ্ট্রকে বিপন্ন করে তোলার কুওমিনতাঙ-এর সকল জঘন্য দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে দেখা যাবে যে আমাদের ধৈর্যকে শেষ সীমায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। উহানের পতনের সময় থেকে উত্তর ও মধ্য চীনে কমিউনিস্ট-বিরোধী ছোট-বড় যুদ্ধবিগ্রহের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আজ দু'বছর হল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হয়েছে আর এই পুরো সময়টা কুওমিনতাঙ মধ্য ও উত্তর চীনে কমিউনিস্টদের আক্রমণ করেই চলেছে, ওখানে শুরুতে যা সৈন্য মোতায়েন ছিল তা ছাড়াও ওয়াং চুং-লিয়েন ও লি সিয়েন চৌ এর অধীনে গ্রুপ সৈন্যবাহিনীকে কমিউনিস্টদের আক্রমণ করার জন্য কিয়াংসু ও শানতুং এ পাঠানো হয়েছে। তাইহাং পর্বত অঞ্চলে পাং পিং-সুন-এর গ্রুপ সৈন্যকে আদেশ দেওয়া হয়েছে একমাত্র কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করার জন্য; একই আদেশ গেছে আনওয়েই ও হুপের কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর কাছে। দীর্ঘকাল এই বাস্তব ঘটনাবলীকেও আমরা জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি। কুওমিনতাঙ সংবাদ ও সাময়িক পত্রপত্রিকাগুলি এক মুহূর্তের জন্যও কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে নিন্দা প্রচারে ক্ষান্ত দেয়নি, কিন্তু দীর্ঘকাল প্রত্যুত্তরে একটি কথাও আমরা বলিনি। একেবারে অযৌক্তিকভাবে কুওমিনতাঙ নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে ভেঙে দিল অথচ তা জাপানের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছিল; শুধু তাই নয়, কুওমিনতাঙ দক্ষিণ আনহুইয়ে এই বাহিনীর নয় হাজার সৈন্যকে হত্যা করেছে, ইয়ে তিংকে গ্রেপ্তার করেছে, সিয়াং য়িংকে[২] হত্যা করেছে এবং ঐ বাহিনীর শত শত সৈন্যকে গ্রেপ্তার করেছে; যদিও এটা ছিল জাতি ও জনগণের প্রতি একটি দানবীয় বিশ্বাসঘাতকতা, আমরা দেশের কথা ভেবে আমাদের সহ্যশক্তি বজায় রেখেছিলাম, শুধু প্রতিকার দাবি করে একটি প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। ১৯৩৭ সালের জুন-জুলাই মাসে মিঃ চিয়াং কাই-শেক যখন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি কমরেড চৌ এন-লাই-এর সঙ্গে দেখা করেছিলেন তখন চিয়াং এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে একটি বিশেষ আদেশ বলে জাতীয় সরকারের শাসন বিভাগীয় য়ুয়ান-এর প্রত্যক্ষ এলাকাধীন একটি প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হবে এবং তার পদাধিকারী কর্মচারীরা আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র পাবেন। এখন মিঃ চিয়াং কাই-শেক শুধু যে তাঁর কথাগুলি গিলে খেয়েছেন তাই নয়, তিনি চার

থেকে পাঁচ লক্ষ সৈন্য পাঠিয়েছেন সীমান্ত অঞ্চলকে সামরিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে ঘিরে ধরার জন্য ; সীমান্ত অঞ্চলের জনগণ এবং অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্বর্তী সদর দপ্তরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করা পর্যন্ত তাঁর পক্ষে আনন্দের কোন অবকাশই নেই। এটা সবিশেষ কুখ্যাতির কথা যে অষ্টম রুট সেনাবাহিনীকে প্রতিশ্রুত সরবরাহ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, অথচ কমিউনিস্ট পার্টিকেই 'বিশ্বাসঘাতক পার্টি' বলে নিন্দা করা হয়েছে, নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে 'বিদ্রোহী সেনাবাহিনী' বলে কুৎসা জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং অষ্টম রুট সেনাবাহিনীকে 'বিশ্বাসঘাতক সেনাবাহিনী' ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এক কথায় কুওমিনতাঙ-এর যেসব লোকজনেরা এভাবে চলছেন তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টিকে তাঁদের শত্রু বলে মনে করেন। কুওমিনতাঙ-এর কাছে কমিউনিস্ট পার্টি জাপানীদের চেয়ে দশ বা একশ গুণ বেশি ঘৃণার বস্তু। কুওমিনতাঙ-এর যত ঘৃণা সবই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি, জাপানীদের প্রতি ঘৃণা তাদের আদৌ নেই বা থাকলেও তা নামমাত্র। কুওমিনতাঙ ও কমিউ-নিস্ট পার্টিকে যারা আলাদা করে দেখে এটা হচ্ছে জাপানী ফ্যাসিষ্টদের সেই আচরণেরই অনুরূপ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাদের ঘৃণা থেকে জাপানী ফ্যাসিষ্টরা ক্রমেই বেশি বেশি করে কুওমিনতাঙ-এর প্রতি ভদ্রভব্য হয়ে উঠেছে ; 'কমিউনিস্টদের বিরোধিতা কর' এবং 'কুওমিনতাঙকে ধ্বংস কর' তাদের এই দুটি শ্লোগানের মধ্যে এখন শুধু প্রথমটিই বহাল আছে। জাপানীরা ও ওয়াং চিং-ওয়েই-এর কর্তৃত্বাধীন পত্রপত্রিকায় এখন আর কুওমিনতাঙ ধ্বংস হোক' বা 'চিয়াং কাই-শেককে খতম কর' ইত্যাদি শ্লোগান ছাপা হয় না। চীনে জাপানীরা তাদের সৈন্যবাহিনীর শতকরা ৫৮ ভাগ নিয়োজিত করেছে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এবং শতকরা ৪২ ভাগকে নিয়োগ করেছে কুওমিন-তাঙ-এর ওপর নজর রাখার জন্য ; সম্প্রতি এই নজর রাখার কাজটিও তারা শিথিল করেছে এবং চেকিয়াং ও হুপে থেকে তাদের অনেক সৈন্যকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে কুওমিনতাঙ-এর আত্মসমর্পণের বাসনাকে উৎসাহিত করে তোলার জন্য। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা কমিউনিস্টদের আত্মসমর্পণে প্ররোচিত করার ব্যাপারে কোন সময়ে একটা কথা উচ্চারণ করতেও সাহস পায়নি কিন্তু কুও-মিনতাঙকে আত্মসমর্পণে প্ররোচিত করার জন্য অন্তহীন বাক্যব্যয় করতে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের প্রতিই কুও-মিনতাঙ-এর যত প্রচণ্ড বিক্রম কিন্তু জাপানীদের কাছে এলে তাদের সকল

বিক্রমই একেবারে মিইয়ে যায়। যথার্থ যুদ্ধবিগ্রহের দিক থেকে যুদ্ধের প্রকৃত অংশীদারের ভূমিকা থেকে সরে এসে কুওমিনতাঙ নিছক দর্শন হয়ে উঠেছে কিন্তু জাপানী সাম্রাজ্যবাদের অপমানজনক উক্তি ও অবজ্ঞার একটা কড়া জবাব মুখের কথায় দেবার হিম্মৎও আজ তাদের নেই। জাপানীরা বলেছে, 'চীনের ভবিষ্যৎ-এ উপস্থাপিত চিয়াং কাই-শেকের যুক্তিধারার ভুল কিছুই নেই'। মিঃ চিয়াং বা তাঁর পার্টির কোন সদস্য এটাকে খণ্ডন করেছেন কি? না, এখনো তা করার সাহস তাঁদের হয়নি। জাপানীরা যখন দেখছে যে মিঃ চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ-এর যত সামরিক ও সরকারী নির্দেশ' এবং 'যা কিছু শৃঙ্খলা বিধানের তৎপরতা' সবই ব্যবহৃত হচ্ছে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কিন্তু কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের যে বিশজন সদস্য ও আটাশ জন সেনাপতি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে সেগুলি ব্যবহার করার কোন ইচ্ছা বা সাহসই তার নেই—সেই কুওমিনতাঙকে জাপানীরা ঘৃণাভরে অবজ্ঞা না দেখিয়ে পারে কী? দেশব্যাপী সকল মানুষ এবং বিশ্বব্যাপী মিত্র দেশসমূহ দেখছে মিঃ চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ কিভাবে নতুন চতুর্থ সেনা-বাহিনীকে ভেঙে দিয়েছে, অষ্টম রুট সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেছে, সীমান্ত অঞ্চলকে অবরোধ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে 'বিশ্বাসঘাতকদের পার্টি' 'বিশ্বাসহন্তা সেনাবাহিনী', নতুন ধরনের যুদ্ধবাজদের দল', নতুন ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজত্ব', 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টিকারী'এবং 'রাষ্ট্রকে বিপন্ন করার যত সব অপবাদ ছড়াচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে অনবরত 'সামরিক ও সরকারী নির্দেশ জারী করে' চলেছে আর 'শৃঙ্খলা বিধানে তৎপর রয়েছে। তারা কোন সময় এটা দেখেনি যে মিঃ চিয়াং ও কুওমিনতাঙ শত্রুপক্ষে যোগদান-কারী কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বিশজন সদস্য এবং আটাশ জন সেনাপতির বিরুদ্ধে কোন সামরিক আদেশ, সরকারী হুকুমনামা জারী করেছেন বা তাদের বিরুদ্ধে শৃংখলাবিধানের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। একইভাবে, সম্প্রতি কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এবং জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের সভায় যা কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তার সব কটিই কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে পরিচালিত কিন্তু কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বহু সংখ্যক যে সদস্যগণ এবং বহু সংখ্যক যেসব সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ও শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা হয়নি। সারা দেশের জনগণ ও সারা বিশ্বের

বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলি কুওমিনতাঙ সম্পর্কে কী ভাবছে? একান্ত প্রত্যাশিত-ভাবেই তাই আবার 'রাজনৈতিক সমাধান' ও নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রস্তুতির কথা একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বলা হয়েছে। খুবই ভাল কথা, আমরা এইসব কথাবার্তাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু সাম্প্রতিক এই কয় বছর ধরে কুওমিনতাঙ যে রাজনৈতিক লাইন একটানা অনুসরণ করে আসছে তা থেকে আমরা মনে করি এই কথাগুলি নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা কথা, যার লক্ষ হচ্ছে জনগণকে ধোঁকা দেওয়া এবং আসল মতলব হচ্ছে গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য খানিকটা সময় করে নেওয়া, যাতে তাদের নিজেদের একনায়ক-তন্ত্রী রাজত্ব জনগণের ওপর তারা চিরস্থায়ীভাবে চালিয়ে যেতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতি কি তৃতীয় একটি দিকে মোড় নিতে পারে? হাঁ, তা পারে। বেশ কিছু সংখ্যক কুওমিনতাঙ সদস্য, সমগ্র জনগণ এবং আমরা কমিউনিস্টরা এই আশাই করছি। এই তৃতীয় ধারাটি কী? তা হচ্ছে, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত সমাধান, যথার্থ গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা 'এক দল এক নীতি, এক নেতা' বিশিষ্ট ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্বের অবসান এবং প্রতিরোধ যুদ্ধ চলাকালে জনগণ কর্তৃক যথার্থভাবে নির্বাচিত একটি জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করা। আমরা কমিউনিস্টরা একেবারে প্রথম থেকে এই পথে কথা বলে আসছি। বেশ কিছু সংখ্যক কুওমিনতাঙ সদস্যও এ বিষয়ে একমত। দীর্ঘকাল ধরে আমরা আশা করে আসছি যে মিঃ চিয়াং কাই-শেক এবং তার নিজস্ব কুওমিনতাঙ উপদলও এই পথ অনুসরণ করবে। কিন্তু গত ক'বছর ধরে যা ঘটেছে এবং এখন যা ঘটেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে মিং চিয়াং এবং ক্ষমতাসীন কুওমিনতাঙ ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশই এই পথ অনুসরণ করতে রাজী নন।

এই পথ গ্রহণ করার আগে বেশকিছু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে (ইউরোপে ফ্যাসিবাদ যখন সম্পূর্ণ পতনের দ্বার-প্রান্তে উপনীত) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তখন চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধের অনুকূল কিন্তু ঠিক ঐ সময়েই আত্মসমর্পণকারীরা বিশেষ আগ্রহভরে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে তৎপর হয়ে উঠেছে যাতে তারা আত্মসমর্পণ করে বসতে পারে এবং জাপানীরা ও ওয়াং চিং-ওয়েই প্রভৃতিও আত্মসমর্পণকে সহজ করে তোলার জন্য গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে সবিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। 'ডোমেই নিউজ

এজেন্সির' ১লা অক্টোবরের সংবাদ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ওয়াং চিং-ওয়েই বলেছেন: 'অনুরক্ত ভাইয়েরা সর্বদা অনুরক্ত ভাই হয়েই থাকবেন, এবং চুংকিং নিশ্চিতভাবেই আমাদের পথ ধরে চলবে, আর আমরা আশা করছি তা যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল।' কী প্রীতি, কী আস্থা আর কী আগ্রহ! তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে কুওমিনতাঙ-এর কাছ থেকে সবচেয়ে ভাল যা প্রত্যাশা করা চলে তা হচ্ছে স্থিতাবস্থা, তবে হঠাৎ করে অবস্থার অবনতির বিপদ প্রকৃতপক্ষেই গুরুতর। তৃতীয় পথের অনুকূল সব প্রয়োজনীয় শর্তই এখনো পর্যন্ত বিরাজ করছে না এবং সমগ্র চীনব্যাপী সকল দলের দেশপ্রেমিক ও জনগণকে নানাদিক থেকে তাকে বাস্তব করে তোলার জন্য প্রয়াস চালাতেই হবে।

একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে মিঃ চিয়াং কাই-শেক ঘোষণা করেছেন:

> এটা পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী শাসন পরিত্যাগ করা, জাতীয় সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের হঠাৎ আক্রমণের ফলে প্রতিরোধ-যুদ্ধে যে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি হচ্ছে তা বন্ধ করা ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির কাছে আর কোন দাবিই করছে না; এটা আশা করা চলে যে সাধারণতন্ত্রের ২৬ তম বর্ষে (১৯৩৭ সালে) জাতিকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাবার যে আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং ঐ ঘোষণায় যে চারটি প্রতিশ্রুতি কার্যকর করার কথা বলা হয়েছিল সেই ঘোষনাকে কমিউনিস্ট পার্টি কার্যকর করবে।

'জাতীয় সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হঠাৎ আক্রমণে প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত করার সৃষ্টির' যে কথা মিঃ চিয়াং বলেছেন তা কুওমিনতাঙ-এর নিজের বিরুদ্ধেই প্রয়োজ্য হওয়া উচিত এবং এটা খুবই পরিতাপের কথা যে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এইসব ভিত্তিহীন ও অভিসন্ধি প্রসূত কুৎসা রটনা করা হচ্ছে। উহানের পতনের সময় থেকে, কুওমিনতাঙ তিন-তিনটি আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করেছে এবং বাস্তব তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এর প্রত্যেকটির বেলাতেই কুওমিনতাঙ সৈন্যরাই কমিউনিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়েছে। প্রথম অভিযানের সময়ে ১৯৩৯-এর শীতকাল থেকে ১৯৪০-এর বসন্তকাল পর্যন্ত সময়ে, কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী তাদের আকস্মিক আক্রমণের মধ্য দিয়ে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর অধ্যুষিত চুনহুয়া, সুনাই, চেংনিং, নিংসিয়েন ও চেনয়ুয়ান—এই পাঁচটি আঞ্চলিক শহর দখল করে নিয়েছিল এবং এইসব অভিযানকালে বিমান

বাহিনীকেও ব্যবহার করেছিল। উত্তর চীনে চু হুয়াই-পিং- এর সৈন্যবাহিনীকে তাইহাং পার্বত্য অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়েছিল অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আকস্মিক আক্রমণ চালাবার জন্য এবং অষ্টম রুট বাহিনী একমাত্র আত্মরক্ষার জন্যই সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়েছিল। দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালিত হয় ১৯৪১ সালে জানুয়ারিতে। তার আগে হো য়িং-চিন ও পাই চুং-সি ১৯৪০-এর অক্টোবরে চু তে, পেং তে-হুয়াই, ইয়ে' তিং ও শিয়াং ইংকে তারযোগে এই দ্ব্যর্থহীন আদেশ পাঠায় যে পীত নদীর দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত তাদের পরিচালনাধীন সকল বাহিনীকে একমাসের মধ্যে নদীর উত্তরতীরে নিয়ে যেতে হবে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আনহুই-এর দক্ষিণের আমাদে সৈন্যদের উত্তরে সরিয়ে নেওয়া হবে; অন্যান্য বাহিনীর ব্যাপারে যদিও এই পরিস্থিতিতে তাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল, আমরা তবু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের পর তারা ঐ নির্দিষ্ট অবস্থানে সরে যাবে। তা সত্ত্বেও দক্ষিণ আনহুই-এর আমাদের নয় হাজার সৈন্য ঐ আদেশ অনুসারে ৫ই জানুয়ারি সরে যেতে শুরু করার আগেই, চিয়াং কাই শেক অন্য একটি আদেশ জারী করে 'ওদের সবাইকে জালে জড়িয়ে ফেলার' নির্দেশ দেন। ৬ই জানুয়ারী থেকে ১৮ই জানুয়ারির মধ্যে কুওমিনতাঙ সৈন্যদল সত্যিসত্যিই নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর ঐ ইউনিটগুলিকে জালে জড়িয়ে ফেলল। তারপর ১৭ই জানুয়ারী, মিঃ চিয়াং কাই শেক সমগ্র নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকেই ভেঙে দেবার এবং ইয়ে তিংকে কোর্ট মার্শাল করার আদেশ দিলেন। তারপর থেকে মধ্য ও উত্তর চীনের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে যেখানে যেখানেই কুওমিনতাঙ সৈন্য রয়েছে তারা সবাই অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেছে এবং ওরা একমাত্র বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছে। তৃতীয় অভিযান শুরু হয়েছে বর্তমান বছরের মার্চ মাস থেকে এবং তা এখনো চলছে। মধ্য ও উত্তর চীনে কুওমিনতাঙ বাহিনী অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া মিঃ চিয়াং কাই-শেক তাঁর লেখা **চীনের ভবিষ্যৎ** নামক যে বইখানি প্রকাশ করেছেন তা হচ্ছে কমিউনিজম ও জনগণের বিরুদ্ধে তাঁর সুতীব্র নিন্দাসূচক এক সুদীর্ঘ ফিরিস্তি। পীত নদী থেকে তাঁর বহু প্রতিরক্ষা বাহিনীকে অপসারণ করে তিনি নিয়ে গেছেন সীমান্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে আচমকা আক্রমণ চালাবার জন্য। তিনি সারা দেশ জুড়ে তথাকথিত জনগণের সংগঠনসমূহকে উত্তেজিত করে

তুলছেন কমিউনিস্ট পার্টিকে ভেঙে দেবার দাবি জানাবার জন্য। জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের কুওমিনতাঙ সংখ্যাগরিষ্ঠকে তিনি জড়ো করেছেন অষ্টম রুট সেনাবাহিনীকে কুৎসা করে আনীত হো য়িং-চিনের সামরিক রিপোর্টটি অনুমোদন করার জন্য এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য। তিনি পর্ষদকে এভাবে তৈরী করে ফেলেছেন গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতির ব্যাপারে কমিউনিস্ট-বিরোধী জনমত বানানোর জন্য কুওমিনতাঙ-এর একটি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে অথচ তার হওয়া উচিত ছিল জাপ-বিরোধী ঐক্যেরই একটি প্রতীক এবং এই জন্যই পর্ষদের কমিউনিস্ট প্রতিনিধি কমরেড তুং পি-উ প্রতিবাদে ওয়াক আউট করে চলে এসেছেন। এই তিনটি কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান কুওমিনতাঙ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রণয়ন করেছে এবং পরিচালনা করেছে। আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, যদি এইসব কার্যকলাপ 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি' না করে থাকে তবে আর কিসের থেকে তা হয়েছে?

সাধারণতন্ত্রের ২৬তম বছরের (১৯৩৭ সালে) ২২ শে সেপ্টেম্বর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জাতিকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাবার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে একটি ঘোষণা করেছিল। তাতে বলা হয়:

> শত্রুকে ছলাকলার কুট চক্রান্ত বিস্তারের যে-কোন সুযোগ থেকে নিরস্ত করার জন্য এবং সরল বিশ্বাস থেকে যথার্থ যে সন্দেহ নানাজনের মনে রয়েছে সে রকম যে-কোন ভুল ধারণা দূর করে দেওয়ার জন্য, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য সম্পর্কে তার একান্ত আন্তরিক অনুরক্তির কথা ঘোষণা করা প্রয়োজন মনে করে। সুতরাং, আর একবার তা একান্ত গুরুত্বসহকারে সমগ্র জাতির কাছে ঘোষণা করছে: (১) ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের যে তিন গণ-নীতির আজ চীনের প্রয়োজন রয়েছে, আমাদের পার্টি তার পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত; (২) কুওমিনতাঙ শাসন উচ্ছেদের জন্য অভ্যুত্থানের নীতি এবং জমিদারদের জমি বলপূর্বক দখল করার নীতি আমরা পরিত্যাগ করব; (৩) আমরা বর্তমান লাল সরকারকে এই প্রত্যাশা নিয়ে এমনভাবে পুনর্গঠিত করব যাতে তা গণতান্ত্রিক সরকারের একটা বিশেষ অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হয়ে সমগ্র দেশব্যাপী রাষ্ট্রশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলবে, এবং (৪) লালফৌজ তার নাম ও পরিচয়চিহ্ন বদল করবে,

জাতীয় বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ হিসেবে পুনর্গঠিত হবে এবং জাতীয় সরকারের সামরিক পর্ষদের অধীনস্থ হবে ও আদেশ পাওয়ামাত্র জাপ-বিরোধী রণক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে ও নিজের কর্তব্য সম্পাদন করতে প্রস্তুত থাকবে।

আমরা পরিপূর্ণভাবে এই চারটি প্রতিশ্রুতি পালন করছি; মিঃ চিয়াং-কাই-শেক বা কুওমিনতাঙ এর কেউই এদের একটিও লংঘন করার দায়ে আমাদের অভিযুক্ত করতে পারবেন না। প্রথমেই, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে এবং শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্ভাগের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে যেসব নীতি কমিউনিস্ট পার্টি অনুসরণ করছে তা ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের তিন গণ-নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং একটিও তার পরিপন্থী নয়। দ্বিতীয়তঃ, কুওমিনতাঙ যতক্ষণ জাতীয় শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ না করছে, কুওমিনতাঙ কমিউনিস্ট সহযোগিতাকে ভেঙে না দিচ্ছে অথবা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ শুরু না করছে, আমরা কুওমিনতাঙ শাসনকে উচ্ছেদ না করার অথবা জমিদারদের জমি বলপূর্বক দখল না করার ব্যাপারে প্রদত্ত আমাদের প্রতিশ্রুতি আমরা সব সময় পালন করব। অতীতে আমরা এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এসেছি, এখনো তা রক্ষা করছি এবং ভবিষ্যতেও তা করে যাব। তার অর্থ হচ্ছে, কুওমিনতাঙ যখন শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করবে, সহযোগিতাকে ভেঙে দেবে এবং গৃহযুদ্ধ শুরু করবে একমাত্র তখনই আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি বাতিল করে দিতে বাধ্য হব, কারণ একমাত্র ঐ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেই আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা অসম্ভব হবে, তৃতীয়তঃ, প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রথম বছরেই মূল লাল সরকারকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে এবং দীর্ঘকাল ধরেই গণ-তান্ত্রিক সরকারের 'তিনটি এক তৃতীয়াংশের ব্যবস্থা' কার্যকর রয়েছে কিন্তু শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে স্বীকার করার প্রতিশ্রুতি কুওমিনতাঙ আজ পর্যন্ত পূরণ করেনি এবং আরও অতিরিক্ত ব্যাপার হচ্ছে তা আমাদের 'সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতার' দায়ে অভিযুক্ত করছে। মিঃ চিয়াং কাই-শেক এবং কুওমিনতাঙ এর অপরাপর সদস্যবৃন্দ! 'বিচ্ছিন্নতা' বলতে আপনারা কী বোঝাচ্ছেন তা আপনাদের জানা উচিত—শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের এবং অন্যান্য জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলের যে পরিস্থিতিকে কুওমিনতাঙ সরকার স্বীকার করে না—তা তো আমরা চেয়ে আনিনি বরং পুরোপুরি আপনারাই আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। সীমান্ত অঞ্চলের

স্বীকৃতিদানের আপনাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে আপনারা অমান্য করলেন, ওখানকার গণতান্ত্রিক সরকারকে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন, আর এখন আমাদের বিরুদ্ধে 'বিচ্ছিন্নতাবাদের' অভিযোগ করছেন—তার কী কারণ থাকতে পারে বলতে পারেন? দিনের পর দিন আমরা স্বীকৃতির জন্য বলে এসেছি, আপনারা অস্বীকার করেছেন—তাহলে কে দায়ী বলুন? যদিও তিনি নিজেই কুওমিনতাঙ-এর ডাইরেক্টর জেনারেল এবং ঐ সরকারের প্রধান তবু এই বিষয়ে তাঁর নিজের বিন্দুমাত্র দায়িত্ববোধ না দেখিয়ে মিঃ চিয়াং তাঁর **চীনের ভবিষ্যৎ** বইটিতে 'বিচ্ছিন্নতাবাদের' বিরুদ্ধে এমন যে আক্রমণ করেছেন তার কী যুক্তি আছে বলুন তো? একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে মিঃ চিয়াং কাই-শেক আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি পালনের যে দাবি জানিয়েছেন তার সুযোগ নিয়ে আমরা তার কাছে দাবি জানাচ্ছি, যে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে গণতন্ত্রের মূলনীতি দীর্ঘকাল ধরে বাস্তবে প্রতিপালিত হয়ে আসছে তাকে এবং শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্বর্তী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি অঞ্চলসমূহকেও তিনি আইনসঙ্গত স্বীকৃতি প্রদান করুন। আপনি যদি আপনার স্বীকৃতি না দেবার নীতি আঁকড়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে আপনি চান আমরা এই 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' চালিয়ে যাই এবং তাতে অতীতের মতোই পুরো বদনাম বর্তাবে আপনার ওপর, আমাদের ওপর নয়। চতুর্থতঃ, আজ দীর্ঘকাল হয় লালফৌজ তার 'নাম ও পরিচয়' বদল করেছে, 'জাতীয় বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ হিসেবে পুনর্গঠিত হয়েছে' এবং 'জাতীয় সরকারের সামরিক পর্ষদের অধীনে স্থাপন করা হয়েছে', এই প্রতিশ্রুতি অনেক আগেই পূরণ করা হয়েছে। জাতীয় সরকারের সামরিক পর্ষদের অধীনে নয়, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একমাত্র যে বাহিনীটি রয়েছে, তা হচ্ছে জাতীয় বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীটি; তারও কারণ হচ্ছে এই যে সামরিক পর্ষৎ প্রতিবিপ্লবী একটি আদেশ বলে প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রকে বিপন্ন করে তুলে ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি এই বাহিনীকে 'বিদ্রোহী সেনাদল' বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ করে দেয় এবং তাকে 'ভেঙে দেওয়া হয়', আর তাছাড়াও কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী প্রতিদিন তার বিরুদ্ধে একটানা আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। অথচ এই নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী অবিচলিতভাবে মধ্য চীনে জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে এবং চারটি প্রতিশ্রুতির প্রথম তিনটিকে পুরোপুরি

পালন করেছে; তদুপরি তা জাতীয় সরকারের সামরিক পর্ষদের অধীনে' আবার চলে আসার তার ইচ্ছার কথা জানিয়েছে এবং মিঃ চিয়াং কাই-শেককে ঐ বাহিনী ভেঙে দেওয়ার আদেশটি বাতিল করে দিতে বলেছে এবং চতুর্থ প্রতিশ্রুতিটিও তা যাতে পালন করতে পারে তারজন্য তার পরিচয় সংক্রান্ত অভিজ্ঞানটি আবার ফিরিয়ে দিতে বলেছে।

একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত কমিউনিস্ট পার্টি সংক্রান্ত দলিলে এ কথাও বলা হয়েছে:

> অন্যান্য সমস্যাদি সম্পর্কে বলা যায় জাতীয় বিধানসভায় সেগুলি আলোচনার ও সমাধানের জন্য উত্থাপন করা যেতে পারে এবং যেহেতু বর্তমান অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করা হবে, একটি সংবিধান রচনা করা হবে এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার এক বছরের মধ্যেই তা ঘোষণা করা হবে—তাই ওখানেই তার বিহিত করা যাবে।

এখানে উল্লিখিত 'অন্যান্য সমস্যাদি' হচ্ছে কুওমিনতাঙ-এর একনায়কত্বের অবসান, ফ্যাসিষ্ট গোয়েন্দা ব্যবস্থার অবসান, সমগ্র দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের পক্ষে ক্ষতিকর অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণের, বিভিন্ন ধরনের লেভির ও গুরুতর করভারের অবসান, জাতিজোড়া পর্যায়ে খাজনা ও সুদ হ্রাস করার কৃষিনীতি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সহায়তা দান ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের অর্থ নৈতিক নীতি অনুসরণ। ১৯৩৭ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর জাতিকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের আহ্বানের ঘোষণায় আমাদের পার্টি বলেছিল:

> গণতন্ত্রকে কার্যকর করে তুলতে হবে, একটি জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করতে হবে এবং একটি সংবিধান গ্রহণ করতে হবে এবং জাতীয় মুক্তির একটি নীতি প্রণয়ন করতে হবে। চীনের জনগণ যাতে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে পারে তার জন্য প্রথমেই দুর্ভিক্ষত্রাণের, জীবিকা নির্বাহে নিশ্চয়তা বিধানের প্রতিরক্ষা শিল্প বিকাশের, জনগণকে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তিদানের ও তাদের জীবিকার অবস্থার উন্নতি বিধানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঠিক পরের দিন (২৩শে সেপ্টেম্বর) মিঃ চিয়াং কাই-শেক একটি

বিবৃতিতে এই ঘোষণাকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি আজ শুধু কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রদত্ত চারটি প্রতিশ্রুতি পালনের নিছক আহ্বান জানালেই চলবে কেন, তাঁর নিজেকে, কুওমিনতাঙ ও কুওমিনতাঙ সরকারকেও ওপরে উধৃত ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করার জন্য বলতে হবে। মিঃ চিয়াং কাই-শেক শুধু কুওমিনতাঙ এর ডাইরেক্টার জেনারেল নন, তিনি কুওমিনতাঙ সরকারের (নামের দিক থেকে জাতীয় সরকারের) সভাপতিও বটেন। তাই তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সততা সহকারে গণতন্ত্রের ও জনগণের জীবনযাত্রার উন্নয়নের এই সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাগুলিকে কার্যকর করা, তিনি স্বয়ং আমাদের কমিউনিস্টদের কাছে, সমগ্র দেশের জনগণের কাছে যে অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা মান্য করা, তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং জবরদস্তিমূলক কাজকর্ম করা, মুখে এক কথা বলা ও কাজে অন্যটি করা বন্ধ করা। সমগ্র জনগণের সঙ্গে একত্রে আমরা কমিউনিস্টরাও নেহাৎ ফাঁকা, প্রতারণাপূর্ণ কথা আর চাই না, চাই কাজ। যদি কাজ হতে থাকে, আমরা খুশি হব ; কাজে রূপায়িত না করে শুধু ফাঁকা কথা দিয়ে জনগণকে আর বেশি সময় ঠকানো যাবে না। মিঃ চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ এর কাছে আমরা যা চাইছি তা হচ্ছে : প্রতিরোধ যুদ্ধকে একেবারে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে চলুন, আত্মসমর্পণের বিপদ পরিহার করুন ; সহযোগিতা অব্যাহত রাখুন, গৃহযুদ্ধের বিপদ পরিহার করুন ; সীমান্ত অঞ্চলের এবং শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্বর্তী জাপ বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলের গণতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকার করুন, চতুর্থ সেনাবাহিনীকে স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করুন, কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযান বন্ধ করুন, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া অঞ্চল অবরোধকারী চার লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ সৈন্য প্রত্যাহার করুন, জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদকে কমিউনিস্ট বিরোধী অভিমত জাগিয়ে তোলার কুওমিনতাঙ-এর একটি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করা বন্ধ করুন, বাকস্বাধীনতার, সভা ও সমাবেশের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিন, কুওমিনতাঙ এর একদলীয় একনায়কত্বের অবসান করুন ; খাজনা ও সুদ হ্রাস করুন, শ্রমিকদের জীবিকা ও কাজের অবস্থার উন্নতি বিধান করুন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি স্তরের শিল্পকে সহায়তা করুন ; গোয়েন্দা ব্যবস্থা বাতিল করুন, ফ্যাসিষ্ট শিক্ষার সমাপ্তি ঘোষণা করুন এবং গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রচলন করুন। আপনারা নিজেরাই এসবের অনেকগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন। আপনারা যদি এইসব দাবি ও প্রতিশ্রুতি পালন করেন আমরা

আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে আমরাও আমাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করে যাব। মিঃ চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ রাজী থাকলে আমরা যে-কোন সময়ে দুই পার্টির মধ্যেকার আলাপ আলোচনা শুরু করতে সম্মত আছি।

সংক্ষেপে, কুওমিনতাঙ সম্ভাব্য যে তিনটি পথ নিতে পারে তার প্রথমটি হল আত্মসমর্পণ ও গৃহযুদ্ধের পথ, মিঃ চিয়াং কাই শেক ও কুওমিনতাঙ-এর ধ্বংসের পথ। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ প্রতারণাপূর্ণ বাক্চাতুরী দিয়ে একদিকে কিছুটা সময় করে নেওয়া এবং অন্যদিকে ফ্যাসিষ্ট একনায়ত্ব আঁকড়ে থেকে গোপনে গোপনে সক্রিয়ভাবে গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়ার পথটিও অনুরূপভাবে মিঃ চিয়াং কুওমিনতাঙ-এর জন্য কোন মুক্তির সন্ধান নিয়ে আসছে না। একমাত্র তৃতীয় পথ, ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ব ও গৃহযুদ্ধের ভ্রান্ত পথ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করলে এবং গণতন্ত্র ও সহযোগিতার সঠিক পথ অনুসরণ করলেই মিঃ চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ মুক্তিপথের সন্ধান পেতে পারেন। কিন্তু এ যাবৎ জনগণকে আশ্বস্ত করার মতো এমন কিছুই মিঃ চিয়াং ও কুওমিনতাঙ করেননি যাতে মনে হতে পারে যে তাঁরা তৃতীয় পথেই চলতে চান; সুতরাং সারা দেশের জনগণকে আত্মসমর্পণ ও গৃহযুদ্ধের চূড়ান্ত গুরুতর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকতেই হবে।

কুওমিনতাঙ এর সকল দেশপ্রেমিক সদস্যই ঐক্যবদ্ধ হোন এবং প্রথম পথ ধরে এগিয়ে যেতে কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষকে নিষেধ করুন, দ্বিতীয় পথ আঁকড়ে থাকা থেকে ওদের নিবৃত্ত করুন এবং তৃতীয় পথ গ্রহণ করার দাবি জানান!

জাপ-বিরোধী সকল দেশপ্রেমিক পার্টি ও জনগণ ঐক্যবদ্ধ হোন এবং কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষকে প্রথম পথ গ্রহণ করতে নিষেধ করুন, দ্বিতীয় পথ আঁকড়ে থাকা থেকে ওদের নিবৃত্ত করুন এবং তৃতীয় পথ গ্রহণ করার দাবি জানান!

বিশ্বে এক অতুলনীয় পরিবর্তন আসন্ন। আমরা আশা করি, মিঃ চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ আমাদের যুগের এই মহাসন্ধিক্ষণে নিজেদেরকে দক্ষভাবেই পরিচালনা করবেন। আমরা আশা করি, সমস্ত দেশপ্রেমিক দল ও দেশপ্রেমিক জনগণ আমাদের যুগের এই মহাসন্ধিক্ষণে দক্ষভাবেই নিজেদের পরিচালনা করবেন।

টীকা

১। ওহামপোয়া চক্র বলতে এখানে কুওমিনতাঙ-এর সেইসব সেনাপতি ও অফিসারদেরই বোঝানো হচ্ছে যারা এক সময়ে ওহামপোয়া সামরিক একাডেমিতে শিক্ষক বা সৈনিক হিসেবে নিযুক্ত ছিল। কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীতে এরা ছিল চিয়াং কাই-শেক-এর ঘনিষ্ঠতম অনুগামী।

২। ইয়ে তিং এবং সিয়াং য়িং ছিলেন নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর যথাক্রমে সৈনাধ্যক্ষ ও উপ-সৈনাধ্যক্ষ।

সংগঠিত হোন!

২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৩

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম, কল-কারখানা, সেনাবাহিনী, সরকারী ও অন্যান্য সংগঠন এবং বিদ্যালয়গুলি থেকে আগত শ্রমবীর ও বীরাঙ্গনা এবং উৎপাদনকার্যে আদর্শ কর্মী হিসেবে নির্বাচিত ব্যক্তিদের জন্য আয়োজিত এই সম্বর্ধনা সভায় আমি কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি যা বলতে চাই তাকে সংক্ষেপে বলা যায় 'সংগঠিত হোন!' বর্তমান বছরে সীমান্ত অঞ্চলের জনসাধারণ ও সৈন্য বাহিনীর লোকেরা, সরকারী ও অন্যান্য সংগঠন, বিদ্যালয় ও কল-কারখানাসমূহের লোকজনেরা গত শীতকালে কেন্দ্রীয় কমিটির উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রীয় ব্যুরোর আহূত প্রবীণ কর্মীদের সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে উৎপাদন অভিযান পরিচালনা করে এসেছেন: বর্তমান বছরে উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাট বিরাট সাফল্য ও অগ্রগতি লাভ করা গেছে এবং সীমান্ত অঞ্চলের নতুন একটি চেহারাই দেখা যাচ্ছে। প্রবীণ কর্মীদের সম্মেলনে গৃহীত নীতির সঠিকতা বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়ে পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে। এই নীতির সার কথা ছিল জনসাধারণকে সংগঠিত করা, জনগণ, সৈন্যবাহিনী, সরকারী ও অন্যান্য সংগঠন ও বিদ্যালয়সমূহ থেকে ব্যতিক্রমহীনভাবে সম্ভাব্য সকল শক্তিকে—সকল নরনারী, তরুণ ও বৃদ্ধ সকলেই যাঁরা আংশিক বা পুরো সময়ের ভিত্তিতে তাঁদের শ্রমশক্তি নিয়োজিত করতে পারবেন তাঁদের সবাইকে নিয়ে একটি বিশাল শ্রমবাহিনী গড়ে তোলা ও তাঁদের সবাইকে এই কাজে সমবেত করা। যুদ্ধ করার জন্য যেমন আমাদের একটি সৈন্যবাহিনী আছে, তেমনি শ্রম করার জন্যও আমাদের একটি সৈন্যবাহিনী রয়েছে। যুদ্ধ করার জন্য আমাদের রয়েছে অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী; কিন্তু তাঁরাও দ্বিবিধ কাজ করেন, যুদ্ধবিগ্রহ করেন আর উৎপাদনের কাজ করেন। এই দুই ধরনের সৈন্যবাহিনী এবং এই দুইটি কাজে ও জনগণের কাজে সুদক্ষ একটি সংগ্রামী সৈন্যবাহিনী

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের শ্রমবীরদের সম্মানে আয়োজিত অভ্যর্থনা সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতাটি করেছিলেন।

থাকলে আমরা আমাদের বাধাবিপত্তিগুলি দূর করতে পারব এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে পারব। সীমান্ত অঞ্চলের সাম্প্রতিক কয়েক বছরের উৎপাদন অভিযানের সাফল্য যদিও চূড়ান্তভাবে এ কথা প্রমাণ করে দেওয়ার মতো বিরাট ও উল্লেখযোগ্য কিছু হয়নি, বর্তমান বছরে আমাদের সাফল্য প্রকৃতপক্ষেই তা সপ্রমাণ করেছে এবং আমরা সকলেই আমাদের চোখের সামনে তা দেখতে পাচ্ছি।

সীমান্ত অঞ্চলের সশস্ত্র বাহিনীর যে সকল ইউনিটকে এবার জমি বরাদ্দ করে দেওয়া হয়েছে তাতে করে সৈনিকদের গড়ে জনপ্রতি আঠারো মু করে চাষের জমি পড়েছে; এবং তাঁরা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের প্রয়োজনীয় সবকিছুই, উৎপাদন করতে বা তৈরী করে নিতে পারবেন—তাঁরা তাঁদের খাদ্য (তরি-তরতারি, মাংস, রান্নার তৈল), পোশাক (তুলোর পট্টি লাগানো পোশাক, উলের পোশাক এবং জুতো), বাসস্থান (গুহাবাস, ঘরবাড়ি এবং সভা-সমিতির জন্য কক্ষ), দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র (টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ ও মনোহারি দ্রব্যাদি) এবং জ্বালানি (কাঠ, কাঠকয়লা ও কয়লা) ইত্যাদি পেয়ে যাবেন। আমরা আমাদের নিজের হাত দিয়েই 'যথেষ্ট খাদ্য ও কাপড়-চোপড়ের' লক্ষ্য অর্জন করে ফেলেছি। প্রতিটি সৈন্যকে বছরে মাত্র তিনটি মাস উৎপাদনের জন্য ব্যয় করতে হবে বাকী নয় মাস ট্রেনিং ও যুদ্ধের কাজে তিনি নিয়োজিত করতে পারবেন। আমাদের সৈন্যরা তাঁদের মাইনের জন্য কুও-মিনতাঙ সরকার, সীমান্ত অঞ্চলের সরকার বা জনগণ কারও ওপরই নির্ভর করে থাকেন না এবং তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পুরো ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। আমাদের জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে কী অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ নতুন ব্যবস্থা প্রচলিত হল। প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিগত সাড়ে ছয় বছরের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলগুলি শত্রুর 'সব কিছু পুড়িয়ে ফেল, সবাইকে হত্যা কর ও সবকিছু লুঠ করে নাও' এই নীতির শিকার হয়েছে, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল কুওমিনতাঙ কর্তৃক নিশ্ছিদ্রভাবে অবরুদ্ধ হয়ে আছে এবং আর্থিক ও অর্থ-নৈতিকভাবে আমরা চরম দুর্দশায় উপনীত হয়েছি। আমাদের সৈন্যবাহিনী যদি যুদ্ধ করা ছাড়া আর কিছুই করতে না পারতেন তবে আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারতাম না। এখন সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের সৈন্যরা উৎপাদন করতে শিখেছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যরাও তা শিখেছেন, আর অন্যরাও তা শিখছেন। আমাদের বীর অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ

বাহিনীর সংগ্রাম-সমর্থ প্রতিটি সৈনিক যদি শুধু যুদ্ধ করতে ও জনগণের কাজ করতে নয়, উৎপাদনের কাজও করতে পারেন তবে কোন বাধা-বিপত্তিকেই ভয় করার আমাদের কিছু নেই এবং মেনসিয়াস এর কথায় বলতে পারা যায় 'এই পৃথিবীতে আমরা অপরাজেয়'[১] হয়েই থাকব। আমাদের সংগঠন ও বিদ্যালয়গুলি এ বছর বিরাট অগ্রগতি সাধন করেছে; তাদের খরচের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশই সরকারের কাছ থেকে এসেছে, অধিকাংশটুকুই তারা তাদের উৎপাদন থেকে পুষিয়ে নিয়েছে। তাদের প্রয়োজনীয় তরিতরকারির শতকরা একশ ভাগই তারা উৎপাদন করেছে, গত বছর শতকরা মাত্র পঞ্চাশ ভাগ তারা উৎপাদন করতে পেরেছিল; শূকর ও মেষ পালন করে তারা তাদের মাংসের ব্যবহার অনেক পরিমাণে বাড়াতে পেরেছে এবং সাধারণ নিত্যব্যবহার্য নানা জিনিসের বহু কারখানা তারা স্থাপন করেছে। যেহেতু সৈন্যবাহিনী নানা সংগঠন ও বিদ্যালয়সমূহ এখন তাদের বৈষয়িক জিনিসপত্রের প্রয়োজন পুরোপুরি বা অনেকাংশে নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারছে তাই কর হিসেবে জনগণের কাছ থেকে অনেক কম আদায় করতে হচ্ছে, যার ফলে জনগণও তাদের নিজেদের শ্রমের ফল বেশি করে ভোগ করতে পারছে। যেহেতু সৈনিক ও অসামরিক জনগণ সকলেই উৎপাদন বাড়াচ্ছেন সকলেরই তাই যথেষ্ট খাবার ও কাপড়-চোপড় রয়েছে এবং সকলেই তাতে খুশি। আমাদের কারখানাগুলিতেও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, গুপ্তচরদের ছেঁকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাতে উৎপাদন বিরাটভাবে বেড়ে গেছে। সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে শ্রমবীররা বিরাট সংখ্যায় কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে, বিভিন্ন সংগঠনে ও বিদ্যালয়ে এবং সেনা-বাহিনীতে এগিয়ে এসেছেন। আমরা এ কথা বলতে পারি যে সীমান্ত অঞ্চলে উৎপাদনকে সঠিক পথে স্থাপন করা গেছে। জনসাধারণের শক্তিকে সংগঠিত করার ফলেই তা সম্ভবপর হয়েছে।

জনসাধারণের শক্তিকে সংগঠিত করা হল একটা কর্মনীতি। তার বিপরীত একটা কর্মনীতি আছে কি? হাঁ, আছে। এই কর্মনীতিতে গণ-দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে, জনগণের ওপর আস্থা রাখতে বা তাদের সংগঠিত করতে তা ব্যর্থ হয় এবং আর্থিক ব্যাপার, সরবরাহ অথবা ব্যবসায়িক সংগঠনে কর্মরত ক্ষুদ্রসংখ্যক লোককে সংগঠিত করার প্রতিই তা একান্ত মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে, কিন্তু গ্রামে গ্রামে, সৈন্যবাহিনীতে, সরকারী ও অন্যান্য সংগঠনে, বিদ্যালয়সমূহে এবং কল-কারখানাতে জনগণকে সংগঠিত করার প্রতি তা

কোনই মনোযোগ প্রদান করে না; অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে তা ব্যাপক আন্দোলন বা একটি সুবিস্তৃত ফ্রন্টের কাজ হিসেবে দেখে না, দেখে নিছক আর্থিক ঘাটতি পূরণের কাজ চালাবার একটি সহজ পন্থা হিসেবে। এই হচ্ছে অন্ধ কর্মনীতিটি, একটি ভ্রান্ত কর্মনীতি। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে এরকম একটি কর্মনীতি প্রচলিত ছিল কিন্তু বিগত কয় বছরের সঠিক পরিচালনার পরিণামে এবং বিশেষ করে গত বছরের প্রবীণ কর্মীদের সম্মেলনের পর ও বর্তমান বছরের গণ-আন্দোলনের পর, এখনো এইরকম চিন্তা করার মতো লোকের সংখ্যা সম্ভবতঃ খুবই অল্প। উত্তর ও মধ্য চীনের যেসব ঘাঁটি অঞ্চলে তীব্র লড়াই চলছে এবং নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলি এ ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেনি, সেখানে জনগণের উৎপাদন অভিযান যথেষ্ট ব্যাপক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এই বছরের কেন্দ্রীয় কমিটির ১লা অক্টোবরের নির্দেশাবলীর[২] পর, সর্বত্র আগামী বছরের উৎপাদন অভিযানের প্রস্তুতি চলছে। সীমান্ত অঞ্চলের চেয়ে যুদ্ধের ফ্রন্ট অঞ্চলের অবস্থা আরও অনেক বেশি অসুবিধাজনক; শুধু যে কঠিন লড়াই চলছে তাই নয়, কোন কোন অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগও দেখা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও সমগ্র পার্টি, সরকার ও সৈন্যবাহিনী এবং অসামরিক জনগণকে আমাদের সমবেত করতে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য এবং উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হওয়ার জন্য যাতে করে যুদ্ধকে সহায়তা করা যায়, 'সবকিছু পুড়িয়ে দেওয়ার, সবাইকে হত্যা করার আর সবকিছু লুণ্ঠন করার' শত্রুর এই নীতিকে মোকাবিলা করা যায় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করা যায়। এক্ষেত্রে গত কয় বছরে ইতিমধ্যেই যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা গেছে, এই শীতকালে যে মতাদর্শগত, সাংগঠনিক এবং বৈষয়িক প্রস্তুতি করা গেছে তাতে পরবর্তী বছরে একটি ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করা যায় এবং তা পরিচালনা করতেই হবে। রণক্ষেত্রের যে অঞ্চলে যুদ্ধ চলছে সেইসব জায়গায় 'যথেষ্ট খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় ঠিকই, কিন্তু 'আমাদের নিজের হাতকে কাজে লাগাও ও বাধাবিপত্তি দূর কর'—এটা সম্পূর্ণভাবেই সম্ভব এই বলতে গেলে একেবারে অবশ্যকরণীয় একটি কর্তব্য।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমবায়গুলি গণ-সংগঠন হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আমাদের সেনাবাহিনীতে, আমাদের সরকারী ও অন্যান্য সংগঠনে এবং আমাদের বিদ্যালয়সমূহে জনগণের উৎপাদনী কাজকর্মের গায়ে সমবায়ের তকমা

এঁটে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা অপ্রয়োজনীয়, তবু এই কার্যকলাপগুলি সমবায়ী প্রকৃতির, কেননা কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বাধীনে তা পরিচালনা করা হচ্ছে বিভিন্ন দপ্তরের, ইউনিটের এবং ব্যক্তিবর্গের বৈষয়িক প্রয়োজন পারস্পরিক সাহায্য ও যৌথ শ্রমকর্মের মাধ্যমে মেটাবার লক্ষ্য নিয়ে। এগুলি এক ধরনের সমবায়ই বটে।

হাজার হাজার বছর ধরে কৃষকজনগণের মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অর্থনীতির একটি ধারা চলে আসছে, এককভাবে প্রতিটি পরিবার উৎপাদনী ইউনিট হিসেবে এক্ষেত্রে গণ্য হয়। বিক্ষিপ্ত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই উৎপাদনের রূপ হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক শাসনের অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং তা কৃষকদের চিরস্থায়ী দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে; একে পরিবর্তন করার একমাত্র পথ হচ্ছে ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে তার যৌথীকরণ করা এবং এই যৌথীকরণের একমাত্র পথ হচ্ছে, লেনিনের মতে, সমবায়ের মধ্য দিয়ে।[৩] সীমান্ত অঞ্চলে ইতিমধ্যে আমরা বহু কৃষি-সমবায় গড়ে তুলেছি কিন্তু বর্তমানে তা একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের এবং সোভিয়েত ধরনের যৌথ খামার হিসেবে পরিচিত সমবায় হতে গেলে তাদের আরও বেশ কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আমাদের অর্থনীতি হচ্ছে নয়া-গণতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং আমাদের সমবায়গুলি এখনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থনীতির (অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির) ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যৌথ শ্রম-সংগঠন মাত্র। তাছাড়া, এগুলি আবার নানা ধরনের। এক ধরনের সংগঠন হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য কৃষিগত শ্রমের সংস্থা, যেমন, 'শ্রম বিনিময়কারী টীম' এবং 'শ্রম ও ক্ষেতের কাজে নিয়োজিত মজুর বিনিময়কারী টীম'[৪]; কিয়াংসির লাল অঞ্চলে এই ধরনের সংগঠন 'পারস্পরিক সহায়তাকারী শ্রমকারী গোষ্ঠী' বা 'জমিচাষকারী টীম'[৫] বলে পরিচিত ছিল এবং বর্তমানে যুদ্ধক্ষেত্রের সন্নিকটবর্তী কোন কোন জায়গায় তাদের পারস্পরিক সাহায্যকারী গোষ্ঠী' বলা হয়। যেহেতু এইগুলি হচ্ছে যৌথ পারস্পরিক সাহায্যকারী সংগঠন, জনসাধারণ এইগুলিতে স্বেচ্ছামূলকভাবেই যোগ দেবেন (কোন সময়ই জোর-জবরদস্তি প্রয়োগ করে বাধ্য করা চলবে না)—এবং এইসব সংস্থাগুলির যে নামই দেওয়া হোক না কেন, তাতে যত কম লোকই থাকুক না কেন, কয়েক কুড়ি থেকে কয়েক শ যাই সদস্যসংখ্যা হোক না কেন অথবা সদস্যরা সকলেই পুরো সময় শ্রম তাতে বিনিয়োগ করুন বা আংশিক সময় কাজ করুন না কেন, সদস্যরা সকলেই শ্রমকারী লোকজন, চাষবাসের জন্য বলদ বা যন্ত্রপাতি দিয়ে

পারস্পরিক সাহায্য করতে পারুন কি না পারুন, বা চাষবাসের পুরোদমে কাজের সময়ে একত্রে খাওয়াদাওয়া করুন কি না করুন এবং সংগঠনগুলি অস্থায়ী বা স্থায়ী যাই হোক—এই সংগঠনগুলি খুবই হিতকর সংস্থা। যৌথ শ্রমের এই পারস্পরিক সাহায্যের পদ্ধতিগুলি জনগণের নিজেদেরই উদ্ভাবিত। অতীতে কিয়াংসিতে জনগণের মধ্যেকার এইসব অভিজ্ঞতায় একটা মূল্যায়ন আমরা করেছিলাম এবং এখন উত্তর শেনসির প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাগুলির আমরা মূল্যায়ন করছি। সীমান্ত অঞ্চলে শ্রমের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্যের ব্যাপারটিকে অনেক বেশি সুবিন্যস্ত ও বিকশিত করে তোলা গেছে, গত বছর প্রবীণ কর্মীদের সভায় তার প্রতি উৎসাহ জ্ঞাপনের পর থেকে এবং চলতি সারা বছর ধরে তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা গেছে। সীমান্ত অঞ্চলে বহু শ্রম-বিনিময়কারী টীম যৌথভাবে তাদের চাষবাস করেছে, চারা পুঁতেছে, নিড়ানি দিয়েছে আর ফসল কেটেছে এবং বর্তমান বছরের ফসল হয়েছে গত বছরের দ্বিগুণ। জনগণ এখন নিজেরাই এই উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখতে পেয়েছেন, তাই বেশি বেশি করে জনগণ আগামী বছরে নিঃসন্দেহে এই পথ গ্রহণ করবেন, সীমান্ত অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ যাঁরাই পুরো সময় বা আংশিক সময়ের জন্য শ্রমদান করতে পারবেন তাঁদের সবাইকেই এক বছরে সমবায়ে সংগঠিত করে ফেলার প্রত্যাশা আমরা করি না; কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে এই লক্ষ্য পূরণ করা যাবে। অন্ততঃ কিছু পরিমাণ উৎপাদনকার্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য সকল মহিলাকেই সমবেত করতে হবে। উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সকল অকর্মণ্য বাউণ্ডুলেকে সৎ নাগরিক করে তুলতে হবে। পারস্পরিক সাহায্যকারী যৌথ উৎপাদকদের এই সমবায় ব্যাপকভাবে ও স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে উত্তর ও মধ্য চীনের জাপ-বিরোধী সকল ঘাঁটি অঞ্চলেই গড়ে তুলতে হবে।

পারস্পরিক সাহায্যকারী যৌথ কৃষি উৎপাদনের এই সমবায় ছাড়াও অন্য তিন ধরনের সমবায় রয়েছে: ইয়েনানের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা সমবায়ের মতো বহুমুখী সমবায় যাতে উৎপাদক, ভোক্তা, পরিবহনকারী (লবণ পরিবহন) এবং ঋণদানকারী সমবায়; পরিবহন সমবায় (লবণ পরিবহন টীম); এবং হস্তশিল্প সমবায়।

জনগণের মধ্যেকার এই চার ধরনের সমবায় এবং সৈন্যবাহিনী, বিদ্যালয় এবং সরকারী সংগঠন ও অন্যান্য সংগঠনের যৌথ শ্রমকারী সমবায়ের মাধ্যমে

আমরা জনগণের মধ্যেকার সকল শক্তিকে একটি বিশাল শ্রম-বাহিনীতে সংগঠিত করে তুলতে পারব। এই হচ্ছে জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ, একমাত্র এই পথই দারিদ্র্য থেকে সমৃদ্ধিতে উপনীত হওয়ার পথ এবং একমাত্র এইটিই হচ্ছে প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয়ের পথ। প্রত্যেকটি কমিউনিস্টকে জনগণের শ্রম-শক্তিকে সংগঠিত করতে শিখতে হবে। বুদ্ধিজীবীসুলভ অতীত পটভূমি-বিশিষ্ট কমিউনিস্টদেরও এটা শিখতে হবে; একবার মন স্থির করার পর ছ'মাস বা একবছরের মধ্যে তাঁরা তা রপ্ত করে নিতে পারবেন। তাঁরা জনসাধারণকে উৎপাদন সংগঠন করার ব্যাপারে এবং অভিজ্ঞতার মূল্যায়নের ব্যাপারে সহায়তা করতে পারবেন। আমাদের কমরেডরা যখন অন্যান্য দক্ষতার সঙ্গে জনগণের শ্রম সংগঠনের দক্ষতাও অর্জন করতে পারবেন, কৃষকদের তাদের পারিবারিক উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সাহায্য করতে পারবেন, শ্রম-বিনিময়কারী টীম গড়ে তুলতে, লবণ পরিবহন টীম গড়ে তুলতে, বহুমুখী সমবায় গড়ে তুলতে, সৈন্যবাহিনী, বিদ্যালয়, সরকারী ও অন্যান্য সংস্থায় উৎপাদন সংগঠন করতে, কল-কারখানায় উৎপাদন সংগঠন করতে, উৎপাদনে অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করতে, শ্রমবীরদের উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করতে এবং উৎপাদন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে সাহায্যদান করতে পারবেন—তখন বোঝা যাবে আমাদের কমরেডরা জনগণের সৃজনশীল ক্ষমতা ও উদ্যোগকে অবারিত করে তুলতে শিখে নিয়েছেন, তখন আমরা নিশ্চিতভাবেই জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়িত করে দিতে পারব এবং সমগ্র জনগণের সঙ্গে মিলিতভাবে একটি নতুন চীন গড়ে তুলতে পারব।

সমস্ত ব্যাপারেই জনগণের সঙ্গে একেবারে মিলেমিশে যাওয়া আমাদের কমিউনিস্টদের দরকার। আমাদের পার্টির সদস্যরা যদি তাঁদের সারা জীবন রুদ্ধদ্বার কক্ষেই কাটিয়ে দেন, বাইরের দুনিয়ার মুখোমুখি না হন এবং ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে অগ্রসর না হন, তাহলে চীনের জনগণের কী কল্যাণ তাঁরা করবেন? তাঁরা কিছুই করতে পারবেন না এবং পার্টি-সদস্য হিসেবে এ ধরনের লোকের আমাদের কোন দরকারও নেই। আমাদের কমিউনিস্টদের দুনিয়ার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হবে, যেতে হবে ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে, যেতে হবে গণ-সংগ্রামের মহান জগতের মধ্য দিয়ে আর গণ-সংগ্রামের প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে। 'তিনজন মুচি তাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনা একত্র করে চুকে লিয়াং-এর মতো ওস্তাদের সমান হয়ে উঠেছিলেন।'[৬] অন্য কথায়, জনগণের রয়েছে মহান

সৃজন ক্ষমতা। আসলে চীনের জনগণের মধ্যে হাজার হাজার চুকে লিয়াং রয়েছেন; তাঁরা রয়েছেন চীনের প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি শহরে। জনগণের কাছে গিয়ে তাদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, তাদের অভিজ্ঞতাকে সুসমন্বিত করে সেগুলিকে উন্নততর, সুস্পষ্ট কর্মনীতি ও কর্ম-প্রণালীতে রূপায়িত করে তুলতে হবে, তারপর জনগণের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতে হবে ঐ মূলনীতিগুলিকে ও পদ্ধতিগুলিকে কার্যকর করার জন্য তাদের আহ্বান জানাতে হবে যাতে তারা তাদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে এবং নিজেদের মুক্তি ও সুখী জীবন গড়ে তুলতে পারে। আঞ্চলিক কাজকর্মে নিযুক্ত আমাদের কমরেডরা যদি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন, তাদের ভাবনা-চিন্তা উপলব্ধি করতে ও তাদের উৎপাদন সংগঠিত করতে এবং তাদের জীবিকার উন্নতিবিধানে ব্যর্থ হন এবং যদি তাঁরা 'জাতীয় মুক্তির জন্য সমবেত শস্য সংগ্রহেই' নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন, যদি এ কথা ভুলে যান যে এর জন্য তাঁদের শতকরা দশভাগ শক্তি নিয়োজিত করলেই যথেষ্ট এবং তাঁদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের বাকী শতকরা নব্বইভাগ শক্তি কাজে লাগিয়ে 'জনগণ যাতে তাদের নিজেদের মুক্তির জন্য ব্যক্তিগত শস্য সংগ্রহের' সমস্যার সমাধান করতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করা—তা না করলে বুঝতে হবে ঐ কমরেডরা কুওমিনতাঙ-এর কাজের ধারায় দূষিত হয়ে পড়েছেন এবং আমলাতন্ত্রের ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন। কুওমিনতাঙ জনগণের কাছ থেকে শুধু চায়ই, বিনিময়ে তাদের কিছুই দেয় না। আমাদের কোন কমরেড যদি এভাবে কাজ করেন, তাহলে তাঁর কাজের ধারা হবে কুওমিনতাঙ-এর কাজের ধারার মতনই এবং তাঁর মুখ আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে আমলাতান্ত্রিকতার এমন ধুলোয় যে গরম জলের একটি পাত্রে আচ্ছা করে মুখ ধোওয়ার তাঁর দরকার হবে। আমাদের মনে হয়, আমাদের জাপ-বিরোধী সকল ঘাঁটি অঞ্চলের স্থানীয় কাজকর্মেই এই আমলাতান্ত্রিক কাজের ধারা দেখতে পাওয়া যাবে এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এমন সব কমরেড যে রয়েছেন তার কারণ হচ্ছে তাঁদের গণ-দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে। জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বন্ধন গড়ে তুলতে হলে এই কাজের ধারাকে একেবারে দৃঢ়ভাবে দূর করে দিতে হবে।

তাছাড়া, আমাদের সৈন্যবাহিনীর কাজের মধ্যে ও যুদ্ধবাজসুলভ একটি কাজের ধারা দেখা যায় যে ধারাটি কুওমিনতাঙ-এর যে সৈন্যবাহিনী জনগণ

থেকে বিচ্ছিন্ন তারই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আমাদের সৈন্যবাহিনীকে জনগণ ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যেকার, সৈন্যবাহিনী ও সরকারের মধ্যেকার, সৈন্যবাহিনী ও পার্টির মধ্যেকার, অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যেকার, সামরিক কাজ ও রাজনৈতিক কাজের মধ্যেকার, সৈনিক-কর্মীদের নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারক সঠিক নীতিই অনুসরণ করতে হবে এবং কোন সময়ই যুদ্ধবাজসুলভ ভুল করা চলবে না। অফিসারগণকে তাঁদের সৈনিক-দের যত্ন নিতে হবে এবং তাঁদের কল্যাণ সম্পর্কে উদাসীন থাকলে চলবে না বা শারীরিক শাস্তিদান করলে চলবে না; সৈন্যবাহিনীকে জনগণের যত্ন নিতে হবে, কোন সময়ই তাদের স্বার্থের হানি করলে চলবে না; সৈন্যবাহিনীকে সরকারকে ও পার্টিকে মান্য করতে হবে এবং কোন সময়ই 'স্বাধীনতা জাহির করা' তার চলবে না। আমাদের অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী হচ্ছেন জনগণের সেনাবাহিনী; তাঁরা সব সময়ই খুব চমৎকার বাহিনী হয়ে আছেন এবং বস্তুতঃ দেশের মধ্যে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী। কিন্তু এটাও সত্য যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এক বিশেষ ধরনের যুদ্ধবাজ-সুলভ আচরণ তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছে এবং সৈন্যবাহিনীর কিছু কমরেড সৈনিকদের প্রতি, জনগণের প্রতি, সরকার ও পার্টির প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে উদ্ধত ও জবরদস্তির মনোভাবসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন, সব সময় আঞ্চলিক কাজ-কর্মে নিযুক্ত কমরেডদের দোষ দিচ্ছেন, কিন্তু কোন সময়ই নিজেদের দায়ী করছেন না, সব সময় খালি নিজেদের সাফল্যই দেখছেন কিন্তু কোন সময়ই নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছেন না, সব সময়ই তোষামোদকে আস্কারা দিচ্ছেন কিন্তু কোন সময়ই সমালোচনাকে সহ্য করছেন না। দৃষ্টান্ত হিসেবে, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে এসব ব্যাপার নজরে পড়বে। গত বছরে প্রবীণ কমরেডদের সম্মেলন এবং সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সভার পর এবং 'সরকারকে সমর্থন করুন ও জনগণের যত্ন নিন' ও এই বছরের বসন্তকালীন উৎসবের সময়[7] 'সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করুন' এই অভিযানগুলির পর এই মনোভাবকে মূলগতভাবে দূর করা গেছে; কিন্তু এখনো এমন কিছু অবশেষ তলানি হিসেবে রয়ে গেছে যেগুলি একেবারে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য আমাদের আরও প্রয়াস চালাতে হবে। উত্তর ও মধ্য চীনের ঘাঁটি অঞ্চলে, পার্টি সংগঠনে ও সৈন্যবাহিনীতেও এসব দোষত্রুটি চোখে পড়ে এবং এগুলিকে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য আরও প্রয়াস চালাতে হবে।

আঞ্চলিক কাজকর্মে আমলাতান্ত্রিকতার প্রতি ঝোঁক হোক বা সৈন্য-বাহিনীর কাজে যুদ্ধবাজসুলভ মনোভাবই হোক, দোষত্রুটির প্রকৃতি কিন্তু একই অর্থাৎ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা। কমরেডদের মধ্যেকার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠরাই হচ্ছেন ভাল কমরেড়। সমালোচনা করার পর এবং তাঁদের ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেওয়ার পর তাঁরা তাঁদের ভুলত্রুটিগুলি শুধরে নেন। কিন্তু আত্ম-সমালোচনা একেবারে অবশ্য করণীয় কর্তব্য এবং ভ্রান্ত মনোভাবগুলিকে পুরোপুরি মোকাবিলা করতে হবে এবং সততার সঙ্গে শুধরে নিতে হবে। আঞ্চলিক কাজের প্রতি আমলাতান্ত্রিকতার এই ঝোঁক এবং সৈন্যবাহিনীর কাজের ক্ষেত্রে যুদ্ধবাজসুলভ মনোভাবের সমালোচনা করতে যদি কেউ ব্যর্থ হন, তাহলে বুঝতে হবে যে কুওমিনতাঙসুলভ কাজের ধারাই তিনি বজায় রাখতে চান এবং অন্যদিক থেকে তার এমন পরিচ্ছন্ন মুখে আমলাতান্ত্রিকতা ও যুদ্ধবাজসুলভ মানসিকতার ধুলোই তিনি লাগিয়ে রেখে দিতে চান, আর তিনি একজন ভাল কমিউনিস্টই নন। এই দুই মনোভাবকে যদি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় তবে উৎপাদন অভিযানের কাজ সহ আমাদের সকল কাজই অবাধে এগিয়ে যেতে পারবে।

কৃষকজনগণের মধ্যে বা সরকারী ও অন্যান্য সংগঠনে, বিদ্যালয়ে, সৈন্য-বাহিনীতে ও কলে-কারখানায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বিরাট সাফল্য অর্জন করা গেছে তার ফলে আমাদের সীমান্ত অঞ্চলের গোটা চেহারাটাই পুরোপুরি বদলে গেছে এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়েছে। এসব কিছু থেকে বোঝা যায় যে আমাদের কমরেডদের অনেক জোরদার একটি গণদৃষ্টিভঙ্গিই রয়েছে এবং জনগণের সঙ্গেই এক হয়ে ওঠার ব্যাপারে তাঁরা প্রচুর অগ্রগতি সাধন করেছেন। তা সত্ত্বেও আমাদের আত্মসন্তুষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না এবং আত্মসমালোচনা আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে ও আরও অগ্রগতির জন্য প্রয়াস চালাতে হবে। উৎপাদন ক্ষেত্রেও আরও অগ্রগতি-লাভের জন্য আমাদের প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের মুখমণ্ডল যেহেতু ময়লা হয়ে যেতে পারে তাই আমাদেরই প্রতিদিনই তা ধুতে হবে; মেঝেটাতে তো প্রতিদিনই ধুলো জমতে পারে, তাই প্রতিদিনই তাকে ঝাঁট দিতে হবে। যদিও আঞ্চলিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিকতার মনোভাব এবং সৈন্যবাহিনীর কাজকর্মে যুদ্ধবাজসুলভ মনোভাব মূলতঃ দূর করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, ঐ খারাপ প্রবণতাগুলি কিন্তু আবার দেখা দিতে পারে। জাপানী

সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের ঘিরে ধরেছে এবং আমাদের বসবাস করতে হচ্ছে বিশৃংখল পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে, আর স্বাভাবিকভাবেই আমলাতান্ত্রিকতা ও যুদ্ধবাজসুলভ মনোভাবের ধুলো-ময়লা প্রতিদিন আমাদের মুখমণ্ডলে উড়ে এসে পড়বে। সুতরাং, প্রতিটি সাফল্যেই আমাদের আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়লে চলবে না। ঠিক যেমন ধুলো-ময়লা দূর করে তা পরিষ্কার রাখার জন্য আমরা প্রতিদিন আমাদের মুখ ধুই বা প্রতিদিন আমরা যেমন ঘরের মেঝে ঝাঁট দিই তেমনি আমাদের আত্মতৃপ্তিকে সব সময় যাচাই করে দেখতে হবে এবং আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি-গুলিকে অনবরত সমালোচনা করতে হবে।

উৎপাদন ক্ষেত্রের শ্রমবীর ও আদর্শ কর্মীরা! আপনারা জনগণের নেতা, আপনারা আপনাদের কাজে খুবই সাফল্য অর্জন করেছেন; কিন্তু আমি আশা করি আপনারা আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়বেন না। আমি আশা করছি, যখন আপনারা কুয়ানচুং, লুংতুং, সানপিয়েন, সুইতে এবং ইয়েনান উপ বিভাগীয় অঞ্চলে[৮] ফিরে যাবেন, আপনাদের সংগঠন, বিদ্যালয়, সেনাবাহিনীর ইউনিট ও কল-কারখানায় ফিরে যাবেন, আপনারা জনগণকে সেখানে নেতৃত্ব দেবেন, জনসাধারণকে পথ দেখাবেন এবং আরও ভালভাবে কাজ করবেন এবং সবার আগে জনসাধারণকে স্বেচ্ছামূলকভাবে সমবায়ে সংগঠিত করে তুলবেন, তাদের আরও ভালভাবে এবং আরও অনেক বেশি সংখ্যায় সংগঠিত করে তুলবেন। আমি আশা করছি, আপনারা যখন কর্মস্থলে ফিরে যাবেন তখন এই কাজই আপনারা করবেন এবং তা প্রচার করবেন, যাতে করে আগামী বছরের শ্রমবীরদের সম্মেলনের আগে আমরা আরও বিরাট সাফল্য অর্জন করতে পারি।

টীকা

১। **মেনসিয়াস**, তৃতীয় খণ্ড, 'কুঙসুন চৌ', প্রথম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায় থেকে।

২। 'ঘাঁটি অঞ্চলসমূহে খাজনা হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং "সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে সাহায্য করার" অভিযানকে প্রসারিত করুন' এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির ১লা অক্টোবরের নির্দেশাবলী। (বর্তমান খণ্ডের ১৬৮-৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন।)

৩। 'সমবায় প্রসঙ্গে': ভি. আই. লেনিন, **নির্বাচিত রচনাবলী,** ইংরাজী সংস্করণ, বিদেশীভাষা প্রকাশন সংস্থা, মস্কো, ১৯৫২, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৭১৫-৭২৩।

৪। 'শ্রম বিনিময়কারী টীম' এবং 'শ্রম ও ক্ষেতের কাজের নিয়োজিত মজুর বিনিময়কারী টীম' এই দুটোই ছিল শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে কৃষিকাজে, যৌথভাবে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য গঠিত শ্রম-সংগঠন। শ্রম-বিনিময় হচ্ছে একটা মাধ্যম যার সাহায্যে কৃষকেরা নিজেদের মধ্যে শ্রম-শক্তির সামঞ্জস্য বিধান করে নেন। মানুষের শ্রমদিবসকে মানুষের শ্রমদিবসের সঙ্গে, বলদের-শ্রমদিবসকে বলদের-শ্রমদিবসের সঙ্গে এবং মানুষের-শ্রমদিবসকে বলদের-শ্রমদিবসের সঙ্গে ইত্যাকারে বিনিময় করা হয়। যেসব কৃষকেরা শ্রম বিনিময়কারী টীমে যোগ দেন তাঁরা তাঁদের শ্রমশক্তি বা তাঁদের প্রতি-পালিত পশুদের শক্তি প্রত্যেকটি সদস্য-পরিবারের জমি যৌথভাবে চাষ করার জন্য পালাক্রমে দান করেন। হিসেব-নিকেশ করার সময় শ্রমদিবসকে বিনিময়ের একক হিসেবে ধরা হয়; যারা বেশি মানুষ-শ্রমদিবস বা পশু-শ্রমদিবস দান করবেন তাঁদের পাওনা বাড়তিটুকু যাঁরা কম শ্রমদিবস দান করেছেন তাঁরা মিটিয়ে দেন। 'শ্রম ও কৃষিকাজে নিয়োজিত মজুর বিনিময়কারী টীম' সাধারণতঃ কম জমির মালিক কৃষকেরা গড়ে থাকেন। পারস্পরিক সাহায্যের জন্য নিজেদের মধ্যে কাজ বিনিময় ছাড়াও ঐ টীমগুলির সদস্যরা নিজেরা মিলিতভাবে যাঁদের শ্রমশক্তির অভাব রয়েছে সেইসব পরিবারগুলির জন্য মজুর খেটে দেন।

৫। ব্যক্তিগত কৃষিকার্যের ওপর ভিত্তি করে পারস্পরিক সাহায্যকারী শ্রমদানকারী গোষ্ঠী ও চাষবাসকারী টীম লাল এলাকার কৃষকেরা গড়ে তুলেছিলেন শ্রমশক্তির উন্নততর সংগঠনের মধ্য দিয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে তোলার জন্য। স্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক হিতের জন্য সদস্যরা একে অন্যের জন্য সমান পরিমাণ কাজ করে দিতেন বা একজন যদি আরেকজনকে ঠিক সমান পরিমাণ সাহায্য ফিরিয়ে দিতে না পারতেন তবে নগদ পয়সায় সেই ব্যবধানটুকু পুষিয়ে দিতেন। একে অন্যকে সাহায্য করা ছাড়াও, এই টীমগুলি লালফৌজের সৈন্যদের পরিবারের প্রতি সুবিধাজনক সহায়তা দান করত এবং শুধুমাত্র কাজের সময়কার খাবারের বিনিময়ে দুর্দশা-গ্রস্ত বৃদ্ধদের জন্য বিনা মজুরিতে কাজ করে দিত। পারস্পরিক সাহায্যের

এই ব্যবস্থাগুলি যেহেতু উৎপাদনের পক্ষে খুবই সহায়ক ছিল এবং যেহেতু সেগুলি বাস্তববুদ্ধিসম্মতভাবে পরিচালনা করা হতো, তাই ঐগুলি জনসাধারণের উষ্ণ সমর্থন লাভ করে।

৬। চুকে লিয়াং ছিলেন 'তিন রাজ্যের' সময়কার (২২১-২৬৫ খ্রীঃ) একজন রাষ্ট্র নীতিবিদ ও রণনীতি বিশারদ। চীনের লোককাহিনীতে তিনি জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার প্রতীকস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন।

৭। বসন্ত উৎসব হচ্ছে চীনের চান্দ্র বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী নববর্ষ দিবসের উৎসব।

৮। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে এই পাঁচটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছিল।

আমাদের অধ্যয়ন এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

১২ই এপ্রিল, ১৯৪৪

(১)

গত শীতকাল থেকে পার্টির প্রবীণ কমরেডরা পার্টির ইতিহাসে যে দুটি লাইন চলে আসছে সেই প্রশ্নটি নিয়ে অধ্যয়ন করে আসছেন। বিপুল সংখ্যক প্রবীণ কমরেডের রাজনৈতিক মান তার ফলে খুবই বিরাটভাবে উন্নতিলাভ করেছে। এই অধ্যয়নকালে কমরেডরা বহু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো তাদের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ :

১। আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা অধ্যয়নকালে আমরা কী মনোভাব গ্রহণ করব সেই প্রশ্ন সম্পর্কে। কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে যে পার্টির ইতিহাসে যে প্রশ্নগুলি দেখা দিয়েছে সেগুলি সম্পর্কে কর্মীদের মতাদর্শগত দিক থেকে একেবারে পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার করে বুঝে নিতে সাহায্য করতে হবে এবং একই সঙ্গে যেসব কমরেড অতীতে ভুলভ্রান্তি করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় আমাদের নমনীয় একটি নীতিই গ্রহণ করতে হবে যাতে করে একদিকে কর্মীরা আমাদের পার্টির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং অতীতের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি

১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থা ও প্রবীণ কর্মীরা পার্টির ইতিহাস নিয়ে, বিশেষ করে ১৯৩১ সালের শুরু থেকে ১৯৩৪ সালের শেষ পর্যন্ত সময়টুকুর পার্টির ইতিহাস নিয়ে, আলোচনা করেন। এইসব আলোচনা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে পার্টিতে মতাদর্শগত ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে বিরাটভাবে সাহায্য করে। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে কিউচৌ-এর সুনাইতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর বর্ধিত সভায় ১৯৩১ সালের শুরু থেকে ১৯৩৪ সালের শেষ পর্যন্ত যে 'বামপন্থী' ভ্রান্ত লাইন অনুসৃত হচ্ছিল তা সংশোধন করে, কেন্দ্রীয় পরিচালন সংস্থার গঠনে পরিবর্তন নিয়ে আসে, কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং পার্টির লাইনকে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পথে পুনরায় স্থাপন করে। তা সত্ত্বেও বহু কর্মীদের পক্ষে অতীতের ভ্রান্ত লাইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে উপনীত হওয়া তখনো সম্ভব হয়নি। পার্টি-কর্মীদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শগত মান আরও উন্নততর করে তোলার জন্য ১৯৪২-৪৩ সালে

পরিহার করতে পারবেন, আবার অন্যদিকে সাধারণ প্রয়াসে সকল কমরেডগণকেই ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। আমাদের পার্টির ইতিহাসে চেন তু-শিউ[১] এবং লি লি-সানের ভুল লাইনগুলির বিরুদ্ধে বিরাট বিরাট সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল এবং সেগুলি একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু যে পদ্ধতিগুলি গৃহীত হয়েছিল তাতে ত্রুটি ছিল। প্রথম কথা হচ্ছে, ভুলগুলির কারণ; কী পরিস্থিতিতে ভুলগুলি হয়েছিল এবং এইগুলি শোধরানোর বিস্তারিত পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে কর্মীদের পরিপূর্ণ মতাদর্শগত উপলব্ধি জাগিয়ে তোলা হয়নি, যাতে করে একই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভবপর হয়নি; এবং অন্য কথাটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্বের ওপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয়ে গিয়েছিল যার ফলে যত বেশি সংখ্যক মানুষকে আমাদের সাধারণ প্রয়াসে ঐক্যবদ্ধ করা যেত তা করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম। এই দুটি ত্রুটি থেকে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বর্তমানে পার্টির ইতিহাসের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনাকালে আমাদের কিছু কিছু কমরেডকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করলেই চলবে না, যে পরিস্থিতিতে এই ভুলগুলি হয়েছিল তার বিশ্লেষণের ওপর, ভুলগুলির বিষয়বস্তুর ওপর এবং তাদের সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং ভাবাদর্শগত মূলের ওপর জোর দিতে হবে এবং তা করতে হবে 'অতীত ভুলগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যৎ ভুলগুলি পরিহার করার জন্য' এবং 'রোগ দূর করা কিন্তু রোগীকে রক্ষা করার' মনোভাব থেকে যাতে মতাদর্শের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা ও কমরেডদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার দ্বিবিধ লক্ষ্য অর্জন

পলিটব্যুরো পার্টির ইতিহাস নিয়ে অনেকগুলি আলোচনার আয়োজন করে এবং তারপর ১৯৪৩-৪৪ সালে সমগ্র পার্টির প্রবীণ কমরেডদের মধ্যে অনুরূপ আলোচনা পরিচালনার ব্যবস্থা করে। এই আলোচনাগুলি ১৯৪৫ সালে পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তুতির এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হয়ে দাঁড়ায় যাতে করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে অতুলনীয় মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক ঐক্য পার্টির পক্ষে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এই আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়েই ১৯৪৪ সালের ১২ই এপ্রিল ইয়েনানে প্রবীণ কর্মীদের একটি সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ যে বক্তৃতা করেন তাই হচ্ছে 'আমাদের অধ্যয়ন এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতি'। ১৯৩১ সালের শুরু থেকে ১৯৩৪ সালের শেষ পর্যন্ত 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী যে লাইন অনুসৃত হয় তার ভুলগুলি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটি যে আনুপূর্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তারজন্য 'আমাদের পার্টির ইতিহাসের কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত' দেখুন। এই সিদ্ধান্তটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির সপ্তম বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত হয়; বর্তমান প্রবন্ধটির পরিশিষ্ট হিসেবে তা তারপরই মুদ্রিত হয়েছে।

করা সম্ভবপর হয়। ব্যক্তিগতভাবে কমরেডদের ব্যাপারগুলি বিচার করার সময় সতর্ক মনোভাব গ্রহণ করা, যেমন নানা বিষয়কে পাশ কাটিয়ে না যাওয়া, তেমনি কমরেডদের ক্ষতিও না করা—এই মনোভাব গ্রহণ করা থেকে বোঝা যায় আমাদের পার্টি প্রাণবন্ত এবং তার শ্রীবৃদ্ধিই ঘটছে।

২। সমস্ত প্রশ্নগুলিকে বিশ্লেষণাত্মকভাবে গ্রহণ করুন; কোন কিছুকেই খারিজ করে দেবেন না। উদাহরণ হিসেবে, চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন[২] থেকে সুনাইতে অনুষ্ঠিত সভা[৩] পর্যন্ত সময়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের লাইনকে এই দুই দিক থেকেই বিচার করতে হবে। এটা দেখিয়ে দেওয়া চাই যে একদিকে রাজনৈতিক রণকৌশল, সামরিক রণকৌশল ও কর্মী সংক্রান্ত যে কর্মনীতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদানকারী সংস্থা ঐ সময়ে গ্রহণ করেছিলেন, তা প্রধান প্রধান দিক থেকে ভুল থাকলেও, অন্যদিক থেকে, চিয়াং কাই-শেকের বিরোধিতা করা ও কৃষি-বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং লালফৌজের সংগ্রামের মৌলিক প্রশ্নে আমাদের ও যেসব কমরেড ভুল করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। এমনকি ঐ রণকৌশলগত দিককেও বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, জমি সংক্রান্ত প্রশ্নে অতি-বামপন্থী নীতি অনুযায়ী তাঁরা জমিদারদের কোনই জমি বরাদ্দ করেননি এবং ধনী কৃষকদের অনুর্বর জমিই শুধু বরাদ্দ করেছিলেন—তাঁদের ভুল হয়েছিল সেখানেই, কিন্তু জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে জমিহীন বা নামমাত্র অল্পজমির মালিক কৃষকদের মধ্যে তা বিলি করে দেওয়ার ব্যাপারে ঐ কমরেডদের সঙ্গে আমরা একমতই ছিলাম। বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণই 'মার্কসবাদের একান্ত আসল সার কথা, মার্কসবাদের একেবারে জীবন্ত মর্মবস্তু'[৪]—এই হচ্ছে লেনিনের কথা। বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব না থাকার ফলে আমাদের অনেক কমরেডই কোন জটিল বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করেন না, সেগুলিকে বারে বারে বিচার ও অধ্যয়ন করেন না, শুধু সরল সিদ্ধান্ত টানতে চান যেগুলি হয় চূড়ান্ত সমর্থক বা একেবারে চূড়ান্ত নেতিবাচক। আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে বিশ্লেষণাত্মক রচনার অভাবের বাস্তব সত্য এবং বিশ্লেষণের অভ্যাস এখনো পার্টিতে যে পুরোপুরি রপ্ত হয়নি তা থেকেই দেখা যায় এ ধরণের ত্রুটিবিচ্যুতি এখনো রয়ে গেছে। এখন থেকে এই অবস্থার সংশোধন আমাদের করতেই হবে।

৩। ষষ্ঠ জাতীয় পার্টি কংগ্রেসের দলিলগুলির আলোচনা সম্পর্কে

এ কথা বলতে হবে যে ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের লাইন ছিল মূলতঃ সঠিক কেননা ঐ কংগ্রেস বর্তমান বিপ্লবের চরিত্রকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক হিসেবে নিরূপণ করেছিল, ঐ সময়ের পরিস্থিতিকে দু'টি উচ্চ বৈপ্লবিক জোয়ারের অন্তর্বর্তী অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, সুবিধাবাদকে এবং আচমকা জোর করে ক্ষমতা দখলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং দশ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছিল।[৫] এইসবই ছিল সঠিক। কংগ্রেসের ত্রুটিও ছিল। উদাহরণ হিসেবে, অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলের মধ্যে ছিল তা চীনের বিপ্লবের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি এবং বিপ্লবে গ্রামীন ঘাঁটি এলাকার অত্যন্ত বিপুল গুরুত্বকে দেখিয়ে দিতে তা ব্যর্থ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস আমাদের পার্টির ইতিহাসে একটি প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল।

৪। ১৯৩১ সালে সাংহাইয়ে যে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরে যে পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন[৬] আহূত হয়েছিল ঐগুলি বিধিসঙ্গত ছিল কিনা এই প্রশ্ন সম্পর্কে। কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে যে, ঐ দুটিই বিধিসঙ্গত ছিল কিন্তু এটাও বলা দরকার যে নির্বাচনের যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল তা যথেষ্ট ছিল না এবং এই ঘটনাটিকে একটি ঐতিহাসিক শিক্ষা হিসেবেই গ্রহণ করা দরকার।

৫। পার্টির ইতিহাসে উপদলের প্রশ্ন সম্পর্কে। এটা বলতে হবে যে সুনাইয়ে অনুষ্ঠিত সভার পর থেকে ধারাবাহিক যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার ফলে আগে যে উপদলগুলি ছিল এবং যারা আমাদের পার্টির ইতিহাসে একটি অস্বাস্থ্যকর ভূমিকা পালন করত তাদের আর অস্তিত্ব নেই। পার্টির ভেতরে দুটি লাইন সম্পর্কে আমাদের বর্তমান অধ্যয়নে এই উপদলগুলির অস্তিত্ব যে ছিল এবং তারা যে অস্বাস্থ্যকর একটি ভূমিকা পালন করত তা দেখিয়ে দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু ঐ একই ভ্রান্ত রাজনৈতিক লাইন ও সাংগঠনিক পদ্ধতি সহ উপদলগুলি এখনো পার্টিতে রয়েছে এ কথা ভাবা ভুল হবে;—১৯৩৫ সালের জানুয়ারীতে সুনাইয়ে অনুষ্ঠিত সভা, ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন, ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরে পলিটব্যুরোর বর্ধিত অধিবেশন,[৭] ১৯৪২ সালে সমগ্র পার্টি জুড়ে শুদ্ধিকরণ আন্দোলন এবং ১৯৪৩ সালের শীতকাল থেকে পার্টির মধ্যে দুটি লাইনের ভেতর অতীতের সংগ্রামগুলি নিয়ে যে অধ্যয়নের অভিযান শুরু হয়েছে— এতগুলি অন্তঃপার্টি সংগ্রামের ফলে সাধিত সমস্ত পরিবর্তনের পর পার্টিতে

ঐ উপদলগুলি রয়েছে ভাবা ভুল হবে। পুরানো উপদলগুলি বিদায় হয়েছে। যা বাকী রয়েছে তা হচ্ছে মতান্ধ ও অভিজ্ঞতাবাদী ভাবাদর্শের কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এবং আমাদের শুদ্ধিকরণ আন্দোলনকে অব্যাহত রেখে ও তীব্রতর করে এগুলিকে আমরা দূর করে দিতে পারব। কিন্তু আমাদের পার্টিতে এখনো গুরুতর আকারে এবং প্রায় সর্বত্র যা বর্তমান রয়েছে তা হচ্ছে অনেকটা অন্ধ 'পর্বতকেন্দ্র প্রীতির' মানসিকতা।[৮] দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, পারস্পরিক সমঝওতার, পারস্পরিক শ্রদ্ধার এবং বিভিন্ন ইউনিটের কমরেডদের মধ্যে ঐক্যের অভাব বর্তমান রয়েছে এবং এটা দেখা দিয়াছে তাদের সংগ্রামের পটভূমির বিভিন্নতা, তাদের কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতা (যেমন, একটি ঘাঁটি অঞ্চলের সঙ্গে অন্য ঘাঁটি অঞ্চলের এবং জাপান-অধিকৃত এলাকা, কুওমিনতাঙ এলাকা এবং বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার মধ্যেকার বিভিন্নতা) এবং তাদের বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যেকার বিভিন্নতা (যেমন, একটি সেনাবাহিনীর ইউনিট ও অন্য ইউনিটের মধ্যেকার এবং এক ধরনের কাজের সঙ্গে অন্য ধরনের কাজের মধ্যেকার বিভিন্নতা) থেকে ; এই ব্যাপারটিকে খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার মনে হতে পারে কিন্তু আসলে এর ফলে পার্টির ঐক্য এবং সংগ্রামের সামর্থ্যের বিকাশের পথে গুরুতর বাধা সৃষ্টি হয়। পর্বতকেন্দ্র প্রীতির এই মানসিকতার সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল নিহিত রয়েছে এই বাস্তব তথ্যের মধ্যে যে চীনের পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী সংখ্যায় বিশেষ রকমের বিপুল এবং দীর্ঘকাল আমাদের গ্রাম্য ঘাঁটি এলাকাগুলি শত্রু কর্তৃক একটি অন্যটির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল এবং চিন্তাগত দিক থেকে তার কারণ হচ্ছে অন্তঃপার্টি শিক্ষার স্বল্পতা। আমাদের সামনে গুরুতর কর্তব্য হচ্ছে এই কারণগুলি দেখিয়ে দেওয়া, আমাদের কমরেডদের বুঝিয়ে এই অন্ধতার কবল থেকে তাদের মুক্ত করা এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করা, ভাবাদর্শগত যে প্রতিবন্ধকতাগুলি কমরেডদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছে তা ভেঙে ফেলা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝওতা ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা যাতে করে সমগ্র পার্টিতে ঐক্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

সমগ্র পার্টি কর্তৃক এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা সৃষ্টি হলে তা যে পার্টির মধ্যেকার বর্তমান অধ্যয়নের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করবে তাই নয়, তা চীন বিপ্লবের বিজয়কেও সুনিশ্চিত করে তুলবে।

বর্তমান পরিস্থিতির দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে: একটি হচ্ছে ফ্যাসি-বিরোধী ফ্রণ্ট অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে ও ফ্যাসিষ্ট ফ্রণ্টের শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, আর অন্যটি হচ্ছে ফ্যাসি-বিরোধী ফ্রণ্টের মধ্যে জনগণের শক্তিগুলি অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে ও গণ-বিরোধী শক্তিগুলি দুর্বল হয়ে পড়ছে। প্রথম বৈশিষ্ট্যটি খুবই স্পষ্ট এবং সহজেই তা দেখা যাচ্ছে। খুব শীঘ্রই হিটলারের পরাজয় ঘটবে এবং জাপানী আক্রমণকারীরাও পতনের দিকে চলেছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি তত স্পষ্ট নয় এবং সহজে তা চোখেও পড়ে না কিন্তু প্রতিদিনই ইউরোপে, ব্রিটেনে, যুক্তরাষ্ট্রে এবং চীনে তা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

চীনে জনগণের শক্তির এই বিকাশকে সমগ্র চিত্রটির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আমাদের পার্টিকে রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের পার্টির বিকাশকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে। প্রথম পর্যায় হচ্ছে ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত। এই পর্যায়ের ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সাল এই দুটি বছর জাপানী সমরতন্ত্রীরা কুওমিনতাঙকে খুবই গুরুত্ব সহকারে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে একান্ত হেলাভরে গ্রহণ করেছিল; সুতরাং তারা তাদের মূল বাহিনীগুলিকে কুওমিনতাঙ-এর বিরোধী ফ্রণ্টে নিয়োজিত করেছিল এবং কুওমিনতাঙ-এর প্রতি তাদের নীতির ক্ষেত্রে মূল জোর ছিল সামরিক আক্রমণের ওপর, আর আত্মসমর্পণে প্ররোচিত করার জন্য রাজনৈতিক চাপ ছিল গৌণ প্রকৃতির; তারা কমিউনিস্ট ঘাঁটি অঞ্চলগুলিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেনি, ধরেই নিয়েছিল যে এগুলি হচ্ছে গেরিলা কার্যকলাপে রত মুষ্টিমেয় কিছু কমিউনিস্টের কাজকর্ম মাত্র। কিন্তু ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে উহান দখল করার পর জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নীতি বদলাতে শুরু করে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে গুরুত্ব সহকারে ও কুওমিনতাঙকে হেলাভরে গ্রহণ করতে থাকে। কুওমিনতাঙ-এর প্রতি তাদের নীতির ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণে প্ররোচিত করার জন্য রাজনৈতিক চাপ দেওয়াকেই তারা তাদের নীতি মূল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং সামরিক আক্রমণকে গৌণ ব্যাপার করে তোলে এবং এভাবে একই সঙ্গে ক্রমে ক্রমে তাদের মূল বাহিনীগুলিকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে। কারণ, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা তখন বুঝতে পারছিল যে আর কুওমিনতাঙ নয় কমিউনিস্ট পার্টিই তাদের ভয়ের ব্যাপার। ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সালে কুওমিনতাঙ তাদের অধিকাংশ প্রয়াস প্রতিরোধ-যুদ্ধে

নিয়োজিত করে, আমাদের পার্টির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল তুলনামূলকভাবে ভালই এবং জনগণের জাপ-বিরোধী আন্দোলনে যদিও তাঁরা অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল তবু বেশ খানিকটা স্বাধীনতাও তারা স্বীকার করে নিয়েছিল। উহানের পতনের পর কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়ের ভয়ে ভীত হয়ে এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁদের ক্রমবর্ধমান শত্রুতার জন্য কুওমিনতাঙ ক্রমেই বেশি বেশি করে প্রতিক্রিয়াশীল, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বেশি বেশি করে সক্রিয় এবং জাপানের বিরুদ্ধে বেশি বেশি করে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে থাকে। ১৯৩৭ সালে গৃহযুদ্ধের যুগের পশ্চাদপসরণের পরিণাম হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠিত সদস্যসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার এবং সৈন্যবাহিনীর সৈনিকদের সংখ্যা ত্রিশ হাজারে এসে দাঁড়ায়; সুতরাং জাপানী সমরবাদীরা তাকে নিতান্ত হেলাভরেই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯৪০ সালের মধ্যে পার্টির সদস্যসংখ্যা আট লক্ষে পৌঁছায়, আমাদের সৈন্যবাহিনী প্রায় পাঁচ লক্ষে দাঁড়ায় এবং ঘাঁটি এলাকার জনসংখ্যা যাঁরা শুধু আমাদের শস্যকর দেন এবং যাঁরা আমাদের এবং জাপানী ও ক্রীড়নকদেরও[৯] দুই পক্ষকেই শস্যকর দেন তাঁদের নিয়ে মোট দাঁড়ায় প্রায় দশ কোটিতে। গত কয় বছরে আমাদের এমন সুবিস্তৃত সমরাঙ্গন সৃষ্টি অর্থাৎ মুক্ত এলাকা সৃষ্টি করেছে যে গত সাড়ে পাঁচ বছর ধরে কুওমিনতাঙ ফ্রন্টের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণকারীদের প্রধান শক্তিগুলিকে রণনীতিগত আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করেছে এবং জাপানী ঐ বাহিনীগুলিকে আমাদের বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে, আর নিজেদের রণক্ষেত্রের সংকটের হাত থেকে কুওমিনতাঙকে উদ্ধার করেছে ও প্রতিরোধ-যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্রকে অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু ঐ পর্যায়ে আমাদের পার্টির কিছু কিছু কমরেড একটা ভুল করেন; তাঁরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে ছোট করে দেখেন (তাঁর যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী ও নির্মম প্রকৃতি দেখতে পাননি, বিপুল সৈন্যদলের সমাবেশ করে সম্মুখ সমরের দাবি করেন এবং গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহকে খাটো করে দেখেন), কুওমিনতাঙ-এর ওপর নির্ভরতা স্থাপন করেন এবং ধীরস্থিরভাবে একটি স্বাধীন নীতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হন (তারই জন্য কুওমিনতাঙ-এর প্রতি তাঁদের আত্মসমর্পণের মনোভাব দেখা দেয় এবং সাহসের সঙ্গে বাধাবন্ধহীনভাবে জনগণকে জাগিয়ে তুলে শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্ভাগে আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীন সৈন্যবাহিনীর প্রসার সাধনের নীতি প্রয়াস করার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে দোদুল্যমানতা দেখা দেয়)। ইতিমধ্যে এটিকে আমাদের

পার্টিতে বিরাট সংখ্যক এমন নতুন সদস্য সংগ্রহ করা হয়েছে যারা তখনো অনভিজ্ঞ এবং শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের প্রতিষ্ঠিত সব কটি ঘাটি অঞ্চলই ছিল আনকোরা ও তখনো সেগুলি সুসংহত হয়ে উঠেনি। এই পর্যায়ে সাধারণ পরিস্থিতির অনুকূল বিকাশের ধারা, আমাদের পার্টি ও সশস্ত্র বাহিনীর বিপুল বিস্তারের ফলে পার্টির মধ্যে এক ধরনের আত্মতৃপ্তিবোধ দেখা দেয় এবং অনেক সদস্যেরই অহংকারবোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে অবশ্য আমরা পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি প্রতিরোধ করতে সমর্থ হই এবং স্বাধীন নীতিই চালিয়ে যাই; আমরা যে শুধু জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে কঠিন আঘাত করলাম, নতুন নতুন ঘাঁটি এলাকাসমূহ গড়ে তুললাম, অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে সম্প্রসারিত করলাম তাই নয়, আমরা কুওমিনতাঙ-এর প্রথম ব্যাপক কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণকেও প্রতিহত করে দিলাম।

১৯৪১ এবং ১৯৪২ সাল এই বছর দুটি নিয়ে ছিল দ্বিতীয় পর্যায়। ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও পরিচালনার জন্য যে নীতি জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা উহানের পতনের পর থেকে অধিকতর সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করে চলছিল তারই অঙ্গ হিসেবে তারা কুওমিনতাঙ-এর নয় কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধেই তাদের আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করার নীতি গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন সকল ঘাঁটি এলাকার চারিপাশেই তারা তাদের প্রধান বাহিনীর আরও অধিক সৈন্য সমাবেশ করে এবং একটির পর একটি 'ঘিরে ধরে নিশ্চিহ্ন করার' অভিযান চালাতে শুরু করে এবং আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করে 'সব কিছু পুড়িয়ে ফেলার, সবাইকে হত্যা করার ও সব কিছু লুণ্ঠন করার' নিষ্ঠুর নীতি কার্যকর করতে থাকে। তার ফলে ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সাল এই দুবছরে আমাদের পার্টি একটি চূড়ান্ত অসুবিধাজনক অবস্থায় পতিত হয়। এই সময়ে আমাদের ঘাঁটি এলাকা আয়তনে সংকুচিত হয়ে পড়ে, লোকসংখ্যা পাঁচ কোটির নীচে নেমে যায়, অষ্টম রুট সেনাবাহিনী তিন লক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনীতে পরিণত হয়, কর্মীদের মৃত্যুর সংখ্যা বিরাট হয়ে দাঁড়ায়, এবং আর্থিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় খুবই প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এদিকে কুওমিনতাঙ নিজেকে নিরাপদ অবস্থানে দেখতে পেয়ে হাজার রকমভাবে আমাদের বিরুদ্ধে লেগে পড়ে, দ্বিতীয় ব্যাপক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান শুরু করে এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিলিতভাবে একযোগে আক্রমণ চালায়। কিন্তু এই কঠিন পরিস্থিতি আমাদের কমিউনিস্টদের অনেক শিক্ষায়

শিক্ষিত করে তোলে এবং আমরা অনেক কিছুই শিখে নিই। শত্রুর 'ঘিরে ধরে নিশ্চিহ্ন করার' অভিযানের বিরুদ্ধে কী করে লড়তে হবে, আমাদের অঞ্চল-গুলিকে 'একটু একটু করে গ্রাস করার' নীতির বিরুদ্ধে, তাদের 'জননিরাপত্তাকে জোরদার করার' অভিযানের বিরুদ্ধে,[১০] তাদের 'সব কিছু পুড়িয়ে ফেলা, সবাইকে হত্যা করা ও সব কিছু লুণ্ঠন করার' এবং তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য পরিত্যাগ করার স্বীকৃতি আদায়ে জবরদস্তির নীতির বিরুদ্ধে কী করে লড়তে হবে তা আমরা শিখে নিই। যুক্তফ্রণ্টের রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহে 'তিনটি এক-তৃতীয়াংশের ব্যবস্থার' প্রয়োগ, কৃষিনীতি কার্যকরী করা, আমাদের অধ্যয়নের ধারা, পার্টি-গত সম্পর্ক ও রচনারীতি সঠিক করে তোলার জন্য শুদ্ধিকরণ আন্দোলন পরি-চালনা, উন্নততর সৈন্যবাহিনী ও সরলতর প্রশাসনের নীতি, সুসংহত নেতৃত্বের নীতি, সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে সহায়তা করার এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন পরিচালনা করার নীতি আমরা শিখে নিই বা শিখে নিতে শুরু করি। প্রথম পর্যায়ে অনেক লোকের মধ্যে আত্মতৃপ্তির যে মনোভাব দেখা দিয়েছিল তা সহ বহু ভুলত্রুটি কাটিয়ে উঠতে আমরা সমর্থ হই। যদিও দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের ক্ষয়ক্ষতি দাঁড়িয়েছিল অত্যন্ত গুরুতর রকমের তবু আমরা আমাদের অবস্থান অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলাম। একদিকে আমরা জাপানী আক্রমণকারীদের আক্রমণ প্রতিহত করে দিলাম এবং অন্যদিকে কুওমিনতাঙ-এর দ্বিতীয় ব্যাপক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানকে প্রতিহত করলাম। কমিউ-নিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙ-এর আক্রমণ এবং আত্মরক্ষার জন্য আমরা যে সংগ্রাম চালাতে বাধ্য হয়েছিলাম তার ফলে পার্টিতে এক ধরনের অতিবাম বিচ্যুতি দেখা দেয়, তার একটি উদাহরণ হচ্ছে এই বিশ্বাস যে কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা শীঘ্রই ভেঙে পড়বে এবং তাই জমিদারদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত আক্রমণ চালানো হতে লাগল এবং পার্টির বাইরের জনপ্রতিনিধি-মূলক ব্যক্তিদের সঙ্গে ঐক্যের কাজটি অবহেলিত হয়। কিন্তু এই বিচ্যুতিও আমরা দূর করে দিতে সমর্থ হই। কুওমিনতাঙ-সৃষ্ট সংঘাতকে মোকাবিলা করার সংগ্রামে 'ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, আমাদের সুবিধাজনক অবস্থান থেকে এবং সংযতভাবে' সংগ্রাম চালানোর মূলনীতিতে আমরা অবিচলিত থাকি এবং যুক্তফ্রণ্টের কাজের ব্যাপারে আমরা 'ঐক্য, সংগ্রাম, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঐক্যের' প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এভাবে আমরা জাপ-বিরোধী

জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে সমগ্র দেশে এবং ঘাঁটি অঞ্চলসমূহে অব্যাহত রাখতে পারি।

তৃতীয় পর্যায় ১৯৪৩ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের বিভিন্ন নীতি আরও বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে এবং বিশেষ করে, শুদ্ধিকরণ আন্দোলন এবং উৎপাদনের বিকাশের ক্ষেত্রে মৌলিক প্রকৃতির সুফল লাভ করা গেছে এবং আমাদের পার্টি মতাদর্শগত ও বৈষয়িক দিক থেকে অপরাজেয় হয়ে উঠেছে। তদুপরি, গত বছরে আমাদের কর্মীদের পূর্ব ইতিহাস বিচার করার ও শত্রুপক্ষের গুপ্তচরদের ছেঁকে বের করার নীতি কিভাবে কার্যকরী করতে হবে আমরা তা শিখে নিয়েছি বা শিখে নিতে শুরু করেছি। এই পরিস্থিতিতে আমাদের ঘাঁটি অঞ্চলগুলি আবার সম্প্রসারিত হতে থাকে, যাঁরা শুধু আমাদের শস্যকর দেন এবং যাঁরা আমাদের ও জাপানীদের এবং ক্রীড়নকদের সবাইকেই শস্যকর দেন তাঁদের একত্রে ধরে ঐ অঞ্চলগুলির লোকসংখ্যা মোট আট কোটির অধিক হয়ে দাঁড়ায়, আমাদের সৈন্যসংখ্যা চার লক্ষ সত্তর হাজার এবং আমাদের জনগণের সশস্ত্র সহায়ক গণ-বাহিনীর সংখ্যা বাইশ লক্ষ সত্তর হাজারে দাঁড়ায় এবং আমাদের পার্টির সদস্যসংখ্যা নয় লক্ষ বা তারও বেশি হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৪৩ সালে জাপানী সমরবাদীরা চীনের প্রতি তাদের নীতিতে লক্ষণীয় কোন পরিবর্তন সাধন করেনি এবং কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধেই তাদের প্রধান আক্রমণ অব্যাহত রাখে। ১৯৪১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিন বছরের অধিককাল ধরে চীনে অবস্থিত জাপানী সৈন্যদের শতকরা ষাটভাগের বেশি অংশ আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীন জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকার বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হানতে থাকে। এই বছরগুলিতে বেশ কয়েক লক্ষ যে কুওমিনতাঙ সৈন্য শত্রুপক্ষের লাইনের পেছনে পড়ে গিয়েছিল তারা জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আঘাত সহ্য করতে পারেনি, প্রায় অর্ধেক আত্মসমর্পণ করেছে, প্রায় অর্ধেক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং মাত্র অল্প সংখ্যক সৈন্যই প্রাণে বেঁচেছে এবং সরে যেতে পেরেছে। আত্মসমর্পণকারী ঐ কুওমিনতাঙ সৈন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাদের পার্টিকে আক্রমণ করেছে, ফলে আমাদের পার্টিকে শতকরা নব্বইভাগের বেশি ক্রীড়নক সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হয়েছে। কুওমিনতাঙকে শতকরা চল্লিশ ভাগের কম জাপানী সৈন্য এবং দশভাগেরও কম ক্রীড়নক সৈন্যদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে উহানের পতনের সময় থেকে বিগত

পুরো সাড়ে পাঁচ বছর ধরে জাপানী সমরবাদীরা কুওমিনতাঙ ফ্রন্টের বিরুদ্ধে একটিও রণনীতিগত আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করেনি ; কয়েকটি মাত্র তুলনামূলক বড় রকমের অভিযান পরিচালিত হয়েছে (যেমন, চেকিয়াং-কিয়াংসিতে, চ্যাংসাতে, পশ্চিম হুপেতে, দক্ষিণ হোনানে ও চ্যাংতেতে) কিন্তু এগুলিকে নেহাৎ হামলা বলা চলে কেননা তাদের মূল লক্ষ্য আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীন জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। এই পরিস্থিতিতে কুওমিনতাঙ 'পর্বতে পশ্চাদপসরণের' এবং অন্যদের লড়াই করতে দেখার' নীতি অনুসরণ করে, শত্রুরা যখন এগিয়ে আসছিল তখন তাদের আঘাত থেকে তারা নিছক আত্মরক্ষা করছিল এবং শত্রু যখন আবার পিছিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা হাত জোড় করে বসে বসে শুধু দেখছিল। ১৯৪৩ সালে আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে কুওমিনতাঙ আরও বেশী প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে এবং তাদের তৃতীয় ব্যাপক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে এবং আমরা তাকেও প্রতিহত করে দিই।

১৯৪৩ সাল থেকে বর্তমান বছরের বসন্তকাল পর্য্যন্ত জাপানী আক্রমণকারীরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে একটানা পিছু হঠছে, যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতি আক্রমণ তীব্র করছে এবং এখন পাশ্চাত্যে হিটলার সোভিয়েত লালফৌজের দুর্বার আঘাতে থরহরি করে কাঁপছে। তাদের চূড়ান্ত পতনকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টায়, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা পিপিং-হ্যাংকাও এবং হ্যাংকাও-ক্যান্টন রেলপথ ধরে একটানা রেল যোগাযোগ জোর করে খোলার মতলব করেছে এবং যেহেতু এখনো চুংকিং-এর কুওমিনতাঙকে তাদের নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করাতে পারেনি, তাই তারা আরেকটি আঘাত হানার প্রয়োজন আছে মনে করেছে ; সুতরাং তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে বর্তমান বছরে একটি বিরাট আকারের আক্রমণ কুওমিনতাঙ ফ্রন্টের বিরুদ্ধে পরিচালনা করা। আজ একমাসের অধিককাল ধরে হোনান অভিযান[১১] চলছে। ওখানে শত্রুর মাত্র কয়েক ডিভিশন সৈন্য রয়েছে তবু কুওমিনতাঙ-এর বেশ কয়েকলক্ষ সৈন্য একটিমাত্র যুদ্ধ না করেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে এবং পাঁচমিশালী কিছু সৈন্যরাই শুধু যা হোক এক ধরনের লড়াই করতে পেরেছে। তাঙ্-এন-পোর অধীনস্ত সৈন্যবাহিনীতে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে, অফিসারগণ সৈন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং সৈন্যগণ জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আর মোট সৈন্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের বেশিই বিনষ্ট হয়ে গেছে। একইভাবে হু সুং-নান যে

ডিভিশনগুলি হোনানে প্রেরণ করেছিল শত্রুর সঙ্গে তাদের প্রথম মোকা-বিলাতেই তারা ছত্রখান হয়ে পড়েছে। গত কয় বছর ধরে কুওমিনতাঙ যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতিগুলি গায়ের জোরে চালিয়ে আসছে এটি হচ্ছে পুরোপুরি তারই পরিণাম। উহানের পতনের পর থেকে সাড়ে পাঁচ বছর ধরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন মুক্ত অঞ্চলের রনাঙ্গনসমূহকেই জাপানী ও ক্রীড়নকদের মূলবাহিনীর প্রধান আক্রমনকে প্রতিরোধ করতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এতে সামান্য কিছু পরিবর্তন হলেও তা একান্তই সাময়িক ধরনের হবে, কেননা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে নিস্ক্রিয়তা এবং কমিউনিস্টদের বিরোধিতায় সক্রিয়তার প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে সম্পূর্ণভাবে অধঃপতিত কুওমিনতাঙ গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য। যখন তা ঘটবে তখন কিন্তু শত্রু ও ক্রীড়নকদের বিরুদ্ধে আমাদের কঠিনতর সংগ্রামেরই সম্মুখীন হতে হবে। গত সাড়ে পাঁচ বছরে হাত জোড় করে বসে থেকে পরিস্থিতি অবলোকণ করে করে কুওমিনতাঙ যা লাভ করেছে তা হচ্ছে নিজের সংগ্রামের সামর্থ্য তা একেবারে খুইয়ে বসেছে। গত সাড়ে পাঁচ বছর ধরে কঠোর যুদ্ধবিগ্রহ ও সংগ্রাম করে কমিউনিস্ট পার্টি যা লাভ করেছে তা হচ্ছে তার সংগ্রামের সামর্থ্যই জোরদার হয়ে উঠেছে। এইটাই চীনের ভবিষ্যৎকে নির্দ্ধারণ করবে।

কমরেডরা নিজেদের থেকেই দেখতে পাচ্ছেন যে ১৯৩৭ সালের জুলাই থেকে আমাদের পার্টির নেতৃত্বে জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এসেছে—একটি অগ্রগতি, একটি পশ্চাৎগতি এবং একটি নতুন অগ্রগতি। আমরা জাপানী আক্রমণকারীদের হিংস্র আক্রমণকে আঘাতে আঘাতে হটিয়ে দিয়েছি, ব্যাপক বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলেছি, ব্যাপক-ভাবে পার্টি ও সৈন্যবাহিনীকে প্রসারিত করেছি, কুওমিনতাঙ-এর তিন-তিনটি ব্যাপক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান প্রতিহত করেছি এবং পার্টির আভ্যন্তরীণ ভ্রান্ত দক্ষিণ ও 'বাম' মতাদর্শকে পরাজিত করেছি; এবং সমগ্র পার্টি অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। গত সাত বছরের আমাদের কাজের এই হচ্ছে সংক্ষিপ্তসার।

আমাদের বর্তমান কর্তব্য হচ্ছে, আরও বিপুলতর কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তোলা। যে পরিস্থিতিই দেখা দিক না কেন জাপানী আক্রমণকারীদের চীন থেকে বিতাড়িত করে দেওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের পার্টি যাতে এই দায়িত্ব পালনের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে

তার জন্য আমাদের পার্টিকে, আমাদের সৈন্যবাহিনী ও ঘাঁটি অঞ্চলসমূহকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করে তুলতে হবে, প্রধান যোগাযোগ পথ ধরে বড় বড় মহানগরগুলির কাজের প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে, এবং মহানগর-গুলিতে আমাদের কাজকে ঘাঁটি অঞ্চলসমূহের কাজের সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে হবে।

ঘাঁটি অঞ্চলে আমাদের কাজ সম্পর্কে বলা যায়, প্রথম পর্যায়ে এই অঞ্চল-গুলি ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করে কিন্তু সেগুলিকে তেমনভাবে সুসংহত করা যায়নি এবং তাই দ্বিতীয় পর্যায়ে যখনই তা শত্রুর কঠিন আঘাতের সম্মুখীন হল তখন সেগুলি সংকুচিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীন সকল জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকাই একটি কঠিন অগ্নিপরীক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে, তার প্রথম পর্যায়ের তুলনায় তা অনেক উন্নত হয়ে ওঠে। কর্মী ও পার্টি-সদস্যরা মতাদর্শগত ও রাজনীতিগত মানের দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত হয়ে ওঠেন এবং আগে জানতেন না এমন অনেক কিছুই তাঁরা শিখে নিতে পারেন। কিন্তু চিন্তাকে পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্ত করে তুলতে এবং কর্মনীতি অধ্যয়ন করতে সময়ের প্রয়োজন হয় এবং আমাদের এখনো শেখার মতো অনেক কিছু বাকী রয়েছে। আমাদের পার্টি এখনো তেমন যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, তেমন যথেষ্ট ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত নয় এবং এখনো আমরা যে দায়িত্বভার বহন করছি তার চেয়ে অধিকতর দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সমর্থ নয়। এখন থেকে সমস্যা হচ্ছে প্রতিরোধ যুদ্ধকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের পার্টিকে, আমাদের সৈন্যবাহিনীকে এবং ঘাঁটি অঞ্চলসমূহকে আরও সম্প্রসারিত ও সুসংহত করে তোলা। এটি হচ্ছে ভবিষ্যতে আমাদের জন্য যে সুবিপুল কর্তব্যভার অপেক্ষা করছে তার জন্য মতাদর্শগত ও বৈষয়িক প্রস্তুতির দিক থেকে প্রথম অপরিহার্য অবশ্য করণীয় কর্তব্যকর্ম। এই প্রস্তুতি ছাড়া আমরা জাপানী আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করতে পারব না এবং সমগ্র চীনকেও মুক্ত করতে পারব না।

বিরাট বিরাট মহানগরগুলিতে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান লাইনগুলি ধরে আমাদের কাজকর্ম সব সময়ই প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর ছিল। আমরা যদি আমাদের পার্টির চারিপাশে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ এবং বড় বড় মহানগরগুলিতে ও যোগাযোগের প্রধান লাইনগুলি ধরে বিভিন্নস্থানে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে পড়ে নিপীড়িত অপরাপর জনগণকে যদি আমরা

সমবেত করতে প্রয়াসী না হই, তাদের সশস্ত্র ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান গড়ে তুলতে প্রস্তুত না হই তবে আমাদের সৈন্যবাহিনী এবং গ্রাম্য ঘাঁটি অঞ্চলসমূহ বড় বড় মহানগরগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব হেতু বিভিন্ন রকম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হবে। দশ বছরের অধিককাল ধরে আমরা গ্রামাঞ্চলে রয়েছি এবং গ্রামাঞ্চলকে ভালভাবে জানার জন্য এবং গ্রাম্য ঘাঁটি অঞ্চলসমূহ গড়ে তোলার জন্য জনগণকে উৎসাহিত আমাদের করতে হয়েছিল। এই দশ বছরেরও অধিককাল ধরে পার্টি ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে মহানগরগুলিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির কাজ কার্যকর করা যায়নি এবং তা করা সম্ভবও হয়নি। কিন্তু এখন অবস্থা স্বতন্ত্র এবং ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবকে সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের পর কার্যকর করতে হবে। এই কংগ্রেস সম্ভবতঃ শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে এবং মহানগরগুলিতে আমাদের কাজকর্ম জোরদার করার ব্যাপারে এবং জাতিজোড়া বিজয় অর্জনের সমস্যাদির ব্যাপারে তা আলোচনা করবে।

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের যে শিল্প সম্মেলনগুলি এখন চলছে তার বিপুল তাৎপর্য রয়েছে। ১৯৩৭ সালে সীমান্ত অঞ্চলে কারখানার শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০০ জন, ১৯৪২ সালের মধ্যে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৭,০০০ জন এবং এখন তা ১২,০০০ জনে দাঁড়িয়েছে। এই সংখ্যাগুলি হেলাফেলা করে নিলে চলবে না। ঘাঁটি অঞ্চলসমূহে থাকাকালেই আমাদের বিরাট বিরাট মহানগরগুলির শিল্প, বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রশাসন সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে অন্যথায় যখন সময় আসবে তখন কী করতে হবে তার কিছুই আমরা বুঝতে পারব না। তাই ভবিষ্যতের জন্য আমাদের মতাদর্শগত ও বৈষয়িক প্রস্তুতির ব্যাপারে দ্বিতীয় অপরিহার্য অবশ্য করণীয় কর্তব্যকর্ম হচ্ছে বড় বড় মহানগরগুলিতে এবং যোগাযোগের প্রধান লাইনগুলি ধরে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করা; এবং কিভাবে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রশাসন পরিচালনা করতে হয় তা শিক্ষা করা। এই প্রস্তুতি ছাড়া আমরা জাপানী আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করতে পারব না এবং সমগ্র চীনকেও মুক্ত করতে পারব না।

(৬)

নতুন বিজয় অর্জন করার জন্য পার্টির কর্মীদের আমাদের আহ্বান জানতে

হবে কাঁধের বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিতে এবং কলে দম দিয়ে যাত্রা শুরু করতে। 'কাঁধের বোঝা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া' বলতে আমাদের মন থেকে নানা আবর্জনাকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়াই বোঝাচ্ছে। অন্ধভাবে বা নির্বিচারে সেগুলি আঁকড়ে থাকলে অনেক জিনিসই বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে, আবর্জনার প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ভুল করে বসার পর আপনি ভাবতে পারেন, যাই হোক না কেন, ভুলগুলি আপনাকে একেবারে পেয়ে বসেছে এবং আপনি নিস্তেজ হয়ে পড়বেন; আপনি যদি ভুল না করেন আপনি মনে করতে পারেন আপনি তো ভুল থেকে মুক্ত, তাই আপনি আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়তে পারেন। কাজে সাফল্যের অভাব আপনার মধ্যে নৈরাশ্য ও উদ্যমহীনতা সৃষ্টি করতে পারে, অন্যদিকে সাফল্য আপনার মধ্যে অহংকার ও ঔদ্ধত্য জাগিয়ে তুলতে পারে। যে কমরেডের অল্পদিনের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা রয়েছে তিনি এই কারণে দায়িত্ব পরিহার করতে পারেন, অন্যদিকে একজন প্রবীণ কর্মী তাঁর দীর্ঘকালের সংগ্রামের অভিজ্ঞতার জন্য আত্মম্ভরী হয়ে উঠতে পারেন। শ্রমিক এবং কৃষক কমরেডরা যেহেতু তাঁদের শ্রেণীগত উৎসের জন্য গৌরব বোধ করেন, তাই তাঁরা বুদ্ধিজীবীদের প্রতি হেয় দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন, অন্যদিকে যেহেতু বুদ্ধিজীবীদের বেশ কিছু জ্ঞান রয়েছে, তাই তাঁরা শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি হেয় দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন। যে-কোন ধরনের বিশেষজ্ঞের দক্ষতাকে মূলধন করার ফলে কেউ কেউ উদ্ধত হয়ে উঠতে পারেন ও অন্যদের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব প্রকাশ করতে পারেন। এমনকি, অনেকের বয়সও তাঁদের আত্মতৃপ্তির হেতু হয়ে উঠতে পারে। যেহেতু তরুণেরা বুদ্ধিদীপ্ত ও সুদক্ষ তাই তাঁরা বৃদ্ধদের হেয় চক্ষে দেখতে পারেন; এবং যেহেতু বৃদ্ধদের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে তাই তাঁরা তরুণদের প্রতি হেয় দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন। যদি বিচারশীল সজাগ মনোভাব না থাকে তবে এই সবগুলিই মানসিক প্রতিবন্ধ এবং বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিছু কমরেড যে খুব উঁচু ভাব দেখিয়ে জনগণের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে বারে বারে ভুল করে বসেন তার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে তাঁরা এ ধরনের বোঝা বয়ে ফিরছেন। তাই জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা এবং অতি অল্প ভুলভ্রান্তি করার একটি প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে নিজের বোঝাটি পরখ করে দেখা, তাকে পরিহার করা এবং মনকে মুক্ত করে রাখা। আমাদের পার্টির ইতিহাসে বহু ঘটনা ঘটেছে যখন বিরাট রকমের আত্মম্ভরিতার অভিব্যক্তি দেখা গেছে এবং

আমরা তার ফলে প্রচুর ভুগেছি। প্রথমটি ঘটে ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে। উত্তরমুখী অভিযানকারী সৈন্যবাহিনী উহানে পৌঁছেছে এবং কিছু কিছু কমরেড এমন গর্বোদ্ধত ও বেসামাল হয়ে পড়লেন যে তাঁরা ভুলেই গেলেন—কুও-মিনতাঙ আমাদের আঘাত হানতে প্রায় সমুদ্যত। তার ফলে চেন তু-শিউর লাইন দেখা দিল যা বিপ্লবকে পরাজয়ে পর্যবসিত করল। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১৯৩০ সালে। ফেঙ য়ু-সিয়াং এবং ইয়েন সি-শানের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে চিয়াং কাই-শেকের যুদ্ধবিগ্রহের সুযোগ নিয়ে লালফৌজ বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং আবার কিছু কমরেড গর্বোদ্ধত ও বেসামাল হয়ে পড়লেন। তার ফল হল লি লি-সানের লাইনের ভুল এবং তাতে বিপ্লবী শক্তিগুলির বেশ কিছু ক্ষতি সাধিত হয়। তৃতীয় ঘটনা ঘটে ১৯৩১ সালে লালফৌজ কুওমিনতাঙ-এর তৃতীয় 'অবরোধ ও দমন' অভিযানকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে এবং তার অব্যবহিত পরেই জাপানী আক্রমণের মুখে পড়ে সারা দেশের জনগণ ঝঞ্ঝাসম ও বীরত্বপূর্ণ একটি জাপ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন; আবার কিছু কমরেড গর্বোদ্ধত ও বেসামাল হয়ে পড়েন। তার পরিণতি হিসাবে রাজনৈতিক লাইনে আরও গুরুতর এমন ভুল হয় যাতে করে আমাদের এত পরিশ্রমে গড়ে তোলা বৈপ্লবিক বাহিনীর শতকরা প্রায় নব্বই ভাগই ধ্বংস হয়ে যায়। চতুর্থ ঘটনা ঘটে ১৯৩৮ সালে। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আবার কিছু কমরেড গর্বোদ্ধত ও বেসামাল হয়ে পড়লেন। তার ফলে অনেকটা চেন তু-শিউর লাইনের মতো ভুলই তাঁরা করে বসলেন। যেখানে যেখানে এইসব কমরেডদের ভ্রান্ত ধারণার প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি সেইসব স্থানে এইবারেও বৈপ্লবিক কাজ-কর্মের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হল। গর্ব ও ভুলভ্রান্তির এইসব দৃষ্টান্ত দেখে সমগ্র পার্টির কমরেডদেরই সতর্ক হতে হবে। সম্প্রতি আমরা কুও মো-জো লিখিত লি জু-চেঙ[13] সম্পর্কিত প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণ করেছি যাতে করে কমরেডরাও এই গল্প থেকে সতর্কবাণী গ্রহণ করতে পারেন এবং সাফল্যের মুহূর্তে আত্মম্ভরিতার ভুলটির পুনরাবৃত্তি না করে বসেন।

'কলে দম দিয়ে যাত্রা শুরু করে দেওয়া' বলতে বোঝাচ্ছে চিন্তাযন্ত্রের সদ্ব্যবহার করা। যদিও কিছু লোক কোন বোঝাই বহন করেন না এবং জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও তাঁদের রয়েছে তবুও তাঁরা বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেন না কারণ কী করে অনুসন্ধানের মনোভাব নিয়ে

চিন্তা করতে হয় তা তাঁরা জানেন না, মাথা ঘামিয়ে বেশি চিন্তা করতে তাঁরা রাজী নন বা আদৌ চিন্তা করতেই তাঁরা রাজী নন। অনেকে আছেন যাঁরা বোঝা বয়ে ফিরছেন বলে চিন্তা করতে পারেন না কারণ ঐ বোঝাগুলি তাঁদের চিন্তাশক্তিকে একেবারে চেপে খর্ব করে রাখে। লেনিন ও স্তালিন প্রায় সময়ই লোকজনদের তাদের মস্তিষ্ক খাটাতে পরামর্শ দিতেন এবং আমরাও ঠিক এই একই উপদেশই দেব। মস্তিষ্ক যন্ত্রটির প্রধান কাজই হচ্ছে চিন্তা করা। মেনসিয়াস বলেছিলেন, 'মনের চাকরিই হচ্ছে চিন্তা করা।'[১৪] তিনি মস্তিষ্কের কাজেই সঠিক সংজ্ঞাই নিরূপণ করেছেন। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মস্তিষ্ককে ব্যবহার করা এবং প্রতিটি জিনিসকেই সতর্কভাবে ভেবে দেখা। সাধারণ কথায় বলা হয় 'ভুরুটা একটু কুঁচকে নিন, তাহলেই পথ পেয়ে যাবেন।' অর্থাৎ ভাল করে চিন্তা করলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। আমাদের পার্টিতে বহুলদৃষ্ট অন্ধভাবে কাজ করার অভ্যাস থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কমরেডদের চিন্তা করতে উৎসাহিত করা, বিচার-বিশ্লেষণের পদ্ধতিটি শিখতে এবং বিচার-বিশ্লেষণের অভ্যাসটির অনুশীলন করতে তাঁদের উৎসাহিত করা। আমাদের পার্টিতে এই অভ্যাসটির যথেষ্টই অভাব রয়েছে। আমরা যদি আমাদের বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিই এবং কলে দম দিয়ে যাত্রা শুরু করি, যদি হাল্কা বোঝা নিয়ে এগিয়ে চলি এবং কিভাবে ভাল করে চিন্তা করতে হয় তা জানি, তবে আমরা নিশ্চয়ই বিজয় অর্জন করব।

টীকা

১। চেন তু-শিউ প্রথমে ছিলেন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এবং **নিউ ইয়ুথ** পত্রিকার অন্যতম একজন সম্পাদকরূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি অন্যতম। ৪ঠা মে আন্দোলনের সময়কার খ্যাতির জন্য এবং পার্টির প্রাথমিক দিকের অপরিপক্কতার জন্য তিনি পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের শেষ অধ্যায়ে চেন তু-শিউর মাধ্যমে অভিব্যক্ত দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারা আত্মসমর্পণের একটি লাইনে বিকশিত হয়ে ওঠে। কমরেড মাও সে-তুঙ মন্তব্য করেছেন ঐ সময়ের আত্মসমর্পণবাদীরা 'কৃষকজনগণ, শহুরে পেটি-বুর্জোয়া এবং মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বকে এবং বিশেষ করে সৈন্যবাহিনীতে পার্টির

নেতৃত্বকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে বসে এবং এভাবে বিপ্লবের পরাজয়ের পথ করে দেয়।' ('বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য,' **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, ইংরাজী সংস্করণ, বিদেশীভাষা প্রকাশন সংস্থা, পিকিং ১৯৬০, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭১)। ১৯২৭ সালের পরাজয়ের পর চেন তু-শিউ ও মুষ্টিমেয় অন্যান্য কিছু আত্মসমর্পণবাদীরা বিপ্লবের ভবিষ্যতের প্রতিই আস্থা হারিয়ে বসেন এবং বিলুপ্তিবাদীতে পরিণত হয়ে পড়েন। তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল ট্রট্স্কিবাদী অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ট্রট্স্কিপন্থীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি পার্টি-বিরোধী গোষ্ঠী স্থাপন করেন। তার ফলে ১৯২৯ সালের নভেম্বরে চেন তু-শিউকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। ১৯৪২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

২। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

৩। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে কিউচৌ প্রদেশের সুনাইতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর যে বর্ধিত সভা হয় তা-ই হচ্ছে সুনাইতে অনুষ্ঠিত সভা।

৪। ভি. আই. লেনিনের 'কমিউনিজম' দেখুন, যেখানে লেনিন হাঙ্গেরীয় কমিউনিস্ট বেলা কুনকে সমালোচনা করে বলেছিলেন যে তিনি 'মার্কসবাদের একান্ত আসল সারবস্তু, মার্কসবাদের জীবন্ত মর্মবস্তু, বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণকেই জলাঞ্জলি দিয়ে দিচ্ছেন' (**সংগৃহীত রচনাবলী**, রুশ সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫০, ৩১শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৩)।

৫। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে দশ দফা কর্মসূচী গৃহীত হয়: (১) সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে উৎখাত কর; (২) বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যাঙ্কগুলিকে বাজেয়াপ্ত কর; (৩) চীনকে ঐক্যবদ্ধ কর এবং জাতিসত্তাসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নাও; (৪) কুওমিনতাঙ-এর যুদ্ধবাজ সরকারকে উৎখাত কর; (৫) শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের পর্ষদের একটি সরকার কায়েম কর; (৬) আট ঘণ্টা কাজের দিন চালু কর, মজুরি বাড়াও এবং বেকার-ভাতা ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু কর; (৭) সকল জমিদারের জমি বাজেয়াপ্ত কর এবং কৃষকদের মধ্যে ঐ জমি বিলি করে দাও; (৮) সৈনিকদের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি বিধান কর এবং প্রাক্তন

সৈনিকদের জমি ও চাকরি দাও। (৯) গুরুতর সকল করভার ও নানাবিধ লেভি আদায় বাতিল কর এবং সুসংহত একটি কর-নীতি চালু কর; এবং (১০) দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হও, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হও।

৬। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

৭। ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত পলিটব্যুরোর এই অধিবেশনে পার্টির অতীত ইতিহাসের, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধকালের রাজনৈতিক লাইনের প্রশ্ন নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

৮। 'পর্বতকেন্দ্রের প্রতি প্রীতির' মানসিকতা হচ্ছে উপদলীয় চক্র গঠনের একটি প্রবণতা এবং তা প্রধানতঃ দেখা দেয় দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের একটা পরিস্থিতিতে যখন গ্রামীণ বিপ্লবী ঘাঁটিগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল এবং একটি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। এইসব অধিকাংশ ঘাঁটিই প্রথমে পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিটি ঘাঁটিই নিজেদের এক একটি সুসংবদ্ধ ইউনিট হিসেবে গণ্য করত, মনে করত এক একটি পার্বত্য ঘাঁটি হিসেবে, কাজেই এই মনোভাবটি পর্বতকেন্দ্রের প্রতি প্রীতির মানসিকতা হিসেবে পরিচিত হয়।

৯। তুলনামূলকভাবে সুদৃঢ় ঘাঁটি অঞ্চলে জনসাধারণ নিয়মিত শস্যকর শুধু জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকারকেই দিতেন। চারিদিকের বিক্ষিপ্ত অঞ্চলের ঘাঁটি এলাকায় এবং গেরিলা অঞ্চলসমূহের যে জনসাধারণ সব সময়ই শত্রুর উৎপীড়নের মধ্যে বাস করতেন তাঁরা শত্রুর ক্রীড়নকদের সরকারকেও আরেকটি শস্যকর দিতে বাধ্য হতেন।

১০। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে জাপানী আক্রমণকারী ও চীনা বিশ্বাসঘাতকেরা উত্তর চীনে 'জননিরাপত্তা জোরদার করার একটি অভিযান' ঘোষণা করে যার অঙ্গ ছিল মানুষের বাড়িতে বাড়ীতে হানা দেওয়া, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার গ্যারান্টি দেওয়া, বাড়ি বাড়ি তল্লাসী করা এবং ক্রীড়নক সেনাবাহিনী গড়ে তোলা—এবং এইসব কিছুরই উদ্দেশ্য ছিল জাপবিরোধী সৈন্যবাহিনীকে দমন করা।

১১। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে জাপানী আক্রমণকারীরা হোনান প্রদেশে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের অভিযান শুরু করে।

চিয়াং তিং ওয়েন, তাং এন-পো এবং হু স্থং-নানের পরিচালনাধীন চার লক্ষ কুওমিনতাঙ সৈন্য জাপানী আক্রমণকারীদের সামনে পড়ে একেবারে হাওয়া হয়ে গেল। চেংচাও এবং লোয়াং সহ আটত্রিশটি বিভাগ একের পর এক শত্রুর কবলিত হয়। তাং এন-পোর দুই লক্ষ সৈন্য বিনষ্ট হয়ে যায়।

১২। যুদ্ধবাজদের মধ্যেকার এই ব্যাপক আকারের যুদ্ধে একদিকে ছিলেন চিয়াং কাই-শেক এবং অন্যদিকে ছিলেন ফেং উ-সিয়াং এবং ইয়েন শি-শান। লুংহাই এবং তিয়েনসিন-পুকৌ রেলপথ বরাবর এই যুদ্ধ হয়। ১৯৩০ সালের মে থেকে অক্টোবর এই ছয় মাস ধরে যুদ্ধ চলে। উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় তিন লক্ষ।

১৩। মিং রাজবংশের শেষ বছরগুলিতে লি জু-চেং-এর নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহের বিজয়ের স্মৃতিতে ১৯৪৪ সালে কুও মো-জো '১৬৪৪ সালের অভ্যুত্থানের ত্রিশত বার্ষিকী' নামক এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখান, ১৬৪৫ সালে এই অভ্যুত্থান পরাজিত হওয়ার কারণ হচ্ছে ১৬৪৪ সালে কৃষক বাহিনীর পিকিং প্রবেশের পর তাদের কিছু কিছু নেতা বিলাসী জীবনযাপন করে দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়ে এবং উপদলীয় সংঘাত শুরু হয়ে যায়। এই প্রবন্ধটি প্রথমে চুংকিং-এর **নিউ চায়না ডেইলি** পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পরে ইয়েনানে এবং মুক্ত এলাকার অন্যান্য স্থানে পুস্তিকা আকারে তা প্রকাশিত হয়।

১৪। **মেনসিয়াস,** একাদশ খণ্ড, 'কাও জু', প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য।

'পরিশিষ্ট' ঃ আমাদের পার্টির ইতিহাসের কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কিত প্রস্তাব

(১৯৪৫ সালের ২০শে এপ্রিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির সপ্তম বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত)

(১)

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি চীন বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে তার সকল কাজের পথনির্দেশক নীতি হিসেবে সুসমন্বিতভাবে প্রয়োগ করে এসেছে এবং চীন বিপ্লবে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর তত্ত্ব ও প্রয়োগই হচ্ছে এই সমন্বয়। আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই চীন বিপ্লবের একটি নতুন স্তর, নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর, উন্মোচিত হল—এ কথাটি কমরেড মাও সে-তুঙ দেখিয়ে দিয়েছেন। নয়া গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের এই চব্বিশ বছরে (১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই সময়ে), তিনটি ঐতিহাসিক যুগ জুড়ে—প্রথম মহান বিপ্লবের যুগ, কৃষি-বিপ্লবের যুগ এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের এই তিনটি যুগ জুড়ে—আমাদের পার্টি চীনের জনগণের ব্যাপক জনসমষ্টিকে তাদের শত্রু সাম্রাজ্যবাদের ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সুকঠিন এবং তিক্ত বৈপ্লবিক সংগ্রামে অবিচল নেতৃত্ব প্রদান করে এসেছে এবং বিরাট সাফল্য ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টি তার নিজস্ব নেতা কমরেড মাও সে-তুঙকে হাজির করেছে। চীনের শ্রমিকশ্রেণী ও চীনের জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কমরেড মাও সে-তুঙ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে—মানুষের জ্ঞানজগতের এই শ্রেষ্ঠ সম্পদকে—চীনের মতো একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক যে বিশাল দেশটিতে কৃষক-জনগণই হচ্ছেন জনগণের বিপুল অংশ এবং যেখানে আশু কাজ হচ্ছে সাম্রাজ্য-বাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, এমন দেশ আয়তন যার বিশাল ও লোকসংখ্যা যার বিপুল, দেশে পরিস্থিতি নিতান্ত জটিল এবং সংগ্রাম চূড়ান্ত রকমের দুরূহ—এমন একটি দেশে সৃজনশীলভাবে সেই তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন এবং তিনি উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ সংক্রান্ত লেনিন ও স্তালিনের তত্ত্ব-

গুলিকে এবং চীন বিপ্লব সংক্রান্ত স্তালিনের তত্ত্বকে প্রতিভাদীপ্তভাবে বিকশিত করে তুলেছেন। যেহেতু আমাদের পার্টি দৃঢ়তার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের লাইনকে অনুসরণ করে এসেছে এবং এই লাইনের পরিপন্থী সকল ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে বিজয়ী সংগ্রাম পরিচালনা করে এসেছে, তাই এই তিনটি যুগেই পার্টি বিরাট সাফল্য অর্জন করে আজকের এই অতুলনীয় মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ঐক্যে উপনীত হয়েছে, পরিণত হয়েছে আজকের শক্তিশালী এক বিপ্লবী বাহিনীতে, বার লক্ষের ওপর সদস্য নিয়ে প্রায় দশ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রায় দশ লক্ষ সৈন্যের একটি সৈন্যবাহিনী সহ জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে এবং মুক্তির লক্ষ্যে সমগ্র জাতির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে উঠেছে।

(২)

চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম যুগে ১৯২১ থেকে ১৯২৭ সালে এবং বিশেষ করে ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সালে চীনের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মহান বিপ্লবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক নেতৃত্বের দ্বারা প্রভাবিত, সম্মুখে এগিয়ে চলার পথে উদ্বোধিত ও সংগঠিত হয়ে পার্টি দ্রুত অগ্রগতি লাভ করেছে এবং বিরাট বিরাট বিজয় অর্জন করেছে। এই মহান বিপ্লবে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সমগ্র সদস্যবৃন্দ বিপুল বৈপ্লবিক কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, সমগ্র দেশে শ্রমিক, যুবক ও কৃষকজনগণের আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, কুওমিনতাঙ-এর পুনর্গঠন ও অগ্রগমনকে রূপায়িত করেছেন এবং জাতীয় বৈপ্লবিক সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছেন, পূর্বমুখী অভিযান[১] এবং উত্তরমুখী অভিযানের রাজনৈতিক মেরুদণ্ড জুগিয়েছেন, জাতিজোড়া সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী মহান সংগ্রামে নেতৃত্বদান করেছেন এবং এভাবে চীনের বিপ্লবের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। তা সত্ত্বেও এই বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, কারণ ১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙ-এর প্রতিক্রিয়াশীলদের যে চক্র আমাদের সহযোগী মিত্র ছিল তারা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে; কারণ ঐ সময়ে সাম্রাজ্যবাদীদের এবং প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ চক্রের সম্মিলিত শক্তি ছিল অনেক বেশি; আর বিশেষ করে, আমাদের পার্টিতে চেন তু-শিউর মাধ্যমে অভিব্যক্ত দক্ষিণপন্থী মতাদর্শ বিপ্লবের চূড়ান্ত অধ্যায়ে

(প্রায় ছয় মাস ধরে) আত্মসমর্পণের একটি লাইন হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থাকে গ্রাস করে বসে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও কমরেড্‌ স্তালিনের বহু প্রাজ্ঞ নির্দেশাবলীকে পালন করতে অস্বীকার করে, আর কমরেড মাও সে-তুঙ ও অন্যান্য কমরেডদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, যার ফল দাঁড়ায় এই যে কুওমিনতাঙ যখন বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল এবং আচমকা জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে বসল তখন পার্টি ও জনগণ কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হল।

১৯২৭ সালে বিপ্লবের পরাজয় থেকে ১৯৩৭ সালে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত এই দশ বছরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং একমাত্র চীনের কমিউনিস্ট পার্টিই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী পতাকাকে অব্যাহতভাবে উচ্চে তুলে ধরে প্রতিবিপ্লবী শাসনের চূড়ান্ত সন্ত্রাসের মধ্যেও শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবি ও অন্যান্য বিপ্লবীদের ব্যাপক জনগণকে রাজনৈতিক সামগ্রিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এইসব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি লালফৌজ গড়ে তুলেছে, শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের পর্ষদের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে, বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছে, দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করেছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকার ও ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এই উভয়ের আক্রমণকে প্রতিরোধ করেছে। এসবের ফলে, চীনের জনগণ জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির নয়া গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেন। অনুরূপভাবে, সমগ্র পার্টি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ট্রট্‌স্কিপন্থী চেন তু-শিউ চক্র ও লো চ্যাঙ-লুং,[২] চ্যাঙ কুও-তাও[৩] এবং অন্যান্য যারা পার্টির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল এবং পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তাদের প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল; এভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাধারণ নীতির ভিত্তিতে পার্টির ঐক্য সুনিশ্চিত হয়। এই দশ বছরের অধিককাল ধরে পার্টির সাধারণ নীতি এবং তাকে কার্যকর করার জন্য সাহসিক সংগ্রাম সম্পূর্ণ সঠিক এবং অপরিহার্য ছিল। অসংখ্য পার্টি-সভ্য, অসংখ্য সাধারণ মানুষ এবং বহু পার্টি-বহির্ভূত বিপ্লবীরা বিভিন্ন ফ্রন্টে জলন্ত বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করে গেছেন, নির্ভীক সংগ্রাম চালিয়েছেন ও আত্ম বলিদান করেছেন, অন্যদের মৃত্যুর ফলে যে স্থান শূন্য হয়েছে, তা পূর্ণ করতে অদম্য

সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেছেন ; তাঁদের বীরত্ব ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তাঁরা আমাদের জাতির ইতিহাসে অমরত্ব অর্জন করেছেন। এসব ছাড়া, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভবপর হতো না অথবা তাকে রূপ দিলেও ঐ যুদ্ধকে চালিয়ে যাওয়া ও বিজয়ের পথে তাকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হতো না কারণ তখন জনযুদ্ধের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট একটি কমিউনিস্ট পার্টিকে তাঁর মেরুদণ্ড হিসেবে পাওয়া যেত না। এইসব বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

আমরা বিশেষভাবে এই বাস্তব সত্যের জন্য আনন্দিত বোধ করছি যে, ঐ দশ বছরে কমরেড মাও সে-তুঙকে প্রতিনিধি হিসেবে রেখে আমাদের পার্টি চীনের বাস্তব পরিস্থিতিতে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের বৈপ্লবিক তত্ত্বসমূহকে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগের ব্যাপারে খুবই বিরাট অগ্রগতি সাধন করেছে। অবশেষে, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের শেষের দিকে, আমাদের পার্টি সুনিশ্চিতভাবেই সমগ্র পার্টিতে এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থায় কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এইটিই হচ্ছে ঐ যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মহত্তম সাফল্য এবং এটাই হচ্ছে চীনের জনগণের মুক্তির সবচেয়ে সুনিশ্চিত গ্যারান্টি।

অবশ্য ঐ দশ বছরে এইসব বিরাট বিরাট সাফল্য সত্ত্বেও এটা দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে কিছু কিছু সময়ে আমাদের পার্টি বেশ কয়েকটি ভুলভ্রান্তি করেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হচ্ছে ১৯৩১ সালের জানুয়ারিতে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সময় থেকে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর বর্ধিত সভা (সুনাইতে অনুষ্ঠিত সভা) পর্যন্ত রাজনৈতিক, সামরিক এবং সাংগঠনিক লাইনের ক্ষেত্রে 'বামপন্থী' ভুলটি। এই ভুল আমাদের পার্টি ও চীন বিপ্লবের পক্ষে গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চীন বিপ্লবের ঐতিহাসিক শিক্ষাগুলি লাভ করার সময় 'অতীতের ভুলগুলি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে ভবিষ্যতে এই ধরনের ভুল পরিহার করার জন্য এবং রোগ দূর করতে হবে রোগীকে বাঁচাবার জন্য', 'সামনের যে রথটি উল্টে পড়ে গেল তা পেছনের রথের কাছে সতর্কবাণীর কাজ করার জন্য' এবং সাধারণ মার্কসবাদী লেনিনবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে সমগ্র পার্টিকে সুসংহত একটি পরিবারের মতো ঐক্যবদ্ধ করে তোলার জন্য, নিখাদ ইস্পাতের মতো

মজবুত করে তোলার জন্য, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয় ও চীনের জনগণের পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জন করার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কমিটির এই সপ্তম বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ঐ দশ বছরের পার্টির ইতিহাসের কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে ও বিশেষ করে চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন থেকে যুনাই সভা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের লাইন সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হিতকর ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করে।

(৩)

১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর, আমাদের পার্টিতে 'বাম' ও দক্ষিণ এই দুটি বিচ্যুতিই ঘটে।

প্রথম মহান বিপ্লবের যুগের চেন তু-শিউ প্রমুখ মুষ্টিমেয় আত্মসমর্পণকারীরা বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে ক্রমে ক্রমে বিলুপ্তিবাদীতে পরিণত হয়। তারা প্রতিক্রিয়াপন্থী ট্রট্স্কিবাদী অবস্থান গ্রহণ করে ও এ কথা বলতে থাকে যে ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পর চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে এবং জনগণের ওপর তাদের শাসন সুদৃঢ় হয়ে উঠছে, আর চীনের সমাজ ইতিমধ্যেই এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে পুঁজিবাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে ও তা শান্তিপূর্ণভাবেই বিকশিত হয়ে উঠবে। সুতরাং তারা এই খামখেয়ালী দাবি করে বসল যে চীনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং চীনের শ্রমিকশ্রেণীকে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' করার জন্য ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে হবে, তার এখনকার মতো শুধু 'একটি জাতীয় বিধানসভার জন্য' তথাকথিত আইনসঙ্গত একটি শ্লোগানকে কেন্দ্র করে আন্দোলন করা চলতে পারে, এভাবে বিপ্লবী আন্দোলনকে তারা বিলুপ্ত করে দেয়। সুতরাং, তারা পার্টির পরিচালিত সকল বিপ্লবী আন্দোলনের বিরোধিতা করে এবং লালফৌজের আন্দোলনকে 'ভ্রাম্যমান বিদ্রোহীদের আন্দোলন' বলে কুৎসা করতে থাকে। পার্টির পরামর্শ গ্রহণ করে তাদের সুবিধাবাদী, বিলুপ্তিবাদী পার্টি-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করতে যে তারা অস্বীকার করে তাই নয়, তারা প্রতিক্রিয়াশীল ট্রট্স্কিবাদীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি পার্টি-বিরোধী উপদল গড়ে তোলে, ফলে তাদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দিতে হয় এবং পরে তারা প্রতিবিপ্লবীতে অধঃপতিত হয়।

অন্যদিকে, যে পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী উগ্রতা কুওমিনতাঙ-এর হত্যাকাণ্ডের নীতির প্রতি ঘৃণা এবং চেন তু-শিউর আত্মসমর্পণবাদের প্রতি ক্রোধ থেকে বৃদ্ধি পায় তাও পার্টিতে প্রতিফলিত হয় এবং 'বামপন্থী' একটি মনোভাবের তা দ্রুত প্রসার ঘটায়। এই 'বামপন্থী' মনোভাবের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯২৭ সালের ৭ই আগস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরী সভায়। পার্টির ইতিহাসে ৭ই আগস্টের সভার একটি সুনির্দিষ্ট অবদান রয়েছে। চীন বিপ্লবের একটি সংকটময় মুহূর্তে তা দৃঢ়তার সঙ্গে চেন তু-শিউর আত্মসমর্পণবাদকে সংশোধন করে এবং তার সমাপ্তি ঘটায়, কৃষি-বিপ্লবের একটি সাধারণ নীতির ব্যাপারে ও কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পার্টি ও জনসাধারণের কাছে বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। এই সবই ছিল সঠিক এবং তা ছিল ঐ সভার প্রধান দিক। কিন্তু দক্ষিণপন্থী ভুলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে ঐ সভা 'বামপন্থী' ভুলের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। রাজনৈতিক দিক থেকে, তা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী হয় উপযুক্ত প্রতি আক্রমণের বা প্রয়োজনীয় রণকৌশলগত পশ্চাদসরণের ব্যবস্থা ঐ সময়ে করতে হবে যাতে করে বিপ্লবী অবস্থানগুলিকে রক্ষা করা এবং পরিকল্পিতভাবে বৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে সংহত করে তোলা সম্ভবপর হয়। তার পরিবর্তে, তা হঠকারিতার ও হুকুমদারির (বিশেষ করে, শ্রমিকদের জোর করে ধর্মঘট করানোর) মনোভাবকে প্রশ্রয় দেয় ও সেগুলিকে বাড়িয়ে তোলে। সাংগঠনিক দিক থেকে, এই সভা অতিরিক্ত রকমের ও সংকীর্ণতাবাদী অন্তঃপার্টি সংগ্রামের সূত্রপাত করে, অযথা বা অসঙ্গতভাবে তা নেতৃস্থানীয় কর্মী হিসেব শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত ব্যক্তিদের নিয়োগ করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে পার্টিতে অতি-গণতন্ত্রের গুরুতর একটি অবস্থা সৃষ্টি করে। ৭ই আগস্টের সভার পর এই 'বামপন্থী' মনোভাব বেড়ে যেতেই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯২৭ সালের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় নেতৃস্থানীয় সংস্থার বর্ধিত সভায় তা জোর করে এগিয়ে যাওয়ার (অর্থাৎ হঠকারী) একটি 'বামপন্থী' লাইনের রূপ গ্রহণ করে, আর এই প্রথমবারের মতো 'বামপন্থী' লাইনকে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থায় প্রাধান্যের আসনে অধিষ্ঠিত করে। জোর করে এগিয়ে চলার পক্ষপাতীরা তখন বলতে শুরু করল যে প্রকৃতির দিক থেকে চীনের বিপ্লব হচ্ছে তথাকথিত একটি স্থায়ী বিপ্লব (তাঁরা

গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললেন) এবং বললেন চীনের বিপ্লব তথাকথিত একটি স্থায়ী উচ্চাভিমুখী অবস্থানে উপনীত হয়েছে (অর্থাৎ তারা ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়কেই অস্বীকার করে বসলেন)। ফলে তাঁরা যে শুধু সুশৃংখলভাবে পশ্চাদপসরণ সংগঠিত করতে ব্যর্থ হলেন তাই নয়, বরং উল্টো, শত্রুর শক্তি ও বিপ্লবের পরাজয়ের পর জনগণের অবস্থাকে লক্ষ্য না করেই তাঁরা পার্টির মুষ্টিমেয় সদস্যবৃন্দ ও অনুগামীদের সারাদেশে আঞ্চলিক অভ্যুত্থান ঘটানোর আহ্বান জানালেন যার সাফল্যের সামান্যতম আশাও ছিল না। রাজনৈতিক এই হঠকারিতার সঙ্গে সঙ্গে কমরেডদের আক্রমণ করার একটি সংকীর্ণতাবাদী সাংগঠনিক নীতিও দেখা দিল। অবশ্য এই ভুল লাইন একেবারে প্রথম থেকেই কমরেড মাও সে-তুঙ এবং শ্বেত এলাকাসমূহে কর্মরত বহু কমরেডের পক্ষ থেকে সঠিক সমালোচনা ও আপত্তির মুখোমুখী হল এবং যেহেতু এই নীতির ফলে বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে বহু ক্ষতির সৃষ্টি হচ্ছিল তাই ১৯২৮ সালের শুরু থেকে বহু অঞ্চলে তার প্রয়োগ বন্ধ হয়ে যায় এবং ঐ বছরের এপ্রিলের মধ্যেই (অর্থাৎ শুরু থেকে ছয় মাসের মধ্যেই) সারাদেশে বাস্তব কাজকর্মে তা কার্যতঃ পরিত্যক্তই হয়ে যায়।

১৯২৮ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের লাইন মূলতঃ সঠিকই ছিল। কংগ্রেস সঠিকভাবেই জোর দিয়ে এ কথা বলেছিল যে চীনের সমাজ হচ্ছে আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক, এটা দেখিয়ে দিয়েছিল যে বর্তমান চীন বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে যে মৌলিক দ্বন্দ্বগুলি তার কোনটিরই এখনো সমাধান হয়ে যায়নি সুতরাং তা বর্তমান স্তরে চীন বিপ্লবকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক একটি বিপ্লব হিসাবেই চিহ্নিত করে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দশ দফা একটি কর্মসূচী[৫] ঘোষণা করে। এই কংগ্রেস সঠিকভাবেই এটা নির্ধারণ করে যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থাটি হচ্ছে দুটি উচ্চাভিমুখী বিপ্লবী জোয়ারের অন্তর্বর্তীকালীন একটি পরিস্থিতি, বিপ্লবের বিকাশ অসমান এবং এই সময়ে পার্টির সাধারণ কাজ আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ বা অভ্যুত্থান সংগঠন করা নয় বরং তা হচ্ছে জনসাধারণকে সপক্ষে নিয়ে আসা। দুটি ফ্রন্টে তা সংগ্রাম পরিচালনা করে, একদিকে চে তু-শিউর দক্ষিণপন্থা এবং জোর করে এগিয়ে যাওয়ার 'বামপন্থাকে' খারিজ করে দেয় এবং বিশেষভাবেই এটা দেখিয়ে দেয় যে পার্টিতে জোর করে এগিয়ে চলার এই হঠকারিতা, সামরিক হঠকারিতা ও হুকুমদারির মনোভাবই হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রবণতা কেননা

তা জনগণের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাই সৃষ্টি করে। এইসব কিছুই একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু অন্যদিকে ষষ্ঠ কংগ্রেসের ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তিও ছিল। মাঝারি শ্রেণীসমূহের দ্বৈত চরিত্র সম্পর্কে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সঠিক পরিমাণ ও নীতির তার অভাব ছিল; মহান বিপ্লবের পরাজয়ের পর সুশৃংখলভাবে রণকৌশলগত পশ্চাদপসরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, গ্রামীণ ঘাঁটি অঞ্চলের গুরুত্ব সম্পর্কে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত উপলব্ধির অভাব পার্টির দিক থেকে রয়ে গিয়েছিল। ৭ই আগস্টের সভার পরও যেসব 'বামপন্থী' ধ্যানধারণা পার্টির মধ্যে রয়ে গিয়েছিল যদিও সেই ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তিগুলিকে প্রতিরোধ করতে তা বাধা সৃষ্টি করে এবং যদিও সেগুলি পরবর্তী 'বামপন্থী' ধ্যানধারণায় আরও চরম ও প্রচণ্ডভাবে বিরাট আকার লাভ করে তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের এই প্রধান দিকটির সঠিকতা তাতে লোপ পেয়ে যায় না। কংগ্রেসের কিছু সময় পরে পার্টির কাজ ফলবতী হয়ে ওঠে। ঐ সময়ে কমরেড মাও সে-তুঙ শুধু যে বাস্তব ক্ষেত্রে ষষ্ঠ কংগ্রেসের লাইনের সঠিক দিকটিকে বিকশিত করে তোলেন এবং কংগ্রেস যেসব বহু সমস্যার হয় সমাধান করেনি বা ভুলভাবে সমাধান করেছিল সেগুলির সঠিক সমাধান করেন তাই নয়. তিনি তত্ত্বগতভাবে আরও পূর্ণতর ও অধিকতর বস্তুনিষ্ঠভাবে চীন বিপ্লবের গতিধারাকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পরিস্ফুট করে তোলেন। তাঁর পরিচালনায় ও প্রভাবে লালফৌজ আন্দোলন ক্রমশঃ দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে ওঠে। শ্বেত অঞ্চলেও পার্টি সংগঠন ও পার্টির কাজকর্ম কিছু পরিমাণে নতুন প্রাণ লাভ করে।

কিন্তু ১৯২৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ও ১৯৩০ সালের প্রথমার্ধে পার্টির কিছু কিছু যে 'বামপন্থী' ধ্যানধারণা ও কর্মনীতি তখনো রয়ে গিয়েছিল সেগুলি আবার খানিকটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ঘটনাবলী যখন বিপ্লবের অনুকূল হয়ে উঠেছিল তখন ঐ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সেগুলি দ্বিতীয় 'বামপন্থ' লাইন হিসেবে দেখা দেয়। একদিকে চিয়াং কাই-শেক এবং অন্যদিকে ফেঙ উ-সিয়াং ও ইয়েন সি-শানের মধ্যে ১৯৩০ সালের মে মাসে যখন যুদ্ধ-বেধে উঠল তখন আভ্যন্তরীণ ঐ ঘটনাপ্রবাহে উত্তেজিত হয়ে লি লি-সানের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো ১১ই জুন 'নতুন বৈপ্লবিক উচ্চাভিমুখী জোয়ার দেখা দিয়েছে এবং প্রথমে এক বা একাধিক প্রদেশে বিজয় অর্জন করুন, এই বামপন্থী

প্রস্তাবটি গ্রহণ করে যার পর থেকে দ্বিতীয়বারের মতো 'বামপন্থী' লাইন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থায় প্রাধান্য স্থাপন করে। এই ভুল লাইন (লি লি-সানের লাইন) বেশ কয়েকটি কারণেই দেখা দেয়। লি লি-সান ও অন্যান্য কমরেডরা বিপ্লবের জন্য যে নিজস্ব সাংগঠনিক শক্তি গড়ে তোলার যথেষ্ট প্রস্তুতি প্রয়োজন তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই তা দেখা দিয়েছিল, তাঁরা ভেবেছিলেন 'জনগণ এখন ছোটখাট নয়, চায় শুধু বিরাট বিরাট সংগ্রাম' এবং তাই তাদের বিশ্বাস ছিল ঐ সময়ের যুদ্ধবাজদের নিজেদের মধ্যেকার অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্গে লালফৌজ আন্দোলনের প্রাথমিক যে জাগরণ দেখা দিয়েছে ও শ্বেত এলাকায় আমাদের কাজকর্মের মধ্যে প্রাথমিক যে প্রাণসঞ্চার হয়েছে তা মিলিত হয়ে ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী 'বিরাট বিরাট সংগ্রামের' (অর্থাৎ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের) পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। চীন বিপ্লবের অসমান বিকাশ বুঝতে না পারা এবং এ কথা ধরে নেওয়া যে দেশের সকল অংশেই বৈপ্লবিক সংকট সমানতালে বিকশিত হয়ে উঠেছে, তাই সর্বত্র এখন আশু অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া দরকার এবং মূল মহানগরগুলিকেই বিশেষভাবে নেতৃত্ব নিয়ে জাতিজোড়া বিপ্লবী অভ্যুত্থানের কেন্দ্র হয়ে উঠতে হবে—এসব ধরে নেওয়ার জন্যই তা দেখা দিয়েছিল। তাঁরা কমরেড মাও সে-তুঙ-এর ধ্যানধারণাকে 'নিতান্ত ভ্রান্ত···আঞ্চলিকতাবাদী ও কৃষক মানসিকতার রক্ষণশীলতার প্রকাশ' বলে কুৎসা করেন; কমরেড মাও সে-তুঙ বলেছিলেন, দীর্ঘকাল ধরে আমাদের মূল শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে গ্রামীণ ঘাঁটি এলাকাসমূহ গড়ে তোলার জন্য, গ্রামীণ ঘাঁটি এলাকাগুলিকে ব্যবহার করে মহানগরগুলিকে ঘিরে ফেলতে হবে এবং এই ঘাঁটি এলাকাগুলিকে ব্যবহার করে জাতিজোড়া বিপ্লবের উচ্চাভিমুখী জোয়ারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই 'বামপন্থী' লাইন দেওয়ার কারণ ছিল, ওঁরা বিশ্ব বিপ্লবের অসম বিকাশকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং ধরে নিয়েছিলেন চীন বিপ্লবের সাধারণ বিস্ফোরণ অনিবার্যভাবে বিশ্ব বিপ্লবের বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে দেবে এবং তা না হলে চীনের বিপ্লবের সাফল্যলাভ সম্ভব হবে না। তা দেখা দিয়েছিল কারণ ওঁরা চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্রটি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং ধরে নিয়েছিলেন যে একটি বা একাধিক প্রদেশে বিজয়ের সূত্রপাত হলেই তা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরের সূত্রপাত করবে এবং তাই তাঁরা বেশ কয়েকটি অসময়োচিত ও 'বামপন্থী'

নীতি নির্ধারণ করে বসেন। এইসব ভুল ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে লি লি-সান লাইনের নেতৃবর্গ সমগ্র দেশব্যাপী মূল মহানগরগুলিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠনের এবং এইসব মহানগরগুলি আক্রমণের জন্য সমগ্র লালফৌজকে সমবেত করার একটি হঠকারী পরিকল্পনা রচনা করেন। তারপর তাঁরা পার্টি, ইয়ুথ লীগ ও ট্রেড ইউনিয়নের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলিকে একত্র করে সেইগুলিকে স্ব স্ব স্তরে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠনের সংগ্রাম কমিটিতে পরিণত করেন এবং এভাবে সমস্ত দৈনন্দিন কাজকর্মকে একটি অচল অবস্থায় টেনে নিয়ে আসেন। এই ভুল সিদ্ধান্তগুলির রূপায়ণ ও কার্যকরী করার সময় কমরেড লি লি-সান বহু কমরেডের সঠিক সমালোচনাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং পার্টির মধ্যেকার এবং তথাকথিত দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ওপর জোর দিলেন এবং এই স্লোগান অনুসারে যেসব কর্মীরা তাঁর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করছিলেন তাঁদের অন্যায়ভাবে আক্রমণ করলেন ও এইভাবে পার্টির মধ্যে অন্তঃপার্টি সংকীর্ণতাবাদকে গভীরতর করে তুললেন। ফলে, প্রথম 'বামপন্থী' লাইনের চেয়ে লি লি-সান লাইন অনেক বেশি পরিপূর্ণ বিকশিত একটি রূপে দেখা দিল।

অবশ্য পার্টিতে লি লি-সান লাইনের প্রাধান্যও স্বল্পকাল (চার মাসেরও কম সময়) স্থায়ী হয়। যেহেতু যেখানে যেখানে এই লাইন বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়েছিল সেখানেই পার্টি ও বিপ্লবী শক্তিগুলির ক্ষতি সাধিত হয় তাই কর্মীদের এবং পার্টি-সদস্যদের ব্যাপক অংশ এই লাইনের সংশোধন দাবি জানান। বিশেষ করে, কমরেড মাও সে-তুঙ কোন সময়ই লি লি-সান লাইনের সঙ্গে একমত ছিলেন না এবং আসলে খুবই ধৈর্যের সঙ্গে লালফৌজের প্রথম ফ্রন্ট সেনাবাহিনীর[৬] 'বামপন্থী' ভুলগুলি সংশোধন করে দিয়েছিলেন; তার ফলে এইসময়ে ক্ষতি স্বীকার করা দূরে থাক, কিয়াংসির বৈপ্লবিক ঘাঁটি অঞ্চলে লালফৌজ চিয়াং কাই-শেক এবং ফেঙ উ-সিয়াং ও ইয়েন সি-শানের মধ্যেকার যুদ্ধবিগ্রহের অনুকূল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালীই হয়ে ওঠে এবং ১৯৩০ সালের শেষের দিকে ও ১৯৩১ সালের প্রথমদিকে শত্রুর প্রথম 'অবরোধ দমন' অভিযানকে সাফল্যের সঙ্গে চুরমার করে দেয়। মাত্র কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, অন্যান্য বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাতেও লালফৌজ অনুরূপ সাফল্যলাভ করে। শ্বেত এলাকাগুলিতেও বাস্তব কাজকর্মে নিযুক্ত বহু কমরেডই পার্টির সাংগঠনিক সূত্রের মাধ্যমে লি লি-সান লাইনের বিরোধিতা করেছিলেন।

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বলে এবং পরবর্তী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব লি লি-সান লাইনের প্রয়োগের সমাপ্তি ঘটানোর ব্যাপারে একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। যদিও এই অধিবেশনের দলিলপত্রে লি লি-সান লাইন সম্পর্কে একটি সমঝওতায় ও আপোষমূলক মনোভাব প্রদর্শন করা হয়েছিল (উদাহরণ হিসেবে, এই লাইনটিকে ভুল বলে চিহ্নিত করতে তা অস্বীকার করে এবং বলে যে লাইনটি শুধু 'রণকৌশলগত-ভাবেই ভুল' ছিল) এবং যদিও সাংগঠনিকভাবে এই অধিবেশন সংকীর্ণতা-বাদের ভুলই অব্যাহত রেখেছিল, তবু তা চীন বিপ্লবের পরিস্থিতির অতি-বাম মূল্যায়নের সংশোধন করে, জাতিজোড়া সাধারণ অভ্যুত্থান সংঘটনের এবং মূল মহানগরগুলিতে আক্রমণ সংগঠিত করার জন্য সমগ্র লালফৌজকে কেন্দ্রীভূত করার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে ও স্বাধীন সংগঠনগুলিকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করে পার্টি, ইয়ুথ লীগ ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের দৈনন্দিন কাজকর্ম আবার চালু করে, এভাবে লি লি-সান লাইনের সবচেয়ে লক্ষণীয় ভুলগুলির সমাপ্তি ঘটানো হয়। তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কমরেড লি লি-সান নিজেই যে ভুলগুলি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা স্বীকার করে নেন এবং পলিটব্যুরোর নেতৃস্থানীয় অবস্থানটি পরিত্যাগ করেন। তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আরও এক কদম অগ্রসর হয়ে ১৯৩০ সালের নভেম্বরে তাঁদের পরিপূরক প্রস্তাবে ও ডিসেম্বরে ৯৬ নং সার্কুলারে ঘোষণা করলেন যে লি লি-সানের লাইন ভুল ছিল ও অন্যান্য অনুগামী কমরেডগণ ভুল ছিলেন এবং পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সমঝওতার মনোভাবও ভুল ছিল। অবশ্য তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এবং পরবর্তী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উভয়ই লি লি-সান লাইনের ভাবাদর্শ-গত মর্মবস্তুকে গভীরভাবে বিচার করতে ও তাকে সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং ১৯২৭ সালের ৭ই আগস্টের সভার সময় থেকে ও বিশেষ করে ১৯২৯ সাল থেকে পার্টির মধ্যে কিছু কিছু 'বামপন্থী' ধ্যানধারণা ও কর্মনীতি বজায় ছিল এবং এই অধিবেশন ও তারপরেও বেশ জোরদারভাবে বিরাজমান ছিল। কিন্তু যেহেতু তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর পরবর্তী নেতৃত্ব উভয়ই উপরে বর্ণিত ইতিবাচক ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করে লি লি-সান লাইনের সমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন, সকল পার্টি-সদস্যগণেরই উচিত ছিল এই ব্যবস্থাগুলির ভিত্তিতে আরও কিছু প্রয়াস চালিয়ে 'বামপন্থী' ভুলগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়া।

কিন্তু এই সময়ে এমন কিছু পার্টি কমরেড এগিয়ে এলেন যাঁদের বাস্তব বৈপ্লবিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ছিল না এবং যাদের নিজেদেরই 'বামপন্থী' একগুঁয়েমির ভুল ছিল—কমরেড চেন শাও-য়ু (ওয়াং মিং) ছিলেন তাঁদের প্রধান। 'লি লি-সান লাইনের বিরুদ্ধে' এবং 'সমঝওতার লাইনের বিরুদ্ধে' এই পতাকা উড়িয়ে তাঁরা লি লি-সান লাইনের চেয়ে আরও বেশি উগ্র একটি সংকীর্ণতাবাদী অবস্থান গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। লি লি-সান লাইনের এবং ১৯২৭ সালের ৭ই আগস্টের সভার পর থেকে ও বিশেষ করে ১৯২৯ সাল থেকে যে 'বামপন্থী' ধ্যানধারণা ও কর্মনীতি পার্টিতে বিরাজ করছিল এবং যেগুলি কোন সময়ই আনুপূর্বিকভাবে শুধরানো হয়নি সেই ভুলগুলির মতাদর্শগত মর্মবস্তুকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাঁরা এই সংগ্রাম পরিচালনা করেননি তাঁরা কার্যতঃ একটি নতুন রাজনৈতিক কর্মসূচীই হাজির করলেন, যে কর্মসূচীটি কমরেড চেন শাও-য়ু ঐ সময়ে প্রকাশিত তাঁর **দুই লাইন** অথবা **চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অধিকতর বলশেভিকীকরণের জন্য সংগ্রাম** নামক পুস্তিকায় হাজির করেন; তা ছিল এমন একটি কর্মসূচী যা নতুন ছদ্মবেশে লি লি সান লাইন ও অন্যান্য 'বামপন্থী' ধ্যানধারণা ও কর্মনীতিকেই অব্যাহতভাবে, নতুনভাবে ও বিকশিত আকারে উপস্থিত করে। তাই পার্টিতে 'বামপন্থী' ধ্যানধারণার আরও প্রসার ঘটল' এবং তা নতুন একটি 'বামপন্থী' লাইনের আকারের দেখা দিল।

যদিও চেন শাও-য়ুর নেতৃত্বাধীন এই নতুন 'বামপন্থী' লাইন লি লি-সান লাইনের 'বামপন্থী' ভুলগুলির এবং তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সমঝওতার ভুলের সমালোচনা করেছিল তবু তার লক্ষনীয় বৈশিষ্ট ছিল এই যে তা লি লি-সান লাইনকে মুলতঃ দক্ষিণপন্থী' লাইন হিসেবেই সমালোচনা করে এবং তা তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করে যে তা 'লি লি-সান লাইনের অবিচল দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী তত্ত্ব ও প্রয়োগকে উদঘাটিত করে দেওয়ার ও আক্রমণ করার জন্য কিছুই করছে না' এবং তা ৯৬ নং সার্কুলারকে 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিই যে বর্তমানে পার্টিতে প্রধান বিপদ' এ কথা দেখতে না পাওয়ার জন্য নিন্দা করে। চীনের সমাজের ও শ্রেণী সম্পর্কের প্রকৃতির প্রশ্নে এই নতুন 'বামপন্থী' লাইন চীনের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের তুলনামূলক গুরুত্বকে অনেক বাড়িয়ে দেখে, বুর্জোয়াশ্রেণী এবং ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে

সংগ্রামের তাৎপর্যকে ও চীন বিপ্লবের বর্তমান স্তরে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপাদানগুলির' তাৎপর্যকে অনেক বাড়িতে দেখে এবং মাঝারি শিবিরের অস্তিত্ব এবং তৃতীয় পার্টি ও গ্রুপের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি পার্টির কর্তব্যের প্রশ্নে নতুন 'বামপন্থী' লাইন সমগ্র দেশজোড়া একটি 'উচ্চাভি-মুখী বৈপ্লবিক জোয়ারের' কথাই জোরের সঙ্গে বলে চলতে লাগল এবং পার্টির কর্তব্য হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে একটি 'আক্রমণমুখী লাইন গ্রহণ করা' এই কথাই বলে চলতে লাগল এবং তা এ কথাই বলে চলতে লাগল যে মূল মহানগর বিশিষ্ট এক বা একাধিক প্রধান প্রদেশে অনতিবিলম্বেই একটি 'আশু বৈপ্লবিক পরিস্থিতি' দেখা দেবে। একটি 'বামপন্থী' দৃষ্টি থেকে কুৎসার ভঙ্গীতে তা জোর দিয়ে বলে বসে যে চীনে এখনো একটি 'যথার্থ' লালফৌজ এবং শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের পর্যায়ের 'যথার্থ' একটি সরকার এখনো নেই এবং বিশেষ জোর দিয়ে বলতে থাকে যে 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ', 'বাস্তব কাজকর্মে সুবিধা-বাদ' ও ধনী কৃষকদের লাইনই হচ্ছে পার্টিতে প্রধান বিপদ। সাংগনিক দিক থেকে এই নতুন 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তরা শৃঙ্খলা অমান্য করেন' পার্টির বরাদ্দ করা কাজ করতে অস্বীকার করেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উপদলীয় কার্যকলাপে অন্য কিছু কমরেডদের সঙ্গে যোগদানের ভুল করে বসেন, পার্টি সদস্যদের কাছে একটি অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থা গড়ে তোলার ভ্রান্ত আহ্বান জানিয়ে বসেন এবং এই দাবি করেন যে, যেসব 'জঙ্গী কর্মী' তাঁদের 'বামপন্থী' লাইন 'সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন ও অনুসরণ করেন' ওঁদের কাজে লাগিয়ে 'সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলিকে সংস্কার ও জোরদার করে তোলা' দরকার; এভাবে তাঁরা পার্টিতে এক গুরুতর সংকট সৃষ্টি করেন। সুতরাং সাধারণভাবে বলা চলে যে এই নতুন 'বামপন্থী লাইন লি লি-সান লাইনের তুলনায় অনেক বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অনেক বেশি 'তাত্ত্বিক', অনেক বেশি প্রভুত্বপ্রয়াসী এবং 'বামপন্থী' বাগ্‌বিস্তারে অনেক বেশি স্পষ্ট, যদিও তা মূল মহানগরগুলিতে অভ্যুত্থান সংগঠনের আহ্বান জানায়নি এবং একটা সময় পর্যন্ত ঐ মহানগরগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার জন্য লালফৌজকে কেন্দ্রীভূত করার আহ্বানও জানায়নি।

১৯৩১ সালের জানুয়ারিতে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আহ্বান করা হল এমন একটা পরিস্থিতিতে যখন কমরেড চেন শাও-য়ুর নেতৃত্বে বামপন্থী গোঁড়া ও সংকীর্ণতাবাদী লোকজনেরা সব দিক থেকে চাপ

দিচ্ছিলেন এবং যে সময়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থার যেসব কমরেডরা নিছক অভিজ্ঞতাবাদী ভুল করেছিলেন তাঁরা ঐ লোকজনদের সঙ্গে আপোষ করছিলেন ও তাদের সমর্থন করছিলেন। এই অধিবেশনের আহ্বান কোন ইতিবাচক অথবা গঠনমূলক ভূমিক পালন করেনি ; ফল দাঁড়াল এই যে, নতুন 'বামপন্থী' লাইন গৃহীত হল, কেন্দ্রীয় নেতৃস্থানীয় সংস্থায় তার বিজয় সাধিত হল ও কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের যুগে তৃতীয়বারের মতো পার্টিতে 'বামপন্থী' লাইনের প্রাধান্যের শুরু হল। চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অবিলম্বে নতুন 'বামপন্থী' লাইনের কর্মসূচীর দুটি পরস্পর যুক্ত ও ভ্রান্ত বিষয়কে কার্যকর করল, সেগুলি হচ্ছে : 'বর্তমানে পার্টির মধ্যে প্রধান বিপদ' হিসাবে তথা অভিহিত 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির, বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং 'সমস্ত স্তরে নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলিকে সংস্কার ও জোরদার করা'। বাহ্যতঃ তা কখনো লি লি-সান লাইনের এবং 'সমঝওতার লাইনের' রাজনৈতিক কর্মসূচীর সারকথা ছিল মুখ্যতঃ 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে'। চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন তার প্রস্তাবাদিতে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ করেনি বা পার্টির সামনে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্তব্য উপস্থিত করেনি এবং তথাকথিত 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি' এবং সাধারণভাবে 'বাস্তব কাজকর্মের ক্ষেত্রে' সুবিধাবাদের নিছক বিরোধিতা করেছিল কিন্তু আসলে তা কমরেড চেন শাও-য়ুর পুস্তিকা **দুই লাইন** অথবা **চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অধিকতর বলশেভিকী-করণের জন্য সংগ্রামকে** অনুমোদন করে, যে পুস্তকটিতে পার্টির মধ্যেকার 'বামপন্থী' ধ্যানধারণাই ফুটে উঠেছিল এবং ঐ সময়কার লোকজনেরা ও তারপরের দশ বছর বা তারও বেশি সময় একটি 'সঠিক কর্মসূচীগত ভূমিকা' পালন করেছিল বলে ধরে নিয়েছিল যদিও উপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে যে তা মূলতঃ ছিল ' দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরোধী' সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী সাধারণ একটি কর্মসূচী। এই কর্মসূচী অনুযায়ী চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এবং পরবর্তী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একদিকে 'বামপন্থী' গোঁড়া সংকীর্ণতাবাদী কমরেডদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থায় দায়িত্বশীল উচ্চপদে নিয়োগ করেন ; অন্যদিকে, যেসব কমরেড লি লি-সান লাইনের ভুল করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে মাত্রাতিরিক্ত আক্রমণ চালান এবং চু চিউ-পাই-এর[৭] নেতৃত্বাধীনে যেসব কমরেড তথাকথিত 'সমঝওতার লাইনের ভুল' করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে অন্যায় আক্রমণ চালান এবং অধিবেশনের

অব্যবহিত পরেই কেন্দ্রীয় কমিটি বিপুলসংখ্যক তথাকথিত 'দক্ষিণপন্থী' কমরেডদের অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেন। আসলে, তদানীন্তন ঐ 'দক্ষিণপন্থীরা' ছিলেন মূলতঃ ঐ অধিবেশনে 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে' পরিচালিত উপদলীয় সংগ্রামেরই সৃষ্টি। অবশ্য ঐ লোকেদের মধ্যে লো চ্যাঙ-লুং-এর নেতৃত্বাধীন কিছু ভাঙনসৃষ্টিকারীরা ছিলেন এবং তাঁরা পরে যথার্থ দক্ষিণপন্থী হয়ে উঠেছিলেন, অধঃপতিত প্রতিবিপ্লবী হয়ে উঠেছিলেন এবং চিরস্থায়ীভাবে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন, এতে কোন সন্দেহই নেই যে ওঁদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালানোই প্রয়োজন ছিল; তাঁরা যে দ্বিতীয় একটি পার্টি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন এবং তা বজায় রাখার জন্য একটানা চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন তা পার্টি-শৃংখলার দিক থেকে একান্তভাবে অনুমোদনের অযোগ্য ছিল। কিন্তু লিন য়ু-নান,[৮] লি চিউ-শী[৯] হো মেঙ-শিউাং[১০] এবং অন্য যে প্রায় বিশজন গুরুত্বপূর্ণ পার্টি-কর্মীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হয়েছিল তাঁরা পার্টি ও জনগণের প্রয়োজনীয় হিতকর অনেক কাজ করে যাচ্ছিলেন ও জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিলেন; যখন তাঁদের কিছু পরেই গ্রেপ্তার করা হল, তাঁরা অবিচল অমননীয় দৃঢ়ভাবে শত্রুর সামনে দাঁড়ালেন এবং বীরের মতো মৃত্যু বরণ করলেন। 'সমঝওতার লাইন অনুসারে ভুল করার' অভিযোগ করা হয়েছিল যে কমরেড চু চিউ-পাইয়ের বিরুদ্ধে তিনি ঐ সময়ে একজন শ্রদ্ধেয় পার্টিনেতা ছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর পরও তিনি (প্রধানতঃ সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে) অনেক হিতকর কাজ করে যাচ্ছিলেন এবং ১৯৩৫ সালের জুন মাসে শত্রুর জল্লাদের হাতে তিনি বীরের মতোই মৃত্যুবরণ করেন। এইসব কমরেডদের প্রলেতারীয় বীরত্বের স্মৃতি চিরকাল অম্লান রাখা উচিত। চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্রীয় সংস্থায় যে ধরণের 'সংস্কার' কার্যকর করেছিলেন ঠিক একইভাবে সেগুলিকে সকল বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে এবং শ্বেত এলাকাতেও স্থানীয় সংগঠনসমূহে প্রসারিত করা হল। তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ও তার পরবর্তী নেতৃত্বের তুলনায় চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পরবর্তী নেতৃত্ব 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সারা দেশব্যাপী নিজের প্রতিনিধিদের, মুখপাত্রদের এবং নতুন নেতৃস্থানীয় কর্মীদের প্রেরণ করে কার্যকর করার ব্যাপারে ছিলেন অনেক বেশি দৃঢ়পণ অনেক বেশি ধারাবাহিক।

চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কিছুকাল পরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ১৯৩১ সালের

৯ই মে যে প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেন তা থেকে দেখা যায় যে ঐ নতুন 'বামপন্থী' লাইন ইতিমধ্যেই বাস্তবে প্রয়োগ করা শুরু হয়ে গেছে এবং বাস্তব কাজকর্মে তার প্রকাশ আরম্ভ হয়ে গেছে। তারপরই চীনে ধারাবাহিক অনেকগুলি বিরাট বিরাট ঘটনা ঘটে গেল। চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাদের ভ্রান্ত লাইন কার্যকর করে তোলার আগেই কিয়াংসির মধ্য অঞ্চলের লালফৌজ কমরেড মাও সে-তুঙ-এর সঠিক নেতৃত্বাধীনে এবং সকল কমরেডের অদম্য প্রয়াসের মধ্য দিয়ে বিরাট বিজয় অর্জন করে ফেলল এবং শত্রুর 'অবরোধ ও দমনের' দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযানকে চুরমার করে দিল; অপরাপর অধিকাংশ ঘাঁটি অঞ্চল ও লালফৌজের ইউনিটসমূহ বহু বিজয় অর্জন করে এবং ঐ সময়ে এবং একই পরিস্থিতিতে অনেকখানি অগ্রগতি সাধন করে। ইতিমধ্যে, ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার মধ্য দিয়ে যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ শুরু হয়েছিল তাতে করে সারা দেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এক নতুন জাগরণ দেখা দিল। একেবারে শুরু থেকেই এই ঘটনাগুলির ফলে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল নতুন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তার মূল্যায়নে সম্পূর্ণ ভুল করে বসলেন। তা কুওমিনতাঙ শাসনের সাম্প্রতিক সংকট ও বৈপ্লবিক শক্তিগুলির বিকাশ এই দুটিকেই অনেক বাড়িয়ে দেখল; ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর যে চীন ও জাপানের মধ্যেকার জাতীয় দ্বন্দ্ব ক্রমেই বেড়ে উঠছে এবং মাঝারি শ্রেণীগুলি জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানাচ্ছে এই বাস্তব ঘটনাকেই তা অবহেলা করল। তাঁরা জোর দিয়ে বলতে লাগলেন যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করার জন্য জোট বাঁধতে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি, চীনা প্রতিবিপ্লবী চক্রগুলি ও মাঝারি গ্রুপগুলি পর্যন্ত চীন বিপ্লবকে আক্রমণ করার জন্য জোট বাঁধবে; তাঁরা দ্ব্যর্থহীনভাবে জোর দিয়ে বললেন যে ঐ মাঝারি গ্রুপগুলিই হচ্ছে চীন বিপ্লবের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু। সুতরাং এই নতুন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 'সব কিছুকে গোল্লায় পাঠানোর' তাঁদের প্রচারে নিরলস থেকে গেলেন এবং বললেন 'চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মর্মকথাই হচ্ছে প্রতিবিপ্লব ও বিপ্লবের মধ্যেকার জীবন-মরণের সংগ্রাম'; তাই তাঁরা আরেকবার অনেকগুলি হঠকারী প্রস্তাব, যেমন লালফৌজ কর্তৃক মূল মহানগরগুলি দখল করে নিয়ে প্রথমে এক বা একাধিক প্রদেশে বিজয় অর্জন করা, শ্বেত এলাকার সর্বত্র শ্রমিক ও কৃষকদের অস্ত্রসজ্জিত করে তোলা এবং

সাধারণ-ধর্মঘট আহ্বান করা ইত্যাদি প্রস্তাব হাজির করলেন। এই ভুলগুলির প্রথম প্রকাশ দেখা গেল ১৯৩১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের তাদের "অবরোধ ও দমনের" জন্য শত্রুর তৃতীয় অভিযান শ্রমিক ও কৃষকদের লাল-ফৌজ কর্তৃক চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়া এবং ক্রমান্বয়ে বৈপ্লবিক সংকটের পরিপক্ক হয়ে ওঠার ফলে উদ্ভূত জরুরী কর্তব্য সম্পর্কিত প্রস্তাবে'। অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা তাদের নির্দেশ অনুসারে লিখিত নিম্নলিখিত দলিলগুলিতে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করা হল এবং সেগুলির পূর্ণতর প্রকাশ ঘটল :

'জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কতৃক বলপূর্বক মাঞ্চুরিয়া দখল সম্পর্কিত প্রস্তাব' (২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১) ;

'প্রথমে একটি বা একাধিক প্রদেশে বিপ্লবের বিজয়ের জন্য সংগ্রাম সম্পর্কিত প্রস্তাব' (৯ই জানুয়ারী, ১৯৩২) ;

'২৮শে জানুয়ারী সম্পর্কে প্রস্তাব' (২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২) ;

'প্রথমে একটি বা একাধিক প্রদেশে চীন বিপ্লবের বিজয়ের জন্য সংগ্রামে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সুবিধাবাদী দোদুল্যমানতা' (৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩২) ;

'সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং চীনের বিভাগের বিরুদ্ধে ও জাতীয় বৈপ্লবিক যুদ্ধের সম্প্রসারণের জন্য আন্দোলন অভিযান সপ্তাহে নেতৃত্বদান ও অংশগ্রহণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্য-অঞ্চলীয় ব্যুরোর প্রস্তাব' (১১ই মে, ১৯৩২) ; এবং

'বর্ধমান বৈপ্লবিক সংকট ও উত্তর চীনে পার্টির কর্তব্য' (২৪ শে জুন, ১৯৩২)।

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে কমরেড চিন প্যাং-সিয়েন (পো কু)র[১১] নেতৃত্বে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে সুনাইতে অনুষ্ঠিত সভা পর্যন্ত সময় হচ্ছে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের একটানা বিকাশলাভের সময়। এই ভ্রান্ত লাইনের ফলে শ্বেত এলাকা-সমূহে যে গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় তাতে করে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ১৯৩৩ সালের প্রথমদিকে দক্ষিণ কিয়াংসির ঘাঁটি অঞ্চলে চলে আসে এবং এই চলে আসার ফলে ওখানে ও পার্শ্ববর্তী ঘাঁটি অঞ্চলসমূহে তাদের ভ্রান্ত লাইনের অধিকতর প্রয়োগ সহজ হয়। তার আগেই, দক্ষিণ কিয়াংসি ও পশ্চিম ফুকিয়েনের

ঘাঁটি অঞ্চলে অনুসৃত সঠিক লাইনকে ১৯৩১ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ কিয়াংসি ঘাঁটি অঞ্চলের পার্টি কংগ্রেস এবং ১৯৩২ সালের আগস্টে লাল ঘাঁটি-অঞ্চলের মধ্য-অঞ্চলীয় ব্যুরোর নিংতুতে অনুষ্ঠিত সভা চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম' এবং 'সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলির সংস্কারের' ভ্রান্ত কর্মসূচী অনুযায়ী কুৎসা করে এবং সঠিক লাইনকে 'ধনী কৃষকদের লাইন' 'সবচেয়ে গুরুতর ও একটানা দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ' বলে অভিহিত করা হয় এবং পার্টি ও সামরিকবাহিনীর সঠিক নেতৃত্বকে অপসারণ করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও লালফৌজের মধ্যে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর সঠিক রণনীতিগত নীতিসমূহের সুগভীর প্রভাবের জন্য সৈন্যবাহিনীতে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভ্রান্ত লাইন পুরোপুরি কার্যকর হয়ে ওঠার আগেই ১৯৩৩ সালের বসন্তকালে চতুর্থ 'অবরোধ ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে জয় অর্জিত হয়। অন্যদিকে, ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে যে পঞ্চম 'অবরোধ ও দমন' অভিযানের সূত্রপাত হয় তার বিরুদ্ধে অভিযানকালে একান্ত ভ্রান্ত রণনীতি পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। অন্যান্য বহু নীতির ক্ষেত্রে ও বিশেষ করে ফুকিয়েনের ঘটনার ব্যাপারে ভ্রান্ত 'বামপন্থী' লাইনকে পুরোপুরিভাবে প্রয়োগ করা হয়।

ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ যে অধিবেশন ১৯৩৪ সালের জানুয়ারীতে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আহ্বান করে তাতে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যায়। চীনের বিপ্লবী আন্দোলনে এবং ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ও ১৯৩২ সালের ২৮ শে জানুয়ারির ঘটনার পর কুওমিনতাঙ এলাকার জনগণের জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে 'বামপন্থী' লাইন যে বিরাট ক্ষতিসাধন করেছে তাকে উপেক্ষা করে পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অন্ধভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে 'চীনে বৈপ্লবিক সংকট একটি নতুন তীব্র পর্যায়ে উপনীত হয়েছে—চীনে একটি আশু বৈপ্লবিক পরিস্থিতিই বিরাজ করছে' এবং পঞ্চম 'অবরোধ ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে 'চীন বিপ্লবের পরিপূর্ণ বিজয়েরই সংগ্রাম' যার মধ্য দিয়ে চীনের ক্ষেত্রে '"কে কাকে জয় করবে" এই প্রশ্নের এবং বিপ্লবের পথ, না ঔপনিবেশিকতার পথ' এই প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। লি লি-সান লাইনের দৃষ্টিভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করে এই অধিবেশনে ঘোষনা করা হয় যে, 'আমরা যখন শ্রমিক ও কৃষকদের গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবকে চীনের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে দিতে পারব তখন সমাজ-

তান্ত্রিক বিপ্লবই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে; একমাত্র এই ভিত্তিতেই চীনকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে এবং চীনা জনগণ জাতীয় মুক্তি অর্জন করবে' ইত্যাদি ইত্যাদি,। 'প্রধান বিপদ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম', 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের প্রতি সমঝওতার মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম' এবং 'বাস্তব কাজে পার্টি লাইনকে বিনিষ্ট করার দ্বিমুখী মনোভাব গ্রহণের' বিরুদ্ধে সংগ্রামের শ্লোগান হাজির করে তা মাত্রাতিরিক্ত উপদলীয় সংগ্রামকে চালিয়ে যেতে ও বাড়িয়ে তুলতে থাকে এবং কমরেডদের আক্রমণ করার নীতি চালিয়ে যেতে থাকে।

বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের সবচেয়ে মারাত্মক পরিণতি হচ্ছে 'অবরোধ ও দমনের' বিরুদ্ধে অভিযান এমন একটি এলাকায় ব্যর্থ হয় যেখানে কেন্দ্রীয় নেতৃস্থানীয় সংস্থাটি অবস্থিত ছিল এবং সেখান থেকেই লাল-ফৌজের মূল বাহিনীকে অপসারণ করে নিতে হল। কিয়াংসি থেকে অপসারণ-কালে এবং লং মার্চকালে সামরিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে ভিন্ন একটি ভুল, পলায়নবৃত্তির ভুল 'বামপন্থী' লাইনের পরিণতি হিসেবে ঘটল যাতে করে লাল-ফৌজের আরও অনেক ক্ষতি হল। অনুরূপভাবে, 'বামপন্থী' লাইনের প্রভাবের জন্য অন্যান্য প্রায় সকল বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে (ফুকিয়েন-চেকিয়াং-কিয়াংসি অঞ্চলে, হুপে-হোনান-আনহুই অঞ্চলে, হুনান-হুপে-কিয়াংসি অঞ্চলে, হুনান-কিয়াংসি অঞ্চলে, পশ্চিমে হুনান-হুপে অঞ্চলে, সেচুয়ান-শেনসি অঞ্চলে) এবং বিশাল শ্বেত এলাকাসমূহে পার্টির কাজকর্ম পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। চ্যাঙ কুও-তাও-এর যে লাইন এক সময়ে হুপে-হোনান-আনহুই এবং সেচুয়ান-শেনসি অঞ্চলে প্রধান্য বিস্তার করেছিল—তা নিছক একটি 'বামপন্থী' সাধারণ ধরনের লাইন ছিল না বরং তার মধ্যে ফুটে উঠেছিল বিশেষ গুরুতর রকমের যুদ্ধবাজদের একটি মনোভাব এবং শত্রুর আক্রমণের সামনে পলায়নের একটি মনোবৃত্তি।

যে ভ্রান্ত 'বামপন্থী' লাইনটি তৃতীয়বারের মতো সমগ্র পার্টির ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং যে লাইনের নেতা ছিলেন দুজন গোঁড়াপন্থী কমরেড চেন শাও-যু ও চিন প্যাং-সিয়েন—এই ছিল তার মূল বিষয়বস্তু।

'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে' নিজেদের আবৃত করে এবং চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন যে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক মর্যাদা ও প্রভাব সৃষ্টি করেছিল তার ওপর নির্ভর করে গোঁড়া মতান্ধতার ভুলের দোষে দোষী ঐ কমরেডরা দীর্ঘ চার বছর পার্টিতে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রাধান্যের জন্য দায়ী ছিলেন, তাকে

মতাদর্শগতভাবে, রাজনৈতিকভাবে, সামরিকভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও সবচেয়ে ধারাবাহিকভাকে প্রকট করে তুলেছিলেন এবং পার্টিতে তাকে সুগভীর প্রভাবশালী করে তুলতে পেরেছিলেন—তারই ফল হিসেবে এতে করে সবচেয়ে মারাত্মক রকমের ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। তা সত্বেও, এই বাস্তব সত্যকে অবজ্ঞা করে, এই ভুল লাইনের দোষে দোষী কমরেডরা দীর্ঘকাল প্রবল চিৎকার করে চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পরবর্তী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের লাইনের 'সঠিকতা' ও 'অবিনশ্বর অবদান্' সম্পর্কে গলাবাজী করে বেড়াচ্ছিলেন এবং 'চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অধিকতর বলশেভিকীকরণ" ও 'শতকরা একশ ভাগ বলশেভিক' ইত্যাদি গোঁড়ামিপূর্ণ শব্দসমষ্টি ব্যবহার করছিলেন। এভাবে পার্টির ইতিহাসকে তাঁরা পুরোপুরি বিকৃত করে দিয়েছিলেন।

কমরেড মাও-তুঙকে তাঁদের মুখপাত্র করে যেসব কমরেডরা সঠিক লাইনের কথা বলছিলেন তাঁরা তৃতীয় বামপন্থী লাইনের আধিপত্যের সময়টাতে পুরোপুরি বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা 'বামপন্থী' লাইন সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন এবং তা সংশোধন করার দাবী জানিয়েছিলেন, তার ফল হিসেবে চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পরবর্তী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, তাদের মুখপাত্র ও প্রতিনিধিগণ সব জায়গাতেই তাদের সঠিক নেতৃত্বকে দূর করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব কাজকর্মে 'বামপন্থী' লাইন বারবার ব্যর্থ হওয়া এবং যেখানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অবস্থান করছিল সেই অঞ্চলেই পঞ্চম 'অবরোধ ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পুনঃপুনঃ ব্যর্থতা অধিক থেকে অধিকতর নেতৃস্থানীয় কর্মী ও সাধারণ পার্টি-সদস্যদের কাছে এই লাইনের ভুলকে উদঘাটিত করে দিতে লাগল এবং তাঁদের মনে সন্দেহ ও বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলতে লাগল। ঐ অঞ্চলের লালফৌজ লং মার্চের যাত্রা শুরু করার সময়ে এই সন্দেহ ও বিক্ষোভ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, যেসব কমরেড 'বামপন্থী' ভুলভ্রান্তি করেছিলেন তাঁরা অনেক সজাগ হয়ে উঠলেন এবং তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলেন। ফলে 'বামপন্থী' লাইনের বিরোধী বিরাট সংখ্যক কর্মী ও পার্টি-সদস্য কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে সমবেত হলেন। সুতরাং কিউচাও প্রদেশের সুনাই শহরে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বাধীনে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর বর্ধিত সভার পক্ষে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থায় বিজয়ী সাফল্যের সঙ্গে 'বামপন্থী'

লাইনের আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটানো এবং সর্বাপেক্ষা সংকটময় একটি মুহূর্তে পার্টিকে রক্ষা সম্ভবপর হয়।

সুনাইতে অনুষ্ঠিত সভা সামরিক ও সাংগঠনিক ভুলগুলি সংশোধনের ব্যাপারে সকল প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করে সম্পূর্ণ সঠিক কাজই করেছিল এবং ঐ সময়ে ঐগুলির চূড়ান্ত নির্ধারক গুরুত্ব ছিল। কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বাধীন একটি নতুন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঐ সভায় নিয়োগ করা হয়—চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে তা বিপুল গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন হয়ে ওঠে। ঠিক এই কারণের জন্যই আমাদের পার্টি বিজয়ীর মতো লং মার্চ সমাপ্ত করতে সমর্থ হয়, চূড়ান্ত কঠিন ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে লালফৌজ ও পার্টির কর্মীদের একটি শক্তিশালী কেন্দ্রকে রক্ষা করা ও তাকে ইস্পাত-কঠিন করে তোলা সম্ভব হয় যে চাঙ কুও-তাও পিছু হটার ও পলায়নের লাইনের কথা বলছিলেন এবং বাস্তবে একটা নকল পার্টিই স্থাপন করছিলেন তাঁর লাইনকে সাফল্যের সঙ্গে পরাজিত করা সম্ভব হয় এবং 'বামপন্থী' লাইনের[১২] সৃষ্ট সংকট থেকে উত্তর শেনসির বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলকে রক্ষা করা, ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বরের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়া, ১৯৩৬ সালের সিয়ান ঘটনাকে সঠিকভাবে সমাধান করা, জাপ-বিরোধী জাতীয় ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তোলা এবং জাপানের বিরুদ্ধে পবিত্র প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রতিষ্ঠা ও গতি সঞ্চার করা সম্ভবপর হয়।

সুনাইতে অনুষ্ঠিত সভার পর থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থার রাজনৈতিক লাইন ছিল সম্পূর্ণ সঠিক। 'বাম পন্থী' লাইনকে রাজনৈতিকভাবে, সামরিকভাবে ও সাংগঠনিকভাবে ক্রমান্বয়ে দূর করা গেছে। ১৯৪২ সাল থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বাধীনে আত্মগত বিষয়ীবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ও ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা এবং পার্টির ইতিহাস অধ্যয়নের ব্যাপারে সমগ্র পার্টিব্যাপী শুদ্ধিকরণের জন্য আন্দোলন একেবারে তাদের মতাদর্শগত মূলে ধরে পার্টির ইতিহাসে বিভিন্ন যেসব 'বামপন্থী' ও দক্ষিণপন্থী ভুলভ্রান্তি হয়েছে সেগুলিকে সংশোধন করেছে। যে সব কমরেড 'বামপন্থী' বা দক্ষিণপন্থী ভুলভ্রান্তি করেছিলেন তাঁদের বিপুল সংখ্যাধিক অংশ একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা সঞ্চয় করে পার্টি ও জনগণের জন্য প্রচুর ভাল কাজ করেছেন। একটি সাধারণ রাজনৈতিক উপলব্ধির ভিত্তিতে তাঁরা ব্যাপক অপরাপর কমরেডদের সঙ্গে এখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছেন।

এই বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এটা দেখিয়ে দিতে পেরে আনন্দিত যে আমাদের পার্টি তার সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে অবশেষে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে বর্তমানের এই অতুলনীয় মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও সামরিক ঐক্য ও সংহতির একটি উচ্চ মান অর্জন করেছে। আজ তা এমন একটি পার্টি হয়ে উঠেছে যে শীঘ্রই তা বিজয় অর্জন করবে, আজ তা এমন একটি পার্টি হয়ে উঠেছে যে, কোন শক্তিই আর তাকে পরাজিত করতে পারবে না।

বর্ধিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন মনে করে, যেহেতু প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগ এখনো শেষ হয়ে যায়নি তাই প্রতিরোধ-যুদ্ধের সময়কার পার্টির ইতিহাসের কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটা ভবিষ্যতের পরবর্তী একটা দিনের জন্য মুলতুবী রেখে দেওয়া চলে।

(৪)

বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইনের এবং বিশেষ করে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে কমরেডরা যাতে একটা ভাল ধারণা করতে পারেন ও তাঁরা যাতে 'অতীতের ভুলগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যৎ ভুলগুলি পরিহার করতে পারেন', এইসব ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে পারেন তার জন্য আমরা ঐ লাইনগুলি মূল বিষয়বস্তুর দিক থেকে কোথায় কোথায় রাজনৈতিক, সামরিক, সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত দিক থেকে সঠিক লাইনের পরিপন্থী তা এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

১। রাজনৈতিক দিক থেকে:

কমরেড স্তালিন এটি দেখিয়ে দিয়েছেন[১৩] এবং কমরেড মাও সে-তুঙ বিস্তারিতভাবে তার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন যে বর্তমান স্তরে চীন হচ্ছে একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ (১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে দেশের কোন কোন অংশে তা উপনিবেশেও পরিণত হয়েছে) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে চীনের বিপ্লব হচ্ছে একটা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব যে যুগে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজয়ী হয়েছে এবং চীনের শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিকভাবে জেগে উঠেছে। এর মধ্য দিয়ে বর্তমান স্তরে চীন বিপ্লবের চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে ও অন্যান্য ব্যাপক

সামাজিক স্তরের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সম্পাদিতব্য তা হচ্ছে একটি সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লব অর্থাৎ তা হচ্ছে একটি নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যা অতীতের পুরানো গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এই দুয়ের থেকেই স্বতন্ত্র। বর্তমান স্তরে চীন যেহেতু বেশ কয়েকটি শক্তিমান অথচ পারস্পরিক সংঘর্ষরত সাম্রাজ্যবাদী দেশের ও চীনের সামন্তবাদী শক্তি-গুলির প্রভাবাধীন একটি বিশাল আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ, তাই তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ চূড়ান্ত রকমের অসমান এবং তাতে একারূপতার অভাব রয়েছে। এ থেকেই দেখা দিয়েছে চীনের নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশে চূড়ান্ত অসমতা এবং এর ফলেই দীর্ঘস্থায়ী আঁকাবাঁকা পথ ধরে অগ্রসর হওয়ার মধ্য দিয়েই জাতীয় স্তরে বিপ্লবের সাফল্য অর্জিত হওয়া সম্ভবপর হবে, একই সঙ্গে শত্রুর মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহকে ব্যাপক-ভাবে কাজে লাগিয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করা ও যেসব বিশাল অঞ্চলে শত্রুর নিয়ন্ত্রণ তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্রথমেই সেইসব অঞ্চলে সশস্ত্র বৈপ্লবিক ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা সম্ভবপর হবে। এইগুলিই হচ্ছে চীন বিপ্লবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক বিধানসমূহ এবং চীন বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সেগুলি সুপ্রমাণিত হয়েছে অথচ বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী ও 'বামপন্থী' এই উভয় লাইনগুলি এবং বিশেষ করে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইন সেগুলি উপলব্ধি করতে পারেনি ও সেগুলিকে লংঘনই করেছে। সুতরাং 'বামপন্থী' লাইনগুলি তিনটি প্রধান দিক থেকে রাজনীতিগতভাবে ভুল ছিল।

প্রথম দিক। সবার আগে বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইনগুলি ভুল করেছিল বিপ্লবের কর্তব্য ও শ্রেণী-সম্পর্কের প্রশ্নে। কমরেড স্তালিনের মতোই কমরেড মাও সে-তুঙ দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে বর্তমান স্তরে চীনের বিপ্লবের কাজ হচ্ছে শুধু সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা নয় বরং আরও বিশেষ করে বলতে গেলে, চীনে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জমির জন্য কৃষকদের সংগ্রামই হচ্ছে তার মৌলিক বিষয় এবং চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব মর্মবস্তুর দিক থেকে হচ্ছে একটি কৃষি-বিপ্লব এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে চীনের শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক কর্তব্য হচ্ছে কৃষকজনগণের সংগ্রামকে নেতৃত্বদান করা[১৪] কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধের প্রথম যুগের শুরুর দিকে কমরেড মাও সে-তুঙ দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে চীনের এখনো যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং চীন 'ঐ রকম একটি

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেই' কারো পক্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনার[১৫] কথা বলা সম্ভব হবে তিনি বলেছিলেন মহানগরগুলিতে বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর কৃষি বিপ্লব আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং 'আধা-ঔপনিবেশিক চীনের বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব না থাকলে কৃষকদের সংগ্রাম সব সময়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, কিন্তু কৃষকজনগণের সংগ্রাম যদি শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিগুলিকে ছাড়িয়েও যায় তবে তাতে বিপ্লবের কোন ক্ষতি হবে না।[১৬] তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, বিপ্লবের প্রতি বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার পরও উদারনৈতিক বুর্জোয়াশ্রেণী ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে ; এখনো পর্যন্ত ব্যাপক জনগণের একটি স্তর রয়েছে যা গণতন্ত্র চায় এবং বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চায় ; এই সব বিভিন্ন মাঝারি শ্রেণীগুলিকে সঠিকভাবে বিচার করা প্রয়োজন এবং তাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা বা তাদের নিরপেক্ষ করে রাখার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করা প্রয়োজন ; এবং গ্রামাঞ্চলে মাঝারি ও ধনী কৃষকদের প্রতি সঠিক আচরণ করা প্রয়োজন ('যাদের বাড়তি রয়েছে তাদের কাছ থেকে নিতে হবে এবং যাদের কমতি আছে তাদের দিতে হবে, আর যাদের অপেক্ষাকৃত ভাল জিনিস রয়েছে তাদের কাছ থেকে নিতে হবে এবং যাদের অপেক্ষাকৃত খারাপ জিনিস আছে তাদের দিতে হবে' এবং এই সঙ্গে মাঝারি কৃষকদের সাথে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, সম্পন্ন কৃষকদের রক্ষা করে ধনী কৃষকদের কিছু কিছু অর্থনৈতিক সুবিধার সুযোগ করে দিয়ে এবং ঐ সঙ্গে সাধারণ জমিদার-গণকেও বাঁচার মতো একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে)।[১৭] এইসবই হচ্ছে নয়া-গণতন্ত্রের মৌলিক ধ্যানধারণা অথচ 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তারা এই কথা বোঝেননি এবং এইগুলির বিরোধিতাই করেছিলেন। বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইন যেসব বৈপ্লবিক কাজকর্ম হাজির করেছিল যদিও তার অনেকগুলি ছিল চরিত্রের দিক থেকে গণতান্ত্রিক, তবু 'বামপন্থী' লাইনগুলির প্রবক্তারা কিন্তু অপরিহার্যভাবে গণতান্ত্রিক 'বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যেকার সুনির্দিষ্ট পার্থক্যকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন এবং চিন্তার দিক থেকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী ছিলেন ; তাঁরা অপরিহার্য-ভাবে চীন বিপ্লবে কৃষকজনগণের সামন্তবাদ-বিরোধী সংগ্রামের নির্ধারক ভূমিকাকে খাটো করে দেখছেন ; এবং তাঁরা সব সময়ই পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর উপরতলার লোক সহ সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর' বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথাই

বলে এসেছেন। তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইন আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমান পর্যায়ে স্থাপন করেছিল, মাঝারি শিবিরের এবং পার্টি গ্রুপের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছিল এবং ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল। বিশেষ করে ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর চীনের শ্রেণী-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল কিন্তু এই পরিবর্তনকে স্বীকার করা দূরে থাক তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইন প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ শাসনের সঙ্গে যে মাঝারি গ্রুপগুলির দ্বন্দ্ব-বিরোধ ছিল এবং যাঁরা ইতিবাচক পদক্ষেপ করছিলেন সেই মাঝারি গ্রুপ-গুলিকেই 'সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু' বলে দ্ব্যর্থহীনভাবে চিহ্নিত করেছিল। তবু এটা বলতেই হবে, তৃতীয় বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তরা কৃষকদের জমি বণ্টনের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা এবং কুওমিনতাঙ সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই সমস্ত প্রয়াসই সঠিক ছিল। কিন্তু উপরে উল্লিখিত 'বামপন্থী' ধ্যানধারণার জন্য লালফৌজ আন্দোলনকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষকদের একটি আন্দোলন হিসেবে স্বীকার করতে অযথা ভুল করে তাঁরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবং তাঁদের ভাষায় যাতে তাঁরা 'কৃষকদের অদ্ভুত বিপ্লবীয়ানা', 'কৃষক পুঁজিবাদ' ও 'ধনী কৃষকদের লাইন' বলে অভিহিত করেছিলেন অহেতুক অযথা ভুল করে তার বিরোধিতাও করেছিলেন। উল্টোদিকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সীমা ছাড়িয়ে তাঁরা বেশ কিছু তথাকথিত 'শ্রেণী-লাইনের' কর্মনীতিকে কার্যকর করলেন, যেমন, ধনী কৃষক অর্থনীতির বিলোপসাধনের নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং অন্যান্য অতি-বাম অর্থ নৈতিক ও শ্রমনীতি গ্রহণ করেছিলেন; এমন একটি রাষ্ট্রনীতি তাঁরা গ্রহণ করলেন যাতে কোন শোষকেরই রাজনৈতিক অধিকার ছিল না; তাঁদের জনশিক্ষার নীতি বিষয়বস্তু হিসেবে সাম্যবাদের ওপরই জোর দিল; বুদ্ধিজীবীদের প্রতি অতি বামনীতি গ্রহণ করা হল; শত্রুদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কাজের যে নীতি গ্রহণ করা হল তাতে অফিসারদের নয়, শুধু সাধারণ সৈনিকদেরই পক্ষে নিয়ে আসার কথা বলা হল; এবং প্রতিবিপ্লবীদের দমনের ব্যাপারে একটি অতি-বামনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। তাই বিপ্লবের আশু কর্তব্যগুলিকে বিকৃত করা হল, বিপ্লবী শক্তিগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং লালফৌজ আন্দোলনের ক্ষতি সাধিত হল।

অনুরূপভাবে, এটাও বলা দরকার যে ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর কুওমিনতাঙ অঞ্চলে আমাদের পার্টি জনগণের জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানে প্রয়াসী ছিল, শ্রমিক ও অন্যান্য জনগণের অর্থনৈতিক সংগ্রামে এবং বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানে তা প্রয়াসী ছিল, জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও জনগণের প্রতি নিপীড়নের কুওমিনতাঙ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তা প্রয়াসী ছিল। বিশেষ করে ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর আমাদের পার্টি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জাপ-বিরোধী সংযুক্ত সৈন্যবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছে, ১৯৩২ সালের ২৮শে জানুয়ারির যুদ্ধে ও উত্তর চাহারে জাপ-বিরোধী মিত্র সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করেছে, ফুকিয়েন-এর জনগণের সরকারের সঙ্গে একটি জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক মৈত্রী গড়ে তুলেছে এবং যে তিনটি শর্তের ভিত্তিতে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করে লালফৌজ জাপানকে প্রতিরোধ করতে রাজী তা উপস্থিত করেছে[১৮] এবং জনগণের সকল অংশকে নিয়ে জাতীয় সশস্ত্র প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার জন্য ছয়টি শর্ত হাজির করেছে[১৯] এবং ১৯৩৫ সালের ১লা আগস্ট 'জাতীয় মুক্তি ও জাপানকে প্রতিরোধের জন্য সকল দেশবাসীর কাছে একটি আবেদন' ঘোষণা করেছে যাতে জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার ও জাপ-বিরোধী সংযুক্ত সৈন্যবাহিনী গঠনের আহ্বান জানিয়েছে। এই সবগুলিই সঠিক কাজ হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু পরিচালক নীতিটি বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইনের এবং বিশেষ করে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রাধান্যের সময়ে ভুল ছিল তাই পার্টি বাস্তবক্ষেত্রে সমস্যাগুলিকে সমাধান করতে পারেনি এবং তার ফলে কুওমিনতাঙ এলাকাতেও পার্টির কাজ প্রার্থিত ফললাভে হয় ব্যর্থ হল আর নয়তো একেবারেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গেল। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রশ্নে অবশ্য ১৯৩৫ সালের উত্তর চীনের ঘটনার এবং বিশেষ করে ১৯৩৬ সালের সিয়ান-এর ঘটনার পর চীনের বড় বড় জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রধান অংশগুলির প্রতিনিধিত্বকারী কুওমিনতাঙ-এর প্রধান শাসক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যেসব পরিবর্তন আসবে তা আগেভাগে অনুমান করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু মধ্যবর্তী স্তরের এবং বৃহৎ জমিদারগণ ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলিই কিছু কিছু ইতিমধ্যেই জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের মিত্রতে পরিণত হয়ে উঠেছিল। যদিও আমাদের পার্টির ব্যাপক সদস্যগণ ও জনগণ এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন কিন্তু তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তারা হয় তাকে অবহেলা

করলেন বা অস্বীকার করেই বসলেন যার ফলে তাঁরা একটি গুরুতর রকমের রুদ্ধদ্বার মনোভাব সৃষ্টি করলেন এবং রাজনৈতিক জীবনে চীনের জনগণের অনেক পেছনে পড়ে গেলেন। বিচ্ছিন্নতার ও পেছনে পড়ে থাকার এই পরিস্থিতি ছিল রুদ্ধদ্বার নীতির ভুলেরই পরিণতি এবং সুনাইতে অনুষ্ঠিত সভার পূর্ব পর্যন্ত তা মূলতঃ অপরিবর্তিতই রয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় দিক। বৈপ্লবিক যুদ্ধ ও বৈপ্লবিক ঘাঁটি এলাকার প্রশ্নে বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইন ভুল করেছিল। কমরেড স্তালিন বলেছিলেন, 'চীনে সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। এটি হচ্ছে চীন বিপ্লবের অন্যমত একটি বৈশিষ্ট্যের এবং অন্যতম একটি সুবিধার দিক।'[২০] কমরেড স্তালিনের মতোই কমরেড মাও সে-তুঙ সঠিকভাবে অনেক আগে কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের যুগের শুরুর দিকেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে চীনের বিপ্লবে সশস্ত্র সংগ্রামই হচ্ছে সংগ্রামের প্রধান রূপ এবং মূলতঃ কৃষকদের নিয়ে গঠিত একটি সৈন্য-বাহিনীই হচ্ছে সংগঠনের প্রধান রূপ—এবং তার কারণ হচ্ছে এই যে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীন হচ্ছে একটি বিশাল, অসমান বিকাশ প্রাপ্ত এমন একটি দেশ যেখানে গণতন্ত্র নেই এবং শিল্প-কলকারখানাও কম। কমরেড মাও সে-তুঙ এ কথাও দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে বিপুল কৃষকজনগণ অধ্যুষিত বিশাল গ্রামাঞ্চল চীন বিপ্লবের দিক থেকে অপরিহার্য ও অত্যন্ত গুরুত্ব-সম্পন্ন (বিপ্লবী গ্রামগুলি মহানগরগুলিকে অবরোধ করে ফেলতে পারবে কিন্তু বিপ্লবী মহানগরগুলি নিজেদের গ্রামগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারবে না) এবং দেশব্যাপী বিজয়ের জন্য (অর্থাৎ সমগ্র দেশের গণতান্ত্রিক ঐক্যসাধনের জন্য) প্রাথমিক বিষয় হিসেবে চীন সশস্ত্র বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল স্থাপন করতে পারে এবং তাকে তা স্থাপন করতেই হবে।[২১] ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের যুগে কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতার মাধ্যমে যখন একটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল তখন ঘাঁটি অঞ্চলগুলি বিরাট বিরাট মহানগরগুলিকে তাদের কেন্দ্র হিসেবে পেয়েছিল কিন্তু তখনো ঘাঁটি অঞ্চলসমূহের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকদের প্রধান অংশ হিসেবে নিয়ে জনগণের একটি সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা ও গ্রামাঞ্চলে কৃষি সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের সময় যেহেতু মহানগর-গুলি সবই ছিল শক্তিশালী প্রতিবিপ্লবীগুলির কবলিত, তাই (সামনা-সামনি যুদ্ধবিগ্রহের ওপর নির্ভর না করে) কৃষকজনগণের গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহের

ওপর প্রধানতঃ নির্ভর করে ঘাঁটি অঞ্চল স্থাপন করা, প্রসারিত করা ও সুসংহত করে তোলা প্রয়োজন ছিল এবং (মূল মহানগরগুলিতে নয়) গ্রামাঞ্চলে যেখানে প্রতিবিপ্লবী শাসন ছিল দুর্বল সেখানেই সবার আগে তা স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল। কমরেড মাও সে-তুঙ দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে চীনে এ ধরনের সশস্ত্র গ্রামীণ ঘাঁটি এলাকা টিঁকে থাকার ঐতিহাসিক সহায়ক পরিস্থিতি হচ্ছে '(ঐক্যবদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনীতির বদলে রয়েছে) আঞ্চলিক ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা কৃষি-অর্থনীতি এবং খণ্ডছিন্ন করার জন্য ও শোষণ করার জন্য নিজ নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চলসমূহ ভাগ করে নেওয়ার সাম্রাজ্যবাদী নীতি' এবং তারই পরিণতিজাত 'শ্বেত শাসনের অভ্যন্তরে দীর্ঘস্থায়ী বিভেদ ও যুদ্ধবিগ্রহ।'[২২] চীন বিপ্লবের পক্ষে এই ঘাঁটি অঞ্চলগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য দেখিয়ে দিয়ে তিনি এ কথাও বলেছিলেন :

> একমাত্র তাহলেই সমগ্র বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে বিপ্লবী জনগণের আস্থা জাগিয়ে তুলেছে সেভাবে সমগ্র দেশ জুড়ে বিপ্লবী জনগণের আস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। একমাত্র তাহলেই প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-শ্রেণীসমূহের পক্ষে প্রচণ্ড অসুবিধা সৃষ্টি করা যাবে, তাদের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে তোলা যাবে এবং তাদের আভ্যন্তরীণ ভাঙনকে দ্রুতগতি করে তোলা যাবে। একমাত্র তাহলেই এমন একটি লালফৌজ গড়ে তোলা যাবে যা ভবিষ্যতের মহান বিপ্লবের মুখ্য হাতিয়ার হয়ে উঠবে। সংক্ষেপে বলা যায়, একমাত্র তাহলেই উচ্চাভিমুখী বৈপ্লবিক জোয়ারকে দ্রুততর করা সম্ভবপর হবে।[২৩]

ঐ যুগের মহানগরগুলির জনগণের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে শ্বেত এলাকার সঠিক লাইনের কাজকর্ম চালানোর প্রবক্তা কমরেড লিউ শাও-চির উপস্থাপিত প্রধান নীতিগুলিই অনুসৃত হওয়া উচিত ছিল, যেমন (আক্রমণাত্মকভাবে নয়) মুখ্যতঃ আত্মরক্ষামূলকভাবে কাজকর্ম করা; (আইনানুগ সুযোগের ব্যবহারকে বাতিল করে দেওয়া নয়) কাজকর্মের জন্য সম্ভাব্য সকল আইনানুগ সুযোগগুলি ব্যবহার করা যাতে করে পার্টি সংগঠনগুলি জনগণের মধ্যে গভীরভাবে ঢুকে যেতে পারে, দীর্ঘকাল আবরণের আড়ালে থেকে কাজকর্ম করতে পারে এবং শক্তি সঞ্চয় করতে পারে; আর সব সময় গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামকে বিকশিত করে তোলার জন্য লোকজনকে সেখানে প্রেরণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এভাবে গ্রামাঞ্চলের সংগ্রামকে তার সঙ্গে

সুসমন্বিত করে তুলতে হবে এবং বৈপ্লবিক পরিস্থিতির বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং শহরগুলিতে গণতান্ত্রিক সরকার গড়ে তোলার মতো সাধারণ অবস্থা আবার সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত চীনের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে গ্রামাঞ্চলের কাজকেই মুখ্য কর্তব্য এবং শহরাঞ্চলের কাজকে পরিপূরক কর্তব্য করে তুলতে হবে। গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের বিজয় এবং মহানগরগুলিতে বিজয় অর্জনে সাময়িক অক্ষমতা, গ্রামাঞ্চলে আক্রমণমুখীন এবং মহানগরগুলিতে সাধারণভাবে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ, এমনকি একটি গ্রাম্য এলাকায় বিজয়লাভ ও আক্রমণমুখীন অভিযান এবং একটি গ্রাম্য এলাকায় পশ্চাদপসরণ ও আত্মরক্ষার প্রয়াস—এই সবকিছু মিলিয়ে ঐ যুগে সমগ্র দেশ জুড়ে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের একটি আঁকাবাঁকা গতিধারা রচনা করেছে এবং পরাজয় থেকে বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বিপ্লবকে যে পথ অনুসরণ করতে হবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তারা আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীনের সমাজের বৈশিষ্ট্যের দিকগুলিকে উপলব্ধি করে উঠতে পারেননি, বুঝতে পারেননি যে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব মূলগতভাবে হচ্ছে একটি কৃষি-বিপ্লব এবং তাঁরা চীন বিপ্লবের অসমান, আঁকাবাঁকা ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতিটিই বুঝে উঠতে পারেননি। সুতরাং তাঁরা সামরিক সংগ্রামের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের ঘাঁটি এলাকা ও কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহের, গুরুত্বকে খাটো করে দেখেছিলেন এবং তাদের অভিহিত 'বন্দুকের মতামত' এবং 'অঞ্চলসর্বস্বতা ও রক্ষণশীলতা প্রভৃতি কৃষক মানসিকতা বৈশিষ্ট্যগুলির' তাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা সর্বক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন যে মহানগরগুলির শ্রমিক ও অন্যান্য জনসাধারণের সংগ্রাম শত্রুর কঠোর দমননীতি পর্যুদস্ত করে একদিন হঠাৎ করে ফেটে পড়বে, এগিয়ে যাবে, মূল মহানগরগুলিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান আকারে বিস্ফোরিত হয়ে পড়বে, 'প্রথমেই এক বা একাধিক প্রদেশে বিজয় অর্জন করবে' এবং জাতিজোড়া তথাকথিত উচ্চাভিমুখী বিপ্লবী জোয়ার ডেকে নিয়ে আসবে ও জাতিজোড়া বিজয় অর্জন করবে; এবং এই স্বপ্নকেই ভিত্তি করে তারা তাঁদের সকল কাজকর্ম পরিচালনা ও সংগঠন করছিলেন। বাস্তবে কিন্তু ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর শ্রেণী-শক্তিসমূহের প্রদত্ত সাধারণ সম্পর্ক হেতু তাদের এই স্বপ্নের প্রথম পরিণতিই হল শহরাঞ্চলেই কাজকর্মের ব্যর্থতা। এভাবেই প্রথম 'বামপন্থী' লাইন পরাজিত হল; দ্বিতীয় 'বামপন্থী' লাইন

একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করল, শুধু পার্থক্য ছিল এই যে এখন লালফৌজের সমর্থন দাবি করা হল কারণ লালফৌজ ঐ সময়ে একটি বিশিষ্ট শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় 'বামপন্থী' লাইনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল তবুও তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের বড় বড় মহানগরগুলিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের 'যথার্থ' প্রস্তুতির দাবিই জানিয়ে যেতে লাগল, শুধু পার্থক্য ছিল এই যে এখন প্রধান দাবি হল লালফৌজকে বড় বড় মহানগরগুলি দখল করে নিতে হবে কেননা তা তখন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং মহানগরগুলিতে কাজকর্ম আরও অনেক সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ঠিক উল্টোটা না করে মহানগরগুলিতে কাজকর্মকে গ্রামাঞ্চলের কাজকর্মের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফল দাঁড়াল এই যে শহরাঞ্চলের কাজকর্ম যখন ব্যর্থ হয়ে পড়ল তখন অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলীয় কাজকর্মও ব্যর্থ হয়ে গেল। এটা দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, ১৯৩২ সালের পরে মূল মহানগরগুলি দখল করার কাজ স্তব্ধ হয়ে গেল কেননা লালফৌজ সেগুলি দখল করতে বা দখলে রাখতে পারল না এবং অন্যদিকে কুওমিনতাঙ ব্যাপক আকারে আক্রমণ শুরু করেছিল; তাছাড়া ১৯৩৩ সালের পরে শহরাঞ্চলের কাজে আরও অধিকতর ক্ষতি সাধিত হওয়ার ফলে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেই শহর থেকে গ্রামীণ ঘাঁটি এলাকায় সরে আসতে হল। এভাবে একটি পরিবর্তন সাধিত হল। কিন্তু যেসব কমরেড এই 'বামপন্থী' লাইন অনুসরণ করছিলেন তাঁরা সচেতনভাবে বা চীন বিপ্লবের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের আনুপূর্বিক অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে উপনীত সঠিক সিদ্ধান্ত অনুযায় এই পরিবর্তন সাধন করেননি, তাই তাঁরা লালফৌজের ও ঘাঁটি অঞ্চলের সকল কাজকর্মেই তাঁদের ভ্রান্ত শহুরে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করে যাচ্ছিলেন এবং তার ফলে কাজের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হয়। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত থেকে তার পরিষ্কার প্রমাণ মিলবে: তাঁরা সামনাসামনি যুদ্ধবিগ্রহের কথা বলেছিলেন এবং গেরিলা প্রকৃতির সচল যুদ্ধবিগ্রহের বা গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহের বিরোধিতা করেছিলেন; তাঁরা তাঁদের কথিত 'নিয়মিতকরণের' কাজ লালফৌজে ভ্রান্তভাবে জোর দিয়ে চালু করলেন এবং তথাকথিত 'গেরিলাবাদের' বিরোধিতা করলেন; তাঁরা এটা বুঝতে পারলেন না যে তাঁদের বিক্ষিপ্ত গ্রামীণ অঞ্চলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে এবং শত্রু কর্তৃক বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধ চলাতে হবে, তাই তাঁরা ঘাঁটি এলাকাসমূহের লোকবল ও বৈষয়িক সম্পদকে বুঝেসুঝে বা একান্ত প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করেননি;

পঞ্চম 'অবরোধ ও দমন' অভিযানকালে তাঁরা 'এটি হচ্ছে দুই পথের মধ্যেকার চূড়ান্ত নির্ধারক সংগ্রাম' এবং 'ঘাঁটি অঞ্চলের এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেবেন না' এইসব ভুল শ্লোগানগুলি হাজির করলেন।

বর্ধিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন জোরের সঙ্গেই বলতে চায় যে পরিস্থিতিতে একটি পরিবর্তন এখন আসন্ন, উপরে আলোচিত যুগে গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজ থামিয়ে রেখে এই পরিবর্তনকেই বাস্তবে নিয়ে আসা দরকার ছিল। একমাত্র এখন জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীন সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং তা যখন আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে তখনই জাপানের অধিকৃত শহরগুলির কাজকে মুক্ত অঞ্চলের কাজের সমান গুরুত্ব দিয়ে চালানো সঠিক হবে, আজ যখন মূল মহানগরগুলিতে ভিতর ও বাইরের আক্রমণগুলিকে সুসমন্বিত করে জাপানী আক্রমণকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সকল অবস্থাই প্রস্তুত, তখনই আমাদের কাজের মূল কেন্দ্রবিন্দুকে ঐ শহরগুলিতে সরিয়ে নেওয়া সঠিক হবে। আমাদের পার্টির দিক থেকে এই নতুন পরিবর্তনটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন কারণ ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর বহু বাধাবিপত্তি দূর করে তা গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজের কেন্দ্রবিন্দুকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পূর্ণ রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে পার্টির সকল সদস্যকেই এই পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে হবে; কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের সময় শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে সরে যাওয়ার ব্যাপারে 'বামপন্থী' লাইনের যে ভুল হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি করা চলবে না, যে ভুল প্রথমে দেখা গিয়েছিল গ্রামাঞ্চলে সরে যাওয়ার বিরোধিতা ও অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে এবং তারপর রাজনৈতিক চেতনা থেকে নয় অবস্থার চাপে পড়ে অনিচ্ছা সহকারে সরে যেতে রাজী হওয়ার মধ্য দিয়ে। কুওমিনতাঙ অঞ্চলে কিন্তু অবস্থা ছিল স্বতন্ত্র, সেখানে আমাদের আশু কাজ গ্রামাঞ্চল কি শহরাঞ্চলে দু' জায়গাতেই ছিল সর্বপ্রকারে জনগণকে সমবেত করা, দৃঢ়ভাবে বিভেদের ও গৃহযুদ্ধের বিরোধিতা করা, ঐক্য ও শান্তির জন্য প্রয়াস চালানো এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রচেষ্টাকে চতুর্গুণ করা, কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কত্বের অবসান এবং ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রচেষ্টাকে চতুর্গুণ করা। যখন জাপানের কবলিত মহানগরগুলি জনগণ কর্তৃক মুক্ত হবে এবং ঐক্যবদ্ধ কোয়ালিশন সরকার প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হবে ও সংহত হয়ে উঠবে, তখনই গ্রামাঞ্চলীয়

ঘাঁটি এলাকাগুলির ঐতিহাসিক কর্তব্য সুসম্পন্ন হবে।

তৃতীয় দিক। বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইনগুলি আক্রমণ ও আত্মরক্ষার রণকৌশল পরিচালনার ব্যাপারে ভুল করেছিল। কমরেড স্তালিন দেখিয়ে দিয়েছেন, রণকৌশলকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন পরিস্থিতির সঠিক পর্যালোচনা (শ্রেণী-শক্তিগুলির সঠিক মূল্যায়ন এবং আন্দোলনের জোয়ার ও ভাটার সঠিক বিচার), প্রয়োজন তার ওপর ভিত্তি করে সংগ্রাম ও সংগঠনের সঠিক রূপ নির্ধারণ এবং তার জন্য প্রয়োজন 'শত্রুর শিবিরের প্রতিটি বিভেদের সুযোগ গ্রহণ করা এবং মিত্রদের খুঁজে বের করার সামর্থ্য'[২৪]; এবং তার একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছে কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক চীনের বিপ্লবী আন্দোলনের পরিচালনা। ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর কমরেড মাও সে-তুঙ সঠিকভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, সারাদেশে বিপ্লবের জোয়ার তখন ভাটার দিকে চলেছে, সামগ্রিকভাবে দেশ জুড়ে শত্রু আমাদের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী এবং হঠকারী আক্রমণ অনিবার্যভাবেই পরাজয় বরণ করবে কিন্তু, 'এক বা একাধিক এলাকায় লাল রাজনৈতিক শাসনের' অভ্যুদয় 'চারিদিকের শ্বেত রাজত্বের অবরোধের মধ্যেও'[২৫] ঘটানো সম্ভব. প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের অভ্যন্তরে অবিরাম ভাঙন, ভেদ-বিভেদ ও যুদ্ধবিগ্রহের সাধারণ একটি পরিস্থিতির মধ্যে এবং বিপ্লবের জন্য জনগণের দাবি যখন ক্রমেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ও বেড়ে উঠছে এবং জনগণ যখন প্রথম মহান বিপ্লবের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, যখন বিরাট শক্তিধর একটি লালফৌজ তাদের রয়েছে এবং সঠিক কর্মনীতিসম্পন্ন একটি কমিউনিস্ট পার্টি রয়েছে সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে লাল রাজনৈতিক শাসনের অভ্যুদয় ঘটানো সম্ভবপর হতে পারে। তিনি এ কথাও বলেছিলেন, এমন একটি যুগে যখন শাসকশ্রেণীগুলির মধ্যে ভাঙন রয়েছে তখন লাল রাজনৈতিক শাসনের প্রসার তুলনামূলকভাবে দুঃসাহসের কাজই হয়ে পড়তে পারে এবং সামরিক অভিযানের ফলে যে অঞ্চল কেড়ে নিয়ে আসা হবে তা তুলনামূলকভাবে বেশ বড়ই হয়ে পড়তে পারে,' অন্যদিকে শাসকশ্রেণীগুলির পক্ষে তুলনামূলক একটি সুস্থির অবস্থাতে এ ধরনের প্রসারণ

শুধু ক্রমান্বয়ে ধীর গতিতেই হতে পারে। এ রকম একটা যুগে আমাদের শক্তিগুলিকে সামরিক ব্যাপারে বিভক্ত করে দুঃসাহসিক অগ্রগতির চেষ্টা করা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা হানিকর কাজ এবং আঞ্চলিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে

(জমির বিলি বণ্টন, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, পার্টিকে সম্প্রসারিত করা ও আঞ্চলিক সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে) আমাদের লোকজনদের বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় জেলাতে একটি দৃঢ়ভিত্তি স্থাপনের অবহেলা করা হবে সবচেয়ে হানিকর কাজ।[২৬]

এমনকি একটিমাত্র যুগেই আমাদের রণকৌশল আমাদের শত্রুর শক্তির তারতম্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে। তাই, হুনান-কিয়াংসি সীমান্ত অঞ্চলে যে এলাকা আমরা কেটে আলাদা করে নিয়ে এসেছিলাম সেখানে 'হুনানের তুলনামূলক শক্তিশালী শাসকশক্তির বিরুদ্ধে আমরা আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ করেছিলাম এবং কিয়াংসির তুলনামূহক দুর্বল শাসকশক্তির বিরুদ্ধে আমরা আক্রমণাত্মক অবস্থানই গ্রহণ করেছিলাম।'[২৭] পরে যখন হুনান-কিয়াংসি সীমান্ত অঞ্চলের লালফৌজ ফুকিয়েন-কিয়াংসি সীমান্ত অঞ্চলে উপস্থিত হল, তখন প্রস্তাব করা হল 'কিয়াংসি প্রদেশটি দখল করে নেওয়ার... এবং পশ্চিম ফুকিয়েন ও পশ্চিম্ চেকিয়াং দখল করে নেওয়ার জন্য।'[২৮] আমাদের রণকৌশলগত বিভিন্নতা নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূণ ভিত্তি হচ্ছে বিভিন্ন শত্রুদের স্বার্থের ক্ষেত্রে বিপ্লবের বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া। তারই জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ সব সময় বলে এসেছেন 'প্রতিবিপ্লবের মধ্যেকার প্রতিটি সংঘাতকে কাজে লাগাতে হবে এবং তাদের মধ্যেকার বিভেদকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে,'[২৯] এবং 'বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার নীতির বিরোধিতা করতে হবে ও সম্ভাব্য সকল মিত্রকে জয় করার নীতিকে সামনে তুলে ধরতে হবে।'[৩০] 'দ্বন্দ্বসমূহের সুযোগ গ্রহণ করা, বিপুল সংখ্যককে পক্ষে নিয়ে আসা মুষ্টিমেয়ের বিরোধিতা করা এবং একে একে শত্রুকে ধ্বংস করার' রণকৌশলগত নীতির[৩১] প্রয়োগকে কমরেড মাও সে-তুঙ প্রতিভা-দীপ্তভাবে, অবরোধ ও দমন' অভিযানগুলির বিরুদ্ধে এবং বিশেষভাবে সুনাইতে অনুষ্ঠিত সভার পর, লং মার্চের সময়ে এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের সময়ে বিকশিত করে তুলেছিলেন। অনুরূপভাবে শ্বেত এলাকাগুলিতে কমরেড লিউ শাও-চির রণকৌশলগত ধ্যানধারণাগুলি ছিল একটি অনুকরণীয় আদর্শ। শ্বেত এলাকাগুলিতে এবং বিশেষ করে মহানগরগুলিতে শত্রুর ও আমাদের শক্তির মধ্যেকার অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যবধানকে সঠিকভাবে হিসেবের মধ্যে ধরে, ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর কমরেড লিউ শাও-চি সুশৃংখলভাবে আমাদের পশ্চাদপসরণ ও আত্মরক্ষাকে সংগঠিত করার কথা বলেছিলেন এবং

সাময়িকভাবে অবস্থা ও পরিস্থিতি যখন আমাদের প্রতিকূল তখন শত্রুর সঙ্গে নির্ধারক মোকাবিলা পরিহার করার কথা বলেছিলেন যাতে করে 'ভবিষ্যতের বিপ্লবী আক্রমণ ও নির্ধারক চূড়ান্ত মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হওয়া যেতে পারে।'[৩২] তিনি একথাও বলেছিলেন যে ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের সময়কার পার্টির প্রকাশ্য সংগঠনগুলিকে ধারাবাহিকভাবে ও কঠোরভাবে আত্মগোপনকারী সংগঠনে পরিণত করতে হবে এবং 'যথাসম্ভব প্রকাশ্য আইনানুগ উপায়গুলিকে ব্যবহার করে' জনগণের মধ্যেকার কাজের সাহায্যে পার্টির আত্মগোপনকারী সংগঠনগুলিকে তাদের আপন শক্তিকে দীর্ঘকাল লুকিয়ে রাখতে, জনগণের মধ্যে গভীরভাবে ঢুকে যেতে এবং 'জনগণের শক্তিগুলিকে জোরদার করে ও সংহত করে তুলতে এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনাকে সমুন্নত করে তুলতে'[৩৩] সাহায্য করতে হবে। গণ-সংগ্রামে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কমরেড লিউ শাও-চি বললেন যে এটা প্রয়োজন—

> একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন জায়গার বাস্তব বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতি এবং জনগণের রাজনৈতিক চেতনার মান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট শ্লোগান, দাবি-দাওয়া ও জনগণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সংগ্রামের রূপ হাজির করে যাতে করে গণ-সংগ্রামকে গতিশীল করে তোলা যায় এবং পরে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত অবস্থা অনুসারে হয় এই গণ-সংগ্রামকে উচ্চতর সংগ্রামের স্তরে ধীরে ধীরে উন্নতি করা অথবা 'ঠিক কতদূর যাব তা জেনে রেখে' সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত রাখা যাতে করে আরও উচ্চতর স্তরে ও ব্যাপকতরভাবে পরবর্তী যুদ্ধকে চালাবার জন্য প্রস্তুতি করা যায়।

শত্রুর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে সদ্ব্যবহার করার ও সাময়িক মিত্রদের সপক্ষে নিয়ে আসারপ্রশ্নে তিনি বললেন, এখানে প্রয়োজন হচ্ছে—

> এই দ্বন্দ্বগুলিকে ভেঙে পড়ার পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এবং মুখ্য শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুর শিবিরের সেইসব শক্তিগুলির সঙ্গে একটি সাময়িক মৈত্রী গড়ে তোলা যে শক্তিগুলি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে অথবা যারা তখনো আমাদের মুখ্য শত্রু হয়ে ওঠেনি ;

এবং

> আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী মিত্রদের প্রয়োজনীয় সুবিধা দান করা, তাদের আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে প্রেরণা দেওয়া, তারপর তাদের প্রভাবিত করে তাদের ব্যাপক অনুগামীদের সপক্ষে নিয়ে আসা।[৩৪]

১৯৩৫ সালে ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলনের সাফল্য শ্বেত এলাকার কাজের রণকৌশলগত নীতিসমূহের সঠিকতা প্রমাণ করেছিল। রণকৌশলগত এই সঠিক পরিচালনার বিপরীত দিকে, বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইন অনুসরণকারী কমরেডরা শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার শক্তির পরিমাপকে বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাই করে দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, সংগ্রাম ও সংগঠনের উপযুক্ত রূপ উদ্ভাবনে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং শত্রুর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহকে স্বীকার করতে ও ঐ দ্বন্দ্বসমূহের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেননি। ফলে, যখন আত্মরক্ষামূলক লাইন অনুসরণ করা তাঁদের উচিত ছিল তখন তথাকথিত 'আক্রমণাত্মক লাইনটি' অন্ধভাবে কার্যকর করার পরিণতি হিসেবে তাঁরা পরাজয় বরণ করেন, এমনকি যখন আক্রমণাত্মক অভিযান সময়োচিত ছিল তখনো তাঁরা পরাজিত হন কারণ কিভাবে বিজয়ী আক্রমণাত্মক অভিযান সংগঠিত করতে হয় তা-ও তাঁরা জানতেন না। 'একটি পরিস্থিতির পরিমাপ' সম্পর্কে তাঁদের পথটি ছিল তাঁদের অভিমতের অনুকূল ব্যাপারগুলি সম্পর্কে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, একান্ত প্রারম্ভিক, পরোক্ষ, একপেশে এবং ভাসাভাসা মনোভাব গ্রহণ করা এবং সেগুলিকে অনেক বড় করে দেখিয়ে সেগুলিকে ব্যাপক, সুগভীর, প্রত্যক্ষ, সর্বব্যাপ্ত ও অপরিহার্য বিষয় হিসেবে হাজির করা এবং তাঁদের অভিমতের অনুকূল নয় (যেমন, শত্রুর শক্তি ও সাময়িক বিজয়, আমাদের দুর্বলতা ও সাময়িক পরাজয়, জনগণের রাজনৈতিক চেতনার অভাব, শত্রুর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও মাঝামাঝি পথের লোকদের প্রগতিশীল দিক ইত্যাদি) এমন সকল বাস্তব তথ্যকে স্বীকার করে নিতে তাঁরা ভীতিগ্রস্ত অথবা ঐসব বাস্তব তথ্যের প্রতি তাঁরা অন্ধ হয়েই থাকতেন। চূড়ান্ত কঠিন ও জটিল যে পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে তা কোন সময়ই তাঁরা তাঁদের হিসেবের মধ্যে ধরতেন না; সব সময়ই সবচেয়ে অনুকূল ও সবচেয়ে সহজ-সরল যে পরিস্থিতির কোনকালেই হয়তো দেখা দেওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার তার খোয়াব দেখতেই তাঁরা পছন্দ করতেন। লালফৌজের আন্দোলনে সব সময়ই অপরিহার্যভাবে তাঁরা বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাকে অবরোধকারী শত্রুকে 'ভীষণ নড়বড়ে', 'চূড়ান্ত রকমের আতঙ্কগ্রস্ত', 'চূড়ান্ত বিনাশের সমীপবর্তী', 'দ্রুতগতিতে ভেঙে পড়ছে,' 'সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে' ইত্যাদি, ইত্যাদি ভাষায় বর্ণনা করতেন। তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তারা তো এ কথাও মনে করতেন যে লালফৌজের বহুগুণে বেশিসংখ্যক সমগ্র কুওমিনতাঙ বাহিনীর চেয়েও অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এবং

তারই জন্য তাঁরা বাস্তব অবস্থার কোন বিচার না করে এবং কোন বিরাম-বিশ্রামের কথা না ভেবেই লালফৌজকে বেপরোয়া অভিযান পরিচালনার জন্য চাপ দিয়েই চলেছিলেন। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের পরিণতি হিসেবে দক্ষিণ ও উত্তর চীনের বৈপ্লবিক বিকাশের মধ্যেকার অসমতাকে (এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু না হওয়া পর্যন্ত যে পরিস্থিতিতে কোন পরিবর্তন ঘটেনি তাকে) তাঁরা অস্বীকার করতেন, 'উত্তর চীনের পশ্চাদ্‌পদতার তত্ত্ব' বলে তাঁরা যাকে অভিহিত করতেন ভ্রান্তভাবে তাঁরা তার বিরোধিতা করতেন, উত্তর চীনের গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র লাল শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি করতেন এবং সকল শ্বেত সৈন্যবাহিনীর মধ্যেই লালফৌজ গড়ে তোলার জন্য বিদ্রোহ সংগঠনের তাঁরা দাবি জানাতেন। ঘাঁটি অঞ্চলগুলির মধ্যভাগ ও সীমান্তবর্তী এলাকার মধ্যেকার অসমতাকেও তাঁরা অস্বীকার করতেন এবং তাঁদের অভিহিত 'লো মিং লাইন'-এর[৩৫] ভ্রান্তভাবে বিরোধিতাই তাঁরা করতেন। লালফৌজকে আক্রমণকারী যুদ্ধবাজদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহকে সদ্ব্যবহার করতে এবং যে শক্তিগুলি আক্রমণ বন্ধ করতে রাজী ছিল তাঁদের সঙ্গে আপোষ করতেও তাঁরা অস্বীকার করতেন। শ্বেত এলাকার কাজের ক্ষেত্রে বিপ্লবী জোয়ারে যখন ভাটা দেখা দিয়েছে এবং শহরাঞ্চলে প্রতিবিপ্লবী শাসক শক্তিরা যখন খুবই শক্তিশালী সেখানে পশ্চাদপসরণের ও আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে বা শহরাঞ্চলগুলিতে সকল প্রকার আইনানুগ সম্ভাবনার সুযোগ নিতে তাঁরা অস্বীকার করতেন। তার পরিবর্তে তদানীন্তন পরিস্থিতিতে অনুমোদনের অযোগ্য পদ্ধতি গ্রহণ করে তাঁরা আক্রমণ অভিযান চালিয়ে যেতে লাগলেন, অরক্ষিত বিরাট বিরাট পার্টি সংগঠন ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন 'লাল গণ-সংগঠন' তাঁরা গড়ে তুললেন, পার্টিকে দুভাগে ভাগ করে ফেললেন, অবিরাম গতিতে বাস্তব পরিস্থিতির হিসেব না করে রাজনৈতিক ধর্মঘট, যুক্ত ধর্মঘট, ছাত্রদের, ব্যবসায়ীদের, সৈনিকদের ও পুলিশের লোকজনদের ধর্মঘট আহ্বান ও সংগঠন করে যেতে লাগলেন এবং মহড়া, মিছিল, আচমকা সভা-সমিতির অনুষ্ঠান এবং এমনকি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহ্বান ও সংগঠন করে যেতে লাগলেন—যে সংগ্রামগুলিতে জনগণের অংশগ্রহণ ও তাতে তাদের সমর্থন অর্জন করা ছিল অসম্ভব বা অবাস্তব—অথচ এই সংগ্রামগুলির ব্যর্থতাকেই তাঁরা 'বিজয়' হিসেবে অকারণে কীর্তন করতেন। সংক্ষেপে বলা যায়, বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইন অনুসরণকারী

কমরেডরা এবং বিশেষ করে তৃতীয় লাইনের অনুসারীরা, রুদ্ধদ্বার নীতি ও হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই জানতেন না, তাঁরা শুধু 'সবকিছুর উপরে সংগ্রাম, আর সবকিছুই সংগ্রামের জন্য' এবং 'অনবরত সংগ্রামকে প্রসারিত করা ও তাকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করার' কথা অন্ধভাবে বলে যাওয়াতেই বিশ্বাস করতেন এবং স্বভাবতঃই তাঁরা পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করে গেছেন অথচ তা করার কোন হেতু ছিল না এবং তা পরিহার করা যেত।

২। সামরিক দিক থেকে :

বর্তমান স্তরে চীনের বিপ্লবে সামরিক সংগ্রামই হচ্ছে রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রধান রূপ। কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের সময় তা পার্টি-লাইনের দিক থেকে সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল। কমরেড মাও সে-তুঙ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে প্রয়োগ করে শুধু যে চীন বিপ্লবের সঠিক রাজনৈতিক লাইনটিই রূপায়িত করে তুলেছেন তা নয়, তিনি কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের যুগ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক লাইনের আওতায় সঠিক সামরিক লাইনটিও হাজির করেছেন। কমরেড মাও সে-তুঙ-এর সামরিক লাইন উদ্ভাবিত হয়েছে দুটি মৌলিক বিষয়বস্তু থেকে। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, আমাদের সৈন্যবাহিনীটি শুধু একটি ধরনের সৈন্যবাহিনীই হবে ও হতে পারে; তাকে হতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর ভাবাদর্শগত নেতৃত্বের অধীন এবং জনগণের সংগ্রামের সেবায় ও বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলসমূহ গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত একটি হাতিয়ার। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, আমাদের যুদ্ধ শুধু এক ধরনের যুদ্ধই হবে ও হতে পারে; এটা হবে এমন একটা যুদ্ধ যাতে আমরা স্বীকার করি যে শত্রু হচ্ছে শক্তিশালী এবং আমরা দুর্বল, শত্রু হচ্ছে বিশালকায় এবং আমরা ছোটখাট, এই যুদ্ধে তাই আমরা শত্রুর দুর্বলতাগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করব, আমাদের শক্তির দিকগুলি কাজে লাগাব এবং আমাদের বেঁচে থাকার, বিজয়ের ও সম্প্রসারণের জন্য আমরা জনগণের শক্তির উপরই পুরোপুরি আস্থা রাখব। প্রথম বিষয় থেকে এটা বেরিয়ে আসছে যে লালফৌজকে (এখনকার অষ্টম রুট সেনাবাহিনী, নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য জনগণের সশস্ত্র বাহিনীকে) অবশ্যই পার্টির লাইন, কর্মসূচী ও কর্মনীতিসমূহের জন্য সর্বান্তঃকরণে সংগ্রাম করে যেতে হবে অর্থাৎ তাকে সংগ্রাম করে যেতে হবে সমগ্র জনগণের বহুবিধ স্বার্থের জন্য এবং এসবের বিপরীত যুদ্ধবাজসুলভ মনোভাবের প্রতি যে-কোন প্রবণতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করে যেতে হবে। সুতরাং লালফৌজকে নিছক

সামরিক দৃষ্টিভঙ্গির এবং ভ্রাম্যমাণ-বিদ্রোহীদের চিন্তাধারার বিরোধিতা করতে হবে, কারণ এইসব চিন্তাধারা অনুসারে সামরিক নেতৃত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্বকে মান্য করে না বরং রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই তা আজ্ঞাধীন করে রাখে। লালফৌজকে একই সঙ্গে সংগ্রাম করার, জনগণের হয়ে কাজকর্ম করার এবং অর্থ সংগ্রহের (বর্তমানে যার অর্থ হচ্ছে উৎপাদনের জন্য কাজ করার) এই ত্রিবিধ কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে; জনগণের হয়ে কাজকর্ম করার অর্থ হচ্ছে পার্টির এবং জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার সপক্ষে প্রচারক ও সংগঠক হয়ে ওঠা এবং আঞ্চলিক জনগণকে জমির বিলিবণ্টনে (বর্তমানে যা দাঁড়াচ্ছে-খাজনা ও সুদ হ্রাস করার কাজে) সাহায্য করার, জনগণের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার, রাজনৈতিক শক্তির সংস্থা ও পার্টি-সংগঠনগুলি গড়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করার একটি হাতিয়ার হয়ে ওঠা। সুতরাং সরকার ও জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে লালফৌজকে সততার সঙ্গে জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহকে ও গণ-সংগঠন-গুলিকে শ্রদ্ধা করতে হবে, তাদের মর্যাদাকে জোরদার করে তুলতে হবে এবং 'নিয়মানুবর্তিতার তিনটি মূল নিয়ম এবং মনোযোগের আটটি বিষয়কে'৩৬ কঠোরভাবে পালন করতে হবে। সৈন্যবাহিনীর ভেতরেও অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে, দুই পক্ষকেই গণতান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে এবং রাজনৈতিক সচেতনতার ওপর ভিত্তি করে একটি অবশ্য পালনীয় নিয়মানুবর্তিতাকে মেনে চলতে হবে। শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে শত্রু-সৈন্যবাহিনীকে ভেঙে দেওয়ার এবং বন্দীদের সপক্ষে নিয়ে আসার জন্য সঠিক একটি নীতি অনুসরণ করা। 'দ্বিতীয় বিষয়টি থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে লালফৌজকে স্বীকার করতেই হবে যে কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের যুগে গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহ ও গেরিলা ধরনের সচল যুদ্ধবিগ্রহই হচ্ছে' যুদ্ধের প্রধান রূপ এবং এটা স্বীকার করতেই হবে যে একমাত্র এমন একটা গণযুদ্ধ যাতে মূলবাহিনী আঞ্চলিক বাহিনী-গুলির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকবে, নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গেরিলা ইউনিট-সমূহ ও সশস্ত্র গণবাহিনীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকবে এবং সশস্ত্র জনসাধারণ নিরস্ত্র জনসাধারণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য একাকার হয়ে থাকবে তার মধ্যে দিয়েই আমাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হবে। সুতরাং রণনীতির ক্ষেত্রে, লালফৌজ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যুদ্ধের বিরোধিতা

করবে এবং রণকৌশলের ক্ষেত্রে, দীর্ঘসময় ধরে একটানা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করবে; রণনীতির ক্ষেত্রে, তা দৃঢ়ভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবে এবং রণকৌশলের ক্ষেত্রে, তা দ্রুত সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী থাকবে; অভিযানকালে ও যুদ্ধবিগ্রহকালে বহুসংখ্যককে পরাজিত করার জন্য অল্প সংখ্যককে নিয়োগ করার জন্যই তা দৃঢ়ভাবে দাবি জানাবে। লালফৌজকে তাই নিম্নলিখিত রণনীতি ও রণকৌশলগত নীতিগুলি অনুসরণ করতে হবে:

> জনগণকে জাগিয়ে তোলার জন্য আমাদের বাহিনীকে ভাগ করে ছড়িয়ে দেওয়া, শত্রুর সাথে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা।
>
> শত্রু যখন এগিয়ে আসবে, আমরা তখন পিছিয়ে যাব; শত্রু যখন বিশ্রাম নেবে, আমরা তখন তাদের বিব্রত করব; শত্রু যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, আমরা তখন তাদের আক্রমণ করব; শত্রু যখন পিছিয়ে যাবে' আমরা তখন তাদের পিছু ধাওয়া করব।
>
> দৃঢ় ঘাঁটি এলাকাগুলিকে প্রসারিত করতে হবে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে এগিয়ে যাওয়ার নীতিটি প্রয়োগ করতে হবে; শক্তিশালী শত্রু বাহিনী যখন পিছু ধাওয়া করবে তখন তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলার নীতি অনুসরণ করতে হবে।[৩৭]
>
> শত্রুকে লোভ দেখিয়ে একেবারে গভীরে টেনে নিয়ে আসতে হবে।[৩৮]
>
> অধিকতর সংখ্যক শক্তি নিয়োগ করুন, শত্রুর দুর্বল স্থানগুলি খুঁজে বের করুন এবং যখন আপনারা শত্রু-বাহিনীর অংশকে বা অধিকাংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন তখনই সচল যুদ্ধবিগ্রহের সংগ্রামে লিপ্ত হবেন যাতে করে শত্রুর বাহিনীগুলিকে একটি একটি করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন।[৩৯]

সামরিক দিক থেকে বিভিন্ন-'বামপন্থী' লাইন কমরেড মাও সে-তুঙ-এর লাইনের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। এক ঝটকায় এগিয়ে যাওয়ার প্রথম 'বামপন্থী' লাইন লালফৌজকে ব্যাপক জনগণের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল; দ্বিতীয় 'বামপন্থী' লাইন লালফৌজকে ঠেলে দিয়েছিল হঠকারী আক্রমণের পথে। কিন্তু এই দুটির কোনটিই সামরিক দিক থেকে পুরোপুরি সুবিন্যস্ত হয়ে ওঠেনি। তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের সময়ই শুধু তা পুরোপুরি সুস্পষ্টভাবে

সুবিন্যস্ত হয়ে ওঠে। সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তারা লালফৌজের ত্রিবিধ কাজকে শুধুমাত্র যুদ্ধ করার একটি কাজে পর্যবসিত করলেন এবং লালফৌজকে সৈন্যবাহিনী ও জনগণ, সৈন্য-বাহিনীর ও সরকার এবং অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যেকার সঠিক সম্পর্কের ব্যাপারে শিক্ষিত করে তোলার কাজকে অবহেলা করলেন; তাঁরা অতিরিক্ত নিয়মিতকরণের জন্য দাবি জানালেন এবং ঐ সময়ের লালফৌজের নির্ভুল গেরিলা প্রকৃতিকে 'গেরিলা-বাদ' বলে বিরোধিতা করলেন; তাছাড়া সৈন্য-বাহিনীতে রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতার আমদানি করলেন। সামরিক অভিযান পরিচালনার প্রশ্নে, শত্রু শক্তিশালী এবং আমরা দুর্বল এই প্রাথমিক বক্তব্যকেই তাঁরা অস্বীকার করলেন; তাঁরা অবস্থানগত যুদ্ধবিগ্রহের এবং তথাকথিত নিয়মিত যুদ্ধবিগ্রহের দাবি জানালেন যা মুখ্যতঃ মূলবাহিনীর ওপরই নির্ভরশীল; রণনীতি হিসেবে তাঁরা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যুদ্ধের এবং রণকৌশল হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের দাবি জানালেন; 'সকল ফ্রণ্টে আক্রমণের' এবং 'মুষ্টিবদ্ধ দুই হাতে আঘাত হানার' দাবি জানালেন; শত্রুকে লোভ দেখিয়ে গভীরে ডেকে নিয়ে আসার বিরোধিতা করলেন এবং সৈন্যদলের প্রয়োজনীয় রদবদলকে 'পশ্চাদপসরণ ও পলায়নপরতা' বলে মনে করলেন নিয়মিত নির্দিষ্ট রণাঙ্গন ধরে যুদ্ধের ও একান্ত কেন্দ্রীভূত পরিচালনার তাঁরা দাবি জানালেন। সংক্ষেপে বলা যায়, গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহ ও গেরিলা ধরনের যুদ্ধবিগ্রহকে তাঁরা নাকচ করে দিলেন এবং কি করে একটা গণযুদ্ধ সঠিকভাবে চালাতে হয় তাই তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি। পঞ্চম 'অবরোধ ও দমন' অভিযানের সময় তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তারা শুরু করলেন আক্রমণের ক্ষেত্রে হঠকারিতা দিয়ে, বললেন 'শত্রুকে ফটকের বাইরেই আমাদের ব্যাপৃত রাখতে হবে,; তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে রক্ষণশীল আত্মরক্ষার লাইন নিলেন, বললেন, আমাদের বাহিনীগুলিকে বিভক্ত করে সবকিছুকে রক্ষা করতে হবে, চালাতে হবে 'সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত আক্রমণ' এবং 'ধীরে ধীরে ক্ষয় করে ফেলার প্রতিযোগিতা'; কিন্তু তাঁরা শেষ করলেন যথার্থ পলায়নপরতা দিয়ে, কিয়াংসির ঘাঁটি এলাকা থেকে বাধ্য হয়ে তাঁদের সরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহ ও সচল যুদ্ধবিগ্রহের স্থলে অবস্থানগত যুদ্ধবিগ্রহ, এবং সঠিকভাবে পরিচালিত একটি গণযুদ্ধের স্থলে 'নিয়মিত' যুদ্ধবিগ্রহ চালু করার তাঁদের প্রয়াসের এই হল পরিণাম।

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ ও রণনীতিগত অচলাবস্থার সময়ে শত্রুর এবং আমাদের শক্তির মধ্যে তারচেয়েও অনেক বেশি ব্যবধান দেখা দিয়েছে এবং তাই অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর সঠিক কর্মনীতি হচ্ছে : 'গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহই মৌলিক, কিন্তু অনুকূল পরিস্থিতিতে সচল যুদ্ধবিগ্রহের কোন সুযোগই হাতছাড়া করবেন না।' সচল যুদ্ধবিগ্রহের ওপর অনেক বেশি জোর দেওয়া একটি ভুল হবে। কিন্তু আসন্ন প্রতি-আক্রমণের স্তরে যখন সমগ্র পার্টির কাজের ভার-কেন্দ্রটিকে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলিতে সরিয়ে নিতে হবে, তখন রণনীতির ক্ষেত্রেও গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহের প্রাথমিক গুরুত্বকে সরিয়ে সচল ও অবস্থানগত যুদ্ধবিগ্রহের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে হতে পারে অবশ্য যদি, আমাদের বাহিনীগুলি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে যায়। এই আসন্ন পরিবর্তনের জন্যও পরিপূর্ণ সচেতনতা নিয়ে সমগ্র পার্টিকে প্রস্তুতি চালাতে হবে।

৩। সাংগঠনিক দিক থেকে :

কমরেড মাও সে-তুঙ বলেছেন, সঠিক রাজনৈতিক লাইন হচ্ছে 'জনগণের কাছ থেকে এনে জনগণকেই ফিরিয়ে দেওয়া।' লাইনটি যাতে যথার্থভাবেই জনগণের কাছ থেকে আসে তার নিশ্চয়তা সাধনের জন্য এবং বিশেষভাবে তা যাতে জনগণের কাছেই ফিরে যায় তার জন্য শুধু পার্টি এবং পার্টি-বহির্ভূত জনগণের মধ্যে (অর্থাৎ শ্রেণী এবং জনগণের মধ্যে) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেই চলবে না, বরং সর্বোপরি পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থাসমূহ এবং পার্টির অন্তর্ভুক্ত জনগণের মধ্যেও (অর্থাৎ কর্মীবাহিনী ও সাধারণ সদস্যদের মধ্যেও) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন; অর্থাৎ সঠিক সাংগঠনিক লাইন থাকা প্রয়োজন। তাই, পার্টির ইতিহাসের প্রতিটি যুগে কমরেড মাও সে-তুঙ যেমন জনগণের স্বার্থের প্রকাশক একটি রাজনৈতিক লাইন উপস্থিত করেছেন তেমনি রাজ-নৈতিক লাইনের সহায়ক এবং পার্টির ভিতরকার ও বাইরের উভয় জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবন্ধনগুলি অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় একটি লাইনও উপস্থিত করেছেন। এক্ষেত্রে কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের সময় এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটেছিল যেগুলিকে ১৯২৯ সালে চতুর্থ লালফৌজ সৈন্যবাহিনী নবম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাবে[৪০] সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। এই প্রস্তাবে পার্টি গঠনকে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক নীতির স্তরে উন্নীত করেছিল এবং প্রলেতা-রীয় মতাদর্শের নেতৃত্বের ভূমিকাকে দৃঢ়ভাবে উচ্চে তুলে ধরেছিল, সঠিকভাবেই

তা নিছক সামরিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে আত্মগত বিষয়ীবাদের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিবাদ সর্বসমতাবাদ, ভ্রাম্যমাণ-বিদ্রোহীদের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে, জোর করে ক্ষমতা দখলের মতবাদ এবং অন্যান্য মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল; এই সঙ্গে তা এইসব মনোভাবের মূল ও সেগুলির ক্ষতিকর দিকগুলি এবং ঐগুলিকে সংশোধনের পদ্ধতিগুলি পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছিল। একই প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে কঠোর গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে উচ্চে তুলে ধরেছে, গণতন্ত্র কিংবা কেন্দ্রিকতা ত্রুটোর ব্যাপারেই অযথা সংকোচনের বিরোধিতা করেছে। সমগ্র পার্টির ঐক্যের স্বার্থ থেকে অগ্রসর হয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ জোরের সঙ্গে দাবি জানিয়েছিলেন অংশের মানতে হবে সমগ্রকে, চীনের বিপ্লবের বাস্তব বৈশিষ্ট অনুসারে তিনি নতুন ও পুরানো কর্মীবাহিনীর মধ্যেকার, বহিরাগত ও স্থানীয় কর্মীবাহিনীর মধ্যেকার, অঞ্চলের সৈনিক কর্মীবাহিনী এবং কর্মরত অন্যান্য কর্মীবাহিনীর মধ্যেকার এবং বিভিন্ন দপ্তর ও অঞ্চলের কর্মীবাহিনীর মধ্যেকার সঠিক সম্পর্ক নিরূপন করে দিয়েছিলেন। এভাবে কমরেড মাও সে-তুঙ নীতিগত বিষয় হিসেবে সত্যে উপনীত হওয়ার একাগ্রতাকে নিয়মানু-বর্তিতার বিষয় হিসেবে সংগঠনের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে কিভাবে সংযুক্ত করা যায় তার একটি অনুকরণীয় আদর্শ উপস্থিত করেছেন, সঠিকভাবে অন্তঃপার্টি ঐক্য বজায় রেখে কিভাবে অন্তঃপার্টি সংগ্রাম সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় তার একটি অনুকরণীয় আদর্শ উপস্থিত করেছেন। বিপরীতদিকে, যখনই ভ্রান্ত রাজনৈতিক লাইন প্রাধান্যলাভ করেছে তখন অনিবার্যভাবে একটি ভ্রান্ত সাংগঠনিক লাইন দেখা দিয়েছে, এবং এই ভ্রান্ত রাজনৈতিক লাইনের প্রাধান্যের কাল যত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে তার সাংগঠনিক লাইনের ক্ষতির পরিমাণও তত বেশি হয়েছে। তদনুযায়ী, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের যুগে বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইন-গুলির প্রবক্তারা কমরেড মাও সে-তুঙ-এর সাংগঠনিক লাইন ও তাঁর রাজ-নৈতিক লাইনেরও বিরোধিতা করেছিল; তাঁরা এমন এক সংকীর্ণতাবাদের সৃষ্টি করলেন। যা পার্টির মধ্যেকার জনগণকে দূরে ঠেলে দিয়েছে (অর্থাৎ, তাঁরা কিছু সংখ্যক-পার্টি সদস্যদের আংশিক স্বার্থকে সমগ্র পার্টির স্বার্থের অধীন করেননি এবং নেতৃস্থানীয় সংস্থাকে সমগ্র পার্টির ইচ্ছার কেন্দ্রীভূতকারী হিসেবে গণ্য করেননি) এবং তা পার্টি-বহির্ভূত জনগণকেও দূরে ঠেলে দিয়েছে (অর্থাৎ পার্টিকে তাঁরা জনগণের স্বার্থের প্রতিভূ ও তাঁদের ইচ্ছার কেন্দ্রীভূত-কারী হিসেবে গণ্য করেননি) বিশেষ করে, তাঁদের ইচ্ছাকে জোর করে

চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তারা অনর্থকভাবে নির্বিচারে যেসব পার্টি কমরেডরা ভুল লাইনটিকে অনুপযুক্ত বলে মনে করছিলেন এবং স্বভাবতঃই যাঁরা সংশয়, মতানৈক্য বা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন কিংবা ভুল লাইনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেননি বা দৃঢ়ভাবে কার্যকর করেননি তাঁদের সবাইকে বদনাম দিয়েছেন; 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ', 'ধনী কৃষকদের লাইন', 'সো মিড লাইন', 'সমঝওতার লাইন' এবং 'দুমুখো লাইনের' তকমা এঁটে দিয়ে ঐসব কমরেডদের নিন্দা করেছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে 'নির্মম সংগ্রাম' চালিয়েছেন ও তাঁদের বিরুদ্ধে 'নিষ্ঠুর আঘাত' হেনেছেন এবং 'অন্তঃ-পার্টি সংগ্রাম' এমনভাবে চালিয়েছেন যেন তাঁরা অপরাধী ও শত্রুদের বিরুদ্ধেই লড়াই করছেন। এই ভ্রান্ত ধরনের অন্তঃপার্টি সংগ্রামকেই এই 'বামপন্থী' লাইন পরিচালনা ও প্রয়োগকারী কমরেডরা একটা নিয়মিত পদ্ধতি করে তুলে তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে তুললেন, তাঁদের নিজ নিজ দাবিগুলি জোর করে চাপিয়ে দিলেন এবং পার্টি-কমরেডদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তুললেন। পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার মৌল নীতিকে তাঁরা অমান্য করলেন, সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার মনোভাবকে বিলুপ্ত করে দিলেন, পার্টি-শৃংখলাকে যান্ত্রিক শৃংখলার ব্যাপার করে তুললেন এবং অন্ধ অনুগত্য ও বশীভূত হয়ে থাকার মনোভাবের প্রসার ঘটালেন; এভাবে প্রাণবন্ত ও সৃজনশীল মার্কসবাদের বিকাশে বাধা সৃষ্টি হল এবং তার ক্ষতি সাধিত হল। কর্মীদের প্রতি একটা উপদলীয় নীতির সঙ্গে যুক্ত হল একটা ভ্রান্ত ধরনের অন্তঃপার্টি সংগ্রাম। উপ-দলীয় ব্যক্তিরা প্রবীণ কর্মীদের পার্টির অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য করলেন না, উল্টে তাঁদের আক্রমণ করা হল, শাস্তি দেওয়া হল এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সংগঠন-গুলি থেকে কাজকর্ম সু-অভিজ্ঞ ও জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবিশিষ্ট যে বহু সংখ্যক প্রবীণ কমরেড উপদলীয় ব্যক্তিদের কাছে অসুবিধাজনক বলে গণ্য হলেন বা তাঁদের অন্ধ অনুগামী হতে বা জো-হুকুম বনতে অস্বীকার করলেন তাঁদের পদচ্যুত করা হল। নতুন কর্মীদের (বিশেষ করে, শ্রমিকশ্রেণী থেকে তাঁদের কর্মীদের) তাঁরা উপযুক্ত শিক্ষাও দিলেন না বা তাঁদের পদোন্নতিকে গুরুতরভাবে পরিচালনাও করলেন না। তার বদলে, তাঁরা অবিবেচকের মতো নতুন কর্মীদের এবং বহিরাগত সেইসব কর্মীদের পদোন্নতি করে দিলেন যাঁদের বাস্তব কাজকর্মের অভিজ্ঞতার এবং জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাব রয়েছে কিন্তু যাঁরা উপদলীয় ব্যক্তিদের পক্ষে মনোমত ছিলেন ও তাঁদের একে-

-বারে অন্ধ-অনুগামী এবং জো-হুকুম ছিলেন, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সংগঠনে প্রবীণ কর্মীদের জায়গায় এঁদের বসানো হল। এভাবে, তাঁরা শুধু প্রবীণ কর্মীদের আক্রমণ করেছেন তাই নয়, তাঁরা নতুন কর্মীদেরও নষ্ট করে করে দিয়েছেন। তা ছাড়া, প্রতিবিপ্লবীদের দমন করার ব্যাপারে একটি ভুল নীতি কর্মীদের প্রতি উপদলীয় নীতির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে এমন বহু জায়গায় বহু চমৎকার কমরেডকে মিথ্যা অভিযোগে অন্যায় শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং এতে করে পার্টির একান্ত মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এ ধরনের উপদলীয় ভুলগুলি পার্টিকে বিরাটভাবে দুর্বল করে দিয়েছে, উচ্চতর নিম্নতর সংগঠনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করেছে ও পার্টির মধ্যে অন্যান্য নানা বিশৃংখলার সৃষ্টি করেছে।

এই বর্ধিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছে : ভ্রান্ত লাইনের প্রবক্তাদের দ্বারা কোন কমরেডকে প্রদত্ত অন্যায় যে-কোন শাস্তি বা আংশিক শাস্তি পরিস্থিতি অনুযায়ী খারিজ হয়ে যাবে। তদন্ত করে যদি এটা প্রমাণিত হয় যে কোন কমরেড মিথ্যা অভিযোগে শাস্তি পেয়েছেন তবে এমন প্রতিটি কমরেডকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হবে এবং পার্টি-সদস্য হিসেবে তাঁকে পুনরায় গ্রহণ করা হবে এবং সকল কমরেড তাঁর স্মৃতিকে সসম্মানে স্মরণ করবেন।

৪। মতাদর্শগত দিক থেকে :

কোন একটি রাজনৈতিক, সামরিক, বা সাংগঠনিক লাইনের সঠিকতা বা বেঠিকতার মতাদর্শগত উৎস রয়েছে—তা নির্ভর করে ঐ লাইনগুলি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তি থেকে বা তা চীন বিপ্লবের বাস্তব ভিত্তি এবং চীনের জনগণের বাস্তব প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত কিনা তার ওপর। চীন বিপ্লবের লক্ষ্যকে নিজের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার দিন থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের সমাজের বাস্তব পরিস্থিতির অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের কাজে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে প্রয়োগে আত্মনিয়োগ করেছেন। কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের সময়ে 'অনুসন্ধান না করলে, কথা বলার অধিকার থাকবে না' এই নীতির ওপর তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বারবার গোঁড়ামি ও আত্মগত বিবস্ত্রীবাদের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন। বস্তুতঃ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক যে লাইনগুলি কমরেড মাও সে-তুঙ রূপায়িত করেছেন সেগুলি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের ভিত্তিতে, দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে

ভিতরের ও বাইরের এবং পার্টির ভিতরের ও বাইরের প্রকৃত অবস্থার ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহের বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়নের এবং চীন বিপ্লবের, বিশেষ করে ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁর সমুজ্জ্বল সাফল্যের উদাহরণ। চীনে বসবাসকারী চীনের যে কমিউনিস্টরা সংগ্রাম করছেন, দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তাঁদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কমরেড মাও সে-তুঙ যেমন করেছেন, সেভাবে চীন বিপ্লবের বাস্তব সমস্যার অধ্যয়ন ও সমাধানের ব্যাপারে তাকে প্রয়োগ করা। কিন্তু 'বামপন্থী' ভুল করেছিলেন যেসব কমরেড তাঁরা অবশ্যই তখন তাঁর পদ্ধতিকে অনুধাবন করতে বা গ্রহণ করতে পারেননি এবং তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তারা তো তাঁকে 'সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদী' বলে কুৎসাও করেছিলেন। তার কারণ হচ্ছে এই যে ওঁদের ভাবাদর্শের মূল ছিল আত্মগত বিষয়ীবাদী ও আনুষ্ঠানিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রাধান্যের সময়টাতে তা অনেক বেশি স্পষ্ট গোঁড়ামির আকারে দেখা দিয়েছিল। গোঁড়ামির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে তা বাস্তব পরিস্থিতির বিচার থেকে শুরু করে না, বইপত্রের বিশেষ কিছু শব্দ ও ব্যাকাংশ নিয়েই কাজ শুরু করে। গোঁড়ারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ও পদ্ধতির ওপর নিজেদের স্থাপন করে চীনের অতীত ও বর্তমান রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এবং চীনের বিপ্লবের বাস্তব অভিজ্ঞতার গুরুতর কোন অধ্যয়ন করেন না এবং তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চীন বিপ্লবের কার্যকলাপকে পরিচালনা করেন না বা জন সাধারণের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঐ সিদ্ধান্তগুলির সারবত্তাকে বিচার করে দেখেন না। বরং উল্টোদিকে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মর্মবস্তুকে বিসর্জন দিয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য থেকে কিছু শব্দ ও বাক্যাংশ দেশে আমদানি করে বর্তমানের চীনের বাস্তব পরিস্থিতিতে এই উধৃতিসমূহের উপযুক্ততা নিয়ে কোন বিচার-বিবেচনা না করেই সেগুলিকে শাস্ত্রবাক্য হিসেবে গ্রহণ করেন। সুতরাং অনিবার্যভাবে গোঁড়াদের এই 'তত্ত্বগুলি' বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তাদের নেতৃত্ব জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং বাস্তব তথ্য থেকে সত্যকে খুঁজে বের করার পরিবর্তে তারা আত্মম্ভরী, দাম্ভিক, বাকসর্বস্ব এবং প্রকৃত সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা সম্পর্কে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

নিছক যে অভিজ্ঞতাবাদী মতাদর্শ এদের প্রাধান্যের এই যুগে গোঁড়ামির

সহযোগী ও সহায়তাকারী হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটাও এইরকমভাবে ছিল আত্মগত বিষয়ীবাদ চিন্তার ও আনুষ্ঠানিকতার একটি প্রকাশ মাত্র। গোঁড়ামির থেকে অভিজ্ঞতাবাদের পার্থক্যটি হচ্ছে এই যে তা বই থেকে নয়, শুরু করে নিছক সংকীর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে। এটা সজোরেই বলা চাই যে বাস্তব কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বিপুল সংখ্যক কমরেডরা যে হিতকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা সবচেয়ে অমূল্য একটি সম্পদ। এ ধরনের অভিজ্ঞতাগুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে মূল্যায়ন করে ভাবী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অভিজ্ঞতাবাদ নয়, তা হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ; ঠিক অনুরূপ নিশ্চিতভাবেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব ও মূলনীতিগুলিকে বৈপ্লবিক কার্যক্ষেত্রে শাস্ত্রবাক্য হিসেবে গ্রহণ না করে পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করা গোঁড়ামি নয়, তা হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। কিন্তু বাস্তব কাজকর্মে সুদক্ষ এমন যদি কিছু কমরেড থাকেন যাঁরা তাঁদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা ও নিছক ঐ অভিজ্ঞতা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকেন, যদি তাকে শাস্ত্রবাক্য বলে গ্রহণ করেন এবং সর্বত্র তা প্রয়োগ করা যাবে বলে ভাবেন এবং যদি তাঁরা এটা না বোঝেন বা তার চেয়েও বড় কথা যদি এই সত্যটিই তাঁরা মেনে নিতে না চান যে 'বৈপ্লবিক তত্ত্ব ছাড়া বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্ভব নয়'[৪১] এবং 'নেতৃত্ব দিতে হলে একজনকে দূরদৃষ্টির অধিকারী হতে হবে,'[৪২] আর এরই পরিণতি হিসেবে যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে বিশ্বের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার নির্যাস তার অধ্যয়নকেই তাঁরা ছোট করে দেখেন এবং একটি মূলনীতি বিবর্জিত সংকীর্ণ বাস্তব কাজকর্ম নিয়েই অন্ধভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে থাকেন, চিন্তাচরিত্র না করে ভবিষ্যৎ লক্ষ্যহীন রুটিনমাফিক কাজ নিয়ে মেতে থাকেন; এবং এসব সত্ত্বেও যদি উপরে বসে থাকেন ও হুকুম জারী করতে থাকেন, যদি তাঁদের এই প্রায় অন্ধত্ব থেকে নিজেদের তাঁরা বীর বলে জাহির করতে থাকেন, প্রবীণত্বের ভাবসাব দেখাতে থাকেন এবং কমরেডদের সমালোচনার প্রতি মনোযোগ দিতে অস্বীকার করেন বা আত্মসমালোচনা না করেন—তাহলে নিশ্চয়ই বলতে হবে ঐ কমরেডরা অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে পড়েছেন। তাই যাত্রারম্ভের স্থলের দিক থেকে পার্থক্য সত্ত্বেও অভিজ্ঞতাবাদীরা ও গোঁড়াপন্থীরা তাদের চিন্তাধারার দিক থেকে মূলতঃ একই। উভয়পক্ষই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে চীন বিপ্লবের বাস্তব কার্যকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন; দুই পক্ষই দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে অমান্য করেন এবং খণ্ডিত ও আপেক্ষিক সত্যকেই বিশ্ব-

জনীন ও চরম সত্য হিসাবে বড় করে দেখান; আর এদের কোন পক্ষেরই চিন্তা বাস্তব, প্রকৃত সামগ্রিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। ফলে, চীনের সমাজ ও চীনের সমাজ সম্পর্কে বহু ভ্রান্ত ধারণাই এঁরা সমানভাবে পোষণ করতেন (যেমন, ওঁরা ভ্রান্তভাবে মহানগরগুলিকেই মূল ভারকেন্দ্র হিসাবে মনে করেছেন, শ্বেত এলাকাসমূহের কাজকেই ওরা মূল ভারকেন্দ্র বলে গণ্য করেছেন এবং এসব থেকেই দেখা দিয়েছে বাস্তব-পরিস্থিতি-বিচ্ছিন্নভাবে 'নিয়মিত' যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি)। মতাদর্শগত অনুরূপ উৎসের ফলেই এই দু'ধরনের ভিন্ন ভিন্ন কমরেডগণের পরস্পর সহযোগিতা গড়ে ওঠা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার জন্য অধিকাংশ অভিজ্ঞতাবাদীদেরই স্বাধীন, পরিচ্ছন্ন ও ধারাবাহিক কোন ধারণা সাধারণ ধরনের সমস্যাগুলি সম্পর্কে ছিল না এবং তারই জন্য গোঁড়াপন্থীদের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতার সময়ে সাধারণভাবে ওরা সুরে সুর মিলিয়ে গেছেন; কিন্তু আমাদের পার্টির ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে গোঁড়াপন্থীদের পক্ষে 'সমস্ত পার্টি জুড়ে তাদের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া' অভিজ্ঞতাবাদীদের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভবপর হতো না; এবং গোঁড়ামির পরাজয়ের পর পার্টিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকাশের পথে অভিজ্ঞতাবাদই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আত্মগত বিষয়ীবাদী অভিজ্ঞতাবাদ ও আত্মগত বিষয়ীবাদী গোঁড়াপন্থা এই দুটোকেই দূর করে দিতে হবে। গোঁড়াপন্থী ও অভিজ্ঞতাবাদী এই দুটি মতাদর্শকে সম্পূর্ণভাবে দূর করে দিয়েই শুধু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শ, লাইন ও কর্মধারাকে সর্বত্র প্রসারিত করে দেওয়া সম্ভবপর হবে এবং তা সমগ্র পার্টিতে গভীরভাবে দানা বেঁধে উঠবে।

ওপরে যে ভুলগুলির রাজনৈতিক, সামরিক, সাংগঠনিক এবং ভাবাদর্শগত চারটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হল, ঐগুলিই হচ্ছে বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইনের এবং বিশেষ করে তৃতীয় লাইনের মৌলিক ভুল। আর রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংগঠনিক সকল ভুলগুলিই মতাদর্শগত দিক থেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে অমান্য করা থেকে, বিষয়ীবাদ ও আনুষ্ঠানিকতাবাদ থেকে, গোঁড়াপন্থা ও অভিজ্ঞতাবাদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

বর্তমান বর্ধিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এই বিষয়টি দেখিয়ে দিচ্ছে যে বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইনের ভুলগুলি খারিজ করে দেওয়ার সময় আমাদের

কমরেড মাও সে-তুঙ-এর 'সকল প্রশ্নকেই বিশ্লেষণাত্মকভাবে গ্রহণ করার, সব কিছুকেই খারিজ করে না দেওয়ার'[৪৩] নির্দেশটিকে মনে রাখতে হবে এবং কার্যকর করতে হবে। এটাও মনে রাখতে হবে, যেসব কমরেড এই ভুলগুলি করেছিলেন তাঁদের সবগুলি ধারণাই ভুল ছিল না; সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁদের ধারণাগুলির কৃষি-বিপ্লব সম্পর্কে এবং চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁদের ধারণাগুলির সঙ্গে সঠিক লাইন অনুসরণকারী কমরেডদের ধারণাগুলির মিলই ছিল। আরও লক্ষ্য করা চাই, বিশেষ করে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের দীর্ঘকাল প্রাধান্য সত্ত্বেও এবং তার ফলে পার্টি ও বিপ্লবের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও এই যুগে পার্টি বহু অঞ্চলে ও বহু ক্ষেত্রে বাস্তব কাজকর্মে বিরাট বিরাট সাফল্য অর্জন করে (যেমন, যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে, সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, যুদ্ধের জন্য সমাবেশের ব্যাপারে, রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তোলার ব্যাপারে এবং শ্বেত অঞ্চলের কাজকর্মে) সৈনিকসাধারণ ও জনসাধারণের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সদস্যদের সক্রিয় কার্যকলাপ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্যই এই সাফল্যগুলি অর্জিত হয়। আসলে এই সকল সাফল্যের জন্যই বেশ কয়েক বছর ধরে শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমরা যুদ্ধ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে পেরেছিলাম এবং তাকে কঠিন আঘাত হানতে পেরেছিলাম, আর এই ভ্রান্ত লাইনের প্রাধান্যের জন্যই শুধু এই সাফল্যগুলি শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পার্টি এবং জনগণ চিরকাল পার্টির ভেতরের ও বাইরের সেই সকল নেতা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও কর্মী, সকল পার্টি-সদস্য ও জনগণ যাঁরা বীরের মতো বিভিন্ন ভ্রান্ত লাইনের প্রধান্যের যুগে জীবন বলিদান করে গেছেন তাঁদের সকলের স্মৃতিকে, পার্টির ইতিহাসের অন্যান্য যুগের জীবন বলিদান-কারীদের স্মৃতির মতোই সম্মান প্রদর্শন করে যাবে।

(৫)

চারটি দিক থেকে 'বামপন্থী' লাইনগুলির যে ভুলের কথা ওপরে আলোচিত হল তা আকস্মিক কিছু নয়; তাদের খুবই গভীর সামাজিক উৎস রয়েছে।

কমরেড মাও সে-তুঙ যে সঠিক লাইনের প্রতিভূ তাতে যেমন ফুটে উঠেছে চীনের শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর অংশের ভাবাদর্শ, তেমনি 'বামপন্থী' লাইনে

ফুটে উঠেছে চীনের পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের ভাবাদর্শ। আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীন বিপুল সংখ্যক পেটি-বুর্জোয়া অধ্যুষিত একটি দেশ। শুধু যে আমাদের পার্টি এই বিশাল সামাজিক স্তর কর্তৃক চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ তাই নয়, পার্টির মধ্যেও অধিকাংশ সদস্যই হচ্ছে পেটি-বুর্জোয়া থেকে উদ্ভূত লোকজন। এর কারণ হচ্ছে, বিপুল সংখ্যক পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা শ্রমিকশ্রেণীর দিকে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সংকট থেকে পরিত্রাণের আশায়, কেননা অক্টোবর বিপ্লবের পর মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান বিশ্বময় বিজয়ের মধ্য দিয়ে এবং চীনের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য ও বিশেষভাবে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক বিকাশের ফলে চীনে পেটি-বুর্জোয়াদের শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, চীনের অর্থনৈতিক অবস্থাতে এমনকি সাধারণ শ্রমিকজনগণ এবং শ্রমিকশ্রেণী থেকে আগত পার্টি-সদস্যরাও পেটি-বুর্জোয়া ভাবাপন্ন হতে পারেন। সুতরাং, এটা মোটেই বিস্ময়কর নয় বরং অনিবার্যই যে পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শ পার্টির মধ্যে প্রতিটি রূপ ও আকার নিয়ে বারেবারে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

যে কৃষকজনগণ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল শক্তি তাদের ছাড়াও পার্টির বাইরের পেটি-বুর্জোয়া জনসাধারণের মধ্যেকার শহুরে পেটি-বুর্জোয়ারাও বর্তমান স্তরে যে বিপ্লবের অন্যতম একটি পরিচালিকা শক্তি, কেননা তার বিপুল সংখ্যক সদস্যরা সর্ববিধ নিপীড়নের শিকার হয়ে রয়েছেন, অবিরাম আর দ্রুত-গতিতে দারিদ্র্যের, দেউলিয়াপনার ও বেকারীত্বের পথে ছুটে চলেছেন, এবং একান্ত জরুরীভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের দাবি জানাচ্ছেন। কিন্তু রূপান্তরের মাঝে রয়েছে এরকম একটা শ্রেণী হিসেবে পেটি-বুর্জোয়াদের একটি দ্বৈত চরিত্র আছে। ভাল এবং বৈপ্লবিক দিকটি হচ্ছে এই যে এই শ্রেণীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রভাবে এমনকি তার মতাদর্শগত প্রভাবেও সহজেই সাড়া দেয়, বর্তমানে তারা একটি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দাবি করছে এবং তারজন্য ঐক্যবদ্ধ হতে ও সংগ্রাম করতেও তারা সমর্থ আর ভবিষ্যতে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মিলিতভাবে সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ করতেও তারা রাজী; কিন্তু ওদের খারাপ ও পশ্চাৎ-মুখী দিক হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার মতো বহু দুর্বলতাই যে শ্রেণীটির রয়েছে তাই নয়, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হলে এরা প্রায়ই

উদারনৈতিক বুর্জোয়াশ্রেণীর, এমনকি, বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর দিকে ঝুঁকে পড়ে ও ওদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে এবং ওদের বন্দী হয়ে পড়ে। সুতরাং বর্তমান স্তরে শ্রমিকশ্রেণীকে ও তার অগ্রবাহিনী চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে পার্টি-বহির্ভূত ব্যাপক পেটি-বুর্জোয়া জনসাধারণের সাথে নিজেদের একটি দৃঢ় ও ব্যাপক মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে এবং একদিকে এদের প্রতি আচরণে যেমন খুবই নমনীয় হতে হবে ও যে সমাজজীবনের আমরা সাধারণ অংশীদার তার মধ্যে বিভেদ না ঘটিয়ে এবং আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তা যত সময় প্রতিহত না করবে তত সময় তাদের উদারনৈতিক ধ্যানধারণা ও কাজের ধারাকে আমাদের বরদাস্ত করতে হবে, কিন্তু অন্যদিকে, তাদের সঙ্গে আমাদের মৈত্রীকে জোরদার করে তোলার জন্য তাদের উপযুক্ত শিক্ষাও দিতে হবে।

পেটি-বুর্জোয়াদের থেকে আগত যেসব ব্যক্তি স্বেচ্ছামূলকভাবেই তাঁদের মূল শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি বিসর্জন দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে যোগদান করেছেন, তাঁদের ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পার্টি-বহির্ভূত পেটি-বুর্জোয়া জন-সাধারণের প্রতি যে নীতি গ্রহণ করা হবে। তার চেয়ে নীতিগতভাবে আলাদা একটি নীতিই এঁদের প্রতি গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু এইসব লোক প্রথমাবধি শ্রমিকশ্রেণীর খুবই ঘনিষ্ঠ এবং স্বেচ্ছামূলকভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে যোগদান করেছেন, তাই তাঁরা পার্টিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার মাধ্যমে এবং গণ-বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পোড় খেয়ে তাঁদের মতাদর্শের দিক থেকেও তাঁরা ক্রমে শ্রমিকসুলভ হয়ে উঠতে পারেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনীর পক্ষে বিরাট সহায়তাকারীই হয়ে উঠতে পারেন। আসলে, পেটি-বুর্জোয়া থেকে আগত যে লোকজন পার্টিতে যোগদান করেছিলেন তার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, পার্টি ও জনগণের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন ও ভাবাদর্শের দিক থেকে অগ্রগতিলাভ করেছেন এবং তাঁদের মধ্যেকার অনেকেই ইতিমধ্যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হয়ে উঠেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও জোর দিয়ে বলার দরকার রয়েছে, যেসব পেটি-বুর্জোয়া এখনো শ্রমিকসুলভ হয়ে উঠেননি, তাঁদের বিপ্লবী চরিত্র প্রলেতারীয় বিপ্লবী চরিত্র থেকে মূলতঃ পৃথক এবং এই পার্থক্য একটা বিরোধীয় দ্বন্দ্বের অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে। পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী চরিত্র নিয়ে যে সদস্যরা সাংগঠনিকভাবে পার্টিতে যোগদান করেছেন কিন্তু এখনো ভাবাদর্শগতভাবে

পার্টিতে যোগদান করেননি বা পুরোপুরিভাবে যোগদান করেননি তাঁরা প্রায়ই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর ছদ্মবেশে উদারনীতিবাদী, সংস্কারবাদী, নৈরাজ্যবাদী ও ব্ল্যাঙ্কিবাদী[৪৪] ইত্যাদিই থেকে যান। অবস্থাটি এরকম থাকার জন্য, তাঁরা যে আগামীদিনের চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিজয়ে নেতৃত্বদানেই অসমর্থ হবেন তাই নয়, তাঁরা আজকের দিনের নয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়েও নেতৃত্বদানে ব্যর্থ হবেন। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর লোকজনেরা যদি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শ এবং পেটি-বুর্জোয়াদের থেকে আগত ঐ পার্টি-সদস্যদের সাবেক ভাবাদর্শের মধ্যে সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট একটি লাইন না টানেন, যদি গুরুতর, যথোপযুক্ত ধৈর্যশীল পথে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করেন, তাহলে তাঁদের পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শকে জয় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে; তার চেয়েও বড় কথা ঐ সদস্যরাই অনিবার্যভাবে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীকে তাঁদের নিজেদের আদলে রূপায়িত করে তুলতে প্রয়াসী হবেন এবং পার্টি নেতৃত্বকেই জবরদখল করে বসবেন, আর এভাবে পার্টি ও জনগণের লক্ষ্যেরই ক্ষতিসাধন করবেন। পার্টির বাইরেকার পেটি-বুর্জোয়ারা যত বিপুল সংখ্যক হবেন এবং পার্টির ভিতরেও পেটি-বুর্জোয়া থেকে আগত সদস্যরা যত বিপুল সংখ্যক হবেন পার্টিকে তত বেশি দৃঢ়তা সহকারে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী হিসেবে নিজের বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করতে হবে; এ কাজে ব্যর্থ হলে পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শ আরও বেশি হিংস্রভাবে পার্টিকে আঘাত হানবে এবং তার অধিকতর ক্ষতি-সাধন করবে। আমাদের পার্টির ইতিহাসে, সঠিক লাইন ও অন্যান্য ভ্রান্ত লাইনগুলির মধ্যেকার সংগ্রাম মূলতঃ হচ্ছে পার্টির মধ্যে বাহিরের শ্রেণী-সংগ্রামেরই প্রকাশ ও 'বামপন্থী' লাইনগুলির যে রাজনৈতিক, সামরিক, সাংগঠনিক ও ভাবাদর্শগত ভুলের আলোচনা ওপরে করা হয়েছে সেগুলি পার্টিতে এই পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শেরই একেবারে যথাযথ অভিব্যক্তি। এই প্রশ্নটিকে তিন দিক থেকে আলোচনা করা যায়।

প্রথম হচ্ছে, চিন্তা-পদ্ধতির দিক। পেটি-বুর্জোয়া চিন্তা-পদ্ধতির প্রকাশ ঘটে মূলতঃ সমাস্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিতে বিষয়ীবাদ ও একদেশদর্শিতা রূপে অর্থাৎ তা বস্তুনিষ্ঠ বিষয়গতভাবে শ্রেণীশক্তিসমূহের আনুপূর্বিক একটি চিত্র উপস্থিত করে না বরং বিষয়ীবাদী আত্মগত বাসনা ও ধারণা থেকে বাস্তবতার বদলে ফাঁকা কথাই এনে হাজির করে, সমস্ত দিকগুলির একটিকেই ধরে বসে থাকে, অংশকেই সমগ্র মনে করে বসে এবং আলাদা আলাদা গাছপালাকেই

অরণ্য বলে ভুল করে। উৎপাদনের যথার্থ প্রকৃত প্রক্রিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের শুধুমাত্র পুঁথিগত জ্ঞান থাকে ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব থাকে এবং তাই তাঁদের চিন্তার পদ্ধতি ওপরে আলোচিত নির্বিচার গোঁড়ামি হিসেবেই সহজে আত্মপ্রকাশ করে বসে। যদি তাঁদের কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও থাকে তাহলেও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত এই পেটি-বুর্জোয়া লোকজনদের ক্ষুদে উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যগুলির সীমাবদ্ধতা—যেমন, সংকীর্ণতা, বিক্ষিপ্ততা, বিচ্ছিন্নতা ও রক্ষণশীলতা ইত্যাদি থেকেই যায় এবং তাই তাঁদের চিন্তাধারাতেও ওপরে আলোচিত অভিজ্ঞতাবাদের প্রকাশ ঘটে।

দ্বিতীয় হচ্ছে, রাজনৈতিক প্রবণতার দিক। পেটি-বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক প্রবণতা তাঁদের জীবনধারা ও তারই পরিণতিজাত আত্মগত বিষয়ীবাদী চিন্তা এবং চিন্তাধারার একদেশদর্শিতার জন্য 'বামপন্থা' ও দক্ষিণপন্থার মধ্যে নিজের দোদুল্যমানতা রূপে সহজেই দেখা দেয়। পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবীদের বহু প্রতিনিধিই তাঁদের বর্তমান অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য বিপ্লবের আশু বিজয়ের প্রত্যাশা করেন। সুতরাং, দীর্ঘস্থায়ী বৈপ্লবিক প্রয়াস পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ধৈর্যের তাঁদের প্রভাব থাকে, ও'রা 'বামপন্থী' বিপ্লবী কথাবার্তার ও শ্লোগানের খুবই অনুরাগী এবং তাদের আবেগ ও বাস্তব কাজকর্মে তাঁরা রুদ্ধদ্বার পদ্ধতি বা হঠকারিতারই প্রবণতা সম্পন্ন। পার্টিতে প্রতিফলিত হয়ে এই পেটি-বুর্জোয়া প্রবণতা থেকে ওপরে আলোচিত প্রশ্ন-সমূহের ব্যাপারে, যেমন, বিপ্লবের কর্তব্য, বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল, রণকৌশল এবং সামরিক লাইন পরিচালনার ব্যাপারে বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইনের ভুলের সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু এই একই বা অন্য একটি অংশের পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবীদের যখন ভিন্ন একটি পরিস্থিতিতে স্থাপন করা যাবে তখন দেখা যাবে ওঁরা নৈরাশ্যবাদী ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন এবং দক্ষিণপন্থী আবেগ ও ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড়ের মতো ওদের পেছনে পেছনে ছুটে চলেছেন। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের যুগের শেষের দিকটার চেন তু-শিউবাদ, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের যুগের শেষের দিকটার চ্যাঙ কুও-তাওবাদ এবং লং মার্চের প্রথম দিকটার পলায়নবৃত্তি—এই সবগুলিই হচ্ছে পার্টির মধ্যে ঐ পেটি-বুর্জোয়া দক্ষিণ পন্থী ভাবাদর্শের অভিব্যক্তি। আর জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের সময়ে আবার আত্মসমর্পণবাদী ধ্যানধরণার আবির্ভাব ঘটেছে। সাধারণভাবে বলতে

গেলে 'বামপন্থী' ভুলগুলি বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার বিভেদের যুগেই বেশি বেশি করে দেখা দিয়ে থাকে (যেমন, কৃষি-বিপ্লবের যুগে পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলিতে 'বামপন্থী' লাইন তিন-তিনটিবার নিজের প্রাধান্য স্থাপন করেছে) অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার মৈত্রীর সময়েই দক্ষিণপন্থী ভুলগুলি বেশি বেশি করে দেখা দিয়ে থাকে (যেমন, ১৯২৪ সালের বিপ্লবের শেষের দিকে এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথমদিকে তা দেখা দিয়েছিল)। কিন্তু 'বাম' বা দক্ষিণ যাই হোক, এই প্রবণতাগুলি বিপ্লবের হিতসাধন করে না বরং প্রতিবিপ্লবেরই তা হিত-সাধন করে। 'বামপন্থার' দিকে বা দক্ষিণপন্থার দিকে বিচ্যুতি, চরম অবস্থান গ্রহণ করার অন্তঃসারশূন্য চমকের প্রতি বা নিছক সুবিধাবাদের প্রতি এই যে আকুল আগ্রহ—এই সবগুলিই দেখা দেয় পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপের ফলে এবং এইগুলিই হচ্ছে পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শের খারাপ দিক। এই সবগুলিই হচ্ছে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্থির অর্থনৈতিক অবস্থার ভাবাদর্শ-ক্ষেত্রে প্রকটিত প্রতিফলন।

তৃতীয় হচ্ছে, সাংগঠনিক জীবনের দিক। সাধারণভাবে পেটি-বুর্জোয়াদের জীবনধারায় ও চিন্তাধারায় যেসব সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং বিশেষ করে চীনের পশ্চাদপদ ও বিকেন্দ্রীভূত সমাজ পরিবেশে গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদক চক্র তথা গিল্ডগুলির অস্তিত্বের জন্য সাংগঠনিক জীবনে পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যেকার প্রবণতাগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংকীর্ণতাবাদ হিসেবে সহজেই আত্মপ্রকাশ করে এবং জনগণের সঙ্গে তার ফলে বিচ্ছিন্নতা ঘটে। এই প্রবণতা যখন পার্টিতে অভিব্যক্ত হয় তখনই ওপরে আলোচিত ভ্রান্ত 'বামপন্থী' সাংগঠনিক লাইন দেখা দেয়। দীর্ঘকাল ধরে পার্টিকে গ্রামাঞ্চলে যে বিক্ষিপ্ত গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হয়েছিল এই বাস্তব সত্য এই প্রবণতাটিকে বাড়িয়ে তোলা সহজতর করে তুলেছিল। এই প্রবনতা পার্টি ও জনগণের হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে শেখায় না বরং পার্টি ও জনগণের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পার্টি ও জনগণের স্বার্থের হানি করতে অথবা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসাধন করতেই শেখায়। সুতরাং তা জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখার পার্টির নীতির সঙ্গেই বেমানান, পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিকতার সঙ্গে এবং পার্টির শৃংখলার সঙ্গে বেমানান। এই প্রবণতা বারেবারে আমলাতান্ত্রিকতা, কর্তৃত্ব-বাদ, শক্তিপ্রদানের মনোবৃত্তি, হুকুমদারির মনোবৃত্তি, ব্যক্তিগত বীরত্বপনা,

আধা-নৈরাজ্যবাদ, উদারনীতিবাদ, অতি-গণতন্ত্র, নিজেদের 'স্বাধীনতা' জাহির করার প্রবণতা, গোষ্ঠীতন্ত্র, 'পর্বতকেন্দ্র প্রীতির' মানসিকতা, ৪৫ একই শহরবাসী ও সমপাঠীদের অনুগ্রহ প্রদর্শন, উপদলীয় কোন্দল ও বদমায়েসী ছলচাতুরী হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং এই সবগুলিই জনগণের সঙ্গে পার্টির বন্ধনকে ও পার্টির আভ্যন্তরীণ ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শের এই হচ্ছে তিনটি দিক। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে আত্মগত বিষয়ীবাদ, রাজনীতির ক্ষেত্রে 'বাম' ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি এবং সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সংকীর্ণতাবাদ—নানা সময়ে আমাদের পার্টিতে এইসব বিচ্যুতিগুলিই দেখা দিয়েছে এবং তা একটা পরিষ্কার লাইন হিসেবে বিকশিত হয়ে পার্টির নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ কব্জা করে ফেলুক বা না ফেলুক স্পষ্টতঃই এই প্রবণতাগুলি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী ও শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শেরই প্রকাশ। পার্টি ও জনগণের স্বার্থে, শিক্ষার পদ্ধতি ব্যবহার করে ঐগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করা ও পার্টির মধ্যেকার পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শকে দূর করে দেওয়া এবং তাকে প্রলেতারীয় ভাবাদর্শে রূপান্তরিত করে তুলতে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

(●)

ওপরে আলোচিত বিষয় থেকে এটা দেখা যাচ্ছে 'বামপন্থী' লাইন এবং বিশেষ করে যে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইন সমগ্র পার্টিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল তা আকস্মিক কিছু নয় এবং তা সুনির্দিষ্ট সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতিরই প্রকাশ। সুতরাং যদি আমাদের 'বামপন্থী' ও দক্ষিণপন্থী ভ্রান্ত ভাবাদর্শের অবসান ঘটাতে হয় তবে হেলাফেলা করে বা উগ্রতা সহকারে অগ্রসর হলে চলবে না, বরং আমাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষাকে গভীর করে তুলতে হবে এবং প্রলেতারীয় ও পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শের মধ্যেকার পার্থক্য নিরূপণ করার ক্ষমতাকে সমগ্র পার্টিতেই উন্নত করে তুলতে হবে; অন্তঃপার্টি গণ-তন্ত্রকে পুরোপুরি কার্যকর করে তুলতে হবে, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনাকে বিকশিত করে তুলতে হবে, ধৈর্য সহকারে বোঝাবার ও শিক্ষাদানের কাজে এগিয়ে যেতে হবে, ভুলগুলির এবং সেগুলির বিপদ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তাদের ঐতিহাসিক ও ভাবদর্শগত উৎসের বিশ্লেষণ করতে হবে, আর একই সঙ্গে ভুলগুলি সংশোধন করার উপায় নির্ধারণ করতে

হবে। পার্টির মধ্যেকার ভুল দূর করা সম্পর্কে এই হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের সঠিক মনোভাব। এই বর্ধিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন দেখিয়ে দিতে চায় যে সমগ্র পার্টিতে বর্তমান শুদ্ধিকরণ আন্দোলনের জন্য এবং পার্টির ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ 'অতীতের ভুলগুলি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে ভবিষ্যৎ ভুলগুলি পরিহার করার এবং রোগ নিরাময় করার কিন্তু রোগীকে রক্ষা করার' এবং 'ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রে সুস্পষ্টতা অর্জনের ও কমরেডদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের'[৪৬] যে নীতি গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে পার্টিতে ভুল দূর করার ব্যাপারে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মনোভাবের একটি অনুকরণীয় আদর্শ। তারই জন্য, সমগ্র পার্টির মানকে ভাবাদর্শগত, রাজনীতিগত এবং সংগঠনগত দিক থেকে উন্নত করতে ও সমগ্র পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে বিরাট সাফল্য অর্জন করা গেছে।

এই বর্ধিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন দেখিয়ে দিচ্ছে যে পার্টি তার ইতিহাসের গতিপথে চে তু-শিউবাদ ও লি লি-সানবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে তা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই সংগ্রামগুলির ক্ষেত্রে ত্রুটি ছিল এই যে পার্টিতে বর্তমান গুরুতর রকমের পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শকে সংশোধনের জন্য সচেতন, গুরুতর পদক্ষেপ হিসেবে সেগুলিকে গ্রহণ করা হয়নি; ফলে ঐগুলির ভাবাদর্শগত মর্মবস্তুকে পরিষ্কার করে তোলা যায়নি ও ভুলগুলির মূলগুলিকেও পুরোপুরি দেখিয়ে দেওয়া যায়নি বা ঐগুলিকে সংশোধনের এবং এই ভুলগুলি যাতে আবার সহজে ঘটতে না পারে তার পদ্ধতি নির্দেশ করে দেওয়া যায়নি। তাছাড়া এই বিশ্বাস থেকে ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের ওপর অযথা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল যে একবার যদি ভ্রান্ত একজন কমরেডকে আক্রমণ করা হয় তাহলেই সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে। ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সময়ে বা তার পরের ভুলগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করে পার্টি মনে করে এর পরের সকল অন্তঃপার্টি সংগ্রামে এই ত্রুটিগুলিকে পরিহার করতে হবে এবং কমরেড মাও সে-তুঙ-এর কর্মনীতিকে দৃঢ়ভাবে কার্যকর করতে হবে। অতীতে ভুল করেছেন এমন একজন কমরেড যখন তাঁর ভুল বুঝতে পারছেন এবং সেগুলিকে সংশোধন করতে আরম্ভ করেছেন, তখন আমরা কোন বিদ্বেষ না রেখেই তাঁকে স্বাগত জানাব এবং পার্টির কাজে তাঁর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াব। যেসব কমরেড এখনো তাঁদের ভুল সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারছেন না এবং ভুলগুলিকে শুদ্ধ করতে

পারছেন না কিন্তু যাঁরা আর ভুলগুলি আঁকড়ে থাকছেন না তাঁদের প্রতিও আমাদের ঐকান্তিক ও কমরেডসুলভ মনোভাব গ্রহণ করতে হবে এবং ঐ ভুলগুলিকে সঠিকভাবে বুঝতে ও সেইগুলিকে সংশোধন করতে তাঁদের আমাদের সাহায্যই করতে হবে। সমগ্র পার্টিই এখন অতীতের ভ্রান্ত লাইনগুলির উপলব্ধির ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। সমগ্র পার্টি-কমরেড মাও সে-তুঙ-এর পরিচালনাধীন কেন্দ্রীয় কমিটির চারিদিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সুতরাং, এখন থেকে সমগ্র পার্টির কাজ হচ্ছে চিন্তাকে পরিচ্ছন্ন করে তুলে ও নীতির প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুগত থেকে বা বর্তমান প্রস্তাবের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের ভাষায় 'সমগ্র পার্টিকে সুসংহত একটি পরিবারের মতে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার জন্য, নিখাঁদ ইস্পাতের মতো মজবুত করে তোলার জন্য, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয় ও চীনের জনগণের পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জন করার জন্য, পার্টির ঐক্যকে জোরদার করে তোলা। পার্টির ইতিহাস সংক্রান্ত সকল প্রশ্নে আমাদের সমগ্র পার্টির যা কিছু বিচার-বিশ্লেষণ, সমালোচনা ও বিতর্ক তা শুরু হওয়া চাই পার্টির ঐক্য প্রতিষ্ঠার ও ঐক্যে উপনীত হওয়ার বাসনা থেকে। এই মূলনীতিটিকে যে-কোনভাবে লংঘন করাই ভুল হবে। যেহেতু পার্টিতে পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সামাজিক উৎস রয়েছে এবং পার্টি বহুকাল ধরে গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘ ও বিক্ষিপ্ত গেরিলা যুদ্ধের পরিবেশে থেকেছে তাই গোঁড়ামি ও অভিজ্ঞতাদের ভাবাদর্শগত ভগ্নাবশেষের অস্তিত্ব এখনো রয়েছে এবং অভিজ্ঞতাবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা এখানে বিশেষভাবেই অপ্রচুর পরিমাণে করা হয়েছে এবং তারই জন্য 'পর্বতকেন্দ্র প্রীতির' মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ণতাবাদের প্রবণতাগুলি এখনো যথেষ্ট ব্যাপক যদিও পার্টিতে গুরুতর রকমের সংকীর্ণতাবাদকে প্রধানতঃ দুর করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে তবু সমগ্র পার্টিকেই এই বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে যে যদি পার্টি পরিপূর্ণ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শগত ঐক্য অর্জন করতে চায় তবে ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণাগুলিকে দুর করে দেওয়ার জন্য দীর্ঘকাল ধরে অবিরাম সংগ্রামের একটি প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। এই সপ্তম বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন তাই এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছে যে সমগ্র পার্টিতেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শগত শিক্ষাকে জোরদার করে তুলতে হবে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে চীন বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে সংযুক্ত করে তোলার ওপর জোর দিতে হবে, যাতে করে কাজকর্মের সঠিক ধারাকে আরও বিকশিত করে তোলা যায় এবং

গোঁড়ামি, অভিজ্ঞতাবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ও 'পর্বতকেন্দ্র প্রীতির' মানসিকতা ইত্যাদি প্রবণতাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দূর করে দেওয়া সম্ভবপর হয়।

(৭)

এই বর্ধিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন জোয়ারের সঙ্গে এ কথা ঘোষণা করতে চায় যে গত চব্বিশ বছরের চীন বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগ এ কথা প্রমাণ করেছে এবং প্রমাণ করেই চলেছে যে কমরেড মাও সে-তুঙ আমাদের পার্টির ও সমগ্র দেশের জনগণের সংগ্রামের যে লাইন উপস্থিত করেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক। বর্তমান প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের পার্টি যে বিরাট বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে এবং আমাদের পার্টি যে নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে তার মধ্য দিয়ে এই লাইনের সঠিকতা সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে সুপ্রমাণিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে চীন বিপ্লবের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বিকাশের, বিরাট বিরাট সাফল্যের ও গত চব্বিশ বছরের আমাদের পার্টির নেতৃত্বে অর্জিত সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার পটভূমিতে দেখলে, পার্টিতে কোন কোন সময়ে যে 'বামপন্থী' ও দক্ষিণপন্থী ভুলগুলি ঘটেছে তা শুধু আংশিক কিছু ব্যাপার মাত্র। পার্টির যেখানে প্রচুর অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে ও রাজনৈতিক চেতনার ঘাটতি রয়েছে এরকম একটা সময়ে এ ধরনের ব্যাপারগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা কঠিন। তা সত্ত্বেও, ঠিক এই সময়েই এই ভুলগুলিকে দূর করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টি দৃঢ়তর ও অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আজ সমগ্র পার্টি অভূতপূর্ব ঐক্যবোধ নিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর লাইনের সঠিকতাকে স্বীকার করে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। কমরেড মাও সে-তুঙ-এর মধ্যে অভিব্যক্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শের প্রকাশ যত বেশি বেশি করে কর্মীদের, পার্টি-সদস্যদের এবং জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করে তুলবে তার ফলে তত বিরাট বিরাট অগ্রগতি নিশ্চিতভাবেই সাধিত হবে এবং পার্টি ও চীন বিপ্লবের শক্তি অপরাজেয় হয়ে উঠবে।

ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির এই বর্ধিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এই দৃঢ় আস্থা পোষণ করে যে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর পরিচালনাধীন কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক নেতৃত্বাধীনে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, উত্তরমুখী অভিযান, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধ ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ—এই তিনটি বিপ্লবী যুদ্ধের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট হয়ে চীনের বিপ্লবকে সুনিশ্চিতভাবেই পরিপূর্ণ বিজয়ের পথে পরিচালিত করে নিয়ে যাবে।

টীকা

১। ১৯২৪ সালে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন কমিউনিস্ট পার্টী ও বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে 'বণিকদের সৈন্যবাহিনীকে' অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে ক্যান্টনে মুৎসুদ্দি ও জমিদারদের যে সশস্ত্র বাহিনী প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল সেই বাহিনীকে পরাজিত করে দেন। কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টীর সহযোগিতার ভিত্তিতে যে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠেছিল ১৯২৫ সালের প্রথম দিকে ক্যান্টনে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সৈন্যবাহিনীই পূর্বমুখী অভিযানে কৃষকদের সমর্থন নিয়ে সংগ্রাম করে এবং যুদ্ধরাজ চেন চিউয়াং-মিং-এর সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে তারপর তা ক্যান্টনে ফিরে এসে য়ুন্নান ও কুয়াংসির যে যুদ্ধবাজরা ওখানে আসন গেড়ে বসেছিল তাদের উচ্ছেদ করে দেয়। ঐ বছর শরৎকালেই তা দ্বিতীয় পূর্বমুখী অভিযান পরিচালনা করে এবং চেন চিউয়াং-মিং-এর সৈন্যবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিহ্ন ক.র দেয়। এইসব অভিযানে কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট ইয়ুথ লীগের সদস্যরা সম্মুখ সারিতে দাঁড়িয়ে বীরের মতো সংগ্রাম করেন এবং কুয়াংতুং প্রদেশের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেন ও উত্তরমুখী অভিযানের রাস্তা প্রস্তুত করে দেন।

২। লো চ্যাঙ-লুং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম দিককার একজন সদস্য; পরে তিনি বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়েন। ১৯৩১ সালে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে চীন বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী লো চ্যাঙ-লুং খোলাখুলি ট্রট্স্কিপন্থী চেন তু-শিউ গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের লাইনের বিরোধী প্রতিবিপ্লবী অবস্থানকে সমর্থন করেন, লালফৌজকে ও লাল ঘাঁটি অঞ্চলকে কুৎসা করেন এবং ইস্তাহার বিলি করে চিয়াং কাই-শেক গোষ্ঠীকে কমিউনিস্ট কমরেডদের নাম জানিয়ে দেন। পার্টি কর্তৃক পরিচালিত বিপ্লবী সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য তিনি তথাকথিত একটি 'আপৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটি', 'দ্বিতীয় প্রাদেশিক কমিটি-গুলি', 'দ্বিতীয় আঞ্চলিক কমিটিগুলি' এবং 'ট্রেড ইউনিয়নসমূহে দ্বিতীয় ফ্র্যাকশন কমিটি' স্থাপন করেন এবং পার্টিতে বিভেদমূলক কাজকর্ম চালান। ১৯৩১ সালের জানুয়ারিতে তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়।

৩। চ্যাঙ কুয়ো-তাও সম্পর্কে জানার জন্য বর্তমান খণ্ডের ৬৬ 'পৃষ্ঠার কাজের ধারা সংশোধন করুন' নামক প্রবন্ধের ৫নং টীকা দেখুন।

৪। ১৯২৭ সালের চীন বিপ্লবের ব্যর্থতার পর চীনে ও কিছু সংখ্যক ট্রট্স্কিপন্থীদের উদ্ভব ঘটে। চেন তু-শিউ চক্রের সঙ্গে ও অন্যান্য দলত্যাগীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তারা ১৯২৯ সালে একটি ক্ষুদ্র প্রতিবিপ্লবী চক্র গড়ে তোলে এবং এই প্রতিবিপ্লবী প্রচার চালায় যে কুওমিনতাঙ ইতিমধ্যেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করে ফেলেছে এবং তারা জনগণের বিরুদ্ধে একটি নোংরা সাম্রাজ্যবাদী-কুওমিনতাঙ হাতিয়ারে পরিণত হয়। চীনা ট্রট্স্কিপন্থীরা নির্লজ্জভাবে কুওমিনতাঙ-এর গোয়েন্দাবাহিনীতে যোগদান করে। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর অপরাধী দলত্যাগী ট্রট্স্কির 'সাম্রাজ্যবাদী জাপান কর্তৃক চীন দখলে বাধা না দেওয়ার' আদেশ অনুসরণ করে তারা জাপানী গোয়েন্দাচক্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শুরু করে, তাদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে শুরু করে এবং জাপানী আক্রমণের সহায়ক সকল প্রকার অপকর্মে লিপ্ত হয়।

৫। দশ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে জানার জন্য 'আমাদেব অধ্যায়ন ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি', বর্তমান খণ্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা, ৫নং টীকা দেখুন।

৬। লালফৌজের প্রথম ফ্রন্ট সৈন্যবাহিনী হুনানের রাজধানী চ্যাংসার বিরুদ্ধে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় আক্রমণ অভিযান শুরু করে। শত্রু পরিখার আড়ালে দাঁড়িয়ে শত্রু বাহিনীর প্রতিরোধের জন্য এবং বিমানবহর ও যুদ্ধ জাহাজের সমর্থন ওদের পেছনে থাকার জন্য দীর্ঘ আক্রমণ পরিচালনা সত্ত্বেও লালফৌজ ঐ শহরটি দখল করতে ব্যর্থ হয়। এর মাঝে শত্রুর নতুন সৈন্যবাহিনী এসে সমবেত হতে শুরু করে এবং অবস্থা লালফৌজের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। কমরেড মাও সে-তুঙ প্রথম ফ্রন্ট সৈন্যবাহিনীর কর্মীদের চ্যাংসা অবরোধকারী সৈন্যবাহিনীকে অপসারণের প্রয়োজন বোঝাতে শুরু করেন এবং তারপর তাদের উত্তর কিয়াংসির গুরুত্বপূর্ণ মূল একটি শহর কিউ-কিয়াং অবরোধের এবং অন্যান্য বড় বড় শহর আক্রমণের তাদের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে তাদের রাজী করান ও তাদের নীতি পরিবর্তন করে, তাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করে নিতে বলেন এবং হুনানের চালিং, যুসিয়েন ও লিলিং বিভাগ এবং কিয়াংসির পিং সিয়াং ও কিয়ান বিভাগগুলি দখল করে নিতে পরামর্শ দেন। এর ফলে প্রথম ফ্রন্ট বাহিনীর পক্ষে বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হওয়া সম্ভবপর হয়।

৭। কমরেড চু চিউ-পাই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একবারে প্রথম দিককার অন্যতম একজন পার্টি-সদস্য ও একজন নেতা; ১৯২৩ থেকে ১৯২৮

সাল পর্যন্ত পার্টির তৃতীয়, চতুর্থ, ও ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন। প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় তিনি সক্রিয়ভাবে কমিউনিস্ট-বিরোধী, জন-বিরোধী কুওমিনতাঙ দক্ষিণপন্থীদের 'তাই চিং-তাও তত্ত্বের' বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করেন এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে চেন তু-শিউর মাধ্যমে অভিব্যক্ত দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। ১৯২৭ সালে বিপ্লবের প্রতি কুওমিনতাঙ-এর বিশ্বাসঘাতকতার পর তিনি ৭ই আগস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি জরুরী সভা আহ্বান করেন এবং ঐ সভা পার্টিতে চেন তু-শিউবাদের আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটায়। কিন্তু ১৯২৭ সালের শীতকাল থেকে ১৯২৮ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থা পরিচালনাকালে তিনি জোর করে এগিয়ে চলার 'বামপন্থী' ভুলটি করেন। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন পরিচালনা করেন; এই অধিবেশন পার্টির পক্ষে ক্ষতিকর লি লি-সান লাইনের সমাপ্তি ঘটায়। ১৯৩১ সালের জানুয়ারীতে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কিন্তু 'বামপন্থী' গোঁড়া ও উপদলীয় লোকেরা তাঁকেই আক্রমণ করে এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থা থেকে তাঁকে বিতাড়িত করে দেয়। ঐ সময় থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত লু সুন-এর সহযোগিতায় সাংহাইয়ে বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি কাজ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কিয়াংসির লাল ঘাঁটি এলাকায় এসে পৌঁছান এবং শ্রমিক ও কৃষকদের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় সরকারের গণশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। লালফৌজের মূলবাহিনীর লং মার্চ শুরু করার পর তাকে কিয়াংসি ঘাঁটি এলাকায় থেকে যেতে বলা হয়। ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে চু চিউ-পাই ফুকিয়েনের গেরিলা অঞ্চলে চিয়াং কাই-শেকের দস্যুবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং ১৮ই জুন ফুকিয়েন প্রদেশের চ্যাঙতিং-এ তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

৮। কমরেড লিন য়ু-নান ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম দিককার একজন সদস্য ও পার্টি নেতা এবং চীনের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রথম দিককার একজন সংগঠক। চীনের ট্রেড ইউনিয়নের সম্পাদকমণ্ডলীর উহানের অফিসের পরিচালক, কর্মপরিষদের সদস্য এবং একই সঙ্গে নিখিল চীন ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন-এর তিনি সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। ১৯৩১ সালে চিয়াং-এর দস্যুবাহিনী তাঁকে সাংহাইয়ে গ্রেপ্তার করে এবং সাংহাই-এর

লুংহুয়াতে তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

৯। কমরেড লি চিউ-শী ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য; ১৯২৮ সালে তিনি চীনের কমিউনিস্ট ইয়ুথ লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন ও প্রচার দপ্তরের প্রধান ছিলেন এবং **চাইনিজ ইয়ুথ** পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩১ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার দপ্তরের কাজে লিপ্ত থাকার সময় চিয়াং কাই-শেকের দস্যুবাহিনীর হাতে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং লুংহুয়াতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

১০। কমরেড হো মেং-শিয়াং ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য এবং উত্তর চীনের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রথম দিককার একজন সংগঠক এবং পিকিং সুইয়ুয়ান রেলপথের রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন-এর অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙ দল বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর তিনি সাংহাইস্থ কমিউনিস্ট পার্টির কিয়াংসু প্রাদেশিক কমিটির একজন সদস্য ও কৃষক দপ্তরের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি চিয়াং কাই-শেকের দস্যুবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন এবং লুংহুয়াতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

১১। কমরেড চিন প্যাং-সিয়েন 'পো-কু' নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি সাংহাইয়ে পার্টির প্রথম অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রধান এবং তারপর লাল ঘাঁটি অঞ্চলের কেন্দ্রীয় ব্যুরোর প্রধান ছিলেন। এই সময়ে তিনি 'বামপন্থী' লাইনের গুরুতর ভুলগুলি করেন। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম দিকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দক্ষিণাঞ্চলীয় ব্যুরোতে তিনি কাজ করেন। ১৯৪১ সালের পর কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে তিনি ইয়েনানে **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকা এবং নয়াচীন সংবাদ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। ১৯৪৫ সালের পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে পুনর্নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে কুওমিনতাঙ-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি চুংকিং যান। ইয়েনানে ফিরে আসার পথে এপ্রিলে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

১২। কমরেড চু লি-চি 'বামপন্থী' ভুল করেছিলেন; তিনি ১৯৩৫ সালের শরৎকালে (শেনসি-কানসু সীমান্ত অঞ্চল ও উত্তর শেনসি নিয়ে

গঠিত) উত্তর শেনসির বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় নেতৃস্থানীয় সংস্থার একজন সদস্য হিসেবে এসে পৌঁছান। তিনি ওখানে অবস্থানকারী এবং 'বামপন্থী' ভুল পথ অনুসরণকারী কমরেড কুয়ো হাঙ-তাও-এর সঙ্গে সহযোগিতা করে রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী লাইনটি কার্যকর করেন এবং সঠিক লাইন অনুসরণকারী এবং ওখানে যাঁরা লালফৌজ গড়ে তুলেছিলেন ও উত্তর শেনসির বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলেছিলেন সেই লিউ চি-তান ও অন্যান্য কমরেডদের ঠেলে বের করে দেন। তারপর প্রতিবিপ্লবীদের দমন করার কাজে তাঁরা গুরুতর ভুল করেন এবং সঠিক লাইন অনুসরণকারী বহু সংখ্যক কর্মীদের গ্রেপ্তার করেন এবং এভাবে উত্তর শেনসির বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় এক গুরুতর সংকটের সৃষ্টি করেন। ১৯৩৫ সালের নভেম্বরে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব লং মার্চের শেষে উত্তর শেনসিতে এসে উপনীত হন এবং এই 'বামপন্থী' ভুলগুলি সংশোধন করেন এবং লিউ চি-তান ও অন্যান্য কমরেডদের জেল থেকে মুক্ত করেন এবং উত্তর শেনসির বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলকে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেন।

১৩। জে. ভি. স্তালিন : 'চীন বিপ্লবের সমস্যাবলী' এবং 'চীনের বিপ্লব ও কমিনটার্নের কর্তব্য' (**রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ৯ম খণ্ড, দ্রষ্টব্য) ; এবং 'চীনের বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ,' (**রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, অষ্টম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

১৪। 'হুনানের কৃষক-আন্দোলনের অনুসন্ধান সম্পর্কিত রিপোর্ট', **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৫। 'চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রাম', **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৬। ১৯২৯ সালের এপ্রিলে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে চিংকাং পাহাড়ের ফ্রন্ট কমিটির চিঠি থেকে গৃহীত এবং 'একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে' নামক রচনায় উধৃত। **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৭। 'চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিঁকে থাকতে পারে ?' এবং 'চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রাম', **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৮। ১৯৩৬ সালের জানুয়ারি মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একটি ঘোষণায় বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল ও লালফৌজকে আক্রমণকারী কুওমিনতাঙ-এর সকল সৈন্যবাহিনীর কাছে তিনটি শর্তে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তাব করে: (১) বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল ও লালফৌজকে আক্রমণ করা বন্ধ করতে হবে; (২) জনগণকে স্বাধীনতা ও অধিকার দিতে হবে; এবং (৩) জনগণকে সশস্ত্র করে তুলতে হবে।

১৯। ১৯৩৪ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক উপস্থাপিত এবং সুং চিং লিং (মাদাম সান ইয়াৎ-সেন) ও অন্যান্যদের স্বাক্ষরিত হয়ে প্রকাশিত 'চীনের জনগণের জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মৌলিক কর্মসূচীতে ছয়টি শর্তের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে: (১) সমস্ত স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীকে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমবেত কর; (২) সারা দেশের জনগণকে সমবেত কর; (৩) সমস্ত জনগণকে অস্ত্রসজ্জিত কর; (৪) চীনে জাপানী সাম্রাজ্যবাদী-দের ও বিশ্বাসঘাতকদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহ কর; (৫) জাতীয় সশস্ত্র প্রতিরক্ষার জন্য নিখিল চীন কমিটি শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে তোল; এবং (৬) জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধী সকল শক্তির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন প্রতিষ্ঠা কর এবং যে সকল দেশ সহৃদয় নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করছে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোল।

২০। জে. ভি. স্তালিন: 'চীনের বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ', **রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, অষ্টম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২১। 'চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিকে থাকতে পারে?' এবং 'একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে', **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২২। 'চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিকে থাকতে পারে?', **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২৩। 'একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে', **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২৪। জে. ভি. স্তালিন: 'লেনিনবাদের ভিত্তি'; **রচনাবলী**, বাংলা

সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ষষ্ঠ খণ্ড, এবং 'সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে কিছু বক্তব্য', **রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, নবম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২৫। 'চিংকাং পাহাড়ে সংগ্রাম', মাও সে-তুঙ-এর **নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২৬। ঐ।

২৭। ঐ।

২৮। ১৯২৯ সালের এপ্রিলে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লিখিত চিংকাং পাহাড় ফ্রন্ট কমিটির চিঠি থেকে গৃহীত এবং 'একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে' নামক রচনায় উধৃত। মাও সে-তুঙ-এর **নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২৯। 'শত্রুর পঞ্চম অবরোধ ও দমনমূলক অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রসঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ প্রস্তাব' (সুনাইতে অনুষ্ঠিত সভার প্রস্তাব) থেকে।

৩০। 'চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা', মাও সে-তুঙ-এর **নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড।

৩১। 'কর্মনীতি সম্পর্কে', মাও সে-তুঙ-এর **নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, দ্বিতীয় খণ্ড।

৩২। লিউ শাও-চি: 'রুদ্ধদ্বার-নীতি এবং হঠকারিতার অবসান করুন।

৩৩। লিউ-শাও-চির 'শ্বেত এলাকার অতীত কাজকর্ম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে চিঠি থেকে।

৩৪। লিউ শাও-চি: 'রুদ্ধদ্বার-নীতি এবং হঠকারিতার অবসান করুন।'

৩৫। লো মিং ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রাক্তন সদস্য। ১৯৩৩ সালে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় ঘাঁটি অঞ্চলের ফুকিয়েন প্রাদেশিক কমিটির অস্থায়ী সম্পাদক। তিনি বলেছিলেন, যেহেতু পার্টি শাংহাং, য়ুংতিং ও পশ্চিম ফুকিয়েনের সীমান্তভাগে অবস্থিত এলাকায় অনেকটা কঠিন একটি পরিস্থিতির মুখে পড়েছে ওখানে পার্টির নীতি সুদৃঢ় ঘাঁটি অঞ্চলের নীতির চেয়ে স্বতন্ত্র হওয়া দরকার—এই অভিমতের জন্য 'বামপন্থীরা' তাকে আক্রমণ করে। 'বামপন্থীরা' ভুলভাবে ও অতিরিক্তভাবে বাড়িয়ে তার অভিমতকে 'বিপ্লব সম্পর্কে

নৈরাশ্য ও হতাশা থেকে জাত সুবিধাবাদী-বিলুপ্তিবাদী পলায়ন ও পশ্চাদপসরণের একটি লাইন বলে অভিহিত করে এবং সাংগঠনিকভাবে তথাকথিত 'লো স্লিং লাইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম' পরিচালনা করেন।

৩৬। নিয়মানুবর্তিতার তিনটি মূল নিয়ম এবং মনোযোগের আটটি বিষয় কমরেড মাও সে-তুঙ কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের সময়ই চীনের শ্রমিক ও কৃষকদের লাল-ফৌজের জন্য প্রণয়ন করেছিলেন এবং পরে তা অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং বর্তমান গণমুক্তি ফৌজের শৃংখলার বিধি হিসেবে গৃহীত হয়। যেহেতু বিভিন্ন অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলির ক্ষেত্রে এই বিধিগুলির বিষয়বস্তুর সামান্য পরিবর্তন লক্ষিত হতো তাই চীনে গণমুক্তি ফৌজের জেনারেল হেডকোয়ার্টার ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে নিম্নলিখিত বয়ানটি প্রকাশ করে:

নিয়মানুবর্তিতার তিনটি মূল নিয়ম:

(১) আপনার সকল কাজে আদেশ মান্য করুন।

(২) জনসাধারণের কাছ থেকে একটি সুঁচ বা একটুকরো সুতোও নেবেন না।

(৩) অধিকৃত প্রতিটি জিনিস জমা দিন।

মনোযোগের আটটি বিষয়:

(১) ভদ্রভাবে কথা বলুন।

(২) কোন জিনিস কিনলে তার উপযুক্ত দাম মিটিয়ে দিন।

(৩) কোন কিছু ধার করলে তা সবই ফিরিয়ে দেবেন।

(৪) কোন কিছু নষ্ট করে ফেললে তার দাম মিটিয়ে দিন।

(৫) জনগণকে আঘাত করবেন না বা গালমন্দ দেবেন না।

(৬) ফসলের ক্ষতি করবেন না।

(৭) স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে কোন সুযোগ নেবেন না।

(৮) বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করবেন না।

৩৭। ১৯২৯ সালের এপ্রিলে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লিখিত চিং-কাং পাহাড় ফ্রন্ট কমিটির চিঠি থেকে গৃহীত এবং 'একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে' নামক রচনায় উধৃত। **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড।

৩৮। 'চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা', **মাও সে-তুঙ-এর**

নির্বাচিত রচনাবলী, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড।

৩৯। 'শত্রুর পঞ্চম "অবরোধ ও দমন" অভিযানকে ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ' থেকে; ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫।

৪০। ১৯২৯ সালে চতুর্থ লালফৌজের নবম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাব বলতে 'পার্টির ভিতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে' প্রবন্ধটির কথা বোঝানো হচ্ছে; **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড।

৪১। ভি. আই. লেনিন: 'কী করতে হবে?', **সংকলিত রচনাবলী**; ইংরেজী সংস্করণ, বিদেশীভাষা প্রকাশন সংস্থা, পঞ্চম খণ্ড।

৪২। জে. ভি. স্তালিন: 'কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত যুক্ত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কাজকর্ম', **রচনাবলী**, ইংরেজী সংস্করণ, বিদেশীভাষা প্রকাশনা সংস্থা, মস্কো, ১৯৫৪, একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৩৯।

৪৩। 'আমাদের অধ্যয়ন এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতি', বর্তমান খণ্ডের ২০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪৪। ব্ল্যাঙ্কিবাদ হচ্ছে ফ্রান্সে অগাস্তে ব্ল্যাঙ্কি (১৮০৫-১৮৮১ খ্রীঃ) কর্তৃক অভিব্যক্ত বৈপ্লবিক হঠকারিতার মতাদর্শ। ব্ল্যাঙ্কিপন্থীরা শ্রেণী-সংগ্রামকে অস্বীকার করত, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নয় মুষ্টিমেয় কিছু বুদ্ধিজীবীদের ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে মানবজাতি পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাবে বলে তারা কল্পনা করত।

৪৫। 'পর্বতকেন্দ্র প্রীতির' মানসিকতার জন্য 'আমাদের অধ্যয়ন এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতি', বর্তমান খণ্ডের ২২৫ পৃষ্ঠার ৮নং টীকা দেখুন।

৪৬। ঐ।

জনগণের সেবা করুন

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী হচ্ছে বিপ্লবী বাহিনী। আমাদের এই বাহিনী সম্পূর্ণরূপে জনগণের মুক্তির জন্য এবং পুরোপুরি জনগণের স্বার্থের জন্য কাজ করে। কমরেড চ্যাং জু-তে[১] ছিলেন এই বাহিনীরই অন্যতম কমরেড।

মানুষের মৃত্যু অবশ্যই হয়, কিন্তু মৃত্যুর তাৎপর্য ভিন্ন রকম হতে পারে। প্রাচীন চীনের স্জুমা ছিয়েন নামক একজন লেখক বলেছিলেন, 'মানুষের মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু তা থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী বা পাখির একটি পালকের চেয়েও হাল্কা হতে পারে।'[২] জনগণের জন্য যিনি মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর মৃত্যু থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী; কিন্তু যে লোক ফ্যাসিষ্টদের জন্য খাটে বা জনগণের শোষণকারী ও অত্যাচারীদের জন্য মরে তার মৃত্যু পাখির পালকের চেয়েও হাল্কা। কমরেড চ্যাং জু-তে জনগণের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, তাই তাঁর মৃত্যু থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী।

আমরা জনগণের সেবা করি, তাই আমাদের কোন ত্রুটি থাকলে তা দেখিয়ে দিয়ে কোন ব্যক্তি আমাদের সমালোচনা করলে আমরা তাতে ভয় করি না। যিনিই হোন না কেন সকলেই আমাদের ত্রুটি দেখিয়ে দিতে পারেন। যদি তাঁর কথা ঠিক হয়, তাহলে আমরা তা শুধরে নেব। তিনি যা প্রস্তাব করবেন তাতে যদি জনগণের উপকার হয় তবে আমরা তাঁর প্রস্তাব অনুসারেই কাজ করব। 'উন্নততর সৈন্য এবং সহজতর প্রশাসন' এই মত পেশ করেছিলেন মিঃ লি তিং-মিং[৩]; তিনি একজন কমিউনিস্ট নন। তিনি ভাল এবং জনগণের পক্ষে হিতকর একটি প্রস্তাবই দিয়েছিলেন এবং আমরা তা গ্রহণ করেছি। যা ভাল তা জনগণের স্বার্থে যদি আমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরি এবং যা ভুল তা জনগণের স্বার্থে যদি আমরা সংশোধন করি, তাহলে আমাদের এই বাহিনী অবশ্যই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে।

সরাসরি চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ দপ্তরগুলি কর্তৃক আহূত কমরেড চ্যাং জু-তের স্মৃতিসভায় কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতাটি করেন।

দেশের সকল অংশ থেকে আমরা এসেছি এবং একই সাধারণ বিপ্লবী লক্ষ্য নিয়ে একত্র মিলিত হয়েছি আর সমগ্র দেশের বিপুল সংখ্যাধিক জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই লক্ষ্যের পথে আমাদের এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আজ ইতিমধ্যেই আমরা নয় কোটি দশ লক্ষ জনসংখ্যাবিশিষ্ট ঘাঁটি এলাকার নেতৃত্ব করছি[৪], কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়; একে আরও আরও বিস্তৃত করা উচিত, তাহলেই আমরা সমগ্র জাতির মুক্তি অর্জন করতে পারব। দুঃখকষ্টের সময়ে আমাদের সাফল্যগুলিকে ভুলে থাকলে চলবে না, আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকেও দেখতে হবে এবং আমাদের সাহসকে বাড়িয়ে যেতে হবে। চীনের জনগণ দুঃখ কষ্ট ভোগ করছেন, তাঁদের বাঁচানো আমাদের কর্তব্য এবং তাই তৎপরতা সহকারে আমাদের কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। সংগ্রাম হলে বলিদান অনিবার্য, মৃত্যু সাধারণ ঘটনা মাত্র। কিন্তু আমরা যদি জনগণের স্বার্থ এবং ব্যাপক সংখ্যাধিক জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা মনে রেখে জনগণের জন্য মৃত্যু বরণ করি, তাহলে আমাদের মৃত্যু সার্থক হবে। তবে অনাবশ্যক প্রাণদান পরিহার করার জন্য আমাদের যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত। আমাদের কর্মীদের প্রত্যেকটি সৈনিকের প্রতি যত্নবান হতে হবে, বিপ্লবী বাহিনীর সমস্ত লোককেই পরস্পরের যত্ন নিতে হবে, পরস্পরকে ভালবাসতে হবে এবং সাহায্য করতে হবে।

এখন থেকে আমাদের বাহিনীতে যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তিনি একজন পাচক বা সৈনিক যাই হোন না কেন, যদি তিনি কিছুটা হিতকর কাজ করে থাকেন তবে তাঁর সম্মানার্থে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শোকসভার আয়োজন আমাদের করতে হবে। এটা একটা নিয়ম হওয়া উচিত। জনসাধারণের মধ্যেও এটার প্রচলনকরা উচিত। কোন গ্রামে যখন কেউ মারা যাবেন তখন একটি শোকসভার আয়োজন করা হোক। এভাবে মৃতের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের শোক প্রকাশ করতে পারব এবং সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারব।

টীকা

১। কমরেড চ্যাং জু তে ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রহরী বাহিনীর একজন সৈনিক। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এই কমরেড আনুগত্য সহকারে জনগণের সেবা করে গেছেন। তিনি ১৯৩৩ সালে বিপ্লবে

যোগদান করেন; তিনি লং মার্চে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কর্মরত অবস্থায় আহত হন। উত্তর শেনসির আনসাই জেলার পাহাড়ে কাঠকয়লা তৈরী করার সময় ১৯৪৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর আকস্মিক একটি পাথর চাপা পড়ে তিনি নিহত হন।

২। সজুমা ছিয়েন ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর চীনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি **হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস্** নামক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। বর্তমান উধৃতিটি নেওয়া হয়েছে 'জেন শাও-চিং-এর পত্রের জবাব' নামক তাঁর রচনা থেকে।

৩। লি তিং মিং উত্তর শেনসি প্রদেশের একজন আলোকপ্রাপ্ত জমিদার। একটা সময়ে তিনি শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সরকারের উপ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৪। এই ছিল ঐ সময়ে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের এবং উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ চীনের অন্য সকল মুক্ত অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা।

দুই-দশ উৎসব উপলক্ষে চিয়াং কাই-শেকের বক্তৃতা প্রসঙ্গে

১১ই অক্টোবর, ১৯৪৪

দুই-দশ[১] উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত চিয়াং কাই-শেকের বক্তৃতার অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার চূড়ান্ত অন্তঃসারশূন্যতা এবং জনগণ যেসব প্রশ্ন নিয়ে গভীরভাবে বিচলিত সেইসব কোন প্রশ্নেরই উত্তর দানে নিতান্ত অক্ষমতা। চিয়াং কাই-শেক বলেছেন, শত্রুকে ভয় করার কিছু নেই কেননা এখন মহান পশ্চাদবর্তী এলাকায় বিশাল অঞ্চল রয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত স্বৈরাচারী কুওমিনতাঙ নেতারা রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্তনের বা শত্রুকে পরাভূত করার কোন বাসনা বা ক্ষমতাই প্রদর্শন করেননি এবং শত্রুকে প্রতিরোধের জন্য ভৌগোলিক অঞ্চলই হচ্ছে তাদের একমাত্র মূলধন'। কিন্তু সকলের কাছেই এটা অত্যন্ত সহজ-সরল যে সঠিক নীতি ছাড়া এবং মানুষের চেষ্টা ছাড়া শুধু এই মূলধনই যথেষ্ট নয়, কারণ জাপানী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিদিনই অবশিষ্ট অঞ্চলকে বিপন্ন করে চলেছে। এটা খুবই সম্ভব যে চিয়াং কাই-শেক এই বিপদ সম্পর্কে তীব্রভাবে বুঝতে পারছেন কারণ এই তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে তিনি বারেবারে জনসাধারণকে এই যে আশ্বাস দিয়ে আসছিলেন যে 'ওরকম কোন বিপদই নেই এমনকি এই কথাই বলেছিলেন যে, 'ওয়ামপোয়া মিলিটারী একাডেমিতে[২] সৈন্যবাহিনী আমি যখন প্রতিষ্ঠা করি তার পরের কুড়ি বছরে বিপ্লবী পরিস্থিতি আজকের মতো আর কোন সময়ই এত মজবুত ছিল না।' তিনি অবিরাম বলেই চলেছেন, 'আমাদের আত্মবিশ্বাস হারালে চলবে না' যার আসল নির্গলিতার্থ হচ্ছে কুওমিনতাঙ-এর সভ্য-সাধারণের বহুজনের মধ্যে এবং কুওমিনতাঙ ঘাঁটি অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই বিশ্বাসে ভাটা দেখা দিয়েছে। চিয়াং চারিদিকে হাত-পা ছুঁড়ে যেনতেন প্রকারে এই বিশ্বাসটাকেই চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা-চরিত্র করছেন। কিন্তু এরকম কোন পথের সন্ধান রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ও কার্যকলাপ যাচাই করে

নয়া চীন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের জন্য এই সংবাদ-ভাষ্যটি কমরেড মাও সে-তুঙ লিখেছিলেন।

বের করার পরিবর্তে তিনি সমালোচনাকে প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন এবং তার ভুলগুলিকে রং চড়িয়ে চালিয়েই যাচ্ছেন। তিনি বলছেন 'বিদেশী পর্যবেক্ষকেরা 'বিষয়টির মূল সম্পর্কেই অজ্ঞ' এবং 'আমাদের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিদেশী সমালোচনার বহর আক্রমণকারী ও তাদের চীনা সহযোগীদের প্রচারিত গুজব ও ছলাকলাকে' সরল বিশ্বাসে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করারই পরিণাম। অথচ খুবই কৌতুকের বিষয় হচ্ছে এই যে ফ্রাঙ্কলিন ডি: রুজভেল্ট এবং কুওমিনতাঙ-এরই সুং চিং লিং-এর মতো সদস্যবৃন্দ, জনগণের রাজনৈতিক পর্যদের বহু সদস্য এবং বিবেক বিসর্জন দেননি এমন সকল চীনাবাসীই চিয়াং কাই-শেকের ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের উপস্থাপিত এই আপাতমধুর ব্যাখ্যাকে অবিশ্বাস করছেন এবং তাঁরাও 'আমাদের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সমালোচনার বহর' ছড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। চিয়াং কাই-শেক বিরক্ত হয়েছেন কিন্তু এই বছরের দুই-দশ উৎসবের আগে তিনি এই যাকে বলেছেন যোক্ষম যুক্তি তা আবিষ্কার করে উঠতে পারেননি, তা হচ্ছে, এই লোকজনেরা 'আক্রমণকারী ও তাদের চীনা সহযোগীদের প্রচারিত গুজব ও ছলাকলাকে' বিশ্বাস করে বসেছেন। তাই তাঁর বক্তৃতায় চিয়াং কাই-শেক তীব্র ভাষায় বিস্তারিতভাবে 'আক্রমণকারী ও তাদের চীনা সহযোগীদের প্রচারিত গুজব ও ছলাকলার' বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপন করেছেন। তিনি আপন মনে ভাবছেন যে এই নিন্দা জ্ঞাপনের পর তিনি সকল চীনা ও বিদেশীদেরই মুখ বন্ধ করে দিতে পারবেন। আর তার পরও যদি কেউ আবার তার সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে 'সমালোচনার বহর' শুরু করেন তবে বুঝতে হবে তিনি হচ্ছেন 'আক্রমণকারী ও তাদের চীনা সহযোগীদের প্রচারিত গুজব ও ছলাকলায়' বিশ্বাসী। আমরা চিয়াং কাই-শেকের এই অভিযোগকে চূড়ান্ত হাস্যকর বলেই মনে করি। কারণ আক্রমণকারীরা এবং তাদের চীনা সহযোগীরা কুওমিনতাঙকে তার স্বৈরতন্ত্র, তার দায়সারাভাবে যুদ্ধ পরিচালনা, তার দুর্নীতি ও অপদার্থতার জন্য, তার ফ্যাসিবাদী হুকুমনামা ও তার সরকারের পরাজয়বাদী সামরিক আদেশাবলীর জন্য কোন সময়ই সমালোচনা করেননি এবং উল্টোদিকে উচ্চ প্রশংসাই জ্ঞাপন করেছে। চিয়াং কাই শেকের **চীনের ভবিষ্যৎ** বইখানিকে সাধারণভাবে অপছন্দ করা হলেও তা জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট থেকে ঐকান্তিক ও অবিরাম প্রশংসাই অর্জন করেছে। আক্রমণকারীরা ও তাদের চীনা

সহযোগীরা জাতীয় সরকারের এবং তার সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলীর পুনর্গঠন সম্পর্কে একটি কথাও কোনকালে বলেনি কারণ এই যে সরকার ও সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলী জনগণকে নিপীড়ন করে চলেছে এবং যুদ্ধের পর যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে চলেছে তা বজায় থাকুক, এই তো তাদের একান্ত বাসনা। এটা কি একটি বাস্তব সত্য নয় যে চিয়াং কাই শেক ও তার গ্রুপটি সব সময়ই আত্মসমর্পণের জন্য জাপানী প্রলোভনের একটি লক্ষ্যবস্তু হয়ে রয়েছে? এটাও কি একটি বাস্তব সত্য নয় যে প্রথমে যে দুটি শ্লোগান জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা হাজির করেছিল তার মধ্যে একটি, অর্থাৎ 'কুওমিনতাঙকে ধ্বংস কর!' এই শ্লোগানটি বহু আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে এবং শুধু অন্যটি, অর্থাৎ 'কমিউনিস্টদের বিরোধিতা কর! এই শ্লোগানটিই বহাল রয়েছে? এই মুহূর্ত পর্যন্ত জাপানী সাম্রাজ্য-বাদীরা কুওমিনতাঙ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি এবং তারা বলছে জাপান ও কুওমিনতাঙ সরকারের মধ্যে কোন যুদ্ধাবস্থা বর্তমান নেই! এই মুহূর্ত পর্যন্ত আক্রমণকারীরা ও তাদের চীনা সহযোগীরা সাংহাই নানকিং, নিংপো প্রভৃতি স্থানের কুওমিনতাঙ হোমরাচোমরাদের সম্পত্তিকে অতি যত্নে পাহারা দিয়ে রেখেছে। শত্রুপক্ষের দলপতি সুনরোকু হাতা তার প্রতিনিধি-দের ফেংহুয়াতে চিয়াং কাই-শেকের পূর্বপুরুষদের স্মৃতিমন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছে। সাংহাই এবং অন্যত্র চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বস্ত অনু-গামীদের প্রেরিত গোপন দূতেরা জাপানী আক্রমণকারীদের সঙ্গে প্রায় অবিরাম যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছে ও সংগোপনে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে। জাপানীরা যখন তাদের আক্রমণ জোরদার করে তখনই এইসব যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনা খুবই বেড়ে যায়। এসব কি বাস্তব সত্য নয়? যারা চিয়াং কাই-শেক ও তাঁর গোষ্ঠীর সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে 'সমালোচনার বহর' চালাচ্ছেন তাঁরা 'বিষয়টির মূল সম্পর্কে অজ্ঞ', না উল্টে, তাঁরা এ সম্পর্কে বিশেষভাবেই তথ্যাভিজ্ঞ? যাই হোক 'বিষয়টির' মূলকে' কোথায় পাওয়া যাবে, 'আক্রমণকারীগণ ও তাদের চীনা সহযোগীদের প্রচারিত গুজব ও ছলাকলার' মধ্যে, না চিয়াং কাই-শেক ও তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে?

তাঁর বক্তৃতায় অন্য একটি বিবৃতিতে চিয়াং কাই-শেক চীনে গৃহযুদ্ধ বাধবে একথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি যোগ করে দিয়েছেন, 'নিশ্চয়ই এরপর আর কেউই ওয়াং চিং-ওয়েই ও অন্যান্যদের মতো সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে

আবার বিদ্রোহ করতে এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করতে দুঃসাহস করবে না।' এখানে চিয়াং কাই-শেক গৃহযুদ্ধের একটি অজুহাত খুঁজছেন এবং আসলে দেখা যাচ্ছে একটি অজুহাত পেয়েও গেছেন। চীনাদের মধ্যে যাঁরই স্মৃতিশক্তি একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি তাঁর মনে পড়বে ১৯৪১ সালে এই সময়টিতেই চীনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকেরা নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে ভেঙে দেওয়ার হুকুম জারী করছিল এবং চীনের জনগণ যখন গৃহযুদ্ধের সংকটকে পরিহার করার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল তখন চিয়াং কাই-শেক একটি বক্তৃতা করে বলেছিলেন যে 'কমিউনিস্টদের দমন করার জন্য' কোন সময়ই যুদ্ধ করা হবে না এবং যদি যুদ্ধ করতেই হয় তবে তা হবে বিদ্রোহীদের দমনের জন্য একটি শাস্তিমূলক অভিযান মাত্র। যাঁরা চীনের ভবিষ্যৎ পড়েছেন তাঁদেরই মনে পড়বে চিয়াং কাই-শেকের সেই মন্তব্যটি, যেখানে তিনি বলেছিলেন উহানের সরকারের যুগে ১৯২৭ সালের সময়ই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ওয়াং চিং-ওয়েই এর সঙ্গে 'দল পাকিয়েছিল।' কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রস্তাবে ১৯৪৩ সালেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির গায়ে 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত- সৃষ্টি করার ও রাষ্ট্রকে বিপন্ন করার' আটটি শব্দের একটি লেবেল এঁটে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর বর্তমান বক্তৃতা পড়ে মনে হবে গৃহযুদ্ধ যে বেধে গেছে তাই নয়, তা আসলে বেশ জোরেই এগিয়ে চলেছে। এখন থেকে চীনা জনগণকে খুব স্পষ্ট করে এ কথা মনে রাখতে হবে, যে-কোন দিনই চিয়াং কাই-শেক তথাকথিত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযানের হুকুমজারী করে দিতে পারেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে তারা সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে,' 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করছে' এবং 'ওয়াং চিং-ওয়েই ও অন্যান্যরা যা করেছে' তারাও তাই করছে। এই খেলায় চিয়াং বেশ চৌকশ খেলোয়াড় ; তিনি প্যাঙ পিং-স্থন, সান লিয়াং-চেং ও চেন শিয়াও-চিয়াং প্রভৃতি লোককে বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করতে বা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান প্রেরণ করতে একেবারেই পারেন না কিন্তু মধ্য চীনে নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী ও শানসির প্রাণ-কবুল-করা বাহিনীটিকে[৪] 'বিদ্রোহী' অপবাদে আখ্যায়িত করে দিতে খুবই ওস্তাদ এবং তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান প্রেরণ করতে তিনি বিশেষভাবেই পারদর্শী। চীনের জনগণকে ভুলে গেলে চলবে না, যখন তিনি বলছেন যে তিনি গৃহযুদ্ধ লড়বেন না, তার আগেই চিয়াং কাই-শেক ৭, ৭৫,০০০ জন সৈন্যকে বিশেষভাবে

দায়িত্ব দিয়ে অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং দক্ষিণ চীনে জনগণের গেরিলা বাহিনীকে ঘেরাও করে রাখার জন্য বা আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করেছেন।

চিয়াং কাই-শেকের বক্তৃতায় দেখার মতো ইতিবাচক কোন কিছুই নেই এবং জাপ-বিরোধী ফ্রন্টকে শক্তিশালী করার চীনা জনগণের আকুল আগ্রহকে মেটাবার মতো কিছুই তিনি করেননি। নেতিবাচক দিক থেকে তাঁর বক্তৃতা বিপজ্জনক সম্ভাব্য পরিণতিতে ভরা। তাঁর মনোভাব ক্রমেই বেশি বেশি করে গোলমেলে হয়ে উঠছে, রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য জনগণের দাবির বিরুদ্ধে তাঁর কট্টর প্রতিরোধ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর সুতীব্র ঘৃণা এবং কমিউনিস্ট বিরোধী গৃহযুদ্ধের জন্য তাঁর প্রস্তুতির অজুহাতের প্রতি ইঙ্গিত থেকেই তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু এই চক্রান্তের কোনটিতেই তিনি সফল হবেন না। তিনি যদি তাঁর গতিবিধি সংশোধন না করেন, তাহলে যে পাথরটি তিনি তুলছেন তা তাঁর পায়েই পড়বে এবং তাঁর আঙ্গুলগুলিকেই একেবারে থেতলে দেবে। আমরা একান্তভাবেই আশা করি তিনি তাঁর গতিবিধি পরিবর্তন করবেন কারণ তাঁর বর্তমান কাজকর্মের গতিধারা তাঁকে আদৌ কোন মঙ্গলের পথে নিয়ে যাবে না। যেহেতু তিনি ঘোষণা করেছেন যে অভিমত ব্যক্ত করার ব্যাপারে অধিকতর সুযোগ দেওয়া হবে'[৫] তাই 'আক্রমণকারী ও তাদের চীনা সহযোগীদের প্রচারিত গুজব ও ছলাকলা' স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে চলেছেন এই মিথ্যা অপবাদ দিয়ে জনগণের 'সমালোচনার বহরকে' কণ্ঠরুদ্ধ করার ভয়ভীতি দেখানো তাঁর পক্ষে উচিত হবে না। যেহেতু তিনি ঘোষণা করেছেন 'রাজনৈতিক অভিভাবকত্বের অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত করা হবে', তাই সরকার ও তাঁর সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলী পুনর্গঠনের দাবি প্রত্যাখ্যান করা তাঁর পক্ষে উচিত কাজ হবে না। যেহেতু তিনি ঘোষণা করেছেন 'কমিউনিস্ট সমস্যাটিকে রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করা হবে', তাই গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতির আবার অজুহাত খোঁজা তাঁর পক্ষে উচিত কাজ হবে না।

টীকা

১। 'দুই-দশ' হচ্ছে অক্টোবরের যে দশ তারিখে উহানে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ১৯১১ সালের বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল তারই বার্ষিক উৎসবের দিন।

২। ক্যান্টনের নিকটে ওহামপোয়াতে ১৯২৪ সালে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় কুওমিনতাঙকে পুনর্গঠিত করার পর ওহামপোয়া মিলিটারী একাডেমিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯২৭ সালে বিপ্লবের প্রতি চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতার আগে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তভাবে এই শিক্ষাকেন্দ্রটি পরিচালনা করতেন। কমরেড চৌ এন-লাই, ইয়ে চিয়েন-ইং, য়ুন তাই-ইং, সিয়াও চু মু ও অন্যান্যরা নানা সময়ে এই একাডেমিতে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বহু সংখ্যক ক্যাডেটই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট ইয়ুথ লীগের সদস্য এবং তাঁরাই ঐ একাডেমির বিপ্লবী মর্মকেন্দ্রটি গড়ে তুলেছিলেন।

৩। প্যাঙ পিং-সুন, সান লিয়াং-চেং ও চেন শিয়াও-চিয়াং হচ্ছেন সেইসব কুওমিনতাঙ সেনাপতিবৃন্দ যারা প্রকাশ্যে দলত্যাগ করে জাপানী আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগদান করে।

৪। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের একেবারে প্রথম দিকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ও পরিচালনাধীনে জনগণের যে জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী শানসিতে গড়ে ওঠে তাই হচ্ছে 'প্রাণ-কবুল-করা বাহিনী।'

৫। ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে কুওমিনতাঙ ঘোষণা করে 'অভিমত ব্যক্ত করার ব্যাপারে অধিকতর সুযোগ দেওয়া হবে'। তার উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে ধোঁকা দেওয়া কারণ কুওমিনতাঙ-এর একনায়কতন্ত্রের অবসান করা হোক, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং বাক্‌স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হোক এই দাবিটি কুওমিনতাঙ এলাকায় ঐ বছরের প্রথম দিক থেকে সর্বসাধারণের একটি দাবি হয়ে উঠেছিল। মে মাসে কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের দ্বাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আবার ঘোষণা করে যে তা 'বাক্‌স্বাধীনতা রক্ষা করবে'। কিন্তু বাধ্য হয়ে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার একটিও কুওমিনতাঙ কোনকালে রক্ষা করেনি এবং গণতন্ত্রের দাবিতে জনগণের দাবি যখন অগ্রসর হয়ে চলতেই থাকল তখন কুওমিনতাঙ জনমতকে দমন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণকে বহুগুণে বাড়িয়েই দেয়।

সাংস্কৃতিক কাজকর্মে যুক্তফ্রণ্ট

৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৪

আমাদের সকল কাজের লক্ষ্যই হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা। হিটলারের মতোই জাপানী সাম্রাজ্যবাদও তার শেষ মুহূর্তে উপনীত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে কারণ একমাত্র তাহলেই আমরা চূড়ান্তভাবে তাকে উৎখাত করে দিতে পারব। আমাদের কাজকর্মে প্রথমেই আসে যুদ্ধের প্রশ্নটি, তারপর উৎপাদনে, আর তারপরে আসে সাংস্কৃতিক কাজকর্মের প্রশ্ন। যে সৈন্যবাহিনীর সংস্কৃতিবোধ নেই তা একটি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন সৈন্যবাহিনী এবং জড়বুদ্ধিসম্পন্ন একটি সৈন্যবাহিনী শত্রুকে পরাজিত করতে পারে না।

মুক্ত এলাকার সংস্কৃতিতে ইতিমধ্যেই একটি প্রগতিশীল দিক গড়ে উঠেছে কিন্তু তার একটা পশ্চাৎমুখী দিকও রয়েছে। মুক্ত এলাকাতে ইতিমধ্যেই একটি নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে জনগণের একটি সংস্কৃতি কিন্তু এখনো সামন্ততন্ত্রের বেশ কিছু অবশেষ রয়ে গেছে। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের পনের লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে দশ লক্ষই নিরক্ষর, এবং দু' হাজার ডাইনীবিদ্যা বিশারদ এখানে রয়েছে এবং সাধারণ মানুষেরা নানাবিধ কুসংস্কারে এখনো আচ্ছন্ন। এইগুলি হচ্ছে মানুষের মনের ভেতরের শত্রু। অনেক সময় দেখা যায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার চেয়ে জনগণের মনের ভেতরের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আরও বেশি কঠিন। জনগণকে ডাক দিয়ে আমাদেরকেই বলতে হবে তাদের নিরক্ষতার, কুসংস্কার ও অস্বাস্থ্যকর বদভ্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। এই সংগ্রামের জন্য একটি ব্যাপক যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য। এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের মতো স্থানে এই যুক্তফ্রণ্টকে বিশেষভাবে ব্যাপকভিত্তিক হতে হবে, এখানকার জনবসতি বিক্ষিপ্ত ও বিরল, যোগাযোগ ব্যবস্থা পশ্চাদপদ এবং সংস্কৃতির প্রাথমিক ভিত্তিটি নীচু মানের এবং তার ওপর একটা

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রের কর্মীদের একটি সম্মেলনে কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতাটি করেছিলেন।

যুদ্ধ লড়তে হচ্ছে। সুতরাং, আমাদের শিক্ষাক্রমে শুধু নিয়মিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকলেই চলবে না তার সঙ্গে থাকা চাই বিক্ষিপ্ত, নিয়মের বাঁধনমুক্ত গ্রামীণ বিদ্যালয়, সংবাদপত্র পড়ুয়াদের গোষ্ঠী এবং অক্ষরজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। শুধু আধুনিক ধাঁচের বিদ্যালয় নয়, আমাদের পুরানো ধারার গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিকেও ব্যবহার করা ও নতুন রূপদান করা চাই। শিল্পকলার ক্ষেত্রে আমাদের শুধু আধুনিক নাটক থাকলেই চলবে না, শেন-সিতে প্রচলিত অপেরা এবং **ইয়াংকো** নৃত্যও আমাদের চাই। আমাদের শুধু নতুন শেনসি অপেরা এবং নতুন **ইয়াংকো** নৃত্য থাকলেই চলবে না, আমাদের প্রাচীন অপেরা কোম্পানীগুলিকে ও প্রাচীন **ইয়াংকো** দলগুলিকেও কাজে লাগানো চাই এবং ধীরে ধীরে সেগুলিকে রূপান্তরিত করে তোলা চাই, কারণ ঐ সাবেক দলগুলিই হচ্ছে মোট **ইয়াংকো** দলগুলির শতকরা নব্বই ভাগ। ঔষধপত্রের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন আরও বেশি। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে মানুষ ও পশুর মৃত্যুর হার দুটিই খুব বেশি, আর তাছাড়া বহু লোক এখনো ডাইনীবিদ্যায় বিশ্বাস করে। এই পরিস্থিতিতে, শুধু আধুনিক ডাক্তারদের দিকে চেয়ে নির্ভর করে থাকা কোন সমাধান নয়। অবশ্য আধুনিক ডাক্তারদের সাবেকী ধাঁচের ডাক্তার-বৈদ্যের চেয়ে সুবিধা অনেক বেশি রয়েছে কিন্তু তাঁরা যদি জনসাধারণের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা না ভাবেন, জনগণের জন্য চিকিৎসকদের শিক্ষিত করে না তোলেন এবং সীমান্ত অঞ্চলের সহস্রাধিক পুরানো ধাঁচের ডাক্তার ও পশু-চিকিৎসকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ না হন এবং তাদের অগ্রগতিলাভে সহায়তা না করেন তাহলে আসলে তাঁরা ডাইনী-চিকিৎসকদেরই সাহায্য করবেন এবং মানুষ ও পশুমৃত্যুর উচ্চহারের প্রতি উদাসীনতাই প্রকাশ করবেন। যুক্তফ্রন্টের দুটিই মূলনীতি রয়েছে: প্রথমটি হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমালোচনা করা, শিক্ষা দেওয়া ও রূপান্তরিত করে তোলা। যুক্তফ্রন্টে আত্মসমর্পণ করা ভুল হবে এবং তেমনি নিজেদের বিশিষ্টতা বোধ থেকে ও অন্যদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব থেকে সংকীর্ণতাবাদও ভুল হবে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সকল বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও পুরানো ধাঁচের চিকিৎসকদের মধ্যে যাঁরাই হিতকর হতে পারে তাঁদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, তাঁদের সাহায্য করা, তাঁদের আমাদের মতের সপক্ষে নিয়ে আসা এবং তাঁদের রূপান্তরিত করে তোলা। তাঁদের রূপান্তরিত করে তোলার জন্য প্রথমেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তা

যদি আমরা যথোপযুক্তভাবে করি তবে তাঁরা আমাদের সাহায্যকে স্বাগতই জানাবেন।

আমাদের সংস্কৃতি হচ্ছে জনগণের সংস্কৃতি। আমাদের সংস্কৃতি-কর্মীদের বিপুল উদ্দীপনা ও নিষ্ঠা সহকারে জনগণকেই সেবা করতে হবে এবং জনগণের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে, জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাঁদের চলবে না আর তা করতে হলে জনগণের প্রয়োজন ও বাসনা অনুসারেই তাঁদের কাজ করতে হবে। জনগণের জন্য যে কাজই করা হোক তা জনগণের চাহিদা অনুযায়ীই করতে হবে, যত সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিতই হোন না কেন কোন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছানুসারে তা করা চলবে না। প্রায়ই দেখা যায় বাস্তব দিক থেকে জনসাধারণের একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু ভাবনার দিক থেকে তারা তখনো ঐ প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেনি বা ঐ পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারে ইচ্ছুক বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেনি। এরকম ক্ষেত্রে, আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। যতক্ষণ আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের অধিকাংশ এই পরিবর্তনের প্রয়োজন সম্পর্কে ইচ্ছুক হয়ে উঠছে বা ঐ পরিবর্তন সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠছে ততক্ষণ ঐ পরিবর্তন নিয়ে আসা আমাদের দিক থেকে উচিত হবে না। অন্যথায় আমরা জনগণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলব। যদি তারা সচেতন ও ইচ্ছুক না হয়, যে কাজে তাদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন, তাহলে সেই কাজ করতে গেলে তা নিছক একটি আনুষ্ঠানিকতা হয়ে দাঁড়াবে এবং তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। 'তাড়াহুড়ো করলে সফল হওয়া যায় না' এই জনপ্রবাদের অর্থ এই নয় যে আমরা দ্রুত কাজ করব না, তার অর্থ হচ্ছে আমাদের উগ্র হলে চলবে না; উগ্রতা পরিণামে শুধু ব্যর্থতাই ডেকে আনবে। যে-কোন কাজের ক্ষেত্রেই কথাটা সত্য এবং বিশেষ করে যে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত কাজকর্মের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের চিন্তাধারায় রূপান্তর নিয়ে আসা, সেক্ষেত্রে আরও বেশি করে সত্য। এক্ষেত্রে দুটি মূল নীতি রয়েছে: একটি হচ্ছে তাদের কী প্রয়োজন সে সম্পর্কে আমাদের কল্পনাবিলাস নয়, জনগণের প্রকৃত প্রয়োজনটি কী তা নিরূপণ করা, এবং অন্যটি হচ্ছে, জনগণের হয়ে আমাদের মনস্থির করা নয়, জনগণকেই তাদের নিজেদের মনস্থির করে তারা কী চায়, কী তাদের ইচ্ছা তা নিরূপণ করতে দেওয়া।

সাংস্কৃতিক কাজকর্মে যুক্তফ্রণ্ট

৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৪

আমাদের সকল কাজের লক্ষ্যই হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা। হিটলারের মতোই জাপানী সাম্রাজ্যবাদও তার শেষ মুহূর্তে উপনীত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে কারণ একমাত্র তাহলেই আমরা চূড়ান্তভাবে তাকে উৎখাত করে দিতে পারব। আমাদের কাজকর্মে প্রথমেই আসে যুদ্ধের প্রশ্নটি, তারপর উৎপাদনে, আর তারপরে আসে সাংস্কৃতিক কাজকর্মের প্রশ্ন। যে সৈন্যবাহিনীর সংস্কৃতিবোধ নেই তা একটি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন সৈন্যবাহিনী এবং জড়বুদ্ধিসম্পন্ন একটি সৈন্যবাহিনী শত্রুকে পরাজিত করতে পারে না।

মুক্ত এলাকার সংস্কৃতিতে ইতিমধ্যেই একটি প্রগতিশীল দিক গড়ে উঠেছে কিন্তু তার একটা পশ্চাৎমুখী দিকও রয়েছে। মুক্ত এলাকাতে ইতিমধ্যেই একটি নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে জনগণের একটি সংস্কৃতি কিন্তু এখনো সামন্ততন্ত্রের বেশ কিছু অবশেষ রয়ে গেছে। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের পনের লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে দশ লক্ষই নিরক্ষর, এবং দু' হাজার ডাইনীবিদ্যা বিশারদ এখানে রয়েছে এবং সাধারণ মানুষেরা নানাবিধ কুসংস্কারে এখনো আচ্ছন্ন। এইগুলি হচ্ছে মানুষের মনের ভেতরের শত্রু। অনেক সময় দেখা যায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার চেয়ে জনগণের মনের ভেতরের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আরও বেশি কঠিন। জনগণকে ডাক দিয়ে আমাদেরকেই বলতে হবে তাদের নিরক্ষতার, কুসংস্কার ও অস্বাস্থ্যকর বদভ্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। এই সংগ্রামের জন্য একটি ব্যাপক যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য। এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের মতো স্থানে এই যুক্তফ্রণ্টকে বিশেষভাবে ব্যাপকভিত্তিক হতে হবে, এখানকার জনবসতি বিক্ষিপ্ত ও বিরল, যোগাযোগ ব্যবস্থা পশ্চাদ্‌পদ এবং সংস্কৃতির প্রাথমিক ভিত্তিটি নীচু মানের এবং তার ওপর একটা

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রের কর্মীদের একটি সম্মেলনে কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতাটি করেছিলেন।

যুদ্ধ লড়তে হচ্ছে। সুতরাং, আমাদের শিক্ষাক্রমে শুধু নিয়মিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকলেই চলবে না তার সঙ্গে থাকা চাই বিক্ষিপ্ত, নিয়মের বাঁধনমুক্ত গ্রামীণ বিদ্যালয়, সংবাদপত্র পড়ুয়াদের গোষ্ঠী এবং অক্ষরজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। শুধু আধুনিক ধাঁচের বিদ্যালয় নয়, আমাদের পুরানো ধারার গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিকেও ব্যবহার করা ও নতুন রূপদান করা চাই। শিল্পকলার ক্ষেত্রে আমাদের শুধু আধুনিক নাটক থাকলেই চলবে না, শেনসিতে প্রচলিত অপেরা এবং ইয়াংকো নৃত্যও আমাদের চাই। আমাদের শুধু নতুন শেনসি অপেরা এবং নতুন ইয়াংকো নৃত্য থাকলেই চলবে না, আমাদের প্রাচীন অপেরা কোম্পানীগুলিকে ও প্রাচীন ইয়াংকো দলগুলিকেও কাজে লাগানো চাই এবং ধীরে ধীরে সেগুলিকে রূপান্তরিত করে তোলা চাই, কারণ ঐ সাবেক দলগুলিই হচ্ছে মোট ইয়াংকো দলগুলির শতকরা নব্বই ভাগ। ঔষধপত্রের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন আরও বেশি। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে মানুষ ও পশুর মৃত্যুর হার দুটিই খুব বেশি, আর তাছাড়া বহু লোক এখনো ডাইনীবিদ্যায় বিশ্বাস করে। এই পরিস্থিতিতে, শুধু আধুনিক ডাক্তারদের দিকে চেয়ে নির্ভর করে থাকা কোন সমাধান নয়। অবশ্য আধুনিক ডাক্তারদের সাবেকী ধাঁচের ডাক্তার-বৈদ্যের চেয়ে সুবিধা অনেক বেশি রয়েছে কিন্তু তাঁরা যদি জনসাধারণের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা না ভাবেন, জনগণের জন্য চিকিৎসকদের শিক্ষিত করে না তোলেন এবং সীমান্ত অঞ্চলের সহস্রাধিক পুরানো ধাঁচের ডাক্তার ও পশু-চিকিৎসকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ না হন এবং তাদের অগ্রগতিলাভে সহায়তা না করেন তাহলে আসলে তাঁরা ডাইনী-চিকিৎসকদেরই সাহায্য করবেন এবং মানুষ ও পশুমৃত্যুর উচ্চহারের প্রতি উদাসীনতাই প্রকাশ করবেন। যুক্তফ্রন্টের দুটিই মূলনীতি রয়েছে: প্রথমটি হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমালোচনা করা, শিক্ষা দেওয়া ও রূপান্তরিত করে তোলা। যুক্তফ্রন্টে আত্মসমর্পণ করা ভুল হবে এবং তেমনি নিজেদের বিশিষ্টতা বোধ থেকে ও অন্যদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব থেকে সংকীর্ণতাবাদও ভুল হবে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সকল বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও পুরানো ধাঁচের চিকিৎসকদের মধ্যে যাঁরাই হিতকর হতে পারে তাঁদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, তাঁদের সাহায্য করা, তাঁদের আমাদের মতের সপক্ষে নিয়ে আসা এবং তাঁদের রূপান্তরিত করে তোলা। তাঁদের রূপান্তরিত করে তোলার জন্য প্রথমেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তা

যদি আমরা যথোপযুক্তভাবে করি তবে তাঁরা আমাদের সাহায্যকে স্বাগতই জানাবেন।

আমাদের সংস্কৃতি হচ্ছে জনগণের সংস্কৃতি। আমাদের সংস্কৃতি-কর্মীদের বিপুল উদ্দীপনা ও নিষ্ঠা সহকারে জনগণকেই সেবা করতে হবে এবং জনগণের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে, জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাঁদের চলবে না আর তা করতে হলে জনগণের প্রয়োজন ও বাসনা অনুসারেই তাঁদের কাজ করতে হবে। জনগণের জন্য যে কাজই করা হোক তা জনগণের চাহিদা অনুযায়ীই করতে হবে, যত সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিতই হোন না কেন কোন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছানুসারে তা করা চলবে না। প্রায়ই দেখা যায় বাস্তব দিক থেকে জনসাধারণের একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু ভাবনার দিক থেকে তারা তখনো ঐ প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেনি বা ঐ পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারে ইচ্ছুক বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেনি। এরকম ক্ষেত্রে, আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। যতক্ষণ আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের অধিকাংশ এই পরিবর্তনের প্রয়োজন সম্পর্কে ইচ্ছুক হয়ে উঠছে বা ঐ পরিবর্তন সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠছে ততক্ষণ ঐ পরিবর্তন নিয়ে আসা আমাদের দিক থেকে উচিত হবে না। অন্যথায় আমরা জনগণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলব। যদি তারা সচেতন ও ইচ্ছুক না হয়, যে কাজে তাদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন, তাহলে সেই কাজ করতে গেলে তা নিছক একটি আনুষ্ঠানিকতা হয়ে দাঁড়াবে এবং তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। 'তাড়াহুড়ো করলে সফল হওয়া যায় না' এই জনপ্রবাদের অর্থ এই নয় যে আমরা দ্রুত কাজ করব না, তার অর্থ হচ্ছে আমাদের উগ্র হলে চলবে না; উগ্রতা পরিণামে শুধু ব্যর্থতাই ডেকে আনবে। যে-কোন কাজের ক্ষেত্রেই কথাটা সত্য এবং বিশেষ করে যে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত কাজকর্মের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের চিন্তাধারায় রূপান্তর নিয়ে আসা, সেক্ষেত্রে আরও বেশি করে সত্য। এক্ষেত্রে দুটি মূল নীতি রয়েছে: একটি হচ্ছে তাদের কী প্রয়োজন সে সম্পর্কে আমাদের কল্পনাবিলাস নয়, জনগণের প্রকৃত প্রয়োজনটি কী তা নিরূপণ করা, এবং অন্যটি হচ্ছে, জনগণের হয়ে আমাদের মনস্থির করা নয়, জনগণকেই তাদের নিজেদের মনস্থির করে তারা কী চায়, কী তাদের ইচ্ছা তা নিরূপণ করতে দেওয়া।

অর্থ নৈতিক কাজকর্ম করা আমাদের শিখতে হবে

১০ই জানুয়ারী ১৯৪৫

শ্রমবীর ও আদর্শ কর্মীবৃন্দ!

আপনারা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার একটা আদান-প্রদান করেছেন; আমরা সকলেই আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনাদের প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করছি। আপনাদের তিনটি ভাল গুণ রয়েছে এবং আপনাদের রয়েছে তিনটি ভূমিকা। প্রথমে হচ্ছে, উদ্ভাবকের ভূমিকা, প্রবর্তকের ভূমিকা; অর্থাৎ আপনাদের বিরাট বিরাট প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এবং আপনাদের অসংখ্য উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে আপনারা আপনাদের কাজকে অন্যদের সামনে একটি আদর্শ করে তুলেছেন, মান উন্নয়ন করেছেন এবং আপনাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে অন্যদের অনুপ্রাণিত করেছেন। দ্বিতীয় হচ্ছে, মেরুদণ্ডের ভূমিকা। আপনারা অনেকেই এখনো ক্যাডার হয়ে ওঠেননি, কিন্তু আপনারা মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছেন, জনগণের একেবারে মূল মর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছেন। আপনাদের পক্ষে আমাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আরও সহজ। ভবিষ্যতে আপনারাও ক্যাডার হয়ে উঠবেন, উঠতে পারেন, এখন আপনারা আমাদের অপেক্ষমান ক্যাডার। তৃতীয় হচ্ছে, সেতু হিসেবে আপনাদের ভূমিকা। নেতৃত্ব ও ব্যাপক জনগণের মধ্যে আপনারা একটি সেতুর মতন; আপনাদের মাধ্যমে জনসাধারণের অভিমতগুলি নেতৃত্বের কাছে পৌঁছায়, আর উল্টোদিক থেকে নেতৃত্বের অভিমতগুলি পৌঁছায় জনসাধারণের কাছে।

আপনাদের অনেক সদ্গুণ রয়েছে এবং আপনারা বিরাট কর্তব্য সম্পাদন করেছেন কিন্তু সব সময়ই আপনাদের মনে রাখা চাই যে আপনারা যেন আত্মম্ভরী হয়ে না পড়েন। সবাই আপনাদের সম্মান করেন এবং তাঁরা ঠিক কাজই করেন, কিন্তু এতে করে সহজেই আত্মম্ভরিতা জন্মে যায়। যদি

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের শ্রমবীর ও আদর্শ কর্মীদের একটি সম্মেলনে কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতাটি করেছিলেন।

আপনারা আত্মম্ভরী হয়ে পড়েন, যদি আপনারা বিনয়নম্র না হন এবং পুরোদমে নিজেদের কাজ করে না যান, যদি অন্যদের শ্রদ্ধা না দেখান, ক্যাডারদের ও জনগণকে শ্রদ্ধা না করেন তবে আপনারা আর বীর এবং আদর্শ থাকবেন না। অতীতেও এ ধরনের অনেক লোক দেখা গেছে, তবে আমি আশা করি, আপনারা ওদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন না।

এই সম্মেলন আপনাদের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করেছে। এই মূল্যায়নটি খুব ভালই হয়েছে এবং অন্যান্য মুক্ত এলাকাতেও এইগুলি প্রযোজ্য। কিন্তু ঐদিক নিয়ে আমি আলোচনা করছি না। আমি আমাদের অর্থ নৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে কয়েক কথাই শুধু বলতে চাই।

বিগত কয়েক বছর ধরে কি করে অর্থ নৈতিক কাজকর্ম করতে হয় তা আপনারা শিখেছেন এবং এই ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্যই অর্জন করেছি কিন্তু এটা তো সবেমাত্র শুরু। আমাদের দেখতে হবে যাতে দুই বা তিন বছরের মধ্যে শেনসি-কানসু-নিংশিয়া সীমান্ত অঞ্চল ও শত্রুর পশ্চাদ্বর্তী মুক্ত এলাকাসমূহ খাদ্যশস্য ও তৈরী জিনিসপত্রের দিক থেকে পুরোপুরি বা অনেকখানি আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে বা উদ্বৃত্ত হয়ে উঠতে পারে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে আমাদের আরও অধিকতর সাফল্য অর্জন করতে হবে। একমাত্র তখনই আমরা অর্থ নৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে অনেকখানি জেনেছি বলতে পারব এবং তা আরও ভালভাবে করতে শিখেছি বলতে পারব। যেসব জায়গায় সৈন্যবাহিনী ও জনগণের জীবনধারণের অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়নি, যেখানে প্রতি আক্রমণের বস্তুগত ভিত্তিগুলি দুর্বল রয়ে গেছে এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য থমকে আছে বা বছরে বছরে প্রসারিত হওয়ার পরিবর্তে নিম্নাভিমুখী হয়ে পড়ছে, বুঝতে হবে স্পষ্টতঃই সেখানে পার্টি, সরকার ও সৈন্যবাহিনীর লোকজন কি করে অর্থ নৈতিক কাজকর্ম করতে হয় তা শেখেননি এবং নিঃসন্দেহে প্রচুর বাধাবিপত্তিরই তাঁদের সম্মুখীন হতে হবে।

আরও একটা কথা আমি আপনাদের সকলের সামনে রাখতে চাই, তা হচ্ছে, আমাদের ধ্যানধারণাগুলিকে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিবেশ হচ্ছে গ্রামীণ পরিবেশ; মনে হবে এ বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ নেই, কে না জানেন যে আমরা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করছি? তবু প্রকৃতপক্ষে, অবস্থাটা কিন্তু তা নয়। বহু কমরেড গ্রামাঞ্চলকে আদৌ বোঝেন না বা অন্ততঃ সুগভীরভাবে বোঝেন না, যদিও তাঁরা ওখানেই

বসবাস করছেন এবং পরিবেশটাকে বোঝেন বলে তাঁরা মনেও করেন। আমাদের পরিবেশটি গ্রামীণ পরিবেশ, তার ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত অর্থনীতি, শত্রু কর্তৃক তা বিচ্ছিন্ন ও গেরিলা যুদ্ধে তা জড়িয়ে রয়েছে এটা তাঁরা বোঝেন না এবং তার ফল দাঁড়ায় এই যে রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা অথবা পার্টির কাজকর্ম পরিচালনা এবং শ্রমিক, কৃষক, যুব ও নারী আন্দোলন প্রায়ই ভুলভাবে বা অংশতঃই শুধু সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। তাঁরা গ্রামীণ ব্যাপারগুলিকে শহুরে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন এবং প্রায়ই পাথরের দেয়ালে তাঁদের মাথায় ঠোক্কর খান, কারণ তাঁরা আত্মগত চিন্তাধারা থেকে যতসব অনুপযুক্ত পরিকল্পনা রচনা করেন এবং নিজেদের খেয়াল মতো সেগুলি চালু করতে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটান। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শুদ্ধিকরণ আন্দোলন এবং তাঁদের কাজকর্মের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষালাভ এই ত্রুটির জন্যই আমাদের কমরেডরা অনেকখানি অগ্রগতি সাধন করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সতর্কতার সঙ্গে আমাদের ধ্যানধারণাগুলিকে আমাদের পরিবেশের সঙ্গে পুরোপুরি সুসঙ্গত করে তোলা চাই, তাহলেই কাজকর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা সুফললাভ করতে পারব এবং দ্রুত সেগুলিকে করে উঠতে পারব। আমরা যদি যথার্থভাবে এটা মনে রাখি যে ঘাঁটি অঞ্চলে যেখানে আমরা কাজ করছি সেখানে অর্থনীতির ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত অর্থনীতি, শত্রু কর্তৃক তা বিচ্ছিন্ন এবং গেরিলা যুদ্ধে তা জড়িয়ে রয়েছে, আর যদি এই উপলব্ধি থেকেই আমাদের করণীয় সকল কাজে আমরা অগ্রসর হই, তাহলে সঙ্গতভাবেই এই প্রশ্ন ওঠে, কেন তবে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি যেমন, শহুরে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পাদিত কাজকর্মের ফলাফলের তুলনায় আমাদের কাজের ফলাফল এমন ধীরগতিসম্পন্ন ও নিতান্ত সাধারণ ধরনের হয়ে দাঁড়ায়? ধীরগতি হওয়া দূরে থাক, আসলে কিন্তু তা বেশ দ্রুতগতিসম্পন্নই বটে। কারণ যদি আমরা শহুরে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অগ্রসর হই এবং আমাদের বর্তমানের বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত হই তবে প্রশ্নটা তো আর দ্রুত বা ধীরগতিসম্পন্ন ফলাফলের থাকবে না, সেটা হয়ে দাঁড়াবে অন্তহীন জট ও জটিলতায় জড়িয়ে পড়া এবং পরিণামে একেবারে নিষ্ফল হয়ে দাঁড়ানোর প্রশ্ন।

আমরা বর্তমানে যে আকারে সৈন্যবাহিনীর ও বেসামরিক লোকজনদের উৎপাদন অভিযান চালিয়ে আসছি তার বিরাট সাফল্য থেকে এই বাস্তব সত্যের একটি পরিষ্কার প্রমাণ মিলবে।

আমরা জাপানী আক্রমণকারীদের কঠিন আঘাত হানতে চাই, মহানগরগুলি দখল করার জন্য প্রস্তুতি চালাতে চাই এবং আমাদের হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে চাই। কিন্তু এই লক্ষ্য কী করে আমরা অর্জন করতে পারব, কেননা আমরা রয়েছি গ্রামাঞ্চলে যেখানে অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত অর্থনীতি, শত্রু কর্তৃক আমরা বিচ্ছিন্ন এবং গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহে আমরা জড়িত হয়ে রয়েছি? আমরা কুওমিনতাঙকে অনুকরণ করতে পারি না, ওরা একটি আঙুলও নাড়বে না আর সব কিছুর জন্য, এমনকি সুতীর কাপড়ের মতো নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যও পুরোপুরি বিদেশীদের ওপর নির্ভর করে বসে থাকবে। আমরা আত্মনির্ভরতার পক্ষপাতী। আমরাও বৈদিশিক সাহায্য প্রত্যাশা করি কিন্তু তার ওপর আমরা নির্ভরশীল হতে পারি না; আমরা আমাদের নিজেদের চেষ্টার ওপর নির্ভর করতে চাই, আমাদের সমগ্র সৈন্য-বাহিনী ও সমগ্র জনগণের সৃজনশীল শক্তির ওপরই আমরা নির্ভর করতে চাই। কিন্তু ওটা আমরা করব কিভাবে? একই সঙ্গে সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যে ব্যাপক আকারে উৎপাদন অভিযান পরিচালন করেই আমরা তা করব।

যেহেতু আমরা গ্রামাঞ্চলে রয়েছি যেখানে জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ বিক্ষিপ্ত তারই জন্য আমরা উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য 'সংঘবদ্ধ নেতৃত্ব ও বিকেন্দ্রীভূত পরিচালনার' কর্মনীতি গ্রহণ করেছি।

যেহেতু আমরা গ্রামাঞ্চলে রয়েছি যেখানে কৃষকরা বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত উৎপাদক হিসেবে পশ্চাদ্‌পদ উৎপাদনের উপকরণই ব্যবহার করেন, যেখানে এখনো অধিকাংশ জমি জমিদারদের মালিকানাধীন এবং কৃষকেরা সামন্ততান্ত্রিক খাজনার শোষণের শিকার হয়ে রয়েছেন সেখানে আমরা নীতি হিসেবে খাজনা ও সুদ হ্রাস করা এবং উৎপাদনের ব্যাপারে কৃষকদের উদ্দীপনা বৃদ্ধি করার জন্য এবং কৃষিশ্রমিকদের উৎপাদনীশক্তি বৃদ্ধির জন্য পারস্পরিক সহায়তাকারী শ্রমদানের আয়োজন করেছি। খাজনা হ্রাস উৎপাদনের ব্যাপারে কৃষকদের উদ্দী-পনাকে বাড়িয়েছে এবং পারস্পরিক সাহায্য কৃষিশ্রমিকদের উৎপাদনীশক্তিকে বাড়িয়েছে। আমি উত্তর ও মধ্য চীনের বিভিন্ন স্থানের তথ্য সংগ্রহ করেছি, তা থেকে দেখা যাচ্ছে সর্বত্রই কৃষকেরা খাজনা হ্রাসের পর উৎপাদনের ব্যাপারে বেশী আগ্রহ নিচ্ছেন এবং আমাদের শ্রম বিনিময়কারী টীমের অনুরূপ পারস্পরিক সাহায্যকারী গ্রুপ গঠনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন যাতে করে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে তিনজনের উৎপাদনী ক্ষমতা আগেকার দিনের চারজনের

উৎপাদনী ক্ষমতার সমান। অবস্থাটা এই দাঁড়ালে, ৯ কোটি মানুষ ১২ কোটি মানুষের সমান কাজ করতে পারে। এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে যেখানে আগেকার তিনজনের কাজ এখন দুজনেই করে ফেলছে। দ্রুত ফললাভের বাসনা থেকে যদি জবরদস্তি ও হুকুমদারির পথ নেওয়া হয় তাতে করে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়, কিন্তু তার পরিবর্তে যদি আমরা ধৈর্য সহকারে জনগণকে বুঝিয়ে রাজী করানোর কর্মনীতি গ্রহণ করি, তাদের সামনে ভাল উদাহরণ রাখি তাহলে আগামী কয়েক বছরে কৃষকজনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠকেই কৃষি ও হস্তশিল্পগত উৎপাদনের জন্য পারস্পরিক সাহায্যকারী টীমে সংগঠিত করে তুলতে পারব একবার যখন এই উৎপাদন গ্রুপগুলিই সাধারণ রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াবে তখন যে শুধু উৎপাদন বাড়বে ও নিত্যনতুন নানা ধরনের উদ্ভাবন দেখা দেবে তাই নয় রাজনৈতিক প্রগতিও দেখা দেবে, শিক্ষার স্তর উন্নততর হবে, স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা দেবে; অকর্মণ্য বাউণ্ডুলেদের সংস্কার সাধিত হবে, সামাজিক রীতিনীতিতে পরিবর্তন আসবে এবং অল্পকালের মধ্যেই উৎপাদনের যন্ত্রপাতি-গুলিরও উন্নতি সাধিত হবে। এইসব যখন ঘটবে, আমাদের গ্রাম সমাজ তখন ক্রমে ক্রমে নতুন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে পুনর্গঠিত হয়ে উঠবে।

আমাদের কর্মীরা যদি এই কর্মক্ষেত্রটিকে সতর্কভাবে অধ্যয়ন করেন এবং গ্রামীণ জনগণকে উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযানে একান্ত উদ্যম সহকারে সহায়তা করেন তাহলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে খাদ্যশস্যের ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রাচুর্য দেখা দেবে। আমরা তাহলে শুধু যে যুদ্ধই চালিয়ে যেতে ও শস্যহানির মোকাবিলা করতে পারব তাই নয়, ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য খাদ্যশস্যের ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিরাট মজুত ভাণ্ডারও গড়ে তুলতে পারব।

উৎপাদনের জন্য সৈন্যবাহিনীর ইউনিট, সরকারী ও অন্যান্য সংগঠনের সবাইকেই কৃষকদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংগঠিত করে তুলতে হবে।

যেহেতু আমরা গ্রামাঞ্চলে রয়েছি যেখানে শত্রু প্রতিনিয়ত হামলা চালাচ্ছে এবং আমরা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে রয়েছি তাই সৈন্যবাহিনীর ইউনিট, সরকারী ও অন্যান্য সংগঠনকে উৎপাদনে নিয়োজিত করা একটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য এবং তাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব কেননা গেরিলা যুদ্ধ একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়া শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্যদল ও সরকারী কর্মীরা সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় সংখ্যাগত

দিক থেকে অনেক বেশি, আর যদি তাঁরা উৎপাদনের কাজে নিজেরা লিপ্ত না হন তাহলে তাঁদের ক্ষুধার্তই থাকতে হবে, অন্যদিকে যদি তাঁরা জনগণের কাছ থেকে অতিরিক্ত বেশি আদায় করেন এবং বোঝা যদি তাদের পক্ষে বহন করা অসাধ্য হয়ে ওঠে তবে জনগণই ক্ষুধার্ত থাকবে। এইসব কারণেই আমরা ব্যাপক আকারে উৎপাদন অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। উদাহরণ হিসেবে, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের কথাই ধরা যাক। সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলি এবং সরকারী ও অন্যান্য সংগঠনগুলিতে নিযুক্ত লোকজনদের জন্য বার্ষিক খাদ্যের প্রয়োজন হল মোট ২,৬০,০০০ **তান** (এক **তান** হচ্ছে ৩০০ **চিন**-এর সমান), তার মধ্যে ১,৬০,০০০ **তান** তাঁরা পান জনগণের কাছ থেকে আর বাকীটুকু নিজেরাই নিজেদের জন্য উৎপাদন করেন; যদি তাঁরা নিজেরা উৎপাদনের কাজে লিপ্ত না হন, তবে হয় তাঁরা আর নয়তো জনগণকে ক্ষুধার্ত থাকতেই হবে। আমাদের উৎপাদন অভিযান-গুলির জন্য ক্ষুধার্ত হতে থেকে আমরা অব্যাহতি পেয়েছি এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণ সত্যিই বেশ ভালভাবে খেতে পাচ্ছেন।

খাদ্যশস্য, কাপড়চোপড় ও বিছানাপত্র ছাড়া সীমান্ত অঞ্চলের সরকারী ও অন্যান্য সংগঠনসমূহ তাদের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল, কিছু কিছু ইউনিট পুরোপুরিই আত্মনির্ভরশীল। অনেক ইউনিট খাদ্যশস্য কাপড়চোপড় ও বিছানাপত্রের ব্যাপারেও অংশত আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছে।

সীমান্ত অঞ্চলের সৈন্যদলের ইউনিটগুলির সাফল্য আরও অনেক বেশি। বহু ইউনিট খাদ্যশস্য, কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারেই পুরো আত্মনির্ভর অর্থাৎ তারা একশ ভাগ আত্মনির্ভর হয়েই উঠেছে এবং সরকারের কাছ থেকে তারা কিছুই নেয় না। এই হচ্ছে সর্বোচ্চ মান, একেবারে সেরা দৃষ্টান্ত এবং বেশ কয়েক বছরের চেষ্টার মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

ফ্রন্টে যেখানে যুদ্ধ করতে হচ্ছে সেখানে এই মানকে গ্রহণ করা চলে না। সেখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় একটি মান গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় মানটি হচ্ছে, সরকার কর্তৃক সরবরাহ করা খাদ্যশস্য, কাপড়চোপড় ও বিছানাপত্র ছাড়া উৎপাদনের মাধ্যমে নিম্নোক্ত জিনিসগুলির ব্যাপারে আত্মনির্ভরতা অর্জন করা: রান্নার তেল (দৈনিক জনপ্রতি ০.৫ **লিয়াং**), লবণ (দৈনিক জনপ্রতি

০·৫ লিয়াং), তরিতরকারি (দৈনিক জনপ্রতি ১-১·৫ চিন) এবং মাংস (দৈনিক জনপ্রতি ১-২ চিন); জ্বালানি, অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ও অন্যান্য বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয় করা ; শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সাহায্য দান ; অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করার এবং তামাক, জুতো মোজা, দস্তানা, তোয়ালে, টুথ-ব্রাশ ইত্যাদির জোগান দেওয়া ; এইসব জিনিসের জন্য মোট ব্যয়ের অর্ধেকই লেগে যায়। এই মানটি দুই বা তিন বছরে ক্রমে ক্রমে অর্জন করা যায়। কোন কোন স্থানে এটি ইতিমধ্যে অর্জন করা গেছে। দৃঢ় ঘাঁটি এলাকাসমূহে এই মানকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

গেরিলা অঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিকে তৃতীয় মানটি গ্রহণ করা চলে যেখানে লক্ষ্য হবে, শতকরা ৫০ ভাগ আত্মনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভব না হলেও অন্ততঃ ১৫ থেকে ২০ ভাগ লক্ষ্য অর্জন করা। ওখানে ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই যথেষ্ট হবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া সৈন্যবাহিনীর সকল ইউনিটকে সরকারী ও অন্যান্য সকল সংগঠনকেই যুদ্ধবিগ্রহ, ট্রেনিং ও কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। অবসর সময়ে যৌথ উৎপাদনে এভাবে আত্মনিয়োগ করা ছাড়া তাঁদের কর্তব্য হবে, তাঁদের কিছু লোকজনকে সুনির্দিষ্টভাবে উৎপাদনের কাজের জন্য বরাদ্দ করে দেওয়া ; তাঁদের কৃষি খামার, তরিতরকারির বাগান, পশুচারণ ক্ষেত্র, কারখানা, ছোট-খাট ফ্যাক্টরী, পরিবহনকারী টীম ও সমবায় পরিচালনার জন্য বা কৃষকদের সঙ্গে অংশীদারীর ভিত্তিতে খাদ্যশস্য ও তরিতরকারি উৎপাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া। আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিটি সংগঠন ও সৈন্যবাহিনীর ইউনিটকেই নিজেদের অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য নিজেদের 'পারিবারিক অর্থনীতির' প্রচলন করতে হবে। এটা করার অনিচ্ছা হচ্ছে বাউণ্ডুলেদের স্বভাবজাত এবং তা খুবই লজ্জার কথা। উৎপাদন বাড়াবার জন্য আমাদের ব্যক্তিগত সুবিধাদানের একটি ব্যবস্থারও উদ্ভাবন করতে হবে, কাজের গুণানুসারে যাঁরাই সরাসরি কাজে অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের মধ্য থেকে তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। তাছাড়া কাজকর্মকে কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেক সংগঠনের প্রধানকে বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে এবং ব্যক্তিগতভাবে কাজে অংশগ্রহণ করতে ও নেতৃস্থানীয় গ্রুপকে জনগণের সঙ্গে, আর সাধারণ আহ্বানকে বিশেষ নির্দেশের সঙ্গে যুক্ত করার পদ্ধতি অনুসরণ

করতে হবে।

অনেকে বলেন সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলি যদি উৎপাদন নিয়ে ব্যস্ত থাকে তবে তারা ট্রেনিং নিতে বা যুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে পড়বে, আর সরকারী ও অন্যান্য সংস্থা যদি তা করে বেড়ায় তবে তাদের নিজের কাজই তারা করে উঠতে পারবে না। এটা একটা ভিত্তিহীন যুক্তি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের সীমান্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলি তাদের নিজেদের জন্য যথেষ্ট খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ জোগাবার জন্য ব্যাপক আকারে উৎপাদনের কাজ শুরু করেছে এবং একই সঙ্গে তাদের ট্রেনিং চালিয়ে গেছে, তাদের রাজনৈতিক অধ্যয়ন ও সাক্ষরতা প্রসারের ও অন্যান্য নানা ধরনের কাজকর্ম আগের চেয়ে অনেক বেশি সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে এসেছে এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যেকার ও সৈন্যবাহিনী এবং জনগণের মধ্যেকার ঐক্য আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। গত বছর যুদ্ধের ফ্রন্টে যখন ব্যাপক আকারে উৎপাদনের কাজকর্মের জন্য অভিযান শুরু হল তখন দেখা গেছে যুদ্ধবিগ্রহে অধিকতর সাফল্যই অর্জিত হয়েছে এবং তাছাড়া ব্যাপক আকারে ট্রেনিং দেওয়ার কাজ শুরু করা গেছে। উৎপাদন অভিযানের জন্য সরকারী ও অন্যান্য সংগঠনের লোকজনেরা উন্নততর জীবনযাপন করেছেন, অনেক বেশি নিষ্ঠা ও দক্ষতা সহকারে কাজকর্ম করেছেন; সীমান্ত অঞ্চলে ও ফ্রন্টে দুজায়গাতেই এরকম হয়েছে।

এভাবে গ্রামীণ এলাকাসমূহের গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেছে যেসব সৈন্যবাহিনীর ইউনিট, সরকারী ও অন্যান্য সংগঠন আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য উৎপাদনের কাজ শুরু করেছে তারা অনেক বেশি উদ্যম ও সক্রিয়তা নিয়েই যুদ্ধবিগ্রহ করেছে, ট্রেনিং লাভ করেছে এবং অন্যান্য কাজকর্ম করতে পেরেছে, নিজেদের শৃংখলাকে সমুন্নত করে তুলেছে, নিজেদের আভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং অসামরিক জনগণের সঙ্গে আমাদের ঐক্য এই দুটোকেই জোরদার করে তুলেছে। আত্মনির্ভরতাব জন্য উৎপাদন আমাদের দেশের দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধেরই একটি পরিণাম, আর এটা তো আমাদের গৌরবেরই কথা। একবার যখন আমরা তাকে আয়ত্তা করে ফেলব, তারপর কোন বৈষয়িক বাধাবিপত্তিই আমাদের ভীতিগ্রস্ত করে তুলতে পারবে না। বছরে বছরে আমাদের শক্তি ও উদ্দীপনা বেড়েই যাবে এবং প্রতিটি যুদ্ধের পরই দেখা যাবে আমাদের শক্তি বেড়ে গেছে। আমরাই শত্রুকে নাস্তানাবুদ করে দেব

এবং শত্রুর পক্ষে আমাদের নাস্তানাবুদ করে ফেলার আর কোন ভয়ই আমাদের থাকবে না।

যুদ্ধের ফ্রণ্টে কর্মরত আমাদের কমরেডদের মনোযোগ আরেকটি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করা দরকার। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত আমাদের কয়েকটি অঞ্চল বৈষয়িক সম্পদের দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ এবং এইটি ধরে নিয়ে কর্মীরা হিসেবী হয়ে চলা বা উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করার ব্যাপারে অনিচ্ছুক হয়ে পড়েছেন। এটা খুবই খারাপ কথা এবং এর জন্য পরে তাঁদের কষ্টভোগ করা অবধারিত হয়ে পড়বে। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের জনবল ও বৈষয়িক সম্পদকে মহামূল্যজ্ঞানে রক্ষা করা চাই এবং সংকীর্ণ দৃষ্টি গ্রহণ করে অপব্যয় ও অযথা ব্যয়ে মশগুল হওয়া চলবে না। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের কাজের একেবারে প্রথম বছরেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে সামনের অনেকগুলি বছর ধরে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে, প্রতি-আক্রমণ সংগঠিত করতে হবে এবং শত্রুকে বিতাড়নের পর পুনর্গঠনের কাজকর্ম পরিচালনা করতে হবে। একদিকে তাই আমরা অপব্যয় ও অযথা ব্যয় যেমন করব না, অন্যদিকে তেমনি সক্রিয়ভাবে উৎপাদন প্রসারিত করে যাব। অতীতে, কোন কোন স্থানে দূরদৃষ্টি গ্রহণ না করার জন্য এবং উৎপাদনের প্রসার না ঘটানোর জন্য, জনবল ও বৈষয়িক সম্পদকে মিতব্যয়িতার সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবহেলার জন্য জনগণকে অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। এই শিক্ষা আমাদের সামনে রয়েছে এবং তাই এ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ব্যাপারে বলা যায়, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল তুলো, সুতীবস্ত্র, লোহা, কাগজ ও অন্যান্য বহু জিনিসপত্রের ব্যাপারে দু'বছরের মধ্যে পুরোপুরি আত্মনির্ভর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এখানে যা কিছুরই উৎপাদন হয় না বা সামান্য মাত্রই উৎপাদন হয় সে সব কিছুই আমাদের উৎপাদন করতে হবে, তৈরী করতে হবে, সেগুলির সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে এবং আদৌ বাইরের ওপর নির্ভর করা চলবে না। এই গোটা কাজটিকে যৌথ, ব্যক্তিগত ও সমবায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। এই সকল জিনিসের ব্যাপারে আমরা শুধু পরিমাণই চাই না, চাই তাদের গুণগত উৎকর্ষও অর্থাৎ সেগুলি বেশ টেঁকসই হওয়া চাই। সীমান্ত অঞ্চলের সরকার, অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর যুক্ত প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর

এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উত্তর-পশ্চিম ব্যুরো এইসব ব্যাপারে নিবিড় দৃষ্টি প্রদান করে একান্ত সঠিক কাজই করেছে। আমি আশা করি, যুদ্ধের ফ্রন্টের সকল স্থানে এইভাবেই কাজ করা হবে। অনেক জায়গায় ইতিমধ্যেই কাজটি শুরু করে দেওয়া হয়েছে, আমি তাদের সাফল্যই কামনা করছি।

আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে ও অন্যান্য মুক্ত এলাকাতে অর্থনৈতিক সকল বিভাগের কাজকর্ম শিখে নিতে আমাদের আরও দুই বা তিন বছর সময় লাগবে। যেদিন আমরা সব কিছুই বা অন্ততঃ আমাদের অধিকাংশ খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারব বা আমাদের প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র বা অন্ততঃ আমাদের অধিকাংশ জিনিসপত্র তৈরী করতে পারব এবং পুরোপুরি বা মূলতঃ আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারব, এমনকি বেশ কিছু উদ্বৃত্তই উৎপাদন করতে পারব, সেই দিনটিতে এ কথাও বলা যাবে যে গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রতিটি শাখাতেই আমরা দক্ষতা অর্জন করে ফেলেছি। মহানগর-গুলিকে শত্রুকবলমুক্ত করার পর, আমরা অর্থনৈতিক ব্যাপারে নতুন নতুন শাখায় কাজকর্ম শুরু করতে পারব। আমাদের প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে এবং শিক্ষা নিতে হবে কারণ চীন তার পুনর্গঠনের জন্য আমাদের ওপরই নির্ভর করে রয়েছে।

গেরিলা অঞ্চলগুলিতেও উৎপাদন করা সম্ভব

৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৫

শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্বর্তী তুলনামূলকভাবে সুদৃঢ় মুক্ত অঞ্চলের সৈন্য-বাহিনী এবং জনগণের মধ্যে উৎপাদন অভিযান পরিচালনা করা যায় এবং তা পরিচালনা করতেই হবে এ কথা ইতিমধ্যেই মেনে নেওয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু গেরিলা অঞ্চলসমূহে এবং শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্বর্তী সুদূর অঞ্চলে তা পরিচালনা করা যায় কিনা বহুজনের মনেই প্রমাণের অভাবে এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি এখনো হয়ে যায়নি।

কিন্তু প্রমাণ তো রয়েছে। ১৯৪৪ সালে বহু গেরিলা অঞ্চলেই ব্যাপক আকারে উৎপাদনের কাজকর্ম শুরু করা হয়েছে আর চমৎকার সুফলই তা থেকে পাওয়া গেছে; এবং কমরেড চ্যাঙ পিং-কাইয়ের শানসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলের গেরিলা ইউনিটগুলিতে উৎপাদন অভিযান সম্পর্কে যে রিপোর্ট **লিবারেশন ডেইলির** ২৮শে জানুয়ারির সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে এটা দেখা যাচ্ছে। তাঁর রিপোর্টে যেসব জেলা ও ইউনিটের তালিকা রয়েছে তা হচ্ছে: মধ্য হোপেইতে ষষ্ঠ উপবিভাগ, দ্বিতীয় উপবিভাগের চতুর্থ জেলাবাহিনী, চতুর্থ উপবিভাগের অষ্টম জেলাবাহিনী, সুসহুই-তিংশিয়েন বাহিনী, পাওতিং মানচেং বাহিনী এবং য়ুনপিয়াও বাহিনী; এবং শানসিতে তাইসিয়েন ও কুয়োসিয়েন বিভাগের সৈন্যবাহিনী। ঐসব অঞ্চলের অবস্থা খুবই প্রতিকূল:

> সারা তল্লাট জুড়ে শত্রু ও ক্রীড়নকদের ঘাঁটি এবং বন্দী শিবিরগুলি সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে আর সর্বত্র খাল নালা, প্রাচীর, পরিখা ও রাস্তাঘাট ছড়িয়ে রয়েছে; সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার সুযোগ নিয়ে শত্রুরা প্রায়ই আচমকা আক্রমণ অভিযান চালায়, অবরোধ রচনা করে এবং আমাদের বিরুদ্ধে 'নিশ্চিহ্ন করার' অভিযানে মেতে ওঠে। পরিস্থিতিটা এমন যে একদিনেই গেরিলা ইউনিটগুলিকে কয়েকবার তাদের স্থান বদল করতে হয়।

ইয়েনান-এর **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকার পক্ষ থেকে এই সম্পাদকীয়টি কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন।

তা সত্ত্বেও, গেরিলা ইউনিটগুলি যুদ্ধবিগ্রহের ফাঁকে ফাঁকে উৎপাদনের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে; তার ফল হয়েছে:

প্রত্যেকেই এখন ভাল করে খেতে পারছে, প্রত্যেকটি লোকই প্রতিদিন ০·৫ লিয়াং করে রান্নার তেল ও লবণ পাচ্ছে এবং ১ চিন করে তরিতরকারি পাচ্ছে, প্রতিমাসে ১·৫ চিন করে মাংস পাচ্ছে। তাছাড়া গত কয় বছর ধরে যে টুথ-ব্রাশ, টুথ-পাউডার ও বর্ণপরিচয়ের প্রাথমিক বই পাওয়া যাচ্ছিল না, তা এখন সবাইকে দেওয়া যাচ্ছে।

একবার ভেবে দেখুন। কে বলেন গেরিলা অঞ্চলে উৎপাদন করা সম্ভব নয়?

অনেকে দাবি করেন, ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে বাড়তি জমি নেই। সত্যিই কি বাড়তি জমি নেই? আবার দয়া করে শানসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলের দিকে তাকান:

কৃষির প্রতি প্রাথমিক মনোযোগ প্রদানের নীতি অনুসারে জমির সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এখানে নয়টি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে: (১) অবরোধের উদ্দেশ্যে শত্রু যে দেয়ালগুলি ব্যবহার করে সেগুলি গুড়িয়ে দিয়ে এবং ডোবাগুলি ভরাট করে দিয়ে; (২) মোটর যাতায়াত করতে পারে এমন যেসব রাস্তা শত্রু ব্যবহার করতে পারে সেগুলি নষ্ট করে সেখানে রাস্তার ওপরে ফসল লাগিয়ে; (৩) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতিত জমি ব্যবহারের উপযোগী করে তুলে; (৪) সশস্ত্র গণ-রক্ষীবাহিনীকে সশস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে জ্যোৎস্নার রাত্রে শত্রুর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বন্দী শিবির-গুলির চারিপাশের জমিতে ফসল লাগিয়ে; (৫) যেসব কৃষকদের শ্রমকারী জনবল কম আছে তাদের সঙ্গে অংশীদারীর ভিত্তিতে জমি চাষ করে দিয়ে; (৬) শত্রুর ঘাঁটি অথবা বন্দীশিবিরগুলির চারিপাশের জমি কৃষকদের বেশে সৈন্যদের কাজে লাগিয়ে মোটামুটি খোলাখুলিভাবে চাষ করে; (৭) নদীতে বাঁধ বেঁধে, বালি সরিয়ে নদীতীরকে কাজে লাগিয়ে ফসল চাষের জন্য ব্যবহার করে; (৮) শুকনো জমিতে জলসেচের ব্যাপারে কৃষকদের সাহায্য করে; এবং (৯) যেসব গ্রামে গেরিলা [illegible] সক্রিয়তা রয়েছে সেখানে খামারের কাজে সহায়তা করার মধ্য দিয়ে—তা করা হয়েছে।

কিন্তু কৃষিকাজই যদি সম্ভবপর হয় তবে কি হস্তশিল্প ও অন্যান্য উৎপাদনের

কাজ অসম্ভব হয়ে পড়ে রয়েছে? অবস্থাটি কি তাই? দয়া করে শানসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলের দিকে তাকান :

শত্রুর অবরোধের লাইনের বা অবরোধের জন্য ব্যবহৃত জলাভূমিগুলির নিকটবর্তী সৈন্যরা নিজেদের উৎপানকার্যকে সুদৃঢ় অঞ্চলগুলির মতো শুধু কৃষির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখে না, হস্তশিল্প ও পরিবহন ব্যবস্থাও তাঁরা গড়ে তুলেছেন। চতুর্থ জেলার বাহিনীটি ফেল্টের টুপি নির্মাণের একটি কারখানা গড়ে তুলেছে, তৈলবীজ পেষাই-এর একটি ঘানি ও একটি ময়দার কল স্থাপন করেছে এবং সাত মাসে আঞ্চলিক মুদ্রার হিসেবে ৫,০০,০০০ মুনাফা লাভ করেছে। তারা যে শুধু নিজেদের অসুবিধাগুলি দূর করে দিতে পেরেছে তাই নয়, তারা এই গেরিলা অঞ্চলের জনগণের প্রয়োজনও মেটাতে পারছে। সৈন্যরা এখন নিজেদের সকল উলের সোয়েটার ও মোজা নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারছেন।

যেহেতু সামরিক অভিযান গেরিলা অঞ্চলসমূহে খুবই ঘন ঘন পরিচালিত হয় তাই সৈন্যরা যদি উৎপাদনে লিপ্ত থাকেন তবে যুদ্ধবিগ্রহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলেই মনে হয় না কি? অবস্থাটা আসলে তাই কি? দয়া করে শানসি-চাহার-হোপেই সমান্ত অঞ্চলের দিকে তাকান :

শ্রমশক্তি ও সশস্ত্র শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের নীতি প্রয়োগ করে তাঁরা উৎপাদন ও যুদ্ধবিগ্রহের কাজে সমান গুরুত্বই দিয়ে থাকেন।

এবং

দ্বিতীয় উপবিভাগের চতুর্থ জেলাবাহিনীর কথাই দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরুন তাঁরা যখন তাঁদের বসন্তকালীন চাষবাস শুরু করলেন তখন তাঁরা একটি বিশেষ বাহিনীকে পাঠালেন শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য এবং একই সঙ্গে জোরদার রাজনৈতিক আক্রমণ অভিযান চালালেন। ঠিক এই কারণের জন্যই সামরিক ক্ষেত্রেও কাজকর্ম অনেক জোরদার হয়ে উঠল এবং সৈন্য-বাহিনীর কার্যকর যুদ্ধ করার ক্ষমতাও এতে বৃদ্ধি পেল। ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিক পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনীগুলি ৭১টি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, চতুংশে, শাংচুয়াং, ইয়েচুয়াং, কেংচিয়া চাই এবং আইতাউ-এর শত্রু ঘাঁটিগুলি তারা দখল করে নেয়, শত্রুর ও ক্রীড়নকবাহিনীর ১৬৫ জন সৈন্যকে হতাহত করে, ৯১ জন ক্রীড়নক সৈন্যকে গ্রেপ্তার করে, ৩টি লাইট-মেশিনগান ও ১০১টি রাইফেল ও পিস্তল দখল করে।

এবং

ব্যাপক উৎপাদনের জন্য প্রচার অভিযানকে সামরিক কার্যকলাপের সঙ্গে সুসমন্বিত করে তাঁরা অবিলম্বে একটি রাজনৈতিক অভিযান শুরু করলেন এই মূল লক্ষ্য নিয়ে: 'যে কেউই মহান উৎপাদন অভিযানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টা করবে, তাকে চুরমার করে দিন।' জেলাশহর তাইসিয়েন ও কুওসিয়েনে শত্রুরা ঐ শহরগুলির অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করেছিল: 'অষ্টম রুট' সেনাবাহিনী সম্প্রতি এত কঠিন-কঠোর হয়ে উঠেছে কেন? তাঁরা জবাবে বললেন: তোমরা সীমান্ত অঞ্চলের মহান উৎপাদন অভিযানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টা করছ, তার জন্যই এটা হয়েছে। ক্রীড়নক সৈন্যরা একে অন্যে বলাবলি করছিল: 'ওরা যখন উৎপাদন অভিযান চালাচ্ছে তখন তফাৎ থাকাই ভাল কাজ হবে।'

গেরিলা অঞ্চলের জনগণকেও কি উৎপাদন অভিযান পরিচালনায় সমবেত করা সম্ভব? ঐসব এলাকায় কৃষকেরা উৎপান বৃদ্ধির ব্যাপারে আগ্রহী কি করে হবে, কারণ সম্ভবতঃ খাজনা ও সুদ হ্রাস করার ব্যাপারটা সেখানে এখনো পুরোপুরিভাবে চালু হয়নি? শানসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলে এই প্রশ্নের সদর্থক জবাবই দেওয়া হয়েছে:

তাছাড়া, শত্রুর অবরোধের লাইন ও অবরোধের জন্য নির্মিত জলাভূমির নিকটবর্তী সৈনিকেরা আঞ্চলিক জনগণকে উৎপাদন অভিযান বিস্তারিত করে তুলতে প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রদান করে। উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত জনগণকে একদিকে তাঁরা সশস্ত্রভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন এবং অন্যদিকে, তাঁদের শ্রম শক্তি দিয়ে তাঁরা জনগণকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেন। কিছু কিছু ইউনিট এই নিয়মই চালু করেছেন যে পুরোদমে চাষবাসের কাজের সময় তাঁরা তাঁদের জনগণকে শতকরা ৫০ জনকেই জনগণের হয়ে বিনা মজুরিতে ওদের কাজে সাহায্য করার জন্য বরাদ্দ করে দেবে। এভাবে, উৎপাদনের জন্য জনগণের উদ্দীপনা খুবই বেড়ে গেছে, সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক আরও সুসমন্বিত হয়েছে এবং জনগণেরও যথেষ্ট খাদ্য রয়েছে। সুতরাং গেরিলা অঞ্চলগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি ও অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর প্রতি জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন বেড়ে গেছে।

গেরিলা অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী ও জনগণ ব্যাপক আকারে উৎপাদন অভিযান পরিচালনা করতে পারবেন এবং তা তাঁদের পরিচালনা করতে হবেই

কিনা এই সম্পর্কে সকল সংশয়ের জবাবই পাওয়া গেছে। মুক্ত অঞ্চলের এবং বিশেষ করে গেরিলা অঞ্চলের সকল পার্টি, সরকার ও সৈন্যবাহিনীর কর্মীদের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি এই বিষয়টি তাঁরা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করুন কারণ একবার যদি তাঁরা 'পারা' এবং 'পারতেই হবে'র ব্যাপারটা উপলব্ধি করে নিতে পারেন, তবে সর্বত্রই উৎপাদনের কাজটি শুরু হয়ে যাবে। ঠিক এই বিষয় থেকেই শেনসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলে কাজটি শুরু করে দেওয়া হয়েছিল :

> শত্রুর অবরোধের লাইন ও অবরোধের জন্য নির্মিত পরিখার নিকটবর্তী অঞ্চলে সৈন্যরা উৎপাদন অভিযানে শুধু যে তাঁদের উৎপাদন পরিকল্পনা সময়সূচী অনুসারে মাত্র পাঁচ মাস সময়ের মধ্যে সফল করে তুলতে পেরেছেন তাই নয়, তার চেয়েও বড় কথা তাঁরা কয়েকটি বাস্তব নতুন উদ্ভাবনাকেও কার্যকর করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছিল এইজন্য যে কর্মীরা তাঁদের চিন্তাকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছিলেন, তাঁরা উৎপাদনের ব্যাপারে গুরুতর মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং শ্রমশক্তিকে সামরিক শক্তির সঙ্গে সুসংহত করতে পেরেছিলেন এবং জনগণের মধ্য থেকেই শ্রমবীর ও আদর্শ কর্মীদের খুঁজে বের করেছেন (প্রাথমিক হিসেব থেকে দেখা গেছে ৬৬ জন শ্রমবীর ও আদর্শ কর্মী বেরিয়ে এসেছেন)।

১৯৪৫ সালে, মুক্ত এলাকাকে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে আগের চেয়ে আরও বিরাটতর একটি সামরিক ও অসামরিক উৎপান অভিযান চালাতে হবে এবং আগামী শীতকালে আমরা সকল এলাকার সাফল্যগুলিকে তুলনা করে দেখব।

যুদ্ধ শুধু সামরিক ও রাজনৈতিক একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নয়, তা একটি অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বটে। জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করার জন্য অন্য সব কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক কাজেও আত্মনিয়োগ করতে হবে এবং দুই কি তিন বছরের মধ্যেই তা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। বর্তমান বছরে, ১৯৪৫ সালে, আমাদের আগের চেয়ে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করতে হবে। সমগ্র মুক্ত অঞ্চলের সমস্ত জনগণের কাছে ও সকল কর্মীদের কাছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সাগ্রহে এইটুকুই প্রত্যাশা করে এবং আমরা আশা করি, এই লক্ষ্যটি অর্জিত হবেই।

চীনের দুটি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ

২৩শে এপ্রিল, ১৯৪৫

কমরেডগণ! চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসর আজ উদ্বোধন হল।

আমাদের এই কংগ্রেসের তাৎপর্যটি কী? বলতে হয়, এটা হচ্ছে এমন একটা কংগ্রেস যা চীনের ৪৫ কোটি জনগণের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করবে। দুটি ভবিষ্যতের একটিই চীনের হতে পারে। কে একজন তার একটি নিয়ে একখানি বই লিখেছেন[১]; আমাদের কংগ্রেস চীনের অন্য ভবিষ্যতের কথাই বলবে এবং আমরাও এ নিয়ে একখানি বই লিখব।[২] আমাদের কংগ্রেসের লক্ষ্য হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করা এবং চীনের সমগ্র জনগণকে মুক্ত করা। আমাদের কংগ্রেস হচ্ছে জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করার এবং একটি নতুন চীন গড়ে তোলার কংগ্রেস, সমগ্র চীনা জনগণের এবং সমগ্র দুনিয়ার জনগণের ঐক্যের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের কংগ্রেস।

সময় আমাদের খুবই অনুকূলে। ইউরোপে হিটলার শীঘ্রই উৎখাত হবে। বিশ্বের ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের প্রধান রণক্ষেত্র হচ্ছে পাশ্চাত্যে যেখানে অচিরেই বিজয়ের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত লালফৌজের প্রয়াসের জন্য যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে। ইতিমধ্যেই লালফৌজের কামান-গর্জন বার্লিনে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে এবং অনতিবিলম্বেই সম্ভবতঃ তার পতন ঘটবে। প্রাচ্যেও জাপানী সাম্রাজ্য-বাদীদের উচ্ছেদের জন্য যুদ্ধের বিজয় সন্নিকটবর্তী। ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালেই আমাদের এই কংগ্রেসের অধিবেশন বসছে।

চীনের জনগণের সামনে দুটি পথ রয়েছে, একটি হচ্ছে আলোকের পথ, আর অন্যটি অন্ধকারের। চীনের সামনে দুটি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ, একটি হচ্ছে আলোকময় ভবিষ্যৎ, আর অন্যটি হচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এখনো পরাজিত হয়নি। কিন্তু তার পরাজয়ের পরও এই দুটি সম্ভাবনাই আমাদের সামনে থেকে যাবে। হয় তা হবে মুক্ত, স্বাধীন,

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধনী বক্তৃতা।

গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ, সমৃদ্ধ ও শক্তিমান একটি চীন অর্থাৎ আলোকোদ্ভাসিত একটি চীন, এমন একটি নতুন চীন যার জনগণ অর্জন করেছে তাদের মুক্তি, আর নয়তো তা হবে আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, খণ্ডবিখণ্ড, দরিদ্র ও দুর্বল অর্থাৎ পুরানো একটি চীন। নতুন চীন না পুরানো চীন— চীনের জনগণের সামনে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সামনে এবং আমাদের কংগ্রেসের সামনে এই হচ্ছে দুটি সম্ভাবনা।

যেহেতু জাপান আজও পরাজিত হয়নি এবং যেহেতু তার পরাজয়ের পরও দুটি সম্ভাবনাই আমাদের সামনে থেকে যাবে তাই আমরা কিভাবে কাজকর্মে হাত দেব? আমাদের কাজটা কী? আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে নির্ভীকভাবে জনগণকে সমবেত করা, জনগণের শক্তিগুলিকে সম্প্রসারিত করা এবং ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব জাতির এমন সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের পার্টির নেতৃত্বে জাপানী সাম্যজ্যবাদীদের পরাজিত করা এবং সমুজ্জল নতুন এক চীন গড়ে তোলা, যে চীন হবে মুক্ত, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ, সমৃদ্ধ ও শক্তিমান। আমাদের সকল শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে উজ্জ্বল একটি ভবিষ্যৎ, আলোকোজ্জ্বল একটি ভবিষ্যতের জন্য এবং প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে অন্ধকার ভবিষ্যতের ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে। এই হচ্ছে আমাদের এক এবং একটিমাত্র কাজ। বস্তুতঃ এই হচ্ছে আমাদের কংগ্রেসের, আমাদের সমগ্র পার্টির এবং চীনের সমগ্র জনগণের একমাত্র কাজ।

আমাদের প্রত্যাশা কি পূর্ণ হতে পারে? আমরা বিশ্বাস করি, পারে। সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ আমরা ইতিমধ্যেই নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূর্ণ করেছি:

(১) শক্তিমান, সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ১২,১০,০০০ সদস্যের একটি কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের রয়েছে।

(২) ৯,৫৫,০০০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত শক্তিমান মুক্ত অঞ্চল, ৯,১০,০০০ সৈন্যের একটি সেনাবাহিনী ও ২২,০০,০০০ সশস্ত্র গণ-রক্ষীবাহিনী আমাদের রয়েছে।

(৩) সমগ্র দেশব্যাপী জনগণের সমর্থন রয়েছে।

(৪) সকল দেশের, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের সমর্থন রয়েছে।

এই শর্তগুলি পূর্ণ করে—একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি, শক্তিশালী

মুক্ত অঞ্চল, দেশব্যাপী জনগণের সমর্থন এবং দুনিয়ার জনগণের সমর্থন নিয়ে— আমাদের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করা যাবে? আমরা বিশ্বাস করি তা করা যাবে। এর আগে কোন সময়ই চীনে এই অবস্থাগুলি বর্তমান ছিল না। কয়েকটি মাত্র কয়েক বছর বর্তমান ছিল কিন্তু আজকের মতো এত পূর্ণ আকারে তা কোনকালেই ছিল না। আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি এত শক্তিমান এর আগে কোন সময়ই ছিল না, বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় এমন বিরাট জনসংখ্যা ও এমন বিরাট একটি সৈন্যবাহিনী এর আগে কোন সময়ই ছিল না, জাপানের কবলিত এবং কুওমিনতাঙ এলাকার দুটিতেই জনগণের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদা এর চেয়ে বেশি উঁচু আর কোন সময়ই ছিল না এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবী শক্তিগুলি ও সকল দেশের জনগণ আগের যে-কোন সময়ের চেয়েই এখন বেশি শক্তিশালী। বলতেই হচ্ছে এই শর্তগুলি পূর্ণ হয়েছে বলে আক্রমণকারীদের পরাজিত করা এবং নতুন একটি চীন গড়ে তোলা সম্পূর্ণভাবেই সম্ভব।

আমাদের একটি সঠিক কর্মনীতি দরকার। আমাদের কর্মনীতির মূল কথাই হচ্ছে নির্ভীকভাবে জনগণকে সমবেত করা, জনগণের শক্তিগুলিকে সম্প্রসারিত করা যাতে করে আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীনে তারা আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে পারবে এবং নতুন একটি চীন গড়ে তুলবে।

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার পরে নিজের অবস্থানের এই চব্বিশ বছরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের তিনটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের—উত্তরমুখী অভিযান, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধ এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের—মধ্য দিয়ে গিয়েছে এবং সংগ্রহ করেছে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। আজ আমাদের পার্টি জাপানকে প্রতিরোধের জন্য এবং জাতিকে রক্ষা করার জন্য চীনের জনগণের সংগ্রামের মূল ভারকেন্দ্র হয়ে উঠেছে, তাদের মুক্তির সংগ্রামের, আক্রমণকারীদের পরাজিত করার এবং নতুন একটি চীন গড়ে তোলার সংগ্রামের মূল ভারকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। চীনের ভারকেন্দ্রটি ঠিক আমরা যেখানে রয়েছি সেখানেই রয়েছে আর আর অন্য কোথাও নয়।

আমাদের বিনয়নম্র হতে হবে ও আমাদের সুবিবেচক হতে হবে, ঔদ্ধত্যের ও অবিবেচনার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং চীনের জনগণকে মনপ্রাণ দিয়ে আমাদের সেবা করতে হবে যাতে করে তাদের ঐক্যবদ্ধ করে জাপানী আক্রমণকারীদের আমরা বর্তমানে পরাজিত করে দিতে পারি এবং

ভবিষ্যতে নয়া-গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারি। যদি আমরা তা করতে পারি, যদি আমাদের সঠিক কর্মনীতি থাকে এবং যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে পারি তবে আমরা সুনিশ্চিতভাবেই আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারব।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক!

চীনের জনগণের মুক্তি দীর্ঘজীবি হোক!

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘজীবি হোক!

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেস দীর্ঘজীবি হোক!

টীকা

১। এখানে ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত চিয়াং কাই-শেকের বই **চীনের ভবিষ্যৎ**-এর কথাই বলা হচ্ছে।

২। এখানে ঐ একই কংগ্রেসে কমরেড মাও-সে-তুঙ-এর রিপোর্ট '**কোয়ালিশন সরকার প্রসঙ্গে**'র কথা বলা হচ্ছে।

কোয়ালিশন সরকার প্রসঙ্গে

২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫

১। চীনের জনগণের দাবিসমূহ

নিম্নে বর্ণিত একটি পরিস্থিতিতে আমাদের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রায় আট বছর ব্যাপী যে দৃঢ়পণ বীরত্বপূর্ণ ও অদম্য সংগ্রাম চীনের জনগণ অপরিমেয় আত্মত্যাগ ও অবর্ণনীয় প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে চালিয়ে এসেছেন তারপর একটি নতুন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে; সামগ্রিকভাবে বিশ্বে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায্য ও পবিত্র যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে এবং মিত্র দেশগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চীনের জনগণ জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করে দেবে এই মুহূর্তটি নিকটবর্তী হয়ে উঠেছে। কিন্তু চীন ঐক্যহীনই রয়ে গেছে এবং এখনো এক গভীর সংকটেরই তা সম্মুখীন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কর্তব্য কী? কোন সন্দেহ নেই, জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী এবং দল-বহির্ভূত জনগণের প্রতিনিধিদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং এমন একটি অস্থায়ী গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করা যে সরকারের লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করা, বর্তমান সংকটকে অতিক্রম করা, দেশের সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিগুলিকে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ করে মিত্রদেশগুলির সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় স্থাপন করে জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করা এবং এভাবে ওদের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য চীনের জনগণকে সমর্থ করে তোলা। তারপর প্রয়োজন ব্যাপক গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে একটি জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা যে সরকার প্রকৃতির দিক থেকেও হবে কোয়ালিশন সরকার এবং যাতে সকল দল ও গ্রুপ অথবা দল-বহির্ভূত লোকদের ব্যাপকতর প্রতিনিধিত্ব থাকবে এবং যা সমগ্র দেশের মুক্ত জনগণকে একটি স্বাধীন, মুক্ত, গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী চীন গড়ে

এটি হচ্ছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর প্রদত্ত রাজনৈতিক রিপোর্ট।

তোলার পথে পরিচালিত করবে। সংক্ষেপে, আমরা গ্রহণ করব ঐক্য এবং গণতন্ত্রের, .আক্রমণকারীদের পরাজয় সাধনের এবং নয়া চীন গড়ে তোলার লাইন।

আমরা বিশ্বাস করি, একমাত্র এর মধ্য দিয়েই চীনের জনগণের মৌলিক দাবিগুলি অভিব্যক্ত হয়ে উঠতে পারে। একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত কিনা তা চীনের জনগণের কাছে এবং মিত্রদেশগুলির গণতান্ত্রিক জনমতের কাছে গভীর উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমার রিপোর্ট এই প্রশ্নটির ব্যাখ্যানের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আট বছরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এসেছে এবং বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে; কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে করে আমাদের পার্টি ও জনগণের সামনে এখনো গুরুতর বাধাবিপত্তি রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি দাবি জানাচ্ছে যে আমাদের পার্টিকে আরও দৃঢ়বদ্ধভাবে, আরও গভীরভাবে কাজ করে যেতে হবে, বাধা-বিপত্তিগুলিকে অবিরত অতিক্রম করে যেতে হবে এবং চীনের জনগণের মৌলিক দাবিগুলিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে।

২। আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

চীনের জনগণ কি এইসব মৌলিক দাবিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে পারবে? তা নির্ভর করবে তাদের রাজনৈতিক চেতনার, তাদের ঐক্য এবং তাদের প্রয়াসের ওপর। একই সঙ্গে, বর্তমান আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি খুবই অনুকূল সুযোগ সৃষ্টি করেছে। চীনের জনগণ যদি এই অনুকূল সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারে এবং দৃঢ়তা সহকারে, উদ্দীপনা সহকারে এবং অবিচলিতভাবে সংগ্রাম অব্যাহতগতিতে চালিয়ে যেতে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে তারা আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে এবং নয়া চীন গড়ে তুলতে পারবে। এই পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনের সংগ্রামে তাদের প্রয়াসকে চতুর্গুণ করে তুলতে হবে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিটি কী?

বর্তমান সামরিক পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বার্লিনে আক্রমণ চালাচ্ছে এবং ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মিত্রবাহিনীগুলি এই

আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হিটলারীয় ভগ্নাবশেষের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে অন্যদিকে ইতালীয় জনগণ অভ্যুত্থান পরিচালনা করছে। এই সবকিছু মিলে হিটলারকে একেবারে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। হিটলারের বিলুপ্তির পর জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজয় আর দূরে থাকবে না। চীনা ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের ভবিষ্যদ্বাণীর বিপরীতটিই ঘটেছে, ফ্যাসিষ্ট আগ্রাসনের শক্তিগুলি নিঃসন্দেহেই উৎখাত হবে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি নিঃসন্দেহে বিজয়ী হবে। বিশ্ব যে প্রগতির পথেই যাবে এবং প্রতিক্রিয়ার পথে যাবে না, সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন নেই। অবশ্য আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে এবং ঘটনার গতিধারায় কিছু কিছু সাময়িক অথবা বেশ গুরুতর রকমের সম্ভাব্য বাঁক ও মোড়ের ব্যাপারেই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। বহু দেশে এখনো শক্তিশালী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি রয়ে গেছে যারা স্বদেশের ও বিদেশের জনগণের ঐক্য, প্রগতি ও মুক্তির ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণ করে। এই সম্ভাবনা সম্পর্কে চোখ বুঁজে থাকলে রাজনৈতিকভাবে ভুল করা হবে। কিন্তু ইতিহাসের সাধারণ গতিধারা ইতিমধ্যেই পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং তার কোন পরিবর্তন হবে না। এটা শুধু ফ্যাসিষ্টদের এবং সকল দেশের যে প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাদের মদৎদার তাদের পক্ষেই অশুভ ব্যাপার কিন্তু জনগণের পক্ষে এবং সকল দেশের সংগঠিত গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে তা একটি আশীর্বাদ-স্বরূপ। জনগণ এবং একমাত্র জনগণই বিশ্ব-ইতিহাসের সঞ্চালক শক্তি। সোভিয়েত জনগণ বিপুল শক্তি গড়ে তুলেছে এবং ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ক্ষেত্রে প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছে। তাদের প্রয়াস এবং তার সঙ্গে ফ্যাসি-বিরোধী অন্যান্য মিত্রদেশের শক্তিগুলি যুক্ত হয়ে ফ্যাসিবাদের বিনাশকে সম্ভবপর করে তুলেছে। যুদ্ধ জনগণকে শিক্ষিত করে তুলেছে এবং জনগণই যুদ্ধ করবে, জয় করে আনবে শান্তি ও প্রগতি।

এই নতুন পরিস্থিতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির চেয়ে অনেক ভিন্ন। তখনো সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্ভবই ঘটেনি এবং আজ বহু দেশে জনগণ যে রকম রাজনৈতিকভাবে সজাগ তখন তারা এমনটি ছিল না। দুটি বিশ্বযুদ্ধ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন যুগেরই অভিব্যক্তি।

এ থেকে এটা বোঝায় না যে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারী দেশগুলির পরাজয়ের, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের এবং আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার পর আর কোন সংগ্রাম হবে না। ফ্যাসিবাদের ভগ্নাবশেষের যে শক্তিগুলি এখনো সুপরিব্যাপ্ত

তারা নিশ্চিতভাবেই গোলমাল বাধাবে, অন্তদিকে ফ্যাসিষ্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শিবিরের মধ্যেও এমন সব শক্তি রয়েছে যারা গণতন্ত্রের বিরোধী এবং অন্যান্য জাতিদের নিপীড়ন করে এবং তারা বিভিন্ন দেশে, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে জনগণকে নিপীড়ন করেই যাবে। সুতরাং আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিশ্বের ব্যাপকতর অঞ্চলে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনগণ এবং ফ্যাসিবাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে, গণতন্ত্র ও গণতন্ত্র-বিরোধীদের মধ্যে, জাতীয় মুক্তি ও জাতীয় নিপীড়নের মধ্যে নানাবিধ সংগ্রাম অব্যাহতই থাকবে। একমাত্র দীর্ঘ ও অবিচল প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের অবশিষ্ট শক্তিগুলির, গণতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলির এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পরাজয় সাধনের দ্বারাই জনগণ সর্বাপেক্ষা পরিব্যাপ্ত বিজয় অর্জন করিতে পারবে। তবে এটা সুনিশ্চিত, ঐ দিনটি খুব দ্রুত বা সহজে আসবে না, কিন্তু ঐ দিনটি নিশ্চিতভাবেই আসবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসি-বিরোধী বিজয় জনগণের যুদ্ধোত্তর সংগ্রামের বিজয়ের পথকেই উন্মুক্ত করে দেবে। একমাত্র এইসব সংগ্রামে বিজয় অর্জিত হলেই একটি স্থায়ী ও সুস্থির শান্তি সুনিশ্চিত হবে।

বর্তমান আভ্যন্তরীণ অবস্থাটি কী ?

চীনের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চীনের জনগণের কাছ থেকে বিরাট ত্যাগ আদায় করেছে এবং তা অব্যাহতভাবে এই ত্যাগ আদায় করেই যাবে, কিন্তু একই সঙ্গে এই যুদ্ধ তাদের মজবুতও করে তুলেছে। গত একশ বছরের তাদের সকল সংগ্রামের চেয়েও এই যুদ্ধ চীনের জনগণকে অনেক বেশি পরিমাণে জাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছে। চীনের জনগণ শুধু সাংঘাতিক একটি জাতীয় শত্রুরই সম্মুখীন হয়নি, তারা সম্মুখীন হয়েছে এমন একটি আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির যা কার্যতঃ শত্রুকেই সাহায্য করে চলেছে। এই হচ্ছে চিত্রের একটি দিক। কিন্তু অন্যদিক হচ্ছে এই যে চীনের জনগণ শুধু আগের যে-কোন সময়ের চেয়ে রাজনৈতিকভাবে বেশি সচেতন তাই নয়, তারা গড়ে তুলেছে শক্তিশালী মুক্ত এলাকা এবং এমন একটি জাতিজোড়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন যা দিনের পর দিন বেড়েই উঠছে। এইগুলি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির অনুকূল দিক। যদি গত একশ বছরের চীনের জনগণের সংগ্রামের পরাজয় ও ব্যর্থতা কিছু কিছু আবশ্যকীয় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির অনুপস্থিতির জন্যই ঘটে থেকে থাকে, তবে আজকের পরিস্থিতিটি

স্বতন্ত্র—আজ কিন্তু সকল আবশ্যকীয় পরিস্থিতিই বর্তমান। পরাজয় পরিহারের এবং বিজয় অর্জনের সমস্ত সম্ভাবনাই আজ বর্তমান রয়েছে। আমরা যদি দৃঢ়পণ সংগ্রামে সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি ও তাদের উপযুক্ত নেতৃত্ব প্রদান করতে পারি, তবে আমরা বিজয়ী হবই।

আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে এবং নয়া চীন গড়ে তুলতে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে এ ব্যাপারে চীনের জনগণের আস্থা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি। সমস্ত বাধাবিপত্তিকে জয় করা ও তাদের মৌলিক দাবিকে, তাদের মহান ঐতিহাসিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করার সময় আজ তাদের সামনে এসেছে। এতে কি কোন সন্দেহ আছে? আমি মনে করি, এতে কোন সন্দেহই নেই।

এই হচ্ছে আজকের সাধারণ আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি।

৩। জাপ-বিরোধী যুদ্ধে দুটি লাইন

চীনের সমস্যাবলীর মূল চাবিকাঠি

আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির কথা বলতে গেলে আমাদের চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধের সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণও করতে হবে।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পাঁচটি বৃহত্তম দেশের চীন হচ্ছে একটি এবং এশিয়া মহাদেশে জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত তা প্রধান দেশ। শুধু জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই যে চীনের জনগণ খুব বিরাট একটি ভূমিকা পালন করেছে তাই নয়, যুদ্ধোত্তর বিশ্বে শান্তিরক্ষার সংগ্রামে তারা খুবই বিরাট একটি ভূমিকা পালন করবে এবং প্রাচ্যে শান্তিরক্ষার ব্যাপারেও তারা একটি চূড়ান্ত নির্ধারক ভূমিকাই পালন করবে। নিজেকে মুক্ত করার জন্য এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের আট বছরে মিত্র দেশগুলিকে সাহায্য করার জন্য চীন খুবই বিরাট প্রয়াস চালিয়ে এসেছে। প্রধানতঃ চীনের জনগণই এই প্রয়াস চালিয়ে এসেছে। চীনের সৈন্যবাহিনীর বিপুল সংখ্যক অফিসার ও সৈনিকেরা রণক্ষেত্রে সংগ্রাম করেছেন এবং আপন রক্ত ঝরিয়েছেন; চীনের শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পপতিরা পশ্চাদ্ভাগে থেকে কঠোর কাজ করে গেছেন, বিদেশে প্রবাসী চীনেরা যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য অর্থদান করেছেন, এবং জনগণের বিরোধী তাঁদের সদস্যবৃন্দ ছাড়া সমস্ত জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিই যুদ্ধে তাদের ভূমিকা পালন করেছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, তাদের রক্ত ও ঘর্ম দিয়ে চীনের জনগণ দীর্ঘ আট বছর ধরে জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের নির্ভীক সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে চীনা প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই যুদ্ধে চীনের জনগণ যে ভূমিকা পালন করে এসেছে সে ব্যাপারে সত্যটি যাতে বিশ্ব জানতে না পারে তার জন্য মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে আসছে এবং জনমতকে বিভ্রান্ত করে আসছে। তাছাড়া, এই আট বছরের যুদ্ধে চীন যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছে তার পূর্ণাঙ্গ কোন মূল্যায়ন আজও হয়নি। সুতরাং জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য এবং পার্টির নীতি-নির্ধারণের ভিত্তি হাজির করার জন্য বর্তমান কংগ্রেসের উচিত এই সমগ্র অভিজ্ঞতার একটি উপযুক্ত মূল্যায়ন করা।

এ রকম মূল্যায়ন করতে গেলে এটা সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে চীনে এ ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ভিন্ন পরিচালক লাইনই রয়েছে। একটি জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজয় নিয়ে আসবে আর অন্যটি তাদের পরাজয়কে যে শুধু অসম্ভব করে তুলবে তাই নয়, বরং কোন কোন দিক থেকে আসলে তাদের সাহায্যই করবে এবং আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধেরই ক্ষতিসাধন করবে।

জাপানের প্রতি কুওমিনতাঙ সরকারের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি এবং জনগণকে সক্রিয়ভাবে দমন করার তার প্রতিক্রিয়াশীল আভ্যন্তরীণ নীতির পরিণতি হিসেবে সামরিক ব্যর্থতা, বিশাল অঞ্চল হারানো, আর্থিক ও অর্থনৈতিক সংকট, জনগণের নিপীড়ন ও দুঃখযন্ত্রণা এবং জাতীয় ঐক্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে। চীনের জনগণের সকল জাপ-বিরোধী শক্তিকে কার্যকরভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তা জনগণের জাগরণ ও ঐক্যকেই প্রতিহত করেছে। তবু এই রাজনৈতিক জাগরণ ও এই ঐক্যের অগ্রগতি কোন সময়ই রুদ্ধ হয়ে যায়নি, শুধু একটি আঁকাবাঁকা গতিপথ ধরে জাপানী আক্রমণকারীগণ এবং কুওমিনতাঙ সরকারের দ্বিমুখী নিপীড়নের মধ্য দিয়ে তা অগ্রসর হয়েছে। এটা পরিষ্কার, দীর্ঘকাল ধরে চীনে দুটি লাইন চলে আসছে ; একটি হচ্ছে কুওমিনতাঙ সরকারের জনগণকে দমন করার ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের লাইন এবং অন্যটি হচ্ছে, গণযুদ্ধ পরিচালনার জন্য তাদের নিজেদের চেতনা ও ঐক্যকে বৃদ্ধি করার জন্য চীনের জনগণের লাইন। চীনের সকল সমস্যার মূল চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে এইখানেই।

ইতিহাস অনুসরণ করে একটি আঁকাবাঁকা গতিপথ

এই দুই লাইনের প্রশ্নটি কেন চীনের সকল সমস্যার মূল চাবিকাঠি এ কথা যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে তার জন্য জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধের ইতিহাসটি সংক্ষেপে অনুসরণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

চীনের জনগণের প্রতিরোধ-যুদ্ধ অনুসরণ করে এসেছে একটি আঁকাবাঁকা গতিপথ। শুরু হয়েছে তা অনেক আগে সেই ১৯৩১ সালে। ঐ বছরে ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপানী আক্রমণকারীরা শেনইয়াং দখল করে এবং কয়েক মাসের মধ্যে তিনটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ তারা দখল করে নেয়। কুওমিনতাঙ সরকার প্রতিরোধ না করার নীতিই গ্রহণ করে। কিন্তু কুওমিনতাঙ সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় ও সহায়তায় জনগণ এবং ঐ প্রদেশগুলির সৈন্যবাহিনীর একটি দেশপ্রেমিক অংশ জাপ-বিরোধী স্বেচ্ছাসেবী-বাহিনী এবং জাপ-বিরোধী সংযুক্ত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং বীরত্বপূর্ণ গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। একটা সময়ে এই নির্ভীক গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহ এমন বিরাট আকার লাভ করে যে তাদের বহু বাধাবিপত্তি ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া শত্রুর পক্ষে সম্ভব হয়নি। জাপানী আক্রমণকারীরা যখন ১৯৩২ সালে সাংহাই আক্রমণ করে তখন কুওমিনতাঙ-এর দেশপ্রেমিক একটি অংশ কুওমিনতাঙ সরকারকে অমান্য করে এবং জাপানী আক্রমণকারীদের প্রতি-রোধে উনবিংশ রুট সেনাবাহিনীকে তার বিরুদ্ধে পরিচালনা করে। ১৯৩৩ সালে জাপানী আক্রমণকারীরা জেহোল ও চাহার প্রদেশগুলি আক্রমণ করে এবং তৃতীয়-বারের মতো কুওমিনতাঙ-এর একটি দেশপ্রেমিক অংশ কুওমিনতাঙ সরকারের ইচ্ছার বিরোধিতা করে এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করে জাপ-বিরোধী মিত্র সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলে শত্রুকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু জাপানের এই সকল সংগ্রামে যা কিছু সমর্থন তা পুরোপুরি এসেছিল চীনের জনগণ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, অন্যান্য গণতান্ত্রিক গ্রুপ এবং প্রবাসী দেশপ্রেমিক চীনাদের কাছ থেকে, কিন্তু প্রতিরোধ না-করার নীতি অনুসরণকারী কুওমিনতাঙ সরকার এতে কিছুই সাহায্য করেনি। বরং উল্টোদিকে, সাংহাই এবং চাহারের জাপ-বিরোধী দুটো অভিযানই কুওমিনতাঙ সরকার নিজেই বিনষ্ট করে দেয়। ১৯৩৩ সালে, উনবিংশ রুট সেনাবাহিনী ফুকিয়েনে জনগণের যে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল তাকেও কুওমিনতাঙ সরকার ধ্বংস করে দেয়।

ঐ সময়ের কুওমিনতাঙ সরকার প্রতিরোধ-না-করার নীতিটি গ্রহণ করেছিল কেন ? তার প্রধান কারণ ছিল তা কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা ও চীনা জনগণের ঐক্যকে ১৯২৭ সালেই ধ্বংস করে দিয়েছিল।

১৯২৪ সালে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব গ্রহণ করে কুওমিনতাঙ-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেস আহ্বান করেছিলেন, ঐ কংগ্রেসে কমিউনিস্টগণ অংশগ্রহণ করেন। কংগ্রেস রুশদেশের সঙ্গে মৈত্রী, কমিউ-নিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা এবং কৃষকশ্রমিকদের সহায়তাদানের তিনটি মহান নীতি গ্রহণ করে, ওহামপোয়া মিলিটারী একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে এবং কুও-মিনতাঙ, কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের সকল অংশের একটি জাতীয় যুক্ত-ফ্রন্ট গড়ে তোলে। তার ফলে ১৯২৪-২৫ সালে কোয়ানতুং প্রদেশের প্রতিক্রিয়া-শীল শক্তিগুলির বিনাশসাধন করা হয়, ১৯২৬-২৭ সালে পরিচালিত হয়, বিজয়ী উত্তরমুখী অভিযান যার মধ্য দিয়ে ইয়াংসি ও পীতনদী বরাবর অধি-কাংশ অঞ্চলেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র যুদ্ধবাজদের সরকারের পরাজয় ঘটে এবং জনগণের মুক্তিযুদ্ধ চীনের ইতিহাসে কোনদিন যা দেখা যায়নি এ রকম বিরাট ব্যাপ্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। উত্তরমুখী অভিযানের এরকম একটি সংকটময় জটিল মুহূর্তে ১৯২৭ সালের বসন্তকালের শেষের দিকে এবং গ্রীষ্মের প্রথমদিকে কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ 'দল থেকে বিতাড়নের' ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করে চীনের জনগণের মুক্তির মূর্তরূপ কুওমিনতাঙ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনগণের সকল অংশকে নিয়ে গঠিত জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে ভেঙে দেয় এবং তার সকল বিপ্লবী নীতিকেই চুরমার করে দেয়। মাত্র গতকালের মিত্রবাহিনী চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের জনগণই তার শত্রু হয়ে গেল আর গত-কালের শত্রুরা, সাম্রাজ্যবাদীরা ও সামন্তবাদীরা এখন তার মিত্র হয়ে উঠল। তাই দাঁড়ালো অবশেষে, আকস্মিক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণ পরিচালিত হল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের বিরুদ্ধে আর সেই সুমহান, দুর্দান্ত গতিসম্পন্ন ও উদ্দীপ্ত বিপ্লবটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। তারপর ঐক্যের বদলে দেখা দিল গৃহযুদ্ধ, গণতন্ত্রের স্থান দখল করে নিল একনায়কতন্ত্র এবং আলোকোজ্জ্বল চীনে নামল অন্ধকারের কৃষ্ণছায়া। কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণ মাথা নত করল না, পরাজয় মেনে নিল না, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল না। তারা আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল, রক্ত মুছে ফেলে, নিহত কমরেডদের সসম্মানে

কবর দিয়ে আবার সংগ্রামে নেমে গেল। বিপ্লবের মহান পতাকা উচ্চে তুলে তারা সশস্ত্র প্রতিরোধে রুখে দাঁড়াল এবং চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জনগণের সরকার স্থাপন করল, ভূমি সংস্কার কার্যকর করল, গড়ে তুলল জনগণের সৈন্যবাহিনী—চীনের লালফৌজ—এবং চীনের জনগণের বিপ্লবী শক্তিগুলিকে রক্ষা করল আর সম্প্রসারিত করে দিল। ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী তিন গণ-নীতিকে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা খারিজ করে দিয়েছিল —জনগণ, কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণতন্ত্রীরা সেগুলিকেই এগিয়ে নিয়ে চললেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিনটি প্রদেশে জাপানী আক্রমণকারীদের হামলার পর ১৯৩৩ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যেসব কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী ঘাঁটি অঞ্চলসমূহ ও লালফৌজকে আক্রমণ করছিল তাদের কাছে জাপানকে সম্মিলিত-ভাবে প্রতিরোধের স্বার্থে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করল, প্রস্তাবের তিনটি শর্ত হল—আক্রমণ বন্ধ করতে হবে, জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হবে এবং জনগণকে অস্ত্রসজ্জিত করে তুলতে হবে। কিন্তু কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করল।

তারপর থেকে কুওমিনতাঙ সরকারের গৃহযুদ্ধের নীতি ক্রমেই হিংস্র রূপ গ্রহণ করতে লাগল, অন্যদিকে চীনের জনগণের কণ্ঠে ক্রমেই গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার ও জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের জোর দাবি বিঘোষিত হল। সাংহাই ও অন্যান্য বহু স্থানে নানারকম জনপ্রিয় দেশপ্রেমিক সংগঠন গড়ে উঠল। ১৯৩৪ এবং ১৯৩৬ সালের মধ্যে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে ইয়াংসি নদীর উত্তরের ও দক্ষিণের লালফৌজের মূল বাহিনী অবর্ণনীয় দুঃখ-বিপদ তুচ্ছ করে উত্তর-পশ্চিম চীনে চলে গিয়ে ওখানকার লালফৌজের ইউনিটগুলির সঙ্গে মিলিত হল। এই দুবছরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি নতুন পরিস্থিতির উপযোগী পূর্ণাঙ্গ ও নতুন একটি রাজনৈতিক লাইন—জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের এবং নয়া-গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের লাইনটি গ্রহণ করে এবং তাকে রূপায়িত করে চলতে থাকে। ১৯৩৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর পিপিং-এর ছাত্রসাধারণ আমাদের পার্টির নেতৃত্বে একটি নির্ভীক দেশপ্রেমিক আন্দোলন শুরু করে; তারা চীনের জাতীয় মুক্তির অগ্রবাহিনী[১] গড়ে তোলে এবং চীনের সমস্ত বড় বড় শহরে এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেয়। ১৯৩৬ সালের ১২ই

ডিসেম্বর, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্যবাহিনী এবং সপ্তদশ রুট সেনাবাহিনী—জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে আগ্রহী কুওমিনতাঙ-এর দেশপ্রেমিক এই দুটি বাহিনী একত্রে মিলিত হয়ে জাপানের সঙ্গে আপোষ করার এবং দেশের জনগণকে হত্যা করার প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ নীতির সাহসিকতাপূর্ণ বিরোধিতা করে সিয়ানের বিখ্যাত ঘটনাটি ঘটায়। কুওমিনতাঙ-এর অন্যান্য দেশপ্রেমিকেরাও কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষের ঐ সময়কার নীতিতে বিক্ষুব্ধ ছিলেন। এই পরিস্থিতি-তেই কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে তাদের গৃহযুদ্ধের নীতি পরিত্যাগ করে এবং জনগণের দাবিগুলি মেনে নেয়। সিয়ানের ঘটনার শান্তিপূর্ণ সমাধান একটি দিকপরিবর্তনকারী ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়; নতুন এই পরিস্থিতিতে আভ্যন্তরীণ সহযোগিতা রূপায়িত হয়ে ওঠে এবং জাপানের বিরুদ্ধে জাতিজোড়া প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৩৭ সালের মে মাসে লুকৌচিয়াওএর ঘটনার[২] সামান্য কিছু আগে আমাদের পার্টি ঐতিহাসিক জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করে এবং ঐ সম্মেলনে ১৯৩৫ সাল থেকে অনুসৃত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নতুন রাজনৈতিক লাইনটি অনুমোদিত হয়।

১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই লুকৌচিয়াও-এর ঘটনা থেকে ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে উহানের পতন পর্যন্ত কুওমিনতাঙ জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে তুলনামূলকভাবে সক্রিয়ই ছিল। ঐ সময়ের ব্যাপক জাপানী আক্রমণ এবং সমগ্র জনগণের ক্রমবর্ধমান দেশপ্রেমিক ঘৃণার অভিব্যক্তির জন্য জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে কুওমিনতাঙ সরকার তার নীতির মূল ভারকেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয় যার ফলে জাপানের বিরুদ্ধে সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও জনগণের সংগ্রামে একটি বিরাট জাগরণ নিয়ে আসা সহজতর হয় এবং একটা সময়ের জন্য নতুন ও অগ্রগতিসঞ্চারী একটা পরিবেশ রচিত হয়। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য গণতন্ত্রীরা সহ সমগ্র জনগণই একান্তভাবে আশা করেছিলেন যে কুওমিনতাঙ সরকার এই সুযোগটি গ্রহণ করে, জাতির সামনে যখন দারুণ বিপদ ও জনগণ যখন উদ্দীপনায় ভরপুর তখন গণতান্ত্রিক সংস্কার ও ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী তিন গণ-নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলবে। কিন্তু তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। এমনকি তুলনামূলকভাবে সক্রিয় প্রতিরোধের ঐ দুটি বছরেও কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ গণযুদ্ধের জন্য জন-গণকে সমবেত করার বিরোধিতা অব্যাহত রাখে এবং জাপ-বিরোধী ও গণ-তান্ত্রিক অভিযানে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াসে নানা বাধা-

নিষেধ আরোপ করে। যদিও কুওমিনতাঙ সরকার চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য জাপ-বিরোধী পার্টিসমূহের প্রতি তার পূর্বেকার মনোভাব খানিকটা পরিবর্তন করেছিল তবু তা তাদের সমান মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে ও তাদের কার্যকলাপে নানা বিধিনিষেধ অব্যাহতভাবেই আরোপ করে চলতে থাকে। বিরাট সংখ্যক দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক বন্দীদের তখনো তা জেলে আটক করে রেখেছিল। সর্বোপরি, ১৯২৭ সালে গৃহযুদ্ধ চালাবার পর তা যে মুষ্টিমেয় অভিজাতদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল তাই কুওমিনতাঙ সরকার চালিয়ে যেতে লাগল যার ফলে সমগ্র জাতির সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতিনিধিত্বকারী গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা অপূর্ণই রয়ে গেল।

এই অধ্যায়ের একেবারে শুরুতেই আমরা কমিউনিস্টরা জাপানের বিরুদ্ধে চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধের দুটি বিকল্প লাইন সামনে তুলে ধরে বলেছিলাম—হয় গ্রহণ করতে হবে বিজয়ের পথে এগিয়ে চলার সর্বব্যাপ্ত গণযুদ্ধের পথ, আর নয়তো গ্রহণ করতে হবে আংশিক যুদ্ধের পথ যাতে জনগণ নির্যাতিতই থেকে যাবেন আর পরিণামে পরাজয়কেই তা ডেকে আনবে। আমরা এটাও দেখিয়ে দিয়েছিলাম, যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী আর অপরিহার্যভাবে তার পথে দেখা দেবে অসংখ্য বাধাবিপত্তি ও দুঃখ-বিপদ কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের আপন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে চীনের জনগণ নিশ্চিতভাবেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে।

গণযুদ্ধ

ঐ একই অধ্যায়ে কমিউনিস্ট-নেতৃত্বাধীন লালফৌজের যে প্রধান বাহিনীগুলি উত্তর-পশ্চিম চীনে চলে এসেছিল তাদের নতুন করে নামকরণ করা হল চীনের জাতীয় বৈপ্লবিক সৈন্যবাহিনীর অষ্টম রুট সেনাবাহিনী হিসেবে এবং চীনের লালফৌজের যে গেরিলা ইউনিটগুলি ইয়াংসি নদীর দুই তীরে নানাস্থানে রয়ে গিয়েছিল তাদের নতুন নামকরণ করা হল চীনের জাতীয় বৈপ্লবিক সেনাবাহিনীর নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী। প্রথমটি চলে গেল উত্তর চীনের যুদ্ধফ্রন্টে আর দ্বিতীয়টি গেল মধ্য চীনের যুদ্ধফ্রন্টে। গৃহযুদ্ধের যুগে চীনের যে লালফৌজ ওহামপোয়া মিলিটারী একাডেমির এবং জাতীয় বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর উত্তরমুখী অভিযানকালের দিনগুলির গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে রক্ষা ও বিকশিত করে চলেছিল তা একটা সময়ে বহু লক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু

হওয়ার মধ্যেই দক্ষিণাঞ্চলের ঘাঁটি এলাকাসমূহে কুওমিনতাঙ সরকারের পরিচালিত নিষ্ঠুর ধ্বংসের তাণ্ডবের ফলে, লং মার্চের সময় আমাদের ক্ষয়ক্ষতি ও অন্যান্য কারণে তা হ্রাস পেয়ে মাত্র কয়েক হাজারে এসে দাঁড়ায়। ফলে অনেকে এই সৈন্যবাহিনীকে একান্ত তাচ্ছিল্যই করতেন এবং ভেবেছিলেন জাপ-বিরোধী প্রতিরোধের ব্যাপারে প্রধান ভরসা কুওমিনতাঙ-এর ওপরই ন্যস্ত করতে হবে। কিন্তু জনগণই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। জনগণ জানত ঐ সময়কার তাদের অল্প সংখ্যা সত্ত্বেও অষ্টম রুট সেনাবাহিনী এবং নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী হচ্ছেন উচ্চমানসম্পন্ন, একমাত্র তাঁরাই যথার্থ গণযুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবেন এবং একবার যখন তাঁরা জাপ-বিরোধী যুদ্ধফ্রণ্টে পৌঁছে যাবেন এবং ওখানকার ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন তখনই তাঁদের সামনে সীমাহীন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আর জনগণ সঠিক বিচারই করেছিল। এই মুহূর্তে আমি যখন এই রিপোর্ট রাখছি তখন আমাদের সৈন্যবাহিনী বেড়ে ৯,১০,০০০এ উপনীত হয়েছে এবং আমাদের যে সশস্ত্র গ্রামীণ গণ-রক্ষীবাহিনীকে এখনো তাদের দৈনন্দিন উৎপাদনের কাজ থেকে সরিয়ে আনা হয়নি তাদের সংখ্যা বেড়ে বাইশ লক্ষের অধিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংখ্যাগত দিক থেকে আমাদের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী (আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙ-এর সকল ইউনিটকে হিসেবে ধরে) কুওমিনতাঙ বাহিনীর চেয়ে অনেক ক্ষুদ্রতর হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে নিয়োজিত জাপানী ও ক্রীড়নক সৈন্যদের সংখ্যা ও যুদ্ধের ফ্রণ্টগুলির পরিমাপ হিসেবে ধরলে, তার কার্যকর সংগ্রাম-সামর্থ্যের বিচার করলে, অভিযানকালে তা যে জনসমর্থন পায় তার বিচার করলে এবং তার রাজনৈতিক মান, সংহতি ও ঐক্যের বিচার করলে তা ইতিমধ্যেই প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রধান বাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সৈন্যবাহিনী শক্তিমান তার কারণ এই বাহিনীর সকল সৈনিকই রাজনৈতিক সচেতনতা বোধ থেকে শৃংখলাপরায়ণ; তাঁরা একযোগে এসেছেন, আর তাঁরা মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির বা সংকীর্ণ একটি গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করেন না, তাঁরা লড়ছেন সমগ্র জাতি ও ব্যাপক জনসাধারণের স্বার্থের জন্য। এই সৈন্যবাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে চীনা জনগণের সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো এবং সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে তাদের সেবা করা।

এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলেই এই সৈন্যবাহিনীর অদম্য মনোবল রয়েছে

এবং সকল শত্রুকে পরাজিত করতে ও কোন সময়ই পরাজয় মেনে না নিতে তা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যত বাধাবিপত্তি দুঃখ-বিপদই আসুক না কেন, যতক্ষণ একজন সৈন্যও বেঁচে আছেন, ততক্ষণ সংগ্রাম তিনি চালিয়েই যাবেন।

এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলেই এই সৈন্যবাহিনী নিজের সৈনিকদের মধ্যে এবং বাইরের সাধারণ লোকজনের সঙ্গে এমন লক্ষণীয় ঐক্যস্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। আভ্যন্তরীণ দিক থেকে এই বাহিনীতে অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে, উচ্চতর ও নিম্নতর স্তরের মধ্যে এবং সামরিক কাজকর্ম, রাজনৈতিক কাজকর্ম ও বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের নানাবিধ সহায়ক কাজকর্মের মধ্যে ঐক্য রয়েছে; এবং বাইরের দিক থেকে, সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যে, সৈন্যবাহিনী ও সরকারী সংগঠনগুলির মধ্যে এবং আমাদের সৈন্যবাহিনী ও বন্ধু সৈন্যবাহিনী-গুলির মধ্যে ঐক্য রয়েছে। এই ঐক্যের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন যে কোন কিছুকে জয় করাই হচ্ছে অবশ্যকরণীয় কর্তব্য।

এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলেই, শত্রুবাহিনীর অফিসার ও সৈনিকদের জয় করে নিয়ে আসার এবং যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে ব্যবহারের একটি সঠিক নীতি এই সৈন্যবাহিনীর রয়েছে। ব্যতিক্রমহীনভাবে শত্রুবাহিনীর যে ব্যক্তিরাই আত্মসমর্পণ করবেন, যাঁরা আমাদের পক্ষে চলে আসবেন বা যাঁরা অস্ত্র বিসর্জন করার পর সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করবেন তাঁদের সবাইকে স্বাগত জানানো হবে এবং যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করা হবে। কোন যুদ্ধবন্দীকেই হত্যা করা, দুর্ব্যবহার করা অথবা অপমান করা নিষিদ্ধ।

এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলেই, এই সৈন্যবাহিনীর গণযুদ্ধের জন্য অপরিহার্য রণনীতিগত ও রণকৌশলগত একটি ব্যবস্থা রয়েছে। পরিবর্তিত বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নমনীয় গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহে এই বাহিনী সুদক্ষ এবং তা সচল যুদ্ধবিগ্রহেও সুদক্ষ।

এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলেই, এই সৈন্যবাহিনী গণযুদ্ধের পক্ষে অপরিহার্য রাজনৈতিক কাজকর্মের একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এবং তার লক্ষ্য হচ্ছে বাহিনীর নিজের সৈনিকদের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি করে তোলা, বন্ধু সৈন্যবাহিনী-সমূহের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলা এবং জনগণের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলা, শত্রু-বাহিনীগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া এবং যুদ্ধে বিজয়কে সুনিশ্চিত করা।

এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলেই, গেরিলা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে অভিযান

পরিচালনাকালেও সমগ্র সৈন্যবাহিনীটি দুটি যুদ্ধবিগ্রহের অন্তর্বর্তী সময়কে এবং ট্রেনিংপাভের নানা সময়ের ফাঁকটুকুকে শস্য উৎপাদনের ও অন্যান্য কাজে নিয়োজিত করতে সমর্থ এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে তাকে কাজেও লাগিয়েছে এবং এভাবে পুরোপুরি, আধাআধি বা অংশতঃ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে যাতে করে অর্থনৈতিক বাধাবিপত্তিকে তা জয় করে নিতে পেরেছে, জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে পেরেছে এবং জনগণের উপরকার বোঝাকে হাল্কা করে দিতে পেরেছে। বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি এলাকাসমূহে বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্রাকার অস্ত্রনির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত সম্ভাবনাকেই তারা কাজে লাগিয়েছে।

তাছাড়া, এই সৈন্যবাহিনী এইজন্যই শক্তিশালী যে, জনগণের আত্মরক্ষাকারী বাহিনী এবং সশস্ত্র গণরক্ষীবাহিনী—অর্থাৎ জনগণের বিশাল এমন সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তুলেছে যারা এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে সংগ্রাম করে চলে। চীনের মুক্ত এলাকাসমূহে সকল নরনারী, যুবক থেকে মধ্যবয়সী সবাইকে জনগণের আত্মরকাকারী বাহিনীতে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের কাজকর্ম পরিত্যাগ না করার ভিত্তিতেই সংগঠিত করে তোলে। আত্মরক্ষাকারী বাহিনীর চমৎকার যে অংশটি সৈন্যবাহিনী বা গেরিলা ইউনিটে যোগ দেননি তাঁদেরকেই সশস্ত্র গণরক্ষীবাহিনীতে নিয়ে আসা হয়। এই সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সহযোগিতা ছাড়া শত্রুকে পরাজিত করা অসম্ভব হতো।

সর্বশেষে, এই সৈন্যবাহিনী এইজন্যই শক্তিশালী যে এই বাহিনীটি দুটি অংশে—মূলবাহিনী এবং আঞ্চলিক বাহিনীতে বিভক্ত, আগেরটি যে-কোন অঞ্চলে যখনই প্রয়োজন সেখানেই সংগ্রামের জন্য চলে যেতে সমর্থ এবং পরেরটি তার নিজের অঞ্চলকে রক্ষা করতেই নিয়োজিত থাকে এবং আঞ্চলিক গণরক্ষী ও আত্মরক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে শত্রুকে আক্রমণও করতে পারে। এই শ্রম-বিভাজন জনগণের সর্বান্তঃকরণ সমর্থনই লাভ করেছে। এই সঠিক শ্রম-বিভাজন ছাড়া, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি শুধু মূল-বাহিনীর ভূমিকার ওপরই মনোযোগ দেওয়া হতো—তবে, চীনের মুক্ত অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতিতে শত্রুকে পরাজিত করা অনুরূপভাবে অসম্ভব হতো। আঞ্চলিক বাহিনীগুলির অধীনে বহুসংখ্যক সশস্ত্র টীম গড়ে তোলা হয়েছে যারা সুশিক্ষিত এবং তারই জন্য সামরিক, রাজনৈতিক ও জনগণের কাজের দিক

থেকে সেগুলি খুবই উন্নততর মানসম্পন্ন, তাঁরা শত্রুর লাইনের সুদূর পশ্চাৎ অঞ্চল পর্যন্ত চলে যান, শত্রুর ওপর সেখানে আঘাত হানেন এবং জনগণকে জাপ-বিরোধী সংগ্রামে জাগিয়ে তোলেন ও বিভিন্ন মুক্ত অঞ্চলের যুদ্ধফ্রণ্টের সামরিক অভিযানের ব্যাপারে এভাবে সহায়তা করেন। এই সমস্ত ব্যাপারেই তাঁরা বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন।

তাঁদের গণতান্ত্রিক সরকারের নেতৃত্বাধীনে চীনের মুক্ত অঞ্চলের সমস্ত জাপ-বিরোধী জনগণকেই আহ্বান জানানো হয়, তাঁরা যেন শ্রমিক, কৃষক, যুব ও নারীদের সংগঠনের, সাংস্কৃতিক, পেশাগত এবং অপরাপর সংগঠনের সদস্য হন এবং ঐ সংগঠনগুলি আবার সর্বান্তঃকরণে সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থনে নানা কাজে অংশগ্রহণ করেন। তাদের কাজ শুধুমাত্র সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের জন্য জনগণকে সমবেত করা, সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য নিয়ে যাওয়া, সৈনিকদের পরিবারগুলির যত্ন নেওয়া বা সৈনিকদের বৈষয়িক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করাই নয়; গেরিলা ইউনিটগুলিকে, গণরক্ষী ও আত্মরক্ষাকারী বাহিনীগুলিকে সমবেত করে শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ অভিযান চালানো, শত্রুর বিরুদ্ধে মাটিতে মাইন পুঁতে রাখা, শত্রু সম্পর্কে খোঁজখবর সংগ্রহ করা, বিশ্বাসঘাতক ও গুপ্তচরদের খুঁজে বের করা, যানবাহনের ব্যবস্থা করা, আহতদের রক্ষা করা এবং সামরিক বাহিনীর অভিযানে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করা —এই সবগুলিও তাঁদের কাজের অন্তর্ভুক্ত। একই সঙ্গে মুক্ত এলাকার সকল লোকজনেরাই উৎসাহভরে বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজকর্মে অংশগ্রহণ করছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য প্রতিটি মানুষকে সমবেত করা। এবং বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়সমূহ যাতে তাদের অবসর সময় তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের যথেষ্ট আত্ম নির্ভর হয়ে ওঠার অভিযানের পরিপূরক হিসেবে যোগ করার জন্য কাজ করে তা সুনিশ্চিত করা এবং এইভাবে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ-যুদ্ধ অব্যাহত রাখার জন্য যাতে উৎপাদনের একটি অভিযান জাগিয়ে তোলা যায় তার ব্যবস্থা করা। চীনের মুক্ত অঞ্চলে শত্রু প্রচণ্ড তাণ্ডব চালিয়েছে, তাছাড়া বন্যা, খরা, কীটপতঙ্গাদির উপদ্রব তো লেগেই আছে। কিন্তু ওখানকার গণতান্ত্রিক সরকার সংগঠিতভাবে ঐসব বাধাবিপত্তিগুলিকে জয় করার জন্য জনগণকে পরিচালনা করছেন এবং তার

ফলে এক্ষেত্রে কীটপতঙ্গাদি বিনাশের গণ-অভিযানে, বন্যা নিয়ন্ত্রণে ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকের সময় ত্রাণকার্যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে; আর এইভাবে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে অব্যাহত রাখাও সম্ভবপর হয়েছে। এক কথায়, সবকিছুই যুদ্ধফ্রন্টের জন্য, সবকিছুই জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজয়ের জন্য এবং চীনের জনগণের মুক্তির জন্য—এই হচ্ছে সাধারণ শ্লোগান, এই হচ্ছে চীনের মুক্ত অঞ্চলের সমগ্র সেনাবাহিনী ও সমগ্র জনগণের সাধারণ কর্মনীতি।

এই হচ্ছে সত্যিকারের গণযুদ্ধ। একমাত্র এরকম একটা গণযুদ্ধ চালিয়েই আমরা জাতীয় শত্রুকে পরাজিত করতে পারব। গণযুদ্ধের প্রতি ঠিক তাদের চরম বিরোধিতার জন্যই কুওমিনতাঙ ব্যর্থ হয়েছে।

একবার যখন আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠবে, চীনের মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী তখন আরও অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং জাপানী আক্রমণকারীদের চূড়ান্ত পরাজয়ই সাধন করবে।

দুটি যুদ্ধফ্রন্ট

একেবারে শুরু থেকেই চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধে দুটি ফ্রন্ট রয়েছে, একটি হচ্ছে কুওমিনতাঙ ফ্রন্ট আর অন্যটি হচ্ছে মুক্ত অঞ্চলের ফ্রন্ট।

১৯৩৮ সালের অক্টোবরে উহানের পতনের পর জাপানী আক্রমণকারীরা কুওমিনতাঙ ফ্রন্টের বিরুদ্ধে তাদের রণনীতিগত আক্রমণ বন্ধ করে দেয় এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ মুক্ত অঞ্চলের ফ্রন্টেই তাদের মূল বাহিনীগুলিকে সমবেত করে; একই সঙ্গে কুওমিনতাঙ সরকারের মধ্যেকার পরাজয়বাদী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে জাপানী আক্রমণকারীরা ঘোষণা করে দিল যে, তারা কুওমিনতাঙ সরকারের সঙ্গে শান্তির ব্যাপারে আপোষ করতে ইচ্ছুক এবং চীনা জাতিকে প্রবঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই নীতিটি গ্রহণ করে তারা দেশদ্রোহী ওয়াং চিং-ওয়েইকে চুংকিং পরিত্যাগ করতে লোভ দেখায় এবং নানকিং-এ তাকে দিয়ে একটি তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করে। কুওমিনতাঙ সরকার তখন থেকে তার নীতি বদলাতে শুরু করে, ক্রমে ক্রমে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ থেকে জোর সরিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের বিরুদ্ধেই তা জোর দিতে থাকে। সামরিক ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন সর্বপ্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিজেদের সামরিক শক্তিকে অক্ষত রাখার জন্য, কুওমিনতাঙ সরকার জাপানের প্রতি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ করে, মুক্ত অঞ্চলের ফ্রন্টের বিরুদ্ধেই তা তার সমরশক্তিকে

নিয়োজিত করে এবং জাপানী আক্রমণকারীদের পুরো শক্তি নিয়ে মুক্ত অঞ্চল আক্রমণের সুযোগ করে দেয় এবং 'নিজেরা পর্বতশীর্ষে বসে থেকে দুটো বাঘের লড়াই দেখতে থাকে।'

১৯৩৯ সালে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল 'বিদেশী পার্টিগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদি' গ্রহণ করে এবং জাপ-বিরোধী জনগণ ও পার্টিগুলিকে প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথমদিকে যা কিছু অধিকার তাঁরা অর্জন করেছিলেন তা থেকেও বঞ্চিত করে। তারপর থেকে কুওমিনতাঙ অঞ্চলগুলিতে সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টিগুলিকে এবং সবচেয়ে বেশি করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে কুওমিনতাঙ সরকার আত্মগোপন করতে বাধ্য করে। প্রতিটি প্রদেশে, প্রতিটি অঞ্চলে জেলখানাগুলি ও বন্দীশিবিরগুলি কমিউনিস্ট, তরুণ দেশ-প্রেমিক এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত বন্দীদের দ্বারা ভর্তি হয়ে গেল। ১৯৩৯ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে কুওমিনতাঙ সরকার জাতীয় ঐক্য ভেঙে দেওয়ার জন্য তিনটি ব্যাপক কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণ অভিযান[৩] চালিয়েছে এবং এভাবে গৃহযুদ্ধের গুরুতর বিপদই সৃষ্টি করেছে। এই সময়েই তা নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে 'ভেঙে দেওয়ার' জন্য হুকুম জারী করে এবং দক্ষিণ আনহুইতে এই সৈন্যবাহিনীর নয় হাজারেরও বেশি সৈন্যকে হত্যা করে—এই ঘটনায় সমগ্র দুনিয়াই স্তম্ভিত হয়ে যায়। এই মুহূর্তেও মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যদের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙ-এর আক্রমণ বন্ধ হয়নি এবং তা বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। একই সঙ্গে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা নানারকমের অপবাদ ও কুৎসা ছড়িয়ে চলেছে। তারাই 'বিশ্বাসঘাতক পার্টি', 'বিশ্বাসঘাতক সৈন্যবাহিনী', 'বিশ্বাসঘাতক অঞ্চল', 'প্রতিরোধ-যুদ্ধের অন্তর্ঘাত সৃষ্টি ও রাষ্ট্রকে বিপন্ন করে তোলা' ইত্যাদি বাছা বাছা বদনাম ও গালমন্দ আবিষ্কার করেছে কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট সেনাবাহিনী, নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং মুক্ত অঞ্চলগুলিকে নিন্দা জাপনের মতলব নিয়ে। এই সংকটের মোকাবিলা করার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নিম্নলিখিত শ্লোগান সহ একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে: 'প্রতিরোধে অবিচল থাকুন এবং আত্মসমর্পণের বিরোধিতা করুন! ঐক্যে অবিচল থাকুন এবং ভাঙন প্রতিরোধ করুন! প্রগতিতে অবিচল থাকুন এবং পশ্চাৎগমনকে প্রতিরোধ করুন!' এই পাঁচ বছরে আমাদের পার্টি এইসব সময়োচিত শ্লোগান নিয়ে কাজ করে তিনটি প্রতিক্রিয়াশীল ও জন-বিরোধী

কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণ অভিযানকেই সদর্পে প্রতিহত করে দিয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংকটকে অতিক্রম করেছে।

কুওমিনতাঙ যুদ্ধফ্রণ্টে এই বছরগুলিতে গুরুতর রকমের কোন সংগ্রামই হয়নি। জাপানী আক্রমণের মূল ধারা মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধেই নিবদ্ধ ছিল। ১৯৪৩ সালের মধ্যে মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী ও জনগণ চীন আক্রমণকারী জাপানী সৈন্যবাহিনীর শতকরা ৬৪ ভাগ এবং তাঁবেদারবাহিনীর শতকরা ৯৫ ভাগের বিরুদ্ধেই লড়াই করে চলেছে, অন্যদিকে কুওমিনতাঙ ফ্রণ্টে জাপানীদের শতকরা ৩৬ ভাগ এবং তাঁবেদারদের ৫ ভাগ সৈন্যই নিয়োজিত রয়েছে।

১৯৪৪ সালে জাপানী আক্রমণকারীরা উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত চীনের ট্রাঙ্ক রেলপথটি অবিরাম যাত্রাপথ হিসেবে জোর করে উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য[৪] অভিযান শুরু করে; আতঙ্কগ্রস্ত সৈন্যবাহিনীগুলি কোনরকম প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই হোনান, হুনান, কোয়াংসি এবং কোয়ানতুং প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল শত্রুর করতলগত হয়ে পড়ে। তার আগে দুই ফ্রণ্টে নিয়োজিত শত্রুবাহিনীর সংখ্যায় অনুপাতগত তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। তা সত্বেও এই মুহূর্তে চীনে জাপানের মোট ৫,৮০,০০০ সৈন্যের ৪০টি ডিভিশনের মধ্যে (উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিনটিকে এর মধ্যে ধরা হয়নি), ৩,২০,০০০ জাপানী সৈন্যের ২২½টি ডিভিশন অর্থাৎ মোট সৈন্যের শতকরা ৫৬ ভাগ মুক্ত এলাকায় নিয়োজিত রয়েছে এবং ২,৬০,০০০ সৈন্যের ১৭½টি ডিভিশনের অনধিক শত্রুসৈন্য কুওমিনতাঙ ফ্রণ্টে নিয়োজিত রয়েছে। দুই ফ্রণ্টে নিয়োজিত তাঁবেদার সৈন্যের অনুপাতে মোটেই কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

এটাও দেখিয়ে দেওয়ার দরকার আছে যে (নিয়মিত ও আঞ্চলিক সৈন্য সহ) তাঁবেদার বাহিনীর আট লক্ষাধিক সৈন্য মুখ্যতঃ গড়ে উঠেছে আত্মসমর্পণকারী কুওমিনতাঙ সেনাপতিদের অধীনস্থ ইউনিটগুলিকে নিয়ে বা আত্মসমর্পণের পর কুওমিনতাঙ অফিসাররা যে ইউনিটগুলি গড়ে তুলেছে তাদের নিয়ে। এই তাঁবেদার সৈন্যবাহিনীকে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা আগেভাগেই 'ঘোরাপথে জাতিকে রক্ষা করার' তথাকথিত একটি মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতক তত্ত্ব এনে দিয়েছে এবং তাদের আত্মসমর্পণের সময় থেকেই তাদের নৈতিক ও সাংগঠনিক মদৎ জুগিয়ে আসছে এবং জাপানী আক্রমণ-

কারীদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চীনের জনগণের মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে আক্রমণে তাদের পরিচালিত করে আসছে। এই প্রতিক্রিয়াশীলেরা বিপুল সংখ্যক সৈন্যবাহিনীকে, মোট ৭,৯৭,০০০-এর কম নয়, সমবেত করেছে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল ও অন্যান্য মুক্ত অঞ্চল অবরোধ ও আক্রমণ করার জন্য। এই গুরুতর পরিস্থিতিকে কুওমিনতাঙ সরকারের সংবাদ চেপে রাখার নীতির মাধ্যমে বহু সংখ্যক চীনা ও বিদেশীদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে।

চীনের মুক্তি অঞ্চল

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন চীনের মুক্ত এলাকার জনসংখ্যা এখন ৯,৫৫,০০,০০০। উত্তরে ভেতর মঙ্গোলিয়া থেকে দক্ষিণে হাইনান দ্বীপ পর্যন্ত তা বিস্তৃত; শত্রুরা প্রায় যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই তারা অষ্টম রুট সেনাবাহিনী, নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী অথবা কর্মরত অন্য কোন গণফৌজের দেখা পাচ্ছে। এই বিশাল মুক্ত বিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে উনিশটি প্রধান প্রধান মুক্ত অঞ্চল, লিয়াওনিং, চাহার, সুইয়ুয়ান, শেনসি, কানসু, নিংসিয়া, শানসি, হোপেই, হোনান, শানতুং, কিয়াংসু, চেকিয়াং, আনহুই, কিয়াংসি, হুপে, হুনান, কোয়ানতুং এবং ফুকিয়েন প্রদেশের কমবেশি অঞ্চল তারই অন্তর্ভুক্ত। এই সকল মুক্ত অঞ্চলগুলিকে পরিচালনার কেন্দ্র হচ্ছে ইয়েনান। পীতনদীর পশ্চিমে অবস্থিত ১৫,০০,০০০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল হচ্ছে এই উনিশটি অঞ্চলের একটি, সারা চীনের বিশাল মুক্ত এলাকা জুড়ে এই অঞ্চলগুলি ছড়িয়ে রয়েছে এবং তার মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে যথার্থই অল্প জনবসতি রয়েছে চেকিয়াং প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে ও হাইনান দ্বীপের এলাকা দুটিতে। এটা জানেন না বলেই অনেক মনে করেন চীনের মুক্ত এলাকা বুঝি মূলতঃ শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল নিয়েই গঠিত। কুওমিনতাঙ সরকারের অবরোধের জন্যই এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি মুক্ত অঞ্চলেই জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের সমস্ত প্রাথমিক প্রয়োজনীয় নীতিগুলি কার্যকর করা হয়েছে, জনপ্রিয় নির্বাচিত সরকার রয়েছে অর্থাৎ আঞ্চলিক কোয়ালিশন সরকার রয়েছে, হয় এ ধরনের সরকার ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়ে গেছে না হয় সেগুলি স্থাপন করা হচ্ছে, এইসব সরকারগুলিতে কমিউনিস্টরা, অন্যান্য জাপ-বিরোধী পার্টিগুলির প্রতিনিধি

বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বা দল-বহির্ভূত লোকজনেরা রয়েছেন, সহযোগিতা করছেন। এই মুক্ত অঞ্চলগুলিতে জনগণের সমগ্র শক্তিকেই সমবেত করা হয়েছে। তার ফলে, শত্রুর ভয়াবহ চাপ, কুওমিনতাঙ-এর সামরিক অবরোধ ও আক্রমণ এবং বিদেশী সাহায্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি সত্ত্বেও চীনের মুক্ত অঞ্চলগুলি দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও একটানা উন্নতিলাভ করেছে, শত্রুর কবলিত এলাকা কমিয়ে এনেছে এবং নিজের এলাকা সম্প্রসারিত করেছে। গণতান্ত্রিক চীনের তা আদর্শরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং জাপানী আক্রমণকারীদের বিতাড়নের এবং মিত্রদেশগুলির সামরিক সহায়তায় চীনের জনগণের মুক্তিসাধনের প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। চীনের মুক্ত এলাকার সশস্ত্রবাহিনী, অষ্টম রুট সেনাবাহিনী, নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং জনগণের অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীগুলি জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শুধু বীরত্বপূর্ণ একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তাই নয়, জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের গণতান্ত্রিক নীতিগুলি কার্যকরী করার ক্ষেত্রেও তারা আদর্শ স্থাপন করেছে। ১৯৩৭ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার ঘোষণাপত্রে জোর দিয়ে বলেছিল 'চীনের আজ প্রয়োজন ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের তিন গণ-নীতি, আমাদের পার্টি সেগুলির পরিপূর্ণ রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত'; চীনের মুক্ত অঞ্চলগুলিতে তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলা হয়েছে।

কুওমিনতাঙ এলাকা

নিজের একনায়কতন্ত্রী শাসনের ব্যাপারে অবিচল কুওমিনতাঙ-এর মুখ্য শাসকচক্র জাপানের প্রতি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের একটি নীতি এবং জনসাধারণের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি আভ্যন্তরীণ নীতি অনুসরণ করেছে। তার ফলে, তার সশস্ত্রবাহিনী আজ তার মূল আকারের অর্ধেকে দাঁড়িয়েছে এবং তার অধিকাংশই তাদের সংগ্রাম-সামর্থ্য কার্যতঃ হারিয়ে বসেছে। এই গোষ্ঠী ও ব্যাপক জনগণের মধ্যে একটি গভীর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, জনগণের ব্যাপক দারিদ্র্যের ও রিক্ততার ব্যাপক অসন্তোষ ও পরিব্যাপ্ত বিদ্রোহের এক গুরুতর সংকটই দেখা দিয়েছে। এতে করে শুধু যে যুদ্ধে তার ভূমিকা লক্ষণীয়ভাবে নগণ্য হয়ে পড়েছে তাই নয়, চীনের জনগণের জাপ-বিরোধী সকল শক্তিগুলির সমাবেশ ও ঐক্যের পথে তা একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুওমিনতাঙ এর মুখ্য শাসকচক্রের নেতৃত্বাধীনে এরকম একটি গুরুতর

পরিস্থিতি কেন দেখা দিয়েছে? এটা দেখা দিয়েছে তার কারণ এই চক্র হচ্ছে চীনের বৃহৎ জমিদারগণ, বৃহৎ ব্যাঙ্কমালিক এবং বৃহৎ মুৎসুদ্দিদেরই প্রতিনিধি। মুষ্টিমেয় যে লোকদের নিয়ে এই প্রতিক্রিয়াশীল স্তরটি গড়ে উঠেছে তারা কুওমিনতাঙ সরকারের অধীনস্থ সমস্ত প্রধান প্রধান সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলিকে একচেটিয়া করতলগত করে রেখেছে। তারা তাদের নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষা করাকে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে। 'সবকিছুর ওপরে জাতি' এ কথা তারাও বলে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপের সঙ্গে জাতির বিপুল সংখ্যাধিকের দাবির কোনই মিল নেই। 'সবকিছুর ওপরে রাষ্ট্র' এ কথা ওরাও বলে কিন্তু তারা যা বোঝাতে চায় তা হচ্ছে সামন্ত-ফ্যাসিবাদী বৃহৎ জমিদার, বৃহৎ ব্যাঙ্কমালিক ও বৃহৎ মুৎসুদ্দিদের একটি রাষ্ট্র এবং মোটেই জনগণের গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র তা নয়। তারই জন্য, জনগণের অভ্যুত্থানের ভয়ে তারা ভীত, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভয়ে তারা ভীত এবং জাপানের বিরুদ্ধে সামরিক সমাবেশের ব্যাপারে তারা ভীত। এখানেই নিহিত রয়েছে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে তাদের নিষ্ক্রিয় নীতির এবং জনগণের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির মূল কারণ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের দুমুখো নীতি রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, একদিকে জাপানকে প্রতিরোধ করছে কিন্তু অন্যদিকে তারা অনুসরণ করছে নিষ্ক্রিয় একটি যুদ্ধনীতি এবং তদুপরি জাপানীরা সব সময় ওদের আত্মসমর্পণে লুব্ধ করার লক্ষ্যবস্তু করে রেখেছে। তারা চীনের অর্থনীতিকে বিকশিত করে তোলার কথা বলে, কিন্তু আসলে তারা তাদের নিজেদের আমলাতান্ত্রিক পুঁজির অর্থাৎ বৃহৎ জমিদার, ব্যাঙ্কমালিক ও মুৎসুদ্দিদের পুঁজিরই শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। আর এভাবে চীনের অর্থনীতির প্রাণ-প্রবাহগুলিকেই তারা কৃষক, শ্রমিক, পেটি-বুর্জোয়া ও একচেটিয়া নন এমন বুর্জোয়াশ্রেণীকে নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়ন করে নিজেদের একচেটিয়া কব্জায় নিয়ে আসে। তারা 'গণতন্ত্রকে' বাস্তবে প্রয়োগ করার কথা বলে এবং 'রাষ্ট্র ক্ষমতা জনগণের হাতে তুলে দেওয়ার' কথা বলে কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য জনগণের আন্দোলনকে তারা নিষ্ঠুরভাবে দমনপীড়ন করে এবং সামান্যতম গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রচলন করতেও অস্বীকার করে। তারা বলে 'কমিউনিস্ট সমস্যা হচ্ছে একটি রাজনৈতিক সমস্যা এবং রাজনৈতিকভাবেই তার সমাধান হওয়া উচিত,' কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে তারা সামরিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে

এবং অর্থনৈতিকভাবে নিষ্ঠুর দমনপীড়ন চালায়; আর মনে করে কমিউনিস্ট-পার্টি হচ্ছে ওদের 'এক নম্বর দুশমন' আর জাপানী আক্রমণকারীরা ওদের কাছে 'দুই নম্বর দুশমন' মাত্র। দিনের পর দিন তারা গৃহযুদ্ধ বাধাবার প্রস্তুতি এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে ধ্বংস করার চক্রান্ত নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রয়েছে; তারা বলে একটি 'আধুনিক রাষ্ট্রই' তারা কায়েম করতে চায়, কিন্তু বৃহৎ জমিদার, ব্যাঙ্কমালিক ও মুৎসুদ্দিদের সামন্ত-ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র বজায় রাখার জন্যই তারা মরীয়া হয়ে প্রয়াস চালায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখলেও আসলে তারা তার প্রতি বৈরী-ভাবাপন্ন। 'ইউরোপের আগে এশিয়া' এই কথাটি যুক্তরাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতাবাদী-দের সুরে সুর মিলিয়ে কপচাতে কপচাতে তারা ফ্যাসিষ্ট জার্মানির জীবদ্দশাকে প্রলম্বিতই করতে চায়, যার আসল অর্থ দাঁড়ায় চীনের জনগণের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের ফ্যাসিষ্ট শাসনসহ সকল দেশের তাবৎ ফ্যাসিষ্টদেরই জীবদ্দশাকে বাড়ানোর অপচেষ্টা, তথাপি অন্যদিকে একই সঙ্গে তারা নানা কূটনৈতিক ছলাকলা চালায় আর এমন হাবভাব দেখায় যেন তারা একেবারে খাঁটি ফ্যাসি-বিরোধী বীর। পরস্পর-বিরোধী এই দুমুখো নীতি মূলের দিকে তাকালে দেখা যাবে তার সবগুলিরই উৎস হচ্ছে বৃহৎ জমিদার, ব্যাঙ্ক মালিক ও মুৎসুদ্দিদের সামাজিক স্তরটি।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও কুওমিনতাঙ সমমতাবলম্বী একটি রাজনৈতিক দল নয়। যদিও তা বৃহৎ জমিদার, ব্যাঙ্কমালিক ও মুৎসুদ্দিদের স্তরের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রণাধীন তবু ঐ দলটিকে পুরোপুরি এই চক্রের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা ঠিক হবে না। কিছু কিছু কুওমিনতাঙ নেতৃবৃন্দ এই চক্রের অন্তর্ভুক্ত নন এবং এই চক্রটি তাঁদের অবজ্ঞাই করে, দূরে সরিয়ে রাখে এবং তাঁদের আক্রমণ করে। তার অনেক কর্মী ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ এবং তিন-গণনীতি অনুসরণকারী ইয়ুথ লীগের বহু সভ্যই এই চক্রের নেতৃত্ব সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ এবং কিছু কিছু অংশ তার বিরোধিতাই করেন। কুওমিনতাঙ সৈন্য-বাহিনী সম্পর্কে, সরকারী সংস্থা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যেসব প্রতিষ্ঠানগুলি এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সম্পর্কেও কথাটি খাঁটি। এই সবগুলি সংগঠনেই বেশ কিছু সংখ্যক গণতান্ত্রিক লোকজন রয়েছেন। তদুপরি, খোদ এই চক্রটিই যেহেতু কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলে বিভক্ত হয়ে রয়েছে তাই তাও সুসংবদ্ধ একটি চক্র নয়। কুওমিনতাঙকে

সমমতাবলম্বী প্রতিক্রিয়াশীল একটি সংস্থা মনে করা নিঃসন্দেহে ভুল হবে।

বিপরীত চিত্র

চীনের জনগণ মুক্ত অঞ্চল ও কুওমিনতাঙ অঞ্চলের মধ্যেকার সুস্পষ্ট বিপরীত চিত্রটি দেখতে পেয়েছে।

এই তথ্যগুলি কি যথেষ্ট পরিষ্কার নয়? এখানে দেখা যাচ্ছে দু'টি লাইন, একদিকে গণযুদ্ধের লাইন আর অন্যদিকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের লাইন যা গণযুদ্ধের বিরোধী; একটি চীনের মুক্ত অঞ্চলের কঠিন পরিস্থিতিতে কোনপ্রকার বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই এগিয়ে চলেছে বিজয়ের দিকে, আর অন্যটি বৈদেশিক সাহায্য পেয়েও কুওমিনতাঙ এলাকায় একান্ত অনুকূল পরিস্থিতিতে এগিয়ে চলেছে পরাজয়ের পথে।

কুওমিনতাঙ অস্ত্রশস্ত্রের অভাবকেই এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে দেখাতে চাইছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করা যায়, দুয়ের মধ্যে অস্ত্রের অভাব কার—কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর, না মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর? চীনের সকল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মুক্ত অঞ্চলের বাহিনীরই অস্ত্রের অভাব সবচেয়ে তীব্র, তাদের একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে শত্রুর কাছ থেকে যেগুলি দখল করা হয় সেগুলি বা অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তৈরী করা যা কিছু অস্ত্রপাতি।

এটা কি সত্য নয় যে প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনীগুলির চেয়ে কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী অনেক ভালভাবে অস্ত্রসজ্জিত? অথচ দেখা যাচ্ছে, সংগ্রাম-সামর্থ্যের বিচারে কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনীর চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট।

কুওমিনতাঙ-এর সংরক্ষিত বিশাল জনবল রয়েছে, তবু তাদের ভ্রান্ত সংগ্রহ-নীতির জন্য তাদের লোকবলের জোগান দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে যদিও শত্রু কর্তৃক একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত যুদ্ধবিগ্রহ করতে হচ্ছে তবু চীনের মুক্ত অঞ্চলের অন্তহীন লোকবল জোগানের সামর্থ্য রয়েছে কারণ তার রয়েছে গণরক্ষীবাহিনী ও আত্মরক্ষীবাহিনীর এমন একটি ব্যবস্থা জনগণের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে যা একান্ত সুপ্রযুক্ত বলে সর্বত্র তাকে প্রয়োগ করা চলে, কেননা লোকবলের অপব্যয় ও অযথা অপচয়ের পথ এখানে পরিহার করা হয়ে থাকে।

যদিও কুওমিনতাঙ-এর শস্যবহুল বিশাল অঞ্চল নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে এবং

জনগণ সাত থেকে দশ কোটি তার প্রতিবছর তাকে সরবরাহ করে তবু তার সৈন্যবাহিনী সব সময় খাদ্যাভাবে ভুগছে এবং তার সৈন্যগণ নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ-দেহ কেননা খাদ্যশস্যের বিরাট অংশই যাদের হাত দিয়ে তা যায় তারা আত্মসাৎ করে ফেলে। কিন্তু যদিও চীনের অধিকাংশ মুক্ত এলাকাই শত্রুর লাইনের পেছনে পড়ে গেছে এবং শত্রু তার 'সবকিছু পুড়িয়ে দেওয়ার, সবাইকে হত্যা করার ও সবকিছু লুট করার' নীতি অনুসারে ধ্বংসের তাণ্ডব চালিয়েছে, তাছাড়া উত্তর শেনসির মতো কিছু অঞ্চল একেবারে মরুভূমি সদৃশ,—তা সত্বেও কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমরা আমাদের চেষ্টার মাধ্যমে খাদ্যসমস্যা সাফল্যের সঙ্গেই সমাধান করেছি।

কুওমিনতাঙ অঞ্চল এক গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছে; অধিকাংশ শিল্পই দেউলিয়া হয়ে পড়েছে এবং কাপড়চোপড়ের মতো নিত্য-ব্যবহার দ্রব্যাদিও মুক্তরাষ্ট্র থেকে তাকে আমদানি করতে হচ্ছে। কিন্তু চীনের মুক্ত অঞ্চলে কাপড়চোপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি করে সমাধান করা সম্ভবপর হয়েছে।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলে শ্রমিক, কৃষক, দোকান কর্মচারী, সরকারী কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরা চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছেন। মুক্ত এলাকাতে সকল মানুষেরই খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং কাজ রয়েছে।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে—জাতীয় সংকটকে মুনাফা-খোরীর কাজে লাগিয়ে সরকারী কর্মচারীরা সমস্ত লজ্জা ও শালীনতাবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে একই সঙ্গে বেনিয়া আর অভ্যস্ত ঘুষখোর হয়ে উঠেছে। চীনের মুক্ত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সহজ-সরল জীবনযাত্রা আর কঠোর শ্রমশীলতা, কর্মীরা তাঁদের নিয়মিত কাজ ছাড়াও উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করেন; সততাকে খুবই উচ্চ মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে এবং দুর্নীতিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলে জনগণের কোন স্বাধীনতাই নেই। চীনের মুক্ত অঞ্চলে জনগণের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

কুওমিনতাঙ শাসকেরা আজ যে বিশৃংখলার সম্মুখীন তার জন্য কাদের দায়ী করা যায়? তারা নিজেরা ছাড়া আর অন্য কাদের দায়ী করা যাবে? যথেষ্ট সাহায্য না দেওয়ার জন্য বিদেশীদের দায়ী করা চলে, না কুওমিনতাঙ

সরকারের একনায়কতন্ত্রী শাসন, দুর্নীতি ও অপদার্থতাকেই তার জন্য দায়ী করতে হয়? উত্তর কি খুবই পরিষ্কার নয়?

কারা 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করছে আর রাষ্ট্রকে বিপন্ন করে তুলছে?

এইসব অকাট্য প্রমাণের আলোকে বলা চলে না কি যে কুওমিনতাঙ সরকার নিজেই চীনের জনগণের প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করছে এবং আমাদের দেশকে বিপন্ন করে তুলছে? পুরো দশটি বছর এই সরকার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত রেখেছে, জাতীয় প্রতিরক্ষাকে চূড়ান্তভাবে অবহেলা করে জনগণের বিরুদ্ধেই তার অসির ফলাটি ঘুরিয়ে ধরেছে এবং তার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতির ফলে তা উত্তর-পূর্ব চীনের চারটি প্রদেশকে জলাঞ্জলি দিয়ে দিয়েছে। জাপানী আক্রমণকারীরা যখন মহান প্রাচীরের দক্ষিণদিকে এগিয়ে আসছিল, তা নানকেওয়াস্তে এক ঝটকা প্রতিরোধ সৃষ্টি করেই লুকৌচিয়াও থেকে পিছু হটে পালিয়ে সোজা চলে গেল কিউচৌ প্রদেশে। তা সত্ত্বেও এই কুওমিনতাঙই অভিযোগ করছে 'চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করছে এবং রাষ্ট্রকে বিপন্ন করে তুলছে' (১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি দেখুন)। তার একমাত্র সাক্ষ্য-প্রমাণ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি, জনগণের সকল অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি করেছে এবং তা জাপানকে সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিরোধ করে চলেছে। কুওমিনতাঙ-এর যুক্তি-ধারা চীনের জনগণের যুক্তি-বিচারের ধারা থেকে এমনই আলাদা যে বহু সমস্যার ব্যাপারে একটা সাধারণ ভাষা খুঁজে না পেলেও বিস্ময়ের কিছুই নেই।

এখানে দুটি প্রশ্ন রয়েছে।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, হেইলুংকিয়াং প্রদেশ থেকে লুকৌচিয়াও এবং লুকৌচিয়াও থেকে কিউচৌ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এমন বিশাল, এমন জনসমৃদ্ধ একটা অঞ্চলকে ছেড়ে আসতে কুওমিনতাঙ সরকারকে কী বাধ্য করেছে? প্রথম দিকের তার জাপানকে প্রতিরোধ না করার নীতি, তার পরের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি এবং জনগণকে বিরোধিতা করার নীতি ছাড়া তা আর কী হতে পারে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, জাপানী ও তাঁবেদার সৈন্যবাহিনীর নিষ্ঠুর ও দীর্ঘস্থায়ী

আক্রমণকে চুরমার করে দিতে, এমন বিশাল অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে এবং জাতীয় শত্রুর কবল থেকে এমন বিপুল সংখ্যাকে মুক্ত করতে চীনের মুক্ত অঞ্চলকে ঠিক কী জিনিসটি এই সামর্থ্য এনে দিয়েছে? এটা কী সঠিক লাইন, গণযুদ্ধের লাইন ছাড়া আর কী হতে পারে?

'সরকারী ও সামরিক আদেশের প্রতি অবাধ্যতা'

কুওমিনতাঙ সরকার চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এই বলেও অনবরত অভিযোগ করছে যে তা 'সরকারী ও সামরিক আদেশের প্রতি অবাধ্যতা' প্রদর্শন করছে। আমাদের যা বলা দরকার তা হচ্ছে শুধু এইটুকুই যে সৌভাগ্যবশতঃ চীনের কমিউনিস্টগণ চীনের জনগণের সাধারণ বুদ্ধির অংশীদার হিসেবে সেইসব 'সরকারী ও সামরিক আদেশকে' মান্য করেনি; কারণ বাস্তবে তার পরিণাম দাঁড়াত যে মুক্ত এলাকাগুলি চীনের জনগণ জাপানী আক্রমণকারীদের কবল থেকে প্রচুর বাধাবিপত্তি ও দুঃখ-দুর্দশা বরণ করে উদ্ধার করেছে সেগুলি তাদের হাতেই সঁপে দেওয়া। এ রকম কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে ১৯৩৯ সালের 'বিদেশী পার্টিসমূহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থাদি', ১৯৪১ সালের 'নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়া' সম্পর্কে এবং 'পীতনদীর প্রাক্তন গতিপথের উত্তর অঞ্চলে সরে যাওয়া' সম্পর্কে আদেশাবলী, ১৯৪৩ সালের 'চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিলোপসাধন' সম্পর্কিত আদেশ, ১৯৪৪ সালে 'একটা নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে দশ ডিভিশন ছাড়া সমস্ত সৈন্য-বাহিনী ভেঙে দেওয়ার' জন্য আমাদের প্রতি আদেশ এবং কুওমিনতাঙ সরকার আমাদের সঙ্গে সাম্প্রতিক আলোচনাকালে তাঁরা যাকে অভিহিত করেছেন 'একটা সুবিধাদান হিসেবে' তদনুযায়ী তাদের একনায়কতন্ত্রী সরকার কটি পদের বিনিময়ে কিন্তু কোন কোয়ালিশন সরকার গঠন না করেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে এবং আঞ্চলিক সরকারকে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে এই সম্পর্কিত প্রস্তাবটি। সৌভাগ্যের কথা আমরা এ ধরনের জিনিসকে মান্য করিনি এবং এভাবে অন্ততঃ অক্ষত একটি ভূভাগকে এবং বীর জাপ-বিরোধী একটি ফৌজকে চীনের জনগণের জন্য বজায় রেখেছি। এই 'অবাধ্যতার' জন্য চীনের জনগণের কি নিজেদের অভিনন্দিত করা উচিত নয়? কুওমিনতাঙ সরকারের কি এটা মনে করা উচিত নয় যে জাপানী আক্রমণকারীদের হেইলুং-কিয়াং থেকে কিউচৌ পর্যন্ত বিশাল জনবহুল অঞ্চল উপহার দানের পর নিজের

ফ্যাসিষ্ট সরকারী হুকুমনামা ও পরাজয়বাদী সামরিক আদেশের মাধ্যমে তা যথেষ্টই করেছে? জাপানী আক্রমণকারী এবং প্রতিক্রিয়াশীলেরা এইসব 'সরকারী ও সামরিক আদেশকে' স্বাগত জানিয়েছে কিন্তু একজন সৎ চীনা দেশপ্রেমিক কি এইগুলিকে স্বাগত জানাতে পারবেন? যদি একটি কোয়ালিশন সরকার, শুধু আকারে নয় বাস্তবেও না থাকে, ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্র নয় যদি গণতান্ত্রিক একটি সরকার না থাকে, তবে কি এটা ভাবা যায় যে, মুক্ত অঞ্চলে জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করেছেন এবং এমন গণফৌজ গড়ে তুলেছেন যা প্রতিরোধ-যুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছে, চীনের জনগণ চীনের কমিউনিস্ট-দের কি ঐ মুক্ত অঞ্চল ও গণফৌজকে পরাজয়বাদী, ফ্যাসিষ্ট ও একনায়কতন্ত্রী কুওমিনতাঙ সরকারকে উপঢৌকন দিয়ে দিতে অনুমতি দেবেন? মুক্ত এলাকা ও গণফৌজ না থাকলে চীনের জনগণের জাপ-বিরোধী লক্ষ্য কি আজ যা হতে পেরেছে তা হতে পারত? আর চীনা জাতির ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াত তা কি কারও পক্ষে অনুমান করা সম্ভব?

গৃহযুদ্ধের বিপদ

আজ পর্যন্ত কুওমিনতাঙ-এর মূল শাসকগোষ্ঠী একনায়কতন্ত্র ও গৃহযুদ্ধের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতেই অবিচল রয়েছে। বিশেষ একটি মিত্র দেশের সৈন্য-বাহিনী চীনের মূল ভূখণ্ডের বিরাট অংশকে জাপানী আক্রমণকারীদের কবল থেকে নিষ্কণ্টক করে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই তা গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি অনেকদিন থেকে চালিয়ে আসছে এবং এখন তাকে জোরদার করে তুলছে এমন বহু লক্ষণই দেখা যাচ্ছে। তারা এইটিও আশা করছে যে চীনে কিছু কিছু মিত্র দেশের সেনাপতিগণ, গ্রীসে ব্রিটিশ সেনাপতি স্কোবি[৫] যা করে আসছে, সেই এক কাজই করবে। স্কোবির ও প্রতিক্রিয়াশীল গ্রীক সরকারের সম্পাদিত কসাইবৃত্তিকে তারা সহর্ষে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আবার ১৯২৭-৩৭ সালের গৃহযুদ্ধের ঘূর্ণিঝড়ে তা চীনকে ডুবিয়ে দিতে মতলব ফাঁদছে। 'জাতীয় বিধান-সভা আহ্বানের' ও 'রাজনৈতিক সমাধানের' ধূম্রজালের আড়ালে তা সংগোপনে গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। আমাদের দেশবাসীরা যদি এই প্রস্তুতি লক্ষ্য না করেন, এই ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে না দেন এবং তার সমাপ্তি না ঘটান—তবে একদিন হঠাৎ করে গৃহযুদ্ধের কামানের গর্জন শুনে তাঁদের হতচকিতই হয়ে উঠতে হবে।

আলাপ-আলোচনা

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলির সম্মতিলাভের পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের কাছে এই দাবি হাজির করে যে জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করা, নতুন চীন গড়ে তোলা এবং গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধ করার জন্য কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কত্বের অবসান করা হোক এবং একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গড়ে তোলা হোক। নিঃসন্দেহে তা ছিল সময়োচিত একটি দাবি এবং কয়েক মাসের মধ্যে ব্যাপক জনগণের উষ্ণ সমর্থন তাতে লাভ করা যায়।

কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কতন্ত্রের অবসান, কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা এবং অপরিহার্য গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রচলনের জন্য কুওমিনতাঙ সরকারের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা আলাপ-আলোচনাই আমরা করেছি, কিন্তু তা আমাদের সকল প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেছে। কুওমিনতাঙ শুধু তার একদলীয় একনায়কতন্ত্রের অবসানে এবং একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনে অনিচ্ছুক তাই নয়, একান্ত প্রয়োজনীয় জরুরী গণতান্ত্রিক সংস্কারের একটিও—যেমন, গোয়েন্দা পুলিশের অবসান, জনগণের স্বাধীনতাকে খর্ব করে এমন প্রতিক্রিয়াশীল আইন ও হুকুমনামাগুলি খারিজ করা, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান, রাজনৈতিক পার্টিগুলির আইনানুগ মর্যাদার স্বীকৃতি, মুক্ত অঞ্চলের স্বীকৃতি, এবং মুক্ত অঞ্চলে অবরোধ সৃষ্টিকারী ও আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর প্রত্যাহার ইত্যাদি কোনটিই প্রচলন করতে তা রাজী হয়নি। ফলে, চীনে রাজনৈতিক সম্পর্ক খুবই তিক্ত হয়ে উঠেছে।

দুটি সম্ভাবনা

সামগ্রিকভাবে, এই পরিস্থিতির এবং আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ বাস্তব অবস্থার আলোকে আমি এখানে উপস্থিত সবাইকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানাচ্ছি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের পথে আমরা অবাধে ও সহজে এগিয়ে যাব এটা প্রত্যাশা না করতেই বলছি। না, তা অবাধ ও সহজ হবে না। আসলে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে—একটি শুভ আর অন্যটি অশুভ। একটি সম্ভাবনা বা ভবিষ্যৎ হচ্ছে, ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব অব্যাহত থাকবে এবং গণতান্ত্রিক সংস্কার গ্রাহ্য হবে না, জাপানী আক্রমণকারীদের নয়, জনগণকে বিরোধিতা করাই অব্যাহত থাকবে এবং জাপানী আক্রমণকারীরা পরাজিত হওয়ার পর

এমনকি একটা গৃহযুদ্ধও বেধে যেতে পারে, চীন এভাবে আবার তার দুঃসহ পুরানো অবস্থাতেই নিক্ষিপ্ত হবে এবং স্বাধীনতা, মুক্তি, গণতন্ত্র, ঐক্য, সমৃদ্ধি ও শক্তিহীন হয়েই পড়ে থাকবে। এই সম্ভাবনা বা ভবিষ্যৎ এখনো রয়েছে, তার সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যায়নি বা অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং জনগণের বর্ধিত রাজনৈতিক চেতনা এবং সংগঠিত শক্তির জন্য তা আপ্‌সে উধাও হয়েও যায়নি। এই সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ বাস্তবে রূপলাভ করবে এ কথা দেশের মধ্যে কুওমিনতাঙ-এর প্রতিক্রিয়াশীলচক্র এবং বিদেশে সাম্রাজ্যবাদী-মানসিকতা সম্পন্ন প্রতিক্রিয়াশীলেরা প্রত্যাশা করছে। এই হল একটি দিক যা হিসেবে রাখা চাই।

কিন্তু অন্য একটি সম্ভাবনা রয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে এই পরিস্থিতির ও ওপরের আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিচারের আলোকে, আমরা অধিকতর আস্থা ও সাহস নিয়ে দ্বিতীয় সম্ভাবনা বা ভবিষ্যতের জন্য প্রয়াসী হতে পারি। তা হচ্ছে, সকল বাধাবিপত্তি জয় করার, সমগ্র জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, কুওমিনতাঙ-এর ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ব অবসানের, গণতান্ত্রিক সংস্কার কার্যকর করার, জাপ-বিরোধী শক্তিগুলিকে সংহত ও সম্প্রসারিত করার, জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করার এবং মুক্ত, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী নয়া চীন গড়ে তোলার সম্ভাবনা। যাঁরা আশা করেন এই সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ চীনে বাস্তব হয়ে উঠবে তাঁরা হচ্ছেন চীনের জনসাধারণ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য গণ-তান্ত্রিক দলগুলি এবং বিদেশে আমাদের যাঁরা সমান বলে ভাবেন সেই জাতিগুলি, প্রগতিশীলেরা ও জনসাধারণ।

আমরা ভাল করেই জানি আমরা কমিউনিস্টরা সমগ্র চীনা জনগণের সঙ্গে মিলিতভাবে এখনো বিরাট বিরাট বাধাবিপত্তি ও অসংখ্য প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হব এবং এখনো আমাদের সামনে রয়েছে সুদীর্ঘ আর আঁকাবাঁকা বন্ধুর যাত্রাপথ। কিন্তু এটাও আমরা একইভাবে ভাল করেই জানি, সমগ্র-ভাবে চীনা জনগণের সঙ্গে মিলে, আমরা সমস্ত বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধক-গুলিকে জয় করতে পারব এবং ইতিহাস চীনের ওপর যে দায়িত্বভার অর্পণ করেছে তা আমরা সুসম্পাদন করতে পারব। আমাদের এবং সমগ্র জনগণের মহান কর্তব্য হচ্ছে প্রথম সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎকে পরিহার করা এবং আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে দ্বিতীয় সম্ভাবনা ও ভবিষ্যতের জন্য কাজ করে যাওয়া

মূলতঃ আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সমগ্র চীনা জনগণ সহ আমাদের কমিউনিস্টদেরই অনুকূল। এটা আমি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিষ্কার করে বলেছি। আমরা আশা করি কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ বিশ্বের সাধারণ গতিধারা এবং চীনের জনমতের অভিব্যক্তির আলোকে তাঁদের বর্তমান ভ্রান্ত নীতিগুলি পরিবর্তন করতে সৎ সাহস দেখাবেন যাতে করে আমরা যুদ্ধ জয় করতে পারব, চীনের জনগণের দুঃখ-দুর্দশাকে লাঘব করে আনতে পারব এবং অচিরেই একটি নয়া চীন প্রতিষ্ঠালাভ করবে। এটা বুঝতে হবে, পথ যত আঁকাবাঁকা ও বন্ধুরই হোক না কেন, চীনের জনগণ স্বাধীনতা ও মুক্তিলাভের এই কর্তব্যটি সুনিশ্চিতভাবেই সুসম্পাদন করবে এবং সেই সময়টিই এখন সমাগত। বিগত শতাব্দীকালের অসংখ্য শহীদদের অপূর্ণ মহান আশা-আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপায়ণের দায়িত্ব আমাদের যুগের মানুষদের কাঁধে সমর্পিত হয়েছে এবং আমাদের স্তব্ধ করার সকল প্রয়াসই নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

৪। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মনীতি

চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধের দুটি লাইন নিয়ে আমি আলোচনা করেছি। এই আলোচনার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। এই মুহূর্ত পর্যন্ত বহু চীনা জনগণই জানেন না এই যুদ্ধে আসলে কী ঘটছে। কুওমিনতাঙ অঞ্চলের ও বিদেশের অনেকেই কুওমিনতাঙ সরকারের অবরোধের নীতির জন্য অন্ধকারে রয়ে গেছেন। ১৯৪৪ সালে একদল চীনা ও বিদেশী সাংবাদিক এখানে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বেড়াতে আসার পূর্বে চীনের মুক্ত অঞ্চল সম্পর্কে তাঁরা আসলে কিছুই জানতেন না। এই দলটি ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেহেতু কুওমিনতাঙ সরকার মুক্ত অঞ্চলের খবর বাইরে জানতে দিতে একান্ত আতঙ্কগ্রস্ত তাই তারা দোর বন্ধ করে দিয়েছে এবং আর কোন সাংবাদিককেই এখানে আসতে দিতে অস্বীকার করেছে। একইভাবে তা কুওমিনতাঙ অঞ্চল সম্পর্কে সত্যকে চেপে রেখেছে। সুতরাং, আমি মনে করি 'এই দুটি অঞ্চল সম্পর্কে যথাসম্ভব সত্যিকার ছবি জনসাধারণকে দেওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। একমাত্র যখন চীনের সমগ্র পরিস্থিতি জনগণ পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে তখনই তারা বুঝতে পারবে কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙ-এর মধ্যে কর্মনীতিগত এমন পার্থক্য কেন এবং কেনই-বা দুই লাইনের মধ্যে এরকম

একটা সংগ্রাম চলছে। একমাত্র তখনই জনগণ বুঝতে পারবে যে দুই পার্টির মধ্যেকার বিরোধ কোন অপ্রয়োজনীয়, গুরুত্বহীন বা অনেকে যা অভিযোগ করেছেন সেরকম কোন খুঁতখুঁতে বাদবিবাদ মাত্র নয় বরং তা হচ্ছে এমন একটি নীতিগত বিরোধ যার ওপর কোটি কোটি মানুষের জীবনমৃত্যু নির্ভর করছে।

চীনের বর্তমান এই গুরুতর পরিস্থিতিতে স্বদেশের জনগণ, গণতন্ত্রী ব্যক্তিগণ ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি এবং অন্যান্য দেশে যাঁরাই চীনের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন তাঁরা সকলেই আশা করেন অনৈক্যের স্থানে ঐক্য দেখা দেবে, গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তিত হবে এবং তাঁরা সকলেই আজকের গুরুতর বহু সমস্যার সমাধানে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি কী তা জানতে চাইবেন। আমাদের পার্টির সদস্যরা অবশ্যই এইসব বিষয়ে আরও গভীরতর আগ্রহ নেবেন।

যুদ্ধে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের আমাদের নীতি সব সময়ই পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট এবং যুদ্ধের আট বছরে তা পরীক্ষিত হয়েছে। আমাদের কংগ্রেসকে আমাদের ভবিষ্যৎ সংগ্রামের পথনির্দেশ হিসেবে তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

চীনের সমস্যাবলী সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান প্রধান কর্মনীতি সম্পর্কে আমাদের পার্টি যে কয়টি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে এখানে আমি তা ব্যাখ্যা করছি।

আমাদের সাধারণ কর্মসূচী

চীনের জনগণের সকল জাপ-বিরোধী শক্তিগুলিকে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ করার, জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এবং স্বাধীন, মুক্ত, গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী নয়া চীন গড়ে তোলার জন্য চীনের জনগণ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও সমস্ত জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির একটি সর্বসম্মত সাধারণ কর্মসূচীর জরুরী প্রয়োজন রয়েছে।

এ ধরনের একটি সাধারণ কর্মসূচীকে সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট এই দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমে আমরা সাধারণ ও পরে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করব।

জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিতে হবে এবং নয়া চীন

গড়ে তুলতে হবে—এই মূল বিষয়ে আমরা কমিউনিস্টরা এবং জনগণের বিপুলতম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই চীনের বর্তমান বিকাশের স্তরে নিম্নলিখিত মৌল প্রস্তাবনার ব্যাপারে সহমত পোষণ করি। প্রথমতঃ, বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের একনায়কত্বাধীন সামন্ততান্ত্রিক, ফ্যাসিবাদী ও জন-বিরোধী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চীনে আমাদের চাই না কারণ কুওমিনতাঙ-এর মূল শাসকগোষ্ঠীর আঠারো বছরের সরকার ইতিমধ্যেই তার পরিপূর্ণ দেউলিয়াপনা প্রমাণ করেছে। দ্বিতীয়তঃ, চীনে সম্ভবতঃ আর পুরানো ধাঁচের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব—একটি নিছক জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র—প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয় এবং তাই তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত হবে না, কারণ একদিকে চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে খুবই দুর্বল প্রমাণ করেছে এবং অন্যদিকে, দীর্ঘকাল ধরে নতুন একটি উপাদান উপস্থিত হয়েছে অর্থাৎ চীনের জাগ্রত শ্রমিকশ্রেণী তার নেতা চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে বিরাট শক্তির প্রকাশ সহকারে আবির্ভূত হয়েছে এবং কৃষকজনগণের, শহুরে পেটি-বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। তৃতীয়তঃ, একই সঙ্গে চীনের জনগণের পক্ষে বর্তমান স্তরে যখন বিদেশী এবং সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম অসমাপ্ত রয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অভাব রয়েছে তখন তাদের পক্ষে একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলন করাও সম্ভব নয়।

তাহলে আমরা কী প্রস্তাব করছি? আমরা প্রস্তাব করছি, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর আমরা চাই নয়া-গণতন্ত্র বলে অভিহিত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে, অর্থাৎ তা হবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপুলতম সংখ্যাধিক জনগণের গণতান্ত্রিক মৈত্রীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি যুক্তফ্রন্ট।

তা হবে এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা যা চীনের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চাহিদা যথার্থভাবে পূরণ করবে, কেননা তা প্রথমেই লক্ষ লক্ষ শিল্পশ্রমিকের এবং কোটি কোটি হস্তশিল্পী ও কৃষিশ্রমিকদের সম্মতি অর্জন করবে এবং আসলে তা অর্জন করেই চলেছে; দ্বিতীয়তঃ, তা চীনের ৪৫ কোটি জনগণের শতকরা ৮০ ভাগ অর্থাৎ ৩৬ কোটি কৃষকজনগণের সম্মতি পাবে এবং তৃতীয়তঃ, বিপুল সংখ্যক শহুরে পেটি-বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবৃন্দ এবং দেশপ্রেমিকদের সম্মতিলাভ করবে।

অবশ্য এই শ্রেণীসমূহের মধ্যে এখনো নানা দ্বন্দ্ব রয়েছে, বিশেষ করে দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে শ্রমিক ও পুঁজির মধ্যে; এবং তার ফলেই শ্রেণীসমূহের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব দাবি আছে। এইসব দ্বন্দ্বের ও বিভিন্ন রকম দাবির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কপটতার নামান্তর ও ভুল হবে। কিন্তু নয়া-গণতন্ত্রের সমগ্র স্তরে ঐ দ্বন্দ্বগুলি, ঐ বিভিন্ন দাবিগুলি বেড়ে তাদের সকলের সাধারণ দাবিকে ছাড়িয়ে যাবে না এবং তা ছাড়িয়ে যেতে দিলেও চলবে না; তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা যায়। এরকম সামঞ্জস্য সাধিত হলে, ঐ শ্রেণীগুলি একত্র হয়ে নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্তব্য-গুলি সম্পাদন করবে।

নয়া-গণতন্ত্রের যে রাজনীতির কথা আমরা বলছি তা বৈদেশিক নিপীড়ন এবং আভ্যন্তরীণ সামন্ততান্ত্রিক ও ফ্যাসীবাদী নিপীড়নকে উৎখাত করে দেবে এবং তারপর পুরানো ধাঁচের নয়, নয়া-গণতান্ত্রিক এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলবে যা হবে সমস্ত গণতান্ত্রিক শ্রেণীসমূহের এক যুক্তফ্রন্ট। আমাদের এই ধ্যানধারণাগুলি ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের বৈপ্লবিক ধ্যানধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কুওমিনতাঙ-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারে ডাঃ সান লিখেছিলেন:

> বিভিন্ন আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে যে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে তা সাধারণতঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর একচেটিয়া করতলগত এবং তা সাধারণ মানুষকে নিপীড়নের নিছক একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে, কুও-মিনতাঙ-এর গণতন্ত্রের মূলনীতি হল এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে সমগ্র সাধারণ মানুষই তার অংশীদার, এবং মুষ্টিমেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার তা নয়।

এই হচ্ছে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের একটি মহান রাজনৈতিক নির্দেশ। চীনের জনগণ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমস্ত গণতন্ত্রী ব্যক্তিদের এই নির্দেশকে মান্য করতে হবে, দৃঢ়ভাবে তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে এবং যেসব ব্যক্তি ও গ্রুপগুলি তাকে অমান্য করবে বা তার বিরোধিতা করবে তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালাতে হবে এবং নয়া-গণতন্ত্রের এই সম্পূর্ণ সঠিক রাজনৈতিক মূলনীতিকে রক্ষা করতে হবে ও বিকশিত করে তুলতে হবে।

নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাংগঠনিক মূলনীতি হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, জনগণের কংগ্রেসগুলি প্রধান কর্মনীতিসমূহ নির্ধারণ করে দেবে এবং তারাই

সর্বস্তরে সরকারকে নির্বাচন করবে। তা হবে একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত অর্থাৎ তা হবে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কেন্দ্রিকতা এবং কেন্দ্রীভূত পরিচালনাধীন গণতন্ত্র। এই হচ্ছে একমাত্র ব্যবস্থা যা গণতন্ত্রকে পূর্ণ অভিব্যক্তি দেবে, বিভিন্ন স্তরের গণ-কংগ্রেসের হাতে থাকবে পূর্ণ ক্ষমতা এবং একই সঙ্গে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনকে তা সুনিশ্চিত করবে এবং প্রতিটি স্তরে কেন্দ্রীয় পরিচালনাধীনে স্ব স্ব স্তরের গণ-কংগ্রেসগুলি কর্তৃক তাদের ওপর অর্পিত কর্তব্যগুলি তারা কার্যকর করে যাবে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক জীবনের পক্ষে যা যা অপরিহার্য তাকে সুনিশ্চিত করবে।

নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তির কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে সৈন্যবাহিনী ও অন্যান্য সশস্ত্রবাহিনী না থাকলে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা যাবে না। শক্তির অন্যান্য সকল সংস্থার মতোই নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনী হবে জনগণেরই সশস্ত্রবাহিনী এবং তা তাদের রক্ষা করবে; পুরানো ধাঁচের যে সৈন্যবাহিনী ও পুলিশবাহিনী প্রভৃতি মুষ্টিমেয়ের সম্পত্তি ছিল এবং জনগণকে নিপীড়ন করত তার সঙ্গে এদের কোনই মিল নেই।

নয়া-গণতন্ত্রের যে অর্থনীতির কথা আমরা বলছি তাও হবে ডা: সান ইয়াৎ-সেনের মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ভূমি সমস্যার প্রশ্নে ডাঃ সান 'কৃষকের হাতে জমি'র কথা বলেছিলেন। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রশ্নে ডাঃ সান তাঁর উপরে উধৃত ইস্তাহারে বলেছিলেন :

> মালিকানা চীনদেশীয় হোক বা বিদেশীয় হোক, যে প্রতিষ্ঠানগুলি একচেটিয়া চরিত্রের অথবা ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার পক্ষে অত্যন্ত বড়—যেমন ব্যাঙ্ক, রেলপথ, বিমানপথের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ—সেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও শাসিত হবে, যাতে ব্যক্তিগত পুঁজি জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য না করতে পারে; এই হচ্ছে পুঁজি নিয়ন্ত্রণের মূল নীতি।

বর্তমান স্তরে, অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে ডাঃ সানের এই ধ্যানধারণাগুলির সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত।

কিছু কিছু লোক সন্দেহ করেন যে, চীনের কমিউনিস্টরা ব্যক্তিগত উদ্যোগের বিকাশের বিরোধী, ব্যক্তিগত পুঁজির এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করার বিরোধী, কিন্তু তাঁরা ভুল করেন। বৈদেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নই চীনের জনগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগের বিকাশের পথে নিষ্ঠুর বেড়ি পরিয়ে রেখেছে, ব্যক্তিগত

পুঁজির বিকাশকে ব্যাহত করছে এবং জনগণের সম্পত্তিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমরা যে নয়া-গণতান্ত্রিক কর্তব্যের কথা বলছি তা এই বেড়িগুলিকে দূর করে দিতে চায়, এই ধ্বংসের তাণ্ডবকে স্তব্ধ করে দিতে চায়, জনগণ যাতে অবাধে তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সমাজকাঠামোর মধ্যে থেকে বিকশিত করে তুলতে পারে এবং ব্যক্তিগতভাবে এমন পুঁজিবাদী অর্থনীতি স্বাধীনভাবে বিকশিত করে তুলতে পারে যা 'জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য করবে না', তার পক্ষে হিতকরই হবে—তাকে সুনিশ্চিত করবে এবং সকল উপযুক্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির রূপকেই তা রক্ষা করবে।

ডাঃ সানের মূলনীতিগুলি এবং চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অনুসারে চীনের জাতীয় অর্থনীতিতে বর্তমান স্তরে থাকবে রাষ্ট্রীয় বিভাগ, ব্যক্তিগত বিভাগ এবং সমবায়ী বিভাগ। কিন্তু এই রাষ্ট্র নিশ্চয়ই 'মুষ্টিমেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার' হবে না, তাকে হতে হবে এমন একটি নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা হবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন এবং 'সমগ্র সাধারণ মানুষই হবে তার অংশীদার'।

অনুরূপভাবে নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে 'সমগ্র সাধারণ মানুষই হবে তার অংশীদার' অর্থাৎ তাকে হতে হবে একটি জাতীয়, বৈজ্ঞানিক ও গণ-সংস্কৃতি এবং কোন পরিস্থিতিতেই এই সংস্কৃতি 'মুষ্টিমেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার' হবে না।

এই হচ্ছে সেই সাধারণ বা মৌলিক কর্মসূচী যার কথা আমরা বর্তমান স্তরের জন্য, সমগ্র বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের জন্য বলছি। এটি হচ্ছে আমাদের নিম্নতম কর্মসূচী, তার সঙ্গে রয়েছে সমাজতন্ত্রের ও সাম্যবাদের আমাদের ভবিষ্যৎ বা সর্বোচ্চ কর্মসূচী। নিম্নতম কর্মসূচীটি কার্যকর হলে চীনের রাষ্ট্র ও চীনের সমাজ এক কদম এগিয়ে ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক থেকে নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ হয়ে দাঁড়াবে।

শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ী যে বিভাগগুলির কথা আমাদের কর্মসূচীতে রয়েছে সেগুলি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক উপাদান। কিন্তু এই কর্মসূচীর রূপায়ণ চীনকে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত করে তুলবে না।

আমরা কমিউনিস্টরা আমাদের রাজনৈতিক অভিমত গোপন করে রাখি না। সুনিশ্চিতভাবে এবং সন্দেহাতীতভাবে, আমাদের ভবিষ্যৎ বা সর্বোচ্চ কর্মসূচী হচ্ছে চীনকে এগিয়ে সমাজতন্ত্রে ও সাম্যবাদে নিয়ে যাওয়া।

আমাদের পার্টির নাম এবং আমাদের মার্কসবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি দ্ব্যর্থহীনভাবে ভবিষ্যতের এই পরম আদর্শের কথাই বলছে, যে ভবিষ্যৎ অতুলনীয় আলোকে ও গৌরবদীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত। পার্টিতে যোগদানের পর প্রত্যেক কমিউনিস্টেরই দুটি সুপরিচ্ছন্ন লক্ষ্য অন্তরে গাঁথা হয়ে থাকে, একটি হচ্ছে বর্তমানের নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং অন্যটি হচ্ছে ভবিষ্যতের সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ এবং সাম্যবাদের শত্রুদের সকল বিরোধিতা সত্বেও, তাদের অমার্জিত ও অজ্ঞতাপ্রসূত কুৎসা, তিরস্কার আর ঠাট্টা-বিদ্রূপকে আমরা শক্তভাবেই মোকাবিলা করে যাব। অবশ্য যথার্থ সংশয়ী সৎ মানুষদের আমরা সদিচ্ছা সহ, ধৈর্য ধরে এবং কোন আক্রমণ না করে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলব। এ সব খুবই পরিষ্কার, সুনির্দিষ্ট আর দ্ব্যর্থহীন কথা।

কিন্তু চীনের সকল কমিউনিস্ট এবং সাম্যবাদের অনুরাগীকেই বর্তমান স্তরের লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। তাদের সংগ্রাম করতে হবে বিদেশী ও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে চীনের জনগণকে তাদের দুঃসহ ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দুরবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে নয়া-গণতান্ত্রিক চীন গড়ে তোলার জন্য যার প্রধান কাজ হবে কৃষকজনগণকে মুক্ত করা, ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী তিন গণ-নীতির চীন গড়ে তোলা এবং মুক্ত, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী চীন গড়ে তোলা। আমরা আসলে ঠিক এই কাজটিই করছি। চীনের ব্যাপক জনগণের সঙ্গে মিলিতভাবে আমরা কমিউনিস্টরা বিগত চব্বিশ বছর ধরে এই লক্ষ্য সামনে রেখেই বীরের মতো সংগ্রাম করে চলেছি।

যদি কোন কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট দরদী সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের কথা বলেন কিন্তু এই লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করতে ব্যর্থ হন, তিনি যদি এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে খাটো করে দেখেন, একটু জিরিয়ে নিতে চান, সামান্য পরিমাণেও মন্থরতায় আশ্রয় নেন, সামান্যতম অশ্রদ্ধা ও আনুগত্যের অভাব দেখান, নিরুত্তাপ ভাব দেখান, নিজের রক্ত বিসর্জনে বা তার জন্য জীবনদানে অনিচ্ছা দেখান তবে জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক এরকম একজন লোক সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রতিই অল্পাধিক বিশ্বাস ঘাতকতা করছেন এবং বুঝতে হবে তিনি নিশ্চিতভাবেই একজন রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সাম্যবাদের জন্য দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামী নন। সমাজতন্ত্রে উপনীত হতে হয় গণতন্ত্রের স্তরের মাধ্যমে এই হচ্ছে মার্কসবাদের বিধান। আর চীনে গণতন্ত্রের জন্য এই

সংগ্রাম হবে দীর্ঘস্থায়ী। ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসাবশেষের ওপর দাঁড়িয়ে একটি নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছাড়া, নয়া-গণতান্ত্রিক অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় বিভাগ বিকশিত না করে, ব্যক্তিগত পুঁজি এবং সমবায়ী বিভাগের বিকাশ না করে, একটি জাতীয়, বৈজ্ঞানিক ও গণ-সংস্কৃতি অর্থাৎ নয়া-গণতন্ত্রের সংস্কৃতি গড়ে না তুলে এবং কোটি কোটি জনগণের মুক্তি এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ না ঘটিয়ে—অর্থাৎ সংক্ষেপে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নতুন ধাঁচের আনুপূর্বিক একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা নিছক স্বপ্ন দেখার সামিল।

কিছু কিছু লোক বুঝতেই পারেন না কেন কমিনিউস্টরা পুঁজিবাদকে ভয় পাওয়া দূরে থাক, বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদের বিকাশের কথাই বলছেন। আমাদের উত্তরটি সহজ-সরল। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও আভ্যন্তরীণ সামন্ততন্ত্রের নিপীড়নের স্থলে একটা পরিমাণ পুঁজিবাদী বিকাশ শুধু যে খানিকটা অগ্রগতি তাই নয়, তা একটা অপরিহার্য প্রক্রিয়াও বটে। এতে শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণী দুয়েরই হিত সাধিত হয় এবং সম্ভবতঃ প্রথমোক্তদেরই অধিকতর হিত সাধিত হয়। আভ্যন্তরীণ পুজিবাদ নয় বরং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং আভ্যন্তরীণ সামন্ততন্ত্রই চীনে আজ অপ্রয়োজনীয় হয়েই দাঁড়িয়েছে ; বস্তুতঃ পুঁজিবাদ তো আমাদের খুবই কম রয়েছে। বিস্ময়ের কথা হচ্ছে এই যে চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর কিছু কিছু মুখপাত্ররাই খোলাখুলি পুঁজিবাদের বিকাশের কথা বলতে লজ্জায় কুঁকড়ে যান, যা বলেন তাও বলেন আভাসে-ইঙ্গিতে। এমন অন্য কিছু লোকও আছেন যাঁরা চীনে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুঁজিবাদের বিকাশকে সরাসরি অস্বীকার করে বসেন, এক লাফে সমাজতন্ত্রে পৌঁছে যাওয়ার কথা বলেন এবং 'এক ধাক্কায়' তিনি গণ-নীতি ও সমাজতন্ত্রের কাজগুলি সেরে ফেলতে চান। স্পষ্টতঃই এই অভিমতগুলি হয় চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দুর্বলতারই প্রকাশ আর নয়তো তা হচ্ছে বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীরই গলাবাজির কপট চালাকি। সমাজ বিকাশের মার্কসীয় বিধানের আমাদের জ্ঞান থেকে, আমরা কমিউনিস্টরা এ কথা খুব পরিষ্কার করেই বুঝি যে চীনে নয়া-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রব্যবস্থাধীনে অর্থনীতির ব্যক্তিগত পুঁজির অংশটি বিকাশ (যদি অবশ্য তা জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য না করে) রাষ্ট্রীয় অংশের এবং ব্যক্তিগত ও সমবায়ী যে অংশের পরিচালনার ভার থাকছে শ্রমজীবী জনগণের ওপর তার পাশাপাশি থেকে সমাজ

সংগ্রাম হবে দীর্ঘস্থায়ী। ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসাবশেষের ওপর দাঁড়িয়ে একটি নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছাড়া, নয়া-গণতান্ত্রিক অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় বিভাগ বিকশিত না করে, ব্যক্তিগত পুঁজি এবং সমবায়ী বিভাগের বিকাশ না করে, একটি জাতীয়, বৈজ্ঞানিক ও গণ-সংস্কৃতি অর্থাৎ নয়া-গণতন্ত্রের সংস্কৃতি গড়ে না তুলে এবং কোটি কোটি জনগণের মুক্তি এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ না ঘটিয়ে—অর্থাৎ সংক্ষেপে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নতুন ধাঁচের আনুপূর্বিক একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা নিছক স্বপ্ন দেখার সামিল।

কিছু কিছু লোক বুঝতেই পারেন না কেন কমিনিউস্টরা পুঁজিবাদকে ভয় পাওয়া দূরে থাক, বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদের বিকাশের কথাই বলছেন। আমাদের উত্তরটি সহজ-সরল। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও আভ্যন্তরীণ সামন্ততন্ত্রের নিপীড়নের স্থলে একটা পরিমাণ পুঁজিবাদী বিকাশ শুধু যে খানিকটা অগ্রগতি তাই নয়, তা একটা অপরিহার্য প্রক্রিয়াও বটে। এতে শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণী দুয়েরই হিত সাধিত হয় এবং সম্ভবতঃ প্রথমোক্তদেরই অধিকতর হিত সাধিত হয়। আভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদ নয় বরং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং আভ্যন্তরীণ সামন্ততন্ত্রই চীনে আজ অপ্রয়োজনীয় হয়েই দাঁড়িয়েছে; বস্তুতঃ পুঁজিবাদ তো আমাদের খুবই কম রয়েছে। বিস্ময়ের কথা হচ্ছে এই যে চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর কিছু কিছু মুখপাত্ররাই খোলাখুলি পুঁজিবাদের বিকাশের কথা বলতে লজ্জায় কুঁকড়ে যান, যা বলেন তাও বলেন আভাসে-ইঙ্গিতে। এমন অন্য কিছু লোকও আছেন যাঁরা চীনে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুঁজিবাদের বিকাশকে সরাসরি অস্বীকার করে বসেন, এক লাফে সমাজতন্ত্রে পৌঁছে যাওয়ার কথা বলেন এবং 'এক ধাক্কায়' তিনি গণ-নীতি ও সমাজতন্ত্রের কাজগুলি সেরে ফেলতে চান। স্পষ্টতঃই এই অভিমতগুলি হয় চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দুর্বলতারই প্রকাশ আর নয়তো তা হচ্ছে বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীরই গলাবাজির কপট চালাকি। সমাজ বিকাশের মার্কসীয় বিধানের আমাদের জ্ঞান থেকে, আমরা কমিউনিস্টরা এ কথা খুব পরিষ্কার করেই বুঝি যে চীনে নয়া-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রব্যবস্থাধীনে অর্থনীতির ব্যক্তিগত পুঁজির অংশটি বিকাশ (যদি অবশ্য তা জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য না করে) রাষ্ট্রীয় অংশের এবং ব্যক্তিগত ও সমবায়ী যে অংশের পরিচালনার ভার থাকছে শ্রমজীবী জনগণের ওপর তার পাশাপাশি থেকে সমাজ

প্রগতিকে সহজতর করার স্বার্থেই প্রয়োজন রয়েছে। অন্তঃসারশূন্য বা প্রতারণাপূর্ণ কথার চালাকিতে আমরা কমিউনিস্টরা বিভ্রান্ত হই না।

এমন কিছু কিছু লোক আছেন, আমরা কমিউনিস্টরা যখন বলি যে 'তিন গণ-নীতিরই আজ চীনের প্রয়োজন, আমাদের পার্টি তাদের পূর্ণ রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত', তখন তাঁরা আমাদের সন্দেহ করেন। তাঁদের এটা বুঝতে না পারার কারণ হচ্ছে, ১৯২৪, সালে কুওমিনতাঙ-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন যে তিন গণ-নীতির কথা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন এবং আমরা যা গ্রহণ করেছিলাম, তার মূলটিই তাঁরা ধরতে পারেননি, তাঁরা বুঝতে পারেননি যে বর্তমান স্তরে আমাদের পার্টির কর্মসূচীর অর্থাৎ আমাদের নিম্নতম কর্মসূচীর মূল বক্তব্যের সঙ্গে তার মিল আছে। এটা দেখিয়ে দেওয়ার দরকার আছে যে, ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের তিন গণ-নীতির সঙ্গে বর্তমান স্তরে আমাদের পার্টির কর্মসূচীর কিছু কিছু মূল বক্তব্যেরই শুধু মিল রয়েছে, সব কিছুতেই তার মিল নেই। আমাদের পার্টির নয়া-গণতন্ত্রের কর্মসূচী ডাঃ সান-এর মূলনীতিগুলির চেয়ে অবশ্যই অনেক পূর্ণাঙ্গ, বিশেষ করে আমাদের পার্টির তত্ত্ব, নয়াগণতন্ত্রের কর্মসূচী ও প্রয়োগ ডাঃ সান-এর মৃত্যুর পরবর্তী কুড়ি বছরে চীন বিপ্লবের বিকাশের মধ্য দিয়ে অনেক বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং তার আরও বিকাশ সাধিত হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মর্মবস্তুর দিক থেকে আগেকার, পুরানো তিন গণ-নীতির চেয়ে স্বতন্ত্র-ভাবে এই তিন গণ-নীতি হচ্ছে নয়া-গণতন্ত্রেরই কর্মসূচী; স্বভাবতঃই, সেগুলি হচ্ছে 'চীনের আজ যা প্রয়োজন' এবং তারই জন্য 'তাদের পরিপূর্ণ রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে আমাদের পার্টি প্রস্তুত'। আমাদের তথা চীনের কমিউনিস্টদের কাছে আমাদের পার্টির নিম্নতম কর্মসূচীর জন্য সংগ্রাম এবং ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী তথা নতুন তিন গণ-নীতির জন্য সংগ্রাম মূলতঃ (যদিও সর্বাংশে নয়) এক এবং অভিন্ন বিষয়। সুতরাং অতীতে ও বর্তমানে যেমন, চীনের কমিউনিস্টরা ভবিষ্যতেও বিপ্লবী তিন গণ-নীতিকে কার্যকর করার ব্যাপারে সবচেয়ে ঐকান্তিক এবং সবচেয়ে দৃঢ় রূপকার হিসেবেই নিজেদের প্রমাণিত করবেন।

কিছু কিছু লোকের সন্দেহ আছে এবং তাঁরা ভাবেন যে একবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে কমিউনিস্ট পার্টি রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে এবং শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব ও একদলীয় প্রথা প্রচলন করে বসবে। আমাদের

উত্তর হচ্ছে এই যে, গণতান্ত্রিক শ্রেণীসমূহের মৈত্রীর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নীতিগত দিক থেকেই ভিন্ন। কোন সন্দেহ নেই, আমাদের নয়া-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে শ্রমিকশ্রেণীর এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে, কিন্তু নয়া-গণতন্ত্রের পুরো স্তরটি জুড়ে চীনে একটি শ্রেণীর একনায়কত্ব বা একটি পার্টির সরকার সম্ভব নয় আর তাই সে চেষ্টা করা উচিতও হবে না। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাদের মনোভাব যদি বৈরীভাবাপন্ন না হয়ে সহযোগিতামূলক হয় তবে এরকম সকল দল, সামাজিক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করার আমাদের দিক থেকে কোন কারণই নেই। রুশ ব্যবস্থাটি রুশীয় ইতিহাসের দ্বারা রূপায়িত হয়ে উঠেছে; রাশিয়াতে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ একটি সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে উচ্ছেদ হয়েছে, সবচেয়ে নতুন ধাঁচের গণতন্ত্রের অর্থাৎ, সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জনগণ শুধু বলশেভিক পার্টিকেই সমর্থন করে এবং সমাজতন্ত্র-বিরোধী সব কটি পার্টিকেই তারা খারিজ করে দিয়েছে। এই সবকিছুর মধ্য দিয়েই রুশীয় ব্যবস্থাটি রূপায়িত হয়ে উঠেছে তা খুবই প্রয়োজনীয় এবং ওখানে তা খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এমনকি রাশিয়াতেও বলশেভিক পার্টি সেখানে একমাত্র পার্টি হলেও, রাষ্ট্রশক্তির বিভিন্ন সংস্থাতে যে ব্যবস্থাটি এখনো অনুসৃত হয় তা হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী এবং পার্টি-সদস্য ও পার্টি-বহির্ভূত লোকজনদের মৈত্রীবন্ধনের একটি ব্যবস্থা এবং তা সরকারী সংস্থায় শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ও বলশেভিকদের কাজ করার একটি ব্যবস্থা নয়। বর্তমান স্তরের চীনা ব্যবস্থাটি চীনের ইতিহাসের বর্তমান স্তরের দ্বারা রূপায়িত হচ্ছে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিশেষ ধরনের একটি রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক শক্তি, রাশিয়ান ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র এক রূপেই তা এখানে প্রচলিত থাকবে যা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং আমাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত অর্থাৎ তা হবে গণতান্ত্রিক শ্রেণীগুলির মৈত্রীর ভিত্তিতে গঠিত নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক শক্তির একটি রূপ।

আমাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী

সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রতিটি যুগের জন্যই আমাদের পার্টির একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকা চাই। নয়া-গণতন্ত্রের আমাদের সাধারণ কর্মসূচী

সমগ্র বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর জুড়ে অর্থাৎ কয়েক দশক ধরে অপরিবর্তিতই থাকবে। কিন্তু এই স্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে বা হচ্ছে এবং তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে আমাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীকেও তদনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে, নয়া-গণতন্ত্রের আমাদের সাধারণ কর্মসূচী উত্তরমুখী অভিযান, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধ এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগগুলি জুড়ে একই থেকে গেছে কিন্তু এই তিনটি যুগে আমাদের শত্রু ও মিত্ররা একই থেকে যায়নি।

চীনের জনগণ এখন নিজেদের নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে দেখতে পাচ্ছে:

(১) জাপানী আক্রমণকারীরা এখনো পরাজিত হয়নি;

(২) চীনের জনগণকে জরুরী কর্তব্যজ্ঞানে একত্র হয়ে জাতীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য গণতান্ত্রিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে, সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিগুলিকে দ্রুত সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, মিত্রদেশগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে হবে; এবং

(৩) কুওমিনতাঙ সরকার জাতীয় ঐক্যে ভাঙন সৃষ্টি করছে এবং এ ধরনের একটি গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী কী, বা অন্য কথায়, জনগণের আশু দাবিগুলি কী কী?

নিম্নলিখিত দাবিগুলিকে আমরা উপযুক্ত এবং সর্বনিম্ন দাবি বলে মনে করি:

জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের জন্য এবং মিত্রশক্তিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভাব্য সকল শক্তিকে সমবেত কর;

কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কত্বের অবসান কর এবং একটি গণতান্ত্রিক সরকার ও যুক্ত সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা কর;

জনগণের বিরোধিতাকারী এবং জাতীয় ঐক্য বিনাশকারী জাপানের সমর্থক লোকজনদের, ফ্যাসিষ্টদের ও পরাজয়বাদীদের শাস্তি প্রদান কর এবং জাতীয় ঐক্য গড়ে তোল;

গৃহযুদ্ধের বিপদ সৃষ্টিকারী প্রতিক্রিয়াশীলদের শাস্তিদান কর এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি সুনিশ্চিত কর;

বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তিদান কর, শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কর এবং জাপানীদের দালালদের শাস্তিদান কর ;

প্রতিক্রিয়াশীল গোয়েন্দা বিভাগ ও তার দমনপীড়নের সমস্ত কার্য-কলাপের বিলোপসাধন কর এবং বন্দী শিবিরগুলি ধ্বংস কর ;

জনগণের বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমাবেশের, সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ব্যক্তির স্বাধীনতাকে দমন করার উদ্দেশ্যে রচিত সকল প্রতিক্রিয়াশীল আইনকানুন এবং হুকুমনামা খারিজ কর এবং জনগণের পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা সুনিশ্চিত কর ;

সমস্ত গণতান্ত্রিক দল ও গ্রুপের আইনানুগ মর্যাদা স্বীকার কর ;

দেশপ্রেমিক সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও ;

চীনের মুক্ত এলাকা অবরোধকারী ও আক্রমণকারী সকল সৈন্য-বাহিনীকে সরিয়ে নাও এবং তাদের জাপ-বিরোধী যুদ্ধফ্রণ্টে প্রেরণ কর ;

জাপ-বিরোধী সশস্ত্রবাহিনীগুলিকে এবং জনপ্রিয়ভাবে নির্বাচিত চীনের মুক্ত অঞ্চলের সরকারগুলিকে স্বীকৃতি দাও ;

মুক্ত অঞ্চলগুলি ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সংহত ও সম্প্রসারিত কর এবং সমস্ত হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার কর ;

জাপ-অধিকৃত অঞ্চলসমূহের জনগণকে গোপন সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলতে এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাতে সাহায্য কর ;

চীনের জনগণকে নিজেদের সশস্ত্র করে তুলতে, নিজেদের ঘরবাড়ি ও নিজেদের দেশকে রক্ষা করতে অনুমতি দাও ;

কুওমিনতাঙ-এর সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলীর অধীন যে সৈন্যবাহিনীগুলি অবিরাম যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছে, জনগণকে নিপীড়ন করছে এবং তাদের প্রত্যক্ষভাবে অধীনস্থ নয় এমন সৈন্যবাহিনীগুলির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছে, সেই সৈন্যবাহিনীগুলিকে রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে ঢেলে সাজাতে হবে এবং যেসব সেনাপতি এই মারাত্মক পরাজয়গুলির জন্য দায়ী তাদের শাস্তি দিতে হবে ;

সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থার এবং অফিসার ও সৈনিকদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন করতে হবে ;

যাতে যুদ্ধফ্রন্টে সৈনিক ও অফিসারেরা পারিবারিক উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়ে সংগ্রাম করতে পারেন তার জন্য জাপ-বিরোধী যুদ্ধে সংগ্রামরত পরিবারগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে ;

যুদ্ধে দৈহিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েছেন এমন সৈনিকদের এবং দেশের জন্য যাঁরা জীবন দান করেছেন সেইসব সৈনিকদের পরিবারবর্গকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে এবং সৈন্য-বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের পুনর্বাসনের এবং জীবিকা অর্জনের ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে ;

যুদ্ধ সংক্রান্ত শিল্পকে বিকশিত করে যুদ্ধ পরিচালনায় সহায়তা করতে হবে ;

মিত্রদেশগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত সামরিক ও আর্থিক সাহায্যকে পক্ষপাতহীনভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধে রত সকল সৈন্যবাহিনীকে ভাগ করে দাও;

দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের শাস্তি দাও ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের প্রচলন কর ;

মাঝারি ও নিম্নস্তরের সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাড়াও ;

চীনের জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার দাও ;

দমনপীড়নমূলক **পাও-চিয়া** ব্যবস্থার বিলোপসাধন কর[৩] ;

যুদ্ধের জন্য শরণার্থী হয়েছেন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছেন এমন সকলকে ত্রাণমূলক সাহায্যদান কর ;

চীনের হৃত অঞ্চল উদ্ধারের পর ঐসব অঞ্চলের জনগণ শত্রুকবলিত থাকাকালে যে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেছেন তা দূর করার জন্য ব্যাপক আকারে ত্রাণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ কর ;

অতিরিক্ত গুরুতর করভার ও বিভিন্ন ধরনের লেভির অবসান কর এবং সুসংহত প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা চালু কর ;

গ্রামীণ ভূমি-সংস্কার প্রবর্তন কর, খাজনা ও সুদ হ্রাস কর, চাষীদের অধিকার সুরক্ষিত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কর, নিঃস্ব কৃষকদের অল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা কর এবং যাতে কৃষিগত উৎপাদনের সম্প্রসারণ সহজ হয় তার জন্য কৃষকদের সংগঠিত হতে সাহায্য কর ;

আমলাতান্ত্রিক পুঁজিকে বে-আইনী ঘোষণা কর ;

বর্তমান অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অবসান কর ;

বল্গাহীন মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ কর ;

ব্যক্তিগত শিল্পগুলিকে ঋণলাভে, কাঁচামাল ক্রয়ে এবং উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী বাজারজাত করতে সহায়তা দান কর ;

শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত কর, বেকারদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা কর এবং যাতে শিল্পগত উৎপাদনের প্রসার সাধিত হয় তারজন্য শ্রমিকদের সংগঠিত হতে সাহায্য কর ;

শিক্ষাক্ষেত্রে কুওমিনতাঙ-এর মতান্ধ প্রচারের অবসান কর এবং একটি জাতীয়, বৈজ্ঞানিক এবং গণ-সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রচলন কর ;

শিক্ষকদের ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অপরাপর কর্মীদের জীবনযাত্রাকে সুনিশ্চিত কর এবং শিক্ষামূলক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সুনিশ্চিত কর ;

যুব, নারী ও শিশুদের স্বার্থ সুরক্ষিত কর—তরুণ শরণার্থী ছাত্রদের সাহায্যদান কর, যুদ্ধ-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ও সমাজপ্রগতির ক্ষেত্রে হিতকর সকল কাজকর্মে সমতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণে সহায়তা করার জন্য যুব ও নারীদের সংগঠিত হতে সাহায্যদান কর, বিবাহের ব্যাপারে স্বাধীনতা ও নরনারীর মধ্যে সমতা সুনিশ্চিত কর এবং তরুণ-তরুণী ও শিশুদের হিতকর শিক্ষাদান কর ;

চীনের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলিকে উন্নততর সুযোগ-সুবিধা দান কর এবং তাদের স্ব-শাসনের অধিকার দাও ;

বিদেশে বসবাসকারী চীনাদের স্বার্থরক্ষা কর এবং যাঁরা মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছেন তাঁদের সহায়তা দান কর ;

জাপানী নিপীড়নের কবল থেকে পালিয়ে যেসব বিদেশী লোকজন চীনে চলে এসেছেন তাঁদের স্বার্থরক্ষা করতে হবে এবং জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে সাহায্য করতে হবে ;

চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক উন্নত কর।

এই দাবিগুলি অর্জন করতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কত্বের অবসান এবং একটি গণতান্ত্রিক অস্থায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, এমন একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায় পেছনে রয়েছে জাতিজোড়া সমর্থন এবং যার মধ্যে থাকবেন জাপ-বিরোধী সমস্ত

পার্টিগুলির প্রতিনিধিগণ এবং দল-বহির্ভূত ব্যক্তিগণ। এই প্রাথমিক শর্তটি পূর্ণ না হলে কুওমিনতাঙ অঞ্চলে এবং স্বভাবতঃই সমগ্র দেশে যথার্থ কোন পরিবর্তন নিয়ে আসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

এই দাবিগুলির মধ্যে চীনের ব্যাপক জনগণের এবং মিত্র দেশগুলির গণতান্ত্রিক জনমতের ব্যাপক অংশের আন্তরিক কামনাই প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

সমগ্র জাপ-বিরোধী পার্টিগুলির স্বীকৃত সর্বনিম্ন সুনির্দিষ্ট একটি কর্মসূচী একেবারে অপরিহার্য এবং আমরা তাদের সঙ্গে ওপরে উল্লিখিত কর্মসূচীটির ভিত্তিতে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছি। বিভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন রকম দাবি-দাওয়া রয়েছে কিন্তু তাদের সবাইকেই সাধারণ কর্মসূচী সম্পর্কে একমত হতে হবে।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলে এরকম একটি কর্মসূচী জনগণের দাবির স্তরেই রয়েছে; সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য গোপন সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলার সাংগঠনিক বিষয়টি ছাড়া জাপানী অঞ্চলে এই কর্মসূচীর রূপায়ণ ঐ অঞ্চল-গুলির পুনরুদ্ধারের ওপর নির্ভর করে রয়েছে; মুক্ত অঞ্চলে এই কর্মসূচীটি ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে এবং অব্যাহত গতিতে তাকে কার্যে প্রয়োগ করে যেতেই হবে।

উপরে চীনের জনগণের যে আশু দাবিগুলি বা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীটি বিবৃত হল তার সঙ্গে এমন বহু গুরুতর যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তরকালীন সমস্যা জড়িত রয়েছে যেগুলি নিয়ে আরও বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই সমস্যাগুলিকে নীচে বিশ্লেষণ করার সময় আমরা কুওমিনতাঙ-এর মূল শাসকচক্র যেসব ভ্রান্ত অভিমত পোষণ করে তার কোন-কোনটার আমরা সমালোচনা করব এবং একই সঙ্গে অন্যান্য লোকজনেরা কিছু কিছু যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার জবাব দেব।

১। জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দাও, মাঝপথে কোন আপোষরফা করতে দিও না

কায়রো সম্মেলন[৭] সঠিকভাবেই জাপানী আক্রমণকারীদের বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কিন্তু জাপানী আক্রমণ-

কারীরা এখন পর্দার আড়ালে আপোষে শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করছে এবং কুওমিনতাঙ সরকারের জাপান-অনুগামী চক্রটি নানকিং-এর তাঁবেদার সরকারের মাধ্যমে জাপানের গোপন দূতদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র আঁটছে এবং এসবের এখনো সমাপ্তি ঘটানো হয়নি। সুতরাং, মাঝপথে আপোষরফার বিপদ এখনো সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যায়নি। কায়রো সম্মেলন আরেকটি ভাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তা হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চারটি প্রদেশ, তাইওয়ান ও পেংহু দ্বীপগুলি চীনকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তার বর্তমান কর্মনীতির বিচার করলে, কুওমিনতাঙ সরকার ইয়ালু নদী পর্যন্ত লড়াই করে এগিয়ে যাবে এবং সমস্ত হৃত অঞ্চল উদ্ধার করবে, এই সম্ভাবনার ওপর ভরসা করা যায় না। এই পরিস্থিতিতে চীনের জনগণ কী করবে? তাদের দাবি করা উচিত—কুওমিনতাঙ সরকারকে জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে হবে এবং মাঝপথে কোন আপোষরফা তা করতে পারবে না। আপোষরফার সকল চক্রান্তকে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। চীনের জনগণকে দাবি করতে হবে—কুওমিনতাঙ সরকারকে তার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতির পরিবর্তন করতে হবে এবং তার সমস্ত সামরিক শক্তিকে জাপানের বিরুদ্ধে সক্রিয় যুদ্ধবিগ্রহে নিয়োজিত করতে হবে। তাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের নিজস্ব সশস্ত্রবাহিনী—অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং জনগণের অন্যান্য বাহিনীকে সম্প্রসারিত করে তোলা, এবং শত্রুরা যেসব স্থানে পৌঁছেছে সেইসব স্থানেই ব্যাপক আকারে তাদের নিজেদের উদ্যোগে জাপ-বিরোধী সশস্ত্রবাহিনীগুলিকে বিকশিত করে তোলা, সরাসরি মিত্রশক্তিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে তাদের উচিত সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা; কোন অবস্থাতেই শুধুমাত্র কুওমিনতাঙ-এর ওপর চীনের জনগণের একান্তভাবে নির্ভর করা উচিত নয়। জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করা চীণের জনগণের একটি পবিত্র অধিকার। যদি প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করে, তাদের জাপ-বিরোধী কার্যকলাপকে দমন করে বা তাদের শক্তিহানি ঘটায় তবে চীনের জনগণের উচিত যদি বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজী করানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয় তবে আত্মরক্ষার জন্য শক্ত হয়ে পাল্টা আঘাত হানা। কারণ চীনের প্রতিক্রিয়াশীলদের ঐ ধরণের জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতামূলক অপকর্ম শুধু জাপানী আক্রমণকারীদেরকেই সহায়তা করে ও মদৎ জোগায়।

২। কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কতন্ত্রের অবসান কর এবং গণতান্ত্রিক একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা কর

জাপানী আক্রমণকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক সংস্কার কার্যকর করা অপরিহার্য। কিন্তু যদি কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় এক-নায়কতন্ত্রের অবসান না করা হয় এবং গণতান্ত্রিক একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা না করা হয় তবে তা সম্ভবপর হবে না।

কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কতন্ত্র আসলে কুওমিনতাঙ-এর মধ্যেকার জন-বিরোধী চক্রেরই একনায়কতন্ত্র এবং এই একনায়কতন্ত্রই চীনের জাতীয় ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে, কুওমিনতাঙ-এর যুদ্ধফ্রন্টে পরাজয়ের পর পরাজয় রচনা করছে এবং চীনের জনগণের জাপ-বিরোধী শক্তিগুলির সমাবেশ ও ঐক্যের পথে তাই হচ্ছে প্রধান বাধা। গত আট বছরের প্রতিরোধ-যুদ্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই একনায়কতন্ত্রের অশুভ ব্যাপারটি সম্পর্কে চীনের জনগণ সম্পূর্ণভাবে অবহিত হয়ে উঠেছে এবং তারা স্বাভাবিকভাবেই তার আশু অবসান দাবি করছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কতন্ত্রটি গৃহযুদ্ধেরও জন্মদাতা এবং এই একনায়কতন্ত্রটিকে যদি অবিলম্বে বিনাশ করা না হয় তবে তা আবার তাদের ওপর গৃহযুদ্ধের দুর্বিপাককে চাপিয়ে দেবে।

এই জন-বিরোধী একনায়কতন্ত্র অবসানের জন্য চীনের জনগণের দাবি এত ব্যাপক হয়ে উঠেছে যে কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই বাধ্য হয়ে প্রকাশ্যে 'রাজনৈতিক অভিভাবকত্বের আশু অবসান ঘটাতে' সম্মত হয়েছে, এ থেকে দেখা যাচ্ছে 'এই রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব' তথা একদলীয় একনায়কতন্ত্র জনগণের সমর্থন এবং জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্য মর্যাদার কী পরিমাণ হানি ঘটিয়েছে। চীনে একটি লোকও 'রাজনৈতিক অভিভাবকত্বের' এই দাবি জানানোর বা একদলীয় একনায়কতন্ত্র কোনপ্রকারে হিতকর বা তার সমাপ্তি বা 'অবসান ঘটনো' উচিত নয় এই দাবি জানানোর দুঃসাহস রাখে না — এটা পরিস্থিতির একটি বিরাট পরিবর্তনেরই সূচক।

এটা সুনিশ্চিত এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে তার 'অবসান ঘটবে'। কিভাবে তার অবসান ঘটানো হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, অবিলম্বে তার অবসান ঘটাও এবং একটি অস্থায়ী

গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার কায়েম কর। অন্যরা বলছেন, একটু অপেক্ষা কর, 'জাতীয় বিধানসভা' আহ্বান কর এবং একটি কোয়ালিশন সরকারের হাতে নয়, 'জনগণের হাতেই রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরিয়ে দাও'।

এর অর্থ কী ?

এর অর্থ হচ্ছে, এটা করার দুটি পথ আছে, একটি হচ্ছে সৎ পথ আর অন্যটি হচ্ছে অসৎ পথ।

প্রথমে সৎ পথের কথা বলা যাক। সৎ পথ হচ্ছে অবিলম্বে কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করা, কুওমিনতাঙ, কমিউনিস্ট পার্টি, ডিমোক্র্যাটিক লীগ এবং দল-বহির্ভূত লোকজনদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অস্থায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং চীনের জনগণের যে আশু দাবিগুলি আমরা ওপরে বিবৃত করেছি তার ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এবং জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করার জন্য একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক করণীয় কর্তব্যকর্মের কর্মসূচী ঘোষণা করা। বিভিন্ন দলের ও দল-বহির্ভূত লোকজনের প্রতিনিধিদের একটি গোলটেবিল সম্মেলন আহ্বান করে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং ঐকমত্যে উপনীত হওয়া ও তদনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করাই উচিত কাজ হবে। এই হচ্ছে ঐক্যের পথ এবং চীনের জনগণ তাকে দৃঢ়ভাবেই সমর্থন জানাবে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে অসৎ পথ। এই অসৎ পথটি হচ্ছে জনগণের এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টির দাবিকে অবহেলা করা এবং কুওমিনতাঙ-এর জন-বিরোধী গোষ্ঠী কর্তৃক সাজানো তথাকথিত একটি জাতীয় বিধানসভা আহ্বানের বায়না ধরা এবং তাকে দিয়ে একটি 'সংবিধান' গ্রহণ করানো যা আসলে হবে গণতন্ত্র-বিরোধী এবং যার লক্ষ্য হচ্ছে এই গোষ্ঠীটির একনায়কত্বকেই মদৎ দেওয়া, এবং ঐ বে-আইনী 'জাতীয় সরকারের' গায়ে আইনানুগতার একটি অঙ্গরাখা পরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা, কয়েক কুড়ি কুওমিনতাঙ সদস্যকে নিয়োগ করে, জনগণের ঘাড়ে তাদের চাপিয়ে দিয়ে এবং জনগণের লেশমাত্র সমর্থনের ভিত্তি যার নেই সংগোপনে গড়ে তোলা ঐরকম একটি সরকারকে সামনে রেখে 'জনগণের হাতে রাষ্ট্রশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হল' এই ভান করা অথচ আসলে তা কিন্তু কুওমিনতাঙ-এর অন্তর্ভুক্ত ঐ একই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতেই 'তাকে ফিরিয়ে দেওয়া'। যে-কেউই তার বিরোধিতা করবে তাকেই 'গণতন্ত্র' ও 'ঐক্যের' ক্ষতিসাধনকারী বলে অভিযুক্ত করা হবে এবং এই অভিযোগই তখন

তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশদানের 'কারণ' হয়ে দাঁড়াবে। এটি হচ্ছে বিভেদ সৃষ্টির পথ এবং চীনের জনগণ তাকে দৃঢ়ভাবেই বিরোধিতা করবে।

আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল বীরপুরুষেরা এই বিভেদ সৃষ্টির নীতির সঙ্গে তাল রেখে যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণের প্রস্তুতি করছে তা সম্ভবতঃ তাদের ধ্বংসের পথেই নিয়ে যাবে। তারা তাদের গলায় একটি ফাঁস পরছে, তাকে শক্ত করে আটকাচ্ছে এবং এই ফাঁসই হচ্ছে তাদের 'জাতীয় বিধানসভাটি'। তাদের মনোগত বাসনা হচ্ছে 'জাতীয় বিধানসভাকে' একটি জাদুদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে প্রথমে কোয়ালিশন সরকার গঠনকে প্রতিহত করা, দ্বিতীয়তঃ, তাদের একনায়কতন্ত্র বজায় রাখা এবং তৃতীয়তঃ, গৃহযুদ্ধের একটি যুক্তি খাড়া করা। কিন্তু ইতিহাসের বিচারধারা বয়ে চলেছে তাদের মনোগত বাসনার প্রতিকূলে এবং তারা দেখতে পাবে 'যে পাথরটি তারা তুলেছে তা তাদের পায়ে পড়ে সবগুলি আঙ্গুলকেই থেঁতলে দিয়েছে'। কারণ এটা এমন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, কুওমিনতাঙ অঞ্চলের জনগণের কোন স্বাধীনতাই নেই এবং জাপানের কবলিত অঞ্চলের জনগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, অন্যদিকে যে মুক্ত অঞ্চলগুলিতে স্বাধীনতা রয়েছে তাকে কুওমিনতাঙ সরকার স্বীকারই করে না। এই যখন অবস্থা, তাই জাতীয় প্রতিনিধি কি করে পাওয়া যাবে? 'জাতীয় বিধানসভা' আসবে কোথা থেকে? যে জাতীয় বিধানসভা নিয়ে ওরা এত হৈ-হল্লা করছে, আট বছর আগে গৃহযুদ্ধের যুগেই তার সকল আকার-প্রকার সহ কুওমিনতাঙ একনায়কতন্ত্র তা বানিয়ে রেখেছিল। যদি এইরকম একটি বিধানসভা আহ্বান করা হয়, সমগ্র জাতি অনিবার্যভাবে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং তখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল বীরপুরুষেরা এই বিপজ্জনক অবস্থা থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাবে? যাই হোক, এই মেকী জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করলে তা তাদের ধ্বংসের পথেই নিয়ে যাবে।

কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কত্ব অবসানের জন্য আমরা কমিউনিস্টরা দুটি পদক্ষেপের প্রস্তাব করেছি। প্রথমটি হচ্ছে, বর্তমান স্তরে সমস্ত পার্টি দল-বহির্ভূত লোকজনের প্রতিনিধিদের মধ্যেকার সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে একটি অস্থায়ী কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, পরবর্তী স্তরে, স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করা এবং একটি নিয়মিত কোয়ালিশন সরকার গড়ে তোলা। এই উভয় ক্ষেত্রেই

গঠিত হবে একটি কোয়ালিশন সরকার যাতে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সমস্ত শ্রেণী ও সমস্ত দলের প্রতিনিধিরাই আজকে জাপানের বিরুদ্ধে এবং আগামীকাল জাতীয় গঠনকর্মের সংগ্রামে একটি গণতান্ত্রিক সাধারণ কর্মসূচীর ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকবেন।

কুওমিনতাঙ বা অন্যান্য পার্টি, গ্রুপ বা ব্যক্তিগণের মনোগত বাসনা যাই হোক, তা তাঁরা পছন্দ করুন বা না করুন, তাঁরা এ ব্যাপারে সচেতন থাকুন বা না থাকুন—চীন একমাত্র এই পথই গ্রহণ করতে পারে। এটি হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক বিধান, একটি অপ্রতিরোধ্য গতিধারা যাকে কোন শক্তিই প্রতিহত করে দিতে পারবে না।

এই সমস্যা ও গণতান্ত্রিক সংস্কারের অন্য সকল সমস্যার ব্যাপারে আমরা কমিউনিস্টরা ঘোষণা করছি যে যদিও কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ এখনো গোঁয়ারের মতো ভ্রান্ত নীতিই আঁকড়ে রয়েছেন এবং আলাপ-আলোচনাকে সময় কাটাবার ও জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যবহার করছেন তবু যে মুহূর্তে তাঁরা তাঁদের বর্তমান ভ্রান্ত নীতিগুলি খারিজ করে দিতে ও গণতান্ত্রিক সংস্কারের ব্যাপারে সম্মতি জানাবেন আমরা তখনই তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করতে রাজী আছি। কিন্তু এই আলাপ-আলোচনার ভিত্তি হওয়া চাই প্রতিরোধ, ঐক্য এবং গণতন্ত্রের সাধারণ মূলনীতিগুলি আর এই সাধারণ মূলনীতি থেকে বিচ্যুত তথাকথিত যে-কোন ব্যবস্থা, পরিকল্পনা বা ফাঁকা ঘোষণাবাণী যত মধুর স্বরেই প্রচারিত হোক না কেন আমরা তাতে সম্মত হব না।

৩। জনগণের জন্য স্বাধীনতা

বর্তমানে চীনের জনগণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম মূলতঃ জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত। কিন্তু কুওমিনতাঙ সরকার তাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে রেখে এবং হাত-পা বেঁধে রেখে জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে বাধা দিচ্ছে। যদি এই সমস্যার সমাধান না হয়, তবে জাতির জাপ-বিরোধী সকল শক্তিকে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ করা অসম্ভব। জনগণ যাতে নিজেদের ঐক্যের বন্ধনকে গড়ে তুলে জাপানকে প্রতিরোধ করার স্বাধীনতা পেতে পারে, ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং গণতন্ত্র জয় করে আনতে পারে ঠিক তারই জন্য আমাদের কর্মসূচীতে নিম্নলিখিত দাবিগুলি উপস্থাপিত করা হয়েছে: একদলীয় একনায়কত্বের অবসান করতে হবে; একটি কোয়ালিশন

সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে; গোয়েন্দা পুলিশের বিলোপসাধন করতে হবে; দমনপীড়নমূলক আইনকানুন ও হুকুমনামাগুলিকে খারিজ করে দিতে হবে; বিশ্বাসঘাতক, গুপ্তচর, জাপানের অনুগামী ব্যক্তিদের, ফ্যাসিষ্ট ও দুর্নীতি-পরায়ণ কর্মচারীদের শাস্তিদান করতে হবে; রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে; সমস্ত গণতান্ত্রিক দলের আইনানুগ মর্যাদা স্বীকার করতে হবে; মুক্ত অঞ্চল অবরোধকারী ও আক্রমণকারী সৈন্যদের প্রত্যাহার করতে হবে; মুক্ত অঞ্চলগুলিকে স্বীকৃতি দান করতে হবে; পাও চিয়া প্রথা উচ্ছেদ করতে হবে; এবং অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও গণ-আন্দোলন সংক্রান্ত এ ধরনের বহু দাবিই উত্থাপন করা হয়েছে।

সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনগণকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়, কারও অনুগ্রহের দান হিসেবে তা পাওয়া যায় না। চীনের মুক্ত অঞ্চলে ইতিমধ্যেই জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলিতেও জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে এবং স্বাধীনতা তাদের অর্জন করতেই হবে। চীনের জনগণের স্বাধীনতা যত বেশি হবে, তাদের সংগঠিত গণতান্ত্রিক শক্তি যত বেশি জোরদার হবে, অস্থায়ী ও ঐক্যবদ্ধ কোয়ালিশন সরকার গঠনের সম্ভাবনাও তত বেশি হবে। একবার গঠিত হওয়ার পর, এই কোয়ালিশন সরকার তার পক্ষ থেকে জনগণকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে এবং এভাবে তার ভিত্তিকেই সুসংহত করে তুলবে। একমাত্র তখনই জাপানী আক্রমণকারীদের উচ্ছেদসাধনের পর সমগ্র দেশব্যাপী স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হবে, একটি জাতীয় বিধানসভা গড়ে তোলা যাবে। নিয়মিত ও ঐক্যবদ্ধ সংহত একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে। জনগণের যদি স্বাধীনতা না থাকে, তবে কোন জাতীয় বিধানসভা সম্ভব নয় বা জনগণ কর্তৃক যথার্থভাবে নির্বাচিত সরকার গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। এটা কি যথেষ্ট পরিষ্কার নয়?

বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমাবেশের ও সংঘ গঠনের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা—এইগুলি হচ্ছে জনগণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা। চীনে একমাত্র মুক্ত এলাকাগুলিতেই এই স্বাধীনতাকে পুরোপুরিভাবে কার্যকর করা হয়েছে।

১৯২৫ সালে মৃত্যুশয্যা থেকে তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন ঘোষণা করেছিলেন:

চল্লিশ বছর ধরে জাতীয় বিপ্লবের লক্ষ্য নিয়ে চীনের স্বাধীনতা ও সমানাধিকার অর্জনের জন্য আমি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি। এই চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী করে তুলেছে যে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের জনগণকে জাগাতে হবে এবং পৃথিবীর সেই-সব জাতির সঙ্গে সাধারণ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যারা আমাদেরকে সমান বলে গণ্য করে।

ডা: সান ইয়াৎ-সেনের যে অযোগ্য উত্তরাধিকারীরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করেছে তারা জনগণকে জাগিয়ে তোলার পরিবর্তে জনগণকে নিপীড়নই করছে, তাদেরকে বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমাবেশের, সংঘ গঠনের, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। জনগণকে যারা যথার্থভাবে জাগিয়ে তুলছে, তাদের স্বাধীনতা ও অধিকারকে রক্ষা করছে সেই কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট সেনাবাহিনী, নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং মুক্ত অঞ্চলগুলিকে তারা 'বিশ্বাসঘাতক পার্টি,' 'বিশ্বাস-ঘাতক সেনাবাহিনী' এবং 'বিশ্বাসঘাতক অঞ্চল' ইত্যাদি অপবাদে ভূষিত করেছে। আমরা আশা করি, সত্য ও মিথ্যার এই উল্টোপাল্টা ব্যবহারের শীঘ্রই সমাপ্তি ঘটবে। তা যদি আরও দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে, তবে চীনের জনগণ তাদের সকল ধৈর্যই হারিয়ে ফেলবে।

৪। জনগণের ঐক্য

জাপানী আক্রমণকারীদের ধ্বংস করার জন্য, গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধ করার জন্য এবং নতুন চীন গড়ে তোলার জন্য বিভক্ত চীনকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলা একান্ত প্রয়োজন; এই হচ্ছে চীনের জনগণের ঐতিহাসিক কর্তব্য।

কিন্তু চীনকে কেমন করে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে? একজন সর্বময় নায়কের স্বৈরাচারী ঐক্যের মধ্য দিয়ে, না জনগণের গণতান্ত্রিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে তা ঐক্যবদ্ধ হবে? য়ুয়ান শী-কাইয়ের[৮] সময় থেকে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজরা স্বৈরাচারী ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু ফল কী দাঁড়িয়েছে? তাদের যা অভিলাষ ছিল তার উল্টোটিই ঘটেছে, যা পাওয়া গেল তা ঐক্য নয়, বিচ্ছেদ; এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ক্ষমতার আসন থেকে হুমড়ি খেয়ে বিদায় নিতে হয়েছে। য়ুয়ান শী-কাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুওমিনতাঙ-এর জন-বিরোধী চক্র স্বৈরাচারী ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিল, পুরো দশটি

বছর ধরে তারা গৃহযুদ্ধ চালিয়ে এসেছে, ফল হয়েছে শুধু এইটুকু, জাপানী আক্রমণকারীদের তারা আসতে দিয়েছে আর ওরা নিজেরা পালিয়ে ওমেই পাহাড়ে[৯] আশ্রয় নিয়েছে। আর এখন ঐ পাহাড়ের চূড়া থেকে তারা আবার স্বৈরাচারী ঐক্য স্থাপনের তত্ত্ব নিয়ে চিৎকার জুড়েছে। কিন্তু কাদের কাছে তারা চিৎকার জুড়েছে? কোন সৎ দেশপ্রেমিক চীনা কি তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন? উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের ষোলো বছরের শাসনে আর একনায়কতন্ত্রী কুওমিনতাঙ-এর আঠারো বছরের শাসনে জীবন কাটানোর পর জনগণের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও বিচার করার দৃষ্টিলাভ হয়েছে। তারা চায় জনগণের গণতান্ত্রিক ঐক্য এবং একজন সর্বময় নায়কের স্বৈরাচারী ঐক্য তারা চায় না। অনেক আগে ১৯৩৫ সালেই, আমরা কমিউনিস্টরা জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নীতি উপস্থিত করেছিলাম এবং তারপর থেকে ঐ ঐক্যের জন্যই আমরা সংগ্রাম করে এসেছি। ১৯৩৯ সালে, কুওমিনতাঙ যখন 'বিদেশী পার্টিগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের' প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করছিল, আত্মসমর্পণের, বিভেদের আর পশ্চাদ্‌গামিতার বিপদকে আসন্ন করে তুলেছিল এবং তাদের স্বৈরাচারী ঐক্যের তত্ত্ব নিয়ে চিৎকার করছিল, আমরা তখন আবার ঘোষণা করেছিলাম: আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে নয়, ঐক্য হওয়া চাই প্রতিরোধকে ভিত্তি করে; তা হওয়া চাই ঐক্যের ভিত্তিতে, ভাঙনের ভিত্তিতে নয়; ঐক্য চাই পশ্চাদ্‌গামিতার ভিত্তিতে নয়, চাই প্রগতির ভিত্তিতে। প্রতিরোধের ভিত্তিতে, ঐক্য ও প্রগতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংহতিই হচ্ছে যথার্থ সংহতি এবং অন্যটি হচ্ছে মেকী জিনিস। ছবছর কেটে গেছে, কিন্তু সমস্যা সেই একই রয়ে গেছে।

জনগণের যদি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র না থাকে তবে কি ঐক্য সম্ভব? যখনই তাদের এই দুটি থাকবে তখনই ঐক্য হবে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও কোয়ালিশন সরকারের জন্য চীনের জনগণের আন্দোলন একই সঙ্গে ঐক্যের জন্যই আন্দোলন। আমাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীতে যখন আমরা স্বাধীনতার জন্য অনেকগুলি দাবি হাজির করেছিলাম, আমরা ঐ সঙ্গে ঐক্যই চেয়েছিলাম। এটা তো খুবই সহজ সাধারণ বুদ্ধির কথা, কুওমিনতাঙ-এর জনবিরোধী গোষ্ঠীর একনায়কতন্ত্রের যদি অবসান না ঘটানো হয় এবং যদি একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে কুওমিনতাঙ অঞ্চলে কোন গণতান্ত্রিক সংস্কারই যে শুধু কার্যকর করা অসম্ভব হবে, সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে

জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজয়ের জন্য সমবেত করা অসম্ভব হবে তাই নয়, তাতে করে শুধু গৃহযুদ্ধের সর্বনাশই অবধারিত হয়ে উঠবে। কুওমিনতাঙ-এর অন্তর্ভুক্ত অনেক লোকজন সহ পার্টি ও পার্টির বাইরের এত বহু সংখ্যক গণ-তন্ত্রীরা সর্বসম্মতভাবে কোয়ালিশন সরকার দাবি করছেন কেন? কারণ বর্তমানের সংকটের কথা তাঁরা খুব পরিষ্কারভাবেই জানেন এবং এ কথা বোঝেন যে তা অতিক্রম করার এবং শত্রুর বিরুদ্ধে ও জাতীয় গঠনকার্যের উভয়ক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠার এ ছাড়া অন্য কোন পথই নেই।

৫। গণফৌজ

জনগণের পক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছে এ রকম একটি সৈন্যবাহিনী না থাকলে চীনের জনগণের পক্ষে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা, একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করা, জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করা বা নয়া চীন প্রতিষ্ঠা করা কোনটিই সম্ভব নয়। বর্তমানে যে সশস্ত্রবাহিনী সম্পূর্ণভাবে জনগণের পক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা হচ্ছে মুক্ত অঞ্চলের অষ্টম রুট সেনাবাহিনী এবং নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী; আকারে এইগুলি খুব বড় নয়, প্রয়োজনের তুলনায় দেখলে সংখ্যায় এরা অল্পই। তবু জন-বিরোধী কুওমিনতাঙ গোষ্ঠী মুক্ত অঞ্চলের এই সৈন্যবাহিনীগুলির ক্ষতিসাধন করার জন্য ও তাদের ধ্বংস করার জন্য অবিরাম ষড়যন্ত্র করেই চলেছে। ১৯৪৪ সালে কুওমিনতাঙ সরকার তথাকথিত একটি স্মারকলিপি পেশ করে দাবি জানায় যে কমিউনিস্ট পার্টিকে 'একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে' মুক্ত অঞ্চলের চার-পঞ্চমাংশ সশস্ত্র বাহিনীকে 'ভেঙে' দিতে হবে। ১৯৪৫ সালে অত্যন্ত সাম্প্রতিক আলোচনকালে তা আরও দাবি জানিয়েছে যে মুক্ত অঞ্চলের সমস্ত সশস্ত্রবাহিনীকেই কমিউনিস্ট পার্টিকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে এবং তারপরই তারা কমিউনিস্ট পার্টিকে 'আইনানুগ মর্যাদা' দেবে।

এই লোকেরা কমিউনিস্টদের বলছে, 'তোমাদের সৈন্যবাহিনীকে আমাদের হাতে অর্পণ কর, আর তারপরই তোমাদের আমরা স্বাধীনতা দেব।' তাদের তত্ত্ব অনুযায়ী যে রাজনৈতিক দলের সৈন্যবাহিনী থাকবে না সে-ই স্বাধীনতা পাবে। কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২৪-২৭ সালে যা কিছু স্বাধীনতা ভোগ করেছিল, তা করেছিল ঐ সময়ে তাদের যে ছোট একটি সশস্ত্র-বাহিনী ছিল.তার দৌলতেই এবং কুওমিনতাঙ সরকারের 'পার্টি শুদ্ধিকরণ ও

হত্যাকাণ্ডের নীতি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বাধীনতা শেষ হয়ে যায়। আজ চীনের ডিমোক্র্যাটিক লীগ ও কুওমিনতাঙ-এর অন্তর্ভুক্ত গণতন্ত্রীদের যেহেতু কোন সশস্ত্রবাহিনী নেই, তাই ওদের কোন স্বাধীনতা নেই। কুওমিনতাঙ শাসনাধীন শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও প্রগতিমুখী সংস্কৃতি-কর্মীবৃন্দ, শিক্ষা ও শিল্প জগতের লোকজনদের কথা ধরুন—গত আঠারো বছর ধরে তাদের কারও কোন সশস্ত্রবাহিনী ছিল না আর তাই কোন স্বাধীনতাও তাদের ছিল না। তাহলে কি এই দাঁড়িয়েছিল যে এই সকল গণতান্ত্রিক পার্টি ও জনগণের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তাঁরা সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন 'সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছিলেন', 'বিশ্বাসঘাতক এলাকা' গড়েছিলেন এবং 'সরকারী ও সামরিক আদেশ' লংঘন করেছেন বলে? মোটেই তা নয়। বরং উল্টো, তাঁরা এই কাজগুলির কোনটি করেননি তার জন্যই তাঁদের কোন স্বাধীনতা ছিল না।

'সৈন্যবাহিনী রাষ্ট্রের ব্যাপার'—কথাটা সম্পূর্ণ সত্য এবং পৃথিবীতে কোথাও কোন সৈন্যবাহিনী নেই যা রাষ্ট্রের আওতাধীন নয়। কিন্তু সেটা কি ধরনের রাষ্ট্র? ঐ রাষ্ট্র কি বৃহৎ জমিদার' বৃহৎ ব্যাঙ্কমালিক ও বৃহৎ মুৎসুদ্দিদের সামন্ততান্ত্রিক, ফ্যাসিবাদী একটি রাষ্ট্র, না ব্যাপক জনগণের নয়া-গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র? একমাত্র যে ধরনের রাষ্ট্র চীনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা হচ্ছে একটি নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং এই ভিত্তিতেই তার চাই একটি নয়া-গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার, চীনের সমস্ত সশস্ত্রবাহিনী থাকবে এরকমের একটি সরকারের হাতে যাতে করে তা জনগণের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে পারবে এবং কার্যকরভাবে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারবে। যে মুহূর্তে চীনে নয়া-গণতান্ত্রিক সরকার গড়ে উঠবে, চীনের মুক্ত অঞ্চলগুলি তখনই তার হাতে নিজেদের সশস্ত্রবাহিনীকে তুলে দেবে। কিন্তু একই সঙ্গে কুওমিনতাঙ-এর সকল সশস্ত্রবাহিনীকেও তার হাতে তুলে দিতে হবে।

১৯২৪ সালে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন বলেছিলেন, 'আজকের এই দিনটি জাতীয় বিপ্লবের একটি নতুন যুগের সূত্রপাত করছে।...তার প্রথম পদক্ষেপ হবে সশস্ত্রবাহিনীকে জনগণের সঙ্গে এক করে দেওয়া এবং পরবর্তী পদক্ষেপ হবে তাদের জনগণের সশস্ত্রবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা।'[১০] এই কর্মনীতির প্রয়োগ করা হয়েছে বলেই অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী হয়ে উঠেছে 'জনগণের সশস্ত্রবাহিনী' অর্থাৎ গণফৌজ এবং তা নানা বিজয় অর্জন

করেছে। তার আগে উত্তরমুখী অভিযানের প্রাথমিক দিকে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী ডাঃ সানের 'প্রথম পদক্ষেপটি' গ্রহণ করে এবং বিজয় অর্জন করে। উত্তরমুখী অভিযানের পরের দিকে তারা 'প্রথম পদক্ষেপটি'ও পরিত্যাগ করে বসে, জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তারা ক্রমেই বেশি বেশি করে দুর্নীতিপরায়ণ ও অধঃপতিত হয়েছে; আভ্যন্তরীণ যুদ্ধকালেই এদের আসল শক্তি দেখা যায় কিন্তু যখন বিদেশীদের সঙ্গে লড়তে হয় তখন তাদের আসল শক্তির কোন দেখাই মেলে না। কুওমিনতাঙ-এর প্রতিটি দেশপ্রেমিক অফিসারকেই ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের মনোভাবটিকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তার সৈন্যবাহিনীকে নবরূপ দান করতে হবে।

পুরানো সৈন্যবাহিনীগুলিকে রূপান্তরিত করার সময় যেসব অফিসারকে আবার শিক্ষা দেওয়া সম্ভব এমন সকল অফিসারকেই উপযুক্ত শিক্ষাদান করতে হবে তাঁদের অচল সাবেক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করার জন্য এবং সঠিক একটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য যাতে করে তাঁরা নিজ কাজে নিযুক্ত থাকতে পারেন এবং গণফৌজকে সেবা করে যেতে পারেন।

সমগ্র জাতিরই কর্তব্য হচ্ছে চীনের জনগণের সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করা। গণফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকে না। এই প্রশ্নে ফাঁকা কোন তত্ত্বকথার অবকাশ নেই।

আমরা কমিউনিস্টরা চীনের সৈন্যবাহিনীর রূপান্তর সাধনের কাজে আমাদের সমর্থনদান করতে প্রস্তুত আছি। ঐ সামরিক বাহিনীগুলির মধ্যে যারাই চীনের মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীগুলির বিরোধিতা করার পরিবর্তে জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং জাপানী আক্রমণকারীদের বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক, তাদেরই মিত্র সৈন্যবাহিনী হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী তাদেরকে যথোপযুক্ত সহায়তাদানই করবে।

ভূমি সমস্যা

জাপানী আক্রমণকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং নয়া চীন গড়ে তোলার জন্য ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারসাধন ও কৃষকদের মুক্ত করা একটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য। প্রকৃতির দিক থেকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আমাদের এই বিপ্লবের বর্তমান যুগে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের 'কৃষকের হাতে জমির' নীতিটিই সঠিক।

আমরা কেন এ কথা বলছি যে বর্তমান যুগে আমাদের বিপ্লব হচ্ছে প্রকৃতির দিক থেকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক? আমরা বোঝাতে চাই যে, বিপ্লবের লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণভাবে বুর্জোয়া নিপীড়ন নয় বরং জাতীয় ও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নেরই অবসান অর্থাৎ বিপ্লবে যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হবে তা সাধারণভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধনের দিকে নয় বরং তাকে রক্ষা করার দিকেই পরিচালিত এবং এই বিপ্লবের ফলে চীনকে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যেতে শ্রমিকশ্রেণী নিজের শক্তিবৃদ্ধি করে তুলতে সমর্থ হবে যদিও বেশ খানিকটা দীর্ঘকাল ধরে পুঁজিবাদ উপযুক্ত পরিমাণে এখানে বিকশিত হয়ে উঠতে পারবে। 'কৃষকের হাতে জমির' অর্থ হচ্ছে সামন্ত শোষকদের হাত থেকে জমি কৃষকদের হাতে দিয়ে দেওয়া, সামন্ত জমিদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কৃষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা এবং সামন্তবাদী ভূমি সম্পর্কের বন্ধন থেকে তাদের মুক্তিদান করা ও এইভাবে কৃষিপ্রধান দেশটিকে শিল্পপ্রধান একটি দেশে রূপান্তরিত হওয়াকে সম্ভবপর করে তোলা। 'কৃষকেব হাতে জমির' দাবিটি তাই প্রকৃতির দিক থেকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক, তা প্রলেতারীয়-সমাজতান্ত্রিক দাবি নয়। এটা শুধুমাত্র কমিউনিস্টদের নয়, সকল বিপ্লবী গণতন্ত্রীদেরই দাবি। পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে চীনের পরিস্থিতিতে একমাত্র আমরা কমিউনিস্টরাই এই দাবিটিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখে থাকি এবং নিছক মুখের কথা হিসেবে তাকে না রেখে বাস্তবে তাকে প্রয়োগ করি। বিপ্লবী গণতন্ত্রী কারা? বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে একনিষ্ঠ শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া, কৃষকেরাই হচ্ছেন বৃহত্তম অংশ। কৃষকদের বিপুলতম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক লেজবিশিষ্ট ধনী কৃষকগণ ছাড়া সকল কৃষকেরাই সক্রিয়ভাবে 'কৃষকের হাতে জমি' দাবি করেন। শহুরে পেটি-বুর্জোয়ারাও বিপ্লবী গণতন্ত্রী এবং 'কৃষকের হাতে জমি' তাদের পক্ষেও হিতকর প্রমাণিত হবে কারণ তা কৃষির উৎপাদিকাশক্তির বিকাশের সহায়ক হবে। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী হচ্ছে একটি দোদুল্যমান শ্রেণী—তারাও 'কৃষকের হাতে জমির' দাবি অনুমোদন করে কারণ তাদেরও বাজারের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু তাদের অনেকের ভয়ও আছে যেহেতু তাদের অনেকেরই ভূমি সম্পত্তির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা রয়েছে। ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন ছিলেন চীনের একেবারে প্রথমদিকের বিপ্লবী গণতন্ত্রী। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিপ্লবী অংশের এবং শহুরে পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী ও কৃষকজনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সশস্ত্র

বিপ্লব পরিচালনা করেছিলেন এবং 'ভূমিস্বত্ব সমীকরণের' ও 'কৃষকের হাতে জমির' তাঁর মূল বক্তব্য তিনি হাজির করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার-সাধন করেননি। আর যখন কুওমিনতাঙ-এর জন-বিরোধী অংশ ক্ষমতা করতলগত করল, তারা পুরোপুরি তাঁর আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করে বসল। এই চক্রটিই এখন একগুঁয়েভাবে 'কৃষকের হাতে জমির' বিরোধিতা করছে কারণ তারা হচ্ছে বৃহৎ জমিদার, ব্যাঙ্কমালিক আর মুৎসুদ্দিদেরই প্রতিনিধি। একমাত্র বিশেষ করে কৃষকদের প্রতিনিধিত্বকারী কোন রাজনৈতিক দল যেহেতু চীনে নেই এবং যেহেতু জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর কোন আনুপূর্বিক ভূমি-সংক্রান্ত কর্মসূচী নেই, তাই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কৃষকদের এবং অন্য সকল বিপ্লবী গণতন্ত্রীদেরও নেতা হয়ে উঠেছে কেননা তাই হচ্ছে একমাত্র পার্টি যা আমূল ভূমি সংস্কারের একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে এবং তাকে কার্যকর করেছে, কৃষকদের স্বার্থে ঐকান্তিকতার সাথে সংগ্রাম করে এসেছে এবং মহান মিত্র হিসেবে কৃষকদের বিপুলতম সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করেছে।

১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল এবং ডাঃ সানের 'কৃষকের হাতে জমিকে' বাস্তবে প্রয়োগ করেছিল। কুওমিনতাঙ-এর প্রতিক্রিয়াশীল চক্র, ডাঃ সানের অযোগ্য অনুগামীদের এই দঙ্গলটিই তারপর তাদের নখদন্ত বিস্তার করে দশটি বছর ধরে 'কৃষকের হাতে জমির' বিরুদ্ধে জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এসেছে।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি 'কৃষকের হাতে জমির' কর্মনীতি পরিবর্তন করে খাজনা ও সুদ হ্রাসের কর্মনীতি গ্রহণ করে একটি বড় রকমের সুযোগ দিয়েছে। এই সুযোগটি দিয়ে ঠিকই করা হয়েছে কারণ এতে করে কুওমিনতাঙকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়ে আসার সহায়তা হয়েছে এবং মুক্ত অঞ্চলে যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের কৃষকদের সমবেত করার পথে জমিদারদের প্রতিরোধ শিথিল হয়েছে। যদি বিশেষ কোন বাধা দেখা না দেয়, আমরা যুদ্ধের পরেও এই নীতি অব্যাহত রাখতে রাজী আছি, প্রথমে সারাদেশে খাজনা ও সুদ হ্রাসের নীতিটি প্রসারিত করা হবে এবং তারপরই 'কৃষকের হাতে জমির' ব্যবস্থা চালু করার জন্য ধীরে ধীরে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু যারা ডাঃ সানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে তারা 'কৃষকের হাতে জমি' দূরে থাক খাজনা ও সুদ হ্রাসেরই বিরোধিতা করছে। কুওমিনতাঙ সরকার নিজেই 'শতকরা পঁচিশ ভাগ খাজনা হ্রাস করা' ও অন্যান্য যেসব হুকুমনামা জারী করেছিল তা কার্যে প্রয়োগ করেনি; একমাত্র মুক্ত অঞ্চলে আমরাই তা কার্যকর করেছি এবং এই অপরাধের জন্য মুক্ত অঞ্চলকে ওরা 'বিশ্বাসঘাতক অঞ্চল' বলে অভিহিত করেছে।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধ চলাকালে একটি 'জাতীয় বিপ্লবের' স্তর এবং অন্যটি 'গণতন্ত্র ও জনগণের জীবিকার বিপ্লবের' স্তর তথাকথিত এই দুই স্তরের তত্ত্বটি আবির্ভূত হয়েছে। এই তত্ত্ব ভুল।

'ভয়াবহ এক শত্রুর মুখোমুখি হয়ে আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্কার বা জনগণের প্রশ্নটি উত্থাপন করা উচিত নয়; জাপানীরা বিদায় নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল'—যুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয় প্রতিহত করার মতলব নিয়ে কুওমিনতাঙ-এর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রটি এই আজব তত্ত্ব হাজির করেছে। তবু এমন লোক দেখা যাচ্ছে যারা এই তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি করছে এবং তার একান্ত অনুগত স্তাবক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'ভয়াবহ এক শত্রুর মুখোমুখি হয়ে জাপানীদের বিরুদ্ধে ঘাঁটি অঞ্চলসমূহ গড়ে তোলা এবং তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা গণতন্ত্র ও জনগণের জীবিকার প্রশ্নের সমাধান না করলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না'—চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই কথাটিই বলে আসছে এবং তাছাড়া এটাকে কাজে প্রয়োগ করে চমৎকার ফলই লাভ করেছে।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধের যুগে খাজনা ও সুদ হ্রাস এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংস্কার যুদ্ধেরই স্বার্থসাধন করে। যুদ্ধ-প্রয়াসের ক্ষেত্রে জমিদারদের প্রতিরোধকে শিথিল করার জন্য আমরা জমির ওপর তাদের মালিকানার বিলোপসাধন করা থেকে বিরত রয়েছি এবং শুধুমাত্র খাজনা ও সুদই হ্রাস করছি; একই সঙ্গে, আমরা তাদের সম্পদকে শিল্পে বিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছি এবং আলোকপ্রাপ্ত অভিজাত জমির মালিকদের যুদ্ধ সংক্রান্ত এবং সরকারের সমবেত কার্যক্রমে জনগণের অন্যান্য প্রতিনিধিদের পাশাপাশি অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছি। ধনী কৃষকদের সম্পর্কে বলা যায়, আমরা তাদের উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহ দিয়েছি। গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক সংস্কারের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পথেরই তা অঙ্গ এবং তা একান্তই অপরিহার্য।

এই হচ্ছে দুই লাইন। হয় গণতন্ত্র ও জনগণের জীবিকার সমস্যার সমাধানের জন্য চীনের কৃষকদের প্রয়াসের প্রাণপণ বিরোধিতা করতে হবে ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়তে হবে, জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অকর্মণ্য ও একেবারে অসমর্থ হয়ে পড়তে হবে; আর নয়তো মোট লোকসংখ্যার শতকরা আশি ভাগ চীনের কৃষককে তাঁদের প্রয়াসে দৃঢ় সমর্থন জানিয়ে, সবচেয়ে মহান এক মিত্রবাহিনীকে সপক্ষে পেয়ে বিশাল সংগ্রামী শক্তির অধিকারী হয়ে উঠতে হবে। প্রথমটি হচ্ছে কুওমিনতাঙ সরকারের লাইন, পরেরটি হচ্ছে চীনের মুক্ত অঞ্চলগুলির লাইন।

সুবিধাবাদীদের লাইন হচ্ছে এই দুটির মধ্যে দোদুল্যমান হয়ে থাকা, কৃষকদের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করা অথচ খাজনা ও সুদ হ্রাসের ব্যাপারে, কৃষকদের সশস্ত্র করে তোলার ব্যাপারে অথবা গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দৃঢ়তার অভাব প্রদর্শন করা।

তাদের আওতাধীন সমস্ত শক্তিকে ব্যবহার করে কুওমিনতাঙ-এর জনবিরোধী চক্রটি সর্বপ্রকার প্রকাশ্য ও গোপন জঘন্য সামরিক ও রাজনৈতিক, রক্তাক্ত ও রক্তপাতহীন এই উভয় পথেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে এসেছে। এই সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে দুই পার্টির মধ্যেকার এই বিরোধ মূলত দেখা দিয়েছে কৃষি সম্পর্কের প্রশ্নে। ঠিক কোথায় আমরা কুওমিনতাঙ-এর প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিরক্তি উৎপাদন করেছি? তা কি এইখানটিতেই নয়? এক্ষেত্রে জাপানী আক্রমণকারীদের বিরাট সাহায্য জুগিয়ে এই গোষ্ঠীটি কি তাদের কাছ থেকে আনুকূল্য ও উৎসাহলাভ করেনি? চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে আন্তর্ঘাত সৃষ্টি ও রাষ্ট্রকে বিপন্ন করা', 'বিশ্বাসঘাতক পার্টি', 'বিশ্বাসঘাতক সৈন্যবাহিনী', 'বিশ্বাসঘাতক অঞ্চল' এবং 'সরকারী ও সামরিক আদেশ অমান্য করা' প্রভৃতি যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তা কি ঠিক এক্ষেত্রে জাতির প্রকৃত স্বার্থে সততার সঙ্গে কাজ করার জন্যই আরোপ করা হয়নি?

কৃষকেরাই হচ্ছেন চীনের শিল্পশ্রমিকদের উৎস। ভবিষ্যতে আরও কোটি কোটি কৃষক শহরে ও কল-কারখানায় কাজ করতে যাবেন। চীনকে যদি শক্তিশালী জাতীয় শিল্প ও বহু সংখ্যক আধুনিক নগর গড়ে তুলতে হয় তবে গ্রামাঞ্চলীয় অধিবাসীদের শহরাঞ্চলীয় অধিবাসীতে পরিণত করার দীর্ঘ এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যেতে হবে।

কৃষকরাই হচ্ছেন চীনের শিল্পজাত পণ্যের প্রধান ক্রেতা। একমাত্র তাঁরাই খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে জোগান দিতে পারবেন এবং উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের বিপুল পরিমাণকে ব্যবহার করবেন।

কৃষকেরাই হচ্ছেন চীনের সৈন্যবাহিনীর উৎস। সৈনিকেরা হচ্ছেন সামরিক পোশাক পরিহিত কৃষকমাত্র, জাপানী আক্রমণকারীদের তাঁরা হচ্ছেন চরম শত্রু।

কৃষকেরাই হচ্ছেন চীনের বর্তমান স্তরে গণতন্ত্রের সপক্ষের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। ৩৬ কোটি কৃষকজনগণের ওপর নির্ভর না করলে চীনের গণতন্ত্রীরা কিছুই করতে পারবেন না।

কৃষকেরাই হচ্ছেন চীনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বর্তমান স্তরের প্রধান ভাবনার বিষয়। ৩৬ কোটি কৃষককে বাদ দিয়ে দিলে, 'নিরক্ষরতার অবসান', 'শিক্ষার জনপ্রিয়তাসাধন', 'জনগণের জন্য সাহিত্য ও শিল্প' এবং 'জনস্বাস্থ্য' ইত্যাদি কথাবার্তা অনেকখানি ফাঁকা আওয়াজ হয়ে দাঁড়ায় না কি ?

এই কথা বলে অবশ্যই আমি জনগণের বাকী অংশ অর্থাৎ প্রায় ৯ কোটি মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে আদৌ অবহেলা করছি না, বিশেষ করে, যে শ্রমিকশ্রেণী হচ্ছেন রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে সচেতন এবং স্বভাবতঃই সমগ্র বৈপ্লবিক আন্দোলনকে নেতৃত্বদানের যোগ্য তাকে অবহেলা করছি না। এক্ষেত্রে কেউ যেন ভুল বুঝে না বসেন।

শুধু কমিউনিস্টদের পক্ষেই নয় বরং চীনের প্রত্যেকটি গণতন্ত্রীর পক্ষেই এই বিষয়গুলি আয়ত্ত করা একান্ত অপরিহার্য।

ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার হওয়ার পর, এমনকি খাজনা ও সুদ হ্রাসের মতো অত্যন্ত প্রাথমিক সংস্কারের পর, কৃষকরা উৎপাদনের ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তারপর কৃষকেরা যখন ক্ষেতের কাজের সংগঠনে নানা-প্রকার সাহায্যলাভ করেন এবং স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে ধাপে ধাপে অন্যান্য সমবায়ী কাজকর্মের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন তখন উৎপাদিকাশক্তিগুলিই বিকশিত হয়ে ওঠে। বর্তমানে কৃষি খামারগুলি শুধু যৌথ; ব্যক্তিগত কৃষক অর্থনীতির ভিত্তিতে (অর্থাৎ কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে) পারস্পরিক সাহায্যের শ্রমসংগঠন, যেমন শ্রম-বিনিময়কারী টীম, পারস্পরিক সাহায্যকারী টীম ও সমপরিমাণ কাজের বিনিময়কারী গোষ্ঠীই হতে পারে, তা সত্ত্বেও শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বেড়ে যাবে এবং ফলন হয়ে দাঁড়াবে

রীতিমত বিস্ময়কর। চীনের মুক্ত অঞ্চলে এ ধরনের সংগঠন ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং এখন থেকে তাকে যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করে তুলতে হবে।

এটাবলা দরকার শ্রম-বিনিময়কারী টীমের অনুরূপ সমবায়ী সংগঠন কৃষকদের মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত রয়েছে কিন্তু অতীতে একমাত্র এই পথের মধ্য দিয়েই তারা তাদের দুঃসহ নিঃস্বতাকে যথাসাধ্য ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করত। আজ চীনের মুক্ত অঞ্চলে এই শ্রম-বিনিময়কারী টীমগুলি আকার ও মর্মবস্তু দুই দিক থেকেই ভিন্ন রকমের; এইগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে উৎপাদন বৃদ্ধির এবং উন্নততর জীবনের জন্য প্রয়াসের ক্ষেত্রে কৃষকজনগণের হাতিয়ারস্বরূপ।

শেষ বিচারে চীনের যে-কোন রাজনৈতিক দলের নীতি ও প্রয়োগের ভাল বা মন্দ, অল্প বা অধিক যে প্রভাবই জনগণের ওপর সৃষ্টি হবে তা নির্ভর করছে তাতে করে জনগণের উৎপাদিকাশক্তিগুলির বিকাশ সাধিত হচ্ছে কিনা বা কতখানি' হচ্ছে এবং তা ঐ শক্তিগুলিকে রুদ্ধ করছে না মুক্ত করে দিচ্ছে তার ওপর। চীনের সামাজিক উৎপাদিকাশক্তিগুলিকে মুক্ত করে দেওয়া যাবে একমাত্র জাপানী আক্রমণকারীদের ধ্বংস করে দেওয়া, ভূমি সংস্কার কার্যকর করা, কৃষকজনগণকে মুক্তিদান করা, আধুনিক শিল্প গড়ে তোলা এবং মুক্ত; স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী নয়া চীন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে—এবং তা চীন জনগণের অনুমোদনই লাভ করবে।

এটা দেখিয়ে দেওয়ার দরকার আছে যে শহুরে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা গ্রামাঞ্চলে কাজ করার জন্য আসেন তাঁদের পক্ষে গ্রামীণ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝা খুব সহজ নয়, কেননা গ্রামাঞ্চল এখনো বিক্ষিপ্ত, পশ্চাদ্পদ, ব্যক্তিগত অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তদুপরি মুক্ত অঞ্চলগুলি শত্রু কর্তৃক একটি অন্যটির থেকে বিচ্ছিন্ন ও গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করতে না পেরে তাঁরা প্রায়ক্ষেত্রেই অনুপযুক্ত মনোভাব গ্রহণ করেন এবং গ্রামীণ সমস্যা ও গ্রামীণ কাজকর্মের ক্ষেত্রে শহরের জীবন ও কর্মধারার দৃষ্টিকোন থেকে অগ্রসর হন এবং এভাবে নিজেদের গ্রামাঞ্চলের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন ও কৃষকদের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে তুলতে ব্যর্থ হন। শিক্ষার মাধ্যমে এটিকে দূর করা প্রয়োজন।

চীনের অসংখ্য বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীকে কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে হবে। কৃষকেরা তাঁদের সাহায্য

চান এবং তাঁদের সাহায্যের অপেক্ষা করছেন। তাঁদের উৎসাহ নিয়েই গ্রামাঞ্চলে যেতে হবে, তাঁদের ছাত্রদের খোলস ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং মোটা কাপড় পরতে হবে এবং স্বেচ্ছায় একেবারে তুচ্ছ হলেও সেই সকল কাজই করতে এগিয়ে যেতে হবে; কৃষকেরা যা চান তা-ই তাঁদের শিখতে হবে এবং গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনের সংগ্রামে তাঁদের জাগিয়ে তুলতে ও সংগঠিত করে তুলতে সাহায্য করতে হবে, চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে তা হচ্ছে অন্যতম একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কর্তব্য।

জাপানী আক্রমণকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পর, তারা ও মুখ্য বিশ্বাসঘাতকেরা যে জমি জবরদখল করেছিল আমরা তা বাজেয়াপ্ত করে নেব এবং যেসব কৃষকের কোন জমি নেই বা অল্প জমি আছে তাঁদের মধ্যে তা বণ্টন করে দেব।

৭। শিল্পের সমস্যা

জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করার জন্য এবং নয়া চীন গড়ে তোলার জন্য শিল্পের বিকাশসাধন প্রয়োজন। কিন্তু কুওমিনতাঙ সরকার সবকিছুর জন্যই বিদেশের ওপর নির্ভর করছে এবং তার আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতি জনগণের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কুওমিনতাঙ অঞ্চলে ছোটখাট কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠানই চোখে পড়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের পক্ষে দেউলিয়া হয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকেনি। রাজনৈতিক সংস্কারের অনুপস্থিতির জন্য সমস্ত উৎপাদিকাশক্তিই ধ্বংস হয়ে পড়ছে এবং এটা শিল্প ও কৃষি উভয়ের ক্ষেত্রেই সঠিক।

মোটামুটিভাবে বলা যায় চীন স্বাধীন, মুক্ত, গণতান্ত্রিক এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার আগে শিল্পের বিকাশ অসম্ভব। জাপানী আক্রমণকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে স্বাধীনতার প্রত্যাশা। কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কত্বের বিলোপসাধন করার অর্থ হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক ও ঐক্যবদ্ধ কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং চীনের সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে জনগণের সশস্ত্রবাহিনীতে রূপান্তরিত করা, ভূমি সংস্কার কার্যকর করা এবং কৃষকদের মুক্ত করার অর্থ হচ্ছে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ঐক্যের প্রত্যাশা। স্বাধীনতা, মুক্তি, গণতন্ত্র, ও ঐক্য ছাড়া যথার্থ ব্যাপক আকারে শিল্প গড়ে তোলা অসম্ভব। শিল্প ছাড়া কোন দৃঢ়সংবদ্ধ জাতীয় প্রতিরক্ষা, জনগণের

কল্যাণ, জাতির শক্তি ও সমৃদ্ধি অসম্ভব। ১৮৪০ সালের আফিম যুদ্ধের[11] থেকে ১০৫ বছরের এবং বিশেষ করে কুওমিনতাঙ ক্ষমতায় আসার পরবর্তী আঠারো বছরের ইতিহাস এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি চীনের জনগণকে পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। দরিদ্র ও দুর্বল চীন নয়, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী চীন বললেই বোঝায় ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক নয়, স্বাধীন চীনকে; আধা-ঔপনিবেশিক নয়, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক চীন বললেই বোঝায়, বিভক্ত নয়, ঐক্যবদ্ধ চীনকে। আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক এবং বিভক্ত চীনে বহু মানুষ বহু বছর ধরে শিল্পের বিকাশ, জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, জনগণের কল্যাণসাধন এবং জাতির সমৃদ্ধি ও শক্তির স্বপ্ন দেখে এসেছেন কিন্তু তাঁদের সকল স্বপ্নই চুরমার:হয়ে গেছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বহু শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক এবং ছাত্ররা তাঁদের নিজেদের কাজ ও অধ্যয়নে ডুবে রয়েছেন; রাজনীতির প্রতি কোন মনোযোগই তাঁরা দেননি এবং ভেবেছিলেন তাঁরা তাঁদের জ্ঞান দিয়ে দেশের সেবা করতে পারবেন, কিন্তু তাও একটি নিছক স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এটা অবশ্যই একটা শুভ লক্ষণ, এই শিশুসুলভ স্বপ্নগুলি চুরমার হয়ে যাওয়ার ফলে শক্তি ও সমৃদ্ধির পথে চীনের যাত্রা শুরু হয়েছে। যুদ্ধে চীনের জনগণ অনেক কিছুই শিখেছে; তারা জানে জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজয়ের পর তাঁদের নয়া-গণতান্ত্রিক চীন গড়ে তুলতে হবে, যে চীন হবে স্বাধীন, মুক্ত, গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী এবং যার মধ্যে এই গুণগুলি পরস্পর যুক্ত ও অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকবে। যদি তারা তা করে তবে চীনের সামনে অপেক্ষা করেছে উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ। নয়া গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা চীনের সকল অংশে প্রসারিত হলে পর চীনের জনগণের উৎপাদিকাশক্তিগুলি উন্মুক্ত হয়ে উঠবে এবং সম্ভাব্য সকল উপায়েই তা বিকশিত হয়ে উঠবে। অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যক জনগণ প্রতিদিন এ বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠছে।

নয়া-গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যখন অর্জিত হবে, চীনের জনগণ ও তাদের সরকারকে তখন বেশ কয়েক বছর ধরে ধাপে ধাপে ভারী ও হাল্কা শিল্প গড়ে তোলার জন্য বাস্তব ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে এবং চীনকে একটি কৃষি প্রধান দেশ থেকে শিল্পপ্রধান দেশে রূপান্তরিত করে তুলতে হবে। অর্থনীতির একটি দৃঢ়ভিত্তি না থাকলে, বর্তমানের চেয়ে অনেক অগ্রসর কৃষি না

থাকলে, জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাধান্যের ভূমিকা গ্রহণ করে আছে এমন বৃহদায়তন শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং যথোপযুক্ত বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যবস্থা না থাকলে নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সুসংহত করে তোলা যাবে না।

সারা দেশের সকল গণতান্ত্রিক দল ও শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলের সহযোগিতাক্রমে আমরা কমিউনিস্টরা এই লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত আছি। এই প্রয়াসে চীনের শ্রমিকশ্রেণী এক বিরাট ভূমিকাই পালন করবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই চীনের শ্রমিকশ্রেণী সচেতনভাবে চীনের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে আসছেন। ১৯২১ সালে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছে এবং চীনের মুক্তিসংগ্রাম তার পর থেকে এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। পরবর্তী তিনটি যুগে, উত্তর-মুখী অভিযান, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধ ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগে চীনের শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টি চূড়ান্ত কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে এবং চীনের জনগণের মুক্তির ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান সৃষ্টি করেছে। জাপানী আক্রমণকারীদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার সংগ্রামে এবং বিশেষ করে বিরাট বিরাট মহানগরগুলির ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান লাইনগুলির পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে চীনের শ্রমিকশ্রেণী একটি বিরাট ভূমিকাই পালন করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে যে জাপ-বিরোধী যুদ্ধের পর চীনের শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়াস ও অবদান আরও বেড়ে যাবে। শুধু নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করাই চীনের শ্রমিকশ্রেণীর কাজ হবে না, তাকে চীনের শিল্পায়ন ও তার কৃষির আধুনিকীকরণের জন্যও কাজ করতে হবে।

নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাধীনে শ্রমিক ও পুঁজির স্বার্থের সুসঙ্গতি সাধনের কর্মনীতিই গৃহীত হবে। একদিকে তা শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করবে, পরিস্থিতি অনুযায়ী দৈনিক আট থেকে দশ ঘণ্টা কাজের প্রচলন করবে, উপযুক্ত বেকার-ভাতা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারগুলি রক্ষা করবে; অন্যদিকে তা সুপরিচালিত রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত ও সমবায়ী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে বিধিসঙ্গত মুনাফা সুনিশ্চিত করবে যাতে করে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উভয় অংশই এবং শ্রমিক ও পুঁজি দুপক্ষ মিলেই শিল্প উৎপাদনকে বিকশিত করে তুলতে পারবে।

জাপানের পরাজয়ের পর চীনে জাপানী আক্রমণকারীদের ও মুখ্য দেশ-

দ্রোহীদের সকল প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তিই বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সরকারের হাতে সেগুলিকে অর্পণ করা হবে।

৮। সংস্কৃতি, শিক্ষা ও বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা

বৈদেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়ন চীনের জনগণের ওপর যে দুর্বিপাক চাপিয়ে দিয়েছে তাতে করে জাতীয় সংস্কৃতিও প্রভাবিত হয়েছে। প্রগতিশীল সংস্কৃতি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মীবৃন্দ এবং শিক্ষা-দাতারাই বিশেষ করে দুর্ভোগ ভুগেছেন। বৈদেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিয়ে নয়া-গণতান্ত্রিক চীন গড়ে তোলার জন্য আমাদের চাই জনগণের জন্য বিরাট সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষাদাতা, আর চাই জনগণের বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ, ডাক্তার, সাংবাদিক, লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাধারণ অজস্র সংস্কৃতিকর্মী। তাঁদের জনগণের সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে হবে এবং কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। জনগণকে সুদক্ষ-ভাবে সেবা করলে সকল বুদ্ধিজীবীকেই সম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং মূল্যবান জাতীয় ও সামাজিক সম্পদ বলেই তাঁদের গণ্য করা হবে। চীনে বুদ্ধিজীবীদের সমস্যাটি বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বৈদেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের ফলে আমাদের দেশ সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ এবং বুদ্ধিজীবীদের জনগণের মুক্তির সংগ্রামের জরুরী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তে হয়েছিল। বিগত অর্ধশতাব্দীকাল ধরে এবং বিশেষ করে ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলনের সময় থেকে এবং জাপ-বিরোধী যুদ্ধের আট বছরে বহু বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী জনগণের মুক্তির সংগ্রামে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকাই পালন করেছেন। আসন্ন সংগ্রামে তাঁরা আরও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। সুতরাং জনগণের সরকারের কর্তব্য হচ্ছে জনগণের মধ্যেকার মননশীলতার দিক থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন সবাইকেই ধারাবাহিকভাবে বিকশিত করে তোলা এবং একই সঙ্গে বর্তমানের সম্ভাব্য সকল হিতকর বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং তাঁদের নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

নয়া চীনের পক্ষে জনগণের শতকরা আশি ভাগের নিরক্ষরতার অবসান ঘটানো একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

সকল দাসত্বমূলক মনোভাবসম্পন্ন সামন্ততান্ত্রিক এবং ফ্যাসিষ্ট সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

জনগণের মধ্যেকার আঞ্চলিক ও অন্যান্য সকল ব্যাধির প্রতিরোধ ও দূরীকরণের জন্য উদ্যোগী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং জনগণের জন্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা প্রকল্পের ব্যবস্থা করতে হবে।

পুরানো ধাঁচের সংস্কৃতিকর্মী, শিক্ষাকর্মী ও চিকিৎসকদের যথোপযুক্ত নতুন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে তাঁরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করতে পারেন এবং জনগণকে সেবা করার জন্য নতুন পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারেন।

চীনের জনগণের সংস্কৃতি ও শিক্ষা হবে নয়া-গণতান্ত্রিক অর্থাৎ চীন তার নিজের নতুন একটি জাতীয়, বৈজ্ঞানিক এবং গণ-সংস্কৃতি ও শিক্ষারই প্রচলন করবে:

বৈদেশিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বলা যায় তাকে দূরে সরিয়ে রাখা ভুল হবে বরং তার মধ্যে যা প্রগতিশীল যথাসম্ভব তাকে গ্রহণ করে চীনের নয়া-সংস্কৃতির বিকাশে তাকে ব্যবহার করতে হবে; তাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করাও ভুল হবে বরং সমালোচনার সঙ্গে তাকে গ্রহণ করে চীনের জনগণের বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাকে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের জনগণের সংস্কৃতি গড়ে তোলার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা একটি আদর্শ হতে পারে। অনুরূপভাবে, প্রাচীন চীনের সংস্কৃতিকে পুরোপুরি খারিজ করে দেওয়া বা অন্ধভাবে তার অনুকরণ করা চলবে না বরং তাকে বিচারশীলভাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে তা চীনের নতুন সংস্কৃতির প্রগতিকে সাহায্য করতে পারে।

৯। সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের সমস্যা

কুওমিনতাঙ-এর জন-বিরোধী চক্রটি চীনে বহু জাতিসত্তা রয়েছে এ কথাই অস্বীকার করে এবং হান জাতিসত্তা ছাড়া আর সবাইকেই তারা 'উপজাতি' বলে অভিহিত করে। চিং রাজবংশ ও উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজদের সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিই সংখ্যালঘু জাতিসত্তা সম্পর্কে তারা অনুসরণ করে চলেছে, সর্ববিধ উপায়ে তাদের নিপীড়ন ও শোষণ করে চলেছে। ১৯৪৩ সালে ইখচাও লীগের মঙ্গোলদের হত্যাকাণ্ড, ১৯৪৪ সালে সিংকিয়াং-এর সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের বিরুদ্ধে সশস্ত্র দমনমূলক অভিযান এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কানসু প্রদেশে হুই জনগণের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের অভিযান তার পরিষ্কার উদাহরণ। এইগুলি হচ্ছে হান-উগ্রজাত্যভিমানের ভ্রান্ত ভাবাদর্শ ও কর্মনীতিরই প্রকাশ।

১৯২৪ সালে কুওমিনতাঙ-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন লিখেছিলেন যে 'কুওমিনতাঙ-এর জাতীয়তাবাদের মূলনীতির দ্বিবিধ অর্থ রয়েছে, প্রথমতঃ, তা হচ্ছে চীনা জাতির মুক্তিসাধন এবং দ্বিতীয়তঃ, তা হচ্ছে চীনের সকল জাতিসত্তার সমান অধিকারের স্বীকৃতি' এবং 'কুওমিনতাঙ এই সুস্পষ্ট ঘোষণাই করছে যে তা চীনের সকল জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করে এবং স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ চীন সাধারণতন্ত্র (সমস্ত জাতিসত্তাসমূহের একটি স্বাধীন সংঘ) সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও যুদ্ধবাজ-বিরোধী বিপ্লবের বিজয়ের পর প্রতিষ্ঠিত হবে।'

এখানে বর্ণিত ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের জাতিসত্তা সংক্রান্ত নীতির সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণ একমত। কমিউনিস্টদের সক্রিয়ভাবে সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের জনগণকে এই সংগ্রামে সাহায্য করতে হবে, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন নেতৃবৃন্দসহ তাদের সকলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি ও বিকাশের জন্য সাহায্য করতে হবে এবং জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য তারা যাতে তাদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে পারে সেই ব্যাপারেও তাদের সাহায্য করতে হবে। তাদের কথ্য ও লিখিত ভাষা, তাদের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল এবং উত্তর চীনের মুক্ত অঞ্চলসমূহ বহু বছর ধরে মঙ্গোলীয় ও হুই জাতিসত্তা সম্পর্কে যে মনোভাব গ্রহণ করেছে তা সঠিক এবং তারা যে কাজ করেছে তা ফলপ্রসূই হয়েছে।

১০। বৈদেশিক নীতির সমস্যা

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আটলান্টিক সনদ এবং কায়রো, তেহেরান ও ক্রিমিয়ায়[১২] অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে একমত, কারণ এই সিদ্ধান্তসমূহ ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীদের পরাজয়ে এবং বিশ্বশান্তি অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে যে মৌলিক নীতির কথা বলে তা হচ্ছে নিম্নরূপ: চীন সকল দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে ও তাকে জোরদার করে তুলবে এবং জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করা হবে ও বিশ্বশান্তি অব্যাহত রাখা হবে, জাতীয় স্বাধীনতা

ও সমতার প্রতি পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ ও মৈত্রী বৃদ্ধি করা হবে এই মৌল শর্তাধীনে সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল প্রশ্ন, যেমন যুদ্ধে সামরিক অভিযানের সংহতিসাধন, শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠান, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রশ্নের সমাধান করবে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখার জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ডাম্বারটন ওকস সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী এবং ক্রিমিয়া সম্মেলনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। সানফ্রান্সিসকোতে আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রসঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্মেলনকে তা স্বাগত জানাচ্ছে। এই সম্মেলনে চীনের জনগণের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করার জন্য তা চীনের প্রতিনিধিদলে তার নিজস্ব প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে।[১৩]

আমরা মনে করি, কুওমিনতাঙ সরকারকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বৈরিতার অবসান করতে হবে এবং চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের দ্রুত উন্নত করে তুলতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নই হচ্ছে প্রথম দেশ যে চীনের সঙ্গে অসমান চুক্তিগুলি বাতিল করে দিয়েছে এবং নতুন ও সমমর্যাদাসম্পন্ন চুক্তি সম্পাদন করেছে। ১৯২৪ সালে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক আহূত কুওমিনতাঙ-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের সময়ে এবং পরবর্তী উত্তরমুখী অভিযানকালে সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল একমাত্র দেশ যা চীনের মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করেছিল। ১৯৩৭ সালে যখন জাপ-বিরোধী যুদ্ধ শুরু হল তখনো সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল প্রথম দেশ যা, জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে চীনকে সাহায্য করেছিল। এই সাহায্যের জন্য চীনের জনগণ সোভিয়েত সরকার ও জনগণের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় কোন সমস্যারই চূড়ান্ত ও আনুপূর্বিক সমাধান সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়।

আমরা সকল মিত্রদেশের সরকারকে এবং সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সরকারকে চীনের জনগণের বক্তব্যের প্রতি গুরুতর মনোযোগ প্রদানের জন্য এবং তাদের ইচ্ছার প্রতিকূল বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে তাদের সঙ্গেকার মৈত্রীকে ক্ষুণ্ণ না করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা মনে করি, যদি কোন বিদেশী সরকার চীনের প্রতিক্রিয়াশীলদের সাহায্য করে এবং চীনের জনগণের গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের বিরোধিতা করে তবে তা গুরুতর ভুলই করবে।

বহু বিদেশী সরকার চীনের সঙ্গে সম্পাদিত তাদের অসমান চুক্তিগুলি বাতিল করে দেওয়ার এবং নতুন ও সমমর্যাদাসম্পন্ন চুক্তি সম্পাদনের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন চীনের জনগণ সেগুলিকে স্বাগত জানাচ্ছে। কিন্তু আমরা মনে করি, নিছক সমতাভিত্তিক চুক্তি সম্পাদন করা থেকেই এটা বোঝায় না যে চীন যথার্থ সমমর্যাদা অর্জন করে ফেলেছে। যথার্থ ও প্রকৃত সমমর্যাদা কোন সময়ই বিদেশী সরকারগুলির দান-দক্ষিণার ব্যাপার হতে পারে না, চীনের জনগণকেই তাদের আপন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মূলতঃ তা অর্জন করতে হবে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে নয়া-গণতান্ত্রিক চীন গড়ে তোলাই হচ্ছে তা অর্জন করার পথ ; অন্যথায় তা হবে শুধু নামমাত্র ব্যাপার, আর তা প্রকৃত স্বাধীনতা ও সমতা হবে না। অর্থাৎ বর্তমান কুওমিনতাঙ সরকারের নীতি অনুসরণ করে চীন কোন সময়ই যথার্থ স্বাধীনতা ও সমতা অর্জন করতে পারবে না।

আমরা মনে করি, জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজয় ও নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণের পর জাপানী জনগণের সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে তাদের নিজস্ব গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করার প্রয়োজন রয়েছে যাতে করে জাপানী ফ্যাসিবাদ ও সমরবাদকে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল সহ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া সম্ভব হবে। জাপানী জনগণের যদি একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা না থাকে তবে জাপানী ফ্যাসিবাদ ও সমরবাদকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি সুনিশ্চিত করা অসম্ভব।

আমরা মনে করি, কায়রো সম্মেলনে কোরিয়ার স্বাধীনতা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা সঠিক। চীনের জনগণের কর্তব্য হচ্ছে কোরিয়ার জনগণকে স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করা।

আমরা আশা করি, ভারত স্বাধীনতা অর্জন করবে। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারত শুধু ভারতীয় জনগণেরই প্রয়োজন নয়, তা বিশ্বশান্তির জন্য অপরিহার্য।

বার্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইন—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশগুলি সম্পর্কে আমরা আশা করি যে জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজয়ের পর ঐসব দেশের জনগণ তাদের অধিকার প্রয়োগ করে তাদের নিজস্ব স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলবে। থাইল্যাণ্ড সম্পর্কে বলা যায়, তাকে ইউরোপের ফ্যাসিষ্ট তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির মতোই গণ্য করতে হবে।

আমাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে এইটুকুই বক্তব্য।

আবার বলা দরকার, সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর কোন বিষয়ই সমগ্র জাতির সমর্থনপুষ্ট একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার ছাড়া জাতীয় স্তরে সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর করা সম্ভব নয়।

চব্বিশ বছর ধরে চীনের জনগণের মুক্তির জন্য তার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এমন এক মর্যাদা অর্জন করেছে যে কোন রাজনৈতিক দল বা সামাজিক গোষ্ঠী বা কোন চীনা ও বিদেশী যদি চীন সংক্রান্ত কোন প্রশ্নে তার অভিমতকে অবহেলা করেন তবে তাঁরা গুরুতর ভুলই করবেন এবং নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ হবেন। আগে ছিলেন এবং আজও এমন লোক রয়েছেন যাঁরা আমাদের অভিমতকে অবহেলা করতে চেষ্টা করেন এবং তাঁদের আত্মম্ভরী পথই অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এরা সকলেই কানাগলিতে এসে আটকে পড়েছেন। কেন এমনটি হল? তার সোজা কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের অভিমতগুলি চীনের জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে চীনের জনগণেরই সবচেয়ে বিশ্বস্ত মুখপাত্র এবং যে-কেউই তাকে সম্মান প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হবে সে কার্যত: চীনের জনগণকেই সম্মান প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হবে এবং তার পরাজয় অবধারিত।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলের কর্তব্য

আমি এখানে আমাদের পার্টির সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি। কোন সন্দেহ নেই, ঐ কর্মসূচীগুলি শেষ পর্যন্ত চীনের সর্বত্রই কার্যকর হবে; চীনের জনগণের সামনে আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে এই সম্ভাবনার দিগন্তকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু এইমুহূর্তে কুওমিনতাঙ অঞ্চলে, শত্রুকবলিত অঞ্চলে এবং মুক্ত অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি বর্তমান, তাই আমাদের কর্মসূচী কার্যকর করার ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে; পরিস্থিতির বিভিন্নতা বিভিন্ন কর্তব্যের সৃষ্টি করেছে। এই কর্তব্যগুলির কয়েকটি আমি ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছি এবং অন্যান্য কয়েকটির বিশ্লেষণ এখনো প্রয়োজন।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলে জনগণ দেশপ্রেমিক কার্যকলাপে অবাধে লিপ্ত হতে পারে না এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অবৈধ বলেই গণ্য করা হয়, তবু

নানাবিধ সামাজিক স্তরের লোকজনেরা, গণতান্ত্রিক পার্টি ও ব্যক্তিবর্গ বেশি বেশি করে সক্রিয় হয়ে উঠছেন। বর্তমান বছরের জানুয়ারি মাসে চীনের ডিমোক্র্যাটিক লীগ একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কতন্ত্রের অবসান ও কোয়ালিশন সরকারের প্রতিষ্ঠা দাবি করেছেন। জনগণের বিভিন্ন অংশও অনুরূপ ঘোষণা করেছে। কুওমিনতাঙ-এর মধ্যেও বহু মানুষ তাঁদের নিজ দলের নেতৃস্থানীয় সংস্থাসমূহের কর্মনীতি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সংশয় ও অসন্তোষ প্রকাশ করছেন, জনগণের থেকে তাঁদের পার্টির বিচ্ছিন্নতার বিপদ সম্পর্কে. তাঁরা বেশি বেশি করে সচেতন হয়ে উঠছেন এবং তাঁরা সময়োপযোগী গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি জানাচ্ছেন। চুংকিং ও অন্যান্য স্থানে শ্রমিক, কৃষক, সাংস্কৃতিক মহল, ছাত্র, শিক্ষাসংক্রান্ত মহল, নারী সমাজ, শিল্প ও ব্যবসায়ী মহল, সরকারী কর্মচারীবৃন্দ, এমনকি কিছু কিছু সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এই তথ্যগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে সমস্ত নিপীড়িত স্তরগুলি ক্রমেই একটি সাধারণ লক্ষ্যে এসে সমবেত হচ্ছে। বর্তমান আন্দোলনগুলির একটি দুর্বলতা হচ্ছে, সমাজের মূল অংশগুলি এখনো ব্যাপক আকারে তাতে যোগ দেয়নি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শক্তিগুলি, যেমন কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক, নিম্নস্তরের সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকেরা যাঁরা এমন তীব্র যন্ত্রণায় রয়েছেন তাঁরা এখনো সংগঠিত হয়ে ওঠেননি। অন্য দুর্বলতা হচ্ছে, এই আন্দোলনে লিপ্ত গণতান্ত্রিক ব্যক্তিবর্গের অনেকেই মৌলিক নীতির ব্যাপারে অর্থাৎ ব্যাপক গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সংগ্রাম পরিচালনার মাধ্যমেই যে অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে এই ব্যাপারে এখনো অস্পষ্ট ও দ্বিধান্বিত রয়েছেন। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি নিপীড়িত স্তরের লোকজনদের, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক গোষ্ঠীদের ধীরে ধীরে জেগে উঠতে ও ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করছে। কুওমিনতাঙ সরকারের কোন দমনপীড়নই এই আন্দোলনের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারছে না।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলের সমস্ত নিপীড়িত স্তর, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক গ্রুপগুলিকে তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ব্যাপক আকারে প্রসারিত করে তুলতে হবে এবং ধীরে ধীরে তাদের বিক্ষিপ্ত শক্তিকে জাতীয় ঐক্যের জন্য সংগ্রামে, কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা, জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজয় ও নয়া চীন গড়ে তোলার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে হবে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও মুক্ত অঞ্চলের জনগণকে সম্ভাব্য সর্ববিধ উপায়ে তাদের এই সংগ্রামে সাহায্যদান করতে হবে।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলে কমিউনিস্টগণকে জাপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতীয় যুক্তফ্রন্টের কর্মনীতিই অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে। সাধারণ লক্ষ্যের এই সংগ্রামে কেউ অতীতে আমাদের বিরোধিতা করে থাকলেও আজ যদি তিনি আমাদের বিরোধিতা না করেন তবে তাঁর সঙ্গেও আমাদের সহযোগিতা করতে হবে।

জাপানীদের অধিকৃত অঞ্চলের কর্তব্য

অধিকৃত অঞ্চলে যাঁরাই জাপানের বিরোধিতা করেন তাঁদের ফরাসী ও ইতালীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি হিসেবে সংগঠন ও আত্মগোপনকারী বাহিনী গড়ে তোলার জন্য কমিউনিস্টরা আহ্বান জানাবেন যাতে করে যখন সময় আসবে তখন তাঁরা যেন ভেতর থেকে বাইরের আক্রমণরত সৈন্যদের সঙ্গে সুসমন্বয় রেখে একই সঙ্গে আঘাত হানতে পারেন এবং জাপানী আক্রমণকারীদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। অধিকৃত অঞ্চলে জাপানী আক্রমণকারীদের এবং তাদের আজ্ঞাবাহী দাসানুদাসদের হাতে আমাদের ভাই ও বোনেরা যে অনাচার-অত্যাচার, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন তার ফলে সমগ্র চীনদেশবাসীদের ক্রোধ জ্বলে উঠেছে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের মুহূর্তটি দ্রুত এগিয়ে আসছে। যুদ্ধের ইউরোপীয় রণক্ষেত্রে অর্জিত বিজয় এবং আমাদের অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর অর্জিত বিজয় অধিকৃত অঞ্চলের জাপ-বিরোধী মনোভাবকে নতুন প্রেরণাদান করেছে এবং তাকে বাড়িয়ে তুলেছে। তাঁরা দ্রুত সংগঠিত হয়ে ওঠার জন্য ও যত শীঘ্র সম্ভব মুক্তি অর্জনের জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন। সুতরাং অধিকৃত অঞ্চলের আমাদের কাজকে মুক্ত অঞ্চলের কাজের সমান পর্যায়ের গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের বিপুল সংখ্যক কর্মীবাহিনীকে ওখানে কাজ করার জন্য প্রেরণ করতে হবে। ওখানকার জনগণের মধ্যেকার বিপুল সংখ্যক সক্রিয় কর্মীদের শিক্ষাদান করে উন্নত করে তুলতে হবে এবং আঞ্চলিক ঐসব কাজকর্মে তাঁদের অংশগ্রহণ করতে হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চারটি প্রদেশে আমাদের গোপন কার্যকলাপকে তীব্রতর করে তুলতে হবে—অন্য যে-কোন অঞ্চলের চেয়ে অধিককাল ধরে

এই চারটি প্রদেশ অধিকৃত হয়ে রয়েছে এবং এই অঞ্চলটি হচ্ছে একটি মূল শিল্পাঞ্চল এবং ওখানে জাপানী আক্রমণকারীদের বিপুল সংখ্যক সৈন্যেরও সমাবেশ রয়েছে। এই হৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে জনসাধারণ দক্ষিণে পালিয়ে এসেছিল তাদের সঙ্গে আমাদের সংহতিকে জোরদার করে তুলতে হবে।

সকল অধিকৃত অঞ্চলেই কমিউনিস্টদের ব্যাপকতম যুক্তফ্রন্টের কর্মনীতিটি অনুসরণ করে যেতে হবে। আমাদের অভিন্ন শত্রুর উচ্ছেদসাধনের জন্য যে-কেউই জাপানী আক্রমণকারী এবং তাদের আজ্ঞাবাহী দাসানুদাসদের বিরোধী তার সঙ্গেই আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

শত্রুকে যারা সাহায্য করছে এবং তাদের দেশবাসীর বিরোধিতা করছে এমন সকল তাঁবেদার সৈন্যবাহিনী, তাঁবেদার পুলিশ ও অন্যান্যদের সতর্ক করে দিতে হবে যে তারা যেন অবিলম্বে তাদের কার্যকলাপের অপরাধমূলক প্রকৃতিটি অনুধাবন করে, যথাসময়ে তার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের দেশবাসীর সাহায্য করে তাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে। অন্যথায় জাতি শত্রুর পতনের দিনেই সুনিশ্চিতভাবে তাদের উপযুক্ত বিচারের ব্যবস্থা করবে।

ব্যাপক সমর্থন রয়েছে তাঁবেদারদের এমন সকল সংগঠনের প্রতি বুঝিয়ে রাজী করানোর নীতিই কমিউনিস্টদের গ্রহণ করতে হবে যাতে করে যে সাধারণ মানুষ বিপথগামী হয়েছে জাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে তাদেরকে আমাদের সপক্ষে নিয়ে আসা সম্ভবপর হয়। একই সঙ্গে শত্রুর সেইসব সহযোগী যারা অনুতপ্ত নয় এবং সবচেয়ে অপরাধে অপরাধী, হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের পরই যাতে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণও জোগাড় করতে হবে।

যে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা প্রকাশ্য সহযোগীদের চীনের জনগণ, কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট সেনাবাহিনী, নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী ও জনগণের অন্যান্য সশস্ত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণে লেলিয়ে দিয়ে জাতির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে তাদের যথাসময়ে অনুতাপ করার জন্য সতর্ক করে দিতে হবে। অন্যথায় হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার হওয়ার পর জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা-কারীদের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকেও তাদের অপরাধের জন্য নিশ্চিত শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং তাদের প্রতি এ ব্যাপারে কোনরকম করুণাই প্রদর্শন করা হবে না।

মুক্ত অঞ্চলের কর্তব্য

মুক্ত অঞ্চলসমূহে আমাদের পার্টি সমগ্র নয়া-গণতান্ত্রিক কর্মসূচীকে কার্যে প্রয়োগ করে লক্ষণীয় সুফললাভ করেছে এবং জাপ-বিরোধী বিপ্লব শক্তিসঞ্চয় করেছে। এখন থেকে এই শক্তিকে সববিধ উপায়ে বিকশিত ও সুসংহত করে তুলতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে, মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীকে জাপানীদের ও তাঁবেদারদের কবল থেকে মুক্ত করা সম্ভব এমন সকল জায়গাতেই ব্যাপক আক্রমণ চালাতে হবে যাতে মুক্ত অঞ্চলকে সম্প্রসারিত করা যায় এবং শত্রুকবলিত অঞ্চলকে হ্রাস করে আনা যায়।

কিন্তু একই সঙ্গে এটাও মনে রাখা চাই যে শত্রু এখনো শক্তিশালী এবং মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে আরও আক্রমণ তারা চালাতে পারে। আমাদের অঞ্চলগুলির সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে সকল সময় শত্রুর এই আক্রমণকে চুরমার করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং মুক্ত অঞ্চলগুলিকে সর্ববিধ উপায়ে সুসংহত করার জন্য কাজ করে যেতে হবে।

মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী, গেরিলা ইউনিট ও সশস্ত্র গণরক্ষী বাহিনী এবং আত্মরক্ষী বাহিনীগুলিকে আমাদের সম্প্রসারিত করে তুলতে হবে এবং তাদের ট্রেনিং ও সংহতিকে দ্রুততর করে তুলে তাদের যুদ্ধ করার সামর্থ্যকে বাড়িয়ে দিতে হবে যাতে করে আক্রমণকারীদের চূড়ান্ত পরাজয় সাধনের জন্য যথেষ্ট শক্তি গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়।

মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীকে সরকারকে সমর্থন করতে হবে এবং জনগণের যত্ন নিতে হবে, অন্যদিকে সৈন্যবাহিনীকে সহায়তা করার কাজে এবং জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সৈনিকদের পরিবারগুলির ভালভাবে যত্ন নেওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক সরকারকে জনগণকে নেতৃত্বদান করতে এগিয়ে আসতে হবে। এভাবে সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক আরও অনেক উন্নততর হয়ে উঠবে।

আঞ্চলিক কোয়ালিশন সরকারের ও গণ-সংগঠনের কাজকর্মে কমিউনিস্টগণকে নয়া-গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে সকল জাপ-বিরোধী গণতন্ত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে।

অনুরূপভাবে সামরিক কাজকর্মে কমিউনিস্টদের জাপ-বিরোধী যেসব গণতন্ত্রীরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী, তা তাঁরা মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর

সদস্য হোন আর নাই হোন, তাঁদের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে।

শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের যুদ্ধ ও উৎপাদন সংক্রান্ত কাজকর্মে উদ্দীপনা বাড়িয়ে তোলার জন্য আমাদের আনুপূর্বিকভাবে খাজনা ও সুদ হ্রাস করার কর্মনীতিকে কার্যকর করে তুলতে হবে এবং শ্রমিক ও অফিস-কর্মচারীদের বেতন বাড়াতে হবে। মুক্ত অঞ্চলের কর্মীবাহিনীকে নিরলসভাবে অর্থনৈতিক কাজকর্ম শিখে নিতে হবে। সম্ভব্য সকল শক্তিকে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের এবং সৈনিক ও জনগণের জীবিকার মান উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে শ্রমের ব্যাপারে নৈপুণ্য অর্জনের অভিযান শুরু করতে হবে এবং শ্রমবীর ও আদর্শ কর্মীদের পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করতে হবে। জাপানী আক্রমণকারীদের বড় বড় শহর থেকে যখন বিতাড়িত করে দেওয়া সম্ভব হবে, আমাদের কর্মীদলকে তখন দ্রুত শহরের অর্থনৈতিক কাজকর্ম কি করে চালাতে হয় তা শিখে নিতে হবে।

মুক্ত অঞ্চলের জনগণের এবং বিশেষ করে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করে তোলার জন্য এবং বিরাট সংখ্যক কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য আমাদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রের কাজকর্মকে বিকশিত করে তুলতে হবে। এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই কাজে নিযুক্ত কর্মীদের গ্রামাঞ্চলের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং জনগণের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে উপযুক্ত আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে।

মুক্ত অঞ্চলের সকল কাজকর্মে জনবল ও বৈষয়িক সম্পাদকে যথাসম্ভব অল্পই ব্যয় করতে হবে এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা অনুসারে অপব্যয় ও অযথা ব্যয় পরিহার করতে হবে। জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করা ও নয়া চীন গড়ে তোলা এই দুয়ের জন্যই তা প্রয়োজন।

মুক্ত অঞ্চলের সকল কাজকর্মে স্থানীয় লোকেরাই যাতে আঞ্চলিক কাজকর্ম পরিচালনা করতে পারে তার জন্য একান্ত যত্ন নিতে হবে এবং অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ লোকজনদের মধ্য থেকে যত বেশি সংখ্যক সম্ভব কর্মীদের খুঁজে বের করতে হবে। অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত কমরেডরা যদি স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে একেবারে অভিন্ন হয়ে উঠতে না পারেন এবং যদি তাঁরা সমস্ত অন্তর দিয়ে, একান্ত যত্নসহকারে এবং আঞ্চলিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থানীয় কর্মীদের

সাহায্য না করেন এবং একেবারে নিজেদের ভাই-বোনের মতো তাঁদের যত্ন না নেন তবে গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান কর্তব্য সুসম্পন্ন করা অসম্ভব।

অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী বা অন্য যে-কোন সশস্ত্র বাহিনীর কোন ইউনিট যখন কোন স্থানে এসে উপস্থিত হবে তখনই স্থানীয় কর্মীদের পরিচালিত শুধু গণরক্ষী বা আত্মরক্ষী বাহিনী নয়, স্থানীয় ও আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনীও গড়ে তোলার জন্য সেখানকার জনগণকে সাহায্য করতে হবে। এসবের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক লোকজনদের দ্বারা পরিচালিত নিয়মিত বাহিনী ও নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন দল যথাসময়ে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এটা চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্তব্য। তা না করা হলে, আমরা সুদৃঢ় জাপ-বিরোধী ঘাঁটি গড়ে তুলতে পারব না, গণফৌজকেও সম্প্রসারিত করতে পারব না।

অবশ্য আঞ্চলিক জনগণকেও তাদের দিক থেকে অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত বিপ্লবী শ্রমিকদের ও জনগণের বাহিনীদের আন্তরিক সমাদর জানাতে হবে এবং সাহায্য করতে হবে।

গোপন অন্তর্ঘাত সৃষ্টিকারীদের মোকাবিলা করার প্রশ্নে প্রত্যেককেই সতর্ক করে দিতে হবে। জাতীয় স্বার্থের প্রকাশ্য শত্রুদের ও আন্তর্ঘাত সৃষ্টিকারীদের সহজেই চিহ্নিত করে দেওয়া ও তাদের সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়; কিন্তু যারা গোপনে আড়ালে থেকে কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সহজ নয়। তাই এই কাজটিকে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং একই সঙ্গে এদের মোকাবিলা করার সময় আমাদের খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতার নীতি অনুসারে চীনের মুক্ত অঞ্চলে সমস্ত ধর্মাচরণই অনুমোদিত। প্রোটেস্টান্ট, ক্যাথলিক, ইসলাম, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী লোকজনেরা যতক্ষণ আইনকানুন মান্য করে চলবেন, জনগণের সরকার তাঁদের রক্ষা করবে। ধর্মে বিশ্বাস করা বা না করার অধিকার সকলেরই আছে; এক্ষেত্রে কোনরকম জবরদস্তি বা বৈষম্যমূলক আচরণ কোনটিই অনুমোদন করা হবে না।

মুক্ত অঞ্চলসমূহের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয়সাধন, প্রতিরোধ-যুদ্ধে তাদের কাজকর্মকে জোরদার করে তোলা, কুওমিনতাঙ অঞ্চলের জনগণের জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সাহায্য করা, অধিকৃত অঞ্চলে আত্ম-গোপনকারী জনগণের সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে সাহায্য করা এবং জাতীয় ঐক্য

জোরদার করা এবং কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রশ্নগুলি আলোচনা করার জন্য চীনের মুক্ত অঞ্চলসমূহের একটি গণ-সম্মেলন ইয়েনানে যথাশীঘ্র সম্ভব আহ্বান করা হোক—এই মর্মে আমাদের কংগ্রেসের উচিত জনগণের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করা। যেহেতু চীনের মুক্ত অঞ্চলসমূহ এখন জাপানকে প্রতিরোধ করার ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য জনগণের সংগ্রামের মূল ভারকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই সমগ্র দেশের জনসাধারণ আমাদের ওপর তাদের ভরসা স্থাপন করেছে এবং তাদের নিরাশ না করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য। এ ধরনের একটি সম্মেলন চীনের জনগণের জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে বিরাট প্রেরণাই জোগাবে।

৫। সমগ্র পার্টি ঐক্যবদ্ধ হোক এবং তার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সংগ্রাম করুক !

কমরেডগণ, আমাদের করণীয় কর্তব্য এবং তা সম্পাদনের কর্মনীতি কী তা আমরা বুঝতে পেরেছি, এখন এই কর্মনীতিগুলিকে কার্যকর করার ও এই কর্তব্যগুলি সম্পাদনের ব্যাপারে আমাদের মনোভাব কী হবে?

বর্তমান আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং আমাদের ও সামগ্রিকভাবে চীনা জনগণের সামনে তা অভূতপূর্ব অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে; এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু একই সঙ্গে, এখনো গুরুতর সব সমস্যা রয়ে গেছে। যদি কেউ শুধু উজ্জ্বল দিকগুলিই দেখেন কিন্তু বাধাবিপত্তিগুলি দেখতে না পান, তবে তিনি পার্টির কর্তব্যগুলি সুসম্পাদনের জন্য কার্যকরভাবে সংগ্রাম করতে পারবেন না।

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের আটটি বছর সহ পার্টির ইতিহাসের চব্বিশটি বছর ধরে চীনের জনগণের সঙ্গে মিলিতভাবে আমাদের পার্টি চীনা জাতির হয়ে বিপুল শক্তিসঞ্চয় করেছে; আমাদের কাজের সাফল্য খুবই স্পষ্ট এবং এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, এখনো আমাদের কাজে নানা ত্রুটি রয়ে গেছে। যদি কেউ শুধু সাফল্যের দিকটিই দেখেন কিন্তু ত্রুটিগুলি দেখতে না পান তবে একইভাবে তিনি পার্টির কর্তব্যগুলি কার্যকরভাবে সুসম্পাদন করতে পারবেন না।

১৯২১ সালে জন্মের পর থেকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি উত্তরমুখী অভিযান,

কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধ এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে যুদ্ধ এখনো চলছে—এই তিনটি বিরাট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। একেবারে শুরু থেকেই আমাদের পার্টি নিজেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে কারণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদই হচ্ছে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সবচেয়ে নির্ভুল ও সবচেয়ে বৈপ্লবিক সারসংক্ষেপ। যখন থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে চীন বিপ্লবের বাস্তব-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শুরু হল চীনের বিপ্লব তখন থেকে সম্পূর্ণ নতুন এক রূপ ধারণ করল এবং নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পূর্ণ একটি ঐতিহাসিক যুগেরই অভ্যুদয় ঘটল। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে সজ্জিত হয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি চীনের জনগণের কাছে নতুন একটি কাজের ধারা এনে হাজির করেছে, যে কাজের ধারাটির মূল কথাই হচ্ছে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয়সাধন, জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রীবন্ধন প্রতিষ্ঠা ও আত্মসমালোচনার অনুশীলন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে বিশ্বজনীন সত্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের বাস্তব প্রয়োগের অভিজ্ঞতা, তা চীনের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি অপরাজেয় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই হাতিয়ারটি আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছে। এই মূলনীতির পরিপন্থী নির্বিচার মতান্ধতা ও অভিজ্ঞতাবাদের সর্বপ্রকার অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের পার্টি বড় হয়ে উঠেছে এবং অগ্রসর হয়েছে। মতান্ধতার গোঁড়ামি বাস্তব প্রয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, অন্যদিকে, অভিজ্ঞতাবাদ খণ্ডিত অভিজ্ঞতাকেই বিশ্বজনীন সত্য বলে ভুল করে বসে। এই দুই ধরনের সুবিধাবাদী চিন্তাই মার্কসবাদের পরিপন্থী। বিগত চব্বিশ বছরের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টি সাফল্যের সঙ্গে এইসব ভ্রান্ত চিন্তাধারার মোকাবিলা করে এসেছে এবং আজও সেই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এবং এভাবে নিজেকে মতাদর্শগত দিক থেকে বিরাটভাবে সুসংহত করে তুলেছে। আমাদের পার্টির সদস্যসংখ্যা এখন ১২,১০,০০৫। তার মধ্যেকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই প্রতিরোধ-যুদ্ধকালে পার্টিতে যোগ দিয়েছেন এবং তাঁদের মতাদর্শে নানা-রকম আবর্জনা রয়ে গেছে। যুদ্ধের আগে যাঁরা পার্টিতে যোগ দিয়েছেন তাঁদের অনেকের ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য। গত কয় বছরের শুদ্ধিকরণের কাজের ফলে এক্ষেত্রে খুবই সাফল্যলাভ করা গেছে এবং এইসব আবর্জনা অপসারণের

কাজে অনেকখানি অগ্রসর হওয়া গেছে। এই কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং পার্টির মধ্যে এই মতাদর্শগত শিক্ষাকে আরও ব্যাপকভাবে বিকশিত করে তুলতে হবে, 'অতীতের ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে ভবিষ্যতের ভুল পরিহার করার' এবং 'রোগ দূর করা কিন্তু রোগীকে রক্ষা করার' মনোভাব থেকেই এক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে। সর্বস্তরের পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীদেরই এটা বুঝতে হবে যে তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্যসাধন করাই হচ্ছে অন্যান্য পার্টির চেয়ে আমাদের পার্টির স্বাতন্ত্র্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন। সুতরাং মতাদর্শগত শিক্ষাই হচ্ছে সমগ্র পার্টিকে বিরাট বিরাট রাজনৈতিক সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করার দিক থেকে মূল চাবিকাঠি স্বরূপ। তা করা না হলে, পার্টি তার করণীয় রাজনৈতিক কর্তব্যের কোনটিই সুসম্পন্ন করতে পারবে না।

অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টির চেয়ে আমাদের পার্টির স্বাতন্ত্র্যের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আমাদের পার্টি আমাদের জনগণের ব্যাপকতম অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলে। মনপ্রাণ দিয়ে জনগণের সেবা করাই হচ্ছে আমাদের কাজের মূল কথা এবং কোন সময়ই আমরা নিজেদের এক মুহূর্তের জন্যও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করি না, সকল কাজেই আমরা জনগণের স্বার্থে থেকে অগ্রসর হই; কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে আমরা কাজ করি না এবং জনগণের প্রতি আমাদের দায়িত্ব এবং পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থার প্রতি আমাদের দায়িত্বের মধ্যে অভিন্নতা স্থাপন করা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত থাকি। কমিউনিস্টদের সব সময় সত্যের সপক্ষে দাঁড়াতে প্রস্তুত থাকতে হবে কেননা সত্য জনগণের স্বার্থের অনুকূল। কমিউনিস্টদের সব সময় তাঁদের ভুল সংশোধন করতে প্রস্তুত থাকতে হবে কেননা ভুলভ্রান্তি জনগণের স্বার্থের প্রতিকূল। চব্বিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে সঠিক কর্তব্য, সঠিক কর্মনীতি ও সঠিক কাজের ধারা সব সময়ই একটা বিশেষ সময়ে, বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে জনগণের দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে এবং তা অপরিহার্যভাবে জনগণের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রকে জোরদার করে তোলে, কিন্তু ভ্রান্ত কাজকর্ম, ভ্রান্ত কর্মনীতি ও ভ্রান্ত কাজের ধারা সব সময়ই একটা বিশেষ সময়ে বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে জনগণের দাবির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে পড়ে এবং তা অপরিহার্যভাবে জনগণের থেকে আমাদের বিচ্ছিন্নতাই সৃষ্টি করে। গোঁড়ামি, অভিজ্ঞতাবাদ, হুকুমদারির মনোভাব, লেজুড়বৃত্তি, সংকীর্ণতাবাদ, আমলাতান্ত্রিকতা ও কাজের ক্ষেত্রে উদ্ধত মনোভাব নিশ্চিতভাবে ক্ষতিকর

এবং অসহনীয় এবং তারই জন্য এসব ব্যাধিতে যাঁরা ভুগছেন তাঁদের তা দূর করতেই হবে কেননা তা আমাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নই করে রাখে। আমাদের কংগ্রেসের কর্তব্য হচ্ছে সমগ্র পার্টিকে এই আহ্বান জানানো যেন তা সজাগ থেকে এটা লক্ষ্য রাখে যাতে যেখানে যে-কোন পদেই থাকুন না কেন কোন কমরেডই যেন জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়েন। প্রতিটি কমরেড যাতে জনগণকে ভালবাসেন, জনগণের বক্তব্যকে মনোযোগ দিয়ে শোনেন পার্টিকে তা শিখিয়ে দিতে হবে; যেখানেই তিনি যান না কেন জনগণের ঊর্ধ্বে অবস্থান না করে তাকে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে হবে, তাদের মধ্যে একেবারে মিশে যেতে হবে; এবং জনগণের বর্তমান স্তর অনুসারে তাদের জাগিয়ে তুলতে হবে ও তাদের রাজনৈতিক চেতনাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে এবং ধীরে ধীরে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতেই তাদের নিজেদের সংগঠিত হয়ে উঠতে সাহায্য করতে হবে এবং ঐ বিশেষ স্থান ও কালের ভিতরের ও বাইরের পরিস্থিতি অনুযায়ী অনুমোদিত অপরিহার্য সংগ্রামে অগ্রসর হতে তাদের সাহায্য করতে হবে। যে-কোন কাজেই হুকুমদারির মনোভাব গ্রহণ করা ভুল হবে কেননা জনগণের রাজনৈতিক চেতনা অতিক্রম করে এগিয়ে যায় বলে এবং গণ-উদ্যোগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার নীতি তা অমান্য করে বলে তার মধ্যে দেখা দেয় উগ্রতার ব্যাধিটি। আমাদের কমরেডদের এটা মনে করলে চলবে না যে তাঁরা নিজেরা যা বোঝেন জনগণও তাই বুঝে ফেলেছে; জনগণ তা বুঝেছে কিনা এবং কাজে অগ্রসর হতে প্রস্তুত কিনা জনগণের মধ্যে গেলে এবং অনুসন্ধান করলেই শুধু তা জানা যাবে। তা করলে আমরা হুকুমদারির ত্রুটিটি পরিহার করতে পারব। যে-কোন কাজেই লেজুড়বৃত্তি করা ভুল কেননা জনগণের রাজনৈতিক মানের নীচে পড়ে থাকে বলে এবং জনগণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নেতৃত্বদানের নীতি অমান্য করে বলে তাতে ফুটে ওঠে গড়িমসি করার ব্যাধিটি। আমাদের কমরেডদের এটা ধরে নিলে চলবে না যে তারা নিজেরা যা এখনো বোঝেননি জনগণও বুঝি তা বুঝতে পারেনি। প্রায়ই দেখা যায় জনগণ আমাদের থেকে এগিয়ে আছে এবং তারা আরও এক কদম এগিয়ে যেতে আগ্রহী অথচ আমাদের কমরেডরা তখনো কিছু কিছু পশ্চাদ্‌পদ ধ্যানধারণা নিয়ে পেছনে পড়ে আছেন এবং জনগণের নেতা হিসেবে কাজ করার পরিবর্তে ঐ কমরেডদের মধ্যে পিছিয়ে পড়া লোকজনদের ধ্যানধারণাই অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে এবং তদুপরি ঐ পিছিয়ে

পড়া লোকজনকেই তাঁরা ব্যাপক জনগণ বলে ভুল করে বসেন। এক কথায়, প্রতিটি কমরেডকেই এটা সযত্নে বুঝিয়ে দিতে হবে যে একজন কমিউনিস্টের কথা ও কাজের চরম পরীক্ষা হচ্ছে তা জনগণের ব্যাপকতম অংশের সর্বোচ্চ স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এবং তাদের সমর্থন লাভ করতে পারছে কিনা। প্রতিটি কমরেডকেই এটা সযত্নে বুঝতে দিতে হবে যে যতক্ষণ আমরা জনগণের ওপর নির্ভর করব, জনগণের অপরিমেয় সৃজনশীল ক্ষমতার ব্যাপারে আমাদের দৃঢ় আস্থা থাকবে এবং তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করব ও তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকব ততক্ষণ কোন শত্রুই আমাদের ধ্বংস করে ফেলতে পারবে না বরং আমরা যে-কোন শত্রুকেই ধ্বংস করে দিতে পারব এবং প্রতিটি বাধা-বিপত্তিকেই জয় করে নিতে পারব।

সততার সঙ্গে আত্মসমালোচনা করা অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টির চেয়ে আমাদের পার্টির স্বাতন্ত্র্যের আরও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমরা বলে থাকি, ঘর নিয়মিত ঝাঁট না দিলে মেঝেতে ধুলোবালি জমে, আমাদের মুখ নিয়মিত না ধুলে মুখে ময়লা জমে। 'স্রোতের জল বাসি হয় না এবং দরজার খিলে ঘুন ধরে না' এই প্রবাদের অর্থ হচ্ছে নিয়ত কাজে থাকলে জীবাণু বা অন্য প্রাণীর আক্রমণের বিপদ কম থাকে। নিয়মিত আমাদের কাজকর্ম বিচার করে দেখা এবং এর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক কাজের ধারা বিকশিত করে তোলা, সমালোচনা বা আত্মসমালোচনাকে ভয় না করা এবং 'যা জান তাই বল এবং যা বলার স্পষ্ট করে বল', 'বক্তাকে নিন্দা করতে হয় কর কিন্তু তার কথা থেকে সতর্ক হও' এবং 'ভুল করে থাকলে তা শুধরে নাও, না করে থাকলে সজাগ থাক'—ইত্যাদি ও চীন দেশীয় জনপ্রিয় প্রবাদবচনকে কাজে লাগানো —আমাদের কমরেডদের মনকে এবং আমাদের পার্টিদেহকে বিষিয়ে দেওয়ার মতো সকলপ্রকার রাজনৈতিক ধুলোবালি ও জীবাণু প্রতিরোধ করার এই হচ্ছে একমাত্র কার্যকর পথ। 'অতীতের ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে ভবিষ্যতের ভুল পরিহার করা এবং রোগ দূর করা কিন্তু রোগীকে রক্ষা করার' উদ্দেশ্যে পরিচালিত শুদ্ধিকরণ আন্দোলনের বিরাট কার্যকারিতার কারণই ছিল এই যে আমরা যে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা করেছিলাম তা ছিল সৎ এবং অকপট, তা দোষ ছাড়ানো বা কপটতার ব্যাপার ছিল না। আমরা চীনের কমিউনিস্টরা যেহেতু চীনের ব্যাপকতম জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থকেই আমাদের সকল কাজের ভিত্তি করে চলি এবং আমাদের লক্ষ্যের ন্যায্যতা সম্পর্কে আমরা

সম্পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাসী বলে কোন ব্যক্তিগত আত্মত্যাগের বড়াই আমরা করি না এবং সব সময়ই এই লক্ষ্যের জন্য জীবন বলি দিতে পর্যন্ত আমরা প্রস্তুত, তাই কোন ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, অভিমত বা কর্মপদ্ধতি যদি জনগণের স্বার্থের পক্ষে অনুপযুক্ত হয় তবে তাকে বরবাদ করে দিতে কি আমরা অনিচ্ছুক হতে পারি? আমরা কি আমাদের পরিচ্ছন্ন মুখকে রাজনৈতিক ময়লা জমে বা জীবাণু-দুষ্ট হয়ে থাকতে দিতে পারি অথবা আমাদের সুস্থ দেহকে কুরে কুরে খেতে দিতে পারি? অসংখ্য বিপ্লবী শহীদেরা জনগণের স্বার্থে জীবন বলিদান করে গেছেন এবং তাঁদের কথা ভাবলে আমাদের অন্তর বেদনায় ভরে ওঠে—তাই আমাদের এমন কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ রয়েছে কি যা আমরা বিসর্জন দিতে না পারি আর এমনকি কোন ভুল থাকতে পারে যাকে আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইতস্ততঃ করতে পারি?

কমরেডগণ! কংগ্রেস শেষ হওয়ার পর আমরা ফ্রণ্টে চলে যাব এবং কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসরণ করে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের চূড়ান্ত পরাজয় সাধনের জন্য ও নয়া চীন গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাব। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, আমরা আমাদের দেশের সমগ্র জনগণের সঙ্গেই ঐক্যবদ্ধ হব। আবার পুনরাবৃত্তি করে বলি: যদি তাঁরা জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে চান এবং নয়া চীন গড়ে তুলতে চান তবে আমরা যে-কোন শ্রেণী, যে-কোন পার্টি, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সঙ্গেই ঐক্যবদ্ধ হব। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আমরা সংগঠনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার এবং নিয়মানুবর্তিতার নীতির ভিত্তিতে আমাদের পার্টির সকল শক্তিকেই দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করে তুলব। পার্টির কর্মসূচী, গঠনতন্ত্র ও সিদ্ধান্তগুলি মেনে চললে আমরা যে-কোন কমরেডের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হব। উত্তরমুখী অভিযানকালে আমাদের পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল ষাট হাজারেরও কম এবং তাঁদের অধিকাংশকেই শত্রু পরে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল; কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধকালে আমাদের সদস্যসংখ্যা ছিল তিন লক্ষেরও কম এবং তাঁদের অধিকাংশকেই একইভাবে শত্রু ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। এখন আমাদের সদস্যসংখ্যা বারো লক্ষেরও বেশি; এবার কিন্তু কোন অবস্থাতেই শত্রুকে আমরা আমাদের ছিন্নভিন্ন করে দিতে দেব না। এই তিনটি যুগের অভিজ্ঞতা থেকে যদি আমরা লাভবান হতে পারি, যদি আমরা বিনয়নম্র থাকি এবং আত্মম্ভরিতার বিরুদ্ধে সজাগ থাকি, পার্টির অভ্যন্তরে সকল কমরেডের মধ্যে ঐক্য এবং পার্টির বাইরের জনগণের সঙ্গে ঐক্য যদি

আমরা জোরদার করে তুলতে পারি তবে এ বিষয়ে একান্ত নিশ্চিত থাকা চলে যে শত্রু কর্তৃক ছিন্নভিন্ন হওয়ার পরিবর্তে আমরাই জাপানী আক্রমণকারীদের এবং তাদের আজ্ঞাবাহী কুকুরগুলিকে দৃঢ়ভাবে, পুরোপুরিভাবে, সম্পূর্ণভাবে এবং নিঃশেষে ধ্বংস করে দিতে পারব এবং তারপর নয়া-গণতান্ত্রিক চীন গড়ে তুলতে পারব।

বিপ্লবের তিনটি যুগের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষভাবে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমাদের এবং সমগ্র চীনা জনগণকে এই দৃঢ় বিশ্বাস এনে দিয়েছে যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রচেষ্টা না থাকলে, চীনের জনগণের প্রধান নির্ভরস্থল হিসেবে কমিউনিস্টদের না পেলে, চীন কোনদিনই স্বাধীনতা বা মুক্তি, শিল্পায়ন বা কৃষির আধুনিকীকরণ অর্জনে সমর্থ হবে না।

কমরেডগণ। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তিনটি বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠলে আমরা আমাদের বিরাট রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদন করতে পারব।

হাজার হাজার শহীদ জনগণের জন্য বীরের মতো জীবনদান করে গেছেন; আসুন আমরা তাঁদের পতাকাকে উচ্চে তুলে ধরি এবং তাঁদের রক্তে রঞ্জিত পথ ধরেই সামনের দিকে এগিয়ে চলি!

নয়া-গণতান্ত্রিক চীন অচিরেই জন্ম নেবে। আসুন, আমরা সেই মহান দিনটিকে অভিনন্দিত করি।

টীকা

১। চীনের ন্যাশনাল ভ্যানগার্ড কোর বা তার সংক্ষিপ্ত নাম 'ন্যাশনাল ভ্যানগার্ড কোর' হচ্ছে একটি বিপ্লবী যুব সংগঠন। ১৯৩৫ সালের ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলনে যে প্রগতিশীল যুবকেরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরাই ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে এই সংগঠনটি গড়ে তোলেন। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তার অনেক সদস্যই এই প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শত্রুর লাইনের পেছনে ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলতে অংশগ্রহণ করেন। চিয়াং কাই-শেক সরকার ১৯৩৮ সালে কুওমিনতাঙ অঞ্চলে ন্যাশনাল ভ্যানগার্ড কোর-এর বিভিন্ন সংগঠনকে জোর করে ভেঙে দেয়; পরে মুক্ত অঞ্চলের এই সংগঠনগুলি আরও ব্যাপকতর একটি সংগঠন 'ইয়ুথ কর

ন্যাশনাল স্যালভেশন' সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

২। ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই জাপানী হানাদার বাহিনী পিকিং থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত লুকৌচিয়াও-এর চীনা বাহিনীকে আক্রমণ করে। দেশজোড়া আন্তরিক, প্রবল জাপ-বিরোধী আন্দোলনের প্রভাবে চীনা সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধ রচনা করে। এই ঘটনা জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের আট বছর ব্যাপী বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ-যুদ্ধের সূচনা করে।

৩। তিনটি কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য 'কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের এবং জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের দুটি অধিবেশন সম্পর্কে মন্তব্য', বর্তমান খণ্ড, পৃঃ ১৭৪ দেখুন।

৪। একটানা যোগাযোগ পথ হিসেবে চীনের উত্তর-দক্ষিণ ট্রাঙ্ক রেলপথ জোর করে দখল করার এই আক্রমণ অভিযান জাপানী সৈন্যবাহিনী ১৯৪৪ সালের মে মাসে চালিয়েছিল; তাদের লক্ষ্য ছিল ক্যান্টন-হ্যাঙ্কাও বরাবর পুরো রেলপথটি দখল করে নেওয়া তাহলে উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে অব্যাহত স্থলপথে যোগাযোগ তারা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলত।

৫। স্কোবি গ্রীসে আক্রমণকারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনীর সেনাপতি। ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে ইউরোপ মহাদেশে জার্মান হানাদার বাহিনী যখন পরাজিত হয়ে পলায়ন করছিল, তখন স্কোবির সৈন্যবাহিনী গ্রীস আক্রমণ করে এবং লণ্ডনে প্রবাসী প্রতিক্রিয়াশীল গ্রীক সরকারকেও তা সঙ্গে করে নিয়ে আসে। জার্মান হানাদারদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনকারী গ্রীক গণ-মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে এই সরকারের আক্রমণ অভিযানকে স্কোবি পরিচালনা ও সহায়তা করে, এবং গ্রীক দেশপ্রেমিকদের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গ্রীসকে রক্তস্নানে ভাসিয়ে দেয়।

৬। **পাও চিয়া** হচ্ছে সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা যার সাহায্যে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী প্রাথমিক স্তরে তাদের ফ্যাসিষ্ট শাসন কার্যকর করত। ১৯৩২ সালের ১লা আগস্ট, চিয়াং কাই-শেক তাঁর 'জেলাগুলিতে লোকগণনার জন্য **পাও** ও **চিয়া** সংগঠন সংক্রান্ত নিয়মাবলী' ঘোষণা করে। হোনান, হুপে এবং আনহুই প্রদেশগুলি নিয়েই এই কাজ শুরু হয়। এই 'নিয়মাবলী' অনুসারে ব্যবস্থা করা হয় যে পরিবার ভিত্তিতে **পাও** ও **চিয়া** সংগঠন করা হবে; প্রত্যেক পরিপারের, প্রতিটি **চিয়ার** একজন প্রধান থাকবেন, প্রতিটি **চিয়া** গড়ে উঠবে

দশটি পরিবার নিয়ে এবং প্রতিটি পাও গড়ে উঠবে দশটি চিয়া নিয়ে। প্রতিটি প্রতিবেশীকে একে অন্যের কাজকর্মের প্রতি নজর রাখতে হতো এবং কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হতো; যদি একজনের দোষ হতো তবে সবাইকে শাস্তি পেতে হতো। বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়ের প্রতিবিপ্লবী ব্যবস্থাও এতে ছিল। ১৯৩৪ সালের ৭ই নভেম্বর কুওমিনতাঙ সরকার সরকারীভাবে ঘোষণা করে যে এই ফ্যাসিষ্ট ব্যবস্থা তার শাসনাধীন সকল প্রদেশ ও পৌর এলাকাতেই চালু হবে।

৭। ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন কায়রো সম্মেলন অনুষ্ঠান করে এবং যে 'কায়রো ঘোষণা' প্রকাশ করা হয় তাতে পরিষ্কারভাবে বলা হয় যে তাইওয়ান ও অন্যান্য কিছু অঞ্চল চীনকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ১৯৫০ সালের জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই চুক্তি প্রকাশ্যে লংঘন করে; চীন যাতে তাইওয়ানে নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারে তার জন্য একটি নৌবাহিনী তাইওয়ানকে নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা প্রেরণ করে।

৮। য়ুয়ান শী-কাই চিং বংশের শেষের দিকের বছরগুলিতে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের প্রধান। ১৯১১ সালের বিপ্লবে চিং রাজবংশের পতনের পর য়ুয়ান শী-কাই সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ জবরদখল করে নেয় এবং উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ মুৎসুদ্দিশ্রেণীর প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রথম সরকারটি স্থাপন করে। তার পক্ষে তা করা সম্ভব হয় প্রতি-বিপ্লবী সশস্ত্রবাহিনী ও সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনের জন্য; তাছাড়া বিপ্লবের নেতৃত্বদানকারী বুর্জোয়াশ্রেণীর আপোষমূলক মনোভাবকেও সে কাজে লাগায়। ১৯১৫ সালে সে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে দিতে চায় এবং এ ব্যাপারে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনলাভের জন্য জাপানের একুশ দফা দাবি মেনে নেয় যার মাধ্যমে জাপান সমগ্র চীনে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। য়ুন্নান প্রদেশে তার সিংহাসন আরোহণের বিরুদ্ধে ঐ বছরই ডিসেম্বরে একটি অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং দ্রুত তা জাতিজোড়া সাড়া জাগিয়ে তোলে ও সমর্থনলাভ করে। ১৯১৬ সালের জুন মাসে য়ুয়ান শী-কাই পিকিংয়ে মারা যায়।

৯। ওমেই হচ্ছে সেচুয়ান প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি বিখ্যাত পাহাড়। এখানে সেচুয়ানের পার্বত্য অঞ্চলের প্রতীক হিসেবেই তা ব্যবহৃত হয়েছে—এটাই ছিল জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে চিয়াং কাই-শেক শাসকগোষ্ঠীর শেষ আশ্রয়স্থল।

১০। 'উত্তর অভিমুখে আমার যাত্রাকালে প্রদত্ত বিবৃতি': ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন, ১০ই নভেম্বর, ১৯২৪।

১১। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বহু দশক ধরে ব্রিটেন ক্রমবর্ধমান পরিমাণে চীনে আফিম পাঠাতে থাকে। এতে করে চীনের জনগণই যে শুধু আফিমে আসক্ত হয়ে পড়েছিল তাই নয়, এর মাধ্যমে ব্রিটেন চীন থেকে সঞ্চিত রূপোও লুণ্ঠন করে নিতে থাকে। চীনে এর ফলে তীব্র প্রতিরোধ জেগে ওঠে। ১৮৪০ সালে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সুরক্ষার আছিলা করে ব্রিটেন চীনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। লিন সে-সুর নেতৃত্বে পরিচালিত চীনা সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ক্যান্টনের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'ব্রিটিশ সৈন্যদের ঠাণ্ডা করে দেওয়ার' অভিযান সংগঠিত করে যার ফলে ব্রিটিশ আক্রমণকারী বাহিনীকে প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে হয়। ১৮৪২ সালে দুর্নীতিপরায়ণ চিং রাজত্ব ব্রিটেনের সঙ্গে নানকিং চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তির ফলে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, হংকংকে ব্রিটেনের হাতে ছেড়ে দিতে হয় এবং সাংহাই, ফুচাও, আময়, নিংপো ও ক্যান্টনকে ব্রিটেনের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, আর ঠিক হয় চীনে যে ব্রিটিশ পণ্য আমদানি করা হবে তার শুল্ক চীন ও ব্রিটেন যুক্তভাবে ঠিক করে দেবে।

১২। আটলান্টিক সনদ যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ১৯৪১ সালে আটলান্টিক সম্মেলনের সমাপ্তির পর ঘোষণা করে। মস্কো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যেকার তেহরান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। ইয়াণ্টাতে ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে ক্রিমিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সবকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে স্বাক্ষরদানকারীরা সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে জার্মানি ও জাপানের ফ্যাসিষ্টদের পরাজয়ের প্রতিজ্ঞার ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধের পর আক্রমণকারী শক্তিগুলির ও ফ্যাসিবাদের ভগ্নাবশেষের পুনরভ্যুত্থানের প্রতিরোধে, বিশ্বশান্তি রক্ষায় এবং সমস্ত দেশের জনগণ যাতে তাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রলাভের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করে তুলতে পারে সে ব্যাপারে তাদের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনতিকাল পরেই যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন এই আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি অমান্য করে।

১৩। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সানফ্রান্সিসকোতে পঞ্চাশটি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে চীনের মুক্ত অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে কমরেড তুঙ পি-য়ু যোগদান করেছিলেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংগঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবের খসড়া আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ডাম্বারটোন ওকস-এ প্রণয়ন করা হয় যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের, যুক্তরাষ্ট্রের, ব্রিটেন ও চীনের প্রতিনিধিরা মস্কো ও তেহেরান সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪৪ সালের আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে মিলিত হন।

১৪। জাপানের আত্মসমর্পণের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং চীনের মুক্ত অঞ্চলের গণ-সম্মেলন আর আহ্বান করা হয়নি যদিও এই সম্মেলনের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের পর ইয়েনানে গঠিত হয়েছিল এবং তার একটি উদ্বোধনী সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাতে সমস্ত মুক্ত অঞ্চল থেকেই প্রতিনিধিরা যোগদান করেছিলেন।

যে বোকা বুড়োটি পাহাড় সরিয়েছিল

১২ই জুন, ১৯৪৫

আমাদের কংগ্রেস খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আমরা তিনটি কাজ করেছি। প্রথমতঃ, পার্টির লাইন নির্ধারণ করেছি যে লাইন হচ্ছে সাহসের সঙ্গে জনগণকে সমবেত করা এবং জনগণের শক্তিকে সম্প্রসারিত করা যাতে করে আমাদের পার্টির নেতৃত্বে জাপানী আক্রমণকারীদের তাঁরা পরাজিত করবেন, সমগ্র জনগণকে মুক্ত করবেন ও গড়ে তুলবেন একটি নয়া-গণতান্ত্রিক চীন। দ্বিতীয়তঃ, পার্টির নতুন গঠনতন্ত্র আমরা গ্রহণ করেছি। তৃতীয়তঃ, পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থা—কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত করেছি। এখন থেকে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সারা-পার্টির সদস্যবৃন্দকে নেতৃত্ব দিয়ে পার্টি-লাইনকে কার্যকর করা। আমাদের কংগ্রেস হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজয়ের কংগ্রেস, ঐক্যের কংগ্রেস। প্রতিনিধিরা তিনটি রিপোর্ট সম্পর্কেই চমৎকার মন্তব্যাদি করেছেন।[১] অনেক কমরেড আত্মসমালোচনা করেছেন এবং ঐক্যকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ঐক্যে উপনীত হয়েছেন। এই কংগ্রেস হচ্ছে ঐক্যের, আত্মসমালোচনার ও পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের প্রতীকস্বরূপ।

কংগ্রেস শেষ হওয়ার পর অনেক কমরেড তাঁদের নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যাবেন, বিভিন্ন যুদ্ধফ্রণ্টে ফিরে যাবেন। কমরেডগণ, আপনারা যেখানেই যান না কেন, আপনাদের কাজ হবে পার্টির কমরেডদের মাধ্যমে ব্যাপক জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের লাইনটি প্রচার করা।

কংগ্রেসের লাইন প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বিপ্লবের বিজয় যে সুনিশ্চিত এ বিষয়ে সমগ্র পার্টি ও জনগণের আস্থা জাগিয়ে তোলা। প্রথমে অগ্রবাহিনীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আত্মবলিদানে নির্ভীক হয়ে প্রতিটি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তা বিজয় অর্জন করতে পারে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়; সমগ্র জনগণের রাজনৈতিক চেতনাকেও আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে করে তারা স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সঙ্গে বিজয় অর্জনের জন্য একযোগে সংগ্রাম করে যাবে। সমগ্র দেশের জনগণকে এই বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে যে চীন চীনা

---

[১] চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসে এটি হচ্ছে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর সমাপ্তিসূচক ভাষণ।

জনগণেরই, প্রতিক্রিয়াশীলদের নয়। 'যে বোকা বুড়োটি পাহাড় সরিয়েছিল' হচ্ছে একটা প্রাচীন চীনা উপকথা। তাতে বহু প্রাচীনকালের উত্তর চীনে বসবাসকারী এক বুড়োর কাহিনী বলা হয়েছে। 'উত্তর পাহাড়ের বোকা বুড়ো' নামে সে পরিচিত ছিল। তার বাড়িটি ছিল দক্ষিণমুখী এবং তার দোরগোড়া ছাড়িয়েই পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল থাইহাং আর ওয়াংয়ু নামের দুটো উঁচু পাহাড়। তার ছেলেদের ডেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পাহাড় দুটোকে খুঁড়ে উপড়ে ফেলার জন্য কোদাল হাতে নিয়ে কাজে লেগে পড়ল। আরেক জন 'সাদা দাড়িওয়ালা জ্ঞানী' নামে পরিচিত বৃদ্ধ তাদের দেখে উপহাসভরে বলল, 'তোমরা কী বোকার মতোই না কাজ করছ! তোমাদের কজনের পক্ষে এই বিরাট দুটো পাহাড় খুঁড়ে উপড়ে ফেলা একেবারেই অসম্ভব।' বোকা বুড়ো জবাব দিল, 'আমি মরলে আমার ছেলেরা এ কাজ চালিয়ে যাবে; তারা যখন মরে যাবে তখন আমার নাতিরা, তারপর তাদের ছেলে ও নাতিরা অনন্তকাল ধরে এ কাজ চালিয়ে যাবে। পাহাড় দুটো অনেক উঁচু, কিন্তু তারা আর উঁচু হতে পারবে না এবং আমরা যতটুকু খুঁড়ে ফেলব, ততটুকু তারা নীচুই হয়ে পড়বে। তাহলে কেন আমরা এগুলিকে সমান করে দিতে পারব না?' জ্ঞানী বুড়োর ভুল অভিমত এভাবে খণ্ডন করে দিয়ে তার প্রতিজ্ঞায় অবিচল থেকে প্রতিদিনই সে মাটি খুঁড়ে যেতে লাগল। এই দেখে ভগবান মুগ্ধ হয়ে গেলেন, তিনি দুজন দেবদূতকে প্রেরণ করলেন, তাঁরা এসে পাহাড় দুটোকে পিঠে করে সরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। আজ চীনা জনগণের মাথার ওপর দুটো প্রকাণ্ড পাহাড়ের মতো বোঝা চেপে রয়েছে। একটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, আর অন্যটি হচ্ছে সামন্তবাদ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অনেকদিন আগেই এই দুটোকে খুঁড়ে উপড়ে ফেলার ব্যাপারে মনস্থির করেছে। আমাদের অবশ্যই অধ্যবসায় সহকারে অবিরাম কাজ করে যেতে হবে, তাহলে আমরাও ভগবানের মন গলাতে পারব। আমাদের ভগবান কিন্তু চীনা জনগণ ছাড়া আর কেউ নয়। তারা যদি একযোগে উঠে দাঁড়ায় আর আমাদের সঙ্গে মিলে খুঁড়তে শুরু করে তবে এই দুটো পাহাড়কে উপড়ে ফেলা যাবে না কেন?

আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছেন এমন দুজন আমেরিকানকে আমি গতকাল কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে আমেরিকান সরকার আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, আমরা তা করতে দেব না। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন করার আমেরিকান সরকারের নীতির আমরা বিরোধিতা

করি। কিন্তু আমাদের একটা পার্থক্য করতে হবে প্রথমতঃ আমেরিকান জনগণ ও তাদের সরকারের মধ্যে এবং দ্বিতীয়তঃ আমেরিকান সরকারের মধ্যেকার নীতি নির্ধারণকারীদের ও তাঁদের অধীনস্থ সাধারণ কর্মীদের মধ্যে। আমি ঐ দুজন আমেরিকানকে বলেছিলাম, 'আপনাদের সরকারের নীতি নির্ধারণকারীদের বলবেন—আমাদের মুক্ত এলাকায় প্রবেশ করতে আপনাদের নিষেধ করছি কারণ আপনাদের নীতি হচ্ছে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন করা, তাই আপনাদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যদি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মুক্ত এলাকায় আসতে চান তাহলে আপনারা আসতে পারেন কিন্তু তার আগে একটা চুক্তি হওয়া দরকার। আমরা আপনাদের চোরের মতো অন্ধকারে সর্বত্র ঘোরাফেরা করতে দিতে পারি না। প্যাট্রিক জে. হার্লি[২] প্রকাশ্যে চীনা কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতার বিরুদ্ধে ঘোষণা করার পরও আপনারা কেন মুক্ত এলাকায় এসে যেখানে-সেখানে ঘুরঘুর করে বেড়াতে চান?'

আমেরিকান সরকারের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন করার নীতি আমেরিকান প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্লজ্জতারই প্রকাশ। কিন্তু চীনা ও বৈদেশিক প্রতিক্রিয়াশীলদের চীনা জনগণের বিজয় অর্জনকে বাধা দেবার সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বর্তমান বিশ্বের গতিধারায় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিই হচ্ছে প্রধান ধারা আর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে একটি প্রতিকূল ধারা মাত্র। এই প্রতিক্রিয়াশীল বিপরীত ধারা জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্রের প্রধান ধারাকে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা করছে, কিন্তু এটা কোনদিনই প্রধান ধারায় পরিণত হতে পারবে না। আজ পুরাতন পৃথিবীতে এখনো তিনটি বৃহৎ দ্বন্দ্ব বিদ্যমান রয়েছে যে দ্বন্দ্বগুলি সম্পর্কে স্তালিন অনেকদিন আগেই বলে গেছেন: প্রথমতঃ, সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব; দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব; এবং তৃতীয়তঃ ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলি এবং উপনিবেশ-শাসক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব।[৩] তিনটি দ্বন্দ্ব যে কেবলমাত্র আগের মতো বিদ্যমান রয়েছে তাই নয়, বরং সেগুলি আরও তীব্রতর ও ব্যাপকতর হয়েছে। এই দ্বন্দ্বগুলির অস্তিত্ব ও বিকাশের ফলে একটা সময় আসবে যখন সোভিয়েত-বিরোধী, কমিউনিস্ট-বিরোধী ও গণতন্ত্র-বিরোধী বিপরীত যে ধারাটি আজও

বিদ্যমান রয়েছে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

এই সময়ে চীনে দুটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে—কুওমিনতাঙ-এর ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেস। এই দুটি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন: একটির উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের অন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নির্মূল করে দেওয়া এবং এভাবে চীনকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করা; অন্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের, চীনের সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলিকে উচ্ছেদ করে দেওয়া এবং একটা নয়া-গণতান্ত্রিক চীন গড়ে তোলা এবং এভাবে চীনকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়া। এই দুটি লাইনের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত শুরু হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের লাইনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে চীনের জনগণ পরিপূর্ণ বিজয় অর্জন করবে এবং কুওমিনতাঙ-এর প্রতিবিপ্লবী লাইন অনিবার্যভাবেই ব্যর্থ হবে।

টীকা

১। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের তিনটি রিপোর্ট ছিল: কমরেড মাও সে-তুঙ-এর রাজনৈতিক রিপোর্ট, কমরেড চু তের সামরিক রিপোর্ট, এবং কমরেড লিউ শাও-চির পার্টির সংবিধান পরিবর্তন সংক্রান্ত রিপোর্ট।

২। প্যাট্রিক জে. হার্লি, রিপাবলিকান পার্টির প্রতিক্রিয়াশীল এই রাজনীতিবিদকে ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে চীনে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, কারণ চিয়াং কাই-শেকের কমিউনিস্ট-বিরোধী নীতির প্রতি তাঁর সমর্থন চীনের জনগণের দৃঢ় প্রতিরোধ জাগিয়ে তোলে। ওয়াশিংটনে আমেরিকান পররাষ্ট্র দপ্তরের এক সাংবাদিক সম্মেলনে ১৯৪৫ সালের ২রা এপ্রিল হার্লি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ঘোষণাটি করেন। বিস্তৃত তথ্যের জন্য এই খণ্ডের 'হার্লি-চিয়াং দ্বৈত সঙ্গীতের চরম ব্যর্থতা' প্রবন্ধটি দেখুন।

৩। দ্রষ্টব্য: জে. ভি. স্তালিন: 'লেনিনবাদের ভিত্তি,' **রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ষষ্ঠ খণ্ড।

নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সৈন্যবাহিনী কর্তৃক উৎপাদন করা সম্পর্কে এবং শুদ্ধিকরণের জন্য ও উৎপাদনের জন্য মহান আন্দোলনসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে

২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৫

বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন আমাদের সৈন্যবাহিনী চূড়ান্ত বৈষয়িক অসুবিধার সম্মুখীন এবং তা বিক্ষিপ্ত অভিযানে লিপ্ত তখন সৈন্যবাহিনীকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের পুরো দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গ্রহণ করা একান্ত-ভাবেই অনুমোদনের অযোগ্য, কারণ তা করার ফলে বিপুল সংখ্যক অফিসার ও নীচের তলার লোকজনদের এই দুপক্ষেরই উদ্যোগকে রুদ্ধ করে দেওয়া হবে এবং তা তাদের প্রয়োজন মেটাতেও ব্যর্থ হবে। আমাদের বলা উচিত, 'কমরেডগণ, আসুন সবাই মিলে কাজ শুরু করি এবং বাধাবিপত্তি-গুলিকে দূর করে ফেলি!' যদি উচ্চতর স্তরের নেতৃত্ব সঠিকভাবে কর্তব্য নিরূপণ করতে পারেন, নিম্নতর স্তরের হাতে নিজেদের অসুবিধাগুলিকে নিজেদের চেষ্টায় দূর করার অবাধ অধিকার দেওয়া হয় তাহলে সমস্যাটির সমাধান হবে এবং আসলে সবচেয়ে সন্তোষজনকভাবেই তার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু তার পরিবর্তে যদি উচ্চতর স্তরের কাঁধে তাঁদের আসল বহন ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত বোঝা সবসময় চাপানো থাকে, তাঁরা যদি নিম্নতর স্তরকে অধিকতর অবাধে কাজ করতে না দেন ও জনগণের আত্মনির্ভরতার উদ্যমকে জাগিয়ে না তোলেন তাহলে উচ্চতর স্তরের সকল প্রয়াস সত্ত্বেও ফল দাঁড়াবে এই যে উচ্চতর ও নিম্নতর এই উভয় স্তরই একটি সংকটের মধ্যে নিজেদের নিপতিত দেখতে পাবেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনমতেই এতে সমস্যার সমাধান হবে না। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা যথেষ্টভাবেই তা স্পষ্ট করে তুলেছে। 'ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব ও বিকেন্দ্রীভূত পরিচালনার' নীতিটি বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের মুক্ত অঞ্চলে সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সংগঠনের সঠিক নীতি বলে সুপ্রমাণিত হয়েছে।

ইয়েনানের **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকার পক্ষ থেকে এই সম্পাদকীয়টি কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন।

মুক্ত অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনীর মোট সংখ্যা ইতিমধ্যেই নয় লক্ষাধিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করার জন্য আমাদের এই সংখ্যাকে আরও বেশ কয়েকগুণ বাড়িয়ে তুলতে হবে। আমরা এ যাবৎ বাইরের কোন সাহায্য পাইনি। ভবিষ্যতে যদি তা পাইও, তবু নিজেদের জীবিকা নির্বাহের সংস্থান আমাদেরকেই করতে হবে; এক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণার কোন অবকাশই নেই। অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় বেশ কিছু সংখ্যক সামরিক বাহিনীকে তাঁদের এখানকার স্ব স্ব এলাকা থেকে সরিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে নানা অভিযানে আমরা প্রেরণ করব এবং শত্রুর বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যস্থলে আক্রমণের জন্য তাঁদের কেন্দ্রীভূত করব। এইসব বিরাট বিরাট বাহিনীগুলি কেন্দ্রীভূত অভিযানে লিপ্ত থাকার সময় নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হতে পারবে না এবং অধিকন্তু, পশ্চাদ্ভূমি থেকে তাঁদের বিপুল পরিমাণ রসদ সরবরাহেরই প্রয়োজন দেখা দেবে। স্থানীয়ভাবে নিযুক্ত ও আঞ্চলিক যে সৈন্যবাহিনীগুলি পেছনে থেকে যাবে (এবং তারাও সংখ্যার দিক থেকে সুপ্রচুরই হবে) শুধু তারাই একই সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ ও উৎপাদনের কাজে আগের মতো নিয়োজিত থাকতে পারবে। এই যখন অবস্থা, এতে কি সন্দেহ আছে যে যুদ্ধ ও ট্রেনিং-এর যতক্ষণ ক্ষতি হচ্ছে না ততক্ষণ সকল সৈন্যগণকেই ব্যতিক্রমহীনভাবে বর্তমান সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনের মাধ্যমে আংশিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে চলা শিখে নিতেই হবে?

আমাদের পরিস্থিতিতে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদন যদিও আকারগতভাবে পশ্চাদ্‌পদ ও পশ্চাৎমুখী একটা ব্যাপার তবু বিষয়বস্তুর দিক থেকে তা প্রগতিশীল এবং বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্য-সম্পন্ন। আনুষ্ঠানিকতার দিক থেকে বলতে গেলে, শ্রমবিভাজনের নীতি আমরা এখানে অমান্য করছি। কিন্তু আমাদের পরিস্থিতিতে—দেশের দারিদ্র্য ও ঐক্যহীনতার এই পরিস্থিতিতে (কুওমিনতাঙ-এর মুখ্য শাসক চক্রগুলির অপরাধজনক কার্যকলাপেরই যা পরিণতি) এবং দীর্ঘস্থায়ী ও জনগণের বিক্ষিপ্ত গেরিলা যুদ্ধের এই পরিস্থিতিতে আমরা এই যে কাজ করছি তা হচ্ছে প্রগতিশীল। কুওমিনতাঙ-এর বিষণ্ণ আর জীর্ণশীর্ণ সৈন্যদের দিকে তাকান আর মুক্ত অঞ্চলের আমাদের প্রাণোচ্ছল ও শক্তিমান সৈন্যদের দিকে চেয়ে দেখুন! নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদনের কাজ শুরু করার

আগের আমাদের অসুবিধাগুলির কথা ভাবুন আর এখন আমরা তার চেয়ে কত ভাল আছি তা একবার চেয়ে দেখুন! এখানকার যে-কোন দুটো সৈন্যবাহিনীর ইউনিট বা দুটো কোম্পানীকে বলুন এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে একটিকে—অর্থাৎ উচ্চতর মহল থেকে তাদের জীবনধারণের সব উপকরণের জোগান দেওয়া এবং উচ্চতর মহল থেকে অতি অল্প জোগান দেওয়া বা আদৌ কিছু জোগান না দেওয়া অথচ তাদের যা কিছু প্রয়োজন তা তাদের উৎপাদন করে নেওয়ার, বা অনেকখানি, অর্ধেক বা তাদের যা প্রয়োজন তার অর্ধেকেরও কম উৎপাদন করে নেওয়ার মধ্যে—একটি পদ্ধতি বেছে নিতে বলুন। কোন্ পদ্ধতিতে অধিকতর ভাল ফল পাওয়া যাবে? আত্মনির্ভরতার জন্য উৎপাদন করার জন্য বছর খানেকের গুরুতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁরা নিশ্চিতভাবেই বলবেন যে দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই উন্নততর সুফল মিলেছে এবং তা-ই তাঁরা গ্রহণ করতে চাইবেন আর নিশ্চিতভাবেই বলবেন প্রথম পদ্ধতিটি খুবই হতাশাজনক এবং তাঁরা তা গ্রহণই করতে চাইবেন না। তার কারণ হচ্ছে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সেনাবাহিনীর সকলেরই জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধিত হয়, অন্যদিকে প্রথম পদ্ধতিতে উচ্চতর স্তরের পক্ষ থেকে যত চেষ্টাই করা হোক না কেন বর্তমান কঠিন বৈষয়িক পরিস্থিতিতে কোনমতেই তাদের পুরো প্রয়োজন মেটানো যাবে না। তাই যাকে মনে হচ্ছে 'পশ্চাদ্‌পদ' ও 'পশ্চাৎমুখী' পদ্ধতি তা গ্রহণ করার পর, আমাদের সৈন্যবাহিনী নিজেদের জীবনধারণের উপকরণের অভাব দূর করে দিতে পেরেছেন ও তাঁদের জীবিকার মানকে উন্নত করে তুলেছেন যার ফলে প্রতিটি সৈন্যই প্রাণোচ্ছল ও শক্তিমান হয়ে উঠেছেন; তার ফলে, নানা অসুবিধায় নিমজ্জিত জনগণের ওপর থেকে করভার আমরা লাঘব করে দিতে পেরেছি, অর্জন করেছি তাদের সমর্থন, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ আমরা চালিয়ে যেতে পারছি, পারছি আমাদের সৈন্যবাহিনীকে সম্প্রসারিত করে তুলতে আর এইভাবে মুক্ত অঞ্চলকে বিস্তারিত করে তুলতে সমর্থ হয়েছি, শত্রুর অধিকৃত অঞ্চলকে হ্রাস করে আনতে পেরেছি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের এবং সমগ্র চীনের মুক্তি অর্জনের দিকে এগিয়ে চলেছি। এইগুলি কি বিরাট বিপুল ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন নয়?।

নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সৈন্যবাহিনীর উৎপাদনকার্য শুধু

সৈন্যবাহিনীর জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন করেছে, জনগণের ওপরের বোঝাকে লাঘব করেছে তাই নয়, তা সৈন্যবাহিনীকে সম্প্রসারিত করে তোলাও সম্ভবপর করে তুলেছে। তাছাড়া তাতে করে বহু আশু সুপ্রভাবও সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে :

(১) অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হয়েছে। অফিসার ও সৈনিকেরা একত্রে উৎপাদনের কাজ করছেন এবং পরস্পর ভাই ভাই হয়ে উঠছেন।

(২) শ্রমের প্রতি উন্নততর মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এখন যে ব্যবস্থাটি দাঁড় করেছি তা অতীতের ভাড়াটে ব্যবস্থা বা সার্বজনীন সামরিক ব্যবস্থাও নয়, তা হচ্ছে তৃতীয় একটি ব্যবস্থা, স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সমাবেশের একটি ব্যবস্থা। ভাড়াটে ব্যবস্থার চেয়ে তা উন্নততর কেননা তা অসংখ্য বাউণ্ডুলে অকর্মণ্যের ভীড় সৃষ্টি করে না; কিন্তু তা সার্বজনীন সামরিক ব্যবস্থার মতো তত উত্তম একটি ব্যবস্থা অবশ্যই নয়। তা সত্ত্বেও আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সমাবেশের পদ্ধতিটিই আমরা গ্রহণ করতে পারি, সার্বজনীন সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় সমবেত এই সৈন্যগণকে দীর্ঘকাল ধরেই সৈনিকজীবন যাপন করতে হয় তাই শ্রমের প্রতি এদের মনোভাবে হানি ঘটে এবং তারা এমন বাউণ্ডুলে হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের এমন কিছু খারাপ অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায় যুদ্ধবাজদের সৈন্যবাহিনীতেই যা দেখা যেত। কিন্তু সৈন্যবাহিনী যখন থেকে নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য উৎপাদনের কাজ শুরু করল তখন থেকে শ্রমের প্রতি মনোভাবের উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং তাদের বাউণ্ডুলে চালচলনও দূর হয়ে গেছে।

(৩) শৃংখলাপরায়ণতা জোরদার হয়েছে। যুদ্ধে ও সৈনিকজীবনে শৃংখলা দুর্বল হয়ে পড়েনি, উৎপাদনকার্যে শ্রম-নিয়মানুবর্তিতা তাকে শক্তিশালীই করে তুলেছে।

(৪) সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কের উন্নতি সাধিত হয়েছে। যখন থেকে সৈন্যবাহিনী নিজের 'ঘর গুছিয়ে' চলতে শুরু করেছে তখন থেকে জনগণের সম্পত্তির ওপর হামলাদারী কদাচিৎ ঘটেছে বা আদৌ ঘটেনি। সৈন্যবাহিনী ও জনগণ যখন শ্রম বিনিময় করতে ও উৎপাদনের কাজে পরস্পরকে সাহায্য করতে শুরু করেছেন তখন থেকে

তাদের মধ্যেকার বন্ধুত্ব শক্তিশালীই হয়ে উঠেছে।

(৫) সরকার সম্পর্কে সৈন্যবাহিনীতে ক্ষোভের গুঞ্জন কমে এসেছে এবং দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হয়েছে।

(৬) জনগণের বিরাট উৎপাদন অভিযানে তা জুগিয়েছে একটি উদ্দীপনা। যখন থেকে সৈন্যবাহিনী উৎপাদনের কাজে লিপ্ত হয়েছে তখন থেকে সরকার ও অন্যান্য সংগঠনেরও অনুরূপভাবে কাজে লিপ্ত হওয়া অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে এবং তাঁরা অনেক বেশি উদ্যম সহকারে কাজে গেলে গেছেন এবং তাছাড়া, সমগ্র জনগণের পক্ষ থেকেও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সার্বিক অভিযান আরও অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং তাও অনেক বেশি উদ্যম সহকারে পরিচালিত হয়েছে।

শুদ্ধিকরণের জন্য এবং উৎপাদনের জন্য যে ব্যাপক আন্দোলনগুলি যথাক্রমে ১৯৪২ এবং ১৯৪৩ সালে শুরু হয়েছিল সেগুলি চূড়ান্ত নির্ধারক ভূমিকাই পালন করেছে, একটি পালন করেছে আমাদের ভাবাদর্শগত জীবনে আর অন্যটি পালন করেছে আমাদের বৈষয়িক জীবনে। এই দুটি আন্দোলনের যোগসূত্রকে যদি আমরা যথাসময়ে ধরতে না পারতাম তাহলে বিপ্লবের সমগ্র যোগসূত্রকেই আমরা ধরে ফেলতে ব্যর্থ হতাম এবং আমাদের সংগ্রামের কোন অগ্রগতিই হতো না।

আমরা জানি ১৯৩৭ সালের আগে যাঁরা পার্টিতে যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যেকার মাত্র কয়েক লক্ষই এখনো বেঁচে আছেন এবং আমাদের বর্তমানের ১২,০০,০০০ সদস্যের মধ্যে অধিকাংশ এসেছেন কৃষকজনগণের ও পেটি-বুর্জোয়াদের অপরাপর অংশ থেকে। এইসব কমরেডদের বৈপ্লবিক প্রেরণা খুবই প্রশংসনীয় এবং তা মার্কসবাদী শিক্ষায় দীক্ষালাভে ইচ্ছুক কিন্তু তাঁরা তাঁদের সঙ্গে করে পার্টিতে নিয়ে এসেছেন এমন সব ধ্যানধারণা যা মার্কসবাদের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বা পুরোপুরিই অসঙ্গতিপূর্ণ। ১৯৩৭ সালের আগে পার্টিতে যোগদান করেছেন এমন কিছু কিছু ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। এতে করে চূড়ান্ত গুরুতর একটি দ্বন্দ্বের বিপুল একটি অসুবিধারই সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা যদি ব্যাপক একটি মার্কসবাদী শিক্ষা-অভিযান অর্থাৎ শুদ্ধিকরণ অভিযান শুরু না করতাম, তবে কি আমরা নির্ঝঞ্ঝাটে এগিয়ে যেতে পারতাম? স্পষ্টতঃই বলা যায়, না, পারতাম না। কিন্তু আজ বিরাট সংখ্যক কর্মীদের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্বকে আমরা সমাধান

করেছি বা তা সামাধান করার প্রক্রিয়া শুরু করেছি—পার্টির মধ্যেকার এই দ্বন্দ্ব, প্রলেতারীয় (পেটি-বুর্জোয়া; বুর্জোয়া ও এমনকি জমিদারশ্রেণীর তবে মুলতঃ পেটি-বুর্জোয়া) মতাদর্শের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব অর্থাৎ মার্কসীয় ও অ-মার্কসীয় মতাদর্শের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের আমরা সমাধান করেছি বলেই আমরা বিরাট ও দৃঢ় পদক্ষেপ ফেলে ফেলে অভূতপূর্ব (যদিও পরিপূর্ণ নয়) এমন একটি মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ঐক্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারছি। এখন থেকে আমাদের পার্টি আরও বিশাল বিপুল হয়ে উঠতে পারবে, আর উঠতে তাকে হবেই এবং মার্কসবাদী ভাবাদর্শের মূলনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমরা আরও বেশি কার্যকরভাবে তার বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

এক্ষেত্রে অন্য যোগসূত্রটি হচ্ছে উৎপাদনের জন্য আন্দোলন। আজ আট বছর ধরে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলছে। যখন তা শুরু হয়েছিল, আমাদের খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ তখন যথেষ্টই ছিল। কিন্তু অবস্থা খারাপ হতে হতে আমরা কঠিন অসুবিধায় পড়লাম, খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিল, রান্নার তেলের ও লবণের অভাব দেখা দিল, কাপড়চোপড় ও বিছানাপত্রের এবং টাকাকড়ির অভাব দেখা দিল। এই কঠিন অসুবিধা, এই দুরূহ দ্বন্দ্ব বিরাট বিরাট জাপানী আক্রমণের অভিযানের এবং কুওমিনতাঙ সরকারের ১৯৪০-৪৩ সালের তিন তিনটি জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের (অর্থাৎ 'কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণ অভিযানের') সূত্র ধরে দেখা দিল। আমরা যদি এই অসুবিধাকে দূর করে দিতে ও এই দ্বন্দ্বের সমাধান করতে না পারতাম এবং যদি এই যোগসূত্রটিকে ধরতে না পারতাম তবে কি আমাদের জাপ-বিরোধী সংগ্রাম এমন অগ্রগতি লাভ করতে পারত? স্পষ্টতঃই পারত না। কিন্তু উৎপাদনকে বিকশিত করে তুলতে আমরা শিখেছি এবং এখনো শিখছি, তাই দেখুন, আমরা প্রাণশক্তি ও উদ্যমে আবার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছি। কোন শত্রুর ভয়েই আমরা আর বিচলিত নই, আগামী কবছরের মধ্যেই আমরা তাদের সবকটির বিরুদ্ধেই বিজয়ী হয়ে উঠব।

তাই, শুদ্ধিকরণ ও উৎপাদনের এই দুটি বিরাট আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

আসুন, আমরা এগিয়ে যাই এবং দুটি বিরাট আন্দোলনকে আমাদের সংগ্রামের অন্যান্য কর্তব্য সুসম্পাদনের ভিত্তি হিসেবে সর্বত্র ছড়িয়ে দিই।

তা যদি আমরা করতে পারি তবে চীনের জনগণের পরিপূর্ণ বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে।

এখন হচ্ছে বসন্তকালীন ফসলের মৌসুম, আমরা আশা করছি, নেতৃস্থানীয় কমরেডরা, সকল শ্রমজীবী ব্যক্তিবর্গ ও জনগণ প্রতিটি মুক্ত এলাকাতেই উৎপাদনকার্যের যোগসূত্রটিকে যথাসময়ে আঁকড়ে ধরবেন এবং গত বছরের তুলনায় আরও বিপুলতর সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়াসী হবেন। যেসব এলাকায় উৎপাদন বিকাশের কাজকর্ম এখনো শিখে নেওয়া হয়নি, বিশেষ করে সেইসব এলাকায় এই বছর বিপুলতর প্রয়াস অবশ্যই আমাদের চালাতে হবে।

হার্লি-চিয়াং দ্বৈত সঙ্গীতের চরম ব্যর্থতা

১০ই জুলাই, ১৯৪৫

চিয়াং কাই-শেকের একনায়কতন্ত্রী রাজত্বকে আড়াল করে রাখার জন্য আহূত চতুর্থ জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের উদ্বোধনী সভা বসেছে চুংকিং-এ ৭ই জুলাই তারিখে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি হচ্ছে ক্ষুদ্রতম উদ্বোধনী সভা। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কেউই যে উপস্থিত ছিলেন না তা-ই নয়, অন্যান্য গ্রুপেরও বহু পর্ষৎ-সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। মোট ২৯০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৮০ জন উপস্থিত হয়েছেন। উদ্বোধনী সভায় চিয়াং এই কথাগুলি বলেছেন :

> সরকার জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হাজির করছে না ; অতএব ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা ঐ বিষয়গুলি নিয়ে পুরোপুরি আলোচনা করতে পারেন। সর্বপ্রকার সততা ও নিষ্ঠা সহকারে ঐ প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আপনাদের মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনতে সরকার প্রস্তুত।

জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করা সংক্রান্ত গোটা কারবারটার একটা ইতি সম্ভবতঃ এই বছরের ১২ই নভেম্বরই হতে যাচ্ছে। এই কারবারে সাম্রাজ্যবাদী প্যাট্রিক জে. হার্লির একটা কিছু করণীয় নিশ্চয়ই রয়েছে। প্রথমে তিনি খুব জোরেই চিয়াং কাই-শেককে এই ব্যবস্থাটি নিতে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন এবং তারই জন্য চিয়াং কাই-শেকের নববর্ষ দিবসের বক্তৃতায়[১] খানিকটা কড়া সুর শোনা গিয়েছিল এবং ১লা মার্চের বক্তৃতায়[২] তা আরও খানিকটা বেশি করেই ছিল কারণ ঐ বক্তৃতায় তিনি ১২ই নভেম্বর 'জনগণের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার' ব্যাপারে তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথাই ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর ১লা মার্চের বক্তৃতায় চীনের কমিউনিস্ট পার্টির যে প্রস্তাবে, চীনের জনগণের সাধারণ ইচ্ছাই অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল তাকে অর্থাৎ সকল পার্টির একটি সম্মেলন আহ্বান করা হোক এবং একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করা

সিনহুয়া সংবাদ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কমরেড মাও সে তুঙ এই সংবাদভাষ্যটি রচনা করে দিয়েছিলেন।

হোক এই প্রস্তাবকে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি মহানন্দে একজন আমেরিকান সহ তথাকথিত তিনজনের একটি কমিটি গঠনের ভাবনাটি খেলার ছলে ছুঁড়ে দিয়েছেন যার কাজ হবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র বাহিনী-গুলিকে 'পুনর্গঠিত' করা। তাঁর এইটুকু বলার ঔদ্ধত্যও হয়েছে যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে 'আইনানুগ মর্যাদা' দানের আগে পার্টিকে তার সৈন্য-বাহিনীকে তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে। এই সবকিছু ব্যাপারেই মহামান্য মিঃ প্যাট্রিক জে. হার্লির মদৎটা ছিল চূড়ান্তরকমেই স্পষ্ট। ওয়াশিংটনে ২রা এপ্রিল একটি বিবৃতিতে হার্লি চিয়াং কাই-শেকের 'জাতীয় বিধানসভাকে' প্রচুর মদৎ জুগিয়েছেন এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে অস্বীকার করা, তার কাজকর্মের কুৎসাকীর্তন করা, কমিউনিস্ট পার্টি সঙ্গে সহযোগিতার বিরোধিতা করা এবং এই ধরনের তাবৎ বাক্যজাল বিস্তার সহ সর্ববিধ নোংরা ষড়যন্ত্রেরই তিনি সাফাই গেয়েছেন। তাই যুক্তরাষ্ট্রে হার্লির আর চীনের চিয়াং কাই-শেকের এই দ্বৈত সঙ্গীতের সুর চীনের জনগণকে বলি দেওয়ার সাধারণ মতলবে এসে রাসভরাগিণীর একেবারে সপ্তমে পৌঁছেছে। তারপর থেকে দেখা যাচ্ছে রাগিণীটা যেন খানিকটা মিইয়ে এসেছে। চীনা ও বিদেশী উভয়ের মধ্যেই, কুওমিনতাঙ-এর ভিতরে ও বাইরে, বিভিন্ন পার্টির অন্তর্ভুক্ত ও পার্টির বাইরের সকলে সর্বত্র অসংখ্য কণ্ঠে তার প্রতিবাদে আওয়াজ তুলেছেন। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে গালভরা উচ্চকণ্ঠ সব কথাবার্তা সত্ত্বেও হার্লি-চিয়াং-এর এই নষ্টামির আসল লক্ষ্য হচ্ছে চীনের জনগণের স্বার্থকেই জলাঞ্জলি দেওয়া, তাদের ঐক্যকে আরও তছনছ করে দেওয়া এবং বলা চলে যেন চীনের ব্যাপক গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার জন্য একটি বিস্ফোরক মাইনই পুঁতে রাখা আর এভাবে ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের সময়কার আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য মিত্রদেশের জনগণের সাধারণ স্বার্থেরই ক্ষতিসাধন করা এবং পরবর্তী সময়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্ভাবনার ক্ষতিসাধন করা। এই মুহূর্তে হার্লি খানিকটা চুপ মেরে আছেন, আরও কি জানি সব ধান্ধা নিয়ে উনি ব্যস্ত রয়েছেন যার ফলে চিয়াং কাই-শেককেও জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের সভার সামনে চতুর বাক্যজাল বিস্তারের আশ্রয় নিতে হয়েছে। আগে ১লা মার্চে চিয়াং কাই-শেক বলেছিলেন :

আমাদের দেশের অবস্থা অন্যান্য দেশের অবস্থার চেয়ে আলাদা : জাতীয় বিধানসভা আহ্বানের আগে আমাদের দেশে জনগণের প্রতি-

নিধিত্বকারী কোন দায়িত্বশীল সংস্থাই নেই যার মাধ্যমে সরকার জনগণের সঙ্গে তাদের অভিমত জানার জন্য আলাপ-আলোচনা করতে পারে।

তাই যদি অবস্থা হয় তবে জেনারেলিসিমো এখনই জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের কাছে গিয়ে 'মনোযোগ দিয়ে' 'মতামত' শুনে নিচ্ছেন না কেন? তাঁর মতে গোটা চীনে 'দায়িত্বশীল কোন সংস্থাই' নেই যার মাধ্যমে 'তাদের অভিমত জানার জন্য জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা যায়'; তাহলে দেখা যাচ্ছে একটা 'সংস্থা' হিসেবে জনগণের রাজনৈতিক পর্ষৎ রয়েছে শুধু খানাপিনা করার জন্য আর তার 'মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য' যদিও তার কোন আইনানুগ ভিত্তিই নেই। তা যাই হোক, যদি জনগণের রাজনৈতিক পর্ষৎ এই মেকী 'জাতীয়' সভা আহ্বানের বিরুদ্ধে একটি শব্দও করে তবে তা ভাগ্য কাজই হবে আর ঈশ্বরের অপার করুণাই তার ওপর বর্ষিত হবে, কিন্তু হায়, এর মাধ্যমে তাঁরা যে মহামহিম সম্রাটেরই বিরুদ্ধাচরণ করে বসবেন, অমান্য করে বসবেন সম্রাটের পয়লা মার্চের অনুশাসনকে! অবশ্য, জনগণের রাজনৈতিক পর্ষৎ সম্পর্কে এখনই কোন মন্তব্য করা অসময়োচিত হবে, তার জন্য আমাদের আরও কদিন অপেক্ষা করে দেখতে হবে জেনারেলিসিমোকে 'মনোযোগ দিয়ে শোনার মতো' কী তাঁরা হাজির করেন। একটা বিষয় কিন্তু সুনিশ্চিতঃ জাতীয় বিধানসভার বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ ধ্বনিত করে তোলার পর থেকে 'নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের' পরম উৎসাহী সমর্থকেরাও আমাদের খোদ 'যুবরাজ' সম্পর্কেই কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন; তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন 'শূকরছানাদের একটি পার্লামেন্ট'[৩] আহ্বান করে তিনি যেন তাঁর গলায় একটি ফাঁস পরে না নেন আর তাঁকে তাঁরা য়ুয়ান শী-কাই-এর পরিণামের কথা উল্লেখ করে সাবধান করে দিয়েছেন। কে জানে হয়তো শেষ পর্যন্ত, এর ফলে আমাদের 'যুবরাজ'-এর হাতটি থেমেও-বা যেতে পারে? কিন্তু এটা একেবারে সুনিশ্চিত যে যদি তাঁদের একটি চুলও খোয়াতে হয় তবে তিনি এবং তাঁর চেলাচামুণ্ডারা জনগণকে, একরতি ক্ষমতাও লাভ করতে দেবে না। তার একেবারে সাক্ষাৎ প্রমাণ হচ্ছে জনগণের ন্যায্য সমালোচনাকে মহামান্য সম্রাট 'বল্গাহীন আক্রমণ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন:

··যুদ্ধের পরিস্থিতিতে জাপ-অধিকৃত এলাকায় সাধারণ নির্বাচনের স্পষ্টতঃই কোন প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই দুবছর আগেই কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন জাতীয় বিধানসভা আহ্বানের এবং যুদ্ধ শেষ

হওয়ার এক বছরের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ঐ সময়ে কোন কোন মহলে তার বল্গাহীন সমালোচনাই করা হয়েছে।

এইসব সমালোচনার কারণ ছিল এই যে ঐ দিনটি অনেক বিলম্বিত হয়ে যেতে পারে। অতঃপর মহামহিম সম্রাট প্রস্তাব করলেন 'যদি দেখা যায় চূড়ান্ত-ভাবে যুদ্ধ শেষ হয়ে আসা বিলম্বিত হতে পারে এবং এমনকি যুদ্ধ শেষ হয়ে এলেও সর্বত্র দ্রুত শৃংখলা ফিরে আসছে না তবে যুদ্ধের পরিস্থিতিটা সুস্থির হয়ে দাঁড়ালেই জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করা যেতে পারে।' কিন্তু আবার তাকে অনেকখানি চমকে দিয়ে ঐ লোকেরাই আবার 'বল্গাহীন সমালোচনা' শুরু করে দিয়েছে। এতে মহামহিম সম্রাটকে একটি সাংঘাতিক উভয়সংকটে পড়তে হয়েছে। কিন্তু চীনের জনগণকে চিয়াং কাই-শেক ও গোষ্ঠীকে একটি শিক্ষা দিতেই হবে আর বলতে হবে: আপনারা যাই করুন আর বলুন না কেন, জনগণের ইচ্ছাকে অমান্য করার কোন ছলচাতুরিই বরদাস্ত করা হবে না। চীনের জনগণ যা দাবি করছে তা হচ্ছে আশু রাজনৈতিক সংস্কার, যেমন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান, গোয়েন্দা বিভাগের অবসান জনগণকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান এবং রাজনৈতিক দলগুলির আইনানুগ মর্যাদার স্বীকৃতিদান। আপনারা এসব কোন কাজই করছেন না, বরং উল্টে 'জাতীয় বিধানসভা' আহ্বানের দিনক্ষণের মতো নকল সমস্যা নিয়ে অনর্থক খেলা করছেন। এতে করে তিন বছরের একটি শিশুকেও প্রতারিত করা যাবে না। যথার্থ নিম্নতম গণতান্ত্রিক সংস্কার ছাড়া ছোট-বড় আপনাদের সকল বিধানসভাই আস্তাকুঁড়েতে নিক্ষিপ্ত হবে। একে 'বল্গাহীন আক্রমণ' বলতে চান বলুন, কিন্তু এ ধরনের প্রতিটি প্রতারণাকেই দৃঢ়ভাবে, পুরোপুরিভাবে, সামগ্রিকভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হবেই এবং তার রেখামাত্র চিহ্নেরই অবশেষে রাখা হবে না। তার কারণ হচ্ছে, এ হচ্ছে নিছক প্রতারণা। জাতীয় বিধানসভা আছে কি নেই তা হচ্ছে এক কথা, কিন্তু নিম্নতম গণতান্ত্রিক সংস্কারসাধন করা হবে কিনা, তা হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। এখনকার মতো প্রথমটি না থাকলেও চলে কিন্তু পরবর্তীটিকে অবিলম্বে প্রচলিত করতে হবে। যেহেতু চিয়াং কাই-শেক ও তাঁর গোষ্ঠী 'জনগণের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আরও আগেই ছেড়ে দিতে চান' তাই 'খানিকটা আগেভাগেই' তাঁরা নিম্নতম গণতান্ত্রিক সংস্কারগুলি কার্যকর করতে অনিচ্ছুক কেন? কুওমিনতাঙ-এর হে ভদ্রমহোদয়গণ! যখন আপনারা এই শেষ লাইনগুলি পড়বেন, আপনাদের এ কথা মানতেই হবে যে চীনের কমিউনিস্টরা কোনমতেই আপনাদের বিরুদ্ধে 'বল্গাহীন আক্রমণ' করছেন না বরং তাঁরা আপনাদের একটি সোজা প্রশ্নই করছেন। আমরা কি একটা প্রশ্নও করতে পারব না? তাও আপনারা একপাশে সরিয়ে রেখে দেবেন? যে

প্রশ্নের জবাব আপনাদের দিতেই হবে তা হচ্ছে: এটা কি করে হয়, আপনারা যেখানে 'জনগণের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতাই ছেড়ে দিতে' ইচ্ছুক সেখানে গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রচলন করতে আপনারা এমন অনিচ্ছুক কেন?

টীকা

১। ১৯৪৫ সালের পয়লা জানুয়ারী চিয়াং কাই-শেক যে রেডিও বক্তৃতা করেন তাতে তিনি জাপানী আক্রমণকারীদের হাতে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী গত বছরে যে লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করেছে তার কোন উল্লেখই করেননি, বরং জনগণের বিরুদ্ধে অপবাদ রটিয়ে কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কতন্ত্রের অবসানের প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতাই করেছেন, কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার এবং একটি যুক্ত সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলী গঠনের যে প্রস্তাব দেশের সমগ্র জনগণ এবং জাপ-বিরোধী সকল পার্টিই সমর্থন জানিয়েছেন তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কতন্ত্র চালিয়ে যাওয়ার জেদই বজায় রেখেছেন এবং জনগণের সমালোচনার বিরুদ্ধে একটি মুখরক্ষা হিসেবে কুওমিনতাঙ-নিয়ন্ত্রিত 'জাতায় বিধানসভা' আহ্বানের যে প্রস্তাব করেছেন তাকে গোটা জাতিই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে।

২। ১৯৪৫ সালের পয়লা মার্চ চিয়াং কাই-শেক চুংকিং-এ নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সহায়ক সমিতির সভায় একটি বক্তৃতা করেন। তাছাড়া তাঁর নববর্ষ দিবসের বক্তৃতায় তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল অভিমতগুলির পুনরাবৃত্তি করে চিয়াং অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও চতুর্থ সেনাবাহিনীকে 'পুনর্গঠনের' জন্য একজন আমেরিকান প্রতিনিধিসহ তিনজনের একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন যা বস্তুতঃ হচ্ছে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপের জন্য প্রকাশ্য আমন্ত্রণ জ্ঞাপন।

৩। ১৯২৩ সালে উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজ সাও কুন পার্লামেন্টের প্রতিটি সদস্যকে ৫,০০০ রৌপ্য ডলার ঘুষ দিয়ে বশীভূত করে নিজেকে 'চীন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি' নির্বাচিত করিয়ে নেন। ঘুষদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার জন্য তিনি প্রচুর কুখ্যাতি অর্জন করেন। এবং ঐ উৎকোচ গ্রহণকারী সদস্যদেরও 'শূকর ছানাদের পার্লামেন্ট-র সদস্য' হিসেবে অভিহিত করা হতো। কমরেড মাও সে-তুঙ তাঁর এই উপমায় এখানে কুওমিনতাঙ-এর মেকী 'জাতীয় বিধানসভাকে' ঐ 'শূকর ছানাদের পার্লামেন্ট-এর সঙ্গেই তুলনা করেছেন।

হার্লি-নীতির বিপদ সম্পর্কে

১২ই জুলাই, ১৯৪৫

এটা ক্রমেই বেশি বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, চীনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে যে নীতি তার রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিক জে. হার্লির মাধ্যমে ব্যক্ত হচ্ছে তা হল চীনে গৃহযুদ্ধের একটি সংকট সৃষ্টি করা। নিজের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি আঁকড়ে ধরে কুওমিনতাঙ সরকার আঠারো বছর আগে তার প্রতিষ্ঠার দিন থেকে গৃহযুদ্ধ ভাঙিয়েই টিকে রয়েছে; শুধু ১৯৩৬ সালের সিয়ানের ঘটনার সময় এবং ১৯৩৭ সালে চীনের বিরাট প্রাচীরের দক্ষিণাঞ্চলে জাপানী আক্রমণের সময় তা বাধ্য হয়ে একটা সময়ের মতো জাতিজোড়া গৃহযুদ্ধের নীতিটি পরিত্যাগ করে। কিন্তু ১৯৩৯ সাল থেকে বিরামহীনভাবে আবার আঞ্চলিক স্তরে গৃহযুদ্ধ ওরা চালিয়ে আসছে। কুওমিতাঙ সরকার নিজেদের লোকজনদের সমাবেশ করার জন্য প্রথমেই কমিউনিস্টদের 'বিরুদ্ধে লড়াই কর' এই শ্লোগানটি ব্যবহার করেছে, অন্যদিকে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে গৌণ পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে তাদের সকল সামরিক সমাবেশের লক্ষ্যমুখ আর জাপানী আক্রমণকারীদের প্রতিরোধের দিকে তাক করা নেই, তা নিবদ্ধ রয়েছে চীনের মুক্ত অঞ্চলগুলি থেকে 'হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের' দিকে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার দিকে। আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিজয় এবং যুদ্ধের পর শান্তিপূর্ণ পুনর্গঠন এই দুটোর দিক থেকেই এই পরিস্থিতিকে আমাদের গুরুতরভাবে হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এটাকে হিসেবের মধ্যে ধরেছিলেন, তার ফলেই তিনি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ অভিযান চালানোর জন্য কুওমিনতাঙকে সাহায্য করার নীতি গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন। ১৯৪৪ সালের নভেম্বরে হার্লি যখন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে ইয়েনানে এসেছিলেন তখন তিনি কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কত্ব অবসান এবং গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পরিকল্পনার সঙ্গে সহমত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তাঁর সুর বদল করে নিলেন এবং ইয়েনানে তিনি

এই সংবাদভাষ্যটি সিনহুয়া সংবাদ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লিখিত হয়েছিল।

যা বলেছিলেন তার খেলাপ করলেন। ২রা এপ্রিল ওয়াশিংটনে প্রদত্ত তাঁর বিবৃতিতে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে সেই একই হার্লি চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী কুওমিনতাঙ অপরূপ সুন্দরী এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে একটি জানোয়ারে পরিণত করে ছেড়েছেন বলে মনে হচ্ছে এবং তিনি সোজাসুজি ঘোষণা করেছেন যুক্তরাষ্ট্র চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নয়, শুধু চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গেই সহযোগিতা করবে। এটা অবশ্য হার্লির ব্যক্তিগত অভিমতামত নয়, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের বেশ এক-দল লোকেরই তা অভিমত। এটা একটা ভ্রান্ত আর বিপজ্জনক অভিমত। এই জটিল মুহূর্তেই রুজভেল্ট মারা গেছেন এবং হার্লি তাঁর পুরো মেজাজ নিয়ে চুংকিং-এর আমেরিকান দূতাবাসে ফিরে এসেছেন। হার্লির মাধ্যমে অভিব্যক্ত যুক্তরাষ্ট্রের চীন-নীতির বিপদ হচ্ছে এই যে তা কুওমিনতাঙ সরকারকে আরও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠতেই উৎসাহী করে তুলছে এবং গৃহযুদ্ধের সংকটকে আরও গভীরতর করে তুলছে। হার্লি-নীতি যদি অব্যাহত থাকে তবে যুক্ত-রাষ্ট্রের সরকারও চীনের প্রতিক্রিয়াশীলদের পচা আস্তাকুঁড়ে অপ্রতিরোধ্যভাবে ক্রমেই বেশি বেশি করে ডুবে যেতে থাকবে; কোটি কোটি জাগ্রত ও জাগরমান চীনা জনগণের বিরোধিতা একটি অবস্থানেই নিজেকে ঠেলে দেবে এবং বর্তমানের প্রতিরোধ-যুদ্ধে ও ভবিষ্যতের বিশ্বশান্তির পথে তা একটি প্রতিবন্ধই হয়ে দাঁড়াবে। এটা কি পরিষ্কার নয় যে এইটি হবে অনিবার্য পরিণাম? যুক্তরাষ্ট্রের জনমতের একটা অংশ এই বিপদের কথা ভেবেই হার্লি ধাঁচের চীন-নীতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন এবং তার পরিবর্তন চান কারণ চীনের ভবিষ্যৎ যা দেখা যাচ্ছে তাতে তাঁরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন চীনের জনগণের যে শক্তিগুলি স্বাধীনতা, মুক্তি ও ঐক্য দাবি করছেন তাঁরাই অপ্রতিরোধ্য এবং বৈদেশিক ও সামন্ততন্ত্রের নিপীড়নের অবসান ঘটানোর জন্য বিপুল বিক্রমে এগিয়ে যেতে বাধ্য। আমরা জানি না যুক্তরাষ্ট্রের নীতি পরিবর্তিত হবে কিনা বা হলেও কখন হবে। কিন্তু একটা বিষয় সুনিশ্চিত। চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে সাহায্য করার ও মদৎ জোগানোর এবং বিপুল সংখ্যক চীনা জনগণকে বিরুদ্ধভাবাপন্ন করে তোলার এই হার্লি-নীতি যদি অব্যাহতই থাকে তবে তা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও জনগণের ওপর দুঃসহ একটি ভার চাপিয়ে দেবে এবং তাদের অন্তহীন যন্ত্রণায় নিমজ্জিত করবে। এই ব্যাপারটি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে অবশ্যই বুঝতে হবে।*

কমরেড উইলিয়াম জেড. ফস্টারের কাছে প্রেরিত তারবার্তা

২৯শে জুলাই, ১৯৪৫

কমরেড উইলিয়াম জেড ফস্টার এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় কমিটি :

যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ সম্মেলনে ব্রাউডার-এর সংশোধনবাদী তথা আত্মসমর্পণবাদী লাইন[১] প্রত্যাখান করে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মার্কসবাদী নেতৃত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টিকে পুনরায় স্বমর্যাদায় ফিরিয়ে এনেছে এই সংবাদে আমরা আনন্দিত। এতদ্দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীর ও মার্কসবাদী আন্দোলনের এই বিরাট বিজয়ে আপনাদের আমরা উষ্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ব্রাউডারের যে গোটা সংশোধনবাদী-আত্মসমর্পণবাদী লাইন (তাঁর **তেহেরান** নামক পুস্তকে পুরোপুরি অভিব্যক্ত) তার মধ্যে মূলতঃ ফুটে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক-আন্দোলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী চক্রগুলোর কুপ্রভাব। ঐ চক্রগুলিই এখন চীনে তাদের প্রভাব প্রসারিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, তারা কুওমিনতাঙ-এর অন্তর্বর্তী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রটির যে নীতি জাতি ও জনগণের স্বার্থ-বিরোধী সেই ভ্রান্ত নীতিকেই সমর্থন করছে এবং এভাবে চীনের জনগণকে গৃহযুদ্ধের গুরুতর বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ও আমাদের দুটি মহান দেশের চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের স্বার্থকেই তারা ক্ষুণ্ণ করছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির অর্জিত ব্রাউডারের সংশোধনবাদী ও আত্মসমর্পণবাদী লাইনের বিরুদ্ধে এই বিজয়, যে মহান লক্ষ্যসাধনের জন্য চীন ও আমেরিকার জনগণ নিয়োজিত রয়েছে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এবং যুদ্ধের পর যে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক বিশ্ব রচনার ব্যাপার নিয়োজিত রয়েছে তাতে লক্ষণীয় অবদান জোগাবে।

১ আর্ল ব্রাউডার ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধকালে

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টিতে দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারা দেখা দেয় এবং ব্রাউডারই ছিলেন তার প্রধান মুখপাত্র। এই দক্ষিণপন্থী ভাবধারা একটি মার্কসবাদ-বিরোধী সংশোধনবাদী-আত্মসমর্পণবাদী লাইন হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠে। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরের পর থেকে ব্রাউডার তাঁর এই লাইন অনেক বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে প্রকাশ করেন এবং ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে তাঁর দক্ষিণ পন্থী সুবিধাবাদী কর্মসূচী হিসেবে তাঁর **তেহেরান** নামক বই প্রকাশ করেন। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে একচেটিয়া, ক্ষয়িষ্ণু ও মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ লেনিনবাদী এই মৌলিক বক্তব্যের সংশোধন করে এবং আমেরিকান পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতিকে অস্বীকার করে তিনি ঘোষণা করলেন—যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদের **নবীন** পুঁজিবাদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে (বড় হরফ ব্রাউডারের) এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সাধারণ স্বার্থ, রয়েছে। তাই তিনি একচেটিয়া ট্রাস্টের ব্যবস্থাটিকে রক্ষা করার ওকালতি করতে লাগলেন এবং শ্রেণী-সমন্বয়ের পথে অনিবার্য সংকট থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদকে রক্ষা করায় স্বপ্ন দেখেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদের এই অবাস্তব মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে এবং একচেটিয়া পুঁজির শ্রেণী-সহযোগিতার আত্মসমর্পণবাদী লাইন অপুসরণ করে ১৯৪৪ সালের মে মাসে ব্রাউডার আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টির বিলোপসাধনের ব্যবস্থা করেন এবং 'আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন' নামক একটি নির্দলীয় সংগঠন গড়ে তোলেন। প্রথম থেকেই ব্রাউডারের এই ভ্রান্ত লাইন কমরেড উইলিয়াম জেড. ফস্টারের নেতৃত্বাধীন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি বহু সংখ্যক সদস্যের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। ১৯৪৫ সলের জুন মাসে কমরেড ফস্টারের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন একটি প্রস্তাব নিয়ে ব্রাউডারের লাইনকে বাতিল করে, জুলাই মাসে একটি বিশেষ জাতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করে ও এই লাইনকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর যে অবস্থান ছিল শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর সেই অবস্থান আঁকড়ে থাকার জন্য এবং ট্রুম্যান প্রশাসনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি সমর্থন করার জন্য ও পার্টি-বিরোধী উপদলীয় কাজকর্মে যুক্ত থাকার জন্য ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পার্টি থেকে ব্রাউডারকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়।

জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে শেষবারের লড়াই

৯ই আগষ্ট, ১৯৪৫

৮ই আগস্ট জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সরকারের যুদ্ধ ঘোষণাকে চীনের জনগণ আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই কার্য ব্যবস্থা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বহু পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করে আনবে। যুদ্ধ ইতিমধ্যেই শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং জাপানী আক্রমণকারীদের ও তাদের সমস্ত আজ্ঞাবাহী কুকুরদের চূড়ান্ত আঘাত হানার সময়ই এখন উপস্থিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চীনা জনগণের সকল জাপ-বিরোধী শক্তিকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য মিত্রদেশসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও কার্যকর সমন্বয় রক্ষা করে জাতিজোড়া প্রতি-আক্রমণ শুরু করতে হবে। অষ্টম রুট সেনা-বাহিনী, নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং জনগণের অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীকে এই প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সকল আক্রমণকারী ও তাদের যেসব আজ্ঞাবাহী কুকুরেরা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করবে তাদের বাহিনীগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে, তাদের অস্ত্রপাতিগুলি এবং জিনিসপত্রগুলিকে দখল করতে হবে, সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুক্ত অঞ্চলকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং শত্রুর কবলিত অঞ্চলকে হ্রাস করে আনতে হবে। আমাদের সাহসের সঙ্গে এমন সব শত শত, হাজার হাজার সশস্ত্র টীম গড়ে তুলতে হবে যারা শত্রুর কবলিত অঞ্চলের পশ্চাদ্ভাগের অনেক গভীরে ঢুকে যাবে এবং শত্রুর যোগাযোগের লাইনগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য জনগণকে সংগঠিত করে তুলবে এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। অধিকৃত এলাকাসমূহের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে আমাদের সাহসের সঙ্গে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং অবিলম্বে আত্মগোপনকারী বাহিনী গড়ে তুলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি করতে হবে এবং বাইরে থেকে আক্রমণকারী সৈন্যদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। ইতিমধ্যে মুক্ত অঞ্চলের সংহতিসাধনকে অবহেলা করলেও চলবে না। ওখানকার দশ কোটি লোকের মধ্যে এবং যেসব এলাকায় জনসাধারণ যখনই মুক্ত হবে তখনই

তাদের মধ্যে সর্বত্র এই শীতে ও আগামী বসন্তেই আমাদের খাজনা ও সুদ হ্রাস করার কর্মনীতিটি কার্যকর করতে হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে হবে, সশস্ত্র গণরক্ষীবাহিনী গড়ে তোলার কাজ জোরদার করতে হবে, সৈন্যবাহিনীর শৃংখলাকে জোরদার করতে হবে, সমস্ত অংশের জনগণের যুক্তফ্রন্টকে বিকশিত করে তুলতে হবে, জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের অপচয়ের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এই সবগুলিই করতে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে আরও শক্তি সঞ্চারের জন্য। সমগ্র দেশের জনগণকে গৃহযুদ্ধের বিপদ এড়াবার জন্য সতর্ক থাকতে হবে এবং একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠনের ব্যাপারকে বাস্তব করে তোলার জন্য প্রয়াসী হতে হবে। চীনের জাতীয় মুক্তির যুদ্ধে এক নতুন স্তরই সমুপস্থিত হয়েছে এবং দেশের সমগ্র জনগণকেই তাদের ঐক্য ও চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য এই সংগ্রামকে জোরদার করে তুলতে হবে।